GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL LIBRARY, CALCUTTA.

Class No. 182. Qa.
Book No. 862. 13. 1839-1840 Sakas
N. L. 38.
MGIP Santh.—S1—30 LNL/58—9-4-59—50,000.
Vol. 19. Pt 3 No 885-896
Vol-19, Pt 4 No 897-907.
Rare Books

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞাননন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"

সম্পাদক

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ও

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

NATIONAL LIBRARY
Temp 3889
25/8/97
CALCUTTA

RARE BOOK

ঊনবিংশ কল্প

তৃতীয় ভাগ

১৮৩৯ শক

কলিকাতা

আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং আপার চিৎপুর রোড্

সাল ১৩২৪। খৃঃ ১৯১৮। সম্বৎ ১৯৭৪। কলিগতাব্দ ৫০১৭।

তত্ত্ববোধনী পাত্রিকা।

ঊনবিংশ কল্প, তৃতীয় ভাগ।

১৮৩৯ শক, ব্রাহ্মসম্বৎ ৮৮।

বর্ণানুক্রমিক বিষয়সূচী।

বিষয়	লেখক		পৃষ্ঠা।
অধ্যক্ষসভার কার্য্যবিবরণ (৩রা ভাদ্র ১৩২৪)		...	
অনন্ত ও কাল	শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী	...	১৩২
অষ্টাশীতিতম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব		...	২৭৩
আয়ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব (১৮৩৯ শক)		...	
আয় ব্যয় (১৮৩৯ শকের বৈশাখ—আষাঢ়)		...	১০১
আলোক ও অন্ধকার	শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়	...	৩১৫
আনন্দ (কবিতা)	শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এ	...	১৮১
আলো ও ছায়া (কবিতা)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	১৯০
আর্য্য-বিবাহের অভিব্যক্তি	শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ, বার-অ্যাট-ল,		২০৮,২৪৬, ৩০৮
আগে ও এখন (প্রসাদী পদচ্ছায়া)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	২১৫
উদ্বোধন	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	২৩
উন্নতি প্রসঙ্গ—		...	২৬১, ২৯১
বহু বিজ্ঞান মন্দির ; কংগ্রেস ও মুসলমান লীগ্ ; আর্য্য মৈত্রাত্র সম্মিলনী ; লবণের মূল্য বৃদ্ধি ; মদ্য কি ভারত হইতে তিরোহিত হইবে না ? মহম্মদীয় শিক্ষাবৈঠক এবং সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় যুদ্ধের পর ? ভারতে অশান্তির কথা	শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী	...	২২০
কংগ্রেস ; স্বায়ত্তশাসন ; ভারতের ব্রহ্মবাদী সম্মিলন ; গোরক্ষা সম্মিলন ; ভারতের মহিলা সম্মিলন ; ভারতে শিক্ষা বিস্তার ; অন্তর্হরণ (intern) করিবার সম্বন্ধে কয়েকটী কথা ; কৃষি চর্চ্চা ; দেশীয় রাজন্যবর্গ ; রাজনৈতিক সভাসমিতিতে ছাত্রগণের যোগদান নিষেধ ; পাশ্চাত্য জগতে ধর্ম্মভাবের জাগরণ ; ব্যবসায়ের উন্নতি ; কর্ম্মাভাবের কথা।			২৬১-২৯১
মাঘোৎসব ; বঙ্গবর্ণশিক্ষা ; একলিপি ও ভাষাবিস্তার ; স্বায়ত্তশাসন ; ভারতের শিল্প সম্মিলন ; শিল্প কারখানায় বিলোপ ; ওজন ও মাপের ঐক্যসাধন ; স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর		২৯১-২৯৯
ঋগ্বেদের প্রথম অনুবাদ	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	১১৫
একটী পত্র		...	১৩০
কলঙ্ক (কবিতা)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	২৫৪
করে যাব (কবিতা)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	২২০
কাতর প্রার্থনা	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	১৩১
কেন বসে (কবিতা)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	১০৩
কেবল তুমি (কবিতা)	শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এ	...	৩০৩
কেশবচন্দ্র—ব্রাহ্মসমাজে আগমনের পূর্ব্বে	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৩০৩
গতি	শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়	...	৭৫
গ্রন্থ পরিচয়	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	২০৫
গ্রন্থভাণ্ডারে প্রাপ্তিস্বীকার		...	২৭০
গান (কবিতা)	শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এ	...	১৪২, ১৯৮, ২১৩, ২৮২
গাও, বীণা গাও (কবিতা)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	১২
গার্হস্থ্য সংবাদ—			
শ্রীনরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এবং শ্রীপ্রেমরঞ্জন রায় চৌধুরীর উপনয়ন ; শ্রীনরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবাহ			১৫৮
৺প্রতীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে (প্রসাদী পদচ্ছায়া)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর		১৫৮
গীতা-রহস্য (টিলক প্রণীত)	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর		১৩,৪২,৬৩,৭৯,১১৯,১৩৫,১৭১,২২৭,২৫১,২৯৪,৩২১
ছুটি (গীতি নাট্য)	কথক—শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ন	...	১৪৭
জলমগ্ন ব্যক্তির মনের অবস্থা	শ্রীসংজ্ঞা দেবী	...	১৬
ডাকা (কবিতা)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	২৯

তত্ত্ববোধিনী সভার অস্তিত্ব বিলোপ	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	২৩৭
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ৭৫ বৎসরে পদার্পণ উপলক্ষে নব ক্ষেত্র সমাবেশ		...	১৪৬
তরুণ ক্রন্দন (কবিতা)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	১৩১
তান্ত্রিক বর্ণ বিবরণ	শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ	...	২০৬
তন্ত্রে তত্ত্বপদার্থ	শ্রীগিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ	...	১৭৭
তন্ত্রের দার্শনিক মত	শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ	...	১০৯
থাক্ পাছে (কবিতা)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৩০৭
দানপ্রাপ্তি		...	৩০২
দৈব ও পুরুষকার	শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়	...	১৯১
দিয়েছ ধরা (কবিতা)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৭৫
দিব্য বিরহ	শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ন	...	৫৩
ধর্ম্ম	শ্রীশঙ্করনাথ পণ্ডিত	...	২৮
ধর্ম্ম প্রচারের সহজ উপায়	কথক—শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ন	...	১২৭
ধর্ম্ম ও সুখদুঃখ	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	২১৫
ধর্ম্মানুষ্ঠানে ধৃতি	শ্রীশঙ্করনাথ পণ্ডিত	...	২৪৩
নববর্ষ (কবিতা)	শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এ,	...	২
নববর্ষ (কবিতা)	শ্রীপ্রসন্নময়ী দেবী	...	২২
নববর্ষে স্বাগত	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	২
নববর্ষের উপদেশ	শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৩৮
নীরবে (কবিতা)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	১৬৮
নূতন গান	শ্রীসরলা দেবী	...	২৭৩
পরাজয় (কবিতা)	শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এ	...	১৭৭
প্রভাতী উপাসনা (কবিতা)	শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ন	...	৮৬
প্রভাতী উপাসনা	কথক—শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ন	...	১৩৫
প্রাণ খুলে গাও (প্রসাদী পদচ্ছায়া)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	১৪৬
প্রেমের বাঁশী	শ্রীগৌরীনাথ চক্রবর্ত্তী	...	৪৭
বঙ্গদেশ ও বঙ্গভাষা	শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী	...	১৮১
বর্ষ বিদায় (কবিতা)	শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এ,	...	১
ব্রহ্মযোগ	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	২৭১
ব্রহ্মগোল ও দেবেন্দ্রনাথের হিমালয় ভ্রমণ	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	১৯৬
ব্রহ্মসাধনা	শ্রীগৌরীনাথ চক্রবর্ত্তী কাব্যরত্নশাস্ত্রী	...	৫
বাইবেল সংশোধন ও সত্যের অভিব্যক্তি	শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়	...	১৫১
ব্যাকুলতা (কবিতা)	শ্রীগৌরীনাথ চক্রবর্ত্তী কাব্যরত্নশাস্ত্রী	...	২০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের প্রকাশ	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	১৬০
ব্রাহ্মসমাজ ও বক্তৃতা	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৫৫
ব্রাহ্মধর্ম্মবীজের অভিব্যক্তি	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	২৪
ব্রাহ্মসমাজে অনূঢ়া-সমস্যা	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৯২
বৈয়াসিক ন্যায়মালা	শ্রীরামচন্দ্র শাস্ত্রী সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ ও শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি	...	১৮,১৫৩, ২২৪,৩১৭
বোধগয়া প্রাকের নূতন কথা	শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	...	৫০
ভারতের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কাউণ্ট ওকুমার উক্তি	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	১০৩
ভারতের ধর্ম্মতরঙ্গ	শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়	...	২৭৫
ভাষার উৎপত্তি	রায় বাহাদুর শ্রীসুরেশ চন্দ্র সিংহ বিদ্যার্ণব	...	২৬৮, ২৮৭, ৩২৯
ভাসাও তরী (প্রসাদী পদচ্ছায়া)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	১৮৭
ভোজরাজ	শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ	...	৭১
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চিত্রোন্মোচন		...	২৮৩
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ	বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী		২৮৩
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথে স্বাজাত্যবোধ ও সার্ব্বজাতিকতার সামঞ্জস্য	শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী বি-এ	...	২৮৫
মা (প্রসাদী পদচ্ছায়া)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	১৫৯
মাতাকে স্মরণ কর	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	১৫৯
মান্যবর শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহোদয়ের সম্মানলাভ		...	১৩০

মাতৃপূজা (প্রসাদী পদছায়া)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	২৪৩
মানবজীবন ও ব্রাহ্মধর্ম্ম	শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	২৭৪
মাতৃপূজা	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	২৭৮
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময় (কবিতা)	শ্রীনলিনীনাথ দাস গুপ্ত এম-এ, বি-এল, ...	১৯৫
মিলন (কবিতা)	শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এ ...	১৫২, ২৪৬
মূকের বাণী (কবিতা)	শ্রীনলিনীনাথ দাস-গুপ্ত এম-এ, বি-এল ...	৪৯
রঙ্গপুরের একখানি প্রাচীন পুথি	শ্রীগিরিজাকান্ত ঘোষ ...	৬১
রসায়ন বিজ্ঞানে জড়ের লক্ষণ	৺হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	১৯৮
রসায়ন বিজ্ঞানে পরমাণুর আকৃতি	৺হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	২৩৮
রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে (কবিতা)	শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এ ...	৩৭
রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার গান	ডাক্তার শ্রীজিতেন্দ্রপ্রসাদ বসু ...	১৮৭
রাণাডের স্মৃতি কথা	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ৩৩, ৫৮, ৯৬, ১১২, ১৮৪, ২০০, ২৬৬, ৩২৬	
রামপ্রসাদের মাতৃসাধন	শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ...	৭
লিঙ্গায়তদিগের ধর্ম্মমত	শ্রীকালীপ্রসন্ন বিশ্বাস ...	১৬৮
লিঙ্গায়ত সম্প্রদায়	শ্রীকালীপ্রসন্ন বিশ্বাস ...	৩০
লিঙ্গায়ত ভিক্ষুক ও উৎসব	শ্রীকালীপ্রসন্ন বিশ্বাস ...	১৪৩
শোক-সংবাদ—		
নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস ; মৃণালিনী বিশ্বাসজায়া ; ৺কান্তিচন্দ্র মিত্র ; ৺ব্রতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ; ৺ভাই দীননাথ মজুমদার ; ৺ কবি গোবিন্দচন্দ্র রায় ; ৺হেমেন্দ্রনাথ সিংহ ; ৺শক্তিপতি মুখোপাধ্যায় ; সার চন্দ্রমাধব ঘোষ	৭৪, ১৫৮, ২১৪, ২৭১, ৩০২	
সহজ হ' (কবিতা)	শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এ ...	১১২
সন্ধ্যায় (কবিতা)	কথক—শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ন ...	২২৭
সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে ধর্ম্ম ও নীতি	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	২২
সম্মুখে (কবিতা)	শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এ ...	৯১
স্বরলিপি—		
নাহি সূর্য্য, নাহি জ্যোতিঃ, নাহি শশাঙ্ক সুন্দর— বহু দূর হ'তে আসিয়াছি	শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা ...	৪০
সাগরের প্রতি (কবিতা)	শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা ...	২৩৫
সারনাথ	শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ, বার-অ্যাট-ল ...	১০১
সারস্বত গীত (কবিতা)	শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ...	৮৭
সাহিত্যিকগণের প্রতি নিবেদন	শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ ...	৩১৫
সুন্দর (কবিতা)	...	২১৪
	শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল ...	২২৪

একমেবাদ্বিতীয়ং

ঊনবিংশ কল্প
তৃতীয় ভাগ।
বৈশাখ, ব্রাহ্মসম্বৎ ৮৮।

৮৮৫ সংখ্যা

১৮৩৯ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্॥
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"

বর্ষ বিদায়।

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এ)

জান্‌তে আমি পারিনি তো
বরষ কখন চলে গেল
শুধু বুকের মাঝে সুরে বাজে
বরষ গেল বরষ গেল!
ওরে অবোধ, বরষ গেল!
কখন গেল, কবে গেল
এই তো আকাশ এই তো ধরা—
তবুও সুর প্রাণে বাজে
বরষ গেল বরষ গেল
শেষ বিদায়বাঁশী বাজিয়ে দিয়ে
ঐ মিলালো রে মিলালো!
এমনি করেই যেতেছে দিন
ওরেরে ও অবোধ মন
এমনি করেই বাজিয়ে বাঁশী
চলেছে দিন চলেছে ক্ষণ।
আছিস্ কেবল ঘুমের ঘোরে—
ভাঙ্গবে কবে ভাঙ্গবে কবে
আর কতদিন চেতনবিহীন
এম্‌নিতর কাট্‌বে ভবে?
ওরে ঐ সুরই ফুল গেয়ে গেল
পাখীও গান বাজিয়ে গেল
দিনের আলো নিলীন হ'ল
ঐ সুরই যে শুনিয়ে গেল।
ওরে আরও কত যাবে যে দিন
ঐ গানটাই গেয়ে গেয়ে—
ওরে মন, আকাশ পানে চেয়ে চেয়ে
আর কতদিন র'বি রে লীন!
ওরে মন জীবনে যে সন্ধ্যে হবে
এম্‌নি তো দিন নাহি র'বে
কেউ জান্‌বে নাকো কখন গোলি
তবু সন্ধ্যে হবে সন্ধ্যে হবে!
ওরে এম্‌নিতরই রবে আকাশ
এমনিতরই ব'বে বাতাস
সূর্য্যতারায় এমনিতরই
হবে সোণার আলো বিকাশ।
তবু তুই তো সেদিন লুপ্ত হ'বি
কোন সাগরে মিলিয়ে যাবি
একটি তারাও বল্‌বে নাকো
কোথায় যাবি কোথায় র'বি।
ওরে বরষকে তোর প্রণাম দে
বাধা বাঁধন খুলে দিক্ সে
হাসিকান্না ফুটিয়ে তুলুক
আবার নবীন সাজে এসে।
বরষ গেল, বরষ গেল
বিদায় প্রণাম করে নে ভাই
কত যে দান দিয়ে গেল
প্রাণে যেন সেইটুকু পাই॥

নববর্ষ।

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এ)

নূতন দিনে নূতন কথা
নূতন ব্যথা জানা'ব
নূতন দিনে নূতন করে
মনকে তোমায় মানা'ব।
নূতন গানে নূতন তানে
নূতন প্রাণে দাঁড়াব
নূতন করে নেব তোমায়
নূতন গীতি শুনাব।
এমনি করে নূতন করে
নেব তোমায় বারে বারে
পুরাতনের মাঝে কেবল
নূতনেরেই আনাব॥

নববর্ষে স্বাগত।

নববধূ যেমন নিত্য নব নব সাজে সজ্জিত হইয়া, নিত্য নূতন ভূষণে ভূষিত হইয়া সকলের হৃদয়ে আনন্দধারা ঢালিয়া দেন, হে নববর্ষ তুমিও তেমনি নিত্য নূতন শ্রীতে সুশোভিত হইয়া, নিত্য নবতর ভাবসমূহের অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া আমাদের হৃদয়ে আনন্দ বিধান কর। নবজাত শিশু যেমন পিতামাতার হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব স্নেহ-প্রীতি উৎপাদন করে, তুমিও, হে নববর্ষ, সেইরূপ আমাদের সকলকে তোমার প্রতি স্নেহপ্রীতির সুদৃঢ় আকর্ষণে টানিয়া লও। তোমাকে আমরা স্বাগত সম্ভাষণ করিতেছি। গত বর্ষের গর্ভে তুমি যখন বাস করিতেছিলে, সেই সময়েই তোমার সুলক্ষণের পূর্ব্বাভাস সকল স্পষ্টই দেখিতে পাইয়াছিলাম। সেই সকল পূর্ব্বাভাস হইতেই আমরা সুন্দররূপে উপলব্ধি করিতেছি যে তুমি কি প্রকারে ভাবগরিষ্ঠ ও প্রেমদৃঢ়িষ্ঠ হইয়া বর্দ্ধিত হইবে। বীর নেপোলিয়নের মাতা নানা বিপদ আপদের মধ্যে, নানা দুর্দিন দুর্য্যোগের মধ্যে যে সন্তানের জন্মদান করিয়াছিলেন, আজ সেই সন্তান জগতের মধ্যে অদ্বিতীয় বীর, অদ্বিতীয় কর্ম্মী বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। সেইরূপ হে নববর্ষ, তোমার জননী যে দুঃখদুর্দিনের মধ্যে যে লোকক্ষয়কর মহাসমরের মধ্যে তোমাকে জন্মদান করিয়াছেন, কে বলিতে পারে যে তুমি জ্ঞানে বিজ্ঞানে, ধর্ম্মে কর্ম্মে সকল বিষয়ে ভারতে নবযুগ আনয়ন করিবে না? গত বর্ষের প্রথমাবধি নবযুগ আবির্ভাবের প্রবল আশ্বাস লাভ করিয়াছিলাম। কে জানে যে জ্ঞানের ধর্ম্মের কর্ম্মের ও সত্যের সেই নবযুগ এই বৎসরে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে না? পূর্ব্বাভাসের দ্বারা যদি কোন ঘটনার কিছুমাত্র পরিচয় পাওয়া যায়, তবে আমাদের বর্ত্তমান বৎসরের ভিতরেই নবযুগ সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিবার আশা কিছুতেই নিষ্ফল হইবে না, ইহা আমরা খুবই দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি।

গত বৎসর পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে মাদক দ্রব্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম যে প্রকার অবিশ্রামে চলিয়াছে, তাহাই তো নববর্ষকে দ্রঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ করিবার অন্যতর উপায়। একথা সত্য যে ভারতের বিলাতবাসী মূল গবর্ণমেণ্ট পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় এদেশে সুরা উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব গ্রাহ্য করেন নাই, কিন্তু পাশ্চাত্য দেশের সুরা-বিরোধের বাতাস যে আমাদের দেশকেও নিঃসন্দেহ স্পর্শ করিবে সে কথা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই। আর, তার পর, আজ গবর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাব গ্রাহ্য করিলেন না, কিন্তু পরে, এই লোকক্ষয়কর মহাসমরের পরে এদেশ রক্ষার জন্য যখন এদেশ হইতেই সেনা সংগ্রহের প্রয়োজন হইবে, তখন সুরা প্রভৃতি মাদক দ্রব্য সেবনে অনুপযোগিতার কারণে লোকের অভাব অনুভূত হইলেই গবর্ণমেণ্টকে নিশ্চয়ই অনুতপ্ত হইতে হইবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপে দেখি যে ইংলণ্ডে স্বয়ং সম্রাট সুরা বর্জ্জনের দৃষ্টান্ত দেখাইলেও সেখানে সুরাসেবন সম্পূর্ণ প্রতিরুদ্ধ হইতেছে না বলিয়া তথাকার নেতৃবর্গ দুঃখিত ও ভীত হইয়া উঠিতেছেন।

গত বৎসর দেশে ও বিদেশে সরল ও সবল সত্যধর্ম্মের প্রতি প্রবল আস্থার স্রোত অন্তঃসলিলভাবে কিন্তু অপ্রতিহত বেগে প্রবাহিত দেখিতে পাই। এক সময়ে ভারতে অশোক প্রভৃতি রাজাগণ যে ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। এখন যদি আমাদের রাজার জাতি সত্যধর্ম্মের প্রতি আস্থাবান হইয়া উঠে, তাহা হইলে

এদেশেও যে সত্যধর্ম্মের একটা প্রবল বন্যা আসিয়া এদেশকে ভাসাইয়া দিবে না, তাহা তো বিশ্বাস হয় না। এদেশ যে সেই অতি পুরাকাল হইতেই সত্যধর্ম্ম গ্রহণের জন্য উন্মুখ হইয়া আছে। ভারতের পুণ্য কথাসকল দেশ হইতে দেশান্তর পরিভ্রমণ করিয়া, সমুন্নত জাতিগণের স্বীকৃত হইয়া আবার এদেশে ফিরিয়া আসিতেছে, আবার এদেশবাসীদিগের অন্ধ হৃদয় উন্মুক্ত করিয়া স্বীয় ভাস্বর জ্যোতিতে আলোকিত করিয়া তুলিতেছে। সমস্ত জগত জানিত যে ভারতবর্ষ ধর্ম্মের নামে যোগের নামে ধর্ম্মাভাসের একটা মোহমদিরায় ডুবিয়া আছে। কেহই আশা করিতে সাহস করে নাই যে ভারতবাসী বিজ্ঞানে পাশ্চাত্যদিগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হইবে। নবযুগে প্রকৃতি ভারতবর্ষকে এক আশ্চর্য্য উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়া দিবে বলিয়াই ভারতবাসীকে সকল বিষয়ে সত্যসমূহ সঞ্চয় করিবার অবসর দিতেছে। সম্মুখের উন্নতিশিখরে উঠিতে হইবে জানিয়া আমাদিগকে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে হইবে। বৃথা কোলাহল বৃথা মানমর্য্যাদার আশা পরিত্যাগ করিয়া সত্যের অন্বেষণে ধর্ম্মের অন্বেষণে, জ্ঞান বিজ্ঞানের তত্ত্বান্বেষণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া পরিশ্রম করিতে থাক, নিজেও প্রকৃত শান্তি লাভ করিতে পারিবে এবং দেশকে ও সমগ্র জগতকে শান্তিপ্রদানে সমর্থ হইবে।

গতবর্ষে একটী মহান কার্য্য সাধিত হইবার সূত্রপাত হইয়াছে—শাসন বিষয়ে স্ত্রীলোকের মতামত গ্রহণ। যখন ইংলণ্ডে কয়েকটী স্ত্রীলোক আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া ভোটের দ্বারা পার্লামেণ্টে নিজেদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিয়া তাঁহাদের দ্বারা শাসনবিষয়ে নিজেদের মতামত জানাইবার অধিকার প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদিগকে পাগল প্রভৃতি আখ্যা দিয়া সে কথা উড়াইয়া দিবার বিশেষ চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহাদের অধ্যবসায় অদম্য—তাঁহারা সেই অধিকার প্রাপ্তির চেষ্টা হইতে কিছুতেই বিরত হয়েন নাই। কেবল যুদ্ধের কারণে তাহা স্থগিত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু আজ সেই যুদ্ধের ফলেই গবর্ণমেণ্ট হইতেই স্ত্রীলোকদিগকে ভোট দিবার অধিকার দানের কথা উপস্থিত করা হইয়াছে এবং উপস্থিত করিবার সময়ে জানানো হইয়াছে যে গবর্ণমেণ্টের অধিকাংশ কর্ম্মচারীই এই অধিকার দিবার পক্ষপাতী। স্ত্রীলোকদিগকে এই অধিকার দেওয়া হইলে জগতে মঙ্গলপ্রসূ নবযুগের যে সূচনা হইবে সে বিষয়ে আমাদের কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। একদিকে ইংলণ্ড, অপরদিকে রষিয়া, ইউরোপের দুইপ্রান্ত হইতে এই শুভ প্রস্তাব দেখা দিয়াছে। আমাদের বিশ্বাস যে এবারে এই অধিকার হইতে স্ত্রীলোকদিগকে আর কিছুতেই বঞ্চিত করা যাইবে না।

রষিয়ার কথা বলিলেই আজকাল রুষসম্রাটের পদত্যাগের কথাই সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়। আলোচনা করিলে এক্ষেত্রেও ধর্ম্মের ইঙ্গিত দেখা যাইবে। একদিকে সমগ্র দেশ সরল ও সবল সত্যধর্ম্ম লাভের জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিতেছে, অপরদিকে রুষসম্রাট ও তাঁহার পরিবার প্রাচীন কুসংস্কারের মধ্যে আপনাদিগকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। একদিকে রুষিয়ার জনসঙ্ঘ জ্ঞানে বিজ্ঞানে উন্নতির অভিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছে, অপরদিকে সম্রাটপরিবার অজ্ঞানের অন্ধকারে পড়িয়া বিজ্ঞানের বিরুদ্ধ উপায় অবলম্বনে যুবরাজের চিকিৎসা করাইতে গিয়া এক দুর্নীতিপরায়ণ পাদরি র‍্যাসপুটিনের কবলে গিয়া পড়িলেন। সম্রাটতনয় অসুস্থ,—র‍্যাসপুটিন সম্রাটপরিবারকে বুঝাইলেন যে তাঁহার নিজের জীর্ণ ও মলিন কন্থা দ্বারা সম্রাটতনয়কে একবার আচ্ছাদন করিলেই তাঁহার সকল রোগ দূর হইবে। এদিকে র‍্যাসপুটিন, জর্ম্মনির জয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সম্রাটের সকল কার্য্য পরিচালনের উপদেশ করিতে লাগিলেন। লক্ষ লক্ষ লোক নিহত হইতে লাগিল, কোটী কোটী অর্থ ব্যয় হইতে লাগিল, অথচ রষিয়া পদে পদে পরাজয় সহ্য করিতে লাগিল। কাজেই তখন বর্ত্তমান যুগের যুগধর্ম্ম জাগ্রত হইয়া উঠিল, সেই ধর্ম্মবিরহিত র‍্যাসপুটিন নিহত হইলেন, রসিয়ার সম্রাট পদত্যাগপূর্ব্বক প্রজাগণের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন এবং রষিয়াতে সাধারণ তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। এই সাধারণতন্ত্রের যে আকার দিবার কথা হইয়াছে, তাহাতে স্ত্রীলোকদিগকেও পুরুষের সহিত ভোট দিবার সমান অধিকার দেওয়া হইতেছে।

গতবর্ষে এই ভারতে একটী যুগধর্ম্ম প্রকাশ পাইয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে শ্বেত ও কৃষ্ণ চর্ম্মের মধ্যে ভেদজ্ঞানটী বড়ই প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। অনেক লোকক্ষয়ের ফলে এই ভেদজ্ঞান দূর হইবার মাত্র উপক্রম হইয়াছে। এখনও যদি পাশ্চাত্য জগত উদ্ধত গর্ব্বের মধ্যে বাস করিয়া যুগধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি না করে এবং শ্বেতকৃষ্ণের মধ্যে ভেদজ্ঞান বিদূরিত করিয়া না দেয়, তবে তাহাকে আরও কত ভীষণ আঘাত সহ্য করিতে হইতে পারে তাহা কে বলিতে পারে?

আমাদের দেশে যদি নবযুগকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও মঙ্গলপ্রসূ করিতে চাই, তবে আমাদিগকে যুগধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া চলিতে হইবে। আমাদের প্রত্যেক কর্ম্মে প্রত্যেক অনুষ্ঠানে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে আমরা যুগধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতেছি কি না। একটী যুগধর্ম্ম দেখিতেছি—সত্যধর্ম্মের প্রতি আস্থা। আমাদের প্রত্যেক কর্ম্মে দেখিতে হইবে যে আমরা ঈশ্বরকে লক্ষ্য রাখিয়া কর্ম্ম করিতেছি, অথবা অর্থ মানমর্য্যাদাকেই আমাদের কার্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা করিয়া তুলিতেছি। আমাদের দেশে সত্যধর্ম্মের প্রতি আস্থার একটা বাতাস উঠিয়াছে সত্য, কিন্তু এখনও আমাদের দেশ সত্যধর্ম্মকে, যে ধর্ম্মের বলে মানবাত্মা স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়া ভগবানের সিংহাসনতলে ছুটিয়া যাইতে পারে, সেই সত্যধর্ম্মকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। এক সময়ে ইহাকে গ্রহণ করিতেই হইবে, কিন্তু আশঙ্কা হয়, পাছে ভবিষ্যতে দেশকে পুনরায় বশিষ্ঠবিশ্বামিত্রের মহাসংগ্রামের ভিতর দিয়া গিয়া প্রকৃত সত্যধর্ম্মকে পাইতে হয়।

আমরা যে প্রকৃত সত্যধর্ম্মকে অবলম্বন করি নাই তাহার একটী প্রধান পরিচয় হইতেছে এই যে এখনও আমরা পরস্পরকে ভ্রাতৃভাবে গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। আমরা শ্বেতকৃষ্ণের প্রভেদ উঠাইয়া দিবার জন্যই কেবল চীৎকার করিলে হইবে কি, আমাদের নিজেদেরও মধ্যে উচ্চনীচভেদ উঠাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমরা মনে করি যে উচ্চনীচের ভেদ পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখিব। কিন্তু ভগবানের তেজঃকণা লইয়া যে মানুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছে সে মানুষ কখনও চিরকাল সেই ভেদমূলক অবজ্ঞা নীরবে সহ্য করিতে পারে না। প্রকৃতির নিয়মে সেই অবজ্ঞা সমগ্র সমাজকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিবে। একটী প্রবাদ আছে যে মেষকে কোন পশু আক্রমণ করিতে গেলে মেষ চক্ষু বন্ধ করিয়া মনে করে যে কেহ তাহাকে দেখিতে পাইতেছে না। সেইরূপ আমরা যদি চক্ষু বন্ধ করিয়া থাকি তাহা হইলে আমাদের বিপদ দেখিতে পাইব কি প্রকারে? কিন্তু ভারতের বিভিন্ন স্থানে উন্মুক্ত নয়নে পরিভ্রমণ করিয়া আইস, দেখিবে যে সমাজ কিরূপ ভগ্নদশা প্রাপ্ত হইতেছে। তোমরা সমাজের উচ্চাসনে বসিয়া নিম্নশ্রেণীর স্পৃষ্ট অন্ন ভক্ষণে অসম্মত। তোমাদেরই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া সেই নিম্নশ্রেণীরদিগেরও মধ্যে, এমন সকল সম্প্রদায় উত্থিত হইয়াছে ও হইতেছে, যাহারা উচ্চবর্ণের স্পৃষ্ট অন্ন ভক্ষণ অধর্ম্ম মনে করিতে শিক্ষিত হইতেছে।

আমাদের মধ্যে বর্ণভেদ ছাড়িয়া দিলেও, আমরা কি এখনও পরস্পরকে স্নেহপ্রীতি করিতে শিক্ষা করিয়াছি? এই সেদিন দেখি যে একটী সংবাদপত্র অপর এক সংবাদপত্রকে "আস্তাকুঁড়ের কুকুর" বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। এরূপ তীব্র গালি দিবার কোনই কারণ ছিল বলিয়া দেখিতে পাইলাম না। পরস্পরে মিলিতভাবে কোথায় দেশের হিতসাধনে অগ্রসর হইব—না, তাহার পরিবর্ত্তে আমরা পরস্পরে বৃথা কলহ করিয়া মরিব? এই সেদিন দেখি যে পথের ধারে ফেরীওয়ালারা একটী সংবাদপত্র বিক্রয়ের ধুয়া ধরিয়াছে যে তাহাতে গালাগালি আছে। তোমরা সহস্র উপায়ে স্বদেশী প্রচার কর, কোনই ফল হইবে না, যদি এই সংবাদপত্র প্রভৃতির সাহায্যে গালাগালি দিবার বিষময় বিদেশী প্রথা বর্জ্জন করিতে না পার। তোমরা বলিবে যে পেটের দায়ে এরূপ প্রথা অবলম্বন করিয়াছ। যে পেটের দায় সমগ্র দেশের অহিত উৎপাদন করিয়া নিজের স্বার্থসাধনের চেষ্টা করে সে পেটের দায়কে ধিক।

এই নববর্ষের উন্মেষে আমরা আর একটী বিষয় উল্লেখ করিতে বাধ্য হইতেছি। যেমন পেটের দায়ে গালাগালির খরতর স্রোত নামিয়াছে, সেইরূপ আর্টের নামে অশ্লীলতার স্রোত দেশকে ঘিরিয়া ফেলিবার উপক্রম করিতেছে। যে আর্ট অশ্লীলতাকে

উলঙ্গ আকারে ব্যক্ত করিয়া নিজেকে আর্ট বলিয়া আত্মপরিচয় দিতে চাহে সে আর্টকে ধিক। তোমরা স্বদেশহিতৈষী বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিতে চাও, অথচ এই উলঙ্গ অশ্লীলতার সমর্থনে দেশকে কিরূপ ভীষণ পাপের স্রোতে ডুবাইবার চেষ্টায় আছ, সেটা তোমাদের একবার মনে আসিল না? ইতিহাসে উলঙ্গ অশ্লীলতা প্রচারের ফলে দেশবিদেশের ছারখার হইবার ফল প্রত্যক্ষ করিয়াও আজ তুমি কেমন করিয়া আর্টের দোহাই দিয়া উহার প্রশ্রয় দিতেছ? উলঙ্গ অশ্লীলতাই যদি আর্ট হয়, তবে তোমরা কাম ক্রোধ প্রভৃতি বিষয়ে মানবের পাশবিক আচরণে চমকাইয়া উঠ কেন? কামের উত্তেজনায় পশুধর্ম্ম অনুসরণ করিয়া মানুষ ব্যভিচারে রত হইলে ব্যভিচারীর প্রতি তোমাদের ঘৃণাদৃষ্টি ও রুদ্রদণ্ড উত্তোলিত হয় কেন?

প্রকৃতিকে বিকৃতির চক্ষে এবং বিকৃতিকে প্রকৃতির চক্ষে দেখিলেই তো ধ্বংস নিকটবর্ত্তী বলিয়া বুঝিতে হইবে। আমরা দেশকে বিনাশ হইতে রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলে যুগধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়া আমাদিগের নববর্ষকে সাধুভাবের অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া, স্নেহ প্রেম ও ভগবৎপ্রীতির সুশোভন সজ্জায় সজ্জিত করিয়া স্বাগত সম্ভাষণে আহ্বান করিয়া লইতে হইবে। আমাদের প্রত্যেকের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে হইবে যে নববর্ষে অন্যায় অধর্ম্মের পথে পদার্পণ করিব না, এবং ঈশ্বরের প্রতি হৃদয়ের সমুদয় প্রীতি সমর্পণ করিয়া তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনে নিরত থাকিব। আমরা আর কিছু চাহি না—একটী বৎসর এই প্রণালীতে কার্য্য করিয়া তোমরা দেখ যে কি ফল হয়। মিষ্ট যে একেবারেই আস্বাদ করে নাই তাহাকে মিষ্ট আস্বাদ কিরূপ বুঝানো যেরূপ কঠিন, সৎপথে না চলিলে সৎপথে চলার ফলও বুঝানো সেইরূপ কঠিন।

নববর্ষে ঈশ্বর আমাদের সহায় হউন।

ব্রহ্মসাধনা।

ভগবৎ-সাধনা জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। ভগবানের জন্য জীবমাত্রেই ব্যাকুল। জীব স্বভাবত ভগবানকেই চাহে। সেই ভগবানকে পাইবার জন্য সকলেই সজ্ঞানে হউক অজ্ঞানে হউক চেষ্টা করিতেছে। যিনি তাঁহার পথ খুঁজিয়া পাইতেছেন তিনি সেই পথে অগ্রসর হইয়া ভগবানকে লাভ করিতেছেন, আর যিনি বিপথে ভ্রমণ করিতেছেন তিনি পথভ্রান্ত হইয়া দিশাহারা হইতেছেন, বিপদসঙ্কুল স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইতেছেন, কণ্টকাদিপূর্ণ গভীর গর্ত্তে নিপতিত হইতেছেন।

জীব সর্ব্বদা কি খুঁজে? তাহার প্রাণের বস্তু খুঁজে—যে বস্তুটীকে পাইয়া সে চির আনন্দ লাভ করিবে তাহাকেই খুঁজে। বর্ত্তমান অবস্থায় সে সুখী নহে। সে আপনাকে অসম্পূর্ণ মনে করিতেছে—কি যেন একটা অভাব মনে করিতেছে। কি যেন একটা হারাইয়া ফেলিয়াছে—সেই হারাণ জিনিষটার জন্য তাহার মন সর্ব্বদাই উৎকণ্ঠিত—সর্ব্বদাই ছট্‌ফট্ করিতেছে, ফাঁকা ফাঁকা বোধ করিতেছে। সেই জিনিষটীকে পাইলেই সে সম্পূর্ণতা লাভ করিবে এই মনে করিয়া সর্ব্বদাই তাহাকে খুঁজিতেছে। ছাই পাঁশ যাহা সম্মুখে পড়িতেছে তাহাই উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতেছে তাহার মধ্যে সেই জিনিষটী আছে কি না।

সাধারণ ভাষায় সেই জিনিষটীর নাম সুখ বা আনন্দ। কিন্তু এই সুখ বা আনন্দ কি পদার্থ? কোন্ বস্তু পাইলে আমরা সুখী হই—কেন হই? ঐ উদ্যানের প্রস্ফুটিত কুসুমটী দেখিয়া আমরা তাহার সৌরভে ও সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হই, তাহার পানে ধাবিত হই, তাহাকে নিকটস্থ করিবার ইচ্ছা করি। কেন করি? কুসুমে কি শক্তি আছে যে সে আমার মনকে চুম্বকশলাকা যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে সেইরূপ আকর্ষণ করে? কুসুম সুন্দর ও সুগন্ধ একথা বলিলেও ঐ প্রশ্নের সম্পূর্ণ উত্তর হয় না। সুন্দর ও সুগন্ধ বস্তু কেন আমার মনকে আকর্ষণ করে? জগতে নানা প্রকারের আকর্ষণ আছে। আকর্ষণগুলি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হইলেও তাহারা মূলত এক। আসলে পৃথক নহে। সেই আকর্ষণের বলে সরূপ বস্তু সকল পরস্পরে মিলিয়া একীভূত হইতে চায়। আপাত প্রতীয়মান জগতে পরস্পর-ভিন্নতা অভিব্যক্ত হইলেও এই ভিন্নতার ভিতরে যে একটী বিরাট একতা

আছে তাহা বর্ত্তমানে বিজ্ঞান সপ্রমাণ করিয়াছে।

ব্রহ্মাণ্ডের কারণ ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয় বলিয়াই তাঁহা হইতে ঐ একতার ভাব নামিয়াছে। ব্রহ্মেরই শক্তির অভিব্যক্তি বা বিকাশে এই ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি। নিখিল ব্রহ্মাণ্ড সেই ব্রহ্মরূপ অনন্তপ্রেমজলধির অনন্ত তরঙ্গমালা। তরঙ্গগুলি পরস্পর ভিন্ন বোধ হইলেও তাহারা মূলে সেই অনন্তপ্রেমজলধি হইতে ভিন্ন নহে। তরঙ্গগুলি পরস্পর মিলিত হইতে চাহে—এইটী তাহাদের সাধারণ ধর্ম্ম, কারণ তাহাদের মধ্যে একই প্রেম, এক শক্তিই কার্য্য করিতেছে। তাই তুমি আমার সঙ্গে মিলিতে চাও আর আমি তোমার সঙ্গে মিলিতে চাই এবং মিলিয়া সুখী হই। তাই ঐ উদ্যানস্থ বিকশিত কুসুম, গগনতলে পূর্ণ শশধর, গিরি নদী বন প্রান্তরের কমনীয় কান্তি, শিশুর হাসি আমাদের প্রাণ রজ্জুকে আকর্ষণ করে। আমরা পরস্পর এক জাতীয় বস্তু। আমরা সেই অনন্তপ্রেম মহানিধির এক এক বিন্দু বারি বা এক একটী তরঙ্গ। আমরা পরস্পর মিলিতে চাই, আমরা সকলে মিলিয়া এক হইয়া যাইতে চাই, আমরা একা একা থাকিতে ভাল বাসি না। আমাদের পৃথক থাকার অবস্থাটা আমাদের সুখের অবস্থা নহে। উহা একটা অভাবের অবস্থা, অসম্পূর্ণ অবস্থা। আমরা সম্পূর্ণ হইতে চাই, এক অদ্বিতীয় পরব্রহ্মে মিলিত হইতে চাই। তাহা হইতে পারিলে আর কোন অভাব থাকিবে না, কোন স্পৃহা থাকিবে না—তখন অনন্ত আনন্দ অনন্ত সুখ!

আমরা সকলে সেই অনন্ত আনন্দই খুঁজিতেছি এবং যতক্ষণ তাহা না পাইতেছি ততক্ষণ আমাদের অভাব মোচন হইতেছে না। সেই অনন্ত আনন্দের অংশ তোমাতে আছে, আমাতে আছে, চন্দ্রে আছে, সূর্য্যে আছে, অনন্ত জগতে বিন্দু বিন্দু ভাবে ছড়ান আছে। সেই ভূমা আনন্দের অংশ পাইয়া আমাদের অভাব দূর হয় না, পক্ষান্তরে উত্তরোত্তর আনন্দতৃষ্ণা বৃদ্ধিই হইতে থাকে। যতক্ষণ না সেই পূর্ণ আনন্দকে পাইব ততক্ষণ এই তৃষ্ণার নিবৃত্তি হইবে না। এই অনন্ত আনন্দপ্রাপ্তির চেষ্টাই ব্রহ্মসাধনা। আমরা সকলে সজ্ঞানে হউক আর অজ্ঞানে হউক যদিও সেই পথে ধাবিত, কিন্তু অনেক সময় প্রকৃত পথ খুঁজিয়া না পাইয়া পথভ্রান্ত হইয়া পড়িতেছি। আমরা সকলে সুখ খুঁজিতেছি—ইহা ভগবৎসাধনার ইচ্ছা সন্দেহ নাই, কারণ যাহা খুঁজিতেছি তাহা সেই নিত্য আনন্দেরই আভাস। কিন্তু আভাসে ত অভাব মোচন হইবে না। আমরা চাই অসীম আনন্দ অসীম ও অনন্তকাল স্থায়ী আনন্দ। সসীম আনন্দ প্রকৃত আনন্দ নহে। ফুল ত কাল শুকাইয়া যাইবে। বসন্তকাল চলিয়া গেলে ত মলয় হিল্লোল আর বহিবে না, পুত্র কলত্রের ভালবাসা ত চিরকাল পাইবার আশা নাই। যে প্রেমের আদি নাই অন্ত নাই—সেই প্রেম যতক্ষণে না পাইব ততক্ষণ ত মনের আকাঙ্ক্ষা মিটিবে না, খোঁজা শেষ হইবে না। সেই অমৃত সলিল যতক্ষণ না পান করিব ততক্ষণ কি পিপাসা মিটিবে? মরীচিকাভ্রান্ত পথিকের কি সর্ব্বনাশ হয় না?

ব্রহ্মসাধনা আমাদের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। আমরা সকলে সুখ অন্বেষণ করিতেছি এবং অনন্ত সুখে সুখী হইতেও চাহিতেছি। কিন্তু অনন্ত সুখ কিসে পাওয়া যায় সে বিষয়ে মনোযোগ দিইনা। যে অনন্তপ্রেমমহানিধি হইতে আমরা বিক্ষিপ্ত হইয়া পৃথক হইয়া পড়িয়াছি, যতক্ষণ না সেই অনন্ত সাগরে আবার মিলিয়া যাইতে পারিব ততক্ষণ অনন্ত সুখ কোথায়? তুমি সেই সমুদ্রের একবিন্দু বারি হইয়াও আপনাকে তাহার অংশ বলিয়া মনে করিতে পারিতেছ না। আপনাকে স্বতন্ত্র মনে করিতেছ। সেই স্বতন্ত্র অস্তিত্বটুকুর উপর সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে নির্ভয়ে বাস করিতে চাহিতেছ, একবারও ভাবিতেছ না যে সে দুর্গ যে ভূমির উপর দণ্ডায়মান হইবে সে ভূমি একমুহূর্ত্তে প্রবল তরঙ্গে ভাসিয়া যাইতে পারে। যতক্ষণ তুমি আপনাকে সেই মহাপ্রেম হইতে পৃথক রাখিবে ততক্ষণ তুমি সেই প্রেমপয়োনিধির অমৃত পানে সমর্থ হইবে না। আপনাকে ভুলিয়া যাইতে হইবে, ঐ প্রেমপয়োনিধিতে আত্মবিসর্জ্জন করিতে হইবে, উহারই সঙ্গে এক হইয়া আনন্দে ভাসিয়া যাইতে হইবে। তবেই সুখ তবেই শান্তি।

তোমার আপনার বলিবার তিনি ছাড়া আর কেহ নাই। তুমি যেগুলিকে আপন বলিয়া মনে করিতেছ সেগুলি তোমার আপন নহে। সেগুলি তাঁহার। তুমি সেগুলির জিম্মাদার মাত্র। সেগুলিকে রক্ষণাবেক্ষণ করাই তোমার কার্য্য, কিন্তু সেগুলিকে তোমার আপনার বলিবার অধিকার নাই। যে দিন হইতে তুমি অহংজ্ঞানে ভুলিবে সে দিন হইতে তোমার দুঃখনিশা আরম্ভ হইবে। তুমি সেই অনন্ত হইতে পৃথক হইয়া অসম্পূর্ণ হইয়া পড়িবে; শত শত অভাব দেখিতে পাইবে, নানাপ্রকারের শোক তাপ দুঃখ আসিয়া তোমাকে জর্জ্জরিত করিবে; তুমি আজীবন সেই দুঃখ-সাগরে হাবুডুবু খাইবে। যতক্ষণ না খেলিতে বস ততক্ষণ তোমার চিন্তা ভাবনা দুঃখ আক্ষেপ কিছুই থাকে না; যেই খেলিতে বস অমনি কতকগুলি ঘুঁটিকে তুমি তোমার আপন বলিয়া মনে কর, তাহাদের রক্ষার জন্য নানাপ্রকার চিন্তায় পতিত হও, তাহাদিগকে হারাইয়া ঘোর দুঃখ ও আক্ষেপ করিতে থাক। ভাবিয়া দেখিলে ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কোন কিছুকেই আপন বলাই ভুল।

তোমার যিনি আপন তিনি সর্ব্বদাই ডাকিতেছেন। তিনি তোমায় প্রেমরজ্জু দ্বারা নিয়তই আকর্ষণ করিতেছেন। সেই প্রেমই তোমার একমাত্র সাধ্য—তোমার জীবনের একমাত্র ধ্রুবতারা। সেই দিকে লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হও অন্য দিকে তাকাইও না, অন্য ভাবনা ভাবিও না। তাঁহাকে ব্যতীত অপর কাহাকেও আপন মনে করিও না। যে কার্য্যে নিযুক্ত আছ সে কার্য্য নির্লিপ্তভাবে করিতে থাক, আর অনুক্ষণ সেই প্রেমের বাঁশীর মধুরধ্বনি শ্রবণ কর, তাহাতে প্রাণ বিসর্জ্জন কর, অনন্ত সুখ অনন্ত আনন্দ পাইবে। ইহাই ব্রহ্মসাধনা।

রামপ্রসাদের মাতৃসাধন।*

(শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী)

ভক্তজীবনী ঈশ্বরবিশ্বাসী বিশেষতঃ ভক্তের নিকট অতি আদরের জিনিষ, ভবরোগগ্রস্ত বদ্ধজীবের পক্ষে অতি উপকারী পথ্য। কিন্তু সংসারে যে দ্রব্য যত উপকারী ও উপাদেয়, তাহা তত দুর্ল্লভ। প্রকৃত ভক্তের প্রকৃত জীবনী সংগ্রহের নানা অন্তরায়। ত্যাগ ও অনুরাগের পথে না চলিলে প্রকৃত ভক্ত হওয়া যায় না। এই মার্গের পথিক সাংসারিক সকল বিষয়েই নিজের জন্য আস্থাশূন্য; সকল ব্যাপারই তাঁহারা অনুরাগের পাত্রের জন্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। পার্থিব ধন সম্পত্তির কথা দূরে থাকুক, যশ মান খ্যাতি প্রতিপত্তি প্রভৃতি মানবের প্রাণের আকাঙ্ক্ষার বস্তুর প্রতিও তাঁহারা দৃক্ পাত করেন না; কেবল আহার নিদ্রা প্রভৃতি অনিবার্য্য কার্য্য কথঞ্চিৎরূপে সংসারে সম্পাদন করিয়া প্রায় সর্ব্বদা তাঁহারা অধ্যাত্ম জগতেই বাস করেন। ভক্তের জীবনকাহিনী তাঁহার হৃদয়ের রহস্যময় গুহ্য কথায় পরিপূর্ণ; তাঁহার নিজের প্রত্যক্ষীভূত আধ্যাত্মিক সত্যে আলোকিত, তাঁহার নিত্যাস্বাদিত আনন্দে মধুর। ভক্ত স্বয়ং নিয়ত যাহা সম্ভোগ করেন, যাহার তাহার নিকট তাহা ব্যক্ত করিবার প্রবৃত্তি তাঁহার নাই, অন্যকে তাহা বুঝাইবার প্রয়োজনও তিনি মনে করেন বলিয়া বোধ হয় না। সামাজিক বা রাজনৈতিক ব্যাপারে যাঁহারা প্রসিদ্ধি লাভ করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে আত্মজীবনী লিখেন; তাঁহারা সকলেই আপন আপন কার্য্যের একটা রোজনামচা রাখেন। মানবসমাজের মধ্যে তাঁহাদের কার্য্য সম্পূর্ণ রূপে সীমাবদ্ধ, সুতরাং অনেক বিষয়েই তাঁহাদের কার্য্যের সমর্থন ও হেতু প্রদর্শনের প্রয়োজন হয়। কিন্তু ভক্তের হৃদয়ে যে আনন্দলহরী নিয়ত খেলা করিতেছে, তাহার হিসাব রাখিবার তাঁহার অবসরই বা কোথায়, আর প্রয়োজনই বা কি?

বসোয়েল যেমন জন্‌সনের ভক্ত ছিলেন, অথবা শ্রীম—যেমন পরম হংস রামকৃষ্ণদেবের ভক্ত, সেইরূপ অনুরক্ত ভক্ত কেহ সর্ব্বদা নিকটে থাকিয়া যদি সাধকজীবনের ছবি অঙ্কিত করিবার চেষ্টা

* এই প্রবন্ধটী "নচিকেতা" প্রভৃতির গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের যন্ত্রস্থ গ্রন্থ "রামপ্রসাদ" ভূমিকা স্বরূপে লিখিত হইয়াছিল। আমরা তাহার দু একস্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছি। লেখক কুলকুণ্ডলিনীকে দেহধর্ম্ম কি অর্থে বলিয়াছেন আমরা ঠিক বুঝিলাম না। তৎপরিবর্ত্তে উহাকে আত্মশক্তি বলিলে বোধ হয় অসঙ্গত হয় না। তঃ বোঃ সঃ।

করেন, তাহা হইলে তাহা সমাজের নিকট কতকটা অধিগম্য হইতে পারে। কিন্তু সেরূপ অনুরক্ত ভক্ত অতি বিরল। এ অবস্থায় ভক্তজীবনী যে দুর্ল্লভ হইবে, তাহাতে আর সংশয় কি? এই জন্যই ভক্তজীবন এত আদরের জিনিষ, এবং এই জন্যই যাঁহারা ভক্তের জীবনী সংগ্রহ করেন, তাঁহারা আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতার পাত্র।

সমস্ত বঙ্গদেশ জুড়িয়া রামপ্রসাদের খ্যাতি বিশ্রুত; যে সকল স্থানে বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত সেই সমস্ত স্থানেই রামপ্রসাদের সঙ্গীত গীত ও শ্রুত। যে বাঙ্গালী সঙ্গীতরসে নিতান্ত বঞ্চিত, সেও রামপ্রসাদের সঙ্গীত একটুকু দাঁড়াইয়া শুনে; যাহার কণ্ঠে সঙ্গীতের ধ্বনি কখনও ফোটে না, সেও রামপ্রসাদের অন্ততঃ দুই একটি পদ, দুই একটি ছত্র জানে। যিনি স্বজাতীয় আবালবৃদ্ধস্ত্রীপুরুষ সকলের নিকটেই এত পরিচিত, তাঁহার সৌভাগ্যের সীমা নাই। কিন্তু এমন পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে যে আমাদের প্রকৃত পরিচয় নাই, এমন লোকপ্রিয় কবির যে একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জীবনচরিত নাই, ইহা আমাদের নিতান্তই দুর্ভাগ্য।

রামপ্রসাদ একজন ভক্ত গায়ক ছিলেন, এবং নিজে সঙ্গীত রচনা করিয়া গাহিতেন, এই মাত্রই আমরা জানি; সঙ্গীতোচ্ছ্বাসের ভিতর দিয়া তাঁহার অধ্যাত্ম জীবনের যে পরিচয়টুকু পাওয়া যাইতে পারে, কেবল তাহাই আমরা পাই। তিনি কোন্ স্থানে, কোন্ গ্রামে, কোন্ বংশে, কোন্ সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে এতদিন আমরা কিছুই জানিতাম না। কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে তাহার বিদ্যাবুদ্ধি, কাজ কর্ম্ম, অভ্যাস অভিজ্ঞতা, আচার ব্যবহার, সাধন ভজন, পরিবার প্রতিবেশী কিরূপ ছিল, এবং কোন্ অবস্থায় পড়িলে তিনি কোন্ পথে চলিতেন, এ সমস্ত বিষয় জানিবার নিতান্ত প্রয়োজন। কিন্তু রামপ্রসাদ সম্বন্ধে এ সমস্তই আমাদের চক্ষে তমসাবৃত ছিল। তরুকুঞ্জ হইতে প্রবাহিত মধুরধ্বনি শ্রবণ করিয়া আমরা যেমন কোকিলের অস্তিত্ব অনুমান করিয়া লই, রামপ্রসাদ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান তাহার অধিক কিছু ছিল না।

রামপ্রসাদ যে সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তখন এ দেশে জীবনচরিতের আদর হয় নাই। তাহার পূর্ব্ব হইতেই কড়চা এবং ভক্তজীবন বঙ্গ ভাষায় লিপিবদ্ধ হইতেছিল বটে, কিন্তু তাহা একদেশব্যাপী এবং বৈষ্ণবদিগের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। পাশ্চাত্য সাহিত্যের সংশ্রবে আসিয়া বাঙ্গালী জীবনচরিতের মর্ম্ম বুঝিয়াছেন, তাই এই শ্রেণীর গ্রন্থ এখন বঙ্গসাহিত্যকে অলঙ্কৃত করিতেছে। মধুসূদনচরিত, বিদ্যাসাগরকাহিনী, রামকৃষ্ণপ্রসঙ্গ প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত। কিন্তু এই সকল আধুনিক জীবনীর উপাদান সংগ্রহ করা যত সহজ, রামপ্রসাদের বিস্মৃত জীবনীর উপকরণ সংগ্রহ করা তত সহজ নহে। যুগযুগান্তরসঞ্চিত আবর্জ্জনারাশি এবং ঝোড় জঙ্গল অনুসন্ধান করিয়া রামপ্রসাদের সাধনক্ষেত্র আবিষ্কার করিতে যতটা কষ্ট হয়, তাঁহার জীবনের একটা ধারাবাহিক কাহিনী গ্রথিত করিতে গ্রন্থকারকে তাহার অনেক বেশী বেগ পাইতে হয়। যাঁহারা এত কষ্ট স্বীকার করিয়া ভক্তিসিদ্ধ রামপ্রসাদের জীবনকাহিনী লোকলোচনের বিষয়ীভূত করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই আমাদের নিকট গভীর কৃতজ্ঞতার পাত্র।

রামপ্রসাদ শাক্ত ছিলেন—মহাশক্তিকে মাতৃভাবে উপাসনা করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন। অনন্ত ভক্তের মঙ্গলের জন্য জগন্মাতার অনন্ত মূর্ত্তি রহিয়াছে, তন্মধ্যে কালীই রামপ্রসাদের আরাধ্যা ছিলেন। একটা সংস্কৃত বচন প্রচলিত আছে, "কলৌ কালী কলৌ কৃষ্ণঃ কলৌ জাগর্ত্তি পন্নগী"। এই বচনটির মূল কোথায় জানি না, কিন্তু ইহা অনেকের মুখেই শুনিয়া থাকি। কেহ কেহ বলেন "পন্নগী" বলিতে মনসাকে বুঝায়, কিন্তু কুলকুণ্ডলিনী ইহার বাচ্য কিনা তাহাও বিবেচ্য। যাহার জন্য সাধন করা যায়, তাহাকে প্রত্যক্ষ ভাবে লাভ করাই সিদ্ধি। সাধকেরা বলেন, কুলকুণ্ডলিনী না জাগিলে ইষ্টসিদ্ধি হয় না, ইষ্ট দেবতাকে প্রত্যক্ষ ভাবে লাভ করিতে হইলে শরীরস্থ কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণ চাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে সিদ্ধিলাভে কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণ অপরিহার্য্য। কুলকুণ্ডলিনী না জাগিলে ইষ্টদেবতাকে প্রত্যক্ষ করা গেল না;

আবার কুলকুণ্ডলিনী জাগিলেন, তিনি দূর হইতে ইষ্টদেবতাকে দেখাইয়া দিলেন, কিন্তু তিনি নিদ্রিত অর্থাৎ শ্রুতিগত, শাস্ত্রগত, চিত্রগত অথবা বিশ্বাসগত অবস্থায় বর্ত্তমান, নিষ্ক্রিয়, সুতরাং এ অবস্থায় সিদ্ধি সুদূরপরাহত।

কুলকুণ্ডলিনী সকলের মধ্যেই বর্ত্তমান আছেন। কিন্তু এই আশ্চর্য্য বস্তুটি কি? তাঁহার জাগরণই বা কি? আপনার নাভিস্থ মৃগমদগন্ধে উন্মত্ত হইয়া কস্তুরীমৃগ বনে বনে তাহার অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়, কিন্তু সে জিনিষটা তাহার নিকট চিরদিন অজ্ঞাত এবং অপরিচিতই থাকিয়া যায়। কুলকুণ্ডলিনী দেহধর্ম্ম, দেহেতেই তাঁহার স্থিতি এবং দেহের অন্তে তাঁহারও অন্তর্ধান। এই কুলকুণ্ডলিনীকে বুঝিবার জন্য, জাগাইবার জন্য, প্রত্যক্ষ করিবার জন্য সাধকদিগের কত চেষ্টা! কিন্তু এই চেষ্টায় কতজন কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন বলা যায় না। কুলকুণ্ডলিনীকে বুঝাইবার জন্য তন্ত্রাদি শাস্ত্রের অনেকস্থলে বিস্তারিত বর্ণনা আছে, এবং তাঁহাকে জাগাইবার জন্য তন্ত্রশাস্ত্রে ও যোগশাস্ত্রে অনেক মন্ত্র-তন্ত্র ক্রিয়াকলাপ এবং কল-কৌশলেরও উল্লেখ দেখা যায়। যোগীদিগের নিকট উপদেশপ্রার্থী হইলে তাঁহারাও দয়া হইলে উপদেশ দেন, সাধনের ক্রম বলিয়া থাকেন। কিন্তু "আমার কুণ্ডলিনী শক্তি জাগিয়াছে" অথবা "আমি কুণ্ডলিনী প্রত্যক্ষ করিয়াছি," একথা অদ্যাপি কাহারও মুখে শুনি নাই। বৈষ্ণবেরা বলেন, "আপন ভজন কথা না বলিবে যথা তথা।" তন্ত্রশাস্ত্রের প্রায় পদে পদেই বলা হইয়াছে, "ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ।" বোধ হয় এই কুণ্ডলিনী ব্যাপারেও এইরূপ লুকোচুরি কিছু থাকিবে। যাঁহারা লোকসমাজে অবতার বলিয়া পূজিত হইতেছেন, তাঁহারাও নিজের সম্বন্ধে এমন কথা বলিয়াছেন বলিয়া স্মরণ হয় না। সিদ্ধ পুরুষদিগের অন্তঃকরণ অগাধ সমুদ্র; তাঁহাদের অন্তর-রাজ্যে কি আছে কি নাই কে বলিতে পারে? তাঁহারা অবশ্য পরস্পর পরস্পরকে জানেন, কিন্তু অসিদ্ধ লোকের কাছে সে রাজ্য ঘোর অন্ধকারে আবৃত।

কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগরিত করিবার উদ্দেশ্যে সাধন না করিলেও তিনি জাগিতে পারেন। ইহাতে চিত্তের একাগ্রতা এবং একনিষ্ঠতার নিতান্ত প্রয়োজন। সিদ্ধ মহাপুরুষের সাহায্যেও ইহা হইতে পারে, কিন্তু পাত্রের যোগ্যতা চাই। কুণ্ডলিনী জাগিলেই যে সিদ্ধি বা মুক্তি হইবে, এমন নহে। কুণ্ডলিনী শক্তি একবার জাগিলেই যে আমরণ জাগিয়াই থাকিবেন, এমন নহেন। তিনি কিছুদিন দেখা দিয়া আবার লুকাইতে পারেন। কিন্তু তিনি কিভাবে দেখা দেন আর কি ভাবে লুকান, তাঁহার প্রত্যক্ষ দর্শন কি পরিমাণ দৈব এবং কতটা পুরুষকারের উপর নির্ভর করে, তাঁহার স্বরূপ কি, এবং তাঁহার জাগরণ হইতে প্রবাহিত আনন্দ কীদৃশ, এ সকল বিষয় শাস্ত্রের বর্ণনা বা অন্যের উপদেশে উপলব্ধ হইতে পারে না। সৌভাগ্যবলে যাহার রসনায় শর্করা-সংযোগ হয়, সে-ই কেবল চিনি কি পদার্থ তাহা বুঝিতে পারে। শাস্ত্রীয় বা মৌখিক বর্ণনা যে একেবারে বিফল তাহা বলিতেছি না। বর্ণিত বিষয়ের আলোচনায় তাহার জন্য কৌতূহল এবং তাহার দিকে চিত্তের আকর্ষণ জন্মিতে পারে, কিন্তু কেবল এইটুকুই বর্ণনার ফল, ইহার অধিক নহে। যিনি সাধক, তাঁহার জাগরণ বর্ণনার অপেক্ষা করে না; আর যিনি সাধনে বিমুখ তাঁহার জীবনে কুণ্ডলিনীর বর্ণনা সিদ্ধি উৎপাদন করিতে পারে না।

বর্ণনার গুণে প্রকৃত বিষয় প্রত্যক্ষ হয় না বটে, কিন্তু তথাপি সকল কার্য্যেরই আরম্ভে চিত্রগত বা বাক্যগত একটা বর্ণনার প্রয়োজন। ইহার সাহায্যে হৃদয়ে যে একটা অস্পষ্ট অনুভূতি উপলব্ধি হয়, তাহাই প্রকৃত বিষয়ের ছায়া, এবং সেই ছায়ার অনুসরণ করিলে সেই ছায়াই একদিন প্রকৃত তত্ত্বে পৌঁছাইয়া দিতে পারে। আলোকচিত্র আর কিছুই নহে, আলোকের সাহায্যে অঙ্কিত ব্যক্তিবিশেষের ছায়া মাত্র; কিন্তু সেই আলোকচিত্র দেখিয়া প্রকৃত ব্যক্তিকে যে বাছিয়া লইতে পারা যায়, তাহা প্রত্যক্ষ ব্যাপার। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের কাচফলকে গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতির ছায়ামাত্র প্রতিফলিত হয়, গ্রহ নক্ষত্রেরা সশরীরে আসিয়া কাচফলকে আবির্ভূত হয় না; কিন্তু সেই মাত্র অবলম্বন করিয়াই জ্যোতির্বিগণ প্রকাণ্ড প্রত্যক্ষ জ্যোতিষ শাস্ত্র গঠন করিয়াছেন। বহির্জগতে যেমন, অন্তর্জগতেও সেইরূপ। এই কুলকুণ্ডলিনী ব্যাপার যোগগ্রন্থে যোগিগণ কর্ত্তৃক বহুতন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। বহু সাধক

আবার সেই বর্ণিত বিষয়ের চিত্র অঙ্কিত করিয়া আপন আপন শিষ্যবর্গকে দেখাইয়া থাকেন। যাঁহারা এই বর্ণিত ও চিত্রিত বিষয় বিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিয়া প্রত্যক্ষদর্শী যোগীদিগের উপদেশমতে সাধনপথে অগ্রসর হন, তাঁহাদের এই কুণ্ডলিনীচক্র যথাকালে প্রত্যক্ষ না করিবার কোন কথা নাই। তবে বিশ্বাস ও সাধন চাই, এই দুইটীর অভাবে অন্তর্জগতে ক্রিয়া ও সিদ্ধি উভয়ই অসম্ভব।

সাধন ও সাধকের উল্লেখ সর্ব্বদাই শুনি, কিন্তু বিষয়টা প্রত্যক্ষ অতি অল্পই হয়। বহিঃসাধন প্রণালীর অবধি নাই, জনে জনে স্বতন্ত্র বলিলেও চলে। কেহবা জটামালা গৈরিক লইয়াই ব্যস্ত, কেহ বা পুষ্পচন্দন বিল্বপত্র লইয়াই উন্মত্ত, কেহ বা ব্রতোপবাস প্রভৃতি কৃচ্ছ্র সাধনেই রত, কেহ বা মন্ত্র তন্ত্র জপপাঠ লইয়াই বিব্রত। সকল সাধকই যে এক ছাঁচে গঠিত হইবেন এবং এক তানে এক মানে এক প্রাণে এক পথেই চলিবেন, এমন কথা বলিতেছি না। কিন্তু সাধকের ভিতর দেখিবার মত অন্তর্দৃষ্টি যখন জন্মে নাই, তখন কে সিদ্ধিলাভের অধিকারী হইয়াছেন, আর কে নিরর্থক দৌড়াদৌড়ি করিতেছেন, তাহা কেমন করিয়া বলিব?

কিন্তু সাধন ও সাধকের সঙ্গে পরিচিত না হইলেও একটা আভ্যন্তরীণ সূত্র ধরিয়া বিষয়টা উপলব্ধি করা যাইতে পারে। সাধনের তিনটি স্তর কল্পনা করিয়া বিষয়টা ধারণার মধ্যে আনিতে পারা যায়। প্রথম স্তরে তত্ত্বান্বেষণ। সাধন কি, সাধ্য কে, তাঁহার স্বরূপ কি, তাঁহার সঙ্গে সাধকের সম্বন্ধ কি, সাধনের প্রয়োজন কি, ইত্যাদি প্রশ্ন প্রথমাবস্থায় জিজ্ঞাসুর চিত্তকে আন্দোলিত করিতে থাকে। যখন এই সকল প্রশ্নের সমাধান হয়, তখন সাধক বলিতে পারেন, সাধ্যবস্তু "ওঁ তৎসৎ" মন্ত্রের প্রতিপাদ্য। এই অবস্থায় সাধ্য প্রথম পুরুষ, অবধারিত বস্তু।

দ্বিতীয় অবস্থায় সাধ্যের সঙ্গে সাধকের সম্বন্ধ স্থাপন এবং আত্মীয়তা বৃদ্ধির চেষ্টা। এই অবস্থার সাধন মন্ত্র "তৎ-ত্বমসি"—যিনি প্রথম পুরুষরূপে অবধারিত হইয়াছিলেন, তিনি এখন মধ্যমপুরুষরূপে প্রত্যক্ষীভূত হইলেন। সাধনের চরম পরিণতি, অর্থাৎ প্রকৃত সিদ্ধির অবস্থায় ক্রমে এই ব্যবধানটুকুও দূর হইয়া যায়, সাধক তখন "সোঽহং" মন্ত্রের প্রকৃত প্রতিপাদ্য প্রেমে একাত্মভাব আপনাতে জীবন্ত এবং প্রত্যক্ষরূপে উপলব্ধি করিয়া কৃতার্থ হন।

"তৎসৎ" মন্ত্রের প্রতিপাদ্য ঈশ্বরে বিশ্বাস হইলেই সাধনের আরম্ভ হয়, আর একাত্ম জ্ঞান জন্মিলেই তাহার নিবৃত্তি হয়। সাধ্য যে কাল পর্য্যন্ত প্রথম পুরুষ বা মধ্যম পুরুষরূপে অবস্থান করেন, ততদিনই উপাসনা; যে মুহূর্ত্তে তিনি উত্তম পুরুষরূপে উপলব্ধ হন, যে মুহূর্ত্তে তিনি তুমি এবং আমি প্রেমসূত্রে এক হইয়া যায়; তিনি, তুমি এবং আমি এই তিনের প্রভেদজ্ঞান থাকে না, সেই মুহূর্ত্তেই সাধন বা উপাসনার সমস্ত প্রয়োজনের পর্য্যবসান হয়। তখন সাধক পরম হংস, সাধনভজন জ্ঞান বিজ্ঞান ব্রতনিয়মের অতীত পুরুষ। সাধনের জন্য যে সময়টি অবধারিত হইল, সাধকজীবনের সেই অংশটুকুই জানিবার জন্য আমরা লালায়িত। ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিশ্বাসের পূর্ব্বে মানুষ কি করে বা না করে, কোন্ পথে চলে বা না চলে, তাহার সংবাদ না রাখিলেও চলে। আবার পরমহংসত্ব লাভ করিয়া সাধক কি অবস্থায় থাকেন, তাহা যখন আমাদের মত সাধারণ মানবের পক্ষে অনুভবের অতীত তখন পরমহংসজীবনের আলোচনাতেও আমাদের বিশেষ লাভ নাই—যাহা উপলব্ধির বিষয় নহে, তাহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। বালক খেলাধুলার গল্প আগ্রহের সহিত শুনিয়া আনন্দ লাভ করিতে পারে, কিন্তু ষড়দর্শনের বিচার বিতর্ক তাহার উপকার করিতে পারে না, বরং তাহার বিরক্তি জন্মাইতে পারে।

সাধনের প্রণালী কতপ্রকার, তাহার অবধারণ অসম্ভব। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান প্রভৃতি নানা ধর্ম্মমত জগতে প্রচলিত আছে। আবার প্রত্যেক ধর্ম্মমতের অনুশাসনে যাঁহারা চলে, তাঁহারা সকলেই যে এক প্রণালীতে উপাসনা করেন এমত নহে। এক এক ধর্ম্মে কত শাখা, প্রশাখা, সম্প্রদায় আছে, তাহার অবধি নাই। এক গুরুর বহু শিষ্য এক মন্ত্র এবং একই উপদেশ পায়, কিন্তু সাধনের পথে চলিতে চলিতে তাহাদের প্রায় প্রত্যেকের সাধন-প্রণালীতে বিভিন্নতা জন্মিয়া যায়। এমন কি, এক সাধক যে চিরদিন এক প্রণালীতেই চলেন তাহাও নহে; সাধনপথে যিনি যতটা অগ্রসর হন, তাঁহার

উন্নতির মাত্রানুসারে প্রণালীর পৌর্ব্বাপর্য্যে ততটা বিভিন্নতা আসিয়া পড়ে। অন্য ধর্ম্মের কিছু বুঝিনা; হিন্দুধর্ম্মের যৎকিঞ্চিৎ যাহা বুঝি, তাহা লইয়াই সাধন সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিব।

মানব অসংখ্য, জগদম্বার মূর্ত্তি বা ভাবও অনন্ত। সাধকের শক্তি, বুদ্ধি, প্রকৃতি প্রভৃতি লইয়াই উপাসনা। ঈশ্বরের অনন্ত শক্তি এবং অনন্ত ভাব অগ্রে উপলব্ধি করিব, তাহার পরে তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইব, এ কথা যে ভাবে তাহার উপাসনা হয় না। যে ঈশ্বরকে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিবে, সে ত ঈশ্বর হইতেও বড় সুতরাং তাহার আর উপাসনা কি? সাধক হইতে সাধ্য চিরদিনই বড়, সকল প্রকার সাধনের মূলেই এই ভাব। সাধ্য আছেন, আমি আছি এবং সাধ্যের সঙ্গে আমার একটী সম্বন্ধ রহিয়াছে, এই জ্ঞান বা বিশ্বাসই সকল প্রকার সাধনের মূল সূত্র। এই সূত্র ধরিয়া উপাসনা আরম্ভ করিলেই সেই সম্বন্ধ ক্রমশঃ গাঢ়তর হইবে, এবং সেই গাঢ়তার সঙ্গে সঙ্গে সাধ্যের উপলব্ধি বিস্তৃতি লাভ করিয়া আমাকে ধন্য করিবে, এই আশাই সাধকের প্রথম সম্বল। আমাকে জগদম্বা যে ক্ষুদ্র ঘট দিয়াছেন, অপার জ্ঞান ও প্রেম-সাগরে অবগাহন করিয়া তাহাই পরিপূর্ণ করিতে পারিলে আমি ধন্য। আমি যাহা খাই, হস্তী তাহার অনেক গুণ বেশী খায়; কিন্তু আমি হস্তীর ন্যায় অধিক আহার করিতে পারি না বলিয়া আমার কোন দুঃখ হয় না। ক্ষুন্নিবৃত্তিতেই সুখ। আমার শক্তি বুদ্ধি প্রকৃতি প্রভৃতি যতটুকু সাধনের অনুকূল, ততটুকু সাধনেই আমার মঙ্গল। ইহাই হিন্দু ধর্ম্মের পাত্রবিচার, ইহাই তাহার বিশেষত্ব, এবং ইহাই তাহার বিজ্ঞানসম্মত দৃঢ় ভিত্তি।

দূরবর্ত্তী বলিয়া অনুমিত ঈশ্বর যখন সাধকের সাধনবলে নিকটবর্ত্তী হন, যিনি এতদিন "তিনি" ছিলেন, তিনি যখন "তুমি" হইয়া দাঁড়ান, তখন সেই সাধ্যসাধকের সম্বন্ধ আপনা হইতেই গাঢ়তর হইয়া উঠে, স্নেহ ভক্তি প্রেম প্রভৃতি অমৃতধারা তাহা হইতে প্রবাহিত হইতে থাকে। আমার জীবনের বহুমূল্য ধন, শ্রেষ্ঠ সম্পদ, সাধনের বস্তু এবং চরম আশ্রয়কে যখন এই রূপে প্রত্যক্ষ ভাবে উপলব্ধি করি, তখন সাংসারিক জীবনের ছায়াবলম্বনে একটা সম্পর্ক আপনা হইতে তাহার সঙ্গে জন্মিয়া যায়। প্রথমেই আকাঙ্ক্ষা হয়, আমার প্রিয়তমকে আমি কি বলিয়া ডাকিব। তখন সমাজ খুঁজিয়া বেড়াই, পরিবার খুঁজিয়া বেড়াই, অভিধান খুঁজিয়া বেড়াই, হৃদয়ের ভিতরে খুঁজিয়া বেড়াই কি বলিয়া প্রিয়তমকে ডাকিলে আমার প্রাণ শীতল হইবে। প্রত্যেকের হৃদয়ের অবস্থানুসারে সম্পর্ক নির্ণীত হয়, ডাক নির্ব্বাচিত হয়। এই কারণেই হিন্দুদিগের মধ্যে মাতৃভাব, পিতৃভাব, পুত্রভাব, গুরুভাব প্রভৃতি নানা ভাবের সাধনপ্রণালী প্রচলিত।

মানবজীবনে যত প্রকার সম্বন্ধের অভিজ্ঞতা আছে, তন্মধ্যে মাতার সহিত সন্তানের সম্বন্ধই সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও সর্ব্বাপেক্ষা সরল ও সর্ব্বাপেক্ষা স্বাভাবিক। আর কাহারো দ্বারা সন্তানের সর্ব্বপ্রকার অভাব দূর হইতে পারে না, কেবল মাতাই তাহার সকল প্রকার অভাব দূর করিতে পারেন। শিশুর আসন, শয্যা, আহার, পানীয়, যান, বাহন, ভৃত্য এবং ঈশ্বর, সমস্তই মা। শিশু যতক্ষণ মাতৃক্রোড়ে থাকে, ততক্ষণ তাহার অভাব নাই, ভয় নাই, আনন্দের সীমা নাই। মাতার প্রতি শিশুর যে স্বাভাবিক নির্ভর ও বিশ্বাস, তাহা স্বয়ংসিদ্ধ এবং জন্মলব্ধ। যে সৌভাগ্যশালী সাধক দীর্ঘ কালের সাধন দ্বারা ঈশ্বরের প্রতি এইরূপ বিশ্বাস ও নির্ভর লাভ করিতে পারেন তাঁহারই জন্ম সার্থক। শিশুর নিকটে সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী প্রভৃতি ভীতি জনক ও প্রাণহানিকর যাহাই আসুক না কেন, শিশু মাতার বক্ষে মুখ লুকাইয়া নিশ্চিন্ত। শিশু খেলা করিতে করিতে যদি বজ্রনাদ শুনিতে পায়, অমনিই দৌড়িয়া সে মাতার কাছে যায় এবং মাতার আশ্রয়ে দাঁড়াইয়া নিশ্চিন্ত হয়। মাতৃপ্রভাব এবং মাতৃনিহিত শক্তিই শিশুর ব্রহ্মাণ্ডকে সংযত রাখিতেছে, শাসন করিতেছে। মাতার মত শক্তিশালিনী এবং মাতার মত জ্ঞানশালিনী শিশুর ব্রহ্মাণ্ডে আর কেহ নাই। সহস্র পণ্ডিত এবং সহস্র আত্মীয় যাহা সমস্বরে সত্য বলিতেছেন, মা যদি একবার বলেন তাহা মিথ্যা, তবে তাহা মিথ্যাই থাকিয়া যাইবে, সহস্র প্রমাণের বলেও তাহা আর সত্য হইতে পারিবে না। সকল ভাবের সিদ্ধিই সাধনসাপেক্ষ, কিন্তু মাতৃভাবের সিদ্ধি সাধনের অপেক্ষা রাখে না।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জাগতিক অভিজ্ঞতার আঘাতে যদি শিশুর এই ভাব বিহত না হইত, তবে আর মানবজীবনে সাধনের প্রয়োজন থাকিত না, মানব বিনা সাধনেই মুক্তিলাভ করিত। কিন্তু শৈশবের বিশ্বাস ও নির্ভর শৈশব অতিক্রান্ত হইলেও অব্যাহত রাখিতে পারে, মানবকুলে এরূপ ব্যক্তি অত্যন্ত দুর্লভ।

সাধনের কার্য্য, মাতার প্রতি শিশুর যেরূপ বিশ্বাস ও নির্ভর থাকে, ঈশ্বরের প্রতি সেইরূপ বিশ্বাস ও নির্ভর লাভ করা। এইটুকু যে পর্য্যন্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত ইষ্ট লাভ বা মুক্তি অসম্ভব।

সাধ্যে ঠিক এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস এবং অটল নির্ভর মাতৃভাব-সাধকের পক্ষে যতটা সরল, সহজও স্বাভাবিক ততটা অন্যের পক্ষে নহে। মাতৃভাব অবলম্বন করিয়া আমাদের প্রকৃতি জন্ম হইতেই, বোধ হয় গর্ভাবস্থা হইতেই গঠিত, অভ্যস্ত ও নিয়মিত হইতে থাকে। এই স্বাভাবিক ভাব ভাঙ্গিয়া সাধনের সময়ে ভাবান্তর জন্মানও যেমন কঠিন, তাহাতে সিদ্ধিলাভও সেইরূপ দূরপরাহত।

শক্তিসাধক—মাতৃসাধক এই সহজ ও স্বাভাবিক পন্থাই অবলম্বন করে না। তাঁহাকে ভাব ভাঙ্গিয়া গড়িতে হয় না, অনভ্যস্ত ভাবে অভ্যস্ত হইতে হয় না, অনাত্মীয়ের সঙ্গে নূতন আত্মীয়তা স্থাপন করিতে হয় না। দূরবীক্ষণে জ্যোতিষ্কের প্রতিবিম্বের ন্যায়, পরমাত্মাতে তিনি বিশ্বমাতার যে প্রতিবিম্ব প্রত্যক্ষ করেন, সে প্রতিবিম্বই বাস্তবের কার্য্য করে—তাঁহাকে বিশ্বমাতার কোলে পৌঁছাইয়া দেয়।

রামপ্রসাদ এই ভাবেরই সাধক ছিলেন—তাহা তিনি সহজে বিশ্বমাতার কোলে স্থান পাইয়াছিলেন, সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার দৃঢ় নির্ভর এবং সরল মাতৃভাবের প্রতিকৃতি তাঁহার সঙ্গীতমালার প্রত্যেক মণিতে, তাঁহার ভাবের পরতে পরতে চিত্রিত রহিয়াছে। তাঁহার নির্ভর, আব্দার ও অভিমান শিশুরই যোগ্য। যে মাকে প্রত্যক্ষ না করে, তাহার জীবনে এগুলি আসিতে পারে না। মাতৃস্নেহ আকর্ষণ করিবার পক্ষে শিশুর সরলতা এবং নির্ভরই প্রবল অজেয় শক্তি। রামপ্রসাদের এই শক্তি ছিল, এবং ইহাতেই আকৃষ্ট হইয়া মা তাঁহাকে ধরা দিয়াছিলেন।

রামপ্রসাদের সঙ্গীতে যুক্তিতর্কের বাহুল্য নাই, পরমতত্ত্ব বুঝাইবার প্রবল চেষ্টা নাই, আছে কেবল মার সঙ্গে সন্তানের কথা, আর মধ্যে আত্মতত্ত্ব—ষট্‌চক্রের কথা। অন্ধকার গৃহে আলোকের আবির্ভাব হইলেই কোথায় কি বস্তু আছে দেখা যায়, দিবাকর উদিত হইলেই পদ্মগুলি ফুটিয়া উঠে, ইহা প্রমাণনিরপেক্ষ স্বাভাবিক সত্য।

গাও, বীণা গাও।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

(১)

একে একে ধীরে দুখের চিন্তার শত
ভাঙ্গা ভাঙ্গা ঢেউগুলি লাগিছে আসিয়া
হৃদয়ের বেলা-পরে—চিরসঙ্গী মম।
কাতর হয়ো না তায়—গাও বীণা গাও,
তারি মাঝে নিয়ে এসো আনন্দেরি তান—
যে গান বিহগে গাহে বসন্তের প্রাতে
প্রভাত-তপনে উঠে ফুটিয়া যে গান,
ঊষার শিশিরে প্রতি ফুলে প্রতি পাতে
যে আনন্দ শুভ্র-হাসি লুটোপুটি খায় ;
গাও বীণা গাও তুমি সে আনন্দগান—
আকাশ হইতে নীরব সন্ধ্যার মত
চুপে অতি চুপে দেবতার আশীর্ব্বাদ
ঝরুক তাহার পরে। ঘুচে যাক যত
দুঃখশোকতাপ মলিন হৃদয় হতে।

(২)

নির্জ্জন আঁধারতলে পশেনাকো যেথা
একটী আলোক রেখা, গাও সেথা গাও
বীণাটী আমার ; তোমার সুতান গান
আশার আলোক ধরে তুলুক জাগায়ে
দীনহীন যত আঁধার কুটীরবাসী।
মরুভূর অগ্নিময় বালুরাশি যেথা
ধূ ধূ করে দিবানিশি, তারি মাঝে যবে
দু'একটী তৃণগাছি তৃষাতুর কণ্ঠে
দু'ফোঁটা জলের তরে চাহে ঊর্দ্ধমুখে,
গাও বীণা গাও সেথা—তব হর্ষবাণী

ফল্গু নদী যথা আনন্দের স্রোত ঢালি
নিরাশ হৃদয়ে সেথা দিয়ে যাক আশা।
শুনে তব গান যত পথিকের প্রাণ
ভগবৎ-প্রেম-বলে হোক বলীয়ান।

বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত—

গীতা-রহস্য।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদিত)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

গীতা ও প্রস্থানত্রয়ীর অন্তর্ভূত অন্য গ্রন্থ সম্বন্ধে সাম্প্রদায়িক ভাষ্য লিখিবার রীতি এইরূপ একবার সুরু হইলে পর, অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও ঐরূপ অনুকরণ আরম্ভ হইল। মায়াবাদ, অদ্বৈত ও সন্ন্যাস-প্রতিপাদনকারী শঙ্কর-সম্প্রদায়ের প্রায় আড়াই শো বৎসর পরে, শ্রীরামানুজাচার্য্য (জন্ম শক ৯৩৮) বিশিষ্টাদ্বৈত সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করিলেন, এবং উহা সিদ্ধ করিবার জন্য শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় রামানুজাচার্য্যও প্রস্থানত্রয়ী সম্বন্ধে (সুতরাং তদন্তর্গত গীতা সম্বন্ধেও) স্বতন্ত্র ভাষ্য লিখিয়াছেন। শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মায়া-মিথ্যাত্ববাদ ও অদ্বৈত সিদ্ধান্ত এ দুইই সত্য নহে ; জীব, জগৎ ও ঈশ্বর এই তিন তত্ত্ব ভিন্ন হইলেও, জীব (চিৎ) ও জগত (অচিৎ) এই দুইই এক ঈশ্বরেরই শরীর ; সুতরাং চিৎ-অচিৎ বিশিষ্ট ঈশ্বর একই এবং ঈশ্বর-শরীরান্তর্ভূত এই সূক্ষ্ম চিৎ-অচিৎ হইতে পরে স্থূল চিৎ ও অচিৎ কিংবা অনেক জীব ও জগৎ উৎপন্ন হইয়া থাকে—ইহাই রামানুজ সম্প্রদায়ের মত। এবং এই মতই উপনিষদ্, ব্রহ্মসূত্র ও গীতাতেও প্রতিপাদিত হইয়াছে,—এইরূপ রামানুজাচার্য্য তত্ত্বজ্ঞানদৃষ্টিতে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। (গী, রা, ভা, ২, ১২, ১৩, ২)। কিং বহুনা, ভাগবৎধর্ম্মের মধ্যে বিশিষ্টাদ্বৈত মত যে প্রবেশলাভ করিয়াছে, ইহাঁরই গ্রন্থ তাহার হেতু,—এইরূপ বলিলেও চলে। কারণ, তৎপূর্ব্বে মহাভারত ও গীতাতে ভাগবৎ-ধর্ম্মের যে সিদ্ধান্ত আছে তাহাতে অদ্বৈতবাদই স্বীকৃত হইয়াছে দেখা যায়। রামানুজাচার্য্য ভাগবৎ-ধর্ম্মাবলম্বী হওয়া প্রযুক্ত, গীতাতে কর্ম্মযোগ প্রতিপাদিত হইয়াছে—এই কথা প্রকৃতপক্ষেই তাঁহার মনে হইয়াছিল। কিন্তু রামানুজাচার্য্যের সময়ে মূলভাগবত ধর্ম্মের অন্তর্ভূত কর্ম্মযোগ অনেকটা লুপ্ত হওয়ায় তিনি তাহার মধ্যে তত্ত্বজ্ঞানদৃষ্টিতে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও নৈতিক আচরণদৃষ্টিতে ভক্তিতত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গীতাতে জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তি এই তিনই বর্ণিত হইলেও তত্ত্বজ্ঞানদৃষ্টিতে বিশিষ্টাদ্বৈত ও আচরণ-নীতির দৃষ্টিতে বাসুদেব-ভক্তিই গীতার সারতত্ত্ব ; সুতরাং কর্ম্মনিষ্ঠাও জ্ঞাননিষ্ঠার নিষ্পাদক, স্বতন্ত্র নহে—এইরূপ রামানুজাচার্য্যও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। (গী, রা, ভা, ১৮, ১ ও ৩০১ দেখ)। কিন্তু অদ্বৈত জ্ঞানের স্থানে বিশিষ্টাদ্বৈত এবং সন্ন্যাসের স্থানে ভক্তি—যদিও রামানুজাচার্য্য শঙ্কর সম্প্রদায় হইতে এইরূপ প্রভেদ করিয়াছেন, তথাপি নৈতিক আচরণদৃষ্টিতে ভক্তিই শেষ-কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকার করায়, চাতুর্বর্ণের স্বধর্ম্মোক্ত সাংসারিক কর্ম্ম মরণান্ত পর্য্যন্ত সম্পাদন করা—ইহা তাঁহার মতে গৌণ পক্ষের কথা। এবং সেইজন্য গীতাসম্বন্ধে রামানুজীয় তাৎপর্য্যও একপ্রকার কর্ম্ম-সন্ন্যাসপরই বলিতে হইবে। কারণ, কর্ম্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইয়া জ্ঞানোদয় হইলে পর, চতুর্থাশ্রম গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মচিন্তাতে নিমগ্ন থাকা অথবা প্রেমযোগে অপরিসীম বাসুদেব-ভক্তিতে মজিয়া থাকা—এই দুই মার্গই কর্ম্মযোগদৃষ্টিতে একই উপাদানভূত অর্থাৎ উভয়ই নিবৃত্তিপর।

রামানুজাচার্য্যের পরবর্ত্তী সম্প্রদায়েরাও এই আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। মায়ামিথ্যাতত্ত্ববাদ সত্য নহে বলিয়া, বাসুদেবভক্তির দ্বারাই অবশেষে মোক্ষলাভ হয়—রামানুজাচার্য্যের ইত্যাকার সিদ্ধান্ত সকল যদিও ঠিক হয়, তথাপি পরব্রহ্ম ও জীব কিয়দংশে এক ও কিয়দংশে ভিন্ন—ইহা স্বীকার করাটা পরস্পরবিরুদ্ধ ও অসম্বদ্ধ। এইজন্য উভয়ই সতত ভিন্ন এইরূপ স্বীকার করিতেই হয় ; পূর্ণরূপে কিংবা অংশতও উহাদের মধ্যে ঐক্য থাকিতে পারে না ;—এইরূপ শ্রীরামানুজাচার্য্যের পরবর্ত্তী তৃতীয় সম্প্রদায়ের মত। এই হেতু এই সম্প্রদায়কে "দ্বৈতী সম্প্রদায়" বলা হইয়া থাকে। এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক শ্রীমধ্বাচার্য্য—ওর্ফে—শ্রীমৎ আনন্দতীর্থ। ইনি ১১২০ শকে সমাধিস্থ হইয়াছেন এবং তখন তাঁহার বয়স ৩৬ বৎসর ছিল,

এইরূপ মাধ্ব-সম্প্রদায়ের লোকেরা বলেন। কিন্তু ডাক্তর ভাণ্ডারকর "বৈষ্ণব, শৈব ও অন্যান্য গ্রন্থ" নামে যে ইংরাজী গ্রন্থ সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন, (৫৯ পৃ) তাহাতে তিনি, শিলা-লেখ্যাদি প্রমাণের বলে, মধ্বাচার্য্যের কাল ১১১৯ হইতে ১১৯৮ শক পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। শ্রীমধ্বাচার্য্যের প্রস্থানত্রয়ী সম্বন্ধে—সুতরাং গীতাসম্বন্ধেও—যে ভাষ্য আছে তাহাতে এই সমস্ত গ্রন্থ দ্বৈতমতেরই প্রতিপাদক—ইহাই তিনি দেখাইয়াছেন। তাঁহার গীতা-ভাষ্যে তিনি এইরূপ বলেন যে, নিষ্কাম কর্ম্মের মাহাত্ম্য যদিও গীতাতে বর্ণিত হইয়াছে, তথাপি নিষ্কাম কর্ম্মের সাধন করিয়া অবশেষে ভক্তি-নিষ্ঠাই উৎপন্ন হয়। ভক্তি সিদ্ধ হইলে পর, কর্ম্ম কিছু করিলে বা না করিলে, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। "ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগঃ"—পরমেশ্বরের ধ্যান অপেক্ষা অর্থাৎ ভক্তি অপেক্ষা কর্ম্মফলত্যাগ অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ—ইত্যাদি কতকগুলি গীতাবচনও এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ; কিন্তু ঐসকল বচন অক্ষরশঃ সত্য নহে, উহা অর্থবাদাত্মক এইরূপ বুঝিতে হইবে। গীতাসম্বন্ধীয় মাধ্ব-ভাষ্যাদিতে এইরূপ লিখিত হইয়াছে (গী, মা ভা, ১২, ১৩)।

চতুর্থ সম্প্রদায় শ্রীবল্লভাচার্য্য। জন্ম শক ১৪০১। রামানুজ ও মাধ্ব-সম্প্রদায় অনুসারে এই সম্প্রদায়ও বৈষ্ণবপন্থী। কিন্তু জীব, জগৎ ও ঈশ্বর সম্বন্ধে বিশিষ্টাদ্বৈতী কিংবা দ্বৈতী মত হইতে, এই মতটি স্বতন্ত্র। মায়া-বিরহিত অর্থাৎ শুদ্ধ জীব ও পরব্রহ্ম ইহারা একই, দুই নহে,—ইহাই এই সম্প্রদায়ের মত। এবং এইজন্যই এই মতকে 'শুদ্ধাদ্বৈত' বলে। তথাপি, শ্রীশঙ্করাচার্য্যের সিদ্ধান্তানুসারে জীব ও ব্রহ্ম একই, ইহা অগ্রাহ্য; অগ্নির স্ফুলিঙ্গের ন্যায় জীব ঈশ্বরের অংশমাত্র; মায়াত্মক জগৎ মিথ্যা নহে, মায়াও ঈশ্বরের ইচ্ছায় ঈশ্বর হইতে বিভক্ত এক শক্তি, এবং মায়াপরতন্ত্র জীবের মোক্ষজ্ঞান ঈশ্বরানুগ্রহ ব্যতীত হইতে পারে না, সুতরাং ভগবদ্-ভক্তিই মোক্ষের মুখ্য সাধন—এই যে সিদ্ধান্ত ইহা-রই দরুণ শঙ্কর সম্প্রদায় হইতে এই সম্প্রদায় ভিন্ন হইয়াছে। পরমেশ্বরের এই অনুগ্রহ, "পুষ্টি, পোষণ" নামেও অভিহিত হইয়া থাকে; তাই এই সম্প্র-দায়কে "পুষ্টিমার্গ"ও বলা হইয়া থাকে।

এই সম্প্রদায়ের গীতা সম্বন্ধে তত্ত্বদীপিকাদি যে গ্রন্থ আছে, তাহাতে এইরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, সাংখ্য জ্ঞান ও কর্ম্মযোগের কথা অর্জ্জুনকে প্রথমে বলিয়া শেষে ভক্তি-অমৃত পান করাইয়া যে অর্থে ভগবান তাহাকে কৃতকৃত্য করিয়াছেন সেই অর্থে ভক্তি—অর্থাৎ সেই সঙ্গে ঘর দ্বার ছাড়িয়া দিয়া কেবল নিবৃত্তিপর পুষ্টিমার্গীয় ভক্তি—ইহাই সমস্ত গীতার তাৎপর্য্য; এবং এই জন্যই ভগবান "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" (গী, ১৮, ৬৬)—সকল ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণ লও—শেষে এই উপদেশ করিয়াছেন।

ইহা ব্যতীত নিম্বার্কেরও এক রাধাকৃষ্ণ-ভক্তিপর বৈষ্ণব-সম্প্রদায় আছে। এই আচার্য্য, রামানুজাচার্য্যের পর ও মাধ্বাচার্য্যের পূর্ব্বে, ১০৮৪ শকে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ডাক্তার ভাণ্ডারকর এইরূপ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। জীব, জগৎ ও ঈশ্বর সম্বন্ধে নিম্বার্কাচার্য্যের মত এই যে, এই তিন ভিন্ন হইলেও, জীব ও জগতের ব্যাপার ও অস্তিত্ব স্বতন্ত্র না হইয়া উহা ঈশ্বরের ইচ্ছাকে অবলম্বন করিয়া আছে এবং মূল পরমেশ্বরের মধ্যেই জীব ও জগতের সূক্ষ্মতত্ত্ব অন্তর্ভূত রহি-য়াছে। এই মত সিদ্ধ করিবার জন্য নিম্বার্ক বেদান্ত-সূত্র সম্বন্ধে এক স্বতন্ত্র ভাষ্য লিখিয়াছেন। এবং এই সম্প্রদায়ের কেশব কাশ্মীরী ভট্টাচার্য্য, 'তত্ত্ব-প্রকাশিকা' নামে এক টীকা লিখিয়া, তাহাতে তিনি দেখাইয়াছেন, গীতার্থ এই সম্প্রদায়ের অনু-কূল। রামানুজাচার্য্যের বিশিষ্টাদ্বৈত হইতে এই সম্প্রদায়ের ভেদ প্রদর্শনার্থ ইহাকে 'দ্বৈতাদ্বৈতী' সম্প্রদায় বলা যাইতে পারে। চক্ষুগ্রাহ্য প্রত্যক্ষ বস্তুকে সত্য বলিয়া স্বীকার না করিয়াও ব্যক্তের উপাসনা অর্থাৎ ভক্তি নিরাধার কিংবা কিয়দংশে সাধার এইরূপ ধারণাক্রমে শঙ্কর সম্প্রদায়ের যে মায়াবাদ সেই মায়াবাদকে স্বীকার না করিয়া, দ্বৈতের কিংবা বিশিষ্টাদ্বৈতের এই পৃথক আর এক ভক্তিপর সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, ইহা স্পষ্টই উপলব্ধি হয়। কিন্তু ভক্তিবাদ স্থাপন করিবার জন্য অদ্বৈত ও মায়াবাদ ত্যাগ করিতেই হইবে এরূপ বলিতে পারা যায় না। কারণ, মায়া-বাদ ও অদ্বৈতবাদ স্বীকার করিয়াও মহারাষ্ট্র

দেশের সাধু সন্তেরা ভক্তির সমর্থন করিয়াছেন, অতএব এই পন্থা শ্রীশঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্ব হইতেই চলিয়া আসিতেছে এইরূপ দেখা যায়। অদ্বৈত, মায়া-মিথ্যাত্ববাদ ও কর্ম্মত্যাগের আবশ্যকতা—এই যে শঙ্কর সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত,—ইহা উক্ত পন্থাতেও গৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু ব্রহ্মা-ত্মৈক্যরূপ মোক্ষপ্রাপ্তির যে সকল সাধনা আছে, তন্মধ্যে ভক্তিমার্গই খুব সুলভ। "তুজ হবাবা আহে দেব। তরি হা সুলভ উপাব" (তুকা. গা. ৩০০২-২) অর্থাৎ—তোমার যদি দেবতা হইতে হয়, ইহাই তাহার সুলভ উপায়। এইরূপ তুকারাম-বাবাজির কথা অনুসারে এই পন্থাবলম্বীর উপ-দেশ। ভগবদ্‌গীতাতেও আছে—"ক্লেশোঽধিকতর স্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্" অর্থাৎ অব্যক্ত ব্রহ্মের প্রতি চিত্তকে আসক্ত করা আরো অধিক ক্লেশকর। এইরূপ প্রথম কারণ দর্শাইয়া, পরে, "ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ"—অর্থাৎ আমার ভক্তও আমার অতীব প্রিয়—এইরূপ বলা হই-য়াছে। যে অর্থে ভগবান অর্জ্জুনকে এইরূপ বলিয়াছেন সেই অর্থে অদ্বৈত-পর্য্যবসায়ী ভক্তি-মার্গও গীতার মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়—এইরূপ তাঁহারা বলেন। শ্রীধর স্বামী নিজের গীতার টীকাতে (গী. ১৮.৭৮) গীতার যে তাৎপর্য্য বাহির করিয়াছেন তাহা এই প্রকারের। কিন্তু এই সম্প্রদায়ের গীতাসম্বন্ধীয় উত্তম মরাঠী গ্রন্থ—"জ্ঞানেশ্বরী"। ইহাতে গীতার আঠারো অধ্যায়ের মধ্যে প্রথম চারি অধ্যায়ে কর্ম্ম, পরের সাত অধ্যায়ে উপাসনা এবং তৎপরবর্ত্তী অধ্যায়গুলিতে জ্ঞান প্রতিপাদিত হইয়াছে,—এইরূপ বলা হইয়াছে। জ্ঞানেশ্বর নিজ গ্রন্থের শেষে বলিয়াছেন, "ভাষ্য-কারা তেঁ (শঙ্করাচার্য্যকে) বাট পুসত"—অর্থাৎ ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্যকে রাস্তা জিজ্ঞাসা করিয়া—অর্থাৎ শঙ্করাচার্য্যের মতানুসরণ করিয়া আমি নিজের টীকা রচনা করিয়াছি। রাস্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। তথাপি অনেক সরল দৃষ্টান্তের দ্বারা পুষ্পিত করিয়া বলিবার এক অসাধারণ ক্ষমতা জ্ঞানেশ্বর মহারাজার ছিল। শ্রীশঙ্করাচার্য্য হইতে ভিন্ন ভক্তিমার্গ ও কিয়দংশে নিষ্কাম ধর্ম্মেরও তিনি সমর্থন করায়, "জ্ঞানেশ্বরী" গীতা সম্বন্ধে এক স্বতন্ত্র গ্রন্থ স্বীকার করিতে হইবে। জ্ঞানেশ্বর মহারাজ নিজে যোগী ছিলেন। তাই, গীতার ৬ অধ্যায়ে পাতঞ্জল যোগা-ভ্যাসের বিষয় যে শ্লোকে আসিয়াছে তৎসম্বন্ধে ইঁহার এক বিস্তৃত টীকা আছে। তাহাতে তিনি এইরূপ বলিয়াছেন যে,—অধ্যায়ের শেষে "তস্মাদ্-যোগী ভবার্জ্জুন"—(অতএব হে অর্জ্জুন তুমি যোগী হও) (গী. ৬. ৪৯), এইরূপ অর্জ্জুনকে বলিয়া, সমস্ত মোক্ষপন্থার মধ্যে পাতঞ্জল যোগকেই, ভগবান্ 'পন্থরাজু' অর্থাৎ সর্ব্বোত্তম পন্থা বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছেন।

সার কথা, গীতায় উপদিষ্ট প্রবৃত্তিপর কর্ম্মমার্গ গৌণ, অর্থাৎ জ্ঞানের একমাত্র সাধন স্থির করিয়া, নিজ নিজ সম্প্রদায়ে যে যে তত্ত্বজ্ঞান এবং তাহারই অনুসারে মোক্ষদৃষ্টিতে শেষের কর্ত্তব্য বলিয়া যে সকল আচার বর্ণিত হইয়াছে সেই সকল অর্থাৎ মায়াবাদাত্মক অদ্বৈতবাদ ও কর্ম্মসন্ন্যাস, মায়াসত্যত্ব প্রতিপাদক বিশিষ্টাদ্বৈত, ও বাসুদেব-ভক্তি, দ্বৈত ও বিষ্ণুভক্তি, শুদ্ধাদ্বৈত ও ভক্তি, শঙ্করাদ্বৈত ও ভক্তি কিংবা পাতঞ্জল-যোগ ও ভক্তি, কিংবা কেবলমাত্র ভক্তি, কেবলমাত্র যোগ, অথবা কেবলমাত্র ব্রহ্মজ্ঞান—এইরূপ অনেক প্রকারের কেবল মাত্র নিবৃত্তিপর মোক্ষধর্ম্মও গীতাতে প্রতিপাদিত হইয়াছে,—এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ভাষ্যকারেরা ও টীকা-কারেরা, নিজ নিজ মতানুসারে গীতা-তাৎপর্য্য স্থির করিয়াছেন।*

ভগবদ্‌গীতায় কর্ম্মযোগ প্রধান বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, এ কথা কেহ মানে না। শুধু আমাদেরই নহে, প্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্র কবি বামন পণ্ডিতের মতও এইরূপ। গীতা সম্বন্ধীয় তাঁহার "যথার্থ দীপিকা" নামক বিস্তৃত মারাঠী টীকার উপোদ্‌ঘাতে তিনি প্রথম

পরী অজী ভগবন্তজী। য়া কলিযুগ মাজী॥
জো জো গীতার্থ যোজী। মতানুরূপ॥

অর্থাৎ—কিন্তু হে ভগবান এই কলিযুগ মাঝে, যে-যে গীতার্থ যোজিত হইয়াছে, তাহা নিজ নিজ মতানুরূপ।

* ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের আচার্য্যদিগের গীতা সম্বন্ধীয় ভাষ্য ও সেই সেই সম্প্রদায়ের ছোট বড় সমস্ত মিলিয়া ১৫টি টীকা, বোম্বায়ে "গুজরাটী প্রিন্টিং প্রেসের" কর্ত্তা সম্প্রতি ছাপাইয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন টীকাকারদিগের অভিপ্রায় একযোগে অবগত হইবার পক্ষে এই গ্রন্থটী বড়ই সুবিধাজনক।

এইরূপ লিখিয়া তাহার পর—

কোণ্যা মিসেঁ তরী কোণী। গীতার্থ অন্যথা বাখাণী॥
যজ্ঞনাবডে তো থোরামতীহি করণী।
কায় করুঁ জী ভগবন্তা॥

অর্থাৎ—কোন কারণে কোন কোন লোক, গীতার্থের অন্যথা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ঐ বড় লোকদের কাজ আমার ভাল লাগে না, কি করিব ভগবান। এইরূপ ভগবানের নিকট তিনি গানে মনের আক্ষেপ জানাইয়াছেন।

অনেক সাম্প্রদায়িক টীকাকারদিগের ভিন্ন ভিন্ন মতের এইরূপ তুমুল কোলাহল দেখিয়া তৎসম্বন্ধে কেহ কেহ এই কথা বলেন যে, যেহেতু এই সমস্ত মোক্ষসম্প্রদায় পরস্পরবিরোধী, গীতায় কি প্রতিপাদিত হইয়াছে নিশ্চয় করিয়া কোন সম্প্রদায়ই বলিতে পারে নাই, সেই হেতু উক্ত সমস্ত মোক্ষসাধনের—এবং বিশেষতঃ তাহারই অন্তর্গত কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান এই তিনের—স্বতন্ত্রভাবে, ও সংক্ষেপে পৃথক পৃথক সূক্ষ্ম বর্ণনা করিয়া ভগবান রণভূমির উপর ঠিক যুদ্ধের আরম্ভে, অনেক প্রকার মোক্ষোপায়ের গোলযোগের মধ্যে পড়িয়া বিভ্রান্তচিত্ত অর্জ্জুনকে আশ্বস্ত করিয়াছেন, এইরূপ স্বীকার করিতে হয়। অনেক মোক্ষোপায়ের বর্ণনাই পৃথক পৃথক অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন না হওয়ায়, গীতায় সেই সমস্তের একবাক্যতা সম্পাদন করিয়া দেখান হইয়াছে, কেহ কেহ এইরূপও বলেন; এবং সর্ব্বশেষে কেহ কেহ এ কথাও বলেন যে, গীতার ব্রহ্মবিদ্যা উপরি-উপরি যদিও সুলভ বলিয়া মনে হয় তথাপি তাহার প্রকৃত মর্ম্ম অতীব গূঢ়;—গুরুমুখ ব্যতীত তাহা কেহ অবগত হইতে পারে না (গী, ৪, ৩৪), এবং গীতার টীকা যদিও অনেক হইয়াছে তথাপি গীতার গূঢ়ার্থ বুঝিবার পক্ষে গুরুমুখ ব্যতীত অন্য পন্থা নাই।

জলমগ্ন ব্যক্তির মনের অবস্থা।

(শ্রীসংজ্ঞা দেবী)

['Lusitania' জাহাজডুবিতে জলমগ্না একটি স্ত্রী যাত্রী বাঁচিয়া উঠিয়া তাঁহার সে সময়কার মনোভাব ব্যক্ত করিয়া সুবিখ্যাত বিজ্ঞানাচার্য্য Sir Oliver Lodgeকে একটি পত্র লিখিয়াছেন তাহা তাঁহার 'Raymond or Life & Death' নামক গ্রন্থে সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে আচার্য্যের পরলোকগত পুত্রের সহিত কথাবার্ত্তা ও জীবনমৃত্যু সম্বন্ধে গভীর তত্ত্বসকল সন্নিবিষ্ট আছে। পত্রখানি ভাষান্তরে নিম্নে উদ্ধৃত হইল।]

"যদি বলি যে যাত্রার আরম্ভ হইতেই আমি জানিতাম যে পরিণামে কি ঘটিবে তবে সে কথা অলীক হইবে, কারণ আমার মনে যে ভাবটুকু আসিয়াছিল তাহাকে ঠিক জানা বলা যায় না। কিন্তু তখনই আমার চেতনার মধ্যে খুব একটা স্পষ্টরকম পূর্ব্বাভাস উদয় হইয়াছিল। যাত্রার আরম্ভে জল ও আকাশের মৃদুশান্ত ভাবেতেই যেন একটা কি প্রচণ্ড ঘটনার সূচনা হইয়াছিল। সুতরাং মনের ভিতর সর্ব্বদা একটা প্রতীক্ষার ভাব জাগিয়া থাকায়, যখন জাহাজটা আঘাতের ধাক্কায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল তখন আমি বড় একটা কিছু চমকিত হই নাই। সে সময়কার একমাত্র উগ্রভাব যাহা আমার মনে জাগিতেছে সে শুধু রাগ—যে এমন পাপ কাজও মানুষে করে! এই অদৃশ্য অথচ নিকটবর্ত্তী শত্রু আসিয়া পড়ায় মনে একটা স্বাভাবিক সংগ্রামের স্পৃহা প্রধান হইয়া উঠিল। আমার মনে হয়, অন্যান্য যাত্রীর মধ্যেও যে একটা প্রশান্ত দৃঢ়তা দেখা দিয়াছিল তাহার মূলেও ঐ একই স্পৃহা—মরি তো লড়িয়া মরিব। এই জাহাজডুবিটা তো দৈব-বিপাকে নয়, উহা যুদ্ধচেষ্টার ফল। আমার হাতের বইখানা রাখিয়া দিয়া আমি জাহাজের ওপাশে উঠিয়া গেলাম, যেখানে বোটগুলার চারিদিকে যাত্রীরা জটলা করিতেছিল। সেখানে অনেক কষ্টে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিয়াছিলাম, কারণ জাহাজটা ক্রমশঃই বেশী রকম কাৎ হইতেছিল। কিন্তু ভয়ের হুড়াহুড়ি কোথায়ও কিছু দেখা গেল না। আমি আমার ক্যাবিনের মধ্যে গেলাম, জাহাজের এক জন চাকর আমাকে একটা (রক্ষা কবচ) Life jacket পরাইয়া দিল এবং বলিল যে ভারি পশমের fur coat ছাড়িয়া ফেলাই ভাল। আমি কিন্তু কিছুমাত্র ব্যস্ত বা উদ্বিগ্ন না হইয়া ছাতে ফিরিলাম এবং সেখানে পূর্ব্ববৎ কষ্টে দাঁড়াইয়া একটি অল্প পরিচিত বুড়ো মানুষের সঙ্গে

আমাদের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলাম। সেই সময়ই আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, আমাদের মধ্যে অনেকেরই একটা স্বাভাবিক সাধনা আছে যাহা আমাদিগকে পাগলের মত জীবন রক্ষার জন্যে লড়ালড়ি হইতে বিরত রাখে। এবং জীবনই হউক মৃত্যুই হউক যাহা আপনি আসিয়া পড়ে তাহার জন্যে প্রস্তুত থাকিতে শেখায়, যাহাতে করিয়া যে সকল প্রাণী ঝাঁকে ঝাঁকে ঠেলাঠেলি চেঁচামেচি করিতে করিতে জাহাজের নীচের তলা হইতে উপরে আসিয়া আমাদের হৃদয়ে বড় ব্যথা দিয়াছে তাহাদের মত আমরা আত্মহারা হই না। মুহূর্ত্তের জন্যও আমার মনে হয় নাই যে আমার পরপারে যাইবার সময় উপস্থিত—অন্ততঃ যতক্ষণ না আমি প্রশান্ত আকাশের নীচে প্রশান্ত সমুদ্রের জলে পড়িয়া সেই ভাঙ্গাচোরার, সেই দুঃখ কষ্টের দৃশ্য হইতে ক্রমে দূর হইতে দূরে ভাসিয়া গেলাম। যাহারা ডুবিয়া যাইতেছিল, তাহাদের আর্ত্তনাদ, যে খালাসিরা জাহাজের Life Boat লইয়া জল হইতে লোক তুলিয়া বেড়াইতেছিল তাহাদের দাঁড়ের ঝুপঝাপ, তাহাদের হাঁকাহাঁকি ক্রমে অস্পষ্ট হইয়া আসিল। আমাকে যে কেহ তুলিয়া লইবে এমন সম্ভাবনা মাত্র দেখা গেল না। তখন আমি নিজেকে বুঝাইতে লাগিলাম "দেখ অন্ধ আশা ত্যাগ কর সময় হয়েছে, পারে যাবার সময় এসেছে!" কিন্তু তবুও ভিতর হইতে ক্রমাগত কে যেন বলিতে লাগিল "না, এখনও না!" গাংচিলের দল মাথার উপরে উড়িয়া বেড়াইতেছিল, আমার বেশ মনে পড়িতেছে যে নীল সমুদ্রের রঙের ছায়া তাহাদের সাদা পালকের উপর পড়িয়া কেমন দেখাইতেছিল তাহাও আমি নজর করিতেছিলাম। তাহারা সুখে প্রাণের স্ফূর্ত্তিতে উড়িয়া বেড়াইতেছে দেখিয়া আমার মনে কেমন উদাসভাব আসিতে লাগিল। আমার আত্মীয়-স্বজনের প্রতি মন ধাবিত হইল তাহারা আমার পথ চেয়ে বসিয়া আছে। তাহারা হয়তো এখন বাগানে বসিয়া চা খাইতেছে। যখন আমার জন্য তাহাদের শোকের কথা মনে হইল তখন সেটা অসহ্য হইয়া উঠিল, চোখে জল আসিল। কত রকম বইএর নাম আমার মাথার ভিতর দিয়া যাইতে লাগিল, বিশেষতঃ একটা যাহার নাম "Where no fear is"—ঠিক আমার মনোভাবের উপযুক্ত বলিয়া বোধ হইল। আমার সে সময়কার মনের ভাব 'উদাস' বলিতে পার—পরের শোকে কাতর বলিতে পার কিন্তু আমার মনে ভীতি ছিল না। আমার এই মনোভাব নিতান্তই সময়োচিত ও স্বাভাবিক বলিয়া আমার মনে হইতেছিল, যেমন করিয়া অবশ্যম্ভাবী ঘটনার প্রতীক্ষা করিতে হয় ঠিক তাহাই। তাহা হইবেই বা না কেন, যেহেতু ভাবটা স্বাভাবিক। মনে হইতে লাগিল যে ওপারের কাহারও সঙ্গে পরিচয় থাকিলে বেশ হইত, ভাবিতে লাগিলাম সেখানে এমন কি কেহ নাই যাহারা অচেনা অভ্যাগতকে আদর করিয়া অভ্যর্থনা করিবে? উভয় লোকের মধ্যেকার সীমানার খুব কাছাকাছি আসিয়াছি এমন সময়, একটা দলছাড়া Life Boat নিঃশব্দে আমার পিছনদিক হইতে আসিয়া পড়িল, তাহার মধ্যে হইতে দুইজন খালাসি ঝুঁকিয়া পড়িয়া হাত বাড়াইয়া আমাকে তুলিয়া লইল। আশ্চর্য্য, আমার গতপ্রায় জীবন কত বেগে ফিরিয়া আসিতে লাগিল! বোটের মধ্যে সকলকেই ধীর ও সংযত দেখিলাম, যদিও তাহাদের মধ্যে একজন মৃত ও একজন পাগল হইয়া গিয়াছিল। একটি স্ত্রীলোক চা পাইবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিল—সে আকাঙ্ক্ষা অভাবনীয় রকমে শীঘ্রই পূর্ণ হইল, কারণ Queens Town হইতে একটি mine-ধরা জাহাজ আসিয়া পড়িল। ঐ জাহাজটার নাম মনে নাই, কিন্তু তাহার লোকজনের দয়া ও সৌজন্য কখনও ভুলিতে পারিব না, তাহারা আমাকে শুক্‌নো গরম কাপড় দিয়া সমূহ বিপদ হইতে বাঁচাইয়া তুলিল।

কাগজে কলমে বর্ণনা করিবার আমার বড় একটা ক্ষমতা নাই। পরপারের সীমার নিকটবর্ত্তী গিয়া ফিরিয়া আসায়, এ সীমানা সর্ব্বদা আমাদের কত কাছে অনুভব করিতে পারায়, মনে আমার একটা বড় আনন্দ হইতেছে, দৈনিক কাজকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকায় সেটা সচরাচর ঘটিয়া ওঠে না। আমার পক্ষে যে মৃত্যুর দ্বার বন্ধ ছিল, সেদিন তাহার মধ্য দিয়া অপর অনেকে চলিয়া গেল। আমার ধারণা তাহারা সে সময় মোটেই ভীত হয়নি, আমারই মত তাহাদেরও নিশ্চয়ই মনে হইয়াছিল যে যাহাই আসুক

না কেন তাহা সুন্দর তাহা পূর্ব্বজীবনের পরিণতি মাত্র। আমার এই অভিজ্ঞতা হইতে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে অন্ততঃ রোগের অবস্থায় ব্যতীত পরপারে যাইবার কোন কষ্ট নাই। অনন্ত জীবনের সোপানে ইহা একটী ধাপ মাত্র।

বৈয়াসিক ন্যায়মালা।

উপোদ্ঘাত প্রকরণ (পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(শ্রীরামচন্দ্র শাস্ত্রী সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ
ও
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি)

মূল। সন্ত্বেবং শাস্ত্রাধ্যায়পাদপ্রতিপাদ্যা অর্থাঃ। কিং তত ইত্যত আহ—

ঊহিত্বা সংগতীস্তিস্রস্তথাঽবান্তরসংগতীঃ।
ঊহেদাক্ষেপদৃষ্টান্তপ্রত্যুদাহরণাদিকাঃ॥

তদ্যথা—ঈক্ষত্যধিকরণে—"তদৈক্ষত" ইতি বাক্যং প্রধানপরং, ব্রহ্মপরং বা, ইতি বিচার্য্যতে। তস্য বিচারস্য ব্রহ্মসম্বন্ধিত্বাদ্‌ব্রহ্মবিচার শাস্ত্রসংগতিঃ। 'বাক্যং ব্রহ্মণি তাৎপর্য্যবৎ' ইতি নির্ণয়াৎ সমন্বয়াধ্যায়সংগতিঃ। ঈক্ষণস্য চেতনে ব্রহ্মণ্যসাধারণত্বেন স্পষ্টব্রহ্মলিঙ্গত্বাৎ প্রথমপাদ সংগতিঃ। এবং সর্ব্বেষ্বপ্যধিকরণেষু যথাযথং সংগতিত্রয়মূহনীয়ং। অবান্তরসংগতিস্ত্বনেকধা ভিদ্যতে—আক্ষেপসংগতিঃ দৃষ্টান্তসংগতিঃ প্রত্যুদাহরণসংগতিঃ প্রাসঙ্গিকসংগতিঃ ইত্যেবমাদিঃ।

অনুবাদ। শাস্ত্র, অধ্যায় ও পাদপ্রতিপাদ্য অর্থ সকল এইরূপ হউক। তৎপরে কি? তদুত্তরে বলা হইতেছে—ত্রিবিধ সংগতি আলোচনা করিয়া আক্ষেপ, দৃষ্টান্ত, প্রত্যুদাহরণ প্রভৃতি অবান্তরসংগতি সেইপ্রকার আলোচনা করিতে হইবে।

তদ্যথা—ঈক্ষতি অধিকরণে "তদৈক্ষত" এই বাক্য প্রধানপর অথবা ব্রহ্মপর ইহা বিচার্য্য বিষয়। উক্ত বিচারের ব্রহ্মসম্বন্ধিত্ব প্রযুক্ত ব্রহ্মবিচাররূপ শাস্ত্রের সহিত সংগতি হইল। "সকল বাক্য ব্রহ্মেতেই পর্য্যবসিত" এই নির্ণয় থাকাতে (উক্ত বিচারের) সমন্বয় অধ্যায়ের সহিত সংগতি। ঈক্ষণকার্য্য চেতন ব্রহ্মের অসাধারণ লক্ষণ হওয়া প্রযুক্ত স্পষ্টলিঙ্গত্বের কারণে প্রথমপাদের সহিত সংগতি। এই প্রকারে সকল অধিকরণেরই ত্রিবিধ সংগতি যথাযথ আলোচ্য। অবান্তরসংগতি নানাপ্রকার—আক্ষেপসংগতি, দৃষ্টান্তসংগতি, প্রত্যুদাহরণসংগতি, প্রাসঙ্গিকসংগতি ইত্যাদি।

তাৎপর্য্য। গ্রন্থের প্রারম্ভে মূল সংগতির ত্রিবিধ ভেদ—শাস্ত্রসংগতি, অধ্যায়সংগতি এবং পাদসংগতি উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু গ্রন্থকার শাস্ত্র, অধ্যায় ও পাদের তাৎপর্য্য জানিলে উক্ত সংগতিত্রয় সুবোধ্য এই কথা বলিয়া শাস্ত্র, অধ্যায় ও পাদের ব্যাখ্যা বিবৃত করিয়া গিয়াছেন। এই শাস্ত্রাদি পদার্থের ব্যাখ্যা করিবার পর গ্রন্থকার উক্ত তিনটী পদার্থ সম্বন্ধীয় ত্রিবিধ মূল সংগতির বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা আবশ্যক বোধ করেন নাই। কিন্তু তিনি উপরোক্ত শ্লোকে বলিয়া গেলেন যে প্রত্যেক বিচারে ত্রিবিধ মূল সংগতি দেখিবার পর প্রসঙ্গক্রমে আগত নানাবিধ অবান্তরসংগতিও আলোচনা করা উচিত।

শ্লোকের টীকাতে গ্রন্থকার তাঁহার বক্তব্য উক্ত ত্রিবিধসংগতি এক একটী উদাহরণের দ্বারা যৎকিঞ্চিৎ পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। "তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়" এই একটী শ্রুতিবাক্য আছে। "ঈক্ষতের্নাশব্দং" প্রভৃতি কয়েকটী সূত্রের দ্বারা ব্রহ্মসূত্রকার একটী অধিকরণে উক্ত শ্রুতিবাক্যের বিচার করিয়াছেন। উক্ত সূত্রের প্রথম শব্দ "ঈক্ষতি" ধরিয়া সেই অধিকরণের নাম দেওয়া হইয়াছে—"ঈক্ষতি অধিকরণ"। এই অধিকরণে আলোচিত হইয়াছে যে শ্রুতিবাক্যের "তদৈক্ষত" অর্থাৎ তিনি দৃষ্টি করিয়াছিলেন এই বাক্যের সূচিত দ্রষ্টা কে—সাংখ্যোক্ত "প্রধান" বা অচেতন প্রকৃতি অথবা চেতন ব্রহ্ম? তর্কশাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে সর্ব্বপ্রথম এই অধিকরণ বা বিচারশরীরে শাস্ত্রসংগতি আছে কি না দেখা কর্ত্তব্য। এখন, উপরোক্ত বিচারের মূল প্রশ্নটী অন্যতর পক্ষের মতে ব্রহ্মপর হওয়াতে এবং ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থটীও ব্রহ্মবিচার-বিষয়ক হওয়াতে, অধিকরণ এবং শাস্ত্র উভয়ের মধ্যে সংগতি দৃষ্ট হইতেছে।

সেই প্রকার, ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থের সমন্বয় বা প্রথম অধ্যায়ে সমস্ত শ্রুতিবাক্য ব্রহ্মে পর্য্যবসিত, ইহা প্রতিপাদন করা হইয়াছে। এই অধ্যায়ে উপরোক্ত মূল প্রশ্নটীকেও ব্রহ্মে পর্য্যবসিত করা

হইয়াছে। অতএব উক্ত অধিকরণের সহিত ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের সংগতি রক্ষিত হইল।

এইবারে উক্ত অধিকরণের পাদসংগতি দেখানো যাইতেছে। ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে সমন্বয় অধ্যায়ের প্রথমপাদে ব্রহ্মের স্পষ্টলিঙ্গক বাক্যসকল, অর্থাৎ যে সকল বাক্য একমাত্র ব্রহ্মকেই নির্দ্দেশ করে সেই সকল বাক্য আলোচিত হইয়াছে। এখন, বিচারের অন্যতর পক্ষ "ঐক্ষত" বাক্যটীকে ব্রহ্মের স্পষ্টলিঙ্গাত্মক বলিয়া স্থির করায় যে প্রথমপাদে এই শ্রুতিবাক্য আলোচিত হইয়াছে সেই প্রথম পাদের সহিত উক্ত অধিকরণের পাদসংগতি রক্ষিত হইল। এই পক্ষ বলেন যে "ঐক্ষত" শব্দের অর্থ দৃষ্টি করিয়াছিলেন, কাজেই এই দৃষ্টিকার্য্য বা দৃষ্টিমূলক সৃষ্টিকার্য্য অচেতন প্রধান বা প্রকৃতির কার্য্য হইতে পারে না, চেতন ব্রহ্মেরই কার্য্য। সুতরাং, যখন এই বিষয়ের বিচার সমন্বয় অধ্যায়ের প্রথমপাদে করা হইয়াছে, তখন বলিতেই হইবে যে সমস্ত অধিকরণটীর বা বিচারশরীরের সঙ্গে উক্ত বিচারাধিকৃত পাদের অসঙ্গতি নাই অর্থাৎ উক্ত পাদটী অধিকরণের পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক হয় নাই।

এই প্রকারে যখনই এই গ্রন্থের কোন বিষয় আলোচিত হইবে, তখন প্রথমেই দেখিতে হইবে যে ব্রহ্মসূত্রের সহিত, তাহার কোন্ অধ্যায় এবং কোন্ পাদের সহিত উক্ত বিষয়ের সংগতি রহিয়াছে। যদি কোন বিচারে উক্ত ত্রিবিধ সংগতি দৃষ্ট না হয় তবে তাহা বিচার বা আলোচনার বিষয়ই হইতে পারে না।

ত্রিবিধ মূল সংগতি থাকিলে, তাহার পর দেখা যাইতে পারে যে অবান্তর সংগতির মধ্যে কতগুলি উক্ত বিচারে দেখা যায়। অবান্তরসংগতি নানাবিধ, সকলগুলি যে একটী বিচারেই থাকিতে হইবে এমন কোন কথা নাই।

মূল। সেয়মবান্তরসংগতির্ব্যুৎপন্নেনোহিতুং শক্যতে। অতস্তাং ব্যুৎপাদয়তি ঃ—

পূর্ব্বন্যায়স্য সিদ্ধান্তযুক্তিং বীক্ষ্য পরে নয়ে।
পূর্ব্বপক্ষস্য যুক্তিং চ তত্রাহক্ষেপাদি যোজয়েৎ ॥১০

তদ্যথা প্রথমাধিকরণে "ব্রহ্মবিচারশাস্ত্রমারম্ভণীয়ং" ইতি সিদ্ধান্তঃ। তত্র যুক্তিঃ—'ব্রহ্মণঃ সন্দিগ্ধত্বাৎ" ইতি। দ্বিতীয়াধিকরণস্য "জগজ্জন্মাদি ব্রহ্মলক্ষণং ন ভবতি" ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। তত্র যুক্তিঃ—"জন্মাদের্জগন্নিষ্ঠত্বাৎ" ইতি। তদুভয়মবলোক্য তয়োরাক্ষেপসংগতিং যোজয়েৎ। "সন্দিগ্ধত্বাদ্ ব্রহ্ম বিচার্য্যং" ইত্যেতদযুক্তং। জন্মাদেরন্যনিষ্ঠত্বেন ব্রহ্মণো লক্ষণাভাবে সতি ব্রহ্মৈব নাস্তি, কুতস্তস্য সন্দিগ্ধত্বং বিচার্য্যত্বং চ—ইত্যাক্ষেপসংগতিঃ। দৃষ্টান্তপ্রত্যুদাহরণসংগতী চাত্র যোজয়িতুং শক্যেতে। "যথা সন্দিগ্ধত্বেন হেতুনা ব্রহ্মণো বিচার্য্যত্বং, তথা—জন্মাদ্যন্যনিষ্ঠত্বেন হেতুনা ব্রহ্মণো লক্ষণং নাস্তি" ইতি দৃষ্টান্তসংগতিঃ। যথা—বিচার্যত্বে হেতুরস্তি, ন তথা লক্ষণসদ্ভাবে হেতুং পশ্যামঃ' ইতি প্রত্যুদাহরণসংগতিঃ। তে এতে দৃষ্টান্তপ্রত্যুদাহরণসংগতী সর্ব্বত্র সুলভে। পূর্ব্বাধিকরণসিদ্ধান্তবদুত্তরাধিকরণপূর্ব্বপক্ষে হেতুমত্বসাম্যস্য, উত্তরাধিকরণসিদ্ধান্তে হেতুশূন্যত্ববৈলক্ষণস্য চ মন্দৈরপ্যুৎপ্রেক্ষিতুং শক্যত্বাৎ। আক্ষেপসংগতির্যথাযোগমুন্নেয়া। অথ প্রাসঙ্গিকসংগতিরুদাহ্রিয়তে— দেবতাধিকরণস্যাধিকারবিচাররূপত্বাৎ সমন্বয়াধ্যায়ে জ্ঞেয়ব্রহ্মবাক্যবিষয়ে তৃতীয়পাদে চ সংগত্যভাবেঽপি বুদ্ধিস্থাবান্তরসংগতিরস্তি। তথাহি পূর্ব্বাধিকরণে 'অঙ্গুষ্ঠমাত্রবাক্যস্য ব্রহ্মপরত্বাদঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বং ব্রহ্মণো মনুষ্যহৃদয়াপেক্ষং, মনুষ্যাধিকারত্বাচ্ছাস্ত্রস্য' ইত্যুক্তং। তৎপ্রসঙ্গেন দেবতাধিকারো বুদ্ধিস্থঃ। সেয়ং প্রাসঙ্গিকসংগতিঃ। তদেবং ন্যায়সংগতির্নিরূপিতা ॥

অনুবাদ। ব্যুৎপন্ন ব্যক্তি সেই অবান্তরসংগতি বুঝিতে পারেন। অতএব (অব্যুৎপন্ন ব্যক্তির জন্য) তাহার ব্যাখ্যা করা যাইতেছে।

পরবর্ত্তী ন্যায় বা অধিকরণে পূর্ব্ববর্ত্তী ন্যায় বা অধিকরণের সিদ্ধান্তমূলক যুক্তি এবং পূর্ব্বপক্ষেরও যুক্তি এই উভয় অবলোকন করিয়া তাহাতে আক্ষেপাদি-সংগতি সংযোজিত করিতে হইবে।

তদ্‌যথা—প্রথম (বা জিজ্ঞাসা) অধিকরণে ব্রহ্মবিচারশাস্ত্র আরম্ভ করা কর্ত্তব্য এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে। উক্ত সিদ্ধান্তের যুক্তি এই যে ব্রহ্মবিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয়। দ্বিতীয় (বা ব্রহ্মলক্ষণ) অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ হইল এই যে জগতের জন্ম প্রভৃতি ব্রহ্মের লক্ষণ হইতে পারে না। সেই পূর্ব্বপক্ষের যুক্তি হইতেছে এই যে জন্মপ্রভৃতি জগতেরই ধর্ম্ম। উপরোক্ত যুক্তিদ্বয় অবলোকন করিয়া উভয়ের মধ্যে আক্ষেপসংগতি যোজনা

করিতে হইবে। এই বিষয়ে সন্দেহের কারণ্ই যে ব্রহ্মবিষয়ক বিচার করিতে হইবে, একথা যুক্তি-যুক্ত নহে। জন্মাদি কেবল অন্যেরই লক্ষণ হইলে ব্রহ্মের লক্ষণ বা স্বরূপেরই অভাব হইল, সুতরাং ব্রহ্মের অস্তিত্বই রহিল না। তখন ব্রহ্মবিষয়ে সন্দেহই বা আসে কিরূপে এবং তাহার বিচারের কথাই বা উঠে কিরূপে? ইহাই হইল আক্ষেপ সংগতি। এই বিচারে দৃষ্টান্তসংগতি এবং প্রত্যুদাহরণসংগতিও যোজনা করা যাইতে পারে। যেরূপ সন্দিগ্ধত্বের কারণে ব্রহ্মবিষয়ে বিচার্য্যত্ব স্বীকৃত, সেইরূপ জন্ম প্রভৃতির অন্যনিষ্ঠত্ব প্রযুক্ত ব্রহ্মের লক্ষণ নাই, ইহাই হইল দৃষ্টান্তসংগতি। বিচার্য্যত্ব বিষয়ে যেমন হেতু আছে, (ব্রহ্মের) লক্ষণের অস্তিত্ব বিষয়ে আমরা সেরূপ হেতু দেখি না—ইহাই হইল প্রত্যুদাহরণসংগতি। দৃষ্টান্ত ও প্রত্যুদাহরণ সংগতি সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বাধিকরণের সিদ্ধান্তের ন্যায় উত্তরাধিকরণের পূর্ব্বপক্ষে হেতুর অস্তিত্ববিষয়ক সাম্য এবং উত্তরাধিকরণে সিদ্ধান্তে হেতুর অনস্তিত্ব-রূপ (পূর্ব্বাধিকরণ সিদ্ধান্ত হইতে) পার্থক্য মন্দ-বুদ্ধি ব্যক্তিগণও বুঝিতে সক্ষম। যথাযুক্তস্থলে আক্ষেপসংগতি বুঝিতে হইবে। এক্ষণে প্রাসঙ্গিক সংগতির উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে—দেবতাধিকরণের অধিকারবিষয়ক বিচাররূপত্ব হেতু সমন্বয় অধ্যায়ে জ্ঞেয়ব্রহ্মবাক্য বিষয়ে এবং তৃতীয় পাদে সংগতির অভাব সত্ত্বেও বুদ্ধিস্থ অবান্তরসংগতি রহিয়াছে। পূর্ব্বাধিকরণে (অর্থাৎ দেবতাধিকরণের পূর্ব্ববর্ত্তী অধিকরণে) "'অঙ্গুষ্ঠমাত্র' এই বাক্যের ব্রহ্মপরত্ব প্রযুক্ত ব্রহ্মের অঙ্গুষ্ঠমাত্রত্ব মনুষ্যের হৃদয়সাপেক্ষ কারণ শাস্ত্রে মনুষ্যেরই অধিকার" ইহা উক্ত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে দেবতার অধিকার বুদ্ধিস্থ হয় (অর্থাৎ স্বতই আসিয়া পড়ে)। ইহাই হইল প্রাসঙ্গিকসংগতি। এই প্রকারে ন্যায়সঙ্গতি নিরূপিত হইল।

তাৎপর্য্য। যাঁহারা বেদান্ত প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্রে অভিজ্ঞ, তাঁহাদের পক্ষে বিচার প্রসঙ্গে অবান্তর-সংগতি দেখা সহজ, কিন্তু দর্শনশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি-রহিত ব্যক্তিগণের পক্ষে সেই সকল সংগতি অবান্তর বা অপ্রধান হইলেও বাহির করা সহজ নহে। তাই গ্রন্থকার সেই সকল সংগতির স্বরূপ বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন।

বেদান্ত সূত্রের প্রথম অধ্যায়, প্রথম পাদের প্রথম অধিকরণ হইতেছে ব্রহ্মবিচারবিষয়ক। এই অধিকরণে ব্রহ্মবিষয়ে যে বিচার বা আলোচনা করা উচিত তাহাই বিচার করা হইয়াছে। আলোচনার ফলে এই অধিকরণের সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে ব্রহ্ম বিচার্য্য অর্থাৎ ব্রহ্মবিষয়ে আলোচনা করা যাইতে পারে। এই সিদ্ধান্তে আমরা আসি কেন? ব্রহ্মবিষয়ে নানাবিধ সন্দেহ উপস্থিত হয়—তুমি যে কারণেই হৌক বলিতেছ যে ব্রহ্ম বিচার্য্য নহে, আর আমি যে কারণেই হৌক বলিতেছি যে ব্রহ্ম বিচার্য্য। এখন এই রকম সন্দেহদোলায় দোদুল্যমান হওয়া কোন জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তির উপযুক্ত নহে। কাজেই আমাকে একটা সিদ্ধান্তে আসিতেই হইবে। আমি যে সিদ্ধান্তেই উপনীত হই না কেন, বিচার করিয়া সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার কারণ বা যুক্তিই হইল সেই সন্দেহ।

প্রথম অধ্যায় প্রথম পাদের দ্বিতীয় অধিকরণ হইতেছে ব্রহ্মলক্ষণবিষয়ক। এই অধিকরণে ব্রহ্মের লক্ষণ বা স্বরূপ কি, তদ্বিষয়ে আলোচিত হইয়াছে। এই বিচারের প্রথমেই এই সন্দেহ উপস্থিত হয় যে ব্রহ্মের কোন প্রকার লক্ষণ হইতে পারে কি না। এই সন্দেহে পূর্ব্বপক্ষ বলিবেন যে ব্রহ্মের কোন প্রকার লক্ষণ হইতে পারে না এবং উত্তরপক্ষ বলিবেন যে ব্রহ্মের লক্ষণ হইতে পারে। পূর্ব্বপক্ষ তখন উত্তর-পক্ষকে এই প্রশ্ন করিবার অধিকারী যে ব্রহ্মের লক্ষণ কি? উত্তরপক্ষ তখন শ্রুতি অবলম্বনে বলিবেন যে জগতের কারণত্ব ব্রহ্মের অন্যতর লক্ষণ। তখন পূর্ব্বপক্ষ বলিবেন যে জগতের জন্ম প্রভৃতি ব্রহ্মের লক্ষণ হইতে পারে না। পূর্ব্ব-পক্ষের এই উক্তির যুক্তি হইতেছে যে জন্ম বা উৎপত্তি জড় জগতের ধর্ম্ম, তাহা চেতন ব্রহ্মের লক্ষণ হইতে পারে না। উপরোক্ত পূর্ব্ববর্ত্তী অধিকরণের সিদ্ধান্তের যে যুক্তি (ব্রহ্ম বিষয়ক সন্দেহ) তাহার সহিত পরবর্ত্তী অধিকরণের পূর্ব্ব-পক্ষীয় যে যুক্তি (জন্মাদি জড় জগতের ধর্ম্ম, ব্রহ্মের ধর্ম্ম নহে), এই উভয় যুক্তির মধ্যে একটী আপত্তিমূলক সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। সে সম্বন্ধটী এই যে, ব্রহ্মের যদি কোন লক্ষণই

না থাকে * তবে ব্রহ্ম বিষয়ে সন্দেহও আসিতে পারে না এবং সুতরাং ব্রহ্মের বিচার্য্যত্বও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। এই আপত্তিমূলক সম্বন্ধটীই হইল আক্ষেপসংগতি। গ্রন্থকার অব্যবহিত পরেই তাঁহার টীকাতে এইটী বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

এই আক্ষেপসংগতির ন্যায় অবান্তরসংগতি আরও অনেক প্রকার আছে। দুইটী অধিকরণের পরস্পারের মধ্যে যে সকল সংগতি বা সম্বন্ধ দৃষ্ট হয় সেইগুলিকেই অবান্তরসংগতি বলা হয়। দুইটী অধিকরণোক্ত বিষয়ের বিচারকালে স্বভাবতই পরস্পরসম্বদ্ধ নানা কথা আসিয়া পড়ে, কাজেই নানাবিধ সংগতিও অনায়াসে খুঁজিয়া লওয়া যাইতে পারে। মোটামুটি যে সকল অবান্তরসংগতি বিচারকালে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে করেকটী প্রধান প্রধান সংগতি গ্রন্থকার তাঁহার গ্রন্থে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তন্মধ্যে আক্ষেপসংগতি প্রথমেই বুঝাইয়া এইবারে দৃষ্টান্ত ও প্রত্যুদাহরণসংগতি বুঝাইতেছেন।

দুইটী অধিকরণের মধ্যে দৃষ্টান্তমূলক যে সম্বন্ধ, তাহাই দৃষ্টান্তসংগতি। তুমি একটী যুক্তি দেখাইয়া বলিলে যে ব্রহ্মবিষয়ে সন্দেহ আছে বলিয়াই ব্রহ্মবিষয়ে বিচার করা কর্ত্তব্য। আমিও সেইরূপ যুক্তি দেখাইয়াই বলিতেছি যে জড় জগতের লক্ষণ বলিয়াই উহা ব্রহ্মের লক্ষণ হইতে পারে না। তোমার যুক্তি যদি স্বীকৃত হইতে পারে, তবে আমারই বা যুক্তি অস্বীকৃত হইবে কেন? তোমারও উক্তির যেমন হেতু আছে, আমার উক্তিরও সেইরূপ হেতু আছে। এই খানেই দুইটী অধিকরণের দৃষ্টান্তসংগতিরূপ পরস্পরসম্বন্ধ দেখা যাইতেছে।

কোন বিষয়ের বিচার কালে পূর্ব্ববর্ত্তী অধিকরণের সিদ্ধান্তের সহিত পরবর্ত্তী অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষের কোন সূত্রে সাম্য থাকিলেই তাহাকে দৃষ্টান্তসংগতি বলা যায়। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে একটা যুক্তি বা হেতু থাকার সাম্য দেখা যায়—পূর্ব্বাধিকরণের সিদ্ধান্তের (ব্রহ্ম বিচার্য্য) সন্দেহরূপ একটা হেতু আছে, আর পরবর্ত্তী অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষেরও (ব্রহ্মের লক্ষণ হইতে পারে না) জন্মাদি জড় জগতের ধর্ম্মরূপ একটা হেতু আছে। পুনশ্চ, যদি পূর্ব্ববর্ত্তী অধিকরণের সিদ্ধান্তের সহিত পরবর্ত্তী অধিকরণের সিদ্ধান্তের কোন সূত্রে বৈষম্য দৃষ্ট হয় তাহাকেই প্রত্যুদাহরণসংগতি বলা যায়। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে পূর্ব্বাধিকরণের সিদ্ধান্তের যেমন সন্দেহরূপ একটা হেতু দেখানো হইতেছে, উত্তরাধিকরণের সিদ্ধান্তের (ব্রহ্মের লক্ষণ আছে) সেরূপ কোন হেতু থাকা পূর্ব্বপক্ষ কর্ত্তৃক অস্বীকৃত হইতেছে—দুইটী সিদ্ধান্তের একটাতে হেতু থাকা, অপরটীতে হেতু না থাকা, এই বৈষম্যমূলক সম্বন্ধই হইল প্রত্যুদাহরণসংগতি।

সর্ব্ববিধ সংগতির মধ্যেই আপত্তি উঠিতে পারে এবং আপত্তি উঠিলেই তাহা আক্ষেপ সংগতির অন্তর্ভুক্ত হইবে। সেই কারণে গ্রন্থকার বলিতেছেন যে, "যথাযুক্তস্থলে আক্ষেপ-সংগতি বুঝিতে হইবে।"

এইবারে প্রাসঙ্গিকসংগতিটী কি তাহা বুঝানো যাইতেছে। বেদান্তসূত্রের সমন্বয় অধ্যায়ের (১ম অধ্যায়) তৃতীয় পাদে, জ্ঞানগম্য যে ব্রহ্ম, তদ্বিষয়ক যে সকল শ্রুতিবাক্য আছে, তাহারই বিচার করা হইয়াছে। এই বিচারের একটী অধিকরণে দেবতার অধিকার আলোচিত হইয়াছে—সেই অধিকরণকে দেবতাধিকরণ বলা হয়। আপাতদৃষ্টিতে এই দেবতাধিকরণ উপস্থিত করিবার কোনই কারণ দেখা যায় না। যেখানে জ্ঞেয় ব্রহ্মবিষয়ক শ্রুতিবাক্য বিচার করা হইতেছে, সেখানে দেবতার অধিকার বিষয়ক আলোচনা আসিবার প্রয়োজন কি? কিন্তু গ্রন্থকার দেখাইতেছেন যে ইহা প্রসঙ্গক্রমেই আসিয়াছে। এই অধিকরণের পূর্ব্ববর্ত্তী অধিকরণে "অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ" ইত্যাদি কঠোপনিষদুক্ত শ্রুতিবাক্য ব্রহ্মপ্রতিপাদক বলিয়াই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। এখন, এই বাক্য ব্রহ্মপর বলিয়াই এই আশঙ্কা উঠিতেছে যে, যে ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী তিনি অঙ্গুষ্ঠমাত্র হইবেন কি প্রকারে? এই আশঙ্কার নিরাকরণে বলা হইতেছে যে, ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী হইলেও তিনি যে মনুষ্যহৃদয়ের দ্বারা উপলব্ধ হইবেন সেই হৃদয় অঙ্গুষ্ঠমাত্র বলিয়াই ব্রহ্মকেও অঙ্গুষ্ঠমাত্র বলা হইয়াছে। এখন, উক্ত অঙ্গুষ্ঠমাত্রাধিকরণে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে শাস্ত্রে অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত বাক্যসমূহ আলোচনা করিবার অধিকার মনুষ্যেরই আছে। তৎক্ষণাৎ এই একটী প্রশ্ন মনে সমুত্থিত হইল যে তবে কি শাস্ত্রে দেবতাদিগের অধিকার নাই? এই প্রশ্নটী প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত করা না হইলেও অঙ্গুষ্ঠমাত্রাধিকরণোক্ত বিষয়ের বিচারকালে বুদ্ধিস্থ বা নিগূঢ়ভাবে প্রসঙ্গক্রমে উপস্থিত হইতেছে। এইরূপ কোন বিষয়ের বিচারকালে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনরূপে কোন একটী বহির্ভূত বিষয় প্রসঙ্গক্রমে উপস্থিত হইলেই তাহা অসঙ্গত হইবে না, প্রত্যুত তাহা আলোচনার পক্ষে সংগত বলিয়াই বিবেচিত হইবে। এই ভাবে সংগত হইবার নামই হইল প্রাসঙ্গিকসংগতি।

এই পর্য্যন্ত গ্রন্থকার প্রধান এবং অপ্রধান বা অবান্তর সংগতিসমূহ যথাসম্ভব বুঝাইয়া আসিলেন।

আগামী সংখ্যা হইতে মূল বেদান্তসূত্রের অনুবাদ আরম্ভ হইবে। তৎ বোং সং।

* ব্রহ্মের জগৎ কারণত্ব রূপ লক্ষণ অস্বীকৃত হইলে অন্যান্য লক্ষণ জগত্ত্বা বাধিত হইয়া পড়ে।

সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে ধর্ম্ম ও নীতি।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর)

পাণ্ডিত্য।

স্ত্রীলোক পণ্ডিত হয় স্বভাবের বলে
পুরুষ পাণ্ডিত্য লভে শাস্ত্র শিক্ষা ফলে।

—মৃচ্ছকটিক ৪ অঙ্ক।

গুণের শ্রেষ্ঠতা।

গুণের অর্জ্জনে নর হইবেক সদা যত্নবান
গুণহীন ধনী হ'তে শ্রেষ্ঠতর নিঃস্ব গুণবান ॥
পুরুষ গুণেতে যত্ন করিবে সদাই,
গুণের অপ্রাপ্য বস্তু হেথা কিছু নাই।
গুণের উৎকর্ষ-বলে শশাঙ্ক যেমন
অলঙ্ঘ্য শম্ভুর শির করিলা লঙ্ঘন ॥
গুণ যার কিশলয়, বিনয় প্রশাখাচয়,
সুযশ কুসুম, আর মূলটি বিশ্বাস,
নিজগুণে ফল ধরে,—এ হেন বৃক্ষের পরে
সুহৃদ-বিহঙ্গ সবে সুখে করে বাস ॥

—ঐ-ঐ।

আশ্রয় দান।

জয়লক্ষ্মী, আর যত মিত্র বন্ধু
ত্যজে সে অধমে,
—লোক-উপহাস্য হয়,
যে ত্যজে শরণাগত জনে ॥

ঐ-ঐ।

পর-উপকারী জন, ভীতজনে করে যদি
অভয় প্রদান,
যায় যাক্ প্রাণ তার, তবু লোকে করে সদা
তার গুণগান ॥

ঐ-ঐ।

ধর্ম্ম সঞ্চয়।

অজ্ঞ জন কর সবে ধরম সঞ্চিত,
নিজের উদর নিত্য কর সংকুচিত।
বাজারে ধ্যানের ঢাক্, সতর্ক হইয়া সদা কর জাগরণ,
বিষম ইন্দ্রিয়-চোর হরণ করয়ে চির-সঞ্চিত ধরম ॥
সংসার অনিত্য দেখি লইয়াছি ধর্ম্মের শরণ,
—ইন্দ্রিয়ের পঞ্চজনে যে করয়ে জ্ঞানাস্ত্রে নিধন।
অবিদ্যা-নারীরে বধি, রক্ষণ যে করে আত্ম-গ্রামে,
—পাপ-চণ্ডালেরে নাশে, নিশ্চয় সে যায় স্বর্গধামে ॥
মস্তক মুণ্ডিত কর, অথবা মুণ্ডিত কর বদন মণ্ডল
চিত্তের মুণ্ডন বিনা, ও-সব মুণ্ডনে বল' আছে কিবা
ফল।
মুণ্ডিত যে করে চিত্ত, মস্তক মুণ্ডিত জানি তাহারি
কেবল ॥

ঐ—৮ম অঙ্ক।

উদ্যানের আশ্রয় দান।

গৃহহীন জনে স্থান করিয়া প্রদান,
নিরানন্দে আনন্দ করিয়া বিধান
এই সব তরু করে পুণ্য অনুষ্ঠান।
দুরাত্মা-হৃদয় কিম্বা নব-রাজ্য সম
বিশৃঙ্খল এ উদ্যান তবু মনোরম ॥

ঐ—ঐ।

কুলশিক্ষা ও স্বভাব-চরিত্র।

কি হইবে বল' ওগো কুলের শিক্ষায়,
স্বভাব-চরিত্র মূল-কারণ হেথায়।
হোক্ না উর্ব্বর ক্ষেত্র অতীব সুচারু
বাড়ে নাকি তাহে হীন কণ্টকের তরু ?

ঐ—ঐ।

আত্ম সংযম।

সুসংযত মুখ হস্ত, সুসংযত ইন্দ্রিয়াদি যার
তাকেই মনুষ্য বলি, কি করিতে পারে রাজা
তার ?
হস্তে তার পরলোক, কাড়ি লয় সাধ্য আছে
কার ?

ঐ—৯ অঙ্ক।

নববর্ষ।

(শ্রীপ্রসন্নময়ী দেবী)

খুলি দেও হৃদি দ্বার
আশীর্ব্বাদ দেবতার
বরষিবে সেথা আজি নব ;
বরষের দূত ক'য়ে
পাঠাইছে ঘরে ঘরে,
রাজেশ্বর ক্ষমা করি সব।
ভুল ভ্রান্তি পুরাতন
নাহি তার নিদর্শন,
রাজকর দিতে নাহি হবে ;
হিসাব নিকাশ সাপ্
বকেয়া বাকীর মাপ,
কায়েমী ব্যবস্থা নাহি ভবে।
আসে যায় এই নিত্য
জীবন প্রত্যক্ষ সত্য,
অগ্রসর হও নব কাজে ;
বরষের সুপ্তি দূর
এ নহে স্বপন-পুর,
জাগরণ শঙ্খধ্বনি বাজে।
বাদ্য শব্দে মুখরিত
সচেতন চারিভিত,
জয় ধ্বনি করি উঠ সবে ;
রাজপদে রাখি হিয়া
আপনারে সঁপি দিয়া,
বিশ্বব্রতে খাঁটি হতে হবে।
ছোটখাট স্বার্থ হীন
লইয়া রবে না দীন,
আজ পুনঃ নব জন্ম হবে।

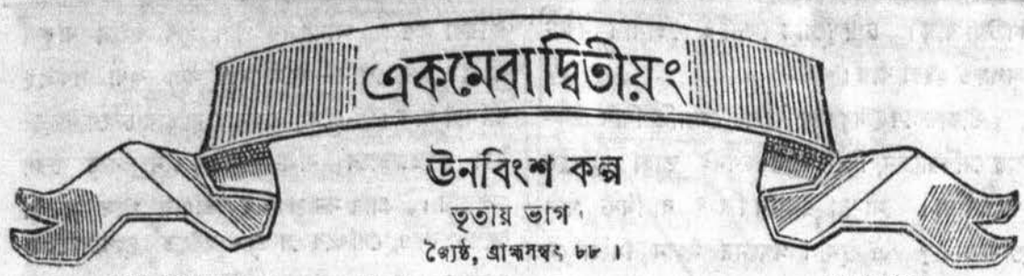

ঊনবিংশ কল্প
তৃতীয় ভাগ।
জ্যৈষ্ঠ, ব্রাহ্মসম্বৎ ৮৮।

৮৮৬ সংখ্যা। ১৮৩৯ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ যদ্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"

ব্যাকুলতা।

(শ্রীগৌরীনাথ চক্রবর্ত্তী কাব্যরত্নশাস্ত্রী)

হৃদয় আমার পাইতে তোমারে
ব্যাকুল দিবসযামিনী
পরাণ নিয়ত কাঁদিছে লাগিয়া
তোমারি চরণ-তরণী।

তুমি কোথা আছ—না হেরি তোমায়—
তোমারে লভিতে খুঁজি বিশ্বময়,
আছ তুমি সদা বলিছে হৃদয়—
কোথা আছ নাহিক জানি।

অন্তরে বাহিরে করুণা-নিঝর—
মহিমা ব্যাপিছে দিক্ দিগন্তর—
আনন্দে গাহিছে বিশ্বচরাচর
মধুর তব যশো বাণী

কোথায় রেখেছ তব সিংহাসন—
কোথা আছে তব প্রেমনিকেতন—
যেথায় বসিয়া করিছ শাসন
ব্রহ্মাণ্ডের নিখিল প্রাণী।

দেবের অগম্য তোমার সদন,
পায় তথা স্থান নিরাশ্রয় জন,
যে তোমারে ডাকে ভাবিয়া আপন,
(তুমি) ডেকে লও তারে আপনি।

তোমার মন্দির নহে অতি দূরে,
থাক তুমি মম হৃদয় কুটীরে—
হেরিবারে দাও ঘুচায়ে তিমিরে,
তোমারে আমার জননি।

উদ্বোধন।

এই শুভ পবিত্র সময়ে এই পবিত্র স্থানে আমাদের সেই প্রাণারাম পরমেশ্বরের দর্শনলাভের জন্য এখানে আসিয়াছি।

হে প্রাণারাম হৃদয়দেবতা, তুমি এসো, প্রাণের ভিতরে এসো। আমাদের সমুদয় প্রাণকে কাড়িয়া লইয়া তোমাদ্বারা সেই প্রাণের স্থান পূর্ণ কর। তুমি আনন্দস্বরূপ, তুমি মঙ্গলময়, তুমি আমাদের পিতামাতা সকলই। তোমার মঙ্গলভাব আমাদের সম্মুখে চিরবিরাজমান রাখ। তোমার সঙ্গে আমাদিগকে বাঁধিয়া রাখ, তোমার সঙ্গে আমাদিগকে এক করিয়া দাও। তোমার বিরহের ব্যথা আর আমাদের সহ্য হয় না। তোমাকে ছাড়িয়া কতবার সংসারে ডুবিয়া যাই, অতল অন্ধকারের পাতালে ডুবিয়া যাই। কিন্তু যেখানেই যাই, সেখানে তোমার চক্ষু ধ্রুবতারারূপে জাগ্রত থাকিয়া আমাদিগকে সর্ব্বদাই অমঙ্গল হইতে রক্ষা করে। যতই আমরা তোমার দিকে অগ্রসর হই, ততই সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা দূরে সরিয়া যায়, হৃদয়ের অন্ধকার ততই

কাটিয়া যায়। চন্দ্রসূর্য্যের জ্যোতি তোমার নিকট অপহৃত হইয়া যায়।

তাঁহার সেই মধুর শান্তিপ্রদ জ্যোতি যিনি একবার দেখিয়াছেন, তিনি আর কখনই তাহা ভুলিতে পারেন না। আমরা এখানে কি-ই বা মিষ্ট গান শুনিতেছি? ঐ সুনীল গগনের মহান সিংহাসনে অধিষ্ঠিত পরমদেবতা পরমেশ্বরকে ঘিরিয়া দেবতাদের যে অনাহত সুরের গীত দিবানিশি ধ্বনিত হইতেছে, সে গান যিনি শুনিয়াছেন, তিনি কখনই তাহা ভুলিতে পারেন না। চেষ্টা থাকিলে মনুষ্যের ভাগ্যে এক আধবার সেই গান কানে পৌঁছিতে পারে, সেই জ্যোতি এক আধবার নয়নে প্রতিভাত হইতে পারে। যে মুহূর্ত্তে সেই জ্যোতি অন্তশ্চক্ষুর সম্মুখে আবির্ভূত হইবে, যে মুহূর্ত্তে সেই অনাহত সুরের গান কানে আসিয়া পৌঁছিবে, সেই মুহূর্ত্তে সেই জ্যোতি, সেই গান অন্তরে না ধরিয়া রাখিলে সে জ্যোতি অদৃশ্য হয় এবং সে গানও শ্রুতির অগোচর হইয়া যায়। তখন তাহার জন্য পাগল হইতে হয়, অথচ পাগল হইলেও তাহার আর সন্ধান পাওয়া যায় না।

আমাদের সেই করুণাময়ী মাতার স্নেহদয়া অসীম। যখনই তাহা স্মৃতিপথে জাগরূক হইয়া উঠে, তখনই হৃদয় হইতে সংসারের সকল ভাবনা দূরে চলিয়া যায়। কোথায় বা মর্ম্মরখচিত অট্টালিকা, আর কোথায় বা স্ত্রীপুত্র আত্মীয় স্বজনের বিন্দুপরিমিত প্রেম, তখন সে সকলই তুচ্ছ অতিতুচ্ছ বলিয়া জানিতে পারি। তখন ইচ্ছা হয় যে সকল সংসার ছাড়িয়া গিরিকন্দর বৃক্ষতলে গিয়া সেই মাতার অতুলনীয় প্রেমের মধ্যে নিয়ত বাস করি। তাঁহারই সঙ্গে নিয়ত আহার বিহার করিতে, তাঁহার সহিত নিত্য বিচরণ করিতে প্রাণ কাঁদিয়া উঠে।

এই উপাসনামন্দিরে প্রাণ খুলিয়া চক্ষু চাহিয়া দেখ, আমাদের মাতা আমাদের হৃদয়ের পূজা গ্রহণ করিবার জন্য এখনই এখানে দাঁড়াইয়া আছেন। সংসারের কোলাহল এখন পশ্চাতে পড়িয়া থাক্, সংসারের কথা যেন এসময়ে এক মুহূর্ত্তও আমাদের হৃদয়ে স্থান না পায়। যিনি আমাদিগকে সকলই দিতেছেন, তাঁহাকে একটীবার অনিমেষ নয়নে দেখিয়া লও, হৃদয়ের পূজা অর্পণ কর, জীবনের সঙ্গী করিয়া লও। আমাদের প্রাণ পূর্ণ হইয়া যাক। তাঁহার কথা শোন—আমাদের অন্য কথা সকলই থামিয়া যাক। এসো, একবার মাতার চরণে দাঁড়াইয়া কাতরভাবে বলি—ছাড়িব না কভু চরণ তোমার। প্রাণ মন সকলই তাঁহার পদে সমর্পণ করিয়া দাও, দেখিবে যে প্রাণ হইতে দুঃখশোকের কঠোর ভার কেমন সহজে নামিয়া যাইবে।

ব্রাহ্মধর্ম্মবীজের অভিব্যক্তি।

১৭৬৭ শকে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে বেদের নিত্যতা ও অভ্রান্ততা বিষয়ক বাদানুবাদ বড়ই তীব্রতা ধারণ করিয়াছিল। ১৭৬৮ শকে এই বিষয়ে জগদ্বন্ধু পত্রিকার সহিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বাদানুবাদ প্রকাশ্যেই চলিয়াছিল। বলা বাহুল্য যে প্রথম প্রথম ব্রাহ্মসমাজ বেদবেদান্তকে কতকটা অপৌরুষেয়, নিত্য ও অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। বর্ত্তমানে আর্য্যসমাজ বেদেতে সত্য ভিন্ন আর কিছুই উক্ত হয় নাই, এইভাবে বেদকে নিত্য ও অভ্রান্ত স্বীকার করেন। ব্রাহ্মসমাজও পূর্ব্বে কতকটা সেইভাবেই বেদের অভ্রান্ততায় বিশ্বাস করিতেন। জগদ্বন্ধু পত্রিকায় একবার বেদ অভ্রান্ত ধর্ম্মশাস্ত্র নহে, এই কথা লেখা হইয়াছিল। তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক অক্ষয় বাবু তাহার প্রতিবাদে অস্বীকৃত হওয়ায় দেবেন্দ্রনাথ ও রাজনারায়ণ বসু তাহার প্রতিবাদ লিখিয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশিত করেন। এই সকল প্রতিবাদ আলোচনা করিলে দেবেন্দ্রনাথ ও তৎমতানুযায়ী ব্রাহ্মদিগের বেদের অভ্রান্ততা বিষয়ে কি প্রকার মত অবলম্বিত হইয়াছিল তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। তাঁহাদের এই মত ছিল যে "পরমেশ্বর মনুষ্যমাত্রেরই মনে সামান্যত ধর্ম্মজ্ঞানের সামর্থ্য প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু মোহ বা ভ্রান্তিবশত তাহা কদাপি আচ্ছন্ন হয়; সকল সময়ে জ্ঞানের প্রকৃত স্ফূর্ত্তি হয় না। এই সময় মহাজনের বাক্য বিশেষ ফলোপধায়ক হইয়া থাকে। এই মহাজনকে তপস্বী ঋষিই বল বা বেদান্তের ব্রহ্মাই বল, তাঁহার কথিত বাক্য বা বেদ দীপবৎ মোহান্ধকার দূর করিয়া দেয়।" আর একটী প্রতিবাদের উপসংহারে আছে যে "পক্ষপাত ও মোহন্যশূ

হইয়া সেই বেদভাবকে আমরা আলোচনা করিলে যখন তন্মধ্যে যুক্তিসাধ্য সমুদয় বিষয় আমাদিগের বুদ্ধিনিষ্পন্ন সিদ্ধান্তের সহিত সম্পূর্ণ ঐক্য হয়, তখন বেদমধ্যে আমাদিগের বুদ্ধিসীমার অতীত সমুদয় ধর্ম্মও যে অখণ্ডরূপে প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার প্রতি সংশয় কি ?"

১৭৬৭ শকের বৈশাখ মাসের তত্ত্ববোধিনীতে এই বিষয়ে কতকগুলি প্রশ্নোত্তর প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই প্রশ্নোত্তরগুলির নিম্নে "কস্যচিৎ সভ্যস্য" (অর্থাৎ ব্রাহ্মসমাজের কোন সভ্যের) স্বাক্ষর দেখা যায়। আমরা দু একটী প্রশ্নোত্তর নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

১ম প্রশ্ন। বেদশাস্ত্র নিত্য কিনা ?

উত্তর। জন্মমৃত্যুশূন্য যে বস্তু তাহাকেই নিত্য বলা যায়, সুতরাং বেদকে নিত্য বলা যায় না, কারণ শ্রুতিতে বেদের উৎপত্তি দৃষ্ট হইতেছে—"তস্মাদৃচঃ সামযজুংষি দীক্ষা যজ্ঞাশ্চ সর্ব্বে ক্রতবো দক্ষিণাশ্চ। সম্বৎসরশ্চ যজমানশ্চ লোকাঃ সোমো যত্র পবতে যত্র সূর্য্যঃ॥ মুণ্ডকশ্রুতিঃ॥ অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতৎ যদৃগ্বেদঃ॥ শঙ্করাচার্য্যধৃতশ্রুতি॥ অতএব শ্রুতিতে যখন বেদের উৎপত্তি দেখা যাইতেছে, তখন তাহা কদাপি কূটস্থ নিত্য নহে, কিন্তু বহুকাল স্থায়ী প্রযুক্ত কোন কোন মুনিরা তাহাকে আপেক্ষিক নিত্য বলিয়াছেন। কূটস্থ নিত্য এক বস্তু ভিন্ন আর দ্বিতীয় বস্তু নাই।" * *

৪র্থ প্রশ্ন। স্মৃতি আগম পুরাণাদি শাস্ত্র মান্য কি না ?

৫ম প্রশ্ন। উক্ত শাস্ত্রাদির বচন গ্রাহ্য কিনা ?

উত্তর। অবিভাগে বেদবাক্য মাত্রই প্রামাণ্য, বেদার্থানুযায়ী যে স্মৃতি তাহাও সুতরাং মান্য, এবং বেদসম্মত বা বেদাবিরোধী যুক্তিযুক্ত যে পুরাণতন্ত্র তাহাও অবশ্য মান্য।

৯ম প্রশ্ন। বেদবাক্য তর্কাভাব কিনা ? *

উত্তর। তর্ক প্রতি নির্ভর করিয়া বেদকে অমান্য করিবেক না।

যোঽবমন্যেত তে মূলে হেতুশাস্ত্রাশ্রয়াদ্দ্বিজঃ।
স সাধুভির্বহিষ্কার্য্যো নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ॥ মনুঃ

কিন্তু বেদবাক্যের অর্থ তর্কের দ্বারা অনুসন্ধান করিবেক।

আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।
যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ॥ মনুঃ॥

১০ম প্রশ্ন। তর্কের দ্বারা যে বেদবাক্য যুক্তিসিদ্ধ হইবেক, ঐ বেদবাক্য সত্য, অন্য অসত্য কিনা ?

উত্তর। বেদবাক্যমাত্রেই সত্য, তাহার কোন অংশই অসত্য হইতে পারে না।

ধর্ম্মং জিজ্ঞাসমানানং প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ॥ মনুঃ॥
শ্রুতিপ্রামাণ্যতো বিদ্বান্ স্বধর্ম্মে নিবিশেত বৈ॥ মনুঃ॥

শ্রুতিই যখন সকল ধর্ম্মের প্রমাণ হইলেন, তখন সে শ্রুতির প্রতি সংশয় করিলে কি প্রকারে ধর্ম্মরক্ষা হয় ?" বেদের নিত্যতায় ব্রাহ্মসমাজের এই প্রকার বিশ্বাসের মূল যে রামচন্দ্রবিদ্যাবাগীশ, তাহা তাঁহারই উক্তি হইতে সপ্রমাণ হয়।

যাই হৌক, এই সময়ে অক্ষয় কুমার দত্তের সহিত দেবেন্দ্রনাথের এই বিষয় লইয়া বিশেষ তর্ক উপস্থিত হয়। তাহার ফলে দেবেন্দ্রনাথকে এই বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করিতে হইয়াছিল। অবশেষে জগদ্বন্ধু পত্রিকার সহিত বাদানুবাদের ফলে দেবেন্দ্রনাথ আর নিশ্চিন্ত থাকিতে না পারিয়া স্বয়ং কাশীধামে যাইয়া বেদবেদান্ত আলোচনা করিয়া ১৭৬৯ শকে আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশকে সঙ্গে লইয়া প্রত্যাগত হইলেন। এই আলোচনার ফলে এই বৎসরের প্রথমেই ব্রাহ্মসমাজ বেদের অভ্রান্ততা ও নিত্যতায় বিশ্বাস হইতে মুক্ত হইলেন। তাই ১৭৬৯ শকের বৈশাখ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার শিরোদেশে সেই সুপ্রসিদ্ধ উপনিষৎ মন্ত্র শোভিত দেখিতে পাই—"অপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদো হথর্ব্ববেদঃ **শিক্ষা** কল্পো ব্যাকরণন্নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।" * এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যে কি দুর্দ্ধর্ষ মানসিক বলের পরিচয় তাহা আমরা এখন কল্পনাতেও আনিতে পারি না। শতসহস্র যুগ যুগান্তরের অর্জ্জিত মানসিক শৃঙ্খল নির্ব্বিবাদে ও সহজে খসিয়া গেল, বিনা রক্তপাতে একটী মহান আধ্যাত্মিক বিপ্লব সাধিত হইল। বেদ অভ্রান্ত ও

* তং বোং পত্রিকা, আষাঢ় ১৭৬৭।

* ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ, এ সমুদয়ই অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা, আর যে বিদ্যা দ্বারা সেই অক্ষয় পুরুষকে জানা যায়, তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা।

নিত্য কিনা, সে বিচার এক্ষণে অনাবশ্যক, কিন্তু এই বিচার উপলক্ষে ব্রাহ্মসমাজ ভারতে চিন্তার যে স্বাধীনতা-ভাগীরথী আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহাই এই ঘটনাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। এই স্বাধীনতা-ভাগীরথী আনয়ন বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথ যে অক্ষয়কুমারের নিকটে সাহায্য পাইয়াছিলেন, তাহা তিনি কখনও অস্বীকার করিতেন না।

এদিকে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ প্রণালী ও উপাসনাপ্রণালী প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজে উৎসাহের এক মহাতরঙ্গ উঠিয়াছিল। সেই তরঙ্গের আঘাতে বঙ্গের চতুর্দ্দিকে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের আদর্শে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইতে লাগিল। লালা হাজারীলালের প্রচারপ্রণালী বিষয়ে আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি। হাজারীলাল ব্যতীত সেই সময়ে আরও দুইজন প্রচারক, হরদেব চট্টোপাধ্যায় এবং রাজনারায়ণ বসু মহোদয়দ্বয়ের আবির্ভাব হইয়াছিল। হরদেব চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রচারপ্রণালী কর্ম্মভিত্তি ছিল—কোথায় কোন্ কলেরা রোগী রহিয়াছে, কোথায় কোন্ পথিক আসন্নমৃত্যু অবস্থায় পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে, চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সংবাদ পাইলেই সেখানে উপস্থিত। তাঁহার সেই সেবাগুণে বিস্তর লোক সেকালে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। আর, রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের প্রচারপ্রণালী শিক্ষিত মণ্ডলীর মধ্যে প্রীতিমূলক বক্তৃতা ও উপদেশের উপর গ্রথিত ছিল।

কলিকাতার বাহিরে মেদিনীপুরে সর্ব্বপ্রথম সুপ্রসিদ্ধ শিবচন্দ্র দেব কর্ত্তৃক ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হয়। পরে সুখসাগর, বংশবাটী ও মণিরামপুরে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইল। পূর্ব্ববঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কারক ব্রজসুন্দর মিত্র কর্ত্তৃক ঢাকায় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়। ১৭৭০ শকে বর্দ্ধমানে তদানীন্তন মহারাজ কর্ত্তৃক ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহারই সমসময়ে কৃষ্ণনগরেও এক ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়। এই কৃষ্ণনগর ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্বপ্রথম অধিবেশন তদানীন্তন হিন্দুসমাজপতি নবদ্বীপাধিপতির প্রাসাদে হইয়াছিল। কিন্তু পরিশেষে মহারাজা মূর্ত্তিপূজার পক্ষপাতী প্রাচীনপন্থীদিগের পরামর্শে ব্রাহ্মসমাজের সহিত সহানুভূতি প্রকাশে বিরত হয়েন। অগত্যা ব্রাহ্মসমাজও কিছুকালের জন্য কৃষ্ণনগর হইতে উঠিয়া গেল। নবদ্বীপাধিপতি স্বীয় হৃদয়ের বিশ্বাসের উপর দাঁড়াইয়া নির্ভয়ে ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সঙ্গে দেশেরও এক যুগান্তর উপস্থিত হইত নিঃসন্দেহ। নবদ্বীপাধিপতির সহানুভূতির অভাব ঘটিলেও কৃষ্ণনগর বিদ্যালয়ের সুপ্রসিদ্ধ শিক্ষক ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় তথায় ব্রাহ্মসমাজ পুনঃ স্থাপিত করেন।

এইরূপে একদিকে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে বেদের অভ্রান্ততা ও নিত্যতায় বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে আগম নিগমের প্রতি ধর্ম্ম ও জীবনের একমাত্র নিয়ামক বলিয়া যে অটুট শ্রদ্ধা ছিল তাহাও শিথিল হইয়া পড়িল। অপরদিকে ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মদিগের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। তখন ব্রাহ্মদিগের মধ্যে জীবনের নিয়ামক কতকগুলি মূলমন্ত্রের বড়ই অভাব বোধ হইতে লাগিল। কোন্ মন্ত্র স্বীকার করিলে ব্রহ্মোপাসকের জীবন নিয়মিত হইতে পারে, এবং লোকসমক্ষে ব্রহ্মোপাসকমণ্ডলীর সভ্য বলিয়া পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে, ব্রাহ্মগণ সেই বিষয়ে গুরুতর অভাব বোধ করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মোপাসনা করা প্রত্যেক ব্রাহ্মের কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির হইয়াছিল বটে; কিন্তু কিরূপ ব্রহ্মের উপাসনা কর্ত্তব্য, তাঁহার উপাসনারই বা স্বরূপ কি, কিভাবে তাঁহাকে ডাকিতে হইবে, এই সকলের মূলভিত্তি তখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। পুরাতনকে চূর্ণ করা সহজ, কিন্তু তাহার স্থলে নূতন কিছু গড়িয়া তোলাই বড় কঠিন। ব্রাহ্মদিগের মতের মূলভিত্তি আবিষ্কার করিবার ভার স্বভাবতই দেবেন্দ্রনাথের উপর পড়িয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে ইহা বিশেষ কঠিন কার্য্য হয় নাই। এই সময়ে তিনি রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী আলোচনায় বিশেষভাবে নিরত ছিলেন। রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলীতে তৎকৃত বেদান্ত দর্শনের ব্যাখ্যায় একস্থলে * উক্ত হইয়াছে যে "পরমেশ্বরে এবং তাঁহার সৃষ্ট মানবের প্রতি প্রীতি এবং তৎপ্রিয় কার্য্যসাধন, এই দুই পরম মুখ্য উপাসনা।" দেবেন্দ্রনাথ ইহাকেই কেন্দ্রে রাখিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মবীজ দৃষ্টি করিয়াছিলেন।

* ৩ অ:, ৩ পা, ৫৩ সূ:।

এই ব্রাহ্মধর্ম্মবীজ কয়টীই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাণ। সেই বীজচতুষ্টয় নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

১। ওঁ ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীৎ নান্যৎ কিঞ্চনাসীৎ। তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ।

২। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমৎ ধ্রুবং অপ্রতিমমিতি।

৩। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি।

৪। তস্মিন্ প্রীতি স্তস্যপ্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।*

১৭৭০ শকে দেবেন্দ্রনাথ এই বীজচতুষ্টয় দৃষ্টি করিয়া একখণ্ড কাগজে লিখিয়া তাঁহার বাক্সের মধ্যে ফেলিয়া রাখিলেন। এক বৎসর পরে সেই বাক্স হইতে তিনি উক্ত কাগজখানি বাহির করিয়া উক্ত বীজচতুষ্টয় আর একবার আলোচনা করিলেন। আলোচনা করিয়া যখন তিনি তাহাতে পরিবর্ত্তিত করিবার কোন কিছু দেখিতে পাইলেন না, তখন তিনি বুঝিলেন যে এই বীজগুলি ব্রাহ্মদিগের ধর্ম্মমতের বীজরূপে গৃহীত হইতে পারে, এবং তখন তিনি সেই বীজচতুষ্টয় ব্রাহ্মসমাজকে ব্রাহ্মধর্ম্মবীজরূপে প্রদান করিলেন।

এই বীজচতুষ্টয় সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়েরই মিলনের এক অত্যন্ত উদার পত্তনভূমি, এক মহা সঙ্গমক্ষেত্র বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। প্রথম বীজে দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদের বাক্যে বলিয়াছেন যে কিছুই ছিল না, একমাত্র পরব্রহ্ম ছিলেন এবং তিনিই এই সকল সৃষ্টি করিলেন। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন বটে যে এই বীজের সহিত আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত সৃষ্টিপ্রকরণের বিরোধ আছে। আলোচনা করিলে বুঝা যাইবে যে সেরূপ কোন বিরোধ নাই। ঈশ্বর সৃষ্টি করিলেন, ইহার অর্থ এমন নহে যে তিনি প্রত্যেক বস্তু হাতে করিয়া গড়িলেন। ইহার ভাব এই যে তাঁহার আদেশে, তাঁহার নিয়মে এই সৃষ্টিকার্য্য ঘটিয়াছে; তাঁহার শক্তির বিকাশেই এই সৃষ্টি, ইহাই প্রথম বীজের তাৎপর্য্য। আমরা দেখিতেছি যে বিজ্ঞান যতই অগ্রসর হইতেছে, ততই এই তত্ত্বেরই অভিমুখে চলিতেছে। দ্বৈতবাদ বা অদ্বৈতবাদ, যে মতই সত্য বলিয়া গৃহীত হউক না কেন, এই বীজের সহিত কোনটারই বিরোধ ঘটিবে না, কারণ এই বীজনিহিত সত্য সকল সত্যের সাধারণ সত্য। দ্বৈতবাদী যেমন এই সৃষ্টি অস্বীকার করেন না, অদ্বৈতবাদীও সেইরূপ সৃষ্টি ব্যাপারটী অস্বীকার করিতে পারেন না, কেবল মায়া প্রভৃতি কথার অবলম্বনে সমস্ত সৃষ্টি যে সেই একেরই বিকাশ তাহাই নানা প্রকারে ব্যাখ্যা করিতে চাহেন। প্রথম বীজ সম্বন্ধে তবু কতকটা তর্ক বিতর্কের সম্ভাবনা থাকিলেও অপর তিনটী বীজ সম্বন্ধে সে সম্ভাবনাটুকুও আছে বলিয়া বোধ হয় না। দেশ যখন সমাজের কঠোর দাসত্বশৃঙ্খলে, মানসিক পরাধীনতার কঠিন পাশে আবদ্ধ ছিল, সে সময়ে যে দেবেন্দ্রনাথ সেই কঠোর শৃঙ্খল কাটিয়া এই উদারতম অসম্প্রদায়িকতার মূলভিত্তি বীজচতুষ্টয় দৃষ্টি করিয়া ব্রাহ্মসমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার আত্মার আশ্চর্য্য বলের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। একমাত্র এই বীজচতুষ্টয় দৃষ্টি করাই তাঁহাকে মহর্ষির আসনে অবিচলিত রাখিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

ব্রাহ্মসমাজ-প্রচারিত এই ধর্ম্মবীজমূলক উদার অসাম্প্রদায়িকভাবে চমকিত হইয়া অধ্যাপক মোক্ষমূলর তাঁহার খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বী ছাত্রগণকে বলিয়াছিলেন—"তোমরা যদি অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের আলোচনা না কর, তবে অন্য জাতি, অন্য সম্প্রদায় তোমাদের স্থান অধিকার করিবে।" বলিতে কি, ব্রাহ্মসমাজের এই বীজমূলক উদারতাই বর্ত্তমান যুগের উদার ধর্ম্মমতসমূহের নেতা এবং মহাধর্ম্মপরিষৎ প্রভৃতির জন্মদাতা বলিতে পারি।

পরলোকগত ভক্তিভাজন রাজনারায়ণ বসু ব্রাহ্মধর্ম্মবীজ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে "ব্রাহ্মধর্ম্মবীজে

* ১। পূর্ব্বে কেবল এক পরব্রহ্মমাত্র ছিলেন; অন্য আর কিছুই ছিল না; তিনি এই সমুদয় সৃষ্টি করিলেন।

২। তিনি জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ, মঙ্গলস্বরূপ, নিত্য, নিয়ন্তা, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বাশ্রয়, নিরবয়ব, নির্ব্বিকার, একমাত্র, অদ্বিতীয়, সর্ব্বশক্তিমান, স্বতন্ত্র ও পরিপূর্ণ; কাহারও সহিত তাঁহার উপমা হয় না।

৩। একমাত্র তাঁহার উপাসনা দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়।

৪। তাঁহাকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা।

সকল বাক্যের মধ্যে নিম্নলিখিত বাক্যটী সকল অপেক্ষা সুন্দর এবং মহান্—'তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনামেব' ঈশ্বরকে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা। এই উচ্চ ও মহান্ বাক্যটী মহর্ষির নিজের রচিত। বাইবেলে এইরূপ একটী বাক্য আছে—"সমস্ত হৃদয়ের সহিত তোমার ঈশ্বরকে ভালবাস এবং তোমার প্রতিবাসীদিগকে নিজের ন্যায় দেখ।" মহর্ষির বাক্যটী বাইবেলোক্ত উক্ত রচনা অপেক্ষা যে শ্রেষ্ঠ তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। কারণ বাইবেলে নিজের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অন্যের প্রতি কর্ত্তব্য অবধারিত হইয়াছে। কেবল ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া করা হয় নাই। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং লক্ষ্ণৌয়ের বিখ্যাত রাজা দক্ষিণারঞ্জন প্রথমে এই বাক্যটী অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং বেদোক্তি মনে করিয়াছিলেন। আমি তাঁহাদিগকে জানাই যে উহা বেদোক্তি নহে, মহর্ষির রচনা।" রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলীতে এই ভাবের কথা থাকিলেও এই ভাবটীকে সম্পূর্ণ ভাবে দৃষ্টি করা এবং বীজমন্ত্রের আকারে তাহাকে একটা বিশুদ্ধ গঠন দিয়া সমাজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করাতেই ভারতের ধর্ম্মজগতে দেবেন্দ্রনাথের আসন অচলপ্রতিষ্ঠ হইয়া গিয়াছে।

ধর্ম্ম।

(শ্রীশঙ্করনাথ পণ্ডিত)

মনুষ্য স্বভাবত ত্রিবিধ দুঃখ অর্থাৎ আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক তাপত্রয় হইতে ত্রাণ পাইয়া পূর্ণানন্দ প্রাপ্তির ইচ্ছা করে এবং তাহার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। কিন্তু তাহা প্রাপ্তির নিয়মের অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত মনুষ্যকে অশেষবিধ কষ্ট ভোগ করিতে হয়। মানব যাহাতে ত্রিবিধ তাপ হইতে ত্রাণ পাইয়া যথার্থ সুখ বা পরমানন্দ উপভোগ করিতে সমর্থ হয় তাহারই জন্য ধর্ম্ম ও ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রয়োজন। সাংখ্যদর্শনে আছে—"অথ ত্রিবিধ দুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ" অর্থাৎ আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক তাপত্রয়ের অতিক্রমকারী আত্যন্তিক নিবৃত্তি অর্থাৎ যে নিবৃত্তির ফলে উক্ত তাপত্রয় কেবল যে ক্ষণেকের জন্য নিবৃত্ত হয় তাহা নহে, পরন্তু আর কখনও উদ্ভূত হয় না সেই নিবৃত্তিই মানবের পক্ষে পরম পুরুষার্থ বা প্রয়োজন।

যে তাপ বা ক্লেশ আমরা শরীর ও মনে অনুভব করি তাহাই আধ্যাত্মিক তাপ। জ্বরাদি জন্য আমরা শরীর ও মনে যে তাপ বা কষ্ট প্রাপ্ত হই তাহাকে আধ্যাত্মিক তাপ বলা যায়। চৌর তস্কর সর্প ব্যাঘ্র আদি অপর জীবজন্তু হইতে যে কষ্ট বা দুঃখ প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাকে আধিভৌতিক তাপ এবং শীত গ্রীষ্ম বর্ষা বজ্রাঘাত উল্কাপাত প্রভৃতি যে সকল দুঃখ দৈবনিবন্ধন পাওয়া যায় সে গুলিকে আধিদৈবিক তাপ বলা যায়।* এই তাপত্রয়ের অতিরিক্ত মানবের অন্য কোন তাপ বা দুঃখ অনুভূত হয় না। এখন দেখা যাউক যে ধর্ম্ম কাহাকে বলে। ধৃ ধাতুর উত্তর মনিন্ প্রত্যয় করিলে "ধর্ম্ম" পদ সিদ্ধ হয়। ধৃ ধাতু ধারণার্থে ব্যবহৃত হয়। যাহা ধারণ করা যায় বা যদ্দ্বারা ধারণ করা যায় অর্থাৎ যদ্দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক উন্নতির বিষয়সমূহ ধারণ করা যায়, এক কথায়, যাহা দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক উন্নতি সাধিত হয় তাহাই ধর্ম্ম। ভগবান কণাদ ঋষি বৈশেষিক দর্শনে লিখিয়াছেন—যতোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ অর্থাৎ যদ্দ্বারা মানবগণের ইহকালে সাংসারিক উন্নতি ও জ্ঞানবৃদ্ধি সাধিত হয় এবং পরকালে নিঃশ্রেয়স বা পরা মুক্তি উপভোগ করণে সমর্থ হওয়া যায় তাহাকেই ধর্ম্ম বলে। ধর্ম্ম কেবল পরকালেরই জন্য উপযোগী নহে। যদ্দ্বারা আমরা পুরুষকারের সাহায্যে ইহলোকে সুখসমৃদ্ধি লাভে পরিতৃপ্ত হইয়া জীবনান্তে পরকালে পরমাত্মার অতুল আনন্দ উপভোগ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি তাহাকেই প্রকৃত ধর্ম্ম বলা যায়। যদ্দ্বারা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গের ফললাভে সমর্থ হওয়া যায় তাহাকেই ধর্ম্ম বলে।

---

* কোন কোন আচার্য্যের মতে এবং লেখকের পূজ্যপাদ গুরু মহর্ষি স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী মহাশয়ের মতে জ্বরাদি জন্য তাপ প্রভৃতি যাহা কেবলমাত্র শরীরের দ্বারা অনুভূত হয় তাহাই আধ্যাত্মিক তাপ, যাহা অপর প্রাণী কর্ত্তৃক প্রদত্ত হয় তাহা আধিভৌতিক এবং দিব্যগুণযুক্ত মন ইন্দ্রিয়বিকার, অশুদ্ধি ও চিত্তবিকারাদি যে তাপ অনুভব করে তাহাই আধিদৈবিক তাপ।

অভিধানে ধর্ম্মশব্দ বহু অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে যথা—গুণ, কর্ম্ম, শক্তি, স্বভাব, রীতি যম ইত্যাদি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে ধর্ম্মশব্দের অন্যান্য অর্থ পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র যদ্দারা মানবের যথার্থ ঐহিক ও পারত্রিক উন্নতি সাধিত হয় সেই অর্থই গৃহীত হইবে। শাস্ত্রে আছে—প্রাপ্য চাপ্যুত্তমং জন্ম লব্ধ্বা চেন্দ্রিয়সৌষ্ঠবং।
ন বেত্ত্যাত্মহিতং যস্তু স ভবেদাত্মঘাতকঃ॥

উত্তম মানব জন্ম প্রাপ্ত হইয়া এবং ইন্দ্রিয়সৌষ্ঠব লাভ করিয়া যে ব্যক্তি নিজ হিত বুঝিতে পারে না তাহাকে আত্মঘাতী বলা যায়।

মনুষ্যের পক্ষে ধর্ম্ম যে সর্ব্বাপেক্ষা হিতকারী তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আমরা বলিয়াই আসিয়াছি যে যদ্দারা মানবের ঐহিক ও পারত্রিক উভয় প্রকার উন্নতি সাধিত হয় তাহাকেই ধর্ম্ম বলে। যাহা দ্বারা কেবল ঐহিক উন্নতি মাত্র সাধিত হয়, তৎসঙ্গে পারলৌকিক কোন প্রকার উন্নতি সাধিত হয় না তাহাকে ধর্ম্ম বলা যায় না। যদিও ঐহিক অপেক্ষা পারলৌকিক উন্নতিই ধর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্য, তথাপি ধার্ম্মিক ব্যক্তি ধর্ম্ম্য পুরুষকারের সাহায্যে ধর্ম্মোপার্জ্জন করত ইহকালেও উন্নতি প্রাপ্ত হয়েন ও জীবন্মুক্ত অবস্থায় অবস্থিতি করেন এবং দেহান্তে পরা মুক্তি লাভ করিয়া কৃতকৃত্য হয়েন। পরলোকে উন্নতি সাধনে ধর্ম্মের ন্যায় মানবের দ্বিতীয় সহায় নাই।

ধর্ম্মং শনৈঃ সঞ্চিনুয়াদ্বল্মীকমিব পুত্তিকাঃ।
পরলোকসহায়ার্থং সর্ব্বভূতান্যপীড়য়ন্॥
নামুত্র হি সহায়ার্থং পিতা মাতাচ তিষ্ঠতি।
ন পুত্রদারং ন জ্ঞাতি র্ধর্ম্মস্তিষ্ঠতি কেবলঃ॥
একঃ প্রজায়তে জন্তুরেক এব প্রলীয়তে।
একোঽনুভুংক্তে সুকৃতং এক এব তু দুষ্কৃতং॥
মৃতং শরীরমুৎসৃজ্য কাষ্ঠলোষ্ট্রসমং ক্ষিতৌ।
বিমুখা বান্ধবা যান্তি ধর্ম্মস্তমনুগচ্ছতি॥
তস্মাদ্ধর্ম্মং সহায়ার্থং নিত্যং সঞ্চিনুয়াচ্ছনৈঃ।
ধর্ম্মেণ হি সহায়েন তমস্তরতি দুস্তরং॥
ধর্ম্মঃ প্রধানং পুরুষং তপসা হতকিল্বিষং।
পরলোকং নয়ত্যাশু ভাস্বন্তং খ-শরীরিণং॥
মনু অঃ ৪, শ্লো ২৩৮-২৪৩

উপরোক্ত মনুবচনে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে পরলোকে জীবের নিজকৃত ধর্ম্ম বা সুকৃতি ভিন্ন অপর কেহই কোন প্রকারে সহায়তা করিতে সমর্থ হয় না। এই ধর্ম্মসাধনে বলিদান প্রভৃতি কারণে পশুহিংসার পরিবর্ত্তে জীবমাত্রেরই প্রতি মৈত্রী ও করুণা প্রকাশ করিতে হইবে। আমাদের দেশে সাধারণত হিন্দুদের মধ্যে ধারণা আছে যে, গয়াধামে পিণ্ডাদি প্রদান করিলে ও তথায় ফল্গু নদীতে তর্পণ করিলেই মৃত ব্যক্তির আত্মা সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হয়। এই প্রকার আরও অনেক বিশ্বাস আছে, যেগুলি উক্ত মনুবচন হইতে কেবল ভ্রান্ত বলিয়া সপ্রমাণ হইতেছে না, কিন্তু স্পষ্টই অনিষ্টকর। ঐ সকল বিশ্বাস ও ধারণা সত্য হইলে ধনী ব্যক্তিরা নিজেদের জীবনান্তে পিণ্ডাদির ব্যবস্থা* করিয়া সর্ব্ব-পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া প্রমুক্ত পুরুষ হইতে পারিতেন। মনু তাই স্পষ্টই বলিয়াছেন—এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ" একমাত্র ধর্ম্মই মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তির অনুসরণ করে। এই কারণে ধার্ম্মিকগণ এই পরম সহায় ধর্ম্মকে কদাপি পরিত্যাগ করেন না। মহাভারতে আছে—ন জাতুকামান্ন-লোভাদ্ধর্ম্মং ত্যজেজ্জীবিতস্যাপি হেতোঃ, অর্থাৎ কাম, ভয়, লোভ, এমন কি পরমপ্রিয় নিজের প্রাণের জন্যও ধর্ম্মকে ত্যাগ করা বিধেয় নহে। মনু বলিয়াছেন—

ধর্ম্ম এব হতো হন্তি ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।
তস্মাদ্ধর্ম্মো ন হন্তব্যো মানো ধর্ম্মো হতোঽবধীৎ॥
মনু ৮ম অঃ, ১৫

ধর্ম্মকে যে নষ্ট করে, ধর্ম্মও তাহাকে নষ্ট করেন এবং ধর্ম্মকে যিনি রক্ষা করেন, ধর্ম্মও তাঁহাকে রক্ষা করেন; অতএব ধর্ম্মকে নষ্ট করা উচিত নহে এবং ধর্ম্ম যেন নষ্ট হইয়া আমাদিগকে বিনষ্ট না করেন। ধর্ম্ম কোন কালেই আমাদের অতিক্রমণীয় নহেন। আমাদের সর্ব্বদাই সাবধান হওয়া উচিত, যেন ধর্ম্ম অতিক্রান্ত হইয়া আমাদিগকে বিনষ্ট না করেন। মানবগণ ইন্দ্রিয়সুখে আসক্তির কারণেই লোকসহায়ক ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া বিনষ্ট হয়।

ডাকা।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

তোমারি দুয়ারে আসিয়াছি প্রভু
বিরহের জ্বালা লয়ে।

---

* আমাদের বিশ্বাস যে পূর্ব্বপুরুষদিগের স্মৃতিরক্ষার্থ পিণ্ডব্যবস্থা প্রভৃতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। পরে সেই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য বিভিন্ন আকারে পরিণত হইয়াছে। তঃ বোঃ সং।

তুলে মোরে কোলে দাও শান্তি
দগধ তপ্ত হৃদয়ে ॥

জানি না কেমনে ডাকিবার মত
তোমারে ডাকিব হায়—
প্রাণের মাঝারে ডাকা আসে তাই,
প্রাণ সদা ডেকে যায় ॥

ডাকের ভিতর অবোধের মত
বলে যাই কত কথা।
তুমি ছাড়া আর কে বুঝিবে তাহে
কত জাগে মর্ম্মব্যথা ॥

ডাকিবার মত শিখাও হে ডাকা,
কাঁদিতে শিখাও আরো
তব পদে যাহে পারি গো নামাতে
পাষাণ হৃদয়ভার ॥

লিঙ্গায়ত সম্প্রদায়।

(শ্রীকালীপ্রসন্ন বিশ্বাস)

লিঙ্গায়ত পুরোহিতগণকে জঙ্গম বলে। জঙ্গম দুই শ্রেণীভুক্ত। প্রথম বিরক্ত বা সন্ন্যাসী, দ্বিতীয় গুরুস্থলী বা সংসারী। বিরক্তগণের বিবাহ করিবার অধিকার নাই। গুরুস্থলীরা বিবাহ করিয়া পুত্র কলত্রসহ বাস করেন। বিরক্তগণ গুরু বা পুরোহিতের কার্য্য করেন না। তাহারা কেবল শাস্ত্র পাঠ বা শাস্ত্র ব্যাখ্যান ও উপদেশ প্রদান কার্য্যে নিরত থাকেন। ইহাঁদের সংখ্যা অতি অল্প কিন্তু ইহাঁরা দেবতার ন্যায় সম্মান ও পূজা প্রাপ্ত হয়েন। ইহাঁরা বৃদ্ধ হইলে কোন সাধু গুরুস্থলী জঙ্গম বালককে শিষ্য এবং উত্তরাধিকারীরূপে বরণ করেন। গুরুস্থলী জঙ্গমেরা গুরু এবং পৌরোহিত্য কার্য্য করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে সাধারণ লিঙ্গায়তের ন্যায় বিধবা বা পরিত্যক্তা স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করা নিষিদ্ধ।

বিরক্তগণ মঠে বাস করেন এবং সর্ব্বদা মঠের ভিতরেই থাকেন। তাঁহাদের চরন্তি নামক প্রধান শিষ্যগণ নানা স্থানে গমন করিয়া অর্থ শস্য বস্ত্রাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া থাকে—এবং মঠের কার্য্যাদি করিয়া থাকে। চরন্তিগণের অধীন দুই হইতে দ্বাদশটী সহকারী থাকে। ইহাদিগকে মরিস বা যুবা কহে। মরিসগণ বৃদ্ধ হইলেও যুবা নাম হইতে বঞ্চিত হয় না। মরিসগণ পূজার জন্য পুষ্প সংগ্রহ, বর্ত্তনাদি ধৌত করা প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত থাকে। চরন্তি এবং মরিসগণ গুরুস্থলী জঙ্গম বংশ হইতে গৃহীত হইয়া থাকে। সাধারণ লিঙ্গায়তগণের এই পদ পাইবার অধিকার নাই। যে সকল চরন্তি বা মরিসের ভবিষ্যতে বিরক্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে তাহারা বিবাহ করে না। অপর সকলের বিবাহ করিবার অধিকার আছে।

মঠের অধ্যক্ষকে পাটদয়া বলে। ইহাঁরা সকল ধর্ম্মকর্ম্মের তত্ত্বাবধারক এবং ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্যের বিচারক। লিঙ্গায়তগণের মধ্যে কেহ ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্য করিলে ইহাঁরা তাহাদিগের অর্থদণ্ড করিয়া থাকেন। এই অর্থ মঠের প্রাপ্য। গুরুতর অপরাধ করিলে জাতিচ্যুত করিবার ক্ষমতাও ইহাঁদের আছে। জাতিচ্যুত ব্যক্তিগণ অর্থদণ্ড দিলে সমাজ মধ্যে পুনর্গৃহীত হইতে পারে।

বিরক্তগণ মঠ মধ্যেই বাস করেন এবং আত্মীয় স্বজনের সহিত সাক্ষাৎ করাও অনুচিত বিবেচনা করেন। গুরুস্থলীগণও মঠে বাস করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা স্ত্রী, পুত্র আত্মীয়গণের সঙ্গ ত্যাগ করেন না। কয়েকটী মঠ চরন্তিদিগের অধীনেও আছে।

প্রতিদিন প্রাতে এবং সায়ংকালে মঠমধ্যে বিরক্ত বা পাটদয়াগণ পুষ্পাদির দ্বারা লিঙ্গপূজা করিয়া থাকেন। তৎপরে শিষ্যগণ তাঁহাদের পদ ধৌত করিয়া উক্ত জল (ধূল পদক) উপস্থিত লিঙ্গায়তগণের অঙ্গে নিক্ষেপ করে। তদনন্তর প্রধান বিরক্তের পদের বৃদ্ধাঙ্গুলি ধৌত করিয়া উক্ত জল দ্বারা তাঁহার গলদেশলম্বিত লিঙ্গকে ধৌত করিয়া রাখে। এই জলকে করুণা কহে। ইহা অতি পবিত্র। জঙ্গম এবং সাধারণ লিঙ্গায়ত সকলেই এই জল অতি ভক্তির সহিত পান করিয়া থাকে।

জঙ্গমগণ তাঁহাদের ধর্ম্মমন্দিরে সকলে মিলিত হইয়া আহার করিয়া থাকেন। প্রথমে একখানি গালিচা বা সতরঞ্চ বিছাইয়া তাহার উপর সকলে উপবেশন করেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের সম্মুখে

এক একখানি ক্ষুদ্র চৌকি রাখা হয়। এই চৌকির উপর রৌপ্য, কাংস্য বা পিত্তলের থালা রাখিয়া তদুপরি আহার্য্য দ্রব্যাদি পরিবেশন করা হয়। ভোজনান্তর ঐ সকল পাত্রাদি তাঁহারা নিজেরাই ধৌত করিয়া উত্তরীয় বস্ত্র দ্বারা পরিষ্কার করিয়া রাখেন। তৎপরে যে জল দ্বারা পাত্র সকল ধৌত হয়, সেই জল তাঁহারাই পান করিয়া থাকেন। উক্ত জল অন্যত্র প্রক্ষেপ করা নিষিদ্ধ। বলা বাহুল্য যে পাত্র ধৌত করিতে তাঁহারা অতি অল্পই জল ব্যবহার করিয়া থাকেন। জঙ্গমদিগের সর্ব্বপ্রধান আচার্য্যের নাম মুর্গ্যাস্বামী। তিনি মহীশূরের চিতলদ্রুগ নামক স্থানে বাস করেন।

লিঙ্গায়তগণের মধ্যে এক গুরুর শিষ্য বা এক বংশসম্ভূত স্ত্রী পুরুষের মধ্যে বিবাহ হয় না। বিবাহের কথাবার্ত্তা শেষ হইলে ইহারা প্রথমে জ্যোতিষ মতে কোষ্ঠিগণনা করিয়া বিবাহের মিল বা শুভাশুভ নির্ণয় করিয়া থাকে। তৎপরে বিবাহের দিন ধার্য্য হয় এবং উক্তদিবস বরপক্ষীয় ব্যক্তিদিগের শুভাগমন জন্য পান সুপারি বিতরণ ও ভোজনাদির ব্যবস্থা করা হয়।

বিবাহের নির্দ্দিষ্ট দিনের কয়েক দিবস পূর্ব্বে কন্যার বাটী হইতে বরকর্ত্তাকে একখানি পত্র, দুখানি বিছানার চাদর, পাঁচটি নারিকেল, পাঁচখানি তালপত্র, পাঁচ সের চাউল, পাঁচটি পাতিলেবু, পাঁচটি সুপারি, পাঁচখানি হলুদ, পাঁচ টুকরা মিছরি প্রেরিত হয়।

বিবাহের দিন বর স্বপক্ষীয়গণের সহিত কন্যার গ্রামে আসে এবং গ্রামের বাহিরে কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে অপেক্ষা করে। কন্যাপক্ষীয়গণ এই সংবাদ পাইবামাত্র সদলবলে পুরোহিত ও বাদ্যগীত সহ তাহাদিগকে আহ্বান করিতে গমন করে এবং তৎপরে তাহাদিগকে গ্রাম মধ্যে আনয়ন করিয়া নির্দ্দিষ্ট বাসভবনে লইয়া যায়।

পরদিবস প্রাতে কন্যার বাটীতে পাঁচটি মাটির হাঁড়ি পূজা করা হয়, তৎপরে কন্যাকে লইয়া তাহার আত্মীয় স্বজন বরের বাসায় গমন করে। তৎপরে বরকন্যাকে কাষ্ঠের চৌকীর উপর বসাইয়া তাহাদের গায়ে তৈল ও হরিদ্রা মাখাইয়া দেয়। অপরাপর হিন্দুগণের ন্যায় এই কার্য্যে পাঁচজন "এয়ো"র প্রয়োজন হয়। যে সকল স্ত্রীর প্রথম স্বামী বর্ত্তমান আছে তাহারাই এয়ো হইতে পারে। গাত্রহরিদ্রার পর এয়োগণ বরকন্যার চারিদিকে পাঁচবার সুতার দ্বারা বেষ্টন করে। এই সুতার নাম "সুর্গিসূত্র" বা উদ্বাহ সূত্র।

পরদিবস বরকন্যার গাত্রে পুনরায় তৈল ও হরিদ্রা মর্দ্দিত হয় এবং তাহাদিগকে পবিত্র উদক পান করান হয়। তৎপরে কন্যার পক্ষ বরের বাটীতে পাত্রপূর্ণ মিষ্টান্ন, "সিদা" এবং এক কলসী জল পাঠাইয়া দেয়। বরপক্ষ এই সকল দ্রব্য গ্রহণ করে এবং বাদকদিগকে সুপারি, বস্ত্র, মিষ্টান্ন ও অর্থ দ্বারা পরিতুষ্ট করে। বর ও কন্যা উভয় পক্ষই নিজ নিজ বাটীতে দেবতার আরাধনা করায় এবং দেবমন্দিরে পূজা বা সিদা পাঠাইয়া দেয়। তৎপরে উভয় পক্ষই দেবমন্দিরে তৈলপ্রদীপ প্রেরণ করে।

পরদিবস বিবাহিতা স্ত্রীগণ পুনরায় বরকন্যার গাত্রে হরিদ্রা ও তৈল মাখাইয়া দেয় এবং পুরোহিতগণ পবিত্র জল প্রস্তুত করিয়া উভয়কে পান করিতে দেন। এই দিবস কন্যার বাটী হইতে অন্ন ব্যঞ্জনাদি বরের বাসায় প্রেরিত হয় এবং উক্ত খাদ্য বর স্বয়ং আহার করে। তৎপরে বরের পিতা বরকে একখানি থালার উপর দাঁড় করাইয়া তাহার পদ ধৌত করিয়া দেয় এবং সস্ত্রীক উক্ত পাত্রে লাল গুঁড়া প্রক্ষেপ করে।

তৎপরে বর বিবাহসজ্জা পরিধান পূর্ব্বক মস্তকে টোপর এবং কপালে বিভূতি মাখিয়া বৃষভবাহনে সদলবলে দেবমন্দিরে যাইয়া পূজা করে এবং তদনন্তর কন্যার বাটীতে গমন করে। বর বিবাহসভায় উপস্থিত হইলে তাহাকে একখানি খাটের উপর বসিতে দেওয়া হয়। তৎপরে কন্যাকর্ত্তা বরকে নব বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি উপহার দেয় এবং বরের গণ্ডদেশে হস্তে ও পদে হরিদ্রার গুড়া মাখাইয়া দেয়। তৎপরে বরকে গৃহাভ্যন্তরে লইয়া গিয়া দান কার্য্য সমাপ্ত করা হয়।

প্রথমে "বরকনে"কে একখানি তণ্ডুলাবৃত গালিচায় বসান হয়। তাহাদের দক্ষিণ দিকে দুইটি অবিবাহিত কন্যা বা কুমারীকে বসিতে দেওয়া হয় এবং তাহাদের সম্মুখে পাঁচটি কুম্ভে হিরা, মুক্তা, স্বর্ণ, রৌপ্য, পিত্তল বা তাম্রমুদ্রা রাখিয়া দেওয়া

হয়। এই পঞ্চ পাত্রের নাম "পঞ্চ কলস।" তৎপরে পঞ্চকলসের উপর পান রাখিয়া তাহাদের চারিদিকে পাঁচবার সূত্র দ্বারা বেষ্টন করা হয়। এই সূত্রের অগ্রভাগ পুরোহিতের হস্তেই থাকে। সূত্রের যে অংশ পঞ্চকুম্ভের চারিদিকে বেষ্টিত থাকে তাহার নাম "সূর্গি" এবং যে অংশ বর ও পুরোহিতের মধ্যে থাকে তাহার নাম "গুরুসূত্র।" এই সময় পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণ করিতে থাকেন এবং পাত্রী পাত্রের দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিয়া থাকে। তৎপরে মঠপতি একটি পাত্রে দুগ্ধ, ঘৃত, দধি, শর্করা ও মধু মিশ্রিত করিয়া কিয়দংশ বরের দক্ষিণ হস্তে প্রদান করে। "কনে"কে ইহা স্পর্শ করিতে হয়। তদনন্তর বরকনের হস্ত পঞ্চবার ধৌত করিয়া দেওয়া হয়। তারপর পুরোহিত এবং উপস্থিত বর ও কন্যাযাত্রগণ "বরকনের" মস্তকে লাল গুঁড়ামিশ্রিত তণ্ডুল নিক্ষেপ করে। পুরমহিলাগণ আঁচলা করিয়া উক্ত তণ্ডুল তাহাদের মস্তকে ঢালিয়া দেয়, এবং উভয়ের সম্মুখে প্রদীপ লইয়া আরতি করে।

ইহার পর পুরোহিত মঙ্গলসূত্রকে পুষ্প, লাল গুড়া ও শশা দ্বারা পূজা করেন এবং পঞ্চ এয়োগণ এই সূত্র নববধূর কণ্ঠদেশে বাঁধিয়া দেন। এই সূত্র স্ত্রীকে স্বামীর জীবনান্ত পর্য্যন্ত কণ্ঠে ধারণ করিতে হয়। ইহাই এ দেশে বিবাহিত স্ত্রীর চিহ্ন, এয়োতের লক্ষণ।

পূর্ব্বোক্ত পঞ্চকুম্ভবেষ্টক সূত্রের যে অংশ বর এবং পুরোহিতের হস্তে থাকে তাহা বরের দক্ষিণ হস্তের কবজির উপর বাঁধিয়া দেওয়া হয়। ইহার নাম গুরুকঙ্কন। তৎপরে বরকন্যা উঠিয়া পুরোহিত, গুরুজন এবং উপস্থিত বাক্তিগণকে প্রণাম করে। ইহার পর যথাসাধ্য ভোজনের ব্যবস্থা থাকে। তৎপরে নৃত্য বাদ্য সঙ্গীতাদির দ্বারা সকলকে আপ্যায়িত করা হয় এবং "বরকনে" লইয়া সকলে জাকজমকের সহিত দেবমন্দিরে গমন করে।

বিবাহের পর বরকন্যা প্রথমে বরের ভগ্নীর গৃহে প্রবেশ করে। সে সময় বরের ভগ্নী তাহাদিগকে বাধা দিয়া প্রথমে শপথ করিতে বলে যে তাহাদের কন্যা হইলে তাহার পুত্রের সহিত বিবাহ দিবে। বরের ভগ্নী না থাকিলে অপর কোন স্ত্রীলোক দ্বারা বা আত্মীয়ের ভগ্নীর দ্বারা এই কার্য্য সম্পন্ন করা হয়। তৎপরে উভয়ে বরের মাতার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করে।

শ্বশ্রূঠাকুরাণী একটি বৃষভ-জিনের উপরে বসিয়া থাকেন। বরকে তাহার দক্ষিণ উরুতে এবং কন্যাকে বাম উরুতে বসিতে দেওয়া হয়। তৎপরে তাহারা উভয়ে স্থান পরিবর্ত্তন করে। এই সময়ে পঞ্চ এয়ো বরের মাতাকে প্রশ্ন করে "এই দুইটি ফলের মধ্যে কোন্‌টির গুরুত্ব অধিক।" তিনি উত্তর করেন "দুইটিই সমান"। তৎপরে বিবাহিত স্ত্রীরা তাঁহাকে উপদেশ দেয় যে তিনি যেন চিরদিন উভয়কেই সমানভাবে দেখেন।

এই সকল ক্রিয়া সমাপন হইবার পর "বরকনে" উভয়কে উদ্বাহমঞ্চে লইয়া যাওয়া হয় এবং ক্ষৌরকার আসিয়া তাহাদের হস্তপদে হরিদ্রা লেপন করিয়া দেয় এবং পঞ্চ এয়োগণ তাহাদিগকে স্নান করাইয়া দেয়।

এখানে বলা আবশ্যক যে উপরি-উক্ত সমস্ত কার্য্যই কন্যার গ্রামে সম্পাদিত হইয়া থাকে। বিবাহের পর বর এবং বরপক্ষীয় ব্যক্তিগণ নিজ গ্রামে বা বাটীতে প্রত্যাগমন করেন। নববধূ পিত্রালয়েই থাকিয়া যায়। পুনর্বিবাহের পর তাহাকে স্বামীগৃহে লইয়া যাওয়া হয়।

এক্ষণে আমরা লিঙ্গায়ত জঙ্গমগণের শবসৎকার প্রথা সম্বন্ধে কিছু বলিব। যখন কোন লিঙ্গায়ত জঙ্গমের মৃত্যুকাল উপস্থিত হয় তখন একজন পুরোহিতকে তথায় আনয়ন করা হয়। তৎপরে মৃতপ্রায় ব্যক্তিকে স্নান এবং নববস্ত্র পরিধান করাইয়া একখানি গালিচার উপর বালিশে ঠেস দিয়া বসান হয়। পুরোহিত উপস্থিত হইবামাত্র দুইবার তাঁহার পদ ধৌত করাইয়া উক্ত জলের কয়েক বিন্দু মৃতবৎ ব্যক্তিকে পান করিতে দেওয়া হয়। তৎপরে পুরোহিত তাহার অঙ্গে বিভূতি মাখাইয়া দেন এবং গলদেশে একটি রুদ্রাক্ষের মালা প্রদান করেন। আসন্নমৃত্যু ব্যক্তি উক্ত পুরোহিতকে পান, সুপারি এবং কিছু বিভূতি ও অর্থ দক্ষিণাস্বরূপ প্রদান করে।

মৃত্যুর পর পুরোহিতকে পুনরায় আনয়ন করা হয়। প্রধান পুরোহিত মৃত ব্যক্তির মস্তক স্বীয় পদ দ্বারা স্পর্শ করেন এবং মঠপতি মৃত দেহের

উপর পুষ্প নিক্ষেপ করেন। তৎপরে মৃতদেহকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া একখানি সজ্জিত পর্য্যঙ্কে শায়িত করা হয়। এই সময় মঠধারী একখণ্ড নব বস্ত্র ছিঁড়িয়া ফেলেন। ইহার তাৎপর্য্য যে মৃত ব্যক্তির সমস্ত সাংসারিক বন্ধন ছিন্ন হইল। তৎপরে শবদেহ শ্মশানাভিমুখে লইয়া যাওয়া হয়।

শ্মশানে পৌঁছিবার কিছু পূর্ব্বে শব সাবধানে নামাইয়া শবের অঙ্গ হইতে বস্ত্রালঙ্কারাদি খুলিয়া লইয়া মৃত ব্যক্তির পুত্র বা উত্তরাধিকারীকে প্রদান করা হয় এবং তাহার উষ্ণীষ উক্ত ব্যক্তির মস্তকে রক্ষিত হয়।

তৎপরে দুইজন পুরোহিত যে স্থানে শবদেহ প্রোথিত করিবার জন্য গর্ত্ত করা হইয়াছে তথায় গমন করিয়া শবযাত্রিগণের নিকট ফিরিয়া আইসেন। লিঙ্গায়তগণ এই দুই ব্যক্তিকে শিব-দূতের প্রতিনিধিস্বরূপ মনে করে।

তৎপরে মৃতব্যক্তিকে নববস্ত্রে বেষ্টিত করিয়া গর্ত্তের মধ্যে বসাইয়া দেওয়া হয়। তারপর এক-জন পুরোহিত সেই গর্ত্তে নামিয়া মৃতদেহের নানা স্থানে একবিংশটী তাম্র মুদ্রা রক্ষিত করে। তদ-নন্তর একখণ্ড বস্ত্র ঐ গর্ত্তের উপর রক্ষিত হয় এবং সকলে সমস্বরে মন্ত্রোচ্চারণ করে এবং উক্ত বস্ত্রের উপর বিল্বদল পুষ্প গন্ধাদি প্রক্ষিপ্ত হয়। ইহার পর প্রত্যেক উপস্থিত ব্যক্তি অল্পবিস্তর মৃত্তিকা নিক্ষেপ করিয়া ক্রমশঃ গর্ত্তটি পূর্ণ করিয়া ফেলে। তৎপরে পুরোহিত ঐ কবরের উপর যাইয়া দাঁড়ান এবং তাঁহার পদতলে পুষ্পাদি নিক্ষেপ এবং একটি নারিকেল ভগ্ন করিয়া সকলে গৃহে প্রত্যাগমন করে।

গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া মৃতব্যক্তির জ্যেষ্ঠ পুত্র বাটীর চারিদিকে শান্তিজল নিক্ষেপ করিয়া গৃহ সংস্কার করিয়া থাকে। লিঙ্গায়তগণের অশৌচ ব্যবস্থা নাই। তবে প্রায় এক মাস পরে পুরোহিত ও আত্মীয়গণকে ভোজন করান হয়।

রাণাডের স্মৃতি কথা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আমার বিবাহ।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদিত)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সে যাক্, তাঁহারা যেদিন চলিয়া গেলেন সেইদিন সন্ধ্যাকাল প্রায় ৬॥০ টার সময় কোর্ট হইতে বাড়ী আসিয়া আমার স্বামী আমাকে ছাদের উপর ডাকিয়া আনিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর পিতা কি চলে গিয়েছেন?" আমি বলিলাম,—"হাঁ"। আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার সঙ্গে তোর বিবাহ দিয়েছিলেন, কিন্তু আমি কে, আমার নাম কি, এই সব তুই কি জানতে পেরেছিস্? আমি ঘাড় নাড়িয়া বলি-লাম "হাঁ"। "আচ্ছা বল্ দিকি আমার নাম কি।" তখন, লোকেরা যে নামে তাঁকে ডাকে সেই সমস্ত নামটা বল্লেম। (যাই হোক না কেন, তখন লজ্জা কি তা বুঝ-তেম না) কিন্তু তাহা শুনিয়া মনে হল যেন তিনি একটু সন্তুষ্ট হলেন, এটা আমার খুব মনে আছে। তার পর, আমার বাপের বাড়ীর সমস্ত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন ও আমিও, যা আমার জানা ছিল, সমস্ত বলিলাম। লেখা-পড়ার কথা তন্ন-তন্ন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু আমি লেখাপড়া কিছুই জানিতাম না। তাই তিনি সেই রাত্রেই এক শ্লেট ও পেন্সিল আনাইয়া "শ্রীগণেশায় নমঃ" —এই পদের প্রথম ৭ অক্ষর এই পাঠ অভ্যাস করিতে দিলেন। তখনো পর্য্যন্ত শ্লেটের ১১ অক্ষর আমার পরিচয় না হওয়ায়, ঐ ৭ অক্ষর না দেখিয়া লিখিতে ও চিনিতে প্রায় দুই ঘণ্টা লাগিল। তখনো অক্ষর পরিচয় পাকা হয় নাই। দ্বিতীয় দিন হইতে প্রতিদিন রাত্রে দুই ঘণ্টা ধরিয়া আমার শিক্ষার জন্য একটা পাঠ-ক্রম স্থির করি-লেন এবং মূল অক্ষরগুলি ও অক্ষরের ১২ বর্গ প্রভৃতি শিখাইয়া প্রায় ১৫ দিনের দিন, আমাকে দিয়া প্রথম পুস্তকের প্রথম-পাঠ পাঠ করাইলেন। সেইদিন মনে হইল যেন তিনি খুব সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

এইখানে, যে সব কথা সহজে আমার মনে পড়িতেছে তাহা বলিতেছি—

আমার বাপের বাড়ীর লোকেরা অর্থাৎ যাহাদের প্রকৃত মারাঠী চাল-চলন সেই সব জায়গীরদার;—তাঁহা-দের বংশে, পিতৃগৃহবাসিনী ৮ বৎসরের বেশী বয়সের মেয়েরা, গুরুজনদের সম্মুখে ঘরের দাওয়াতেই আসিতে পারে না, তো খেলা কিম্বা গান করা আর কি করিয়া হইবে? লিখিবার ত নামই নাই। আমার এক বড় পিসী, যাঁহার শ্বশুরালয় ব্রহ্মাবর্ত্তে ছিল, তিনি কেবল

ব্যঙ্কটেশ স্তোত্র প্রভৃতি পড়িতে শিখিয়াছিলেন। পরে তাঁহার দুর্ভাগ্যবশতঃ বৈধব্য ঘটিবার পর হইতে আমাদের বড় খুড়ী স্থির করিলেন যে, আমাদের বংশে মেয়েদের লেখাপড়া শেখা 'সয় না' বস্। এইরূপ শুনিবার পর, লিখিবার কথা শুধু মনে আনিলেও পাপ হইবে কি কি-হইবে এইরূপ বাড়ীর সব মেয়েদের আশঙ্কা হইতে কি আর বিলম্ব হয়? এই অনুসারে, সব মেয়েদেরই এইরূপ ধারণা হওয়ায়, আমাদের মেয়েদের লেখাপড়ার গন্ধ পর্য্যন্ত না থাকাই স্বাভাবিক। আমার দুই ভগিনীরই বিবাহ ৫ ও ৭ বৎসর বয়সে হইয়াছিল। কেবল আমার বিবাহই ১১ বৎসরে হইয়াছিল। আমার ভগিনী শ্বশুর-বাড়ী যাইবার পর, আমার খেলিবার সাথী কেহ ছিল না। আমার যে মিত্রাণী ছিল, সে রোজ আসিত না। কারণ আমার পিতার স্বভাবটা বড় কড়া ছিল। তাঁহার মেয়েরা কোথাও গিয়া খেলা করে, ইহা তিনি পছন্দ করিতেন না। বাহিরের মেয়েরাও আসিয়া যে চেঁচা-মেচি করিবে, টানাটানি করিবে, হৈৎকামি করিবে ইহাও তাঁহার ভাল লাগিত না। এইজন্য পিতা ধানের গোলা প্রভৃতি স্থানে গেলেও সেইদিন সেখানে সকলকেই যাইতে হইত। এই কারণে একদিন শরীর খারাপ ছিল বলিয়া,—আমার বড় ভাই বাড়ী ছিলেন, আমি তাঁর সঙ্গ ধরিলাম এবং তাঁহাকে গল্প প্রভৃতি পড়িতে দেখিয়া আমার বড় কৌতূহল হইল; এবং কি করিয়া তিনি এই সব পড়িতে পারেন মনে করিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। সরকারী কাজে ও ঘোরো মোকদ্দমা মামলার জন্য আমার পিতাকে প্রায়ই মফস্বলে যাইতে হইত। তিনি চলিয়া গেলে তাঁর পত্রাদি আসিত। আমার ভাই সেই সকল পত্র মাকে পড়িয়া শুনাইতেন। কিন্তু আমি সে-দিকে লক্ষ্য করিতাম না। একদিন আমার পিতা মফঃ-স্বলে যাত্রা করিবার পর, আমার ভাই বাড়ীর উঠানে একলা আছেন দেখিয়া আমি তাঁহার নিকট গেলাম। আমাদের ভাই বোনদের মধ্যে কোন ছেলেপিলেই তাঁহার নিকট কখনও যাইত না। কারণ, আমার জন্মাবার পূর্ব্বে এক বৎসর আমার ঠাকুর মা (আজী) জীবিত ছিলেন। তাই তিনি জীবিত থাকিতে কোন ছেলে-পিলের সঙ্গে আমার ভাই কথা কহেন নাই। তবে ছেলে পিলের তত্ত্বাবধান করিবেন কি করিয়া? ঠাকুরমার মৃত্যুর পর আমার জন্ম হয়। সেইজন্য পরে, আমাকে খাওয়া-বার ও ঘুম পাড়াইবার ভার আমার ভাইকে লইতে হইত, আদর যত্ন করিতে হইত। তিনি আমাকে তাঁহার কাছে লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কেন এলে? তোমার কিছু চাই?" আমি বলিলাম,—"তুমি যখন পুণায় যাবে, আমার জন্য পুঁতির পুতুল ও একটা শাড়ী এনো। ভুলো না—এনো।" এই কথা বলিয়াই আমি ছুটিয়া পলাইলাম। তিনি পুতুল আনিবার আগে এ কথা কাহাকেও জানাইবেন না, এইরূপ আমি মনে করিয়াছিলাম। তদনুসারে কেহ শুনে নাই এই-রূপ আমি বিশ্বাস করিয়াছিলাম। পরে দুপুর বেলায় আন্না সাহেব পুণায় গেলেন। "তাঁকে কি কি জিনিস তুই আনতে বলিছিস্ রে" আমার পিসী জিজ্ঞাসা করিলেন।

"কোন কিছু জিনিস্?—কোন কিছু জিনিস?" কিন্তু আমি কিছুই বলিলাম না। খেলিতে চলিয়া গেলাম। পরে, ৭।৮ দিনের মধ্যে পুণা হইতে তাঁর পত্র আসিল। সেই পত্রের শেষে আমাকে আশীর্ব্বাদ লিখিয়া —"তোর শাড়ী ও পুতুল নিশ্চয়ই আনিব। ভুলিব না" এইরূপ লিখিত হওয়ায়, তাহা পাঠ করিয়া "দাজী (?) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আরে চোট্টা, পরশুদিন, পিসিমা যখন জিজ্ঞাসা করলেন, তখন তুই পালিয়ে গেলি; কিন্তু তুই আন্না সাহেবকে যে জিনিস আন্বার জন্য বলেছিলি, তা আমি জানি।" আমি বলিলাম,—"জানতে আর হয় না, তুই কি দেবতা? কেবল আমার গণপতিই (আমি রোজ ঐ মূর্ত্তির পূজা করিতাম) জানেন। কিন্তু তিনি ত আমায়। ঐটী তিনি কাকেও বল্বেন না।" সে খুব জোরের সহিত বলিল, "আরে যা। তোর গণপতি কি জানে? আমি জানি, তুই পুঁতির পুতুল ও শাড়ী আন্তে বলেছিস ত?" এই কথা শুনিয়া আমি একেবারেই স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। সে কি করিয়া জানিতে পারিল, ইহা আমার বড়ই আশ্চর্য্য মনে হইল। একটু পরেই সে নিজ অভ্যস্ত কামরায় চলিয়া গেল দেখিয়া আমি সেখানে গেলেম এবং খুব কাকুতি মিনতি করিয়া বলিলাম,—"দাজী, এ তুই কি করে' জান্লি আমাকে বল্।" সে বলিল,—"ওরে, তাঁর যে পত্র আজ এসেছে তাতেই ওকথা লেখা আছে।" আমি এ কথার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আমি বলিলাম,—"পত্র এসে থাক্বে, কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা কর্‌চি তুই কি করে' জান্লি?" সে বলিল—"ওরে, তিনিই লিখেছেন।" আমি বলিলাম—"তিনি লিখে থাক্বেন, কিন্তু তুই কি করে টের পেলি?" আমার জিজ্ঞাসার মর্ম্ম সে বুঝিতে পারে নাই; সেইজন্য পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করায় সে বিরক্ত হইয়া উঠিল। তবু আমার জেদ্ আমি ছাড়িলাম না। তখন সে আরো বিরক্ত হইয়া আমাকে এমন এক থাপ্পড় দিল যে, সেই দিন হইতে আর আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করি নাই।

কিন্তু আমি নিশ্চিন্ত হইলাম না। ছেলেমানুষ বলিয়া আমি শীঘ্রই ভুলিয়া গেলাম। এখন একটু পড়িতে পারি; এবং তৃতীয় পাঠ্য পুস্তকের ছোট ছোট গল্প পড়িয়া তাহার পূর্ব্ব দিবসের গল্প আমার মনে পড়িল ও খুব আনন্দ হইল। যেন অনেক দিনের রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইল এইরূপ মনে হইল। সে কথা থাক্।

কিন্তু পরে পুস্তকের ইয়ত্তা (standard) অনুসারে পদ্ধতি ক্রমে আমার শিক্ষা আরম্ভ হইল। ব্যাকরণ, গণিত, মোড়ী অক্ষর ও দেবনাগরী অক্ষর লেখা, পড়া—এইরূপ সুরু হইল। আমার স্বামী রোজ রাত্রে নিয়মিত দুই ঘণ্টা সময় দিতে পারিবেন না বলিয়া এই শিক্ষা দিবা-ভাগে দিবার জন্য, পরে দুই তিন মাস, "ফিমেল ট্রেনিং কালেজ" হইতে এক শিক্ষয়িত্রী (মাষ্টারণী) রাখা হইল। ঐ পর্য্যন্ত শিক্ষার আনন্দ। সেই মাষ্টারণীকে ভয় করবে কে? তিনি আসিলে পর শ্লেট ও পুস্তকাদি খুঁজিতেই অর্দ্ধঘণ্টা কাটিত। মাষ্টারণী অল্পবয়স্কা। তিনি কি করিয়া আমার শাসনে রাখিবেন? তাঁকে স্কুলের বিষয় আমি জিজ্ঞাসা করিতাম। একবার বলিতে আরম্ভ করিয়াই তিনি চলিয়া যাইতেন। প্রায়ই "আগে পড়, তারপর গল্প করব" এইরূপ স্পষ্ট বলিবার পর তবে আমি পড়িতে আরম্ভ করিতাম। দুই এক পৃষ্ঠা হইতে না হইতেই ঘণ্টা পূর্ণ হইবামাত্র তিনি চলিয়া যাইতেন। শিক্ষা হইয়া গেল। মাষ্টারণীর আসা পর্য্যন্ত দ্বিতীয় দিনে, শ্লেট পেন্‌সীল পুস্তকের সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত হইত না। এইরূপে প্রায় ছয় মাস কাটিয়া গেল। ইত্যবসরে তিন মাসের ছুটি লইয়া আমার স্বামী এলাহাবাদ, কাশী, কলিকাতা ও মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশ দেখিবার জন্য, নারায়ণ-মহাদেব-পরমানন্দ, রাঃ বালমঙ্গেশ ওয়াগ্রে ও রাঃ শঙ্কর-পাণ্ডুরং পণ্ডিত ও আরো কতকগুলি বন্ধুবর্গের সহিত যাত্রা করিয়াছিলেন। আমি পুণাতেই ছিলাম। বাড়ী ফিরিয়া আসিলে পর, একদিন আমার স্বামী আমার পাঠাভ্যাসের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার পড়া শুনিলেন। কিন্তু এ কি! আমার স্বামী পূর্ব্বে যতটা শিখাইয়াছিলেন তাহাই আছে—তাহার বেশী কিছু হয় নাই। ইহা দেখিয়া তার পরদিন মাষ্টারণীকে বলিলেন—"আমি এর শিক্ষার ভার তোমার উপর দিয়ে গিয়াছিলেম, কিন্তু তুমি দেখছি উচিত মত পরিশ্রম করনি।" এইকথা বলিবামাত্র সে রাগিয়া বলিল, "মেয়েটা বড় বোকা, খেলা-ভক্ত, যা বলি তা বোঝে না, কত মেহনৎ করেছি, কিন্তু ওদিকে ওর মন নেই। ওর সব মনটা খেলাতেই পড়ে আছে। খেলার দিকে যার ঝোঁক, তার শিখতে মন লাগবে কি করে? আপনি নিজে শিখালে বুঝতে পারবেন। এর যদি কখন লেখা পড়া হয় তো আমি আমার নাম বদলে ফেলব। আমি কাল থেকে আর আসছি নে।" এই কথা বলিয়াই সে চলিয়া গেল। আমার স্বামী কোন উচ্চবাচ্য না করিয়া, এক পুস্তক হস্তে লইয়া, শান্তভাবে পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। যাহা হউক, এই সর্ব্ব-প্রথম আমার মন খারাপ হইল, আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। কিন্তু পাছে কেহ দেখে, এই মনে করিয়া চট্ করিয়া চোখ মুছিয়া নীচে চলিয়া গেলাম। সেই দিন হইতে আমার মনে হয় আমার চঞ্চলতা কমিয়া গিয়েছিল। কিন্তু শীঘ্রই "ফিমেল ট্রেনিং কালেজের" সগুণা বাঈদেব নামক এক মাষ্টারণী বাঈকে পড়াইবার জন্য রাখা হইল। ইনি শান্ত-স্বভাব ও সুশীলা ছিলেন। তাঁহার নিকট ১৮৭৫ সালের শেষ পর্য্যন্ত শিক্ষা ৫ম ইয়ত্তা পর্য্যন্ত ভাল রকম হইয়াছিল।

১৮৭৫ অব্দের মার্চ মাসের মধ্যে বাবা ভাউজীর (ছোট ভাই) পৈতা হইল। এই বৎসর বিষ্ণু শাস্ত্রী পণ্ডিত বিধবা-বিবাহ করেন এবং তিনি মহাবলেশ্বরে যাইবার জন্য পুণায় আসিয়াছিলেন। কাছারীতে খুব গোলমাল হওয়ায়, আমার স্বামী রাত্রিতেই ভোজের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। দুপুর বেলায় আহারের সময় আমার স্বামী আমার ননদকে বলিলেন—"আজ রাত্রে বিষ্ণু শাস্ত্রী পণ্ডিত ও কতকগুলি লোককে আহারে নিমন্ত্রণ করেছি। মনে থাকে যেন।" সে দিন কাছারী ছিল বলিয়া আমার স্বামীর ও আমার শ্বশুর মহাশয়ের দুপুর বেলায় খাওয়া এক-দম হয় নাই। কারণ, শ্বশুর মহাশয় ১১ টার পরেই স্নান করিতে উঠিতেন। সন্ধ্যা, ব্রহ্মযজ্ঞ, জপ, স্তোত্রপাঠ প্রভৃতি শেষ হইতে সহজেই ১২টা বাজিত। সেই জন্য, ১॥০ টার সময় আমার স্বামী ও ছেলেদের পাত পড়িত। এই সময়ে শ্বশুর মহাশয় খাশুড়ী ঠাকরুণ প্রভৃতি মণ্ডলী, বাবা-ভাউজীর পৈতা উপলক্ষে আসিয়াছিলেন। তখনো তাঁহারা পুণায় ছিলেন। আমার ননদের নিকট আমার স্বামী বলিয়াছিলেন, যখন দ্বিতীয় পংক্তি বসিবে তখন সহজ-ভাবে যেন শ্বশুর মহাশয়কে খবর দেওয়া হয়, আজ সন্ধ্যাকালে বিষ্ণুশাস্ত্রী পণ্ডিতকে আমাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। এই সংবাদ শুনিয়া শ্বশুর মহাশয় রাগিয়া গেলেন। কিন্তু এ সময় তিনি কিছু বলিলেন না। ৪।৫ টা বাজিলে, দেবালয়ে যাইবার সময় খাশুড়ী ঠাকরুণ হাঁক দিয়া বলিলেন, "আজ 'তুমি পংক্তিতে পরিবেশন করতে যেও না। ঐ মেয়েটাই পরিবেশ-

করবে, তুমি খেয়ে নেও। আমাদের বাড়ী, ব্রাহ্মণ কিংবা মেয়েদের কাহারও পরিবেষণ করা ভাল লাগে না বলিয়া, আমাদের বাড়ীতে,কেবল মেয়েদের দুইবার পরিবেষণ করবার রীতি ছিল। আমার যেতে যেতে রাত হবে, তুমি খেয়ে নেও। আমার জন্য অপেক্ষা কোরো না।" এই কথা বলিয়া তিনি সন্ধ্যা হইতে শ্বশুর মহাশয়ের সঙ্গে বাহিরে চলিয়া গেলেন। তাঁরা ১১টা পর্য্যন্ত বাড়ী আসিলেন না। এদিকে নিমন্ত্রিত মণ্ডলী আহারান্তে ইতস্ততঃ চলিয়া গেলেন। শ্বশুর মহাশয় ১১ টার সময় বাড়ী আসিলেন এবং বালভট্‌জীকে হাঁক দিয়া বলিলেন, "কালই আমাদের কোল্‌হাপুরে যেতে হবে। খুব ভোরে উঠে গাড়ী ঠিক্ করে নিয়ে আস্‌বে"; এই কথা বলিয়া আহার কিংবা জলযোগ না করিয়াই শুইতে গেলেন।

এই সমস্ত বৃত্তান্ত আমার স্বামী আমার ননদের নিকট জ্ঞাত হইলেন। আমার শ্বশুর মহাশয়ের স্বভাব দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়ায়, তাঁহার কোহ্লাপুরে যাইবার মৎলবটা আমার স্বামীর বড় খারাপ লাগিল এবং নিজের বিশেষ হেতু না থাকিলেও ছোট খাটো কথা লইয়া এত জেদ হইবে এই চিন্তায় সমস্ত রাত্রি আমার স্বামীর মনে শান্তি আসিল না। সকালে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া পূর্ব্বেই শ্বশুর মহাশয় বারণ্ডায় বসিয়াছিলেন; আমার স্বামী তথায় গিয়া স্তম্ভের ন্যায় নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। শ্বশুর মহাশয় দেখিতে পাইলেন। কিন্তু সে দিকে তাঁহার কোন লক্ষ্য নাই এইরূপ ভাব দেখাইয়া কোন কথাই বলিলেন না। আমরা ঘরের লোকেরা শুধু ঠাকুর ঘরের জালি দিয়া দরজার আড়াল হইতে সম্মুখে কি হইতেছে দেখিবার জন্য দাঁড়াইয়া রহিলাম। কারণ, শ্বশুর মহাশয়ের কোহ্লাপুরে যাত্রার সংকল্প শুনিয়া আমাদের ভয় হইয়াছিল। প্রায় এক ঘণ্টা কাল ঐরূপেই কাটিয়া গেল। এই দুজনের মধ্যে কেহ কাহারো সহিত কথা কহিলেন না ও মুখ চাওয়া-চাওয়ি পর্য্যন্ত হইল না; কারণ প্রত্যেকেই এইরূপ মনে করিয়া থাকিবেন যে দ্বিতীয় ব্যক্তি আগে কথা কহিবেন। কিন্তু শেষে শ্বশুর মহাশয় উপর দিকে তাকাইয়া নাম ধরিয়া আমার স্বামীকে নীচে বসিতে বলিলেন। তিনি "মাধব রাও" এই পাঁচ অক্ষর যুক্ত নাম ধরিয়াই সর্ব্বদা আমার স্বামীকে ডাকিতেন। অনেক ক্ষণের পর আবার আমার স্বামীকে বসিতে বলিলেন। তখন আমার স্বামী এই উত্তর দিলেন যে, "আপনি কোহ্লাপুরে যাবার সঙ্কল্প রহিত করিলেন এই কথা আমাকে বল্লে তবে আমি বস্‌ব। আপনারা সবাই যদি কোহ্লাপুরে যান, তবে—আমার এখানে কি আছে—আমিও আপনার সঙ্গে যাব, কাল্‌কের কথায় আপনার এত রাগ হবে, আমি মনে করি নি। এ রকম হবে জান্‌লে আমি কোন গোলযোগ করতেম না" ইত্যাদি নানা কথা বলিয়া তাঁহাকে বুঝাইবার ও শান্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু শ্বশুর মহাশয় কোন উত্তর দিলেন না। ৯টা বাজিয়া গেল, তখনও আমার স্বামীর প্রাতঃকৃত্য পর্য্যন্ত হয় নাই ও সে দিন কাছারীর ছুটিও ছিল না। তবুও শ্বশুর মহাশয় কোন কথা কহিলেন না। কিন্তু বালভট্‌জী সম্মুখে আসিয়া শ্বশুর মহাশয়কে বলিলেন যে, "আপনার কথা-মত গাড়ীর বন্দোবস্ত করা হয়েছে, এখনি গাড়ী আস্‌বে।" ইহা শুনিয়াও এতক্ষণ ধরিয়া মিনতি করা সত্ত্বেও শ্বশুরমহাশয় কোন উত্তর দিতেছেন না দেখিয়া আমার স্বামীর বড়ই খারাপ লাগিল এবং বালভট্‌জীর দিকে চাহিয়া আবার বলিলেন, "শেষে যাওয়াই বুঝি স্থির হল! আমাকে এখানে রেখে সকলেই চলে যাবে! যে দিন আমার মা মারা যান সেই দিনই আমি অনাথ হয়েছি।" এই কথা বলিয়া সেখানে আর দাঁড়াইয়া রহিলেন না। একেবারে উপর তলায় চলিয়া গেলেন। কিছু কাল পরে, বালভট্‌জীকে উপরে ডাকাইয়া লইয়া তাঁহাকে দিয়া শ্বশুর মহাশয়ের নিকট এই কথা বলিয়া পাঠাইলেন যে, "আপনি যদি কোহ্লাপুরে যাবার সঙ্কল্প রহিত না করেন তবে আমিও কাজে ইস্তফা দিয়া রাজিনামা লিখে দেব।" এই কথা বালভট্‌জী শ্বশুর মহাশয়কে বলার পূর্ব্বেই আমার স্বামী দোতালায় চলিয়া যাওয়ায় শ্বশুর মহাশয়ের মন খারাপ হইয়া ছিল। বালভট্‌জীর নিকট এই কথা শুনিয়া তাঁহার বড়ই খারাপ লাগিল এবং একেবারেই বলিলেন যে—"আমি কোহ্লাপুরে যাচ্চিনে, সে সঙ্কল্প রহিত করেছি। এখন আমি তবে স্নান করতে উঠছি। কোর্টের সময় হয়েছে, উপরে গিয়ে তাঁকে বলো।" এই কথা শুনিয়া, আমার স্বামীর মনে এতক্ষণ যে একটা ভার চাপিয়াছিল, এখন একটু কমিয়া গিয়া আবার মন চাঙ্গা হইয়া উঠিল; এবং তাঁহার নিত্য নিয়মিত কাজ আবার আরম্ভ করিলেন। আমার স্বামী আর কখন ঐ রকম অবস্থা ঘটিতে দেন নাই। এই বৎসরেই, যে বাড়ীতে বাস করিতেছিলেন সেই বাড়ীটা আমার স্বামী খরিদ করিবার পর (১৮৭৫) জুন মাসে শ্বশুর মহাশয়, ছেলেপিলেদের সঙ্গে লইয়া কোহ্লাপুরে গেলেন। পুণায় বাড়ী খরিদ করা হইয়াছে বলিয়া শ্বশুর মহাশয়ের বড়ই আনন্দ হইল। কারণ, সমস্ত কাজকর্ম্মের দরুণ তখন ২৫০৲ টাকা পাইলেও, খর্চে-স্বভাব হওয়ায়, তিনি তাঁহার সম্বলের অতিরিক্ত এত খরচ করিয়াছিলেন যে কয়েক হাজার টাকা তাঁর ধার

হইয়া পড়িয়াছিল। এইরূপ অবস্থা হওয়ায়, তাঁহার উপার্জ্জিত অর্থ হইতে স্থাবর সম্পত্তি আদৌ খরিদ করা হয় নাই। শ্বশুর মহাশয়ের যে ধার হইয়াছিল তাহা কোন প্রকার সুখোপভোগ বা আয়েষের দরুণ নহে। তাঁহার স্বভাব অত্যন্ত উদার ও দয়ালু হওয়ায় এবং তাঁহার তিন সহোদর ভাই ও অন্য খুড়তুতো ভায়ের পরিবারের বিবাহ, উপবীত ও শিক্ষা প্রভৃতি সমস্ত ভার তাঁহার উপর পড়ায় এই ধার হইয়াছিল।

পরিবার বর্গের মধ্যে কাহারও খরচের টানাটানি হইলে তাহারা শ্বশুর মহাশয়ের নিকট আসিয়া মিনতি করিত ও সেই সময়ে শ্বশুর মহাশয়ের হাতে পয়সা না থাকিলেও তাহারা কর্জ্জ করিয়া তাহাদের গরজ মিটাইত, কিন্তু কিছু বলিত না। তাঁহার এই উদারতার দরুণ তাঁহাকে কর্জ্জ করিতে হইয়াছিল; অন্য কোন কারণ নাই। কিন্তু তাঁহার পুণ্যে, তাঁহার ঔরসে জন্মগ্রহণ করায় আমার স্বামী সমস্ত কর্জ্জ শোধ করিয়াছিলেন ও পুত্রধর্ম্ম উত্তমরূপে পালন করিয়াছিলেন। শ্বশুর মহাশয় পেন্সন লইলে পর, সেই পেন্সনের টাকায় খরচ কুলাইত না বলিয়া আমার স্বামী পুণা হইতে ১৫০৲ টাকা প্রতি মাসে খরচের জন্য পাঠাইতেন। আজ পর্য্যন্ত যাহা করা হয় নাই তাহা আজ পুত্রের দ্বারা সম্পন্ন হইল। তাই, পুণা ও কোহ্লাপুরের দুই সংসারের খরচ চালাইয়া ও আত্মীয় স্বজনের পরামর্শ না লইয়া আজ পরমেশ্বরের কৃপায় স্থাবর সম্পত্তি হইতে অর্থোপার্জ্জনের সুযোগ হওয়ায় শ্বশুর মহাশয়ের খুব আনন্দ হইল, এবং তাহা হওয়াই স্বাভাবিক। ক্রয়পত্রের লেখাপড়া শেষ হইবার পূর্ব্বেই শ্বশুর মহাশয় মুসবিদা প্রস্তুত করিয়া দেখিবার জন্য পাঠাইলেন। আমার স্বামী তাহা হাতে লইয়া, পড়িয়া দেখিয়া পেন্সিলে তাহার উপর এই কথা লিখিলেন যে, "আমার নাম লেখা হইয়াছে, সেই জায়গায় আপনার নাম থাকে এই আমার ইচ্ছা। এতে আর কিছু বদল করবার মত নেই।" এই কাগজ বাড়ীর নীচের তলায় আসিলে পর, শ্বশুর মহাশয় পড়িয়া দেখিলেন ও 'গম্' হইয়া বসিলেন। "আগামী কল্য কবলা-পত্র রেজিষ্ট্রী করাইব," সমাগত রেজিষ্ট্রারকে এই কথা বলিয়া তিনি আপনার কাজে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু রাত্রিতে আহারের পর, শ্বশুর মহাশয় ছাদের উপরে যাইয়া আমার স্বামীকে নিরালা ডাকাইয়া বলিলেন যে, "আমাদের এত বড় বংশে আজ পর্য্যন্ত ঝগড়াঝাঁটি কিংবা ভাগাভাগি হয় নি। তার কারণ, বংশের সকলেই দৃঢ়-চিত্ত ত ছিলেনই, তা-ছাড়া আমাদের বংশে কেহ হালে স্থাবর সম্পত্তি খরিদ করেন নি। এখন জগদম্বার কৃপায় আমাদের বাড়ী খরিদ করবার সুযোগ এসেছে, ঐ বাড়ীর কোবালা আমার নামে না ক'রে তোমার নামেই হবে। কারণ এই ছেলের সম্বন্ধ একটু স্বতন্ত্র হওয়ায় কোবালা তোমার নামেই হবে, তাহলে কোন গোলযোগ থাকবে না।" এই সমস্ত শুনিয়া লইয়া আমার স্বামী বলিলেন যে, "আমি এরই দিক দিয়া সমস্ত বিচার করেছি। এই প্রথম স্থাবর সম্পত্তির কোবালা আপনার নামে হওয়াই আমি বেশী শোভন মনে করি ও তাহলে মনেও শান্তি পাই। অতএব আপনি 'না' বলবেন না।" এইরূপ বলা হইলে পর, শ্বশুর মহাশয় নীচে চলিয়া গেলেন এবং তার পর দিন আমার স্বামীর ইচ্ছা অনুসারে শ্বশুরমহাশয় ঐ বাড়ীর কোবালা করিয়া লইলেন। (ক্রমশঃ)

রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে।

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এ)

কোন্ কল্পলোকের বিহগ তুমি
বেড়াও উধাও হয়ে।
নিশুত রাতের তারার সাথে
কত কথা যাও কয়ে॥
নীল আকাশে ভেসে বেড়াও
ঢালি অবিরল তান।
আলোকের সাথে বাতাসের সাথে
গেয়ে যাও তুমি গান॥
মরতের সুখে মরতের দুখে
মোদের জরজর মনপ্রাণ।
নন্দনের পাখী তুমি সেথা এসে
করিছ গো সুধাদান॥
সংসার তাপে তাপিত যে জীব
তাহারে দিতে সান্ত্বনা
পাঠালেন তোমা বিধি দয়াময়
ঘুচায়ে সকল বেদনা॥
তব গীতিতান ভেসে আসে ওই
আকাশে আলোয় বাতাসে।
ঝরণার সম বহিছে মোদের
জীবনের আশেপাশে॥
কলমুখরিত অরুণ উষায়
শুনি সে তোমার গান।
সকাল সাঁঝে দিবস মাঝে
শুনি সে পাগল তান॥

যে কুসুম ঝারি লয়ে এসেছিলে
এখনো হয়নি শেষ।
শেষ কি গো আছে—শেষ কি গো হবে—
তার নিতি নিতি নব বেশ॥
গেয়ে যাও কবি গেয়ে যাও গান
সুশীতল হোক প্রাণ।
ও বীণার রেশ রবে চিরদিন
নাহি—নাহি অবসান॥
কত সুরে তুমি বাজালে যে বীণা
ও গো অদ্ভুত যন্ত্রী।
মোদের সুখে দুখে কাজে বাজে নানা সাজে
তোমারি বীণার তন্ত্রী॥
ধন্য তুমি ধন্য হে কবি
ধন্য নিখিল বিশ্ব।
ধন্য আজি মা জননী বঙ্গ—
নহে নহে দীন নিঃস্ব॥

নববর্ষের উপদেশ।*

(শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

আজ নববর্ষের আরম্ভে যাহা কিছু প্রকাশমান তাহার মধ্যে দীপ্যমান পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিয়া, তাঁহার চিন্তনে নববলে বলীয়ান হইয়া এস আমরা জীবনপথে অগ্রসর হই। এই পরম পুরুষের ন্যায় এমন জীবন্ত সত্য, এমন পরম সহায়, এমন বলদাতা এমন জীবনধন্যকর স্পর্শমণি জগতে আর কিছুই নাই।

জীবন্ত সত্য। যে সত্য উৎসের ন্যায় উৎসারিত হইয়া জগতের বহিঃরূপ ভেদ করিয়া প্রকাশ পাইতেছেন, যে সত্য জগতের প্রাণস্বরূপ, যে সত্য আছেন বলিয়া এ জগৎ সত্য হইয়াছে। মূল সত্য, একমাত্র সত্য, অনাদ্যনন্ত সত্য। এমন সত্য, এত বড় সত্য, এমন জাজ্বল্যমান সত্য জগতে আর কিছুই নাই।

পরম সহায়। যে সহায় জ্বলন্ত সূর্য্য, দুরন্ত সমুদ্রকে সৃজন ও শাসন করিয়া আমাদিগের সেবায় নিযুক্ত করিয়াছেন, যে সহায় দরিদ্রের জীর্ণ কুটীরের শোকার্ত্তের ভগ্নপ্রাণের একমাত্র ভরসাস্থল, যে সহায়চ্যুত হইলে এ জগৎ এক মুহূর্ত্তও রক্ষা পায় না, নিমেষে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এমন সহায়, এত বড় সহায়, এমন অসহায়ের সহায় জগতে আমাদের আর কে আছে?

বলদাতা। যাঁহার কথা স্মরণ করিলেও আশায় উৎসাহে বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠে, প্রাণে অসুরের বলসঞ্চার হয়, সকল দুঃখশোকতাপ দূরে পলায়ন করে; এবং যাঁহাকে লাভ করিলে মানব কি যে হইয়া যায় তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এমন বলদাতা জগতে আর নাই।

স্পর্শমণি। যাঁহার স্পর্শে জন্মজন্মের পাপ মলিনতা ধৌত হইয়া যায়, শুষ্ক মৃত তরুও মুঞ্জরিত হয়, কদর্য্য পঙ্ক ভেদ করিয়া অপূর্ব্ব শোভায় পঙ্কজ ফুটিয়া উঠে। এ স্পর্শমণি জগতে কেবল এক—সিদ্ধিদাতা পরমেশ্বর।

তাই বলি, আজ নববর্ষে এস আমরা এই পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হই, তাঁহার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি। তাঁহাকে সহায় পাইলে আমাদিগের আর কোনও ভয় ভাবনা থাকিবে না, প্রাণে বল পাইব, নির্ভয়ে জীবনের লক্ষ্যপথে অগ্রসর হইতে পারিব, আমরা ধন্য হইব।

আকাশ যখন গুম্ হইয়া থাকে,—মেঘাচ্ছন্ন রহে অথচ বারিবর্ষণ হয় না, পাতা নড়ে না, বাতাস বহে না, প্রকৃতির তখন যেরূপ অবস্থা হয় ঈশ্বরকে হারাইলে মানবাত্মারও ঠিক সেইরূপ অবস্থা হয়—একেবারে কেমনতর হইয়া যায়; প্রাণে কিছুমাত্র সুখ থাকে না শান্তি থাকে না, আনন্দ থাকে না, জীবন একেবারে শুষ্ক নীরস শূন্য বলিয়া বোধ হয়। মানবের পক্ষে ইহা অপেক্ষা যাতনাদায়ক অবস্থা আর নাই।

তখন দুঃখ দিয়া ঈশ্বর আমাদিগের উদ্ধার সাধন করেন, তাঁহার দিকে আমাদিগকে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করেন। দুঃখে না পড়িলে আমরা ত তাঁহার মুখের দিকে একবারও ফিরিয়া চাহি না। এ দুঃখ তাঁহারই স্নেহের দান। ঈশ্বর আমাদিগকে চাহেন, আমাদের না হইলে তাঁহার চলে না, কেন না তিনি আমাদিগকে ভালবাসেন, আমরা তাঁহার সন্তান—ঈশ্বরকে না হইলে আমাদেরও

* গত ১লা বৈশাখে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ভবনে নববর্ষের ব্রহ্মোপাসনা উপলক্ষে বিবৃত।

চলে না, কেন না তিনি আমাদের পরম পিতা, পরম গতি, পরম আশ্রয়। সকল আশ্রয় খুঁজিয়া যখন আমরা নিরাশচিত্তে পথে আসিয়া দাঁড়াই, তখন এ আশ্রয় আমাদিগকে বক্ষে টানিয়া রক্ষা করেন।

মানবের অশ্রুজলের মূল্য তখন, যখন তাহাতে পরমাত্মরূপ প্রকাশ পান। তাই ভগবদ্বিরহে ব্যাকুল হইয়া ভক্ত যখন অশ্রুজলে ভাসিতে থাকেন, লোকে তাঁহাকে ধন্য ধন্য করে। ইহার কারণ, যাঁহাকে লইয়া ভক্তের বিরহব্যথা অশ্রুজল, তাঁহাকে পাইলেই মানবের চিরজন্মের মত সকল ব্যথা অশ্রু মুছিয়া যায়।

কথায় বলে, মা'র চেয়ে যা'র টান বেশী সে ডাইন। ইহার অর্থ আর কিছুই নয় কেবল এই যে, মা'র অপেক্ষা অধিক জগতে কেহ আর ভালবাসিতে পারে না। যেখানে তাহা দেখিবে, তাহাতে তুমি বিশ্বাস করিও না, আস্থা রাখিও না, নিশ্চিত জানিও তাহার মধ্যে কিছু দুরভিসন্ধি আছে। জগন্মাতা সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাই খাটে। জগতে যাহা কিছু তাঁহাকে ভুলাইয়া, তাঁহার নিকট হইতে মন কাড়িয়া লইয়া আমাদিগকে দূরে লইয়া যাইবার চেষ্টা করে, তুমি তাহাতে ভুলিও না প্রলুব্ধ হইও না, নিশ্চিত জানিও তাহা হইলে পরিশেষে তোমাকে ঠকিতে হইবে, অনুতাপে দগ্ধ হইতে হইবে।

কিন্তু মানবের মন—বাহিরের চমক্ দেখিয়াই আমরা ভুলিয়া যাই। তাই এই ডাইনের ভালবাসার ফাঁদে পড়িয়া আজ আমরা এত দুঃখ পাইতেছি, মৃত্যুকে ইচ্ছা করিয়া আমরা ঘরে ডাকিয়া আনিতেছি, এমন যে মা তাঁহাকেও ভুলিতে বসিয়াছি। তাই আজ এই জগদ্ব্যাপী মৃত্যুদহন, এই হাহাকার অশ্রুপাত—চতুর্দ্দিকে চিতার আগুন ধূধূ করিয়া জলিতেছে। যে জড়-বিজ্ঞান-শক্তিকে মাতৃজ্ঞানে এতদিন আমরা সেবা করিয়া আসিতেছি তাহাই আজ রাক্ষসীরূপ ধারণ করিয়া আমাদিগের বিনাশসাধন করিতেছে।

কিন্তু এই ডাইনের হাতে চেতনা পাইয়াই আবার আমরা আমাদিগের মাকে চিনিতে পারিব—তখন আরও ভাল করিয়া চিনিব; মাতার সে অনন্ত মঙ্গল-দৃষ্টি, সে অপার প্রেমের মূল্য আমরা বুঝিতে পারিব। তাহারই আয়োজন লক্ষণ চতুর্দ্দিকে দেখা যাইতেছে। ইহাও সেই ঈশ্বরের করুণা-সাপেক্ষ। তিনি আমাদিগকে কৃপা করুন।

যিনি আমাদের জীবনের আলো, যিনি আমাদের চিরসঙ্গী থাকিয়া জীবনপথে আমাদিগকে এতদূর লইয়া আসিয়াছেন, আজ নববর্ষের ঊষালোকে তাঁহাকে প্রণাম করি। যিনি গত রজনীতে আমাদের নিদ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় নির্নিমেষ নয়নপাতে সকল বাধাবিঘ্ন হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিয়ছেন, আজ নববর্ষের ঊষালোকে তাঁহাকে প্রণাম করি। যিনি আমাদিগের ভবিষ্য জীবনের একমাত্র সহায় আশ্রয়স্থল, আজ নববর্ষের ঊষালোকে তাঁহাকে প্রণাম করি।

হে জননি! হে জনক! শিশু আমরা খেলাঘরে খেলা লইয়াই মত্ত ছিলাম,—তুমি আমাদিগের নিকটে আছ এই বিশ্বাসে। এখন তোমাকে পাইবার জন্য আমাদিগের প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছে, মন আর প্রবোধ মানিতেছে না। তুমি এস; তোমার স্নেহাঞ্চলে আমাদের অঙ্গের সমস্ত ধূলামলা মুছিয়া দিয়া তুমি তোমার অভয় ক্রোড়ে আমাদিগকে লহ। আমরা ডাইনের ভয়ে ভীত, তুমি আমাদিগকে সে ভয় হইতে পরিত্রাণ কর। আজ নববর্ষে দয়া কর, তুমি দয়া কর। তোমার চরণে ভক্তিভরে আবার আমরা বারবার প্রণাম করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

স্বরলিপি।

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

নাহি সূর্য্য, নাহি জ্যোতিঃ, নাহি শশাঙ্ক সুন্দর।
ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্বচরাচর॥
অস্ফুট মন-আকাশে, জগত সংসার ভাসে,
ওঠে ভাসে ডোবে পুনঃ অহংস্রোতে নিরন্তর॥
ধীরে ধীরে ছায়াদল, মহালয়ে প্রবেশিল,
বহে মাত্র আমি আমি—এই ধারা অনুক্ষণ॥
সে ধারাও বন্ধ হল, শূন্যে শূন্য মিলাইল,
অবাঙ্‌মনসগোচরম্ বোঝে—প্রাণ বোঝে যার॥

কথা—স্বামী বিবেকানন্দ। স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা।

সম্পূর্ণ। বাদী জ্ঞ; সম্বাদী ম, প; অনুবাদী র, ধ, ণ, ন।

ঠাট—স র জ্ঞ ম প ধ ন স ণ ধ প ম, জ্ঞ র স।

॥ ১ ২´ ৩ ০
সা সা II "মা -া মা মা। ণা -পা -া -া। মা -জ্ঞা জ্ঞা রা। -মজ্ঞা -া জ্ঞা জ্ঞা I
না হি সূ • র্য্য না হি • • • জ্যো • তি না •• • হি শ

১ ২´ ৩ ০
I মা -পমা -ণণা পা। -া -মজ্ঞা -রজ্ঞা -রজ্ঞমা। -া -রা -া রা। সা -া -া সা I
শা •• •• ঙ্ক • •সূ •• ••• • • ন্ দ র • •ভা

১ ২´ ৩ ০
I সা -মা -া -জ্ঞমপা। পা -া -া পা। -া মা জ্ঞা -রা। -মজ্ঞা -া মজ্ঞা জ্ঞা I
সে • • ••• ব্যো • •মে • ছা য়া • •• • স• ম

১ ২´ ৩ ০
I মা পা -মা -া। পা -া পা -ধা। -পধণা ণা -ধণর্সা -া। -ণর্সর্রা -া -র্সর্রজ্ঞা -র্রজ্ঞর্মা I
ছ বি • • বি • শ্ব • ••চ রা ••• • ••••••• •••

১ ২´ ৩ ০
I পর্মা র্মা -জ্ঞা -র্রা। -র্মা -ণা -ধা -পধা। -পধণা -া -ধণর্সা -া।
চ• র •• • • • • •• ••• • ••• •

০
।-ণর্সর্রা -র্সা র্রর্সা র্সা II
••• • "না হি"

১ ২´ ৩ ০
II মা মা -পধা না। না র্সা -া র্রর্রর্সনা। র্সা -া -না র্সা। -া -া -া -র্সনা I
অ স্ফু •• ট ম ন • আ•• কা • • শে • • • • ••

১ ২´ ৩ ০
I র্সা র্রর্সা না -া। না র্সা -নর্সা -নর্সর্রা। -র্রর্সা র্সা -পা ধা। -পধা -পধণা -ধণর্সা সা I
ব্র গ• ত • সং সা •• ••• •র ভা • মে •• ••• ••• ও

১ ২ ৩ ০
I -র্সণা -ধপা -মা মা। -ণণা পা -মা -জ্ঞা। -রজ্ঞমা জ্ঞমা রা -া। সা -া -া -া I
০ঠে ০ভা ০ সে ০ভো বে ০ ০ ০০পূ নঃ অ ০ হং ০ ০ ০

১ ২ ৩ ০
I সা -মা -া মা। মা পা -ধা -পধণা। -ধণর্সা -া -ণর্সর্রা -া। -র্সর্রজ্ঞা -া র্রজ্ঞর্মা -া I
শ্রো ০ ০ তে নি র ০ ০০০ ০০০ ০ ০০০ ০ ০০০ ০ ০০০০

১ ২ ৩ ০
I র্পর্মা র্মা -জ্ঞা -া। -র্রা -া -র্সা -ণা। -ধা -া -পা -ধা। -পধা -পধণা ধা পা II
নৃত র ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০০০ "না হি"

১ ২ ৩ ০
II সা -মা মা মা। -পা পা পা -মা। -জ্ঞা -া -রা -া। মজ্ঞা -া -া রা I
ধী ০ রে ধী ০ রে ছা ০ ০ ০ ০ ০ য়া ০ ০ ০ দ

১ ২ ৩ ০
I জ্ঞা জ্ঞা মা পা। পা মা মা -জ্ঞা। -রজ্ঞমজ্ঞমা -রা -া -া। সা -া -া ন্া I
ল ম হা ল য়ে প্র বে শি ০০০০০ ০ ০ ০ ল ০ ০ ব

১ ২ ৩ ০
I সা রা -া সা। ন্া সা -ন্সরা সা। সা -ণ্া -ধ্া সা। সা মা মা পা I
হে মা ০ ত্র আ মি ০০০ আ মি ০ ০ এ ই ধা রা অ

১ ২ ৩ ০
I পা -মজ্ঞা -রজ্ঞা -রজ্ঞমা। রা সা -া মা। মা -ণধা না র্সা। র্সনা -র্সর্সা র্সা র্সা I
সু ০০ ০০ ০০০ ক ণ ০ লে ধা ০রা ও ব ছ ০ ০হ ল শূ

১ ২ ৩
I র্সা নর্সর্রর্সনা র্সনর্সর্রা র্সা। র্সর্গা -ধপধা -পধণা ধা। পমা মমা ধপা -মজ্ঞা।
গ্যে শূ০০ন্যমি লা০০ ই ল ০ ০০০ ০০০ অ বাঙ্ ম ন স গো ০০

০ ১ ২ ৩
। -রজ্ঞমজ্ঞমা রা সা সা I -া মা -া মা। মা পা ধা -া। -পধা -ণা -ধণা -র্সা।
০০০চ র ম্ বো ঝে ০ প্রা ০ ণ বো ঝে ০ ০ ০০ ০ ০০ ০

০ ১ ২ ৩
। -ণর্সা -র্রা -র্সর্রা -জ্ঞা I -র্রজ্ঞা -র্মা র্মা -া। -জ্ঞা -র্রা -র্সা -া। -ণা -ধা -পা -ধা।
০০ ০ ০০ ০ ০০ ০ যা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

০
। -পধা -ণা ধা পা II
০০ র্ "না হি"

বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত—

গীতা-রহস্য।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদিত)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এইরূপে, স্বয়ং মহাভারতকার কর্ত্তৃক প্রতিপাদিত ভাগবত ধর্ম্মানুসারী অর্থাৎ প্রবৃত্তিপর তাৎপর্য্য এবং তাহার পর আবির্ভূত অনেক বিদ্বান আচার্য্য, কবি, যোগী ও ভগবদ্ভক্তদিগের নিজ নিজ সম্প্রদায়ানুরূপ প্রতিপাদিত শুদ্ধ নিবৃত্তিপর তাৎপর্য্য, ভগবদ্গীতার এইরূপ অনেক প্রকার তাৎপর্য্য দেখিয়া যে কোন ব্যক্তি বিভ্রান্তচিত্ত হইয়া স্বভাবতই এইরূপ প্রশ্ন করিতে পারে,—এই পরস্পরবিরোধী নানাবিধ তাৎপর্য্য একই গ্রন্থ হইতে বাহির করা যাইতে পারে কি? বাহির করা যাইতে পারে শুধু নয়; উহাতে ইষ্টও আছে এইরূপ যদি কেহ বলে, তবে এইরূপ হইবার হেতু কি? বিভিন্ন ভাষ্যকার আচার্য্য, বিদ্বান, ধার্ম্মিক ও অত্যন্ত সাত্ত্বিকপ্রকৃতির লোক ছিলেন সে বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই। কিং বহুনা, শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মত মহাতত্ত্বজ্ঞানী আজ পর্য্যন্ত জগতে আবির্ভূত হয় নাই বলিলেও চলে। কিন্তু তাঁহার সহিত পরবর্ত্তী আচার্য্যদিগের এতটা মতভেদ কেন? গীতাতো একটা ভোজবাজী ("গোড়বঙ্গাল") নহে যে তাহা হইতে যে যাহা খুসি একটা অর্থ বাহির করিবে। উপরি উক্ত সমস্ত সম্প্রদায়ের আবির্ভাবের পূর্ব্বেই গীতা রচিত হইয়াছিল এবং অর্জ্জুনের ভ্রম বাড়াইবার জন্য নহে, পরন্তু তাঁহার ভ্রম দূর করিবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণ এই গীতা অর্জ্জুনের নিকট বিবৃত করিয়াছিলেন। তাহাতে একই বিশিষ্ট প্রকারের নিশ্চিত তাৎপর্য্যের উপদেশ করায়, অর্জ্জুনের উপর উহার পরিণামফলও সেইরূপ হইয়াছে। কিন্তু গীতার তাৎপর্য্য লইয়া এতটা গোলযোগ কেন?

প্রশ্নটা কঠিন বলিয়া মনে হয় সত্য। কিন্তু উহার উত্তর প্রথম দৃষ্টিতে যতটা কঠিন বলিয়া মনে হয় আসলে ততটা কঠিন নহে। মনে কর কোন সুমিষ্ট ও সুরস পক্কান্ন দেখিয়া একজন যদি তাহাকে গমের, আর একজন ঘৃতের ও তৃতীয় ব্যক্তি চিনির পক্কান্ন এইরূপ নিজের রুচি অনুসারে বলে, "তাহা হইলে আমরা কোন্‌টা মিথ্যা বলিয়া স্বীকার করিব? তিনই আপন আপন হিসাবে সত্য। কারণ গম, ঘৃত ও চিনি এই তিন পদার্থই একত্র মিলিত হইয়া তাহা হইতে লাড্ডু, জিলেপী, মোতিচুর ইত্যাদি অনেক প্রকার পক্কান্ন প্রস্তুত হইতে পারে, সুতরাং তাহার মধ্যে প্রস্তুত পক্কান্ন কোন্‌টি তাহা নির্ণয় করিতে হইলে, উহা গোধূমপ্রধান, ঘৃতপ্রধান কিংবা শর্করাপ্রধান, শুধু এইরূপ বলিয়াই নির্ণয় করা যাইতে পারে না। সমুদ্রমন্থনের সময় যেরূপ একজন অমৃত, আর একজন বিষ, আবার কেহ কেহ ঐরাবত, কৌস্তুভ, পারিজাত, প্রভৃতি বিভিন্ন বস্তু লাভ করিয়াছিলেন, তবু তাহা দ্বারা সমুদ্রের বাস্তবিক স্বরূপ নির্ণয় হয় নাই; সাম্প্রদায়িকভাবে গীতাসাগরের মন্থনকারী টীকাকারদিগের অবস্থাও সেইরূপ হইয়াছে। কিংবা কংসবধের সময় রঙ্গমণ্ডপে অবতীর্ণ একই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ প্রত্যেক প্রেক্ষকের নিকট বিভিন্ন অর্থাৎ মল্লের নিকট বজ্রসদৃশ, স্ত্রীলোকের নিকট মদনসদৃশ, আপন মাতাপিতার নিকট পুত্রসদৃশ প্রতিভাত হইয়াছিলেন, সেইরূপ ভগবদ্গীতা এক হইলেও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নিকট উহা বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইয়াছে এইরূপ বলা যাইতে পারে। যে কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের কথা ধর না কেন, সে সম্প্রদায় একটা প্রামাণিক ধর্ম্মগ্রন্থের অনুসরণ করিবেই করিবে, ইহা ত স্পষ্টই দেখা যায়। কারণ, তাহা না হইলে ঐ সম্প্রদায় একেবারেই অপ্রমাণ বিবেচিত হইয়া সকল লোকের নিকটেই অমান্য হইবে। এইজন্য, বৈদিক ধর্ম্মের যত সম্প্রদায়ই হউক না কেন, কোন বিশেষ বিষয় যথা, ঈশ্বর, জীব ও জগৎ ইহাদের পরস্পরসম্বন্ধ বাদ দিলে বাকী বিষয় এই সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে একই থাকে; এবং সেইজন্য আমাদের ধর্ম্মের প্রামাণিক গ্রন্থাদির উপর যে সকল সাম্প্রদায়িক ভাষ্য বা টীকা আছে তন্মধ্যে প্রায় শতাধিক বচনের কিংবা লোকের অভিপ্রায় একই প্রকারে প্রযুক্ত হইয়াছে। যাহা কিছু ভেদ তাহা অবশিষ্ট বচন সম্বন্ধেই দেখা যায়। ঐ সকল বচনের সরল অর্থ গ্রহণ করিলেও উহা সকল সম্প্রদায়ের পক্ষে সমান অনুকূল হইবে ইহা সম্ভবপর নহে। এইজন্য ইহার মধ্যে যে সকল বচন নিজ সম্প্রদায়ের অনুকূল সেই গুলিই প্রধান ও অন্যগুলি গৌণ বলিয়া স্বীকার করিয়া, অথবা প্রতিকূল বচনগুলির অর্থ যুক্তির দ্বারা অন্যথা করিয়া কিংবা যতটা সম্ভব তাহাতে সহজ ও সরল বচনাদি হইতেও নিজ নিজ অনুকূল শ্লেষার্থ ও অনুমান বাহির করিয়া, নিজ সম্প্রদায় যাহাতে সেই অর্থে সিদ্ধ হয় এইরূপ বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক টীকাকার প্রতিপাদন করিয়া থাকেন। তাহার উদাহরণ স্বরূপ, গীতা, ২—১২ ও ১৩; ৩—১৯; ৬—৩ এবং ১৮—২ উপরি উক্ত আমার টীকা দেখ। কিন্তু এই রীতি অনুসারে কোন গ্রন্থের তাৎপর্য্য নিরূপণ করা, আর নিজ সম্প্রদায় গীতাতে প্রতিপাদিত হওয়া চাই এইরূপ কিংবা অন্য কোনরূপ অভিমান না রাখিয়া স্বতন্ত্র রীতিতে প্রথমে সমগ্র গ্রন্থের পরীক্ষা করিয়া কেবল তাহা হইতে সার অর্থ বাহির করা—এই দুই

বিষয় স্বভাবতই অত্যন্ত ভিন্ন, ইহা যে-কোন ব্যক্তিরই সহজে উপলব্ধি হইবে।

গ্রন্থতাৎপর্য্যনির্ণয়ের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টি সদোষ বলিয়া পরিত্যক্ত হইল; এখন তবে গীতার তাৎপর্য্য বাহির করিবার অন্য উপায় কি আছে তাহা বলা আবশ্যক। গ্রন্থ, প্রকরণ কিংবা বাক্য এই সকলের অর্থনির্ণয় কার্য্যে অত্যন্ত কুশল যে মীমাংসাকার তাঁহারই এই সম্বন্ধে সর্ব্বমান্য এক পুরাতন শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

উপক্রমোপসংহারৌ অভ্যাসোঽপূর্ব্বতা ফলম্
অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্য্যনির্ণয়ে ॥

মীমাংসাকার বলিতেছেন যে, যে কোন লেখার, প্রকরণের কিংবা গ্রন্থের তাৎপর্য্য বাহির করিতে হইলে উদ্ধৃত শ্লোকোক্ত সাতটি বিষয় উপায় স্বরূপ (লিঙ্গ) হওয়ায় ঐ সাত বিষয়ের বিচার করা নিতান্তই আবশ্যক। তন্মধ্যে, 'উপক্রমোপসংহারৌ' অর্থাৎ গ্রন্থের আরম্ভ ও শেষ এই দুই বিষয়। যিনিই হউন না কেন, তিনি মনোমধ্যে কোন বিশিষ্ট হেতু ধরিয়া গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করেন; এবং উক্ত বিশিষ্ট উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে পর, গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। এই জন্য, গ্রন্থতাৎপর্য্যনির্ণয়কার্য্যে প্রথমেই গ্রন্থের উপক্রম ও উপসংহারের প্রতি লক্ষ্য করা আবশ্যক। সরল রেখার ব্যাখ্যা দিবার সময়, ভূমিতি শাস্ত্রে এইরূপ বলা হইয়া থাকে যে, আরম্ভের বিন্দু হইতে যে রেখা দক্ষিণ-বাম দিকে কিংবা উপর নীচে না বাঁকিয়া শেষের বিন্দু পর্য্যন্ত বরাবর সমান যায় তাহাকে সরল রেখা বলে। গ্রন্থের তাৎপর্য্যেও এ নিয়ম প্রযুক্ত হইতে পারে। যে তাৎপর্য্য গ্রন্থের আরম্ভ ও শেষকে ত্যাগ না করিয়া এই দুই সীমা-বিন্দুর মধ্যে ঠিক অবস্থান করে তাহাই গ্রন্থের সরল তাৎপর্য্য। প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত যাইবার অন্য পথ থাকিলে সে সব বাঁকা পথ বা আড়-পথ বলিয়া বুঝিতে হইবে। আদ্যন্ত দেখিয়া এইরূপ গ্রন্থের দিক নির্ণয় করিবার পর, সেই গ্রন্থে 'অভ্যাস' অর্থাৎ পুনরুক্তি কিরূপ করা হইয়াছে, অর্থাৎ পুনঃপুনঃ কি বলা হইয়াছে ইহা দেখিতে হইবে। কারণ, গ্রন্থকার যে বিষয় সিদ্ধ করিতে চাহেন, তাহার সমর্থনার্থ তিনি অনেক সময় অনেক কারণ দেখাইয়া প্রত্যেকবার "অতএব এই বিষয় সিদ্ধ হইল" কিংবা "অতএব অমুক করা আবশ্যক" এইরূপ একই সিদ্ধান্ত পুনঃপুনঃ বলিয়া থাকেন।

গ্রন্থতাৎপর্য্য বাহির করিবার চতুর্থ ও পঞ্চম সাধন 'অপূর্ব্বতা' ও "ফল"। 'অপূর্ব্বতা' অর্থাৎ নূতনত্ব। যে কোন গ্রন্থকার হউন, একটা কিছু নূতন বলিবার কথা না থাকিলে, প্রায়ই তিনি নূতন গ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হন না। অন্তত যে সময় ছাপাখানা ছিল না, সে সময় এইরূপ হইত না। এই জন্য কোন গ্রন্থের তাৎপর্য্য নির্ণয় করিবার পূর্ব্বে, সেই গ্রন্থে অপূর্ব্বতা, বৈশিষ্ট্য, কিংবা নূতনত্ব কি আছে তাহা দেখা আবশ্যক। সেইরূপ, সেই লেখার বা গ্রন্থের কোন ফল বা তাহার দরুণ কোন পরিণাম কিছু যদি ঘটিয়া থাকে, তবে সে কিরূপ ফল, কিরূপ পরিণাম সে দিকেও বিশেষ লক্ষ্য করা উচিত। কারণ, এই ফল মিলিবে কিংবা হইবে মনে করিয়াই যদি গ্রন্থ লেখা হইয়া থাকে তবে সংঘটিত পরিণাম সম্বন্ধে গ্রন্থকর্ত্তার অভিপ্রায় আর-একটু অধিক করিয়া ব্যক্ত হইত।

ষষ্ঠ সাধন ও সপ্তম সাধন কি? না,—'অর্থবাদ' ও 'উপপত্তি'। 'অর্থবাদ' এই শব্দটি মীমাংসাকারের পারিভাষিক শব্দ। মুখ্যত কোন্ বিষয়ের বিধান করিতে হইবে অথবা কোন্ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে হইবে ইহা নির্দ্ধারিত হইলেও, উপপাদনের যুক্তিক্রম দেখাইবার জন্য তুলনা করিয়া একবাক্যতা সম্পাদনার্থ, অথবা সাম্য বা ভেদ প্রদর্শনার্থ, প্রতিপক্ষের দোষ দেখাইয়া স্বপক্ষ সমর্থনার্থ, অলঙ্কারার্থ, অতিশয়োক্তির ভাবে, কিংবা যুক্তিবিন্যাসের পরিপোষক ঐ প্রশ্নের পূর্ব্ব-ইতিহাসের সম্বন্ধসূত্রে, অথবা আর কোন কারণে, এবং কখন কখন কোন বিশেষ কারণ না থাকিলেও, গ্রন্থকার প্রসঙ্গক্রমে আরও অনেক বিষয়ের বর্ণনা করিয়া থাকেন। এরূপ স্থলে গ্রন্থকার যে বর্ণনা করেন, মূল উদ্দেশ্যটা একেবারে ছাড়িয়া না দিলেও গৌরবার্থ, স্পষ্টীকরণার্থ কিংবা পূর্ণতাসম্পাদনার্থ, এইরূপ করেন বলিয়া উহা অক্ষরশ সকল সময়ে যে সত্য হইবে এরূপ কোন নিয়ম নাই।* কিংবহুনা, এই বিধানাদি সম্বন্ধে উক্ত বর্ণনা অক্ষরশ সত্য কি সত্য নহে ইহা দেখিবার জন্য গ্রন্থকার সাবধানতাও অবলম্বন করেন না বলিলেও চলে। এইজন্য ঐ সকল বিধানকে প্রমাণসিদ্ধ স্বীকার না করিয়া অর্থাৎ তদন্তর্গত বিভিন্ন বিষয় গ্রন্থকারের সিদ্ধান্তপক্ষ সপ্রমাণ করে এরূপ স্বীকার না করিয়া উহা কেবল প্রশংশাবাদ অর্থাৎ শূন্যগর্ভ, আগন্তুক, বা স্তুতিবাচক এই ভাবে গ্রহণ করিয়া মীমাংসাকার উহাকে 'অর্থবাদ' এই নাম দিয়া থাকেন, এবং এই অর্থবাদাত্মক বিধানগুলি ছাড়িয়া দিয়া পরে গ্রন্থের তাৎপর্য্য নিদ্ধারণ করিয়া থাকেন। এ সমস্ত হইলেও শেষে উপপত্তিকে দেখিতেই হইবে। কোন বিশিষ্ট বিষয় প্রমাণ করিয়া দেখাইবার জন্য তর্ক-

* অর্থবাদান্তর্ভূত বর্ণনা, বস্তুস্থিতিমূলক বর্ণনা হইলে তাহাকে 'অনুবাদ', বস্তুস্থিতির বিরুদ্ধ হইলে তাহাকে 'গুণবাদ' এবং পূর্ব্বে বস্তুস্থিতি ধরিয়া কিন্তু আপাতত বস্তুস্থিতি ছাড়িয়া দিয়া যে বর্ণনা তাহাকে "ভূতার্থবাদ' বলে। অর্থবাদের এই তিন বিভিন্ন নাম 'অর্থবাদ' এই সামান্য শব্দের অন্তর্গত নিবন্ধাদির সত্যাসত্য অনুসারে এই তিন ভেদ।

শাস্ত্রানুসারে বাধক প্রমাণাদি ছাড়িয়া সাধক প্রমাণ সমূহের যে অনুকূল বিন্যাস করা হয় তাহাকে 'উপপত্তি' বা 'উপপাদন' বলে। উপক্রম উপসংহার-রূপ দুই সীমান্ত প্রথমে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইলে পর, মধ্য পথটা অর্থবাদ ও উপপত্তির ছাপ্ দিয়া সুনিশ্চিত করিতে পারা যায়। কোন্ বিষয়টি অসংলগ্ন কিংবা আনুষঙ্গিক ইহা অর্থবাদ বলিয়া বুঝিতে পারিয়া অর্থবাদের একবার নির্ণয় হইলে পর, যে ব্যক্তি গ্রন্থতাৎপর্য্য নির্ণয় করিতে চাহেন তিনি সমস্ত বাঁকা পথ ছাড়িয়া দেন; এবং বাঁকা পথ ছাড়িয়া আসল রাস্তায় আসিয়া, উপপত্তির সিধা রাস্তা সাগর-তরঙ্গের ন্যায় পাঠককে কিংবা গ্রন্থ সমালোচককে প্রথম হইতেই সম্মুখে ক্রমশ ধাক্কা দিয়া-দিয়া শেষের তাৎপর্য্যে সোজা আনিয়া তবে ছাড়ে। আমাদের প্রাচীন মীমাংসাকারের স্থিরীকৃত গ্রন্থতাৎপর্য্যনির্ণয়ের এই নিয়ম সর্ব্ব দেশীয় বিদ্বানদিগের সমান অভিমত হওয়ায় উহার যোগ্যতা বা আবশ্যকতা সম্বন্ধে বেশী বিচার আলোচনার দরকার নাই। *

এ সম্বন্ধে কেহ এরূপ সন্দেহ করিতে পারেন যে, মীমাংসাকারের এই নিয়ম সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক আচার্য্যের জানা ছিল না কি? এবং তাঁহার গ্রন্থাদির মধ্যেও এই নিয়ম জানা ছিল বলিয়া যদি তুমি দেখিতে পাও, তাহা হইলে তাঁহার নিষ্কাশিত গীতাতাৎপর্য্য একদেশীয়তা দোষে দুষ্ট এরূপ মনে করিবার কারণ কি? তাহার উত্তর এই—দৃষ্টি একবার সাম্প্রদায়িক হইয়া পড়িলে, যে ধর্ম্মগ্রন্থ প্রামাণিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে নিজ সম্প্রদায়ের বর্ণনা আছে, ইহা যে রীতিতে দেখান যাইতে পারে সাম্প্রদায়িক টীকাকার সেই রীতিই স্বীকার করিয়া থাকেন। কারণ, নিজ সম্প্রদায় ছাড়া উক্ত গ্রন্থের অন্য কোন অর্থ হইলেও উহা সত্য নহে, তাহাতে কোন-না কোন স্বতন্ত্র হেতু আছে, এইরূপ গ্রন্থের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে সাম্প্রাদারিক টীকাকারদিগের পূর্ব্ব হইতেই দৃঢ় ধারণা হইয়া থাকে; এবং নিজ মতানুসারে যে অর্থ পূর্ব্বেই সত্য বলিয়া তাঁহারা স্থির করিয়াছেন তাহাই সর্ব্বত্র প্রতিপাদিত আছে এইরূপ দেখাইতে গিয়া মীমাংসাশাস্ত্রের কোন নিয়মের বাধা আসিলেও উপরি-উক্ত দৃঢ় ধারণার দরুণ টীকাকারেরা ঐ সকল নিয়মের কোন গুরুত্ব আছে বলিয়া মনে করেন না। হিন্দু-ধর্ম্ম-শাস্ত্রান্তর্গত মিতাক্ষরা, দায়ভাগ প্রভৃতি গ্রন্থাদির স্মৃতি-বচনসমূহের ব্যবস্থা কিংবা একবাক্যতা এই তত্ত্বের প্রতি প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কিন্তু কেবল হিন্দুধর্ম্মগ্রন্থাদিতেই এইপ্রকার পাওয়া যায় এরূপ নহে। খৃষ্টীয় ও মহম্মদীয় ধর্ম্মের আদিগ্রন্থ বাইবেল ও কোরাণের যে সকল গ্রন্থকার পরে আবির্ভূত হইয়াছেন সেই শত শত সাম্প্রদায়িক গ্রন্থকারও এইরূপেই উক্তধর্ম্মের অর্থান্তর করিয়াছেন। এবং বাইবেলের পুরাতন অঙ্গীকারের অন্তর্গত কতকগুলি বাক্যের অর্থ এই নিয়মানুসারেই ইহুদি লোকদিগের অর্থ হইতে খৃষ্টভক্তেরা ভিন্নরূপে নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। কিংবহুনা, কোন বিষয় সম্বন্ধে প্রামাণিক গ্রন্থ কিম্বা লেখা কোন্‌টি, ইহা যে-যে স্থলে পূর্ব্ব হইতেই স্থির নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং এই নির্দ্দিষ্ট প্রামাণিক গ্রন্থের প্রমাণবলে পরবর্ত্তী সমস্ত বিষয়ের নির্ণয় করা হইয়া থাকে, সেই-সেই স্থলে গ্রন্থার্থনির্ণয়ের এই পদ্ধতিই স্বীকৃত হইয়া থাকে দেখিতে পাওয়া যায়। এখনকার বড় বড় আইন-পণ্ডিত, উকীল ও বিচারপতি ইহাঁরা পূর্ব্বেকার প্রামাণিক আইন গ্রন্থাদিকে কিংবা বিচার-নিষ্পত্তির সম্বন্ধে আপন আপন দিকে যেরূপ ভাবে টানিয়া থাকেন, তাহারই মধ্যে এই বীজ নিহিত আছে।

যদি শুধু লৌকিক বিষয়ের সম্বন্ধেই এই অবস্থা হয়, তবে উপনিষদ ও বেদান্ত সূত্র এবং তাহারই সমান প্রস্থানত্রয়ীর অন্তর্গত তৃতীয় গ্রন্থ ভগবদ্‌গীতা সম্বন্ধে, সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতে যে বিভিন্ন ভাষ্য হইয়াছে ইহাতে বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই। কিন্তু এই সাম্প্রদায়িক পদ্ধতি ছাড়িয়া উপরে যাহা বলা হইল তদনুসারে ভগবদ্‌গীতার উপক্রম উপসংহারাদির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, ভারতীয় যুদ্ধ প্রত্যক্ষ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রের উপর দুই দিকের সৈন্য যুদ্ধে সজ্জিত হইয়া পরস্পরের উপর শস্ত্রসম্পাতে উদ্যত, এই অবসরে একাদিক্রমে ব্রহ্মজ্ঞানের বিষয় বিবৃত করিয়া, 'বিমনস্ক' ও সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য প্রস্তুত অর্জ্জুনকে নিজ ক্ষাত্রকর্ম্মে প্রবৃত্ত করিবার জন্য ভগবান গীতার উপদেশ করিয়াছেন। দুষ্ট দুর্য্যোধনের সহায় হইয়া আমাদের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য কে কে আসিয়াছেন, যখন অর্জ্জুন দেখিতে লাগিলেন, তখন বৃদ্ধপিতামহ ভীষ্ম, গুরু দ্রোণাচার্য্য, ও গুরুপুত্র অশ্বত্থামা প্রতিপক্ষ হইলেও আত্মীয়; এইরূপ কৌরব, এবং অন্যান্য সুহৃৎ, আত্মজন, বন্ধু, মিত্র, মামা কাকা, ভগ্নীপতী শ্যালক, রাজা, রাজপুত্র প্রভৃতি তাঁহার নজরে পড়িল। এবং কেবল হস্তিনাপুরের রাজ্যলা-

* গ্রন্থতাৎপর্য্যের এই নিয়ম ইংরাজি আদালতেও পালিত হইয়া থাকে। যেমন মনে কর, কোন বিচারনিষ্পত্তির অর্থ ঠিক বুঝা না গেলে, ঐ বিচারনিষ্পত্তির ফল যে হুকুমনামায় আছে তাহা দেখিয়া নিষ্পত্তির অর্থ নির্ণয় করা হয় এবং কোন নিষ্পত্তির অন্তর্গত উদ্দেশ্য নির্ণয় করিবার আবশ্যকতা নাই এইরূপ কোন বিধান থাকিলে উহা পরবর্ত্তী মোকদ্দমায় প্রমাণ বলিয়া গণ্য হয় না। এইরূপ বিধানকে (obiter dicta) কিংবা 'বাহ্য বিধান' বলে এবং বাস্তবপক্ষে দেখিতে গেলে ইহা অর্থবাদেরই প্রকারান্তর মাত্র।

ভার্থ ইহাঁদিগকে বধ করিয়া নিজ কুলক্ষয়াদি মহাপাপ করিতে হইবে এই বিচার তাঁহার মনে উদিত হওয়ায় তাঁহার হৃদয় একেবারে ক্ষুব্ধ হইল। একদিকে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম "যুদ্ধ কর" বলিতেছিল, এবং অন্যদিকে পিতৃভক্তি, গুরুভক্তি, বন্ধুপ্রেম, সুহৃৎপ্রীতি তাঁহাকে পিছনে টানিতেছিল! যদি যুদ্ধ করি তাহা হইলে পিতামহ গুরু ও আত্মীয়দিগকে হত্যা করিয়া ঘোর পাতকে পতিত হইতে হইবে, আর যদি না করি তবে ক্ষাত্রধর্ম্মকে লঙ্ঘন করা হইবে। এইরূপ একদিকে গর্ত্ত আর একদিকে কূপ দেখা দিলে পর, দুই ম্যাড়ার গুঁতার মধ্যে পড়িয়া কোন নিরুপায় প্রাণীর যে অবস্থা অর্জ্জুনের সেই অবস্থা হইয়াছিল! খুব বড় যোদ্ধা সত্য; কিন্তু ধর্ম্মাধর্ম্মের সেই নৈতিক ফাঁদে অকস্মাৎ পতিত হওয়ায় তাঁহার মুখ শুকাইয়া গেল, গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল, হাতের ধনু খসিয়া পড়িল এবং "আমি যুদ্ধ করিব না" বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি রথে আড়ষ্ট হইয়া রহিলেন। শেষে মনুষ্যের যাহা স্বভাবতই বেশী প্রিয় সেই মমতা—অর্থাৎ কাছাকাছির বন্ধুস্নেহ, দূরস্থ ক্ষাত্রধর্ম্মের স্থান অধিকার করায়, মোহবশে তিনি এইরূপ বলিতে লাগিলেন যে, পিতৃবধ, গুরুবধ, বন্ধুবধ, সুহৃদ্বধ, অধিক কি সমগ্র কুলক্ষয় প্রভৃতি ঘোরতর পাপ করিয়া রাজ্যলাভাপেক্ষা উদরপূর্ত্তির জন্য ভিক্ষা করা কি মন্দ? শত্রু এ সময় আমাকে নিরস্ত্র দেখিয়া আমার গলা কাটিয়া ফেলে সেও ভাল; কিন্তু যুদ্ধে আত্মীয়দিগের বধসাধন করিয়া তাঁহাদের রক্তে কলঙ্কিত ও অভিশাপগ্রস্ত হইতে আমি ইচ্ছা করি না! ক্ষাত্রধর্ম্ম হইল ত কি হইল? তার জন্য পিতৃবধ, বন্ধুবধ ও গুরুবধ-রূপ ভয়ঙ্কর পাতক যদি করিতে হয় তবে পুড়ে যাক্ সে ক্ষাত্রধর্ম্ম, আগুন লাগুক সেই ক্ষাত্রনীতির মুখে! প্রতিপক্ষ এ বিষয়ে ভ্রুক্ষেপ না করিলেও, তাহারা দুর্জ্জন হইলেও, এইরূপ আচরণ আমার পক্ষে উচিত নহে। আমার আত্মার কিসে প্রকৃত কল্যাণ হয় তাহাই আমার দেখা আবশ্যক। আমার যখন মনে হইতেছে এই-রূপ ঘোর পাতক করা শ্রেয়স্কর নহে তখন ক্ষাত্রধর্ম্ম যতই শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম হউক না কেন, এই প্রসঙ্গে তাহা আমার কি কাজে আসিবে? এইরূপ তাঁহার মন চিন্তায় ক্ষতবিক্ষত হওয়ায়, ধর্ম্মসম্মূঢ় হইয়া অর্থাৎ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের শরণা-পন্ন হইলে, ভগবান গীতা-উপদেশ দিয়া তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিলেন; এবং তৎকালে যুদ্ধ করাই তাঁহার কর্ত্তব্য হওয়ায়, ভীষ্মাদিকে বধ করিতে হইবে এই ভয়ে পরাঙ্মুখ অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ স্বেচ্ছা-ক্রমে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিলেন।

গীতা-উপদেশের রহস্য যদি উদ্ঘাটন করিতে হয় তবে এই উপক্রম উপসংহার ও ফলকে ধরা আবশ্যক। ভক্তির দ্বারা কিরূপে মোক্ষলাভ হয়, কিংবা ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা অথবা পাতঞ্জল যোগের দ্বারা কিরূপে তাহা লাভ করা যায়, ইত্যাদি নিছক নিবৃত্তিপর মার্গ কিংবা কেবল কর্ম্মত্যাগরূপ সন্ন্যাসধর্ম্মও এস্থলে বলিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। অর্জ্জুনকে সন্ন্যাস দিয়া বৈরাগ্য অবলম্বনে ভিক্ষা করিতে করিতে বনে পাঠানো কিংবা কৌপীন ধারণ করিয়া ও নিম্বফল খাইয়া আমরণ যোগাভ্যাস করিবার জন্য হিমালয়ে প্রেরণ করা শ্রীকৃষ্ণের মনোগত অভিপ্রায় ছিল না। অথবা ধনুর্ব্বাণের বদলে, হাতে করতাল, মৃদঙ্গ ও বীণা দিয়া সেই সকল বাদ্য সহযোগে ভগবানের নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রেমানন্দে পূর্ণ হইয়া কুরু-ক্ষেত্রের ধর্ম্মভূমির উপর, ভারতবর্ষীয় সমস্ত ক্ষাত্র-সমাজের সম্মুখে বৃহন্নলার ন্যায় অর্জ্জুনকে আবার নৃত্যে প্রবৃত্ত করা ভগবানের উদ্দেশ্য ছিল না। অজ্ঞাতবাস সমাপ্ত হইলে পর সমস্ত কুরুক্ষেত্রের উপর অন্যপ্রকার কঠোর নৃত্যের ব্যবস্থা হইয়াছিল। গীতা বিবৃত করিবার সময় স্থানে স্থানে, অনেক প্রকারের অনেক কারণ দেখাইয়া এবং পরে 'তস্মাৎ' অর্থাৎ 'অতএব' এই পদ—অনুমানবাচক গৌরবা-ত্মক পদ প্রয়োগ করিয়া "তস্মাদ্‌যুধ্যস্ব ভারত"—হে অর্জ্জুন, অতএব তুমি যুদ্ধ কর (২—১৮); "তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ"—অতএব তুমি যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া উত্থান কর (গী,২—৩৭) "তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর"—অতএব তুমি আসক্তি ছাড়িয়া নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম কর (গী, ৩—১৮,); "কুরু কর্ম্মৈব তস্মাৎ ত্বং"—অতএব তুমি কর্ম্মই কর (গী, ৪—১৮); "মামনুস্মর যুধ্য চ"—আমাকে স্মরণ কর ও যুদ্ধ কর (গী, ৮—৭) "সর্ব্বকর্ত্তা ও কারয়িতা আমি, তুমি নিমিত্ত মাত্র, অতএব যুদ্ধ কর ও শত্রুকে জয় কর" (গী ১১—৩৩) "শাস্ত্র প্রমাণ অনুসারে প্রাপ্ত কর্ত্তব্য করা তোমার উচিত" (গী ১৬—১৪);—এইরূপ অর্জ্জুনকে নিশ্চিতার্থক কর্ম্মপর উপদেশ করিয়া, ১৮তম অধ্যায়ের উপসংহারে পুনর্ব্বার "এই সমস্ত কর্ম্ম করা উচিত" (গী ১৮—৬) এইরূপ নিজের নিশ্চিত ও উত্তম মত ভগবান বিবৃত করিয়াছেন; এবং পরিশেষে, "অর্জ্জুন! তোমার অজ্ঞান মোহ এখনো কি নষ্ট হইল না? (গী ১৮—৭২) এই প্রশ্নের উত্তরে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন:—

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥

"আমার কর্ত্তব্যমোহ ও সংশয় নষ্ট হইয়াছে; এখন আমি তোমার কথা মত কাজ করিব।"

এইরূপ প্রাপ্তিস্বীকার করা হইয়াছে। এইরূপ প্রাপ্তি-স্বীকার অর্জ্জুনের শুধু মুখের কথা মাত্র নহে। তাহার পর, তদনুসারে সত্য সত্যই যুদ্ধ করিয়া সেই প্রসঙ্গে যুদ্ধে ভীষ্ম কর্ণ জয়দ্রথাদির বধ সাধন করিয়াছেন।

এই বিষয়ে কেহ কেহ এইরূপ বলেন যে, 'অর্জ্জুনকে ভগবান যে উপদেশ দিয়াছেন তাহা নিবৃত্তিপর জ্ঞানের, যোগের কিংবা ভক্তির উপদেশ হওয়ায় তাহাই গীতার মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়। কিন্তু যুদ্ধের আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়া কর্ম্মের মধ্যে মধ্যে অল্পস্বল্প প্রশংসা করিয়া অর্জ্জুনকে ঐ যুদ্ধ সম্পূর্ণ করিতে দিয়াছিলেন। সুতরাং যুদ্ধের সম্পূর্ণতা সাধনকে মুখ্য বিষয় না ধরিয়া আনুষঙ্গিক কিংবা অর্থবাদাত্মক বলিয়াই ধরিতে হইবে।' কিন্তু এইরূপ তর্কযুক্তি অনুসারে গীতার উপক্রম উপসংহারের কিংবা ফলের যুক্তিটা ঠিক সংলগ্ন হয় না। স্বধর্ম্মানুসারে প্রাপ্ত কর্ত্তব্য যাহাই হউক না কেন, আমরণান্ত উহা সাধন করিবার মহত্ত্ব ও আবশ্যকতা এইস্থলে দেখান প্রয়োজন ছিল। এবং উহা সিদ্ধ করিবার জন্য উপরি-উক্তরূপ শূন্যগর্ভ কারণ গীতার মধ্যে কোথাও কথিত হয় নাই। এবং কথিত হইলেও অর্জ্জুনের ন্যায় বুদ্ধিমান ও চৌকোস পুরুষ উহা গ্রহণ করিতেন না, এবং করিতে বলিলেও পাপ না করিয়া কিরূপে করিবেন, ইহাই তাঁর মুখ্য প্রশ্ন হইত; এবং যতই কেন তর্ক কর না, "নিষ্কাম বুদ্ধিতে যুদ্ধ কর" কিংবা "কর্ম্ম কর" এইরূপ ঐ প্রশ্নের অর্থাৎ মুখ্য উদ্দেশ্যের যে উত্তর তাহা "অর্থবাদ" বলিয়া কখনই উড়াইয়া দিতে পারা যায় না। সেরূপ করা, আর নিজ যজমানের ঘরেই যজমানের অতিথি হইয়া থাকা একই কথা! বেদান্ত, ভক্তি কিংবা পাতঞ্জল যোগ এই সমস্ত গীতায় আদৌ উপদিষ্ট হয় নাই, একথা আমি বলি না। কিন্তু গীতায় এই যে তিন বিষয় জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা এইরূপ হওয়া চাই যে, তাহার দরুণ পরস্পরবিরুদ্ধ কঠিন সমস্যায় পড়িয়া "এটা করিব, কি ওটা করিব" এই প্রকার কর্ত্তব্যবিমূঢ় অর্জ্জুন যাহাতে নিজ কর্ত্তব্যের নিষ্পাপ পন্থা লাভ করিয়া ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারে স্বকীয় শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম করিতে পারে। তৎপর্য্য,—প্রবৃত্তি-ধর্ম্মের জ্ঞান এস্থলে মূল বিষয় হওয়ায় তৎসিদ্ধির নিমিত্ত বাকী বিষয় কাজেই আনুষঙ্গিক বলিয়া ধর্ত্তব্য; সুতরাং গীতাধর্ম্মের যে রহস্য তাহাও প্রবৃত্তিপর অর্থাৎ কর্ম্মপরই হইবে, ইহা ত স্পষ্টই রহিয়াছে। কিন্তু এই প্রবৃত্তিপর রহস্যটি কি এবং তাহা বেদান্তশাস্ত্র হইতেও কিরূপে নিষ্পন্ন হয়, কোন টীকাকারই তাহার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করেন নাই যে-কোন লোকের ইহা উপলব্ধি হইবে। গীতার উপক্রম অর্থাৎ প্রথম অধ্যায়, ও শেষের উপসংহার ও ফল,—ইহার দিকে ঠিক্ লক্ষ্য না করিয়া, গীতার ব্রহ্মজ্ঞান কিংবা ভক্তি নিজ নিজ সম্প্রদায়ের কিরূপ অনুকূল হয়, নিবৃত্তিদৃষ্টিতে তাহাতেই তাঁহারা নিমগ্ন হইয়া গিয়াছেন। যেন কর্ম্মের সহিত জ্ঞান ও ভক্তির নিত্য সম্বন্ধ স্থাপন করা একটা মহা পাপ! আমি যে আশঙ্কার কথা বলিতেছি সেইরূপ আশঙ্কা এক জনের হওয়ায় আমি তাঁহাকে লিখিয়াছি—শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয় চরিত্র চোখের সাম্নে রাখিয়া ভগবদ্গীতার অর্থ করা উচিত; * এবং শ্রীক্ষেত্র কাশীর সমাধিস্থ প্রসিদ্ধ অদ্বৈতী পরমহংস শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী, 'গীতার্থ-পরামর্শ' নামে ভগবদ্-গীতার সম্বন্ধে যে এক ক্ষুদ্র সংস্কৃত নিবন্ধ লিখিয়াছেন তাহাতে "তস্মাৎ গীতা নাম ব্রহ্মবিদ্যামূলং নীতি শাস্ত্রম্"—অর্থাৎ গীতা কর্ত্তব্যধর্ম্মশাস্ত্র এইরূপ স্পষ্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।† জর্ম্মন পণ্ডিত প্রফেসর-ডায়সনও স্বকীয় "উপনিষদের তত্ত্বজ্ঞান" গ্রন্থের এক স্থানে এইরূপ কথা বলিয়াছেন। আরো কতকগুলি পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য গীতাসমালোচকও এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। তথাপি তাঁহাদের মধ্যে কেহই সমগ্র গীতাগ্রন্থের পর্য্যালোচনা করিয়া কর্ম্মপর দৃষ্টিতে তদন্তর্ভূত সমস্ত প্রতিপাদনের কিংবা অধ্যায়ের যোগাযোগ কিরূপ তাহা স্পষ্ট করিয়া দেখাইবার প্রযত্ন করেন নাই। উল্টা, এই প্রতিপাদন কষ্টসাধ্য, এইরূপ ডায়সন স্বকীয় গ্রন্থে বলিয়াছেন।‡ এই জন্য ঐরূপ পর্য্যালোচনা করিয়া গীতার সঙ্গতি প্রদর্শন করা এই গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু তাহা করিবার পূর্ব্বে, গীতার প্রারম্ভে পরস্পরবিরুদ্ধ নীতিধর্ম্মের কঠিন সমস্যা দেখিয়া অর্জ্জুন যে সঙ্কটে পড়িয়াছিলেন, তাহার স্বরূপ আরো বেশী খোলসা করিয়া ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। নচেৎ গীতান্তর্গত বিষয়ের মর্ম্ম ভাল করিয়া পাঠকের ধারণায় আসিবে না; অতএব, এই কর্ম্ম অকর্ম্মের বিচারসঙ্কট কিরূপ এবং অনেক প্রসঙ্গে, "ইহা করিব কি উহা করিব" এইরূপ সংশয়-গোলযোগের মধ্যে পড়িয়া মানুষ কিরূপ হতবুদ্ধি হইয়া পড়ে ঠিক্ বুঝিবার জন্য, এই প্রসঙ্গের অনেক উদাহরণ যাহা শাস্ত্রে, বিশেষত মহাভারতে পাওয়া যায়, এক্ষণে তাহারই বিচারে প্রবৃত্ত হইব।

ইতি বিষয়-প্রবেশ সমাপ্ত।

* এই টীকাকারের নাম এবং তাঁহার টীকা হইতে উদ্ধৃত কিয়দংশ বহু বৎসর পূর্ব্বে একটি ভদ্রলোক আমাকে জানাইয়াছিলেন। কিন্তু ঐ পত্র আমার গোলযোগের সময় কোথায় যে গেল তাহা আর খুঁজিয়া পাইলাম না। এবং ঐ পত্র যদি কখন ঐ ভদ্রলোকটির চোখে পড়ে তাহা হইলে উক্ত বিষয়টি সম্বন্ধে তিনি যেন আমাকে আবার জানান তাঁহার নিকট আমার এই মিনতি।

† শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীর শ্রীগীতা-রহস্য, গীতার্থ প্রকাশ, গীতার্থ-পরামর্শ এবং গীতাসারোদ্ধার এইরূপ এই বিষয়ে চারি ক্ষুদ্র নিবন্ধ আছে। তাহা সমস্ত এক করিয়া রাজকোটে ছাপান হইয়াছে। উপরিপ্রদত্ত বাক্য তাঁহার গীতার্থপ্রকাশে আছে।

‡ Prof Deussen's Philosophy of the Upanishads (p. 362) English Translation.

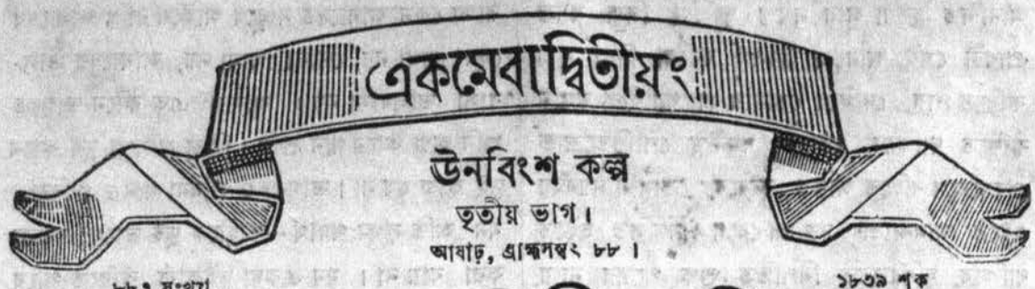

উনবিংশ কল্প
তৃতীয় ভাগ।
আষাঢ়, ব্রাহ্মসম্বৎ ৮৮।

৮৮৭ সংখ্যা ১৮৩৯ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং প্রতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"

প্রেমের বাঁশী।

(শ্রীগৌরীনাথ চক্রবর্ত্তী কাব্যরত্নশাস্ত্রী)

প্রেমের বাঁশী ভুবন ভরিয়া বাজিতেছে। কোথায় না সেই হৃদয়োন্মাদনকারী বংশীধ্বনি শুনিতেছি? অন্তরে বাহিরে সেই বাঁশী নিয়ত বাজিতেছে। জলে, স্থলে, আকাশে ভূতলে, যেখানে যাই, সেই মধুর মুরলী সর্ব্বত্র ধ্বনিত হইতেছে। নীল নভোমণ্ডলে অসংখ্য তারকাগণ অসংখ্য গ্রহগণ, কোটি কোটি রবি শশী, সকলে সেই আনন্দের গান গাহিতেছে। সকলে সেই প্রেমের বাঁশী বাজাইতে বাজাতে অনন্তের পথে চলিয়াছে। শ্যামল পুষ্পপরিশোভিত বিজন প্রান্তর, তরুরাজিসুসজ্জিত ও নির্ঝর-ঝঙ্কারে নিনাদিত গিরিকন্দর, বীচিমালা-বিক্ষোভিত সমুদ্রোপকূল; সমস্তই সেই আনন্দের ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। নববসন্তসমাগমে যখন তরুরাজি নব পল্লবে সুশোভিত হয়, যখন কুসুমরাশি প্রস্ফুটিত হইয়া সৌন্দর্য্যে ও সৌরভে দশদিক ভূষিত ও আমোদিত করিতে থাকে, যখন মধুর মলয়হিল্লোল বহিয়া উল্লাসের স্রোতে জগত পরিপ্লাবিত করিতে থাকে, যখন পাপিয়ার সুমধুর স্বরে, কোকিলের কুহুরবে, মধুকরবৃন্দের শ্রুতিমধুর ঝঙ্কারে চারিদিক শব্দায়মান হইতে থাকে, তখন ঐ বিজন প্রান্তরে দণ্ডায়মান হইয়া হৃদয়ের কবাট খুলিয়া দেও, সংসারগণ্ডীর সীমান্তরেখা হইতে ক্ষণকাল হৃদয়কে সুদূরে লইয়া যাও, ঐ সৌন্দর্য্যে, ঐ সৌরভে, ঐ মধুরনিনাদে, ঐ মৃদুমন্দ মলয়হিল্লোলে তোমার মনপ্রাণ ঢালিয়া দেও, তোমার উন্মুক্ত হৃদয়কে উহাতে একবার ভাসাইয়া দেও; তোমার আপাদমস্তক শিহরিয়া উঠিবে, প্রাণে প্রবল উচ্ছ্বাসবায়ু বহিতে থাকিবে, হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠিবে; মুহূর্ত্তের মধ্যে তুমি আত্মহারা হইবে—অপার আনন্দজলধিতে সন্তরণ করিতে থাকিবে;—অনন্ত সৌন্দর্য্যরাশি, অযুতবর্ণের স্বর্গীয় আলোকমালা তোমার দর্শনপথে পতিত হইবে, আনন্দের উত্তাল তরঙ্গমালা প্রবলবেগে তোমাকে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে, তুমি বিহ্বল হইয়া পড়িবে; তুমি এক অনির্ব্বচনীয় নূতন রাজ্যে নীত হইয়া অপূর্ব্ব আনন্দ উপভোগ করিতে থাকিবে। সেই অমৃতভাণ্ডে নিপতিত হইয়া তুমি তোমার পার্থিব ঐশ্বর্য্য, সুখশান্তি সমস্তই ভুলিয়া যাইবে। সেগুলি তোমার নিকট তখন তুচ্ছাদপিতুচ্ছ ও স্বপ্নবৎ বলিয়া বোধ হইবে; সেই প্রেমের বাঁশীর মধুর নিনাদে তুমি আত্মবিসর্জ্জন করিবে! আবার ঐ পৌর্ণমাসীর পূর্ণ শশধরের কিরণধবলিত শৈকত চারিদিকে ধূ ধূ করিতেছে, জনপ্রাণীর সাড়া শব্দ নাই, বিজনতা একাকিনী এই শৈকতরাজ্যে আধিপত্য বিস্তার করিয়া নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে; একবার ঐ বিজনতাকে প্রাণের সঙ্গিনী করিয়া যদি তুমি তাহার সঙ্গে একপ্রাণে তাহারই আনন্দে

আনন্দিত হইয়া আর সমস্ত ভুলিয়া গিয়া সমস্ত প্রাণটী সেই আনন্দে উৎসর্গ করিয়া দিয়া নৃত্য করিতে পার, দেখিবে তোমার প্রাণের বীণা ঝঙ্কার করিতে থাকিবে, তোমার ধমনীস্থ শোণিতস্রোত প্রবলবেগে বহিতে আরম্ভ করিবে, তোমার নয়নদ্বয় হইতে আনন্দাশ্রু দর দর বেগে বিগলিত হইতে থাকিবে, ঘূর্ণিবায়ুতে নিপতিত শুষ্ক পত্রের ন্যায় তোমাকে অপার আনন্দের প্রবল তুফান সুদূরে লইয়া যাইবে, তোমার সম্মুখে অনন্ত সৌন্দর্য্য অনন্ত সুখ উপস্থিত হইবে। সে সুখ সে সৌন্দর্য্য বর্ণনার অতীত, ভাষার অতীত, চিন্তার অতীত, কল্পনার অতীত। সে এক অমৃতময় রাজ্য! প্রেমের বাঁশী আমাদিগকে সেই রাজ্যে লইয়া যায়।

সেই বাঁশী আমাদের চারিদিকে বাজিতেছে, আমাদিগকে চারিদিক হইতে আহ্বান করিতেছে, আমাদের চারিদিকে অমৃতের ভাণ্ডার বিস্তার করিতেছে। ঐ শিশুর হাসিতে, সংগীতের সুমধুর স্বরলহরীতে, জননীর অকৃত্রিম স্নেহরাশিতে, সুহৃদের নিঃস্বার্থ ভালবাসায়, নিখিল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে প্রেমের বাঁশী সকল সময় বাজিতেছে,—সে বাঁশী আয় আয়, বলিয়া নিয়ত আমাদিগকে ডাকিতেছে। আমরা যদি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া, সমস্ত ভুলিয়া সেই বংশীনিনাদে আত্মবিসর্জ্জন করিতে পারি, এক মনে এক প্রাণে সেই বংশীনিনাদ শ্রবণ করিতে পারি, তবেই উহার অমৃত আস্বাদন করিতে পারিব, তবেই উহার অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য আমাদের দৃষ্টিগোচর হইবে। বাঁশী আমাদের সমস্ত প্রাণটী চায়। প্রাণটীকে ধরিয়া রাখিলে সে বাঁশীর স্বর শুনা যায় না। প্রাণের বন্ধন খুলিয়া দিতে হইবে, প্রাণের অন্য পথগুলি বন্ধ করিয়া দিতে হইবে, তবেই সে বাঁশীর রব প্রাণের কানে প্রবেশ করিয়া প্রাণকে উন্মাদ করিয়া দিবে। তখন তোমার সম্মুখে অনন্ত স্বর্গ রাজ্য!

জগতের সৌন্দর্য্য ত আমরা সর্ব্বদাই দেখিতেছি, সঙ্গীতের স্বরলহরী ত আমরা নিয়তই শুনিতেছি; পিতামাতার স্নেহ, সুহৃদের ভালবাসায় ত আমরা কেহই বঞ্চিত নহি, তথাপি সেই বংশীনিনাদ কেন শুনিতে পাইনা? প্রাণ কেন সে সৌন্দর্য্যে, সে সংগীতে সে স্নেহে উন্মত্ত হইয়া উঠে না? সে স্বর্গরাজ্য কেন আমাদের সম্মুখে আইসে না? আমাদের দেখা দেখা নয়, শোনা শোনা নয়, আমাদের ভালবাসা ভালবাসা নয়। আমরা এক কানে ভাগবত শুনি অন্য কানে গান শুনি। কিন্তু আসলে দুই কানে দুই কাজ হয় না। ভাগবতও শুনিনা গানও শুনিনা। মন অতি সূক্ষ্ম পদার্থ—তাহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায় না। মন একদা দুইকার্য্য করিতে পারে না। তাহাই করিতে চাই বলিয়া প্রেমের বাঁশীতে বঞ্চিত হই। সুন্দর বস্তু দর্শন করি, কিন্তু নয়ন ভরিয়া দর্শন করি না, সে সৌন্দর্য্যে ডুব দিতে পারি না;—দর্শনের আনন্দকে অধিককাল হৃদয়ে স্থান দিতে পারি না। সুমধুর সংগীত শ্রবণ করি, কিন্তু প্রাণ দিয়া করি না;—প্রাণটী তাহাতে ঢালিয়া দিই না;—সংগীতের তরঙ্গে ভাসিয়া যাইতে পারি না। স্নেহ ভালবাসা প্রভৃতি আধ্যাত্মিকভাবে মোহিত হই, কিন্তু সে ভাব আমাদের অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করিতে পারে না, মরমে আঘাত করিতে পারে না, তাহাতে আত্মসমর্পণ করিতে পারি না। তাই কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া আমাদের প্রাণকে তাহা আকুল করিতে পারে না। ঐ সুন্দর বস্তুতে, ঐ মধুর স্বরে ঐ আধ্যাত্মিকভাবে যে প্রবল আকর্ষণী শক্তি নাই একথা আমরা বলিতে পারি না। সে প্রবল শক্তি যিনি কখনও অনুভব করিয়াছেন, তিনি জানেন যে উহার আয়ত্তে পড়িলে আর ফিরিয়া আসিবার উপায় থাকে না। কিন্তু আমরা সে ফাঁদে পড়িতে চাই না, আমরা ধরিতে ছুঁইতে দিই না; আমরা যে আমাদিগকে নানাভাবে বাঁধিয়া ছাঁদিয়া রাখিয়াছি, কাজেই সে শক্তি আমাদিগের উপর কার্য্য করিতে পারে না।

আমাদের বন্ধন অনেক প্রকারের; তন্মধ্যে কতকগুলি মিথ্যা বিভীষিকার, আর কতকগুলি ভগবানের উপর নির্ভর-শূন্যতার ফল। প্রথমোক্ত বন্ধনগুলি সম্বন্ধে বঙ্গের কোন মহাত্মা পুরুষ নিম্নলিখিত উক্তিটী করিয়াছেন।

"লজ্জা ঘৃণা ভয়
তিন থাকতে নয়।"

আমরা অনেক সময় আমাদের প্রাণের আবেগ লজ্জাবশত রোধ করি, পাছে লোকে কিছু মনে করে, পাছে আমাদের সামাজিক অবনতি হয়;

মানের খর্ব্বতা হয়। মধুর ব্রহ্মনাম গান হইতেছে তাহা শুনিয়া আমার নয়নাশ্রু নির্গত হইতে চায়, শরীর পুলকিত হইয়া ঐ সংগীতের তালে তালে নৃত্য করিবার স্পৃহা হয়। আমি যদি আমার ইচ্ছাটুকু দমন না করিয়া সেই মধুর ব্রহ্মনামে প্রাণটীকে ঢালিয়া দিতে পারি তাহা হইলে নিশ্চয়ই ঐ ব্রহ্মনামসুধা আমার অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করিয়া আমার অন্তরস্থ প্রেমজলধিতে প্রবল তুফান আনয়ন করিবে—আমি সেই স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য-রাশির সম্মুখীন হইতে পারি।

লজ্জা যেমন একটী মিথ্যা বিভীষিকার বন্ধন, ভয় ও ঘৃণা আরো দুইটী বিভীষিকার বন্ধন। মানুষ আত্মহারা হইতে ভয় পায়। আপনাকে হারাইতে গেলেই মনে হয়, না জানি কি বিপদে পড়িব, তখন আর আমি তাহার প্রতীকার করিতে পারিব না। ইহা মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। কে ইচ্ছা করিয়া জলে ঝাঁপ দিতে চায়? কথাটা সত্য, কিন্তু সকল স্থানে এই সাবধানতার প্রয়োজন নাই। যাহাতে বিপদ নাই পক্ষান্তরে মঙ্গল আছে সেখানে এই আত্মসংযমের কোন আবশ্যকতা নাই। ঘৃণাও অপর একটী বন্ধন। উহাহরণ নিষ্প্রয়োজন যে মহাত্মার উপরোক্ত উক্তি, তাঁহার জীবনী পড়িলে জানিতে পারিবেন যে, সাধনার পথে তাঁহাকে কত দূর ঘৃণিত কার্য্য করিতে হইয়াছিল, ঘৃণাকে তখন তিনি আর মনে স্থান দেন নাই।

শেষোক্ত প্রকারের বন্ধনগুলির সংখ্যা অনেক। সেগুলির সহিত জীবিকা ও বৈষয়িক উন্নতির সম্বন্ধ—সেগুলি লাভালাভের চিন্তাসমুদ্ভূত। আমি যদি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে বিহ্বল হইয়া উহাতে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করি, আমি যদি অধ্যাত্মিক ভাবে উন্মত্ত হইয়া আত্মপর ভুলিয়া যাই তাহা হইলে আমার কার্য্যের ক্ষতি হইবে, আমার জীবিকা কি প্রকারে চলিবে? আমি বৈষয়িক উন্নতি কি প্রকারে করিব? এই সকল চিন্তার বশবর্ত্তী হইয়া অনেক সময় আমরা আমাদের অন্তরস্থ সুমধুর ভাবগুলিকে বাড়িতে দিইনা, অনেক সময় প্রশ্রয়ও দিই না। অনন্ত সুখের পরিবর্ত্তে অলীক সাংসারিক সুখে সন্তুষ্ট থাকি, এবং তাহারই উন্নতি সাধনের জন্য জীবনটীকে সংসারগণ্ডীর ভিতরে আবদ্ধ রাখিয়া আজীবন সেই সংসারহ্রদের বিষবারি পান করি। একবারও ভাবিনা যে সেই প্রেমের বাঁশরী আমাকে যে সুখময় রাজ্যে লইয়া যাইবার জন্য আহ্বান করিতেছে তাহার কাছে এই সাংসারিক সুখ সাংসারিক উন্নতি তুচ্ছাদপিতুচ্ছ অলীক স্বপ্নসদৃশ। একবারও ভাবিনা সে যিনি এই প্রেমের বাঁশী বাজাইয়া আমাদিগকে ডাকিতেছেন তাঁহারই সব, আমার কিছুই নহে। আমিও তাঁহারই, আমার সংসারও তাঁহারই। তাঁহার কার্য্য তিনি করিবেন, তাঁহার সংসার তিনি দেখিবেন—আমার এত ভাবনা কেন? তাঁহার ডাক শোনাই আমার কার্য্য। তিনি যাহা আদেশ করিবেন তাহাই প্রতিপালন করিলেই আমার কর্ত্তব্য শেষ হইয়া গেল। এ তথ্য বুঝেন কয় জন? যিনি বুঝেন তাঁহার কখনও অভাব হয় না। তিনি অনন্ত সুখ লাভ করেন। মহাপ্রভু চৈতন্য প্রভৃতি মহাভক্তগণ তাহা বুঝিয়াছিলেন, তাই তাঁহারা ভগবানের প্রেমে উন্মত্ত হইয়া নগরে নগরে জনপদে জনপদে হরিগুণ গাহিয়া নাচিয়া নাচিয়া বেড়াইতে পারিয়াছিলেন।

প্রেমের বাঁশী ত চারিদিকে বাজিতেছে, অন্তরেও বাজিতেছে বাহিরেও বাজিতেছে। আমরা যে সে বাঁশী শুনিয়াও শুনি না, আমরা যে তাহার মধুর নিনাদ দূর হইতে শ্রবণ করিয়া কর্ণে হস্তার্পণ করি—পাছে ফাঁদে পড়ি এই ভয়ে সুদূরে পলায়ন করি। আমরা কি প্রকারে সে স্বর্গীয় ধ্বনি শুনিতে পাইব, সে অনুপম সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইব? আমরা কি প্রকারে সে অমৃত পান করিয়া অমরত্ব লাভ করিব?

মূকের বাণী।

(শ্রীনলিনীনাথ দাস-গুপ্ত এম-এ, বি-এল)

মূকের বাণী বুঝবি কি তুই মূকের কথা শুনবি কিরে?
বিশ্বজোড়া রূপের বাহার আছে যে তোর নয়ন ঘিরে,
লুব্ধ অলির মত্ত গানে মুগ্ধ যে তোর শ্রবণ দুটি,
যক্ষরাজের রত্নরাজি পড়ছে যে তোর পায়ে লুটি।
যেই দিকে চা'স, হাসির রাশি ছড়িয়ে পড়ে ডাইনে বামে,
তৃপ্ত যে তোর চিত্তচকোর বৈঠকখানার সরঞ্জামে।
মূকের কথা শুনবি যদি এ সব ছেড়ে চল্ ভিতরে,
নকল ফেলে আসল নিবি, এই বেলা তুই পড়্‌রে সরে।

ওই গগনে নীল বরণে মেঘের কোলে রবির খেলা,
ফুল বাগানে মুচকি হাসি হাস্‌ছে যে অই ফুলের মেলা ;
খেলুক তারা হাস্থক তারা চোখ বুজে তুই যা'না চলে,
যার খেলা এ, যার হাসি এ, তারেই একবার দেখবি বলে।
বাহির থেকে চোখ টেনে নে, চেয়ে দেখ্ আজ প্রাণের মাঝে
অপরূপ তোর আসনে কোন্ অরূপ দেবের রূপ বিরাজে।
বধির কর আজ শ্রবণ দুটী বিহগের অই কল কূজনে,
সরিৎপতির গর্জ্জনে আর স্রোতস্বতীর মধুর স্বনে ;
পায় ঠেলে দে ধরার ধনে গায় মেখে নে ভক্তি মাটি,
দূর করে দে কুটিলতায়, মন করে নে পরিপাটী ;
বহু দিনের রুদ্ধ গৃহের মুক্ত আজি দুয়ারপথে
গোপন বাণী শুনবি যদি কান পেতে থাক্ কোন মতে,
সকল গীতির সার যে গীতি, গীত সেথায় তালে তালে,
সব কথার সার সেথায় কথা, শুনিস্‌নি যা কোন কালে,
(ওরে সেই) মধুর কথার সুধার ধারায় সব ইন্দ্রিয়ই তৃপ্ত হবে
সুখের সেরায় মহাসুখে আত্মা যে তোর মগ্ন রবে!
সেথায় বসে শুন্‌বিরে তুই মেঘের সনে তারার কথা,
হেসে হেসে চাঁদ চলে যায় ক'য়ে তোরে কোন্ বারতা,
কি গান গেয়ে ধেয়ে ধেয়ে যাচ্ছে ছুটে তরঙ্গিনী,
অভিমানে ম্লান মৌন কি কহে অই নিশীথিনী,
কোন্ বা রঙ্গে ধরার অঙ্গে লুটিয়ে পড়ে শস্যরাজি—
যার যে কথা সবই সেথা শুনবিরে তুই শুনবি আজি।
মন মজিয়ে দণ্ড দুয়েক আত্মা গুরুর চরণতলে
দেখনা বসে, বাইরে যত আসবে সবাই সেথায় চলে।
অন্তরে তোর অন্তর্য্যামী আসন পেতে আছেন বসে
যুক্ত হ'লে তাঁর সনে তুই মুক্ত হবি তাঁর পরশে—
ব্রহ্ম হ'তে তুচ্ছ তৃণ সবাই সেথা মিলছে গিয়ে,
মহাযোগীর যোগসাধনা দেখবি যদি আয় পালিয়ে।
স্নেহের ডাকে ডাক্‌ছে তোরে ডাক শুনে আয় থাকিস্ নারে
বাইরে যদি থাকিস্ বসে বদ্ধ হবি কারাগারে।
গুরুর গুরু পরমগুরু পরমাত্মার মুখের বাণী
শুনবি যদি মুকের কথা, আয় চলে আয় সকল প্রাণী।

বোধগয়া প্লাকের নূতন কথা।

(অবসরপ্রাপ্ত সিভিলিয়ান মিঃ ভিনসেণ্ট এ, স্মিথের অভিমত)

(শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়)

ডাঃ স্পুনার বাঁকিপুরের নিকটবর্ত্তী কুমাহরহারে আবিষ্কৃত 'বোধগয়া প্লাক' পরীক্ষা করিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে 'ইহাই বোধগয়া মন্দিরের অতি প্রাচীনতম চিত্র।' প্লাকে অঙ্কিত সরল রেখাঙ্কিত মন্দিরে ধ্যানী বুদ্ধ, বেষ্টনী ও কতকগুলি স্তূপের চিত্রাবলীই এই সিদ্ধান্তের মূল ভিত্তি। বেষ্টনী ও স্তূপ এই সিদ্ধান্তে গ্রহণ করা যায় না, কারণ বহু বিখ্যাত স্মৃতিমন্দিরে এই ধরণের চিত্রাবলী পরিলক্ষিত হয়।

এখন প্রশ্ন এই, প্লাকে অঙ্কিত চিত্র বোধগয়া মন্দিরের প্রামাণিক বিবরণের সহিত মিলে কি না ? ডাঃ স্পুনারের অনুমানে একটি পূর্ণায়বয়ব স্তূপাকৃতি মন্দিরের চূড়াই এই নক্সার বিশেষ পরিচয় নিদর্শনস্বরূপ। বোধগয়া মন্দিরের চূড়ার গঠনপ্রণালী কখনও এই ধরণের ছিল ইহা অনুমান করিবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে কি না ইহা বিশেষভাবে প্রণিধান করিতে হইবে। চীন পরিব্রাজক হিউয়েন সিয়াং ৬৪২ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত বিহারে ছিলেন। তাঁহার বিবরণী হইতে জানা যায় যে, 'বোধগয়া মন্দির ইষ্টক নির্ম্মিত এবং ইহার গায়ে চূণকাম করা ছিল। প্রাচীরগাত্রে ক্রমশ উপরে উপরে সজ্জিত কুলুঙ্গিতে সুবর্ণনির্ম্মিত দেবদেবীর মূর্ত্তি ও ইহার চারিদিকের প্রাচীর মুক্তার মালা ও যক্ষের মূর্ত্তির অতি মনোরম খোদাই কাজে পরিশোভিত ছিল। খিলানের মধ্যভাগে গিল্টি করা তাম্রের আমলক ; মন্দিরের পূর্ব্বভাগে পর পর অতি উচ্চ ও জাঁকাল তিনটি বৃহৎ 'হল' বা কক্ষ। এই কক্ষগুলির কাঠের কাজে সোণা ও রূপার খোদাই কাজ করা এবং নানারঙ্গের মূল্যবান প্রস্তর বসান ছিল। একটি খোলা প্রশস্ত দরদালান এই কক্ষগুলিকে মাঝখানের প্রকোষ্ঠের সহিত সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। এই কক্ষ তিনটির বহির্ভাগের দরজার বামপার্শ্বে রৌপ্যনির্ম্মিত দশ ফিট উচ্চ 'কুয়ান-জু-সাই পুশার' (Kuan-tyu-tsai) মূর্ত্তি ও ডানদিকে জু-শী (মৈত্রেয়ী) বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

নৃপতি অশোক বোধগয়া মন্দিরের জমীতে প্রথমে একটি ক্ষুদ্র চৈত্য নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান মন্দিরটি কোন এক ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। সেই কিম্বদন্তী এই,—'বোধিবৃক্ষের নীচে বুদ্ধের একটি মূর্ত্তি ইনি প্রতিষ্ঠা করেন। এই মূর্ত্তি আসনে উপবেশন পূর্ব্বক জগতের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া মারকে বলিতেছেন সংসার এই

ব্যাপারের সাক্ষ্য প্রদান করিবে।' মিঃ বিলও এই আখ্যায়িকা এই ভাবেই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 'খিলানের মধ্যভাগ গিল্টি করা তাম্রনির্ম্মিত আমলকী ফলে পরিশোভিত। বুরুজের উপরে আসনে উপবিষ্ট অতি সুন্দর বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি, ডান পা খানি বাম পায়ের উপর স্থাপিত, বাম হাতখানি আসনে রক্ষিত এবং ডান হাত নীচের দিকে প্রসারিত।'

এই বিবরণী হইতে মিঃ স্মিথ তিনটি প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়াছেন :—

১। সপ্তম খৃষ্টাব্দে হিউয়েন সিয়াং যে মন্দির দেখিয়াছিলেন তাহাই অশোকের প্রতিষ্ঠিত স্তূপের উপর ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই সময়ের মধ্যে অপর কোন মন্দির নির্ম্মিত হয় নাই।

২। মন্দিরের শীর্ষদেশ গিল্টি করা তাম্রনির্ম্মিত আমলকী সদৃশ ছিল; ডাক্তার স্পুনারের মতে উহার অগ্রভাগ স্তূপাকার ছিল না।

৩। বুদ্ধদেব ভূমিস্পর্শ আসনে উপবেশন করিয়াছিলেন অর্থাৎ তাঁহার ডান হস্ত নীচের দিকে প্রসারিত এবং অঙ্গুলিগুলি সংসারকে মার-বিজয়ের সাক্ষ্য দিবার জন্য আহ্বান করিতেছিল।

ডাঃ স্পুনার যে অনুমান করিয়াছেন 'প্লাক খানা সম্ভবতঃ কুষাণ যুগের, অন্ততঃ ২য় বা ৩য় শতাব্দের হইবে'—ইহা হইতেও পারে না-ও বা হইতে পারে। যাহা হউক, এই অনুমান সত্য বলিয়া ধরিয়া লইলেও চীন পরিব্রাজকের বিবরণীতে এরূপ উল্লেখ নাই যে মন্দিরের অগ্রভাগ স্তূপাকার ছিল। প্লাকের ফটোতে যতদূর বুঝিতে পারা যায় তাহা হইতে ইহাই স্পষ্টীকৃত যে বুদ্ধদেবের ডান হাতখানা ঊর্দ্ধে উত্তোলিত অবস্থায় জীবকে আশীর্ব্বাদ দিতেছে এবং ইহা কিছুতেই নীচের দিকে প্রসারিত নয়। এইভাবে দুইটি অপরিহার্য্য বিষয় বিশেষভাবে বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে এই প্লাকখানার সহিত বোধগয়া মন্দিরের কোনই সাদৃশ্য নাই। অধিকন্তু ডাঃ স্পুনার অসাবধানভাবে বলিয়াছেন 'মূল মন্দিরের প্রধান মন্দিরাংশের দক্ষিণে ও বামদিকে দুইটি দণ্ডায়মান মূর্ত্তি আছে, সম্ভবতঃ এই মূর্ত্তি চীন পরিব্রাজকের বর্ণিত বোধিসত্ত্বের রৌপ্য মূর্ত্তি।' কিন্তু এই মূর্ত্তিদ্বয় প্রধান কক্ষ তিনটির বহির্ভাগের দরজার বামপার্শ্বে অবস্থিত। এই কক্ষগুলি মূল মন্দির হইতে বিভিন্ন, শুধু একটি খোলা প্রশস্ত দরদালান এই কক্ষগুলিকে মাঝখানের প্রকোষ্ঠের সহিত সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে ডাঃ স্পুনারের উপরোক্ত উক্তি খাটে না। প্লাকখানা বোধগয়ায় আবিষ্কৃত হয় নাই, ইহা পাটলিপুত্রে পাওয়া গিয়াছে, এই কারণেও মিঃ স্মিথের মনে একটা সন্দেহ আসিয়াছে। তিনি মনে করেন সম্ভবতঃ ইহা পাটলিপুত্রের কোন বিখ্যাত মন্দিরের অনুকরণে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহা অস্বীকার করিবার কোন বিশেষ কারণ নাই যে এই মন্দিরটীর চূড়া একটি সরল রেখায় গঠিত ছিল, কিন্তু ইহার স্থাপত্যের সবিশেষ কিছুই জানা যায় না। এই যুক্তি হইতে ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে মিঃ বেগলার যে বোধগয়া মন্দিরের সংস্কার করিয়াছেন সেই বর্ত্তমান মন্দিরটির সহিত হিওয়েন সিয়াং বর্ণিত মন্দিরের অভিন্নতা প্রতিপাদনের কোনই সম্পর্ক নাই। মিঃ স্মিথের সমালোচনার বক্তব্য এই যে, তিনি প্লাকে অঙ্কিত মন্দিরের সহিত চীন পরিব্রাজকের বর্ণিত মন্দিরের কোনই সামঞ্জস্য দেখিতে পান না। বরং তাঁহার ভাষা হইতে ইহাই বুঝা যায় যে স্তূপাকৃতি অগ্রভাগবিশিষ্ট কোনও মন্দির পূর্ব্বে এখানে ছিল না। মিঃ স্মিথ ইহা একবারও অনুমান করেন না যে এই প্লাকে অঙ্কিত মন্দির ও বোধগয়া মন্দিরের সহিত চীন পরিব্রাজকের বর্ণিত 'তিলোশিকা' (তিলোদক) মন্দিরের কোনও সাদৃশ্য আছে—এই উভয় ক্ষেত্রে কোনই সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় না। এই 'তিলোশিকা' মন্দিরের বর্ণনায় আছে 'রাস্তার প্রান্তভাগে মাঝখানের ফটকের মধ্য দিয়া তিনটি মন্দির (চিংশী) দেখিতে পাওয়া যায়। এই মন্দিরগুলির ছাদ গোলাকার থালার মত এবং উহাতে ক্ষুদ্র ঘণ্টা ঝুলিতেছে। মূল ভিত্তির চতুর্দ্দিক রেলিং দিয়া ঘেরা; দ্বার, বাতায়ন, কড়ি, বর্গা, প্রাচীর এবং সিঁড়ী সমস্তই গিল্টি করা খোদিত কারুকার্য্যে পরিশোভিত। মাঝখানের মন্দিরে ত্রিশ ফিট্ উচ্চ বুদ্ধদেবের প্রস্তর প্রতিমূর্ত্তি, বাম পার্শ্বের মন্দিরে তারা বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি এবং দক্ষিণ পার্শ্বের মন্দিরে অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি। এই তিনটি মূর্ত্তি ব্রনজ ধাতু নির্ম্মিত। মিঃ স্মিথ

মোটামুটিভাবে শেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়া বলিয়াছেন যে 'প্লাকে অঙ্কিত মন্দিরের সহিত বোধগয়া মন্দিরের সাদৃশ্য ঠিক করিয়া মিলাইবার উপায় নাই। হিওয়েন সিয়াং বর্ণিত বোধগয়া মন্দিরের সহিত ইহার সাদৃশ্য নাই এবং ইহা যে বোধগয়া মন্দিরের 'প্রাচীনতম চিত্র' ইহাও বিশ্বাস করিবার কোনও গ্রহণযোগ্য প্রমাণ নাই।'

মিঃ স্মিথের অভিমত পাঠ করিয়া ডাঃ স্পুনার বলেন 'ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে এই দুইটি মন্দিরের একত্ব সম্বন্ধে কোন সবিশেষ প্রমাণ নাই, তবে বিহার প্রদেশে যতগুলি মন্দির বর্ত্তমানে দেখিতে পাওয়া যায় তন্মধ্যে বোধগয়া মন্দিরের সহিত এই প্লাকে অঙ্কিত মন্দিরের অনেক বিষয়ে মিল আছে। বোধগয়া মন্দির যদি সাধারণ মন্দিরের মত হইত তাহা হইলে সম্ভবতঃ এ বিষয়ে কিছুই বলিতে হইত না। প্রকৃতপক্ষে বোধগয়া মন্দিরের স্থাপত্য ভারতবর্ষে প্রায় অদ্বিতীয়, ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে প্লাকে অঙ্কিত মন্দির বোধগয়া মন্দিরেরই অনুকরণে চিত্রিত। প্লাক হইতে ইহাও বেশ স্পষ্ট বুঝা যায় যে প্লাকের মন্দির কোন বিখ্যাত মন্দিরের প্রতিচ্ছবি লইয়াই চিত্রিত হইয়াছিল। অতি সাধারণ মন্দিরের চারিদিক এভাবে রেলিং বেষ্টিত অথবা এইরূপ অসংখ্য স্তূপবেষ্টিত হয় না, অথবা সম্মুখভাগে এইরূপ স্তম্ভশ্রেণীও দেখিতে পাওয়া যায় না। কাজেই রেলিং ও স্তূপ প্রমাণের দিক দিয়া ধরিতে হইবে না—ইহাতে আমি মিঃ স্মিথের সহিত একমত হইতে পারি না। তাঁহার অনুমানে ইহা ঠিক হইতে পারে যে বোধগয়া প্লাকের কতকগুলি সুস্পষ্ট লক্ষণ অন্যান্য বিখ্যাত মন্দিরের সঙ্গে সমানভাবে একই প্রকারের কিন্তু পাটনার চারিদিকের নিকটবর্ত্তী স্থানে এইরূপ বিখ্যাত মন্দির একমাত্র বোধগয়া মন্দির,এই কারণে ইহাকে এই ক্ষেত্রে বাদ দেওয়া চলে না। প্লাকের মন্দিরের স্বাভাবিক আদর্শ একমাত্র বোধগয়া মন্দিরের সহিতই তুলনা করা যাইতে পারে, তবে ইহাতে যে সামান্য একটু সন্দেহ আসিতে পারে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে। যাহা হউক এই মন্দিরকে মিঃ স্মিথ যেভাবে বড় করিয়া তুলিয়াছেন তাহাও যে ঠিক নহে ইহা সুনিশ্চিত। মিঃ স্মিথের সন্দেহ প্রধানতঃ চীন পরিব্রাজকের বর্ণনার উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার বর্ণনা হইতে তিনটি বিষয়ের অসামঞ্জস্য মিঃ স্মিথের চক্ষে ধরা পড়িয়াছে যথা :—(১) মন্দিরের ছাদ আমলকাকৃতি ছিল, (২) মন্দিরাভ্যন্তরে বোধিসত্বের মূর্ত্তি ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় উপবিষ্ট এবং (৩) মন্দিরের পূর্ব্বাংশে যে তিনটি অতিরিক্ত 'হল' ছিল তাহা এই প্লাকে দেখিতে পাওয়া যায় না।

আমার মনে হয় যে এই সকল অনৈক্য সত্ত্বেও খুব সম্ভবপর অনুমানদ্বয়ের একটির উপর নির্ভর করিলে আমার অভিন্নতা-নিরূপণ ঠিক বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। মিঃ স্মিথ বলেন যে হিওয়েন সিয়াংএর সময় পর্য্যন্ত (৭ম শতাব্দের মধ্যভাগে) এইস্থানে দুইটিমাত্র মন্দির ছিল, ইহার মধ্যে একটি অশোক কর্ত্তৃক নির্ম্মিত এবং অপরটি পুরাতন মন্দিরের স্থানে কোন ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। পরিব্রাজক শেষোক্তটিই দেখিয়াছিলেন এবং তাঁহার বর্ণনা আমাদের প্লাকের সহিত মিলে না। প্লাকে অঙ্কিত মন্দিরটি যে অতি প্রাচীন ইহা সন্দেহ করিবার বিশেষ কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নাই। ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে মৌর্য্যেরা যে খরোষ্ঠি * অক্ষর ব্যবহার করিতেন এই প্লাকে সেই অক্ষর খোদিত, ইহা অশোকের রাজধানীতে পাওয়া গিয়াছিল এবং ইহাতে দেখা যায় যে মন্দিরের পুরোভাগে যে লিখিত অংশ আছে তাহা মৌর্য্যদের অক্ষরে লিখিত এবং অপর পক্ষে প্লাকের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে যে সকল প্রমাণ পাওয়া যায় তাহার গুরুত্ব কিছুতেই উড়াইয়া দিতে পারা যায় না। চীন পরিব্রাজকের মতে এই প্রাচীন মন্দিরটি একটি ক্ষুদ্র চৈত্য ছিল, ইহাও স্থির সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারা যায় না, কারণ এ সম্বন্ধে তাঁহার ব্যক্তিগত কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। অধিকন্তু আমরা বর্ত্তমানে যে রেলিং দেখিতে পাই ইহাতে বিপরীত অনুমানই আসিয়া পড়ে। প্রথম দেখিতে গেলে ইহা অসম্ভব বলিয়া মনে হয় যে রাজা অশোক এইরূপ প্রসিদ্ধ বৌদ্ধতীর্থে অতি ক্ষুদ্র একটি চৈত্য নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহা নিতান্তই সম্ভব যে

* 'ইহা প্রাচীন আরামীয় লিপি হইতে উদ্ভূত। ইহা বর্ত্তমান পারস্য লিপির ন্যায় দক্ষিণ দিক হইতে বামদিকে লিখিত হইত। ইহা খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর পর লোপ হয়।'
সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩২৪ সন।

এই প্লাকে অঙ্কিত মন্দির অশোকের মন্দিরেরই অনুরূপ। ডাঃ সপুনারের মতে 'Such resemblance as is now discernible between it and the modern temple will in this case be explainable by 'Amara' having copied the general style of the original when he rubuilt it (a very natural thing to do), whereas the minor differences will also be accounted for. This scems therefore quite a possible alternative.'

ডাঃ স্পুনারের মতে ইহাই সম্ভবতঃ ঠিক যে চীন পরিব্রাজক প্লাকে অঙ্কিত মন্দিরের প্রাচীনতর মূল জিনিসই দেখিয়াছিলেন। প্লাকখানা দ্বিতীয় শতাব্দের, ডাঃ স্পুনারের এই অনুমান মিঃ স্মিথ পরীক্ষাস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি চীন পরিব্রাজকের ভ্রমণের সময় ৭ম শতাব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং লিখিয়াছেন যে এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত মন্দিরটি মৌলিক অবস্থায়ই ছিল; ইহা কোন প্রকারেই ঠিক নয়। ডাঃ স্পুনারের প্লাকের তারিখ ঠিক হউক বা না হউক, ইহা যে কুষাণ যুগের অথবা ২য় বা ৩য় শতাব্দের ইহাতে সন্দেহ নাই। তাহা হইলে চীন পরিব্রাজকের আগমন পর্য্যন্ত চারিশত বৎসর অতীত হইয়াছে; এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে মূল মন্দিরের বহু পরিবর্ত্তন ও সংস্কার হইবার কথা। বোধগয়া মন্দিরের প্রতিলিপি এই প্লাকের আদর্শ হইয়া থাকিলে ঐ চারিশত বৎসর মধ্যে যে মন্দিরের চূড়া নাই কে বলিবে? এবং উহা সংস্কারের সময় স্তূপের পরিবর্ত্তে আমলকাকৃতিতে পরিণত নাই ইহাও অস্বীকার করা যায় না। মূল মন্দিরের অগ্রভাগ যে আমলকাকৃতি ছিল ইহারও সবিশেষ কোন প্রমাণ নাই। যে হিউয়েন সিয়াংএর বর্ণনায় মিঃ স্মিথ এতটা জোর দিয়া প্লাকের প্রতিবাদ করিয়াছেন তাহাতে আর একটি অসামঞ্জস্য মন্দিরের পূর্ব্বদিকের তিনটি কক্ষকে অবলম্বন করিয়া লেখা হইয়াছে। চীন পরিব্রাজকের বর্ণনা আমাদিগকে উড়িষ্যা মন্দিরের জটিল গঠনপ্রণালীর ভিতর আনিয়া ফেলে। ইহাতে চূড়া, জগমোহন ও কোন কোন স্থানে মন্দিরের উভয় পার্শ্বে বিভিন্ন কক্ষের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু মিঃ স্মিথ এই কক্ষগুলিকে মূল মন্দির হইতে পৃথক্ ধরিয়া লইয়াছেন। এই স্বীকারোক্তিতেই তিনি তাঁহার নিজ মতকে ভ্রান্তিপূর্ণ করিয়াছেন। কক্ষগুলিকে মন্দির হইতে পৃথকভাবে ধরিয়া লওয়া সেই যুগের স্থাপত্যের সমসাময়িকতার পক্ষে কোন মতেই অনুকূল নহে। প্রকৃতপক্ষে এই কক্ষগুলি ধীরে ধীরে বিভিন্ন সময়ে নির্ম্মিত হইয়া মূল মন্দিরের সঙ্গে একাঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে মন্দিরের মূল নক্সাতে এই কক্ষগুলির কোন স্থান ছিল না, কাজেই প্লাকে এই কক্ষের কোন চিত্র দেখিতে পাওয়া যায় না।

প্লাক খানা পাটলিপুত্রে পাওয়া গিয়াছিল, এই প্রসঙ্গে ডাঃ স্পুনার বলেন 'তীর্থের নিদর্শনস্বরূপ যাত্রিগণ বোধগয়া প্লাক যে বিভিন্ন স্থানে লইয়া যাইতেন ইহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। রাজধানী পাটলিপুত্রে যে এইরূপ প্লাক পাওয়া যাইত ইহা খুবই সম্ভবপর। এই সব কারণে আমার পূর্ব্বমত পরিবর্ত্তন করিবার কোনই কারণ দেখি না। তবে বোধিসত্ত্বের ভূমিস্পর্শ মুদ্রা সম্বন্ধে মিঃ স্মিথ যে আপত্তি তুলিয়াছেন ইহা অবশ্য ভাবিবার বিষয় বটে।' পরবর্ত্তী যুগের স্থাপত্যের সাদৃশ্য হইতে বুঝিতে পারা যায় যে ভূমিস্পর্শ মুদ্রা বোধগয়ার স্থাপত্যে স্থান লাভ করিয়াছিল এবং মিঃ স্মিথের মতে ৭ম শতাব্দে এইরূপ স্থাপত্যের নিদর্শন চীন পরিব্রাজকের বিবরণীতে দেখিতে পাইয়াছেন—ইহা একেবারে উড়াইয়া দেওয়া চলে না। তবে ইহাও সম্ভবপর যে ২য় কি ৩য় শতাব্দে এইরূপ মুদ্রার প্রচলন ছিল না, চারি শত বৎসরের মধ্যে ঐরূপ নূতন ভাব স্থাপত্যে স্থান পাইয়াছিল। যাহা হউক প্লাকে খোদিত লিপির পাঠোদ্ধার যত দিন না হইতেছে ততদিন এই শেষ বিবরণীর মীমাংসা হইতে পারে না। *

দিব্য বিরহ।

(শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ন)

অসীমকে পাবার জন্য, ধরে' রাখবার জন্য অনুভব করবার জন্য প্রকৃতির ভিতরে যে একটী

* এই প্রবন্ধটী বিহার ও উড়িষ্যার Research Society's জর্ণাল হইতে গৃহীত।

বিচিত্র ব্যাকুলতা আছে. সে নানা রূপে উচ্ছ্বসিত হয়ে' উঠে। সে কোনো সময় শিশিরপাতচ্ছলে মৃদু অশ্রুধারা বর্ষণ করে, বর্ষাধারাপাতচ্ছলে আকুল ক্রন্দন করে, আবার কখনো বা উদ্দাম বিরাট আগ্রহে ঝঞ্ঝায় মাতিয়া উঠে। এই লীলা বৈচিত্র্যময়ী প্রকৃতির এই ব্যাকুলতাটুকু দেখিতে, অনুভব করিতে অনন্তের বড় মধুর লাগে, তাই সে আপনাকে সমগ্ররূপে, স্পষ্টভাবে সহজে ধরা দিতে চায় না—ইঙ্গিতে, ভঙ্গিমায়, সঙ্কেতে একটু আভাস দেয় মাত্র।

এই বিচিত্র বিরহ-ব্যাকুলতার নানা রূপ। সে নিশায় গম্ভীর, প্রভাতে কমনীয়' মধ্যাহ্নে প্রখর, সন্ধ্যায় প্রশান্ত। সে বসন্তে শ্যামল, হেমন্তে মৃদু, শীতে শীর্ণ, নিদাঘে দীপ্ত, বর্ষায় আর্দ্র, শরতে প্রফুল্ল। সে জ্যোৎস্নায় সুন্দর, আঁধারে করাল, রৌদ্রে দৃপ্ত, ছায়ায় স্নিগ্ধ। আজিকার এই ঝড় দেখে মনে হচ্চে প্রকৃতি যেন প্রখরা হয়ে' মেতে উঠেচে। এটা লাভ করার আনন্দ নয়, না পাওয়ার নৈরাশ্য নয়, এটা কেবল দীর্ঘ বিশ্রান্ত ব্যর্থ প্রতীক্ষার অসহ-ব্যাকুলতা।

মানুষ, মানুষের আনন্দে আনন্দ প্রকাশ করে, দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করে, কিন্তু এই প্রকৃতির বিরহ-বৈচিত্র্যের সঙ্গে তার সহানুভূতি নিবিড় হয়ে উঠচে না কেন? আজ এই বিরহ-ঝঞ্ঝায় বৃক্ষ ভেঙ্গে পড়ল, পাতা আপনাকে উড়িয়ে দিল, মাটি গলে' জল হয়ে গেল কিন্তু মানুষ কেবলি তার অভিমান-সঞ্চিত বিজ্ঞতায় হৃদয়-দুয়ার বন্ধ করিয়া অবাধে আপিস যাতায়াত ও কারখানার কাজ করিতেছে ও মোকদ্দমার তদ্বিরে ব্যস্ত।

আজ সকলের চেয়ে লোকহিতৈষী তাঁকে বলব যিনি লোকের দ্বারে দ্বারে গিয়ে বলবেন—"ও গো তোমরা দুয়ার খুলে দেখ, কান পেতে শোন, প্রাণ দিয়ে উপভোগ কর।" আজকে এমন দিনে, দার্শনিকের সূক্ষ্ম বিচার, স্থবিরের বহুদর্শিতা, আচারনিষ্ঠের গোঁড়ামী বিদ্যাভিমানীর বিজ্ঞতা সব এর কাছে পরাজয় মানবে।

যা' আমরা সহজে পাচ্চি, তাকে যেন সহজ বলেই অবহেলা কচ্চি, তাকে পাচ্চি বলেই পাচ্চি না; তাকে ছাড়তে পারা যায় না বলেই যেন ছেড়ে দিতে চাচ্ছি। আকাশ বাতাস যে কত বড় প্রয়োজনের, তা যে কত মনোহর, তার সঙ্গে যে আমাদের নিবিড় ঐক্য, তা মনেই থাকে না; কিন্তু এরচেয়ে নিজের হাতের গড়া ছোট পুতুলটিকেই বেশি যত্ন কচ্চি। নিত্য-নৈমিত্তিক প্রয়োজনসিদ্ধি ছাড়া আকাশ বাতাসের আর একটা মহান্ সার্থকতার দিক আছে।

যাকে মোটে দেওয়া হয় নাই সে হতভাগ্য; কিন্তু তার চেয়েও বেশি হতভাগ্য সে-ই, যাকে দেওয়া হ'ল অথচ তার পাওয়া হ'চ্চে না,—যে নিতে পাচ্চে না। এই অবস্থাটাই আমাদের নয়কি? এতটা জিনিস দেওয়া হয়েছে অথচ সেগুলি পাওয়া হ'ল না। কিন্তু এগুলি আমরা চেয়েছি। অভিমানে বৃথা বিজ্ঞতায় স্বীকার না করলেও বুঝতে পারছি যে আমরা এগুলো চেয়েছি।

মানুষ এই পৃথিবীর মানুষ। আজ লতাটি পাতাটি তৃণ গাছটি এই প্রকৃতির সঙ্গে একতানে সাড়া দিচ্চে, মানুষ তা পারচে না! এটা বিজ্ঞতা না অক্ষমতা? আজ কি তবে এই কথা মনে করলে অন্যায় হয় যে মানুষের চেয়ে তৃণ গাছটি বড়? আমি পর জন্মে বরং তৃণ হ'তে রাজি তবু এমন হৃদয়হীন মানুষ হব না। আজকে এমন দিনে ইচ্ছা হয় না কি সকল বিজ্ঞতা ছেড়ে স্রোতের মত বয়ে যেতে, গন্ধের মত ছড়িয়ে যেতে? ইচ্ছা হয় না কি মাটির মত গলে যেতে? ইচ্ছা হয় না কি গাছের মত নুয়ে' পড়তে, ফুলের মত ফুটে পড়তে, লতার মত ছিঁড়ে যেতে? মানুষের ভিতরেও এরূপ দিব্য বিরহ আছে। যখনি সে ঝড়ের মত প্রমত্ত বেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে তখনি তার বিরাট আগ্রহে হৃদয়ের অন্যান্য প্রবৃত্তিগুলি টুটে লুটে পড়তে চায়। এই বিরহটাকে ক্রমেই ফেনায়ে তুলতে হবে; একে রুদ্ধ করলে আমাদের জিত মোটেই নহে, কেবলি হার। আপাততঃ এই ঝড়টাকে নিতান্ত আকস্মিক বলে বোধ হচ্ছে। কিন্তু এর জন্য কি প্রকৃতির ভিতরে আগেই কোন আয়োজন হচ্ছিল না! হচ্ছিল বৈ কি? ফাল্গুনী পূর্ণিমার রাত্রির নিস্তব্ধতার পরেই প্রভাতে এই ঝড়।

এই বিরহবেদনাকে জাগিয়ে তোলবার জন্য মানুষের ভিতরেও এমন একটা অদৃশ্য আয়োজন

চলতে পারে। শেষে সহসা একদিন সুপ্রভাতে তা' উদ্দামবেগে উদ্বেলিত হয়ে উঠবে। শৈল-গহ্বরের অন্ধকারময় নির্জ্জন প্রদেশে বহুদিন ধরে যে বারিধারা সঞ্চিত থাকে, তাই একদিন একসময়ে, ফুলিয়া, ফুঁপিয়া, গর্জ্জিয়া, মাতিয়া বাধাবাঁধন তুচ্ছ করে বাহির হয়, তখন তাকে কেউ রোধ করে রাখতে পারে না। সে আপনার ক্ষুব্ধ আবেগে ছুটিয়া যায়।

আজকে এই ঝড়ের দিন—মাতামাতির দিন। আজকে ভিতর বা'র এক করে দেবার মহামুহূর্ত্ত। আনন্দ তাকেই বলে যার গতিতে বাধা নাই, যার আদান প্রদানে সঙ্কোচ নাই। যার বন্ধনও মুক্তি। আজকে বিজ্ঞ গম্ভীর হয়ে' একা বসে' থাকলে চলবে না। আজ ছোট বড় সবারি সঙ্গে মিশতে হবে। আপনার চারিদিকে ধীরে ধীরে যে দেয়াল গড়ে তুলছি তাকে একেবারেই ভূমিসাৎ করে দিতে হবে। এ যদি না পারো, এ যদি না শোনো, এ যদি না করো, তা হলে ওহে মানুষ, তুমি মানুষ নও—ধিক্ তোমার বিদ্যায়, ধিক্ তোমার বিচারে।

ব্রাহ্মসমাজ ও বক্তৃতা।

অন্য বিষয়ক বক্তৃতার কথা বলিতে পারি না, বঙ্গভাষায় অন্তত ধর্ম্মবিষয়ক বক্তৃতা করা আরম্ভ হয় ব্রাহ্মসমাজ হইতে। ভারতবর্ষে বর্ত্তমান যুগে স্বদেশীয় ভাষায় ধর্ম্মবিষয়ক বক্তৃতার জন্মদাতা হইল ব্রাহ্মসমাজ, একথা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না। এরূপ বক্তৃতার জন্মের কারণ কি? মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ হিমালয়প্রবাসে ধ্যানধারণার ফলে ঈশ্বরের সত্তা দ্বারা নিজের আত্মাকে পূর্ণ দেখিতে পাইলেন। সেই আত্মদৃষ্টিই তাঁহাকে, তিনি যতটুকু ব্রহ্মজ্ঞান প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহাই নিজের আত্মার সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিবার পরিবর্ত্তে সমগ্র দেশে প্রচার করিবার জন্য প্রেরণ করিল। বাস্তবিক বক্তৃতা মাত্রেরই প্রকৃত উদ্দেশ্য এই যে, যে বিষয়ে বক্তা যেটুকু প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, তাহাই জনসাধারণ্যে প্রচার করা। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বক্তৃতা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে রাজা রামমোহন রায় শাস্ত্রাদি হইতে জ্ঞানসঞ্চয় করিয়া যে একেশ্বরবাদের সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাহা তিনি শাস্ত্রাদি প্রকাশ প্রভৃতি নানা উপায়ে প্রচার করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সে প্রকার উপায় অবলম্বন করিতে পারিলেন না। তিনিও শাস্ত্রাদি পাঠ প্রভৃতি উপায়ে রামমোহন রায়প্রদর্শিত একেশ্বরবাদেই আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তদতিরিক্ত, তিনি সেই একেশ্বরবাদের মূল লক্ষ্য পরব্রহ্মের সত্তা দ্বারা আত্মাকে পূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। ইংরাজীতে যাহাকে fullness of the heart বলে, সেই অন্তরের পূর্ণতা হইতে তিনি আর বসিয়া বসিয়া ধীরে সুস্থে গ্রন্থরচনার দিকে মনোনিবেশ করিতে পারিলেন না, অথবা বিরুদ্ধ পক্ষকে ক্রমাগত তর্ক-সংগ্রামে আহ্বান করিতে উদ্যত হইলেন না, কিন্তু অন্তর্নিহিত সত্যবাণী সকল বলিয়া যাইতে লাগিলেন, এবং তাঁহার সেই সকল বক্তৃতাবন্ধ উপদেশ সমগ্র দেশকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি স্বীয় হৃদয়ে সেই পূর্ণ পুরুষের ভাব এতই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার সত্তার বিরুদ্ধে তর্ককে তিনি অনেকটা ভীতির চক্ষে দেখিতেন, আমরা ইহা অনেকবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বনের সেই প্রথম অবস্থায় যখন তাঁহার পিতৃব্য প্রসন্নকুমার ঠাকুর ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে বিমুখ করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তিনি ঈশ্বরকে দেখিতে পান কি না, তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন যে তাঁহার প্রশ্নকর্ত্তা সম্মুখস্থ দেওয়াল যতটুকু প্রত্যক্ষ করিতেছেন, তদপেক্ষা তিনি ঈশ্বরকে অনেক অধিক প্রত্যক্ষ করিতেছেন। দেবেন্দ্রনাথের বক্তৃতা ধর্ম্মসাধনের ফল এবং তাহার উদ্দেশ্য আত্ম-প্রচার নহে, কিন্তু ধর্ম্মপ্রচার। আমাদের বিশ্বাস যে যাঁহাদের হৃদয় প্রকৃত ধর্ম্মভাবে পরিপূর্ণ হইবে, তাঁহাদেরই হৃদয় হইতে ধর্ম্মবিষয়ক বক্তৃতা স্বতই প্রকাশিত হইবে, এবং সে বক্তৃতার মধ্যে কোন প্রকার অতিরঞ্জন থাকিবে না, আত্মঘোষণা থাকিবে না, পরনিন্দা থাকিবে না, অথবা মিথ্যামিথ্যা ফেনাইয়া বাড়াইয়া বলিবার চেষ্টাও থাকিবে না। ঋষিদিগের হৃদয় ধর্ম্মভাবে পূর্ণ ছিল, তাঁহারা পরব্রহ্মকে করতলন্যস্ত আমলকের ন্যায় প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন বলিয়াই

তাঁহাদের বেদবেদান্তনিহিত এক একটী উক্তি শত দীপ্ত সূর্য্যের ন্যায় আবির্ভূত হইয়া আমাদের হৃদয়-গুহা আলোকিত করিয়া তুলে। ব্রাহ্মসমাজের প্রথম অবস্থায় দেবেন্দ্রনাথপ্রমুখ মহাত্মাগণের বক্তৃতার ফলে ব্রাহ্মধর্ম্ম দেশবিদেশে প্রচারিত ও গৃহীত হইয়াছিল।

বর্ত্তমানে কিন্তু বক্তৃতারই কারণে ব্রাহ্মসমাজ নিজের উচ্চ আসন হইতে নামিবার উপক্রম করিতেছে বলিয়া অনেকের ধারণা। কথাটী একটু প্রহেলিকার মত বোধ হইলেও তাহার মধ্যে যে সত্য একেবারেই নাই, একথা সাহস করিয়া বলিতে পারি না। বর্ত্তমানে ব্রাহ্মসমাজের প্রত্যেক ক্রিয়াকলাপে সুদীর্ঘ বক্তৃতা একটী অপরিহার্য্য অঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। কাজেই এখন ব্রাহ্মসমাজের 'হাটে ঘাটে বাটে' বক্তা পাওয়া আবশ্যক। এইরূপ যথাতথালব্ধ বক্তাগণের বক্তৃতা প্রকৃত ধর্ম্মসাধনের ফল আর হইতে পারে না; অধিকাংশ স্থলেই পাঠদ্দশায় পঠিত গ্রন্থসমূহের অথবা কর্ণে শ্রুত কথাসমূহের চর্ব্বিতচর্ব্বণ হয় মাত্র—তাহাতে না থাকে হৃদয়ের প্রত্যক্ষ অনুভূতির সরসতা, আর না থাকে তাহাতে শ্রোতৃবর্গের প্রাণ-স্পর্শ করিবার ক্ষমতা। বলিতে কি, অনেক স্থলেই এই সকল বক্তৃতা সত্যসত্যই শ্রোতৃবর্গের নিকট তিক্ত বোধ হইয়া থাকে, অথচ তাঁহারা কেবলমাত্র সভ্যতা ও ভদ্রতার খাতিরে সভা ছাড়িয়া উঠিতেও ইচ্ছা করেন না। ফলে দাঁড়ায় এই যে, বর্ত্তমানে ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা শ্রোতৃবর্গের নিকটে উপহাসের বস্তু হইয়া দাঁড়াইতেছে। বলা বাহুল্য যে ধর্ম্ম প্রভৃতি ভাল বিষয়কে নষ্ট করিবার পক্ষে উপহাসের ন্যায় মারাত্মক বস্তু আর দ্বিতীয় নাই।

আমাদের ধারণা ভ্রান্ত হইতে পারে, কিন্তু আমরা দেখিয়াছি যে, ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া আমরা যে ধারণা পোষণ করিতেছি, তাহা আমাদের ন্যায় আরও অনেকে পোষণ করিয়া থাকেন। সেই কারণে তাহা এখানে প্রকাশ করিয়া বলা কর্ত্তব্য বোধ করিতেছি। সে ধারণাটী এই যে বর্ত্তমানে ব্রাহ্মসমাজের অনেকেই আচার্য্যের পদ অধিকার করিয়া বক্তৃতা করিবার জন্য বড়ই ব্যগ্র এবং বক্তৃতা করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইলেই নিজেকে বড়ই সুখী মনে করেন। এরূপ ভাবের মূল প্রাণ হইল বিনয়ের অভাব এবং অহঙ্কারের মাত্রাধিক্য। বক্তৃতা করিবার পূর্ব্বেই অহমিকতা বক্তাকে অধিকার করিয়া বসে। সাধারণত দেখিতে পাই যে আজকাল বক্তাদের মুখে বিনয়ের পরাকাষ্ঠা থাকিলেও অন্তরে অহমিকতার ভাণ্ডার পূর্ণ। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রে এম এ উপাধি যেই লাভ করিলাম, অমনি আমি গর্ব্বের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়া নিজেকে শ্রেষ্ঠ বক্তা, অন্যান্য সকলের অপেক্ষা উন্নত এবং কাজেই বেদীগ্রহণ করিয়া আচার্য্য পদের উপযুক্ত বলিয়া ধারণা করিলাম। তারপর, বক্তৃতার সময় দেশীয় বিদেশীয় পণ্ডিতগণের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া অথবা নিজের কথাগুলিকে অলঙ্কারে ও নানাবিধ ছন্দে ব্যক্ত করিয়া ভাবিতে লাগিলাম যে অনুপম বক্তৃতা করিয়াছি এবং বক্তৃতা শেষ হইলে শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলাম যে বক্তৃতা শুনিয়া শ্রোতৃবর্গ মোহিত হইয়া গিয়াছেন কি না। শ্রোতৃবর্গও আমার সম্মুখে ভদ্রতা রক্ষার উদ্দেশ্যে বলিলেন যে বড়ই সুন্দর হইয়াছে—আমি তাহা শুনিয়া আরও গর্ব্ব অনুভব করিতে লাগিলাম, কিন্তু তাঁহারা আমার পশ্চাতে যে কি বলিলেন, তাহা শুনিবার অবসর পাইলাম না। ইহাই হইল সাধারণত বর্ত্তমান বক্তাগণের চিত্র। আজ অনেক বৎসর হইল কোন ধর্ম্মবক্তা লেখককে মুখে বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করিয়া শ্রোতৃবর্গকে নিতান্ত অজ্ঞ বলিয়া মনে করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। আবার, আমরা সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মবক্তাদিগকে বক্তৃতার পর শ্রোতৃবর্গকে জিজ্ঞাসা করিতেও শুনিয়াছি যে বক্তৃতা কেমন লাগিল। ধর্ম্মবক্তাদের এই প্রকার তীব্র অহমিকা আমাদের হৃদয়কে বড়ই ব্যথিত করিয়া তুলে। আমাদের মনে হয় যে এই প্রকার অহমিকাপূর্ণ ধর্ম্মবক্তাদের বক্তৃতা শত উৎকৃষ্ট হইলেও তাহা অন্তঃসারশূন্য, কারণ তাহা আত্মার অভিজ্ঞতা হইতে বাহির হয় না।

প্রকৃতি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে একটা বয়সে অহমিকা উপকারী হয় বটে। যৌবনের প্রথম উন্মেষে এই অহমিকাই মনুষ্যকে উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়া দেয়। কিন্তু বয়স ও জ্ঞান-বৃদ্ধির সঙ্গে এবং অবস্থাবিশেষে সেই অহমিকা

পরিত্যক্ত হইতে না থাকিলে তাহাই আবার মনুষ্যকে অধোগতির দিকে লইয়া যায়। ব্রাহ্মসমাজেরও প্রথম অবস্থায় সকল বক্তারই হৃদয় যে অহমিকা হইতে বিমুক্ত ছিল, এমন কথা বলা যায় না। ইহা বলিতে পারা যায় যে তখন সেই অহমিকা ব্রাহ্মসমাজের মতপ্রচারে সহায়কের কার্য্য করিয়াছিল। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই অহমিকা পরিত্যক্ত না হইলে তাহার পতন অনিবার্য্য। প্রকৃত ধর্ম্মকামী ব্যক্তিগণের পক্ষে সর্ব্বপ্রকার অহমিকা ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইবার অন্তরায়, ধর্ম্মসাধনের কঠোরতম বিঘ্ন। এই কারণে অহমিকাপূর্ণ হৃদয়ে ধর্ম্মবক্তা হইবার আমরা বিরোধী। আমাদের মনে হয় যে ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞানের পথে, অনন্ত প্রেমের পথে যিনি যতই অগ্রসর হইবেন, তিনি ততই মৌনী হইয়া পড়িবেন। তিনি মৌনীর ভেক গ্রহণ করিবেন না বটে, কিন্তু বাহিরের প্রশংসালাভের প্রার্থী হইয়া নিজের জ্ঞান, নিজের প্রেমভক্তি প্রকাশ করিবার জন্য ব্যস্ত হইবেন না—তাঁহার অন্তরে ভগবদ্ বিষয়ক আলোচনা গভীর হইতে গভীরতর খাদ কাটিতে থাকিবে। এই ভাবের অনুবর্ত্তী হইয়াই মাধ্যাকর্ষণের আবিষ্কর্ত্তা সার আইজাক নিউটন বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, যে তিনি জ্ঞানসমুদ্রের তীরে বসিয়া দুই চারিটী লোষ্ট্রখণ্ড কুড়াইয়াছিলেন মাত্র। এই ভাবেরই অনুবর্ত্তী হইয়া আমাদের নিজেকে শিক্ষার্থী বলিয়াই বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। আমরা প্রত্যেক জ্ঞানীর কাছে, প্রত্যেক ভক্তের চরণে, প্রত্যেক মনুষ্যের নিকটে শিক্ষা করিব। প্রত্যেক মনুষ্যের প্রত্যেক কার্য্যে আমার প্রভুর হস্ত, মঙ্গলময়ের মঙ্গলভাব প্রত্যক্ষ দেখিতে শিক্ষা করিব, ইহাই আমাদের প্রাণের ইচ্ছা হওয়া উচিত। জ্ঞানালোচনার ফলে, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবার ফলে যদি কোন সত্য লাভ করি, তাহা বন্ধুবান্ধবের নিকট প্রকাশ করিয়া আনন্দ উপভোগের আমরা বিরোধী নহি, কিন্তু ধর্ম্মবিষয়ে বক্তৃতা করিতে হইবে বলিয়া বক্তৃতা করিবার সম্পূর্ণ বিরোধী।

সত্য কথা বলিতে গেলে অনেক অপ্রিয় কথা বলিতে হয়। কিন্তু সময়ে সময়ে রোগীর জীবনরক্ষার জন্য অপ্রিয় সত্য না বলিয়া উপায় নাই। আমার বিশ্বাস যে ব্রাহ্মসমাজকেও বক্তৃতা সম্বন্ধে অপ্রিয় সত্য শুনাইবার সময় আসিয়াছে। ধর্ম্মরাজ্যে অহমিকার বিনাশই হইল প্রথম সাধনসোপান, ইহা সকল সাধকের একবাক্যে স্বীকৃত। ব্রাহ্মসমাজে অহমিকার প্রবেশের কারণে প্রকৃত ধর্ম্মসাধনের অভাব ঘটিতেছে ইহা আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি, এবং ইহাও আমাদের প্রত্যক্ষ হইতেছে যে বৃথা বাক্যের আড়ম্বরপূর্ণ বক্তৃতা দ্বারা ব্রাহ্মসমাজ প্রকৃত সাধনেচ্ছু ব্যক্তিগণকে আকর্ষণও করিতে পারিতেছে না। প্রত্যুত, এই কারণে জনসাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে সরিয়া পড়িতেছে। ইহার দৃষ্টান্ত আমাদের প্রত্যক্ষ হইলেও তাহা এখানে উল্লেখ করিতে বিরত রহিলাম।

অহমিকার সহিত প্রকৃত সাধনের সম্বন্ধ ভগবদ্গীতার একটী শ্লোকে সুন্দর প্রদর্শিত হইয়াছে। গীতা বলিয়াছেন—

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥

সকল প্রাণীগণের যাহা রাত্রি, তাহাই সংযমী পুরুষের জাগরণকাল, এবং সকল প্রাণীগণের যাহা জাগরণের অবস্থা, তাহাই আত্মদর্শী মুনির পক্ষে রাত্রি।

চারিদিকে যখন কোলাহল কলরব, অহমিকার লীলাখেলা অবিশ্রাম চলিতেছে, একমুহূর্ত্ত যখন প্রাণীগণের চিন্তা করিবার অবকাশ থাকে না, তখন বাহিরে বাহিরে দেখিলে মনে হয় বটে যে সমগ্র বিশ্ব বুঝি জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তাহাই তো প্রকৃত সাধকের পক্ষে মহাসর্ব্বনাশকর অবস্থা। মৎস্য যেমন মাটিতে উত্তোলিত হইলে ছটফট করিতে থাকে, সাধকও সেইরূপ এই অবস্থায় নিপতিত হইলে নিতান্তই ব্যাকুল হইয়া উঠেন। সাধক জাগ্রত হয়েন কখন্? যখন সকল প্রাণী নিদ্রিত, বিশ্বজগতে যখন এতটুকু কোলাহল কলরব নাই, চন্দ্রতারকা যখন নীরব পদক্ষেপে অনন্তের আহ্বান শুনিবার জন্য আমাদিগকে আহ্বান করে, নীরবতার কারণেই অহমিকা যে অবস্থাকে হেয়চক্ষে দৃষ্টি করে, তাহাই তো সাধকের জাগরণের সময়। আত্মার নিগূঢ়তম প্রদেশে প্রাণারাম পরমেশ্বরের সহিত কথোপকথনের তাহাই তো উপযুক্ত সময় ও অবস্থা।

বক্তৃতা করিবার ও কেবলই বক্তৃতা শুনিবার বাসনা এবং অহমিকা পরিত্যাগ করিয়া যতদিন না ব্রাহ্মসমাজ গীতোক্ত এই মন্ত্র অবলম্বন করিয়া নীরব সাধনায় মনোনিবেশ করিবে, ততদিন ব্রাহ্মসমাজের শ্রেয় নাই। ইহা প্রত্যক্ষ সত্য যে শত বক্তৃতায় যে সংশয় ছিন্ন হয় নাই, সাধু মহাপুরুষদিগের একটী মাত্র ইঙ্গিতে সে সংশয় বিখণ্ডিত হইয়া গিয়াছে।

আমাদের নিজেকেও যেমন সাধনপথে অগ্রসর করিতে হইবে, আমাদের সন্তানসন্ততিগণকেও সেইরূপ নীরব সাধনাপ্রিয় করিয়া তুলিতে হইবে, ভক্তি-বিনম্র করিতে হইবে। ঈশ্বরে প্রীতির সঙ্গে তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনেও তৎপর হইবার শিক্ষা দিতে হইবে। এই যে ব্রাহ্মসমাজে কথায় কথায় নিরাশার কথা শোনা যায়, বক্তৃতার অতিমাত্র আধিক্য, অহমিকার অতিমাত্র প্রভাব এবং সুতরাং সাধনার একান্ত অভাবই নিরাশার অন্যতর জন্মদাতা বলিতে পারি। যে নীরব সাধনার উপকারিতা পাশ্চাত্য জগত আজ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছে, ব্রাহ্মসমাজ যদি কিছুকাল বক্তৃতা প্রভৃতি ছাড়িয়া সেই নীরব সাধনার পথে অগ্রসর হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মসমাজের নূতন শক্তি নূতন তেজ দেখিয়া আমরা নিজেরাই অবাক হইয়া যাইব।

রাণাডের জীবন-স্মৃতি।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদিত)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ইহার পর, পূর্ব্বলিখিত অনুসারে শ্বশুর মহাশয় "করবীর" তীর্থস্থানে যাইবার পর, কয়েক মাসের মধ্যে তাঁহার পিঠে এক ফোড়া হইল। তাঁহার মধুমেহ রোগ থাকায় দুই এক বৎসর হইতে এইরূপ ফোড়া হইয়া তিনি দুই এক মাস পীড়িত থাকেন এবং তাহার দরুণ তাঁহার মর্ম্মান্তিক যাতনা হয়। সেইরূপ, এই সময়েও পিঠে ফোড়া হওয়ায় করবীরের বহুদর্শী সিভিল সর্জ্জন, এবং শ্বশুর মহাশয়কে যিনি নিত্য ঔষধাদি দিতেন সেই ডাঃ সিংক্লেয়ারের ঔষধ-উপচার সুরু হইল। প্রথম এক পক্ষ অতীত হইলেও রোগের প্রকোপ কমে নাই—এইরূপ পুণা হইতে পত্র আসিল। তখন আমার স্বামী একমাসের ছুটি লইয়া আমার শ্বশুর মহাশয়ের নিকটে গিয়া থাকিবেন এবং ঔষধোপচার নিজ হাতে করিবেন, এইরূপ স্থির করিয়া এক মাসের ছুটি লইলেন ও কোহ্লাপুরে যাইয়া রাত্রিজাগরণ ও ঔষধোপচার করিলেন। কিন্তু শ্বশুর মহাশয় এক-পা অন্তিমের দিকে অগ্রসর হইয়াছেন, এইরূপ দেখা গেল। এই নিমিত্ত, ডাঃ সিংক্লেয়ারের পরামর্শ গ্রহণ করা হইল। তিনিও একটু নৈরাশ্য প্রকাশ করিলেন; এবং রোগ আরও দীর্ঘকাল চলিবে এইজন্য আরো এক মাসের ছুটি বাড়াইতে হইবে, এই কথা বলিলেন। কারণ পৃষ্ঠের আর এক ভাগে এক ফোড়া বাহির হইয়াছে ও তাহাও বিস্তৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ডাঃ সিংক্লেয়ার প্রতিদিন আসিয়া ক্ষতস্থান ধুইয়া বাঁধিতেন। ঔষধ ও পথ্য-পানীয়ের ব্যবস্থা আমার স্বামী নিজেই করিতেন। কিন্তু কোন ফল হইল না। এইরূপ করিতে করিতে ছুটির দ্বিতীয় মাসটাও কাটিয়া গেল। এক্ষণে আমার স্বামী পুণায় আসিয়া কর্ম্মে হাজির হইয়া পুনর্ব্বার ছুটির দরখাস্ত না করিলে ছুটি মঞ্জুর হইবে না, এইরূপ অবগত হইলেন। কিন্তু শ্বশুর মহাশয়ের পীড়া দিন দিন বাড়িয়া যাওয়ায় শ্বশুর মহাশয়কে ছাড়িয়া আমার স্বামী পুণায় যাইতে ভরসা পাইলেন না। তাছাড়া ছুটি বাড়াইবার জন্য আমার স্বামীর যাওয়া আবশ্যক, এইকথা আমার শ্বশুর মহাশয় শুনিয়া ছোট ছেলের মত কাঁদিতে লাগিলেন, এবং "আমাকে ছেড়ে যেও না" এই কথা বলিলেন। এই রূপে, ছুটির মেয়াদ পূর্ণ হইতে আর দুই তিন দিন বাকি রহিল। এই সময় রেলগাড়ী না থাকায় ডাকের টোঙ্গা গাড়িতে চড়িয়া পুণায় যাইতে ৩৬ ঘণ্টা লাগিত। এই মনে করিয়া, ডাঃ সিংক্লেয়ারকে ডাকাইয়া আনাইয়া আমার স্বামী এই সমস্ত বাধার কথা জানাইলেন, আর বলিলেন যে, তিনি শ্বশুর মহাশয়ের পাশ হইতে নড়েন এরূপ শ্বশুর মহাশয়ের ইচ্ছা নয়। "তিনি আমাকে যাইতে দিতেছেন না, আর আমি না গেলেও ছুটি পাওয়া যাইবে না। কিন্তু আপনার যদি বিশ্বাস থাকে তবে আপনি তাঁহাকে সাহস দিন ও বুঝাইয়া দিন। তাহা হইলে তিনি আমাকে যাইতে দিবেন।" এই কথায়, ডাক্তার বলিলেন, "তাতে আর বাধা কি আছে? ৭। ৮ দিনের যাওয়া আসায় কোনও হানি হইবে না। এই রোগ সারিবার আশা খুব কমই কিন্তু ইহা দীর্ঘকাল চলিবে, এবং কষ্ট যন্ত্রনার দরুণ তাঁহার তাগিদও বিলক্ষণ আছে। তাই, পুণায় যাইয়া এক মাসের ছুটি বাড়াইয়া লইয়া ফিরিতে হইবে।" এইরূপ বলিয়া তিনি শ্বশুর মহাশয়ের ঘরে গেলেন এবং তাঁহাকে সাহস দিয়া বলিলেন যে, "বিশেষ চিন্তিত হইবার মত আপনার শারীরিক অবস্থা নহে। আপনি মিঃ রাণাডেকে যাইবার অনুমতি দিবেন; চার দিনের মধ্যেই তিনি ফিরিয়া

আসিবেন। তাঁহার ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত আমি প্রতিদিন দুইবার ও আবশ্যক বিবেচনা করিলে তিনবারও আসিয়া দেখিয়া যাইব, আপনি চিন্তিত হইবেন না।" এই কথা বলিবার পর, আমার শ্বশুর মহাশয় স্বামীকে পুণায় যাইতে অনুমতি দিলেন। দ্বিতীয় দিনে যাইবার জন্য একেবারে প্রস্তুত হইলে পর, আমার স্বামীকে কাছে ডাকাইয়া ও হাত ধরিয়া খুব আবেগের সহিত অশ্রুপাত করিতে করিতে বলিলেন যে, "মাধবরাও, ডাক্তার সাহেব আমাকে সাহস দিয়াছেন কিন্তু আমি ভরসা পাই না। শীঘ্র যদি ফিরে এস ত ভালই হয়, নতুবা আর সাক্ষাৎ হবে না—এই মাত্র—তাছাড়া আমার আর কোন ভাবনা নাই। সে-সব ব্যবস্থা তুমি ঠিক্ করবে এরূপ আমার বিশ্বাস আছে। কিন্তু আমার মাথার সমস্ত বোঝা এখন তোমার মাথার উপর এসেছে এটা মনে আছে ত?" এই কথা শুনিয়া আমার স্বামী তখনই বলিলেন যে, "আপনি কোন চিন্তা করিবেন না। আমি পুত্রধর্ম্ম ছাড়িব না।" এই কথা শুনিয়া শ্বশুর মহাশয়ের মনে একটা স্নেহের আবেগ উপস্থিত হইল। তিনি আমার স্বামীকে কাছে লইয়া পিঠের উপর হাত বুলাইয়া পুণায় যাইবার অনুমতি দিলেন। পরে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ও ঘরের লোকের নিকট বিদায় লইয়া ও জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া টঙ্গাগাড়ীতে উঠিবার সময়, আমার স্বামী আমার ননদ ও মোরু মামাকে (খাণ্ডড়ী ঠাকুরাণীর ভাই) একত্র ডাকাইয়া বলিলেন যে, "ভাউসাহেবের ব্যামোটা বাড়িয়াছে তোমরা ত দেখ্‌তেই পাচ্ছ; কিন্তু মায়ের উদ্বেগের কথাই আমি বিশেষ করে' ভাবচি। তাঁর ছেলেরা এখন ছোট। তাঁর খুব যত্ন কোরো। কপিল তীর্থের দিকে পিছনের দরজায় কুলুপ লাগাবে ও মায়ের উপর খুব নজর রাখবে" ইত্যাদি বলিয়া টাঙ্গায় চড়িয়া চলিয়া গেলেন। পুণায় আসিবার পর ছুটি মঞ্জুর হইতে ছয় দিন লাগিল। সেই পর্য্যন্ত শ্বশুর মহাশয়ের শারীরিক অবস্থার কথা ডাক্তার সাহেব প্রতিদিন আমার স্বামীকে তার-যোগে জানাইতে থাকিবেন এইরূপ স্থির হইয়াছিল। তদনুসারে জানান হইত। ছুটি মঞ্জুর হইবার পর, তারে খবর আসিল, ব্যামো একটু বাড়িয়াছে। সেই দ্বিপ্রহরেই তিনি কোহ্লাপুরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন ও টাঙ্গাগাড়ীতে আস্‌বাব-আদিও উঠাইলেন। ইতিমধ্যে আর এক তার আসিল। তাহাতে শ্বশুর মহাশয়ের শোচনীয় মৃত্যু সংবাদ অবগত হইয়া অত্যন্ত শোকগ্রস্ত হইলেন এবং কোহ্লাপুরে যাইবার মৎলব রহিত করিলেন। পরে দুই এক দিনের মধ্যেই, এই সংবাদ কেরোপন্ত নানা-ভত্রে, কৃষ্ণশাস্ত্রী চিপড়ুনকর প্রভৃতির গোচরে আসিল। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোহ্লাপুরে যাইবার কথা ছিল, এখানে রহিলেন কেন?" তখন আমার স্বামী বলিলেন, "সেখানে আমার ভগিনী, দুর্গা দিদি, বালভট্‌জী, মোরুমামা ও তাঁর মা আছেন। তাঁরা সব ব্যবস্থা করবেন। এখন—পরে যে সব ব্যাপার হবে তা আমি দেখতে পারব না, আমি সইতে পারব না; এবং তা নিবারণ করাও আমার সাধ্য নয়। তাই আমার যাওয়া হল না। কেবল সংবাদ জানা অপেক্ষা, সেখানকার বাসা উঠিয়ে দিয়ে, সমস্ত পরিবারবর্গকে এখানে আনাব মনে করেছি। অর্থাৎ দুই স্থানের ভাবনা-চিন্তা করা ঠিক নয়।" এই বিষয় লইয়া ১৫ দিন কাটিয়া গেলে কোহ্লাপুরের বাসা ভাঙ্গিয়া ও শ্বশুর মহাশয়ের দেনার মধ্যে যে দুই হাজার টাকার দেনা পরিশোধ করা হয় নাই, সুদ সমেত তাহার হিসেব নিকাশ করিয়া, বাকী টাকা পরিশোধ করিবে ও কাগজ ছিঁড়িয়া ফেলিবে এইরূপ পত্র লিখিয়া এক হুণ্ডী পাঠাইয়া দিলেন। শ্বশুর-মহাশয়ের কিরূপ "খোর্চে" স্বভাব ছিল তাহা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। কোন কোন সময়ে (আমার স্বামী) টাকা পাঠাইয়া তাঁহার কর্জ্জ পরিশোধ করিয়া দিলেও তিনি কোন আত্মীয়ের প্রার্থনায় আবার কর্জ্জ করিয়া তাহাকে টাকা ধার দিয়াছেন—এরূপও হইয়াছে। দুই একবার এইরূপ হইতে দেখিয়া খুচরা দেনা ও বড় রকমের দেনার মধ্যে অধিকাংশ দিয়া ফেলিয়া, শুধু শ্বশুর মহাশয়ের বিশেষ পরিচিত এক মহাজনের ২০০০৲ টাকা দেনা বাকী রাখা হইবে আমার স্বামী এইরূপ বন্দোবস্ত করিলেন। তাহার পরিণাম ভালই হইয়াছিল। তাহার প্রথম-দেনা হওয়ায় শ্বশুর মহাশয় তাহার নিকট নূতন কর্জ্জ আর করেন নাই। সে যাক্। এইরূপ পত্র ও হুণ্ডি যাইবার পর, পত্রের লেখা অনুসারে বলভট্‌জী বাণ্টবে ও মোরু মামা ইহাঁরা দেনা পরিশোধের সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া ও বাসা উঠাইয়া সেখানকার ছেলেপিলে ও চাকর-বাকর-সহ পুণায় আসিলেন। খাণ্ডড়ী ঠাকরুণ যে দিন পুণায় আসিলেন সেই দিন হইতে আমার স্বামী এইরূপ নিয়ম করিলেন যে, সন্ধ্যাকালের আহারের পূর্ব্বে এক ঘণ্টা খাণ্ডড়ী ঠাকরুণের কামরায় বসিয়া তাঁহার সহিত ও ছেলেদের সহিত জিজ্ঞাসাবাদ করিবেন। তাঁহার অত্যন্ত শোক হওয়ায়, যাহাতে তাঁহার সান্ত্বনা হয় এরূপ কোন রকমের কথাবার্ত্তা কহিয়া তাহার পর তিনি খাইতে উঠিতেন। এইরূপ নিত্য নিয়ম শেষ পর্য্যন্ত রাখিয়াছিলেন। অন্য গ্রামে যাওয়া ব্যতীত এই নিয়মের কখন ব্যতিক্রম হয় নাই।

তদনুসারে দুই ছেলে (অর্থাৎ "আবা", "বাবা") খাণ্ডড়ী ঠাকরুণের সহিত পুণায় আসিবার পর হইতে

আমার স্বামী সেই দুই ছেলের ও আমার পাঠাভ্যাসের দিকে বেশী লক্ষ্য ও সময় দিতে লাগিলেন। আমার ও এই দুই ছেলের (ভাই) বয়সের অনুক্রম প্রায় দুই বৎসরের অন্তর হওয়ায় এবং আমার উপর আমার স্বামীর পুরাপুরি নজর থাকায়, আমরা তিনজনই আপনার ভাই বোনের মত, আনন্দে, প্রেমে, মিলিয়া-জুলিয়া কাজ করিতাম। ঘরের বয়স্ক লোকেরা, যে যতই বলুক না কেন, আমাদের জোট ভাঙ্গিত না। এই সময়ে, আমার পাঠাভ্যাস মারাঠি ৫ম ইয়ত্তা (standard) শেষ করিয়া আমি লিখিতে, পড়িতে ও হিসাব করিতে শিখিতেছিলাম এবং উভয়কেই "ভাউজী" হাই স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহাদের ইংরেজি প্রথম ইয়ত্তা শেষ করিয়া এই সময় তাঁহারা দ্বিতীয় ইয়ত্তা ধরিয়াছিলেন। তাঁহাদের দেখিয়া আমারও ইংরেজি শিখিতে খুব ইচ্ছা হইল এবং সেইজন্য একদিন আমার স্বামীর কাছে আস্তে আস্তে কথাটা পাড়িলাম। ইংরেজি শিখিবার কথা আমাকে বলিতে দেখিয়া, আমার স্বামী বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত এবং সেই সঙ্গে খুসীও হইলেন। আমাকে বলিলেন, "আমি তোমাকে ইংরেজি নিশ্চয়ই শিখাইব। কিছুদিন হইতেই আমি এই কথা মনে করিয়াছি। কিন্তু তোমার মারাঠি শিক্ষা শেষ হইলে তবে ত!" এইখানে একটা কথা বলা আবশ্যক;—আমাদের বাড়ীতে, পুরুষেরা মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো ভালবাসিতেন বলিয়া আমার শ্বশুরমহাশয় নিজে আমার ননদ ও শাশুড়ী ঠাকরুণকে লেখাপড়া ও জমাখরচের হিসাব পুরাপুরি শিখাইয়াছিলেন। এইজন্য তাঁহারা দুজনেই লেখাপড়া শেখা একটা অলঙ্কার ও একটা অহঙ্কারের বিষয় বলিয়া মনে করিতেন। আমাদের বাড়ীর পুরুষেরা মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো পছন্দ করিতেন এবং আমার ননদ ও শাশুড়ীঠাকরুণ একথা জানিতেন শুধু তাহা নহে, তাঁহাদের নিজেদের এ সম্বন্ধে সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা ছিল। ইহা সত্ত্বেও কেবল আমার শিখিবার সময় তাঁহাদের সহানুভূতি ত ছিলই না, উল্টা আরো তাঁহারা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইতেন ও টিট্‌কারী দিতেন। মনে হইত যেন আমার ননদ ও শাশুড়ী একেবারেই প্রাচীনতন্ত্রের লোক, যেন তাঁহাদের লেখাপড়ার গন্ধমাত্র নাই। এই সময়ে আমাদের বাড়ীতে স্বামীর দূরসম্পর্কীয় আট নয় জন মেয়ে ছিল। কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে আমার সমান একজনও ছিল না। সেই জন্য তাহাদের এক পৃথক দল ছিল। রোজ রাত্রে আমি দোতালার উপর গেলে পর, পড়া আরম্ভ হইত। এই সময় দক্ষিণা-প্রাইজকমিটির পুস্তক ও অন্যান্য মারাঠী পুস্তক আমার পাঠ্য হওয়ায়, যে সকল পুস্তক গদ্যাত্মক তাহা সহজে পড়িতে পারিতাম। কিন্তু পদ্যাত্মক পুস্তক হইলে তাহা পড়িতে আমার সংকোচ বোধ হইত। কারণ,—পদ, আর্য্যা, শ্লোক প্রভৃতি কিছু থাকিলে উচ্চস্বরে পড়িতে হইত। সেরকম করিয়া পাঠ করিলে, সংকোচের সহিত আস্তে আস্তে পাঠ করিলেও আমার স্বামী রাগ করিতেন; আবার যদি উচ্চ স্বরে পড়িতাম, তাহলে উপরি-উক্ত মেয়েদের মধ্যে কেহ না কেহ সিঁড়ির কাছে বা দরজার কাছে দাঁড়াইয়া থাকিত। ইহারা, এক দিন রাত্রে, আমার পড়িবার ধরণ অথবা কবিতা সুর করিয়া পাঠ করিবার ধরণ বড় মেয়েদের নিকট নকল করিয়া দেখাইত, আমাকে খোঁচা দিয়া কথা বলিত, আমাকে লজ্জা দিত। কেহ কিছু বলিলেও আমি কাহকেও উত্তর দিতাম না। কেহ কিছু বলিলে, সত্য হোক্ মিথ্যা হোক্, আমি কেবল শুনিয়া যাইতাম ও চুপ করিয়া সহিয়া থাকিতাম। কখন কখন এই সব মেয়েরা বিজ্ঞতা ও সহানুভূতির ভান করিয়া, ও আমার নিকট বসিয়া আমাকে বলিত—"এই লেখা পড়ার দরুণ বড় মেয়েদের কাছ থেকে তুমি কত লাঞ্ছনা গঞ্জনা পেয়েছ, আমাদেরও খারাপ লাগে, কিন্তু উপায় কি? দেখ, পুরুষদের যদি ভাল লাগে, এক আধবার পড়বে। কিন্তু এতে ঘরের গুরুজনদের অপমান হয় না কি? পুরুষেরা এ সব কি বোঝে? মেয়েদের সঙ্গেই আমাদের সমস্ত সময় কাটাতে হয়। পুরুষদের সঙ্গে আমাদের কতই বা সম্বন্ধ? ওরা একবার নয় দশবার বলবে! আমরা সে কথা না শুনলেই হ'ল। বিরক্ত হয়ে আপনা হতেই ছেড়ে দেবে। করা না করা কি আমাদের হাতে নেই?" সুবিধা পাইলেই, উহারা এই সব কথা আমাকে শিখাইত। তারা যে এই রকম করত—ভিতরে ভিতরে বড় মেয়েদেরও তাতে যোগ ছিল, বড় মেয়েরা তাদের পৃষ্ঠবল ছিল;—এই কথা আমার জানা থাকায় তাহাদিগকে অনুকূল কিংবা প্রতিকূল উত্তর আমি কখনই দিই নাই। আমার যাহা করিবার তাহা আমি নীরবে করিতাম। এইরূপে কয়েক মাস কাটিয়া গেলে, আমার মারাঠী পাঠাভ্যাস শেষ হইলে, আমার স্বামী ইংরেজি শিখাইতে আরম্ভ করিলেন। সেই জন্য আগেকার মত কেবল রাত্রে ও প্রভাতে আমার স্বামীর নিকট বসিয়া পাঠাভ্যাস করায় যথেষ্ট হইত না। শব্দ পাঠ করিবার জন্য, দিবসেই এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা সময় দিতে হইত। তথাপি, নীচের ঘরে বসিয়া পাঠ অভ্যাস করার সুবিধা হইত না, তাই দোতলার ঘরেই বসিতে হইত। এইজন্য আমাদের বড় মেয়েদের বড়ই গায়ের জ্বালা হইল। তাহাদের রাগ খুব বাড়িয়া উঠিল। এবং একদিন তাহারা স্পষ্ট বলিল, "দোতালায় যা ইচ্ছে তাই কর কিন্তু

আমাদের অমর্য্যাদা করলে আমরা একেবারেই সহ্য করব না।" ক্রমশঃ।

রঙ্গপুরের একখানি প্রাচীন পুথি।

আনন্দ-সভারঞ্জন চম্পূ।

(শ্রীগিরিজাকান্ত ঘোষ)

এক সময়ে 'রঙ্গপুর-কুণ্ডীর ভূম্যধিকারী ৺কাশীচন্দ্র রায়চৌধুরী ও কালীচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় ও কাকিনার ভূম্যধিকারী ৺শম্ভুচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় বাঙ্গালা সাহিত্যের অকৃত্রিম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ইঁহাদের চেষ্টায় ও পৃষ্ঠপোষকতায় বাঙ্গালা-সাহিত্যের বহুপ্রকারে শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে। * ১৮৪৭ খৃঃ অব্দে কুণ্ডীতে "রঙ্গপুর-বার্ত্তাবহ" এবং ১৮৬০ খৃঃ অব্দে কাকিনায় "রঙ্গপুর দিক্ প্রকাশ" প্রকাশিত হয়। এই সময়ে রঙ্গপুরে বহু গ্রন্থ প্রণীত ও প্রকাশিত হইয়াছে। ৺তারাশঙ্কর মৈত্র মহাশয়ের "কমল দত্তাহরণ" কাব্যও এ সময়ে সাধারণ্যে প্রচারিত হয়। বস্তুতঃ রঙ্গপুরের সাহিত্যের ইতিহাসে এই যুগ চিরস্মরণীয়—আমরা বর্ত্তমান ক্ষুদ্র প্রবন্ধে একমাত্র শম্ভুচন্দ্রের "আনন্দ-সভারঞ্জন" চম্পূ গ্রন্থের পরিচয় প্রদান করিব। বর্ত্তমান ক্ষুদ্র প্রবন্ধে, রঙ্গপুরের আধুনিক সাহিত্যের এই প্রথম যুগের বিস্তৃত আলোচনা সম্ভবপর নহে; আমরা আজ সে চেষ্টা করিব না।

শম্ভুচন্দ্র শুধু লক্ষ্মীর বরপুত্র বা ফাঁকা সাহিত্যসেবী নহেন। তিনি তত্ত্ববিষয়ে কবি ও লেখক। তাঁহার "আনন্দ-সভারঞ্জন চম্পূই" আমাদের এ কথার সাক্ষ্যপ্রদান করিবে। প্রায় ৬২ বৎসর কাল পূর্ব্বে ১৭৭৭ শকে ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহা এখন দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে। যাঁহারা শম্ভুচন্দ্রের সাহিত্যিক স্মৃতি-রক্ষার প্রয়াসী, আশা করি, তাঁহারা ইহার পুনঃপ্রচারে সচেষ্ট হইবেন।

আনন্দ-সভারঞ্জন চম্পূকাব্য; ইহাতে কএকটী বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও উর্দ্দু কবিতা এবং বাঙ্গালায় দুইটী প্রস্তাব আছে। রঙ্গপুর ভূম্যধিকারী সভার নিকট আনন্দ-সভার সম্পাদকের প্রেরিত বিজ্ঞাপন বা প্রস্তাবটী অন্যত্র উদ্ধৃত হইল।

বাঙ্গালা-অক্ষরে উর্দ্দু-প্রচলনের প্রস্তাবটী আপাততঃ উদ্ধৃত হইল না। এক্ষণে এ বিষয়ে কোন কোন মুসলমান লেখকেরও সাগ্রহ দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। † তাঁহারা শম্ভুচন্দ্রের এই প্রবন্ধটী সংগ্রহ করিয়া পড়িয়া দেখিতে পারেন।

আজকাল কোন কোন রাজা বা মহারাজকেও সাহিত্যক্ষেত্রে দেখিতেছি; কিন্তু ৬২ বৎসর পূর্ব্বে কাকিনার মত এরূপ বিস্তীর্ণ জমিদারীর স্বত্বাধিকারী শম্ভুচন্দ্র তিনটী ভাষায় স্বচ্ছন্দক্রমে লেখনী সঞ্চালন করিয়া গিয়াছেন, এ কথা মনে করিতেও আনন্দ হয়।

গ্রন্থ-পরিচয়

আলোচ্য গ্রন্থের প্রচ্ছদপটে (coverএ) আমরা এই গ্রন্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার এইরূপ পরিচয় পাইতেছি:—

আনন্দ-সভারঞ্জন চম্পূ।
শ্রীশম্ভুচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক
কলিকাতা।
তত্ত্ববোধিনী সভার যন্ত্রে মুদ্রিত
ভাদ্র, ১৭৭৭।

গ্রন্থখানির আকার ক্রাউন, অষ্টাংশিত, ১১০ পৃষ্ঠা। সম্ভবতঃ শম্ভুচন্দ্রের পূর্ব্বে, মফঃস্বলের আর কোনও ভূম্যধিকারী সাহিত্যে তাঁহার ন্যায় প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে পারেন নাই।

বর্ণনীয় বিষয়

এই প্রাচীন গ্রন্থে কি কি বিষয় আলোচিত হইয়াছে, কোন কোন পাঠকের তাহা জানিতে কৌতূহল জন্মিতে পারে। ইঁহাদের কৌতূহল-পরিতৃপ্তির উদ্দেশ্যে এস্থলে আমরা ইহার বিষয়-সূচী তুলিয়া দিলাম।

বিষয়-সূচী।

পৃষ্ঠা।	বিষয়।
৩—২৮	"নিকুঞ্জ সংহার প্রার্থনা
২৮—৪০	জ্ঞান-হিতোপদেশ

* 'নাটুকে' রামনারায়ণ তর্করত্নের "কুলীন, কুল-সর্ব্বস্ব" নাটক (কাহারও কাহারও মতে, ইহাই বাঙ্গালা-ভাষার আদি নাটক) কালীচন্দ্রের প্ররোচনায় লিখিত ও মুদ্রিত। ইঁহারই প্রস্তাবে রঙ্গলালের "পদ্মিনীর উপাখ্যানের"ও সৃষ্টি।

† ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকির প্রবন্ধ—"বঙ্গাক্ষরের সাহায্যে আরবী ও পার্শী ভাষার শব্দ ও অক্ষরের উচ্চারণ ও লিখনপ্রণালী (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, চৈত্র, ১৩২৩।)

৪০—৫৫	শচীন্দ্র কাব্য
৫৫—৬০	অথ বারাণসী দেওয়ালী
৬৩—৮৭	আগরার তাজমহল রৌজা
৮৭—৮৮	যমুনার নহরের সংক্ষেপ
৮৮—৯২	রুড়কী ও হরিদ্বারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
৯৩—	আত্মপ্রসাদ ১ পাঠ
৯৪—৯৫	,, ২ পাঠ জনজলে খাঁ
৯৫	উর্দ্দু সায়ের ১ পাঠ
৯৬	ঐ ২ পাঠ
৯৬	গায়ের দোহরা
৯৬—৯৯	সংস্কৃত বসন্ত কাশিকা
৯৯—১০১	অথ শরৎ কাশিকা
১০১—১০৩	রঙ্গপুর ভূম্যধিকারি সভায় আনন্দ সভা সম্পাদকের প্রশ্ন
১০৩—১০৬	সাধারণের মহদুপকারক বিজ্ঞাপন।
১০৬—১১০	অথ তত্ত্বসঙ্গীত।”

শম্ভুচন্দ্র স্বয়ং লেখক ছিলেন; সুতরাং সাহিত্যে তাঁহার এই স্বাভাবিকী অনুরক্তির ফলে তিনি নয় জন প্রতিভাশালী লেখককে লইয়া একটী “নব-রত্ন-সভার” সৃষ্টি করেন। এই সকল লেখকদের প্রায় সকলেই নানা গ্রন্থ লিখিয়া সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রভূত প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। এস্থলে ‘কজলাক্ষ কাব্য’ ‘কমল দত্তাহরণ কাব্য, ‘বোধেলা রহস্য’ নাটক প্রভৃতি বহু গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা এখন ইঁহাদিগকে ক্রমেই ভুলিয়া যাইতেছি।

এই গ্রন্থে গ্রন্থকর্ত্তার এইরূপ বংশ-পরিচয় রহিয়াছে :—

গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়

“জেলা রঙ্গপুর অতি রঙ্গপুরধাম।
তার অন্তর্গত গ্রাম কাকিনীয়া নাম॥
তথায় ভূম্যধিকারী নাম রুদ্র রায়।
ছিলেন ধার্ম্মিক তিনি মহাতপস্যায়॥
তাঁহার প্রথম পক্ষে তৃতীয় কুমার।
ঈশ্বর ভৈরবচন্দ্র ঈশ্বর প্রচার॥
শিবলোকে গেলা তিনি রাখি সুতদ্বয়।
জ্যেষ্ঠ শ্রীল কালীচন্দ্র রায় মহাশয়॥
কনিষ্ঠ শ্রীশম্ভুচন্দ্র রসজ্ঞ নায়ক।
ঈশ্বর ইচ্ছায় যার রচিত পুস্তক॥”

এই গ্রন্থখানি কি উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছে, কোন কোন পাঠক তাহাও জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। এই জিজ্ঞাস্য প্রশ্নেরও উত্তর আলোচ্য গ্রন্থে রহিয়াছে। যথা—

গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য

“আনন্দ-সভার সন্তোষ কারণ
শম্ভুনগরীতে শম্ভুর রচন।” (৫৪ পৃঃ)

এই আনন্দ-সভা ছিল—৺বারাণসী ধামে; শম্ভুনগরী সম্ভবতঃ—কাকিনার নামান্তর।

গ্রন্থকারের রাজভক্তি প্রশংসনীয়। তিনি প্রার্থনা লিখিয়াছেন—

“জয় হৌক, কোম্পানীর রাজ্য হৌক অবিনাশী,
সুখে প্রজা হৌক বাসী আমি এই অভিলাষী,”
(৮৮ পৃঃ)।

এই প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে, এই ভূম্যধিকারী-কবি একটী পংক্তিতে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের কেমন সন্ধান দিয়াছেন, পাঠক তাহা শুনিয়া রাখুন।

‘যে তুমি সে’ আমি ভূমা একাকার’ (৯৫ পৃঃ) ইহাতে উপনিষদের “যো বৈ ভূমা, তৎসুখম্, নাল্পে সুখমস্তি” কথাটা স্মরণ হয় না কি?

এক্ষণে শম্ভুচন্দ্রের গদ্য-রচনার নমুনা দেখাইয়া বিদায় গ্রহণ করিব। বারান্তরে আমরা শম্ভুচন্দ্রের সংস্কৃত ও উর্দ্দু কবিতা পাঠকবর্গকে উপহার প্রদান করিতে সচেষ্ট হইব।

রঙ্গপুর-ভূম্যধিকারী সভা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনেরও এক বৎসরের বয়ো জ্যেষ্ঠ। শম্ভুচন্দ্র * ইহার অন্যতর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি বারাণসীর আনন্দ-সভারও সম্পাদক ছিলেন। আনন্দ-সভার সম্পাদকরূপে তিনি রঙ্গপুর ভূম্যধিকারী সভায় কতিপয় প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলেন। প্রধানতঃ রঙ্গপুরে কএকটী নূতন শ্রম-শিল্প-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই তিনি এরূপ প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন। পাঠক লক্ষ্য করিবেন, ইহাতে তিনি তাঁহার বৈষয়িক সূক্ষ্মবুদ্ধিরও কিরূপ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

* রঙ্গপুর জমিদার-সভার সভাপতি ছিলেন—কুণ্ডীর সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী রাজমোহন রায়চৌধুরী। কাশীচন্দ্র ও কালীচন্দ্র তাঁহারই বংশধর। রাজেন্দ্র ভট্টাচার্য্য এই সভার বেতনভোগী সম্পাদক ছিলেন। সভার ব্যয়ে সম্পাদক রাজেন্দ্র ভট্টাচার্য্যের কএকখানা গ্রন্থও প্রকাশিত হইয়াছিল।

আনন্দ-সভারঞ্জন চম্পূ

বিজ্ঞাপন।

"স্বদেশের উন্নতি ও সাধারণের মহদুপকার-কল্পে যে সকল আলোচনা হয় তন্মধ্যে দুইটী প্রস্তাব উত্তম যাহা রঙ্গপুর ভূম্যধিকারী সভায় প্রশ্নপঞ্চকরূপে ও সাধারণের মহদুপকারক বিজ্ঞাপন নামে পরিণ্যস্ত হইয়াছে।

১ প্রশ্ন—উক্ত সভার উদ্যোগে অত্র কাশীধাম হইতে কথকগুলিন ছত্র তারাশ অর্থাৎ পাতরের কারিগরকে স্ত্রী পুত্রাদি সমভিব্যাহারে স্বদেশে বাটি ঘর করিয়া দিয়া স্থায়ী করান যায় ও তাহাদিগের বংশপরম্পরা স্ব ব্যবসায় ভিন্ন অন্য কর্ম্ম করিতে না পারে এ বিষয়ে মনোযোগ রাখা যায়, এবং নৈকট্য কড়ইবাড়ি গোয়ালপাড়া প্রভৃতির পর্ব্বত হইতে প্রস্তর আনয়নের বাধ রহিতের বিশেষ এক নিয়ম ধার্য্য করিয়া যদ্যপি অবিরোধ প্রস্তর আনয়ন করা যায় তাহা হইলে শীল পাটা চন্দন পাটা খোরাখুরি খাদা পরতঃ পর এমারৎ তৈয়ারির বিবিধ সরঞ্জাম অর্থাৎ ঢাকা কোমরবন্দি উভক তরঙ্গীব স্তম্ভ রেল তকীয়া বরঙ্গা সীল্লি প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া দেশের মঙ্গল হইতে পারে কিনা।

২ প্রশ্ন—ঐ উদ্‌যোগে কাশ্যাদি অঞ্চল হইতে কথকগুলিন কারচবি জেলাহা অর্থাৎ জরির কারিকরকে উক্ত নিয়মে স্বদেশে যদি বশতী করান যায় ও এথা হইতে বিশেষ নিয়ম দ্বারা সল্‌মা চুম্‌কি বাদ্‌লা ছেতার কলাবতু প্রভৃতি অবিরোধে তথায় পৌছার বিশেষ এক নিয়ম হয় তবে দেশের উপকার দর্শিতে পারে কি না।

৩ প্রশ্ন—ঐ উদ্যোগে ঐ প্রকারে যদি এ প্রদেশ হইতে কথকগুলিন গড়রিয়া অর্থাৎ কম্বল প্রস্তুতের কারিকরকে কথিত নিয়মে স্বদেশে বশতী করান যায় ও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গেই কথকগুলিন দীর্ঘপুচ্ছ ভেড়ি প্রেরিত ও প্রতিপালিত হইতে থাকে তাহা হইলে নানা প্রকার কম্বল প্রচুররূপে প্রস্তুত হইয়া সাধারণের উপকার হইয়া দেশের মঙ্গল দর্শিতে পারে কিনা।

৪ প্রশ্ন—ঐ উদ্যোগে স্বদেশ হইতে রাঢ়ি বারেন্দ্র মৈথিল শ্রেণীর কতিপয় ব্রাহ্মণ বালককে গ্রাসাচ্ছাদনের বিশেষ এক নিয়ম পূর্ব্বক এথা হইতে বেদান্ত ও উপনিষৎ প্রভৃতি অধ্যয়ন করাইয়া যদি স্বদেশে নীত হয়, তবে অবিদ্যা বিনাশ হইয়া অন্যান্য বিদ্যার পোষকতা হইতে পারে কিনা।

৫ম প্রশ্ন—রঙ্গপুর ভূম্যধিকারি মহাশয়দিগের মধ্যে অবয়প্রাপ্ত ভূম্যধিকারিদিগের বয়প্রাপ্ত পর্য্যন্ত সেই সেই ভূমি বিত্ত রক্ষণাবেক্ষণ নিমিত্ত অন্য কোন নিয়ম অর্থাৎ অবোধ স্ত্রীলোকের হস্তে নিঃক্ষেপ কিম্বা লিখনি জীবিকা বিশিষ্ট দেওয়ান মোক্তার প্রভৃতি এক ব্যক্তি মাত্রকে কদিম চাকর জ্ঞানে উছি অস্থে বিত্তের নানা বিশৃঙ্খলতার বীজ রোপণ না করিয়া এবং কোন ভূম্যাধিকারি ঋণ পরিশোধ বা অন্য কোন কারণ বশতঃ আপন ভূমি বিত্ত যাহারা অপরকে ইজারা বা অন্য কোন নিয়মে গচ্ছিত রাখিয়া থাকেন, তাহারা তাহা না করিয়া যদি উক্ত সভার সভ্যগণের প্রকাশ্য শাসনাধীনে রাখেন তাহা হইলে পরস্পর বান্ধবতা ও আত্মিয়তা বৃদ্ধি পাইয়া দেশের বিদ্বেষভাব দূর হইয়া সৌভাগ্য জন্মিতে পারে কি না।"

প্রশ্নকর্ত্তা এই প্রশ্নপঞ্চকের কোন উত্তর পাইয়াছিলেন কি না অথবা ইহাতে কোন ফল দাঁড়াইয়াছিল কি না, আমরা তাহা জানিতে পারি নাই। পক্ষান্তরে এই সময়ে রঙ্গপুরের একজন ভূম্যধিকারী কি কি বিষয়ে রঙ্গপুরের অভাব অনুভব করিয়াছেন, পাঠক ইহাতে তাহারও আভাস পাইবেন।

আমরা বারান্তরে শম্ভুচন্দ্রের বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও উর্দ্দু কবিতা উদ্ধৃত করিয়া সম্যক্ কাব্য-পরিচয় এবং সেই সময়ের রঙ্গপুরের সাহিত্যের বিশেষতঃ কাকিনার সাহিত্যের বিবরণ প্রদান করিতে সচেষ্ট হইব।

বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত—

গীতা-রহস্য।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদিত।)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

দ্বিতীয় প্রকরণ।

কর্ম্ম জিজ্ঞাসা।

"কিং কর্ম্ম কি মকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতা।"*

গীতা ৩. ১৬.

ভগবদ্‌গীতার আরম্ভে, ধর্ম্মের দুই পরস্পর-বিরুদ্ধ কাঁইচীর মধ্যে আসিয়া পড়ায় কর্ত্তব্যবিমূঢ়

* কর্ম্ম কোন্‌টি এবং অকর্ম্ম কোন্‌টি এই সম্বন্ধে পণ্ডিতদিগেরও মোহ হইয়া থাকে।" এই স্থলে অকর্ম্ম শব্দ 'কর্ম্মের অভাব' ও 'মন্দ কর্ম্ম' এই দুই অর্থেই গ্রহণ করিতে হইবে। মূল শ্লোক সম্বন্ধে আমার টীকা দেখ।

অর্জ্জুনের মনে যে চিন্তা উপস্থিত হইয়াছিল তাহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। যাহারা সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া, সংসার ত্যাগ করিয়া বনে গমন করে, যাহারা আত্মম্ভরী, সেই সব লোকের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু সমাজে থাকিয়া যে সকল শ্রদ্ধাভাজন ধীর কর্ত্তাপুরুষ, স্বকীয় সাংসারিক কর্ত্তব্য সকল যথা-ধর্ম্ম ও যথানীতি সম্পাদন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মনেও এইরূপ চিন্তা অনেক সময় উপস্থিত হইয়া থাকে। অর্জ্জুনের কর্ত্তব্যজিজ্ঞাসা ও মোহ যুদ্ধারম্ভে হইয়াছিল। পরে, যুদ্ধে নিহত অনেক আত্মীয়ের শ্রাদ্ধ করিবার সময় উপস্থিত হইলে যুধিষ্ঠিরেরও এইরূপ মোহ উৎপন্ন হয়। ঐ মোহ নিবৃত্তি করিবার জন্যই 'শান্তিপর্ব্ব' কথিত হইয়াছে। অধিক কি, কর্ম্মাকর্ম্ম-সংশয়ের এইরূপ প্রসঙ্গ খুঁজিয়া বাহির করিয়া কিংবা কল্পনা করিয়া সেই বিষয়ে বড় বড় কবিরা সুরস কাব্য বা উত্তম নাটকাদি রচনা করিয়াছেন। যেমন মনে কর, প্রসিদ্ধ ইংরেজ নাটককার শেক্‌সপীয়রের হেম্‌লেট-নামক নাটক। ডেন্‌মার্ক দেশের প্রাচীন রাজপুত্র হেমলেটের খুল্লতাত, আপন ভাইকে—ডেন-মার্কের রাজাকে অর্থাৎ হেম্‌লেটের পিতাকে—খুন করিয়া ও হেমলেটের মাতার সহিত পুনর্ব্বিবাহ করিয়া, সিংহাসন পর্য্যন্ত দখল করিয়াছিলেন। তখন এইরূপ পাপাচারী খুল্লতাতকে হত্যা করিয়া পুত্রধর্ম্মানুসারে পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইবে, কিম্বা মায়ের দ্বিতীয় বিবাহ সম্পর্কে বাপ বলিয়া ও সিংহাসনের দখলকারী রাজা বলিয়া তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিবে, এই সংশয়-মোহে পড়িয়া তরুণ হেমলেটের মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল এবং শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় যোগ্য পথপ্রদর্শক ও পৃষ্ঠপোষক কেহ না থাকায় উন্মাদগ্রস্ত হইয়া শেষে "বাঁচিয়া থাকা, কি না থাকা" এইরূপ বিচার বিবেচনার পর হেম্‌লেটের কি পরিণাম হইয়াছিল, এই নাটকে তাহার চিত্র উৎকৃষ্টরূপে রঞ্জিত হইয়াছে। 'কোরায়লেনস্' নামক আর-এক নাটকেও এই প্রকারের আর এক প্রসঙ্গ শেক্‌সপীয়ার বর্ণনা করিয়াছেন। কোরায়লেনস্ নামক বীরপুরুষ, এক রোমক সর্দ্দারকে রোম-নগরের লোকেরা নগর হইতে নির্ব্বাসিত করায়, সেই রোমক বীর রোমনগরের শত্রুদিগের সহিত গিয়া মিলিয়াছিলেন, এবং "তোমাদিগকে আমি কখনই পরিত্যাগ করিব না" এইরূপ তিনি তাহাদিগের নিকট অঙ্গীকার করেন। কিয়ৎকাল পরে এই শত্রুদিগের সাহায্যে রোমান্ লোকদিগের উপর আক্রমণ করিয়া, দেশ জয় করিতে করিতে অবশেষে একেবারে রোম নগরের দরজার সামনে তাঁহার শিবির স্থাপন করিলেন। তখন, রোম-নগরের রমণীগণ কোরায়লেনসের স্ত্রী ও মাতাকে তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া, মাতৃভূমি সম্বন্ধে তাঁহার কর্ত্তব্য কি সেই বিষয় তাঁহাকে উপদেশ দিলেন এবং রোমান-লোকদিগের শত্রুর সমীপে তিনি যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই অঙ্গীকার-বাক্য ভাঙ্গাইয়া দিলেন। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের সংশয়-মোহে পতিত হইবার এইরূপ দৃষ্টান্ত জগতের প্রাচীন কিংবা অর্ব্বাচীন ইতিহাসে অনেক আছে। কিন্তু এত দূরে যাইবার আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। আমাদের মহাভারত গ্রন্থই এইরূপ প্রসঙ্গের এক খনি বলিলেও হয়। গ্রন্থারম্ভে ভারতের বর্ণনা করিতে করিতে স্বয়ং ব্যাস "সূক্ষ্মার্থ ন্যায় যুক্ত," "অনেকসময়ান্বিত," তাহার এইরূপ বিশেষণ দিয়া, তাহাতে সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, ও মোক্ষশাস্ত্র আছে শুধু নয়,—এই সকল শাস্ত্র সম্বন্ধে "যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি নতৎক্বচিৎ"—ইহাতে যাহা আছে তাহা অন্যত্রও আছে, এবং ইহাতে যাহা নাই তাহা অন্য কোথাও নাই (আ. ৬২, ৫৩)—এইরূপ মহাভারতের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। অধিক কি, সংসারের অনেক কঠিন প্রসঙ্গ প্রাচীন মহাত্মা পুরুষেরা কিরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, ইহা সুবোধ্য কাহিনীর আকারে, সামান্য লোকদিগের বোধ সৌকর্য্যার্থে, ভারত 'মহা-ভারতে' পরিণত হইয়াছে। নচেৎ কেবল ভারতীয় যুদ্ধের কিংবা 'জয়' নামক ইতিহাসের বর্ণনা করিবার জন্য আঠারো পর্ব্ববিবৃত করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না।

কেহ এইরূপ প্রশ্ন করিতে পারে, শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের কথা ছাড়িয়া দেও; কিন্তু তোমার-আমার এতটা গভীর জলে প্রবেশ করিবার দরকারটা কি? মনু প্রভৃতি স্মৃতিকারেরা আপন-আপন গ্রন্থে, মনুষ্যেরা সংসারে কিরূপভাবে

চলিবে এই বিষয়ে স্পষ্ট নিয়ম নির্দ্দেশ করিয়া দেন নাই কি? কাহারো হিংসা করিবে না, প্রাণ-নাশ করিবে না, নীতিরক্ষা করিয়া চলিবে, সত্য বলিবে, গুরুজনদিগকে সম্মান করিবে, চুরি কিংবা ব্যভিচার করিবে না, প্রভৃতি সর্ব্বধর্ম্মের সাধারণ নিয়মগুলি সকলে যদি পালন করে, তাহা হইলে তোমার এই গোলযোগের মধ্যে পড়িবার কারণ কি? কিন্তু উল্টা এইরূপ বিচার করা যাইতেও পারে যে, জগতের যাবতীয় লোক যে পর্য্যন্ত না এই নিয়মানুসারে চলে সেই পর্য্যন্ত সজ্জনেরা সদা-চরণের দ্বারা দুষ্ট লোকদিগের জালে আপনা-দিগকে জড়াইয়া ফেলিবেন, না, তাহার প্রতি-কারার্থ যে প্রকারেই হউক আপনাদিগকে রক্ষা করিবেন? তাছাড়া, এই সাধারণ নিয়মগুলিকে নিত্য ও প্রামাণিক বলিয়া মানিয়া লইলেও, অনেক সময় কর্ত্তাপুরুষের সম্মুখে এইরূপ প্রসঙ্গও আসিয়া পড়ে যে স্থলে এই সাধারণ নিয়মগুলির মধ্যে দুই কিংবা ততোধিক নিয়ম একসঙ্গে একই সময়ে আমরা প্রাপ্ত হই। এবং তখন "এ-টা করিব কি ও-টা করিব" এইরূপ বিচারের মধ্যে পড়িয়া মানুষ পাগল হইয়া যায়। অর্জ্জুনের অবস্থা এইরূপই হইয়াছিল।

কিন্তু অর্জ্জুন ব্যতীত অন্য মহৎ ব্যক্তির নিকটেও এইরূপ কঠিন সমস্যা উপস্থিত হইয়া থাকে,—এই সম্বন্ধে মহাভারতের অনেক স্থানে মর্ম্মস্পর্শী বিচার আলোচনা আছে। তাহার দৃষ্টান্ত—মনু, সর্ব্ববর্ণের পক্ষে সাধারণ বলিয়া যাহা বলিয়াছেন "অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ"—অহিংসা সত্য, অস্তেয়, কায়মনোবাক্যের শুদ্ধতা ও ইন্দ্রিয় নিগ্রহ (মনু ১০-৬৩) এই সনাতন নীতিধর্ম্মগুলির মধ্যে অহিংসার কথাটাই ধরা যাক্। "অহিংসা পরমো-ধর্ম্মঃ" (সভা, আ, ১১, ১৩) এই তত্ত্বটি আমাদের বৈদিক ধর্ম্মের মধ্যে নাই, কিন্তু অন্য সকল ধর্ম্মের মধ্যেই ইহা মুখ্যরূপে পরিগণিত হইয়াছে। বৌদ্ধ ও খৃষ্টানদিগের ধর্ম্মগ্রন্থে যে সকল আদেশ আছে তন্মধ্যে "হিংসা করিবে না," এই আদেশ বচনটিকে মনুর মতই প্রথম স্থান দেওয়া হইয়াছে। হিংসা অর্থাৎ শুধু জীব-হত্যা নহে,—অন্য প্রাণীদের মনে কিংবা শরীরে কষ্ট দেওয়াও এই হিংসার ভিতরে ধরা যায়। সুতরাং অহিংসা অর্থে, কোন সচেতন প্রাণীকে কোন প্রকার দুঃখ না দেওয়া বুঝায়। পিতৃ-হত্যা, মাতৃ-হত্যা, নর-হত্যা এই সকল হিংসা জগতের সকল লোকেরই মতে বড় রকমের হিংসা হওয়ায়, সকল ধর্ম্মের মধ্যেই এই সকল হিংসাকেই প্রধান স্থান দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু মনে কর, আমার প্রাণ নাশ করিবার জন্য, কিংবা আমার পত্নী বা কন্যার উপর বলাৎকার করিবার জন্য, অথবা আমার ঘরে আগুন লাগাইবার জন্য, অথবা আমার সমস্ত ধনসম্পত্তি, স্থাবর অস্থাবর সমস্ত হরণ করিবার জন্য কোন দুষ্ট মনুষ্য হাতে অস্ত্রশস্ত্র লইয়া সুস-জ্জিত এবং নিকটে পরিত্রাতা লোক কেহই নাই, তখন এইরূপ 'আততায়ী' মনুষ্যকে আমরা কি "অহিংসা পরমো ধর্ম্ম" বলিয়া চক্ষু বুজিয়া উপেক্ষা করিব? না—এই দুষ্ট লোককে—সাম-উপচারের কথা যদি না শুনে—যথাশক্তি শাসন করিব? মনু বলেন—

গুরুং বা বালবৃদ্ধৌ বা ব্রাহ্মণং বা বহুশ্রুতম্।
আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্॥

"এইরূপ আততায়ী অর্থাৎ দুষ্ট মনুষ্যকে—সে গুরুই হউক, মা-ই হউক, ছেলেই হউক, বা বিদ্বান্ ব্রাহ্মণই হউক, সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া, নিশ্চয়ই বধ করিবে!" কারণ, এইরূপ স্থলে, হত্যার পাপ হত্যাকারীকে স্পর্শ করে না, আততায়ী নিজের অধর্ম্মাচরণেই নিহত হয়, এইরূপ শাস্ত্রকারেরা বলেন (মনু ৮, ৩৫০)। শুধু মনু নহে, অর্ব্বাচীন ফৌজ-দারী আইনও আত্মরক্ষণ অধিকারের একটা সীমা নির্দ্দেশ করিয়া ইহা স্বীকার করিয়াছে। এইরূপ প্রসঙ্গে, অহিংসা অপেক্ষা আত্মসংরক্ষণের ঔচিত্যই সমধিক বুঝিতে হইবে। ভ্রূণ-হত্যা সকলেই অতি গর্হিত বলিয়া স্বীকার করে; কিন্তু গর্ভে আট্‌কাইয়া গেলে উহা কাটিয়া বাহির করা হয় না কি? যজ্ঞে পশুবধ প্রশস্ত বলিয়া বেদও স্বীকার করেন (মনু ৫-৩১); তথাপি পিষ্ট পশু নির্ম্মাণ করিয়া তাহাও এক সময় এড়াইতে পারা যায় (সভা, শাং, ৩৩৭) কিন্তু বায়ু, জল, ফল প্রভৃতি সর্ব্বস্থান ছোট ছোট ক্ষুদ্র জীবে যে ভরিয়া আছে, তাহাদের হত্যা কিরূপে বন্ধ হইবে? মহাভারতে (শাং ৭৫, ১৬) অর্জ্জুন বলিতেছেন:—

সূক্ষ্মযোনীনি ভূতানি তর্কগম্যানি কানিচিৎ।
পক্ষ্মনোঽপি নিপাতেন যেষাং স্যাৎ স্কন্ধপর্য্যয়ঃ॥

"চক্ষে না দেখিতে পাইলেও তর্কের দ্বারা যাহার অস্তিত্ব বুঝা যায় এইরূপ সূক্ষ্ম জীবে জগৎ এতটা ভরিয়া আছে যে, আমরা আমাদের চোখের পাতা ফেলিলেও এই সকল জীবের হাত পা ভাঙ্গিয়া যায়!" অতএব হিংসা করিবে না, এই কথা শুধু মুখে বলিলে কি ফল হইবে? এইরূপ সারাসার বিচার করিয়া মৃগয়ার অনুশাসন পর্ব্বে (অনু, ১১৬) ইহারই সমর্থন করা হইয়াছে। বনপর্ব্বে এইরূপ কাহিনী আছে যে, এক ব্রাহ্মণ ক্রোধের দ্বারা কোন পতিব্রতা রমণীকে ভস্ম করিতে উদ্যত হইয়া যখন নিষ্ফলপ্রযত্ন হইলেন, তখন তিনি সেই রমণীর শরণাপন্ন হইলেন; তাহার পর, ধর্ম্মের প্রকৃত রহস্য বুঝাইবার জন্য ঐ রমণী উক্ত ব্রাহ্মণকে এক ব্যাধের নিকট পাঠাইলেন। ঐ ব্যাধ মাংস বিক্রয় করিত ও পরম মাতৃ-পিতৃ ভক্ত ছিল। ব্যাধের এই ব্যবসায় দেখিয়া ব্রাহ্মণের অত্যন্ত বিস্ময় ও খেদ উপস্থিত হইল। তখন ব্যাধ অহিংসার প্রকৃত তত্ত্ব তাঁহাকে বলিয়া তাঁহার জ্ঞান সম্পাদন করিল! জগতের মধ্যে কে কাকে না খায়? "জীবো জীবস্য জীবনম্" (ভাগ, ১, ১৩, ৪৬) এই ব্যবহার নিত্য চলিতেছে; আপৎকালে "প্রাণস্যান্নমিদং সর্ব্বম্"—ইহা শুধু স্মৃতিকারগণই যে বলেন তাহা নহে (মনু ৫, ১৮; সভা, শাং ১৫, ২১), ইহা উপনিষদের মধ্যেও স্পষ্ট কথিত হইয়াছে (বেসু, ৩, ৪, ১৮; ছাং ৫, ১, ১; বৃ, ৬, ১, ১৪)। সকলেই হিংসা ছাড়িয়া দিলে ক্ষাত্রধর্ম্ম কিরূপে থাকিবে? এবং ক্ষাত্রধর্ম্ম চলিয়া গেলে প্রজাদিগের পরিত্রাতার বিনাশ ঘটিয়া, যে-যাহাকে-ইচ্ছা খাইয়া ফেলিবে, এইরূপ অবস্থা দাঁড়াইবে। সার-কথা, নীতির সাধারণ নিয়মের দ্বারা সব সময়ে কর্ম্মের বিভাগ হয় না; নীতিশাস্ত্রের মুখ্য নিয়ম যে অহিংসার নিয়ম সেই অহিংসার নিয়মেতেও কর্ত্তব্য-কর্ত্তব্যের তারতম্যের বিচার বর্জ্জিত হয় না।

যেমন অহিংসা ধর্ম্ম তেমনি ক্ষমা, শান্তি দয়া—এই সকল গুণও শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। কিন্তু সর্ব্ব স্থানে এই শান্তি কিরূপে রক্ষিত হইবে? নিয়ত যাঁহারা শান্তি অবলম্বন করিয়া থাকে তাহাদের স্ত্রী পুত্রাদিকেও ইতর লোকেরা প্রকাশ্যভাবে নিশ্চয়ই হরণ করে—এইরূপ কারণ প্রথমে দেখাইয়া, প্রহ্লাদ আপন নাতিকে অর্থাৎ বলিকে—এইরূপ বলিতেছেন:—

ন শ্রেয়ো সততং তেজো ন নিত্যং শ্রেয়সী ক্ষমা।

* * *

তস্মান্নিত্যং ক্ষমা তাত পণ্ডিতৈরপবাদিতা॥

অর্থাৎ নিয়ত তেজস্বিতা ও নিয়ত ক্ষমা শ্রেয়স্কর হয় না। এইজন্যই জ্ঞানীরা ক্ষমার অপবাদ করিয়াছেন" (বন, ২৮, ৬৮)। অনন্তর, ক্ষমার যোগ্য কতকগুলি প্রসঙ্গের মধ্যে একটি প্রসঙ্গ প্রহ্লাদ বিবৃত করিলেন। তথাপি, যোগ্যপ্রসঙ্গ বুঝিতে না পারিয়া যদি কেহ অপবাদের প্রসঙ্গেরই প্রয়োগ করে, তাহা হইলে তাহার সেই আচরণ দুর্নীতির আচরণ হয়। অতএব, এই যোগ্য প্রসঙ্গ কিরূপে নির্ণয় করা যাইতে পারে, তাহার তত্ত্বটি বুঝিয়া লওয়া খুবই আবশ্যক।

সকল দেশের ও সকল ধর্ম্মের আবালবৃদ্ধবনিতা, অপর যে তত্ত্বটিকে সর্ব্বোপরি প্রামাণিক বলিয়া মান্য করে—সেটি 'সত্য'। সত্যের মাহাত্ম্য কি আর বর্ণনা করিব? সমস্ত সৃষ্টি উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে 'ঋত' ও 'সত্য' উৎপন্ন হয়। সেই সত্যেতেই আকাশ, পৃথ্বী, বায়ু প্রভৃতি পঞ্চমহাভূতও আবৃত ও ধৃত হইয়া আছে,—এইরূপ দেবতারা সত্যের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। "ঋতং চ সত্যং চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত" (ঋ, ১০, ১৯০, ১), "সত্যেনোত্তভিতা ভূমিঃ" (ঋ, ১০, ১৮৫, ১), ইত্যাদি মন্ত্র দেখ। 'সত্য' এই শব্দের ধাতুর্থও 'হওয়া' অর্থাৎ "কখনই বিনাশ হইবার নহে" অথবা "যাহা ত্রিকালে অবাধিতভাবে থাকে"—এইরূপ; সুতরাং "সত্যাপরতা নাহি ধর্ম্ম। সত্য তেঁচি পরব্রহ্ম।" (সত্যপরতা অপেক্ষা ধর্ম্ম নাই, সত্যই পরব্রহ্ম) এইরূপ সত্যের প্রকৃত মহিমা বর্ণিত হইয়াছে। "নাস্তি সত্যাৎপরোধর্ম্মঃ" (শাং, ১৬২, ২৪), এই বচন মহাভারতের অনেক স্থানে পাওয়া যায় এবং এইরূপ কথিত হইয়াছে যে—

অশ্বমেধসহস্রং চ সত্যং চ তুলয়া ধৃতম্।
অশ্বমেধ সহস্রাদ্ধি সত্যমেব বিশিষ্যতে॥

"হাজার অশ্বমেধ ও সত্য এই উভয়ের তৌল করিলে সত্যেরই গুরুত্ব উপলব্ধি হয়"—(আ, ৭৪, ১০২)। সাধারণ সত্য সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা আছে।

সত্য কথা বলিবার সম্বন্ধে মনু বিশেষ করিয়া আরও এই কথা বলেন :—

বাচ্যর্থা নিয়তাঃ সর্ব্বে বাঙ্‌মূলা বাগ্‌বিনিঃ সৃতাঃ।
তাং তু যঃ স্তেনয়েদ্বাচং স সর্ব্ব স্তেয়কৃন্নরঃ॥

"মনুষ্য মাত্রেরই সমস্ত ব্যবহার বাক্যের দ্বারা পরিচালিত হয়। পরস্পরের বিচার আলোচনা পরস্পরকে জানাইবার পক্ষে শব্দের ন্যায় দ্বিতীয় সাধন নাই। কিন্তু এই সমস্ত ব্যবহারের আশ্রয়ীভূত বাক্যের যে মূল উৎস তাহাকে যে ব্যক্তি ঘোলাইয়া ফেলে অর্থাৎ বাক্যের সহিত প্রতারণা করে, সে ব্যক্তি চোর বই আর কিছুই নহে।" অতএব "সত্যপূতাং বদেদ্বাচং" (মনু ৬, ৪৬) সত্যের দ্বারা পবিত্র হইয়াছে এইরূপ বাক্যই বলিবে—এইরূপ মনু বলিয়াছেন। উপনিষদেও "সত্যং বদ। ধর্ম্মং চর।" (তৈ, ১, ১১, ১) এইরূপে অন্য ধর্ম্ম অপেক্ষা সত্যকেই প্রথম স্থান দেওয়া হইয়াছে। শরশয্যাশায়ী ভীষ্মদেব, শান্তি ও অনুশাসন পর্ব্বে, যুধিষ্ঠিরকে সর্ব্বধর্ম্মের উপদেশ দিয়া, প্রাণত্যাগের পূর্ব্বে "সত্যেষু যতিতব্যং যঃ সত্যং হি পরমং বলং" এইরূপ সকল ধর্ম্মের সারভূত বলিয়া সর্ব্বশেষে এক সত্যকেই পালন করিতে বলিয়াছেন (সভা, অনু, ১৬৮, ৫০)। বৌদ্ধ ও খৃষ্টান ধর্ম্মেও এই ধর্ম্মেরই অনুরূপ বচন দেখিতে পাওয়া যায়।

এই প্রকারে সর্ব্বোপরি সিদ্ধ ও চিরস্থায়ী সত্যের কোন অপবাদ হইতে পারে ইহা কি কেহ স্বপ্নেও মনে করিতে পারে? কিন্তু দুষ্টলোকে পূর্ণ এই জগতের ব্যবহার বড়ই কঠিন! মনে কর, কোন ব্যক্তি দস্যুহস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তোমার চক্ষুর গোচরে নিবিড় বনে লুকাইয়া আছে; পরে তরবার হস্তে সেই ডাকাত "সেই ব্যক্তি কোথায়" বলিয়া তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, তখন তুমি কি উত্তর দিবে? সত্য বলিবে, না, সেই নিরপরাধ প্রাণীর প্রাণ বাঁচাইবে? কারণ, নিরপরাধ প্রাণীর হিংসা নিবারণ করা ইহা শাস্ত্রানুসারে সত্যেরই ন্যায় মহৎ ধর্ম্ম। মনু বলেন, "নাপৃষ্টঃ কস্যচিদ্‌ব্রূয়ান্ন চান্যায়েন পৃচ্ছতঃ" (ম, ২, ১১০; সভা, শাং, ২৮৭, ৩৪,)—জিজ্ঞাসা ব্যতীত কাহারও সহিত কথা কহিবে না, এবং অন্যায় পূর্ব্বক যদি কেহ প্রশ্ন করে, জিজ্ঞাসা করিলেও তাহার উত্তর দিবে না; জানা থাকিলেও পাগলের মত কেবল হুঁ হুঁ করিয়াই কালক্ষেপ করিবে—"জানন্নপি হি মেধাবী জড়বল্লোক আচরেৎ।" ঠিক্ কথা। কিন্তু 'হুঁ হুঁ' বলা ও মিথ্যা বলা পর্য্যায়ক্রমে একই নহে কি? "ন ব্যাজেন চরেদ্ধর্মং",—ধর্ম্মের সহিত প্রতারণা করিয়া মনকে বুঝাইও না—তাহাতে ধর্ম্ম প্রতারিত হয় না, তুমিই প্রতারিত হইবে; এইরূপ মহাভারতেরও অনেক স্থানে কথিত হইয়াছে। (সভা, আ, ২১৫, ৩৪)। কিন্তু হুঁ হুঁ করিয়া কালক্ষেপ করিবার মতও যদি অবস্থা না হয়? দস্যু হাতে তরবার লইয়া, তোমার বুকের উপর বসিয়া, ধন রত্ন কোথায় আছে বলিয়া তোমাকে জিজ্ঞাসা করিল, এবং উত্তর না দিলে তোমার প্রাণ যাইবে,—এই অবস্থায় তুমি কি বলিবে? সকল ধর্ম্মের রহস্যজ্ঞ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উক্ত দস্যুর দৃষ্টান্ত দিয়া কর্ণ পর্ব্বে অর্জ্জুনকে (ক, ৬৯, ৬১), এবং পরে, শান্তিপর্ব্বে, সত্যানৃতাধ্যায়ে (শাং, ১০৯, ১৫, ১৬) ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ বলিতেছেন :—

অকূজনেন চেন্মোক্ষো নাবকূজেৎ কথংচন।
অবশ্যং কূজিতব্যেবা শঙ্কেরন্বাপ্যকূজনাৎ।
শ্রেয়স্তত্রানৃতং বক্তুং সত্যাদিতি বিচারিতম্॥

"না বলিলে যদি মুক্তি পাইবার সম্ভাবনা থাকে তবে কোন কথাই বলিবে না; বলা যদি নিতান্তই আবশ্যক হয়, কিংবা না বলিবার দরুণ কোন বিপদের আশঙ্কা থাকে, তবে সেই সময় মিথ্যা বলা অধিক প্রশস্ত, বিচারে এইরূপ স্থির হইয়াছে।" কারণ, সত্য ধর্ম্ম কেবল শব্দোচ্চারণ নিঃসৃত বাক্য নহে, কিন্তু যে ব্যবহারে সর্ব্বাপেক্ষা কল্যাণ হয় সেই ব্যবহার শুধু শব্দোচ্চারণ অযথার্থ হইয়াছে বলিয়া গর্হিত বলা যাইতে পারে না। যাহাতে করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষতি হয় তাহা সত্য নহে অহিংসাও নহে :—

সত্যস্য বচনং শ্রেয়ঃ সত্যাদপি হিতং বদেৎ।
যদ্ভূত হিতমত্যন্তং এতৎসত্যং মতং মম॥

"সত্য বলা প্রশস্ত বটে; কিন্তু সত্য অপেক্ষাও সর্ব্বভূতের যাহাতে হিত হয় সেইরূপ বাক্যই বলিবে কারণ, সর্ব্বভূতের যাহা অত্যন্ত হিত তাহাই আমার মতে প্রকৃত সত্য"—এইরূপ শান্তিপর্ব্বে (শাং,

৩২৯, ১৩ ; ২৮৭, ১৯) সনৎকুমারের প্রসঙ্গে নারদ শুককে বলিয়াছেন। "যদ্ভূত হিতং" এই পদার্থটি দেখিয়া, আধুনিক ইংরেজী উপযোগীতাবাদী স্মরণে আসায় কোন ব্যক্তি এই বচনটি প্রক্ষিপ্ত মনে করিয়া এইরূপ বলেন যে, এই বচনটি মহাভারতের বনপর্ব্বে ব্রাহ্মণব্যাধ-সম্বাদে, দুই-দুইবার আসিয়াছে, তন্মধ্যে একস্থানে "অহিংসা সত্য বচনং সর্ব্বভূত হিতং পরং (বন, ১০৬, ৭৩) এবং আর এক স্থানে যদ্ভূতহিতত্যন্তং তৎসত্যমিতি ধারণা" (বন, ২০৮, ৪), এইরূপ কিছু কিছু পাঠভেদ আছে। সত্যপ্রতিজ্ঞ যুধিষ্ঠির দ্রোণকে "নরো বা কুঞ্জরো বা"—অশ্বত্থামা হত ইতি গজ—এইরূপ উত্তর দিয়া যে সংশয়-মোহ উৎপাদন করিয়াছিলেন,—ইহাই তাহার একমাত্র কারণ ; তৎসদৃশ অন্য বিষয়েও এই নীতি প্রযুক্ত হইতে পারে। হত্যাকারী মনুষ্যের প্রাণ মিথ্যা বলিয়া বাঁচাইবে আমাদের শাস্ত্র একথা বলে না। কারণ, শাস্ত্রেই হত্যাকারী মনুষ্যের দেহান্ত প্রায়শ্চিত্ত কিংবা বধদণ্ড কথিত হইয়াছে ; সুতরাং উক্ত মনুষ্য দণ্ডার্হ কিংবা বধ্য। এই প্রসঙ্গে কিংবা ইহার ন্যায় অন্য প্রসঙ্গে মিথ্যা সাক্ষ্য-দাতা মনুষ্যের সাত কিংবা ততোধিক পূর্ব্বপুরুষ ও সে ব্যক্তি স্বয়ং নরকগামী হয়,—ইহা সকল শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন (মনু, ৮, ৮৯—৯৯ ; সভা, আ, ৭, ৩)। কিন্তু কর্ণপর্ব্বে উপরি-উক্ত দস্যুর দৃষ্টান্ত কথা অনুসারে, যদি সত্য কথা বলার দরুণ নিরপরাধ মনুষ্যের প্রাণ, বিনা কারণ বিনষ্ট হয়—তখন কি করা যাইবে? গ্রীন নামক এক ইংরাজ গ্রন্থকার স্বকীয় "নীতি শাস্ত্রের উপোদ্ঘাত" গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে সমস্ত নীতিশাস্ত্র নিরুত্তর ও নীরব, এইরূপ বলিয়াছেন। মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য এইরূপ প্রসঙ্গকে সত্যাপবাদের মধ্যে পরিগণিত করেন সত্য ; কিন্তু এইরূপ গণনা তাঁহাদের মতে সাধারণতঃ গৌণ—তাই—

তৎপাবনায় নির্ব্বাপ্যশ্চরুঃ সারস্বতো দ্বিজৈঃ॥

এইরূপ শেষে তাহার প্রায়শ্চিত্ত কথিত হইয়াছে (যাজ্ঞ, ২, ৮৩ ; মনু, ৮, ১০৪-১০৬),।

অহিংসার অপবাদে যিনি বিস্মিত হন নাই এইরূপ কোন বড় ইংরেজ সত্য সম্বন্ধে আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রকারদিগের নীচে নামাইয়া রাখিবার প্রযত্ন করিয়াছেন। তাই, প্রামাণিক খৃষ্টান ধর্ম্মোপদেশক ও নীতিশাস্ত্রসম্বন্ধীয় ইংরেজ গ্রন্থকার এই সম্বন্ধে কি বলেন তাহা এইখানে বলিতেছি। "আমি মিথ্যা বলিলে, প্রভুর সত্যের মহিমা যদি অধিক বর্দ্ধিত হয় (অর্থাৎ খৃষ্টধর্ম্মের অধিক প্রচার হয়) তাহা হইলে আমাকে কিরূপে পাপী বলিয়া স্থির করিবে? (রোম, ৩, ৭) এইরূপ খৃষ্ট-শিষ্য পলের মুখোচ্চারিত বাণী বাইবেলের নূতন অঙ্গীকারের মধ্যে প্রদত্ত হইয়াছে ; প্রাচীন খৃষ্টধর্ম্মোপদেশক কতবার এই অনুসারে কাজ করিয়াছেন—খৃষ্টধর্ম্মের ইতিহাসকার "মিল্‌মন" বলিয়াছেন। কাহাকে ভোগা দেওয়া কিংবা ভুল বুঝানো—ইহা বর্ত্তমান কালের পাশ্চাত্য নীতিশাস্ত্র প্রায়ই ন্যায্য বলিয়া স্বীকার করে না। তথাপি, সত্যধর্ম্মনীতি একেবারে নিরপবাদ এ কথা তাঁহারাও বলেন না। যে সিজ্‌ক্‌ নামক পণ্ডিতের নীতিশাস্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থ অধুনা আমাদের স্কুলে পড়ান হয়, তাহারই কথা ধর না কেন। সিজ্‌ক্‌, এই কর্ম্মাকর্ম্মসংশয় স্থলে, "অধিক তম লোকের অধিক সুখ" এই তত্ত্বের বনিয়াদে নীতি নির্ণয় করিয়া থাকেন এবং ঐ কষ্টিপাথর প্রয়োগ করিয়াই, তিনি শেষে এইরূপ স্থির করিয়াছেন যে, এইরূপ প্রসঙ্গে,—"ছোট ছেলে, পাগল, রুগ্ন ব্যক্তি (সত্য বলিলে যদি তাঁহার শরীর খারাপ হয়) নিজের শত্রু, চোর—ইহাদের নিকট এবং অন্যায়পূর্ব্বক যে ব্যক্তি প্রশ্ন করে তাহাকে উত্তর দিবার সময়, কিংবা উকীলের পক্ষে নিজ ব্যবসায়ে,—মিথ্যা কথা বলা অন্যায় নহে।"* মিলের নীতিশাস্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থে এই অপবাদের কথা অর্থাৎ ব্যতিক্রমস্থলের কথা আছে।† এই অপবাদ ব্যতীত সিজ্‌ক্‌ নিজ গ্রন্থে আরও এ কথা লিখিয়াছেন যে, "সকলেই সত্যাচরণ করিবেক এইরূপ যদিও আমরা বলি, তথাপি যে রাজকীয় পুরুষকে নিজ কাজকর্ম্ম গুপ্ত রাখিতে হয় তিনি অন্যের নিকট কিংবা কোন ব্যাপারী খরিদ্দারের নিকট সব সময় সত্যই বলিবেন

* Sidgwick's Methods of Ethics, Book III. Chap. XI § 6. P. 355 (7th Ed). Also see PP. 315-317 (Same ed.)

† Mill's Utilitarianism, Chap II. PP. 33-34.

এ কথা আমরা বলি না।"* আর এক স্থানে, এই প্রকার নিজের সুবিধা মত কাজ করা পাদ্রি ভট্টদিগের ও সৈনিকদিগের মধ্যে দেখা যায়,—এইরূপ তিনি বলেন।

আধিভৌতিক দৃষ্টিতে যিনি নীতিশাস্ত্রের বিচার-আলোচনা করিয়াছেন সেই লেস্‌লি-ষ্টিফেন নামক আর এক ইংরেজ গ্রন্থকার এই প্রকারের অন্য উদাহরণ দিয়া শেষে এইরূপ লিখিতেছেন যে, "আমার মতে, কোন কার্য্যের পরিণামের দিকে লক্ষ্য করিয়াই তাহার নীতির্মত্তা স্থির করা আবশ্যক। মিথ্যা বলিলে যদি সর্ব্ব সমেত অধিক কল্যাণ হইবে আমার বিশ্বাস হয় তাহা হইলে সত্য বলিবার জন্য আমি পীড়াপীড়ি করিব না। এবং এই প্রকার বিশ্বাস হইলে সম্ভবতঃ মিথ্যা বলাই আমার কর্ত্তব্য—এইরূপ আমি বুঝিব।"† যিনি অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে নীতি শাস্ত্রের বিচার করিয়াছেন সেই গ্রীন সাহেব ‡ এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করিয়া, এই সময়ে নীতিশাস্ত্রে মনুষ্যের সংশয় নিবৃত্তি করিতে পারে না, এইরূপ স্পষ্ট বলিতেছেন; এবং শেষে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে "কোন সাধারণ নিয়ম কেবল নিয়ম বলিয়াই পালন করিতে হইবে এই কথার কোন গুরুত্ব নাই; সাধারণতঃ তাহার পালনে আমার শ্রেয় হইবে এই টুকুই নীতিশাস্ত্রের কথা। কারণ, এই স্থলে আমরা কেবল নীতির উপদেশে আমাদের লোভমূলক লঘু মনোবৃত্তি সকল ত্যাগ করিতে শিখিয়া থাকি," নীতিশাস্ত্রবেত্তা বেন, হেবেল্ প্রভৃতি ইংরেজ পণ্ডিতদিগেরও মত এইরূপ।

উপরি-উক্ত গ্রন্থকারদিগের মতের সহিত আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রকারদিগের প্রবর্ত্তিত নিয়মগুলির তুলনা করিলে সত্য সম্বন্ধে অধিক অভিমানী কে, তাহা সহজেই উপলব্ধি হইবে:—

ন নর্ম্মযুক্তং বচনং হিনস্তি ন স্ত্রীষু রাজন্ন বিবাহ কালে।
প্রাণাত্যয়ে সর্ব্বধনাপহারে পঞ্চানৃতান্যাহুরপাতকানি॥

"ঠাট্টা করিয়া, স্ত্রীলোকের নিকট, বিবাহকালে, প্রাণ-সঙ্কট উপস্থিত হইলে, এবং সঞ্চিত ধন বাঁচাইবার জন্য—সর্ব্ব-সমেত এই পাঁচ স্থলে অনৃত বলায় পাতক নাই" (সভা, আ, ৮২. ১৬; তদনুসারে শাং, ১০৯ ও মনু ৮, ১১০ দেখ)। এইরূপ আমাদের শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে সত্য। কিন্তু তাহার অর্থ স্ত্রীলোকের নিকট সব সময়েই মিথ্যা বলিবে এরূপ নহে; সিজ্‌উইক্ সাহেব যে অর্থে "ছোট ছেলে, পাগল, কিংবা রুগ্ন" ইহাদের সম্বন্ধে অপবাদ কহিয়াছেন সেই অর্থই মহাভারতের অভিপ্রেত। কিন্তু পারলৌকিক ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকে যাঁহারা গুটাইয়া রাখিয়াছেন, সেই ইংরেজ গ্রন্থকারেরা আরো বেশী দূর গিয়া, ব্যাপারীরা পর্য্যন্ত নিজের লাভের জন্য মিথ্যা বলিতে পারে—এই যে কথা স্পষ্টরূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন, ইহাই কেবল আমাদের শাস্ত্রকারেরা কখনই মান্য করেন নাই। কেবল সত্যশব্দ উচ্চারণ অর্থাৎ শুধু বাচিক সত্য এবং সর্ব্বভূতহিত অর্থাৎ বাস্তবিক সত্য এই দুয়ের মধ্যে যে স্থলে বিরোধ হয় সেই স্থলে ব্যবহার-দৃষ্টিতে, অপরিহার্য্য বলিয়া অসত্য কহিয়া কার্য্য সিদ্ধ করিতে কোন কোন স্থানে অনুমতি দিয়াছেন সত্য। তথাপি সত্যাদি নীতিধর্ম্ম তাঁহাদিগের মতে নিত্য, অর্থাৎ সর্ব্বকালে সমান অবাধিত; সুতরাং পারলৌকিক দৃষ্টিতে সাধারণত ইহাতে কিঞ্চিৎ পাপ আছে স্থির করিয়া তজ্জন্য তাঁহারা প্রায়শ্চিত্তের বিধান করিয়াছেন। এই সকল প্রায়শ্চিত্ত নিরর্থক ও শূন্যগর্ভ, এই কথা কেবল আধিভৌতিক শাস্ত্রকারেরাই বলিবেন। কিন্তু যাঁহারা এই সকল প্রায়শ্চিত্তের বিধান করিয়াছেন তাঁহাদিগের ধারণা কিংবা যাদের জন্য এইরূপ বিধান হইয়াছে তাদের ধারণা সেরূপ না হওয়ায়, উভয়েই উক্ত সত্যাপবাদ গৌণ বলিয়াই স্বীকার করেন, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হইবে; এবং এই অর্থই এই প্রসঙ্গের কথাকাহিনীতেও প্রতিপাদিত হইয়াছে।

* Sidgwick's Methods of Ethics Book IV. Chap III. § 7 P. 454 (7th Ed) & Book II Chap V § 3. P. 169.

† Leslie Stephen's Science of Ethics Chap IX § 29. P. 369 (2. Ed). "and the certamty may be of such a kind as to make me think it a duty to lie."

‡ Green's Prologomena to Ethics. § 315. P. 379 (5th cheaper edition) § Bain's Mental and Moral Science. P. 445 (Ed 1875); † Whewell's Element of Morality Book II.

উদাহরণ যথা—যুধিষ্ঠির "নরো বা কুঞ্জরো বা" এইরূপ কঠিন সমস্যার স্থলে একবার মাত্র ইতস্তত করিয়া বলিয়াছেন; কিন্তু তাহার দরুণ, পূর্ব্বে তাঁহার যে রথ জমি হইতে চারি আঙ্গুল উপরে অন্তরীক্ষে চলিত, সেই রথ পরে অন্য লোকের রথের ন্যায় জমির উপর দিয়া চলিতে লাগিল এবং শেষে তাহার দরুণ ঘণ্টা খানেকের জন্যও নরকলোকে তাঁহাকে বাস করিতে হইল—এইরূপ মহাভারতেই কথিত হইয়াছে (দ্রোণ, ১৯১, ৫৭, ৫৮ ও স্বর্গ ৩, ১৫)। সেইরূপ, ভীষ্মের বধ ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারে—কিন্তু শিখণ্ডীকে সামনে রাখিয়া—সাধন করিবার দরুণ, অর্জ্জুনের আপন পুত্র বভ্রুবাহনের হাতে অর্জ্জুন পরাভূত হন এইরূপ অশ্বমেধ পর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে (সভা, অশ্ব, ৮১, ১০)। এই সম্বন্ধে, প্রসঙ্গবিশেষে কথিত উপরি উক্ত অপবাদ মুখ্য ও প্রামাণিক না হওয়ায়, মহাদেব পার্ব্বতীকে যাহা বলিয়াছেন তদনুসারে—

আত্মহেতোঃ পরার্থেবা নর্মহাস্যাশ্রয়াত্তথা।
যে মৃষা ন বদন্তীহ তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ॥

"স্বার্থের জন্য, পরহিতের জন্য, কিংবা ঠাট্টা করিয়া যে সকল ব্যক্তি এই জগতে কখন মিথ্যা বলে না, তাহারা স্বর্গগামী হয়।" (সভা, অনু, ১৪৪, ১৯)—এইরূপ আমাদিগের শাস্ত্রকারদিগের চূড়ান্ত তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

আপন বাক্য বা প্রতিজ্ঞাপালন ইহা সত্যেরই অন্তর্ভূত। "হিমাচল বিচলিত হইতে পারে, কিংবা অগ্নি শীতল হইতে পারে, কিন্তু আপন মুখের কথা অন্যথা হইবার নহে।" এইরূপ শ্রীকৃষ্ণ ও ভীষ্ম বলিয়াছেন। ভর্ত্তৃহরিও সৎ পুরুষের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যথা ঃ—

তেজস্বিনঃ সুখমস্থনপি সন্ত্যজন্তি।
সত্যব্রত ব্যসনিনো ন পুনঃ প্রতিজ্ঞাম্॥

"সত্যব্রত তেজস্বী পুরুষ আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করেন, তথাপি প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করেন না" (নীতি শ, ১১০)। সেইরূপ "দ্বিঃ দারং নাভি সন্ধত্তে রামো দ্বির্নাভিভাষতে" (সুভাষিত) এইরূপ দাশরথী রামচন্দ্রের একপত্নীব্রতের মতই একবাণী ও একবাক্যব্রতেরও খ্যাতি হইয়াছে; এবং হরিশ্চন্দ্র স্বপ্নদত্ত বাক্যকে সত্য করিবার জন্য ডোমের ঘরেও জল বহন করিয়াছিলেন, এইরূপ পুরাণের কথা আছে। কিন্তু উল্টাপক্ষে, ইন্দ্রাদি দেবতারাও বৃত্রের ন্যায় স্বকৃত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া, কিংবা তাহার মধ্যেও পলাইবার কোন রাস্তা বাহির করিয়া বৃত্রের বধসাধন করিয়াছিলেন, এইরূপ বেদান্তে বর্ণিত হইয়াছে, এবং ঐ ধরণে পুরাণেও হিরণ্যকশিপুবধের কথা আছে। তদ্ব্যতীত আইনের ভিতরেও এমন কতকগুলা কড়ার দেখা যায় যাহা ন্যায়বিচারে বে-আইনী ও পালনের অযোগ্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে। অর্জ্জুন সম্বন্ধে এইরূপ একটা বিষয় মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে। অর্জ্জুনের এইরূপ প্রতিজ্ঞা ছিল যে, "'তুমি আপন হাতের গাণ্ডীব ধনু অন্যকে দেও'" এই কথা যে কেহ আমাকে বলিবে আমি তখনি তার শিরশ্ছেদ করিব।" অনন্তর কর্ণ যুদ্ধে যুধিষ্ঠিরকে পরাজয় করিলে পর, যুধিষ্ঠিরের মুখ হইতে "তোমার গাণ্ডীবে আমাদের কি কাজ হইল? উহা হাত হইতে ফেলিয়া দেও" এইরূপ অর্জ্জুনকে উদ্দেশ করিয়া যখন নৈরাশ্যজনিত স্বাভাবিক উচ্ছ্বাসোক্তি মুখ দিয়া বাহির হইল, তখন অর্জ্জুন হাতে তরবার লইয়া যুধিষ্ঠিরকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সেই সময় নিকটে থাকায়, সত্যধর্ম্ম কাহাকে বলে, তত্ত্বজ্ঞানদৃষ্টিতে ইহার মার্ম্মিক বিচার করিয়া, "তুমি মূঢ়, সূক্ষ্ম ধর্ম্ম এখনও তুমি জান না, তা বৃদ্ধদের নিকট তোমার শিক্ষা করা আবশ্যক, "ন বৃদ্ধাঃ সেবিতাস্ত্বয়া"—তুমি বৃদ্ধদের সেবা কর নাই, তোমার প্রতিজ্ঞা যদি রাখিতে হয় তবে তুমি যুধিষ্ঠিরকে ভর্ৎসনা কর, কারণ মানী ব্যক্তির পক্ষে ভর্ৎসনা বধেরই তুল্য," ইত্যাদি প্রকারে তিনি অর্জ্জুনকে বুঝাইলেন; এবং অবিচারক্রমে তাঁহার হাতে সংঘটিত জ্যেষ্ঠভ্রাতৃহত্যারূপ পাতক হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিলেন। কর্ণপর্ব্বে এইরূপ এক কথা আছে। (সভা, কর্ণ, ৬৯)। শ্রীকৃষ্ণ এই সময়ে সত্যানৃতের বিচার করিয়া অর্জ্জুনকে এবং পরে শান্তিপর্ব্বে সত্যানৃতাধ্যায়ে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিয়াছিলেন (শাং, ১০৯); এবং ব্যবহারক্ষেত্রে সকলেরই এই বিষয়ে লক্ষ্য করা আবশ্যক। তথাপি এই সূক্ষ্ম প্রসঙ্গ কি করিয়া নির্ণয় করা যাইবে, ইহা বলা কঠিন। কারণ, ভ্রাতৃধর্ম্ম এই স্থলে

সত্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও গীতার কথিত প্রসঙ্গ ইহার উল্টা হওয়ায়, ভ্রাতৃপ্রেমাপেক্ষা ক্ষাত্রধর্ম্ম তথায় বলবত্তর বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে, ইহা পাঠকদিগের সহজেই উপলব্ধি হইবে।

(ক্রমশঃ)

ভোজরাজ।

(শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ)

ভোজরাজের নাম পণ্ডিতসমাজে সুপরিচিত। কিন্তু তিনি কোন্ বিষয়ে কত গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, এখনও তাহা পর্য্যাপ্তরূপে নির্ণীত হয় নাই। তবে তিনি যে স্মৃতি, তন্ত্র, জ্যোতিষ, কাব্য, অলঙ্কার, নীতি, শিল্প, বৈদ্যক, শব্দানুশাসন প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্রবিষয়ক নানাগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহার সময়ে ভারতবর্ষে ঐ সকল শাস্ত্রের অধ্যয়ন অধ্যাপনা কতদূর প্রবল ছিল, ইহাতে তাহারও কিছু কিছু নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি পাতঞ্জলদর্শনের রাজমার্ত্তণ্ড নামক বৃত্তির উপক্রমে যে আত্মপরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে,—তিনি "শব্দানুশাসন" পাতঞ্জলদর্শনের "বৃত্তি" এবং "রাজমৃগাঙ্ক" নামক বৈদ্যক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। "কামধেনু" নামক তদীয় বৃহত্তর স্মৃতিনিবন্ধের প্রমাণাবলী মহামহোপাধ্যায় শূলপাণি এবং জীমূতবাহন প্রভৃতির গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। এই উপাদেয় গ্রন্থ এবং গ্রন্থকার সুধীসমাজে এতই শ্রদ্ধাস্পদ যে, যাহা এই গ্রন্থে উল্লিখিত হয় নাই পরবর্ত্তী গ্রন্থকারগণ সেরূপ অনেক বচনের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে "কামধেনু" গ্রন্থ নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। শ্রাদ্ধবিবেকের টীকায় শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার "কামধেনুকে" অতীব প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার সময়েও বাঙ্গালাদেশে "কামধেনু" নিবন্ধের পুথি দেখিতে পাওয়া যাইত কি না, তাহা ঠিক বলা যায় না। সম্প্রতি অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, কাশ্মীরের রাজকীয় পুস্তকালয়ে "কামধেনু" নিবন্ধ বর্ত্তমান আছে। ইহা সত্য হইলে, গ্রন্থখানি মুদ্রিত করা কর্ত্তব্য।

বেদভাষ্যকার মাধবাচার্য্যকৃত "কালমাধব" নামক স্মৃতিনিবন্ধে ভোজদেবের গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। তৎপাঠে জানা যায় যে ভোজরাজ সমস্ত শৈবাগমের সারভূত অর্থ আর্য্যাচ্ছন্দে নিবদ্ধ করিয়াছিলেন। ভোজদেবকৃত "রাজমার্ত্তণ্ড" নামক জ্যোতির্নিবন্ধ অতি প্রামাণিক গ্রন্থ। এতদ্ব্যতীত ভোজদেবের অনেক বচন রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহোদয় প্রভৃতির বিবিধ গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে গ্রন্থের নাম কথিত হয় নাই। ইহাতে বোধ হয় জ্যোতিষ সম্বন্ধে তিনি আরও অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। কাব্যের মধ্যে "ভোজচম্পূ" গ্রন্থ অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। "সরস্বতীকণ্ঠাভরণ" নামক বৃহত্তম অলঙ্কার গ্রন্থও ভোজদেবের বিপুল কীর্ত্তিস্তম্ভরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। "দশরূপক" নামক গ্রন্থে তিনি নাট্যজ্ঞতার বিশেষ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। এই গ্রন্থও বর্ত্তমান আছে। আর একখানি উপাদেয় গ্রন্থ বর্ত্তমান আছে; তাহার নাম যুক্তিকল্পতরু। ইহা একখানি উপাদেয় নিবন্ধ। ইহাতে তাঁহার নীতিশাস্ত্রপারদর্শিতা এবং শিল্পজ্ঞানকুশলতা বিশেষরূপে প্রকটিত হইয়া রহিয়াছে।

পাতঞ্জল বৃত্তির উপক্রমে তিনি নিজেকে "রণরঙ্গমল্ল" নামে অভিহিত করিয়া উপসংহারে "ভোজ মহীপতি" সমাখ্যায় নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। সমাপ্তিপ্রতিপাদক চুর্ণিকা পাঠে জানা যায়, ধারানগরী তাঁহার রাজধানী ছিল। জীমূতবাহন প্রভৃতি নিবন্ধকারগণও তাঁহাকে "ধারেশ্বর" বিশেষণে ভূষিত করিয়াছেন।

বোম্বে নির্ণয়সাগর প্রেস হইতে প্রকাশিত সাহিত্যদর্পণের ভূমিকায় ভোজদেবের সময় সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে; এবং সময় নির্ণয়ের উপযোগী একখানা দানপত্রের সংক্ষিপ্তাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। তৎপাঠে জানা যায় যে ভোজরাজ ১০৭৮ শকাব্দে (১১৫৬ খৃঃ অঃ) ধারানগরীতে বর্ত্তমান ছিলেন। পাঠকদিগের অবগতির জন্য দানপত্রের সংক্ষেপ অবিকল উদ্ধৃত হইল।

"জয়তি ব্যোমকেশোঽসৌ যঃ সর্গায় বিভর্ত্তি তাম্।
ঐন্দবীং শিরসা লেখাং জগদ্বীজাঙ্কুরাকৃতিম্॥

পরমভট্টারক-মহারাজাধিরাজ-পরমেশ্বর-শ্রীসীয়ক-দেবপাদানুধ্যাত-পরমভট্টারক-মহারাজাধিরাজ পর-

মেশ্বর-শ্রীবাক্‌পতিরাজদেবপাদানুধ্যাত পরমভট্টারক-মহারাজাধিরাজ-পরমেশ্বর-শ্রীসিন্ধুরাজদেবপাদানুধ্যাত —পরমভট্টারক-মহারাজাধিরাজ-পরমেশ্বর-শ্রীভোজ-দেবঃ কুশলী নাগহ্রদপশ্চিমপথকান্তঃপাতিবীরাণকে সমুপগতান্ সমস্তরাজপুরুষান্ ব্রাহ্মণোত্তরান্ প্রতি-নিবাসি পট্টকিলজনপদাদীংশ্চ সমাদিশতি—অস্তু বঃ সংবিদিতম্, যথা অতীতাষ্টসপ্ততাধিক সাহস্রিক-সংবৎসরে মাঘাসিততৃতীয়ায়াং রবাবুদগয়নপর্ব্বণি কল্পিতহলানাং লেখ্যে শ্রীমন্ধারায়া মবস্থিতৈ রস্মাভিঃ স্নাত্বা চরাচরগুরুং ভগবন্তং ভবানীপতিং সমভ্যর্চ্চ্য সংসারস্যাসারতাং দৃষ্ট্বা—

বাতাভ্রবিভ্রমমিদং বসুধাধিপত্য-
মাপাতমাত্রমধুরো বিষয়োপভোগঃ।
প্রাণাস্তৃণাগ্রজলবিন্দুসমা নরাণাং
ধর্ম্মঃ সখা পরমহো পরলোকযানে॥

ইতি জগতো বিনশ্বরং স্বরূপমাকলয্য উপরি-লিখিতগ্রামঃ স্বসীমাতৃণগোচরযূতিপর্য্যন্তঃ সহিরণ্য-ভাগভোগঃ সোপরিকরঃ সর্ব্বাদায়সমেতঃ ব্রাহ্মণধন-পতিভট্টায় ভট্টগোবিন্দসুতায় বহ্বৃচাশ্বলায়নশাখায় ত্রিপ্রবরায় বেল্লবল্লপ্রতিবদ্ধ শ্রীবাদাবিনির্গতরাধসুর সঙ্গকর্ণাটায় মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ পুণ্যযশোভিবৃদ্ধয়ে অদৃষ্টফলমঙ্গীকৃত্য আচন্দ্রার্কার্ণবক্ষিতিসমকালং যাবৎ পরম্পরয়া ভক্ত্যা শাসনেনোদকপূর্ব্বং প্রতিপাদিত ইতি মত্বা যথাদীয়মানভাগভোগকর-হিরণ্যাদিকমাজ্ঞাশ্রবণ বিধেয়ৈ র্ভূত্বা সর্ব্বমস্মৈ সমুপনেতব্যম্। সামান্যঞ্চৈতৎ ফলং বুদ্ধ্বাস্মদ্বংশজৈ রন্যৈরপি ভাবিভোক্তৃভিরস্মৎপ্রদত্তধর্ম্মাদায়োয়ং অনুমন্তব্যঃ পালনীয়শ্চেতি। সংবৎ ১০৭৮ চৈত্রসুদি ১৪ স্বয়মাজ্ঞামঙ্গলং মহাশ্রীঃ। স্বহস্তোয়ং শ্রীভোজ দেবস্য।"

বিবিধ শাস্ত্রবিশারদ ভোজনৃপতির কীর্ত্তিস্বরূপ তদীয় গ্রন্থগুলির মর্ম্মার্থ সঙ্কলন করিতে পারিলে মধ্যযুগের অনেক রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইবার সম্ভাবনা আছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে—তদীয় গ্রন্থ-কলাপের মধ্যে অনেক গুলিই অধুনা আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। সুতরাং যাহা আমরা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহারই সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদানে প্রবৃত্ত হইলাম।

যুক্তিকল্পতরু।

এই গ্রন্থ কতিপয় শাস্ত্রের সমন্বয়ে বিরচিত হই-য়াছিল। ইহাতে নীতি এবং শিল্পশাস্ত্রই বিশেষ-রূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। গ্রন্থকার উপক্রমে সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা পরমেশ্বরকে প্রণাম করিয়া, দ্বিতীয় শ্লোকের দ্বারা ভগবান্ বিষ্ণুকে প্রণাম করিয়াছেন। ইহার রচনায় শ্লেষাত্মক কাব্যকৌশল প্রকটিত হইয়াছে। যথা—

"কংসানন্দ মকুর্ব্বাণঃ কং সানন্দং করোতিঃ যঃ।
তং দেববৃন্দৈ রারাধ্য মনারাধ্য মহং ভজে॥"

ইহার অর্থ—যিনি কংসাসুরের আনন্দ (সম্পাদন) করেন না, অথচ "কং সানন্দ" করেন, (কং ব্রহ্মাণং সানন্দং আনন্দান্বিতং করোতি, অসুর বিনাশের দ্বারা ব্রহ্মার আনন্দোৎপাদন করেন), যিনি দেব-বৃন্দের আরাধ্য অথচ "অনারাধ্য", সেই বিষ্ণুকে আমি ভজনা করি। অনারাধ্য শব্দের অর্থ—যাঁহার আরাধনীয় অন্য কেহ নাই, অর্থাৎ যিনি সর্ব্বেশ্বর।

গ্রন্থকার শাস্ত্রকারদিগের চরণবন্দন পূর্ব্বক বক্তব্য গ্রন্থের মূলীভূত মুনিনিবন্ধের উল্লেখ করিয়া গ্রন্থের নাম নির্দ্দেশ এবং অধিকারী নির্দ্দেশ করি-য়াছেন। যথা—

"নমামি শাস্ত্র কর্ত্তৃণাং চরণানি মুহুর্মুহুঃ।
যেষাং বাচঃ পাবয়ন্তি শ্রবণেনৈব সজ্জনান্ ঃ
নানামুনিনিবন্ধানাং সারমাকৃষ্য যত্নতঃ।
তনুতে ভোজনৃপতি র্যুক্তিকল্পতরুং মুদে॥
বিবুধাভীষ্টদমমুং কল্পবৃক্ষং সমাশ্রিতঃ।
প্রাপ্নোতীষ্টতমাং সিদ্ধিং বুধৈঃ সংসেব্যতামযম্॥"

অনন্তর কথিত হইয়াছে যে—দণ্ডনীতি যাহার মূল, জ্যোতিঃশাস্ত্র যাহার প্রকাণ্ড, দৃষ্টফলজনক "ইতর" বিদ্যা যাহার শাখা, অন্যান্য বিদ্যা যাহার পুষ্প, অদৃষ্ট অর্থাৎ সৌভাগ্যসম্পাদন যাহার ফল, এবং যাহার রস সজ্জনের পক্ষে অমৃত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, সেই "কল্পতরু" রাজমন্ত্রীদিগের উপা-সনীয় অর্থাৎ জ্ঞাতব্য। অনন্তর নীতিশাস্ত্রের প্রশংসা এবং রাজাদিগের পক্ষে নীতিজ্ঞানের আবশ্যকতা বর্ণিত হইয়াছে। ইহাও কথিত হই-য়াছে যে,—বক্তব্য গ্রন্থের প্রথমেই যে নীতি নিবদ্ধ হইতেছে, উহা বৃহস্পতিপ্রোক্ত নীতিশাস্ত্র এবং ঔশনসী নীতির অর্থাৎ শুক্রনীতির অবিরুদ্ধ।

অতঃপর গুরু পুরোহিত অমাত্য মন্ত্রী দূত লেখক জ্যোতির্ব্বিদ্ অন্তঃপুরাধ্যক্ষ প্রভৃতির লক্ষণ এবং পরীক্ষা কথিত হইয়াছে। এই স্থলে "অমাত্য" এবং "মন্ত্রী" সমানার্থক এই দুইটি শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহাতে বোধ হয়,—"অমাত্য" শব্দে প্রধান মন্ত্রী এবং "মন্ত্রী" শব্দে সাধারণ মন্ত্রী অভিপ্রেত হইয়াছে।

ইহাও বলা আবশ্যক যে,—এই স্থলে পরীক্ষণীয় বর্গের প্রথমেই যে গুরুর নাম কথিত হইয়াছে, উহা তান্ত্রিক মন্ত্রদাতা গুরু বলিয়াই বোধ হয়। কারণ, তন্ত্রশাস্ত্রানুসারে গুরুর যে সমস্ত গুণ থাকা আবশ্যক, এইস্থলেও তাহারই সম্পূর্ণ সমন্বয় দেখিতে পাওয়া যায়।

অতঃপর চতুর্ব্বিধ বল কথিত হইয়াছে। তৎপরে চতুর্ব্বিধ যানের নামমাত্র কথিত হইয়াছে। অনন্তর যুদ্ধের স্থান, তৎপর চরবিবরণ, অনন্তর আসন, তৎপর দ্বৈধ, তৎপর আশ্রয়, তৎপর দণ্ডমন্ত্রণা—নীতিযুক্তি নামক প্রকরণে এই কয়টি বিষয় বিবেচিত হইয়াছে।

অনন্তর দ্বন্দ্বযুক্তি। ইহাতে নানা প্রকার দুর্গের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রকরণে নীতিশাস্ত্র এবং অন্য গ্রন্থকারের উল্লেখ আছে। যথা গর্গ ভোজ।

অনন্তর নগর নির্ম্মাণের কাল প্রভৃতি বিবেচিত হইয়াছে। ইহাতে ভবিষ্যোত্তর পুরাণের প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। অনন্তর বসতিলক্ষণ। অতঃপর বাস্তুযুক্তি নামক প্রকরণ আবদ্ধ হইয়াছে। ইহাতে বাস্তুর জ্ঞাতব্য বিষয় বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। প্রমাণপ্রসঙ্গে এই কয়টি গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম উদ্ধৃত হইয়াছে—বাস্তুকুণ্ডলী, ভোজপরাশর।

অতঃপর জলাশয়ের বিবরণ। তৎপর বাস্তুর দিগ্ বিশেষে বৃক্ষস্থাপন ব্যবস্থা, বৃক্ষের দোষগুণ বিবেচনা, গৃহের স্থান প্রভৃতি বিবেচনা।

গৃহযুক্তি প্রকরণের পর আসনযুক্তি প্রকরণ আরব্ধ হইয়াছে। ইহাতে সিংহাসনের বিবরণ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। অতঃপর খট্টিকার লক্ষণ কথিত হইয়াছে। অতঃপর পীঠ নিরূপণপ্রকরণ, ইহাতে পীঠের অর্থাৎ পীঁড়ীর অতি বিস্তৃত বিবরণ দৃষ্ট হয়।

অতঃপর ছত্রযুক্তি প্রকরণ। ইহাতে ছত্রের বিস্তৃত বিবরণ দেখা যায়। অনন্তর ধ্বজযুক্তি প্রকরণ। ইহাতে নানা প্রকার ধ্বজের লক্ষণ প্রভৃতি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ধ্বজপ্রসঙ্গে পতাকার বিবরণ কথিত হইয়াছে। অতঃপর নবপ্রকার রাজোপকরণ কথিত হইয়াছে। যথা—

"চামর শ্চাথ ভৃঙ্গার শ্চযকশ্চ প্রসাধনী।
বিতান শ্চাথ শয্যাচ ব্যজনং দর্পণাম্বরম্॥
এতন্নবক মুদ্দিষ্টং রাজোপকরণাখ্যয়া।"

উক্ত নয়টি উপকরণের মধ্যে প্রত্যেকেরই লক্ষণ বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। উপকরণযুক্তির পর অলঙ্কারযুক্তি প্রকরণ আরম্ভ হইয়াছে। ইহাতে অষ্টপ্রকার প্রধান অলঙ্কারের নাম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

"শিরস্ত্রং মুকুটং হারঃ কুণ্ডলঞ্চাঙ্গদস্তথা।
কঙ্কণং বালকঞ্চৈব মেখলাষ্টাবিতি ক্রমাৎ॥
প্রধানভূষণান্যেষু যথা স্বং মণিনিশ্চয়ঃ।"

অলঙ্কারের প্রসঙ্গে মণিপ্রকরণ আরম্ভ হইয়াছে। ইহাতে হীরক প্রভৃতি মণির অতি বিস্তৃত বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। মণিস্বরূপনির্ণয়ের উপযোগী প্রমাণাবলী গরুড়পুরাণ ও বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

অতঃপর অস্ত্রযুক্তি প্রকরণ আরব্ধ হইয়াছে। ইহাতে প্রধানতঃ এই কয়টি অস্ত্রের নাম দেখিতে পাওয়া যায়—খড়্গ, চর্ম্ম, ধনুঃ, বাণ, শল্য, ভল্ল, অর্দ্ধচন্দ্র, নারাচ, শক্তি, যষ্টি, পরশু, চক্র, শূল এবং পরিঘ ইত্যাদি। এই সকল অস্ত্র ভোজমহীপতিসম্মত। বাৎস্যের মতে অস্ত্র সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। তন্মধ্যে কতকগুলি নির্ম্মায় নামে পরিচিত, অপরগুলি মায়িক বলিয়া সমাখ্যাত। খড়্গ প্রভৃতি নির্ম্মায় অস্ত্র এবং দহন প্রভৃতি মায়িক অস্ত্র বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। অগ্নি, জল, কাষ্ঠ, লোষ্ট্র, শব্দ প্রভৃতি এবং তপ্ত তৈলাদি মায়িক নামে অভিহিত হইয়াছে।

কাষ্ঠ, চর্ম্ম প্রভৃতির দ্বারা কবচ প্রস্তুত হইত। কোন কোন নিপুণ ব্যক্তি স্বর্ণ রৌপ্য তাম্র এবং লৌহ এই চারিপ্রকার ধাতুর দ্বারা কবচ নির্ম্মাণ করিতেন।

অতঃপর খড়্গপরীক্ষা প্রকরণে খড়্গের অতি বিস্তৃত বিবরণ কথিত হইয়াছে। ইহাতে এই কয়টি গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম দেখিতে পাওয়া যায়—লৌহদীপ, লৌহপ্রদীপ, শার্ঙ্গধর, নাগার্জ্জুন মুনি, পদ্মপুরাণ, লৌহার্ণব। এই সমস্ত গ্রন্থের নামমাত্র শ্রবণে মনে হয় ভোজদেবের সময় পর্য্যন্ত লৌহ প্রভৃতি ধাতুপরীক্ষার নানাপ্রকার গ্রন্থ বর্ত্তমান ছিল।

অতঃপর বাণ প্রভৃতির লক্ষণ কথিত হইয়াছে। অনন্তর রাজার যাত্রাপ্রকরণ আরব্ধ হইয়াছে। ইহাতে অশ্ব প্রভৃতির বিস্তৃত নীরাজনপদ্ধতি দেখিতে পাওয়া যায়। অতঃপর অশ্বপরীক্ষা প্রকরণ আরব্ধ হইয়াছে। ইহাতে অশ্বসম্বন্ধীয় যাবতীয় বিষয় জানিতে পারা যায়।

অতঃপর গজ পরীক্ষা প্রকরণ আরব্ধ হইয়াছে। এই প্রকরণে হস্তীর গুণাগুণ বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

অনন্তর চতুষ্পাদপরীক্ষা প্রকরণ আরব্ধ হইয়াছে। ইহাতে গো মহিষ মৃগ কুক্কুর ও ছাগ এই কয় প্রকার জন্তুর শুভাশুভ লক্ষণ কথনানন্তর অন্যান্য চতুষ্পাদ জন্তুর লক্ষণ অশ্বলক্ষণের ন্যায় বুঝিতে হইবে, এইরূপ বলা হইয়াছে। এই প্রকরণে গার্গ্য শঙ্খ ও ভরদ্বাজ এই কয়জন গ্রন্থকারের নাম দেখিতে পাওয়া যায়।

অনন্তর দ্বিপদযান প্রকরণ আরব্ধ হইয়াছে। এই দ্বিপদযান মানুষ, পক্ষী এবং অন্যান্য দ্বিপদের দ্বারা চালিত হইত বলিয়া উহার অনেক প্রকার ভেদ বিবেচিত হইয়াছে। দ্বিপদযান সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। তন্মধ্যে দোলা প্রভৃতি সামান্য দ্বিপদযানরূপে কথিত হইয়াছে। এই প্রকরণে দোলার অনেক প্রকার ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। উহাতে শিল্পনৈপুণ্যেরও পরিচয় পাওয়া যায়।

অতঃপর নিষ্পদযানপ্রকরণ আরব্ধ হইয়াছে। ইহাতে নৌকার বিবরণ অতি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে এবং এই প্রসঙ্গেই গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে।

শোক-সংবাদ।

৺নকুড় চন্দ্র বিশ্বাস—৺নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস গত ২৯শে জ্যৈষ্ঠ পরলোক গমন করিয়াছেন। গত কয়েক মাস ধরিয়া তিনি রোগের যাতনা নীরবে সহ্য করিতেছিলেন। আদিব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁহার অনেক দিনের যোগ। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় তাঁহার প্রবন্ধ এক সময় ধারাবাহিকরূপে বাহির হইয়াছে। তিনি আদিব্রাহ্মসমাজের জনৈক অধ্যক্ষ ছিলেন। কয়েকখানি ক্ষুদ্র পুস্তক তিনি রচনা করিয়া গিয়াছেন। মাইকেল মধুসূদনের সমাধির উপরে যে প্রস্তরফলক নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা তাঁহার ও পরলোকগত শ্রদ্ধেয় নরেন্দ্রনাথ সেনের উদ্যম ও চেষ্টার ফল। প্রতিবর্ষে মধুসূদনের স্মৃতি জাগাইয়া রাখিবার জন্য নকুড় বাবুই বিশেষভাবে তাঁহার সমাধিপার্শ্বে সকলকে আহ্বান করিতেন। পঠন ও পাঠনে তাঁহার জীবন কাটিয়া গিয়াছে। তিনি কর্ম্মী ও উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার মৃত্যু সংবাদে আমরা অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছি। ঈশ্বর তাঁহার পরলোকগত আত্মার কল্যাণ সাধন করুন ইহাই প্রার্থনা।

৺মৃণালিনী বিশ্বাসজায়া—গত ২৯শে চৈত্র, ইংরাজি ১১ই এপ্রেল, বুধবার শেষ রাত্রে ভদ্রেশ্বর নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিশ্বাস মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী মৃণালিনী বিশ্বাসজায়ার দেহান্ত হইয়াছে। পরমেশ্বর তাঁহার পরলোকগত আত্মার শান্তিসুখ বিধান করুন।

একমেবাদ্বিতীয়ং

ঊনবিংশ কল্প

তৃতীয় ভাগ।

শ্রাবণ, ব্রাহ্মসম্বৎ ৮৮।

৮৮৮ সংখ্যা

১৮৩৯ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞাননন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"

দিয়েছ ধরা।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

আপনার নহ তুমি—তুমি যে আমার—
আপনি দিয়েছ ধরা স্বেচ্ছায় তোমার।
যাহা কিছু ছিল মম, সবি দিয়া আমি
বেঁধেছি আমার সাথে, ওগো মোর স্বামী।

মূল্য যার নাহি কোন—ভক্তিধন দিয়া
আটক করেছি তোমা' দরিদ্রের হিয়া'।
মুক্তি ভুক্তি কোন কিছু নাহি চাহি আমি—
তোমা সনে বাঁধা রব—চাহি দিনযামি।

আপনার নহ তুমি—তুমি যে আমার—
আপনি দিয়েছ ধরা স্বেচ্ছায় তোমার।
তুমি মোর প্রাণসখা, এই অধিকারে
বাঁধিয়া প্রাণের মাঝে রাখিব তোমারে।

দুরু দুরু মৃদুধ্বনি শুনিতে শুনিতে
চিরতরে রবে হৃদে—নারিবে ছাড়িতে।
নীরবে চরণ প্রভু পূজি' হব ধন্য—
সফল কর এ কাম—নাহি কাম অন্য।

আপনার নহ তুমি—তুমি যে আমার—
আপনি দিয়েছ ধরা স্বেচ্ছায় তোমার।
তুমি মোর রাজরাজ, আমি প্রজা তব—
প্রতিদিন গাব আমি জয়গীত নব।

যে যেথায় আছে সারা জগতের প্রাণী
আসিবে সমুখে তব শুনিবারে বাণী।
তোমার গৌরবে মম আনন্দ সাগরে
উঠিবে তরঙ্গ কত থরে থরে থরে।

আপনার নহ তুমি—তুমি যে আমার—
আপনি দিয়েছ ধরা স্বেচ্ছায় তোমার।
আমারো জীবন সব, যত ভালবাসা
সঁপেছি তোমারি পদে যত সুখ আশা।

আমার বলিয়া কিছু না চাহি রাখিতে—
লহ লহ সবি মম, থাক মম চিতে।
লাগাও সেবায় তব জীবন আমার—
উঠুক সেথায় তব নিত্য জয়কার।

গতি।*

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)

আমরা সত্য সত্যই যে চলিতেছি, একথা অস্বীকার করিবার যো নাই। সচলতাই জীবনের লক্ষণ, নিশ্চেষ্টতাই মৃত্যুর প্রতিরূপ। আমরা নানা কারণে রুদ্ধবীর্য্য হইয়া পড়িয়াছিলাম, জীবনের গতি মন্থরভাবে চলিতেছিল, তাহার পরে যখন হইতে

* ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চষষ্টিতম উৎসবে গত ১ই আষাঢ় দিবসে বিবৃত।

পাশ্চাত্য শিক্ষার খরতর আলোক এদেশে পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, ব্যাপকভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা চলিয়াছে, বিভিন্ন দেশের শিক্ষা সভ্যতার আদর্শ আমাদের চক্ষের সমক্ষে নিপতিত হইয়াছে, সেই দিন হইতেই আমরা প্রকৃত প্রস্তাবে নড়িতে আরম্ভ করিয়াছি; প্রাচীন ধারা আমাদিগকে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করিয়া রাখিতে পারিতেছে না। আমরা চলিষ্ণু হইয়াছি। আমাদের মধ্যে যাঁহারা নিতান্ত স্থিতিশীল, তাঁহারা স্বীকার করুন বা না করুন, তাঁহারাও নড়িতে আরম্ভ করিয়াছেন।

এই নড়াচড়া জীবনী শক্তির পরিচায়ক হইলেও সর্ব্ববিধ নড়াচড়া উন্নতি লাভের অনুকূল কি না, তাহাই বিবেচ্য। এই নড়াচড়াই বল, আর গতিই বল, যখন কোন নিয়মের অধীন হইয়া সৎ উদ্দেশ্যের দিকে অগ্রসর হয়, তখনই তাহা হইতে সুফল প্রসূত হয়, ইহা স্থির নিশ্চিত। কিন্তু যখন কোন সৎ উদ্দেশ্য না মানিয়া, কোন নিয়ম না ধরিয়া উহা চলে, তখন সুফলের আশা করা যায় না। উহা উচ্ছৃঙ্খলতাতে পর্য্যবসিত হয়।

আমাদের কণ্ঠস্বরের একটি গতি আছে। সঙ্গীতের উদ্দেশ্য শ্রোতার হৃদয়ে বিভিন্ন সুন্দরভাবের উদ্রেক সাধন। কণ্ঠ হইতে সঙ্গীত বাহির করিতে হইলে, কণ্ঠস্বরের গতি, সপ্ত-স্বরের ভিতর দিয়া যাওয়া চাই, রাগ-রাগিণী তালের নিয়ম মানিয়া চলা চাই, তবেই তাহা সঙ্গীত হইবে। উদ্দামভাবে চীৎকার কস্মিনকালে সঙ্গীতে পরিণত হইতে পারে না।

আমাদের কর্ম্মচেষ্টার ভিতরে হস্তপদ সঞ্চালনের যে গতি অর্থাৎ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যে সঙ্কোচ ও প্রসারণ রহিয়াছে, তাহা কর্ম্মঠ সকল মনুষ্যের মধ্যে একই ভাবের। ক্রিয়াসিদ্ধি তখনই সম্ভবপর, যখন পেশীর সঞ্চালন নিয়মে চলিতে থাকে। অপোগণ্ড শিশু বা বাতুল হস্তপদে গতিবেগ আনয়ন করে বটে, কিন্তু তাহারা কোন উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করে না, তাই কোন কার্য্যসিদ্ধি হয় না।

বালক বা যুবা যখন বিদ্যালয়ে পাঠ করে, তখন তাহার চিন্তার গতি ত আরম্ভ হইয়াছে, সে ত চিন্তা করিতে শিখিয়াছে; কিন্তু তাহার চিন্তার গতি "শিক্ষা করিব" এই উদ্দেশ্য লইয়া যদি পাঠ্য পুস্তকের ভিতরে বা শিক্ষকের উপদেশের দিকে না যায়, তবে তাহার সমস্ত চিন্তার গতি নিষ্ফল। সদুদ্দেশ্য মানিয়া না চলিলে তাহার চিন্তার সেই গতি তাহাকে ক্রীড়ার দিকে, বিলাসের দিকে, জীবনের নিষ্ফলতার দিকে লইয়া যাইবে।

মানুষ যে সকল শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সে ইচ্ছা করিলে তাহার সমস্ত শক্তির গতিকে সুপথে লইয়া যাইতে পারে। মানুষের ইহাই অনন্য-সাধারণ অধিকার। অন্য কোন জীব এই প্রসারণ শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে নাই। তাই মনুষ্যজীবন এত অমূল্য। তাহার কণ্ঠস্বরের গতি সঙ্গীতে এতই গমক ও মূর্চ্ছনা আনিয়া দেয়, যে শ্রোতার দল মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া অবস্থান করে। হস্তের পেশী সঞ্চালনের গতি চিত্রাঙ্কনে, মূর্ত্তিগঠনে, বিবিধ শিল্প-সামগ্রী নির্ম্মাণে, কৃষিকার্য্যে এতই পটুত্ব আনিয়া দেয়, যে তাহা হইতে সভ্যতার দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া পড়ে। তাহার মানসিক চিন্তার গতি কাব্যে, পদার্থ বিদ্যায়, দর্শনে, রসায়নে, জ্যোতিষে, ইতিহাসে প্রবল হইয়া মর্ত্ত্যলোকে যে জ্ঞানের মন্দাকিনীর সৃষ্টি করে, তাহাতে ধরণীর মুখশ্রী উদ্ভাসিত হইয়া পড়ে; আবার আধ্যাত্মিক ব্যাপারে শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি কৃতজ্ঞতার বিকাশ-ক্ষেত্রে মানবাত্মার নিভৃত নিলয়ে যে একটি গতি রহিয়াছে, তাহা পরম লক্ষ্যে পৌঁছিলে মানুষকে দেবতা করিয়া তোলে।

মনুষ্যের এই যে সক্রিয় বা সবলভাব, তাহার উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বিধান, আমাদেরই হস্তে। তাই এক কথায় মানুষ স্বাধীন। কিন্তু তাহার স্বাধীনতার তখনই মূল্য থাকে, যখন সে আপনার দায়ীত্বের কথা মনে রাখিয়া অগ্রসর হইতে চায়। তাহার প্রকৃত স্বাধীনতা লক্ষ্যহারা হইতে পারে না। তাহাকে লক্ষ্য মানিয়া চলিতে হইবেই হইবে। তাহার স্বাধীনতাকে তাহার গতিচেষ্টাকে লক্ষ্যের অধীন করিয়া লইতেই হইবে।

মানুষ্যের চিন্তাশক্তি যখন ক্ষুদ্র পরিধির ভিতরে কার্য্য করে, সমাজের মুষ্টিমেয় কয়েকজন যখন জ্ঞানের আলোচনা লইয়া বসিয়া থাকে, অধিকাংশ লোক যখন নিরবচ্ছিন্ন প্রাচীন ধারা লইয়া রোমন্থন করিতে থাকে, অনেক সময়ে অর্থহীন আচারের

অনুবর্ত্তনে যখন জীবন ক্ষয় হইতে থাকে; তখন স্বাধীন চিন্তার গতিবেগ এতই মন্দীভূত হইয়া যায়, যে তাহার ভিতরে জীবনের সাড়া আর বড় পাওয়া যায় না। যখন এই অবস্থা নিতান্ত নিবিড় হইয়া উঠে, তখনই ভগবানের মঙ্গল বিধানে জ্ঞানের ও সমুচ্চ আদর্শের তোরণ দ্বার উৎঘাটিত করিয়া মহাপুরুষের বা সমুন্নত মতের আবির্ভাব হয় এবং তাহা হইতে যে ভেরী নিনাদ বহির্গত হয়, তাহাতে জন-সমাজের প্রত্যেক মনুষ্যের হৃদয় বিচলিত হইয়া উঠে। সে সাড়ায় সকলেই জাগিয়া উঠে, এবং মনুষ্যের চিন্তা পূর্ব্ব ক্ষুদ্র পরিধি অতিক্রম করিয়া চারিদিকে বিস্ফারিত হইতে থাকে। বর্ষার আগমনে মৃতা নদীর রুদ্ধ জল যেমন বালুকার বেষ্টনীকে আর মানিতে যায় না, তেমনি স্বাধীন চিন্তার আগমন মানুষকে অতিরিক্ত মাত্রায় বিচলিত করিয়া তোলে। নদীর সমুন্নত পাড়ের মত বহুকালের বিধিবদ্ধ সমাজশৃঙ্খলাকে সে নিতান্ত নির্ম্মমভাবে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়া যায়।

একেশ্বরবাদ, বেদের প্রাণের কথা হইলেও যখন যাগযজ্ঞের বাহুল্য সেই একেশ্বরবাদকে চাপিয়া ধরিয়াছিল, উপনিষদ-যুগের স্বাধীন চিন্তার গতি প্রবল হইয়া চারিদিকে ঘোষণা করিয়া দিল "প্লবা-হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা" যজ্ঞরূপ ভেলার সাহায্যে পরব্রহ্মে কখনই পৌঁছিতে পারা যায় না। জ্ঞানোন্নত ও সাধন-নিষ্ঠ ঋষিগণ সে কথা নীরবে মানিয়া লইলেন। পরবর্ত্তী সময়ে সকাম ধর্ম্মানুষ্ঠান যখন দারুণ হইয়া উঠিয়াছিল, ফলকামনাই যখন জন-সাধারণকে ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি দান করিতেছিল, গীতার বাণী উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করিয়া দিল, যদি ধর্ম্ম সাধন করিতে হয়, ফল কামনা পরিত্যাগ করিয়া সম্পন্ন কর, তোমার অনুষ্ঠিত কার্য্যে ফল কামনার কলঙ্ক স্পর্শ না করুক। ধর্ম্ম-কার্য্যে ফল-কামনারাহিত্যই প্রকৃত যোগ। এই যে স্বাধীন চিন্তার উন্মেষ বা গতি, তাহা অদ্যাপিও বিশাল হিন্দু-সমাজকে ছাড়িতে পারে নাই। প্রাণী হত্যা লইয়া দুইটি বিভিন্ন যুগে; দুইটী স্বাধীন চিন্তার ধারা এদেশে পরিলক্ষিত হয়। "সদয়ঃ দর্শিত পশুঘাতঃ" বুদ্ধদেব এবং বহুকাল পরে প্রেমাবতার গৌরাঙ্গদেব পশু-হননের বিপক্ষে যে স্বাধীন চিন্তার ধারা প্রবাহিত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা নিষ্ফল হয় নাই। তাই হিন্দু জাতির প্রাণ এত কোমল, তাহার হৃদয় এত সরস। তাই এই বিশাল ধরণীর মধ্যে এই পবিত্র ভারতবর্ষ এখনও অগণ্য অসংখ্য নিরামিষাশীকে স্বীয় বক্ষে স্থান দিতে পারিয়াছে এবং প্রকৃত মনুষ্যত্বের গৌরব ঘোষণা করিয়া আসিতেছে।

রাজা রামমোহন রায় কোন্ দিকে আমাদের চিন্তার ধারাকে প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন? একটুকু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিব। পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোক যখন প্রথমে এদেশে নিপতিত হইল, তাহার দর্শন-বিজ্ঞান, রসায়ন-জ্যোতিস্তত্ত্ব, আমাদের কোন কোন ধারণাকে একেবারে বিপর্য্যস্ত করিয়া ছিল, তাহার আড়ম্বরহীন ধর্ম্মানুষ্ঠান আমাদিগকে অশান্ত করিয়া তুলিল, জ্ঞান ও ধর্ম্মের সামঞ্জস্য যখন এদেশে তিরোহিত হইবার উপক্রম হইল, সেই সন্ধিক্ষণে রামমোহন রায় বিপুল জ্ঞান, অসাধারণ সহিষ্ণুতা প্রভৃত ভবিষ্যৎদৃষ্টি ও অজেয় শক্তি লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। কীটনিষ্কৃষিত বেদান্ত উপনিষদের জীর্ণ পুঁথি হইতে মূর্ত্তিহীন ঈশ্বরের সন্ধান বলিয়া দিলেন এবং উপনিষদ প্রতিপাদ্য আড়ম্বর-বিহীন ধর্ম্ম-সাধনার সরল ধর্ম্ম জন সাধারণের সম্মুখে অনাবৃত করিয়া দিলেন। যাহা আমাদের দেশের ধর্ম্মের চিরন্তন মর্ম্ম কথা, যাহা সনাতন সত্য, তাহা প্রচার করিতে গিয়াও তাঁহাকে সামান্য লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয় নাই। তাঁহার সেই বাণী ক্রমে ক্রমে শিক্ষিত মণ্ডলীর অন্তরে স্থান লাভ করিতেছে এবং পিপাসু ব্যাকুল হৃদয়ে শান্তি ধারা বর্ষণ করিতেছে।

বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষা যখন জাতি নির্ব্বিশেষে প্রদত্ত হইতেছে, জ্ঞান লাভ করিয়া ধর্ম্মের পিপাসাও, যখন সকল জাতির ভিতরে বেগবতী হইয়া দাঁড়াইতেছে, তখন কোন জাতিবিশেষের মধ্যে আধ্যাত্মিক সত্যকে বদ্ধ করিয়া রাখিলে চলিবে না। মুদ্রাযন্ত্রের প্রভাবে যখন রাশি রাশি ধর্ম্মপুস্তক প্রকাশিত হইয়া সকল জাতির দ্বারে আসিয়া পৌঁছিতেছে, তখন অন্য বিতণ্ডা ছাড়িয়া দিয়া সকল জাতির ভিতরে নিষ্ঠা ও সাত্ত্বিকভাব জাগ্রত করিয়া দেওয়াই ধর্ম্ম-প্রচারকগণের কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বর্ত্তমানে চিন্তার গতি বহুদিকে ছুটিতেছে। সমাজসংস্কার, রাজ্যশাসনে অধিকার লাভ, সাম্য বিস্তার লইয়া চারিদিকে আন্দোলন চলিতেছে। কিন্তু চিন্তার ধারা বহুমুখী বা সর্ব্বতোমুখী হইলেও আমাদের সাধনার ধারাকে বিশেষভাবে সেই পরম লক্ষ্যের প্রতি প্রধাবিত করিতে না পারিলে আমাদের কল্যাণ নাই। আধ্যাত্মিক সম্পদ লাভই ভারতের চির আকাঙ্ক্ষিত ধন। ধর্ম্মলাভ ঈশ্বর লাভকে মুখ্য করিয়া তাহারই সন্ধানে অগ্রসর হইতে হইবে। ঈশ্বরকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে সমদর্শন আপনা হইতেই অভ্যস্ত হইবে, জনসমাজে ধর্ম্মকে বিকশিত করিতে পারিলেই বিবাদ বিসম্বাদ বিদূরিত হইবে। জ্ঞানের বর্ত্তিকাকে প্রজ্জ্বলিত করিতে পারিলেই সর্ব্ববিধ কুসংস্কার আপনা হইতে দূরে পলায়ন করিবে। তাহার জন্য পৃথক আয়াসের বড় প্রয়োজন হইবে না।

আমরা পরিবর্ত্তনের যুগে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। স্বাধীন চিন্তা আমাদিগকে আন্দোলিত করিয়া তুলিতেছে। ভারতের যাহা কিছু নিজস্ব, যাহা কিছু গৌরবের, ভয় হয় পাছে সংস্কারের নামে সে সমস্ত হারাইয়া বসি। রক্ষণশীলতার দোষ থাকিতে পারে, কিন্তু নবভাব প্রবর্ত্তন চেষ্টার ভিতরে যে একটি অস্থিরতা আসিয়া দেখা দেয়, তাহাতে আমাদের মত ভাব-প্রধান জাতির অন্তঃসারশূন্য হইবার আশঙ্কা রহিয়া যায়।

ত্যাগের উপরেই ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। অভ্যাসযোগেই ধর্ম্ম জীবনে বদ্ধমূল হয়। হিন্দুর নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়া-কলাপে, আত্মীয় স্বজনের আহ্বানে ও নিমন্ত্রণে, দরিদ্র সেবায়. হৃদয়ের যে সদ্ভাবের বিনিময় হইত, যে ত্যাগের ধর্ম্ম সহজে অভ্যস্ত হইত, আমাদের ভিতরে সে অবসর ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। ত্যাগের স্থানে বিলাস আসিয়া অধিকার করিয়া বসিতেছে। একান্নবর্ত্তী পরিবারের ভিতরে থাকিয়া যে স্বার্থত্যাগ সহজে অভ্যস্ত হইত, যে সাম্যভাবের শিক্ষা মিলিত, শিক্ষিতের মধ্যে তাহাও লুপ্তপ্রায় হইতে চলিয়াছে। আভিজাত্যের ভিতরে ধনী দরিদ্র পণ্ডিত মূর্খের বিচার ছিল না। এখন ধন-ঐশ্বর্য্য নব-আভিজাত্যের সৃষ্টি করিবার উপক্রম করিতেছে। গ্রামের ভিতরে হিন্দু মুসলমান ও অন্যান্য শ্রেণীর মধ্যে জাতি-নিরপেক্ষ যে একটি সদ্ভাব ও বাধ্যতার বন্ধন ছিল, তাহা শিথিল হইয়া পড়িতেছে। আমরা সংস্কার চাই ঠিক, কিন্তু সংস্কার কার্য্য ধীরগতিতে সদয়ভাবে সুসম্পন্ন হইলে জনসাধারণ তাহাতে সত্য সত্যই লাভবান হয়। বিচ্ছেদজনিত শুষ্কতা কাহাকেও অনুভব করিতে হয় না।

আমরা গতিবেগে চলিয়াছি কিন্তু স্মরণে রাখিতে হইবে তিনিই আমাদের পরম গতি। তাঁহাকে জানাই তাঁহাকে পাওয়া; "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং" ব্রহ্মবিৎই তাঁহাকে প্রাপ্ত হন। আমরা যতই কেন মান ঐশ্বর্য্য প্রভূত সম্পত্তি লাভ করি না, আমরা চির-দরিদ্র যে পর্য্যন্ত না তাঁহাকে লাভ করি; কেন না তিনিই আমাদের পরম সম্পদ। তাঁহাকে পাইলেই আমাদের যাত্রার পরিসমাপ্তি। শূন্য সে গৃহ, শূন্য সে পরিবার, যেখানে তাঁহার স্থান নাই। শূন্য সে হৃদয়, যেখানে তাঁহার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত নাই; নিরানন্দময় সে জীবন, উৎসবহীন সে প্রাণ,যাহার বীণার তারে তাঁহার নাম প্রতিধ্বনিত না হয়। অর্থহীন সে সংস্কার, যাহা আমাদিগকে তাঁহার পথের পথিক করিয়া না দেয়, তাঁহার দ্বারের ভিখারী করিয়া না তোলে। ব্যর্থ সে সংস্কার, যাহা এদেশের উজ্জ্বল অতীতের সহিত আমাদের সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। আমরা সে সংস্কার চাহি না, যাহা ধর্ম্মকে জীবনে ভাসা-ভাসা করিয়া তোলে, এবং বর্ত্তমান সভ্যতার অঙ্গ করিতে চায়। আমরা নিবিড় প্রেমের পক্ষপাতী। তাঁহার নামে আজ আমাদের এই উৎসব; ব্রাহ্মসমাজের নামে আমাদের এই আয়োজন; একেশ্বরবাদের নামে আমাদের এই সম্মিলন। আজ তাঁহার বিশেষ কৃপা আমাদের উপর অবতীর্ণ হউক। আমাদিগকে সুপথে পরিচালিত করুক। তাঁহার সহিত আমাদের হৃদয়ের বন্ধন আরও সুদৃঢ় হউক। হোমশিখার ন্যায় আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা-ভক্তি, নিষ্ঠা-প্রেমের ধারা তাঁহার প্রতি অচঞ্চল হউক, জীবনের গতি আমাদিগকে তাঁহারই সমীপস্থ করুক, ইহাই আজ আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

গীতা-রহস্য।

কর্ম্ম-জিজ্ঞাসা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদিত)

অহিংসা ও সত্য—ইহাদের সম্বন্ধেই যদি এত বাদানুবাদ, তবে যে তৃতীয় সাধারণ তত্ত্ব অস্তেয়, তাহার সম্বন্ধেও যে এই যুক্তি প্রয়োগ হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? একজনের ন্যায়োপার্জ্জিত সম্পত্তি অন্যেরা যদি অবাধে চুরী বা লুট করিতে পায়, তাহা হইলে ধনসঞ্চয় বন্ধ হইয়া সকলেরই ক্ষতি হইবে,—ইহা নির্ব্বিবাদ। কিন্তু এ-নিয়মেরও ব্যতিক্রম আছে। চারিদিকে দুর্ভিক্ষ হইবার দরুণ,—মূল্য দিয়া, মজুরী করিয়া, কিংবা ভিক্ষা করিয়াও অন্ন সংগ্রহ হইতেছে না—এইরূপ বিপত্তি উপস্থিত হইলে পর, যদি কেহ চুরী করিয়া আত্মরক্ষা করিবে মনে করে, তাহাকে কি পাপী ঠাওরাইবে? ১২ বৎসর ধরিয়া অকাল পড়ায়, বিশ্বামিত্রের নিকট এইরূপ এক কঠিন প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়; এই বিপত্তিকালে, চণ্ডালের ঘরের কুক্কুর-মাংসের ঠ্যাং চুরী করিয়া সেই অভক্ষ্য অন্নে স্বীয় প্রাণ বাঁচাইবার প্রবৃত্তি তাঁহার হইয়াছিল, এইরূপ মহাভারতে আছে (শাং ১৪১)। "পঞ্চপঞ্চনখাভক্ষ্যাঃ" (মনু, ৫,১৮ দেখ) * প্রভৃতি বহু শাস্ত্রার্থের ব্যাখ্যা করিয়া অভক্ষ্যভক্ষণ—ও তাহা চুরি করিয়া ভক্ষণ—না করিবার জন্য, শাস্ত্রপ্রমাণের উপর ভর করিয়া অনেক উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু—

পিবন্ত্যেবোদকং গাবো মণ্ডুকেষু কৃবৎস্বপি।
ন তেঽধিকারো ধর্ম্মেঽস্তি মা ভূরাত্মপ্রশংসকঃ॥

"ওরে! ভেকেরা ডাকিলেও গাভীরা জল পান করিতে ছাড়ে না; চুপ কর্! আমাকে ধর্ম্ম শেখাবার তোর অধিকার নাই, মিছামিছি বড়াই করিস নে" এই কথা বলিয়া বিশ্বামিত্র তাহা অবজ্ঞা করিয়াছেন। "জীবিতং মরণাৎশ্রেয়ো জীবন্ধর্ম্মমবাপ্নুয়াৎ"—"বাঁচিলে তবে ধর্ম্ম লাভ হয়, অতএব জীবন মরণাপেক্ষা শ্রেয়"—এই কথা বিশ্বামিত্র এই সময় বলিয়াছেন; এবং কেবল বিশ্বামিত্র নহে, এই প্রসঙ্গে অজীগর্ত্ত, বামদেব প্রভৃতি অপর অনেক ঋষিও এইরূপ আচরণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনু উদাহরণ দিয়াছেন (মনু ১০, ১০৫, ১০৮)। হব্‌স্ নামক ইংরেজ গ্রন্থকার আপন গ্রন্থে এইরূপ বলেন যে, "দুর্ভিক্ষের সময়, মূল্য দিয়া বা ভিক্ষার দ্বারা অন্ন সংগ্রহ করিতে না পারিয়া যদি কেহ পেটের দায়ে চুরী বা ডাকাতী করে তবে তাহার সে অপরাধ সর্ব্বথা মার্জ্জনীয়।" † এবং মিল্‌ও লিখিয়াছেন এই অবস্থায় চুরী করিয়াও আপনার প্রাণ রক্ষা করা মানুষের কর্ত্তব্য!

"মরণ অপেক্ষা জীবন শ্রেয়" বিশ্বামিত্রের এই তত্ত্বটি কি সর্ব্বথা অব্যভিচারী? এই জগতে বাঁচিয়া থাকাটা কিছুই পুরুষার্থ নহে। বলি খাইয়া কাকেরাও অনেক বৎসর বাঁচিয়া থাকে। তাই, বীরপত্নী বিদুলা আপন পুত্রকে এইরূপ বলিয়াছেন যে, শয্যার উপর জড়বৎ পড়িয়া থাকা অপেক্ষা কিংবা গৃহে শতবৎসর ধুঁয়াইতে থাকা অপেক্ষা, মুহূর্ত্তকালের জন্য জ্বলিয়া উঠাও শ্রেয়—"মুহূর্ত্তং জ্বলিতং শ্রেয়ো ন চ ধূমায়িতং চিরং" (সভা, উ. ১৩২, ১৫)। আজ নহে কাল, অন্তত শত বৎসরের মধ্যেও মৃত্যু যদি কাহাকেও না ভোলে, তবে তাহার জন্য ভীতি কিংবা আক্রোশ, ভয় কিংবা কান্না কেন? অধ্যাত্মশাস্ত্রানুসারে দেখিলে আত্মা নিত্য, তাহার কখনই মৃত্যু হয় না। তাই, মৃত্যুর বিচার করিবার সময়, প্রারব্ধ কর্ম্মানুসারে প্রাপ্ত যে শরীর সেই শরীরের কি হয়—এই প্রশ্নটার মীমাংসা বাকী থাকিয়া যায়। চলা-বলা করি-

* কুকুর, বানর প্রভৃতি যে সকল প্রাণীর ৫টা নখ আছে, এইরূপ প্রাণীর মধ্যে (যাদের গায়ে কণ্টক আছে সেই) সজারু, শল্লক (সজারুর এক জাত) গোধা, কূর্ম্ম, শশক, এই পাঁচ প্রাণীর মাংস ভক্ষ্য—(এইরূপ মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য) বলিয়াছেন (মনু ৫. ১৮.; যাজ্ঞ. ১ ১৭৭)। ইহা ব্যতীত মনু খড়্গ অর্থাৎ গণ্ডারেরও উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু সে বিষয়ে বিকল্প আছে—এইরূপ টীকাকার বলেন। এই বিকল্প ছাড়িয়া দিলে, পাঁচ প্রাণীই থাকিয়া যায় এবং তাহাদের মাংসই 'ভক্ষ্য—এইরূপ "পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যাঃ"র—অর্থ। তথাপি মাংস খাইবার যাহার অনুমতি আছে, সে উল্লিখিত প্রাণীর মাংস ছাড়া অপর পাঁচনখী প্রাণীর মাংস খাইবেক না, এইটুকু মাত্র বলা হইয়াছে, উহাদের মাংস খাইলেই এরূপ বিধান নাই,—মীমাংসক ইহার এইরূপ অর্থ করেন। এই পারিভাষিক অর্থকে তিনি "পরিসংখ্যা" এই নাম দিয়াছেন। "পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যাঃ"—ইহাই এই পরিসংখ্যার মুখ্য উদাহরণ। মাংস খাওয়াটাই যদি নিষিদ্ধ বলিয়া মানিতে হয়, তাহা হইলে উহাদের মাংস খাওয়াও নিষিদ্ধ হইতেছে।

† Hobbes' Leviathan, Part II Chap XXVII. P. 139 (Morley's Universal Library Edition)—"Thus, to save a life, it may not only be allowable but a duty to steal &c."

তেছে এই যে শরীর ইহা নশ্বর, কিন্তু আত্মার কল্যাণার্থ যাহা কিছু এজগতে করিবার আছে, এই শরীরই তাহার এক সাধন ; তাই মনুও বলিয়াছেন,—"আত্মানং সততং রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি" ধন, দারা প্রভৃতির দ্বারা আপনাকে সতত রক্ষা করিবে। (মনু ৭, ২১৩)। তথাপি এই দুর্লভ অথচ নশ্বর মানবদেহ বিসর্জ্জন করিয়া তাহা অপেক্ষা অধিক শাশ্বত কোন বস্তু যদি কখন লাভ করিতে হয় তখন দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের জন্য, দেশের জন্য, ধর্ম্মের জন্য, সত্যের জন্য, আপন ব্যবসায়, ব্রত, কিংবা দাবী বজায় রাখিবার জন্য, মানের জন্য, যশের জন্য অথবা সর্ব্বভূতের হিতের জন্য অনেক মহাত্মাই অনেক প্রসঙ্গেই এই তীব্র কর্ত্তব্যবহ্নিতে আপনার প্রাণকেও আনন্দের সহিত আহুতি দিয়াছেন! বশিষ্ঠের ধেনু সিংহ হইতে রক্ষা করিবার মানসে সিংহের নিকট আপন দেহকে বলি দিবার জন্য প্রস্তুত দিলীপ—"আমার ন্যায় পুরুষদিগের পাঞ্চ-ভৌতিক শরীর সম্বন্ধে অনাস্থা হইয়া থাকে, এইজন্য তুই আমার জড় শরীর অপেক্ষা আমার যশঃ-শরীরের দিকে চাহিয়া দেখ্"—(রঘু. ২. ৫৭), এই কথা সিংহকে বলিয়াছিলেন, রঘুবংশে আছে ; এবং সর্পের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য জীমূতবাহন গরুড়কে আপনার দেহ অর্পণ করিবার কথা কথাসরিৎসাগরে ও নাগানন্দ নাটকে বর্ণিত হইয়াছে। মৃচ্ছকটিক নাটকে (১০, ২৭) চারুদত্ত এইরূপ বলিতেছেন :—

ন ভীতো মরণাদস্মি কেবলং দূষিতং যশঃ।
বিশুদ্ধস্য হি মে মৃত্যুঃ পুত্রজন্মসমঃ কিল॥

"আমি মরণে ভীত নহি ; কেবল যশ দূষিত হইয়াছে এই জন্যই আমি দুঃখিত। বিশুদ্ধ থাকিয়া আমার যে মৃত্যু, তাহা নিশ্চয়ই আমার পক্ষে পুত্রজন্মজনিত উৎসবের তুল্য।" এই তত্ত্ব সম্বন্ধে শিবি রাজা, শরণাগত কপোতের রক্ষণার্থ, শ্যেন পক্ষীর রূপধারী উক্ত কপোতের অনুধাবক ধর্ম্মকে নিজ শরীরের মাংস কাটিয়া দিয়াছিলেন। দেবতাদিগের শত্রু যে বৃত্র—তাহাকে মারিবার জন্য দধীচি ঋষির অস্থি হইতে এক বজ্র পাইবার কথা ছিল,—তাই, সকল দেবতারা উক্ত ঋষির নিকট গিয়া—"শরীরত্যাগং লোকহিতার্থং ভবান্ কর্ত্তুম অর্হতি"—"মহর্ষি, সর্ব্বলোকের কল্যাণার্থ আপনার দেহত্যাগ করা কর্ত্তব্য" এইরূপ তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলে পর, দধীচি ঋষি পরমানন্দে প্রাণত্যাগ করিলেন এবং দেবতাদিগকে আপন অস্থিদান করিলেন।

এই কাহিনীটি মহাভারতের বনপর্ব্বে ও শান্তিপর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে (বন. ১০০.১৩১ ; শাং ৩৪২)। কর্ণের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সহজাত কবচ কুণ্ডল হরণ করিবার জন্য ইন্দ্র ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিয়া দানশূর কর্ণের নিকট ভিক্ষা মাগিতে আসিবেন জানিতে পারিয়া, উক্ত কবচ-কুণ্ডল কাহাকে দান না করা হয়, সূর্য্য পূর্ব্ব হইতেই ইঙ্গিতে জানাইয়া দিলেন এবং এইরূপ আদেশ করিলেন যে, "তুই দানশূর বলিয়া যদিও তোর কীর্ত্তি আছে, তথাপি কবচ-কুণ্ডল দান করিলে তোর প্রাণ সংশয় হইবে অতএব উহা কাহাকেও দিবি না।" কারণ মরিয়া গেলে কীর্ত্তি কি-কাজে লাগিবে? "মৃতস্য কীর্ত্ত্যা কিং কার্য্যং"? সূর্য্যের এই কথা শুনিয়া—"জীবিতেনাপি মে রক্ষ্যা কীর্ত্তিস্তৎবিদ্ধি মে ব্রতম্"—প্রাণ গেলেও কীর্ত্তি রক্ষা করিতে হইবে, ইহাই আমার ব্রত জানিবে। কর্ণ তাঁহাকে এইরূপ খট্‌খটে জবাব দিয়াছিলেন (সভা. বন. ২৯৯.৩৮)। অধিক-কি, মরিলে স্বর্গে যাইবে এবং বাঁচিয়া থাকিলে পৃথিবী ভোগ করিবে ইত্যাদি ক্ষাত্রধর্ম্ম (গী. ২.৩৭) কিংবা "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ" (গী. ৩.৩৮) এই সিদ্ধান্তও ঐ তত্ত্ব অবলম্বন করিয়া আছে ; এবং তাহার অনুসরণ করিয়াই "কীর্ত্তি পাহোঁ জাতাঁ সুখ নাহি। সুখ পাহ তাঁ কীর্ত্তি নাহি॥" অর্থাৎ কীর্ত্তি দেখিয়া চলিলে সুখ নাই, সুখ দেখিলে কীর্ত্তি নাই। (দাস.১২.১০.১৮. ১০-২৫)। তাই, "দেহ ত্যাগিতাঁ কীর্ত্তি মাগে উরাবী। মনা সজ্জনা হেচি ক্রিয়া করাবী"॥ অর্থাৎ দেহ ত্যাগ করিবার সময় কীর্ত্তি সম্মুখে রাখিবে, রে মন! সজ্জনদিগের এইরূপই আচরণ জানিবে। এইরূপ শ্রীসমর্থ রামদাস স্বামীর উপদেশ আছে। কিন্তু পরোপকারের দ্বারা কীর্ত্তি অর্জ্জিত হয় এ কথা সত্য হইলেও, মরিয়া গেলে কীর্ত্তি কি কাজে লাগিবে? অথবা মানী পুরুষেরা দুষ্কীর্ত্তি অপেক্ষা (গী.২.৩৪), কিংবা জীবন অপেক্ষা

পরোপকার অধিক প্রিয়—কেন মনে করিবে? এই প্রশ্নের যোগ্য উত্তর দিতে হইলে, অন্তরাত্মার আত্মবিচারক্ষেত্রে প্রবেশ ভিন্ন দ্বিতীয় উপায় নাই, এবং উত্তর দিলেও তথাপি কোন্ প্রসঙ্গে জীবের সম্বন্ধে উদার হওয়া উচিত, কোন্ প্রসঙ্গে অনুচিত তাহা বুঝিবার জন্য সেই সঙ্গে কর্ম্ম-অকর্ম্ম সংক্রান্ত শাস্ত্রের বিচার করা আবশ্যক হয়। নচেৎ জীবের উপর উদার হইবার যশোলাভ দূরের কথা, মূর্খতা করিয়া আত্মহত্যা পাপের কোঠায় আসিয়া পড়িবার সম্ভাবনা থাকে।

মাতা, পিতা, গুরু প্রভৃতি বন্দ্য ও পূজ্য পুরুষদিগকে দেবতার ন্যায় পূজা ও সেবা করা—ইহাও সাধারণ ও সর্ব্বমান্য ধর্ম্ম সমূহের মধ্যে এক প্রধানধর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। কারণ, সেরূপ না হইলে, কুটুম্বদিগের, গুরুকুলের কিংবা সমস্ত সমাজেরও ঠিক্ ব্যবস্থা কখনই থাকিতে পারে না। তাই শুধু স্মৃতিগ্রন্থাদিতে নহে, উপনিষদের "সত্যং বদ ধর্ম্মং চর" এইরূপ বলিয়া তাহার পর আছে "মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। আচার্য্যদেবো ভব।" এইরূপ শিষ্যের অধ্যয়ন সম্পূর্ণ হইয়া সে গৃহে ফিরিয়া গেলে পর প্রত্যেক গুরু তাহাকে উপদেশ করিতেন, এইরূপ উক্ত হইয়াছে (তৈ. ১.১১.১ ও ২) এবং মহাভারতের ব্রাহ্মণ-ব্যাধ আখ্যানের ইহাই তাৎপর্য্য (বন.২১৩)।

কিন্তু ধর্ম্মেতেও কতকগুলি অকল্পিত, কঠিন সমস্যা উপস্থিত হইয়া থাকে—

উপাধ্যায়ান্দশাচার্য্যঃ আচার্য্যাণাং শতং পিতা।
সহস্রং তু পিতৃন্মাতা গৌরবেণাতিরিচ্যতে॥

অর্থাৎ "দশ উপাধ্যায় অপেক্ষা আচার্য্য, শত আচার্য্য অপেক্ষা পিতা ও সহস্র পিতা অপেক্ষা মাতা গৌরবে অধিক" এইরূপ মনু বলেন (২.১৪৫)। তথাপি মাতা এক গুরুতর অপরাধ করিয়াছিলেন বলিয়া পিতার আদেশক্রমে পরশুরাম তাঁহার কণ্ঠচ্ছেদ করেন, এই কথা প্রসিদ্ধ আছে (বন. ১১৬.১৪); এবং শান্তিপর্ব্বে চিরকারিকোপাখ্যানে (শাং.২৬৫) এই প্রকারের আর এক প্রসঙ্গে, পিতার আজ্ঞানুসারে মাতাকে বধ করা শ্রেয়স্কর কিংবা পিতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করা শ্রেয়স্কর—ইহার তারতম্যের অনেক সাধক-বাধক প্রমাণ দিয়া এক স্বতন্ত্র অধ্যায়ে সবিস্তার বিচার করা হইয়াছে। এই সম্বন্ধে এইরূপ সূক্ষ্ম প্রসঙ্গসমূহের নীতি নীতিশাস্ত্রদৃষ্টিতে মীমাংসা করিবার প্রথা মহাভারতের কালে পূর্ণরূপে প্রচলিত ছিল, এইরূপ স্পষ্ট দেখা যায়। পিতার প্রতিজ্ঞা সত্য করিবার জন্য তাঁহার আদেশে রামচন্দ্রের চৌদ্দ বৎসর বনবাস স্বীকার করিবার কথা আবালবৃদ্ধ সকলেই অবগত আছে। কিন্তু উপরে মাতা সম্বন্ধে যে নীতি কথিত হইল, তাহা পিতার সম্বন্ধেও কখন কখন প্রযুক্ত হইবার সময় আসিতে পারে। তাহার উদাহরণ যথা—পুত্র আপন পরাক্রমে রাজা হইলে পর, পিতার অপরাধের বিচার নিষ্পত্তির জন্য তাহার সম্মুখে আসিল, তখন রাজা এই সূত্রে তাহার বাপকে শাসন করিবে কিংবা বাপ বলিয়া ছাড়িয়া দিবে? মনু বলেন:—

পিতাচার্য্যঃ সুহৃন্মাতা ভার্য্যা পুত্রঃ পুরোহিতঃ।
নাদণ্ড্যো নাম রাজ্ঞোঽস্তি যঃ স্বধর্ম্মে নতিষ্ঠতি॥

অর্থাৎ—"পিতা আচার্য্য, মিত্র, মাতা, পত্নী, পুত্র কিংবা পুরোহিত যেই হউক না কেন, যদি সে আপন ধর্ম্ম অনুসারে আচরণ না করে, তবে সে অদণ্ড্য নহে, অর্থাৎ উচিত শাসন করা রাজার কর্ত্তব্য" (মনু, ৮. ৩৩৫; সভা, শাং, ১২১, ৬০)। কারণ, এইস্থলে পুত্রধর্ম্মাপেক্ষা রাজধর্ম্মের ঔচিত্য অধিক। এই নীতি অনুসারে মহাপরাক্রমী সূর্য্যবংশীয় সগর রাজা, আপন দুরাচারী পুত্র অসমঞ্জস প্রজাবর্গকে কষ্ট দিতেছে দেখিয়া তাহাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন, এইরূপ মহাভারত ও রামায়ণ এই দুই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে (সভা, ব. ১০৭; রামা, ১.৩৮)। মনুস্মৃতিতেও এইরূপ এক কথা আছে যে, আঙ্গিরস নামে এক ঋষির অল্প বয়সে উত্তম জ্ঞানলাভ হওয়ায় তাহার কাকা, মামা, প্রভৃতি গুরুজনেরা তাহার নিকট অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন; তখন অধ্যয়নের সময় শিষ্যকে গুরু প্রায়ই যাহা বলিয়া থাকেন সেইরূপ কোন এক প্রসঙ্গে আঙ্গিরসের মুখ হইতে তাঁহাদিগের উদ্দেশে "পুত্রগণ" এই শব্দটা সহজভাবে মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়িল।—"পুত্রকা ইতি হোবাচ জ্ঞানেন পরিগৃহ্য তান্।" কিন্তু কি জিজ্ঞাসা করিতেছ? সেই সকল বৃদ্ধেরা অতিশয় রুষ্ট হইয়া, "ছোঁড়াটার

ভারী দেমাক্ হইয়াছে" ঠাওরাইলেন। এবং তাহার যাহাতে সমুচিত শাসন হয়, এই নিমিত্ত দেবতাদিগের নিকট নালিস করিলেন। দেবতারা উভয় পক্ষের কথা শুনিয়া "আঙ্গিরস তোমাদিগকে যাহা বলিয়াছে তাহা ন্যায্য"—এইরূপ বিচার-নিষ্পত্তি করিলেন। কারণ—

ন তেন বৃদ্ধো ভবতি যেনাস্য পলিতং শিরঃ।
যো বৈ যুবাপ্যধীয়ানস্তং দেবাঃ স্থবিরং বিদুঃ॥

অর্থাৎ চুল পাকিলেই কোন মনুষ্য বৃদ্ধ হয় না, যুবা হইয়াও যে অধীয়ান্ তাহাকেই দেবতারা বৃদ্ধ বলিয়া জানেন" (মনু, ২. ১৫৬; সেইরূপ সভা, বন, ১৩৩, ১১; শল্য, ৫১, ৪৭ দেখ) শুধু মনু ও ব্যাস নহে বুদ্ধদেবও এই তত্ত্ব মান্য করিয়াছিলেন। কারণ, মনুসংহিতার উপরি-উক্ত শ্লোকের প্রথম চরণ অক্ষরশঃ 'ধম্মপদ' * নামে প্রসিদ্ধ নীতিপর পালী বৌদ্ধ গ্রন্থে আছে (ধর্ম্মপদ ২৬০); পরে ঐ গ্রন্থে,—"কেবল বয়সেই যে পরিপক্ক হইয়াছে তাহার জীবন ব্যর্থ এবং প্রকৃত ধার্ম্মিক ও বৃদ্ধ হইতে হইলে, অহিংসা ইত্যাদি সদগুণ নিতান্তই আবশ্যক" এইরূপ কথিত হইয়াছে। এবং 'চুল্লবগ্গ' নামক অপর গ্রন্থে, ধর্ম্মনিদর্শনকারী ভিক্ষু তরুণবয়স্ক হইলেও স্বতঃ উচ্চ আসনে বসিয়া, আপনার পূর্ব্বে দীক্ষিত বয়োবৃদ্ধ ভিক্ষুকে ধর্ম্মোপদেশ করিবে, এইরূপ বুদ্ধেরা অনুমতি দিয়াছেন (চুল্লবগ্গ ৬, ১৩০ দেখ) প্রহ্লাদ আপন পিতা যে হিরণ্যকশিপু তাহার অবজ্ঞা করিয়া ভগবানকে লাভ করিয়াছিলেন—এই পৌরাণিক কথা সর্ব্ববিশ্রুত আছে; এবং সেই সম্বন্ধে শুধু ছোট বড় বয়সের হিসাবে নহে, পরন্তু পিতাপুত্রের সর্ব্বমান্য সম্বন্ধেতেই কখন কখন আর এক উচ্চতর সম্বন্ধ উপস্থিত হইয়া পিতৃ পুত্র সম্বন্ধ ক্ষণকালের জন্য ভুলিতে হয়—এইরূপ দেখা যায়। কিন্তু এইরূপ প্রসঙ্গ উপস্থিত না হইলেও, এই নিয়ম যথাসম্ভব উপস্থিতক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া কোন ছোট ছেলে আপন বাপকে যদি গালি দেয় তবে আমরা সেই ছেলেকে পশুর মধ্যে গণনা করি না কি? "গুরুর্গরীয়ান্ পিতৃতো মাতৃতশ্চেতি মে মতিঃ" (শাং, ১০৮, ১৭) মা বাপ অপেক্ষা গুরু শ্রেষ্ঠ—এইরূপ ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন। কিন্তু "মরুত্ত" রাজার গুরু "লোভা" স্বার্থের জন্য তাঁহাকে ত্যাগ করিলে পর মরুত্ত—

গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য ন্যায্যং ভবতি শাসনম্॥

"কার্য্যাকার্য্য জ্ঞানরহিত ও আপন দোষে উন্মার্গগামী গুরুকেও শাসন করা ন্যায়সঙ্গত" এইরূপ উচ্ছ্বাসবাক্য বাহির করিয়াছেন, এইরূপ মহাভারতে কথিত হইয়াছে। মহাভারতের এই শ্লোক চারি স্থানে লিখিত হইয়াছে (সভা, আ. ১৪২, ৫২. ৩; ১৭৮, ২৪; শাং, ৫৭, ৭; ১৪০, ৪৮)। তন্মধ্যে প্রথম স্থানের পাঠ উপরে লিখিত হইয়াছে; অন্যান্য স্থলে চতুর্থ চরণ বাদে "দণ্ডী ভবতি শাশ্বতঃ" কিংবা "পরিত্যাগো বিধীয়তে"—এইরূপ পাঠান্তর আছে। কিন্তু বাল্মীকি-রামায়ণের যে স্থানে (রামা, ২, ২১, ১৩) এই শ্লোকটি আছে সেখানে একই অর্থাৎ উপরি-উক্ত পাঠই পাওয়া যায় বলিয়া আমি তাহাই এই গ্রন্থে মানিয়া লইয়াছি। ভীষ্ম পরশুরামের সহিত এবং অর্জ্জুন দ্রোণের সহিত যে যুদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা এই তত্ত্বেরই বনিয়াদে হইয়াছিল। হিরণ্যকশিপু কর্ত্তৃক নিয়োজিত প্রহ্লাদের গুরু যখন প্রহ্লাদকে ভগবৎপ্রাপ্তির বিরুদ্ধ উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন তখন এই তত্ত্বের বনিয়াদেই প্রহ্লাদ তাঁহাকে নিষেধ করেন। শান্তিপর্ব্বে ভীষ্ম স্বতই শ্রীকৃষ্ণকে এই বলিতেছেন যে, গুরু পূজ্য সত্য, কিন্তু তাঁহারও নীতির মর্য্যাদা পালন করা কর্ত্তব্য; নচেৎ—

সময়ত্যাগিনো লুব্ধান্ গুরূনপি চ কেশব।
নিহন্তি সমরে পাপান্ ক্ষত্রিয়ঃ স হি ধর্ম্মবিৎ॥

"হে কেশব, মর্য্যাদা, নীতি, কিংবা শিষ্টাচার যাহারা পালন করে না সেই লোভী ও পাপিষ্ঠ লোকেরা গুরু হইলেও, যে ক্ষত্রিয় যুদ্ধে তাহা-

* "ধম্মপদ" এই গ্রন্থের ইংরাজী ভাষান্তর Sacred Books of the East (প্রাচ্য ধর্ম্মপুস্তকমালা) Vol X—ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে; চুল্লবগ্গার ইংরেজি ভাষান্তর-মালার Vol XVII ও XXএর মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। মারাঠীতেও.রা, রা, যাদব রাও বার্ষিকর ধম্মপদের ভাষান্তর করিয়াছেন—তাহা কোল্হাপুরের গ্রন্থমালায় ও পরে পুস্তকাকারে ছাপা হইয়াছে। ধম্মপদের পালী শ্লোকটী নিম্নে দিতেছি:—

ন তেন থেরো হোতি যেনস্স পলিতং সিরঃ।
পরিপক্কো বয়ো তস্স মোঘজিন্নো তি বুচ্চতি॥

"থের" এই শব্দ বৌদ্ধ ভিক্ষুর সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়—উহা সংস্কৃত 'স্থবিরের' অপভ্রংশ।

দিগকে বধ করে তাহারা ধর্ম্মজ্ঞ।" (শাং, ৫৫, ১৬)। সেইরূপ, তৈত্তিরীয়োপনিষদেও "আচার্য্য-দেবো ভব" এইরূপ প্রথম বলিবার পর, পরে তৎক্ষণাৎ—আমাদের যে সকল আচরণ ভাল তাহারই অনুকরণ করিবে, অন্য আচরণ পরিত্যাগ করিবে—"যান্যস্মাকং সুচরিতানি তানি ত্বয়োপাস্যানি। নো ইতরাণি।"—এইরূপ উক্ত হইয়াছে (তৈ, ১, ১১, ২)। এই সম্বন্ধে, পিতৃদেব কিংবা আচার্য্যদেব হইলেও, বাপ কিংবা গুরু সুরা পান করেন বলিয়া তুমি সুরা পান করিও না, কারণ, নীতিমর্য্যাদার কিংবা ধর্ম্মের অধিকার,—মা বাপ গুরু, প্রভৃতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলবান এইরূপ উপনিষদের সিদ্ধান্ত স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। "ধর্ম্ম পালন কর, ধর্ম্মকে যে নাশ করে অর্থাৎ ত্যাগ করে, ধর্ম্ম তাহাকে নাশ না করিয়া ক্ষান্ত হয় না"। মনু এইরূপ যে সকল বিধান করিয়াছেন, তাহার অন্তর্নিহিত বীজ ইহাই (মনু, ৮,১৪-১৬)। রাজা ত গুরু অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ—একরূপ দেবতা (মনু, ৭,৮, ও সভা, শাং, ৬৮, ৪০)। কিন্তু তাঁহাকেও ধর্ম্ম ছাড়ে না, ছাড়িলে তিনিও বিনাশ প্রাপ্ত হন এইরূপ মনুস্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে। মহাভারতে বেন ও থনীনেত্র এই দুই রাজার আখ্যানে এই অর্থই ব্যক্ত হইয়াছে (মনু, ৭,৪১ ও ৮, ১২৮; সভা, শাং, ৫৯.৯২,১০০, ও অশ্ব, ৪ দেখ)।

অহিংসা, সত্য ও অস্তেয়—ইহাদের ন্যায় ইন্দ্রিয়-নিগ্রহও সাধারণ ধর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে (মনু, ১০,৬৩)। কাম, ক্রোধ, লোভ এই সমস্ত মনুষ্যের শত্রু হওয়ায়, প্রত্যেকে উহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে জয় করিতে না পারিলে তাহার কিংবা সমাজেরও কল্যাণ হয় না, এইরূপ উপদেশ সকল শাস্ত্রেই আছে; বিদুরনীতি ও ভগবদ্‌গীতাতেও এইরূপ উক্ত হইয়াছে যে—

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতৎ ত্রয়ং ত্যজেৎ॥

অর্থাৎ—"কাম, ক্রোধ ও লোভ এই তিন নরকের দ্বার ও আত্মবিনাশের সাধক হওয়ায় উহাদিগকে ত্যাগ করিবেক" (গীতা, ১৬.২১; সভা. উ,৩২,৭০)। কিন্তু গীতাতেও ভগবান্ "ধর্ম্মাহবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ"—অর্থাৎ হে অর্জ্জুন, প্রাণী-দিগের মধ্যে, ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ যে কাম সে আমিই (গীতা, ৭, ১১) এইরূপ আপন স্বরূপের বর্ণনা করিয়াছেন। অর্থাৎ ধর্ম্মের বিরুদ্ধ যে কাম সে নরকেরই দ্বার, উহা ব্যতীত অন্য প্রকারের কাম ভগবানের নিকট মান্য এইরূপ এই সম্বন্ধে স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। মনুও "পরিত্যজেদর্থকামৌ যৌ স্যাতাং ধর্ম্মবর্জিতৌ"—অর্থাৎ ধর্ম্মবর্জ্জিত যে অর্থ কাম তাহা পরিত্যাগ করিবে—এইরূপ বলিয়াছেন। (মনু, ৪,১৭৬)। সর্ব্ব প্রাণী কল্য যদি কাম-মহারাজকে একেবারে ছুটি দিয়া আমরণ ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালনের সঙ্কল্প করে, তাহা হইলে ৫০ বৎসর কিংবা খুব-বেশী ১০০ বৎসরের মধ্যেই সমস্ত জীবসৃষ্টির লয় হইয়া সমস্ত নিস্তব্ধ হইয়া যাইবে, এবং যে সৃষ্টি উৎসন্ন না হয় বলিয়া সময়-মত ভগবান্ অবতার ধারণ করেন, স্বল্পকালের মধ্যেই সেই সৃষ্টির উচ্ছেদ হইয়া যাইবে। কাম ও ক্রোধ এ দুই শত্রু বটে, কিন্তু কখন্? সংযত করিয়া না রাখিলে তবেই। সৃষ্টির ক্রমগতির উচিত সীমার মধ্যে উহাদিগের অত্যন্ত আবশ্যকতা আছে, এই বিষয়ে মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারদিগেরও সম্মতি আছে (মনু, ৫,৫৬)। এই প্রবল দুই মনোবৃত্তিকে উচিত শাসনে রাখিলে, উহার দ্বারা সমস্ত সৃষ্টি বিধৃত হইয়া থাকে, বিনষ্ট হয় না।

লোকে ব্যবায়ামিষমদ্যসেবা নিত্যাস্তি জন্তোর্নহি তত্র চোদনা।
ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহযজ্ঞসুরাগ্রহৈরাসু নিবৃত্তিরিষ্টা॥

অর্থাৎ—"এই জগতে, মৈথুন, মাংস ও মদ্য সেবন কর বলিয়া কাহাকেও বলিতে হয় না; উহা মনুষ্যের স্বভাবতই হইয়া থাকে। এই তিনের কোন প্রকার ব্যবস্থা করিবে অর্থাৎ উহাদিগকে সীমার মধ্যে রাখিয়া, সংযত করিয়া, সুব্যবস্থিত করিবে; এই কারণেই, বিবাহ, সোম যাগ ও সৌত্রামনী যজ্ঞ—ইহাদের অনুক্রম শাস্ত্রকারেরা যোজনা করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও "নিবৃত্তি অর্থাৎ নিষ্কাম আচরণই ইষ্ট হয়"—এইরূপ ভাগবতে উক্ত হইয়াছে (ভাগ, ১১,৫,১১)। 'নিবৃত্তি' এই শব্দের, পঞ্চমী-অন্ত পদের সহিত সম্বন্ধ থাকায় "অমুক হইতে নিবৃত্তি অর্থাৎ অমুক কর্ম্ম সর্ব্বথা ত্যাগ করা" এইরূপ যদি অর্থ হয় তথাপি কর্ম্ম যোগে 'নিবৃত্ত' এই বিশেষণ কর্ম্মের সম্বন্ধেই

প্রয়োগ হওয়ায় 'নিবৃত্ত কর্ম্ম' অর্থাৎ নিষ্কাম বুদ্ধিতে কৃত কর্ম্ম—এইরূপ এই পদের অর্থ ইহা যেন এইখানে মনে রাখা হয়; এবং ঐরূপ অর্থ মনু-স্মৃতি ও ভাগবত পুরাণে স্পষ্টরূপে প্রদত্ত হইয়াছে (মনু, ১২,৮৯; ভাগ, ১১,১০,১ ও ৭,১৫,৪৭ দেখ)। ক্রোধ সম্বন্ধে বলিবার সময় ভারবি কিরাত কাব্যে এইরূপ বলিতেছেন—

অমর্ষশূন্যেন জনস্য জন্তুনা ন জাতহার্দেন য বিদ্বিষাদরঃ॥

অর্থাৎ—অবমানিত হইলেও যে পুরুষের ক্রোধ বা রাগ হয় না সে পুরুষের আদরই বা কি, দ্বেষই বা কি—দুই সমান! ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারে দেখিতে গেলে—

এতাবানেব পুরুষো যদমর্ষী যদক্ষমী।
ক্ষমাবান্নিরমর্ষশ্চ নৈব স্ত্রী ন পুনঃ পুমান্॥

অর্থাৎ—"অন্যায় দেখিলে যাহার রাগ হয়, অপমান যাহার অসহ্য হয় সেই পুরুষ; যাহার ক্রোধ হয় না, রাগ হয় না, সে স্ত্রীও নহে পুরুষও নহে। এইরূপ বিদুল বিবৃত করিয়াছেন (সভা, উ, ১৬২, ৩৩)। জগতের ব্যবহারে, সব-সময় ক্রোধ কিংবা তেজও উপযোগী নহে, সব সময় ক্ষমাও উপযোগী নহে—ইহাই উপরে কথিত হইয়াছে। লোভের সম্বন্ধেও এই নীতি প্রযুক্ত হইতে পারে; কারণ, সন্ন্যাসী হইলেও মোক্ষের বাসনা সে ত্যাগ করিতে পারে না, তাহাকে মোক্ষলাভ করিতেই হয়!

শৌর্য্য, ধৈর্য্য, দয়া, শীল, মৈত্রী, সমতা ইত্যাদি সমস্ত সদ্‌গুণের পরস্পর-বিরোধ ব্যতীত দেশ-কালাদির সীমাও তাহাদের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়, এইরূপ ব্যাস, মহাভারতের অনেক স্থানে বিভিন্ন আখ্যানে প্রতিপাদন করিয়াছেন। যে কোন সদ্‌গুণই হউক না কেন, উহা সর্ব্বপ্রসঙ্গেই উপ-যোগী হইবে এরূপ নহে। ভর্ত্তৃহরি বলেন—

বিপদি ধৈর্য্য মথাভ্যুদয়ে ক্ষমা সদসি বাক্‌পটুতা যুধি বিক্রমঃ।

অর্থাৎ "বিপদে ধৈর্য্য, অভ্যুদয়ে (অর্থাৎ শাসন করিবার ক্ষমতা থাকিবার সময়) ক্ষমা, সভায় বক্তৃতা-শক্তি ও যুদ্ধে শৌর্য্য—ইহাই সদ্‌গুণ" (নীতি,৩৬)। শান্তির সময় উত্তরার মত বড় বড় করিয়া বকিবার লোকের অভাব নাই। কিন্তু গৃহে স্ত্রীর উপর বীরত্ব ফলাইবার লোক অধিক থাকিলেও রণাঙ্গনে প্রকৃত ধনুর্দ্ধর বীর দুই এক-জনই বাহির হয়! ধৈর্য্যাদি গুণ, উপরি উক্ত সময়ে শোভা পায়; শুধু তাহাই নহে, এই প্রকারের প্রসঙ্গ ছাড়া তাঁহাদের প্রকৃত পরীক্ষাও হয় না। ক্ষণি-কের নর্ম্মসুহৃৎ অনেক আছে; কিন্তু "নিকষ-গ্রাবা তু তেষাং বিপৎ"—সঙ্কটকালই তাহাদিগের পরীক্ষার প্রকৃত কষ্টি-পাথর। 'প্রসঙ্গ' এই শব্দের ভিতর দেশকাল ব্যতীত পাত্রাপাত্রাদি বিষয়েরও সমাবেশ হয়। সমতা অপেক্ষা অন্য কোন গুণই শ্রেষ্ঠ নহে। "সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু"—ইহা সিদ্ধপুরুষের লক্ষণ, এইরূপ ভগবদ্‌গীতা স্পষ্ট বলিয়াছেন। কিন্তু সমতার অর্থ কি? কোন ব্যক্তি, যোগ্যতা না দেখিয়া সকলকেই সমান দান করিতে থাকিলে আমরা তাহাকে বুদ্ধিমান বলিব, না নির্ব্বোধ বলিব? ভগবদ্‌গীতাতেই "দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং বিদুঃ—দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া যে দান করা হয় তাহাই সাত্ত্বিক দান (গীতা ১৭,২০) এইরূপে এই প্রশ্নের নির্ণয় করা হইয়াছে। কালের সীমা শুধু বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্তই, এরূপ নহে। কালের যেমন যেমন বদল হয়, সেই সঙ্গে ব্যবহারিক ধর্ম্মেতেও পার্থক্য আসিয়া পড়ে, এবং তাহার দরুণ কোন প্রাচীনকালের বিষয়ের যোগ্যতা অযোগ্যতা সম্বন্ধে নির্ণয় করিতে হইলে, তৎকালীন ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ধারণার বিচার করা নিতান্তই প্রয়োজন হয়।

অন্যে কৃতযুগে ধর্ম্মাস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽপরে।
অন্যে কলিযুগে নৃণাং যুগহ্রাসানুরূপতঃ॥

"যুগ-মান অনুসারে কৃত ত্রেতা দ্বাপর ও কলি ইহাদের ধর্ম্মও ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে," এইরূপ মনু (১,৮৫) ও ব্যাস বলিয়াছেন (সভা, শাং, ২৫৯,৮)। পূর্ব্বকালে স্ত্রীলোকদিগের বিবাহের সীমা না থাকায় তাহারা এই বিষয়ে স্বতন্ত্র ও অসংযত হইত, কিন্তু পরে এই আচারের দুষ্পরিণাম নজরে আসিলে পর, শ্বেতকেতু বিবাহের সীমা স্থাপন করিলেন (সভা, আ, ১২২) এবং সুরাপান সম্বন্ধে নিষেধ শুক্রাচার্য্য প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন, এইরূপ কথা মহাভারতেও বর্ণিত হইয়াছে (সভা, আ, ৭৬)। সুতরাং এই নির্ব্বন্ধ যে সময়ে আমলে আইসে নাই সেই সময়কার ধর্ম্মাধর্ম্ম ও তাহার পরবর্ত্তীকালের ধর্ম্মাধর্ম্ম ইহাদের নির্ণয় ভিন্ন রীতিতে করা আবশ্যক; বর্ত্তমানকালের ধর্ম্ম যদি পরে বদল

হয় তবে সেই অনুসারে ভবিষ্যৎকালের ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনাও বিভিন্ন ধরণে করা যাইবে। কালমান অনুসারে দেশাচার, কুলাচার কিংবা জ্ঞাতিধর্ম্মও এই বিষয়ে ধর্ত্তব্যের মধ্যে আনিতে হয়; কারণ, আচারই সর্ব্বধর্ম্মের মূল। তথাপি আচার বিচারাদির মধ্যেও মিল না থাকায়—

ন হি সর্ব্বহিতঃ কশ্চিদাচারঃ সংপ্রবর্ত্ততে।
তেনৈবান্যঃ প্রভবতি সোঽপরং বাধতে পুনঃ॥

সকলের সব সময়ে এক রকমই হিতকর—এরূপ আচার দেখিতে পাওয়া যায় না। "এক আচার যদি অবলম্বন কর, তার উপরেও উচ্চতর আচার আছে এবং দ্বিতীয় আচার যদি গ্রহণ কর, তাহা আবার তৃতীয়ের বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে" (শাং, ২৮৯, ১৭, ১৮), এইরূপ আচার-ভেদের বর্ণনা করিয়া আচার অনাচারের মধ্যেও তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায়, এইরূপ ভীষ্ম বলিয়াছেন।

সে যাক্। কর্ম্মাকর্ম্ম কিংবা ধর্ম্মাধর্ম্ম সংক্রান্ত সংসারের সমস্ত সমস্যা এইরূপে সমাধান করিতে বসিলে দ্বিতীয় মহাভারত লিখিতে হয়। গীতার আরম্ভে ক্ষাত্রধর্ম্ম ও ভ্রাতৃপ্রেম এই দুয়ের মধ্যে ঝুঝাযুঝি করিয়া অর্জ্জুনের যে অবস্থা হইয়াছিল তাহা অ-লোকসাধারণ অবস্থা নহে, ঐরূপ অবস্থা সংসারে কর্ত্তৃপুরুষদিগের ও মহাত্মা ব্যক্তিদিগের অনেক সময়ে উপস্থিত হইয়া থাকে। তাহার পর কখন অহিংসা ও আত্মরক্ষণ, কখন সত্য ও সর্ব্বভূতহিত, কখন দেহসংরক্ষণ ও যশ, কখন বা ভিন্ন ভিন্ন সম্বন্ধসূত্রে উপস্থিত কর্ত্তব্যসমূহের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইয়া শাস্ত্রোক্ত সাধারণ ও সর্ব্বমান্য নীতি নিয়মের দ্বারা কর্ম্মের বিভাগ না হওয়ায়, উহাদিগের অনেক অপবাদ বা ব্যতিক্রম উৎপন্ন হয়; এবং সাধারণ মনুষ্যের শুধু নহে, বড় বড় পণ্ডিতেরও এইরূপ স্থলে কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থিতি—অর্থাৎ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ধর্ম্মের নির্ণয় করিবার কোন স্থায়ী পদ্ধতি কিংবা যুক্তি আছে কি নাই ইহা জানিবার ইচ্ছা স্বভাবতই হইয়া থাকে—এই সমস্ত বিষয়ের প্রতি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য উপরি লিখিত বিচার আলোচনা করা হইয়াছে। দুর্ভিক্ষের মত সঙ্কটকালে 'আপদ্ধর্ম্ম' বলিয়া শাস্ত্রে কতকগুলি সুবিধার কথা বলা হইয়াছে সত্য। দৃষ্টান্ত যথা—আপৎকালে ব্রাহ্মণ যে-কোনস্থানেই অন্ন গ্রহণ করুক না কেন তাহাতে দোষ বর্ত্তে না এইরূপ স্মৃতিকারেরা বলিয়াছেন। উষস্তি চাক্রায়ণ তদনুসারে আচরণ করিয়াছিলেন বলিয়া ছান্দোগ্য উপনিষদে কথিত হইয়াছে (যাজ্ঞ, ৩, ৪১; ছাং ১, ১০)। কিন্তু ঐ প্রসঙ্গ ও উপরের প্রসঙ্গ এই দুয়ের মধ্যে অনেক প্রভেদ আছে। দুষ্কালের মত প্রসঙ্গে শাস্ত্রধর্ম্ম ও ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বৃত্তি, ইহাদের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়া ইন্দ্রিয়গণ একদিকে ও শাস্ত্রধর্ম্ম অন্যদিকে টানিয়া থাকে। কিন্তু উপরে যে সকল প্রসঙ্গ প্রদত্ত হইয়াছে তন্মধ্যে অনেক স্থলেই ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও শাস্ত্রের পরস্পর বিরোধ নাই। শাস্ত্রবিহিত এইরূপ দুই ধর্ম্মের পরস্পর বিরোধ ঘটিলে, ইহা করিব কি উহা করিব—তাহার সূক্ষ্ম বিচার করা আবশ্যক হয়; এবং ইহার মধ্যে কোন বিষয়ের নির্ণয়, পূর্ব্ববর্ত্তী সাধু পুরুষেরা এইরূপ প্রসঙ্গে যেরূপ আচরণ করিয়াছিলেন, তদনুসারে সাধারণ মনুষ্যের নিজ বুদ্ধিতে করিবার মত হইলেও অন্য প্রসঙ্গে বুদ্ধিমানেরও চিত্ত বিহ্বল হইয়া পড়ে। কারণ, যতই অধিক বিচার করিবে ততই যুক্তি ও উপপত্তি অধিকাধিক নিষ্পন্ন হইয়া শেষের নির্ণয় দুর্ঘট হইয়া পড়ে; এবং যোগ্য নির্ণয় না হইলে, আমাদের দ্বারা অধর্ম্ম কিংবা অপরাধ ঘটিবারও সম্ভাবনা হইয়া থাকে। এইরূপ দৃষ্টিতে দেখিলে, ধর্ম্মাধর্ম্মের কিংবা কর্ম্মাকর্ম্মের বিচার আলোচনাই এক স্বতন্ত্র শাস্ত্র হইয়া উহা ন্যায়, ব্যাকরণাপেক্ষাও গভীর, এইরূপ মনে হয়। 'নীতিশাস্ত্র' এই শব্দ পুরাতন সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে প্রায়ই রাজনীতি শাস্ত্রেই প্রযুক্ত হয়; তাই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য শাস্ত্রকে 'ধর্ম্মশাস্ত্র' বলাই প্রাচীন পদ্ধতি। কিন্তু 'নীতি' এই শব্দে কর্ত্তব্য কিংবা সদাচরণ এই অর্থও গৃহীত হওয়ায়, আধুনিক পদ্ধতি অনুসারে ধর্ম্মাধর্ম্মের কিংবা কর্ম্মাকর্ম্মের এই বিচার আলোচনাকে 'নীতিশাস্ত্র' এইরূপ এই গ্রন্থে আমি বলিয়াছি। নীতি, কর্ম্মাকর্ম্ম কিংবা ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার সংক্রান্ত এই শাস্ত্র অতি গভীর, ইহা দেখাইবার জন্যই "সূক্ষ্মাগতির্হি ধর্ম্মস্য"—ধর্ম্মের অর্থাৎ ব্যবহারিক নীতিধর্ম্মের স্বরূপ অতিসূক্ষ্ম—এই বচনটি মহাভারতের অনেক স্থানে পাওয়া যায়। পঞ্চপাণ্ডব এক দ্রৌপদীর সহিত বিবাহ কেমন করিয়া

করিলেন ? দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের সময় ভীষ্ম দ্রোণাদি শূন্যহৃদয় হইয়া চুপ করিয়া কেন বসিয়া রহিলেন ? কিংবা দুষ্ট দুর্য্যোধনের পক্ষে যুদ্ধ করিবার সময় ভীষ্ম দ্রোণাদি আত্মসমর্থনার্থ বলিয়াছেন "অর্থস্য পুরুষো দাসঃ দাসস্ত্বর্থো ন কস্যচিৎ"—পুরুষ অর্থের দাস, অর্থ কাহারও দাস নহে (সভা, ভী, ৪৩, ৩৫) এই তত্ত্বটি ঠিক্ না ভুল ? যখনই হোক্ না কেন, "সেবা শ্ববৃত্তিরাখ্যাতা" (মনু, ৪০৬) সেবাধর্ম্ম যদি কুক্কুরবৃত্তির ন্যায় গর্হিত বলিয়া স্বীকৃত হয় তবে অর্থের দাস না হইয়া ভীষ্মাদি কৌরবেরা দুর্য্যোধনের সেবাও কেন পরিত্যাগ করেন নাই ?—ইত্যাদি প্রশ্নের উচিত নির্ণয় করা বড়ই কঠিন। কারণ, এইরূপ স্থলে ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্য প্রসঙ্গানুসারে ভিন্ন ভিন্ন অনুমান কিংবা নির্ণয় করিয়া থাকে। "সূক্ষ্মা গতির্হি ধর্ম্মস্য" (সভা. অনু, ১০. ৭০) ধর্ম্মের তত্ত্ব সূক্ষ্ম, শুধু তাহাই নহে, পরে "বহুশাখা হ্যনন্তিকা"—তাহা হইতে বহু শাখা প্রশাখা বাহির হওয়ায়, তাহা হইতে নিষ্পন্ন অনুমানও বিভিন্ন হইয়া থাকে,—এইরূপ মহাভারতে উক্ত হইয়াছে (বন, ২০৮, ২)। তুলাধার-জাজলি সংবাদে তুলাধারও ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিচার আলোচনা করিবার সময়, "সূক্ষ্মমস্থান্ন স বিজ্ঞাতুং শক্যতে বহুনিহ্নবঃ"—ধর্ম্ম সূক্ষ্ম ও অতীব জটিল হওয়ায় অনেক সময় জানা যায় না, এইরূপ উক্ত হইয়াছে (শাং, ২৬১, ৩৭)। মহাভারতকার এই সূক্ষ্ম প্রসঙ্গ সম্পূর্ণরূপে অবগত থাকায়, এইরূপ প্রসঙ্গে প্রাচীন মহাত্মারা কি করিয়াছিলেন, তাহা বলিবার জন্যই মহাভারতে বিভিন্ন উপাখ্যান সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু শাস্ত্র-রীতি-অনুসারে সমস্ত বিষয়ের বিচার করিয়া তাহার সাধারণ মর্ম্ম মহাভারতের ন্যায় ধর্ম্মগ্রন্থে কোথাও না কোথাও বলা আবশ্যক হইয়াছিল। এই মর্ম্ম, অর্জ্জুনের কর্ত্তব্যমোহ অপসারিত করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বে যে উপদেশ করিয়াছেন তাহারই বনিয়াদে ব্যাস ভগবদ্গীতায় প্রতিপাদিত করিয়াছেন ; এবং তাহার দরুণ গীতা, মহাভারতের রহস্যোপনিষৎ ও শিরোভূষণ হইয়াছে এবং মহাভারতও গীতাপ্রতিপাদিত মূলভূত কর্ম্মতত্ত্বসমূহের সোদাহরণ বিস্তৃত ব্যাখ্যানে পরিণত হইয়াছে। গীতাগ্রন্থ মহাভারতের মধ্যে পরে ঢুকাইয়া দেওয়া হইয়াছে, এরূপ সন্দেহ যাঁহারা করেন, তাঁহারা আমার এই কথার প্রতি লক্ষ্য করিবেন। অধিক কি, গীতা-গ্রন্থের যদি কিছু অপূর্ব্বতা অর্থাৎ বিশিষ্টতা থাকে তবে সে উহাই। কারণ, শুধু মোক্ষশাস্ত্রের অর্থাৎ বেদান্তের প্রতিপাদক উপনিষদাদি এবং অহিংসাদি সদাচরণের শুধু নিয়ম উপদেষ্টা স্মৃতিশাস্ত্রাদি অনেক থাকিলেও বেদান্তের গভীর তত্ত্বজ্ঞানের বনিয়াদে, 'কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থিতি' প্রবর্ত্তক গীতার ন্যায় অপর প্রাচীন গ্রন্থ, অন্তত বর্ত্তমানে সংস্কৃত বাঙ্ময়ে (সাহিত্যে) প্রাপ্ত হওয়া যায় না। 'কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থিতি' এই শব্দ আমাদের ঘর-গড়া নহে, উহা গীতাতেই আছে (গীতা, ১৬, ২৪),—এ কথা গীতাভক্তদিগকে বলা বাহুল্য। ভগবদ্গীতার ন্যায় যোগবাশিষ্ঠেও, বশিষ্ঠ রামকে জ্ঞানমূলক প্রবৃত্তি-মার্গের চরম উপদেশ করিয়াছেন ; কিন্তু গীতার পরে যে সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছে বা অনুকরণ করা হইয়াছে সেই সকল গ্রন্থের দ্বারা, গীতার যে অপূর্ব্বতা উপরে উক্ত হইয়াছে তাহার কোন বাধা হয় না। ইতি—কর্ম্মজিজ্ঞাসা সমাপ্ত।

প্রভাতী উপাসনা।

ভৈরবী—একতালা।

(শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ন) ২৯।

আজি এ মধুর প্রভাতবেলায়
এ পূজা যাবেনা বিফলে ;
আকাশে বাতাসে কাননে সলিলে
তাহারি আভাস উছলে।

মন্দ সমীরে কুসুম গন্ধ
আসিছে বহিয়া একি আনন্দ
বিহগের গীতে ললিত ছন্দ
অন্ধ-আবেগে উথলে।

একিরে দিব্য আলোক হাসি
একি অসহ্য পুলক-রাশি
মোহজড়তাতন্দ্রা বিনাশি'
পূর্ব্ব গগনে উজলে।

ইঙ্গিত কার উদ্ভাসি উঠে
সঙ্কেত কার শিহরিয়া ফুটে
একি তরঙ্গ উছলি ছুটে
পরাণ-প্রবাহ অতলে।

সার্থক আজি আয়োজন যত
সুন্দর আজি জীবন-ব্রত
আজিকে পূর্ণ যত মনোরথ
প্রণমি চরণ কমলে।

সারনাথ।

(শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়)

সারনাথ বৌদ্ধতীর্থ; ইহা কাশী হইতে চারি মাইল উত্তরে অবস্থিত। ইহা এক সময়ে বৌদ্ধদিগের নিকট ধর্ম্মপ্রচারের কেন্দ্রস্বরূপ ছিল। বুদ্ধদেব গয়ায় বোধিদ্রুমমূলে বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া তাঁহার নবধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তনের জন্য এখানে আসিয়াছিলেন। সন্তপ্ত নরনারী চতুর্দ্দিক হইতে আকুল প্রাণে ছুটিয়া আসিয়া অঞ্জলি পুরিয়া নির্ব্বাণসুধা পান করিয়া হৃদয় মন সুশীতল করিয়াছিল। সারনাথ বৌদ্ধ মহাতীর্থ-চতুষ্টয়ের অন্যতম। এখানে কাশীর পুরাতন বৌদ্ধ শিল্পকলারীতির যে সকল অনিন্দ্যসুন্দর ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান আছে, তাহা দেখিবার জন্য বিগত ১৩২০ সালের ১৯শে আশ্বিন রবিবার দ্বিপ্রহর ২টার সময় গোধূলিয়ার গাড়ীর আড্ডা হইতে একখানি এক্কাগাড়ী ভাড়া করিয়া রওনা হই। চলিতে চলিতে সারনাথ রেলওয়ে ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। এখান হইতে একটি মুণ্ডিতশীর্ষ স্তূপ দেখিতে পাইলাম। ইহাই বিখ্যাত ধামেকস্তূপ। * * * * এখানে একটি মন্দিরে হিন্দুর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া সারনাথ মহাদেব দেখিতে চলিলাম। একটি উচ্চ মৃত্তিকাস্তূপের উপর সুন্দর একটি শিবমন্দির; মন্দিরাভ্যন্তরে লিঙ্গরূপী মহাদেব স্থাপিত। সম্ভবতঃ সারনাথে বৌদ্ধ প্রভাব বিনষ্ট করিবার জন্য হিন্দু মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মন্দিরসংলগ্ন সুবৃহৎ 'সারঙ্গ তলাও' জলাশয় সারনাথ অঞ্চলে দ্রষ্টব্য স্থানের অন্যতর। এই স্থানের নির্ব্বাক্ সৌন্দর্য্যের মধ্যে নিজেকে ডুবাইয়া দিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলাম। পরে এক্কাওয়ালা আমাকে ধামেকস্তূপের নিকটবর্ত্তী একটি মাঠের ধারে আনিয়া ছাড়িয়া দিল। মাঠ অতিক্রম করিয়া ধামেকস্তূপ ও অন্যান্য বৌদ্ধ ধ্বংসাবশেষের সুবৃহৎ প্রাঙ্গনের উপর আসিয়া দাঁড়াইলাম। এই স্মৃতিস্তম্ভের চতুর্দ্দিক একদিন বৌদ্ধধর্ম্মের বিশ্ববিজয়-গৌরব ও মহিমার ছটায় অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছিল। কালচক্রের আবর্ত্তনে সেই স্বর্ণযুগের যাহা কিছু সম্পৎ সকলি গিয়াছে, বিস্মৃতির অতলগর্ভে সকলি ডুবিয়া গিয়াছে, অতীতের শ্লাঘাময়ী স্মৃতির শেষচিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে। ভূগর্ভে সমগ্র বৌদ্ধ সহরটি বসিয়া গিয়াছিল, আজ সেই বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও সভ্যতার বহু পুরাতন লীলাভূমি, বহুযুগের বহু বিপ্লবের চিতাভস্মাচ্ছন্ন মহাশ্মশান পাশ্চাত্য সুধীমণ্ডলীর গবেষণায় আবিষ্কৃত হইয়াছে।

বৌদ্ধ সাহিত্যে সারনাথের প্রাচীন নাম 'ঋষিপত্তন মৃগদাব' (ইতিপতন মিগদায়) উল্লিখিত হইয়াছে। কথিত আছে, মৃগদাবে বুদ্ধদেবের ধর্ম্মচক্র প্রথম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল এবং এখানে তিনি পূর্ব্বজন্মে মৃগদিগের রাজা রূপে বর্ত্তমান ছিলেন। সম্ভবত ইহা হইতেই এই স্থানের নাম মৃগদাব বা মৃগদিগের বন বলিয়া কথিত হইয়াছে। চীনদেশের সাহিত্যে ও দিব্যাবদানে 'ঋষিবদন' বলা হইয়াছে। ইচিঙ্গ (It-sing) ঋষিপত্তনকে ঋষির পতনরূপে অনুবাদ করিয়াছেন। কিন্তু ফাহিয়ান্ লিখিয়াছেন যে পঞ্চ প্রত্যেক বুদ্ধ (পঞ্চ পচ্চেক বুদ্ধে) 'ঋষিপতন' এই নামের প্রণেতা। ফরাসী পণ্ডিত সেনারের (E. Senart) মতে সারনাথের নাম ঋষিপত্তন ছিল, কালক্রমে তাহা অপভ্রষ্ট হইয়া ঋষিপতন হইয়াছে। মহাবস্তুতে আছে 'ঋষিবদনস্মিং', আবার ইহাতে ঋষিপত্তনেরও উল্লেখ আছে যথা,—'মৃগাণাং দায়ো দিন্ন মৃগদায়েতি ঋষিপত্তনো' অর্থাৎ মৃগদিগকে দান দেওয়া হইয়াছে বলিয়া এই স্থানের নাম 'মৃগদায় ঋষিপত্তন।' ইচিঙ্গ প্রভৃতি চীন দেশীয় লেখকগণ মৃগদায়ের অনুবাদ করিয়াছেন, 'শি-লুয়ে' বা শিলুলিন' অর্থাৎ মৃগদিগকে প্রদত্ত বনভূমি।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে সারনাথের বর্ত্তমান খননক্রিয়া

আরম্ভ হয়। এই কার্য্যের দ্বারা বিলুপ্ত বৌদ্ধস্তূপ, মন্দির, মঠ, মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ১৭৯৪খৃষ্টাব্দে কাশীর রাজা চৈৎ সিংহের দেওয়ান জগৎ সিংহ একটি বাজার (বর্ত্তমান জগৎগঞ্জ মহল্লা) নির্ম্মাণ করিবার জন্য ধামেকস্তূপ হইতে অনুমান তিনশত হস্ত পশ্চিমে একটি স্থান খনন করাইয়া ইষ্টক প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা করেন। উক্ত স্থান হইতে প্রচুর পরিমাণে ইষ্টক প্রভৃতি বাহির হয়। ইহাই হইল খননের সূত্রপাত। এইস্থানে একখানি প্রস্তর-ফলক পাওয়া গিয়াছিল। উক্ত ফলকে উৎকীর্ণ লিপি হইতে জানা যায় যে গৌড়রাজ মহীপাল ১০৮৩ সম্বতে (৯৪৯ শক) বর্ত্তমান ছিলেন। আদিশূর এই পালবংশের শেষ রাজাকে পরাভূত করিয়া গৌড়ের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। এই আবিষ্ক্রিয়া হইতেই পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর মনোযোগ এদিকে প্রথম আকৃষ্ট হয়। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল সি, মেকেঞ্জী এই সব ভগ্নাবশেষ বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া কতকগুলি প্রতিকৃতি কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটীকে উপহার দেন। ইহার পর জেনারেল কানিংহাম ১৮৩৫-৩৬ খৃষ্টাব্দে বহু অর্থ ব্যয়ে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে খননক্রিয়া আরম্ভ করিয়া ধামেকস্তূপ, চৌখণ্ডী, মধ্যযুগের কতকগুলি মঠ, দেবমূর্ত্তি ও প্রতিকৃতি ভূগর্ভ হইতে উদ্ধার করেন। কানিংহামের পর ১৮৪৮-৫২ খৃষ্টাব্দে মেজর কিটো (Major Kittoe) ধামেকস্তূপের চতুর্দ্দিকে বহুস্থান খনন করিয়া নানা মূর্ত্তি, স্তম্ভ প্রভৃতি ভূগর্ভ হইতে উত্তোলন করিয়াছিলেন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে মিঃ হর্ণ (Mr. C. Horn) এবং ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে মিঃ আর, কারনাক (Mr. R. Carnac) প্রভৃতি পণ্ডিতগণও কিয়ৎপরিমাণে খনন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের আবিষ্কৃত মূর্ত্তি, স্তম্ভ, কতকগুলি কলিকাতা মিউজিয়ামে, কতকগুলি লক্ষ্ণৌ মিউজিয়মে এবং কতকগুলি কাশীর কুইনস্ কলেজে বিশৃঙ্খলভাবে রক্ষিত হয়। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ভূতপূর্ব্ব বড়লাট মাননীয় লর্ড কার্জ্জনের আদেশে পূর্ত্তবিভাগের ইঞ্জিনিয়ার মিঃ অরটেল (Mr F. O. Oertel) ও তাঁহার সহকারী কাশীর একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার পরলোকগত রায় বাহাদুর বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তীর তত্ত্বাবধানে সারনাথের বহুস্থানে নিয়মমত খননক্রিয়া আরম্ভ হয়। ইঁহাদের আশ্চর্য্য প্রতিভা ও গবেষণার ফলে অশোকস্তম্ভ এবং স্তম্ভোপরি চারিটি সিংহমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

আমি একজন সঙ্গী লইয়া ধ্বংসাবশেষের উপর দিয়া চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে লাগিলাম। কত প্রাচীন ভগ্ন প্রস্তর নয়নগোচর হইল। একস্থানে দেখিলাম, একখানা ছোট চালাঘরের নীচে অর্দ্ধ-ভগ্ন একটি স্তম্ভ মৃত্তিকায় প্রোথিত রহিয়াছে। ইহাই অশোক-স্তম্ভ। বুদ্ধদেবের ধর্ম্মপ্রচারকাহিনী চিরস্মরণীয় করিবার জন্য দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী সম্রাট অশোক ইহা খৃঃ পূর্ব্ব ২৫০ অব্দে স্থাপিত করিয়াছিলেন। স্তম্ভের নিম্নাংশ দৈর্ঘ্যে ১৮ ফিট এবং সমগ্র স্তম্ভটি ৫০ ফিট। এই স্তম্ভের উপরে চারিটি সিংহ * মূর্ত্তি। বুদ্ধদেবের ধর্ম্মচক্র † চারিটি সিংহ কর্ত্তৃক রক্ষিত। ইহার শীর্ষদেশ ভারতীয় শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায়ক। 'কেহ কেহ বলেন, স্তম্ভগুলি পারস্য স্থাপত্যের অনুকৃতি; তাঁহাদের মতে মৌর্য্যযুগে ভারতের সভ্যতা পারস্য প্রভাবান্বিত ছিল। একটি প্রস্তরস্তম্ভ নির্ম্মাণ, স্তম্ভশীর্ষে পশুর প্রতিকৃতি স্থাপন বা অঙ্কন প্রভৃতি আকেমেনি সাম্রাজ্যের পারসী অনুকরণ বলিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অনুমান করেন। কিন্তু সারনাথ স্তম্ভ পারস্যের স্তম্ভ অপেক্ষা সুন্দর এবং সমধিক শিল্পনৈপুণ্য-পরিপূর্ণ। ভারতীয় স্থাপত্য কিসের আদর্শে গঠিত, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। কেহ কেহ বলেন, গ্রীক অনুকরণে বৌদ্ধশিল্প গৌরবান্বিত। কিন্তু তাহাও ঠিক নয়। শুধু একটি অনুমান সাহায্যে ভারতশিল্পের প্রকৃত ধারণা হইতে পারে না। * * * * আমাদিগের বিশ্বাস

* বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ মার্শাল বলেন,—'They are wonderfully vigorous and true to nature and are treated with that simplicity and reserve which is the key note of all great master-pieces of plastic art.'

† 'এই ধর্ম্মচক্রের কারুকার্য্য এমন সুন্দর ও মনোরম যে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ না করিলে তাহা অনুভব করা যায় না। ইহার সমস্ত অংশ মসৃণ প্রস্তরে প্রস্তুত। অনেকটা দেখিতে ঠিক যেন মার্ব্বেল প্রস্তরের ন্যায়। কিন্তু বর্ণ শ্বেত নহে, ঈষৎ হরিদ্রাভ। তাহা আবার কৃষ্ণ বিন্দুতে পরিপূর্ণ। এমন মনোহর প্রস্তর অত্যল্পই দৃষ্ট হয়। * * ইহার গঠন প্রণালী ভূমণ্ডলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। হালিকারনেসাস (Halicarnasus) নামক স্থানে যে প্রকার সিংহের কেশর দেখিতে পাওয়া গিয়াছে এই স্থানের সিংহের কেশরেও তদ্রূপ শিল্পচাতুর্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে।' শ্রীগণপতি রায় বিদ্যাবিনোদ লিখিত 'ইসিপতন-মিগদাব' (ভারতবর্ষ—১৩২০, অগ্রহায়ণ সংখ্যা) প্রবন্ধ হইতে গৃহীত।

ভারতশিল্প বিদেশীয় প্রভাবের নিকট কোন প্রকারে ঋণী নহে।' *

মহারাজ অশোক খৃঃ পূঃ ২৭৩ হইতে ২৩২ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইনি ধর্ম্মসংঘের একত্ব রক্ষা করিবার জন্য ঘোষণা প্রচার করিয়াছিলেন। লক্ষ্ণৌ মিউ জিয়মের কিউরেটর (curator) মিঃ দয়ারাম সাহনী এম, এ সারনাথ-লিপির একটী সংস্কৃত পাঠ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সেই পাঠ ও অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

১। দেবা নাং পিয়ে পিয়দসি লাজা অর্থাৎ দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা।

২। এল এইরূপ আদেশ করিতেছেন।

৩। পাট লিপুতে যে কেনপি সংঘে ভেতবে এ চুংখো অর্থাৎ পাটলিপুত্রে সংঘমধ্যে কেহও ভেদ সংঘটন করিবে না।

৪। (ভিখু বা ভিখুনি বা) সংঘং ভাখতি সে ওদাতানি দুস নি সংনংধাপয়িয়া আনাবামসি (ণ)।

৫। আবাসয়িয়ে॥ হেবং ইয়ং সাসনে ভিখুসংঘসি চ ভিখুনি সংঘসি চ বিনপয়িতবিয়ে॥

(৪) ও (৫) অর্থাৎ ভিক্ষুই হউন বা ভিক্ষুণী হউন, যে কেহ সংঘে ভেদ আনয়ন করে, তাহাকে শ্বেতবস্ত্র পরিধান করাইবে এবং ভিক্ষুনিবাস হইতে অন্যস্থানে বাস করাইবে। আমার এই শাসন ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী-সংঘকে বিজ্ঞাপিত করিবে।

৬। হেবং দেবানাং পিয়ে আহা॥ হেদিসা চ ইকা লিপি তুফাকং তিকাং হুবা তি সংসলনসি লিখিতা॥

৭। ইকং চ লিপিং হেদিসমেব উপাসকানং তিকং লিখিপাথ। তে পি চ উপাসকা অনুপোসথং চ যাবু।

৮। এতমেব সাসনং বিস্বংসয়িতবে॥ অনুপোসথং চ ধুবায়ে ইকিকে মহামাতেপোসথায়ে।

৯। যাতি এতং এব সাসনং বিস্বংসয়িতবে আজানিতবে চ॥ আবতকো চ তুফাকং আহালে।

১০। সবত বিবাসয়াথ তুফে এতেন বিয়ংজনেন॥ হেমেব-সবেসু কোট-বিসবেসু এতেন।

১১। বিয়ং জনেন বিবাসাপয়াথা॥

* শ্রীচারুচন্দ্র বসু প্রণীত অশোক পৃঃ ১৯২।

অর্থাৎ—দেবগণের প্রিয় এইরূপে বলিতেছেন। এইরূপ একটী অনুশাসন (লিপি), তোমাদের নিকটে থাকুক্—এই জন্য (তোমাদের) মিলিত হইবার স্থানে লিখিত (উৎকীর্ণ) হইয়াছে। (তোমরা) এই প্রকারই এক অনুশাসন উপাসকদিগের নিকট (নিমিত্ত) লিখাও (উৎকীর্ণ করাও), এবং উপাসকগণ এই লিপির মর্ম্ম গ্রহণ করিবার জন্য প্রতি পর্ব্বদিবসে আসুক্; এবং প্রত্যেক পর্ব্বদিবসে মহামাত্রগণ প্রত্যেকেই নিয়মিতরূপে পর্ব্ব (উপোসথ) পালন জন্য এবং শাসনের মর্ম্ম গ্রহণ করিবার ও সম্যক্‌রূপে বুঝিবার জন্য আসিবেন।

তোমাদের অধিকার যতদূর (বিস্তৃত), ততদূর (এই আদেশ) ইহার তাৎপর্য্য বা উদ্দেশ্য (অনুসারে) প্রচার করিবে। এবং প্রত্যেক দুর্গ ও প্রদেশ মধ্যে ইহার উদ্দেশ্য প্রচার করাইবে। *

হিউএন স্যাঙ্ ৭ম শতাব্দে এই অশোকস্তম্ভ দেখিয়া লিখিয়া গিয়াছেল,—'অশোকস্তূপের নিকট জেড্ নামক মূল্যবান্ মর্ম্মর প্রস্তরের আভাযুক্ত ৭০ ফিট্ উচ্চ একটী স্তম্ভ আছে; উহার ভিতর হইতে অত্যুজ্জ্বল আলো বাহির হইয়া থাকে। যে কেহ ভক্তি ও বিশ্বাসের সহিত এ স্থানে প্রার্থনা করে, সে নিজ অভীষ্টানুরূপ ফল এই স্তম্ভগাত্রে দেখে। এই স্থানে বুদ্ধদেব জ্ঞানালোক লাভ করিয়া সর্ব্বপ্রথম ধর্ম্মচক্র ঘূর্ণিত করিয়াছিলেন।' এই স্তম্ভ খনন করিবার সময় একটি সুবৃহৎ প্রস্তরনির্ম্মিত ছত্রদণ্ড, ছত্র ও একটি বৃহৎ বুদ্ধমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। খোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে, রাজা কনিষ্কের রাজত্বকালে ইহা সংস্থাপিত হইয়াছিল। এই ছত্রটী নূতন যাদুঘরে দেখিতে পাই।

ধামেকস্তূপ—প্রথমেই ধামেকস্তূপটী অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া দেখি। এই স্তূপ মহারাজ অশোক কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার উপরিভাগ ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া ইষ্টকগুলি বাহির হইয়া পড়িয়াছে। এই স্তূপ সম্বন্ধে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের রিপোর্টে লিখিত আছে—'This stupa is a solid structure rising to a height of 104 feet above

* অনুবাদটী 'অশোক-অনুশাসন' হইতে গৃহীত।

the paved terrace of the Jaina temple adjoining it, or 143 feet, if we include the foundations which lie buried underground. The lower part or basement is 93 feet in diameter and solidly built, the stones being secured together with iron cramps to a height of 37 feet above the terrace of the Jaina temple. The upper part of the structure is made of brickwork which was possibly originally faced with stone.' এই স্তূপটী ৪৩ ফুট্ উচ্চ পর্য্যন্ত চুনার প্রস্তরে গ্রথিত। ভূমি হইতে ২৪ ফুট্ উচ্চে স্তূপের চারিদিকে ৬ ফুট্ প্রশস্ত কারুকার্য্যময় ৮টী ফলক এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। জগৎ সিংহ এই ধামেকস্তূপের নিম্নাংশের কতক অংশ ভাঙ্গিয়াছিলেন। স্তূপের অভ্যন্তরে কোনরূপ ভস্মাধার প্রোথিত আছে কিনা দেখিবার জন্য জেনারেল্ কানিংহাম এই স্তূপের উপরিভাগ হইতে খনন করান, কিন্তু তিনি একখানি প্রস্তর ফলক ভিন্ন কিছুই পান নাই।

চৌখণ্ডী স্তূপ—ধামেকস্তূপের দক্ষিণ দিকে অর্দ্ধ মাইল দূরে চৌখণ্ডী স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। আমার এক্কাওয়ালা কিছুতেই এখানে গাড়ী থামাইবে না। সে বলিতে লাগিল 'দাদা, ওস্মে কুচ নেই হ্যায়, দাঁও নেই হ্যায়।' আমি ধমক দিতেই সে গাড়ী থামাইল। এক্কাওয়ালা গম্ভীরভাবে বলিল 'ওতো সীতাজীকা রসুয়া হ্যায়।' আমি ব্যাপারটা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

এই চৌখণ্ডী অষ্টকোণাকৃতি স্মৃতিস্তম্ভ। উহার উচ্চতা ৮২ ফুট। কথিত আছে, বুদ্ধদেব নবজ্ঞান লাভ করিয়া কাশীধামে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং পূর্ব্ব পরিত্যক্ত পঞ্চ শিষ্যকে এখানে দীক্ষিত করেন। এই শিষ্যত্ব গ্রহণ ব্যাপারে যে স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহাই চৌখণ্ডী স্তূপ নামে খ্যাত। খোদিত পারস্য লিপি হইতে জানা গিয়াছে যে হুমায়ুন বাদশাহ কোন সময়ে এখানে আসিয়া বিশ্রাম করিয়াছিলেন। সম্রাট আকবর সেই ঘটনা চিরস্মরণীয় করিবার জন্য এই স্মৃতিগৃহ ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। আকবরের বহুশত বৎসর পূর্ব্বে যে এই স্তূপ বিদ্যমান ছিল তাহা হিউয়েন সাঙের বর্ণনায় লিপিবদ্ধ আছে। সম্ভবতঃ আকবর বাদশাহ উক্ত স্তূপের চূড়াটী মুসলমানী ধরণে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এখানে উঠিলে চতুর্দ্দিকের অতি অপূর্ব্ব দৃশ্য নয়ন পথে প্রতিভাত হয়।

জৈন মন্দির—উচ্চ প্রাচীর-বেষ্টিত জৈন মন্দির ধামেকস্তূপের পূর্ব্বাংশে অবস্থিত। ইহা একাদশ জৈনাচার্য্য শ্রীঅমশানাথের নামে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল।

পুরাতন যাদুঘর—ধ্বংসাবশেষ ও খনন কার্য্যের শেষচিহ্ন বিশেষভাবে পরিদর্শন করিয়া আমরা জৈনমন্দিরের পশ্চিমে পুরাতন যাদুঘরে আসিয়া উপস্থিত হই। এই গৃহটী ১৯০২ খৃষ্টাব্দে অর্টেল সাহেব সারনাথে আবিষ্কৃত দ্রব্যসম্ভার সুরক্ষিত করিবার জন্য নির্ম্মাণ করেন। বর্ত্তমানে মাত্র ব্রাহ্মণ্য ও জৈন মূর্ত্তিগুলি এখানে রক্ষিত হইয়াছে। এখানে নবগ্রহের মূর্ত্তি ও যমুনার মূর্ত্তিই দর্শকের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করে।

নূতন যাদুঘর—পুরাতন যাদুঘর হইতে বাহির হইয়া আমারা রাস্তার উপর আসি। এখান হইতে অপর পার্শ্বেই নূতন যাদুঘর। এই যাদুঘরটী ভারত-গভর্ণমেণ্টের Consulting Architect মিঃ জেমস্ র‍্যানসম কর্ত্তৃক বৌদ্ধ বিহারের অনুকরণে পরিকল্পিত। এখানে ৫ঠি কুঠরী। উত্তরাংশের কুঠরীতে মাটীর হাঁড়িকুড়ি, বড় বড় তিনটি 'জালা' এবং ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নানাবিধ ইট সুরক্ষিত হইয়াছে। পূর্ব্বদিকের মধ্যবর্ত্তী সুবৃহৎ 'হলে' প্রবেশ করিয়া দেখি সম্মুখেই অশোকস্তম্ভের সিংহমূর্ত্তি। মূর্ত্তিগাত্রে লেখা রহিয়াছে—'Lion Capula of Asoka Pillar' (Circa 250 B. C.)

২। শিবের অসম্পূর্ণ মূর্ত্তি—Unfinished image of Siva, Circa 1000 A. D.

৩। বোধিসত্বের খণ্ডীকৃত ছত্র,—ইহার ব্যাস দশ ফুট।

৪। বেদীযুক্ত দণ্ডায়মান বোধিসত্বের এক সুবিশাল মূর্ত্তি। Dedicated by Friar Bala in the 3rd yaer of the reign of Kaniksha (1st Century A. D.) ইহা হেমন্ত ঋতুর তৃতীয়

মাসের দ্বাবিংশতি দিবসে মহারাজা কনিষ্কের রাজত্বের তৃতীয় বর্ষে প্রতিষ্ঠিত হয়।

৫। একটী মস্তক শূন্য বুদ্ধমূর্ত্তি ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় বসিয়া আছেন। এই মূর্ত্তি একখানা লোহিত প্রস্তরে নির্ম্মিত। (Kushan period 1-300 A. D.) এই প্রকার বহু মূর্ত্তি আছে।

সারনাথের অতীত কীর্ত্তি দেখিতে দেখিতে মনে হইল জগতের ইতিহাসে অনেক দেশ নানা বিষয়ের জন্য প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে; কিন্তু ভারতবর্ষ বৌদ্ধ-যুগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের জন্য যেরূপ প্রকৃষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে, সেরূপ অতি অল্প দেশেই দেখিতে পাওয়া যায়। সেই স্বর্ণযুগে অমর ভাস্কর-গণ যে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, সেই কীর্ত্তিরাশির শেষচিহ্ন মাত্র অবশিষ্ট থাকিলেও, তাহা আজ সভ্য জগতকে মুগ্ধ করিয়াছে। পূর্ব্বে এই পুণ্যদেশে ধর্ম্মভাবের ভিতর দিয়া ভাস্কর্য্য বিদ্যার পূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়াছিল।

কি করিয়া এবং কোন্ সময়ে সারনাথের বৌদ্ধ-কীর্ত্তিসমূহ লোপ পাইয়াছিল তাহা এখনও ঠিক করিয়া জানা যায় নাই। খৃঃ পূঃ ৫ম শতাব্দ হইতে খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দ পর্য্যন্ত সারনাথে বৌদ্ধপ্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। চীন পরিব্রাজক ফাহিয়ান ও হিওয়েন-সাংএর বর্ণনা পাঠে সারনাথের সমৃদ্ধির বিষয় সবিশেষ অবগত হওয়া যায়। বৌদ্ধধর্ম্মের অব-নতির সঙ্গে সঙ্গে এই পুণ্যতীর্থের কীর্ত্তিচিহ্ন ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়াছিল বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। কিন্তু কি করিয়া যে এত বড় একটি বহুজনসঙ্কুল সহর লোকলোচনের অদৃশ্য হইল সে কথা ইতি-হাসের পৃষ্ঠা হইতে সম্যক্ জানিবার উপায় নাই, তবে বহু অনুসন্ধানের ফলে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ নির্ণয় করিয়াছেন যে 'সারনাথের অকাল লোপসাধন সম্ভবতঃ অত্যন্ত বর্ব্বরতার সহিত সাধিত হইয়াছিল। অসংখ্য প্রস্তরমূর্ত্তি ও প্রাণভয়ে পলায়নপর শ্রমণ-দিগের কঙ্কাল হইতে জানা যায় যে কোন বিধর্ম্মীর অত্যাচারে এই স্থানের এই বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল। শ্রমণ, মন্দির, দেবদেবীর মূর্ত্তি অগ্নিসংযোগে বিধ্বস্ত ও দগ্ধ করা হইয়াছিল। আবিষ্কৃত বিহারের কক্ষের স্থানে স্থানে দগ্ধ অস্থি, কাষ্ঠ, রুটি ও ডাল, দ্রবীভূত ধাতুপাত্র এবং অন্যান্য ধাতু মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। এই সব দেখিয়া মনে হয় যে শ্রমণগণ অন্ন-পাক আরম্ভ করিয়াছে, এমন সময় বিধর্ম্মীর অত্যা-চারভয়ে তাহারা পলাইয়াছিলেন।' সম্প্রতি 'বেনারস গেজেটিয়ারে' প্রকাশিত মত হইতে জানা যায় যে সহাবুদ্দিন ঘোরী প্রেরিত কুতুবুদ্দিনের নৃশংস অত্যা-চারের ফলে ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে সারনাথের অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছিল।

সম্মুখে।

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি, এ)

পিছন পানে চাইবো নাকো
চল্‌বো পথে চল্‌বো পথে,
লাগুক্ ধূলা ফুটুক কাঁটা
ফিরবো না তো কোন মতে।
চল্‌তে গেলেই লাগবে ধূলা
আস্‌বে বাধা নূতন নয়,
তাই বলে কি নদীরা সব
পথের পাশে বসেই রয় ?
চল্‌তে হবে চল্‌তে হবে
নামটী নিয়ে চল্‌তে হবে,
বুকের বলে ভর করে ভাই
চল্‌তে হবে কঠিন ভবে।
থামলে পরে চল্‌বে না
দাঁড়ালেই তো বিপদ নানা,
এগিয়ে চল—যা হবে হোক্
বাধা সে তো আছেই জানা।
রাখিস্ মনে মিলন যাত্রী
অমৃত তোর হবেই কেনা,
অতল সুধা পাবি যেথায়
সেথা গুন্‌বি কিরে পাওনা দেনা।
ওরে সুধার তলে ভুল্‌বি যে সব
লাগ্‌বে প্রাণে গীতোৎসব,
হিসাব কি রে থাকবে মনে
পেয়ে অসীম রতন ধনে।
মৃত্যু সে তো কিছুই নয়
দেহ অবসান মাত্র হয়,
অসীম পথে যাওয়ার মুখে
একটি সেতু পেরোতে রয়।

মন রে আমার করিস্ নে ভয়
এগিয়ে চল্ এগিয়ে চল্,
ফুট্‌বে কাঁটা টুট্‌বে বাধা
কাছেই আছে শান্তিজল।
তাঁরি উপর মুখ তুলে চা'
কোনই বাধা লাগবে না পায়
সমুখ পানে যাওয়ার মুখে,—
হিসাব তখন কেই বা চায়॥

ব্রাহ্মসমাজে অনূঢ়া-সমস্যা। *

ব্রাহ্মসমাজে অনূঢ়া কন্যার আধিক্য একটী গুরুতর চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইতেছে। হিন্দুসমাজের অন্যান্য নানা সম্প্রদায়েরও ভিতরে যে অনূঢ়া কন্যার আধিক্য নাই অথবা তাহা যে চিন্তার বিষয় হইয়া উঠে নাই, সে কথা আমরা বলিতেছি না। তবে, একটী কথা আমাদের মনে হয় যে অন্যান্য সম্প্রদায়ে কন্যার অনূঢ়া নাম ঘুচাইবার প্রয়োজন হইলে নিতান্ত অল্পবয়স্কা বালিকাকেও অভিভাবকগণ নিতান্ত বয়োবৃদ্ধের হস্তে সমর্পণ করিতে পারেন। এরূপ ঘটনা নিতান্ত বিরলও নহে। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে নানা কারণে এরূপ ঘটনা এক-প্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে বলিলেও বলিতে পারি।

যে সকল কারণে এরূপ ঘটনা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের মধ্যে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে পুত্র ও কন্যাদিগকে সমসূত্রে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া অন্যতর প্রধান কারণ। কন্যাকে পুত্রের সহিত সমানভাবে শিক্ষা দেওয়াকে ব্রাহ্মসমাজ প্রথমাবধি একটী মূলমন্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এই কারণে ব্রাহ্মসমাজে স্ত্রীশিক্ষা খরবেগে চলিয়াছে। এখন, যে পিতামাতা স্বীয় কন্যাকে ভালরকম লেখাপড়া শিক্ষা দিয়াছেন, সে পিতামাতা সেই শিক্ষিতা কন্যাকে বিবাহের অযোগ্য এক বৃদ্ধের বা অশিক্ষিতের হস্তে কোনপ্রকারেই সমর্পণ করিতে পারেন না। কোন কারণে পিতামাতা সেরূপ অসঙ্গত কার্য্যে অগ্রসর হইলে কন্যা তাহাতে নিশ্চয়ই অসম্মতি প্রকাশ করিবে এবং সেরূপ অসম্মতি প্রকাশ করিবার অধিকার তাহার আছে। কাজেই বিদ্যাশিক্ষা ব্রাহ্মসমাজে অনূঢ়া কন্যার সংখ্যাবৃদ্ধির বিশেষ সহায়তা করে। আবার, অনূঢ়া কন্যার সংখ্যাবৃদ্ধি ব্রাহ্মসমাজে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের অন্যতর কারণ। বয়স্কা অনূঢ়া কন্যাকে শিক্ষাদান অপেক্ষা ভাল কাজ আর কি আছে? এইরূপে স্ত্রীশিক্ষা ও অনূঢ়াবৃদ্ধি, পরস্পর পরস্পরের সহায়কের কার্য্য করে।

ব্রাহ্মসমাজে স্বার্থপরতার প্রাবল্যকে অনূঢ়াবৃদ্ধির দ্বিতীয় কারণ বলিয়া মনে হয়। ব্রাহ্মসমাজ যখন প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়, সে সময়ে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে পরোপকারিতার এক প্রবল স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে স্বার্থপরতা ও সুখভোগের প্রবল ইচ্ছা তাহার স্থান অধিকার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজে যে পরোপকারিতা একেবারেই নাই তাহা আমরা বলিতেছি না, কারণ পরোপকারিতার সম্পূর্ণ অভাব হইলে ব্রাহ্মসমাজের কেন, কোন সমাজেরই অস্তিত্ব থাকিতে পারে কি না সন্দেহ। তবে ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে ব্রাহ্মসমাজে স্বার্থপরতা পূর্ব্বাপেক্ষা প্রবলতর বেগ ধারণ করিয়া সমাজের ভিত্তি বিধ্বস্ত করিবার উপক্রম করিতেছে। ইহার ফলে ক্রমশ দাঁড়াইতেছে এই যে ব্রাহ্মদিগের অনেকেই দরিদ্র ব্রাহ্মের কন্যা বিবাহ করিতে প্রস্তুত নহেন, কারণ কন্যার অভিভাবকগণ বরের সুখভোগের ইচ্ছা পরিতৃপ্ত করিবার উপযুক্ত ধনরত্ন প্রদানে অসমর্থ। ব্রাহ্মসমাজে প্রকৃত ধনী ব্রাহ্ম অপেক্ষা নির্ধন মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মের সংখ্যাই অধিক, সে কথা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। উপযুক্ত ধনরত্ন না পাওয়াতে ছেলেরা বিবাহ করিতে অসম্মত হইবার কারণে ব্রাহ্মসমাজেও প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে ক্রমশ পণপ্রথা প্রবর্ত্তিত হইতে চলিয়াছে, তাহা চক্ষুষ্মান ব্যক্তিমাত্রেই দেখিতে পাইবেন। অগত্যা নির্ধন ব্রাহ্মদিগের অধিকাংশেরই কন্যাগণ অনূঢ়া থাকিয়া যাইতেছে। ইহার পরিণামে সমাজে যে ভীষণ অমঙ্গলরাশি প্রবেশ করিতে পারে, এমন কি, তাহার অস্তিত্ব বিলোপেরও সম্ভাবনা, সে কথা

* সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের খ্যাতনামা কোন সভ্য আমাদিগকে এই বিষয়ে একটী প্রবন্ধ প্রেরণ করেন। নানা কারণে তাহা প্রকাশ করিতে পারিলাম না। সেই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া এই বিষয়ের সমাধান করিবার যত্ন পাইয়াছি। মতভেদ থাকিলেও এ বিষয়ে প্রত্যেক ব্রাহ্মসমাজ হিতৈষীর মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। তঃ বোঃ সং।

ব্রাহ্ম যুবকেরা একবার ভাবিয়া দেখেন কি না সন্দেহ।

অপরের সুখদুঃখের প্রতি, সমাজের মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া আপনার সুখভোগের ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পরিতৃপ্ত করিব, এই ভাবেরই আনুষঙ্গিক ফলস্বরূপে প্রধানত বিলাতফেরত ব্রাহ্মদিগের মধ্যে একটা ফ্যাসন উঠিয়াছে—পাশ্চাত্য স্ত্রীপুরুষের সহিত বিবাহে আবদ্ধ হওয়া। যাঁহারা এই সকল প্রাচ্য-পাশ্চাত্য বিবাহের সন্ধান রাখেন তাঁহারাই জানেন যে সুখভোগের ইচ্ছা পরিতৃপ্ত হইবার পরিবর্ত্তে অধিকাংশ স্থলে স্বামী ও স্ত্রী উভয়কেই দুঃখে কষ্টে অশান্তিতে অবনিবনাতে চিরজীবন নষ্ট করিয়া চলিতে হইয়াছে। তাঁহাদের কেহই মুখে কষ্ট দেখাইতে চাহেন না, কিন্তু প্রত্যেকে বুকফাটা কষ্ট হৃদয়ে পোষণ করিয়া জীবন যাপন করিতে বাধ্য হন। দুঃখের বিষয় যে নব্যতন্ত্রের স্বদেশীয়গণ বাহিরের চাকচিক্য দেখিয়া দিশাহারা হইয়া পড়েন এবং সুবিধা পাইলেই পাশ্চাত্য স্ত্রীপুরুষের সহিত বিবাহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইবার জন্য ধাবিত হয়েন।

হার্বার্ট স্পেন্সর একস্থানে বলিয়াছেন যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যগণের মধ্যে বিবাহবন্ধন মঙ্গলজনক নহে। আমাদেরও বিশ্বাস যে ইহা দ্বারা সমাজের মঙ্গল হয় না। প্রথমেই তো দেখা যায় যে ইহা দ্বারা আমাদের দেশের দাম্পত্য আদর্শ বিকৃত হইয়া পড়িতেছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জীবন ও দাম্পত্যের আদর্শ সম্পূর্ণ ভিন্ন। উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। প্রাচ্য পুরুষের আদর্শ হইল একটী বৃহৎ পরিবারের কর্ত্তা হইয়া সেই পরিবার প্রতিপালন করা। পরিবার যতই বৃহৎ হইবে, এবং সেই পরিবার যতই সুচারুরূপে প্রতিপালিত হইবে, প্রাচ্য পুরুষ ততই সুখবোধ করিবেন ও পরিতৃপ্ত হইবেন। প্রাচ্য রমণীর আদর্শ হইল মাতৃত্ব—মাতৃত্বেই তাহার সুখ। শত দুঃখ কষ্টের মধ্যে বলিতে গেলে মাতৃত্ব সর্ব্বতোভাবে পরিস্ফুট করাতেই প্রাচ্য রমণীর সমগ্র জীবনের পরিসমাপ্তি। প্রাচ্য পুরুষ ও রমণীর জীবনের আদর্শ উপরোক্ত প্রকার হইবার কারণে প্রাচ্য দাম্পত্যেরও আদর্শ হইল দম্পতীর একাত্মীকরণ। তাই প্রাচ্য বিবাহের অন্যতর মন্ত্রই হইল "তোমার যে হৃদয় তাহা আমার হউক, আমার যে হৃদয় তাহা তোমার হউক।" এই আদর্শের বশবর্ত্তী হইয়াই প্রাচ্য রমণী প্রত্যেক মানবের পরম প্রিয় স্বাধীনতারত্ন স্বামীর চরণে সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন দিতে আনন্দ বোধ করে এবং প্রাচ্য পুরুষ স্বীয় পরিবারের মঙ্গলকল্পে জীবন উৎসর্গ করিয়া সুখী হয়। অপরদিকে, পাশ্চাত্য, কি পুরুষ কি স্ত্রী, সকলেরই আদর্শ হইতেছে ব্যক্তিগত সুখ, স্বাধীনতা ও অধিকার রক্ষা করা। পাশ্চাত্য পুরুষ আপনাকেই বিশেষরূপে চিনে। বহুকাল পূর্ব্বে সংবাদপত্রে পড়িয়াছিলাম যে একবার গ্ল্যাডষ্টোনের গৃহে তাঁহার পুত্র বা জামাতা আসিয়া আহারাদি করিয়াছিলেন। আহারের পর গ্ল্যাডষ্টোন আগন্তুককে প্রদত্ত আহার্য্যাদির একটী বিল দেওয়াইয়া তাঁহার নিকট হইতে কড়ায় গণ্ডায় মূল্য আদায় করিয়াছিলেন। লেখকের কোন ইংরাজ বন্ধুর পুত্র বারম্বার ম্যালেরিয়া ভোগ করিবার কারণে বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও নিজের জীবিকা সংস্থান করিতে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছিল। একদিন তাহার পিতা তাহাকে অন্নধ্বংস করিবার অপবাদ দিয়া বিশেষ ভৎর্সনা করিলেন। পুত্রটী মনের দুঃখে সুদূর অষ্ট্রেলিয়ায় মৃত্যু পণ করিয়া চলিয়া গেল। এইরূপ কার্য্য ভাল বা মন্দ তাহা এখানে বিচার করিতেছি না। কিন্তু ইহা ঠিক যে কোন প্রাচ্য পুরুষ এরূপ কার্য্য করিতে পারিত না। সাধারণত পাশ্চাত্য পুরুষের ন্যায় পাশ্চাত্য রমণীও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও অধিকার কাহারও হস্তে উঠাইয়া দিতে সম্মত নহে। নিজ নিজ অধিকার রক্ষা করিবার জন্য প্রত্যেকেই মরণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া থাকে। পাশ্চাত্য দাম্পত্যও ঐহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য এবং ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার অধিকারের উপর দাঁড়াইয়া আছে। ইহারই ফলে পাশ্চাত্য দেশেই দাম্পত্য অধিকারের পুনঃস্থাপনের জন্য আদালতে নালিশ উপস্থিত করা সম্ভব হয়। পাশ্চাত্য আদর্শের কারণেই পাশ্চাত্য বিবাহ রেজেষ্ট্রী করিবার প্রথা প্রচলিত হইতে পারিয়াছে, কিন্তু ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ৩ আইন প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে শত সহস্র যুগেও এদেশে বিবাহ রেজেষ্ট্রী করিবার প্রথার কোনই প্রয়োজন অনুভূত হয় নাই। যাই হৌক, পাশ্চাত্য দেশে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও অধিকার নষ্ট হইবার ভয়ে যেমন স্ত্রী-

পুরুষের অনেকে ক্লব-গত জীবনকে বিবাহ অপেক্ষা শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়া বিবাহ করিতে অসম্মত হয়, আমাদের দেশেও, পাশ্চাত্য আদর্শ যাঁহাদের মাথার মণি, তাঁহারাও সেই আদর্শের অনুসরণ করিয়া সহজে বিবাহের "শৃঙ্খলে" আবদ্ধ না হইয়া শৃঙ্খলের বাহিরে বিচরণ করিতে ভাল বাসেন। নীতির অবনতি, চরিত্রের পবিত্রতার বিনাশ, এ সকল বিষয়ে তাঁহারা বিবেচনা করিবার অবসরই প্রাপ্ত হন না।

আরও একটী কারণে আমরা পাশ্চাত্যদিগের সহিত বিবাহে আবদ্ধ হওয়া অন্যায় মনে করি। আমরা মনে করি, যে সকল স্বদেশবাসী স্ত্রী-পুরুষ পাশ্চাত্য পুরুষ বা রমণীর সহিত বিবাহে সম্মত হয়েন তাঁহারা তাঁহাদের স্বদেশবাসী স্ত্রী-পুরুষদিগকে অপমানিত করেন। হইতে পারে, তোমার উচ্চতম আদর্শের অনুযায়ী পাত্র বা পাত্রী স্বদেশে পাও নাই। ইহা স্বীকার করিলেও আমরা জিজ্ঞাসা করি যে সে প্রকার পাত্রপাত্রী কে কবে পাইয়াছে? যদি তুমি বল যে তোমার বিবাহের উপযুক্ত পাত্র বা পাত্রী এদেশে দেখিতে পাও নাই, তবে সে কথাকে দেশের বিরুদ্ধে "লাইবেল" বলিয়া মনে করি। তোমরা কথায় কথায় দেশের মোটা ভাত মোটা কাপড়ে সন্তুষ্ট থাকিবার কথা উঠাও। কিন্তু তোমরা যদি দেশের মানুষে সন্তুষ্ট থাকিতে না পার, বিলাতের বিলাসপুষ্ট মানুষের সহিত সম্প্রীতি করিতে যাও, তবে তোমরা যে দেশের মোটা ভাত মোটা কাপড়ে সন্তুষ্ট থাকিবে সে কথা অসম্ভব—কপটাচার মাত্র।

পাশ্চাত্যদিগের সহিত বিবাহের ঔচিত্য সম্বন্ধে "বিশ্বজনীন প্রেম" "প্রকৃত প্রেম কোন বাধা মানে না" ইত্যাদি বাঁধি-বুলি-মূলক নানাবিধ তর্ক উপস্থিত করা যাইতে পারে। কিন্তু এ বিষয় একটু গভীরভাবে আলোচনা করিলেই বুদ্ধিমান ব্যক্তি সেই সকল যুক্তির অসারতা দেখিতে পাইবেন। সেই সকল যুক্তি যদি ঠিকই হয়, তবে "স্বদেশী" ভাব দেশে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য এত মাথাব্যথা কেন? বিশ্বজনীন প্রেম প্রভৃতি খুব ভাল বটে। কিন্তু তাহা আত্মকেন্দ্রক হওয়া উচিত। আত্মকেন্দ্র হইতে বিচ্যুত হইলে সেই বিশ্বজনীন প্রেম কক্ষভ্রষ্ট গ্রহনক্ষত্রের ন্যায় বিলয়প্রাপ্ত হয়। সেই উদারতা ধ্বংসেরই নামান্তর মাত্র। এই যে "স্বদেশী" ভাবের প্রতি শ্রদ্ধা, ইহা সমগ্র দেশের আত্মকেন্দ্র খুঁজিয়া বাহির করা এবং তাহা দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করিবার চেষ্টা মাত্র। এখনও আমরা অনেকটা কেন্দ্রচ্যুত হইয়া আছি বলিয়াই আমরা "স্বদেশী" ভাবকে যেমনটী ইচ্ছা করি, তেমনটী দাঁড় করাইতে পারিতেছি না। বৃথা যুক্তিতর্ক ছাড়িয়া দিলে দেখিতে পাই যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে বিবাহের ফলে সাধারণতঃ সুখশান্তির বিশেষ অভাবই দেখা যায়। কিন্তু এখনও আমরা যে মোহমদিরার মধ্যে ডুবিয়া আছি, তাহার ফলে আমাদের অনেকেই পাশ্চাত্যদিগের সহিত বিবাহে আবদ্ধ হইতে পারিলে আপনাদিগকে পরম সুখী দেখিবার স্বপ্ন দেখিতে ছাড়ি না। অবান্তরভাবে ইহাও ব্রাহ্মসমাজে অনূঢ়া বৃদ্ধির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ব্রাহ্মসমাজে অনূঢ়াবৃদ্ধির কারণে নানাবিধ ভীষণ অমঙ্গলের সম্ভাবনা, সে কথা আমরা ইতিপূর্ব্বেই ইঙ্গিত করিয়াছি। আপাতত ইহার কারণে বিলাসিতার স্রোত ব্রাহ্মসমাজে ভীষণবেগে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি। একথা বলিয়া আপনার মনকে প্রবোধ দিতে যাইও না যে অন্যান্য সমাজেও বিলাসিতা আছে। তোমরা আদর্শ দেখাইবার কথা ঘোষণা করিয়া থাক, উচ্চতম আদর্শকে তোমাদের আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছ। তখন তোমাদের সমাজে যাহা কিছু দোষ বা গ্লানি আছে তাহা অবিলম্বে দূর করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। একটী প্রবাদ আছে যে আলস্য সকল দোষের মূল। আমরা বলিতে চাহি যে বিলাসিতাও সকল দোষের মূল। সেই বিলাসিতা সমাজে বাড়িবার কারণ কি? প্রত্যেক অনূঢ়া কন্যার মাতা কন্যাকে অলঙ্কার এবং বিদেশী লেস-মণ্ডিত স্বচ্ছাতিস্বচ্ছ বস্ত্র প্রভৃতি বিলাস-সম্ভারে বিভূষিত করিয়া বাহির করিতে চাহেন। অনূঢ়া কন্যার সংখ্যা যতই অধিক হইবে ততই এবিষয়ে প্রতিযোগিতা বাড়িতে থাকিবে, এবং কাজেই সমাজের মধ্যে বিলাসিতা ক্রমশ অতিমাত্রায় প্রবেশ লাভ করিয়া সমাজকে অন্তঃসারশূন্য করিয়া তুলিবে। বিলাসিতার ফলে হৃদয় হইতে প্রকৃত ধর্ম্মভাব ধীরে ধীরে সরিয়া পড়িতে

চায়। একথা আমরা বলিতে বাধ্য যে ব্রাহ্মসমাজে প্রকৃত ধর্ম্মভাব পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। এই যে বর্ষে বর্ষে ব্রাহ্মসমাজের উৎসব হইয়া থাকে, সেই উৎসবেই এই বিলাসিতা বৃদ্ধি এবং ধর্ম্মভাব হ্রাসের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রাহ্মসমাজের উৎসব যে বিবাহের উৎসব নহে, ব্রাহ্মসমাজের উৎসব যে বৃথা আমোদের উৎসব নহে, সে কথা অতি অল্প সংখ্যক পিতামাতাই ভাবিয়া থাকেন। ইহা যে সাজসজ্জা দেখাইবার প্রতিদ্বন্দ্বিতাক্ষেত্র নহে, সঙ্গীতে পারদর্শিতা দেখাইবারও প্রতিদ্বন্দ্বিতাক্ষেত্র নহে, সে কথা অনেকেই ভুলিয়া যান। ফলে দাঁড়াইয়াছে এই যে উৎসবের সময়ে পিতামাতা পুত্রকন্যাদিগকে পবিত্র বেশে সজ্জিত করিবার পরিবর্ত্তে রাশি রাশি বিলাসসজ্জাতেই ভূষিত করিয়া বাহির করেন এবং পুত্র-কন্যাগণও অন্তরের সদ্‌গুণ অপেক্ষা বাহিরের শোভাপ্রদর্শন করিতেই অধিক শিক্ষা পায়। যেখানে এই বিষয়ের প্রতিযোগিতা, সেখানে এরূপ হওয়া প্রকৃতির নিয়মানুসারে স্বাভাবিক।

আমাদিগের এখন দেখা কর্ত্তব্য যে এই সকলের প্রতীকার হয় কিসে? আমরা বলিয়া আসিয়াছি যে কন্যাদিগকে ভালরূপে লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়া অনূঢ়াবৃদ্ধির অন্যতর কারণ। এই লেখাপড়া অর্থে বর্ত্তমানে প্রচলিত লেখাপড়াই ধরিয়াছি। শৈশবে বি-এল-এ-ম্লে শিখিতে আরম্ভ হয় এবং জীবনের এক চতুর্থাংশ অতিবাহিত হইবার সময়ে সেক্ষপীয়রের হত্যা প্রভৃতি পাপমূলক, ব্রহ্মচর্য্যের মূলচ্ছেদক নাটকগুলি এবং হৃদয়ের উদ্বেজনার উত্তেজক কবিতা ও উপন্যাস প্রভৃতি অভ্যাস করিতে করিতে শিক্ষার্থীগণ বলিতে গেলে নিজেদের জীবনের শিরায় শিরায় সেই সকলের মন্দভাবগুলি মিশাইয়া লইতে অভ্যস্ত হয়েন। এই শিক্ষা ক্ষণেকেরও জন্য মাতৃত্বের দিক দিয়া যায় বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই। আমরা জানি যে এই সকল কথা নব্যতন্ত্রীদিগের ভাল লাগিবে না, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের জ্ঞান ও বিশ্বাসমত সত্য কথা স্পষ্ট করিয়া না বলিলেও আর উপায় নাই। যে কোন সমাজে, অনূঢ়া কন্যার সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে ভীষণ হইতে ভীষণতর অমঙ্গল আসা অত্যন্ত স্বাভাবিক। সেই কারণে যে কোন উপায়ে প্রত্যেক সমাজেরই উচিত অনূঢ়া বৃদ্ধির প্রতিরোধ করা। এই প্রতিরোধের একটী উপায় হইতেছে প্রত্যেক কন্যার হৃদয়ে মাতৃত্ব জাগ্রত করিয়া দেওয়া। ভারতের বৃদ্ধ ঋষি মনু তাঁহার ধর্ম্মশাস্ত্রে মাতৃত্বের কারণেই রমণীগণ পূজার্হ বলিয়া এবং উপযুক্তরূপ সমাজব্যবস্থা করিয়া সমগ্র সমাজেরই হৃদয়ে মাতৃত্ব পরিস্ফুট করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ঋষিদিগের ব্যবস্থার যথাযুক্ত ভাব লইয়া আমাদেরও ব্রাহ্মসমাজে এমন শিক্ষা প্রবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য যাহার ফলে আমাদের কন্যাদের হৃদয়ে মাতৃত্ব জাগ্রত হইয়া উঠে। আমরা এমন কথা বলি না যে প্রত্যেক কন্যাকেই বিবাহের জন্য উৎসাহ দিয়া পাগল করিয়া তুলিতে হইবে। বরঞ্চ তাহার বিপরীত বলিতে চাহি। আমাদের মতে সমস্ত শিক্ষাকে ধর্ম্মকেন্দ্রক ও ব্রহ্মচর্য্যমূলক করিলে কন্যাদিগের স্বাভাবিক ভাব মাতৃত্ব স্বতই প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিবে। সেই শিক্ষার সঙ্গে যথাযুক্ত সময়ে শিশুদিগের সেবাকার্য্য, রন্ধন কার্য্য প্রভৃতি মাতৃত্ব-সহায়ক কার্য্য সকলও শিক্ষা দেওয়া উচিত। এইরূপ শিক্ষার ফলে পিতামাতাগণ যেমন কন্যাগণকে সহজে অযোগ্য পাত্রের হস্তে সমর্পণ করিতেও পারিবেন না, সেইরূপ বর্ত্তমানে শিক্ষিতা কন্যাগণ যেমন কথায় কথায় কতকটা লোক-দেখাইবার জন্য বিবাহের নামে ঘৃণা প্রদর্শন করেন, সেটা আর তাঁহারা করিবেন না।

রন্ধন কার্য্য কন্যাদিগের মাতৃত্ব পরিস্ফুটনের একটী প্রধান সহায়। বিদ্যালয়ে আজকাল রন্ধন কার্য্য শিক্ষা দেওয়া প্রবর্ত্তিত হইতেছে শুনিয়া আমরা অত্যন্ত সুখী হইয়াছি। কিন্তু কেবল বিদ্যালয়ে শিক্ষা করিলে চলিবে না। গৃহে পরিবারের মধ্যে প্রত্যেক কন্যাকে রাঁধিয়া বাড়িয়া খাওয়াইতে শিক্ষা দেওয়া উচিত। তাঁহার স্বহস্তে রাঁধা ভোজ্য সকল আহার করিয়া যখন পরিবারের তৃপ্তিসাধন হয়, সেই তৃপ্তির ফলে কন্যার হৃদয়ে যে নিষ্কলঙ্ক আনন্দ হয়, সেই আনন্দের মধ্য হইতে কন্যার মাতৃত্ব ধীরে ধীরে ফুটিতে থাকে। আর, ভগবানের প্রতিষ্ঠিত নিয়মের বলে

জীবমাত্রেই আপনাপন উদর পূর্ত্তির জন্য ছুটাছুটি করিয়া থাকে। মানুষও সে নিয়মের অতীত নহে। এখন, কোন লোক যদি কোন শিক্ষিতা বালিকাকে বিবাহ করিয়া দেখে যে তাহার স্ত্রী বড় বড় কবিতা আবৃত্তি করিতে পারে, কিন্তু গৃহ-কর্ম্মে সম্পূর্ণ অপটু এবং সমস্ত দিনের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর গৃহে যদি দুমুটো সুপক্ক অন্নব্যঞ্জন নিজের পেটে দিতে না পারে, তাহা হইলে কাজেই সে বিবাহের প্রতি ধিক্কার দিতে থাকিবে এবং বন্ধুবান্ধবের নিকট নিজের দৃষ্টান্ত সবিস্তার ব্যাখ্যা করিয়া তাহাদিগকেও বিবাহ হইতে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিবে, ইহা জানা কথা। নূতন বিবাহের পর নবদম্পতী দুই চারিদিন কবিতার সুধারস পান করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারে, কিন্তু চিরকাল তাহা সম্ভব নহে। বর্ত্তমানে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে বিবাহে অনিচ্ছার ইহাই একটী প্রধান কারণ বলিয়া আমাদের দৃঢ় ধারণা। পক্ষান্তরে যদি স্বামী গৃহে আসিয়া দেখে যে তাহার স্ত্রী গৃহের সকলই সুশৃঙ্খল করিয়া রাখিয়াছে, অন্নব্যঞ্জন সুন্দর রাঁধিয়া রাখিয়াছে, তাহা হইলে এমন স্বামী নাই যে আপনার দৃষ্টান্তে অপরকেও না বিবাহে উৎসাহ দিবে। এই জন্য বলিতেছি যে বিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষার ভিতর হইতে যে কোন গ্রন্থে "নবেলীয়ানা"র এতটুকু গন্ধও আছে, সে গ্রন্থ শিক্ষণীয়-তালিকা হইতে নিষ্কাশিত করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, এবং সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে রন্ধনাদি মাতৃত্বের উদ্বোধক শিল্পাদি শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। সেই সঙ্গে প্রত্যেক গৃহে, প্রত্যেক পরিবারে ধর্ম্মকেন্দ্রক, ব্রহ্মচর্য্যমূলক এবং মাতৃত্বের পরিপোষক শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত। ব্রহ্মচর্য্যের নামে ভয় পাইবার কোন কারণ নাই। ব্রহ্মচর্য্যের প্রকৃত অর্থ যথাযুক্ত সময়ে যথাযুক্ত ইন্দ্রিয়াদির যথাযুক্ত পরিচালনা, —ধনুর্ভঙ্গ পণ করিয়া বিবাহের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া নহে। আমাদের বিশ্বাস যে আমাদের কথামত শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে বিদ্যাশিক্ষা দিবার ফলে অনূঢ়াবৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকিবে না।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, ব্রাহ্মসমাজে স্বার্থপরতা কি প্রকারে প্রতিরুদ্ধ করা যাইতে পারে। এ বিষয় নানাস্থানে নানাভাবে আলোচনা চলিতেছে, সুতরাং এ বিষয়ে বেশী কথা বলিতে যাওয়া অনাবশ্যক। তবে দুইটী উপায় আমাদের মনে হইতেছে। একটী এই যে, সুবিধা পাইলেই ধনী নির্ধন, আত্মীয় অনাত্মীয় সকলে একত্র হইয়া পান ভোজন করা উচিত। একথা আমি কোন মুখপত্রে ইঙ্গিতব্যক্ত দেখিয়াছি। দ্বিতীয় উপায় হইতেছে এই যে প্রত্যেক পরিবারের কর্ত্তৃপক্ষ শৈশবাবধিই পরিবারের বালকবালিকাদিগকে সর্ব্বতোভাবে নিঃস্বার্থপর হইতে শিক্ষা দিবেন এবং যাহাতে বাড়ীর ছেলেমেয়েরা পণপ্রথাকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিতে অভ্যস্ত হয়, কন্যাপক্ষের নিকট হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত পণ করিয়াও যাহাতে কন্যার অভিভাবকগণের নিকটে আশীর্ব্বাদ ব্যতীত আর একটী কড়াও না লয় তদ্বিষয়ে বিশেষভাবে শিক্ষা দিবেন। শৈশব অবধি ছেলেমেয়েকে ব্রহ্মচর্য্যের পথে থাকিবার জন্য উপদেশ দিতে হইবে। গৃহে বিলাসিতার সংস্পর্শও আসিতে দিবে না। আমরা দেখিয়াছি যে স্বামীর মত হয়তো দেশের মোটা ভাত মোটা কাপড়ে চলা, কিন্তু বাড়ীর গৃহিণী প্রভৃতির জেদের কারণে স্বামী পুত্রকন্যাদিগকে বিদেশীয় বিলাসসজ্জায় ভূষিত করিবার পক্ষে সম্মতি দিতে বাধ্য হইয়াছেন। এরূপ করিলে চলিবে না। স্বামীস্ত্রী একমত হইয়া বিলাস বর্জ্জন করিলে দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় যে শান্তি সুনিশ্চল হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিলাস বর্জ্জন করিলে অতি অল্প খরচে সংসার চলিবে, কাজেই তখন দৃষ্টান্ত দেখিয়া কেহই যথাবয়সে বিবাহ করিবার বিরুদ্ধে আপত্তি উপস্থিত করিবে না বলিয়া আমরা মনে করি।

বিষয়টী ব্রাহ্মসমাজকে বড়ই কঠোরভাবে আঘাত করিতেছে। তাই আমাদের বুদ্ধি ও বিবেচনামত এসম্বন্ধে দুচারিটী কথা বলিলাম। কিন্তু প্রত্যেক ব্রাহ্মসমাজহিতৈষীর এই বিষয় আলোচনা করিয়া নিজের সাধ্যমত অনূঢ়াবৃদ্ধির প্রতীকারের চেষ্টা করা উচিত।

রাণাডের জীবন-স্মৃতি।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদিত)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এইরূপ বলিবার তাহারা একটা উপলক্ষ্য পাইয়াছিল। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর, সকল মেয়েরাই পিছনের উঠানে

বসিয়াছিল, আমি মাঝঘরের ধূলা ঝাঁট দিতেছিলাম। আধা-আধি ঝাঁট দেওয়া শেষ হইলে, সেই জঞ্জালের মধ্যে ইংরাজী সংবাদপত্রের একটা টুক্‌রো পাওয়া গেল। প্রথমেই আমার ছেলেমানুষির দরুণ,—কোন এক বিষয় আরম্ভ না করিয়াও তাহা করিতে আমি সমর্থ এইরূপ মনে করিয়া তাড়াতাড়ি হাতের ঝাঁটাটা নীচে রাখিয়া সেই কাগজের টুক্‌রোটা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পড়িতে লাগিলাম। প্রথম বই আরম্ভ করিয়া পুরা পনেরো দিনও হয় নাই, ইহারই মধ্যে কি আমি ইংরাজী পড়িতে পারি? কিন্তু কেবল দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অক্ষরগুলিই দেখিতে লাগিলাম। আমি যে নীচের ঘরে আছি তাহা আমার মনেই ছিল না। এই সময়ে আমার উপর আমার দিদি-শাশুড়ীর নজর পড়িল। তিনি নিকটে আসিয়া চুপি চুপি মেয়েদের ইসারা করিবামাত্র দুই তিন জন দরজার কাছে আসিয়া আমাকে দেখিল; কিন্তু আমি ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারি নাই। আমার নিজের খেয়ালেই ঐরূপ নিমগ্ন আছি দেখিয়া আমার ননদের খুবই রাগ হইল এবং সে চড়া গলায় আমাকে বলিল—"তোমার আপিস দোতালায়। সেখানে গিয়ে তুমি পাঠ কর, কি নাট কর—যা ইচ্ছে তাই কর। কিন্তু খবরদার আমাদের অপমান কোরো না! আমাদের প্রথম বৌদিদি কি ছিল না? তাকে দাদা লেখা পড়া সব শিখিয়েছিলেন। সে আমাদের এক-বয়সী ছিল, তবু সে আমাদের সামনে এমন কি এক অক্ষরও পড়েনি। তাকে ইংরেজি শেখাবার জন্য দাদা খুবই চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সে বেচারীর সে দিকে লক্ষ্য ছিল না। সে ত তাঁরই স্ত্রী ছিল। তাকে কোন বিষয় দশবার বললে, তবে সে একবার করত। কিন্তু হাজার বল্‌লেও সে এ রকম বেহায়ামী করত না।" পদে পদে এই রকমের বোলচাল চলিত। এইজন্য, ইংরেজি শিক্ষা কেন আরম্ভ করিলাম এইরূপে মনে করিয়া সময়ে সময়ে আমার কান্না আসিত ও কখন কখন খুব বেশী হইলে একান্তে গিয়া কাঁদিতাম, কিন্তু এ কথা আমার স্বামীর কাছে একটুও বলি নাই। কারণ আমি যখন প্রথম শ্বশুরবাড়ী আসি তখন বাবা আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে গিয়ে এই উপদেশ দিয়েছিলেন "দেখ্, তুই শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছিস। আপনার সপত্নী, কুটুম্ব সম্পর্কের দশরকম মানুষ আছে। তুই আমার মেয়ে। যতই কষ্ট হোক না, নিজ কুলীন বংশের যোগ্য আচরণ করে সব সহ্য করবি। এমন কি চাকর-বাকরদের কথাতেও পাল্টা জবাব দিবিনে। এই এক কথা, আর এক কথা মনের কষ্ট অসহ্য হলেও, কারও নামে লাগিয়ে স্বামীর কাছে বলতে যাসনে। লাগালাগি করাতে শুধু পরিবার কেন—রাজ্যও বিনষ্ট হয়। এইজন্য আমি বলচি, এই দুই ব্রত পালন করলে তোর কখনই কোন অভাব হবে না। তুই ভাগ্যবতী। সহ্যগুণ থাকলে তোর মূল্য আরও বাড়বে ও আমাদের কুলে জন্মগ্রহণ করা তোর সার্থক হবে। আমার এই কথাগুলি মনে রাখিস। এর উল্টো যদি কিছু করেছিস শুনতে পাই, তাহলে আর কখনই তোকে আমার বাড়ী নিয়ে আসব না।" আমার পিতা বড়ই কড়াকড় ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোক বলিয়া আমার বিশ্বাস থাকায় তাঁর কথাগুলি আমার মনে খুব বসিয়াছিল। তাই এই দুই ব্রতই আমি পালন করিব বলিয়া স্থির করিলাম। ইহার দরুণ আমার খুব কষ্ট করিতে হইয়াছিল।

এই ব্রত পালনের দরুণ আমার কান্না ও শুষ্ক মুখ যাতে আমার স্বামীর নজরে না আসে এইজন্য খুব সহ্য করে থাকতে হত। তবু তাঁর নজরে আসিত। মানুষের যাতনা বা কষ্ট বেশীমাত্রায় হইলে, কাহারও কাছে তাহা ব্যক্ত করিয়া বলা ভিন্ন মন হাল্‌কা হয় না, এইরূপ উপলব্ধি হয়। কিন্তু সেরূপ প্রকাশ করিয়া বলিবার সুযোগ না হওয়ায়, সমস্ত দিনের কষ্টে সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত যেন ফোড়া-ফাটার মত বোধ হত। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, রাত্রে দোতালার ঘরে গেলে পর, এই সব কথা আমি একেবারেই বিস্মৃত হইতাম। যেন সমস্ত দিন কোন কষ্টই হয় নাই। যাক্। "আজ অমুক সময়ে তোমাকে ওরকম কেন দেখা যাচ্ছিল? কেউ কিছু কি বলেছে? যেন কাঁদছিলে এই রকম মনে হচ্ছিল" এরূপ অনেক কথা আমার স্বামী আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেও, "আমার ছোট ভাই-বোনদের মনে পড়েছে, মাকে মনে পড়েছে" এই রকম কোন কিছু বলিতাম। কারণ, একবার যদি অল্প কিছুও বলি, তাহা হইলে তিনি সেই সূত্র ধরিয়া সব কথা বাহির করিয়া লইবেন, অথবা আমার মুখ হইতেই সহজে বাহির হইয়া পড়িবে। যাহাই হউক না কেন, ইহার দ্বারা আমার নিয়মভঙ্গ হইবে; তাছাড়া আমাদের প্রকৃত সুখশান্তির সময়টা এই সব কথায় যতটা অতিবাহিত হইবে, ততটাই আমাদের সুখের হ্রাস হইবে; আর ত কোন লাভ নাই, এইরূপ আমার ধারণা হইয়াছিল। তথাপি, আমাদের বাড়ীর বড় মেয়েদের স্বভাব আমার স্বামীর ভাল রকম জানা থাকায়, আসল ব্যাপারটা কি, তখন তাহা অনুমান করিয়া লইতেন এবং তদনুসারে আমায় বুঝাইতেন ও সান্ত্বনা দিতেন। তাঁহার সেই প্রীতিপূর্ণ শান্তিপ্রদ কথাগুলি অল্প সময়ের মধ্যেই আমার মনের উপর এরূপ কাজ করিত যে, সমস্ত দিনের কষ্ট ভুলিয়া গিয়া, আমার মত সুখী কেহই নাই এইরূপ মনে করিয়া সকাল পর্য্যন্ত আনন্দে থাকিতাম। সকালে, নীচে যাইবার সময় আবার আমার আতঙ্ক

হইত। তখন আমার স্বামী আমাকে সাহস দিয়া বলিতেন যে, "একটু সহ্য করতে শিখবে; উত্তর না দিলেই হইল। আমি কি তোমাকে তিরস্কার করে কখন কোন কথা বলি? আর কেউ কিছু বল্‌লে তুমি কেঁদো না।" এই রকম সাহস দিবার পর, সমস্ত দিনটা বেশ শান্তিতে অতিবাহিত হইত। এই উপদেশ অনুসারে আমাদের বাড়ীর সব মেয়েদের প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ বাক্যযন্ত্রণা সমস্তই সহ্য করিতাম, কিন্তু পাঠাভ্যাস ছাড়ি নাই। এই সমস্ত যখন সহ্য করিতাম, আমার দুই দেবর, এই কষ্ট যন্ত্রণার মাঝে, আমার প্রতি মমতা ও প্রীতি প্রদর্শন পূর্ব্বক, আমাকে বলিত,—"বড় মেয়েরা যখন রাগ করবে তখন তুমি ভয় পেয়ো না।" এই বলিয়া তাহারা আমাকে সাহস দিত ও আমার পক্ষ গ্রহণ করিয়া তাহাদের নিকট নানা কথা বলিত। আমি যে সমস্ত সহ্য করিতাম, আমার স্বামীপ্রদত্ত প্রীতিপূর্ণ গম্ভীর উপদেশই তাহার মূলীভূত কারণ। এইরূপ না হইলে, এবম্বিধ কষ্ট যন্ত্রণা, আমার মত অল্পবয়স্কা ও অল্প-বুদ্ধি মেয়ে কখনই সহ্য করিতে পারিত না; অথবা গৃহে বাস করিবার মত সুখশান্তি থাকিত না। কারণ, আমার মন ক্রমাগত কষ্ট পাইয়া সর্ব্বদাই উদাস থাকিত। বাহিরের লোক যতই সহানুভূতি করুক, বা না করুক,—ভালবাসার লোকেরা পরস্পরকে যেমন সহজে ও ভাল রকমে চিনিতে পারে, তেমন আর কিছুতেই হয় না। তাই, আমার স্বামীরও খুব কষ্ট হইয়াছিল, তাঁহার মনের শান্তি কমিয়া গিয়াছিল। এবং এইরূপ ভাবে যদি আরো কিছু দিন চলিত, তাহা হইলে, এই ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়া একটা বিভ্রাট ঘটিবার আশঙ্কা ছিল। কিন্তু পুণ্যবল ছিল বলিয়া, সেরূপ কোন বিভ্রাট না ঘটিয়া, শীঘ্রই "নাসিকে" আমাদের বদলী হইল। কিন্তু এই বদলীর দরুণ, আমার স্বামীর ও পুণানগরস্থ মিত্র-মণ্ডলীর মনের অবস্থা কিরূপ হইল, তাঁহাদের ভাল লাগিল, কি খারাপ লাগিল; এই এক বদলী করবার দরুণ সরকার-বাহাদুরের কত উলট-পালট করিতে হইয়াছে, ইত্যাদি বিষয় আমার কল্পনাতেও আসে নাই। আমাদের বদলী নাসিকে হইয়াছে, এখন আমরা সেইখানে যাইব। সেখানে আমি এইরূপ করিব, ঐরূপ করিব প্রভৃতি ভাবী আনন্দের কল্পনায় দুই এক সপ্তাহ মগ্ন হইয়া ছিলাম। কিন্তু শীঘ্রই আমরা দুজন, ও "আবা"-ভাই আমরা নাসিকে গেলাম। ইচ্ছা করিয়াই বড় মেয়েদিগের কাহাকেও সঙ্গে লওয়া হইল না। তাহার দরুণ আমার স্বামীরও শিখাইবার উৎসাহ বেশী হইল, এবং আমাদের উভয়েরই আনন্দে দিন কাটিতে লাগিল। কিন্তু নাসিকে যাইবার পূর্ব্বে পুণার কিছু বৃত্তান্ত দিতেছি।

১৮৭৪-৭৫ খৃষ্টাব্দে পুণায় সার্ব্বজনিক আন্দোলনের একটা বিশেষ উপলক্ষ্য ঘটিয়াছিল। মল্‌হার রাও গায়কবাড়ের বিষপ্রয়োগ মোকদ্দমায়, মোকদ্দমা চালাইবার খরচা সংস্থান (State) মঞ্জুর করে নাই, তথাপি এক লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত খরচ দিবার জন্য পুণা প্রস্তুত। মহারাজা শেষ পর্য্যন্ত মোকদ্দমা, চালাইবেন, এই মর্ম্মে, পুণার লোকেরা বড়োদায় তার পাঠাইলে, এই বিষয়ের উপর সরকারের কড়া নজর পড়িল। বলা বাহুল্য, এই সময় সর রিচার্ড টেম্পলের শাসন-কাল ছিল। এই সমস্ত আন্দোলনের মূলে কেহ আছে ভাবিয়া কোন বরিষ্ঠ কর্ম্মচারী জেলিয়ার ন্যায় জাল ফেলিয়া চারিদিকে সন্ধান করিতেছিলেন। কোন উপায়েই স্পষ্ট সন্ধান না পাওয়ায়, কোন বিশেষ মণ্ডলীকে সরকার-বাহাদুর সংশয়দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। এবং পুণার এই সমস্ত আন্দোলন থামাইবার জন্য পুণা হইতে কোন বিশিষ্ট মণ্ডলীকে উঠাইয়া লইতে হইবে এইরূপ মৎলব করিয়া, এখান হইতে আমাদিগকে বদলী করিবার জন্য, তিন বা পাঁচ বৎসরের পর একই সব্-জজ্ একই জায়গায় থাকিবে না—বোম্বাই এলাকা সংক্রান্ত এই নূতন আইন প্রয়োগ করিয়া, তদনুযায়ী আমাদিগকে বদলী করা হইল। এই বদলী হইবার চারি মাস আগে কোন এক বিদেশী গৃহস্থ মুশাফেরের ভাণ করিয়া পুণায় আসিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। পুণার ছোট বড় বিদ্বান অবিদ্বান প্রাচীন ও নব্য অনেক লোকের সহিত পরিচয় করিয়া লইয়া তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল—বাহ্যত এইরূপই দেখা যাইত। কিন্তু তাঁহার অন্তরে কি অভিসন্ধি ছিল সে তিনিই জানিতেন। তিনি যে বাসায় ছিলেন, তাহারই এক কামরায় পান সুপারীর থালা, পানের খিলী, চুরোট, দশ পঁচিশ, "গঞ্জিফা"-তাস, দারা, বেঞ্জিক্, ও সেতার এই সমস্ত সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিত। আমাদের পুণার মণ্ডলী এই বিষয়ে একটু বেশী আসক্ত সত্য। ইহার দরুণ তাঁহার বেশ সুযোগ হইল। তাহাদের মধ্যে একজন মধুমক্ষিকার ন্যায় সেখানে একেবারে লাগিয়াই থাকিত। ইহাকে অনুসরণ করিয়া কতকগুলি লোক সকাল সন্ধ্যায় ঐ গৃহস্থের ঘরে আড্ডা করিল। এই সব লোক কোন-না-কোন খেলায় একেবারে নিমগ্ন থাকিত। এই মণ্ডলীর মধ্যে সীতারাম-হরি চিপড়ুনকরের বিশেষ ঝোঁক পড়িয়াছিল। তিনি এই সময় সার্ব্বজনিক সভার সেক্রেটারী ছিলেন, এবং সভার ত্রৈমাসিকের প্রবন্ধ লিখিয়া লইবার জন্য প্রতিদিন আমাদের বাড়ী আসিতেন। কিন্তু আজ কাল ঠিক সময়ে আসিতেন না, দেরীতে আসিতেন। কাজ কর্ম্মে

তাঁহার খুব দৃঢ়তা ছিল, কখন ক্লান্ত হইতেন না। কিন্তু আজকাল একটু আলস্য করিতে দেখিয়া, ও রাগাইয়া দিবার জন্য, আমার স্বামী সীতারামপন্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজকাল তোমার কি-রকম ভাবগতিক?" তখন, তিনি এই ভদ্রলোকের বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বলিলেন। কিন্তু আমার স্বামী তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না। আমার স্বামী নিজেই তাহার খোঁজ খবর লইবার জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এবং "আমাকে না জানাইয়া সেই ব্যক্তির সহিত সার্ব্বজনিক সভা সম্বন্ধে কিংবা অন্য কোন বিষয় সম্বন্ধে কোন কথা বলিবে না, নিরর্থক কেন ফ্যাসাদে পড়িবে। ঐ ব্যক্তি একজন গোয়েন্দা এইরূপ আমার অনুমান হয় ও তাই ঠিক"—এইরূপ আমার স্বামী বলিলেন। একদিন, কতকগুলি লোক আমাদের বাড়ী আসিলে, তাঁহারা এই নবাগত ভদ্রলোকটির সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন—"এই আগন্তুক ভদ্রলোকটি ভারী সৌখীন, সদানন্দ, মিশুক ও বিদ্বান।" তখন আমার স্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইঁহার নাম ধাম কি? কোথায় থাকেন? এখন কি কাজ করেন? লেখাপড়া কতটা জানেন? এ সমস্ত বৃত্তান্ত তোমাদের জানা আছে কি?" এই কথা শুনিয়া তাহারা বলিল—"লোকটি ভারী লাজুক ও মুখচোরা। নাম, ধাম, ব্যবসায়, ও কতদূর পর্য্যন্ত শিক্ষা হয়েছে, এ সমস্ত তিনি কিছুই বলেন না, কেউ জিজ্ঞাসা করলে তিনি কেবল হাসেন, আর বলেন—আমি একজন সামান্য মানুষ। আমার নাম ধাম জেনে তোমাদের কি হবে? এইরূপ বলে' তিনি হেসেই উড়িয়ে দেন; কিন্তু কিছুই বলেন না। তিনি অত্যন্ত বিনয়ী বলিয়া আমাদের এই প্রশ্নগুলি তাঁর ভাল লাগে না। কিন্তু তিনি যে ভাল বংশের লোক ও বিদ্বান তা বেশ মনে হয়।" এই সমস্ত কথা শুনিয়া আমার স্বামী বলিলেন—"তোমাদের অনুমান অনুসারে ঐ ভদ্রলোকটি সজ্জন ও বিদ্বান; কিন্তু আমি বলি, তোমরা যা বলচ তা ঠিক কি না, আগে অনুসন্ধান করে আমাকে বল, তারপর অন্য কাজ কর; কিন্তু ইনি কে, তোমরা খোঁজ করে জানবে। কাল সকালে উঠেই ইঁহার ডাকের পত্রাদির খোঁজ নিও। পত্রের উপর কোন্ গ্রামের ছাপ থাকে, এবং ইনি যে পত্র পাঠান, তাহা কোন্ গ্রামে যায় এই সমস্ত ভাল করে দেখে, দুই একদিনের মধ্যে এখানে এসে আমাকে জানাবে।" তাঁহারা "আচ্ছা" বলিয়া উঠিয়া গেলেন। তৃতীয় দিনে সকাল বেলায় সীতারামপন্ত চিপলুনকর আসিয়া বলিলেন—"পরশু ও কাল আমি ডাক-পত্রের সমস্ত খোঁজ নিয়েছি। সেই ভদ্রলোকের ডাকের চিঠি ডাকহরকরার হাত দিয়ে আসে না। তিনি প্রভাতে উঠে বেড়াতে যাচ্ছি বলে বাহিরে যান। তিনি প্রথমে এক রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে, তারপর আর একটা বাঁকা রাস্তা ধরে শেষে জেনেরাল পোষ্ট আফিসে যান—সেখানে গিয়ে ডাকের চিঠি নিজের হাতে ডাকবাক্সে ফেলে দেন। কাল আমি অনেকটা অন্তর থেকে, তাঁর পিছনে পিছনে চলেছিলুম। তাই, যেতে যেতে পথের মধ্যে তাঁর এক ছেঁড়া পত্রের মোড়ক কুড়িয়ে পেলুম। মোড়কের উপর সিমলার ছাপ আছে। সমস্ত বিষয়টা সম্বন্ধে আপনার যে সংশয় হয়েছে, তার যথেষ্ট কারণ আছে—আমাদেরও এখন মনে হচ্ছে। তাছাড়া, আমার এক পোষ্ট আফিসের বন্ধু আমাকে এখনই বল্লেন, "এই ভদ্রলোকটির পত্রব্যবহার, কলিকাতা ও সিমলার গভর্ণমেণ্ট সেক্রেটারীর সঙ্গে চলছে এইরূপ মনে হয়। কারণ, তাঁর নামে এঁর অনেক চিঠিই যায়।" এতটা হইবার পর, এই সব কথা আমাদের সমস্ত লোকের কানে আসায়, সকাল বেলায় ও সকাল হইতে পর দিনের সন্ধ্যাকালে এই ভদ্রলোকটির ঘরে পুণার যে সব লোক আসিয়া জমিত, তাহাদের সংখ্যা খুব কমিয়া যাইতে লাগিল। তাঁরা হইতে লোকেরা সরিয়া পড়ায়, তিনি অনুমান করিলেন, তাঁহার আসল স্বরূপটা বুঝি প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। এই মনে করিয়া, পাছে তাঁর অভিসন্ধি প্রকাশ হইয়া পড়ে, "বিদেশী মুসাফেরের" ছদ্মবেশী এই ভদ্রলোকটি কাহাকেও না জানাইয়া তৃতীয় দিনের রাত্রে বোচকা বুচ্‌কি লইয়া পিট্টান দিলেন।

ইতি তৃতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

৪র্থ পরিচ্ছেদ।

দয়ানন্দ সরস্বতীর পুণায় আগমন।

(১৮৭৫ খৃঃ)

লাহোর হইতে স্বামীজীর পুণায় আসা অবধি, "বুধবার" অঞ্চলে বেল্‌বাগের সম্মুখস্থ "ভিড়ে" মহাশয়ের বাড়ীতে প্রতিদিন বক্তৃতা হইত। আমার স্বামীর, সাড়ে ছয়ের আড়াই ঘণ্টা কাল এই বক্তৃতা শ্রবণ করিতে ও বক্তৃতার বন্দোবস্ত করিতেই অতিবাহিত হইত। বক্তৃতা শেষ হইলে, দয়ানন্দজী স্বস্থানে যাইবার পূর্ব্বে, তাঁহার সম্মানার্থ একটা মিছিল বাহির করা যাইবে, এইরূপ একদিন আমাদের গৃহে কতকগুলি লোক একত্র হইয়া স্থির করিলেন। এবং ইহা দুই তিন দিন পূর্ব্বে সকলকে জানাইয়া দেওয়া হইল। ইহা জানিবার পর বিরুদ্ধপক্ষের লোকেরা ইহা লইয়া খুব ঘোঁট করিতে লাগিল। এই সময়ে বিরুদ্ধপক্ষ অর্থাৎ রাঃদীক্ষিত আপ্‌টে শাস্ত্রীদিগের মধ্যে প্রধান হওয়ায় তাঁহার সহিত

গ্রামস্থ অনেক লোক ছিল। এই সুযোগ পাইয়া আজ পর্য্যন্ত ধর্ম্ম জিনিসটা কি—এসম্বন্ধে কোন চিন্তা পর্য্যন্ত যাহাদের মনে আদৌ প্রবেশ করে নাই এরূপ কতকগুলি লোক এই সময়ে বিরুদ্ধ পক্ষের সহিত মিলিয়া দয়ানন্দজীর ও তাঁহার পক্ষের মানহানি ও বিড়ম্বনা যাহাতে কোনরকমে হয় সেই বিষয়ে মন্ত্রণা করিতে লাগিল। শেষে তাহাদের বুদ্ধি অনুসারে তাহারা শকুনী মামার মত এক মৎলব আঁটিল। সেই মৎলবটা সবার খুব পছন্দ হইলে পর, তাহার পরদিন উহা আমলে আনিবে বলিয়া সকলে স্থির করিল। এইরূপ উত্তমরূপে দয়ানন্দজীকে অপমান করিবার যুক্তি স্থির হইলে, ঐ সকল লোকেরা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কাল কখন্ রাত পোহাইবে, কখন্ এই যুক্তি আমলে আনিবে সেই চিন্তাতেই তাহারা মগ্ন ছিল। এদিকে অপর পক্ষের লোকেরা আমাদের বাড়ীতে একত্র হইয়া, কালই মিছিল বাহির করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। পরদিন সকালে ৬টার পূর্ব্বে, বরাবর ব্যাণ্ড ও ২০।২৫ জন গোঁয়ার লোকের ঠাটসহ সুসজ্জিত "গর্দভানন্দাচার্য্যের সোয়ারী" কালো পাথরের জলের-হাউজ হইতে যাত্রা করিয়া সহরের ভিতর দিয়া বাহির হইল। যেখানে সেখানে ঠাট্টা তামাসা ও হাসাহাসি সুরু হইল। প্রায় সাড়ে ৬টা কিংবা সাতটার সময় এই খবর আমাদের বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিল। যাহারা চাক্ষুষ দেখিয়া আসিয়াছে এইরূপ কতকগুলি লোক এই সমারোহ ব্যাপারের উত্তমরূপে বর্ণনা করিল। তাহা শুনিয়া এই সমস্ত লোকেরও খুব হাস্যোদ্রেক হইল। অবশ্য ইহাতে বিরুদ্ধপক্ষের বিশেষ উদ্যোগ চেষ্টা আছে। তখন যাহাতে দয়ানন্দের উপর কোনরূপ আক্রমণ না হয় তার জন্য বেশী রকম বন্দোবস্ত করা আবশ্যক, এইরূপ স্থির হইল। একদল পুলিস আনাইবার জন্য গঙ্গারাম ভাউ প্রস্তাব করিলেন। এই প্রস্তাব অনুমোদিত হইবামাত্র তিনি পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টকে পত্র লিখিলেন। এদিকে গর্দভানন্দের মিছিল যাহা সকালে ৬টা হইতে বাহির হইয়াছিল, তাহা সায়াহ্নে ৬টা পর্য্যন্ত রাস্তায় রাস্তায় গলিতে গলিতে চলিতেছিল। যে সকল লোক মিছিলের সঙ্গে ছিল তাহারা "শ্রীরামানন্দ স্বামী কি জয়" এইরূপ জোর গলায় প্রত্যেক ৩।৪ পদ অন্তর জয়ধ্বনি করিতেছিল। শোভাযাত্রার অনুগামী লোকেরা ইহা গর্দভানন্দের মিছিল বলিয়া কতদূর জানিত কে জানে। পরদিন দয়ানন্দ স্বামীজী আসন পাতিলেন, কি সমাধিতে বসিয়া নিজস্থানে চলিয়া গেলেন, জানা গেল না। এই রকমে চারিটা বাজিল, ৪৷৷০টা হইল, সবাই "ভিড়" মহাশয়ের বাড়ীতে নিত্য রীতি-অনুসারে বক্তৃতা শুনিতে সমবেত হইল। স্বামী দয়ানন্দজী একজন উত্তম সরস বক্তা ছিলেন। তাঁহার বাণী গম্ভীর ছিল, তাঁহার ভাষণপদ্ধতি খুব মর্ম্মস্পর্শী ও কখন কখন অলঙ্কারিক হইত। তাহার দরুণ, তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে যাহারা আসিত তাহারা একেবারে তল্লীন হইয়া যাইত। স্বামী দয়ানন্দজী স্বীয় অঙ্গীকৃত বক্তৃতা শেষ করিয়া কিছু বলিবার জন্য দাঁড়াইয়া রহিলেন, এবং এতদিন তাঁহার বক্তৃতা সকলে মন দিয়া যে শুনিয়াছে ও তাঁহার প্রতি সস্নেহ ব্যবহার করিয়াছে তজ্জন্য তিনি অল্প কথায়, আলঙ্কারিক ও বিনোদী ভাষায়, উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইলেন ও বিদায় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু পান সুপারী মাল্য প্রভৃতি স্বামীজীকে অর্পণ করিবার পর, স্বামীসহ সমবেত মণ্ডলী নীচে নামিয়া আসিলেন। রাস্তার উপর হাতী, পাল্কী প্রভৃতির ব্যবস্থা পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত ছিল। সেই পাল্কীর মধ্যে গ্রন্থ রাখিয়া ইঁহারা দয়ানন্দজীকে হাতীর উপর বসাইলেন এবং মিছিল আরম্ভ হইবামাত্র উপরি উক্ত বিরুদ্ধপক্ষের লোকেরা এই সমারোহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ও ভীড় করিয়া আবল-তাবল যা তা বলিতে লাগিল ও চেঁচামেচি আরম্ভ করিল। এই পক্ষের উৎসাহদাতা জঘন্য ও কুটীল লোকেরা সভ্যতার খোলস পরিয়া কিছু দূরে, স্থানে স্থানে দাঁড়াইয়া ছিল; এবং আত্মপক্ষকে দাঙ্গা করিবার জন্য উৎসাহ দিতেছিল। সেই দিন খুব বৃষ্টি পড়ায়, রাস্তার কিছু কাদা হইয়াছিল। এই দাঙ্গার প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, কিংবা কোন প্রকার প্রতিকার না করিয়া, এই মিছিল ঢিমা চালে চলিতেছে দেখিয়া ঐ সব গ্রাম্য গুণ্ডারা নিরাশ হইয়া চটিয়া উঠিল। স্থানে স্থানে দণ্ডায়মান প্রতিনিধিগণ উত্তেজিত হইয়া উঠায়, যার হাতে যা' ছিল তাহাই শোভাযাত্রার লোকের দিকে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। যাহাদের হাতে কিছু ছিল না, রাস্তার উপর, নীচে নুইয়া, কাদার গোলা তৈরী করিয়া, তাহাও ঐ সকল লোকের পিঠের উপর দমাদম মারিতে সুরু করিল। মিছিলে আমাদের পক্ষের লোক এত ঢিমা চালে চলিতেছিল যে, কাদার গোলা পিঠের উপর ও পায়ের উপর ধপাধপ পড়িতেছে তবু কেহ পশ্চাৎ দিকে ফিরিয়াও দেখিল না। কিছুমাত্র ভীত না হইয়া মিছিলের লোকেরা শান্তভাবে চলিতে লাগিল। পুলিসের লোক যাহারা ছিল তাহাদিগকে এরূপ বলিয়া রাখা হইয়াছিল যে তাহাদিগকে না বলিলে যেন তাহারা ইহার ভিতরে না আসে, মিছিলের সহিত শুধু মিছিলের দলই থাকিবে। দশ পনেরো মিনিট ধরিয়া কাদামাটি ফেলিবার পর, "আদিত বারের" চৌকা হইতে "দারুওয়ালা"র পুল পর্য্যন্ত মিছিলের ঠাট পৌঁছন পর্য্যন্ত এই কর্দ্দম নিক্ষেপকারী লোকদিগের মধ্যে কেহ

কেহ কেহ কাঠি ও পাথর ফেলিতে সুরু করিল। তাহার দরুণ যদিও কোন প্রধান লোকের অনিষ্ট হয় নাই তথাপি শুধু পাঁচ ছয় জন গরিব লোকের গায়ে আঘাত লাগিয়াছিল ও তাহারা জখমও হইয়াছিল। তাহা দেখিয়া পুলিস আসিয়া পড়ায় এই গুণ্ডালোকেরা পলাতক হইল এবং তাহার পর এই শোভাযাত্রা শান্তভাবে অগ্রসর হইতে লাগিল। ঔষধোপচার করিবার জন্য জখমী লোকদিগকে হাসপাতালে পাঠান হইল। তাহার পর, আমার স্বামী বাড়ী আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার কাপড় চোপড় কাদার গোলায় স্থানে স্থানে ভরিয়া গিয়াছে; তখন সমস্ত কাপড় ফেলিয়া দিয়া অন্য কাপড় পরিলেন। কাপড় ছাড়িবার পর নিকটস্থ ঘরের লোকেরা যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, পুলিস বরাবর সঙ্গে ছিল তবু তাঁর কাপড়ে কাদা লাগিল কি করিয়া? তখন তিনি হাসিয়া বলিলেন,—"কেন লাগিল? সকলের মধ্যে আমি যখন ছিলুম, তখন আমার গায়ে লাগবে না কেন? দলাদলির কাজে এইরূপই হয়ে থাকে। অপর পক্ষের লোকেরা ছোটই হোক্ কি বড়ই হোক্, তারা কি কারও পরোয়া রাখে? এই সময়ে মান-অপমানের বিচার আমাদের মনেই বা আস্‌বে কেন? এই সব বিষয় এই রকম করেই চালাতে হয়।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

সাগরের প্রতি।

(শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ, বার-অ্যাট-ল)

হে জলধি! কার তরে, কর হা হুতাশ?
কার তরে নিরন্তর ফেল দীর্ঘশ্বাস?
হে নীলাম্বু! কারে তুমি ডাক সকাতরে?
কারে তুমি খোঁজ যুগ-যুগান্তর ধরে?
কি রত্ন খুঁজিছ বল ওহে রত্নাকর!
প্রসারি সহস্র বাহু সৈকত উপর?
হারায়েছ কি কমলা কমল-নয়না?
বুঝিছি হে সিন্ধু তব মরম বেদনা॥

আয় ব্যয়।

১৮৩৯ শকের বৈশাখ অবধি আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত আয় ও ব্যয় আদিব্রাহ্মসমাজ।

আয়	... ...	২০৪১৷৷৶৬
পূর্ব্বকার স্থিত	...	৩৸৶১১
সমষ্টি	... ...	২০৪৫৷৷৶৫
ব্যয়	... ...	২০৪৫৷৷৩
স্থিত	... ...	৶২

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	১৭০২৷৷৶০
বণ্ডেড্ ওয়ার হাউস	৫০৲
কাগজের সুদ	৫০৸৬
মাসিক দান	৬০০৲
দানাধারে প্রাপ্ত	৫৷৷৬
হাওলাত আদায়	২০৷৷৶৬
গচ্ছিত আদায়	৮০০৸৩
হাওলাত জমা	১২৮৷৶৩

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৲
,, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৲
,, সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৲
,, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৲
,, পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়	১৲
,, ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৲
শ্রীমতী সরোজিনী দেবী	১৲
শ্রীযুক্ত শৈলেন চন্দ্র সেন	১৲
,, চন্দ্রকুমার দাসগুপ্ত	১৷৷০
শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী	২৲
,, তনুজা দেবী	২৲
শ্রীযুক্ত সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়	২৲
	১৫৷৷০

বাৎসরিক দান।

শ্রীনরেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ	১০৲

মাঘোৎসবের দান।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০৲
,, সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়	২৲

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪৲
শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দেবী	৫৲
	১৭০২৷৷৶০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	১২৬৷৷৶০

পত্রিকার মূল্য।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৩৮ শক	৩৲
,, প্রিন্সিপাল সংস্কৃত কলেজ ,,	৩৲
,, নরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ,,	৩৲
,, যোগেশচন্দ্র গুহ ঠাকুরতা ,,	৩৲
,, নৃত্যগোপাল গোস্বামী ১৮৩৭ ও ১৮৩৮শক	৪৸০
ডি, আর, ঘোষ স্কোয়ার ১৮৩৮	৩৲
সম্পাদক কণ্টাই ব্রাহ্মসমাজ ,,	২৲
শ্রীযুক্ত সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ,,	৩৲

শ্রীযুক্ত রাজকুমার সেন	১৮৩৭ ও ১৮৩৮ শক	৬
,, জয়কালী দত্ত	১৮৩৭	৩
,, নলিনী নাথ দাস গুপ্ত	১৮৩৮	৩
রায় বাহাদুর বসন্তকৃষ্ণ বসু	১৮৩৮	৩
শ্রীযুক্ত তুলসী দাস দত্ত	,,	৩
,, শ্রীদয়াল রায়	১৮৩৮ ও ১৮৩৯	৬
,, সুকুমার হালদার	১৮৩৯	৩
,, প্রকাশচন্দ্র দেব	১৮৩৮ ও ১৮৩৯	৬
মহাশয় রামচন্দ্র রায়	১৮৩৬ হইতে ১৮৩৯	১২
শ্রীযুক্ত হিরণ্যনাথ মুখোপাধ্যায়	১৮৩৯	১৷৷০
,, শিশিরকুমার দত্ত	,,	১৷৷০
রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁ বাহাদুর	১৮৩৬ হইতে ১৮৩৯	১১৷৷/০
রায় বাহাদুর নৃত্যগোপাল বসু	১৮৩৯	৩
শ্রীযুক্ত হরিপদ ত্রিবেদী	,,	১৷৷০
,, বেহারীলাল মল্লিক	,,	৩
,, কিশোরীলাল দত্ত	,,	৩
,, সন্তোষকুমার লাহিড়ী	,,	৩
,, খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	১৮৩৮ ও ১৮৩৯	৬
,, কাশীনাথ রুদ্র সরকার	১৮৩৯	২
,, কনকচন্দ্র বড়াল	,,	২
মাননীয় মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর	,,	৩
শ্রীযুক্ত সুকুমার রায়	,,	৩
,, ক্ষেত্রমোহন চক্রবর্ত্তী	,,	২
ডাক্তার চুণীলাল বসু রায় বাহাদুর	,,	৩
		১১৮৸/০
ডাকমাশুল		৬৷০
নগদ বিক্রয়		১৷০
		১২৬৸/০

পুস্তকালয়।

সমাজের পুস্তক	...	৪৷৶/০
গচ্ছিত পুস্তক	...	৪১৷০
কমিশন	...	৵৬
মাশুল	...	৩৷৵০
সমষ্টি		৪৯৶৬

যন্ত্রালয়।

অপরের পুস্তক মুদ্রণ	৭৩
কাগজের মূল্য	৮৫৷৷০
দপ্তরী	৫
সমষ্টি	১৬৩৷৷০
মোট	২০৪১৷৷৶৬

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ।

কর্ম্মচারীর বেতন	২১৩
ইলেক্‌ট্রিক্ লাইট্	১৬৷৷০
সরঞ্জামী	২৷৷/০
ট্যাক্স	৫১৸৶৬
লাইসেন্স	১২৲
পায়খানা তৈয়ারী	৯০
পূর্ত্তকার্য্য	১৫৸৶৬
সসপেন্স	৯৫
কোম্পানির কাগজ	১৩৮৸/০
অন্যান্য	৫৩৶৩
গচ্ছিত	৭০৭৷৷০
সমষ্টি	১৩৯৬৷৷/৩

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

কাগজ	৭৩৸/৩
প্রবন্ধ	৪৭/০
মাশুল	১৭৬
কর্ম্মচারীর বেতন	২৫
সমষ্টি	১৬২৸৯

পুস্তকালয়।

পুস্তকক্রয়	৸০
গচ্ছিত পুস্তকের মূল্য	২৫৷৷০
ডাকমাশুল	৩৲৩
কমিশন	৶০
বিবিধ	৷৷৬
সমষ্টি	২৯৸৶৯

যন্ত্রালয়।

কর্ম্মচারীর বেতন	২৬২/০
ছাপার কাগজ	১২১৸৶৩
কালী	৪৷৵০
অতিরিক্ত পারিশ্রমিক	৩২৸৬
অন্যান্য	৩৷৸৶৯
সমষ্টি	৪৫৬৲৬
মোট	২০৪৫৷৷০
সেভিংস ব্যাঙ্ক	১৷৷৶২
১ কেতা ১৭৬৩৬৬ নং	২০০
১ কেতা ১৬১৮০৯ নং	২০০
১ কেতা ২২৩১৭৯ নং	১০০
১ কেতা ২৮১৭৮০ নং	১০০
১ কেতা ২২৮৮৪৩ নং	১০০
১ কেতা ২২৯৩৩৬ নং	১০০
কোম্পানীর কাগজ ১ কেতা ২৩১১৫২ নং	১০০৲
১ কেতা ২৩২১৪১ নং	১০০
	১০০০
ওয়ার লোন	১০০

সম্পাদক
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

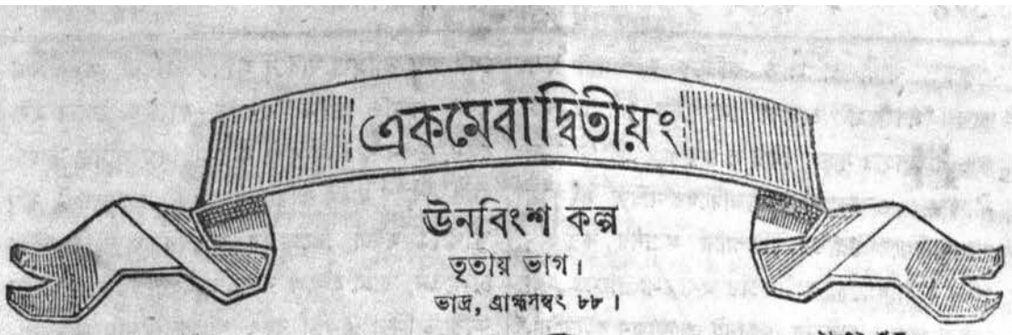

ঊনবিংশ কল্প
তৃতীয় ভাগ।
ভাদ্র, ব্রাহ্মসম্বৎ ৮৮।

৮৮৯ সংখ্যা ১৮৩৯ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং প্রতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"

কেন বসে ?

কেন তুমি বসে আছ মলিন হৃদয়ে
অন্ধকার গৃহকোণে যেন কত ভয়ে ?
চারিদিকে দেখ চেয়ে ফুটে ফুলরাশ
হাসি হাসি বিথারিছে মোহন সুবাস ;
তুমি কেন নিরানন্দ কাঁদিছ ফুকারি—
হানিছে কিসের দুঃখ বুকেতে তোমারি ?
ঘাসের পাতায় প্রতি প্রভাত-শিশির
বিশুভ্র হাসির মত দোলে ঝির ঝির ;
ঘাসের সুগন্ধ কিবা মোহিছে পরাণ—
তোমারি পরাণে কেন নাহি জাগে গান ?
গোলাপ কুসুম যত নিজ রক্ত দিয়া
রঞ্জিছে সুরাগে কত জগতের হিয়া ;
আনন্দের মহাগান সাগর ভেদিয়া
উঠিতেছে অবিরাম শোন কান দিয়া ;
তুমি কেন ফেল একা প্রতপ্ত নিশ্বাস—
কল্পনায় পুষ্ট শুধু প্রাণের হুতাশ ?
তোমারি হৃদয়বীণা উঠেনাকো কেন
ঝঙ্কারি বিশ্বের গানে—সাড়াহীন যেন ?
ছেড়ে দাও মলিনতা, ফেলিওনা শ্বাস—
আনন্দ ছেয়েছে বিশ্ব—হয়ো না হতাশ।
রবির কিরণ শত আনন্দ পুলকে
নাচে খেলে পাতে ফুলে পলকে পলকে ;
বনের ভিতর দিয়ে উঁকি ঝুঁকি মেরে
লুকোচুরি খেলা করে—কবি মুগ্ধ হেরে।
তুমি কেন বসে যেন শ্রান্ত প্রাণ লয়ে—
চিন্তার পাষাণ ভারে অবনত হয়ে ?
সাগরের উপকূলে কত মেয়ে ছেলে
আনন্দে তরঙ্গ সাথে ছুটে ছুটে খেলে ;
সিন্ধুপৃষ্ঠ হতে আসে হুহু করে বায়—
আনন্দে ফেনিল ঢেয়ে লুটোপুটি খায়।
তুমি কেন নাহি শুধু ভুলিয়া আপন
বিশ্বের আনন্দ মাঝে হও নিগমন ?
এত প্রেম আনন্দের তুফানের মাঝে
কেন না হৃদয় তব দিবানিশি বাজে ?
আনন্দের মূল যিনি তাঁরে হৃদে ধর—
পরাণে জ্বলিছে যাহা আগুন প্রখর,
পরশমণির স্পর্শে করগো নির্ব্বাণ ;—
লভিয়া জীবনী সুধা, কর বিশ্বে দান।

ভারতের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কাউণ্ট ওকুমার উক্তি।

ভারত-জাপানী সভার প্রথম বার্ষিক অধিবেশনে সুপ্রসিদ্ধ জাপানী মন্ত্রীবর কাউণ্ট ওকুমা ভারতের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কতকগুলি অত্যন্ত সারগর্ভ কথা বলিয়াছিলেন। তন্মধ্যে দু একটি কথা আমরা বিশেষভাবে আলোচনা করিব। তিনি বলেন যে 'ভারতবাসীগণ কেবল স্বাধীনতা স্বাধীনতা করিয়া চীৎকার করিলে চলিবে না। ভারতবাসীরা যদি

প্রকৃতই স্বাধীনতা লাভ করিতে অভিলাষী হয়, তবে "সর্ব্বাগ্রে তাহারা নিজেদের অমঙ্গলজনক আচার ব্যবহার সকল নির্ম্মূল করুক, এবং চরিত্রে, নীতিবলে ও জ্ঞানে ইংরাজদিগের সহিত সমসূত্রে আপনাদিগকে উন্নতির সোপানে অগ্রসর করুক; তখন তাহাদিগকে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের কথা বলিয়া মাথা ঘামাইবার কোনই প্রয়োজন হইবে না, কারণ তখন স্বাধীনতা আপনিই তাহাদিগের হস্তগত হইবে। কিন্তু যদি তাহারা সকল বিষয়ে কেবল পরের ঘাড়েই দোষ চাপাইতে ব্যস্ত থাকিয়া নিজেদের বিষয় চিন্তা করিবার অবসর হারাইয়া ফেলে, তাহা হইলে ভারতের সৌভাগ্য চিরকালের জন্য অস্তমিত হইবে—পুনরভ্যুদয়ের সম্ভাবনাও থাকিবে না।"'

কথাটা কেবল ঠিক নহে—অতি ঠিক। তুমি নিজে স্বরচিত অন্ধকার গৃহে আপনাকে কঠোর লৌহনিগড়ে আবদ্ধ করিয়া যদি চীৎকার কর যে প্রতিবেশী কেহ তোমাকে নিগড়মুক্ত করিতেছে না, তাহা কি বাতুলের চীৎকার হইবে না? আবার যদি তুমি এমন বন্দোবস্ত করিয়া রাখ যে তোমার সেই গৃহের নিকটে কোন প্রতিবেশী পৌঁছিতেও পারিবে না, তবে তুমি সেই অন্ধকার গৃহে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিলে প্রতিবেশীকে নিশ্চয়ই তাহার জন্য দোষী করিতে পার না। আমরা চক্ষের সম্মুখে দেখিতেছি যে কত কুপ্রথা আমাদের সমাজে ঘুণের মত অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া সমাজকে সম্পূর্ণ অন্তঃসারহীন করিয়া দিতেছে, তবুতো সেই সকল কুপ্রথা আমরা পরিত্যাগ করিতে সাহস করি না। কেবল তাহাই নহে, সেই সকল কুপ্রথা রহিত করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট অগ্রসর হইলেও আমরা তাহাতে বাধা দিই এবং কুপ্রথা সকল স্থায়ী রাখিতে পারিলে আমরা নিজেদের জয়জয়কার করিয়া কত না উৎফুল্ল হই।

বাল্যবিবাহের বিষয় দেখ না কেন। আমরা দেখিতেছি, বুঝিতেছি যে বাল্যবিবাহে আমাদের কিরূপ সর্ব্বনাশ হইতেছে, তবু তো আমরা তাহা পরিত্যাগ করিতে চাহি না। এই বিষয়ক শাস্ত্রোক্তির ভ্রান্ত ব্যাখ্যার দোহাই দিয়া তাহারই আশ্রয়ে শান্তিময় সুখস্বপ্নের মোহে নিমগ্ন থাকিতে চাহি। সেই স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইবে আশঙ্কা করিয়া, গভর্ণমেণ্ট যখন সম্মতি-আইন বিধিবদ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন, তখন কত না বাধা কত-না বিঘ্ন আমরা তাঁহাদের সম্মুখে ধারণ করিয়াছিলাম। গভর্ণমেণ্ট যদি স্বার্থপর হইয়া নিজেদের স্বার্থের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতেন, তাহা হইলে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে আইন করিতে গিয়া একটা বৃহৎ আন্দোলনের ঝড় উপস্থিত করিতেন না, বরঞ্চ বাল্যবিবাহ রক্ষা করিবার পক্ষপাতী হইতেন, কারণ বাল্যবিবাহের ফলে নিস্তেজ ও হীনবীর্য্য জাতিকে শাসন করিতে তাঁহাদের বিশেষ বেগ পাইতে হইত না। এমন অনেকে আছেন যাঁহারা সত্যসত্যই বাল্যবিবাহকে মঙ্গলজনক বলিয়া বিবেচনা করেন। তাঁহারা উহার বিরুদ্ধে না দাঁড়াইলে আমরা তত দোষাবহ মনে করি না। কিন্তু যাঁহারা বাল্যবিবাহের অপকারিতা বুঝিয়াছেন, তাঁহারা যে সমাজে একটা নাড়াচাড়া আসিবার ভয়ে অথবা শাস্ত্রের ভ্রান্ত ব্যাখ্যার সাহায্যে, শাস্ত্রবিপরীত কার্য্য হইবে এই আশঙ্কামাত্র করিয়া বাল্যবিবাহের রক্ষাকল্পে বদ্ধপরিকর হয়েন, সেইটুকুই দুঃখের বিষয়। সম্মতি আইনের আন্দোলনফলে বুঝিয়াছি যে দেশে এইপ্রকার লোকের সংখ্যাই বেশী।

শাস্ত্রের ভ্রান্ত ব্যাখ্যার দোহাই দিবার কথা আমরা উপরে বলিয়া আসিলাম। আমরা শাস্ত্রের কিরূপ ভ্রান্ত ব্যাখ্যা স্বীকার করিতে প্রস্তুত, তাহার একটি হাস্যকর দৃষ্টান্ত দিতেছি। কোন সুপ্রসিদ্ধ বিলাতফেরত স্থির করিলেন যে সমাজের মঙ্গলের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়া তাঁহার নিজের "জাতে" উঠা কর্ত্তব্য। পল্লীগ্রামের একস্থানে তাঁহার স্ব শ্রেণীর অনেক "ঘর" বাস করিতেন। তাঁহার কোন বন্ধু সেই মণ্ডলীর সকলকেই এ বিষয়ে সম্মত করাইতে পারিলেন, কিন্তু একটী মোড়ল-গোছের বৃদ্ধের সম্মতি কিছুতেই পাইলেন না। বৃদ্ধ সম্মতি না দিলে অন্যান্য লোকেরা প্রকাশ্যে সম্মতি দিতে পারিতেছেন না। কাজেই এই অবস্থায় বন্ধুটী সেই বৃদ্ধকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না—তিনি প্রতিদিনই সেই বৃদ্ধের সঙ্গে এই বিষয়ের আলোচনা করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধের প্রধান আপত্তি ছিল এই যে, একবার বিলাতফেরতকে জাতে উঠাইলে সমস্ত একাকার হইয়া যাইবে। একদিন কথায় কথায়

বন্ধুটী তাঁহাকে বলিলেন যে যখন শাস্ত্রেই আছে যে কলিতে সমস্ত একাকার হইবে, তখন সেই একাকার হইবার বিরুদ্ধে দাঁড়াইলে তাঁহার ন্যায় শাস্ত্রজ্ঞ ও ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তির পক্ষে নিতান্ত অশাস্ত্রীয় ও অধর্ম্মোচিত কার্য্য হইবে। এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধটীরও চমক ভাঙ্গিল। তখন তিনি মহাবিজ্ঞের ন্যায় বলিলেন যে "তাও তো বটে—যখন শাস্ত্রেই আছে যে কলিতে সকলই একাকার হইবে, তখন তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার পরিবর্ত্তে তাহার সমর্থন করা উচিত।" এইরূপ বলিয়া তিনি জাতে উঠিবার পক্ষে সম্মতি দিলেন, বিলাতফেরত ব্যক্তিও জাতে উঠিলেন।

বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক যুক্তির অবতারণা করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধকে কোলাহল কলরবের উৎস করিতে চাহি না। তবে, সোজাসুজি হিসাবে দেখিলে দেখিতে পাই যে তাহার ফলে গৃহে দুর্ভিক্ষ ও অনাশনের করাল ছায়া আসিয়া দেখা দেয়। বালকবালিকার বাল্যবিবাহ হইয়া গেল। বালিকা যৌবনে পদক্ষেপ করা অবধি বন্যার মত "বর্ষে বর্ষে পুত্রকন্যা" প্রসূত হইতে লাগিল। তাহার ফলে নবদম্পতী নিজেদের প্রকৃত অবস্থা বুঝিবার এবং সন্তান লালনপালনের ক্ষমতা অর্জ্জন করিবার অনেক পূর্ব্বেই নিজেদের অজ্ঞাতসারে ও অসম্মতিতেই সন্তান পালনের গুরুতর পাষাণভার মস্তকে লইয়া বসিয়া রহিল। কাজেই তখন বাল-পিতা হা চাকরী যো চাকরী করিয়া জ্ঞানশূন্য হইয়া ঘুরিতে লাগিল। যাঁহারাই চাকরী করিয়াছেন—সে চাকরী যতই ছোট হউক, আর যতই বড় হউক,—তাঁহারাই মুখে স্বীকার না করিলেও মনে স্বীকার করিবেন যে চাকরীর মত হৃদয়ের বলবীর্য্য, আত্মার স্বাধীনতা নষ্ট করিবার দ্বিতীয় উপায় দেখা যায় না। যদি বা সামান্য বেতনের একটা চাকরী জুটিল, তাহাতে বালদম্পতী ছেলেপিলেদের মানুষ করিয়া উঠিতে পারিল না। তখন সেই চাকরে স্বামী নানাবিধ অন্যায় উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিতে গিয়া দুর্ভিক্ষ হইতে দুর্ভিক্ষে নিপতিত হইল, অথবা অনশন প্রভৃতি নানা উপায়ে স্বীয় জীবনধ্বংসে অগ্রসর হইল। একবার আমাদের খ্যাতনামা কোন বন্ধু তাঁহার একটী আত্মীয়কে আমাদের নিকট চাকরীর জন্য পাঠাইয়াছিলেন। তখন আমাদের অধীনে কোন পদ খালি না থাকাতে একটী পত্রসহ আমরা সেই লোকটীকে ফেরত পাঠাইলাম। তদুত্তরে আমাদের বন্ধুটী তাঁহার আত্মীয়কে অন্তত একটী চাপরাশীর পদে নিযুক্ত করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন, এবং তাহার কারণ লিখিলেন এই যে, আত্মীয়টী বাল্যবিবাহের ফলে অনেকগুলি পুত্রকন্যার পিতা হইয়া পড়িয়াছে, এবং এক্ষণে চাকরী না পাইলে আত্মহত্যা করিতে উদ্যত। এরূপ একটী নহে, অনেকগুলি দৃষ্টান্ত আমাদের প্রত্যক্ষ হইয়াছে।

সম্প্রতি আইন বিধিবদ্ধ হইবার কালে বাল্যবিবাহ লইয়া অনেক আন্দোলন আলোচনা হইয়া গিয়াছে বলিয়াই এদেশপ্রচলিত কুপ্রথাসমূহের মধ্যে বাল্যবিবাহের বিষয়ই সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ করিলাম।

যে সকল কুপ্রথা আমাদের সমাজে ক্ষয়রোগের ন্যায় ধ্বংস সাধন করিতেছে, সেই সকল কুপ্রথার ফল প্রত্যক্ষ করিয়াও যে আমরা কিপ্রকার অম্লানবদনে সেগুলি সহ্য করিতে পারি তাহারই আরো দু একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে বাল্যবিবাহের উপকারিতা অপকারিতা লইয়া মতভেদ আছে। ভাল, বাল্যবিবাহের কথা ছাড়িয়া দাও। যে বিষয়ে মতভেদ নাই এমন একটী বিষয় ধরা যাক। বিবাহে পণ লইবার প্রথা যে আমাদের সমাজের কিরূপ সর্ব্বনাশ করিতেছে তাহা কাহারও অবিদিত নাই। এই পণপ্রথার যজ্ঞে স্নেহলতাপ্রমুখ কতগুলি বালিকা যে আহুতি প্রদত্ত হইয়াছে, কয়জন তাহা গণনা করিয়াছে? কলিকাতা ও কলিকাতার ন্যায় বড় বড় সহরে যে সকল বালিকা বিশেষভাবে পণপ্রথার কারণে আত্মহত্যা করিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে এবং সংবাদপত্র প্রভৃতির সাহায্যে সাধারণ্যে ঘোষিত হইয়াছে, সেইরূপ দুই চারিটী আত্মহত্যার কথা আমরা জানিতে পারি। তাহাও আমরা জানিতে পারি, যখন কোন বালিকা নূতন প্রথামতে কেরোসিনে আত্মহত্যা করে। পল্লীগ্রামে এবং বহুপূর্ব্বাবধি প্রচলিত প্রথামতে অহিফেন প্রভৃতি সেবনে যে সকল বালিকা পণপ্রথার যজ্ঞে স্বীয় জীবন আহুতি প্রদান করিয়াছে, তাহাদের বিষয় কয়জনই বা খোঁজ রাখিয়াছে—সংখ্যা করা তো দূরের কথা।

এই পণপ্রথা লইয়া কত বক্তৃতা, কত সভা, কত লেখালেখি, কত শপথগ্রহণ হইয়া গেল, কিন্তু সমাজকে বুকে হাত দিয়া ভগবানকে সাক্ষী রাখিয়া বলিতে বল দিকিন যে, সমাজের কয়জন সত্যসত্য স্বস্ব পরিবারের বিবাহকার্য্যে প্রত্যক্ষভাবে পণ বলিয়া না হউক, পাকেপ্রকারে নানাবিধ কৌশল অবলম্বনে পণগ্রহণে ক্ষান্ত আছেন? দেখিবে যে সুবৃহৎ হিন্দুসমাজে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যতীত কেহই বোধ হয় পণগ্রহণ অস্বীকার করিতে পারিবে না। সে দিন একটী সংবাদপত্রে দেখিয়া মর্ম্মাহত হইলাম যে, যে স্নেহলতা সর্ব্বপ্রকার স্নেহবন্ধন ছিন্ন করিয়া কেরোসিনের ভয়াবহ অগ্নিতে অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিয়া ভগবানের চরণে পণপ্রথার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবার জন্য পরলোকে প্রস্থান করিলেন, যে স্নেহলতা পিতাকে পণপ্রথার হস্ত হইতে অব্যাহতি দিবার জন্য মৃত্যুকেও আলিঙ্গন করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না, সেই স্নেহলতার কোন পরমাত্মীয় নাকি নিজের পুত্রের বিবাহে অকুণ্ঠিতচিত্তে রীতিমত পণ আদায় করিয়াছেন! "মর্ম্মাহত" অপেক্ষা যদি আর কোন কঠোরতর শব্দ বঙ্গভাষায় থাকে, তবে তাহা দ্বারাও আমাদের মনের ভাব সম্যক ব্যক্ত হয় কি না সন্দেহ। আশা করি এসংবাদ সর্ব্বৈব মিথ্যা। যে কোন বঙ্গবাসী, বিশেষত স্নেহলতার আত্মীয়, কন্যাপক্ষের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া পণগ্রহণে উদ্যত হয়েন, করুণাময়ী স্নেহলতার মূর্ত্তি কি সেই সময়ে পুত্রের পিতার সম্মুখে আবির্ভূত হয় না? যাহারা পণগ্রহণ করিয়া মাতৃস্থানীয়া বালিকাগণের বধ সাধনের উপায় হয়, তাহাদের মত স্নেহহীন লজ্জাহীন পাষাণপ্রাণ মনুষ্যও আবার সমাজে জন্মগ্রহণ করে এবং জন্মগ্রহণ করিয়া সমাজের মধ্যে গণ্যমান্য ব্যক্তি হইয়া অকুতোভয়ে বিচরণ করে! সমাজ যে এত অত্যাচার কিরূপে সহ্য করে ইহাই আশ্চর্য্য! এই সেদিন শুনিলাম যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম উপাধিধারী খ্যাতনামা কোন ব্যক্তি তাঁহার পুত্রের বিবাহে কন্যাপক্ষ হইতে অম্লানবদনে "দেড়েমুষে" পণ আদায় করিয়া লইয়াছেন। এমন সমাজের প্রতি কাহার আস্থা থাকিতে পারে? এমন সমাজ যত শীঘ্র অন্তর্হিত হইয়া নবতর সমাজের জন্মদান করে ততই মঙ্গল। পণপ্রথা উপলক্ষ্য করিয়া বলিতে গেলে আমরা নানাবিধ ভীষণ হইতে ভীষণতর সামাজিক পাপোৎপত্তির যে প্রকার সহায়তা করিতেছি, তাহাতে ইহা সাহসের সহিত বলিতে পারি যে এরূপ সমাজ চিরকাল অটুট থাকিতে পারে না, এবং অটুট থাকা বাঞ্ছনীয়ও নহে। আমাদের পুণ্যযশা পিতৃপিতামহগণ তর্পণকালে আমাদের প্রদত্ত জল নিশ্চয়ই গ্রহণ করেন না—আমরা তো প্রকৃত পক্ষে অনাচরণীয় জাতি হইয়া পড়িয়াছি। বৈদিক সম্প্রদায় প্রভৃতি যে সকল সম্প্রদায় এই পণপ্রথার আবর্ত্তের বাহিরে ছিল, সর্প কর্ত্তৃক যেমন ভেক আকৃষ্ট হয়, সেইরূপ এই ভীষণ সত্রে সেই সকল সম্প্রদায়ও অল্পে অল্পে আকৃষ্ট হইতেছে দেখিতে পাই।

সমাজের আচার ব্যবহার অনুসন্ধান করিলে পণপ্রথার অনুরূপ অমঙ্গলোৎপাদক কত যে ভীষণ প্রথা দেখা যাইবে তাহার বোধ হয় সংখ্যা হয় না। বঙ্গদেশে, প্রধানত পূর্ব্ববঙ্গ অঞ্চলে, কতকগুলি শ্রেণী আছে; সেই সকল শ্রেণীস্থ অনেকে বিধবা হইলেই পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগকে বৈষ্ণবী করিয়া দিয়া গৃহ হইতে চিরনির্ব্বাসিত করিয়া দেয়। ইহা বাড়িতে বাড়িতে প্রায় প্রথায় পরিণত হইতে চলিয়াছে। বৈষ্ণবী করিয়া দিবার অর্থ ও পরিণাম কাহাকেও স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিতে হইবে না। সেই সকল গৃহ-বিতাড়িত নরক কুণ্ডে বলপূর্ব্বক নিক্ষিপ্ত স্ত্রীলোকের চক্ষের জল, মর্ম্মোত্থিত অভিসম্পাত কি আমাদের সমাজের উপরে অগ্নি বর্ষণ করিবে না? তাহারা যে মমন্তুদ আঘাত সহ্য করিবে, সেই সকল আঘাতের প্রতিঘাত কি ততই ভীষণ হইবে না? সেই প্রতিঘাতের উত্তাল তরঙ্গরাজির সম্মুখে কি সমাজ, জীবনের পথে অগ্রসর হওয়া দূরে থাক, জীবিত থাকিবে বলিয়া আশা হয়? যে কেহ একটু বিবেচনা করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে এই প্রকার কদাচারসমূহকে প্রশ্রয় দিবার ফলে সমাজে ব্রহ্মচর্য্যের কিরূপ অভাব হইতে থাকে, এবং ব্রহ্মচর্য্যের অভাবের সঙ্গে সঙ্গে লোকেরা হীনবীর্য্য হওয়াতে স্বাধীনতার দিকে অগ্রসরই হইতে পারে না, প্রত্যুত মরণেরই পথে দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে থাকে। স্বাধীনতা লাভের

জন্য যে স্ফূর্ত্তি চাই, যে দৃঢ়তা চাই, বিলাসিতার প্রতি যে অবজ্ঞা চাই, হীনবীর্য্য চঞ্চলচিত্ত লোকদিগের নিকটে সে স্ফূর্ত্তি, সে দৃঢ়তা, বিলাসিতার প্রতি সে অবজ্ঞা দেখিবার আশা কোথায় ?

আমরা কাউণ্ট ওকুমার সহিত একহৃদয়ে বারম্বার বলিব যে আমরা দেশের অমঙ্গলপ্রসূ আচার ব্যবহার নির্ম্মূল করিলে স্বাধীনতা স্বয়ং আসিয়া আমাদের নিকটে ধরা দিবে।

আমরা স্বাধীনতা চাই—কেন ? স্বাধীনতালাভের পরিণামে সুখ পাইব এই আশায়। আমাদের শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

"সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখং"

পরবশ হওয়াই দুঃখের কারণ এবং আত্মবশ হওয়াই সুখের কারণ। ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট হইলে আমার শরীরই যখন নষ্ট হইল, শরীর বিষয়েই যখন আমি প্রত্যেক পদে আমার আত্মীয়স্বজন চিকিৎসক প্রভৃতির পরাধীন হইয়া পড়িলাম, তখন তো আমার প্রতিপদেই দুঃখ। পথে চলিবার জন্য আমার গাড়ীঘোড়া চাই, কারণ আমার আর পূর্ব্বের মত চলিবার শক্তি নাই। প্রতিপদে আমার ঔষধ সেবন করা চাই, কারণ আমার আর পূর্ব্বের মত পরিপাক করিবার শক্তি নাই। এইরূপে দেখি যে ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট হইবার কারণে প্রতি পদক্ষেপে আমি পরবশ হইয়া পড়িয়াছি। এ অবস্থায় আমার স্বাধীনতার জন্য চীৎকার করা বৃথা। স্বাধীনতার অর্থ যদি আত্মবশ হওয়া হয়, তবে তাহার মূল উৎস হইতেছে ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠা, ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠিত হইলে প্রথমেই তো বিলাসের প্রতি অনুরাগের পরিবর্ত্তে বিরাগ উপস্থিত হইবে। এইখানেই তো আমি এতটা স্বাধীনতা অর্জ্জন করিব যে, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন না করিলে সে স্বাধীনতার পরিমাণ কল্পনাও করিতে পারিব না। ব্রহ্মচর্য্যের উপর দাঁড়াইতে পারিলে তোমার বিলাতী দ্রব্যকে বয়কট করিবার জন্য বিরোধবিবাদমূলক এত চেষ্টাও করিতে হইবে না—তখন যে স্বদেশী মোটা ভাত মোটা কাপড়ে তোমার আনন্দ স্বতই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে।

ব্রহ্মচর্য্যের উপর না দাঁড়াইয়া আমরা বিলাতী দ্রব্য বয়কট করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম বলিয়া আমাদের সে উদ্যম অনেক পরিমাণে নিষ্ফল হইল—নিষ্ফল হইবারই যে কথা। আমরা জানি ও নিত্যই দেখিতেছি যে, স্বদেশী আন্দোলনের সময় যাঁহারা বিলাতী জিনিস বয়কট করিবার মন্ত্রপ্রদানে বড় অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই নানাবিধ কারণ প্রদর্শন করিয়া বিলাতী বিলাসদ্রব্য ভারে ভারে ক্রয় ও ব্যবহার করিয়া আপনাদিগকে অত্যন্ত সুখী বোধ করেন। আমরা বিলাতী দ্রব্য বয়কট করিবার সপক্ষে যে বলিতেছি, তাহা যেন কেহ না ভাবেন। বরঞ্চ আমরা বয়কট প্রণালীর সম্পূর্ণ বিরোধী। আমাদের বলিবার ইহাই উদ্দেশ্য যে ব্রহ্মচর্য্যের উপর দাঁড়াইতে না পারিলে আমরা বিলাস বর্জ্জন করিতে পারিব না, এবং কাজেই তাহার ফলে কেবল বিলাতের কাছে কেন, সমগ্র জগতের দ্বারে আমাদিগকে ভিখারীর বেশে হাত পাতিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে। ব্রহ্মচর্য্যের উপর দাঁড়াইলে যেখানে দুই পয়সায় চলিতে পারে, ব্রহ্মচর্য্যের অভাবে সেখানে কুড়ি কেন, দুই শত টাকাতেও পোষায় কি না সন্দেহ।

ভগবান এমন সোনার ভারতবর্ষে আমাদের জন্ম দিয়াছেন, যেখানে সহস্রবার জন্মগ্রহণ করিলেও বলিতে ইচ্ছা হয় যে "এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতে মরি"। ইচ্ছা করিলে এই জন্মভূমি জননীর কাছে সর্ব্বপ্রকার সুখ, সর্ব্বপ্রকার ধনরত্নের অফুরন্ত ভাণ্ডার পাইতে পারি। কিন্তু আমরা নিতান্তই হতভাগ্য যে, আমরা সে ভাণ্ডারের দিকে একবার ফিরিয়াও চাহি না—দেশের হীরক ছাড়িয়া বিদেশের কাচে বিভ্রান্ত হইয়া পড়ি। যে অন্তর্দৃষ্টির বলে মানুষ উন্নত হয়, আপনার প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়া নিজের অবনতির কারণ সকল দূর করিতে সমর্থ হয়, ব্রহ্মচর্য্যের অভাবে সেই অন্তর্দৃষ্টিরই অভাব হয়, এবং তখন আমাদের কিসে উন্নতি হয়, আর কিসে অবনতি হয়, তাহা আমাদের ধারণাতেই আসে না—স্বদেশ, স্বাধীনতা, এ সকল কথার কোনই অর্থ তখন আমাদের নিকটে প্রকাশ পায় না।

কাউণ্ট ওকুমা যথার্থই বলিয়াছেন যে "অন্তর্দৃষ্টির মাত্রা অনুসারেই একটা জাতির উন্নতি বা

অবনতি প্রকাশ পায়। স্বাধীনতা হিন্দুদিগের মধ্যে কথোপকথনের জন্য পরম উপাদেয় বিষয়। ইংরাজ-জাতির অধীনতা হইতে মুক্ত হইবার ইচ্ছা কিছু অন্যায় নহে, এবং তাহা শুনিতে বলিতেও লাগে ভাল, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহা স্বপ্নের বিষয়মাত্র—নিতান্তই অসম্ভব ব্যাপার। যে জাতি নিজের কদাচার সকল বিদূরিত করিয়াছে, এবং নিজের চরিত্র উন্নত করিয়া অপরাপর ক্ষমতাশালী ও উত্থানশীল জাতির সহিত সমধর্ম্মী হইয়াছে, সেই জাতির পক্ষেই স্বাধীনতার কথা বলা শোভা পায়।"

কাউণ্ট ওকুমা আর একটী অত্যন্ত সারগর্ভ কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন যে একটা মহাদেশের বিনাশ আসলে তাহার বাহির হইতে আসে না, ভিতর হইতেই আসে। "কাষ্ঠখণ্ড কীটদষ্ট হইবার পূর্ব্বেই তাহাতে 'পচ' ধরিয়া থাকে। পুরাকাল অবধি ভারতবর্ষ অনেক বিদেশী শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া তাহাদের অধীন হইয়া পড়িয়াছিল; তাহার পর স্পেন, পর্ত্তুগাল, ফ্রান্স ও ইংলণ্ড কর্ত্তৃক আক্রমণের ফলে ভারতের অগাধ ধনসম্পত্তি বিনষ্ট হইয়া গেল, এবং সেই সঙ্গে তাহার শিল্প, কলাবিদ্যা ও সাহিত্যের অবনতি সম্পূর্ণ হইল। এই সকলের জন্য কে দায়ী? আমি বলিতেছি যে ইহার জন্য ঐ সকল আক্রমণকারী জাতিগণের কোনটাই দায়ী নহে, ভারতবর্ষ আপনাকেই আপনি নষ্ট করিয়াছে।"

ওকুমা একটী চিরন্তন সত্য অতি স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। "কাষ্ঠখণ্ড কীটদষ্ট হইবার পূর্ব্বেই পচিয়া যায়।" কাষ্ঠখণ্ড পচিয়া না গেলে তাহাতে সহজে কীট প্রবেশ করিতে পারে না; পচিয়া যাইবার পরই তাহাতে সহস্র প্রকার কীট প্রবেশ করিয়া আপনাপন বাসা নির্ম্মাণ করিতে থাকে এবং পরিণামে কাষ্ঠখণ্ড স্বীয় অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিবার পথে অগ্রসর হয়। ভারতসমাজ সম্বন্ধেও এই কথা বোধ হয় খুবই খাটে। এক সময়ে যখন ভারতের আর্য্যদের মধ্যে একতা ছিল, যখন প্রতিদিন প্রভাতে ভারতের অরণ্য সকল ঋষিদের বেদগানে মুখরিত হইয়া উঠিত, তখন কোন্ জাতি বাহির হইতে আসিয়া ভারতভূমিকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল? একটী জাতিও নহে। ভারতসমাজের সকল ভেদের মূল, সকল অবনতির মূল জন্মগত জাতিভেদের নিষ্ঠুর গণ্ডী তখন তো সমাজকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া দেয় নাই—এক কথায়, তখনও সমাজে 'পচ' ধরে নাই। সমাজের উন্নতি ও বিস্তৃতির সঙ্গে নানা বিভাগ সংঘটিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন ক্ষতি হইতে পারে নাই, কারণ তখনও কর্ম্মের বিভাগই সেই বিভাগসমূহের সেই জাতিভেদের মূল ছিল। অবশেষে সেই বিভাগের ফলে সমাজের কয়েকটী অঙ্গ যখন অর্থে ও ক্ষমতায় অন্যান্য অঙ্গ অপেক্ষা অনেকদূর অগ্রসর হইল, তখন তাহারা আপনাদিগের মানমর্য্যাদা ক্ষমতা প্রভৃতি স্থিরতর রাখিবার উদ্দেশ্যে সেই বিভাগ বা জাতিভেদকে জন্মগত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইল এবং তাহাতে কৃতকার্য্যও হইল। হয় তাহারা বুঝিতে পারে নাই, অথবা স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে বুঝিতে চাহে নাই যে, জাতিভেদকে জন্মগত করিবার ফলে, আত্মবিভাগ বা গৃহবিচ্ছেদকে চিরকালের জন্য স্থিরতর রাখিবার ফলে, সমাজ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে—সমাজে পচ ধরিবে। আমরা কিন্তু দেখিতেছি যে তাহার ফলে সমাজে রীতিমত পচ ধরিবার সূত্রপাত হইয়াছিল। সত্যযুগের বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের সমরবার্ত্তায়, ত্রেতাযুগে শূদ্রকমুনির শিরশ্ছেদনে এবং পরশুরামের ধরণীকে একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয় করিবার সম্বাদে এবং দ্বাপরযুগে মহাভারতোক্ত নানা ঘটনায়, জন্মগত জাতিভেদের ফলে সমাজে পচ ধরিবার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। মহাভারতের যুদ্ধের পর অবধি ভারতের সমাজে আত্মবিচ্ছেদ ওতপ্রোতভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সমাজকে একেবারে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিয়াছিল, এবং তখনই বাহির হইতে গ্রীক, মুসলমান প্রভৃতি বহিঃশত্রুগণ আসিয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে সাহস করিয়াছিল। জন্মগত জাতিভেদের কারণে সমাজ যেভাবে বিখণ্ডিত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে কখনই মঙ্গলের আশা করা যায় না। সমাজ 'চটকস্য মাংসং শতধা বিভক্তং' হইয়া টুকরো টুকরো হইলে কি প্রকারে মঙ্গলজনক কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে পারে? এই জাতিভেদের কুফল তো আমরা প্রতিপদেই উপলব্ধি করিতেছি, তবু কত যুক্তি দেখাইয়া আমরা তাহা রক্ষা করিতে চেষ্টা করি? জাপানে এক সময় এই প্রকার বিষময় জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত ছিল,

কিন্তু জাপানবাসীগণ যখনি তাহার কুফল বুঝিতে পারিল, তৎক্ষণাৎ তাহাকে জাপান হইতে চির-নির্ব্বাসিত করিয়া মঙ্গলবায়ু প্রবাহিত হইবার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিল। তাহার ফলে আজ দুই হস্ত পরিমিত জাপান দেশ সমস্ত জগতের নমস্য হইয়া উঠিয়াছে। জন্মগত জাতিভেদ আমাদের দেশে যেভাবে চলিতেছে, এবং তাহার ফলে আমাদের সমাজে যে প্রকার ছুঁই-ছুঁই-ভাব চলে, তাহাতে কোন ভাল কাজ কি আমরা পরস্পর প্রাণ দিয়া মিলিয়া মিশিয়া করিবার জন্য অগ্রসর হইতে পারি? মনে কর, দেশের জন্য ৫৬টি জাতির এক একটী লোক লইয়া একটী সৈন্যদল সংগঠিত হইল। যদি এই ৫৬টী লোক একসঙ্গে আহারাদি না করে, যদি তাহারা প্রত্যেকে এক একটী পৃথক "চুলা"র বন্দোবস্ত করিতে বাধ্য হয়, তবে তাহাদের কাছে দেশ-রক্ষার আশা খুব বেশী বলিয়া মনে হয় না। তাহারা দেশ রক্ষার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইবে অথবা নিজের নিজের আহারের বন্দোবস্তেই মনোনিবেশ করিবে? আমাদের দেশে একটী প্রবাদই প্রচলিত আছে—বারো রাজপুত তেরো চুল্লী। কেবল তাহাই নহে। এই ৫৬টী জাতির আবার কত উপবিভাগ আছে। আমরা দেখিয়াছি যে কুলীন প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যেও—বিভিন্ন জাতির কথা দূরে থাক—অনেকস্থলে আহারাদি চলে না। জাতিভেদ উঠিয়া গেলে ভাবিয়া দেখ যে সকল বিষয়েই কি একটা মহান্ ক্ষেত্র খুলিয়া যায়!

এই প্রকারে আমরা দেখিতেছি যে আমরা এত হীনবীর্য্য যে, কদাচারসমূহের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া যে স্বাধীনতাটুকু আনিবার ক্ষমতা আমাদের হাতের মধ্যে আছে, সেই স্বাধীনতাটুকুও আনিতে আমরা সাহস করি না, অথচ স্বাধীনতা দাও বলিয়া ভিক্ষার বিকট চীৎকার করিতে ক্ষান্ত হই না। আমরা কাউণ্ট ওকুমার সহিত একবাক্যে শতবার বলিব যে আমাদের কর্ত্তব্য হইতেছে আমাদের দেশ হইতে আমাদের সমাজ হইতে সর্ব্বপ্রকার কদাচার দুর্নীতি বিদূরিত করা এবং চরিত্রে, নীতিতে, জ্ঞানে ও ধর্ম্মে আপনাদিগকে এবং সেই সঙ্গে সকল দেশবাসীকে সর্ব্বতোভাবে উন্নত করিবার চেষ্টা করা। এই বিষয়ে যদি আমরা প্রাণপণে যত্ন করি, এবং তাহাতে কৃতকার্য্য হই—কেনই বা তাহাতে কৃতকার্য্য হইব না, ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ঈশ্বর যে তখন আমাদের পরম সহায় হইবেন—তখন স্বাধীনতাধন তো হস্তগত হই-বে নহে—হইয়া-ছে।

তন্ত্রের দার্শনিক মত।

(শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ)

বিবিধ শাস্ত্রের উর্ব্বর ক্ষেত্র ভারতবর্ষে কত-প্রকার দর্শনের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা সাধারণ দার্শনিক সমাজেও এপর্য্যন্ত সুপরিচিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ভারতের সুধীসমাজে অনুশীলনীয় যে সমস্ত শাস্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যেই অল্পাধিক পরিমাণে দার্শনিক তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। কাব্যে নাটকে দর্শনের মত বিবৃত হইয়াছে, ব্যাকরণের অনেক স্থান দার্শনিক সিদ্ধান্তের দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে, জ্যোতিষে দর্শনের কথা আছে, পুরাণ স্মৃতি আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতিতো দার্শনিক রহস্যে পরিপূর্ণ প্রতিভাত হয়।

এ ত গেল সাধারণের অনুশীলনযোগ্য শাস্ত্রের কথা। গুরুগম্য রহস্যপূর্ণ মন্ত্রবিদ্যা বা বিপুল তন্ত্র-শাস্ত্রও দর্শনের সমুদ্র বলিয়া উল্লেখযোগ্য। তন্ত্রের মৌলিকত্বে যে সকল দর্শন অভিব্যক্ত হইয়াছে, এই স্থলে আমরা সেই গুলিরই আলোচনা করিব।

কুলার্ণব রুদ্রযামল প্রভৃতি তন্ত্রের অনেক স্থলেই ষড়্‌দর্শনের নিন্দাবাদ দেখিতে পাওয়া যায়। * এই সকল তন্ত্র সমস্বরে ষড়্‌দর্শনকে মহাকূপ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে। ইহাতে পাঠকের মনে আপাতত একপ্রকার প্রশ্নের আবির্ভাব হইতে পারে যে—ষড়্‌দর্শন ছাড়িয়া দিলে হিন্দুর অবলম্বনীয় দর্শন আর থাকে কি? এই প্রশ্নের উত্তর পূর্ব্বেই সূচিত হইয়াছে যে, ভারতে দর্শনের ইয়ত্তা নাই। বিবিধ শাস্ত্র অনুশীলন করিলে অনেক নূতন নূতন দর্শনের মত দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি, সাধারণের নিকট পরিচিত যে ষড়্‌দর্শন, ষড়্‌দর্শন শব্দে এতদ-তিরিক্ত ষড়্‌দর্শনেরও পরিচয় পাওয়া যায়। সুগৃ-

* ষড়্‌দর্শনমহাকূপে পতিতাঃ পশবঃ প্রিয়ে।
পরমার্থং ন জানন্তি পশুপাশনিযন্ত্রিতাঃ॥
[কুলার্ণবতন্ত্র ১ম পটল]

হীতনামা মাধবাচার্য্য পরাশরভাষ্যে অন্য প্রকার ষড়্‌দর্শনের উল্লেখ করিয়াছেন। এই ষড়্‌দর্শন পুরাণসম্মত। পুরাণসার নামক গ্রন্থ হইতে উহাদের বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে। যথা—

"শৈবঞ্চ বৈষ্ণবং শাক্তং সৌরং বৈনায়কন্তথা।
স্কান্দঞ্চ ভক্তিমার্গস্য দর্শনানি ষড়েবহি॥"

ইহার অর্থ—শৈব বৈষ্ণব শাক্ত সৌর বৈনায়ক অর্থাৎ গাণপত্য ও স্কান্দ, ভক্তিমার্গের এই ছয় প্রকার দর্শন। এই স্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, তন্ত্রশাস্ত্রে যে ষড়্‌দর্শনের নিন্দাবাদ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা জ্ঞানের মোক্ষসাধনতা-প্রতিপাদক প্রসিদ্ধ সাংখ্যাদি দর্শন বলিয়াই বুঝিতে হইবে। কারণ, তন্ত্রশাস্ত্রের সর্ব্বত্রই ভক্তির মাহাত্ম্য বিঘোষিত হইয়াছে। সুতরাং ভক্তিপ্রধান পৌরাণিক দর্শনের সহিত তান্ত্রিক দর্শনের সর্ব্বথা বিরোধ সম্ভবপর হয় না। পুরাণশাস্ত্র ভক্তিকে জ্ঞানলাভের উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে। তন্ত্রেও এই মতই সমীচীন বলিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। বিশেষতঃ তন্ত্র ও পুরাণ এই উভয়ের অনেক বিষয়েই ঐকমত্য দেখিতে পাওয়া যায়।

তান্ত্রিক দর্শনে অদ্বৈতবাদ এবং বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ এতদুভয়েরই পরিচয় পাওয়া যায়। তবে অধুনা দৃশ্যমান তন্ত্রগুলির মধ্যে বিশিষ্টাদ্বৈত মতেরই যেন অধিকতর আভাস পাওয়া যায়। আমরা ক্রমে এই বিষয়ের আলোচনা করিব।

তান্ত্রিক দর্শনসম্মত কতকগুলি পদার্থ সাংখ্যশাস্ত্রপ্রসিদ্ধ, কতকগুলি বেদান্তসম্মত, এবং অনেকগুলি উহার নিজস্ব বলিয়া উল্লেখযোগ্য। উহার মতে তত্ত্ব বা মৌলিক পদার্থগত সংখ্যার বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন—শৈবতত্ত্বের সংখ্যা ষট্‌ত্রিংশৎ, বৈষ্ণব তত্ত্বের সংখ্যা দ্বাত্রিংশৎ, মৈত্র অর্থাৎ সাংখ্যতত্ত্ব চতুর্ব্বিংশতি, প্রকৃতি অর্থাৎ শক্তির তত্ত্ব দশ এবং ত্রিপুরসুন্দরীর তত্ত্বসংখ্যা সপ্ত *। ক্রমে ইহাদের বিবরণ প্রদর্শিত হইবে।

শিবই সৃষ্টির মূলীভূত কারণরূপে বিবেচিত হইয়াছেন। তিনি সগুণ এবং নির্গুণ এই দুইপ্রকারে অবস্থিত বলিয়া কথিত হইয়াছেন। প্রকৃতির অন্য অর্থাৎ অবিদ্যাসম্বন্ধরহিত শিব নির্গুণ এবং মায়াবচ্ছিন্ন শিব সকল বা সগুণ নামে অভিহিত হইয়াছেন। সুতরাং সগুণ ব্রহ্ম ও নির্গুণ ব্রহ্মই সগুণ ও নির্গুণ শিব নামে তন্ত্রশাস্ত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। অনেক তন্ত্রে শিব শব্দের পরিবর্ত্তে ব্রহ্মশব্দই ব্যবহৃত হইয়াছে।

সগুণ শিব মায়াবচ্ছিন্ন এবং সচ্চিদানন্দযুক্ত। ইঁহা হইতেই প্রথমতঃ শক্তির উৎপত্তি হইয়াছে। অনন্তর এই শক্তি হইতে নাদ, এবং নাদ হইতে বিন্দুর উৎপত্তি হইয়াছে।

উক্ত বিন্দু সাক্ষাৎ শক্তিস্বরূপ। উহা আবার বিন্দু, নাদ ও বীজ এই তিন ভাগে বিভক্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। বিন্দু শিবস্বরূপ, বীজ শক্তিস্বরূপ এবং এতদুভয়ের পরস্পর মিশ্রণের নাম নাদ।

অনন্তর বিন্দু হইতে রৌদ্রী, নাদ হইতে জ্যেষ্ঠা এবং বীজ হইতে বামা, এই ত্রিশক্তির উৎপত্তি হইয়াছে। এই ত্রিশক্তি হইতে যথাক্রমে রুদ্র, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু উৎপন্ন হইয়াছেন। উক্ত ত্রিমূর্ত্তি যথাক্রমে জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তিস্বরূপ। এবং ইঁহারাই অগ্নি, চন্দ্র ও সূর্য্যস্বরূপ।

সৃষ্টির প্রাক্কালে শক্তির বা প্রকৃতির ক্ষোভ অর্থাৎ স্পন্দন উপস্থিত হয়, এই স্পন্দমানশক্তির অবস্থান্তরের নাম পরবিন্দু বা প্রথমবিন্দু। এই বিন্দু হইতে অব্যক্তস্বরূপ রব উৎপন্ন হইয়াছে। আগমশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ এই অব্যক্ত রবকেই শব্দব্রহ্মরূপে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কেহ বা শব্দ নামে অভিহিত করেন। শারদাতিলকরচয়িতা লক্ষ্মণ দেশিক বলেন যে, সর্ব্বভূতগত চৈতন্যই শব্দব্রহ্ম নামে অভিহিত হইয়া থাকেন এবং তিনিই প্রাণিবর্গের দেহ মধ্যে কুণ্ডলীরূপে অবস্থান করেন ও কণ্ঠ তালু প্রভৃতি স্থান প্রাপ্ত হইয়া গদ্যপদ্যাদিভেদে আবির্ভূত হন। বিন্দুরূপে পরিণত, মায়াবচ্ছিন্ন কালসহায় (কাল যাহার সহকারী) নাদস্বরূপ শম্ভু হইতে জগতের সাক্ষী সর্ব্বব্যাপী সদাশিব উৎপন্ন হইয়াছেন। সদাশিব হইতে ঈশ্বর, ঈশ্বর হইতে রুদ্র, রুদ্র হইতে বিষ্ণু এবং বিষ্ণু হইতে ব্রহ্মা, এইক্রমে

---

* ষট্‌ত্রিংশচ্ছিবতত্ত্বানি দ্বাত্রিংশদ্বৈষ্ণবানিতু।
চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বানি মৈত্রাণি প্রকৃতেঃ পুনঃ॥
উক্তানি দশতত্ত্বানি সপ্তচ ত্রিপদাস্যনঃ।
[শারদাতিলক ৫ম পটল]

সাংখ্যের (পুরুষ ভিন্ন) চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব তন্ত্রেও গৃহীত হইয়াছে।

উৎপত্তি হইয়াছে। জগতের মূলস্বরূপ সদাশিব বিকৃতি প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে গুণাত্মক এবং অন্তঃকরণাত্মক মহত্তত্ব উৎপন্ন হইয়াছ। এই স্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, শৈবাগম মতে মায়া এবং চৈতন্যাত্মক সদাশিবের অভেদ অভিপ্রেত হইয়াছে; সুতরাং সদাশিবের বিকৃতি শব্দে মায়াংশের বা প্রকৃতিরই বিকৃতি বুঝিতে হইবে। কারণ, সদাশিবের সহিত মায়ার সংপৃক্তভাব সর্ব্বদাই রহিয়াছে। প্রসঙ্গতঃ ইহাও বক্তব্য যে, উক্ত মায়া বা প্রকৃতি কোথাও বা বিমর্শ নামেও অভিহিত হইয়াছেন। বিকৃত সদাশিব হইতে যে মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি কথিত হইয়াছে, শৈবাগম মতে উহা বুদ্ধিতত্ত্বেরই নামান্তর। উক্ত মহত্তত্ত্ব হইতে সৃষ্টির ভেদসম্পাদক ত্রিবিধ অহঙ্কার উৎপন্ন হইয়াছে। তন্মধ্যে বৈকারিক অহঙ্কার সাত্ত্বিক, তৈজস অহঙ্কার রাজস, এবং ভূতাদি অহঙ্কার তামস। এই ত্রিবিধ অহঙ্কারের মধ্যে বৈকারিক অহঙ্কার হইতে দিক্, বাত, অর্ক, প্রচেতস্, অশ্বি, বহ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, মিত্র ও ব্রহ্মা এই দশটি দেবতার উৎপত্তি হইয়াছে। তৈজস অহঙ্কার হইতে ক্রমে পঞ্চতন্মাত্র এবং ইন্দ্রিয় সকল উৎপন্ন হইয়াছে। এই স্থলে বলা আবশ্যক যে অবিভাজ্য সূক্ষ্মতম অংশ তন্মাত্র নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই সংজ্ঞা সাংখ্যশাস্ত্রপ্রসিদ্ধ হইলেও স্মৃতি পুরাণ তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রেও উহার ভূরি ব্যবহার দেখা যায়। সুতরাং উহা কাহার নিজস্ব তাহা ঠিক করিয়া বলিবার উপায় নাই। ভূতাদি অহঙ্কার হইতে পঞ্চভূতের উৎপত্তি হইয়াছে। প্রথমতঃ শব্দতন্মাত্র হইতে আকাশ, স্পর্শতন্মাত্র হইতে বায়ু, রূপতন্মাত্র হইতে অগ্নি, রসতন্মাত্র হইতে জল, এবং গন্ধতন্মাত্র হইতে পৃথিবী সমুৎপন্ন হইয়াছে। এই উৎপত্তিপ্রক্রিয়া সাংখ্যশাস্ত্রপ্রসিদ্ধ হইলেও এইস্থলে তান্ত্রিকদর্শনের অনেকটা স্বাধীনতার পরিচয় পাওয়া যায়। সাংখ্য পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তি বর্ণনা করিয়াই নিরস্ত হইয়াছেন। কিন্তু তন্ত্র আরও অগ্রসর হইয়াছেন। তিনি বলেন যে, নিবৃত্তি, প্রতিষ্ঠা, বিদ্যা, শান্তি ও শান্ত্যতীতা এই পাঁচটি কলা অর্থাৎ শক্তিবিশেষ যথাক্রমে পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চভূতের উৎপাদন করিয়াছে।

নিবৃত্তি প্রভৃতি পঞ্চকলা শারদাতিলকে "নাদদেহসমুদ্ভব" বলিয়া কথিত হইয়াছে। টীকাকার রাঘব ভট্ট বায়বীয় সংহিতার প্রমাণের দ্বারা প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, প্রথমতঃ শান্ত্যতীতা শক্তি উৎপন্ন হইয়াছে। শান্ত্যতীতা হইতে শান্তি, শান্তি হইতে বিদ্যা, বিদ্যা হইতে প্রতিষ্ঠা, ও প্রতিষ্ঠা হইতে নিবৃত্তি উৎপন্ন হইয়াছে। ঈশ্বরনির্ম্মিত সৃষ্টির এই ক্রম। ইহাদের আনুলোম্যে সৃষ্টি এবং প্রাতিলোম্যে সংহার হইয়া থাকে। উক্ত পঞ্চপ্রকার সৃষ্টির অতিরিক্ত আর সৃষ্টি নাই, যেহেতু এই পঞ্চবিধ কলার দ্বারা সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত রহিয়াছে।

"নাদদেহসমুদ্ভবাঃ" এই পদের অর্থ বড়ই জটিল ইহার অনেক প্রকার ব্যাখ্যা দেখা যায় এবং ইহার সহিত তান্ত্রিক দর্শনের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। নাদ হইতে যাহার দেহ অর্থাৎ উৎপত্তি সে নাদদেহ বিন্দু; তাহা হইতে সমুদ্ভব অর্থাৎ উৎপত্তি হইয়াছে যাহাদের তাহারাই "নাদদেহ সমুদ্ভব"—সুতরাং সাক্ষাৎ বিন্দু হইতে উৎপন্ন। অথবা নাদ হকার, নাদের (ধ্বনির) দেহ (উৎপত্তি) হয় যাহা হইতে, এই নিরুক্তি অনুসারে "নাদদেহ" শব্দের অর্থ বায়ু অর্থাৎ বায়ুবীজ যকার। ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মীর অভেদ স্বীকার করিয়া দেহ শব্দের উৎপত্তিরূপ অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। মারুত অর্থাৎ বায়ু বক্ষঃস্থলে বিচরণ করিয়া মন্ত্রধ্বনি উৎপাদন করে। "মারুত স্তূরসি চরন্ মন্ত্রং জনয়তি ধ্বনিম্" এই উক্তি হইতে বায়ুবীজ যকারের নাদদেহত্ব অর্থাৎ নাদজনকত্ব জানা যায়। সমুদ্দীপ্যমানা অর্থাৎ দেদীপ্যমানা ভা (দীপ্তি) আছে যাহার, সেই "সমুদ্ভ", এই পদের অর্থ অগ্নি অর্থাৎ বহ্নিবীজ র, এবং "ব" শব্দে বকারই গৃহীত হইয়াছে। ক্রমে হ য র ব ল এই পঞ্চবর্ণের গ্রহণ কর্ত্তব্য হইলেও চারিটি বর্ণের গ্রহণ দেখা যায়, ইহাতে লকারের গ্রহণও বুঝিতে হইবে। ইহারা বিলোমে অর্থাৎ বিপরীতভাবে পঞ্চতন্মাত্রের বীজ। যথা—লকার পৃথিবীর বীজ, বকার জলের বীজ, র বহ্নির বীজ, যকার বায়ুর বীজ এবং হকার আকাশের বীজ। প্রথমতঃ নাদের উল্লেখ হওয়ায় এই সকল বর্ণে বিন্দুযোগও বুঝিতে হইবে। সুতরাং লং বং রং যং হং এই পঞ্চবীজ গৃহীত হইয়াছে।

অথবা নাদ হকার, তাহার দেহ অর্থাৎ স্বরূপ তাহাতে সমুদ্ভব অর্থাৎ স্থিতি আছে যাহার, ঈদৃশ

"আ" অর্থাৎ "আকারাদি দীর্ঘস্বরসমূহ" আ ঈ ঊ ঐ ঔ এই সকল বর্ণে বিন্দুর যোগ বুঝিতে হইবে। ত্রিকোণোত্তর গ্রন্থে কথিত হইয়াছে যে, "নাদনামক যে পর (উৎকৃষ্ট) বীজ তাহা সর্ব্বভূতেই অবস্থিত, তাহা মূর্ত্তিদাতা, পরম দিব্য সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ, শান্ত সর্ব্বগত শূন্য এবং মাত্রাপঞ্চকে (পঞ্চতন্মাত্রে) অবস্থিত। যদিও এই প্রমাণে বিন্দুর স্পষ্টত উল্লেখ নাই, তথাপি নাদের সহিত বিন্দুর অব্যভিচারি-সম্বন্ধ নিবন্ধন নাদের উল্লেখেই বিন্দুর গ্রহণ বুঝিতে হইবে। কেহ বলেন যে এই স্থলে দীর্ঘস্বরে ক্রমে ল ব র য হকারের যোগ বুঝিতে হইবে, সুতরাং হ্রাং হ্রীং হ্রূং হ্রৈং হ্রৌং এই সকল বীজ অভিপ্রেত হইয়াছে। এই গুলি পঞ্চীকৃত ভূতের বীজ; এই সকল বীজই ইহাদের অধিষ্ঠাতৃ নিবৃত্তি প্রভৃতি দেবতার বীজ অর্থাৎ এই সকল বীজকে তাঁহারা নিজের দেহ বলিয়া মনে করেন।

তান্ত্রিক দর্শন শব্দ হইতেই জগতের উৎপত্তি স্বীকার করেন, সুতরাং বর্ণগুলি বীজ নামে কথিত হইয়াছে। আকাশাদি পঞ্চভূতের প্রত্যেকেরই এক একটি মণ্ডল কথিত হইয়াছে। মণ্ডল শব্দের অর্থ অবস্থানজনিত আকৃতি বিশেষ; অর্থাৎ স্ব স্ব আধারে ইহারা যেভাবে অবস্থিত আছে, তাহাতেই ইহাদের কক্ষের এক একটি আকৃতি হইয়াছে। আকাশের মণ্ডল বৃত্তাকার, বায়ুর মণ্ডল ষড়্‌বিন্দু চিহ্নযুক্ত বৃত্ত, বহ্নির মণ্ডল স্বস্তিকচিহ্নযুক্ত ত্রিকোণ, জলের মণ্ডল উভয়দিকে পদ্মযুক্ত অর্দ্ধচন্দ্রাকার এবং পৃথিবীর মণ্ডল বজ্রচিহ্নযুক্ত অর্দ্ধচন্দ্রাকার।

তন্ত্র এই পঞ্চভূতের বর্ণবিষয়েও অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, আকাশ স্বচ্ছ, বায়ু কৃষ্ণবর্ণ, অগ্নি রক্তবর্ণ, জল শুভ্রবর্ণ, পৃথিবী পীতবর্ণ। এইস্থলে শারদাতিলকের টীকাকার রাঘব ভট্ট অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, আকাশের এবং বায়ুর পরমার্থতঃ কোনও বর্ণ নাই, কিন্তু ইহাদের উপাসনার জন্য তন্ত্রশাস্ত্রে শুভ্র প্রভৃতি বর্ণ কল্পিত হইয়াছে।

উক্ত পঞ্চভূত এক এক আধারে অধিষ্ঠিত। তন্মধ্যে আকাশ স্বাধার অর্থাৎ স্বশক্তিতেই অবস্থিত, উহার অন্য আধার নাই। বায়ুর আধার আকাশ, তেজের আধার বায়ু, জলের আধার তেজ, এবং পৃথিবীর আধার জল। শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ যথাক্রমে পঞ্চভূতের গুণ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

সহজ হ'।

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এ)

আকাশের আলোর সাথে মিল্‌বি যদি
সহজ হ'
কাননের ফুলের সাথে মিল্‌বি যদি
সহজ হ'!
তরুমর্ম্মর পবন দোলায়
নৃত্য-দোদুল তারার মালায়
যে গান দোলে, সেই দোলাতে
দুলবি যদি সহজ হ'!
আনিস্‌নে তোর ঘরের কথা
বিজন মনের ব্যাকুল ব্যথা
সহজ সরল শিশুর প্রাণে
বাহির হ'!
দেখ্‌ রে চেয়ে আকাশ পানে
বিশ্বভুবন ভরা গানে
সেই গানের তালে হৃদয় মেলে
সহজ হ'॥

রাণাডের জীবন-স্মৃতি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর)

আমাদের পূর্ব্বের সব্‌জজ্‌ রা-ব-বিষ্ণু মো-ভিড়ে আপনার নাসিকস্থ বাগান যখন বেচিতে চাহিলেন, তখন ঐ

---

* মৈত্র শব্দে সাংখ্য এবং ত্রিপদাস্থন্‌ ত্রিপুরাদেবী, এই উত্তরার্ধের সমর্থক বায়বীয় সংহিতার প্রমাণ রাঘবভট্টের টীকা হইতে উদ্ধৃত হইল। মৈত্রাণি সাংখ্যানি। তদুক্তং বায়বীয় সংহিতায়াং—"পৌরাণানিচ তন্ত্রানি ত্রিপুরায়াশ্চ কানিচিৎ সাংখ্যযোগপ্রসিদ্ধানি তন্ত্রানাপিচ কানিচিৎ" শিবশাস্ত্র প্রসিদ্ধানি ততোঽন্যান্যাপি কৃৎস্নশঃ ইতি। ত্রিপদাস্থনঃ ত্রিপুরায়াঃ। রাঘবভট্ট।

সারদা তিলকের প্রামাণ্য সম্বন্ধে হিন্দুসম্প্রদায়ের কোনও সন্দেহ নাই। টীকাকার রাঘব ভট্টও নিরতিশয় বিদ্যাবত্তাজন বলিয়া পরিচিত।

বাগান আমরা কিনিলাম। এই বাগানটি আমাদের কাজের ও আমোদের আর একটি স্থান বেশী হইল। রোজ সকাল সন্ধ্যায় বাগানে গিয়া লোকজনের কাজ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া ও তাহাদের কৃত কর্ম্মের তদারক করা—এই নিয়ম করিয়াছিলাম। সকালে আমি একলাই বাগানে হাঁটিয়া যাইতাম। কিন্তু "উনি" সন্ধ্যাকালে কোর্ট হইতে গৃহে আসিলে পর আমরা দুজন ও আমার দেবর ভাউজী আমরা টাঙ্গা করিয়া বাগানের দিকে বেড়াইতে যাইতাম। সেখানে দুই এক ঘণ্টা খোলা হাওয়ায় বেড়িয়া বেড়াইয়া আনন্দে গল্প-স্বল্প করিয়া, ও সকাল হইতে লোকজনেরা কি কি কাজ করিল, উনি তাহার জিজ্ঞাসাবাদ করিলে পর আমরা গৃহে ফিরিয়া যাইতাম। গৃহে আসিয়া, পূর্ব্বোক্ত নিয়ম-অনুসারে আমার ইংরেজি পাঠ পড়িয়া লইয়া নূতন পাঠের শব্দ বলিতে বলিতে তখনই এক ঘণ্টা চলিয়া যাইত। পরে, খাওয়া দাওয়া হইয়া গেলে প্রায় দশটা সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত আমাকে দিয়া উনি মারাঠী পড়া পড়াইয়া লইলে পর আমরা ঘুমাইতে যাইতাম। তাহার পর প্রভাতে নিত্যনিয়মানুসারে চারিটার সময় উঠিয়া সকাল বেলায় আমি একলাই সিপাই সঙ্গে লইয়া বাগান যাইতাম, তাই "উনি" এক ঘণ্টা আমার "পড়া লইয়া" তাহার পর পাঁচটা বাজিলে আমাকে বলিতেন—"তোমার বাগানে যাবার সময় হয়েছে তুমি যাও।" আমি আমাদের বেতনভোগী বুড়া সর্দ্দারকে সঙ্গে লইয়া যাইতাম। পরে উনি ভাউজিকে উঠাইয়া তাহাকে পাঠাভ্যাস করাইতেন ও ছয়টা বাজিলে তাহাকে অনুলিপি (Copy) লিখিতে বসাইয়া দিয়া "উনি" আপনার নিত্যক্রম আরম্ভ করিতেন। এখন, আমি বাগানে যাইবার সময় সখারাম নামে যে সিপাইকে সঙ্গে লইতাম, তাহার "বারকরী" সম্প্রদায়ের সাধুসন্তের অনেক কথা জানা ছিল এবং সে অনেক "অভঙ্গ"ও আবৃত্তি করিত। প্রথম প্রথম রাস্তায় চলিতে চলিতে সে আপন মনেই গুন্-গুন্ করিত। আমি না বলিলে, সে আপনা হইতে কোন কথা কহিত না। আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতাম তাহারই উত্তর দিত। কিন্তু মুখে কি একটা আস্তে আস্তে কথা বলিত। বোধ হয় কোন অভঙ্গ আবৃত্তি করিত। কিন্তু আদব-কায়দার খাতিরে সে উচ্চস্বরে আওড়াইত না—এইরূপ আমার মনে হওয়ায় আমি তাহাকে বলিলাম—"সখারাম, "অভঙ্গ" আবৃত্তি করা যদি তোমার নিত্যনিয়ম হয়, তুমি উচ্চস্বরে আবৃত্তি কর না কেন। আমি শুধু শুনিতে পাই এইরকম ভাবে আবৃত্তি করলেই চলবে। অভঙ্গ আমার বড় ভাল লাগে।" এই কথায়, সে নম্রভাবে রাম-রাম করিয়া বলিল "আচ্ছা ঠাকুরুণ। অনেকে এটা বেয়াদবী মনে করে ও আমাদের মতো বুড়াদের বড়র-বড়র বকা অনেকের ভাল লাগে না। তাই আমি ভীত হয়েছিলুম।" এইরূপে, বাগানে যাইবার সময় প্রভাত হওয়ায় আত্মবিনোদনের প্রয়োজন অনুভব করিতাম, তখন সে কোন একটা অভঙ্গ বলিত; ও নিজের বুদ্ধি অনুসারে তাহার অর্থও করিত। আমি কেবল হুঁ হুঁ করিয়া যাইতাম। কিন্তু আমার হাসি পাইত। কারণ, ভক্তলোকদের সম্বন্ধে কতকগুলি মজার কথা প্রচলিত আছে; আবার তাহাতে মূল অর্থের সম্পূর্ণ বিপরীত বাক্য, অথবা পাঠে যেরূপ কবিতার পদ থাকে ঠিক সেইরূপ অক্ষরশ গ্রহণ করিয়া, ভক্তেরা সেই সমস্তের ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। যথা,—"'হিরণ্যকশ্যাপুচা পোঁটি প্রহ্লাদ বাল জন্মলে" (অর্থাৎ, হিরণ্যকশিপুর ঔরসে প্রহ্লাদ বালক জন্মগ্রহণ করিল) এই পাঠের স্থানে "হরিণ কাসবাচে পোঁটি পরলা'ত বাল জন্মলে" (অর্থাৎ হরিণ কচ্ছপের পেটে মাটির থালা হইয়া জন্মাইল)—এইরূপ উহারা বলিয়া থাকে এবং তাহার এরূপ ব্যাখ্যা করে যে, দেবতাদের আমরা দশ অবতারের কথাই শুনিয়াছি কিন্তু ভক্তের জন্য দেবতাকে অনেক অবতার গ্রহণ করিতে হয়। ইহার প্রমাণ এই যে, হরিণের পেটে কচ্ছপের পেটে জন্ম লইয়া শেষে মাটির থালা হইয়াও জন্মাইতে হইল। অতএব দেখ, ভক্তবৎসল দেবতাকে কত ভাল ভাল অবতার লইতে হয়।'—ইত্যাদি উহারা খুব ভক্তিভাবে বলিয়া থাকে। এই অর্থ ও বাক্যের যে মিল নাই এই কল্পনা পর্য্যন্ত তাহাদিগকে স্পর্শ করে না। এবং আর কেহ এই সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিলে তাহাদের সহ্য হয় না। ইহাতে তাঁহাদিগের দোষ নাই, বরং ভক্তির বলই দেখিতে পাওয়া যায়; এবং এই মণ্ডলীর লোকেরা পরস্পরের প্রতি অন্ধভাবে ও ভক্তির ভাবে দৃঢ় আসক্ত। বেশী ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখে না—এই যা। তাহাদের সম্বন্ধে কিছু কিছু গল্প আমাদের সিপাইয়ের জানা ছিল। কখন কখন সে কোন ভগবদ্-ভক্তের গল্প বলিতে বলিতে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িত। কিন্তু তাহার অর্থ বলিবার সময় উপরি-কথিত-অনুসারে সে কোন-না-কোন প্রকারে অর্থবিপর্য্যয় করিত। তবুও আমি তাহার গল্প মনোযোগ দিয়া শুনিতাম। কারণ, তাহার মতো ভক্ত বৃদ্ধের মনে ব্যথা দিতে আমার ভাল লাগিত না। গৃহে ফিরিয়া আসিয়া আহারের সময় যখন "ওঁর" কাছে এই সব গল্প করিতাম তখন উনি খুব হাসিতেন। এই রকম রোজ সকালে হাঁটিয়া বাগানে যাওয়ায় আমার ব্যায়ামও হইত এবং টাট্‌কা শাকসবজী ও ফুলও পাওয়া যাইত। শীতকালে প্রতিদিন চার-পাঁচশো গোলাপ ফুল ফুটিত এবং বেগুণ ও লাউ দুই তিন ঝুড়ি ফলিত। তাহার

মধ্য হইতে, ঘরের খরচের মতন ভাঙ্গা সুপারী (ঐ রকম গোলাপফুলের মধ্যে রাখা সুপারী "উনি" ভাল বাসিতেন এবং উহা রোজ করিতে হইত বলিয়া) তৈয়ারী করিবার মতন ফুল রাখিয়া দিয়া, বাকী ফুল চাকরদের দিয়া বেচিবার জন্য পাঠাইতাম; বেচিয়া যে পয়সা হইত তাহাও তরকারী বাগানের খাতায় জমা করিতাম। পাঁচ সাত দিন সব জিনিসই ঘরে রাখিয়া দিয়া বন্ধু ও আলাপী লোকদের নিকট অল্প স্বল্প তরকারী ও ফুল পাঠাইয়া দিবে এইরূপ উনি আমাকে বলিতেন, এবং তদনুসারে আমি কাজ করিতাম।

এই বৎসরে উনি, দেশমুখ, কেতকর, বাড প্রভৃতি মিত্রমণ্ডলীর সহায়তায় নাসিকে প্রার্থনাসমাজ স্থাপন করেন। রা. ব. গোপালরাও হরী সেখানে জয়েণ্ট জজ্ ছিলেন। তাঁহার ছয় ছেলে ও দুই মেয়ে তখনকার হিসাবে খুবই শিক্ষিত ছিল। তাঁর পরিবারবর্গ প্রাচীন-তন্ত্রের লোক ছিলেন। পুরাণ শুনিবার ও পড়িবার দিকে তাঁহাদের খুব ঝোঁক ছিল। ইহাঁদের মধ্যে অনেকেই সমস্ত ব্রত ও নিয়ম-ধর্ম্ম পালন করিতেন। এই নিমিত্ত বারম্বার সহরের মেয়েদিগকে "হল্‌দী কুঙ্কুমে" তাঁহারা ডাকিতেন। এই দরুণ আমারও তাঁহার গৃহে যাতায়াত হইতে থাকায় তাঁহার সহিত আমার পরিচয় বেশী হইয়াছিল। রা. সা. দেশমুখ ও আমার স্বামী দুজনেই স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী বলিয়া,—নিজের মেয়েরা হল্‌দী কুঙ্কুমের উপলক্ষে হউক না কেন—সহরের মেয়েরা বারংবার এক স্থানে আসিয়া জমায়, সীতা সাবিত্রীর মতন প্রাচীন সাধ্বীদিগের চরিত্রকথা তাহাদিগকে পড়িয়া শুনাইতেন ও শিক্ষার দিকে তাহাদের মন আকর্ষণ করিতেন। সেইরূপ, সহরের মেয়েদের স্কুল দেখিতে আসিয়া, তাহাদিগের উত্তেজনার জন্য অল্প স্বল্প পুরস্কার দেওয়া প্রভৃতির কাজও ভাল বাসিতেন। এবং এই সম্বন্ধে আমাদিগকে তাগাদা করিতেন। এই বিষয় সম্বন্ধে, বেশী দিন যাইতে না যাইতে এক প্রসঙ্গ উপস্থিত হইল। ঠানার সেশন-জজ কাগলন্ সাহেব, সেশনের কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য নাশিকে আসিলেন। আট-দশ দিন তিনি নাশিকে অবস্থিতি করেন। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার অল্প বয়স্কা শালী ও পত্নী ছিলেন। হিন্দু নারীদিগের সহিত আলাপ পরিচয় করিবার ইচ্ছা হওয়ায়, সাহেবের শালী ও পত্নী পর দিন আপনা-হইতেই আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আমাদের বাড়ী আসিলেন। কাজেকাজেই, আমরাও তাহার পর দিন, তাঁহাদের ওখানে প্রতিসাক্ষাৎ করিতে গেলাম। দেশমুখের দুই মেয়ে, আমি, মিসেস্ কাগলন্, তাঁহার ভগিনী—আমরা এক বয়সী হওয়ায়, দুইবার সাক্ষাতেই আমাদের মধ্যে খুবই ভাব হইয়া গেল। সকালে সন্ধ্যায় কখন আমাদের বাগানের দিকে, কখন শরণপুরের দিকে, কখন সুন্দর-নারায়ণের ঘাটের দিকে, আমরা বেড়াইতে যাইতাম। এই সময়ে গডবোলে নামক ডেপুটি এজ্যুকেশনল ইন্‌স্‌পেক্টর সেখানে ইস্কুল তদারক করিতে আসিয়াছিলেন। এই সময়ে নাশিকে, দ্বারকানাথ রাঘোবা তরখড়কর নামক একটি ভদ্রলোক সেখানকার হাই-স্কুলের-হেড্‌মাষ্টার, ছিলেন। তাঁহার পত্নী সৌ. লক্ষ্মীবাই আমা অপেক্ষা বয়সে অনেক বড় হইলেও বরাবরকার মিত্রাণীর মত হাসিয়া খেলিয়া বেশ মন খুলে' আমাদের সহিত ব্যবহার করিতেন। পশমের সেলাই ও সাদাসিধা সিলাইয়ের কাজ তিনিই আমাকে শিখাইয়াছিলেন। এই সময়ে আমার ছোট খুড়তুতো ননদ সখুবাই ঠোসর বোম্বাই হইতে নাশিকে মাতৃগৃহে থাকিবার জন্য আসিয়াছিলেন। তিনি সম্পর্কে ননদ ছিলেন কিন্তু ব্যবহারে আপন ভগিনীর মত ছিলেন, ভগিনীর মত আমাকে ভাল বাসিতেন; সেই দরুন, আমরা দুই ননদ-ভাজ ও সৌ. লক্ষ্মীবাই—আমাদের পরস্পরের মধ্যে ভগিনীর মত ভালবাসা জমিয়া উঠিল। তাই প্রতি দিন কোন এক সময় আমাদের পরস্পরের মধ্যে দেখা শুনা না হইলে মনে স্ফূর্ত্তি আসিত না; হয় তাঁরা আমাদের এখানে আসিতেন, নয় আমরা তাঁহাদের ওখানে যাইতাম—এইরূপ নিত্য নিয়ম ছিল। তাঁহাদের ওখানে, সহজভাবের কথা বার্ত্তায় আমাদের অনেক জ্ঞান লাভ হইত। মিসেস্ কাগলন্ সেখানে আসা অবধি আমাদের এইরূপ চলিত। উপরি কথিত অনুসারে, ডেপুটী ইনেস্পেক্টরের সমস্ত স্কুলের পরিদর্শন শেষ হইলে বালিকা-বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণের সময় মিসেস্ কাগলন্ এখানে আসিয়াছিলেন। তাঁহার হাত দিয়াই পুরস্কার দেওয়া হইবে এইরূপ পরামর্শ করিয়া তিনি ও রায়সাহেব দেশমুখ, এই সম্বন্ধে আমার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়া দিনস্থির করিবার জন্য আমাদের বাড়ী আসিলেন। "উনি" দিন প্রভৃতি স্থির করিয়া দিলেন। এই পুরস্কার বিতরণ-সভায় মেয়ে যত বেশী জড়ো হইবে ততই সভার শোভাবৃদ্ধি হইবে। তখন, কি করিলে বেশী মেয়ে আসিয়া জমে তৎসম্বন্ধে পরামর্শ করিয়া এইরূপ স্থির হইল যে, কোন বনেদি ঘরের ও জায়গীরদার প্রভৃতির মেয়েরা শুধু আমন্ত্রণ চিঠিতে আসিবে না; এখান হইতে মেয়েরা গিয়া তাহাদিগকে মুখে নিমন্ত্রণ করিতে হইবে—তবে তাহারা আসিবে। আমাদের দুই ঘরের মেয়েরা এই কাজের ভার গ্রহণ করিলে পর, সহরের উকীল মণ্ডলীর ও অন্য কার্য্যকারীদিগের মেয়েরা যাহাতে আইসে তাহার তদ্‌বিষয় আমি করিতেছি, এই কথা

ডেপুটি বলিয়া চলিয়া গেলেন। দেশমুখের দুই মেয়ে ও আমি—আমরা এই তিন জন বাড়ী গিয়া, ফর্দ্দে লেখা নাম অনুসারে নিমন্ত্রণ করিব এইরূপ স্থির করিয়া, দেশমুখও চলিয়া গেলেন। যেরূপ স্থির হইল তদনুসারে দুই এক দিনের মধ্যেই আমি ও দেশমুখের মেয়েরা, ঘরে ঘরে গিয়া নিমন্ত্রণ করিলাম। তদনুসারে, পুরস্কার বিতরণের দিনে প্রায় ৫০।৬০ জন মেয়ে আসিয়া জমিয়াছিল। এই সংখ্যা তখন আমাদের খুব বেশী বলিয়া মনে হইয়াছিল। কারণ নাশিকের স্ত্রী পুরুষের একত্র সম্মিলন এই প্রথম ঘটিয়াছিল। সহরের অন্য পুরুষ-মণ্ডলীর নিমন্ত্রণ করা হয় নাই। কিন্তু তাহার ভিতর স্ত্রীশিক্ষার প্রার্থী ও অগ্রণী এইরূপ ১০। ১২ জন মাত্র ছিলেন। নির্দ্ধারিত কার্য্যক্রম অনুসারে সমস্ত মণ্ডলী সমবেত হইলে মেয়েরা ঈশ্বর-স্তবমূলক ও স্বাগত-মূলক কবিতা আবৃত্তি করিল। ডেপুটী গত বৎসরের রিপোর্ট পড়িয়া শুনাইলেন। তাহার পর, মিসেস্ কাগলনের হাত দিয়া পুরস্কার বিতরণ হইলে পর, মিসেস্ কাগলনের প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বীকার ও সমবেত বালিকাদিগের প্রতি উত্তেজনা ও উপদেশ আছে এইরূপ কিছু রচনা "উনি" লিখিয়া দিয়াছিলেন, তাহা দেশমুখ-গৃহিণী উঠিয়া পাঠ করিবেন এইরূপ স্থির হইয়াছিল। কিন্তু পাঠের সময় উপস্থিত হইলে তিনি তাহা পাঠ করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় "উনি" আমাকে পাঠ করিতে বলিলেন। তদনুসারে ঐ কাগজ পড়িয়া শুনাইয়া, মিসেস্ কাগলন্ ও সমবেত মহিলাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া আমি নীচে বসিলাম। তখনি ডেপুটি মালা ও তোড়ার থালা আমার সম্মুখে আনিয়া রাখিলেন। আমি তাহা হইতে একটা মালা মিসেস্ কগলনের গলায় প্রথমে পরাইয়া, তাহার পর তাঁহার মাতা ও ভগিনীর গলায় পরাইয়া একটা মালা সেই থালায় নিক্ষেপ করিয়া থালাখানি ডেপুটীর সম্মুখে সরাইয়া দিলাম। এই মালা সাহেবের গলায় পরাইয়া দিতে হইবে এইরূপ ডেপুটি আমাকে খুব আস্তে আস্তে বলিলেন। আমি তখনই সাফ্ অস্বীকার করিলাম এবং তাঁহার উপর আমার রাগ হইল। রাওসাহেব দেশমুখ আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। তিনি মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিয়া একেবারে উঠিয়া গিয়া ডেপুটীর হস্তধৃত থালা হইতে মালা উঠাইয়া লইয়া কাগলন্ সাহেবের গলায় পরাইয়া দিলেন এবং ফুলের তোড়া ও আতর প্রভৃতিও দিলেন। এদিকে দেশমুখের দুই মেয়ে ও ছেলে, সমবেত সমস্ত মহিলাদিগকে হলুদ, কুঙ্কুম, পানের খিলি, ফুলের মালা, আতর গোলাব দিবার পর, সভা ভঙ্গ হইল এবং আমরা আপন আপন গৃহে চলিয়া আসিলাম।

রাত্রে শুইতে যাইবার সময়, 'উনি' একটু ঠাট্টার ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের সভার কাজ বেশ সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হ'ল তো? কিন্তু মহিলাদের সম্বন্ধে এতটা পক্ষপাত কেন করা হল? সভার উদ্যোগ আয়োজন সমস্তই ত পুরুষদের দ্বারাই হয়েছে। উপস্থিত মহিলাদের মধ্যে তুমি শুধু তিন জনের গলায় মালা পরাইয়া দিলে কিন্তু বেচারা কাগলন সাহেবকে কেন উপেক্ষা করলে?" আমি বলিলাম "আমি যদি হিন্দু না হতুম তাহলে আমি এ বিষয়ে কিছু মনে করতুম না। ডেপুটী হিন্দু ও একজন বিজ্ঞ লোক হয়েও সাহেবের গলায় মালা দিতে বল্লেন এতেই আমার আশ্চর্য্য মনে হল, রাগও হল।"

"কিন্তু তোমার পাশে দেশমুখ ছিলেন, তিনিই তোমাকে ত বাঁচিয়ে দিলেন?" আমি বলিলাম "তাঁর কথা কেন? তাঁর মহত্ত্বের কথা ছেড়ে দেও, তিনি ত ওরকম অবিবেচক নন।" এই কথার পর "উনি" বলিলেন যে "তুমি ডেপুটীর উপর অনর্থক রাগ করেছ, তাঁর কোন খারাপ মৎলব ছিল না, তিনি সহজভাবে বলেছিলেন। অনেক সময়, এই বিষয় প্রথমে মনে আসে না; যাই হোক, এরকম ব্যবহার কম দেখা যায় বটে।" তার পর দিন, লক্ষ্মীবাই আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। তিনি বলিলেন যে "কালকের সভাটা আমাদের বেশ হয়েছিল। কিন্তু ডেপুটির চালাকিটা তুমি চট্ করে ধরতে পেরেছিলে দেখে আমার খুব ভাল লেগেছিল। আমিও বড় মুস্কিলে পড়েছিলুম"—এইরূপ তিনি বলিলেন। ইহার পর, আমাদের তিন মিত্রাণীর মধ্যে আবার ছাড়াছাড়ি হইয়া গেল। সৌ, সখু ননদ শ্বশুরবাড়ী চলিয়া গেলেন, "ধুলে"তে হঠাৎ আমাদের বদ্‌লী হল। সৌ. লক্ষ্মীবাই নাশিকেই রহিলেন। তাঁহার সহিত আমাদের আর সাক্ষাৎ হয় নাই। কারণ, পরে, এক বৎসরের মধ্যেই তিনি মারা যান।

ইতি পঞ্চম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

ঋগ্বেদের প্রথম অনুবাদ।

কাশীধাম হইতে ১৭৬৯ শকের মধ্যভাগে দেবেন্দ্রনাথের ফিরিয়া আসা অবধি আমরা দেখি যে ব্রাহ্মসমাজে ধর্ম্মনির্ণয় সংক্রান্ত একটা বিশাল কার্য্য-স্রোত বহিয়াছিল। পিতামাতা যেমন বাল্যকালে সন্তানের শরীর রক্ষার প্রতিই সমধিক মনোযোগী

হয়েন, এবং তাহার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার মানসিক উন্নতিরও প্রতি দৃষ্টি করেন, সেইরূপ ব্রাহ্মসমাজেরও প্রথমাবস্থায় পাঠশালা, বিদ্যালয়, মাসিক পত্র প্রভৃতির সাহায্যে লোকবুদ্ধি দ্বারা তাহার বহিরঙ্গের পরিপুষ্টি সাধনে ব্রাহ্মগণ অধিকতর মনোযোগ প্রদান করিয়াছিলেন, এবং ক্রমে ব্রাহ্মসমাজের উপযুক্ত প্রতিষ্ঠা হইলে ধর্ম্মতত্ত্ব নির্ণয় প্রভৃতি উপায়ে তাহার আভ্যন্তরীণ উন্নতির জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন। বলিতে গেলে এই ধর্ম্মনির্ণয়ের প্রথম সোপান হইয়াছিল ঋগ্বেদের অনুবাদ।

আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়া আসিয়াছি যে ১৭৬৯ শকের বৈশাখ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার শিরোদেশ "অপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ" প্রভৃতি মানসিক স্বাধীনতার বীজমন্ত্রে সুশোভিত হইয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথ ১৭৬৯ শকের আশ্বিনমাসে বিশেষভাবে বেদ আলোচনা করিবার জন্য কাশীধামে যাত্রা করিয়াছিলেন। সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে কাশীযাত্রার পূর্ব্বেই দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্মবিদ্যার তুলনায় বেদাদি শাস্ত্রসমূহের অশ্রেষ্ঠত্ব ও অনিত্যতা বিষয়ক সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। কাশীধামে গিয়া বেদ আলোচনা দ্বারা তাঁহার সেই সিদ্ধান্ত দৃঢ়তর হইয়াছিল মাত্র।

বেদাদি আলোচনার ফলে দেবেন্দ্রনাথ কয়েকটী তত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন—(১) বেদের অনেকাংশ "অপরা বিদ্যা" এবং দেবতাদিগের যাগযজ্ঞমূলক ; (২) অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র, সূর্য্য, ইহাঁরা বেদের পুরাতন দেবতা এবং ইহাঁদের লইয়াই যাগযজ্ঞের মহা আড়ম্বর ; (৩) ঋষিরা যে কেবল জড় চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, অগ্নিকে উপাসনা করিতেন তাহা নহে—তাঁহারা সেই এক পরমেশ্বরকেই অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি নানা প্রকারে উপাসনা করিতেন—একং রূপং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ। এই তিনটী তত্ত্বের যাথার্থ্য এবং সেই সঙ্গে তন্ত্রপুরাণের দেবতা ও বেদের দেবতাদিগের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করিবার জন্য দেবেন্দ্রনাথ ঋগ্বেদের অনুবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি বলেন—"তন্ত্রপুরাণের দেবতা আর বেদের দেবতা, ইহাঁদের অনেক প্রভেদ। কিন্তু এদেশের সাধারণ লোকদের মধ্যে এ ভেদজ্ঞান নাই। ইহাদের বিশ্বাস যে বেদের মধ্যেই কালী দুর্গাপূজার বিধি আছে।" তাঁহার ঋগ্বেদ অনুবাদের ইচ্ছা জাগ্রত হইবার আর একটী কারণ এই যে তাহা দ্বারা ভারতীয় আর্য্যগণের আচার ব্যবহার ও ধর্ম্মের ক্রমাভিব্যক্তি সম্বন্ধে নানা সত্যতত্ত্ব আবিষ্কৃত হইবার সম্ভাবনা এবং সেই সকল তত্ত্ব প্রচারিত হইলে বেদের নিত্যতা ও অভ্রান্ততা বিষয়ে সাধারণের ভ্রান্ত সংস্কার আপনা হইতেই চলিয়া গিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারে বিশেষ সহায়তা হইবে। এই প্রকার চিন্তা করিয়া তিনি কাশীর এক পণ্ডিতের সাহায্যে ঋগ্বেদের অনুবাদে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই অনুবাদের ভূমিকা স্বরূপে যে সৌম্যভাব ও উদারতাপূর্ণ "ঋগ্বেদ অনুবাদকের উক্তি" প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"যদিও বেদের মধ্যে পরব্রহ্মবিষয়ক শ্রুতিসকলই আমাদিগের মুখ্যরূপে আলোচনীয় কিন্তু সেই ব্রহ্মপর শ্রুতিসমুদয় বেদের কিয়দংশ মাত্র, এজন্য সমস্ত বেদের মর্ম্ম অবগত হওয়া আবশ্যক। অতএব ঈশ্বরের অনুগ্রহে প্রথমত ঋগ্বেদ বঙ্গভাষাতে অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, ঈশ্বরেচ্ছায় ইহার সমাপ্তি হইলে ক্রমে ক্রমে যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব বেদও এতদনুসারে প্রকাশিত হইতে পারিবেক। প্রতি বেদের দুই অংশ—সংহিতা এবং ব্রাহ্মণ। সম্প্রতি ঋগ্বেদের সংহিতা অংশ অনুবাদ আরম্ভ হইল। এই ঋগ্বেদের সংহিতাতে দশসহস্রেরও অধিক ঋক্ আছে, সুতরাং ইহাও অল্পদিনে ও অল্প পরিশ্রমে সমাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নহে। সম্প্রতি আশাকে অবলম্বন করিয়া এই কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিলাম, ইহার শেষ করিবার ভার পরমেশ্বরের প্রতিই আছে।

"যিনি তাবৎ শুভাশুভের বিধানকর্ত্তা তাঁহার নিকট হইতে শুভবস্তু প্রার্থনা করা এবং তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা সমুদয় বেদের তাৎপর্য্য হইয়াছে। ইন্দ্রিয়ের অগোচর পরব্রহ্ম যে ক্রমাগত আমাদিগের মঙ্গলবিধান করিতেছেন ইহা সাধারণরূপে প্রত্যক্ষ প্রতীতি করাইবার জন্য সূর্য্য, ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি দেবতাদিগের উপাসনা বেদে বাহুল্যরূপে বিধান রহিয়াছে। সূর্য্যের অন্তর্যামী যে কোনও পুরুষ তিনি সূর্য্যদেবতা, বায়ুর অন্তর্যামী যে কোনও পুরুষ তিনি বায়ুদেবতা, অগ্নির অন্তর্যামী যে কোনও পুরুষ তিনি অগ্নিদেবতা, ইহাতে বৈদি-

কেরা বাহ্য জড় সূর্য্য প্রভৃতিকে উপাসনা করেন না, কিন্তু তাহার অন্তর্যামী যে চৈতন্য পুরুষ তাঁহারই উপাসনা করেন। সূর্য্য, বায়ু প্রভৃতির দ্বারা প্রত্যক্ষ উপকার প্রাপ্ত হইয়াই তৎক্ষণাৎ তাহার অন্তর্যামী পুরুষ সূর্য্যদেবতা, বায়ুদেবতা প্রভৃতির প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে মন উদ্যত হয়। সূর্য্য, বায়ু প্রভৃতির অন্তর্যামী পুরুষ পরমেশ্বর ভিন্ন নহে, কারণ তিনি সকলের অন্তর্যামী, অতএব সূর্য্যদেবতা বা বায়ুদেবতার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করাতে পরমেশ্বরের প্রতিই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা হইল। ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যেতে ভিন্ন ভিন্ন নাম দ্বারা পরমেশ্বরকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া সকাম উপাসনা করিতে তাবৎ বিধি আছে, যাবৎ বেদান্তপ্রতিপাদ্য অনন্ত পরমেশ্বরের স্বরূপ জানা না হয়। এই ঋগ্বেদের ঋক্ সকল প্রায় দেবতাদিগের স্তোত্র, এই ঋক্সকল ভিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন ঋষি দ্বারা দৃষ্ট হইয়াছে।"

ঋগ্বেদের পূর্ব্বার্দ্ধ মূল এবং কতকাংশ ভাষ্য তত্ত্ববোধিনী সভা কর্ত্তৃক সংগৃহীত হওয়াতে এই অনুবাদ কার্য্যে বড়ই সুবিধা হইয়াছিল। ১৭৬৯ শকের ১লা ফাল্গুন তারিখের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে ঋগ্বেদ সংহিতা দেবেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক অনুবাদিত হইয়া প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। এই দিবস ভারতের একটী স্মরণীয় দিবস সন্দেহ নাই। বেদ যে অনুবাদিত হইতে পারে এবং সত্য সত্যই অনুবাদিত হইয়া সাধারণ্যে প্রকাশিত হইবে, ইহা সেকালে ভারতবাসীর স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। এই অনুবাদই উত্তরকালের শাস্ত্রানুবাদ বিষয়ে যে পথপ্রদর্শক হইয়াছিল তাহা বলা বাহুল্য। বেদ অনুবাদ করিবার কল্পনা দেবেন্দ্রনাথের সাহস ও প্রতিভা এবং দেবেন্দ্রপ্রমুখ ব্রাহ্মদিগেই মানসিক স্বাধীনতার প্রভূত পরিচয় দিতেছে। এই অনুবাদ যে বর্ত্তমান কালের কি উপকার সাধন করিয়াছে তাহা চক্ষুষ্মান ব্যক্তিমাত্রেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ঋগ্বেদের অনুবাদ কতকটা অগ্রসর হইলে পর অধ্যাপক মোক্ষমূলর ঋগ্বেদ প্রকাশে হস্তক্ষেপ করেন। অবশেষে মোক্ষমূলর যখন সমগ্র ঋগ্বেদ প্রায় প্রকাশিত করিয়াছেন, তখন দেবেন্দ্রনাথ নিজের ঋগ্বেদ প্রকাশ বন্ধ করিয়া দিলেন। ১৭৯৩ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রথম মণ্ডলের ষোড়শ অনুবাদের তৃতীয় সূক্তের ত্রয়োদশ ঋক্ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়া বন্ধ হইয়া গেল। দেবেন্দ্রনাথের এই বিচার যে সুযুক্তিপূর্ণ হয় নাই তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না।

আমরা ঋগ্বেদসংহিতার প্রথম মন্ত্রের প্রথম সূক্তের দেবেন্দ্রকৃত টীকা ও অনুবাদসহ উদ্ধৃত করিয়া এই অধ্যায়ের উপসংহার করিলাম।

প্রথম মণ্ডলস্য প্রথমানুবাকে প্রথমং সূক্তং।

গায়ত্রং ছন্দঃ মধুচ্ছন্দাঋষিঃ * অগ্নির্দ্দেবতা।

১। অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং।
হোতারং রত্নধাতমং।

১। 'যজ্ঞস্য' 'পুরোহিতং' 'দেবং' 'ঋত্বিজং' 'হোতারং' হোতৃ নামকং ঋত্বিজং 'রত্নধাতমং' রত্নানি যাগফলরূপাণি তেষাং অতিশয়েন ধারয়িতারং 'অগ্নিং' 'ঈড়ে' স্তৌমি।

১। যজ্ঞের পুরোহিত, † দীপ্তি বিশিষ্ট, ‡ হোতা নামক ঋত্বিক, ‖ যাগ ফলের ধারয়িতা যে অগ্নি তাঁহাকে স্তব করি।

২। অগ্নিঃ পূর্ব্বেভিঋষিভিরীড্যোনূতনৈরুত।
সদেবাং এহবক্ষতি।

২। 'অগ্নিঃ' 'পূর্ব্বেভিঃ ঋষিভিঃ' পূর্ব্বকালিকৈঃ ঋষিভিঃ 'নূতনৈঃ' ইদানীন্তনৈঃ 'উত' অপি 'ঈড্যঃ' স্তুত্যঃ। 'সঃ' অগ্নিঃ এহ আ ইহ 'ইহ' যজ্ঞে 'দেবাং' দেবান্ 'আ-বক্ষতি' আবক্ষতি আবহতু।

২। পূর্ব্বকালিক এবং ইদানীন্তন ঋষিদিগের দ্বারা অগ্নি স্তুত্য হয়েন। সেই অগ্নি এযজ্ঞে দেবতা সকলকে আহ্বান করুন।

৩। অগ্নিনা রয়িমশ্নবৎ পোষমেব দিবে দিবে।
যশসম্বীরবত্তমং।

---

* মধুচ্ছন্দা বিশ্বামিত্রের পুত্র।

† যে প্রকার পুরোহিত দ্বারা যজমানের তাবৎ কর্ম্ম সম্পন্ন হয়, তদ্রূপ অগ্নি দ্বারা যজ্ঞের তাবৎ কর্ম্ম সম্পন্ন হয়, এই হেতু অগ্নিকে যজ্ঞের পুরোহিত রূপে বেদে বলিয়াছেন।

‡ দেব শব্দের অর্থ দীপ্তি বিশিষ্ট এবং দানগুণবিশিষ্টও বটে; অগ্নি দ্বারা যজ্ঞ সম্পন্ন হইলে পুণ্য লাভ হয় এ নিমিত্তে অগ্নি দানগুণবিশিষ্টরূপে বেদে উক্ত হইয়াছে।

‖ দেবতাদিগের যজ্ঞেতে হোতা নামক ঋত্বিক্ অগ্নি হয়েন। অগ্নির্বৈ দেবানাং হোতেতি শ্রুতিঃ।

৩। 'যশসং' দানাদিনা যশোযুক্তং 'বীরবত্তমং' অতিশয়েন বীরপুরুষোপেতং 'দিবে দিবে' প্রতি দিনং 'পোষং এব' পুষ্যমানতয়া বর্দ্ধমানং এব 'রয়িং' ধনং 'অগ্নিনা' 'অশ্নবৎ' প্রাপ্নোতি।

৩। দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে এমত যশোযুক্ত এবং বীরপুরুষ বিশিষ্ট যে ধন * তাহাকে অগ্নি দ্বারা প্রাপ্ত হয়।

৪। অগ্নে যং যজ্ঞমধ্বরং বিশ্বতঃ পরিভূরসি।
সইদ্দেবেষু গচ্ছতি।

৪। হে 'অগ্নে' ত্বং 'যং' 'অধ্বরং' হিংসারহিতং 'যজ্ঞং' 'বিশ্বতঃ' সর্ব্বাসুদিক্ষু 'পরিভূঃ অসি' পরিতঃ প্রাপ্তবানসি 'সইৎ' স এব যজ্ঞঃ 'দেবেষু' তৃপ্তিং জনয়িতুং স্বর্গে 'গচ্ছতি'।

৪। হে অগ্নি যে হিংসারহিত যজ্ঞকে তুমি সম্যক প্রাপ্ত হও, সেই যজ্ঞ দেবতাদিগকে তৃপ্তি জন্মাইবার নিমিত্তে স্বর্গে গমন করেন।

৫। অগ্নির্হোতা কবিক্রতুঃ সত্যশ্চিত্রশ্রবস্তমঃ।
দেবোদেবেভিরাগমৎ।

৫। 'হোতা' হোমনিষ্পাদকঃ 'কবিক্রতুঃ' ক্রান্তকর্ম্মা 'সত্যঃ' অনৃতরহিতঃ 'চিত্রশ্রবস্তমঃ' অতিশয়েন চিত্র কীর্ত্তিযুতঃ 'অগ্নিঃ' 'দেবঃ' 'দেবেভিঃ' দেবৈঃ সহিতঃ 'আগমৎ' সমাগচ্ছতু অস্মিন্ যজ্ঞে।

৫। হোমনিষ্পাদক, ক্রান্তকর্ম্মা, মিথ্যারহিত, বিচিত্র কীর্ত্তিযুক্ত, অগ্নিদেবতা অন্য অন্য দেবতার সহিত এই যজ্ঞে আগমন করুন।

৬। যদঙ্গদাশুষেত্বমগ্নে ভদ্রং করিষ্যসি।
তবেত্তৎসত্যমঙ্গিরঃ।

৬। 'অঙ্গ' হে 'অগ্নে' 'দাশুষে' হবির্দ্দত্তবতে যজমানায় 'ত্বং' 'যৎ' 'ভদ্রং' 'করিষ্যসি' 'তৎ' ভদ্রং 'তবইৎ' তবৈব 'অঙ্গিরঃ' অগ্নে। এতৎ 'সত্যং'।

৬। হে অগ্নি হবিদাতা যজমানের যে কিছু কল্যাণ তুমি কর সে কল্যাণ তোমারই †; ইহা অতি সত্য।

৭। উপত্বাগ্নে দিবে দিবে দোষাবস্তর্ধিয়া বয়ং।
নমোভরন্তএমসি।

৭। হে 'অগ্নে' 'দিবে দিবে' প্রতিদিনং 'দোষাবস্তঃ' রাত্রাবহনি চ 'ধিয়া' বুদ্ধ্যা 'বয়ং' 'নমঃ ভরন্তঃ' নমস্কারং সম্পাদয়ন্তঃ 'উপ ত্বা' ত্বৎসমীপে 'এমসি' এমঃ আগচ্ছামঃ।

৭। হে অগ্নি রাত্রি দিন বুদ্ধি পূর্ব্বক নমস্কার করত তোমার নিকটে আমরা প্রত্যহ আগমন করি।

৮। রাজন্তমধ্বরাণাং গোপামৃতস্য দীদিবিং।
বর্দ্ধমানং স্বেদমে।

৮। ত্বাং অগ্নিং কীদৃশং 'রাজন্তং' দীপ্যমানং 'অধ্বরাণাং' হিংসারহিতানাং যজ্ঞানং 'গোপাং' রক্ষকং 'ঋতস্য' অবশ্যম্ভাবিনাঃ কর্ম্মফলস্য 'দীদিবিং' পৌনঃপুন্যেন দ্যোতকং। 'স্বেদমে' স্বকীয়ে গৃহে যজ্ঞশালায়াং হবির্ভিঃ 'বর্দ্ধমানং'।

৮। তুমি দীপ্যমান, তুমি হিংসারহিত যজ্ঞের রক্ষক, কর্ম্মফলের পুনঃ পুনঃ স্মারক এবং যজ্ঞশালাতে হবি দ্বারা বর্দ্ধমান হইয়া থাক, তোমার নিকটে আমরা প্রত্যহ আগমন করি।

৯। সনঃ পিতেব সুনবেঽগ্নে সূপায়নোভব।
সচস্বানঃ স্বস্তয়ে। ১।১।২

৯। হে 'অগ্নে' 'সঃ' ত্বং অগ্নিঃ 'নঃ' অস্মাকং 'পিতা ইব' 'সুনবে' পুত্রার্থং 'সূপায়নঃ' সুপ্রাপঃ 'ভব'। 'নঃ' অস্মাকং 'স্বস্তয়ে' কল্যাণায় 'সচস্বা' সচস্ব যুক্তোভব।

৯। হে অগ্নি, পুত্র যেমন পিতার সুপ্রাপ্য তদ্রূপ তুমি আমাদিগের সুপ্রাপ্য হও, আমাদিগের কল্যাণীয় হও। ১।১।২॥

* ধন দ্বারা যশ হয় এবং ধন দ্বারা সামর্থ্য হয় এ নিমিত্তে ধন যশোযুক্ত এবং বীরপুরুষবিশিষ্ট।

† যদি ফলাকাঙ্ক্ষী যজমানের কল্যাণ হয় তবেই তাঁহার নিকট হইতে অগ্নি পুনঃ পুনঃ হবি প্রাপ্ত হইতে পারেন, সুতরাং যজমানের মঙ্গলে অগ্নির মঙ্গল হয়।

বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত—

গীতা-রহস্য।

তৃতীয় প্রকরণ।

কর্ম্মযোগ শাস্ত্র।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদিত)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

তস্মাদ্যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্ ।*

কোন শাস্ত্রের জ্ঞানলাভার্থ যদি কোন ব্যক্তির পূর্ব্ব হইতে ইচ্ছা না থাকে, তবে সে ব্যক্তি শাস্ত্র শিক্ষার অনধিকারী হয়; এবং এইরূপ অনধিকারী ব্যক্তিকে শাস্ত্র বলা আর উল্টানো কলসে জল ভরা—একই কথা। শিষ্যের তাহা হইতে কোন ফল হয় না,—শুধু তাহা নহে, গুরুরও অকারণে শ্রম হয়; দুজনেরই সময় ব্যর্থ হইয়া যায়। জৈমিনি ও বাদরায়ণের সূত্রের আরম্ভে "অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" ও "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এইরূপ সূত্র এই কারণেই স্থাপিত হইয়াছে। ব্রহ্মোপদেশ যেরূপ মুমুক্ষুকে, ধর্ম্মোপদেশ যেরূপ ধর্ম্মজিজ্ঞাসুকে দেওয়া উচিত, সেইরূপ, সংসারে কর্ম্ম কিরূপে করিতে হইবে, ইহার তত্ত্ব জানিবার ইচ্ছা কিংবা জিজ্ঞাসা যাহার হইয়াছে তাহাকেই কর্ম্মশাস্ত্রোপদেশ দেওয়া উচিত; এবং এই জন্যই প্রথম প্রকরণে 'অথাতো' করিয়া, দ্বিতীয় প্রকরণে কর্ম্মজিজ্ঞাসার স্বরূপ ও কর্ম্মযোগশাস্ত্রের গুরুত্ব সম্বন্ধে আমি একটা মোটামুটি আলোচনা করিয়াছি। অমুক স্থানে আমার আট্‌কাইতেছে এইরূপ প্রথমেই অনুভবে আসা ব্যতীত, আটক বাধা হইতে মুক্তিলাভের পক্ষে শাস্ত্রের যে কতটা গুরুত্ব তাহা আমাদের উপলব্ধি হয় না এবং উহার গুরুত্ব উপলব্ধি না হওয়ায়, কেবল মুখে আওড়ানো শাস্ত্র পরে মনে রাখাও কঠিন হইয়া পড়ে। এই জন্য, সদ্‌গুরু প্রথমত শিষ্যের জিজ্ঞাসা অর্থাৎ জানিবার ইচ্ছা আছে কিনা তাহাই দেখেন, যদি না থাকে তবে তাহাকে জাগ্রত করিবার জন্য প্রযত্ন করিয়া থাকেন। গীতার কর্ম্মযোগশাস্ত্রের বিচার-আলোচনা এই পদ্ধতি অনুসারেই করা হইয়াছে। যে যুদ্ধে নিজের হাতে পিতৃবধ ও গুরুবধ হইয়া সকল রাজাদিগের ও ভ্রাতাদিগেও ক্ষয় হইবার কথা, সেই ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত কি অনুচিত, এই সংশয় অর্জ্জুনের মনে উদয় হওয়ায় অর্জ্জুন যুদ্ধ ছাড়িয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিতে যখন প্রস্তুত হইলেন, এবং প্রাপ্ত কর্ম্ম ছাড়িয়া দেওয়া পাগ্‌লামি ও দুর্ব্বলতার লক্ষণ হওয়ায় তাহাতে স্বর্গপ্রাপ্তি হওয়া দূরে থাকুক, উল্টা তোমার শুধু দুষ্কীর্ত্তিই হইবে, এইরূপ সাধারণ ধরণের যুক্তিবাদে যখন তাহার সমাধান হইল না তখন "অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে"—তুমি অশোচ্যের জন্য শোক করিতেছ এবং ব্রহ্মজ্ঞানের লম্বা লম্বা কথা আমাকে বলিতেছ"—এইরূপ শ্রীকৃষ্ণ একটু উপহাসের ভাবে বলিয়া অর্জ্জুনকে কর্ম্মজ্ঞানের উপদেশ দিয়াছেন। অর্জ্জুনের সংশয় ভিত্তিহীন না হওয়ায়, বড় বড় পণ্ডিতেরাও প্রসঙ্গ বিশেষে "কি করিবে, কি করিবে না" এই বিষয়ে যেরূপ হতবুদ্ধি হইয়া পড়েন তাহা আমি পূর্ব্ব প্রকরণে দেখাইয়াছি। কিন্তু কর্ম্মাকর্ম্মের বিচারে অনেক কঠিন সমস্যার উদ্ভব হয় বলিয়া কর্ম্ম ত্যাগ করা যুক্তিসিদ্ধ নহে; যাহাতে জাগতিক কর্ম্মের লোপ না হইয়া, কেবলমাত্র কর্ম্মজনিত পাপ বা বন্ধন আমাতে না লাগে, এই প্রকারের 'যোগ' অর্থাৎ যুক্তি বুদ্ধিমান ব্যক্তির মানিয়া লওয়া আবশ্যক; অতএব হে অর্জ্জুন তুমিও এই যুক্তি স্বীকার কর—তস্মাদ্‌যোগায় যুজ্যস্ব—ইহা অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রথম বক্তব্য। এই 'যোগ'ই "কর্ম্মযোগশাস্ত্র"। এবং অর্জ্জুন যে সমস্যায় পড়িয়াছিলেন, সে সমস্যা-প্রসঙ্গ অলৌকিক না হওয়ায়, সংসারে এই প্রকারের ছোট বড় অনেক সংকট সকলের নিকটেই উপস্থিত হয়; অতএব, ভগবদ্‌গীতায় কর্ম্মযোগ শাস্ত্রের যে বিচার করা হইয়াছে তাহা আমাদের সকলেরই শিক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু যে-কোন শাস্ত্র হউক না, তাহার প্রতিপাদনে প্রযুক্ত মুখ্য শব্দসমূহের অর্থ ঠিক্ বুঝিবার জন্য, ঐ সকল শব্দের ব্যাখ্যা করিয়া সেই শাস্ত্র প্রতিপাদনের মূল পন্থাটাও প্রথমে সংক্ষেপে বলা আবশ্যক। নচেৎ পরে অনেক প্রকার বুঝিবার-ভুল কিংবা গণ্ডগোল

* অতএব তুমি যোগ অবলম্বন কর। কর্ম্ম করিবার যে শৈলী, চাতুর্য্য, কিংবা কুশলতা তাহাকেই যোগ বলে।

উৎপন্ন হইতে পারে। এই জন্য এই সাধারণ পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া প্রথমে এই শাস্ত্রে ব্যবহৃত কতকগুলি শব্দের অর্থ-পরীক্ষা অগত্যা করিতে হইতেছে।

তন্মধ্যে, প্রথম শব্দ 'কর্ম্ম'। 'কর্ম্ম' শব্দ কৃ-ধাতু হইতে বাহির হওয়ায় তাহার অর্থ 'করা', 'ব্যাপার', 'আচরণ'—এইরূপ; এবং এই সাধারণ অর্থে ঐ শব্দ ভগবদ্গীতায় ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা বলিবার কারণ এই, মীমাংসাশাস্ত্র কিংবা অন্যত্র এই শব্দের যে সংকুচিত অর্থ আছে, তাহা মনে আনিয়া পাঠক যেন ভ্রমে পতিত না হন। যে কোন ধর্ম্মই ধর না কেন, তাহাতে ঈশ্বরকে লাভ করিবার জন্য, কোন একটা কিছু কর্ম্ম করিতে বলা হইয়াছে। প্রাচীন বৈদিক ধর্ম্ম অনুসারে বলিতে হইলে, যজ্ঞযাগই কর্ম্ম; এবং এই যজ্ঞযাগ কিরূপে করিবে এই সম্বন্ধে বৈদিক গ্রন্থাদির স্থানে স্থানে যে অনেক বিরোধী বচন ও কখন কখন প্রতীয়মান বিরোধী বচন আছে তাহাদিগের সঙ্গত সমন্বয় কিরূপে হইতে পারে তাহা জৈমিনীয় পূর্ব্বমীমাংসা-শাস্ত্র দেখাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। জৈমিনীয় মতানুসারে, এই বৈদিক কিংবা শ্রৌত যজ্ঞযাগের অনুষ্ঠান করাই মুখ্য প্রাচীন ধর্ম্ম।

মানুষ যাহা কিছু করে সবই যজ্ঞের জন্য করে। মানুষের ধন পাইতে হইলে, যজ্ঞের জন্যই পাওয়া চাই। এবং ধান্য সংগ্রহ করিলেও তাহা যজ্ঞের জন্যই বুঝিতে হইবে (সভা. শাং. ২৬. ২৫)। যে হেতু, যজ্ঞ করিবে ইহাই দেবতাদিগের আদেশ, অতএব যজ্ঞের জন্য অনুষ্ঠিত কোন কর্ম্ম স্বতন্ত্ররূপে মনুষ্যের ফলদায়ক হয় না, তাহা যজ্ঞের সাধন, স্বতন্ত্র সাধ্য নহে। তাই, যজ্ঞ হইতে যে ফল পাওয়া যায় তাহা যজ্ঞেরই অন্তর্ভূত; উহার অন্য পৃথক্ ফল নাই। কিন্তু যজ্ঞার্থে অনুষ্ঠিত এই সকল কর্ম্ম স্বতন্ত্র ফলদায়ক না হইলেও শুধু যজ্ঞের দ্বারাই স্বর্গপ্রাপ্তি (অর্থাৎ মীমাংসকের মতে একপ্রকারের সুখপ্রাপ্তি) হয় ও সেই স্বর্গপ্রাপ্তির জন্যই কর্ত্তাপুরুষ অনুরাগের সহিত যজ্ঞ করিয়া থাকে। সুতরাং স্বয়ং যজ্ঞকর্ম্মই পুরুষার্থ ইহা স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। যে বস্তু সম্বন্ধে মনুষ্যের প্রীতি থাকে ও তাহা পাইবার ইচ্ছা হয় তাহাকেই পুরুষার্থ বলে (জৈ, সূ, ৪।১।১ ও ২) যজ্ঞের এক পর্য্যায় শব্দ—'ক্রতু'; তাই 'যজ্ঞার্থের বদলে "ক্রত্বর্থ" এই শব্দও ব্যবহৃত হয়। 'যজ্ঞার্থ' (ক্রত্বর্থ) অর্থাৎ স্বতন্ত্ররূপে ফলদায়ক নহে বলিয়া অবন্ধক এবং পুরুষার্থ অর্থাৎ পুরুষের ফলদায়ক বলিয়া বন্ধক, এইরূপ সর্ব্বকর্ম্ম দুই বর্গে বিভক্ত হইয়া থাকে। সংহিতা ও ব্রাহ্মণগ্রন্থে সমস্তই যাগযজ্ঞাদিরই বর্ণনা। ঋগ্বেদ সংহিতায় ইন্দ্রাদি দেবতাদিগের স্তুতিপর সূক্তি আছে সত্য; কিন্তু তাহাদের বিনিয়োগ যজ্ঞের সময়েই কর্ত্তব্য হওয়ায় সমস্ত শ্রুতি গ্রন্থ যজ্ঞাদি কর্ম্মেরই প্রতিপাদক, এইরূপ মীমাংসক বলেন। বেদের অন্তর্ভূত যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে স্বর্গপ্রাপ্তি হয়, নতুবা হয় না; অতএব ঐ যাগযজ্ঞ তুমি অজ্ঞানে কর কিংবা ব্রহ্মজ্ঞানপূর্ব্বক কর একই ফল—এইরূপ এই কর্ম্মনিষ্ঠ যাজ্ঞিক কিংবা নিছক্ কর্ম্মবাদীরা বলিয়া থাকেন। উপনিষদে এই মত্ত গ্রাহ্য বলিয়া ধৃত হইলেও, উহার যোগ্যতা ব্রহ্মজ্ঞানাপেক্ষা নিম্নপদবীর স্থির করিয়া যজ্ঞের দ্বারা স্বর্গপ্রাপ্তি হইলেও প্রকৃত মোক্ষলাভের পক্ষে ব্রহ্মজ্ঞানও আবশ্যক আছে এইরূপ প্রতিপাদিত হইয়াছে। ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে "বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ" (গী. ২, ৪২) প্রভৃতি যে যাগ যজ্ঞাদি কাম্যকর্ম্ম বর্ণিত হইয়াছে তাহা বিনা ব্রহ্মজ্ঞানে অনুষ্ঠিত উপরি উক্ত যাগযজ্ঞাদি কর্ম্ম। সেইরূপ "যজ্ঞার্থাৎকর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ"—যজ্ঞার্থ অনুষ্ঠিত কর্ম্ম বন্ধন হয় না, বাকী সব কর্ম্ম বন্ধন হইয়া থাকে (গী. ৩, ৯), ইহাই মীমাংসকের মতের অনুবাদ। এই যাগযজ্ঞাদি বৈদিক অর্থাৎ শ্রৌত কর্ম্ম ব্যতীত, ধর্ম্মদৃষ্টিতে অন্য আবশ্যক কর্ম্মও চাতুর্বর্ণ্যভেদে মনুস্মৃত্যাদি ধর্ম্মগ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে,—যথা—ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ, বৈশ্যের বাণিজ্য প্রভৃতি; এবং এই সকল কর্ম্ম প্রথমতঃ স্মৃতিগ্রন্থাদিতেই পদ্ধতিপূর্ব্বক প্রতিপাদিত হওয়ায়, ইহাদিগকে 'স্মার্ত্তকর্ম্ম' কিংবা 'স্মার্ত্ত যজ্ঞ' এমনও বলা হইয়া থাকে। এই শ্রৌতস্মার্ত্ত কর্ম্ম ব্যতীত কতকগুলি ধর্ম্মকর্ম্ম—যথা, ব্রত উপবাস প্রভৃতি—কেবল পুরাণ গ্রন্থাদিতেই প্রথমে সবিস্তার প্রতিপাদিত হওয়ায় উহাদিগের 'পৌরাণিক কর্ম্ম' এইরূপ সংজ্ঞা দেওয়া যাইবে। এই সমস্ত কর্ম্মের

আবার নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্য এইরূপ ভেদ নিরূপিত হইয়াছে। নিত্য করা আবশ্যক যে স্নান সন্ধ্যাদি কর্ম্ম তাহাই নিত্য কর্ম্ম। ইহা করিলে কোন বিশেষ ফল কিংবা অর্থসিদ্ধি হয় না; কিন্তু না করিলেই দোষ হয়। নৈমিত্তিক অর্থাৎ কোন কারণ পূর্ব্বে উপস্থিত হওয়ায় যাহা করা আবশ্যক হয় সেই কর্ম্ম, যথা—অনিষ্ট-গ্রহ-শান্তি, প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি। যে নিমিত্ত আমরা শান্তিস্বস্ত্যয়ন কিংবা প্রায়শ্চিত্ত করি, সেই সব ঘটনা পূর্ব্বে না ঘটিয়া থাকিলে এই সকল কর্ম্ম করিবার আবশ্যকতা নাই। ইহা ব্যতীত কোন বিশেষ বিষয়ের ইচ্ছা হইলে তাহার প্রাপ্তির নিমিত্ত আমরা কত সময় শাস্ত্রানুসারে যে সকল কাজ করি, তাহাই কাম্যকর্ম্ম, যথা—বৃষ্টির জন্য কিংবা পুত্রলাভের জন্য যজ্ঞ করা। নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য—ইহা ব্যতীত কোন কর্ম্মকে নিষিদ্ধ কর্ম্ম বলে। যথা—সুরাপান শাস্ত্রে একেবারেই ত্যাজ্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। কোন্‌টা নিত্যকর্ম্ম, কোন্‌টা নৈমিত্তিক, কোন্‌টা কাম্য এবং কোন্‌টাইবা নিষিদ্ধ, তাহা ধর্ম্মশাস্ত্র নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছে; এবং অমুক ব্যক্তির কৃত অমুক কর্ম্ম পাপজনক না পুণ্যপ্রদ? এইরূপ যদি কোন ধর্ম্মশাস্ত্রকে প্রশ্ন করা যায়, তবে সেই শাস্ত্রের আদেশ অনুসারে উক্ত কর্ম্ম যজ্ঞার্থ বা পুরুষার্থ, নিত্য কি নৈমিত্তিক, কাম্য কি নিষিদ্ধ, ইত্যাদি বিচার করিয়া পরে আমার নিজের নির্ণয়টা বলিব। ভগবদ্গীতার দৃষ্টি ইহা অপেক্ষা বেশী ব্যাপক—অধিক কি, উহাকে ছাড়াইয়া গিয়াছে বলিলেও হয়। শাস্ত্রে কোন-এক কর্ম্ম নিষিদ্ধ বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে, অধিক কি, উহা বিহিত বলিয়া আমাদের কর্ত্তব্যের মধ্যেও পরিগণিত হইতে পারে; উদাহরণ যথা:—উপস্থিত প্রসঙ্গে ক্ষাত্রধর্ম্ম অর্জ্জুনের পক্ষে বিহিত ছিল। কিন্তু এইরূপভাবে শাস্ত্র ধরিয়া ঐ সকল কর্ম্ম আমরা সর্ব্বদা করিব, ইহা সম্ভব হয় না, কিংবা করিলেও উহা সর্ব্বদাই যে শ্রেয়স্কর হইবে এরূপ ভরসাও নাই। তাছাড়া, শাস্ত্রের আদেশও কোন কোন প্রসঙ্গে পরস্পরবিরুদ্ধ হইয়া থাকে তাহা পূর্ব্বপ্রকরণে দেখাইয়াছি। এইরূপ অবস্থায়, মানুষ কোন্ মার্গ স্বীকার করিবে, তাহা স্থির করিবার কোন যুক্তি আছে কিনা এবং যদি থাকে ত সে যুক্তিটি কি,—ইহা গীতার প্রতিপাদ্য বিষয়। এই প্রতিপাদন কার্য্যের যে ভেদ উপরে বলা হইয়াছে, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিবার কারণ নাই। যাগযজ্ঞাদি বৈদিক কর্ম্ম সম্বন্ধে কিংবা চারি বর্ণের অন্য কর্ম্ম সম্বন্ধে মীমাংসক যে সকল সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা গীতা-প্রতিপাদিত কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে কতটা প্রযুক্ত হইতে পারে তাহা দেখাইবার জন্য, মীমাংসকের উক্তি সকলও গীতায় প্রসঙ্গক্রমে বিচার করা হইয়াছে ও শেষ অধ্যায়ে যাগযজ্ঞাদি কর্ম্ম জ্ঞানীপুরুষের কর্ত্তব্য, কি কর্ত্তব্য নয়, এই প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর কথিত হইয়াছে (গী, ১৮, ৬)। কিন্তু গীতার মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় ইহা অপেক্ষা বেশী ব্যাপক হওয়ায়, গীতা প্রতিপাদনে 'কর্ম্ম' শব্দের অর্থ কেবল শ্রৌত বা স্মার্ত্ত কর্ম্ম—এইরূপ সঙ্কুচিত অর্থে না বুঝিয়া তাহা অপেক্ষা অধিক ব্যাপক বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। সারকথা, মানুষ যে-যে কাজ করে—মানুষের খাওয়া, পরা, খেলা, বসা, ওঠা, থাকা, নিঃশ্বাস গ্রহণ করা, হাসা, কাঁদা, আঘ্রাণ করা, দেখা, বলা, শোনা, চলা, দেওয়া, নেওয়া, ঘুমান, জাগিয়া থাকা, মারা, লড়াই করা, মনন বা ধ্যান করা, আজ্ঞা কিংবা নিষেধ করা, দান করা, যাগযজ্ঞ করা, চাষ কিংবা বাণিজ্য ব্যবসায় করা, ইচ্ছা করা, নিশ্চয় করা, গল্প করা ইত্যাদি ইত্যাদি—এই সমস্ত কর্ম্ম এই শব্দের অন্তর্ভুক্ত; সেই সব কর্ম্ম কায়িকই হউক, বাচনিকই হউক, বা মানসিকই হউক (গীতা, ৫।৮।৯)। অধিক কি, বাঁচা মরা পর্য্যন্ত সমস্তই কর্ম্মের অন্তর্ভূত; এবং প্রসঙ্গ অনুসারে "বাঁচা কিংবা মরা" এই দুয়ের মধ্যে কোন্ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে ইহারও বিচার করা আবশ্যক হয়। এই বিচার উপস্থিত হইলে পর, এই শব্দের 'কর্ত্তব্য কর্ম্ম' কিংবা 'বিহিত কর্ম্ম' এই অর্থও হইয়া থাকে (গী, ৪, ১৬)। মনুষ্যের কর্ম্ম-সম্বন্ধে এইরূপ বিচার হইল। ইহারও পরে, সমস্ত চরাচর সৃষ্টির, অর্থাৎ অচেতন পদার্থাদির ব্যাপার সম্বন্ধেও এই শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। কিন্তু তাহার বিচার পরে কর্ম্মবিপাক প্রকরণে করা যাইবে।

কর্ম্মাপেক্ষাও অধিক 'গোলমেলে' শব্দ হইতেছে—যোগ। এই শব্দের বর্ত্তমান প্রচলিত অর্থ

"প্রাণায়ামাদির সাধনের দ্বারা চিত্তবৃত্তি কিংবা ইন্দ্রিয়াদির নিরোধ করা" অথবা "পাতঞ্জলিক সূত্রোক্ত সমাধি কিংবা ধ্যানযোগ।" এই অর্থে এই শব্দ উপনিষদেও প্রযুক্ত হইয়াছে (কঠ, ৬, ১১)। কিন্তু এই সঙ্কুচিত অর্থ ভগবদ্‌গীতাতে সাধারণভাবে বিবক্ষিত হয় নাই ইহা মনে রাখা আবশ্যক। 'যোগ' এই শব্দ 'যুজ্' অর্থাৎ যুড়িয়া দেওয়া এই ধাতু হইতে বাহির হইয়াছে,সুতরাং উহার ধাত্বর্থ 'জোড়', জোড়া, মিলন, সঙ্গতি, একত্রাবস্থিতি—এইরূপ ; এবং পরে, ঐরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইবার 'উপায়, সাধন, যুক্তি কিংবা কৌশল' অর্থাৎ কর্ম্ম—এইরূপই অর্থ হয়। "যোগঃ সংহননোপায়ধ্যানসঙ্গতিযুক্তিষু" এই অর্থ অমরকোষেও প্রদত্ত হইয়াছে। ফলিত জ্যোতিষে কোন গ্রহ ইষ্ট বা অনিষ্ট জনক হইলে সেই গ্রহদিগের 'যোগ' ইষ্ট বা অনিষ্টজনক এইরূপ আমরা বলিয়া থাকি ; এবং 'যোগক্ষেম' এই শব্দে 'যোগ' অর্থাৎ প্রাপ্ত না হওয়া বস্তু প্রাপ্ত হওয়া এইরূপ অর্থ (গী, ৯. ২২)। মহাভারতীয় যুদ্ধে দ্রোণাচার্য্যকে পরাজয় করিতে পারা যাইতেছে না দেখিয়া তাঁহাকে পরাভূত করিবার জন্য একই 'যোগ' (সাধন বা যুক্তি)—একোহি যোগোঽস্য ভবেদ্‌বধায়—এইরূপ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন (সভা, দ্রো, ১৮১, ৩১) ; এবং ইতিপূর্ব্বে আমরা, জরাসন্ধাদি রাজাদিগকে পূর্ব্বে ধর্ম্ম রক্ষণার্থ 'যোগের দ্বারাই' কি করিয়া বধ করা হইল তাহার বর্ণনা করিয়াছি। ভীষ্ম অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকাকে হরণ করিলে পর অন্য রাজারা 'যোগ, যোগ' বলিয়া তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন এইরূপ উদ্যোগ পর্ব্বে (অ, ১৭২) উক্ত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত অন্য স্থানেও মহাভারতে এই অর্থেই 'যোগ' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। গীতাতে 'যোগ, যোগী' কিংবা যোগ শব্দ হইতে নিষ্পন্ন সামাসিক শব্দ প্রায় ৮০ বার প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু, খুব যদি বেশী হয়, চারি পাঁচ (গী, ৬, ১২, ২০) স্থল ছাড়া 'পাতঞ্জল যোগ' এই অর্থ কোথাও অভিপ্রেত হয় নাই। 'যুক্তি, কৌশল, সাধন, উপায়, যোড়া দেওয়া' এই অর্থই স্বল্পাধিক ভেদে সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায় ; সুতরাং গীতাশাস্ত্রান্তর্ভূত ব্যাপক শব্দগুলির মধ্যে ইহাও একটি, ইহা বলিতে কোন বাধা নাই। তথাপি যোগ অর্থে সাধন, কৌশল বা যুক্তি, এইরূপ সাধারণভাবে বলিলেও চলে না। কারণ, বক্তার ইচ্ছানুসারে এই সাধন,—সন্ন্যাসের, কর্ম্মের, চিত্তনিরোধের, মোক্ষের, কিংবা আর কোন কিছুরও হইতে পারে। দৃষ্টান্ত যথা—গীতাতেই দুই চারি স্থানে ভগবানের নানাবিধ ব্যক্ত সৃষ্টি নির্ম্মাণ করিবার ঐশ্বরিক কৌশল কিংবা অদ্ভুত সামর্থ্যের সম্বন্ধে যোগ শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে (গী, ৭।২৫ ; ৮।৫ ; ১০।৭ ; ১১।৮)। এই অর্থেই ভগবানকে 'যোগেশ্বর' বলা হইয়াছে (গী, ১৮।৭৫)। কিন্তু গীতান্তর্ভূত যোগ শব্দের ইহা কিছু মুখ্যার্থ নহে। তাই গীতায় 'যোগ' শব্দের মুখ্য অর্থ কোন বিশেষ প্রকারের কৌশল, সাধন, যুক্তি বা উপায় ইহা বলিবার জন্য "যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্" (গী, ২।৫০) অর্থাৎ কর্ম্ম করিবার কোন বিশেষ প্রকারের কুশলতা, যুক্তি, চাতুর্য্য বা শৈলী—এইরূপ এই শব্দের ব্যাখ্যা স্পষ্টরূপে করা হইয়াছে ; এবং এই সম্বন্ধে শঙ্করভাষ্যেও "কর্ম্মসু কৌশলম্" এই পদের "কর্ম্মের যে স্বাভাবিক বন্ধকত্ব তাহা বিনষ্ট করিবার যুক্তি" এইরূপ অর্থই করা হইয়াছে। সাধারণভাবে দেখিতে গেলে, একই কর্ম্মের অনেক 'যোগ' কিংবা 'উপায়' হইয়া থাকে। কিন্তু তাহার মধ্যে, উত্তম সাধনের সম্বন্ধেই 'যোগ' শব্দ বিশেষরূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। উদাহরণ যথা—ধনলাভ করিতে হইলে তাহা চুরি করিয়া, ঠকাইয়া, ভিক্ষা করিয়া, সেবা করিয়া, কর্জ্জ করিয়া, মেহনৎ করিয়া ইত্যাদি অনেক সাধনের দ্বারা করা যাইতে পারে ; এবং ইহার মধ্যে প্রত্যেক সাধন সম্বন্ধে 'যোগ' শব্দ ধাত্বর্থ অনুসারে প্রযুক্ত হইতে পারিলেও "আপনার স্বাতন্ত্র্য না হারাইয়া, মেহনৎ করিয়া পয়সা রোজগার করা" এই উপায়ই মুখ্যরূপে 'ধনপ্রাপ্তি যোগ' এইরূপ বলা প্রচলিত আছে।

"যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্"—কর্ম্ম করিবার এক প্রকার বিশেষ যুক্তি অর্থাৎ যোগ, এইরূপ স্বয়ং ভগবানও যদি গীতায় যোগ শব্দের 'বিশেষ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন তবে, বস্তুত গীতায় এই শব্দের মুখ্য অর্থ কি সে বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকে না। কিন্তু ভগবানকৃত এই ব্যাখ্যার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া গীতার অনেক টীকাকার এই শব্দকে

টানিয়া বুনিয়া নানাপ্রকারে গীতার মথিতার্থ বাহির করিয়াছেন; তাই, ভুল-বুঝা দূর করিবার জন্য এইখানে 'যোগ' শব্দের আরও কিছু ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। সর্ব্বপ্রথমে গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে যোগ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, সেই স্থানে উহার অর্থ কি তাহা স্পষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে। যুদ্ধ করা কেন কর্ত্তব্য, সাংখ্য মার্গানুসারে ইহার যুক্তি বিবৃত করিবার পর, এক্ষণে তোমাকে যোগশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত বলিতেছি (গী. ২, ৩৮) এইরূপ ভগবান আরম্ভ করিয়াছেন; প্রথম, যাগযজ্ঞাদি কাম্য কর্ম্মেতে নিমগ্ন লোকদিগেরও বুদ্ধি, ফল-প্রত্যাশার দরুণ কিরূপ ব্যগ্র হইয়া থাকে তাহার বর্ণনা করিয়াছেন (গী, ২, ৪১-৪৬)। তাহার পর, এতাদৃশ বুদ্ধিকে ব্যগ্র হইতে না দিয়া "আসক্তি ছাড়, কিন্তু কর্ম্ম ছাড়িয়া দিতে ব্যগ্র হইও না" এইরূপ বলিয়া, "যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম কর" (গী, ২, ৪৮) এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন; এবং সেইখানেই "যোগ অর্থাৎ সিদ্ধি বা অসিদ্ধি এই বিষয়ে সমত্ব বুদ্ধি" এইরূপ 'যোগ' শব্দের অর্থ প্রথমে স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। তাহার পর, "ফল প্রত্যাশায় কর্ম্ম করা অপেক্ষা সমত্ব বুদ্ধির যোগই শ্রেষ্ঠ" (গী, ২০, ৪৮), "বুদ্ধি সমতা প্রাপ্ত হইলে, কর্ম্মের পাপ-পুণ্য বাধা কর্ত্তাকে স্পর্শ করে না অতএব তুমি এই 'যোগ' সম্পাদন কর", এইরূপ বলিয়া তথনই আবার "যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্" (গী, ২, ৫০) যোগের এই লক্ষণ বলিয়াছেন। ইহাতে, কর্ম্মের পাপ কর্ত্তাকে স্পর্শ না করায় কর্ম্ম করিবার সমত্ব বুদ্ধিরূপ যে বিশেষ যুক্তি প্রথমে উক্ত হইয়াছে তাহারই নাম 'কৌশল,' এবং এই কৌশলের দ্বারা অর্থাৎ যুক্তির দ্বারা কর্ম্ম করা, ইহাকেই গীতাতে 'যোগ' বলা হইয়াছে, স্পষ্টই উপলব্ধি হয়। এই অর্থই পূর্ব্বে "যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন" (গী, ৬, ৩৩) সমতার অর্থাৎ সমত্ব বুদ্ধির এই যে যোগ তুমি আমাকে বলিলে,—এই শ্লোকে অর্জ্জুন আবার স্পষ্ট করিয়াছেন। জ্ঞানী মনুষ্য এই জগতে কিরূপভাবে চলিবেন তাহার এবং শ্রীশঙ্করাচার্য্যও পূর্ব্ব হইতে যে বৈদিক ধর্ম্ম অনুসরণ করিয়া আসিয়াছেন সেই ধর্ম্মানুসারে—দুই মার্গ আছে। তন্মধ্যে, জ্ঞানী ব্যক্তির সম্বন্ধে সর্ব্ব কর্ম্মের স্বরূপতঃ সন্ন্যাস অর্থাৎ ত্যাগ করা—এই এক মার্গ; এবং জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেও কর্ম্মত্যাগ না করিয়া, কর্ম্মের পাপ পুণ্য বাধা না স্পর্শ করে সেইরূপ যুক্তি অনুসারে আমরণ কর্ম্ম করিতে থাকিবে—এই অপর মার্গ। এই দুই মার্গের উদ্দেশেই গীতাতে পূর্ব্বে (গী, ৫।২) সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ এইরূপ পূর্ণ নাম সংযোজিত হইয়াছে। সন্ন্যাস অর্থাৎ ছাড়া এবং যোগ অর্থাৎ জোড়া; সুতরাং কর্ম্মের ছাড়া-জোড়ারই এই দুই ভিন্ন ভিন্ন মার্গ। "সাংখ্য ও যোগ" (সাংখ্যযোগৌ) এইরূপ আর একটি সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞাও পূর্ব্বে (গী, ৫।১৪) এই দুই মার্গেরই অনুলক্ষণ সংযোজিত হইয়াছে। বুদ্ধি স্থির করিবার জন্য পাতঞ্জল যোগান্তর্ভূত আসনাদির বর্ণনা ষষ্ঠ অধ্যায়ে আছে সত্য; কিন্তু তাহা কি জন্য? তপস্যা করিবার জন্য নহে, পরন্তু কর্ম্মযোগীর অর্থাৎ যুক্তির দ্বারা কর্ম্মকারী মনুষ্যের এই সমতারূপ যুক্তি সিদ্ধ করিবার জন্য বলা হইয়াছে। নচেৎ "তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী" এই বাক্যও সংলগ্ন হয় না। সেইরূপ আবার "তস্মাদ্যোগী ভবার্জ্জুন" (৬।৪৬) বলিয়া এই যে উপদেশ অধ্যায়ের শেষে আছে তাহার অর্থও "পাতঞ্জল যোগের অভ্যাসকারী তুমি হও" এইরূপ না হইয়া, "যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি" (২।৪৮) অথবা তৎপূর্ব্বে "তস্মাদ্যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্" (গী, ২, ৫০), কিংবা চতুর্থ অধ্যায়ের শেষে "যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত" (৪।৪২) ইহার সহিত সমানার্থক অর্থাৎ "যুক্তির দ্বারা কর্ম্মকারী যোগী অর্থাৎ কর্ম্মযোগী হও—এইরূপ অর্থ গ্রহণ করাই সঙ্গত। কারণ, পাতঞ্জল যোগের আশ্রয় করিয়া তুমি যুদ্ধে দাঁড়াইয়া থাক" এ কথা বলা সম্ভবনীয়ও নহে, শক্যও নহে। "কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্" (গী, ৩।৩) অর্থাৎ যোগী পুরুষ কর্ম্ম করিয়া থাকেন ইহা ইতিপূর্ব্বে স্পষ্ট বলা হইয়াছে। মহাভারতে নারায়ণীয় ধর্ম্ম কিংবা ভাগবৎধর্ম্মের বিচার-আলোচনাতেও এই ধর্ম্মাবলম্বী লোক আপনার কর্ম্ম না ছাড়িয়া তাহা যুক্তিপূর্ব্বক সাধন করিয়া (সুপ্রযুক্তেন কর্ম্মণা) পরমেশ্বরকে লাভ করে এইরূপ উক্ত হইয়াছে (সভা, শাং, ৩৪৮

৫৬)। ইহাতে, যোগী ও কর্ম্মযোগী এই দুই শব্দ গীতাতে সমানার্থক হওয়ায়, উহাদের 'যুক্তিপূর্ব্বক কর্ম্মকারী' এইরূপ অর্থ স্পষ্টই দেখা যায়। তথাপি 'কর্ম্মযোগ' এই ঈষৎ দীর্ঘ শব্দ ব্যবহৃত না হইয়া 'যোগ' এই সংক্ষিপ্ত শব্দই গীতাতে ও মহাভারতেও অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। "আমি তোমাকে এই যে যোগের কথা বলিলাম তাহা পূর্ব্বে বিবস্বানকে বলিয়াছিলাম (গী, ৪।১); বিবস্বান মনুকে বলিয়াছিলেন; কিন্তু ঐ যোগ ইতিপূর্ব্বে নষ্ট হওয়ায় আজ নূতন করিয়া ঐ যোগের কথা তোমাকে বলিতে হইল", ভগবান যখন এইরূপ 'যোগ' শব্দের তিনবার উল্লেখ করিয়াছেন তখন পাতঞ্জল যোগ বিবক্ষিত হয় নাই;—"কর্ম্ম করিবার কোন এক প্রকারের বিশিষ্ট যুক্তি, সাধন কিংবা মার্গ" এই অর্থই সঙ্গত হয়। সেইরূপ আবার, গীতা-অন্তর্গত কৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে সঞ্জয় যখন 'যোগ' শব্দ প্রয়োগ করিতেছেন (গী, ১৮।৩৫) তখনও ঐ অর্থই অভিপ্রেত। শ্রীশঙ্করাচার্য্য নিজে সন্ন্যাসপন্থী হইলেও আপন গীতা-ভাষ্যের আরম্ভেই বৈদিক ধর্ম্মের নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তি এইরূপ দুই ভেদ বলিয়া, 'যোগ' শব্দের অর্থ, ভগবান-প্রদত্ত ব্যাখ্যা-অনুসারে কখন 'সম্যগ্‌দর্শনোপায় কর্ম্মানুষ্ঠানম্' (গী, ৪।৪২), আবার কখন 'যোগযুক্তিঃ' (গী, ১০।৭) এইরূপ তিনি করিয়াছেন। সেইরূপ মহাভারতেও "প্রবৃত্তিলক্ষণো যোগঃ জ্ঞানং সন্ন্যাস লক্ষণম্"—যোগ অর্থাৎ প্রবৃত্তিমার্গ এবং জ্ঞান অর্থাৎ সন্ন্যাস কিংবা নিবৃত্তিমার্গ (সভা, অশ্ব, ৪৩।২৫)—এইরূপ এই দুই শব্দের অর্থ অনুগীতায় স্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন, এবং শান্তিপর্ব্বের শেষে নারায়ণীয় উপাখ্যানে সাংখ্য ও যোগ শব্দ এই অর্থেই অনেকবার প্রযুক্ত হইয়াছে—এই দুই শব্দ সৃষ্টির আরম্ভেই ভগবান কিরূপে ও কি-কারণে স্থাপন করিলেন তাহার বর্ণনা করা হইয়াছে (সভা, শাং, ২৪০ ও ৩, ৪৮ দেখ)। এই নারায়ণী কিংবা ভাগবত ধর্ম্ম ভগবদ্‌গীতার প্রতিপাদ্য, তাহা প্রথম প্রকরণে প্রদত্ত মহাভারতের বচনাদি হইতে প্রকাশ পায়। তাই সাংখ্য অর্থাৎ নিবৃত্তি এবং যোগ অর্থাৎ প্রবৃত্তি, এইরূপ যে দুই শব্দের প্রাচীন ও পারিভাষিক অর্থ নারায়ণী ধর্ম্মে আছে, তাহা গীতারও অভিপ্রেত এইরূপ বলা যাইতে পারে। এবং এই সম্বন্ধে কোন সংশয় থাকিলে "সমত্বং যোগ উচ্যতে" কিংবা "যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্" এই গীতার ব্যাখ্যার দ্বারা ও "কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্" ইত্যাদি উপরি উক্ত গীতা-বচনাদির দ্বারা ঐ সংশয়ের পূর্ণ নিরসন হইয়া, গীতাতে যোগশব্দ প্রবৃত্তিমার্গ অর্থাৎ 'কর্ম্মযোগ' এই অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহা নির্ব্বিবাদে সিদ্ধ হয়। শুধু বৈদিক ধর্ম্মগ্রন্থে নহে, পালী ও সংস্কৃত বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থেও এইরূপ অর্থেই যোগশব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। উদাহরণ যথা—প্রায় ২০০ শকে লিখিত মিলিন্দ প্রশ্ন নামক পালীগ্রন্থে 'পুব্বযোগো' (পূর্ব্বযোগ) এইরূপ শব্দ প্রযুক্ত হওয়ায় তাহার অর্থ 'পুব্বকম্ম' (পূর্ব্বকর্ম্ম) এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে (মি, প্র, ১।৪); এবং শালিবাহন শকের আরম্ভে আবির্ভূত অশ্বঘোষ কবির 'বুদ্ধ চরিত' নামক সংস্কৃত কাব্যের প্রথম সর্গের ৫০ শ্লোকে—

"আচার্যকং যোগবিধৌ দ্বিজানামপ্রাপ্তমন্যৈর্জনকো জগাম।"

"ব্রাহ্মণদিগকে যোগবিধি শিখাইবার কাজে জনকরাজা আচার্য্য (উপদেষ্টা) হইয়াছিলেন, জনকের পূর্ব্বে কেহই আচার্য্য পদ প্রাপ্ত হন নাই" এইরূপ বর্ণনা আছে। এইস্থানে যোগবিধি অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্মযোগের বিধি এইরূপ অর্থই করিতে হয়। কারণ, জনকের আচরণের ইহাই রহস্য এইরূপ গীতাদি গ্রন্থ উচ্চকণ্ঠে বলিয়াছেন; অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতে (৯।১৯। ও ২০) "গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়াও মোক্ষ কিরূপে সাধন করা যাইতে পারে" ইহা দেখাইবার জন্য জনকের দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছে। জনক প্রদর্শিত মার্গের নামও 'যোগ' ছিল। এইরূপ যোগ বৌদ্ধগ্রন্থাদিতেও যখন সিদ্ধ হইয়াছে তখন গীতার যোগ শব্দেরও এই অর্থ গ্রহণ করিতে হয়; কারণ, জনকের মার্গও গীতার প্রতিপাদ্য এইরূপ গীতাই বলিতেছেন (গী, ৩।২০)। সাংখ্য ও যোগ এই দুই মার্গ সম্বন্ধে বেশী বিচার-আলোচনা পরে করা যাইবে। কোন্ অর্থে গীতায় যোগশব্দের প্রয়োগ হইয়াছে ইহাই এখনকার উপস্থিত প্রশ্ন।

যোগ অর্থাৎ কর্ম্মযোগ এবং যোগী অর্থাৎ কর্ম্মযোগী, এইরূপ গীতার এই দুই শব্দের মুখ্য অর্থ এই

অনুসারে একবার নির্ণয় হইলে পর, ভগবদ্গীতার প্রতিপাদ্য বিষয় কোন্‌টি ইহা আর স্বতন্ত্ররূপে বলিতে হইবে না। ভগবান নিজেই আপন উপদেশকে 'যোগ' নামে অভিহিত করিয়াছেন (গী, ৪। ১-৩), শুধু তাহা নহে, ষষ্ঠ অধ্যায়ে অর্জ্জুন (গী, ৬। ৩৩) এবং গীতার শেষের উপসংহারে (গী, ১৮। ৭৫) সঞ্জয়ও গীতোক্ত উপদেশের 'যোগ' এই নাম দিয়াছেন,—ইহা উপরে বলা হইয়াছে। সেইরূপ আবার প্রত্যেক গীতাধ্যায়ের শেষ অধ্যায়ে সমাপ্তিপ্রদর্শক যে সঙ্কল্প থাকে তাহাতেও 'যোগশাস্ত্র'ই গীতার প্রতিপাদ্য বিষয়, এইরূপ স্পষ্ট বলা হইয়াছে। কিন্তু এই সঙ্কল্পের অন্তর্গত শব্দের অর্থের প্রতি বর্ত্তমানের টীকাকারদিগের মধ্যে কেহই মনোযোগ দিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু উপনিষৎসু" এই আরম্ভের দুই পদ লিখিবার পর, এই সঙ্কল্পের মধ্যে "ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে" এইরূপ দুই শব্দ আসিয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম দুই পদের অর্থ "ভগবান কর্ত্তৃক গীত উপনিষদে" এইরূপ হওয়ায়, পরবর্ত্তী দুই শব্দ ব্রহ্মবিদ্যান্তর্গত যোগশাস্ত্র অর্থাৎ "কর্ম্মযোগশাস্ত্র" ব্রহ্মবিদ্যারই বিষয়, এইরূপ এক্ষণে স্পষ্ট অর্থ হইতেছে।

ব্রহ্মবিদ্যা অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান, ঐ জ্ঞান লাভ হইলে, জ্ঞানী পুরুষের নিকট দুই মার্গ খোলা হইয়া থাকে (গী, ৩।৩)—এক, সাংখ্য অথবা সন্ন্যাস-মার্গ—অর্থাৎ জ্ঞানলাভের পর, জাগতিক সর্ব্ব-কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বিরাগীর মত থাকা এবং অপর, যোগ কিংবা কর্ম্মমার্গ—অর্থাৎ কর্ম্ম না ছাড়িয়া ঐ কর্ম্ম এরূপ যুক্তিপূর্ব্বক করা যাহাতে মোক্ষ-প্রাপ্তির বাধা কখন না হয়। এই দুই মার্গের মধ্যে প্রথমটির 'জ্ঞাননিষ্ঠা' এইরূপ অন্য নামও থাকায়, উপনিষদের অনেক ঋষি ও অপর গ্রন্থকারেরাও উহার আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যার অন্তর্গত কর্ম্মযোগের কিংবা যোগশাস্ত্রের তাত্ত্বিক উপাদান ভগবদ্গীতা ব্যতীত অন্য কোথাও নাই। তাই, যিনি এই সঙ্কল্প প্রথম রচনা করিয়াছেন—এবং উহা গীতার সকল সংস্করণেই দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া, গীতার কোন টীকা হইবার পূর্ব্বে রচিত হইয়া থাকিবে এইরূপ অনুমান হয়, আগেই বলা হইয়াছে,—তিনি গীতাশাস্ত্রান্তর্গত বিষয়ের অপূর্ব্বতা কিরূপ তাহা দেখাইবার জন্যই "ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে" এই পদগুলি সেই সঙ্কল্পের মধ্যে স্থাপন করিয়াছেন এবং তাহা স্থাপন করিবার ভিত্তি আছে, হেতু আছে; উহা নিরর্থক বা মন-গড়াও নহে—তাহা এক্ষণে প্রকাশ পাইতেছে; এবং গীতাসম্বন্ধে সাম্প্রদায়িক টীকা হইবার পূর্ব্বে গীতার তাৎপর্য্য লোকে যেরূপ বুঝিত তাহাও উহার দ্বারা সহজে উপলব্ধি হয়। সৌভাগ্য আমাদের, এই যোগ-মার্গের প্রবর্ত্তক এবং সমস্ত যোগের সাক্ষাৎ ঈশ্বর (যোগেশ্বর = যোগ + ঈশ্বর) যে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ তিনি স্বয়ং কর্ম্মযোগ প্রতিপাদন কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়া, সর্ব্বলোকের হিতার্থ অর্জ্জুনকে তাহার রহস্য বুঝাইয়া দিয়াছেন। 'যোগ' ও 'যোগশাস্ত্র'—গীতার এই দুইটি শব্দ অপেক্ষা 'কর্ম্মযোগ' ও 'কর্ম্মযোগশাস্ত্র' এই দুই শব্দ একটু দীর্ঘধরণের সত্য, কিন্তু গীতার প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ না থাকে এইজন্য এই গ্রন্থে ও প্রকরণে "কর্ম্মযোগশাস্ত্র" এই ঈষৎ দীর্ঘ ধরণের নাম আমি দিয়াছি।

একই কর্ম্ম করিবার যে অনেক যোগ, সাধন কিংবা মার্গ আছে তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দর ও শুদ্ধ মার্গ কোন্‌টি, তাহা সর্ব্বদা আচরিত হয় কি হয় না, না হইলে তাহার অপবাদ বা ব্যতিক্রমস্থলটি কি, এবং সেই ব্যতিক্রম কেন উৎপন্ন হয়; যে মার্গ আমরা ভাল মনে করি, তাহা কেন ভাল, কিংবা যাহাকে খারাপ বলি তাহা কেন খারাপ এবং এই ভালমন্দ কি উপায়ে কেমন করিয়া স্থির করিবে কিংবা তাহার বীজটি কি, ইত্যাদি বিষয়,যে শাস্ত্রের বনিয়াদে নিশ্চিত করা যাইতে পারে তাহাকে যোগশাস্ত্র কিংবা গীতান্তর্গত সংক্ষিপ্ত রূপ অনুসারে 'যোগশাস্ত্র' বলা হইয়া থাকে। ভাল ও মন্দ এই দুই শব্দ "সামান্য" শব্দ; এবং সেই অর্থেই কখন শুভ কখন অশুভ, কখন হিতকর কখন অহিতকর, কখন শ্রেয়স্কর কখন অশ্রেয়স্কর, কখন পাপ কখন পুণ্য, বা কখন ধর্ম্ম্য কখন অধর্ম্ম্য, ঐ দুই শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কার্য্য বা অকার্য্য কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য এবং ন্যায্য ও অন্যায্য, এই যুগল শব্দগুলিরও ঐ অর্থ। তথাপি এই শব্দব্যবহারকারী-দিগের সৃষ্টিরচনা সম্বন্ধীয় মত বিভিন্ন হওয়ায় 'কর্ম্মযোগ' শাস্ত্রের নিরূপণ-পন্থাও বিভিন্ন হইয়াছে।

যে কোন শাস্ত্রই ধর না কেন, তদন্তর্ভূত বিষয়ের চর্চ্চা সাধারণতঃ তিন প্রকারে করা যাইতে পারে—(১) জড়সৃষ্টির অন্তর্গত পদার্থ আমাদের ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে যেমনটি প্রকাশ পাইয়া থাকে, সেইরূপই তাহারা, তাহার ওদিকে আর কিছুই নাই,—এই দৃষ্টিতে তাহাদের সম্বন্ধে বিচার করা, ইহাই প্রথম পদ্ধতি; এবং ইহাকে আধিভৌতিক বিচার আলোচনা বলা হইয়া থাকে। উদাহরণ যথা—সূর্য্যকে দেবতা বলিয়া না মানিয়া, কেবল পাঞ্চভৌতিক এক গোলা বলিয়া মানিয়া, উষ্ণতা, প্রকাশ, ওজন, অন্তর, আকর্ষণ প্রভৃতি তাহার গুণধর্ম্মেরই যখন পরীক্ষা করা হয় তখন সেই সূর্য্য সম্বন্ধে আধিভৌতিক আলোচনা করা হয়। আর একটা গাছের উদাহরণ ধর। গাছের ডালপালা গজাইয়া উঠা প্রভৃতি ক্রিয়া কোন্ অন্তর্নিহিত শক্তির দ্বারা হইয়া থাকে ইহার বিচার না করিয়া, জমিতে বীজ লাগাইলেই অঙ্কুর জন্মায় ও পরে তাহারই বৃদ্ধি হইয়া শাখা, পত্র, ফুল, ফল প্রভৃতি তাহার দৃশ্যমান বিকার উৎপন্ন হয়, ইত্যাদি প্রকার কেবল বাহ্যদৃষ্টিতেই বিচার করিলে, ঐ গাছের আধিভৌতিক আলোচনা করা হয়। রসায়নশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, বিদ্যুৎ-শাস্ত্র প্রভৃতি আধুনিক শাস্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা এই প্রকারেরই হইয়া থাকে। অধিক কি, এইরূপ প্রকারে কোন বস্তুর পরিদৃশ্যমান গুণের বিচার হইলেই আমাদের কাজ শেষ হইল, ইহা অপেক্ষা সৃষ্টি পদার্থের বেশী বিচার আলোচনা করা নিষ্ফল, ইহাই আধিভৌতিক পণ্ডিতদিগের মত। (২) এই দৃষ্টি ছাড়িয়া, জড়পদার্থগুলি মূলতঃ কি, এই সকল পদার্থের ব্যবহার কেবল তাহাদের গুণধর্ম্মের দ্বারাই হইয়া থাকে কিংবা তাহাদের পিছনে অন্য কোন তত্ত্ব আছে, এইরূপ দৃষ্টিতে বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেই আধিভৌতিক বিচারকে ছাড়াইয়া যাইতেই হয়। উদাহরণ যথা—পাঞ্চভৌতিক সূর্য্যের জড় কিংবা অচেতন গোলকের মধ্যে তদধিষ্ঠাত্রী সূর্য্য নামে এক দেবতা আছেন ও তিনিই জড় সূর্য্যের ব্যবহার চালাইয়া থাকেন এইরূপ যখন আমরা মানি তখন তাহাকে আধিদৈবিক বিচার বলে। এই মতানুসারে, বৃক্ষ, পত্র, বায়ু প্রভৃতি সর্ব্বত্র সেই সেই জড়পদার্থ হইতে ভিন্ন এরূপ অনেক দেবতা আছেন যাঁহারা উক্ত জড়পদার্থ সকলের কাজ চালাইয়া থাকেন—এইরূপ বুঝা যায়। (৩) কিন্তু জড় সৃষ্টির অন্তর্গত সহস্র সহস্র জড়পদার্থের মধ্যে এইরূপ সহস্র সহস্র স্বতন্ত্র দেবতা না মানিয়া বাহ্যসৃষ্টির সর্ব্বকার্য্যপরিচালক এবং মনুষ্যের শরীরে আত্মস্বরূপ থাকিয়া, তাহাকে সমস্ত সৃষ্টির জ্ঞান বিধান করিতেছেন এইরূপ ইন্দ্রিয়াতীত একমাত্র চিৎশক্তি এই জগতের মধ্যে অধিষ্ঠিত আছে—যে শক্তির দ্বারাই এই জগৎ চলিতেছে—এইরূপ যখন মানা হয়, তখন তাহাকে আধ্যাত্মিক বিচার এই নাম দেওয়া হয়। উদাহরণ যথা—সূর্য্যচন্দ্রাদির ক্রিয়া, অধিক কি, গাছের পাতাটি নড়া পর্য্যন্ত এই আচন্ত্য শক্তিরই প্রেরণায় হইয়া থাকে, অন্যস্থানে বিভিন্ন ও স্বতন্ত্র দেবতা নাই—এইরূপ অধ্যাত্মবাদীদিগের মত। যে কোন বিষয়েরই বিচার করা হউক না কেন, এই তিন মার্গ প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে; উপনিষদ্ গ্রন্থাদিতেও তাহা অনুসৃত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। উদাহরণ যথা—জ্ঞানেন্দ্রিয় ও প্রাণ ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে, ইহার বিচার চলিতে থাকায়, একবার ইন্দ্রিয়ের অগ্নি-আদি দেবতা ও একবার তাঁহাদের সূক্ষ্মস্বরূপ (অধ্যাত্ম) লইয়া বৃহদারণ্যকাদি উপনিষদে ইঁহাদের বলাবল সম্বন্ধে বিচার করা হইয়াছে (বৃ, ১।৫।২১ ও ২২; ছাং, ১।২ ও ৩; কৌষী, ২।৮); এবং গীতার সপ্তম অধ্যায়ের শেষে ও অষ্টম অধ্যায়ের আরম্ভে ঈশ্বরস্বরূপের যে বিচার কথিত হইয়াছে তাহাও এই দৃষ্টিতে করা হইয়াছে। তন্মধ্যে "অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাম্" (গী, ১০।৩২) এই বাক্য অনুসারে আধ্যাত্মিক আলোচনাকেও আমাদের শাস্ত্রকার অন্য অপেক্ষা অধিক গুরুত্ব দিয়া থাকেন। কিন্তু অর্ব্বাচীন কালে, উপরি উক্ত তিন শব্দের অর্থ একটু বদলাইয়া প্রসিদ্ধ আধিভৌতিক ফরাসী পণ্ডিত "কোঁৎ" আধিভৌতিক প্রতিপাদনকেই সর্ব্বত্র অধিক গুরুত্ব প্রদান করিয়াছেন। *

* অগুস্ত কোঁৎ—ইনি ফ্রান্সদেশে, গত শতকে এক বড় পণ্ডিত ছিলেন। ইনি সমাজশাস্ত্রের উপর এক বড় গ্রন্থ লিখিয়া, শাস্ত্রীয় রীতিতে সমাজ রচনার কিরূপ বিচার করিবে ইহাই প্রথম দেখাইয়াছেন। যে কোন শাস্ত্র ধর না কেন, তাহার আলোচনা প্রথম theological, তাহার পর metaphysical পদ্ধতিতে হইয়া থাকে

তিনি এইরূপ বলেন যে, সৃষ্টির মূলে কি-তত্ত্ব আছে তাহার অনুসন্ধান করিতে যাওয়ায় কোন লাভ নাই; এবং এই তত্ত্ব অনধিগম্য হওয়ায় কখনই আমাদের জানা সম্ভব নহে, সুতরাং সেই ভিত্তির উপর কোন শাস্ত্রের ইমারৎ খাড়া করা উচিত বা সাধ্যায়ত্ত নহে। বুনো লোকেরা গাছ, পাথর, জ্বালামুখী প্রভৃতি নড়াচড়া পদার্থ যখন প্রথম দেখিল তখন এই সমস্তই দেবতা এইরূপ ধর্ম্মান্ধতাবশত মনে করিতে লাগিল। কোঁতের মতে ইহাই আধিভৌতিক বিচার। কিন্তু পরে মানুষ শীঘ্রই এই কল্পনাটি ছাড়িয়া দিয়া, সকল পদার্থের মধ্যে কোন একপ্রকার আত্মতত্ত্ব পূর্ণ হইয়া আছে এইরূপ মনে করিতে লাগিল—কোঁতের মতে মানবীয় জ্ঞানের ইহাই দ্বিতীয় ভিত্তি; এবং এহ ভিত্তিকে তিনি আধ্যাত্মিক এই নাম দিয়াছেন। কিন্তু এই মার্গ ধরিয়া সৃষ্টির বিচার করিয়াও প্রত্যক্ষ-উপযোগী শাস্ত্রীয় জ্ঞানের যখন কোন বৃদ্ধি হয় না, তখন মানুষ শেষে সৃষ্টির অন্তর্গত পদার্থসমূহের গুণধর্ম্মেরই বেশী অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইল; এবং তাহার দরুণ এক্ষণে আগ-গাড়ী, তারাযন্ত্র প্রভৃতির ন্যায় কৌশল অবলম্বনে বাহ্য সৃষ্টির উপর মানুষের অধিক আধিপত্য হইল। কোঁৎ ইহার আধিভৌতিক মার্গ এই নাম দিয়াছেন; এবং যে-কোন শাস্ত্রের কিংবা বিষয়ের বিচার আলোচনা করিবার সময় এই মার্গই অন্যান্য মার্গ অপেক্ষা অধিক লাভজনক ও শ্রেষ্ঠ—ইহাই তিনি স্থির করিয়াছেন। কোঁতের মতে, সমাজ শাস্ত্র সম্বন্ধে কিংবা কর্ম্মযোগ শাস্ত্র সম্বন্ধে তাত্ত্বিক বিচারের এই দৃষ্টিভূমিকেই স্বীকার করিতে হইবে; এবং তাহা স্বীকার করিয়া, ইতিহাস অবলম্বন পূর্ব্বক এই পণ্ডিত সকল ব্যবহার শাস্ত্রের এই মথিতার্থ বাহির করিয়াছেন যে, প্রত্যেক মনুষ্য সমস্ত মানবজাতির উপর প্রেম স্থাপন করিয়া সতত সর্ব্ব-লোকের কল্যাণার্থ চেষ্টা করিবে, ইহাই তাহার পরমধর্ম্ম। মিল, স্পেন্সর, প্রভৃতি ইংরেজ পণ্ডিত এই মতের অগ্রণী বলিলেও চলে। উল্টাপক্ষে, কাণ্ট, হেগেল, শোপেন্‌হোয়ের প্রভৃতি জর্ম্মন তত্ত্বজ্ঞানী এই আধিভৌতিক পদ্ধতি নীতিশাস্ত্রের বিচার পক্ষে অপূর্ণ স্থির করিয়া আমাদের বেদান্ত অনুসারে অধ্যাত্মদৃষ্টির দ্বারা নীতি সমর্থনকারী মার্গ অধুনা স্থাপন করিয়াছেন। তৎসম্বন্ধে অধিক জ্ঞাতব্য কথা পরে বলা যাইবে। (ক্রমশঃ)

এবং শেষে তাহার positive স্বরূপ প্রাপ্ত হওয়া যায়—এইরূপ অনেক শাস্ত্রের পর্য্যালোচনা করিয়া ইনি স্থির করিয়াছেন। এই তিন পদ্ধতির অনুক্রমে আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক এই প্রাচীন নাম আমি এই গ্রন্থে দিয়াছি; কোঁৎ এই পদ্ধতি নূতন বাহির করেন নাই, উহা পুরাতনই। কিন্তু উহাদিগের ঐতিহাসিক ক্রমটি তাঁহার নূতন রচনা। সর্ব্বাপেক্ষা positive (আধিভৌতিক) পদ্ধতিই শ্রেষ্ঠ ইহাই তাঁহার নূতন কথা। ইংরাজী ভাষায় ইঁহার প্রধান গ্রন্থের ভাষান্তর হইয়াছে।

ধর্ম্ম প্রচারের সহজ উপায়।

(কথক—শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ন)

মানুষের ধর্ম্ম, মানুষের স্বাভাবিক। মানুষ স্বভাবতঃ ধার্ম্মিক; তাহার ধর্ম্মচ্যুত হইতে হয় চেষ্টা করিয়া। ধার্ম্মিক হওয়ার অর্থ এই যে মানুষ স্বভাবতঃ যাহা আছে তাহাই থাকিবে। যে জাতি, যে সম্প্রদায়, যে ব্যক্তি ইহা যখনই ভুলিয়াছে তখনই সে ধর্ম্মে "পতিত" হইয়া পড়িয়াছে।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে এই তিনটী কথা মনে রাখিতে হইবে যে ধর্ম্ম, সরস, সহজ এবং মঙ্গলপ্রদ। যাঁহারা কেবল একচোখো বিচার অনুসারে, শুধু আপনাদিগকে বড় করিবার জন্যই অধিকারি-ভেদে ধর্ম্মশিক্ষাদানের দোহাই দিয়া মানুষে মানুষে একান্ত ভেদের প্রশ্রয় দিয়াছেন, তাঁহারাই ধর্ম্ম জিনিসটাকে কেবল একটা কঠোর, দুর্ব্বোধ্য, শুষ্ক, এবং কৃচ্ছ্রলভ্য বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। ইহাঁরা ভগবানকেও যেন কেবল পাতকীর শাস্তিদাতা—"মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্"রূপে দেখিয়াছেন। ইহার ফলে এই দাঁড়াইল যে একদল লোকে ভাবিল যে ধর্ম্ম কেবল স্বার্থসাধনের উপায়; কেহ ভাবিল ধর্ম্ম একটা পোষাকের মত, কেহ ভাবিল ধর্ম্ম একটা দুষ্প্রাপ্য, দুর্ব্বোধ্য, দুঃসাধ্য বস্তু মাত্র।

ইহার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। মানুষ চিরদিন নিজেকে ছোটো ভাবিয়া এক কোণে পড়িয়া থাকিতে পারিবেই না। আজ কাল সক-

লের মনেই এ কথা জাগিতেছে যে, অন্য সকল বিষয়ে ভেদ থাকুক, তাহা না হয় ঠেকিয়াই সহিব, কিন্তু ধর্ম্মজগতেও আমরা চিরদিন ছোটো হইয়া চলিব এ একটা কেমন কথা? আমরা যতই কেননা চেষ্টা করি, এই যে ধর্ম্মজগতের নব-জাগরণ, ইহাকে কখনই আর বাধা দিতে পারিব না। কারণ মানুষের ভিতরের আসল মানুষটা জাগিয়া উঠিয়া যখন কিছু দাবী করে তখন আর তাহাকে কিছুতেই ঠেকাইয়া রাখা চলে না। যাহাদের ধর্ম্মগ্রন্থে নারদ দাসীপুত্র হইয়াও দেবর্ষি, ব্যাসদেব ধীবরীর গর্ভজাত হইয়াও পুরাণ-প্রণেতা, জবালার পুত্র সত্যকাম অজ্ঞাতকুলশীল হইয়াও শ্রদ্ধাভাজন, ধর্ম্মব্যাধ নিষাদ হইয়াও নমস্য, সে দেশে ইহা সহিবে কেন?

অনেক উৎপীড়নের পরে মানুষ যখন চেতিয়া উঠে, তখন তাহার গতিবিধি একান্ত উচ্ছৃঙ্খল, ও অনিয়মিত হইয়া উঠে। তখন তাহার সত্য লাভ করার চেয়ে উৎপীড়নের উপর আঘাত করিবার ঝোঁকটাই প্রবল হয়। কারণ তাহার হৃদ্‌গত আক্রোশে সে অন্ধবেগে চলিয়াছে, খাঁটি জিনিসটা চোখের সাম্‌নে থাকিলেও তাহার চোখে পড়ে না। বর্ত্তমান ধর্ম্মজগতে যাহারা পিছনে পড়িয়া আছে, তাহাদের এখন এই অবস্থা।

এখন প্রধান সমস্যা এই দাঁড়াইয়াছে যে ধর্ম্মকে সহজে সর্ব্ব-সাধারণের ভিতরে প্রচার করিবার উপায় কি?

প্রধান উপায়—ধর্ম্মশাস্ত্রের জটিল, নীরস, তথ্যগুলি খুব সরল এবং সরস ভাবে সর্ব্বসাধারণের ভিতরে প্রচার করিতে হইবে। আমাদের দেশে পূর্ব্বে কথকতা দ্বারা এই প্রকারে ধর্ম্ম প্রচারের খুব সুবিধা ছিল। কালক্রমে এখন কথকতাটা যেন একটু সেকেলে হইয়া পড়িয়াছে। আধুনিক শিক্ষিতগণের অনেকেই এই মহামঙ্গলপ্রদ বিষয়টির মর্য্যাদা বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। কিন্তু ইহা কতকটা কথকগণের দোষেও হইয়াছে বটে। দেশে ভালো কথক প্রস্তুত হওয়া দরকার। পরন্তু ধনীমানী শিক্ষিত ব্যক্তিগণের আবার কথকের উপরে সহানুভূতি থাকাও দরকার। গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের উৎসাহ দেওয়া আবশ্যক। কথকতা করা বড় কঠিন কার্য্য, কথক হওয়া বহু সাধন-সাপেক্ষ। কথকতার ভিতরে অভিনয়, সঙ্গীত, বক্তৃতা, তত্ত্বমীমাংসা, সকলই আছে। একজন কথক হইতে হইলে তাঁহার উৎকৃষ্ট অভিনেতা, সঙ্গীতজ্ঞ, পণ্ডিত, ভাবুক, ভক্ত এবং রসিক হইতে হইবে।

সেকালের বৃদ্ধবৃদ্ধাগণের অনেকেই নিরক্ষর হইয়াও ধর্ম্মতত্ত্বের জটিল বিষয়গুলির মীমাংসা করিতে পারিতেন। এ সকল তাঁহারা প্রধানত কথকতা শুনিয়াই শিক্ষা করিতেন। 'সেকেলে' বৃদ্ধবৃদ্ধাগণ সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয় সমস্ত রাজগণের এবং আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের বংশাবলীর ইতিহাস উত্তমরূপে জানিতেন। এখন আমরা শ্রীরামচন্দ্রের পিতার নাম জানি না, কিন্তু Henry নামক রাজার পূর্ব্ব পুরুষের নাম বলিতে পারি! সে একদিন গিয়াছে, যখন অনাড়ম্বর শ্যামস্নিগ্ধ ছায়াচ্ছন্ন পল্লীগৃহের অঙিনায়, শান্ত, স্তব্ধ সন্ধ্যায়, স্নেহময়ী, পুণ্য-প্রতিমা "দিদিমা"গণ মৃণ্ময়-প্রদীপের সম্মুখে পা ছড়াইয়া ভূম্যাসনে বসিতেন, আর তাঁহাদের চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া সরল, মুক্ত-প্রাণ বালক বালিকাগণ বসিয়া সীতার বনবাসদুঃখে কাঁদিত, শ্রীরামচন্দ্রের ত্যাগে বিস্মিত হইত, লক্ষ্মণের বীরত্বে উত্তেজিত হইত, এবং হনুমানের ভক্তিতে আর্দ্র হইত!

উপদেশের চেয়ে দৃষ্টান্তের প্রভাব অনেক বেশী। শুধু উপদেশে, এবং কয়েকটী দুর্ব্বোধ্য জটিলসূত্রবিশেষ বারম্বার আওড়াইলেই কোনো ফল হয় না। তত্ত্ববোধিনী কলাবিদ্যারও প্রয়োজন। নতুবা সহজে তত্ত্ববোধ হইবে না। যদি কেবল শুষ্ক উপদেশেই কাজ চলিত, তবে আমরা দেখিতে পাই যে শিশুপাঠ্য বাল্যশিক্ষা নামক গ্রন্থেই তো "ক—চোরকে সকলে ধিক্কার দেয়" অবধি "স্ত—হস্তীরও পদস্খলন হয়" ইত্যাদি অনেক উপদেশই তো রহিয়াছে। কিন্তু কেবল বাল্যশিক্ষার উপদেশেই ধর্ম্মজীবন গঠিত হয় না। দৃষ্টান্তের প্রভাবই অধিক ইহা আমরা সর্ব্বদা সর্ব্বথা দেখিতে পাই।

এই দৃষ্টান্তগুলি একটু সরস হইলে ভালো হয়; এবং সত্যিকার জীবনচরিত হইতে দেখাইলে আরো ভালো হয়। যাঁহার জীবনী হইতে দৃষ্টান্ত দেওয়া

যাইবে, তিনি যদি পরিচিত ব্যক্তি হন, অথবা এমন মানুষ হন, যাঁহার চরণে বহুকাল অবধি বহুলোকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়া আসিতেছেন, তবে তো কথাই নাই। অনেক সময়ে জীবিত ব্যক্তিদের চেয়ে মৃত ব্যক্তিদের জীবনচরিত হইতে দৃষ্টান্ত দিলেই সর্ব্বসাধারণের অধিক শ্রদ্ধার উদ্রেক হওয়া সম্ভাবনা। কারণ জীবিত কোনো এক ব্যক্তির প্রতি সকলের শ্রদ্ধা নাও থাকিতে পারে। কিন্তু যাঁহারা জগতে শুভ্র কীর্ত্তি রাখিয়া পরলোকে গমন করিয়াছেন, মৃত্যু দ্বারা যাঁহারা লোকের মনে আরো বেশী আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন, তাঁহাদের কথা প্রায় সকলেই শ্রদ্ধার সহিত শুনিবে ও তাঁহাদের পদাঙ্কানুসরণ করিতে ইচ্ছুক হইবে।

এই জন্যই বাজে নভেল নাটকের দৃষ্টান্ত অপেক্ষা জীবনচরিত হইতে দৃষ্টান্ত দেখাইলেই মানুষের বেশী শ্রদ্ধা আকৃষ্ট হয়, কারণ জীবনচরিত সত্য। এই জন্যই পুরাণ গ্রন্থগুলির অনেক স্থান হইতে কিছু কিছু বাদসাদ দিয়া, আধুনিক যুগের উপযোগী করিয়া, কেহ যদি তাহা প্রচার করিতে পারেন, তবে বিশেষ উপকার হয়। পুরাণগ্রন্থের ভাবগুলি আমাদের মজ্জাগত। বিশেষ করিয়া পুরাণগুলি পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে তাহাতে সামাজিক, নৈতিক কোনো আলোচনাই বাদ পড়ে নাই। কোনো নবেল অথবা নাটকে কোনো কল্পিত সদানন্দ স্বামী তাঁহার রামানন্দনামক শিষ্যকে কি উপদেশ দিতেছেন ইহা শুনার চেয়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন শুনিলেই লোকের মনে বেশী শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়। সত্য, চিরকালই সত্য। কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের মুখ হইতে তাহা বাহির হইলে উহার শতগুণ ক্রিয়ার উপলব্ধি হয়। ধর্ম্মজগতের জটিল তত্ত্বগুলি সেই নমস্য ঋষিগণের ধ্যানলব্ধ প্রত্যক্ষ সত্য। তাঁহাদের জীবনের সঙ্গে উহা গ্রথিত। তাই শুষ্ক তৃণের ভিতরে অগ্নিবৎ, লোকের চিত্ত উহা শুনিবামাত্রই পুণ্যপ্রভায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে বর্ত্তমান সময়ে, আধুনিক ধরণে বালকগণকে কি প্রকারে ধর্ম্মশিক্ষা দিতে হইবে, কি প্রকারে তাহাদের জীবন গঠন করিতে হইবে ইহা একটি বিষম সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বালকদের কাছে "ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ" কথাটাকে খুব প্রাকৃত বাংলা ভাষায় নেহাৎ সরল করিয়া ধরিলেও তাহাদের তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন হয়—কোনো-প্রকারে বুঝিলেও তাহা তাহাদের হৃদয় স্পর্শ করিবে না। একটা কথা বুঝা, আর তাহা জীবনে পরিণত করা এ দুইটা বিভিন্ন জিনিস। নিরক্ষর ও অর্দ্ধ-শিক্ষিত সাধারণ ব্যক্তিগণ ধর্ম্মজগতে বালক। তাহাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিতে হইলে একটু সরস এবং সরলভাবে বুঝাইতে হইবে। এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে হইবে নাটক, উপন্যাস, কবিতা, জীবনচরিত এবং কথকতা প্রভৃতির দ্বারা।

যাহারা কেবলমাত্র জটিল ও গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ রচনা দ্বারা ধর্ম্মপ্রচারের একান্ত পক্ষপাতী, তাহাদের দ্বারা উল্লিখিত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। বিশেষতঃ এযুগে শিক্ষিতগণের জন্যও বক্ষ্যমান উপায় অবলম্বনীয়।

এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমাদের ভিতরে পৌরাণিক উপাখ্যান, সুরুচিপূর্ণ, ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কারোপযোগী নাটকাদির প্রচলন হওয়া বিশেষ আবশ্যক। শক্তিমান্ গ্রন্থকারগণ এই সকল কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে বড়ই ভালো হয়। প্রায়শঃ এ ভাবের কোনো ভালো পুস্তক বাহির হইতেছে না। কেবল কবিতা আর ছোটো গল্পের পুস্তকেরি বেশী কাট্‌তি দেখিতে পাই। কিন্তু আমাদের নির্দ্দিষ্ট পুস্তকগুলির মধ্যে কবিতা ও ছোট গল্পের আস্বাদ তো থাকিবেই ; ইহা ছাড়া এমন কিছু থাকিবে. যাহাতে মানুষকে প্রকৃত পক্ষেই মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারে।

উক্ত উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী পুস্তক লিখিতে হইলে, পাণ্ডিত্য, ধৈর্য্য এবং শ্রদ্ধা থাকা বিশেষ দরকার। কারণ "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং"। পুরাণের উপাখ্যানগুলির অন্তর্নিহিত সত্য বিশেষ-ভাবে উপলব্ধি করিতে হইবে। একটা সত্য কথা পুনঃ পুনঃ বলা কিম্বা লিখিত হইল, তবু মানুষ তাহা গ্রহণ করিল না ; ইহাতে বুঝিতে হইবে যে সেই ভাব বা সত্যটার পশ্চাতে যতটা ভাষার জোর, লিখন ক্ষমতা এবং ঐকান্তিকতা থাকিলে মানুষের মনে ক্রিয়া করিবে, তাহার অভাব হইয়াছে। এক একটী সত্য প্রচারের জন্য প্রাণপাত করিতে হইবে। চালাকির দ্বারা কোনো মহৎকার্য্য সিদ্ধ হয় না। যিশুখ্রীষ্ট, সক্রেটিশ, গ্যালিলিও সত্য প্রচারের জন্য প্রাণ দিয়াছেন ; গৌরাঙ্গ, বুদ্ধ গৃহত্যাগ করিয়াছেন ; মহম্মদ কতই না লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াছেন !

নাট্যাভিনয়ের দ্বারাও সহজে সর্ব্বসাধারণের ভিতরে ধর্ম্মপ্রচারের সুবিধা হয়। সকল সভ্যজাতির ভিতরেই উৎকৃষ্ট নাট্যাভিনয়ের দ্বারা লোকশিক্ষার ব্যবস্থা আছে। আমাদের দেশেও এ প্রথা অতি পুরাতন কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে সুরুচিপূর্ণ, সরস নাটকের এ দেশে বড়ই অভাব। ব্যবসায়ী নাট্যসম্প্রদায় যে সকল নাটকের অভিনয় করিয়া থাকেন, তাহা দ্বারা ভাল হওয়া অপেক্ষা ক্ষতিই বেশী হইতেছে। ইহাদের অনেক নাটকই পিতার কাছে বসিয়া পুত্র অসঙ্কোচে পড়িতে পারে না। অথচ এই সকল নাট্যাভিনয় দেখিতে অর্থব্যয় করিয়া দলে

দলে স্কুল কলেজের ছাত্রগণ এবং ভদ্রলোকগণ রঙ্গালয়ে উপস্থিত হইতেছেন। স্কুল কলেজের ছাত্রগণেরও এই সকল অভিনয় দেখিয়া অভিনয় করিবার একটা ইচ্ছা জন্মে। কিন্তু সুরুচিপূর্ণ উৎকৃষ্ট নাটকের অভাবে প্রায়শঃ তাহাদের সে ইচ্ছা পূর্ণ হইয়া উঠে না। মানুষের জীবনে উৎকৃষ্ট আনন্দ না পাইলেই রুচিবিকার উপস্থিত হয়। ধর্ম্মমূলক, সমাজ সংস্কারোপযোগী নাটক প্রকাশিত করিয়া দেশের এই অভাব দূর করিলে বড়ই ভালো হয়।

আমাদের দেশে গুরুগম্ভীর দার্শনিক তত্ত্বের লেখক ও কথক অনেক আছেন; কিন্তু আমরা এ যুগে চাই একদল পণ্ডিত এবং রসজ্ঞ ব্যক্তি, যাঁহারা সহজ মানুষ হইয়া, সহজ কথা কহিয়া, সহজে মানুষকে মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারিবেন।

একটী পত্র।

আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি যে গত সংখ্যার পত্রিকায় প্রকাশিত "ব্রাহ্মসমাজে অনূঢ়া-সমস্যা" প্রবন্ধ সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। এই সম্বন্ধে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জনৈক গণ্যমান্য সভ্য আমাদিগকে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা হইতে কতক অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি—

"শ্রাবণ মাসের তত্ত্ববোধিনীতে আপনি যে "ব্রাহ্মসমাজে অনূঢ়া-সমস্যা" প্রবন্ধটী লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া অত্যন্ত সন্তোষ লাভ করিলাম, এবং এই কথা আপনাকে জানাইবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।

"এমন কোন আচার বা রীতি নাই, যাহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। যাহাতে আচার নিয়মের ভালটী রক্ষা পায় এবং মন্দটী বর্জ্জন করা যায়, সাধুসমাজমাত্রের বুদ্ধিমান্ ও হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত। মেয়েদিগকে লেখাপড়া না শিখাইলেও চলিবে না; কিন্তু লেখাপড়া শিখাইবার যদি কোনও আনুষঙ্গিক দোষ থাকে, তাহাও পরিহার করিতে হইবে। আমাদের মেয়েরা উচ্চ শিক্ষা না পাইলে চিরকালই বিলাতী মহিলাদের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে; তাঁহারা আসিয়া আমাদের দেশের স্ত্রীশিক্ষার হর্ত্রী, কর্ত্রী, বিধাত্রী হইবেন। আবার গৃহস্থাশ্রম বা বিবাহিত জীবনই যে যুবক ও যুবতীর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট জীবন, তাহা ভুলিলে চলিবে না।

"আপনার বিপক্ষবাদীদের অবস্থায় আপনি সহানুভূতি দেখাইয়া ব্রাহ্মসমাজে অনূঢ়া বৃদ্ধির অমঙ্গল আশঙ্কা যথাযথ বিবৃত করিয়াছেন, বিশেষতঃ একদিকে পুত্রের ইংরেজী শিক্ষা, অন্যদিকে কন্যার ইংরেজী শিক্ষা, এতদ উভয় ব্যয়-সাপেক্ষ শিক্ষার চাপে পড়িয়া ব্রাহ্মসমাজ বিশেষরূপ দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে।"

মান্যবর শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহোদয়ের সম্মানলাভ।

আমরা গভীর আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে আদিব্রাহ্মসমাজের অন্যতর সভাপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী এম-এ, মহোদয় গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক "সার" উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। এতদুপলক্ষে পারিবারিক হিতকরী সভা গত ২৮শে জুলাই দিবসে টেগোর কাসেলে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। তদুপলক্ষে নিম্নলিখিত কবিতাটী পঠিত হইয়াছিল।

হে বাঙ্গালীর ভুবন-আলো, জ্ঞানের মেরুযাত্রী,
তোমার মানস-প্রতিভাতে, প্রভাত তিমির-রাত্রি।
দেশ বিদেশের নিত্য বাণী, ভাষা-সাগর-রত্নহার,
উজলিছে কণ্ঠ তব অক্ষয় অতুল অলঙ্কার।
সুপ্রসন্ন দৃষ্টি তোমার, সম্মানিত শুভ্রকেশ,
দিব্য শুভ মনুষ্যত্বে উদ্বোধিত সর্ব্ব দেশ।
একনিষ্ঠ বিদ্যাতপাঃ গৌরব-হিমালয়-মাঝে,
সিদ্ধি তোমায় বরণ করে, সফল-শঙ্খ ওই বাজে।
মগ্ন আছ কর্ম্মযোগে, স্বর্ণরথে পূর্ব্বাশায়,
দেখ্‌ছ অন্তঃনেত্র মেলি' শুক-তারকার রশ্মি প্রায়।
সার্ব্বভৌম শ্রেষ্ঠ নিধি, চিত্ত-বিকাশ-মন্তরে
ধন্য তোমার অন্তরাত্মা, যশের তৃষ্ণা জয় করে।'
আজকে তোমায় বন্দিতেছি, প্রস্ফুটিত হৃৎকমল,
আনন্দেরি ছন্দলীলায় স্পন্দিছে এই বক্ষতল।
তোমার মহিমায় মহীয়ান্, আমরা তোমার দেশবাসী
গুণের পূজায়, বীরের পূজায় অর্ঘ্য সঁপি তাই আসি।
দেশকে বড় করেছ গো, এই অভিষেক তার লাগি'
বিরাট্ বনস্পতি তুমি, আমরা ছায়া-ফল-ভাগী।
অনুরাগের বেদীর পরে প্রতিষ্ঠিয়া সিংহাসন,
আরতি-দীপ উদ্ভাসিয়া বসায় তোমার ভক্তজন।
এস নীরব সরল সুধা, প্রাণ উঠেছে চঞ্চলি'
লও গো মোদের সচন্দন এই ভক্তিপ্রেমের অঞ্জলি।

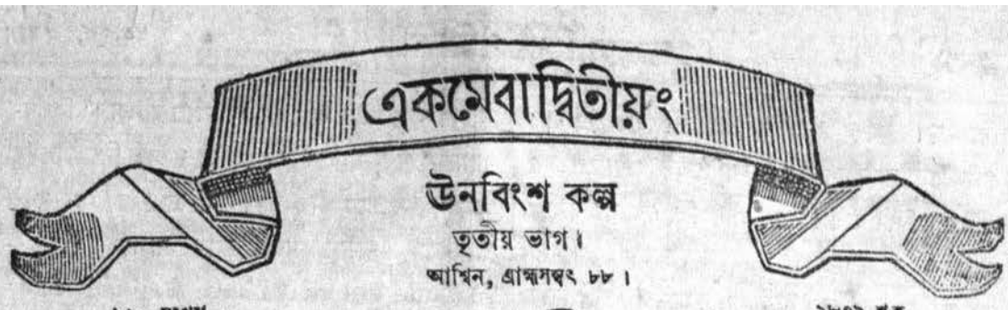

ঊনবিংশ কল্প
তৃতীয় ভাগ।
আশ্বিন, ব্রাহ্মসম্বৎ ৮৮।

৮৯০ সংখ্যা

১৮৩৯ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"

তবুও ক্রন্দন।

তোমা বড় ভালবাসি ওগো প্রাণসখা—
তুমি এসে দেখে যাও মরমের মাঝে
তোমার প্রেমের দীপ ধ্রুবতারা যেন
নয়নের আগে মোর সদা জেগে আছে—
তবুও ক্রন্দন কেন অন্তরেতে জাগে ?
চিন্তা তবু কেন ঘুরে তোমা হতে দূরে ?
তোমারে জানিতে চাহি আরো আরো আরো
সাধিয়া তোমারি প্রিয়—আশা নাহি পূরে।
মুহূর্ত্তেরো তরে তোমা দেখিবারে চাই—
কেঁদে কেঁদে অন্ধ হনু—তবু নাহি পাই।
তবে কি তোমারে ভাল নাহি বাসি আমি ?—
ভাবিতেও নারি যে তা' হে জীবনস্বামি।
কবে মম পূর্ণ প্রেম তোমারি চরণে
নিবেদি' সার্থক হব, সদা ভাবি মনে।
মুহূর্ত্তের তরে দেব ভেঙ্গে দাও ভয়
সংশয় দূরিয়া দাও করগো অভয়।
তোমারি পরে নির্ভর শিখাও করিতে
তোমারি মহান প্রেমে শিখাও মিলিতে।
সকল সংসার মাঝে কেবা আছে বল
হৃদয়ে ধরিয়া যারে হইব সবল!
জানায়ে যাহারে সব সুখ দুঃখ কথা
জুড়াব তপত প্রাণ ঘুচাইব ব্যথা ?

———

কাতর প্রার্থনা।

হে প্রাণেশ্বর, তোমাকে পাইবার আনন্দের একটী কণিকামাত্র আমাকে দাও, তাহাতেই যে আমার হৃদয় আনন্দে ভরিয়া উঠিবে; তাহাতেই যে আমার হৃদয়ে আনন্দের বন্যা আসিবে। সেই বন্যাতে আমার হৃদয়ের দুই কূল ভাসিয়া গিয়া নব নব জ্ঞানের নব নব ভাবের জন্মদান করিবে। প্রাণনাথ, তোমার সেই আনন্দের চিন্তামাত্র আমাকে পাগল করিয়া দিতেছে। তোমার আনন্দ-বারির একটী কণা দিয়া আমার এই উন্মত্ত প্রাণকে শীতল কর, তাহার পিপাসার শান্তি কর। তোমার সেই আনন্দকণাটুকু পাইবার জন্য সমস্ত রাত্রি আমি আমার হৃদয়নদীর তীরে বসিয়া কাটাইলাম। তোমার আনন্দকণার পরিবর্ত্তে চারিদিক হইতে কত গঞ্জনা লাঞ্ছনার তীব্র শিলাঘাত, নিন্দাবাদের বরষার ধারা, ভবিষ্যৎ চিন্তার নিবিড় অন্ধকার, এই সকল একটীর পর একটী আসিয়া কত না আঘাত দিয়াছে, হৃদয়ে কত না ভীষণ তরঙ্গ জাগাইয়া তুলিয়াছে। সমস্ত রাত্রি নিশীথিনীর গভীর অন্ধকারে ভয়ে কাঁপিতেছিলাম, কিন্তু তোমার সেই আনন্দকণা লাভ করিবার আশা ত্যাগ করিতে পারি নাই। প্রভু, সে অন্ধকার এখন কাটিয়া গিয়াছে, এখন আর নিন্দা গঞ্জনা প্রভৃতির সকল ভয় দূরে গিয়াছে। প্রভাতের আলোক দেখা

দিতেছে। প্রভু আর তুমি বিলম্ব কোরো না। তোমার আনন্দধারায় আমাকে প্রাতঃস্নাত ও পবিত্র করিয়া দাও। হে প্রাণপতি, তোমার সঙ্গে আমাকে অচ্ছেদ্য প্রেমসূত্রে আবদ্ধ কর। আমার মত অকিঞ্চন ব্যক্তি তোমার প্রেমের অধিকারী হইয়াছি—একথা ভাবিতেও যে ভয়ে আনন্দে সমস্ত হৃদয় কাঁপিয়া উঠে। যত কিছু নিন্দা গঞ্জনা আমি সহ্য করিয়াছি, সকলকে নমস্কার করি—তাহারা তোমাকে আমার স্মৃতিতে সর্ব্বদা জাগ্রত রাখিয়াছে।

অনন্ত ও কাল।

(শ্রীযোগেশ চন্দ্র চৌধুরী)

অনন্তের মুখের অবগুণ্ঠনের নিমিত্ত যে দুইখানি যবনিকা প্রস্তুত হইয়াছে তাহার একখানি কাল অপর খানি স্থান। সান্ত মানব যখনই অনন্তকে জানিতে চায় এই দুইটী যবনিকা তাহার দৃষ্টির অন্তরাল করিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়ায়। তাই সৃষ্টির আদি কাল হইতে মানব কেবলই অনন্তকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহার সাক্ষাৎলাভ করিয়া মানবের হিসাব নিকাশ একেবারে কখনও মিটাইয়া ফেলা হয় নাই। কোন্ মাহেন্দ্রযোগে হয়ত কখন্ কে এই অবগুণ্ঠন ঈষদুন্মোচিত হইতে দেখিয়াছেন—বিদ্যুৎপ্রভার ন্যায় চকিতে অনন্তের সেই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া ক্ষণিকের তরে আত্মবিস্মৃত হইয়াছেন—আবার পরক্ষণেই সেই যবনিকা তাঁহার নয়নের সম্মুখে পড়িয়া তাঁহার দৃষ্টি অবরোধ করিয়াছে। অনন্ত চিরদিনই মানবের নিকট প্রহেলিকা। "ফাউষ্ট" সারাজীবন জ্ঞান উপার্জ্জনে কাটাইয়া, মৃত্যুকালে—"আরো আলো আরো আলো" বলিয়া হতাশ হৃদয়ে চীৎকার করিয়াছেন।

"কোথায় আলো ওরে কোথায় আলো
বিরহ আঁধারে তারে জ্বালো"

অনন্তের সঙ্গে মিলন হয় নাই, বিরহ-অন্ধকারে হৃদয় পূর্ণ—আলোর অন্বেষণ চলিয়াছে, আলো কোথায়? কালের যবনিকার অন্তরালে। এই যবনিকা ভেদ করিতে পারিলে যথার্থ আলো দেখা যাইবে—অন্য আলো আলেয়ার আলোকের ন্যায় মানবকে বিপথগামী করিবে, সারাজীবন কেবল মৃত্যুর দিকে লইয়া যাইবে, অবশেষে জীবনপথে দীর্ঘ ভ্রমণের পর ক্লান্ত পথিককে ম্যাক্‌বেথের ন্যায় বলিতে হইবে—"All our yesterdays have lighted fools the way to dusty death"—কিন্তু অনন্তের আলোকরশ্মি যদি আবিষ্কৃত হয়, যদি সত্যের আলোক নয়নে কখনো আবির্ভূত হয়, তখন সমস্ত অন্ধকার কাটিয়া যাইবে—সব অস্ফুট ফুটিয়া উঠিবে, সন্দেহ থাকিবে না—সংশয় থাকিবে না—সত্যের ভাস্বর জ্যোতিতে হৃদয়পদ্ম প্রস্ফুটিত হইবে।

অনন্তের ব্যাপার আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না। ক্ষুদ্র জ্ঞান ক্ষুদ্র দর্শনে কত নব নব মীমাংসা করিতেছি—কত বিজ্ঞানের সৃষ্টি হইতেছে তথাপি মানবের অভাব মিটিতেছে না। জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করিবার জন্য কত নব নব অস্ত্র নির্ম্মিত হইল, কত সুখের, সাধের ভোগের সামগ্রী প্রস্তুত হইল কিন্তু সুখ কোথায়, শান্তি কোথায়? সবই অচিরস্থায়ী, সবই অনিত্য, সবই চঞ্চল। আজ যাহাকে দেখি—কাল আর দেখি না, আজ যে যৌবন সরোবরে স্নান করিয়া সুখের হিল্লোলে ভাসিতেছে—কাল সে জীর্ণ জরাগ্রস্ত; সবই অনিত্য সবই চঞ্চল সবই নশ্বর! কালের হস্তে কাহারও নিস্তার নাই, কাল সকলকে ধ্বংসের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। সংহার—সংহার, মহামার, গগনে গহনে এই ভীমরব উঠিয়াছে। নিস্তার নাই কাহারও, নিস্তার নাই "সহায় সম্পদবল, সকলই ফুরায় কাল";—কাল রৌদ্র, কাল ভীষণ, কাল করাল! বিশ্বে যখন মহাপ্রলয় উপস্থিত হয় প্রলয়ের প্রলয়ঙ্করী ভেরী যখন স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল প্রকম্পিত করিয়া বাজিতে থাকে, সেই বাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে মহাকাল তাণ্ডব নৃত্য করেন। কাল এমনই ভয়ঙ্কর। নিত্য খণ্ডপ্রলয় চলিতেছে, আবার মহাপ্রলয়—যদিও বা খণ্ডপ্রলয়ে কিছু রহিয়া গেল মহাপ্রলয়ে তাহাও আর রহিবে না। সর্ব্বসৃষ্টির নাশকর্ত্তা মৃত্যুবিধায়ক এই কাল মানবের সমস্ত চিহ্ন লোপ করিয়া আসিতেছে। কোথায় গেল আর্য্যের সে অপূর্ব্ব গৌরব, সমগ্র সভ্য জগত স্তব্ধ হইয়া অনিমিষ নয়নে যাহার পানে দৃষ্টিপাত করিয়াছিল? ম্যারাথন,

থার্ম্মাপলী, গ্রীস আজ আঁধারে নিমজ্জিত কেন? মুসলমানের সে অর্দ্ধচন্দ্রাঙ্কিত বিজয়বৈজয়ন্তী, সসাগরা অর্দ্ধধরার বক্ষের মাঝখানে একদিন যাহা উড্ডীন হইয়াছিল, সুবাতাসের অভাবে আজ তাহা কোথায় পড়িয়া আছে? এ সকলের প্রভাব লোপ করিয়াছে কে? এ প্রশ্নের একমাত্র উত্তর "কাল।" কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে শ্রীভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া ভীত অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "এ রূপ কিসের?" —উত্তর হইয়াছিল—"কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ"—সকলে চক্ষে দেখিতেছেন এবং বিশ্বাসও করিতেছেন যে কালই যথার্থ ক্ষয়কারী; কালের ভীম প্রহরণের আঘাতে বালক বৃদ্ধ যুবা কাহারও পরিত্রাণ নাই। কালের অঙ্গ হইতে অগ্নিবৃষ্টির ন্যায় জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু নিয়ত বর্ষিত হইতেছে—ইহাই কালের চিত্র।

ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানব আমরা—প্রকৃতির সকল দিক দেখিবার শক্তি আমাদের কোথায়? সামান্য একটু দর্শন ও পর্য্যবেক্ষণ করিতে না করিতে আমাদের ধৈর্য্যচ্যুতি হয়—নিজেদের মনগড়া একটা মীমাংসায় আমরা অবিলম্বে উপস্থিত হইয়া থাকি। টেনিসনের "আর্থার" পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার সে চেষ্টা সফল হয় নাই। তাঁহার আত্মীয় শিষ্য তাঁহার সর্ব্বনাশ করিয়াছে—তাঁহার প্রাণোপমা পত্নী বিশ্বাসঘাতিনী। আপনারই বাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিয়া রক্তাক্তকলেবরে বিকলাঙ্গ আর্থার পড়িয়া আছেন —তাঁহার মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে জীবনের একমাত্র শেষ সঙ্গী "সার বিডিভিয়ার"। বিডিভিয়ার চিন্তা করিতেছেন—"একি হইল—এমন মহৎ কার্য্যের এ শোণিতবাহী পরিণাম কেন? আত্মীয় স্বজনের রক্তরঞ্জিত সমরস্থল এ মহাপুরুষের সমাধি কেন"? মীমাংসা হয় না—কিছুই বুঝিতে পারেন না। সহসা তাঁহার মনে হইল—"perchance we see not to the end" আমরা শেষ পর্য্যন্ত দেখি না। পরিণাম পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবার ধৈর্য্য আমাদের নাই, তাই জগতের অনেক কার্য্য আমাদের প্রহেলিকা মনে হয়, অনেক কার্য্য অত্যাচার অন্যায় বলিয়া মনে হয়। বিশ্বের অপরিবর্ত্তনীয় সনাতন নিয়ম যুগ যুগান্তরের ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়া জীব ও জড় জগতকে রমণীয় বরণীয় ও কমনীয় করিয়া তুলিতেছে। আমরা মনে করিতেছি কাল ধ্বংস করিতেছে—মানবের প্রিয়তমগুলিকে অপহরণ করাই কালের কার্য্য। আর্থারকে রণস্থলে শোণিতার্দ্র ভাবে পতিত থাকিতে দেখিয়া কাহার না চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হয়—তাঁহার অপেক্ষা কে অধিক দুঃখ ভোগ করিয়াছে? তাঁহার সমস্ত জীবনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছে। যদি এই খানেই এ দৃশ্যের পরিসমাপ্তি হইত তাহা হইলে বলিতাম "কাল সব ধ্বংস করিল—আর্থারের বিপুল কীর্ত্তি, মহান উদ্দেশ্য আজ কালস্রোতে ভাসিয়া গেল।" কিন্তু পরক্ষণেই দেখিতেছি যে না, তাহা সত্য নয়; ইহা পরিণাম নহে, একটী অবস্থামাত্র—এখনও শেষ হয় নাই—ইহা আর্থারের জীবননাট্যের যবনিকা নয়—একটী গর্ভাঙ্কের পরিসমাপ্তি মাত্র। Hope Charity এবং Faith নামক তিনটী তরুণী দেবকন্যা পরিশ্রান্ত আর্থারকে লইয়া কোন্ অজানার পারে চলিয়া গেলেন। কালের যবনিকার অন্তরালে যে দৃশ্য লুক্কায়িত ছিল তাহা যে অতীব মনোরম, সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী তাহাতে আর কি সন্দেহ আছে? আর্থারের জীবননাট্য যে ট্রাজেডী তাহা আর বলিবার উপায় নাই; যদি আশা থাকে, বিশ্বাস থাকে, প্রাণের কণ্টক তুলিয়া ফেলিবার জন্য কোন ব্যগ্রহস্ত পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকে তবে আর কিসের ভয়? এইখানেই ট্রাজেডীর কল্পনা ছাড়িয়া দিয়া মনে করিতে হয়—জীবন—"Divine Comedia।" কদর্য্যতার মধ্য হইতে এ স্বর্গের সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিল কে? কাল—অপেক্ষা করিতে হইবে, কালকে ধ্বংসের কর্ত্তা বলিয়া সব মীমাংসা শেষ করিয়া ফেলিলে চলিবে না।

কালের ধ্বংসের চিত্র আমরা দেখিয়াছি—এইবার তাহার মুখের অবগুণ্ঠন অপসারিত করিয়া তাহার অন্যমূর্ত্তি দেখিতে হইবে। জগতে যত বরণীয় মহাজন জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহারা ছিলেন বলিয়া এই ধরণী ধন্য হইয়াছে সেই সকল মহাপুরুষগণের সৌন্দর্য্য কে এ জগতে প্রকাশ করিয়াছে? অতীতকে কে নূতন নূতন রূপ দিয়া মানবের মানসসরোবরে "মধুময় তামরসের" ন্যায় নিত্য প্রস্ফুটিত করিয়া রাখিয়াছে? কাল যদি

ধ্বংসেরই নায়ক, তবে কেন এত ধ্বংসের পর ধরণী আজিও সুন্দর? এখনও প্রভাতের আলো, মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড, সান্ধ্য তপন, পূর্ণিমার কৌমুদীধারা নিত্য সৌন্দর্য্য প্রবাহ আনিতেছে কেন? কাল যদি শুধু ধ্বংসই করিত তাহা হইলে এ পৃথিবীর অস্তিত্ব এতদিন লোপ পাইত, এই পরিদৃশ্যমান সুন্দর বিশ্বের পরিবর্ত্তে রহিয়া যাইত একটী শব—কঙ্কালচ্ছাদিত বিরাট মহাশ্মশান। ধ্বংস এ সৃষ্টির পরিণতি নহে; কঙ্কাল সৌন্দর্য্যের পরিণতি নহে, মৃত্যু জীবনের পরিণতি নহে।

অনন্তের দুইটী দিক আছে একটী ব্যক্ত আর একটী অব্যক্ত। একটী মানবের নয়নে নিত্য প্রতিভাত আর একটী গভীর রহস্যযবনিকার অন্তরালে। দুইটী দুই বিভিন্ন প্রকারের। কবি লংফেলো বলিয়াছেন "Things are not what they seem"—বাস্তবিক তাই কালকে আমরা ধ্বংসের নায়ক বলিয়া মনে করিতেছি। আপাত দৃষ্টিতেতাহাই বোধ হয়। কিন্তু ব্যক্ত দৃষ্টিতে অব্যক্তের রহস্য কেমনে উদ্ঘাটন করিব? অব্যক্তকে বুঝিতে হইলে দৃষ্টির সম্মুখে যাহা দেখা যায় তাহা হইতে আরও দূরে যাইতে হইবে—দূরে দূরে বহুদূরে, তরঙ্গের পর তরঙ্গে চলিতে হইবে; বিশাল কালপয়োধির অন্ত নাই সীমা নাই কেবল অবিশ্রান্ত গর্জ্জনশীল লক্ষ উর্ম্মিমালার আকুল প্রাণের অশ্রান্ত লীলা।

কালের তরঙ্গাঘাতে ধ্বংসের সম্ভাবনা নাই কেবলমাত্র নিত্য সৌন্দর্য্যের নবতর বিকাশ! অনিত্য আসিয়া সেই বিকাশকে মাঝে মাঝে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলে, কাল তাহার তরঙ্গাঘাতে অনিত্যের সেই আবরণ খানিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়—তখন আবার নিত্য জ্বাজল্যমান ভাস্বর জ্যোতিতে বিরাজমান হইতে থাকেন। এই লীলা অনন্তকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে।

আমাদের এই ধরণী অনন্তযৌবনা। নব নব ধ্বংসের মধ্য দিয়া ইহাঁর অনন্ত সৌন্দর্য্যের বিকাশ। জরা, ব্যাধি, মৃত্যুকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া কাল এই নিত্য সৌন্দর্য্যকে নিত্য নূতন করিয়া প্রকাশ করিতেছে। আপাত দৃষ্টিতে আমরা ধ্বংস দেখি বটে, কিন্তু এ ধ্বংসের প্রকৃত তত্ত্ব কি? সৌন্দর্য্যের গাত্র হইতে ধূলি অপসারণ, বিশ্বের এই সনাতন নিয়মই এই তত্ত্ব। সকল সমাজ, মানব এবং জড় জগতকে এই নিয়ম মানিয়া চলিতে হইতেছে। সকল দেশে সংস্কারকগণ এই বিশ্বনিয়মেই তাঁহাদের কার্য্য করিতেছেন। "Iconoclast" বলিয়া জগত যাঁহাদিগকে গালি দিয়াছে তাঁহারা বাস্তবিক "Iconoclast" নহেন—তাঁহারা প্রকৃতই সৌন্দর্য্য ও কল্যাণের উপাসক! ধ্বংসের মধ্যেই সৃষ্টির বীজ নিহিত রহিয়াছে। সৃষ্টির নিমিত্ত ধ্বংসের প্রয়োজন—নব সৌন্দর্য্য বিকাশের নিমিত্ত ধ্বংসের প্রয়োজন। মৃত্যু অমঙ্গল নহে—মৃত্যু চিরদিন কল্যাণকে বরণ করিয়া আসিতেছেন। মানব এই চিরযৌবনা ধরণীকে নিজের ক্ষীণ দৃষ্টিতে দেখিয়া মাঝে মাঝে মনে করেন বুঝি ইহার যৌবন বিগত হইয়াছে—তখন যেমন দেখিয়াছিলাম আর বুঝি তেমন নাই; প্রভাতের আলো সেকালে যেমন করিয়া সোনা ছড়াইত—কই এখন ত আর তেমন করিয়া ছড়ায় না—আকাশের নীলিমা আর যেন তেমন গাঢ় নয়—যেমন দেখিয়াছি তেমন আর দেখিব না, যেমন গিয়াছে তেমন আর হইবে না! তাঁহার কেবলই মনে হইতে থাকে—"আবার কবে ধরণী হবে তরুণা?" তাঁহার প্রাণে অনন্ত আশা—ধরণীকে আর একবার তেমন ভাবে দেখেন, জগতে নব আগন্তুক হইয়া আসিয়া সেই সোনার শৈশবকালে যেমন দেখিয়াছিলেন—যৌবনের সুখস্বপ্নের মাঝে মাঝে আধবিজড়িত ঘুমঘোরে এই তরুণা ধরণীর যে মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন তাহা তাঁহার চিত্তে চিরাঙ্কিত হইয়া গিয়াছে; তাই জরাগ্রস্ত কলেবরে বৃদ্ধ বয়সে পুনরায় তিনি ধরণীর সেই রূপ দেখিতে কামনা করেন।

কিন্তু কেমন করিয়া দেখিবেন—কে তাঁহাকে দেখাইবে, সে নয়ন যেআর নাই—নয়নে আবরণ পড়িয়াছে। এ আবরণ উন্মুক্ত করিবে কে?

"দিবে সে খুলি এ ঘোর ধূলি আবরণ
তাহার সাথে কনকপ্রাতে জগতজাগা জাগরণ"

এই সুপ্ত সৌন্দর্য্যবোধকে জাগাইয়া তুলিবে কাল—সেই জাগরণে ধূলি অপসারিত হইবে, মানব নিজে জাগিবেন, সঙ্গে সঙ্গে এই জগতও জাগিয়া উঠিবে। এই জাগরণের নিমিত্ত মৃত্যুর প্রয়োজন; মৃত্যুর মধ্য হইতে এই জাগরণের বিকাশ। সেক্ষপীয়র বলিতেছেন—"To die perchance to sleep
Ah, there's the rub."

হ্যামলেটের সন্দেহ হইতেছে যে মৃত্যু মাত্র নিদ্রা বা বাস্তবিকই মৃত্যু। নিদ্রা নয়—জাগরণ। মানবের যৌবন মৃত্যুনদীর পরপারে মানবের জন্য অপেক্ষা করিতেছে, মরণ পার হইলেই আবার তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। চিরকল্যাণকে জাগরিত করিতে চিরসৌন্দর্য্যের উদ্বোধনে মৃত্যু পুরোহিত মাত্র। কবি বলিতেছেন—

"যে অম্লান কুসুমের মধু পান তরে
নিয়ত লোলুপ মম চিত্ত মধুকরে
যে উদ্যানে সে কুসুম নিত্য বিরাজিত
হে মৃত্যু তাহার তুমি শরণি নিশ্চিত!"

হিন্দু পুরাণ আলোচনা করিলে—"মৃত্যু যে মঙ্গলময় এবং সৌন্দর্য্যের আকর" এই তত্ত্বেরই মীমাংসা দেখিতে পাই। মহাকাল ধ্বংসের নায়ক। দেবদেব ত্রিশূলী তাঁহার শূলাঘাতে এই জগত সংসারের লয় করিতেছেন। অথচ তিনিই আবার শিব সুন্দর। তিনি সর্ব্বমঙ্গলের আকর—তাঁহার সৌন্দর্য্যের তুলনা নাই। অনন্তের এ প্রহেলিকা কে বুঝিবে! হে মৃত্যুরহস্যবিজড়িত অনন্ত, মঙ্গলময় চির সৌন্দর্য্যাধিনায়ক মহাকাল, তোমাকে বুঝিতে চাহি না! তুমি তোমার যবনিকার অন্তরালে চিরদিন অবস্থান করিয়া, অনন্তকালের তরে আমার হৃদয়ে নব নব সৌন্দর্য্যের সঞ্চার কর—নব নব কল্যাণের দ্বারা আমাকে বিমণ্ডিত কর। হে অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় চিররহস্যময় তোমার চরণে কোটী কোটী প্রণাম।

প্রভাতী-উপাসনা।

(কথক—শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ন)

আজি এ প্রভাতে, উঠিনু জাগিয়া
তোমারে করিয়া প্রণতি
দেহ হৃদয়ে নবীন আশা
বাহুতে দেহগো শকতি।

জীবনে মরণে মননে বচনে
মতি গতি যেন রহে গো চরণে
অবিরত যেন রাখি গো স্মরণে
জীবনসাধনা মহতী।

বরণে গন্ধে ছন্দে গীতে
আঁধারে আলোকে প্রদোষে নিশীথে
অবিরত যেন বহি আনে চিতে
তোমারই অনুভূতি।

(কর) আকাশের মত কান্তবিমল
শিশিরের মত শুভ্র শীতল
প্রভাতের মত আলোক-উজল
দেহগো প্রাণে ভকতি।

(কর) কুসুমের মত পূত নিরমল
সুরভির মত পীযূষ-তরল
বাতাসের মত মুক্ত সরল
দেহ অবাধ মুকতি।

স্থির চেতনা প্রাণের প্রাণ
উচ্চ লক্ষ্য হৃদয়ে আন
দৈন্য লজ্জা করহে ম্লান
জয় জয় তব জয়তি।

গীতা-রহস্য।

কর্ম্মযোগশাস্ত্র।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদিত)

একই অর্থ বিবক্ষিত হইলেও 'ভাল ও মন্দ' এই অর্থেই 'কার্য্য ও অকার্য্য', 'ধর্ম্ম্য ও অধর্ম্ম্য', ইত্যাদি বিভিন্ন পর্য্যায় শব্দের ব্যবহার কেন প্রচলিত হইল? ইহার কারণ,—বিষয় প্রতিপাদন বিষয়ে প্রত্যেকের মার্গ কিংবা দৃষ্টি ভিন্ন ভিন্ন। যে যুদ্ধে ভীষ্ম দ্রোণাদিকে বধ করিতে হইবে সেই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর কিংবা শ্রেয়স্কর নহে, অর্জ্জুনের এইরূপ প্রশ্ন ছিল (গী, ২, ৭)। কোন আধিভৌতিক পণ্ডিতের উপর যদি এই প্রশ্নের উত্তর দিবার ভার পড়িত, তবে মহাভারতীয় যুদ্ধ হইতে অর্জ্জুনের নিজের লাভালাভ কিরূপ ও সমস্ত সমাজের উপর তাহার কি পরিণাম ঘটিতে পারে তাহার সারাসার বিচার করিয়া, যুদ্ধ করা 'ন্যায্য' কি 'অন্যায্য' এই বিষয়ে তিনি নিষ্পত্তি করিতেন। কারণ, কোন কর্ম্মের—

জগতের উপর—যে আধিভৌতিক অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বাহ্য পরিণাম ঘটিতে পারে তাহা ব্যতীত উক্ত কর্ম্মের ভালমন্দ নির্ণয় করিবার দ্বিতীয় সাধন বা কষ্টিপাথর এই আধিভৌতিক পণ্ডিতের অভিমত নহে। কিন্তু এইরূপ উত্তরে অর্জ্জুনের সমাধান হয় না। তাঁহার দৃষ্টি ইহা অপেক্ষা ব্যাপক ছিল। শুধু এই জগতের নহে, পারলৌকিক দৃষ্টিতে আপন আত্মার পরিণামেও এই যুদ্ধ শ্রেয়স্কর হইবে কি হইবে না ইহার নিষ্পত্তি হওয়া আবশ্যক। যুদ্ধে ভীষ্ম দ্রোণাদি নিহত হইলে, আমাদের রাজ্যপ্রাপ্তি হইয়া সুখ লাভ হইবে কি না, কিংবা যুধিষ্ঠিরাদির শাসনকাল, দুর্য্যোধনের রাজত্ব অপেক্ষা লোকের পক্ষে অধিকতর সুখজনক হইবে কি না, সে সম্বন্ধে তাঁহার কোন সংশয় উপস্থিত হয় নাই। সুতরাং আমি যাহা করিতেছি তাহা 'ধর্ম্ম্য' বা 'অধর্ম্ম্য', 'পুণ্য' কি পাপ, ইহাই তাঁহার দেখিবার বিষয় ছিল। গীতার বিচার আলোচনাও সেই দৃষ্টিতেই করা হইয়াছে। শুধু গীতায় নহে, মহাভারতেও অন্য স্থানে যে বিচার-আলোচনা আছে তাহাও এই পারলৌকিক ও অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে করা হইয়াছে। তাহাতে কোন কর্ম্মের 'ভাল মন্দ' দেখাইবার সময়, 'ধর্ম্ম' ও 'অধর্ম্ম' এই দুই শব্দই প্রায় ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু 'ধর্ম্ম' ও তাহার প্রতিযোগী অর্থাৎ উল্টা 'অধর্ম্ম' এই দুই শব্দের ব্যাপক অর্থে কখন কখন ভ্রম উৎপাদন করায়, কর্ম্মযোগশাস্ত্রে মুখ্যরূপে কোন্ অর্থে উহাদের ব্যবহার হইয়া থাকে তৎসম্বন্ধে এইখানে অল্পাধিক মীমাংসা করা আবশ্যক।

নিত্যব্যবহারে, অনেক সময় "ধর্ম্ম" শব্দ, নিছক্ "পারলৌকিক সুখের মার্গ" এই অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। "তোমার কোন্ ধর্ম্ম?" এইরূপ যখন আমরা কাহাকে প্রশ্ন করি, তখন কেবল পারলৌকিক কল্যাণার্থ, তুমি কোন্ মার্গ অনুসরণ করিতেছ—বৈদিক, বৌদ্ধ, জৈন, খৃষ্ট কি পার্সী—এইরূপ জিজ্ঞাসা করিবার আমাদের হেতু থাকে; এবং তদনুসারে সে তাহার উত্তরও দিয়া থাকে। সেইরূপ, স্বর্গপ্রাপ্তির সাধনীভূত যাগযজ্ঞাদি বৈদিক বিষয়ের মীমাংসা করিবার সময়, "অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" প্রভৃতি সূত্রেতেও ধর্ম্মশব্দের এই অর্থই অভিপ্রেত হইয়াছে। কিন্তু 'ধর্ম্ম' শব্দের এরূপ সঙ্কুচিত অর্থ নহে; ইহা ব্যতীত রাজধর্ম্ম, প্রজাধর্ম্ম, দেশধর্ম্ম, জ্ঞাতিধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম, মিত্রধর্ম্ম প্রভৃতি ঐহিক নীতিবন্ধনেও ধর্ম্মশব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ধর্ম্মশব্দের এই দুই অর্থ পৃথক করিয়া দেখাইতে হইলে পারলৌকিক ধর্ম্মকে 'মোক্ষধর্ম্ম' কিংবা কেবল 'মোক্ষ' এইরূপ বিশেষ নাম দিয়া, ব্যবহারিক ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিংবা নীতি সম্বন্ধে এই একই শব্দ প্রয়োগ হইয়া থাকে। উদাহরণ যথা—চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থের গণনা করিবার সময়, 'ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ' এইরূপ আমরা বলিয়া থাকি। ইহার অন্তর্গত প্রথম শব্দ 'ধর্ম্ম'—ইহার ভিতর মোক্ষের সমাবেশ হইলেও, 'মোক্ষ" বলিয়া শেষে পৃথক পুরুষার্থ বলিবার আবশ্যকতা নাই। সুতরাং ধর্ম্ম শব্দে এইস্থানে জগতের কিংবা সংসারের শত শত নীতিধর্ম্মই শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রেত এইরূপ বলিতে হইবে। ইহাকেই আমরা কর্ত্তব্য কর্ম্ম, নীতি, নীতিধর্ম্ম কিংবা সদাচরণ এইরূপ আজকাল বলিয়া থাকি। কিন্তু প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে 'নীতি' কিংবা 'নীতিশাস্ত্র' এই শব্দ বিশেষরূপে রাজনীতির উদ্দেশেই প্রযুক্ত হইত বলিয়া কর্ত্তব্যকর্ম্ম কিংবা সদ্‌বর্ত্তন সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনাকে 'নীতিপ্রবচন' না বলিয়া 'ধর্ম্মপ্রবচন' এই নাম পূর্ব্বে দেওয়া হইত।

নীতি ও ধর্ম্ম এই দুই শব্দের এই পারিভাষিক ভেদ, সকল সংস্কৃত গ্রন্থেই স্বীকৃত হইয়াছে এরূপ নহে। তাই আমিও 'নীতি', 'কর্ত্তব্য' ও শুধু 'ধর্ম্ম' এই সকল শব্দ এই গ্রন্থে একই অর্থে ব্যবহার করিয়াছি; এবং মোক্ষের বিচার যেখানে কর্ত্তব্য, সেই প্রকরণকে আমি 'অধ্যাত্ম' ও 'ভক্তিমার্গ' এইরূপ স্বতন্ত্র নাম দিয়াছি। মহাভারতে 'ধর্ম্ম' শব্দ অনেক স্থানেই পাওয়া যায়; "কেহ কোন কিছু সাধন করিতে গিয়া ধর্ম্মের সাহায্যেই তাহা প্রাপ্ত হইয়াছে" এইরূপ বিধান যখন করিতে পারা যায়, তখন ধর্ম্ম এই শব্দে কর্ত্তব্য শাস্ত্র কিংবা তৎকালীন সমাজব্যবস্থাশাস্ত্র এই অর্থই অভিপ্রেত বুঝিতে হইবে; এবং পারলৌকিক কল্যাণের মার্গ বিবৃত করিবার প্রসঙ্গ যখন আসিয়াছে তখন—অর্থাৎ শান্তিপর্ব্বের উত্তরার্দ্ধে এই বিশিষ্ট শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। সেইরূপ আবার মনু-আদি স্মৃতিশাস্ত্রে,

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র ইহাদের বিশিষ্ট কর্ম্ম অর্থাৎ চাতুর্বর্ণ্যের বিশিষ্ট কর্ম্ম বিবৃত করিবার সময়েও ধর্ম্মশব্দ অনেক সময়ে ও অনেক স্থানে ব্যবহার করা হইয়াছে ; ভগবদ্ গীতাতেও "স্বধর্ম্ম-মপি চাবেক্ষ্য" (গী, ২, ৩১) অর্থাৎ স্বধর্ম্ম কি তাহা দেখিয়া অর্জ্জুনকে ভগবান যুদ্ধ করিতে যখন বলিয়াছেন, তখন এবং তৎপূর্ব্বে "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ" (গী, ৩, ৩৫) এই স্থানেও 'ধর্ম্ম' শব্দ "ইহলৌকিক চাতুর্বর্ণ্যের ধর্ম্ম" এই অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। সমাজের সমস্ত ব্যবহার যাহাতে সুচারুরূপে পরিচালিত হয় এবং কোন এক বিশিষ্ট ব্যক্তির উপরে কিংবা মণ্ডলীর উপরেও সমস্ত ভার ন্যস্ত না হইয়া সকল পক্ষেরই সংরক্ষণ ও পোষণ হয়, এই নিমিত্ত শ্রমবিভাগরূপ চাতুর্ব্বর্ণ্য ব্যবস্থা ঋষিগণ কর্ত্তৃক সংস্থাপিত হয়। পরে, উহাদের অন্তর্গত ব্যক্তি কেবল জাতিমাত্রোপজীবী অর্থাৎ প্রকৃত স্বকর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া কেবল নামধারী ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র হইয়া পড়িল, এই বিষয়টা আপাত আমরা পাশে সরাইয়া রাখিব। গোড়ায় এই ব্যবস্থা সমাজধারণার্থ বাহির হওয়ায় চাতুর্ব্বর্ণ্যের মধ্যে যদি কোন বর্ণ আপন ধর্ম্ম অর্থাৎ কর্ত্তব্য পরিত্যাগ করে, কিংবা কোন বর্ণ হঠাৎ বিনষ্ট হয় ও তাহার স্থান অন্য লোক আসিয়া পূর্ণ না করে, তাহা হইলে, সমাজ সেই অনুসারে একেবারে পঙ্গু হইয়া পড়ে, আস্তে আস্তে বিনাশ প্রাপ্ত হয়, কিংবা অন্ততঃ নিকৃষ্ট অবস্থায় আসিয়া পৌঁছে, ইহা স্পষ্টই দেখা যায়। পাশ্চাত্য খণ্ডে চাতুর্ব্বর্ণ্য ব্যবস্থা ব্যতীত, পরিণত অবস্থায় উপনীত অনেক সমাজ আছে। কিন্তু চাতুর্ব্বর্ণ্য ব্যবস্থা না থাকিলেও চারিবর্ণের সমস্ত ধর্ম্ম, জাতিরূপে না হউক, গুণবিভাগরূপে অন্য ব্যবস্থার দ্বারা, সেই পাশ্চাত্য দেশের সমাজে জাগ্রত রহিয়াছে, এ কথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না। সারকথা, যখন আমরা ব্যবহারিক দৃষ্টিতে ধর্ম্মশব্দ ব্যবহার করি তখন সর্ব্বসমাজের ধারণ ও পোষণ কিরূপে হইতে পারে, তাহা আমরা দেখিয়া থাকি। 'অনুত্থোদর্ক' অর্থাৎ যাহা হইতে পরিণামে দুঃখ হয় সেরূপ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে, মনু বলিয়াছেন (মনু, ৪, ১৩৬) ; এবং শান্তিপর্ব্বে সত্যানৃতাধ্যায়ে (শাং, ১০৯, ১২) ধর্ম্মাধর্ম্মের যখন আলোচনা হইতেছিল, তখন ভীষ্ম ও তৎপূর্ব্বে কর্ণপর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বলিয়াছেন যে—

ধারণাদ্ধর্ম মিত্যাহুঃ ধর্ম্মো ধারয়তে প্রজাঃ।
যৎস্যাদ্ধারণসংযুক্তং সধর্ম্ম ইতি নিশ্চয়ঃ॥

অর্থাৎ "ধর্ম্ম শব্দ ধারণ করা এই ধাতু হইতে বাহির হওয়ায় ধর্ম্মের দ্বারাই সমস্ত প্রজা বদ্ধ হইয়াছে। যাহার দ্বারা (সর্ব্বপ্রজার) ধারণ হয় তাহাই ধর্ম্ম—ইহা নিশ্চিত" (সভা, কর্ণ, ৬৯, ৫৯)। অতএব, এই ধর্ম্ম চলিয়া গেলে সমাজের বন্ধন ছিন্ন হয় এইরূপ বুঝিতে হইবে ; এবং "সমাজের বন্ধন ছিন্ন" অর্থে আকর্ষণ শক্তি ব্যতীত আকাশস্থ সূর্য্যাদি গ্রহমালার কিংবা কর্ণধার ব্যতীত সমুদ্রের উপর জাহাজের যে অবস্থা হয়, সমাজেরও সেইরূপ হইয়া থাকে। এই শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হইয়া যাহাতে সমাজের বিনাশ না হয়, এইজন্য অর্থ কিংবা দ্রব্য লাভ করিতে হইলে, তাহা ধর্ম্মতঃ অর্থাৎ যাহাতে সমাজের গঠন বিগড়াইয়া না যায়, এইরূপ ভাবে করিবে এবং কামাদি বাসনা তৃপ্ত করিতে হইলে তাহা ধর্ম্মতই করিবে, এইরূপ অনেক স্থানে বলিয়া মহাভারতের শেষে ব্যাস বলিতেছেন যে—

ঊর্দ্ধবাহুর্বিরৌম্যেষঃ ন চ কশ্চিচ্ছৃণোতি মাম্।
ধর্ম্মাদর্থশ্চ কামশ্চ স ধর্ম্মঃ কিং ন সেব্যতে॥

অর্থাৎ, "ওরে ! বাহু তুলিয়া আমি আক্রোশ করিতেছি, (কিন্তু) আমার কথা কেহই শুনে না ! ধর্ম্মের দ্বারাই অর্থ ও ধর্ম্মের দ্বারাই কাম প্রাপ্ত হওয়া যায় ; (তথাপি) এইরূপ ধর্ম্ম তুমি কেন আচরণ করিতেছ না ?" মহাভারত যে ধর্ম্মদৃষ্টিতে পঞ্চম বেদ কিংবা ধর্ম্মসংহিতাকে স্বীকার করে, সেই 'ধর্ম্মসংহিতা' শব্দের মধ্যে "ধর্ম্ম" এই শব্দের মুখ্য অর্থ কি তাহা ইহা হইতে পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইবে। পূর্ব্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা এই দুই পারলৌকিক ধর্ম্মগ্রন্থের ন্যায় ধর্ম্মগ্রন্থ ও এই সম্বন্ধসূত্রে "নারায়ণং নমস্কৃত্য" এই প্রতীক শব্দগুলি মহাভারতও যে ব্রহ্মযজ্ঞের নিত্যপাঠের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন, ইহাই তাহার কারণ।

ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্বন্ধে উপরি-উক্ত সিদ্ধান্ত শুনিয়া কেহ এইরূপ প্রশ্ন করিতে পারেন যে, 'সমাজধারণ, ও দ্বিতীয় প্রকরণের মধ্যে সত্যানৃতবিবেক প্রসঙ্গে যাহা কথিত হইয়াছে তদনুসারে 'সর্ব্বভূতহিত' এই

তত্ত্ব যদি তুমি স্বীকার কর, তবে তোমার দৃষ্টিতে ও আধিভৌতিক দৃষ্টিতে তফাৎটা কি? কারণ, এই দুই তত্ত্বই বাহ্যতঃ প্রত্যক্ষ জ্ঞানমূলক কিংবা আধিভৌতিক। পরবর্ত্তী প্রকরণে এই প্রশ্নের সবিস্তার বিচার করিয়াছি। আপাতত এইটুকু বলিতেছি যে, সমাজ-ধারণই ধর্ম্মের প্রধান বাহ্য উপযোগ—এই তত্ত্ব আমি স্বীকার করিলেও, বৈদিক কিংবা অন্য সমস্ত ধর্ম্মের পরম সাধ্য যে আত্মকল্যাণ কিংবা মোক্ষ তাহা হইতে আমার দৃষ্টিকে কখনই বিচলিত হইতে দিই না;—অন্য হইতে আমার মতের ইহাই বিশেষত্ব। 'সমাজ ধারণ'ই বল, আর 'সর্ব্বভূতহিত'ই বল, এই দুই বাহ্যোপযোগী তত্ত্ব যদি আমাদের আত্মকল্যাণের পথের অন্তরায় হয়, তবে তাহা আমরা চাহি না। বৈদ্যকশাস্ত্রও শরীররক্ষণ দ্বারা মোক্ষপ্রাপ্তির সাধন বলিয়াই সংগ্রহণীয়—আমাদের আয়ুর্ব্বেদের যদি এইরূপ মত হয়, তবে, এই জগতে কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, এই গুরুতর বিষয়ের যে শাস্ত্র বিচার-আলোচনা করে, সেই কর্ম্মযোগশাস্ত্রে আমাদের শাস্ত্রকার আধ্যাত্মিক মোক্ষজ্ঞান ছাড়িয়া আর কিছু বিবৃত করিবেন ইহা কখনই সম্ভবনীয় নহে। অতএব, মোক্ষের অর্থাৎ আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির অনুকূল যে কর্ম্ম তাহাই পুণ্য, ধর্ম্ম, কিংবা শুভকর্ম্ম এবং তাহার প্রতিকূল যে কর্ম্ম তাহাই পাপ, অধর্ম্ম কিংবা অশুভ, এইরূপ আমরা বুঝিয়া থাকি। কর্ত্তব্য ও কার্য্য এবং অকর্ত্তব্য ও অকার্য্য এই সকল শব্দের স্থানে একই অর্থে, একটু সন্দিগ্ধ হইলেও, আমরা ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এই দুই শব্দ প্রায়ই ব্যবহার করিয়া থাকি; উহাদের মর্ম্মও ইহাই। বাহ্যসৃষ্টির অন্তর্ভূত ব্যবহারিক কর্ম্ম কিংবা ব্যাপার, মুখ্যরূপে আমাদের বিচারের বিষয় হইলেও, উক্ত কর্ম্মসমূহের বাহ্য পরিণামের বিচারের ন্যায়ই, এই সকল ব্যাপার আমাদের কল্যাণের অনুকূল কি প্রতিকূল—এই বিচারও আমরা সর্ব্বদা করিয়া থাকি। আমি নিজের হিত ছাড়িয়া লোকের হিত কেন করিব, এইরূপ আধিভৌতিকবাদীকে কোন প্রশ্ন করিলে—"সাধারণত ইহাই মানব স্বভাব"—ইহা ব্যতীত আর কোন উত্তর তিনি কি দিতে পারেন? আমাদের শাস্ত্রকারদিগের দৃষ্টি আমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে; এবং সেই ব্যাপক আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতেই মহাভারত কর্ম্মযোগশাস্ত্রের বিচার করিয়াছেন; ভগবদ্গীতাতে বেদান্ত এইজন্যই বিবৃত হইয়াছে। মনুষ্যের 'অত্যন্ত হিত' কিংবা 'সদ্গুণের পরাকাষ্ঠা' এইরূপ কোন কিছু পরম সাধ্য কল্পনা করিয়া, পরে সেই অনুসারে কর্ম্মাকর্ম্মের বিচার আলোচনা করিতে হইবে, এইরূপ প্রাচীন গ্রীক পণ্ডিতদিগের মত; আত্মহিতের মধ্যেই এই সমস্ত বিষয়ের সমাবেশ হইয়া থাকে এইরূপ আরিষ্টটল আপন নীতিশাস্ত্রসংক্রান্ত গ্রন্থে বলিয়াছেন (১, ৭, ৫)। তথাপি আত্মহিত সম্বন্ধে যতটা প্রাধান্য দেওয়া আবশ্যক, আরিষ্টটল ততটা প্রাধান্য দেন নাই। আমাদের শাস্ত্রকারদিগের কথা সেরূপ নহে। আত্মার কল্যাণ কিংবা আধ্যাত্মিক পূর্ণাবস্থা ইহাই প্রত্যেক মনুষ্যের প্রথম ও পরম সাধনার বিষয় এবং অন্য প্রকারের হিত অপেক্ষা উহাকেই প্রধান স্বীকার করিয়া পরে তদনুসারে কর্ম্মাকর্ম্মের বিচার করা আবশ্যক, আধ্যাত্মিক বিদ্যাকে ছাড়িয়া কর্ম্মাকর্ম্ম বিচার করা যুক্তিসিদ্ধ নহে, এইরূপ তাঁহারা স্থির করিয়াছেন; এবং অর্ব্বাচীনকালে, পাশ্চাত্যদেশের কোন কোন পণ্ডিত কর্ম্মাকর্ম্ম বিচারের এই পদ্ধতিই স্বীকার করিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়। উদাহরণ যথা—জর্ম্মন তত্ত্বজ্ঞানী কাণ্ট প্রথমে 'শুদ্ধ (ব্যবসায়াত্মিক) বুদ্ধির মীমাংসা' এই আধ্যাত্মিক বিষয়ক গ্রন্থ লিখিয়া পরে তাহার পূরণস্বরূপ 'ব্যবহারিক (বাসনাত্মক) বুদ্ধির মীমাংসা' এই নীতিশাস্ত্রের গ্রন্থ লিখিয়াছেন,* এবং ইংলণ্ডেও গ্রীন্ আপন 'নীতিশাস্ত্রের উপোদ্ঘাতে'† সৃষ্টির মূলে অবস্থিত আত্মতত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু এই গ্রন্থের বদলে কেবল আধিভৌতিক পণ্ডিতদিগেরই নীতিগ্রন্থ আমাদের ইংরেজি পাঠশালায় প্রায়ই পড়ান হয় বলিয়া, গীতায় উক্ত কর্ম্মযোগশাস্ত্রের মূলতত্ত্ব আমাদের ইংরেজিশিক্ষিত বিদ্বানেরাও ঠিক বুঝিতে পারেন না,—এইরূপ অবস্থা হইয়াছে।

* কাণ্ট জর্ম্মন তত্ত্বজ্ঞানী; ইনি অর্ব্বাচীন তত্ত্বজ্ঞানশাস্ত্রের জনক বলিয়া খ্যাত, ইঁহার critique of pure reason (শুদ্ধ বুদ্ধির মীমাংসা) ও critique of practical reason (বাসনাত্মক বুদ্ধির মীমাংসা) এই দুই প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

† গ্রীন্, এই গ্রন্থের নাম prolegomena to ethics এই নাম দিয়াছেন।

'ধর্ম্ম' এই সাধারণ শব্দ মুখ্যরূপে ব্যবহারিক নীতিবন্ধন সম্বন্ধে কিংবা সমাজধারণব্যবস্থা সম্বন্ধে আমি কেন প্রয়োগ করিয়াছি, তাহা উপরি-উক্ত বিচার আলোচনা হইতে জানিতে পারা যাইবে। মহাভারত, ভগবদ্গীতা এই সংস্কৃত গ্রন্থে শুধু নহে, প্রাকৃতিতেও ব্যবহারিক কর্ত্তব্য কিংবা নিয়ম অর্থে ধর্ম্ম শব্দ সর্ব্বদাই ব্যবহার হইয়া থাকে। কুলধর্ম্ম ও কুলাচার এই দুই শব্দ আমরা সম্মানার্থক বলিয়া বুঝি। মহাভারতীয় যুদ্ধে পৃথ্বী-গ্রাসিত রথের চাকা উপরে তুলিবার জন্য কর্ণ রথ হইতে নীচে নামিলে পর, অর্জ্জুন তাহাকে বধ করিতে উদ্যত দেখিয়া "শত্রু নিঃশস্ত্র হইলে তাহাকে মারা যুদ্ধকর্ম্ম নহে" এইরূপ কর্ণ বলিলে পর শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, কিংবা সকলে মিলিয়া একলা অভিমন্যুর বধসাধন প্রভৃতি আগেকার কথা পাড়িয়া তিনি নানাপ্রসঙ্গে—

"তখন কোথায় ছিল রাধাসুত ধর্ম্ম তব"

এইরূপ কর্ণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন বলিয়া মহারাষ্ট্র কবি মোরোপন্ত বর্ণনা করিয়াছেন, এবং মহাভারতেও এই প্রসঙ্গে "ক্ব তে ধর্ম্মস্তদা গতঃ" এইরূপ ধর্ম্ম শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। শেষে এই প্রকারের অধর্ম্মকে ঠিক্ এই নীতি অনুসারেই শাসন করা উচিত এইরূপ দেখাইয়াছেন। সার-কথা, কি সংস্কৃত, কি প্রাকৃত উভয়েতেই শিষ্টেরা নানা বিষয় সম্বন্ধে, অধ্যাত্মদৃষ্টিতে সমাজ-বিধরণের জন্য যে নীতি নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন, ধর্ম্ম শব্দে তাহার উল্লেখ করিবার রীতি সর্ব্বত্রই আছে। ঐ শব্দ আমিও এই গ্রন্থে বজায় রাখিয়াছি। সমাজ বিধরণার্থ শিষ্টগণস্থাপিত ও সর্ব্ববাদিসম্মত নীতির যে নিয়ম কিংবা যাহাকে 'শিষ্টাচার'ও বলা হইয়া থাকে, তাহা এই দৃষ্টিতে ধর্ম্মের মূল। এবং তাই, মহাভারতে (অনু, ১০৪।১৫৭) ও স্মৃতিগ্রন্থে "আচারপ্রসবো ধর্ম্মঃ"অথবা "আচারঃ পরমো ধর্ম্মঃ" (মনু, ১।১০৮), কিংবা ধর্ম্মের মূল কি তাহা বলিবার সময় "বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ" (মনু, ২।১২), এই সকল বচন প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু কর্ম্মযোগ শাস্ত্রে এইরূপ মর্ম্মার্থ খাটে না; এই আচার প্রবৃত্ত হইবার কারণ তবে কি হইয়াছিল, তাহার পূর্ণ ও মার্মিক বিচার করা কেন আবশ্যক তাহা আমি দ্বিতীয় প্রকরণে বলিয়াছি।

ধর্ম্ম শব্দের আর এক যে ব্যাখ্যা প্রাচীন গ্রন্থাদিতে প্রদত্ত হয়, তাহারও কিছু বিচার করা এইখানে আবশ্যক। এই ব্যাখ্যা মীমাংসাকারেরা "চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ" এইরূপ বলিয়া থাকেন (জৈ, সূ, ১।১।২)। চোদনা অর্থাৎ প্রেরণা; কোন অধিকারী ব্যক্তি কর্ত্তৃক "তুমি অমুক কাজ কর" বা "করিও না" এইরূপ বলা কিংবা আদেশ করা। যে পর্য্যন্ত এই রকমের বিধান কেহ স্থাপন না করে, কিংবা প্রাপ্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত যে-কোন বিষয় যে-কোন ব্যক্তির করিবার অধিকার আছে। ধর্ম্ম প্রথমতঃ নিয়ম বিধানের হিসাবে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, এইরূপ মীমাংসাকারের অভিপ্রায়; এবং প্রসিদ্ধ ইংরেজ গ্রন্থকার "হব্‌স্"এর মতের সঙ্গে, ধর্ম্মের এই ব্যাখ্যার কিয়দংশে মিল আছে। অসভ্য বন্য অবস্থায় প্রত্যেক মনুষ্য, যখন যে মনোবৃত্তি প্রবল হয়, তদনুসারে কাজ করে। কিন্তু পরে, আস্তে আস্তে এই প্রকারের স্বৈরাচার একেবারেই শ্রেয়স্কর নহে এইরূপ অবগত হইবার পর, ইন্দ্রিয়গণের যদৃচ্ছাপ্রযুক্ত ব্যাপারের সীমা নির্দ্দেশ করিয়া তাহারই পালনে সকলের কল্যাণ হয়, এইরূপ বিশ্বাস জন্মে এবং শিষ্টাচারের দ্বারা কিংবা অন্য কোন রীতির দ্বারা দৃঢ়প্রতিষ্ঠ এই সীমামর্য্যাদা প্রত্যেক মনুষ্য আইনের ন্যায় পালন করিতে প্রবৃত্ত হয়। এবং এই প্রকারের সীমামর্য্যাদার সংখ্যা বেশী হইলে, সেই সমস্ত লইয়াই শাস্ত্র রচিত হইয়া থাকে। বিবাহব্যবস্থা পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল না, শ্বেতকেতুই বিবাহব্যবস্থা আমলে আনিয়াছিলেন। সুরপান শুক্রাচার্য্য নিষিদ্ধ বলিয়া স্থির করেন—ইহা আমি পূর্ব্ব প্রকরণে বলিয়াছি। এই সীমামর্য্যাদা স্থাপনে শ্বেতকেতু কিংবা শুক্রাচার্য্যের হেতু কি ছিল তাহা না দেখিয়া, এই প্রকার সীমা মর্য্যাদা স্থাপনের পক্ষে কেবল তাঁহাদের কর্ত্তৃত্বকেই লক্ষ্যের মধ্যে আনিয়া "চোদণালক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ" এই ধর্ম্ম শব্দের ব্যাখ্যা নিষ্পন্ন হইয়াছে। ধর্ম্ম হইলেও প্রথমতঃ তাহার মহত্ত্ব লক্ষ্যের মধ্যে আনিয়া তবে কেহ তাহাতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। 'খাও, পিয়ো, মজা লোটো' একথা কাহাকে বলিতে হয় না। কারণ, উহা ইন্দ্রিয়াদিরই স্বাভাবিক ধর্ম্ম। "ন মাংস ভক্ষণে দোষো ন মদ্যে ন চ মৈথুনে" (মনু, ৫।৫৬) মাংস ভক্ষণ, মদ্যপান ও মৈথুনে

কোন দোষ নাই অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ম্মের বিরুদ্ধ বিষয় এরূপ নহে—এইরূপ মনু যে বলিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্যই এই। এই সব বিষয় শুধু মনুষ্য নহে, বিবিধ প্রাণী প্রবৃত্তিসূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছে—"প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাম্"। সমাজধারণের জন্য অর্থাৎ সকল লোকের সুখের জন্য এই প্রবৃত্তি-সূত্রে প্রাপ্ত স্বৈরাচারকে আটক করাই ধর্ম্ম। কারণ—

আহারনিদ্রাভয়মৈথুনং চ সামান্য মেতৎপশুভির্নরাণাম্।
ধর্ম্মোহি তেষামধিকো বিশেষো ধর্ম্মেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥

অর্থাৎ আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন মনুষ্য ও পশু উভয়েই সমানভাবে প্রবৃত্তিমূলে প্রাপ্ত হইয়াছে। ধর্ম্মেই ("অর্থাৎ এই সকল বিষয়ে নীতির সীমা স্থাপন") মনুষ্য পশুতে ভেদ, বুঝিতে হইবে। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে এই অর্থের এক শ্লোক আছে (শা, ২৯৪, ২৯ দেখ)। আহার বিহারের সংযম সম্বন্ধে ভাগবতের শ্লোক পূর্ব্বপ্রকরণে প্রদত্ত হইয়াছে। সেইরূপ ভগবদ্গীতাতেও—

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ॥

অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি ও সেই সেই ইন্দ্রিয়ের উপভোগ্য কিংবা ত্যাজ্য পদার্থে, প্রীতি ও দ্বেষ স্থায়ীভাবে স্বভাবসিদ্ধ। ইহাদের অধীন হওয়া আমাদের উচিত নহে। কারণ, রাগ ও দ্বেষ উভয়ই আমাদের শত্রু। এইরূপ যেখানে ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন, (গী, ৩, ৩৪) তখন স্বভাবতঃ প্রাপ্ত স্বৈরমনোবৃত্তিকে সংযত করা যে ধর্ম্মের লক্ষণ, তাহাই ভগবানের অভিপ্রেত। মনুষ্যের ইন্দ্রিয়াদি তাহাকে শত্রুর ন্যায় আচরণ করিতে বলে এবং তাহার বুদ্ধি তাহাকে উল্টাদিকে টানিয়া থাকে। দেহের মধ্যে বিচরণকারী পশুত্বকে এই কলহানলে আহুতি দিয়া যে ব্যক্তি যজ্ঞানুষ্ঠান করে, সেই প্রকৃত যাজ্ঞিক ও সেই ধন্য হয়।

ধর্ম্ম 'আচার-প্রভবই' বল, 'ধারণাৎ' ধর্ম্মই বল, বা 'চোদনালক্ষণ' ধর্ম্মই বল, ধর্ম্মের অর্থাৎ ব্যবহারিক নীতিবন্ধনের যে কোন ব্যাখ্যাই গ্রহণ কর না কেন, ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হইলে তাহা নির্ণয় করিবার জন্য উপরি-উক্ত তিন লক্ষণের উপযোগ বড় একটা হয় না। ধর্ম্মের মূল স্বরূপ কি তাহা প্রথম ব্যাখ্যাটিতে বুঝা যায়; উহার বাহ্য উপযোগ কি, তাহা দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটির দ্বারা জানা যায়, এবং ধর্ম্মের সীমা মর্য্যাদা প্রথমে যেই কেন স্থাপন করুক না, তৃতীয় ব্যাখ্যার দ্বারা তাহার উপলব্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু আচারে আচারে ভেদ হয় শুধু নহে, এক আচারের কর্ম্ম পরিণাম অনেক হওয়া প্রযুক্ত এবং অনেক ঋষির আদেশ অর্থাৎ 'চোদনা'ও ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় সংশয়স্থলে ধর্ম্মনির্ণয়ের অন্য মার্গ কি তাহা দেখা আবশ্যক হয়। এই মার্গটা কি, যক্ষ যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করিলে পর, যুধিষ্ঠির তাঁহাকে এইরূপ উত্তর দিলেন—

তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্নাঃ নৈকো ঋষির্যস্য বচঃ প্রমাণম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা॥

অর্থাৎ—"তর্ক অপ্রতিষ্ঠ, যাহার যেরূপ বুদ্ধি তীক্ষ্ণ তদনুসারে অনেক প্রকারের সিদ্ধান্ত তর্কের দ্বারা স্থাপিত হইতে পারে; শ্রুতি অর্থাৎ বেদেরও ভিন্ন ভিন্ন আদেশ; এবং স্মৃতিশাস্ত্রের কথা যদি বল, এমন এক ঋষিও নাই যাঁহার বচন আমরা অন্য অপেক্ষা অধিক প্রামাণ্য বলিয়া মনে করিতে পারি। (এই ব্যাবহারিক) ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব যদি দেখিতে যাও, তাহাও অন্ধকারের মধ্যে প্রচ্ছন্ন, অর্থাৎ সাধারণ লোকের বুদ্ধির অগম্য। এই জন্য মহাজন যে পথ দিয়া গিয়াছেন, সেই পথই পথ। (সভা. বন, ৩১২, ১১৫)"। ঠিক্ কথা! কিন্তু 'মহাজন' কাহাকে বলে? "অধিক কিংবা বহু জন সমূহ" এরূপ উহার অর্থ হইতে পারে না। কারণ, যে সাধারণ লোকের মনে ধর্ম্মাধর্ম্মের সংশয়ও কখন উৎপন্ন হয় না, তাহাদের প্রদর্শিত পথে চলা কি রকম?—না যেমন, কঠোপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে, অন্ধ কেশিশ্বিরের ন্যায় ("অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ) অন্ধের দ্বারা নীয়মান অন্ধ! মহাজনের অর্থ যদি "বড় বড় শিষ্ট ব্যক্তি" ধরা যায়—এবং এই অর্থই উপরি উক্ত শ্লোকের অভিপ্রেত হয় তাহা হইলেও, ঐ সকল ব্যক্তির আচরণে মিল কোথায়? নিষ্পাপ রামচন্দ্র, অগ্নি হইতে শুদ্ধ হইয়া নির্গত আপন পত্নীকে কেবল লোকাপবাদের জন্যই ত্যাগ করিলেন; এবং সুগ্রীবকে পাইবার জন্য, তাহার সহিত 'তুল্যারিমিত্র' অর্থাৎ 'তোমার আমার শত্রু মিত্র এক' এই প্রকার অঙ্গীকারে বদ্ধ হইয়া রামচন্দ্রের প্রতি যে ব্যক্তি

কোন অপরাধ করে নাই, সেই বালীকে রামচন্দ্র বধ করিলেন! পরশুরাম পিতার আজ্ঞাক্রমে আপন মাতার শিরচ্ছেদ করিলেন! পাণ্ডবদিগের আচরণ দেখ—পঞ্চজনের এক স্ত্রী! স্বর্গের দেবতাদের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে—কোন এক অহল্যার উপপতি কোন দেবতা (ব্রহ্মদেব) মৃগরূপা আপন কন্যায় অভিলাষ করা প্রযুক্ত রুদ্রের বাণে বিদ্ধশরীর হইয়া আকাশ হইতে পতিত হন (ঐ, ব্রা, ৩, ৩৩)। এই কথা মনে করিয়াই 'উত্তররামচরিত' নাটকে, লবের মুখ দিয়া "বৃদ্ধাস্তে ন বিচারণীয় চরিতা;"—অর্থাৎ, এই বৃদ্ধদের চরিত্র বেশী বিচার করিয়া কাজ নাই—এই কথা ভবভূতি বাহির করিয়াছেন। ইংরেজীতে সয়তানের ইতিহাসলেখক এক গ্রন্থকার এইরূপ বলিয়াছেন যে, সয়তানের অনুচর ও দেবদূত ইহাঁদের যুদ্ধবৃত্তান্তে দেখা যায়, অনেকবার দেবতারাই দৈত্যদিগকে কাপট্য করিয়া ঠকাইয়াছেন; এবং সেইরূপ কৌষীতকী ব্রাহ্মণোপনিষদে (কৌষী, ৩, ১ ও ঐ, ব্রা, ৭, ২, ৮ দেখ) ইন্দ্র প্রতর্দনকে এইরূপ বলিতেছেন যে, আমি বৃত্তকে (সে ব্রাহ্মণ হইলেও) বধ করিয়াছি। অরূন্মুখ সন্ন্যাসীকে আমি টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া বৃকদিগের নিকট ফেলিয়া দিয়াছি এবং আমার অনেক অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়া প্রহ্লাদের আত্মীয় ও গোত্রজদিগকে ও পৌলোম ও কালখঞ্জ নামক দৈত্যদিগকে বধ করিলেও আমার এক গাছা চুলও বাঁকে নাই,—"তস্য মে তত্র ন লোম চ মা মীয়তে"! "এই মহাপুরুদিগের কর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য করিবার তোমাদের কোন হেতু নাই; তৈত্তিরীয়োপনিষদে কথিত অনুসারে (তৈত্তি, ১, ১১, ২) তাঁদের যে সকল কর্ম্ম ভাল, তোমরা তাহারই অনুকরণ কর, বাকী ছাড়িয়া দেও; উদাহরণ যথা—পরশুরামের মতোই পিতার আজ্ঞা পালন কর, কিন্তু মাতাকে বধ করিও না" এইরূপ যদি কেহ বলে, তাহা হইলে ভাল মন্দ কর্ম্ম বুঝিবার উপায় কি—এই যে প্রথম প্রশ্ন, তাহাই পুনর্ব্বার আবির্ভূত হয়। তাই, উপরে যাহা বলা হইল তদনুসারে আপন কৃত্যাদি বর্ণনা করিলে পর ইন্দ্র প্রতর্দনকে এইরূপ বলিতেছেন যে, "যে সম্পূর্ণ আত্মজ্ঞানী হইয়াছে; তাহাকে মাতৃবধ, পিতৃবধ, ভ্রূণহত্যা কিংবা স্তেয় ইত্যাদি কোন কর্ম্মেরই দোষ স্পর্শে না—ইহা মনে করিয়া "আত্মা কাহাকে বলে" ইহা তুমি প্রথমে বুঝিয়া লও; তাহা হইলে তোমার সকল সংশয়ের নিবৃত্তি হইবে"; তাহার পর ইন্দ্র, প্রতর্দনকে আত্মবিদ্যার উপদেশ দিয়াছেন। সার কথা, "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা" এই যুক্তি সাধারণ লোকদিগের পক্ষে সহজ হইলেও, উহার দ্বারা সব কাজ না হওয়ায়, শেষে মহাজনদিগের আচরণের প্রকৃত তত্ত্ব যতই গূঢ় হউক না কেন—বিচারক ব্যক্তিগণ আত্মজ্ঞানের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে বাধ্য হন। "ন দেবচরিতং চরেৎ" অর্থাৎ, দেবতাদের কেবল বাহ্য চরিত্র অনুসারে কাজ করিবে না—এই যে উপদেশ দেওয়া হয়, তাহার কারণও ইহাই।

কর্ম্মাকর্ম্ম নির্ণয়ার্থ ইহা ব্যতীত আর এক সহজ যুক্তি কেহ কেহ বাহির করিয়াছেন। তাঁহারা এই কথা বলেন যে, যে কোন সদ্‌গুণ হউক না কেন, তাহার অতিরেক না হয় এই জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করা আবশ্যক; কারণ, এইরূপ অতিরেকের দ্বারা সদ্‌গুণও শেষে দুর্গুণ হইয়া পড়ে। দান-করা একটা সদ্‌গুণ সত্য, কিন্তু "অতি দানাদ্ বলির্বদ্ধঃ"—অর্থাৎ অতিদানে বলি বাঁধা পড়িয়াছিল। প্রসিদ্ধ গ্রীক পণ্ডিত আরিস্টটল আপন নীতিশাস্ত্র সংক্রান্ত গ্রন্থে কর্ম্মাকর্ম্ম নির্ণয়ের এই যুক্তি বিবৃত করিয়া প্রত্যেক সদ্‌গুণ 'অতি' হইলে কিরূপে 'মাটি' হয়, তাহা স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন। কালিদাসও, নিছক্ শৌর্য্য—বাঘের ন্যায় হিংস্র জন্তুদিগের ক্রূর কর্ম্ম, এবং নিছক্ নীতি—ভীরুতা এইরূপ স্থির করিয়া, "অতিথি" রাজা, তরবার ও রাজনীতি এই দুয়ের যোগ্য মিশ্রণে আপন রাজ্য চালাইয়াছিলেন, এইরূপ রঘুবংশে বর্ণনা করিয়াছেন। (রঘু, ১৭, ৪৭)। বেশী বলিলে 'বাচাল ও অল্প বলিলে 'মূক', বেশী খরচ করিলে 'উড়োনচণ্ডী' ও খরচ না করিলে 'কঞ্জুষ', সামনে অগ্রসর হইলে 'প্রগল্‌ভ' ও পিছাইয়া পড়িলে 'শিথিল', অতিশয় আগ্রহ করিলে 'জেদী' ও না করিলে "চপল", সর্ব্বদা গোলমাল করিলে 'লঘু' ও চুপ করিয়া থাকিলে 'গর্ব্বিত'—এইপ্রকারে ভর্ত্তৃ-

হরি প্রভৃতিও কোন কোন দোষগুণের বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু এইরূপ স্থূলরকমের কষ্টিপাথরে শেষ পর্য্যন্ত কাজ হয় না। কারণ, 'অতি'ই বা কি 'মিত'ই বা কি—ইহার ঠিক নির্দ্ধারণ কে করিবে, কেমন করিয়াই বা করিবে? একজনের নিকট কিংবা এক প্রসঙ্গে যাহা 'অতি' তাহাই আর একজনের নিকট কিংবা আর এক প্রসঙ্গে 'অনতি' বা ন্যূন হইতে পারে। উপজল্যার সমান, সূর্য্যকে ধরিবার জন্য লম্ফ প্রদান করা হনুমান কঠিন মনে করে নাই (বা, রামা, ৭, ৩৫)। এইজন্য, শ্যেন যেরূপ শিবিরাজকে বলিয়াছিল—সেইরূপ ধর্ম্মাধর্ম্মের সংশয় উপস্থিত হইলে প্রত্যেক মনুষ্যের, শেষে—

অবিরোধাত্তু যো ধর্ম্মঃ স ধর্ম্মঃ সত্যবিক্রম।
বিরোধিষু মহীপাল নিশ্চিত্য গুরুলাঘবম্।
ন বাধা বিদ্যতে যত্র তং ধর্ম্মং সমুপাচরেৎ॥

পরস্পরবিরুদ্ধ ধর্ম্ম সকলের তারতম্য কিংবা লাঘব গৌরব দেখিয়াই প্রত্যেক প্রসঙ্গে আপন বুদ্ধি অনুসারে প্রকৃত ধর্ম্মের কিংবা কর্ম্মের নির্ণয় করা আবশ্যক হয় (সভা বন, ১৩১, ১১, ১২ ও মনু, ৯, ২৯৯ দেখ)। কিন্তু তাহাতেও ধর্ম্মাধর্ম্মের সারাসার বিচার করাই সংশয়স্থলে প্রকৃত কষ্টিপাথর এরূপও বলা যাইতে পারে না। কারণ, যাহার যেরূপ বুদ্ধি তদনুসারে ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিত সারাসার বিচারও ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে করিয়া, একই বিষয়ের নীতিমত্তার নির্ণয় ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে করিয়া থাকেন, এইরূপ ব্যবহার অনেক সময় আমাদের নজরে পড়ে; এবং এই অর্থেই "তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ" ইহা উপরি-উক্ত বচনে বর্ণিত হইয়াছে। তাই, এই প্রশ্নের নির্ভুল মীমাংসা করিবার অন্য কোন উপায় আছে কি নাই, যদি থাকে ত সেটী কি, আর যদি অনেক উপায় থাকে তবে তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় কোনটি, ইহাই এক্ষণে আমাদের দেখিতে হইবে। শাস্ত্রের দ্বারা ইহাই নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। "অনেক সংশয়োচ্ছেদি পরোক্ষার্থস্য দর্শকম্"—অর্থাৎ অনেক সংশয় উৎপন্ন হইবার দরুণ, অজ্ঞাত বিষয়সমূহের জটিল পাক হইতে বুদ্ধিকে প্রথমে মুক্ত করিয়া ঐ সকল বিষয়ের অর্থ নিঃসংশয় ও সুগম করা এবং এক্ষণে যাহা প্রত্যক্ষ নহে কিংবা পরে প্রত্যক্ষ হইবে এইরূপ বিষয়সমূহেরও যথার্থ জ্ঞান সম্পাদন করা—এইরূপ শাস্ত্রের লক্ষণ। জ্যোতিষশাস্ত্রবেত্তা ভাবী গ্রহণও কিরূপে গণনা করিতে পারেন তাহা দেখিলে, এই লক্ষণগুলির মধ্যে "পরোক্ষার্থস্য দর্শকং" এই অন্য অংশটির সার্থকতা উপলব্ধি হইবে। কিন্তু অনেক সংশয়-জালের মধ্যে সেই বিশেষ সংশয় কোন্‌টি তাহা প্রথমে জানা আবশ্যক। তাই, কোন শাস্ত্রান্তর্গত সিদ্ধান্তপক্ষ বিবৃত করিবার পূর্ব্বে, সেই সংক্রান্ত যে অন্য পক্ষ বাহির হইতে পারে তাহার উল্লেখ করিয়া, তাহার দোষ কিংবা অপূর্ণতা প্রদর্শন করা—প্রাচীন ও অর্ব্বাচীন গ্রন্থকারদিগের প্রচলিত পদ্ধতি। এই পদ্ধতিই স্বীকার করিয়া লইয়া গীতাতে কর্ম্মাকর্ম্ম নির্ণয়ার্থ প্রতিপাদিত সিদ্ধান্তপক্ষীয় যোগ অর্থাৎ যুক্তি বিবৃত করিবার পূর্ব্বে এই কাজের জন্যই অন্য যে কিছু মুখ্য যুক্তি পণ্ডিত লোকেরা সংযোজিত করিয়া থাকেন, এক্ষণে আমি তাহারও বিচার করিব। এই সকল যুক্তি আমাদের মধ্যে পূর্ব্বে বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল না; মুখ্যরূপে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাই অর্ব্বাচীনকালে পরে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন সত্য; কিন্তু তাহার দরুণ উহার বিচার এই গ্রন্থে করা উচিত নহে, একথা বলা যাইতে পারে না। কারণ, কেবল তুলনার জন্য নহে, গীতার অন্তর্গত আধ্যাত্মিক কর্ম্মযোগের মহত্ত্ব উপলব্ধি করিবার জন্যও এই সকল যুক্তি—যতই সংক্ষেপে হউক না কেন—অবগত হওয়া আবশ্যক।

ইতি তৃতীয় প্রকরণ সমাপ্ত।

গান।

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এ)

তোমায় শিশুর মতন সহজ দেখা
দেখ্‌বো কবে
আকাশ বাতাস পুষ্প আলো
সবায় ভালো বাসব কবে।
না লাগে ভালো এ দ্বন্দ্ব ও দ্বেষ—
এ দীনতা হীনতা বন্ধ অশেষ
কুটিল স্বার্থ কপট বেশ
চিরতরে ঘুচবে কবে!

তাই তো চেয়ে আছি আমি—
তুমি কবে আস্‌বে নামি
সহজ করে তুল্‌বে আমায়
বাধাবাঁধন খুলে দিবে!
মরুর মাঝে ফুট্‌বে গো ফুল
গুঞ্জরিয়া ছুট্‌বে অলি
তোমার আকাশ বাতাস অবাক্ হবে
আমার পানে চেয়ে রবে॥

লিঙ্গায়ত ভিক্ষুক ও উৎসব।

(শ্রীকালীপ্রসন্ন বিশ্বাস)

লিঙ্গায়তগণ গলদেশে যে লিঙ্গ ধারণ করে তাহা একটি ক্ষুদ্র শিবলিঙ্গের অনুরূপ। এ সম্বন্ধে বিজাপুরের গেজেটিয়রে এইরূপ বর্ণনা লিখিত আছে।

It consists of two discs, the lower one circular about one-eighth of an inch thick, the upper slightly elongated. Each disc is about three quarters of an inch in diameter, and is separated by a deep groove about an eighth of an inch broad. From the centre of the upper disc, which is slightly rounded, rises a pea-like knob about a quarter of an inch long and three-quarters of an inch round, giving the stone lingam a total height of nearly three quarters of an inch. This knob is called the bain on arrow. The upper disc is called Jalhari, that is, the water carrier, because this part of a full sized lingam is grooved to carry off the water which is poured over the central knob. It is also called *pita*, that is the seat, and *pithak* the little seat. Over the lingam, to keep it from harm, is plastered a black mixture of clay, cow-dung ashes, and marking nut-juice. This coating is called *kanthi* lingam."

জঙ্গম ভিক্ষুকগণ অতি অভিনব সাজসজ্জায় সজ্জিত হইয়া ভিক্ষার্থ গমন করিয়া থাকে। আমরা পাঠকগণের কৌতূহল নিবারণার্থে একটি জঙ্গম ভিক্ষুকের সাজসজ্জার কিছু বিবরণ দিতেছি। উহার মস্তকের পাগড়ীর উপর একটি লিঙ্গ রক্ষিত আছে। সেই লিঙ্গের উপর একটি পঞ্চশিরবিশিষ্ট সর্প ফণা বিস্তার করিয়া আছে। এই লিঙ্গের সম্মুখে একটি কৃষ্ণমূর্ত্তি উপবিষ্ট আছে। এতদ্ভিন্ন বত্রিশটি লিঙ্গের একটি মালা তাহার শিরদেশে বেষ্টন করিয়া আছে। পশ্চাৎদিকে শুভ্রবর্ণ পরচুলা। মুখমণ্ডল তৈল ও সিন্দুর দ্বারা রক্তবর্ণে রঞ্জিত। গলদেশে রুদ্রাক্ষমালা এবং রৌপ্যকোষবেষ্টিত একটি লিঙ্গ দোদুল্যমান আছে। কটিদেশে দক্ষ-প্রজাপতি, বীরভদ্র প্রভৃতি প্রতিমূর্ত্তি-অঙ্কিত একটি ধাতুনির্ম্মিত বন্ধনী এবং কয়েকটি ঘণ্টা। বক্ষস্থলে একটি তাম্র নির্ম্মিত চতুষ্কোণ পত্রে দক্ষপ্রজাপতি তাঁহার স্ত্রী এবং বীরভদ্রের প্রতিমূর্ত্তি খোদিত আছে। কটিদেশের নিম্নস্থান ব্যঘ্রচর্ম্ম দ্বারা আবৃত। তাহার উপর একটি সিংহ অঙ্কিত ও তাহার উভয় পার্শ্বে আবার দক্ষপ্রজাপতি ও বীরভদ্রের প্রতিমূর্ত্তি লম্বমান আছে। ইহার নিম্নদেশে লিঙ্গায়ত ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক বাসবার প্রতিমূর্ত্তি। দক্ষিণ হস্তে একটি প্রকাণ্ড খড়্গ, এবং বামহস্তে আবরণ-কবচবিশিষ্ট একটি করবাল ধারণ করিয়া আছে। এইরূপ সাজসজ্জায় বিভূষিত হইয়া সে মধ্যে মধ্যে ভীষণ হুঙ্কার প্রদান এবং বীরভদ্র ও শিবের গুণগান করিতে করিতে নগর মধ্যে ভিক্ষার্থে প্রবেশ করিয়া থাকে।

বেলারী জেলার অন্তর্গত মহীশূর রাজ্যের সীমান্তে কড্‌লিগি নামক মহকুমায় উজানী গ্রামে লিঙ্গায়তগণের একটি প্রধান মঠ বিদ্যমান আছে। এতদ্ভিন্ন শ্রীশৈল, কোলেপাক, বলিহালী এবং বারাণসী ধামেও লিঙ্গায়তদিগের প্রধান প্রধান মঠ ছিল। ইহাদিগের মধ্যে কোলেপাকস্থ মঠটি এক্ষণে হস্পেটের সন্নিকট বক্কসাগর নামক স্থানে স্থানান্তরিত হইয়াছে। অন্যান্য লিঙ্গায়ত গ্রামেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লিঙ্গায়ত মঠ দেখিতে পাওয়া যায়। তবে যে সকল

মঠে "বিরক্ত"গণ থাকেন, সেগুলি প্রায়ই গ্রামের বাহিরে সংস্থাপিত।

লিঙ্গায়ত শাস্ত্রমতে যে কেহ ইচ্ছা করিলে লিঙ্গায়ত ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া লিঙ্গায়ত শ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন। গত শতাব্দীতেও ধারবার জেলার অন্তর্গত টুমিনকট্টি নামক স্থানের বহুসংখ্যক তন্তুবায়কে উজানী নিবাসী জনৈক জঙ্গম লিঙ্গায়ত ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন।

বাসবার মতে অতি নীচ জাতিকেও লিঙ্গায়ত ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার রীতি আছে। এ সম্বন্ধে Abbe Dubois লিখিয়াছেন :—Even if a pariah joins the sect, he is considered in no way inferior to a Brahmin. Wherever the lingam is found, there they say is the throne of the deity, without distinction of class or rank. The pariah's humble hut containing the sacred emblem is far above the most magnificent palace, where it is not.

বাসবার মত এইরূপ হওয়া সত্ত্বেও উজানী মঠের জঙ্গমগণ "মাল" জাতিকে লিঙ্গায়ত শ্রেণীভুক্ত করিতে অস্বীকার করিয়াছেন।

বর্ত্তমান লিঙ্গায়তগণের মধ্যে কোন কোন স্থানে বাল্য বিবাহও প্রচলিত আছে। অসৎ-চরিত্র স্ত্রীলোককে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়। ইহাদের মধ্যে দেবদাসী প্রথাও বর্ত্তমান আছে। এই দেবদাসীগণকে বাসবি কহে। লিঙ্গায়তদিগের মধ্যে ভ্রাতা ও ভগ্নীর সন্তানগণের পরস্পরের মধ্যে বিবাহ দিবার রীতি নাই। এই সম্বন্ধ দুই পুরুষ অন্তর হইলেও বিবাহ হইতে পারে না। কিন্তু বয়োজ্যেষ্ঠ ভগ্নীর কন্যাকে বিবাহ করিবার প্রথা আছে। এইরূপ বিবাহ মাদ্রাজ অঞ্চলের ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও হইয়া থাকে।

জঙ্গমদিগের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে। মৃতপত্নীকগণ সাধারণতঃ বিধবাকে বিবাহ করিয়া থাকে। অবিবাহিত ব্যক্তি প্রায়ই বিধবা বিবাহে সম্মত হয় না। বিধবাগণ তাহাদের পূর্ব্ব স্বামীর ভ্রাতা বা ভর্ত্তৃ সম্পর্কীয় নিকটাত্মীয় ব্যক্তিকে বিবাহ করিতে পারে না। বিধবাবিবাহ সাধারণ বিবাহের ন্যায় ক্রিয়াসংকুল নহে। বিবাহার্থী পুরুষ এবং রমণী মঠপতি এবং একজন "চুড়ীওয়ালার" সহিত দেবমন্দিরে গমন করে। তথায় "চুড়ীওয়ালা" রমণীর হস্তে "চুড়ী" পরাইয়া দেয় এবং মঠপতি তাহার কণ্ঠে একটি সূতার হার পরাইয়া দেয়। এই বিবাহের নাম "উদিকী বিবাহ" এবং গলদেশে লম্বিত সূত্রকে "মঙ্গল সূত্রের" পরিবর্ত্তে "তালী" কহিয়া থাকে। এই বিবাহ সমাজে এবং আদালতে গ্রাহ্য হয়।

এ সম্বন্ধে Indian Law Report, Madras VII, 1884এ নিম্নলিখিত নজীর দেখিতে পাওয়া যায় :—

There is an immemorial custom by which Lingait widows are remarried. Such marriage is styled, not Kalianum, but Odaveli or Kudaveli, It is not accompanied with the same ceremonies as a Kalian marriage, but a feast is given, the bride and bridegroom sit on a mat in the presence of the guests and chew betel, their cloths are tied together, and the marriage is consummated the same night. Widows married in this form are freely admitted into society, They cease to belong to the family of their first husband, and the children of the second family inherit the property of their own father.

লিঙ্গায়তদিগের মধ্যে বিবাহ বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিবার প্রথা আছে। স্ত্রী কুচরিত্রা হইলে পঞ্চগণ সম্মুখে স্বামী দোষ সপ্রমাণ করিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে। তৎপরে তাহার বিবাহ করিবার অধিকার জন্মে। পরিত্যক্ত স্ত্রীকে কেহ বিবাহ করিতে পারে না। স্বামী ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিলে স্ত্রীকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইতে পারে। তৎপরে তাহার উপর পরিত্যক্ত স্বামীর কোন দাবী দাওয়া থাকে না। কিন্তু সে স্ত্রী পুনরায় বিবাহ করিতে পারে না। এই রীতি উজানী মঠ কর্ত্তৃত সমর্থিত হইয়া থাকে।

কোন কোন মঠ স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত স্ত্রীর বিবাহের বিধান দিয়া থাকেন। এ সম্বন্ধেও, Madras Law Report series viii, 1885এ এইরূপ একটি নজীর আছে :—

Second marriage of a wife forsaken by the first husband is allowed. Such marrige is known as Serai Udiki (giving cloth); as distingnished from lagna on dhara, the first marriage.

লিঙ্গায়ত সম্প্রদায়ের সকল শ্রেণীর মধ্যেই হিন্দু দায়ভাগ (Law of inheritance) মতে সম্পত্তির উত্তরাধিকার নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে।

লিঙ্গায়তদিগের প্রতিমাসেই একটা না একটা উৎসব হইয়া থাকে। চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের প্রতিপদে তাহাদিগের নববর্ষ। নববর্ষকে উগাড়ী কহে। এই দিবস সকলে তৈল মর্দ্দন পূর্ব্বক স্নান করিয়া, নিম্ব পুষ্প, সর্করা অথবা গুড়, কিস্‌মিস্ কিম্বা মনক্কা, বাদাম, পোস্ত, নারিকেল এবং বেশম দ্বারা খাদ্য প্রস্তুত করিয়া খায়। বোধ হয় "বসন্তে নিম্ব ভক্ষণম্" এই বাক্য অবলম্বনে এই প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। পূর্ণিমার দিন হম্পেপম্পাপথিস্বামীর রথযাত্রা উপলক্ষে উৎসব হইয়া থাকে।

বৈশাখী পূর্ণিমার দিন কৃষকগণ "হগি" নামক বনৌষধি পত্র বিস্তৃত করিয়া শয়ন করিয়া থাকে। এইজন্য এই উৎসবের নাম "হগিহুনমে"।

জ্যৈষ্ঠ মাসে পূর্ণিমার দিন বৃষসকলকে নানা রঙ্গে রঞ্জিত করিয়া মহাসমারোহের সহিত শোভাযাত্রা করিয়া থাকে। এই মাসের অমাবস্যার দিন মৃত্তিকানির্ম্মিত বৃষের পূজা হইয়া থাকে। ইহার নাম "মন্নয়েথিনা" অমাবস্যা।

আষাঢ় মাসের পূর্ণিমাকে "কদলাকদভেন হুন্যমে" কহে। এই দিবস আস্ত কলাইয়ের পূর দিয়া পুলিপিঠার ন্যায় সিদ্ধ করত পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া ভক্ষণ করা হয়।

শ্রাবণ মাসের শুক্লপক্ষ পঞ্চমী তিথিকে নাগর পঞ্চমী বলে। এই দিবস সর্প বিবর হইতে সংগৃহীত মৃত্তিকা দ্বারা সর্প নির্ম্মাণ করিয়া, দুগ্ধ, কলাই, চাউল, গুড়, তিল, তিলপিষ্টক, নারিকেল, কদলী এবং ফুল দিয়া পূজা করিয়া থাকে। প্রতি সোমবারে ঈশ্বরের পূজা এবং জঙ্গম ভোজন করান হয়।

ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষ চতুর্থীর দিবস ইহারা অপরাপর হিন্দুগণের সহিত গণেশ চতুর্থী উৎসবে যোগদান করিয়া থাকে। মহালয়ার বা মলদ-অমাবস্যার পঞ্চদশ দিবসের মধ্যে প্রেতকার্য্যাদি সমাপন করিয়া থাকে।

আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষ প্রতিপদের দিন বালকগণ স্নান এবং নব বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া পাঠশালায় গমন করে। দশমীর দিন পর্য্যন্ত এই প্রথা প্রচলিত থাকে। শিক্ষকগণ ছাত্রদিগের সমভিব্যাহারে গৃহে গৃহে গমন পূর্ব্বক বৃত্তি সংগ্রহ করিয়া থাকে। তৎপরে দশমীর দিন পুস্তক, খাতা, দাঁড়ী, পাল্লা, বাটখারাদি তৌল-যন্ত্র প্রভৃতির পূজা করিয়া থাকে এবং জঙ্গমদিগের সহিত একত্র বসিয়া মধ্যাহ্ন-ভোজন করে। সায়ংকালে দেবমন্দিরে নারিকেল প্রদত্ত হয়। তৎপরে সকলে আত্মীয় স্বজন এবং গুরুজনের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের পদধারণ পূর্ব্বক প্রণাম করে। একাদশীর দিন শিবপার্ব্বতীর পূজা করিয়া থাকে।

অমাবস্যার দিবস "নোপে" অথবা "নোমুলু" অর্থাৎ গৌরীব্রত সমাপন করা হয়। এই ব্রতে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি ব্যবহৃত হয় যথা—২১টি পান, ২১টি আস্ত সুপারী, ২১টি ভাঙ্গা সুপারি, ২১ টুকরা হরিদ্রা, ২১টি "চিস্ত" অর্থাৎ গাঁদাফুল, ২১টি "তুম্বে হভু" অর্থাৎ রেসমের সুতা, ২১টি তুলার সুতা, ২১টি গিরা বাঁধা সুতা, ১টি নারিকেল শস্য, ১টি সোয়ারা, কুঙ্কুম, নারিকেল, গন্ধদ্রব্যাদি এবং ১খানি ব্যজন। এই ব্যজন বা পাখা দ্বারা দেবীকে ২১বার হাওয়া করা হয়। সাধারণত ঘটস্থাপন দ্বারা দেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। পরদিবস প্রাতে, দেবীকে নানাবিধ খাদ্যদ্রব্যাদি দ্বারা পরিতুষ্ট করে এবং পূজারি পুরুষের দক্ষিণ হস্তে ও স্ত্রীলোকের বাম হস্তে রেসমের সুতা বন্ধন করিয়া দেয়। উক্ত দিবস সকলে তৈল মর্দ্দন পূর্ব্বক স্নান করিয়া নব বস্ত্রাদি পরিধান পূর্ব্বক ভোজন করিয়া থাকে। পরদিবস অতি প্রত্যূষে স্ত্রীলোকেরা গোময় দ্বারা দুই স্তর পঞ্চপাণ্ডবদিগের প্রতিমূর্ত্তি গঠন করিয়া বহির্দরজার দুই পার্শ্বে রাখিয়া দুগ্ধ, নবনী, ঘৃতাদির দ্বারা পূজা করিয়া থাকে।

কার্ত্তিক মাসে বালিকাগণ বল্মীক-মৃত্তিকা সংগ্রহ পূর্ব্বক কয়েক দিবসব্যাপী একটি ব্রত করিয়া থাকে।

পৌষ মাসের সংক্রান্তির পূর্ব্বদিবস পিষ্টক নির্ম্মাণ করিয়া ভক্ষণ করিয়া থাকে। সংক্রান্তির দিবস নানাবিধ খাদ্যাদি প্রস্তুত করিয়া ভোজন করে এবং জঙ্গমদিগকে ভোজন করায়।

মাঘ মাসের পূর্ণিমাকে "বরাত পুণ্যমে" বলে। এই দিবস উপবাস করিয়া থাকে। কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীর দিবস সমস্ত দিবারাত্রব্যাপী উপবাসাদি দ্বারা সাবিত্রীব্রত সম্পন্ন করা হয়।

ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন সকলে হোলী বা দোল উৎসবে যোগদান করে। কিন্তু উপরিউক্ত কোন উৎসব বা ব্রতকার্য্যে ব্রাহ্মণ দ্বারা কোন কার্য্য সমাধান করা হয় না।

পৌষমাসে ভূমিকর্ষণ নিষিদ্ধ। "মার্গ-শিরা" অর্থাৎ অগ্রহায়ণ অথবা মাঘমাস ভূমিকর্ষণের উপযুক্ত সময় বলিয়া প্রসিদ্ধ। মঙ্গল কিম্বা শুক্রবারই প্রথম ভূমিকর্ষণের প্রকৃষ্ট সময় বলিয়া পরিগণিত হয়। ভূমিকর্ষণের পূর্ব্বে কর্ষণকারী বৃষের পূজা এবং তাহার শৃঙ্গদ্বয় ধৌত করিয়া বিভূতি দ্বারা ভূষিত করে। ধূর্য্যকাষ্ঠের উপর নারিলেল ভগ্ন করে। যে বংশখণ্ডের দ্বারা বীজ রোপণ করা হয় তাহাকে চূণ এবং রাঙ্গা মাটি দ্বারা রং করে। কতকগুলি অশ্বত্থ পত্র এবং হরিদ্রা ভূমির স্থানে স্থানে প্রোথিত করিয়া রাখে। লাঙ্গলে এক টুকরা সুতার দ্বারা ভেলা তাল পত্রাদি বাঁধিয়া দেয়। শস্য কর্ত্তন করিবার পূর্ব্বে উহার উপর দুগ্ধ ঘৃতাদির ছিটা দেওয়া হয়। শস্য সংগৃহীত হইলে পর শস্য-স্তূপের সম্মুখে গোময়নির্ম্মিত মন্দিরাকার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া খাদ্য দ্রব্যাদির দ্বারা পূজা করিয়া থাকে।

প্রাণ খুলে গাও।

(রামপ্রসাদী সুরে)

(মন) প্রাণ খুলে গাও মায়েরি নাম॥
বিপদ আপদ যাই না আসুক
বিকট হাসি যতই হাসুক
(ওরে) বাঁকিসনে টুক্ এদিক ওদিক
মায়ের পরে রাখিস রে প্রাণ।
(যবে) ধন-রাশি রাশি সুখ
ভরে দেয় তোর হাসিতে মুখ
(তখন) ভুলিস নে-কো সার কথাটী
যা কিছু সব মায়েরি দান।
উঠিস যবে সকাল হোলে
ফিরিস যবে সাঁঝের কোলে
(তখন) ভক্তি-ভরে চরণ পরে
মাথা থুয়ে করিস্ প্রণাম॥

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ৭৫ বৎসরে পদার্পণ উপলক্ষে নব ক্ষেত্র সমাবেশ।

আমরা গত সংখ্যার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে "ধর্ম্ম প্রচারের সহজ উপায়" প্রবন্ধে ধর্ম্মপ্রচার সম্বন্ধে কতকগুলি সহজ উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছি, তন্মধ্যে অভিনয় একটী। কেবল জোর করিয়া ধর্ম্মশিক্ষার্থীদিগের মস্তকে ধর্ম্মকথাগুলি কিলাইয়া প্রবেশ করাইলে বিশেষ ফল হয় না। গুরুর স্নেহের, প্রেমের ও দৃষ্টান্তের দ্বারা অনেক ধর্ম্মভাব ছাত্রের মস্তিষ্কে বসিয়া যায়। সময়বিশেষে অবস্থাবিশেষে ছাত্রদিগের প্রতি যে ভয়ের কঠোর শাসন প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য তাহা বলা বাহুল্য, কিন্তু স্নেহপ্রেমের কোমল শাসনই যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট তাহা অস্বীকার করা যায় না। কেবল রাশি রাশি দার্শনিক তত্ত্ব উদ্গীর্ণ করিয়া নানা প্রকারে পরলোক সম্বন্ধে ঈশ্বর সম্বন্ধে ভয়প্রদর্শন করা কঠোর শাসনপ্রণালীর অন্যতর এবং অভিনয়াদির দ্বারা দর্শনতত্ত্ব হৃদগত করানো প্রেমের শাসনপ্রণালীর অন্যতর। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় নানাবিধ সুগম্ভীর দার্শনিক প্রবন্ধ প্রথমাবধি প্রকাশিত হইবার কারণে সাধারণ শিক্ষিত বাঙ্গালী উহাকে শ্রদ্ধাপূর্ণ কিন্তু একটু ভীতিপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন। সেই ভীতি দূর করিবার জন্য আমরা আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া নানা উপায়ে চেষ্টা করিয়া আসিতেছি—কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি জানি না। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ৭৫ বৎসর বয়সে পড়িবার উপলক্ষে বর্ত্তমান সংখ্যার পত্রিকায় একটী ক্ষুদ্র গীতিনাট্যের সমাবেশ দ্বারা একটী নূতন ক্ষেত্র উন্মুক্ত করিয়া পত্রিকার সম্বন্ধে পূর্ব্বসংস্কার দূরীকরণে কৃতসংকল্প হইয়াছি।

গীতিনাট্যের নাম "ছুটী" এবং লেখক সুপ্রসিদ্ধ কথক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ন। "ছুটী"তে দেখানো হইয়াছে যে আমাদের ছুটীর মধ্যে কাজ এবং কাজের মধ্যে ছুটী। ইহা ছোট ছোট বালকবালিকাদের দ্বারা অভিনয় করিবার খুবই উপযুক্ত। সম্মুখে শারদীয় পূজার অবকাশ আসিতেছে। যদি বালকবালিকাদের অভিভাবকগণ সেই অবকাশে নিজ নিজ বাড়ীর ছেলেমেয়েদের দ্বারা এই গীতিনাট্যের অভিনয় করান, তবেই আমাদের শ্রম সার্থক বিবেচনা করিব। আবালবৃদ্ধ বনিতার সম্মুখে অম্লানবদনে অভিনয় করিতে পারা যায় এরূপ পুস্তক আমাদের দেশে দুএকখানি ব্যতীত নাই বলিলেই চলে। ধ্রুব, বুদ্ধ প্রভৃতি সম্বন্ধেও অভিনয় করিতে বা দেখিতে গেলে এমন অংশে আসিয়া পড়িতে হয় যেখানে পিতাপুত্রে একত্র বসিয়া থাকা অসম্ভব। যাঁহারা ছেলেমেয়েদের জন্য নির্দ্দোষ অভিনয়ের উপযুক্ত পুস্তকাদি রচনা করেন, তাঁহারা আমাদের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র। এরূপ পুস্তকের মধ্যে আমরা রবীন্দ্রনাথের বাল্মীকিপ্রতিভা, কালমৃগয়া, কথক হেমচন্দ্রের উৎসব প্রভৃতির উল্লেখ করিতে পারি। হেমচন্দ্রের রচিত "দাদা ঠাকুর" বা "আদর্শ" গত বৎসর মুকুন্দ দাস কর্ত্তৃক অভিনীত হইয়া সমগ্র রাজধানীকে মুগ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। এবারে আমরা তাঁহার রচিত "ছুটী" প্রকাশ করিলাম। এ বিষয়ে পাঠকগণের অভিমত পাইলে সুখী হইব।

ছুটি।

(গীতি-নাট্য)

(কথক—শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ন)

(গান করিতে করিতে পাঠশালার বালকগণের প্রবেশ।)

প্রভাতকাল।

গীত।

সারা রাত্ ঘুমিয়ে কেটে' সকাল বেলায় উঠি,
হঠাৎ দেখি আজ আমাদের হয়ে গেছে ছুটি,
ওরে হয়ে গেছে ছুটি!
সারা জগৎ মোদের সনে
খেলতে এসেছে
কোন্ সুদূরের সাগর পারের
খবর এনেছে—
কোথায় বাঁশী বেজেছে! কোথায় সাড়া পড়েছে
ভোরের আলো তাই দেখে ভাই হেসে কুটি-কুটি!
লুট করে আজ নেব আকাশ
সবাই মুঠি মুঠি
হাসি গানের ঝড় বহায়ে'
নেব জগৎ লুটি!
মোরা, নেব জগৎ লুটি'!

১ম বালক। ছুটি তো হল এখন কি করব?

২য় বালক। তাইতো কি করব?

৩য় বা। বাঃ, ছুটির দিনে আবার কি করব? ছুটিতো ছুটিই।

৪র্থ বা। ছুটিও তো একটা কাজ

৫ম বা। ওগো তা বোলো না। ছুটিটাকেও একটা কাজ বলে ভাবলে আর ছুটিতে ছুটির আনন্দটুকু থাকবে না।

২য় বা। কাজের আনন্দটুকুই তো ছুটি। এই আনন্দটুকু পাবার জন্যই তো যত কাজ।

৪র্থ বা। তা হলে কথাটা দাঁড়াল কি, কাজের জন্য ছুটি না ছুটির জন্য কাজ?

২য় বা। ও দুটো'ই।

৫ম বা। কাজের মধ্যেই একটা ছুটি আছে; আর ছুটির মধ্যেও একটা কাজ আছে। কাজ আর ছুটি—দুটোতে এত আধামাখি যে বেশী করে না ভাবলে চেনা যায় না।

২য় বা। আমাদের পাঠশালাটি বেশ কিন্তু—

৩য় বা। কি রকম?

২য় বা। এটা বরাবর দেখে আসচি যে আমরা ছুটির মধ্যে কাজের আনন্দ পাই আবার কাজের মধ্যে ছুটির আনন্দটুকু পাই।

৫ম বা। পাঠশালার শিক্ষাই যে তাই।

গীত।

মোদের কাজ আর ছুটি এক হয়েছে
কাজেই আমোদ পাই
এই পড়া পড়েছি মোরা এই শেখাই
শিখ্‌চি ভাই।
মোদের এই ভোর বেলাতে
মোদের এই পাঠশালাতে
বাধা বাঁধন, বেতের শাসন, কোনো বারণ নাই।

হাওয়ার সনে মেতে উঠে
ফুলের মতন উঠি ফুটি'
ভোরের আলোর আমোদ লুটি, পাখীর মতন গাই।

(একটী আগন্তুক বালকের পুস্তকহস্তে প্রবেশ।)

১ম বা। কি হে ভাই. তুমি যাচ্ছ কোথায়?

২য় বা। হ্যাঁগা তোমার নাম কি?

৩য় বা। তুমি কোন্ পাঠশালায় পড়?

৪র্থ বা। তুমি কোন্ গাঁয়ে থাকো?

৫ম বা। ওকি কথা কইছনা যে?

৪র্থ বা। ওকি অমন ক'চ্ছ কেন?

আ-বা। আঃ পথ ছেড়ে দাও, পথ ছেড়ে দাও!

২য় বা। ওগো দুটো কথাই কও!

আ-বা। কথা কয়োনা; কথা কয়োনা।

৩য় বা। কেন?

আ-বা। তোমাদের সঙ্গে কথা কইতে মানা।

৩য় বা। কেন ভাই?

আ-বা। গুরুমশায় মানা করেছেন।

৩য় বা। তোমার গুরুমশায় কে?

আ-বা। ঐ, যাঁর হাতে বেত।

৩য় বা। ও বাবা, হাতে বেত কেন?

আ-বা। তিনি যে গু-রু-ম-হা-শ-য়।

৩য় বা। তা হোক—তা বেত কেন হাতে?

আ-বা। না হলে শাসন করবে কি দিয়ে? তোমরা পাঠশালায় পড়না?

৩য় বা। পড়ি।

আ-বা। তোমাদের গুরুমশায় নেই?

৩য় বা। আছেন। তাঁর হাতে বেত নেই। তাঁর বেতের শাসন নেই।

আ-বা। তবে কিসের শাসন? তা হলে বুঝি মোটে শাসনই নেই? বেত না হলে কি শাসন হয়?

৩য় বা। শাসন থাকবেনা কেন? কিন্তু সে বড় মজার শাসন, তা কেমন; মুখে বুঝিয়ে বলতে পারব না। এ পাঠশালায় পড়লেই বুঝতে পারবে।

আ-বা। তোমরা পড়তে যাবে না?

২য় বা। পড়চিই তো।

আ-বা। সেকি! এখানে যে ঘর নেই; এযে খোলা জায়গা।

২য় বা। আমাদের পড়া এই রকম খোলা জায়গাতেই। আমাদের পাঠশালায় জায়গার অন্ত নেই।

আ-বা। গান কচ্ছিলে কেন?

২য় বা। বাঃ, আজ যে ছুটি!

আ-বা। তবে আর পড়া হল কৈ? ছুটি কি পড়া? পড়াতে ছুটি নেই।

২য় বা। পড়া আছে বলেই তো ছুটি আছে; তোমাদের পাঠশালায় বুঝি ছুটি নেই।

(এমন সময়ে বই হাতে করিয়া আর একটি বালকের প্রবেশ।)

আ-বা। তা নেই। সে খানে কেবল নড়াচড়া না করে, চুপ্ করে বুড়োর মত মুখ ভারী করে বসে কেবল পড়তে হবে।

৪র্থ বা। ওহে, এ কি রকম পাঠশালা?

আ-বা। এ সব শুনে মনে হচ্ছে তোমাদের পাঠশালা-টাই ভালো। আমি ও-পাঠশালা থেকে পালিয়ে আস্‌ব। তোমাদের সাথে মিশে আমোদ কর্‌ব।

৪র্থ বা। সে কি? পাঠশালা থেকে কি আর পালানো যায়? পালানো কেন? পালানোটা ভালো নয়। যে ওখান থেকে পালাতে পারে সে এখান থেকেও পালাতে পারে।

৩য় বা। চল ওকে আমাদের গুরুমশায়ের কাছে নিয়ে যাই।

২য় আ-বা। ও বাবা! গুরুমশায়ের নাম শুন্‌লেই যে ভয় হয়।

৩য় বা। কেন?

২য় আ-বা। তিনি যে গুরুমশায়—সেইটাই তো ভয়।

৩য় বা। তাই বলেই তো ভয় নেই; আমরা তো ভয় পেলেই আরো গুরুমশায়ের কাছে যাই।

১ম ও ২য় আ-বা। তাঁর কি রকম চেহারা?

১ম বা। ঠিক্ গুরুমশায়েরি মত।

১ম ও ২য় আ-বা। ও বাবা! তবেই হয়েছে। ও বাবা! আমরা যাই।

সকল বালকেরা। আরে দাঁড়াও না! যাচ্ছ কেন?

২য় আ-বা। তাঁর খুব রাঙা চোখ, গম্ভীর মুখ, লম্বা দাড়ি—কেমন, নয় কি?

১ম বা। না গো না; তুমি যেমন ভাবছ তেমন নয়।

১ম ও ২য় আ-বা। সে খানে আমাদের নিয়ে কি কর্‌বে?

২ ও ৩য় বা। তাঁর সঙ্গে মিলে মিশে তোমরা নাচবে, গাইবে, আমোদ করবে।

১ম বা। সে কি! বল কি!—গুরু মশায়ের সঙ্গে আমোদ!

৩য় বা। তা নয় তো কি? কাজের দিনে তিনি সাথে সাথে, আর ছুটির দিনে কি তিনি ছাড়া?

গীত।

কাজের দিনের সাথের সাথী ছুটির দিনে নয় ছাড়া
কাজের মাঝে ছুটির মাঝে সকল কাজেই পাই সাড়া।
আমাদের কাছে আসে
আমাদের সাথে হাসে
ভালোবাসায় ভালোবাসে এম্‌নি বটে তাঁর ধারা।
যূথীর মালা গলে দোলে
হাসিতে তাঁর পরাণ খোলে
(সব) মুখ দেখিলেই আপন ভোলে ভয় ভাবনা হয় হারা

১ম আ-বা। আজ তোমাদের ছুটি কেন?

৩য় বা। বেশি করে কাজ সুরু করতে হবে। আমাদের পাঠশালায় যাবে একবার? সেখানে গেলে কাজও হবে, ছুটীও পাবে।

১ম ও ২য় আ-বা। যাবো। কিন্তু পথে যদি আমাদের গুরুমশায়ের সাথে দেখা হয়?

৪র্থ বা। তা হলে কি হবে?

২য় আ-বা। মেরে ধরে নিয়ে যাবে?

৩য় বা। না গো না। এ পথ থেকে কেউ নিতে পারে না। এটা আমাদের পাঠশালার পথের গুণ।

১ম ও ২য় আ-বা। তবে চল। বড় ভাগ্যি তোমাদের সঙ্গে সকাল বেলায় দেখা হয়েছে।

৩য় বা। সেটা ভোরের আলোর গুণে।

১ম ও ২য় আ-বা। তবে চল একবার তোমাদের গুরু-মশায়ের কাছে।

৪র্থ বা। তিনিই এখানে আস্‌বেন।

১ম আ-বা। একথা তোমায় কে বল্লে?

৪র্থ বা। এই রকম তিনি আসেন। ছুটির আনন্দ যখন খুব বেশী হয়ে উঠবে, তখনি তিনি আস্‌বেন।

২য় আ-বা। তা হলে এস আমরা আমোদ করি।

(গীত।)

আয় আকাশের ঝোড়ো বাতাস
আয়রে চাঁদের হাসি
আয়রে তারা আয়রে লয়ে
কিরণ-মালার রাশি।
(তোরা, আয় আয় আয় আয় রে।)
ফটিক জলের নাচন লয়ে
আয়রে নিঝর-বারি
নদীর জলে পড়া চাঁদের
আলোর ঝিলিক মারি।
(তোরা, আয় আয় আয় আয় রে)
মেঘ দেখে যে ময়ূর নাচে,
ফাগুন মাসের পিকের গান—
গানের মাঝে নাচের মাঝে
হয়ে উঠ মূর্ত্তিমান।
(তোরা, আয় আয় আয় আয় রে)

২য় দৃশ্য—পথ।

দুইটী পথিক। সন্ধ্যাকাল।

১ম পথিক। কি গো তুমি কাঁদ্‌ছ কেন?

২য় পথিক। আজ নাকি ছুটি?

১ম প। এ কি আর বলে দিতে হয়। চার দিকে চাইলেই বুঝা যায়।

২য় প। যায় নাকি? ওঃ এত দূর হয়েছে! বাহির দেখেও বুঝা যাচ্ছে! তাইতো একটু কাঁদি।

১ম প। আহা, বল কি! এমন সুখের দিনে কাঁদতে আছে?

২য় প। সুখের দিন! শুনেছি নাকি আজ বাঁধন গুলো সব খসে' পড়্‌বে, সব ছাড়বে, এও কি একটা সুখের দিন?

১ম প। তাই বলেই তো সুখ। সব ছেড়ে যেতে হবে এমন কথা তোমায় কে বল্লে? ছুটির অর্থ তা নয়। ছুটি যে সব ছেড়ে সব পাওয়া। সবাই তোমায় ছাড়বে, তুমিও সবাইকে ছাড়বে, অথচ সকলি তোমার হবে।

২য় প। বল কি! এ আমার বিশ্বাস হয় না।

১ম প। বিশ্বাস করেই দেখ না।

২য় প। হায়, হায়, এই আমার খাতাপত্র, এই আমার পোঁটলা পুঁটলী এ সব ছাড়তে হলে আর আমি বাঁচব না। এ সব গেলে এর সঙ্গে সঙ্গে আমিও যাব। এই দ্যাখ না ভাই শিকল দিয়ে হাত পা সব বেঁধে রেখেছি।

১ম প। তা যতই বাঁধো, ছুটি হলে ও-সব আপনা আপনি খসে পড়্‌বে।

২য় প। হায়রে আমার পুঁটলী!

১ম প। আবার কাঁদ্‌ছ?

২য় প। আচ্ছা, ছুটি হল কেন?

১ম প। ও অমন হয়ে থাকে। ছুটি হতেই হবে।

২য় প। কি সর্ব্বনাশ!

১ম প। সর্ব্বনাশ কি?

২য় প। সর্ব্বনাশ নয়! সব ছেড়ে যাওয়া, সব ছেড়ে দেওয়া,—এর চেয়ে কি সর্ব্বনাশ কিছু আছে?

১ম প। বলেছিই তো এ সব-ছাড়া নয়,—সব-পাওয়া। অনেক জিনিস দেওয়া হয়েছে, সেগুলি পাওয়া হয় নাই। আজ এই ছুটিতে সেগুলি পাওয়া হবে।

২য় প। এ কেমন করে হয় আমি বুঝ্‌তেই পারি না।

১ম প। যদি আমার কথা শোনো,তাহলে বুঝতে পারবে।

২য় প। যদি পুঁটলী ছাড়ার কথা ছাড়া আর কোনো কথা বল তাহলে শুনতে পারব।

১ম প। আচ্ছা যাক্; পুঁটলী তুমি নিজেই ছাড়তে চাইবে। আগে একটা সহজ কাজ কর।

২য় প। কি?

১ম প। এই শিকলটা খুলে ফেল।

২য় প। ও বাবা তা'হলে আর বাঁচব না; আমার এরূপ বাঁধা থাকাই অভ্যাস। একি একদিনের অভ্যাস?

১ম প। একবার খোলা হয়ে দেখ কি মজাটা।

২য় প। আমি খুলতে পারব না, তুমি যদি পারো খুলে দাও।

১ম প। তা আমার একার ইচ্ছায়, একার চেষ্টায় হয় না। তোমারো ইচ্ছা থাকা চাই,—চেষ্টা থাকা চাই।

২য় প। যাই বল, খুলতেই আমার মন সরে না।

১ম প। আচ্ছা থাক্; মন না সরলে, ধরে বেঁধে খোলা কোনো কাজের নয়। আচ্ছা দাঁড়াও, তুমি নিজেই যখন খুলতে চাইবে তখন খুলে দেব।

২য় প। ও বাবা—বল কি? আমি নিজেই খুলতে চাইব? হায়রে এ আমার ভাবতেই যে কান্না পায়। হায়রে আমার পুঁটলী।

১ম প। আঃ ছুটির দিনে আবার কাঁদছ?

২য় প। ও কি অমন চ্যাঁচাচ্ছে কারা? এই রে সেরেছে! আমার পুঁটলি নিতে এল বুঝি; এই বুঝি আমার শিকল খুলে দিতে আসচে। হায়রে! হায়রে আমার পুঁটলী। বেরোও বাপু এখান থেকে, আমি বুঝতে পেরেছি তুমিই একজন ঐ দলের। আমি বেশ বুঝতে পারছি, বেশ বুঝতে পারছি। হায় হায় এই তো শিকলটা যেন ঝন্ ঝন করছে, এই খুল্‌ল বুঝি! খুলল বুঝি! হায়রে আমার পুঁটলি!

১ম প। আচ্ছা আমি তবে এখন ঐ আনন্দে মিশে যাই।

(গান করিতে করিতে বালকগণের প্রবেশ)

গীত।

সকল বাঁধন পড়বে খসে;—আজ যে মোদের ছুটি
রইবে কে আর কোণে বসে? আজ যে মোদের ছুটি
সব ছেড়ে সব পাবে যে আজ; আজ যে মোদের ছুটি
আমায় আমি ভুলতে হবে; আজ যে মোদের ছুটি
ভোরের আলোয় নাইতে হবে; আজ যে মোদের ছুটি
পুঁটলী তোমার ছাড়িয়ে লবে; আজ যে মোদের ছুটি
হয়নি যাহা হবে তা আজ; আজ যে মোদের ছুটি
করনি যা করবে তা আজ; আজ যে মোদের ছুটি

২য় প। এই এই গেল বুঝি, শিকল খুলে গেল বুঝি! এই এই বেরো, বেরো দুষ্টু ছোঁড়াগুলো বেরো।

(বালকগণ তাহাকে ঘিরিয়া গাহিতে লাগিল)

২য় প। হায়, হায়রে এই তো, এই তো খুলে গেছে! ঐ যাঃ খুলে গেল! (শিকল খুলিয়া পড়িল) হায়রে, হায়রে আমার পুঁটলী!

(তাড়াতাড়ি প্রস্থান)

১ম প। চল চল গেয়ে চল; দেখছ আকাশ ক্রমে বেশি নীল হয়ে উঠচে; বাতাস ক্রমে খোলা হয়ে আসচে। চল গেয়ে চল।

(কাঁদিতে কাঁদিতে পুঁটলীধারী পথিকের পুনরায় প্রবেশ)

২য় প। হায়, হায়রে! হায়রে আমার পুঁটলী! সর্ব্বনেশে ছোঁড়াগুলো কি-করে বা খোঁজ পেলে! ঐ ঐ ঐ বুঝি আবার আসে। ঐ ঐ এলো তো! হায়রে আমার পুঁটলী! একি! শিকল খুলে যাওয়ার পর থেকেই যে কেবল ছুটাছুটি করতে ইচ্ছে হচ্ছে। একি কেবলি যে দৌড়োচ্চি। একি হল? শেষটা কি ঐ ছোঁড়াগুলোর মত হব নাকি? না, না, আমি পুঁটলি নিয়ে এবার গম্ভীরভাবে বসব। আমি বুড়ো মানুষ, আমি তো আর ছোক্‌রা নই। যাক্, গম্ভীরভাবে বসি (গম্ভীরভাবে উপবেশন) না না একি! কেবলি যে মনে হচ্ছে আমি আর বুড়ো মানুষ নই। আমি যেন আবার নতুন হয়ে গেছি। হায়রে আমার "আমি" গেল কোথায়?

২য় প। সর্ব্বনাশ! ছোঁড়াগুলো আবার আসছে! প্রথমবারে বাঁধন খুলে গেছে; এবার পুঁটলীটিও যাবে। লুকোবোই বা কোথায়? বাঁধন খুলে গেলে কি আর লুকানো যায়?

(বালকগণের গাইতে গাইতে প্রবেশ)

গীত।

বারে বারে আসতে হবে, বারে বারে ডাকতে হবে
কাঁদতে হবে, গাইতে হবে, ঘুরতে হবে এই দ্বারে।
কত আর তাড়িয়ে দিবে, কত আর ফিরিয়ে দিবে?
সাথের সাথী হতেই হবে পেতেই হবে আজ তাঁরে।
চল্‌বেনা আজ ফেলে যাওয়া, চল্‌বেনা আজ একা গাওয়া
সবারি ডাক পড়বে যাহে সেই সুরে আজ গান গা'রে।
চলবেনা আজ একলা হাসন, চলবেনা আজ মিছে কাঁদন
ছুটির আমোদ হলে ঘন থাকতে একা কে পারে?

২য় প। ওরে তোরা গান গাচ্ছিস কেন?

১ম প। আজ যে ছুটি, তাইতো আমোদ

২য় প। আমার তো আমোদ বোধ হচ্ছে না।

১ম প। ঐ পুঁটলীটি ছেড়ে দেও; তবেই আমোদ হবে।
২য় প। ও সর্ব্বনাশ! তা হতেই পারে না।
১ম বা। তবে একবার চারিদিকে চেয়ে দেখ।
২য় প। তাতে কি হবে?
১ম বা। গুরুমশাইকে দেখতে পাবে।
২য় প। সে কোথায়?
১ম বা। তাকে খুঁজলেই দেখতে পাবে।
২য় প। দেখলে কি হবে।
১ম বা। আনন্দ হবে।
২য় প। আমি তো সব দিক্ দেখ্‌চি, তাঁকে তো দেখতে পাচ্ছি নে।
১ম বা। তবে এই গানে যোগ দাও।

(বালকগণের গীত)

আনন্দে আজ দেছে ধরা সারা গায়ে ঢেউ লাগে
সারা রাতের ঘুমের পরে ভোরের আলো আজ জাগে
মেল নয়ন দেখ্‌তে পাবে
দাঁড়িয়েছে সে কি সাজে
কাণ পেতে ভাই শোনো শোনো
বাঁশীতে তাঁর কি বাজে
হৃদয় দিয়ে বোঝো হৃদয় তাঁরেই শুধু আজ আগে।

২য় প। বাঃ এতো বড় চমৎকার! পুঁটলীটি কে যেন নিয়ে গেল, কিন্তু দুঃখ তো হচ্ছে না! বাঃ সঙ্গে সঙ্গে আমিই যে বদলে গেছি। বাঁধন তো আগেই গেছে; দুঃখও নেই—এখন কেবল আনন্দ—গাও তোমরা, আমিও গাইব।

সকলের গীত।

সকল দিকে পরশ-করা এই তো তাঁকে পেয়েছি
সবার পরাণ হরষ-করা এই তো সে গান গেয়েছি
সুধার সাগর মাঝে নামি'
এই হারালাম আমার "আমি!"
ডুব্ দিয়ে যে উঠে দেখি, নূতন সাজে সেজেছি!
এতই ছিল পাইনি এত
তাড়িয়ে দিছি যায়নি' সে তো
জিততে গিয়ে হার মেনেছি; হেরে' যে আজ জিতেছি।

শেষ।

বাইবেল সংশোধন ও সত্যের অভিব্যক্তি।

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)

এদেশে গত শতাব্দী হইতে ধর্ম্মবিশ্বাস ও ধারণা লইয়া আবার নূতন চিন্তার ধারা প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় যে স্বাধীন চিন্তার উন্মেষ সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রভাব চারিদিকে দিন দিন ছাইয়া পড়িতেছে। তাঁহার প্রভাব যে কেবলমাত্র ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ তাহা নহে, উহার অবান্তর ফলে ভারতের বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ভিতরে সজীবতার লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। জ্ঞানের সঙ্গে ধর্ম্মের অবিচ্ছিন্ন যোগ রক্ষা করিবার জন্য আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার সূত্রপাত হইয়াছে। বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মসাধনার ভিতরে যেখানে যে কিছু কলঙ্ক বা আবর্জ্জনা রহিয়াছে, তাহার উপরে তত্তৎ সম্প্রদায়ের মনোযোগ নিপতিত হইয়াছে। বামাচার বীরাচার, সতীদাহ, সমুদ্রে পুত্রকন্যা নিমজ্জন উঠিয়া গিয়াছে, ধর্ম্মের নামে পশুহত্যার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে।

কেবলমাত্র এ দেশে নহে; ইউরোপব্যাপী রণকোলাহলের ভিতরে পড়িয়াও বিলাতে ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয় নাই। যাঁহারা প্রকৃত সাধু ও প্রকৃত ভগবৎভক্ত তাঁহাদের তীব্র দৃষ্টি ধর্ম্মপুস্তকের ভিতরে পড়িয়া কলঙ্ক অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে। তাঁহাদের (গির্জ্জায়) ধর্ম্মালয়ে যে সঙ্গীত গীত হয়, তাহার মধ্য হইতে আপত্তিকর অংশগুলি বাদ দিবার কথা উঠিয়াছে। "ভগবান চিরদয়ালু চিরকৃপাল, তিনি বিদ্বেষ বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইয়া কখনও কাহাকে বিধ্বস্ত করেন না, কাহাকেও অভিসম্পাত দেন না, তাঁহার রাজ্যে যে কেবলই দয়া, তিনি পাপী অপরাধী সকলকেই পরিশোধিত করিয়া তুলিতেছেন", এই ভাবের ভাবুক হইয়া কয়েকজন পাদ্‌রী Pslams of David হইতে কোন কোন অংশ অপসারিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে অভিশাপমূলক অংশগুলি পরিবর্জ্জন করিয়া উক্ত সঙ্গীতপুস্তকের নূতন সংস্করণ বাহির হওয়া নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। বলা বাহুল্য উক্ত সঙ্গীতপুস্তক অতীব প্রাচীন। উহা Old Testamentএর অংশ বিশেষ। খৃষ্ট জন্মিবার পূর্ব্বে উহা বিরচিত। উক্ত সঙ্গীতগুলির উপর সমগ্র খৃষ্টীয়ান জাতির শ্রদ্ধা অপরিসীম। কিন্তু যখন সত্যের নিকটে বর্ত্তমানে উহা পরীক্ষিত হইল, তখন উহার

অন্তর্নিহিত ত্রুটিগুলি তাঁহাদের চক্ষে পড়িল। তাই তাঁহারা উক্ত সঙ্গীতপুস্তকের নূতন সংস্করণের পক্ষপাতী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ উক্ত সঙ্গীতপুস্তকের ৫৮ সংখ্যক ধরা যাইতে পারে। উক্ত সঙ্গীতে আছে, "বিচারকগণ তোমরা আইনের সাহায্যে বিচার কর, তোমরা কি কখন ন্যায্য দাবীকে উপেক্ষা করিতে পার? যখন বিপন্ন দরিদ্র তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়, তোমরা কি সেই নির্দ্দোষ দরিদ্রকে তাড়াইয়া দিবে! যখন অর্থ তোমাদের হস্তকে কলঙ্কিত করিবে, তখন কি তোমরা অর্থশালী দোষীকে ছাড়িয়া দিবে। তোমরা কি ভুলিয়া গিয়াছ, অথবা জাননা, যে ভগবান বিচারকগণের বিচার করিবেন, স্বর্গের চারিভিতে তাঁহার বিচার চলিতেছে! তোমরা ভগবানের বিচারকে অতিক্রম করিতে চাও, ও সাধারণের হিতাহিতজ্ঞানকে শৃঙ্খল-বদ্ধ করিবার জন্য তোমরা আদেশ প্রচার কর। তোমাদের জিহ্বা হইতে বিষাক্ত শর বাহির হয় ও যেখানে পতিত হয় মৃত্যুকে আনয়ন করে; তোমরা সুপরামর্শ ক্রন্দন ও চক্ষুজল সবই উপেক্ষা কর। * * * হে অনাদি ঈশ্বর! সিংহের মত রক্তস্নাত তাহাদের সেই দন্ত ভগ্ন করিয়া দাও, তাহাদিগকে ভূমিতে বিলুণ্ঠিত কর, * * তাহাদের আশা ও নাম সমস্তই বিলুপ্ত কর"। * * * তাঁহারা বলেন এইরূপ সঙ্গীত ভজনাগারে গীত হইবার উপযুক্ত নহে। তাঁহাদের মতে উক্ত সঙ্গীত পুস্তকের অন্তর্গত ১৪, ৫৫, ৬৮, ৬৯, ১০৯, ১৩৭, ১৩৯, ১৪০, ১৪৩ সংখ্যক সঙ্গীতের কোন কোন অংশ ঐরূপ দোষদুষ্ট। ঐ ঐ সকল অংশ পরিহার হওয়া বিধেয়। সঙ্গীতের যে যে অংশে ভগবানের অভিশাপ ভিক্ষা করা হইয়াছে, তাহা সাধারণ সঙ্গীত পুস্তকে স্থান পাইবার উপযুক্ত নহে।

এইরূপ আন্দোলনে প্রকৃত সত্যনিষ্ঠার গৌরব সূচিত হয়। কত শত শতাব্দী পূর্ব্বে Psalms of David রচিত হইয়াছিল। উক্ত পুস্তকের উপর অসামান্য শ্রদ্ধা থাকিলেও সত্যের অনুরোধে তাঁহারা উক্ত সঙ্গীত পুস্তককে নির্দ্দোষ করিতে চান। ধন্য তাঁহাদের সৎসাহস।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সমগ্র উপনিষদ্ মন্থন করিয়া, সময় ও শিক্ষা ও গ্রহণের উপযোগী করিয়া, উহার ভিতর হইতে শ্লোকরাজি সংকলন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ নিবদ্ধ করিলেন এবং আপনার হৃদয়ের ছবি উহার ভিতরে প্রতিবিম্বিত করিলেন। ক্ষুদ্র আকারে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম কি তাহা সহজে ও সংক্ষেপে বুঝিবার সুবিধা করিয়া দিলেন। তিনি ধর্ম্মবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া যে সংগ্রহগ্রন্থ প্রচার করিয়া গেলেন, নিরপেক্ষ ব্যক্তি মাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে যে তাহার জন্য চিন্তাশীল মাত্রেরই তিনি শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করিবার অধিকারী। তিনি সমগ্র জীবনে সত্যনিষ্ঠার যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত নিতান্তই বিরল।

মিলন।

(শ্রীনির্ম্মল চন্দ্র বড়াল বি-এ)

তোমার সঙ্গে মিলন আমার
হবেই হবে হবেই হবে।
এই সেই পাপের তুচ্ছ বাঁধন
কদিন রবে কদিন রবে!
তুমি চাহ মিলন আমার
আমি চাহি মিলন তোমার
মোদের মিলনের এই ইচ্ছা-নদী
কোন্ সে পাষাণ-বাধা স'বে।
পাষাণ সে তো গলবে প্রেমে
বুকের বোঝা যাবে নেমে
ঝঞ্ঝা সে তো আস্‌বে থেমে
মিলন যত নিকট হবে!
তপন তারা রহে চেয়ে
আলোয় আনে ভুবন ছেয়ে
মোদের মিলনেরি বার্ত্তা সে তো
ভুবন মাঝে তা'রাই ক'বে!
কাননে সব কুসুম ফোটে
কোন্ কথা সে জানায় তারা—
কিসের কথা প্রকাশ করে
পাখীর গীতি নদীর ধারা?
নিমেষহারা চাহে আকাশ
কুসুমগন্ধ বহে বাতাস

কিসের লাগি—কি তারা চায়—
মোদের দোঁহার প্রেমের বিকাশ !
মোহের বাধা ক'দিন রবে
গভীর ইচ্ছা বাঁধন স'বে ?
জন্ম মরণ পারে যে ঐ
নিবিড় মিলন হবেই হবে ॥

বৈয়াসিক ন্যায়মালা।

(শ্রীরামচন্দ্র শাস্ত্রী সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ
ও
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি)

মূল। অথেদানীং প্রত্যধিকরণমবয়বচতুষ্টয়ং শ্লোকাভ্যাং সংগৃহ্যতে—তত্র প্রথমে ব্রহ্মণো বিচার্য্যত্বাধিকরণে শাস্ত্রস্য প্রথমং সূত্রং ॥

অনুবাদ। অনন্তর এক্ষণে দুইটী শ্লোকের দ্বারা অবয়বচতুষ্টয়সহ প্রত্যেক অধিকরণ সংগৃহীত হইতেছে। বেদান্তশাস্ত্রের আরম্ভে "ব্রহ্মের বিচার্য্যত্ব" অধিকরণে প্রথম সূত্র—

তাৎপর্য্য। পূর্ব্বে ২য় শ্লোকে বলা হইয়াছে যে প্রত্যেক অধিকরণের পঞ্চ অবয়ব—বিষয়,সন্দেহ, পূর্ব্বপক্ষ, সিদ্ধান্ত এবং সংগতি। তন্মধ্যে সংগতিসকল সহজবোধ্য বলিয়া, অতঃপর যে সকল অধিকরণ বলা হইবে, সেই সকল অধিকরণের সংগতিগুলি আর স্পষ্ট করিয়া দেখানো হইবে না, কিন্তু অন্য চারিটী অবয়ব স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইবে। সর্ব্বপ্রথম অধিকরণ হইতেছে—"ব্রহ্মের বিচার্য্যত্ব"। তাহার প্রথম সূত্র নিম্নে উক্ত হইল—

মূল। অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ॥১॥

প্রথমাধিকরণমারচয়তি—

অবিচার্য্যং বিচার্য্যং বা ব্রহ্মাধ্যাসানিরূপণাৎ।
অসন্দেহাফলত্বাভ্যাং ন বিচারং তদর্হতি ॥১১॥
অধ্যাসোঽহংবুদ্ধিসিদ্ধোঽসংগং ব্রহ্ম শ্রুতীরিতং।
সন্দেহান্মুক্তিভাবাচ্চ বিচার্য্যং ব্রহ্মবেদতঃ ॥১২॥

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" [বৃহং ২।৪।৫] ইত্যত্রাত্মদর্শনফলমুদ্দিশ্য তৎসাধনত্বেন শ্রবণং বিধীয়তে। শ্রবণং নাম বেদান্তবাক্যানাং ব্রহ্মণি তাৎপর্য্যং নির্ণেতুমনুকূলো ন্যায়বিচারঃ। তদেতদ্বিচারবিধায়কং বাক্যং বিষয়ঃ। ন চ অয়ং বিষয়ঃ শ্লোকয়োর্ন সংগৃহীতঃ ইতি শঙ্ক্যং সন্দেহসংগ্রহেণৈবার্থাত্তৎসংগ্রহপ্রতীতেঃ। ব্রহ্মবিচারাত্মকং ন্যায়নির্ণয়াত্মকং শাস্ত্রমনারভ্যম্ আরভ্যম্ বা ইতি সন্দেহঃ। পূর্ব্বোত্তরপক্ষযুক্তিদ্বয়ং সর্ব্বত্র সন্দেহবীজমুন্নেয়ং। তত্র অনারভ্যম্ ইতি তাবৎ প্রাপ্তং বিষয়প্রয়োজনয়োরভাবাৎ। সন্দিগ্ধং হি বিচারবিষয়ো ভবতি। ব্রহ্মত্বসন্দিগ্ধং। তথাহি—তৎ কিং ব্রহ্মাকারেণ সন্দিহ্যতে আত্মাকারেণ বা নাদ্যঃ "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" [তৈত্তিং ২।১।১] ইতি বাক্যেন ব্রহ্মাকারস্য নিশ্চয়াৎ। ন দ্বিতীয়ঃ অহংপ্রত্যয়েনাত্মাকারস্য নিশ্চয়াৎ। অধ্যস্তাত্মবিষয়ত্বেন ভ্রান্তোঽহংপ্রত্যয়ঃ ইতি চেৎ ন অধ্যাসানিরূপণাৎ। তমঃপ্রকাশবদ্বিরুদ্ধস্বভাবয়োর্জড়াজড়য়োর্দেহাত্মনোঃ শুক্তিকারজতবদন্যোন্যতাদাত্ম্যাধ্যাসো ন নিরূপয়িতুং শক্যতে। তস্মাদভ্রান্তাভ্যাং শ্রুত্যহংপ্রত্যয়াভ্যাং নিশ্চিতস্যাসন্দিগ্ধত্বাদ্বিচারস্য ন বিষয়োঽস্তি। নাপি প্রয়োজনং পশ্যামঃ উক্তপ্রকারেণ ব্রহ্মাত্মনি নিশ্চিতেঽপি মুক্ত্যদর্শনাৎ। তস্মাৎ ব্রহ্ম বিচারানর্হং ইতি শাস্ত্রমনারম্ভণীয়ং ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ।

অত্রোচ্যতে শাস্ত্রমারম্ভণীয়ং। কুতঃ বিষয়প্রয়োজনসম্ভাবাৎ। শ্রুত্যহংপ্রত্যয়য়োর্বিপ্রতিপত্ত্যা সন্দিগ্ধং ব্রহ্মাত্মবস্তু। "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" [বৃহং ২।৫।১৯] ইতি শ্রুতিরসংগং ব্রহ্মাত্মত্বনোপদিশতি। অহং মনুষ্যঃ ইত্যাদ্যহংবুদ্ধির্দেহতাদাত্ম্যাধ্যাসেনাত্মানং গৃহ্নাতি। অধ্যাসস্য চ দুর্নিরূপণত্বমলংকারায়। তস্মাৎ সন্দিগ্ধং বস্তু বিষয়ঃ। তন্নিশ্চয়েন মুক্তিলক্ষণপ্রয়োজনং শ্রুত্যা বিদ্বদনুভবেন চ প্রসিদ্ধং। তস্মাৎ বেদান্তবাক্যবিচারমুখেন ব্রহ্মণো বিচারার্হত্বাচ্ছাস্ত্রমারম্ভণীয়ং। ইতি সিদ্ধান্তঃ।

সূত্রানুবাদ। অনন্তর এই হেতু ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।

অধিকরণ শ্লোকের অনুবাদ। প্রথম অধিকরণ সংরচিত হইতেছে—

ব্রহ্মবিচার্য্য অথবা অবিচার্য্য ? অধ্যাস নিরূপিত হইবার অভাব, সন্দেহের অভাব এবং বিচারের নিষ্ফলত্ব প্রযুক্ত ব্রহ্ম বিষয়ে বিচারের প্রয়োজন নাই। (কিন্তু) অহংবুদ্ধি দ্বারাই অধ্যাস সিদ্ধ হইতেছে এবং শ্রুতিকথিত ব্রহ্ম নির্লিপ্ত। সন্দেহ এবং মুক্তিফলত্ব হেতু ব্রহ্ম বেদমুখে বিচার্য্য।

টীকার অনুবাদ। "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" এই মন্ত্রে আত্মদর্শনরূপ ফলের উদ্দেশ্যে তাহারই সাধনস্বরূপে শ্রবণ বিহিত হইয়াছে। বেদান্তবাক্য সমূহের ব্রহ্মবিষয়ক তাৎপর্য্য নির্ণয় করিবার পক্ষে অনুকূল যুক্তিবিচারের নামই শ্রবণ। সেই এই বিচারপ্রবর্ত্তক বাক্যই হইল বিষয়। এই বিষয় যে উপরোক্ত দুইটী শ্লোকে সংগৃহীত হয় নাই বলিয়া আশঙ্কা করিবে তাহা ঠিক নহে। সন্দেহের উল্লেখেই স্বতই বিষয়ও উল্লিখিত বলিয়া ধরিতে হইবে। যুক্তিমূলক ব্রহ্মবিচারবিষয়ক শাস্ত্র আরম্ভ করা উচিত বা অনুচিত ইহাই হইল সন্দেহ। সর্ব্বক্ষেত্রে পূর্ব্বপক্ষ এবং উত্তরপক্ষের যুক্তি হইতেই সন্দেহবীজ পাওয়া যাইতে পারে। এই বিচারে বিষয় এবং প্রয়োজনের অভাব প্রযুক্ত বিচার আরম্ভ করা উচিত নহে ইহা পাওয়া গেল। যে বিষয়ে সন্দেহ থাকে তাহাই বিচারের বিষয় হয়। ব্রহ্মবিষয়ে কিন্তু কোনই সন্দেহ নাই। যদি বল যে ব্রহ্মবিষয়ে সন্দেহ আছে—তবে সে সন্দেহ কি ব্রহ্মাকার ধরিয়া অথবা আত্মাকার ধরিয়া? ব্রহ্মাকারে সন্দেহ হইতে পারে না, কারণ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম এই শ্রুতিবাক্যের দ্বারা ব্রহ্মাকার সুনিরূপিত হইয়াছে। অহংপ্রত্যয়ের দ্বারা আত্মাকারও সুনিশ্চিত হওয়া প্রযুক্ত আত্মাকার ধরিয়াও কোন সন্দেহ হইতে পারে না। যদি বল যে আত্মাতে অধ্যাস প্রযুক্ত অহংপ্রত্যয় ভ্রান্ত, তাহাও ঠিক নহে, কারণ অধ্যাসের স্বরূপ নিরূপিত হয় নাই। অন্ধকার ও আলোকের ন্যায় বিরুদ্ধস্বভাব জড় ও চেতন দেহ ও আত্মার, শুক্তি ও রজতের ন্যায় পরস্পরের তাদাত্ম্যমূলক অধ্যাস নিরূপণ করিতে পারা যায় না। অতএব শ্রুতিবাক্য ও অহংপ্রত্যয়, এই দুইটী অভ্রান্ত বস্তু দ্বারা নিরূপিত বিষয় সম্বন্ধে সন্দেহের অভাব বশত বিচার করিবার বিষয়েরও অভাব হইল। এরূপ বিচারের কোন প্রয়োজনও দেখি না, কারণ উক্ত প্রকারে ব্রহ্মাত্মা নিরূপিত হইলেও মুক্তি সংঘটিত হইতে দেখা যায় না। অতএব ব্রহ্ম বিচারের অযোগ্য এবং তদ্বিষয়ক শাস্ত্রও আরম্ভ করা উচিত নহে। ইহাই হইল পূর্ব্বপক্ষের কথা।

তদুত্তরে বলা যাইতেছে যে শাস্ত্র আরম্ভ করা উচিত। কেন? কারণ, বিচারের বিষয় ও প্রয়োজন উভয়ই আছে। শ্রুতিবাক্য এবং অহংপ্রত্যয়, এই উভয়ের মধ্যে বিবাদ থাকিবার কারণেই ব্রহ্মাত্মবস্তু সম্বন্ধে সন্দেহ আছে স্বীকার করিতে হয়। "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" এই শ্রুতিবাক্য সঙ্গবিহীন ব্রহ্মকেই আত্মা বলিয়া উপদেশ দিতেছেন। আর, "আমি মনুষ্য" ইত্যাদি অহংবুদ্ধি দেহের উপরেই তাদাত্ম্য অধ্যস্ত করিয়া আত্মাকে গ্রহণ করিতেছে। অধ্যাসের দুর্নিরূপণত্ব আমার সপক্ষেই যায়। সুতরাং সন্দেহোদ্দিষ্ট বস্তু হইল বিষয়। সেই বস্তুর স্বরূপ অবগতি দ্বারা মুক্তিরূপ প্রয়োজন যে সিদ্ধ হয় তাহা শ্রুতিবাক্যেও দৃষ্ট হয় এবং বিদ্বানগণ স্বীয় অনুভূতির দ্বারা তাহা উপলব্ধি করেন বলিয়াও প্রসিদ্ধি আছে। অতএব বেদান্তবাক্য সমূহের বিচার অবলম্বনে ব্রহ্ম বিচারের যোগ্য এবং সুতরাং তদ্বিষয়ক শাস্ত্রও আরম্ভ করা কর্ত্তব্য। ইহাই হইল সিদ্ধান্তপক্ষের কথা।

তাৎপর্য্য। উপোদ্ঘাতের পর এখন অবধি এক একটী করিয়া অধিকরণমালা ব্যাখ্যাত হইবে। তন্মধ্যে বেদান্তসূত্রের সুপ্রসিদ্ধ প্রথম সূত্র "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" অবলম্বনে প্রথম অধিকরণ সংরচিত হইয়াছে।

"অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এই সূত্রের পদ হিসাবে অর্থ হইতেছে "অনন্তর এই হেতু ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।" "অনন্তর"—কিসের অনন্তর? যে ঘটনার পর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা উপস্থিত হয় সেই ঘটনার পর। সে ঘটনাটী কি? চিত্তশুদ্ধি। চিত্তশুদ্ধি না হইলে প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছাই হয় না, ইহা সর্ব্ববাদসম্মত। এই চিত্তশুদ্ধির উপায় কি? উপায় হইতেছে সাধনচতুষ্টয়। এই সাধনচতুষ্টয় হইতেছে—(১) নিত্য ও অনিত্যবস্তু স্বরূপ জানা, (২) ঐহিক ও পারত্রিক ফলকামনারাহিত্য, (৩) যোগশাস্ত্রোক্ত শমদমাদিসাধনে প্রতিষ্ঠা এবং (৪) মুক্তিলাভের ইচ্ছা। এই কারণে শঙ্কর প্রভৃতি ভাষ্যকারগণ "অথ" শব্দের অর্থে "সাধন-চতুষ্টয়ের দ্বারা চিত্তশুদ্ধির পর" এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

সূত্রের দ্বিতীয় পদ হইতেছে "অতঃ" অর্থাৎ "এই হেতু"। এই হেতুটী কি? ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হয়

কেন? অনিত্য বস্তুকে অনিত্য বলিয়া জানিলে এবং নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মকেই নিত্য সুখের উৎস বলিয়া জানিতে পারিলেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা উপস্থিত হয়। তাই ভাষ্যকারগণ শ্রুতি অবলম্বনে বলেন যে "অগ্নিহোত্রাদি যাগযজ্ঞ অনিত্য অর্থাৎ নিত্যসুখ প্রদান করিতে পারে না এবং একমাত্র ব্রহ্মই নিত্য" বলিয়া ব্রহ্মজিজ্ঞাসা অথবা ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছা করা কর্ত্তব্য। শ্রুতি বলিয়াছেন—"যাঁহা হইতে এই ভূত সকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যাঁহা দ্বারা জীবিত রহে এবং প্রলয়কালে যাঁহার প্রতি গমন করে ও যাঁহাতে প্রবেশ করে, তাঁহাকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা কর—তিনিই ব্রহ্ম"।

অধিকরণ-নির্দ্দেশক শ্লোকদ্বয়ের তাৎপর্য্য দিবার প্রয়োজন নাই, কারণ উক্ত শ্লোকদ্বয়ের তাৎপর্য্য তাহার টীকাতেই সুব্যক্ত হইয়াছে। টীকার তাৎপর্য্য নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে সংগতি ছাড়িয়া দিলে প্রত্যেক অধিকরণের চারিটি করিয়া অবয়ব থাকে—বিষয়, সন্দেহ, পূর্ব্বপক্ষ এবং সিদ্ধান্ত। সমস্ত শ্রুতিবাক্যই যে ব্রহ্মনির্দ্দেশক এই কথা বুঝানোই হইল সমুদয় বেদান্তগ্রন্থের উদ্দেশ্য। তাই সমুদয় বেদান্তগ্রন্থের বিষয় হইল ব্রহ্ম। কিন্তু এই ন্যায়মালা-রচয়িতা কয়েকটী যথাযুক্ত শ্রুতিবাক্য অবলম্বনে সুবোধ্য করিবার অভিপ্রায়ে সমস্ত বেদান্তগ্রন্থের সূত্রগুলিকে কতকগুলি অধিকরণে বিভক্ত করিয়াছেন। যে যে শ্রুতিবাক্য অবলম্বনে যে যে অধিকরণ রচিত হইয়াছে, সেই সেই শ্রুতিবাক্য সেই সেই অধিকরণের বিষয়। বর্ত্তমান অধিকরণের বিষয় হইতেছে বৃহদারণ্যকোপনিষদের একটী বাক্য—"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ"—আত্মাকে দর্শন, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিবেক।

উপরোক্ত শ্রুতিবাক্য হইল বর্ত্তমান অধিকরণের বিষয় এবং বেদান্তগ্রন্থের প্রথম সূত্র হইল তাহার অবলম্বন। বিষয় এবং অবলম্বন, এই উভয়ের মধ্যে একটী সংগতি বা সম্বন্ধ থাকা উচিত এবং আছেও। এই সম্বন্ধটী কি? উক্ত শ্রুতিবাক্য হইতে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার কথা কিপ্রকারে আসে। শ্রুতিবাক্যের মুখ্য বক্তব্য হইল আত্মদর্শন এবং সেই আত্মদর্শন করিবার উপায় হইল শ্রবণ। শ্রবণ অর্থে শোনা। কোন বিষয় শুনিতে গেলেই তদ্বিষয়ে বিচার বা আলোচনাও অপরিহার্য্য। এখন, আত্মদর্শনের উপায়স্বরূপে যে শ্রবণের কথা বলা হইয়াছে, সেই শ্রবণ শব্দেরও অর্থে আসিতেছে আত্মার বিষয়ে শোনা এবং তদ্বিষয়ে বিচার। এই বিচার কোন্‌মুখী হইবে। "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" এই আত্মাই ব্রহ্ম, এইরূপ শ্রুতিবাক্যসমূহ অবলম্বনে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে এই বিচার ব্রহ্ম-মুখী হইতে হইবে, অর্থাৎ শ্রুতিবাক্যসমূহ শুনিয়া আমার বুঝিতে হইবে যে সেই সকলের তাৎপর্য্য ব্রহ্মপর। বৈয়াসিক ন্যায়মালাকার সেই অর্থ পরিস্ফুট করিয়া বলিয়াছেন যে "বেদান্তবাক্যসমূহের অর্থ একমাত্র ব্রহ্মেতেই পরিসমাপ্তি হয়, ইহাই বুঝাইবার পক্ষে অনুকূল যে যথাযুক্ত বিচার, তাহারই নাম শ্রবণ।" শ্রুতিবাক্যে "দ্রষ্টব্য" "শ্রোতব্য" প্রভৃতি তব্য প্রত্যয়ান্ত শব্দ সকল ব্যবহৃত হইয়াছে। তব্য প্রত্যয়ের তাৎপর্য্যই হইল বিধি। কাজেই "দ্রষ্টব্য" "শ্রোতব্য" প্রভৃতি শব্দের দ্বারা আত্মা বা ব্রহ্মের দর্শনের সঙ্গে ব্রহ্মবিষয়ে শ্রবণ ও বিচার করা বিহিত, ইহা উক্ত শ্রুতিবাক্যে সূচিত হইতেছে। এবং এই বিচার করা উচিত এইরূপ বিধি উক্ত শ্রুতিবাক্যে সূচিত হইয়াছে বলিয়াই উহা বর্ত্তমান ব্রহ্মবিচার্য্যত্ব অধিকরণের বিষয় বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

এখন, গ্রন্থকার যে দুইটী শ্লোকে বর্ত্তমান অধিকরণ রচনা করিয়াছেন, সেই দুইটী শ্লোকে "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" এই শ্রুতিবাক্য-রূপ বিষয়টী স্পষ্টরূপে সন্নিবিষ্ট হয় নাই। তাই, পাছে কেহ বলেন যে শ্লোকে যখন বিষয়েরই উল্লেখ নাই, তখন উহা দ্বারা বিষয়প্রমুখ পঞ্চাবয়বসমন্বিত অধিকরণ সংরচিত হইতে পারে না, গ্রন্থকার ইহা আশঙ্কা করিয়া বলিয়া দিতেছেন যে বিষয়টী স্পষ্টভাবে উল্লিখিত না থাকিলেও শ্লোকদ্বয়ের ভিতর অন্তর্নিহিত ভাবে রহিয়াছে। শ্লোকদ্বয়ে যখন সন্দেহের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তখন সেই সন্দেহসূত্রেই উক্ত বিষয়ের স্বতই প্রতীতি হইবে। এইখানে অধিকরণের একটী অঙ্গ বিষয়ের অস্তিত্ব স্থাপিত হইল। অধিকরণের বিষয়ের সহিত বেদান্তসূত্রের

সংগতির অস্তিত্ব ইতিপূর্ব্বেই প্রকারান্তরে আলোচিত হইয়াছে। এইবারে অধিকরণের তৃতীয় অবয়ব আলোচিত হইবে।

অধিকরণ-শ্লোকে "সন্দেহ" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই সন্দেহটী কি? না ব্রহ্ম বিচার্য্য বা বিচার্য্য নহে? মূলসূত্রে আছে "ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" অর্থাৎ ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছা। শ্রুতিবাক্যে আছে "ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর।" এই সকল বাক্য অবলম্বনে এক পক্ষ (পরে যাহাকে সিদ্ধান্ত পক্ষ বলা হইয়াছে) যুক্তি দেখাইয়া বলিবেন যে ব্রহ্মবিষয়ে আলোচনা করা নিশ্চয়ই কর্ত্তব্য। প্রতিকূল পক্ষ যদি যুক্তি দেখাইয়া বলেন যে ব্রহ্মবিচার নিষ্প্রয়োজন, তখনই সন্দেহের উৎপত্তি হইল। দুইটী পক্ষের যুক্তি না পাইলে সন্দেহ উঠিতেই পারে না। তাই গ্রন্থকার বলিতেছেন যে পূর্ব্ব ও উত্তর (প্রতিকূল ও অনুকূল) এই উভয় পক্ষের যুক্তিই হইল সন্দেহের মূল। যখন শ্লোকদ্বয়ে সংক্ষেপে পূর্ব্ব ও উত্তর পক্ষের যুক্তি প্রদত্ত হইয়াছে, তখন কাজেই সেই যুক্তিমূলক সন্দেহও উক্ত শ্লোকে রহিয়া গিয়াছে। আর, বিষয় না থাকিলে সপক্ষ ও বিপক্ষ কোন পক্ষেরই কোন যুক্তি বিনা অবলম্বনে দাঁড়াইতে পারে না। কাজেই উভয় পক্ষের যুক্তির উল্লেখ থাকাতেই যেমন সন্দেহের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়, সেই সঙ্গে বিষয়েরও অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। এইরূপে অধিকরণের তিনটী অবয়ব প্রদর্শিত হইল। এইবারে পূর্ব্বপক্ষের বা প্রতিকূল পক্ষের যুক্তি প্রথমে বলা যাইতেছে।

পূর্ব্বপক্ষ বলেন যে ব্রহ্মবিচার নিষ্প্রয়োজন। তাঁহার মূল যুক্তি হইতেছে যে ব্রহ্মবিষয়ে কোন সন্দেহই আসিতে পারে না। সন্দেহের বস্তুই না বিচারের বিষয় হয়? সন্দেহের অভাবে যখন বিষয়েরও অভাব হইল, তখন বৃথা বিচার করা একান্তই নিষ্ফল। সন্দেহ নাই কেন? পূর্ব্বপক্ষ বলেন যে দুইভাবে বিচারের ফলে সন্দেহ আসিতে পারে—(১) ব্রহ্মের স্বস্বরূপ অবলম্বনে বিচার এবং (২) আত্মস্বরূপ অবলম্বনে বিচার। পূর্ব্বপক্ষের মতে কোন বিচারেরই ফলে সন্দেহ আসিতে পারে না। প্রথমত, ব্রহ্মের স্বস্বরূপ অবলম্বনে বিচারের ফলে কোনই সন্দেহ আসিতে পারে না। কারণ, শ্রুতিই তো "সত্যংজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা ব্রহ্মের আকার বা স্বরূপ সুস্পষ্টরূপে নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন। ব্রহ্মের এই স্বরূপ পূর্ব্ব এবং উত্তর উভয় পক্ষই স্বীকার করিয়া লইতেছেন, কাজেই উভয় পক্ষের স্বীকৃত বিষয়ে সন্দেহও রহিল না এবং কাজেই সে বিষয়ে আর বিচারও চলিতে পারিল না। শ্রুতি উভয় পক্ষেরই অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকৃত।

পূর্ব্বপক্ষের দ্বিতীয় কথা এই যে, আত্মস্বরূপ অবলম্বনে বিচার করিলেও কোন সন্দেহ আসিতে পারে না; কারণ আমি আমার আত্মাকে খুব ভাল করিয়াই জানিতেছি এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ আত্মাকে বিশেষভাবেই জানিতেছে। এই অহংপ্রত্যয়ের দ্বারা যে আত্মাকে আমরা উভয়পক্ষই ভালরূপে জানি তাহার সম্বন্ধে কোন সন্দেহও থাকিতে পারে না। সন্দেহের অভাবে বিচারবিষয়েরও অভাব এবং কাজেই সে বিষয়ে বিচারও চলে না।

এই দ্বিতীয় যুক্তিসূত্রেই পূর্ব্বপক্ষ বিপক্ষের হইয়া আর একটী তর্ক উঠাইয়া নিজেই তাহার উত্তর দিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি বলেন যে, বিপক্ষ পক্ষ বলিতে পারেন যে আমি যে অহংপ্রত্যয়কে সত্য জ্ঞান বলিয়া মনে করিতেছি, সে জ্ঞান প্রকৃত সত্যজ্ঞান নহে, তাহা অধ্যস্ত বা আরোপিত আত্মজ্ঞান। অধ্যস্ত শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতেছে অধি+অস্+ত এবং সেই ব্যুৎপত্তিমূলক অর্থ হইতেছে অধিক্ষিত অর্থাৎ একটীর উপর আর একটী নিক্ষিপ্ত বা আরোপিত। এখন কথা হইতেছে যে কিসে কি আরোপিত? উত্তর হইতেছে—দেহে বা অন্তঃকরণে বা অনাত্ম অন্য কোন বস্তুতে আত্মজ্ঞান আরোপিত, অর্থাৎ আত্মার অতিরিক্ত দেহাদি বস্তুকে আত্মা বলিয়া জ্ঞান। ইহা হইতে অধ্যাসের অর্থ দাঁড়াইয়াছে মিথ্যা বা ভ্রান্তজ্ঞান। বিপক্ষ পক্ষ বলেন যে পূর্ব্বপক্ষের অহংপ্রত্যয়-নির্দ্দিষ্ট আত্মজ্ঞান অধ্যস্ত বা ভ্রান্ত জ্ঞান, অর্থাৎ অনাত্ম বস্তুকে তাঁহার আত্মা বলিয়া ভ্রম হইতেছে; সাধারণতঃ যখন মানুষ বলে যে আমি করিতেছি, আমি খাইতেছি, তখন সে প্রকৃত কর্ত্তা "আমি" বা আত্মাকে দেহাদি হইতে পৃথক করিয়া দেখিবার অবসরই পায় না,

দেহাদিকেই কর্ত্তা মনে করিয়া বলিয়া থাকে যে আমি করিতেছি ইত্যাদি এবং সেই কারণে সাধারণত মনুষ্যের অহংপ্রত্যয় হইতে আত্মাবিষয়ক ভ্রান্ত জ্ঞানেরই উৎপত্তি হয়। তদুত্তরে পূর্ব্বপক্ষ বলেন যে "আমি এপ্রকার মিথ্যাজ্ঞান স্বীকার করিতেই পারি না, কারণ তুমি এখন ঠিকই করিতে পার নাই যে কোন্ বস্তুতে কোন্ বস্তুর জ্ঞান অধ্যস্ত বা আরোপিত করিতেছ। তুমি বলিতেছ যে শুক্তিতে যেরূপ রজত-ভ্রম হয়, অনাত্মবস্তুতে সেইরূপ আত্মা বলিয়া ভ্রম হয়? কখনই নহে—শুক্তিতে রজত ভ্রম হওয়া সম্ভব, কারণ উভয়েরই মধ্যে চাকচিক্যবিষয়ক একটা সাদৃশ্য আছে; কিন্তু অনাত্মবস্তুতে আত্মা বলিয়া সেরূপ কোন ভ্রম হওয়া সম্ভবই নহে—উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ; অনাত্মবস্তুর ধর্ম্ম হইল তম বা অন্ধকার, আত্মার ধর্ম্ম হইল প্রকাশ; একটী হইল জড়, অপরটী হইল অজড় বা চেতন। এরূপ বিরুদ্ধস্বভাব দুইটী বস্তুর একটীতে অপরটীর জ্ঞান আরোপ করা, একটীকে অপরটী বলিয়া ভ্রম করা একেবারেই অসম্ভব। যখন এরূপ ভ্রম হওয়া অসম্ভব, তখন আমাদের অহংপ্রত্যয় আমাদিগকে আত্মা সম্বন্ধে যে জ্ঞান প্রদান করিতেছে, সে জ্ঞান্ নিশ্চয়ই সত্যজ্ঞান। কাজেই বলিতে হয় যে সেই অহংপ্রত্যয় যে আত্মাকে নির্দ্দেশ করিতেছে, সেই আত্মাকে আমরা সকলেই বিশেষরূপে জানিতেছি, এবং শ্রুতিবাক্য অনুসারে যদি সেই আত্মাই ব্রহ্ম হয়েন, তবে আত্মাকারেও আমরা ব্রহ্মকে স্পষ্টরূপেই জানিতেছি—তদ্বিষয়ে আমাদের কোন পক্ষেরই কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

এই প্রকারে শ্রুতিবাক্য অবলম্বনে ব্রহ্মাকারে অথবা অহংপ্রত্যয় অবলম্বনে আত্মাকারে, কোন আকারেই যখন ব্রহ্মের স্বরূপ বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না, তখন বিচারের বিষয়ও সেই সঙ্গে বিলুপ্ত হইল বলিতে হয়। পূর্ব্বপক্ষ আরও বলেন যে ব্রহ্মবিষয়ক এই বিচার করিয়া কোন লাভও নাই, কারণ বিচারের ফলে এই আত্মাকে ব্রহ্ম বলিয়া নিশ্চিত করিলেও তাহার ফলে মুক্তিলাভ হইয়াছে এমন তো কোথাও দেখা যায় না। পূর্ব্বপক্ষ উপরোক্ত যুক্তিসমূহ দেখাইয়া এই মীমাংসা করিতে চাহেন যে ব্রহ্মবিষয়ে বিচার করা এবং এতদ্বিষয়ক শাস্ত্রের সূত্রপাত করা কর্ত্তব্য নহে।

এইবারে উত্তরপক্ষ পূর্ব্বপক্ষের প্রদর্শিত যুক্তিসমূহ খণ্ডন করিয়া ব্রহ্মবিষয়ে বিচার করা এবং তদ্বিষয়ক শাস্ত্রও আরম্ভ করা যে উচিত তাহাই প্রদর্শন করিতেছেন। পূর্ব্বপক্ষের প্রথম কথা এই যে ব্রহ্মবস্তুতে সন্দেহের অভাবে বিচার-বিষয়েরও অভাব। উত্তরপক্ষ বলিতেছেন যে ব্রহ্মবস্তুতে সন্দেহের অভাব নাই—একদিকে শ্রুতি সত্যংজ্ঞানমনন্তং বলিয়া যে অসঙ্গ বা সম্বন্ধরহিত ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই অসঙ্গ ব্রহ্মকেই আবার শ্রুতি "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" এই বাক্যের দ্বারা আত্মারূপে নির্দ্দিষ্ট করিতেছেন; অপরদিকে তুমি (পূর্ব্বপক্ষ) আমিই মনুষ্য এইরূপ অহংবুদ্ধি অবলম্বনে দেহেতেই আত্মার অধ্যাস করিতেছ, অর্থাৎ দেহকেই ভ্রান্তজ্ঞানে আত্মা বলিয়া গ্রহণ করিতেছ। তুমি স্বীকার কর বা না-ই কর, আমার মতে তোমার এই ভ্রান্তজ্ঞান হইতেছে। এইখানেই শ্রুতিবাক্য এবং অহংপ্রত্যয়, এই উভয়ের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইবার কারণেই ব্রহ্মই আত্মা কিনা তদ্বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইল। কাজেই সন্দেহের সঙ্গে সঙ্গে বিচারের বিষয়ও আপনা হইতেই আসিতেছে।

পূর্ব্বপক্ষ ব্রহ্মের আত্মাকারে আলোচনাতেও সন্দেহের অভাবপক্ষে যুক্তি দেখাইবার কালে বলিয়াছেন যে তিনি অনাত্মবস্তুতে আত্মজ্ঞানের অধ্যাস সম্ভব মনেই করেন না। তদুত্তরে উত্তরপক্ষ বলেন যে পূর্ব্বপক্ষের যে ঠিকই অধ্যাস বা ভ্রান্তজ্ঞান হইতেছে, অধ্যাস সম্ভব মনে না করাই তাহার প্রমাণ। ভ্রমকে যদি ভ্রম বলিয়াই জ্ঞান হইল, তবে তো সেই ভ্রম দূর হইয়া সত্যজ্ঞান উপস্থিত হইল। রজ্জুকে যতক্ষণ সর্প বলিয়া মনে করিব ততক্ষণই তাহা অধ্যাস বা ভ্রান্তজ্ঞান। কিন্তু যেই সেই ভ্রমকে ভ্রম বলিয়া বুঝিতে পারিলাম, তখনই তো যাহা সত্য তাহাই অর্থাৎ রজ্জুকে রজ্জু বলিয়াই উপলব্ধি করিলাম। এই যুক্তিতে উত্তরপক্ষ বলিতেছেন যে পূর্ব্বপক্ষের স্বীয় ভ্রম বুঝিতে না পারাই তাঁহার ভ্রমের অস্তিত্বের পরিচয় দিতেছে। কাজেই, উত্তরপক্ষের মতে সন্দেহ যখন রহিয়াছে, তখন বিচারের বিষয়ও রহিল।

তারপর, পূর্ব্বপক্ষ যে বলিয়াছেন ব্রহ্মবিষয়ে বিচার করিয়াও কোন লাভ নাই, কারণ ব্রহ্মকে আত্মারূপে জানিতে পারিলেও যে মুক্তিলাভ হয় এমন কোন প্রমাণ দেখা যায় না। তদুত্তরে উত্তর-পক্ষ বলেন যে, যখন শ্রুতিতে দেখা যায় যে ব্রহ্মকে আত্মারূপে জানিলে মুক্তি হয় বলিয়া উল্লেখ আছে এবং আত্মজ্ঞানী মহাপুরুষেরা উক্ত প্রকার জ্ঞানের ফলে মুক্তি লাভ করিয়াছেন বলিয়া যখন প্রসিদ্ধি আছে, তখন পূর্ব্বপক্ষের একথা মানিতে পারা যায় না,—স্বীকার করিতে হয় যে ব্রহ্মকে আত্মা-রূপে মানিলে মুক্তিলাভ হয়।

উত্তরপক্ষ এইরূপে পূর্ব্বপক্ষের যুক্তিসকল খণ্ডন করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছেন যে বেদান্তবাক্য বা উপনিষদ্‌বাক্য অবলম্বনে ব্রহ্মবিষয়ে বিচার করা এবং বেদান্তশাস্ত্র আরম্ভ করা কর্ত্তব্য।

সংবাদ।

আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে বালী-গঞ্জ নিবাসী আমাদের পরম বন্ধু রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তি-ধারী শ্রীযুক্ত বাবু অমলকুমার রায় চৌধুরী এম-এ, গত ৪ঠা শ্রাবণ "নবদ্বীপ বঙ্গবিবুধজননী" সভা হইতে "বিদ্যা-ভূষণ" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

গার্হস্থ্য সংবাদ।

বিবাহ। বিগত ২৯শে ভাদ্র শুক্রবার শ্রীউমা-চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীমান্ নরেন্দ্রনাথের সহিত কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রসাদদাস গোস্বামী মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী নীহারিকা দেবীর বিবাহ আদিব্রাহ্ম-সমাজের পদ্ধতি অনুসারে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বিবাহক্ষেত্রে কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

উপনয়ন। শ্রীমান প্রেমরঞ্জন রায় চৌধুরী ও শ্রীমান্ নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপনয়ন আদিব্রাহ্ম-সমাজের পদ্ধতি অনুসারে বিগত ২৫শে ভাদ্র সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

শোক-সংবাদ।

৺কান্তিচন্দ্র মিত্র। বিগত ৪ঠা ভাদ্র ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রসিদ্ধ প্রচারক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র প্রায় ৭৭ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে নববিধান মণ্ডলী যেরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন, তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নহে। তিনি বিনয়ে ঔদার্য্যে চরিত্রের মাধুর্য্যে নিষ্ঠায় এবং সেবাধর্ম্মে জনসাধারণের অনুরাগ ও শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। মঙ্গলময় বিধাতা তাঁহার চির শান্তিময় ক্রোড়ে তাঁহার পরলোকগত আত্মাকে স্থান দিন ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

৺ব্রতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আমরা শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে আমাদের প্রিয়তম বন্ধু শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ ব্রতীন্দ্র নাথ পরিবারবর্গকে শোকে ভাসাইয়া গত ১৪ই সেপ্টেম্বর ২৫শে ভাদ্র বেলা ৯টা ৪০ মিনিটে টাইফয়েড রোগে অকালে ইহধাম পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। ব্রতীন্দ্রনাথ সবেমাত্র ১২ বৎসরে পদার্পণ করিলেও অত্যন্ত ব্রহ্মনিষ্ঠ ছিল। রোগে ৪০ দিন ভুগিয়াছিল, কিন্তু একটী দিনও স্ব-ইচ্ছায় ঈশ্বরকে প্রণাম করিতে ভুলে নাই। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বেও কম্পিত হস্তে ঈশ্বরকে প্রণাম করিয়া গিয়াছে। এরূপ ব্রহ্মপরায়ণ বালক আমরা অল্পই দেখিয়াছি। এই উপলক্ষে তাঁহার শোকার্ত্ত পিতা যে একটী গান রচনা করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

৺ব্রতীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে।

(রামপ্রসাদী সুরে)

(ওমা) এমন ছেলে তুই কেন আমায় দিলি।
(তার) মনটা ছিল সোনায় গড়া,তোর পরেতে প্রাণটা পড়া
(সে) তোরি নামেতে ছিল ডুবে কেন তারে হরে নিলি।
কে তো'য় বলেছিল দিতে, (তার)ভোগ না হতে হরে নিতে
(এমন) রাক্ষস বিধান তোর যদি হয়,
ভেবেই পাইনে কি যে বলি।
ফুটতে সে না ফুটতে ফুল, চললি নিয়ে ভবের ওকুল,
(তার) সুগন্ধেতে আকুল চিতে রইনু পড়ে মুগ্ধ অলি।
(কবে) ঠুলি দিলি তুই চোখের পরে,
তুলো দিলি তুই দুকান ভরে,
(তোরে) দয়াময়ী জানতুম আগে করালী মা কবে হলি।
কষ্ট তার দেখে শুনে মানুষের প্রাণ যেত ভেঙ্গে
লাগত না কি তোর মনে তা' কবে এত নিঠুর হলি।
(আহা) কত কষ্ট সে পেয়েছিল হাড় কখানা রেখে গেল
(তার) আত্মাপাখী বিমান রথে আরাম করে গেল চড়ি।
দিয়ে নিতে নাইক যদি, মানুষের বেলায় হয় এ বিধি,
(তবে তুই) কোন্ বিধানে দিয়ে নিলি
বুঝতে আমায় নাহি দিলি।
(তারে) যতদিন ফিরে পাব নাকো,
(তোর) শিষ্ট ছেলে হব নাকো,
(দেখবি) আমিও মরব ঘুরে ফিরে,
(তুই) আমার পাছে মরবি ফিরি॥

শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়।

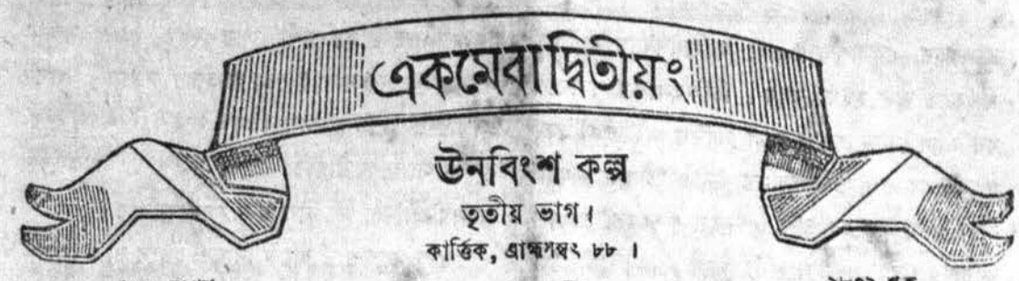

ঊনবিংশ কল্প
তৃতীয় ভাগ।
কার্ত্তিক, ব্রাহ্মসম্বৎ ৮৮।

৮৯১ সংখ্যা ১৮৩৯ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞাননন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্। সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"

মা।

(প্রসাদী পদচ্ছায়া)

(রামপ্রসাদী সুরে)

(ওমা) মা বলে তুই ডাকতে দে মা ॥
মায়ের মত তুই মা আমার,
বুঝবে কে তুই কি-মা আমার,
(ওমা) মা মা বলে প্রাণের ভিতর
রাখব ধরে তোরে ওমা।
কতদিন তোরে ছেড়ে ছিনু,
কাঁটার ঘায়ে ফিরে এনু,
(ওমা) হারা ছেলে পেয়ে ফিরে
কোলে করে তুলে নে মা।
(আর) যাব নাকো তোরে ছেড়ে,
চরণ র'ব বুকে ধরে,
(এবার তোর) দুষ্টু ছেলে ভাগতে গেলে
কানটী মলে ফেরাস ওমা।
অপরাধ করেছি ঢের,
ক্ষমা তো মা চেয়েছি ফের,
(তবে) কেমন করে না নিয়ে কোলে
চুপ করে বসে ওমা।
(তোর) দুষ্টু ছেলে শিষ্ট হোল,
বুকের পরে ঝাঁপিয়ে এল,
(এবার) জড়িয়ে বুকে না নিলে তাকে
মাথা কুটে মরবে সে মা ॥

মাতাকে স্মরণ কর।

আজ এই পবিত্র সময়ে এসো আমরা সমাহিত হইয়া আমাদের করুণাময়ী মাতার নাম স্মরণ করি। বর্ষার মেঘান্ধকার কাটিয়া গিয়াছে, শরতের প্রসন্ন গগন আমাদের মাতার প্রসন্ন মূর্ত্তি দিনে নিশীথে আমাদের সম্মুখে ধারণ করিতেছে। এসো আমরা প্রাণ খুলিয়া তাঁহারই নাম কীর্ত্তন করিতে থাকি। আমাদের পূর্ব্বে ভারতের কত শত সাধক জগন্মাতাকে প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইয়া গিয়াছেন এবং হৃদয়ের ভাব হৃদয়ে চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া সেই ইষ্টদেবতার নাম জীবন্ত মন্ত্রে জনসাধারণকে শুনাইয়া এই ভারতভূমিকে পুণ্যময় করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের পবিত্র দৃষ্টান্ত সম্মুখে পাইয়া আমরাও কি প্রাণ খুলিয়া আমাদের মাতা জগতের মাতাকে ডাকিতে পারিব না? তাহাই যদি না পারি, তবে সুখের কথা বলিয়াই বা লাভ কি, আর দুঃখের কথা আলোচনা করিয়াই বা লাভ কি? সেই করুণাময়ী মাতাকে হৃদয়ে উপলব্ধি করিলে সত্যই অনুভব করিব যে সুখ যাহা কিছু তাহাও যেমন মাতার দান, তেমনি দুঃখ কষ্ট যাহা পাই, তাহাও আমাদের মঙ্গলের জন্য ঔষধস্বরূপে তিনিই প্রেরণ করেন। মাতাকে হৃদয়ে অনুভব করিলে সত্যই যে এই জ্ঞান উপস্থিত হয় তাহা আজ অল্প কয়েক দিন হইল আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আমি দ্বাদশবর্ষীয় একটী

বালকের রোগশয্যায় এবং অন্তিমশয্যায় উপস্থিত থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। চিকিৎসকের পরামর্শে যখনি সে কোন একটী ভাল জিনিস খাইতে পাইত, তখনই সে প্রাণ ভরিয়া বলিয়া উঠিত "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ" এবং ঈশ্বরের প্রতি এইরূপে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার পর সেই আহার্য্য মুখে গ্রহণ করিত। আবার যখন রোগযন্ত্রণায় বড়ই কাতর হইত, তখন তেমনই বলের সহিত বলিত যে এই রোগ, এই যন্ত্রণা, এ সকলই ঈশ্বর মঙ্গলের জন্যই দিয়াছেন। সেই বালক হইতে আমি প্রত্যক্ষ শিক্ষা লাভ করিয়াছি যে দেহ হইতে আত্মা কিরূপ সম্পূর্ণ পৃথক এবং শত সুখের মধ্যে সহস্র বিপদের মধ্যেও সেই বিশ্বপিতা অখিলমাতাকে ভুলিতে নাই।

বিপদ আপদের মধ্যে, দুঃখ কষ্টের মধ্যে, তাঁহাকে ভুলিবার অবসরই কোথায়? আমাদের মতে, সংসারের দৃষ্টিতে বিপদের শেষ সীমা মৃত্যু। কিন্তু একবার নিজ নিজ অন্তরে স্থির দৃষ্টি রাখিয়া দেখিবার চেষ্টা কর—দেখিবে যে মঙ্গলময়ের রাজ্যে মৃত্যু বলিয়া সত্যই কিছুই নাই। এখানেও যেমন তাঁর রাজ্য, পরলোকও কি তেমনই তাঁর রাজ্য নহে? অনন্ত গ্রহ তারা অনন্ত সূর্য্য চন্দ্র, অনন্ত লোক লোকান্তর সকলই তো তাঁরই নিয়মে চলিতেছে। তুমি বলিতেছ যে তোমার আত্মীয়স্বজনের মৃত্যু ঘটিয়াছে, কিন্তু মৃত্যু কোথায়? তোমার সেই আত্মীয়স্বজন তো মঙ্গলময়েরই রাজ্যে বাস করিতেছে? তিনি তো তাহার ইহলোকের অনুপযুক্ত দেহ হইতে আত্মাকে পৃথক করিয়া যথোপযুক্ত অন্য লোকে লইয়া গিয়া আশ্রয় প্রদান করিলেন। তাঁহারই চরণে আত্মসমর্পণ কর—দেখিবে সহস্র রোগশোক সহস্র মৃত্যু তোমাকে বিভীষিকা দেখাইতে পারিবে না।

যেমন বিপদ আপদেও মাতার করুণাহস্ত দেখিবার চেষ্টা করিবে, সেইরূপ সুখ সম্পদেরও মধ্যে তাঁহাকে ভুলিবে না। তিনিই যখন সকলই নিয়মিত করিতেছেন, তখন তোমার যাহা কিছু সুখসম্পদ তাহাও তো তাঁহারই মঙ্গলনিয়মে তোমার সম্মুখে উপস্থিত হইতেছে। তখন ইহা কি আর বলিয়া দিতে হইবে যে সুখসম্পদ সকলই তাঁহারই দান? সেই দানের জন্য আমাদের কিসের গর্ব্ব? আমার এত টাকা বেশী আয় হইল, এত সম্মান লাভ হইল, এ সমস্তই তো তাঁহারই কৃপায়; ইহাতে আমাদের গর্ব্ব করিবার কিছুই নাই। এরূপ সুখসম্পদ লাভকে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অবসর জানিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিবে।

এক মুহূর্ত্তও তাঁহাকে বিস্মৃত হইবে না। প্রভাতের প্রাতঃসমীরণের সঙ্গে যখন তাঁহার মঙ্গল নিশ্বাস তোমাকে জাগ্রত করিয়া তুলিবে, তখনও সেই বিশ্বপিতাকে যেমন ভক্তিভরে প্রণাম করিবে, আবার সন্ধ্যা যখন নীরব পদক্ষেপে তোমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া স্বীয় শান্তভাবের প্রভাব তোমার উপর বিস্তৃত করিয়া শান্তিময় রাজ্যে তোমার চিত্তকে উপনীত করিবে, তখনও তেমনি তুমি সেই অখিলমাতা পরমেশ্বরকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া আপনাকে কৃতার্থ করিবে। জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্ত, প্রত্যেক নিশ্বাসকে তাঁহার সংস্পর্শে পবিত্র করিয়া তুলিবে। তোমার শোক দুঃখ সমুদয় তো চলিয়া যাইবেই; তাহার উপর পরলোকের অনন্তরাজ্য, পরলোকের গভীর তত্ত্বসমূহ তোমার নয়নের সম্মুখে এই বিস্তৃত আকাশের ন্যায় উন্মুক্ত হইয়া যাইবে।

এসো আমরা সকলে সমাহিত হইয়া আমাদের অন্নদাতা, সুখদাতা, মঙ্গলবিধাতা পরমেশ্বরকে প্রাণ ভরিয়া ডাকি এবং আমাদের তপ্ত হৃদয়কে শীতল করি।

ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের প্রকাশ।

ঋগ্বেদ অনুবাদের ফলে ব্রাহ্মগণ দেখিলেন যে সাধারণত হিন্দুসমাজ সমগ্র বেদকে যেভাবে আপনাদের অপৌরুষের ধর্ম্মভিত্তি বলিয়া গ্রহণ করেন, সেভাবে তাঁহারা গ্রহণ করিতে পারেন না। বেদে ঈশ্বরের উপাসনার সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রাকৃতিক শক্তিরও উপাসনার বিষয় সন্নিবিষ্ট আছে। উপনিষৎ আলোচনা করিয়াও দেখা গেল যে তাহাও সমগ্রভাবে ব্রাহ্মগণ গ্রহণ করিতে অক্ষম। উপনিষদ্ সমূহের অনেকগুলিই অদ্বৈতবাদ পূর্ণ, অথচ দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ব্রাহ্মমণ্ডলী অদ্বৈতবাদ সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়া উপাস্য-উপাসক সম্বন্ধমূলক পূর্ণ দ্বৈতবাদ অবলম্বন করিয়াছিলেন। এবিষয়ে দেবেন্দ্রনাথ

বলেন—"ঈশ্বরের সঙ্গে উপাস্য-উপাসক সম্বন্ধ, এইটী ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাণ। যখন শঙ্করাচার্য্যের শারীরক মীমাংসা বেদান্তদর্শনে ইহার বিপরীত সিদ্ধান্ত দেখিলাম, তখন আর তাহাতে আমাদের আস্থা রহিল না। আমাদের ধর্ম্ম পোষণের জন্য তাহা গ্রহণ করিতে পারিলাম না। মনে করিয়াছিলাম যে, বেদান্তদর্শনকে ছাড়িয়া কেবল একাদশ উপনিষৎকে গ্রহণ করিলে ব্রাহ্মধর্ম্মের পোষকতা পাইব, এই জন্য সকল পরিত্যাগ করিয়া কেবল সেই সমস্ত উপনিষদের উপরেই একান্ত নির্ভর করিয়াছিলাম। কিন্তু যখন দেখিলাম "সোঽহমস্মি," তিনিই আমি, "তত্ত্বমসি" তিনিই তুমি, তখন আবার সেই উপনিষদের উপরেও নিরাশ হইয়া পড়িলাম।" যখন ব্রাহ্মগণ সমগ্র বেদ উপনিষদকেই ধর্ম্মভিত্তিরূপে গ্রহণ করিতে পারিলেন না, তখন যে তাঁহারা তন্ত্র পুরাণাদি শাস্ত্রকেও সমগ্রভাবে ধর্ম্মভিত্তি বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই তাহা বলা বাহুল্য।

এইরূপে একসময়ে ব্রাহ্মেরা বলিতে গেলে সর্ব্বশাস্ত্রত্যাগী হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই সময়েই হিন্দুসমাজের প্রকৃত বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। বিপ্লবের সময় প্রত্যেকেই আপনাপন ইচ্ছামত কর্ম্ম করিতেই প্রবৃত্ত হয় ও ভালবাসে। ব্রাহ্মগণও এই সময়ে সকল শাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নিজ নিজ ইচ্ছামত চলিতে চাহিয়াছিলেন। এবিষয়ে "একাত্মপ্রত্যয়সারং" শাস্ত্রের এই বাক্যটী তাঁহাদের বড়ই সহায় হইয়াছিল। তাঁহারা আত্মপ্রত্যয় অর্থে নিজের মনগড়া ধর্ম্মকেই ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। বিশুদ্ধ হৃদয়ের প্রতীতিমূলক আত্মপ্রত্যয়কে বুঝিয়া তাহাকে ধর্ম্মভিত্তি ও জীবনের নিয়ামক করিলাম, একথা বলা যত সহজ, তাহা কার্য্যে পরিণত করা তত সহজ নহে। আর, তাহার উপর, একটী তত্ত্বমাত্র, তাহা যতই সত্য হউক না, অবলম্বনে সাধারণ মানবের পক্ষে নিজ নিজ জীবনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা অসম্ভব না হইলেও অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। তাহারা সেই তত্ত্বের এমন একটী প্রত্যক্ষ আকার দেখিতে চায়, যাহা অবলম্বনে নিশ্চিন্তমনে সংসারযাত্রা সুনির্ব্বাহ করা যাইতে পারে। ফরাসি বিপ্লবেই আমরা এই সত্যের সুস্পষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হই। সেই বিপ্লবের সময়ে সকলেই নিজ নিজ মনগড়া ভাবকেই সত্য বলিয়া মনে করিত। প্রত্যেকেই ভাবিত যে তাহার অভিপ্রায়-মত দেশ শাসিত হইলেই দেশে শান্তি সংস্থাপিত হইবে। কিন্তু ফলে ফ্রান্সে আর কিছুতেই শান্তি স্থাপিত হইতে পারিতেছিল না। অবশেষে মহাপুরুষ নেপোলিয়ন ন্যায়, ধর্ম্ম প্রভৃতিকে প্রত্যক্ষ আকার দিয়া ফরাসিজাতিকে একটী আইন সংগ্রহ (Code Napoleon) প্রদান করিলেন ; সেই অবধি বলিতে গেলে ফ্রান্সে শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার সময় আসিল। ব্রাহ্মসমাজেও যখন ব্রাহ্মসংখ্যা দিন দিন বাড়িতে লাগিল, অথচ ব্রাহ্মসমাজ হইতে পুরাতনের প্রতি শ্রদ্ধা, শাস্ত্রের প্রতি ভক্তি চলিয়া গিয়াছিল, তখন আত্মপ্রত্যয়রূপ গভীর তত্ত্বের নামমাত্র তাঁহাদের প্রাণের অভাব কতদিন পূর্ণ করিতে পারে ? এই তত্ত্বকে প্রত্যক্ষ আকারে দেখিবার আকাঙ্ক্ষা ব্রাহ্মদিগের মধ্যে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল ; আত্মপ্রত্যয়কে প্রত্যক্ষভাবে জীবনের নিয়ামক ও ধর্ম্মভিত্তি করিবার উপায় সম্বন্ধে একটী তীব্র অভাব অনুভূত হইতেছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথই ব্রাহ্মদিগের আত্মপ্রত্যয়তত্ত্বকে প্রত্যক্ষ আকার দিয়া ব্রাহ্মদিগের সেই তীব্র অভাব দূরীকরণে সমর্থ হইয়াছিলেন। যে সকল উপায় দ্বারা তিনি এই অভাব দূর করিতে পারিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মবীজ সর্ব্বপ্রথম এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ সর্ব্বপ্রধান।

ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের ন্যায় অসাম্প্রদায়িক উদারমন্ত্র একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পর তাহার ছিদ্র অন্বেষণ করা বা সমালোচনা করা সহজ,এবং তাহার পরে তদনুকরণে আরও ভাল করিয়া নূতন নূতন গ্রন্থ প্রকাশ করাও সহজ, কিন্তু আত্মপ্রত্যয়ের পরিপোষক স্বরূপে এরূপ একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিবার কল্পনা নিজ মস্তিষ্কে সর্ব্বপ্রথম আনয়ন করা এবং সেই কল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করা যে এক অসাধারণ প্রতিভাবান ও ভগবন্নিষ্ঠ মহাপুরুষের কার্য্য সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। রাজা রামমোহন রায় তাঁহার "Precepts of Jesus" গ্রন্থ সংকলিত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহা প্রত্যক্ষভাবে আত্মপ্রত্যয়ের পরিপোষকরূপে রচিত হয় নাই, এবং তাহা অনেকটা একপেশে হইয়াছিল বলিতে পারি—জীবনের সমগ্রটা তাহার অন্তর্ভুক্ত হইতে

পারে কিনা সন্দেহ। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ, একদিকে প্রত্যক্ষভাবেই আত্মপ্রত্যয়ের পরিপোষকরূপে, অপরদিকে যাহাতে সমগ্র জীবন ইহা অবলম্বনে সুপরিচালিত হইতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই সংগ্রথিত হইয়াছিল। এই কারণে ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ প্রকাশ কেবল ব্রাহ্মসমাজের নহে, বর্ত্তমান যুগে সমগ্র ভারতের এবং সমগ্র জগতের পক্ষে এক অভাবনীয় ঘটনা। প্রত্যেক জাতির ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে যে আত্মপ্রত্যয়-পোষক এবং সমগ্র জীবনের নিয়ামক মন্ত্রতন্ত্র সংকলিত হইতে পারে, ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থকেই তদ্বিষয়ে সর্ব্বপ্রথম পথপ্রদর্শক বলা যাইতে পারে।

আত্মপ্রত্যয়পোষক অসাম্প্রদায়িক একখানি ধর্ম্মগ্রন্থ রচনা বিষয়ে সে সময়ে দেবেন্দ্রনাথের ন্যায় আর কোন ভারতবাসীর ক্ষমতা বা অধিকার বেশী ছিল বলিয়া আমাদের জানা নাই। এরূপ একখানি গ্রন্থ রচনার জন্য যে অন্তর্দৃষ্টি থাকা আবশ্যক, পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য দর্শন ও বিজ্ঞানশাস্ত্রে যে পাণ্ডিত্য থাকা আবশ্যক এবং সর্ব্বশেষে স্বদেশবাসীর সহিত, স্বদেশের প্রাচীন ইতিহাস ও ধারার সহিত যে গভীর সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা থাকা আবশ্যক, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথে সে সকলই যথাযুক্ত পরিমাণে ছিল বলিয়াই ভগবান ঐরূপ গ্রন্থ রচনার জন্য তাঁহাকেই নিজের যন্ত্র করিয়া লইয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মবীজ প্রতিষ্ঠিত করিয়া আত্মপ্রত্যয়কে প্রত্যক্ষ আকার দিবার একটী কাঠামো দাঁড় করাইয়াছিলেন, এখন সেই কাঠামোর উপর তদনুকূল মন্ত্রসাহায্যে একটী সুন্দর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করা তাঁহার পক্ষে বিশেষ কষ্টকর হইল না। তিনি অক্ষয়কুমার দত্তকে কাগজ কলম লইয়া বসিতে বলিলেন এবং সেই আত্মপ্রত্যয়মূলক ব্রাহ্মধর্ম্মবীজকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া হৃদগত উপনিষৎসমূহ হইতে আত্মপ্রত্যয়সমর্থক যে সকল মন্ত্র মনে সহজে উদিত হইতে লাগিল তাহাই বলিয়া যাইতে লাগিলেন এবং অক্ষয়বাবু সেইগুলি লিখিয়া লইতে লাগিলেন। এইরূপে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রস্তুত হইল। ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থের মন্ত্রভাগ বা উপনিষৎখণ্ড। সর্ব্বপ্রথম এই উপনিষৎখণ্ডই ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। এইখণ্ড সংকলন বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথের নিজের উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"এখন (ব্রাহ্মধর্ম্মবীজ বাক্সের মধ্যে রাখিবার পর) আমি ভাবিতে লাগিলাম, ব্রাহ্মদিগের জন্য একটা ধর্ম্মগ্রন্থ চাই। তখনই আমি অক্ষয়কুমার দত্তকে বলিলাম যে, তুমি কাগজ কলম লইয়া ব'সো এবং আমি যাহা বলি লিখিতে থাক। এখন আমি একাগ্রচিত্ত হইয়া ঈশ্বরের দিকে হৃদয় পাতিয়া দিলাম। তাঁহার প্রসাদে আধ্যাত্মিক আমার হৃদয়ে যাহা উদ্ভাসিত হইতে লাগিল, আমি তাহা উপনিষদের মুখে নদীর স্রোতের ন্যায় সহজে সতেজে বলিতে লাগিলাম এবং অক্ষয়কুমার তাহা তখনি লিখিয়া যাইতে লাগিলেন। আমি সতেজে বলিলাম "ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি" ব্রহ্মবাদীরা বলেন। ব্রহ্মবাদীরা কি বলেন? "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্‌ব্রহ্ম।" যাঁহা হইতে এই শক্তি বিশিষ্ট বস্তুসকলের সহিত প্রাণীজঙ্গম জীবজন্তু উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যাঁহা দ্বারা জীবিত রহে এবং প্রলয়কালে যাঁহার প্রতি গমন করে ও যাঁহাতে প্রবেশ করে তাঁহাকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা কর, তিনি ব্রহ্ম। তাহার পর আমার হৃদয়ে এই সত্য আবির্ভূত হইল যে ঈশ্বর আনন্দ স্বরূপ। আমি অমনি বলিলাম "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।" আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে এই ভূত সকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম কর্ত্তৃক জীবিত রহে এবং প্রলয়কালে আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্মের প্রতি গমন করে ও তাঁহাতে প্রবেশ করে। আমি দেখিলাম যে পূর্ব্বে কেবল এক অজ আত্মা পরব্রহ্মই ছিলেন, আর কিছুই ছিল না। অমনি বলিলাম "ইদং বা অগ্রে নৈব কিঞ্চিদাসীৎ। সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং। সবা এষ মহানজ আত্মাঽজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়ঃ।" এই জগৎ পূর্ব্বে কিছুই ছিল না। এই জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে হে প্রিয় শিষ্য! কেবল অদ্বিতীয় সৎস্বরূপ পরব্রহ্ম ছিলেন। তিনিই এই জন্মবিহীন মহান্ আত্মা। তিনি অজর, অমর, নিত্য ও অভয়। আমি দেখিলাম যে তিনি দেশ, কাল, কার্য্যকারণ, পাপপুণ্য কর্ম্মের ফল সকলি আলোচনা করিয়া এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। "স তপোঽ-

তপ্যত স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত যদিদংকিঞ্চ।" তিনি বিশ্বসৃজনের বিষয় আলোচনা করিলেন, তিনি আলোচনা করিয়া এই সমুদয় যাহা কিছু সৃষ্টি করিলেন। "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্জ্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী॥" ইহাঁ হইতে প্রাণ, মন ও সমুদায় ইন্দ্রিয় এবং আকাশ বায়ু, জ্যোতি, জল ও সকলের আধার এই পৃথিবী উৎপন্ন হয়। আমি দেখিলাম তাঁহারি অনুশাসনে সকলি শাসিত হইয়া চলিতেছে। বলিলাম—"ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥" ইহাঁর ভয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে, ইহাঁর ভয়ে মেঘ, বায়ু ও মৃত্যু সঞ্চরণ করিতেছে। এই প্রকারে আমার হৃদয়ে যেমন যেমন উপনিষৎ-সত্যের আবির্ভাব হইতে লাগিল, তেমনি পরপর বলিতে লাগিলাম। সর্ব্বশেষে এই বলিয়া উপসংহার করিলাম—"যশ্চায়মস্মিন্নাকাশে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ। যশ্চায়মস্মিন্নাত্মনি তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ। তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥" এই অসীম আকাশে যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ, যিনি সকলি জানিতেছেন, এই আত্মাতে যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ, যিনি সকলি জানিতেছেন, সাধক তাঁহাকেই জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করেন। তদ্ভিন্ন মুক্তিপ্রাপ্তির আর অন্য পথ নাই। এই প্রকারে আমি উপনিষদের মুখে, ঈশ্বরের প্রসাদে ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তিভূমি আমার হৃদয় হইতে বাহির করিলাম। তিন ঘণ্টার মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ হইয়া গেল।" * * * "লেখা হইয়া গেলে তাহা আমি ষোড়শ অধ্যায়ে বিভাগ করিলাম।* প্রথম অধ্যায়ের নাম আনন্দ অধ্যায় হইল। এইরূপে ব্রহ্মবিষয়ক উপনিষৎ—ব্রাহ্মী উপনিষৎ প্রস্তুত হইল। এইজন্য ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম খণ্ডের শেষে লেখা আছে—"উক্তা তউপনিষৎ ব্রাহ্মীং বাব তউপনিষদমব্রূমেত্যুপনিষৎ।" তোমার নিকট উপনিষৎ উক্ত হইল, ব্রহ্মবিষয়ক উপনিষদই তোমাকে বলিয়াছি। ইহাই উপনিষৎ, ইহাই উপনিষৎ।"

* ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ প্রথম প্রচারিত হইবার অনেক পরে দেবেন্দ্রনাথ সুইজরলণ্ড পর্ব্বত বিচরণ কালে "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততং" উপনিষদের এই মন্ত্রটী ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থের ষোড়শ অধ্যায়ে সন্নিবেশিত করিয়া দিয়াছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথের উপরি-উদ্ধৃত উক্তি হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ যে কি প্রণালীতে প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা সুস্পষ্টরূপে বুঝা যাইতেছে। আমরা যেমন একটী একটী করিয়া বাছাই করিয়া কোন সংকলন-গ্রন্থ রচনা করি, দেবেন্দ্রনাথ সে প্রকারে ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ রচনা করেন নাই। তাঁহার হৃদয়ে আত্মপ্রত্যয়-পোষক যে সকল সত্য মন্ত্রসকল সহজে সদ্য সদ্য উদিত হইতেছিল, তাহাই তিনি মুখে বলিয়া গিয়াছিলেন। এ অবস্থায় ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থকে আত্মপ্রত্যয়-পোষক একখানি নাভিগ্রন্থ (nucleus) বলিতে পারি, কিন্তু একথা বলিতে পারি না যে অন্যান্য শাস্ত্র ছাড়িয়া দিয়া, উপনিষৎ হইতেও আত্মপ্রত্যয়-পোষক সকল মন্ত্রই ইহাতে উদ্ধৃত হইয়াছে। সেভাবে মন্ত্র বাছাই করিয়া গ্রন্থ প্রস্তুত করিলে হয়তো তাহা একখানি সুন্দর কোষগ্রন্থ স্বরূপে গৃহীত হইত, কিন্তু তাহা জীবনের নিয়ামক ও নিত্যব্যবহার্য্য গ্রন্থ বলিয়া স্বীকৃত হইত কিনা সন্দেহ। ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ রচনার প্রণালীর কারণেই তাহা মন্ত্রসম্বন্ধীয় কোষগ্রন্থহিসাবে অসম্পূর্ণ থাকিয়া গিয়াছে তাহা বলা বাহুল্য। আমরা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহিত এবিষয়ে অনেকবার আলাপ করিয়া দেখিয়াছি যে তিনি কখনও ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থকে আত্মপ্রত্যয়পোষক একমাত্র অদ্বিতীয় এবং শেষগ্রন্থ বলিয়া মনে করিতেন না—তিনিও ইহাকে একখানি আত্মপ্রত্যয়পোষক অন্যতর আদর্শ গ্রন্থ বলিয়াই মনে করিতেন। বেদকে যে দৃষ্টিতে দেখিয়া সাধারণত অপৌরুষেয় বলা হয়, মহর্ষিই বল, অথবা অন্য যে কোন ব্রাহ্ম বল, ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থকে কাহারও কখনও সেভাবে অপৌরুষেয় দাঁড় করাইবার ইচ্ছা জাগ্রত হয় নাই। ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থের প্রথম খণ্ডকে ব্রাহ্মী উপনিষৎ বলা হইয়াছে। তাহার কারণ দেবেন্দ্রনাথ নিজেই বলিয়া দিয়াছেন—উপনিষৎ হইতে সকল মন্ত্রই গৃহীত এবং সকল মন্ত্রগুলিই ব্রহ্মনির্দ্দেশক বলিয়াই উহাকে ব্রাহ্মী উপনিষৎ বলা হইয়াছে। ১৭৭০ শকে ব্রাহ্মধর্ম্মের উপনিষৎ খণ্ড গ্রন্থে আবদ্ধ হইয়াছিল। তাহার পর অনেক বৎসর ধরিয়া তাহার তাৎপর্য্য লেখা ও তাহার সংশোধন কার্য্য চলিয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথের এই একটী গুণ ছিল যে তাঁহার হস্ত দিয়া যে সকল

লেখা যাইত বা তাঁহাকে যাহা কিছু শোনানো হইত, তাহা তিনি সংশোধনের পর সংশোধনের দ্বারা নিখুঁত না করিয়া ছাড়িতেন না। জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাতে এই গুণ ছিল, আমরা অনেকবার তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি। ব্রাহ্মধর্ম্মের তাৎপর্য্যগুলি যে তাঁহার হস্তে কিপ্রকার আমূল সংশোধন লাভ করিয়াছিল, তাহা আমরা প্রথম সংস্করণের একখণ্ড ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থের প্রথম খণ্ডের প্রথম তিনটী মন্ত্রের * মূল তাৎপর্য্য ৺অক্ষয়কুমার দত্ত কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছিল বলিয়া আমরা শুনিয়াছি। অবশিষ্ট অংশের তাৎপর্য্য রাজনারায়ণ বসু, অক্ষয়কুমার দত্ত এবং দেবেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে। যখন দেখি যে তেরো বৎসর বাদে ১৭৮৩ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের তাৎপর্য্য তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, তখনই কতকটা বুঝিতে পারি যে কত সাবধানতার সহিত তাৎপর্য্যগুলি লিখিত ও সংশোধিত হইয়াছিল।

উপনিষৎখণ্ড গ্রন্থাবদ্ধ হইবার পর একদিকে তাৎপর্য্য লেখা চলিতে লাগিল, অপরদিকে ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থের দ্বিতীয়খণ্ড সংকলিত হইতে লাগিল। দ্বিতীয়খণ্ড অনুশাসন খণ্ড। উপনিষৎ খণ্ডের ন্যায় এখণ্ড একদিনেই সংকলিত হয় নাই। ইহা সংকলিত হইতে প্রায় দুই বৎসর সময় লাগিয়াছিল। উপনিষৎ খণ্ড হইতে ব্রাহ্মগণ আত্মপ্রত্যয়মূলক ধর্ম্মতত্ত্ব সকল লাভ করিলেন বটে, কিন্তু সেই সকল ধর্ম্মতত্ত্বের অনুযায়ী সুনীতির পথে নিজ নিজ পরিবারের সন্তানবর্গকে চালাইবার পথপ্রদর্শন করিতে পারে এরূপ একখানি নীতিগ্রন্থেরও অভাব অনুভূত হইয়াছিল। ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থের এই অনুশাসনখণ্ড সেই অভাব পূর্ণ করিল।

এই দ্বিতীয়খণ্ড সংকলন সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথ বলেন—"ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য যে, হৃদয় ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে বিশুদ্ধ না হইলে ব্রহ্মোপাসনার কেহ অধিকারী হইতে পারে না। সেই ধর্ম্ম কি? ধর্ম্মনীতি কি? ইহা ব্রাহ্মদিগের জানা নিতান্ত আবশ্যক এবং সেই ধর্ম্মনীতি অনুসারে চরিত্রগঠন করা তাঁহাদের নিত্য কর্ম্ম। অতএব ব্রাহ্মদের জন্য ধর্ম্মের অনুশাসন ও উপদেশের প্রয়োজন। যেমন ব্রহ্মবিষয়ক উপনিষৎ পড়িয়া ব্রহ্মকে জানিবে, তেমনি ধর্ম্মের অনুশাসন দ্বারা অনুশাসিত হইয়া হৃদয়কে বিশুদ্ধ করিবে। ব্রাহ্মধর্ম্মের এই দুই অঙ্গ—একটী উপনিষৎ, দ্বিতীয়টী অনুশাসন। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথমখণ্ডের উপনিষৎ তো সমাপ্ত হইল। এখন দ্বিতীয় খণ্ডের অনুশাসনের জন্য অন্বেষণ পড়িয়া গেল। মহাভারত, গীতা, মনুস্মৃতি প্রভৃতি পড়িতে লাগিলাম এবং তাহা হইতে শ্লোক সকল সংগ্রহ করিয়া অনুশাসনের অঙ্গ পুষ্ট করিতে লাগিলাম। ইহাতে মনুস্মৃতি আমাকে বড়ই সাহায্য করিয়াছে। ইহাতে অন্যান্য স্মৃতিরও শ্লোক আছে, তন্ত্রেরও শ্লোক আছে, মহাভারতের এবং গীতারও শ্লোক আছে। এই অনুশাসন লিপিবদ্ধ করিতে আমার বিস্তর পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। প্রথমে ইহাকে সপ্তদশ অধ্যায়ে বিভাগ করিয়াছিলাম, পরে এক অধ্যায় ত্যাগ করিয়া ইহাকেও ষোড়শ অধ্যায়ে বিভাগ করিলাম। ইহার প্রথম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে এই উপদেশ আছে যে, গৃহস্থের তাবৎ কর্ম্মে ব্রহ্মের সহিত যোগ রক্ষা করিতে হইবে—"ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞান পরায়ণঃ। যদ্‌যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥" গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ হইবেন, যে কোন কর্ম্ম করুন তাহা পরব্রহ্মে সমর্পণ করিবেন। দ্বিতীয় শ্লোকে পিতামাতার প্রতি পুত্রের কর্ত্তব্য বিষয়—"মাতরং পিতরঞ্চৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষদেবতাং। মত্বা গৃহী নিষেবেত সদা সর্ব্বপ্রযত্নতঃ॥" গৃহী ব্যক্তি পিতামাতাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতাস্বরূপ জানিয়া সর্ব্বপ্রযত্নে সর্ব্বদা তাঁহাদের সেবা করিবেন। শেষের শ্লোকে গৃহে পরিবারের মধ্যে পরস্পর পরস্পরকে কিপ্রকারে ব্যবহার করিবে তাহার উপদেশ—"ভ্রাতা জ্যেষ্ঠঃ সমঃ পিত্রা ভার্য্যা পুত্রঃ স্বকাতনুঃ। ছায়া স্বদাসবর্গশ্চ দুহিতা কৃপণং পরং। তস্মাদেতৈরধিক্ষিপ্তঃ সহেতাসংজ্বরঃ সদা।" জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃতুল্য, ভার্য্যা ও পুত্র স্বীয় শরীরের ন্যায়, দাসবর্গ আপনার ছায়াস্বরূপ, আর দুহিতা অতি কৃপাপাত্রী; এই হেতু এ সকলের দ্বারা উত্ত্যক্ত হইলেও সন্তপ্ত না

* (১) ওঁ ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি; (২) যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্বতদ্‌ব্রহ্ম; (৩) আনন্দাদ্ধ্যেবখল্বিমানিভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।

হইয়া সর্ব্বদা সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিবেক। "অতিবাদাংস্তিতিক্ষেত নাবমন্যেতে কঞ্চন। নচেমং দেহমাশ্রিত্য বৈরং কুর্ব্বীত কেনচিৎ॥" পরের অত্যুক্তি সকল সহ্য করিবেক, কাহাকেও অপমান করিবেক না; এই মানবদেহ ধারণ করিয়া কাহারও সহিত শত্রুতা করিবেক না। তাহার পরে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে পতি এবং পত্নীর মধ্যে পরস্পর কর্ত্তব্য ও ব্যবহার বিষয়ে উপদেশ। চতুর্থ অধ্যায়ে ধর্ম্মনীতি। পঞ্চম অধ্যায়ে সন্তোষ। ষষ্ঠ অধ্যায়ে সত্যপালন ও সত্য ব্যবহার। সপ্তম অধ্যায়ে সাক্ষ্য। অষ্টম অধ্যায়ে সাধুভাব। নবম অধ্যায়ে দান। দশম অধ্যায়ে রিপুদমন। একাদশ অধ্যায়ে ধর্ম্মোপদেশ। দ্বাদশ অধ্যায়ে পরনিন্দা নিষেধ। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ইন্দ্রিয় সংযম। চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে পাপপরিহার। পঞ্চদশ অধ্যায়ে বাক্য, মন এবং শরীরের সংযম। এবং ষোড়শ অধ্যায়ে ধর্ম্মে মতি। ইহার শেষের দুই শ্লোকে আছে—"মৃতংশরীরমুৎসৃজ্য কাষ্ঠলোষ্ট্রসমং ক্ষিতৌ। বিমুখাবান্ধবা যান্তি ধর্ম্মস্তমনুগচ্ছতি॥" "তস্মাদ্ধর্ম্মং সহায়ার্থং নিত্যং সঞ্চিনুয়াৎ শনৈঃ। ধর্ম্মেণ হি সহায়েন তমস্তরতি দুস্তরং॥" বান্ধবেরা ভূমিতলে মৃতশরীরকে কাষ্ঠলোষ্ট্রবৎ পরিত্যাগ করিয়া বিমুখ হইয়া গমন করে, ধর্ম্ম তাহার অনুগামী হয়েন। অতএব আপনার সাহায্যার্থ ক্রমে ক্রমে ধর্ম্ম নিত্য সঞ্চয় করিবে। জীব ধর্ম্মের সহায়তায় দুস্তর সংসার অন্ধকার হইতে উত্তীর্ণ হয়েন। "এষ আদেশ এষ উপদেশ এতদনুশাসনং এষ মুপাসিতব্যমেবমুপাসিতব্যং।" এই আদেশ, এই উপদেশ, এই শাস্ত্র, এই প্রকারে তাঁহার উপাসনা করিবেক, এই প্রকারে তাঁহার উপাসনা করিবেক।" এই দ্বিতীয় খণ্ডের তাৎপর্য্য প্রধানত পণ্ডিত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী কর্ত্তৃক লিখিত। অনুশাসন খণ্ডের সংকলনেও অযোধ্যানাথ দেবেন্দ্রনাথের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন। রাজনারায়ণ বসুও এ বিষয়ে তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথের উপরি-উদ্ধৃত উক্তিসমূহ হইতে বেশ বুঝা যায় যে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মকে গৃহীর, সৎকর্ম্মনিষ্ঠ গৃহস্থের ধর্ম্মরূপে গড়িয়া তুলিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থে সন্ন্যাসভাবকে বলিতে গেলে কিছুমাত্র প্রশ্রয় দেওয়া হয় নাই। কাজে কাজেই সাধারণত নির্গুণ ব্রহ্ম অর্থে যাহা বুঝা যায় সে প্রকার কৈবল্যস্বরূপ নির্গুণ বা গুণরহিত পরব্রহ্মের কোনপ্রকার উপাসনাবিধি ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থে নাই—সে প্রকার নির্গুণ ব্রহ্মের শাস্ত্রমতে কোন উপাসনা হইতে পারে কিনা সন্দেহ। সাধারণত সগুণ ব্রহ্ম বলিতে যাহা বুঝা যায় সেই সগুণ কিন্তু পূর্ণস্বরূপ পরব্রহ্মেরই পূজাবিধি অর্থাৎ কি ভাবে তাঁহাকে আত্মস্থ করিয়া প্রত্যক্ষ করিতে হইবে তাহারই উপায় প্রভৃতি ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থে উপনিষদাদি শাস্ত্রমুখে উক্ত হইয়াছে। সচরাচর মানুষ যে ভাবেই হউক, কোন না কোনভাবে ভগবানকে ডাকিতে হইলেই তাঁহাকে আত্মা বা তাহার নিজস্বরূপ হইতে পৃথকভাবে না ডাকিয়া থাকিতে পারে না, তাই ব্রাহ্মধর্ম্মে দ্বৈতবাদ অবলম্বিত হইয়াছে এবং পরব্রহ্মের সত্যস্বরূপ অবলম্বনে আমাদের এই আত্মা, এই জগত প্রভৃতি সকলই সত্য, এই তত্ত্বের উপর ব্রাহ্মধর্ম্মকে দাঁড় করানো হইয়াছে। দেবেন্দ্রনাথের মতে যাহা ব্রাহ্মধর্ম্মের ভাব তাহা তাঁহার উক্তিতে আর একটু বিশদভাবে ব্যক্ত হইয়াছে—"এই প্রকারে ১৭৭০ শকে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থে আবদ্ধ হইল। ইহাতে অদ্বৈতবাদ, মায়াবাদ নিরস্ত হইল। ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থে প্রকাশিত হইল যে, জীবাত্মা পরমাত্মা পরস্পর পরস্পরের সখা ও তাঁহারা সর্ব্বদা যুক্ত হইয়া আছেন, "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া" ইহাতে অদ্বৈতবাদ নিরস্ত হইল। ব্রাহ্মধর্ম্মে আছে "ন বভূব কশ্চিৎ" তিনি আপনি কিছুই হন নাই। তিনি জড়জগতও হন নাই, বৃক্ষলতাও হন নাই, পশুপক্ষীও হন নাই, মনুষ্যও হন নাই। ইহাতে অবতারবাদ নিরস্ত হইল। ব্রাহ্মধর্ম্মে আছে "স তপোঽতপ্যত সতপস্তপ্ত্বা ইদংসর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ।" তিনি আলোচনা করিলেন, আলোচনা করিয়া এই সমুদায় যাহা কিছু তিনি সৃষ্টি করিলেন। পূর্ণ সত্য হইতে এই বিশ্বসংসার নিঃসৃত হইয়াছে। এই বিশ্বসংসার আপেক্ষিক সত্য, ইহার স্রষ্টা যিনি তিনি সত্যের সত্য, পূর্ণ সত্য। এই বিশ্বসংসার স্বপ্নের ব্যাপার নহে, ইহা মানসিক ভ্রমও নহে, ইহা বাস্তবিক সত্য। যে সত্য হইতে ইহা প্রসূত হইয়াছে, তিনি পূর্ণ সত্য আর ইহা আপেক্ষিক সত্য। ইহাতে মায়াবাদ নিরস্ত হইল। এ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মদিগের কোন ধর্ম্ম-

গ্রন্থ ছিল না; তাঁহাদিগের ধর্ম্ম, মত ও অভিপ্রায় নানা গ্রন্থে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছিল, এখন ইহা একত্র সংক্ষিপ্ত হইল।"

অনেকের একটী ভ্রান্ত ধারণা আছে যে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম্মকে উপনিষদাদি হিন্দুশাস্ত্রের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে চাহিতেন। ইহা অত্যন্ত ভ্রান্ত ধারণা। তাঁহার মতে আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ সত্যসকল দেশকাল-নিরপেক্ষ সত্য। সেই সকল সত্য যেমন বিশুদ্ধচিত্ত নিষ্পাপ ঋষিরা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, আমরাও সেইরূপ আমাদের চিত্তকে নির্ম্মল ও জ্ঞানোজ্জ্বল করিলে সেই সকল সত্য আমাদেরও হৃদয়ে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশমান হইবে। দেশকালজাতি-নিরপেক্ষভাবে সকলেরই আত্ম-প্রত্যয়সিদ্ধ সত্যসকল প্রত্যক্ষ করিয়া ব্রহ্মবিৎ ও ব্রহ্মবাদী হইবার অধিকার আছে। ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থে উপনিষৎখণ্ডের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম মন্ত্রের যে তাৎপর্য্য তিনি সন্নিবেশিত করিয়াছেন সেই তাৎপর্য্য হইতেই এ বিষয়ে তাঁহার মনোগত ভাব স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে। সেই তাৎপর্য্যে লিখিত আছে "ব্রহ্মজ্ঞানরূপ স্বর্গীয় অগ্নি সকলেরই হৃদয়ে নিহিত আছে, সকলের আত্মাতেই ব্রহ্মের অনন্ত মঙ্গল ভাব অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিত আছে। বিশ্বকার্য্যের আলোচনা দ্বারা তাহা প্রজ্বলিত করিলেই অনন্ত মঙ্গলস্বরূপ ঈশ্বরকে দর্শন পাই। তিনি আপনার বিশুদ্ধ মঙ্গলরূপ এই তাবৎ ভৌতিক পদার্থে এবং মনুষ্যের মানসপটে মুদ্রিত করিয়া রাখিয়াছেন। যে সকল ভাগ্যবান সদ্বুদ্ধিসম্পন্ন নিষ্পাপ যত্নশীল মহাত্মা তাহা প্রতীতি করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাঁহারাই ব্রহ্মবিৎ এবং যাঁহারা এইরূপে প্রতীতি করিয়া উপদেশ করেন, তাঁহারা ব্রহ্মবাদী। ব্রহ্ম-বিৎ ও ব্রহ্মবাদী হইবার জন্য দেশবিশেষ কি কাল-বিশেষ কি জাতিবিশেষের অপেক্ষা নাই। সকল দেশীয় ব্রহ্মবাদিদিগেরই ব্রহ্মবিষয়ে উপদেশ দিবার অধিকার আছে।"

এই তাৎপর্য্যের ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থে স্থান প্রাপ্ত হও-য়াই উপরোক্ত ভ্রান্ত ধারণার মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে। কিন্তু তবুও যে অনেকের মন হইতে ঐ ভ্রান্ত ধারণা দূর হয় না তাহার কারণ এই যে দেবেন্দ্রনাথ উপনিষৎ হইতেই প্রথম খণ্ড সংকলিত করিয়াছেন এবং প্রথম অধ্যায়ের প্রথম মন্ত্রের তাৎপর্য্যের শেষে স্পষ্টাক্ষরে তাহা স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন—"ভারতবর্ষের পূর্ব্বতন ব্রহ্মবাদী ঋষিরা ব্রহ্মবিষয়ে যে সকল যথার্থ তত্ত্ব ও আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ সত্যের উপদেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই এই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম খণ্ডে সংকলিত হইয়াছে।" ইহার উপর, ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের উপদেশ ও নীতিসমূহও তিনি একমাত্র হিন্দুশাস্ত্র হইতে সং-কলিত করাইয়াছেন। ইহা দ্বারা কখনই এরূপ প্রমাণিত হইতে পারে না যে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মকে হিন্দুশাস্ত্রের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে চাহিয়া-ছিলেন। আমরা ইতিপূর্ব্বে যে সকল কথা বলিয়া আসিয়াছি তাহা প্রণিধান পূর্ব্বক আলোচনা করিলে বরঞ্চ ইহাই প্রতীতি হইবে যে ব্রাহ্মদিগকে আত্ম-প্রত্যয়পোষক একটী আদর্শ গ্রন্থ দিবার জন্যই তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ সংকলিত করিয়াছিলেন। তবে, এই গ্রন্থটীকে হিন্দুশাস্ত্রের মধ্যে আবদ্ধ রাখা তাঁহার পক্ষে কেবলমাত্র স্বাভাবিক কার্য্য হয় নাই, কিন্তু ইহা তাঁহার স্বাভাবিক দূরদর্শিতারও পরিচয় দিয়াছে। যখন যৌবনের প্রথম উন্মেষে তাঁহার হৃদয়ে নানাবিধ সংশয় নানা প্রকার অশান্তির কঠোর আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইতেছিল, তখন তিনি যে উপনিষদের মন্ত্রে ছিন্নসংশয় হইয়াছিলেন, যে উপনিষদের শান্তিমন্ত্রে তাঁহার হৃদয়ের সমুদয় অশান্তি নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইতে পারিয়াছিল, ব্রাহ্মমণ্ডলীরও সংশয় দূরীকরণ এবং শান্তি আনয়নের জন্য তাঁহার দৃষ্টি যে প্রথমেই সেই উপনিষদের প্রতি নিপতিত হইবে, তাহাই যে সর্ব্বপ্রথম তাঁহার অবলম্বনীয় হইবে তাহা কি কিছু আশ্চর্য্য? বরঞ্চ এরূপ না হইলেই আশ্চর্য্যের বিষয় হইত। যখন তিনি সেই উপনিষৎ অবলম্বনে নিজের এবং ব্রাহ্মমণ্ডলীর সকল সংশয়ের উত্তর পাইলেন, আত্মপ্রত্যয়ের সম্পূর্ণ সমর্থন প্রাপ্ত হইলেন, তখন নিকটের সেই উপনিষৎ ছাড়িয়া কেন তিনি দূরের বিদেশীয় শাস্ত্রের নিকট ভিক্ষার্থী স্বরূপে দণ্ডায়মান হইবেন? সেইরূপ পরিবার, সমাজ প্রভৃতিকে আত্মপ্রত্যয়ের অনুবর্ত্তী করিয়া সুপথে চালাইবার জন্য যে সকল নীতির প্রয়োজন, সেই সকল নীতি যখন তিনি দেশের স্বজাতির ধর্ম্ম-শাস্ত্রসমূহেই প্রাপ্ত হইলেন, তখন সেই সকল নীতির

জন্য বিদেশের অপরাপর জাতির ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহ অন্বেষণ করিবার তাঁহার কোন প্রয়োজনই হয় নাই। এমন যদি হইত যে আমাদের শাস্ত্রসমূহের মধ্যে আত্ম-প্রত্যয়পোষক বিশেষ কোন কিছু পাওয়া যায় না, তাহা হইলে বিদেশীয় শাস্ত্রের নিকটে ভিক্ষার ঝুলি লইয়া দাঁড়ানো আবশ্যক হইত। ভগবৎগীতা যে সময়ে রচিত হয়, সে সময়ে কত দেশের কত শাস্ত্র ছিল, কিন্তু গীতার উপদেশ সমূহ আমাদের স্বদেশীয় শাস্ত্র ব্যতীত অন্য কোন শাস্ত্রের উপর অবলম্বিত করিবার প্রয়োজনই হয় নাই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের স্বদেশের প্রতি যেরূপ প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল, প্রাচীন ইতিহাস ও ধারার প্রতি যেরূপ গভীর শ্রদ্ধা ছিল, প্রাচ্য দর্শনশাস্ত্র প্রভৃতিতে যেরূপ প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল তাহাতে দেশের শাস্ত্র অবলম্বনে ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ সংকলন করা তাঁহার পক্ষে কিরূপ স্বাভাবিক কার্য্য ছিল তাহা একজন বালকও অনায়াসে বুঝিতে পারে।

এই ভাবে সংকলন তাঁহার স্বাভাবিক দূর-দর্শিতারও ফল বটে। তিনি স্বাভাবিক দূরদর্শিতার ফলেই বুঝিয়াছিলেন যে দেশের শাস্ত্র অবলম্বন বিনা আত্মপ্রত্যয়পোষক তত্ত্বসকল সহস্র মুখে প্রচার করিলেও ভারতবর্ষের ন্যায় একটী প্রাচীন দেশের অধিবাসীগণের পক্ষে তাহা গ্রহণ করা সহজ হইবে না। গীতোক্ত উপদেশসকল যদি বিদেশীয় কোন শাস্ত্র অবলম্বনে প্রদত্ত হইত, তবে সেগুলি সহস্র প্রকারে মিষ্ট হইলেও এখন যে ভাবে গৃহীত হইতেছে সেভাবে গৃহীত হইত কি না সন্দেহ। তুমি গঙ্গাতীরে বাস কর—তোমার পক্ষে গঙ্গাজলে তৃষ্ণানিবারণ করা সহজ হইবে অথবা টেম্‌স্ নদীর জল আনয়ন করিয়া তৃষ্ণা দূর করা সহজ হইবে? নিকটে তোমার যদি জল না থাকে, তবে শতবার বলিব যে, যেখানে জল আছে এমন দেশে যাও। বাইবেলোক্ত অথবা কোরাণোক্ত পুণ্যাত্মাদিগের জীবন-চরিত অবলম্বনে হিন্দুদিগের নিকটে ধর্ম্মকথা বুঝানো সহজ হইবে অথবা ধ্রুব প্রহ্লাদ প্রভৃতি পুরাণোক্ত কথা দ্বারা ধর্ম্মতত্ত্ব সকল বুঝানো সহজ হইবে? এ বিষয়ে দুই মত হইতে পারে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই। অবশ্য আমি যদি বাইবেল বা কোরাণপন্থীদিগের নিকটে ধর্ম্ম প্রচার করিতে ইচ্ছা করি তবে আমার নিজেকে আগে স্বধর্ম্মের কেন্দ্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া বাইবেল বা কোরাণ হইতে তদনুকূল বিষয় সকল নির্ব্বাচন পূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া লইব এবং সেই সকল বিষয়ের উপর নির্ভর করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতে থাকিব। কিন্তু স্বধর্ম্মের কেন্দ্র হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতে গেলে কৃতকার্য্য হইবার আশা বড়ই কম। রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ ব্রাহ্মগুলী হিন্দুসম্প্রদায় হইতেই বাহির হইয়াছিলেন। কাজেই সেই ব্রাহ্মগুলীকে জাতীয় শাস্ত্র অবলম্বনে স্বধর্ম্মের কেন্দ্রে দাঁড় করাইবার চেষ্টা ও উদ্যোগ করিয়া দেবেন্দ্রনাথ যে দূরদর্শিতার বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন, তাহা যে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বারম্বার বুঝাইতে হয় ইহাই আশ্চর্য্য।

ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ সম্বন্ধে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন তাঁহার পরিচালিত ইণ্ডিয়ান মিরর পত্রে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ২১শে এপ্রিল তারিখে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাই উদ্ধৃত করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম—"ইহা (ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ) অত্যন্ত গভীর ও আশ্চর্য্য মনুষ্যের গভীরতম চিন্তার ফল। এরূপ মনুষ্য কেবল এদেশে কেন, কোন দেশেই সহজে দেখা যায় না। যে উপনিষৎ তাঁহার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনের আদিম কারণ এবং এখনও যে উপনিষদের চিরনবীন ও পূর্ণ উৎস হইতে তাঁহার মহান্ আত্মা সত্য, আত্মানুভূতি, আনন্দ ও পবিত্রতার সুধা পান করেন, এই গ্রন্থে সেই উপনিষদের সুনির্ব্বাচিত মন্ত্রসমূহের উপর তাঁহার গভীর আলোচনা প্রকাশ পাইতেছে। তাঁহার শিক্ষাফলে ও অভিজ্ঞতাতে তিনি যে আলোক যে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন তাহারই পূর্ণ প্রতিবিম্ব এই গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। ইহাতে সর্ব্বাঙ্গীন আধ্যাত্মিক ভক্তিতত্ত্বের উপর সংক্ষিপ্ত ও হৃদয়স্পর্শী উপদেশ সন্নিবিষ্ট আছে। ইহা পাঠ করিতে করিতে বুদ্ধি-চালনা এবং শাস্ত্রালোচনার একটী বিস্তৃত ক্ষেত্র সম্মুখে উন্মুক্ত হয় এবং সেই কারণে ইহা চিন্তা-শীল ও ভক্তিমান জিজ্ঞাসুদিগের নিকট অত্যন্ত আদরণীয়।"*

* It represents the deepest thoughts of a very deep and singular man, the like of

নীরবে।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

নীরবে তোমায় স্বামী, কত ভাল বাসি আমি,
আমার চিরিয়া বুক দেখে যাও আসি।
তব সাথে দিবানিশি, চাহি যে রহিতে মিশি,
দাওনা তেমন ধরা—আঁখি জলে ভাসি॥
তোমায় আমায় মধু, কত কথা প্রাণবঁধু,
সবার অজানা চাহি নীরবে কহিতে।
তুমি কেন সরে যাও, পরাণ ভাঙ্গিয়া দাও,
আপনার প্রাণ চাহি আছাড়ি বধিতে॥
জগতে আনন্দ আলো, কিছুই না লাগে ভালো,
প্রাণের হুতাশ জাগে আগুনের মত।
মরিতেও সুখ তায়, তোমারে যদি গো পাই,
বারেক হৃদয় পুরে আপনার মত॥
দুরু দুরু কাঁপে হিয়া, শোন তুমি কান দিয়া,
বুঝিবে আমার প্রাণে কি গভীর ব্যথা।
থাকিতে নারিবে কভু, ওগো মোর প্রাণপ্রভু,
জানিলে বেদনা মম না কহিয়া কথা॥
দুপুর বেলায় যবে, আঁধার বনের মাঝে,
চলে যাই একা একা শ্রান্ত ক্লান্ত মনে।
সহসা জাগিয়া উঠে, হৃদয়কমল ফুটে,
কহিতে শতেক কথা তব মধু-সনে॥
এস মোর চিত্তধন, তুমি এক প্রিয়জন,
তোমারে ছাড়িয়া মম নাহি আর কেহ।
চাহিনা কিছুই আর, শুধু তুমি একবার,
ভালবেসে দাও মোরে ঢালি তব স্নেহ॥

---

whom is not easily met with in this or in any other country. It contains his mature reflections on the chosen passages of the Upanishads, the early source of his wonderful conversion, and still the fresh and full fountain from which his grand spirit drinks truth, inspiration, joy and sanctity, reflects all the light, all the wisdom, which his trained and experienced mind can throw upon them, sets forth short and effective sermons on all manner of devotional speculation and practical subjects, which those feats suggest. It opens out a large area of critical and scriptural thought, very attractive to the devout and meditative students.

লিঙ্গায়তদিগের ধর্ম্মমত।

(কালীপ্রসন্ন বিশ্বাস)

এক্ষণে আমরা লিঙ্গায়তদিগের ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিব। লিঙ্গায়ত ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক বাসবা কি শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন? তাঁহার উদ্দেশ্য কি ছিল? কি প্রকারে তিনি মানবগণকে উন্নতির পথে অগ্রসর করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন? তিনি ধর্ম্মজগতে কোন্ স্থান অধিকার করিবার উপযুক্ত ছিলেন? এই সকল তাঁহার উপদেশাবলী বিশেষ রূপে আলোচনা করিলে জানিতে পারা যায়।

তাঁহার কার্য্য কেবল ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কতকগুলি নিয়ম বা ক্রিয়াকলাপের মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। তাঁহার সারা জীবন ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যে অভিষিক্ত ছিল। তাঁহার মতে কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে কোন একটি অথবা কতকগুলি যাগযজ্ঞপুজাদি করিলেই ধর্ম্ম করা হয় না। মানবজীবনের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন করাই প্রকৃত ধর্ম্ম। সর্ব্বান্তঃকরণে ভগবানের আরাধনা, সৃষ্ট জীবের সেবা করা এবং কর্ত্তব্য প্রতিপালন না করিলে প্রকৃত ধর্ম্মমার্গে উপনীত হইতে পারা যায় না। বর্ণাশ্রম, সামাজিক ও নৈতিক তত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি বহুতর উপদেশ প্রদান করিয়াছেন এবং অবশেষে পরমাত্মা এবং জীবাত্মার অদ্বৈতভাব প্রদর্শন করিয়াছেন।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সম্বন্ধে বাসবা বলিয়াছেন যে মনুষ্য উচ্চ কুলে জন্মগ্রহণ করিলেই উচ্চ হয় না। মানব নিজ অধ্যাত্মিক উন্নতির দ্বারা যে স্থান অধিকার করিবার উপযুক্ত সে সেই স্থানই প্রাপ্ত হয়—জন্ম হেতু নহে। সে যে কোন বংশেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন, যে কোন পেষা বা ব্যবসাই অবলম্বন করুক না কেন, যদি আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করিয়া অকপট হৃদয়ে পরমাত্মায় চিত্তার্পণ করিতে পারে তবে ব্রহ্মানন্দ লাভ করিতে সমর্থ হয়।

বাসবা বলিয়াছেন:—

তুমি জাতি নির্ব্বাচন করিতে চাও? তুমি কি জানিতে চাও তোমার পূর্ব্বপুরুষগণ কোন্ জাতিভুক্ত ছিলেন? তবে শুন, তোমাদের পূর্ব্বপুরুষ ব্যাসদেব ধীবরকন্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

বশিষ্ট উর্ব্বশী-পুত্র ছিলেন। মানুষ নীচকুলে জন্ম-গ্রহণ করিলে কি হইল? যদি সে প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হয় তাহা হইলে সে উচ্চ জাতি মধ্যে পরিগণিত হইবে। সকল দেহই সমান, সকল দেহই রক্ত, মাংস ও বীর্য্য হইতে উৎপন্ন, সকল দেহই ব্যাধিসংকুল। লৌহ উত্তপ্তকারী অর্থাৎ যে ব্যক্তি লৌহ উত্তপ্ত করিয়া যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ করে, কর্ম্মকার বা লোহার নাম প্রাপ্ত হয়। বস্ত্র ধৌতকারী রজক নামে অভিহিত হয়। জাল বিস্তার পূর্ব্বক মৎস্য জীবীকে ধীবর কহে। ধর্ম্ম শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে ব্রাহ্মণ হয়। জগতে কি কেহ জাতি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে? যে ব্যক্তি গোসকলকে বধ করে সেই চণ্ডাল। যে ব্যক্তি শাস্ত্রনিষিদ্ধ বস্তু ভক্ষণ করে সেই "জেরিয়া" (অতি নিকৃষ্ট ও অস্পৃশ্য জাতি মধ্যে পরিগণিত হয়। দেহের জাতিত্ব কোথায়? যে যাবতীয় জীবের হিত সাধন করে সেই উচ্চ বংশীয় মধ্যে গণ্য হয়। "কুদাল সঙ্গমের" (বাসবার গুরু) ভক্তগণ সকলে উচ্চ শ্রেণীভুক্ত কারণ তাহারা জীব মাত্রেরই হিত সাধন করে।

মাহেশ্বর স্থল—৬৩-৬৪

তুমি তোমার জাতিগত অভিমানে অভিমানী। শতকোটী ব্রাহ্মণের মধ্যে একজন বলিয়া পরিগণিত হইয়া কি ফল? ভগবৎ-বাণীর প্রতি ভক্তিই সাধুগণের অমূল্য রত্ন। মানব! নষ্টপ্রজ্ঞ হইও না। যাহারা কুদাল সঙ্গে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, যাহারা ধর্ম্মজগতে চুম্বকস্বরূপ তাহাদিগের উপর বিশ্বাস স্থাপন কর।

—ঐ ৬৯

ধর্ম্মগ্রন্থপাঠ করিয়া ফল কি? ধর্ম্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া কি উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়? কঠিন তপস্যা করিলে কি ফল প্রাপ্ত হইবে? মন্ত্র পাঠ দ্বারা কি লাভ হইবে? যত দিন না তুমি আমাদের গুরু এক মাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের প্রতি অগ্রসর হইবে ততদিন তোমার সকল কর্ম্মই বৃথা।

ঐ ৭৩

হে কর্ম্মপ্রিয় ব্যক্তি, তুমি কর্ম্ম দ্বারা তোমাকে উচ্চ মনে করিতেছ? তোমার বেদাদি শাস্ত্র, পুরাণ এবং স্মৃতি কাহার যশ গান করিতেছে? তাহারা সকলেই সেই একমেবাদ্বিতীয়ং পুরুষের এই বলিয়া অর্চ্চনা করিতেছে "সেই একমাত্র ঈশ্বর যিনি পৃথিবী এবং আকাশকে সৃষ্টি করিয়াছেন।" তাহারা বলিতেছে যে "ব্রাহ্মণ সকল বর্ণের গুরু একথা সর্ব্বৈব মিথ্যা। আমাদের কুদাল সঙ্গমের শিষ্যগণই সকল জাতির গুরু। ব্রহ্মের প্রতি অকপট ভক্তিই প্রকৃত শিক্ষা পরাবিদ্যা, এবং প্রকৃত ঐশ্বর্য্য। যে ব্যক্তি সেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছে তাহার জাতিতে কি করে? ভগবান চণ্ডালের অন্নও গ্রহণ করিয়া থাকেন। অতএব তোমাদের ধর্ম্ম বিষয়ে কলহ হইতে ক্ষান্ত হও। কেবল কুদল সঙ্গমের শিষ্যগণই উচ্চ বর্ণভুক্ত।

ঐ ৭৪। ৭৫

মনুষ্য নিজের মঙ্গলের জন্য কর্ম্ম করিবে এমত নহে, যাবতীয় মানবসমাজের মঙ্গল সাধন করাই তাহার কর্ত্তব্য। ভগবন্! আমার শরীর এবং মনে বলপ্রদান করুন যাহা দ্বারা আমি তোমার ভক্তগণের সেবা করিতে পারি। আমি যেন তোমার কার্য্যে প্রাণমন সমর্পণ করিতে পশ্চাৎপদ না হই।

ভক্তন মাহেশ্বর স্থল

পাপীর অর্থ বৃথা কার্য্যে ব্যবহৃত হয়, দরিদ্রের দুঃখমোচনে নহে। কুকুরের দুগ্ধে কখন পঞ্চামৃত হয় না। যে অর্থ ব্রহ্মজ্ঞানীদিগের সেবার জন্য প্রয়োগ করা না হয় তাহা নিশ্চয়ই বৃথা কার্য্যে ব্যবহৃত হয়।

ভক্ত জ্ঞানীস্থল ২২৩

কষ্টি পাথরে স্বর্ণকে ঘর্ষণ করিলে যে পরিমাণে উহাতে স্বর্ণ লাগিয়া থাকে, আমি যদি সেই পরিমাণ স্বর্ণকে চুরি করি, অথবা কোন বস্ত্রের একটিমাত্র সুতাও অপহরণ করি, কিংবা তণ্ডুলস্তূপ হইতে কণামাত্র শস্য অসৎ উপায়ে গ্রহণ করি তাহা হইলে কুড়ল দেবকে প্রতারণা করা হয়।

ভক্তন মাহেশ্বর স্থল ৫।

আমি তোমার প্রদত্ত ধন তোমারই কার্য্যে ব্যয় করিব।

মাহেশ্বরণ ভক্তস্থল—১৮২।

অতএব মানুষ যে ব্যবসাই করুক না কেন, তাহার জাতিগত পেশা তাহাকে নীচ করিতে পারে না। মড়িবাল মাথিদেব রজকবংশে জন্মগ্রহণ

করিয়াছিলেন তত্রাচ তিনি বীর শৈব (লিঙ্গায়ত) সম্প্রদায়ে উচ্চপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। লিঙ্গায়তগণকে তপ-মন-জ্ঞান দ্বারা যখন পরমেশ্বরে লীন হইতে হইবে তখন যে লিঙ্গায়ত ভিন্ন অপরের দাস্য বৃত্তি বা নীচ কর্ম্ম করে সে আধ্যাত্মিক অবনতি প্রাপ্ত হয়। যদি সে কেবলমাত্র ব্রহ্মবিশ্বাসী গণের সেবা করে তাহাতে কোন দোষ হইতে পারে না।

বসবা যে কেবল উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা নহে। তিনি নিজ জীবনেও ঐ সকল উপদেশানুসারে কার্য্য করিয়া প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম এবং জাতি হইতে সংগৃহীত লিঙ্গায়তগণের মধ্যে পংবিবাহ, পুঁক্তিভোজন সম্বন্ধে তিনি যেমন উপদেশ দিয়াছিলেন, নিজেও সেইরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বলিতেন যে লিঙ্গায়তগণ অপর ধর্ম্মাবলম্বীর সহিত ঐ প্রকার কার্য্যে লিপ্ত হইবে না। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, অপরের সংসর্গে তাহাদের ধর্ম্মবিশ্বাস শিথিল হইবার সম্ভাবনা।

তিনি বলিয়াছেন :—

প্রকৃত বিশ্বাসী যে জাতি মধ্যেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন (তাহার ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য) আমি তাহার চর্ব্বিত তাম্বুলও চর্ব্বণ করিতে দ্বিধা করিব না। তৎকর্ত্তৃক বর্জ্জিত বস্ত্রও ব্যবহার করিতে লজ্জিত হইব না।

ভক্তন প্রসাদ স্থল ৪৬২।

আমি প্রকৃত ভক্তের গৃহে তাহার উচ্ছিষ্ট অন্ন ভক্ষণ করিয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিব। আমি (ভগবৎ) ভক্তগণের উচ্ছিষ্ট ভোজনকারী কিঙ্কর মাত্র।

ঐ ৪৬০।

যদি মহাপাপী অতি নিকৃষ্ট পাপে লিপ্ত হইয়াও প্রকৃত ভক্তের গৃহে গমন করে এবং তাহার ভোজনাবিশিষ্ট অন্নকণামাত্রও ভোজন করে তাহা হইলে তাহার সকল পাপ ধৌত হইয়া যায়।

ঐ ৪৬৯।

অনেকে ভক্তগণের সহিত একত্র ভোজন পান করা সত্ত্বেও জাত্যভিমানবশত তাহাদের সহিত বিবাহসূত্রে কুটুম্বিতা করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। হে কুড়ল সঙ্গ! আমি কেমন করিয়া তাহাদিগকে প্রকৃত ভক্ত বলিব? আমি কেমন করিয়া তাহাদিগকে জ্ঞানীজননধ্যে গণ্য করিব? তাহারা নিশ্চয়ই পবিত্র সলিলে অবগাহনকারী চণ্ডালের ন্যায় গণ্য হইবে।

বাসবা বলিয়াছেন যে প্রকৃত (ভগবৎ) ভক্ত হইবামাত্রই মনুষ্যের জাতিগত হীনতা দূরীভূত হইয়া যায়। অনেকে লিঙ্গায়ত ধর্ম্মগ্রহণ করিয়া, অপরাপর লিঙ্গায়তগণের সহিত একত্র পান ভোজনাদি করা সত্ত্বেও তাহাদিগের সহিত অসবর্ণ বিবাহে লিপ্ত হইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। ইহাদের উপর নিশ্চয়ই বাসবার শিক্ষা ফলপ্রদ হয় নাই। এমন কি, আজকাল অনেক লিঙ্গায়ত পরস্পরের মধ্যে পান ভোজনাদি করিতেও অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকে। জঙ্গম ব্যতীত অপর লিঙ্গায়তগণ এইরূপ করিতেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই প্রথা বহুকাল প্রচলিত ছিল।

আমরা দেখিতে পাই যে বিবাহপ্রথা সম্বন্ধে অনেকেই জাতিগত প্রথা পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। তথাপি লিঙ্গায়তদিগের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহপ্রথা অপর সম্প্রদায়ের ন্যায় কখন সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হয় নাই।

মঠে লিঙ্গায়ত ভক্তগণ সকলে পংক্তিভোজনই করিয়া থাকে। ঐ সকল খাদ্য দ্রব্যাদি যে কোন জাতীয় লিঙ্গায়তের গৃহেই প্রস্তুত হউক না কেন তাহাতে কোন আপত্তি হয় না। যাহারা আপনাদিগকে উচ্চশ্রেণী মধ্যে জ্ঞান করিয়া অপর নীচ জাতীয় ব্যক্তির গৃহে ভোজন করিতে অস্বীকার করেন, যদি তাহাদের গৃহে উচ্চ নীচ জাতীয় লিঙ্গায়ত নিমন্ত্রিত হয় তাহা হইলে তাহাকে লইয়া এক পংক্তিতে বসিয়া পান ভোজন করিতে আপত্তি হয় না। এমন কি উক্ত নীচ জাতীয় ব্যক্তির উচ্ছিষ্ট থালা কোন উচ্চশ্রেণীভুক্ত লিঙ্গায়ত ধৌত করিতে অপমান বোধ করে না। সুতরাং ধর্ম্মের সহিত জাতিগত মর্য্যাদার সামঞ্জস্য রক্ষণের ইহা একটি অভিনব প্রথা বলিতে হইবে।

লিঙ্গায়ত রজক, ক্ষৌরকার প্রভৃতি জাতি যাহারা লিঙ্গায়ত ভিন্ন অপর জাতির কার্য্য করিয়া থাকে, তাহারা লিঙ্গায়ত বলিয়া গণ্য হয় না। তাহাদিগকে লইয়া কেহ পংক্তি ভোজনও করে না।

গীতা-রহস্য।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদিত)

৪র্থ প্রকরণ।

আধিভৌতিক সুখবাদ।

দুঃখাদুদ্বিজতে সর্ব্বঃ সর্ব্বস্য সুখমীপ্সিতম্।

(অর্থাৎ, দুখ সকলকেই উদ্বেজিত করে, সুখ সকলেরই অভীপ্সিত।)

মহাভারত, শান্তি, ১৩৮।৬১।

মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারদিগের "অহিংসা সত্যমস্তেয়ং" ইত্যাদি নিয়ম স্থাপন করিবার কারণ কি, উহা নিত্য কি অনিত্য, উহাদের ব্যাপ্তি কিরূপ, অথবা উহাদের মূলতত্ত্বটি কি, এবং ইহাদের মধ্যে দুই পরস্পরবিরোধী ধর্ম্ম এক কালেই প্রাপ্ত হইলে, কোন্ মার্গ স্বীকার করা যাইবে, ইত্যাদি প্রশ্নের "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ," কিংবা "অতি সর্ব্বত্র বর্জ্জয়েৎ" এইরূপ সাধারণ যুক্তির দ্বারা নিষ্পত্তি হইতে না পারায়, এই সকল প্রশ্নের উচিত নির্ণয় করিয়া শ্রেয়স্কর মার্গ কোন্‌টি তাহা স্থির করিবার কোন নিশ্চিত সাধন আছে কি নাই, অথবা কোনরূপ দৃষ্টিতে পরস্পরবিরুদ্ধ ধর্ম্মসমূহের লাঘব গৌরব কিংবা ন্যূনাধিক মহত্ত্ব আমরা নির্দ্ধারণ করিতে পারি কি না, তাহা এক্ষণে দেখিতে হইবে।

অন্য শাস্ত্রীয় প্রতিপাদন অনুসারে কর্ম্মাকর্ম্ম-বিচার-প্রশ্নেরও মীমাংসা করিবার আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক এইরূপ যে ত্রিবিধ মার্গ আছে সেই সকল মার্গের মধ্যে ভেদ কি, তাহা পূর্ব্বপ্রকরণে বলিয়াছি। আমাদের শাস্ত্রকর্ত্তাদিগের মতে, এই সকলের মধ্যে আধ্যাত্মিক মার্গই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু অধ্যাত্মমার্গের মহত্ত্ব পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে অন্য দুই মার্গেরও বিচার করা আবশ্যক হওয়ায়, কর্ম্মাকর্ম্ম পরীক্ষণের আধিভৌতিক মূলতত্ত্বের চর্চ্চা এই প্রকরণে প্রথম করিয়াছি। অর্ব্বাচীনকালে যে আধিভৌতিক শাস্ত্রের অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে তাহাতে ব্যক্ত পদার্থ সমূহের বাহ্য ও দৃশ্য গুণের বিচার মুখ্যরূপে কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। তাই, আধিভৌতিক শাস্ত্রাদির অধ্যয়নে যাঁহার জীবন কাটিয়াছে, কিংবা এই সকল শাস্ত্রের বিচারপদ্ধতি সম্বন্ধে যাঁহার অভিমান আছে, তিনি বাহ্য পরিণামের বিচারে নিত্য অভ্যস্ত; এবং সেই কারণে তাঁহার তত্ত্বজ্ঞানদৃষ্টিও অল্পবিস্তর সঙ্কুচিত হইয়া কোন বিষয়ের বিচার করিবার সময় আধ্যাত্মিক ও পারলৌকিক, কিংবা অব্যক্ত ও অদৃশ্য কারণসমূহের প্রতি তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন না। কিন্তু এইরূপ কারণে, অধ্যাত্ম কিংবা পারলৌকিক দৃষ্টি পরিহার করিলেও, এই জগতে, মনুষ্যে-মনুষ্যে ব্যবহার সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইয়া লোকসংগ্রহ হইবার পক্ষে নীতিনির্ব্বন্ধ অবশ্যই আছে। পরলোক সম্বন্ধে যাঁহাদিগের অনাস্থা আছে কিংবা অব্যক্ত অধ্যাত্মজ্ঞানের উপর যাঁহাদের বিশ্বাস হয় না, এইরূপ পাশ্চাত্যদেশের পণ্ডিতেরাও কর্ম্মযোগশাস্ত্রের অত্যন্ত গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া, কেবল আধিভৌতিক শাস্ত্ররীতি অনুসারে অর্থাৎ নিছক ঐহিক প্রত্যক্ষ যুক্তিবাদ অনুসারেও কর্ম্মাকর্ম্মশাস্ত্রের উপপত্তি প্রয়োগ হইতে পারে কি না এই সম্বন্ধে অনেক তর্কবিতর্ক করিয়াছেন এবং এখনও এই তর্কবিতর্ক চলিতেছে। এই তর্কবিতর্কে, অর্ব্বাচীন পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এইরূপ স্থির করিয়াছেন যে, নীতিশাস্ত্রের আলোচনা করিবার জন্য অধ্যাত্মশাস্ত্রের আদৌ আবশ্যকতা নাই। কোন কর্ম্ম ভাল কি মন্দ ইহার মীমাংসা—উক্ত কর্ম্মসমূহের যে বাহ্য পরিণাম প্রত্যক্ষ আমাদের নজরে পড়ে সেই অনুসারেই করা আবশ্যক এবং তাহা করিতেও পারা যায়। কারণ, মনুষ্য যে যে কর্ম্ম করে তাহা সমস্তই সুখের জন্য কিংবা দুঃখ নিবারণার্থই করিয়া থাকে। অধিক কি, "সকল মনুষ্যের সুখ"—ইহাই ঐহিক পরমসাধ্য বিষয়; এবং সকল কর্ম্মের শেষের দৃশ্যফল এই অনুসারে নিশ্চিত হইলেও সুখপ্রাপ্তির কিংবা দুঃখনিবারণের তারতম্য অর্থাৎ লাঘবগৌরব দেখিয়া সকল কর্ম্মের নীতিমত্তা নির্দ্ধারণ করা নীতি নির্ণয়ের প্রকৃত মার্গ। যে গরু হ্রস্বশৃঙ্গী ও শান্ত এবং অধিক পরিমাণে দুধ দেয় সেই গরু ভালো, এইরূপ বাহ্য উপযোগের হিসাবেই যদি ব্যবহারে কোন বিষয়ের ভাল মন্দ স্থির করা যায় তবে ঐ নীতি অনুসারেই যে কর্ম্ম হইতে সুখপ্রাপ্তি কিংবা দুঃখনিবারণাত্মক বাহ্য ফল অধিক, তাহাই নীতিদৃষ্টিতেও শ্রেয়স্কর বুঝিতে

হইবে। কেবল বাহ্য ও দৃশ্য পরিণামসমূহের লাঘব-গৌরব দেখিয়া নীতিমত্তার নির্ণয়—ইহাই সহজ ও শাস্ত্রীয় কষ্টিপাথর বলিয়া উপলব্ধি হয়। সেই জন্য, আত্মা-অনাত্ম বিচারের মধ্যে প্রবেশ করিবার সময় "দ্রাবিড়ী প্রাণায়াম" করা উচিত নহে। "অর্কে চেন্মধু বিন্দেত কিমর্থং পর্ব্বতং ব্রজেৎ" * অর্থাৎ হাতের কাছে যদি মধু পাওয়া যায় তবে মধুর জন্য কিজন্য পর্ব্বতে যাইবে? কোন কর্ম্মের কেবল বাহ্যফল দেখিয়া নীতি ও অনীতির নির্ণয়কারীর পক্ষকে আমি "আধিভৌতিক সুখবাদ" এই নাম দিয়াছি। কারণ, নীতিমত্তার নির্ণয়ার্থ এই মত অনুসারে যে সুখদুঃখের বিচার করিতে হয় তাহা সমস্ত প্রত্যক্ষদৃষ্ট সুতরাং আধিভৌতিক হওয়ায়, এই পন্থাও সর্ব্বজগতের কেবল আধিভৌতিক দৃষ্টিতে বিচারকারী পণ্ডিতেরাই বাহির করিয়াছেন। কিন্তু এই মতবাদের সবিস্তর বিবরণ এই গ্রন্থে বলা সুসাধ্য নহে। বিভিন্ন গ্রন্থকারদিগের মতের শুধু সংক্ষিপ্তসার দিতে গেলেও একটা স্বতন্ত্র গ্রন্থ লিখিতে হয়। তাই, ভগবদ্গীতান্তর্গত কর্ম্মযোগ শাস্ত্রের স্বরূপ ও গুরুত্ব সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিবার নিমিত্ত নীতিশাস্ত্রের এই আধিভৌতিক মার্গের যতটা বিবরণ দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক ততটা স্থূল বিবরণই এই প্রকরণে সংক্ষেপে একত্র করিয়া আমি দিয়াছি। ইহা অপেক্ষা অধিক বিবরণ কাহারও জানিতে হইলে পাশ্চাত্য বিদ্বানদিগের মূল গ্রন্থ তাঁহার দেখা আবশ্যক। আধিভৌতিকবাদী পরলোক সম্বন্ধে কিংবা আত্মবিদ্যা সম্বন্ধে উদাসীন এইরূপ উপরে যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে এই মার্গের সকল বিদ্বানই স্বার্থসাধু, আত্মম্ভরী কিংবা অনীতিমান এইরূপ কেহই মনে করে না। পারলৌকিক না হইলেও ঐহিক দৃষ্টিতেও যতটা হইতে পারে ততটা ব্যাপক করিয়া সমস্ত জগতের কল্যাণের নিমিত্ত বলাই প্রত্যেক মনুষ্যের কর্ত্তব্য, এইরূপ খুব আগ্রহ ও উৎসাহের সহিত যাঁহারা প্রতিপাদন করিয়াছেন সেই কোঁৎ, মিল, স্পেন্সর প্রভৃতি সাত্ত্বিকবৃত্তির পণ্ডিতও এই মার্গে আছেন; এবং তাঁহাদের গ্রন্থ অনেক প্রকারের উদাত্ত ও প্রগল্‌ভ বিচারের দ্বারা পূর্ণ হওয়ায় তাঁহাদের সকলেরই গ্রন্থ পঠনীয়। কর্ম্মযোগশাস্ত্রের পন্থা ভিন্নরূপ হইলেও 'জগতের কল্যাণ' এই বাহ্য সাধ্য যে পর্য্যন্ত না উহা হইতে বাদ পড়ে সেই পর্য্যন্ত নীতিশাস্ত্রের উপাদানের কোনও মার্গ ভিন্নরূপ বলিয়া সেই জন্যই তাহা উপহাস করা উচিত নহে। সে যাই হোক্; নৈতিক কর্ম্মাকর্ম্মের নির্ণয়ার্থ যে আধিভৌতিক বাহ্য সুখের বিচার করিতে হইবে, সে কাহার সুখ? নিজের, না, পরের, একজনের, না, বহুলোকের—এই সম্বন্ধে মতভেদ থাকায় নব্য প্রাচীন উভয়ে মিলিয়া সমস্ত আধিভৌতিকবাদীরা কোন্ কোন্ বর্গের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে এবং তাঁহাদের এই মার্গ কতটা উপযোগী কিংবা নির্দ্দোষ, এক্ষণে সংক্ষেপে তাহার বিচার করা যাইবে।

তন্মধ্যে প্রথম বর্গটি নিছক স্বার্থসুখবাদীদিগের। পরলোক কিংবা পরোপকার সমস্তই মিথ্যা হওয়ায়, দুর্নীতিপরায়ণ লোকেরা শুধু নিজের উদর পূর্ণ করিবার জন্য আধ্যাত্মিক ধর্ম্মশাস্ত্র লিখিয়াছে; এ জগতে স্বার্থই একমাত্র সত্য, এবং তাহা যে প্রকারেই সাধিত হউক না কেন, কিংবা যাহার দ্বারা নিজের আধিভৌতিক সুখের অভিবৃদ্ধি হউক না কেন তাহাই ন্যায্য, প্রশস্ত কিংবা শ্রেয়স্কর বলিয়া বুঝিতে হইবে,—এই মার্গের এইরূপ কথা। আমাদের ভারতবর্ষে এই মত অতি প্রাচীনকালেচার্ব্বাক উচ্চৈস্বরে প্রতিপাদন করিয়াছিলেন; রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডের শেষে, জাবালী রামকে যে কুটিল উপদেশ করিয়াছেন তাহা এবং মহাভারতের কণিক নীতি (সভা, আ, ১৪২) এই মার্গেরই অন্তর্ভূত। পঞ্চমহাভূত একত্র হইয়া তাহার মিশ্রণ হইতে আত্মারূপ গুণ উৎপন্ন হয় এবং দেহ দগ্ধ হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে আত্মাও দগ্ধ হইয়া যায়। তাই, আত্মবিচারের গণ্ডগোলের মধ্যে না পড়িয়া বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা যতদিন জীবিত থাকিবে ততদিন "ঋণ করিয়াও উৎসব করিবে"—ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ,—মরিলে আর কিছুই থাকে না—এইরূপ চার্ব্বাক বাহাদুরের মত। চার্ব্বাক ভারতবর্ষে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া ঘৃতের উপরে তাঁহার লোভটা বেশি ছিল।

* এই শ্লোকে 'অর্ক' শব্দের অর্থ তুলার বৃক্ষ এইরূপ কেহ কেহ করিয়া থাকেন। কিন্তু ব্রহ্মসূত্র ৩.৪.৩ উপরি উক্ত শঙ্কর ভাষ্যের টীকায় আনন্দগিরি 'অর্ক' শব্দের অর্থ 'সমীপ' এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে। এই শ্লোকের দ্বিতীয় চরণ "সিদ্ধ্যর্থা স্বা সংপ্রাপ্তৌ কো বিদ্বানাদরেৎ" এইরূপ আছে।

তা না হইলে "ঋণং কৃত্বা সুরাং পিবেৎ" এইরূপ সূত্রটির রূপান্তর হইত! কোথায় বা ধর্ম্ম, কোথায় বা পরোপকার! এজগতে যে যে বস্তু পরমেশ্বর—শিব শিব! ভুলিয়াছি! পরমেশ্বর কোথা হইতে আসিল?—এই জগতে যে যে বস্তু আমি দেখিতেছি সে সমস্তই আমার উপভোগের জন্য। তাহাদের অন্য কোন ব্যবহার দেখা যায়-না, সুতরাং নাই-ই! আমি মরিলেই জগৎ অন্তর্হিত হইল! তাই, যতদিন বাঁচি সেই পর্য্যন্ত আজ এটা, কাল ওটা, এইরূপ যাহা কিছু সমস্ত আমার আয়ত্ত করিয়া লইয়া আমার সমস্ত বাসনা কামনা আমি পরিতৃপ্ত করিব। আমি তপ করিলে কিংবা দান করিলে, সবাই আমার যশ ঘোষণা করিবে বলিয়াই আমি তপ করি বা দান করি। এবং আমি রাজসূয় কিংবা অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেও কেবল আমার অধিকার সর্ব্বত্র অবাধিত আছে ইহাই প্রদর্শন করিবার জন্যই করি। সারাংশ,—এই জগতের 'আমি'ই একমাত্র কেন্দ্র; ইহাই সমস্ত নীতিশাস্ত্রের রহস্য; বাকী সব মিথ্যা। "ঈশ্বরোঽহং ভোগীসিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী" (গীতা, ১৬,১৪) আমি ঈশ্বর, আমি ভোগী, আমি সিদ্ধ, আমি বলবান্, আমি সুখী—ইত্যাদি প্রকারে, ষোড়শ অধ্যায়ে আসুরী সম্পদের যে বর্ণনা আছে, তাহা এইরূপ মতাবলম্বী মনুষ্যেরই বর্ণনা। শ্রীকৃষ্ণের পরিবর্ত্তে ইহাদের মধ্যে জাবালীর ন্যায় কোন ব্যক্তি অর্জ্জুনের পাশে বসিয়া অর্জ্জুনকে যদি উপদেশ দিত তাহা হইলে প্রথমেই সে অর্জ্জুনকে মুখথাব্ড়া দিয়া বলিত যে "ওরে তুই কি মূর্খ! যুদ্ধে সকলকে জিতিয়া অনেক প্রকারের রাজভোগ ও বিলাস উপভোগের এই উত্তম সুযোগ পাইয়াও "ইহা করিব কি উহা করিব" এইরূপ ব্যর্থ প্রলাপ কেন বলিতেছিস্? এরূপ সুযোগ আর আসিবে না। কোথাকার আত্মা তা ঠিক্ নেই, আর তুই কিনা আত্মকুটুম্ব নিয়ে বসে আছিস্! ভারী ভুল! তুই হস্তিনাপুরের সাম্রাজ্য সুখে ও নিষ্কণ্টকে ভোগ কর্! ইহাতেই তোর পরম কল্যাণ। নিজের প্রত্যক্ষ ঐহিক সুখ ব্যতীত এই জগতে আর কিছু আছে কি?" কিন্তু অর্জ্জুন এই জঘন্য বাণী স্বার্থসাধু ও নিছক্ আত্মম্ভরী রাক্ষসী উপদেশের অপেক্ষা না করিয়া প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়া রাখিয়াছেন যে—

এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন।
অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিং নু মহীকৃতে॥

"শুধু পৃথিবী কেন, সমস্ত ত্রৈলোক্যের রাজ্যও (এইরূপ বিপুল বিষয় সুখ) যদি (এই যুদ্ধে) আমি পাই তবু তজ্জন্য আমি কৌরবদিগকে বধ করিতে ইচ্ছা করি না। আমার যদি গলা কাটা যায় তাও স্বীকার!" (গী, ১, ৩৫)। অর্জ্জুন আগেই, যে আত্মমৎলবী নিছক্ স্বার্থপরায়ণ আধিভৌতিক সুখবাদ-পন্থার এই প্রকার নিষেধ করিলেন সেই আসুরী মতের কেবল উল্লেখ মাত্রেই তাহার খণ্ডন হয়। লোকের যাই হৌক্ না কেন, কেবল আমার নিজের বিষয়োপভোগসুখকেই পরম পুরুষার্থ মনে করিয়া নীতি ও ধর্ম্মবিসর্জ্জনকারী আধিভৌতিকবাদীদিগের এই অত্যন্ত কনিষ্ঠ পদবীর কর্ম্মযোগ শাস্ত্রসংক্রান্ত সমস্ত গ্রন্থকার ও সাধারণ লোকেরাও এক্ষণে অত্যন্ত অনীতিমূলক ত্যাজ্য ও গর্হিত বলিয়া স্থির করিয়াছেন। অধিক কি, এই পন্থাটি নীতিশাস্ত্র কিংবা নীতিবিচার নামেরও যোগ্য নহে। তাই, এই সম্বন্ধে বেশী আলোচনা না করিয়া আধিভৌতিক সুখবাদীদিগের দ্বিতীয় বর্গের দিকে ফেরা যাক্।

সুস্পষ্ট নগ্ন স্বার্থ বা আত্মোদরভরণসর্ব্বস্বতা জগতে চলেনা। কারণ, আধিভৌতিক বিষয় সুখ প্রত্যেকের অভীষ্ট হইলেও, নিজের সুখ অন্য লোকের সুখভোগের অন্তরায় হওয়ায়, উহা নিজের সুখেরও বিঘ্ন না হইয়া যায় না, এইরূপ প্রত্যেক লোকই নিজের অভিজ্ঞতায় উপলব্ধি করে। তাই, আর কতকগুলি আধিভৌতিক পণ্ডিত এইরূপ প্রতিপাদন করেন যে, নিজের সুখ কিংবা স্বার্থ সাধ্য হইলেও, অন্য লোকদিগকে নিজের মত সাহায্য করা ব্যতীত নিজেরও সুখলাভ হইতে পারে না, তাই নিজের সুখের জন্য, দূরদর্শিতা-সহকারে অন্যের সুখের প্রতিও আমাদের লক্ষ্য করা আবশ্যক এই আধিভৌতিকবাদীদিগকে আমি অন্য বর্গের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণনা করি। নীতির আধিভৌতিক উপপত্তির প্রকৃত আরম্ভ এইখান হইতেই হয়, বলিলেও চলে। কারণ, সমাজ বিধ-

রণের জন্য নীতির বন্ধন চাই না এইরূপ চার্ব্বাকের ন্যায় না বলিয়া, উল্টা ঐ সমস্ত নীতি কেন পালন করা আবশ্যক, আমাদের দৃষ্টিতে তাহার কারণ বলিবার জন্য এই বর্গের অন্তর্গত লোকেরা প্রযত্ন করিয়াছেন। ইহাঁরা বলেন যে, জগতে অহিংসাধর্ম্ম কিরূপে উৎপন্ন হইল কিংবা লোকেরা তাহা কেন পালন করে ইহার সূক্ষ্ম বিচার করিলে, "আমি অন্যকে মারিলে, অন্যেরাও আমাকে মারিবে ও পরে আমার নিকট হইতে সুখ চলিয়া যাইবে" এই স্বার্থমূলক ভয় ব্যতীত তাহার অন্য কোন গভীর কারণ নাই, এইরূপ দেখা যায়; এবং অহিংসাধর্ম্মের ন্যায় অন্য সমস্ত ধর্ম্মই এই স্বার্থমূলক কারণপ্রযুক্তই প্রচলিত হইয়াছে। নিজের দুঃখ হইলে আমরা কাঁদি এবং অন্যের দুঃখে আমাদের দয়া হয়। কেন? আমারও কখন ঐরূপ অবস্থা হইতে পারে এই ভীতি, সুতরাং নিজের ভাবী দুঃখ, মনে আইসে। তাই, পরোপকার, ঔদার্য্য, দয়া, মায়া, কৃতজ্ঞতা, নম্রতা, মৈত্রী প্রভৃতি যে সকল গুণ প্রথম দৃষ্টিতেই লোকের সুখের নিমিত্ত বলিয়া মনে হয়, তাহা মূলত দেখিতে গেলে, আমার নিজেরই সুখের কিংবা নিজেরই দুঃখনিবারণের পর্য্যায় মাত্র। আমার নিজের সঙ্কট উপস্থিত হইলে অন্য লোকেও আমাকে সাহায্য করিবে এই অন্তঃস্থ ধারণা হইতেই, কোন কিছু ঘটিলে অন্যকে আমরা সাহায্য বা দান করিয়া থাকি; এবং আমার উপর লোকেরা দয়া করিবে বলিয়া আমি তাহাদের উপর দয়া করিয়া থাকি। নিদানপক্ষে, লোকেরা ভাল বলিবে এই স্বার্থমূলক হেতুটিও আমাদের মনের মধ্যে নিহিত থাকে। পরোপকার ও পরার্থ এই দুই শব্দ নিছক ভ্রান্তি-মূলক। একমাত্র স্বার্থই সত্য; স্বার্থ অর্থাৎ নিজের সুখলাভ কিংবা দুঃখনিবারণ। মাতা সন্তানকে স্তন্য দেন—তাহার কারণ মাতার প্রেম নহে; তবে তাহার স্তনের স্ফীতি তাহাকে কষ্ট দেয় বলিয়া সেই কষ্ট নিবারণের জন্য কিংবা পরে সন্তানেরা তাহার প্রতি মমতা করিয়া তাহাকে সুখ দিবে এইজন্যই সে এই স্বার্থসাধু উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে,—প্রেম বাৎসল্যাদির ইহাই মূল কারণ! আমার নিজের সুখের জন্য যাহাই হউক না, আরও দূরদৃষ্টিপূর্ব্বক যাহাতে অন্যেরও সুখ হইতে পারে এইপ্রকারের নীতিধর্ম্ম পালন করিতে হইবে—এই পন্থার লোকেরা এইরূপ স্বীকার করেন। এই মতের সহিত চার্ব্বাকমতের গুরুতর প্রভেদ আছে। তথাপি মনুষ্য নিছক বিষয়সুখরূপ স্বার্থের ছাঁচে তোলা পুতুল—সেই যে চার্ব্বাকমত, তাহাও ইহাতে স্থায়ীভাবে রক্ষিত হইয়াছে। ইংলণ্ড হব্‌স্ ও ফ্রান্সদেশে হেল্‌বেশিয়স্ ইহাঁরা এই মত প্রতিপাদন করিয়াছেন। কিন্তু শুধু ইংলণ্ডে নহে, অন্যত্রও এই মতের অনুগামী এক্ষণে বেশী নাই। হব্‌সের নীতিধর্ম্মের উপপত্তি প্রকাশিত হইলে বট্‌লরের * ন্যায় বিদ্বানেরা তাহার খণ্ডন করিয়া এইরূপ সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, সব-শুদ্ধ মানবস্বভাব নিছক্ স্বার্থপর নহে; স্বার্থের ন্যায় ভূতদয়া, প্রেম, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি সদ্‌গুণও ন্যূনাধিক পরিমাণে মনুষ্যের মধ্যে জন্ম হইতেই নিহিত থাকে। এই নিমিত্ত, কোন ব্যবহার কিংবা কর্ম্মের নৈতিক দৃষ্টিতে বিচার করিবার সময়, কেবল স্বার্থের দিকে কিংবা দূরদর্শী স্বার্থের দিকেই না দেখিয়া স্বার্থ ও পরার্থ এইরূপ মানবস্বভাবের যে দুই নৈসর্গিক প্রবৃত্তি সেই দুই দিকেই সর্ব্বদা লক্ষ্য করা আবশ্যক। বাঘিনীর ন্যায় ক্রূর জানোয়ার পর্য্যন্ত আপন বাচ্ছা-দের রক্ষণার্থ যদি প্রাণ দিতে প্রস্তুত থাকে, তবে সকল মনুষ্যের মধ্যে প্রেম কিংবা পরোপকারবুদ্ধি নিছক স্বার্থ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে এরূপ বলা ব্যর্থ; কেবল দূরদর্শী স্বার্থবুদ্ধিতেই ধর্ম্মাধর্ম্মের পরীক্ষা করা শাস্ত্রদৃষ্টিতেও উচিত নহে এইরূপ প্রমাণিত হয়। কেবল সংসারেতেই আসক্ত থাকায় যাহাদের বুদ্ধি পরিশুদ্ধ হয় নাই এইরূপ মনুষ্য এ জগতে অন্যের জন্য যাহা কিছু করে তাহা অনেক সময় আমাদের হিতের জন্যই করিয়া থাকে, এই কথা আমাদের প্রাচীন পণ্ডিতদিগেরও মনে আসি-য়াছিল। "শ্বাশুড়ীর তরে কাঁদে বৌ। মনের ভাব ভিন্নরূপ।" (গা, ২৫৮, ৩,২) এইরূপ তুকারাম বলিয়াছেন। কোন কোন পণ্ডিত হেল্‌বেসি-য়সকেও ছাড়াইয়া গিয়াছেন। উদাহরণ যথা—

* হব্‌সের মত তাঁহার Leviathan গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে; এবং বট্‌লরের মত তাঁহার Sermons on Human nature এই প্রবন্ধে বিবৃত হইয়াছে। হেল্‌-ভেশিয়সের পুস্তকের সারাংশ, মর্‌লি স্বীয় Diderot বিষ-য়ক গ্রন্থে দিয়াছেন। (Vol. II. Chap V.)

মনুষ্যের সমস্ত স্বার্থ ও পরার্থপ্রবৃত্তিই দোষময় হইয়া থাকে—প্রবর্ত্তনালক্ষণা দোষাঃ—এই গৌতম ন্যায়সূত্রের (১, ১, ১৮) বনিয়াদে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্য যে সকল বিধান করিয়াছেন (বে, সূ, শাং, ভা, ২, ২, ৩), তাহার উপর টীকা করিবার সময় আনন্দগিরি এইরূপ লিখিয়াছেন যে, "আপনার মধ্যে কারুণ্যবৃত্তি জাগ্রত হইলে, তাহা হইতে আমাদের যে দুঃখ হয় তাহা দূর করিবার জন্য আমরা লোকের উপর দয়া কিংবা পরোপকার করিয়া থাকি।" আনন্দগিরির এই যুক্তি প্রায় সমস্ত সন্ন্যাসমার্গীর গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায়। সব কর্ম্মই স্বার্থপর অতএব ত্যাজ্য,—ইহাই উহার দ্বারা মুখ্যরূপে সিদ্ধ করিবার চেষ্টা করা হইয়া থাকে। কিন্তু বৃহদারণ্যক উপনিষদে, যাজ্ঞবল্ক্য ও তাঁহার স্ত্রী মৈত্রেয়ী ইঁহাদের মধ্যে দুই স্থানে যে কথোপকথন আছে (বৃ, ২. ৪, ৪. ৫) তাহাতে আর এক চমৎকার রীতিতে এই যুক্তিক্রমই প্রযুক্ত হইয়াছে "আমার অমৃতত্ব কিসে লাভ হইবে?" মৈত্রেয়ীর এই প্রশ্নের উত্তর দিবার সময় যাজ্ঞবল্ক্য তাঁকে এইরূপ বলিলেন যে "মৈত্রেয়ী! স্ত্রী স্বামীকে যে ভালবাসে তাহা স্বামীর জন্য নহে;—আত্মপ্রীত্যর্থই ভাল বাসে। সেইরূপ, পুত্রকে পুত্রের জন্য আমরা ভালবাসি না, আমার নিজের জন্য পুত্রকে ভালবাসি।* ধন সম্পত্তি, পশু কিংবা অন্য সমস্ত পদার্থেও এই নীতি প্রয়োগ হইতে পারে। 'আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বপ্রিয়ং ভবতি'—আত্মপ্রীত্যর্থ সমস্ত পদার্থ আমাদের প্রিয় হইয়া থাকে; এবং সমস্ত প্রেমই যদি এইরূপ আত্মমূলক হয়, তবে আত্মাকে (আমি) প্রথমে চেনা আবশ্যক নহে কি? তাই, 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ'—আত্মা কে (প্রথমে) তাহা দেখ, শোনো, এবং তাহার মনন ও ধ্যান কর" এইরূপ যাজ্ঞবল্ক্যের শেষ উপদেশ। এই উপদেশ অনুসারে আত্মার প্রকৃত স্বরূপ একবার জানিতে পারিলে তাহার পর সমস্ত জগৎই আত্মময় হইয়া গিয়া, স্বার্থ ও পরার্থ এই ভেদও মন হইতে বিলুপ্ত হয়। যাজ্ঞবল্ক্যের এই যুক্তিবাদ হবসের ন্যায় প্রতীয়মান হইলেও, উহা হইতে দুই জনের নিষ্কর্ষিত সিদ্ধান্ত পরস্পরবিরুদ্ধ, ইহা সহজেই উপলব্ধি হইবে। হব্‌স্ স্বার্থকেই প্রাধান্য দেন ও সমস্ত পরার্থ দূরদর্শী স্বার্থ মনে করিয়া, স্বার্থ ব্যতীত এই জগতে আর কিছু নাই—এইরূপ বলেন; এবং যাজ্ঞবল্ক্য 'স্বার্থ' এই শব্দান্তর্ভূত 'স্ব' (আপনি) এই পদের বনিয়াদে অধ্যাত্মদৃষ্টিতে, আমার এক আত্মার মধ্যেই সমস্ত ভূতের ও সমস্ত ভূতের মধ্যেই আমার আত্মার অবিরোধে যেরূপ সমাবেশ হয়, তাহা দেখাইয়া স্বার্থ ও পরার্থ এই উভয়ের মধ্যে অবভাসমান দ্বৈতের বিরোধও ভাঙ্গিয়া দিলেন। সন্ন্যাসমার্গের ও যাজ্ঞবল্ক্যের উপরি-উক্ত মতের বেশী বিচার পরে করা যাইবে। "সাধারণ মনুষ্যের প্রবৃত্তি স্বার্থপর অর্থাৎ আত্মসুখপর হইয়া থাকে" এই এক বিষয়ের ন্যূনাধিক গৌরব করিয়া কিংবা উহা একেবারেই অব্যভিচারী এইরূপ বুঝিয়া আমাদের প্রাচীন গ্রন্থকারেরা উহা হইতেই হব্‌সের উল্টা অন্য সিদ্ধান্ত কিরূপে বাহির করিয়াছেন তাহা দেখাইবার জন্যই এইস্থানে যাজ্ঞবল্ক্যাদির উল্লেখ করিয়াছি।

ইংরেজ গ্রন্থকার হব্‌স্ ও ফরাসী পণ্ডিত হেল্‌ভেসিয়াস্, ইহাঁদের সিদ্ধান্ত অনুসারে, মনুষ্যস্বভাব নিছক্ স্বার্থপর অর্থাৎ তমোগুণী কিংবা রাক্ষসী নহে; স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গে পরোপকার-বুদ্ধিরূপ সাত্ত্বিক মনোবৃত্তিও মনুষ্যের অন্তরে জন্ম হইতেই স্বতন্ত্ররূপে সৃষ্ট হইয়াছে, পরোপকার শুধু দূরদর্শী স্বার্থ নহে;—এইরূপ সিদ্ধ হইলে পর স্বার্থ অর্থাৎ স্ব-সুখ এবং পরার্থ অর্থাৎ অন্যের সুখ এই দুই তত্ত্বের উপরেই সমান দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্যাকার্য্য-ব্যবস্থিতি শাস্ত্রের রচনা করা যাইতে পারে। আধিভৌতিকবাদীদিগের এই তৃতীয় বর্গ। তথাপি কি স্বার্থ কি পরার্থ উভয়ই ঐহিক সুখবাচক, ঐহিক সুখের ওদিকে আর কিছুই নাই, এই আধিভৌতিক মত এই পক্ষেও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

* "What say you of natural affection? Is that also a spieces of self-love? yes; all is self-love. Your children are loved only because they are yours. Your friend for a like reason. And your country engages you only so far as it has connection with yourself." এইরূপ হিউমও স্বকীয় "Degnity or meanness of Human nature" নামক প্রবন্ধে এই যুক্তির উল্লেখ করিয়াছেন। হিউমের নিজের মত ইহা হইতে ভিন্ন।

এইটুকু ভেদ যে, স্বার্থবুদ্ধির ন্যায় পরার্থবুদ্ধিও নৈসর্গিক বলিয়া স্বীকৃত হওয়ায়, নীতির বিচার করিবার সময় স্বার্থের ন্যায় পরার্থকেও আমাদের দেখা কর্ত্তব্য, এইরূপ এই পন্থার লোকেরা বুঝে। সাধারণত স্বার্থ ও পরার্থ ইহাদের মধ্যে বিরোধ উৎপন্ন না হওয়া প্রযুক্ত মনুষ্য যে যে কর্ম্ম করে সেই সেই কর্ম্ম প্রায় সমাজের হিতকরই হইয়া থাকে। এক জন ধনসঞ্চয় করিলে তাহাতে সমস্ত সমাজেরও হিত সাধিত হয়; কারণ, সমাজ অর্থে অনেক ব্যক্তির সমূহ হওয়ায় তদন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তি অন্যের ক্ষতি না করিয়া নিজের লভ্য করিয়া লইলেও তাহাতে সমাজেরই কল্যাণ হয়। এইজন্য নিজের সুখের প্রতি দুর্লক্ষ্য না করিয়া যদি কেহ লোকের হিত সাধন করিতে পারে তাহাই তাহার কর্ত্তব্য,—এইরূপ এই মার্গের লোকেরা স্থির করিয়াছেন। কিন্তু এই পক্ষের লোক পরার্থের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার না করিয়া সব সময়ে নিজের বুদ্ধি অনুসারে, স্বার্থ শ্রেষ্ঠ কি পরার্থ শ্রেষ্ঠ ইহার বিচার করিয়া নিজ অভিপ্রায় প্রকাশ করায়, স্বার্থ ও পরার্থের মধ্যে যখন বিরোধ উপস্থিত হয় তখন লোকের সুখের জন্য নিজের সুখ কতটা বিসর্জ্জন করিবে ইহার নির্ণয়ে গোলযোগে পড়িয়া অনেক সময় মনুষ্যের স্বার্থের দিকে বেশী টানাই সম্ভব হইয়া পড়ে। উদাহরণ যথা,—স্বার্থ ও পরার্থ দুই-ই সমান প্রবল বলিয়া মানিলে সত্যের জন্য প্রাণ দেওয়া কিংবা রাজ্য হারানো দূরের কথা, ধনের ক্ষতি অধিক হইলেও উহা সহ্য করিবে কিনা, ইহা এই মার্গের মতানুসারে নির্ণয় হয় না। কোন উদারচিত্ত ব্যক্তি পরার্থের জন্য নিজের প্রাণ দিলে, এই মার্গাবলম্বী লোক কদাচিৎ তাহার প্রশংসা করিবে। কিন্তু নিজের সম্বন্ধে ঐরূপ প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে স্বার্থ ও পরার্থ এই দুই নৌকায় যে সকল পণ্ডিত সর্ব্বদাই পা দেন তাঁহারা স্বার্থের দিকেই যে অধিক ঝুঁকিবেন তাহা আর বলিতে হইবে না। হব্‌সের অনুসারে পরার্থ স্বার্থেরই দূরদর্শী প্রকারভেদ ইহা না মানিয়া স্বার্থ ও পরার্থ উভয়কেই তৌলে স্থাপন করিয়া উহাদের তারতম্য অনুসারে আমরা নিজের নিজের স্বার্থ খুব চতুরতার সহিত স্থির করিয়া থাকি—এইরূপ বুঝিয়া এই পন্থার লোকেরা আপন মার্গকে * "উচ্চ" বা "জ্ঞানদীপ্ত স্বার্থ" (কিন্তু যাই হোক্ না, উহা স্বার্থই) এইরূপ নাম দিয়া তাহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। কিন্তু ভর্ত্তৃহরি কি বলিতেছেন দেখ—

একে সৎপুরুষাঃ পরার্থঘটকাঃ স্বার্থান্ পরিত্যজ্য যে
সামান্যাস্তু পরার্থমুদ্যমভৃতঃ স্বার্থোঽবিরোধেন যে।
তেঽমী মানবরাক্ষসাঃ পরহিতং স্বার্থায় নিঘ্নন্তি যে
যে তু ঘ্নন্তি নিরর্থকং পরহিতং তে কে ন জানীমহে॥

অর্থাৎ—নিজের লাভ ছাড়িয়া দিয়া যাঁহারা লোকের কল্যাণ করিয়া থাকেন তাঁহারাই প্রকৃত সৎপুরুষ, বলিতে হইবে। স্বার্থ না ছাড়িয়া লোকের জন্য যাহারা চেষ্টা করিয়া থাকেন তাঁহারা সাধারণ পুরুষ, এবং নিজের লাভের জন্য লোকের ক্ষতি যাহারা করে তাহারা মনুষ্য নহে, তাহারা রাক্ষস! কিন্তু ইহাদের পরেও, যাহারা নিরর্থক লোকহিতের নাশ করে, তাহাদের কি নাম দিব তাহা জানি না!" (নী, শ, ৭৪)। রাজ ধর্ম্মের উত্তম অবস্থা বর্ণন করিতে গিয়া কালিদাসও—

স্বসুখনিরভিলাষঃ খিদ্যসে লোকহেতোঃ।
প্রতিদিনমথবা তে বৃত্তিরেবংবিধৈব॥

"নিজ সুখের অভিলাষ না করিয়া তুমি প্রতিদিন লোকহিতের জন্য কষ্ট করিয়া থাক। অথবা তোমার বৃত্তি কিংবা ব্যবসায়ই এইরূপ,"—এই কথা বলিয়াছেন (শকুং, ৫, ৭)। কর্ম্মযোগশাস্ত্রে স্বার্থ ও পরার্থ এই দুই তত্ত্বই স্বীকার করিয়া উহাদের তারতম্যের দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্মের কিংবা কর্ম্মাকর্ম্মের নির্ণয় কেমন করিয়া করিবে, তাহা ভর্ত্তৃহরি কিংবা কালিদাস দেখেন নাই, তথাপি পরার্থের জন্য যাঁহারা স্বার্থ ত্যাগ করেন সেই সব পুরুষকে তাঁহারা যে প্রথম স্থান দিয়াছেন, তাহা নীতিদৃষ্টিতেও ন্যায্য। এই মার্গের লোকেরা, এই সম্বন্ধে এইরূপ বলেন যে, তাত্ত্বিকদৃষ্টিতে পরার্থ শ্রেষ্ঠ হইলেও সনাতন বিশুদ্ধ নীতি কি, ইহা না দেখিয়া সাধারণ ব্যবহারে 'সামান্য' মনুষ্য কি ভাবে কাজ করিবে ইহাই স্থির করিতে হইবে, তাই, জ্ঞানদীপ্ত স্বার্থকে আমরা যে অগ্রস্থান দিই তাহাই ব্যবহারদৃষ্টিতে

* ইংরাজীতে ইহাকে Enlightened self interest বলে। আমি ইহার ভাষান্তরে "উদাত্ত" কিংবা (সেয়ানা) "সুবিজ্ঞ স্বার্থ" করিয়াছি।

সমুচিত। † কিন্তু আমাদের মতে এই যুক্তিক্রমে কোন ফল নাই। বাজারে ব্যবহৃত ওজন মাপে সর্ব্বদাই কিছু কমি বেশী হইয়া থাকে; এই কারণে রাজদরবারে সকলের প্রমাণভূত বলিয়া নির্দ্ধারিত ওজনমাপের উপর যতটা সম্ভব যদি চোখ না রাখা হয় তবে কি আমরা সেই সম্বন্ধে রাজকর্ম্মচারী-দিগের উপর দোষারোপ করি না? কর্ম্মযোগ-শাস্ত্রেও এই নীতি প্রযুক্ত হইতে পারে। নীতি-ধর্ম্মের পূর্ণ, শুদ্ধ ও নিত্য স্বরূপ কি,—ইহার শাস্ত্রীয় নিশ্চয় সম্পাদনার্থই নীতিশাস্ত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে; এবং এই কাজ নীতিশাস্ত্র যদি না করে তবে নীতিশাস্ত্র নিষ্ফল বলিতে হইবে। 'জ্ঞানা-লোকিত স্বার্থ'—ইহা সাধারণ মনুষ্যের মার্গ—এই-রূপ সিজ্‌বিক্ যে বলেন, তাহা কিছু মিথ্যা নহে। ভর্ত্তৃহরিও তাহাই বলেন। কিন্তু এই সাধারণ লোকদিগেরও পরাকাষ্ঠা-নীতিমত্তা সম্বন্ধে কিরূপ মত তাহা যদি অনুসন্ধান করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে সিজ্‌বিক্ "জ্ঞানদীপ্ত স্বার্থের" যে মহত্ত্ব দিয়াছেন, তাহা ভ্রান্তিমূলক এবং নিষ্কলঙ্ক নীতির মার্গ কিংবা সৎপুরুষ অনুসৃত আচরণের মার্গ—ইহা সাধারণ স্বোদর-পূরণ মার্গ হইতে ভিন্ন,—এই-রূপ সাধারণ লোকেরও ধারণা। এবং এই অর্থই উপরি-উক্ত শ্লোকে ভর্ত্তৃহরি বিবৃত করিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

† Sidgwick's Methods of Ethics, Book I. Chap. II. § 2, pp 18-29, also Book Iv. Chap. Iv § 3 P. 474. এই তৃতীয় পন্থা Sidgwick বাহির করিয়াছেন এরূপ নহে, সাধারণ সুশিক্ষিত ইংরেজ লোক প্রায় এই পন্থারই অনুগামী; ইহার Common sense morality এইরূপ নামও আছে।

পরাজয়।

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এ)

এমনি করেই তৈরি হচ্চে পথটা গো
এমনি করেই তৈরি হচ্চে পথ—
বুকের রক্তে রাঙিয়ে তোমার তৈরি হচ্চে পথ
ওগো চল্‌বে তোমার রথ।
ব্যথা দিয়েই হচ্চে মাটী পেষা গো
পথটা হচ্চে পেটা
অশ্রুধারার বন্যাজলে হচ্চে বারি ছিটা গো
হচ্চে বারি ছিটা!
এম্‌নি দারুণ আগমনী গো—
এম্‌নি ভীষণ আগমনী
ওগো রুদ্র বাজাও শঙ্খধ্বনী
তুমি শোনাও তোমার বাণী
এমনিতর বুকের রক্ত তরল করে ছানি!
ওগো বল্‌ব আমি কি
রেখেছ বা কি বাকি
চরম করে মরণ-বাণে বিঁধেছ
এখনো সেই পথটী তোমার হল না কি?
ওগো চল্‌বে তোমার রথ—
আমি নইলে রথটী তোমার
সর্‌বে কি গো পথ
রশি সে তো আর কিছু নয়
আমারি মনোরথ।
তবুও রুদ্র জয় হবে তা জানি
শেষকালে হার—আমিই হার্‌বো মানি
তবু তোমায় বলি
ওগো প্রিয়, আর কত দিন
এমনে রাখ্‌বে ফেলি
ওগো এসো এসো এসো আমার
মরমখানি চরণপাতে দলি।
তোমা তরেই চেয়ে আছি আমি
ব্যথা দিয়েই এসো প্রাণে নামি॥

তন্ত্রে তত্ত্বপদার্থ।

(শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ)

বিভিন্ন তন্ত্রসম্মত তত্ত্ব বা মৌলিক পদার্থের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। মৌলিক পদার্থের প্রভেদানুসারে উৎপত্তিপ্রক্রিয়ারও পার্থক্যের পরিচয় পাওয়া যায়। শৈবাগমসম্মত ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্ব, বৈষ্ণবাগমসম্মত দ্বাত্রিংশত্তত্ত্ব, মৈত্রাগমসম্মত বা সাংখ্য-সম্মত চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব, প্রাকৃতাগমসম্মত দশতত্ত্ব এবং ত্রৈপুরাগমসম্মত সপ্ততত্ত্ব বিবেচিত হইয়াছে।

সাংখ্যপ্রসিদ্ধ চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব এবং শিব, শক্তি সদাশিব, ঈশ্বর, বিদ্যা, মায়া, কাল, নিয়তি, কলা, বিদ্যা ও রাগ; এই ষট্‌ত্রিংশ তত্ত্ব শৈবতত্ত্ব নামে

প্রসিদ্ধ।* (এই স্থানে ঈশ্বর শব্দের পর যে বিদ্যা শব্দ পঠিত হইয়াছে, উহার অর্থ শুদ্ধ বিদ্যা।)

ইহাদের মধ্যে শৈবতত্ত্বেরই বিস্তৃত বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। সাংখ্যসম্মত চতুর্ব্বিংশতি পদার্থ যেমন প্রকৃতি, বিকৃতি এবং প্রকৃতি-বিকৃতি নামে পরিভাষিত হইয়াছে, সেইরূপ শৈবতত্ত্বগুলিও শুদ্ধ, শুদ্ধাশুদ্ধ ও অশুদ্ধ এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। শিব, শক্তি, সদাশিব, ঈশ্বর ও বিদ্যা এই পাঁচটি তত্ত্ব শুদ্ধ ; মায়া, কাল, নিয়তি, কলা, বিদ্যা, রাগ ও পুরুষ এই সপ্ততত্ত্ব শুদ্ধাশুদ্ধ ; এবং প্রকৃতি, বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চমহাভূত এই চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব বা পদার্থ অশুদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। শারদাতিলকে এই বিষয়ের প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। রাঘবভট্ট তত্ত্বের শুদ্ধত্বসম্বন্ধে হেতু প্রদর্শন করিয়াছেন যে, আণব, কার্ম্মণ এবং মায়ীয় এই ত্রিবিধ মলের সম্বন্ধরহিত পদার্থই শুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। প্রদর্শিত পঞ্চপদার্থে উক্ত ত্রিবিধ মলের সম্বন্ধ নাই, অতএব উহারা শুদ্ধতত্ত্ব। মলত্রয়ের বিবরণ ভাস্করায়কৃত সেতুবন্ধ নামক রামকেশ্বর তন্ত্র-টীকায় কথিত হইয়াছে, যথা—অণু কর্ম্ম ও মায়া এই তিন প্রকার পাশ, তন্মধ্যে অণু শব্দের অর্থ অজ্ঞান। এই অজ্ঞান দুই প্রকার,—এক, চৈতন্যস্বরূপ আত্মাতে আত্মজ্ঞানের অভাব, অপর, অনাত্ম দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি, অর্থাৎ প্রকৃত আত্মাকে আত্মা বলিয়া মনে না করিয়া অনাত্মাকে আত্মা বলিয়া জ্ঞান করা। এই দ্বিবিধ অজ্ঞানই মিলিতভাবে আণব মল বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। ইহার অণু নাম এবং মল সংজ্ঞা হইল কেন, তাহার কারণ সৌরসংহিতা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। যথা—"আত্মনোঽণুত্বহেতুত্বাদণুর্মালিন্যতোমলম্" অপরিচ্ছিন্ন আত্মার অণুত্ব সম্পাদন করে বলিয়া অর্থাৎ জীবভাবে আত্মার সূক্ষ্মতা প্রতিভাত করে বলিয়া অজ্ঞান অণু নামে অভিহিত হয়, এবং নির্লেপ আত্মাতে মালিন্য সঞ্চার করে বলিয়া মল নামে কথিত হয়।

বিহিত নিষিদ্ধ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান জন্য শরীর সম্পাদন-সমর্থ যে অদৃষ্ট উৎপন্ন হয়, তাহার নাম কর্ম্ম। (সমস্ত আস্তিক দর্শনের মতেই পুণ্যপাপের ফলেই বিবিধ যোনিতে জন্ম হইয়া থাকে।) কর্ম্ম দুই প্রকার—পুণ্য ও পাপ ; এই উভয়ই "কার্ম্মণ" মল নামে অভিহিত হইয়াছে। এক আত্মার যে নানাত্ব অর্থাৎ নানাত্বজ্ঞান, তাহার কারণ মায়া। এই মায়া অনেক প্রকার হইলেও মিলিত হইয়া মায়ীয় মল নামে অভিহিত হইয়াছে।

উক্ত মলত্রয়ের বিবরণ "শিবসূত্র নামক * শৈব দর্শনের "জ্ঞানং বন্ধঃ", ১। ২ এই সূত্রে এবং উহার বিমর্শিনী নামক টীকায় বিস্তৃত ভাবে কথিত হইয়াছে। পরন্তু তথায় কার্ম্মণ শব্দের পরিবর্ত্তে কার্ম্ম এইরূপ প্রয়োগ দেখা যায়। প্রাসঙ্গিক বিষয়ের পল্লবনা পাঠকের অপ্রীতিকর হইতে পারে, এই ভয়ে শিবসূত্রের অধিক প্রমাণ এবং ব্যাখ্যা এই স্থলে প্রদত্ত হইল না। বিশেষতঃ ভাস্কর রায়ের বাক্যাবলী শিবসূত্র বিমর্শিনীরই প্রতিধ্বনি মাত্র।

শিব হইতে বিদ্যা পর্য্যন্ত পাঁচটী পদার্থ কারণরূপে বিবেচিত হইয়াছে, অতএব ইহারাও শুদ্ধতত্ত্ব।

---

* জগৎকে যিনি অভেদরূপে দর্শন করেন, অর্থাৎ যিনি সমস্ত জগতই আমার শরীর এইরূপ মনে করেন, তিনি সদাশিব। আবার যিনি জগৎকে নিজ হইতে ভিন্নরূপে দর্শন করেন, তিনি ঈশ্বর। জগৎ ও আত্মা এতদুভয়ের অভেদবুদ্ধি শুদ্ধবিদ্যা এবং এতদুভয়ের ভেদবুদ্ধির নাম মায়া। পরব্রহ্মেতে বর্ত্তমান সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব, নিত্যতৃপ্তত্ব, নিত্যত্ব ও স্বতন্ত্রত্ব এই পঞ্চনামে প্রসিদ্ধ নিরবগ্রহ (অপ্রতিহত অর্থাৎ যাহাকে কেহই বাধা দিতে পারে না এইরূপ) পাঁচটি শক্তিরূপ দেবতা আছেন। ইহারা সাবগ্রহ অর্থাৎ কিঞ্চিৎ প্রতিবন্ধকযুক্ত হইয়া যখন সঙ্কুচিত হন, যখন শক্তির কিছু হ্রাস হয়, তখন ক্রমে কলা, বিদ্যা, রাগ, কাল ও নিয়তি এই পঞ্চসংজ্ঞা প্রাপ্ত হন।

উক্ত ষট্‌ত্রিংশৎ তত্ত্ব আবার আত্মতত্ত্ব বিদ্যাতত্ত্ব ও শিবতত্ত্ব, এই তিন তত্ত্বের অন্তর্নিবিষ্ট। এতত্ত্রিতয়ের সমষ্টি তুরীয়তত্ত্ব নামে অভিহিত হইয়াছে। যথা—

"মায়ান্তমাত্ম-তত্ত্বং বিদ্যাতত্ত্বং সদাশিবান্তং সাৎ।
শক্তিশিবৌ শিবতত্ত্বং তুরীয়তত্ত্বং সমষ্টি রেতেষাম্।"

ক্ষিতি হইতে মায়া পর্য্যন্ত একত্রিংশৎ পদার্থ আত্মতত্ত্ব নামে কথিত, শুদ্ধবিদ্যা, ঈশ্বর ও সদাশিব এই তিন পদার্থ বিদ্যাতত্ত্ব নামে অভিহিত, এবং শিব ও শক্তি এই উভয় পদার্থ শিবতত্ত্ব নামে পরিভাষিত হইয়াছে। ইহাদের সমষ্টিই তুরীয়তত্ত্ব বা সর্ব্বতত্ত্ব। পৃথিবী হইতে মায়া পর্য্যন্ত পদার্থসমূহে সৎরূপ অর্থাৎ ব্রহ্মের সত্তারূপ অংশ প্রকটিত ভাবে আছে, কিন্তু চিদংশ ও আনন্দাংশ আবৃত অর্থাৎ চৈতন্যের এবং আনন্দের অভিব্যক্তি নাই ; অতএব ইহারা আত্মতত্ত্ব। শুদ্ধবিদ্যা, ঈশ্বর ও সদাশিব, এতত্ত্রিতয়ে সচ্চিদংশ অভিব্যক্ত এবং আনন্দাংশ আবৃত, অতএব ইহারা বিদ্যাতত্ত্ব। শিব ও শক্তি এতদুভয়ে সৎ চিৎ ও আনন্দ ব্রহ্মের এই তিন অংশই সমভাবে প্রকটিত আছে। সুতরাং ইহারা শিবতত্ত্ব নামে অভিহিত।

* "শিবসূত্র" সাক্ষাৎ শিবকৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ। বসুগুপ্ত নামক পরম শৈব স্বপ্নযোগে শিবের আদেশক্রমে জানিয়াছিলেন যে মহাদেবগিরির উপত্যকাতে মহতী শিলা অবস্থিত। উহার অপর পার্শ্বে শিবসূত্র উৎকীর্ণ আছে। অনন্তর তিনি সেই শিলা হইতে সূত্রগুলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই শিলা অদ্যাপি "শঙ্করোপল" নামে প্রসিদ্ধ আছে। অভিনব গুপ্তের শিষ্য ক্ষেমরাজ এই সূত্রের উপরে শিবসূত্র-বিমর্শিনী নামক টীকা লিখিয়া গিয়াছেন।

মায়া হইতে পুরুষ পর্য্যন্ত সপ্ততত্ত্ব শুদ্ধাশুদ্ধ অর্থাৎ কার্য্য ও কারণ এবং মলত্রয়ের সম্বন্ধ যুক্ত। ইহারা পূর্ব্বকথিত তত্ত্বের কার্য্য এবং পরবর্ত্তী পদার্থের কারণ, অতএব ইহারা শুদ্ধাশুদ্ধ। প্রকৃতি হইতে পঞ্চ মহাভূত পর্য্যন্ত অশুদ্ধতত্ত্ব বলিয়াই কথিত হইয়াছে, কারণ উহারা পূর্ব্বকথিত তত্ত্বের কার্য্য এবং মলত্রয়ের সম্বন্ধযুক্ত।

এই সমস্ত শৈবতত্ত্বের উৎপত্তিপ্রণালী মাধবাচার্য্যকৃত "কালমাধবে" ভোজদেবের "তন্ত্রনিবন্ধ" হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। "ভোজরাজ শিব, শক্তি, সদাশিব, ঈশ্বর ও বিদ্যা এই পাঁচটি শুদ্ধতত্ত্বের নির্দ্দেশ করিয়া অন্যান্য তত্ত্বগুলিকে মায়ার কার্য্যরূপে নির্দ্দেশ করিবার সময়ে কালের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—জগতের নির্ম্মাণের জন্য শিবসংযুক্ত মায়া হইতে কাল, নিয়তি, কলা, বিদ্যা ও রাগ এই পঞ্চতত্ত্বের উৎপত্তি হইয়াছে। ভোজরাজ মায়ার সহিত এই একাদশতত্ত্ব এবং সাংখ্যপ্রসিদ্ধ পঞ্চবিংশতিতত্ত্বের উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন যে, নানাবিধ শক্তিময়ী সেই মায়া প্রথমত কালতত্ত্বকেই সৃষ্টি করিয়াছেন। *

রাঘবভট্ট বায়বীয় সংহিতার প্রমাণ হইতে দেখাইয়াছেন যে, শিব হইতে শক্তি, শক্তি হইতে নাদ, নাদ হইতে বিন্দুরূপী সদাশিব উৎপন্ন হইয়াছেন এবং সদাশিব হইতে মহেশ্বর, মহেশ্বর হইতে শুদ্ধা বিদ্যা উৎপন্ন হইয়াছেন। †

এই পঞ্চবিধ শুদ্ধতত্ত্বের উৎপত্তি কথনের পর অশুদ্ধতত্ত্বের উৎপত্তি সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে যে, বাগীশ্বর নামক মহাদেবের বাগীশ্বরী নাম্নী যে শক্তি আছেন, যিনি বর্ণস্বরূপে মাতৃকা নামে অভিহিত হইয়া আবির্ভূত হন, তিনিই শিবের সংযোগবলে মায়ার সৃষ্টি করেন। অনন্তর মায়া হইতে কাল, তৎপর নিয়তি কলা, বিদ্যা, এবং কলা হইতে রাগ ও পুরুষ এই ক্রমে উৎপন্ন হইয়াছে। *

উৎপন্ন তত্ত্বসমষ্টির মধ্যে সদাশিব পঞ্চমূর্ত্তিতে বিভক্ত, এই পঞ্চমূর্ত্তির দ্বারা তিনি জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, ধ্বংস, নিগ্রহ ও অনুগ্রহ এই পাঁচ প্রকার কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। † উক্ত পঞ্চকর্ম্মসম্পাদক পঞ্চমূর্ত্তি যথাক্রমে ঈশান, তৎপুরুষ, অঘোর, বামদেব ও সদ্যোজাত এই পঞ্চ নামে অভিহিত হইয়াছেন। মাধবাচার্য্য "ন্যায়মালা বিস্তরের" উপক্রমে বুক্কন নরপতির সর্ব্বজ্ঞতা প্রতিপাদনাভিপ্রায়ে শৈবাগমোক্ত রহস্যের উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, "সমস্ত উপনিষদে যে ব্রহ্ম প্রতীয়মান হন, তিনিই শৈবাগমে সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার, নিরোধ ও অনুগ্রহ এই পাঁচপ্রকার ক্রিয়া নিষ্পাদনের জন্য ঈশান, তৎপুরুষ, অঘোর, বামদেব ও সদ্যোজাত এই পাঁচ প্রকার মূর্ত্তির প্রথা (প্রসিদ্ধি অথবা বিস্তার) প্রকটিত করেন, ইহা প্রতিপাদিত হয়। সেই মূর্ত্তিসকলের মধ্যে এই বুক্কন রাজ স্থিতিমূর্ত্তি ধারণ করিতেছেন। সেই মূর্ত্তির অর্থাৎ নরপতিরূপধারী স্থিতিমূর্ত্তির আত্মাতে (অন্তঃকরণে) স্ফুরিত মূর্ত্তি বিদ্যাতীর্থ মুনি (রাজ গুরু) সমস্ত জগতের অনুগ্রাহিকা মূর্ত্তি বলিয়া কথিত হইয়াছেন। যেহেতু এই রাজা বেদান্তোক্ত পরং ব্রহ্ম, যেহেতু ইনি আগমোক্ত মহেশ্বরের স্থিতিমূর্ত্তি, যেহেতু বিদ্যাতীর্থ মুনি ইঁহার অন্তঃকরণে সন্নিহিত হইয়া প্রকাশ পাইতেছেন, অতএব এই রাজার সর্ব্বজ্ঞত্ব অবিসংবাদে সকলের হৃদয়েই প্রতিভাত হয়"। ‡

মাধবাচার্য্যের এই উক্তি হইতে প্রতীয়মান হয়

---

* ভোজরাজঃ শুদ্ধানি পঞ্চতত্ত্বানি শিব-শক্তি-সদাশিবেশ্বর-বিদ্যাখ্যানি নির্দ্দিশ্যেতরাণি নির্দ্দিশন্মায়াকার্য্যোক্তিপূর্ব্বকমেব কালং নিরদিক্ষৎ।

"পুঃ সো জগতঃ ক্রিয়তে মায়াত স্তত্ত্বপঞ্চকং ভবতি।
কালো নিয়তি শ্চ তথা কলাচ বিদ্যাচ রাগ শ্চেতি॥"

তানি মায়াসহিতান্যেকাদশতত্ত্বানি সাংখ্যপ্রসিদ্ধ পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানি চোদ্দিশ্য ক্রমেণ বিবৃণ্বন্নিদমাহ—

"নানাবিধশক্তিময়ী মা জনয়তি কালতত্ত্বমেবাদৌ।"
[কালমাধব]

† শিবঃ শক্তি স্ততো নাদ স্তস্মাদ্বিন্দুঃ সদাশিবঃ।
তস্মান্মহেশ্বরো জাতঃ শুদ্ধা বিদ্যা মহেশ্বরাৎ॥

* সা বাচামীশ্বরী শক্তি র্বাগীশাখ্যা সা শূলিনঃ।
যা সা বর্ণস্বরূপেণ মাতৃকেতি বিজৃম্ভতে॥
অথানন্তসমাযোগান্মায়ায়াঃ কালমবাসৃজৎ।
নিয়তিঞ্চ কলাং বিদ্যাং কলাতো রাগ-পুরুষৌ॥

† সৃষ্টি-স্থিতি-ধ্বংস-নিগ্রহানুগ্রহকার্য্যপঞ্চককর্ত্তা অতএব জগন্নির্ম্মাণবীজরূপো জগৎসাক্ষী সদাশিবো জাতঃ।
[রাঘবভট্ট]

‡ যদ্‌ব্রহ্ম প্রতিপাদ্যতে প্রগুণয়ন্তৎপঞ্চমূর্ত্তিপ্রথাম্
তত্রায়ং স্থিতিমূর্ত্তিমাকলয়তি শ্রীবুক্কণক্ষ্মাপতিঃ।
বিদ্যাতীর্থমুনি স্তদাত্মনি লসন্মূর্ত্তিং স্বনুগ্রাহিকা
তেনাস্য স্বগুণৈ র্যথোদিতপদং সার্ব্বজ্ঞ্য মুদ্যোততে॥
[জৈমিনীন্যায়মালা]

যে, বেদান্তে যিনি ব্রহ্ম বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছেন, তিনিই তন্ত্রশাস্ত্রে পঞ্চমূর্ত্তিতে বিভক্ত সদাশিব নামে অভিহিত হইয়াছেন।

এই স্থলে একটা কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, তন্ত্রশাস্ত্রে উৎপত্তিসম্বন্ধে যাহা কথিত হইয়াছে তাহা সদুৎপত্তিবাদি সাংখ্যমতের তুল্য। এই মতে প্রলয়সময়ে সমস্ত পদার্থই মায়াবচ্ছিন্ন শিবে কাষ্ঠসংশ্লিষ্ট জতুর ন্যায় লীন হইয়া থাকে। অনন্তর সৃষ্টি সময়ে তিল হইতে তৈলের ন্যায় জগতের যাবতীয় পদার্থের আবির্ভাব হয় মাত্র। সুতরাং এই উৎপত্তি আরম্ভবাদি নৈয়ায়িক-বৈশেষিকাভিমত উৎপত্তির মত নহে *। ইহাতে মায়ার কথা আছে সত্য, কিন্তু উহা বেদান্তসম্মত মায়ার মত তুচ্ছ পদার্থ নহে। সুতরাং উহার কার্য্য পদার্থনিবহও মরীচিকার ন্যায় ভ্রমমাত্রের বিষয় নহে, উহাদের সত্তা রহিয়াছে।

তান্ত্রিক দর্শনে কালের উৎপত্তি স্বীকার করা হইয়াছে, অথচ শারদাতিলকের ১ম পটলের পঞ্চদশ শ্লোকে কালসহকৃত পরম শিব হইতে সদাশিবের উৎপত্তি কথিত হইয়াছে; ইহাতে আপাততঃ বিরোধ প্রতিভাত হয় যে, কাল যদি উৎপন্ন পদার্থ হয়, তবে প্রলয়সময়ে তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং জগতের সাক্ষী সদাশিবের উদ্ভব সময়ে কালের সহকারিতা সম্ভব হয় না। এই বিরোধের পরিহারাভিপ্রায়ে রাঘবভট্ট অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, "মহাপ্রলয় সময়েও প্রকৃতির এবং কালের অবস্থিতি স্বীকৃত হইয়াছে, অতএব ইহাদেরও আপেক্ষিক নিত্যতা আছে। পারমার্থিক নিত্যত্ব একমাত্র পুরুষেরই বুঝিতে হইবে, কারণ সংহৃতি সময়ে অর্থাৎ প্রলয়কালে ক্রমে যাবতীয় পদার্থের বিনাশ পুরুষ পর্য্যন্তই বর্ণিত হইয়াছে; একমাত্র পুরুষেরই ধ্বংস হয় না। প্রলয় সময়েও বিষ্ণুর কালস্বরূপ রূপ বর্ত্তমান থাকে, এই মতটি বিষ্ণু পুরাণেও দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং শারদাতিলকে বর্ণিত মতও তাহারই অনুরূপ মনে হয়।

কালের নিত্যত্ববাদি-বৈশেষিকের মত উপেক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে মাধবাচার্য্য বলিয়াছেন যে, "যদি মনে কর মহামুনি কণাদ মহাতপস্যার দ্বারা শিবের আরাধনা করিয়া সর্ব্বজ্ঞত্বপদ লাভ করিয়া বেদের তাৎপর্য্য সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়াছিলেন, সুতরাং মন্দবুদ্ধিরা বেদের যেরূপ অর্থ বুঝিয়া থাকে, তাহারই অর্থান্তর কল্পনাসঙ্গত, অর্থাৎ কণাদাভিমত কালের নিত্যত্ব মতই সমীচীন, এমত হইলেও যাঁহার প্রসাদে কণাদ মুনি সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, সেই শিবই মুখ্য সর্ব্বজ্ঞ, অতএব তাঁহার মতানুসারে কণাদমতেরই অন্যথা কল্পনা অত্যন্ত উচিত। যে হেতু, শিব সমস্ত আগমে ষট্‌ত্রিংশতত্ত্ব নিরূপণ করিবার সময়ে কালতত্ত্বের উৎপত্তি স্বীকার করিয়াছেন" *।

বৈষ্ণবতত্ত্ব—জীব, প্রাণ, বুদ্ধি, চিত্ত, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্রা, পঞ্চমহাভূত, হৃৎপদ্ম, তেজস্ত্রয় (অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য) চতুর্ব্যূহ অর্থাৎ বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ। এই দ্বাত্রিংশৎ পদার্থ বৈষ্ণবতত্ত্ব বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

মৈত্রতত্ত্ব বা সাংখ্যতত্ত্ব—পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চমহাভূত, দশ ইন্দ্রিয়, মন, অহঙ্কার, বুদ্ধি এবং প্রকৃতি এই চতুর্ব্বিংশতি পদার্থ সাংখ্যতত্ত্ব বলিয়া কথিত হইয়াছে।

প্রাকৃততত্ত্ব—নিবৃত্তি প্রভৃতি পঞ্চকলা, বিন্দু, কলা, নাদ, শক্তি এবং সদাশিব এই দশটি প্রকৃতির বা শক্তির কলা।

ত্রৈপুরতত্ত্ব—আত্মতত্ত্ব, বিদ্যাতত্ত্ব, শিবতত্ত্ব (আবার ব্যুৎক্রমে) শিবতত্ত্ব, বিদ্যাতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব এবং সর্ব্বতত্ত্ব এই সপ্ত পদার্থ ত্রিপুরসুন্দরী বা শ্রীবিদ্যার তত্ত্ব বলিয়া পরিভাষিত হইয়াছে।

প্রদর্শিত তত্ত্বগুলির মধ্যে অল্পসংখ্যক তত্ত্বের মধ্যে অন্যান্যতত্ত্বের অন্তর্নিবেশ বুঝিতে হইবে। আচার্য্যগণ এই সমস্ত বিষয়ের সামঞ্জস্যরক্ষণে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। আমরা উহা ক্রমে দেখাইতে চেষ্টা করিব। উক্ত তত্ত্বভেদের সহিত তান্ত্রিক উপাসনারও সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ; তাহাও ক্রমে প্রতিপাদিত হইবে।

* নৈয়ায়িক বৈশেষিক মতে পরমাণু নিত্য পদার্থ, তাহা হইতেই দ্ব্যণুকাদিক্রমে জগতের উৎপত্তি হয়। সুতরাং পূর্ব্বে যাহা ছিলনা তাহারই উৎপত্তি হয়। এই মতটি শঙ্করভাষ্যে আরম্ভবাদ নামে কথিত হইয়াছে।

* অথ মন্যসে, মহতা তপসা শিবমারাধ্য তৎপ্রসাদলব্ধসর্ব্বজ্ঞত্বপদঃ কণাদমহামুনি র্ব্বেদতাৎপর্য্যং সম্যগ্ বেত্তীতি বেদস্যৈব মন্দমতিপ্রতীতাদর্থাদর্থান্তরং নেতব্যমিতি, এবমপি যস্য প্রসাদাদয়ং সর্ব্বজ্ঞতামলভত স এব শিবো মুখ্যঃ সর্ব্বজ্ঞ ইতি তন্মতানুসারেণ কণাদমতস্যৈবান্যথানয়ন মত্যন্তমুচিতম্। শিবোহি সর্ব্বেষাগমেষু ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বানি নিরূপয়ন্, কালতত্ত্বস্যোৎপত্তিমঙ্গীচকার। (কালমাধব)

আনন্দ।

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এ)

আনন্দ তাঁর জড়িয়ে আছে
প্রতি ফুলে ফুলে
আনন্দ তাঁর ছড়িয়ে গেছে
তৃণে তরুর মূলে।
আনন্দ তাঁর উঠ্‌ছে বেজে
নীল আকাশের নীরব গানে
বাতাসের ঐ করুণ তানে
তপন তারার দোলে!
আনন্দ তাঁর উঠ্‌ছে ফুটে
নিখিল বেদন-জটা টুটে
অশ্রুমণির মালা হয়ে
ঝর্‌চে বুকের তলে!
আনন্দ তাঁর মূর্ত্তি ধরি
আস্‌চে আমার জীবন 'পরি
দুঃখ সুখের সাজে, দুয়ার
দিচ্চে খুলে খুলে॥

বঙ্গদেশ ও বঙ্গভাষা।

(শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী)

অনেক প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে বঙ্গদেশের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মনুসংহিতায় আর্য্যাবর্ত্তের যে সীমা নির্দ্দেশ করা আছে—তাহাতে বঙ্গদেশ আর্য্যাবর্ত্তের অন্যান্য প্রদেশের মধ্যে আপনার আসন প্রাপ্ত হইয়াছে। স্মরণাতীত কাল হইতে বঙ্গদেশ আর্য্য সভ্যতালোকে আলোকিত হইয়া ভারতবর্ষের একটী বিশিষ্ট প্রদেশ বলিয়া পরিগণিত। অতি প্রাচীন যুগের ইতিহাসের সহিত বঙ্গদেশের ইতিহাসের বিশেষ সম্পর্ক আছে। এই দেশের ভাষা ও সাহিত্য সেই প্রাচীন আর্য্য ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত। সংস্কৃত ভাষা নানাবিধ বিবর্ত্তন পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া চালিত হইয়া প্রাদেশিক ভাষা সমূহের সৃষ্টি করিয়াছে। সংস্কৃত ভাষার উপরে কোন কোন স্তর পড়িয়া যে বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে তাহা যথার্থরূপে নিরূপণ করিবার উপায় নাই।

আদিযুগ ও পৌরাণিক যুগে বঙ্গদেশের ভাষা ভিন্ন ছিল না। তখন ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র একই সংস্কৃত ভাষা লিখিত ও কথিত হইত। বঙ্গদেশে ও অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় সংস্কৃত ভাষারই সমধিক চর্চ্চা ছিল। জগতের সমস্ত চলিত ভাষার সাধারণতঃ দুইটী করিয়া শ্রেণী থাকে—একটী ঐ ভাষার ব্যাকরণসঙ্গত সাধু প্রয়োগ এবং অন্যটী কথোপকথনাদিতে প্রযুক্ত সাধারণের ভাষা। এই সাধারণ নিয়মানুসারে প্রাচীন আর্য্যাবর্ত্তেও দুই শ্রেণীর ভাষা ব্যবহৃত হইত। ঋষিগণ যে ভাষায় পুরাণ সংহিতাদি রচনা করিতেন, মহাকবিগণ যে ভাষায় কাব্যাদি প্রণয়ন করিতেন তাহার নাম ছিল সংস্কৃত এবং স্ত্রীলোক ও জনসাধারণ যে ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিত তাহার নাম ছিল প্রাকৃত। কথিত ভাষা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নরূপে ব্যবহৃত হয়। আমাদের বর্ত্তমান বাঙ্গলা ভাষা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে কিরূপ রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। পশ্চিম বঙ্গের কথাবার্ত্তার ভাষা এবং চট্টগ্রামের খালাসীগণ যে ভাষায় কথোপকথন করিয়া থাকে তাহা যদি পাশাপাশি করিয়া দেখা যায় তাহা হইলে ঐ দুইটী ভাষা যে একই ভাষা হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে তাহা কখনই মনে হইবে না।

ভূতত্ত্ব আলোচনা করিলে দেখা যায় যে নানা প্রকার মৃত্তিকাস্তরের সহযোগে বর্ত্তমান ভূখণ্ড সংগঠিত। কতপ্রকার পরিবর্ত্তন যে ইহার উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া ইহার বর্ত্তমান আকার গঠনের সহায়তা করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ভাষাতত্ত্বও এই ভূতত্ত্বের ন্যায় দুর্জ্ঞেয়। প্রত্যেক ভাষার উপর দিয়াও এইরূপ প্রবল পরিবর্ত্তনের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে এবং হইবে। যে ভাষায় কথাবার্ত্তা হয় বা পুস্তকাদি প্রণয়ন হয় সে ভাষা চিরদিনই পরিবর্ত্তনশীল। বর্ত্তমানকালে পৃথিবীতে যে কয়টী ভাষা চলিত আছে তাহাদের প্রত্যেকটী প্রাচীন ভাষা (classical language) হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। প্রাচীন ভাষা বলিতে সংস্কৃত, জেন্দ, গ্রীক ও ল্যাটিন বুঝায়। আধুনিক প্রত্যেক ভাষায় এই সকল প্রাচীন ভাষার এবং সেই সকল ভাষায় লিখিত সাহিত্যের বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

যেমন প্রাচীন ভাষা সমূহ হইতে আধুনিক ভাষার সংগঠন হইয়াছে সেইরূপ প্রাচীন ভাষাসমূহও যে একই ভাষার শাখা তাহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। বৈদিক যুগের আর্য্যগণ যে ভাষা ব্যবহার করিতেন তাহা যথার্থ সংস্কৃত ভাষা নহে। সেই ভাষাই বিশেষভাবে পরিবর্ত্তিত ও সংস্কৃত হইয়া সংস্কৃত ভাষায় রূপান্তরিত হইয়াছে। সংস্কৃত হইবার পূর্ব্বে যে ভাষা ছিল তাহার নাম আর্য্যভাষা। এই আর্য্যভাষা আর্য্য সভ্যতার অনুগামী হইয়া দেশ বিদেশে বিভিন্নভাষা, সাহিত্য ও সভ্যতার ধারা বিকীর্ণ করিয়াছে। ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ এইরূপ সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে সংস্কৃত ভাষায় দুইটী শ্রেণী ছিল, একটী লিখিবার ভাষা সংস্কৃত, আর একটী কথা কহিবার ভাষা প্রাকৃত। এই প্রাকৃত কালক্রমে এবং দেশভেদে প্রাদেশিক ভাষাসমূহে পরিণত হইয়াছে। ভাষাতত্ত্বের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া যদি বাঙ্গালা ভাষার কুলজী প্রস্তুত করিতে হয় তবে তাহা এইরূপ হইবে যথা—আর্য্যভাষা হইতে সংস্কৃত, সংস্কৃত হইতে প্রাকৃত এবং প্রাকৃত হইতে বঙ্গ প্রভৃতি অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষা।

বাঙ্গালা ভাষা সংগঠিত হইলেও তাহা বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত শুধু কথাবার্ত্তায় ব্যবহৃত হইত—লিখিবার ভাষায় উন্নীত হয় নাই। বঙ্গভাষা জনসাধারণের ভাষা, বঙ্গসাহিত্যও জনসাধারণের সাহিত্য। যাঁহারা শিক্ষিত ও সুপণ্ডিত ছিলেন, ভাষা ও সাহিত্যের আভিজাত্যের প্রতি তাঁহাদের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। জনসাধারণের এই অনাদৃত মলিন ভাষা কোন দিন তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। তাঁহারা সংস্কৃত ভাষার আলোচনা করিতেন এবং সেই ভাষাতেই আবার তাঁহাদের গ্রন্থাদিও লিখিতেন। আমাদের বঙ্গভাষা জননী কালক্রমে বয়ঃপ্রাপ্তা হইয়া যখন আপন বক্ষের ভাব পীযূষধারা পান করাইবার জন্য আকুল হইয়া উঠিলেন তখন এই শ্যামল বাঙ্গালার জনসাধারণ তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিয়াছিল। এই বঙ্গদেশের কৃষকগণ তাহাদের আপনার ভাব তাহাদের দৈনন্দিন সুখ দুঃখ হর্ষ বিষাদের গীত এই মাতৃভাষায় প্রথম গান করিয়া ধন্য হইয়াছিল। পণ্ডিতগণ তাহাকে অনাদর করিয়াছিলেন। ইহা ব্রাহ্মণের ভাষা নহে, রাজার ভাষা নহে,—ইহা সাধারণের ভাষা। দীন দরিদ্রনির্ব্বিশেষে সর্ব্বসাধারণের হৃদয়-পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়া যেখান হইতে অমৃতের ধারা ক্ষরিত হইতেছে—সেই স্থান হইতেই এই ভাষার উৎপত্তি। এখন পর্য্যন্তও বাঙ্গালা ভাষার এইরূপ প্রকৃতিই রহিয়া গিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বেও শিক্ষিত লোকে বাঙ্গালা ভাষার চর্চ্চা করা অপমানকর বলিয়া মনে করিতেন। আমাদের দেশের পণ্ডিতম্মন্য নেতৃবৃন্দ আজ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে রাষ্ট্রনীতি বা সমাজনীতি আলোচনা করিতে গিয়া বঙ্গভাষার স্থলে অবলীলাক্রমে ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা করিয়া থাকেন। কিন্তু নিরুপায় জনসাধারণ, যাঁহারা সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন নাই, ইংরাজী প্রভৃতি পাশ্চাত্য সাহিত্যের রসাস্বাদ যাঁহাদের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই,—কেবলমাত্র তাঁহারাই একনিষ্ঠ সাধকের ন্যায় এই বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের সেবা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদেরই ভাবরাশি বক্ষে ধারণ করিয়া এই বঙ্গভাষা মাতৃত্বের আসন প্রাপ্ত হইয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস বলিলে বঙ্গদেশের জনসাধারণেরই ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস বুঝায়। বাঙ্গালা সাহিত্যে আমরা দেখিতে পাই—বাঙ্গালার সাধারণ লোকের দৈনন্দিন জীবনের চিত্র, তাহাদের আশা আকাঙ্ক্ষা, ধর্ম্ম, রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, ব্যবসায় ও বাণিজ্য প্রভৃতি। এক কথায় বাঙ্গালা দেশের প্রকৃত ইতিহাস এই বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের মধ্যেই নিবদ্ধ।

যে সাহিত্য ধর্ম্মের দ্বারা পরিপুষ্ট না হয় তাহা অধিকদিন স্থায়ী হইতে পারে না ইহা জগতের সাহিত্যিক ইতিহাসে দেখা যায়। বঙ্গভাষা যে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিশালী হইয়াছেন ধর্ম্মই তাহার একমাত্র কারণ। ধর্ম্মপ্রাণ বাঙ্গালী ধর্ম্মবুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত হইয়া সাহিত্য আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। আর দেশমধ্যে প্রচলিত সাধারণের ধর্ম্মমতই তাঁহার কাব্যাদির বিষয় ছিল। এই জন্য আমরা দেখিতে পাই প্রাচীন সাহিত্য বঙ্গদেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার একান্ত আপনার জিনিষ হইয়া তাহাদের ধর্ম্মবিশ্বাসকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছিল। ইয়োরোপে বিভিন্ন বিভিন্ন ধর্ম্মমতাবলম্বীদিগের বিরোধ ঘোর সমরানল প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিল কিন্তু বঙ্গদেশে উক্ত বিরোধ

বিভিন্ন বিভিন্ন সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছে। বঙ্গদেশের প্রাচীন সাহিত্যের উদ্দেশ্য জনসমাজের মঙ্গলসাধন। এক একটী ধর্ম্মসম্প্রদায় তাঁহাদের সম্প্রদায়োক্ত দেবতার মঙ্গল জয়গান করিয়া সমাজের কল্যাণের প্রতি সমুৎসুক হইয়াছেন। সমাজের মঙ্গলকামনা উদ্দেশ্যে সেগুলি নিজ নিজ সমাজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার উদ্বোধন। সেই জন্য প্রাচীন সাহিত্যে বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন মঙ্গলগান প্রচলিত হইয়াছিল—যথা ধর্ম্মমঙ্গল, মঙ্গলচণ্ডী,মনসামঙ্গল ইত্যাদি। ইহার মধ্যে বৈষ্ণব কবিতাই কেবল সাম্প্রদায়িক ভাব বিমুক্ত হইয়া মানবহৃদয়ের সনাতন ভাবধারার অভিষিঞ্চনেই বরেণ্য হইয়া উঠিয়াছে।

কতকাল ধরিয়া যে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হইতে হইতে বঙ্গভাষায় পরিণত হইয়াছে তাহা নিরূপণ করিবার কোনই উপায় নাই। তবে বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে প্রাদেশিক ভাষাগুলি যে বিশেষ ভাবে সাহিত্যের জন্মদান করিয়াছে সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী নৃপতিগণ এই ধর্ম্ম সাধারণের মধ্যে প্রচার করিবার জন্য প্রাদেশিক ভাষাসমূহের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষা শিক্ষিতের ভাষা, নিম্নশ্রেণীর লোকসকল সে ভাষায় ধর্ম্মোপদেশ সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবে না এই মনে করিয়া তাঁহারা সর্ব্বসাধাণের ভাষায় ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করেন। মহারাজ অশোক যে ভাষায় তাঁহার অনুশাসনলিপি প্রণয়ন করাইয়াছিলেন তাহার নাম "মাগধী ভাষা। এই ভাষাই পরবর্ত্তীকালে পালী ভাষায় উন্নীত হয়। বঙ্গদেশে যে ভাষায় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল তাহা "পৈশাচী প্রাকৃত" নামে অভিহিত। পণ্ডিতগণ সাধারণের কথিত এই অবিশুদ্ধ ভাষার প্রতি এমনই বিরূপ ছিলেন যে তাহাকে "পৈশাচী প্রাকৃত" এইরূপ ঘৃণার্হ নাম দিতে কিছু মাত্র কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। উত্তর কালে যখন রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণাদি ভাষান্তরিত হইয়া বঙ্গভাষাকে বিশেষ ভাবে সৌষ্ঠবশালিনী করিয়া তুলিতেছিল তখনও পণ্ডিতগণের এ বিরূপতা বিলুপ্ত হয় নাই। নিম্নলিখিত সুপ্রসিদ্ধ শ্লোকটী তাহার সাক্ষ্যস্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে—

"অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানি চ।
ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ॥"

অর্থাৎ যে মানব অষ্টাদশ পুরাণ এবং রামচরিত বঙ্গভাষায় শ্রবণ করিবে সে সুনিশ্চয় রৌরব নরকগামী হইবে। মহাকবি কৃত্তিবাস ও কাশীরামদাস যাঁহারা মাতৃভাষার মুখোজ্জ্বল করিয়া বঙ্গভাষা ও সমাজের মহাকল্যাণ সাধন করিয়াছেন—তাঁহারাও ব্রাহ্মণগণের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন নাই। নিম্নলিখিত প্রচলিত প্রবাদ বাক্যটী তাহার প্রমাণ—

"কৃত্তিবেসে, কাশীদেশে, আর বামুনঘেঁষে—
এই তিন সর্ব্বনেশে।"

কিন্তু "সাগর উদ্দেশে যবে বাহিরায় নদী,
কে রোধে তাহার গতি"

সমগ্র গৌড়ীয় জনসমাজের মঙ্গল সাধন করিতে বঙ্গভাষা তখন আবেগময়ী—ব্রাহ্মণগণের বাধা ভাগিরথী স্রোতে মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় দূরে অপসৃত হইল। রৌরব নরকের ভয় কেহ করিল না—"কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান"—এই বাক্যই সকলের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইল। মহাভারত পঞ্চমবেদ স্বরূপ। চতুর্ব্বেদ ধারণা করিবার মত ক্ষমতা যাঁহাদের নাই সেই সাধারণ লোকের জন্য ইহার সৃষ্টি। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার মহাভারতের মহদুদ্দেশ্য। কালক্রমে বঙ্গভাষা যখন সাধারণের ভাষা হইয়া দাঁড়াইল তখন এই সাধারণের সামগ্রী আর মাত্র সংস্কৃত ভাষায় নিবদ্ধ রাখা অসম্ভব হইয়াছিল—তাহার বঙ্গানুবাদ মানবসমাজের দায়িত্ব জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট একটী অপরিহার্য্য বিষয় বলিয়া মনে হইয়াছিল। লোকশিক্ষা ও জনসমাজে ধর্ম্মমত প্রচারই বঙ্গ সাহিত্যের উৎপত্তির কারণ।

ইহা অতীব আশ্চর্য্যের বিষয় যে শিক্ষিত পণ্ডিতগণের বিরোধ সত্ত্বেও এ ভাষা ক্রমোন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। পণ্ডিতগণ বিরোধী হইলেও দেশের রাজা ও জমিদারগণ অনেকে বাঙ্গালা কবির পক্ষপাতী ছিলেন—অনেক মুসলমান শাসনকর্ত্তা এবং বাঙ্গালী রাজগণ বঙ্গীয় কবিগণকে বৃত্তি ও ভূমি দান করিয়াছেন। অনেক কবি রাজার আদেশে দেশে লোকশিক্ষা বিস্তারের জন্য তাঁহার কাব্য প্রকাশ করিয়াছেন। যে যে কারণে বঙ্গভাষা

সাহিত্যের পদে উন্নীত হইয়াছে—তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে। প্রথমত, বৌদ্ধ নৃপতিগণের প্রাদেশিক ভাষায় ধর্ম্মপ্রচার। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে, খ্রীষ্টীয় দশম ও একাদশ শতাব্দীতে বৌদ্ধ সহজিয়া সম্প্রদায় বঙ্গ ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোঁহা রচনা করিয়া বাঙ্গালী কৃষক ও শিল্পীগণের মধ্যে ধর্ম্ম প্রচার করিতেন। শাস্ত্রী মহাশয় নেপালে ঐ সম্বন্ধে কয়েকখানি পুস্তক সম্প্রতি আবিষ্কার করিয়াছেন উহাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে—যথা (১) চার্য্যাচার্য্য বিনিশ্চয়, (২) বোধিচার্য্যাবতার (৩) ডাকার্ণব। ডাকের প্রবচনগুলি আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গালাদেশে প্রচলিত আছে।

বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ অবস্থায় যখন উহা দুরাচারী তান্ত্রিক কাপালিকের প্রেতলীলায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল, যখন ভগবান শঙ্করাচার্য্য সমগ্র ভারতবর্ষে অদ্বৈতবাদের পাঞ্চজন্য নিনাদিত করিয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন সেই সময়ে জনসাধারণের মধ্যে বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের ঘাত-প্রতিঘাতে বঙ্গসাহিত্যে একটী নূতন ধারা প্রবাহিত হইয়া সাহিত্যকে নূতনতর কলেবর প্রদান করিয়াছিল এবং পৌরাণিক ধর্ম্ম এবং দেবদেবীগণের পূজাপদ্ধতির প্রতি সাধারণের আগ্রহ আবার জাগিয়া উঠিয়াছিল। ইহাই হইল বঙ্গসাহিত্যোন্নতির দ্বিতীয় কারণ।

তৃতীয় কারণ সংস্কৃত ধর্ম্মগ্রন্থ পুরাণাদির বঙ্গভাষানুবাদ এবং মুসলমান শাসনকর্ত্তৃগণ ও দেশীয় রাজগণের তদ্বিষয়ে সহায়তা।

চতুর্থ কারণ নানাবিধ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মঙ্গলগান রচনা এবং সমাজে সেই গানের প্রচার।

পঞ্চম এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কারণ বৈষ্ণব কবি ও কাব্যের আবির্ভাব এবং যুগাবতার শ্রীশ্রীচৈতন্য দেবের গৌড়ীয় ভাষায় সঙ্কীর্ত্তন ও সর্ব্বসাধারণের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণমহিমা এবং ভক্তগণের চরিতামৃত প্রচার। এই সকল হইল প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি ও পরিণতির কারণ। দেখা যাইতেছে যে জাতীয় তিনটী ধর্ম্মসম্প্রদায় এই সাহিত্যকে আশ্রয় করিয়া দেশ ও সাহিত্যের কল্যাণ সাধন করিয়াছেন—(১) বৌদ্ধধর্ম্ম সম্প্রদায় (২) পৌরাণিক ধর্ম্মসম্প্রদায়—শৈব ও শাক্ত এবং (৩) বৈষ্ণব ধর্ম্মসম্প্রদায়। বঙ্গদেশের সৌভাগ্য যে ধর্ম্মান্দোলনেই প্রধানত তাহার সাহিত্যের উৎপত্তি হইয়াছে এবং এখনও প্রধানতঃ ধর্ম্মের উপরেই তাহার গতি নিয়মিত হইতেছে।

রাণাডের জীবন-স্মৃতি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ—নাসিকে বদলী।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নাসিকে আমাদের বদলী হইল এবং আমরা যখন নাসিকে গেলাম তখন ঘরের লোক আমরা তিনটি ও ব্রাহ্মণ, সহিস ও কোচম্যান এই কয়জন গিয়াছিলাম। চাকরের মধ্যে, কিংবা আত্মীয়ের মধ্যে কোন মেয়ে মানুষকে লওয়া হয় নাই। নাসিকে পাচিকা অনেক পাওয়া যায়, সেখানকার একজনকে সেইখানেই রাখিয়া দিব, এইরূপ মনে করিয়াছিলাম। সেখানে গিয়া দেখি, পাচিকা শীঘ্র পাওয়া যায় না। পাচিকা খুঁজিতে এক মাস দেড় মাস গেল। সেই পর্য্যন্ত, অভ্যাস না থাকায় ঘরকন্নার প্রত্যেক কাজ আমার নিকট কঠিন বোধ হইতে লাগিল এবং তাহার দরুণ, আমার মনও একেবারে অস্থির হইয়া পড়িল; অতি সহজ কাজও এই মনের চাঞ্চল্যে খারাপ হইতে লাগিল। আমার এই অবস্থা দেখিয়াও, রান্নায় নুন বেশী বা ঝাল বেশী যাই হোক না কেন, আমার স্বামী আমাকে বকাইতেন না, রাগ করিতেন না। রান্নার অভ্যাস না থাকায়, পাছে রান্না খারাপ হয় এই ভয়ে আমার চিত্ত যেরূপ চঞ্চল হইয়া উঠিত তাহাতে কখন কখন রান্নায় নুন দিতেই ভুলিয়া যাইতাম ও কখন কখন ভুলিয়া দুইবার করিয়া নুন দিতাম; তবুও আমার স্বামী রাগ বা তিরস্কার করিতেন না। যে কোন আনাড়ী মানুষ হোক না কেন, তাহাকে কোন রকমে রাগাইয়া লইবেন—এ যেন আমার স্বামীর একটা ব্রতই ছিল। আমার স্বামী আহার করিয়া কোর্টে গেলে পর, আমি আহারে বসিতাম, তখন, নুন কিংবা ঝাল বেশী হইয়া থাকিলে, কাজটা খারাপ মনে হইত, এবং সন্ধ্যাকালের রান্নায় খুব মনোযোগ দিয়া রাঁধিব, ভুলিব না এইরূপ স্থির করিতাম। তদনুসারে, সত্য সত্যই ভাল রান্না হইলে, আমার স্বামী সুধু ঠাট্টা করিয়া বলিতেন, "কিরে "আবা" (নিজের ছোট ভাই) এখন তরকারি খাচ্চিস্, আর, দুপুরের সময় দুটো রান্না বেশী ছিল তবু কেন ভাল করে খাস্‌নি? তাতে কি কিছু খারাপ হয়েছিল"? তাতে সে হাসিয়া বলিল যে, "দুপুরে রান্না কেমন কেমন! তার মধ্যে একটা রান্না আলুনী ও একটাতে নুন বেশী; কেবল গোটা

ডাল ও শাকের রান্নাটা ভাল হয়েছিল। আমি তাই শুধু খেয়েছিলুম।" তখন তিনি বলিতেন, "নুনে-পোড়া, ঝাল, আ-লুনী যাই হোক, বিদ্যার্থীরা সেদিকে লক্ষ্য করবে না, যা পাবে তাই চুপটি করে খেয়ে যাবে, দেখ আমি তা নিয়ে কখন কি খুঁত খুঁত করেছি, যা পাই তাই চুপ্ চাপ্ করে খেয়ে যাই।" আমি একবার সাহস করিয়া বলিলাম, "আমি আগে থাকতে যদি জানতে পাই, তাহলে আলুনী জিনিসে তখনি নুন দিতে পারি। কিন্তু আমি যখন খেতে বসি তখনই টের পাই ও বড় লজ্জা হয়।" তখন তিনি বলিলেন, "তার আর উপায় কি? একথা বলে দেওয়া অপেক্ষা নিজের অনুভবে জানাই ভাল। তাহলে মানুষ সাবধান হয় ও বেশী মনোযোগ দেয়। আজ আমি তোমার জন্য পাক-শাস্ত্রের এক পুস্তক আনিয়েছি। সব পড়ে দেখ, ওতে যে রকম লেখা আছে সেই অনুসারে রোজ এক একটা রান্না করলেই হবে। তাতে যে সকল জিনিস লাগবে তার পরিমাণ ঠিক্ করে নিয়ে, ধীরে সুস্থে রাঁধবে। রান্নাটা ঠিক হলে ত ভালই, না হলেও একটা বেশ আমোদ হবে"। খুব মনোযোগ দিলে সবই হইতে পারে এই মনে করিয়া, পুস্তকখানি হস্তগত হইলে পর, প্রথম প্রথম প্রতিদিন একটা কোন রান্না করিয়া দেখিতাম। কোন রান্না ঠিক্ হইত, কোন রান্না দুই চারি বার করিয়াও ঠিক্ হইত না। এইরূপ অনেকদিন হইলে পর, রান্নার সখটা কমিয়া আসিল, একজন ভাল পাচিকাও পাওয়া গেল; আহারের ব্যবস্থা ভাল হইল এবং এখন পাঠ-অভ্যাসের বেশী সময় পাইলাম।

এই সময়ে "হাওয়ার্ডের প্রথম পুস্তক" সমাপ্ত করিয়া দ্বিতীয় পুস্তক ধরিয়াছিলাম। এখন আমার স্বামীও আমার "পড়া নেবার" জন্য ও "নূতন পড়া দেবার" জন্য সময় পাইতেন। সকালে ঘণ্টা-দেড়েক পাঠ অভ্যাস করবার পর ও সন্ধ্যাকালে বাহির হইতে ফিরিয়া আসিবার পর একঘণ্টা আহারের পূর্ব্বে, মারাঠী সংবাদপত্র পাঠ করিয়া পরে তিনি আহার করিতে উঠিতেন এবং আহারান্তে ১০টা ১০৷৷০টা পর্য্যন্ত পুণার "দক্ষিণা প্রাইজ কমিটির" পুস্তকগুলি আসিলে তাহা আমাকে দিয়া পাঠ করাইতেন—এইরূপ পাঠের নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন। আবার ভোর ৪টা ৪৷৷০টার সময়ে আমার স্বামীর ঘুম ভাঙ্গিত। তখন "কেকা", "আর্য্যা", "শ্লোক", কখন কখন "নবনীত" কিংবা "প্রার্থনা-সঙ্গীত" এই সমস্তের মধ্য হইতে যা' পড়িতে বলিতেন, তাহাই তাঁহাকে আমার পড়িয়া শুনাইতে হইত। কোন কোন দিন আমার স্বামী তাঁর স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোক কিংবা স্তোত্র আবৃত্তি করিতেন ও তাহার অর্থ বলিতেন এবং আমাকে দিয়া শ্লোক পাঠ করাইতেন পূর্ব্ব-কথিত অর্থ কিরূপ আমার মনে আছে তাহা দেখিতেন। এইরূপ, আলো-হওয়া পর্য্যন্ত চলিত। তখন হইতে ১০টা পর্য্যন্ত—রান্নার সমস্ত সামগ্রী, শাক-সবজী চাটনী, "কোসিম্বিরী" ও ঘোল প্রভৃতি প্রস্তুত হইলে পর, প্রথমে ভাত তরকারী পাতে 'বাড়িয়া' লইয়া সমস্তক্ষণ কথা কহিতে কহিতে আহার করিতেন। আহারান্তে আমার স্বামী কাছারী গেলে পর, আমি কাছারীতে পাঠাইবার জলখাবার প্রস্তুত করিতাম। রোজ ভিন্ন ভিন্ন চারি পাঁচ রকমের জিনিস করিতে হইত। সেই পর্য্যন্ত দুই ঘণ্টা কাল বেশ সহজে কাটিয়া যাইত। পৌনে দুইটার সময় জলযোগের পাত্র ভরিয়া ব্রাহ্মণের হাতে উহা উঠাইয়া দিবার পর, আমি পাঠ অভ্যাস করিতে বসিতাম। তাহা ৪৷৷০টা পর্য্যন্ত,—সন্ধ্যাকালে পড়িয়া দেখাইবার জন্য পাঠ তৈরী করিতাম এবং শব্দও একেবারে কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতাম। কারণ প্রথম, শব্দের বানান ও অর্থ বেশ তৈরী হইয়াছে দেখিয়া পরে নির্দ্দিষ্ট পাঠ পড়িয়া লওয়া হইত; নচেৎ তিনি রাগ করিতেন। সে রাগ অন্য লোকদিগের মত হাঁক-ডাক কিংবা মুখে কটূক্তি করা নয়, বরং উল্টা চুপ করিয়া উদাসীনভাবে বসিয়া থাকা। খুব যদি বেশী হইল ত একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিতেন। এই অবস্থা অনেকক্ষণ থাকিত। কোন রাগী লোক রাগিয়া উঠিলে সেই রাগের ভরে হাঁক-ডাক করিয়া দুটা গালী দিয়াই খালাস। দুই চারি মিনিটের মধ্যে আবার হাসিতে কথা কহিতে প্রস্তুত—যেন রাগ মোটেই হয় নাই। কিন্তু আমার স্বামীর প্রকৃতি সেরূপ ছিল না। ছোট খাটো বিষয়ে তাঁর রাগ কখনই হইত না, কিন্তু এইরূপ কোন বিষয়ে রাগ হইলে সে রাগ অনেকক্ষণ থাকিত। সেইজন্য আমার বড় ভয় হইত, মন খারাপ হইত, মনে সুখ থাকিত না। তাই, পারতপক্ষে ঐরূপ প্রসঙ্গ উপস্থিত না হয়, তার জন্য আমি খুব সাবধান হইতাম। এইরূপে, ইংরেজি দ্বিতীয় বুক্ শেষ করিয়া তাহার দ্বিতীয় ভাগ সমাপ্ত হইলে পর, ইসপ্ নীতি ও সেই সঙ্গে, বাইবেলের ভাষা সহজ ও তাহাতে ছোট ছোট বাক্য থাকায় বাইবেলের নিউটেষ্ট-মেণ্ট পড়িতে আরম্ভ করিলাম।

আমার ঘরকন্নার কাজ ও পাঠ-অভ্যাসের ব্যবস্থা ঠিক হইলে পর তিনি আমাকে বলিলেন—"এখন প্রতিদিনের উপস্থিত খরচ নিজের হাতে নির্ব্বাহ করে' তার হিসাব টুকে রেখো।" নাসিকে আসা অবধি দুই মাস কাল, আমাদের সঙ্গে বিনায়ক নামে যে ব্রাহ্মণ আসিয়াছিল, তাহার উপরেই উপস্থিত মত খরচ করিবার ও হিসাব লিখিয়া রাখিবার ভার ছিল এবং তদনুসারে সে ঐ কাজ সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিত। মোট টাকাটা আমার কাছে থাকিত। কিন্তু আমার স্বামী জিজ্ঞাসা করিয়া, উপস্থিত মত খরচের জন্য টাকা তাহার হাতেই দিতেন। এখন, উপস্থিত খরচের ভার আমার হাতে লওয়ায়, রোজকার খরচ আমিই লিখিয়া রাখিতাম। কিন্তু প্রায়ই তেরিজ কসিতে ও জের বাকীতে ভুল করায়. মোট বাকীর মিল হইত না, এবং তাহা মিলাইবার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দিতাম। এইরূপ হইলে পর, সে দিনকার নির্দ্দিষ্ট পাঠের অভ্যাস যেমন হওয়া উচিত—তাহা হইত না। তাহার দরুন সমস্ত বিষয়েই বিভ্রাট উপস্থিত হইত। পাঁচ ছয়বার এইরূপ হইলে পর, উনি এক দিন এইরূপ নিয়ম করিয়া দিলেন যে, প্রতিদিন জমা খরচের বহি দেখিয়া তাহার পর শুইতে যাইবেন। তদনুসারে, পাঁচ সাত দিন হইয়া গেলে, এক দিন, আমার ভুল কোথা থেকে হয় জানিতে পারিলেন এবং আমি যাহাতে বুঝিতে পারি, এইরূপ স্পষ্টরূপে আমাকে দেখাইয়া

দিয়া এরূপ ভুল যাহাতে আর না হয় সেইরূপ চেষ্টা করিতে বলিলেন। আরো দুই এক বার পরীক্ষা লইয়া তাহার পর, প্রতিদিন জমা খরচের বহি দেখা ছাড়িয়া, মাসের শেষে একবার দেখিবার নিয়ম করিলেন। আমাদের বাড়ীতে খাবার লোক আট জন ছিল। তখন প্রতিমাসে খাই-খরচ কত পড়িত তাহার একটা আনুমানিক হিসাব, আগের দুই মাসের দৈনিক হিসাবের খাতা দেখিয়া স্থির করিতেন। এবং কোন মাসের ১লা তারিখে আমাকে বলিলেন যে, "তুমি, এই মাসে শুধু খাইখরচের জন্য ১০০ টাকা নেও, ওতে পূরা এক মাসের খরচ বেশ চলবে।" আমার আন্দাজ ছিল না, তাই আমার মনে হইল, ১০০ টাকা ত খুব বেশী, এত টাকা কি শুধু খাই খরচেই ফুরাইয়া যাইবে? তখন উনি বলিলেন,—"ভালই ত, যদি এর চেয়ে কম টাকা লাগে, যে টাকা বাঁচবে তা আমি ফেরত নেব না। তোমার শেলাই কাজের জন্য তোমাকে বক্‌শিস্ করব।" এই কথা শুনিয়া আমার মনে খুব আনন্দ হইল। তাহার পর আমি আবার বলিলাম, "ইহার ভিতর চাকরদিগের বেতন, চাঁদার টাকা প্রভৃতি আসিবে না ত"? তখন, তিনি বলিলেন, "খাই-খরচ ছাড়া, অন্য খরচ ওর ভিতর নেই। অন্য খরচের জন্য, তুমি আর কিছু টাকা বের করে' নিও। কেবল আমার এখনকার মতো আহারের ও জলযোগের জিনিস ঠিক সব পাওয়া চাই, তাতে কমি হলে চলবে না,—কিন্তু যে-কোন জিনিস আনাতে হবে তা নগদ মূল্যেই আনাতে হবে—ধারে নয়"। এত করে' বলিলেও আমার মনে কিছুই বসিল না; উল্টা, এত টাকা কি-করিয়া ফুরাইবে ইহাই আমার মনে হইতে লাগিল। সেই মাসের ২০দিন বিনা-বিভ্রাটে কাটিয়া গেল; কিন্তু তাহার পর, ২১শে তারিখ হইতে,—একেবারে নির্দ্দিষ্ট বৃত্তিভোগী পরিবারবর্গের, মাসকাবারে যেরূপ টানাটানি হইয়া থাকে ও তাহার দরুণ গোলযোগ ঘটে, আমার অবস্থা সেইরূপ হইল। ২৫শে তারিখ পর্য্যন্ত আমি,—আলাদা বাহির করা পুঁজি অনেকটা ক্ষয় হইয়া গেলে,—একেবারে মর্ম্মাহতের ন্যায় হইয়া, এতটা ভাবিত হইয়া পড়িলাম যে, সে ভাবনা কিছুতেই মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারিতেছিলাম না। কেবল ভাবনা চিন্তা করিয়া রোজকার খরচ অল্পই কমান যায়। ঐ টাকায় খরচ চালাতেই হইবে। এবং অনুমতি ব্যতীত বেশী টাকা খরচ করা যায় না। সেইজন্য আমি খুব ভাবিত হইয়া পড়িলাম। এইরূপভাবে দুই একদিন চলিয়া গেলে, উনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "আজকাল তুমি এরকম নিরুৎসাহ ও মন-মরা হয়ে আছ কেন? তোমার কিছু হয়েছে কি"? এই কথা শুনিয়া আমি আরও মর্ম্মাহত হইলাম (কারণ এই বিষয় তাঁর নজরে না পড়ে বলিয়া খুব চেষ্টা করিতাম) এবং ঘাড় হেঁট করিয়া বলিলাম,—"না, আমার কিছুই হয়নি।" তাহার পর,—খরচের টাকা ফুরাইয়া গিয়াছে, আরও কিছু টাকা বাহির করিয়া লইব কিনা,—ইহা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য হাজারবার মনে হইতেছিল। কিন্তু আমার অভিমানী স্বভাব তাহা করিতে দিল না। এইরূপে মন বেশী অস্থির হইয়া উঠিলে, আমি একেবারে কাঁদিতে লাগিলাম, কান্না ঢাকিতে পারিলাম না। আমার অবস্থা পূর্ব্বেই উনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন বলিয়া আমি না বলিলেও অনেকটা বুঝিয়া লইয়াছিলেন, এবং "খরচের টাকা ফুরাইয়া গিয়াছে এইটুকু কথা আমার মুখ হইতে বাহির হইবামাত্র উনি বলিলেন যে, "খরচের জন্য যত টাকা আবশ্যক, বার ক'রে নেও। এর দরুণ এতটা মন খারাপ হবার কারণ কি? সমস্ত টাকা তোমার কাছেইত আছে। তবে এত ভাবনা কিসের জন্য? টাকার কমী হলে মন খুলে বলবে। ওরকম মনের মধ্যে লুকিয়ে রাখবে না। অল্প খরচ করতেই হবে এরকম আমাদের অবস্থা নয়, আর তার জন্য ভাবিত হবারও কোন কারণ নেই। কিন্তু ব্যয় সংযম করতে ও হিসাব টুকে রাখতে শিখলে মানুষের মনোযোগ ও বিচক্ষণতা বাড়ে ও গৃহের সমস্ত বিষয় সুব্যবস্থাক্রমে চলে—এইটিই তোমাকে শেখান আমার উদ্দেশ্য। আমার এই উদ্দেশ্যের দিকে একটু যদি তোমার লক্ষ্য থাকত তাহা হইলে ঐ নির্দ্দিষ্ট কাজটাকে একটা ভার মনে করে ওরকম পাগলের মত ভাবিত হয়ে পড়তে না; এখন থেকে যত টাকা লাগে তুমি নিতে থাকো কিন্তু কেবল খরচটা সময় মত টুকে রেখো"—এইরূপ উনি বলিলেন। সেই মাসে যত টাকা খরচ হইয়াছে সেই পরিমাণ টাকা খরচের জন্য বাহির করিয়া লইতে বলিলেন। এই সময়ে উঁহার ৮০০৲ টাকা বেতন ছিল। বেতনের সমস্ত টাকা ও ঘরের সঞ্চিত সমস্ত টাকা আমার কাছেই থাকিত। কারণ উনি এক পয়সাও নিজের কাছে রাখিবেন না, এইরূপ নিয়ম ছিল। কোন তালার চাবি কোন প্রসঙ্গেই তিনি হাতে লইতেনই না, পৈতায় ঝুলাইয়া রাখা তো দূরের কথা কিন্তু সমস্ত টাকা আমার নিকট থাকিলেও মাসিক খরচের জন্য নির্দ্দিষ্ট টাকা ছাড়া উঁহার অনুমতি গ্রহণ ব্যতীত আমি পাঁচ টাকার বেশী খরচ করিতাম না। বেশী খরচ করিতে হইলে, উঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেই উনি "হাঁ" বলিতেন, "না" কখন বলিতেন না; কিন্তু জিজ্ঞাসা না করিয়া অধিক খরচ করিলেও রাগ করিতেন না। এবং তদনুসারে চলিতে আমি কখন অবহেলা কিংবা কসুর করি নাই। সেইজন্য আমাদের উভয়ের মধ্যে, রাগ কিংবা অসন্তোষ উৎপন্ন হইবার প্রসঙ্গই হইত না। (ক্রমশঃ)

উনবিংশ কল্প
তৃতীয় ভাগ।
অগ্রহায়ণ, ব্রাহ্মসম্বৎ ৮৮।

৮৯২ সংখ্যা

১৮৩৯ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"

ভাসাও তরী।

(প্রসাদী পদচ্ছায়া)

(রামপ্রসাদী সুর)

পাল্ তুলে দাও, ভাসাও তরী॥
ডাক এসেছে, ওপার্ হতে
মায়ের ঘরে হবে যেতে
(সবাই) আনন্দেতে, হৃদয় ভরে
একমনে যায় গো চলি।
ওপারেতে, দেখ্ না চেয়ে
আলোয়্ আলো যাচ্ছে ছেয়ে
(সেই) আলোর নাচে, স্রোতের মাঝে
ছুট্‌ছে তরী হেলি দুলি।
ভাসা মেঘে, চাঁদের মত
ঢেয়ের পরে হাঁসের মত
(আমার) পাগল হয়ে, হৃদয় ছোটে
কে আর্ তারে রাখবে ধরি।
সারা পালে, লেগেছে বায়
জোয়ার জোরে ঠেলেছে নায়
এমন্ সুযোগ, দিয়ে ছেড়ে
রোস্ নে কো পাছে পড়ি।
(হোথা) সাঁঝের্ আগে, হবে যেতে
চল্‌রে ধরে অভয়্ হরি॥

রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার গান।

(ডাক্তার শ্রীজিতেন্দ্রপ্রসাদ বসু)

কবি সাধারণতঃ দুই দিক দিয়া দেখিয়া কবিতা রচনা করিয়া থাকেন—একদিক হইতেছে চক্ষু, অন্যদিক হইতেছে হৃদয়। যাঁহারা শুধু একটা কিছু দেখিয়া কবিতা রচনা করেন তাঁহাদের কবিতাগুলি প্রায়ই একঘেঁয়ে হয়। পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সে কবিতার মাধুর্য্য উপভোগ শেষ হইয়া যায়। আর যাঁহারা ভাবের কবি, যাঁহারা চক্ষু ও হৃদয় উভয় লইয়া কাব্যকুঞ্জের অধিকারী হন, তাঁহাদের কবিতা মর্ম্মস্পর্শী ও নূতন ধরণের হয়। এই ভাবের যে সকল কবিতা, সেগুলি কখন কোন বাঁধা অর্থের ভিতরে নিজের মাধুর্য্যকে ধরা দেয় না। এইগুলি কবির অপূর্ব্ব সৃষ্টি,—কবিতার এই বিশেষত্ব রবীন্দ্রনাথের কবিতাতে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথের এত নিন্দা ও প্রশংসা। রবীন্দ্রনাথের কবিতা বা তাহার অর্থ লইয়া যদি কাহারো কোলাহল করিতে হয় করুন, তাহাতে সাধকের সাধনা কখনও ভঙ্গ হইবে না। তিনি গাহিয়াছেন

তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে
তা বলে ভাবনা করা চলবে না।

রবীন্দ্রনাথের রচনায় মানুষ মুগ্ধ হয় কেন? কারণ, তাঁহার কবিতার মধ্যে মানবজীবনের নিতনৈমিত্তিক ঘটনাগুলির প্রতিধ্বনি সর্ব্বদাই পাওয়া যায়।

"কুঁড়ির ভিতরে কাঁদিছে গন্ধ অন্ধ হয়ে
কাঁদিছে আপন মনে।"

এই যে সৃষ্টির অনাদি কাল হইতে মানবের ক্রন্দন, এ ক্রন্দন যিনি শোনেন তিনিই তো কবি! কবিবর অভয় বাণীতে নূতন আশা জাগাইয়া বলিয়াছেন—

"ভয় নাই ভয় নাই ওরে ভয় নাই
কিছু নাই তোর ভাবনা ;
কুসুম ফুটিবে বাঁধন টুটিবে
পূরিবে সকল কামনা ;
নিঃশেষ হয়ে যাবি যবে তুই
ফাগুন তখনো যাবে না।"

এই যে অভয়বাণী, এই যে এত বড় আশার কথা—তবু ব্যাকুল পরাণের উদ্বেগ মিটিল কই? ফাগুনের প্রভাতসমীরণে, প্রভাতসূর্য্যের দিকে হাসিয়া ফুল যখন প্রতিযোগিতায় বলিয়া উঠে—"দেখ দেখি কে সুন্দর" তখন কুঁড়ির ভিতরের বদ্ধ গন্ধ অতৃপ্ত বাসনায় ছটফট করে, তাই না বিকাশের জন্য পূর্ণতার জন্য "কুসুম দল বদ্ধ" মানব-আত্মার এ ক্রন্দন যুগে যুগে ধরিত্রীর উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে।

কুড়ির ভিতরে ফিরিছে গন্ধ কিসের আশে
ফিরিছে আপন মাঝে।
বাহিরিতে চায় আকুল শ্বাসে
কি জানি কিসের কাজে॥

এই যেতে চাওয়া, এই ব্যাকুল হওয়া এই জীবনের প্রারম্ভে ছটফট—এ কুঁড়ি জীবনে কে না উপলব্ধি করেছেন? এ সকল কেন? এ কেনর জবাব কেউ দিতে পারেন নাই। কোথায় পথ, কোথায় যেতে হবে, কেহই জানেনা—তবু যেতেই হবে।

আপনারে তোর না করিয়া ভোর
দিন তোর চ'লে যাবে না।

কবির এ আশ্বাসবাণী যদি না থাকিত, তবে ব্যাকুলতাও থাকিত না,—এ ডাকে যে ব্যাকুলতা আরো বাড়াইয়া দেয়। আবার এই ব্যর্থ আশাকে ধিক্কার দিয়াই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—

আশারে কই ঠাকুরাণী—
তোমার খেলা অনেক জানি
যাহার ভাগ্যে সকল ফাঁকি
তারেও ফাঁকি দিতে চাস।

তাপদগ্ধ সংসারী—সারাজীবনে যাহারা ব্যর্থতার ফোঁটা ললাটে দাগিয়া লইয়া আশার শেষে দাঁড়াইয়াছে, তাহাদিগকে কবি কত বড় পদ দান করিয়াছেন—ভবিষ্যতে কত বড় অমৃতখণ্ড পাওয়ার জন্য তাহাদিগকে পথ দেখাইয়াছেন—

রিক্ত যারা সর্ব্বহারা
সর্ব্বজয়ী বিশ্বে তারা
গর্ব্বময়ী ভাগ্যদেবীর
নয়কো তারা ক্রীত দাস।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে
করব মোরা পরিহাস॥

একথা শুনিয়া দীন দুঃখীরও কি প্রাণ পরিপূর্ণ দিকে নব আশা লইয়া ছুটিয়া যাইতে চাহে এতবড় সত্য কথা কি কেহ বিশ্বাস করিবে? যেমন না আসা পর্য্যন্ত মানুষের ভুল ভাঙ্গে না, মনের গতি না ফিরিয়া গেলে এ কথাটাও মানিবে না। সত্য চিরকালই সত্য, তবু এ সত্য কথার উপর কেহ নির্ভর করিতে পারে না তাহা যদি পারিত, তাহা হইলে মানুষ সর্ব্ব ক ভিতরেই সিদ্ধিকে প্রতিষ্ঠা করিতে পারিত।

রবীন্দ্রনাথের সমস্ত বা কতকগুলি কা পরিচয় দিতে গেলেও একখানা পুস্তকের অ আবশ্যক। রবীন্দ্রনাথ আশার কথার সঙ্গে ভগবানের বাঁশী শুনিয়া আমাদিগকে ভ কত কথা শুনাইয়াছেন।

এই যে নানা সুরের ছন্দ, এ ছন্দ ক শুনাইলে বঙ্গসাহিত্যে একটা অপ্রকাশিত চিরলুক্কায়িত থাকিত। অভিধানের আদ্যে পাঠ করিয়া কেহ কি কবিতার সুখ উপভোগ য়াছেন? কিন্তু কবি সেই শব্দগুলিই বাছিয়া নৈপুণ্য ও শৃঙ্খলা সাহায্যে তাহাতে কবিতার ম ফুটাইয়া দেন। যে পর্য্যন্ত তাহা না দেন সে প আমরা কবিতার রসগ্রহণে সক্ষম হই না। রসের মধুরতা যখন মর্ম্মস্থল স্পর্শ রে কত কবির প্রতি শ্রদ্ধা আপনি ছুটিয়া যায়, তাহার গতি রোধ করতে পারে না। বাঙ্গলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ সেই শ্রদ্ধার আ প্রতিষ্ঠিত।

বসন্তের শেষ রাতে, এসেছিরে শূন্য হাতে
এবার গাঁথিনি মালা তোমারে করি দান।

ইহাতেই বুঝা যায় যে ভগবানকে রবীন্দ্রনাথ কেমন করিয়া পাইতে চান। এ মালা না গাঁথাতেই,

কাঁদিছে নীরব বাঁশি অধরে মিলায়ে হাসি,
তোমার নয়ন ভাসে ছল ছল অভিমান,
এবার বসন্ত গেল, হলনা গান।

ভগবানের সঙ্গে মানুষের এই যে আপন ভাব, এ মানুষ লালসায় ডুবিয়া থাকিয়া লাভ করিতে চায় না, কিন্তু কবি বলিয়াছেন,

আরো আঘাত সইবে আমার—সইবে আমারো।
আরো কঠিন সুরে জীবন তারে ঝঙ্কারো॥

এই যে যাচিয়া দুঃখকে ডাকিয়া আনা—এ কেন? দুঃখ যদি আসে, ব্যথা যদি মর্ম্মস্থল স্পর্শ করে, তাহলেই যে সে বিজয়ীর মত ভগবানকে লাভ করিতে ছুটিবে। তাই

যে রাগ জাগাও আমার প্রাণে,
বাজেনি তা চরম তানে
নিঠুর মূর্চ্ছণার সে গানে
মূর্ত্তি সঞ্চারো।

চরম তানে যদি বাজিত তাহা হইলেতো মানুষ তখনই হৃদয়ে ভগবানের মূর্ত্তি সঞ্চারে ব্যস্ত হইয়া উঠিত। ব্যথা জাগিতে জাগিতে—

যতবার আলো জ্বালাতে চাই
নিবে যায় বারে বারে।
আমার জীবনে তোমার আসন
গভীর অন্ধকারে॥
যে লতাটি আছে শুকায়েছে মূল
কুঁড়ি ধরে শুধু নাহি ফোটে ফুল
আমার জীবনে তব সেবা
তাই বেদনার উপহারে।

কুঁড়ি-জীবন থেকে কবি কি বেদনা কেন বহিয়া আজ জীবনের শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছেন, তাহা সম্ভবত কাহাকেও নূতন করিয়া বুঝাইতে হইবে না।

রবীন্দ্রনাথ নীরব সাধক, নীরবে গান গাহিয়াই তাহার সিদ্ধি একদিন নীরবে বরণ করিয়া লইয়া যাইবেন। প্রকাশ হইলে কবি ব্যস্ত হইয়া পড়েন, বাহিরে কবিকে লইয়া কোলাহল হইলেই কবি গান ধরেন

আমার নামটা দিয়ে ঢেকে রাখি যারে,
মরচে সে এই নামের কারাগারে।

সে গান শুনিয়া দেশ যখন তাঁহাকে সকল কোলাহলের ভিতরে বলপূর্ব্বক ডাকিয়া আনে, তখনও কি তিনি গান নাই?—

অহঙ্কারের মিথ্যা হতে বাঁচাও দয়া করে—
রাখ আমায় যেথা আমার স্থান।

এই অহঙ্কারে জড়িত হইয়া অপরাধী হইবেন বলিয়াই তিনি ভগবানকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

গর্ব্ব করে নিইনি ওনাম জান অন্তর্য্যামী।
আমার মুখে তোমার নাম কি সাজে॥

তিনি এমনি ভাবে লজ্জিত হইয়া তাঁকে তো এক-ভাবে চান নাই,—

তুমি নব নব রূপে এস প্রাণে,
এস গন্ধে বরণে এস গানে।
* * *
এস দুঃখ সুখে এস মর্ম্মে,
এস নিত্য নিত্য সব কর্ম্মে;
এস সকল কর্ম্ম অবসানে।

এমন ভাবে প্রাণ দিয়া যাঁহাকে নানা ছন্দে চাহিয়াছেন, তাঁহাকে ধর্ম্মবীর পাইয়াছেন। কবি ত্যাগী, লালসাহীন, সব ছাড়িয়াছেন, তাই সব তাঁর বজায় আছে।

মানুষের কোলাহলে যেই কবির ধ্যান ভাঙ্গিয়া যাইবে, অমনি ব্যাকুল কবি গাহিয়া উঠিবেন,—

নয়ন তোমারে পায়না দেখিতে
রয়েছো নয়নে নয়নে;
হৃদয় তোমারে পায়না জানিতে
রয়েছো হৃদয়ে হৃদয়ে॥

বালকের মত কবি যখন এমনি বিভোর—ধরি ধরি করিয়া যখন ধরিতে পারেন না, তখনই হার মানিয়া গাহিয়াছেন,—

তুমি কেমন করে গান করহে গুণী,
আমি অবাক হয়ে শুনি, কেবল শুনি।

পাওয়ার মত হইলেই মানুষের নানা বাধা সম্মুখে পড়ে, পাওয়া আর হইয়া উঠে না। তাই কবি গাহিয়াছেন,—

কইতে কি চাই কইতে কথা বাধে।
হার মেনে যে পরাণ আমার কাঁদে,
আমায় তুমি ফেলেছ কোন ফাঁদে
চৌদিকে মোর সুরের জাল বুনি।

এত গেল তাঁর নীরব সাধনা। আবার দেশকে তিনি ভক্তি করিয়া গাহিয়াছেন—

অয়ি ভুবনমনোমোহিনী
অয়ি-নির্ম্মল সূর্য্যকরোজ্জ্বল ধরণী
জনক জননী।

সমস্ত সাধনার মাঝখান থেকে কার এ আহ্বান বাণী,—

"ধূলি শয্যা ছাড়ি উঠ উঠ সবে,
মানবের সাথে যোগ দিতে হবে।"

মানুষহ ইবার জন্য তাঁর এ ডাক তো আজকার নহে, ডেকে ডেকে সারা হইয়াই নিজেকে নিজে বুঝাইয়াছেন—

যদি তোর ডাক শুনে ভাই কেউ না আসে
তবে তুই একেলা চলরে।

সোণার বাংলা তাঁর প্রাণ, বাঙ্গলার মাটী তাঁর তীর্থরেণু। এমন হৃদয় নিংড়াইয়া কেহ জননী জন্মভূমিকে ভাল বাসেন নাই। কৈ—একজনও তো একবার বলেন নাই,—

আমার সোণার বাংলা
আমি তোমায় ভালবাসি।

কৈ মায়ের কোমল স্পর্শে মাতিয়া কেহইতো শান্তির সুরে গান নাই—

কি শোভা কি ছায়া গো,
কি স্নেহ কি মায়া গো,
কি আঁচল বিছায়েছ বটেরমূলে নদীর কূলে কূলে।

জননীর মলিন মুখ দেখিয়া কৈ একজন বাঙ্গালীও তাহাতে ব্যথিতকণ্ঠে বলেন নাই—

মা তোর বদনখানি মলিন হলে,
আমি নয়ন জলে ভাসি।

এভাবে কত ব্যথার গান, কত শান্তির গান, কত জাগরণের গান, কত আশার গান গাহিয়া গাহিয়াও খাঁটী জিনিষকে ধরিতে কবি আবার গাহিয়াছেন,—

হেথা যে গান গাইতে আসা,
হয়নি সে গান গাওয়া,
আজো কেবলি সুর সাধা,
কেবল গাইতে চাওয়া।

এমনি কঠিন সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াই না কবি পরিপূর্ণতার সুরে গাহিয়াছেন,—

এবার নীরব করে দাওহে তোমার
মুখর কবিরে।
তার হৃদয় বাঁশি আপনি কেড়ে
বাজাও গভীরে॥

তাই না সব সম্পদ, যা কিছু বাহ্যিক আনন্দ তা ছাড়িয়া কবি বলিয়াছেন—

বহুদিনের বাক্য রাশি,
এক নিমেষে যাবে ভাসি,
একলা বসে শুনব বাঁশি
অকূল তিমিরে।

এ গান তাঁর প্রাণের; এই গানের সুরেই তাঁর জীবনের পরিপূর্ণতা আনয়ন করিবে; তিনি চান,—

তোমারই জগতে প্রেম বিলাইব
তোমারি কার্য্য সাধিব।
শেষ হয়ে গেলে ডেকে নিও কোলে
বিরাম আর কোথা লইব॥

রবীন্দ্রনাথের এই আনন্দময় জীবন কোন্ এক ঈপ্সিতের জন্য অনির্দ্দিষ্ট পথে আত্মগোপন করিয়া আছে, কয়জন তাহার খোঁজ রাখে। জগতের স্তুতি ও নিন্দা তাঁহাকে কিছুমাত্র স্পর্শ করে না।

আলো ও ছায়া।

জগতের যাহা কিছু হাসি আর ভালো।
সকলের পরিচয় বুঝি তুমি আলো॥
তবু কেন থাকে তাহে আঁধারের ছায়া।
কিছুই বুঝিতে নারি কি যে তাঁর মায়া॥
শুধু জ্যোতি কেবা পারে সুদীর্ঘ সহিতে।
তাই বুঝি দেখি তায় আঁধারে ঢাকিতে॥
নিদাঘের তাপ যবে দগধিয়া মারে।
আঁধার জলদ ঢালে মধু বারিধারে॥
গোলাপ কুসুম নাই কণ্টকবিহীন।
প্রেম জাগে কোথা, বিনা বিরহ মলিন?
সুখ দেন যিনি, পাছে রহি তাঁরে ভুলে।
তাই বুঝি সুখ মাঝে দুঃখচ্ছায়া দুলে॥
গভীর আনন্দ যবে চিত্তে পরকাশে—
দুঃখের আঘাতকম্প কোথা হতে আসে॥
কেনই বা আসে আর আসে কোথা হতে।
কিছুই না জানি বুঝি, ভাসি সংশয়েতে॥
আলো আঁধা মিলে আনে বিশ্বে প্রেমগান।
সন্ধ্যার রাগিণী নিতি ঢালে নব প্রাণ॥
তারি মাঝে জেগে ওঠে দয়াময় নাম।
তাঁহারে প্রণমি সবে, ছাড়ি অন্য কাম॥

দৈব ও পুরুষকার।

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)

দৈব ও পুরুষকার লইয়া মধ্যে মধ্যে বাক্-বিতণ্ডা উপস্থিত হয়। কাহারও মতে দৈবই সব, পুরুষকার কিছুই নহে। আবার কেহ বা বলিতে চান, পুরুষকারই মনুষ্যের সর্ব্বস্ব, পুরুষকার ছাড়িয়া মনুষ্য একদণ্ড তিষ্ঠিতে পারে না। যাঁহারা এইরূপে পরস্পরের মধ্যে তর্ক বিতর্কে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা যদি দৈব ও পুরুষকার শব্দের প্রকৃত অর্থের দিকে মনোনিবেশ করেন, তাহা হইলে মতবিভিন্নতার বিশেষ কারণ থাকে না। যত গণ্ডগোল ঐ দুইটি বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য-বোধের অভাবে।

আমাদের মতে দৈব কথাটি নানা অর্থ-বাচী। ভাষার মধ্যে শব্দের বাহুল্যের অভাবে আমরা অনেক স্থলে একই শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকি। এই শব্দদৈন্য যে কেবলমাত্র বঙ্গ-ভাষার মধ্যে বিদ্যমান তাহা নহে, ইংরাজি প্রভৃতি ভাষার ভিতরেও এইরূপ দৈন্য যথেষ্ট পরিমাণে বিরাজমান। দৃষ্টান্ত স্বরূপ idea কথাটি লওয়া যাইতে পারে। ইহার অর্থ স্থল-বিশেষে মর্ম্ম, কল্পনা, কোথাও বা আদর্শ (ideal আদর্শীভূত) কোথাও বা অবাস্তব (unreal), কোথাও বা দর্শন শাস্ত্রের অনুভূতি, কোথাও বা ধারণা ইত্যাদি। দৈব কথাটির অর্থ ঠিক এইরূপ পিচ্ছিল। (১) যাহা দেব বা দৈবতার দান বা অন্য কথায় ভগবানের দান তাহাও দৈব; (২) যাহা আকস্মিক (accidental) তাহাও দৈব; (৩) যাহা প্রাক্তন বা পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল, তাহাও দৈব। (৪) যাহা বিনা আয়াসে লাভ করা যায়, তাহাও দৈব। আমরা যদি দৈব এই কথার এক একটি অর্থ লইয়া আলোচনা করি এবং উহার একটি অর্থ হইতে অন্য অর্থে পিছলাইয়া না পড়ি, তাহা হইলে প্রকৃত সিদ্ধান্তে সহজে উপনীত হওয়া যায়। অন্যথা উভয় পক্ষেরই বিভ্রান্ত হইতে হয় এবং হাবুডুবু খাইতে হয়, কোন মীমাংসায় পৌঁছিতে পারা যায় না।

(১) যাহা দেবতা বা ভগবানের দান এই অর্থে দৈব শব্দ ধরিলে আমাদিগের সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে আমরা দৈবাধীন। সবই তাঁহার দান, সবই তাঁহার কৃপা। আমরা যে কিছু শক্তি লাভ করিয়াছি, যে কিছু বিষয় বিভব, খ্যাতি প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিয়াছি, যে কিছু ধর্ম্মভাব হৃদয়ে পোষণ করিতেছি, এ সবই যে তাঁহার দান। নিজের বলিয়া গর্ব্ব করিবার যে আমাদের কিছুই নাই। আমাদের প্রত্যেকের ক্ষুদ্র জীবনের সবেতেই যে তাঁর লীলা, তাঁর কৃপা কার্য্য করিতেছে। এই অর্থে দৈববাদী ও পুরুষকারবাদীর মধ্যে মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না।

(২) দৈব শব্দের অর্থ আকস্মিক ধরিলে এই আকস্মিকতা আমাদের জীবনে সত্য সত্যই কার্য্য করিতেছে কি না তাহা চিন্তা বা আলোচনা করিতে হইবে। আকস্মিক ঘটনার বা আকস্মিক অবস্থা বা সুবিধার সংযোগ আমাদের জীবনে মধ্যে মধ্যে ঘটিলেও তাহার ভিতরে কার্য্যকারণশৃঙ্খলা সূক্ষ্ম-ভাবে বর্ত্তমান। মানুষের শিক্ষা, তাহার সাধনা, তাহার ধর্ম্মভাব, তাহার চরিত্র-সংগঠন, তাহার অর্থোপার্জ্জন আকস্মিকতার ফলে নহে। যুবক মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিতেছে, ধর্ম্মলাভের জন্য কঠোর তপস্যা করিতেছে, অর্থ-সংগ্রহের জন্য দিন-যামিনী প্রয়াস পাইতেছে, দেহ রক্ষার জন্য পরিমিত আহার ও ব্যায়াম করিতেছে, রোগে চিকিৎসকের ঔষধ সেবন করিতেছে, প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়িয়া আত্ম-রক্ষার জন্য দারুণ সংগ্রাম করিতেছে, এই সকলের ভিতর আত্মচেষ্টা ভিন্ন যে আর কিছুই নাই। এত সভ্যতার বিস্তার, এত জলযান বাষ্পীয়শকট খপোতের আবিষ্কার, এত শিক্ষা বাণিজ্যের উদ্ভাবন, সাহিত্য গণিত জ্যোতির্ব্বিদ্যা চিকিৎসা-শাস্ত্র দর্শন রসা-য়নের আলোচনা, ইহার ভিতরে নিরবচ্ছিন্ন পুরুষকারের কার্য্য চলিতেছে। এই আত্মচেষ্টা ও পুরুষকার মনুষ্যজীবনকে নিয়মিত করিতেছে। আকস্মিকতার ভাব নিয়মের ভাব নহে, পদ্ধতির ভাব নহে। ধনীর পুত্র নির্ধনের পুত্রকে কেহ পোষ্যপুত্র গ্রহণ করাতে সেই দরিদ্র পুত্র রাজা হইয়া দাঁড়াইল, ইহা আপাতদৃষ্টিতে আকস্মিকতার নিদর্শন ধরিলেও ইহার ভিতরে যে নিয়ম বা কারণ নাই তাহা নহে। ধনীর পুত্র দায়াদ সূত্রে পিতার ধনের অধিকারী হইল,

ইহা তাহার দেশের নিয়ম। এ নিয়ম তাহার দেশ প্রবর্ত্তন করিয়াছে। আসামে গারোদের মধ্যে পুত্র পিতার ধনসম্পত্তির অধিকারী হয় না, কন্যা তাহার পিতার ত্যক্ত সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়, ইহা তাহার জাতির নিয়ম। রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজত্ব প্রাপ্ত হয়, ইহা তাহার দেশের নিয়ম। এইরূপ অবস্থায় পিতৃধনের অধিকারী হওয়া দেশের নিয়মাধীন, ঠিক আকস্মিক নহে। পোষ্য-পুত্র নির্ব্বাচন সম্বন্ধে পোষ্যপিতার হৃদয়ে অনুরাগের নিয়ম রহিয়াছে; পোষ্যপুত্রের পক্ষে এমন কিছু আকর্ষণের বিষয় আছে, যাহা দ্বারা সে আকৃষ্ট হইয়াছে। অধিকন্তু পোষ্যপুত্র গ্রহণ সকল দেশের নিয়ম নহে। অপুত্রক ব্যক্তি স্নেহের নিয়মের অধীন হইয়া, ভবিষ্যতে বিষয়রক্ষার উপর দৃষ্টি রাখিয়া, বংশমর্য্যাদার উপর লক্ষ্য রাখিয়া দরিদ্র পিতার নিকট তাহার পুত্রটিকে চাহিয়া লইয়া তাহাকে নিজের করিয়া লইল। দরিদ্র পিতা পুত্রের ভাবী সৌভাগ্য বুঝিয়া ইচ্ছা করিয়া শিশু পুত্রকে দান করিল। ইহাতে দরিদ্র পিতার পুরুষকারের ভাবই দেখা যায়। এই নির্ব্বাচন ও দানপ্রণালীর ভিতরে ঠিক আকস্মিকতা নাই। তাহার ভিতরে উভয় পক্ষেরই পুরুষকার রহিয়াছে। আবার এই আপাত-প্রতীয়মান আকস্মিকতার ভিতরে অর্থরক্ষণে ধনীর পুত্র ও পোষ্যপুত্রের জীবনব্যাপী পুরুষকারের প্রয়োজন, তাহা না হইলে দুই দিনের মধ্যে প্রাপ্ত বিষয় বিনষ্ট হইয়া যায়। আকস্মিকতা যাহাকে বল, তাহা যে জীবনের কোন মুহূর্ত্তে আসিতে পারে না, তাহা স্থির ভাবে চিন্তা করিলেই বুঝা যায়। আত্মচেষ্টা ও পুরুষকার মনুষ্যের সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া কার্য্য করে। মহামারীতে বা বজ্রপাতে মৃত্যু ঘটিলে তাহা আমাদের স্থূল গণনায় আকস্মিক হইতে পারে, কিন্তু আমাদিগকে বুঝিতে হইবে উহার পশ্চাতে স্বভাবের নিয়ম কার্য্য করিতেছে। যখন কোন কারণে কোন স্থানের বায়ু দূষিত হইয়া পড়ে, তখন তাহার প্রভাব স্বভাবের নিয়ম অনুসারে মনুষ্যের উপর কার্য্য করিবেই করিবে; অধিকন্তু যাহারা স্বাস্থ্যের নিয়ম রক্ষায় অজ্ঞ, তাহাদের উপরে অধিকতর প্রভাব বিস্তার করিবে। যখন পৃথিবী ও নভোমণ্ডলের মধ্যে তাড়িতের তারতম্য ঘটিবে তখনই স্বভাবের নিয়মানুসারে বজ্রপাত অবশ্যম্ভাবী। আমি এমনস্থানে গিয়া পড়িয়াছিলাম যেখানে তাড়িতের সমতা রক্ষার কার্য্য চলিতেছিল, তাই বজ্রপাতে আমার মৃত্যু ঘটিল। আমি নিয়ম বুঝিলাম না, বলিয়া উঠিলাম, অকস্মাৎ আমি প্রাণ হারাইলাম। আমরা যাহাকে অদৃষ্ট বলি, তাহার প্রকৃত অর্থ এই যে সেখানে কারণ অদৃশ্য রহিয়া যায়; আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ঐ কারণ ধরিয়া লইতে পারি না, কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খল বুঝিয়া উঠি না। তাই আমাদের জীবনের কোন কোন ঘটনাকে আমরা অদৃষ্টের ফল বলি। প্রকৃত পক্ষে অদৃষ্ট কথাটি একভাবে অর্থশূন্য। তাই বলিতেছিলাম আকস্মিক সম্পদ বা বিপদ, যাহাই বল, উহারও ভিতরে সূক্ষ্মভাবে কারণ প্রচ্ছন্ন থাকে। জগতে আকস্মিক ঘটনা ঘটে না। একদিকে প্রকৃতির নিয়ম অবাধে কার্য্য করিতেছে। অপরদিকে মনুষ্যের আত্মচেষ্টা অবিরাম চলিতেছে। আকস্মিক মারীভয়ের সময়ে মানুষ আত্ম-রক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে, চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ করে, দেশব্যাপী রোগের আক্রমণকে ব্যর্থ করিতে যায়, আকস্মিক বিপদ আসিয়াছে বলিয়া নীরবে আত্মবলিদান দেয় না, সে সংগ্রাম করে। আকস্মিকতাকে দৈব বলিয়া সে বরণ করিয়া লয় না, সে পুরুষকারের সাহায্য গ্রহণ করে, ইহাই তাহার সংস্কার এবং এই সংস্কার তারপক্ষে যারপরনাই স্বাভাবিক। মানুষ জড় নহে, সে চেতন। তাহার সমস্ত চেতনা তাহাকে পুরুষকারের শরণাপন্ন হইতে আদেশ দেয়।

(৩) যাহা পূর্ব্বজন্ম বা প্রাক্তনের ফল তাহাও দৈব, এইরূপ ধরিলে সংসারে ধনী দরিদ্র বিদ্বান মূর্খ ইত্যাকার বিচিত্রতার যে পূর্ণ মীমাংসা হইয়া যায় তাহা নহে। আমরা সহজে যাহা স্থির করিয়া উঠিতে বা যাহার মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে পারি না, অতীতের বা পূর্ব্বজন্মের অন্ধকারময় গহ্বরে তাহার বরাত দিলে আপাততঃ মীমাংসা সহজ হইয়া যায় বটে, কিন্তু উহাকে চরম সিদ্ধান্ত বলিলে চলিবে না। ফলকামনা ও ফললাভের আশা আমাদের দেশের কাম্যকর্ম্মাত্মক ব্রতনিয়মের ও যাগযজ্ঞের অস্থি-মজ্জা হইয়া রহিয়াছে। তাই যাহারা পূর্ব্বজন্মে দানধ্যান করিয়া আসিয়াছে তাহারা ইহজগতে সৌভাগ্যলাভ করিয়াছে, যাহারা

করে নাই তাহারা কষ্টে দুঃখে দুর্ভিক্ষে কালযাপন করিতেছে এইরূপ অনুমান করিয়া লওয়া আমাদের দেশে স্বাভাবিক। আমরা বলি পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির ফল ইহলোকে পুণ্যজীবন লাভ। সম্পত্তিলাভ মান-যশ খ্যাতি প্রতিপত্তি ও অর্থলাভ পূর্ব্বজন্মের কৃত পুণ্যকর্ম্মের চরম পুরস্কার নহে। আমরা নিজে চির-দরিদ্র, তাই ধনীর অবস্থাকে আমরা সৌভাগ্যের অবস্থা বলি। বিষয়রক্ষার জন্য মানসম্ভ্রম রক্ষার জন্য এত দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাগ্যের ভিতর দিয়া ধনীর জীবন অতি-বাহিত হয়, যে বঙ্গের একজন রাজর্ষি বলিয়া গিয়া-ছেন যে "বিষয়ের সুখ যাহা, জানি তা, কাজ নাই সে সুখে সে ধনে ; আহা কে দিবে আনিয়ে তাঁরে"। বলিতে কি প্রকৃত সুখ আত্মপ্রসাদে, প্রকৃত শান্তি ভগবানের নাম গানে ও তাঁহার মহিমা প্রচারে। আমরা এই পর্য্যন্ত মানিয়া লইতে প্রস্তুত যে বিগত জীবনে যতদূর মানবাত্মার উন্নতি হইয়াছে, ইহজীবনে তাহার পর হইতে উন্নতির ধারা ঊর্দ্ধদিকে চলিতে থাকিবে। কিন্তু এই উন্নতির ধারা রক্ষা করিতে হইলে মানবের আত্ম-চেষ্টা চাই। এই আত্ম-চেষ্টা বা সাধনা না থাকিলে আমাদিগকে আবার অধো-গতির অভিমুখীন হইতে হইবে। প্রাক্তন আমাদিগকে উচ্চস্থানে রক্ষা করিতে পারিবে না। পূর্ব্বজন্মের দুষ্কর্ম্মফলে দুর্ভাগ্য বহন করিয়া যে এখানে আসি-য়াছি, একথা সত্য হইলেও সেই দুর্ভাগ্যের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভের একমাত্র উপায় আত্ম-চেষ্টা বা পুরুষকার, একথা আমাদিগকে স্মরণে রাখিতে হইবে।

(৪) যাহা বিনা আয়াসে লাভ করা যায় তাহা দৈব। এই অর্থ ধরিয়া আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে মানুষ বিনা চেষ্টায় আপনার সমগ্র জীবনের ভিতরে অতি অল্পই লাভ করিতে পারে। অতি অল্প লোক, এমন কি লক্ষের মধ্যে একজন, লুপ্তধন এক-বার মাত্র প্রাপ্ত হয় কি না তাহাও সন্দেহ। অরণ্যের মধ্যে যোগী তপস্বী বৃক্ষের ফল লাভ করে এবং তাহা খাইয়া জীবনরক্ষা করে ইহাকে দৈব বলা যায় না। কেন না ফলদান বৃক্ষের স্বাভাবিক। কেহ বা পীড়াতে মৃতপ্রায় হইয়া স্বপ্নে ঔষধ লাভ করে, ইহাকে দৈব বলে এবং কেহ বা ঐরূপ ঔষধ সেবনে রোগমুক্ত হয়। কিন্তু এইরূপ ঔষধ লাভ দৈব হইলেও লক্ষের মধ্যে একজনের ঘটে কিনা সন্দেহ। রোগী যখন অনন্যোপায় হইয়া মুক্তিকামনায় ঐকা-ন্তিকভাবে চিন্তা করিতে থাকে, বুঝিতে হইবে যে ঔষধ লাভও তাহার ঐ ঐকান্তিকতার ফল। এখানেও মানস-রাজ্যে চিন্তার ভিতরে ব্যাকু-লতার ভিতরে পুরুষকারের চেষ্টা প্রচ্ছন্ন রহি-য়াছে।

সত্যযুগে সমুদ্র মন্থনে অমৃত উৎপন্ন হইয়াছিল, উহার ভিতরে দেবতাগণের পুরুষকার বিদ্যমান ছিল। রামরাবণ-যুদ্ধে, কুরুপাণ্ডব-রণে পুরুষ-কারেরই অভিব্যক্তি। সাহিত্য বিজ্ঞান আপনা হইতে সংরচিত হয় না, সেখানেও লেখকের পুরুষ-কার। শিল্পীর কর্ম্মশালায় পুরুষকারেরই বিকাশ। চিকিৎসক আপনার নিপুণতা লইয়া রোগের সহিত সংগ্রাম করে, রোগী আত্মচেষ্টা লইয়া রোগমুক্ত হইতে চায়। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে উভয়পক্ষ নিজ নিজ পুরুষকার লইয়া সংগ্রাম করিতেছে। এই সমস্ত দেখিয়াও দুর্দ্দিনে যদি বলি সবই দৈব এবং দৈব বলিয়া নীরবে সহ্য করিতে চাই, তবে তাহার ভিতরে অলসপ্রকৃতি আমাদের এই বাঙ্গালী-চরিত্রই ফুটিয়া উঠে ; জগতের অন্যান্য দেশের লোক বা চিন্তাশীল ব্যক্তি তাহার বিন্দুমাত্র পোষকতা করে না।

তিন চারি জন বন্ধুবান্ধবের মধ্যে একজন সাহস করিয়া ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া অপর দুই তিন জন বন্ধু, যাহারা আলস্যে ঔদাস্যে জীবন যাপন করিতেছে, তাহারা বন্ধুর বিপুল অর্থাগম দেখিয়া তাম্রকূট সেবন করিতে করিতে পরস্পরের মধ্যে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিল যে এ সবই অদৃষ্টের ফল, তাহা না হইলে আমরা বিদ্যা ও বুদ্ধিতে কিসে কম,—ঐ লোকটাই বা কেন এত অর্থ উপার্জ্জন করে—যার যেমন ভাগ্য। এইরূপ সুমিষ্ট আলাপে এবং অপরের মুখে তাহার প্রতিধ্বনি শ্রবণ আমাদের নিকট বড়ই সরস লাগে, এবং ইহাই আমাদের জাতীয় চরিত্রের পরিস্ফুট ছবি। গৃহে ক্ষুদ্র শিশু-সন্তান প্রকৃষ্ট চিকিৎসার অভাবে বা স্বাস্থ্যের নিয়ম রক্ষার অজ্ঞানতা ফলে অকালে প্রাণত্যাগ করিল। নিজের ত্রুটি বুঝিলাম না, শেল-বিদ্ধ অন্তরে প্রলাপ

করিতে করিতে বলিলাম এ সমস্তই অদৃষ্টের ফল। এই ত আমাদের অধিকাংশের ভাব। এই অদৃষ্টবাদ স্বীকারে আমরা শোকে সান্ত্বনা পাই, বিপদে সহজ মীমাংসা দেখিতে পাই, অশান্ত হৃদয়ে শান্তি লাভ করি, একথা সমস্তই সত্য; কিন্তু ইহাও স্বীকার করিয়া লইতে হইবে যে অতিরিক্ত মাত্রায় অদৃষ্টবাদ স্বীকারে স্বাধীন চেষ্টার পথ চিরনিরুদ্ধ হইয়া যায়। ব্যক্তিগত জাতিগত সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিলাভের আর কোন আশা থাকে না। যেখানে রোগে মারীভয়ে বজ্রাঘাতে সর্পদংশনে দুর্ভিক্ষে জর্জ্জরিত হইয়া আমরা দৈবকে, অভিসম্পাত করি, ঠিক সেইখানে পাশ্চাত্য জগৎ রোগ ও মারীভয়ের কারণ অনুসন্ধান করিতেছে, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান তাহার প্রশমন চেষ্টা করিতেছে, মিউনিসিপালিটি রোগের আক্রমণ ব্যর্থ করিতেছে, ঔষধ আবিষ্কারে সর্পভয় খর্ব্ব করিতেছে, ফল-শস্য অধিক পরিমাণে পাইবার আশায় ক্ষেত্রের উৎপাদনী শক্তি বিবর্দ্ধিত করিতেছে, উপনিবেশ সংস্থাপনে দুর্ভিক্ষের অপনোদন করিতেছে; রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্ত্তন সংঘটনে সর্ব্ববিধ লাঞ্ছনা বিদূরিত করিতেছে; অবাধ বাণিজ্যের পথ প্রমুক্ত করিয়া দিয়া দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিতেছ; ধর্ম্মপ্রাণ মহাত্মাগণ ভগবানের মঙ্গলভাবের সাধনা করিয়া শোকশল্যের মর্ম্মগত যাতনার তীব্রতাকে খর্ব্ব করিয়া তুলিতেছে।

দুই জন সমবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তি একই মূলধন লইয়া ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইল; একজন প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিল, আর একজন অর্থলাভ করা দূরে থাকুক মূলধন পর্য্যন্ত হারাইল। আপাত-দৃষ্টিতে ভাগ্য একজনের অনুকূল, অপরের প্রতিকূল, অনেকে এইরূপ সহজ মীমাংসা করিয়া বসেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। উহাদের মধ্যে একজন প্রয়োগসন্ধান-বিধিতে পটু, আর একজন প্রত্যুৎপন্নমতিবিহীন। তাই পরস্পরের এই অবস্থাবিপর্য্যয়। আমরা সূক্ষ্ম কারণের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম না, বলিয়া উঠিলাম সবই ভাগ্য। কিন্তু একটু নিবিষ্ট চিত্তে ও শান্তভাবে যদি আলোচনা করি, দেখিব যে আত্মচেষ্টা বা পুরুষকার সর্ব্ববিধ উন্নতির মূল কারণ।

অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, তবে পৃথিবীতে এত পার্থক্য কেন, কেহ ধনী কেহ নির্দ্ধন, কেহ পণ্ডিত কেহ মূর্খ, কেহ সুখী কেহ সন্তপ্ত। আমরা তাহার উত্তরে বলিব বিচিত্রতাই জগতের ভাব এবং ঐ বিচিত্রতার মূলে কারণ রহিয়াছে। দুইজন মনুষ্য এক প্রকৃতির নহে, দুই জনের মুখশ্রী সমতুল্য নহে, পশুজগতে দুইটি প্রাণী একই আকারের নহে, সবই বিচিত্র, সকলের ভিতর সামান্য অসামান্য বিভিন্নতা রহিয়াছে। আমরা বলি প্রতি মনুষ্যের উপরে চারিটি শক্তি কার্য্য করিতেছে, জন্ম, শিক্ষা, সঙ্গ ও সাধনা। সবলের পুত্র সবল, দুর্ব্বলের পুত্র রুগ্ন হওয়াই স্বাভাবিক। শিক্ষা ও শিক্ষার অভাব, মনুষ্যের মধ্যে পার্থক্য আনিয়া দিতেছে। সৎসঙ্গ অসৎসংসর্গ চরিত্রে কত বিভিন্নতা আনিয়া দিতেছে। সাধনার বা আত্মচেষ্টার ফলে এক জন ঋষি তপস্বী, আর এক জন তাহার অভাবে দস্যু তস্কর হইয়া পড়িতেছে; একজন ধনী আর এক জন দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে। এক জন সাধনা ও চেষ্টা করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে এবং মৃত্যু সময়ে তাহার অর্জ্জিত ধন পুত্রকে দিয়া যাইতেছে; আর এক জন সাধনা বা চেষ্টার অভাবে দুর্গতি ও দারিদ্র্য লাভ করিতেছে এবং তাহার সন্তান সন্ততির উপরে ঋণের চাপ রাখিয়া পরলোকে প্রস্থান করিতেছে। এইত সংসারের গতি। ঐ চারিটি কারণ ও দেশের নিয়ম পদ্ধতি ও অন্যান্য নানা কারণ জীবনে কার্য্য করিতেছে, তাই এত পার্থক্য। আমরা তাহা না বুঝিয়া বলি সবই ভাগ্য সবই অদৃষ্ট এবং পুরুষকারের কোন স্থান নাই।

আমরা উপসংহারে এই টুকু বলিতে চাই যে একটি জিনিষ বিভিন্ন দিক হইতে দেখা যাইতে পারে বা আলোচনা করা যাইতে পারে। ইংরাজিতে ইহাকে angle of vision কহে। একটি মনুষ্যকে সম্মুখ হইতে বা পশ্চাৎ বা পার্শ্ব দেশ হইতে দেখা যাইতে পারে। দৈব ও পুরুষকার কতকটা সেই ভাবের। উভয়ের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। মনুষ্য আপনার জীবনে যাহা কিছু পায়, সবই ভগবৎপ্রসাদাৎ, সবই দৈব বা দেবতার দান। তাই মানুষ ভগবানের দিক হইতে দৈবাধীন। আবার মনুষ্যের আত্মচেষ্টা বা সাধনার একটি দিক আছে; সেই দিক দিয়া দেখিলে মানুষ জীবনে

যাহা কিছু লাভ করে, সবই তাহার পুরুষকার বা আত্মচেষ্টা প্রসূত। একটু সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিলে বুঝা যায়, দৈব বা পুরুষকার প্রতিদ্বন্দ্বী শব্দ নহে, উহারা ফল কথায় এক।

ভগবানের রাজ্যে প্রকৃত পক্ষে নির্ব্বাচিত ব্যক্তি বা জাতি নাই। যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে ভগবানকে পক্ষপাতদোষযুক্ত বলিতে কেহই কুণ্ঠিত হইত না। মনুষ্যকে তিনি স্বাধীন করিয়াছেন। অথচ তাহার উপরে প্রকৃতির নিয়ম, ধর্ম্মের নিয়ম আধ্যাত্মিক রাজ্যের নিয়ম কার্য্য করিতেছে। যখন মানুষ সাধনাপ্রভাবে আপনাকে সমুন্নত করিয়া তুলে, আপনার ক্ষুদ্র ইচ্ছাকে তাঁহার মহতী ইচ্ছার অনুগত করিয়া ফেলে, আপনার স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন দেয়, অভিমান অহঙ্কার একেবারে বিসর্জ্জন করে, তখন ভগবানের কৃপা ভিন্ন আর সে কিছুই দেখিতে চায় না, আত্মশক্তির প্রভাব তাহার নিজের চক্ষে ঠেকে না, দেখে সে চারিদিকে ভগবৎকৃপা। তাই সে বলিয়া উঠে "জিস্‌নে তু জানায়া সোহি জন জানে" যাহাকে তুমি দেখাও সেই তোমাকে (ভগবানকে) দেখিতে পায়। ঋষিরাও তাই বলিয়াছিলেন "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ" যাঁহাকে তিনি বরণ করেন, সেই তাঁহাকে পায়। ইহার ফলিতার্থ ইহা নহে যে ভগবানের রাজ্যে তাঁহার নির্ব্বাচিত ব্যক্তি বা জাতি রহিয়াছে। সংসারী লোক ঠিক এই স্থানে এইরূপ গণনা করিয়া বসে যে, ভগবান সত্য সত্যই অপরকে বঞ্চিত করিয়া ব্যক্তি বিশেষকে বরণ করেন—অন্য কথায়, তাঁহার পক্ষপাতিতা আছে। সাধক আপনার সাধনার কথা মুখে না আনিয়া তাঁহার কৃপারই কথা বলেন; নিজের পুরুষকারের কথা মুখে উচ্চারণ করা পাপের কথা বিবেচনা করেন। মানুষ যখন এই উচ্চ গগনে বিহার করে তখন তাহারই এই কথা বলিবার অধিকার হয় "ত্বয়া হৃষীকেষ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি" আমি তোমাকে আমার জীবন-তরীর হাল ছাড়িয়া দিয়াছি, তুমি আমাকে যে দিকে ফিরাইতেছ আমি সেই দিকেই ফিরিতেছি। ইচ্ছা-যোগে মিলিত সাধকের এই বাণী; সংসারমুগ্ধ আমরা, আমাদের তাহা উচ্চারণে অধিকার নাই।

উপসংহারে আমরা বলিতে চাই আত্মশক্তির উপর নির্ভর কর। এই আত্মশক্তি ভগবানেরই দান। তিনি চান, আমরা এই আত্মশক্তিকে উদ্বোধিত করি। "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত" উত্থান কর জাগ্রত হও এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত হও। উৎযোগী হও, সাধনা কর, আলস্য পরিহার কর, শ্রীসম্পদ সকলই লাভ করিতে পারিবে। ধরণীর মুখ উজ্জ্বল করিতে সক্ষম হইবে এবং নিজ জীবনকে সার্থক করিয়া ধন্য হইবে।

মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়।

(শ্রীনলিনীনাথ দাস গুপ্ত এম-এ, বি-এল)

অন্তরের মাঝে বসি তুমি আমারে যে দিয়াছ ছাড়িয়া,
সংযমের বাঁধ ভাঙ্গি চুরি কোন্ দিকে চলেছি ছুটিয়া।
দিয়েছ নয়ন দুটি তবু নাহি দৃষ্টি আপনার পরে,
দর্শনের যোগ্য যাহা নয় তাই দেখি ঘুরে ঘুরে মরে।
তোমার আদেশ শুনিবারে দিয়েছিলে শ্রবণ যুগল,
বধির হয়েছে শুনি শুধু সংসারের মত্ত কোলাহল।
বাহুযুগ দিয়েছিলে তব প্রিয়কার্য্য করিতে সাধন,
কুক্রিয়ার ভীষণ আঘাতে রুগ্ন ভগ্ন দুর্ব্বল এখন।
নির্ম্মল সরল চিত্তখানি কুচিন্তায় কুটিল পঙ্কিল,
তোমার দানের মাঝে আজি খুঁজি নাহি পাই একতিল।
হারায়ে ফেলেছি সব নাথ! আপনাতে করিয়া নির্ভর,
যে পথে চলেছি হেরি তাহা সত্য হ'তে অনেক অন্তর।
রুদ্ধ করি গৃহদ্বার যবে প্রাণে আনি তোমারে ডাকিয়া,
মুক্ত রহে হৃদিদ্বার হায়, কোন্ পথে যাও পলাইয়া।
বিক্ষিপ্ত চিত্তের মাঝে যেন পিশাচের দল উঠে হাসি,
মৃত্যুপথে লয়ে যেতে মোরে লালসার শত দৃশ্যরাশি।
কোথা রহে একাগ্রতা আর কোথা যায় প্রাণের ভকতি,
নিমেষের মাঝে যেন ফেলি হারাইয়া সকল শকতি।
জীবনের সত্যপথ ভুলে হ'তেছি বিপথে অগ্রসর,
বিষম দুর্দ্দিনে তুমি বিনে কে মোরে বাঁচাবে মহেশ্বর!
মৃত্যুরে দেখাও মৃত্যু—তব শাসনের প্রদীপ্ত কুলিশ,
ভেঙ্গে যাবে বিপথের ভুল—দণ্ড ছলে লভিয়া আশীষ।
কুপথের মাঝে চ'লে চ'লে তোমার সে ভ্রূকুটি হেরিয়া,
অকস্মাৎ থামিবে চরণ আঁখি দুটি চাহিবে ফিরিয়া।
জীবনের বিস্মৃত সে পথ হয়ত বা লইব চিনিয়া,
জড়তার কঠিন বন্ধন হয়ত বা পড়িবে খসিয়া।
পাপের সে প্রায়শ্চিত্ত-মাঝে আত্মার চৈতন্য যাবে ফুটি,
দেহ মোর কৃতজ্ঞতাভরে পড়িবে চরণে তব লুটি।

মুক্তনেত্রে হেরিব চৌদিকে দিব্যধাম তোমার ভাস্বর,
অক্ষয় সে পুণ্যতীর্থ হেরি চিনিব এ জীবন নশ্বর।
দেখিতে স্বর্গের সেই ছবি ডাকিতেছি তোমারে সভয়ে,
মরণের পথ দিয়া দিয়া লয়ে যাও অমৃত আলয়ে॥

ব্রহ্মগোল ও দেবেন্দ্রনাথের হিমালয় ভ্রমণ।

ব্রহ্মোপাসনাপদ্ধতি প্রবর্ত্তন, ব্রাহ্মধর্ম্মবীজ, ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রভৃতি প্রকাশের পর বলিতে গেলে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠালাভের সমস্ত উপকরণই সংগৃহীত হইয়াছিল। ইহার উপর অক্ষয় বাবুর সম্পাদকত্বে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা তখন সতেজে চলিতেছে। ব্রাহ্মসমাজের এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মদিগেরও সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। ব্রাহ্মসমাজের সভ্যমাত্রেই যে কেবল ধর্ম্মপিপাসা মিটাইবার জন্য ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়াছিলেন তাহা বলা যায় না। সভ্যদিগের মধ্যে এমন অনেকে ছিলেন যাঁহারা ঈশ্বর বা পরকাল কিছুই মানিতেন না—কেবল নিজেদের একটা খ্যাতি প্রতিপত্তি হইবে, নিজেরা দলের নেতৃত্ব করিতে সক্ষম হইবেন, এই প্রকার নানা স্বার্থভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের দলভুক্ত হইয়াছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত অনেকের হৃদয়ে এই প্রকার একটা ধর্ম্মবিরুদ্ধ ভাব দেখা যায়। কেবল ব্রাহ্মসমাজে কেন, সকল সমাজেই দেখা যায় যে এমন অনেক ব্যক্তি থাকেন যাঁহারা কোন প্রকার ধর্ম্মে বিশ্বাস না করিলেও হয়তো কেবল রোগমুক্তি বা অর্থলাভ প্রভৃতির উদ্দেশ্যে সাধুসন্ন্যাসীর শরণাগত হয়েন।

যাই হৌক, ব্রাহ্মসমাজে যখন ধর্ম্মে অশ্রদ্ধাবান, নেতৃত্বপ্রার্থী অনেক লোকের সমাগম হইতে লাগিল, তখন যে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে দলাদলি বিবাদ বিসম্বাদ আসিবে, তাহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। প্রথম প্রথম যখন দেবেন্দ্রনাথ নূতন মণ্ডলী সংগঠিত করিতেছিলেন, তখন তিনি "ব্রাহ্মের সহিত ব্রাহ্মের আশ্চর্য্য হৃদয়ের মিল" দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন যে "সহোদর ভাইয়ে ভাইয়েও এমন মিল দেখা যায় না।" কিন্তু দল যতই পুষ্ট হইতে লাগিল, ততই মতভেদ ও তদানুসঙ্গিক বিবাদ বিসম্বাদ অল্পে অল্পে দেখা দিতে লাগিল। পরিশেষে এই মতভেদ ও বিবাদ নিতান্ত যৎসামান্য বিষয় লইয়া উঠিলেও কথায় কথায় গুরুতর হইয়া দাঁড়াইত। দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মদিগের মধ্যে এইভাব দেখিয়া বড়ই উত্ত্যক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

মতভেদ ও বিবাদ বিসম্বাদের মূল কারণ হইতেছে যে অনেকে আত্মপ্রত্যয়ের প্রকৃত মর্ম্ম ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। সেকালে ইয়ং বেঙ্গলের সমাজে সভাসমিতির বড়ই প্রাবল্য দেখা যায় এবং কথায় কথায় তাঁহারা প্রত্যেক বিষয় ভোট (vote) বা হস্তগণনার দ্বারা স্থির করিতে উদ্যুক্ত হইতেন। ইয়ং বেঙ্গল সম্প্রদায়ের যে সকল লোক ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে এখানেও কোন বিষয়ে তর্ক উপস্থিত হইলেই তাহা ভোটের সাহায্যে মীমাংসা করিয়া লইবেন। ঈশ্বরের স্বরূপ পর্য্যন্ত তাঁহারা ভোটের দ্বারাই স্থির করিয়া লইতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্তে বলিয়াছেন "একমাত্র সহজজ্ঞান ও আত্মপ্রত্যয়ের বিষয় বলিয়া ঈশ্বরকে লোকের নিকট প্রতিপন্ন করিবার অভিপ্রায় তাঁহার (রামমোহন রায়ের) ছিল না। যদিও তিনি জানিতেন, ধর্ম্ম প্রচার ও রক্ষার জন্য এক এক আপ্ত পুস্তকের অবলম্বন চাই, কিন্তু তাঁহার বিশ্বাসের ভূমি সহজজ্ঞান ছিল; তাহা না হইলে সকল ধর্ম্মের মধ্য হইতে তিনি সার সত্য কেমন করিয়া সংকলন করিলেন? যদিও তিনি ভরসা করিয়া আত্মপ্রত্যয়ের উপর লোকদিগকে নির্ভর করিতে বলিতে পারেন নাই, কিন্তু তিনি নিজে আত্মপ্রত্যয় দ্বারা চালিত হইতেন। * * * রামমোহন রায় মনে করিয়াছিলেন, যাহারা বেদ মানে তাহাদের মধ্যে বেদ রক্ষা করিয়া পরব্রহ্মের উপাসনা প্রচলিত করা; কিন্তু যাহারা জ্ঞানবিজ্ঞানে উন্নত হইয়া বেদকে আপ্তবাক্য বলিয়া না মানিবে তাহাদের মধ্যে কি করা, ইহা তাঁহার তখন বিবেচনায় আসে নাই।" ক্রমে ব্রাহ্মদিগের মনে হইল যে "বেদের মধ্যে যে সত্য আছে, তাহাই সংকলন

করা। এই জন্য দুই বৎসর লইয়া শ্রুতি স্মৃতি হইতে টীকার সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ প্রস্তুত করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ তাহাতে অন্তর্নিবেশিত করা হইল। শেষে ঈশ্বরের স্বরূপ লইয়াই ব্রাহ্মদলের মধ্যে বিবাদ পড়িয়া গেল। তাঁহারা তর্ক উপস্থিত করিলেন, ঈশ্বর অনন্ত কি প্রকারে হইতে পারেন? হস্তোত্তোলন কর দেখি, ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ কি না? কি হাস্যাস্পদ! দ্বার রুদ্ধ করিয়া হস্তোত্তোলন দ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ণয় করা যে কি হাস্যাস্পদ, ইহা তাঁহারা তখন বুঝিতেন না। যখন বেদের প্রতিষ্ঠা গেল এবং সহজজ্ঞান ও আত্মপ্রত্যয় তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই, তখন বড়ই কলহ হইতে লাগিল। ১৭৭৭ অবধি ক্রমাগতই এইরূপ গোল চলিল।"

এই গোলযোগের তদানীন্তন অন্যতর নেতা কানাইলাল পাইন বলেন যে ঈশ্বরের স্বরূপ লইয়া কোন গোলযোগ হয় নাই, তবে কতকগুলি কথা এবং সংস্কৃত ভাষায় উপাসনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠিয়াছিল। ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থে এবং ব্রাহ্মসমাজে ঈশ্বর "সর্ব্বব্যাপী" বলিয়া উক্ত হয়েন। অক্ষয় বাবু এবং কানাই বাবুপ্রমুখ ব্রাহ্মেরা বলিলেন যে "সর্ব্বব্যাপী" কথার পরিবর্ত্তে "সর্ব্বত্র বিদ্যমান" শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে। আমরা শুনিয়াছি যে তাঁহারা "সর্ব্বশক্তিমান" শব্দের পরিবর্ত্তে "বিচিত্র শক্তিমান" শব্দ ব্যবহার করিবার জন্য জেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই সকল হইতে বুঝা যাইতেছে যে কিরূপ ছোটখাটো বিষয় লইয়া ব্রাহ্মদিগের মধ্যে প্রথম বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হইয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথ এই সকল গোলযোগের নাম দিয়াছিলেন "ব্রহ্মগোল"। তিনি ট্রষ্টীদিগের দোহাই দিয়া তবে এই ব্রহ্মগোল নিরস্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সেই সময়ে ট্রষ্টীদিগের মধ্যে একমাত্র রমানাথ ঠাকুরই জীবিত ছিলেন।

একদিকে ব্রাহ্মসমাজে এই ব্রহ্মগোল, অপরদিকে এই সময়ে দেবেন্দ্রনাথের গৃহেও গণ্ডগোল চলিয়াছিল অনুমান হয়। দেবেন্দ্রনাথের ইচ্ছা যে বাটী হইতে মূর্ত্তিপূজা সম্পূর্ণরূপে উঠাইয়া দেওয়া হউক। সে সময়ে তাঁহার বাটীতে দুর্গাপূজা ও জগদ্ধাত্রীপূজা এই দুইটী পূজা বিশেষভাবে ও মহাসমারোহে সম্পন্ন হইত। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নগেন্দ্রনাথ এই সময়ে বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ভাবিয়াছিলেন নগেন্দ্রনাথের মতের বল পাইয়া মূর্ত্তিপূজা দুইটী একেবারেই উঠাইয়া দিতে পারিবেন। দেবেন্দ্রনাথের ভ্রাতাগণ জগদ্ধাত্রী পূজা উঠাইয়া দিবার পক্ষে সম্মতি দিলেন, কিন্তু দুর্গোৎসব হিন্দুদিগের সমাজবন্ধন, বন্ধুমিলন এবং সকলের পক্ষে সদ্ভাব স্থাপনের একটী উৎকৃষ্ট ও প্রশস্ত উপায় এবং ইহার উপরে হস্তক্ষেপ করিলে সমগ্র পরিবারের মনে আঘাত লাগিবে বলিয়া তাহা উঠাইয়া দিতে সম্মত হইলেন না। ইহার উপর ১৭৭৬ শকে দেবেন্দ্রনাথের মধ্যম ভ্রাতা গিরীন্দ্রনাথ পরলোক গমন করেন। তিনিই জমীদারী সমূহ এবং দ্বারকানাথ ঠাকুরের স্থাপিত "হৌস"গুলির কাজকর্ম্ম পরিদর্শন করিতেন। গিরীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে দেবেন্দ্রনাথকেই সেই সকল কার্য্যের ভার লইতে হইল। ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মগোল এবং গৃহের গণ্ডগোলের মধ্যে পড়িয়া দেবেন্দ্রনাথ এই সময়ে কিছু ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন বলিয়া অনুমান হয়। বিষয়কর্ম্ম প্রভৃতির একরকম বন্দোবস্ত করিয়া ১৭৭৮ শকে আশ্বিন মাস অতিক্রম হইতে না হইতেই দেবেন্দ্রনাথ নৌকারোহণে পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করিলেন।

তিনি পাটনা, মুঙ্গের হইয়া কাশী পৌঁছিলেন। কাশী হইতে ক্রমে এলাহাবাদে উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে অমৃতসহরে গিয়া শিখদিগের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। অমৃতসহর হইতে সিমলাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার সিমলায় অবস্থানকালে সেই সুপ্রসিদ্ধ সিপাহীবিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি নানা বিপদের হাত এড়াইয়া উত্তরপ্রদেশে আরও অগ্রসর হইলেন। সেই উত্তর প্রদেশ হইতে প্রত্যাগমনের মুখে দেবেন্দ্রনাথ একদা শতদ্রু নদীর উৎপত্তিস্থান দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। তথায় একটা সেতুর উপর দাঁড়াইয়া তাহার স্রোতের অপ্রতিহত গতি ও উল্লাসময়ী ভঙ্গী দেখিতে দেখিতে বিস্ময়সাগরে মগ্ন হইয়া গেলেন। তাঁহার মনে হইল—"আহা! এখানে এই নদী কেমন নির্ম্মল ও শুভ্র! ইহার জল কেমন স্বাভাবিক পবিত্র ও শীতল। এ কেন তবে আপনার এই পবিত্র ভাব

পরিত্যাগ করিবার জন্য নীচে ধাবমান হইতেছে? এ নদী যতই নীচে যাইবে ততই পৃথিবীর ক্লেদ ও আবর্জ্জনা ইহাকে মলিন ও কলুষিত করিবে, তবে কেন এ সেইদিকেই প্রবল বেগে ছুটিতেছে? কেবল আপনার জন্য স্থির হইয়া থাকা তাহার কি ক্ষমতা! সেই সর্ব্বনিয়ন্তার শাসনে পৃথিবীর কর্দ্দমে মলিন হইয়াও ভূমি সকলকে উর্ব্বরা ও শস্যশালিনী করিবার জন্য উদ্ধত ভাব পরিত্যাগ করিয়া ইহাকে নিম্নগামিনী হইতেই হইবে।" তিনি ইহা ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ যেন অন্তর্যামী পুরুষের গম্ভীর আকাশবাণী শুনিলেন "তুমি এ উদ্ধতভাব পরিত্যাগ করিয়া এই নদীর মত নিম্নগামী হও। তুমি এখানে যে সত্য লাভ করিলে, যে নির্ভর ও শিক্ষা লাভ করিলে, যাও, পৃথিবীতে গিয়া তাহা প্রকাশ কর।" দেশে ফিরিয়া আসা ঈশ্বরের আদেশ ভাবিয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিয়া ১৭৮০ শকের ১লা অগ্রহায়ণ কলিকাতায় নির্ব্বিঘ্নে উপস্থিত হইলেন। দেবেন্দ্রনাথের হিমালয়ে নির্জ্জনপ্রবাসে বড়ই উপকার হইয়াছিল। হিমালয়ের সেই প্রাকৃতিক গাম্ভীর্য্য ও উদারতার মধ্যে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ অনুভব করিবার ফলে তাঁহার হৃদয় হইতে সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডী স্বতই খসিয়া গিয়াছিল। তাঁহার প্রত্যাগমনের পর ব্রাহ্মসমাজে বিবৃত ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যানেই তাঁহার হিমালয়ে প্রবাসের মহৎ ফল উপলব্ধি হইবে।

গান।

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এ)

ভৈরবী—একতালা।

বন্ধ আছে স্রোতের ধারা
তোমায় পেলেই পাবে ছাড়া।
ভাসিয়ে দেব ভুবন সেদিন,
আপনারে আর রাখবো না দীন।
বুকের তলে রসের ধারা
বয়ে যাবে পাগল পারা।
আর যে আমি রইতে নারি,
এসো তুমি তৃষার বারি।
জ্বলচে অনল প্রাণে প্রাণে,
মরু জাগায় স্থানে স্থানে,
সেথা কান্তি-কমল ফুটবে গানে
তোমার মাঝেই হলে হারা॥

রসায়ন বিজ্ঞানে জড়ের লক্ষণ।*

(৺হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

রসায়নের পূর্ব্বে জড়ের সাধারণ গুণ ও তাপ তড়িৎ প্রভৃতি বর্ণনা করা উচিত। জড়পদার্থের সাধারণ গুণ ও প্রকৃতি আলোচনা করিতে গেলে দেখিতে পাইবে যে, যেমন ইহার ভিতর পরীক্ষার বিষয় অনেক আছে, তেমনি ইহার ভিতর অনেক অনুমানসিদ্ধ আছে। জড় পদার্থ কাহাকে বলে, এই প্রশ্নের উত্তরে যদি বলা যায় যে, যে কোন বস্তু বাহ্যেন্দ্রিয়ের দ্বারা জানা যায় তাহাই জড় পদার্থ, পঞ্চেন্দ্রিয়ের কোন একটী ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রাহ্য যাহা তাহাই জড় বস্তু, যেমন এই টেবিল দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা জানিতেছি এইজন্য টেবিল জড় পদার্থ—কেহ কেহ বলেন যে এ কথাতে (লক্ষণে) ভ্রম আছে। আয়নার ভিতর যখন ছবি দেখিয়া বালকেরা তাহার পিছনে হাত দিয়া তাহাকে ধরিতে যায়, বাস্তবিক তো সেখানে কিছু থাকে না, কাজেই ঐ লক্ষণ অনুসারে জড় পদার্থের নিরাকরণ করা যায় না।

এইজন্য কেহ কেহ আর এক লক্ষণ করেন—এক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুতে যদি অন্য ইন্দ্রিয় সাক্ষ্য দেয় তাহা হইলেই সেই পদার্থের যথার্থত নিরূপণ হইবে, যেমন এই টেবিল—দর্শন ও স্পর্শন দ্বারা গ্রাহ্য। ইহার উপর আর কথা কহিবার যো নাই। (কোন কোন স্থলে এক বস্তুর পঞ্চেন্দ্রিয়ই সাক্ষী হয়।) দর্শন দ্বারা কোন বস্তু দেখিলে তাহাতে যদি অপ্রত্যয় জন্মে, স্পর্শন দ্বারা সে ভ্রম দূর হয়। অতএব দর্শন স্পর্শন দ্বারা যাহা একদা গ্রাহ্য, তাহাই যথার্থ। এই লক্ষণেরও ব্যত্যয় আছে। সূর্য্যকে আমরা দেখিয়া আসিতেছি, কিন্তু তাহাকে স্পর্শন দ্বারা টের পাই না। কিরণকে স্পর্শ করিতেছি বলিয়া কিছু সূর্য্যকে স্পর্শ করিতেছি না। অত-

* ১ই বৈশাখ, রবিবার ১৭৯৫ শক।

এব দেখা গেল যে দ্বিতীয় লক্ষণেও সব বস্তুকে পাওয়া যায় না।

যদি আর একটা লক্ষণ করিয়া লই তাহা হইলে এই করিতে পারি যে, বাহ্যেন্দ্রিয়ের একটী দ্বারাই হউক বা দুইটী দ্বারাই হউক, স্থাননির্ব্বিশেষে কাল-নির্ব্বিশেষে মনের অবস্থা নির্ব্বিশেষে যাহাকে একই দেখিতে পাই তাহাই যথার্থ, এবং এই লক্ষণের তারতম্যানুসারে কোন বস্তুর বাস্তবিকতার প্রতি প্রত্যয় বা সন্দেহ হইবে। যে পদার্থকে কি এখানে কি ওখানে যেখানেই থাকি না কেন, কি আজ কি কাল প্রতিক্ষণেই, কি মনের ভাল অবস্থায় কি খারাপ অবস্থায়, কি ব্যস্ত অবস্থায় কি শান্ত অবস্থায়, একইরূপে দেখিতে পাই তাহাকেই যথার্থ বস্তু বলিতে হইবে। কিন্তু এ লক্ষণ এত গুরুতর হইয়া পড়িল যে পরমেশ্বর বস্তু ভিন্ন আর কোন বস্তু ইহাকে সম্যক আবরণ করিতে পারে না।

যাহাকে এক সময়ে দেখিতে পাইলাম, আর এক সময়ে দেখিতে পাইলাম না, তাহাকে পদার্থ বলিয়া সন্দেহ থাকিতে পারে। আয়নার ভিতর ছবি—আয়নার নিকট এই রকম মুখ লইয়া গেলে ছবি দেখিতে পাইলাম, মুখ সরাইলে আর দেখিতে পাইলাম না; একসময়ে এক রকম দেখিলাম, আর এক সময়ে আর এক রকম দেখিলাম—তাহা হইলেও বিশ্বাস ঠিক হয় না। বস্তুতে পরিবর্ত্তন যত কম হয় ততই তাহাতে প্রত্যয় অধিক হয়। ভেল্কীতে বস্তুর স্থান কাল ও বস্তুগত অত্যন্ত পরিবর্ত্তন দেখিয়া তাহাতে আমরা অত বিশ্বাস স্থাপন করি না। আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারাই জড় পদার্থ ঠিক করি বটে, কিন্তু তাহার নিশ্চয়তা স্থাপনের নিমিত্ত স্থান কাল ও অবস্থা নির্ব্বিশেষে যতটুকু হয় তাহাকে সমানভাবে দেখা আবশ্যক হয়, তবে তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না। মরুভূমিতে মরীচিকা দ্বারা লোকে প্রতারিত হয়; একস্থান হইতে মরীচিকাকে প্রথমে বোধ হইয়াছিল, সেখানে গেলে আর তাহাকে সে স্থানে দেখা যায় না, তখন আবার তাহা ততদূর সরিয়া যায়। দুই তিনবার এইরূপ ঠকিয়া আর তাহার যাথার্থ্যে বিশ্বাস থাকে না, অর্থাৎ দূর হইতে যেরূপ দেখা যাইতেছে, নিকটে গেলে বাস্তবিক যে সেইরূপ দ্রব্য প্রাপ্ত হইব তাহা মনে হয় না। আবার উহাকে প্রাতঃকালে দেখিতে পাইব না, সন্ধ্যাকালেও দেখিতে পাইব না, কিন্তু মধ্যাহ্নকালে সূর্য্যকিরণ যখন প্রখর হয় তখনই তাহাকে দেখা যায়। আবার যাহারা তৃষ্ণাতুর হয়, তাহারাই হয়তো উদ্যান জলাশয়াদি অধিক দেখিতে পায়। সুতরাং মরীচিকা ভ্রম মাত্র। মরীচিকাকে যে দেখিতে পাইতেছে, সেটা ভ্রম নহে। বাস্তবিক বায়ু উত্তপ্ত হইয়া সূর্য্যকিরণকে ঐরূপ বিখণ্ডিত (refract) করিতেছে বলিয়া সেই সূর্য্যের কিরণ চক্ষে পড়িয়া নানাপ্রকার ছবির আকার ধারণ করে, কিন্তু যেরূপ ছবি চক্ষে দেখিতে পাই সেরূপ কোন পদার্থ সেখানে নাই।

বাহ্যেন্দ্রিয়ের দ্বারাই জড় পদার্থ চেনা যায়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে যতদূর হইতে পারে স্থানের নির্ব্বিশেষতা কালের নির্ব্বিশেষতা ও কখন কখন মনের নির্ব্বিশেষতা হইলে তাহার সত্তায় বিশ্বাস দৃঢ় হয়। কিন্তু এই শেষোক্ত লক্ষণের সম্যকভাব জড়পদার্থে খাটে না। এ লক্ষণ পরমেশ্বরেতেই পর্য্যবসিত হয়। তিনিই দেশকালপাত্রে অপরিবর্ত্তিতস্বভাবরূপে স্থির হইয়া আছেন। আর সকলই লক্ষণের অংশমাত্রে পর্য্যবসিত হয়। যে বস্তু এই লক্ষণের ভাগ যত অধিক পায় তাহাকে আমাদের ততটা অধিক সত্য বলিয়া বোধ হয়। এই কারণে মরীচিকা বা ভেল্কী অপেক্ষা ক্ষণস্থায়ী পুষ্পকে অধিক সত্য বলিয়া বোধ হয়, পুষ্প অপেক্ষা প্রাচীরকে, প্রাচীর অপেক্ষা পর্ব্বতকে, পর্ব্বত অপেক্ষা পৃথিবীকে, পৃথিবী অপেক্ষা সৌরজগতকে, সৌরজগত অপেক্ষা ব্রহ্মাণ্ডকে, এবং ব্রহ্মাণ্ড অপেক্ষা পরমেশ্বরকে অধিক সত্য বলিয়া বোধ হইবে।

আমাদের উপারাক্ত লক্ষণ দ্বারা জড় পদার্থ আমাদের নিকট অধিক সত্য বা কম সত্য বলিয়া যতই বোধ হউক না, যাহা সত্য তাহা সত্যই থাকিবে। উল্কাপাত দেখিতে দেখিতে অদৃশ্য হয় বলিয়া উহা কি সত্য নহে? উহাও সত্য। কত উল্কাখণ্ড পৃথিবীতে পতিত হইয়া লোকের প্রত্যক্ষগোচর হইয়াছে। ক্ষণপ্রভা ক্ষণমাত্র চক্ষুগোচর হয় বলিয়া কি উহা পদার্থ নহে? এক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইলেও তাহা পদার্থ। কেবল ঐরূপ ক্ষণিক ঘটনার সময় জ্ঞানক্রিয়া দ্বারা বিবেচনা

করিয়া লইতে হইবে যে ইহা কল্পনা বা বাস্তবিক। যেমন, আমাদের চক্ষুতে যদি কোন রোগ না থাকে, আকাশ যদি পরিষ্কার থাকে এবং তাহাতে উল্কাপাত হয়, তাহা কেন না আমরা উল্কাপাত বলিয়া বিশ্বাস করিব—বিশেষত, ঐরূপ উল্কাপাত যখন আরও অনেকবার হইতে দেখিয়াছি? যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়, আর যদি তাহাতে ক্ষণপ্রভা দীপ্তি পায়, তাহাতে আমরা বিশ্বাস করি; তাহার কারণ, এক, যখনই মেঘ হয় তখনই বিদ্যুৎ দেখিতে পাই, আর দ্বিতীয়, বিদ্যুৎ যেরূপে উৎপন্ন হয় তাহার অনেকটা আমরা জানি এবং বিদ্যুৎ প্রস্তুত করিতে পারি। যে দ্রব্য কখনও দেখি নাই কখনও শুনি নাই, এমন কোন জিনিস হঠাৎ প্রত্যক্ষ হইলে সংশয় হইতে পারে, কিন্তু জ্ঞান দ্বারা নিরাকরণ করিতে পারিলে সে সংশয় দূর হয়।

কেহ কেহ বলেন যে বাস্তবিক পদার্থ দেখিতে পাই না, গুণ দেখিতে পাই—যেমন, এই বোর্ডের কাল গুণটুকু চক্ষে দেখিতে পাই, ইহার বন্ধুরতা গুণ হাতের দ্বারা টের পাই, ইহা হইতে নির্গত শব্দ-গুণ কর্ণ দ্বারা শুনিতে পাই; ইন্দ্রিয় দ্বারা বস্তুর গুণ নিরূপণ হয়, কিন্তু বস্তু নহে। গুণ যে আধারে থাকে সেই আধার তো বস্তু? গুণ আধারে দেখিতে পাই, অথবা গুণের যহিত বস্তুকে একত্র দেখি, ইহা একই কথা। যেমনি কাল দেখিতেছি তেমনি কালতে আধার জড়িত দেখিতেছি। বস্তুত যদি জড়জ্ঞানকে বিভাগ করিয়া দেখিতে যাই, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে ইন্দ্রিয় তাহার আংশিকভাগ প্রকাশ করে এবং আমাদের মনও আংশিক ভাগ তাহাতে অর্পণ করে। এই দুইয়ের রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারাই যেন আমরা জড় পদার্থকে জানিতে পারি।

আমাদের আত্মার প্রতিঘাতে আত্মা হইতে ভিন্ন বাহ্য পদার্থের অভ্যাস হয়। আমরা ছেলে-বেলায় যাহা কিছু দেখি, সব যেন আত্মাতেই দেখি। শিশু ঘর দ্বার যাহা কিছু দেখে, বাহিরে যে এসকল দেখিতেছে তাহা তাহার মনে হয় না; তাহার আত্মাই যেন তাহার নিকট ঐ সকল হইয়াছে। তাহাকে চিমটি কাটিলে কেহ চিমটি কটিয়াছে বলিয়া তাহার বোধ হয় না। কিন্তু তাহার আত্মাতে ক্লেশ উপস্থিত হইল, সেইটুকুই সে জানে। বড় হইলে ক্রমে বুঝিতে পারে আত্মাতো ঐ সকল ঘটনার কারণ নহে; অতএব আত্মার বাহির হইতে ঐ সকল কারণ আসিতেছে। এই প্রকারে আপনার সঙ্গে প্রতিঘাত দ্বারা বাহ্য পদার্থকে জানিতে পারে।

কিন্তু বাহ্য পদার্থের যেটুকু ইন্দ্রিয়গম্য, সেটুকু গুণ। আমাদের মন তাহাতে আধার প্রদান করে। যেমন, বোর্ডের কালটুকু চক্ষে দেখিতেছি, কিন্তু এই বস্তু কাল, ইহা মন বলিতেছে। বোর্ডের রংটুকু চক্ষে পড়িতেছে, ইহা যে শক্ত হাত তাহা টের পাইতেছে। কিন্তু ইহা যে এতখানি স্থান ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে, এই স্থানটুকু মন দিতেছে। স্থানকে তো হাত স্পর্শ করিতে পারে না, চক্ষু দেখিতে পায় না—আকাশ শূন্য পদার্থ। মন কিন্তু গুণেতে আধার দিয়া ও আকাশ দিয়া আকৃতি ও বিস্তৃতিযুক্ত বস্তুরূপে গ্রহণ করে। বাস্তবিক মন যে এই আধার ও আকাশ দেয় তাহা নহে। যখনি আমরা জড় পদার্থকে জানি তখনি তাহাকে আকাশস্থ আকৃতিবিশিষ্ট বস্তু বলিয়াই জানি। তবে আমাদের এমন ক্ষমতা আছে যে বস্তু হইতে গুণকে প্রত্যাহার করিয়া কল্পনাতে আলোচনা করিতে পারি, কিন্তু বাস্তবিক ভিন্ন বলিয়া মনে করিতে পারি না।

যাহা হৌক মতামত বিভিন্ন থাকিলেও বাহ্যেন্দ্রিয়ের দ্বারা আংশিক স্থাননির্ব্বিশেষে কালনির্ব্বিশেষে মনের অবস্থানির্ব্বিশেষে যে পদার্থ গ্রহণ করি তাহাই জড় পদার্থ। সেই জড় পদার্থ লইয়াই রসায়নের ব্যাপার। অজড় পদার্থ লইয়া রসায়ন ব্যাপার হয় না। অজড় পদার্থ আত্মা পরমাত্মা। আত্মা হইতে না কোন রসায়নিক ব্যাপার সমুদ্ভূত হয়, না জড়ের রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারাই আত্মার উদ্ভব হইতে পারে।

রাণাডের জীবন-স্মৃতি।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর)

আমার নাশিকের অভ্যাস এখানেও বজায় রাখিয়াছি, কিন্তু কোন মৈত্রিনী নেই। "উনি" কোর্ট হইতে বাড়ী

আসিলে ও "ভাউজি" স্কুল হইতে আসিলে পর, আমরা তিন জনে টাঙ্গায় করিয়া জমনাগিরির নিকটে কিংবা আর কোথাও বেড়াইতে যাইতাম। একদিন আমি ওঁকে বলিলাম,—আমরা এই সহরে আসিয়াছি, এখন এখানকার ভদ্র মহিলাদের সহিত পরিচয় করিয়া লইব, তাঁহাদিগকে হলদীকুঙ্কুম প্রভৃতির উপলক্ষে আমাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিব। কখন বা আমরাও তাঁহাদের বাড়ী যাইব। পরিচয় হইয়া গেলে, তাঁহাদের এখানকার চাল-চলন ও ধরণ-ধারণ আমরা জানিতে পারিব। ভাল স্ত্রীলোকদের সহবাসে, যে সকল বিষয় আমাদের বোধগম্য হয় না, তাহা চোখে দেখিয়াই সহজে বুঝিতে পারিব। এবং সংসারে কিরূপভাবে চলিলে লোকে ভাল বলিবে তাহাও জানিতে পারিব। এইরূপ বলিবার পর, প্রতি শুক্রবারে ও মঙ্গলবারে দুপুর বেলায় হলদীকুঙ্কুমের উপলক্ষে মহিলাদিগকে আমি নিমন্ত্রণ করিতে আরম্ভ করিলাম। এবং তাঁহারাও আসিতে লাগিলেন। এইরূপে চেনাপরিচয় হইয়া গেলে, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ সাদা সিলাই, গলাবন্ধ, টুপী প্রভৃতি করিবার জন্য দুপুর বেলায় আমাদের বাড়ী আসিয়া শিখিতে বসিয়া যাইতেন। আমি এই পর্য্যন্তই তাহাদিগকে শিখাইতে পারিতাম। যাহাই হোক, আমার সময় বেশ কাটিতে লাগিল। আমরা নীচের গলীতে থাকিতাম। সেই গৃহের সংলগ্ন আর এক ভায়ের ভাগে এই রকমেরই এক গৃহ ছিল। এই দ্বিতীয় গৃহে মাধবরাও মোরেশ্বর নামে থানদেশী পরিবার-বৎসল এক গৃহস্থ বাস করিতেন। বউ, মেয়ে, ছেলে, ভাই, মা প্রভৃতি পরিবারের অনেক লোক। ইহাদের ব্যবহার সরল ও দয়ালু ছিল। পরে, তাঁহাদের বদলীর হুকুম আসিলে পর, ছেলেপিলে লইয়া তাঁহাদের যাইতে হইল। তাঁহারা চলিয়া গেলে, তাঁহাদের সঙ্গ হইতে বঞ্চিত হওয়ায়, আমার বড় একা-একা ঠেকিতে লাগিল। এবং আর এক ভাল সঙ্গী লাভের জন্য আমার ইচ্ছা হইল। কিছুদিনের মধ্যেই এক ভাড়াটিয়া আসিলেন। ইনিও পরিবার বৎসল ছিলেন। অর্থাৎ ছেলে, বৌ, স্ত্রী, চাকর-বাকর প্রভৃতি এই পরিবারে অনেক লোক। কিন্তু প্রেম ও বাৎসল্য এই দুইটি জিনিস তাঁহাদের নিকট হইতে বহু দূরে ছিল। এইজন্য সমস্ত বৃত্তান্ত আমি তাহাদের দুই বউ ও স্ত্রীর নিকট হইতে জানিয়াছিলাম। প্রধান মহিলাটি স্বভাবত দয়ালু, কর্ম্মদক্ষ ও ধার্ম্মিক ছিলেন। হিন্দু-পরিবারের যে সমস্ত সুখের সাধন বলিয়া আমরা বুঝি, তাহা তাঁহার অনুকূল ছিল। তাহার দরুণ ইনি খুব ভাগ্যবান এইরূপ আমার ধারণা ছিল। কিন্তু তিনি অত্যন্ত দুঃখে আছেন, তাঁহার সহিত পরিচয়ের পর শীঘ্রই জানিতে পারিলাম। এবং এই প্রতিবেশী আমার নিজের হইবে না এইরূপ মনে হইতে লাগিল। এই মহিলার মেয়ে ছিল না, এবং তিনি মেয়ে ভাল বাসিতেন। সেই জন্যই হয়তো আমাকে মায়ের মতো স্নেহ করিতেন। আমারও তাঁর প্রতি টান ছিল। আমাদের দুই ভাড়া বাড়ীর মাঝামাঝি দরজা থাকায়, উহা প্রথম বাড়ী হইতে খোলাই থাকিত। সেই দরজা দিয়াই এই বাড়ীতে আসা যায় বলিয়া সৌভাগ্যবতী কাকু ও দুই বউ সেইদিন হইতে চারি পাঁচ-বার আমাদের বাড়ী আসিতেন। সকালে আসিয়া চুল বাঁধিতেন। আমার কোন জিনিস অল্পবিস্তর জানা থাকিলে, তিনি আসিয়া, দাঁড়াইয়া থাকিয়া শিখিয়া লইতেন। দুপুর বেলায় পুরুষেরা কাছারীতে চলিয়া গেলে, দুই বউ-সহ কাকু আমাদের বাড়ী আসিয়া বলিলেন যে, "কাল আমাদের পুণায় যেতে হবে" আমি ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "হঠাৎ এ মৎলব কেন হল? তিনি বলিলেন, আমাদের বাড়ীতে কোন কারণ থাকার দরকার হয় না, কোন মৎলব থাকার দরকার হয় না, এই রকম আমাদের অবস্থা। আজ পর্য্যন্ত তোমাকে ছোট মেয়ে মনে করে স্পষ্ট কিছু বলিনি। কিন্তু তোমাকে আমি 'মেয়ে' বলিয়াছি, তাই তোমাকে কিছু বলিয়া রাখি। একটু এইদিকে বোসে যাও; যে পর্য্যন্ত এই মেয়েটা না আসে সেই পর্য্যন্ত কিছু বলতে পারব।"—এইরূপ বলিয়া তিনি আমাকে অনেক কথা বলিলেন। এই কথা বলিতে বলিতে তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন।

এই সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিতে শুনিতে বিস্ময় ও ভয়ে অভিভূত হইয়া আমিও কাঁদিতে লাগিলাম। কাকু আমাকে কাছে লইয়া বলিলেন যে, "তুমি ভয় পেয়ো না। মাঝের দরজা বন্ধ করিয়া পাকা করিয়া ফেল। আমার এই কথা তোমার মনে-মনেই রেখে দিও। এই কথা তোমার বাড়ীর লোকেরা জান্‌তে পেলে আমার সম্বন্ধে না জানি কি মনে করবেন", আমি বলিলাম "ছি, তোমার সম্বন্ধে মনে করবার কি আছে? তুমি মায়ের মতো আমার প্রতি কত স্নেহ করেছ, আমার সঙ্গে সহবাস করেছ; আর এখনকার উপকার আমি কখনই ভুল্‌ব না।" এইরূপ বলিবার পর, আমার মনে কি হইতেছিল, তা আমি জানি না। মন যেন একেবারে "হতভম্ব" ও হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিল। কাকু অনেক সময়ই এখানকার ওখানকার গল্প বলিতেন, আমিও তাঁর সহিত গল্প করিতাম। কিন্তু আমরা কেন গল্প করিতাম এবং আমাদের মধ্যে কে কি বলিতাম তাহা কিছুই বুঝিতে পারিতাম না। এই সময়েও যদি কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করিত, আমি

কিছুই বলিতে পারিতাম না। সে যাক্। "ওঁর" আসিবার সময় হইয়াছে দেখিয়া আমরা তিন জনই উঠিয়া গেলাম। কিন্তু আমার প্রাণটা যেন একটু হাল্‌কা হইল এবং উনি বাড়ী আসিলে এই কথাটা বলিব কিংবা আহারান্তে শুইবার সময় বলিব ইহা আমি মনে মনে ঠাওরাইতে লাগিলাম। সেই সব লোকের জঘন্য ব্যবহারের কথা শুনিয়া পর্য্যন্ত আমার মন গোড়াতেই বিহ্বল হইয়া পড়ায় একাকি চুপটি করিয়া বসিয়া কাঁদিতাম। "উনি" শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া যখন বাড়ী ফিরিবেন তখন এই বৃত্তান্ত বলিলে ওঁর কষ্ট হইবে ও তাঁহার খাওয়া হইবে না, তাই, রাত্রে তাঁহাকে এই বৃত্তান্ত বলিব স্থির করিলাম। নিত্য নিয়মানুসারে ৫টা ৫৷৷০ টা বাজিলে উনি বাড়ী আসিলেন। আমি উঁহার কাপড় ছাড়াইয়া লইবার জন্য নিত্যনিয়মানুসারে উহাঁর সম্মুখে গেলাম। কাপড় ছাড়াইবার সময়, অন্য সময়ের মতো ঠাট্টা করিয়া আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিয়া থাকিবেন, কিন্তু সে দিকে আমার লক্ষ্য না থাকায়, আমার নিকট হইতে কোন উত্তর পাইলেন না। সেই জন্যই হোক, কি আর কোন কারণেই হোক, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আজ তোমার হয়েছে কি? তোমার মায়ের বাড়ী থেকে কি কোন পত্র এসেছে?" এই কথা শুনিয়া আমি বলিলাম, "চিঠিপত্র কিছু আসে নি,—"আমি এখনি ভাউজীর জলখাবার দিতে যাচ্চি"—এই কথা বলিয়াই আমি চলিয়া গেলাম। জলখাবার দিবার সময়ে দুপর বেলার বৃত্তান্ত, "উনি বেড়াইতে যাইবার সময়েও আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, রাত্রি পর্য্যন্ত আমি ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে পারিব না, মনে করিলাম। তাহার পর, নিত্যানুসারে ফল ও সুপারী লইয়া বৈঠকখানায় গেলাম। ফল খাইতে খাইতে আবার পূর্ব্বের মতো "আজ কোন বিশেষ খবর আছে"? এইরূপ বলিলে আমি কহিলাম যে, 'আজ বেড়াইতে যাবার সময় অনেক কথা বল্‌বার আছে। উনি পোষাক পরিলেন; ভাউজি জলযোগ করিয়া বাহিরে আসিল। টাঙ্গা দরজার সামনে তৈয়ারীই ছিল। টাঙ্গায় আমরা তিন জন বসিয়া বেড়াইতে গেলাম। গাড়ীতে বসিলে পর, উহাঁর জিজ্ঞাসার অপেক্ষা না করিয়াই (একবার কোন বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার উত্তর না পাইলে, আবার সেই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি রাগ করেন, একথা আমি জানি) আমি আপনা হইতেই বলিতে আরম্ভ করিলাম, কিন্তু সমস্ত কথা ভাউজির সামনে বলিবার মতো না হওয়ায় আমি "সাঁটে সুঁটে" বলিতে লাগিলাম। ইহা লক্ষ্য করিয়া উনি গাড়ী দাঁড় করাইতে বলিলেন এবং "আমরা আজ এক মাইল হেঁটে যাব" এইরূপ বলিলে, আমরা চলিতে লাগিলাম। ভাউজীও আমাদের সঙ্গে চলিতে লাগিল। তখন "উনি" আপন পকেট্ হইতে ঘড়ী বাহির করিয়া বলিলেন যে, "আবা, এখন কটা বেজেছে দেখ। ঘড়িটা পকেটের ভিতর রেখে দেও। এই মাইল হইতে অন্য মাইল পর্য্যন্ত পৌঙ্গে দৌড়ে যেতে কত মিনিট লাগে তা' সেখানে গিয়ে দেখে রেখো। আমরা সেখানে পৌছিলে আমাদের বোলো। "উহাঁর" সোনার ঘড়িটা হাতে পেয়ে ভাউজীর খুব আনন্দ হল। এবং সে "উহাঁর" কথা অনুসারে দৌড়তে আরম্ভ করিল। আমরা আস্তে আস্তে চলিতে লাগিলাম ও চলিতে চলিতে, কাকু যেমন যেমন বলিয়াছিলেন তাঁকে সেই সমস্ত বৃত্তান্ত আমি বলিলাম। আমার বড় খারাপ লাগিতেছিল। আমরা এখন এই বাড়ী ছাড়িয়া অন্যত্র থাকিতে যাইব, এইরূপ আমি অনেকবার বলিলাম। ওঁর এই সময় মুখ গম্ভীর হইল, এবং খালি আমাকে নানাপ্রকার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। আমি কোন উত্তরই দিলাম না। যাইবার দুই রাস্তা ছিল। ভাউজি যে রাস্তা দিয়া যাইবে বলিয়াছিল সেই রাস্তা দিয়া আমরা না যাইয়া, কথা কবার ঝোঁকে সে রাস্তার দিকে না ফিরিয়া অন্য রাস্তা দিয়া আমরা চলিতে লাগিলাম। এক মাইল গিয়া অন্য এক মাইল আসিলেও আবাকে দেখিতে পাওয়া গেল না। আরও কতদূর যাইতে হইবে জিজ্ঞাসা করিবামাত্র, ওঁর মনে হইল উনি ভুল করিয়াছেন। বলিলেন, "ওগো, আমি ভুল করেছি। তাকে অন্য রাস্তা দিয়ে যেতে বোলে, আমরা সেদিকে না গিয়ে এদিকে এসেছি। শীঘ্র চল সে আমাদের জন্য অপেক্ষা করচে।" এই বলিয়া আমরা তাড়াতাড়ি চলিয়া যেখানে ভাউজী ছিল, সেই মাইল পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিলাম। সে একেবারে হতভম্বার মত হইয়া আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। তাহার নিকটে গিয়া "উনি" বলিলেন "ওরে কথা ক'বার ঝোঁকে আমরা ভুলে অন্য রাস্তা দিয়া আসায়, আমাদের জন্য তোর অপেক্ষা করতে হয়েছে। চল্ আমরা এখন ফিরে যাই," এইকথা বলিয়া আমরা আরো এক মাইল চলিয়া টাঙ্গা মিলিবার পর, শীঘ্রই বাড়ী আসিলাম। তবুও, নিয়মাপেক্ষা বেশী রাত হইয়াছিল। সেই দিন, নিত্যানুসারে কোন কিছু পাঠ না করিয়া, দেরী হইয়াছে মনে করিয়া শীঘ্র আহারাদি শেষ করিয়া শুইতে গেলাম। ছেলে মানুষ বলিয়া ভাউজী শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িল। আমরা বিছানায় শুইয়া পড়িলাম। কিন্তু ঘুম আসিল না। আমার মনে সেই দুপর বেলার কথাটা ঘোরপাক খাচ্ছিল। ওঁর মনের অবস্থাও

খুব খারাপ ছিল। প্রায় ১২টা পর্য্যন্ত আমরা আপন-আপন জায়গায় স্তব্ধ হইয়াছিলাম। এবং ১২ টার সময় কথা কহিতে আরম্ভ করিয়া এইরূপ বলিলেন :—"অনীতিমান মনুষ্য হইতে নীতিমান মানুষের কোন ভয় নাই। এই সম্বন্ধে অকারণ ভয় করবে না, চিন্তা করবে না। খারাপ বিষয় যতটা বলা সহজ, ততটা করা সহজ নয়। এই সব লোক বাহিরে সাহস ও ঔদ্ধত্যের ভাব ধারণ দেখালেও ওরা ভিতরে ভিতরে ভীরু। তাই নীতিমান মানুষের সাম্‌নে, ওরা নিজে সঙ্কল্পের দৃঢ়তা রক্ষা করতে পারে না। সেই স্ত্রীলোকটি যে রকম বলেছেন তাই কর। মাঝের দরজার তালা লাগিয়ে, নিশ্চিন্ত মনে আমাদের যে-যার কাজ করতে থাক্‌ব। মনকে যদি বেকার অবস্থায় না রাখা যায়, তাহলে কোন ভয় ও চিন্তা মনে আড্ডা গাড়তে পারে না। যাওয়া আসা করতে পাঁচ ছয়বার তোমার একলা বাহিরে যেতে হয়। সেই সেই সময় টাইম্‌-টেবলের মতো নিয়মিত কাজে মন দিলে কোন ভাবনা থাক্‌বে না।" তাহার পর, আমার স্বামীর বোম্বায়ে বদ্‌লী হইলে, আমরা শীঘ্রই বোম্বায়ে চলিয়া গেলাম এবং এই নরাধম প্রতিবেশীর নৈকট্য সহজেই এড়াইলাম। এই ভদ্রলোককে অনেক লোকেই জানেন, এবং এই রত্নটি পুণ্যভূমির এক কোটরে এখনো জীবিত আছেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

"ধুলিয়া"—১৮৭৯-৮০।

১৮৭৯ অব্দে, মে মাসের ছুটিতে আমরা নাশিক হইতে পুণায় আসিলাম। এই ছুটির মাসটাকে, সমস্ত গ্র্যাজুয়েট মণ্ডলী দেওয়ালী অপেক্ষাও বেশী উৎসব ও আনন্দের মাস বলিয়া মনে করিত। কারণ, সেই সময়ে পুরাতন ও নব্য মণ্ডলীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি প্রেম ও আদর যত্নের ভাব বেশী প্রকাশ পাইত। তাহারা আপন নেতৃত্ব পূর্ণবিশ্বাসে এক জনের হাতে অর্পণ করিয়াছিল। সেই সুদৃঢ় সামর্থ্যবান হস্তে বিন্যস্ত স্বকীয় ভার ও দায়িত্ব পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিয়া, পুণারপুরাতন জীর্ণ নৌকা কয়েক বৎসর সুব্যবস্থিত ভাবে পরিচালিত হইয়াছিল। যে প্রকার, মেয়েরা অনেক দিনের পর, দূর দেশ হইতে পিত্রালয়ে আসিয়া ভাই বোন্‌দের মধ্যে যতদিন থাকে ততদিন খুব আনন্দে কাটাইয়া পরস্পরের সহিত প্রেমে ও সদ্‌ভাবে মন খুলিয়া ব্যবহার করে, ও বয়স্ক লোকেরাও তাহাদিগকে স্নেহ ও আদর যত্ন করে, তাহাদের সমস্ত আবদার শোনে, ইহাও সেই প্রকার। উহারা, এই প্রকার পরস্পরের সহিত দেখাসাক্ষাৎ ও সহবাসকে পরম লাভ বলিয়া মনে করে। কাছাকাছি প্রায় ১৫ বৎসর ধরিয়া পুণার এইরূপ সর্ব্বদাই ঘটিত এ কথা বলা যাইতে পারে। 'উনি' ও এই সমস্ত গ্র্যাজুয়েট মণ্ডলী এই মে-মাসের ছুটিকে একটা পরম সুযোগ বলিয়া মনে করিতেন। বসন্ত ঋতুর আরম্ভে পুরাতন ও নূতন সমস্ত বৃক্ষলতা নব পল্লবে ভূষিত হয় ও তাহাদের নূতন অঙ্কুর বাহির হয়। সেইরূপ এই বসন্ত ঋতুতে, গ্র্যাজুয়েট মণ্ডলীর নূতন নূতন বিচার-আলোচনা একত্র করিয়া সুব্যবস্থিত রূপে জুড়িয়া ও গাঁথিয়া তাহা উত্তম উপযুক্ত কাজে লাগাইবার সুনিপুণ মালীর যে কাজ, আমার স্বামীর সেই কাজ ছিল। আমার স্বামীর এই কাজ সমস্ত মণ্ডলীর ইচ্ছানুসারেই হইয়াছিল বৎসরের বারো মাসের মধ্যে এই দুই মাস আমার স্বামীর অবিশ্রান্ত কাজ করিতে হইত। সমস্ত রাত্রির মধ্যে কখন কখন দুই ঘণ্টাও ঘুমান নাই, এইরূপ কয়েক রাত কাটিলেও তিনি ক্লান্তি বোধ করিতেন না। এই কাজ কেহ তাঁহাকে দিলে তিনি বেগার কিংবা 'ঘাড়ের বোঝা' মনে করিতেন না, প্রত্যুত অত্যন্ত প্রিয় কার্য্য বলিয়া মনে করিতেন। তাহার দরুণ ক্লান্তি কিংবা বিশ্রামের অভাব বোধ করিতেন না। এই সময়ে পুণায় "বসন্ত ব্যাখ্যান মালা" (series of lectures) ও বক্তৃত্ব উদ্দীপনী সভার অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছিল এবং এইরূপ আরও অন্য নৈমিত্তিক কোন-না-কোন সভা সমিতির কাজ প্রতিদিন উপস্থিত হইত। এই সমস্তের তত্ত্বাবধান করিয়া সকাল ছাড়া, সন্ধ্যাকালে প্রাচীন ও নবীন মিত্রমণ্ডলীর বৈঠক আমাদের গৃহে হইত। এই মণ্ডলী একবার বসিয়া 'ভবতি ন ভবতি' তর্ক আরম্ভ করিয়া দিলে আহারের সময়ে উঁহার কখনই উঠা হইত না। দিনের বেলা, ১২ টা কিংবা ১ টার সময়, ও রাত্রিতে ১০॥ টা, এমন কি ১১ টার সময়েও উনি খাইতে বসিতেন পরে নিদ্রার ব্যাপারও এইরূপ। খাওয়া হইয়া গেলে, গৃহের গুরুজনদিগের সহিত ও আশ্রিত লোকদিগের সহিত ১২টা পর্য্যন্ত কথাবার্ত্তা কহিয়া তবে শুইতে যাইতেন। দিনের বেলাটা বিশেষ বিচার-আলোচনায় অতিবাহিত না হইলে, শীঘ্রই নিদ্রা আসিত ও ভাল নিদ্রা হইত। কিন্তু ইহার উল্টা, যদি কোন নূতন বিচার আলোচনায় দিনের বেলাটা কাটিত, তবে লোকদৃষ্টিতে বিছানায় গিয়া শুইতেন মাত্র, কিন্তু সমস্ত দিনের বিচার আলোচনায় মন ব্যাপৃত হওয়ায় কখন কখন সকাল পর্য্যন্তও বিনা ঘুমে কাটিত। কিন্তু মনের উল্লাসে এই জাগরণ উৎপন্ন হওয়ায় তাহার দরুণ শ্রান্তি কিংবা কষ্ট বোধ করিতেন না। এইরূপ আনন্দে অতি-

বাহিত মে মাসের ছুটিতে আমরা নাশিক হইতে পুণায় আসিয়াছিলাম। এই বৎসরে বাসুদেব-বলবন্ত-ফড়কের বিদ্রোহের এবং আশপাশের অন্যস্থানে ডাকাতদিগের হাঙ্গামার সত্য মিথ্যা বৃত্তান্ত, সকাল সন্ধ্যাকালে মিত্র মণ্ডলী একত্র জমা হইলে নিত্যই জানা যাইত। তাছাড়া, এই সম্বন্ধে কতকগুলি সম্মানিত ভদ্রলোকের পরোক্ষ ও অপরোক্ষভাবে লাঞ্ছনা হইতেছে একথাও আমার স্বামীর কানে আসিল। এই সময়ে আমাদিগের পুণাবাসীদিগের দুর্দৈবক্রমে ১৮৭৯ অব্দের ১৯শে মে তারিখে রাত্রি প্রায় দুইটার সময় পেশোয়ার স্মারক ও সহরের অলঙ্কার এইরূপ এক "বুধবারের" ও আর এক "বিশ্রামবাগের" প্রাসাদ—এই দুই প্রাসাদেই হঠাৎ আগুন লাগিয়া সকালে দুই প্রাসাদই পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। এই আগুনে আমাদের বড়ই অনিষ্ট হইয়াছিল। এই সময়ের বোম্বাই এলাকার রাজ্য পরিচালক প্রতিনিধি (টেম্পল সাহেব) হংসের বিপরীত ছিলেন; সেইরূপ কাছাকাছি তাহারই অনুযায়ী হইবার দরুণ, দুধ জলের বাছাই করিবার পরিবর্ত্তে ঠুকরাইয়াই ক্ষত উৎপাদনের দিকেই তাঁহার বিশেষ প্রবৃত্তি ছিল। তাঁহার ইঙ্গিতেই আংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজ ওয়ালারা তাঁহার জয় ঘোষণা করিতে প্রস্তুত ছিল; তাহারা যে দিকে বাতাস সেই দিকে পিঠ ফিরাইল। এই সময়ে বোম্বায়ের টাইমসপত্র মানহানিজনক লেখা লিখিয়া এবং প্রাসাদ দগ্ধকারী "রাণাডে"র নামের সহিত আমাদের নামের বাদরায়ণী সম্বন্ধ টানিয়া বাহির করিয়া, সরকারের মতের বলবৃদ্ধি করিয়া সরকারের মনকে অধিক দূষিত করিল। প্রাসাদ দগ্ধ হইবার পর হইতে প্রায় ৮ দিবসের মধ্যে যথাহুকুম ছুটি শেষ হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া "ধুলিয়ায়" গিয়া প্রথম শ্রেণী সবজজের চার্জ্জ লইবে এইরূপ হুকুম আসায় ছুটি শেষ হইবার পূর্ব্বেই ধুলিয়ায় গিয়া আমাদের উপস্থিত হইতে হইল। পুণা হইতে যাইবার সময়, পুণা ও অন্যস্থানের মিত্রমণ্ডলীর বড়ই খারাপ লাগিল। এবং তাঁহারা খুব আগ্রহের সহিত বলিলেন যে, এই সময় ধুলিয়ায় আমাদিগকে বদলী করায় সরকারের কোন গূঢ় অভিসন্ধি নিশ্চয়ই আছে, অতএব সাবধানে চলিবে। আমার মনের মত সকল জগতের মন নির্ম্মল এইরূপ মনে করিয়া সকলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া চলা ঠিক নহে। না হয়, ধুলিয়ার হাওয়া উষ্ণ, আমার চোখের পক্ষে ভাল নহে, এইজন্য আমাকে সেখানে বদলী করা না হয়, এইরূপ সরকারের নিকট দরখাস্ত করিবে। এই কথায় "উনি" মণ্ডলীকে স্পষ্টই বলিলেন যে, এমন কথা একেবারেই বোলো না। যে পর্য্যন্ত আমার তাহাদের অধীনে চাকরী করতে হবে, সে পর্য্যন্ত কোন রকম কারণ দেখিয়ে ওজর করা আমি ভালবাসি নে। কারণ দেখিয়ে দরখাস্ত করবার সময় উপস্থিত হলে, রাজিনামা দিয়ে একেবারেই অব্যাহতি পাব, এই আমার বেশী পছন্দ হয়"। তাহার পর আমরা ধুলিয়ায় যাইয়াও, মিত্রমণ্ডলী হইতে উক্ত প্রকার কথা লেখা পত্র পাইতাম। এই পত্রে তাঁহারা যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা শীঘ্রই ফলিল দেখিলাম। সেখানে যাইয়া প্রায় একমাস হইলে পর, আমাদের রোজকার ডাক একটু বিলম্বে পাইতে লাগিলাম। এবং ঐ সকল পত্র আবার আটা দিয়া বন্ধ করা এইরূপ ভাবে আসিতে লাগিল (অর্থাৎ একবার ছিঁড়িয়া ফেলিয়া আবার আটা লাগাইয়া বন্ধ করা) এবং ঐ সকল পত্র ঠিক সময়ে না পাইয়া অন্য লোকের অপেক্ষা বিলম্বে পাইতে লাগিলাম। আমাদের পেয়াদা প্রতিদিন ডাকঘরে ডাক আনিবার জন্য যাইয়া থাকে, তবু আমাদের ডাক কেন এত দেরীতে পাই ইহার কারণ কিছুই বুঝিয়া পাইতাম না। উলটা আমি পেয়াদার উপর রাগ করিয়া বলিতাম, "তুই ডাক আনতে নিশ্চয়ই দেরীতে যাস্; কিংবা কোথাও গল্প করতে বসে যাস্" সে বলিত "না মহারাজ! আমি পোষ্টমাষ্টারকে বলি "ডাক শীঘ্র দেও" কিন্তু সমস্ত ডিলিভারি না হওয়া পর্য্যন্ত মাষ্টার সেদিকে মনোযোগ দেন না এবং নিজের কাজ না হয়ে গেলে ডাকও দেন না। এই কথা "উনি" শুনিয়া আমাকে এইরূপ বলিলেন যে, "ও বেচারাকে অনর্থক কেন বোকুচ? এর ভিতরকার কথা আর কিছু হবে, আমার মনে হয়।" আমি তাঁর এই কথার অর্থ ভালো বুঝিতে পারি নাই; কিন্তু পেয়াদাকে এই বিষয়ে আর কোন কথা বলিব না, এইটুকু মাত্র মনে রাখিলাম।

দুই মাসের পর একদিন সন্ধ্যাকালে সেখানকার সেই সময়ের আসিষ্টাণ্ট কলেকটর আমাদের বাড়ীর সামনে আসিলেন এবং "বেড়াইতে যাইবেন কি"? এই কথা "ও'কে" জিজ্ঞাসা করিলেন। উনি "হাঁ যাইব" বলিলে তিনি আবার বলিলেন, "গাড়ী জোতবার উদ্যোগ কেন? আমার গাড়ীতেই আপনি চলুন"। তখন "উনি" তাঁহার সঙ্গেই গেলেন। প্রায় দুই ঘণ্টার পর বাড়ী ফিরিয়া আসিলে, আমাকে উনি বলিলেন যে, আমি যা মনে করেছিলাম তাই ঠিক্। আমরা এই বিষয়ে আমাদের পেয়াদাকে বকুছিলুম, কিন্তু তার কোন দোষ নেই। আজ সাহেব কথায়-কথায় সহজভাবে বলিলেন যে—"কিছু দিন থেকে আমি একটু অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে আপনার সহিত ব্যবহার করছিলাম, এই জন্য আমি বড়ই দুঃখিত"। এই দিন অনেকক্ষণ ধরিয়া এই সম্বন্ধে আমাদের কথা হইল। সেই সময়ে পুণার লোকের উপর সরকারের অবিশ্বাস ও সেই মনোভাব

অনুযায়ী মৎলব আঁটা, এই সম্বন্ধেও অনেক কথা উনি বলিলেন। ঐ কথা শুনিবামাত্র, পুণার লোকেরা কেন যে ঐরূপ সিখিয়াছিল তাহা বুঝিতে পারিলাম। তাছাড়া, দুই একদিনের মধ্যে, বাসুদেব-বলবন্ত-ফড়কে কিংবা হরি-রামোশী এই স্বাক্ষরে ও অমুকস্থানে বিদ্রোহ কিংবা ডাকাতি সম্বন্ধে কাল পরামর্শ হইয়াছে, অমুক লোক কিংবা অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গিয়াছে ইত্যাদি এই মর্ম্মের পত্র না ছোঁড়া অবস্থাতেই আমাদের হাতে আসিত। ঐ সকল পত্র আসিলে, উহা পড়িয়া দেখিয়া, "উনি"পাঠ সমেত যেমনটি তেমনি ফৌজদারের নিকট পাঠাইয়া দিতেন। উপরি উক্ত পত্রাদি বিদ্রোহী কিংবা ডাকাত দিগের নামে লিখিত হইয়া পুলিশ বিভাগের দ্বারাই পাঠান হইয়া থাকিবে এইরূপ দৃঢ় সংশয় উপস্থিত হইলে, উনি ঐ সকল পত্র তাহাদের নিকট ফেরৎ দিতে লাগিলেন। নচেৎ, অন্য বিনামা ও মাথাপাগলা লোকদিগের যা তা লেখা পত্রাদিও আসিত কিন্তু তাহার মধ্যে বিদ্রোহ কিংবা সরকারী কোন কিছু বিচার করিবার মত লেখা না থাকায়, তিনি সে সমস্ত পড়িয়াই ছিঁড়িয়া ফেলিতেন। এইরূপ প্রথম ২।৪ মাস পর্য্যন্ত আমার স্বামীর মন উদ্বিগ্ন হওয়ায় এবং আমিও দুপুর বেলায় একলাটি থাকিতাম বলিয়া খুবই কষ্টে কাটিতে লাগিল ও বিরক্তি বোধ হইতে লাগিল। (ক্রমশঃ)

গ্রন্থ পরিচয়।

পল্লী স্বাস্থ্য—ডাক্তার শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু প্রণীত,—মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র। প্রকাশক—শ্রীজ্যোতিঃপ্রকাশক বসু—২৫ নং মহেন্দ্র বসুর লেন—কলিকাতা। গ্রন্থখানি ১১৩ পৃষ্ঠায় একটী ক্ষুদ্র গ্রন্থ হইলেও বিষয় গৌরবে মহান্। গ্রন্থখানি পড়িতে আরম্ভ করিয়া আমরা শেষ না করিয়া থাকিতে পারি নাই। পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্য বিষয়ে যাঁহারা সদুপদেশ দিতে পারিবেন, তাঁহারাই আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন। পল্লীগ্রামে স্বাস্থ্যের অভাবে আমাদের আহার্য্যাদি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ সমূহ কিরূপ মহার্ঘ্য হইয়া পড়িতেছে তাহা অতি অল্প লোকেই অনুধাবন করিয়া থাকেন। চুনীবাবুর গ্রন্থখানি এ বিষয়ে একটী রত্নবিশেষ বলিলেও চলে। রত্নবিশেষ হইলেও ইহা Sacondary Schoolএর পাঠ্য পুস্তকের ন্যায় লিখিত হইয়াছে। আমরা তাঁহাকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতে চাই যে তিনি Primary Schoolএর উপযোগী করিয়া আলোচ্য গ্রন্থ হইতে বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি অংশ বাদ দিয়া একটী পুস্তিকা রচনা করুন এবং সেই পুস্তিকা তিনি গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে Primary স্কুল সমূহের পাঠ্য পুস্তক স্বরূপে প্রবর্ত্তিত করিবার ব্যবস্থা করুন। কেবল তাহাই নহে—আমাদের ইচ্ছা যে সেই পুস্তিকা প্রত্যেক জমীদার স্ব স্ব জমীদারির প্রজাগণের হস্তে অর্পণ করিবার ব্যবস্থা করুন। তাহার মূল্য সম্ভবমত অল্প করিলেই ভাল হয়। এ বিষয়ে আমাদের সাধ্যমত সাহায্য করিবার জন্য আমরা প্রস্তুত আছি।

খাদ্য—ডাক্তার শ্রীচুনীলাল বসু রায় বাহাদুর প্রণীত। ৩য় সংস্করণ। প্রকাশক—শ্রীজ্যোতিঃপ্রকাশ বসু—২৫ নং মহেন্দ্র বসুর লেন,—কলিকাতা। ইহার মূল্য কত কোথাও লিখিত দেখিলাম না। পুস্তকখানি আমরা আদ্যোপান্ত পড়িয়া অত্যন্ত সন্তোষ লাভ করিলাম। গ্রন্থখানি অমূল্য। ইহাতে খাদ্য সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য সকলই আছে। ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুল প্রভৃতি মেডিকেল বিদ্যালয় সমূহে ইহা পাঠ্য পুস্তকরূপে নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত, সে বিষয়ে দ্বিধা আসিতে পারে না। তবে, আমরা পল্লী স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছি, এই গ্রন্থ সম্বন্ধেও সেই কথা বলিতে চাহি। খাদ্য সম্বন্ধে নানা গবেষণা পূর্ণ তত্ত্ব বাদ দিয়া ছোট ছেলেদের পক্ষে Practicalভাবে একখানি সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা করিয়া উচ্চ প্রাইমারি বিদ্যালয় সমূহের পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে অন্যতররূপে নির্দ্দিষ্ট করাইতে পারিলে দেশের অশেষ মঙ্গল হয়। উপবাসের উপকারিতা, বিভিন্ন রোগে পথ্য নির্ণয় এবং পথ্য প্রস্তুত করণ, এই তিনটী অধ্যায় যেন সেই সংক্ষিপ্ত পুস্তিকাতে সংযুক্ত করা হয়। এরূপ পুস্তক সমূহের দেশব্যাপী প্রচার প্রার্থনীয়।

PREVENTION OF SMALL POX—By Dr. Chuni Lall Bose M. B. & C. S.—ভীষণ ইচ্ছা-বসন্তের হাত হইতে যাঁহারা পরিত্রাণ চাহেন অথবা ইচ্ছা-বসন্ত হইলে কিরূপ পরিচর্য্যা করা আবশ্যক, তাঁহাদিগের এই পুস্তিকা পাঠ করা কর্ত্তব্য। দুঃখের বিষয় পুস্তিকাখানি ইংরাজী ভাষায় লিখিত। ইহা বঙ্গভাষায় লিখিত হইলে দেশের অধিকতর উপকার সাধিত হইত সন্দেহ নাই।

বলিদানের শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত—শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীজীর কাশী যোগাশ্রম হইতে প্রকাশিত। বিনা মূল্যে বিতরিত।

এই পুস্তকখানি ক্ষুদ্র হইলেও দেশের বিশেষ কল্যাণ সাধন করিবে নিঃসন্দেহ। ইহাতে নানা শাস্ত্রীয় প্রমাণের দ্বারা দেখানো হইয়াছে যে পশুবলি প্রকৃতপক্ষে বলিদানের উদ্দেশ্য নহে। এমন কি, পশুবলির সহিত সংসৃষ্ট সকলেই নরকগামী হয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। বিভিন্ন ধর্ম্মসমাজ হইতে এইরূপ পুস্তকের বহুল প্রকাশ অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়।

ডাকের কথা—শ্রীভোলানাথ দত্ত প্রণীত। মূল্য ।৹ আনা। শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে প্রাপ্তব্য। গ্রন্থকারের নিবাস হুগলী জেলার অন্তর্গত মথুরাবাটী। নগরের কোলাহলের ভিতরে "ডাকের" কথা বড় শোনা যায় না। তাই লেখক পল্লীর নিভৃত নিলয় হইতে "ডাকের" কথা শুনাইয়াছেন। "ডাকের কথা" নামে কতকগুলি বচন আমাদের এই বঙ্গদেশে বহু দিন হইতে প্রচলিত আছে। খনার রচনা যেমন "খনার বচন" বলিয়া এদেশে প্রসিদ্ধ, তেমনি "ডাক পুরুষ" নামক জনৈক ব্যক্তির রচনা "ডাকের কথা" বলিয়া পরিচিত। বঙ্গ ভাষার প্রথম বিকাশের সময় তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল। তাঁহার রচনা দেখিলে তিনি যে প্রায় তিন শত বৎসরের পূর্ব্বের লোক এরূপ স্থির করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। ঐ পুরাতন ডাকের কথার লেখক ডাক পুরুষ অশিক্ষিত ছিলেন বলিয়া মনে হয়। কেহ কেহ বলেন, প্রাগুক্ত ডাক পুরুষ জাতিতে গোয়ালা, এবং সম্ভবতঃ তিনি কৃষিজীবী ছিলেন। কিন্তু তাহা হইলেও সাংসারিক ব্যাপারে, কৃষি কার্য্যে ও মনুষ্যচরিত্র সম্বন্ধে তাঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভোলানাথ বাবু যে "ডাকের কথা" শুনাইয়াছেন তাহা প্রাচীন "ডাকের কথার" অনুকরণে সহজ বাণীতে চলিত ভাষায় লিখিত হইলেও উহার সরল কবিত্ব, আমাদিগকে আকৃষ্ট করিয়াছে। তিনি সুদূর হইতে যে ডাক দিয়াছেন তাহা আমাদের কর্ণকে স্পর্শ করিয়াছে। তাঁহার "ডাক" ব্যর্থ হয় নাই। এই কবিতা-পুস্তকখানিতে ধর্ম্ম ও নীতির কথা যথেষ্ট পরিমাণে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। স্থানাভাব না হইলে আমরা দু এক-স্থল উদ্ধৃত করিয়া ডাকের কবিত্ব দেখাইতে পারিতাম। লেখক পুস্তকখানি বর্দ্ধমান মহারাজকে উৎসর্গ করিয়াছেন।

তান্ত্রিক বর্ণ বিবরণ।

(শ্রীগিরীশ চন্দ্র বেদান্ততীর্থ)

তান্ত্রিক দর্শনের মতে বর্ণাবলী হইতেই জগতের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সুতরাং বর্ণের সহিত উহার সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। বর্ণবিবরণ বিষয়ে তন্ত্রের প্রভূত নিজস্বের পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, বাগীশ্বরী শক্তি মাতৃকাবর্ণরূপে আবির্ভূত হইয়া শিবসান্নিধ্যবলে জগদুপাদান মায়ার সৃষ্টি করেন। তন্ত্রে অনেকস্থলে মাতৃকা শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। মাতৃকা শব্দের নিরুক্তির প্রতি লক্ষ্য করিলে উহার দুই প্রকার অর্থ প্রতিভাত হয়। জননী অর্থে মাতৃশব্দ সুপ্রসিদ্ধ, তাহার পর স্বার্থে ক প্রত্যয় ও তদুত্তর স্ত্রীলিঙ্গবিহিত আকার যোগে মাতৃকাশব্দ নিষ্পন্ন হইতে পারে। অক্ষর হইতেই জগতের উৎপত্তি স্বীকৃত হইয়াছে; অতএব তাহাতে মাতৃত্বারোপ অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। পরিমাপক অর্থেও মাতৃকাশব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে; কারণ সৃষ্ট যাবতীয় পদার্থই বর্ণাবলীর দ্বারা ব্যাপ্ত, এমত প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং বর্ণাবলীর দ্বারা জগৎ নিরন্তরই পরিমিত বা পরিচ্ছিন্ন, একথা অবশ্যই বলা যাইতে পারে।

বর্ণাবলীর শ্রেণীবিভাগে এবং সংখ্যা নির্দ্দেশে তন্ত্রের স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধ হয়। ইহার মতে প্রথমতঃ বর্ণগুলি স্বর ও ব্যঞ্জন এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। কিন্তু এই দুই শ্রেণীতেই ব্যাকরণ প্রসিদ্ধির এবং লোকপ্রসিদ্ধির ব্যতিক্রম দেখা যায়। ব্যাকরণপ্রসিদ্ধ এবং লোকপ্রসিদ্ধ স্বরের সংখ্যা চতুর্দ্দশ বা ত্রয়োদশ। কিন্তু তন্ত্র মতে ষোড়শস্বর স্বীকৃত হইয়াছে। ইহাতে অনুস্বার বিসর্গও স্বর। এই মতে হ্রস্ব দীর্ঘ সংখ্যাও স্বতন্ত্র। অ ই উ ঋ ঌ এ ও এবং অনুস্বার, হ্রস্ব নামে এবং আ ঈ ঊ ৠ ৡ ঐ ঔ এবং বিসর্গ ইহারা দীর্ঘ নামে পরিভাষিত হইয়াছে। ঋ ৠ ঌ ৡ এই চারিটি বর্ণের নপুংসক সংজ্ঞা কথিত হইয়াছে।

এই মতে ব্যঞ্জনের সংখ্যা পঞ্চত্রিংশৎ। দুইটি নকার স্বীকৃত হওয়ায় এবং ক্ষকারকে স্বতন্ত্র বর্ণ বলিয়া গণনা করায় ব্যঞ্জনের সংখ্যায় লোকপ্রসিদ্ধির ব্যতিক্রম হইয়াছে। দুইটি নকারের মধ্যে একটি নকার ক্ষকারের পূর্ব্বে এবং অপরটী হকারের পর পঠিত হইয়াছে। এই মতে বর্ণসংখ্যা একপঞ্চাশৎ হইয়া থাকে।

সমস্ত বর্ণ অষ্টবর্গে বিভক্ত হইয়াছে *। যথা—

---

* বর্গানুক্রমযোগেন দেবতাষ্টকসংযুতা
অবর্গঃ প্রথমো দেবি বশিনী তত্র দেবতা॥
তৎপরস্তু কবর্গোঽয়ং যত্র কামেশ্বরী স্থিতা
মোদিনী তু চবর্গস্থা টবর্গে বিমলা স্মৃতা॥
অরুণা তু তবর্গস্থা পবর্গে জয়িনী তথা
সর্ব্বেশ্বরী যবর্গে তু শবর্গে কৌলিনীতিচ॥
(রামকেশ্বর তন্ত্রে। ১। প ৮৩-৮৫)

অবর্গ কবর্গ চবর্গ টবর্গ তবর্গ পবর্গ যবর্গ ও শবর্গ। এই মতে সমস্ত স্বরবর্ণ অবর্গের অন্তর্গত। যকার হইতে বকার পর্য্যন্ত চারিটি বর্ণ যবর্গ, শকার হইতে ক্ষকার পর্য্যন্ত বর্ণগুলি শবর্গ নামে অভিহিত।

ভগবান শঙ্করাচার্য্য প্রপঞ্চসারের উপক্রমে অকারাদি পঞ্চাশদ্বর্ণকে সপ্তবর্গে বিভক্ত করিয়াছেন *। অন্যত্রও সপ্তবর্গের পরিচয় পাওয়া যায়। স্থলবিশেষে প্রয়োজনানুসারে এই দুই প্রকার বর্গবিভাগ বিবেচিত হইয়াছে। সপ্তবর্গমতে যকার হইতে ক্ষকার পর্য্যন্ত বর্ণগুলি যবর্গের অন্তর্গত। ভগবান শঙ্কর যে সপ্তবর্গের দ্বারা বিশ্বমূর্ত্তির শরীর বিরচিতরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহাতে পঞ্চাশদ্বর্ণ গৃহীত হইয়াছে। এই মতে হকারের পরবর্ত্তী নকার গৃহীত হয় নাই। এইস্থলে একটা কথা বলা আবশ্যক যে কথিত দুইটি নকারের মধ্যে একটি দন্ত্য, অপরটি মূর্দ্ধণ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

বর্ণাবলীর সৌম্যাদি বিভাগ।

বর্ণ সমষ্টির মধ্যে অকারাদি স্বরবর্ণগুলি সৌম্য অর্থাৎ সোম (চন্দ্র) হইতে উৎপন্নতা নিবন্ধন সোমস্বভাবযুক্ত। (শীতল) স্পর্শ বর্ণগুলি সূর্য্য হইতে উৎপন্ন সুতরাং তীক্ষ্ণস্বভাব। য হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত বর্ণগুলি "ব্যাপক" নামে অভিহিত, এইগুলি আগ্নেয় অর্থাৎ অগ্নি হইতে উৎপন্ন।

হ্রস্ব ও দীর্ঘ বর্ণগুলি যথাক্রমে শিবশক্তিময়রূপে বিবেচিত হইয়াছে। ইহাও কথিত হইয়াছে যে অনুস্বার রবিরূপী পুরুষ, এবং বিসর্গ চন্দ্রাত্মিকা শক্তি।

স্বরবর্ণের মধ্যে হ্রস্ব বর্ণগুলি পিঙ্গলা নাড়ীতে, দীর্ঘ বর্ণগুলি ইড়ানাড়ীতে ও নপুংসক বর্ণগুলি সুষুম্নানাড়ীতে অবস্থিত, এমত বুঝিতে হইবে। স্বরবর্ণের সাহায্য ব্যতীত ব্যঞ্জনবর্ণের অভিব্যক্তি হইতে পারে না; অতএব সমস্ত বর্ণই শিবশক্তিময়রূপে বিবেচিত হইয়াছে।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে—স্বরবর্ণের শিবশক্তিময়ত্ব কথিত হইয়াছে; ব্যঞ্জনের উচ্চারণও স্বরের অধীন, অর্থাৎ স্বরসম্বন্ধ, সুতরাং তাহাতেও শিবশক্তিময়ত্ব বুঝিতে হইবে।

বর্ণের পাঞ্চভৌতিকত্ব।

বিশ্বপ্রপঞ্চের উপাদান যে পঞ্চভূত, তাহাদের কারণ শিবশক্তি। বর্ণগুলি শিবশক্তি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; সুতরাং এই সকল বর্ণও পঞ্চভূতাত্মক। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি বর্ণ আকাশাত্মক, কতক বায়বীয়, কতক আগ্নেয়, কতক জলীয় এবং কতকগুলি ভৌম বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। দীক্ষাপ্রকরণে এই বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ দেখা যায়, অনাবশ্যক বোধে তাহা এস্থলে উপেক্ষিত হইল।

জগৎকারিণী বিশ্বনিয়ন্ত্রীর দেহ বর্ণাত্মক। তাঁহার হস্তপদাদি অবয়ব বর্ণের দ্বারা বিরচিত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। এই সকল বর্ণের প্রত্যেকেরই আবার বিপুল আকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। রাঘবভট্ট প্রত্যেক বর্ণের ধ্যেয় রূপপ্রতিপাদক যে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, অকারের বর্ণ স্বর্ণের মত, উহার অষ্ট হস্তে শূল ও গদা শোভা সম্পাদন করিতেছে। উহার মুখ চারিটি, শরীর অতি বৃহৎ এবং কূর্ম্ম উহার বাহন। এইরূপ প্রত্যেক বর্ণেরই নানাপ্রকার আকৃতি অস্ত্র শস্ত্রও বর্ণিত হইয়াছে। ষট্‌চক্র নিরূপণেও বর্ণের নানাপ্রকার আকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাও সেই প্রকরণে প্রদর্শিত হইবে।

মাতৃকাবর্ণগুলি সৌম্য, সৌর ও আগ্নেয় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। সুতরাং চন্দ্রাদির যে প্রসিদ্ধ কলা (অংশ বা শক্তিবিশেষ) তাহাই তত্ত্বর্ণের কলা বলিয়া কথিত হইয়াছে। চন্দ্রের ষোড়শ কলা যথাক্রমে—অমৃতা, মানদা, পূষা, তুষ্টি, পুষ্টি, রতি, ধৃতি, শশিনী, চন্দ্রিকা, কান্তি, জ্যোৎস্না, শ্রী, প্রীতি, অঙ্গদা, পূর্ণা ও পূর্ণামৃতা এই ষোড়শ নামে অভিহিতা। এই সকল কলা স্বরবর্ণ হইতে সঞ্জাত।

সূর্য্যের দ্বাদশ কলা যথাক্রমে—তপিনী, তাপিনী, ধূম্রা, মরীচী, জ্বালিনী, রুচি, সুষুম্না, ভোগদা, বিশ্বা, বোধিনী, ধারিণী ও ক্ষমা, এই দ্বাদশ নামে অভিহিতা। ইহারা ক হইতে ভ পর্য্যন্ত চতুর্ব্বিংশতি ব্যঞ্জন বর্ণ হইতে উৎপন্ন। তন্মধ্যে ককার হইতে যথাক্রমে ঠকার পর্য্যন্ত দ্বাদশ বর্ণ এবং ডকার হইতে ফুৎক্রমে ভকার পর্য্যন্ত দ্বাদশ বর্ণ বুঝিতে হইবে।

* অকচটতপযাদ্যৈঃ সপ্তভি র্বর্ণবর্গৈ
র্বিরচিত মুখবাহ্বাপাদমধ্যাখ্য হৃৎকা।
সকলজগদধীশা শাশ্বতী বিশ্বযোনি
র্বিতরতু পরিশুদ্ধিং চেতসঃ সারদা হিবঃ॥ ১।১

বহ্নির দশকলা যথাক্রমে ধূম্রার্চ্চি, উষ্মা, জ্বলিনী, জ্বালিনী, বিস্ফুলিঙ্গিনী, সুশ্রী, সুরূপা, কপিলা, হব্যাবহা ও কব্যাবহা এই দশ নামে অভিহিতা। এই দশ কলা যকারাদি বর্ণ হইতে উৎপন্ন।

উক্ত ত্রিবিধ কলাকে যথাক্রমে শ্বেতবর্ণ পীতবর্ণ ও রক্তবর্ণরূপে এবং বরাভয়হস্তরূপে চিন্তা করিতে হয়।

পঞ্চাবয়বঘটিত ওঁকারের পঞ্চাশৎ কলা কথিত হইয়াছে। অকার, উকার, মকার নাদ ও বিন্দু, ওঁকারের এই পাঁচটি অবয়ব। উক্ত পঞ্চাবয়ব যথাক্রমে ব্রহ্ম বিষ্ণু রুদ্র ঈশ্বর ও সদাশিব স্বরূপ। ওঁকারান্তর্গত পঞ্চাশৎ কলার মধ্যে ক-চ বর্গের দশকলা, ট-ত বর্গের দশকলা, প-য বর্গের দশকলা, শ-ষ-স-হ ল ইহাদের চারিকলা এবং স্বরবর্ণের ষোড়শকলা। এই গণনায় ক্ষকার গৃহীত হয় নাই, সুতরাং তাহার কলারও উল্লেখ হয় নাই। কিন্তু ন্যাসবিশেষে অনন্তা নামক ক্ষকার-কলারও উল্লেখ দেখা যায়।

এইস্থলে বলা আবশ্যক যে প্রপঞ্চসারে ওঁকারের সপ্তাবয়ব কথিত হইয়াছে। তত্রত্য সপ্তাবয়ব—অকার, উকার, মকার, বিন্দু, নাদ, শক্তি ও শান্তি। পরিগণিত সপ্তাবয়বের মধ্যে শক্তি ও শান্তি, এতদুভয়ের সহিত প্রদর্শিত বর্ণোৎপত্তিপদ্ধতির সম্পর্ক নাই। প্রপঞ্চসারেও ভূতগত অর্থাৎ পঞ্চভূতসম্বন্ধ ওঁকারের পঞ্চ বয়বসংসৃষ্ট বর্ণ হইতেই সর্ব্বব্যাপক পঞ্চাশৎ কলার উৎপত্তি কথিত হইয়াছে।* বিশেষত কোন্ অবয়ব হইতে কোন্ কলার উৎপত্তি হইয়াছে, প্রপঞ্চসারে তাহারও বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—সৃষ্টি, ঋদ্ধি, স্মৃতি, মেধা, কান্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি, স্থিরা, স্থিতি ও সিদ্ধি এই দশ কলা অকার হইতে উৎপন্ন; জগতের সৃষ্টির জন্য এই দশ কলা ব্রহ্মা হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। জরা, পালিনী, শান্তি, ঐশ্বরী, রতি, কামিকা, বরদা, হ্লাদিনী, প্রীতি ও দীর্ঘা উকারজাত; এই দশকলা বিষ্ণু হইতে সমুৎপন্ন। জগতের স্থিতির জন্য ইহাদের উৎপত্তি হইয়া থাকে। তীক্ষ্ণা, রৌদ্রী, ভয়া, নিদ্রা, তন্দ্রা, ক্ষুৎ, ক্রোধিনী, ক্রিয়া, উৎকারী ও মৃত্যু মকারপ্রভব; এই দশকলা জগৎসংহারের জন্য রুদ্র হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। বিন্দু হইতে পীতা, শ্বেতা, অরুণা, কৃষ্ণা এই চারি কলার উৎপত্তি হইয়া থাকে। নাদ হইতে নিবৃত্তি, প্রতিষ্ঠা, বিদ্যা, শান্তি, ইন্ধিকা, দীপিকা, রেচিকা, মোচিকা, পরা, পরায়ণা, সূক্ষ্মা, অমৃতা, আপ্যায়নী, ব্যাপিনী, ব্যোমরূপা ও অনন্তা এই ষোড়শ কলা উৎপন্ন হয়। ইহারা ভোগমোক্ষপ্রদায়ক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

ওঁকারের ঘটকবর্ণ হইতে পঞ্চাশৎ সংখ্যক শক্তি, পঞ্চাশৎ সংখ্যক বিষ্ণুমূর্ত্তি, পঞ্চাশৎ সংখ্যক মাতৃমূর্ত্তি, পঞ্চাশৎ রুদ্রমূর্ত্তি ও পঞ্চাশৎ ওষধি উৎপন্ন হইয়াছে। এই সমস্ত মূর্ত্তির নাম প্রপঞ্চসারের তৃতীয় পটলে কথিত হইয়াছে। বিস্তৃতিভয়ে ও অনাবশ্যক বোধে তাহা এইস্থলে উপেক্ষিত হইল।

প্রদর্শিত বর্ণবিবৃতির মধ্যে তান্ত্রিকদর্শনের গূঢ় অভিপ্রায় অপরিস্ফুটভাবে নিহিত রহিয়াছে। বৈদান্তিকগণ ওঁকারকেই জগদুপাদান ব্রহ্ম বলিয়া বিবেচনা করেন। তন্ত্রও এই মতটি আরও কিছু সূক্ষ্মভাবে প্রদর্শিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—মূলাধারস্থিত কুলকুণ্ডলিনী শক্তি নিজেকে ত্রিগুণিত করিয়া যখন কামাগ্নি নাদাত্মক গূঢ় মূর্ত্তিরূপে প্রবৃত্ত হন, তখন বহুবিদ্য পণ্ডিতগণ তাঁহাকে "তার" এবং "ও মাত্মা" অর্থাৎ ওঁকার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, অন্যে তাঁহাকেই শক্তি ও পরমাত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তিনিই ত্রিগুণা, ত্রিদোষা, ত্রিবর্ণা, ত্রয়ী, ত্রিলোকা, ত্রিমূর্ত্তি এবং ত্রিরেখা এই সমস্ত সংজ্ঞায় বিশেষিত হইয়া থাকেন।

ওঁকাররূপী বিভু প্রদর্শিত পদার্থের তারণ অর্থাৎ উদ্ভাবন করেন, এই হেতু তার নামে এবং সৃষ্টিপদার্থে শক্তিরূপে অবস্থান করেন, অতএব শক্তি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।*

আর্য্য-বিবাহের অভিব্যক্তি।

(শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম, এ, বার-য়্যাট-ল)

স্ত্রী পুরুষের চিরন্তন অন্যোন্য-আকর্ষণই বিবাহের ভিত্তি। প্রজা-প্রজননই স্ত্রীপুরুষ সংযোগের প্রাকৃতিক উদ্দেশ্য। সভ্যজগতে বিবাহের

* অকার শ্চাপ্যুকারশ্চ মকারো বিন্দু রেবচ।
নাদশ্চ শক্তি শান্তিশ্চ তারভেদাঃ সমীরিতা॥ ২।৬
বর্ণেভ্যএব তারস্য পঞ্চভেদৈস্তু ভূতগৈঃ।
সর্ব্বগাশ্চ সমুৎপন্নাঃ পঞ্চাশৎ সংখ্যকাঃ কলাঃ॥ ১২-১৩

* এতেষাং তারণাত্তারঃ শক্তি স্তদ্বত্তি-শক্তিতঃ।

প্রচুর প্রচলন দেখিয়া বিবাহ স্বাভাবিক বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। প্রকৃত পক্ষে বিবাহ কৃত্রিম, স্বাভাবিক নহে। স্বাভাবিক হইলে, সভ্যাসভ্য সর্ব্বজন-সমাজে সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশেই ইহার প্রচার থাকিত। এইরূপ চিরপ্রচারের কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ দৃষ্ট হয় না। বরঞ্চ দেখা যায়, আদিম অসভ্য অবস্থায় বিবাহ প্রথা আদৌ প্রচলিত ছিল না। অদ্যাপিও অসভ্যদিগের মধ্যে, দুষ্মন্ত-শকুন্তলা বা বিদ্যাসুন্দরের romantic বা উপন্যাস সুলভ প্রেম অজ্ঞাত। এমন কি পৃথ্বীরাজ যেরূপ সংযুক্তার সঙ্গপ্রিয় ছিলেন, অসভ্যদিগের মধ্যে তদ্রূপ স্ত্রীসঙ্গ-প্রিয়তাও অতি বিরল। আদিম অসভ্য অবস্থায় লোকে বৃষাদির ন্যায় সাময়িক মত্ততাপ্রযুক্ত স্ত্রীতে উপগত হইত। এইরূপ স্ত্রীসংযোগই পৈশাচিক "বিবাহ"—স্ত্রী হইলেই হইল. বর্ণাবর্ণ গোত্রাগোত্রের সূক্ষ্মবিচার তৎকালে ছিল না।

বৃষাদির ন্যায় আদিম অসভ্যগণ স্ত্রীপ্রাপ্তির জন্য মারামারি লড়ালড়ি করিত। প্রেমরাজ্যে জোর যার স্ত্রী তার। অসভ্যেরা শীকার মারিয়া খাইত, শীকার না পাইলে অনাহারে মরিত বা নরমাংস ভক্ষণ করিত। ইহারাই রাক্ষস নামে অভিহিত হইত। "ভর্ত্তা" বা পতি অর্থে "স্ত্রীপালন করা", আদিম অসভ্য অবস্থায় এইরূপ "স্ত্রীপালন"-ক্ষমতা থাকা অসম্ভব। কালক্রমে যখন অসভ্যেরা নানা কৌশলে অধিক পরিমাণে শীকার ও অন্যান্য খাদ্য আহরণ করিতে সমর্থ হইল, তখনই তাহারা দু একটী স্ত্রী ধরিয়া বা সংগ্রহ করিয়া রাখিতে আরম্ভ করিল। অন্য অসভ্যেরা অধিক বলবান হইলে এই স্ত্রীলোক-দিগকে জোরজবরদস্তি হরণ করিয়া লইয়া যাইত। শ্রীকৃষ্ণের মরণানন্তর যাদবরমণীরা এইরূপে অপহৃত হইয়াছিলেন। এইরূপ স্ত্রীসংগ্রহ concubinage বা "সেবাদাসী" গ্রহণ প্রথা ছাড়া আর কিছুই নহে। প্রথমে রমণীরা উপপত্নী, পরে পত্নীরূপে গৃহীত হইতে লাগিল। উদ্বাহতত্ত্বের ক্রমবিকাশের এই প্রথম সূত্রপাত। "গান্ধর্ব্ব বিবাহ" এই concubinage প্রথার রূপান্তর মাত্র। এইরূপ বিবাহে মন্ত্রপাঠও নাই, হোমযজ্ঞও নাই, সপ্তপদীও নাই। "কন্যা-কর্ত্তা হন কন্যা, বরকর্ত্তা বর। পুরোহিত, ভট্টাচার্য্য হন পঞ্চশর।" দুষ্মন্তশকুন্তলার গান্ধর্ব্ব বিবাহের বিবরণে বৈবাহিক পদ্ধতির কোন উল্লেখ নাই। গান্ধর্ব্ব বিবাহ সম্ভবত গান্ধার দেশের অসভ্য পার্ব্বত্য জাতির মধ্যেই প্রথমে প্রচলিত ছিল, "গন্ধর্ব্ব" এই নামেতেই তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়।

আদিম অসভ্যেরা জোরজবরদস্তি পূর্ব্বক স্ত্রী-সংগ্রহ করিত। "রাক্ষস বিবাহ" ইহাকেই বলে। নামেতেই বোঝা যায় যে, এইরূপ স্ত্রীসংগ্রহ প্রথা অসভ্যদিগের মধ্যেই প্রথম প্রচলিত ছিল। গান্ধর্ব্ব-রাক্ষস-সংমিশ্রিত বিবাহ প্রথারও উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের রুক্মিণীহরণ ও অর্জ্জুনের সুভদ্রাহরণ এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

বীর্য্য দ্বারা স্ত্রীগ্রহণ প্রথাই পূর্ব্বে সাধারণতঃ প্রচলিত ছিল। বীরত্বই পতিত্বের কারণস্বরূপ দাঁড়াইয়াছিল। যেখানে বীরত্ব খাটিত না সেখানে দুর্ব্বল অসভ্যেরা বলবান অসভ্যদিগের নিকট হইতে স্ত্রী ক্রয় করিয়া লইত। "বীর্য্যের" মূল্য ধরিয়া দিত। কন্যা-শুল্ক এই বীর্য্যশুল্কের রূপান্তর মাত্র। কন্যাশুল্ক পিতারই প্রাপ্য ছিল, স্ত্রীলোকেরা ধনসম্পত্তির মধ্যে গণ্য ছিল। কালক্রমে যখন কন্যা স্বয়ংদত্তা হইতে লাগিল, (গান্ধর্ব্ব বিবাহে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়) তখন হইতে কন্যাই এই শুল্কের অধিকারিণী হইল। এইরূপ বিবাহ "আসুর" বিবাহ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। "আসুর" শব্দেই বোঝা যাইতেছে যে এইরূপ বিবাহ প্রথা অসভ্যদিগের মধ্যেই প্রথম প্রচলন ছিল। কন্যাশুল্ক বীর্য্যশুল্কের রূপান্তর। স্বয়ম্বর প্রথাও বীর্য্যশুল্কের রূপান্তর মাত্র।

ধনুর্ভঙ্গ প্রভৃতি দ্বারা বীরত্বের পরিচয় বা পরীক্ষা দিয়া কন্যাপ্রাপ্তি, বীর্য্যশুল্ক ছাড়া আর কি হইতে পারে? শ্রীরামচন্দ্র হরধনু ভঙ্গ করিয়া এবং অর্জ্জুন জল মধ্যে ছায়া দেখিয়া ঘূর্ণায়মান মৎস্যের চক্ষু বাণবিদ্ধ করিয়া বীরত্বের বা সমরকৌশলের পরীক্ষা দিয়াছিলেন। এইরূপে রামচন্দ্র সীতা ও অর্জ্জুন দ্রৌপদীকে লাভ করিয়াছিলেন। স্বয়ম্বর-স্থল হইতে বলপূর্ব্বক কন্যা লইয়া যাওয়ারও উদা-হরণ দেখিতে পাওয়া যায়। সুভদ্রাহরণ-কালে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এইরূপে হরণ করিবার উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন যে, "বলপূর্ব্বক স্বয়ম্বরস্থল হইতে কন্যাহরণ করা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে গৌরব-

জনক।” ভীষ্ম তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতার জন্য স্বয়ম্বরস্থল হইতে দুইটী কন্যা হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন—অম্বার আখ্যান কে না পড়িয়াছে? পৃথ্বীরাজও কনৌজদুহিতা সংযুক্তাকে স্বয়ম্বরস্থল হইতে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন।

পরবর্ত্তীকালে ব্রাহ্মণের আধিপত্য ক্ষত্রিয়ের আধিপত্যকে অভিভূত করিল। “বীর্য্যের” পরিবর্ত্তে “বিদ্যার” গৌরব বাড়িল। “বীর্য্য” শুল্কের স্থলে “বিদ্যা”শুল্ক আদৃত হইতে লাগিল। এই কালে কন্যাগণ পণ্ডিতদিগকে পতিত্বে বরণ করিতে লাগিলেন। শৌর্য্য বীর্য্য বা সমরকৌশলের পরিবর্ত্তে বিদ্যা বা পাণ্ডিত্য পরীক্ষা “বীর্য্য” শুল্কের স্থান অধিকার করিয়া ফেলিল। “বুদ্ধির্যস্য বলংতস্য।” কালিদাস শারদানন্দন রাজর্ষির কন্যা বিদ্যোত্তমাকে তর্কে হারাইয়া তাঁহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিক্রমাদিত্যও এইরূপে বিদ্যার পরীক্ষা দ্বারা ভানুমতীকে লাভ করিয়াছিলেন। বিদ্যাসুন্দরের গল্পেও “বিদ্যাশুল্কের” পরিচয় পাওয়া যায়। স্বায়ম্বরিক বা বীর্য্যশৌল্কিক বিবাহও তদ্-রূপান্তর স্বরূপ—বিদ্যাশৌল্কিক বিবাহ আসুর বিবাহের অনুরূপ। ভাল হউক বা মন্দ হউক, কুশ্রী হউক বা সুশ্রী হউক, সবর্ণ হউক বা অসবর্ণ হউক, ধনী হউক বা নিধনী হউক, “বীর্য্যশুল্ক বা “বিদ্যাশুল্ক” দ্বারা যে কোন ব্যক্তিই কন্যা লাভ করিতে পারিত—আসুর বিবাহের ন্যায় এইরূপ বিবাহ কন্যার মতামতের উপর নির্ভর করিত না। কন্যা-শুল্কই হউক বা বীর্য্যশুল্কই হউক বা বিদ্যাশুল্কই হউক, শুল্কই সর্ব্বেসর্ব্বা। স্বয়ম্বরকালেও কন্যা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর রাজার গলে মাল্যপ্রদান করিতে বাধ্য হইতেন—যে রাজাকে তিনি হয়ত ভালবাসিতেন স্বয়ম্বরে হয়তো তাঁহার নিমন্ত্রণ নাও হইত। স্বয়ম্বরের নাম শুনিয়া একটী রাজকন্যা শঙ্কিত হইয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। *

ব্রাহ্মণের আধিপত্য অর্থাৎ পাণ্ডিত্যের বা বিদ্যা-শুল্কের গৌরবকালে রাজকুমারীগণ ঋষিকুমারের সহিত বিবাহ করিতেন। শর্য্যাতি রাজার কন্যা চ্যবন ঋষিকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বিদর্ভ রাজার কন্যা অগস্ত্য মুনিকে বিবাহ করিয়াছিলেন। রাজা লোমপাদের কন্যা শান্তা ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষিকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। রাজা তৃণবিন্দুর কন্যা পুলস্ত্য ঋষির ও রাজা ভগীরথের কন্যা কৌৎস ঋষির পত্নী হইয়াছিলেন। শ্যাবাশ্ব নামক জনৈক ক্ষত্রিয় রথবীতি রাজার কন্যা অর্চ্চনাকে বিবাহ করিতে বাসনা করেন। শ্যাবাশ্ব ঋষি ছিলেন না, এই কারণে রাজমহিষী বিবাহে আপত্তি করিয়া বলিলেন “আমাদের বংশের সকল কন্যারই ঋষি-দিগের সহিত বিবাহ হইয়াছে। শ্যাবাশ্ব! তুমি ঋষি নহ, তোমার সহিত রাজকুমারী অর্চ্চনার বিবাহ হইতে পারে না।” শ্যাবাশ্ব কঠোর তপস্যা করিয়া ঋষিত্বপদ লাভ করিলেন, তখন রাজমহিষী তাঁহার সহিত অর্চ্চনার বিবাহ দিলেন।

এইখানে বলিয়া রাখা যাউক যে, দৈব ও আর্ষ বিবাহ আসুর বিবাহের রূপান্তরমাত্র। দৈব বিবাহে পুরোহিতপ্রাপ্য দক্ষিণা বা বেতন এবং আর্ষ বিবাহে একজোড়া বলীবর্দ্দ “কন্যাশুল্ক” ছিল। তখনকার কালে গোধনই ধন ছিল, শুল্ক অর্থদণ্ড প্রভৃতি গরুর দ্বারাই প্রদত্ত হইত। আসুর বিবাহের প্রভেদ এই যে, এই বিবাহে কোন পরিমিত শুল্ক নির্দ্দিষ্ট ছিল না। দৈব ও আর্ষ বিবাহের শুল্কের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট ছিল, আসুর বিবাহের মত অপরিমিত ছিল না। প্রাজাপত্য বিবাহে শুল্ক উপেক্ষিত হইত।

* “My mother bids me seek a spouse,
To whom to give my maiden vows;
Râjàs and Thakoors, waiting near,
Abide my choice twixt hope and fear.
“Within my heart a gem lies hid,
For him ’twill glow who lifts the lid;
Within my breast a fountain sleeps,
For him ’twill gush who opes its deeps.
“Within my soul I feel a power,
To love through every changeful hour;
But none has waked that slumbering might,
Or kindled that still sleeping light.
“A vision visits oft my dreams,
A bright and manly form it seems;
But when the expectant crowd draw near,
Will such a form mid them appear?
“Then, who shall wear the nuptial wreath,
If none can wake affection’s breath,
No, rather let me still abide
A maiden by my mother’s side!”

পাণিগ্রাহী স্বয়ং আসিয়া কন্যার পাণিগ্রহণ প্রার্থনা করিত। কন্যাপিতা এই বলিয়া কন্যা দান করিতেন—"তোমরা উভয়ে দাম্পত্য ধর্ম্ম পালন কর।" ব্রাহ্মবিবাহে বিদ্যাশুল্ক ত আছেই, ব্রাহ্মবিবাহে বেদজ্ঞ বরকেই কন্যাদান করা হইত। কন্যাকর্ত্তা বরকে আহ্বান করিয়া এবং বস্ত্রালঙ্কারে কন্যাকে ভূষিত করিয়া কন্যাদান করিতেন। এই কারণে প্রাজাপত্য বিবাহ অপেক্ষাও ব্রাহ্মবিবাহের এত গৌরব। প্রাজাপত্য বিবাহে শুল্ক নাই, সুতরাং গৌরবও নাই।

ব্রাহ্মবিবাহে বিদ্যাশুল্ক আছে। গান্ধর্ব্ব বিবাহ ছাড়া কোন বিবাহে কন্যা স্বাধীনভাবে হৃদয়ের পরিবর্ত্তে হৃদয় দান করিতে পারে না। যেখানে এইরূপ ante-nuptial love বা বিবাহের পূর্ব্বে বরকন্যার পরস্পরের প্রতি অনুরাগ নাই, সে বিবাহ স্ত্রীলোকের পক্ষে কোনমতে গৌরবান্বিত হইতে পারে না। বর্ত্তমান কালে ব্রাহ্মবিবাহই প্রচলিত। আসুর বিবাহও দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ইহা "আসুর ব্রাহ্ম"রূপ মিশ্রিত বিবাহ। আজ কাল কন্যাশুল্ক স্থলে "বরশুল্ক" দাঁড়াইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে কন্যাদান কালে যে সুবর্ণদান প্রথা আছে, এ "বরশুল্ক" সেই সুবর্ণদানের রূপান্তর স্বরূপ। "বরশুল্ক" বন্ধ করিতে হইলে পূর্ব্বে হিন্দু আইনের পরিবর্ত্তন হওয়া চাই। পুত্র বর্ত্তমানে বিবাহিত কন্যা এক কপর্দ্দকেরও অধিকারী নহে। হিন্দু আইনের এই inequitable বা ন্যায়বিগর্হিত ব্যবস্থা যতদিন থাকিবে, ততদিন শত শত "স্নেহলতা" আত্মহত্যা করিলেও "বরশুল্কে"র রোধ হইবে কি না সন্দেহ।

আধুনিক হিন্দুসমাজে ব্রাহ্ম বিবাহেরই বহুল প্রচার দৃষ্ট হয়। এককাল ছিল যখন আর্য্যদিগের মধ্যে বিবাহ প্রথা আদৌ ছিল না। উদ্দালক-শ্বেতকেতুযুগে বিবাহ প্রথা ছিল না। এক স্ত্রীর একাধিক পুরুষ-সহবাস (promiscuity) প্রথাই প্রচলিত ছিল। যে কোন পুরুষ যে কোন স্ত্রীর "পাণিগ্রহণ" করিয়া অর্থাৎ হাত ধরিয়া লইয়া যাইত। নহুষপুত্র ক্ষত্রিয় যযাতি, ব্রহ্মর্ষি শুক্রের কন্যা দেবযানীর "পাণিধারণ" করিয়া তাঁহাকে কূপ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহাই তাহা "পাণিগ্রহণ" (অর্থাৎ বিবাহ) স্বরূপ পরিগণিত হইয়াছিল, এইরূপ একটা জনশ্রুতি আছে। "বিবাহ" শব্দের অর্থই বহন করা,—ইহা রাক্ষস বিবাহের স্মৃতি। বিবাহকালে বর যে কন্যার "পাণিগ্রহণ" করে, তাহা শ্বেতকেতুযুগের "পাণিগ্রহণের" অনুকরণ, আর শ্বেতকেতুযুগের যে "পাণিগ্রহণ", তাহা রাক্ষস বিবাহের কন্যা "বহনের" রূপান্তরমাত্র। "পাণিগ্রহণ" বিবাহের প্রথম অঙ্গ বা অঙ্ক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

অসভ্য গণ্ডজাতির মধ্যেও "পাণিগ্রহণ" বিবাহের প্রধান অঙ্গ। কোন গণ্ডযুবক বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলে, নিকটবর্ত্তী গ্রামের কোন্ রমণীকে গ্রহণ করিবে, তৎসম্বন্ধে একটা স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া লয়। পরে দলবল লইয়া যেখানে তাহার ভাবী স্ত্রী অন্যান্য রমণীর সহিত ক্ষেত্রে কাজ করিতেছে, তাহার সন্নিকটস্থ জঙ্গলে লুকাইয়া থাকে। যখন সুবিধা দেখে তখন একাকী সে জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া সেই স্ত্রীলোকদিগকে আক্রমণ করে। তাহারা পালাইতে থাকে, সেও তাহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে দৌড়ায়। যতক্ষণ সে তাহার ভাবী স্ত্রীর "পাণিগ্রহণ" অর্থাৎ হাত ধরিতে না পারিবে, ততক্ষণ তাহার সঙ্গীরা আসিয়া তাহাকে সেই কন্যাকে ধরিয়া লইয়া যাইবার সহায়তা করিবে না। একবার যদি সে কন্যার "পাণিস্পর্শ" করিতে পারিল, তাহা হইলে তাহাদের বিবাহ হইয়া গেল। গণ্ডসমাজের এই রীতি।

শ্বেতকেতুই প্রথম এক স্ত্রীর একাধিক পুরুষসহবাস প্রতিষেধ করিয়াছিলেন, এবং একরকম বিবাহ প্রথার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, বলা যাইতে পারে। শাস্ত্রোক্ত এই প্রাচীন কথা একেবারে অলীক হইতে পারে না। ঋষি দীর্ঘতমার সম্বন্ধেও এইরূপ বিবাহসংস্কারের কথা বর্ণিত আছে।

অর্থশাস্ত্রে যেমন the supply is adjusted to the demand অর্থাৎ প্রয়োজনের সহিত বস্তুযোগের সামঞ্জস্য হয়, সেইরূপ প্রকৃতির নিয়মানুসারে স্ত্রীপুরুষের সংখ্যার তারতম্য হইলে উভয়ের মধ্যে একটা না একটা সামঞ্জস্য আসিয়া পড়ে। উদাহরণ—পুরুষ অপেক্ষা মেয়ের সংখ্যা অত্যধিক কম হইলে, প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে promiscuity অর্থাৎ একস্ত্রীর একাধিক পুরুষসহবাস অনিবার্য্য। যে সকল ভারতীয় কুলি ভারতবর্ষের বাহিরে কার্য্য

করিতে যায়, তাহাদিগের মধ্যে স্ত্রীকুলির সংখ্যা সচরাচর কম হওয়াতে, এই কুলি স্ত্রীদিগকে শেষে বহুপুরুষের সহিত সহবাস করিতে বাধ্য হইতে হয়।

Promiscuityঅর্থাৎ এক স্ত্রীর একাধিকপুরুষ সহবাস প্রথা দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—unlimited promiscuity অর্থাৎ এক স্ত্রীর অনির্দ্দিষ্ট সংখ্যক পুরুষের সহিত সহবাস, এবং limited promiscuity অর্থাৎ এক স্ত্রীর নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক পুরুষের সহিত সহবাস। শ্বেতকেতুযুগের বহুপুরুষ সহবাস প্রথম শ্রেণীর, দ্রৌপদীর বহু-পুরুষ সহবাস দ্বিতীয় শ্রেণীর দৃষ্টান্ত। সত্যকাম মাতা জবালার কথা প্রথম শ্রেণীর উদাহরণ।

গৌতমবংশীয়া জটিলাও বহুভর্ত্তৃকা ছিলেন। বাক্ষী নাম্নী ঋষিকন্যা সাতটী ঋষির পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। মারিষা নাম্নী কন্যাকে প্রচেতারা দশ ভ্রাতায় বিবাহ করিয়াছিলেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয় সূর্য্যাকে জয় করিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন, ঋক্‌বেদে বর্ণিত আছে। এ সমস্ত দৃষ্টান্ত নির্দ্দিষ্ট বহুসহবাস অর্থাৎ এক স্ত্রীর নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক পুরুষের সহিত সহবাসের দৃষ্টান্ত। Limited Promiscuityকে Polyandry বা বহুভর্ত্তৃকতা বলে।

Unlimited Promiscuity বা বহু পুরুষ সহবাস উদ্বাহতত্ত্বের ক্রমবিকাশের দ্বিতীয় সোপান।

Polyandry অর্থাৎ বহুভর্ত্তৃকতা Polygamy বা বহুপত্নীকতা বা এক পুরুষের একাধিক স্ত্রীগ্রহণ প্রথার বিপরীত। পুরুষ অপেক্ষা মেয়ে কম হইলে কিন্তু অত্যধিক কম না হইলে Polyandry বা বহুভর্ত্তৃকতা (এক স্ত্রীর একাধিক পুরুষ-গ্রহণ প্রথা) প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে ঘটিয়া থাকে। তিব্বত প্রভৃতি উষর পার্ব্বত্যপ্রদেশে দ্রৌপদীর আদর্শের বহুভর্ত্তৃকতা প্রচলিত আছে। পার্ব্বত্য প্রদেশে খাদ্য উৎপাদন বা আহরণ করা দুষ্কর বলিয়া তত্রত্য দেশবাসীরা কন্যার সংখ্যা বাড়িতে দেয় না, কন্যাহত্যার আশ্রয় গ্রহণ করে। এই দুই কারণে পার্ব্বত্য প্রদেশে polyandry অর্থাৎ বহুভর্ত্তৃকতার প্রচার দৃষ্টিগোচর হয়।

পাণ্ডবেরা বনবাসকালে দ্রৌপদীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। জঙ্গলে খাদ্যাভাব হইয়া থাকে, এই কারণেই নল রাজা দময়ন্তীকে অরণ্যমধ্যে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন অনুমান হয়। অরণ্যে খাদ্যাহরণ দুষ্কর ভাবিয়াই বোধ হয় পঞ্চপাণ্ডবে মিলিয়া এক স্ত্রী গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পঞ্চ-পাণ্ডব মিলিয়া পাঞ্চালীকে যে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহার অন্য এক কারণ নির্দ্দিষ্ট করা যাইতে পারে। তৎকালে পাঞ্চালদেশে pentarchy অর্থাৎ পঞ্চরাজতন্ত্র প্রথা প্রচলিত ছিল—পাঁচ রাজায় মিলিয়া রাজত্ব করিত। সচরাচর ইহারা ভাই হইত। প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন স্ত্রী গ্রহণ করিলে পাছে রাজ্য লইয়া স্বস্ব পুত্রদিগের মধ্যে ঝগড়া হয়, তাই পাঁচ ভাইয়ে মিলিয়া এক স্ত্রী গ্রহণ করিত। এই প্রথানুসারেই বোধ হয় পঞ্চপাণ্ডবেরা পাঞ্চালীকে বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পাঞ্চাল অত্যন্ত পরাক্রান্ত রাজ্য ছিল। পাঞ্চাল-দিগের সাহায্যেই বনবাসী পাণ্ডবেরা ইন্দ্রপ্রস্থ রাজ্য পুনরায় পাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যে যুদ্ধ, সে প্রকৃত পক্ষে কুরুপাঞ্চালেরই যুদ্ধ। এই বিবাহের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও থাকিতে পারে।

Promiscuity অর্থাৎ এক স্ত্রীর একাধিক পুরুষ-সহবাস প্রথা matriarchal বা মাতৃপ্রধান হয়। মাতাই সর্ব্বেসর্ব্বা, মাতৃগৃহেই মাতা বহুপুরুষের সহিত সহবাস করে। এইরূপ বহুপুরুষের সংসর্গে পুত্রের পিতার সম্বন্ধে সন্দেহ হইতে পারে, * কিন্তু গর্ভধারিণী মাতার সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ হইতে পারে না, তাই মালাবারের কোন কোন জাতির মধ্যে "ভাগিনেয়াধিকার" দৃষ্টিগোচর হয়। Matriarchal "বিবাহ"তে মায়ের দিক দিয়াই উত্তরাধিকার নির্ণীত হয়।

Limited Promiscuity বা Polyandry অর্থাৎ বহুভর্ত্তৃকতা উদ্বাহতত্ত্বের ক্রমবিকাশের তৃতীয় সোপান।

আবার স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষ অত্যধিক কম হইলে Polygamy অর্থাৎ এক পুরুষের একাধিক স্ত্রী-গ্রহণ প্রথা প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে ঘটিয়া থাকে। Polygamy বা বহুপত্নীকতা অতি পুরাতন প্রথা। মনুসংহিতা ও তৎপূর্ব্বকালের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদিগের মধ্যে ইহা প্রচলিত ছিল। ঋক্‌বেদের

* জবালা—কথায় ইহার পরিচয় পাওয়া যায়।

সূত্রকার দীর্ঘতমা ঋষির পুত্র কক্ষীবান এক রাজার দশ কন্যাকে বিবাহ করেন।

ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের দুই স্ত্রী ছিল—মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী। শিব ঠাকুর সম্বন্ধে একটা ছেলে ভুলানো গান আছে—"বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদী এল বাণ; শিব ঠাকুরের বিয়ে হবে তিন কন্যা দান; এক কন্যা রাঁধেন বাড়েন, এক কন্যা খান" ইত্যাদি। যাজ্ঞবল্ক্য সম্বন্ধেও বলিতে পারা যায়—"এক স্ত্রী রাঁধেন বাড়েন, এক স্ত্রী উপনিষদ পড়েন।" উর্ব্বর প্রদেশে শিশু (কন্যা) হত্যা করিবার প্রয়োজন হয় না। বরঞ্চ, ঘরের ও বাহিরের কার্য্যের জন্য মজুরের পরিবর্ত্তে সস্তায় একাধিক স্ত্রী রাখাতে লাভ। তাই উর্ব্বর দেশে বহুপত্নীকতা দৃষ্ট হয়। কুমাঁয়ুনবাসীরা একাধিক স্ত্রী বিবাহ করে, একজন রান্না করে, একজন হাটবাজার করে, একজন ক্ষেত্রে স্বামীর সাহায্য করে ইত্যাদি। রাজ-রাজড়াদের ত কথাই নাই। প্রথমতঃ বিলাসিতার জন্য তাঁহারা অন্তঃপুরে সুন্দরী সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন। দ্বিতীয়তঃ সেকালে রাণীরা living hostages বা সজীব প্রতিভূ স্বরূপ ছিলেন। রাজারা ভিন্ন ভিন্ন রাজবংশের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়া শক্তিশালী সাহায্য প্রাপ্ত হইতেন। Exchange of cards অর্থাৎ "পরিচয়"বিনিময়ের মত রাজকন্যারও বিনিময় হইত। বহুরাণী গ্রহণের ফলে অনেক রাজ্য ধ্বংসও হইয়া যাইত। "তোমার ছেলে রাজা হইবে" এইরূপ পণ করিয়া রাজারা কখন কখন বিবাহ করিতেন। পণ না রাখিলে যুদ্ধবিগ্রহ বাঁধিত। এইরূপ পণ করিয়া দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং পণ রাখিতে অনিচ্ছুক হইয়াই বোধ হয় শকুন্তলার সহিত পূর্ব্ববিবাহ প্রথমে স্বীকার করেন নাই। দশরথের নিকটেও কৈকেয়ী যথাসময়ে এইপ্রকার একটী পণ আদায় করিয়াছিলেন। এইরূপ পণ করিয়া বিবাহ না করিলে কালিদাসের অমর গ্রন্থ অভিজ্ঞান শকুন্তল লিখিত হইত না এবং বাল্মীকির রামায়ণ হইতেও জগত বঞ্চিত থাকিত। শান্তনু এই পণ করিয়া বিবাহ করাতে ভীষ্ম চিরকৌমার্য্যরূপ ভীষণ পণ করিয়াছিলেন।

বহুপত্নীকতা প্রথা থাকাতে পুত্রেরা পিতৃসম্পত্তির সমান ভাগ পাইবার অধিকার পাইল। পূর্ব্বে বড় ছেলে সব পাইত। পূর্ব্বে জ্যেষ্ঠাধিকার প্রথা ছিল। বহুপত্নীকতা হেতু সে প্রথা বন্ধ হইল। ছোট স্ত্রীকে হয়ত স্বামী বেশী ভালবাসিত—পিতা তাহার পুত্রকে একবারে বঞ্চিত না করিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ভুলাইয়া তাহাকেও কিঞ্চিৎ দিত। আবার বড় স্ত্রীর পুত্র শেষে হইলে তাহার মান্যের জন্য তাহার পুত্রকেও বঞ্চিত করিতে পারিত না। এই সকল কারণে সম্ভবত হিন্দু আইন পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। এখন সর্ব্ব পুত্রেরই সমান অধিকার। বিশ্বামিত্র দেবদত্তকে জ্যেষ্ঠাধিকার দিবার জন্য তাঁহার পুত্রদিগকে বলিয়াছিলেন, কেহ কেহ তাহাতে অস্বীকার করিয়াছিলেন; তাই তিনি তাহাদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

Polygamy বা বহুপত্নীকতা স্বাভাবিক। কথায় বলে, "Man is a polygamous animal" Polygamy বা বহুপত্নীকতা একটা না একটা রূপে চিরকালই থাকিবে। অষ্টম হেন্‌রীর মত ঘন ঘন divorce বা স্ত্রীপরিত্যাগ এবং ঘন ঘন বিবাহ polygamyরই রূপান্তর ছাড়া আর কি হইতে পারে? Polygamy বা বহুপত্নীকতা উদ্বাহতত্ত্বের ক্রমবিকাশের চতুর্থ সোপান।

পুরুষ ও স্ত্রীর সংখ্যা সমান হইলে monogamy অর্থাৎ এক পুরুষের এক স্ত্রী গ্রহণ এবং এক স্ত্রীর এক পুরুষ গ্রহণ প্রথা আপনা আপনি প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে সংঘটিত হয়। স্ত্রী বা স্বামী মরিয়া গেলে দ্বিতীয় স্ত্রী বা স্বামী গ্রহণ না করাকে "strict monogamy বা কঠোর একৈকক স্ত্রী পুরুষগ্রহণ প্রথা বলে। Monogamy patriarchal অর্থাৎ পিতৃপ্রধান হয়। পিতার দিক দিয়া উত্তরাধিকার স্থির করা হয়। Monogamy বা একৈকক স্ত্রীপুরুষ গ্রহণ প্রথা বিবাহের শেষ সোপান।

গান।

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল)

ভৈরবী—একতালা।

দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ যামিনী কেমনে কাটা'ব আমি।
তুমি যদি মাঝে মাঝে দেখা না দাও স্বামী।

ফিরি আমি সদা পাগলের পারা,
তোমা তরে আমি কেঁদে হই সারা,
তিলেক শান্তি না পাই জীবনে দুঃখসাগরে নামি।
ডাকিছে তোমার আকাশ আলো,
পুষ্প নদী বাতাস জল
গন্ধে বর্ণে ছন্দে গীতে পাগল করে দিন-যামী।
এসো তুমি এসো রেখো না ফেলিয়া,
তোমারে দেখিব নয়ন মেলিয়া,
জীবন মরণ ধন্য করিব এ চিতদহন যাবে থামি॥

সাহিত্যিকগণের প্রতি নিবেদন।

আজ ৮ বৎসর যাবৎ আমি সাধক শ্রীরামপ্রসাদের জীবনী ও সটীক পদাবলী সংগ্রহ করিতেছি। সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী গ্রন্থ এখন ছাপা হইতেছে। যদি কোন সদাশয় ব্যক্তি আমাকে নিম্ন লিখিত প্রশ্নগুলির সদুত্তর দেন এবং আমাকে কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত ১২৬০ সালের 'সংবাদ প্রভাকর' (১লা পৌষ সংখ্যা) রেজেষ্টরী ডাকে পাঠাইয়া দেন অথবা উহা কোথায় পাইতে পারি তাহা দয়া করিয়া জানান, তাহা হইলে আমার এবং বঙ্গসাহিত্যের পরমোপকার সাধন করা হইবে।

প্রশ্ন:—

১। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় রামপ্রসাদকে ১৪/ বিঘা অথবা ১০০/ বিঘা ভূমি নিষ্কর দান করিয়াছিলেন? এ সম্বন্ধে দলিলাদির প্রমাণ চাই। জনশ্রুতিতে কাহারও মতে ১৪/ বিঘা, কাহারও মতে ১০০/ বিঘা ভূমিদানের কথা শুনিতে পাওয়া যায়।

২। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় প্রসাদকে যে দানপত্র দিয়াছিলেন ঐ মূল দানপত্র কেহ কোথায়ও দেখিয়াছেন কি না? কৃষ্ণনগরের রাজবাটীতে অথবা প্রসাদের বংশধরদের নিকট উহা নাই।

৩। ঐ নিষ্কর ভূমির স্থান নির্ণয় এখনও করিতে পারি নাই। কেহ বলেন হালিসহরে এবং কেহ বলেন তেতুলিয়া গ্রামে। প্রকৃত সংবাদ কেহ জানিলে আমাকে জানাবেন।

৪। আমার জনৈক সাহিত্যবন্ধু লিখিয়াছেন প্রসাদের হস্তলিখিত খাতা ভূকৈলাসের রাজবাটীতে আছে। আমি অনুসন্ধান করিয়াও কিছু জানিতে পারি নাই। কেহ জানিলে আমাকে জানাবেন।

৫। প্রসাদের অপ্রকাশিত নূতন পদাবলী কাহারও নিকট থাকিলে আমাকে দয়া করিয়া পাঠাইবেন।

শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
বি—২০ ডোরাণ্ডা
পো. আ. রাঁচি সেক্রেটারিয়ট
রাঁচি।

শোকসংবাদ।

ভাই দীননাথ মজুমদার—আমরা দুঃখের সহিত জানাইতেছি, নববিধান-সমাজের অন্যতর প্রচারক ভাই দীননাথ মজুমদার গত ৩০শে আশ্বিন লোকান্তর গমন করিয়াছেন। ভগবান তাঁহার আত্মাকে স্বীয় ক্রোড়ে আশ্রয় দিন এবং তাঁহার পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা প্রদান করুন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার জন্য একজন অবৈতনিক সহকারী সম্পাদক আবশ্যক। যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজকে যথার্থই ভাল বাসেন এবং তাহাকে ধীরে ধীরে উন্নতির পথে অগ্রসর করাইতে চাহেন, তাঁহারা সত্বর নিজ নিজ পরিচয়সহ সম্পাদক মহাশয়ের নিকট স্বীয় অভিপ্রায় জানাইলে বাধিত হইব।

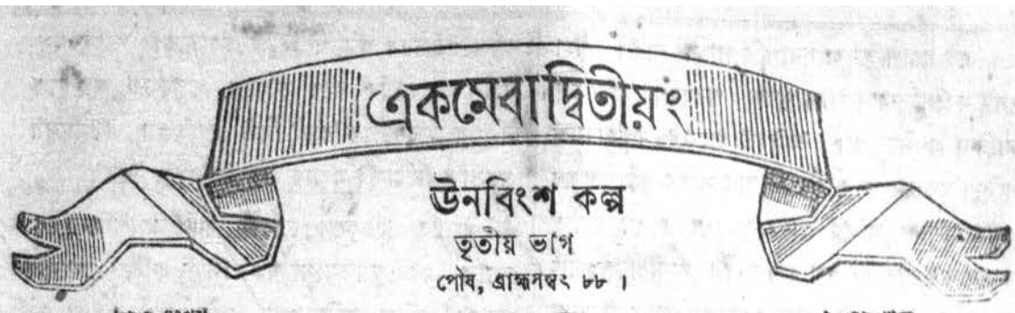

ঊনবিংশ কল্প
তৃতীয় ভাগ
পৌষ, ব্রাহ্মসম্বৎ ৮৮।

৮৯৩ সংখ্যা ১৮৩৯ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"আত্মা বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং প্রতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"

আগে ও এখন।

(প্রসাদী পদচ্ছায়া)

(ওমা) আগের মত তুই, কথা কস্‌নে কেন॥ (ধুয়া)
(আগে) মুখভরা, দেখতেম্ হাসি,
(এখন) রাগ্‌ভরেতে সদাই বসি',—
(যদি) দোষই কোন, করেই থাকি,
আমায়্ তুই না বুঝাস্ কেন?

(আগে) ভয়্ হলে তো, যেতেম ছুটে,
(এখন) যাবার্ নামে প্রাণ্ ভয়ে টুটে,
(তুই) ঘা কতক আমায়্, মেরে ধরে,
কোলে তুলে ফের্ নিস্‌নে কেন?

(আগে) মায়ে পোয়ে হ'ত, কতই কথা,
সুখের্, দুখের্ প্রাণের্ ব্যথা,
(এখন) এতই বা দোষ, করেছি কি মা
বারেক্ সাড়া দিস্‌নে কেন?

কুপুত্র যদি বা, হয়েই থাকি,
ক্ষমা তুই আর্ করবি না-কি?
তোর ছেলে তুই, মারিস্ যদি
(সবে) মা বলে আর্ ডাক্‌বে কেন॥

ধর্ম্ম ও সুখদুঃখ।

বর্ত্তমান যুগসন্ধিক্ষণে এবং উৎসবঋতুর প্রারম্ভভাগে ভক্তগণকে ঋষিদিগের অমোঘ ও অমূল্য মহাবাণীর অতিরিক্ত আর কি উপহার দিব জানি না। তাঁহাদের উপদেশ এই—ধর্ম্মং চর ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু—ধর্ম্মাচরণ কর, ধর্ম্ম ভূতচরাচরের পক্ষে মধুস্বরূপ। তাঁহারা স্বীয় জীবনে ধর্ম্মের মধুময় ভাব প্রত্যক্ষ উপলব্ধি না করিলে এমন সবল ও সরল সত্যবাণী তাঁহাদের হৃদয় হইতে নিঃসৃত হইত না। সেই মধুময় ভাব আমরাও প্রত্যক্ষ করিতে চাহিলে আমাদেরও জীবনে ধর্ম্মকে অনুস্যূত করিয়া লইতে হইবে।

ধর্ম্ম কি? সমস্ত জগতসংসার সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে শক্তিবলে বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে তাহাই ধর্ম্ম। সেই মহাশক্তি ধর্ম্মই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেকের ভিতরে যথোপযোগী আকারে বর্ত্তমান থাকিয়া প্রত্যেককেই মঙ্গলের পথে, সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির পথে পরিচালিত করিতেছে। ধর্ম্ম আছে বলিয়াই আকাশের গ্রহনক্ষত্র সকল আপনাপন নির্দ্দিষ্ট কক্ষে পরিভ্রমণ করে এবং কক্ষের বাহিরে পদার্পণ করিলেই ধ্বংসমুখে পতিত হয়। ধর্ম্ম আছে বলিয়াই আমরা পুণ্যাচরণে কত আনন্দ প্রাপ্ত হই এবং পাপের প্রতিঘাতে আকুল হইয়া পড়ি।

এই মহাশক্তি আপনাপনি আসে নাই। ইহা সেই সর্ব্বশক্তিমান পরম পুরুষ পরমেশ্বর হইতেই নামিয়া আসিয়াছে। তাই তাঁহাকেই ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক বলিয়া নমস্কার করি এবং তাঁহার সহিত জগতের যে যোগ, তাঁহার সহিত প্রত্যেক জীবের যে যোগ, তাহাকেই প্রধানত ধর্ম্ম বলা যায়। আমরা যাহাকে জড় বলি, পশুপক্ষী প্রভৃতি যাহাদিগকে আমরা চেতন বলি, এই যোগের বিষয় জানিয়া শুনিয়া ইহার পথ অক্ষুণ্ণ রাখিবার অধিকার তাহাদের আছে কি না জানি না। কিন্তু পরমেশ্বরের সহিত প্রত্যেক মানবাত্মার যে একটী বিশেষ যোগ আছে, তাহা জানিয়া সেই যোগের পথে চলিবার অধিকার আমাদের আছে, তাহা আমরা জানি। এই কারণে পরমাত্মার সহিত মানবাত্মার যোগকে আমরা বিশেষভাবে ধর্ম্ম নামে অভিহিত করি, এবং তাহারই অনুষঙ্গে, যে সকল কার্য্য, যে সকল চিন্তা, যে সকল আচার অনুষ্ঠান সেই যোগ অক্ষুণ্ণ রাখিবার সহায়তা করে, আমাদিগকে তাঁহা হইতে অবিচ্ছিন্ন রাখে, সেগুলিকেও অবান্তরভাবে ধর্ম্ম বলিয়াই উল্লেখ করি।

পরমাত্মার সহিত যোগ হইতে, প্রকৃত ধর্ম্ম হইতে আমরা কখনই আপনাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারি না। কিন্তু আমরা সীমাবদ্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি বলিয়াই প্রকৃতিবশেই আমরা কখনও বা আপনাদিগকে সেই যোগের অনুকূলে ভাসাইয়া দিই, আর কখনও বা তাহার প্রতিকূলে চলিবার চেষ্টা করি। আমরা যখন সেই যোগের অনুকূলে চলি, আমাদের সকল কার্য্য সকল ভাবনা তাহার অনুকূলে নিয়মিত করি, তখনই গভীর শান্তি ও আনন্দ আসিয়া আমাদের সমুদয় হৃদয়কে অধিকার করে এবং আমরা আপনা হইতেই বলিয়া উঠি যে সেই ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক পরমেশ্বর রসস্বরূপ। তখনই জ্ঞানেতে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করি যে আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম হইতে এই ভূতসকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম কর্ত্তৃক জীবিত রহে এবং প্রলয়কালে আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্মের প্রতি গমন করে ও তাঁহাতে প্রবেশ করে। ঋষিরা সেই আনন্দ সাগরে অবগাহন করিয়া আমাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন—ধর্ম্মং চর ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু—ধর্ম্মাচরণ কর, ধর্ম্মই ভূতচরাচরের পক্ষে মধুস্বরূপ। ধর্ম্মের পথে চলিলে, যোগের অনুকূলে চলিলে জীবনটাকে বড়ই মিষ্ট বোধ হয়, আমাদের প্রত্যেক নিশ্বাসই মধুময় মঙ্গলময় হইয়া উঠে।

ধর্ম্মের প্রতিকূলে চলিলে সেই মহাশক্তির যে স্রোত এই জগতসংসারকে সিক্ত করিয়া কোমল শ্যামল করিয়া তুলিতেছে, সেই স্রোতে প্রতিকূলতার অনুপাতে প্রবল প্রতিঘাত আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই প্রতিঘাতের ফলে কালভৈরব তরঙ্গরাজি উঠিয়া মানবাত্মাকে গ্রাস করিয়া ফেলে এবং তাহার প্রতিকূল ভাবসকল বিনষ্ট করিয়া তাহাকে পুনরায় ধর্ম্মের অনুকূল পথে পরিচালিত করিয়া দেয়। প্রলয়কালে বা পরিণামে সকলকেই ধর্ম্মের পথে, পরমাত্মার সহিত যোগের পথে চলিতেই হইবে।

প্রতিকূল ভাব আসে কেন? আমাদের যখন পার্থিব সুখের অভাব হয়, কিম্বা যখন অতিরিক্ত পার্থিব সুখের সেবার ফলে অতৃপ্তি আসে, মোটামুটি হিসাবে বলিতে গেলে যে কারণেই হউক, পার্থিব সুখশান্তির উপরে আঘাত পড়িলেই সাধারণত ধর্ম্মের প্রতিকূল ভাব সকল জাগিয়া উঠে। অনেক সময়েই কেবল কল্পনারই কারণে আঘাতের বেগ বড়ই অসহ্য বলিয়া বোধ হয়। যাই হৌক, আমাদের উপর ঐপ্রকার আঘাত পড়িলে সময়ে সময়ে এই ধর্ম্মবিরোধী প্রশ্ন আসিয়া আমাদের অন্তরাত্মাকে বড়ই উদ্বেজিত করিয়া তুলে যে ধর্ম্মকে ধরিয়া থাকিয়া লাভ কি? ধর্ম্মকে ধরিয়া যখন আমাদের ইচ্ছামত সুখশান্তি পাওয়া যায় না, তখন কথায় কথায় ধর্ম্মপথ অনুসরণ করিবার কথা বলিয়া লাভ কি? এই প্রকার প্রশ্নের আকারে ধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধা আসিয়া আমাদের হৃদয়কে অধিকার করিতে উদ্যত হয়।

যেই ধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধা যে কোন আকারে হউক না কেন, আসিয়া আমাদের জীবনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে উদ্যত হইবে, তখনই সদুত্তররূপ অস্ত্রের দ্বারা সেই অশ্রদ্ধাকে হৃদয় হইতে সমূলে উৎপাটন করিয়া ফেলাই আমাদের কর্ত্তব্য। এবিষয়ে নিজেকে বিশ্রাম দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। অবহেলা পূর্ব্বক অশ্রদ্ধাকে অন্তরে বর্দ্ধিত হইতে দিলে দুষ্ক-

পুষ্ট কালসর্পের ন্যায় তাহার হস্তে পরিণামে আমাদিগকে বিনষ্ট হইতে হইবে।

পার্থিব সুখসমৃদ্ধি লাভ হয় না বলিয়া ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিবার ভাব পাশ্চাত্য ভাবের সংস্পর্শেই আমাদের দেশে জাগিয়া উঠিয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। পাশ্চাত্য জাতিগণের মুখ্য ভাবই এই যে ধর্ম্ম বল, সত্য বল সকলকেই পার্থিব সুখের মাপকাঠিতে পরিমাপ করিতে হইবে। পার্থিব সুখের সাহায্য করিবে যেটুকু ধর্ম্ম তাহাই গ্রহণীয়, অবশিষ্ট ধর্ম্ম পরিত্যজ্য। এই ভাবের দ্বারা জীবনকে পরিচালিত করিলে যে কি বিষম বিষ উদ্গীরিত হয় তাহা বর্ত্তমান মহাসমর অগ্নিময় অক্ষরে সমগ্র জগতে ঘোষণা করিয়া দিয়াছে। আমাদের দেশেও যে এ ভাবের এবং ইহা অপেক্ষাও অধিকতর অনিষ্টকর ভাবের কথা উঠে নাই তাহা নহে। চার্ব্বাকপ্রমুখ ব্যক্তিগণ এই প্রকার ভাবসমূহ এদেশে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছিলেন বলিয়া অনুমান হয়। ঈশ্বরের ইহা পরম করুণার পরিচয় যে এই পুণ্যভূমি ভারতের অন্তর্নিহিত ধর্ম্মভাব তাহাদের প্রতিকূলে দাঁড়াইয়া সেই সকল ভাব এদেশ হইতে সম্পূর্ণ বিদূরিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

পার্থিব সুখসমৃদ্ধি হস্তগত না হইলে ধর্ম্মপথ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য কি না, এই প্রশ্নের উত্তরে আমাদের দেখা কর্ত্তব্য যে ধর্ম্মপথে চলিবার অপরিহার্য্য পরিণামফল পার্থিব সুখসমৃদ্ধি কি না। তাহা যদি সত্য হইত, তাহা হইলে আমরা অন্তত অধিকাংশ স্থলেই দেখিতে পাইতাম যে ইহজগতের ধনী মানী ব্যক্তিগণই ধর্ম্মপথেও অনেকদূর অগ্রসর। কিন্তু প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই ঠিক তাহার বিপরীত। এ জগতে পার্থিব ধনে মানে যাহারা পূর্ণোদর, তাহাদেরই অধিকাংশ ধর্ম্মপথে বিশেষভাবে পশ্চাৎপদ। মধ্যে মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ মেঘসকল মধ্যাহ্নসূর্য্যকেও আবৃত করিয়া ফেলে, সেইরূপ পার্থিব সুখসম্পদও ধর্ম্মের পথ অনেক সময়ে অন্ধকারে ঢাকিয়া ফেলে দেখা যায়। যে মহাশক্তি সত্য ধর্ম্ম সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে সমস্ত জগতসংসারকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে, যে সত্য দেশকালের অতীত, সে ধর্ম্মের অপরিহার্য্য পরিণামফল পৃথিবীর সুখ দুঃখ হইতে পারে না—পৃথিবীর সুখ দুঃখ তো দেশে কালে পরিচ্ছিন্ন, অবস্থা প্রভৃতি পার্থিব পরিধি দ্বারা সীমাবদ্ধ। ধর্ম্মের কর্ম্মক্ষেত্র সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্বার্থ—যাহার অপর নাম মঙ্গল, আর পার্থিব সুখ দুঃখের ক্ষেত্র হইল তোমার আমার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ। ধর্ম্মসাধনের পরিণামে আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখও আসিতে পারে, দুঃখও আসিতে পারে। কিন্তু পার্থিব সুখ বা দুঃখ, কোনটাই ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইবার অপরিহার্য্য পরিণামফল হইতে পারে না। কোনটাই অবিচ্ছিন্ন বা অনন্ত আকারে আমাদের সঙ্গী হইতে পারে না, কারণ উভয়ই প্রকৃতিবশেই সীমাবদ্ধ।

প্রকৃতিতে এমন একটী কলকাঠি লাগানো আছে, যাহা তোমাকে পৃথিবীর সুখে কখনই চিরসন্তুষ্ট থাকিতে দেয় না। মিষ্টদ্রব্য তোমার প্রিয় হইতে পারে, কিন্তু তাহাই আবার অবস্থাবিশেষে তোমার সহ্য শক্তির সীমা অতিক্রম করিলে সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখ আনয়ন করে। সুখের উপকরণ সকল সংগ্রহ ও রক্ষার জন্য আমাদের চিন্তা ও পরিশ্রমই তো আমাদের অবিচ্ছিন্ন সুখের পথে সর্ব্বপ্রধান বিঘ্ন। পার্থিব সুখসম্পদের মধ্য ডুবিয়া থাকিলেও সুখের প্রতি কিরূপ বিতৃষ্ণা জন্মে, আমাদের কর্ণে দুঃখের ক্রন্দন কিরূপ ধ্বনিত হইতে থাকে, আমেরিকার ক্রোরপতি জে গুল্ড তাহার জ্বলন্ত পরিচয় দিয়াছেন। ঐশ্বর্য্যের আতিশয্যের কারণেই তাঁহার অন্তরে বিষাদের ক্রন্দন জাগিয়া উঠিল। তাহার ফলে তিনি আত্মহত্যা করিলেন। ইহা তো জানা কথা যে কত লোকে সহসা অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়া পাগল হইয়া যায়, মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়।

যেমন পার্থিব সুখের মধ্যে দুঃখের ধ্বনি জাগ্রত থাকে, মৃত্যুবীজ লুক্কায়িত থাকে, সেইরূপ পার্থিব দুঃখও অবিচ্ছিন্ন থাকিতে পারে না। পার্থিব সুখের ন্যায় পার্থিব দুঃখও কাজেই ধর্ম্মের অপরিহার্য্য পরিণামফল হইতে পারে না। দুঃখের মধ্যেও আমরা সুখের আভাস দেখিতে পাই। দুঃখের মধ্যেও এই সুখ পাওয়া যায় বলিয়াই লক্ষকোটী জননী স্বীয় স্বাস্থ্য ও সুখের বিনিময়েও সন্তানপালনে প্রবৃত্ত হয়, লক্ষ কোটী পিতা সন্তানগণের সুখের জন্য কঠোর পরিশ্রম সহকারে অর্থো-

পার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইয়াও আরাম অনুভব করে। দুঃখের মধ্যেও সুখের মৃদু স্রোত জাগিয়া থাকে বলিয়াই লক্ষ কোটী লোক দেশের জন্য ধর্ম্মের জন্য অকাতরে ও আনন্দের সহিত প্রাণত্যাগে অগ্রসর হইতে পারে।

পার্থিব সুখ দুঃখ ধর্ম্মের অপরিহার্য্য পরিণাম-ফল না হইলেও ধর্ম্মসাধনের পক্ষে যে তাহাদের উপযোগিতা নাই তাহা নহে। মহাশক্তির সাগরে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই এই সুখদুঃখই ক্ষুদ্রতর নদীর আকারে ধর্ম্মকে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া তাহার স্রোতে জীবনকে পরিচালিত করিবার একটী অবসর প্রদান করে। নদীর এক কূলে সুখের কাছাড় দাঁড়াইয়া আছে। তাহার উপরে নানাবিধ শস্যরাজি হাসিতেছে। সেই সকল ভূমি ও শস্যের অধিকারী তাহাতে ধর্ম্মসাধনের বাঁধন না দিলে সুখের মত্ততায় জানিতে পারে না যে সেই কাছাড় কবে নদীর পায়ে আছাড়িয়া পড়িবে। নদীর অপর কূলে দুঃখের চর পড়িয়া আছে। দিবারাত্র তাহা নদীর স্রোতে সিক্ত হইতে হইতে ধীরে ধীরে আপনাকে শস্যশ্যামল করিবার উপযোগী করিয়া তুলিতেছে।

প্রকৃতিতে আমরা দেখি যে ভগবৎপ্রেরিত শক্তি কেন্দ্রাতিগ ও কেন্দ্রানুগ আকারে কার্য্য করিয়া এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে স্বীয় কক্ষে সুনিয়মে পরিচালিত করিতেছে। সেইরূপ সুখদুঃখও কেন্দ্রাতিগ ও কেন্দ্রানুগ আকারে কার্য্য করিয়া আমাদিগের প্রত্যেকের জীবনকে ধর্ম্মপথে পরিচালিত করিয়া ধীরে ধীরে সেই মহাযোগের উপযোগী করিয়া তুলিতেছে। পার্থিব সুখ আমাদের জীবনের সকল কার্য্যকে বিক্ষিপ্ত করিয়া ধর্ম্মপথ হইতে দূরে লইয়া যাইবার চেষ্টা করে। পার্থিব দুঃখকষ্ট আমাদের সমগ্র জীবনকে সংহত করিয়া আপনাকে আপনি দেখিতে দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে পরমাত্মার সহিত মহাযোগের পথে অগ্রসর করিয়া দেয়। এই প্রকারে সুখদুঃখের ঘাতপ্রতিঘাতেই আমাদের প্রকৃত জীবন, মনুষ্যত্ব ফুটিয়া উঠে; তিলে তিলে পরমাত্মার সহিত আমাদের মিলন সাধিত হইতে থাকে। দুঃখের এই কেন্দ্রানুগ শক্তি থাকিবার কারণেই অধিকাংশ সাধকই দুঃখকে আত্মীয়রূপে বরণ করিয়া লয়েন। সেই কারণেই দ্রৌপদী শ্রীকৃষ্ণের নিকট দুঃখের বর ভিক্ষা করিয়াছিলেন।

আমরা এখন স্পষ্টই বুঝিতেছি যে ধর্ম্মসাধনের পরিণামফল যখন অবিচ্ছিন্ন সুখ নহে, তখন কেবল অবিশ্রান্ত সুখলাভের প্রত্যাশায় ধর্ম্মাচরণের কথা আসিতেই পারে না। ধর্ম্মাচরণের ফল হইতেছে সমগ্র জগতের নিয়ামক শক্তির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করা, সেই মহাশক্তিপ্রবর্ত্তক পরমাত্মার সহিত আমাদের আত্মার মিলন সাধন করা এবং পরিণামে বিমল আনন্দসাগরে ডুবিয়া থাকা। এই কারণেই গীতা উপদেশ দিয়াছেন যে "সুখেতে বিগতস্পৃহ হইয়া এবং দুঃখেতে অনুদ্বিগ্নমনা হইয়া" ধর্ম্মসাধন করিবে। ধর্ম্মসাধনের পথে একটী সোপানও অগ্রসর হইলে বুঝা যায় যে পৃথিবীর সুখে স্পৃহা করিবার মত, তাহাকে আঁকড়াইয়া ধরিবার মত কিছুই নাই এবং দুঃখেতেও উদ্বিগ্ন হইবার মত সত্য সত্যই কিছুই নাই। সাধকেরা সত্যই জানেন যে ধর্ম্মপথে চলিলে মৃত্যুও অমৃতসোপান হইয়া উঠে।

ধর্ম্মসাধনের একমাত্র প্রকৃত পথ হইতেছে "তস্মিন্ প্রীতস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ" ঈশ্বরকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করা। অনেকে আক্ষেপ করেন যে শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনিয়া, শাস্ত্রবিহিত নানাবিধ আচার অনুষ্ঠান করিয়াও জীবনে কোন শান্তি লাভ করেন না, তাঁহাদের জীবন সরস হইয়া উঠে না। শাস্ত্রব্যাখ্যা শোনা, শাস্ত্রাধ্যয়ন, শাস্ত্রীয় আচার অনুষ্ঠান, এ সকলই ধর্ম্মপথে চলিবার পক্ষে বিশেষ সহায় হইলেও এইগুলিই প্রকৃত পথ নহে। কিন্তু তাঁহারা এইগুলিকেই প্রকৃত ধর্ম্মপথ মনে করিয়াই ভুল করেন। বিভিন্ন পণ্ডিত শাস্ত্র-সমূহের বিভিন্ন ব্যাখ্যা করিয়া বিভিন্ন মার্গই সৃষ্টি করিয়াছেন। আমরা কোন্ মার্গ অবলম্বন করিব? দেশকালঅবস্থাবিশেষে ইষ্টকর কত প্রথা শাস্ত্রে নিবদ্ধ হইলেও বর্ত্তমানে হয়তো সেগুলি অনিষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। সেগুলি আমরা এখন অবলম্বন করিব কিনা? শাস্ত্রব্যাখ্যা প্রভৃতি সূত্রে এইরূপ কতই প্রশ্ন জাগিয়া উঠিয়া প্রকৃত ধর্ম্মের বাণী শুনিবার অবসর দেয় না। কাজেই তাহাতে আমাদের চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে এবং আমরা অশান্তির কূপে ক্রমশই নিমগ্ন হইতে থাকি।

ঈশ্বরকে প্রাণের সহিত ভালবাসা এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন ব্যতীত পূর্ণ শান্তি লাভের, প্রকৃত ধর্ম্মসাধনের দ্বিতীয় পথ নাই—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়। তাঁহাকে সত্যসত্য ভাল বাসিলে পার্থিব সুখের প্রতি তোমার স্পৃহা থাকিতে পারিবে না। তখন, তোমার ইষ্টদেবতার যে মঙ্গলবিধানে সমস্ত জগতসংসার নিয়মিত হইতেছে, সেই মঙ্গল বিধানের সহিত তোমার সকল ইচ্ছা মিলিত হইবে; তোমার সমুদয় কার্য্য, সকল আচার অনুষ্ঠান তাহারই অনুকূল হইয়া চলিবে। তোমার শান্তি ও আনন্দ অটুট থাকিবে।

এই ভালবাসা, এই ভগবদ্ভক্তি কেবল মুখের কথা হইলে চলিবে না। ঋষিরা যে সবল ঈশ্বরপ্রীতি দেখাইয়াছিলেন, তাহা যে পরিমাণে আমরা হারাইয়া বসিয়াছি, সেই পরিমাণেই দুঃখ ক্লেশ ভোগ করিতেছি। সৌভাগ্যক্রমে শত বিপর্য্যয়ের মধ্যে কত শত সাধু মহাত্মা আবির্ভূত হইয়া এই ধর্ম্মপ্রাণ ভারতভূমিকে ভক্তিস্রোতে মধ্যে মধ্যে ডুবাইয়া দিয়া শ্যামল করিয়া রাখিয়াছেন। পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে কিন্তু মুখের কথার উপর ধর্ম্মকে এতই অধিক দাঁড় করানো হইয়াছিল যে পরিণামে পার্থিব সুখের স্পৃহা অতিমাত্র বর্দ্ধিত হইয়া মহাসমরসূত্রে ধর্ম্মের স্রোতে সম্পূর্ণ আত্মবলি প্রদান করিবার উপক্রম করিয়াছে। যদি পাশ্চাত্য জাতিগণের সুখস্পৃহা ইহাতেও না যথাযথ সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে চাহে, তবে আবারও এই প্রকার প্রলয়ঙ্কর মহাসমর সংঘটিত হইবে নিঃসন্দেহ।

প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য ভাবের এই বিভিন্নতার কারণ প্রধানত এই যে আমরা শৈশবাবধিই ধর্ম্মপথে চলিবার শিক্ষা প্রাপ্ত হই এবং পাশ্চাত্যগণ শৈশবাবধিই ধর্ম্মবিরুদ্ধ পথে চলিবার শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়। একথা আমরা বলিতেছি না, পাশ্চাত্যগণ নিজেরাই ইহা উপলব্ধি করিয়া বলিতেছেন। * তাই তাঁহারা বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীরই ঘোর বিরোধী হইয়া উঠিয়াছেন—তাহার আমূল সংস্কার করিতে উদ্যত হইয়াছেন। আমাদের দেশেও অল্প কয়েক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পাশ্চাত্যদিগের অনুকরণে এই কথা প্রচারিত হইতেছিল যে শৈশবাবধি ধর্ম্মশিক্ষা দিলে শিশুগণ অকালপক্ক হইয়া উঠিবে। আমরা কিন্তু আবহমান কাল শৈশবাবধি ধর্ম্মশিক্ষার উপকারিতা প্রচার করিয়া আসিতেছি। বর্ত্তমান প্রলয়কালীন আন্দোলন আলোচনাও আমাদেরই প্রচারিত সত্যের যাথার্থ্য অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপন্ন করিতেছে। বালিকাদিগকে গৃহকর্ম্মে পটু করিতে ইচ্ছা করিলে শৈশবাবধি শিক্ষা দিবে; বালকদিগকে সুদূর ভবিষ্যতে সংসারের প্রতিদ্বন্দ্বিতাক্ষেত্রে রণপটু করিবার জন্য শৈশবাবধি যথোপযুক্ত বিষয়সমূহের শিক্ষা দিবে। কিন্তু ধর্ম্মপথে সন্তানগণকে চালাইবার কথা হইলেই কি আমরা পরীক্ষিত সত্যের বিপরীত পথ অবলম্বন করিব? সমগ্র জগত হইতে সন্তানসন্ততিকে বিশুদ্ধ ধর্ম্মে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার এক মহা কাতরধ্বনি জাগিয়া উঠিয়াছে—সমগ্র শিক্ষিত জগতে এবিষয়ে বিশেষ চেষ্টা ও উদ্যম দেখা যাইতেছে। আমরা ঋষিদিগের আশীর্ব্বাদে, পিতৃপিতামহদিগের তপস্যার ফলে সেই বিশুদ্ধ ধর্ম্মের বীজ উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হইয়াও কেবল কি অবহেলার কারণে, আলস্যের কারণে হারাইয়া বসিব? কথায় কথায় ব্রহ্মের রূপকল্পনার কথা ছাড়িয়া দিয়া এখন প্রাণপণে সেই প্রত্যক্ষ ভগবানকে ধরিয়া থাকিতে হইবে, একনিষ্ঠ হইয়া তাঁহারই প্রিয় কার্য্য সাধন করিতে হইবে। তাঁহার আদেশ পালনের ফলে, তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনের ফলে যদি পার্থিব সুখ প্রাপ্ত হই, তবে তাহাকেও ধর্ম্মেরই অনুকূল করিয়া লইতে হইবে, পরমাত্মার সহিত মহাযোগের সহায় করিয়া লইতে হইবে। আর যদি দুঃখও পাই, তাহাতেও অবিচলিত থাকিয়া তাহাকেও সেই মহাযোগেরই অনুকূল করিয়া লইতে হইবে।

যে বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানমূলক সত্যধর্ম্ম একসময়ে সমগ্র ভারতভূমিকে পুণ্যময় করিয়া তুলিয়াছিল, যাহার বলে ভারতভূমি শত মহাপ্রলয়েরও মধ্যে নিজের উন্নত মস্তক তুলিয়া দাঁড়াইতে সমর্থ হই-

* "No English school-boy is ever taught to speak the truth, for the very simple reason that he is never taught to desire the truth. From the very first he is taught to be totally careless as to whether a fact is a fact; he is taught to care only whether the fact can be used on his side, when he is engaged in playing the game. Passing of the Empire by H. Fielding Hall.

য়াছে, যাহার কণামাত্র প্রচারের ফলে আজ সমগ্র জগত ভারতের নিকট অবনতমস্তক হইয়াছে, ঋষিদিগের সবল সরল ও মধুস্রাবী বাণীতে সেই বিশুদ্ধ ধর্ম্ম অবলম্বন করিবার জন্য পরস্পরকে আমরা বলিতে চাহি—ধর্ম্মং চর ধর্ম্মং সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু—ধর্ম্মাচরণ কর, ধর্ম্ম ভূতচরাচরের পক্ষে মধুস্বরূপ। ঈশ্বর আমাদের এই ধর্ম্মাচরণে নিত্য সহায় হউন।

করে যাব।

করে যাব কাজ আছে করিবার যাহা।
বলিবার থাকে যদি বলে যাও তাহা॥
অনন্তের মহাশক্তি নিত্য দেয় বল—
দৌর্ব্বল্য দৈন্যের যত ঘুচায়ে গরল॥
নিরানন্দ মলিনতা কোথা যায় চলে।
তাদের দলেছি দেখ এই পদতলে॥
তোমরা ঘুমাও কেন অচেতন প্রায়
নিশার আঁধার যবে আবরে ধরায়?
নাহিক ঘুমের লেশ আমার নয়নে—
দিন রাত খেটে যাব শকতি অর্জ্জনে॥
পিছনে চাব না কভু, চলিব এগিয়ে।
মায়ামরীচিকা সব থাক্ না পড়িয়ে॥
আঁধারের মাঝে দেখি প্রেমের আলোক।
ভুলায়ে দেয় যে তাহা শ্রান্তি ক্লান্তি শোক॥
অভয় হয়েছি আমি ধরিয়া অভয়ে।
বাহির হয়েছি তাই পৃথিবীর জয়ে॥
এধরার কাজ যবে হয়ে যাবে সারা।
অনায়াসে যাব চলি ছাড়ি এই কারা॥
সংসারের ওপারেতে সাথে দেবগণ
ধন্য হব তাঁর নাম গাহি অনুক্ষণ॥

উন্নতি-প্রসঙ্গ।

বসু বিজ্ঞান মন্দির—গত ৩০ শে নবেম্বর বঙ্গের জাতীয় উন্নতির ইতিহাসে একটী বিশেষ স্মরণীয় দিন। ঐ দিবস সন্ধ্যা ছয় ঘটিকার সময় বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের (Bose Research Institute) প্রতিষ্ঠা হইয়া গিয়াছে। ভারতের উন্নতির পথে এই মন্দির অন্যতর জয়স্তম্ভ। ইহা বিজ্ঞানাচার্য্য সার জগদীশচন্দ্র বসুর নাম ভারতের ইতিহাসে অক্ষয় রাখিবে। সেই প্রতিষ্ঠার দিবস সার জগদীশচন্দ্র আমাদিগকে যে আশার বাণী শুনাইয়াছেন, তাহা শুনিয়া আমাদের হৃদয় বিস্ফারিত হইয়া উঠে, নব আশায় নবজীবনের অনুপ্রাণনে আমাদের প্রাণ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। সুখ-দুঃখ তুচ্ছ করিয়া এবং জড়-বিজ্ঞানবাদীদিগের অস্ফুট উপহাসধ্বনি অবিচলিতভাবে সহ্য করিয়া, সারাজীবন ধরিয়া একনিষ্ঠ সাধকের ন্যায় তিনি যে জ্ঞানরত্নের অনুসন্ধান করিয়া আসিতেছিলেন এতদিন পরে তাহা তাঁহার করায়ত্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডারে তিনি যে রত্ন প্রদান করিলেন তাহাতে তাঁহার কীর্ত্তি সৃষ্টির শেষ দিবস পর্য্যন্ত অটল ও অচল ভাবে স্থায়ী রহিবে।

জড়ের সমস্যা-সমাধান করিতে গিয়া তিনি চৈতন্যের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন; মৃত্যুর যবনিকা উন্মোচন করিয়া জীবন-মরণের রহস্যলীলা দেখাইয়াছেন। আধ্যাত্ম জগতের যাহা সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য, দর্শনশাস্ত্রেও যে তত্ত্বের প্রত্যক্ষ দর্শন হয় না, সেই তত্ত্ব, মানবের সেই সনাতন রহস্য তিনি জড়বিজ্ঞানের সাহায্যে জগতের সমক্ষে প্রত্যক্ষীভূত করিয়া তুলিলেন। কত আশা আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়া তাঁহাকে জ্ঞানের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করিতে হইয়াছে, যুধিষ্ঠিরের মহাপ্রস্থানের মত পথে কত সঙ্গীকে হারাইয়া বিজ্ঞানের তুষারকঙ্করাবৃত কঠোর পথ বাহিয়া দীর্ঘকাল পরে আজ তিনি তাঁহার গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। আজ সমগ্র বঙ্গদেশ আনন্দ-কোলাহলে মুখরিত—বঙ্গের জগদীশচন্দ্র এই তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন যে পদার্থদর্শন, রসায়ন বিদ্যা, জীবতত্ত্ব, সব সম্মিলিত হইয়া একই মহানিয়মের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। দর্শন ও বিজ্ঞান আজ একস্থানে মিলিত হইয়া পরস্পর আলিঙ্গন করিতেছে।

জগদীশচন্দ্র প্রথমেই বলিয়াছেন "আমি কেবল একটী বিজ্ঞান গৃহ নহে, কিন্তু একটী মন্দির উৎসর্গ করিতেছি" কথাটী খুবই সঙ্গত এবং ধর্ম্মপ্রাণ ভারতবাসীর উপযুক্ত। তিনি যে বিষয়ের গবেষণায় নিযুক্ত আছেন, তাহার জন্য সত্যই একটী মন্দির প্রতিষ্ঠা আবশ্যক—যে মন্দিরে জড়বিজ্ঞান ঊর্দ্ধমুখে অধ্যাত্মদর্শনের সহিত মিলিবার জন্য ধাবিত হয় এবং অধ্যাত্মদর্শন স্নেহদৃষ্টিতে নামিয়া আসিয়া জড় বিজ্ঞানের সহিত একাত্ম হইতে চাহে। পাশ্চাত্য জাতিগণ বিজ্ঞানকে বিজ্ঞানের জন্যই ভাল বাসেন—কেবল জড়বস্তুর সহিত মেলামেশা করিতে করিতে জড়ীয়ভাবে মুগ্ধ হইয়া যান এবং জড়ের ক্ষমতায়

বিজ্ঞানাচার্য্য ডাক্তার সার জগদীশচন্দ্র বসু।

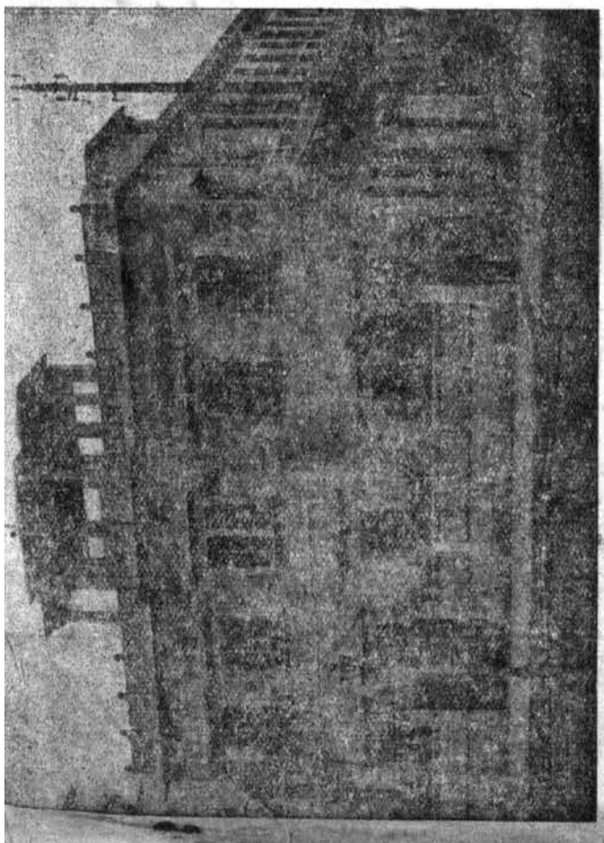

বসু বিজ্ঞান মন্দির।

বসু বিজ্ঞান মন্দির—সার জগদীশচন্দ্রের বাসভবন।

বক্তৃতা গৃহে সংলগ্ন পিত্তলপত্র—"আলোক ও অন্ধকারে বিরোধ।"

ল্যাবোরেটরির বক্তৃতাগৃহে রক্ষিত ছবি—"অনুসন্ধান"—বুদ্ধির সহযোগী কল্পনা।

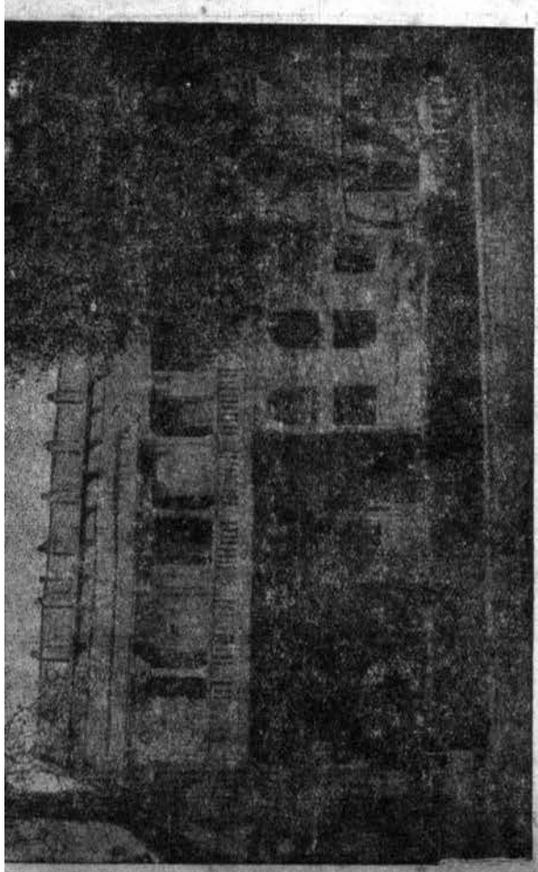

উদ্যান হইতে ডাক্তার বসুর ল্যাবোরেটরির দৃশ্য।

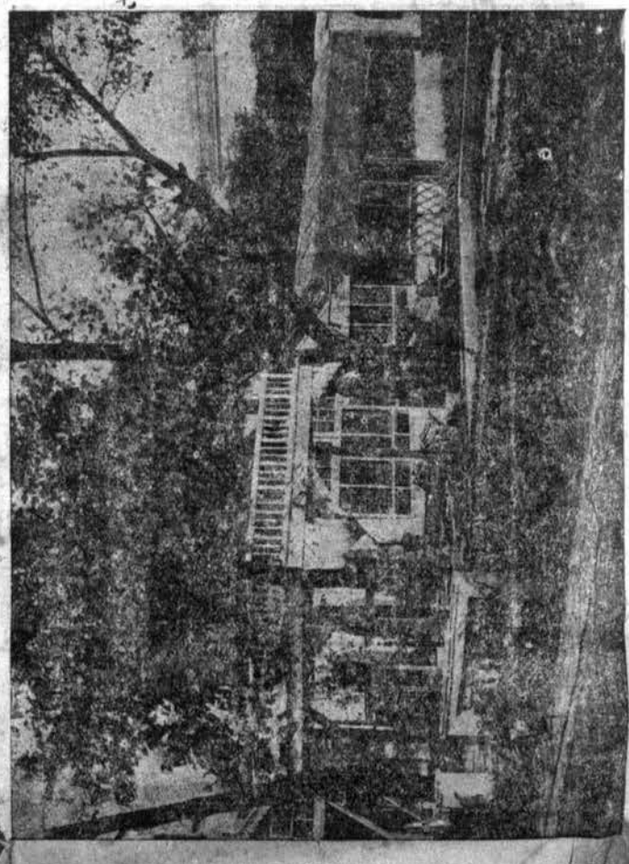

বসু মন্দিরের পশ্চাতের বাগান—এই দুইটী গাছকে অজ্ঞান করিয়া তুলিয়া আনিয়া

মুগ্ধ হইয়া অনেকস্থলেই পরের ধ্বংস সাধনে সেই ক্ষমতার অপব্যবহার করেন। ভারতবাসী যে বহির্জগত হইতে কেবলই অন্তর্জগতের সংস্পর্শ লাভে স্বভাবতই অগ্রসর হইতে চাহে, একথা জড়বাদে অনুরক্ত পাশ্চাত্য জগত ঠিক ধারণাই করিতে পারে না। কিন্তু পরিণামে এই ভাবই জয়লাভ করিবে তাহার সন্দেহ নাই। কেবল তো বহির্জগত লইয়াই প্রকৃতি নহে, অন্তর্জগত ও বহির্জগত উভয় লইয়াই যে প্রকৃতি। এই অন্তর্জগতের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার কারণেই ভাই প্রতাপ-চন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ এবং সার রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য জগতে অতুল প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা কেবল অন্তর্জগত লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন। আজ জগদীশ-চন্দ্র প্রত্যক্ষ পরীক্ষণের সাহায্যে বহির্জগতের ভিতর দিয়া অন্তর্জগতের দ্বার উদ্ঘাটিত করিতেছেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস যে অচিরকালেই ভারতবর্ষ পুনরায় জ্ঞানবিজ্ঞানে জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিবে।

আচার্য্য বলিয়াছেন, এই বিজ্ঞানমন্দিরে ইয়োরোপীয় বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের চর্ব্বিত চর্ব্বণ আলোচিত হইবে না—সম্পূর্ণ নূতনতত্ত্ব, বিজ্ঞানের নবীনতম ধারা এখান হইতে প্রবাহিত হইবে। জগতের জ্ঞানান্বেষীগণ দেশবিদেশ হইতে তাঁহাদের জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করিবার জন্য এই বঙ্গদেশে আগমন করিবেন। আজ মনে পড়ে, ভারতের সেই অতীত বৌদ্ধ যুগের সম্পদের দিন—যখন ভারতের ললাটে জ্ঞানগরিমার অপূর্ব্ব তিলক অঙ্কিত ছিল; যখন নালন্দা ও তক্ষশিলার জ্ঞানের সৌরভ সমগ্র ভূমণ্ডলে সঞ্চারিত হইত। ভারতের জ্ঞান আহরণ করিবার জন্য পূর্ব্বে চীন, জাপান, সিংহল, যবদ্বীপ প্রভৃতি স্থান হইতে যেমন নালন্দা ও তক্ষশিলায় আগমন করিতেন, আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের সহিত আমরাও আজ আশা করিতে পারি যে ইংলণ্ড, জর্ম্মনি, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি স্থান হইতেও জ্ঞানান্বেষীগণ বঙ্গদেশে উপস্থিত হইবেন—এই বসু বিজ্ঞান-মন্দির সময়ে সমগ্র জগতের বিদ্যার্থীগণের তীর্থস্থানে পরিণত হইবে।

জীবজগত এবং জড়জগত যে একই নিয়মে পরি-চালিত হইতেছে এই তত্ত্বটী বুঝাইবার প্রসঙ্গে বিজ্ঞা-নাচার্য্য যে দুইটী জাতির আদর্শের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন তাহা প্রত্যেক ভারতবাসীর সর্ব্বদা স্মৃতিপথে গাঁথিয়া রাখা উচিত। তিনি বলেন যে আমাদিগকে অবশ্য শিক্ষাবিস্তার ও শিল্পবাণিজ্যের প্রসারের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে, কিন্তু মাত্র এই প্রকারের পার্থিব শক্তি সঞ্চয়ে কোন জাতির স্থায়িত্ব দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয় না। পাশ্চাত্য জগতে ইহার ফলে শক্তি ও অর্থ পুঞ্জীভূত হইতেছে বটে কিন্তু সে শক্তির কার্য্য স্থিতি অপেক্ষা ধ্বংসের দিকে অধিক। সংযমের অভাবে ইয়োরোপীয় সভ্যতা ছিন্নমস্তার ন্যায় আপনার ধ্বংসের উপায় আপনিই প্রস্তুত করিয়া লইতেছে। ভারতের আদর্শ শুধু পার্থিব উন্নতিতে নয়, শুধু শক্তিলাভের সাময়িক উত্তেজনায় পর্য্যবসিত নয়, ভারতের আদর্শ শক্তির পরিপাকে। জীবনসংগ্রামে আমরা যে মহাশক্তি অর্জন করিব, তাহাই আবার জগতের কল্যাণে নিঃশেষ পূর্ব্বক দান করিতে হইবে। জগতের কল্যাণময় দানযজ্ঞবেদীতে আমাদিগকে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিতে হইবে। আমাদের জাতীয় জীবনের ইতি-হাসে এ আদর্শের উদাহরণ যথেষ্ট রহিয়াছে। এই অপূর্ব্ব আত্মত্যাগ বিজ্ঞানাচার্য্যের নবপ্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানমন্দিরের সাধনার মূলমন্ত্র। তাঁহার সাধনা সিদ্ধির কল্যাণে সার্থক হউক।

সার জগদীশচন্দ্র এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নিজেদের সর্ব্বস্ব দান করিয়া অতুলনীয় মহানুভবতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র রাজা অশোকের আমলকী দান এবং দধীচি মুনির পরহিতার্থে অস্থি দানের উল্লেখ পূর্ব্বক স্বীয় অভিভাষণের সুন্দর উপসংহার করিয়াছেন।

আজ জগদীশচন্দ্রের গরিমায় সমগ্র জগৎ উদ্ভাসিত—কিন্তু বলিতে লজ্জা হয় যে তাহাতেও বাঙ্গালীর হিংসা জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। এই সকল ঈর্ষ্যাদগ্ধ ব্যক্তির তপ্ত নিশ্বাস উপেক্ষণীয়—ইহা লইয়া আলোচনা করাই ভ্রম।

কংগ্রেস ও মুসলমান লীগ্—প্রতিদিনই ভারতের জাতীয় জীবনে উন্নতির নব নব লক্ষণ দেখা যাইতেছে। এই নব যুগে ভারতবাসীকে যথার্থ শক্তি অর্জ্জন করিতে হইবে নতুবা আমাদের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে মায়ের আহ্বানে আমাদের মিলিত হইতে হইবে। আজ তুচ্ছ বিবাদ বিসম্বাদ লইয়া পর-স্পরের বিরোধ করিবার দিন নয়। আজ হিন্দু মুসলমান সম্মিলিত হইয়া একযোগে কাজ করিতে হইবে। যাঁহারা স্বদেশবাসীগণের মধ্যে বিবাদ বাধাইতে চাহেন, তাঁহারা সাধারণত কংগ্রেসকে হিন্দুপ্রধান বলিয়া উল্লেখ করেন। ভারতবর্ষে হিন্দু অধিবাসীর সংখ্যা এবং হিন্দু শিক্ষিত ব্যক্তিগণেরও সংখ্যা অপরাপর অধিবাসীগণের তুলনায় অনেক বেশী, কাজেই স্বভাবতই কংগ্রেসে হিন্দু-দিগের প্রাধান্য হয়তো একটু বেশী হইয়া পড়িয়াছে। তাই বলিয়া পরস্পরের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদের কোনই কারণ দেখি না। বিবাদ বিসম্বাদের যে সত্যই কোন কারণ নাই, কংগ্রেস এবং মসলেম লীগ একযোগে শাসন-সংস্কারপদ্ধতির একটি প্রণালী উপস্থিত করিয়া তাহার

প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়াছেন। আমরা সেই প্রণালীর ভালমন্দ বিচার করিতে চাহি না। কংগ্রেস ও মুসলমান লীগ যে সর্ব্ববিষয়ে একমত হইয়া জন্মভূমির উন্নতিকল্পে অগ্রসর হইতেছেন ইহা দেখিয়াই আমরা আনন্দিত হইয়াছি এবং সেই কারণে ভারতের উন্নতি সম্বন্ধে আশান্বিত হইতেছি। সর্ব্ববিষয়ে আমাদের এখন অগ্রসর হইতে হইবে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান হাতধরাধরি করিয়া সমগ্র জগতের সহিত একযোগে কার্য্য করিতে হইবে। পার্থক্যের দিন, প্রভেদ বৈষম্যের দিন গত হইয়াছে—এখন সমগ্র বিশ্বকে একভাবে, একটি অখণ্ড সত্যরূপে অনুভব করিবার দিন আসিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের জাতীয় উদ্বোধনের নব সঙ্গীত আমাদের জাতির মর্ম্মদুয়ার উদ্ঘাটিত করিয়া আমাদিগকে উন্নতির পথে প্রচালিত করুক—

নূতনযুগ সূর্য্য উঠিল ঘুচিল তিমির রাত্রি
তব মন্দির অঙ্গন ভরি মিলিল সকল যাত্রী—
দিন আগত ওই,
ভারত তবু কই?
গত গৌরব, হৃত আসন, নত মস্তক লাজে
গ্লানি তার মোচন কর নর সমাজ মাঝে
স্থান দাও, স্থান দাও, দাও দাও স্থান হে
জাগ্রত ভগবান হে জাগ্রত ভগবান।

ত্রিশ কোটী ভারতবাসীর মিলিত কণ্ঠের আবেদন তাঁহার সিংহাসনতলে উপস্থিত হউক।

আর্য্য সৌভ্রাত্র সম্মিলনী—বোম্বাই সহরে এই নামে একটী সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সমিতির মহৎ উদ্দেশ্য নামেই প্রকাশ পাইতেছে। ইহাঁরা প্রাচীন আর্য্য সভ্যতার অনুগামী হইয়া সমাজের বৈষম্য দূরীভূত করিয়া সাম্য প্রচারে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। সর্ব্বপ্রকার সামাজিক উন্নতির অন্তরায় জাতিভেদকে ইহাঁরা সর্ব্বপ্রযত্নে বর্জ্জন করিতে সচেষ্ট। হিন্দুসমাজের বিভিন্ন বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে বৈবাহিক আদান প্রদান প্রাচীন হিন্দু প্রথা ও শাস্ত্র-সম্মত। সেই প্রাচীন আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহাঁরা উদ্বাহ প্রথা প্রচলনে ব্রতী হইয়াছেন; অন্ধ বিশ্বাস, কুসংস্কার এবং সর্ব্বপ্রকার ক্ষুদ্রতা হইতে বিমুক্ত হইয়া জ্ঞানের বর্ত্তিকা সাহায্যে উন্নতির মার্গে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছেন। যাঁহারা পূর্ব্বে হিন্দু ছিলেন, পরে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেন, তাঁহারা যদি পুনরায় হিন্দু ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে পূর্ণমাত্রায় সে সুযোগ প্রদত্ত হইবে—ইহাঁরা এইরূপ প্রস্তাব স্বীকার করিয়াছেন। ফলত যাহাতে সমগ্র ভারতবর্ষে একভ্রাতৃত্ব স্থাপিত হয়, তজ্জন্য এই সম্মিলনী বিশেষ চেষ্টা পাইতেছেন। যে মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া এই সম্মিলনী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সভ্যগণ যদি সেই উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন তবেই বুঝিব যে তাঁহাদের শিক্ষা ও স্বদেশপ্রীতি সার্থক। সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে জ্ঞান ও অজ্ঞানে বিরোধ চলিয়া আসিতেছে—যতই জ্ঞানের প্রসার বৃদ্ধি হইবে, অজ্ঞানতা কুসংস্কার ততই বিনষ্ট হইতে থাকিবে। বর্ত্তমানকালে যখন দেশে দেশে জাগরণের সঙ্গীত ধ্বনিত হইতেছে তখন আর তুচ্ছ আত্মবিরোধ ও স্বকীয় অজ্ঞানতা-সৃষ্ট ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া দিন অতিবাহিত করা কাহারও পক্ষে উচিত নয়। এরূপ সভা যতই অধিক স্থাপিত হয় ততই ভাল। কিন্তু যতদিন না গভর্ণমেণ্ট আইনের দ্বারা সবর্ণ বা সগোত্র বিবাহ, আন্তর্জাতিক বিবাহ প্রভৃতির বৈধতা স্থাপিত করিবেন, ততদিন এরূপ সভাসমিতি দ্বারা বিশেষ ফল হইবে বলিয়া আমরা আশা করি না। কিন্তু এই সঙ্গে ইহাও আমরা বলিতে চাহি যে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ৩ আইনের ন্যায় কোন প্রকার নিরীশ্বর বিবাহ স্থাপিত করিতে উদ্যত হইলে ধর্ম্মপ্রাণ ভারতবাসী, বিশেষত হিন্দুগণ তাহা সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করিবে কিনা সন্দেহ। এই আন্দোলনের জন্য আমাদের বোম্বাইবাসী হিন্দু ভ্রাতৃগণ সমগ্র হিন্দুসমাজের ধন্যবাদের পাত্র হইতেছেন। সমাজ সংস্কারে তাঁহাদের আন্তরিকতা সফল হউক।

লবণের মূল্য বৃদ্ধি—বর্ত্তমান ইয়োরোপীয় মহাসমরের কুফলস্বরূপ এদেশে সকল প্রকার দ্রব্যের মূল্য দিন দিন অত্যন্ত বৃদ্ধি হইতেছে। বস্ত্রের মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে তাহার প্রতিবিধানের কোনও উপায় নাই। কিন্তু আমাদের সদাশয় গভর্ণমেণ্ট যদি ইচ্ছা করেন লবণের মূল্য অনায়াসেই হ্রাস হইতে পারে। লবণ ধনী দরিদ্রের নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, তাহার উপর উহার মূল্য প্রায় তিন চারি গুণ বাড়িয়াছে। বাতাস ও জলের ন্যায় যাহা প্রকৃতি হইতে যথেষ্ট পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায় বা অনায়াসে প্রস্তুত করা যাইতে পারে তাহা এরূপে অযথা মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে হইলে দরিদ্র প্রজার বাস্তবিকই বিশেষ কষ্ট হয়। আমরা সংবাদপত্রে দেখিলাম যে স্থানে স্থানে লবণের মূল্য বৃদ্ধির কারণে বাজার লুটপাট হইয়াছে। লবণ জীবজন্তুর একটি অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয় পদার্থ। এ রকম বস্তুকে গভর্ণমেণ্ট সহজলভ্য না করিয়া ভাল করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। আমরা গভর্ণমেণ্টের হিতাকাঙ্ক্ষী বলিয়াই পরামর্শ দিতেছি যে তাঁহারা এই বস্তু প্রস্তুত করিবার বাধা উঠাইয়া লইয়া সমগ্র ভারতবাসীর আশীর্ব্বাদভাজন হউন। তাঁহারা জানেন না যে এই রকম ছোটখাটো অথচ একান্ত

প্রয়োজনীয় বস্তুর অভাব হইলে কি প্রকার অসন্তোষ বিস্তারের কারণ হইয়া উঠে। সাধারণ ভারতবাসীগণ লবণ দিয়া যদি দুমুঠো ভাত খাইতে পায় তাহা হইলেই তাহারা রাজনীতি ক্ষেত্রে বড় বেশী মনোযোগ দিতে চাহিবে না।

মদ্য কি ভারত হইতে তিরোহিত হইবে না?—এই সূত্রে আমরা বলিতে চাহি যে এই সঙ্গে সুরারাক্ষসীকে কি ভারত হইতে দূর করা যাইবে না? বর্ত্তমান মহাসমরের ফলে ইংরাজ জাতিই আমাদিগকে পদে পদে জানাইয়াছে যে মদ্যপানের ঘোর অপকারিতার কারণে আমাদের সম্রাট উহা পরিত্যাগ করিয়াছেন, ফ্রান্স মদ্যপানের বিরুদ্ধে জাগ্রত হইয়াছে এবং সমগ্র রুষিয়া হইতে সুরারাক্ষসী নির্ব্বাসিত হইয়াছে। তাহার ফলে যতদূর কাগজপত্রে দেখি, তাহাতে জানিতে পারি যে রুষীয়গণ মদ্যপান পরিত্যাগ করিবার ফলে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সুখী। সমর-প্রাঙ্গন হইতেও লর্ড কিচনার হইতে আরম্ভ করিয়া সকল সেনাপতিই একবাক্যে সুরানির্ব্বাসন ঘোষণা করিয়াছেন। তাই আমরা বলিতেছি যে যদি গভর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষ হইতে মদ্য উঠাইয়া দেন, তাহা হইলে মদ্যপানে ভারত-বাসীর যে অর্থ অপব্যয় হইতেছে সে অর্থ ভারতবাসী অন্য সূত্রে গভর্ণমেণ্টকে দিতে যে দ্বিধা করিবে তাহা বোধ হয় না। মদ্যপানের ফলে মস্তিষ্কে যে তরলতা উপস্থিত হয়, কে বলিতে পারে যে বর্ত্তমানে যুবকদের অনেকের চঞ্চলচিত্ততা নবযুগের প্রথমাবস্থায় ইয়ং বেঙ্গল সম্প্রদায়ের মদ্যপানের ফল নহে? তার পর, এক একটী লোকের চঞ্চলভাব যে তাহার সঙ্গীদিগের মধ্যে সংক্রামিত হইতে পারে তাহা বলা বাহুল্য। এই সকল আলো-চনা করিলে আমাদের মনে হয় যে, গভর্ণমেণ্ট মদ্যপান রহিত করিয়া দিলে দেশের মধ্যে বৈপ্লবিক ভাবও অনেক পরিমাণে কমিয়া যাইতে পারে।

মহম্মদীয় শিক্ষাবৈঠক এবং সার আশু-তোষ মুখোপাধ্যায়। সার আশুতোষ মহম্মদীয় শিক্ষাবৈঠকের যে সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, ইহা বর্ত্তমান কালের উপযোগী হইয়াছিল। তিনি ইউনিভারসিটি কমিশনের সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া অবশ্য সভাপতিত্ব প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হইয়া-ছেন। তাহা হউক, মুসলমানগণ যে নির্ব্বিচারে একজন হিন্দুকে তাঁহাদের একটী প্রধান বৈঠকের সভাপতি নির্ব্বা-চন করিয়াছিলেন, তাহাতেই বুঝা যাইতেছে যে ভারতে শত প্রতিবাদ চীৎকারের মধ্যেও প্রকৃত ভ্রাতৃভাব কিরূপ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে।

যুদ্ধের পর?—যুদ্ধের পর সমাজকে কি ভাবে গড়িতে হইবে, ইহা লইয়া বর্ত্তমানে পশ্চিম ভূখণ্ডে মহা হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। আমরা এই বিষয়ক সাহিত্য যতই আলোচনা করিতেছি, ততই আমাদের বিশ্বাস দৃঢ় হইতেছে যে মোটামুটি হিসাবে ঋষিদের প্রচারিত এবং প্রধানত মনুসংহিতার অনুগত সামাজিক ব্যবস্থা এবং উদার অসাম্প্রদায়িক সত্যধর্ম্মের প্রচার যতদিন না হইবে ততদিন প্রকৃত শান্তির আশা সুদূরপরাহত। আমাদের কথা যেন কেহ ভুল না বুঝেন। আমরা "মোটামুটি হিসাবে" কথাটি ব্যবহার করিয়াছি। আমাদের এমন কথা নয় যে শাস্ত্রীয় আচার পদ্ধতি অক্ষরে অক্ষরে প্রব-র্ত্তিত করিতে হইবে। আমাদের বক্তব্য এই যে আমা-দের ঋষিপ্রণীত শাস্ত্রসমূহের মধ্যে সমাজ প্রভৃতি সম্বন্ধে কতকগুলি সত্যধর্ম্মী মূলমন্ত্র সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে, সেই মূল-মন্ত্রগুলির উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা করিলে তবে শান্তি লাভ সম্ভব। আর যদি প্রকৃত শান্তির পরিবর্ত্তে মৌখিক শান্তি পাইতে চাও, তাহা হইলে বর্ত্তমান শিক্ষা, সমাজ প্রভৃতির বিধিব্যবস্থা তদ্বিষয়ে যথেষ্ট অনুকূল দেখিতে পাইবে।

ভারতে অশান্তির কথা।—সকল বিষয়ে উন্নতি লাভ করিতে গেলেই ঘাতপ্রতিঘাত সহ্য করিতেই হইবে। ভারত-বিষয়ক রাজনীতিসূত্রেও উন্নতি লাভের জন্য আমাদিগকে অনেক আঘাত অনেক প্রতিঘাত সহ্য করিতে হইবে তাহা বলা বাহুল্য। সে প্রকার আঘাত প্রতিঘাতের জন্য ভীত হইলে চলিবে না। সার ব্যাম-ফীল্ড ফুলার বিলাতের টাইমস কাগজে ভারতের বর্ত্তমান অশান্তির মূলে সিবিল সার্ব্বিসের সম্মান ক্ষুণ্ণ করিবার কথা বলিয়া এই প্রকার একটি আঘাত দিবার চেষ্টা করিয়াছেন।* তিনি এ প্রকার ভ্রান্ত ধারণা করাইবার চেষ্টা করিয়া বিশেষ অন্যায় করিয়াছেন। তিনি বিশেষ-রূপেই জানেন যে লর্ড কার্জ্জনের সময়ে বঙ্গবিভাগের কথা হইতেই বর্ত্তমান ভারতীয় অশান্তির উৎপত্তি। তখন কি সিবিল সার্ব্বিসের সম্মান বজ্রবৎ সুদৃঢ় ছিল না? সিবিল সার্ব্বিসের প্রতি ভারতবাসীর শ্রদ্ধা যে বড় বেশী ক্ষুণ্ণ হইয়াছে তাহা নহে। তবে সিবিল সার্ব্বিসের অন্ত-র্ভুক্ত এক একটি লোকের অবিবেচনা, চর্ম্মের বর্ণভেদ অনুসারে ব্যবহার-পার্থক্য, দেশের সম্মানিত লোকের প্রতি অসম্মানসূচক ব্যবহার, প্রভৃতি স্থানবিশেষে কালবিশেষে এই পুরাতন দেশের প্রাচীন সভ্যতামূলক ইতিহাসগর্ব্বে গৌরবান্বিত অধিবাসীগণের অন্তরে যে অস-দ্ভাব জাগাইয়া তুলে, তাহাই প্রকৃতপক্ষে অশান্তির মূল কারণ। পরে সেই অশান্তিই প্রধূমিত হইতে হইতে বিস্তৃত

* Statesman Nov 18, 1917.

হইয়া পড়ে এবং যথাসময়ে উপযুক্ত উপকরণ পাইলেই প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া সকল শান্তি গ্রাস করিতে উদ্যত হয়। বাহিরে বাহিরে দেখিলে এই প্রকৃত কারণের কেহই কোন সন্ধান পায় না। ফুলার সাহেব যদি সিবিল সার্ব্বিসের সভ্যগণকে এদেশবাসীর সহিত কেবল মৌখিক নহে, আন্তরিক সদ্ব্যবহার করিতে উপদেশ দিতেন, তাহা হইলে ইংলণ্ডের এবং ভারতের উভয় দেশের এবং সমগ্র সাম্রাজ্যের বিশেষ উপকার করিতেন।

সুন্দর।

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এ)

রাগিণী—টোড়ি-ভৈরবী।

দুখের কথা বল্‌ব যবে
তোমায় কর্‌বো অপমান
সুন্দর চিরসুন্দর হে
সুন্দর ভবে দে'ছ স্থান!

প্রভাতে কি আলোর ধারা
দিকে দিকে প্রাণের সাড়া
কুসুম ফোটে সুবাস ছোটে
কানন-পাখী তোলে সে তান!

জন্ম যে দিন দিয়েছিলে
কোন বারতা কয়েছিলে
"আনন্দের এই ধরা ওরে
পুণ্য মধুর শান্তির ধাম!

হেথা নিশীথ-রাতে ফুট্‌বে তারা
ঝর্‌বে প্রাতে আলোর ধারা
গাইবে পাখী দুলবে শাখী
ফুট্‌বে কুসুম উঠ্‌বে রে গান!

হেথা আছে প্রেম স্নেহ আছে রে সুখ
আছে বেদন-কাঁটা আছে রে দুখ
কুসুম হয়ে ফুটবে যে সব
এ যে আঁধার আলোর বিচিত্র এ তান!"

ওরে মন করিস্ নে তুই মিথ্যা সব
এত প্রেম স্নেহ এত কলরব
এত হাসি গান এত উৎসব
এত আনন্দ এত যে প্রাণ॥

বৈয়াসিক ন্যায়মালা।

(শ্রীরামচন্দ্র শাস্ত্রী সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ
ও
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি)

ব্রহ্মলক্ষণ নামক দ্বিতীয় অধিকরণ।

মূলসূত্র। জন্মাদ্যস্য যতঃ॥ ২॥

অধিকরণ শ্লোক। দ্বিতীয়াধিকরণমারচয়তি—

লক্ষণং ব্রহ্মণো নাস্তি কিম্বাঽস্তি নহি বিদ্যতে।
জন্মাদেরন্যনিষ্ঠত্বাৎ সত্যাদেশ্চাপ্রসিদ্ধিতঃ॥ ১৩॥
ব্রহ্মনিষ্ঠং কারণত্বং স্যাল্লক্ষ্ম স্রগ্‌ভুজঙ্গবৎ।
লৌকিকান্যেব সত্যাদীন্যখণ্ডং লক্ষয়ন্তি হি॥ ১৪॥

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্‌ব্রহ্ম [তৈত্তি, ৩।১।১] ইতি সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম [তৈত্তি, ২।১।১] ইতি বাক্যদ্বয়ং বিষয়ঃ। প্রয়ন্তি ম্রিয়মাণানীত্যর্থঃ। তত্র শ্রূয়মাণং ব্রহ্মলক্ষণং ন ঘটতে ঘটতে বা ইতি সংশয়ঃ। ন ঘটতে। তথাহি কিং জন্মাদিকং তল্লক্ষণং উত সত্যাদিকং। নাঽদ্যঃ তস্য জগন্নিষ্ঠত্বেন ব্রহ্মসম্বন্ধাভাবাৎ। দ্বিতীয়েঽপি লোকপ্রসিদ্ধস্য সত্যজ্ঞানাদেঃ স্বীকারে ভিন্নার্থত্বাদখণ্ডং ব্রহ্ম ন সিধ্যেৎ অপ্রসিদ্ধস্য তু সত্যাদের্লক্ষণত্বমযুক্তং। তস্মাৎ তটস্থলক্ষণং স্বরূপলক্ষণং চ ন বিদ্যতে।

অত্রোচ্যতে—যল্লক্ষণং রূপানন্তর্ভূতং সৎ পদার্থান্তরব্যবস্থাহেতুঃ তত্তটস্থলক্ষণং। জন্মাদেরন্যনিষ্ঠত্বেঽপি তৎকারণত্বং ব্রহ্মণি কল্পনয়া সম্বন্ধং তটস্থলক্ষণং ভবিষ্যতি। যো ভুজঙ্গঃ সা স্রক্ ইতিবৎ যজ্জগৎকারণং তদ্‌ব্রহ্ম ইতি কল্পিতেনাপি বস্তুনোপলক্ষয়িতুং শক্যত্বাৎ। ভিন্নার্থানামপি পিতৃসুতভ্রাতৃজামাত্রাদিশব্দানামেকদেবদত্তপর্য্যবসায়িত্বে যথা ন বিরোধঃ তথা লোকসিদ্ধভিন্নার্থবাচিসত্যাদিশব্দানামখণ্ডব্রহ্মপর্য্যবসায়িত্বে স্বরূপলক্ষণসিদ্ধিঃ। ইত্যুভয়মপ্যুপন্নং॥

সূত্রানুবাদ। যাঁহা হইতে ইহার জন্মাদি।

দ্বিতীয় অধিকরণ সংরচিত হইতেছে—

শ্লোকানুবাদ। ব্রহ্মের লক্ষণ নাই কিম্বা আছে? নাই। কারণ, জন্ম প্রভৃতি (ব্রহ্ম ভিন্ন) অন্য পদার্থের সহিত সম্বন্ধ এবং সত্যাদি শব্দও (ব্রহ্মলক্ষণ হিসাবে) অপ্রসিদ্ধ। স্রগ্‌ভুজঙ্গের ন্যায়

(জগতের) কারণত্ব ব্রহ্মসম্বন্ধীয় লক্ষণ হইতে পারে। লৌকিক সত্যাদি শব্দই অখণ্ডকে নির্দ্দেশ করিতেছে।

টীকার অনুবাদ। যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্‌বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্‌ব্রহ্ম এবং সত্যংজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম এই দুইটী শ্রুতিবাক্য (বর্ত্তমান অধিকরণের) বিষয়। "প্রয়ন্তি" শব্দের অর্থ ম্রিয়মাণ। উপরোক্ত শ্রুতি-বাক্যদ্বয়ে প্রকাশিত ব্রহ্মলক্ষণ স্বীকৃত হইতে পারে কি না ইহাই হইল সংশয়। হইতে পারে না। আচ্ছা—জন্মাদি কি তাঁহার লক্ষণ অথবা সত্যাদি? প্রথম (জন্মাদি) নহে, কারণ তাহার জগতের সহিত সম্বন্ধ আছে, ব্রহ্মের সহিত সম্বন্ধ নাই। দ্বিতীয় (সত্যাদি) লক্ষণেও, সাধারণত সত্যজ্ঞানাদি শব্দ যে অর্থে প্রসিদ্ধ, সে অর্থে ঐ শব্দগুলিকে গ্রহণ করিলে ভিন্নার্থত্ব প্রযুক্ত (উহাদের দ্বারা) অখণ্ড ব্রহ্ম সিদ্ধ হইতে পারে না। আর, যদি সত্যাদি শব্দের কোন অপ্রসিদ্ধ অর্থ স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে সে প্রকার অপ্রসিদ্ধার্থ শব্দের দ্বারা (ব্রহ্মের) লক্ষণত্ব স্থির করা অসঙ্গত। সুতরাং, (ব্রহ্মের) তটস্থলক্ষণ এবং স্বরূপলক্ষণ, কোন প্রকার লক্ষণই দাঁড়াইল না।

এ বিষয়ে বলা যাইতেছে—যে লক্ষণ রূপের অন্তর্ভূত না হইয়া অপরাপর পদার্থ হইতে ব্যবস্থা বা পৃথককরণের কারণ হয় তাহাই তটস্থ লক্ষণ। জন্ম প্রভৃতি (ব্রহ্ম ভিন্ন) অন্য পদার্থের ধর্ম্ম হইলেও তাহাদের কারণত্ব ব্রহ্মেতে কল্পনাসম্বন্ধ হইয়া তটস্থ লক্ষণ হইবে। যাহা ভুজঙ্গ তাহা পুষ্পমাল্য, ইহার ন্যায় যিনি জগৎকারণ তিনিই ব্রহ্ম এইটী কল্পিত বস্তু দ্বারাও উপলক্ষিত হইতে পারে। পিতা, সুত, ভ্রাতা, জামাতা প্রভৃতি শব্দ ভিন্নার্থ হইলেও একই দেবদত্তকে বুঝাইবার পক্ষে যেমন কোন বিরোধ হয় না, সেই প্রকার সত্য প্রভৃতি শব্দের লোকপ্রসিদ্ধ অর্থ বিভিন্ন হইলেও সেগুলি অখণ্ড ব্রহ্মে পর্য্যবসিত হওয়ায় স্বরূপলক্ষণ সিদ্ধ হইল। এইরূপে উভয় লক্ষণই পাওয়া গেল।

তাৎপর্য্য। প্রথম সূত্রের আলোচনাতে স্থির হইয়াছে যে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা আসিতে পারে এবং ব্রহ্ম-বিষয়ক বিচার আলোচনা করাও কর্ত্তব্য। তাই প্রথম অধিকরণের নাম হইল ব্রহ্মজিজ্ঞাসা বা ব্রহ্ম-বিচার অধিকরণ। ব্রহ্মজিজ্ঞাসা আসিলেই অন্তরে প্রথম প্রশ্ন এই জাগিয়া উঠে যে ব্রহ্মের লক্ষণ কি, তাঁহাকে কি প্রকারে চিন্তা করা যাইতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্মের পরিচায়ক লক্ষণের কথা আসিয়া পড়ে বলিয়া দ্বিতীয় অধিকরণের নাম হইল ব্রহ্মলক্ষণ অধিকরণ।

ব্রহ্মের লক্ষণ কি, এই প্রশ্নের সহজ উত্তরই এই মনে আসে যে তিনি জগতচরাচরের সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয় কর্ত্তা। তাই দ্বিতীয় সূত্রে ব্রহ্মের লক্ষণ বলা হইয়াছে যে "যাঁহা হইতে এই জগতের জন্ম-প্রভৃতি।" কাজেই যে শ্রুতিমন্ত্রে এই জন্মাদির কথা উল্লিখিত হইয়াছে তাহাই হইল বর্ত্তমান অধিকরণের বিষয়, অর্থাৎ বর্ত্তমান অধিকরণের বিচার সেই শ্রুতিমন্ত্র অবলম্বনেই হইবে। সেই শ্রুতিমন্ত্রটী হইল—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্‌ব্রহ্ম" (যাঁহা হইতে এই ভূত সকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যাঁহা কর্ত্তৃক জীবিত রহে এবং প্রলয়কালে যাঁহার প্রতি গমন করে ও যাঁহাতে প্রবেশ করে, তাঁহাকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা কর, তিনি ব্রহ্ম)। এই লক্ষণটী ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ অর্থাৎ তট বা কিনারের লক্ষণ। এই লক্ষণ ব্রহ্মের পরিধি বা বহিঃপ্রকাশকে মাত্র স্পর্শ করে। বাহিরে বাহিরে ব্রহ্মকে জানিতে হইলে তাঁহাকে জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা বলিয়াই জানিতে পারা যায়। এ লক্ষণ ব্রহ্মের কেন্দ্রে পৌঁছিতে পারে না, তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করিতে পারে না।

যাই হৌক, ব্রহ্মের এই সহজ তটস্থ লক্ষণেরও বিরুদ্ধে পূর্ব্বপক্ষ বা সংশয়বাদী এই প্রশ্ন উঠাইলেন যে ব্রহ্মকে যখন তোমরা সকলের অতীত বল, তখন তটস্থই হউক বা অন্য যাহাই হউক, জাগতিক সূত্রে অবলম্বিত কোন প্রকার লক্ষণের দ্বারাই ব্রহ্মের পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে কি না সন্দেহ। এই প্রশ্নটীই হইল বর্ত্তমান অধিকরণের অন্যতর অঙ্গ সন্দেহ। পূর্ব্বপক্ষ শ্রুতিমধুর যুক্তিসহকারে নিজেই নিজকৃত প্রশ্নের উত্তর দিলেন এই যে, ব্রহ্মকে জগতের জন্ম প্রভৃতির কারণ বলিয়া বলা যায় না, কারণ জন্মপ্রভৃতির সহিত জগতেরই সম্বন্ধ দেখা যায়, অর্থাৎ জাগতিক পদার্থেরই উৎপত্তি,

স্থিতি ও ধ্বংস দেখা যায়; ব্রহ্মের সহিত জন্ম প্রভৃতির কোনই সম্বন্ধ নাই, অর্থাৎ ব্রহ্মের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় নাই। সুতরাং যাঁহার সহিত যে বিষয়ের কোনই সম্বন্ধ নাই, তাঁহাকে সে বিষয়ের কারণরূপেও পাওয়া যাইতে পারে না; জন্ম, স্থিতি ও লয়ের কারণ বলিয়া যদি কাহারও পরিচয় দিতে হয়, তবে এই জগতেরই উপর সেই লক্ষণ প্রযুক্ত হইতে পারে।

সিদ্ধান্ত পক্ষ তদুত্তরে তটস্থ লক্ষণকে পারিভাষিক সংজ্ঞা দ্বারা বাঁধিয়া লইয়া দেখাইতেছেন যে, জন্ম প্রভৃতি জগতের ধর্ম্ম হইলেও তাহার কারণত্বকে ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ বলা যাইতে পারে। তটস্থ লক্ষণের পারিভাষিক সংজ্ঞা (ইহা পূর্ব্বপক্ষেরও স্বীকৃত বুঝা যাইতেছে) এই যে, "যে লক্ষণ (লক্ষ্য) রূপের অন্তর্ভূত না হইয়া অপরাপর পদার্থ হইতে ব্যবস্থা বা পৃথক করণের কারণ হয় তাহাই তটস্থ লক্ষণ।" দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করা যাউক। একটী পুষ্পমাল্যকে সর্প বলিয়া ভ্রম হইল। এখানে সর্পত্ব হইল মাল্যের তটস্থ লক্ষণ অর্থাৎ দূর হইতে দেখিয়া বিশেষ সাদৃশ্যের কারণ মাল্যকে সর্প বলিয়া ভ্রম হইয়াছে—মাল্যের স্বরূপ মাল্যত্ব দেখিবার অবসর হয় নাই। বাহিরে বাহিরে দেখিলে একভাবে বলিতে পারি যে সর্পত্বই মাল্যের পরিচায়ক লক্ষণ। এখন তটস্থ লক্ষণের পারিভাষিক সংজ্ঞার সহিত এই মাল্যকে ভুজঙ্গ বলিয়া ভ্রম করা ব্যাপারকে মিলাইয়া দেখা যাউক যে ভুজঙ্গত্ব কি ভাবে মাল্যের তটস্থ লক্ষণ হইল। এখানে পরিচায়ক লক্ষণ হইল সর্পত্ব। এই "সর্পত্ব" লক্ষণ উহার লক্ষ্য রূপ "মাল্যের" অন্তর্ভূত না হইয়া তাহাকে অন্যান্য পদার্থ হইতে পৃথক করিয়া নির্দ্দেশ করিতেছে, তাই "সর্পত্ব" হইল "মাল্যের" তটস্থ লক্ষণ।

সিদ্ধান্তপক্ষের কথা এই যে, এই প্রকার তটস্থ লক্ষণের সাহায্যে ব্রহ্মকে জগৎকারণরূপে বলা যাইতে পারে। তাঁহার মতে প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম নির্গুণ হইলেও তাঁহাকে জগৎকারণ বলিয়া ভ্রম বা ভ্রান্ত ধারণা হইতে পারে। যেমন মাল্যকে কল্পনাদৃষ্টিতে সর্প বলিয়া ধারণা করা গিয়াছিল, সেইরূপ কল্পনাচক্ষে ব্রহ্মকে জগৎকারণ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। তাঁহার যুক্তির সার মর্ম্ম এই যে, ধরিয়া লও যে ব্রহ্ম জগৎকারণ, তাহার পরে তটস্থ লক্ষণের সংজ্ঞা অবলম্বনে বিচার করিয়া দেখা যাউক যে জগৎকারণত্ব ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ হইতে পারে কি না। যদি এই প্রকার বিচার ফলে জগৎকারণত্বকে ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ বলিয়া ধরিবার পক্ষে কোন বাধা দেখা না যায়, তাহা হইলে পূর্ব্বপক্ষ বলিতে পারেন না যে ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ হইতে পারে না। যদি ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ হওয়া অসম্ভব না হয়, তখন শ্রুতিবাক্য অবলম্বনে জগৎকারণত্বকে ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ বলিতেও কোনই বাধা ঘটিবে না।

এখন, উপরোক্ত তটস্থ লক্ষণের সংজ্ঞা অবলম্বনে বিচার করিয়া দেখা যাউক যে জগৎকারণত্ব ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ হইতে পারে কি না। এখানে "জগৎকারণত্ব" লক্ষণ লক্ষ্যরূপ ব্রহ্মের অন্তর্ভূত না হইয়া তাঁহাকে অন্যান্য পদার্থ হইতে পৃথক্ করিয়া নির্দ্দেশ করিতেছে, তাই জগৎকারণত্ব ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ হইল। এই জগৎকারণত্ব প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্মের সম্বন্ধে কল্পিত পদার্থ হইলেও তাহা দ্বারাই ব্রহ্মের পরিচয় দেওয়া হইল। একটা মাল্যকে যখন কল্পিত সর্পত্ব লক্ষণের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট করিতে পারা গেল, তখন কল্পিত জগৎকারণত্বরূপ তটস্থ লক্ষণের দ্বারাও ব্রহ্মকে উপলক্ষিত করানো অসঙ্গত হইতে পারে না। তটস্থ লক্ষণ অসঙ্গত না হইলেই সে লক্ষণটী যে কি, তাহা শ্রুতিবাক্য অবলম্বনে সংক্ষেপে বলা হইল যে "যাঁহা হইতে এই জগতের জন্ম, স্থিতি ও লয়।"

যদিও সূত্রে প্রধানত ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ উল্লিখিত হইয়াছে, তথাপি সেই সূত্রের ভিতরে যে ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণও অন্তঃসলিলরূপে প্রচ্ছন্ন নাই তাহা নহে। সূত্রে আছে "যাঁহা হইতে ইহার জন্মাদি"। তাহাতে প্রশ্ন আসে যে তিনি কে, যাঁহা হইতে এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে? উত্তর হইল যে, পূর্ব্ব সূত্রে যাঁহাকে জানিবার কথা বলা হইয়াছে সেই ব্রহ্ম হইতেই এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। তখন আবার প্রশ্ন আসিল এই যে, ব্রহ্ম আছেন বলিয়াই ব্রহ্ম হইতে এই জগতের জন্মাদি ঘটিতেছে, কিন্তু সেই ব্রহ্ম কি প্রকার—তাঁহার

স্বরূপ কি? স্বরূপলক্ষণের অভাব হইলে তটস্থ লক্ষণের কথাই আসিতে পারে না। কাজেই যখন সূত্রে তটস্থ লক্ষণ উল্লিখিত হইয়াছে, তখন ধরিয়া লইতে হইবে যে ঐ সূত্রের দ্বারাই ব্রহ্মের স্বরূপ-লক্ষণও স্বীকৃত হইয়াছে। সেই স্বরূপলক্ষণের জন্য অবশ্য শ্রুতিবাক্য অন্বেষণ করিতে হইবে। শ্রুতিতে আমরা দেখি যে, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং" (সত্য স্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্তস্বরূপ) বলিয়া ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কাজেই, এই শ্রুতিমন্ত্রকেও বর্ত্তমান অধিকরণের অন্যতর বিষয় বলিয়া ধরা হইয়াছে। ইহাও বর্ত্তমান অধিকরণের বিচার্য্য বিষয়।

এ বিষয়েও পূর্ব্বপক্ষ বা সংশয়বাদী বলেন যে শ্রুত্যুক্ত সত্যংজ্ঞানমনন্তং মন্ত্রের দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ-লক্ষণ প্রকাশ করা যাইতে পারে না। সাধারণ লোকে সত্য বলিতে এক পদার্থ, জ্ঞান বলিতে অপর এক পদার্থ এবং অনন্ত বলিতে তৃতীয় এক পদার্থ বুঝিয়া থাকে। তিনটি শব্দের তিনটি পৃথক পৃথক অর্থ, তখন ঐ তিনটি শব্দ যে এক অখণ্ড ব্রহ্মকে বুঝাইবে তাহা সম্ভবপর নহে। আর যদি বলা যায় যে, ঐ তিনটি শব্দের এমন এক একটি গূঢ় অর্থ আছে, যাহার সাহায্যে ঐ তিনটি শব্দের দ্বারাই এক অখণ্ড ব্রহ্মকে বুঝা যাইতে পারে, তাহাও সঙ্গত নহে। সাধারণ্যে অপ্রচলিত অর্থযুক্ত কোন শব্দের দ্বারা কোন পদার্থের পরিচয় দেওয়া বা লক্ষণ স্থির করা যুক্তিযুক্ত নহে—সে অর্থ যখন সাধারণ লোকে জানেই না, তখন সাধারণ লোকে তাহা দ্বারা ব্যক্ত লক্ষণের বিষয়ই বা বুঝিবে কি প্রকারে?

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তপক্ষ বলিতেছেন যে পূর্ব্বপক্ষের এ কথার কোন মূল্য নাই। যখন দেখা যায় যে নানা শব্দের অর্থ পৃথক পৃথক হইলেও সেগুলি একই ব্যক্তিকে বুঝাইবার জন্য প্রয়োগ করা যাইতে পারে, তখন সত্য, জ্ঞান এবং অনন্ত এই তিনটি শব্দের অর্থ পৃথক পৃথক হইলেও সেগুলি কেন না এক অখণ্ড ব্রহ্মকে বুঝাইবে? পিতা, সুত, ভ্রাতা, জামাতা প্রভৃতি শব্দের অর্থ তো এক নহে—পৃথক পৃথক, অথচ ঐ শব্দগুলি একই দেবদত্তকে বুঝাইবার জন্য প্রযুক্ত হইতে কি পারে না? নিশ্চয়ই পারে, তাহাতে কোন প্রকার বিরোধের সম্ভাবনা নাই। সেই প্রকার এক অখণ্ড ব্রহ্মকে বুঝাইবার জন্য ভিন্নার্থবাচী তিনটী শব্দ—সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত—প্রযুক্ত হইলেও কোনই বিরোধের সম্ভাবনা দৃষ্ট হয় না। এইরূপে যখন পূর্ব্বপক্ষ-প্রদর্শিত বিরোধের সম্ভাবনা খণ্ডিত হইয়া গেল, তখন সিদ্ধান্তপক্ষ শ্রুতি অবলম্বনে বলের সহিত স্থাপিত করিলেন যে "সত্যং জ্ঞানমনন্তং"ই ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ।

এই প্রকারে ব্রহ্মের তটস্থ এবং স্বরূপ এই উভয় প্রকার লক্ষণের বিষয় আলোচনা করিয়া প্রদর্শিত হইল যে ব্রহ্মকে জগৎকারণ বলা যাইতে পারে এবং ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্তস্বরূপ।

সন্ধ্যায়।

(কথক—শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ন)

অন্তরের অন্তস্তলে নিবিড় স্তব্ধতা
উঠিছে ঘনায়ে—গিরি-দরী মাঝে যথা
কুণ্ডলিয়া গাঢ় হয়ে উঠে অন্ধকার
মেঘাচ্ছন্ন গভীর নিশীথে! বরষার
সন্ধ্যাবেলা আজি, আপনারে এত একা
করিতেছি অনুভব! যত স্মৃতি-লেখা
মুছে গেছে হৃদয় হইতে। মনে হয়
জনহীন, অন্ধকার এক শূন্যময়
জগতের মাঝে লভিয়া প্রথম জন্ম
উদাসীন, অর্থহীন—শিশুনর সম—
শুধু চেয়ে আছি, স্তব্ধ মৌন অপলক
ছায়া দৃশ্যপট হেরি' একাকী দর্শক!

বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত—

গীতা-রহস্য।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদিত)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

নিছক স্বার্থী, দূরদর্শী স্বার্থী ও উভয়বাদী বা জ্ঞানদীপ্ত স্বার্থী,—এইরূপ আধিভৌতিক সুখবাদের যে তিন মার্গ আছে, সেই তিন মার্গ সম্বন্ধে এখনকার কালপর্য্যন্ত বিচার করিয়া তাহাদের মুখ্য দোষগুলি কি তাহা বলিয়াছি। কিন্তু ইহাতেও

সমস্ত আধিভৌতিক মার্গ শেষ হয় নাই। সমস্ত আধিভৌতিক মার্গের মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য ও শ্রেষ্ঠ মার্গ কি? না, "এক মনুষ্যের সুখের দিকে লক্ষ্য না করিয়া, সমস্ত মনুষ্যেরই আধিভৌতিক সুখ-দুঃখের তারতম্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া নৈতিক কার্য্যাকার্য্যের নির্ণয় করা আবশ্যক"—এইরূপ মার্গই সাত্ত্বিক আধিভৌতিক পণ্ডিতেরা প্রতিপাদন করিয়াছেন। একই কার্য্যে একই সময়ে সমাজের কিংবা জগতের অন্তর্গত সমস্ত ব্যক্তির সুখ হইতে পারে না। একজন যাহা সুখ বলিয়া মনে করে, অন্যের নিকট তাহাই দুঃখজনক। কিন্তু পেচকের আলোক ভাল লাগে না বলিয়া আলোক ত্যাজ্য এরূপ কেহ বলে না, সেইরূপ, কোন বিশেষ লোকের পক্ষে কোন এক জিনিস লভ্যজনক না হইলেও তাহা যে সকলের পক্ষে হিতাবহ নহে—একথা কর্ম্মযোগ শাস্ত্রও বলিতে পারেন না; এবং এই কারণেই "সকল লোকের সুখ" এই শব্দগুলির "অধিক লোকের অধিক সুখ"—এইরূপ অর্থ এখন করিতে হয়। সারকথা,—"যাহাতে অধিক লোকের অধিক সুখ হয়—তাহাই নীতি দৃষ্টিতে ন্যায্য ও গ্রাহ্য বলিয়া বুঝিতে হইবে"—এই মার্গের এইরূপ মত।

আধিভৌতিক সুখবাদের এই তত্ত্ব আধ্যাত্মিক মার্গও স্বীকার করিয়া থাকে; অধিক কি, এই তত্ত্ব আধ্যাত্মিকবাদীরা অতি প্রাচীনকালে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করায়, আধিভৌতিকবাদীরা এক্ষণে, একটা বিশেষ রীতিতে উহার উপযোগ করিয়াছে মাত্র—উভয়ের মধ্যে এইটুকু মাত্র ভেদ আছে, বলা যাইতে পারে। তুকারামের কথা অনুসারে "জগতের কল্যাণই সাধুদিগের বিভূতি। পরোপকারের জন্য তাঁহারা দেহকে কষ্ট দেন।" ইহা কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হয় না। সুতরাং এই তত্ত্বের সত্যতা সম্বন্ধে কিংবা ঔচিত্য সম্বন্ধে কোন বিরোধই নাই। স্বয়ং ভগবদ্গীতাতেও পূর্ণ যোগযুক্ত,—কি না কর্ম্মযোগযুক্ত জ্ঞানী পুরুষের লক্ষণ বলিবার সময় "সর্ব্বভূত হিতে রতাঃ" অর্থাৎ সর্ব্বভূতের কল্যাণ সাধনেই তাঁহারা নিমগ্ন, এইরূপ দুইবার স্পষ্টরূপে কথিত হইয়াছে (গী, ৫—২৫; ১২—৪)। ধর্ম্মাধর্ম্মের নির্ণয়ার্থেও আমাদিগের শাস্ত্রকার এই তত্ত্বকে গণনার মধ্যে আনিয়াছেন,—ইহা দ্বিতীয় প্রকরণে প্রদত্ত "যদ্‌ভূতহিতমত্যন্তং তৎ সত্যমিতি ধারণা" এই মহাভারতের বচনে স্পষ্ট প্রকাশ পায়। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রকার বলেন, "সর্ব্বভূত হিত" ইহা জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের আচরণের বাহ্য লক্ষণ স্থির করিয়া ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ণয়ার্থ প্রসঙ্গ বিশেষে স্থূলভাবে উহার উপযোগ করা এবং ইহাকে নীতিমত্তার সর্ব্বস্ব মনে করিয়া, অন্য কোন বিষয়ের বিচার না করিয়া, কেবল এই ভিত্তির উপরেই নীতিশাস্ত্রের সমস্ত মজবুৎ ইমারত খাড়া করা এই দুই বিষয় অত্যন্ত ভিন্ন। আধিভৌতিক পণ্ডিত অন্য মার্গ স্বীকার করিয়া, অধ্যাত্ম বিদ্যার সহিত নীতিশাস্ত্রের কোন সম্বন্ধ নাই, এইরূপ প্রতিপাদন করিয়া থাকেন। তাই, তাঁহার এই কথা কতটা সযুক্তিক, ইহা আমাদিগের এখন দেখিতে হইবে।

'সুখ' ও 'হিত' এই দুই শব্দের অর্থে খুবই ভেদ আছে; কিন্তু আপাতত ঐ ভেদ যদি একপাশে সরাইয়া রাখা হয় এবং 'সর্ব্বভূতহিত' অর্থাৎ "অধিক লোকের অধিক সুখ" ইহাকে লইয়াই কাজ চালান হয়, তথাপি, কার্য্যাকার্য্যনির্ণয়ের কাজে কেবল এই তত্ত্বেরই উপযোগ করিলে অনেক গুরুতর বাধা-বিঘ্ন উৎপন্ন হইয়া থাকে, এইরূপ দেখা যায়। বুঝিয়া দেখ, এই তত্ত্বের আধিভৌতিক উপদেষ্টা, অর্জ্জুনকে উপদেশ দিতে গেলে, তিনি কি তাঁহাকে উপদেশ দিতেন যে 'ভারতীয় যুদ্ধে তোমাদের জয়লাভ হইলে, যদি অধিক লোকের অধিক সুখ হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবেই ভীষ্মকে বধ করিয়াও যুদ্ধ করা তোমার কর্ত্তব্য"? বাহ্য-দৃষ্টিতে এই উপদেশ অত্যন্ত সহজ বলিয়া মনে হয়; কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলে, উহার মধ্যে অপূর্ণতা ও বাধা আছে বলিয়া বুঝা যায়। অধিক অর্থে কত লোক? পাণ্ডবদিগের সাত, আর কৌরবদিগের এগারো অক্ষৌহিণী লোক; পাণ্ডবদিগের পরাজয় হইলে, এই এগারো অক্ষৌহিণীর সুখ হইত,—এই যুক্তিবাদে, পাণ্ডবদিগের পক্ষ ন্যায়ের বিরোধী পক্ষ ছিল, একথা বলা যাইতে পারে কি? শুধু ভারতী যুদ্ধ সম্বন্ধে কেন, অন্য অনেক প্রসঙ্গেও কেবল সংখ্যা ধরিয়া নীতিমত্তার নির্ণয় করা ভুল। লক্ষ দুর্জ্জনের সুখ হওয়া অপেক্ষা যাহাতে একজন সজ্জনেরও সন্তোষ হয় তাহাই প্রকৃত সৎকার্য্য,—

ব্যবহারক্ষেত্রে সকল লোকই এইরূপ বুঝিয়া থাকে। এই ধারণা সত্য হইলে, এক সজ্জনের সুখকে লক্ষ দুর্জ্জনের সুখাপেক্ষা অধিক মূল্য দিতে হয়; এবং ঐরূপ করিলে, "অধিক লোকের অধিক সুখই" নীতিমত্তার পরীক্ষার সাধন, এই প্রথম সিদ্ধান্তটি ঐ পরিমাণে পঙ্গু হইয়া পড়ে। তাই, লোকের সংখ্যা কম কিংবা বেশী হওয়ার সহিত নীতিমত্তার নিত্য সম্বন্ধ হইতে পারে না, একথা স্বীকার করিতেই হয়। আর একটা কথা মনে করা উচিত যে, সাধারণতঃ সকল লোকে যে বিষয়কে কখন কখন সুখাবহ বলিয়া মনে করে তাহাই দূরদর্শী ব্যক্তির মতে,—পরিণামে সকলের পক্ষেই অনিষ্টজনক এইরূপ দেখা যায়। উদাহরণ যথা—সক্রেটিস্ ও যিশুখৃষ্ট। দুজনেই দেশভাইদিগকে আপন আপন মত অনুসারে কল্যাণকর উপদেশ দিতেন। কিন্তু তাঁহাদের দেশভাইরা তাঁহাদিগকে "সমাজের শত্রু" মনে করিয়া তাঁহাদিগের জন্য "দেহান্ত প্রায়শ্চিত্ত" ব্যবস্থা করিলেন। জনসাধারণ ও জন-নায়ক উভয়েই, "অধিক লোকের অধিক সুখ" এই তত্ত্ব ধরিয়াই কাজ করিয়াছিল; কিন্তু এইবার সাধারণ লোকের আচরণ ন্যায্য হইয়াছিল, এইরূপ এক্ষণে আমরা বলি না। সার-কথা, "অধিক লোকের অধিক সুখ"ই নীতির মূলতত্ত্ব—ইহা যদি মুহূর্ত্তের জন্যও স্বীকার করা যায় তথাপি, লক্ষাবধি লোকের সুখ কিসে হয় এবং কি করিয়া তাহা স্থির হইবে এবং কে স্থির করিবে, উহার দ্বারা এই প্রশ্নের কোন মীমাংসা হয় না। সাধারণ প্রসঙ্গে, যে সকল লোকের সুখদুঃখসম্বন্ধে প্রশ্ন উপস্থিত হয়, সেই সব লোকের হস্তেই ইহার মীমাংসার ভার দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু সাধারণ প্রসঙ্গে, এতটা "হ্যাঙ্গাম হুজ্জৎ" করিবার কারণ হয় না; এবং কোন গোলমেলে বিশেষ প্রসঙ্গে, নিজের সুখ কিসে হয় ইহার নির্ভুল বিচার করা সাধারণ লোকের সাধ্যায়ত্ত নহে. সুতরাং ভুতের হাতে জ্বলন্ত কাঠ দিলে যে পরিণাম হয় "অধিক লোকের অধিক সুখ" এই নীতিতত্ত্ব অনধিকারী লোকের হাতে পড়িলে ঐরূপ পরিণামই হইয়া থাকে,—ইহা উপরি-উক্ত দুই উদাহরণে স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। "আমাদের এই নীতিধর্ম্মের তত্ত্বটি আসলে সত্য, কিন্তু অজ্ঞান লোকেরা যদি তাহার অপব্যবহার করে, আমরা তাহার কি করিব?" এই উত্তরের কোন অর্থ নাই। কারণ, কোন তত্ত্ব সত্য হইলেও তাহার উপযোগ করিবার অধিকারী কে এবং সেই অধিকারী ইহার উপযোগ কখন্ করিবে ও কেমন করিয়া করিবে,—ইত্যাদি নিয়মও তাহার সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া দেওয়া উচিত। নচেৎ, সক্রেটিসেরই ন্যায় নীতিমত্তা নির্ণয় করিতে আমরা সমর্থ—এইরূপ অনর্থক ভুল বুঝিবার দরুণ, অর্থ অনর্থে পরিণত হওয়াই সম্ভব হইয়া থাকে।

কেবল সংখ্যা ধরিয়া নীতির সমুচিত নির্ণয় হয় না এবং অধিক লোকের অধিক সুখ কিসে হয় ইহা তর্কের দ্বারা নির্দ্ধারণ করিবার কোনো বাহ্য সাধন নাই; এই দুই আপত্তি ছাড়া, এই মার্গ সম্বন্ধে আরও একটি আপত্তি আনা যাইতে পারে। উদাহরণ যথা—কোন কার্য্যের শুধু বাহ্য পরিণাম ধরিয়াই সেই কার্য্য ন্যায্য কিংবা অন্যায্য ইহার পূর্ণ ও সন্তোষজনক মীমাংসাও অনেক সময় করিতে পারা যায় না,—একটু বিচার করিয়া দেখিলেই তাহা সহজে উপলব্ধি হইবে। কোন ঘড়ি ঠিক্ সময় রাখে কি না—ইহা ধরিয়াই ঐ ঘড়ি ভাল কি মন্দ নির্ণয় হইয়া থাকে সত্য; কিন্তু মনুষ্যের কার্য্যে এই ন্যায় প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে, মনুষ্য শুধু একটা ঘড়ির মত যন্ত্র নহে, ইহা মনে রাখা আবশ্যক। সজ্জন মাত্রেই জগতের কল্যাণার্থে চেষ্টা করিয়া থাকেন সত্য; কিন্তু উল্টাপক্ষে, যে-কোন লোক কল্যাণার্থে চেষ্টা করে সেই প্রত্যেক ব্যক্তি সাধুই হইবে এইরূপ নিশ্চয়াত্মক উল্টা অনুমান করা যাইতে পারে না। মনুষ্যের অন্তঃকরণটি কিরূপ তাহাই দেখা আবশ্যক। যন্ত্র ও মনুষ্যের মধ্যে যে বড় রকম তফাৎ আছে তাহা ইহাই; এবং সেই জন্যই, অজ্ঞান কিংবা ভুল ক্রমে যদি কাহারো অপরাধ হয় আইনে তাহা মার্জ্জনীয় বলিয়া স্বীকৃত হয়। তাৎপর্য্য,—কোন কর্ম্ম ভাল কি মন্দ, ধর্ম্ম্য কি অধর্ম্ম্য, নীতিমূলক কি অনীতিমূলক, শুধু বাহ্য ফল বা পরিণাম দেখিয়া, অর্থাৎ অধিক লোকের অধিক সুখ হইবে কি না দেখিয়া তাহার নির্ণয় হইতে পারে না। উক্ত কর্ম্ম করিবার বুদ্ধি, বাসনা, বা হেতু কিরূপ সেই সম্বন্ধেই দেখিতে

হইবে। আমেরিকার এক বড় সহরে সকল লোকের সুখ সুবিধার জন্য ট্রামওয়ে করা আবশ্যক হইয়াছিল; কিন্তু সেই কার্য্যে, অধিকারী কর্ম্মচারীদিগের মঞ্জুরী পাইতে বিলম্ব হইতেছিল। তখন ট্রামওএর কর্ম্মকর্ত্তা, অধিকারী পুরুষকে কিছু টাকা ঘুস দিবামাত্র তখনি মঞ্জুরী পাইলেন এবং তখনি ট্রামওয়ের কাজ সম্পূর্ণ হইয়া তাহার দরুণ সহরের সকল লোকের সুবিধা ও উপকার হইল। কিছু দিন পরে এই কথা প্রকাশিত হওয়ায়, কর্ম্মকর্ত্তার উপর ফৌজদারী মোকদ্দামা রুজু হইল। প্রথম "জুরি" একমত না হওয়ায়, অন্য "জুরি" নির্ব্বাচিত হইল; এবং সেই জুরি দোষী বলিয়া সাব্যস্ত করায় ট্রামওয়ে কর্ম্মকর্ত্তার দণ্ড হইল। এই স্থলে, অধিক লোকের অধিক সুখ এই নীতিতত্ত্ব ধরিয়া নিষ্পত্তি হইতে পারে না। ঘুস দিবার দরুণ ট্রামওয়ে হইল—এই বাহ্য পরিণামে অধিক লোকের অধিক সুখ হইবার কথা; কিন্তু এইরূপ ঘুস্ দিয়া কার্য্য উদ্ধার করাটা ন্যায়সঙ্গত হয় নাই। * আমাদের কর্ত্তব্য মনে করিয়া নিষ্কাম বুদ্ধিতে দান করা, কিংবা কীর্ত্তির জন্য বা অন্য কোন ফলকামনায় দান করা—এই দুই প্রকার দানের বাহ্য পরিণাম একই রকম হইলেও প্রথম প্রকারের দান সাত্ত্বিক ও দ্বিতীয় প্রকারের দান রাজসিক—ভগবদ্গীতায় এইরূপ ভেদ করা হইয়াছে। (গী. ১৭—২০, ২১); এবং ঐ দান কুপাত্রে প্রদত্ত হইলে তামসিক বা গর্হিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কোন গরীব লোক কোন ধর্ম্মকার্য্যে চারি পয়সা ও সেই একই কার্য্যে কোন ধনবান ব্যক্তি একশো টাকা দিলেও উভয়ের নৈতিক যোগ্যতা জনসাধারণের মধ্যে সমান বলিয়াই বিবেচিত হয়। কিন্তু কেবল "অধিক লোকের অধিক হিত" এই বাহ্য সাধনের দ্বারা যদি বিচার করা যায় তাহা হইলে এই দুই দান নৈতিক দৃষ্টিতে সমান যোগ্য নহে এইরূপ বলিতে হয়।

"অধিক লোকের অধিক হিত" এই আধিভৌতিক নীতিতত্ত্বের একটা মস্ত দোষ এই যে, কর্ত্তার মনোগত অভিপ্রায় কিংবা বুদ্ধির কোন বিচার উহাতে হয় না; এবং মনোগত অভিপ্রায়ের প্রতি লক্ষ্য করিতে হইলে, অধিক লোকের অধিক বাহ্য সুখই নীতিমত্তার কষ্টিপাথর এই যে প্রথম প্রতিজ্ঞা, তাহার সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। ব্যবস্থাপক সভা কিংবা মণ্ডলী অনেক ব্যক্তির সমষ্টি হওয়ায়, তৎকর্ত্তৃক প্রণীত আইন বা নিয়ম উচিত কি অনুচিত ইহার বিচার করিবার সময় তাহাদের অন্তঃকরণ কিরূপ ছিল তাহা দেখিবার কোন হেতু থাকে না; তাঁহাদের কৃত আইন হইতে, অধিক লোকের অধিক সুখ হইবে কি না, এই বাহ্য বিচার করিলেই যথেষ্ট হয়। কিন্তু অন্য স্থলে ঐ ন্যায় খাটে না,—ইহা পূর্ব্বোক্ত উদাহরণ হইতে সহজেই উপলব্ধি হইবে। "অধিক লোকের অধিক হিত বা সুখ" একেবারেই অনুপযোগী এরূপ আমি বলি না। কেবল বাহ্য বিষয়ের বিচার কর্ত্তব্য হইলে ইহা অপেক্ষা অন্য উৎকৃষ্ট তত্ত্ব পাওয়া যায় না। কিন্তু কোন বিষয় নীতিদৃষ্টিতে ন্যায্য বা অন্যায্য ইহা নির্ণয় করিতে হইলে, এই বাহ্য তত্ত্ব ব্যতীত, অনেক প্রসঙ্গে, অন্য বিষয়েরও বিচার করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। সুতরাং নীতিতত্ত্বনির্ণয় শুধু এই তত্ত্বের উপরেই সম্পূর্ণরূপ নির্ভর করিয়া থাকিতে পারে না। ইহা অপেক্ষা অধিক নিশ্চিত ও নির্দ্দোষ তত্ত্ব খুঁজিয়া বাহির করা আবশ্যক, ইহাই আমার বক্তব্য। "কর্ম্মাপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ" (গী. ২—৪৮) এই যে কথা গীতার আরম্ভেই উক্ত হইয়াছে, তাহারও অভিপ্রায় ইহাই। শুধু বাহ্য কর্ম্ম দেখিতে গেলে, তাহাতে অনেক সময় ভ্রম হইয়া থাকে। "স্নান, সন্ধ্যা, তিলক, মালা" এই বাহ্য কর্ম্ম স্থির রাখিয়া, "অন্তরে ক্রোধের জ্বালা" হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু উল্টাপক্ষে অন্তরে বুদ্ধি শুদ্ধ থাকিলে, বাহ্য কর্ম্মের কোন গুরুত্বই থাকে না, সুদামের প্রদত্ত চিড়া দানের ন্যায় অত্যন্ত অল্প বাহ্য কর্ম্মের ধার্ম্মিক কিংবা নৈতিক যোগ্যতা, অধিক লোকের অধিক সুখদায়ী ২০ মণ অন্নের সমান,—ইহা সাধারণ লোকে বুঝিয়া থাকে। তাই, জর্ম্মন তত্ত্বজ্ঞানী কাণ্ট, * কর্ম্মের বাহ্য ও প্রত্যক্ষ পরিণামের তারতম্যবিচার গৌণ স্থির করিয়া কর্ত্তার নিজের বিবেচনা ও শুদ্ধ বুদ্ধি হইতেই নীতি-

* পল্ কেরসের "The Ethical Problem" গ্রন্থ হইতে এই উদাহরণ গৃহীত হইয়াছে।

* Kants' Theory of Ethics (Tran. by Abott) 6th Ed. P. 6.

শাস্ত্রের আরম্ভ করিয়াছেন। আধিভৌতিক সুখবাদের মধ্যে এই ত্রুটি প্রধান ;—ইহা আধিভৌতিকবাদীদিগের নজরে পড়ে নাই এরূপ নহে। মনুষ্যের কর্ম্ম, তাহার স্বভাবের দ্যোতক হওয়া প্রযুক্ত, যে অর্থে সাধারণ লোকে উহা নীতিমত্তার প্রদর্শক বলিয়া বুঝে, সেই অর্থে বাহ্য পরিণাম ধরিয়া উহা স্তুত্য কিংবা নিন্দনীয় ইহা সাধারণ লোকে বুঝিতে পারে না; এই কথা হিউম স্পষ্ট বলিয়াছেন।† এবং "কর্ত্তা যে বুদ্ধিতে বা হেতুতে কোন কর্ম্ম করে, সেই কর্ম্মের নীতিমত্তা সম্পূর্ণরূপে তাহারই উপর নির্ভর করে" এই কথা মিল্ সাহেবের অভিমত। কিন্তু স্বপক্ষ সমর্থনার্থ মিল্ এই সম্বন্ধে এইরূপ কূটতর্ক করেন যে, "যে পর্য্যন্ত বাহ্য কর্ম্মের মধ্যে কোন ভেদ না হয় সেই পর্য্যন্ত কর্ত্তার উহা করিবার কোনরূপ বাসনা হইলেও তাহার দ্বারা কর্ম্মের নীতিমত্তার কোন ইতরবিশেষ হয় না।" ‡ মিলের এই তর্ক সাম্প্রদায়িক আগ্রহের তর্ক। কারণ, বুদ্ধি পৃথক্ হওয়া প্রযুক্ত, দুই কর্ম্ম দেখিতে এক হইলেও, তত্ত্বতঃ উহা একই মূল্যের কখনই হইতে পারে না। তাই "যে পর্য্যন্ত (বাহ্য) কর্ম্মের মধ্যে ভেদ না হয়" ইত্যাদি মিলের নিয়মটিও নির্ম্মূল হইয়া পড়ে, এইরূপ গ্রীনসাহেব উত্তর দিয়াছেন§ গীতার অভিপ্রায়ও তাহাই। কারণ, দুই ব্যক্তি একই ধর্ম্ম কার্য্যের জন্য একই রকমের দান করিলেও—উভয়ের বুদ্ধিভেদমূলে, এক দান সাত্ত্বিক, অন্য দান রাজসিক বা তামসিকও হইতে পারে, এইরূপ গীতাতে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু এই সম্বন্ধে বেশী বিচার, পরে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মতের তুলনা করিবার সময় করিব। কর্ম্মের নিছক্ বাহ্য পরিণামের উপর নির্ভরকারী আধিভৌতিক সুখবাদের শ্রেষ্ঠ ভিত্তিও নীতিনির্ণয়কার্য্যে কিরূপ অসম্পূর্ণ, ইহা এক্ষণে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে; অতএব মিলের উপরি-উক্ত স্বীকৃতি, আমাদের মতে ইহার উত্তম ত্রুটিপূরক।

"অধিক লোকের অধিক সুখ" এই আধিভৌতিক মার্গে, কর্ত্তব্যবুদ্ধির কোন বিচারই হয় না, ইহা সব চেয়ে বড় দোষ। কারণ মিলের যুক্তিকে সত্য বলিয়া মানিয়া লইলেও, কেবল বাহ্য ফল ধরিয়া যে তত্ত্ব নীতিনির্ণয় করে তাহা একটা সীমার মধ্যে বদ্ধ সুতরাং একদেশদর্শী; সব সময়ে তাহার একই প্রকার উপযোগ করা যাইতে পারে না, ইহা মিলের লেখা হইতেই সপ্রমাণ হয়। কিন্তু ইহা ছাড়া এই মত সম্বন্ধে আরও একটা আপত্তি এইরূপ আছে যে, স্বার্থ অপেক্ষা পরার্থ শ্রেষ্ঠ কেন, কিংবা কিরূপে স্থির করা যাইবে, তাহার কোন যুক্তি না বলিয়া এই তত্ত্বকে শুধু মানিয়া লইয়া সমস্ত বিচার করাপ্রযুক্ত জ্ঞানদীপ্ত স্বার্থকে সাম্‌নে আনিবার সুবিধা হইয়াছে। স্বার্থ ও পরার্থ এই দুই তত্ত্বই মনুষ্যের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই যদি উৎপন্ন হইয়া থাকে, তবে স্বার্থ অপেক্ষা "অধিক লোকের হিত" এই তত্ত্বের বেশী গুরুত্ব আমি কেন মানিব? "অধিক লোকের অধিক হিত" আমরা কেন করিব, ইহাই মূল-প্রশ্ন। লোকের হিত করিলে প্রায় আপনারও হিত হয় বলিয়া এই প্রশ্ন সর্ব্বদা উপস্থিত হয় না, এ কথা সত্য। কিন্তু আধিভৌতিক মার্গের উপরি-উক্ত তৃতীয় ভিত্তি হইতে এই শেষের অর্থাৎ চতুর্থ ভিত্তির যে প্রভেদ আছে তাহা এই যে, স্বার্থ ও পরার্থের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে, জ্ঞানদীপ্ত স্বার্থের মার্গ অনুসরণ না করিয়া, স্বার্থ ছাড়িয়া পরার্থ সাধনের চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য, ইহা শেষের আধিভৌতিক মার্গের লোকেরা মনে করে। এই আধিভৌতিক মার্গের যে এই বিশেষত্ব তাহার

† "For as actions are objects of our morul sentiment, wo far only as they are indications of the internal character, passions and affections, it is imposuble that they can give rise either to praise or blame, where they proceed not grom these principles, but are derived altogether from external objects."—Hume's Inquiry concerning Human Understanding, Section VIII. Part II. (P. 368 of Hume's Essays, the World Library Edition.)

‡ "Morality of the action depends entirely upon the intention, that is, upon what the agent wi ls to do. But the motive, that is, the feeling which makes him will so to do, when it makes no difference in the act, makes none in the morality." Mill's Utilitarea nism, P 27.

§ Green's Prolegomena to Ethics § 292 note. P. 348. 5th Cheaper Edition.

কি কোন যুক্তি দেখাইতে হইবে না? এই বাধাটি এই মার্গের এক আধিভৌতিক পণ্ডিতের নজরে পড়ায়, ক্ষুদ্র কীট হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত সমস্ত সজীব প্রাণীদিগের ব্যবহার নিরীক্ষণ করিয়া তিনি শেষে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলেন যে, যে-হেতু আপনার মতোই আপনার সন্তানসন্ততি ও জ্ঞাতিদিগকে পরিপোষণ করা এবং কাহাকে কষ্ট না দিয়া আপন ভাইদিগকে যতদূর সম্ভব সাহায্য করা—এই গুণটি ক্ষুদ্র কীট হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত উত্তরোত্তর অধিকাধিক ব্যক্ত হইয়া আসিতেছে দেখিতে পাওয়া যায়,—অতএব সজীব সৃষ্টির আচরণের ইহাই মুখ্য ভাব, এইরূপ বলিতে হইবে। সজীব সৃষ্টির এই ভাবটি প্রথমত সন্ততি উৎপাদন এবং পরে তাহার রক্ষণ পোষণ ব্যাপারেই দেখা যায়। স্ত্রীপুরুষ এই ভেদ যাহাদের মধ্যে হয় নাই এইরূপ অতিসূক্ষ্ম কীটজগতের মধ্যেও কীটের দেহ বাড়িতে বাড়িতে ফাটিয়া গিয়া উহা দুই কীটে পরিণত হয়; কিংবা সন্ততির জন্য অর্থাৎ পরের জন্য এই ক্ষুদ্র কীট আপন দেহ বিসর্জ্জন করে বলিলেও চলে। সেইরূপ আবার, সজীব সৃষ্টির মধ্যে এই কীটের উপর উপরকার পদবীর স্ত্রীপুরুষাত্মক প্রাণীও এইরূপ আপন সন্ততি রক্ষণার্থ স্বার্থত্যাগে আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে; এবং এই গুণ পরে উত্তরোত্তর বাড়িয়া গিয়া, নিতান্ত বন্য অসভ্য সমাজের মধ্যেও মনুষ্য শুধু আপন সন্ততিকে নহে, আপন জ্ঞাতিভাইদিগকেও আনন্দের সহিত সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হয়। তাই, পরার্থের কাজেও স্বার্থের মতই সুখ অনুভব করা সমস্ত সৃষ্টির এই যে মুখ্য ভাব—এই ভাবটিকে আরও সম্মুখে অগ্রসর করিয়া দিয়া স্বার্থ ও পরার্থের মধ্যে প্রতীয়মান বিরোধটি একেবারে বহিষ্কৃত করিবার প্রযত্ন সজীব সৃষ্টির শিরোমণি—মনুষ্যের কর্ত্তব্য।* এই যুক্তিবাদ খুবই ঠিক্। পরোপকার এই সদ্‌গুণ, মূক-সৃষ্টির মধ্যেও সন্ততি-রক্ষণব্যাপারে নজরে আসায়, উহার পরমোৎকর্ষ সাধন করাই জ্ঞানবান মনুষ্যের পুরুষার্থ, এই তত্ত্ব কিছু নূতন নহে। আধিভৌতিক শাস্ত্রের জ্ঞান অধুনা অনেক বাড়িয়া যাওয়ার এই তত্ত্বের আধিভৌতিক সিদ্ধান্ত এক্ষণে বেশী বিবৃত করা বাহুল্য মাত্র। আমাদের শাস্ত্রকারদিগের দৃষ্টি আধ্যাত্মিক হইলেও প্রাচীন গ্রন্থাদিতে

অষ্টাদশ পুরাণানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতম্।
পরোপকারঃ পুণ্যায় পাপায় পরপীড়নম্॥

"পরোপকারই পুণ্য এবং পরপীড়াই পাপ—ইহাই অষ্টাদশ পুরাণের সার কথা" এইরূপ কথিত হইয়াছে; এবং ভর্ত্তৃহরিও "স্বার্থোযস্য পরার্থ এব স পুমান্ একঃ সতাং অগ্রণীঃ" পরার্থই যাহার স্বার্থ হইয়াছে সে-ই সমস্ত সজ্জনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—এইরূপ বলিয়াছেন। কিন্তু ক্ষুদ্র কীট হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত সৃষ্টির উত্তরোত্তর উন্নত শ্রেণীদিগকে লক্ষ্যের মধ্যে আনিলে, এইরূপ আর এক প্রশ্নও বাহির হয় যে, পরোপকারবুদ্ধি, দয়া, বিজ্ঞতা, দূরদৃষ্টি, তর্ক, শৌর্য্য, ধৃতি, ক্ষমা, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ ইত্যাদি অন্য সাত্ত্বিক গুণেরও কি বৃদ্ধি হইয়াছে? এই বিচার মনোমধ্যে উদয় হইলে, অন্য সজীব প্রাণী অপেক্ষা মনুষ্যের মধ্যেই সমস্ত সদ্‌গুণের উৎকর্ষ হইয়াছে, এই কথা বলিতেই হয়। এই তাত্ত্বিক গুণসমূহের সমুচ্চয়কে আমরা অচিরাৎ "মানবিকতা" নামে অভিহিত করিয়া থাকি। পরোপকার অপেক্ষা "মানবিকতা"কে এইরূপ শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্থির করিলে পর, কোন কর্ম্মের ঔচিত্য অনৌচিত্য কিংবা নীতিমত্তার নির্ণয়ে, সেই কর্ম্মের পরীক্ষা, কেবল পরোপকারবুদ্ধির দিক দিয়া করা অপেক্ষা "মানবিকতার" দৃষ্টিতে—অর্থাৎ মানবজাতির মধ্যে যে সকল গুণ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে দেখা যায়, সেই সমস্ত গুণের দৃষ্টিতে,—উক্ত কর্ম্মের পরীক্ষা করা একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে। সুতরাং কেবল এক পরোপকারবুদ্ধির উপর ভিত্তিস্থাপন করিয়া কোন প্রকার সিদ্ধান্ত করা অপেক্ষা সমস্ত মনুষ্যের "মনুষ্যপণা" কিংবা "মানবিকতা" যে কর্ম্মের দ্বারা বৃদ্ধি পাইতে পারে কিংবা "মানবিকতা" যাহার দ্বারা বিভূষিত হয় তাহাই সৎকার্য্য কিংবা তাহাই

* এই মতবাদ স্পেনসরের Data of Ethics গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। নিজের মত ও মিলের মতের মধ্যে কি প্রভেদ, তাহা মিলের নিকট প্রেরিত পত্রের মধ্যে বিবৃত হওয়ায়, ঐ পত্র হইতে উহা উদ্ধৃত করিয়া উক্ত গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। PP. 57, 123, Also see Bain's Mental and Moral Science, PP, 721, 722 (1875).

নীতিধর্ম্ম,—এক্ষণে এইরূপ বলিতে হইবে ; এবং এই ব্যাপক দৃষ্টিকে একবার অনুসরণ করিলে, "অধিক লোকের অধিক সুখ" উক্ত দৃষ্টির একটা স্বল্প অংশ হওয়ায় কেবল সেই দৃষ্টিতেই সমস্ত কার্য্যের ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করিতে হইবে, এই মতের উপর আর নির্ভর করা যায় না ; সুতরাং "মানবিকতার" দিকেও তাকাইতে হয়—ইহা সিদ্ধ হইতেছে। "মানবিকতা বা মনুষ্যপণা" কিরূপ পদার্থ তাহার সূক্ষ্ম বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলে, যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তি অনুসারে "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" এই প্রশ্ন স্বভাবতই উৎপন্ন হয়। নীতিশাস্ত্রের বিচারক এক আমেরিকান গ্রন্থকার, এই সমুচ্চয়াত্মক "মানবিকতার" ধর্ম্মকেই 'আত্মা' এই সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন।

নিছক স্বার্থ কিংবা নিজের বিষয় সুখ, এই কনিষ্ঠ পদবী হইতে উচ্চে উঠিতে উঠিতে আধিভৌতিক সুখবাদীরাও কেমন করিয়া পরোপকার ও শেষে মানবিকতা পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিলেন তাহা উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে উপলব্ধি হইবে। কিন্তু "মানবিকতা" বলিলেও আধিভৌতিকবাদীদিগের মনে প্রায় সমস্ত লোকের বাহ্য বিষয়সুখেরই কল্পনা প্রধান হওয়ায়, অন্তঃশুদ্ধি ও অন্তঃসুখের বিচার আমলে না আনায়, এই শেষের পদবীও আমাদিগের অধ্যাত্মবাদী শাস্ত্রকারের মতে নির্দ্দোষ বলিয়া নির্দ্ধারিত হয় নাই। মনুষ্যের সমস্ত চেষ্টা-প্রযত্ন, সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখ নিবারণার্থ হইয়া থাকে—ইহা সাধারণত স্বীকার করিলেও, প্রকৃত ও নিত্য-সুখ আধিভৌতিক অর্থাৎ ঐহিক বিষয়োপভোগের মধ্যেই আছে কিংবা অন্য কিছুতে আছে প্রথমে এই প্রশ্নের নির্ণয় ব্যতীত, কোন আধিভৌতিক পক্ষই গ্রাহ্য বলিয়া ধরা যাইতে পারে না। শারীরিক সুখাপেক্ষা মানসিক সুখের যোগ্যতা অধিক—ইহা আধিভৌতিকবাদীও স্বীকার করেন। পশুরা যে-যে সুখ উপভোগ করিতে সমর্থ, সেই সমস্ত সুখ আমি তোকে দিতেছি, এইরূপ বলিয়া কাহাকে যদি প্রশ্ন করা যায় "তুই পশু হইতে রাজি আছিস্ কি?" —একজন মনুষ্যও পশু হইতে স্বীকার করিবে না ; সেইরূপ, তত্ত্বজ্ঞানের গভীর বিচার নিবন্ধন বুদ্ধি যে এক প্রকার শান্তি লাভ করে তাহার যোগ্যতা, ঐহিক সম্পত্তি কিংবা বাহ্য উপভোগ অপেক্ষা শতগুণ অধিক একথা জ্ঞানী ব্যক্তিকে বলিতে হইবে না। ভাল ; লোকমতের প্রতি লক্ষ্য করিলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, নীতিমত্তা শুধু সংখ্যার উপর নির্ভর করে না ; মনুষ্য যাহা কিছু করে তাহা আধিভৌতিক সুখের জন্যই করে, আধিভৌতিক সুখই তাহার পরম সাধ্য,—সাধারণ লোকেরা এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে মানে না।

শুধু বাহ্য সুখ কেন—জীবনের পরোয়া না রাখিয়াও প্রসঙ্গ বিশেষে, আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে, তাহা অপেক্ষা অধিক যোগ্য সত্যাদি নীতিধর্ম্ম পালনে যে মনোনিগ্রহ করিতে হয় তাহাতেই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব এইরূপ আমরা বুঝিয়া থাকি ; এবং অর্জ্জুনের প্রশ্নও, যুদ্ধ করিলে কাহার কতটা সুখ হইবে এইরূপ না হওয়ায়, "আমার অর্থাৎ আমার আত্মার শ্রেয় কিসে হইবে তাহা আমাকে বল" (গী, ২—৭ ; ৩—২) এইরূপ শ্রীকৃষ্ণকে তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আত্মার এই নিরন্তর—শ্রেয় কিংবা সুখ, আত্মার শান্তিতে আছে। তাই ঐহিক সুখ কিংবা সম্পত্তি যতই পাওয়া যাক্ না কেন, শুধু তাহাতে এই আত্মসুখ কিংবা শান্তিলাভের আশা নাই—"অমৃতত্বস্য তু নাশাস্তি বিত্তেন"—এইরূপ বৃহদারণ্যক উপনিষদে কথিত হইয়াছে (বৃ, ২—৪—২) ; কঠোপনিষদে, নচিকেতাকে পুত্র পৌত্র পশু ধান্য দ্রব্য প্রভৃতি বহু প্রকারের ঐহিক সম্পত্তি দিবার জন্য মৃত্যু প্রস্তুত থাকিলেও, নচিকেতা মৃত্যুকে স্পষ্ট জবাব দিলেন—"আমি আত্মবিদ্যা চাই, আমি সম্পত্তি চাই না ;" প্রেয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের প্রীতিজনক যে ঐহিক সুখ এবং শ্রেয় অর্থাৎ আত্মার প্রকৃত কল্যাণ এই দুয়ের মধ্যে ভেদ করিয়া—

প্রেয়শ্চ শ্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ সংপরীত্য বিবিনক্তিধীরঃ।
শ্রেয়োহি ধীরোঽভিপ্রেয়সো বৃণীতে প্রেয়োমন্দো যোগক্ষেমাদ্বৃণীতে॥

"প্রেয় (ক্ষণিক বাহ্য ইন্দ্রিয় সুখ) ও শ্রেয় (প্রকৃত ও চিরন্তন কল্যাণ) এই দুই মনুষ্যের সম্মুখে আসিলে, বিজ্ঞ মনুষ্য ঐ দুয়ের মধ্যে বাছাই করিয়া থাকে। সুবুদ্ধি যে, সে প্রেয় অপেক্ষা শ্রেয়কে অধিক পছন্দ করে ; এবং মন্দবুদ্ধি মনুষ্যের নিকট আত্মকল্যাণাপেক্ষা প্রেয় অর্থাৎ বাহ্য সুখই অধিক

প্রিয়,"—এইরূপ কথিত হইয়াছে (কঠ, ১-২-২)। তাই, সংসারের ইন্দ্রিয়গম্য বিষয় সুখই এই জগতে মনুষ্যের পরম সাধ্য, এবং মনুষ্য যাহা কিছু করে তাহা কেবল বাহ্য অর্থাৎ আধিভৌতিক সুখার্থ কিংবা দুঃখ নিবারণার্থই করিয়া থাকে—এরূপ মনে করা ঠিক নহে। ইন্দ্রিয়গম্য বাহ্য সুখ অপেক্ষা বুদ্ধিগম্য অন্তঃসুখের কিংবা আধ্যাত্মিক সুখের যোগ্যতা অধিক, শুধু তাহা নহে ; বিষয়সুখ আজ আছে, কাল নাই—অর্থাৎ বিষয় সুখ অনিত্য। নীতিধর্ম্মের কথা তাহা নহে। অহিংসা, সত্য প্রভৃতি ধর্ম্ম বাহ্য উপাধির উপর নির্ভর করে না অর্থাৎ বাহ্য সুখদুঃখকে অবলম্বন করিয়া নাই ; সর্ব্বকালে ও সর্ব্বপ্রসঙ্গে উহা একই প্রকার, উহা নিত্য, এইরূপ সকল লোকেই মানিয়া থাকে। বাহ্য বিষয়ের উপর যাহা নির্ভর করে না সেই নীতি-ধর্ম্মের নিত্যত্ব কোথা হইতে আসিল, তাহার কারণ কি,—আধিভৌতিকবাদে ইহার কোন উপপত্তি পাওয়া যায় না। কারণ, বাহ্য সৃষ্টির মধ্যে, সুখ দুঃখ অবলোকন করিয়া, কোন একটা সাধারণ সিদ্ধান্ত করিলেও সমস্ত সুখ দুঃখ স্বভাবতই অনিত্য হওয়ায়, উহাদের নরম ভিত্তির উপর নির্ম্মিত নীতি-সিদ্ধান্তও ঐরূপ কাঁচা অর্থাৎ অনিত্য হইবে ; এবং সেইজন্য সুখদুঃখের বিচার না করিয়া, সত্যের খাতিরে প্রাণ গেলেও ভাল—এইরূপ, ত্রিকাল-অবাধিত সত্যধর্ম্মের যে নিত্যতা তাহা "অধিক লোকের অধিক সুখ" এই তত্ত্বের দ্বারা সিদ্ধ হয় না। সাধারণ ব্যবহারেও, সত্যের জন্য প্রাণ দিবার সময় উপস্থিত হইলে, বড় বড় লোকও অসত্যের আশ্রয় করিয়া থাকেন এবং শাস্ত্রকারেরাও এইরূপ সময়ে খুব টানিয়া ধরেন না, এইরূপ যদি আমরা দেখিতে পাই, তবে সত্যাদি ধর্ম্ম নিত্য বলিয়া স্বীকার করিবার কোন কারণ নাই—এইরূপ কেহ কেহ তর্ক করিয়া থাকেন। কিন্তু এই যুক্তিবাদ ঠিক নহে। কারণ, সত্যের জন্য প্রাণ দিতে যাহার সাহস হয় না কিংবা সহজসাধ্য হয় না এরূপ ব্যক্তিও এই নীতিধর্ম্মের নিত্যত্ব নিজ মুখে স্বীকার করিয়া থাকে। এইজন্য মহাভারতে, অর্থকামাদি পুরুষার্থ যাহার দ্বারা সিদ্ধ হয় সেই ব্যবহারিক ধর্ম্মের বিচার আলোচনা করিয়া শেষে ভারতসাবিত্রীতে (এবং বিদুর নীতিতেও) ব্যাসদেব—

ন জাতু কামান্ন ভয়ান্ন লোভাদ্ধর্মং ত্যজেজ্জীবিতস্যাপি হেতোঃ।
ধর্ম্মো নিত্যঃ সুখদুঃখে ত্বনিত্যে জীবো নিত্যঃ হেতুরস্য ত্বনিত্যঃ॥

"সুখ দুঃখ অনিত্য, কিন্তু (নীতি) ধর্ম্ম নিত্য ; অতএব, সুখেচ্ছায়, ভয়ে লোভে, কিংবা প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হইলেও, ধর্ম্মকে কখনই ছাড়িবে না। মূলতঃ জীব নিত্য, তাহার হেতু অর্থাৎ সুখদুঃখাদি বিষয়ই অনিত্য"—অতএব, অনিত্য সুখদুঃখের বিচার করিতে না বসিয়া, ধর্ম্মের সঙ্গেই নিত্য জীবকে সংযুক্ত করিয়া দেওয়া আবশ্যক, এইরূপ সকলকে উপদেশ করা হইয়াছে, (সভা, স্ব, ৫, ৬০; উ, ৩৮, ১২, ১৩)। ব্যাসের এই উপদেশ কতটা যোগ্য ইহা দেখিবার জন্য, সুখদুঃখের প্রকৃত স্বরূপ কি, এবং নিত্য সুখ কাহাকে বলে,—এক্ষণে ইহার বিচার করা আবশ্যক।

ইতি চতুর্থ প্রকরণ সমাপ্ত।

কলঙ্ক।

(কীর্ত্তনী ঢঙের সুর)

কাঁদিলাম যদি জনম অবধি
কলঙ্ক রটিবে তব নামে।
তব অপযশ উঠি দিকে দশ
বজর হানিবে মম প্রাণে॥১
শুনিবার আগে দীন হীন মাগে
করিতে করিতে তব নামে।
চলে যাই যেন দেহ ছাড়ি হেন
মরণে বাঁধিয়া বঁধু-মানে॥২
চরণের পরে চিরদিন তরে
বাঁধা রহি যেন ভুলি আনে।
সকলি ছাড়িয়া আকুলিত হিয়া
ধায় সেথা—বাধা নাহি মানে॥৩
যাহা কিছু করি চলি আর বলি
আঁখি থাকে যেন তব পানে।
তুমি ধ্রুবতারা নয়নের তারা
আলো তুমি আঁধার যেখানে॥৪
কেন আর মোরে রাখ মোহ-ঘোরে ?
আছাড়ি পড়িছি দুখবাণে।
কবে পাব বল মুকতি উজল—
হাসিয়া চলিব তোমা পানে॥৫

স্বরলিপি।

(শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা)

জয়জয়ন্তী—একতালা।

"শরণাগত"

বহু দূর হ'তে আসিয়াছি প্রভো তোমার দুয়ারে আজ হে।
দীরঘ নিদাঘ-বেলা অবসান ধীরে এলো ঐ সাঁঝ হে॥
তপত এ তনু ভানুর কিরণে, কণ্টক কত ফুটেছে চরণে,
এসেছি অবশ শ্রান্ত পরাণে তব দ্বারে জ্যোতিরাজ হে॥
এসেছে কাঙ্গাল শুনে তব নাম, হেথা দীন দুঃখী পায় সুখধাম,
শুনেছি জেনেছি আছে কল্পতরু তব নিকেতন মাঝ হে।
কেহ ত হতাশ ফিরে না হেথায়, আমি কি হে শুধু মরম-ব্যথায়
ফিরে যাব আজ নিরাশ শূন্য হৃদয়ে হানিবে বাজ হে॥
আমি—দুরিত দুরিত-পীড়িত ঘৃণ্য, কে লবে আর কোলে তুমি ভিন্ন,
তব স্নেহ-কোল সদা প্রসারিত দুরিত দীনের লাজ হে॥
যাহা ইচ্ছা কর র'হু দ্বারে প'ড়ে, নীরবে কাঁদিব চিরকাল ভ'রে.
তোমা বিনা নাথ ধরমে করমে, মরমে মম কি কাজ হে॥

২ ৩ ০ ১
II { মা মা মা। গ-মগা গা রা। সা নসরা রা। রা রা রা I
ব হু দূ ০র হ তে আ সি ০০ য়া ছি প্র ভো

২ ৩ ০ ১
I গরা গা মা। পা পধা -মগা। রগা -রগা -মা। মা -া -া } I
তো মা র দু যা০ ০রে আ০ ০০ জ হে ০ ০

২ ৩ ০ ১
I মা মা মগা। রগমা গরা সা। রমা মা -পনা। না না -র্সা I
দী র ঘ০ নি০০ দা০ ঘ- বে০ লা ০অ ব সা ন

২ ৩ ০ ১
I নর্সর্রা র্সর্রর্সা নর্সনা। ণধা পধণধা ধপা। -মগা -রগা -রগা। মা -া -া II
ধী০০ রে০ এ০ লো০ ঐ ০০০ সাঁ০ ০০ ০০ ঝ০ হে ০ ০

২ ৩ ০ ১
[না -না না]
II { মা -পা পনা। না না না। র্সা র্সা র্সা। র্সনা র্সা র্সা I
ত প ত০ এ ত নু ভা নু র কি০ র ণে

২ ৩ ০ ১
I র্সা র্সা র্সা। র্সা -া র্সনা। ধা ধর্রা র্রা। র্রা র্রা -র্জ্ঞনা } I
ক ণ্ট ক ক ০ ত০ কু টে০ ছে চ র ণে০

২ ৩ ০ ১
I না না না। র্সা -না র্সা। র্সর্রা র্সর্রর্সা র্সা। ণা র্সণা -ধপা I
এ সে ছি অ ব শ শ্রা০ ০০ স্ত প রা ০ণে

২ ৩ ০ ১
I পা -ধা পধপা। পা মা -মগা। রগা -রগা -রগমা। মা -া -া II
ত ব দ্বা০ রে জ্যো ০তি রা০ ০০ জ০০ হে ০ ০

২´ ৩ ০ ১
II { মা মা গা। গমা রা সা। ংসা সা ন্‌সরা। রা রা রা I
(১) এ সে ছে কা০ ঙ্গা ল শু নে ত০০ ব না ম
(৯) আ মি দু ০রি ত ভু রি ত পী০ড়ি ত ম্ব ণ্য

২´ ৩ ০ ১
I ংগরা গা মা। পা ধা পা। মা গা ংগরা। গা মা মা I
(২) হে০ থা দী ন ঃ খী পা য় স্থ০ খ ধা ম
(১০) কে০ ল বে আ র কো লে, তু মি০ ভি ন্‌ ন

২´ ৩ ০ ১
I মা গমা -রা। মা পা পা। মা পা পনা। না র্সা র্সা I
(৩) শু নে ছি ছে নে ছি আ ছে কল্‌ প ত রু
(১১) ভ ব মে হ কো ল স দা প্র সা রি ত

২´ ৩ ০ ১
I নর্সর্রা র্সর্রর্সা র্সণা। ণধা ধা পা। মাঃ -গঃ -রগমা। মা -া -া } I
(৪) ত০০ ব০ নি০ কে০ ভ ন মা ০ ০০ ঝ হে ০ ০
(১২) ধূ০০ রি০ ত০ দী০ নে র লা ০ ০০ জ হে ০ ০

২´ ৩ ০ ১
[না না না]
I { মা পা পা। না না না। না র্সা র্রর্সা। না সা র্সা I
(৫) কে হ ত হ তা শ কি রে না০ হে থা য়
(১০) যা হা ই চ্ছা ক র র, ন্থ ছা০ রে প ড়ে

২´ ৩ ০ ১
I ংর্সা র্সা র্সা। র্সা র্সা -র্সনা। ধা ধর্রা র্রা। র্সনা র্রা -র্সনা } I
(৬) আ মি কি হে শু ০ধু ম র০ ম ব্য০ থা ০য়
(১৪) নী র বে কাঁ দি ০ব চি র০ কা ল০ ভ ০রে

২´ ৩ ০ ১
I না না না। র্সাঃ -নঃ সা। না র্সর্রা সা। র্সর্রা -া ণধা I
(৭) কি রে যা ব আ জ নি য়া০ শ শূ০ ০ন্য০
(১৫) তো মা রি না না থ ধ র০ মে ক০ র মে০

২´ ৩ ০ ১
I পা ধা পা। মা মা গা। রগা -রগা -রগমা। মা -া -া II II
(৮) স্থ দ য়ে হা নি বে বা০ ০০ জ০০ হে ০ ০
(১৬) ম র মে ম ম কি কা০ ০০ জ০০ হে ০ ০

তত্ত্ববোধিনী সভার অস্তিত্ব বিলোপ।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মগোল এবং গৃহের গণ্ডগোল অতিক্রম করিয়া দেবেন্দ্রনাথ তো হিমালয় প্রবাসে যাত্রা করিলেন। দেবেন্দ্রনাথের সেই প্রবাসকালে ব্রাহ্মসমাজের অবস্থাও নিতান্ত প্রাণহীন শুষ্ক মরুভূমির ন্যায় হইয়া আসিতে লাগিল। তবে, দেবেন্দ্রনাথের পরিপোষণ ও উপযুক্ত ব্যবস্থার ফলে, রামমোহন রায়ের পরবর্ত্তীকালে ব্রাহ্মসমাজের যেরূপ অবস্থা হইয়াছিল, এবারে ব্রাহ্মসমাজ অবনতির পথে ততটা নামিবার অবসর প্রাপ্ত হয় নাই। রামমোহন রায়ের অনুপস্থিতিকালে সমাজের সভা আহ্বান, কর্ম্মচারীনিয়োগ প্রভৃতি বৈষয়িক কর্ম্ম বলিতে গেলে সম্পূর্ণই বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের প্রবাস জনিত অনুপস্থিতিতে সমাজের কাজকর্ম্ম বন্ধ হইয়া যায় নাই। রামমোহন রায়ের নিযুক্ত ট্রষ্টীগণের মধ্যে একমাত্র রমানাথ ঠাকুরই জীবিত ছিলেন। অপর ট্রষ্টীদ্বয় রাধাপ্রসাদ রায় এবং বৈকুণ্ঠনাথ চৌধুরী পরলোকগত হইয়াছিলেন। রমানাথ ঠাকুরই সমাজের বৈষয়িক কর্ম্ম চালাইয়া লইতেন।

রামমোহন রায়ের ট্রষ্টডীড অনুসারে আদিম ট্রষ্টীদিগের মধ্যে কাহারও স্থান কোন কারণে খালি হইলে ডীডকর্ত্তাদিগের মধ্যে যিনি জীবিত থাকিবেন তিনি অবশিষ্ট ট্রষ্টীগণের সম্মতি গ্রহণ করিয়া নূতন ট্রষ্টী নিযুক্ত করিবার অধিকারী ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ যখন পশ্চিমাঞ্চলে, সেই সময়ে রমানাথ ঠাকুর পরলোকগত ট্রষ্টীদ্বয়ের স্থলে অপর দুইজন ট্রষ্টী নিযুক্ত করা আবশ্যক বোধ করিলেন। যথারীতি বিজ্ঞাপন দিয়া অন্যান্য কয়েকটী কার্য্য নিষ্পত্তির সঙ্গে ট্রষ্টীদ্বয়ের মনোনয়ন করিবার জন্য ১৭৭৮শকের ২৯শে পৌষ ব্রাহ্মসমাজের এক সাধারণ সভা আহূত হইল। ঐ সভায় রমানাথ ঠাকুরই সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন। তদানীন্তন সুপ্রসিদ্ধ আইনজ্ঞ শ্যামাচরণ সরকারের পোষকতায় সভাপতি মহাশয় সভাকে জানাইলেন যে অন্যতর ডীডকর্ত্তা প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রমাপ্রসাদ রায় এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ট্রষ্টী পদে নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। সভাপতি মহাশয়ের এই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মত হইল।

এই বৎসর তত্ত্ববোধিনী সভার সম্পাদক ছিলেন দুইজন—রমাপ্রসাদ রায় এবং অমৃতলাল মিত্র। দেবেন্দ্রনাথ ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের ৬ই অক্টোবর (১৭৬১ শকের ২১শে আশ্বিন) তত্ত্ববোধিনী সভা সংস্থাপিত করিয়া তাহার অধিকাংশ ব্যয় স্বয়ং বহন করিতেছিলেন। সভা সংস্থাপিত হইবার প্রায় বৎসর দুই পরেই ব্রাহ্মসমাজের সহিত তত্ত্ববোধিনী সভার মিলন সাধিত করিয়া দেবেন্দ্রনাথ উভয়েরই প্রাণে নবজীবন সঞ্চার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ফলে, সেই মিলন অবধি তত্ত্ববোধিনী সভা স্বীয় স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষা করিয়াও অধ্যক্ষদিগের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের প্রচার কার্য্যের সাহায্য করিয়া আসিতেছিল। তত্ত্ববোধিনী সভা এবং ব্রাহ্মসমাজ, উভয়ের কর্ম্মচারী পৃথক ছিলেন, বিত্তসংস্থান পৃথক ছিল এবং উভয়ের অধিবেশনাদিও পৃথক হইত, কিন্তু উভয়েই মূলত একই উদ্দেশ্যে পরিচালিত হইত। উভয়ের মিলনের ঠিক পরেই তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যদিগের উৎসাহ প্রবল হইয়া উঠিতে দৃষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু কালক্রমে সেই উৎসাহ ধীরে ধীরে নির্ব্বাণপ্রায় হইয়া আসিতে লাগিল। তবে, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতির ন্যায় মহদাশয় সভ্যগণ তাঁহাদের দেয় চাঁদা নিয়মিতরূপে দিতেন এবং সময়ে সময়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রবন্ধাদি প্রেরণ করিয়া তাহার গৌরব বৃদ্ধি করিতেন।

১৭৭৮ শকের আশ্বিন মাসে দেবেন্দ্রনাথ পশ্চিম যাত্রা করেন। এই বৎসরের পৌষমাসের পত্রিকাতে বিধবা বিবাহের সমর্থনে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লেখনীপ্রসূত এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রথম প্রকাশিত হয়। এদিকে এই পৌষমাসেই এক সাধারণ সভায় রমাপ্রসাদ রায় এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ট্রষ্টী মনোনীত হইয়াছিলেন তাহা আমরা উপরে বলিয়া আসিয়াছি। আমরা শুনিয়াছি যে এই বিধবাবিবাহ বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশের পর অবধি রমানাথ ঠাকুর সমাজের কার্য্যে আর কোনরূপ মনোযোগ দিতেন না। আমরা জানি না যে এই পৌষ সংখ্যার পত্রিকা দেবেন্দ্রনাথের হস্তগত হইয়াছিল কিনা এবং

তিনি সে বিষয়ে কোন মতামত প্রকাশ করিয়াছিলেন কিনা।

ঠিক এক বৎসর পরে ১৭৭৯ শকের পৌষমাসে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে বিধবাবিবাহের সমর্থক আর একটী দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। বিধবাবিবাহ বিষয়ক এই দুইটী প্রবন্ধ তদানীন্তন পত্রিকা-সম্পাদকগণের অনুমোদনে প্রকাশিত হইয়াছিল কিনা, তাহা এখন জানিবার উপায় নাই। ইতিপূর্বেই বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুবিবাহের বিপক্ষে এবং বিধবাবিবাহের সপক্ষে সংগ্রাম করিয়া এবং বিধবাবিবাহকে বৈধ ও যুক্তিসম্মত দাঁড় করাইয়া প্রথিতযশা হইয়াছিলেন। সম্ভবত সেই কারণে সম্পাদকগণ তাঁহার প্রবন্ধ প্রকাশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে সাহস করেন নাই। আমরা শুনিয়াছি যে বিধবাবিবাহ-সমর্থক এই সকল প্রবন্ধ প্রকাশের কারণে তত্ত্ববোধিনী সভার সম্পাদকগণ স্বীয় পদ পরিত্যাগে উৎসুক হইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে সভার সম্পাদককেই পত্রিকা যথাসময়ে বাহির করিবার এবং উহার পরিদর্শনের ভার গ্রহণ করিতে হইত।

পর বৎসর (১৭৮০ শকে) ২৭ বৈশাখ তত্ত্ববোধিনী সভার সাম্বৎসরিক অধিবেশনের দিন স্থির হইয়াছিল। ইহা সর্ব্ববিদিত যে সভামাত্রেরই প্রায় সাম্বৎসরিক অধিবেশনেই নূতন কর্ম্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। সম্ভবত তত্ত্ববোধিনী সভার উক্ত সাম্বৎসরিক অধিবেশনে পূর্ব্বতন সম্পাদকদ্বয় পদত্যাগ করিয়াছিলেন। পরবর্তী ১লা শ্রাবণের পত্রিকাতে আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তত্ত্ববোধিনী সভার সম্পাদকপদে বরিত হইবার বিজ্ঞাপন দেখিতে পাই। এই সংখ্যার পত্রিকাতে বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবাবিবাহ-সমর্থক আর একটী স্বলিখিত প্রবন্ধ এবং পরবর্তী দুই সংখ্যায় বিধবাবিবাহের সমর্থনে কয়েকটী সম্বাদ স্বীয় দায়িত্বে প্রকাশ করেন। এই সময় দেবেন্দ্রনাথ হিমালয়প্রবাস হইতে গৃহে ফিরিবার মুখে। আষাঢ় মাসের প্রথমেই সিমলার উত্তরবর্তী পর্ব্বতপ্রদেশ হইতে সিমলায় ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। সিমলাতে প্রত্যাগমন অবধি দেবেন্দ্রনাথের আদেশমত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা তাঁহার নিকট নিয়মিতরূপে প্রেরিত হইত। পত্রিকাতে বিধবাবিবাহসমর্থক প্রবন্ধাদি দেখিয়া দেবেন্দ্রনাথ কিছু বিরক্ত হইয়াছিলেন। আমরা জানি যে তিনি কখনই বিধবাবিহের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাহার উপর, আমরা শুনিয়াছি যে প্রাচীনপন্থী কয়েকজন ব্রাহ্ম তাঁহাকে বিভীষিকা দেখাইয়া পত্র লিখিয়াছিলেন যে এরূপ প্রবন্ধাদি পত্রিকায় স্থান প্রাপ্ত হইলে ব্রাহ্মসমাজের উপর হিন্দুসমাজের আস্থা চলিয়া যাইবে এবং হিন্দুগণ ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণে পরাঙ্মুখ হইবে।

হিমালয় প্রবাস হইতে ১লা অগ্রহায়ণ দেবেন্দ্রনাথ কলিকাতায় পৌঁছিবার পর, আমরা যতদূর জানি, এই বিষয়ে তাঁহার সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তর্কবিতর্ক হয়। দেবেন্দ্রনাথের মতে, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে সভার সম্পাদকলিখিত প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়া উক্ত প্রবন্ধোক্ত মতামতের দ্বারা ব্রাহ্মসমাজকেও একপ্রকার বাঁধিয়া ফেলা হইতেছে এবং তাহার ফলে ব্রাহ্মসমাজ হিন্দু সাধারণের সহানুভূতি হারাইতেছে। যে সকল সামাজিক বিষয়ের উপকারিতা সম্বন্ধে গুরুতর মতদ্বৈধ আছে, এরূপ বিষয়ের সমর্থক প্রবন্ধ সকল পত্রিকাতে ব্যক্তিবিশেষের মতরূপে প্রকাশ না করিয়া সাধারণভাবে প্রকাশ করিলে জনসাধারণের মনে ভ্রান্ত ধারণা হইতে পারে যে সে সকল বিষয়ে ব্রাহ্ম সাধারণই একমত। এই কারণে বিধবাবিবাহ প্রভৃতির ন্যায় দ্বন্দ্বসূচক বিষয়ের সমর্থক প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশ করিবার বিরুদ্ধে দেবেন্দ্রনাথ নিজের মত জানাইলেন। বহুদিন পর্য্যন্ত পত্রিকায় প্রকাশিত কোন প্রবন্ধেই লেখকের নাম সংযুক্ত থাকিত না—তাৎপর্য্য এই ছিল যে পত্রিকা ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র এবং তাহাতে প্রকাশিত প্রত্যেক প্রবন্ধোল্লিখিত মতামত কোন ব্যক্তিবিশেষের মতামত নহে, ব্রাহ্মসাধারণের মতামত বলিয়া স্বীকার্য্য। এ বিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় নিশ্চয়ই দেবেন্দ্রনাথের সহিত একমত হইতে পারেন নাই—সম্ভবত তিনি এবিষয়ে তত্ত্ববোধিনী সভার মতামত জানিতে ইচ্ছুক ছিলেন, এবং দেবেন্দ্রনাথ তাহাতে আপত্তি করিতে পারেন নাই।

বিধবাবিবাহ বিষয়কই বল বা অন্য যে কোন দ্বন্দ্বসূচক প্রবন্ধই বল, তাহা পত্রিকাতে প্রকাশের বিরুদ্ধে

দেবেন্দ্রনাথের আপত্তি থাকিলেই বা কি? তত্ত্ববোধিনী সভা এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা তাঁহা কর্ত্তৃক সংস্থাপিত হইলেও উভয়ই এখন সাধারণের সম্পত্তি এবং সেই সাধারণের সভা হইতে বিদ্যাসাগর মহাশয় তত্ত্ববোধিনী সভার সম্পাদক নিযুক্ত হইয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা পরিচালনের ভার পাইয়াছেন। সুতরাং দেবেন্দ্রনাথ নিজের মতানুসারে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে কার্য্য করাইবার কোনই অধিকার রাখিতেন না। দেবেন্দ্রনাথ বুঝিলেন যে যতদিন তত্ত্ববোধিনী সভা ব্রাহ্মসমাজ হইতে পৃথক থাকিবে এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা অবান্তরে ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র হইলেও মুখ্যভাবে সেই সভারই মুখপত্র থাকিবে, ততদিন তত্ত্ববোধিনী সভার নিযুক্ত সম্পাদকের কার্য্যে তাঁহার কোন অধিকার নাই। অথচ তিনি ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারের সাহায্যের জন্য প্রকৃতপক্ষে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাকে ব্রাহ্মসমাজেরই মুখপত্ররূপে দাঁড় করাইতে চাহিয়াছিলেন। এখন তিনি দেখিলেন যে পত্রিকাখানি তাঁহার আয়ত্তের বাহিরে গিয়া পড়িতেছে।

অনুমান হয় যে বিদ্যাসাগর-দেবেন্দ্রের তর্কবিতর্কের ফলে ১৭৮০ শকের ১লা মাঘের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বাক্ষরিত নিম্নের বিজ্ঞাপনটী প্রকাশিত হইয়াছিল:—

"অধ্যক্ষদিগের অনুমত্যনুসারে অবগত করিতেছি যে সভার কার্য্য সৌকর্য্যার্থে কোন কোন বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা করিবার জন্য আগামী ১৮ই মাঘ রবিবার অপরাহ্ণ ৩ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে বিশেষ সভা হইবেক, সভ্য মহাশয়েরা তৎকালে সভাস্থ হইবেন।"

হিমালয়প্রবাস হইতে দেবেন্দ্রনাথের প্রত্যাগমনের পরেই কেশবচন্দ্র প্রকাশ্যে ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। কেশবের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অনেকগুলি বাল্যবন্ধুও ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া পড়িয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার বাল্যবন্ধুগণের অনেকেই আবার তত্ত্ববোধিনী সভারও সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইলেন—দেখা যায় যে, সে সময়ে ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ প্রায় সকলেই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বিনামূল্যে পাইবার জন্য তত্ত্ববোধিনী সভারও সভ্য হইতেন। কেহ কেহ বলেন যে দেবেন্দ্রনাথ নির্দ্দিষ্ট অধিবেশন দিবসে আত্মপক্ষ সমর্থনার্থ অধিকতর লোকসংগ্রহের নিমিত্ত তাড়াতাড়ি কেশব-সহচরদিগকে তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য করাইয়া লইয়াছিলেন। ইহা সত্য হইলেও, যে কার্য্যের ফলে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের গুরুতর অনিষ্ট হইবে আশঙ্কা করিয়াছিলেন, সেই কার্য্যের প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে বৈধপ্রণালীতে তাঁহার লোকসংগ্রহ করাতে আমরা কোনই অসঙ্গতি দেখিতে পাই না। কিন্তু, মোটের উপর ধর্ম্মসমাজের ভিতর কোন প্রকার রাজনৈতিক প্রণালী অবলম্বনের আমরা পক্ষপাতী নহি। দেবেন্দ্রনাথ যদিরা ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গলোদ্দেশ্যে রাজনৈতিক প্রণালীর সাহায্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন, তাহা হইলেও আমরা শতবার বলিব যে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যের মধ্যে এই সাহায্যগ্রহণের অবসর না আসিলেই ভাল হইত।

সভার নির্দ্দিষ্ট অধিবেশন দিবসে নবনির্ব্বাচিত অনেকগুলি সভ্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। শোনা যায় যে বিদ্যাসাগর মহাশয় সে অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন না—কেহ বলেন তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক অনুপস্থিত ছিলেন, এবং কাহারও মতে তিনি কার্য্যগতিকে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। কেশবপ্রমুখ নবসম্প্রদায়ের সকলেরই ইচ্ছা ছিল যে ব্রাহ্মসমাজই যেন একমাত্র প্রবল শক্তি হইয়া দাঁড়ায়; তত্ত্ববোধিনী সভার ন্যায় পৃথক এক শক্তি দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের শক্তিকে বিভক্ত হইতে দেওয়া তাঁহাদের মতে অসঙ্গত। এবিষয়ে কেশবের সহিত যে দেবেন্দ্রনাথের পরামর্শ হয় নাই তাহা বলা যায় না। ইতিপূর্ব্বেই দেবেন্দ্রনাথ কেশবকে মূর্ত্তিপূজাবর্জ্জিত দীক্ষামন্ত্রগ্রহণে অসম্মত দেখিয়া অত্যন্ত আদরের সহিত আত্মীয়রূপে বরিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অতি অল্পদিনের ভিতরেই কেশবের উপর তাঁহার এক প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। "দেবেন্দ্র বাবু কেশব বাবুকে পুত্রনির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন, নির্জ্জনে বসিয়া হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত করত মনের সকল অভিপ্রায়ই ব্যক্ত করিতেন।" সুতরাং এক্ষেত্রে কেশবদলের ইচ্ছাকে দেবেন্দ্রনাথের ব্যক্ত ইচ্ছারই প্রতিধ্বনি মাত্র বলিতে পারি।

নির্দ্দিষ্ট অধিবেশন দিবসে নবনির্ব্বাচিত সভ্যদিগের সংখ্যাধিক্য হেতু তাঁহাদেরই মতানুসারে

স্থির হইল যে তত্ত্ববোধিনী সভা, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সহিত দুইটী মুদ্রাযন্ত্র এবং তাহার উপকরণ ইংরাজী ও বাঙ্গালা অক্ষরাদি আপনার যাবতীয় সম্পত্তি ব্রাহ্মসমাজে দান করিবেন। কাজেই তত্ত্ববোধিনী সভার অস্তিত্ব বিলোপই সভার এই অধিবেশনের অনুমোদিত হইল বলিতে হয়।

সভার এই সিদ্ধান্ত অবশ্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মনঃপূত হয় নাই। তাই অধ্যক্ষদিগের অনুমতি লইয়া তিনি সেই সিদ্ধান্তের পুনর্বিচারার্থ ২০শে ফাল্গুন পুনরায় এক বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করেন। কিন্তু বুঝাই যাইতেছে যে দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবের বিরুদ্ধে অধিকাংশ সভ্যই মত দিতে রাজী হয়েন নাই। সভ্যগণের অনুপস্থিতির কারণে নির্দ্দিষ্ট দিনে সভার বিশেষ অধিবেশন হইল না। ১৭৮০ শকের ২২শে চৈত্র এবং ১৭৮১ শকের ১৬ই বৈশাখ, এই দুই দিবসে বিদ্যাসাগর মহাশয় আরও দুইবার উক্ত সিদ্ধান্তের পুনর্বিচারার্থ বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করেন। তত্ত্ববোধিনী সভা এক প্রকার উঠিয়া যাওয়াতে ১৭৮১ শকের প্রারম্ভ হইতেই কেশব বাবুর অভ্যুত্থানের অবসর ঘটিল। ইতিপূর্ব্বেই ১৭৮০ শকের চৈত্রমাসে তিনি দেবেন্দ্রনাথের সাহচর্য্যে ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপিত করিয়াছিলেন। ১৭৮১ শকের ১৬ই বৈশাখে সম্ভবত উক্ত অধিবেশন হইয়াছিল। সম্ভবত নবনির্ব্বাচিত সভ্যগণের আধিক্যবশত এই অধিবেশনে পূর্ব্ববর্ত্তী অধিবেশনের সিদ্ধান্ত স্থিরতর হইয়াছিল। আমরা দেখি যে ১৬ই বৈশাখের বিশেষ অধিবেশন আহ্বানের পরে ২৬ বৈশাখ বিদ্যাসাগর মহাশয়েরই স্বাক্ষরিত আহ্বানের দ্বারা তত্ত্ববোধিনী সভার এক সাধারণ অধিবেশন আহূত হইয়াছিল। ইহাই তত্ত্ববোধিনী সভার শেষ সাধারণ সভা।

তত্ত্ববোধিনী সভা উঠিয়া যাইবার প্রস্তাব যখন উহার সভ্যগণের অনুমোদিত হইল, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় বিবেচক ব্যক্তি যে তাহাতে ব্যক্তিবিশেষের দোষ দেখিবেন অথবা অভিমানভরে ব্রাহ্মসমাজের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাহা আমরা মনেও স্থান দিতে পারি না। আর প্রকৃতই যে তিনি ইহাতে ব্যক্তিবিশেষের দোষ দেখেন নাই অথবা ব্রাহ্মসমাজের উপর কোন দোষারোপ করেন নাই, তাহার একটী প্রধান প্রমাণ এই যে, তিনি উপরোক্ত ঘটনার পরে অন্তত দুই বৎসর কাল ব্রাহ্মসমাজের চাঁদা নিয়মিত দিয়া আসিয়াছিলেন।

এইরূপে তত্ত্ববোধিনী সভা ১৭৬১ শক অবধি ১৭৮০ শক পর্য্যন্ত প্রায় কুড়ি বৎসর কাল ব্রাহ্মসমাজের সহিত একত্র বাস করিয়া নানা প্রকারে তাহার সেবাশুশ্রূষা করিয়া অবশেষে ব্রাহ্মসমাজেরই ক্রোড়ে দেহত্যাগ করিল।

রসায়ন বিজ্ঞানে পরমাণুর আকৃতি।

(৺হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

জড় পদার্থমাত্রেরই সাধারণ গুণ ও বিশেষ গুণ আছে। বিশেষ গুণের ইয়ত্তা নাই। বিশেষ গুণের আলোচনা করিতে গেলে সীমা পাওয়া যায় না। ঈশ্বরে যেমন একতার মধ্যে বিচিত্রতা, তেমনি তাঁহার সৃষ্ট এক একটী বস্তুতেও অসীম বিচিত্রতা প্রকাশ পায়—ইহার এই গুণের সঙ্গে ইহার এই গুণের বিশেষ, উহার ঐ গুণের সঙ্গে উহার ঐ গুণের প্রভেদ ইত্যাদি। বিশেষ গুণ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাইবে। এখন সাধারণ গুণগুলি আলোচনা করা আবশ্যক।

জগতে লক্ষবিধ পদার্থ আছে বলিয়া তাহার লক্ষবিধ উপাদান বলিলে অন্যায় হয়। সেইরূপ নানা প্রকার গুণ থাকিলেও তাহাদের মধ্যে কতকগুলি গুণ হয় তো এক সাধারণ গুণের অন্তর্গত বলা যাইতে পারে। আমরা এই-এইরূপ বিশেষ বিশেষ গুণকে অন্তর্গত করিয়া এক সাধারণ গুণ বলিতে চাহি। তাহা হইলে এবিষয় আমাদের বেশী মনে থাকিবে।

জড়পদার্থের প্রথম সাধারণ গুণ এই যে, যাহা কিছু পদার্থ আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করি তাহাদের কোনটীই একটী অংশহীন অখণ্ড পদার্থ নহে, কিন্তু পরমাণুর সমষ্টি। পরমাত্মা যেমন নির্ব্বিশেষে এক অথবা প্রত্যগাত্মা এবং আত্মা যেমন বিশেষ বিশেষ এক, জড় পদার্থ তেমনি এক হইলেও বিশেষ বিশেষ পরমাণুর সমষ্টি। এই কাগজকে প্রত্যক্ষ কর। এটী এক নহে। ইহাকে যে

বিচ্ছিন্ন করা যায় না, তাহা নহে। এই কাগজে কত আঁশ আছে, সেই এক একটী আঁশ আবার কত অংশের সমষ্টি। এই কাগজকে লক্ষ লক্ষ ভাগে বিভক্ত করিয়া যাওয়া যায়—চরমে এক প্রকার পরমাণুতে আসা যায়, যাহার আর ভাগ হইতে পারে না। সেই সূক্ষ্মতম পরমাণুর সমষ্টি এই কাগজ। সেই পরমাণুর সমষ্টি সমস্ত বস্তু। বস্তু ভাগ হইতে হইতে ভাগের শেষ যাহা, অথবা যাহার আর ভাগশেষ হইতে পারে না, তাহাই পরমাণু।

এ বিষয়েও মতান্তর আছে। এই পদার্থকে দশভাগ করিলাম, তাহাকে আবার বিশভাগ করিলাম, তাহাকে আবার চল্লিশভাগ করিলাম—এইরূপে অসীমভাগ হইতে পারে, তাহার আর অবশিষ্ট থাকে না। যেমন, ৮ কে যদি ২ দিয়া ভাগ করা যায়, তাহার ভাগফল হইবে ৪; কিন্তু অনন্ত যদি ভাজক হয়, ভাগক্রিয়া শূন্য হইবে—যেমন, ২)৮(৪; ৪)৮(২; ৮)৮(১; অনন্ত)৮(০। এই দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে ভাজকটা যত ছোট হয় ভাগফল তত বড় হয়, ভাজক যত বড় হয় ভাগফল তত ছোট হয়। এক খণ্ড বস্তু, যেমন এই খড়িখানি হইল যেন ১০; এই ১০ কে যদি কুড়ি ভাগ করা যায়, ভাগফল হইবে ½ অর্থাৎ দুই ভাগের একভাগ। ১০ কে যদি ১০০ ভাগ করা যায়, তবে ভাগ ফল হইবে $\frac{১}{১০০}$ অর্থাৎ $\frac{১}{১০}$। এইরূপ ভাজককে বড় করিতে করিতে ভাগফল ভগ্নাংশের ভগ্নাংশ হইতে হইতে ক্রমে অনন্ত ভাজক হইলে ভাগফল অনন্তগুণে ছোট হইবে অর্থাৎ শূন্য হইবে, যেমন অনন্ত)১০(০। এই মত ধরিলে পরমাণু শূন্যে পরিণত হয়।

কিন্তু ইহাই কি সত্য? যদি কিছু না থাকে, তবে কিছু না হইতে কিছু হয় কি প্রকারে? কাজেই অনন্তগুণে ভাগ করিবার কথা বলা বৃথা। প্রত্যেক পদার্থকে ভাগ করিতে করিতে এমন ভাগে পৌঁছিতে পারা যায়, যে রাশির আর ভাগ হইতে পারে না। সেই সূক্ষ্মাংশের নাম পরমাণু। পরমাণু যদি না থাকে, তবে পরমাণুর সমষ্টির ফলে বস্তু হইবে কেমন করিয়া? অতএব স্থির হইতেছে যে বস্তু পরমাণু-সমষ্টি। ভৌতিক পদার্থ পরমাণু-সমষ্টি, এইটী হইল প্রথম তত্ত্ব।

সেই পরমাণুর আকার আছে, ভার আছে, ক্রিয়া আছে। পরমাণুর গুণেতেই বস্তুর গুণ প্রকাশ পায়। পরমাণু যদি নির্গুণ হয় বস্তুও নির্গুণ হইবে। পরমাণু কারণ, বস্তু কার্য্য। কারণের গুণ না থাকিলে কার্য্যের গুণ থাকিতে পারে না।

ভৌতিক পদার্থের আর একটী সাধারণ গুণ বিস্তৃতি। বিস্তৃতির অর্থ স্থান ব্যাপিয়া থাকা। স্থান কাহাকে বলে? এই বায়ু যে আছে, ইহা স্থান নহে; এই যে দেওয়াল আছে, ইহা স্থান নহে। ইহারা স্থানেতে আছে মাত্র। এই ঘর হইতে সমস্ত জিনিস যদি বাহির করিয়া লওয়া যায়, তাহাই স্থান। শূন্য যাহা পড়িয়া থাকিবে, সেই স্থান ব্যাপিয়া থাকা, এই একটী ভৌতিক গুণ। যেমন, খড়ি এখানে রহিয়াছে—ইহা যত বড়, ততটুকু আপনার মত স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে। ইহা যেটুকু স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে, সে স্থানে আর কিছু নাই। সেই স্থান যতটুকু যে ব্যাপিয়া থাকে সে-ই স্থান তাহার আকার। বোর্ডের এই সমস্তটাই যেন স্থান, তাহার মধ্যে আমি কখঘগ আঁকিলাম। কখঘগ বোর্ডের এইটুকু স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে। ঐ স্থানের যাহা প্রান্ত, সেই প্রান্তের সমষ্টি লইলেই উহার আকার পাওয়া গেল। এটী চতুষ্কোণ। কোন আকার ত্রিকোণ হয়, কোনটা গোল হয়। স্থান-ব্যাপিত্ব হইতেই আকার হয়।

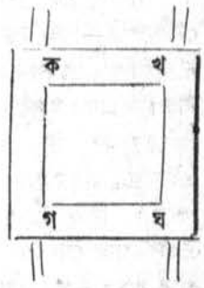

যেমন এই বইটী বইয়ের মত স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে, তেমনি ইহার সূক্ষ্মতম পরমাণুও কি স্থান ব্যাপিয়া নাই? অবশ্যই আছে। যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরমাণুর অংশে বই হইল, তেমনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থান দ্বারা এত বড় স্থান হইল। ব্যাপিত্ব হইতেই আকার হয়। স্থূল পদার্থ যেমন স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে, জলও তেমনি স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে, বায়ুও তেমনি স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে, অণুও স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে। তাহাতেই বিভিন্ন আকার হইতেছে।

আকার দুই রকমে হয়। এক, স্থানের যেমন যেমন সীমা, বস্তুর তেমনি আকার হয়। আর আকার হয় কি করিয়া,—পরমাণুর আকার যেরূপ, বস্তুর আকার সেইরূপ হয়। পরমাণুর আকার কি দেখা যায়? তাহার আকার চক্ষে দেখা যায়

না বটে, কিন্তু প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে। রাজমিস্ত্রী যখন গোল থাম গাঁথে, গোল গোল ইট দিয়া গাঁথে বলিয়া থাম গোল হয়। বইটা চতুষ্কোণ, ইহাতে স্থূলতা আছে, এই জন্য জানিতেছি যে ইহার পাতগুলিও চতুষ্কোণ এবং সেগুলিতেও অল্প-পরিমাণে স্থূলতা আছে। বস্তুত, পাতের চতুষ্কোণতা ও স্থূলতা থাকাতেই পাতের সমষ্টি যে এই বই, ইহাও চতুষ্কোণ ও স্থূল হইয়াছে। আরও যদি এই বইয়েতে পাত দেওয়া যায়, বই আরও স্থূল হইবে। অতএব বলা যাইতে পারে যে, পরমাণুপুঞ্জ যেমন যেমন স্থান লইয়া থাকে, বস্তুও তেমনি আকার ধারণ করে। যদিও দেখা যাইতেছে যে, এই খড়ির আকার এক রকম, এই টেবিলের আকার এক-রকম—ইহা কেবল পরমাণু যেরূপে স্থানে সাজানো রহিয়াছে, সেই অনুসারে ইহাদের আকার বিভিন্ন হইয়াছে।

আবার, এই টেবিলটাকে বেশ মসৃণ সমতল দেখিতেছি—বাস্তবিক ইহা মসৃণও নহে, সমতলও নহে, কিন্তু কেবলই এবড়োখেবড়ো অর্থাৎ উঁচু-নীচু। প্রবল অণুবীক্ষণ দ্বারা দেখিলে গোল গোল ল য়ের মত উঁচু দেখা যাবে— ᔓᔓ। আবার এই বইটা রহিয়াছে—ইহার ধার বলিয়া বোধ হইতেছে। কিন্তু ঠিক ইহার ধার নাই। ধারটাও ঐরূপ গোল গোল। আবার দেখা যায়, জগতের প্রায় সকল বস্তুই গোলাকার—গ্রহতারা চন্দ্রসূর্য্য পৃথিবী হইতে ক্ষুদ্র জলবিন্দু পর্য্যন্ত সবই গোল। গাছ গোলাল—অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে মাথা নাড়ী সকলই গোল। জলকে সমতল বলিয়া বোধ হয়—তাহার উপরিভাগও ঢেউয়ের মত গোল; সেই জলের আবার একবিন্দু যদি উঠাইয়া ধরা যায়, তাহাও গোল। পারা ধাতু—তাহাকে যদি টেবিলের উপর ফেলিয়া দাও, সব গোল গোল হইয়া গড়াইয়া যাইবে। যদি কোন বস্তু চতুষ্কোণ হয়, তাহার ঠিক ছুঁচলো কোণ থাকিবে, তাহার ধার থাকিবে। সেই ধারকে এইরূপে আঁকা যাইতে পারে ⊂। কিন্তু এ রকম কোন ধার জগতের মধ্যে দেখা যায় না। যেখানে ⊂ এমনি, সেইখানে ⌒ এমনি গোলত্ব আছে। অতএব ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে পরমাণুর প্রাকৃতিক আকার গোল। পরমাণুর পরিবর্ত্ত হইতে পারে না, তাহার ভাগও হইতে পারে না, তাহাকে চাঁচাও যায় না—ঈশ্বর যাহা করিয়াছেন, তাহাই আছে—সেই আকার গোল।

কেহ কেহ বলেন ভিন্ন রকম পরমাণুর ভিন্ন ভিন্ন আকার। মিছরিতে দানা বাঁধিয়া যায়, জলে লবণ ফেলিয়া দিলে জল উথিয়া গেলে তাহাতে দানা বাঁধে। দানার পার্শ্ব আছে। সেই সব পার্শ্ব মিলিয়া দানা বাঁধে। অতএব, পরমাণুর সংহতি দ্বারা যখন দানা বাঁধে, তখন পরমাণুরই আকার দানার আকারের মত, অর্থাৎ পরমাণুতে ধার আছে এবং কোণ আছে।

কিন্তু অণুবীক্ষণ দ্বারা দানার প্রতি পার্শ্ব দেখিলে যেখানে 'ল'য়ের মত উঁচু উঁচু আছে দেখা যায়—খালি চক্ষে যেখানে ছুঁচলো বোধ হয়, তারও ভিতর ⌒ গোল আছে দেখা যায়। আবার দেখা যায় যে, একই বস্তুকে রকম রকম অবস্থায় ফেলিলে রকম রকম দানা বাঁধে। সুতরাং পরমাণুর আকার দানার আকারের মত হইতে পারে না, কারণ পরমাণুর আকারের পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। তবে যে দানা বাঁধে, তাহা কেবল গোল পরমাণুসমূহের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে সন্নিবেশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, পরমাণুমাত্রের ঈশ্বর-প্রদত্ত আকার গোল। গোলত্ব হইতে বিভিন্ন আকার হইতেছে, তাহারও মধ্যে গোলত্ব রহিয়াছে।

এখন প্রশ্ন উদয় হইতে পারে যে, পরমাণু যদি গোল হয়, তবে বস্তু সকল কেমন করিয়া চতুষ্কোণ হয়, ত্রিকোণ হয়? কেল্লাতে যেরূপে কামানের গোলা সাজায়, তাহা হইতে দেখা যায় যে, এক গোল হইতে সব রকম আকার হইতে পারে। গোলা দ্বারাও চৌক হয়, যেমন ⁘। আবার এই চৌকার প্রত্যেক অণুই গোল, এইজন্য ঐ সকল গোল যদি একত্র থাকে, তাহা হইলেই বস্তুর উপরিভাগ সকল 'ল'-আকার ᔓᔓ এইরকম দেখিতে পাওয়া যাইবে। যদি পরমাণু চতুষ্কোণ হইত, তাহা হইলে উঁচুনীচু থাকিবার প্রয়োজন থাকিত না—যেমন, আবার গোলাদ্বারা ত্রিকোণ হইতে পারে—যেমন, ∴। এই যুক্তি দ্বারা স্থির হইল যে পরমাণুর আকার আছে এবং তাহা সম্ভবত গোল। তাহা দ্বারা বিভিন্ন রকম আকার প্রস্তুত হয়। বস্তুগত আকারের সকল বিভিন্নতার ভিতর সাধারণত্ব দেখা যাইতেছে—গোল।

প্রথম বিস্তৃতির কথা হইল। বিস্তৃতি হইতে আকৃতির কথা আসিল এবং দেখা গেল যে পরমাণুর আকৃতি গোল।

একমেবাদ্বিতীয়ং

ঊনবিংশ কল্প

তৃতীয় ভাগ

মাঘ, ব্রাহ্মসম্বৎ ৮৮।

৮৯৪ সংখ্যা

১৮৩৯ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"

মাতৃপূজা।

(প্রসাদী পদচ্ছায়া)

মিলেছি মা তোর আজি মধুর ডাকে ॥
(মোরা) হিংসা দ্বন্দ্ব গেছি ভুলে,
প্রাণ্ আমাদের্ গেছে খুলে,
এসেছি মা পূজা দিতে
ছুটে তাইতে মিলে তোকে।
মান অভিমান ছোটখাটো,
ফেলেছিল চোখে কুটো,
এতদিন তাই দেখিনিকো,
(এখন) ভরেছে প্রাণ তোরে দেখে।
(এবার্) পূজায় যেন বুঝ্তে শিখি,
তুই মা মোদের্ সবার্ একই ;
ভায়ে ভায়ে যেন ভালবেসে
হাসি আনতে পারি মুখে।
শক্তিময় তোর দুগ্ধ খেয়ে
চলেছি মা মানুষ হয়ে ;
শত বাধায় আর ফির্তে না হয়,
এই-মত বল দে মা বুকে।
ত্রিশ কোটী তোর্ ছেলে মিলে
অভ্রভেদী মহান সুরে
(তোরে) ডাক্‌বে যবে মা মা বলে,
সাড়া পড়্‌বে বিশ্বলোকে ॥

ধর্ম্মানুষ্ঠানে ধৃতি।

(শ্রীশঙ্করনাথ পণ্ডিত)

প্রতিজনের আচরণে কিরূপ ধর্ম্ম প্রতিপাল্য অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক ধর্ম্ম কি, তদ্বিষয়ে ভগবান মনু বলিয়াছেন—

"অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ।
এতং সামাসিকং ধর্ম্মং চাতুর্বর্ণ্যেঽব্রবীন্মনুঃ ॥মনু১০-৬৩

ইহার অর্থ এই যে, অহিংসা, সত্য, অস্তেয় বা অচৌর্য্য, শুচিতা এবং ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, সংক্ষেপে ইহাই ধর্ম্ম, মনু তাহা চতুর্বর্ণকে বলিয়াছিলেন।* উপরোক্ত চারি প্রকার সংক্ষিপ্ত ধর্ম্ম ব্যতীত মনু ধর্ম্মের বিস্তারিত দশ লক্ষণ বর্ণন করিয়াছেন—

ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণং ॥ মনু ৬-৯২

ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য এবং অক্রোধ এই দশটী ধর্ম্ম লক্ষণ।

---

* "মনু বলিয়াছিলেন" এই কথা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে প্রচলিত মনুসংহিতার পূর্ব্বে আরও একটী মনুপ্রণীত বলিয়া কোন ধর্ম্মশাস্ত্র ছিল এবং সেই ধর্ম্মশাস্ত্রে বেদ বা স্মৃতির প্রামাণ্যতার কোন কথাই উল্লিখিত দেখা যায় না। তাহাতে অনুমান হয় যে বেদ, স্মৃতি প্রভৃতির প্রামাণ্যতার কথা অনেকগুলি স্মৃতি রচিত হইবার পরে প্রচারিত হইয়াছিল। মনুসংহিতার "বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ" প্রভৃতি শ্লোকগুলিও আমাদের এই কথার সমর্থন করে বোধ হয়। মনুসংহিতাই যদি আদি স্মৃতি হয়, তবে এখানে "স্মৃতিঃ" শব্দের সার্থকতা কোথায়? সম্ভবত উত্তরকালে এই শ্লোকটী মনুসংহিতার ভিতর প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, অথবা ইহা দ্বারা প্রচলিত মনুসংহিতার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন স্মৃতি ইঙ্গিত-নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তং বোং সং।

ধর্ম্মের প্রথম লক্ষণ হইল ধৃতি। ধৃতি শব্দের মুখ্যার্থ হইল ধৈর্য্য এবং গৌণার্থ হইল ধারণ বা ধারণা এবং সন্তোষ। ধৈর্য্য শব্দে ধীরতা, স্থিরতা বা অচঞ্চলতা বুঝায়। বিপদ বা দুঃখে পতিত হইয়াও যে ব্যক্তির মনে কিছুমাত্র চঞ্চলতা উপস্থিত হয় না এবং বুদ্ধি স্থির থাকে, তাহাকেই ধীর বা ধৈর্য্যবান পুরুষ বলা যায় এবং ধীর পুরুষের মনের অবস্থাকেই ধৈর্য্য বলা যায়। নীতিশাস্ত্রকারগণও বিপদ আপদে ধৈর্য্য অবলম্বন করিবার জন্য বারম্বার উপদেশ দিয়াছেন। কোন মহাত্মা উপদেশ দিয়াছেন—

বিপদমে ধৈর্য্য ধরো প্রাণ রহে সুখ ঢের।
নলপাণ্ডব রঘুবীর পুনঃ পায় রাজ সুখের॥

বিপদকালে ধৈর্য্য ধরিবে, অধীর হইয়া হতাশ হইয়া পড়িও না; প্রাণ রক্ষা করিলে অনেক সুখপ্রাপ্তির আশা থাকে। নলরাজা, পাণ্ডবগণ, রামচন্দ্র, ইহাঁরা ধৈর্য্য ধরিবার ফলে অনেক বিপদের পরেও সুখের রাজ্য পুনরায় লাভ করিয়াছিলেন। বলিতে কি, ধৈর্য্য অবলম্বন না করিলে জগতে যথার্থ সুখ বা শান্তি পাওয়া যায় না এবং ধর্ম্মোপার্জ্জনও সহজ হয় না। যিনি সর্ব্বপ্রকার বাধাবিঘ্ন প্রাপ্ত হইয়াও ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক সাহসের সহিত তৎসমুদয় অতিক্রম করিবার জন্য সমুদয় শক্তি প্রয়োগ করেন, তিনিই অধিকাংশ স্থলে জীবনযুদ্ধে জয়ী হইয়া জগতে আদর্শ স্থাপন করিতে সমর্থ হয়েন। যিনি নানা প্রকার বিপদ, দুঃখ বা অসুবিধা প্রাপ্ত হইয়াও নিজ পুরুষকার দ্বারা তাহাদের প্রতিরোধ ও প্রতিবিধান করিয়া তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হয়েন, তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত ও ক্ষমতাশালী বলিয়া কথিত হয়েন। ইংরাজীতে ইহাকে survival of the fittest বলে। এই নিয়ম জীবজন্তু উদ্ভিদ মনুষ্য সর্ব্বত্রই সমভাবে কার্য্য করিয়া থাকে।

যিনি কষ্টসহিষ্ণু নহেন এবং বিপদে পড়িলে ভীত ও ভগ্নোৎসাহ হইয়া তাহার প্রতীকারে যত্ন করেন না, ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া পড়েন, তিনি কদাপি কোন বিষয়ে লাভবান হইতে পারেন না। শাস্ত্রে এইজন্য উপদেশ আছে—"তাবৎ ভয়স্য ভেতব্যং যাবদ্ভয়মনাগতং, আগতন্তু ভয়ং বীক্ষ্য প্রতিকুর্য্যাৎ যথোচিতং"—যে পর্য্যন্ত ভয়জনক কোন কিছু না আসে, সেই পর্য্যন্ত ভয়কে ভয় করিবে অর্থাৎ যাহাতে ভয়ের কোন কারণ উপস্থিত না হয় তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিবে; কিন্তু ভয়জনক কোন কিছু উপস্থিত হইলে তাহার যথোচিত প্রতীকার করিবে।

সংসারে প্রতি পদেই আমাদিগকে আঘাত পাইতেই হয়। সেই আঘাতের প্রতিঘাতেই ধৈর্য্যশালী ব্যক্তির ধৈর্য্য পরিস্ফুট হইয়া পড়ে। সুগন্ধি দ্রব্য পেষণের আঘাত পাইলেই তাহার সুগন্ধ সম্যক বাহির হয়। বৃক্ষাদির অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছাঁটিয়া দিলে তবে তাহা শাখাপ্রশাখায় ফুলে ফলে ভরিয়া উঠে। স্বর্ণকে যতই দগ্ধ ও ঘর্ষণ দ্বারা পালিশ করা যাইবে ততই তাহার উজ্জ্বলতা প্রকাশ পাইতে থাকে। চন্দন কাষ্ঠকে যতই অধিক ঘর্ষণ করিবে ততই তাহার সুগন্ধ অধিক পরিমাণে বাহির হইবে। সেইরূপ প্রকৃত সাধুব্যক্তি যতই অধিক পীড়িত হইবেন, ততই তাঁহার সাধুতা অধিকমাত্রায় প্রকাশ পাইবে।

সাধুগণ অমৃতস্বরূপ পরমাত্মার প্রিয় পুত্র। তাঁহারা আপনাদের আধ্যাত্মিক জীবনের গৌরব প্রকৃতরূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়েন এবং বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া জাগতিক সমস্ত অনিত্য সুখভোগের পরিণাম দুঃখময় জানিয়া ইহজগতের সুখ ও দুঃখ উভয়কেই সমভাবে দুঃখময় জ্ঞান করেন। তাঁহারা যতই কেন কষ্টে পতিত হউন না, তৎসমুদয় স্বীয় ধৈর্য্যবলে অকাতরে সহ্য করিয়া শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়েন। তাঁহারা যত অধিক দুঃখে পতিত হয়েন, ততই তাঁহাদিগের জীবনে ধর্ম্মাচরণ ও সাধুতার মাত্রা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। বলিতে কি, সাধু পুরুষেরা জানেন যে তাঁহারা যে কষ্ট প্রাপ্ত হয়েন, তাহা ঈশ্বর তাঁহাদের শিক্ষার জন্য এবং ধর্ম্মসাধনের দ্বারা শক্তি অর্জ্জনের একটী সুযোগ স্বরূপে প্রেরণ করেন।

খণ্ডং খণ্ডং ত্যজতি ন পুনঃ স্বাদুতামিক্ষুদণ্ডং।
ঘৃষ্টং ঘৃষ্টং ত্যজতি ন পুনশ্চন্দনং চারুগন্ধং॥
দগ্ধং দগ্ধং ত্যজতি ন পুনঃ কাঞ্চনং কান্তিবর্ণং।
প্রাণান্তেঽপি প্রকৃতিবিকৃতি র্জায়তে নোত্তমানাং॥
ভর্ত্তৃহরি।

অর্থাৎ ইক্ষুদণ্ড যতই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করিয়া কর্ত্তন করা হউক না কেন, তাহার মিষ্টতা নষ্ট হয় না, চন্দনকাষ্ঠকে যতই ঘর্ষণ করা হউক না কেন, তাহার মনোহর গন্ধ চলিয়া যায় না, সুবর্ণ শতদগ্ধ হইলেও

তাহার কান্তিবর্ণ হীন হয় না এবং মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকিলেও উত্তম ব্যক্তিদিগের স্বভাবের বিকৃতি হয় না।

ইহা প্রায়ই দেখা যায় যে, দেশহিতৈষী মহাত্মাগণ জগতের হিতকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে সাধারণ লোকে পূর্ব্বপ্রচলিত কুসংস্কারের বশীভূত হইয়া তাঁহার সাধুকার্য্যে প্রতিপদেই বাধা প্রদান করে; এমন কি, অনেকস্থলে এই প্রকার সাধু-ব্যক্তিকে নিহত করিতেও জনসাধারণ অগ্রসর হয় দেখা যায়। প্রকৃত সাধুগণ নির্ভীকচিত্তে আপনার মহান উদ্দেশ্যসাধনে তৎপর থাকেন এবং ধৈর্য্য সহকারে সকল প্রকার বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিবার চেষ্টা করেন। তাঁহারা স্বীয় কর্ত্তব্য সাধনে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতেও কুণ্ঠিত হয়েন না। কিন্তু ইহা জানা কথা যে তাঁহাদের মহান উদ্দেশ্যসাধনে প্রাণ বিসর্জ্জনও ব্যর্থ হয় না। তাই গীতাশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টই বলিয়াছেন—

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি॥

অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, হে শ্রীকৃষ্ণ, জগতে যদি কোন ধার্ম্মিক ব্যক্তি ধর্ম্মাচরণ করিতে করিতে তাহার সম্পূর্ণ ফলভোগে বঞ্চিত হইয়া শরীর ত্যাগ করেন, তখন তাঁহার অসম্পূর্ণ কর্ম্ম কি নষ্ট হইয়া যায়, অথবা তাহার কোন স্থায়ী ফল থাকে। তাহার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন যে, হে পার্থ, তুমি নিশ্চয় জানিও যে সাধু কর্ম্মের ফল কি ইহকালে কি পরকালে বিনষ্ট হয় না, মঙ্গল কার্য্যের অনুষ্ঠাতা কখনই দুর্গতি প্রাপ্ত হয়েন না।

বর্ত্তমান কালে মহর্ষি স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি মহাত্মাগণ পরোপকারার্থ জীবন উৎসর্গের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। স্বামী দয়ানন্দ যে কি কষ্ট, কি লাঞ্ছনা প্রভৃতির ভিতর দিয়া আর্য্যাবর্ত্তে সত্যধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার জীবনী পাঠ করিলেই উপলব্ধি হইবে। তিনি স্বীয় জীবনে ধৃতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি নিজ কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠানে জীবন বিসর্জ্জনকেও অতি তুচ্ছ বোধ করিতেন।

সাধুদিগের জীবন ধৃতিসাধনের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। যেমন একজাতীয় কীটাণু জ্বলন্ত অগ্নিতেও দগ্ধ না হইয়া জীবিত থাকে, তদ্রূপ সাধু ব্যক্তিগণ সংসারের ক্লেশতাপে বারম্বার দগ্ধ হইলেও ধৈর্য্য ও তিতিক্ষা সহকারে সে সকল অনায়াসে সহ্য করিয়া অবিচলিত ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। কোন প্রকার দুঃখ কষ্ট তাঁহাদিগকে তাপ প্রদান করিতে সমর্থ হয় না। তাঁহারা স্পষ্ট উপলব্ধি করেন যে, করুণাময় পরমেশ্বর তাঁহার ন্যায়বিচারে মানবকে যে দুঃখ ক্লেশ প্রদান করেন, তাহার ফলে মানব বিশুদ্ধি ও মঙ্গল লাভ করে। যেমন কোন বক্র কাষ্ঠখণ্ডকে সরল করিতে হইলে জ্বলন্ত অগ্নিতে তাহাকে স্বেদ দিতে হয়, তদ্রূপ মানবেরও আত্মার অন্তরায় সকল দূর করিয়া তাহার সদ্‌গুণ সকল প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিবার জন্য মানবকে অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করিতে হয়।

ধৈর্য্য অবলম্বনের পরিচয় গ্রীসদেশীয় মহাত্মা সক্রেটিস যেরূপ দিয়াছেন, এরূপ অতি অল্পলোকেই দিয়াছেন। তাঁহার জীবন সত্য ও ধর্ম্মাচরণের মহোচ্চ আদর্শ। সত্য ও ধর্ম্মকে আশ্রয় করিলে কতদূর নির্ভীক হওয়া যায়, সক্রেটিস তাহা স্বীয় জীবনে প্রদর্শন করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহাকে সত্য ও ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য অসহ্য কষ্ট অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইয়াছিল, কিন্তু তিনি, অসীম ধৈর্য্যবলে সে সকলই অক্লেশে সহ্য করিয়া জগতকে চমকিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্বদেশবাসীগণ অজ্ঞতার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিলে তিনি কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই। তিনি তাঁহার বিচারকগণকে বলিলেন যে আপনারা আমার এই নশ্বর শরীরকে যদৃচ্ছা বিনষ্ট করিতে পারেন, কিন্তু আমার আত্মা অবিনাশী, তাহার কোনই অনিষ্ট করিতে পারেন না। শিষ্যগণ তাঁহাকে পলায়নের পরামর্শ প্রদান করিলে তিনি তাঁহাদিগকে বুঝাইলেন যে আজ না হয় কাল মরণ তো আছেই, তাহার জন্য ভীত হইবার কারণ নাই। তাঁহাকে যখন বিষ প্রদান করা হইল, তিনি অকুতোভয়ে তাহা পান করিলেন এবং কোন প্রকার যন্ত্রণা প্রকাশ না করিয়া জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত শিষ্যদিগকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন।

ধর্ম্মের পথে অগ্রসর হইতে চাহিলে আমাদিগকে

সর্ব্বপ্রথম ধৃতিসাধনা দ্বারা ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে হইবে। এই পথে অনেক সময়ে আত্মীয়স্বজনেরাও পর্ব্বত সমান বিঘ্ন উপস্থিত করে, ধৈর্য্যসহকারে সে সকল অতিক্রম করা আবশ্যক। ধৃতিশীল ধার্ম্মিকের কর্ত্তব্য সহস্র বাধা বিঘ্নের মধ্যেও স্বীয় লক্ষ্যচ্যুত না হওয়া। ধার্ম্মিক ব্যক্তি বিঘ্নকারীগণের জন্য অন্তরের সহিত প্রার্থনা করেন এবং ধৈর্য্যবর্ম্মের দ্বারা তাহাদিগের হস্ত হইতে নিজের রক্ষাসাধন করেন। কোন প্রকার লাভের আশায় বা বাধ্যবাধকতার কারণে নিজের ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। ধৈর্য্যধারণে অক্ষম হইয়া কেহ কেহ কর্ত্তব্যের বিরুদ্ধে সুখ লাভের প্রতি ধাবিত হয়েন, এবং কেহ কেহ বা মৌনং সম্মতিলক্ষণং অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মের বিরুদ্ধে ভাবসম্মতি (passive consent) দিয়া থাকেন। আবার, কেহ কেহ বা আত্মীয়স্বজনের বিরাগভাজন হইবার আশঙ্কায় তাঁহাদের বিরুদ্ধে কথা বলিতে সাহস করেন না। এভাবে চলিলে ধর্ম্মের পথে অগ্রসর হওয়া দুষ্কর। এরূপ উপেক্ষার ভাবে আত্মা প্রকৃত মঙ্গলের পথে অগ্রসর হইতে পারে না। ছাইচাপা আগুনের ন্যায় সুখের আশায় চাপা ধর্ম্মভাবের দ্বারা বিশেষ কোন উপকার সাধিত হয় না। যাঁহাদের ধর্ম্মভাব এরূপ আচ্ছন্ন থাকে, তাঁহাদের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলসাধন সুদূরপরাহত। তাঁহাদিগকে প্রায় সর্ব্বদাই অন্তরাত্মার প্রেরণার বিরুদ্ধে চলিতে হয়। এইরূপ মনুষ্যের জীবন বহুরূপীর জীবন বলা যাইতে পারে। দুইকূল রাখিবার পরামর্শ রাজনীতির অপভ্রংশ জর্ম্মনির দুর্নীতির পক্ষে শোভা পাইতে পারে, কিন্তু তাহা ধর্ম্মজীবনের পক্ষে সম্পূর্ণই অনুপযোগী। ধর্ম্মজীবন চালাইতে হইলে কিছুতেই ধর্ম্মরূপ লক্ষ্য হইতে স্বীয় কর্ত্তব্য হইতে ভ্রষ্ট হওয়া উচিত নহে। উভয়কূল রক্ষা করিতে চাহিলে লক্ষ্যস্থানে পৌঁছিতে পারা যায় না। ধৈর্য্যের সহিত বীরের ন্যায় অধর্ম্ম ও তৎসহায় শত সহস্র বিঘ্নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া তৎসমুদয় অতিক্রম করিয়া আমাদিগকে ভগবানের চরণে উপস্থিত হইতে হইবে।

মিলন গীত।

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এ)

রাগিণী জয়জয়ন্তী—একতালা।

তোমার মিলন লাগি
আকাশ আছে চেয়ে ;
মণিরতন আলোয়
আঙ্গিনা তার ছেয়ে।
কুসুম ফুটেছে বনে
বহে গন্ধ পবনে
গীতি-মুখর নিখিল ধরা
মিলনের গান গেয়ে'।
আজি আমার চিত্তমাঝে
শঙ্খ ধ্বনি বাজে
কুহু কুহু সুরে মুহু মুহু
ডাকে বসন্তরাজে।
ঐ থেমেছে রথ দ্বারে
দেখি আমি আজি কারে
বিশ্বরাজ পুরোহিত সাজে
এসেছেন আজি ধেয়ে।
তাঁহারি পায়ে নমিয়া
মিলে যাক্ দুটী হৃদয়ে
প্রেমের বন্যা বহিয়া যাক্
নিখিল ধরণী বেয়ে।
নির্ভয়ে চল পথে
রাখি তাঁরে হৃদি-রথে
নিশিদিন রহ তাঁহারি কাজে
তাঁরই প্রসাদ পেয়ে॥

আর্য্য-বিবাহের অভিব্যক্তি।

(শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বিএল, বার-এট-ল)

আর্য্য-সমাজের সভ্যতার ক্রমোন্নতির সহিত পতি-পত্নীত্ব সম্বন্ধের ক্রমোন্নতির সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন। আর্য্য-বিবাহের ক্রম-বিকাশের ইতিহাসের তিনটী stage বা স্তর দেখা যায়। প্রথম অর্থাৎ আদিম অবস্থায় স্ত্রীরা "বে-ওয়ারিস্" অর্থাৎ "স্বতন্ত্রা" বা অস্বামিকা ছিল—"কামাচার বিহারিণ্যঃ স্বতন্ত্রাশ্চ"। রতিসুখার্থ যে-সে পুরুষের

সহিত সংসর্গ করিত। এইরূপ স্ত্রীপুরুষসহবাস সাময়িক ছিল—পতি পত্নীত্ব-রূপ চির-সম্বন্ধ ছিল না। উদাহরণ—উদ্দালক-দীর্ঘতমা যুগের স্ত্রীরা "বে-ওয়ারিস" অর্থাৎ "স্বতন্ত্রা" বা অস্বামিকা ছিল এবং "গো-গণের" ন্যায় যাহার তাহার সহিত উপগত হইত। উদ্দালকের মতে ইহাই তৎকালে "ধর্ম্মঃ সনাতনঃ"—"সনাতন ধর্ম্ম"—ছিল।

আর্য্য বিবাহের ক্রমবিকাশের দ্বিতীয় stage বা স্তরে স্ত্রীগণ গোধনাদি অস্থাবর সম্পত্তির ন্যায় গণ্য হইতে লাগিল। সুতরাং কোন না কোন পুরুষের অধীনে আসিয়া পড়িল—"স্বামী" (অর্থাৎ 'মালিক') শব্দ তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। "ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি"—বোধ হয় ইহা এই যুগেরই বীজ-মন্ত্র। পতি-পত্নীত্ব সম্বন্ধ এযুগেও দৃঢ়বদ্ধ হয় নাই, তবে স্ত্রীপুরুষসহবাস অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল স্থায়ী হইত।

আর্য্যবিবাহের ক্রমবিকাশের তৃতীয় stage বা স্তরে স্ত্রীগণ গোধনাদি অস্থাবর সম্পত্তির ন্যায় পরিগণিত হইত না। স্ত্রীপুরুষদিগের হৃদয়ে পতি-পত্নীত্ব সম্বন্ধের সম্যক জ্ঞান বা উপলব্ধি এই যুগেই বিশিষ্টরূপে দৃষ্ট হয়। পতির স্ত্রীর প্রতি দায়িত্ব-জ্ঞান জন্মাইল। পতি নাম এই যুগেই সার্থক হইল—"পালনাচ্চ পতিঃ স্মৃতঃ।" পূর্ব্ববর্ত্তীকালে এ নিয়মের কিঞ্চিৎ বিপরীত দেখা যায়। দীর্ঘতমার স্ত্রীই স্বামীর ভরণপোষণ করিতেন। দীর্ঘতমা তাঁহার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি আমায় পরিত্যাগ করিয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছ কেন?" তদুত্তরে তাঁহার স্ত্রী বলিলেন—"পতি পালন করেন, তজ্জন্যই তিনি পতি নামে আখ্যাত। আমিই তোমার ভরণপোষণ করিতেছি অতএব তুমি আমার পতি নহ।" *

আর্য্যবিবাহের ক্রমবিকাশের তৃতীয় stage বা স্তরে স্ত্রী ধর্ম্মপত্নী অর্থাৎ জায়া-বাচ্যা হইলেন,—'পত্নীর' 'উপ'-পত্নীত্ব বিলুপ্ত হইল। জায়া বা ভার্য্যা শব্দে যে-সে স্ত্রী বুঝায় না। 'যূপকাষ্ঠ' বলিলে যেমন যা তা কাষ্ঠ বুঝায় না, বেদমন্ত্র দ্বারা সংস্কৃত কাষ্ঠ-বিশেষ বুঝায়—জায়া বা ভার্য্যা শব্দেও যে সে স্ত্রী বুঝায় না, বেদমন্ত্র দ্বারা সংস্কৃতা অর্থাৎ পাণিগৃহীতা স্ত্রীবিশেষ বুঝায় *। এইরূপে 'দম্পতি বা জায়া-পতিত্ব' সম্বন্ধ-জ্ঞানের উপলব্ধিই প্রকৃত ধর্ম্মবিবাহ। এই যুগেই পতি-পত্নীত্ব সম্বন্ধ স্থায়িত্বভাব ধারণ করিল। একমাত্র পতিই স্ত্রীলোক-দিগের যাবজ্জীবনের আশ্রয় হইল—"এক এব পতির্নার্য্যা যাবজ্জীবং পরায়ণম।"

মনুপ্রমুখ শাস্ত্রকারগণ Monogamy বা একৈকস্ত্রীপুরুষগ্রহণ প্রথার বিশেষ পক্ষপাতী। কতিপয় নির্দ্দিষ্ট কারণ ব্যতিরেকে পুরুষের পক্ষে স্ত্র্যন্তর গ্রহণ এবং স্ত্রীর পক্ষে পত্যন্তর গ্রহণ নিষিদ্ধ—এই মনুস্মৃতির মত। স্ত্রীর পক্ষে পত্যন্তর গ্রহণরূপ সত্য-যুগের নিয়ম—"কলৌ নিষিদ্ধঃ।"

'Ancestor-worship বা বৈদিক পিতৃ-যজ্ঞের' † পৌরাণিক সংস্কার বা রূপান্তর, শ্রাদ্ধ বা

* পালন করে বলিয়া "পতি" নাম—পালন করিতে অক্ষম হইলে "পতিত্বেরও" শেষ হইবে—দীর্ঘতমার স্ত্রীর কথার ভাবে এইরূপ মনে হয়।

* রঘুনন্দন।

† ঋগ্বেদে "পিতৃযজ্ঞের" কথা আছে। ঋগ্বেদে 'পিতৃন্' শব্দ বহুবচনে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'পিতৃন্' শব্দ দ্বারা আর্য্য-দিগের tribal ancestors বা পূর্ব্বপুরুষগণের সমষ্টি বুঝায়। এইকালে 'সপিণ্ড' 'সমানোদক' "সাকুল্য" "গোত্র" প্রভৃতি নানা জাতীয় পিণ্ডের দায়াদিরের আবির্ভাব বা উপদ্রব হয় নাই। এ সব "সূত্র" যুগে হয়।

"ব্রাহ্মণ" যুগে যাগযজ্ঞাদি ব্রাহ্মণগণ একচেটে করিয়া লইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণদিগের 'অভ্রভেদী অভিমান' এত বাড়িয়াছিল যে, তাঁহারা ধরাকে সরা জ্ঞান করিতেন। এমন কি ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে যাগযজ্ঞাদি অন্য কাহারও করিবার অধিকার ছিল না—ব্রাহ্মণ না হইলে দেবতাগণ যজ্ঞান্ন গ্রহণ করিতেন না। যজ্ঞ ব্যাপার এত জটিল হইয়া পড়িয়াছিল যে, যজ্ঞের "পান" হইতে মন্ত্রের "চুণ" খসিলে সে যজ্ঞ নিষ্ফল হইত। (ঐঃ ব্রাঃ, ৮।৫, ২৪, ২৬)।

ঋগ্বেদে (১০।১৬,১০) একস্থানে 'শ্রাদ্ধ' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে—ইহা দৈনিক পিতৃতর্পণাদি ছাড়া আর কিছুই নহে। বাজসনেয় সংহিতায় (১৯।৩৬,৩৭) পিতৃন্ শব্দের সহিত "স্বধা" (অর্থাৎ খাদ্য) শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। তৎসঙ্গে সঙ্গে পিতা, পিতামহ ও প্রপিতা-মহেরও উল্লেখ প্রথম দৃষ্ট হয়। শতপথ ব্রাহ্মণে (৯।১।৭) যাজ্ঞবল্ক্য প্রথম পিতৃলোকের উল্লেখ করেন। ঋগ্বেদের একস্থানে সোমই পরকালের সুখদাতা—সোমই সুখকর—বলিয়া বর্ণিত আছে। এইরূপে চন্দ্রলোকে পিতৃলোক কল্পিত হইয়াছে। গৌতম (১৫) ও আপস্তম্বের মতে (প্রশ্ন ২) তিন ঊর্দ্ধতন পুরুষেরা পিণ্ডাধিকারী, মনুর মতে ঊর্দ্ধতন ছয় পুরুষ পিণ্ডাধিকারী। তদূর্দ্ধতন সাতপুরুষ

পিণ্ডদাতৃত্বই, আর্য্যদিগের ধর্ম্মবিবাহের ভিত্তি বা আদি কারণ—এক কথায় মূল বলিয়া অনুমিত হয়। পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রঃ পিণ্ডপ্রয়োজনং"—এই শাস্ত্রোক্তিই এই মতের প্রমাণ। 'Ancestor-worship বা পিতৃযজ্ঞের দুইটী stage বা স্তর দেখা যায়। প্রথম স্তরে স্ত্রীলোকের সাধ্বী-সতীত্ব সম্বন্ধে আর্য্যদিগের মত অত্যন্ত Crude বা অসংস্কৃত ছিল। এই কালেই 'ক্ষেত্রজ' 'সহোঢ়জ' 'কানীন' প্রভৃতি উপ-পুত্রের ছড়াছড়ি—মহাভারতের কোন কোন প্রধান নায়ক ক্ষেত্রজ বা কানীন পুত্র। Ancestor-worship এর দ্বিতীয় stage বা স্তরে উপ-পুত্র, উপপত্নী, উপ-বিবাহ ইত্যাদি তিরোহিত হইল এবং ব্রাহ্মাসুর বিবাহ ও দত্তকৌরস পুত্র একমাত্র রহিল।

Ancestor-worship বা পিতৃযজ্ঞ বা শ্রাদ্ধই যে আর্য্যদিগের ধর্ম্মবিবাহের মূল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কোন বৈদেশিক শাস্ত্রে পাগল ও নপুংসকের বিবাহের কথা নাই। অথচ মনুর মতে নপুংসক, ক্লীব ও পাগলের বিবাহের কোন শাস্ত্রবাধা নাই, বরঞ্চ শাস্ত্রবিধি আছে (মনু ৯।২০১,২০৩)। পুত্রোৎপাদনে অসমর্থ হইলে 'দেবরেণ সুতোৎপত্তি'-কার্য্য চলিতে পারে। 'দেবর' শব্দের প্রকৃত অর্থ 'দ্বিতীয় বর'। 'মিত্বর' বা 'মিত্রবর' এই পূর্ব্ব প্রথার স্মারক, বা অনুকরণ বা রূপান্তরমাত্র। পুত্রাভাবরূপ "আপদি"—আপদকালে-দেবরই মিত্র হইতেন অর্থাৎ নিয়োগ বিধানে ভ্রাতৃজায়ার গর্ভে পুত্রোৎপাদন করিয়া মিত্রের ন্যায় ভ্রাতার ঐহিক ও পারলৌকিক উপকার সাধন করিতেন। দেবর অভাবে সপিণ্ডেরাই সুতোৎপত্তির নিমিত্ত নিযুক্ত হইত।

স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে অন্য স্ত্রী গ্রহণের শাস্ত্রে বিধি আছে, কিন্তু পতি স্বয়ং রতিশক্তিহীন হইলে নিয়োগরূপ প্রথার দ্বারা স্ত্রীর গর্ভে অন্য কর্ত্তৃক পুত্রোৎপাদনের বাধা ছিল না। এইরূপে একাদশ সংখ্যক ক্ষেত্রজ পুত্র এক বা একাধিক পুরুষদ্বারা উৎপাদন করিবারও শাস্ত্রবিধি ছিল—উপপত্নীত্ব (concubinage) বা বহুপুরুষ সহবাস (promiscuity) ছাড়া ইহা আর কি হইতে পারে? পাছে পিণ্ডোদকক্রিয়া লোপ পায় তজ্জন্য 'overinsurance' করা চাই, অর্থাৎ "যেন তেন প্রকারেণ" পুত্রোৎপাদন বা পুত্রসংগ্রহ করা দরকার—এই কারণে ত্রয়োদশ বা তদধিক পুত্রেরও উল্লেখ দেখা যায় যথা, "কানীন" (কর্ণ), ক্ষেত্রজ (পঞ্চপাণ্ডব) ইত্যাদি।

পিতৃগণ "অসপিণ্ড" বা পরহস্তপ্রদত্ত পিণ্ডোদক গ্রহণ করেন না, তাই কোনরকমে তাঁহাদিগকে ভুলাইবার জন্য 'আসল' পুত্রের অভাবে 'নকল' পুত্রের প্রয়োজন। রক্তের সহিত সম্বন্ধ থাকুক বা না থাকুক পিতাপুত্র সম্বন্ধ হইলেই হইল। দত্তক পুত্র অপেক্ষা ক্ষেত্রজ পুত্র শ্রেষ্ঠ—ক্ষেত্রজ পুত্রের সমধিক আদর ছিল; কেননা ক্ষেত্রজ পুত্র নিয়োগকর্ত্তার "ক্ষেত্রে" অর্থাৎ ভার্য্যার গর্ভে উৎপন্ন হইত। দত্তকপুত্র একটা fiction বা কল্পনামাত্র, নিয়োগকর্ত্তার স্ত্রীর সহিত তাদৃশ পুত্রের রক্তমাংসের যোগ নাই। এই কারণে উপপুত্রের অর্থাৎ নকল পুত্রের তালিকায় দত্তকপুত্রের স্থান ক্ষেত্রজ পুত্রের নীচে দৃষ্ট হয়।

নিয়োগবিধি লঙ্ঘন করিয়া যে পর-"ক্ষেত্রে" পুত্রোৎপাদন করে সে "দিধিষু-পতি" নামে অভিহিত হইত। নিয়োগ প্রথা কালক্রমে বিধবা বিবাহে পরিণত হইল। উদাহরণ—বালীর মৃত্যুর পর তৎকনিষ্ঠ ভ্রাতা সুগ্রীব ভ্রাতৃজায়া তারাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, রামায়ণে আছে—এইরূপ দেবর-ভ্রাতৃজায়া-বিবাহ ইংরাজীতে Levirite নামে আখ্যাত (মনু ৯। ৬৯, ৭০)। ঈদৃশ বিধবা বিবাহ তৎকালে দোষজনক ছিল না। পতি মরিলে পতির সঙ্গে সঙ্গে 'জায়াত্ব' অর্থাৎ 'জনি'-ত্বের শেষ হয়। ঋগ্বেদে এক-স্থানে দেবর ভ্রাতৃজায়ার হস্ত ধারণ করিয়া তাহাকে আহ্বান করিতেছে—"হে প্রেতপত্নী! যিনি তোমার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি তোমার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করিয়া সর্ব্ব কার্য্য শেষ করিয়াছেন। তোমার জায়াত্বও শেষ হইয়াছে। তুমি আমার

সমানোদক। কিন্তু মনু মাতৃপক্ষের পূর্ব্বপুরুষের সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। মিতাক্ষর স্মৃতিকার যাজ্ঞবল্ক্য (১।২৪১) প্রথম মাতৃপক্ষীয় পূর্ব্বপুরুষদিগকে পিণ্ড প্রাপ্তির অধিকারী করিলেন। ঋগ্বেদে অধস্তন পুরুষেরা উর্দ্ধতন পুরুষ কর্ত্তৃক (অর্থাৎ ancestors কর্ত্তৃক) উপকৃত হইতেন; আধুনিক শাস্ত্রে ইহার বিপরীত অর্থাৎ অধস্তন পুরুষেরা উর্দ্ধতন পুরুষদিগের স্বর্গের সিঁড়ি-স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।

সহিত এস। * সম্ভবত নিয়োগ যুগের স্মৃতি স্বরূপ এখনও বড় ভাইয়ের স্ত্রীকে ছোট ভাই "ভার্য্যা" বা "ভাজ" বলিয়া থাকে।

সপিণ্ডের নিয়োগ বিধান দ্বারা সপিণ্ডেরই "ক্ষেত্রে" সুতোৎপত্তি করিবার অধিকার ছিল। ক্রমে ক্রমে এইরূপে বিধবা বিবাহের সূত্রপাত হইল। পরবর্ত্তীকালে শ্রাদ্ধের উৎকর্ষ সাধন হইল। তৎসঙ্গে সঙ্গে বিধবাবিবাহ স্থগিত হইল। কারণ স্ত্রী স্বামীর "অর্দ্ধাঙ্গী"। স্বামীর মরণান্তর স্বামীর পারলৌকিক সুখের জন্য বিধবা স্ত্রীর যাবজ্জীবন পিণ্ডোদকদান করা প্রয়োজন। "একবার কদলী বৃক্ষ ফলধারণ করে, একবারই স্ত্রীলোকের সংস্কার অর্থাৎ বিবাহ হয়",—কালক্রমে এইরূপ কঠোর বিধি হইল। স্ত্রী স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গী—অর্দ্ধাঙ্গীর পুনর্বিবাহ ধর্ম্মচক্ষে polyandry বা একাধিক-পুরুষগ্রহণ প্রথা-স্বরূপ গৃহীত হইত। ক্রমে ক্রমে সভ্যতার ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রাক্ষসাদি উপবিবাহ ও পৌনর্ভব ক্ষেত্রজাদি উপ-পুত্র সকল তিরোহিত হইল। আজ কাল একমাত্র মিশ্রিত আসুর-ব্রাহ্মবিবাহ প্রশস্ত এবং একমাত্র ঔরস ও দত্তক পুত্রই শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ার যোগ্য বা অধিকারী। সপিণ্ডের সহিত সপিণ্ডারও বিবাহ নিষিদ্ধ, কেন না, সপিণ্ডের সহিত সপিণ্ডার রক্তের সংযোগ আছে। এইরূপ বিবাহ incest স্বরূপ বা পাপ বিবাহ। এই রকম বিবাহে "পিণ্ডসংমিশ্রনের" ভয় আছে—"উদোর" পিণ্ড "বুদোর" মুখে পড়িতে পারে। পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রঃ পিণ্ড-প্রয়োজনং। এই কারণেই "গার্হস্থ্যধর্ম্ম" সর্ব্বধর্ম্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া শাস্ত্রেতে আদৃত।

"পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা"—অতএব স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য নিষ্ফল হয়। তাই স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে পতির অন্য স্ত্রী গ্রহণের শাস্ত্রাদেশ আছে। 'বন্ধ্যা' অর্থে একেবারে বন্ধ্যা বা barren নহে—কেবল মাত্র কন্যা-প্রসবিনীও 'বন্ধ্যা'বাচ্য।

স্ত্রী ব্যভিচারিণী হইলে সে স্ত্রীও পরিত্যাজ্য—ব্যভিচারিণী বলিয়া নহে (নিয়োগযুগে সতীত্ব ডুম্বুর ফুলসদৃশ অদৃশ্য ছিল)—ব্যভিচারিণী স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র ঔরসজাত বা জারজ এই সন্দেহ দূরীকরণার্থ তাদৃশ স্ত্রী পরিত্যাজ্য। ঔরসজাত না হইলে সে পুত্রের পিণ্ডোদক দানের অধিকার নাই অর্থাৎ পিণ্ডোদক দান করিলেও পিতৃগণ তদ্‌প্রদত্ত পিণ্ডোদক গ্রহণ করিবেন না। সপিণ্ডই সপিণ্ডের পিণ্ড দিতে পারে।

ভ্রাতৃহীন কন্যার বিবাহ নিষিদ্ধ, কেননা তাহার গর্ভজাত পুত্র, কন্যার পিতারই শ্রাদ্ধাদির কার্য্যে লাগিত; জন্মদাতার পিণ্ডোদকক্রিয়ায় নিযুক্ত হইত না। অতএব ধনী হইলেও ভ্রাতৃহীন কন্যার বিবাহ করা না করা একই—বিবাহের উদ্দেশ্য নিষ্ফল হয়। এইরূপ কন্যাকে 'যমজায়া' বলিত কেননা তাহাকে আমরণ অনূঢ়া থাকিতে হইত।

অজ্ঞাতকুলশীলা কন্যার বিবাহও নিষিদ্ধ—সবর্ণা কি অসবর্ণা, সগোত্রা কি অসগোত্রা না জানা থাকিলে তদগর্ভজাত পুত্র সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিয়া যাইবে। সত্য সত্যই অবিবাহ্যা হইলে সেরূপ কন্যার গর্ভজাত পুত্র সঙ্কর পুত্র হইবে। 'সঙ্কর' পুত্র পিণ্ডোদক দানের অধিকারী নহে। সঙ্কর পুত্র হইলে পিণ্ডোদক লোপ হইবে, অর্জ্জুন এই ভয়ে ভারত যুদ্ধের প্রারম্ভেই স্বজন বিনাশ করিতে অনিচ্ছুক হইয়াছিলেন। পুরুষেরাই যুদ্ধ করে। যুদ্ধে পুরুষেরা মরিলে স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা কম হয়, এবং তৎকারণবশত স্ত্রীরা বর্ণাবর্ণবিচার না করিয়া বিবাহ করে বা ব্যভিচারিণী হয় বা হইতে পারে। "ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি"—স্বস্ব পতি বা পালক বা তত্ত্বাবধারক অভাবে ইহাদিগকে কোন না কোন পরপুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতে হয়। স্ত্রীরা ব্যভিচারিণী হইলে সঙ্কর জাতির উৎপন্ন হয়। সঙ্কর বা জারজ পুত্র পিণ্ডোদক দানের অনধিকারী। *

---

* মার্কণ্ডেয়পুরাণে হরিশ্চন্দ্রমহিষী শৈব্যা রোহিতাশ্ব নামক পুত্র প্রসব করিয়া "জায়ায়" নিষ্পন্ন করিয়াছিলেন। তিনি রাজাকে বলিলেন—"হে রাজন্! আমার গর্ভে অপত্য উৎপন্ন হইয়াছে। সাধুগণ পুত্রের নিমিত্ত দার-পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। অতএব আপনি আমাকে বিক্রয় করিয়া যে ধন পাইবেন তাহাই ব্রাহ্মণকে (অর্থাৎ বিশ্বামিত্র ঋষিকে) দক্ষিণা দান করুন।"

"রাজন্ জাতপত্যং মে সতাং পুত্রফলাঃ স্ত্রিয়ঃ।
তৎ মাং প্রদায় বিত্তেন দেহি বিপ্রায় দক্ষিণাম॥

* "পুনর্জন্ম" ও "শ্রাদ্ধ" theory পরস্পরবিরুদ্ধ বলিয়া মনে হয়।

এইরূপে কুলনাশ হয়। কুলনাশে পিণ্ডোদক যাগযজ্ঞাদি লোপ হয়। পিণ্ডোদক লোপ হইলে পিতৃগণ স্বর্গভ্রষ্ট হন এবং যাগযজ্ঞাদি লোপ হইলে ইন্দ্রাদি দেবগণের সোমরস হব্যাদি বন্ধ হইয়া যায়। যজ্ঞ না করিলে দেবতারা জলবর্ষণ করিবেন না। দেবতারা জলবর্ষণ না করিলে শস্য উৎপন্ন হইবে না শস্য উৎপন্ন না হইলে সৃষ্টি নাশ হইবে, (গীতা ৩। ১৪) অতএব "পুত্রং দেহি পুত্রং দেহি ন কুর্য্যাৎ যুদ্ধবিগ্রহং" * অর্জ্জুন এইরূপ যুক্তি অবলম্বন করিয়া ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভারত যুদ্ধ হইতে নিরস্ত হইতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সঙ্কর পুত্রের ভয়ে adultery বা অভিমর্ষণতার শাস্তি পুরাকালে অতি শক্ত ছিল—স্ত্রীকে কুকুর দিয়া খাওয়াইত। স্ত্রী উচ্চ বর্ণের হইলে ব্যভিচার-দোষী পুরুষের শাস্তি গুরুতর হইত। রক্ষিতা ও অরক্ষিতা হইলে শাস্তিরও কিঞ্চিৎ তারতম্য হইত। এই কারণে গৌতম প্রভৃতি শাস্ত্রকারেরা স্ত্রীর উপর বিশেষ "নজর" রাখিতে বলিয়াছেন। বোধ হয় পর্দ্দা system বা প্রথার সৃষ্টি ইহা হইতে। মনু বলেন—

"He who preserves his wife from *vice*, preserves his offspring from *suspicion of bastardy*, his ancient usages from *neglect*, his family from *disgrace*, himself from *anguish*, and his duty from *violation*.†

দৈব পৈত্রাদি ঋণ হইতে মুক্ত হইবার জন্য পুত্রের প্রয়োজন। জ্যেষ্ঠপুত্রের জন্মমাত্রেই পিতা এই ত্রিঋণ হইতে মুক্ত হন, অতএব জ্যেষ্ঠপুত্রই পিতৃধনের একমাত্র অধিকারী। তিনিই প্রকৃত "ধর্ম্মজ" পুত্র। অন্য পুত্র "কামজ" এই মন্বাদি শাস্ত্রকারদিগের মত। এই কারণে জ্যেষ্ঠাধিকার প্রথা পূর্ব্ববর্ত্তীকালে প্রচলিত হয়। গৌতম ও মনুর মতে—"ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই" হইলে শ্রাদ্ধাদি কার্য্যও multiplied বা একাধিকবার হয় এবং "ধর্ম্মবিভাগ" অনুষ্ঠিত হয়, ধর্ম্মকর্ম্মের বৃদ্ধি হয়। ইহাকে "Partition theory" কহে। কতকটা এই কারণে, কতকটা বহুবিবাহ থাকাতে, জ্যেষ্ঠাধিকার প্রথার লোপ হইল এবং সকল পুত্রগণ পিতৃধনের সমান অধিকারী হইল।

কালক্রমে আর্য্যবিবাহ একটী জটিল শাস্ত্রে পরিণত হইয়াছে। একদিকে "বহির্বিবাহিক" (Exogamy) অর্থাৎ "অ-সগোত্রে", অপরদিকে "অন্তর্বিবাহিক" (Endogamy) অর্থাৎ "স-বর্ণে" বিবাহ প্রচলিত হইল। শ্রাদ্ধকর্ত্তার পিণ্ডের সহিত দাতৃত্বসম্বন্ধ, অতএব শ্রাদ্ধকর্ত্তা ও তদূর্দ্ধতন ছয় পুরুষ পরস্পর সপিণ্ড। এই সাতজন ও ইহাদের সন্তানসন্ততির মধ্যে পরস্পরের সম্বন্ধই সাপিণ্ড্য সম্বন্ধ। সপিণ্ডের সহিত সপিণ্ডার বিবাহ নিষিদ্ধ। সমানপ্রবরের সহিত সমানপ্রবরারও বিবাহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ।

তাহা ছাড়া সামুদ্রিক শাস্ত্রেরও উল্লঙ্ঘন নিষিদ্ধ। অশ্বাদি ক্রয় করিবার সময় অশ্বের শুভাশুভ চিহ্ন পরীক্ষা করিয়া লইতে হয়। পাত্রী নির্ব্বাচন কার্য্যে সামুদ্রিক শাস্ত্রের সাহায্যে পাত্রীর শুভাশুভ চিহ্ন বা লক্ষণ পরীক্ষা করিয়া গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা দেখা যায়। যে রমণীর করতলে শঙ্খ পদ্ম মৎস্যাদি চিহ্ন থাকে সে নারী সৌভাগ্যবতী, যে রমণীর পদতলে রেখা থাকে সে রাজরাণীসদৃশ। এই সব লক্ষণাক্রান্ত কন্যা বিবাহ করিলে পতি ভাগ্যবান হইবে। 'খড়মপেয়ে, চিরুণদাঁতী, বেরাল চোখো' প্রভৃতি কন্যা অবিবাহ্যা (মনু ৩।৮)। 'পটল চোখো' মেয়ের বিরুদ্ধে শাস্ত্রে বা উপশাস্ত্রে কোন বিধান নাই। গঙ্গা যমুনা বা লতাপাতার নাম থাকিলেও তাদৃশ কন্যাকে বিবাহ করা অনুচিত। এই গেল সামুদ্রিক পীড়ন; ইহার উপর

উদাহরণ (১) 'ক' মরিয়া পুনরায় জন্মগ্রহণ করিল; এদিকে 'ক'র পুত্র পৌত্রেরা তাহার শ্রাদ্ধ করিয়া যাইতে লাগিল। এ শ্রাদ্ধ বৃথা।

উদাহরণ (২) খ একটী বিবাহিতা স্ত্রী, ১৫ বৎসরে মরিয়া গেল। স্বামী পরলোকে মৃতা স্ত্রীর সহিত সম্মিলিত হইবার আশায় পুনরায় দারপরিগ্রহ করিলেন না। এদিকে তাঁহার স্ত্রী পুনর্জন্ম করিয়া বিবাহ করিয়া ঘরকন্না করিতেছেন। কিমাশ্চর্য্যং অতঃপরং। চার্ব্বাকপ্রমুখ Epicurean সম্প্রদায়িক ঋষিরা "মরা গরু ঘাস খায়না" এই প্রবচন শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে প্রয়োগ করেন।

"মৃতানামপি জন্তূনাং শ্রাদ্ধং চেৎ তৃপ্তিকারকং।
নির্ব্বাণস্য প্রদীপস্য স্নেহঃ সংবর্দ্ধয়েচ্ছিখাং"

"শ্রাদ্ধ যদি মৃত জন্তুর তৃপ্তিদায়ক হইতে পারে, তাহা হইলে তৈল দানে নির্ব্বাণ প্রদীপের শিখা কেন জ্বলিয়া উঠে না?"

* মহাভারতে আছে, জরৎকারু ঋষি অগৃহীতদার থাকায় তাঁহার যাযাবরাখ্য পিতৃপুরুষগণ "পুন্নামনরকমুখী" হইয়া ঊর্দ্ধপদে লম্বমান ছিলেন।

† Manu-Ch. IX.

আবার জ্যোতিষেরও উপদ্রব আছে। নরগণ কি রাক্ষসগণ দেখিতে হইবে—"মৃত্যুর্মানুষরাক্ষসে" অর্থাৎ নররাক্ষসে বিবাহ হইলে বাঘও ছাগের সদৃশ হইবে। লগ্নও ঠিক থাকা চাই, লগ্ন পার হইলে বিবাহ না-মঞ্জুর *। লীলাবতী ভাস্করাচার্য্যের কন্যা ছিলেন। যাতে লীলাবতীর বিবাহ শুভলগ্নে হয় সেই জন্য সূর্য্যসিদ্ধান্তকার ভাস্করাচার্য্য বরকন্যার নিকট স্বনির্ম্মিত একটী Hour cup বা "হোরাপাত্র" লগ্ন নির্ণয়ার্থে জলাধারের উপর স্থাপন করিলেন। Hour cup বা হোরাপাত্রের নিম্নে একটী ছিদ্র ছিল, সেই ছিদ্র দিয়া হোরাপাত্রে বিন্দু বিন্দু জল প্রবেশ করিতেছিল। এইরূপে যখন পাত্রটী জলপূর্ণ হইয়া জলের মধ্যে ডুবিয়া যাইবে, তখনই বিবাহের শুভলগ্ন বুঝিতে হইবে। লীলাবতী কৌতূহলবশত ঝুঁকিয়া হোরাপাত্রের ভিতর জল প্রবেশ দেখিতে লাগিলেন। ঘটনাক্রমে তাঁহার কর্ণমূলের দুল হইতে একটী ক্ষুদ্র মুক্তা খসিয়া পাত্রাভ্যন্তরে পতিত হইল ও ছিদ্রমধ্যে আবদ্ধ হইল। হোরাপাত্র মধ্যে জলপ্রবেশ বন্ধ হইয়া গেলে, হোরাপাত্র ভাসিতেই লাগিল। অনেক সময় গত হইলেও যখন হোরাপাত্র জলপূর্ণ হইল না, ভাস্করাচার্য্য দেখিলেন ছিদ্রটী একটী মুক্তার দ্বারা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। শুভলগ্ন অতিবাহিত হইয়া গেল, লীলাবতীর আর বিবাহ হইল না। ভাস্করাচার্য্য তখন লীলাবতীকে বলিলেন "লীলাবতি! তুমি অদৃষ্টদোষে দাম্পত্য সুখ হইতে বঞ্চিত হইলে কিন্তু আমি তোমার নামে একটী পুস্তক রচনা করিয়া তোমার নাম জগতে জাজ্বল্যমান রাখিব।" তিনি তাঁহার কথানুযায়ী "লীলাবতী" নামক অঙ্কশাস্ত্রের পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন।

শাস্ত্রোপশাস্ত্ররূপ 'সাত সমুদ্র তের নদী' পার হইয়াও "বাঁশবনে ডোম কানা" সম বিশ কোটী হিন্দুর পক্ষে পাত্র-পাত্রী নির্ব্বাচনকার্য্য অতি দুষ্কর ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই কারণে বঙ্গকুলীনেরা দুগ্ধপোষ্য শিশুবালিকাকে 'tray' বা থালায় বসাইয়া গঙ্গাযাত্রী 'ঘরের' সহিত 'বিবাহ' দিয়া তাহার "আইবড়ত্ব" ঘুচাইত। বেদে একটী বিবাহ মন্ত্র আছে—

"Who gave her? To whom he gave her? Love gave her. Love gave her to love. হায়! হিন্দু বিবাহে "Hymen is seldom attended at the nuptial ceremony by Cupid. (ক্রমশঃ)

* শুভলগ্নে বিবাহ হইলেও, দাম্পত্যসুখ নাও হইতে পারে। উদাহরণ—সীতা "সমাগৃহ্যে শুভগ্রহে বশিষ্ঠদত্তে লগ্নেঽপি জানকী-দুঃখভাজনম্।" গরুড়-পুরাণম্।

বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত—

গীতা-রহস্য।

পঞ্চম প্রকরণ।

সুখদুঃখবিবেক।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদিত)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সুখমাত্যন্তিকং যত্তৎ বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।*

গীতা ৬, ২১।

সুখ কেমন করিয়া পাওয়া যাইবে, কিংবা প্রাপ্ত সুখের কিরূপে বৃদ্ধি হইবে এবং কিসে দুঃখ নিবারণ হইবে কিংবা দুঃখের লাঘব হইবে, এই জন্য প্রত্যেক মনুষ্য এই জগতে সদাই চেষ্টা করিয়া থাকে; এই সিদ্ধান্ত আমাদের শাস্ত্রকারদিগেরও অভিমত। "ইহ খলু অমুষ্মিংশ্চ লোকে বস্তুপ্রবৃত্তয়ঃ সুখার্থমভিধীয়ন্তে। ন হ্যতঃপরং ত্রিবর্গফলং বিশিষ্টতরমস্তি।" ইহলোকে কিংবা পরলোকে, সমস্ত প্রবৃত্তি সুখের নিমিত্ত; ইহার ওদিকে ধর্ম্মার্থকামের আর কোন ফল নাই, এইরূপ শান্তিপর্ব্বে ভৃগু ভরদ্বাজকে বলিয়াছেন (সভা. শা. ১৮০.৮)। কিন্তু আমাদের প্রকৃত সুখ কিসে হয় ইহা না বুঝিবার দরুন, মেকি মুদ্রা আঁচলে বাঁধিয়া তাহাই খাঁটি মনে করিয়া, কিংবা, আজ না হয় কাল সুখ মিলিবে এই আশায় ভর করিয়া, মনুষ্য যখন জীবনের দিন কাটাইতে থাকে, সেই সময় তাহার উপর মৃত্যু অকস্মাৎ আক্রমণ করিলেও, সে সাবধান না হইয়া পুনর্ব্বার তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকে। এই ভাবে এই ভবচক্র চলিতে থাকায়, প্রকৃত ও নিত্য সুখ কি, সে ইহার কিছুই

* "যাহা কেবল বুদ্ধির দ্বারা গ্রাহ্য ও অতীন্দ্রিয় তাহাই আত্যন্তিক সুখ"।

বিচার করে না—শাস্ত্রকারেরা এইরূপ বলেন। সংসার কেবল দুঃখময়, কিংবা সুখপ্রধান বা দুঃখ-প্রধান, এই সম্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য তত্ত্বজ্ঞানী-দিগের মধ্যে খুবই মতভেদ আছে। কিন্তু ইহাঁদের মধ্যে কোন পক্ষ গ্রহণ করিলেও, প্রত্যেক মনুষ্য আপন দুঃখের অত্যন্ত নিবারণ করিয়া অত্যন্ত সুখ লাভের উপায় করায় তাহার কল্যাণ আছে, এসম্বন্ধে কাহারও মতভেদ নাই।

'সুখ' এই শব্দের পরিবর্ত্তে প্রায় 'হিত', কিংবা 'কল্যাণ' এই শব্দ বেশী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উহাদের মধ্যে ভেদ কি, তাহা পরে বলা যাইবে। তথাপি, 'সুখ' শব্দের ভিতর সর্ব্বপ্রকারের সুখ বা কল্যাণের সমাবেশ হয়, এ কথা মানিলে, সাধারণত সুখের নিমিত্ত প্রত্যেকের প্রযত্ন হইয়া থাকে,—এই মত সকলেরই গ্রাহ্য, এরূপ বলা যাইতে পারে। কিন্তু উহার মূলে "যদিষ্টং তৎসুখং প্রাহুঃ দ্বেষ্যং দুঃখ-মিহেষ্যতে"—আপনার যাহা কিছু ইষ্ট তাহাই সুখ এবং আমরা যাহার দ্বেষ করি অর্থাৎ যাহা কিছু আমরা চাহি না তাহাই দুঃখ—এইরূপ সুখ দুঃখের যে লক্ষণ মহাভারতের অন্তর্গত পরাশর গীতায় বিবৃত হইয়াছে (সভা, শাং, ২৯৫—২৭,) শাস্ত্রদৃষ্টিতে তাহা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ নহে। কারণ এই ব্যাখ্যায় 'ইষ্ট' শব্দের অর্থ ইষ্ট বস্তু কিংবা পদার্থ এইরূপ হইলেও হইতে পারে; এবং এই-রূপ অর্থ ধরিলে, ইষ্ট পদার্থকেও সুখ বলিবার প্রসঙ্গ পাওয়া যাইবে। উদাহরণ যথা, তৃষ্ণার সময় জল ইষ্ট হইলেও, 'জল' এই বাহ্য পদার্থকে 'সুখ' নাম দেওয়া যাইতে পারে না। ওরূপ হইলে, নদীর জলে-ডোবা মানুষ সুখে ডুবিয়াছে এইরূপ বলিতে হয়! জল পানে যে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি হয় তাহাই সুখ। মনুষ্য এই ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকেই সুখ বলিয়া মনে করে সত্য; কিন্তু তাহার জন্য মানুষ যাহা চাহে তাহা সমস্ত সুখই হইবে এইরূপ ব্যাপক সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না। তাই, নৈয়ায়িকেরা "অনুকূল-বেদনীয়ং সুখং" যে বেদনা আমাদের অনু-কূল তাহাই সুখ এবং "প্রতিকূল-বেদনীয়ং দুঃখং"—যে বেদনা আমাদের প্রতিকূল তাহাই দুঃখ, এইরূপ ব্যাখ্যা দিয়া সুখ ও দুঃখ ইহা একপ্রকার বেদনা বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এই বেদনা মূলতঃ অর্থাৎ জন্ম হইতেই সিদ্ধ এবং কেবল অনুভবগম্য হওয়া প্রযুক্ত, নৈয়ায়িকদিগের এই ব্যাখ্যা অপেক্ষা সুখদুঃখের কোন সুন্দরতর লক্ষণ বলা যাইতে পারে না। এই বেদনারূপ সুখদুঃখ, কেবল মনুষ্যের ব্যাপারাদিতেই সমুদ্ভূত হয় এরূপ নহে। কখন কখন দেবতাদের কোপ-প্রযুক্তও, কঠিন রোগ উৎপন্ন হইয়া সেই রোগে মনুষ্যকে দুঃখ ভোগ করিতে হয়। তাই, বেদান্তগ্রন্থাদিতে সাধারণত, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যা-ত্মিক—সুখদুঃখের এই তিন ভেদ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে, দেবতার প্রসাদে বা কোপে যে সুখদুঃখ অনুভূত হয় তাহাকে "আধিভৌতিক" এই সংজ্ঞা দেওয়া হয়; বাহ্য জগতের মধ্যে, পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চ মহাভূতাত্মক পদার্থ মনুষ্যের ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হইয়া শীতোষ্ণাদিমূলক যে সুখদুঃখ হয় তাহাকে "আধিভৌতিক" এই নাম দেওয়া হয়; এবং এই প্রকারের বাহ্য সংযোগ ব্যতীত উৎপন্ন অন্য সমস্ত সুখদুঃখ "আধ্যাত্মিক" নামে অভি-হিত হয়। সুখদুঃখের এই বর্গীকরণ স্বীকার করিলে শরীরান্তর্ভূত বাতপিত্তাদি দোষের পরি-মাণ বিগড়াইয়া গিয়া যে জ্বরাদি দুঃখ উৎপন্ন হয়, এবং সেই পরিমাণ ঠিক্ থাকিলে শরীরপ্রকৃতির যে স্বাস্থ্য উৎপন্ন হয়, তাহা আধ্যাত্মিক সুখদুঃখের মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। কারণ, এই সুখদুঃখ পঞ্চ-ভূতাত্মা শরীরান্তর্ভূত হইলেও অর্থাৎ শারীর হই-লেও, শরীরের বাহিরের পদার্থসংযোগে উহা উৎপন্ন হইয়াছে, সব সময়ে এইরূপ বলা যাইতে পারে না; এবং সেই জন্য, বেদান্তদৃষ্টিতে আধ্যাত্মিক সুখ দুঃখেরও কায়িক ও মানসিক এইরূপ ভেদ নির্ণয় করা পুনর্ব্বার আবশ্যক হয়। কিন্তু সুখ দুঃখাদির কায়িক ও মানসিক এইরূপ ভেদ করিলেও, আধিদৈবিক সুখদুঃখ স্বতন্ত্র বলিয়া স্বীকার করিবার আবশ্যকতা থাকে না। কারণ, দেবতার প্রসাদে কিংবা কোপে সমুৎপন্ন সুখ দুঃখও, নিজের শরীরে কিংবা মনে মনুষ্যকে ভোগ করিতে হয়, ইহা ত স্পষ্টই দেখা যায়। তাই বেদান্তগ্রন্থের পরিভাষা অনুসারে সুখদুঃখের ত্রিবিধ বর্গীকরণ না করিয়া উহাদের বাহ্য কিংবা কায়িক, এবং আভ্যন্তর কিংবা মানসিক এইরূপ দুই বর্গই কল্পনা করিয়া, প্রথম অর্থাৎ সর্ব্ব-

প্রকার কায়িক সুখদুঃখকে "আধিভৌতিক" এবং সমস্ত মানসিক সুখদুঃখকে "আধ্যাত্মিক" এই নামে আমি আমার গ্রন্থে অভিহিত করিয়াছি। বেদান্ত গ্রন্থের পরিভাষা অনুসারে 'আধিদৈবিক' বলিয়া স্বতন্ত্র তৃতীয় বর্গ আমি স্থাপন করি নাই। কারণ, আমার মতে সুখদুঃখের শাস্ত্রীয় বিচার করিবার পক্ষে এই ত্রিবিধ বর্গীকরণই অপেক্ষাকৃত অধিক সহজ। সুখদুঃখের পরবর্ত্তী বিচার পড়িবার সময়, বেদান্তগ্রন্থের পরিভাষা ও আমার পরিভাষার ভেদ সর্ব্বদাই মনে রাখা আবশ্যক।

সুখদুঃখ দ্বিবিধই স্বীকার কর, বা ত্রিবিধই স্বীকার কর, তন্মধ্যে দুঃখ কেহই চাহে না। তাই, সর্ব্বপ্রকার দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি করা এবং আত্যন্তিক ও নিত্য সুখ অর্জ্জন করা ইহাই মনুষ্যের পুরুষার্থ, এইরূপ বেদান্ত ও সাংখ্য এই দুই শাস্ত্রেই উক্ত হইয়াছে (সাং, কা, ১ ; গী, ৬—২১, ২২)। এইরূপ আত্যন্তিক সুখই পরম সাধ্য স্থির হইলে পর, সত্য ও নিত্য সুখ কাহাকে বলে, তাহা লাভ করা সাধ্যায়ত্ত কি না, সাধ্যায়ত্ত হইলে কিরূপে ও কখন্ লাভ হইতে পারে ইত্যাদি বিষয়ের বিচার সহজভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায় ; এবং এই বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলে প্রথমেই এইরূপ প্রশ্ন উঠে যে, নৈয়ায়িকদিগের লক্ষণ অনুসারে সুখ ও দুঃখ এই দুই বিভিন্ন স্বতন্ত্র বেদনা, অনুভূতি কিম্বা বস্তু, অথবা "আলোক, না হইলেই অন্ধকার" এই ন্যায়সূত্র অনুসারে এই দুই বেদনার মধ্যে একের অভাবই কি দ্বিতীয়ের সংজ্ঞা ? "তৃষ্ণায় ঠোঁট শুকাইয়া গেলে সেই দুঃখ নিবারণার্থ আমরা মিঠা জল পান করি, ক্ষুধায় পীড়িত হইলে, সুগ্রাস অন্ন খাইয়া সেই ক্লেশ দূর করি, এবং কামবাসনা প্রদীপ্ত হইয়া দুঃসহ হইলে স্ত্রীসঙ্গের দ্বারা তাহা তৃপ্ত করি" এই কথা বলিয়া ভর্ত্তৃহরি শেষে এইরূপ বলিতেছেন—

"প্রতীকারো ব্যাধেঃ সুখমিতি বিপর্য্যস্যতি জনঃ।"

অর্থাৎ—কাহারও ব্যাধি বা দুঃখ হইলে, তাহার নিবারণই সুখ, লোকে ভ্রমক্রমে এইরূপ বলিয়া থাকে। দুঃখনিবারণ ছাড়া সুখ বলিয়া কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই। মনুষ্য স্বার্থের জন্য যে ব্যবহার করে তাহার প্রতিই এই ন্যায় প্রয়োগ হয় এরূপ নহে। অন্যের উপকার করিবার সময়েও তাহার দুঃখ দেখিয়া আমাদের অন্তরে জাগৃত কারুণ্যবৃত্তি আমাদের দুঃসহ হইতে থাকে এবং সেই দুঃসহত্বের ক্লেশ দূর করিবার জন্যই আমরা পরোপকার করি,—এইরূপ আনন্দগিরির মত পূর্ব্ব প্রকরণে বলিয়াছি। এই পক্ষ স্বীকার করিলে মহাভারতের একস্থানে—

"তৃষ্ণার্ত্তিপ্রভবং দুঃখং দুঃখার্ত্তিপ্রভবং সুখং।"

অর্থাৎ—কাহারও তৃষ্ণা প্রথমে উৎপন্ন হইলে, সেই তৃষ্ণার পীড়া হইতে দুঃখ এবং সেই দুঃখের পীড়া হইতে পরে সুখ উদ্ভূত হয়—এইরূপ যে সুখদুঃখের বর্ণনা আছে, তাহাই যথার্থ এইরূপ বলা যাইতে পারে (শাং, ২৫। ২২ ; ১৭৪। ১৯)। সার কথা, মনুষ্যের মনে প্রথমত কোন আশা, বাসনা বা তৃষ্ণা উৎপন্ন হইয়া তাহা হইতে দুঃখ উৎপন্ন হইলে পর, উক্ত দুঃখের নিবারণই সুখ ; সুখ বলিয়া স্বতন্ত্র পৃথক বস্তু নাই, এই মার্গের এইরূপ উক্তি। অধিক কি, মনুষ্যের সাংসারিক সমস্ত প্রবৃত্তি বাসনাত্মক বা তৃষ্ণাত্মক হওয়া প্রযুক্তই সমস্ত সাংসারিক কর্ম্মের ত্যাগ ব্যতীত সম্পূর্ণরূপে তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয় না ; তৃষ্ণার সম্পূর্ণ নিবৃত্তি ব্যতীত, সত্য ও নিত্য সুখ লাভ হইতে পারে না, এইরূপ, ইহার পূর্ব্বে, অন্য সিদ্ধান্তও এই মার্গের লোকেরা বাহির করিয়াছেন। বৃহদারণ্যকে বিকল্পভাবে (বৃ, ৪। ৪। ২২ ; বেসূ, ৩। ৪। ১৫,) এবং জাবাল সন্ন্যাসাদি উপনিষদে মুখ্যভাবে এই মার্গই প্রতিপাদিত হইয়াছে ; এবং অষ্টাবক্র গীতাতে (৯। ৮ ; ১০। ৩-৮) ও অবধূত গীতাতে (৩। ৪৬) ইহারই অনুবাদ করা হইয়াছে। যে ব্যক্তি আত্যন্তিক সুখ কিংবা মোক্ষ লাভ করিতে চাহে, তাহার পক্ষে যত শীঘ্র হয় সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করা আবশ্যক—ইহাই এই মার্গের চরম সিদ্ধান্ত ; এবং স্মৃতি গ্রন্থাদিতে বর্ণিত ও শ্রীশঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক কলিযুগে স্থাপিত শ্রৌত-স্মার্ত্ত-কর্ম্ম-সন্ন্যাসমার্গ এই তত্ত্বের উপরেই ভর করিয়া বাহির হইয়াছে। স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, সুখ বলিয়া যদি কোন বাস্তবিক পদার্থ না থাকে, যাহা কিছু আছে তাহা দুঃখ এবং তাহাই তৃষ্ণামূলক, তাহা হইলে এই তৃষ্ণাদিরই বিকার প্রথমত সমূলে উৎপাটিত করিয়া

ফেলিলে, স্বার্থের কিংবা পরার্থের সমস্ত কচ্‌কচি বিলুপ্ত হওয়ায় মনের মূল সাম্যাবস্থা কিংবা শান্তিই শুধু অবশিষ্ট থাকিয়া যায়; এবং এই অভিপ্রায়েই মহাভারতে শান্তিপর্ব্বের অন্তর্গত পিঙ্গল গীতায় ও সেইরূপ মঙ্কিগীতাতেও

যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ সুখম্ :
তৃষ্ণাক্ষয়সুখস্যৈতে নার্হতঃ ষোড়শীং কলাম্ ॥

অর্থাৎ "ইহলোকে কাম অর্থাৎ বাসনার তৃপ্তিতে যে সুখ হয় সেই সুখ, এবং স্বর্গের যে মহৎ সুখ—এই দুই সুখের যোগ্যতা, তৃষ্ণাক্ষয়জনিত সুখের ষোল কলা পরিমাণেরও সমান নহে" এইরূপ কথিত হইয়াছে (শাং, ১৭৪। ৪৮; ১৭৭। ৪৯)। পরে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মে বৈদিক সন্ন্যাস মার্গের অনুকরণ করা হইয়াছে। তাই, এই দুই ধর্ম্মের গ্রন্থাদিতে উপরি উক্ত বচনের অনুরূপ তৃষ্ণার দুষ্পরিণাম ও ত্যাজ্যতা—আরও একটু সরস করিয়া—বর্ণিত হইয়াছে (উদাহরণার্থ ধম্মপদের অন্তর্ভূত তৃষ্ণাবর্গ দেখ)। তির্ব্বত দেশস্থ বৌদ্ধধর্ম্মের গ্রন্থাদিতে উপরি উক্ত মহাভারতের শ্লোকও, গৌতম বুদ্ধের বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইবার পর, তাঁহারই মুখ হইতে বাহির হইয়াছে। *

উপরি-উক্ত তৃষ্ণার দুষ্পরিণাম ভগবদ্‌গীতায় স্বীকৃত হয় নাই এরূপ নহে। তথাপি উহার নিবারণার্থ সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করা উচিত নহে, এইরূপ গীতার সিদ্ধান্ত হওয়ায়, উক্ত সুখদুঃখের উপপত্তি সম্বন্ধে একটু সূক্ষ্ম বিচার করা আবশ্যক। সমস্ত সুখ, তৃষ্ণাদি দুঃখের নিবারণ হইতে উৎপন্ন হয় এই সন্ন্যাস মার্গের উক্তিও প্রথমে সম্পূর্ণরূপে সত্য বলিয়া গৃহীত হয় নাই। কোন অনুভূত (দেখা শোনা প্রভৃতি) বস্তু পুনর্ব্বার অনুভব করিতে চাহিলে, এইরূপ মনে করাকে 'কাম', 'বাসনা' বা 'ইচ্ছা' বলা হইয়া থাকে; এবং ঈপ্সিত বস্তু শীঘ্র না পাইবার দরুণ দুঃখ হইয়া, এই ইচ্ছা আরও তীব্র হইতে থাকে, কিংবা প্রাপ্ত সুখ পূর্ণ মাত্রায় না হওয়ায়, উত্তরোত্তর উহা যেন আরও অধিক হয় এইরূপ মনে হইলে সেই ইচ্ছাই এই নাম প্রাপ্ত হয়। কিন্তু কেবল ইচ্ছা এইরূপে তৃষ্ণার স্বরূপ প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে যদি সেই ইচ্ছা পূর্ণ হয় তবে তজ্জনিত সুখ তৃষ্ণাদুঃখের ক্ষয় হইতে হইয়াছে এইরূপ বলিতে পারা যায় না। উদাহরণ যথা—প্রতিদিনের আহার সময়মত প্রাপ্ত হইলে, প্রতিদিন আহারের পূর্ব্বে দুঃখই হইয়া থাকে এরূপ আমাদের অনুভব নহে। সময় মত আহার না মিলিলে, প্রাণ ক্ষুধায় ব্যাকুল হইবে, নচেৎ হইবে না। ভাল; তৃষ্ণা ও ইচ্ছায় এরূপ ভেদ না করিয়া দুই-ই সমানার্থক এইরূপ স্বীকার করিলেও সমস্ত সুখ তৃষ্ণামূলকই এই সিদ্ধান্ত সত্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হয় না। উদাহরণ যথা—এক ছোট ছেলের মুখে অকস্মাৎ মিছরীর এক টুক্‌রো আসিলে, তাহা হইতে তাহার যে সুখ হয় সে সুখ পূর্ব্ব-তৃষ্ণার ক্ষয়প্রযুক্ত হইয়াছে এরূপ বলা যায় না। সেইরূপ, রাস্তায় চলিতে চলিতে কোন রমণীয় উদ্যান হইতে কোকিলের মধুর ডাক কানে আসিলে, তৎপ্রযুক্ত যে সুখ হয় সেই সুখ, প্রথমে উক্ত বস্তু প্রাপ্ত হইবার ইচ্ছা উৎপন্ন না হইলেও, আমাদের মনে অনুভূত হইয়া থাকে। এই উদাহরণের প্রতি লক্ষ্য করিলে এইরূপ বলিতে হয় যে,—সন্ন্যাস মার্গের অন্তর্ভূত সুখের উপরি-উক্ত ব্যাখ্যা ছাড়িয়া দিয়া, ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা ভাল মন্দ পদার্থের উপভোগ করিবার স্বাভাবিক যে শক্তি আছে তদনুসারে ইন্দ্রিয়গণ আপন আপন ব্যাপার সম্পাদন করিবার সময়, কোন সময়ে তাহাদের অনুকূল ও কোন সময়ে তাহাদের প্রতিকূল বিষয় প্রাপ্ত হইয়া গোড়ায় তৃষ্ণা বা ইচ্ছা না থাকিলেও, আমাদের সুখ দুঃখ হইয়া থাকে, এইরূপ বলিতে হয়। এই অভিপ্রায়েই, "মাত্রাস্পর্শের" দ্বারা শীতোষ্ণাদির অনুভব ঘটিয়া সুখদুঃখ হয়, এইরূপ গীতাতে কথিত হইয়াছে (গী, ২। ১৪)। সৃষ্টির অন্তর্গত বাহ্য পদার্থের সংজ্ঞা হইতেছে—মাত্রা। ইন্দ্রিয়াদির সহিত এই বাহ্য পদার্থের স্পর্শ অর্থাৎ সংযোগ হইলে সুখ কিংবা দুঃখ রূপ বেদনা উৎপন্ন হয়, এইরূপ ইহার অর্থ। এবং উহা কর্ম্মযোগশাস্ত্রেরও সিদ্ধান্ত। কর্কশ আওয়াজ

* Rockhill's Life of Budha, P. 33.—উদান নামক পালী গ্রন্থে (২।২) এই শ্লোকটি আছে। কিন্তু উহা বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইবার সময়, বুদ্ধের মুখ হইতে বাহির হইয়াছে—এইরূপ বর্ণনা নাই। অতএব এই শ্লোক আদিবুদ্ধের মুখ হইতে বাহির হয় নাই এইরূপ স্পষ্ট উপলব্ধি হয়।

কেন, অপ্রিয় এবং জিহ্বায় মধুর রস কেন, প্রিয় কিংবা নেত্রে পূর্ণিমার জ্যোৎস্না কেন আনন্দদায়ক মনে হয়, ইহার কারণ কেহই বলিতে পারে না। জিহ্বা মধুর রস পাইলে পরিতুষ্ট হয়, এইটুকুই আমরা জানি। আধিভৌতিক সুখের স্বরূপ, এই-রূপে কেবল ইন্দ্রিয়াধীন হওয়ায় অনেক সময় শুধু ইন্দ্রিয়ের এইরূপ ব্যাপার চলিতে থাকিলেই সুখ অনুভূত হয়;—পরে তাহার পরিণাম যাহাই হোক্ না কেন। উদাহরণ যথা—কোন চিন্তা মনে আসিলে মুখ দিয়া কখন কখন যে শব্দ সহজে বাহির হয়, তাহা কিছু কাহাকে জানাইবার জন্য নহে। উল্টা, কত সময় এই সকল স্বাভাবিক ব্যাপারে, মনের গুপ্ত অভিপ্রায় কিংবা মৎলব বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়ায় ক্ষতি হইবারও সম্ভাবনা হইয়া থাকে। ছোট ছেলেরা প্রথম চলিতে শিখিলে, সমস্ত দিন অকারণ যে ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়ায়; তাহার কারণ, চলন ক্রিয়াতেই সেই সময় তাহাদের আমোদ বোধ হয়। তাই, দুঃখেরই অভাব সমস্ত সুখ এইরূপ না বলিয়া, "ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ" (গী, ৩। ৩৪) ইন্দ্রিয়াদি ও তাহাদের শব্দস্পর্শাদি বিষয়—ইহাদের মধ্যে প্রিয় ও দ্বেষ্য এই দুই-ই 'ব্যবস্থিত' অর্থাৎ গোড়া-তেই স্বতন্ত্রসিদ্ধ—এইরূপ বলিয়া, এই ব্যাপার কিরূপে আত্মার কল্যাণদায়ক হয় কিংবা কল্যাণলাভে আমাদিগকে সমর্থ করে এইটুকুই আমাদের দেখিতে হইবে এবং সেই জন্য ইন্দ্রিয় ও মনের বৃত্তিকে একেবারে বিনাশ করিতে চেষ্টা না করিয়া, উক্ত বৃত্তি বরং আমাদের উপকারী হওয়ায় মন ও ইন্দ্রিয়-দিগকে আপনার অধীনে রাখিবে, স্বেচ্ছাচারী হইতে দিবে না,—এইরূপ ভগবানের উপদেশ। এই উপ-দেশ এবং তৃষ্ণা কিংবা তৃষ্ণারই ন্যায় অন্য সমস্ত মনোবৃত্তিকে সমূলে উচ্ছেদ করা—এই দুয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। জগতের সমস্ত কর্ত্তৃত্ব কিংবা পরাক্রম একেবারে উচ্ছিন্ন করিবে এইরূপ গীতার তাৎপর্য্য নহে; বরং আঠারো অধ্যায়ে (১৮। ২৬) সমবুদ্ধির সহিত ধৃতি ও উৎসাহ এই গুণ থাকা চাই, এইরূপ গীতাশাস্ত্র বলিয়াছেন। কিন্তু এই সম্বন্ধে অধিক বিচার আলোচনা পরে করিব। এক্ষণে, সুখ ও দুঃখ এই দুই ভিন্ন বৃত্তি কিংবা তন্মধ্যে একটি দ্বিতীয়টির অভাবমাত্র, এইটুকুই আমাদের বিবেচ্য। এবং এই বিষয় সম্বন্ধে ভগবদ্গীতার অভিপ্রায় কি, তাহা উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে পাঠকের উপলব্ধি হইবে। 'ক্ষেত্র' বস্তুট কি ইহা বলিবার সময় সুখ ও দুঃখ ইহাদের পৃথক্ পৃথক্ গণনা করা হই-য়াছে (গী, ১৩। ৬)। শুধু তাহা নহে, সুখ সত্ত্বগুণের লক্ষণ ও তৃষ্ণা রজগুণের লক্ষণ এই কথা বলিয়া, সত্ত্ব ও রজের গুণ পৃথক ধরা হইয়াছে; এই অনু-সারেও সুখ ও দুঃখ উভয়ে পরস্পরের উপযোগী কিন্তু দুই পৃথক বৃত্তি,—এইরূপ গীতায় স্বীকৃত হই-য়াছে স্পষ্টই দেখা যায়। আঠারো অধ্যায়ে "কোন কর্ম্ম দুঃখজনক বলিয়া তাহা ত্যাগ করিলে, ত্যাগের ফল লাভ হয় না, এই ত্যাগ রাজসিক" (গী ১৮। ৮) এইরূপ যে রাজসিক ত্যাগের ন্যূনতা প্রদর্শিত হইয়াছে তাহাও—"সমস্ত সুখই তৃষ্ণাক্ষয়-মূলক", এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ।

সমস্ত সুখ তৃষ্ণাক্ষয়রূপ কিংবা দুঃখ-অভাবরূপ নহে এবং সুখ ও দুঃখ এই দুই স্বতন্ত্র বস্তু এইরূপ স্বীকার করিলেও এই দুই বেদনা পরস্পরবিরুদ্ধ কিংবা প্রতিযোগী হওয়া প্রযুক্ত, যাহার দুঃখের একটুও অনুভব নাই, সে সুখের মধুরতা উপলব্ধি করিতে পারে কি না, এইরূপ ইহার পরে আর এক প্রশ্ন আছে। কেহ কেহ বলেন, দুঃখানুভব প্রথমে না হইলে, সুখের মধুরতা উপলব্ধি করা যায় না। উল্টাপক্ষে, স্বর্গস্থ দেবতাদিগের নিত্য সুখের দৃষ্টান্ত দিয়া অন্য পণ্ডিতেরা এইরূপ প্রতি-পাদন করেন যে, সুখের মধুরতা উপলব্ধি করি-বার জন্য দুঃখের পূর্ব্বানুভব অত্যাবশ্যক নহে। লবণাক্ত পদার্থের আস্বাদন ব্যতীত, মধু, গুড়, চিনি আম, কলা ইত্যাদি পদার্থের পৃথক মিষ্টত্ব যেরূপ অনুভব করা যায়, সেইরূপ সুখেরও অনেক প্রকার ভেদ আছে; তুলার গদির পর পালকের গদি কিংবা পাল্‌কীর পর তাঞ্জাম—এইরূপ সুখের পর্য্যায়ে বিরক্তি না জন্মিয়া, পূর্ব্বদুঃখানুভব ব্যতীতও সব সময়েই সুখানুভব হওয়া অশক্য নহে। কিন্তু এই জগতের ব্যবহার দেখিলে এই তর্কও নিরর্থক, এই-রূপ দেখা যায়। পুরাণে দেবতাদিগেরও সঙ্কটে পতিত হইবার অনেক উদাহরণ আছে, পুণ্যাংশ

চলিয়া গেলে, স্বর্গসুখও কালান্তরে বিলুপ্ত হয়। অতএব স্বর্গসুখের দৃষ্টান্ত উপযোগী নহে; এবং উপযোগী হইলেও স্বর্গের দৃষ্টান্ত আমাদের কি উপযোগী? "নিত্যমেব সুখং স্বর্গে" এই কথা সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেও ইহার পরেই "সুখং দুঃখমিহোভয়ম্" (সভা, শা, ১৮০।১৪)—এই সংসারে সুখ ও দুঃখ দুই মিশ্রিত হইয়া থাকে—এইরূপ কথিত হইয়াছে; এই কথা অনুসরণ করিয়াই ইহার সমর্থনেও "জগতে সর্ব্বসুখী কোন্ জন, বিচারিয়া দেখ্‌রে মন।" এইরূপ আমাদের অনুভূতি বলিয়াছে। তা ছাড়া—

"সুখং সুখেনেহ ন জাতু লভ্যং দুঃখেন সাধ্বী লভতে সুখানি"

অর্থাৎ—সুখের দ্বারা সুখ কখন মেলে না; সুখ পাইতে হইলে সাধ্বীকে কষ্ট সহ্য করিতে হয়" (সভা, বন, ২০৩।৪), এইরূপ যাহা দ্রৌপদী সত্যভামাকে উপদেশ দিয়াছেন ইহা লোকের অনুভূতি অনুসারে সত্য, এইরূপ বলিতে হয়। কারণ জাম ঠোঁটেতে পড়িলেও মুখের ভিতর দিতে হয়, এবং মুখের ভিতর গেলেও তাহা কষ্ট করিয়া চিবাইতে হয়। অন্ততঃ এইটুকু নির্ব্বিবাদ যে, দুঃখের পর প্রাপ্ত সুখের মিষ্টতা এবং সব সময়ে বিষয়ভোগে নিমগ্ন ব্যক্তির সুখের মিষ্টতা, এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। কারণ, নিত্য সুখভোগে সুখানুভব করিবার যে ইন্দ্রিয়শক্তি তাহারও তীব্রতা মন্দীভূত হয়—

"প্রায়েন শ্রীমতাং লোকে ভোক্তুং শক্তির্ন বিদ্যতে।
কাষ্ঠান্যপি হি জীর্য্যন্তে দরিদ্রাণাং চ সর্ব্বশঃ॥"

অর্থাৎ—শ্রীমন্তদিগের সুগ্রাস অন্নের সেবনেও প্রায় শক্তি থাকে না এবং দরিদ্রের কাষ্ঠও জীর্ণ হইয়া যায়—(সভা, শা, ২৮।২৯), এই কথা প্রসিদ্ধ আছে। তাই, ইহলোকের বিচার কর্ত্তব্য হইলে, দুঃখ ব্যতীত সুখ সব সময়ে অনুভূত হয়, কি হয় না, এই প্রশ্নকে লইয়া বেশী রগড়ারগড়ি করায় কোন ফল নাই। "সুখস্যানন্তরং দুঃখং দুঃখস্যানন্তরং সুখম্" (বন, ২৬০।৪৮, শা, ২৪।২৩) সুখের পরে দুঃখ এবং দুঃখের পরে সুখ লাগিয়াই আছে। কিংবা কালিদাস মেঘদূতে (মে, ১১৪) যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

"কস্যৈকান্তং সুখমুপনতং দুঃখমেকান্ততো বা।
নীচৈর্গচ্ছত্যুপরি চ দশা চক্রনেমিক্রমেণ॥"

অর্থাৎ—কাহারই নিয়ত সুখ কিংবা নিয়ত দুঃখ, এইরূপ অবস্থা না হওয়ায়, সুখদুঃখের দশা চক্রগতির ন্যায় একবার নীচু, একবার উপর হইয়া থাকে। এই ক্রম সর্ব্বদাই চলিতে থাকে। পরে এই দুঃখ, আমাদের সুখের মিষ্টতা বাড়াইবার জন্য নির্ম্মিত হইয়াছে, কিংবা প্রকৃতিজগতে তাহার হয়ত অন্য কোন উপযোগ আছে। বিরক্তি উৎপাদন না করিয়া বিষয়সুখের উপভোগও নিত্য একই প্রকার প্রাপ্ত হওয়া একেবারে অসম্ভব নহে; কিন্তু দুঃখ একেবারে বিনষ্ট হইয়া কেবল সুখের নিত্য অনুভূতি, অন্ততঃ এই কর্ম্মভূমিতে সম্ভব নহে।

জগতের ব্যবহার নিছক সুখময় না হইয়া যদি সুখদুঃখাত্মক হয়, তবে সংসারে সুখ অধিক কি দুঃখ অধিক এই তৃতীয় প্রশ্ন পরে যথাক্রমেই উপস্থিত হইয়া থাকে। আধিভৌতিক সুখই পরম সাধ্য এই কথা যাঁহারা মানেন সেই পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেকে এই কথা বলেন যে সংসারে সুখাপেক্ষা যদি দুঃখই অধিক হয় তবে সংসারের গোলযোগের মধ্যে না থাকিয়া, সকলে না হৌক অনেক লোকেই আত্মহত্যা করিত। কিন্তু যেহেতু মনুষ্য জীবনে বিরক্ত হইয়াছে এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না, অতএব সংসারে দুঃখাপেক্ষা সুখভোগই অধিক হইয়া থাকে; এবং মনুষ্যও সুখকেই পরম সাধ্য মনে করিয়া ধর্ম্মাধর্ম্মের নির্ণয়ও এই মাপকাঠীতে করিয়া থাকে। কিন্তু সংসারসুখের সহিত আত্মহত্যার সম্বন্ধটা প্রকৃতপক্ষে দেখিতে গেলে সত্য নহে। কোন প্রসঙ্গে কোন মনুষ্য সংসারে ক্লান্ত হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করে না, এরূপ নহে; কিন্তু লোকে তাহা অপবাদ বা পাগ্‌লামির মধ্যে গণনা করে। এই সম্বন্ধে প্রাণ বিসর্জ্জন করা, কি না করা—সংসার-সুখের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ না রাখিয়া, সাধারণ লোকে ইহাকে এক স্বতন্ত্র বিষয় বলিয়া মনে করে,—এইরূপ দেখা যায়; এবং সুসভ্য মনুষ্য যে অসভ্য-সমাজকে খুব কষ্টময় বলিয়া মনে করে সেই অসভ্য মনুষ্যসমাজের বিচার করিয়া

দেখিলেও এই অনুমানই নিষ্পন্ন হয়। প্রসিদ্ধ সৃষ্টিশাস্ত্রজ্ঞ চার্লস্ ডার্বিন আপন প্রবাস-গ্রন্থে, দক্ষিণ আমেরিকার অত্যন্ত দক্ষিণ প্রান্তে যে সব অসভ্য লোক দেখিয়া আসিয়াছিলেন সেই অসভ্য লোকদিগের বর্ণনা করিবার সময় এইরূপ লিখিতেছেন যে, এই অসভ্য লোক—পুরুষ ও স্ত্রী স্বকীয় অত্যন্ত শীতদেশে বারো মাস বিনা বস্ত্রে বেড়িয়া বেড়ায় এবং নিকটে অন্নের সংগ্রহ না থাকা প্রযুক্ত, কত দিবস তাহাদিগকে বিনা অন্নেই কালাতিপাত করিতে হয়; তথাপি তাহাদের সন্তান সন্ততি বাড়িয়াই চলিয়াছে। * কিন্তু এইরূপ অসভ্য মনুষ্যও প্রাণ বিসর্জ্জন করে না, ইঁহার এই কথা ধরিয়া, তাহাদের সংসার সুখময়, এইরূপ কেহ অনুমান করে না। তাহারা আত্মহত্যা করে না, একথা ঠিক্; কিন্তু তাহার কারণ কি, সূক্ষ্মবিচার করিলে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, "আমি পশু নহি, আমি মনুষ্য" ইহাতেই প্রত্যেক ব্যক্তি অত্যন্ত আনন্দের বিষয় বলিয়া মনে করে; এবং আর সমস্ত সুখ অপেক্ষা মনুষ্য হওয়ারূপ সুখের পরিমাণ এত বেশী বলিয়া মনে করে যে, সংসার যতই কষ্টময় হোক্ না কেন, সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া মনুষ্যত্বের এই শ্রেষ্ঠ আনন্দ হারাইবার জন্য সে কখনই প্রস্তুত থাকে না। মনুষ্য কেন, পশুপক্ষীও আত্মহত্যা করে না। তাই, তাহাদের সংসারও সুখময় হইয়াছে কি? সুতরাং মনুষ্য কিংবা পশুপক্ষী প্রাণ বিসর্জ্জন করে না, এই বলিয়াই তাহাদের সংসার সুখময় এইরূপ ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত না করিয়া, সংসার যাহাই হউক, তাহার অপেক্ষা না রাখিয়া নিছক্ অচেতনের সচেতনে পরিণত হওয়াতেই অনুপম আনন্দ আছে, এবং তাহাতে মনুষ্যত্বের আনন্দ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এই সত্য সিদ্ধান্তই উহা হইতে বাহির হয়, এইরূপ আমাদের শাস্ত্রকারেরা স্থির করিয়াছেন—

ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ।
বুদ্ধিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠা নরেষু ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ॥
ব্রাহ্মণেষু চ বিদ্বাংসঃ বিদ্বৎসু কৃতবুদ্ধয়ঃ।
কৃতবুদ্ধিষু কর্ত্তারঃ কর্ত্তৃষু ব্রহ্মবাদিনঃ॥

* Darwin's Naturalist's Voyage round the World. Chap XI.

অর্থাৎ অচেতনদিগের মধ্যে সচেতন, সচেতনের মধ্যে বুদ্ধিসম্পন্ন মনুষ্য, মনুষ্যের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের মধ্যে বিদ্বান্, বিদ্বানের মধ্যে কৃতবুদ্ধি (যাহার সুসংস্কৃত বুদ্ধি), কৃতবুদ্ধির মধ্যে কর্ত্তা এবং কর্ত্তাদিগের মধ্যে ব্রহ্মবাদী শ্রেষ্ঠ" এইরূপ, শাস্ত্রে যে ক্রমোচ্চপদবীর বর্ণনা আছে তাহা এইভাবেই প্রযুক্ত হইয়াছে (মনু, ১, ৯৬, ৯৭; সভা, উদ্যো, ৫, ১ ও ২); এবং এই নীতি অনুসারে ৮৪ লক্ষ যোনির মধ্যে নরদেহ শ্রেষ্ঠ, নরের মধ্যে মুমুক্ষু ও মুমুক্ষুর মধ্যে সিদ্ধ শ্রেষ্ঠ—এইরূপ প্রাকৃত গ্রন্থাদিতেও কথিত হইয়াছে। "সব্‌সে জীব প্যারা" এই যে চলিত কথা আছে তাহার তাৎপর্য্যই এই; এই কারণেই সংসার দুঃখময় হইলেও, কেহ আত্মহত্যা করিলে, লোকে তাহাকে পাগল ও ধর্ম্মশাস্ত্রে তাহাকে পাপী বলিয়া মনে করে (সভা, কর্ণ, ৭০, ১৮); এবং আত্মহত্যার চেষ্টা আইনে অপরাধ বলিয়া ধরা হইয়া থাকে। মনুষ্য আত্মহত্যা করে না—এই কথা ধরিরা, সংসারের সুখময়ত্বের সিদ্ধান্ত করা ঠিক নহে, এইরূপ সিদ্ধ হইলে পর, সংসার সুখময় কি দুঃখময় এই প্রশ্নের নির্ণয়ে, পূর্ব্বকর্ম্মানুসারে কোন বিশেষ পদবীতে পতিত নরদেহ প্রাপ্তির নৈসর্গিক ভাগ্য, একপাশে সরাইয়া রাখিয়া, তদুত্তরকালীন অর্থাৎ সংসার-ঘটিত বিষয়েরই আমাদের এক্ষণে বিচার করা আবশ্যক। মনুষ্য জীবন বিসর্জ্জন করে না, কিংবা জীবন্ত থাকে,—ইহাই সংসার প্রবৃত্তির কারণ; আধিভৌতিক পণ্ডিত বলেন, তদনুসারে সাংসারিক সুখদুঃখের পূর্ণতা হয় না। কিংবা, এই অর্থই অন্য শব্দের দ্বারা ব্যক্ত করা হইলে, এইরূপ বলিতে হয় যে, প্রাণ বিসর্জ্জন না করিবার বুদ্ধি নৈসর্গিক,—সাংসারিক সুখদুঃখের তারতম্য হইতে উৎপন্ন নহে; এবং সেই জন্যই সংসার সুখময় এই কথা উহা হইতে সিদ্ধ হইতে পারে না।

কেবলমাত্র মনুষ্যজন্মের মহদ্‌ভাগ্য এবং তৎপরে মনুষ্যের সংসার এই দুয়ের ভ্রান্তিজনক মিশ্রণ না করিয়া, মনুষ্যত্ব ও মনুষ্যের সংসার অর্থাৎ নিত্য ব্যবহার, এই উভয়কেই পৃথক করিয়া সংসারে শ্রেষ্ঠ নরদেহধারী প্রাণীর সুখ অধিক, কি দুঃখ অধিক, এই প্রশ্ন সমাধান করিতে হইলে, প্রত্যেক মনু-

য্যের "উপস্থিত" বাসনার মধ্যে কত বাসনা সফল ও কত বাসনা নিষ্ফল হয়, ইহা দেখা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। 'উপস্থিত' এইরূপ বলিবার কারণ এই, যে সব জিনিস সভ্য অবস্থায় সকলেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহা নিত্য ব্যবহারে আসায়, তদুৎপন্ন সুখ আমরা ভুলিয়া যাই; এবং যে বস্তুর গরজ নূতন উৎপন্ন হয়, তাহার মধ্যে কোন্‌টা পাওয়া গেল তাহা দেখিয়া এবং তাহা ধরিয়াই আমরা সংসারের সুখদুঃখের নির্ণয় করিয়া থাকি। বর্ত্তমান কালে আমরা কত সুখসাধন প্রাপ্ত হইয়াছি তাহার তুলনা করা এবং আজিকার মুহূর্ত্তে আমি সুখী কি সুখী নই তাহার বিচার করা—এই দুই বিষয় অত্যন্ত ভিন্ন। উদাহরণ যথা—শত বৎসর পূর্ব্বে, গরুর গাড়িতে ভ্রমণ করা অপেক্ষা এখনকার আগ্‌-গাড়ীতে ভ্রমণ করা খুবই সুখদায়ক, এ কথা সকলেই স্বীকার করিবে। কিন্তু আগ্‌গাড়িতে ভ্রমণ-সুখের এই সুখত্ব এক্ষণে আমরা ভুলিয়া যাওয়ায়, কোনদিন গাড়ী আসিতে বিলম্ব হওয়ায় ডাকে চিঠি পাইতে বিলম্ব হইলে আমাদের বড় খারাপ লাগে। তাই, উপলব্ধ সুখসাধন ধর্ত্তব্যের মধ্যে না আনিয়া, মনুষ্য উপস্থিত গরজ অনুসারে উপস্থিত সুখদুঃখের বিচার করিয়া থাকে। এবং এই গরজ যাহাই হউক না কেন, একবার দেখা দিলে, তাহার আর শেষ হয় না, এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। আজ এক ইচ্ছা সফল হইলে পর, কাল সেই জায়গায় নূতন ইচ্ছা উৎপন্ন হয় এবং এই নূতন ইচ্ছা সফল করিতে হইবে, এইরূপ মনে হইতে থাকে; এবং মানুষের ইচ্ছার এই দৌড় প্রায়ই এক পোয়া মাত্রা এগাইয়া যাওয়ায় মানুষের অদৃষ্টে দুঃখ আর ছাড়ে না। সমস্ত সুখই তৃষ্ণাক্ষয়রূপ এবং যতই সুখলাভ হোক্ না কেন, মনুষ্য আবার অসন্তুষ্ট হয়, এই দুই বিষয়ের ভেদ এই স্থানে ঠিক লক্ষ্য করা আবশ্যক। প্রত্যেক সুখদুঃখ-অভাবরূপ না হওয়ায়, সুখ ও দুঃখ, ইন্দ্রিয়ের এই দুই স্বতন্ত্র বেদনা, এ কথা আলাদা; এবং এক সময়ে কোন প্রাপ্ত সুখ ধর্ত্তব্যের মধ্যে না আনিয়া আরও সুখলাভ করা চাই বলিয়া অসন্তুষ্ট থাকা আলাদা। প্রথম তর্ক সুখের বস্তুস্বরূপ লইয়া; এবং প্রাপ্ত সুখে পূর্ণ তৃপ্তি হয়, কি হয় না—ইহা আর এক প্রশ্ন। বিষয়বাসনা সর্ব্বদাই সমান বাড়িয়া যায় বলিয়া প্রতিদিন নূতন নূতন সুখ লাভ না হইলেও পূর্ব্ব সুখ পুনঃ পুনঃ ভোগ করিব এইরূপ মনে করিয়া মনের আকাঙ্ক্ষার কিছুমাত্র হ্রাস হয় না। ভিটেলিয়স্ নামে এক রোমক সম্রাটের সম্বন্ধে এইরূপ কথিত হইয়া থাকে যে, জিহ্বার সুখ পুনঃ পুনঃ লইবার জন্য উদরস্থ অন্ন বাহির করিয়া ফেলিবার ঔষধ সেবন করিয়া প্রতিদিন তিনি অনেকবার ভোজন করিতেন! কিন্তু এই প্রসঙ্গে যযাতি রাজার কথা ইহা অপেক্ষা আরও জ্ঞানপ্রদ। যযাতি রাজা শুক্রাচার্য্যের শাপে জরাগ্রস্ত হইলে সেই জরা অন্যকে দিয়া তৎপরিবর্ত্তে তাঁহার তারুণ্য গ্রহণ করিতে পারিবেন বলিয়া শুক্রাচার্য্য কৃপা করিয়া তাহার সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। তখন নিজ পুত্রের যৌবন লইয়া, যযাতি এক হাজার বৎসর সমান বিষয় সুখ উপভোগ করিলে পর, পৃথিবীর সমস্ত পদার্থ একজন মনুষ্যের সুখবাসনা তৃপ্ত করিতে অসমর্থ এইরূপ তাঁহার উপলব্ধি হইল; এবং

"ন জাতু কামঃ কামানাং উপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে॥

অর্থাৎ "সুখের উপভোগে বিষয়বাসনার তৃপ্তি না হইয়া হবন দ্রব্যের দ্বারা যেরূপ অগ্নি সেইরূপ উপভোগে বিষয়বাসনা আরও বৃদ্ধি পায়"—তাঁহার মুখ হইতে এই কথা বাহির হইল, এইরূপ মহাভারতের আদিপর্ব্বে ব্যাস বর্ণনা করিয়াছেন (আ, ৭৫।৪৯); এবং এই শ্লোকই মনুস্মৃতিতেও প্রদত্ত হইয়াছে (মনু, ২।৯৪)। সুখসাধন যতই অধিক হউক না কেন, ইন্দ্রিয়ের লালসা সতত বর্দ্ধিত হওয়া প্রযুক্ত কেবল সুখভোগের দ্বারা সুখেচ্ছা কখনই তৃপ্ত হয় না, সুখেচ্ছার তৃপ্তিসাধনের জন্য আর একটা কোন বিষয়সুখ আবশ্যক হয়, ঐটি ইহার বীজ; এবং এই তত্ত্ব আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থকারদিগের অভিমত হওয়ায়, প্রত্যেক ব্যক্তির কামোপভোগে সংযম অবলম্বন করা আবশ্যক, ইহাই তাঁহাদের প্রথম বক্তব্য। বিষয়োপভোগই এই সংসারের পরম সাধ্য, এইরূপ যাঁহারা বলেন তাঁহারা এই আনুভবিক সিদ্ধান্তের প্রতি একটু লক্ষ্য করিলেই তাঁহাদের মতের অসারতা তাঁহাদের সহজেই উপলব্ধি হইবে। বৈদিক ধর্ম্মের

এই সিদ্ধান্ত বৌদ্ধধর্ম্মেও স্বীকৃত হওয়ায় যযাতির পরিবর্ত্তে মান্ধাতা নামক পৌরাণিক রাজার মুখ দিয়া মৃত্যুকালে—

ন কহাপণবর্ষেণ তৃপ্তি কামেষু বিদ্যতে।
অ'প দিব্যেষু কামেষু রতিং সো নাধিগচ্ছতি॥

অর্থাৎ—কর্ষাপণ নামক মোহরের বৃষ্টি হইলেও কামের তৃপ্তি হয় না, এবং স্বর্গসুখ মিলিলেও কামী পুরুষের কামের নিবৃত্তি হয় না,—এইরূপ কথা বাহির হয়,—এইরূপ বৌদ্ধগ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে (ধর্ম্মপদ ১৮৯, ১৮৭)। এইরূপ কখন না কখন বিষয়োপভোগের পূর্ণতা আবশ্যক হওয়ায় প্রত্যেক মনুষ্য মনে করে—"আমি দুঃখী"; মনুষ্যমাত্রের এই অবস্থা লক্ষ্য করিলে মহাভারতের উক্তি অনুসারে—

সুখাদ্বহুতরং দুঃখং জীবিতে নাস্তি সংশয়ঃ॥

অর্থাৎ এই জীবনে অর্থাৎ এই সংসারে সুখ অপেক্ষা দুঃখই অধিক। (শা, ২০৫।৬; ৩৩০।১৬) কিংবা তুকারাম বাবার বর্ণনা অনুসারে (তুকা, গা, ২৯৮৮)—

"সুখপাহতা জবাপাতেঁ। দুঃখ পর্ব্বতা এবঢেঁ॥"

অর্থাৎ—সুখ যব-প্রমাণ, দুঃখ পর্ব্বত প্রমাণ—এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতেই হয়। উপনিষৎকারদিগেরও এইরূপ সিদ্ধান্ত; (মৈত্র্য, ১০২-৪)। গীতাতেও মনুষ্যের জন্ম অ-শাশ্বত ও 'দুঃখের ঘর' এবং পৃথিবীতে সংসার অনিত্য ও সুখহীন (গী, ৮।১৫; ৯।৩৩) এইরূপ কথিত হইয়াছে। জর্ম্মন পণ্ডিত শোপেন হৌয়েরও এই মত হওয়ায়, উহা সপ্রমাণ করিবার জন্য এই দৃষ্টান্ত যোজনা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, মনুষ্যের সমস্ত সুখেচ্ছার মধ্যে যত সুখের ইচ্ছা সফল হয় সেই পরিমাণে আমরা তাহাকে সুখী মনে করি; এবং সুখোপভোগ সুখেচ্ছা অপেক্ষা কম হইলে সেই মনুষ্যকে সেই পরিমাণে দুঃখী বলি। ইহা গণিতের রীতিতে দেখাইতে হইলে, সুখেচ্ছার দ্বারা ভাগ করিয়া ভগ্নাংশরূপে এইরূপ লিখিতে হয় যথা—$\frac{\text{সুখোপভোগ}}{\text{সুখেচ্ছা}}$ কিন্তু এই ভগ্নাংশের এই একটু বিশেষত্ব যে, তাহার বিভাজক অর্থাৎ সুখেচ্ছা তাহার বিভাজ্য অপেক্ষা অর্থাৎ সুখোপভোগ অপেক্ষা বরাবরই অধিক পরিমাণে বাড়িতে থাকায় এই ভগ্নাংশ প্রথমে $\frac{১}{২}$ ও পরে $\frac{৯}{১০}$ হইলে, বিভাজ্য তিন গুণ ও বিভাজক পাঁচ গুণ বাড়িয়া অধিকাধিক ভগ্নাংশই থাকিয়া যায়! অতএব মনুষ্যের পূর্ণ সুখ আশা করা ব্যর্থ। প্রাচীনকালে, সুখ কি পরিমাণ হয় তাহার বিচার করিবার সময় এই ভগ্নাংশের বিভাজ্যেরও আমরা স্বতন্ত্র বিচার করি বলিয়া, বিভাজ্য অংশ অপেক্ষা বিভাজক যে বেশী বাড়িয়াছে সেদিকে আমরা লক্ষ্য করি না। কিন্তু কালের অপেক্ষা না করিয়া মনুষ্যপ্রাণী সুখী কি দুঃখী ইহারও যখন নির্ণয় করিতে হয় তখন বিভাজ্য ও বিভাজক এই দুয়েরই বিচার করা নিতান্তই আবশ্যক হয়; এবং পরে এই অপূর্ণক কখনই পূর্ণ হইতে পারে না এইরূপ উপলব্ধি হয়। "ন জাতু কামঃ কামানাং" এই মনু বচনের (২, ৯৪) অর্থই এই। সুখদুঃখ মাপিবার উষ্ণতামাপক যন্ত্রের মত কোন নিশ্চিত সাধন না থাকায়, গণিতের পদ্ধতি অনুসারে এইরূপ সুখদুঃখের তারতম্য বিন্যাস কেহ কেহ গ্রাহ্য করিবেন না। কিন্তু এই যুক্তিক্রমে সংসারে মনুষ্যের সুখ অধিক ইহা প্রমাণ করিবারও কোন মাপযোগ নাই। তাই উভয়পক্ষের সাধারণ এই আপত্তির দ্বারা উক্ত সাধারণ সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে অর্থাৎ সুখোপভোগাপেক্ষা সুখেচ্ছার অসংযত বৃদ্ধি হয় এই যে সিদ্ধান্ত এই সিদ্ধান্তের পক্ষে কোনও বাধা হইতে পারে না। স্পেন দেশে যখন মুসলমান রাজ্য ছিল সেই সময় তৃতীয় আবদুল রহমান * নামক তত্রস্থ এক ন্যায়পরায়ণ ও পরাক্রমী সম্রাট নিজের দিনগুলি কেমন কাটিতেছে তাহার রোজনামচা রাখিতেন এবং সেই রোজনামচা অনুসারে, তাঁহার রাজত্বের ৫০ বৎসরের মধ্যে ১৪ দিন মাত্র পূর্ণ সুখে কাটিয়াছে তিনি দেখিতে পাইলেন, এইরূপ মুসলমান ইতিহাসে কথিত হইয়াছে; এবং জগতে ও বিশেষতঃ য়ুরোপখণ্ডে, প্রাচীন ও অর্ব্বাচীন তত্ত্বজ্ঞানীদের মত যদি দেখা যায় তবে, "সংসার সুখময়"-প্রতিপাদনকারীর সংখ্যা ও "সংসার দুঃখময়-" প্রতিপাদনকারীর সংখ্যা—এই দুই সংখ্যাই সমান

* Moors in Spain, P. 128. (Story of the Nations series).

দেখা যায়, এইরূপ একজন লিখিয়াছেন। * এই সংখ্যার উপর হিন্দু-তত্ত্বজ্ঞানীর মতের ভার চাপাইলে, তৌল কোন্‌দিকে ঝুঁকিবে তাহা আর বলিতে হইবে না।

সাংসারিক সুখদুঃখের উপরি উক্ত সিদ্ধান্ত শুনিয়া কোন সন্ন্যাসমার্গী ব্যক্তি আবার এইরূপ প্রশ্ন করিবেন যে, "সুখ বাস্তবিক পদার্থ না হওয়ায় তৃষ্ণাত্মক সমস্ত কর্ম্ম না ছাড়িলে শান্তি নাই", এই কথা তুমি স্বীকার না করিলেও, তোমার কথা অনুসারে তৃষ্ণা হইতে অসন্তোষ ও অসন্তোষ হইতে পরে যদি দুঃখ হয়,তাহা হইলে নিদেন এই অসন্তোষ দূর করিবার জন্য মনুষ্য, তৃষ্ণা ও তৃষ্ণার সহিত সমস্ত সাংসারিক কর্ম্ম—তাহা পরোপকারের জন্যই হৌক্ বা স্বার্থপ্রীত্যর্থেই হৌক—ত্যাগ করিয়া সর্ব্বদাই সন্তুষ্ট থাকিবে এইরূপ বলিতে বাধা কি? মহাভারতেও "অসন্তোষস্য নাস্ত্যন্তস্তুষ্টিস্তু পরমং সুখম্"—অসন্তোষের অন্ত নাই, সন্তোষই পরম সুখ—এইরূপ বচন আছে (সভা, বন, ২১৫, ২২) জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মের ভিত্তিও এই তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং পাশ্চাত্য দেশে শোপেন্ হৌয়ের এই মত অর্ব্বাচীন কালে প্রতিপাদন করিয়াছেন। † কিন্তু ইহার উল্টাপক্ষে এইরূপ বিচারও করা যাইতে পারে যে, জিহ্বা দ্বারা কখন কখন অপশব্দ উচ্চারিত হয় বলিয়া, জিহবার সহিত সমস্ত সম্বন্ধ উচ্ছেদ করিতে হইবে কি? কিংবা অগ্নির দ্বারা কখন কখন গৃহদাহ হয় বলিয়া কি, সমস্ত অগ্নিকে বিসর্জ্জন দিয়া লোকে রাঁধাবাড়াও ছাড়িয়া দিয়াছে কি? অগ্নির কথা কি, বিদ্যুৎশক্তিকেও যোগ্য সীমার মধ্যে রাখিয়া আমরা যদি তাহাকে নিত্য কাজে খাটাইয়া লই, তবে তৃষ্ণা কিংবা অসন্তোষের সেইরূপ কোন ব্যবস্থা করা অসাধ্য নহে। অসন্তোষ যদি সর্ব্বাংশে কিংবা সর্ব্বপ্রসঙ্গে অ-লাভজনক হয়, তবে সে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু বিচারান্তে সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। অসন্তোষ অর্থে নিছক আকাঙ্ক্ষা বা হাহুতাশ এরূপ নহে। এই অসন্তোষ শাস্ত্রকারেরাও গর্হিত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের প্রাপ্ত অবস্থাতে কেবলি আক্ষেপ করিতে না থাকিয়া শান্ত ও সমচিত্ততার সহিত যথাশক্তি ঐ অবস্থার উত্তরোত্তর সংশোধন করিয়া যথাসাধ্য উহাকে উত্তম অবস্থায় পরিণত করিবার যে ইচ্ছা তাহারই মূলভূত যে অসন্তোষ তাহা গর্হিত বলিয়া কখন স্বীকার করা যাইতে পারে না। চাতুর্ব্বর্ণ্যের বন্ধনে আবদ্ধ সমাজে ব্রাহ্মণ যদি জ্ঞানের, ক্ষত্রিয় যদি ঐশ্বর্য্যের ও বৈশ্য যদি ধনধান্যের এই প্রকার ইচ্ছা বা বাসনা ছাড়িয়া দেয় তাহা হইলে সমাজ শীঘ্রই অধোগতি প্রাপ্ত হয়, এ কথা আর বলিতে হইবে না। এই অভিপ্রায়ই মনেতে আনিয়া ব্যাস "যজ্ঞো বিদ্যা সমুত্থানমসন্তোষঃ শ্রিয়ং প্রতি" (শাং ২৩।৯)—অর্থাৎ—"যজ্ঞ, বিদ্যা, উদ্যোগ ও ঐশ্বর্য্য বিষয়ে অসন্তোষই ক্ষত্রিয়ের গুণ"—এইরূপ যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন। সেইরূপ বিদুর আপন পুত্রকে উপদেশ করিবার সময় "সন্তোষো বৈ শ্রিয়ং হন্তি" (সভা, উ, ১৩২।৩৩) অর্থাৎ—সন্তোষে ঐশ্বর্য্যনাশ হয়, এইরূপ বলিয়াছেন। "অসন্তোষঃ শ্রিয়ো মূলং" (সভা, ৫৫।১১), এইরূপ অন্য এক প্রসঙ্গেও এই কথা বলা হইয়াছে। * ব্রাহ্মণধর্ম্মে সন্তোষকে গুণ বলা হইয়াছে; তথাপি তাহার অর্থ চাতুর্ব্বর্ণ্যধর্ম্মানুসারে দ্রব্যবিষয়ে কিংবা ঐহিক ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে সন্তোষ ইহাই অভিপ্রেত।

আমি যেটুকু জ্ঞানলাভ করিয়াছি তাহাতেই আমি সন্তুষ্ট এইরূপ যদি কোন ব্রাহ্মণ বলে, তাহা হইলে সে নিজের সর্ব্বনাশ করে; এবং বৈশ্য কিংবা শূদ্র আপন আপন ধর্ম্মানুসারে যাহা পাইয়াছে তাহাতেই যদি সন্তুষ্ট থাকে, তাহারও এইরূপ দশা হয়। সারাংশ,—অসন্তোষই সর্ব্বভাবে উৎকর্ষ, প্রযত্ন, ঐশ্বর্য্য ও মোক্ষের বীজ; এবং এই অসন্তোষ যদি আমরা সর্ব্বাংশে বিনষ্ট করি তাহা হইলে ইহলোকে ও পরলোকেও আমাদের ভাল হয় না, ইহা প্রত্যেকের সর্ব্বদাই মনে রাখা আবশ্যক। ভগবদ্‌গীতাতেও শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ শুনিবার সময় "ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তিহি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতম্" (গী,

* Macmillan's Promotion of Happiness. P. 26.

† ইংরাজীতে ইহাকে Enlightened Self-interest বলে। তন্মধ্যে enlightened ইহার ভাবান্তর আমি 'উদাত্ত' কিংবা জ্ঞানদীপ্ত এইরূপ করিয়াছি।

* cf, "Unhappiness is the cause of progress". Dr. Paul Carus' The Ethical Problem, P. 251 (2nd Ed).

১০, ১৮)—অর্থাৎ "তোমার অমৃতবৎ কথা শুনিয়া আমার তৃপ্তি হয় না, তোমার বিভূতির কথা পুনঃ পুনঃ আমাকে বল"—এই কথা অর্জ্জুন বলিলে পর ভগবান আবার বিভূতির কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন; তুমি আপন ইচ্ছা সম্বরণ কর, অতৃপ্তি বা অসন্তোষ যোগ্য নহে, এইরূপ উপদেশ তিনি করেন নাই। ইহা হইতে দেখা যায়, ভাল কিংবা কল্যাণকর বিষয় সম্বন্ধে উচিত অসন্তোষ হওয়া ভগবানেরও অভীষ্ট এইরূপ সিদ্ধ হইতেছে; এবং "যশসি চাভিরুচির্ব্যসনং শ্রুতৌ" অর্থাৎ অভিরুচি হওয়া চাই যশের অভিরুচি, ব্যসন হওয়া চাই বিদ্যার ব্যসন,—তাহা গর্হিত নহে; এইরূপ ভর্ত্তৃহারিরও এক শ্লোক আছে। কামক্রোধাদির বিকারানুসারে অসন্তোষকেও অসংযত হইতে দেওয়া ঠিক্ নহে। অসংযত হইলে তাহা সর্ব্বস্ব নাশ করিবে, ইহা ত স্পষ্টই দেখা যায়; এবং এই হেতু কেবল বিষয়ভোগের জন্য তৃষ্ণার উপর তৃষ্ণা কিংবা আশার উপর আশা চাপাইয়া ঐহিক সুখের সম্মুখে একেবারে ছুটিয়া চলে যে ব্যক্তি, সেই ব্যক্তির সম্পদকে গীতার ষোড়শ অধ্যায়ে "আসুরী সম্পৎ" বলা হইয়াছে। এইরূপ অসংযত লালসার দরুণ মানবমনের সাত্ত্বিক বৃত্তির উচ্ছেদ হইয়া মনুষ্য শুধু অধোগতি প্রাপ্ত হয় তাহা নহে, তৃষ্ণাও কখনও তৃপ্ত হইতে না পারায় কামোপভোগ-বাসনা অধিকাধিক বাড়িয়া গিয়া তাহাতেই শেষে মনুষ্যের বিনাশ হয়। কিন্তু উল্টা পক্ষে, তৃষ্ণা কিংবা অসন্তোষের এই দুষ্পরিণাম পরিহার করিবার জন্য সর্ব্বপ্রকার তৃষ্ণা ও সেই সঙ্গে একেবারে সমস্ত কর্ম্মত্যাগ করাও সাত্ত্বিক মার্গ নহে। উপরি উক্ত কথা অনুসারে, তৃষ্ণা কিংবা অসন্তোষই ভাবী উৎকর্ষের বীজ; তাই চোরের ভয়ে নির্দ্দোষকে মারিবার প্রযত্ন না করিয়া কোন্ তৃষ্ণা হইতে কিংবা অসন্তোষ হইতে দুঃখ হয় তাহার ঠিক বিচার করিয়া সেইরূপ দুঃখজনক আশা, তৃষ্ণা বা অসন্তোষ ত্যাগ করাই যুক্তির মধ্যমার্গ স্বীকার করিতে হইবে। সেই জন্য সমস্ত কর্ম্মত্যাগ করিবার কারণ নাই। দুঃখজনক আশা ছাড়িয়া দিয়া স্বধর্ম্মানুসারে কর্ম্ম করিবার যে এই যুক্তি বা কৌশল তাহাকেই 'যোগ' বা 'কর্ম্মযোগ' বলে (গী, ২।৫০); এবং তাহাই গীতাতে মুখ্যরূপে প্রতিপাদিত হওয়ায় গীতাতে কোন্ প্রকারের আশা দুঃখজনক বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে, সেই সম্বন্ধে এইখানে আরও কিছু বিচার আলোচনা করিব।

(ক্রমশঃ)

উন্নতি-প্রসঙ্গ।

গত পৌষমাসে কলিকাতায় একটা প্রাণের ঢেউ খেলিয়া গিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কংগ্রেস, কন্‌ফারেন্স প্রভৃতি বিরাট সম্মিলনসমূহে যে প্রকার উৎসাহ, যে প্রকার জীবন প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা আশাতীত—কেহই তাহা কল্পনাতেও আনিতে পারেন নাই। ভারতবাসী যে এখনও মরে নাই এবং শীঘ্র যে মৃত্যুমুখে পড়িবে না, এবারকার এই প্রাণতরঙ্গের প্রকাশে তাহার বহুল পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

কংগ্রেস—কংগ্রেস ও তদানুসঙ্গিক অন্যান্য সম্মিলন হইতে উন্নতির ভিত্তিস্বরূপে এই এক মহাবাণী লাভ করিয়াছি যে উন্নতির অভিমুখে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে চাহিলে তোমার একেলা ছুটিয়া চলিলে বিশেষ কোন লাভ হইবে না—তোমার পরিবারকে, তোমার সমাজকে তোমার দেশকে সঙ্গে লইয়া সকলের সঙ্গে হাত ধরাধরি করিয়া চলিতে হইবে। ঐ যে কংগ্রেসের নেতৃবর্গের মধ্যে বিরোধাগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, যদি তাহা স্থির থাকিত, তবে দেশের উন্নতি, সমাজের উন্নতি এবং সঙ্গে সঙ্গে তোমার নিজের উন্নতি যে অনেক বৎসর পিছাইয়া যাইত, সে বিষয়ে কি কোন সন্দেহ আছে? কাহাকে কংগ্রেসের সভাপতি করিলে ভাল হইত, সে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা একটী ধর্ম্মসমাজের মুখপত্রের ক্ষেত্রবহির্ভূত বলিয়া সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে নিরস্ত রহিলাম। কিন্তু এই সভাপতি নির্ব্বাচনে পরিণামে দলাদলি ঘুচিয়া গিয়া ভারতের সকল দল, সকল জাতি মিলিত হইয়াছে, ইহাতেই আমরা ভারতের ভবিষ্যতের জন্য বিশেষ আশান্বিত হইতে পারিতেছি এবং আনন্দে আমাদের হৃদয় বিস্ফারিত হইতেছে। সভাপতি নির্ব্বাচন সম্বন্ধে দু'একটি কথা না বলিলেও ঠিক হয় না—এবিষয় লইয়া এবার এতই কোলাহল উঠিয়াছিল। অনেক কোলাহল কলরবের পরিণামে শ্রীমতী অ্যানি বেসাণ্ট কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ভারতের সকল দল, সকল জাতি একমত হইয়াই তাঁহাকে নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন। কেবল ইঙ্গভারতীয় কয়েকটী সংবাদপত্র এবং তাহাদের অনুগামী বিলাতের কয়েকটী সংবাদপত্র এই নির্ব্বাচনের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলিয়াছিল।

সেই সকল কথার মধ্যে দুইটী বিষয় লইয়া বড় বেশী নাড়াচাড়া হইয়াছিল। একটী হইতেছে—শ্রীমতী বেসাণ্ট পাশ্চাত্য মহিলা এবং দ্বিতীয়টী হইতেছে তিনি রমণী। সেই সকল সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ স্বার্থপরতার দ্বারা পরিচালিত না হইলে এই দুইটী বিষয় লইয়া এত হৈ চৈ করিবার প্রবৃত্তিই তাঁহাদের আসিত না। ধর্ম্মের উন্নত ভূমির উপর দাঁড়াইয়া দেখিলে বেশ বুঝা যাইবে যে একজন পাশ্চাত্য মহিলাকে সভাপতি নির্ব্বাচন করিবার কারণে কংগ্রেস অশুদ্ধ হইতে পারে না। যে মহিলা আজ বহুবৎসর ধরিয়া স্বদেশের পরিবর্ত্তে ভারতবর্ষকে আপনার দেশ করিয়া লইয়াছেন, এই দেশের সেবায় যিনি "তন-মন-ধন" উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহাকে পাশ্চাত্য বলিয়া জাতীয় কার্য্যে নিযুক্ত করা কিছুতেই অসঙ্গত নহে, নিযুক্ত না করাই অসঙ্গত। শ্রীমতী বেসাণ্টকে যদি বিদেশীয় বলিয়া দেশের কার্য্যে তাঁহাকে আহ্বান করা অনুচিত হয়, তবে যে পার্শি সম্প্রদায় বহুশত বৎসর পূর্ব্বে এদেশে আসিয়াও পরিচ্ছদ প্রভৃতি সামাজিক বিষয়ে, ধর্ম্মবিষয়ে নিজেদের বিশেষত্ব রক্ষা করিয়া আসিতেছে, তাহাদিগকেও ভারতের কোন কার্য্যে আহ্বান করা সঙ্গত নহে। এরূপ প্রস্তাব যেমন অসঙ্গত তেমনি হাস্যাস্পদ।

দ্বিতীয় কথা এই যে শ্রীমতী বেসাণ্ট রমণী। যদি মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাঁহার সুবিস্তৃত সাম্রাজ্য সুশাসনে রাখিয়া শান্তির আবাসভূমি করিতে পারিলেন, তখন কংগ্রেসের সভাপতি একজন শক্তিশালী রমণী হইতে পারিবেন না কেন, তাহার কারণ তো বুঝিলাম না। আসল কথা এই যে, প্রতিবাদকারী সম্পাদকগণের ভয় এই যে, সভাপতি তাঁহার অভিভাষণে নানাবিধ অত্যাচার অবিচারের কথা খুলিয়া বলিবেন, এবং সে কথা বিলাতের সাধারণত ন্যায়নিষ্ঠ জনসাধারণ এবং ধর্ম্ম পরায়ণ সম্রাটের কর্ণগোচর হইলে তাঁহারা ভারতে সম্পূর্ণভাবে স্বায়ত্তশাসন প্রদান না করিয়া থাকিতে পারিবেন না।

স্বায়ত্তশাসন—এবারকার কংগ্রেসের প্রধানতম মন্ত্র ধ্বনিত হইয়াছিল "হোমরুল"। এই শব্দের অর্থ কেহ করেন স্বরাজ, কেহ বা করেন স্বায়ত্তশাসন। আমাদের মনে হয় স্বায়ত্তশাসন রাখিলেই ভাল হয়, কারণ স্বরাজ প্রভৃতি শব্দ গভর্ণমেণ্ট পছন্দ করেন না। যাই হৌক, হোমরুল বল, স্বায়ত্তশাসন বল, বা স্বরাজই বল, ইহাদের মূলভাব এই যে আমাদের দেশকে সত্যসত্য এই সুবৃহৎ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একটি অংশ বলিয়া ধরা কর্ত্তব্য, কেবলমাত্র শাসনের বস্তু বলিয়া ধরিলে চলিবে না; সেই সঙ্গে আমাদের দেশকে দেশের লোকের দ্বারা শাসন করাইতে হইবে। কতকগুলি ইঙ্গ-ভারতীয় সংবাদপত্র ইহার বিরোধী, কারণ ইহাতে ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়ের স্বার্থে ব্যাঘাত পড়িবার খুবই সম্ভাবনা। আমরা কিন্তু আমাদের সেই উন্নত ভূমিতে দাঁড়াইয়া যতদূর সম্ভব ভগবানের দৃষ্টিবিন্দু হইতে এ বিষয় আলোচনা করিতে চাহি।

ভগবান তাঁহার কার্য্যপ্রণালী প্রকৃতিতে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। প্রকৃতিতে আমরা দেখি যে, ঈশ্বর প্রত্যেক মনুষ্যকে পৃথক পৃথক এক একটি শরীর দিয়াছেন। সেই শরীর ভাল আছে কি মন্দ আছে, সেটা তো আমরা নিজেরাই বেশী বুঝি, বাহিরের লোকে সে বিষয়ে এমন কি বুঝিবে? অবশ্য শরীর অসুস্থ হইলে চিকিৎসা চাই, অথবা ছোট শিশু চলিতে শিখিলে সাহায্য পাইলে সুবিধা হয়। ভারতবাসীর ন্যায় একটি প্রাচীনতম জাতিকে যে নূতন করিয়া হাঁটিতে শিখিতে হইতেছে না তাহা বলা বাহুল্য। তবে ইহার অঙ্গে অনেক ক্ষত হইয়াছে, তাহার চিকিৎসার জন্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টরূপ বাহিরের সাহায্য আবশ্যক। কিন্তু কেবল বাহিরের চিকিৎসার উপর আপনাকে ফেলিয়া রাখিলে কোন ব্যক্তিই প্রকৃত স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারে না। একদিকে আমাদের যত্নমূলক স্বায়ত্তশাসনও চাই, অপর দিকে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের চিকিৎসাসাহায্যও চাই।

ভারতের ব্রহ্মবাদী সম্মিলন—কংগ্রেসে এবার সত্য সত্য একটা কাজ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ব্রহ্মবাদী সম্মিলনে (Theistic Conference এ) কি কাজ হইল ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। ইংরাজী ভাষায় লম্বাচৌড়া কয়েকটী বক্তৃতা করিলেই, অথবা ছেলেছোকরার খুব একটা হট্টগোল হইলেই যদি আমরা মনে করিতে চাহি যে মস্ত একটা কাজ হইয়াছে; তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় যে এবারকার Theistic Conference সার্থক হইয়াছে। কিন্তু যদি ভারতের ব্রহ্মবাদীগণের প্রকৃত সম্মিলন এই সভার উদ্দেশ্য হয়, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার সম্বন্ধীয় বিশেষ ভাবে আলোচনা যদি ইহার উদ্দেশ্য হয়, তবে আমাদের মতে এবারকার Theistic Conference ব্যর্থ হইয়াছে। ভারতের ব্রহ্মবাদী সম্মিলনের কর্ত্তৃপক্ষগণ ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলতত্ত্ব সমগ্র ভারতে প্রচারের এত বড় শুভ অবসর কেন যে ছাড়িয়া দিলেন তাহা আমরা বুঝিলাম না। আমরা দেখি যে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এই সম্মিলনকে কতকটা যেন নিজের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে চাহেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মোদ্যোগ প্রশংসনীয় তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে ব্রহ্মবাদী সম্মিলনের ন্যায় মিলনমূলক বস্তুকেও ব্রাহ্মসমাজের কোন শাখারই নিজের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিবার চেষ্টা কিছুতেই প্রশংসনীয় বলা যাইতে পারে না।

দেশ বিদেশ হইতে যে সকল প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া বিভিন্ন সমাজের কর্ত্তৃপক্ষদিগের সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া দেওয়া সম্মিলনের কর্ত্তৃপক্ষের কর্ত্তব্য ছিল। সম্মিলনের সম্পাদক মহাশয় সম্মিলনের নির্দ্দিষ্ট দিনের বহুপূর্ব্বেই ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন শাখাসমূহের প্রতিনিধিগণকে আহ্বান করিয়া কোন্ কোন্ বিষয়ের আলোচনা হইবে, বিভিন্ন শাখার কোন্ কোন্ নেতা দ্বারা কোন্ কোন্ বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়া হইবে, এবং সম্মিলনের কাল, স্থান প্রভৃতি বিষয় স্থির করিলে ভাল হইত। এভাবে কাজ অবশ্য করা হয় নাই।

সম্মিলনের বক্তৃতা সম্বন্ধেও দুএকটী বক্তব্য আছে। কেহ দেখিলেন না যে কে কোন্ বিষয়ে কি বক্তৃতা দিবেন, কি প্রবন্ধ পাঠ করিবেন; কেবল নামের খাতিরে, বক্তৃতা দ্বারা জমাট বাঁধাইবার খাতিরে বক্তৃতা দেওয়ান হইল। হয় তো কোন বক্তৃতা ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলতত্ত্বের বিরুদ্ধে গেল, আর হয় তো কোন বক্তৃতা প্রথম অবধি শেষ পর্য্যন্ত খুঁজিলেও ব্রাহ্মধর্ম্মের, এমন কি ব্রহ্মনামের পর্য্যন্ত নাম গন্ধ পাওয়া যায় না। সে সকল বক্তৃতা ভাল হইতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মবাদী সম্মিলনে এরূপ বক্তৃতা হইলে লোকের ভুল ধারণা জন্মিবে—লোকেরা বুঝিতেই পারিবে না যে ব্রাহ্মধর্ম্ম কি, ব্রাহ্মসমাজ কি চায়। সে সকল বক্তৃতার জন্য অনেক স্থান ছিল এবং আছে। শুনিলাম যে একজন বক্তা একটী প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন যে "সম্মিলিত মানব সমাজ বা মানবত্ব হইতেছে ঈশ্বর।" সাধারণ সমাজের একজন প্রাচীন নেতা এই বিষয় আমাকে বলিয়া বলিলেন—"মহাশয় হোল কি? আগে ছিল সোঽহং, আমরা তাহার প্রতিবাদ করিয়াছি, আর এখন হোল সোবঽং—আমরা সকলে মিলে একটী ঈশ্বর হইলাম।"

ব্রহ্মবাদী সম্মিলনে শ্রীমতী সরোজিনী নেইডু মহাশয়াকে বক্তৃতা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল, কারণ তিনি একজন সুবক্তা। সকলেই বলিলেন যে 'চমৎকার বলেন'; কিন্তু যখন জিজ্ঞাসা করিলাম যে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম বা Theism সম্বন্ধে কি বলিলেন, তাহার উত্তরে সকলেই একবাক্যে বলিলেন যে সে সম্বন্ধে তিনি নাকি একটী কথাও বলেন নাই। এইভাবে সম্মিলনকে শক্তিশালী করিয়া তুলিবার চেষ্টা মহাভুল। ইহাতে বরঞ্চ বিপরীত ফল হইবার সম্ভাবনা—জনসাধারণের চিত্তবিক্ষেপ উপস্থিত হইবে, তাহারা বুঝিতে পারিবে না যে তাহাদের কঃ পন্থা, এবং কাজেই পরিণামে তাহাদিগকে ব্রাহ্মনাম ছাড়িয়া অন্য creed-defined গণ্ডীবদ্ধ পথ অবলম্বনে বাধ্য হইতে হইবে। ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যৎ উন্নতির দিকে দৃষ্টি করিয়াই আমরা এতগুলি কথা বলিলাম।

গোরক্ষা সম্মিলন—আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে জষ্টিস উড্রফ মহোদয়ের নেতৃত্বে ভারতের গোরক্ষা সম্মিলনের এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। গোরক্ষার জন্য যে একটা চেষ্টা হইতেছে, ইহাই সুখের বিষয়। যখন জষ্টিস উড্রফ, মাননীয় পেন সাহেব প্রভৃতি ইংরাজগণও এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তখন গোরক্ষার একটা না একটা উপায় আবিষ্কৃত হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের মনে হয় যে, যদি হিন্দু ও মুসলমান সমাজের কয়েকজন নেতাদিগকে লইয়া এ বিষয়ে ভালরূপ আলোচনা করা হয় তবেই এই উপায় অতি সহজে আবিষ্কৃত হইবে। আমরা সংবাদপত্রে পড়িয়াছিলাম যে একা কলিকাতার নিউ মার্কেটে প্রতি বৎসর প্রায় এক লক্ষ গরু নিহত হয়। শুনিয়াছি যে যাহারা নিউ মার্কেটের মাংসের দোকান ভাড়া লয়, তাহাদিগকে একটা এই সর্ত্তে আবদ্ধ হইতে হয় যে তাহারা প্রতিদিন অন্তত এতগুলি গরু বা ভেড়া বা খাসীর মাংস বিক্রয়ের জন্য উপস্থিত করিবে। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া যদি মাননীয় পেন সাহেবের নেতৃত্বে কলিকাতা কর্পোরেশন গোহত্যা নিবারণে পথপ্রদর্শন করেন, তবে তো জনসাধারণ এতটুকুও দুগ্ধ ঘৃত খাইয়া বাঁচিতে পারিবে, তবেই তো কৃষকেরা চাষ আবাদ করিবার জন্য গরুর অভাব বোধ করিবার অবসর পাইবে না। আমাদের বর্ত্তমান নীতি এই যে বর্ত্তমান সুখই আমাদের সর্ব্বস্ব। একটুখানি দূরদৃষ্টি করিলেই গোরক্ষার উপকারিতার পরিমাণ উপলব্ধ হইবে। প্রাচীনকালের ন্যায় গরুকে সত্যই গোধনরূপে জানিয়া সেবাশুশ্রূষা দ্বারা বাঁচাইয়া রাখিলে ইহার উপকারিতা প্রত্যক্ষ করিতে পারিব।

ভারতের মহিলা সম্মিলন—মহিলা-সম্মিলনে যে সকল প্রবন্ধ পাঠ বা বক্তৃতা হইয়াছিল, তন্মধ্যে গত ৬ই জানুয়ারির ইণ্ডিয়ান মিরর সংবাদপত্রে The Orient Pearls নামক গ্রন্থের রচয়িত্রী শ্রীমতী শোভনা দেবীর স্ত্রীশিক্ষার ভবিষ্যৎবিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধে অনেকগুলি চিন্তার বিষয় আছে। তিনি প্রথমেই বলিয়াছেন যে আমাদের কন্যাগণকেও পুরুষদিগের ন্যায় জীবনসংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া সম্ভব বলিয়া তাহাদিগকে অর্থোপার্জ্জনের অনুকূল বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া উচিত। একথা যে অনেকাংশে ঠিক তাহা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। আমরা কন্যা-

দিগকে তাহাদিগের ভবিষ্যৎ জীবনযাত্রার উপযুক্ত হাতে-হেতেড়ে কাজ শিক্ষা দিবার নিশ্চয়ই পক্ষপাতী। তবে এইটুকু বলিতে চাহি যে কন্যাগণকে ভাতরাঁধা ডাল তরকারী রাঁধা, সুতাকাটা, কাপড় বোনা প্রভৃতি জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহ সংক্রান্ত যাবতীয় বিদ্যা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিখাইতে গেলেই অর্থকরী বিদ্যাসকলও আপনিই আয়ত্ত হইবে। কিন্তু কেবল অর্থকর বলিয়াই যে কোন বিদ্যা শিখিতে হইবে সে মতের আমরা কিছুতেই পক্ষপাতী হইতে পারি না। এ মতে চলিতে গেলে পাশ্চাত্যদেশের অশান্তি আনয়ন ব্যতীত অন্য কোন ফল হইবে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। শোভনা দেবী এদেশে স্ত্রী শিক্ষার অভাবের কারণস্বরূপে আইনের দোহাই দিয়াছেন। তাহা ঠিক মনে হয় না। মেয়েরা বিষয়ের উত্তরাধিকারী হয় না বলিয়া কি তাহারা শিক্ষা প্রাপ্ত হয় না? আমাদের তো তাহা মনে হয় না। বর্ত্তমান লেখক তাঁহার এক আত্মীয়ের কন্যাকে শিক্ষা দিবার প্রস্তাব করাতে কন্যার উত্তরকালে বিধবা হইবার আশঙ্কা করিয়া তাহার মাতা শিক্ষাদানে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি যদি তাহাতে সম্মতি দিতেন, তাহা হইলে কি উত্তরাধিকারের আইন সে বিষয়ে বাধা দিত? আমার মতে অত্রিসংহিতা প্রভৃতির ন্যায় আধুনিক স্মৃতিগ্রন্থ এবং বৌদ্ধ, তান্ত্রিক ও বৈষ্ণবদিগের বামাচার কদাচার অনাচার সকল স্ত্রীশিক্ষা বিলোপের জন্য বিশেষভাবে দায়ী। শিল্পকলা শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাস যে কন্যাগণ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী শিল্পশিক্ষা করিতে গেলেই বাধ্য হইয়া অর্থকরী নানা বিদ্যা আয়ত্ত করিতে থাকিবে—কাজেই তখন কুমারী বল আর বিধবা বল, কাহাকেও বোধ হয় পরের গলগ্রহ হইয়া থাকিতে হইবে না। আমাদের মনে হয়, শোভনা দেবী তাঁহার প্রবন্ধের প্রথম অংশটি সহরের অধিবাসী রমণীদিগের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া লিখিয়াছেন। কিন্তু সহরের অধিবাসী রমণীগণ সমগ্র দেশের রমণী-সংখ্যার অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র।

প্রবন্ধে কন্যাদিগের সাধারণ শিক্ষা সম্বন্ধে যাহা কিছু উক্ত হইয়াছে, তাহা আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করি। কিন্তু বর্ত্তমানে স্কুলকলেজে যে প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হয়, যাহার ফলে অধিকাংশ স্থলে কন্যাগণের শরীর এমন অপটু হইয়া উঠে যে তাহারা এতটুকু কষ্ট সহ্য করিতে সক্ষম হয় না এবং বিবাহের পর হয়তো দু'একটি সন্তান প্রসব করিয়াই কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া স্বামী এবং অন্যান্য আত্মীয়দিগের চক্ষে গৃহের একটি অকর্ম্মণ্য জীবরূপে পরিগণিত হয়, সে প্রণালী আমরা এতটুকুও সমর্থন করি না।

ভারতের নির্মাদক সম্মিলন—এই সম্মিলনের সভাপতি সুপ্রসিদ্ধ রায়বাহাদুর ডাক্তার চুনী লাল বসু মহাশয় যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহার একখণ্ড আমাদের হস্তগত হইয়াছে। তাঁহার মত সর্ব্বজনমান্য ব্যক্তির নেতৃত্ব পাইয়া এই সম্মিলন যে মাদক নিবারণের পক্ষে বিশেষ সাহায্য করিতে পারিবে তাহাতে আমাদের কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আমরা কিন্তু তাঁহাকে একটী অনুরোধ করি যে তিনি ভারতের যে কয়টী ধর্ম্মসমাজ আছে, সকলগুলিকেই তাঁহার এই সম্মিলনের সাহায্য করিতে আহ্বান করুন। তাহাতে সম্মিলনের বিশেষ বলসঞ্চয় হইবে। তিনি তাঁহার বক্তৃতাতে বলিয়াছেন যে ভারতীয় গভর্ণমেণ্টের হৃদগত ইচ্ছাই হইল মাদক নিবারণ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ঐ যে একটী আবগারি বিভাগ আছে, তাহার কর্ম্মচারীদিগের বাহাদুরী লইবার অত্যুগ্র চেষ্টার ফলে গভর্ণমেণ্টের সদিচ্ছাও অনেক সময়ে ব্যর্থ হইয়া যায়। গভর্ণমেণ্ট হয় মার্কিন বা রুষিয়ার গভর্ণমেণ্টের ন্যায় একটী আদেশ দিয়া মাদক দ্রব্যের আমদানী বা প্রস্তুত করা রহিত করিয়া দিন, অথবা তাহা যদি না ইচ্ছা করেন, তবে স্পষ্টাক্ষরে নিম্নতন কর্ম্মচারীদিগকে জানাইয়া দিন যে গভর্ণমেণ্ট আবকারী বিভাগ হইতে একটী পয়সাও আয়ের প্রত্যাশা করেন না, তবেই একমাত্র মাদকদ্রব্য নিবারণ হইতে পারে। আর, পুরাকালের ন্যায় ব্যবস্থা করিলেও চলিতে পারে যে, বড় বড় নগরের শেষপ্রান্তে মাত্র শৌণ্ডিকালয় প্রভৃতি থাকিতে পারিবে। যত দিন না তাহা হয়, ততদিন ভারতবাসীর এ সন্দেহ দূর হইবে কি না সন্দেহ যে গভর্ণমেণ্ট আবকারী বিভাগকে আয়ের অন্যতর পথ বলিয়া ধরেন। চুনী বাবু উপসংহারে যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব—কেবল গভর্ণমেণ্টের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না, আমাদের প্রত্যেককে এবিষয়ে নিজের যত্ন প্রয়োগ করিতে হইবে।

এই অবসরে আমরা বঙ্গগভর্ণমেণ্টকে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি যে তাঁহারা পরীক্ষা স্বরূপেও আগামী ১লা এপ্রিল হইতে এক বৎসরের জন্য কলিকাতার জনবহুল একটী কেন্দ্রাংশে মদ্যবিক্রয় বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। এইরূপ কার্য্যই গভর্ণমেণ্টের প্রতি জনসাধারণের আস্থা স্থাপনের প্রকৃষ্ট উপায়।

ভারতে শিক্ষা বিস্তার—বিগত ১৮ই নভেম্বরের সংখ্যায় একটি চিত্র দ্বারা ষ্টেটসম্যান কাগজ দেখাইয়াছেন যে ভারতে শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা কত অল্প; এবং তাহা উল্লেখ করিয়া স্বায়ত্তশাসন-প্রার্থীগণের প্রতি একটু উপহাসকটাক্ষ করিতে ভুলেন নাই। ইহাকে ভারতের উন্নতি চেষ্টার বিরুদ্ধে একটি নগণ্য আঘাত বলিয়া আমরা

উপেক্ষা করিতে পারি। এই শিক্ষিত সংখ্যার অল্পতার কারণ তো স্বায়ত্তশাসনপ্রার্থীগণ নহেন। স্বায়ত্তশাসন প্রার্থী বা অপ্রার্থী ভারতবাসীমাত্রেই, অন্তত অধিকাংশ ভারতবাসীই চাহেন যে ভারতে শিক্ষাবিস্তার হউক। কিন্তু অর্থাভাব প্রভৃতি নানা কারণ প্রদর্শনে সেই শিক্ষা-বিস্তারেরই পথে পর্ব্বতসমান বিঘ্নসমূহ উপস্থিত করা হইয়াছে এবং এখনও যে হইতেছে না এমন কথা বলিতে পারি না। দেশশুদ্ধই তো চাহে যে দেশের প্রত্যেক ব্যক্তিকে বিদ্যাশিক্ষা করিতে বাধ্য করা হউক অথবা এক কথায় compulsory education প্রবর্ত্তিত হউক। গবর্ণমেণ্ট কি তাহা অনুমোদন করিবেন? বরোদা রাজ্যে তো এই বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার ফলে সেখানে ইষ্ট বা অনিষ্ট হইয়াছে? আমাদের স্থির বিশ্বাস যে এই বাধ্যতামূলক শিক্ষা এদেশে প্রবর্ত্তিত করিতেই হইবে—না করিলে গবর্ণমেণ্ট ভুল করিবেন। কাজেই যত শীঘ্র তাহা প্রবর্ত্তিত হইবে ততই সকল হিসাবেই মঙ্গল। তারপর, শিক্ষাবিস্তার প্রতিহত হইবার অন্যতর কারণ বিদেশীয় ভাষায় শিক্ষা দান। এ বিষয়ে এত বক্তব্য আছে যে আমরা এখানে সে বিষয়ে কিছুই বলিলাম না।

অন্তর্হরণ (intern) করিবার সম্বন্ধে কয়েকটী কথা।—আমাদের দেশে ভারত রক্ষা আইন অনুসারে অনেক ব্যক্তিকে অন্তর্হরণ করা হইয়াছে এবং স্বভাবতই তজ্জন্য দেশে একটা তুমুল আন্দোলন আলোচনা চলিয়াছে। বলা বাহুল্য যে তজ্জন্য একটা গভীর অসন্তোষের অন্তঃসলিল স্রোত প্রবাহিত হইতে উপক্রম করিয়াছে। বঙ্গলাটের ব্যবস্থাপক সভার বক্তৃতা হইতে বুঝা যায় যে অন্তর্হরণের পক্ষে গবর্ণমেণ্টেরও প্রবল যুক্তি আছে। কিন্তু অনেক স্থলে ভুল হওয়াও কিছু অসম্ভব নহে। আমাদের মনে এই প্রশ্নও উঠিতেছে যে ইহাই কি অশান্তি নিবারণের প্রকৃষ্ট উপায়? এই-খানে আমরা আবার বলিতে চাহি—যাহা আমরা আবহমান কাল বলিয়া আসিতেছি যে, ব্রহ্মচর্য্যমূলক সত্যধর্ম্মভিত্তি শিক্ষা বিস্তৃতভাবে দেওয়া হউক এবং বিদ্যাশিক্ষা করিতে প্রত্যেক ভারতবাসীকে বাধ্য করা হউক। গবর্ণমেণ্ট অন্য অনেক বিষয়ে ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া শিক্ষাবিস্তারে মুক্তহস্ত হউন,—দেখিবেন, কি সহজে শান্তি সংস্থাপিত হয়। তারপর, অন্তর্হৃত বালক-গণের শিক্ষার বিশেষভাবে ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। তাহারা ভাবে যে তাহাদের কার্য্য খুব ন্যায়সঙ্গত। উপযুক্ত লোকের দ্বারা তাহাদের সেই ভুলটিই ভাঙ্গাইবার চেষ্টা করা উচিত। সকল শান্তির মূল—সত্যধর্ম্ম বা ভগবানে নিষ্ঠা, ব্রহ্মচর্য্য বিষয়ে শিক্ষাদান এবং অকাতরে জ্ঞান-দান। এ কথাতো স্বীকার্য্য যে আমাদের দেশে যেরূপ দ্রুতবেগে অশান্তি আসিতেছে, অনেক স্বাধীন দেশে অশান্তি সেরূপ বেগে ছুটিতেছে না। তাহার কারণ অনু-সন্ধান করিয়া গবর্ণমেণ্টের উচিত এদেশেও সেই সকল উপায় প্রয়োগ করা। গবর্ণমেণ্ট যদি কেবল শাসক ও শাসিতের চক্ষে এদেশকে দেখেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ভুল করিবেন। তাঁহারা যদি এদেশকে স্বায়ত্তশাসিত বৃহৎ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অংশ বলিয়া দেখেন এবং সেই ভাবে আইন কানুন, আচার ব্যবহার প্রভৃতি নিয়মিত করেন, তবেই উভয়ের পক্ষেই মঙ্গল এবং বর্ত্তমান অশান্তির মূলে কুঠারাঘাত পড়িবে।

কৃষি চর্চ্চা। বঙ্গসাহিত্যে কৃষিবিষয়ক চর্চ্চা বিশেষভাবে হইতেছে দেখিয়া সুখী হইলাম। আমাদের সাঙ্গোপাঙ্গ কৃষি যত দিন না অবলম্বিত হইবে ততদিন উন্নতির সম্ভাবনা নাই। কৃষিতে অবশ্য হাতেহেতেড়ে কাজই বেশী। তবু বলিতে হইবে যে সাহিত্যে কৃষিবিদ্যা বিশেষভাবে স্থান পাওয়াই একটি সুলক্ষণ। ভাব ছড়াইয়া পড়িলে তাহার কর্ম্মক্ষেত্র কে রুদ্ধ রাখিতে পারিবে?

দেশীয় রাজন্যবর্গ। বর্ত্তমান যুগসন্ধিক্ষণের একটি বিশেষ সুলক্ষণ দেখিতেছি যে দেশীয় রাজন্যবর্গের অনেকে শিক্ষিত হইয়া উন্নত আদর্শে নিজ নিজ রাজ্য শাসন করিতেছেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র সাম্রাজ্যেরও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মিলিতভাবে অগ্রসর হইবার উদ্যোগ করিতেছেন। মহীশূর, বরোদা প্রভৃতি রাজ্যের অধী-শ্বরগণ স্বরাজ্যে বাল্যবিবাহ প্রভৃতি অনিষ্টকর প্রথাসমূহ উঠাইয়া দিয়া এবং অবাধ শিক্ষা প্রভৃতি ইষ্টকর ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিয়া সমগ্র ভারতের সম্মুখে যে মহান্ আদর্শ স্থাপিত করিতেছেন তাহার ফলে যে কি সুমহান্ মঙ্গল উৎপন্ন হইবে তাহা বর্ত্তমানে আমাদের কল্পনাতেও আসিতে পারে কিনা সন্দেহ। দেশীয় রাজন্যবর্গ যে মধ্যে মধ্যে মিলিত হইয়া সাম্রাজ্য সংক্রান্ত নানা বিষয়ের আলোচনায় যোগ দিতেছেন, ইহাতেও তাঁহারা পরিণামে যে এই বৃহৎ সাম্রাজ্যশাসনের সভায় আসন পাইবার অধিকারী হইতেছেন তাহা বলা বাহুল্য।

রাজনৈতিক সভাসমিতিতে ছাত্রগণের যোগদান নিষেধ—আজকাল গভর্ণমেণ্টের মনে একটা আতঙ্ক জাগিয়া উঠিয়াছে যে ছাত্রগণ রাজনৈতিক সভা-সমিতিতে যোগদান করিয়া পাছে রাজবিদ্রোহী হইয়া উঠে, তাই তাঁহারা ছাত্রগণকে রাজনৈতিক সভাসমি-তিতে যোগদান করিতে একপ্রকার নিষেধই করিতে-ছেন। আমাদের দেশে সেকালে গুরুসন্নিধানে বাস করিয়া ছাত্রেরা যেরূপ অধ্যয়ন করিত সে প্রথা থাকিলে

এরূপ নিষেধাজ্ঞার প্রয়োজনই হইত না। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায়, যখন শত শত সংবাদপত্রে রাজনীতিচর্চ্চা ও মতামত প্রকাশ উন্মুক্তভাবে চলিতেছে, তখন এ প্রকার নিষেধাজ্ঞার নিষ্ফলতা প্রত্যক্ষ। বরঞ্চ, আমাদের মনে হয়, ছাত্রেরা রাজনৈতিক সভাসমিতিতে উপস্থিত থাকিলে আলোচ্য বিষয়ের সপক্ষে ও বিপক্ষে নানা তর্ক বিতর্ক শুনিয়া একটা সাধু সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারে। ইহার ফলে ছাত্রগণের রাজবিদ্রোহী হইবার আশঙ্কা করা কতদূর যুক্তিযুক্ত বলিতে পারি না।

পাশ্চাত্য জগতে ধর্ম্মভাবের জাগরণ—গীতাতে একটি অমূল্য সত্যবাণী উক্ত হইয়াছে যে, যখনই জগতে ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, তখনই ভগবান নিজের সংসার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া সংসারকে ধর্ম্মক্ষেত্র প্রস্তুত করেন। বর্ত্তমান যুগে পাশ্চাত্য জগতে যেরূপ ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে ভগবান যে নামিয়া আসিবেন তাহা আর বিচিত্র কি? প্রথমে তিনি সমরাগ্নিতে অল্পবিস্তর সমগ্র ধরণীকে দগ্ধ করিয়া বিশুদ্ধ করিয়া লইয়াছেন। তাহার পরে, পাশ্চাত্য জগতের অন্তরে সত্য সত্য এক বিশুদ্ধ ধর্ম্মভাব জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছেন। আজ মাসাধিক হইল মার্কিন রাজ্যের প্রেসিডেণ্ট উইলসনের সাময়িক বক্তৃতাতে তাহার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার বক্তৃতার সার মর্ম্ম এই যে, 'জর্ম্মনির অন্যায় করিবার শক্তি আমাদিগকে ভাঙ্গিতেই হইবে, কিন্তু তাই বলিয়া জর্ম্মনির উপর প্রতিশোধ তুলিতে কখনই যাইব না।' এই ভাবের কথা ইতিপূর্ব্বে অনেকবার শুনিয়াছি বটে, কিন্তু সে কথাগুলি যেন ভাসা ভাসা লাগিয়াছিল, আজ উইলসন যাহা বলিয়াছেন, পড়িলেই বুঝা যায় যে তাহা হৃদয়ের গভীর অন্তস্তল হইতে নিঃসৃত হইয়াছে। ইহাতেই বুঝিতেছি যে, এইবার ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ভগবান সত্য ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য তাঁহার সংসারে নামিয়া আসিয়াছেন।

ব্যবসায়ের উন্নতি—আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে মহীশূর রাজ্যে চন্দন তৈলের ব্যবসায়ের বিশেষ উন্নতিসাধনের চেষ্টা হইতেছে। এই মহাসমরসূত্রে সমগ্র জগতের সঙ্গে ভারতবর্ষকেও দুর্ম্মূল্যতার কারণে অনেক দুঃখকষ্ট সহ্য করিতে হইতেছে। তথাপি আমাদের ঘুম ভাঙ্গিতেছে না ইহাই আশ্চর্য্য। আমরা যে ভাবে ব্যবসায় করি, তাহা মন্দের ভাল। তোমার কাছে জিনিস কিনিয়া অল্পলাভে তৃতীয় ব্যক্তিকে বিক্রয় করিলাম। তাহাতে বিশেষ কি লাভ হইল? সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিলে বরঞ্চ মনে হয় যে তাহাতে দেশের লোকসান—কেবল পরভুৎ রক্তশোষক কীটাণুর ন্যায় একজনের হাতে কতকগুলো টাকা আসিয়া জমে, দেশটা দারিদ্র্যের দিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু দেশের কাঁচা জিনিস হইতে যদি দেশের ব্যবহার্য্য এবং জগতের ব্যবহার্য্য জিনিস প্রস্তুত করিয়া দেশে বিদেশে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা যায়, তবেই প্রকৃত পক্ষে দেশের লাভ। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের সাহায্য পাইলে দেশের এবং গভর্ণমেণ্টের উভয়েরই লাভ। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট যদি বা কোন বিষয়ে সাহায্য দানে অগ্রসর না হয়েন, তথাপি দেশের লোকের চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার অবসর নাই। পরস্পরকে প্রতারিত করিতে যাইব না এবং পরস্পরকে বিশ্বাস করিব, এই প্রতিজ্ঞা লইয়া আমাদিগকে কার্য্যে বাহির হইতে হইবে। সামান্য মূলধন হইতেও অধ্যবসায়ের ও বুদ্ধিপ্রয়োগের ফলে যে কি বৃহৎ কার্য্য সকল সম্পন্ন হইতে পারে, তাহার শত সহস্র দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইতে পারে। জাপান অবসর বুঝিয়া আমাদের মুখের ভাত কাড়িয়া লইয়া যাইতেছে। অতীতের স্বপ্নে আর কাল কাটাইও না, পরস্পরের মধ্যে ভেদবুদ্ধিকে স্থান দিওনা। জন্মভূমিকে সত্যই সেই পরম মাতার প্রতিনিধি জানিয়া তাহার উন্নতি সাধনে বদ্ধপরিকর হও।

কর্ম্মাভাবের কথা—বর্ত্তমানে শত শত বালক বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কর্ম্মাভাবে বসিয়া থাকিতে বাধ্য হওয়ায় যে একটি বিরাট অভাব সৃষ্ট হইতেছে এবং কাজেই অনেক সময়ে তাহাদের দুষ্কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার যে একটি সম্ভাবনা দাঁড়াইতেছে, নূতন বস্তুর প্রস্তুতমূলক ব্যবসায় বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ করিলে সেই অভাবের পথ অনেকটা রুদ্ধ হইয়া যাইবে।

রাণাডের-স্মৃতি।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদিত)

সরকারী কাজে প্রথম পরিভ্রমণ।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

এই কার্য্যক্রম চারিমাস কাল চলিবার পর, "এ্যাসিষ্টাণ্ট স্পেসিয়াল জজ্" এই পদে আমাদের বদলী হইল। ইহার ফলে, আফিসসহ আমার স্বামীকে আটবাস ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত। আমাকে সঙ্গে লইবার মৎলব ছিল না। কারণ, স্ত্রীলোকদিগকে সঙ্গে লইবার সুবিধা কিরূপ, নামিয়া কোথাও থাকিবার সুবিধা কিরূপ এই সম্বন্ধে প্রথম বৎসরে পথযাত্রার অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া এইরূপ বলিয়াছিলেন যে, "দ্বিতীয় বৎসরে তোমাকে লইয়া যাইব।" সুতরাং এই কথা কোন প্রকারেই আমার ভাল লাগে নাই, প্রত্যুত অত্যন্ত খারাপ লাগিয়াছিল।

ইহার পূর্ব্বে আমাদের পদবৃদ্ধির দরুণ যে আনন্দ হইবার কথা তাহা কোন্‌দিক দিয়া কোথায় চলিয়া গেল। এখন আমি একাকী কেমন করিয়া দিন কাটাইব, আমার ইংরেজি শেখা বন্ধ হইয়া যাইবে, পাঠাভ্যাসে যে সময় কাটিবে তাহারও জো ছিল না এবং বিশ্রামের স্থান ত ছিলই না। আমার স্বামীর বাড়ী ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত আমি কি করিয়া দিন কাটাইব, এইরূপ শব্দ আমার মুখ হইতে বাহির হইতে না হইতেই আমার চোখ্ দিয়া অশ্রুবর্ষণ হইতে লাগিল,—কতবার সম্বরণের চেষ্টা করিলাম, সম্বরণ করিতে পারিলাম না। অনেকক্ষণ পরে আমার কান্না কমিয়া গেছে দেখিয়া উনি অনেক প্রকারে আমাকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, কিছু দিন একটু জোর করিয়া মন বাঁধিয়া থাকো। তোমার ইংরেজি পড়া বন্ধ হবে না। ইংরেজি শিখাইবার জন্য কাল কোন মাষ্টারণী মহিলার তল্লাসের তদ্‌বির করিব। সকাল সন্ধ্যায়, ঘরকন্নার কাজেই তোমার সময় যাইবে। এখন বাকি রহিল দুপর বেলা। ঐ ঘণ্টা-খানেক বা ঘণ্টাদেড়েক তাঁহার কাছে শিক্ষা করিতেই কাটিয়া যাইবে এবং আরও দেড়ঘণ্টা তিনি যাহা পাঠাভ্যাস করিতে দিবেন, তাহা অভ্যাস করিয়া রাখিতেই কাটিয়া যাইবে। যে শব্দ বা বাক্য আট-কাইবে তাহা "আবা" কিংবা "বাবা"র নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া লইবে। এখন, বাড়ীর মেয়েরা নিজের চির-অভ্যাস অনুসারে কথা বলাবলি করিবেই করিবে। তাহার উপায় নাই। তাহা সহ্য করিতে হইবে। কিছুদিন শাশুড়ীর, আর কিছুদিন বৌ-র। আপনা হইতে তাঁহা-দের সহিত উদ্ধতভাবে ব্যবহার করা উচিত নহে। আমাদের সম্বন্ধে কোন কথা বলিলে তাহার উত্তরে কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া থাকিবে। এই কথা বলিবার দুই তিন দিন পরে "বানবড়ী"র জেনানা-মিশনের অন্তর্ভূত "সিষ্টরস্"দের মধ্যে মিস, হরফর্ড নামক এক মহিলাকে আমার শিক্ষার জন্য রাখা হইল। এবং তিনি ১টা হইতে ৩৷৷০টা পর্য্যন্ত শিখাইতে লাগিলেন। কাজেকাজেই এই বিষয় বাড়ীর বয়স্ক মেয়েদের নারাজি হইবার কারণ হইল। ইহার দরুণ আমার উপর তাঁহারা অত্যন্ত রাগিয়া উঠিলেন। এবং বাড়ীর কেহই আমার সহিত গরজ অপেক্ষা বেশী কথা কহিবে না এইরূপ চুপি চুপি সকলকে তাকিদ দেওয়া হইল। ইহারা ছিল অ-বোলা ছোট ছোট ভাই বোন্। মিস্ হরফর্ড আমাকে শিখাইবার জন্য আসিতে আরম্ভ করিবার পর, ৮ দিনের মধ্যে, আমার স্বামীকে আফিস-সহ সাতারা জিলায় ঘুরিয়া বেড়াইবার জন্য যাইতে হইল। পরে ৮।১০ দিন ধোঁয়াইয়া ধোঁয়াইয়া ক্রোধাগ্নি হইতে ধীরে ধীরে শিখা বাহির হইতে লাগিল। প্রথম, তুই মেমকে ছুঁইয়া, গা না ধুইয়া, কেবল কাপড় ছাড়িয়া ঘরের মধ্যে নির্ভয়ে প্রবেশ করিস, এটা আমাদের ভাল লাগে না। গা ধোয়া না হইলে তুই উপর-তলাতেই বোসে থাকিস। আমরা তোর খাবার থালা উপরেই পাঠিয়ে দেব। এখন তুই ইংরেজি শিখে মেম হতে যাচ্ছিস। এখন তোকে পাদ্রিনী ও মেমের পোষাকেই অধিক শোভা পাবে! নীচের ঘরে কষ্ট করিবার জন্য আমরাইত তোমার দাসী চাকরাণী আছিই—এই প্রকার অনেক কঠোর কথা আমাকে শুনাইবার জন্য তাঁরা আমার নিকট বলিয়া পাঠাইতেন। আমি এই সমস্ত কথা আগেই শুনিয়াছিলাম বলিয়া বার্ত্তাবাহিনী রমণীকে কোন উত্তরই দিলাম না। দ্বিতীয় দিন হইতে মেম আমাকে শিখাইয়া চলিয়া গেলে পর চুপি চুপি উঠিয়া স্নান করিতাম। চৌবাচ্চা ছোঁয়া হইবে না বলিয়া কুয়ায় গিয়া স্নান করি-তাম। বাড়ীতে চৌবাচ্চা বাঁধিয়া রাখায় ও জলের নল আনায় কাজেই কুয়ার জলের খরচ খুব কমিয়া গিয়াছিল, এবং জলও খুব বাড়িয়াছিল। একে ত কার্ত্তিক মার্গ শীর্ষের মাস, তাতে আবার তিন প্রহরে ঠাণ্ডা জলে স্নান—আমার সহ্য হইল না। ২০।২২ দিনের মধ্যেই আমার জ্বর আসিতে লাগিল। ৩।৪ দিনের পর "রহিনী রোজ ঠাণ্ডা জলে স্নান করেন বলিয়া তাঁর জ্বর হইয়াছে। ডাক্তার "বিশ্রামের" ঔষধ চলিতেছে, কিন্তু এখনও ঘাম হইতেছে না এবং জ্বরও কমিতেছে না।"—এইরূপ উদ্বেগ জন্মাইবার কোন কথা "আবা" ভাই বোধ হয় আমার স্বামীকে লিখিয়া থাকিবে। এইখানে বলা আবশ্যক যে, বাড়ীর বড় মেয়েরা যদিও এই প্রকারে আমাকে বড়ই জ্বালাতন করিত, কিন্তু আমার দুই দেওর আমার সহিত ভায়ের মতন ব্যবহার করিত। তাহারা কখন কখন আপন স্কুলের মজার মজার কথা ও মেয়েদের কিরূপ পৃথক্ পৃথক্ জটলা হয় তাহা বলিয়া আমোদ করিত। আমার পাঠাভ্যাসে তাহারা শুধু যে সাহায্য করিত তাহা নহে, নীচের তলার লোকদের কেহ কিছু আমার নিন্দা করিলে তাহার সহিত অথবা কোন মেয়ে আমার বিরুদ্ধে কথা বলিলে আমার পক্ষ লইয়া তাহার সহিতও ঝগড়া করিত। এইরূপ সর্ব্বপ্রকারে এই দুই জন আমার পক্ষাবলম্বী ছিল, ইহাতেই আমার যাহা কিছু সান্ত্বনা। এইরূপ তাহারা আমার স্বামীকে পত্র পাঠা-ইবার পর দুই এক দিনের মধ্যেই আমার স্বামী পুণায় আসিলেন। আট দিন আমি শয্যাগত ছিলাম। ইতি মধ্যে আমি একটু ভাল বোধ করিলাম। জ্বর ভাল হইয়া গেলে, "উনি" সেখানে থাকিতে থাকিতেই,

মিস্ হরফর্ড আমাকে শিখাইবার জন্য আসিতে লাগিলেন। আমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন যে, হরফর্ডকে ছুঁইবার দরুণ স্নান করিবার দরকার নাই। কাপড় ছাড়িয়া ফেলিলেই হইল। এরূপ করিলেও তবু যদি সকলে রাগ করে, তাহা হইলে মেমের সহিত বেশি ঘেঁসা ঘেঁসি করিয়া বসিবে না; একটু পাশে সরিয়া বসিয়া কাজ করিবে। যখন সকল বাধার বিরুদ্ধে শিক্ষা আরম্ভ করা হয়েছে, তখন যাই ঘটুক না কেন শিক্ষার মাঝখানে ছাড়িয়া দিবে না,—সেই দিকে লক্ষ্য রাখিবে। তাহারা রাগ করিয়াছে বলিয়া কিংবা বকিয়াছে বলিয়া ঠাণ্ডা জলে স্নান করিয়া কিংবা আর কিছু করিয়া আপনার শরীর খারাপ করিবে না। স্নান করিবার দরুণ এখন তাহারা তোমাদের কষ্ট দিবে না। আমি আবার এক মাসের মধ্যেই আসিব, ইতি মধ্যে তুমি শান্তমনে বেশী করিয়া পাঠাভ্যাস করিয়াছ যেন দেখিতে পাই,—এইরূপ নানা কথা "উনি" বলিলেন। দুপর বেলায় মেম্ শিখাইতে আসিলে পর আমি গা ধুইব কি, কি করিব এইরূপ চিন্তা করিতে করিতেই ৫।১০ মিনিট সেই রূপই বসিয়া রহিলাম। ইতি মধ্যে আমার ননদ লোকদিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে—"তাকে বলিবে কুয়ায় যাইয়া গা হাত ধুইয়া আমাদের জন্য আর ব্যামো বাধাতে হবে না। আমাদের যথেষ্ট কাজ আছে। তাহার মধ্যে তোমার ব্যামো সারাবার জন্য আমাদের সময় নেই। যেমন ইচ্ছে নাচো, আরও বেশী কিছু করতে পার।" এই কথা শুনিয়া আমার মন একটু শান্ত হইল। কারণ আমার স্বামী বলিয়াছিলেন, "গা ধুইও না", সেই জন্য আমি এতক্ষণ ভাবনায় পড়িয়াছিলাম, এখন আপনা আপনিই ইহার একটা নিষ্পত্তি হইয়া গেল। তাহার পর একমাস পর্য্যন্ত পাঠাভ্যাস বেশ চলিতে লাগিল। বাড়ীর লোকেরা শান্ত হওয়ায় আমার মনও শান্ত হইল।

ভাষার-উৎপত্তি।

(রায় বাহাদুর শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহ বিদ্যার্ণব)

কিরূপে ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে, এই প্রশ্ন অতি প্রাচীনকাল হইতে মানবের চিত্তকে আকর্ষণ করিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে পৃথিবীর সকল দেশে প্রাচীন মনীষিগণ এই প্রশ্নের একই মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন। সৃষ্টিপ্রকরণ বিষয়ে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে মতদ্বৈধ থাকিলেও এ বিষয়ে সকলেরই একমত; তাহা এই,—যেদিন মানবের সৃষ্টি হইয়াছে সেই দিনই স্রষ্টা স্বয়ং গুরুপ্রদত্ত মন্ত্রবীজের ন্যায় এই ভাষাকেও মানব শিশুর কর্ণে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং ভাষা ও মানবের সৃষ্টি একই সময়ে হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে প্রকৃতি সুন্দরী তাহার হৃদয় কপাট উদ্ঘাটিত করিয়া অনেক নূতন তত্ত্ব আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন যাহা মানবের চিন্তাস্রোতকে এক নূতন পথে প্রধাবিত করিয়া দিয়াছে। ছয় দিনে সৃষ্টিকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, এবং তজ্জনিত অত্যধিক পরিশ্রমবশতঃ স্রষ্টা ক্লান্ত দেহভার বহন করিতে অক্ষম হইয়া সপ্তম দিবসে পালঙ্কশায়ী হইয়াছিলেন অথবা মানবের কুকীর্ত্তিজনিত গুরুতর ভার বহনে অক্ষম হইয়া বসুন্ধরা দেবী নারায়ণ সম্মুখে আবেদন পত্র হস্তে লইয়া উপস্থিত হইলে চক্রীর চক্রান্তমূলে যখন ঘোর প্রলয়কাল উপস্থিত হইয়াছিল তখন নারায়ণ ক্ষীরসমুদ্রে মুদ্রিত লোচনে বিশ্রাম সম্ভোগে নিমগ্ন হইয়াছিলেন আর নারায়ণী পদমূলে বসিয়া সতী-জনোচিত কার্য্যে ব্যাপৃতা ছিলেন, এই সব কথাতে অপোগণ্ড শিশুর মনও আর প্রবোধ মানিতেছেনা। নানাপ্রকার দৃষ্টান্ত ও অকাট্য প্রমাণ সহকারে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে স্বাভাবিক কার্য্যনিচয়ের মধ্যে কোন প্রকার হঠকারিতা কিম্বা ক্ষিপ্রহস্তের বিন্দুমাত্রও নিদর্শন নাই। এই পরিদৃশ্যমান চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ছয় দিনে সৃষ্ট হয় নাই। চব্বিশ ঘণ্টার কথা দূরে থাকুক, এক নিমেষ কালের জন্যও স্রষ্টা তাঁহার চক্ষুকে মুদ্রিত করিবার অবকাশ প্রাপ্ত হন নাই। মানব ছয় হাজার বৎসর কিম্বা ষাট হাজার বৎসর কাল মাত্র পৃথিবীর বক্ষে বিচরণ করিতেছে এ কথাও ঠিক নহে। কত কোটি কোটি বৎসর পূর্ব্বে যে আদি মানব প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার সংখ্যা করা যায় না। এই মানব ঈশ্বরের ইচ্ছাতে এক দিনেও সৃষ্ট হয় নাই, অথবা দৈহিক কি মানসিক গুণে একেবারেই ঈশ্বরের প্রতিকৃতি লাভ করে নাই।

সৃষ্টিপ্রকরণ এক আশ্চর্য্য রহস্যপূর্ণ ব্যাপার। সামান্য ইষ্টক খণ্ডের সমষ্টি দ্বারা যেমন অত্যাশ্চর্য্য মনোহর গগনস্পর্শী রাজপ্রাসাদনিচয় নির্ম্মিত

হইয়া থাকে তেমনই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মানবের দৃষ্টি-শক্তি-বহির্ভূত জীবাণু লইয়াই সৃষ্টিকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে এবং তাহাই ক্রমশঃ উন্নতির পথে প্রধাবিত হইয়া পরিশেষে মানবাকারে ব্যক্তি লাভ করিয়াছে। এই উন্নতি ও অভিব্যক্তি ব্যাপারে প্রকৃতিকে যে কতদূর সাবধানতার সহিত চলিতে হইয়াছে ইহা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির অনধিগম্য। সৃষ্টিকার্য্য যুগ যুগান্তরব্যাপী, নীরবে জ্ঞান ও দৃষ্টির অন্তরালে অতি সাবধানতার সহিত সম্পন্ন হইয়া থাকে। শিশু ভূমিষ্ট হইবার পূর্ব্বে জননীর জঠরদেশে অবস্থান কালে তাহার শরীর কি প্রকারে গঠিত হয় ভ্রূণ-তত্ত্ব (Embryology) শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে তাহার কতক আভাস পাওয়া যায়। প্রকৃতি কি সাবধানতার সহিত না তথায় কার্য্য করিতেছে। শোণিত ও শুক্রের সংযোগ সংঘটন দ্বারা সামান্য কীটাণুটীকে (Spermatoze) কত গণনাতীত-রূপের ভিতর দিয়া পরিচালিত করিয়া অবশেষে ইহাকে মানবের দেহ প্রদান করিয়াছে এ বিষয় যতই চিন্তা করা যায় ততই একদিকে যেমন আমরা সৃষ্টির অত্যাশ্চর্য্য জ্ঞানকৌশল দেখিতে পাই, অপর-দিকে কিরূপ সাবধানতার সহিত এই সৃষ্টিকার্য্য সম্পন্ন হইতেছে তাহা দেখিয়া আমাদের চিত্ত বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন করে। শিশু ভূমিষ্ট হইবার সময় উপস্থিত হইলে প্রসূতিকে কতই না যাতনা ভোগ করিতে হয়। মানবশিশুর সৃষ্টিকার্য্য যেমন চক্ষুর অন্তরালে জননীর জরায়ুপিণ্ডের মধ্যে সম্পন্ন হইয়া থাকে, এবং শিশু ভূমিষ্ট হইবার পূর্ব্বে জননীকে দুর্ব্বিষহ যাতনা ভোগ করিতে হয়, তেমনি নৈসর্গিক জগতে প্রত্যেক নূতন জীবের আগমনের পূর্ব্বে তাহার সৃষ্টিকার্য্য নিভৃত স্থানে সম্পন্ন হইতে এবং প্রসূতির গর্ভবেদনার ন্যায় প্রকৃতিও নিজে অশেষ যাতনা ভোগ করিয়া তাহার এই অভিনব সন্তানকে প্রকাশিত করেন। একদিনে কিংবা ইচ্ছামাত্রেই কোন পদার্থের সৃষ্টি হয় নাই এবং অতি কষ্টলব্ধ ধন বলিয়া জন-নীর নিকট তাহার সন্তানের যেরূপ আদর, প্রকৃতিও প্রত্যেক সৃষ্ট পদার্থকেই তেমনি আদরের চক্ষে দর্শন করিয়া থাকেন। সৃষ্টিকার্য্য অত্যন্ত সাব-ধানতার সহিত এবং বহুকালব্যাপী চেষ্টা ও উদ্যোগে সম্পন্ন হয় ইহা স্বাভাবিক নিয়ম। "ইচ্ছা হইল তব ভানু বিরাজিল" কবিত্বের হিসাবে এই কথা সত্য হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কি প্রকারে এবং কত সময়ব্যাপী চেষ্টার ফলে যে এই ভানু প্রকাশিত হইয়াছে মানবের পক্ষে কি তাহা ধারণা করা সম্ভব? সৃষ্টি প্রকটন ক্রমোন্নতিতে এই ক্রমোন্নতি তত্ত্ব প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে মানুষ প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বরের প্রতিকৃতিতে সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া যেমন জগতের ধারণা ছিল, তেমনি ভাষা-কেও প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বরের বিশেষ দানরূপে আমরা লাভ করিয়াছি এই সংস্কার ছিল। Archbishop Trench তাঁহার "The Study of Words" গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "The true answer to the inquiry how language arose is this:—God gave man language just as He gave him reason, and just because He gave him reason; for what is man's word, but his reason coming forth that it may behold itself? They are indeed so essentially one and the same that the Greek language has one word for them both. He gave it to him, because he could not be man, that is, a social being, without it."

(ক্রমশঃ)

শোক-সংবাদ।

পরলোকগত কবি গোবিন্দচন্দ্র রায়—এখনকার নবীন সাহিত্যিকগণ হয় ত বা কবি গোবিন্দ-চন্দ্রের নাম সর্ব্বদা স্মরণ না করিতে পারেন, কিন্তু যাঁহারা প্রবীণ সাহিত্যিক, তাঁহারা এখনও গোবিন্দচন্দ্র রায়ের নাম সর্ব্বদা মনে করেন। এখন অনেক স্বদেশী গান রচিত ও প্রচারিত হইয়াছে; কিন্তু এমন একদিন ছিল, যখন ঠাকুর বাড়ীর 'মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি' এবং কবি গোবিন্দচন্দ্র রায়ের 'কতকাল পরে, বল ভারত রে, দুঃখ সাগর সাঁতারে পার হবে' বাঙ্গালীর প্রধান স্বদেশ-সঙ্গীত ছিল। আমরা যখন বিদ্যালয়ে পড়িতাম, তখনই কবি গোবিন্দচন্দ্রের 'কতকাল পরে' গান বাহির হইয়াছিল এবং তাহার অব্যবহিত পরে বা সেই সময়েই তাঁহার 'যমুনা লহরী' কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল। আমরা নির্ম্মল সলিলে, বহিছ সদা, তটশালিনী সুন্দর যমুনে ও।' কবিতা তখন কণ্ঠস্থ করিয়াছিলাম, তাহাই

তখন আমাদের জাতীয় সঙ্গীত ছিল। সে বহুদিনের কথা। তাহার পর ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে আগরা নগরীতে সেই ঋষিকল্প কবিকে দর্শন করিয়া পবিত্র হইয়াছিলাম; আগরার যমুনাতীরে বসিয়া কবির 'যমুনা-লহরী' গান করিয়াছিলাম। সেই বাঙ্গালার কবি, বাঙ্গালীর কবি, সুদূর আগরা-প্রবাসী কবি গোবিন্দচন্দ্র রায় আর ইহলোকে নাই। পরিণত বয়সে তিনি অনন্ত ধামে গমন করিয়াছেন। কবি গ্রে যেমন 'এলজি' লিখিয়াই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, আমাদের কবি গোবিন্দচন্দ্র তেমনই 'কতকাল পরে বল ভারত রে'! ও 'যমুনা-লহরী' লিখিয়াই অমর হইয়াছেন। তাঁহার দেহাবসান হইয়াছে বটে, কিন্তু যতদিন বাঙ্গালা ভাষা থাকিবে, ততদিন গোবিন্দচন্দ্রের নাম থাকিবে। 'যমুনা-লহরী'র কবি বলিলেই গোবিন্দচন্দ্রের পরিচয় হয়; তবুও তাঁহার অন্য একটা পরিচয় দিই। ঢাকার সর্ব্বপ্রধান উকিল, স্বদেশ-হিতব্রত, জননায়ক শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র রায় মহাশয় গোবিন্দ বাবুর কনিষ্ঠ সহোদর। গোবিন্দ বাবু যৌবনকালে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক আগরায় গমন করেন এবং সেখানে হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা-কার্য্যে ব্রতী হন। তিনি আগরাতেই জীবন কাটাইয়াছেন এবং আগরার যমুনাতীরেই তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র রায় এম-এ মহাশয় এখন কলিকাতা সিটি কলেজের অধ্যাপক। আমরা কবি গোবিন্দচন্দ্রের পুত্র ও অন্যান্য পরিজনবর্গের শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি। (ভারতবর্ষ)।

৺ হেমেন্দ্রনাথ সিংহ—বিগত ১৫ পৌষ ভুবনডাঙ্গা বোলপুরনিবাসী হেমেন্দ্রনাথ সিংহ পরলোক গমন করিয়াছেন। হেমেন্দ্র বাবু একজন প্রতিভাশালী সুলেখক ছিলেন। তাঁহার রচিত "প্রেম" বঙ্গ-সাহিত্যে অমর হইয়া থাকিবে। তিনি আরও কয়েকখানি সুচিন্তিত পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রপিতামহ ভুবনমোহন, পিতামহ প্রতাপনারায়ণ—মহর্ষিদেবের সহিত ইহাঁদের বহু কালের যোগ। কতক কাল পূর্ব্বে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাদের বাটীতে ব্রহ্মোৎসব করিয়া আসিয়াছেন। হেমেন্দ্রনাথকে মহর্ষিদেব অপত্যনির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন। হেমেন্দ্রনাথের শরীর গত দুই বৎসর হইতে ভগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি ভবানীপুরেই অবস্থান করিতেছিলেন এবং তাঁহার রচিত পুস্তকগুলির ইংরাজি অনুবাদ বিলাত ছাপাইবার আয়োজন করিয়াছিলেন। তাঁহার বয়স প্রায় ৫০ বৎসর হইয়াছিল। তিনি ৬ পুত্র ও ২ কন্যা, পত্নীকে রাখিয়া পরলোক গমন করিলেন। তাঁহাকে হারাইয়া আমরা এক জন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হইতে বঞ্চিত হইলাম। আমরা তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রেমানন্দ এবং তাঁহার ভ্রাতা ভগিনী ও মাতাকে কি বলিয়া সান্ত্বনা দিব জানি না। ঈশ্বর তাঁহাদের কাতর প্রাণে সান্ত্বনা বিধান করুন এবং পরলোকগত আত্মাকে তাঁহার প্রেমের ক্রোড়ে স্থান দিন, ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

৺ শক্তিপতি মুখোপাধ্যায়—শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় আদিব্রাহ্মসমাজের এক জন নিয়মিত উপাসক। তাঁহার মত লোক জগতে বড় বিরল। তিনি মেটিয়াবুরুজ অঞ্চলের একটি হরিসভার সম্পাদক ও আর একটি হরিসভার সহকারী সম্পাদক হইলেও প্রতি বুধবার তিনি তাঁহার আবাসনিকেতন ফতেপুর হইতে আদিব্রাহ্মসমাজে উপাসনায় যোগ দিয়া থাকেন। চারি ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত হওয়া এক জন ৭০ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে অল্প প্রশংসার বিষয় নহে। আদিব্রাহ্মসমাজের উপাসনাপদ্ধতির এবং তথায় প্রদত্ত উপদেশের তিনি বিশেষ অনুরাগী। তাঁহার হৃদয়ের উদারতা অনুকরণীয়। তিনি সংপ্রতি শক্তিপতি পুত্ররত্নকে হারাইয়াছেন। পুত্রটির বয়স প্রায় ৩০ বৎসর। তিনি উপারশীল ছিলেন। তাঁহার বিরহে পঞ্চানন বাবু অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছেন। আমরাও এই সাধু পিতার জন্য নিতান্ত কাতর। পঞ্চানন বাবু নিজে ধর্ম্মপ্রাণ। ভগবান তাঁহার অন্তরে শান্তিবারি বর্ষণ করুন এবং পিতামাতার ক্রোড় হারাইলেও সেই পরমপিতা এই পরলোকগত পুত্রের আত্মাকে স্বীয় চরণে স্থান দান করুন, ইহাই আমাদের মিনতি।

প্রাপ্তি স্বীকার।

আদিব্রাহ্মসমাজের গ্রন্থভাণ্ডার।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে ডাক্তার শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু রায় বাহাদুর তাঁহার প্রণীত তিন খানি গ্রন্থ আদিব্রাহ্মসমাজের গ্রন্থভাণ্ডারে প্রদান করিয়াছেন—(১) খাদ্য; (২) Prevention of Small Pox; এবং (৩) পল্লীস্বাস্থ্য।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি, কাশী যোগাশ্রমের অধ্যক্ষ মহাশয় নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি আদিব্রাহ্মসমাজের গ্রন্থভাণ্ডারে প্রদান করিয়াছেন—(১) ভক্তি ও উপাসনা; (২) A simple means of mass education; (৩) গীতাশতকং; (৪) ছন্দোবোধিকা; (৫) তত্ত্ববিচার; (৬) ত্রিগুণ গাথা; (৭) জ্ঞানোদয়; (৮) শ্রীকৃষ্ণ সৎকথামৃত।

অষ্টাশীতিতম সাম্বৎসরিক

ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ই মাঘ বৃহস্পতিবার প্রাতঃকাল ৮ ঘটিকার সময় মহর্ষিদেবের ভবনে ব্রহ্মোপাসনা হইবে। অতএব ঐ দিবস যথাসময়ে উক্ত গৃহে সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

মাঘোৎসব সংখ্যা।

একমেবাদ্বিতীয়ং

ঊনবিংশ কল্প

তৃতীয় ভাগ।

ফাল্গুন, ব্রাহ্মসম্বৎ ৮৮।

৮৯৫ সংখ্যা

১৮৩৯ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"নজ্ঞদা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"

ব্রহ্মযোগ।

(মাঘোৎসবের উদ্বোধন)

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক ১০ই মাঘের সান্ধ্য উপাসনায় বিবৃত)

সম্বৎসর পরে আজ আবার উৎসবের সম্মুখে আমরা বন্ধুবান্ধবের সহিত ভক্তজনগণের সহিত সম্মিলিত হইয়াছি। আজিকার এই উৎসবে এই শুভ পবিত্র সময়ে ভগবানের নামে আমরা পরস্পরকে উৎসাহ দিয়া বলিতে চাহি—উত্তিষ্ঠত জাগ্রত—উঠ—উঠ—উঠ—জাগ্রত হও।

এই সেদিন ভারতের জাতীয় মহাসম্মিলন উপলক্ষে এই মহানগরীতে—এই মহানগরীতে বলি কেন, সমগ্র ভারতবর্ষে কি একটা মহান্ প্রাণতরঙ্গ চলিয়া গেল। যদি রাজনৈতিক অধিকার লাভের জন্য আমরা এই আশ্চর্য্য উৎসাহ, এই আশ্চর্য্য জাগরণ দেখাইতে পারি, তবে এই ধর্ম্মপ্রাণ ভারতভূমিতে আধ্যাত্মিক অধিকার লাভের জন্য অন্তত সেইটুকু উৎসাহ, সেইটুকু জাগরণও কি দেখাইতে পারিব না? কেবলি কি টাকাকড়ি নাড়াচাড়া করিয়া, কেবলি কি গাড়ীঘোড়া ঘরবাড়ীর বিষয় চিন্তা করিয়া জীবনকে ক্ষয় করিতে থাকিব? তাহাতে মনুষ্যত্ব লাভের সম্ভাবনা কোথায়? মনুষ্যত্ব লাভ দূরে থাক, যে শান্তির আশায় আমরা বিষয়কর্ম্মে নিজেকে ঢালিয়া দিই, সেই শান্তিরও আশা সুদূরপরাহত। কেবল অর্থসঞ্চয় করিব, কেবল ক্ষমতায় শ্রেষ্ঠতম আসন অধিকার করিব, এই আশা লইয়া পাশ্চাত্য জাতিরা ধর্ম্মের সহিত হৃদয়ের বড় একটা সম্বন্ধ রাখে নাই। তাহার ফলে তাহারা এ পর্য্যন্ত প্রকৃত শান্তির আস্বাদ অনুভব করে নাই। পরিণামে তাহাদের অন্তরের অশান্তি যখন সমস্ত সীমা অতিক্রম করিল, তখনই তাহা সমাজরক্ষা দেশরক্ষার বাঁধ ভাঙ্গিয়া সমগ্র পৃথিবীকে একটী সুবৃহৎ অগ্নিদগ্ধ কটাহে পরিণত করিল। আমরা কি সেই অশান্তি চাই, অথবা ভগবানের চরণে কাঁদিয়া পড়িয়া শান্তি ভিক্ষা করিতে চাই?

সত্যের পথে, ধর্ম্মের পথে, ঈশ্বরের পথে না চলিলে কখনই প্রকৃত শান্তির আশা করিতে পারি না। মতামত লইয়া বিবাদ বিসম্বাদ পরিত্যাগ করিয়া, কথা কাটাকাটি ছাড়িয়া দিয়া, সকল শাস্ত্র, সকল দেশের সকল লোকে সকল যুগ ধরিয়া যাঁহার জয় ঘোষণা করিতেছে, সেই দেবদেবের চরণে আমাদিগকে আছড়াইয়া পড়িতে হইবে। এই অর্থদরিদ্র কিন্তু ধর্ম্মধনী ভারতভূমিতে যে জাগরণ আসিয়াছে, ঈশ্বরকে প্রাণে ধরিবার, তাঁহার পতাকা নগরে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে, কুটীরে কুটীরে প্রতিষ্ঠিত করিবার এমন শুভ অবসর হারাইলে আমাদের দাঁড়াইবার স্থান কোথায়?

আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ঈশ্বরের পথে চলিবার

পথ কত সহজ করিয়া দিয়াছেন। যোগসিদ্ধ ঋষি-মুনিগণ তাঁহাদের প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ সিদ্ধ মন্ত্র সকল সেই পথে দীপ্ত প্রদীপ স্বরূপে রাখিয়া গিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে, তাঁহারা সেই সকল মন্ত্র আমাদিগের প্রতিদিনের ব্যবহারে আনিবার জন্য আশ্চর্য্য ব্যবস্থা সকলও প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন। শত রাষ্ট্রবিপ্লব, শত সমাজবিপ্লব, শত মতবাদ সেই মন্ত্রদীপগুলি নির্ব্বাণ করিতে পারে নাই, সে ব্যবস্থাও মুছিয়া দিতে পারে নাই। আমরা যদি কেবল কতকগুলি মুখস্থ মন্ত্র না আওড়াইয়া যথার্থ হৃদয়ের সহিত পূর্ব্বপুরুষগণের তর্পণ করিতে চাহি, তবে আমাদের প্রত্যেককে সেই অক্ষয় মন্ত্র সকল অবলম্বনে সেই অক্ষয় পুরুষের সহিত অখণ্ড যোগ নিবদ্ধ করিতে হইবে। ইহার ফলে আমরা প্রত্যক্ষ দেখিব যে আমাদের দেশ একদিকে শান্তির পথে, অপরদিকে পূর্ব্বতন গৌরবের পথে কি প্রকার দ্রুতপদে অগ্রসর হয়।

আমরা আজ এই প্রশ্ন করিতে চাহি, আমাদের মধ্যে কয়জন ঈশ্বরের সহিত প্রত্যক্ষ যোগে সংবদ্ধ হইবার চেষ্টা করিয়াছি? আমাদের মধ্যে কয়জন আগামী উৎসবকে সার্থক করিতে যত্নবান হইয়াছি? তর্ক বিতর্ক করিয়া আমরা অনেক সময় নষ্ট করিয়াছি বটে, কিন্তু আমরা কয়জন সত্যসত্য ঈশ্বরের চরণে আত্মসমর্পণ করিতে উদ্যুক্ত হইয়াছি? আমরা ভুলিয়া যাই যে আমাদের সমস্ত চিন্তা সমস্ত কার্য্যকে একমুখী—ব্রহ্মের অভিমুখী করিতে হইবে। ইহার জন্য সংসার পরিত্যাগ করিবার প্রয়োজন দেখি না। কিন্তু যদি কোন কার্য্যে, কোন অবস্থায় ঈশ্বরের আদেশের সহিত সংসারের বিরোধ ঘটে, তবে সেই কার্য্যে সেই অবস্থায় সংসারকে ছাড়িয়া ঈশ্বরের চরণ ধরিয়া থাকিতে হইবে—সংসারের ভয় ও প্রলোভনকে পায়ের তলে দলিয়া ফেলিতে হইবে। ব্রহ্মপরায়ণ গৃহস্থ ঈশ্বরকে ছাড়িয়া সংসারের দাসত্ব গ্রহণ করিতে পারেন না। আমরা স্বাধীন ঈশ্বরের স্বাধীন সন্তান। সেই পিতার সহিত, এই আকাশের অধিপতি মহান্ পুরুষের সহিত, এই আত্মার অধিপতি পরমাত্মার সহিত আমাদের প্রত্যক্ষ যোগ নিবদ্ধ করিতে হইবে, তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছার সহিত আমাদের ইচ্ছাকে একেবারে মিলাইয়া দিতে হইবে। তবেই আমাদের মঙ্গল, তবেই আমাদের গৌরব, তবেই আমাদের উৎসব সার্থক।

ঈশ্বরের সহিত আমাদের অচ্ছেদ্য যোগ নিবদ্ধ করিতে হইলে, আমাদের জীবনকে ব্রহ্মময় করিয়া তুলিতে চাহিলে আমাদের অহঙ্কারকে চূর্ণ করিয়া ফেলিতে হইবে। ঈশ্বরকে যন্ত্রী এবং আমাদের নিজেকে তাঁহার যন্ত্র বলিয়া প্রাণের ভিতরে জানিতে হইবে। আগুনের সহবাসে যেমন ঘৃত গলিয়া যায়, ভগবানের সহবাসে আমাদের নিজেকে তেমনি গলাইয়া ফেলিতে হইবে। ঈশ্বর আছেন, ইহা কেবল জ্ঞানেতে জানিলে চলিবে না। তাঁহাকে প্রেমেতে জানিয়া আমাদের জীবনকে এমন প্রস্তুত করিতে হইবে যে তাঁহার নামেমাত্র আমাদের হৃদয়তন্ত্রী ঝঙ্কার দিয়া উঠে। ঐ যে সকল কার্য্যে আমি-কে দেখিতে চাহি, সকল কথায় আমি-কে ধ্বনিত শুনিতে চাহি, এই আমি-কে ভগবানের চরণে না বলি দিলে নবজীবন পাইবার আশা বৃথা। এক আর এক-এ দুই হয় যেমন নিশ্চয় জানি, ঈশ্বরের সহবাসেই জীবন, এবং তাঁহার সহিত বিচ্ছেদেই মৃত্যু, ইহাও তেমনি করিয়া আমাদের অন্তরে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতে হইবে।

আজ এই উৎসবের প্রদোষে, এস, আমরা নিদ্রা ভাঙ্গিয়া দিয়া সেই পরমদেবতার অপরাজিত পতাকার তলে দণ্ডায়মান হইবার জন্য ছুটিয়া চলি। এই সংসারের কঠোর সংগ্রামক্ষেত্রে তিনি স্বীয় জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিতে আমাদের সেনাপতি হইয়া সম্মুখেই দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাকে ছাড়িয়া আর কাহার অধীনে দাসত্ব করিতে যাইব? তাঁহার মত আর কে আমাদের অভাবসকল সূক্ষ্মভাবে দেখিয়া পূর্ণ করিতে পারে? তিনিই আমাদের সংসারপথে একমাত্র বন্ধু। আমরা প্রত্যেকেই আমাদের জীবনে কত আঘাত পাইতেছি; কত আত্মীয়স্বজনকে হারাইয়া শোকে অধীর হইতেছি, বন্ধুবান্ধবের নিকট কতবার মর্ম্মান্তিক আঘাত পাইতেছি; কিন্তু এ সকলই সহ্য হইতেছে, কেবল সেই প্রাণের বন্ধু পরমেশ্বর যথাসময়ে সকল আঘাতের উপরেই তাঁহার মধুময় শান্তিবারি বর্ষণ করেন বলিয়া।

আজ এই উৎসবের প্রারম্ভে, এস, আমরা সকলে মিলিত কণ্ঠে তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া ডাকি। তাঁহাকে ডাকিবার মত ডাকিলে তিনি কথনই নিস্তব্ধভাবে স্থির হইয়া থাকিতে পারিবেন না। হৌক না কেন তাঁহার সুবৃহৎ আকাশব্যাপী স্বর্ণ-সিংহাসন, হৌক না কেন তাঁহার শত শত চন্দ্রসূর্য্য-খচিত মুকুটরাজি, মানুষের—একটীও মানুষের ব্যাকুল হৃদয় তাঁহার নিকট সেই স্বর্ণসিংহাসন, সেই মুকুটরাজি অপেক্ষা শতগুণ মূল্যবান। তাঁহাকে ব্যাকুল হৃদয়ে ডাকিলে তিনি সকলই পরিত্যাগ করিয়া দরিদ্র মানবসন্তানের হৃদয়ে না আসিয়া থাকিতে পারিবেন না। তিনি হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইলে তোমার শোকতাপ বিপদআপদ থাকিতেই পারিবে না—তিনি তাঁহার করুণাকোমল মাতৃহস্তে তোমার চক্ষের জল নিশ্চয়ই মুছিয়া দিবেন। আজ তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া ডাকিয়া, এস, আমাদের জীবনকে ধন্য করি, আমাদের মনপ্রাণ শীতল হৌক। এই শুভ মুহূর্ত্তে, এই পবিত্র স্থানে তাঁহার করুণাবারি অজস্রধারে বর্ষিত হৌক। এই স্থান এখনই ঋষিদিগের পুণ্য তপোবনে পরিণত হৌক।

অষ্টাশীতিতম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব।

মাঘোৎসব আসিল ও চলিয়া গেল। এবারকার উৎসবে একটি গভীর ও পবিত্র ধর্ম্মভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল। আদিব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসবে গত কয়েক বৎসর বোলপুর হইতে ছাত্রবৃন্দ আসিয়া সুমধুর কণ্ঠে ব্রহ্মনাম গান করিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করিত, কিন্তু গত বৎসরে তাহারা কলিকাতায় আসিবার পর তাহাদের মধ্যে দুএকজন অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়ায় এবার তাহাদের অভিভাবকগণ তাহাদের কলিকাতায় আসা সম্বন্ধে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাই শ্রদ্ধেয় রবীন্দ্রনাথ উৎসবের তিন চারি দিন পূর্ব্বে বিশেষ অসুস্থ হইয়া পড়িলেও বোলপুরের ছাত্রগণকে লইয়া শান্তিনিকেতনে উৎসব করিবার জন্য দুর্ব্বল দেহেই তথায় চলিয়া গিয়াছিলেন।

১১ই মাঘের প্রাতঃকালের উপাসনা মহর্ষিদেবের বাটিতে সুসম্পন্ন হয়। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়কে সঙ্গে লইয়া বেদীর আসন গ্রহণ করেন। সুধীন্দ্র বাবুর উদ্বোধন এবং চিন্তামণি বাবুর উপদেশ সকলের হৃদয় আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

রাত্রের উপাসনায় শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় বেদী গ্রহণ করেন। উৎসবক্ষেত্র পূর্ব্ব-পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। বেদগান হইয়া যথা-সময়ে কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল। বেদগানের সময়ে শ্রোতাগণ সকলেই দণ্ডায়মান হওয়াতে এক স্বর্গীয় দৃশ্য আবির্ভূত হইয়াছিল। সে দৃশ্যে আমরা প্রেমাশ্রু সম্বরণ করিতে পারি নাই। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র বাবু উদ্বোধন, এবং ক্ষিতীন্দ্র বাবু উপদেশ দান করেন। প্রাতে ও সায়াহ্নের উপাসনা সকলকেই তৃপ্তিদান করিয়াছিল। এ বৎসর শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী, সরলা দেবী, শোভনা দেবী, গার্গী দেবী, বাণী দেবী ও মেধা দেবী কয়েকটী গান গাহিয়া সমস্ত লোককে বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন। রাম-প্রসাদী সুরের দুইটি সঙ্গীত বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। সেই দুইটি গান (প্রণাম এবং মাতৃপূজা) ইতিপূর্ব্বে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশিত হওয়ায় পুনরায় সেগুলি প্রকাশ করা হইল না। উপরোক্ত দুইটি গান ব্যতীত আর একটি নূতন গান গীত হইয়াছিল তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

নূতন গান।

(শ্রীসরলা দেবী)

রাগিণী মেঘমল্লার—তাল ঝাঁপতাল।

আজিকে মম বক্ষ ভরি
উঠিছে একি ক্রন্দন!
না জানি পরশ-অতীত কারে চাই!

মহাকাশের চন্দ্রমা সে
নিখিল-জগ-বন্দন!
তারে চাই, তারে চাই,
তারে আমি চাই!

যদিও বা অশক্ত আমি,
শক্তিময় হৃদয়স্বামী
আপন প্রেমে আসিয়ে নামি
করেন যদি নন্দন!
কিবা চাই, কিবা চাই,
আর কিবা চাই!

ইচ্ছা জাগে যার ইচ্ছায়
যোগ্যতায় সেই সাজায়
আপন হাতে যদি পরায়
দীনতা-ফুলচন্দন!
যারে চাই, যারে চাই,
যারে আমি চাই!

মানবজীবন ও ব্রাহ্মধর্ম্ম।

(উদ্বোধন)

(শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক ১১ই মাঘের প্রাতঃকালীন উপাসনায় বিবৃত)

আজ উৎসব-আরম্ভে আমাদের পরম পিতা পরমেশ্বরকে আমরা ভক্তিভরে প্রণাম করি। তাঁর অযোগ্য সন্তান হ'লেও বৎসরান্তে এই দিন সকলে একত্র সমবেত হ'য়ে যে, আমরা তাঁর নাম করতে, তাঁর নাম শুনতে, তাঁকে ডাকবার অবসরটুকুও পাই এইই আমাদের পক্ষে পরম সৌভাগ্যের বিষয়।

মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা শ্লাঘার কথা, গৌরবের কথা, অসীম বল ভরসা আশা আশ্বাসের কথা এই যে, এমন যে ত্রিভুবনপতি পরমেশ্বর তিনি আমাদের সকলেরই পিতা, আমরা সকলেই তাঁর সন্তান। 'তিনি আমাদের সকলেরই পিতা, আমরা সকলেই তাঁর সন্তান' একথাটা অতিশয় ছোট ও পুরাতন হ'লেও এর মধ্যে যে শক্তিপ্রবাহ সঞ্চারিত আছে তাইই এ জগতের একমাত্র রক্ষা-কবচ। এর স্মরণে, অনুভূতিতে, উপলব্ধিতে মহাদুঃখী যে সে তার দুঃখ ভুলে যায়, দুর্ব্বল মৃতপ্রায় যে সে নবশক্তি লাভ করে, পাপী যে সে আশার কিরণ, পরিত্রাণের উপায় দেখতে পেয়ে জীবনকে নূতন পথে ফিরিয়ে নেয়। 'তিনি আমাদের সকলেরই পিতা, আমরা সকলেই তাঁর সন্তান' আজ এই কথাই স্মরণ করে' প্রাণে বল পেয়ে এই আসন গ্রহণ করে' আমি দুই একটা কথা বলতে সাহস পাচ্চি।

মানবজীবনকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায়। জীবনের আরম্ভ, মধ্য ও শেষ।

জীবনের আরম্ভে আমরা যখন শিশু থাকি, তখন আমরা আপনা হ'তে আপনার সব চেয়ে বড় মঙ্গলটি কেমন করে' বুঝে নিই, পৃথিবীতে সব চেয়ে আমাদের নিরাপদ স্থান কোথায় তা' ঠিক করে' নিয়ে সেইটিকেই আমরা প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে' থাকি। তাই শিশুকালে আমরা আমাদের মা'র কোলে বাঁচি ও দিনে দিনে পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হ'য়ে অপূর্ব্ব মনুষ্যত্ব লাভ করি। শিশুকালে আমরা একমাত্র আমাদের মাকেই চিনি ও চাই, আমাদের প্রাণের কেবল একটি ডাক 'মা' নাম, আমাদের একটি আশ্রয় মা'র কোল। ভগবানের কি কৌশল, কি করুণা, যে নিতান্ত অসহায় দুর্ব্বল, তাকে প্রেরণার বলে তার মঙ্গলকে গ্রহণ করিয়ে বাঁচিয়ে রাখেন।

তারপর ক্রমে ক্রমে যখন আমাদের জীবন ফুটে উঠতে থাকে, চোখ মেলে এ জগতের দিকে আমরা একবার ভাল করে' চেয়ে দেখি, তখন আমরা জানতে পারি যে, এই পৃথিবীর মা'ই আমাদের সর্ব্বস্ব নন, আমাদের আর এক মা আছেন যিনি জগৎকর্ত্রী জগদ্ধাত্রীরূপে এ জগৎ আলো করে' বিরাজ ক'রচেন। তাঁকে আমরা চোখে দেখতে পাইনে, তাঁর কথা আমরা কানে শুনতে পাইনে, তাঁর স্পর্শ আমরা দেহে অনুভব করিনে, তবুও তাঁর সান্নিধ্য, তাঁর সত্তা আমরা যেমন নিকটতম ঘনিষ্ঠতমভাবে উপলব্ধি করি জগতে এমন আর কোন কিছুরই করিনে। তখন এই অরূপের দিকে আমাদের মন ধায় কিন্তু স্থির থাকতে পারে না, আকাঙ্ক্ষা যখন জ্বলে' ওঠে, সংসারের কোথা হ'তে দম্‌কা বাতাস এসে তাকে তখনি নিভিয়ে দেয়। তখন আমরা যেমন ছিলুম আবার তেমনি থাকি। কিন্তু দেখতে দেখতে যখন এই বাতাস হ'তে ঝড় ওঠে, তুফান ছোটে, ধূলায় আকাশ ভরে' যায়, অন্ধকারে আমরা আশ্রয় খুঁজে হাহাকার করে' বেড়াই, তখন এই অরূপের রূপই অন্ধকারে আলো হয়ে' নির্ভয় আশ্রয় দিয়ে আমাদের রক্ষা করে। এখানেও ভগবানের আশ্চর্য্য করুণা আমরা দেখতে পাই,—সংসারের মাকে দিয়ে তিনি আমাদের বাঁচান ও চোখের জলে আমাদের জীবন ধুয়ে নিয়ে তাঁকে দিয়ে আনন্দে আমাদের জন্ম সার্থক করেন।

তারপর জীবনের শেষ দশায় যখন আমাদের শরীর মন ক্রমে নিস্তেজ হ'য়ে পড়ে, গর্ব্ব মান সব

টুটে যায়, তখন সেই পরমাশ্রয়কেই লাভ করবার জন্য আমাদের মন আপনা হ'তেই ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে। সময় থাক্‌তে যা আমরা বুঝিনি, অন্তিমে তা বুঝতে পারি—এ অকূল-ভবসাগরের একমাত্র কাণ্ডারী ভগবান, তিনি ছাড়া আমাদের গতি নেই, আর গতি নেই। ভগবানও তখন শিশুর মত আমাদের অসহায় দেখে' আপনা হ'তেই ধরা দেন, আমাদের কাছে এসে দাঁড়ান, জীবন বৃন্তচ্যুত হ'য়ে তাঁরই চরণে অবসান লাভ করে।

মানবের এই তিন অবস্থার মধ্যে আমরা দেখলুম, শিশুই একমাত্র গোড়া থেকে অনন্যমন হ'য়ে এককেই ধরে থাকে। ব্রাহ্মধর্ম্মও এই শিশুর মত একানুগত ধর্ম্ম, মানবপ্রাণের সহজ ও সরল ধর্ম্ম। ভগবানের সঙ্গে ব্যবধানরহিত অবিচ্ছিন্ন প্রাণের যোগের কথাই ব্রাহ্মধর্ম্মের আসল কথা। ব্রাহ্মধর্ম্ম নূতন ধর্ম্ম নয়, ব্রাহ্মধর্ম্মই জগতের একমাত্র সত্যধর্ম্ম, মানবের প্রাণগত চিরন্তন ধর্ম্ম।

ধর্ম্মগ্রহণের উপর ধর্ম্মের সারবত্তা বলবত্তা নির্ভর করে না, সত্যের উপরই ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা, ধর্ম্ম ধর্ম্মেরই জন্য। আমরা জানি এদেশে ব্রাহ্মের সংখ্যা অত্যল্প, তবুও বল্‌ব ব্রাহ্মধর্ম্ম সত্যধর্ম্ম, জগতের একমাত্র ধর্ম্ম। আর যদি ঠিক সত্য কথা বল্‌তে হয়, তবে এটা আমরা বেশ জানি কেবল সমাজ ও লোকাচারের ভয়ে আমরা প্রকাশ্যে এ ধর্ম্মকে গ্রহণ করিনে, কিন্তু মনে মনে আমরা সকলেই এ ধর্ম্মের প্রাধান্য স্বীকার করি ও অন্তরে এ ধর্ম্মকেই বরণ করে' নিয়েচি।

তুমি বল্‌চ, ভগবানকে তুমি চোখে দেখ্‌তে পাওনা, কেমন করে' তাঁর অস্তিত্বে তুমি বিশ্বাস করবে, তাঁকে ধারণা করবে? কিন্তু তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি যখন তোমার মনে ব্যথা পাও আর সে কথা অন্যকে জানাও, তখন যদি সেই ব্যক্তি তোমাকে 'জিজ্ঞাসা করেন তোমার মন কোথায়, তোমার ব্যথাই বা কি, তখন তুমি কি তোমার মনকে দেখাতে পার, না তোমার ব্যথার স্বরূপ নির্দ্দেশ করতে পার? তবুও তুমি মনে ব্যথা পেয়েছ একথা সত্য। ভগবানও তেম্‌নি বাহিরের বস্তু নন, তিনি অন্তরের বস্তু, প্রাণের বস্তু, অন্তরের অন্তরতলস্থিত আত্মার একমাত্র ভোগ্য। তিনি যাকে অন্তরে জানান্ দেন, তার আর রক্ষা নেই, সে তাঁকে পাবার জন্য একেবারে পাগল হ'য়ে যায়। তিনি এম্‌নি সত্যবস্তু।

আজ এই উৎসবক্ষেত্রে ক্ষণকালের জন্যও যদি আমরা ভগবানকে আমাদের অন্তরে দেখতে পাই, তবেই আমাদের সকলি চরিতার্থ হবে, তাঁর প্রীতি যদি ক্ষণকালের জন্যও আমরা প্রাণে আস্বাদন করতে পারি তবেই আমাদের জীবন মধুময় হয়ে যাবে। দেখ, রমণীয় প্রাতঃকাল তাঁর পূজা-উপকরণে কেমন আরও রমণীয় হ'য়েছে। তিনি আমাদের পূজাগ্রহণের জন্য এখানে আবির্ভূত হ'য়েছেন, এস, আমরা আমাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধা ভক্তি দিয়ে তাঁর পূজা করে' জীবনকে সার্থক করি।

হে ভগবান! হে এক! তুমিই একমাত্র আমাদের ব্যথার ব্যথী, সাথের সাথী, তুমি ভিন্ন আমাদের গতি নেই, আর গতি নেই। আমরা দুর্ব্বল, তুমিই একমাত্র আমাদের বল, ভরসা; আমরা বিভ্রান্ত, তুমিই একমাত্র আমাদের জীবনের শান্তি, আলো; আমাদের আর কেহ নেই, করুণাময় তুমি আছ বলেই আমরা বেঁচে আছি, আমরা তোমারই কৃপার ভিখারী। আজ আমরা তোমার নিকট প্রার্থনা করি, তুমি আমাদের নিকটে এস, আমাদের বিভ্রান্ত মনকে শান্ত কর, আমাদের অন্তরের সমস্ত বিষাদ মলিনতাকে দূর করে দাও, আমাদের সকলকে আশীর্ব্বাদ কর, এ উৎসবকে সার্থক কর। তোমাকে অধিক আর কি জানাব,—দয়া কর, তুমি দয়া কর। তোমার চরণে ভক্তিভরে আমরা বারবার প্রণিপাত করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

ভারতের ধর্ম্মতরঙ্গ।

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ১১ই মাঘের প্রাতঃকালীন উপাসনায় বিবৃত)

ভারতের এই পুণ্যক্ষেত্রের উপর দিয়া ধর্ম্মের কত তরঙ্গ যে চলিয়া গিয়াছে, কে তাহার সংখ্যা করিবে। তরঙ্গ তো চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু প্রতি তরঙ্গ পশ্চাতে এক একটি স্তর রাখিয়াছে। সেই অতি প্রাচীন বৈদিক যুগে যে তরঙ্গ সমুত্থিত

হইয়াছিল, আমরা সেই তরঙ্গ-পরিত্যক্ত স্তরের ভিতরে কি দেখিতে পাই? না, প্রকৃতির ভিতরে ব্রহ্মদর্শন অর্থাৎ বজ্র বিদ্যুৎ অগ্নি বায়ুর শক্তির ভিতরে ভগবৎ-দর্শনের আকুল চেষ্টা। তাহার অব্যবহিত পরে উপনিষদের যে তরঙ্গ উঠিয়াছিল, তাহার অবসানে স্তরের ভিতরে কি রহিয়াছে? না, অন্তরের ভিতরে, আত্মার অভ্যন্তরে ব্রহ্মদর্শনের জন্য ব্যাকুলতা। কালবিলম্বে দর্শনের যে তরঙ্গ চারিদিক হইতে উত্থান করিল, তাহার পশ্চাতে কি রহিয়াছে? না, ব্রহ্মের সহিত অভেদজ্ঞান উপলব্ধি করিবার জন্য নিদারুণ সাধনা; কোথাও বা দেখিতে পাই ঈশ্বরই সত্য এবং আর যাহা কিছু দেখি সমস্তই মায়া বা মিথ্যা, এই বোধ আনয়ন করিবার জন্য আকুলতা। বুদ্ধদেব যে তরঙ্গ ছুটাইয়া দিলেন, সেই তরঙ্গপরিত্যক্ত স্তরের ভিতরে কি দেখিতে পাই? না, বাসনা নিবৃত্তি, নির্ব্বাণ লাভের জন্য আয়োজন এবং জীবে দয়া। গীতার তরঙ্গের ভিতরে কি দেখিতে পাই? না, নিষ্কামভাবে কর্ত্তব্য সাধন ও ফলকামনাত্যাগ। তন্ত্রের রহস্যময় তরঙ্গ যে স্তরটি রচনা করিয়া দিল, তাহার সকল মর্ম্ম বুঝিবার আমাদের সামর্থ্য না থাকিলেও বুঝি যে মাতৃভাবে ভগবানের সাধন উহার অন্যতম উপাদান। দিগন্ত-ব্যাপী পুরাণের তরঙ্গ, যাহা এই পুণ্যক্ষেত্রের উপর এখনও চলিতেছে, সেই তরঙ্গ-বিরচিত স্তরের ভিতরে কি দেখিতে পাই? না, কাহিনীর ভিতর দিয়া, কল্পনার ভিতর দিয়া, আদর্শ-চরিত্রের ভিতর দিয়া, দয়া প্রেম, নীতি শ্রদ্ধা ও ত্যাগধর্ম্মের বিপুল প্রচার চেষ্টা। গৌরাঙ্গদেব-প্রবর্ত্তিত তরঙ্গের এখনও বিরাম হয় নাই, কিন্তু সেই তরঙ্গের অন্তরালে কি দেখিতে পাই? না, ভক্তির উদ্দাম উচ্ছ্বাস।

এই সমস্ত প্রবল তরঙ্গের মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট অনেক তরঙ্গ সমুত্থিত হইয়া আমাদের দেশের প্রাণকে সুকোমল করিয়া রাখিয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে এই ভারতের প্রকৃত ইতিহাস, অসংখ্য ধর্ম্মতরঙ্গের ইতিহাস। আমাদের দেশের প্রকৃত সংগ্রাম চরিত্র-সংগঠনে এবং অন্তরের রিপুকুল-বিজয়ে। আমাদের জয়োল্লাস ত্যাগে, শান্তিতে, নিষ্ঠায়, বিনয়ে এবং সাধনে।

যখন কোন একটি ধর্ম্মমত বা তাহার সাধনার ভাব ব্যাপক কাল ধরিয়া কোন দেশকে আশ্রয় করিয়া থাকে, আমরা দেখিতে পাই, কালক্রমে মনুষ্যের দুর্ব্বলতা উহাকে কীটদষ্ট কাষ্ঠ-খণ্ডের মত জীর্ণ করিয়া ফেলিবার চেষ্টা পায়। বৈদিক সময়ে প্রকৃতির শক্তির ভিতরে ব্রহ্মদর্শনের আকুল চেষ্টা চলিয়াছিল; কিন্তু অগ্নি বায়ু চন্দ্র সূর্য্য, সাধকের দুর্ব্বলতায়, ঈশ্বরের স্থান অধিকার করিবার যখন উপক্রম করিল, উপনিষদের জ্ঞানোন্নত ঋষিদিগের সমুচ্চ কণ্ঠ ঘোষণা করিয়া দিল, "ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্রতারকং, নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোয়মগ্নিঃ" সূর্য্য তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, চন্দ্র তারকাও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না; অগ্নি ত দূরের কথা। বাহিরে, প্রকৃতিকে ব্রহ্মস্বরূপে দর্শনের বিভীষিকা আছে দেখিয়া, উপনিষদ প্রচার করিলেন "আত্মন্যেবাত্মানং পশ্য" আত্মার মধ্যে পরমাত্মার দর্শন লাভের জন্য সচেষ্ট হও।

উপনিষদ্ যখন "সত্যং জ্ঞানং মনন্তং" বলিয়া ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিলেন, দর্শনের ঋষিগণ স্থির হইয়া থাকিতে পারিলেন না। গায়ক গান করিতে করিতে যখন তন্ময় হইয়া যান, তাঁহার কণ্ঠ হইতে তান আপনা হইতে বাহির হইয়া পড়ে; তাঁহার স্বর উচ্চ হইতে সমুচ্চ গ্রামে সমুত্থিত হইতে থাকে। ঠিক সেই ভাবে ঋষিরা ভগবানের সত্য-ভাব যখন গভীররূপে উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়া উঠিলেন, যে তিনিই একমাত্র সত্য, আর এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সমস্তই মিথ্যা, সবই মায়া। ইহাই একভাবে অদ্বৈতবাদের মূল। কিন্তু সাধক আবার অন্যদিকে তাঁহার সহিত উপাস্য উপাসক সম্বন্ধ ভুলিতে চায় না, তাই আবার দ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের সৃষ্টি। যজ্ঞে পশুবধ যখন বুদ্ধদেবের প্রাণকে আকুল করিয়া তুলিল এবং যাজ্ঞিকের ফল-কামনা তাঁহার অন্তরে আঘাত দান করিল, আধিব্যাধি-সঙ্কুল জরা-বার্দ্ধক্যপরিপূর্ণ মনুষ্য-জীবনের চিত্র চক্ষুপীড়া দিতে আরম্ভ করিল, তখন তিনি অহিংসার উপরে, বাসনাত্যাগের উপরে তাঁহার ধর্ম্মের পত্তন করিলেন। ফল-লাভের লোভ যখন কর্ত্তব্যজ্ঞানকে মলিন করিবার উপক্রম করিল,

গীতাকার আপনার মস্তক উত্তোলন করিয়া বলিয়া উঠিলেন, যদি কর্ত্তব্য পালন করিতে হয়, কর্ত্তব্যের জন্যই তাহা সংসাধন করিতে হইবে, সুকৃতির লোভ তাহার নিয়ামক হইলে চলিবে না। ক্রমে যখন এদেশে জ্ঞানের আলোচনা খর্ব্ব হইয়া আসিল, বৌদ্ধ-বিপ্লব আসিয়া সমগ্র হিন্দু সমাজকে চূর্ণ করিবার উপক্রম করিল, সেই সময় হইতে কাহিনী-মুখে কল্পনার সাহায্যে বৈদিক যুগের সত্য প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইল। এইরূপে পৌরাণিক যুগের সূত্রপাত হইল। লোকে এতদিন ভগবানকে "পিতা নোঽসি" তুমি আমাদের পিতা এই পিতৃ-নামে সম্বোধন করিয়া আসিয়াছিল, তন্ত্রের যুগ তাঁহাকে পরম-মাতা, বিশ্বজননীরূপে আহ্বান করিতে আরম্ভ করিয়া দিল। সন্তানের কল্যাণকামনায় পিতার স্নেহের ভিতরে একটু কাঠিন্য আছে বলিয়া আপাতত মনে হইতে পারে, কিন্তু মাতার হৃদয়ে কেবলই স্নেহ, কেবলই দয়া, কেবলই মার্জ্জনা। সাধক যখন চারি-দিকে আপনার দুর্ব্বলতা দেখে, তখন ভগবানকে মাতৃরূপে সম্বোধন না করিয়া সে আর থাকিতে পারে না। মাতৃরূপে ডাকিয়া সে অভয় প্রাপ্ত হয়। ইহাই তন্ত্রের বিশেষত্ব। ঈশ্বরের নিকট শক্তি-লাভের আশায় যখন পশুবধ আরম্ভ হইল, যখন পশুরক্তে ধরণীর গাত্র কলঙ্কিত হইতে লাগিল, বাহ্য-উপকরণ বাহিরের আয়োজন যখন পূজার স্থান অধিকার করিল, গৌরাঙ্গদেব বিচলিত হইয়া উঠিলেন। তিনি প্রেম ও ভক্তির বন্যা প্রবাহিত করিয়া দিলেন। নাম-সাধন, পূজার আড়ম্বরের স্থান অধিকার করিয়া বসিল।

এইরূপে ঘাতপ্রতিঘাতে এই পুণ্য ভারতে বিভিন্ন ধর্ম্মের বিকাশ সাধিত হইয়াছে। আবার যখন বিগত শতাব্দীতে ইংরাজি শিক্ষার ও দীক্ষার প্রভাবে এদেশে সম্পূর্ণ নূতন আলোকের সম্পাত হইল, রামমোহন রায় আকুল হইয়া উঠিলেন। তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। তিনি বেদ-বেদান্তের কীটনিষ্কুষিত পুঁথি উদ্ঘাটন করিতে আরম্ভ করিলেন। খৃষ্টীয় ও মুসলমানী ধর্ম্ম-সাহিত্য পাঠ করিলেন, আমাদের গতিমুক্তির পথ সন্ধান করিয়া বাহির করিলেন। উপনিষদের উপরে, বেদ বেদান্তের উপরে এই ব্রাহ্মধর্ম্মকে, এই আড়ম্বর-বিহীন ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সার্ব্বজনীন ভাব ইহার সহিত মিলিত করিয়া দিলেন, বিশ্ব-জনীন সত্যের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের সুর মিলাইয়া দিলেন, এবং আমাদিগকে জাতীয়ত্বে অথচ সত্যে রক্ষা করিবার পথ প্রমুক্ত করিয়া দিলেন। ইহা-রই প্রচারকল্পে অদ্যকার পবিত্র দিনে আদি-ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হইল। তাই আজ সত্য-ধর্ম্মা ঈশ্বরের নামে এবং রাজা রামমোহন রায়ের নামে আমরা এখানে মিলিয়াছি। পরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, যিনি এই ব্রাহ্মধর্ম্মকে আকার ও অঙ্গসৌষ্ঠব প্রদান করিলেন, তাঁহাকেও আজ এই ভারতের ভাগ্য-বিধাতা ঈশ্বরের সঙ্গে স্মরণ করিয়া আমরা গৌরব অনুভব করিতেছি।

আমাদিগকে এক্ষণে আলোচনা করিতে হইবে, যে এই ব্রাহ্মধর্ম্মকে সম্যকরূপে বিকশিত করি-বার জন্য অতীতের স্তর হইতে কি কি উপকরণ সংগ্রহ করিয়া লইয়াছি। আমরা লইয়াছি বৈদিক সময়ের নিখিল প্রকৃতির ভিতরে ব্রহ্ম-দর্শনের ভাব। তাই "ওঁ যো দেবোগ্নৌ যোঽপসু" যিনি অগ্নিতে যিনি জলেতে, যিনি ওষধিতে যিনি বনস্পতিতে, তিনিই আমাদের উপাস্য দেবতা, ইহাই আমাদের উপাসনার প্রথম মন্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা উপনিষদের "সত্যং জ্ঞানং অনন্তং" এই মন্ত্র লই-য়াছি। ঈশ্বরের পিতৃভাব বেদ হইতে, তাঁহার মাতৃভাব তন্ত্র হইতে আমরা গ্রহণ করিয়াছি। ভগবানের সঙ্গে আমাদের সখ্য ভাব আমরা বেদ ও পুরাণ হইতে গ্রহণ করিয়াছি, অহিংসার ভাব আমরা বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। নীতির ভাব এবং চরিত্রের আদর্শের ভাব আমরা পুরাণ হইতে লাভ করিয়াছে। পরিশুদ্ধ অহেতুকী ভক্তির ভাব আমা-দের ভিতরে বৈষ্ণবধর্ম্ম হইতে স্থান পাইয়াছে। অথচ সকল ধর্ম্মের সারভূত অমূর্ত্ত ঈশ্বরের পূজার ভাব আমরা বরণ করিয়া লইয়াছি। অথচ এ ধর্ম্ম যে সংগ্রহের ধর্ম্ম তাহা নহে। এই ধর্ম্ম জ্ঞানের আলোকে সময়েরই আহ্বানে আপনা হইতে বিক-শিত, অথচ ইহাতে অন্যান্য ভাবের যুগপৎ-মিলন। স্বদেশীয় ভাব হইতেই ইহার উৎপত্তি এবং দেশীয় ভাবেরই উপরে ইহার প্রতিষ্ঠা, অথচ বিজাতীয় সকল ধর্ম্মের মর্ম্ম-কথার সহিত ইহার আশ্চর্য্য মিলন।

আমাদিগকে এই উৎসবের দিন আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে, আমরা এই ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয়ে সত্য সত্যই কি পাইয়াছি। ইহাতে যদি আমাদের জ্ঞান পরিশুদ্ধ হইয়া থাকে, ভক্তির উৎস উৎসারিত হইয়া যদি আমাদের প্রাণকে সুকোমল করিয়া থাকে, আমাদের চরিত্রকে বিমল করিয়া থাকে, শান্তির পিপাসাকে আরও বিবর্দ্ধিত করিয়া থাকে, আমাদের অহঙ্কারকে বিচূর্ণ করিয়া থাকে, আমাদিগকে সাধন-প্রবণ করিয়া থাকে, পরস্পরের মধ্যে ঘৃণা বা অবজ্ঞার ভাব তিরোহিত করিয়া থাকে, আমাদের ভ্রাতৃসৌহার্দ্যের পথ প্রমুক্ত করিয়া থাকে, তবে এই ব্রাহ্মধর্ম্মের জয়ে আমরা জয়-যুক্ত। আমাদের অন্তরকে চিন্তাকে ধারণাকে আধ্যাত্মিক জ্ঞানকে বিকশিত করিয়া দিবার জন্যই ব্রাহ্মধর্ম্মের আবির্ভাব। ব্রহ্মের দিকে চিত্তের বৃত্তিকে স্থির করিয়া দিবার জন্যই ব্রাহ্মধর্ম্মের আবির্ভাব। মনুষ্য এবং জীবজন্তুর উপরে মৈত্রী ভাবকে জাগ্রত করিবার জন্যই ইহার আবির্ভাব। ধ্যান ধারণা ও সমাধির ভাবকে জাগ্রত করিবার জন্যই ব্রাহ্মধর্ম্মের আবির্ভাব। এই ধর্ম্ম পালনের সকল অবস্থাতেই ইহাই আমাদিগকে স্মরণ করিয়া রাখিতে হইবে। ইহার জ্ঞানোন্নত ভাবকে খর্ব্ব করিলে চলিবে না। ইহার ভক্তি-সমুন্নত ভাবকে ম্লান করিলে চলিবে না। সংস্কারের কোলাহলে কলরবে প্রকৃত লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হইলে চলিবে না। ঈশ্বরই আমাদের পরম লক্ষ্য, তিনিই আমাদের পরম গতি, ইহাই অন্তরে ধরিয়া আমাদিগকে এই ধর্ম্ম-পথে অগ্রসর হইতে হইবে।

হে পরমাত্মন্। তুমি কৃপা করিয়া এই সমুন্নত ধর্ম্ম আমাদের মধ্যে প্রেরণ করিয়াছ। বল দাও আমাদিগকে, যাহাতে তোমার এই ধর্ম্মকে সম্যক ভাবে পালন করিতে পারি। নিষ্ঠা দাও, যাহাতে ইহাকে জীবনে রক্ষা করিতে পারি। জ্ঞান দাও, যাহাতে ইহার প্রকৃত মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারি। আমাদের চেষ্টা বহির্ম্মুখী হইয়া যাহাতে চিত্তের বিক্ষেপ আনয়ন করিতে না পারে, তুমি তাহার সহায় হও। রোগে শোকে জ্বালায় যন্ত্রণায়, দুর্ভিক্ষে, পীড়নে, হতাশায়, আমরা ম্রিয়মান হইতেছি। তুমি আমাদের মধ্যে প্রকাশিত হও, তোমার সৎস্বরূপ প্রকাশ কর, তোমার আলোক বিতরণ কর, নূতন প্রাণের নব চেতনার সঞ্চার কর, নিত্য নব দীক্ষা দান কর, ইহাই অদ্যকার দিনে তোমার চরণপ্রান্তে আমাদের বিনীত প্রার্থনা।

মাতৃপূজা।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক ১১ই মাঘের সান্ধ্য উপাসনায় বিবৃত)

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥

যে দেবতা সর্ব্বভূতে মাতৃরূপে সংস্থিত আছেন, সেই দেবতাকে বারম্বার নমস্কার করি।

যে দেবতা মাতৃরূপে এই সমগ্র ভূতচরাচর, এই সূর্য্যচন্দ্রগ্রহউপগ্রহসমন্বিত বিরাট ব্রহ্মাণ্ডকে নিজ ক্রোড়ে রাখিয়া লালন পালন করিতেছেন, যাঁহার আদেশে এই জগৎসংসারের প্রত্যেক নিমেষ নিয়মিত হইতেছে, যে জগজ্জননী তাঁহার নিতান্ত পঙ্গু সন্তানকেও অত্যুচ্চ গিরিপর্ব্বত উল্লঙ্ঘনের সামর্থ্য প্রদান করেন, আজ সেই জগজ্জননীর, সেই বিশ্ববিধাতা অখিলমাতার প্রেরণায় আমার ন্যায় নিতান্ত দীনহীন ব্যক্তিকেও ভক্তদিগের এই মহাসম্মিলনে উপস্থিত হইতে হইয়াছে। জগজ্জননীর সম্মুখে দাঁড়াইবার কারণে ভক্তজনগণের প্রাণে যে পবিত্রভাব আজ জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে, তাহারই তরঙ্গ আমারও এই দুর্ব্বল হৃদয়ে আসিয়া আঘাত প্রদান করিতেছে, এবং পরমমাতার মধুময় মাতৃনাম এই ভক্তমণ্ডলীর সম্মুখে ঘোষণা করিবার জন্য আমাকে উৎসাহিত করিতেছে।

মা নামের ন্যায় মধুর নাম আর কোথায় পাওয়া যাইবে? কিন্তু সেই মধুর নাম আমিই বা কি ঘোষণা করিব? জন্মগ্রহণ করিলেই তো মা-নাম সকল জীবের, পশু মনুষ্য প্রভৃতি সকল প্রাণীরই হৃদয়ে জাগ্রত হইয়া স্বভাবতই মুখে ব্যক্ত হইয়া পড়ে। মাতার প্রতি দৃষ্টি আমাদের এতই স্বাভাবিক যে সেই দৃষ্টিকে হৃদয়ে না লইয়া আমরা জন্মগ্রহণ করিতেই পারি না। যে মাতা আমাদের হৃদয়ে তাঁহাকে ডাকিবার এই স্বাভাবিক ইচ্ছা একেবারে গাঁথিয়া দিয়াছেন, আজ তাঁহারই মধুর আহ্বানে এই পবিত্র স্থানে সম্মিলিত হইয়াছি।

যে বিশ্বপিতা অখিলমাতার নামে বেদমন্ত্রে প্রতিধ্বনিত গায়ত্রীমন্ত্রপূত এই প্রশস্ত প্রাঙ্গনে আমরা প্রতি বৎসর সম্মিলিত হই, আজ যখন সম্বৎসর পরে তাঁহারই নামে আবার এখানে সমাগত হইয়াছি, তখন একবার প্রাণ ভরিয়া মায়ের নাম কীর্ত্তন করত আজিকার এই উৎসবের সার্থকতা সম্পাদন করিতেই হইবে। আমাদের মাতাকে, আমাদের আপনার মাকে পূজা করিবার এমন শুভ অবসর পাইয়াছি, এই শুভ অবসরে বন্দনাগীতে তাঁহার আরতি করিয়া, প্রীতি-অর্ঘ্যের দ্বারা তাঁহার চরণপূজা করিয়া আজিকার উৎসবকে সার্থক না করিয়া কিছুতেই গৃহে প্রতিগমন করিব না।

ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপনের পূর্ব্বে কত শত বৎসর আমরা আমাদের মাতার নিকট হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছিলাম। মা যে আমাদের অন্তরে থাকিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে মঙ্গলের পথে চলিবার জন্য আমাদিগকে আদেশ উপদেশ দিয়াছিলেন, অমঙ্গলের পথে অসত্যের পথে চলিবার নিষেধবাণী আমাদের অন্তরে নিয়তই দিতেছিলেন, সে আদেশ উপদেশ, সে নিষেধবাণী আমরা অবহেলা করিয়া শুনি নাই—শুনিতে চাহি নাই। এই যে মাতা আমাদের সম্মুখে প্রকাশ পাইতেছেন, এই যে চন্দ্রসূর্য্যের ভিতর দিয়া তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি প্রতিদিন দিনে নিশীথে আমাদের প্রত্যক্ষ হইতেছে, এই যে বাতাসের ভিতর দিয়া তাঁহার নিশ্বাস-প্রশ্বাস প্রত্যক্ষমূর্ত্তিতে প্রতিমুহূর্ত্তে আমাদের গাত্র স্পর্শ করিতেছে, এই যে সর্ব্বংসহা ও বিশ্বধারিণী ধরণীতে তাঁহার মাতৃমূর্ত্তি জীবন্তভাবে প্রতি নিমেষে আমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতেছে, আর এই যে ভক্তমণ্ডলীর কমনীয় মুখজ্যোতিতে তাঁহার অপরূপ রূপ একেবারে সাক্ষাৎ করিতেছি, বর্ত্তমান যুগে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপনের পূর্ব্বে মাতার এই প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি আর কেহ দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছে কি না সন্দেহ। আমরা আমাদের মাকে ভুলিয়া বসিয়াছিলাম। এমন কি, মাতার অস্তিত্ব সম্বন্ধেই সন্দিহান হইয়া আমাদের অন্তরে সকল অমঙ্গলের নিদান, সকল বিষময় ভাবের আকর, মাতার প্রতি একটা বিষম অনাস্থা পোষণ করিয়াছিলাম। সেই অনাস্থা পোষণের কারণে সমগ্র দেশটা বলিতে গেলে এক মহা উষর ভূমিতে পরিণত হইয়াছিল। চারিদিকে অনাচার, কদাচার, নীচের প্রতি অত্যাচার অবিচারমূলক উপধর্ম্মের রাশি রাশি কণ্টকময় বিষবৃক্ষ সকল গজাইয়া উঠিয়া সমগ্র দেশকে ছাইয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছিল। ধর্ম্মের শক্তিময় আহার পাইবার অভাবে দেশবাসীগণ পূর্ব্ব হইতেই যখন আত্মা ও মনের স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়া বসিল, তখন সমগ্র দেশ পরাধীনতার হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে কিছুমাত্র কালবিলম্ব করিল না। পরে যখন সর্ব্বাঙ্গীন পরাধীনতা লাভের ফলে বিষময় কণ্টকরাশির আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া দেশবাসীগণ ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, জগতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সেই মাতৃদেবীকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল, সেই শুভ মুহূর্ত্তে ব্রাহ্মসমাজ সুপ্তোত্থিত সিংহের মহাবল লইয়া জাগ্রত হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মসমাজ সেই উপধর্ম্মের কণ্টকপূর্ণ গুল্মরাজি ছিন্নবিচ্ছিন্ন খণ্ডবিখণ্ড করিয়া আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়পদ্মে অধিষ্ঠিত, অপরূপ জ্যোতিতে উদ্ভাসিত মাতার মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করাইয়া দিল, তাই সেই ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবার দিবসে আমাদের মিলনোৎসব। বর্ত্তমান যুগে ব্রাহ্মসমাজই আমাদিগকে এই শিক্ষা দিয়াছে যে স্বাধীনতা আমাদের মাতার প্রদত্ত স্বাভাবিক অধিকার। ব্রাহ্মসমাজই বর্ত্তমান যুগে আমাদিগকে এই শিক্ষা দিয়াছে যে মাতার নিকটে যাইবার পথপ্রদর্শনের জন্য শাস্ত্র, গুরু প্রভৃতি সহায় হইতে পারে, কিন্তু তাহারা প্রহরী স্বরূপে দাঁড়াইয়া সন্তানের মাতার নিকটে যাইবার পথে বাধা দিতে পারে না—মাতার নিকটে সন্তানের যাইবার জন্য তাহাদের অনুমতি লওয়া আবশ্যক নহে। সন্তান ইচ্ছা করিলেই মাতার নিকটে সোজা চলিয়া যাইতে পারে, সোজা মায়ের ক্রোড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারে—মায়ের নিকটে সন্তানের যাইবার পথ অব্যাহত ভাবে উন্মুক্ত পড়িয়া আছে এবং চিরকাল থাকিবে, এই মহাসত্য ব্রাহ্মসমাজ আমাদের প্রতিজনের নিতান্ত নিকটে আনিয়া দিয়াছে, তাই ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবার দিবসে সাম্বৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। আজ সেই পরমমাতার চরণতলে মস্তক অবনত করিয়া সমস্ত হৃদয়ের সহিত তাঁহার পূজা করিয়া আমাদের এই

উৎসবের সার্থকতা সম্পাদন করিতে হইবে। কেবল মৌখিক কতকগুলি বাক্যের দ্বারা বা দর্শনশাস্ত্রের যুক্তিতর্কের দ্বারা নামেমাত্র তাঁহার পূজা করিলে চলিবে না। আজ আমাদের মাকে মা বলিয়া জানিয়া সমস্ত প্রাণমন দিয়া, তাঁহার চরণে আপনাকে বলি দিয়া পূজা করিলে তবেই এই উৎসবের সার্থকতা।

ব্রাহ্মসমাজ যে মাতৃদেবতার 'মূর্ত্তি আমাদিগকে প্রত্যক্ষ করাইয়াছে, তাঁহার পূজার জন্য বাহির হইতে ধূপ ধুনা পুষ্পাদি সংগ্রহের প্রয়োজন নাই, জীবজন্তু বলি দিবারও প্রয়োজন নাই, অথবা প্রতিমাগঠনও আবশ্যক নহে। যখনই ব্রাহ্মসমাজ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এই বিরাট ব্রহ্মচক্রের অধিষ্ঠাত্রী মাতৃদেবতাকে আমাদের প্রত্যক্ষ করাইয়াছে, সেই সঙ্গেই ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার পূজার উপকরণেরও বিধান দিয়াছে। তাঁহার পূজার উপকরণ তাঁহাতে প্রীতি এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন—তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব। ব্রাহ্মসমাজের যে কয়জন পুরোহিতের আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়াছে, তাঁহাদের সকলেই একপ্রাণে আমাদিগকে এই দুইটী উপকরণের দ্বারাই মাতৃপূজা করিবার উপদেশ দিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগের সমালোচনার কঠোর অগ্নিপরীক্ষায় পরিশুদ্ধ হইয়া ঐ দুইটী উপকরণ স্বীয় অপূর্ব্ব জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া আমাদের সম্মুখে প্রকাশ পাইতেছে। এই দুইটী উপকরণ আবার এমনি আশ্চর্য্য বন্ধনে সম্বদ্ধ যে একটীকে ছাড়িলে অপরটী ম্লান ও পরিশুষ্ক হইয়া যায়। মাতাকে অন্তরের সহিত যদি প্রীতি করি, যদি সত্য সত্য তাঁহাকে ভালবাসি, তবে তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন না করিয়া কি প্রকারে নীরব থাকিতে পারি? আর যদি আমাদের জীবনযাত্রার সমুদয় কার্য্য তাঁহার প্রিয়কার্য্য বলিয়া সম্পন্ন করি, তবে তাঁহার প্রতি প্রীতি আপনিই সরস হইয়া উঠিবে এবং তাহা প্রস্ফুটিত শতদলের ন্যায় স্বীয় সুগন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত করিয়া তুলিবে।

মাতাকে অন্তরের সহিত প্রীতি করিতে হইবে, সমুদয় "তন-মন-ধন" দিয়া তাঁহাকে ভালবাসিতে হইবে, তাঁহার চরণে আপনাকে বিসর্জ্জন দিতে হইবে, সম্পূর্ণ বলি দিতে হইবে, এই সত্যটী খুবই স্বাভাবিক এবং অতি পুরাতন। সংসারের অনেক বিষয় খুব স্বাভাবিক ও পুরাতন হইলেও আমাদের তাহা নূতন করিয়া শিক্ষা করিতে হয়, নানা উপায়ে আত্মগত উপলব্ধির বস্তু করিয়া লইতে হয়। সেইরূপ, মাতার প্রতি প্রীতি খুব স্বাভাবিক ও অতি পুরাতন সত্য হইলেও যাহাতে চর্চ্চার দ্বারা, তাহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ও উৎকর্ষ সাধনের দ্বারা তাহাকে আত্মগত উপলব্ধির বস্তু করিয়া লইতে পারি, সেই অনন্ত-মহিমার ছায়াকে যাহাতে অনন্ত বলিয়া ভ্রমে পতিত না হই, ব্রাহ্মসমাজ আমাদিগকে তাহাই শিক্ষা দেয়, এবং সেই শিক্ষা দিবার জন্যই ব্রাহ্মসমাজের জন্ম।

ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণে আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ভারতের ঋষিমুনিগণের অমূল্য উপদেশরাজির ভিতর দিয়া আমরা এই এক মহাবাণী লাভ করিয়াছি যে সেই বিশ্ববিধাতা অখিলমাতা আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে মাতৃমূর্ত্তিতে অবস্থিতি করিতেছেন। কেবল নিঃসঙ্গ ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন না, তিনি আমাদের প্রত্যেকেরই পরম করুণাময়ী প্রত্যক্ষ মাতৃদেবতারূপে অবস্থিতি করিয়া আমাদের প্রত্যেককেই মঙ্গলের পথে প্রতি মুহূর্ত্তে প্রতি নিমেষে পরিচালিত করিতেছেন।

সেই করুণাময়ী মাতাকে আমাদের সমুদয় হৃদয় দিয়া ভাল বাসিতে হইবে। তাঁহাকে দেখিতে চাহিলে, তাঁহাকে সম্পূর্ণ ভাবে পাইতে চাহিলে আমাদের নিজের বলিয়া এতটুকুও রাখিলে চলিবে না। সরল ভাষায়, তাঁহার জন্য আমাদের পাগল হইতে হইবে। মায়ের প্রকৃতিরাজ্যে এমনই বিধিব্যবস্থা যে, যে ব্যক্তি যে বিষয়ে যতটুকু পাগল হয়, সে সেই বিষয়ে ততটুকুই লাভ করে। নূতন দেশ আবিষ্কার করিবার জন্য কলম্বস পাগল হইয়া গিয়াছিলেন, তাই তিনি নূতন মহাদেশ আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য জর্জ্জ ওয়াসিংটন পাগল হইয়া গিয়াছিলেন, তাই তিনি নূতন মহাদেশে স্বাধীনতার এক অত্যুচ্চ আদর্শ সংস্থাপনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। যে জন্মভূমি সেই মাতৃদেবতার ছায়ামাত্র, সেই জন্মভূমির অধিবাসীদিগের বিগত মহাসম্মিলনও এই সত্যের প্রত্যক্ষ পরিচয় প্রদান করিয়াছে। আমাদের

জাতীয় মহাসম্মিলনকে সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য আমরা যে পরিমাণে পাগল হইয়া গিয়াছিলাম, আমরা সেই পরিমাণে তাহাকে সার্থক করিয়া তুলিতে পারিয়াছি নিঃসন্দেহ। কিন্তু আমাদের ধর্ম্মপ্রধান এই পুণ্যভূমিতে মাতৃদেবতার ছায়া লইয়া তৃপ্ত থাকিলে চলিবে না। জন্মভূমি যাঁহার ছায়া, মৃত্যু ও অমৃত উভয়ই যাঁহার ছায়া, সেই প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ মাকে দেখিবার জন্য, তাঁহাকে অন্তরে উপলব্ধি করিবার জন্য আমাদের পাগল হইতে হইবে। সিদ্ধপুরুষ রামপ্রসাদ সেনের ন্যায় আহারে বিহারে স্বপনে জাগরণে, সকল অবস্থায় মাকে দেখিবার জন্য, সকল কর্ম্মে তাঁহার স্নেহহস্ত দেখিবার জন্য আমাদিগকে পাগল হইতে হইবে। সংসারে বিচরণ করিতে হয় করিব, কিন্তু তাহার মধ্যে মাকে দেখিবার জন্য পাগল হইতে হইবে। প্রত্যেক নিমেষের প্রত্যেক ঘটনায় মায়ের সঙ্গে আমরা আছি, এবং আমাদের সঙ্গে মা নিয়তই সাথের সাথী হইয়া আছেন, তাঁহার ক্রোড় বিস্তৃত রহিয়াছে, সুখের আনন্দে অথবা দুঃখের কশাঘাতে সেই ক্রোড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িলেই তিনি আলিঙ্গন করিয়া কত আদর করিবেন, এই সত্যটি প্রাণ দিয়া আমাদের বুঝিতে হইবে। মাকে অন্তরে পাইবার জন্য পাগল হইলেই আমরা এই সত্য প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিব যে মাতার নিকটে সন্তানের যাইবার পথ অব্যাহতভাবে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হইয়া আছে—সেই সরল প্রেমের পথে কোন প্রকার বাধা নাই, কোনই অর্গল নাই।

সেই মাতাকে অন্তরে প্রত্যক্ষ পাইবার জন্য পাগল হইলে সহস্র উপহাসের অট্টহাসি আমাকে আকুল করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিবে জানি; শতসহস্র শোকসন্তাপ বিপদআপদ তাহাদের বিকট হাসিতে নানাপ্রকার ভয় দেখাইয়া আমাকে মায়ের সন্ধান হইতে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিবে জানি। কিন্তু এই সত্য যদি আমার উপলব্ধি হইয়া থাকে যে মা আমার নিয়তই সঙ্গে আছেন এবং আমি তাঁহার অপরাজিত পতাকার নিম্নে আশ্রয় লাভ করিয়াছি, তবে লক্ষ উপহাসের অট্টহাসি এবং কোটী কোটী বিপদ আপদের বিকট হাসি আমাকে আকুল করিতে পারিবে না। উপহাস, বিপদ-আপদ, এ সকলের ভয় প্রদর্শনের অবসর কোথায়? মায়ের ভক্ত সন্তানের কেশাগ্রও তাহারা স্পর্শ করিতে সাহস করে না। মৃত্যু বল, আত্মীয় স্বজনের বিয়োগবিচ্ছেদ বল, সকলই সেই পরমমাতার নির্দ্দিষ্ট মঙ্গলনিয়মে নিয়মিত হইতেছে। মায়ের এই মঙ্গলরাজ্যে মৃত্যু বলিয়া যে সত্য সত্য কিছুই নাই। তাঁহার রাজ্য প্রাণের রাজ্য। আমরা সাধারণত যাহাকে মৃত্যু বলি, এ রাজ্যে সে মৃত্যু, সে ধ্বংস, সে বিনাশের স্থান নাই। মৃত্যু—তাহা মায়ের রাজ্যের এক বিভাগ হইতে বিভাগান্তরের কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ মাত্র। যখন এখানে মৃত্যুরই অধিকার নাই, তখন দুঃখেরই বা সত্যসত্য অধিকার কোথায়? সুখের বেলায় আমরা মাতার দান বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিব, দুঃখের বেলায় কি আমরা তাহা ভুলিয়া যাইব? আমরা আমাদের দিক হইতে দেখিয়াই সংসারের কোন বিষয়কে সুখের কারণ এবং কোন বিষয়কে দুঃখের কারণ বলিয়া বিবেচনা করি। কিন্তু একবার মায়ের দৃষ্টিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেই বুঝিতে পারিব যে সংসারের যাহা কিছু আমরা ভোগ করি, সে সমুদয়ই মঙ্গলের উদ্দেশ্যেই মায়ের রক্ষিত গচ্ছিত ধন। সেই গচ্ছিত ধনের সদ্ব্যবহারে মাত্র আমাদের অধিকার। সেগুলি যাঁহার ধন, তিনি যেভাবেই ইচ্ছা আমাদের দ্বারা সেগুলির ব্যবহার করাইয়া লইতে পারেন। সেই সকল তিনি আমার হস্তেই রাখুন, বা অপরের হস্তেই ন্যস্ত করুন, অথবা সেগুলি তিনি নিজ হস্তেই গ্রহণ করুন, আমাদের তাহাতে দুঃখবিমূঢ় অথবা সুখে বিহ্বল হইবার কোনই কথা নাই। সংসারের সুখদুঃখকে তুচ্ছ করিয়া, সংসারের উপহাসকে গ্রাহ্য না করিয়া যদি আমরা আমাদের মাকে ভাল বাসিতে পারি, তাঁহার জন্য পাগল হইতে পারি, তবেই আজিকার এই উৎসব সার্থক।

মাতাকে প্রাণ দিয়া প্রীতি করিলে, মায়ের চরণে আত্মবলি প্রদান করিলে তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধনও যে অত্যন্ত সহজ হইবে, সে কথা নূতন করিয়া বলিবার প্রয়োজন দেখি না। মাকে ভালবাসিব অথচ মায়ের অপ্রিয় কার্য্য করিব, ইহা পরস্পরবিরুদ্ধ ও মিথ্যা কথা। মাকে ভালবাসিলে আমরা কখনই তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধনে বিরত হইতে

পারি না। হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশে আমাদের মাতৃপ্রেম জন্মগ্রহণ করিয়া বর্দ্ধিত হইতে হইতে সম্যক পরিপুষ্ট হইলেই তাহা বাহিরে প্রকাশ হইতে চাহে, এবং তখনই তাহা মাতার প্রিয়কার্য্যসাধনে পরিণত হইয়া বাহিরে ব্যক্ত হইয়া পড়ে। মাতার প্রতি কেবলমাত্র মুখে প্রীতি দেখাইলে তাঁহার প্রিয়-কার্য্যসাধনের প্রতি আমাদের অনুরাগ আসিতে পারে না। বরঞ্চ তাহাতে বিপরীত ফলই ফলিবার সম্ভাবনা বেশী—এইরূপ কপটপ্রীতির ফলে যে কি বিষময় ফল, কি গরল প্রসূত হয়, একদিকে প্রাচ্য-ভূখণ্ডের মহাভারতীয় মহাসমর, অপরদিকে পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের বর্ত্তমান মহাসমর, উভয়ই অঙ্গারলিখিত অক্ষরে তাহার পরিচয় প্রদান করিতেছে।

মাকে যথার্থ ভালবাসিলে তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনে যেমন স্বতই অনুরাগ ও আগ্রহ জন্মিবে, সেইরূপ কোন্ কার্য্য তাঁহার প্রিয় এবং কোন্‌টা তাঁহার অপ্রিয়, তাহাও অনায়াসে আমাদের বোধগম্য হইবে। একবার যখন বুঝিব যে এই কাজটা আমার মায়ের প্রিয়, তখন আমাকে কে তাহা হইতে বিচলিত করিতে পারে? তাঁহার অপ্রিয় কার্য্য তো আমি তাঁহাকে নিবেদন করিতে পারিব না। সুতরাং যদি আমার সকল কার্য্যই আমি তাঁহাকে নিবেদন করিয়া সম্পন্ন করিতে পারি, তবে কে আমাকে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পথ হইতে বিচ্যুত করিতে পারে? মানুষের কথায় আমি তাঁহার কার্য্য করিতে নিবৃত্ত হইব? লোকে উপহাস করিবে, আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবে চিরবিচ্ছেদের ভয় প্রদর্শন করিবে বলিয়া আমি আমার সর্ব্বপ্রকার অনুষ্ঠানে মায়ের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে পশ্চাৎ-পদ হইব? কখনই নহে। যে মানুষের পরিমাণ সার্দ্ধ ত্রিহস্ত মাত্র, যে লোক নিজেই নিজের ভয়ে শঙ্কিত, সেই মানুষের ভয়ে, সেই লোকের ভয়ে, আমার যে মায়ের এক এক ইঙ্গিতে নিমেষে নিমেষে ব্রহ্মাচক্রের ছোটবড় সকলই স্বীয় স্বীয় নির্দ্দিষ্ট কক্ষে পরিভ্রমণ করিতেছে, সেই বিশ্বের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, আমার হৃদয়ের চিরশান্তিদাত্রী মাতার চরণপূজায় বিরত হইব? সমুদয় ভয়ভাবনা দূর করিয়া মায়ের অভয় নামটী সম্বল করিয়া দৃঢ়পদে দণ্ডায়মান হও, পরাজয়ের কথা আর শুনিতে পাইবে না; মায়ের শক্তি সন্তানের উপর নীরব সংহত বলে নামিয়া আসিবে, দুঃখ, দৈন্য ও দুর্ব্বলতা মায়ের পায়ের তলে মরিয়া থাকিবে।

আজ আমরা এই উৎসবের দিনে যখন মিলিত হইয়াছি, তখন মায়ের নামে যদি আমরা এই উৎ-সবকে সার্থক করিতে চাহি, তবে আমাদের প্রত্যে-ককে তাঁহার প্রতি প্রীতির এবং তাঁহা হইতে প্রাপ্ত মহাশক্তির এক একটী অগ্নিময় কেন্দ্র হইতে হইবে। সেই এক একটী কেন্দ্র হইতে যখন সেই প্রীতি ও শক্তি ছড়াইয়া পড়িয়া এই ভারতের ত্রিশকোটী সন্তানের আত্মাকে অগ্নিময় করিয়া তুলিবে, এই উৎসবের দিনে যবে এই ত্রিশকোটী সন্তানের কণ্ঠ ভেদ করিয়া মায়ের নাম ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতে থাকিবে, তখন দেবমনুষ্যের মধ্যে কি এক মহান্ ভাবতরঙ্গ উঠিবে, তাহা আমরা কল্পনাতেও আনিতে পারি না।

হে পরমাত্মন্, হে বিশ্বজননী, তুমি আজ এই উৎসবে যখন আসিয়াছ, তখন আমাদের হৃদয় হইতে সকল প্রকার হিংসাদ্বন্দ্ব সকল প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মান অভিমান উৎপাটিত করিয়া আমাদিগকে তোমার দিকে টানিয়া লও। আমাদিগকে বুঝা-ইয়া দাও, আমাদের প্রাণের ভিতর উপলব্ধি করিতে দাও যে তুমিই আমাদের একই মাতা, আমরা সকলেই পরস্পরের ভ্রাতা। তোমার সঙ্গে যোগের পথে যাহা কিছু বাধাবিঘ্ন, তাহা দূর করিয়া দাও। আমাদের সকল কার্য্য সকল অনুষ্ঠানে তোমার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত কর। আমাদের হৃদয়ে এই বল দাও যে সংসারের ভয়ে, উপহাসের ভয়ে যেন তোমার কার্য্য অনুষ্ঠানে পশ্চাৎপদ না হই। আমাদের আজিকার মাতৃপূজা সার্থক হউক।

গান।

(শ্রীনির্ম্মল চন্দ্র বড়াল বি-এ)

ওগো নিঠুর!
তুমি হাসুবে নীরব হাসিতে—
আমায় নিত্য দিবে সকাল সাঁঝে
অশ্রুজলে ভাসিতে।
ওগো তুমি আমায় ছাড়বে না যে
মারবে আঘাত টানবে কাছে
আমায় বিনা নাই যে গতি
তোমায় হবেই হবে আসিতে॥

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চিত্রোন্মোচন।

গত ২রা ফেব্রুয়ারি (২০ মাঘ) বেলা ৫ ঘটিকার সময় কলিকাতাস্থ রামমোহন লাইব্রেরীতে সার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্তের সভাপতিত্বে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্র উন্মোচিত হইয়াছিল। মহর্ষিদেব যৌবনাবস্থায় যখন বেদী হইতে অগ্নিময় ব্যাখ্যান বিবৃত করিতেন, সেই অবস্থার চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। চিত্রকর গবর্ণমেণ্ট আর্টস্কুলের ভাইস প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়। আদিব্রাহ্মসমাজের অন্যতর সভাপতি শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই চিত্রখানি রামমোহন লাইব্রেরীকে উপহার দিয়াছেন। অঙ্কনগুণে চিত্রখানিকে মহর্ষিদেবের জীবন্ত মূর্ত্তি বলিয়া ভ্রম হয়। চিত্রোন্মোচন সভায় সভাপতি মহাশয় মহর্ষিদেবের জীবনী সম্বন্ধে কয়েকটী কথার অবতারণা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কতকগুলি কথা ঠিক বলিয়া আমাদের মনে হইল না, কিন্তু সেগুলি এত লোকবিদিত যে তাহা লইয়া এস্থলে বাদানুবাদ করা সঙ্গত হইবে না। সার নারায়ণ চন্দাবরকর দু চারটী অতি সুন্দর কথা শ্রদ্ধাপূর্ণ ভাষায় বলিয়াছিলেন। বঙ্গভাষায় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ একটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিয়াছিলেন, এবং বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এবং মহর্ষির জীবনীলেখক শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী দুইটী প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। সেই দুইটী প্রবন্ধ আমরা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ।*

(বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী)

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পুণ্যময় স্মৃতিরক্ষা উপলক্ষে রামমোহন লাইব্রেরির পরিচালকগণ তৎপ্রতি শ্রদ্ধার্পণের অবকাশ দিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন; সেই অনুগ্রহের জন্য আমি কৃতজ্ঞ, কিন্তু সেই অবকাশের সমুচিত ব্যবহারে আমার শক্তি নাই। আমার শারীরিক অবস্থা এ কর্ম্মে আমার অনুকূল নহে; মহর্ষিদেবকে পূর্ণভাবে সম্মুখে রাখিয়া তাঁহার মহনীয় চরিতের স্পর্শ লাভ কখনও আমার ভাগ্যে ঘটে নাই, এইজন্য এই কার্য্যে আমার সম্পূর্ণ অধিকারও নাই। একদিন আমি বলিয়াছিলাম, ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে স্বতন্ত্র করিয়া মহর্ষিচরিতের আলোচনা সম্ভবপর নহে। যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত, তাঁহারা যাহা নিকট হইতে দেখিয়াছেন, আমাকে দূর হইতে তাহা দেখিতে হইয়াছে; তাঁহারা তাঁহাদের আচার্য্যের সম্মুখে উপনীত হইয়া যাহা লাভ করিয়াছেন, আমি তাহাতে বঞ্চিত। তথাপি সেই প্রকাণ্ড মনুষ্যত্বকে কোন সঙ্কীর্ণ সমাজের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া তৎপ্রতি নিরীক্ষণ করিলে চলিবে না; বৃহত্তর হিন্দুসমাজের মধ্যে তাঁহার যে সুনির্দ্দিষ্ট স্থান আছে, তাহার আলোচনা না করিলে তাঁহার মাহাত্ম্যের প্রতি অবিচার হইবে। ভারতবর্ষের এই বৃহত্তর সমাজ হইতে তিনি আপনাকে কখনও বিচ্ছিন্ন করেন নাই, বৃহত্তর হিন্দু সমাজও কখনও তাঁহাকে আপনা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিতে পারিবে না।

মহর্ষিপ্রবর্ত্তিত ব্রাহ্মধর্ম্মের আলোড়নে আমাদের হিন্দুসমাজের স্থিরসমুদ্রে যে চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছিল, অদ্যাপি সেই চাঞ্চল্যের নিবারণ হয় নাই—বহু মনস্বী ব্যক্তি সেই বাত্যাপ্রবাহের কেন্দ্রাতিগ বলে কেন্দ্রচ্যুত হইয়াছিলেন। এ সকল সত্য ঘটনা। কিন্তু এই সত্য ঘটনায় ক্ষুব্ধ হইবার আমি কোন হেতু দেখি না। বরং একটা আত্যন্তিক সমাজবিপ্লবের অবসরে সমাজের রক্ষাকর্ত্তারূপে তাঁহাকে অবতীর্ণ দেখিয়া আমি আনন্দ লাভ করি। বাহির হইতে যখন একটা প্রবল আক্রমণ আসিয়া জীবের উপর আপতিত হয়, তখন জীবের প্রাণশক্তি অভ্যন্তর হইতে তাহার প্রতিঘাতের ব্যবস্থা করে। যে সেই প্রতিঘাতের ব্যবস্থা করিতে পারে, সেই বাঁচিয়া যায়। সেই প্রতিঘাতের শক্তিই প্রাণশক্তির অন্যতম প্রধান লক্ষণ। আমাদের ভারতীয় সমাজে সেই প্রাণশক্তি এখনও বিদ্যমান আছে বলিয়াই যথাসময়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আবির্ভাব হইয়াছিল, ইহাই আমার বিশ্বাস। আমাদের সমাজে শত বৎসর পূর্ব্বে যে সমাজবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, সেই বিপ্লবের আক্রমণ হইতে সমাজকে রক্ষা করিবার

* মহর্ষিদেবের চিত্রোন্মোচন উপলক্ষে গত ২রা ফেব্রুয়ারি দিবসে রামমোহন লাইব্রেরিতে পঠিত।

জন্যই তাঁহার আবির্ভাবের প্রয়োজন হইয়াছিল, ইহাই আমার ধারণা। সদ্যপ্রকাশিত মহর্ষির জীবনচরিত পড়িয়া আমার সেই ধারণা আরও বদ্ধমূল হইয়াছে।

শত বৎসর পূর্ব্বে পশ্চিম দেশের হাওয়া প্রবলবেগে আমাদের দেশে বহিয়াছিল। সেই হাওয়ার সহিত ভাল মন্দ নানা নূতন পদার্থ বহিয়া আসিয়াছিল। সেই হাওয়াকে সর্ব্বতোভাবে মরুভূমির প্রাণঘাতী শিরোক্কো হাওয়ার সহিত তুলিত না করিলেও চলিতে পারে। সেই বায়ুবেগে পশ্চিম হইতে যে সকল বীজ আসিয়াছিল, তাহাতে রোগের বীজও ছিল, আবার সঞ্জীবনী শক্তি অর্পণের বীজেরও অভাব ছিল না। যাহাই হউক, উহা অজানা হাওয়া, উহা বাহিরের হাওয়া এবং অতি প্রবল হাওয়া। উহা প্রাণরক্ষার অনুকূল হইবে কি না, তাহা এখনও বিচার্য্য হইয়া আছে। সে সময়ে অন্ততঃ উহা একটা মোহ আনিয়াছিল, প্রাণকে অভিভব করিয়াছিল। উহা যে চাঞ্চল্য আনিয়াছিল, তাহা হয়ত ব্যাধির চাঞ্চল্য, হয়ত ধনুষ্টঙ্কারের আক্ষেপ। তাহা প্রাণশক্তিকে অভিভূত করিবার আশঙ্কা জন্মাইয়াছিল। ভারতের প্রাণশক্তি এই সময়ে রাজা রামমোহন রায়কে ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে উৎপাদন করিয়া সেই ধনুষ্টঙ্কারের আক্ষেপের প্রতিষেধের ব্যবস্থা করিয়াছিল।

আপনারা জানেন, বেদবিদ্যারূপিণী সনাতনী বাণী বিশ্ববিধাতার চতুর্মুখ হইতে সমীরিত হইয়া আজি পর্য্যন্ত এই সমাজে স্মৃতি ও অনুস্মৃতি সহকারে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের শ্রবণে তাহার প্রতিধ্বনি লাগিয়াছিল এবং সেই বাণীর প্রেরণা অবলম্বন করিয়াই তিনি বীরের মত সমাজরক্ষার জন্য দাঁড়াইয়াছিলেন। সেই পুরাতনী ব্রহ্মবাণী রক্ষার ভার যে শ্রেণীর উপর রক্ষিত আছে, সমাজে তাঁহাদের নাম ব্রাহ্মণ; এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে আমি বর্ত্তমানযুগের ব্রাহ্মণোত্তম বলিয়াই জানিয়া আসিতেছি। এই ব্রাহ্মণের কয়েকটা লক্ষণ আছে। ব্রাহ্মণ একদিকে অন্তরে প্রজ্ঞার বাণী শুনিয়া থাকেন; জড়জগৎকে ও মানব জগৎকে যে সত্য, যে ঋত, দৃঢ়ভাবে ধরিয়া আছে, সেই সত্যের প্রতি ও ঋতের প্রতি শীর্ষ অবনত করিয়া তিনি স্থির হইয়া বসিয়া থাকেন। সেই ঋতের মহিমা দেখিয়া অন্তরে তাঁহার ভাবাবেশ হয়, কিন্তু সেই ভাবাবেশে তিনি অধীর হন না; কঠোর কর্ম্মপথে পদক্ষেপে তিনি সঙ্কুচিত হন না; বা ভাবোন্মাদে পথভ্রষ্ট হন না। তাঁহার চরিত্রের একটা দিক শান্ত, মধুর, অন্যদিক কঠোর ও দীপ্তিময়। উচ্ছৃঙ্খলতা তাঁহার স্বভাবের বিরুদ্ধ। তিনি দৃঢ়, তিনি সংযত, তিনি আচারনিষ্ঠ। মহর্ষিচরিতে এই ব্রাহ্মণোচিত লক্ষণসমূহ অত্যন্ত পরিস্ফুট দেখিতে পাই। এইজন্য আমি তাঁহাকে ব্রাহ্মণোত্তমরূপে নির্দ্দিষ্ট করিতে চাই। তাঁহার জীবনচরিতকারে তাঁহার যে মূর্ত্তি আঁকিয়াছেন, তাহাতে আমি এই ছবিটিই অতি স্পষ্টভাবে দেখিতে পাই।

ধর্ম্মপ্রবর্ত্তন কালে তিনি বিদেশের আশ্রয় আবশ্যক বোধ করেন নাই। যে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের ঢক্কানাদ এই দেশকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছিল, তিনি সেই ঢক্কানাদে বধির হন নাই; বরং তাহার প্রতিকূলে বেদবাণীর বিজয়দুন্দুভি ধ্বনিত করিয়াছিলেন। তিনি বেদবাক্যের যে তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা দিয়া গিয়াছেন, আমি তাহা গ্রহণ করিতে পারি নাই, কিন্তু তিনি বেদবাক্যের উপরেই তাঁহার ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা ভুলিলে চলিবে না। বেদবাক্য আমার নিকট নিত্য ও ভ্রমরহিত; কিন্তু আমি ব্রাহ্মণসন্তান; সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে বেদবাক্যের তাৎপর্য্য নির্ণয়ে আমার অধিকার আছে। আমার ধর্ম্মশাস্ত্র এ বিষয়ে আমার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন নাই। এ বিষয়ে ব্রাহ্মণের অধিকার সঙ্কীর্ণ করিতে কেহ কখনও পারিবেন না। ব্রাহ্মণোত্তম দেবেন্দ্রনাথ স্বকীয় প্রবৃত্তি ও প্রজ্ঞার প্রেরণায় বেদবাক্যের যে তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতেও তাঁহার পূর্ণ অধিকার ছিল। তিনি সবলে সেই অধিকার আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন; এ বিষয়ে বেদপন্থী কোন ব্যক্তির ক্ষুব্ধ হইবার কোন হেতু নাই।

ব্রাহ্মণোচিত সংস্কারবশে তিনি পরধর্ম্মের প্রতি কতকটা সন্দিহান ছিলেন বলিয়াই বোধ হয়। হয়ত তিনি খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রতি তেমন সুবিচার করেন নাই। তাঁহার ব্রাহ্মণ্য সংস্কার এ বিষয়ে

হয়ত অন্তরায় ছিল। পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ, এই ভাবটা বোধ করি তাঁহার সমস্ত জীবনকে কতকটা আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছিল। বিদেশীয় পরিচ্ছদ তিনি কখনও পরিয়াছিলেন কিনা, তাহা আমি জানি না—বিদেশী আচার হইতেও তিনি যথাসম্ভব দূরে রহিয়াছিলেন। বিজাতীয় ভাষার আশ্রয় তিনি বোধ করি কখনও লন নাই। তিনি যে সময়ে সমাজমধ্যে একজন প্রধান পুরুষ, সে সময়ে ইংরেজিতে রচনা, ইংরেজি বাগ্মিতা প্রকাশ, ইংরেজিতে ধর্ম্মপ্রচার এদেশের প্রধান পুরুষদেরও কর্ত্তব্যমধ্যে গণ্য হইয়াছিল। তিনি কখনও এই প্রলোভনে আত্মসমর্পণ করেন নাই। ইংরেজ রাজপুরুষগণের নিকট প্রতিপত্তি ও সম্মানলাভের প্রলোভন কখনও তাঁহাকে প্রলোভিত করে নাই। তিনি বড় ইংরেজের স্পর্শ হইতে যথাসম্ভব দূরে থাকিতেন। ইহাতেও আমি তাঁহার ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের পরিচয় পাই। এই যে একটা আত্মাভিমান, এই যে একটা দর্প, এই যে পরাশ্রয়ের ও পরমুখাপেক্ষিতার প্রতি উৎকট অবজ্ঞা, ইহা আমি ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম বলিয়া মনে করি। এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথে ইহার পরিচয় পাইয়া তাঁহার মহনীয় চরিতের সম্মুখে প্রণত হই।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথে স্বাজাত্যবোধ ও সার্ব্বজাতিকতার সামঞ্জস্য।

(শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী বি-এ)

রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতিরক্ষার জন্য যে গৃহ স্থাপিত হইয়াছে, সেইখানে যে মহাত্মার চিত্র উদ্ঘাটন ও চিত্র-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে আজ আমরা সকলে সম্মিলিত হইয়াছি, রামমোহন রায়ের সঙ্গে তাঁর চিত্তের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। রামমোহন রায় তাঁর স্বাজাত্য-বোধকে সার্ব্বজাতিকতার উদার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তিনি হিন্দুসভ্যতার ধর্ম্ম, কর্ম্ম, সামাজিক রীতিনীতি প্রভৃতি সকল বিভাগেই যে সকল মূলগত আদর্শ (fundamental principles) বিরাজিত দেখিয়াছিলেন, সে আদর্শগুলি সর্ব্ব মানবের আদর্শ—কোন সংকীর্ণ দৈশিক আদর্শ মাত্র নয়—ইহাই সর্ব্বপ্রযত্নে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। যে দেশাভিমান পরজাতিবিদ্বেষকে প্রশ্রয় দেয় তাহাও যেমন তাঁর ছিল না, যে বিশ্বপ্রীতি স্বজাতিবিদ্বেষকে লালন করে, তাহাও তেমনিই তাঁর ছিল না। যুগগুরু রামমোহনের এই মন্ত্রে যাঁর পুণ্য-জীবন দীক্ষিত হইয়াছিল, আজ তাঁরই শারীর চিত্র উদ্ঘাটন উপলক্ষ্যে তাঁর জীবনচিত্র যদি উদ্ঘাটন করা সম্ভবপর হয়, তবেই এই অনুষ্ঠান সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারে, সন্দেহ নাই।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, নব্যবঙ্গ তার দেশাত্মবোধের যথার্থ উদ্বোধক যাঁরা, তাঁদের কথাই ভুলিয়া বসিয়াছে। রামমোহনকে সে নামে মাত্র জানে, তাঁর স্বরূপ জানে না এবং দেবেন্দ্রনাথকে সে সম্প্রদায়বিশেষের 'মহর্ষি'তুল্য ব্যক্তি বলিয়াই জানে, সমস্ত দেশকে তিনি কি দিয়াছেন তাহা জানে না। যে সময়ে ডিরোজিয়োর শিক্ষার প্রভাবে হিন্দুকলেজের ছাত্রদের মনে হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসভ্যতার প্রতি প্রবল বিদ্বেষ জাগ্রত হইয়াছিল, যে সময়ে সেই বিপ্লবের উন্মত্ত হাওয়ায় রামমোহন রায়ের হিন্দুশাস্ত্র হইতে প্রজ্জ্বালিত জ্ঞান ও কীর্ত্তির দীপগুলিও নিভ-নিভপ্রায় হইয়াছিল, সেই সময়ে তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠা করিয়া ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রচারের দ্বারা হিন্দুশাস্ত্রের বিস্তৃত আলোচনার সূত্রপাত করিয়া, হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান ফিরাইয়া আনিয়া, এবং রামমোহন রায়ের বিলুপ্তপ্রায় গ্রন্থাদি প্রকাশ করিয়া যিনি দেশের শিক্ষিত সমাজের মনের গতিকে দেশের দিকে ফিরাইলেন, এবং শিশু বঙ্গসাহিত্যকে নানাদেশ বিদেশের জ্ঞান বিজ্ঞান ও ইতিহাসের আলোচনার পুষ্টিতে মাতার মত একান্ত যত্নে লালন করিয়া তুলিলেন, তাঁর কথাই যদি আজ দেশ বিস্মৃত হয়, তবে সেটা দেশের পক্ষে দুর্ভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে।

অক্ষয় কুমার দত্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি যে সকল মনীষী বঙ্গসাহিত্যের সমৃদ্ধি বিধান করিয়াছেন, সেই সকল মনীষীর মনীষাকে দেবেন্দ্রনাথ আপনার ব্যক্তিত্বের অপূর্ব্বপ্রভাবে একটি মহৎ অনুষ্ঠানের দিকে আকৃষ্ট করিয়া পূর্ণভাবে নিয়োজিত করিয়াছিলেন, বিক্ষিপ্ত হইতে দেন নাই—ইহার জন্য আমাদিগকে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেই হইবে।

তারপর শুধু হিন্দুকলেজের বিপ্লব নয়—এক সময়ে যখন খৃষ্টান পাদ্রীদের শিক্ষায় দলে দলে হাজার হাজার লোক হিন্দুসমাজের ক্রোড়চ্যুত হইয়া খৃষ্টান হইয়া যাইতেছিলেন, তখন খৃষ্টান-পরিচালিত বিদ্যালয়ে ছেলেরা না পড়িয়া যাহাতে হিন্দুপরিচালিত বিদ্যালয়ে পড়িতে পারে, সেইজন্য 'হিন্দুহিতার্থী-বিদ্যালয়' স্থাপনে যিনি উদ্যোগী হইয়াছিলেন এবং হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়া হিন্দুধর্ম্মের সত্যের প্রতি এদেশীয় লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেও প্রয়াসী হইয়াছিলেন, তাঁর যে সে সকল চেষ্টার কথাও ভুলিবার নয়। বড় বড় সঙ্কটের সময়ে তিনি হাল শক্ত করিয়া ধরিয়াছেন—দেশকে বিজাতীয়তার স্রোতে ভাসিয়া যাইতে দেন নাই। দেশের ভাষা, দেশের সাহিত্য, দেশের সঙ্গীত, দেশের শিল্প, দেশের অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান, দেশের শাস্ত্র—সমস্তই যাহাতে উন্নত হয়, কুসংস্কারমুক্ত হয় ও সকলের কল্যাণপ্রদ হয়, এইজন্য তিনি আপনার সকল শক্তি সকল মনীষা সকল তপস্যাকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। আজ তাঁর পরিবারই যে সাহিত্য, সঙ্গীত ও শিল্পের উৎসস্বরূপ হইয়াছে, তাহার পশ্চাতে তাঁর সাধনাই কাজ করিয়াছে, ইহা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই।

আপনারা সকলেই জানেন যে, তাঁর জীবনের প্রধান্ কীর্ত্তি, ব্রাহ্মসমাজ। রামমোহন রায় ব্রহ্মমন্দির মাত্র স্থাপন করেন, কিন্তু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের যথার্থ প্রতিষ্ঠাতা। অথচ এই সমাজ যে হিন্দুসমাজ হইতে কখনও বিচ্ছিন্ন হইতে পারে, ইহা কল্পনা করাও তাঁর পক্ষে শক্ত ছিল। ধর্ম্মে ও অন্যান্য বিষয়ে তিনি কালোপযোগী সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু তাঁর আদর্শ ছিল সংরক্ষণ করিয়া সংস্কার। যাহা আছে তাহাকে যতটা পারা যায় রক্ষা করিয়া তবে উন্নতির পথে তাহাকে ধীরে ধীরে অগ্রসর করিতে হইবে—এই conservative reform এর আদর্শই আধুনিক যুগে বাংলাদেশে সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার দ্বারাই ঘোষিত হয়। ভূদেব ও রাজনারায়ণ প্রভৃতি এ আদর্শ পরে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁর একটি উক্তি আমার কানে সর্ব্বদাই বাজে—সেটি এই—"স্বজাতির প্রতি নির্দ্দয় হইয়া ব্রাহ্মসমাজকে হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়ো না।"

উপনিষদ্ তাঁর ধর্ম্মজীবনের আশ্রয় ছিল; উপনিষদের কালের তাপস গৃহস্থ অথবা ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের আদর্শেই তিনি নিজের জীবন গঠিত করেন। রাজর্ষি জনকের মত বিষয়বিভবের মধ্যে থাকিয়াও তিনি মুক্ত ছিলেন। অতুল সম্পদের অধিকারী হইয়াও সত্যের অনুরোধে ধর্ম্মরক্ষার জন্য এক সময়ে তিনি হেলায় সব হারাইয়াছিলেন—সে কাহিনী আপনারা সকলেই অবগত আছেন। যতদিন কর্ম্ম করিবার বয়স ছিল, ততদিন দেশের সর্ব্ববিধ উন্নতিসাধনে তিনি আপনার শক্তিকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন, কিন্তু যখন ভোগজীবন উত্তীর্ণ হইল, তখন হইতে প্রব্রজ্যার জীবন গ্রহণ করিয়া পরিব্রাজকের মত পর্ব্বতে পর্ব্বতে ধ্যানরত হইয়া তিনি কাল কাটাইয়াছেন এবং অবশেষে যতি হইয়া ব্রহ্মসমাহিত অবস্থায় দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার জীবনই সবচেয়ে বড় দান—এই ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের আদর্শ, প্রাচীন কালের চতুরাশ্রমের আদর্শ যে তিনি নিজ জীবনে মূর্ত্তিমান করিয়া আমাদিগকে দিয়া গেলেন, ইহার চেয়ে বড় দান আর কিছুই নাই।

নদীর সঙ্গে তাঁর জীবনের তুলনা দিতে পারি। প্রথম জীবনে একদা অনুতাপের অগ্নিতাপে বিলাসের পাষাণস্তূপ ভেদ করিয়া যখন তাঁর চিত্তগুহায় অমৃতপ্রস্রবণধারা নামিয়াছিল, তখন সুদীর্ঘকাল ধরিয়া সেই ধারা ধ্যানের গহ্বরে গহ্বরেই ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। তার পর একদা হিমালয়ে নদী দর্শনে যখন তিনি দিব্যবাণী শুনিলেন যে, এই নদীর মত লোকালয়ে গমন কর, কর্দ্দমাক্ত ও আবিল হইতে ভয় পাইয়ো না তখন হইতে তিনি লোকালয়ে নামিলেন এবং কত বিচিত্র শুভ অনুষ্ঠানের কূলে উপকূলে অমৃতধারা সিঞ্চন করিয়া সেই সমস্ত অনুষ্ঠানগুলিকে সফল সজল-শ্যামল করিয়া তুলিলেন। তার পর একসময়ে দেখি যে, লোকালয়ের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ নাই, তাঁর গতিবেগ ক্ষীণতর, কারণ তাঁর জীবন গভীরতর ও প্রসরতর হইয়াছে। তখন হইতে তিনি সেই মহাসমুদ্রের আহ্বান শুনিয়াছেন, যেখানে আপনার সমস্ত জীবনকে অঞ্জলিরূপে নিঃশেষে অর্পণ করিবার জন্য তিনি ব্যাকুল ছিলেন।

আজ সেই মহাতীর্থ, সেই সাগরসঙ্গমে যদি

ক্ষণকালের মত স্তব্ধ হইয়া তাঁর পুণ্যচরিতের উদ্দেশে মস্তক অবনত করি, তবেই এই অনুষ্ঠান সার্থক হইবে।

ভাষার উৎপত্তি।

(রায় বাহাদুর শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহ বিদ্যার্ণব, এম-এ)

(পূর্ব্ব প্রকাশের অনুবৃত্তি)

ধর্ম্মগ্রন্থ সকলের কথা :—"Our first parents received language by immediate inspiration," ভাষাকে যদি মানবের অযত্নলব্ধ ঈশ্বরের বিশেষ দান বলিয়া মানিয়া লইতে হয় তবে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে মানবের মন ফনোগ্রাফের চুঙ্গি (cylindar) কিম্বা ডিস্কের ন্যায় যন্ত্রবিশেষ ; ঈশ্বর শব্দ সকল ইহাতে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন প্রয়োজনানুসারে মানবের ইচ্ছানুরূপ স্প্রিং সঙ্কোচিত হইলেই ঐ যন্ত্র হইতে কথা সকল আপনা আপনি বাহির হইয়া থাকে। মানবের চেষ্টাতে কিছুই হয় নাই। জীবসৃষ্টিতে কোন কার্য্যেই প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বরের হস্ত সঞ্চালন ব্যাপার (direct intervention of God) অনুভূত হয় নাই ; ভাষার সৃষ্টিতে কি তাহা হইয়াছে ? এ সম্বন্ধে বিজ্ঞান কি প্রমাণ উপস্থিত করিতেছে তাহা দেখা যা'ক।

আমরা সচরাচর দেখিয়া থাকি, যে বধির সেই মূক হয়। বধির ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ণপটাহে শব্দ ধারণ করিবার জন্য যে সূক্ষ্ম ঝিল্লীর প্রয়োজন, অল্পাধিক পরিমাণে তাহার অভাব থাকে। কর্ণপটাহে বায়ু সংযোগে পরিচালিত শব্দের প্রতিধ্বনি হয় না বলিয়াই সে শুনিতে পায় না।

কিন্তু বাক্য উচ্চারণ করিবার জন্য যে সকল যন্ত্রের প্রয়োজন অধিকাংশ স্থলে তাহার কোনটির অভাব দেখা যায় না। মূক ও বধির ব্যক্তি বুদ্ধিবৃত্তিহীন একথা বলা যাইতে পারে না। যাঁহারা "Deaf & Dumb" স্কুলের বিষয় অবগত আছেন, তাঁহারা জানেন যে মূক ও বধিরদিগকে শিক্ষাপ্রদানের জন্য যে অভিনব শিক্ষাপ্রণালী উদ্ভাবিত হইয়াছে তাহার ফলে অনেক মূক ও বধির শিশু অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিতেছে। এখন জিজ্ঞাস্য এই, যদি আমাদের অন্তঃকরণ ফনোগ্রাফ সদৃশ যন্ত্র হয় এবং শব্দ ও বাক্য সকল তাহার মধ্যে পূর্ব্ব হইতে লিপিবদ্ধ থাকা ঠিক হয়, তবে এরূপ তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন বধির ব্যক্তি মূক থাকিবে কেন ? ইহা হইতে এরূপ সিদ্ধান্তই কি ঠিক হইবে না যে ভাষা আমাদের শিক্ষালব্ধ জিনিষ ? এই শিক্ষা উত্তরাধিকারীত্বসূত্রে অনেক সময়েই আমাদের পক্ষে অতি সহজলভ্য হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা এক কথা, আর আমরা ভাষা "by direct inspiration from God" লাভ করিয়াছি তাহা আর এক কথা। Archbishop Trenchও তাঁহার উক্তির অযৌক্তিকতা অনুভব করিয়া থাকিবেন, কারণ তিনি নিজেই ইহার সঙ্গে একথাও যোগ করিয়া দিয়াছেন যে, ইহাতে এরূপ বুঝিতে হইবে না যে আমাদের অভিধান ও ব্যাকরণ বর্ত্তমানে যে আকার ধারণ করিয়াছে সৃষ্টির প্রারম্ভেই আমরা ঈশ্বরের হস্ত হইতে সেই পূর্ণাবয়ববিশিষ্ট অবস্থায় ইহাদিগকে লাভ করিয়াছি। ঈশ্বর স্বয়ং পদার্থ সকলের নামকরণ করিয়া দেন নাই, তিনি আমাদিগকে নামকরণের ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন মাত্র। তিনি আরো বলিতেছেন "God did not teach man words as one teaches a parrot but gave him a capacity, and then evoked the capacity which he gave." পূর্ব্বে যাহা ব্যক্ত হইল তাহা হইতে এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসঙ্গত হইবে না যে আমরা ভাষাসম্পদ "by direct inspiration from God" প্রাপ্ত হই নাই।

এখন দেখা যাউক ভাষার অভিব্যক্তি সম্বন্ধে বিজ্ঞান কি সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। পরস্পরের মধ্যে স্ব স্ব মনোভাব ব্যক্ত করাই ভাষার উদ্দেশ্য এবং এই কার্য্য সাধনার্থ ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে। যে ক্রমোন্নতি বিধানবলে সামান্য বীজাণু হইতে মানব উৎপন্ন হইয়াছে তাহার মূলসূত্র আত্মরক্ষা ; এই উদ্দেশ্য সাধনার্থে যে অবিরাম চেষ্টা ও সমর চলিতেছে তাহাতে যোগ্যতমেরই একমাত্র জীবন রক্ষার সম্ভাবনা। ক্রমোন্নতি ব্যাপারে এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ সৃষ্টির প্রাথমিক অবস্থাতে যৌথ পারিবারিক (principle of co-operation) বিধি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মান-

বের পরস্পরের সাহায্যশক্তি বর্দ্ধনার্থ বিভিন্ন পরিবার ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইবার পূর্ব্বেই দলবদ্ধাবস্থায় মাঠে ও অরণ্যে বিচরণ করা পশুদিগের মধ্যে স্বাভাবিক ধর্ম্ম ছিল। মৃগ সকল দলবদ্ধাবস্থায় বিচরণ করে, শত সহস্র বানর একত্র হইয়া সেনাদলের ন্যায় এক সঙ্গে একত্র অবস্থান করে, পক্ষিগণ একই বৃক্ষে ঝাঁকে ঝাঁকে কুলায় নির্ম্মাণ করে; মধুমক্ষিকার দল পুষ্পমধু আহরণার্থ অরণ্য পথে যেখানেই ভ্রমণ করুক না কেন একই চক্রে তাহাদের কষ্টলব্ধ মধু সংস্থাপন করে। লক্ষ লক্ষ পিপীলিকা একই যৌথ পরিবাররূপে একসঙ্গে ধরাবক্ষে বিচরণ করিয়া থাকে। ইহা হইতে স্পষ্টই অনুমিত হইতেছে যে সৃষ্টির এই ক্রমোন্নতি ব্যাপারে আত্মরক্ষা ও আত্মোন্নতি সাধনের পক্ষে এইরূপ দলবদ্ধাবস্থায় বাস করা বিশেষ অনুকূল। সাধারণভাবে দেখিতে গেলেও বুঝিতে পারা যায় যে এই সংখ্যাধিক্য প্রযুক্ত শত্রুর হস্ত হইতে ইহাদের আত্মরক্ষার সম্ভাবনা অধিক। এই একত্র অবস্থান হেতু যে নৈতিক বলের উদ্ভব হয় তাহার উপকারিতা এই সংখ্যাধিক্যজনিত বলবৃদ্ধি অপেক্ষাও বেশী। আমার নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ একটি দৃষ্টান্ত এস্থলে বর্ণন করিতেছি; সাহাবাদ জিলার দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে ভাবুয়ার নিকটবর্ত্তী প্রদেশে পাহাড়ে ও মাঠে অসংখ্য কৃষ্ণসার মৃগ দলে দলে বিচরণ করে। পাশবিক বৃত্তির প্ররোচনায় কখন কখনও মৃগশিকারে প্রবৃত্তও যে না হইয়াছি তাহা নহে। দেখিয়াছি যে যূথচারী মৃগগণ ক্বচিৎ মাঠের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত অর্দ্ধ মাইল দীর্ঘ সূত্রাকারে বিচরণ করিতেছে।

কালিদাসপ্রমুখ ভারতের প্রাচীন কবিদিগের কবিত্বগৌরব অনেক সময়ে এই কাননবিহারিণী হরিণীর স্বভাব পর্য্যালোচনায় প্রকাশ পাইয়াছে। রমণীর কমনীয় কান্তি, সুদীর্ঘ নয়ন, নিরীহ নির্ম্মল স্বভাবের পরিচয় দিবার জন্য উপমাস্বরূপ এই বনচারিণী হরিণীর টান পড়িয়াছে। যদি "survival of the fittest" যোগ্যতমের জীবনাধিকারই সৃষ্টিরাজ্যের মূলতত্ত্ব হয় তবে ভীমদর্শন খলপ্রকৃতি স্বভাবনিষ্ঠুর সিংহব্যাঘ্রপ্রমুখ হিংস্র জন্তুর সহিত এক বনে বাস করিয়াও এই বলহীন ভীরুস্বভাব মৃগসকল কিরূপে আজ পর্য্যন্ত ধরাপৃষ্ঠে আপনার অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া আসিতেছে—এরূপ প্রশ্ন সহজেই মনে উদিত হইতে পারে। প্রাকৃতিক নিয়মের কি এখানে কোন ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে? তাহা নহে। নিজের অস্তিত্ব রক্ষা ও প্রাধান্য সংস্থাপনার্থ দিবারাত্রি অবিরাম যে ভীষণ সংগ্রাম চলিতেছে তাহার মধ্যে অপেক্ষাকৃত হীনবল পশুদিগের জীবন রক্ষার সম্ভাবনা আপাততঃ বিরল বলিয়া মনে হইলেও, যূথবদ্ধ হইয়া বিচরণজনিত যে নৈতিক বলের উদ্ভব হইয়াছে তাহা সিংহ ব্যাঘ্র এমন কি "Long range rifle" ধারী নিষ্ঠুরপ্রকৃতি মানবের শক্তিকেও পরাভব করিয়াছে। এই যে অর্দ্ধ মাইলব্যাপী মৃগদল পর্ব্বতের পাদদেশে বিচরণ করিতেছে, দুইটি চক্ষুর পরিবর্ত্তে দুই শত কিম্বা ততোধিক চক্ষু তাহাদের প্রত্যেককে বিপদের সম্ভাবনা হইতে সাবধান করিয়া দিতেছে। দর্শন শক্তির ন্যায় তাহাদের সমবেত আঘ্রাণ এবং শ্রবণ শক্তিও শতগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই অর্দ্ধমাইলের মধ্যে যে কোন স্থান হইতে বিপদ আগমন করুক না কেন, মৃগশ্রেণীর সমবেত শক্তি তাহাদিগকে রক্ষা করিতেছে। এই দলের শত শত চক্ষু চতুর্দ্দিকে ফিরিতেছে, কোথাও কোন বিপদের চিহ্ন কাহারও চক্ষুকে আকর্ষণ করিলে অমনি সেই মৃগ মস্তক উত্তোলন, কর্ণ উত্তোলন, ক্ষুরের আঘাত কিম্বা অপর কোনরূপ সঙ্কেত শব্দ উচ্চারণ দ্বারা পরস্পরের মধ্যে বিপদের আগমনবার্ত্তা এরূপ ক্ষিপ্রকারিতার সহিত প্রচারিত করে যে সকলেই সময় থাকিতে সাবধান হয় ও শত্রুর শত সহস্র উপায়কে ব্যর্থ করিয়া তাহারা দৃষ্টিপথের অতীত হইয়া যায়।

বিখ্যাত প্রাণীতত্ত্ববিৎ (Lord Avebury Sir Jhon Lubbock) আজীবন পিপীলিকার স্বভাব ও ধর্ম্ম পর্য্যালোচনার পর এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে এক সঙ্গে বাস ও একত্র বিচরণ হইতে এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীটেরও আত্মরক্ষার এমন সকল উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে যে কোন কোন বিষয়ে তাহা মানবেরও অনুকরণীয়। অনন্ত পিপীলিকার দল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া মাঠ হইতে মাঠান্তরে গমন করিতে দেখা

যায়। তাহাদের সমাজ বন্ধন প্রণালী এমন সুন্দর ও পূর্ণাবয়ব সম্পন্ন যে এক দলের সঙ্গে অন্য দলের অনুক্ষণ ভাবের বিনিময় চলিতেছে।

দেখা যায় যে অগ্রগামী দলের কোন কোন পিপীলিকা বিপরীত দিকবাহী হইয়া পশ্চাদগামী পিপালিকাদলের সম্মুখে উপস্থিত হইতেছে এবং ক্ষণকাল তাহাদের সম্মুখে অপেক্ষা করিয়া পুনর্ব্বার তৎপরবর্ত্তী দলের দিকে অগ্রসর হইতেছে। ইহাদিগের মধ্যে কিপ্রকার ভাবের বিনিময় হইতেছে জানিবার উপায় নাই কিন্তু ইহা দেখা যায় যে পশ্চাৎবর্ত্তী পিপীলিকাদল পন্থান্তর অবলম্বন করিতেছে। পিপীলিকা কিরূপ মনোভাব ব্যক্ত করিতেছে বর্ত্তমান সময়ে তাহা বুঝিবার সম্ভাবনা না থাকিলেও, ইহা আশা করা যায় যে অচিরে এমন কোন যন্ত্র আবিষ্কৃত হইবে যাহার সাহায্যে মানবের কর্ণের অনধিগম্য এই পিপীলিকার ক্ষীণ কণ্ঠস্বরও আমাদের কর্ণপটাহে প্রতিধ্বনিত হইবে। পিপীলিকা পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়া আসিতেছে, তাহারা কোন্‌টি সোজা পথ, কোন্ দিকে শত্রুর আক্রমণ সম্ভাবনা, কোথায় বিঘ্ন বাধা পথ আগুলিয়া রহিয়াছে, কোন্ স্থানে খাদ্যসম্ভার তাহাদের আগমন অপেক্ষা করিতেছে, এই সকল জ্ঞাতব্য বিষয় পরবর্ত্তী দলভুক্ত পিপীলিকাদিগকে জানাইতেছে এবং এই কার্য্য এরূপ শৃঙ্খলার সহিত হইতেছে যে বর্ত্তমান সভ্যজাতি নিচয়ের "intelligence department" কেও ইহার নিকট হার মানিতে হয়।

কুক্কুর, ঘোড়া, গাধা, মেষ, ছাগ প্রভৃতি গৃহপালিত পশু এবং বানরগণ তাহাদের উচ্চারিত শব্দের তারতম্য দ্বারা যে বিভিন্ন ভাব ব্যক্ত করিয়া থাকে ইহা সকলই অবগত আছেন। প্রসিদ্ধ জার্ম্মান দেশীয় পশুতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত গিবন বহুকাল আফ্রিকার মধ্যদেশবাসী বানরদিগের মধ্যে অবস্থিতি করিয়া দেখিয়াছেন যে বানরগণ উচ্চারিত স্বরের ছয় প্রকার তারতম্য দ্বারা মনোভাব ব্যক্ত করিয়া থাকে। কুকুর যখন শিকারের পশ্চাদ্বর্ত্তী হয় রাগান্ধ হইয়া কাহাকেও আক্রমণ করে কিম্বা শৃঙ্খলাবস্থায় নিরাশার ভাবব্যঞ্জক চীৎকার ধ্বনিতে মনের বেদনা ব্যক্ত করিতে থাকে অথবা রাত্রি যোগে পাহারার সময় অপরিচিত ব্যক্তির আগমন জ্ঞাপন করিতে থাকে কিম্বা ভ্রমণ সময় উপস্থিত হইলে লাঙ্গুল সঞ্চালন করিতে করিতে প্রভুর পশ্চাদ্বর্ত্তী হইবার জন্য আবেদন জ্ঞাপন করে, ইহার প্রত্যেকটির স্বর কি বিভিন্ন প্রকারের নহে? এবং ঝড় বৃষ্টি প্রপীড়িত হইয়া গৃহদ্বার উৎঘাটন করিবার জন্য যে সকরুণ আর্ত্তনাদ—তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ভাবব্যঞ্জক নহে কি? এই উচ্চারিত স্বরের তারতম্য হইতেই আমরা পরিষ্কাররূপে কুক্কুরের মনোভাব বুঝিতে সমর্থ হই। পূর্ব্বে দলবদ্ধ হইয়া মৃগসকলের বিচরণের কথা বলা হইয়াছে। সত্যসত্যই যখন শত্রু অতর্কিতভাবে আসিয়া দলের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তখন কেহ কাহারও দিকে ফিরিয়া তাকায় না; সকলই পলায়ন দ্বারা আত্মরক্ষার পথ দেখিতে থাকে। এই সমবেতভাবে দলবদ্ধ হইয়া বিচরণের শক্তি আক্রমণের সময় প্রকাশ পায় না সত্য, কিন্তু যাহাতে আক্রান্ত না হইতে পারে তদ্বিষয়ে ইহা কিরূপ কার্য্যকরী তাহা পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে। দর্শন, শ্রবণ ও আঘ্রাণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়শক্তি যতই প্রখর থাকুক না কেন ইহারা যে প্রকার অসংখ্য মাংসলোলুপ শত্রুমণ্ডলী দ্বারা পরিবেষ্টিত রহিয়াছে পরস্পরের সাহায্য না পাইলে কিছুতেই ইহাদিগের অস্তিত্ব রক্ষা করা সম্ভবপর হইত না। কিন্তু এই শক্তির কার্য্যকারিতা প্রকাশ পাইতেছে একে অন্যের নিকট ইহাদের মনোভাব জ্ঞাপন দ্বারা। যুদ্ধকালে একই পক্ষভুক্ত সেনানিচয় মধ্যে এক দলের সহিত অপর দলের মনোভাব জ্ঞাপনসূচক সংকেতিক চিহ্নের ব্যবস্থা না থাকিলে দলগুলি যেরূপ হীনবল হয় তদ্রূপ যূথপরিবারভুক্ত এই শত শত মৃগের মধ্যে যদি মনোভাব ব্যক্ত করিতে না পারা যাইত তবে তাহাদের ঐ সমবেত শক্তিও ব্যর্থ হইয়া যাইত। এখন জিজ্ঞাস্য এই মৃগগণ যে মস্তক উত্তোলন, কর্ণ উৎকীরণ ক্ষুরাঘাত প্রভৃতি সঙ্কেত দ্বারা মনোভাব ব্যক্ত করিতেছে তাহা কি ভাষা নহে? আমরা সুসংস্কৃত সম্মার্জিত ব্যাকরণানুমোদিত অভিধানান্তর্গত শব্দ যোজনা দ্বারা যে কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকি পশুদিগের এই সাঙ্কেতিক চিহ্ন ও উচ্চারিত শব্দের তারতম্য কি ঠিক সেই কার্য্যই সম্পন্ন করিতেছে না? এই উভয়েতেই ভাষা আখ্যা প্রযোজ্য। পূর্ব্বে যে

সকল দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছে তাহার মধ্যে অন্তত তিন প্রকারের ভাষার মূল বীজ নিহিত রহিয়াছে। একটি, হরিণ যেই মস্তক উত্তোলন করিল অমনি হরিণের দল সকলই ঊর্দ্ধগ্রীব হইয়া দণ্ডায়মান, ইহা একটি সঙ্কেত, অর্থ, শ্রবণ কর। যে পদার্থ প্রথমোল্লিখিত হরিণের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিয়াছে তাহা হইতে যদি কোনও প্রকার বিপদের আশঙ্কা থাকে তবে মৃগ অনুচ্চ অথচ গভীর ভাবপূর্ণ একটী শব্দ উচ্চারণ করিবে; ইহাকে এক শব্দ বলা যাইতে পারে, এই শব্দের অর্থ সাবধান হও। তদনন্তর মৃগ যদি বুঝিতে পারে যে ঐ পদার্থ হইতে প্রাণ নাশের সম্ভাবনা রহিয়াছে তৎক্ষণাৎ সে অত্যুচ্চ ও কর্কশ আর একটি শব্দ উচ্চারণ করিবে যাহা শ্রবণ মাত্র মৃগের দল বায়ুবেগে সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিবে। ইহার অর্থ নিজ প্রাণরক্ষার পথ দেখ। এই কর্কশ ও অত্যুচ্চ শব্দ প্রয়োগ দ্বারা একটী বিশেষ অর্থ জ্ঞাপক বাক্যের কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে।

ইহা বড়ই কৌতূহলোদ্দীপক যে বর্ত্তমান সময়ে বিভিন্ন দেশে মানব জাতির মধ্যে যে সকল ভাষা প্রচলিত রহিয়াছে তাহাদের প্রত্যেক ভাষার মধ্যেই অল্পাধিক পরিমাণে ভাষার এই তিন অঙ্গ বর্ত্তমান রহিয়াছে। পরস্পরের মধ্যে বাক্যবিনিময় কালে অনেক সময় এই হস্তসঞ্চালন আমাদেরও মনোভাব ব্যক্ত করিয়া থাকে। এই হস্তসঞ্চালন ও মুখ-বিকৃতি, যাহা মুদ্রাদোষ নামে অভিহিত, বড় বড় বক্তার বক্তৃতা ও গায়কের সঙ্গীতের প্রধান অঙ্গ হইয়া রহিয়াছে। মনোভাব জ্ঞাপন কার্য্য কোন সময়ে মানব সমাজেও যে এই সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহার দ্বারা সম্পন্ন হইত তাহার সাক্ষ্য অদ্যাপিও নিম্নলিখিত তিন শ্রেণীর ব্যক্তিদিগের মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। ১ম, মূক ও বধির;—মূক ব্যক্তির মনোভাব ব্যক্ত করিবার উপায় তাহার দুই হস্তস্থিত দশটি অঙ্গুলী ও মুখের মাংসপেশী। এই কয়টি অঙ্গুলীর প্রসারণ এবং মুখমণ্ডলস্থ মাংসপেশীর নানাপ্রকার বিকৃতভাব দ্বারা সে অতি সহজে ও পরিষ্কাররূপে তাহার মনোভাব ব্যক্ত করিতে সমর্থ হইতেছে। এমন কি আমরা মুখোচ্চারিত ভাষা দ্বারাও অনেক সময় তদপেক্ষা অধিক বিশদরূপে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করিতে পারি না। ২য়, অসভ্য মানব। খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণ ও ডাঃ লিভিংষ্টোন প্রভৃতি দেশভ্রমণকারীদিগের সাহায্যে আমরা পৃথিবীর নানাদেশীয় অসভ্যদের রীতি নীতি আচার ব্যবহার ভাষা প্রভৃতি বিষয়ে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি। এই সাঙ্কেতিক চিহ্নদ্বারা ভাবের বিনিময় কার্য্য কিরূপে সম্পন্ন হয় তৎসম্বন্ধে Drummond যাহা লিখিয়াছেন তাহা এস্থানে প্রদত্ত হইল। "No one who has witnessed a conversation—one says "witnessed," for it is more seeing than hearing—between two different tribes of Indians can have any doubt of the working efficiency of this method of speech. After ten minuites of almost pure pantomime each will have told the other everything that it is needful to say. Indians of different tribes, indeed, are able to communicate most perfectly on all ordinary subjects ;with no more use of the voice than that required for the emission of a few different kinds of grunts." অবশ্য ইহা হইতে এরূপ বুঝিতে হইবে না যে এই সকল অসভ্যদিগের নিজেদের কোন প্রকার বাক্য ভাষা নাই—বরং ইহাই বলা সমীচীন হইবে যে এই সকল সাঙ্কেতিক চিহ্ন তাহাদের বাক্য ও ভাষার পুষ্টিসাধক মাত্র। এই সকল চিহ্ন শব্দের সঙ্গে সংযুক্ত থাকিয়া বাক্যের পূর্ণতা সাধন করিতেছে মাত্র।

৩য়, শিশু সন্তান:—নবপ্রসূত শিশু প্রথম কয়েক মাস পর্য্যন্ত কেবল সঙ্কেত ও নানারূপ স্বর উচ্চারণ দ্বারাই মনোভাব ব্যক্ত করিয়া থাকে। বুলি ফুটিবার বহুপূর্ব্বে শব্দের (word) সাহায্য ব্যতিরেকে কেবল ক্রন্দন ও মুখাকৃতির বিভিন্নাবস্থা অবলম্বন দ্বারা শিশু এমনভাবে তাহার অভাব ব্যক্ত করিতে সমর্থ হয় যে তাহা বুঝিবার জন্য বিন্দুমাত্রও আয়াসের প্রয়োজন হয় না। শিশু বর্দ্ধিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে অতি যত্নের সহিত তাহাকে কথা বলিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। এতদ্ সম্বন্ধে Malbery তাহার First annual report of the Buruau of Ethnologyতে লিখিতেছেন—"The wishes and motions of very young children are conveyed in a small number of sounds but in

a great variety of gestures and facial expressions. A child's gestures are intelligent, long in advance of speech ; althrough very early persistent attempts are made to give it instructions in the latter but not in the former." ইহাও এই স্থলে ব্যক্তব্য যে ঘোর উন্মাদ অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ যখন এতদূর জ্ঞানহারা হইয়াছে যে কথার ভাবার্থ গ্রহণ করিবার আর শক্তি থাকে না তখনও তাহারা সাঙ্কেতিক চিহ্ন সকল অনুভব করিতে সমর্থ হয়। বড় বড় বক্তাদেরও বক্তৃতার সময় তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে সাঙ্কেতিক চিহ্নের ব্যবহার ও শব্দ উচ্চারণের তারতম্য হইতে ইহাই অনুমিত হয় যে এই সকলই মানবের আদি ভাষা ছিল। এই ভাষার প্রকৃতিতে প্রস্তর বক্ষে খোদিত লিপির ন্যায় অদ্যাপি মানব সমাজ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া রহিয়াছে। গুরুপরম্পরাগত মন্ত্রের ন্যায় উত্তরাধিকার সূত্রে লব্ধ এই ভাষা অস্থি মজ্জার সহিত মিলিয়া গিয়াছে। কাল সহকারে মানব যতই উন্নত হইতে উন্নততর অবস্থায় উপনীত হইতেছে ততই তাহার অন্তরে উচ্চতর ভাব সকল বিকাশ প্রাপ্ত হইতেছে। ইহা বিশেষ অনুধাবনার বিষয় যে বক্তা যখন সাধারণ ভাবনিচয় অতিক্রম করতঃ উন্নততর ক্ষেত্রে উপনীত হন এবং স্থিরবুদ্ধি, গভীর চিন্তাশক্তি ও গবেষণার পরিচায়ক আধ্যাত্মিক ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে থাকেন তখন আর সাঙ্কেতিক চিহ্নের ব্যবহার থাকে না। আপনা হইতেই উচ্চারিত স্বরের তারতম্য অপসারিত হইয়া যায়। স্রোতস্বিনীর জলরাশির ন্যায় একই ভাবে একই গতিতে চিন্তার গভীরতাব্যঞ্জক স্বরেতে প্রাণের অভ্যন্তর স্থান হইতে বাক্যস্রোত প্রধাবিত হইতে থাকে। এ সময় বক্তা তাহার পুরুষপরম্পরাগত অধিকারিত্ব সূত্রে প্রাপ্ত স্বভাবকে অতিক্রম করিয়া স্বোপার্জ্জিত যে উচ্চতরতম ভূমি, তাহাতে দণ্ডায়মান হইয়া যাহা বস্তুতই তাহার নিজস্ব সম্পত্তি তাহারই আলোচনাতে নিমগ্ন থাকেন ? রসনায় তাহার স্বরচিত যে ভাষা তাহার ব্যবহারই স্বাভাবিক। (ক্রমশঃ)

উন্নতি প্রসঙ্গ।

মাঘোৎসব।—মহর্ষিদেবের বাটীর প্রাঙ্গনে প্রতি বৎসর ১১ই মাঘের সন্ধ্যাকালে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। আদিব্রাহ্মসমাজের উৎসব বিশেষভাবে প্রাতঃকালে সম্পন্ন হয়। পূর্ব্বে পূর্ব্বে প্রাতঃকালের উৎসব আদিব্রাহ্মসমাজ গৃহেই অনুষ্ঠিত হইত। কিন্তু বাটী বহুদিনের পুরাতন বলিয়া ইঞ্জিনিয়রগণ সম্পূর্ণ নিরাপদ বলিলেও সেখানে সমাজের কর্তৃপক্ষগণ উৎসবাদি করাইতে সাহস করেন না। তাই আজ কয়েক বৎসর যাবৎ মহর্ষিদেবের বাটীতেই প্রাতঃকালের এবং সন্ধ্যাকালের, উভয়কালীন উৎসবই অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। কেবল ব্রাহ্মদের নহে, কিন্তু সমস্ত ভারতবাসীর পক্ষে ইহা লজ্জার কথা যে, যে আদিব্রাহ্মসমাজের পত্তনস্থান হইতে সমগ্র ভারতবাসী সর্ব্বাঙ্গীন অবনতির শৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাভের পথ দেখিতে পাইয়াছে, সেই পত্তনস্থানে পথপ্রদর্শক রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতির উপযুক্ত একটী সুপ্রশস্ত অট্টালিকা আজি পর্য্যন্ত নির্ম্মিত হইল না। হইতে পারে যে, আমাদের পরস্পরের মধ্যে ছোট খাটো অনেক বিষয়ে, সামাজিক রাজনৈতিক প্রভৃতি নানা বিষয়ে মতভেদ আছে। কিন্তু রামমোহন রায়ের প্রতি যথার্থ অনুরাগ থাকিলে, সেই বেদান্তপ্রচারিত ব্রহ্মনাম প্রচারের প্রতি যথার্থ প্রীতি থাকিলে অন্যান্য বিষয়ের মতভেদ কোথায় ভাসিয়া যাইত।

উৎসব যেখানেই হোক না কেন, উৎসব মাত্রই সমাজের উন্নতির অনুকূল তাহা বলা বাহুল্য। ধর্ম্মসমাজের যে উৎসবে উৎসবযাত্রীগণের হৃদয়ে যত অধিক পরিমাণে পবিত্রভাব, যত পরমাত্মার সহিত একাত্মযোগের ভাব নামিয়া আসিবে, সেই উৎসব সেই পরিমাণে সার্থক নিঃসন্দেহ। মহর্ষিদেবের বাটীতে এবৎসর যে দ্বৈকালীন উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারকার উৎসবও সার্থক হইয়াছিল। সম্ভবত এবৎসর যুদ্ধোপলক্ষে হাহাকারের কারণে, সকলেরই মনে ভগবানের মাতৃভাব যেন জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল. সকলেই যেন মায়ের কোলে আশ্রয়লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। সেই প্রাণের আকাঙ্ক্ষা এবারকার উৎসবে ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রাতঃকালীন উৎসবে শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার উদ্বোধনে সেই ভাবেরই যেন ইঙ্গিত করিয়াছিলেন এবং সান্ধ্য উৎসবে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার মাতৃপূজাসূচক উপদেশে তাহাই পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছিলেন। সঙ্গীতগুলিও অধ্যাত্মযোগের অনুকূলরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছিল।

বলবৎশিক্ষা—আমরা দেখিয়া আনন্দিত হইতেছি যে ভারতের সকল অংশ হইতেই ইচ্ছা-শিক্ষার পরিবর্ত্তে বলবৎ শিক্ষার পক্ষে অনুকূল মত পাওয়া যাইতেছে। এলাহাবাদ মিউনিসিপালিটি প্রথমে বলবৎ শিক্ষার বিরুদ্ধে গিয়াছিলেন—অর্থাভাবই অবশ্য তাহার অন্যতর কারণ ছিল। কিন্তু সম্প্রতি মিউনিসিপালিটি তাহার অনুকূলে মত দিয়াছেন। একবার বলবৎশিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইলে অর্থের জন্য চিন্তা করিতে হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই। গবর্ণমেণ্টও ক্রমশ এ বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য প্রদানে ধাধ্য হইবেন নিঃসন্দেহ। এই সূত্রে কিন্তু আমরা প্রত্যেক দেশহিতৈষীকে বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া স্থির করিতে বলি যে শিক্ষার কোন্ প্রণালী প্রবর্ত্তিত করা কর্ত্তব্য। আমরা অনেকবার বলিয়া আসিয়াছি যে মূলত মনুসংহিতা-প্রবর্ত্তিত ব্রহ্মচর্য্যপ্রধান পন্থা অবলম্বন করিলেই দেশের মঙ্গল। বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী ছাত্রগণের চরিত্রের উপর অল্পই প্রভাব বিস্তার করে। যে প্রণালীতে ছাত্রগণের চরিত্র সুগঠিত না হয়, সে প্রণালীতে প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ না হয়, সে প্রণালীতে জ্ঞানার্জ্জনের সহস্র পথ উন্মুক্ত থাকিলেও পরিণামে তাহা পতনের কারণ হয়—তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ বর্ত্তমান ইয়োরোপ। আমরা আর একটী বিষয়ের সূচনা দেখিয়া আনন্দিত হইতেছি। সম্প্রতি বিলাতের টাইমস্ পত্রিকায় শ্রীযুক্ত জে, ডি, এণ্ডার্সন ভারতে ব্যারিষ্টার প্রস্তুত করিবার ইঙ্গিত করিয়াছেন। আমরা ইহাই তো চাই যে সর্ব্বপ্রকার শিক্ষার দ্বার ভারতে উন্মুক্ত হইয়া যাক। একদিকে বলবৎ-শিক্ষার প্রবর্ত্তন, অপরদিকে ভারতে সকলপ্রকার শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হওয়া, উভয়ের মিলনে আমাদের প্রিয়তম জন্মভূমির যে কি কল্যাণ সাধিত হইবে তাহা কল্পনাতীত।

একলিপি ও ভাষাবিস্তার। সমস্ত ভারতবর্ষে যে একই প্রকার বর্ণলিপি এবং এক ভাষা স্থির করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা হইতেছে, ইহা অত্যন্ত সুলক্ষণ। আজ প্রায় তিন বৎসর হইল আমরা এই বিষয়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় আলোচনা করিয়া সমগ্র ভারতের জন্য একই বর্ণমালা ও একই ভাষা প্রবর্ত্তনের উপকারিতার প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিলাম। আমরা সেই আলোচনাসূত্রে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষায় সাহিত্যে অগ্রণীদিগকে লইয়া একটী সভা আহ্বানের প্রস্তাব ইঙ্গিত করিয়াছিলাম। গত কংগ্রেসের সময় একলিপি বিস্তারিণী সভার এক অধিবেশন হইয়াছিল দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। কিন্তু ইহার গঠনপ্রণালীতে আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারি নাই। গুটীকয়েক হিন্দি ভাষার পক্ষপাতী হিন্দুস্থানী লোক লইয়া সভা করিয়া হিন্দীভাষাকে ভারতের সাধারণ-ভাষা করিবার ঔচিত্য স্বীকার করিলে যে তাহা সর্ব্ববাদ্ধ সম্মত হইবে এরূপ আশা করা বিড়ম্বনা। সেই সভায় দুচার জন বঙ্গসাহিত্যের অগ্রণীকে সভ্যরূপে লইলেও বিশেষ কোন লাভ নাই। আমাদের মতে ভারতীয় সকল প্রধান ভাষায় সাহিত্যের অগ্রণীদিগকে লইয়া একটী সভা করিয়া তাহাতেই এবিষয়ের আলোচনা হওয়া দরকার।

গত ২৬শে জানুয়ারি হিন্দুপেট্রিয়ট কাগজে এবিষয়ে একটী সুন্দর আলোচনা প্রকাশ হইয়াছে। তাহাতে লেখক বলিতে গেলে আমাদেরই কথা সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন যে ভারতের যে ভাষা যত শক্তিমত্তা দেখাইতে পারিবে, সেই ভাষাই সাধারণ ভাষা হওয়া সম্ভব বেশী। দ্বিতীয়তঃ তিনি বলেন, যেভাবে ফরাসি ভাষাকে সমগ্র ইউরোপের সাধারণ ভাষা বলা যায়, সেই ভাবে উক্ত ভাষা ভারতের প্রাদেশিক ভাষাসমূহ বজায় রাখিয়া সাধারণ ভাষায় দাঁড়াইবে। কথাটার ভিতর সত্য আছে। আমরাও হিন্দুপেট্রিয়টের কথা প্রতিধ্বনিত করিয়া বলিতে চাহি যে, ভারতে যে সর্ব্বাঙ্গীন বৃহৎ জাগরণের ভাব দেখা দিয়াছে, যে ভাষা শক্তিতে, প্রাণেতে, মানবের শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক এই ত্রিবিধ ভাবের মধ্য দিয়া সেই জাগরণের সহায়তা করিতে পারিবে, সেই ভাষারই সাধারণ ভাষায় দাঁড়ানো সম্ভব। কিন্তু আমাদের বোধ হয় যে এমন সময় আসিবে, যখন ভারতের একটী ভাষা এবং একটী বর্ণমালা না হইয়া যাইতে পারিবে না।

স্বায়ত্তশাসন। কংগ্রেসের সময়ে "ভারত প্রেমিকদিগের প্রতি আন্তরিক নিবেদন" নামক একখানি চটী (পুস্তিকা) হস্তগত হইয়াছিল। তাহাতে জাতি বর্ণনির্ব্বিশেষে যাহাতে প্রতি পরিবারকে মূল ধরিয়া দেশের শাসন প্রণালীর ব্যবস্থা হয়, তদ্বিষয়ে একটী প্রস্তাব করা হইয়াছে। প্রস্তাবে অনেকগুলি বিবেচনায় আলোচনাব কথা আছে। এই যে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে প্রতি পরিবার ধরিয়া শাসন প্রণালী গঠন করিবার ভাব আমাদের দেশের লোকের মনে উঠিয়াছে, ইহাতেই আমরা ভগবানের মঙ্গলহস্তের স্পষ্ট পরিচয় পাইতেছি। তবে একথা আমরা বলিব যে এই প্রস্তাবকারীগণ এই প্রণালীতে শাসন নির্ব্বাহ করা যত সহজ মনে করিতেছেন, তত সহজ নহে। এইরূপ শাসনপ্রণালীর যোগ্য হইবার জন্য আমাদের এখন অবধি বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে, আমাদের প্রত্যেকের জীবনকে সর্ব্বতোভাবে উন্নতির দিকে লইয়া যাইতে হইবে, তবেই এরূপ শাসন প্রণালীর উপযুক্ত হইব।

ভারতের শিল্প সম্মিলন—কংগ্রেসের ন্যায়

ভারতের শিল্পসম্মিলনও যে বিশেষ মঙ্গলপ্রসূ, ইহা এখনও সাধারণ ভারতবাসী মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। একটী প্রধান কারণ এই যে, শিল্পসম্মিলনের অনুষ্ঠাতাগণ ইহার বিষয় সকলকে বুঝাইয়া ইহাকে popularise করিতে পারেন নাই। ভারতের সমাজ সম্মিলনে ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় কি বলিলেন, তাহা লইয়া আন্দোলন হইতেছে। তাহার কারণ এই যে, ডাক্তার রায়ের বক্তব্য বিষয় লইয়া দেশবাসীগণ বহু পূর্ব্বাবধি আলোচনা করিয়াছে কাজেই সে বিষয়ের ভালমন্দ আমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিবেচনা অনুসারে কিছু না কিছু বুঝিতে পারি এবং সুতরাং তৎসম্বন্ধে কিছু না কিছু আলোচনা আন্দোলনের অধিকার রাখি। কিন্তু শিল্পসম্মিলনের বক্তব্য সম্বন্ধে সম্মিলনের দিনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দেশবাসী সাধারণের মধ্যে আন্দোলন আলোচনা হয় কি না সন্দেহ। এবারকার শিল্পসম্মিলন যে সকল প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন, সত্য কথা বলিতে কি তন্মধ্যে অনেক প্রস্তাবের ভালমন্দ দূরে থাক, সেই প্রস্তাবগুলিই আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। অথচ বলা বাহুল্য যে শিল্পসম্মিলনের উপস্থিত প্রস্তাবগুলি শত সমাজসম্মিলনের প্রস্তাব অপেক্ষা আমাদের জীবনরক্ষার উপযোগী। আমরা কর্ত্তৃপক্ষের নিকট এই অনুরোধ করি যে তাঁহারা তাঁহাদের প্রত্যেক প্রস্তাবের বক্তব্য বিষয়, বক্তৃতা, প্রবন্ধ, সংবাদপত্রে আন্দোলন আলোচনা প্রভৃতির সাহায্যে দেশবাসীকে সম্বৎসর ধরিয়া বুঝাইয়া দিতে থাকুন, তাহা হইলে সম্মিলনের দিনে সকলের উপস্থিত থাকিবার আগ্রহ জন্মিবে এবং উপস্থিত সকলে বক্তৃতাদিতে বুঝিয়া যোগ দিতে পারিবেন। শিল্পসম্মিলনের যে সকল প্রস্তাব আমরা বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাদেরই দুএকটী সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য বলিব।

শিল্পকারখানার বিলোপ। শিল্পসম্মিলন বড় কঠিন স্থানে হাত দিয়াছেন। সম্মিলনের তৃতীয় প্রস্তাব এই যে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে শিল্পকারখানা স্থাপিত হইয়া বিলুপ্ত হয় কেন, তাহার অনুসন্ধান করা আবশ্যক। এবিষয়ে তাঁহারা কতটা কৃতকার্য্য হইবেন তাহা বলা যায় না। অন্য প্রদেশের কথা জানি না, কিন্তু এই বঙ্গদেশে ইহা একটী প্রকাশ্য গুপ্ত সত্য (open secret) যে, অনেক কারখানা, অনেক কারবারের কর্ত্তৃপক্ষগণের অনবধানতা, জুয়াচুরী প্রভৃতি কারণে বিলোপ প্রাপ্ত হয়। সম্মিলনের অনুসন্ধান কমিটি কি সেই সকল টানিয়া বাহির করিতে পারিবেন এবং বাহির করিলে সাধারণ্যে প্রকাশ করিতে পারিবেন? এই সকল বিষয় প্রকাশ করিলে আমাদের বিশ্বাস যে দেশের বিশেষ উপকার হয়। এই যে কত কত অর্থভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছিল ও হইতেছে, সেগুলির সম্বন্ধেও কি অনুসন্ধান হওয়া উচিত নহে? আমরা দোষপ্রকাশের জন্য অনুসন্ধানের কথা বলিতেছি না, কিন্তু দেখা উচিত যে সেই সকল অর্থভাণ্ডারে কতটা সঞ্চিত আছে এবং দেশবাসীকে আহ্বান করিয়া স্থির করা উচিত যে সেই সঞ্চিত অর্থের দ্বারা দেশের কোন্ মঙ্গলসাধন তাঁহাদের অভিপ্রেত। এই বিষয়ে প্রথমেই যাঁহারা পূর্ব্ববর্ত্তী শিল্পসম্মিলনের সভাপতি ও সদস্যরূপে কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলকে লইয়া বিশেষ বিবেচনা করিয়া তাঁহাদের সিদ্ধান্ত সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করা কর্ত্তব্য। এই কার্য্যে যে নির্ভীকতা আবশ্যক, যে সহিষ্ণুতা আবশ্যক, জানি না তাহা কয়জনের আছে।

ওজন ও মাপের ঐক্যসাধন। সম্মিলনের চতুর্থ প্রস্তাব সমস্ত ভারতের ওজন ও মাপের ঐক্যসাধন। যখন দেশে ভাষা ও বর্ণমালা এক করিবার বিশেষ চেষ্টা হইতেছে, তখন ওজন ও মাপের ঐক্যসাধন যে সঙ্গত তাহা বলা বাহুল্য। যে কোন উপায়ে দেশবাসীগণ ঐক্যের পথে অগ্রসর হইবে, তাহাই আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করিব।

স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার। সম্মিলনের অন্যতর প্রস্তাব হইতেছে স্বদেশী দ্রব্য বিদেশী দ্রব্য অপেক্ষা গুণে মন্দ ও মূল্যে উচ্চ হইলেও আমাদের তাহা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। কথাটা মতবাদ হিসাবে ঠিক, কিন্তু কার্য্যে তাহা কি দাঁড়াইতে পারিবে? আমাদের রুচি এমনই বিকৃত হইয়াছে যে আমরা গুণে ভাল অথচ মূল্যে কম হইলেও অনেক সময়েই দেশীয় দ্রব্য ব্যবহার করি না, কারণ তাহা বিদেশীয় দ্রব্যের নিকট চাকচিক্যে হার মানে। আমাদের আশা কোথায়? আবার অনেক সময়ে ইচ্ছা করিলেও যে প্রয়োজনীয় দেশীয় দ্রব্য পাই না। সম্মিলনের অনুসন্ধান কমিটি এইসূত্রে অন্তত বঙ্গদেশের কাপড়ের কারখানা প্রভৃতির অকৃতকার্য্যতার কারণ অনুসন্ধান করিলে এবং যথাযথ ব্যবস্থা প্রয়োগে সেই কারণ সমূহ বিদূরিত করিলে দেশের প্রভূত মঙ্গল হইতে পারে তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিব. করা ভাল ইত্যাদি মুখস্থ কথা বলিলে চলিবে না—কার্য্যে তাহা করিতে হইবে, তবেই দেশের মুখ উজ্জ্বল হইবে, দস্যুগিরি হ্রাস হইবে, দেশ নিরাপদ হইবে। স্বদেশী মোটা জিনিসের ব্যবহারেও আত্মগৌরব অনুভব করা শিক্ষা করিতে হইবে এবং শিক্ষা দিতে হইবে।

এই সূত্রে শিল্পশিক্ষার বিদ্যালয় সংস্থাপনের কথা উঠিয়াছে। সমস্ত পৃথিবীর যে অবস্থা তাহাতে বোধ হয় যে গভর্ণমেণ্ট এরূপ বিদ্যালয় সংস্থাপনে বাধ্য হইবেন—

নহিলে ভারতবাসীর মরণ নিশ্চিত। কেবল গভর্ণমেণ্টের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। মহানুভব কাশিমবাজারের মহারাজা বাহাদুরের ন্যায় আমাদের শিল্পশিক্ষা অগ্রসর করিয়া দিতে সাধ্যমত সাহায্য করা কর্ত্তব্য।

বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত—

গীতা-রহস্য।

সুখদুঃখবিবেক।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদিত)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মনুষ্য কাণে শোনে, ত্বকের দ্বারা স্পর্শ করে, চোখে দেখে, জিহ্বার দ্বারা আস্বাদন করে, ও নাকের দ্বারা আঘ্রাণ করে, এবং ইন্দ্রিয়দিগের এই ব্যাপার স্বাভাবিক বৃত্তির যেরূপ অনুকূল বা প্রতিকূল হয়, সেই অনুসারে মনুষ্যের সুখ বা দুঃখ হইয়া থাকে—এইরূপ সুখদুঃখের বস্তু-স্বরূপের লক্ষণ উপরে প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু সুখদুঃখের বিচার কেবল এই ব্যাখ্যাতেই সম্পূর্ণ হয় না। আধিভৌতিক সুখদুঃখ উৎপন্ন হইবার পক্ষে ইন্দ্রিয়গণের সহিত বাহ্যপদার্থের সংযোগ প্রথমে নিতান্ত আবশ্যক হইলেও, সুখদুঃখের অনুভব মনুষ্যের নিকট পরে কিপ্রকারে আসিয়া থাকে, ইহার বিচার করিলে এইরূপ উপলব্ধি হইবে যে, ইন্দ্রিয়-ব্যাপার-নিষ্পন্ন এই সুখদুঃখ জানিবার কাজ অর্থাৎ উপলব্ধি করিবার কাজ পরিশেষে প্রত্যেক মনুষ্যকে নিজের মনের দ্বারাই করিতে হয়। "চক্ষু-পশ্যতি রূপাণি মনসা ন তু চক্ষুষা"—দেখিবার কাজ কেবল চোখের দ্বারা হয় না, তাহাতে মনের সাহায্য নিতান্তই আবশ্যক হয় (সভা, শা, ৩১১ । ১৭), এবং সেই মন যদি ব্যাকুল হয়-তবে চোখে দেখিয়াও, না-দেখিবার মতো হইয়া থাকে, এইরূপ মহাভারতে কথিত হইয়াছে; বৃহদারণ্যক-উপনিষদেও "আমার মন অন্যদিকে থাকার দরুণ আমি দেখিতে পাই নাই (অন্যত্রমনা অভূবং নাদর্শম্), আমার মন অন্যত্র আছে বলিয়া আমি শুনিতে পাই নাই (অন্যত্রমনা অভূবং নাশ্রৌষম্)", এইরূপ বর্ণনা আছে (বৃ, ১, ৫, ৩)। অতএব আধিভৌতিক সুখদুঃখের অনুভব ঘটিবার পক্ষে কেবল ইন্দ্রিয়গণই কারণ নহে, তাহার পরে মনের সাহায্য দরকার হয়—ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে; এবং আধ্যাত্মিক সুখ দুঃখ মানসিকও হইয়া থাকে। এই সমস্ত হইতে দেখা যায়,—সর্ব্বপ্রকার সুখদুঃখানুভূতি শেষে মনকেই অবলম্বন করিয়া থাকে। এবং ইহা যদি সত্য হয়, তবে মনোনিগ্রহের দ্বারা সুখ দুঃখানুভূতিরও নিগ্রহ অসাধ্য নহে, এইরূপ পরে স্বতই উপলব্ধি হয়। এই অভিপ্রায় মনেই আনিয়া মনু সুখদুঃখের লক্ষণ, নৈয়ায়িকদিগের লক্ষণ হইতে ভিন্নরূপে বলিয়াছেন। তিনি বলেন—

সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখম্।
এতদ্‌বিদ্যাৎ সমাসেন লক্ষণং সুখদুঃখয়োঃ॥

অর্থাৎ যাহা কিছু পরবশ তাহাই দুঃখ, যাহা কিছু আপনার আয়ত্ত তাহাই সুখ—ইহাই সুখদুঃখের সংক্ষিপ্ত লক্ষণ (মনু ৪। ১৬০)। নৈয়ায়িকদিগের লক্ষণের অন্তর্ভূত 'বেদনা' শব্দের মধ্যে, শারীরিক ও মানসিক এইরূপ দুই বেদনারই সমাবেশ হওয়ায় সুখদুঃখের বাহ্য বস্তুস্বরূপও উহার দ্বারা প্রদর্শিত হইয়া থাকে এবং মনু সুখদুঃখের কেবল আভ্যন্তরিক অনুভূতির উপরেই কটাক্ষপাত করিয়াছেন—এইটুকুর প্রতি লক্ষ্য করিলে, সুখদুঃখের এই দুই লক্ষণের মধ্যে বিরোধ থাকে না। সুখদুঃখানুভূতির ইন্দ্রিয়াবলম্বিতা এইরূপে বিলুপ্ত হইলে পর—

"ভৈষজ্যমেতদ্ দুঃখস্য যদেতন্নানুচিন্তয়েৎ।"

অর্থাৎ—দুঃখের চিন্তা না করাই দুঃখ নিবারণের মহৌষধ (সভা, শা, ২০৫।২); এবং এই নীতি অনুসারে, ইতিহাসে মনকে দৃঢ় করিয়া সত্যের জন্য অথবা ধর্ম্মের জন্য আহ্লাদের সহিত অগ্নিকাষ্ঠভক্ষণের অনেক উদাহরণ আছে। অতএব যাহা কিছু করিবে, মনোনিগ্রহের দ্বারা তদন্তর্ভূত ফলাশা ছাড়িয়া ও সুখদুঃখ সম্বন্ধে সমবুদ্ধি রাখিয়া আমরা কর্ম্ম করিতে থাকিলে অর্থাৎ কর্ম্ম না ছাড়িলেও সেই কর্ম্মে আমাদের দুঃখরূপ বাধাপ্রাপ্তির ভীতি বা সম্ভাবনা থাকে না, এইরূপ গীতায় উক্ত হইয়াছে। ফলের আশা ত্যাগ করা অর্থাৎ ফল লাভ হইলে তাহা ত্যাগ করা, কিংবা সেই ফল কাহারো কখনও পাইবার বাসনা না রাখা, এরূপ অর্থ নহে। সেইরূপ ফলাশা এবং কর্ম্ম করিবার নিছক ইচ্ছা, আশা, হেতু,

কিংবা ফল লাভার্থ কোন বিষয়ের যোজনা করা, ইহাতেও অনেক ভেদ আছে। হাত পা নাড়ানোর নিছক্ ইচ্ছা হওয়া,আর অমুককে ধরিবার জন্য কিংবা অমুককে লাথি মারিবার জন্য হাত বা পা নাড়াইবার ইচ্ছা হওয়া, ইহার মধ্যে ভেদ আছে। প্রথম ইচ্ছাটি কেবল কর্ম্মমাত্রের ইচ্ছা, উহাতে অন্য কোন হেতু থাকে না; এই ইচ্ছা চলিয়া গেলে সমস্ত কর্ম্মই বন্ধ হয়। এই ইচ্ছা ব্যতীত প্রত্যেক কর্ম্মের কোন প্রকার পরিণাম কিংবা ফল ঘটিবার এই জ্ঞানও প্রত্যেক মনুষ্যের থাকা চাই; এবং জ্ঞান শুধু থাকা চাই নহে, অমুক ফলের জন্য এইরূপ অমুক যোজনা করিয়াও কোন-না-কোন কর্ম্ম করিবার ইচ্ছা হওয়া চাই। নতুবা তাহার সমস্ত ক্রিয়া পাগলের মতো নিরর্থক হইবে। এই সমস্ত ইচ্ছা, হেতু, কিংবা যোজনা পরিণামে দুঃখজনক হয় না; এবং তাহা ছাড়িতে হইবে একথা গীতাও বলেন নাই। কিন্তু ইহাকে আরও ছাড়াইয়া গিয়া "আমি যে কর্ম্ম করিতেছি আমার সেই কর্ম্মের অমুক ফল অবশ্যই মিলিবে এই জন্যই করিতেছি" এইরূপ যে কর্ম্মফলের প্রতি কর্ত্তাপুরুষের বুদ্ধির মমত্বের আসক্তি, আকাঙ্ক্ষা, অভিমান, অভিনিবেশ কিংবা আগ্রহ, তাহার দ্বারা মন অধিকৃত হইলে, এবং বাঞ্ছিত ফল মিলিবার পক্ষে বাধা উপস্থিত হইলে দুঃখপরম্পরা আরম্ভ হইয়া থাকে। এই বাধা অনিবার্য্য ও দৈবকৃত হইলে শুধু নৈরাশ্য উপস্থিত হয়, এবং মনুষ্যকৃত হইলে, পরে ক্রোধ কিংবা দ্বেষও উৎপন্ন হইয়া সেই দ্বেষের দ্বারা কুকর্ম্ম ঘটে এবং কুকর্ম্মের দ্বারা বিনাশ উপস্থিত হয়। কর্ম্মপরিণামের প্রতি যে মমত্বযুক্ত আসক্তি ইহারও 'ফলাশা', 'সঙ্গ', 'অহঙ্কার বুদ্ধি' ও 'কাম' এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে; এবং এখান হইতেই সাংসারিক দুঃখপরম্পরার প্রকৃত আরম্ভ, ইহা ব্যক্ত করিবার জন্য গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিষসঙ্গ হইতে কাম, কাম হইতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে মোহ ও পরিশেষে মনুষ্যের নাশও হইয়া থাকে এইরূপ কথিত হইয়াছে (গী, ২।৬২।৬৩)। জড় জগতের অচেতন কর্ম্ম স্বতঃ দুঃখের মূল নহে, মনুষ্য তাহাতে যে ফলাশা, কাম বা আসক্তি স্থাপন করে, তাহাই প্রকৃত দুঃখের মূল, এইরূপ নিশ্চিত হইবার পর, এই দুঃখনিবারণ করিবার জন্য, বিষয়ান্তর্গত আসক্তি, কাম, কিংবা ফলাশা ইহাই মনোনিগ্রহের দ্বারা ত্যাগ করিলেই হইল; সন্ন্যাসমার্গে যাহা বলা হয় তদনুসারে সমস্ত বিষয়, কর্ম্ম, বা সর্ব্বপ্রকারের ইচ্ছা ত্যাগ করিবার আবশ্যকতা, নাই, এইরূপ পরে ন্যায়তই নিষ্পন্ন হয়। অতএব ফলাশা ছাড়িয়া নিষ্কাম ও নিঃসঙ্গ বুদ্ধিতে যে ব্যক্তি যথাপ্রাপ্ত বিষয়ের সেবা করে সে প্রকৃত স্থিতপ্রজ্ঞ, ইহা পরে গীতাতে কথিত হইয়াছে (গী, ২।৬৪)। জগতে কর্ম্মের ব্যবহার কখনই বন্ধ হয় না। মনুষ্য এই জগতে না থাকিলেও প্রকৃতি নিজ গুণধর্ম্মানুসারে সততই কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে থাকিবে। জড় প্রকৃতির সুখও নাই দুঃখও নাই। মনুষ্য নিজের অপ্রকৃত মহত্ব গ্রহণ করিয়া প্রকৃতির ব্যাপারে আসক্ত হওয়া প্রযুক্ত সুখদুঃখভাগী হইয়া থাকে। কিন্তু এই আসক্তি দূরে নিক্ষেপ করিয়া "গুণাগুণেষু বর্ত্তন্তে"—প্রকৃতির গুণধর্ম্মানুসারে সমস্ত ব্যাপার চলিতেছে (গী, ৩।২৮) এইরূপ ভাবিয়া সমস্ত ব্যবহার করিলে পর, পরে অসন্তোষের কোন দুঃখই অবশিষ্ট থাকে না। এইজন্য সংসার দুঃখপ্রধান বলিয়া কাঁদিতে না বসিয়া কিংবা তাহা ত্যাগ করিবারও ইচ্ছা না করিয়া, প্রকৃতির ব্যাপার প্রকৃতি করিতেছে এইরূপ বুঝিয়া—

সুখং বা যদি বা দুঃখং প্রিয়ং বা যদি বাঽপ্রিয়ম্।
প্রাপ্তং প্রাপ্তমুপাসীত হৃদয়েনাপরাজিতা॥

অর্থাৎ—সুখই হউক বা দুঃখই হউক, প্রিয়ই হউক, বা অপ্রিয়ই হউক, যখন যাহা প্রাপ্ত হইবে, অপরাজিত চিত্তে তাহার সেবা করিবে—(সভা, শা, ২৫, ২৬) এইরূপ ব্যাস যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিয়াছেন। সংসারের কোন কর্ত্তব্য দুঃখ সহিয়াও অবশ্য করিতে হইবে—ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখিলে, এই উপদেশের মহত্ত্ব পূর্ণরূপে উপলব্ধ হইবে। ভগবদ্গীতাতেও "যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্" (২।৫৭)—শুভাশুভ প্রাপ্ত হইয়া যে ব্যক্তি সর্ব্বদা অনাসক্ত থাকিয়া তাহার অভিনন্দন বা দ্বেষ করে না সেই স্থিতপ্রজ্ঞ—এইরূপ স্থিতপ্রজ্ঞার লক্ষণ বলিয়া পঞ্চম অধ্যায়ে "ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎপ্রাপ্য চাপ্রিয়ম্" (৫।২০) সুখ পাইয়া উল্লসিত হইবে না, এবং দুঃখে মুহ্যমানও

হইবে না,—এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই সুখদুঃখ নিষ্কাম বুদ্ধিতে ভোগ করা আবশ্যক (২।১৪, ১৫) এইরূপ উক্ত হইয়াছে; এবং অন্য স্থানে পুনঃ পুনঃ এই উপদেশই প্রদত্ত হইয়াছে (গী, ৫।৯; ১৩।৯)। বেদান্তশাস্ত্রের পরিভাষায় "কর্ম্মে ব্রহ্মার্পণ করা" ইহার এই নাম প্রদত্ত হইয়াছে; ভক্তি-মার্গে 'ব্রহ্মার্পণের' স্থলে কৃষ্ণার্পণ' এই শব্দ সংযোজিত হইয়া থাকে; এবং ইহাই সমস্ত গীতার সারতত্ত্ব।

কর্ম্ম যে প্রকারেরই হউক না, উহা করিবার ইচ্ছা ও নিজের উদ্যোগ না ছাড়িয়া এবং আমার যাহা করিতে হইবে তাহাতে ফলের আকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া, পরিণামে প্রাপ্ত সুখ-দুঃখের জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিয়া সেই কর্ম্ম করিয়া গেলে, তৃষ্ণা কিংবা অসন্তোষের অনিবারণে যে দুষ্পরিণাম ঘটে, সেই দুষ্পরিণাম শুধু যে নিবারিত হয় তাহা নহে, তৃষ্ণার সহিত কর্ম্মেরও নাশ করিলে জগৎ ধ্বংস হইবার যে প্রসঙ্গ উপস্থিত হয় তাহাও হয় না এবং মনোবৃত্তি শুদ্ধ থাকিয়া সর্ব্বভূতহিতপ্রদ হইয়া থাকে। ফলাশা এইরূপ ছাড়িতে হইলেও বৈরাগ্যের দ্বারা পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয় ও মনের পূর্ণ নিরোধ করিতে হয়,—ইহা নির্ব্বিবাদ। কিন্তু ইন্দ্রিয়দিগকে বশে রাখিয়া, স্বার্থের বদলে বৈরাগ্যকে ও নিষ্কাম বুদ্ধিকে লোকসংগ্রহার্থ আপন আপন কর্ম্ম করিতে দেওয়া এবং সন্ন্যাসমার্গ অনুসারে তৃষ্ণাকে উচ্ছেদ করিবার জন্য সমস্ত ইন্দ্রিয়ব্যাপারকে অর্থাৎ সমস্ত কর্ম্মকে আগ্রহের সহিত সমূলে নাশ করা—এই দুয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। গীতায় যে বৈরাগ্য ও যে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ কথিত হইয়াছে তাহা প্রথম-প্রকারের, দ্বিতীয়-প্রকারের নহে; এবং সেই অনুসারেই অনুগীতাতে জনক-ব্রাহ্মণ সংবাদে (সভা, অশ্ব, ৩২। ১৭-২৩) জনক রাজা ব্রাহ্মণের রূপধারী ধর্ম্মকে এইরূপ বলিয়াছেন যে—

শৃণু বুদ্ধিং যাং জ্ঞাত্বা সর্ব্বত্র বিষয়ো মম।
নাহমাত্মার্থমিচ্ছামি গন্ধান্ ঘ্রাণগতানপি॥
* * * * *
নাহমাত্মার্থমিচ্ছামি মনো নিত্যং মনোন্তরে।
মনো মে নির্জ্জিতং তস্মাৎ বশে তিষ্ঠতি সর্ব্বদা॥

অর্থাৎ—যে (বৈরাগ্য) বুদ্ধি মনে রাখিয়া সমস্ত বিষয়ের আমি সেবন করিয়া থাকি তাহা তোমাকে বলিতেছি, শুন। আমি নিজের জন্য গন্ধ আঘ্রাণ করি না (চোখে আপনার জন্য দেখি না ইত্যাদি) এবং মনকেও আত্মার্থ অর্থাৎ আপন লাভের জন্য ব্যবহার করি না; অতএব আমার নাক (চোখ ইত্যাদি) ও মনকে আমি জয় করিয়াছি, তাহারা আমার বশে আছে। সমস্ত ইন্দ্রিয়কে দমন করিয়া মনের দ্বারা যে বিষয় চিন্তা করে, সে ভণ্ড, এবং যে ব্যক্তি মনোনিগ্রহের দ্বারা বুদ্ধিকে জয় করিয়া সমস্ত মনোবৃত্তিকে লোকসংগ্রহার্থ আপন আপন কাজ করিতে দেয় সেই ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ এইরূপ গীতাতে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহার তাৎপর্য্যই এই। বাহ্যজগৎ কিংবা ইন্দ্রিয়ব্যাপার আমরা উৎপন্ন করি নাই, তাহারা স্বভাবসিদ্ধ; এবং কোন সন্ন্যাসী যতই নিগ্রহী হউক না কেন, ক্ষুধা অনিবার্য্য হইলে, সে ভিক্ষা মাগিতে বাহির হয় (গী, ৩।৩৩); কিংবা অনেকক্ষণ এক জায়গায় বসিয়া থাকিলে, কখন বা উঠিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। নিগ্রহ যতই হউক না কেন ইন্দ্রিয়ের এই স্বভাবসিদ্ধ ব্যাপার রহিত হয় না যদি আমরা দেখিতে পাই, তবে ইন্দ্রিয়-বৃত্তি ও সেই সঙ্গে সমস্ত কর্ম্ম এবং সর্ব্ব প্রকারের ইচ্ছা বা অসন্তোষ নষ্ট করিবার দুরাগ্রহে না পড়িয়া (গী, ২। ৪৭; ১৮। ৫৯), মনোনিগ্রহের দ্বারা ফলাশা ছাড়িয়া ও সমস্ত সুখদুঃখ সমান জানিয়া (গী, ২। ৩৮) নিষ্কাম বুদ্ধিতে লোক-ব্যবহারার্থ সর্ব্বকর্ম্ম শাস্ত্রোক্ত রীতিতে করিতে থাকা—ইহাই বিজ্ঞতার মার্গ বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়। তাই—

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূঃ মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি॥

এই শ্লোকে (গী, ২।৪৭) ভগবান্ অর্জ্জুনকে প্রথমে এইরূপ বলিতেছেন যে, তুমি যেহেতু এই কর্ম্ম-ভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, অতএব তোমার "কর্ম্ম করিবার অধিকার আছে," ইহা সত্য; কিন্তু তোমার এই অধিকার কেবল সম্যক্‌রূপে (কর্ত্তব্য) কর্ম্ম সাধন করিবারই অধিকার, ইহা মনে রাখিবে। 'এব' অর্থাৎ 'কেবল' এই পদটির দ্বারা—কর্ম্ম ব্যতীত অন্য বিষয়ে—অর্থাৎ কর্ম্মফলে—মনুষ্যের অধিকার নাই—এইরূপ সহজভাবে নিষ্পন্ন হয়। কিন্তু

এই গুরুতর বিষয় কেবল অনুমানের অবলম্বে না রাখিয়া, দ্বিতীয় চরণে "কর্ম্মফলে কখনই তোমার অধিকার নাই", কারণ কর্ম্মের ফল পাওয়া, কি না-পাওয়া, ইহা তোমার আয়ত্তাধীন নহে, উহা নিয়তই পরমেশ্বরের অধীন কিংবা উহা সমস্ত সৃষ্টির কর্ম্মবিপাককে অবলম্বন করিয়া আছে—এইরূপ ভগবান সুস্পষ্ট শব্দে ব্যক্ত করিয়াছেন। যে বিষয়ে আমার অধিকার নাই, তাহা অমুক প্রকারে সংঘটিত হওয়া আবশ্যক, এইরূপ আশা করা মূঢ়তার লক্ষণ। কিন্তু এই তৃতীয় বিষয়টিকেও অনুমানের উপর না রাখিয়া "অতএব তুমি কর্ম্ম-ফলের আকাঙ্ক্ষা মনেতে রাখিয়া কর্ম্ম করিবে না" সমস্ত কর্ম্মবিপাক অনুসারে তোমার কর্ম্মের যে ফল হইবার তাহা হইবেই, তোমার ইচ্ছায় তাহা কম কিংবা বেশী অথবা শীঘ্র কিংবা বিলম্বে হওয়া অসম্ভব; এইরূপ আকাঙ্ক্ষাতিশয্যে কেবল তোমার দুঃখ ও কষ্ট হইবে মাত্র—এইরূপ তৃতীয় চরণে বলিয়াছেন। কিন্তু কর্ম্ম করা ও ফলের আশা ছাড়া, এই প্রকারের বৃথা চেষ্টা করা অপেক্ষা, একেবারেই কর্ম্ম ত্যাগ করা ভাল নহে কি,—এইরূপ এই স্থলে কোন ব্যক্তি—বিশেষতঃ সন্ন্যাসমার্গী—প্রশ্ন করিতে পারেন। এই জন্য শেষে "কর্ম্ম না করিবার (অকর্ম্মের) আগ্রহ রাখিবে না" তোমার যে অধিকার আছে তদনুসারে—কিন্তু ফলাশা ছাড়িয়া—কর্ম্মই করিতে থাক, এইরূপ ভগবান শেষে নিশ্চিত বিধান করিয়াছেন। কর্ম্মযোগদৃষ্টিতে এই সমস্ত সিদ্ধান্ত এতটা গুরুতর যে উপরি-উক্ত শ্লোকের চারি চরণ, কর্ম্মযোগ শাস্ত্রের কিংবা গীতা-ধর্ম্মের চতুঃসূত্র বলিলেও চলে।

সংসারে সুখ দুঃখ পর্য্যায়ক্রমে প্রাপ্ত হওয়া যায়; সুখ অপেক্ষা দুঃখের মোট পরিমাণ অধিক—ইহা সিদ্ধ হইলেও যদি সাংসারিক কর্ম্ম অপরিত্যজ্য হয়, তাহা হইলে অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তি হইয়া অত্যন্ত সুখ-প্রাপ্তির প্রযত্ন মনুষ্যের ব্যর্থ হইয়া যায়,ইহা কাহারও কাহারও মনে হওয়া সম্ভব; এবং কেবল আধি-ভৌতিক—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-গম্য বাহ্য বিষয়োপভোগ রূপ—সুখের দিকে দৃষ্টি করিলেও তাঁহাদের ধারণা অসঙ্গত এরূপ বলা যায় না। চাঁদকে ধরিবার জন্য ছোট ছেলে আকাশে হাত বাড়াইলেও সে যেরূপ চাঁদকে মুষ্ঠির ভিতর আনিতে পারে না, সেইরূপই আত্যন্তিক সুখের আশায় কেবল আধিভৌতিক সুখের অনুসরণ করিলেও, অত্যন্ত সুখপ্রাপ্তি দুর্ঘট হয়। কিন্তু আধিভৌতিক সুখ এই সুখেরই একটা প্রকারভেদ মাত্র না হওয়ায় এই বাধাপ্রযুক্তই অত্যন্ত ও নিত্য সুখপ্রাপ্তির একটা পথ বাহির করা যাইতে পারে। শারীরিক ও মানসিক সুখের এই দুই ভাগ করিলে পর, শরীরের কিংবা ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার অপেক্ষা শেষে মনেরই অধিক গুরুত্ব স্বীকার করিতে হইবে ইহা উপরে বলা হইয়াছে। শারীরিক (অর্থাৎ আধিভৌতিক) সুখাপেক্ষা মানসিক সুখের যোগ্যতা অধিক, এইরূপ যে সিদ্ধান্ত জ্ঞানী ব্যক্তিরা করিয়া থাকেন, তাহা আপন জ্ঞানের অহঙ্কার বশত করেন না, পরন্তু তাহাতেই শ্রেষ্ঠ মনুষ্যজন্মের প্রকৃত মহত্ত্ব অর্থাৎ সার্থকতা আছে, এইরূপ আধিভৌতিক-বাদী "মিল্" আপন উপযোগবাদ সম্বন্ধীয় গ্রন্থে স্পষ্টরূপে স্বীকার করিয়াছেন*। বিষয়োপভোগেই এই জগতে প্রকৃত সুখ, এইরূপ যদি মনুষ্যের ধারণা হইত তাহা হইলে মনুষ্য পশু হইতেও রাজি হইত। কিন্তু পশুর সমস্ত বিষয়-সুখ যদি নিত্য পাওয়া যাইত তথাপি যেহেতু পশু হইতে কেহ রাজি হয় না, অতএব পশু হইতে মনুষ্যের মধ্যে একটা কিছু বিশেষত্ব আছে, ইহা স্পষ্টই দেখা যায়। এই বিশেষত্বটি কি তাহা দেখিতে গেলে অর্থাৎ মন ও বুদ্ধির দ্বারা আত্ম ও বাহ্যজগতের যাহার জ্ঞান হয়, তাহার আত্মস্বরূপের বিচার করা আবশ্যক হয়; এবং একবার এই বিচার সুরু হইলে পর, পশু ও মনুষ্য এই উভয়ের একইরূপ সাধ্য যে বিষয়োপভোগসুখ তাহা অপেক্ষা মনের ও বুদ্ধির অত্যন্ত উদাত্ত ব্যাপারে ও শুদ্ধাবস্থাতে যে সুখ, তাহাই মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ কিংবা অত্যন্ত সুখ—ইহা ঐ বিচারের সঙ্গে সঙ্গে আপনা হইতেই উপলব্ধি হয়। এই সুখ সমস্ত আত্মবশ অর্থাৎ বাহ্যবস্তুর অপেক্ষা না

* "It is better to be a human being dissatisfied than a pig satisfied; better to be Socrates dissatisfied than a fool satisfied. And if the fool, or the pig, is of a different opinion, it is because they only know their own side of the question."—Utilitarianism, P. 14 (Longmans 1907.)

রাখিয়া কিংবা অন্যের সুখের লাঘব না করিয়া, আপন প্রযত্নে আপনা হইতেই প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং যেমন যেমন ঊর্দ্ধে আরোহণ করে, সেই অনুসারে এই সুখের স্বরূপ অধিকাধিক শুদ্ধ ও অবিমিশ্র হইয়া থাকে। "মনসি চ পরিতুষ্টে কোঽর্থবান্ কো দরিদ্রঃ"—মন প্রসন্ন হইলে দরিদ্রই বা কে, ধনবান্‌ই বা কে, দু-ই সমান—এইরূপ ভর্তৃহরি বলিয়াছেন; প্লেটো নামক প্রসিদ্ধ গ্রীক তত্ত্ববেত্তাও শারীরিক (অর্থাৎ বাহ্য কিংবা আধিভৌতিক) সুখাপেক্ষা মনের সুখ শ্রেষ্ঠ, এবং মনের সুখাপেক্ষাও বুদ্ধি-গ্রাহ্য (অর্থাৎ পরম আধ্যাত্মিক) সুখ শ্রেষ্ঠ এই-রূপ প্রতিপাদন করিয়াছেন। † তাই যদিও মোক্ষের বিচার আপাতত এক পাশে সরাইয়া রাখা গিয়াছে তথাপি আত্মবিচারনিমগ্ন বুদ্ধি পরম সুখ লাভ করিতে পারে, এইরূপ সিদ্ধ হইতেছে; এবং সেই দরুণ ভগবদ্‌গীতাতে, সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এইরূপ তিন ভেদ করিবার পর, তন্মধ্যে "তৎসুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তং আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্" আত্মনিষ্ঠ (অর্থাৎ সর্ব্বভূতে একই আত্মা এইরূপ আত্মার প্রকৃত স্বরূপকে চিনিয়া তাহাতেই রত থাকা) বুদ্ধির প্রযত্নে যে আধ্যাত্মিক সুখ পাওয়া যায় তাহাই সাত্ত্বিক অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ—প্রথমে এইরূপ বলিয়া (গী, ১৮।৩৭), তাহার পর ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়প্রসূত আধিভৌতিক সুখের পদবী ইহার নীচে অর্থাৎ রাজসিক (গী, ১৮।৩৮), এবং চিত্তমোহ ও নিদ্রা কিংবা আলস্য হইতে উৎ-পন্ন সুখের যোগ্যতা তামসিক অর্থাৎ কনিষ্ঠ, এই-রূপ পরে ক্রমান্বয়ে বর্ণনা করা হইয়াছে। এই প্রকরণের আরম্ভে গীতার যে শ্লোক প্রদত্ত হই-য়াছে, ইহাই তাহার তাৎপর্য্য; এই পরম সুখের উপলব্ধি একবার হইলে, পরে যতই বড় দুঃখ আসুক না কেন, তাহাতেও স্থৈর্য্য বিচলিত হয় না, এইরূপ গীতাও বলিয়াছেন (গী, ৬।২২)। এই অত্যন্ত সুখ স্বর্গের বিষয়সুখেও নাই; তাহা লাভ করিবার জন্য নিজের বুদ্ধি প্রথমে প্রসন্ন হওয়া চাই। ইহাকে কেমন করিয়া প্রসন্ন রাখিবে তাহা না দেখিয়া, যে ব্যক্তি কেবল বিষয়োপভোগেই নিমগ্ন হয় তাহার সুখ ক্ষণিক বা অনিত্য। কারণ যে ইন্দ্রিয়সুখ আজ আছে তাহা কাল নাই শুধু নহে, যে বিষয় আপন ইন্দ্রিয়ের নিকট সুখকর বলিয়া মনে হয় তাহাও কোন কারণপ্রযুক্ত কল্য দুঃখজনক হইতে পারে। উদাহরণ যথা—গ্রীষ্মকালে যে ঠাণ্ডা জল মিষ্ট লাগে তাহাই শীতকালে আর পান করা যায় না। ভাল; এত করিয়াও তাহা হইতে সুখে-চ্ছার পূর্ণতৃপ্তি হয় তাহাও নহে,—ইহা উপরে বলা হইয়াছে। তাই, 'সুখ' এই শব্দ ব্যাপকভাবে সর্ব্বপ্রকার সুখ সম্বন্ধেই যদি প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে সুখের মধ্যেও ভেদ করা আবশ্যক হয়। নিত্য ব্যবহারে সুখ ইন্দ্রিয় সুখই বুঝায়। কিন্তু ইন্দ্রিয়াতীত ও নিছক্ আত্মনিষ্ঠবুদ্ধির উপলব্ধ সুখ হইতে বিষয়োপভোগরূপ সুখের ভেদ প্রদর্শন করায় যখন ইষ্ট আছে, তখন বিষয়োপভোগের আধি-ভৌতিক সুখকে কেবলমাত্র সুখ কিংবা প্রেয় এবং আত্মবুদ্ধিপ্রসাদ-উৎপন্ন অর্থাৎ আধ্যাত্মিক সুখকে শ্রেয়, কল্যাণ, হিত, আনন্দ কিংবা শান্তি, এইরূপ বলিবার রীতি আছে। পূর্ব্ব প্রকরণের শেষে প্রদত্ত কঠোপনিষদের বাক্যে প্রেয় ও শ্রেয় এই দুয়ের মধ্যে নচিকেতা যে ভেদ করিয়াছেন তাহা এই মর্ম্মেই করা হইয়াছে। মৃত্যু তাঁহাকে অগ্নির রহস্য প্রথমেই বলিয়াছিলেন। কিন্তু এই সুখ প্রাপ্ত হইলে পর নচিকেতা পরে, আমাকে আত্মজ্ঞান বলো এইরূপ যখন বর চাহিলেন তখন তাহার বদলে মৃত্যু অন্য অনেক ঐহিক সুখের লোভ তাঁহাকে দেখাইলেন। পরে এই প্রকারের যে অনিত্য আধিভৌতিক সুখ কিংবা আপাতমনোরম বস্তু—তাহাতে মুগ্ধ না হইয়া, আরো দূরদৃষ্টি দিয়া যাহাতে আপন আত্মার শ্রেয় অর্থাৎ পরিণামে কল্যাণ হয়, সেই আত্মবিদ্যাকে নচিকেতা আগ্রহের সহিত ধরিয়া শেষে তাহাই সম্পাদন করিলেন। সার কথা—আত্মবুদ্ধির প্রসন্নতা হইতে উৎপন্ন নিছক বুদ্ধিগম্য সুখকেই কিংবা আধ্যাত্মিক আনন্দ-কেই আমাদের শাস্ত্রকার শ্রেষ্ঠ সুখ বলিয়া মানেন; এই নিত্য সুখ আত্মবশ হওয়া প্রযুক্ত সকলেরই প্রাপ্তব্য এবং সকলেই তাহা সম্পাদন করিবার প্রযত্ন করেন, ইহাই শাস্ত্রকারের অভিপ্রায়। পশুধর্ম্ম ব্যতীত মনুষ্যের যাহা কিছু বিশিষ্ট সুখ তাহা ইহাই; এবং এই আত্মানন্দ কেবল বাহ্য

† Republic Book IX.

উপাধিকেই কখন অবলম্বন করিয়া থাকে না; সমস্ত সুখের মধ্যে উহাই নিত্য, স্বতন্ত্র ও শ্রেষ্ঠ। গীতাতে ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে—"নির্ব্বাণের শান্তি" (গী, ৬।১৫); স্থিতপ্রজ্ঞার ব্রাহ্মী অবস্থায় যে চরম সুখ অনুভূত হয়, তাহা ইহাই (গী, ২।৭১; ৬।২৮; ১২।১২; ১৮।৬২ দেখ)।

আত্মার শান্তি কিংবা সুখই অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ সুখ; উহা আত্মবশ হওয়া প্রযুক্ত উহা লাভ করা সকলের সাধ্যায়ত্ত, এইরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কিন্তু সকল ধাতুর মধ্যে সোনাকে অত্যন্ত মূল্যবান মনে করিলেও অন্য ধাতুর গরজ যেমন চলিয়া যায় না, কিংবা চিনি অত্যন্ত মিষ্ট হইলেও লবণ বিনা যেমন কাজ চলে না, আত্মসুখ কিংবা শান্তির কথাও সেইরূপ। অন্তত শরীর-ধারণার্থও এই শান্তির সহিত ঐহিক পদার্থসমূহকে যুক্ত করিয়া দেওয়া আবশ্যক, এ কথা নির্ব্বিবাদ; এবং এই অভিপ্রায়েই আশীর্ব্বাদের সঙ্কল্পের মধ্যে কেবল 'শান্তিরস্তু' এইরূপ না বলিয়া "শান্তিঃ পুষ্টিস্তুষ্টিশ্চাস্তু" অর্থাৎ শান্তির সহিত পুষ্টি তুষ্টিও চাই—এইরূপ বলিবার রীতি আছে। কেবল শান্তির দ্বারাই তুষ্টি পাওয়া আবশ্যক এরূপ যদি শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রায় হইত, তাহা হইলে এই সঙ্কল্পের মধ্যে 'পুষ্টি' এই পদার্থটি সন্নিবেশ করিবার কোন হেতু থাকিত না। তথাপি পুষ্টির অর্থাৎ ঐহিক সুখবৃদ্ধির অসংযত আকাঙ্ক্ষা করা উচিত নহে। তাই শান্তি, পুষ্টি ও তুষ্টি (সন্তোষ) এই তিনই যোগ্য পরিমাণে তুমি প্রাপ্ত হও, কিংবা তিনই তোমার পাওয়া চাই, এইরূপ এই সঙ্কল্পের ভাবার্থ। কঠোপনিষদের তাৎপর্য্যও এইরূপ। নচিকেতা যম-লোকে গমন করিলে পর যম তাহাকে তিন বর চাহিতে বলিয়া, তদনুসারে প্রার্থিত বর তাহাকে দিলেন, এই কথাই এই উপনিষদে সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু মৃত্যু বর চাহিতে বলিলে পর, নচিকেতা একেবারে প্রথম হইতেই আমাকে "ব্রহ্মজ্ঞান দান কর" এইরূপ বর না চাহিয়া "আমার পিতা আমার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, তিনি যেন আমার উপর প্রসন্ন হন" এইরূপ প্রথমে, এবং পরে, "অগ্নি অর্থাৎ ঐহিক সমৃদ্ধি উৎপাদক যজ্ঞাদি কর্ম্মের জ্ঞান আমাকে প্রদান কর"—এইরূপ দ্বিতীয় বর চাহিয়াছেন; এবং এই বর প্রাপ্ত হইলে পর, শেষে "আমাকে আত্মবিদ্যার উপদেশ দেও" এইরূপ যমের নিকট তৃতীয় বর চাহিয়াছেন। কিন্তু এই তৃতীয় বরের বদলে আরও অন্য সম্পদ দিতেছি—এইরূপ যখন যম বলিতে লাগিলেন তখন—অর্থাৎ শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির পক্ষে আবশ্যক সেই সব যজ্ঞাদি কর্ম্মের জ্ঞান লাভ হইলে পর, তাহাতে অধিক আশা না রাখিয়া—"এক্ষণে, যাহাতে শ্রেয় লাভ হয় সেই ব্রহ্মজ্ঞানের কথা আমাকে বল,"—এইরূপ নচিকেতা জেদ ধরিলেন। সারকথা—এই উপনিষদের শেষভাগের মন্ত্রাদিতে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে তদনুসারে 'ব্রহ্মবিদ্যা' ও 'যোগবিধি' অর্থাৎ যজ্ঞযাগাদি—এই দুই-ই লাভ করিয়া নচিকেতা মুক্ত হইয়াছে (কঠ, ৬।১৮)। ইহা হইতে,—জ্ঞান ও কর্ম্ম এই দুয়ের সমুচ্চয় উপনিষদের তাৎপর্য্য এইরূপ সিদ্ধ হয়। ইন্দ্র সম্বন্ধে এই প্রকারের একটা কথা আছে। ইন্দ্রের ব্রহ্মজ্ঞান স্বতঃ পূর্ণ হইয়াছিল শুধু নহে, প্রতর্দনাস তাঁহাকে আত্মবিদ্যার উপদেশও দিয়াছিলেন—এইরূপ কৌশীতকি-উপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে। তথাপি ইন্দ্রের রাজ্যে গিয়া প্রহ্লাদ ত্রৈলোক্যাধিপতি হইলে পর,—ইন্দ্র, দেবতার গুরু যে বৃহস্পতি তাঁহার নিকট গিয়া "শ্রেয় কিসে হয় তাহা আমাকে বল" এইরূপ প্রশ্ন করিলেন। তখন বৃহস্পতি রাজ্যভ্রষ্ট ইন্দ্রকে ব্রহ্মবিদ্যা অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের উপদেশ দিয়া "ইহাই শ্রেয়" (এতাবচ্ছ্রেয় ইতি) এইরূপ উত্তর দিলেন। কিন্তু ইন্দ্র তাহাতে আশ্বস্ত না হইয়া "আরও বেশী কিছু আছে কি" (কো বিশেষো ভবেৎ?) এইরূপ পুনঃ প্রশ্ন করিলে পর, বৃহস্পতি তাঁহাকে শুক্রাচার্য্যের নিকট পাঠাইলেন। সেখানেও ঐরূপ হইলে পর, শুক্র "উহা প্রহ্লাদের ভাল জানা আছে" এইরূপ বলিলেন। তখন শেষে ব্রাহ্মণবেশে প্রহ্লাদের নিকট গিয়া ইন্দ্র প্রহ্লাদের শিষ্য হইলেন এবং কিছুকাল তাঁহার সেবা করিয়া, শীলই (সত্য ও ধর্ম্মানুসারে আচরণ করিবার স্বভাব) স্বর্গরাজ্য লাভের নিগূঢ়তত্ত্ব এবং তাহাই শ্রেয়—এইরূপ প্রহ্লাদ তাঁহাকে বলিলেন। তাহার পর, তোমার সেবায় আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি যে বর চাহিবে তাহা আমি তোমাকে দিব,—এইরূপ প্রহ্লাদ যখন বলিলেন,

তখন "তোমার 'শীল' আমাকে দেও,—এইরূপ ব্রাহ্মণবেশধারী ইন্দ্র বর চাহিলেন। তাহাকে প্রহ্লাদ 'তথাস্তু' বলিবার পর 'শীল' ও তাহার পশ্চাতে ধর্ম্ম, সত্য, বৃত্ত ও পরিশেষে শ্রী কিংবা ঐশ্বর্য্য এই সব দেবতা প্রহ্লাদের শরীর হইতে নির্গত হইয়া ইন্দ্রের শরীরে প্রবেশ করিল এবং তাহার দরুণ পরে ইন্দ্র আপন রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন, এইরূপ মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে (শা, ১২৪) ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে এক প্রাচীন কথা বিবৃত করিয়াছেন। নিছক্ ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা, নিছক্ আত্মজ্ঞান যদি যোগ্যতর হয়, তথাপি এ জগতে যাহার থাকিতে হইবে তাহাকে জনসাধারণের মতেই ঐহিক সমৃদ্ধিও আপনার জন্য কিংবা আপনার দেশের জন্য লাভ করিবার আবশ্যকতা ও নৈতিক অধিকার থাকা প্রযুক্ত এই জগতে মনুষ্যের পরম সাধ্য কি?—এই প্রশ্ন সম্বন্ধে শান্তি ও পুষ্টি, শ্রেয় ও প্রেয় কিংবা জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য—এই দুয়ের সমুচ্চয়ই আমাদের শাস্ত্রের চরম উত্তর, এইরূপ উক্ত সুন্দর ইন্দ্র-প্রহ্লাদের কথা হইতে স্পষ্টই দেখা যায়। যে ভগবান অপেক্ষা এই জগতে আর কেহই শ্রেষ্ঠ নাই এবং যাঁহার পথ ধরিয়া অন্য লোকে গমন করিয়া থাকে (গী, ৩।২৩) সেই ভগবান ঐশ্বর্য্য ও সম্পদ ত্যাগ করিয়াছেন কি?—

ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য ধর্ম্মস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীরণা॥

অর্থাৎ সমগ্র ঐশ্বর্য্য, ধর্ম্ম, যশ, সম্পদ, জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই ছয় বিষয়কে ভগ বলে—এইরূপ ভগ শব্দের ব্যাখ্যা পুরাণাদিতে প্রদত্ত হইয়াছে (বিষ্ণু, ৬।৫।৭৪ দেখ)। এই শ্লোকে ঐশ্বর্য্য শব্দের অর্থ 'যোগৈশ্বর্য্য' এইরূপ করা হয়; কারণ, শ্রী অর্থাৎ সম্পদ এই শব্দ পরে আসিয়াছে। কিন্তু ব্যবহারে ঐশ্বর্য্য শব্দে সত্তা, যশ ও সম্পদ এবং জ্ঞানেও বৈরাগ্য ও ধর্ম্মের সমাবেশ হওয়া প্রযুক্ত উপরি উক্ত শ্লোকের সমস্ত অর্থ, জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য এই দুই পদেই লৌকিক দৃষ্টিতে ব্যক্ত হয় এইরূপ বলা যাইতে পারে; এবং যেহেতু জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য এই দুয়ের সংযোগ ভগবানও স্বীকার করিয়াছেন, অতএব উহাই প্রমাণ মনে করিয়া লোকের কাজ করা আবশ্যক (গী, ৩।২১; সভা, শাং, ৩৪১।২৫)। আত্মজ্ঞানই এই জগতের সাধ্য এই সিদ্ধান্ত, সংসার দুঃখময় বলিয়া উহা হঠাৎ ছাড়িয়া দিতে হইবে এই কথা সন্ন্যাসমার্গের কথা, কর্ম্মযোগের নহে; এবং ভিন্ন ভিন্ন মার্গের এই সিদ্ধান্ত একত্র করিয়া গীতার অর্থ বিপর্য্যয় করা উচিত নহে। তথাপি জ্ঞান বিনা কেবল ঐশ্বর্য্য আসুরী সম্পদ—ইহা গীতাও বলিয়াছেন। তাই, ঐশ্বর্য্যের সহিত জ্ঞান ও জ্ঞানের সহিত ঐশ্বর্য্য কিংবা শান্তি ও পুষ্টি এই দুয়ের সংযোগ নিত্য স্থির রাখা আবশ্যক এইরূপ সিদ্ধ হইতেছে। জ্ঞানের সহিত হৌক বা না হৌক, ঐশ্বর্য্যও চাই, এইরূপ বলিবার পর, "কর্ম্ম করা" উহারই সঙ্গে স্বতই আসিয়া পড়ে। কারণ, "কর্ম্মাণ্যারভমাণং হি পুরুষং শ্রীর্নিষেবতে" (মনু, ৯।৩০০) কর্ম্মকারী ব্যক্তিও এই জগতে শ্রী অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য লাভ করে—এইরূপ মনু বলিয়াছেন; প্রত্যক্ষ অনুভূতিতেও এই বিষয় সিদ্ধ হয়; এবং গীতাতে অর্জ্জুনকে যে উপদেশে প্রদত্ত হইয়াছে সে উপদেশেও তাহাই আছে (গী, ৩।৮)। মোক্ষদৃষ্টিতে কর্ম্মের আবশ্যকতা না থাকাপ্রযুক্ত শেষে অর্থাৎ জ্ঞানলাভের পর সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করাই আবশ্যক এইরূপ কেহ কেহ বলেন। কিন্তু অপাতত কেবল সুখদুঃখেরই বিচার করা কর্ত্তব্য, তাছাড়া মোক্ষ ও কর্ম্মের স্বরূপ পরীক্ষা এখনও করা হয় নাই বলিয়া এই আপত্তির উত্তর এখানে বলা যাইতে পারে না। পরে নবম ও দশম প্রকরণে অধ্যাত্ম ও কর্ম্মবিপাক সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে বিচার আলোচনা করিয়া পরে একাদশ প্রকরণে, এই আপত্তিও যে শূন্যগর্ভ তাহা দেখান যাইবে।

সুখ ও দুঃখ এই দুই ভিন্ন ও স্বতন্ত্র অনুভূতি বা বেদনা; সুখেচ্ছা কেবল সুখোপভোগের দ্বারা তৃপ্ত হইতে পারে না, এই জন্য সংসারে মোটের হিসাবে দুঃখ অধিক অনুভূত হইয়া থাকে, কিন্তু এই দুঃখ নিবারণের তৃষ্ণা কিংবা অসন্তোষকে ও তাহার সহিত কর্ম্মকে সমূলে উচ্ছেদ করা উচিত না হওয়ায়, কেবল ফলাশা ছাড়িয়া সমস্ত কর্ম্ম করিতে থাকাই শ্রেয়স্কর। কেবল বিষয়োপভোগসুখ কখনই পূর্ণ হয় না, উহা অনিত্য ও পশুধর্ম্ম; বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়বান মনুষ্যের প্রকৃত ধ্যেয় উহা অপেক্ষা উচ্চ আদর্শের হওয়া চাই; আত্মবুদ্ধিপ্রসাদ হইতে

পাওয়া যায় যে শান্তিসুখ, তাহাই প্রকৃত ধ্যেয়; কিন্তু আধ্যাত্মিক সুখ এইরূপ শ্রেষ্ঠ হইলেও নিষ্কাম বুদ্ধিতে প্রযত্ন অর্থাৎ কর্ম্ম করাও আবশ্যক;—এই-টুকু কর্ম্মযোগশাস্ত্রানুসারে সিদ্ধ হইলে পর, সুখ-দৃষ্টিতে বিচার করিলেও কেবল আধিভৌতিক সুখ-কেই পরম সাধ্য মনে করিয়া কর্ম্মের কেবল সুখ-দুঃখাত্মক বাহ্য পরিণামের তারতম্যের দ্বারাই নীতিমত্তার নির্ণয় করা উচিত নহে, ইহা পৃথকরূপে বলা আবশ্যক নাই। কারণ, যে বস্তু পরিপূর্ণাবস্থায় কখনও স্বতঃ আসিতে পারে না, তাহাকে পরমসাধ্য মনে করা অর্থাৎ 'পরম' শব্দের অপব্যবহার করিয়া মৃগজলের স্থানে জলের ভাবনা করাটাই অসঙ্গত। পরম সাধ্যও যদি অনিত্য ও অপূর্ণ হয় তবে তাহার আশায় থাকিলে অনিত্য বস্তু ছাড়া আর কি পাইবে? "ধর্ম্মো নিত্যঃ সুখ-দুঃখেত্বনিত্যে" এই বচনের মর্ম্মও ইহাই। "অধিক লোকের অধিক সুখ" এই বাক্যের মধ্যে সুখ শব্দের অর্থ কি বুঝিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে আধিভৌতিকবাদী-দিগের মধ্যেও খুব মতভেদ আছে। মনুষ্য অনেক সময় সমস্ত বিষয়সুখকে পদাঘাত করিয়া কেবল সত্যের জন্য কিংবা ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত হয়; আধিভৌতিক সুখপ্রাপ্তির জন্যই তাহারা এইরূপ ইচ্ছা করিয়া থাকে, একথা ঠিক নহে,—উহাদের মধ্যে কতকগুলি পণ্ডিতের এইরূপ মত, এবং তাই সুখশব্দের বদলে হিত কিংবা কল্যাণ শব্দ জুড়িয়া দিয়া "অধিক লোকের অধিক সুখ" এই সূত্রের "অধিক লোকের অধিক হিত বা কল্যাণ" এইরূপ রূপান্তর করিতে হইবে, ইহা তাঁহারা প্রতি-পাদন করিয়াছেন। কিন্তু এত করিয়াও কর্ত্তৃবুদ্ধির কোনই বিচার হয় না, এবং এই প্রকার অন্য দোষও এইমতে থাকিয়া যায়। ভাল, বিষয়সুখের সহিত মানসিক সুখেরও বিচার করিতে হইবে যদি বলা হয়, তাহা হইলে কোন কর্ম্মের নীতিমত্তা কেবল তাহার বাহ্য পরিণাম ধরিয়াই স্থির করা আবশ্যক, ইহা প্রথম প্রতিজ্ঞার বিরুদ্ধ হওয়ায় অধ্যাত্মপক্ষ একরকম অংশত স্বীকার করাই হইল। কিন্তু এই প্রকারে শেষে যদি অধ্যাত্মপক্ষ স্বীকার করিতেই হয়, তবে আধাআধি স্বীকার করিয়া লাভ কি? অতএব সর্ব্বভূতহিত, অধিক লোকের অধিক সুখ, মনুষ্য-ত্বের পরম উৎকর্ষ প্রভৃতি নীতি নির্ণয়ের সমস্ত বাহ্য সাধন কিংবা আধিভৌতিক মার্গ গৌণ স্থির করিয়া আত্মপ্রসাদরূপ অত্যন্ত সুখ এবং তাহার সহিত সংযুক্ত কর্ত্তার শুদ্ধ বুদ্ধি, এই আধ্যাত্মিক কষ্টি-পাথরে পরীক্ষা করা আবশ্যক, এইরূপ আমাদের কর্ম্মযোগশাস্ত্রের চরমসিদ্ধান্ত। যাহাই হোক্ না কেন, দৃশ্য জগতের অতীত যে তত্ত্বজ্ঞান সে তত্ত্বজ্ঞানের মধ্যে প্রবেশ পর্য্যন্ত করিতেও নাই, এইরূপ যাঁহারা শপথ করিয়াছেন তাঁহাদের কথা আলাদা। নচেৎ, মন ও বুদ্ধিরও অতীত নিত্য আত্মার নিত্য কল্যাণই কর্ম্মযোগশাস্ত্রেতেও মুখ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, ইহা যুক্তিতেও পাওয়া যায়। বেদান্তে প্রবেশ করিলে সমস্তই ব্রহ্মময় হওয়ায় ব্যবহারের যুক্তি খাটে না এইরূপ কাহারও কাহারও যে ধারণা, তাহা ভ্রান্ত ধারণা। বেদান্ত সম্বন্ধে অধুনা সাধারণতঃ পাঠ্য গ্রন্থ সন্ন্যাসমার্গ অনুযায়ী লিখিত হওয়ায় এবং তৃষ্ণারূপী সংসার সমস্তই অসার মনে করা হয় বলিয়া তাঁহাদের গ্রন্থাদিতে কর্ম্মযোগের উপ-পত্তি ঠিক্ দেওয়া হয় নাই সত্য। অধিক কি, এই পরসম্প্রদায়াসহিষ্ণু গ্রন্থকারেরা সন্ন্যাসমার্গের যুক্তিক্রম কর্ম্মযোগের মধ্যে গুঁজিয়া দিয়া সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ এই দুই স্বতন্ত্র মার্গ নহে, সন্ন্যাসই একমাত্র শাস্ত্রোক্ত মোক্ষমার্গ, এইরূপ ধারণা জন্মাইবার প্রযত্ন করিয়াছেন, কিন্তু এই মত ঠিক্ নহে। সন্ন্যাসমার্গ অনুসারে কর্ম্মযোগমার্গও বৈদিক ধর্ম্মে অনাদি কাল হইতে স্বতন্ত্ররূপে চলিয়া আসিতেছে; এবং এই মার্গের প্রবর্ত্তকেরা বেদান্তের তত্ত্ব ছাড়িয়া না দিয়া কর্ম্মযোগশাস্ত্রের উপপত্তি ঠিক্ প্রয়োগ করিয়াছেন। ভগবদ্গীতা গ্রন্থ এই পন্থারই গ্রন্থ। তথাপি গীতাকে ছাড়িয়া দিলেও কার্য্যাকার্য্যশাস্ত্রের অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে বিচার আলো-চনা করিবার পদ্ধতি কেবল ইংলণ্ডেই গ্রীণের ন্যায় গ্রন্থকারেরা সুরু করিয়াছেন; * এবং জর্ম্মানীতে গ্রীণের আগেই উহা সুরু হইয়াছিল। দৃশ্য জগতের যতই বিচার আলোচনা করা হোক্ না কেন, এই জগতের সাক্ষী ও কর্ম্মকর্ত্তা কে ইহা

* Prolegomena to Ethics, Book I; and Kant's Metaphysics of Moral. (trans. by. Abbot in Kant's theory of Ethics.)

যে পর্য্যন্ত ঠিক্ অবগত না হওয়া যায় সেই পর্য্যন্ত, এই জগতে মনুষ্যের পরম কর্ত্তব্য কি তাহার বিচার তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে অপূর্ণই থাকিবে। তাই, "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" এই যে যাজ্ঞবল্ক্যের উপদেশ তাহাই উপস্থিত প্রকরণেও অক্ষরশঃ প্রযুক্ত হইতে পারে। দৃশ্য জগৎ পরীক্ষা করিয়া যদি পরোপকাররূপ তত্ত্বও পরিশেষে নিষ্পন্ন হয়, তবে অধ্যাত্মবিদ্যার মাহাত্ম্য উহার দ্বারা লাঘব না হইয়া উল্টা সর্ব্বভূতে একই আত্মা থাকিবার ইহাই এক প্রমাণ বলিলেও চলে। আধিভৌতিকবাদী আপনারাই যে সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, তাহার ও-দিকে তাঁহারা যাইতে পারেন না, তাহার উপায়ও নাই। আমাদের শাস্ত্রকারদের দৃষ্টি এই সীমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে, অধ্যাত্মদৃষ্টিতেও কর্ম্মযোগশাস্ত্রের পূর্ণ উপপত্তি তাঁহারা দিয়াছেন। কিন্তু এই উপপত্তি বলিবার পূর্ব্বে, কর্ম্মাকর্ম্ম পরীক্ষা-সম্বন্ধে অন্য এক পূর্ব্বপক্ষেরও একটু আলোচনা করা আবশ্যক হওয়ায়, এক্ষণে সেই পন্থা সম্বন্ধে বিচার-আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইব।

ইতি পঞ্চম প্রকরণ সমাপ্ত।

শোক সংবাদ।

সার চন্দ্রমাধব ঘোষ বিগত ৬ই মাঘ পরলোকগত হইয়াছেন। স্বদেশ একটি রত্ন হারাইল। বাল্যাবধি তিনি যে হৃদয়ের স্বাধীনতার অধিকারী ছিলেন, জীবনের শেষ পর্য্যন্ত সে স্বাধীনতা হারান নাই; এমন কি, বিচারক পদে অধিষ্ঠিত হইয়াও কোন কারণেই তিনি সে স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দেন নাই। তিনি ধীর সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন। কায়স্থগণের বিভিন্ন শাখার মধ্যে বিবাহ প্রচলিত করিবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিগত জাতীয় মহাসম্মিলনের দলাদলি মিটাইবার জন্য তিনি সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার মত লোকের মৃত্যুতে কেবল তাঁহার পরিবার নহে, সমস্ত বঙ্গবাসী একটি আপনার লোক হারাইল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র স্বনামধন্য রায় বাহাদুর যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ। তাঁহার পুত্রগণ সকলেই কৃতী। আমরা তাঁহাদিগকে কি আর সান্ত্বনা দিব? প্রার্থনা করি, ঈশ্বর পরলোকগত আত্মাকে স্বীয় সুশীতল ক্রোড়ে লইয়া শান্তি প্রদান করুন এবং তাঁহার পরিবারবর্গকে এই দুঃসহ ব্যথা সহ্য করিবার বল বিধান করুন।

দানপ্রাপ্তি।

মহর্ষিদেবের প্রিয় শিষ্য আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী অধ্যক্ষসভার জনৈক সভ্য তিনি আদিসমাজের উন্নতিকল্পে ৫০০৲ শত টাকার বার্ষিক শতকরা ৩½ টাকা সুদের এক খণ্ড কোম্পানির কাগজ প্রদান করিয়া আমাদিগকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার মত আদিব্রাহ্মসমাজের অকৃত্রিম বন্ধু বিরল।

আমরা জানিয়া সুখী হইলাম যে শ্রীমতী সরোজিনী দেবী এবং শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহাদের পুত্রগণের উপনয়ন উপলক্ষে ১৪০৲ টাকা আদিসমাজের অর্থভাণ্ডারে দান করিয়াছেন, এবং তাহা হইতে দুইখণ্ড শতকরা ৩½ টাকা বার্ষিক সুদের কোম্পাণির কাগজ কেনা হইয়াছে।

হাইকোর্টের খ্যতনামা এটর্ণি শ্রীযুক্ত পান্নালাল দে তাঁহার পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে সমাজে ২৫৲ টাকা দান করিয়া আমাদের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা তাঁহার কন্যার বিবাহ উপলক্ষে সমাজে ২৲ টাকা দান করিয়া আমাদের ধন্যবাদের পাত্রী হইয়াছেন।

স্থানাভাব বশত এবারে উৎসবের দান প্রকাশিত হইতে পারিল না—চৈত্র সংখ্যায় তাহা প্রকাশিত হইবে।

ভ্রম সংশোধন।

গীতারহস্য—২৫২ পৃষ্ঠা দ্বিতীয় স্তম্ভ—১২ পংক্তি—"আধিভৌতিক"এর স্থানে "আধিদৈবিক" হইবে।

THE BOSE INSTITUTE.

A valuable and useful Publication Profusely illustrated and printed on Art Paper:

It contains full descriptions of Dr. Bose's researches on sensibility of plant and also particulars regarding Dr. Bose's magnanimous gift to the nations.

This Book should be in the hands of every one as record of a significant incident in country's history and doings of one who is not only pride to this country but to the whole humanity.

Price Re. 1/- Per v. p. Re. 1-2.

Apply to the Manager,
THE HINDU PATRIOT,
148, Baranashi Ghose Street,
CALCUTTA.

একমেবাদ্বিতীয়ং

ঊনবিংশ কল্প
তৃতীয় ভাগ।
চৈত্র, ব্রাহ্মসম্বৎ ৮৮।

৮৯৬ সংখ্যা ১৮৩৯ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"

কেবল তুমি।

(শ্রীনির্ম্মল চন্দ্র বড়াল বি-এ)

মিশ্র বারোঁয়া—দাদ্‌রা।

সকল জ্বালা জুড়িয়ে দিতে
কেবল তুমি কেবল তুমি।
মাঝ-বসন্ত আন্‌তে শীতে
কেবল তুমি কেবল তুমি।
শুষ্ক হৃদে ফুটাতে ফুল
কেবল তুমি কেবল তুমি।
জীর্ণ বীণায় তুলিতে সুর
কেবল তুমি কেবল তুমি।
সাপ খেলাবার মন্ত্র জান
কেবল তুমি কেবল তুমি।
নিমেষে মন ভুলিয়ে নিতে
কেবল তুমি কেবল তুমি।
বহিয়ে দিতে দখিন হাওয়া
কেবল তুমি কেবল তুমি।
জ্যোৎস্না-ধারায় ধুইয়ে দিতে
কেবল তুমি কেবল তুমি।
প্রভাত-রবি নিশীথ-শশী
কেবল তুমি কেবল তুমি।
দীপ্তিবিহীন ঘরের জ্যোতি
কেবল তুমি কেবল তুমি।
আর রেখো না ফেলে প্রিয়,
এসো তুমি এসো তুমি
শুকিয়ে এলো রসের ধারা—
কবে বল আসবে তুমি!
যদিই বা না পাইগো তোমায়,
কর্‌ব কেবল তুমি তুমি;
পলে পলে মরণ স'য়ে
বল্‌ব "তুমি—তুমি—তুমি॥"

কেশবচন্দ্র—ব্রাহ্মসমাজে আগমনের পূর্ব্বে।

কেশবচন্দ্র যে বৈদ্যকুল উজ্জ্বল করিয়াছেন, সেই বৈদ্যকুলের আদিম বাসস্থান হুগলীর পরপারস্থ গৌরিভা (গরফে) গ্রাম। যে পরিবারে কেশব জন্মগ্রহণ করেন, সেই পরবিবারের খ্যাতিপ্রতিপত্তির মূল কেশবের পিতামহ রামকমল সেন। রামকমল তাঁহার পিতা গোকুলচন্দ্র সেনের দ্বিতীয় পুত্র। প্রায় অষ্টাদশ বৎসর বয়সে রামকমল ১৮০১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় আসিয়া ইংরাজী শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। সে সময়ে এদেশে ইংরাজী ব্যাকরণ বা অভিধান কিছুই পাওয়া যাইত না এবং একটীও ইংরাজী বিদ্যালয় ছিল না। রামকমল সেন নিজের অসাধারণ অধ্যবসায়ের গুণে ইংরাজী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন হয়েন। তাঁহার এই অধ্যবসায়ের ফলে ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে মুদ্রাযন্ত্রের সামান্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে

এসিয়াটিক সোসাইটীর কেরাণীর পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহার কিছুকাল পরে তিনি উক্ত সোসাইটির সহকারী সম্পাদক এবং আরও কিছু পরে উহার কাউন্সিলের সভ্যপদেও নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সময়ক্রমে তিনি টাকশাল ও বাঙ্গালব্যাঙ্কের দেওয়ানী পদ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার কর্ম্মপটুতা নানা দিকে প্রকাশ পাইয়াছিল। হিন্দুকলেজের স্থাপন অবধি তিনি উহার কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্যছিলেন। কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটির সভ্য হইয়া তিনি উহার পুস্তক সংগ্রহ এবং গ্রন্থানুবাদ কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিতেন। তিনি শিক্ষাবিভাগের সাধারণ সভারও সভ্য ছিলেন। প্রকৃতিবাদ অভিধান নামক বঙ্গভাষার একখানি সুবৃহৎ অভিধান তাঁহার অক্ষয়কীর্ত্তি। তিনি নানা জনহিতকর কার্য্যে যোগদান করিতেন। তিনি একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন—দিনান্তে প্রতিদিন স্বহস্তে সিদ্ধপক্ক হবিষ্যান্ন রন্ধন করিয়া আহার করিতেন। অনেক সময়ে পেয়ারা সিদ্ধ তাঁহার আহারের উপকরণ হইত। প্রতি বৎসর তিনি সহস্রাধিক বৈদ্যকে নিমন্ত্রণ করিয়া নানাবিধ সুস্বাদু সামগ্রী ভোজন করাইয়া তৃপ্তিলাভ করিতেন। কেশবচন্দ্রের ছয় বৎসর বয়সের সময় রামকমল সেন পরলোক গমন করেন।

কেশবের পিতা প্যারীমোহন রামকমল সেনের দ্বিতীয় পুত্র। প্যারীমোহন টাকশালের দেওয়ান হইয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন। কেশবের এগার বৎসর বয়সে প্যারীমোহনের দেহান্তর ঘটে। কেশবজননী সারদাসুন্দরী পরম ভক্তিমতী ও দয়াবতী সতী ছিলেন। সারদাসুন্দরী অল্পবয়সে বিধবা হইয়া পূজাআহ্নিক, ব্রত উপবাস, তীর্থদর্শন, সাধুসঙ্গম, দরিদ্রসেবা, সন্তানগণের লালন পালন এবং সংসারের রন্ধনাদি কার্য্য লইয়াই দিনযাপন করিতেন। তিনি কাহারও সেবা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিতেন না, অথচ সকলের সেবা করিতে অগ্রসর ছিলেন। তাঁহার হৃদয় খুব উন্নত ও প্রশস্ত ছিল। ব্রহ্মোপাসনা প্রচারে কেশব তাঁহার নিকটে যথেষ্ট উৎসাহ লাভ করিয়াছিলেন।

কেশব প্যারীমোহনের দ্বিতীয় পুত্র। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ১৯শে নবেম্বর (১৭৬০ শকের ৫ই অগ্রহায়ণ) সোমবার শুক্ল দ্বিতীয়া তিথিতে প্রাতে ৭ ঘটিকার সময় কলুটোলাস্থ ভবনে কেশবচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। পিতামহের নিকট কিছু অতিরিক্ত আদর পাইয়া কেশব একটু অতিরিক্ত আবদারপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে কেশবের এগার বৎসর বয়সে তাঁহার জননী বিধবা হয়েন। সেন বংশ একে বৈষ্ণব বংশ, তাহার উপর বৈধব্যের কারণে সারদাসুন্দরীকে নিরামিষ আহার প্রভৃতি কঠোর ব্রতধারণে জীবন যাপন করিতে হইয়াছিল। কেশবচন্দ্র জননীর প্রসাদ খাইতে ভাল বাসিতেন বলিয়া তাঁহাকেও নিরামিষ আহারে অনেকটা অভ্যস্ত হইতে হইয়াছিল। চৌদ্দ বৎসর বয়সে কেশবের বসন্তরোগ হইয়াছিল। যে গৃহে বসন্তশ্রেণীর রোগ দেখা দেয়, সে গৃহে হিন্দুরা মৎস্যাদি কোনপ্রকার আমিষ আহার্য্য আনিতে দেন না। রোগের উপলক্ষে কেশব তো অনেক দিন আমিষ আহার করিতে পারেন নাই; সম্ভবত জননীর রন্ধন নৈপুণ্যবশত আরোগ্যলাভের পরেও নিরামিষ আহার পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা কেশবের মনে জাগ্রত হইবার অবসরই পায় নাই।

সেকালের সাধারণ ধনীসন্তানের ন্যায় কেশবচন্দ্রেরও বাল্যকাল তাসখেলা, যাত্রা শোনা, দিবারাত্রি পানসুপারি চর্ব্বণ, বেহালাবাদ্য প্রভৃতি নানাবিধ আমোদপ্রমোদে অতিবাহিত হইয়াছিল। ক্রীড়াদিতে নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে তিনি সর্ব্বদাই অগ্রসর হইতেন। স্বপ্রবর্ত্তিত ক্রীড়াদিতে সঙ্গীদিগকে আকর্ষণ করিলেও তিনি কাহারও নিকটে হৃদয় খুলিয়া দিতেন বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার চরিতলেখক বলেন যে "তিনি সহজে কাহাকে বড় বিশ্বাস করিতেন না।" * "তিনি কোন বালকের চরিত্র পরীক্ষা না করিয়া তাহাকে সৎ বলিয়া গ্রহণ করিতেন না"। †

বর্ত্তমানে পটলডাঙ্গায় যেস্থানে আলবার্ট হল প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই স্থানে পূর্ব্বে একটি পাঠশালা ছিল। সেই পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের নিকট হাতে খড়ি হইবার পর কেশব সাত বৎসর বয়সে হিন্দু

* কেশব-চরিত। † আচার্য্য কেশবচন্দ্র।

কলেজে ভর্ত্তি হয়েন এবং তথায় উচ্চশ্রেণী (senior class) পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন। নিম্নশ্রেণী (junior class) পর্য্যন্ত কেশব প্রতি বৎসরেই পরীক্ষায় ভালরূপ উত্তীর্ণ হইয়া পারিতোষিক প্রাপ্ত হইতেন।

এই কলেজে পড়িবার কালে কেশবের অনুকরণ-শক্তি বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল। হিন্দু-কলেজ থিয়েটারে বালকগণের আমোদ উৎপাদন করিবার জন্য গিলবার্ট নামক এক ফিরিঙ্গি ম্যাজিক বা ঐন্দ্রজালিক ক্রীড়া প্রদর্শন করিতেন। কেশব সেগুলি শীঘ্রই আয়ত্ত করিয়া নিজেই সেই সকল ক্রীড়া প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।* মাঝে মাঝে বাজার হইতে সাহেবদের পুরাতন পোষাক কিনিয়া পরিয়া এমন সুন্দর বাজীকর সাহেব সাজিতেন যে, অনেক সময়ে দর্শক ইংরাজগণ তাঁহাকে ইতালীয় বাজীকর বলিয়া ভ্রম করিতেন।

কেশবের হৃদয়ে অনুকরণপ্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে রসবোধেরও অভাব ছিল না। "একবার তিনি বিজয়া দশমীর দিন বয়স্যদিগকে লইয়া এক নগর-কীর্ত্তন বাহির করেন। কলার খোলা ঘোড়া দিয়া তাহাতে কয়েকখানি খোল, রাতাবি লেবুর খোসায় খরতাল প্রস্তুত হইল; পরে যজ্ঞডুমুরের মালা গাঁথিয়া গলায় দিয়া, ছেঁড়া ন্যাকড়া দ্বারা এক একটী টিকি রচনা করিয়া একদল বালক কেশবের সঙ্গে ঐরূপ খোল খরতাল বাজাইতে বাজাইতে পথে বাহির হইল। গানটী এই—বাবাজী মজা নিচ্ছে, হাতে হরিনামের মালা ঘুর ঘুর ঘুর ঘুরছে, মাথায় চৈতন্য চুটকি ফুর ফুর ফুর উড়ছে।"

১৮৫২ খৃষ্টাব্দে তিনি হিন্দুকলেজের স্কুল বিভাগের প্রথম শ্রেণীতে প্রবেশ করেন। এই সময় হিন্দুকলেজের সভ্য ও পৃষ্ঠপোষকদিগের মধ্যে বিবাদের ফলে মেট্রপলিটান কলেজ নামক এক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ-দিগের অনুরোধে কেশবের জ্যেষ্ঠতাত হরিমোহন সেনের মতানুসারে কেশব শেষোক্ত বিদ্যালয়েই পড়িবার জন্য প্রেরিত হয়েন। বৎসর দুই একের মধ্যেই কিন্তু এই বিদ্যালয় অর্থাভাবে উঠিয়া গেল। তখন তিনি আবার ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে হিন্দুকলেজে প্রবেশ করেন। এখানে উচ্চ শ্রেণীর গণিত তিনি কিছুতেই আয়ত্ত করিতে পারিলেন না। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে এই গণিতসম্বন্ধীয় পরীক্ষাদিবসে কেশব পার্শ্ববর্ত্তী ছাত্রের নিকটে জিজ্ঞাসা করিয়া দু'একটী প্রশ্নের উত্তর না পাওয়াতে পুস্তক দেখিয়া উত্তর লিখিতেছিলেন। এই কারণে সেই বৎসরের পরী-ক্ষার্থীদিগের তালিকা হইতে তাঁহার নাম কাটিয়া দেওয়া হইল।

কেশবের বাল্যজীবন আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে তিনি বাল্যাবধি একটু বিশেষভাবে প্রশংসা-প্রিয় ছিলেন এবং ধর্ম্মের বহিরাবরণের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। সম্ভবত এই প্রশংসাপ্রিয়তার কারণেই "ধর্ম্মবিষয়ে বাহ্য বেশভূষার প্রতি কেশবের অনুরাগ বাল্যকালে যথেষ্ট দেখা গিয়াছে। বয়স্য-গণের সহিত কার্ত্তিকপূজা এবং রথযাত্রায় অতিশয় উৎসাহ প্রকাশ করিতেন। (এই দুইটীই সেকালে বাবুদিগের মহোৎসব ছিল) গঙ্গাস্নান, গরদের যোড় পরিধান, শুভ্র উপবীত গুচ্ছধারণ, কপালে গণ্ডস্থলে হরিনামের ছাপ অঙ্কিত করা, এ সকলের প্রতি বড় অনুরাগ ছিল।"

বিধাতার সকল কার্য্যই মঙ্গলপ্রসূ। যদি কেশ-বের নাম পরীক্ষার্থীদিগের তালিকা হইতে কাটিয়া দেওয়া না হইত, তাহা হইলে আমরা কেশবকে ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মানন্দরূপে পাইতাম কিনা সন্দেহ। উক্ত ঘটনার পর তিনি গণিতশিক্ষা করিবার এবং বিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিবার অভিপ্রায় সম্পূর্ণ পরি-ত্যাগ করিয়া ইংরাজী সাহিত্য, ধর্ম্মবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ক গ্রন্থ অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিলেন। ক্রমে তিনি বাইবেল গ্রন্থ বিশেষভাবে অধ্যয়ন করিয়া একেশ্বরবাদের পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন। এই সময় অবধি তিনি প্রার্থনার উপকারিতা বুঝিয়া প্রার্থনার ভক্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার এই প্রার্থনার প্রতি অনুরাগ এবং বাল্যজীবনের ধর্ম্মের বহিরাবরণের প্রতি অনুরাগ সম্ভবত মিলিত আকারে অভিব্যক্ত হইতে হইতে পরিণামে নববিধানের জন্মদান করিয়াছিল।

বাইবেল প্রভৃতি পড়িয়া যখন তিনি তদবলম্বিত প্রার্থনা প্রভৃতির অনুরাগী হইয়া পড়িয়াছেন, সেই

* আচার্য্য কেশবচন্দ্র ও কেশবচরিত দেখ। লিওনার্ড সাহেব বলেন যে কেশব গিলবার্ট নামক এক ইংরাজ গ্রন্থকারের নাটক অভিনয় করিতেন।

সময়ে কেশব স্বীয় নেতৃত্বে স্বগৃহে এক নৈশ বিদ্যালয় খুলিয়াছিলেন। এই বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে অনেক বিখ্যাত ইংরাজকে আহ্বান করা হইত। এক বৎসর তদানীন্তন সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী জর্জ্জ টমসন কর্ত্তৃক পারিতোষিক বিতরিত হইয়াছিল। তিন বৎসর চলিবার পর অর্থাভাবে বিদ্যালয়টী উঠিয়া গেল।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ২৭শে এপ্রিল কেশবচন্দ্রের বিবাহ হয়। এই বিবাহ সম্ভবত তাঁহার মনের মত হয় নাই। হয়তো তিনি তখন ইয়ং বেঙ্গলের উপযুক্ত বিবাহের একটী আদর্শ মনোমধ্যে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু বিবাহকালে গুরুজনদিগের কথামত পল্লীগ্রামের এক অশিক্ষিতা নবম বর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহ করিতে হইল। ইহাতে হৃদয়ে একটা আঘাত লাগিবার এবং মনটা একটু খিঁচড়াইয়া যাইবার কথা। বিবাহের পরই সংসারের উপর তাঁহার বিরক্তি আসিল। "কেশবচন্দ্র দশজন সংসারীর ন্যায় পত্নীসম্ভাষণ করিতেন না। কথিত আছে, তিনি কখন অন্তঃপুরে গমন করিতেন না। যদিও কখন অনুরুদ্ধ হইয়া অন্তঃপুরে যাইতেন, পত্নীসম্ভাষণ করিতেন না। মহিলাগণের মনে এই সংস্কার হইয়াছিল যে কেশবচন্দ্রের মনের মত পত্নী না হওয়াতে তাঁহার ঈদৃশ ঔদাসীন্য উপস্থিত।" এই বিরক্তির ফলে তিনি সেক্ষপীয়র প্রভৃতি গ্রন্থ অধ্যয়নে বিশেষ মনোযোগী হইলেন। কেবল অধ্যয়ন করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না, সেক্ষপীয়রের হ্যামলেট প্রভৃতি নাটক অভিনয় পর্য্যন্ত করিতে লাগিলেন। ইহা ব্যতীত কুলীনকুলসর্ব্বস্ব, বিধবা-বিবাহ প্রভৃতি তদানীন্তন বাঙ্গালা নাটকও নানাস্থানে অভিনয় করিতেন। অভিনয় করিবার ভাব তাঁহার হৃদয়ে আমরা সহজাতরূপে দেখিতে পাই।

বিবাহের পর বৎসর খানেকের মধ্যেই ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে তিনি Goodwill Fraternity (গুড উইল ফ্রেটানিটি) নামক একটী উপাসনা সভাও স্থাপন করেন। এই সভাতে কেশব ইংরাজীতে উপদেশ দিতেন। এই সভায় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা হইতেও মধ্যে মধ্যে প্রবন্ধ পঠিত হইত। দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রের সহপাঠী ছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ মধ্যে মধ্যে এই সভায় উপস্থিত থাকিতেন। যতদূর জানা যায়, সত্যেন্দ্রনাথেরই নিকটে দেবেন্দ্রনাথ কেশবপ্রতিষ্ঠিত সভার বিবরণ শুনিয়া সন্তোষলাভ করিতেন। একদিন দেবেন্দ্রনাথ নিজ সঙ্গীসহ সভায় উপস্থিত হইয়া সভ্যগণকে যথেষ্ট উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

এই অবস্থায় ঋষিপ্রতিম রাজনারায়ণ বসু-প্রোক্ত ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতার একখণ্ড কেশবের হস্তগত হওয়াতে, তন্মধ্যে "ব্রাহ্মধর্ম্মের স্বরূপ ও লক্ষণ" বিষয়ক এক বক্তৃতায় কেশব স্বীয় মনোভাবের ছায়া দেখিয়া ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিবার জন্য সমুৎসুক হইলেন। তিনি স্বয়ং শুদ্ধ বাঙ্গালা লিখিতে জানিতেন না। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কলুটোলাস্থ পণ্ডিত রাজবল্লভের দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণের প্রতিজ্ঞাপত্র লিখাইয়া লইয়া গোপনে হিমালয়াঞ্চলে দেবেন্দ্রনাথের নিকট প্রেরণ করেন।

বিশ্বকোষ বলেন—"রেভারেণ্ড ডল সাহেব সেই সময় রামমোহন রায়কে একেশ্বরবাদী খৃষ্টান প্রতিপন্ন করিবার জন্য তৎপ্রণীত যীশুর নীতি (Precepts of Jesus) নামক গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া প্রচার করেন। কেশবচন্দ্র উহা পাঠ করিয়া তাঁহাকে ঐরূপ একেশ্বরবাদী খৃষ্টান বলিয়া প্রচার করিবার চেষ্টা করেন। গোপালচন্দ্র মল্লিক নামক এক ব্রাহ্মণকুমার * তাঁহার প্রতিবাদ করিয়া রাজা রামমোহন রায়কে একেশ্বরবাদী ব্রহ্মজ্ঞানী বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি কেশবকে রামমোহনের মত বুঝাইয়া দিবার জন্য তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার তখনকার সম্পাদক নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনুরোধ করেন। নবীন বাবুর অনুরোধে কেশব রাজা রামমোহনের বহুতর পুস্তক, কাগজপত্র ও তোফতুল মোহদ্দিন নামক পুস্তকের বঙ্গানুবাদ পাঠ করিয়া বুঝিলেন যে স্বর্গীয় রামমোহন রায় একেশ্বরবাদী খৃষ্টান ছিলেন না, প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন। তখন হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মের উপর কেশবের শ্রদ্ধা জন্মে এবং ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাকে মুদ্রিত ব্রাহ্ম পত্রিকা পাঠ করাইয়া

* সম্ভবত বিশ্বকোষ এখানে ভ্রমে পড়িয়াছেন। আমরা যতদূর জানি, সিন্দুরিয়াপটীর সুপ্রসিদ্ধ মল্লিক বংশের গোপালচন্দ্র মল্লিক মহাশয়ই সে সময়ে ধর্ম্মবিষয়ক এবং ব্রাহ্মসমাজ বিষয়ক আলোচনা করিতেন।

দীক্ষিত করিলেন। আদিব্রাহ্মসমাজের রেজিষ্টরী বহিতে তাঁহার নাম লিপিবদ্ধ হইল।"

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ হিমালয় হইতে প্রত্যাগত হয়েন। এদিকে স্বগৃহে কেশবের মূর্ত্তি-পূজাবলম্বিত মন্ত্র গ্রহণের ব্যবস্থা হইতে লাগিল। ইহার পূর্ব্ব হইতে কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথের গৃহে প্রায় প্রতিদিন যাতায়াত করিতেন। যে দিন মন্ত্র দেওয়া স্থির হইল, সে দিন তিনি আর গৃহে ফিরিলেন না। "দ্রব্যসামগ্রী সকল প্রস্তুত করিয়া জননী অপেক্ষা করিতেছেন, লোকজন খাইবে তাহারও আয়োজন হইয়াছে, কিন্তু যাঁহার উপলক্ষে এই সমস্ত আয়োজন, তিনিই উপস্থিত নাই। সমস্ত দিন অতিবাহিত করিয়া রাত্রি দশটার সময় কেশব বাড়ী ফিরিলেন। তজ্জন্য গুরুঠাকুর নিরাশ এবং মাতাঠাকুরাণী অতিমাত্র দুঃখিতা হইলেন; কিন্তু তাঁহাকে কেহ আর কিছু বলিলেন না। অতঃপর মন্ত্রদানের চেষ্টা বিফল হইয়া গেল।" কেশব তাঁহার মাতাকে ব্রাহ্মসমাজের কয়েক খণ্ড পুস্তক দিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে তিনি ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়া কোন প্রকার অন্যায় কার্য্য করেন নাই। এই পরীক্ষায় কেশবচন্দ্র যথেষ্ট স্বাধীনভাবের পরিচয় দিয়াছিলেন। এবিষয়ে দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাকে স্পষ্ট ভাষায় মন্ত্র গ্রহণে নিষেধ না করিলেও তাঁহার মন্ত্র গ্রহণের অস্বীকারে যে নানা উপায়ে বিশেষ উৎসাহিত করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। দেবেন্দ্রনাথ কেশবকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ দেখিয়া তাঁহাকে সমুদয় হৃদয়ের সহিত অভিনন্দন করিলেন।

থাক্ পাছে।

(কীর্ত্তনী ঢপের সুর)

সুখদুখকথা মরমের ব্যথা
পড়ে থাক যত সবি পাছে।
বাসনা কামনা সকলি ছলনা—
প্রাণপ্রিয় তোমা মন যাচে॥

জীবনের পরে সুধার নিঝরে
তোমা বিনা কেবা দিতে পারে।
বিনা প্রাণধন কে আছে এমন
প্রাণ খুলি কথা বলি যারে॥

ধন রাশি রাশি আশারি বা হাসি
বৃথা কেন প্রাণে আসি লাগে।
তারে মন মম ঝাড়ি ধূলি-সম
চলে চল প্রাণ যেথা জাগে॥

কেন গো বসিয়া দুখবিষ পিয়া
আঁখি তুলি' মলিন বয়ানে।
বিধানে যাঁহার জনম সবার
তাঁরি আছ তুমিও নয়ানে॥

সংশয় মলিন জমে দিন দিন
নাহি যদি প্রাণে ডাক তাঁরে।
সকলি ছাড়িয়া পড় আছাড়িয়া
সঁপি' তাঁরি পদে চিতভারে॥

আঁধার আসিছে মরণ শাসিছে
চল আগে নাহি ডরি' কারে।
তাঁরি নাম লয়ে চল নিরভয়ে
মৃত্যু রাখি' মরতের পারে॥

শান্তি শান্তি করি' ঘুরে ফিরে মরি—
লভি শুধু শ্রান্ত ক্লান্ত দেহ।
দেখা পাব কবে আঁধার এ ভবে
বলিতে চাহে না মোরে কেহ॥

তব প্রেম জাগে নয়নের আগে
ধ্রুবতারা আকুল পরাণে।
তুমি প্রাণবঁধু মধু হতে মধু—
গেয়ে যাব তাই কলতানে॥

তব প্রেমে ফুল ফুটে দুল দুল
জাগে শত গ্রহ চন্দ্র রবি।
(তব) প্রেম লাগি কাঁদে খেলে নানা ছাঁদে
গাহে গান শত শত কবি॥

অতি দীন আমি, তুমি ধনী স্বামী
নাহি যদি দাও প্রেম, তবে
প্রাণের আগুন জ্বলুক দ্বিগুণ—
নিবাইবে কেবা তাহা ভবে॥

করিয়া প্রণতি করিছে মিনতি
প্রেম দিয়া জুড়াও হে প্রাণ।
সারা দিবানিশি আঁখি অনিমিষি
তব মধু দেখিব বয়ান॥

আর্য্য-বিবাহের অভিব্যক্তি।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি-এল, বার-এট-ল)

আধুনিক হিন্দুবিবাহ জটিল Science বা শাস্ত্রে পরিণত হইয়াছে এবং অত্যন্ত rigidity বা 'কড়াক্কড়' স্বভাব ধারণ করিয়াছে। Caste system বা বর্ণভেদের rigidity বা কড়াক্কড়ির ইতিহাসের সহিত হিন্দুবিবাহেরও rigidity বা কড়াক্কড়ির ইতিহাসের সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন। বর্ণভেদের সঙ্গে আর্য্য বিবাহের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ ; একের ইতিহাস অন্যের ইতিহাসের সহিত সমসূত্রে গ্রথিত। হিন্দুবিবাহের কড়াক্কড়ি নিয়মের কারণ—আর্য্য ও অনার্য্যের ঘাতপ্রতিঘাতে আর্য্যরক্ত ও আর্য্যভাষা কলুষিত হইতেছিল। আর্য্যরক্ত যাহাতে অকলুষিত থাকে, তজ্জন্য বিবাহের নিয়ম কড়াক্কড় করিয়া অনার্য্য-কন্যা গ্রহণ বন্ধ করা হইল ও আর্য্যভাষা যাহাতে অনার্য্য শব্দ দ্বারা অকলুষিত থাকে, তজ্জন্য পাণিনি ভাষ্য, ব্যাকরণ, নির্ঘণ্ট প্রভৃতি দ্বারা অনার্য্য শব্দ প্রবেশের দ্বারও বন্ধ করা হইল।

"The Wars of Roses"এ ইংলণ্ডের অভিজাত সম্প্রদায় ধ্বংসপ্রায় হইয়া গিয়াছিল এবং তজ্জন্য ইংলণ্ডের সামরিক শক্তিরও লাঘব হইয়াছিল। মহাভারতের ভারতব্যাপী বিবাদযুদ্ধেও ভারতের রাজন্য অভিভাতগণের ক্ষয় হইয়াছিল এবং তজ্জন্যই বোধ হয় বৈদেশিক জাতিরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। অর্জ্জুন অনার্য্য ম্লেচ্ছ জাতির সংস্পর্শে যাহা ঘটিবার ভয় পাইয়াছিলেন তাহাই ঘটিল—আর্য্যদিগের মধ্যে সঙ্কর জাতির আবির্ভাব হইল। কাজেই বিবাহে ও ভাষায় কড়াক্কড়ি না করিলে আর্য্যজাতি ও আর্য্যভাষা রক্ষা পাইত না—এতদিনে বোধ হয় "গঙ্গাপ্রাপ্ত" হইত। আবার আর্য্যধর্ম্মেরও শত্রু ভারতবর্ষে উদয় হইল। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্ম আর্য্য ধর্ম্মকে বিধ্বস্ত করিতে লাগিল। দলে দলে লোক বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিতে লাগিল, সনাতন চাতুর্বর্ণ্য ধর্ম্মের লোপ হইবার উপক্রম হইল। ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম্ম আর্য্য ideals of life বা আর্য্যোচিত আদর্শ ছারখার করিয়া আপনিই ছারখার হইয়া গেল।

বৌদ্ধধর্ম্ম আর্য্য আদর্শ ধ্বংস করিয়া তৎস্থলে বৌদ্ধ আদর্শ সংস্থাপন করিতে অপারক হইলে পর আর্য্যগণ পুরাতন ছাড়িয়া নূতন ধরিতে সাহস করিলেন না, বরঞ্চ শাস্ত্ররূপ বাসুকির শত ফেরে সমাজকে বন্ধন করিতে বাধ্য হইলেন। আর্য্যগণ কঠোর বর্ণভেদ (Caste-system) ও তৎসঙ্গে সঙ্গে কঠোর বৈবাহিক নিয়ম করিয়া অনার্য্য ম্লেচ্ছ কন্যা বিবাহ বন্ধ করিল এবং তদ্বারা আর্য্যজাতির অস্তিত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন। এই একই কারণে সনাতন আর্য্যধর্ম্মও রক্ষা পাইল।

মনুতে ধর্ম্মের চারিটি "মূল" (Sources) উল্লিখিত আছে, তন্মধ্যে "আত্মপ্রসাদ"রূপ ব্যক্তিগত "মূল"গুলি এই কাল হইতে রহিত হইল। "আত্মপ্রসাদ" শত্রুসঙ্কুল সমাজের পক্ষে শুভকর নহে।

আর্য্য বর্ণভেদ আর্য্য বিবাহের ক্রমবিকাশের ইতিহাসের প্রধান অঙ্গ। এইখানে বর্ণভেদের উল্লেখ না করিলে, শকুন্তলাকে বাদ দিয়া শকুন্তলা নাটক অভিনয়স্বরূপ হইবে।

পুরাকালে আর্য্যগণ শীতপ্রধান মধ্য এসিয়া হইতে হিন্দুকুষ পর্ব্বত উত্তীর্ণ হইয়া এই গ্রীষ্মপ্রধান ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। ভারতের ভাগ্যদেবতা যিনি হউন না কেন, গ্রীষ্মপ্রধান ভারতবর্ষে শীতপ্রধান দেশবাসীরা কখন উপনিবেশ স্থাপন করিতে পারে নাই, ভবিষ্যতেও (বিজ্ঞানের সাহায্য ব্যতিরেকে) কেহ পারিবে কি না সন্দেহ।

আর্য্যগণ শীতপ্রধানদেশবাসী হইয়া তবে কিরূপে এই গ্রীষ্মপ্রধান ভারতবর্ষে উপনিবেশ স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন ?

ভারতীয় আর্য্যদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ একেবারেই ভারতবর্ষে আসেন নাই। মধ্য এসিয়া পরিত্যাগ করিয়া নাতিউষ্ণ নাতিশীত প্রদেশেই প্রথমে অবস্থিতি করিয়াছিলেন এবং তত্রত্য দেশবাসী দিগের সহিত বৈবাহিক সূত্রে সংমিশ্রিত হইয়াছিলেন। এই কারণেই তাঁহাদের সন্তান সন্ততিগণ অর্থাৎ ভারতীয় আর্য্যগণ ভারতবর্ষের গ্রীষ্ম সহ্য করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন—ইঁহারাই গ্রীষ্মপ্রধান ভারতবর্ষে উপনিবেশ স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন। "খাঁটি" আর্য্যগণ ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন নাই।

তৎকালে আর্য্যদিগের মধ্যে জাতিভেদ বা

বর্ণভেদ ছিল না—("বর্ণ"-ভেদই জাতিভেদের মূল)—অতএব বিবাহে "কড়াক্কড়ি"ও ছিল না।

প্রথম যখন ভারতীয় আর্য্যগণ এদেশে আগমন করেন তৎকালে কৃষ্ণকায় ও যাগযজ্ঞরহিত অসভ্য জাতিসমূহ ভারতবর্ষের অধিবাসী ছিল। আর্য্যগণ সুন্দর কান্তিবিশিষ্ট ও যাগযজ্ঞপরায়ণ ছিলেন। স্বভাবত আর্য্যগণ এই অনার্য্য জাতিদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন এবং "দস্যু" "রাক্ষস" প্রভৃতি ঘৃণাসূচক বাক্য তাহাদিগের প্রতি প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। ভারতবর্ষে লোকের মধ্যে তৎকালে এই বিভাগটী ছিল, "আর্য্য" ও "দস্যু" (ঋগ্বেদ ৬।২২।১০)।

আর্য্যদিগের বর্ণভেদের এই ক-খ-গ বা প্রথম স্তর। জেতাওজিতদিগের বর্ণভেদে আর্য্যদিগের মধ্যে বর্ণভেদ বা caste systemএর সূত্রপাত হইল। কোন কোন আর্য্য অনার্য্যকন্যা বিবাহ করিলেন ও তাঁহাদের সন্তান সন্ততি হইল—ইহারা আর্য্যদিগের একটী ঘৃণিত শাখারূপে পরিণত হইল। ইহা বর্ণ-ভেদ বা caste system এর দ্বিতীয় স্তর।

আর্য্য-অনার্য্যে অনবরত যুদ্ধ চলিতে লাগিল। (ঋগ্বেদ ১।১৩১।৫—১।১৭৪।৫, ১।১৭৬।২, ১।১৮০।২) "ক্ষত্রিয়" (ঋগ্বেদ ৭।৬৪।১—৭।৮৯।১) অর্থাৎ "বলবান" আর্য্যেরা অনার্য্য রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধ করিতেন, "ব্রাহ্মণ" আর্য্যেরা (ঋগ্বেদ ৬।৭৫।২ ও ৬—৭।১০৩।১ ও ৩—৮।১১।১) অর্থাৎ "স্তোতারা"—সম্ভবতঃ ইহারা দুর্ব্বল আর্য্য ছিলেন—যুদ্ধের প্রাক-কালে ইন্দ্রাদি দেবতাদিগকে শত্রুনাশের জন্য "Hymn of Hate" স্তোত্র রচনা করিয়া তাঁহা-দিগকে আহ্বান করিতেন।

"হে ইন্দ্র ও সোম! তোমরা রাক্ষসগণকে সন্তাপ প্রদান কর ও হিংসা কর। হে কামবর্ষীদ্বয়। তোমরা অন্ধকার দ্বারা বর্দ্ধমান রাক্ষসদিগকে নীচ করিয়া দেও। জ্ঞানরহিত রাক্ষসদিগকে পরাঙ্মুখ করিয়া হিংসা কর, দগ্ধ কর, মারিয়া ফেল, দূর করিয়া দেও। ভক্ষক রাক্ষসগণকে কৃশ করিয়া ফেল"। (ঋগ্বেদ ৭।১০৪।১)।

"হে শূর ইন্দ্র! আমাদের চতুর্দ্দিকে দস্যু জাতি আছে, তাহারা যজ্ঞ কর্ম্ম করে না, তাহারা কিছু মানে না, তাহাদিগের ক্রিয়া স্বতন্ত্র, তাহারা মনুষ্যের মধ্যেই নয়। হে শত্রুসংহারকারী! তাহা-দিগকে নিধন কর। সেই দাসজাতিকে হিংসা কর" (ঋগ্বেদ ৭।৭।১০।৮)।

যুদ্ধ-স্তোত্র করিলেও চলিবে না, শস্যোৎপাদনেরও ব্যবস্থা চাই। তাই "বৈশ্য" বা 'সাধারণ' আর্য্যেরা শস্যোৎপাদনাদি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিত। এই কারণে এই তিন class বা দলের আর্য্যদিগের মধ্যে symbolic বা রূপক বর্ণভেদের সূত্রপাত হইল—"ব্রাহ্মণ" অর্থাৎ স্তোত্রকারীরা শ্বেতবর্ণ (শ্বেতবর্ণ পবিত্র সূচক), "ক্ষত্রিয়" বা বলশালী আর্য্যেরা (লোহিত বর্ণ রক্ত সূচক) এবং "বৈশ্যরা" পীতবর্ণ (পীতবর্ণ "সোনার ধান" বা শস্য-সূচক)। *

পূর্ব্বে "ব্রাহ্মণ" "ক্ষত্রিয়" ও "বৈশ্য"দিগের "কর্ম্মভেদে" "বর্ণভেদ" ছিল না। উদাহরণ—ঋগ্বেদে (৬।২০।১) ভরদ্বাজ ঋষির ইন্দ্রদেবতাদের প্রতি স্তোত্র :—

"হে শক্তিপুত্র ইন্দ্র! তুমি আমাদিগকে সহস্র প্রকার ধন ও শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রের অধিকার ও শত্রু নিহন্তা একটী পুত্র প্রদান কর। সূর্য্য যেরূপ নিজ দীপ্তি দ্বারা পৃথিবী আক্রমণ করেন, তদ্রূপ সেই পুত্ররূপ ধন সংগ্রামে বল দ্বারা শত্রুগণকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইবে।"

বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়কুল হইতে, প্রস্কণ্ব বৈশ্য বংশ হইতে এবং শূদ্রক শূদ্রজাতি হইতে ঋষি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ও "ব্রাহ্মণ" মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে বর্ণের যে ইতরবিশেষ ছিল না, মহাভারতে (শান্তিপর্ব্ব ১৮৯ অঃ) তাহার পরিচয় পাওয়া যায়—"ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ। ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্ব্বর্ণতাং গতম্ ॥"

ক্রমে ক্রমে আর্য্যেরা ভাগ করিয়া যুদ্ধস্তোত্রাদি কার্য্য করিতে লাগিলেন এবং করিতে করিতে স্ব স্ব কার্য্যে নৈপুণ্য লাভ করিলেন বা expert হইলেন; কথায় বলে—"Birds of the same feather

* আর্য্যজাতি তিন। শূদ্র বলিয়া তৃতীয় জাতি ছিল না। শৌচপরিভ্রষ্ট অসংস্কৃত আর্য্যেরাই শূদ্র বলিয়া গণ্য ছিল—যথা মহাভারতে (শান্তিঃ ১৮৯ অঃ)—"শৌচপরিভ্রষ্টাস্ত্বেদ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ।" কথায় বলে—"জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাৎ দ্বিজ উচ্যতে।" বেদের কোন কোন ঋক "শূদ্র" ঋষি লিখিয়াছেন। শূদ্রেরাও ব্রহ্মার পুত্র। শূদ্রেরা অনার্য্যজাতি হইলে আর্য্যজাতির জনক দেবতা ব্রহ্মাকে শূদ্র জাতিরও জনক বলা হইত না।

flock together।" সজাতীয় পক্ষীগণ একত্র দলবদ্ধ হয়। এই সকল আর্য্যদিগের মধ্যে কর্ম্ম-ভেদে উচ্চনীচতার সৃষ্টি হইল। এই কালে আর্য্য Hypergamy অর্থাৎ উচ্চ মর্য্যাদাসম্পন্ন পাত্রে পাত্রীদান প্রথা অবলম্বন করিলেন। উদাহরণ—

"ব্রাহ্মণ বিবাহ করিতে পারেন ব্রাহ্মণকন্যা, ক্ষত্রিয়কন্যা ও বৈশ্যকন্যা। ক্ষত্রিয় বিবাহ করিতে পারেন ক্ষত্রিয়কন্যা ও বৈশ্যকন্যা। বৈশ্য বিবাহ করিতে পারে বৈশ্যকন্যা।" * Hypergamyকে 'অনুলোম' বিবাহ বলিতে পারা যায়। "যযাতি—দেবযানী" আদর্শের বিবাহ প্রতিলোমবাচ্য। প্রতিলোম বিবাহের উদাহরণ বিরল।

'অনুলোম' অর্থে "লোমের সহিত" অর্থাৎ সামাজিক স্রোতানুকূলমুখে চলন। 'প্রতিলোমের অর্থে "লোমের বিরুদ্ধে, অর্থাৎ সামাজিক স্রোতের বিরুদ্ধে গমন।

আর্য্যদিগের বর্ণভেদের এই গেল তৃতীয় স্তর। এই কাল হইতে বিবাহের "কড়াকড়ি" বিধান হইল। বিবাহ কড়াকড়ি করিবার প্রধান উদ্দেশ্য—অনার্য্য রমণীদিগের সহিত আর্য্যদিগের বিবাহ প্রতিরোধ করা। আর্য্যেরা মুষ্টিমেয় ছিলেন, অনার্য্যেরা সংখ্যায় অগণিত ছিল। এইরূপে বিবাহের নিয়ম শক্ত না করিলে আর্য্যগণ অনার্য্য জাতির মধ্যে কোন্ কালে বিলুপ্ত হইয়া যাইতেন।

এই কঠোর নিয়মাবলী আর্য্যরমণীগণের আর্য্যপতি পাইবার পথ প্রশস্ত করিয়া দিল—আর্য্যজাতি, আর্য্যভাষা ও আর্য্যধর্ম্ম একাধারে রক্ষা পাইল। Aryanized আর্য্যীভূত অনার্য্য ও আর্য্য নারীদিগের মধ্যে আর্য্যপতিপ্রাপ্তির জন্য অন্যোন্যপ্রতিদ্বন্দ্বিতার হ্রাস হইয়া গেল। বৈদেশিক মালের উপর অধিক শুল্ক চাপাইলে উহার আমদানি রপ্তানি বন্ধ হইয়া যায়। দেশের মালের কাটতি হয়। তদ্রূপ অনার্য্যকন্যা বিবাহের বিরুদ্ধে কঠোর নিয়ম করাতে আর্য্য রমণীদিগের বিবাহের পথ নিষ্কণ্টক হইল। Exogamy বা বহির্বিবাহিক প্রথা থাকায় "ক্ষত্রিয়" আর্য্যগণ অনার্য্যদিগকে পরাজিত করিয়া বলপূর্ব্বক তাহাদিগের স্ত্রী হরণ করিয়া লইয়া যাইতেন। সম্ভবতঃ আর্য্যপুরুষদিগের সংখ্যায় আর্য্যরমণী কম হইয়াছিল। আর্য্যরমণীর সংখ্যা কম না হইলে অনার্য্যরমণীকে আর্য্যেরা কখন বিবাহ করিতেন না। স্বজাতীয় কন্যাই সকলে বিবাহ করিয়া থাকে। আর্য্যরমণীর সংখ্যা কম হইবার নানা কারণও ছিল। যখন আর্য্যগণ ভারতবর্ষে পদার্পণ করিলেন তৎকালে তাঁহাদের সঙ্গে পুরুষ অপেক্ষা রমণী কম ছিল। পূর্ব্বে আর্য্যগণ 'বীর বা hero (একই কথা) ছিলেন, এই বীরপুরুষদিগের সঙ্গে কম আর্য্য রমণী থাকা সম্ভব। একটী প্রবাদ আছে,—"পথে নারী বিবর্জ্জিতা।" মধ্য এসিয়া পরিত্যাগ কালে আর্য্যগণ বহুসংখ্যক রমণী লইয়া যান নাই, Women are a hindrance rather than a help to an army on the march—যুদ্ধযাত্রায় স্ত্রীলোক একটী বাধা, সহায় নহে। স্বদেশে থাকিলে ক্ষমতানুসারে যত ইচ্ছা গৃহিণী গৃহেতে আনিতে বাধা ছিল না, কিন্তু সমরযাত্রাকালে সে নিয়ম খাটে না। একেত বীর পুরুষ বা যোদ্ধাদিগের জন্য তৎকালে খাদ্যসঞ্চয় অত্যন্ত limited বা পরিমিত ছিল, দেশদেশান্তর হইতে খাদ্যসংগ্রহের সুবিধা ছিল না। অতএব স্ত্রীরূপ luxury এই আর্য্য বীরগণের অদৃষ্টে ঘটে নাই। যুদ্ধযাত্রাকালে বীরপালনই প্রয়োজন, নারীপালন নিষ্প্রয়োজন—এই কারণে কম আর্য্য নারী ভারতে আসিয়াছিল।

দ্বিতীয় কারণ—On the march অর্থাৎ during the migration বা যাত্রাকালে অতিরিক্ত কন্যা জন্মাইলে আর্য্যেরা তাহাদিগকে expose বা পথে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেন। ভারতবর্ষে আসিবার পূর্ব্বেও বহুকাল যাবৎ এই প্রথা প্রচলিত ছিল। অনেক সময়ে পূর্ব্ব কারণ বর্ত্তমান না থাকিলেও force of habit এর দ্বারা অভ্যাস বশত সে কুপ্রথা কিছুদিন চলিয়াছিল। যজুর্ব্বেদে একটী ঋষি তাই দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন যে "কন্যা দুঃখের কারণ"।

কন্যাহত্যা প্রথা আর্য্যবিবাহে ক্রম বিকাশের ইতিহাসের এক প্রধান stage বা অংশ। এই প্রথা থাকাতে পরোক্ষভাবে 'বাক্‌দান' প্রথার প্রচলন হইল। 'বাক্‌দান' প্রথা কন্যাহত্যা রহিতকরিল ও পাত্রপাত্রী সম্বন্ধে মঙ্গলজনক হইল। একবার 'বাক্‌দান' হইয়া গেলে পাত্রীর অর্থাৎ আর্য্যকন্যার আর্য্য পতি পাইবার ব্যাঘাত

* শূদ্র স্ত্রী কামত্বী—স্ত্রীর মধ্যে গণ্য নহে।

বা প্রতিবন্ধক আর রহিল না। এই জন্যই বোধ হয় পুরাকালে "বাকদান" কন্যাদানের তুল্য ছিল। বাকদানের পর "বাকদত্ত পতি" মরিলে, তদ্‌কনিষ্ঠ ভ্রাতারই নিয়োগ বা পাণিগ্রহণসূত্রে সেই কন্যা প্রাপ্য।

বাক্‌দান প্রথায় আরও তিনটী সুফল দেখা যায়—

(১) দুটী অপরিচিত প্রাণী যাবজ্জীবন বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ হইবার পূর্ব্বে পরস্পরকে দেখিবার শুনিবার অবসর পায়।

(২) বিবাহে সুখী কি অসুখী হইবার কোন কারণ আছে কি না—বিবাহ উচিত কি অনুচিত ইত্যাদি ভাবিবার চিন্তিবারও অবসর পাওয়া যায়।

(৩) বিবাহের পূর্ব্বে পরস্পরে সংযম শিক্ষার অবসর পায়। এইরূপ সংযম পাত্রপাত্রীর চরিত্র সংগঠনে সহায়তা করে। ইহাতে সমাজের মঙ্গল ছাড়া অমঙ্গল নাই।

কন্যাহত্যা কারণেও আর্য্য রমণীর সংখ্যা কম হইয়াছিল।

আর্য্য পুরুষ অপেক্ষা আর্য্য রমণী কম হইবার তৃতীয় কারণ—"ব্রাত্যস্তোম" যজ্ঞ দ্বারা সংস্কৃত করিয়া বিজাতীয় লোকদিগকে আর্য্যজাতি ভুক্ত করিবার প্রথাও তৎকালে ছিল। এ কারণেও আর্য্যপুরুষদিগের সংখ্যা বাড়িয়াছিল এবং সেই পরিমাণে আর্য্য রমণীর সংখ্যাও কমিয়াছিল। তদ্‌ব্যতীত কখন কখন আর্য্য নৃপতিগণ অনার্য্যদিগকে আর্য্য পদবী প্রদান করিতেন। আর্য্য ঋষিগণের মধ্যেও কেহ কেহ এই উভয়বিধ প্রথার পক্ষপাতী ছিলেন—উদাহরণ বশিষ্ঠবিশ্বামিত্রের ঐতিহাসিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা। বিশ্বামিত্র cultural conquestএর পক্ষপাতী ছিলেন, অনার্য্যদিগকে আর্য্যসমাজের গণ্ডীর মধ্যে আনিয়া তাহাদের উন্নতি সাধন করাই তাঁহার চরম উদ্দেশ্য ছিল। বশিষ্ঠ অনার্য্যদিগকে আর্য্য সম্প্রদায়ে স্থান দিবার ঘোর বিরোধী ছিলেন। ত্রিশঙ্কু যাগ-যজ্ঞ করিয়া আর্য্যসমাজে আসিবার বাঞ্ছা করিয়াছিলেন, তজ্জন্য বশিষ্ঠ তাঁহাকে চণ্ডাল করিলেন। বিশ্বামিত্র ত্রিশঙ্কুর যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া তাঁহাকে আর্য্যত্বপদ প্রদান করিতে প্রযত্ন করিয়াছিলেন। পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হেতু ত্রিশঙ্কু আর্য্যানার্য্যের মধ্যবর্ত্তী স্থান পাইয়াছিলেন। বশিষ্ঠবিশ্বামিত্রের দ্বন্দ্বের কারণ ত্রিশঙ্কুপ্রমুখ অনার্য্যদিগের আর্য্যপদ প্রাপ্তির অভিলাষ।*

এইরূপ নানা কারণে আর্য্য রমণীগণ "আর্য্য" পুরুষ (অর্থাৎ মিশ্রিতামিশ্রিত আর্য্য পুরুষ) অপেক্ষা সংখ্যায় কম ছিল। আর্য্য রমণী কম না হইলে ক্ষত্রিয়েরা কেন রাক্ষস প্রথা দ্বারা অনার্য্য রমণী বিবাহ করিবে?† আর্য্য রমণী কম থাকায় ব্রাহ্ম দৈব ইত্যাদি আটফেরা বৈবাহিক জালে আর্য্যগণ আর্য্য ও অনার্য্য সকল প্রকার কন্যা টানিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। রাক্ষস বিবাহ wife-hunting বা কন্যা-শীকার ছাড়া আর কিছুই নহে। পৈশাচ "বিবাহ" অভিমর্ষণ ছাড়া আর কিছুই নহে, অথচ মনুর মতে ইহা অভিমর্ষণ নহে। আর্য্যরমণীর স্বল্পতাবশতই মনু ইহাকেও বিবাহ মধ্যে স্থান দিয়াছিলেন।‡

বাল্যবিবাহ ও সতীদাহ প্রথা অনার্য্য কন্যাগ্রহণ সূচিত করিতেছে। আর্য্য রমণী কম হওয়াতে আর্য্যগণ অনার্য্যরমণী গ্রহণ করিতেন। অনার্য্যরমণীরা বিবাহের পূর্ব্বে ব্যভিচারিণী হইয়া থাকে, এইভয়ে যাহাতে pre-marital chastity বা কুমারীত্ব নষ্ট না হয়, তাই অল্প বয়সেই আর্য্যেরা অনার্য্য কন্যা গ্রহণ করিতেন। ভারতবর্ষে climate forces premature puberty অর্থাৎ অল্প বয়সেই যৌবনোদ্গম হয়। সতীদাহ প্রথারও উৎপত্তি ইহাই অনুমান হয়। পাছে স্বামীর মৃত্যুর পর আর্য্যদিগের অনার্য্য স্ত্রী পিতৃমাতৃকুলে ফিরিয়া গিয়া ব্যভিচারিণী হয়, অর্থাৎ অনার্য্যদিগের কু-আচার অবলম্বন করে তাই সহমরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সতীদাহ প্রথার কথা অথর্ব্ববেদে (১৮।৩।১) পাওয়া যায়। অথর্ব্ববেদে সতীদাহকে "পুরাতন ধর্ম্ম"§ বলিয়া আখ্যাত করা হইয়াছে।‖

* ত্রিশঙ্কুর অনার্য্যত্ব লেখক কোথায় পাইলেন? তং বোং সং।

† রাজাদিগের কাম বা রাজসিক ভাবই ইহার প্রধান কারণ বলিয়া বোধ হয়। তং বোং সং।

‡ আর্য্যরমণীর অল্পতা হৌক বা না হৌক, মানবপ্রকৃতিকে সূক্ষ্ম ভাবে দর্শন করিয়া লোকরক্ষার সনসে মনু এরূপ করিয়াছেন ইহা স্থির। তং বোং সং।

§ "পুরাতন ধর্ম্ম" বলাতে কি ইহা ভারতবর্ষে আসিবার পূর্ব্বে আর্য্যদের মধ্যে প্রচলিত প্রাচীন প্রথা বলিয়া বোধ হয় না? তং বোং সং।

‖ অনার্য্যদিগের মধ্যে কোন chief বা দলপতি মরিলে তাহার তীরধনুক ও স্ত্রী দাস অশ্ব প্রভৃতি সহদাহন

সাপ্তপদী মৈত্রতাসূত্রে বা পদে পদে সাতবার বর কন্যাকে প্রতিজ্ঞাপাশে বন্ধন করান হইত। আবার অরুন্ধতী ও ধ্রুব নক্ষত্রও কন্যাকে দর্শন করান হইত। অরুন্ধতী পাতিব্রত্য ধর্ম্মের পুরস্কারস্বরূপ সপ্তর্ষিমণ্ডলে স্বীয় পতির সহিত অবিচ্ছিন্ন বাস করিতেছেন। ধ্রুবও শতবজ্রবাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও স্বধর্ম্মে অটল ছিলেন বলিয়া ধ্রুবনক্ষত্র হইয়া আকাশে বিরাজ করিতেছেন। বরকন্যাকে এই পৌরাণিক অখ্যানদ্বয় বিবৃত করিয়া অরুন্ধতীর ন্যায় পাতিব্রত্য ধর্ম্মে ও ধ্রুবের ন্যায় স্বধর্ম্মে অটল থাকিতে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ করাইয়া লইত। সামবেদের ধ্রুবসম্বন্ধীয় কুশণ্ডিকা মন্ত্রটী এই—

"ধ্রুবাদ্যৌঃ ধ্রুবা পৃথিবী ধ্রুবং বিশ্বমিদং জগৎ।
ধ্রুবাসঃ পর্ব্বতা ইমে ধ্রুবাস্ত্রী পতিকুলে ইয়ম্॥"

আর্য্যবিবাহের এইরূপ কড়াকড়ি দেখিয়া মনে হয় আর্য্য রমণীর স্বল্পতা বশতই এক সময়ে আর্য্যগণ অনার্য্যকন্যা বিবাহ করিতেন। অনার্য্য কন্যারা promiscuity বা বহুপুরুষসহবাস প্রথা অবলম্বন করিত। যাহাতে কুমারী অবস্থা হইতেই আমরণ সচ্চরিত্রা ও পতিব্রত্যধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত না হয়, বাল্যবিবাহ, সহমরণ ও অরুন্ধতী-ধ্রুব নক্ষত্র প্রদর্শন প্রথার তাহাই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল অনুমান হয়। চাতুর্বর্ণ্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইবার পর, বহু বৎসর পর্য্যন্ত আর্য্যরা গুরুগৃহে বেদাধ্যয়ন করিতেন, তৎপরে বিবাহ করিয়া গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন করিতেন। এই কারণেই মনু বারো বৎসরের পাত্রীর সহিত ত্রিশ বৎসরের পাত্রের বিবাহ প্রশস্ত বলিয়াছেন।* (বেদাধ্যয়নের শেষে সুলক্ষণা কন্যার অন্বেষণার্থে মিত্রদের পাঠাইতেন—"বরণ" কন্যা-নির্ব্বাচনকেই বলে)। ভারতবর্ষে দ্বাদশ বর্ষে স্ত্রীলোকদিগের যৌবন আরম্ভ।

'ব্রাহ্মণ-সূত্র' যুগে priestly caste বা পুরোহিত সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হইল। ব্রাহ্মণ ছাড়া যাগযজ্ঞ করিবার কাহারও ক্ষমতা রহিল না। ঐতেরয় ব্রাহ্মণে (৮।৫।২৪।২৬) লেখা আছে, ব্রাহ্মণ দিয়া যাগযজ্ঞ না করিলে দেবতাগণ যজ্ঞান্ন গ্রহণ করেন না। পুরোহিতের প্রাধান্য বাড়িল। একটা উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হইবে। ইন্দ্র ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপকে হনন করেন। ত্বষ্টা ইন্দ্রদ্বেষী হইয়া একটী সোমযজ্ঞ করেন, কিন্তু পুত্রহন্তারক ইন্দ্রকে যজ্ঞে আহ্বান করিলেন না। ইন্দ্র আহূত না হইলেও তথায় আসিয়া সোম পান করিয়া যান। তাহাতে ত্বষ্টা আরও ক্রুদ্ধ হইয়া "ইন্দ্রঘাতক" এক পুত্র পাইবার জন্য যজ্ঞমন্ত্র উচ্চারণ করিলেন। ক্রোধান্ধ হইয়া মন্ত্রোচ্চারণ করাতে উচ্চারণে দোষ হইল। "ইন্দ্র" শব্দের উপরে জোর না পড়িয়া "ঘাতক" শব্দের উপর জোর পড়িল—ইন্দ্র-ঘাতক শব্দ ষষ্ঠীতৎ পুরুষ সমাসে গৃহীত না হইয়া বহুব্রীহি সমাসে গৃহীত হইল। বৃত্র নামে ত্বষ্টার দ্বিতীয় পুত্র হইল, মন্ত্রোচ্চারণ দোষে, সেই বৃত্র ইন্দ্রের ঘাতক না হইয়া, ইন্দ্র তাহার ঘাতক হইলেন।

এই পৌরহিত্যের প্রাধান্য কালেই রাজকুমারীরা ঋষি ও ঋত্বিকদিগকে পতিত্বে বরণ করিতে লাগিলেন। এই যুগই Theocracy বা পুরোহিত-তন্ত্র যুগ। এই যুগেই ব্রাহ্ম ও দৈব বিবাহ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে প্রচলিত হইল এইরূপ অনুমান হয়। জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞের যাজক বা পুরোহিতকে যজ্ঞ প্রারম্ভের পূর্ব্বে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম সম্পাদনের নিমিত্ত সালঙ্কারা কন্যাদানের নাম দৈব বিবাহ। আর্ষ বিবাহ আরও পুরাতন বিবাহ। পাণিগ্রহণ সংস্কার সবর্ণাবিবাহেরই প্রথা ছিল। ব্রাহ্মণদের ক্ষত্রিয় কন্যা গ্রহণকালে, কন্যা বরের ধৃত ধনুকের প্রান্ত গ্রহণ করিতে অধিকারিণী ছিল। বৈশ্যকন্যা বিবাহ কালে ব্রাহ্মণের ধৃত গো-তাড়ন দণ্ডের একদেশ স্পর্শ করিত (মনু ৪০।৪১)। পাণি পীড়ন বা পাণি-গ্রহণ একমাত্র সবর্ণারই অধিকার। আর্য্যদিগের বর্ণভেদের এই চতুর্থ স্তর।

কালক্রমে বৈদিক "পিতৃযজ্ঞ" বিরাট শ্রাদ্ধ ব্যাপারে পরিণত হইল। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ এক একটী ভিন্ন শাখা-জাতিতে পরিণত হইল ও বংশবৃদ্ধি হেতু স্বস্ব বর্ণেই বিবাহ সংবদ্ধ করিল। দত্তক ও ঔরস পুত্র এবং ব্রাহ্ম ও আসুর বা ব্রাহ্মাসুর মিশ্রিত বিবাহ আদৃত হইল। সপিণ্ড theory এই কালেই উদ্ভূত

কি সহপ্রোথনের বিধি দেখা যায়। উদ্দেশ্য—পরকালে অর্থাৎ "স্বর্গেও" ঢেঁকিকে ধান ভাঙ্গিতে হইবে। অধুনাতন কালেও শ্রাদ্ধের রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহিত চিতানলে তাঁহার প্রিয় সেতার তবলা প্রভৃতি পোড়ান হইয়াছিল।

* মনু বারো বৎসরের কন্যাকে বিবাহ করা যে প্রশস্ত বলিয়াছেন, তাহা দেখি নাই। তং বোঃ সঃ

হইল। শ্রাদ্ধকর্ত্তা বা পুত্র তদূর্দ্ধতম ছয় পুরুষ—বৃদ্ধ-প্রপিতামহ, অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ ও অত্যতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ এই তিন জন লেপভাজ; এবং পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ পিণ্ডভোগী এই ছয় জন—এই সাতটী পুরুষ এবং ইহাদের সন্তান সন্ততির মধ্যে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের যে সম্বন্ধ তাহাই সাপিণ্ড্য সম্বন্ধ। পাত্রপাত্রীর উভয় কুলের গোত্রের বা প্রবরের ঐক্য না থাকে, পিতৃবন্ধু ও মাতৃ-বন্ধুদিগের সহিত রক্তসংশ্রবে পঞ্চম পুরুষের সীমা অতিক্রান্ত হইলে সেই কুলের সুলক্ষণা কন্যার পাণিগ্রহণ প্রশস্ত (মনু ৫)। সপিণ্ড সপিণ্ডাকে বিবাহ করিতে পারেন না। Ancestor-worship বা পিতৃযজ্ঞ ওরফে শ্রাদ্ধই ধর্ম্মবিবাহের প্রবর্ত্তক। কন্যাদানে ধর্ম্মফল প্রাপ্তি হয়। ব্রাহ্মবিবাহ দ্বারা কন্যাদান করিলে শ্রেষ্ঠতম ফল লাভ করা যায় অর্থাৎ Metempsychosis বা পুনর্জ্জন্ম ভাল হয়। এই কারণে অন্যান্য উপবিবাহ তিরোহিত হইয়াছে। সবর্ণা স্ত্রীর পুত্রই ধর্ম্মজ পুত্র, অসবর্ণ স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র কামজ পুত্র। বিবাহের পূর্ব্বে ancestorworship হওয়া চাই, তাই "নান্দী-মুখ" অর্থাৎ "বৃদ্ধিশ্রাদ্ধের" প্রয়োজন। 'পিতৃন্'-দিগের বরকন্যার প্রতি আশীর্ব্বাদের জন্য এই 'নান্দীমুখ'। তারপর কন্যাসম্প্রদান অর্থাৎ tutelage over the daughter হস্তান্তর হয়। এই-রূপ কন্যার হস্তান্তরকে রোমকেরা manus "হস্ত" বা ক্ষমতা বলিত। গরুদানের মত কন্যাদান। কন্যার মতামতের উপর কন্যাদান নির্ভর করে না। কালো গোরা—যে রকম বর হউক না কেন—পিতা যাহাকে দান করিবে কন্যা তাঁহারই হইবে, কন্যার অমতে বিবাহ অসিদ্ধ হইবে না। দত্তক পুত্রেরও একই দশা। পিতা যাহাকে দান করিবে সেই তাহার বাপ হইবে। ধনী হউক বা নির্ধনী হউক যায় আসে না। পুত্রের মতামতের উপর পুত্রদান নির্ভর করে না। পিতৃদত্ত পুত্রের ও পিতৃদত্ত কন্যার গোত্রাদির পরিবর্ত্তন হয়। কন্যাদান ও দত্তক পুত্রদানের মন্ত্র একই। মন্ত্রের দ্বারা গোত্রান্তর হয় অতএব "দায়ভাগ"-শাসিত পাত্রী "মিতাক্ষর"-শাসিত সবর্ণের পাত্রকে বিবাহ করিলে পাত্রীর গোত্রান্তরের সঙ্গে সঙ্গে 'শাস্ত্রান্তর"ও হইবে—অর্থাৎ মিতাক্ষরা শাস্ত্র দ্বারাই স্ত্রীধনাদি স্বত্বাস্বত্ব নির্ণীত হইবে। ভর্ত্তৃকুলের গোত্র প্রাপ্ত হয় বলিয়া পাত্রী ভর্ত্তৃকুলের অধীন। ভর্ত্তৃ গোত্রপ্রধান বলিয়া পুরুষের দিক দিয়াই উত্তরাধিকারিতা নির্ণীত হয়।

বেদমন্ত্রদ্বারা 'পাণিগ্রহণ' দ্বিজাতির বিবাহের এক প্রধান অঙ্গ। বিবাহ একটী যজ্ঞ। অগ্নি না হইলে যজ্ঞ হয় না—অগ্নি না জ্বলিলে দেবগণ যজ্ঞে আসেন না, (ঋগ্বেদ—১।১।১-২) অতএব প্রাচীন আর্য্য-ধর্ম্মমূলক বিবাহে (বিশেষত দ্বিজাতির বিবাহে) হোমাগ্নির প্রচলন।

'পাণিগ্রহণ' সপ্তপদীর দ্বারা সিদ্ধ হয়। সপ্ত-পদী কি? Lochinavarএর ন্যায় একপা একপা করিয়া কন্যাকে গৃহের অভ্যন্তর হইতে হরণ করিয়া লইয়া যাইবার স্মৃতি নয় ত? সপ্ত-পদীকে বিষ্ণুর সপ্তপদ বলে, কেননা প্রতিপদে কন্যা বিষ্ণুর নাম লইয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। সপ্তপদীর উৎপত্তি যাহা হউক সপ্তপদীর উদ্দেশ্য deliberately বা ভেবে চিন্তে বিবাহ করা। বরকনে এক পা ফেলিল যেমন, তাহাদিগকে বলা হইল—এখনো দেখ, বিবাহ করিতে ইচ্ছা হয় কর, না ইচ্ছা হয় না কর। দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি প্রতিপদে এইরূপ বরকন্যা সাবধান হইবার অবসর পায়। সপ্তম পদ ফেলিলে আর বিবাহের নড়চড় হইবার যো নাই—the matrimonial Rubicon is crossed।

সপ্তপদী ও 'সাত পাক' এক নহে। বর-কন্যা যে সাত পাক ঘোরে অর্থাৎ পরি- ক্রমণ করে তাহা ও সপ্তপদী এক নয়। Folktale বা উপকথায় 'সাড়ে তিন পাক' বিবাহ করিয়া কখন কখন বর পলায়ন করে, কখন বা এক পাক বাকি রাখিয়া যায়।* বাণিজ্যাদি বা বীরত্বের কার্য্য করিতে গিয়া মরিলে কন্যা আবার বিবাহ করিতে পারিবে—গল্পের এই সাড়ে তিন পাক বা ছয় পাকের অর্থ। বর কার্য্যসিদ্ধি করিয়া ফিরিয়া আসিয়া বাকি এক বা সাড়ে তিন পাক শেষ করিয়া কন্যা লইয়া গৃহে গমন করে। অনুমান হয় পূর্ব্বে বিবাহের প্রধান অঙ্গ "সাত পাক" ছিল।

* শ্রীশোভনা দেবীর "The Orient Pearls" দ্রষ্টব্য।

"কুমার সম্ভবে" হরপার্ব্বতীর বিবাহে ত্রিপদী দৃষ্ট হয়।

বিবাহান্তে পতিগৃহ বধূ আনীত হইলে বধূকে কোলে করিয়া গৃহমধ্যে লইয়া যাওয়া প্রথা আছে। ইহা এবং ঢাক ঢোল বাজাইয়া যুদ্ধযাত্রার ন্যায় বিবাহ করিতে যাওয়া বোধ হয় রাক্ষস বিবাহেরই স্মৃতি। রাক্ষস বিবাহে বরপক্ষীয়েরা কন্যার আত্মীয় সকলকে আক্রমণ করিয়া কন্যা হরণ করিত। রাজপুতানায় বর আসিলে কন্যার আত্মীয়েরা একটা তোরণ নির্ম্মাণ করিয়া নকল কেল্লা করিয়া বরযাত্রীর আগমনে বাধা দেয়। বরযাত্রীরা এই তোরণ ভাঙ্গিয়া কন্যার গ্রামে যাত্রা করে। বঙ্গদেশের পাড়াগাঁয়ে "ঢেলা" ফেলা রীতি আছে। নব বধূর পতিগৃহে আগমন আর্য্য বিবাহের শেষ অঙ্ক।

এইরূপে ভর্তৃ গৃহ গমনকে রোমকেরা বলিত "deductio domum", (domum গৃহ, দম্পতীর অর্থও গৃহপতি)। নববধূকে কোলে করিয়া দরজা পার করাইবার ইহাও কারণ হইতে পারে যে, দরজা পার হইতে গিয়া চৌকাটে হোঁচট না খায় হোঁচট খাইয়া পড়িয়া না যায়। এইরূপ হোঁচট খাওয়া বা হোঁচট খাইয়া পড়িয়া যাওয়াটা অলক্ষণের চিহ্ন। পুরাকালে রোমক দেশেও এই প্রথা ছিল—Holwellএর "The Marriage Feast" শীর্ষক কবিতাতে সুন্দররূপে বর্ণিত আছে—

Raise her now with omens meet,
Bear her tiny, gleaming feet
O'er the threshold's polished floor,
Singing, (as we sang before)
Hymen Hymenaes. অর্থাৎ—

"As the procession nears the bridegroom's door in order to avoid the evil omen of a chance stumble at the threshold, the regular ceremonial is gone through of carrying the bride over the step while still the chant rings high to the double name of the Roman god of Marriage."

আর্য্যবিবাহের কাল সচরাচর harvest gathering বা শস্য কর্ত্তনের পরই হইয়া থাকে। শস্য কাটা হইলে আর্য্যগণের চিন্তা দূর হইলে, বিবাহাদি উৎসবে মত্ত হইতেন।

আজকাল বিবাহ সবর্ণের ভিতর অর্থাৎ সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হওয়ায় wider choice of brides and bridegrooms একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে—পাত্র পাত্রীর নির্ব্বাচন ব্যাপার artificially limited সংকীর্ণ করা হইয়াছে। অশ্বাদির লক্ষণের ন্যায় পাত্রপাত্রীরও লক্ষণাদির নির্ণয়ের ব্যবস্থাও করা হইয়াছে—নোদ্বহেৎ কপিলাং কন্যাং নাধিকাঙ্গীং ন রোগিণীম্। নালোমিকাং নাতিলোমাং ক্ষয়গ্রস্তাং ইত্যাদি। (৩ মনু ৮)। আর্য্যবিবাহ শাস্ত্রোক্তি দ্বারা Eugenics বা সুপ্রজনন বিজ্ঞানশাস্ত্রে পরিণত হইয়াছে। মনু বলেন স্ত্রীকে বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা আদৃত করিবে; বস্ত্রালঙ্কারে সুশোভিত হইলে স্ত্রী স্বামীর হৃদয় আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইবে। হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারিলে স্ত্রীর পুত্রবতী হইবার সম্ভাবনা—প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ। স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন ॥ (মনু ৯।২৬) "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা"—এই শাস্ত্রে বাল্যবিবাহের প্রচার করা হইয়াছে। যত শীঘ্র বিবাহ হয়, পুন্নামক নরক হইতে মুক্তি হইবার সম্ভাবনা তত বেশী থাকে। কারণ—"অনিত্যং খলুজীবিতং। কোহি জানাতি কস্যাদ্য মৃত্যুকালো ভবিষ্যতি।" তাছাড়া স্ত্রী যদি পুত্রসন্তান প্রসব না করে, পতি যৌবন থাকিতে থাকিতে অন্য বিবাহ করিয়া পুত্রোৎপাদন করিতে পারেন। এই কারণেই প্রত্যেক ঋতুতে স্ত্রী-সংসর্গ শাস্ত্রে আদিষ্ট হইয়াছে—তা না হইলে ভ্রূণ হত্যার পাপ। পুত্রের জন্য স্ত্রীর স্ত্রীত্ব ও আদর, স্ত্রীলোকের পৃথক শ্রাদ্ধাদি পাইবার অধিকার নাই।

ব্রহ্মচর্য্যের পর গার্হস্থ্য ধর্ম্ম। অতএব উপনয়ন বিবাহের পূর্ব্বেই হওয়া চাই। আর্য্যদিগের উপনয়ন রোমকদিগের taga virilis বা "যৌবন তাগা বা সূত্র"—বিবাহকালে বরকন্যার হস্তে যে সূত্র বন্ধন করা হয়, তাহাকে "কৌতুকসূত্র বলে। ইহার তাৎপর্য্য "hands off" অর্থাৎ এখন হইতে "এ বর, এ কন্যা" অন্য কেহ যেন ইহাদিগকে বিবাহ করিবার প্রয়াস না পান। "কৌতুকসূত্র" দ্বারা বরকন্যাকে অন্যান্য স্ত্রী পুরুষ হইতে পৃথক করা হয়। আমার বোধ হয় "en-

gagement ring" এই "কৌতুকসূত্রের" রূপান্তর মাত্র। আর্য্যবিবাহের মন্ত্রে তুকতাকও আছে অর্থাৎ একটু আধটু যাদুও আছে। অথর্ব্ববেদে যাদুমন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

"আর্য্য বিবাহ (কন্যার দিক হইতে বলিতে গেলে) এক মহা যজ্ঞ, স্বার্থই ইহার আহুতি, নিষ্কাম ধর্ম্মলাভ এই যজ্ঞের চরম ফল। পবিত্রতম মন্ত্রময় যজ্ঞই আর্য্য বিবাহের একমাত্র পদ্ধতি, যজ্ঞের অনল এই বিবাহের আরম্ভ কিন্তু শ্মশানের অনলেও এই বিবাহবন্ধন বিনষ্ট করিতে পারে না"। (বিশ্বকোষ)

সারস্বত গীত। *

(শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ)

হৃদয় আসন পরে তুমি এস মাত
বাজাও বীণা তব বাণী-বিধায়িনি।
তোমায় কাতরে ডাকি, কৃপা তব দাও,
তনয়ে দীন মাগো জ্ঞান-প্রদায়িনি॥
ভকতিকুসুম ও মা! রেখেছি সাজায়ে
বাসনা পূজিতে ঐ পবিত্র চরণ।
আঁকিয়া রেখেছি প্রাণে তোমারি মূরতি,
তুমি মা একই মম পূজন সাধন॥
অজ্ঞান তামসে মাতঃ মানস জড়িত—
নাশ মা কৃপা করি তিমির সে রাশি।
সত্যেতে পূরিয়া দাও ভকতের চিত,
জ্ঞানের আলোকে তা' উঠুক বিকাশি॥
এনেছি এনেছি মাতঃ চরণে তোমারি
আপন চিত্তখানি দিতে বিসর্জ্জন।
তোমারে প্রণমি মোরা দয়ার ভিখারী,
রাখ মা চিরদিন তব পদে মন॥

আলোক ও অন্ধকার। †

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)

আলোক ও অন্ধকার চিত্রাঙ্কনের প্রাণ। যিনি আলোক ও অন্ধকার সুনিপুণভাবে অঙ্কন করিতে পারেন, তিনিই ছবি আঁকিতে সিদ্ধহস্ত। কিন্তু এই আলোক ও অন্ধকার লইয়া আলোচনা বা উহার অনুভূতি কেবলমাত্র যে চিত্রকরের অনন্য-সাধারণ অধিকার তাহা নহে; ধর্ম্ম ও সাধনাক্ষেত্রে এই আলোক ও অন্ধকার লইয়া উপলব্ধিই মনুষ্যের সর্ব্বস্ব। মানুষ যখন অন্ধকারের ভিতরে অবস্থান করে, তখন সে আলোক লাভের জন্য আপনা হইতেই ব্যাকুল হইয়া উঠে; সংশয়ের ভিতরে পড়িয়া যখন মানুষ আর পথ খুঁজিয়া পায় না, দায়িত্বপূর্ণ জীবনের ছায়া তাহার অন্তরে প্রতিভাত হয়; যখন এই অন্ধকার মানুষকে পীড়া দিতে আরম্ভ করে, তখন সে আলোক লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়ে। বালক জ্ঞানের আলোক লাভ করিবার জন্য যখন ভিতর হইতে প্রপীড়িত হয়, তখন সে গুরুর নিকট, শিক্ষকের নিকট যাইবার জন্য ক্ষিপ্তপ্রায় হয়। হয়ত তাহার অভিভাবক তাহাকে শিক্ষালাভ করিবার সুযোগদান করিতে অসম্মত, কিন্তু যুবক তাহার পিতামাতার কথা অগ্রাহ্য করিয়া আলোক লাভ করিবার সুবিধা নিজেই করিয়া লয়। সাধুযুবা অনেক সময়ে ধর্ম্মের আলোক লাভ করিবার জন্য এই কারণে সাধুসঙ্গ লাভ করিতে চায়, প্রচলিতভাবে অনাস্থাবান হয়, কখন বা সে পাঠে বা গার্হস্থ্যে অবহেলা করিয়া ধর্ম্মের আলোচনায় হৃদয়ের অন্ধকার দূর করিবার জন্য বিব্রত হইয়া পড়ে। মানুষ অন্ধকারের ভিতরে আলোক আনিতে চায়, হৃদয়ের অভ্যন্তরস্থ পুঞ্জীভূত অন্ধকারের ভিতরে জ্ঞানের ও ধর্ম্মের বিমল জ্যোৎস্না আনিবার প্রয়াসী হইয়া পড়ে।

মনুষ্যের প্রকৃত সাধনা, অকৃত্রিম পূজা, তাহার সাধু কর্ম্মচেষ্টা জীবনে তখনই সম্ভবপর হইয়া উঠে, যখন হইতে অন্ধকার তাহাকে পীড়া দিতে আরম্ভ করে। সকল শুভ অনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা সর্ব্বপ্রথমে কোথা হইতে আরম্ভ হয়? আমরা বলিব, অভাব-বোধের বেদনা হইতে। হেমচন্দ্র, মাইকেল, রঙ্গলাল ও ঈশানের তিরোভাব যখন এইস্থানে অন্ধকারের নিবিড় মেঘ রচনা করিয়া তুলিয়াছিল, এখানকার কৃতবিদ্য অধিবাসিগণ স্থির থাকিতে পারিলেন না, সাহিত্য আলোচনায় আলোক লাভ

* কুমার রাধাপ্রসাদ ইন্‌স্টিটিউসনের ছাত্রগণ কর্ত্তৃক গীত।
† খিদিরপুর সারস্বত-সম্মিলন উপলক্ষে লিখিত।

করিবার জন্য তাঁহারা বিব্রত হইয়া উঠিলেন, তাই এখানে এই সারস্বত সম্মিলনের উৎপত্তি।

বহুযুগ পূর্ব্বে ভারতে দেবী সরস্বতীর পূজা আরম্ভ হইয়াছে। যে সময়ে এই পূজার প্রথম প্রবর্ত্তন হয়, সেই সময়ে জ্ঞানের আলোকে চারিদিক ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছিল। তথাপি আরও আলোক লাভ করিবার জন্য মনুষ্যের পিপাসা বিদূরিত হয় নাই। সেই সময়ের পূজার মুখ্য উপকরণ কৃতজ্ঞতার বিকসিত কুসুম। বর্ত্তমানে আমরা অজ্ঞান অন্ধকারে নিমজ্জিত, তাই আজ আমাদের পূজার মুখ্য উপকরণ জ্ঞানলাভের জন্য কাতরতা, ভিক্ষা এবং প্রার্থনা। আমরা চাই আলোক, আমরা চাই অন্ধকার হইতে মুক্তি।

এই আলোক লাভের জন্য চেষ্টা এবং এই অন্ধকারের সহিত সংগ্রাম লইয়াই মনুষ্যের জীবন। এ সংগ্রাম যুগযুগান্তর হইতে চলিয়া আসিয়াছে, সুদূর ভবিষ্যতেও এই সংগ্রামের বিরাম হইবে না। মানুষ ধর্ম্মজগতে, অন্তরে বাহিরে ভগবানকে উপলব্ধি করিতে চায়, জ্ঞানের আলোকে প্রদীপ্ত হইতে চায়; ইন্দ্রিয়দল আমাদের অন্তরে যে মোহের অন্ধকারজাল বিস্তার করে, তাহা হইতে পরিত্রাণ পাইতে চায়।

দেবমন্দির গবাক্ষবিহীন কেন? কেনই বা তাহার ভিতরে আলোকের রশ্মি প্রবেশ করিতে পায় না? তাহার অন্য উদ্দেশ্য যাহাই কেন থাকুক না, আমরা আজ তাহার আলোচনা করিব না। আমরা বলি আমাদের জীবনের প্রতিদিনের চিত্র ঐ অন্ধকারগর্ভ মন্দিরে প্রতিফলিত। আমাদিগকে মন্দিরের গভীর অন্ধকার ভেদ করিয়া উহার অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত দেবমূর্ত্তিকে দেখিতে হইবে, দেবতার শুভ্র আলোক নিরীক্ষণ করিতে হইবে, ব্যাকুলতাভরে অন্তশ্চক্ষুকে প্রসারিত করিয়া সেই জ্ঞান-চক্ষে তাঁহার সেই অরূপ রূপ সন্দর্শন করিতে হইবে। অন্ধকার ভেদ করিতে না পারিলে সেই দেবদুর্ল্লভ মূর্ত্তি সন্দর্শন মনুষ্যের ভাগ্যে অসম্ভব।

যাহা সত্য, তাহাই আলোক। আলস্য, জড়তা, দীর্ঘসূত্রতা, অন্ধকারের নামান্তর মাত্র। যাহা সত্য তাহাই আবার সুন্দর। সত্য যদি সুন্দর না হইত, তাহা হইলে সত্য লাভের জন্য মানুষ ব্যাকুল হইত না। সুন্দর বলিয়া সত্যের প্রতি মনুষ্যের দুর্নিবার্য্য টান। মানুষ সত্যকে সুন্দর বলিয়া পাইতে চায়, উপভোগ করিবার জন্য ব্যাকুল হয়।

গৌরাঙ্গদেব প্রীতিভক্তির বিকাশকল্পে সত্য প্রচার করিলেন, তাই ভক্তের নিকট তিনি গৌরাঙ্গ-সুন্দর। তন্ত্রের সাধনা মৃত্যুর ভিতরে সৌন্দর্য্য দেখিতে চায়, তাই কালিকার প্রলয়ঙ্করী ভীষণমূর্ত্তির ভিতরে সাধক তাঁহার বরাভয় হস্ত প্রসারিত কল্পনা করে। সত্যবাণীর কৌমুদীধবল সরস্বতী মূর্ত্তিতে কেবলই আলোক, কেবলই সৌন্দর্য্য কল্পিত হইয়াছে।

দেবাসুর যুদ্ধে শক্তি লাভের জন্য তন্ত্রের দেবীর নিকট এক সময়ে প্রার্থনা উদ্গীরিত হইয়াছিল। কিন্তু সরস্বতীর আবাহন বাহিরের শক্তিলাভের জন্য নহে, অন্তরের শক্তি লাভ করিবার জন্য; অন্ধকার হইতে আলোকে যাইবার জন্য, বন্ধন হইতে মুক্তি পাইবার জন্য সাধনা। যখন চিরশান্তি দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়, মনুষ্য যখন কাব্য-সাহিত্য আলোচনার জন্য অবসর লাভ করে, যখন বিবাদ কোলাহল নির্ব্বাপিত হইয়া শান্তির রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তখনই সঙ্গীতে, বীণায়, মৃদঙ্গে, সুতানে, নৃত্যে, কলাবিদ্যার শতদল চতুঃষষ্টিদলে আলোকে এবং সৌন্দর্য্যে বিকশিত হইয়া উঠে।

আমরা মোহতিমিরের মধ্যে অবস্থান করিতেছি। চাই আমরা আলোক, চাই আমরা শান্তি, চাই আমরা অন্তরের সৌন্দর্য্য। ঋষিরা কোন সুদূর অতীতে তারস্বরে গাহিয়া গিয়াছেন "তমসোমা জ্যোতির্গময়"; আমরা তাঁহাদের কণ্ঠে আমাদের ক্ষুদ্র কণ্ঠ মিলাইয়া বলিতে চাই, অন্ধকার হইতে আলোকে, দ্বন্দ্ব হইতে মিলনে, সংশয় হইতে সত্যে, দুরাচার হইতে পবিত্রতায়, ঔদাস্য হইতে সাধনে, বিভিন্নতা হইতে ঐক্যে, অন্তরের মলিনতা হইতে জ্ঞানে, প্রেমে, ভক্তিতে, প্রকৃত মনুষ্যত্বে লইয়া যাও। অন্ধকারের বেদনা আমাদিগকে প্রপীড়িত করিয়া তুলুক, যে আলোক লাভ করিয়া আমরা প্রকৃত জীবন লাভ করি।

বৈয়াসিক ন্যায়মালা।

শাস্ত্রযোনিত্ব নামক তৃতীয় অধিকরণ।

(শ্রীরামচন্দ্রশাস্ত্রী সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ
ও
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি)

মূলসূত্র। শাস্ত্রযোনিত্বাৎ ॥ ৩ ॥

তৃতীয়াধিকরণস্য প্রথমং বর্ণকমারচয়তি—

অধিকরণ শ্লোক।

ন কর্ত্তৃ ব্রহ্ম বেদস্য কিংবা কর্ত্তৃ ন কর্ত্তৃতৎ।
বিরূপ নিত্যয়া বাচেত্যেবং নিত্যত্ববর্ণনাৎ ॥১৫॥
কর্ত্তৃনিঃশ্বসিতাদ্ যুক্তে র্নিত্যত্বং পূর্ব্বসাম্যতঃ।
সর্ব্বাবভাসিবেদস্য কর্ত্তৃত্বাৎ সর্ব্ববিদ্ ভবেৎ ॥১৬

অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদঃ [বৃহৎ ২।৪।১০] ইতি বাক্যং বিষয়ঃ। যদৃগ্বেদাদিকমস্তি তদেতস্য নিত্যসিদ্ধস্য ব্রহ্মণো নিঃশ্বাস ইবাযত্নেন সিদ্ধং ইত্যর্থঃ। ব্রহ্ম বেদং করোতি ন করোতি বা ইতি সন্দেহঃ। ন করোতি বেদস্য নিত্যত্বাৎ। বাচা বিরূপ নিত্যয়া ইত্যস্মিন্ মন্ত্রে বিরূপ ইতি দেবতাং সম্বোধ্য নিত্যয়া বাচা স্তুতিং প্রেরয় ইত্যেবং প্রার্থ্যতে। নিত্যা বাক্ বেদ এব।

অনাদিনিধনা নিত্যা বাক্ উৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা।
আদৌ বেদময়ী দিব্যা যতঃ সর্ব্বা প্রবৃত্তয়ঃ ॥

ইতি স্মৃতেঃ। অতঃ ন বেদকর্ত্তৃ ব্রহ্ম। ইতি প্রাপ্তে—

ব্রূমঃ ব্রহ্ম বেদস্য কর্ত্তৃ ভবিতুমর্হতি। কুতঃ নিঃশ্বসিতন্যায়েনাপ্রযত্নোৎপত্ত্যবগমাৎ। "তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে" ইতি সর্ব্বৈর্যজ্ঞৈর্হূয়মানাৎ যজ্ঞশব্দবাচ্যাৎ ব্রহ্মণো বিস্পষ্টমেব বেদোৎপত্তিশ্রবণাচ্চ। অপ্রযত্নোৎপত্ত্যৈবার্থেষু বুদ্ধ্যা রচিতৈঃ কালিদাসাদিবাক্যৈর্বৈলক্ষণ্যাদপৌরুষেয়ত্বং। প্রতিসর্গং পূর্ব্বসাম্যেনোৎপন্নৈঃ প্রবাহরূপেণ নিত্যতা। সর্ব্বজগদ্ব্যবস্থাবভাসিবেদকর্ত্তৃত্ব নিরূপণেন ব্রহ্মণঃ সর্ব্বজ্ঞত্বং নিরূপিতং ভবতি ॥

সূত্রের অনুবাদ। শাস্ত্রযোনিত্ব হেতু।

তৃতীয় অধিকরণের প্রথম বর্ণক (রূপ) সংরচিত হইতেছে—

শ্লোকানুবাদ। ব্রহ্ম বেদের কর্ত্তা নহেন অথবা কর্ত্তা? তিনি কর্ত্তা নহেন। কারণ, "বিরূপ নিত্যয়া বাচা" এইরূপে (বেদের) নিত্যত্ব বর্ণিত আছে। নিঃশ্বসিত যুক্তি অবলম্বনে (ব্রহ্ম) কর্ত্তা। পূর্ব্বের সহিত সাম্য হেতু (বেদের) নিত্যত্ব। সর্ব্বপ্রকাশক বেদের কর্ত্তৃত্ব হেতু (ব্রহ্ম) সর্ব্বজ্ঞ।

টীকার অনুবাদ। "অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতৎ যদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদঃ" [বৃহ ২।৪।১০] এই বাক্যটী (বর্ত্তমান অধিকরণের) বিষয়। ঋগ্বেদাদি যাহা আছে, তাহা এই নিত্যসিদ্ধ ব্রহ্মের নিঃশ্বাসের ন্যায় অযত্নসিদ্ধ, ইহাই তাৎপর্য্য। ব্রহ্ম বেদ করিয়াছেন অথবা করেন নাই, ইহাই হইল সন্দেহ। করেন নাই, কারণ বেদ নিত্য। "বাচা বিরূপ নিত্যয়া" এই মন্ত্রে দেবতাকে বিরূপ নামে সম্বোধন করিয়া নিত্য বাক্যের দ্বারা স্তুতি প্রেরণ কর, এইরূপ প্রার্থনা করা হইয়াছে। নিত্য বাক্য বেদই। কারণ স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে—

সর্ব্বাগ্রে স্বয়ম্ভূ কর্ত্তৃক আদি ও বিনাশরহিত, নিত্য, বেদময় দিব্য বাক্য প্রকাশিত হইয়াছিল, যাহা হইতে সকল প্রবৃত্তি আসিয়াছে। অতএব ব্রহ্ম বেদকর্ত্তা নহেন। ইহা প্রাপ্ত হইলে পর—

আমরা বলিতেছি যে ব্রহ্ম বেদকর্ত্তা হইতে পারেন। কারণ, "নিঃশ্বসিত" যুক্তি অবলম্বনে (বেদের) অপ্রযত্নে উৎপত্তি হওয়া উপলব্ধ হয়; বিশেষতঃ, যখন "তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে" এই মন্ত্রে সকল যজ্ঞ কর্ত্তৃক হূয়মান যজ্ঞশব্দবাচ্য ব্রহ্ম হইতেই বেদোৎপত্তি শ্রুত হইতেছে। অপ্রযত্নে উৎপত্তির কারণেই বুদ্ধিপূর্ব্বক রচিত কালিদাসাদির বাক্যের সহিত অর্থবিষয়ে বৈলক্ষণ্য প্রযুক্ত (বেদের) অপৌরুষেয়ত্ব। প্রত্যেক সৃষ্টিতেই পূর্ব্বের সাম্যসূত্রে উৎপন্ন বেদসমূহের সহিত প্রবাহভাবে (বেদের) নিত্যতা। জগতের সকল ব্যবস্থাদ্যোতক বেদের কর্ত্তৃত্ব নিরূপিত হইবার কারণে (ব্রহ্মের) সর্ব্বজ্ঞত্বও নিরূপিত হইতেছে।

তাৎপর্য্য। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই মন্ত্রসূত্রে জ্ঞানের কথা আসিল। জ্ঞানের কথা আসাতেই জ্ঞানের আধার শাস্ত্রের কথা আসিল। কাজেই তখন শাস্ত্রের সঙ্গে ব্রহ্মের সম্বন্ধ আলোচনার অবকাশ হইল। তাই বলা হইল যে ব্রহ্ম যখন শাস্ত্রযোনি,—যে শাস্ত্র হইতে সকলে জ্ঞান

লাভ করিতেছে.—তখন ব্রহ্মজিজ্ঞাসা অবশ্য কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান অধিকরণে ব্রহ্মের শাস্ত্রযোনিত্ব সম্বন্ধে বিশেষভাবে বলা হইতেছে বলিয়া ইহার নাম হইল শাস্ত্রযোনিত্ব অধিকরণ।

টীকাকার এইখানে শাস্ত্রযোনি শব্দকে দুইপ্রকার সমাসের দ্বারা সিদ্ধ করিয়া দুই ভাবে ইহার অর্থ করিয়াছেন—(১) শাস্ত্রের যোনি বা উৎপত্তিকারণ এবং (২) শাস্ত্র যোনি বা কারণ যাহার। প্রথম বর্ণকে প্রথম অর্থের বিষয় অর্থাৎ ব্রহ্ম শাস্ত্রের কার বা মূল, এই বিষয়ে বলা হইয়াছে।

এখন, পূর্ব্বপক্ষ ও সিদ্ধান্তপক্ষ উভয় পক্ষই মানিয়া লইতেছেন যে শাস্ত্র বলিতে বেদকেই বুঝায়, কারণ বেদই সকল শাস্ত্রের আদিশাস্ত্র। তবেই আলোচ্য বিষয় হইতেছে এই যে ব্রহ্ম বেদের মূল কারণ কি না। যে মন্ত্র অবলম্বনে এই বিষয় আলোচিত হইবে তাহাই হইবে বর্ত্তমান অধিকরণের "বিষয়"। সেই মন্ত্রটী হইতেছে বৃহদারণ্যকীয় শ্রুতিবাক্য—"অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদঃ", অর্থাৎ এই যে ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, এইগুলি মহান্ ভূত বা সৎস্বরূপের নিঃশ্বসিত বা নিঃশ্বাস রূপে আগত। টীকাকার বলেন যে ঋগ্বেদাদি যাহা আছে সেগুলি এই নিত্যসিদ্ধ ব্রহ্মের, আমাদের নিঃশ্বাসের ন্যায় বিনা যত্নে বিনা প্রয়াসে সিদ্ধ, অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে ঋগ্বেদাদি অতি সহজে আবির্ভূত হইয়াছে, ইহাই উক্ত শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য।

পূর্ব্বপক্ষ ইহাতে সন্দেহ উঠাইলেন যে ব্রহ্ম বেদ করিয়াছেন অথবা করেন নাই। তদুত্তরে তিনিই আবার বলিলেন যে তোমরা বল যে বেদ নিত্য, সুতরাং নিত্যবস্তু বেদের কেহই, এমন কি, ব্রহ্মও কর্ত্তা হইতে পারেন না। পূর্ব্বপক্ষ বেদের নিত্যত্ব বিষয়ে শ্রুতি ও স্মৃতির প্রমাণ দিতেছেন—শ্রুতিপ্রমাণ এই যে "বাচা বিরূপ নিত্যয়া" এই মন্ত্রে দেবতাকে বিরূপ বলিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক "নিত্য বাক্য" দ্বারা স্তুতি প্রেরণ কর এইরূপ প্রার্থনা করা হইয়াছে। আর, এই নিত্য বাক্য বেদই, কারণ স্মৃতি বলিতেছেন—

যে বাক্যের আদি নাই ও বিনাশ নাই, সেই বেদরূপ "নিত্য" দিব্য বাক্য স্বয়ম্ভু কর্ত্তৃক আদিকালে ব্যক্ত হইয়াছিল এবং এই বেদরূপ বাক্য হইতেই লোকসকলের যাবতীয় প্রবৃত্তি বা কর্ম্মচেষ্টা।

পূর্ব্ব পক্ষের এই যুক্তির উত্তরে সিদ্ধান্তপক্ষ বলিতেছেন যে বেদ নিত্য হইলেও ব্রহ্মের বেদকর্ত্তা হওয়া কিছু অযৌক্তিক নহে। বর্ত্তমান অধিকরণের বিষয়ীভূত শ্রুতি মন্ত্রেই তো রহিয়াছে যে ঋগ্বেদাদি ব্রহ্ম হইতে নিঃশ্বসিত হইয়াছে। ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে আমাদের নিঃশ্বাস প্রশ্বাস যেমন বিনা যত্নেই সিদ্ধ হয়, সেইরূপ ব্রহ্মেরও বিনা আয়াসেই তাঁহা হইতে ঋগ্বেদাদির উৎপত্তি হইয়াছে। ব্রহ্ম যে বসিয়া বসিয়া মানুষের মত ঋগ্বেদাদি রচনা করিয়াছেন তাহা নহে, সেগুলি ব্রহ্ম হইতে সহজে স্বভাবত বাহির হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু ব্রহ্ম হইতে যে বেদের উৎপত্তি হইয়াছে তাহা স্থির, কারণ শ্রুতিতে স্পষ্টই উল্লিখিত হইয়াছে যে "সেই সর্ব্বহূ যজ্ঞ হইতে ঋক্ সাম সকল জন্মগ্রহণ করিল।" সিদ্ধান্তপক্ষ হইয়া টীকাকার বলেন যে এই সর্ব্বহূ যজ্ঞ শব্দের অর্থে সকল যজ্ঞের দ্বারা যাঁহাকে হবিপ্রদান করা হয় সেই যজ্ঞপুরুষ বা ব্রহ্ম। এই অর্থ পূর্ব্বপক্ষেরও স্বীকৃত দেখা যাইতেছে। সিদ্ধান্তপক্ষ এই সূত্রে আরও বলিতে চাহেন যে বেদ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইলেও উহাতে মানুষের কোনই হস্ত নাই, কারণ উহা ব্রহ্ম হইতে বিনা যত্নে স্বভাবত ও সহজে উৎপন্ন হইয়াছে; কিন্তু কালিদাস প্রভৃতি মানবরচিত গ্রন্থসমূহে এরূপ সহজ ভাব দৃষ্ট হয় না—সেই সকল গ্রন্থে বেশ স্পষ্ট বুঝা যায় যে যে অর্থে যে বাক্য বসানো উচিত, সেই অর্থে সেই বাক্য খুব বিবেচনার সহিত বসানো হইয়াছে।

এখন, বেদের নিত্যত্ব কারণে ব্রহ্ম বেদকর্ত্তা হইতে পারেন না, পূর্ব্বপক্ষ এই যে একটী আপত্তি তুলিয়াছেন, তাহার উত্তরে সিদ্ধান্তপক্ষ বলিতেছেন যে এই নিত্যতা ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি হিসাবে নহে, কিন্তু প্রত্যেক সৃষ্টিতে প্রবাহরূপে আসার হিসাবেই উহার নিত্যতা। এই টীকা হইতে যতদূর বুঝা যাইতেছে, তাহাতে অনুমান হয় যে যথাসময়ে এক একটী মহাপ্রলয় হয়, যে সময়ে সমুদয় সৃষ্টি ব্রহ্মেতে লয় প্রাপ্ত হয় এবং সেই

প্রত্যেক মহাপ্রলয়ের পর নূতন সৃষ্টি পুনর্জাগ্রত হইবার সময়ে ব্রহ্ম হইতে বেদ সকল পূর্ব্বসৃষ্টিতে প্রকাশিত বেদেরই অবিকল অনুরূপ হইয়া প্রকাশিত হয়, এই মতবাদটী পূর্ব্বপক্ষ ও সিদ্ধান্তপক্ষ উভয় পক্ষেরই সম্মত—বলিতে কি, সে কালে এই মত সর্ব্ববাদসম্মত ছিল বলিয়াই বোধ হয়। এই মত স্বীকৃত হওয়াতেই সিদ্ধান্তপক্ষ বলিতে পারিতেছেন যে বেদ এই হিসাবেই নিত্য যে প্রত্যেক মহাপ্রলয়ের পর নূতন সৃষ্টির প্রারম্ভে বেদসকল একই আকারে পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত হইয়া থাকে। সকল জগতসংসারের ব্যবস্থা বা নিয়ম বেদে যে প্রকাশিত আছে, তাহাও উভয় পক্ষেরই স্বীকৃত বলিয়া ধরিয়া লইয়াই সিদ্ধান্তপক্ষ বলিতেছেন যে ব্রহ্ম হইতেই যখন সেই সর্ব্বজগতের ব্যবস্থাপ্রকাশক বেদের উৎপত্তি, তখন কাজেই ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ, এবিষয়ে সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয় বর্ণকমাহ—

অধিকরণ শ্লোক।

অস্ত্যন্যমেয়তাঽপ্যস্য কিন্বা বেদৈকমেয়তা।
ঘটবৎ সিদ্ধবস্তুত্বাৎব্রহ্মান্যেনাপি মীয়তে ॥ ১৭ ॥
রূপলিঙ্গাদিরাহিত্যান্নাস্য মান্তরযোগ্যতা।
তং ত্বৌপনিষদেত্যাদৌ প্রোক্তা বেদৈকমেয়তা ॥১৮॥

তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি [বৃহ. ৩।৯।২৬] ইতি শাকল্যং প্রতি যাজ্ঞবল্ক্যোনোক্তবাক্যে পরব্রহ্মরূপস্য পুরুষস্যোপনিষদ্বেদ্যত্বং প্রতীয়তে। তদ্বাক্যং বিষয়ঃ। তত্র ব্রহ্মণঃ প্রত্যক্ষাদিগম্যত্বমস্তি, ন বা ইতি সংশয়ঃ। পূর্ব্বপক্ষস্তু বিস্পষ্টঃ।

রূপরসাদ্যভাবান্নেন্দ্রিয়যোগ্যতা। লিঙ্গসাদৃশ্যাদিরাহিত্যাচ্চ নানুমানোপমানাদিযোগ্যতা। উপনিষৎস্বেবাধিগতঃ ইতি ব্যুৎপত্ত্যা নাবেদবিন্মুনুতে তং বৃহন্তং ইত্যন্যনিষেধশ্রুত্যা চ বেদৈকমেয়ত্বং। ভাষ্যকারৈঃ জন্মাদিসূত্রে শ্রুত্যাদয়োঽনুভবাদয়শ্চ যথাসম্ভবমিহ প্রমাণং ইত্যন্যমেয়ত্বমঙ্গীকৃতং—ইতি চেৎ। বাঢ়ং। প্রথমতঃ শ্রুত্যৈব প্রমিতে ব্রহ্মণি পশ্চাদনুবাদরূপেণানুমানানুভবয়োরঙ্গীকারাৎ। অতো বেদৈকমেয়ং ব্রহ্ম ॥

দ্বিতীয় বর্ণক বলা যাইতেছে—

অধিকরণ শ্লোকানুবাদ। ইনি (ব্রহ্ম) অন্য প্রমাণের দ্বারা নির্ণেয় অথবা কেবল বেদ অবলম্বনেই নির্ণেয়। ঘটের ন্যায় প্রসিদ্ধ বস্তু হইবার কারণে ব্রহ্ম অন্য প্রমাণের দ্বারাও নির্ণেয় হন। রূপ, লিঙ্গ প্রভৃতির অভাব হেতু ইনি অন্য প্রমাণের বিষয় নহেন। তং ত্বৌপনিষদং ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে ইহাঁকে কেবল বেদের দ্বারাই নির্ণেয় বলিয়া বলা হইয়াছে।

তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি [বৃহং ৩।৯।২৬] শাকল্যের প্রতি যাজ্ঞবল্ক্যের উক্ত এই বাক্যে পরব্রহ্মরূপ পুরুষ উপনিষদ অবলম্বনে বেদ্য বলিয়াই প্রতীত হয়। সেই বাক্য বিষয়। উক্ত বাক্যে ব্রহ্ম প্রত্যক্ষাদিগম্য কি না, ইহাই সংশয়। পূর্ব্বপক্ষের কথা সুস্পষ্ট।

রূপরসাদির অভাব হেতু (ব্রহ্ম) ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে পারেন না। লিঙ্গ, সাদৃশ্য প্রভৃতির অভাব হেতু তিনি অনুমান, উপমান প্রভৃতিরও বিষয় নহেন। উপনিষৎসমূহেই অধিগম্য (ঔপনিষদ শব্দের) এই ব্যুৎপত্তির কারণে এবং বেদানভিজ্ঞ ব্যক্তি সেই বৃহৎ (পুরুষকে) মনন করিতে পারেন না, এই প্রকার অন্যপ্রমাণের নিষেধবাচক শ্রুতিবাক্য থাকাতে (ব্রহ্ম) একমাত্র বেদের দ্বারাই নির্ণেয় স্থির হইতেছে। যদি বল যে, ভাষ্যকারগণ কর্ত্তৃক জন্মাদি সূত্রে শ্রুত্যাদি এবং অনুভবাদি যথাসম্ভব ব্রহ্মবিষয়ে প্রমাণ বলিয়া বেদাতিরিক্ত অন্য প্রমাণের দ্বারাও ব্রহ্ম নির্ণেয় হয়েন, ইহা স্বীকৃত হইয়াছে—ভাল, তাহাই স্বীকার করিলাম। ব্রহ্মবিষয় প্রথমত শ্রুতি দ্বারা নির্ণীত হইলে, পশ্চাৎ অনুবাদরূপে অনুমান ও অনুভবের স্বীকার করা যায়। অতএব ব্রহ্ম একমাত্র বেদ অবলম্বনেই নির্ণেয়।

তাৎপর্য্য। ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে টীকাকার শাস্ত্রযোনি শব্দকে দুই প্রকার সমাসের দ্বারা সিদ্ধ করিয়া দুইভাবে ইহার অর্থ করিয়াছেন—(১) শাস্ত্রের যোনি বা উৎপত্তিকারণ এবং (২) শাস্ত্র যাহার যোনি বা কারণ। প্রথম বর্ণকে প্রথম অর্থের বিষয় বিবৃত হইয়াছে, এইবারে দ্বিতীয় বর্ণকে দ্বিতীয় অর্থ আলোচিত হইবে।

বহুব্রীহি সমাস অবলম্বনে দ্বিতীয় অর্থ আসে। শাস্ত্র যোনি বা কারণ যাহার, ইহা শাস্ত্র যে ব্রহ্মের উৎপত্তির কারণ, সে অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই; শাস্ত্র যাঁহাকে ব্যক্ত করাতে যিনি আমাদের বুদ্ধিগোচর

হয়েন, যাঁহাকে আমরা উপলব্ধি করিতে পারি—শাস্ত্র যাঁহাকে না বুঝাইলে যিনি অব্যক্ত থাকিতেন, এই অর্থে বলা হইয়াছে যে শাস্ত্র ব্রহ্মের যোনি বা কারণ অর্থাৎ শাস্ত্র যাঁহাকে নির্ণয় করিয়া দেয়। এখন প্রথম বর্ণকে বলা হইয়াছে যে শাস্ত্র শব্দের অর্থে পূর্ব্বপক্ষ ও সিদ্ধান্তপক্ষ উভয় পক্ষই বেদকেই ধরেন। তাই অধিকরণ শ্লোকে এই প্রশ্ন করা হইল যে বেদই ব্রহ্মের একমাত্র নির্ণায়ক অথবা বেদাতিরিক্ত অন্য কোন প্রমাণের দ্বারাও তাঁহাকে নির্ণয় করা যাইতে পারে? বৃহদারণ্যক উপনিষদের একটী বাক্যে আছে যে সেই ঔপনিষদ বা উপনিষৎসিদ্ধ পুরুষের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি [বৃহঃ ৩।৯।২৬]। এই বাক্যে ঐ ঔপনিষদ কথাটী থাকাতেই উক্ত বাক্যকেই এই শাস্ত্রযোনিত্ব অধিকরণের বর্ত্তমান বর্ণকের বিষয় বলিয়া ধরা হইল।

এখানে সংশয় হইল এই যে, যখন ব্রহ্মকে শ্রুতিবাক্যে উপনিষৎবেদ্য বলা হইল, তখন ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ প্রভৃতি বেদাতিরিক্ত অন্যান্য প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধ হইতে পারেন কি না। পূর্ব্বপক্ষের এই সংশয় উঠাইবার কারণ এই যে ব্রহ্ম সিদ্ধ বস্তু অর্থাৎ কোন অনুষ্ঠান বা ক্রিয়াদির অপেক্ষা রাখেন না। বেদবিহিত যাগযজ্ঞাদি সম্পূর্ণরূপেই বেদ অবলম্বনেই অধিগম্য, কারণ সেগুলি বেদবিহিত—সেগুলির অনুষ্ঠানের পদ্ধতি বা প্রণালী বেদ ব্যতীত অন্য কোথাও পাইবার সম্ভাবনা নাই। সেই সকল যাগযজ্ঞাদি সিদ্ধ বা সম্পন্ন বস্তু নহে, সেগুলি কতকগুলি অনুষ্ঠানের সাহায্যে সম্পাদ্য। কিন্তু ব্রহ্ম যখন সিদ্ধ বস্তু অর্থাৎ কোন ক্রিয়ার দ্বারা ব্রহ্মকে প্রস্তুত করা যায় না, তখন ব্রহ্মকে বেদের সাহায্যেও যদি বা জানা যায়, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারাও জানা না যাইবে কেন? দৃষ্টান্ত—একটী ঘট রহিয়াছে; সেই ঘটকে যেমন ঘটশব্দের দ্বারাও বুদ্ধিগত করা যাইতে পারে, সেইরূপ প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণের দ্বারাও তাহাকে জানা যাইতে পারে। পূর্ব্বপক্ষের মতে ব্রহ্মকে যেমন বেদ অবলম্বনে, তেমনি অন্যান্য প্রমাণেরও সাহায্যে জানা যাইতে পারে।

সিদ্ধান্তপক্ষ বলিতেছেন যে 'তুমি যে বলিতেছ যে ব্রহ্ম প্রত্যক্ষগ্রাহ্য, তাহা কি প্রকারে সম্ভব? ব্রহ্মের সহিত যখন রূপরসাদির কোনই সম্পর্ক নাই, তখন তিনি কিছুতেই ইন্দ্রিয়গোচর নহেন এবং ইন্দ্রিয়গোচর না হইলেই প্রত্যক্ষগ্রাহ্যও হইতে পারে না।' সিদ্ধান্তপক্ষ আরও বলিতেছেন যে ব্রহ্ম অনুমান বা উপমান প্রমাণেরও গ্রাহ্য নহেন, কারণ ব্রহ্মকে অনুমান করিয়া লইবার কোন কারণ নাই; ধূম দেখিয়া অনুমান হইল যে অগ্নি আছে—কিন্তু সেই অনুমানও হইল প্রত্যক্ষমূলক—ধূম ও অগ্নির পরস্পরের অত্যন্তসংযোগ যাহার প্রত্যক্ষ হইয়াছে, সে-ই ধূম দেখিয়া অনুমান করিতে পারে যে অগ্নি আছে। ব্রহ্ম সম্বন্ধে সেরূপ প্রত্যক্ষমূলক অনুমান করিবার কোন উপায় নাই।

ব্রহ্ম উপমান প্রমাণেরও বিষয় হইতে পারেন না। কারণ তাহাও প্রত্যক্ষমূলক। একটী গরুকে আমি দেখিয়াছি, তুমিও দেখিয়াছ। তখন আমি একটী মহিষকে দেখিয়া তোমার পূর্ব্বদৃষ্ট গরুর সহিত উপমা দিয়া, অর্থাৎ শব্দ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে গরুর সহিত সাদৃশ্য বুঝাইয়া তোমাকে মহিষের বিষয় বুঝাইতে চেষ্টা করিতে পারি, এবং তুমিও মহিষের বিষয় কতক পরিমাণে বুঝিতে পার। কিন্তু ব্রহ্মের সহিত উপমা দিব কাহার, কাহার সহিত সাদৃশ্য দেখাইয়া তাঁহার বিষয় বুঝাইবার চেষ্টা করিতে পারি? নতৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে—শ্রুতি বলিতেছেন যে তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ কোন কিছুই দৃষ্ট হয় না। তবেই দাঁড়াইল যে ব্রহ্ম যখন প্রত্যক্ষ, অনুমান বা উপমান, এই তিনটীর মধ্যে কোনটীরই গম্য নহেন, তখন তিনি প্রমাণচতুষ্টয়ের শেষ প্রমাণ একমাত্র শব্দপ্রমাণ-গম্য। শব্দ বলিতে আপ্তবাক্য অর্থাৎ ভ্রমপ্রমাদরহিত বাক্য বুঝায়। উভয়পক্ষেরই স্বীকৃত যে শ্রুতিবাক্যই এইরূপ আপ্তবাক্য।

ইহার উপর, শ্রুতিতে ব্রহ্মকে যে ঔপনিষদ বলিয়া বলা হইয়াছে, সিদ্ধান্তপক্ষ উপনিষদ্ সমূহেই অধিগত বা প্রাপ্ত এই অর্থে ঔপনিষদ্ শব্দের ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন। তদুপরি, নাবেদবিন্মনুতে তংবৃহন্তং অর্থাৎ বেদে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি সেই মহান পুরুষকে জানিতে পারে না, এইরূপ একটী নিষেধবাচী শ্রুতিবাক্য রহিয়াছে। সিদ্ধান্তপক্ষ একদিকে

দেখাইলেন যে ব্রহ্ম একমাত্র শব্দপ্রমাণগম্য, অপরদিকে দেখাইলেন যে সেই শব্দপ্রমাণ বা শ্রুতিবাক্যই তাঁহাকে যেমন উপনিষদ্‌বেদ্য বলিতেছেন, সেইরূপ তাঁহাকে জানিবার পক্ষে বেদে অনভিজ্ঞ পুরুষের অনধিকারও ঘোষণা করিয়াছেন। কাজেই তাঁহার মতে ইহাই সিদ্ধান্ত হইল সে বেদই একমাত্র ব্রহ্মের নির্ণায়ক। তবে যে ভাষ্যকার আচার্য্য শঙ্কর জন্মাদ্যস্য যতঃ এই সূত্রের ভাষ্যে ব্রহ্মবিষয়ে শ্রুতি প্রভৃতির ন্যায় অনুভব প্রভৃতিকেও প্রমাণস্বরূপে ধরিয়া শ্রুতির অতিরিক্ত অন্যান্য বিষয়কেও ব্রহ্মনির্ণায়ক বলিয়া ধরিয়াছেন, তাহা কি ঠিক নহে? সিদ্ধান্তপক্ষ ভাষ্যকারের কথা অসঙ্গত বলিতে পারেন না। তিনি শঙ্করভাষ্যকে বজায় রাখিয়া বলিলেন যে সর্ব্বপ্রথমে শ্রুতি অবলম্বনে ব্রহ্ম নির্ণীত হইবার পর সেই সকল শ্রুতিবাক্যের সমর্থক অনুমান প্রমাণ ও অনুভবরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বীকৃত হইয়াছে। ইহার ভাবার্থ এই যে, ভাষ্যকার যে অনুভব প্রভৃতিকে প্রমাণ বলিয়া ধরিয়াছেন, তাহা শ্রুতিবাক্যের বিপরীত বা শ্রুতিনির্ণীত স্বরূপ হইতে পৃথক স্বরূপবোধক হইলে প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইবে না; যখন তাহা শ্রুতিবাক্যে নির্ণীত স্বরূপের সমর্থক হইবে, তখনই তাহা প্রমাণ স্বরূপে গ্রাহ্য হইবে। অতএব সিদ্ধান্ত হইল এই যে ব্রহ্ম একমাত্র বেদ অবলম্বনেই নির্ণেয়।

বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত—

গীতা-রহস্য।

৬ষ্ঠ প্রকরণ।

আধিদৈবতবাদ ও ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ বিচার।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদিত)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সত্যপূতাং ভবেদ্‌বাচম্ মনঃপূতং সমাচরেৎ। *

মনু, ৬, ৪৬।

আধিভৌতিক মার্গ ব্যতীত কর্ম্মাকর্ম্ম পরীক্ষণের আর এক মার্গ আছে, তাহা আধিদৈবতবাদীদিগের মার্গ। এই মার্গের লোকেরা এইরূপ বলেন যে, যে সময়ে মনুষ্য কর্ম্মাকর্ম্মের কিংবা কার্য্যাকার্য্যের নির্ণয় করে সেই সময়ে, কোন্ কর্ম্ম হইতে কাহার কত সুখ বা দুঃখ হইবে এবং তন্মধ্যে সমস্ত সুখের মোট সংখ্যা অধিক, না দুঃখের মোট সংখ্যা অধিক, এইরূপ গোলযোগের মধ্যে কিংবা আত্মানাত্মবিচারের মধ্যেও সে কখনই পড়ে না; এবং অনেকে এই গোলযোগের বিষয়টা পর্য্যন্ত জানে না। অধিক কি প্রত্যেক প্রাণী প্রত্যেক কর্ম্ম কেবল নিজের সুখের জন্য করে এরূপ নহে। আধিভৌতিকবাদী যে কোন যুক্তিবাদই বলুন না কেন, ধর্ম্মাধর্ম্মনির্ণয় করিবার সময় মানব-মনের অবস্থা কিরূপ হয় তাহা ক্ষণমাত্র বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কারুণ্য, দয়া, পরোপকার ইত্যাদি মানব-মনের স্বাভাবিক ও উচ্চ মনোবৃত্তি কোন কার্য্য সম্পাদন করিতে মনুষ্যকে একেবারেই প্রবৃত্ত করে। উদাহরণ যথা—কোন ভিখারীকে দেখিয়া তাহাকে কিছু ভিক্ষা দিলে জগতের কিংবা নিজের আত্মার কতটা কল্যাণ হইবে ইহার বিচার মনুষ্যের মনে আসিবার পূর্ব্বে কারুণ্যবৃত্তি জাগ্রত হওয়ায় মনুষ্য আপন শক্তি অনুসারে ভিখারীকে ভিক্ষা দিয়াই খালাস হয়; এবং ছেলে কাঁদিতে আরম্ভ করিলে তাহাকে দুধ দিবার সময়, কত লোকের কতটা হিত হইবে ইহার কিছুমাত্র বিচার না করিয়া, তাহার মা তাহাকে দুধ দেয়। সুতরাং কর্ম্মযোগশাস্ত্রে এই উচ্চ মনোবৃত্তির প্রকৃত ভিত্তি আছে। এই মনোবৃত্তি আমাদিগকে কেহ দেয় নাই, উহা নিসর্গসিদ্ধ অর্থাৎ স্বাভাবিক কিংবা এক ভাবে দেখিলে উহা স্বয়ংভূ দেবতা। বিচারপতি আপন বিচার আসনে বসিলে, তাঁহার বুদ্ধির অন্তর্ভূত ন্যায়দেবতার স্ফুরণ হওয়ায় তিনি ন্যায় বিচার করেন; এবং যখন কোন বিচারপতি এই স্ফুরণকে গ্রাহ্য না করেন, তখনই তাঁহার হাত দিয়া অন্যায় বিচার বাহির হয়। ন্যায়-দেবতার মতোই কারুণ্য, দয়া, পরোপকার, কৃতজ্ঞতা, কর্ত্তব্যানুরাগ, ধৈর্য্য ইত্যাদি সদ্‌গুণাদির যে সকল স্বাভাবিক মনোবৃত্তি তাহারাই দেবতা। এই দেবতাদিগের শুদ্ধ স্বরূপ কি তাহা প্রত্যেকেরই স্বভাবত জানা আছে। কিন্তু লোভ, দ্বেষ, মাৎসর্য্য বশতঃ কিংবা এইরূপ অন্য কোন কারণবশত দেবতাদিগের এই স্ফুরণ গৃহীত হয় না, তাহাতে দেবতারা

* "সত্যের দ্বারা যাহা পূত অর্থাৎ শুদ্ধ হইয়াছে এইরূপ বাক্য বলিবেক এবং মন যাহা শুদ্ধ মনে করিবে তদনুসারে আচরণ করিবেক।"

কি করিবেন? এক্ষণে ইহা সত্য যে, কখন কখন এই দেবতাদিগের মধ্যে লড়াই বাধিয়া যাওয়ায় কোন কার্য্য করিবার সময় কোন্ দেবতার স্ফূর্ত্তি বলবত্তর বলিয়া স্বীকার করা যাইবে এই বিষয়ে আমাদের সংশয় হয়; এবং তাহার পর এই সংশয়ের নির্ণয়ার্থ ন্যায় কারুণ্যাদি দেবতা ব্যতীত অন্য কাহারো পরামর্শ গ্রহণ করা আবশ্যক হয়। কিন্তু এই সময়েও অধ্যাত্মবিচারের কিংবা সুখদুঃখের তারতম্যের গোলযোগের মধ্যে না পড়িয়া আমরা আমাদের মনোদেবতাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করিলে, উক্ত দেবতাদ্বয়ের মধ্যে কোন্ মার্গ শ্রেয়স্কর,শীঘ্রই ইহার একটা নিষ্পত্তি হইয়া যায়; এবং সেই জন্য, উপরিউক্ত সমস্ত দেবতাদিগের মধ্যেও মনোদেবতা শ্রেষ্ঠ। 'মনোদেবতা' এই শব্দের মধ্যে ইচ্ছা, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি সমস্ত বিকারের সমাবেশ না করিয়া, কেবল ভাল কিংবা মন্দ বাছাই করিবার যে ঈশ্বরদত্ত কিংবা স্বাভাবিক শক্তি মনের মধ্যে আছে তাহাই উপস্থিত প্রকরণে বিবক্ষিত বলিয়া ধর্ত্তব্য। এই শক্তির 'সদসদ্‌বিবেকবুদ্ধি' * এই বড় নাম প্রদত্ত হইয়াছে; কোন সংশয় প্রসঙ্গে মনুষ্য সুস্থ অন্তঃকরণে ও শান্তভাবে যদি ক্ষণমাত্র বিচার করিয়া দেখে তাহা হইলে এই সদসদ্‌বিবেচনদেবতা কখনই তাহাকে পরিত্যাগ করিবে না। অধিক কি এইরূপ প্রসঙ্গে "তুই আপনার মনকে জিজ্ঞাসা কর্" এইরূপই আমরা অন্যকে বলিয়া থাকি। কোন সদ্‌গুণের কোন্ সময়ে কতটা গুরুত্ব হইবে তৎসম্বন্ধে এই বড় দেবতার নিকট একটা স্মারক লিপি সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকে, সেই লিপি অনুসারে যথাসময়ে এই মনোদেবতা আপন নিষ্পত্তি তৎক্ষণাৎ ব্যক্ত করেন। ইহা মনে করিও, কোন সময়ে আত্মসংরক্ষণ ও অহিংসার মধ্যে বিরোধ ঘটিলে, দুর্ভিক্ষ-প্রসঙ্গে অভক্ষ্য ভক্ষণ করিবে কিংবা করিবে না, এইরূপ আমাদের যখন সন্দেহ উপস্থিত হয় তখন শান্তচিত্তে এই মনোদেবতার পূজা অর্চ্চনা করিলে তখনি "অভক্ষ্য ভক্ষণ কর" এই নিষ্পত্তি বাহির হইয়া পড়ে। সেইরূপ স্বার্থ কিংবা পরোপকার ইহার মধ্যে বিরোধ হইলে তাহারও নির্ণয় এই মনোদেবতার অর্চ্চনার দ্বারা করিতে হইবে। মনোদেবতার নিকটস্থ এই ধর্ম্মাধর্ম্মতারতম্যের স্মারকলিপি শান্তভাবে বিচার করিয়া এক গ্রন্থকারের তাহা উপলব্ধি হওয়ায় তিনি তাঁহার নিজ গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন *। এই স্মারকলিপিতে, ভক্তিভাবকে প্রথম আসন অর্থাৎ অত্যুচ্চ স্থান দেওয়া হইয়াছে; তাহার নীচে কারুণ্য ও তাহার নীচে কৃতজ্ঞতা, ঔদার্য্য, বাৎসল্য প্রভৃতি নীচের ধাপগুলি ক্রমশ প্রদর্শিত হইয়াছে। নীচের ও উপরের ধাপের সদ্‌গুণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইবামাত্র অপেক্ষাকৃত উপর ধাপের দেবতাদিগকেই অধিকাধিক মান দেওয়া আবশ্যক, এইরূপ এই গ্রন্থকারের অভিপ্রায়। কার্য্যাকার্য্যের কিংবা ধর্ম্মাধর্ম্মের নির্ণয় করিতে হইলে, তাঁহার মতে, ইহা অপেক্ষা যোগ্য মার্গ আর নাই; কারণ, আমাদের দৃষ্টি খুব প্রসারিত করিয়া "অধিক লোকের অধিক সুখ" কিসে হয় তাহা সুনিশ্চিত রূপে নির্দ্ধারিত করিলেও, অধিক লোকের যাহাতে হিত হয় তুমি তাহা কর এইরূপ বলিবার অধিকার তারতম্যবুদ্ধির মধ্যে না থাকায় শেষে "অধিক লোকের অধিক হিত" আমি কেন করিব ইহার নিষ্পত্তি হয় না, সুতরাং সমস্ত প্রশ্ন পূর্ব্বেকার মতোই অনিষ্পন্ন থাকিয়া যায়। কোন বিচারপতি রাজার নিকট অধিকার না পাইয়া কোন বিচার নিষ্পত্তি করিলে, সেই নিষ্পত্তির যেরূপ পরিণাম হয়, সুখদুঃখের দূর দৃষ্টিতে বিচার করিয়া যে কার্য্যাকার্য্য নির্ণয় হয়, তাহারও সেইরূপ পরিণাম হইয়া থাকে। তুমি এইরূপ কর, এই কাজটা তোমায় করিতেই হইবে, একথা কেবল দূর দৃষ্টি কাহাকেও বলিতে পারে না। কারণ, দূর দৃষ্টি হইলেও উহা মনুষ্যকৃত বলিয়া মনুষ্যের উপরে উহার প্রভুত্ব চলিতে পারে না। এইরূপ প্রসঙ্গে, আমাদের অপেক্ষা মহৎ অধিকারবিশিষ্ট অন্য

* এই সদসদ্‌বিবেক বুদ্ধিকেই ইংরাজিতে Conscience বলে, এবং আধিদৈবতবাদ অর্থে Intuitionist School।

* এই গ্রন্থকারের নাম James Martineau (জেমস্ মার্টিনো), ইনি এই স্মারকলিপি নিজের Types of Ethical Theory (Vol II. P. 266. 3d Ed.) নামক গ্রন্থে দিয়াছেন। মার্টিনো আপন গ্রন্থে Idio-psychological এই নাম দিয়াছেন। কিন্তু আমরা আধিদৈবতবাদের মধ্যেই ইহার সমাবেশ করিতেছি।

কাহারো নিকট হইতে আদেশ পাওয়া আবশ্যক, এবং ঐ কার্য্য, মনুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সুতরাং মনুষ্যের উপর হুকুম জারি করিতে সমর্থ এইরূপ ঈশ্বরদত্ত সদসদ্‌বিবেক-দেবতাই করিতে পারেন। এই দেবতা স্বয়ম্ভূ হওয়াপ্রযুক্ত, প্রচলিত ব্যবহারেও আমার মনোদেবতা আমাকে অমুক অমুক প্রকারের সাক্ষ্য দেন নাই এইরূপ বলিবার রীতি আছে। কেহ কোন দুষ্কর্ম্ম করিলে, পরে তাহার জন্য তাহার লজ্জা বোধ হয় কিংবা তাহার মনে একটা যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, ইহাও এই মনোদেবতার শাস্তির ফল; এবং তাহাতে করিয়া এই স্বতন্ত্র মনোদেবতার অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। কারণ, আপনার মন আপনাকে আপনি কেন কষ্ট দেয়, ইহার আর কোন যুক্তি পাওয়া যায় না—এইরূপ এই মার্গের মত।

পাশ্চাত্য আধিদৈবতবাদের সংক্ষিপ্ত সার উপরে প্রদত্ত হইল। পাশ্চাত্য দেশের এই মতবাদ প্রায় খৃষ্ট ধর্ম্মের উপদেশকেরাই প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন; এবং তাঁহাদের মতে ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ণয়ে কেবল আধিভৌতিক সাধন অপেক্ষা ঈশ্বরদত্ত সাধন সুলভ ও শ্রেষ্ঠ অতএব গ্রাহ্য। আমাদের দেশে প্রাচীন কালে কর্ম্মযোগশাস্ত্রের এইরূপ স্বতন্ত্র পন্থা না থাকিলেও উক্ত প্রকারের মত প্রাচীন গ্রন্থাদির অনেক স্থানেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। মনের বিভিন্ন বৃত্তিকে মহাভারতের অনেক স্থানে দেবতার স্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছে দেখা যায়। ধর্ম্ম, সত্য, বৃত্ত, শীল, শ্রী প্রভৃতি দেবতা প্রহ্লাদের শরীর হইতে নিঃসৃত হইয়া ইন্দ্রের শরীরে প্রবেশের বর্ণনাও পরে প্রদত্ত হইয়াছে। কার্য্যাকার্য্য বা ধর্ম্মাধর্ম্মের নির্ণয়কারী দেবতার নাম 'ধর্ম্ম' দেওয়া হইয়াছে; শিবি রাজার আত্মবলের পরীক্ষা করিবার জন্য শ্যেনের রূপ ধরিয়া এবং যুধিষ্ঠিরের পরীক্ষা করিবার জন্য যজ্ঞের রূপ ধরিয়া ও শেষে কুকুরের রূপ ধরিয়া ধর্ম্ম প্রকট হইয়াছিলেন এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। এমন কি ভগবদ্‌গীতাতেও (১০।৩৪) কীর্ত্তি, শ্রী, বাক্, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা ইহারা দেবতা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে এবং তন্মধ্যে স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা ইহারা মনের ধর্ম্ম। মনও এক দেবতা হওয়ায় পরব্রহ্মের প্রতীক বলিয়া তাহার উপাসনাও উপনিষদে কথিত হইয়াছে (তৈ, ৩।৪; ছা, ৩।১৮)। "মনঃপূতং সমাচরেৎ",—মনে যাহা শুদ্ধ বলিয়া বুঝিবে তাহাই করিবে—এইরূপ যখন মনু বলিতেছেন (৬।৪৬), তখন 'মন' এই শব্দে মনোদেবতাই মনুর অভিপ্রেত, এইরূপ অবাধে বলা যাইতে পারে। প্রচলিত ব্যবহারে ইহার বদলে "মনোদেবতার যাহা ভাল লাগে তাহাই করিবে" এইরূপ আমরা বলিয়া থাকি।

'মনঃপূত' এই শব্দের অর্থ মরাঠীতে উল্টা হইয়া গিয়াছে; এবং অনেক সময়, যাহা মনে হয় তাহাই যদৃচ্ছাক্রমে করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাহা 'মনঃপূত' আচরণ এইরূপ আমরা বলিয়া থাকি। কিন্তু এই শব্দের প্রকৃত অর্থ "মনেতে যাহা পবিত্র কিংবা শুদ্ধ বলিয়া উপলব্ধি হইবে তাহাই করিবে"—এইরূপ। মনুসংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ে—

যৎকর্ম্ম কুর্ব্বতোঽস্য স্যাৎ পরিতোষোঽন্তরাত্মনঃ।
তৎ প্রযত্নেন কুর্বীত বিপরীতং তু বর্জ্জয়েৎ॥

অর্থাৎ—"যে কর্ম্ম করিলে আমার অন্তরাত্মা সন্তুষ্ট হয় তাহা সযত্নে করিবেক, এবং তাহার বিপরীত হইলে ত্যাগ করিবেক" এইরূপ মনু আরো স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন (মনু, ৪।১৬১) সেইরূপ আবার, চাতুর্ব্বর্ণ্যধর্ম্মাদির ব্যবহারিক নীতির মূলতত্ত্ব বলিবার সময় মনু যাজ্ঞবল্ক্যাদি স্মৃতিগ্রন্থকারও

বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়নাত্মনঃ।
এতচ্চতুর্ব্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ধর্মস্য লক্ষণম্॥

অর্থাৎ—"বেদ, স্মৃতি, শিষ্টাচার, এবং আপনার আত্মার ভাল লাগা, ধর্ম্মের এই চারি মূলতত্ত্ব" (মনু, ২।১২) এইরূপ বলিয়াছেন। "নিজের আত্মায় যাহা ভাল লাগে তাহা" অর্থাৎ মনে যাহা শুদ্ধ বলিয়া উপলব্ধি হয় তাহা—এইরূপ অর্থ; এবং শ্রুতি, স্মৃতি ও সদাচার ইহাদের দ্বারা কোন কার্য্যের ধর্ম্মাধর্ম্মত্ব নির্ণয় না হইতে পারিলে, উহা নির্ণয় করিবার চতুর্থ সাধন —'মনঃপূততা' বুঝিতে হইবে, ইহা হইতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। মহাভারতে প্রহ্লাদ ও ইন্দ্র ইঁহাদের কথা পূর্ব্ব প্রকরণে বিবৃত করিবার পর "শীলের" লক্ষণ দিবার সময় ধৃতরাষ্ট্র এইরূপ বলিয়াছেন—

যদন্যেষাং হিতং ন স্যাৎ আত্মনঃ কর্ম্ম পৌরুষম্।
অপত্রপেত বা যেন ন তৎ কুর্য্যাৎ কথঞ্চন॥

অর্থাৎ—আপনার যে কর্ম্ম লোকের হিতকর নহে কিংবা যাহার জন্য আপনাদেরই লজ্জা হয়, সে কর্ম্ম কখনই করা উচিত নহে। (সভা, শাং, ১২৪।৬৬)। "লোকের হিতকর নহে" ও "লজ্জা হয়" এই দুই পদে, 'অধিক লোকের অধিক হিত' ও 'মনোদেবতা'—এই দুই পক্ষেরই উল্লেখ এই শ্লোকে করা হইয়াছে,—ইহার প্রতি পাঠক লক্ষ্য করিবেন। মনুস্মৃতিতেও, যে কর্ম্ম করিলে কিংবা করিবার সময় লজ্জা বোধ হয় তাহা তামসিক এবং যে কর্ম্ম করিবার সময় লজ্জা বোধ হয় না ও অন্তরাত্মা সন্তুষ্ট থাকে তাহা সাত্ত্বিক এইরূপ কথিত হইয়াছে (মনু, ১২।৩৫।৩৭) ; এবং ধর্ম্মপদ নামক বৌদ্ধ গ্রন্থেও এই বিচারআলোচনা আছে (ধর্ম্মপদ ৬৭ ও ৬৮ দেখ)। কর্ম্মাকর্ম্ম সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হইলে—

সতাং হি সন্দেহপদেষু বস্তুষু প্রমাণমন্তঃকরণপ্রবৃত্তয়ঃ ॥

অর্থাৎ সৎব্যক্তি আপনার অন্তঃকরণের সাক্ষ্যই প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করেন—এইরূপ কালিদাসও বলিয়াছেন (শকু, ১।২০)। চিত্তবৃত্তির নিরোধ করিয়া একই বিষয়ের উপর মনকে স্থির রাখা পাতঞ্জল যোগের কার্য্য ; এবং এই যোগশাস্ত্র আমাদের নিকট খুব প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত থাকা প্রযুক্ত কর্ম্মাকর্ম্ম সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হইলে, অন্তঃকরণকে স্বস্থ ও শান্ত করিয়া যা উচিত মনে হয় তাহা করিবে—এই মার্গ আমাদের দেশের কাহাকে শিখাইবার আবশ্যকতা নাই। সমস্ত স্মৃতিশাস্ত্রের আরম্ভে স্মৃতিকার ঋষি মনকে একাগ্র করিয়াই ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবৃত করিয়া থাকেন, এইরূপ বর্ণনা আছে (মনু ১।১) ; এবং যে কোন কর্ম্মে এইরূপ মনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা—এই মার্গ প্রথমদৃষ্টিতেও অত্যন্ত সুলভ মনে হয়। কিন্তু শুদ্ধ মন কাহাকে বলে তত্ত্বজ্ঞান দৃষ্টিতে তাহার সূক্ষ্ম বিচার করিলে এই সহজ মতটি শেষ পর্য্যন্ত না টেকায় আমাদের শাস্ত্রকারেরা কর্ম্মযোগ শাস্ত্রের ইমারৎ এই ভিত্তির উপর খাড়া করেন নাই।

এই তত্ত্বজ্ঞানটি কি, এক্ষণে ইহার বিচার করিতে হইবে ; কিন্তু তৎপূর্ব্বে পাশ্চাত্য আধিভৌতিকবাদীরা এই আধিদৈবত মতবাদের খণ্ডন কিরূপ করিয়াছেন, তাহার অল্প বৃত্তান্ত এইখানে দিতেছি। কারণ এই বিষয়সম্বন্ধে আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক এই দুই পন্থার যুক্তিগুলি ভিন্ন হইলেও শেষে সিদ্ধান্ত একই প্রকার ; অতএব প্রথমে আধিভৌতিক যুক্তিগুলি বলিলে পরে আধ্যাত্মিক যুক্তিসমূহের গুরুত্ব ও সযুক্ততা পাঠকদিগের শীঘ্র উপলব্ধি হইবে। আধিদৈবিক পন্থায়, উপরিকথিত অনুসারে শুদ্ধ মনোদেবতাকেই অগ্রস্থান দেওয়া প্রযুক্ত, "অধিক লোকের অধিক সুখ" এই আধিভৌতিক নীতিপন্থায় কর্ত্তার বুদ্ধির কোন বিচার হয় না. এইরূপ পূর্ব্বে যে দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা এই আধিদৈবত মত সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে না, স্পষ্টই দেখা যায়। কিন্তু সদসদ্‌বিবেককে শুদ্ধ মনোদেবতা কেন বলা হইবে ইহার সূক্ষ্ম বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলে, এই পন্থাতেও অন্যান্য অপরিহার্য্য বাধা আসিয়া উপস্থিত হয়। যে কোন বিষয় ধরনা কেন, তাহার সমস্ত দিক বিচার করিয়া তাহা গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য, করিবার যোগ্য কি যোগ্য নহে, অথবা লভ্যজনক বা সুখজনক, ইহা নির্দ্ধারণ করা, নাক কিংবা চোখ এই ইন্দ্রিয়দের কাজ নহে ; সুতরাং মন এক স্বতন্ত্র ইন্দ্রিয়, ইহা কাহাকেও বলিতে হইবে না। সুতরাং কার্য্যাকার্য্যের কিংবা ধর্ম্মাধর্ম্মের নির্ণয় মনই করিয়া থাকে ;—তাকে তুমি ইন্দ্রিয়ই বল বা দেবতাই বল। আধিদৈবতবাদের উক্তি যদি এইরূপই হয় তাহা হইলে তৎবিরুদ্ধে তর্ক করিবার কিছুই নাই।

কিন্তু পাশ্চাত্য আধিদৈবত পক্ষ ইহা অপেক্ষা একপদ আরও অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহারা এই কথা বলেন যে, ভাল কিংবা মন্দ (সৎ কিংবা অসৎ) ন্যায্য কিংবা অন্যায্য, ধর্ম্ম্য কিংবা অধর্ম্ম্য ইহার নির্ণয় করা এবং কোন পদার্থ ভারী কি হাল্কা, সাদা কি কালো, কিংবা হিসাবে ঠিক কি ভুল, ইহার নিষ্পত্তি করা—এই দুই বিষয় অত্যন্ত ভিন্ন। দ্বিতীয় প্রকারের নির্ণয় মন ন্যায়শাস্ত্রের পদ্ধতিক্রমে করিতে পারে ; কিন্তু প্রথম বর্গস্থ বিষয়ের নিষ্পত্তি কেবলমাত্র মন করিতে অসমর্থ,—সেই কার্য্য সদসদ্‌বিবেচনরূপ যে দেবতা মনেতে আছেন কেবল তিনিই করিয়া থাকেন। ইহার কারণ তাঁহারা এইরূপ দেখান যে, কোনও হিসাব ঠিক কিংবা ভুল ইহা স্থির করিবার সময় আমরা সেই হিসাবের তেরিজ কিংবা গুণফল পরীক্ষা

করিয়া তাহার পর আমাদের মত স্থির করিয়া থাকি ; অর্থাৎ এই বিষয়ের নির্ণয় করিবার পূর্ব্বে অন্য কোন ক্রিয়া বা ব্যাপার মনে করা দরকার। কিন্তু ভাল মন্দের নির্ণয় সেরূপ নহে। কোন মনুষ্য কাহাকে খুন করিয়াছে এইরূপ অবগত হইবামাত্র তখনি "ছি! সে মন্দ কাজ করিয়াছে" এই রূপ উচ্ছ্বাসোক্তি মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়ে ; সে সম্বন্ধে আমাদের কোন বিচার করিতে হয় না। সুতরাং কিছু বিচার না-করিয়া আমরা যাহা নির্ণয় করি তাহা এবং বিচার করিয়া যাহা নির্ণয় করি তাহা—এই দু-ই একই মনোবৃত্তির ব্যাপার, এরূপ বলিতে পারা যায় না ; সুতরাং সদসদ্‌বিবেচনশক্তি এক স্বতন্ত্র মানসিক দেবতা, এইরূপ মানিতে হয়। সকল মনুষ্যেরই অন্তঃকরণে এই শক্তি কিংবা দেবতা সমানরূপেই জাগ্রত থাকায় সকলেই হত্যাকাণ্ডকে অপরাধ মনে করে এবং সে সম্বন্ধে কাহাকে কিছু শিখাইতে হয় না।

আধিভৌতিক পন্থার লোকেরা এই আধিদৈবিক যুক্তিবাদের এইরূপ উত্তর দেয় যে, কোন বিষয়ের নির্ণয় তৎক্ষণাৎ আমরা করিতে পারি—এই ব্যাপার, এবং যে বিষয়ের নির্ণয় আমরা বিচার করিয়া করি—এই ব্যাপার, এই দুইটি ভিন্ন হইতেই হইবে একথা স্বীকার করিতে পারা যায় না। কোন বিষয় দ্রুত করা কিংবা রহিয়া বসিয়া করা ইহা অভ্যাসের কাজ। ধর, হিসাবের কথা। ব্যাপারী লোক মণের হিসাবে সেরের দর চট্ করিয়া মুখে মুখে বলিতে পারে, তাই বলিয়া উত্তম গণিতবেত্তা হইতে গুণন করিবার দেবতা তাঁহার আলাদা নহে। সাধনার দ্বারা কোন বিষয় এমনি অভ্যাস হইয়া যায় যে কিছু বিচার না করিয়াও মনুষ্য তাহা সহজে করিয়া যায়। উত্তম লক্ষ্যসন্ধানকারী মনুষ্য উড়োপাখী বন্দুকে সহজে মারিয়া থাকে, তাই বলিয়া লক্ষ্য সন্ধানের দেবতা স্বতন্ত্র এরূপ কেহ বলে না—শুধু বলে না তাহা নহে,—কিরূপে 'তাক্' করিতে হইবে, উড়োপাখীর বেগ কিরূপে গণনা করিতে হইবে ইত্যাদি শাস্ত্রীয় উপপত্তিও সেই জন্য কেহ ত্যাজ্য বলিয়া মনে করে না। সম্রাট নেপোলিয়ন সম্বন্ধে এইরূপ একটা কথা শুনা যায় যে, রণক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, একবার চারিদিকে তাকাইয়া শত্রুর ছিদ্র কোথায়, একেবারেই তাঁহার নজরে পড়িত। কিন্তু তাই বলিয়া যুদ্ধকলার এক স্বতন্ত্র দেবতা আছে, অন্য মানসিক শক্তির সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই, এরূপ কেহ বলে না। কোন কাজে কাহারও বুদ্ধি স্বভাবত বেশী, কাহারও কম, ইহা সত্য ; কিন্তু তাহাতে করিয়া উভয়ের বুদ্ধি বস্তুত ভিন্ন এরূপ আমরা বলি না ; তাছাড়া কার্য্যাকার্য্যের কিংবা ধর্ম্মাধর্ম্মের নির্ণয় সর্ব্বদাই শীঘ্র হইয়া থাকে, এরূপও নহে। কারণ, পরে "অমুক করিবে কিংবা অমুক করিবে না" এইরূপ সংশয় কখন উপস্থিত না হইলেও, অর্জ্জুনের ন্যায় প্রসঙ্গবিশেষে সকলেরই এই সংশয় উপস্থিত হইয়া থাকে। শুধু তাহা নহে, কার্য্যাকার্য্য নির্ণয়ের কোন বিষয়ে বিভিন্ন পুরুষের অভিপ্রায়ও ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। সদাসদ্‌বিবেচনশক্তিরূপ স্বয়ম্ভূ দেবতা যদি একই হন তবে এই ভেদ কেন? অবশ্য, মনুষ্যের বুদ্ধি যে পরিমাণে সুশিক্ষিত কিংবা সুসংস্কৃত হয় সেই পরিমাণে কোন বিষয়ের সে নির্ণয় করে, এ কথা স্বীকার করিতেই হয়। এমন অনেক অসভ্য লোক আছে যাহারা মনুষ্যহত্যাকে অপরাধ মনে না করিয়া হত মনুষ্যের মাংসও আনন্দে আহার করে! কিন্তু অসভ্য লোকের কথা ছাড়িয়া দিলেও দেশাচার অনুসারে এক দেশে যাহা গর্হিত বলিয়া মনে করে, অন্য দেশে তাহাই সর্ব্বমান্য হইয়া থাকে। এক স্ত্রী থাকিতে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করা বিলাতে অপরাধ বলিয়া গণ্য ; কিন্তু হিন্দুস্থানে সে সম্বন্ধে বেশী কিছু বিধিনিষেধ নাই। ভরপুর সভার মধ্যে মাথা হইতে পাগড়ী খুলিয়া বসিতে হিন্দু লোকের লজ্জা বোধ হয় ; কিন্তু ইংরেজ লোক মাথা হইতে টুপি খোলাই সভ্যতার লক্ষণ মনে করে। ঈশ্বরদত্ত কিংবা স্বাভাবিক সদসদ্‌বিবেচনশক্তি প্রযুক্তই যদি ভাল মন্দ সম্বন্ধে লজ্জাবোধ করা সত্য হয়, তাহা হইলে, সকলেই একই কার্য্যে একই রকম লজ্জা বোধ করে না কেন? দস্যুও যাহার অন্ন একবার গ্রহণ করিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরা নিন্দনীয় মনে করে ; কিন্তু বড় বড় সুসভ্য পাশ্চাত্য রাষ্ট্রেও, পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যের লোকদিগকে যুদ্ধে বধ করা স্বদেশভক্তির লক্ষণ মনে করে। সদসদ্‌বিবেচন-

শক্তিরূপ দেবতা যদি একই হয় তাহা হইলে এই পার্থক্য কেন? এবং সদসদ্‌বিবেচনশক্তিরও যদি শিক্ষা অনুসারে কিংবা দেশাচার-অনুসারে ভেদ মানিতে হয় তাহা হইলে তাহার স্বয়ম্ভূ নিত্যত্ব বাধিত হয়। অসভ্য অবস্থা ছাড়িয়া মনুষ্য যেমন-যেমন সভ্য হইতে থাকে সেই অনুসারে তাহার মন ও বুদ্ধি বিকশিত হইয়া থাকে; এবং এই প্রকারে বুদ্ধির অতিবৃদ্ধি হইলে পর পূর্ব্বে অসভ্য অবস্থায় থাকিতে সে যে বিচার করিতে পারিত না, সভ্য অবস্থায় তাহা চট্ করিয়া করিতে পারে। অধিক কি, এই প্রকারে বুদ্ধির উন্নতি হওয়াই সভ্যতার লক্ষণ। সুসভ্য কিংবা সুশিক্ষিত মনুষ্য কোন বস্তু দেখিবামাত্র চাহিয়া বসে না। ইহা যেরূপ তাহার প্রকৃতির মধ্যে বদ্ধমূল ইন্দ্রিয়-নিগ্রহের পরিণাম, সেইরূপ ভালমন্দ বাছিয়া লইবার মনের শক্তিও আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পাইয়া কোন কোন বিষয় মনের এতটা অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে যে, কিছুমাত্র বিচার করিবার অপেক্ষা না করিয়া কোন বিষয় সম্বন্ধে আমাদের নৈতিক সিদ্ধান্ত আমরা ব্যক্ত করি। চক্ষুর দ্বারা নিকটের কিংবা দূরের বস্তু দেখিতে হইলে শিরা ও স্নায়ু ন্যূনাধিক পরিমাণে সঙ্কুচিত করিতে হয়; এবং এই সব ক্রিয়া এত দ্রুত হইয়া থাকে যে আমরা তাহা জানিতেও পারি না। কিন্তু তাহার দরুণ এই বিষয়ের উপপত্তি কেহ কি অনুপযোগী মনে করিয়াছে? সার কথা মনুষ্যের মন কিংবা বুদ্ধি সর্ব্বকালে ও সর্ব্বকাজে একই। কালো সাদা এক প্রকারের বুদ্ধিতে এবং ভালমন্দ অন্যপ্রকারের বুদ্ধিতে নির্ব্বাচন করা যায় এরূপ বাস্তবিক প্রকার-ভেদ নাই। কাহারও বুদ্ধি কম হইতে পারে, কাহারও অশিক্ষিত কিংবা অপরিণত বুদ্ধি বৃদ্ধি পাইতে পারে, এইটুকুই যা' প্রভেদ। এই ভেদের প্রতি লক্ষ্য করিলে, এবং যে-কোন ক্রিয়া দ্রুত করিতে পারা অভ্যাস ও সাধনার ফল, এই উপ-লব্ধির প্রতি লক্ষ্য করিলে মনের যে স্বাভাবিক শক্তি আছে তাহার ওদিকে সদসদ্‌বিচারশক্তি বলিয়া কোন আলাদা, স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট শক্তি স্বীকার করিবার কোন হেতু নাই এইরূপ পাশ্চাত্য আধিভৌতিকবাদীরা স্থির করিয়াছেন।

রাণাডের-স্মৃতি কথা।

পঞ্চম অধ্যায়।

পণ্ডিতা রমা বাইয়ের পুণায় আগমন ও আর্য্যমহিলা-সমাজের স্থাপনা।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর)

পণ্ডিতা রমা-বাই নামে কোঙ্কনস্থ কোন এক মহিলা সংস্কৃতজ্ঞ ও খুব বিদ্বান; সমস্ত শ্রীমদ্‌ভাগবত তাঁহার কণ্ঠস্থ। তিনি কাশীর বড় বড় পণ্ডিতের সহিত শাস্ত্র সম্বন্ধে তর্ক করিয়া জিতিয়াছেন। এইরূপ বিদ্বান মহিলা পুণায় আসিয়া অবস্থিতি করিবেন, এই কথা শুনিয়া আমার খুব আনন্দ হইল এবং এই মহিলা না জানি কিরূপ, তাঁকে কখন্ দেখিতে পাইব, ইহাই আমার সর্ব্বদা মনে হইতে লাগিল। দ্বিতীয় দিন শনিবার ছিল বলিয়া আমি নিত্যানুরূপ সভায় গেলাম। সকল মহিলারই মুখে পণ্ডিতা বাইর কথা। আমারই মতো সকলেই তাঁকে দেখিবার জন্য উৎসুক। তিনি না জানি কি রকম, কোথায় আসিয়া উঠিবেন, আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন কি না, তিনি নিকটেই আসিয়া উঠেন যদি ত বেশ হয়, যদি দূরে কোথায় গিয়া উঠেন তাহলে কি হইবে? এইরূপ নানা বিষয়ের চর্চ্চা আমাদের মধ্যে অনেকক্ষণ হইবার পর, আমি পাকা খবর জানিবার জন্য ভিড়ে ও মোডক যেখানে বসিয়াছিলেন সেইখানে গিয়া, পণ্ডিতা মহিলা সম্বন্ধে সমস্ত জিজ্ঞাসা করিয়া লইলাম। তাঁহারা বলিলেন, "পণ্ডিতা-বাই কি কোন পর-দেশী—তিনি আমাদেরই কোঙ্কনস্থ মহিলা। আমরা সবাই তাঁকে আহ্বান করিয়াছি। তিনি এই বাড়ীতেই আসিয়া উঠিবেন এইরূপ মনস্থ করিয়াছেন। তিনি একজন দুর্দ্দশাগ্রস্ত মহিলা, তোমরা আসিয়া তাঁহার সমাচার লইলে ভাল হয়। তিনি নিকটেই আসিয়া উঠিবেন শুনিয়া আমাদের আনন্দ হইল এবং আমরা তাঁহার পথ চাহিয়া রহিলাম। তদনুসারে চার পাঁচ দিনের মধ্যে তিনি অভ্যঙ্কারের বাড়ীতে আসিয়া উঠিলেন, তাঁহার সঙ্গে তাঁহার পাতানো-ভাই এক গরীব বাঙ্গালী বাবু ছিলেন ও তাঁহার ছয় বৎসরের মনোরমা নামে এক মেয়ে ছিল। তিনি আসিলে পর, এক এক সময়ে আমরা সকল মহিলাই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম।

প্রায় সেই সময়েই, জেলা-ভ্রমণের পর আমার স্বামী পুণায় আসিলেন এবং পণ্ডিতা বাইর পুরাণপাঠ প্রথমে আমাদের বাড়ীতেই হইল। সেখান হইতে, প্রতি সপ্তাহে এক এক বাড়ীতে পুরাণ পাঠ হইবে এইরূপ স্থির হওয়ায় যেখানেই পুরাণ পাঠ হইত সেইখানেই আমি যাইতে লাগিলাম। পণ্ডিতা রমা-বাইর উপর আমাদের

বাড়ীর মেয়েদের রাগ হইবার প্রথমে ইহাই কারণ হইল। আমাদের বাড়ীতে অনেক রমণী থাকায়, দুপর বেলায় আমাদের বাড়ীতে সুতা বাহির করিয়া ভিন্ন ভিন্ন রকমের লক্ষ পল্‌তে তৈরি করা হইত আমাদের বাড়ীতে একটা কারখানা কিম্বা তুলার কল চলিত বলিলেও হয়। সেইজন্য পাড়ায় পরিচিত রমণীরা আপনাদের কাপড় লইয়া কিংবা শুধু বসিয়া গল্প করিতেও আসিত। এবং ভিন্ন ভিন্ন রমণীদের নিকট হইতে সহরের সত্য ও মিথ্যা বিবিধ সংবাদ আমাদের মেয়েদের কাণে আসায়, তাহাদের খুবই আমোদ হইত। আজকাল পণ্ডিতা রমা-বাইর আগমন খুব একটা চর্চ্চার বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার সম্বন্ধে প্রত্যেকে সত্য মিথ্যা ভাল মন্দ যাহা মনে হইত সেইরূপ গল্পগুজব ও মিথ্যা রটনা করিত। এবং এই সব গল্প দুই-চারদিনের মধ্যেই আমাদের বাড়ীর বড় মেয়েদের নিকট আসিয়া পৌঁছিল। তাহার পর, আন্দোলন ও চর্চ্চার আর সীমা রহিল না। তাহাতে আবার আমাদের উভয়ের টান সেইদিকে থাকায়, তাঁহার নাম করিয়া আমাদের নামেও ঘোঁট করিবার ও যা খুসি বলিবার আমাদের বাড়ীর মেয়েদের বেশ সুযোগ হইল, তাঁহারা এমন সুযোগ ছাড়িলেন না। পণ্ডিতা-বাই সম্বন্ধে দিনকে-দিন তাঁহারা বেশী বেশী টিট্‌কারী সুরু করিয়া দিলেন—'সে অপবিত্র, সে আমাদের বাড়ী আসিলে, তাকে ছুঁইয়া আমাদের ছুঁইও না, তোমার ভাল লাগে তুমি তাকে গলায় বেঁধে রাখো; কিন্তু আমাদের নিকট এই ভ্রষ্টাচার চলিবে না। মৃত পিতা, সুন্দর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিবাহ দিলেও, সে বাঙ্গালী বাবুকে আবার বিবাহ করিয়া দেহকে কলুষিত করিয়াছে। ভাল, আবার সংসার করিল কেন? শুধু তা না। সমস্ত ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, এখন সে জগৎকে কলুষিত করিতে আসিয়াছে!' ইত্যাদি খুব টিট্‌কারী দিয়া বলিত।

আমার স্বামীর কথা-অনুসারে আমি পণ্ডিতা-বাইর নিকট এক একদিন জেরা করিবার জন্য যাইতে লাগিলাম। সহজভাবে তিনি বলিলেন যে, "আমি সম্প্রতি হাওয়ার্ডের দ্বিতীয় ভাগ শিখিতেছিলাম, কিন্তু এখানে আসিয়া অবধি শিক্ষার সুবিধা হয় নাই।" আমি বলিলাম, "আমিও কিছু কিছু শিখিতেছি। আজ পর্য্যন্ত আমার স্বামীই শিক্ষা দিতেছিলেন, কিন্তু সম্প্রতি জেলা ভ্রমণে তাঁহার যাইতে হইতেছে এবং আমার শিক্ষা বন্ধ না হয় সেইজন্য মিশনের এক মেমকে আমার শিক্ষার জন্য নিযুক্ত করিয়াছেন। তিনি আমাকে শিখাইতে আসেন। তোমার ইচ্ছা হইলে তুমিও তাঁহার নিকট শিক্ষার জন্য এখানে আসিতে পার।" এই কথা তাঁর মনোমত হইল এবং দুই তিন দিনের মধ্যেই তিনি আমাদের বাড়ী শিক্ষার জন্য আসিতে লাগিলেন। পূর্ব্ব হইতেই আমাদের মেয়েরা এই মহিলা সম্বন্ধে টিটকারী সুরু করিয়াছিলেন; এই অবস্থায় তিনি আমাদের বাড়ী আসিতে লাগিলেন। তিনি আমার সহিত হাস্যালাপ করিতেন এবং আমাকে বন্ধুভাবে ভাল বাসিতেন; বাড়ীর মেয়েদের ইহা ভাল লাগিল না। পরে, আমাদের যে সভা ছিল তাহার সহিত সংযুক্ত করিয়া পণ্ডিতা-বাই আর এক নূতন সভা স্থাপন করিলেন, এবং তাহার "আর্য্য-মহিলা সভা" নাম দিলেন। পূর্ব্বে আমাদের সভা শুধু দশ বারো মহিলার সভা ছিল বলিয়া উহার কোন নাম ছিল না, নামডাকও ছিল না, সেইজন্য আমাদের বাড়ীর মধ্যেও অজ্ঞাত ছিল। কিন্তু এখনকার সভায় অনেক মহিলা ও পুরুষের সহানুভূতি থাকায় প্রতি শনিবারে অনেক লোক জমা হইতে লাগিল। তাহাতে মুখ্যরূপে পণ্ডিতা-বাই-ই বিভিন্ন বিষয়ের উপর বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। পণ্ডিতা বাইর বাণী যেমন অস্খলিত ও মধুর, তাঁর বিষয় প্রতিপাদনের রীতিও তেমনি উত্তম। বলিবার সময়, শ্রোতাদিগের মনকে আপন ভাষার দিকে আকর্ষণ করিবার তাঁহার বিলক্ষণ ক্ষমতা ছিল। এই চার গুণই তাঁহাতে থাকায় সহরের সমস্ত প্রাচীন ও নবীন স্ত্রীশিক্ষণেচ্ছু বিদ্বানদিগের পণ্ডিতা বাই সম্বন্ধে কৌতুক ও শ্রদ্ধা জন্মিতে লাগিল এবং প্রতি শনিবারের সভায় নিজের বাড়ীর মহিলা ও মেয়েদিগকে তাঁহারা নিয়মিতরূপে পাঠাইতে লাগিলেন। তাছাড়া, পণ্ডিতাবাইর কথকতা সহরে সুরু হইয়াছিল।

কথকতা হইলে আমি প্রত্যেক কথকতাতেই প্রায় যাইতাম। তাছাড়া প্রতি শনিবারে প্রকাশ্যভাবে পণ্ডিতা-বাইর সভায় যাইতে লাগিলাম। আমাদের বাড়ীর মেয়েরা এবং যারা গল্প করিতে আসিত; সেই মেয়েরা রোজ নূতন নূতন গল্পগুজব করিতেন। পণ্ডিতা রমা-বাই সভা করিয়াছেন, পুরুষদের উপর তাঁর কটাক্ষ আছে, মেয়েরা পুরুষদের অধীনে কেন চলিবে? পুরুষেরা স্ত্রীলোকের প্রতি দাসবৎ ব্যবহার করে, তাদের পরোয়া করে না; চব্বিশ ঘণ্টা স্ত্রীলোকেরা গরুর মতো খাটে; পুরুষ বাড়ী আসিবামাত্র তাদের স্নানের জন্য জল ঢালিয়া দিবে; তৈয়ারী খাদ্যদ্রব্য পরিবেশন করিবে। খাটিয়া খুটিয়া আমাদের দম বাহির হইয়া গেলেও তার দিকে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া আপন স্বামীর হাত পা টিপিয়া দিবে। এত করিয়াও একটু কিছু ত্রুটি হলেই অমনি লাথি কিল! এমন যে অত্যাচারী পুরুষ তাদের অধীনে তোমরা না থাকিয়া স্বাধীন হও—ইত্যাদি আপন ধারণা অনুসারে ও বুদ্ধি অনুসারে, নানা

খবর সেই মেয়েরা আমার শাশুড়ীর নিকট, ননদের নিকট আসিয়া বলিত। আমাদের বাড়ীর সব মেয়েদের মধ্যে আমার ননদ বোঝদার ছিলেন, শিক্ষার মূল্য তিনি জানিতেন; তবু কিন্তু একবার যে পক্ষ নিতেন তাহা ছাড়িতেন না এইরূপ তাঁহার স্বভাব হওয়ায় এবং যাহা কিছু পুরাতন তাহাই ভাল এইরূপ একবার তাঁহার মনে ধারণা হইলে, তিনি সেই অভিমানের বশীভূত হইয়া পড়িতেন। নিজের মতের সঙ্গে যতক্ষণ না কোন কথা মেলে, ততক্ষণ তিনি নিজের কথাই ধরিয়া থাকেন, কিছুতেই ছাড়েন না; তার পর, সেই বিষয় সম্বন্ধে স্বামী স্ত্রীর যতই কষ্ট হোক্ না কেন, সে বিষয়ে ভ্রুক্ষেপ নাই, এইরূপ তাঁর স্বভাব ছিল। এই কথা আমি নিত্য শুনিতাম যে,—"আমার সভায় যাওয়া উচিত নয়, পণ্ডিতাণাই আমাদের বাড়ী আসিলে তাঁকে ছুঁইতে নাই, পুরুষরা বলিলেও তাঁদের কথা শুনিতে নাই; মুখে "না" বলিবে না, কিন্তু কাজে না করিলেই হইল; তাহারা আপনারাই শেষে বিরক্ত হইয়া তাহাদের জেদ ছাড়িয়া দিবে; তোর বাপের বাড়ীর লোকেরা বনিয়াদি ও উচ্চ-বংশের, তোর এ ঢং তাঁদের কি ভাল লাগিবে? তোর মা ও বাপ কত বড় চালের লোক। তাঁদের দেখিলেও মনে সন্তোষ হয়। তাঁহাদের বাড়ীতে মারাঠী শিক্ষা দিবারই রীতি নাই ত ইংরেজি শিক্ষা। কিন্তু তোর সেই মেমের উপর টান!" এই ধরণে আমার ননদ ও শাশুড়ী স্নেহের ভাবে আমাকে কাছে বসাইয়া নানারকম শিক্ষা দিবার প্রযত্ন করিতেন। তাঁরা যখন বলিতেন তখন তাঁহাদের সমস্ত কথা ঠিক বলিয়া আমার মনে হইত; এবং তাঁরা যেরূপ বলিতেছেন সেই অনুসারেই আমি চলিব, এইরূপ মনে মনে বিচারও করিতাম; এবং তাঁরা জিজ্ঞাসা করিলে তার উত্তরে, মুখে আমি "হাঁ, হাঁ" করিতাম, কিন্তু সময় উপস্থিত হইলে কাজে তাহা করিতাম না। কারণ আমার স্বামীর যাহা মনোমত, তাহা যাহাই হউক না, আমার করিতে হইবে; নৈলে তিনি রাগ করিবেন,—এই কথা আমি ঠিক জানিতাম বলিয়া, আমার স্বামী যাহা করা উচিত মনে করিতেন তাহা আমি করিতে ভুলিতাম না। যিনি আমার সুখ ও শান্তির একমাত্র স্থান তাঁহা হইতে দূরে যাওয়া উচিত নয় এবং এই এক শান্তির দিক বলবৎ থাকিলে অন্য কোন লোকের নিকট হইতে কষ্ট যন্ত্রণা পাইলে তাহা সহ্য করিবার অধিক বল পাইব, এইরূপ আমার দৃঢ় ধারণা ছিল। যেরূপ আট মাসের গ্রীষ্মকাল ও এক দিবসের বর্ষা—সেইরূপ বাড়ীর অন্য আত্মীয় হইতে আমার স্বামীর ব্যবহার পৃথক ছিল। সেইজন্য বাড়ীর মেয়েদের কথায় কোন উত্তর না দিয়া এবং আর কাহাকেও ভালমন্দ কিছু না বলিয়া আমার স্বামী যাহা ভাল বাসিতেন, নীরবে তাহা করিবার দিকে আমার সমস্ত মনের গতি ছিল।

"উনি" বাড়ীর কোন বিষয়েরই খোঁজখবর রাখিতেন না এবং সে সম্বন্ধে কিছুই বলিতেনও না। 'অমুক প্রকারের আচরণ আমার পছন্দসই, আমাদের মেয়েরা কিংবা তুমি অমুক প্রকারে চলিবে, এ বিষয় আমার মনোমত নহে, তুমি তাহা করিও না' প্রভৃতি প্রভুর ধরণে অহমিকাসূচক শব্দ কখনও তিনি মুখে আনিতেন না, এইরূপ তাঁর নিয়ম ছিল। কিন্তু, আমার নিজের লোককে (আমাকে) কোন কথা বলিব না, সে তাহার নিজের যাহা মত সেই অনুসারেই সে চলিবে, এইরূপ আমার স্বামীর মনের ভাব ছিল। তাহা জানিয়া আমি সেই অনুসারে চলিতাম বলিয়া আমাদের বাড়ীর বড় মেয়েরা আমার উপর খুব রাগ করিতেন, চটিয়া যাইতেন। তাঁহারা ও বিশেষতঃ আমার ননদ বলিতেন যে, "সভায় যাইয়া বেহায়ামি করা ওরই কাজ। দাদার (আমার স্বামী) ওতে তেমন আগ্রহ নাই; "ইহা কর, উহা কর" এইরূপ পুরুষদের তো বলিবার রীতিই আছে, কিন্তু মেয়েরা তাহার কতটা শুনিবে তাহার কি কোন তারতম্য নাই? পুরুষেরা একশো কথা বলিলে বড় জোর তারা দশটা শুনিতে পারে। ব্যবহারের ছোটখাটো সূক্ষ্ম বিষয় সম্বন্ধে পুরুষেরা কি বুঝিবে? মেয়েদের শিক্ষা দিতে দাদা খুব ভাল বাসেন তা আমারও জানা আছে। ছুটির সময় কোহ্লাপুরে আসিয়া দাদা আমাকে লিখিতে ও পড়িতে শিখাইয়াছিলেন। পুঁথি পুস্তক পড়িতে পারিলেই হইল, তাহার বেশী কিছু শিক্ষা করায় মেয়েদের কি প্রয়োজন? দাদার এই একটা বাতিক, আমার প্রথম বৌদিদির শিক্ষার সম্বন্ধেও তাঁর কত আগ্রহ ও চেষ্টা ছিল; কিন্তু বৌদিদি বড় ভাল মানুষ ছিলেন। আমরা যতই রাগ করি না কেন, তিনি সব সহ্য করিতেন। কিন্তু সে ভাল মানুষ এমন বেহায়াপনা কখনও করে নি ও পুরোনো রীতিও ছাড়ে নি। তাই আমরা ২৫ জন লোক মানে মানে দিন কাটিয়েছি। আমি ঘরের কর্ত্রী এরূপ অভিমান তার শরীরে একটুও প্রবেশ করে নি। জাগিরদারের মেয়ে না হলেও, তিনি কিছু আর ভিখারিণীও ছিলেন না; ভাল বংশেরই লোক ছিলেন; স্বভাবও শান্ত ছিল। এখন যা দেখি সবই অন্য রকম! দাদা যদি একটা করতে বলেন ইনি তিনটে করতে বসেন। এইরূপ স্থলে আমাদের মান থাকবে কি করে? আমরা টিকবই বা কেমন করে? এদিকে, আমরা রাগ করে যতই বলি না কেন, সে রাগ করে না। গোঙার মতন চুপটি করে শুনে যায়। কিন্তু

কাজের বেলায় করতে ভোলে না। আমাদের কথা সহ্য করে' ফল হল কি"? এইরূপ ধরণের কথা নিত্যই বলিতেন।

এই প্রকারে ৭।৮ মাস কাটিয়া গেল। তার পর "উনি" দুই জেলা ভ্রমণের কাজ শেষ করিয়া আফিস-সমেত বাড়ী আসিলেন। এখন বর্ষাকালে পুণাতেই থাকিতে হইবে, উপরের তলায় আফিস্‌ও করিব। বাহিরে যাইবার কোন কাজও নাই; এইরূপ উহাঁকে বলিতে শুনিয়া আমার খুবই আনন্দ হইল। উনি একলাই উপরের তলায় বসিতেন। কাজের জন্য সেই খানেই শিরস্তেদার কিংবা কোন কেরাণী যাওয়া-আসা করিত। এক সিপাহি মাত্র এই উপর-তলায় পহারা দিত। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর ও তিন প্রহরের সময় টাট্‌কা ফল, বাদাম পেস্তা খাওয়া ওঁর অভ্যাস ছিল; এবং তাহা ঐ সময়ে তাঁহার নিকট আমারই লইয়া যাইতে হইত। যে দিন শনিবার পড়িত সেই দিন দুইটা হইতে উনি আমাকে তাগিদ দিয়া বলিতেন;—"দেখ, তোমার সভায় যেতে হবে; আজ শনিবার; সেটা তোমার মনে নাই কি? সময়টা ভুলো না; কিংবা নীচে কোন কাজ করতে বলেছে, এরকম কোন কারণ বল্লে আমার কাছে চল্‌বে না; কোন নিয়মিত কাজে অমনোযোগী হবে না। তার জন্য প্রথমে একটু কষ্ট হবেই; তা সহ্য করতে হবে। এই প্রকার ওঁর বলিবার পর, আমি তৎক্ষণাৎ নীচে গিয়া, পাছে সময়ের ভুল হয়, সময় হইবামাত্রই আমি যাইবার সময় মুঠোর ভিতর প্রাণটা ধরিয়া, ভয়ে ভয়ে ননদকে "এখনি আস্‌ছি" বলিয়া, ননদ কি বলিবেন তাহার অপেক্ষা না করিয়াই, একেবারে বাহির হইয়া পড়িতাম। সন্ধ্যাকালে বাড়ী আসিলে, আমার কত কষ্ট সহ্য করিতে হইবে, ইহা আমার সততই মনে জাগিতে থাকায়, সেই চিন্তা করিতে করিতে, সভার বাড়ীতে পৌঁছোনো পর্য্যন্ত, আমার মন বড়ই উদ্‌বিগ্ন থাকিত। কিন্তু চিরপরিচিত মহিলাদের মধ্যে যাইবামাত্র তাঁহাদের সহিত হাস্যালাপ করিয়া, এবং আমার উপর যে কাজের ভার ছিল সেই কাজের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া, সে সমস্ত ভুলিয়া যাইতাম; কিন্তু আবার বাড়ী ফিরিয়া আসিলে, সভার আনন্দ ও সেই প্রগল্‌ভতা বিলুপ্ত হইয়া যাইত; আমি ভীরুর ন্যায় মাঝ-ঘরে দাঁড়াইয়া থাকিতাম। কারণ সন্ধ্যাকালে, দিদিশাশুড়ী ও ননদ ইহাদের এই মাঝ-ঘরের বারণ্ডাতেই বসিবার আড্ডা ছিল। সেই জন্য আমি বাড়ী আসিলে প্রথমেই তাঁহাদের নজরে পড়িতাম। আমার দিদিশাশুড়ী ও ননদ একবার বকিতে আরম্ভ করিলে আর কাহারও তক্কা রাখিতেন না। তাহাতে আবার, এই সন্ধ্যাবেলায় বাড়ীতে পুরুষ কেহই থাকিত না, সেই জন্য তাঁহাদের আরও সুবিধা হইত। "উনি" আসিলেই সব বন্ধ হইয়া যাইত। কেবল আমাকে এই কড়া তাগিদ হইত যে, "তুমি সভা থেকে এসেছ কাপড় ছেড়েছ, তাহলেও আমাদের বাড়ী রান্নাঘরে অন্ন পরিবেশন করতে পারবে না। চাট্‌নী কোশিশির, কিংবা রান্নার মশ্‌লা পর্য্যন্ত ছুঁতে পারবে না। সভায় যাওয়া মেয়েদের এ-রকম ছোট কাজ করা উচিতই না। উপরে গিয়ে পুরুষের (স্বামীর) সঙ্গে ঘেঁসাঘেঁসি করে বস্‌লেই বেশ শোভা হবে!" সকাল দুপর ও সন্ধ্যাকালে যখনই সুযোগ হইত, এই রকম কিংবা ইহারও বেশী বোল-চাল চলিত। বাড়ীর অন্য আত্মীয় মেয়ে ছাড়া, বাদরায়ণ রীতি-অনুসারে আরও ৫।৭ জন মেয়ে থাকিত। তাহারা আমাদের বাড়ীর বড় মেয়েদের কথার প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ ভাবে "হুঁ দিয়া সাহায্য করিত। তবু আমি তাহাদের কথার কোন উত্তর দিতাম না। কারণ, সেই অর্থের অনর্থ করিয়া ও মিথ্যা করিয়া বলিয়া আমাদের বাড়ীর মেয়েদের মন যোগাইতে পারিলে উহাদের প্রতিপত্তি বাড়িবে। তাই আমি কাহাকে কিছুই বলিব না, এইরূপ নিশ্চয় করিলাম। বড় জোর নীচে গিয়া আপন মনে চোখের জল ফেলিয়া মনের অসহ্য ভার হাল্‌কা করিব, এই উপায়ই আমার জানা ছিল। এইরূপ শনিবারের রাত্রি হইতে ২।৪ দিন পর্য্যন্ত এই মেয়েদের সহিত আমি কথা কহিতাম না। তবু টিট্‌কারির বোল্‌-চাল মধ্যে মধ্যে আমার কানে আসিত। এইরূপ ভাবে চলিলে, বৃহস্পতিবারে "কোথায় আমার কাপড়? ঘোল তৈরি কর, রান্নার মসলা বের কর, অন্ন পরিবেশন কর" প্রভৃতি কাজ ননদ আবার বলিতে আরম্ভ করায়, আপন দল হইতে বহিষ্কৃত লোককে পুনরায় আপন দলে গ্রহণ করিবার মতো আমার আনন্দ হইত এবং যাহা তাঁহারা বলিতেন তখনি আমি তাহা উল্লাস ও তৎপরতার সহিত করিতাম। এইরূপ আনন্দে দিন যাইতে না যাইতে, সেই শনিবার মহাশয় আবার আসিয়া উপস্থিত। এইরূপ মিশ্র সুখে এক বৎসর কাটিল। সেই সময়ে আমার ইংরেজি শিক্ষাটা বেশ এগাইয়া গিয়াছিল। মিস্‌ হরফর্ডের সহবাসে দুই চারিটা ইংরেজি কথা চলিত-ব্যবহারের মতো যখন বলিতে শিখিলাম, তখন হরফর্ডকে বিদায় দিলাম। (ক্রমশঃ)

ভাষার উৎপত্তি।

(রায় বাহাদুর শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহ বিদ্যার্ণব, এম-এ)

(পূর্ব্ব প্রকাশের অনুবৃত্তি)

প্রথমত সাঙ্কেতিক চিহ্ন, তদনন্তর সাঙ্কেতিক চিহ্ন ও স্বরের সংমিশ্রণ দ্বারা মনোভাব ব্যক্ত করার

অবস্থায় উপনীত হওয়ার পর বিশেষ বিশেষ স্বরের সহিত বিশেষ পদার্থ ও কার্য্যের অর্থ সংবদ্ধ করিয়া শব্দ সকলের সৃষ্টি করা তেমন কষ্টসাধ্য ব্যাপার নহে। আত্মরক্ষার আদি সংগ্রাম অবস্থায় নির্য্যাতনই মানবকে এই উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য করিয়াছিল। মাঠ কিম্বা প্রান্তর, যেখানে দৃষ্টিশক্তিকে বাধা দিবার কিছু থাকে না, তথায় সাঙ্কেতিক চিহ্ন দ্বারা ভাববিনিময় চলিতে পারে, কিন্তু নিবিড় কাননে অবস্থান কালে সাধারণতঃ এরূপ সাঙ্কেতিক ভাষা বিশেষ কোন কার্য্যে লাগিতে পারে না। মনে করুন, তাৎকালিক অসভ্য পুরুষ বনের এক প্রান্তে ও তাহার স্ত্রী অপর প্রান্তে কার্য্যব্যপদেশে গমন করিয়াছে। তাহার স্ত্রীকে কোন বিষয় জানাইতে হইলে সঙ্কেতে চলিবে না, চীৎকার করিয়া উচ্চৈস্বরে তাহার নিকট মনোভাব ব্যক্ত করিতে হইবে। তেমনি রাত্রি যখন গভীর তমসাচ্ছন্ন, তখন একস্থানে অবস্থান করিলেও সাঙ্কেতিক চিহ্নের পরিবর্ত্তে তাহাদিগকে ফিস্ ফিস্ শব্দের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। স্বরের তারতম্য দ্বারা এই রূপ গর্জ্জন ও ফিস্ ফিস্ শব্দের মধ্যেই বিভিন্ন অর্থসূচক বিভিন্নভাব সন্নিবিষ্ট থাকিবে। এই অরণ্যবাসী স্ত্রীপুরুষ যে সকল অবস্থা দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করিতেছিল তাহার মধ্যে যে পদার্থ যে শব্দের উৎপত্তির হেতু, সেই শব্দ কর্ণবিবরে প্রবেশ মাত্রই সঙ্গে সঙ্গে সেই পদার্থেরও অবয়ব মানসপটে অঙ্কিত হওয়া অনিবার্য্য। অরণ্যভূমি বিকম্পিত করিয়া অদূরে সিংহ গর্জ্জন করিতেছে ইহা তাহার শ্রুতিগোচর হইল, কিম্বা রজনীতে গিরিকন্দরে শুষ্কপত্র বিস্তার করিয়া সে বিশ্রাম সম্ভোগ করিতে ছিল তখন অদূরে সর্পের ফিস্ ফিস্ তাহার নিদ্রাভঙ্গ করিল। সিংহের গর্জ্জনের অনুকরণদ্বারা সে তাহার স্ত্রীর নিকট সিংহের আগমন বার্ত্তা জ্ঞাপন করিবে। তদ্রূপ উপায় অবলম্বন দ্বারা নিকটে সর্প রহিয়াছে তাহাও জানাইবে। এই প্রকারে স্রোতস্বিনীর কলকল, পাখীর কূজন প্রভৃতি বিভিন্ন স্বর, যাহা তাহাদের ঐ ক্ষুদ্র রাজ্যের চতুর্দ্দিকে তাহাদের কর্ণপথে পতিত হইতেছে তাহার প্রত্যেকটি শব্দেরই নামকরণ কার্য্য সাধিত হইয়া বিভিন্ন শব্দের সৃষ্টি হইবে।

এইরূপ নামকরণ ক্রিয়া যে স্বাভাবিক, শিশুর নামকরণ তাহার বিশেষ প্রমাণ। শিশু শ্রবণশক্তির সাহায্যে পদার্থের নাম সকল শিক্ষা করিয়া থাকে। এরূপ শিক্ষা অবশ্য আয়াসসাধ্য ব্যাপার; কিন্তু যে স্থলে প্রত্যক্ষভাবে পদার্থ হইতে ইহার নামকরণের সুবিধা হয় সে স্থলে জনকজননী ঐ পদার্থকে যে নামে অভিহিত করিবার শিক্ষা প্রদান করেন তাহা উপেক্ষা করিয়া সে স্বরচিত নামেই তাহাকে ডাকিতে থাকে। দৃষ্টান্ত—শিশু বিড়ালকে বিড়াল না বলিয়া মিউ মিউ বলে, ঘড়িকে ঘড়ি না বলিয়া টিক টিক বলে, কুক্কুরকে বলে ঘেউ ঘেউ, Engineকে পফ্ পফ্ বলে ইত্যাদি।

এইরূপ স্বরসংসৃষ্ট শব্দের দ্বারা প্রত্যেক ভাষারই কলেবর কতকটা পরিপুষ্ট তাহা ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ (Philologists) পরিজ্ঞাত আছেন। অবশ্য স্বরের অনুকরণে শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া যে প্রত্যেক শব্দেই একথা প্রযোজ্য তাহা নহে। পৃথিবীতে যত স্বর আছে, তাহা অপেক্ষা শব্দের সংখ্যা অনেক বেশী, এমন কি অনেক স্থলে স্বরের সাহায্যে পদার্থের নামকরণ সম্ভবপর থাকিলেও গভীর জ্ঞানগর্ভ অর্থবাচক স্বরসম্পর্কবিহীন শব্দ দ্বারা ঐ সকল পদার্থ অভিহিত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত—যেমন ঘড়ি, ইহাকে বাঙ্গালাতে ঘটিকা যন্ত্রই বলি কিম্বা ইংরাজিতে watchই বলি এই দুইয়ের কোনটি শব্দেরই টিক টিক স্বরের সহিত সম্পর্ক নাই। watch শব্দ watchman (পাহারাওয়ালা) শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। প্রত্যেক পাহারাওয়ালাকেই নির্দ্দিষ্ট সময় পাহারার কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হয়। সুতরাং watchman শব্দ সময়ার্থসূচক। ঘটিকা যন্ত্র নাম হইতেই ইহা যে সময়ের পরিচায়ক তাহা বেশ বুঝা যায়। তদ্রূপ Engine শব্দ Latin Inginium শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; অর্থ ইহার genius অর্থাৎ প্রতিভার সৃষ্টি। মানবমনের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাশক্তি যতই গভীরতা লাভ করিয়াছে ততই নূতন নূতন নামকরণগুলির গতি অন্তর্মুখী হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগের সৃষ্ট প্রায় সমুদয় নূতন শব্দই এইরূপ গভীর অর্থব্যঞ্জক। স্বরের সঙ্গে ইহাদিগের বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই। শব্দসৃষ্টির

রহস্য যে এখানেই ভেদ হইল একথাও বলিতে পারা যায় না ; কারণ স্বরের সহিত কোন যোগ নাই অথচ অতি প্রাচীনকালে ভাষায় স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে এ প্রকার শব্দের সংখ্যাও ত নিতান্ত কম নহে।

কিরূপে এই সকল শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে ভাষা তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত হইতে পারিতেছেন না।

মানব কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে পর যে সকল পদার্থ অহর্নিশি তাহার দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিতেছিল তাহার তুলনায় তাহার পরিচিত স্বরের সংখ্যা অতি অল্প হওয়াই স্বাভাবিক। সুতরাং বাধ্য হইয়া তাহাকে কোন কোন শব্দ একাধিক অর্থে ব্যবহার করিতে হইয়াছিল। ইহাতেও যখন কুলাইয়া উঠিল না তখন এমন সব নাম দ্বারা কার্য্য কিম্বা পদার্থকে নির্দ্দেশ করিতে হইয়াছিল যাহার সঙ্গে শব্দের কোন সাদৃশ্য নাই। শিশু সমাজ যতই সভ্যতার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল ততই নূতন নূতন অবস্থায় পরিবেষ্টিত হইয়া নূতন নূতন শব্দের সৃষ্টি ও তদ্দ্বারা নব নব ভাব ও পদার্থের নামকরণ আবশ্যক হইয়া উঠিল। সম্ভবতঃ এই সকল কারণ বশতঃই ভাষাতত্ত্ববিদদিগের এত চেষ্টা ও প্রযত্ন-সত্ত্বেও এই সকল শব্দের কুল ও শীলের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না।

বিশেষ অর্থের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া যে অনেক শব্দের নামকরণ হইতেছে তাহার দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান সময়েও শিশু এবং অসভ্য জীবনে বিরল নহে। উভয়ই মানবজীবনের প্রথম অবস্থার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। শিশুরা অনেক সময় পদার্থের কি প্রকার আজগুবি নাম দিয়া থাকে তাহা সকলেই অবগত আছেন। যাঁহারা মধ্য আফ্রিকার পূর্ব্ব-প্রান্তে উপনিবেশ স্থাপনের প্রথম পথপ্রদর্শক, তাঁহাদিগের অন্যতর Mr. John Muir এ সম্বন্ধে একটি কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। ঐ দেশবাসী অসভ্যগণ জলের মধ্যে প্রতিবিম্বকে Mandala নামে অভিহিত করিয়া থাকে ; Muir সাহেব চশমা ব্যবহার করিতেন, তাঁহাকেও তাহারা Mandala আখ্যা প্রদান করিয়াছিল। ক্রমে শুধু Muir সাহেব নহে চশমারও ঐ নামকরণ হইল। অবশেষে সভ্যতার অনেক বৃদ্ধি সহকারে কাচের গ্লাস ঐ প্রদেশে প্রবেশ লাভ করিলে তাহাও ঐ নামে অভিহিত হইতে লাগিল। বালকদিগের হাডু-ডুডু খেলায় কিম্বা ক্রীড়াচ্ছলে দস্যুবৃত্তির অনুকরণ কার্য্যে সর্ব্বদাই ত সাঙ্কেতিক শব্দের সৃষ্টি হইতেছে। ডাকাইতদিগের মধ্যে এ প্রকার সাঙ্কেতিক ভাষা প্রচলিত আছে। এমন কি যুদ্ধ বিগ্রহ, রাজকার্য্য শাসন প্রণালীর মধ্যেও এই স্বেচ্ছাধীন অর্থ সংযুক্ত শব্দনিচয়, cypher code নামে কি নিয়তই ব্যবহৃত হইতেছে না ?

যখন কি অসভ্য কি সভ্য প্রত্যেক ব্যক্তি এবং বালকেরই নূতন শব্দ সৃষ্টির অধিকার ও ক্ষমতা রহিয়াছে তখন কিরূপে আশা করিতে পারা যায় যে প্রত্যেক শব্দেরই ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত রহিয়াছে এবং তাহার অনুসরণ করিয়া তাহার মূল নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এক দেশের অধিবাসী পরস্পর নিকটবর্ত্তী বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত অসভ্য জাতির ভাষার মধ্যে একই পদার্থের অর্থজ্ঞাপক এমন সকল শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় যাহার মধ্যে স্বর কিম্বা উচ্চারণগত অথবা অন্য কোন প্রকার সাদৃশ্য নাই।

Dr. Whitney উত্তর আমেরিকার আদিম অধিবাসী অসভ্যদিগের ভাষাগত এই প্রকার অসদৃশ শব্দসকলের পর্য্যালোচনা করিতে গিয়া বলিতে-ছেন যে বরঞ্চ ইংরেজী ও হংগেরী ভাষার মধ্যে সমন্বয় সংস্থাপন সম্ভবপর, এই লোহিতবর্ণ অসভ্য-দিগের ভাষা সম্বন্ধে তদ্রূপ চেষ্টার ফল সুদূর-পরাহত। এতদ্ সম্বন্ধে Dr. Hale একটী কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা এই রহস্যপূর্ণ প্রশ্নের মীমাংসা করিয়াছে এ কথা বলিতে না পারিলেও ইহার মধ্যে কতক পরিমাণে সত্য নিহিত থাকা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। তিনি মনে করেন, সম্ভবত কোন অসভ্য যুদ্ধকালে দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সপরিবারে নিবিড় অরণ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, তথায় শত্রুর তীক্ষ্ণ শরাঘাত পিতার প্রাণ হরণ করে, মাতা বন্দিনী অবস্থায় শত্রুশিবিরে প্রেরিত হন, অপরিণতবয়স্ক শিশুসন্তানদিগকে জীবনধারণের জন্য বাধ্য হইয়া একমাত্র কন্দমূলের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। এইরূপ অবস্থায়

জনকজননী ভাইভগিনী গৃহ গো মহিষ জল অগ্নি প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় যে কয়েকটি শব্দ কেবল তাহাই ইহাদের জানা সম্ভব। কালসহকারে শিশুগণ বয়োবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে এবং তাহাদিগের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের সমাগমে বংশবৃদ্ধি হইয়া একটি ক্ষুদ্র জাতির tribe সৃষ্টি হইলে অবস্থার প্রেরণায় তাহাদিগকে অনেক নূতন শব্দের সৃষ্টি করিতে হইয়াছিল। এইরূপে যে ভাষার উৎপত্তি হইবে, তাহার অধিকাংশ শব্দের সঙ্গে পার্শ্ববর্ত্তী জাতিনিচয়ের ভাষার সৌসাদৃশ্য না থাকারই কথা। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে সকল স্থানে জীবনধারণ কার্য্য অনায়াসলব্ধ সেই সকল প্রদেশে এই প্রকার জাতির সংখ্যা অধিক। Dr. Hale এইরূপে ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতেছেন:—

'শিকারীজীবনের অনিশ্চয়তা নিবন্ধন যদি কোনও কারণে অকস্মাৎ পিতামাতার মৃত্যু ঘটে তাহা হইলে অসহায় শিশুদিগের জীবনধারণ স্বভাবতই বৎসরব্যাপী আহার্য্যের সহজলভ্যতা ও জল বায়ুর শীতোষ্ণতার উপর নির্ভর করে। এরূপ অসহায় অবস্থায় পড়িলে প্রাচীন য়ুরোপে দশ বৎসরের ন্যূনবয়স্ক শিশুদিগের পক্ষে শীতঋতুর করাল কবল হইতে উদ্ধার লাভ করা একপ্রকার অসম্ভব ব্যাপার ছিল, সুতরাং য়ুরোপে ৪ কিম্বা ৫টি মাত্র মূল ভাষা লক্ষিত হওয়া কিছুমাত্র বিস্ময়কর ব্যাপার নহে। উত্তর আমেরিকার রকিপর্ব্বতের পূর্ব্ব ও উত্তরায়নান্ত বৃত্তের উত্তরস্থ প্রদেশ সম্বন্ধেও এই একই কথা প্রযোজ্য। ফলতঃ তথায়ও মূল ভাষার সংখ্যা নিতান্ত কম। কিন্তু কালিফর্ণিয়া দেশ বস্তুতই প্রকৃতির স্নিগ্ধমধুরভাবের লীলাক্ষেত্র—তথায় বরফ কিম্বা তুষারপাতের উপদ্রব নাই, আকাশমণ্ডল পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন; বৎসরের মধ্যে সাত মাস কাল বৃষ্টির সঙ্গে দেখা থাকে না অথচ শস্যের উৎপাদনোপযোগী বারিবর্ষণেরও ত্রুটী নাই। প্রকৃতিসুন্দরী বারমাসই শ্যামল বসনপরিহিতা ও ফলপুষ্পে পরিশোভিতা থাকিয়া যেন প্রকৃতপক্ষেই জননীর ন্যায় অসহায় শিশুদিগকে রক্ষা করিবার জন্য স্নেহহস্ত প্রসারণ করিয়া রহিয়াছে। দেখা গিয়াছে ঐ প্রদেশে অন্যূন ১৯টি মূল ভাষা বিদ্যমান রহিয়াছে।' *

* "If, under such circumstances, disease, or the casualties of a hunter's life should carry off the parents, the survival of the children would, it is evident, depend mainly upon the nature of the climate and the ease with which food could be procured at all seasons of the year. In ancient Europe, after the present climatic conditions were established, it is doubtful if a family of children, under ten years of age, could have lived through a single winter. We are not therefore, surprised to find that no more than 4 or 5 linguistic stocks are represented in Europe. Of North America, East of the Rocky mountains and North of the tropics, the same may be said. The climate and the scarcity of food in winter forbid us to suppose that a brood of orphan children could have survived except possibly by a fortunate chance of some favoured spot on the shore of the Mexican gulf where shell fish, berries and edible roots are abundant and easy of access. But there is one region where Nature seems to offer herself as the willing nurse and beautiful stepmother of the feeble and unprotected. Of countries on the globe there is probably not one in which a little flock of very young children would find the means of sustaining existence more readily than in California. Its wonderful climate, mild and equable, beyond example, is well known. Half the months are rainless, snow and ice are almost strangers. There are fully 200 cloudless days in every year. Roses bloom in the open air through all seasons. Berries of many sorts are indigenous and abundant. Large fruits and edible nuts are low and pendent, bows may be said, in Milton's phrase, to "hang amiable." Need we wonder that in such a mild and fruitful region, a great number of separate tribes were found speaking languages which careful investigation has classed in 19 district linguistic stocks ?"

অবশ্য Dr, Haleএর এই উক্তি অনুমানমূলক মাত্র, সত্যরূপে ইহাকে গ্রহণ করা সমীচীন হইবে না। তথাপি এই প্রকার বিভিন্ন উপায় অবলম্বনে ভাষারূপ বৃক্ষ যে অঙ্কুরিত ও ক্রমশ পরিবর্দ্ধিত হইয়া শাখাপ্রশাখাসমন্বিত বিশাল মহীরুহের আকার ধারণ করিয়াছে এরূপ অনুমান করাও অসঙ্গত হইবে না। কালসহকারে আদি মানবের কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে একদিকে

যেমন তাহার জ্ঞান প্রসারতা লাভ করিতে থাকিবে ও নব নব ভাবের উদ্দীপনাতে তাহার হৃদয়ক্ষেত্র সুসজ্জিত হইয়া উঠিবে, অপরদিকে ঐ সকল ভাব প্রকাশ করিবার জন্য নূতন নূতন শব্দের সৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইবে। নবাবিষ্কৃত প্রত্যেক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিন যে নূতন নূতন শব্দের সৃষ্টি হইতেছে ইহা কি এই উক্তির সমর্থন করিতেছে না? দশ বৎসর পূর্ব্বে রচিত অভিধান গ্রন্থে যে সকল শব্দের চিহ্ন মাত্রও বিদ্যমান নাই এরূপ কত শত শত শব্দ আজ তাহার বক্ষে স্থান লাভ করিয়াছে।

মানুষ চিরকালই ঘটনার দাস। আমরা এ পর্য্যন্ত দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে কিপ্রকারে ঘটনাবিপর্য্যয়ের মধ্যে পড়িয়া আমাদের আদিম পিতৃপুরুষগণ শব্দসৃষ্টির মূলভিত্তি স্থাপন করেন এবং কি প্রকারে এই শব্দসৃষ্টি কার্য্য অদ্যাবধি চলিয়া আসিতেছে। অবশ্য এতদ্দ্বারা আমি এরূপ কোন সিদ্ধান্ত করিতেছি না যে ভাষাসৃষ্টির সহিত বিশেষ দৈবী শক্তির কোন সম্পর্ক নাই; কিন্তু এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে মানবের যখন শব্দরচনার শক্তি রহিয়াছে তখন কোরাণ শরিফ প্রদানের ন্যায় অভিধান গ্রন্থকেও প্রদান করিবার জন্য স্বর্গস্থ কোন দূতের মর্ত্ত্যে আগমনের প্রয়োজন ছিল না।

শারীর তত্ত্ববিদ্‌গণ অবগত আছেন কি বিশেষ কারণে মানব বাক্‌শক্তি লাভের অধিকারি হইয়াছে। মানবের জিহ্বা তুলনায় অন্যান্য প্রাণীর জিহ্বা হইতে দৈর্ঘ্যে খর্ব্ব ও প্রসারে বিস্তৃত। এই জিহ্বাকে ধারণ করিবার জন্য এবং সমতল ভাবে ইহার সহজ পরিচালনার জন্য মূর্দ্ধা ও তালু উভয়ই তদ্রূপ হ্রস্বতা ও বিস্তৃতি লাভ পূর্ব্বক মুখগহ্বরকে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়াছে। শব্দের পরিস্ফুটতা এই পরিচালনার উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে এবং এই পরিবর্ত্তনের অধিকতর প্রসারের দ্বারাই উচ্চারণের সমধিক সূক্ষ্মতা সাধিত হয়। *

Prof. Macalistar says :—

এই সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গঠনের তারতম্য প্রযুক্তই সিংহের নিনাদ, ব্যাঘ্রের গর্জ্জন, স্রোতস্বিনীর কলকল স্বর, ভ্রমরের গুঞ্জন ও কোকিলের চিত্তোন্মাদী কুহু কুহু রব মানবের পক্ষে অনুকরণ করা সহজসাধ্য হইলেও গো মহিষাদি পশুদিগের পক্ষে ইহা শক্তির অতীত ব্যাপার। এ বিষয়ে মানবের সঙ্গে বরং পক্ষীদিগের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। শুক প্রভৃতি অনেক পাখী নানাপ্রকার স্বর অনুকরণ করিতে ও স্পষ্ট ভাষায় কথা বলিতে সমর্থ। এস্থলে এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে—তবে পক্ষিদিগের মধ্যেও ভাষার অভিব্যক্তি হইতেছে না কেন? মাংসপেশীর সমাবেশ ও অস্থির গঠনে পক্ষীগণ অনেকটা মানুষের নিকটবর্ত্তী। পালকবিবর্জ্জিত পক্ষীর ডানা ও মানবের হস্তের মধ্যে বিভিন্নতা বড়ই সামান্য। এই সব পর্য্যালোচনা করিলে মনে হইতে পারে যে, কোন না কোন সময়ে হয়ত একই ক্ষেত্র হইতে উভয়ের উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু যে দিবস পক্ষী উষার শুভ্র বিমল কিরণস্নাত অসংখ্য হীরকরজতখচিত নয়নাভিরাম পালকরূপী অমূল্য পোষাকে বিভূষিত হইয়া অনন্ত আকাশমার্গের পানে ছুটিল আর আদি মানব আত্মরক্ষা কিম্বা শত্রুপরাজয়কল্পে নিজের বদ্ধ মুষ্টি ও অঙ্গুলীর নখ রাজি ভিন্ন অপর কোন সম্বলবিহীন হইয়া হিংস্র জন্তুসমাকীর্ণ গভীর অরণ্য মধ্যে নিজের জীবন ধারণের পথ খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য নিক্ষিপ্ত হইল, সেই দিন হইতে একের সঙ্গে অন্যের সম্পর্ক একেবারে তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। এক জন বিমান পথে স্বর্গের দিকে প্রধাবিত হইবার শক্তি লাভ করিয়া আপনাকে পরম সৌভাগ্যশালী মনে করিতে লাগিল এবং "উচ্চ বৃক্ষচূড়ে" আপনার "নীড় বাঁধিয়া" সুখে কালযাপন করিতে লাগিল; আর একজন ম্লান মুখে আপনার অদৃষ্ট চিন্তায় নিমগ্ন হইল। তৃষ্ণায় কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া যাইতেছে; সত্য বটে অদূরে পর্ব্বতদুহিতা ক্ষীণাঙ্গী স্রোতস্বিনী গুহার অভ্যন্তরে অবিরাম গতিতে চলিয়াছে, কিন্তু তীরভূমি ঘন নিবিড় উপলখণ্ড পরিবেষ্টিত কণ্টকাকীর্ণ তরুরাজিত অলঙ্ঘ্য প্রাচীর রূপে দণ্ডায়মান হইয়া তাহাকে ঐ জল স্পর্শ করিতে দিতেছে না। অনাহারে দেহ ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে, জঠরানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া কতই না যাতনা দিতেছে; অভ্রভেদী দ্রুমরাজি সুমিষ্ট রসাল ফলভাণ্ডার তাহার সম্মুখে উপস্থিত করিয়া দণ্ডায়মান। পক্ষীর পক্ষে তাহা অনায়াসলভ্য; সে ঐ ফলের আস্বাদ গ্রহণে রসনার তৃপ্তি সাধন করিয়া আনন্দস্রোতে নিজের মনকে ঢালিয়া দিয়া কণ্ঠ হইতে অবিরল ধারায় অমৃতরস বর্ষণ করিতেছে, আর ক্ষুৎপিপাসায় কাতর ঐ মানবের অন্তরে লুব্ধাশ্বাসের বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া তাহার মনপীড়া শতগুণ বর্দ্ধিত করিতেছে।

* "The acquisition of articulate speech became possible to man only when the aloecolar arch and palative area become shortened and widened and when his tongue, by its accommodation to the modified month, became shorter and more horizontally flattened, and the higher refinements of pronunciation depend for their production upon the more extensive modifications in the same direction."

মানব পক্ষীর সৌভাগ্যের বিষয় চিন্তা করিয়া ঈর্ষ্যা কষায়িত লোচনে ঊর্দ্ধে তাহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে আর নিজের ম[illegible]গ্যকে পুনঃ পুনঃ অভিসম্পাত দিতেছে ও মুহুর্মুহু নিরাশার দীর্ঘ নিশ্বাস দ্বারা আপন বক্ষ:দশকে নিপীড়িত করিতেছে, এমন সময় হঠাৎ কালান্তকরূপী ভীম দর্শন সর্প ফণা বিস্তার করিয়া দংশন করিবার উদ্দেশ্যে তাহার দিকে প্রধাবিত হইল। ঐ যে বৃক্ষশিখরস্থ পক্ষীর প্রতি দ্বেষপরিপূরিত লোচনে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবার সময় মস্তকোপরি দোদুল্যমান বৃক্ষশাখাটি দেখিয়াছিল, অক[illegible]াৎ অতর্কিত ভাবে ঐ শাখাটি তাহার হস্তগত হইল এবং আকর্ষণ মাত্র ভগ্ন হইয়া গেল। কি করিয়া যে কি হইল তাহা সে বুঝিতে পারিল না। বুঝিবার সময়ও ছিল না। তথাপি দেখিতে পাইল ঐ শাখার আঘাতে সর্প পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা কি ঘটনা! শত্রুকে বিনাশ কিম্বা পরাজয় করিবার নিমিত্ত অঙ্গুলীর কয়েকটি নখইত একমাত্র সম্বল বলিয়া তাহার জানা ছিল, এই সামান্য বৃক্ষশাখাটির সাহায্যে আজ এই মহাশত্রু এত সহজে বিনাশ প্রাপ্ত হইল। এক অভিনব রাজ্যের দ্বার তাহার নিকট উদ্ঘাটিত হইয়া গেল। আত্মশক্তি এতকাল ঘোর নিদ্রায় অচেতন ছিল, অদ্য তাহা জাগ্রত হইয়া মানবের অন্তরে নিজের সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিল। মানব জীবনের এই ঘটনা ভাবিলে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। ঐ সামান্য বৃক্ষশাখাটি হস্তের যষ্টিতে পরিণত হইয়া যে মহাবিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিল তাহার তুলনায় বর্ত্তমান সময়ের সমরবিপ্লব, যাহার উপর প্রকৃত প্রস্তাবেই "Staggering humanity" আখ্যা প্রযোজ্য হইতে পারে, সিন্ধুতে বিন্দু অপেক্ষাও অকিঞ্চিৎকর।

হস্ত শিক্ষা করিয়াছে কিরূপে প্রাকৃতিক শক্তিকে নিজের কার্য্যে নিয়োজিত করা যায়। যে বৃক্ষশাখা সর্পের প্রাণ বিনাশ করিয়া তাহার জীবনকে রক্ষা করিয়াছে সেই শাখার সাহায্যেই সে ঐ বৃক্ষের উচ্চতম শিখরদেশে অবস্থিত ফলগুলিকে আকর্ষণ পূর্ব্বক করায়ত্ত করিতেছে ও তদ্দ্বারা নিজের ক্ষুধার নিবৃত্তি করিতেছে। আবার হস্তস্থিত ঐ শাখারই আঘাতে কণ্টকাকীর্ণ জঙ্গলকে বিদীর্ণ করতঃ নদীর গর্ভদেশে গমনের রাস্তা বাহির করিয়া লইতেছে এবং তাহার জল দ্বারা নিজের পিপাসা দূর করিতেছে। মোহের আবরণ উন্মোচিত হইল। দেখিতে পাইল পক্ষীর হস্তকে পালক রাশিতে পরিশোভিত করিয়া ইহাকে কেবল আকাশপথে উড্ডীয়নন হইবার শক্তি প্রদান করা হইয়াছে; কিন্তু তাহার নিজের হস্ত মধ্যে যে সকল শক্তির বীজ নিহিত রহিয়াছে তাহার তুলনায় ঐ পক্ষীই কৃপার পাত্র। উপলখণ্ড ও বংশদণ্ডের সাহায্যে সে আজ ভীমদর্শন অসংখ্য হিংস্রজন্তুসমাকীর্ণ অরণ্যভূমির একচ্ছত্র রাজা। উপলখণ্ড নিক্ষেপ দ্বারা সে কত শত্রুকেই না বিনাশ করিতেছে। এই উপলখণ্ডই বর্ত্তমান সময়ের যুদ্ধক্ষেত্রের প্রাণান্তকারী কামানগোলার আদিপুরুষ। যে ক্ষুদ্র বৃক্ষশাখাটি ঊর্দ্ধদেশে নিক্ষেপ করিয়া ফলকে বৃন্তচ্যুত করত সে নিজের আহারের ব্যবস্থা করিয়াছিল এবং যাহার আঘাতে সে সর্পের দংশন হইতে নিজের জীবনকে রক্ষা করিয়াছিল সেই সামান্য শাখাটিই বর্ত্তমান সময়ের অগণ্য অসভ্যজাতির বর্শা শরফলক এবং সভ্যজাতির প্রাণনাশক অস্ত্র Rifle প্রভৃতি বন্দুকের পিতৃপুরুষ।

পক্ষী ও মানব যদ্যপি একই ক্ষেত্র হইতে উভয়ের উদ্ভূত হইয়া থাকে তথাপি একজন যে পালকরাশি লাভ করিয়া নিজকে অতুল সম্পদের অধিকারী মনে করিয়াছিল সেই পালকই তাহার উন্নতির পথ চিরকালের জন্য রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। আর মানব জীবনরক্ষার নিমিত্ত অবিরাম চেষ্টার দ্বারা উন্নতির উচ্চতম শিখরদেশে উপস্থিত হইয়াছে। সৃষ্টির এই রহস্য পূর্ণ ব্যাপারের মধ্যে প্রবেশ করিলে আত্মহারা হইতে হয়। এবং আত্মহারা হইয়া বক্তব্য বিষয় হইতে কতকটা দূরে সরিয়া পড়িয়াছি।

বর্ষ শেষ ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ৩০শে চৈত্র শনিবার বর্ষ শেষ। প্রত্যেক জীবনের একটি বৎসর নিঃসেষিত হইবে। জন্ম মৃত্যুর মধ্য দিয়া যিনি আমাদিগকে অনন্তের পথে অগ্রসর করিতেছেন—এই বর্ষশেষ দিনে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় আদিব্রাহ্মসমাজ গৃহে তাঁহার বিশেষ উপাসনা হইবে।

নববর্ষ ব্রাহ্মসমাজ।

পরদিন ১লা বৈশাখ রবিবার নববর্ষ। এদিনে সকলকেই অনন্ত জীবনের আর একটি নূতন সোপান উঠিতে হইবে। যখন রাত্রি অবসন্ন এবং দিবা আসন্নপ্রায় সেই সন্ধিক্ষণে শুভ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে অর্থাৎ প্রত্যূষে ৫ ঘটিকার সময় মহর্ষিদেবের যোড়াসাঁকোস্থ ভবনে ব্রহ্মের বিশেষ উপাসনা হইবে। সর্ব্বসাধারণের যোগদান প্রার্থনীয়।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

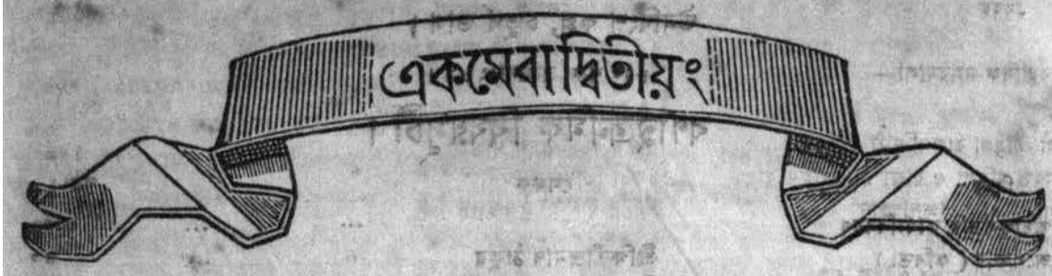

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"

সম্পাদক

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ও

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঊনবিংশ কল্প

চতুর্থ ভাগ

১৮৪০ শক

কলিকাতা

৫৫নং আপার চিৎপুর রোড্

আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সাল ১৩২৫। খৃঃ ১৯১৯। সম্বৎ ১৯৭৫। কলিগতাব্দ ৫০১৮।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

ঊনবিংশ কল্প, চতুর্থ ভাগ।

১৮৪০ শক, ব্রাহ্মসম্বৎ ৮৯।

বর্ণানুক্রমিক বিষয়সূচী।

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা।
অধ্যক্ষসভার কার্য্যবিবরণ	... ...	৩৩৯
অপেক্ষায় (কবিতা)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪৩
আদর্শ বা দাদা ঠাকুর (নাটিকা)	কথক শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ন ...	৫১, ৯০, ১১৬, ১৫৫, ২১৩, ২৫৭,
আনন্দ	শ্রীগৌরীনাথ চক্রবর্ত্তী শাস্ত্রী	৭৫
আঁধারে	শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এ	৩২২
আঁধারে (কবিতা)	শ্রীমতী বিধুমুখী দেবী	১২৭
আমার পরাণ ধায় (গান)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০৭
আমার কুটীর তুমি (গান)	শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এ	১৫০
আমায় রাখো (গান)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৬৩
আয় ব্যয় (১৮৩৯-বৈশাখ-চৈত্র)	... ...	৭৩
আরাধনা	শ্রীসীতানাথ দত্ত তত্ত্বভূষণ	১৬৬
আর্য্যবিবাহের অভিব্যক্তি (আধুনিক)	শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ বি-এল বার-এট-ল ...	২১৮, ৩১১
আদিব্রাহ্মসমাজের ত্রৈবার্ষিক কার্য্যবিবরণ	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫৭
ঈশ্বরকে জানা আর না জানা	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৪৭
ঈশ্বরকে জানার ফল	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩১৫
উদ্বোধন	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৩৫, ১৬৩
উপাসনা	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৯৮
ঊননবতিতম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব	শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী	২৮৭
উন্নতি-প্রসঙ্গ—		
কুম্ভমেলায় স্বেচ্ছাব্রতী ; কালীমোহন দাসের মহত্ত্ব ;		
গান্ধি মহারাজের অনশন ব্রত ; স্ত্রীলোকের ভোট দিবার অধিকার ; রয়াল সোসাইটীর প্রথম ভারতীয় সদস্য ;		
কৃতী বাঙ্গালী ছাত্র।	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৪
দুর্নীতি ও তাহার প্রতীকার ; মুসলমানের বঙ্গসাহিত্য চর্চ্চা ;		
সমাজ সেবা ;	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৭০
অন্নাভাব ; হোলি উৎসব ও মদ্যপান ;		
বৌদ্ধমন্দিরে জুতা পায়ে প্রবেশ ; বঙ্গের নায়িক		
উত্তর বঙ্গ জমীদার সভা	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১২৫
একখানি পত্র	... ...	১৬২
ওরে ও মন (গান)	শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত	২৪৭
কথালাপ	৺মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	২২৬
কর্ণাটের পূর্ব্ব গৌরব	শ্রীকালীপ্রসন্ন বিশ্বাস	২৩০
কর্ণাটের বৈষ্ণব কবি	শ্রীকালীপ্রসন্ন বিশ্বাস	১৩৯
কন্নাড় সাহিত্য	শ্রীকালীপ্রসন্ন বিশ্বাস	২০৫
কি ভয় (কবিতা)	শ্রীমতী বিধুমুখী দেবী	৯৪
কুড়ানো গান	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩৪২
কেশবচন্দ্র—ব্রাহ্মসমাজের সহযোগী সম্পাদক	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৮৬
কেশবচন্দ্র ও ব্রহ্মবিদ্যালয়	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০
গার্হস্থ্য সংবাদ—	... ...	৩৬
শ্রীদেবকুমার চৌধুরীর উপনয়ন		৩৮
শ্রীসুনৃতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্নপ্রাশন ও নামকরণ		১৬২
গীতাধ্যায় সঙ্গতি (টিলক প্রণীত)	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩২৪
গীতারহস্য (টিলক প্রণীত)	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৬, ৬২, ৯২, ১১৯, ১৪২, ১৭২, ২০৯, ২৩৭, ২৬৪, ৩০৩, ৩৩৪,	
গ্রন্থপরিচয়	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩৭, ৭১, ২৪৫,
গ্রন্থপ্রাপ্তি	... ...	৩৭
জ্ঞান ও চিন্তা	শ্রীমতী প্রতিভা দেবী	৪৩

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা।
চা খড়ির আত্মকাহিনী	রায়বাহাদুর ডাক্তার শ্রীচুনীলাল বসু এফ্-সি-এস্	১০৩, ১২৮, ১৮৮, ২০৪
চা পানের অপকারিতা (উদ্ধৃত)	...	১৯০
চিত্র-দর্শন	শ্রীযামিনী প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়	১৯৮
চিত্রপরিচয়	...	১৬২
জাগর্য্যা	শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৩২৩
ঝঞ্ঝারাতে (গান)	শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এ	১১০
তন্ত্রের ইতিহাস	শ্রীগিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ	৩৩, ৮১,
তুমি এস (গান)	শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এ	১৭২
দশরথ	শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ন	৮৮
দাক্ষিণাত্যে জল-প্রপাত (সচিত্র)	শ্রীকালীপ্রসন্ন বিশ্বাস	১০৩
দাক্ষিণাত্যে বাঙ্গালী উপনিবেশ	শ্রীকালীপ্রসন্ন বিশ্বাস	১৪৬, ২৫১
দানপ্রাপ্তি	...	৭৪, ২৪৬, ৩১৪
দিদিমার আশীর্ব্বাদ (কবিতা)	শ্রীমতী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী	১৬১
দুর্দ্দিনে (কবিতা)	শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এ	৯০
দুর্নীতি ও তাহার প্রতীকার	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪৫
দেহ-রূপান্তর (কবিতা)	শ্রীপ্রসন্নময়ী দেবী	১৯৭
ধর্ম্মজগতে নবশক্তির বিকাশ	শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়	৫
ধর্ম্ম ও যুদ্ধ	শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়	১০৭
ধিক্ বলং ক্ষাত্র বলং	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩৯
নববর্ষের অভিবাদন	...	১
নববর্ষে (কবিতা)	শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এ	৪৫
নববর্ষে	শ্রীসুধীন্দ্রলাল রায়	৬৭
নারিকেল ফল ও পাখীর ডিম	শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ বি-এল বার-এট-ল	১৮৬
নির্ভরের সোপান	শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত	৩২০
পল্লীবাস	শ্রীমনোরমা দেবী	৩২২
পরশে তোমার (গান)	শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এ	২৫৭
প্রতিদান (কবিতা)	শ্রীহিরণ্ময়ী চৌধুরাণী	৭০
প্রাণ গেল (গান)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৮০
প্রার্থনা (কবিতা)	শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত	৭৫
প্রার্থনার প্রয়োজন	শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়	২৮৯
পুরাতন স্মৃতি	শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়	২৭৩
বঙ্গসাহিত্যের নবীন যুগ	শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী	৪৯
বঙ্গসাহিত্যের প্রাচীন যুগ	শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী	৩০
বাঙ্গালা ভাষার নিজস্ব	শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ	৩২৯
বঙ্গের বর্ত্তমান শিক্ষাসমস্যা	শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী	১৪১
বারাণসী কথা	শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	২৫৪
ব্রহ্মসঙ্গীত—		
আজিকে মধুর সুবিমল প্রাতে ; হে প্রাণের দেবতা ; আমরি মরি ;	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১, ৪৯
ভোরের বেলায় ; (আমার) কণ্ঠ তাঁরে ডাকে ; ভুবন জোড়া আসন পাতি ; দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩১৯-২০
এস হে এস সুন্দর	শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী	৩১৯
ব্রাহ্মধর্ম্ম (ইংরাজী অনুবাদ)	শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী বি-এ	২৮৫
ব্রাহ্মসমাজের পুণ্যাহ	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৬৭
ব্রাহ্মসমাজ ও প্রচারক	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৯৩
"ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান"	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৩৬
বিজয়-সঙ্গীত	শ্রীপঞ্চানন রায়	২৪১
বিবেক-তত্ত্ব	শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যানিধি এম-এ বি-এল	১২৩, ১৩৬
বেলা যায় (গান)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৩৮

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা।
বৈয়াসিক-ন্যায়মালা—	শ্রীরামচন্দ্র শাস্ত্রী সাংখ্যবেদান্ততীর্থ ও শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি ...	... ২৩, ১১০, ২৮০
বৌদ্ধমহিলা রাজনন্দিনী মাগিনী	পণ্ডিত শ্রীহরিদেব গাস্ত্রী ...	... ১১৩, ১৩৮
ভারত মহিলা ও রাজা রামমোহন রায়	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী ...	... ২১৬
ভাদ্রোৎসবে ব্রাহ্মসম্মিলন	শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় ...	... ১৬৫
ভারতের জাগরণ	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	... ১
মণিলাল পারেখের খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ	...	... ১৮৩
মহর্ষির কথা (উদ্ধৃত)	আচার্য্য—শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী এম-এ ...	... ২৭১
মহর্ষির জীবনের কয়েকটী কথা (উদ্ধৃত)	...	... ১৯১
মায়ের রূপে ভরেছে ভুবন (গান)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	... ১০
মা আমার (গান)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	... ১৯৯
মাঘোৎসবের উদ্বোধন	শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	... ২৮৮
মেঘের মালা (কবিতা)	শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এ ...	... ৫
রসায়ন বিজ্ঞানে আকর্ষণ	৺হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	... ২৭
রাণাডের স্মৃতি কথা	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ২১, ৬৬, ৯৫, ১৫৯, ১৮৫, ২০১, ২৪১, ২৬৭, ৩০৮, ৩৩৬,	
রামচরিত্রে ঋষিপ্রভাব	কথক শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ন ...	... ৩৩৩
রামায়ণী (দশরথ চরিত্র)	কথক শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ন ...	... ৮৮
রাবণবধের মূলতত্ত্ব	শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ন ...	... ২৩৩
রামপ্রসাদ সেন কবিরঞ্জন	৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ...	২৯, ১৩১, ১৫৭, ১১৭
রামায়ণের ভ্রাতৃধর্ম্ম	কথক—শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ন	... ২৫৩
লর্ড বিশপের শ্রাদ্ধ বাসরে	শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ ...	... ৩২৮
লিঙ্গায়তধর্ম্মে নীতিপ্রসঙ্গ	শ্রীকালী প্রসন্ন বিশ্বাস ...	... ৩২৭
লিঙ্গায়তধর্ম্মে পৌরোহিত্য	শ্রীকালী প্রসন্ন বিশ্বাস ...	... ১২১
শাণ্ডিল্যকথা	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	... ৭৮
শাসন	শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ন ...	... ৮
শোক সংবাদ—		
৺উমাশশী দেবী ; ৺অর্ণপ্রভা বসু ; ৺গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় ;		৭৫
৺মাধুরীলতা দেবী ; ৺ইরাবতী দেবী ;		১০৬
সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ; ভাই উমানাথ গুপ্ত ;		
৺সুণালিনী দেবী, ৺অজিত কুমার চক্রবর্ত্তী ;		৪৮৩
৺সুকেশী দেবী ; ৺করুণা দেবী ;		
৺গোবিনলাল দাস ; রায় সাহেব ৺প্রকাশচন্দ্র দেব ;		৩১৫
৺মাধুরী দত্ত		৩০৮
শ্রীরামপুর মিসন	শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় ...	... ২৭৫
সত্যধর্ম্ম ও উপধর্ম্ম	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	... ২২১
স্বধর্ম্মের পরিণতি	শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত ...	... ২২৮
সন্ধ্যায় (কবিতা)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	... ৮৭
সমরক্ষেত্র হইতে পত্র	...	৩৬ ১৯২
সংবাদ	...	৩৬, ৭১, ১৬২, ২২০,
সম্পাদকীয় ব্যক্তব্য (ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে)	...	... ৭২
স্বরলিপি—		
ইচ্ছি তোমা বিনা ;	শ্রীমতী প্রতিভা দেবী ...	... ৭
অরুণবরণের আলো ;	শ্রীমতী প্রতিভা দেবী ...	... ৬৯
হে প্রাণের দেবতা ;	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ...	... ৮৫
৺হিতেন্দ্রনাথের প্রতি (কবিতা)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	... ৫১
হিন্দুর সাধনা	মাননীয় সার আশুতোষ চৌধুরী ...	... ২৯৩
৺হেমেন্দ্রনাথ সিংহ	শ্রীপ্রেমানন্দ সিংহ ...	... ২৭৭
Brahmo Dharma (Creed). Translated by Sri Indira Devi Chaudhurani B-A.		২৮৪

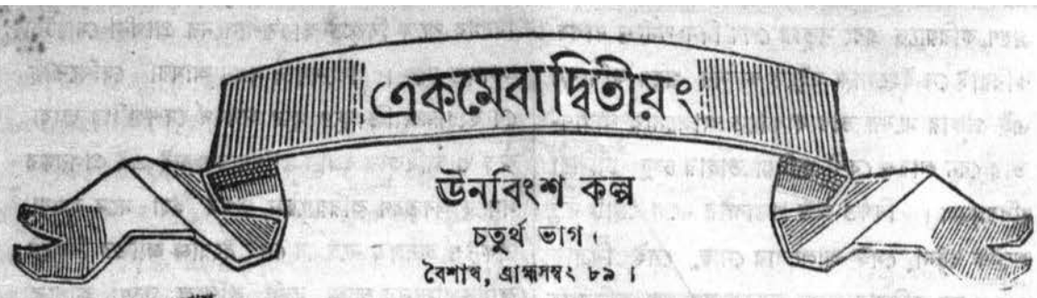

ঊনবিংশ কল্প
চতুর্থ ভাগ।
বৈশাখ, ব্রাহ্মসম্বৎ ৮৯।

৮৯৭ সংখ্যা

১৮৪০ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা।

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"

নববর্ষের অভিবাদন।

আজ নববর্ষের প্রারম্ভে ভগবানের চরণে প্রণিপাত করিয়া, গুরুজনদিগের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া, প্রীতিভাজনদিগকে প্রেমপূর্ণ আলিঙ্গন ও সম্ভাষণ করিয়া এবং স্নেহভাজনদিগকে আন্তরিক আশীর্ব্বাদ জানাইয়া শুভকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছি।

ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি।

ব্রহ্মসঙ্গীত।

গান্ধারী তোড়ী—তাল আড়াঠেকা।

আজিকে মধুর সুরিমল প্রাতে
মরম বাঁশরী উঠিল বাজিয়া।
আজি নামে তব ওহে প্রিয়তম
শত নব গান উঠিছে ফুটিয়া॥
তোমারি মধুরে সকলি মধুর
তব পুণ্য গন্ধ পড়িছে ঝরিয়া।
সুমন্দ বাতাস তোমারি নিশ্বাস
দিতেছে আমারে পাগল করিয়া॥

ভারতের জাগরণ।

যাঁহারা গত দশ পনেরো বৎসরের ঘটনা সকল সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিয়াছেন, যে ভারতে এক মহাজাগরণ আসিয়া পড়িয়াছে। রাজা রামমোহন রায় যে জাগরণের বীজ এই ভারতভূমিতে পুঁতিয়া দিয়াছিলেন, আজ তাহা প্রকাণ্ড বৃক্ষে পরিণত হইতে চলিয়াছে দেখিয়া কাহার হৃদয় না আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। রামমোহন রায় যে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির তরঙ্গ চালাইয়া দিয়াছিলেন, আজ সেই তরঙ্গ ভারতের কূলে কূলে ছাপাইয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছে দেখিয়া হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে। রাজা রামমোহন রায়ের সময় অবধি আমরা পরস্পর পরস্পরের ঘুম ভাঙ্গাইবার বিশেষ চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলাম, কিন্তু কি যেন এক আলস্যের ঘোর মোহ কিছুতেই সে নিদ্রাকে তাড়াইতে পারিতেছিল না। অবশেষে আজ কয়েক বৎসর হইল প্রাচ্য ভূখণ্ডে কয়েকটী অসম্ভব ঘটনা সংঘটিত হওয়াতে এবং সেই সকল ঘটনাসূত্রে প্রাচ্যদিগেরই বিজয়দুন্দুভি বাজিয়া উঠাতে ভারতবর্ষেও আজ জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। বহুকাল যাবৎ পরাধীনতার চাপে নিষ্পেষিত হওয়াতে ভারতবাসী মনে ভাবিত যে, তাহার আর উন্নতির কোনই সম্ভাবনা নাই—সে দাসত্ব করিতেই জন্ম-

গ্রহণ করিয়াছে এবং মৃত্যুর শেষ দিন পর্য্যন্ত দাসত্ব করিয়াই সে ইহলোক হইতে অবসর গ্রহণ করিবে। এই প্রকার মনের ভাব থাকাতে আলস্যের পাষাণ-ভার যেন আরও বেশী করিয়া তাহার চক্ষু চাপিয়া ধরিয়াছিল। বিগত অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে ছোট বড় অনেক ঘটনা সেই আলস্যের মোহ, সেই নিদ্রার জড়তা দূর করিবার পক্ষে অনেক সহায়তা করিয়াছে বটে, কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, গত রুষ-জাপান-যুদ্ধে যেদিন প্রাচ্য ভূখণ্ডের একটী ক্ষুদ্রদ্বীপ জাপানের অধিবাসীগণের নিকট ইউরোপের চির-ভীতিপ্রদ রুষিয়ার ন্যায় বিশাল সাম্রাজ্যের অধিবাসীগণ সম্পূর্ণ পরাজিত হইল, সেইদিন সমগ্র প্রাচ্যভূখণ্ডের সঙ্গে ভারতেরও প্রাণে আশ্বাসের এক মহা ঝড় বহিয়া গেল, ভারতবাসী তাহার হারানিধি মনুষ্যত্বকে খুঁজিয়া পাওয়াতে তাহার ঘুম কোথায় চলিয়া গেল। এই রুষ-জাপান যুদ্ধ হইতেই বুঝা গেল যে হীনবল এসিয়াও আপনার উপর নির্ভর করিতে সূত্রপাত করিয়াছে। এই যুদ্ধই প্রকারান্তরে ঘোষণা করিয়া দিল যে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য উভয় মনুষ্যেরই মনুষ্যত্ব সাধারণ সম্পত্তি, বরঞ্চ প্রাচীনতম ধর্ম্মাবলম্বিত সভ্যতার মধ্যে বর্দ্ধিত হওয়াতে প্রাচ্য ভূখণ্ডের অধিবাসীই অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শনে সক্ষম।

রুষজাপান যুদ্ধের পর চীনসাম্রাজ্যে যখন প্রজাতন্ত্র শাসন প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন প্রাচ্যভূখণ্ডে এবং ভারতবর্ষে জাগরণের আর একটা সাড়া পড়িয়া গেল। যদিও এই ঘটনা রুষজাপান যুদ্ধের ন্যায় তত ঔৎসুক্য জাগাইয়া তুলিতে পারে নাই, তবু সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, চীন সাম্রাজ্যে যে প্রজাতন্ত্র শাসন কখনও অবতীর্ণ হইতে পারে ইহা এসিয়াবাসীর স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। কাজেই যখন সেই অসম্ভব ঘটনাও সম্ভব হইল, তখন এসিয়াবাসী বিস্ময়স্তম্ভিত হৃদয়ে তাহা পর্য্যালোচনা করিতে লাগিল এবং মনে মনে এই একটী আশা পোষণ করিল যে, অসম্ভবও তাহলে সম্ভব হইতে পারে। বহুশত বৎসরের মঙ্গোলীয় দাসত্বের ভিত্তির উপর যে সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা সেই সাম্রাজ্যে যখন অল্পদিনের মধ্যেই প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন ভারতবাসীদিগেরও ইহা মনে হইল যে তাহাদিগের পক্ষে বিস্তৃত স্বায়ত্তশাসনের প্রার্থনা মোটেই অসঙ্গত নহে। বিশেষতঃ যখন আমরা দেখিতেছি যে ইংরাজজাতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসমর্থ দেশগুলির ন্যায্য স্বত্ব ও অধিকার বজায় রাখিবার জন্যই এই প্রলয়ঙ্কর সমরে অবতরণ করিয়াছেন, তখন ইহা মনে হওয়া একটুও অসঙ্গত নহে যে সেই ইংরাজ জাতির নিকটে স্বায়ত্তশাসনের ন্যায্য দাবী করিলে তাহা অচিরে লাভ করা মোটেই অসম্ভব হইবে না। একচ্ছত্র শাসনের কেন্দ্রমন্ত্র যেমন রাজা, সম্রাট বা সর্ব্বোচ্চ ব্যক্তির উপর নির্ভর, প্রজাতন্ত্র শাসনের কেন্দ্রমন্ত্র সেইরূপ আত্মনির্ভর। ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া আত্মনির্ভরের কথা মিথ্যা জল্পনা। আত্মনির্ভর করিতে গেলে, আপনার উপর দাঁড়াইতে গেলেই, চক্ষু হইতে নিদ্রা, প্রাণ হইতে আলস্য বিদূরিত করিতেই হইবে। তাই চীনদেশে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কারণে ভারতবর্ষেও কতকটা জ্ঞানত এবং কতকটা অজ্ঞানত জাগরণের একটা বিশেষ সাড়া পড়িয়া গেল।

সর্ব্বশেষে, বর্ত্তমান মহাসমরে ভারতবাসীদিগের মধ্যে জাগরণের একটা প্রবল সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের পর এরূপ ভয়াবহ মহাসমর সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। সেই যুদ্ধের ঘাতপ্রতিঘাতে ভারতবাসী নিজের মনুষ্যত্ব স্পষ্ট উপলব্ধি করিল, নিজেকে চিনিতে শিখিল। ইউরোপীয় বিভিন্ন জাতিগণের মধ্যে লিখিত বা অলিখিত এই একটী নিয়ম ছিল যে, কোন ইউরোপীয় যুদ্ধে এসিয়াবাসী সৈন্যের সাহায্য লওয়া হইবে না। কিন্তু জর্ম্মনি যখন বেলজিয়মের ভিতর দিয়া প্যারিস আক্রমণের উদ্যোগ করিল, তখন যে কারণেই হউক, ভারতবর্ষীয় সৈন্যদিগের দ্বারা জর্ম্মনির সেই প্রথম ভীষণ আঘাত প্রতিরুদ্ধ করা হইয়াছিল। এই সময়ে সংযম প্রভৃতি উচ্চতর মনুষ্যত্বের উপাদান বিষয়ে তাহারা যে পাশ্চাত্যদিগের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ তাহা প্রত্যক্ষ করিল। তারপর, যখন ভগবানের বিধানে ইংরাজগবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালীদিগকেও সৈন্যশ্রেণীভুক্ত করিতে বাধ্য হইলেন, তখন বাঙ্গালীরা নিজেদের অন্তর্নিহিত বল অনুভব করিল এবং কেবল বঙ্গদেশে নহে, সমুদয় ভারতবর্ষে জাগরণের এক মহাতরঙ্গ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। রবারের গোলককে যেমন চাপিয়া হঠাৎ ছাড়িয়া

দিলে তাহা সবলে ও সবেগে লাফাইয়া উঠে, বাঙ্গালীরা সৈন্য হওয়াতে তাহাদের হৃদয়ে জাগরণের তরঙ্গ সহসা সেইরূপ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

যে সকল সৈন্যের সাহায্যে সেই প্রথম আঘাত প্রতিরুদ্ধ করা হইয়াছিল, তাহাদের ব্যবসায়ই ছিল সৈন্যগিরি। কিন্তু কয়েকজন মিথ্যা ঐতিহাসিকের রচিত মিথ্যা ইতিহাসের সাহায্যে কেবল ভারতবর্ষে নহে, সমস্ত সুসভ্য জগতে একটা অন্যায় ধারণা দাঁড়াইয়া গিয়াছিল যে, বাঙ্গালীজাতিই ভীরু কাপুরুষ ও কেরাণীর জাতি, যুদ্ধের নাম শুনিলে পলায়ন-তৎপর হয়। পাশ্চাত্য জাতিরা যখন প্রথম প্রথম ভারতে পদার্পণ করিয়াছিল, তখন তাহারা নিজেদের ক্ষুদ্রতা অনুভব করিয়া অত্যন্ত দারিদ্র্যবিনম্রভাবে ভারতের রাজন্যবর্গের নিকট বাণিজ্যাদি সম্বন্ধীয় নানাবিধ অধিকার ভিক্ষা করিত কিন্তু সুবিধা পাইলে তাহারা নিজেদের ধর্ম্মভাবের অভাবের ও হৃদয়হীনতার পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হইত না। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ নিজেদের সেই হীনতা ঢাকিবার জন্য কি না জানি না, পাশ্চাত্য কয়েকজন ঐতিহাসিক, যে বাঙ্গালীদের সাহায্যে বঙ্গদেশ পাশ্চাত্যদিগের অধিকৃত হইল এবং যে বঙ্গবীরের বীরত্বে একদিন লর্ড ক্লাইবকেও মুগ্ধ হইতে হইয়াছিল, সেই বাঙ্গালীদের স্কন্ধে কাপুরুষতা, প্রতারণা প্রভৃতির অপবাদ চাপাইবার চেষ্টা করিলেন। সেই সকল অপবাদপূর্ণ পুস্তক সকল কেবল বঙ্গদেশে নহে, ভারতবর্ষে, কেবল ভারতবর্ষে নহে, পাশ্চাত্যভূখণ্ডেরও নানা স্থানে শিক্ষিত বলিয়া খ্যাতিলাভেচ্ছু ব্যক্তিগণের পাঠ্য বলিয়া পরিগৃহীত হইল। এই সকল পুস্তক পাঠ করিতে করিতে আমরা নিজেদের নিকটেই আপনাদিগকে হেয়, কাপুরুষ বলিয়া মনে করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করিতাম না। অপবাদের পাষাণভার আমাদিগকে নিতান্ত ক্ষুদ্রতার ভিতরে আবদ্ধ রাখিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিল। কিন্তু সত্যকে যে কেহ চাপিয়া মারিতে পারে না, এই সত্যটীই মানুষ স্বার্থপরতার চসমা পরিয়া অনেক সময়ে দেখিতে পায় না। অবশেষে বঙ্গবাসীগণ সেই মিথ্যাকলঙ্কের বোঝা সহ্য করিতে না পারিয়া স্বাধীন অনুসন্ধান ও গবেষণার ফলে তাহা ঝাড়িয়া ফেলিয়া ঘোর মানসিক পরাধীনতা হইতে স্বজাতিকে মুক্তিদান করিলেন।* এই মুক্তিলাভের ফলে বাঙ্গালীর সাহস প্রভৃতি সদ্‌গুণসকল সহসা ও সবেগে বিস্তৃতি লাভ করিল।

মানুষ যখন একদিকে মুক্তিলাভ করে, তখন তাহার সকল রুদ্ধশক্তিই স্বাধীনভাবে মুক্তভাবে বিচরণ করিতে চাহে। আমরা দেখি যে, যে সময়ে বাঙ্গালীর কলঙ্ককালিমা ঘুচিবার উপক্রম হইল, সেই সময় অবধিই যেন ভারতবাসী সর্ব্ববিধ মানসিক পরাধীনতা হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া পড়িল। তাহারই ফলে বিজ্ঞানাচার্য্য সার জগদীশচন্দ্র বসু ও তাঁহার অন্তেবাসীগণ বিজ্ঞান-বিষয়ক নব নব পরীক্ষণের দ্বারা জগতকে চমকিত করিয়া তুলিলেন। সেই মুক্তিলাভেরই উদ্দেশ্যে বঙ্গদেশে শিক্ষার নবতর প্রণালীসকল উদ্ঘাটিত হইতে লাগিল; কাশীধামে হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইল; মহীশূর প্রভৃতি ভারতের নানা অঞ্চলে শিক্ষাবিষয়ক নানা পথ খুলিয়া দিবার ব্যবস্থা হইতে লাগিল। এই প্রকারে গত দশ পনেরো বৎসরের ভিতর বিরাট জাগরণের যে কি প্রকার বিরাট সাড়া পড়িয়া গিয়াছে তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। এই যে দলে দলে ভারতবাসীগণ সমরানলে আপনাদিগকে আহুতি দিতে অগ্রসর হইতেছে, কে অস্বীকার করিবে যে ইহা ভারতবাসীর জাগরণেরই অন্যতর পরিচয়? ইংরাজজাতি যদি এই জাগরণের ফলকে কুফলপ্রসূ হইতে দিতে না চাহেন, তাঁহাদের কর্ত্তব্য ভারতবাসীর আত্মনির্ভরের ভার বর্দ্ধিত হইবার উপায় করিয়া দিয়া ভারতবাসীকে বন্ধুভাবে ব্যবহার করা, এবং তাহাকে স্বাবলম্বনের পথে চলিতে সক্ষম করা।

এই প্রকার জাগরণের ফলে আমরা দেখি যে ভারতবাসীগণ বর্ত্তমানে দাসত্ব অপেক্ষা স্বাধীন জীবিকা অর্জ্জন করিতে গিয়া শতবার পতনকেও সাদর আলিঙ্গন প্রদান করিতে প্রস্তুত। ইহারই ফলে আমরা স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের সমর্থন, ইহারই ফলে আমরা ভারতবর্ষে স্বদেশীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিবার নানা কলকারখানার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা দেখিতে পাই।

* শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রভৃতি যে সকল বাঙ্গালী এবিষয়ে হস্তপ্রদান করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই আমাদের চির-নমস্য।

ভারতবাসীগণ এই যে সর্ব্বাঙ্গীন জাগরণ মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছেন, আমরা প্রথমেই বলিয়া আসিয়াছি যে রাজা রামমোহন রায় ইহার বীজ পুঁতিয়া দিয়াছিলেন। সেই বীজ হইতেছে ব্রহ্মনাম। সেই পরব্রহ্মই একমাত্র স্বাধীন পুরুষ। কাজেই বলা বাহুল্য যে তাঁহার ছায়া যে জাতিকে যে ব্যক্তিকে স্পর্শ করিবে, সেই ব্যক্তির সেই জাতিরই ভিতরে একটা সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতার জাগরণ ফুটিয়া উঠিবে। এই পরব্রহ্মই ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক। তাই ধর্ম্মের বিজয়বার্ত্তা যেখানে ঘোষিত হয় সেইখানেই জাগরণ আপনিই উপস্থিত হয়। যখন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ব্রহ্মনামের বিজয়পতাকা ইংলণ্ডে লইয়া গিয়া রাজা রামমোহনের উপ্ত বীজে জলসেচন করিলেন, তখন সেখানে সেই বীজ হইতে প্রসৃত বৃক্ষের শাখা আনন্দহিল্লোলে খেলিতে লাগিল। আবার যখন পরলোকগত শ্রদ্ধেয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ আমেরিকার উর্ব্বর ক্ষেত্রে নানা বিভিন্ন প্রণালীতে সেই একই ব্রহ্মনামের বিজয় গাথা গাহিলেন, তখন সেই রাজা রামমোহনেরই উপ্ত বীজনিঃসৃত মহীরুহের শাখা-প্রশাখা দিগন্তবিস্তৃত হইয়া পড়িল। আবার যখন গীতাঞ্জলিপ্রণেতা পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথ সেই ব্রহ্মনামের আশ্চর্য্য মহিমাগীত আশ্চর্য্য ভাষায় সমগ্র জগতকে শুনাইয়া দিলেন, তখন সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীন ভাবের একটা তড়িৎ-স্রোত সমগ্র জগতের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছিল—সমগ্র জগতের উপর দিয়া বিরাট জাগরণের এক বিরাট তরঙ্গ চলিয়া গিয়াছিল। কয়েকজন ভারতবাসীদেরই দ্বারা প্রধানত এই তরঙ্গ পরিচালিত হইয়াছিল—ভারতবাসী তাহা দেখিয়া আপনাদের ক্ষমতার পরিচয় পাইল এবং চক্ষু হইতে নিদ্রালস্য তাড়াইয়া দিয়া বিশ্ব-সভার মাঝে নিজেদের জন্য একটা উচ্চ আসন রচনা করিতে কৃতসংকল্প হইল।

আমাদের বুঝিতে যেন ভুল না হয় যে ভারতবাসী শত ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যে, সহস্র বিপদ আপদের মধ্যে, লক্ষকোটী বিপ্লবের মধ্যে ব্রহ্মনামকে শত-সহস্র বিভিন্ন প্রণালীর সাহায্যে সত্যসত্য হৃদয়ে ধারণ করিয়া আছে, প্রত্যেক ভারতবাসীর অন্তরে অন্তরে ব্রহ্মের আনন্দধ্বনি ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয় বলিয়া ভারত-বর্ষ মরিতে মরিতেও বাঁচিয়া উঠে; শত শত বৎসরের দাসত্বের কঠোর নিষ্পেষণও ভারতের জীবনী শক্তিকে বিনষ্ট করিতে পারে নাই এবং কখনই পারিবে না। ব্রহ্মনামের গুণেই, ধর্ম্মকে প্রাণপণে ধরিয়া থাকিবার ফলেই আজ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপের সহিত এসিয়ার যে সম্বন্ধ ছিল, সেই সম্বন্ধের যে কিরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং এসিয়া কিরূপ তড়িদ্গতিতে উন্নতির পথে ছুটিতেছে, তাহা বর্ত্তমানে ইউরোপীয়গণ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছে।

এই জাগরণের জোয়ার আর কেহই প্রতিরুদ্ধ করিতে পারিবে না। এখন আমাদের কর্ত্তব্য যে আমরা এই জোয়ারের সম্মুখে যেন নিদ্রিত না থাকি। এই জোয়ারের সময়েই আমাদিগকে উজান চাহিয়া দেশের ভিতরে ভিতরে যাইয়া জাগরণমন্ত্র ঢালিয়া দিতে হইবে—স্ত্রী পুরুষনির্ব্বিশেষে প্রত্যেক ভারতবাসীকে শিক্ষা বিষয়ে নীতিবিষয়ে ধর্ম্মবিষয়ে উন্নত হইবার সহায়তা করিতে হইবে। এই যে জাপানের দৃষ্টান্ত আমাদের সম্মুখে ধারণ করি, জাপানের মত আমরা কোন্ কাজ করিতেছি? সে দিন একটী ইংরাজী সংবাদপত্রে দেখিলাম যে জাপানী মোটর-চালকগণও বিজ্ঞানমূলক নানা বিষয়ে আশ্চর্য্যরূপ শিক্ষা লাভ করিতে বাধ্য। আর, আমরা এখনও বাল্যকালেই পুত্রকন্যাদিগের বিবাহ দিয়া, তাহাদের শিক্ষার পথে পরিপন্থী হইয়া মনে করি যে পুত্রকন্যাদিগের এবং সমাজের পরম উপকার সাধন করিতেছি! ইহার মূল হইল সুখের ও ভোগের স্পৃহা এবং উন্নতি সাধনবিষয়ে ঘোর আলস্য। কিন্তু আমাদের ইহা স্থির জানা উচিত যে এ প্রকার আলস্যের ও নিদ্রার আর স্থান নাই। জাগরণের যে প্রবল জোয়ার আসিয়াছে, তাহার সম্মুখে নিদ্রা ও আলস্যের প্রশ্রয় দিলে মৃত্যু ও বিনাশ অপরিহার্য্য।

বর্ত্তমানে আমাদের আর কেবলমাত্র কথায় বলিবার অবসর নাই যে উত্তিষ্ঠত জাগ্রত—উঠ, জাগ। জাগরণ তো আসিয়াছে—এখন আমরা এইটুকু বলিতে চাহি যে আর নিদ্রা ও আলস্যকে অবলম্বন করিও না। আমাদের প্রত্যেকের নিজেকে জ্ঞানধর্ম্মে উন্নত করিয়া সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ পরমাত্মাকে নিয়তই চক্ষের সম্মুখে ধরিতে

পারমার্থিক সত্যের এবং কল্যাণের নব-নব ভাব তাঁহাদের অন্তরে এবং পরে জনসমাজে প্রচারিত হইতে পারে। বর্ত্তমান সময়ে স্বাধীন চিন্তার সূত্রপাত হইয়াছে। প্রাচীন ভাবের সহিত তাহার সকল বিষয়ে সৌসাদৃশ্য নাই বলিয়া তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রূপ বাণ নিক্ষেপ করিলে চলিবে না। চিন্তাকে স্বাধীনতা প্রদান না করিলে, জ্ঞানোন্নত মনুষ্য প্রচলিত ধর্ম্মসম্প্রদায় হইতে আপনাকে পৃথককৃত করিয়া রাখিবে। গণনা করিয়া দেখিলে, এই যে ক্ষতি ইহার পরিমাণ নিতান্ত সামান্য নহে। এইরূপে চিন্তাশীল লোককে হারাইয়া ধর্ম্মসমাজও অবসন্ন ও নির্বীর্য্য হইয়া পড়িবে। ধর্ম্মের সত্য নিরূপণ এবং সত্যের আবিষ্কার কেবলমাত্র যে ধর্ম্ম-যাজকদিগের অনন্য-সাধারণ অধিকার তাহা নহে, সমস্ত মানবের প্রকৃত অধ্যাত্মিক কল্যাণ ইহারই উপর নির্ভর করে। যাঁহারা আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে নূতন নূতন সত্য আবিষ্কার করেন তাঁহাদিগকে বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম সম্প্রদয়ের বা ধর্ম্মের শত্রু বলিয়া গণনা করিলে চলিবে না, কিন্তু উদার ভাবে তাহাদিগের প্রতি নিরীক্ষণ করিতে হইবে। *

স্বরলিপি।

রাগিণী ভূপালি—তাল কাওয়ালি।

হরি তোমা বিনা জানিনাক কা'রে
তুমি দেখা দাও প্রভু আঁধারের পারে
আনন্দ সুরে বাজাও বীণা
আনন্দ সুরে শিখাও গান
পঞ্চম সুরে বাঁধিব বীণা
আনন্দ সুরে জাগাও গান
আনন্দের প্রতিধ্বনি বাজে মোর কানে
তুমি কাছে এস প্রভু শোন জয় গানে।

কথা, সুর, স্বরলিপি, স্বরসন্ধি—শ্রীমতী প্রতিভা দেবী।

১	২	৩	০
II পা -া গা -া।	গা পা ধা না।	পা ধা পা পা।	গা রা সা -া I
I সা গা পা গা।	পা সা মা পা।	গা মা গা পা।	পা মা সা গা I
হ • রি •	তো মা বি না	জা নি না ক	কা • রে •
১	২	৩	০
I সা ধা সা রা।	গা রা সা রা।	সা রা গা রা।	ন্‌া রা সা -া I
I পা গা পা মা।	পা মা গা রা।	পা মা সা মা।	পা মা গপা ধপা I
তু মি দে খা	দা ও প্র ভু	আঁ ধা রে র	পা • রে • • •
১	২	৩	০
I পা -া পা পা।	পা -া পা -া।	গা পা -া ধা।	পা -া -া -া I
I সা গা পা গা।	সা গা পা গা।	সা গা পা গা।	সা গা পা গা I
আ • ন ন্দ	সু • রে •	বা জাও • বী	ণা • • •
১	২	৩	০
I র্সা -া র্সা র্সা।	না -া ধা -া।	পা গা পা ধা।	পা -া -া -া I
I পা র্সা পা গা।	রা মা পা মা।	সা গা পা গা।	সা গা পা গা I
আ • ন ন্দ	সু • রে •	শি • খা • ও	গা ন • •

* "Times" টাইমস পত্রের একটি প্রবন্ধের সারাংশ।

১	২	৩	০
I মা -া মা মা।	গা -া রা -া।	সা ন্া ধ্া ন্া।	সা -া -া -া I
I সা মা পা মা।	সা রা গা মা।	পা মা গা রা।	সা গা পা গা I
প • ণ্ড ম	সু • রে •	বাঁ ধি ব বী	ণা • • •

১	২	৩	০
I গা -া গা মা।	গা মা গা মা।	পা ধা না র্সা।	র্রা -া -া -া I
I সা গা পা রা।	সা রা পা মা।	সা রা গা মা।	পা মা গা রা।
আ • ন ন্দ	সু • রে •	জা • গা ও	গান • • •

১	২	৩	০
I র্গা -া র্রা র্রা।	র্সা র্সা ধা ধা।	পা পা গা রা।	ন্া রা সা -া I
I সা গা রা মা।	পা গা রা সা।	গা পা সা মা।	পা রা সা গা।
আ • ন ন্দের	প্র তি ধ্ব নি	বা জে মো র	কা • নে •

১	২	৩	০
I সা ধ্া সা রা।	গা রা সা রা।	সা রা গা রা।	ন্া রা সা -া II II
I পা সা পা মা।	সা মা পা মা।	পা মা সা মা।	পা মা সা -া II II
তু মি কা ছে	এ স প্র ভু	শো ন জ র	গা • নে •

শাসন।

(শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ন)

শাসন দুই রকম—বেতের শাসন আর প্রেমের শাসন। ছাত্রেরা যদিও সকলেই বলিবে যে তাহারা পরেরটাই বেশী পছন্দ করে, কিন্তু যাহাদের হাতে পণ্ডিতীর ভার, তাঁহারা ছেলে মানুষ করিতে হইলে দুটোই হাতে রাখিবেন।

মানুষ যে ধর্ম্ম-পথে চলিবে, তাহা কি ভয়ে না লোভে, কিম্বা প্রেমে ও আনন্দে? আমার বোধ হয় এ কয়টাই ঠিক্। কেহ বা বলিবে ভয়ে, কেহ লোভে, কেহ প্রেমে, আর কেহ বা বলিবে আনন্দে। কোনো ধর্ম্ম-প্রচারক মানুষকে ধার্ম্মিক করিতে তলোয়ার চালাইয়াছেন, কেহ বক্তৃতা করিয়াছেন, কেহ অমানুষী শক্তি দেখাইয়াছেন, কেহ কাঁদিয়াছেন, নৃত্য করিয়াছেন, সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া জগৎবাসীকে বিস্মিত করিয়াছেন। ইহার কোন্‌টা ভালো, আমি বলি সবটাই ভালো। যখন যেরূপ প্রয়োজন হয় তখন সেইরূপই করিতে হইবে। এই সময়ানুসারে "প্রয়োজন" বোধটাই হ'চ্চে আসল জিনিস। আমাদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেকের বক্তৃতা প্রবন্ধ ইত্যাদি যে ক্রমশ মাঠে মারা যাইতেছে, ইহার কারণ, আমরা ঝোঁপ বুঝিয়া কোপ দিতে জানি না। চেঁচাইয়া কেবল গলা ভাঙ্গাই, তার পর যখন সকলের উপেক্ষামাত্র পাই, তখন সেই ভাঙ্গা গলায় এই কথাটাই কেবল জাহির করি যে এমন উচু কথাগুলো কেউ বুঝ্‌ল না। লোকগুলি সব নির্ব্বোধ।

ঈশ্বর ভজনা কর, নতুবা মরণান্তে অনন্ত নরকে পড়িতে হইবে। এটা ভয়ের শাসন। আর 'স্বর্গকামো যজেত' এটা হইল লোভের শাসন। আর "আনন্দ রূপং অমৃতং যদ্বিভাতি" কিম্বা "রসো বৈ সঃ" এটা হইল প্রেমের শাসন। ইহার কোন্‌টা সত্য? সকল গুলিই সত্য। কিন্তু সকল গুলির প্রয়োজন একপ্রকার থাকিলেও মূল্য এক প্রকার হইতে পারে না। প্রেমের শাসনই শ্রেষ্ঠ শাসন।

আমরা আগেকার চেয়ে যে একটু বেশী শিক্ষিত হইয়াছি, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। ইহা স্বীকার পাইতে কেবল Evolution এর দোহাই দিতে হইবে না। মানুষের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আত্মার প্রেমভাব বিস্তৃত হয়। আমাদের বর্ত্তমানে ভগবানকে জানিতে হইবে প্রেমের মধ্য দিয়া,

হইবে এবং আমাদের দেশের প্রত্যেককে জ্ঞানধর্ম্মে উন্নত করিবার পথে পরিচালিত করিতে হইবে।

আমাদের উপলব্ধি করিতে হইবে যে বর্ত্তমানে জগতের কি ঋদ্ধিসম্বন্ধীয়, কি রাজনৈতিক, কি বিজ্ঞানপ্রজ্ঞানমূলক ধর্ম্মসম্বন্ধীয়, সকল বিষয়েই ভারতের জাগরণ এক অশ্রুতপূর্ব্ব আশ্চর্য্য কার্য্য সংসাধন করিবে। ভগবানই এ বিষয়ে আমাদের একমাত্র সহায়।

মেঘের মালা।

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এ)

আঁধার মেঘের মালা যে এই
টুটবে ওগো টুট্‌বে।
ছিন্ন মেঘের ফাঁক দিয়ে রোদ
ফুটবে ওগো ফুটবে॥
আকাশ যে গো আবার হবে
আলোয় আলোয় ভরা।
দুঃখেরি এই আঁধার টুটে
জ্বলবে মাণিক হীরা॥
নীলিমায় সে পড়্‌বে লুটে
নুয়ে যাবে এই প্রাণ।
আনন্দেরি কমলটী গো
দুঃখেরি অবসান॥
দুঃখময় এ ভুবনটা
বলে যে সব জন।
ভূমণ্ডলে অজ্ঞ তারাই
আঁধার আকুল মন॥
রহস্যেরি দ্বারের চাবি
পাইনি জেনো ঠিক।
তারা স্বপন দেখে ঘুমের ঘোরে
মিথ্যে সব অলীক॥
ওগো মৃত্যু এ তো মৃত্যু সে নয়
নয় এতো বিনাশ।
মৃত্যুহীন এ আত্মা যে গো
বাঁধবে নূতন বাস॥
সুধাসাগরের ঢেউ এ যে গো
একি মিলবে ধূলা সনে।
সাগরবক্ষে লয় যে গো তার
সে মরণ নাহি জানে।
সুধাসাগরের ঢেউ যে মানুষ
এইটী জেনো মনে।
তবেই তুমি সত্য হবে
সত্য সকল ক্ষণে॥

ধর্ম্মজগতে নবশক্তির বিকাশ।

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)

বিগত শতাব্দী হইতে জনসমাজের মধ্যে স্বাধীন চিন্তার ভাব বিকশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহা আশার কথা বলিতে হইবে। তৎপূর্ব্বে মনুষ্য অতীতের বিশ্বাস ও ধারণা লইয়া নিশ্চিন্ত থাকিত। প্রচলিত ধর্ম্মকে রক্ষা করিবার জন্যই মনুষ্যের সমস্ত শক্তি যুক্ত হইত। তাহা ছাড়া আর যে কিছু করিবার আছে, সে কথা তাহাদের অন্তরে বড় প্রতিভাত হইত না। তাহারা সাধারণতঃ প্রাচীন ধর্ম্ম ও প্রাচীন মতের টীকা টিপ্পনি করিত এইমাত্র, নিজে নূতন কিছু উদ্ভাবনের চেষ্টা কিছুমাত্র পাইত না। বিগত শতাব্দীতে ধর্ম্মসম্বন্ধে যে কোলাহল উঠিয়াছিল তাহার মধ্যে দেখিতে পাই, একদল প্রাচীনমত সমর্থন করিবার প্রয়াসী এবং আর এক দল কোন কোন বিষয়ে স্বাধীনমত পোষণ করিবার জন্য আগ্রহান্বিত।

এক্ষণে আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে, নিশ্চিন্ত ভাবেই কি আমরা আমাদের জীবন কাটাইয়া দিব, না স্বাধীনভাবে বুঝিবার চিন্তা করিবার, এবং তাহা প্রকাশ ও প্রচার করিবার মতো আমাদের অধিকার আছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ধর্ম্মমত জগতে যাহা বিঘোষিত হইয়া আসিয়াছে, তাহাই কি ধর্ম্মবিশ্বাসের ও ধারণার পরিস্ফুট ছবি, না আমাদিগের তাহাকে আরও সংস্কৃত ও পরিমার্জ্জিত করিয়া তুলিতে হইবে। পুরাতন মত ঠিক বজায় রাখিবার জন্য যে এতদিন তর্কযুদ্ধ করিয়া আসিয়াছি সে কাল এক্ষণে কাটিয়া গিয়াছে। আমাদিগকে পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া দেখিতে হইবে যে আমাদের আবিষ্কার করিবার আর কিছু আছে কি না।

আমরা চারিদিকে যে লক্ষণ সুব্যক্ত দেখিতেছি, তাহাতে মনে হয় বিভিন্ন দেশের চিন্তাশীল মানববৃন্দ ধর্ম্ম সম্বন্ধে পৃথক হইয়া অবস্থান করিতে চান না, কিন্তু তাঁহারা অবিসম্বাদী সত্যে পরস্পর মিলিতে চান।

যে সকল dogma বা অন্ধ ধারণা এতদিন সকলকে বিচ্ছিন্ন রাখিয়াছিল, মানুষ এক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছে যে, ধর্ম্মক্ষেত্রে উহাদের বিশেষ সার্থকতা নাই। আজকাল বিভিন্ন ধর্ম্মের লোক পরস্পরকে বাক্যবাণে আঘাত করিতে সঙ্কুচিত। বিভিন্ন দেশের মনীষীগণ সৎভাবে মিলিত হইয়া যেমন পদার্থবিজ্ঞানের রাজ্যে নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কার করিতেছে, ধর্ম্ম-সম্বন্ধেও তেমনি সকলের মিলিয়া উপলব্ধি করিবার এবং প্রচার করিবার যে যথেষ্ট সামগ্রী রহিয়াছে মানুষ তাহা বুঝিতে পারিয়াছে। মানুষ যদি স্বাধীন ভাবে ধীরতার সহিত চিন্তা করিতে আরম্ভ করে, সে দেখিতে পাইবে যে মতদ্বৈধের বিশেষ কোন কারণ নাই। আমরা যদি প্রাচীন ধর্ম্মের উপর এবং তাহার মত ও বিশ্বাসের উপর অতিরিক্ত মাত্রায় জোর দিই, তাহা হইলে পার্থক্য মূলে সামান্য হইলেও উহা পর্ব্বতপ্রমাণ বলিয়া সকলের নিকটে অনুমিত হইবে। ধর্ম্ম কতকটা শিল্পের মত; ইহা চির উন্নতি-শীল, ইহা চিরবিকাশশীল। ধর্ম্ম কেবলমাত্র বিশেষজ্ঞ ও প্রত্নতত্ত্ববিদের জল্পনার সামগ্রী নহে। মাইকেল এঞ্জিলো একজন অসাধারণ চিত্রকর ছিলেন একথা সত্য হইতে পারে, কিন্তু চিত্রবিদ্যায় যদি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা থাকে, তাহা হইলে তাঁহার চিত্রনৈপুণ্যই যে চরম, এই সিদ্ধান্তটুকু লইয়া থাকিলে চলিবে না। আমাদের নিজের শক্তি ও ধারণা অনুযায়ী স্থাপত্যের ও অঙ্কনের আরও উন্নতির চেষ্টা পাইতে হইবে, তবেই আমাদের অন্তরের আদর্শের অনুযায়ী চিত্র ও মূর্ত্তি ফুটিয়া বাহির হইবে এবং ঐ চেষ্টার ভিতর দিয়াই আমাদের শিল্প-প্রীতি প্রকাশ পাইবে। ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমরা প্রত্যেকেই যে চিত্রকরের মতো, এ কথাটি মনে রাখা চাই। ধর্ম্মসম্বন্ধে আমরা আমাদের নিজের মত ও বিশ্বাস প্রকাশ করিতে বাধ্য। তাহা প্রাচীন ধারা হইতে একটু স্বতন্ত্র হইতে পারে, কিন্তু তাহা হইলেও উহা আমাদের নিজস্ব এবং আমাদের অন্তরের সরল ও সহজভাবের স্ফূর্ত্তি, এইটুকু বুঝিতে হইবে।

যতদিন আমরা প্রাচীনভাব রক্ষার জন্য কেবলই প্রয়াস পাইয়াছি বা তাহার বিরুদ্ধে যুক্তি তুলিয়া আসিয়াছি ততদিন আমরা উপরের লিখিত সত্য উপলব্ধি করিতে পারি নাই। আমরা এতদিন বুঝিয়াছিলাম যে কালক্রমাগত প্রাচীনতার ভাব রক্ষা করাতেই আমাদের মনুষ্যত্ব; আমাদের নিজের চিন্তা করিবার আর বড় কিছু নাই। এক্ষণে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে ধর্ম্মের ভিতরে একটা জীবন্ত ভাব আছে, যাহা শিল্পের মতো প্রতি মনুষ্যের অন্তরে আঘাত করে। সত্যের সঙ্গে মনুষ্যের ঘনিষ্টতম যোগ। সত্যকে নিজের বলিয়া উপলব্ধি করা চাই। যাহা কিছু প্রাচীন তাহাই সত্য এই অন্ধ ধারণার অনুবর্ত্তী হইলে চলিবে না। সত্যকে নিজের ধারণা অনুযায়ী নিজের ভাষায় প্রকাশ ও প্রচার করিতে হইবে। জগৎসৃষ্টি সম্বন্ধে যে সকল কথা শাস্ত্রে স্থান পাইয়াছে এবং অন্যান্য অলীক উক্তি যাহা প্রাচীন শাস্ত্রে রহিয়াছে, সত্যের বিরোধী বলিয়া তাহা পরিহার করিতে হইবে। বলিতে কি, সত্যের ধারণা, সত্যে বিশ্বাস, সত্য লাভের পিপাসা, সত্য আয়ত্ত করিবার চেষ্টা—ইহারই উপর ব্যক্তিগত ধর্ম্মজীবনের প্রতিষ্ঠা। মানুষ যদি এইভাবে ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে যায় এবং ধর্ম্মকে ও সত্যকে নিজ নিজ উপলব্ধির মধ্যে আনিতে চায়, তাহা হইলে পরস্পরের মধ্যে মতের অনৈক্য সহজে তিরোহিত হইয়া যাইতে পারে এবং বিশাল ভ্রাতৃসমাজের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইয়া উঠে।

অন্ধ ধারণা হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকিলে চলিবে না, কিন্তু সত্যকে সন্ধান করিবার জন্য আন্তরিক চেষ্টা চাই। এই সত্য নিরূপণ করা আবার সতেজ বুদ্ধি এবং স্বাধীন চিন্তা-সাপেক্ষ। ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রাচীন মত, যাহা বহুযুগ পূর্ব্বে আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহা নির্ব্বিকার চিত্তে ধরিয়া থাকিলে যে মানবের সব হইল, এমন কোন কথা নাই। সত্য নির্ব্বাচন সম্বন্ধে মনুষ্যের অন্তরের যে একটি স্বাভাবিক ও স্বাধীন শক্তি আছে, তাহাকে অস্বীকার করিলে চলিবে না। মানুষের এই শক্তি আছে বলিয়াই মানুষ বিজ্ঞানরাজ্যে কাল-ক্রমাগত মত সমূলে পরিহার করিতে সমর্থ এবং তাই সে কত নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছে। তাই পুনরায় বলিতেছি যে ধর্ম্মরাজ্যেও আমাদের স্বাধীন চেষ্টা চাই। যাঁহারা জ্ঞানে পাণ্ডিত্যে সাধনায় সমুন্নত, তাঁহারা যদি অনুসন্ধিৎসু হইয়া স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিতে আরম্ভ করেন,

আনন্দের মধ্য দিয়া। ভয়ের যুগ বর্ব্বরতার যুগ। আমাদের সে কাল অতীত হইয়া গিয়াছে।

সকল বিষয়কেই প্রয়োজনাতিরিক্ত গম্ভীর করিয়া তোলা এ জাতিটার যেন একটা ব্যারাম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা একটু বেশী এঁচড়ে পাকিয়া গিয়াছি।

আজ কাল বালকদের যোগসাধন, ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি বড় বড় কথার চিন্তা ও আলোচনা করিয়া মাথা প্রায় অসময়ে পাকিয়া পচিয়া উঠিবার যোগাড় হইতেছে। কি প্রকারে সহজ ভালো মানুষ হওয়া যায়, আদর্শ গৃহস্থ হওয়া যায়, তাহা কেহই শিক্ষা দিতেছেন না। ইহার ফলে যুবকগণ কেহ একেবারে দণ্ডকমণ্ডলুধারী হইয়া কার্য্যবিমুখ হ'ন, আরকেহবা উহাকে নিতান্ত কৃচ্ছ্রসাধ্য ভাবিয়া দূর হইতে নমস্কার করিয়া অধঃপতনের পথে অগ্রসর হইতেছেন। সকল কাজেই একটা বাড়াবাড়ির মধ্যে গিয়ে পড়া যেন আমাদের দেশের আবহাওয়ার গুণ।

আজ কাল বিদ্যালয়ের নৈতিক শিক্ষা কিরূপ হইবে, ইহা একটী মহা সমস্যার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বর্ত্তমানে কেবল 'পণ্ডিত গড়া' স্কুল না হইয়া একটা মানুষ-গড়া স্কুল হইলে ভালো হয়। সহজ সাধন, সহজ ভাবের মধ্য দিয়া মানুষ কিরূপে মানুষ হইয়া উঠিতে পারে, আজকাল ছাত্রদের কাছে এই দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা খুব দরকার।

এ প্রশ্নটা অনেকেরই মনে আসে যে, মানুষ ধর্ম্ম সাধন করিবে কেন? ইহার উত্তরে প্রথমতঃ জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে অধর্ম্ম করিবে কেন? অধর্ম্মের চেয়ে ধর্ম্মে যে লাভ বেশী ও আনন্দ অনেক বেশী, তাহা কেবল কষ্ট করিয়াই বুঝিতে হয় না। নিজের দিকে, জগতের দিকে তাকাইলে ইহার উত্তর অতি সহজেই মিলিবে।

আমরা স্বভাবত ধার্ম্মিক; আমরা অধার্ম্মিক হই চেষ্টা করিয়া। মানুষও "সত্যং শিবং সুন্দরং"। এই কথাটী আমাদের প্রতিনিয়ত মনে রাখিতে হইবে যে, আমরা স্বভাবত সুখী, আমাদের দুঃখ পাইতে হয় চেষ্টা করিয়া। স্বাস্থ্যই স্বাভাবিক—রোগ নহে।

পাপীর শাস্তি কি? ইহার উত্তর এই যে সে ঈশ্বরকে ভুলিতে চেষ্টা করে। ইহার চেয়ে আর বড় শাস্তি কিছুই হইতে পারে না। যিনি সকল সুখের আকর, পাপী তাঁহাকেই ভুলিতে বসিল। এমন হতভাগ্য কি আর কেহ আছে! ধর্ম্ম সাধন করার লাভ ধর্ম্মই। যাঁহারা বলিয়াছেন যে, ধর্ম্ম-সাধন করায় আপাতত দুঃখ, ঐহিক ক্ষতি, তবু ধর্ম্ম-সাধন কর, তাঁহারা খুব বীর সাধক বটে! কিন্তু আমরা বলিব যে ইহার আদি, অন্ত ও মধ্য এই তিনটী অবস্থাই সুখময়। কারণ স্বাস্থ্যই সুখ, রোগ নহে।

একদল বলিবেন, ধর্ম্ম-পথে চলিতে যে সংযম, ত্যাগ, অধ্যবসায় প্রভৃতির প্রয়োজন, তৎসমূহ সাধন করিতে হইলে প্রথমতঃ অভ্যাস-কালে বড়ই কষ্ট। কিন্তু ক্ষতির মধ্যে দুঃখ আছে বটে, কিন্তু বীরের মত সেই ক্ষতি সহ্য করিবার আনন্দও খুব আছে। দুঃখ তখনই দুঃখের হয়, যখন তাহাতে আমরা অভিভূত হইয়া পড়ি। কিন্তু অনেকেই ভালবাসার পাত্রের জন্য দুঃখ মনে করিয়া আনন্দ পায়। তবে ভগবানের চেয়ে ভালবাসার পাত্র তো আর কেহই নাই, তাঁহার জন্য দুঃখ সহ্য করার চেয়ে আর কি আনন্দ আছে?

এখন আমার কথাটা এই যে, এই ভালবাসার সাধনা, প্রীতির সাধনাই করিতে হইবে। পাকাপাকি রকম এই ভালবাসা জমাইয়া লইতে পারিলে আর দুঃখ থাকে না। কিন্তু ধর্ম্ম-সাধন না করিলে এই ভালবাসা জন্মিবে না। আবার ভালবাসা না জানিলেও কিন্তু ধর্ম্ম-সাধন করা যায় না। কেবল কর্ত্তব্যের জন্য লোকে ক্ষতি সহ্য করিতে পারে না—কিন্তু প্রেমের জন্য পারে। কর্ত্তব্য নীরস, প্রেম সরস। আসল কথা এই দুইটাই অন্যোন্যসাপেক্ষ। ঐ দুটাই এক সঙ্গে আরম্ভ হয়। ভালবাসিতে আরম্ভ করিলেই, দুঃখ ক্ষতি সহ্য করিবার ক্ষমতা হয়। ভগবানকে ভালবাসিলেই জগৎকে ভালবাসিবে, তখন জগতের জন্য দুঃখ সহ্য করিবার ক্ষমতা জন্মিবে, দুঃখ-সহনই ত্যাগ এবং—"ত্যাগেনৈকেনামৃতত্বমানশুঃ"। এবং এই ত্যাগের নামই ধর্ম্ম।

প্রকৃতপক্ষেই কি ধর্ম্মসাধন করিতে গেলে কোন প্রকার ক্ষতি অথবা দুঃখ সহ্য করিতে হয়?

আমরা বলিব কিছুতেই নহে। আগে বুঝিয়া লই ধর্ম্ম কাহাকে বলে—যাহার জন্য বস্তুর অবস্থিতি, যাহা না থাকিলে বস্তুরও অবস্থিতি থাকে না; যাহা বস্তুর প্রকৃতি স্বরূপ, তাহাই তাহার ধর্ম্ম। সান্নিপাতিক জ্বরাক্রান্ত রোগী যদি বিকারের ঘোরে ঔষধ না খাইয়া রোগে ভুগিতেই ইচ্ছা করে, তাহাই কি তাহার পক্ষে সুখকর হইবে! আমরা মূঢ়, ইচ্ছা বশতঃ যদি একটা দুঃখ ভোগ করিতে প্রস্তুত হই, তবে সেই দুঃখ ভোগটাই কি আমাদের পক্ষে সুখের হইবে! ধর্ম্ম-সাধনের দ্বারাই আমাদের বিশেষত্ব, সুখ প্রভৃতি বজায় থাকে। ধর্ম্মই সুখ, আর অধর্ম্মই দুঃখ। কারণ সর্ব্বমাত্মবশং সুখং আর সর্ব্বং পরবশং দুঃখং।

আত্মানন্দে পরিতৃপ্ত থাকাই সুখ। ধর্ম্ম বজায় রাখিতে পারিলে এই আত্মানন্দ লাভ হইবে। এবং আত্মানন্দ লাভ করিলেই আমরা কৃতার্থ হইব। অতএব মানুষ ধর্ম্মসাধন করিবে কেন? ইহার উত্তর দিতে হইলে বলিব যে ধর্ম্মের জন্যই ধর্ম্ম পালন করিবে।

ধর্ম্ম বাহির হইতে সঞ্চয় করিতে হয় না। কারণ পূর্ব্বে ধর্ম্মের যে সার্ব্বভৌমিক ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে বুঝা যায় যে আমরা ধর্ম্ম লইয়াই জন্মিয়াছি। সুতরাং সেই ধর্ম্মকে বজায় রাখিতে হইবে মাত্র। সেই ধর্ম্মকে বজায় রাখিলেই আপনা আপনি আত্মার প্রসার হইবে।

অতঃপর দেখিতে পাইলাম যে মানুষকে ধর্ম্মপথে চলিতে হইলে, দুঃখ সহ্য করিবার ভার গ্রহণ করিতেও হয় না এবং প্রেমের শাসন ছাড়া বেতের শাসনেরও প্রয়োজন হয় না।

আজকালকার এই লাভলোকসান সম্বন্ধীয় সূক্ষ্ম হিসাবের যুগে মানুষকে এই সার সত্যটাই সব চেয়ে বেশী করিয়া বুঝাইতে হইবে যে ধর্ম্মসাধনের আদিতে সুখ, মধ্যে সুখ, ও পরিণামেও সুখ। তবে কিনা কথা এই যে আমরা প্রকৃত সুখ কোন্‌টা তাহা চিনিনা। এমন কথা, এমন উপদেশ শুনিতে ও শুনাইতে হইবে যাহাতে প্রকৃত সুখ কোন্‌টা তাহা ধরিতে পারি।

মানুষ সুখ চায়, আনন্দ চায়। মানুষের এটা চিরন্তন স্বভাব। এই সুরসের খোঁজ না পাইলেই পচা-রসে মজিয়া থাকি। তাই "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্" ভাবে তাঁর কথা আগে না বলিয়া, বুঝাইতে হইবে যে—"রসো বৈ সঃ"। যখন আর্য্য ঋষিগণ সমগ্র পৃথিবীকে মধুস্বরূপ দেখিলেন, তখনি তাঁহারা ঠিক দেখিলেন।

যখন দেখিব যে আমি মধুময়, পৃথিবী মধুময়, আর আমার দেবতা যিনি তিনিও মধুময়, তখনই আমরা কৃত-কৃতার্থ হইব।

মায়ের রূপে ভরেছে ভুবন।

(প্রসাদী পদচ্ছায়া)

(ওমা) তোর্ মা রূপে আজ্ ভরেছে ভুবন্। (ধুয়া)
(তোর্) জোছনা মেখে আকাশ্ সারা,
হাস্‌ছে দেখ্ মা আপন্-হারা,
(আবার্) সেই হাসির্ মা পরশ্ পেয়ে
পাগল্ হয়্ মোর্ পরাণ মন্।
ভুবন্ ভরে' আজ্ উঠ্‌ছে যে গান্,
সুরের্ পরে সুর্ উঠে যে তান্,
তৃপ্তিতে অতৃপ্ত হয়ে
শোনে গিরি সাগর বন্।
(আমি) হাসি কাঁদি কি যে করি,
আকুল হই মা-ভেবেই মরি,
(তোর্) আলোর্ আঁধার্ অন্ধ করে,
সুখের্ অশ্রু ভাসায়্ নয়ন্।
(আমার্) মিটে যায়্ মা সকল আশ্,
পরাণের্ মা ঘুচে তিয়াশ্,
(যবে) তোরে দেখি তোর্ বাণী শুনি
পড়ে রই তোর্ ধরে' চরণ্॥

কেশবচন্দ্র ও ব্রহ্মবিদ্যালয়।

তত্ত্ববোধিনী সভা উঠিয়া যাইবার পর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি মনীষীগণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে একপ্রকার আত্মসংহরণ করিলেন। এখন অবধি কেশব ও তাঁহার দলের লোক লইয়াই দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের উন্নতিসাধনে প্রয়াসী হইলেন। দেবেন্দ্রনাথ এখন স্বয়ং ট্রষ্টী হইয়াছেন; অপর দুইজন ট্রষ্টী রমাপ্রসাদ রায় এবং রমানাথ

ঠাকুর ব্রাহ্মসমাজের কোন কার্য্যই দেখেন না—দেবেন্দ্রনাথের উপরেই তাঁহারা সম্পূর্ণ ভার দিয়া নিশ্চিন্ত। ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে কেশবের একনিষ্ঠতা ও নিজের সহিত তাঁহার ঐকমত্য দেখিয়া দেবেন্দ্রনাথ কেশবের প্রস্তাবিত প্রায় সকল কার্য্যেই বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলেন। এই সূত্রে দেবেন্দ্রনাথ কেশবের প্রতি যেরূপ সম্প্রীতি দেখাইতেছিলেন এবং তাঁহাকে যে ভাবে সমর্থন করিতেছিলেন, শোনা যায় যে দেবেন্দ্রনাথের প্রাচীনপন্থী পূর্ব্বতন পার্শ্বচরগণ তাহা কিছু অতিমাত্র হইতেছিল বলিয়া মনে করিতেন—তাঁহাদের মধ্যে এবিষয় লইয়া একটু আন্দোলন আলোচনাও যে চলে নাই তাহা নহে।

পৌত্তলিক দীক্ষামন্ত্র গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশে এবং ব্রাহ্মসমাজের নানাকার্য্যে কেশবের বিশেষ উৎসাহ দেখিয়া দেবেন্দ্রনাথের ইচ্ছা হইয়াছিল যে তাঁহাকে ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকপদে নিযুক্ত করিয়া গুরুতর কার্য্যভার তাঁহার স্কন্ধে নিক্ষেপ করেন। কিন্তু তত্ত্ববোধিনী সভার সম্পাদক পরিবর্ত্তনে বিশেষ বেগ পাওয়াতে দেবেন্দ্রনাথ এবিষয়ে হঠাৎ অগ্রসর না হইয়া কেশবের কার্য্য পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। নূতন কর্ম্মচারী নিযুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং ট্রষ্টী হিসাবে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য পরিদর্শন করিতে লাগিলেন।

ব্রাহ্মসমাজে আসিবার পর ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপনই দেবেন্দ্রনাথের সাহচর্য্যে কেশবের সর্ব্বপ্রথম কার্য্য। ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক উপাসনায় যাঁহারা উপস্থিত হইতেন, তাঁহাদেব অধিকাংশ বার্দ্ধক্যের পথে অগ্রসর। কেশবচন্দ্র অল্পদিনেই বুঝিতে পারিলেন যে, ব্রাহ্মসমাজ লইয়া হৈ চৈ করা, জনসমাজের চক্ষের সম্মুখে ব্রাহ্মসমাজকে শক্তিরূপে ধারণ করা, বিগতযৌবন সুতরাং গতোৎসাহ বৃদ্ধদিগের কর্ম্ম নহে;—ব্রাহ্মধর্ম্মকে লোকের কর্ম্মজীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিলে ইংরাজীশিক্ষিত উৎসাহশীল অথচ কোমলমতি যুবকগণকে ব্রাহ্মসমাজের ভিতর আনা চাই। ইংরাজীশিক্ষিত যুবকগণই স্বভাবত যে কোন বিষয় লইয়া কলরব করিতে অগ্রসর হইতেন। কেশব বাবু বুঝিয়াছিলেন যে এই সকল ইংরাজীশিক্ষিত যুবকগণকে পাশ্চাত্য শাস্ত্রাদি ও ইংরাজী বক্তৃতা বিষয়ে পরাজয় করিতে পারিলেই তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মসমাজে পৃষ্ঠপোষকরূপে পাইতে পারিবেন। ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপনের দ্বারা কেশবের এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার পথ খুলিয়া গেল। তিনি স্বয়ং এই বিদ্যালয়ে ইংরাজী বক্তৃতা দিবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ২৪ এপ্রিল (১৭৮০ শকের চৈত্র) কেশবচন্দ্রের কলুটোলাস্থ বাসভবনের নিকটবর্ত্তী একটী বাটীর নিম্নতলের এক ক্ষুদ্র কুটরীতে এই বিদ্যালয় প্রথম স্থাপিত হয়। তাঁহার "গুড-উইল ফ্রেটার্ণিটির" সভ্যগণ এবং তাঁহার নৈশ বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকগণ প্রায় সকলেই ব্রহ্মবিদ্যালয়ে যোগ দিয়াছিলেন। ইহাঁরা যাহাতে ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক উপাসনাকালীন স্তোত্রাদি পাঠে স্বরসংযোগে যোগ দিতে পারেন, তদুদ্দেশ্যে দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্মবিদ্যালয়ে গিয়া উপযুক্ত স্বরে স্তোত্রাদি পাঠ শিক্ষা দিতেন।

কিছুদিন পরে চিৎপুররোডের উপর সিন্দুরিয়াপটী পল্লীস্থিত গোপাল মল্লিকের বাটীতে ব্রহ্মবিদ্যালয় উঠিয়া গিয়াছিল। এখানে প্রতি রবিবারে প্রাতঃকালে ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত ব্রহ্মবিষয়ক উপদেশ দেওয়া হইত। প্রতি মাসের প্রথম রবিবার প্রাতঃকালে ব্রাহ্মসমাজের মাসিক অধিবেশন হইত বলিয়া সেদিন সন্ধ্যা ৭টার সময় ব্রহ্মবিদ্যালয়ের অধিবেশন হইত। এই ব্রহ্মবিদ্যালয়ে দেবেন্দ্রনাথ বঙ্গভাষায় "ব্রহ্মের স্বরূপ ও তাঁহার প্রতি প্রীতি এবং তাঁহাতে আত্মসমর্পণ বিষয়ে উপদেশ" এবং কেশবচন্দ্র ইংরাজী ভাষায় "ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মের লক্ষণ ও তদনুষ্ঠান বিষয়ে সুচারু উপদেশ" দিতেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের আত্মপ্রত্যয় ও ভগবৎপ্রীতিমূলক বিজ্ঞানাংশের উপর দেবেন্দ্রনাথ এবং জনসমাজের সম্বন্ধমূলক কর্ম্মাংশের উপর কেশবচন্দ্র বক্তৃতা করিতেন।

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের মে মাসে (১৭৮১ শকের ২৬ বৈশাখ রবিবার) দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্মবিদ্যালয়ে প্রথম উপদেশ দেন। ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপিত হইবার প্রায় পাঁচ মাস পরে দেবেন্দ্রনাথ সিংহল যাত্রা করেন। তাহার পূর্ব্বেই তিনি ছয়টী উপদেশ এবং সিংহল হইতে ফিরিয়া আসিয়া আরও কয়েকটী

উপদেশ দেন। এই কয়েকটী উপদেশ দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ হইয়া ধারাবাহিকরূপে তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং পরিণামে সেগুলি "ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস" নামক এক পুস্তকের আকারে প্রকাশিত হয়। কেশব বাবু স্বপ্রদত্ত উপদেশ গুলির সারমর্ম্ম পুস্তিকাকারে প্রকাশ করিতেন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের জুন হইতে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের জুন পর্য্যন্ত (১৭৮১ শকের আষাঢ় হইতে ১৭৮২ শকের আষাঢ় পর্য্যন্ত) এক বৎসরে তাঁহার ১৩ খানি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। সেগুলি বিক্রয়ের জন্য রাখা হইত এবং ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্রগণ সেগুলি অতি আগ্রহের সহিত ক্রয় করিতেন। ভারতবাসীর পক্ষে ধর্ম্মসংক্রান্ত ইংরাজী পুস্তিকা প্রকাশের ইহাই বোধ হয় প্রথম উদ্যম। *

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ২৭ সেপ্টেম্বর (১৭৮১শকের ১২ আশ্বিন মঙ্গলবার) বেলা ১১টা ৩৫ মিনিটের সময় দেবেন্দ্রনাথ নিউবিয়া ষ্টীমার যোগে সিংহল যাত্রার উদ্দেশ্যে কলিকাতা পরিত্যাগ করেন। দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয়পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র এবং বাগবাজারের গাঙ্গুলি পরিবারের কালীকমল গাঙ্গুলি তাঁহার সঙ্গী ছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহার সিংহল দ্বীপের ভ্রমণবৃত্তান্তে ইঁহাদের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"আমাদের সঙ্গে প্রিয়সুহৃৎ কেশব বাবু আর কালীকমল বাবু; তাঁহারা বাষ্পীয় নৌকাতে চড়িয়া তাহার কুঠরির এক কোণে লুকাইয়া রহিলেন। সেখান হইতে উপরে কোন বাঙ্গালীকে দেখিবামাত্র বাড়ীর লোক মনে করিয়া চমকিয়া উঠিতে লাগিলেন। সকলের চক্ষে ধূলি দিয়া তাঁহারা যেপ্রকারে আমাদের সমভিব্যাহারী হইলেন, তাহাতে তাঁহারা যে সর্ব্বদাই সশঙ্কিত থাকিবেন, তাহার আর আশ্চর্য্য কি ?" কলিকাতা দৃষ্টিবহির্ভূত হইয়া গেলে তাঁহারা আশ্বস্ত হইলেন। কেশববাবু এই সময়ে তাঁহার উল্টাডিঙ্গিস্থ উদ্যান বাটীতে অবস্থিতি করিতেন। সেখান হইতেই আসিয়া তিনি ষ্টীমারে দেবেন্দ্রনাথের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে কেশবের ষ্টীমারে আগমন উপলক্ষে আরও একটু লিখিয়াছেন যে, "আর দিন কতক পরেই কেশব বাবুর যে সমস্ত গুরুতর ভার লইতে হইবে, তাঁহার অপটু শরীর উল্টাডিঙ্গির দুর্গন্ধপূর্ণ দূষিত বায়ু সেবন করিয়া সে সমস্ত ভার বহনে কখনই সমর্থ হইত না। ঈশ্বরের নিকট প্রণত হইতেছি যে তিনি তাঁহাকে এখানে নির্ব্বিঘ্নে আনিয়াছেন।" সত্যেন্দ্রনাথের এই সকল উক্তি হইতে অনুমান হয় যে, সিংহলযাত্রার উদ্যোগকালেই দেবেন্দ্রনাথের পরামর্শমত কেশবচন্দ্র আত্মীয়-স্বজনের অজ্ঞাতে একেবারে ষ্টীমারে আসিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন এবং দেবেন্দ্রনাথ সিংহল হইতে ফিরিয়া আসিয়া কেশবচন্দ্রকে ব্রাহ্মসমাজ সংক্রান্ত নানা কার্য্য ভার দিবার আশ্বাস প্রদান করিয়াছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথের পিতা দ্বারকানাথ ঠাকুর ইতিপূর্ব্বে বিলাত যাত্রা করিয়া তাঁহার পক্ষে সমুদ্রযাত্রা সহজ করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু সম্ভ্রান্ত বৈদ্যকুলোদ্ভব কেশবের পক্ষে সমুদ্রযাত্রা তত সহজ ছিল না—তাঁহার পক্ষে সমুদ্র যাত্রার ফলে জাতিচ্যুতি, এবং তাঁহার মাতা সারদাসুন্দরী ও জ্যেষ্ঠভ্রাতা নবীনচন্দ্র এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের সহিত চিরবিচ্ছেদের আশঙ্কা ছিল। কেশবের এই সমুদ্রযাত্রার কারণে কেশবপত্নীকে এত লাঞ্ছনা গঞ্জনা ভোগ করিতে হইয়াছিল যে, তিনি প্রকারান্তরে সেই সকলের হাত এড়াইবার জন্য একবার আত্মহত্যার চেষ্টা পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন।

৫ই নবেম্বর (১৭৮১ শক ২০ কার্ত্তিক শনিবার) দেবেন্দ্রনাথ সঙ্গীগণের সহিত কলিকাতায় প্রত্যাগত হইলেন। সৌভাগ্যক্রমে কেশবচন্দ্র গৃহে ফিরিয়া প্রতীক্ষিত অত্যাচার ও আত্মীয়বিচ্ছেদের পরিবর্ত্তে মাতার স্নেহগুণে সাদর অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছিলেন। ষ্টীমারে কেশব দেবেন্দ্রনাথের নিকটে সর্ব্বদাই থাকাতে দেবেন্দ্রনাথ ভালরূপে দেখিতে পাইলেন যে, ব্রাহ্মসমাজের প্রতি কেশবের কিরূপ গভীর অনুরাগ। সেই অনুরাগ দেখিয়া কেশবের প্রতি দেবেন্দ্রনাথের অনুরাগও গাঢ়তর হইয়া উঠিল এবং পরিণামে এই প্রেমসম্মিলন ব্রাহ্মসমাজে অঘটন ঘটনা সকল সংঘটিত করিয়াছিল।

সিংহল হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেবেন্দ্রনাথ

* রামমোহন রায়ের ইংরাজীভাষায় লিখিত প্রবন্ধাদি ধর্ম্মবিষয়ক তর্ক লইয়া; ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব লইয়া কিনা ঠিক বলা যায় না।

ব্রহ্মবিদ্যালয়কে ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয় তলস্থ প্রশস্ত গৃহে উঠাইয়া লইয়া গেলেন। এই গৃহে "একটী লম্বা টেবিল পাতা থাকিত, তাহার উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকে বেঞ্চের উপর দুই সারি দিয়া ছাত্র সকল বসিতেন এবং পূর্ব্বদিকে দুইখানি চেয়ারের উপর উপদেষ্টা দুইজন আসন গ্রহণ করিতেন।" এই সময় অবধি একদিকে দেবেন্দ্রনাথ-প্রচারিত সংস্কৃত শাস্ত্রমূলক "আত্মপ্রত্যয়" শব্দ, অপরদিকে পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রের ব্যবহৃত "Intuition"শব্দের অনুবাদমূলক কেশবচন্দ্র-প্রচারিত "সহজ জ্ঞান" শব্দ, এই দুইটী শব্দের বহুল প্রচার হইতে থাকে। উপদেশের বিষয়ের জন্য দেবেন্দ্রনাথ উপনিষৎ প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থ ও দেশভ্রমণজনিত ভূয়োদর্শনের উপর নির্ভর করিতেন। কেশবচন্দ্র পাশ্চাত্য দার্শনিক গ্রন্থসমূহের উপরেই সমধিক নির্ভর করিতেন। "মোরেল, কুজীন (কুজ্যাঁ?) হ্যামিল্টন প্রভৃতি কয়েকখানি বৈজ্ঞানিক (দার্শনিক?) গ্রন্থ এবং পার্কার, নিউম্যান, মিস কবের রচিত একেশ্বরবাদ মতের সমালোচনা কতক পরিমাণে তাঁহাকে এ বিষয়ে সাহায্য করিয়াছিল। একদিকে তিনি ঐ সকল গ্রন্থ পড়িতেন, আর অপরদিকে ব্রহ্মবিদ্যালয়ে আসিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিতেন। বিদ্যালয়ের প্রতি অধিবেশনেই আমেরিকানিবাসী ইউনিটেরীয় প্রচারক ডল সাহেব (Rev. C. H. A. Dall) উপস্থিত থাকিতেন। তাঁহার মতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম বিভাগে প্রদত্ত দর্শন-বিষয়ক উপদেশের সহিত ব্রহ্মবিদ্যালয়ে প্রদত্ত উপদেশের বিশেষ কোন প্রভেদ লক্ষিত হইত না।

এই বিদ্যালয়ে তিন বৎসরব্যাপী পাঠনার বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। প্রতি বৎসরের শেষে ছাত্রদিগকে কঠোর পরীক্ষা দিতে হইত এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে প্রশংসাপত্র দেওয়া হইত। ভবানীপুরে এবং চুঁচড়াতে এই বিদ্যালয়ের শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৭৮২ শকে তিনটী ব্রহ্মবিদ্যালয়ে সমবেত ছাত্রসংখ্যা প্রায় দেড়শত ছিল দেখা যায়। দ্বিতীয় বৎসরের পরীক্ষায় ঐ দেড়শত ছাত্রের মধ্যে মাত্র উনিশ জন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন—ইহাতে প্রকাশ পাইতেছে যে পরীক্ষা কিরূপ কঠোর হইত। ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রায় পাঁচ-

বৎসরকাল জীবিত থাকিয়া উঠিয়া গেল। কিন্তু এই স্বল্পকালের মধ্যেই ইহা ছাত্রগণের অনেকের জীবনে এ প্রকার ধর্ম্মোৎসাহ মুদ্রিত করিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিল যে, তাঁহারা গৃহসংসার ছাড়িয়া ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। উত্তরকালে ইহাঁরাই প্রধানত ব্রাহ্মধর্ম্মের তত্ত্বসমূহ দেশেবিদেশে প্রচার করিবার জন্য বহির্গত হইয়াছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ স্বপ্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মবিদ্যালয়ের সাহায্যে আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের ন্যায় শাস্ত্রব্যুৎপন্ন পণ্ডিতগণকে লাভ করিয়া যেমন ব্রাহ্মসমাজের জাতীয় বিশেষত্ব রক্ষা করিয়া শিক্ষিত ভারতবাসী হিন্দুগণের পক্ষে একেশ্বরবাদ সহজে গ্রহণ করিবার উপায় করিয়াছিলেন, সেইরূপ কেশবস্থাপিত ব্রহ্মবিদ্যালয়ের সাহায্যে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতির ন্যায় পাশ্চাত্যশাস্ত্রব্যুৎপন্ন সুবক্তা ও সুলেখকগণকে পাইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিক ভিত্তির প্রতি পাশ্চাত্য জগতের শিক্ষিতমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সূক্ষ্মভাবে দেখিলে বুঝা যাইবে যে দেবেন্দ্রনাথের ব্রহ্মবিদ্যালয়প্রতিষ্ঠার ফলে কেশবচন্দ্র প্রভৃতিকে পাওয়া গিয়াছিল এবং কেশবচন্দ্রের ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিক ভিত্তির কথা প্রচারের ফলেই আমেরিকা প্রভৃতি দেশবিদেশের মহাধর্ম্মসঙ্ঘসমূহের আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছিল।

দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং এই ব্রহ্মবিদ্যালয় সম্বন্ধে বলেন—"আমি আহ্লাদপূর্ব্বক ব্যক্ত করিতেছি যে ১৭৮১ শকে শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র ব্রহ্মানন্দের যত্নে ও পরিশ্রমে একটী ব্রহ্মবিদ্যালয় এই কলিকাতাতে স্থাপিত হয়। সেখানে তিনি যে সকল উপদেশ দিতেন তাহাতে ছাত্রদিগের মন উৎসাহে উদ্দীপ্ত হইত। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য সকল যে প্রকার সহজে বলিতেন, তাহা অনায়াসে তাহারা গ্রহণ করিত। তাঁহার সতেজ বাক্যে তাহাদের হৃদয় বিগলিত হইত। এই জীবন্ত সত্য বলপূর্ব্বক তিনি সকলের মনে বিদ্ধ করিয়া দিতেন যে, জ্ঞান প্রীতি অনুষ্ঠান ব্রাহ্মধর্ম্মের সমগ্র অবয়ব, ইহার মধ্যে একের অভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম অঙ্গহীন হয়। হৃদয়ের প্রীতি ব্যতীত ব্রহ্মজ্ঞান যে, সে শুষ্কজ্ঞান; জ্ঞান ব্যতীত

প্রীতি যে, সে অন্ধকার; অনুষ্ঠান ব্যতীত জ্ঞান-প্রীতি উভয়ই নিষ্ফল—আবার জ্ঞানপ্রীতি ব্যতীত অনুষ্ঠান কেবল বাহ্যাড়ম্বর মাত্র।"

পরমশ্রদ্ধেয় ৺ রাজনারায়ণ বসু তাঁহার কোন বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন—"ব্রহ্মবিদ্যালয় দ্বারা মহোপকার সাধন হইতেছে। সেই উপকার সকলের প্রধান মূলীভূত শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের অসাধারণ বাক্‌পটুতা, যত্ন ও উৎসাহ।"

উন্নতি-প্রসঙ্গ।

কুম্ভমেলায় স্বেচ্ছাব্রতী—সঞ্জীবনী বলেন—"গত ১১ই ফেব্রুয়ারি কুম্ভমেলায় বিশেষ উৎসবের দিন ছিল। গত অমাবস্যার দিন ১৫ লক্ষের অধিক যাত্রী ত্রিবেণীতে মিলিত হইয়াছিল। এত লোকসমাগম হইলেও সর্ব্বত্রই শৃঙ্খলা দেখা গিয়াছে। এই শৃঙ্খলা রক্ষাকার্য্যে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য মহাশয়ের সেবা-সমিতির স্বেচ্ছাব্রতীরা পুলিসদিগকে বিস্তর সাহায্য করিয়াছেন। স্বেচ্ছাব্রতীর সংখ্যা ছিল ৭৫০। ভারতভৃত্য সমিতির মিঃ হৃদয়নাথ কুঞ্জর ইহাঁদের কাপ্তেন ছিলেন। ত্রিবেণী সঙ্গমতীর্থে নিরন্তর দুই শত স্বেচ্ছাব্রতী সেবক কার্য্য করিয়াছেন। ইহাঁরা স্নানার্থীদিগকে সর্ব্বদা সাহায্য করিয়াছেন। ইহাঁরা স্নানের স্থানে লাইফবোট ও নৌকা লইয়া লোকের প্রাণরক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন। ইহাঁদের চেষ্টায় অন্যূন দুইশত লোকের প্রাণরক্ষা হইয়াছে। সেবাসমিতির আফিসে প্রায় তিন সহস্র নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির নাম লেখান হইয়াছিল, তাহাদের অধিকাংশকে তাঁহারা সন্ধান করিয়া গৃহে পাঠাইয়াছেন। আত্মীয়দিগকে হারাইয়া যাঁহারা বিপন্ন হইয়াছিলেন, সেবাসমিতির সেবকগণ তাঁহাদিগকে গৃহে পাঠাইয়া দিয়াছেন।" এই প্রকার সংবাদে আমরা যে কি আনন্দ লাভ করিলাম তাহা বলিতে পারি না। ইহাতে ভবিষ্যদ্বংশীয়দিগের উপরে একটা গভীর আস্থা আসে। আমাদের অনুরোধ এই যে সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ দেশের উন্নতি সাধনের জন্য নিজেদের দায়িত্ব স্মরণ করিয়া পরস্পরের গ্লানি কুৎসা ও বিবাদের কথায় সংবাদপত্রের স্তম্ভ পূর্ণ না করিয়া এই প্রকার সংবাদসমূহ প্রকাশ করিয়া বালক ও যুবকদিগকে সৎকার্য্যে উৎসাহিত করুন।

কালীমোহন দাসের মহত্ত্ব—১লা চৈত্রের তত্ত্বকৌমুদীতে ৺কালীমোহন দাস সম্বন্ধে একটী ঘটনা উল্লিখিত হইয়াছে। এরূপ ঘটনা স্মরণীয় করিয়া রাখা উচিত বলিয়া আমরা তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

"জনৈক তৈলব্যবসায়ী তাহার কারবার বাড়াইবার ইচ্ছায় তাঁহার নিকট হইতে ১০০৲ টাকা ধার নিয়াছিল। কোনও কারণে ঐ লোকটীর ব্যবসায়ে ক্ষতি হওয়ায় উহার আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠে। তিনি কিছুদিন পর এই কথা শুনিয়া উহার অবস্থা দেখিয়া নিতান্ত কষ্ট অনুভব করেন। সুদের টাকার জন্য তিনি উহাকে কোনও দিন কোনও কথা বলেন নাই। নওগাঁ হইতে ডিব্রুগড় বদলি হওয়ার সংবাদ পাইয়া তিনি সকলের নিকট হইতে বিদায় লইতে লাগিলেন। ঐ তৈলব্যবসায়ী তাঁহার চলিয়া যাওয়ার সংবাদ পাইয়া টাকা শোধ করিবার জন্য নিজ ব্যবসায়ে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে থাকে। তিনি নওগাঁ পরিত্যাগ করিবার কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীযুক্তা পিসিমাঠাকুরাণীকে উহার পরিজনবর্গকে দেখিয়া আসিতে বলেন। তদনুসারে পিসিমাঠাকুরাণী একদিন সন্ধ্যার সময় যাইয়া দেখেন যে উহারা অতিকষ্টে দিনাতিপাত করিতেছে। ঐ লোকটীর স্ত্রী অন্ধকারে বসিয়া রান্না করিতেছিল। তাঁহাকে দেখিয়াই বাতি জ্বালাইয়া বলিল যে আপনাদের টাকা পরিশোধ করিবার চেষ্টায় বাজারে তৈল বিক্রয় করিতে গিয়াছে। আজই আপনাদের টাকা দিয়া আসিবে। পিসিমা বলিলেন, "আমি ত টাকার তাগাদা করিতে আসি নাই। আমরা ২১ দিন পরেই ডিব্রুগড় চলিয়া যাইব। তোমরা কেমন আছ তাহা দেখিতে আসিয়াছি।" বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া এই কথা বলিবার পরেই ঐ লোকটি পিসামহাশয়ের নিকট আসিয়া বলিল, "অনেক চেষ্টা করিয়া মাত্র নয়টী টাকা আনিয়াছি। এই টাকা কয়টীই নিন।" তিনি উহার নিকট হইতে টাকা কয়টী নিয়া বাক্স হইতে খতখানি আনিয়া উহাকে বলিলেন, "দেখ, এই খত দিয়া তুমি টাকা নিয়াছিলে। তুমি যাহা দিতে পারিয়াছ তাহা দিয়াছ। তুমি অশক্ত, আমার টাকার জন্য তুমি ভাবিও না।" এই বলিতে বলিতে খতখানা টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। এই ব্যাপারে ঐ লোকটী কিয়ৎকাল স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া কাঁদিয়া ফেলিল। পরে বলিল, "আপনার টাকা আমার অবস্থার পরিবর্ত্তন হইলেই দিব। এমন লোকের টাকা মারিতে নাই" তিনি বলিলেন, "তোমার যাহা ইচ্ছা করিতে পার, কিন্তু আমার কোনও দায় দাবী নাই।" তিনি সর্ব্বদাই গরীবের সাহায্যে মুক্ত হস্ত ছিলেন। তাঁহার দ্বার ইহাদের জন্য অবারিত ছিল, ইহারা তাঁহাকে দেবতা জ্ঞানে ভক্তি করিত। তিনি নওগা হইতে চলিয়া আসিবার সময় উহারা তাহাদের কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ শক্তি অনুযায়ী—গামছা বড় কাপড়া ইত্যাদি উপঢৌকন দিয়াছিল।"

গান্ধি মহারাজের অনশন ব্রত—শ্রীযুক্ত গান্ধি

অনশন ব্রত লইয়াছিলেন বলিয়া দেশে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল। তিনি কেন যে অনশন ব্রত লইয়াছিলেন, সে বিষয়ে একটি কৈফিয়ৎ তিনি অল্প কয়েক দিন হইল সংবাদ পত্রে ছাপাইয়াছেন। ঘটনাটি এই—বোম্বাই প্রেসিডেন্সির আমেদাবাদে কলওয়ালাদের সঙ্গে মজুরদের বিরোধ হইল মজুরী লইয়া। কলওয়ালারা যাহা দিতে চাহেন, মজুরগণ তাহা অপেক্ষা বেশী চায়। অবশেষে মজুরগণ ধর্ম্মঘট করিল। গান্ধি যখন বম্বে গেলেন, তখন তাঁহাকে এ বিষয়ে সালিসি করিবার জন্য অনুরোধ করা হইল। অবশেষে তিনি দু'একজন বন্ধুর পরামর্শে যতটা মজুরী দেওয়া উচিত মনে করিলেন তাহা কলওয়ালাদিগকে বলিয়া পাঠাইলেন। কলওয়ালারা তাহাতে রাজী হইলেন না। মজুরগণ গান্ধির কথায় রাজী হইল এবং দলে দলে কলের মজুরী ছাড়িয়া দিয়া ভগবানের নামে প্রতিজ্ঞা করিতে লাগিল যে গান্ধির প্রস্তাবে কলওয়ালারা সম্মত না হইলে তাহারা পুনরায় কলের মজুরী করিবে না। এইভাবে ধর্ম্মঘটের বাইশ দিন কাটিয়া গেল। অবশেষে কতকগুলি মজুর অভাবের তাড়না সহ্য করিতে না পারিয়া কলের মজুরীতে পুনরায় ঢুকিবার জন্য অস্থির হইতে লাগিল। তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল যে 'গান্ধি প্রভৃতির কি—তাঁহারা ভাল খাইবেন পরিবেন মোটর গাড়ী চড়িয়া বেড়াইবেন আর আমাদিগকে প্রাণপণে ধর্ম্মঘট করিয়া থাকিতে উপদেশ দিবেন'? এই অবস্থায় গান্ধি যাহা বলিতেছেন তাহা অনুধাবন যোগ্য।

"আমি কি করিব? মজুরদের দাবী আমি ন্যায়সঙ্গত মনে করি। আমি এই চিঠি লিখছি যেমন জানি, সেই রকমই ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি। আমি মনে করি যে প্রত্যেকের প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা উচিত। আমি জানি যে এই সকল মজুরেরা ঈশ্বরবিশ্বাসী, কিন্তু ধর্ম্মঘট দীর্ঘকালব্যাপী হওয়াতে তাহাদের অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে। * * * আমি জানি যে আমাদের অনেকেরই ঈশ্বর সম্বন্ধে এবং আত্মশক্তি সম্বন্ধে একটা অনির্দ্দিষ্ট ধারণা আছে। এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া আমার মনে হইল যে আমার পক্ষে ইহা শুভ মুহূর্ত্ত, বিশ্বাসের উপযুক্ত কাজ করিতে পারি কিনা তাহার পরীক্ষা উপস্থিত। এই পরীক্ষা দিতে আমার কোনই দ্বিধা আসিল না। আমি তাহাদিগকে বলিলাম যে "তাহাদের প্রতিজ্ঞাভঙ্গের যাতনা আমার পক্ষে অসহ্য এবং যতদিন পর্য্যন্ত তাহারা তাহাদের ন্যায্য দাবী না পায় অথবা তাহারা পরাজয় স্বীকার না করে, ততদিন আমি কোন প্রকার খাদ্য গ্রহণ করিব না।"

তিনি এই অনশন ব্রত গ্রহণ করিয়া ভাল বা মন্দ করিয়াছিলেন, তাহার বিচার করা আবশ্যক দেখি না, কারণ তাহা অতীত ঘটনা। কিন্তু তিনি এই ব্রত গ্রহণে ঈশ্বরের প্রতি যে অটল বিশ্বাস এবং প্রতিজ্ঞা রক্ষার যে আশ্চর্য্য শক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা যে প্রত্যেক ভারতবাসীর অনুকরণীয়, তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। তিনি ঠিকই বলিয়াছেন যে "কোন শ্রেণীরই মানুষ একটা জাতিতে পরিণত হইতে পারে না অথবা কোন মহৎ কার্য্য করিতে পারে না যদি না তাহারা ইস্পাতের মত প্রস্তুত হয় এবং যদি না, জগতের লোকে বুঝিতে পারে যে তাহাদের প্রতিজ্ঞা অচল ও অটল—নোয়াইতেও পারা যাইবে না, ভাঙ্গিতেও পারা যাইবে না"। এইরূপ প্রতিজ্ঞাবলে বলীয়ান লোক গুটীকয়েক আবির্ভূত হইলেই ভারতের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

স্ত্রীলোকের ভোট দিবার অধিকার—ইংলণ্ডে এই অধিকার স্ত্রীলোকদিগকে দেওয়া হইয়াছে। ইহার ফল ভাল কি মন্দ বলা বড়ই শক্ত। কাণ্টর-বরির আর্কবিশপ বলিয়াছেন যে যুদ্ধের পর যে গৃহ পুনঃ সংগঠনের অধিকার হইবে স্ত্রীলোকের, সেই গৃহ কিরূপে সংগঠিত হইবে তদ্বিষয়ে প্রতিনিধির সাহায্যে তাহাদিগকে মতামত প্রকাশে অধিকার দেওয়া নিশ্চয়ই উচিত। একদিকে মহাসমরে পুরুষের মৃত্যু, অপরদিকে গোলাগুলির কারখানায় নিযুক্ত স্ত্রীলোকদিগকে এবং ভোটের পক্ষপাতী স্ত্রীলোকদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তাহাদিগকে ভোটের অধিকার দেওয়া হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। ইহাতে ভাল হইবে কি মন্দ হইবে তাহা পরীক্ষাসাপেক্ষ। তবে এই অধিকার দিবার একটী ভাল ফল এই যে ইহা পাইলাম না বলিয়া বিলাতের স্ত্রীলোকদিগের আর আক্ষেপ এবং তজ্জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা থাকিবে না। আমেরিকার তো এই অধিকার আছে, জানিতে ইচ্ছা করে যে তথাকার যুক্তরাজ্যের কংগ্রেসে কয়জন মহিলা নির্ব্বাচিত হয়েন। আমাদের মনে হয় যে ভোটের জন্য মারামারি করা স্ত্রীলোকের পক্ষে এবং সমাজের পক্ষে সুফলপ্রসূ হইবে না। স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য, নিজগুণে গৃহের পরিবারকে স্বমতে গঠিত করিয়া তোলা। ভোটের হুড়াহুড়ি গুঁতাগুঁতিতে সে কর্ত্তব্য সাধিত হইবে কি না সন্দেহ। বলিতে কি, রাজনৈতিক সংগ্রামের মূলমন্ত্র মারামারি। ভোট সংগ্রহ রাজনৈতিক সংগ্রামেরই অন্যতর অস্ত্র। সুতরাং স্ত্রীলোকেরা ভোট পাবার অধিকার পেলেই যে দেশের উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত হইয়া যাইবে তাহা বলিতে পারি না।

"রয়াল সোসাইটীর প্রথম ভারতীয় সদস্য—মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার কেম্ব্রিজ হইতে তার-

যোগে এই সংবাদ পাইয়াছেন যে মান্দ্রাজের শ্রীযুক্ত এস রামানুজম্ বিলাতের রয়াল সোসাইটীর ফেলো বা সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ইহা বিজ্ঞান জগতে অতি উচ্চ-সম্মান; ব্রিটিশসাম্রাজ্যে ইহা অপেক্ষা উচ্চ বৈজ্ঞানিক সম্মান নাই। ভারতবাসীদের মধ্যে ইনিই প্রথম এই সম্মান পাইলেন। একজন ভারতবাসীর এরূপ উচ্চ সম্মান পাওয়া সুখের ও গৌরবের বিষয়। শ্রীযুক্ত রামানুজম্ মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, কিন্তু এফ্ এ পরীক্ষায় ফেল হওয়ায় সামান্য বেতনে কেরাণীগিরি করিতেন। ঘটনাক্রমে গণিত বিষয়ে তাঁহার প্রতিভার প্রমাণ প্রকাশিত হয় এবং তিনি মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিশেষ বৃত্তি লইয়া কেম্ব্রিজে গণিত অধ্যয়ন করিতে যান। শীঘ্রই তথায় অধ্যাপক হার্ডী তাঁহাকে "a pure mathematician of the first order" "বিশুদ্ধ গণিতে প্রথমশ্রেণীর প্রতিভাশালী ব্যক্তি" বলিয়া মত প্রকাশ করেন।"

প্রবাসী—চৈত্র ১৩২৪।

"কৃতী বাঙ্গালী ছাত্র—বিক্রমপুর বীরতারা-নিবাসী পণ্ডিত সারদাকান্ত বিদ্যারত্ন মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অক্সফোর্ডের অল্‌সোল্‌স্ কলেজের ফেলো নিযুক্ত হইয়াছেন। ভারতবাসীদের মধ্যে তিনিই প্রথম এইরূপ ফেলো হইলেন। তিনি ১৯১৬ সালে গ্রীক লাটীন ভাষায় অক্সফোর্ডের বি এ পরীক্ষায় সম্মানের সহিত প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন, এবং পারদর্শিতা অনুসারে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ইহার পর তিনি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোবিজ্ঞানে জনলক্-বৃত্তি পরীক্ষায় প্রথমস্থানীয় হইয়াছেন। দেশে থাকিতেও তিনি কৃতী ছাত্র বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তিনি বি এ পরীক্ষায় ঈশানবৃত্তি পাইয়াছিলেন, এবং এম্ এ পরীক্ষায় ইংরেজীতে দ্বিতীয় স্থানীয় হন।"

প্রবাসী—চৈত্র ১৩২৪।

বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত

গীতা-রহস্য।

আধিদৈবতবাদ ও ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ বিচার।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদিত)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রকারদিগের এই সম্বন্ধীয় চরম সিদ্ধান্তও পাশ্চাত্য আধিভৌতিকবাদীদিগেরই ন্যায়। স্বস্থ ও শান্ত চিত্তে কোন বিষয়ের বিচার করা আবশ্যক এই তত্ত্ব তাঁহারা স্বীকার করেন। কিন্তু ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ণয়ের বুদ্ধি এক, ও কালো সাদা নির্ব্বাচনের বুদ্ধি আর-এক, এ মত তাঁহারা স্বীকার করেন না। মন যে পরিমাণে সুশিক্ষিত হয় সেই পরিমাণে সে ভালমন্দ নির্ণয় করে, তাই, মনের উন্নতি সাধনের জন্য প্রত্যেকের যত্ন করা আবশ্যক, এইরূপও তাঁহারা প্রতিপাদন করিয়াছেন; এবং এই উৎকর্ষ কিরূপে সাধন করিতে হইবে তাহার নিয়মও বলিয়া দিয়াছেন। কিন্তু সদসদ্ বিবেচনশক্তি সাধারণ বুদ্ধি হইতে কিছু স্বতন্ত্র ঈশ্বরের দান, এ মত তাঁহারা মানেন না। মনুষ্য কিরূপে জ্ঞান লাভ করে ও তাহার মন ও বুদ্ধির ব্যাপার কেমন করিয়া চলে, প্রাচীন কালে তাহার সূক্ষ্ম আলোচনা হইয়া গিয়াছে। এই আলোচনা 'ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ বিচার' এই নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ক্ষেত্র অর্থে শরীর ও ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থে আত্মা। এই ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিচার অধ্যাত্মবিদ্যার মূল; এবং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ বিদ্যার ঠিক্ জ্ঞান হইলে পর, শুধু সদসদ্ বিবেচনশক্তি কেন—অন্যান্য মনোদেবতাও আত্মা হইতে উৎকৃষ্ট কিংবা স্বতন্ত্র বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায় না; তাই, আধিদৈবতপক্ষ খণ্ড কেন ইহারও সহজ মীমাংসা হয়। তাই এই স্থানে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিদ্যার সংক্ষেপে বিচার করিব। ভগবদ্‌গীতার অনেক সিদ্ধান্তেরই প্রকৃত অর্থও সেই সূত্রে পাঠকের ঠিক উপলব্ধি হইবে।

মনুষ্যের দেহ (পিণ্ড, ক্ষেত্র, কিংবা শরীর) ইহা একটা বড় কারখানা বলিলেও চলে। কোন কারখানায় যেরূপ বাহিরের পণ্যদ্রব্য ভিতরে আইসে এবং তাহার পর সেই মালের বাছাই বা ব্যবস্থা করিয়া পরে কারখানার উপযোগী পদার্থ কোন্‌গুলি এবং অনুপযোগী কোন্‌গুলি তাহা স্থির করিয়া বাহির-হইতে-ভিতরে-আসা কাঁচা মাল হইতে নূতন পদার্থ প্রস্তুত করিয়া তাহা বাহিরে পাঠান হয়, সেইরূপ মনুষ্যের দেহের মধ্যে প্রতিক্ষণে অনেক ব্যাপার চলিতে থাকে। জগতের পাঞ্চভৌতিক পদার্থ সম্বন্ধে মনুষ্যের জ্ঞান হইবার পক্ষে 'মনুষ্যের ইন্দ্রিয়াদিই প্রথম সাধন। জাগতিক পদার্থের প্রকৃত কিংবা মূল স্বরূপ কি, ইহা কেহ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জানিতে পারে না। আমাদের ইন্দ্রিয়ের

সমক্ষে তাহাদের স্বরূপ যেরূপ প্রতিভাত হয়, তাহারা তাহাই,—এইরূপ আধিভৌতিকবাদীর ধারণা; কিন্তু কাল যদি আমরা কোন নব ইন্দ্রিয় প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে তাহার দৃষ্টিতে জাগতিক পদার্থের গুণধর্ম্ম এখনকার অপেক্ষা ভিন্ন যে হইবে, তাহা আর বলিতে হইবে না। মনুষ্যের ইন্দ্রিয়াদির মধ্যেও দুই ভেদ আছে। এক কর্ম্মেন্দ্রিয় ও আর এক জ্ঞানেন্দ্রিয়। হাত, পা, বাণী, গুদ ও উপস্থ ইহারা পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়। আমরা আমাদের শরীরের দ্বারা যে-ব্যবহার করি তাহা সমস্তই এই কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারাই করিয়া থাকি। এতদ্ব্যতীত নাক, চোখ, কান, জীভ ও ত্বক্ এই পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়। চক্ষুর দ্বারা রূপ, জিহ্বার দ্বারা রস, কর্ণের দ্বারা শব্দ, নাসিকার দ্বারা গন্ধ ও ত্বকের দ্বারা স্পর্শ উপলব্ধি করি। যে কোন বাহ্য পদার্থই ধর না কেন, তৎ-সম্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান হয়, তাহা উক্ত পদার্থের রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের বাহিরে অন্য আর কিছুই নাই। উদাহরণ যথা—ধর, এক টুকরা সোনা। উহা চোখের দৃষ্টিতে পীতবর্ণ, ত্বচের নিকট কঠিন বলিয়া প্রতিভাত হয়, ঠুকিলে লম্বা হয়, ইত্যাদি তাহার যে-যে গুণ ইন্দ্রিয় গোচর হয় তাহাই আমাদের দৃষ্টিতে সোনা, এবং এই গুণসকল বারংবার এক পদার্থের মধ্যে এক রকমই দেখিতে পাওয়া গেলে, আমাদের মতে সোনা এক স্বতন্ত্র পদার্থ হইয়া দাঁড়ায়! বাহিরের মাল ভিতরে নেওয়া ও ভিতরের মাল বাহিরে পাঠিয়ে দেওয়া যেরূপ কারখানার কাজ সেইরূপই মানবদেহের জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল, এই বাহিরের মাল ভিতরে আনিবার ও কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল ভিতরের মাল বাহিরে পাঠাইবার দ্বারস্বরূপ। সূর্য্যের কিরণ কোন পদার্থের উপর পড়িয়া তথা হইতে আবার ফিরিয়া আমাদের চোখের মধ্যে প্রবেশ করিলে, আমাদের আত্মায় সেই পদার্থের রূপসম্বন্ধে জ্ঞান হইয়া থাকে; এবং কোন পদার্থ হইতে নিঃসৃত গন্ধের সূক্ষ্ম পরমাণু আমাদের নাকের মজ্জাতন্তুর উপর আসিয়া পড়িলে আমাদের নিকট তাহার গন্ধ আসে। অন্য জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ব্যাপারও এইরূপই চলিয়া থাকে; এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়সকল এইরূপে ব্যাপার করিতে থাকিলে তাহাদের দ্বারা বাহ্য জগতের পদার্থ আমরা অবগত হই। কিন্তু জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল যে কোন ব্যাপার করে তাহাদের জ্ঞান স্বতঃ তাহাদের হয় না, তাই জ্ঞানেন্দ্রিয়দিগকে জ্ঞাতা এই সংজ্ঞা না দিয়া শুধু বাহিরের মাল ভিতরে আনিবার দরজা বলা হইয়াছে। এই দরজা দিয়া মাল ভিতরে আসিয়া পড়িলে পর, তাহার পরবর্ত্তী ব্যবস্থা করিবার কাজ মনের। উদাহরণ যথা—দ্বিপ্রহর হইলে ঘড়িতে ১২টা ঠোকা পড়িলে পর কটা বাজিল ইহা কানে বুঝা যায় না। প্রত্যেক ঠোকা যেমন যেমন পড়িতে থাকে তেমনি তেমনি বায়ু তরঙ্গ কানে আসিয়া লাগে, এবং মজ্জাতন্তুর দ্বারা প্রত্যেক ঠোকায় পৃথক পৃথক সংস্কার প্রথম মনের উপর হইলে পর সেই সকলের তেরিজ করিয়া কটা বাজিল তাহা আমরা স্থির করি। জ্ঞানেন্দ্রিয় পশুদিগেরও আছে এবং ঘড়ির এক এক ঠোকা যেমন যেমন পড়িতে থাকে তেমনি তেমনি প্রত্যেক ঠোকার সংস্কার তাহার কান দিয়া মন পর্য্যন্ত পৌঁছায়। কিন্তু সমস্তের তেরিজ করিয়া ১২টা বাজিল কিনা এতটা বুঝিবার পক্ষে তাহার মন বিকসিত হয় নাই। এই অর্থ শাস্ত্রীয় পরিভাষায় বলিতে হইলে এইরূপ বলা হইয়া থাকে যে, পশুর অনেক সংস্কারের পৃথক পৃথক জ্ঞান হইলেও সেই নানাত্বের মধ্যে একত্বের বোধ তাহার হয় না। ভগবদ্গীতাতে "ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুঃ ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং-মনঃ"—ইন্দ্রিয়সকল বাহ্যপদার্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ (গীতা ৩, ৪২) এইরূপ যে বলা হইয়াছে তাহার ভাবার্থ এই। মন স্থানে না থাকিলে অর্থাৎ মনোযোগ না হইলে, চোখ খোলা থাকিলেও দেখা যায় না ও কান খোলা থাকিলেও শোনা যায় না, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তাৎপর্য্য, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা বাহিরের মাল, দেহ-কারখানার হিসাবলেখক যে মন সেই মনের নিকটে আসে এবং এই হিসাবলেখক পরে তাহার অনুসন্ধান করে। এই অনুসন্ধান কিরূপে হয় ও তাহার জন্য আমরা এতক্ষণ যাহাকে সাধারণত 'মন' বলিয়া আসিয়াছি তাহারই আরও কিরূপ ভেদ করা আবশ্যক হয়, কিংবা একই মন অধিকার-ভেদে কি-কি পৃথক নাম প্রাপ্ত হয়, এক্ষণে ইহার বিচার করিব।

জ্ঞানেন্দ্রিয়যোগে মনের উপর যে সকল সংস্কার

বটে তাহা প্রথমে একস্থানে সাজাইয়া রাখিয়া, তাহার পর তাহাদের পরস্পর তুলনার দ্বারা তাহার মধ্যে কোনটি ভাল, কোনটি মন্দ, কোনটি গ্রাহ্য ও কোনটি টেকসই, কোনটি লাভজনক ও কোনটি ক্ষতিজনক, প্রথমে ইহার নির্ণয় করা আবশ্যক হয়; এবং নির্ণয় হইলে পর, তাহার মধ্যে যেটি ভাল, লাভজনক, যোগ্য বা করণীয় তাহাই করিতে আমরা প্রবৃত্ত হই, —এইরূপ সাধারণ ব্যবহার। উদাহরণ যথা—আমরা কোন বাগানে গমন করিলে, চক্ষু ও নাসিকা এই দুই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বাগানের গাছ ও ফুলের সংস্কার আমাদের মনের উপর ঘটিয়া থাকে। কিন্তু এই ফুলের মধ্যে কোন্ ফুলের গন্ধ ভাল ও কোন্‌টির গন্ধ খারাপ এই জ্ঞান আমাদের আত্মাতে না হইলে, কোনও ফুল হস্তগত করিবার ইচ্ছায় তাহা তুলিবার উদ্যোগ আমরা করি না। তাই (১) জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা বাহ্য পদার্থের জ্ঞান হইয়া সেই সকল সংস্কারের একত্র বিন্যাস কিংবা তুলনার জন্য সুব্যবস্থিতরূপে সাজাইয়া রাখা (২) এইরূপ বিন্যাসের পর তাহাদের ভালমন্দত্বের সারাসার বিচার করিয়া কোন্‌টি গ্রাহ্য ও কোন্‌টি অগ্রাহ্য ইহার নিশ্চয় করা (৩) এই নিশ্চয় হইলে পর, গ্রাহ্য বস্তু গ্রহণ করিবার ও অগ্রাহ্য বস্তু ফেলিয়া দিবার ইচ্ছা হইয়া সেই অনুসারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া —এইরূপ সমস্ত মনোব্যাপারের তিন টুক্‌রা ভাগ হইয়া থাকে। এই তিন ক্রিয়ারই মধ্যে ব্যবধান না থাকিয়া তাহা একসঙ্গে একের পিছনে আর একটি হওয়া চাই,—এরূপ নহে। পূর্ব্বদৃষ্ট কোন বিষয় আজ হইল এইরূপ মনে হইতে পারে; তথাপি এই ব্যাপারে ঐ তিন ক্রিয়ার মধ্যে কোন ক্রিয়াই হয় নাই এইরূপ বলা যাইতে পারে না; বিচারের কাছারী এক হইলেও সেখানে যেরূপ প্রথমে বাদী-প্রতিবাদী কিংবা তাহাদের উকিল আপন আপন সাক্ষ্য-প্রমাণ বিচারপতির সমক্ষে সজ্জিত করে, তাহার পর উভয়পক্ষের সাক্ষীসাবুদ দেখিয়া তাহার উপর বিচারপতি আপন বিচার নিষ্পত্তি করেন, এবং বিচারপতি-কৃত নিষ্পত্তি শেষে নাজির আমলে আনে, এইরূপ কাজের বণ্টন হইয়া থাকে; সেইরূপ এতক্ষণ পর্য্যন্ত যে হিসাবকারীকে আমরা সাধারণত 'মন' বলিয়া আসিয়াছি তাহার ব্যাপারাদিরও ভেদ হইয়া থাকে। তন্মধ্যে যে সকল বিষয় পরে আসে তাহার সারাসার বিচার করিয়া কোন বিষয় অমুক প্রকারেরই (এবমেব) অন্য প্রকারের নহে (নাহন্যথা), এইরূপ নিশ্চয় করিবার কাজ অর্থাৎ বিচারপতির কাজ শুধু বুদ্ধীন্দ্রিয়ের হওয়া প্রযুক্ত, উপরে কথিত সমস্ত মনোব্যাপার হইতে এই সারাসার বিবেকশক্তি বাদ দিলে পর, বাকী সমস্ত ব্যাপার যে-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হইয়া থাকে তাহাকেই এক্ষণে 'মন' এই নাম দেওয়া বেদান্ত ও সাংখ্য এই দুই শাস্ত্রেরই প্রচলিত রীতি (সাং, কা, ২৩ ও ২৭ দেখ)। এই (কনিষ্ঠ) মনই উকিলের মতো কোন বিষয় এইরূপ (সংকল্প), কিংবা উল্টা পক্ষে সেইরূপ (বিকল্প) ইত্যাদি কল্পনা বুদ্ধির সমক্ষে নির্ণয়ের জন্য স্থাপিত করে; এবং তাই তাহাকে 'সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক' নিশ্চয়কারী না বলিয়া শুধু কল্পনাকারী ইন্দ্রিয় বলা হইয়াছে। 'সঙ্কল্প' এই শব্দের মধ্যেও কখন কখন নিশ্চয়ের সমাবেশও করা যায় (ছান্দোগ্য, ৭।৪।১ দেখ)। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নিশ্চয়ের অপেক্ষা না রাখিয়া কোন বিষয় অমুক প্রকারের মনে করা, মানা, গ্রহণ করা, বুঝা কিংবা কিছু যোজনা করা, ইচ্ছা করা, চিন্তা করা, মনে আনা ইত্যাদি—ব্যাপারের উদ্দেশ্যেই 'সঙ্কল্প' এই শব্দের উপযোগ করা হইয়াছে। কিন্তু উকিলের মতো এই প্রকার নিজ কল্পনাকে বুদ্ধিসমক্ষে নিষ্পত্তির জন্য করাতেই মনের কাজ শেষ হয় না। বুদ্ধি ভালমন্দের নির্ণয় করিলে পর যে বিষয়, বুদ্ধির গ্রাহ্য হইল তাহা কর্ম্মেন্দ্রিয় দিয়া ঘটাইয়া আনা অর্থাৎ তাহাকে আমলে আনা—এই নাজিরের কাজ মনেরই করিতে হয় এবং তাহার দরুণ মনের ব্যাখ্যা অন্য প্রকারেও করিতে পারা যায়। বুদ্ধিকৃতনির্ণয়কে কিরূপে আমলে আনিতে হইবে তাহার যে বিচার করিতে হয় তাহা সঙ্কল্প বিকল্পেরই এক প্রকারভেদ বলিলেও চলে। তথাপি তাহার সংস্কৃতভাষায় 'ব্যাকরণ,—বিস্তার করা' এইরূপ আর এক স্বতন্ত্র নাম আছে। ইহা ব্যতীত বাঁকী কাজ বুদ্ধিরই। মন আমাদের কল্পনা সমূহের সারাসার বিচার করে না। এই সারাসার বিচার করিয়া কোন বস্তুর যথার্থ জ্ঞান অভ্যাস করিয়া দেওয়া কিংবা বাছাই করিয়া অমুক

বস্তু অমুক প্রকারের ইত্যাদি নিশ্চয় করা বা তর্কের দ্বারা কার্য্যকারণসম্বন্ধ দেখিয়া নিশ্চিত অনুমান কিংবা কার্য্যকারণনির্ণয় করা এই সমস্ত ব্যাপার বুদ্ধির, এবং সংস্কৃত ভাষায় এই ব্যাপারকে 'ব্যবসায়' কিংবা 'অধ্যবসায়' বলে; তাই, এই দুই শব্দের উপযোগ করিয়া বুদ্ধি ও (কনিষ্ঠ) মন ইহাদের মধ্যে ভেদ দেখাইবাব জন্য—

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ মনো ব্যাকরণাত্মকম্॥

অর্থাৎ বুদ্ধি (ইন্দ্রিয়) ব্যবসায়কারী অর্থাৎ সারাসারবিচারপূর্ব্বক নিশ্চয়কারী; এবং মন (কনিষ্ঠ) ব্যাকরণ অর্থাৎ বিস্তার বা পরবর্ত্তী ব্যবস্থাকারী প্রবর্ত্তক ইন্দ্রিয়, সুতরাং বুদ্ধি ব্যবসায়াত্মিকা ও মন ব্যাকরণাত্মক। এইরূপ ইহার ব্যাখ্যা মহাভারতে প্রদত্ত হইয়াছে (সভা, শাং, ২৫১।১১)। ভগবদ্‌গীতাতেও "ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ" এই শব্দের উল্লেখ আছে (গী, ২।৪৪); এবং সেই স্থানে বুদ্ধির অর্থ সারাসারবিচারপূর্ব্বক নিশ্চয়কারী ইন্দ্রিয়। বুদ্ধি কেবল তলোয়ার মাত্র। যাহা কিছু তাহার সম্মুখে আসে কিংবা আনীত হয় তাহা ভাঙ্গাই তাহার কাজ; তাহার অন্য কোনও গুণ বা ধর্ম্ম নাই (সভা. বন, ১৮১।২৬)। সঙ্কল্প, বাসনা, ইচ্ছা, স্মৃতি, ধৃতি, শ্রদ্ধা, উৎসাহ, কারুণ্য, উৎকণ্ঠা, প্রেম, দয়া, কৃতজ্ঞতা, কাম, লজ্জা, আনন্দ, ভীতি, রাগ, সঙ্গ, দ্বেষ, লোভ, মদ, মাৎসর্য্য, ক্রোধ ইত্যাদি সমস্তই মনের গুণ বা ধর্ম্ম হওয়াপ্রযুক্ত (বৃ, ১।৫।২, মৈত্র্য, ৬।৩০) এই মনোবৃত্তি যেরূপ জাগ্রত হয় সেই অনুসারেই কোন কর্ম্ম করিবার দিকে মনুষ্যের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। উদাহরণ যথা—মনুষ্য যতই বুদ্ধিমান-হোক্ না কেন এবং গরীব লোকদের অবস্থা কিরূপ তাহার পূর্ণজ্ঞান কোন ব্যক্তির হইলেও তাহার মনে যদি কারুণ্যবৃত্তি জাগ্রত না হয় তাহা হইলে গরীবের সাহায্য করিবার ইচ্ছা তাহার কখনই হয় না; অথবা যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা থাকিলেও ধৈর্য্য না থাকিলে সে যুদ্ধ করিতে পারে না। যে বিষয় আমরা করিতে ইচ্ছা করি তাহার পরিণাম কি হইবে বুদ্ধি তাহাই বলিয়া থাকে। কিন্তু ইচ্ছা কিংবা ধৈর্য্য প্রভৃতি গুণ বুদ্ধির ধর্ম্ম না হওয়ায় বুদ্ধি আপনা হইতে অর্থাৎ মনের সাহায্য ব্যতীত কখনই ইন্দ্রিয়দিগের প্রেরণা করিতে পারে না। উল্টাপক্ষে ক্রোধাদির আবেশে মন আপনা হইতেই ইন্দ্রিয়দিগকে প্রেরণা করিতে পারিলেও বুদ্ধির সারাসার বিচার ব্যতীত শুধু মনোবৃত্তিদের প্রেরণার দ্বারা সংঘটিত কর্ম্ম নীতিদৃষ্টিতে শুদ্ধ হইবেই এরূপ কোন নিয়ম নাই। উদাহরণ যথা—বুদ্ধির উপযোগ না করিয়া শুধু কারুণ্যবৃত্তির দ্বারা কোন দান করিলে তাহা অপাত্রে পড়িয়া তাহা হইতে মন্দ পরিণাম হইবারও সম্ভাবনা আছে। সার কথা—বুদ্ধির সাহায্যব্যতীত শুধু মনোবৃত্তি অর্দ্ধেক মাত্র। তাই মনুষ্যের হাতে কোন শুদ্ধ কর্ম্ম ঘটিবার প্রসঙ্গে, বুদ্ধিই শুদ্ধনির্ণয়কারী অর্থাৎ ভালমন্দের অভ্রান্ত নির্ণয়কারী; মন, বুদ্ধির অধীনে কার্য্য করে ও ইন্দ্রিয়গণ মনের অধীনে অবস্থিত—এইরূপ উহাদের জোড় মিলাইতে হয়। বুদ্ধি ও মন এই দুই শব্দব্যতীত অন্তঃকরণ ও চিত্ত এই দুই শব্দও প্রচলিত আছে; তন্মধ্যে অন্তঃকরণ এই শব্দের ধাত্বর্থ "অন্তরস্থ করণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়" এইরূপ হওয়ায়, তাহার, মধ্যে মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার প্রভৃতি সমস্তেরই সাধারণত সমাবেশ হয়; এবং মন প্রথমত বাহ্যবিষয়ের গ্রহণ অর্থাৎ চিন্তন করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাহাই চিত্ত হয় (সভা, শা, ২৭৪, ১৭)। কিন্তু সাধারণব্যবহারে এই সমস্ত শব্দ প্রায় সমান অর্থেই প্রযুক্ত হওয়ায় অনেকসময় কোন্ অর্থ কোথায় বিবক্ষিত সে সম্বন্ধে গোলযোগ উপস্থিত হয়। এই গোলযোগ যাহাতে না হয়, তাই এইরূপ অনেক শব্দের মধ্যে শাস্ত্রীয় পরিভাষায় মন ও বুদ্ধি এই দুই শব্দই উপরি-প্রদত্ত নিশ্চয়ার্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। মন ও বুদ্ধি—ইহাদের এইরূপ একবার ভেদ করিলে পর, বিচারপতি এই অধিকারসূত্রে বুদ্ধি, মন অপেক্ষা কাজে-কাজেই শ্রেষ্ঠ হয়, এবং মন বুদ্ধির হিসাব-লেখক-কেরাণী হইয়া দাঁড়ায়। "মনসস্তু পরা বুদ্ধি"—মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ কিম্বা বুদ্ধির অতীত (গী, ৩, ৪২)—গীতাকাব্যের ভাবার্থই এই। তথাপি উপরি-উক্ত অনুসারে এই হিসাবে কেরাণীকে দুই প্রকারের কাজ করিতে হয়। এবং বাহির হইতে কিংবা ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা ভিতরে আনীত সংস্কারসমূহের ব্যবস্থা করিয়া, নিষ্পত্তির জন্য বুদ্ধির সমক্ষে স্থাপন করা এবং বুদ্ধির দ্বারা নিষ্পত্তি

হইলে পর, বুদ্ধির হুকুম কিংবা আদেশমাত্র ইন্দ্রিয়ের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়া, বুদ্ধির উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য যাহা আবশ্যক সেই বাহ্য-ক্রিয়া ইন্দ্রিয়ের দ্বারা করিয়া লওয়া। দোকানের জন্য খরিদ করা ও দোকানে বসিয়া বিক্রী করা এই দুই কাজই অনেক সময় যেমন দোকানের এক কর্ম্মচারীই করিয়া থাকে সেইরূপ মনের অবস্থা। আমাদের কোন স্নেহপাত্র আমাদের নজরে পড়িলে এবং তাহাকে ডাকিবার ইচ্ছা হইলে আমরা তাকে 'ওরে!' বলিয়া ডাকি। এই ব্যাপারটিতে অন্তঃকরণের মধ্যে কত ব্যাপার হয় দেখ। প্রথমে চোখের দ্বারা অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা, আমাদের স্নেহপাত্র নিকটে আছে—এই সংস্কার মনের মারফৎ বুদ্ধির নিকট পৌঁছিলে আবার বুদ্ধির মারফৎ সেই জ্ঞান আত্মাতে উৎপন্ন হয়। এইখানেই, প্রথম ক্রিয়া অর্থাৎ জ্ঞানের ক্রিয়া শেষ হইল। তাহার পর, সেই স্নেহপাত্রকে হাঁক দিয়া ডাকিতে হইবে এইরূপ আত্মা বুদ্ধির দ্বারা স্থির করে এবং বুদ্ধির অভিপ্রায় আমলে আনিবার জন্য মনের মধ্যে বলিবার ইচ্ছা হইয়া মন, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা 'অরে' এইরূপ বলাইয়া থাকে। পাণিনীর শিক্ষাগ্রন্থে শব্দোচ্চারণক্রিয়ার বর্ণনা এই ভাবেই করা হইয়াছে।

আত্মা বুদ্ধ্যা সমেত্যার্থান্ মনো যুংক্তে বিবক্ষয়া
মনঃ কায়াগ্নিমাহন্তি স প্রেরয়তি মারুতম্।
মারুতস্তু বসি চরন্ মন্দ্রং জনয়তি স্বরম্॥

অর্থাৎ—"আত্মা প্রথমে বুদ্ধি দ্বারা সমস্ত বিষয় আত্মগত করিয়া মনো মধ্যে বলিবার ইচ্ছা উৎপন্ন করে; এবং মন কায়াগ্নির চালনা করিবার পর কায়াগ্নি বায়ুকে প্রেরণা করে। তদনন্তর, এই বায়ু বক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মন্দ্রস্বর উৎপন্ন করে"; এবং এই স্বরই পরে কণ্ঠতালব্যাদিবর্ণভেদে মুখ হইতে নিঃসৃত হয়। উপরি-উক্ত শ্লোকের মধ্যে শেষের দুই চরণ মৈত্র্যুপনিষদেতেও প্রদত্ত হইয়াছে (মৈত্র, ৭, ১১,); এবং ইহা হইতে উপলব্ধি হয়, এই শ্লোক পাণিনী হইতেও প্রাচীন।*

আধুনিক শারীরশাস্ত্রে কায়াগ্নির নাম 'মজ্জাতন্তু' দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু বহিঃপদার্থের জ্ঞান ভিতরে আনিবার জন্য এবং বুদ্ধির আদেশ মনের দ্বারা কর্ম্মেন্দ্রিয়দিগকে জানাইবার জন্য শরীরের মধ্যে মজ্জাতন্তু বিভিন্ন; তাই তদনুসারে মনও দুই বলিয়া মানিতে হইবে, এইরূপ পাশ্চাত্য শারীরশাস্ত্রজ্ঞদিগের উক্তি। আমাদের শাস্ত্রকারেরা দুই মন না মানিয়া, বুদ্ধি ও মনকে পৃথক করিয়া, মন উভয়াত্মক অর্থাৎ তাহা কর্ম্মেন্দ্রিয়ের নিকট কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অনুরূপ ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের নিকট জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অনুরূপ কার্য্য করিয়া থাকে, এইমাত্র বলিয়াছেন। তাৎপর্য্য একই। উভয়েরই দৃষ্টিতে বুদ্ধি নিশ্চয়কারী বিচারপতি; তবে মন, প্রথমে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের স্থানে সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক হইয়া গিয়া, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের স্থানে ব্যাকরণাত্মক কিংবা কার্য্যসম্পাদক অর্থাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎ প্রবর্ত্তক হইয়া থাকে। তথাপি কোন বিষয়ের 'ব্যাকরণ' করিবার সময়, বুদ্ধির হুকুম কি প্রকারে সুসিদ্ধ হইবে এই সম্বন্ধে কখন কখন সঙ্কল্প বিকল্প করাও মনের আবশ্যক হয়। তাই, মনের ব্যাখ্যা করিবার সময়, সাধারণত 'সঙ্কল্পবিকল্পাত্মকং মনঃ'—এইরূপ বলিবারই রীতি আছে। কিন্তু কখনও কখনও, মনের দুই ব্যাপারই তাহাতে সমাবেশ হইয়া থাকে,—ইহা বিস্মৃত হইবে না।

বুদ্ধি অর্থাৎ নির্ব্বাচনকারী ইন্দ্রিয় এইরূপ উপরে যাহার অর্থ করা হইয়াছে তাহা শাস্ত্রীয় সূক্ষ্মবিচারের জন্য। কিন্তু এই শাস্ত্রীয় অর্থ প্রায়ই পরে স্থির হইয়া থাকে। তাই এই শাস্ত্রীয় অর্থ স্থায়ী হইবার পূর্ব্বে বুদ্ধিশব্দের যে ব্যবহারিক অর্থ প্রচলিত হইয়া গিয়াছে তাহাও এখানে বিচার করা আবশ্যক। ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি কোনও বিষয়ের প্রথম নির্ণয় না করিলে, সেই বস্তুর জ্ঞান আমাদের হয় না; এবং জ্ঞান না হইলে সেই বস্তু লাভ করিবার ইচ্ছা কিংবা বাসনাও হয় না। তাই ব্যবহারে, আম গাছ ও ফলের নামকরণে যেরূপ 'আম' এই একই শব্দ প্রযুক্ত হয়, সেইরূপ ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি ও সেই বুদ্ধির বাসনাদি ফল দেখাইবার জন্যও

* মৈত্র্যুপনিষৎ পাণিনী হইতে প্রাচীন এইরূপ মেক্ষমূলর সাহেব লিখিয়াছেন। Sacred Books of the East series, Vol XV. PP XLXII—LI—II.

ইহার বিস্তৃত বিচার আমি পরে পরিশিষ্টপ্রকরণে করিয়াছি তাহা দেখ।

ব্যবহারে সাধারণ লোকে অনেক সময় এই একই বুদ্ধিশব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকে। উদাহরণ যথা—অমুকের বুদ্ধি দুষ্ট এইরূপ যখন আমরা বলি তখন বাসনা দুষ্ট এইরূপ অর্থে বলিয়া থাকি। শাস্ত্র দৃষ্টিতে ইচ্ছা কিংবা বাসনা মনের ধর্ম্ম হওয়ায় তাহার বুদ্ধি এই নাম দেওয়া সঙ্গত নহে। কিন্তু বুদ্ধি শব্দের শাস্ত্রীয় অর্থ নিষ্কর্ষিত হইবার পূর্ব্বে ব্যবহারে লোকেরা, বাছাবাছি করিবার ইন্দ্রিয় (১) এবং (২) সেই ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার হইতে পরে মনুষ্যের মনে উৎপন্ন বাসনা কিংবা ইচ্ছা—এই দুই অর্থেই বুদ্ধি শব্দের প্রয়োগ করিয়া আসিয়াছে। তাই আমের ভেদ দেখাইতে হইলে পরে 'গাছ' কিং 'ফল' এই শব্দ যেরূপ প্রযুক্ত হয় সেইরূপ বুদ্ধির দুই অর্থের ভেদ যখন দেখান আবশ্যক হয় তখন নির্ব্বাচনকারী শাস্ত্রীয় বুদ্ধির সহিত 'ব্যবসায়িত্মিকা এই বিশেষণ সংযোজিত করা হয়; এবং বাসনাকে শুধু বুদ্ধি কিংবা বড়-জোর 'বাসনাত্মক' বুদ্ধি এইরূপ বলা হইয়া থাকে। গীতাতে উপরি-উক্ত দুই অর্থেই 'বুদ্ধি' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে (গী, ২, ৪১, ৪৪, ৪৯; ও ৩, ৪২); এবং কর্ম্মযোগের বিচার ঠিক্ বুঝিতে হইলে 'বুদ্ধি' শব্দের উপরি-উক্ত দুই অর্থই সর্ব্বদা মনে রাখা আবশ্যক। মনুষ্য যে-কোন কর্ম্ম করুক না কেন, সেই কর্ম্ম ভাল কি মন্দ, করণীয় কিংবা করণীয় নহে ইত্যাদি বিষয়ের বিচার প্রথমে আমাদের 'ব্যবসায়াত্মিক বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই করিয়া থাকি; এবং পরে সেই কর্ম্ম করিবার ইচ্ছা বা বাসনা (অর্থাৎ বাসনাত্মক বুদ্ধি) তাহার মনে উৎপন্ন হইয়া উক্ত কর্ম্ম করিতে সে প্রবৃত্ত হয়, ইহাই এই মনোব্যাপারের ক্রম। তন্মধ্যে কার্য্যাকার্য্যের নিষ্পত্তি করা—যাহা (ব্যবসায়িক) বুদ্ধির ব্যাপার, তাহা ইন্দ্রিয়ের অধীনে থাকিলে, যদৃচ্ছাক্রমে বাসনা (বুদ্ধির) মনেতে উৎপন্ন হইয়া মন বিগড়িয়া যায় না। তাই প্রথমে ব্যবসায়াত্মিক বুদ্ধিকে শুদ্ধ ও সুস্থির করা আবশ্যক এইরূপ গীতান্তর্গত কর্ম্মযোগশাস্ত্রের প্রথম সিদ্ধান্ত (গী, ২, ৪১)। শুধু গীতায় নহে ক্যাণ্টও * বুদ্ধির এইরূপ দুই ভেদ করিয়া শুদ্ধ অর্থাৎ ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধির ও ব্যবহারিক অর্থাৎ বাসনাত্মক বুদ্ধির ব্যাপারাদি সম্বন্ধে দুই স্বতন্ত্র গ্রন্থে বিচার করিয়াছেন। বস্তুত দেখিলে, ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধিকে কিরূপে সুস্থির করিবে ইহা পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রের বিষয়, কর্ম্মযোগের নহে। কিন্তু কর্ম্মের বিচার করিবার সময় কর্ম্মের পরিণামের দিকে দৃষ্টি করা অপেক্ষা সেই কর্ম্মকারীর বাসনা অর্থাৎ বাসনাত্মক বুদ্ধি কিরূপ ইহা প্রথমে দেখা আবশ্যক, ইহাই গীতার সিদ্ধান্ত (গী, ২, ৪৯); এবং সেইরূপ বাসনার বিচার করিতে হইলে দেখা যায় যে, যাহার ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধি সুস্থির ও শুদ্ধ হয় নাই, তাহার মনে বাসনার বিভিন্ন তরঙ্গ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এবং সেই জন্য সেই বাসনা সর্ব্বদা শুদ্ধ ও পবিত্র হইবেই এরূপ কোন নিয়ম নাই (গী, ২, ৪১)। এবং বাসনা শুদ্ধ না হইলে পরবর্ত্তী কর্ম্ম কি করিয়া শুদ্ধ হইবে? তাই কর্ম্মযোগশাস্ত্রেতেও ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধি শুদ্ধ রাখিবার সাধনা কিংবা উপায় কি তাহার সবিস্তার বিচার করা আবশ্যক হইয়াছে; এবং এই জন্যই ভগবদ্গীতার ৬ অধ্যায়ে, বুদ্ধিকে শুদ্ধ করিবার এক সাধন—এই দৃষ্টিতে পাতঞ্জল যোগের বিচার করিয়াছেন। কিন্তু এই সম্বন্ধের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া গীতার মধ্যে পাতঞ্জল যোগই প্রতিপাদ্য এইরূপ কোন কোন সাম্প্রদায়িক টীকাকার গীতার তাৎপর্য্য বাহির করিয়াছেন। গীতাশাস্ত্রে 'বুদ্ধি' শব্দের উপরি-প্রদত্ত দুই অর্থ ও সেই অর্থের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ মনে রাখা কতটা আবশ্যক তাহা ইহা হইতে পাঠকের উপলব্ধি হইবে। ক্রমশঃ

* ক্যাণ্ট এই ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিকে Pure Reason ও বাসনাত্মক বুদ্ধিকে Practical Reason এইরূপ নাম দিয়াছেন; এবং দুই স্বতন্ত্র গ্রন্থে এই দুই বুদ্ধির বিচার আলোচনা করিয়াছেন।

রাণাডের-স্মৃতি কথা।

নবম—পরিচ্ছেদ।

পণ্ডিতা রমা-বাইয়ের পুণায় আগমন ও আর্য্যমহিলা-সমাজের স্থাপনা।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর)

বালিকাদের জন্য উচ্চ বিদ্যালয় আবশ্যক বলিয়া হিরাঁবাগে, সভার সভ্য-শ্রেণীভুক্ত স্ত্রী পুরুষদিগের একটা বড় সভা বসিয়াছিল। সেই সভায়, সেই সময়কার গভর্ণর সর্-জেম্স্-ফর্গুসন্ ইতিপূর্ব্বে উক্ত উচ্চ-বিদ্যা-

লয় স্থাপনের জন্য টাকা তুলিতে আসিয়াছিলেন। সেই দিন, সভার সম্মুখে ইংরেজিতে অভ্যর্থনা-অভিভাষণ পাঠ করিবার ভার আমার উপর অর্পিত হয়। এত লোকের সম্মুখে ইংরেজীতে "অ্যাড্রেস্" পাঠ করিবার এই প্রথম প্রসঙ্গ উপস্থিত হওয়ায় আমি হয়ত সেই সময়ে তথমত খাইয়া যাইব, ভাল করিয়া পড়িতে পারিব না, তাই "উনি", আমার বোধগম্য সহজ ও ছোট ছোট কথায় এই "অ্যাড্রেস্" লিখিয়া দিয়াছিলেন। তাহা দুই এক দিন সাত আটবার করিয়া পড়িয়া লইয়াছিলাম, কিন্তু শেষে যে রকম পাঠ করা উচিত তাহা হইয়াছিল। পাঠ করিবার সময় যখন দাঁড়াইলাম তখন আমার হাত-পা কাঁপিতে লাগিল। বুক ধড়াস ধড়াস করিতে লাগিল, চোক্ ও গা দিয়া আগুন ছুটিতে লাগিল। মাথার উপর দিয়া যেন তপ্ত রক্ত বহিয়া যাইতেছে এইরূপ আমার মনে হইল। কিছুক্ষণ ঐ রকম ভাবেই দাঁড়াইয়া থাকিলে পর, ভাণ্ডারকর আমার পিছনে বসিয়াছিলেন তিনি আমার এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া, আমার পিঠে আস্তে আস্তে একটু খোঁচা দিলেন এবং আস্তে আস্তে বলিলেন "রমাবাই ঘাব্‌ড়িও না, সাহস করে' পাঠ কর, ব্যস্ত হয়ো না; সমস্ত লোক তোমার দিকে চেয়ে আছে, দেখ।" ইহা শুনিয়া তখনি আমার চৈতন্য হইল এবং কোন প্রকারে মন বাঁধিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলাম, পড়া শেষও করিলাম। কিন্তু প্রথমে যে রকম মনে করিয়াছিলাম তাহা অপেক্ষাও অধিক ঘাব্‌ড়াইয়া গিয়াছিলাম। সে যাক্। আমার এই সঙ্কট হইতে উদ্ধার পাইয়া গৃহে আসিলাম এবং তাহার একটু পরেই, আমাদের বাড়ীর আশ্রিত ছাত্রমণ্ডলী ফিরিয়া আসিয়া আমাদের বাড়ীর বড় মেয়েদের কাছে বলিল "আমাদের দিদি ঠাকরুণ, হাজার দুই হাজার লোকের মধ্যে ফর্‌ফর্ করিয়া ইংরেজিতে পাঠ করিলেন; তাঁর একটু লজ্জাও হয় নাই, ভয়ও হয় নাই;" এইরূপ মিঠেকড়া বুলি দিয়া ও খুব কাঁপাইয়া তুলিয়া কথাটা বলিল। কিন্তু ইহাতে দুই অর্থই ছিল। শব্দগুলা নিন্দাব্যঞ্জক কিন্তু আওয়াজটা দরদ-মূলক এবং আর কতকগুলি শব্দ স্তুতিবাচক কিন্তু আওয়াজটা তাচ্ছিল্য ও নিন্দাবাচক—এই জন্য, আমাদের বাড়ীর বড় মেয়েরা তাহাদিগকে যেরূপ ভাবে প্রোৎসাহিত করিতেছিল, সেই অনুসারে তাহারা পুনঃ পুনঃ তাহাই বলিতেছিল। আমাদের বাড়ীর মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ছিলেন আমার খুড়-শাশুড়ী। আমার শাশুড়ী মারা গেলে পর, আমার স্বামীর খুড়ী দুই তিন বৎসর পর্য্যন্ত, সকলের উপরে মায়ের মতন দেখাশুনা করিতেন, সেই জন্য সকলেই মায়ের মতন তাঁহার কথা মানিয়া চলিত। তিনি কাহাকে কিছু বলিলে, এমন কি গালি দিলেও, তাঁহার মুখের উপর জবাব দেওয়া আমার স্বামী ভাল বাসিতেন না। শুধু তাহা নহে, তিনি আমার স্বামীকে কিছু বলিলেও, তিনি সমস্তই চুপ্ করিয়া শুনিয়া যাইতেন, কোন উত্তর করিতেন না এইরূপ তাঁর নিয়ম ছিল। একবার রাগ হইলে, খুড়-শাশুড়ী-ঠাকরুণের যা-মুখে আসিত তাই বলিতেন, সকলে তাঁকে ভয় করিত। তাঁহার এই গদা কাহার পিঠে পড়িবে তাহার কোন ঠিকানা ছিল না, কোন কারণও থাকিত না। কিন্তু তাঁর রাগের আবেগটা চলিয়া গেলে, তার পর আর কিছুই নাই। তাঁর মনে কোন কুটিলতা বা কপটতা না থাকায়, আবার সহজ-ভাবে তিনি কথা আরম্ভ করিতেন। তাই, তাঁর উপর রাগ হইলেও তাহা টিকিত না। উপরি-উক্ত সভার গল্প চলিতেছে, সেই সময় সেই কথা তাঁহার কাণে আসিল। তিনি এই বৃত্তান্ত শোনায় আমার ননদ তাঁহার নিকট গিয়া বলিলেন,—"কাকী আজ কাল যা হচ্চে তা ত বড় ভাল নয়! ভাইয়ের সময়কার মান তোমাকেই এখন বজায় রাখতে হবে। স্ত্রী দ্বিতীয় (পক্ষের) ও কেলেঙ্কারি তৃতীয়—এই ব্যাপারটা আমাদের ঘরেও এসে দেখা দিয়েছে। আমাদের মা কি রকম ছিলেন? তিনিও ত দ্বিতীয় পক্ষের ছিলেন, আদরের স্ত্রী ছিলেন; কিন্তু পরপুরুষের কাছে যেতে কি তাঁর সাহস হত? এক দিন পহ্লড়গড়ে আমাদের উঠানে একজন কেরাণী জল নিতে এসেছিল, সেই সময় আমরা ঘরের ভিতরে না গিয়ে সেইখানেই দাঁড়িয়েছিলুম, এই মাত্র অপরাধ। এরই দরুণ, আমার ভাই, মায়ের সঙ্গে চার দিন কথা বন্ধ করেছিলেন। সেই এক চাল, আর এখনকার এই চাল। এখন যা দেখা যায় সবই বাড়াবাড়ি।" এইরূপ আমার খুড়শাশুড়ীর রাগ উস্‌কাইয়া দিয়া, আমার ননদ দেওঘরে চলিয়া গেলেন, তার পর খুড়-শাশুড়ীর বকুনীর ঝড় সুরু হইয়া, ৯॥ টা পর্য্যন্ত তাহা চলিতে লাগিল। সেই দিন "উঁহার" বাড়ী আসিতে রাত হইয়াছিল। বাড়ী আসিলে, উঁহার সম্মুখে খুড়শাশুড়ী বকাবকী আরম্ভ করিয়া দিলেন। কিন্তু রাগের প্রথম আবেশটা তখন ছিল না। তিনি বলিলেন,—"দিন-কে দিন লোকেরা আক্কেল আর রাখছে না। প্রথম পক্ষের স্ত্রী, পুরুষের সম্মুখে দাঁড়াত পর্য্যন্ত না—কথা কওয়া দূরে থাক্। "কুশণ্ডিকা"—অনুষ্ঠানের সময় অনেক লোকের মধ্যে বরের সম্মুখে কনেকে বস্‌তে হত; তখন ঘাড় ব্যথা করলেও ঘাড় ওঠাতে কি সাহস হত? তারা কি আদরের ছিল না? তাদের মধ্যে কি ভালবাসা ছিল না? আজ কালকার ভালবাসা হচ্চে—স্ত্রী ঘেঁশাঘেঁসি ক'রে কাছে

থাক্‌বে, কেদারায় কেদারা লাগিয়ে কাছে বস্‌বে, পুরুষের মতো লিখ্‌বে ও পড়বে এতদূর পর্য্যন্ত হয়েছে। আজ পর্য্যন্ত, এ সব কাণ্ড ঘরের ভিতরেই হচ্চে শোনা যেত; কিন্তু আজ তাও ছাড়িয়ে উঠেছে। হাজার দু-হাজার লোকের মধ্যে মেয়েমানুষ ইংরেজি পড়লে তাতে একটু লজ্জা হল না? স্বামীর মাথার পাগড়ী মাথায় ঠিক রইল কি করে? তখন তার মাথা নীচু হল না? পূর্ব্বে লোকেরা আব্রু রাখবার জন্য কত চেষ্টা করত, আর এখন তা একেবারেই নেই; উল্টো, এটাই লোকের ভাল লাগে। সেই সময় উঠে নিজের স্ত্রীর পিঠ থাবড়ালেই আরও ভাল হত। মেয়েদের শিক্ষা দিলে তারা উদ্ধত হয়, তাদের কোমলতা চলে যায়, একথা কি মিথ্যে? শিক্ষা যদি দিতেই হয় ব্যঙ্কটেশ-স্তোত্র, শিবলীলামৃত এই রকম বই পড়তে পার্‌লেই যথেষ্ট হল। পুরুষদের মতন ইংরাজী শিখে কি চাকরী করবে? কোন বিষয়ের সীমা ছাড়িয়ে গেলেই তার পরিণাম এই রকম হয়। ইংরেজি শেখাবার দরুণই এই রকম হয়েছে। এখন তবে ইংরেজি শেখা ছেড়ে দাও। এখনকার মেয়েরা "আঙ্গুল দিলে হাত গিলতে যায়।" তাদের শাসনে না রাখলে নিজের আয়ত্তের মধ্যে রাখা যায় না। কি চমৎকার! ঘরে টুঁ শব্দও করে না। রাগ হলেও মুখে একটি কথা নেই। মনে হয় যেন কত ভাল মানুষ। কিন্তু বাহিরে গেলে তার এত ধিঙ্গিপনা কোত্থেকে আসে? যতই তার কাণ্ড শুনি ততই আমার আশ্চর্য্য মনে হয়।" এই সব কথায় বুঝা যায়, আমার খুড়শাশুড়ীর ধারণা হইয়াছিল—ইংরেজি শিক্ষার দরুণই আমি উদ্ধত হইয়াছি, আমার স্বামীর আয়ত্তের বাহিরে গিয়া পড়িয়াছি, তিনি নিরুপায় বলিয়াই চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন। যখন এই সব কথা হইতেছিল তখন আমার স্বামীর দুই তিনবার হাসি পাইয়াছিল, কিন্তু কোন উত্তর দিলেন না। নীরবে শুনিয়া গেলেন। ইহা দেখিয়া আমি হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলাম এবং কাঁদিতে লাগিলাম; ভোজনে আর গেলাম না। খুড়শাশুড়ীঠাকুরুণের কথার উত্তর না দেওয়ায়, তাঁহার ধারণাটাই বজায় থাকিবে, এর দরুণ দিনকে-দিন আরও কষ্ট পাইতে হবে। এই কথা আমি বুঝিয়াছিলাম বলিয়া আমার বেশী ভয় হইয়াছিল। আমি আপনা হইতে সভায় অভিভাষণ পাঠ করি নাই, "উনি" বলাতেই পাঠ করিয়াছিলাম—এইটুকু যদি উনি বলিতেন তাহা হইলেই আমার পক্ষে যথেষ্ট হইত। কিন্তু সে সব কিছুই বলিলেন না। আহারের পর, নিত্যনিয়মানুসারে উনি উপর-তলায় উঠিলেন। আমিও অনেকক্ষণ পরে যখন সেখানে গেলাম, তখন উনি হাসিয়া আমাকে বলিলেন—"আজকের ঝড়টা কেমন? দম্‌কাটা কি-জোরেই এসেছিল! অনেক দিন পর্য্যন্ত তোমার মনে কষ্টটা থাকবে। কিন্তু মনকে তার উল্টোদিকে তৈরী রাখতে হবে। ধৈর্য্য ধরে' সমস্তই শান্তভাবে সহ্য করতে হবে—এইরূপ যেন আমাদের দৃঢ় সঙ্কল্প হয়। যাতে তাঁর রাগ হয়, এমন কিছুই আমরা আপনা হতে করব না, তাঁদের সময়কার ধারণা অনুসারে তিনি নানা কথা বলেন। তাতে তাঁর দোষ নেই। কিন্তু আমরা তাঁকে দুঃখ দিব না, তাঁর কথার জবাব দিব না। তুমি এই রকম কোরো। তিনি যা-ইচ্ছা তাই বললে, চুপ করে শোনাও কষ্টকর আমি তা বুঝি, কিন্তু আজকের কষ্ট থেকে আমরা যে সহিষ্ণুতা শিখব তা চিরজন্ম আমাদের কাজে লাগবে। এই অভ্যাসটা একবার যদি হয়, তবে যে-যা বলুক না কেন, তাতে মন উচাটন হবে না, মনে কষ্টও হবে না। তখন কোন কথা না বোলে যাহা ঠিক ও উচিত বোলে মনে হবে তাই করতে হবে, তা কিন্তু কিছুতেই ছাড়া হবে না,—এটা যেন খুব মনে থাকে। খুড়শাশুড়ীর ও তোমার ননদের স্বভাবটা খুব কড়া, তার উপায় নেই। এইরূপ লোকদের কথায় জবাব না দেওয়াই ভাল। তুমি কি দেখনি, আমিও তাঁর কথা নীরবে শুনে যাই, কোন উত্তর দিইনে? এখন. আমার চেয়ে তোমার বেশী কষ্ট হয়েছে সত্যি; কিন্তু অন্য লোকে যে-যা বলুক না, আমি ত তোমার আছি। তবে এত ভয় করবার কারণ কি, বল দেখি। একটু ধৈর্য্য ধরে থাকতে শেখো, তাতে একটু কষ্ট হবে বটে কিন্তু তা অল্পদিনের জন্য, তা কখনই চিরকাল থাকবে না"—এইরূপ উনি বহুপ্রকারে আমাকে বুঝাইলেন। ইহার পর, এইরূপ প্রসঙ্গ বারম্বার আসা সত্ত্বেও, খুড়শাশুড়ীঠাকুরুণ যাহাই বলুন না কেন তাহা সমস্তই সহ্য করিতাম, উনি যাহা ভাল মনে করিতেন সেই প্রকার আচরণ করিতাম। তথাপি কোন কোন বিষয়ে আমার ত্রুটি হওয়ায় তার জন্য "ওঁর" নিকটে গিয়া আমার মাপ চাইতে হইয়াছে; এবং আমার অনেক শিক্ষাও হইয়াছে। ইতি নবম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

বৈয়াসিক ন্যায়মালা।

(চতুর্থে বেদান্তানাং ব্রহ্মৈকপরত্বাধিকরণে সূত্রং॥)

বেদান্তসমূহের ব্রহ্মৈকপরত্বরূপ চতুর্থ-অধিকরণ।

(শ্রীরামচন্দ্রশাস্ত্রী সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ
ও
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি)

সূত্র। তত্তু সমন্বয়াৎ॥ ৪॥

অধিকরণশ্লোক। চতুর্থাধিকরণস্য প্রথমবর্ণকমাহ—

বেদান্তাঃ কর্ত্তৃদেবাদিপরা ব্রহ্মপরা উত।
অনুষ্ঠানোপযোগিত্বাৎ কর্ত্রাদিপ্রতিপাদকাঃ ॥১৯॥
ভিন্নপ্রকরণাল্লিঙ্গষট্‌কাচ্চ ব্রহ্মবোধকাঃ।
সতি প্রয়োজনেঽনর্থহানেঽনুষ্ঠানতোঽত্র কিম্ ॥২০॥

টীকা। স্পষ্টৌ বিষয়সন্দেহৌ। জীবপ্রকাশক-বাক্যানি কর্ত্তৃপরাণি। ব্রহ্মপ্রকাশকবাক্যানি দেবতা-পরাণি। সৃষ্টিপ্রকাশকবাক্যানি সাধনপরাণি। তথা সতি বেদান্তানামনুষ্ঠানোপযোগিত্বং ভবিষ্যতি। ব্রহ্মপরত্বে ত্বনুষ্ঠানাসম্ভবান্নিষ্প্রয়োজনং স্যাৎ। তস্মাৎ বেদান্তাঃ কর্ত্তৃদেবতাসাধনপ্রতিপাদকাঃ ॥

অত্রোচ্যতে—ব্রহ্মপরাঃ বেদান্তাঃ। কুতঃ ভিন্নপ্রকরণপঠিতানাং তেষাং কর্ত্রাদিপ্রতিপাদকতয়া কর্ম্মশেষত্বাসম্ভবাৎ। তাৎপর্য্যনিশ্চয়হেতুলিঙ্গষট্‌কেন ব্রহ্মপরত্বসম্ভবাচ্চ। লিঙ্গষট্‌কং পূর্ব্বাচার্য্যৈর্দর্শিতং—

উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোঽপূর্ব্বতা ফলং।
অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্য্যনিশ্চয়ে ॥ ইতি।

"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" ইত্যুপক্রমঃ। "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং। তৎসত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি" ইত্যুপসংহারঃ। তয়োর্ব্রহ্মবিষয়ত্বেনৈকরূপ্যমেকং লিঙ্গং। অসকৃৎ "তত্ত্বমসি" ইত্যুক্তিরভ্যাসঃ। মানান্তরাগম্যত্বমপূর্ব্বত্বং। একবিজ্ঞানেন সর্ব্ব-বিজ্ঞানং ফলং। উৎপত্তিস্থিতিপ্রলয়প্রবেশনিয়মনানি পঞ্চার্থবাদাঃ। মৃদাদিদৃষ্টান্তা উপপত্তয়ঃ। এতৈ-র্লিঙ্গৈর্ব্রহ্মপরত্বং নিশ্চেয়ং। ন চানুষ্ঠানমন্তরেণ প্রয়োজনাভাবঃ নায়ং সর্পঃ ইত্যাদাবিব বোধাদনর্থ-নিবৃত্তেঃ সম্ভবাৎ ॥

সূত্রানুবাদ। তিনি কিন্তু সমন্বয় হেতু।

চতুর্থ অধিকরণের প্রথম বর্ণক বলা যাইতেছে—

শ্লোকানুবাদ। বেদান্তসমূহ (উপনিষৎসমূহ) কর্ত্তা দেবতা প্রভৃতি প্রতিপাদক অথবা ব্রহ্মপ্রতি-পাদক? অনুষ্ঠানের উপযোগী হইবার কারণে কর্ত্তা প্রভৃতির প্রতিপাদক। ভিন্ন প্রকরণ হেতু এবং ছয়টী লিঙ্গবিশিষ্ট হওয়ায় ব্রহ্মবোধক। অনর্থ-নাশরূপ প্রয়োজন থাকিতে অনুষ্ঠানের কি (প্রয়োজন)?

টীকানুবাদ। বিষয় ও সন্দেহ স্পষ্ট। জীব-প্রকাশক বাক্যগুলি কর্ত্তার প্রতিপাদক; ব্রহ্মপ্রকা-শক বাক্যগুলি দেবতাপ্রতিপাদক; সৃষ্টিপ্রকাশক বাক্যগুলি সাধন প্রতিপাদক। এই প্রকার হইলে পর, বেদান্তসমূহের অনুষ্ঠানবিষয়ক উপযোগিত্ব আসিবে। (বেদান্ত সমূহ) ব্রহ্মপ্রতিপাদক হইলে অনুষ্ঠান অসম্ভব হইবার কারণে নিষ্প্রয়োজন হউক। কাজেই বেদান্তসমূহ কর্ত্তা, দেবতা ও সাধনপ্রতি-পাদক।

এ বিষয়ে বলা যাইতেছে। বেদান্তসমূহ ব্রহ্ম-প্রতিপাদক। কারণ, ভিন্ন প্রকরণে পঠিত সেই সকলের (বেদান্ত সমূহের) কর্ত্তাপ্রভৃতির প্রতি-পাদক হইয়া কর্ম্মের বিনিয়োগে পর্য্যবসিত হওয়া অসম্ভব। অপরদিকে, তাৎপর্য্যবোধক ছয়টী লিঙ্গের দ্বারা (বেদান্তসমূহের) ব্রহ্মপ্রতিপাদনই সম্ভব। (সেই) ছয়টী লিঙ্গ পূর্ব্বতন আচার্য্যগণকর্ত্তৃক প্রদর্শিত হইয়াছে—(১) উপক্রম ও উপসংহার, (২) অভ্যাস, (৩) অপূর্ব্বতা, (৪) ফল, (৫) অর্থবাদ এবং (৬) উপপত্তি—এই কয়েকটী তাৎপর্য্য বুঝাইবার লিঙ্গ বা উপায়। "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" ইহাই হইল উপক্রম বা আরম্ভ। "ঐতদাত্ম্যমিদংসর্ব্বং। তৎসত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি" ইহাই হইল উপসংহার বা শেষ। (আরম্ভ ও শেষ) এই উভয়ের ব্রহ্মবিষয়ক-হওয়া প্রযুক্ত উহা-দের একরূপত্ব একটী লিঙ্গ। বারম্বার "তত্ত্বমসি" বলাই হইল অভ্যাস। অপর কোন প্রমাণের বিষয় না হওয়া হইল অপূর্ব্বত্ব। একটীর জ্ঞানের দ্বারা সকল বিষয়ের জ্ঞান হইল ফল। উৎপত্তি, স্থিতি, প্রলয়, প্রবেশ ও নিয়মন এই পাঁচটী হইল অর্থবাদ। মৃত্তিকা প্রভৃতির দৃষ্টান্ত হইল উপপত্তি। এই কয়টী লিঙ্গ বা উপায়ের সাহায্যে (বেদান্ত সমূহের) ব্রহ্মপ্রতিপাদক হওয়া নিশ্চয় করা যাইতে পারে। অনুষ্ঠান বিনা যে প্রয়োজনের অভাব হয় তাহা নহে। যথা, "ইহা সর্প নহে" ইত্যাদি জ্ঞানে অনর্থনিবৃত্তির সম্ভাবনা আছে।

তাৎপর্য্য। "তিনি, কিন্তু, সমন্বয় হেতু", ইহা দ্বারা অনুমান হইতেছে যে সূত্রকর্ত্তা বুঝিয়াছেন যে পূর্ব্বপক্ষ পূর্ব্বমীমাংসার দোহাই দিয়া উপনিষৎ-সমূহের ব্রহ্মপ্রতিপাদক ভাব উড়াইয়া দিতে চাহিবেন। তাই তিনি তাহাকে নিরস্ত করিয়া বলিলেন যে পূর্ব্বমীমাংসা এবং উপনিষৎসমূহের সমন্বয় করিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে উপনিষৎ-সমূহের উদ্দেশ্যই হইল ব্রহ্মপ্রতিপাদন করা।

মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মক বেদ দুই ভাগে বিভক্ত—কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। আদিতে প্রত্যেক ব্রাহ্মণের চতুর্ব্বেদ অধ্যয়নই নিয়ম ছিল; ক্রমে তাহা সংক্ষিপ্ত হইয়া এক বেদে, এবং ক্রমে তাহাও সংক্ষিপ্ত হইয়া বেদের এক একটী শাখায় আসিয়া দাঁড়াইল। এই অবস্থায় বেদের কোন্‌টী বা মন্ত্র, কোন্‌টী বা ব্রাহ্মণ এবং কোন্ মন্ত্র বা মন্ত্রাংশের কোন্ যজ্ঞ বা অনুষ্ঠানে বিনিয়োগ, এই সকল বিষয় স্থির করা আবশ্যক হইল। তখন মহর্ষি জৈমিনি পূর্ব্বমীমাংসা প্রণয়ন করিয়া সেই সকল বিষয় স্থির করিয়া দিলেন। সেই মীমাংসাদর্শনে একটী সূত্র আছে "আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাৎ আনর্থক্যং অ-তদর্থানাং" অর্থাৎ বেদ কর্ম্মপ্রতিপাদক হইবার কারণে কর্ম্মের অপ্রতিপাদক যাহা তাহা অনর্থ বা নিষ্প্রয়োজন—তাহার কোন প্রামাণ্য নাই। পূর্ব্বমীমাংসার এই বাক্যকে ভিত্তি করিয়া পূর্ব্বপক্ষ বর্ত্তমান অধিকরণে সংশয় উপস্থিত করিয়াছেন।

উপনিষদে জীব, ব্রহ্ম, সৃষ্টিপ্রভৃতি-বিষয়ক যে সকল বাক্য আছে, সেইগুলিই হইল বর্ত্তমান অধিকরণের বিষয়। সেই সকল বাক্যের উপরেই পূর্ব্বপক্ষ এই সংশয় উপস্থিত করিলেন যে উপনিষদ্‌সমূহ কর্ত্তা, দেবতা ও সাধন প্রভৃতি যজ্ঞের বিভিন্ন অঙ্গনির্দ্দেশক অথবা একমাত্র ব্রহ্মনির্দ্দেশক? প্রত্যেক যজ্ঞ-অনুষ্ঠান উপলক্ষেই একটী কর্ত্তা থাকা চাই, কর্ত্তা না থাকিলে যজ্ঞানুষ্ঠান করিবে কে? প্রত্যেক যজ্ঞেরই একটী দেবতা চাই—যাঁহার উদ্দেশ্যে যজ্ঞটী অনুষ্ঠিত হয়; এবং প্রত্যেক যজ্ঞেরই কতকগুলি সাধন বা উপকরণ চাই, যাহা অবলম্বনে যজ্ঞ-অনুষ্ঠান সম্ভবপর হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে মহর্ষি জৈমিনি তাঁহার কৃত পূর্ব্বমীমাংসায় বলিয়াছেন যে "বেদ কর্ম্মপ্রতিপাদক, অতএব অ-কর্ম্মপ্রতিপাদক যাহা, তাহা অনর্থক অর্থাৎ নিষ্প্রয়োজন—তাহার কোন প্রামাণ্য নাই। পূর্ব্বপক্ষ বলেন যে জৈমিনি যখন "বেদ কর্ম্মপ্রতিপাদক" এই কথা বলিয়াছেন, তখন এমন কোন কথা নাই যে বেদের এক অংশকে কর্ম্মপ্রতিপাদক বলিব, অপর অংশকে তাহা বলিব না। বলিতে গেলে, শ্রুতিবাক্য মাত্রই কর্ম্ম বা যজ্ঞের কোন না কোন অংশের সহিত সম্বন্ধ। প্রত্যেক শ্রুতিবাক্যই হয় যজ্ঞ-কর্ত্তাসম্বন্ধীয়, অথবা যজ্ঞ-দেবতানির্দ্দেশক, অথবা যজ্ঞের সাধনপরিচায়ক। পূর্ব্বপক্ষের বক্তব্য এই যে, যদি বল যে বেদের অন্যতর অংশ উপনিষদগুলির যজ্ঞের কোন কিছুরই সহিত কোন সম্বন্ধ নাই, তবে উপনিষদ নিরর্থক, কারণ মীমাংসাকার যে স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন যে "বেদ" ক্রিয়ার্থ বা কর্ম্মপ্রতিপাদক। অতএব বাধ্য হইয়া বলিতে হয় যে বেদান্ত বা উপনিষদ ব্রহ্মপ্রতিপাদক নহে, কিন্তু অনুষ্ঠানেরই উপযোগী।

এই সূত্রে এই প্রশ্ন উঠিল যে, উপনিষদের কোন বাক্যেই তো যজ্ঞসম্বন্ধীয় কোন কিছুই উল্লেখ নাই, বরঞ্চ উপনিষদের কোন বাক্যে ব্রহ্ম, কোন বাক্যে বা জীব এবং কোন বাক্যে বা সৃষ্টিস্থিতি প্রভৃতিবিষয়ের উল্লেখ আছে, তবে কি প্রকারে উপনিষদ্‌বাক্যসকল যজ্ঞানুষ্ঠানে অবলম্বিত হইতে পারে? তদুত্তরে পূর্ব্বপক্ষ বলেন যে উপনিষদের যে সকল বাক্যে জীবের বা জীবাত্মার উল্লেখ আছে, সেগুলিকে যজ্ঞকর্ত্তানির্দ্দেশক বলিয়াই ধরিতে হইবে, কারণ জীবই তো প্রকৃতপক্ষে কর্ত্তা। সেইরূপ যে সকল বাক্যে ব্রহ্মের উল্লেখ আছে, সেগুলিকে দেবতাপ্রতিপাদক বলিয়া ধরিতে হইবে—দেবতার স্থানেই ব্রহ্মের উল্লেখ হইয়াছে। আবার, যে সকল বাক্যে সৃষ্টিস্থিতিপ্রভৃতি উল্লিখিত হইয়াছে, সেগুলিকে যজ্ঞের সাধন-প্রতিপাদক বলিয়া ধরিতে হইবে। সেই সকল বাক্যেও আকাশ, বায়ু, জল প্রভৃতির উল্লেখ আছে, আর যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্যও জলপ্রভৃতি উপকরণের প্রয়োজন হয়। এই কারণে পূর্ব্বপক্ষের মতে উপনিষদের সৃষ্টি-প্রকাশক বাক্যসকলকে যজ্ঞেরই সাধনবাচী বলিয়া ধরিতে হইবে। তাঁহার মতে উপনিষদ্‌বাক্যসকল এভাবে গ্রহণ না করিলে সে সকলের কোন অর্থই হইতে পারে না, কারণ জৈমিনি সমস্ত বেদকেই কর্ম্মপ্রতিপাদক বলিয়া বলিয়াছেন।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তপক্ষ বলিতেছেন যে পূর্ব্বপক্ষের যুক্তি ঠিক নহে,—বেদান্ত বা উপনিষদ্‌সমূহ ব্রহ্মপ্রতিপাদক বটে। স্বীকার করা গেল যে, মহর্ষি জৈমিনি বলিয়াছেন যে "বেদ কর্ম্মপ্রতিপাদক" কিন্তু দেখিতে হইবে যে কোন্ প্রকরণে তিনি ঐ

কথা বলিয়াছেন? তিনি কর্ম্মপ্রকরণেই ঐ কথা বলিয়াছেন—প্রথমেই তিনি "ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা" বলিয়া ক্রিয়াত্মক ধর্ম্মেরই মীমাংসা আরম্ভ করিয়াছেন। এই কর্ম্মপ্রকরণে যে সকল শ্রুতিবাক্য তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেই সকল শ্রুতিবাক্য সম্বন্ধেই তিনি কর্ম্মপ্রতিপাদকত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। উপনিষদ্-সমূহ হইল জ্ঞানপ্রকরণ। মহর্ষি জৈমিনি তাঁহার মীমাংসায় উপনিষদের একটী কথাও উদ্ধৃত করেন নাই। তাই সিদ্ধান্তপক্ষ বলিতেছেন যে জৈমিনি একপ্রকরণে উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্য সম্বন্ধে "বেদ কর্ম্ম-প্রতিপাদক" বলিয়াছেন বলিয়া উপনিষদ্-শ্রুতিবাক্য-সম্বন্ধে সে কথা কখনই প্রযোজ্য হইতে পারে না। উপনিষদের বাক্যসমূহকে কর্ত্তা দেবতাপ্রভৃতি-প্রতিপাদক এবং যজ্ঞানুষ্ঠানের উপযোগী কখনই বলা যাইতে পারে না।

সিদ্ধান্তপক্ষ একদিকে ব্যতিরেকভাবে বুঝাইলেন যে উপনিষদসমূহ কর্ম্মপ্রতিপাদক নহে। অপরদিকে তিনি অন্বয়ভাবে বুঝাইতেছেন যে ছয়টী বিশেষ চিহ্নের দ্বারা উপনিষদসমূহ যে ব্রহ্মপ্রতিপাদক তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। পূর্ব্বতন আচার্য্যদিগের অনুসরণ করিয়া সিদ্ধান্তপক্ষ সেই ছয়টি চিহ্নের পরিচয় দিতেছেন এবং দৃষ্টান্তের দ্বারা সেগুলি বুঝাইয়াও দিতেছেন। পূর্ব্বতন আচার্য্যগণ বলেন—(১) উপক্রম ও উপসংহারের একাত্ম্যভাব; (২) একটী বক্তব্যকে বারম্বার বলা; (৩) যে প্রমাণের দ্বারা একটী বিষয়কে সপ্রমাণ করিতে চাহি, সেই বিষয়ের সেই প্রমাণ ভিন্ন অন্য প্রমাণের দ্বারা ইতিপূর্ব্বে প্রমাণিত না হওয়া; (৪) এক কারণকে জানার ভিতর দিয়া তন্মূলক সকল কার্য্যকে জানা; (৫) অর্থবাদ এবং (৬) উপপত্তি বা যুক্তি, এই ছয়টী চিহ্ন অবলম্বনে যে কোন বিষয় বিচার করিলে তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য সহজে বোধগম্য হইতে পারে। সিদ্ধান্তপক্ষের মতে উপনিষদ্সমূহও এই ছয়টী চিহ্ন অবলম্বনে বিচার করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে বেদান্ত বা উপনিষদ্সমূহ ব্রহ্মপ্রতিপাদকই বটে। তিনি আপাতত বৃহদারণ্যক উপনিষদকেই ধরিয়া বিচার করিতেছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রারম্ভভাগে "হে সৌম্য, পূর্ব্বে এই সৎস্বরূপ ছিলেন" ইহা উক্ত হইয়াছে এবং তাহার উপসংহার ভাগে "এই সকলই এই আত্মময়। তিনি সত্য, তিনি আত্মা, তিনি তুমি" এইরূপ উক্ত হইয়াছে। এই উপক্রম ও উপসংহার বা আগাগোড়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে এই আগা ও গোড়া উভয়েই ব্রহ্মবিষয়ক কথা বলা হইয়াছে, কাজেই এই উভয়ের মধ্যে একই প্রকার একটা ভাব চলিয়াছে। আগা ও গোড়ার মধ্যে এই একপ্রকার একটা ভাব থাকাই যে-কোন বিষয়ের তাৎপর্য্য বুঝাইবার অন্যতর চিহ্ন বা উপায়। উপনিষদের মধ্যে (যথা বৃহদারণ্যকোপনিষদেই) এইপ্রকার আগাগোড়া একই ভাব আছে এবং সে ভাব ব্রহ্মপ্রতিপাদক, কর্ম্মপ্রতিপাদক নহে। এই বৃহদারণ্যকোপনিষদেই (এবং অন্যান্য উপনিষদেও) দেখা যায় যে "তিনি তুমি" এই বাক্য বারম্বারই উক্ত হইয়াছে। এখন, কোন বিষয়ের বিচারে একটা ভাবের কথা বারম্বার উক্ত হইলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে বিচার্য্য বিষয় কোন্ ভাবটী ব্যক্ত করিতে চাহে। এক্ষেত্রে, "তিনি তুমি" এই কথা উপনিষদে বারম্বার উক্ত হইয়া স্পষ্টই প্রকাশ করিতেছে যে উপনিষদ্ ব্রহ্ম-নির্দ্দেশক, যজ্ঞনির্দ্দেশক নহে। উপনিষদ যে ব্রহ্ম প্রতিপাদন করে, তাহা জানিবার তৃতীয় উপায় হইতেছে যে ঔপনিষদ্-শ্রুতিবাক্য ভিন্ন অন্য কোন প্রমাণের দ্বারা ইতিপূর্ব্বে ব্রহ্ম প্রমাণিত হন নাই। কোন বিষয়কে এক প্রমাণের দ্বারা একবার সপ্রমাণ করিলে পর সে বিষয়ে বিচারপক্ষে অন্য কোন প্রমাণের প্রামাণ্য স্বীকার করা যাইতে পারে না। যেমন, কোন একটী বিষয়কে অনুভবের দ্বারা জানিলাম—এখানে সে বিষয়ের প্রমাণ হইল অনুভব। কিন্তু তাহার পরে সেই অনুভবের স্মৃতিকে আবার সেই একই বিষয়ের প্রমাণ বলিয়া ধরিতে পারি না। সেই প্রকার, ব্রহ্ম যদি ইতিপূর্ব্বে প্রত্যক্ষ, উপমান বা অনুমান প্রমাণের অধিগত হইতেন, তাহা হইলে অবশ্য শ্রুতিবাক্যের ব্রহ্ম-বিষয়ে প্রামাণ্য স্বীকার করা যাইত না। কিন্তু ব্রহ্ম যখন প্রথম তিনটী প্রমাণের গম্য নহেন, তখন তিনি একমাত্র শব্দ বা আপ্তবাক্যেরই প্রমাণ-গ্রাহ্য ধরিতে হইবে। চতুর্থ চিহ্ন হইতেছে ফল। একটীকে জানিলে সকলকে জানার নামই হইল ফল। যখন শ্রুতিবাক্য ব্রহ্মবিষয়ে প্রমাণ বলিয়া

স্বীকৃত হইল, তখন সেই শ্রুতিই যখন বলিতেছে, যেমন এক মৃত্তিকারূপ কারণকে জানিলে ঘট-পটাদিরূপ কার্য্য জানা যায় সেইরূপ সেই এক-কে জানিলে সকলই জানা যায় তখন ব্রহ্মনির্দ্দেশই উপনিষদের যে তাৎপর্য্য তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। পঞ্চম চিহ্ন হইতেছে অর্থবাদ। অর্থবাদের অর্থ হইতেছে আলোচ্য প্রকরণের প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রশংসা বা বেশী করিয়া বলা। শ্রুতিবাক্যে আছে "ইহাঁ হইতে এই জগতের উৎপত্তি, উৎপন্ন হইয়া ইহাঁতেই জগতের স্থিতি ও লয় হইতেছে, ইহাঁতে জীব সকল প্রবেশ করিতেছে, ইহাঁতে জীব সকল প্রবেশ করিতেছে, ইহাঁর শাসনেই জগত নিয়মিত হইতেছে" ইত্যাদি। এই উৎপত্তি, স্থিতি প্রভৃতির কথা ব্রহ্মকে বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত অর্থবাদ মাত্র বা বেশী করিয়া বলামাত্র। তাঁহাকে কারণরূপে জানিলেই তো এই সকল কার্য্যের বিষয় অনায়াসে জানা যায়, তবু যে এ সকল বিষয় শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, তাহা একটু বেশী করিয়া বলিয়া জনসাধারণের পক্ষে সহজে বুঝাইবার উপায় করিয়া দেওয়া হইয়াছে মাত্র। ষষ্ঠ এবং শেষ চিহ্ন হইতেছে উপপত্তি বা যুক্তি। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত ভিন্ন আর কি যুক্তি দেওয়া যাইতে পারে? যেমন এক মৃত্তিকারূপ কারণকে জানিলেই ঘটাদি কার্য্য জানা যায় এবং সেই সকল কার্য্যের বিনাশ হইলে যেমন ঘটাদি সংস্থানের পুনরায় মৃত্তিকাতে প্রবেশ উপলব্ধি করা যায়, সেইরূপ এই দৃষ্টান্ত-যুক্তি অবলম্বনে ইহাও উপপন্ন হইতেছে যে ব্রহ্মরূপ কারণকে জানিলে জগতরূপ কার্য্য জানা যায়। এই কারণে দৃষ্টান্তরূপ উপপত্তি বা যুক্তিকেও উপনিষদের ব্রহ্ম-তাৎপর্য্য বুঝাইবার পক্ষে একটী চিহ্ন বলিয়া ধরা হইয়াছে।

এতক্ষণে ব্যতিরেক ও অন্বয় উভয় প্রকারেই দেখা গেল যে উপনিষদসমূহ একমাত্র ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে, উপনিষদ কর্ম্ম বা যজ্ঞানুষ্ঠানের উপযোগী নহে।

সিদ্ধান্তপক্ষ সর্ব্বশেষে পূর্ব্বপক্ষের একটী বক্তব্য নিজেই ধরিয়া লইয়া তাহার উত্তর দিতেছেন। কথাটী এই যে, যদি উপনিষদ কোন্ প্রকার কর্ম্মেরই প্রতিপাদক না হইল, তবে উপনিষদের প্রয়োজন কি রহিল? মানুষ কর্ম্ম লইয়াই বাঁচিতে পারে; যখন উপনিষদ্ সেই কর্ম্ম সম্বন্ধেই কোন কথা না বলিল, তখন তাহার আলোচনার আবশ্যকতা কোথায়? সিদ্ধান্তপক্ষ ইহরে উত্তরে বলেন যে উপনিষদ কোন প্রকার অনুষ্ঠানের বিধান করে না বলিয়া যে তাহার প্রয়োজন নাই তাহা নহে। "ইহা সর্প নহে" এই প্রকার জ্ঞান তো কোন প্রকার কর্ম্মের অনুষ্ঠান নহে, অথচ এই জ্ঞান লাভ করিলে অনর্থ বা অজ্ঞানের এবং তজ্জনিত ভয়বিপদাদির নিবৃত্তির সম্ভাবনা থাকে। সেইরূপ উপনিষদে কর্ম্মবিধান না থাকিলেও তদবলম্বনে ব্রহ্মজ্ঞান হইলে অজ্ঞানের বিনাশ এই একটী মহাপ্রয়োজন সিদ্ধ হয়।

রসায়ন বিজ্ঞানে আকর্ষণ।

(৺ হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ভৌতিক পদার্থের আর একটী সাধারণ গুণ আকর্ষণ। যেমন বিস্তৃতি ও আকৃতি সকল বস্তুতে আছে, তেমনি সকলেরই আকর্ষণ আছে।

আকর্ষণ কাহাকে বলে? এক বস্তু অন্য বস্তুকে আপনার দিকে যে শক্তি দ্বারা টানিয়া লইয়া আসে, তাহার নাম আকর্ষণ। সেই আকর্ষণকে কয়েক রকমে বিভাগ করা হয়—যেমন, যোগাকর্ষণ, মাধ্যাকর্ষণ, কৈশিকাকর্ষণ, রাসায়নিক আকর্ষণ, চুম্বকাকর্ষণ, তড়িদাকর্ষণ। বস্তুত এ সকল বিভিন্ন আকর্ষণ কিম্বা সমস্ত বস্তুর একমাত্র আকর্ষণ আছে? সমস্ত বস্তুর একমাত্র আকর্ষণ আছে ইহা যদি বলি, তাহা হইলেই পর্য্যাপ্ত হইল বটে। কিন্তু যখন বিভিন্ন নাম আছে, তখন প্রত্যেক রকম আকর্ষণের বিবরণ করিয়া যদি তাহার পরে দেখানো যায় যে, সব আকর্ষণই এক, তাহা হইলে বিষয়টা স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

আমরা আকর্ষণের সামান্য চিহ্ন অনেক দেখিতে পাই। এক খড়কে কাঠিতে এক বিন্দু জল এবং অপর এক খড়কেতে আর এক বিন্দু জল ধরিয়া যদি উভয়কে খুব নিকট করা যায়, তবে উভয়ে ক্রমে নিকট হইতে হইতে মিশিয়া এক হইয়া যায়। বিস্তৃত মুখবিশিষ্ট পাত্রে কিম্বা পুকুরে অথবা সমুদ্রে বিবিধ জিনিস ভাসাইয়া দিলে, জল নিস্তব্ধ থাকিলেও

সেই সব জিনিস আসিয়া একস্থানে জড়ো হইবে। আবার দেখ, গোলা আছে—তাহাকে ছাড়িয়া দিলে তাহা পট্ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। ইহা দ্বারা সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে মাটি গোলাকে টানিতেছে. গোলা মাটিকে টানিতেছে। গোলাতে যত পরমাণু আছে, গোলা তত জোরে পৃথিবীকে টানিতেছে এবং পৃথিবীতে যত পরমাণু আছে, পৃথিবী তত জোরে গোলাকে টানিতেছে। পৃথিবীর প্রতি পরমাণু গোলার প্রতি পরমাণুকে টানিতেছে, গোলারও প্রতি পরমাণু পৃথিবীর প্রতি পরমাণুকে টানিতেছে।

এই পরমাণুর কম বেশীতে আকর্ষণের গতির কমবেশ হয়। যদি গোলার পরমাণু ১ হয়, পৃথিবীর পরমাণু ১০০ হয়, তাহা হইলে পৃথিবী গোলাকে শত গুণ বেশী টানিবে। গোলা পৃথিবীর দিকে কেবল শতপদ অগ্রসর হইবে, পৃথিবী গোলার দিকে ১০০ অংশ উন্মুখ হইবে। যদি একটা সূর্য্য পৃথিবীর কাছে আসে, তাহলে সূর্য্য পৃথিবীতে আসিতে না আসিতেই পৃথিবী সূর্য্যে গিয়া লাগিয়া যাইবে। আমরা হাঁটিবার সময় এক পা পৃথিবীতে ফেলিয়া আর এক পা উঠাইয়া লইয়া অগ্রসর হই। আমরা পৃথিবীর সঙ্গে সংলগ্ন আছি। আমরাও আকর্ষণ করিতেছি পৃথিবীকে, পৃথিবীও আকর্ষণ করিতেছে আমাদিগকে—পরস্পর লাগালাগি রহিয়াছি।

এমন দৃষ্টান্ত আনা যাইতে পারে, যাহাতে আকর্ষণের প্রতি সন্দেহ হইতে পারে। তাহাও উল্লেখ করি। গাছের পাতা ঊর্দ্ধদিকে যায়, ধোঁয়া উপর দিকে যায়। উহাদের যে আকর্ষণ নাই তাহা নহে, পাতা যে ঊর্দ্ধদিকে যায়,তাহার কারণ, পাতার সঙ্গে পৃথিবীর যে আকর্ষণ, তাহা অপেক্ষা বায়ুর বেগ বেশী। এইজন্য পাতাকে বায়ু উড়াইয়া লইয়া যায়। ধোঁয়া যে উপরে উঠে—ইহা বুঝিতে একটু কঠিন লাগিবে! ধোঁয়া বায়ু অপেক্ষা হাল্কা না হইলেও যে বায়ুতে ধোঁয়া থাকে তাহা গরম ও হাল্কা। শীতল বায়ু ধোঁয়াকে ঊর্দ্ধে সরাইয়া তাহার স্থানে নামিয়া আসে। শীতল বায়ু চেষ্টা করে—যেখানে ধোঁয়া আছে, ঐখানে সে যাবে। উপরের শীতল বায়ু যদি গরম বায়ুর স্থানে নামিতে চায়, তখন কাজে কাজে ধোঁয়া-সমেত গরম বায়ুকে উপরে ফেলিয়া দেয়। গরম বায়ু উপরে উঠে, সঙ্গে সঙ্গে ধোঁয়ার কণিকাগুলিকেও ঠেলিয়া উপরে তোলে।

আর এক প্রকার আকর্ষণের চিহ্ন দেখিতে পাই, যখন দুই আয়তন হাইড্রোজেন মরুত এক আয়তন অক্সিজেনের সঙ্গে মিলিয়া দুই আয়তন মাত্র জলীয় বাষ্প হইল। কোথায় হাইড্রোজেনের এক রকম গুণ, আর অক্সিজেনের এক রকম গুণ, অথচ এই দুই মিলিয়া কোথায় আর এক রকম জিনিস জল হইয়া গেল—ইহাতে তাহার উপাদানের কোন গুণই নাই।

আকর্ষণের আর এক রকম চিহ্ন আমরা দেখিতে পাই, যখন চুম্বক ইস্পাতকে টানিয়া লয়। আরও এক রকম আকর্ষণের চিহ্ন দেখি, যখন কাচকে রেশম বা লোমশ কাপড়ের দ্বারা ঘর্ষণ করিলে সেই কাচ চুল, পালক প্রভৃতিকে আকর্ষণ করে ও বিকর্ষণ করে। এই আকর্ষণ হইতেছে যোগাকর্ষণ। একটা বস্তুর মধ্যে অণুতে অণুতে যে আকর্ষণ, এক দ্রব্যের ভিতর যে সকল ঘেঁসাঘেঁসি অণু আছে তাহাদের মধ্যে পরস্পরের যে আকর্ষণ তাহার নাম যোগাকর্ষণ। সন্নিকটস্থিত পরমাণু সকলের পরস্পর আকর্ষণকে যোগাকর্ষণ বলে।

এই যোগাকর্ষণভেদে বস্তুর নানাপ্রকার অবস্থা হইতেছে—কোনটা কঠিন হইতেছে, কোনটা নরম হইতেছে, কোনটা কাদার মতন হইতেছে, কোনটা আঠার মতন হইতেছে, কোনটা তেলের মতন হইতেছে, কোনটা জলের মতন হইতেছে, কোনটা একেবারে বাষ্পের মতন হইতেছে। ইহাদের মধ্যে তিন অবস্থাই মূল, বাকী অবস্থাগুলি তাহাদের মধ্যবর্ত্তী অবস্থা। প্রধান তিন অবস্থা হইতেছে—কঠিন, তরল ও মরুৎ অবস্থা। একই বস্তুর হয়তো এই তিন অবস্থা ক্রমান্বয়ে ঘটিতে পারে। কোন বস্তু বা একই রকম অবস্থায় থাকে।

জল তরল অবস্থায় আছে; এক সময় উহা জমিয়া বরফ হইয়া কঠিন হইয়া গেল, আর এক সময় বায়ুর অবস্থা পাইয়া নীচে থাকিতে পারিল না —উপরে উঠিয়া মেঘ হইয়া দেখা দিল। আবার, আমাদের এই বায়ু—ইহাকে সহজে তরল করা যায় না বা কঠিন করা যায় না। আবার কতকগুলি মরুৎকে ঠাণ্ডা ও চাপ দ্বারা তরলও করা

যায় এবং কঠিনও করা যায়—যেমন, কার্ব্বনিক অ্যাসিড মরুৎ। প্রথমে উহাতে ঠাণ্ডা ও চাপ প্রয়োগ করিলে উহা ক্রমে তরল ও বরফের ন্যায় কঠিন হয়। ধাতু সামগ্রী, স্বর্ণ বা লৌহ, খুব কঠিন—তাপ দিলে গলিয়া যায়, আবার খুব তাপ দিলে বায়ুবৎ হইয়া চলিয়া যায়।

তবেই দেখ, যোগাকর্ষণ কম হয় তাপ দ্বারা, আর যোগাকর্ষণের শক্তি বাড়ে শীতলতা বা তাপহীনতা দ্বারা। যোগাকর্ষণের কমবেশী দ্বারা জড়ের নানা অবস্থা ঘটে। যোগাকর্ষণের তারতম্য বশত বস্তু সকল মরুৎ, তরল ও কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। কখনও কখনও কঠিন ও তরল অবস্থার মধ্যবর্ত্তী আর এক অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়--যেমন, গন্ধককে গলাইয়া নির্দ্দিষ্ট temperatureএ আনয়ন করিলে তাহা চটচটে অবস্থা প্রাপ্ত হয়; যাহাতে আঘাত করিলে প্রত্যাঘাত পাওয়া যায়, যাহাতে অঙ্গুলি প্রবেশ করানো কঠিন হয় সেরূপ কঠিনও থাকে না; আবার যে রকম তরল হইলে সহজে ঢালা যায় সেরূপও হয় না,—কিন্তু একরকম আঠার মতন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। যোগাকর্ষণ সমস্ত অণুকে ধরিয়া আছে। তাহারই তারতম্য অনুসারে বস্তুর এই সকল অবস্থা ঘটে।

দূরবর্ত্তী পদার্থের যে আকর্ষণ তাহা মাধ্যাকর্ষণ, সন্নিকটস্থ পদার্থের যে আকর্ষণ তাহা যোগাকর্ষণ। দূরস্থ পদার্থের আকর্ষণ—যেমন, পৃথিবী সূর্য্য চন্দ্র গ্রহনক্ষত্রের মধ্যে আকর্ষণ। ঐ আকর্ষণ দ্বারা উহারা পরস্পরকে ধরিয়া রাখিয়াছে। উহারা সকলে মিলিয়া যদি একটা ডেলা বাঁধিয়া যাইত, তাহলে যোগাকর্ষণের কার্য্য হইত। যোগাকর্ষণে একটী বস্তু সমষ্টিভাবে রহিয়াছে, গোটাভাবে রহিয়াছে। তেমনি মাধ্যাকর্ষণ দ্বারা দূরস্থ পদার্থ সকল পরস্পরের সঙ্গে মিলিতে চাহে এবং যথাস্থানে থাকিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। ঐ মাধ্যাকর্ষণের দ্বারাই ঢিল ছাড়িয়া দিলে পৃথিবীতে মিলিত হয়; পর্ব্বতশৃঙ্গ ভাঙ্গিয়া গেলে উপরে পলাইয়া যাইতে পারে না—পৃথিবীর আকর্ষণে মাটিতে পড়িয়া যায়; আবার দূরস্থ জগত সকল দূরেতেই সামান্যভাবে থাকিতেছে।

কৈশিকাকর্ষণ—উহাকে কেহ আকর্ষণ বলেন, কেহ বা বলেন না। কৈশিকাকর্ষণ নাম কেশ হইতে আসিয়াছে। কেশে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্থানের মধ্য দিয়া যে আকর্ষণ আসে তাহার নাম কৈশিকাকর্ষণ। যেমন, এই একটী পাত্র আছে, উহাতে ক খ পর্য্যন্ত জল আছে। উহাতে যদি খুব সরু একটী নল নামাইয়া দেওয়া যায়, তাহলে ঐ জল নল ছাপাইয়া উঠিবে।

মাটি হইতে গাছের উপরে জল উঠে। দেওয়াল যে শুরু দেখিতেছ, ইহার ভিতরে জল আছে—সে জল বনিয়াদের ভিতর হইতে উঠিতেছে, নহিলে পুরাতন বাড়ীতে যখন বড় বড় গাছ হয়, তাহারা বাঁচিয়া থাকে কিরূপে? কৈশিকাকর্ষণের সপক্ষ যাঁহারা, তাঁহারা বলেন যে কৈশিকাকর্ষণ দ্বারাই ঐ সকল ঘটনা হয়। যাঁহারা কৈশিকাকর্ষণের বিপক্ষে, তাঁহারা অন্য অন্য কারণ দ্বারা ঐ সকল ঘটনা বুঝাইয়া দেন। সে সকল এখন বলিবার প্রয়োজন নাই। কেবলমাত্র বলিয়া রাখি যে তাঁহাদের প্রধান বক্তব্য এই যে বায়ুর চাপে ও সূর্য্যতাপে ঐ রকম জল উঠে। সে বিষয় পরে বুঝা যাইবে। এখন সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যক হইতেছে রাসায়নিক আকর্ষণ বুঝা।

এই ০ একটী অণু আছে, এই ০ আর একটী অণু আছে। প্রথম তাহারা মাধ্যাকর্ষণ দ্বারা কাছাকাছি আসিল, তাহার পরে যোগাকর্ষণ দ্বারা তাহারা একটা ডেলা বাঁধিয়া গেল। ইহাতে পরমাণুর গুণ হইতে ডেলার গুণ কিছুই বদলাইল না, কেবল পরমাণুগুলি একত্র হইয়া ডেলা বাঁধিয়া রহিল এই মাত্র। কিন্তু যখন পরমাণুদের পরস্পর মিলনের ফলে অন্যতর গুণ উৎপন্ন হইবে, তখন জানিবে যে পরমাণুতে পরমাণুতে রাসায়নিক আকর্ষণ হইয়াছে। রাসায়নিক আকর্ষণ দ্বারা অণু সকল যুক্ত হইলে যে পদার্থ প্রস্তুত হয়, তাহার আলাহিদা গুণ হইয়া যায়। যেমন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন এই দুই মরুৎ সংযোগে জল উৎপন্ন হইল—এই জল অবশ্য পরে যোগাকর্ষণের বলে তরল অবস্থায় দাঁড়াইল। এই খড়ি রাসায়নিক আকর্ষণে উৎপন্ন হইয়া পরে এখন যোগাকর্ষণ দ্বারা ডেলা বাঁধিয়া রহিয়াছে। এই খড়ির মূল উপাদান হইতেছে ক্যালসিয়ম ধাতুর পরমাণু। সেই পরমাণুর সঙ্গে অক্সিজেনের পরমাণু আকৃষ্ট হইয়া সর্ব্বপ্রথম চুনের

রেণু প্রস্তুত হইল; পরে আবার চুনের রেণুর সহিত কারবনিক অ্যাসিডের রেণুর যোগে এই খড়ির রেণু প্রস্তুত হইল। ঐ কারবনিক অ্যাসিড-মরুতের রেণু আবার অঙ্গারের পরমাণুর সহিত অক্সিজেনের পরমাণুর যোগে উৎপন্ন হইয়াছিল। তবে দেখ, ক্যালসিয়ম ধাতু, কয়লা এবং অক্সিজেন মরুৎ, এই বিভিন্নরূপ তিন পরমাণুর পরিমিত সংযোগে এক খড়ির রেণু প্রস্তুত হইয়াছে। ক্যালসিয়মের যে গুণ, কয়লার যে গুণ, অক্সিজেনের যে গুণ, খড়িতে সে রকম কোন গুণ নাই। দেখ, রাসায়নিক আকর্ষণ দ্বারা স্বতন্ত্র গুণ উৎপন্ন হইয়া গেল।

যে বস্তুতে তাহার মূল উপাদানের গুণ না থাকে সেখানে রাসায়নিক ব্যাপার বুঝিতে হইবে। যতক্ষণ কেবল হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনকে একটা বোতলের ভিতর পুরিয়া রাখা যায়, ততক্ষণ যদিও হাইড্রোজেন অক্সিজেনের সহিত সম্পূর্ণ মিশিয়া থাকে, তথাপি তাহাদের রেণুর গুণ পরিবর্ত্তিত হয় না। কিন্তু যখনি সেই সম্মিলিত মরুতে নির্দ্দিষ্ট তাপ অথবা তড়িৎ প্রয়োগ করা যায়, অমনি তাহাদের রেণুর গুণ পরিবর্ত্তিত হইয়া বাষ্প-রেণুর গুণ প্রাপ্ত হয়—যাহা উহাদের নিজের কোন গুণ নহে। সহজ উপমা দিয়া বুঝাইতেছি। মনে কর, চাউল পৃথক আছে, ডাইল পৃথক আছে; উভয়কে একত্র রাঁধিলে খিচুড়ি হইল। রাসায়নিক আকর্ষণ যেন বহুব্রীহি সমাস। যেমন, ক্ষণপ্রভা—ক্ষণ অর্থে সময়, প্রভা অর্থে আলো; উভয়ে মিলিয়া অর্থ হইল বিদ্যুৎ। এমন অনেক যোগরূঢ়িক শব্দ আছে, যাহার অর্থের সহিত তাহার মূলের অর্থের কোন মিল নাই। পারা ও গন্ধক একত্র গুঁড়া করিলে উভয়ে মিলিত হইয়া কাজলী বা কজ্জলী হয়। আবার, তাহাতে যদি তাপ দেওয়া যায়, তাহা হিঙ্গুলে পরিণত হয়। উপাদানের পরমাণুর সঙ্গে মিশ্রণোৎপন্ন পদার্থের রেণুর কিছুই মিল নাই।

বঙ্গসাহিত্যের প্রাচীন যুগ।

(শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী)

বঙ্গসাহিত্যের সৃষ্টি হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত সমস্ত সাহিত্যের একটী ধারাবাহিক আলোচনা করিতে গেলে সাহিত্যকে কয়েক অংশে বিভাগ করিয়া না লইলে সুবিধা হইবে না। এক একটী যুগে সাহিত্যের বিভিন্ন বিভিন্ন বিভাগে এক একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তির আবির্ভাব হয়—তিনিই সাহিত্যের গতি এক পথ হইতে অন্য পথে পরিচালিত করেন এবং অপর সকলে তন্নির্দ্দিষ্ট মার্গ অবলম্বন করিয়া তাহারই পুষ্টিসাধন করেন। এই প্রকারে নানাবিধ বিবর্ত্তন পরিবর্ত্তনের সাহায্যে সর্ব্বদেশে সাহিত্যের অঙ্গরাগ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এক একজন প্রতিভাশালী লেখকের অনুকরণে বহু লোকেই লিখিয়া থাকেন, কিন্তু তাহার মধ্যে প্রতিভাই চিরস্থায়ী, অনুকরণ কিছুদিন পরেই অনাদৃত হইয়া উঠে—পরে অনুকৃত সাহিত্যের অস্তিত্ব একেবারে বিলুপ্ত হয়। শুনা যায় সেক্ষপীয়রের যুগে প্রায় ২০০ শত ব্যক্তি মহাকবির অনুকরণে নাটক লিখিয়াছিলেন—কিন্তু তাঁহাদের নাম এখন কে জানে? সাহিত্যের বিভাগ করিতে হইলে এই প্রকার এক একজন সাহিত্যরথীর যুগ ধরিয়া লইতে হয়। কিন্তু বঙ্গের প্রাচীন সাহিত্য সম্বন্ধে এ নিয়ম ঠিক খাটিবে না। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের অধিকাংশ স্থলে সাহিত্যরথী অপেক্ষা তাঁহাদের সাহিত্যই অধিকতর খ্যাতি লাভ করিয়াছে। গানের পালা দেশ-মধ্যে পূর্ব্বেই প্রচলিত ছিল। কবি সেই প্রচলিত সঙ্গীতধারায় আপনার প্রতিভা সংযোগ করিয়া সেই সঙ্গীতকে কাব্যের পদবীতে অধিকতর উন্নীত করিতেন, এবং পরে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভাবানের নামের সঙ্গে ঐ পালার নাম চিরতরে সংযুক্ত হইয়া যাইত। যেমন কৃত্তিবাসের রামায়ণ। কৃত্তিবাস ছাড়া আরও অনেক কবি রামায়ণ প্রণয়ন করিয়াছেন—কিন্তু রামায়ণ এই মহাকাব্যের নামের সহিত কৃত্তিবাসের নামই সংযুক্ত রহিয়াছে। আবার সর্ব্বসাধারণের পাঠ্য এই রামায়ণ প্রথমেই পুস্তকাকারে নিবদ্ধ হয় নাই। রামায়ণ মঙ্গল-গানের মত একপ্রকার পাঁচালী গান। সভায় পায়চারী করিতে করিতে মূল গায়ন রামায়ণের কবিতা সুরসংযোগে আবৃত্তি করিতেন। এখনও বঙ্গের অনেক পল্লীতে পূর্ব্বোক্তরূপে পাঁচালী সঙ্গীত গীত হইয়া থাকে।

প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্য প্রকৃতি-ভেদে

দুই বিভিন্ন শ্রেণীর। প্রাচীন সাহিত্যকে আবার দুইটী ঐতিহাসিক বিভাগে পুনর্বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা (১) বৌদ্ধযুগের সাহিত্য (২) মুসলমান যুগের সাহিত্য। "বঙ্গদেশ ও বঙ্গভাষা" নামক প্রবন্ধে উক্ত হইয়াছে যে বৌদ্ধযুগে ডাকার্ণব, খনার প্রবচন, চার্য্যাচার্য্যবিনিশ্চয় প্রভৃতি যে সকল পুস্তক প্রচলিত ছিল তাহাই বঙ্গদেশের আদি সাহিত্য। পরে আমরা এ বিষয় লইয়া একটু বিশেষভাবে আলোচনা করিব, বর্ত্তমানে কেবলমাত্র নামোল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত রহিলাম। ইহার পর বঙ্গের পালবংশীয় রাজগণ ধর্ম্মঠাকুরের মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য গানের পালা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। এই ধর্ম্মঠাকুর, আর কেহই নহেন—স্বয়ং বুদ্ধদেব। ধর্ম্মঠাকুর, এই নামে তিনি বঙ্গের নীচজাতীয় জনসাধারণের নিকট পরিচিত ছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের মূল তত্ত্ব বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের সহিত ইহার সংস্রব আছে। ধর্ম্মমঙ্গল গান এবং শূন্যপুরাণের প্রচার দ্বারা পালবংশীয় রাজগণ সাধারণের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তার করিয়াছেন। ধর্ম্মমঙ্গলই বঙ্গভাষার আদি মঙ্গল-গান। ময়ূরভট্ট, রূপরাম, খেলারাম, ঘনরাম প্রভৃতি অনেক কবি ধর্ম্মমঙ্গলের পালা রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে ঘনরাম প্রণীত ধর্ম্মমঙ্গল বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। "শূন্য পুরাণের" রচয়িতা রমাই পণ্ডিত। এই সকল গ্রন্থ বৌদ্ধ শাস্ত্র ও দর্শনের ভিত্তির উপর স্থাপিত।

সেনবংশীয় রাজগণের শাসন সময়ে যখন বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব কিয়ৎপরিমাণে দমিত হইয়াছিল, সেই হিন্দু পৌরাণিক ধর্ম্মের পুনরুত্থানের যুগে বুদ্ধদেব বা ধর্ম্মঠাকুরের অনুকরণে পৌরাণিক শিবচরিত অবলম্বন করিয়া সঙ্গীত রচিত হইতে লাগিল। ধর্ম্মঠাকুর এবং জনসাধারণের চিন্তার ধারার সহিত একত্র প্রবাহিত করিবার নিমিত্ত মহাদেবচরিত্র তৎকালীন গ্রন্থকারগণ কর্ত্তৃক কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল পরে যথাস্থানে তাহা প্রদর্শিত হইবে।

(২) মুসলমান শাসনকালে বঙ্গসাহিত্য;—(ক) পাঠান রাজত্বকালের প্রথম সময়ে বঙ্গে বৌদ্ধপ্রভাব বিশেষ কিছুই ছিল না। তবে বৌদ্ধতন্ত্রোক্ত বামাচার প্রথা তখনও একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। "সহজিয়া মত" এই তান্ত্রিক বামাচারের অন্যতম মত। পাঠান রাজত্বকালের প্রথম অবস্থায় বঙ্গে যে দুইজন মহাকবির আবির্ভাব হইয়াছিল তন্মধ্যে একজন এই "সহজিয়া মতাবলম্বী" ছিলেন। সেনবংশীয় শেষ রাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকালের শেষ ভাগে বঙ্গে যখন পাঠান রাজত্ব স্থাপিত হয় তখন সমগ্র দেশ এই রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন বিশেষভাবে বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। জয়দেবের কাকলী-মহিমা শ্রবণ করিয়া বঙ্গবাসীগণ ভাববন্যার পবিত্র স্রোতে তখন ভাসিয়া চলিয়াছে। অস্ত্রের ঝনৎকার তাহাদের কর্ণে প্রবেশ করে নাই; তখন অজয় নদীর তীর হইতে লুব্ধ সমীরণ সমগ্র বঙ্গে বিকীর্ণ করিতেছিল—"দেহি মে পদপল্লবমুদারং" এই প্রাণোন্মাদিনী ভাগবতী ভাষা। এই রসধারায় বঙ্গদেশ তখন আপ্লুত—বঙ্গের জনসাধারণের মুসলমানের জয়োল্লাস শুনিবার অবসর ছিল না। তবুও জয়দেব বঙ্গভাষার কবি নহেন। শিক্ষিত বাঙ্গালী তাঁহার পাঠক ছিলেন। তাহার পর বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের আবির্ভাব। ইহাঁদের মধ্যে চণ্ডীদাসই প্রকৃত বাঙ্গালী কবি—বিদ্যাপতিকে লইয়া বাঙ্গালী ও বেহারী পরস্পর বিবাদ করিতেছেন। কাহারও মতে তিনি বাঙ্গালী, কাহারও মতে তিনি বেহারী। চণ্ডীদাস সম্বন্ধে কোনও মতবিরোধ নাই। তিনি খাঁটী বাঙ্গালী কবি। এই চণ্ডীদাস "সহজিয়া মতাবলম্বী" ছিলেন। তাঁহার বৈষ্ণব কবিতার মধ্যে কোথায়ও সহজিয়া মতের কথা বিশেষভাবে পাওয়া যায় না। তবে "সহজিয়া মত" অবলম্বন করিয়া তিনি কয়েকটী কবিতা লিখিয়াছেন। সে কবিতাগুলির অধিকাংশ স্থল প্রহেলিকাবৎ দুর্ব্বোধ।

(খ) সংস্কৃত গ্রন্থ সমূহের বঙ্গানুবাদ—যে সকল সংস্কৃত গ্রন্থ লোকশিক্ষার জন্য সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, পাঠান রাজত্বকালে সেই সকল গ্রন্থই প্রধানতঃ বঙ্গভাষায় অনূদিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত চারিখানি পুস্তকের অনুবাদ এই সময়ে প্রচলিত হয়, যথা—(১) রামায়ণ (২) মহাভারত (৩) শ্রীমদ্ভাগবত এবং (৪) মার্কণ্ডেয় চণ্ডী। অনন্তদেব, কবিচন্দ্র, ভবানীশঙ্কর, লক্ষ্মণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃত্তিবাস প্রভৃতি বহু রামায়ণ-অনুবাদকের নাম পাওয়া যায়, তন্মধ্যে কৃত্তিবাসের নাম

বঙ্গের সর্ব্বত্র পরিচিত। রামায়ণের ন্যায় মহাভারতেরও অনেক অনুবাদকের নাম শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কাশীরাম দাসের ন্যায় সর্ব্বজনবিদিত আর কেহই নহেন। শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ বা ঐ গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া যে সকল পণ্ডিত বঙ্গসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে সঞ্জয়, বিদ্যাবাগীশ, মালাধর বসু, ভবানন্দ প্রভৃতি মহোদয়গণের নাম উল্লেখ যোগ্য। অন্ধ কবি ভবানীপ্রসাদ "মার্কেণ্ডেয় চণ্ডীর" বঙ্গানুবাদ রচনা করেন। কমল নারায়ণ নামে অপর একজন চণ্ডীর অনুবাদকের নাম পাওয়া যায়। এই সকল কবিগণ পাঠান রাজগণ কর্ত্তৃক তাঁহাদের অনুবাদের জন্য বিশেষরূপে পুরস্কৃত হইতেন। কোনো কোনো অনুবাদ পাঠান সম্রাটগণের আদেশে সঙ্কলিত হইয়াছিল। হুসেনশাহ নামক পাঠান নৃপতি সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতার নিমিত্ত সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন।

(গ) বৈষ্ণব সাহিত্য—বৈষ্ণব সাহিত্য বঙ্গের সাহিত্যগঠনে যতদূর সাহায্য করিয়াছে আর কোনও সাহিত্য ততদূর সাহায্য করিয়া উঠিতে পারিয়াছে কিনা সন্দেহ। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে জয়দেবের সঙ্গীতে বঙ্গে বৈষ্ণব কবিতার উৎপত্তি। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের গান জয়দেবের অনুকরণে প্রাদেশিক ভাষায় রচিত। বৈষ্ণব কবিতায় জয়দেবের বিশেষ প্রভাব রহিয়াছে বলিয়া গীতগোবিন্দ সংস্কৃত সাহিত্যের অন্তর্গত হইলেও জয়দেবকে বঙ্গসাহিত্যের আসর হইতে একেবারে বাদ দেওয়া যায় না। জয়দেব গোস্বামীর ভাষা সংস্কৃত হইলেও বাঙ্গালার ন্যায় সহজবোধ্য। জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস বৈষ্ণব সাহিত্যের দ্বার উন্মোচন করিলেন—তাহার পর সেই সভায় যথাকালে প্রবিষ্ট হইলেন যুগাবতার চৈতন্য দেব। তখন বঙ্গদেশে বাস্তবিকই এক অপূর্ব্ব ধর্ম্মান্দোলন উপস্থিত হইল। মহাপ্রভু প্রেমের যে অদ্ভুত অভিব্যক্তি দেখাইয়া যান, সমগ্র জগতের ধর্ম্মেতিহাসে তাহার দৃষ্টান্ত বিরল। মহাপ্রভুর তিরোভাবের পর নানাপ্রকারে বৈষ্ণব সাহিত্য সমৃদ্ধ হইতে লাগিল। কোনও কোনও কবি জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতির অনুকরণে রাধাকৃষ্ণের মাহাত্ম্যে পদ রচনা করিলেন—কেহ বা চৈতন্যদেবের চরিতামৃত রচনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিলেন—কেহ বা সংস্কৃত পৌরাণিক বৈষ্ণব সাহিত্যের অনুবাদ প্রণয়ন করিলেন এবং কোন কোন মহাজন বিভিন্ন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভজনা প্রণালী অবলম্বনে গ্রন্থ প্রচার করিয়া সাধারণের মধ্যে সেই ভজনা প্রণালী শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। ইঁহাদের প্রভাব পড়ে নাই এমন কবি বঙ্গদেশে নাই বলিলেই হয়। বর্ত্তমান কালে বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও শ্যামের বাঁশরীতে মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারেন নাই। তাঁহার "ব্রজাঙ্গনা" কাব্য" ইহার সাক্ষ্য। পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথের—"ভানুসিংহের পদাবলী" কাহার নিকট অপরিচিত? তাহার পর কবিওয়ালার গান, পাঁচালী গান, যাত্রার গান, থিয়েটারের গান প্রভৃতি সকল গানেই বৈষ্ণব কবিতার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই। বঙ্গদেশে প্রবাদ বাক্য চলিত আছে—"কানু বই আর গীত নাই।" বৈষ্ণব কবিতা শুধু যে পাঠান যুগের সাহিত্য তাহা নয়—পাঠান যুগে জন্মলাভ করিয়া বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত সমভাবে জীবিত রহিয়াছে। অনেক মুসলমান কবি বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া বৈষ্ণব কবিতা রচনা করিয়াছেন।

(ঘ) পৌরাণিক ধর্ম্মের পুনরুত্থান যুগ—ভগবান শঙ্করাচার্য্য যখন অদ্বৈতবাদ প্রচার করেন, সেই সঙ্গে সঙ্গে শৈব ধর্ম্ম ভারতবর্ষে কিয়ৎপরিমাণে প্রচারিত হয়। শঙ্করাচার্য্যের আত্মতত্ত্ব নির্ণয়ে—"শিবোঽহং শিবোঽহং" এইরূপ সিদ্ধান্তে তিনি উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার রচিত শিবাষ্টক দেশের মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ। দেবদেবের নামের সহিত সংযুক্ত হইয়া অদ্বৈতবাদ প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া পরবর্ত্তীকালে অদ্বৈতবাদ হইতে শৈবধর্ম্ম সর্ব্বত্র প্রসারিত হইল। এই ধর্ম্মের উপাসকগণ নিষ্ক্রিয়, নির্গুণ, রাগদ্বেষশূন্য, পরব্রহ্মস্বরূপ, শিবকে একমাত্র উপাস্য বলিয়া মানিতেন। তাহার পরে শিবচরিত্র ক্রমে গার্হস্থ্য গুণসংযুক্ত হইল। মহামায়া তাঁহার স্ত্রী, ষড়ানন গণপতি তাঁহার পুত্র, লক্ষ্মী স্বরস্বতী কন্যা। মার্কণ্ডেয় চণ্ডী বঙ্গভাষায় অনূদিত হইলে শিবচরিত্রের এই পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। তখন অনেক ভক্ত কবি এই ভাবটী

লইয়া নানাপ্রকার কাব্য রচনা করিতে লাগিলেন। শিবচরিত্র অবলম্বন করিয়া যে সকল কবি কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন তন্মধ্যে "শিবায়ণ"প্রণেতা রামেশ্বর সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। শিব এবং শক্তির সম্মিলন লইয়া "শিবায়ন" কাব্য রচিত। তাহার পর শুধু শক্তির লীলা দেখাইবার জন্য অনেকগুলি মঙ্গলগানের পালা রচিত হয়। যথা—শীতলা-মঙ্গল, মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, সারদামঙ্গল, কালিকামঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল।

এই সকল মঙ্গল-গান-রচয়িতাগণের মধ্যে অনেক বিশেষ প্রতিভাশালী কবি ছিলেন। বিশেষত মনসামঙ্গলের ক্ষেমানন্দ, চণ্ডীমঙ্গলের কবিকঙ্কণ, কালিকামঙ্গলের রামপ্রসাদ এবং অন্নদামঙ্গলের ভারতচন্দ্রের প্রতিভা যুগান্তস্থায়ী ছিল। আমরা যথাস্থানে তাঁহাদের সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিব।

(৬) বাঙ্গলার গান—মঙ্গলগান ও বৈষ্ণবকবিতা ছাড়িয়া দিলেও বাঙ্গালাদেশের প্রাচীন সাহিত্যে আরও নানাপ্রকার গানের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ভাবুক ভক্ত কবি রামপ্রসাদ কালিকামঙ্গলের বিদ্যাসুন্দরের পালা ছাড়া বঙ্গভাষায় যে সঙ্গীতরত্ন উপহার দিয়াছেন, বঙ্গভাষা সে রত্নহার চিরদিন বক্ষে ধারণ করিয়া রাখিবেন। বাঙ্গালার প্রাচীন গান প্রধানতঃ তিনটী শাখায় বিভক্ত—(১) শ্যামাসঙ্গীত (২) কৃষ্ণবিষয়ক গান এবং (৩) দেহতত্ত্ব। রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, রঘুনাথ রায়, দাশরথি রায়, নীলকণ্ঠ, প্রভৃতির গান বাঙ্গালাদেশ কখনও ভুলিতে পারিবে না। ৺ রামনিধি গুপ্ত (নিধু বাবু) বাঙ্গালার একজন প্রসিদ্ধ গীতরচয়িতা। তাঁহার রচিত সঙ্গীত নিধু বাবুর টপ্পা নামে বিখ্যাত।

ইংরাজ রাজত্বের প্রথম ভাগে কবিওয়ালা ও পাঁচালীর গানের বড় আদর ছিল। রাম বসু, হরু ঠাকুর, ভোলা ময়রা, আণ্টুনি সাহেব প্রভৃতি কবিওয়ালাগণ গীত রচনার দ্বারা বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ কল্যাণ সাধন করেন। পাঁচালীওয়ালাগণের মধ্যে দাশুরায়ের নাম দেশপ্রসিদ্ধ—কি ইতর কি ভদ্র প্রায় সকল শ্রেণীর মধ্যেই তাঁহার রচিত গান আদর লাভ করিত।

তন্ত্রের ইতিহাস।

(শ্রীগিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ)

ইতিহাসপ্রিয় বর্ত্তমান যুগে প্রত্যেক বিষয়েরই ইতিহাসসংগ্রহের চেষ্টা দেখা দিয়াছে। বেদের ইতিহাস, স্মৃতির ইতিহাস, পুরাণের ইতিহাস, অর্থশাস্ত্রের ইতিহাস, নীতিশাস্ত্রের ইতিহাস, কাব্যের ইতিহাস, অলঙ্কারের ইতিহাস, এইরূপ প্রত্যেক শাস্ত্রেরই ঐতিহাসিকতত্ত্বসংগ্রহের আবশ্যকতা অনুভূত হইতেছে। সুতরাং এই সময়ে তন্ত্রশাস্ত্রের ইতিহাসসংগ্রহও আবশ্যক।

তন্ত্রের মূল কি? কোন্ সময় তন্ত্র আত্মপ্রকাশ করিয়াছে? যুগপৎ এই উভয় প্রশ্নের সমাধানে প্রবৃত্ত হইলে প্রথমেই বলিতে হয়, তন্ত্রের মূল ব্রহ্ম, এবং স্মরণাতীত কাল হইতেই তান্ত্রিকোপাসনা শিষ্টসমাজে সমাদৃত হইয়াছে। সুতরাং ইহার সন তারিখ নির্দ্ধারণের কোনও উপায় নাই। এই সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ ভাস্কর রায়ের গ্রন্থে কথিত গুরুপরম্পরাক্রম-পাঠে জানা যায় যে,—

প্রথমতঃ নির্গুণ ব্রহ্ম হইতে ধ্বনি স্বরূপ উন্মনাত্মরূপে সূক্ষ্মবাক্ (শব্দ) উৎপন্ন হইয়াছিল। উহা স্বচ্ছন্দভৈরব-নামক (রুদ্র বিশেষ) নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসক অবগত হইয়া সংক্ষেপরূপে অর্থাৎ সূত্রাকারে কতকগুলি তন্ত্র প্রণয়ণ করিয়া অনাশ্রিতেশ্বরের নিকট বলিয়াছিলেন। অনাশ্রিতেশ্বর আবার সেইগুলি বিস্তৃত করিয়া শাম্ভ্যতীতা দেবীকে (শক্তি দেবতা বিশেষ) বলিয়াছিলেন। সেই দেবী সদাশিবকে সমস্ত বিষয় বলিয়াছিলেন। তিনি সেই গুলিকে পূর্ব্বাম্নায় প্রভৃতি ভেদে অর্থাৎ পূর্ব্বাম্নায় উত্তরাম্নায় পশ্চিমাম্নায় দক্ষিণাম্নায় ও ঊর্দ্ধাম্নায় এই পাঁচ প্রকারে বিভিন্ন অসংখ্য অপরিমেয় বহু-বিস্তর করিয়াছিলেন। অনন্তর ঈশ্বর বিদ্যেশ্বর এবং শ্রীকণ্ঠ প্রভৃতি রুদ্রগণ উক্ত তন্ত্র অবলম্বন করিয়া উপাসনা করিয়াছেন এবং গ্রন্থও রচনা করিয়াছেন।*

---

* আদৌ নিগুণাদ্ ব্রহ্মণো ধ্বনিরূপা উন্মনাখ্যা সূক্ষ্মরূপা বাগুৎপন্না। সা (তাং) স্বচ্ছন্দ ভৈরবো নিগুণব্রহ্ম-শিবো বুদ্ধা সংক্ষেপরূপেণ তন্ত্রাণি প্রণীয়ানাশ্রিতেশ্বরায়োক্তবান্। স তানি বিস্তৃত্য শাম্ভ্যতীতাদেব্যৈ কথয়ামাস। সা সদাশিবায়াকথয়ৎ। স পঞ্চাম্নায়াদিভেদেনাসংখ্যমপ্রমেয়ং বহুবিস্তরং অপারমকরৎ। তত ঈশ্বরো বিদ্যেশ্বরঃ শ্রীকণ্ঠাদ্যো রুদ্রা ইত্যাদি ক্রমেণাতীবপ্রথিতমভূদিতোষা গুরুপরম্পরা ইত্যেবকলা। অত্র সর্ব্বত্র মূলভূতানি বচনানি প্রাচাং টীকায়াং দ্রষ্টব্যানি।

(সেতুবন্ধ ৭ম বিশ্রাম)

এইরূপ গুরুপরম্পরাতে তন্ত্রশাস্ত্র অতীব প্রসিদ্ধি ও বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। (ভাস্কর বলিয়াছেন যে, এই বিষয়ের মূল প্রমাণগুলি প্রাচীনদিগের টীকাতে দ্রষ্টব্য) তবেই দেখা যাইতেছে যে, যে ব্রহ্ম হইতে বেদের উৎপত্তি, সেই ব্রহ্ম হইতেই তন্ত্রেরও উৎপত্তি হইয়াছে। ভাস্কর রায়ের উক্তি হইতে ইহাও প্রতীয়মান হয় যে, স্বচ্ছন্দভৈরব সংক্ষেপে যে সকল সূত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন, সেইগুলিই তান্ত্রিক শ্রুতি বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে; এবং অদ্যাপি বিবিধ নিবন্ধে দৃষ্টিগোচর হইতেছে।

তন্ত্রের মন্ত্রবিশেষ মনূপাসিত * বলিয়া পরিচিত; সুতরাং মনুর সময়েও উহা প্রচলিত ছিল ইহা বেশ বুঝা যায়। ভগবান্ বিষ্ণুর ষষ্ঠাবতার পরশুরাম তন্ত্রশাস্ত্রের কতিপয় কল্পসূত্র রচনা করিয়াছিলেন। ভাস্কররায়ের সেতুবন্ধ-নামক গ্রন্থে ভার্গবকৃত কল্পসূত্রের প্রভূত অংশ গৃহীত হইয়াছে। ভার্গবের সমগ্র কল্পসূত্র অদ্যাপি বিলুপ্ত হয় নাই, উহা মান্দ্রাজ-ওরিয়েণ্টাল-লাইব্রেরীতে অমুদ্রিত অবস্থায় রক্ষিত হইতেছে।

রামচন্দ্রের সমসাময়িক মুনিপ্রবর অগস্ত্য শ্রীবিদ্যার উপাসক ছিলেন। তাঁহার পত্নী লোপামুদ্রা দেবীও উক্ত দেবীর উপাসনা করিতেন। অগস্ত্যের কৃত অগস্ত্যতন্ত্র, অগস্ত্যসংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্রেরও পরিচয় পাওয়া যায়। মহর্ষি অত্রি এবং তৎপত্নী অনসূয়াদেবী রামচন্দ্রের বিশেষ পরিচিত, অত্রিপুত্র কোপন-স্বভাবের আদর্শ দুর্ব্বাসা-মুনির বিবিধ স্তবাবলী তান্ত্রিকনিবন্ধে অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়।

ইক্ষ্বাকুবংশের গুরু ব্রহ্মার পুত্র মহর্ষি বশিষ্ঠ তারা দেবীর উপাসক ছিলেন। ইনি তন্ত্রশাস্ত্রে কুলভৈরবনামেও অভিহিত হইয়াছেন। বশিষ্ঠের তারোপাসনাবৃত্তান্ত ব্রহ্মযামল, রুদ্রযামল, মহাচীনাচার প্রভৃতি তন্ত্রে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বশিষ্ঠের উপাসনাস্থান অদ্যাপি আসামে বশিষ্ঠাশ্রম নামে প্রসিদ্ধ আছে। সত্যযুগের মনু হইতে ত্রেতাযুগের রামচন্দ্র প্রভৃতির সময় পর্য্যন্ত তান্ত্রিকোপাসনার সমর্থক শাস্ত্রীয় প্রমাণের অভাব নাই। দ্বাপরযুগের অবতার প্রসিদ্ধ ব্যাসদেবের মহাভারতে যে পঞ্চরাত্রের বিস্তৃত বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়, এই পঞ্চরাত্রও তন্ত্রগ্রন্থ বলিয়াই আগমজ্ঞ সমাজে সুপরিচিত। রামানুজস্বামীর পরমগুরু যামুন মুনি আগমপ্রামাণ্য নামক গ্রন্থে স্পষ্টভাষায় পঞ্চরাত্রকে তন্ত্র নামে অভিহিত করিয়াছেন। মহর্ষি ব্যাস যে সমস্ত পুরাণ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহার উপাদানও বেদ এবং তন্ত্র হইতেই সংগৃহীত হইয়াছে। যিনি তন্ত্র এবং পুরাণের অনুশীলন করিয়া থাকেন, তিনি অনায়াসেই এই কথার সারবত্তা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। বেদ ও তন্ত্র এতদুভয়ের সংমিশ্রণে পুরাণের নির্ম্মাণ হইয়াছে; এই হেতুই পৌরাণিকধর্ম্ম মিশ্রধর্ম্ম নামে অভিহিত হইয়া থাকে। গুরুপরম্পরানুসারে প্রসিদ্ধ আছে যে, ব্যাসদেবের শিষ্য শুকদেব তৎশিষ্য গৌড়পাদাচার্য্য, উক্ত গৌড়পাদের শিষ্য গোবিন্দপাদ, তাঁহারই শিষ্য ভগবান শঙ্করাচার্য্য।* শঙ্করাচার্য্যের সম্প্রদায় আদি হইতেই তন্ত্রপথের অনুগামী, ইহার প্রমাণের অসদ্ভাব নাই। হয়ত চিরন্তন সংস্কারবশে কেহ কেহ শঙ্করের তন্ত্রানুবর্ত্তিতা একেবারেই অসম্ভব বলিয়া মনে করিতে পারেন, কিন্তু প্রমাণ পাইলে তাঁহাদের এই ধারণা কিছুতেই স্থায়িত্বলাভ করিতে পারিবে না, একথা সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে। শঙ্করের পরমগুরু গৌড়পাদস্বামীকৃত তান্ত্রিকসূত্র ও ভাষ্য পদে পদে ভাস্কর রায়ের গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে।

ভগবৎপাদ শঙ্করাচার্য্য ত্রিপুরাদেবীর উপাসক ছিলেন বলিয়া মনে হয়, কারণ তৎকৃত আনন্দলহরী প্রভৃতি স্তোত্রে ত্রিপুরাদেবীরই মহিমা বর্ণিত হইয়াছে। আনন্দলহরী ও সৌন্দর্য্যলহরী স্তোত্র টীকা সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। শ্রীমৎ পূর্ণানন্দগিরিকৃত শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থে শঙ্করাচার্য্যকৃত ত্রিপুরাদেবীর

* তন্ত্রসার দ্রষ্টব্য।

* ব্যাসঃ পরাশর-সুতঃ কিল সত্যবত্যাং
তস্যাত্মজঃ শুকমুনিঃ প্রথিতানুভাবঃ।
তচ্ছিষ্যতা মুপগতঃ কিলগৌড়পাদঃ
গোবিন্দনাথমুনি রস্য তু শিষ্যভূতঃ॥
শুশ্রাব তস্যনিকটে কিল শাস্ত্রজালং
যস্যাশৃণোদ্‌গুরুগমস্মগত স্তনস্তাৎ।
শব্দাম্বুরাশি মখিলং সময়ং বিধায়
যস্যাখিলানি ভুবনানি বিভর্ত্তি মূর্দ্ধ্নি॥
শঙ্করদিগ্বিজয়। ৫মং ১০৫।৬

একটি স্তব উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রীরঙ্গপত্তন হইতে শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে সৌন্দর্য্যলহরীস্তোত্র, আনন্দলহরীস্তোত্র, দেবীগুজঙ্গস্তোত্র, ত্রিপুরসুন্দরীবেদপাদস্তোত্র, ত্রিপুরসুন্দরীমানসপূজাস্তোত্র, ত্রিপুরসুন্দর্য্যষ্টক, ললিতাপঞ্চরত্ন, নবরত্নমালিকাস্তোত্র, কল্যাণবৃষ্টিস্তব, ধৃত হইয়াছে। এই কয়টি স্তব তন্ত্রসারে দেখিতে পাওয়া যায়। শঙ্করের পরমগুরু গৌড়পাদকৃত গ্রন্থেও ত্রিপুরাদেবীরই বিবরণ দেখা যায়। শঙ্করাচার্য্যের প্রতিষ্ঠাপিত মঠচতুষ্টয়ে অদ্যাপি শ্রীচক্র পূজিত হইয়া থাকেন। ইহাতে মনে হয় শঙ্কর-সম্প্রদায়ে আদি হইতেই ত্রিপুরাদেবীর উপাসনা চলিয়া আসিতেছে।

ভগবৎপাদ-বিরচিত প্রপঞ্চসার তন্ত্র তন্ত্রনিবন্ধের মুকুটস্থানীয় বলিয়া উল্লেখযোগ্য। উহাও শ্রীরঙ্গ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভগবৎপাদের সমসাময়িক প্রধানতম শিষ্য সুগৃহীতনামা পদ্মপাদাচার্য্য প্রপঞ্চসারের টীকা রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার টীকা অদ্যাপি সুধীবৃন্দের নয়নপথিক হইতেছে। পদ্মপাদাচার্য্য তান্ত্রিকসম্প্রদায়ের নিকট অতীব পরিচিত। সুপ্রসিদ্ধ রাঘবভট্টের গ্রন্থে পদ্মপাদাচার্য্যের রচনাবলী সংশয়াপনোদকরূপে উপন্যস্ত হইয়াছে। অতএব তন্ত্রপথিক শঙ্করাচার্য্য ভগবৎপাদ শঙ্কর হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি এই কল্পনারও অবসর নাই। ভগবৎপাদ শঙ্করের তন্ত্রানুশীলনে কোনও সন্দেহেরও অবসরই নাই। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী এবং পরবর্ত্তী অদ্বৈতসম্প্রদায়ী সুধীগণ সমস্বরে তন্ত্রের প্রাধান্য ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে সুগৃহীতনামা বেদভাষ্যকার মাধবাচার্য্যের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। কারণ প্রায় সর্ব্বশাস্ত্রেই তিনি নিবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন। পরিণামে সন্ন্যাসাশ্রমে অবস্থানসময়ে শঙ্করদিগ্বিজয়-নামক শঙ্কর-চরিত লিখিয়াছেন। তাঁহার এই গ্রন্থ পণ্ডিত সমাজে সুপরিচিত। উক্ত গ্রন্থ পূর্ব্ববর্ত্তী শঙ্কর-চরিতের সার সঙ্কলন স্বরূপ। ইহার প্রত্যেক শ্লোকেই অল্পাক্ষরে বহুবিষয় নিবদ্ধ হইয়াছে। টীকাকার পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থকারদিগের নিবন্ধ হইতে বচনান্তর সংগ্রহ করিয়া মূলের ভাব বিশদ করিয়াছেন।

শঙ্কর-দিগ্বিজয়-পাঠে জানা যায় যে, আচার্য্যপাদের নিকট যে সমস্ত শিষ্য সন্ন্যাস ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার জন্য আসিত, তিনি তাহাদের মধ্যে যে সমস্ত ব্যক্তিকে প্রব্রজ্যায় সম্পূর্ণ অধিকারী মনে করিতেন, তাহাদিগকেই সন্ন্যাস ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতেন, পক্ষান্তরে বিষয়রাগকষায়িতচিত্ত ক্ষুদ্রাধিকারীকে পঞ্চদেবতার উপাসনা করিতে উপদেশ দিতেন। * তাদৃশ ক্ষুদ্রাধিকারীর জন্যই ক্রমমুক্তির পথ-প্রদর্শক প্রপঞ্চসার রচনার অবশ্যকতা অনুভূত হইয়াছিল। সুগ্রহীতনামা পদ্মপাদাচার্য্য টীকার দ্বারা দুরধিগম্য প্রপঞ্চসারেরর তাৎপর্য্য বিবৃত করিয়া সাধকসমাজের প্রভূতহিতসম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। সংপ্রতি বরেন্দ্র-অনুসন্ধানসমিতি ঐ টীকা দাক্ষিণাত্য হইতে নকল করাইয়া আনিয়াছেন। তৎপাঠে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, পদ্মপাদ গুরুর নিকট উক্ত গ্রন্থ রীতিমত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। কারণ গ্রন্থকারের উপদেশ ব্যতীত কেবল বিদ্যার জোরে এমত অভিপ্রায়-প্রকটন সম্ভবপর হয় না। পদ্মপাদ কৃত টীকার নাম "প্রপঞ্চসারবিবরণ"। উক্ত প্রপঞ্চসারগ্রন্থ অবলম্বন করিয়া গীর্ব্বাণেন্দ্র সরস্বতী "প্রপঞ্চসার সংগ্রহ" নামক প্রকরণ গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই গ্রন্থকার গ্রন্থশেষে যে আত্মপরিচয় প্রদানকরিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, অমরেন্দ্র-সরস্বতীর শিষ্য বিশ্বেশ্বর, তৎশিষ্য গীর্ব্বাণেন্দ্র-সরস্বতী। * তাঁহার গ্রন্থের উপোদ্‌ঘাতপাঠে জানা

* বিষ্ণুশর্ম্মা প্রভৃতি শিষ্যগণ গুরুপদিষ্ট প্রায়শ্চিত্তান্তে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া ছিল যে, হে প্রভো! আমাদের ব্রাহ্মণ্যসিদ্ধি এবং মুক্তিলাভ কি প্রকারে হইতে পারে? অনন্তর তিনি উপদেশ করিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণাচাররত মানবদিগের পূজনীয় দেবতা শিব, বিষ্ণু, সূর্য্য, উমা ও গণপতি। ইহাঁদের পূজাপরায়ণ মানবগণ ব্রহ্মার্পণ বুদ্ধিতে নিষ্কামভাবে কর্ম্মের আচরণ করিবে।

প্রায়শ্চিত্তেন সংশুদ্ধা বিষ্ণুশর্ম্মাদয়োঽপি তে
কর্ম্মনিষ্ঠা স্ত মাচার্য্যং প্রোচুস্ত্বৎকৃপয়া প্রভো!
ব্রাহ্মণ্যসিদ্ধিরস্মাকং জাতা মুক্তিঃ কথং ভবেৎ
ইত্যুক্ত আহ পরমো গুরুঃ করুণয়ান্বিতঃ।
ব্রাহ্মণাচার-দেবাঃ স্যু রীশো বিষ্ণুর্দিনেশ্বরঃ
উমা গণপতিশ্চৈব তেষাং পূজা-পরানরাঃ॥
ব্রহ্মার্পণধিয়া কামাং স্ত্যক্ত্বা কর্ম্ম চরন্তি যৈ॥

(পুনা আনন্দাশ্রমে মুদ্রিত পুস্তক ৫৬৯পৃ টীকা)

* ইতি শ্রীমদমরেন্দ্র সরস্বতীশিষ্যশ্রীবিশ্বেশ্বর সরস্বত্যাঃ প্রিয়শিষ্যেণ গীর্ব্বাণেন্দ্র সরস্বত্যা সংগৃহীতঃ প্রপঞ্চসারসংগ্রহঃ সমাপ্তঃ।

যায় যে, তিনি প্রপঞ্চসারের সার-সংগ্রহ-পূর্ব্বক "সৎসম্প্রদায়সর্ব্বস্ব"-ব্যাখ্যানোক্তরীত্যনুসারে গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। † ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, ঐ সময়ে গুরুপরম্পরা-ক্রমে প্রপঞ্চসারের পঠন-পাঠন প্রচলিত ছিল।

এমন কি, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য আনন্দলহরী-স্তোত্রে চতুঃষষ্টিসংখ্যক শক্তিতন্ত্রের ‡ উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—

"চতুঃষষ্ট্যা তন্ত্রৈঃ সকল মভিসন্ধায় ভুবনম্
স্থিত স্তত্তৎসিদ্ধিপ্রসবপরতন্ত্রঃ পশুপতিঃ।
পুন স্ত্বন্নির্ব্বন্ধাদখিলপুরুষার্থৈক-ঘটনাৎ
স্বতন্ত্রং তে তন্ত্রং ক্ষিতিতলমবাতীতরদিদম্॥"

ইহার অর্থ হইতে জানা যায় যে, ভগবান্ পশুপতি প্রথমতঃ চতুঃষষ্টি শক্তি-তন্ত্রের দ্বারা ভুবনস্থিত উপাসকবর্গের উপাসনাপদ্ধতির উপদেশ করিয়া দেবীর পরমপুরুষার্থঘটক-নির্ব্বন্ধানুসারে তাঁহার উপাসনার জন্য স্বতন্ত্র এই তন্ত্র ধরণীতলে অবতীর্ণ করিয়াছেন। অত্রত্য স্বতন্ত্র তন্ত্রপদে-কাহারও মতে জ্ঞানার্ণব-তন্ত্র, কাহারও মতে তন্ত্ররাজ তন্ত্র অভিপ্রেত হইয়াছে। ভাস্কররায় যুক্তি তর্কের দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, বামকেশ্বরতন্ত্রই স্বতন্ত্র-তন্ত্র পদের প্রতিপাদ্য।

ক্রমশঃ।

সমরক্ষেত্র হইতে পত্র।

চন্দননগর হইতে শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর মল্লিক সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালী-ফরাসিসৈন্যভুক্ত হইয়া ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্রে প্রথম-দলে যাত্রা করেন। রণক্ষেত্র হইতে তিনি একটী পত্র লিখিয়াছেন, সেই পত্রখানি আমরা সাদরে প্রকাশ করিলাম। "বঙ্গসেনা সংগঠনে দেশের উন্নতি" প্রবন্ধে বাঙ্গালীরা সৈন্য হইলে দেশের যে মঙ্গল-সম্ভাবনা প্রত্যাশা করিয়াছিলাম, এই পত্রের প্রতিছত্র তাহার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিতেছে।

রনাঙ্গন
ফেব্রুয়ারি ১৮।

পূজনীয়—

আজি বহুদিবস হইল আপনাদের কোন সংবাদ না পাইয়া বড়ই ভাবিত আছি আপনারা বোধ হয় পত্র দিয়ে থাকবেন কিন্তু যুদ্ধের গোলমালে বোধ হয় আমার এখান পর্য্যন্ত পৌঁছায়নি। এবার বোধ হয় দেশে ছুটিতে যাব। তখন অনেক কথা হবে। এবারে শীত উত্তর ফ্রান্সে কাটিয়েছি। শীতে কষ্ট কিছুই হয় নি। যাক্, একটা প্রকৃতির ভিন্ন চিত্র দেখা গেল—এ বেশে যথেষ্ট মাধুর্য্য আছে, কিন্তু কঠোরতারও অভাব নেই। এ দেশের লোকের চরিত্র কঠিন, কষ্টসহিষ্ণু করে তোলবার জন্য প্রকৃতির এই কঠোরতা। এদের সঙ্গে থেকে আমাদের চরিত্রেরও একটু পরিবর্ত্তন ঘটেছে—কষ্টে আর কাতর হই না। কোন বাধা আর আমাদের বিঘ্ন ঘটায় না—কষ্টে পড়লে মানুষকে কতটা সহিষ্ণু, পরিশ্রমী এবং বিলাসত্যাগী হতে হয় তা শিক্ষা করছি। মানুষকে বাঁচতে হলে তাকে কতটা Struggle করতে হয় তার এই প্রথম শিক্ষা হল। আজকাল পৃথিবীতে প্রত্যেক জাতি বাঁচবার জন্যে নিজের অস্তিত্ব পৃথিবীতে প্রকাশ রাখবার জন্য চেষ্টা করছে—শুধু যে জাতিগুলি, তা নয়; প্রত্যেক সম্প্রদায়ও নিজের অস্তিত্বের জন্য যুদ্ধ করছে। সকলেই এখন Egalité (equality) আর Fraternitéর (fraternity) জন্য চেষ্টা করছে। সব চেয়ে যারা নিম্নসম্প্রদায়ের লোক তাদের উৎকণ্ঠাই বেশী। তারা আর তাদের অবস্থায় সন্তুষ্ট নয়, তারা সমাজে একটা ভাল জায়গা খুঁজছে। এই ত গেল Social অবস্থা, পলিটিক্যাল জগতও সমতার দ্বন্দ্ব চলছে। ছোট-বড় অধীন-স্বাধীন সব জাতিই একটা Equal footing খুঁজছে। একটা জাতির কতটা দায়িত্ব, তাকে পৃথিবীতে সম্মান বজায় করে থাকতে হলে কতটা স্বার্থত্যাগ কত পরিশ্রম করতে হয়, তা এই দেশকে দেখলেই বেশ শেখা যায়। আর আজকাল ফ্রান্সে সব জাতির সমাবেশ—প্রত্যেকের কাছ থেকে কিছু কিছু শেখবার আছে—জাতি-চরিত্র শিক্ষার এক মহাসুযোগ। অনেক কথাই লিখেছি,—শরীর বেশ। আপনারা কেমন আছেন, সবাই প্রণাম নেবেন, ইতি।

সেবক
সিধু।

গার্হস্থ্য সংবাদ।

উপনয়ন—শ্রীমান্ দেবকুমার চৌধুরী—গত ২রা ফাল্গুন সার আশুতোষ চৌধুরীর কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ দেবকুমার চৌধুরীর শুভ উপনয়ন কার্য্য আদি-ব্রাহ্মসমাজে প্রচারিত অনুষ্ঠানপদ্ধতি-অনুসারে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে সার আশুতোষ আদি-সমাজে ২৫৲ টাকা দান করিয়া আমাদিগের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন।

সংবাদ।

উড়িষ্যার ঔপনিবেশিক মহাবঙ্গসঙ্ঘ—

আমরা এই সভার দ্বিতীয় অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি। উড়িষ্যাতে যে সকল বাঙ্গালী বহুকাল যাবৎ উপনিবেশ করিয়াছেন ও করিতেছেন, ইহা তাঁহাদেরই মিলনক্ষেত্র। উড়িষ্যার অন্যতর সুপ্রসিদ্ধ জমীদার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বসু ইহার প্রতিষ্ঠাতা। এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য রাজনৈতিক। সে উদ্দেশ্যের

"শঙ্করশ্চামরেন্দ্রশ্চ বিশ্বেশ্বর ইতিত্রয়ং।
পুনাতু মামকীং বুদ্ধিং আচার্য্য কৃপয়ামুদা"॥

† সর্ব্বতঃ সারং গৃহীত্বা ময়া সৎসম্প্রদায়সর্ব্বস্বাভিধ-ব্যাখ্যানোক্তমার্গেন বক্ষ্যতে।

‡ তন্ত্রের মধ্যে যে সকল গ্রন্থে শক্তির মাহাত্ম্য এবং শক্তি পূজা প্রভৃতি প্রধানরূপে বর্ণিত হইয়াছে, সেইগুলি শক্তিতন্ত্র বা মাতৃতন্ত্র নামে প্রসিদ্ধ। শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ গিরির বংশধর সিদ্ধপুরুষ রাঘবেন্দ্র ভট্টাচার্য্যমহাশয় স্বকীয় নিবন্ধে এই সকল তন্ত্রকে "চতুঃষষ্টি মূল তন্ত্র" নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এইরূপ শৈব তন্ত্র বৈষ্ণবতন্ত্র প্রভৃতি ও প্রসিদ্ধ আছে।

সহিত আমাদের কোনই সম্বন্ধ নাই। কিন্তু গত ঈষ্টার ছুটীর সময় এই সভার যে অধিবেশন হইয়া গিয়াছে সেই অধিবেশনে উড়িষ্যাতে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রচারের বিশেষ চেষ্টার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে দেখিয়া আমরা অত্যন্ত সুখী হইয়াছি। আর ভাই-ভাই পৃথক থাকিবার সময় নাই। যে ক্ষেত্রে যতটুকু মিলনের ব্যবস্থা হইতে পারে আমাদের ততটুকুই লাভ। এত বাঙ্গালী উড়িষ্যাতে বাস করিয়া আসিতেছে যে, ইহাকে বঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করা আমাদের দৃষ্টিতে কিছুতেই সঙ্গত হইতে পারে না। ভারতের সকল অংশে যদি এইভাবে মিলনের ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে পরস্পরের মধ্যে মনোমালিন্য থাকিবার অবসর থাকিবে না।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার হিতৈষীমাত্রই শুনিয়া আনন্দিত হইবেন যে বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট অনুগ্রহ পূর্ব্বক নিজের অধীনস্থ প্রত্যেক কলেজে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা গৃহীত হইবার আদেশ প্রচার করিয়াছেন।

এই পত্রিকা সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও এই স্থলে উদ্ধৃত করিলাম :—

I read the Tatwabodhini Patrika with great interest as it contains many valuable matters and the subjects it deals with are generally instructive and sublime.

আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে চৈত্রসংখ্যার প্রবাসীতে এবং ১লা বৈশাখের তত্ত্বকৌমুদীতে ফাল্গুনের পত্রিকায় প্রকাশিত আচার্য্য রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের লিখিত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রবন্ধ হইতে কতক অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে।

গ্রন্থপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি, কাশীযোগাশ্রমের অধ্যক্ষ মহাশয় নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি আদিব্রাহ্মসমাজের গ্রন্থভাণ্ডারে প্রদান করিয়াছেন—১) ভক্তি ও উপাসনা; (২) A Simple Means of Mass Education; (৩) গীতাশতকং; (৪) ছন্দোবোধিকা; (৫) তত্ত্ববিচার; (৬) ত্রিগুণ গান; (৭) জ্ঞানোদয়; (৮) শ্রীকৃষ্ণসৎকথামৃত।

গ্রন্থ পরিচয়।

Hindu Social Ideals—ইহা একখানি ইংরাজী পুস্তিকা। রেঙ্গুন হিন্দুসমাজসম্মিলনের একাদশ অধিবেশনোৎসবে সম্মিলনের সভাপতি শ্রীযুক্ত পি, জি, মেটা, ব্যারিষ্টর মহোদয়ের অভিভাষণ। মান্দ্রাজ হইতে জি, এ, ন্যাটসান কোম্পানি কর্ত্তৃক প্রকাশিত। বর্ত্তমান কালে আমরা সর্ব্ববিধ বিষয়ে বিলাতের অনুগামী হইয়া চলিয়াছি। ভারতবর্ষীয়দিগের পক্ষে বিলাতকে সর্ব্ব বিষয়ে আদর্শ করা কতদূর যুক্তিসঙ্গত বা অযুক্তিসঙ্গত তাহা প্রদর্শনার্থ সভাপতি মহাশয় বিলাতে বিলাতী সভ্যতা কিরূপ ফল প্রসব করিয়াছে তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখাইয়াছেন। বহুবিধ প্রসিদ্ধ ইংরাজ লেখকগণের মত উদ্ধৃত করিয়া বিলাতী industria ism এর বিষক্রিয়া আমাদের চক্ষুর গোচরীভূত করিয়াছেন। প্রাচীন হিন্দুর জাতিভেদ সম্বন্ধে বলিতে গিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে জাতিভেদ পরস্পরকে ঘৃণা করিবার জন্য সৃষ্ট হয় নাই। প্রত্যেক জাতি এক একটী বিশেষ শিল্পবিদ্যার institution। কর্ম্মকার, কুম্ভকার, ক্ষৌরক, ব্রাহ্মণ ইহাদের প্রত্যেকেরই সমাজে বিশেষ প্রয়োজন আছে—প্রত্যেকে প্রত্যেকের উপর নির্ভর করিয়া সমাজকে একটী সংহত সম্মিলনে (Corporate body) পরিণত করিয়াছে। গুণ এবং কর্ম্মবিভাগেই যে প্রাচীন ভারতে জাতির উৎপত্তি হইয়াছিল, সভাপতি মহাশয় তাহা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়াছেন। তিনি কতকগুলি হিন্দু আদর্শের উল্লেখ করিয়া তাহার শ্রেষ্ঠত্ব সপ্রমাণ করিয়াছেন এবং বিলাতী অনুকরণ হইতে সর্ব্বথা দূরে থাকিবার উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু তিনি বর্ত্তমান সমাজসমস্যাসমূহের কথা কিছুই বলেন নাই। তিনি প্রাচীন কালের ন্যায় সরল জীবনযাপনের কথা বলিয়াছেন—গৃহশিল্পের প্রয়োজনীতা ও পুনঃ প্রচলনের আভাস দিয়াছেন। কিন্তু এই অবাধ বাণিজ্য প্রসারের দিনে, যখন বিলাতী পণ্যদ্রব্যের মোহে আমরা অন্ধ, যখন বিলাসিতা আমাদের অন্তরে অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে, এই কঠিন জীবনসমস্যার দিনে কিরূপে উহা সম্ভব হইবে তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করেন নাই। অবশ্য উপায় উদ্ভাবন করিবে কে তাহা আমরাও জানি না—তবে Ruskinএর ভাষায় আমরাও বলি, "Go back to your cradles"—আমাদিগকে সেই শৈশবসারল্যে পুনরায় উপস্থিত হইতে হইবে—এই বিজাতীয় বিলাসিতা, যাহা আমাদিগকে সত্যসত্যই দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছে, এই বিলাসিতার শৃঙ্খল সবলে ছিন্ন করিয়া আমাদের প্রাচীনকালের সেই আড়ম্বরশূন্য সরল জীবন অবলম্বন করিতে হইবে। Indistrialisn ইয়ুরোপের সর্ব্বনাশ করিয়াছে—উহা ঠাকুরমার গল্পের রাজকন্যাবেশিনী রাক্ষসী—আমরা মাল্যচন্দনের দ্বারা কখনই ঐ রাক্ষসীকে এদেশে বরণ করিয়া লইব না। কি ধর্ম্মে কি সমাজে নানাবিধ জটিলতা আমাদের জাতীয় জীবনকে জঞ্জালপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে—এই জটিলতা হইতে সর্ব্বপ্রকারে বিমুক্ত হইলে তবেই আমরা জাতীয় জীবনে উন্নতি লাভ করিতে পারিব। সভাপতি মহাশয় বিশুদ্ধ সামাজিক আদর্শের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া সমগ্র হিন্দুর ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

M. K. Gandhi and the South African Indian Problem—এখানিও শ্রীযুক্ত পি, জি মেটা মহোদয় কর্ত্তৃক লিখিত ইংরাজী পুস্তক। ইহা মহাত্মা গান্ধি এবং দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতবাসীদিগের জীবনসমস্যা সম্বন্ধে একটী উৎকৃষ্ট ও সুচিন্তিত প্রবন্ধ। পুস্তকখানি ঠিক মহাত্মা গান্ধির জীবনচরিত নয়। গ্রন্থকার গান্ধি মহাশয়ের সুপরিচিত; তিনি নিজে অনেক দিন তাঁহার সহিত একত্র বাস করিয়াছেন। তাঁহার নিজের অভি-

জন্য এবং Rev T. G, Doke এবং Polak কর্ত্তৃক লিখিত উক্ত মহাত্মার জীবনচরিত, এই উভয়বিধ উপাদানের সাহায্যে তিনি এই মহামূল্য গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়াছেন। আমরা এই পুস্তক পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দিত ও উপকৃত হইয়াছি। মিঃ গান্ধি কিরূপ অসাধারণ আত্মত্যাগের দ্বারা জাতি ও দেশের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন তাহা এই পুস্তক পাঠে বিশেষ অবগত হওয়া যাইতে পারে। তাঁহার আত্মশক্তির বিকাশ অপূর্ব্ব; তাঁহার ত্যাগ, সংযম জীবনের উচ্চ আদর্শ দেখিয়া তাঁহাকে ব্রহ্মবলে বলীয়ান প্রাচীন ভারতীয় ঋষিশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিতে ইচ্ছা করে। এই মহাপুরুষের জীবন-কথাপ্রসঙ্গে গ্রন্থকার প্রাচীন ভারতীয় অনেক আদর্শের বিষয় আলোচনা করিয়া বর্ত্তমান ইয়োরোপীয় সভ্যতা অপেক্ষা আমাদের প্রাচীন সভ্যতা যে বাস্তবিক বরণীয় তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে সমগ্র জগতের বর্ত্তমান জীবনসমস্যার মীমাংসা ভারতীয় সভ্যতার পুনরভ্যুদয়ের উপর নির্ভর করিতেছে। তাঁহার সমস্ত কথাই যুক্তিপূর্ণ এবং প্রগাঢ় চিন্তা ও গবেষণার দ্বারা পরিচালিত। আমরা প্রত্যেক ভারতবাসীকে এই পুস্তক পাঠ করিতে অনুরোধ করি—বর্ত্তমান ইয়োরোপীয় সভ্যতার অন্তঃসারশূন্যতা তিনি ইয়োরোপীয় লেখকগণের গ্রন্থ হইতেই উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধি কেবলমাত্র প্রবন্ধে এবং বক্তৃতায় উচ্চ আদর্শ দেখাইয়া ক্ষান্ত হন নাই। তিনি তাঁহার মত নিজের জীবনে যথার্থ গ্রহণ করিয়া নিজে ধন্য হইয়াছেন এবং দেশবাসীগণকে ধন্য করিয়াছেন। তাঁহার জীবন ত্যাগের জীবন—তপস্যার ঐশ্বর্য্যে তাহা উজ্জ্বল ও জ্যোতিঃপূর্ণ। এরূপ আর একটি আদর্শ জীবন বর্ত্তমান যুগে দুর্লভ। গ্রন্থকারের প্রবন্ধের শেষ কথা উদ্ধৃত করিয়া আমরা উপসংহার করিলাম—"It is no exaggeration to say that in this age of materialism it is not possible to come across another man who lives the ideal life he preaches."—এইরূপ পুস্তকের যতই প্রচার হয় ততই সমাজের মঙ্গল বলিতে হইবে।

জোয়ার—কবিতাপুস্তক—সুপ্রসিদ্ধ কথক কবি শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ন প্রণীত। হেমবাবু সাহিত্যিকগণের নিকট নিতান্ত অপরিচিত নহেন। তাঁহার অপেক্ষা তাঁহার গান আরও পরিচিত। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি যথার্থ কবিযশ অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার কবিত্ব প্রভাত-সূর্য্যালোকের ন্যায় স্বয়ং জ্যোতিঃপূর্ণ এবং যেখানে পতিত হয় সেখানকার অন্ধকার নাশ করে। বঙ্গের আধুনিক অনেক নূতন কবির কাব্যের মত উহা কুহেলিকাপূর্ণ নয়। ইহা বাস্তবিকই তাঁহার কবিহৃদয়ের জোয়ার। তাঁহার কথকতার গানে পৌরাণিক যুগের একখানি নিখুঁত ছবি মানসপটে অঙ্কিত হয়। কবিগুরু বাল্মীকিকে তিনি—

"ক্রৌঞ্চনিধন-ব্যথিতচিত্ত তমসাতটচারী
বাণীবর-তনয়বর বীণাবরধারী"

বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন।

কবি হেমচন্দ্র মানবতার সাধক—

"মানুষ ঘৃণা করে' যে জন আমার পূজা করে
আমায় হারায়, হারায় মানুষ, হয়না পূজা তার ঘরে॥

"পতিতের লাগি ধূলার মাঝারে নামিতে হইবে তোমারে।
(সিংহাসনে রইলে তোমার চলবে না)"

"করুণা কর করুণা কর, করুণা কর তারে
যে তোমারে না চিনিবে আঘাতিবে বারে বারে।"

"জাত্ গেছে সে জাতির,
(যারা) প্রাণ দেখে না, বিচার ক'রে
দেখে কেবল বাহির"

ইত্যাদি সঙ্গীত বিশুদ্ধ মানবপ্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার অধিকাংশ গান এবং কবিতা এইরূপ উচ্চ অঙ্গের। তাঁহার গান গুলি পাঠ করিলে কবিবর রজনীকান্ত সেনের কথা মনে পড়ে। তাঁহার কবিত্ব ব্যর্থ হইবার নয়।

ওয়ার্ডসওয়ার্থ (অনুবাদ)—শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী প্রণীত। এ খানি কবিতাপুস্তক। বিলাতের মহাকবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের কতিপয় কবিতার বঙ্গানুবাদ। যোগেশ বাবু কবিতার মর্ম্ম নষ্ট না করিয়া যেরূপ অনুবাদ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার অনুবাদ শক্তির প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। "Fountain" "To the Cuckoo" "Solitary Reaper" "She was a Phantom of Beauty" ইত্যাদি কবিতাগুলি আমাদের খুবই ভাল লাগিয়াছে। বিদেশীয় ভাষার কবিতা মাতৃভাষায় অনুবাদ নিতান্ত সহজসাধ্য নয়—এই কথা মনে করিয়া সামান্য যা কিছু দোষ আছে তাহা আমরা মার্জ্জনা করিতে প্রস্তুত আছি। যোগেশ বাবুর ভাবানুযায়ী শব্দচয়ন প্রশংসার্হ। যাঁহারা ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ, তাঁহারা এ পুস্তিকা পাঠে কবিবর ওয়ার্ডসওয়ার্থের ভাবের সহিত পরিচিত হইতে পারিবেন। যাঁহারা ইংরাজীতে উক্ত কবিবরের কাব্যসৌন্দর্য্য প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাঁহাদিগকেও আমরা পুস্তকখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি—প্রকৃত কাব্য-রসিক ইহাতে আনন্দ লাভ করিবেন। গ্রন্থের প্রারম্ভে ওয়ার্ডসওয়ার্থকে সম্বোধন করিয়া যোগেশ বাবু যে কবিতা লিখিয়াছেন, তাহা সুন্দর হইয়াছে। তিনি বিদেশীয় পুষ্পে মালা গাঁথিয়া মাতৃভাষার পদে উপযুক্ত অঞ্জলি দিয়াছেন—কবিতাগুলির ভাব ও ভাষায় তাঁহার প্রাণের ঐকান্তিকতা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ঊনবিংশ কল্প
চতুর্থ ভাগ।
জ্যৈষ্ঠ, ব্রাহ্মসম্বৎ ৮৯।

৮৯৮ সংখ্যা ১৮৪০ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং। সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"

ধিক্ বলং ক্ষাত্র বলং।

ভারতের পুরাণাদি যাঁহারা কিছুমাত্র আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই সেই পুরাকালের বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের মহাযুদ্ধের কথা নিশ্চয়ই অবগত আছেন। রাজা বিশ্বামিত্র নিজের বলদর্পে দর্পিত ধনৈশ্বর্য্যমদে মত্ত। তবু তাঁর মনের কথা এই যে তিনি যাহা কিছু চাহিবেন বা পাইতে ইচ্ছা করিবেন, চাহিবা-মাত্রই, ইচ্ছামাত্রই সেটা তাঁর পাওয়া চাই। বলা বাহুল্য এ বিষয়ের ক্ষমতা তাঁহার ছিল না, এবং সেই কারণে তাঁহার হৃদয়ে পরাজিতের একটা দুঃখ চিরজাগরূক ছিল। তাঁহার গর্ব্ব ও অহঙ্কার এতই বাড়িয়া উঠিয়াছিল যে প্রবাদ আছে যে তিনি ভগ-বানের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মানুষ পর্য্যন্ত সৃষ্টি করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। বিজ্ঞান প্রভৃতি জড়ীয় জ্ঞানচর্চ্চায় বা culture বিষয়ে সম্ভবত তিনি অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন।

এদিকে বশিষ্ঠ আপনার তেজে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ধর্ম্মকে সহায় করিয়া নিজের কাজকর্ম্ম, পরের উপকার প্রভৃতি যথাযথরূপে সম্পন্ন করিতেছেন। গর্ব্ব অহঙ্কারের তিনি কোনই ধার ধারেন না। ন্যায় দয়া প্রভৃতি হইতে কিছুমাত্র বিচ্যুত হয়েন না। যাহা কিছু করেন, বা যাহা কিছু প্রাপ্ত হয়েন, তাহা ঈশ্বরেরই দান বলিয়া কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করেন। তাঁহার সেই অবিচলিত ভগবদ্ভক্তির পুরস্কারস্বরূপে বলিতে গেলে তিনি একটী কামধেনু লাভ করিয়াছিলেন। সেই কামধেনুর নিকট চাহি-লেই তাঁহার যখন যাহা আবশ্যক হইত তাহাই পাইতেন। কাজেই তাঁহার কোন বিষয়ে অন্যায় লোভ করিবার অবসরও ছিল না।

বশিষ্ঠের এই কামধেনুর গুণের পরিচয় পাইয়া বিশ্বামিত্র তাহাকে ছলেবলে কৌশলে যে কোন উপায়ে হউক হস্তগত করিবার উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনের কথা এই যে এমন একটী ধেনু তাঁহার ন্যায় রাজারই নিকটে থাকা কর্ত্তব্য, বনবাসী ফলাশী এক দরিদ্র ঋষির সেই ধেনুর উপর কোন অধিকার থাকা সঙ্গত নহে। ছলে কৌশলে সহজে যখন বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের নিকট সেই ধেনুকে লাভ করিতে পারিলেন না, তখন বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইবার অভিলাষে বশিষ্ঠকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। বিশ্বামিত্র রাজা, তাঁহার রাশি রাশি সৈন্য যথারীতি শিক্ষিত ও সমরাগ্নিতে দীক্ষিত। বশিষ্ঠের দলস্থ লোকেরা সেরূপ শিক্ষিত দীক্ষিত ছিল না। কাজেই ন্যায়ধর্ম্মের মর্য্যাদারক্ষণার্থে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেও প্রথম প্রথম বশিষ্ঠ পদে-পদেই পরাজয় লাভ করিতেছিলেন। অবশেষে তিনি অনন্যগতি হইয়া, যাহার জন্য সংগ্রাম ও বিরোধ, সেই কামধেনুরই শরণাগত হইলেন। তখন কামধেনুর প্রতাপে সেকালের প্রাচ্য জগতের প্রায় সকল জাতিই একে একে বশিষ্ঠের সপক্ষে অস্ত্রধারণ করিল। পরিণামে বিশ্বামিত্র পরাজয় স্বীকার

করিতে বাধ্য হইলেন। তখন তাঁহার গর্ব্বদৃপ্ত হৃদয়ের অহঙ্কার একেবারে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। পূর্ব্বের রাজা বিশ্বামিত্র ভস্ম হইয়া গেলেন এবং এক নবতর ভক্ত বিশ্বামিত্র জন্মগ্রহণ করিলেন। ধূলি-লুণ্ঠিতমস্তক বিশ্বামিত্রের সমুদয় হৃদয় ভেদ করিয়া এমন এক তেজঃপূর্ণ মহাবাণী উদিত হইল, যাহা আজ পর্য্যন্ত সমগ্র মানবজগতকে ধর্ম্মের পথে ভগবানের পথে দৃঢ় থাকিতে শিক্ষা দিতেছে। সেই মহাবাণী হইতেছে—ধিক বলং ক্ষাত্রবলং ব্রহ্মতেজোবলং বলং—ক্ষাত্রবল বা জড়ীয় বলকে ধিক; ব্রহ্মতেজ যে বলের ভিত্তি সেই বলই প্রকৃত বল।

শত সহস্র বৎসর পরে আমরাও আজ বর্ত্তমান মহাসমরে সেই বশিষ্ঠবিশ্বামিত্রেরই মহাযুদ্ধের প্রতিরূপ দেখিতেছি। ইংরাজজাতি ন্যায় ও ধর্ম্মের উপর আপনার সিংহাসন ও রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করাতেই ভগবান সুপ্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে সমুদ্রের আধিপত্যরূপ একটী কামধেনু প্রদান করিয়াছেন। এই কামধেনুর সাহায্যে তাঁহারা সুমেরু হইতে কুমেরু পর্য্যন্ত সকল স্থান হইতেই আপনাদের অভিলষিত বিষয় সকল লাভ করিতেছেন। এদিকে বিশ্বামিত্রের প্রতিরূপ জর্ম্মনগণ সাহিত্য ও বিজ্ঞান প্রভৃতিতে খুবই উন্নত হইলেও এবং ব্যবসায়বাণিজ্যে বলিতে গেলে সমগ্র পৃথিবীকে গ্রাস করিতে বসিলেও সন্তোষ লাভ করিতে পারিল না। জর্ম্মনেরা চায় যে তাহাদের ইচ্ছামাত্র সকল অভিলষিত বস্তু লাভ হয়; তাহারা পৃথিবীর প্রত্যেক অংশকেই সম্পূর্ণরূপে নিজস্ব মনে করিয়া স্বজাতি ভিন্ন অপর সকল জাতিকেই ক্রীতদাসের ন্যায় ব্যবহার করিতে চাহে। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী হইতে চলিল, জর্ম্মনি সহসা প্যারিস নগর অবরুদ্ধ করিয়া ফ্রান্সের পরাজয় সাধন করিবার পর অবধি অহঙ্কারের উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে পদার্পণ করিতে করিতে বর্ত্তমানে গর্ব্বের শিখরদেশে আরোহণ করিয়াছে। তাই এখন জর্ম্মনি ইংরাজের কামধেনু সেই সমুদ্রের আধিপত্য হরণ করিতে উদ্যত। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে ইংরাজেরা ন্যায় ও ধর্ম্মের উপর দাঁড়াইয়াছেন বলিয়া পৃথিবীর প্রায় সকল জাতিই একে একে তাঁহাদের সপক্ষে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে ও হইতেছে। সেই ফ্রান্সকে পরাজিত করিবার পর অবধি আজ প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া ইংরাজের কামধেনু হরণের অভিপ্রায়ে জর্ম্মনি জড়ীয় বিজ্ঞানের আশ্রয় লইয়াছিল। জড়ীয় বিজ্ঞান তাহার সাধ্যমত বরদান করিয়াছে বটে, কিন্তু আশঙ্কা হয় যে সেই বিজ্ঞানই পরিশেষে জর্ম্মনির সর্ব্বনাশ সাধন করিবে। আমরা কিন্তু ইহা নিশ্চয় বলিতে পারি যে, যে পক্ষে ধর্ম্ম, যে পক্ষে নীতি, সেই পক্ষেই ভগবান এবং পরিণামে সেই পক্ষেরই নিশ্চিত জয়।

বর্ত্তমান মহাসমর ও তাহার আনুষঙ্গিক কার্য্যকলাপ যাঁহারা সূক্ষ্মভাবে পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই নিশ্চয় উপলব্ধি করিতেছেন যে, যে পক্ষেরই জয় হউক না কেন, জড়ীয় বিজ্ঞানের উন্মাদ তাণ্ডবনৃত্য ভেদ করিয়া, সমুদয় আকাশ দ্বিধাবিভক্ত করিয়া, সমস্ত পাশ্চাত্য ভূখণ্ডকে আচ্ছাদিত করিয়া পুরাকালের সেই বিশ্বামিত্রের মুখসমীরিত ক্রন্দন জাগিয়া উঠিয়াছে—ধিক বলং ক্ষাত্রবলং ব্রহ্মতেজোবলং বলং—ক্ষাত্রবলকে ধিক, ব্রহ্মতেজই যাহার ভিত্তি সেই বলই প্রকৃত বল।

আত্মার শান্ত তেজই যে পরিণামে সমস্ত জগত জয় করিবে একথা কে অস্বীকার করিবে? মানুষ জড়বিজ্ঞানে সহস্র উন্নত হইলেও তাহার অন্তরে ঈশ্বর স্বয়ং যে প্রজ্ঞানবীজ উপ্ত করিয়া দিয়াছেন, জড়বিজ্ঞান সেই প্রজ্ঞানবীজের ধ্বংস সাধন করিতে পারে না। কার্য্য-বৈচিত্র্যের কারণে জড়বিজ্ঞানকে আপাতত মহাশক্তিশালী এবং প্রজ্ঞানবীজকে আপাতত একটী সর্ষপবীজের ন্যায় দেখিতে হইলেও কালক্রমে সেই প্রজ্ঞানবীজই যে জড়বিজ্ঞানের উপরে দাঁড়াইয়া প্রকাণ্ড মহীরুহের আকার ধারণ করে তাহা আমরা প্রতিপদে প্রত্যক্ষ করিতেছি। পৃথিবীর কত অংশ যে ভূমিকম্প প্রভৃতি প্রলয়ঙ্কর ব্যাপারে একেবারে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে তাহা কে বলিতে পারে, কিন্তু সেই সকল বিপ্লবতরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে প্রজ্ঞানবীজ সকল কেমন আশ্চর্য্যরূপে ভাসিয়া আসিয়াছে। এই যে একটী প্রজ্ঞানকথা যে আত্মা অবিনশ্বর, তাহার ধ্বংস নাই বিনাশ নাই মৃত্যু নাই—ইহা কোন্ সুদূর অতীতে মানবহৃদয়ে উঁকি ঝুঁকি মারিয়াছিল। তাহার পর কতবার এই সত্য জড়-

বিজ্ঞানের ধূলিরাশি দ্বারা আচ্ছন্ন হইবার উপক্রম হইয়াছিল। অবশেষে শত বিপ্লবরাশি জড়বিজ্ঞানের সহস্র তর্কজাল ভেদ করিয়া বেদবেদান্তের সময়ে কেমন আশ্চর্য্যরূপে তাহা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। বর্ত্তমান যুগে পাশ্চাত্যদিগের ধর্ম্মে আত্মার অবিনশ্বরত্ব দৃঢ়রূপে প্রচারিত হইলেও, পাশ্চাত্যগণ সে কথা মুখে স্বীকার করিলেও, তাহাদিগের হৃদয়কে ধনৈশ্বর্য্যের মোহমদিরা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। কাজেই যে জড়বিজ্ঞানের সাহায্যে ধনৈশ্বর্য্য লাভ হয়, প্রজ্ঞানকে ছাড়িয়া দিয়া সেই জড়বিজ্ঞানেরই চর্চ্চায় পাশ্চাত্যগণ বড় বেশী আপনাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছে। তাহারই ফলে বর্ত্তমান মহাসমরের ঘূর্ণাবায়ু সমগ্র পৃথিবীকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, সেই মহাহবের অগ্নির ভিতর দিয়া, হতাহত সৈনিকগণের নানা উক্তি ও কার্য্যের মধ্য দিয়া সেই প্রজ্ঞান-প্রচারিত সত্য—আত্মার অবিনশ্বরত্ব—যেন আরও স্পষ্টতর রূপে দেখা দিতেছে। সেই সঙ্গে ন্যায় ধর্ম্ম প্রভৃতির অবিনশ্বর ভাবসকলও যেন সমগ্র পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে স্থায়িত্ব লাভ করিতেছে, তাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি।

ব্রহ্মতেজই যাহার ভিত্তি সেই প্রজ্ঞানবল যে জয়লাভের পথে অগ্রসর হইতেছে, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাই, যখন দেখি যে অন্তত মহাযুদ্ধের এক পক্ষও ঘোষণা করিতেছেন যে তাঁহারা পরের ধন কাড়িয়া নিজের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে নহে, অন্যের সর্ব্বনাশ সাধনের উদ্দেশ্যে নহে, কিন্তু সত্যরক্ষার জন্য, নীতিরক্ষার জন্য, ধর্ম্মরক্ষার জন্য বর্ত্তমান সমরে অবতীর্ণ হইয়াছেন। যে যুগে স্বার্থের কথা, জড়বিজ্ঞানের মোহ মানবহৃদয়কে সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া বসিতেছিল, সে যুগে একথা, নবতর ভাবের কি সুগম্ভীর কথা, তাহা একবার ভাবিয়া দেখিলে ভগবানের চরণে মস্তক স্বতই অবনত হইয়া আসে—হৃদয় হইতে স্বতই বিশ্বামিত্রের সেই মহাবাণী বাহির হয়—ধিক বলং ক্ষাত্রবলং ব্রহ্মতেজোবলং বলং।

এই যে মহাবাণীর ধ্বনিতে আজ দিগ্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইতেছে, এই যে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেণ্ট উইলসন বর্ত্তমান সমরে নামিবার পূর্ব্বে ন্যায়,ব্যক্তিগত অধিকার প্রভৃতি উচ্চতম নীতিসমূহের আদর্শ জগতের সম্মুখে ধারণ করিয়াছিলেন, কে বলিতে পারে যে তাহাতে মহাধর্ম্মসঙ্ঘ প্রভৃতির সাহায্যে পাশ্চাত্য জগতে ভারতের পবিত্র প্রভাবের নির্দ্দেশ দেখা যায় না? পরলোকগত শ্রদ্ধেয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি ভারতবাসীই পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার ও তদানুষঙ্গিক শান্তিপ্রবর্ত্তক অন্যান্য ভাবসকলের বীজ গভীররূপে বসাইয়া আসিয়াছিলেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। যতই আলোচনা করি, ততই মনে হয় যে জগতকে মূল সত্যতত্ত্বসমূহে শিক্ষাদীক্ষা দিবার জন্য ভগবান যেন প্রাচ্যভূখণ্ডকে, বিশেষত প্রাচীনতম সভ্যতার উচ্চতম আদর্শে প্রতিষ্ঠিত এই ভারতবর্ষকে নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন, এবং ভারতবর্ষও যেন সেই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পশ্চাৎপদ নহে।

ভারতবর্ষ তো জগতের চিরন্তন শিক্ষাগুরু, বর্ত্তমান যুগেই বা ভারতবর্ষ সেই শিক্ষাগুরুর দায়িত্ব গ্রহণে পশ্চাৎপদ হইবে কেন? যদি আমরা দেশের উপযুক্ত সন্তান হই এবং ভারতের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে চাহি, তবে আমাদের এক নিমেষও আলস্যে কাটাইলে চলিবে না। কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোক, প্রত্যেক ভারতবাসীকে চিন্তায়, কথায় এবং কার্য্যে দেখাইতে হইবে যে ভারতবর্ষ জগতের শিক্ষাগুরু হইবার উপযুক্ত। আমাদের প্রত্যেককে ভগবৎপ্রীতি এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধনরূপ শ্রেষ্ঠতম উপাসনাকে জীবনের প্রতি নিশ্বাসে জীবন্ত মূর্ত্তি প্রদান করিতে হইবে। এই যুগসন্ধিক্ষণে, এই নবযুগের প্রারম্ভে আমাদের মধ্যে যে কেহ যে পরিমাণে স্বীয় কর্ত্তব্যসাধনে পশ্চাৎপদ হইবেন, তিনি সেই পরিমাণেই দেশের অমঙ্গলের জন্য, জগতের লোকক্ষয়ের জন্য দায়ী হইবেন, এটী যেন আমরা বিস্মৃত না হই।

জগতের শিক্ষাগুরুর গৌরবমণ্ডিত সিংহাসনে ভারতবর্ষকে চিরঅধিষ্ঠিত রাখিতে চাহিলে ভারতের প্রকৃত ব্রাহ্মণ্যকে ফিরাইয়া আনিতে হইবে। আমি অহমিকামূলক ব্রাহ্মণ্যের কথা এখানে বলিতেছি না। যে ব্রাহ্মণ্যের ফলে সমগ্র ভারতের অধিবাসী এক সময়ে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করাকে শ্রেষ্ঠতম অধিকার

বলিয়া মনে করিত, সেই যথার্থ ব্রাহ্মণ্যকে আমাদের জাগ্রত করিয়া তুলিতে হইবে। ক্ষাত্রবলের উপর যাহার ভিত্তি সেই পার্থিব সুখসম্পদকে তুচ্ছ করিতে হইবে এবং ব্রহ্মতেজের উপর যাহার ভিত্তি, সত্যধর্ম্ম যাহার মূল, সে-ই ব্রাহ্মণ্যকে প্রত্যেক ভারতবাসীর অবলম্বন করিতে হইবে। এই ব্রাহ্মণ্য কাহাকেও নীচ বলিয়া ঘৃণা করিতে পারে না। ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্রবৃহৎ প্রত্যেক বস্তুতে প্রত্যেক চিন্তায়, প্রত্যেক কার্য্যে ব্রহ্মের অস্তিত্ব পরিচয় পাইয়া, এই ব্রাহ্মণ্য কাহাকেও নীচ বলিয়া অবজ্ঞা করিতে পারে না; প্রত্যুত, যথাসাধ্য স্বীয় শক্তি-প্রয়োগে প্রত্যেককে ব্রহ্মের পথে অগ্রসর করিবার বিষয়ে, উন্নতির পথে প্রত্যেকের অভিব্যক্তিসাধনে সহায়তা করে। এই ব্রাহ্মণ্যের পরিচয় পাই আমরা বৈদিকপূর্ব্ব যুগের জাবালি মুনিতে। জাবালির উপাখ্যান যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে জাবালির গুরু তাঁহার সরলতার কারণেই কিরূপে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করিতে দ্বিধা করেন নাই। এই ব্রাহ্মণ্যের পরিচয় পাই সেই ব্রাহ্মণে, যিনি গ্রীকসম্রাট আলেকজাণ্ডার কর্ত্তৃক ধনরাশির প্রলোভনেও প্রলুব্ধ না হইয়া তাঁহাকে পৃথিবীর সুখসম্পদের তুচ্ছভাব প্রত্যক্ষ দেখাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কেবলি যে ভারতবর্ষে এই ব্রাহ্মণ্যের পরিচয় পাই তাহা নহে। রুষিয়াতেও এই ব্রাহ্মণ্যের জীবন্তমূর্ত্তি কাউণ্ট টলস্টয়ের জীবনে দেখিতে পাওয়া যায়—যাঁহার মূলমন্ত্র ছিল অসাধুকে সাধুতা দ্বারা জয় করিতে হইবে।

জগদ্গুরুর দায়িত্ব স্কন্ধে লইয়া আমরা যখন সংসারে দাঁড়াইতে চাহি, তখন আর আমাদিগের পিছাইলে চলিবে না—পিছাইবার উপায়ও নাই। ভগবানের মঙ্গলরাজ্যে এমনই নিয়ম যে, যাহার উপর যে কাজের ভার দেওয়া হয়, সে সে-কাজ সহজে স্কন্ধ হইতে নামাইতে পারে না—নামাইতে গেলে ঘাতপ্রতিঘাতের মহাবিপ্লব সহ্য করিতে হয়। যে দায়িত্ব আমরা লইয়াছি, অথবা আমাদের মস্তকে ভগবান দিয়াছেন, সে দায়িত্ব সম্পন্ন করিতে না পারিলে আমাদের রক্ষা নাই। আমাদের প্রত্যেকের নিজেকে, প্রত্যেকের পরিবারকে, প্রত্যেকের সমাজকে, প্রত্যেকের দেশকে এই দায়িত্ব সম্পন্ন করিবার এক একটী অপরিহার্য্য সহায় বলিয়া জানিতে হইবে। একাকী আমা দ্বারা এই দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য সুসম্পন্ন করা অসম্ভব। অথচ সে কার্য্য সম্পন্ন করিতেই হইবে। কাজেই আমার নিজের সঙ্গে সঙ্গে পরিবার, সমাজ ও দেশকে উন্নত করিতে হইবে। যে ব্রহ্মনামের দুন্দুভি একবার বাজিয়া উঠিলে দেশবিদেশের লোক সচকিত হইয়া উঠে, সেই ব্রহ্মকে এবং তিনি যে ধর্ম্মকে আমাদের হৃদয়ে নিহিত করিয়া দিয়াছেন সেই সত্যধর্ম্মকে কেন্দ্রে রাখিয়া যেমন আমাদের নিজের উন্নতি সাধন করিতে হইবে, সেইরূপ পরিবারেরও মঙ্গল সাধন করিতে হইবে; সমাজকে সুসংস্কৃত করিয়া অন্যায়, অবিচার ও অত্যাচারের পথ সকল রুদ্ধ করিয়া দিতে হইবে; দেশ যাহাতে সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলের পথে চলিতে পারে তাহার উপায় করিয়া দিতে হইবে। কোন কাজ করিলে আমার নিজের স্বার্থহানি হইবে অর্থাৎ আমার পার্থিব সুখসম্পদ লাভে আঘাত পড়িবে, এ কথা ক্ষণেকের তরেও মনে স্থান দিব না। স্বার্থের খাতিরে যদি আমরা আমাদের গৌরবমণ্ডিত উচ্চ আসন ছাড়িয়া দিই, তবে আমরা তো ভীষণ আঘাত পাইব, কিন্তু ইহাও স্থির যে, আমাদের চিরন্তন আসন অন্যের অধিকারে চলিয়া যাইবে।

গত বৎসরে আমাদের দেশের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে অনেক বিষয়ে দেশ অগ্রসর হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও অনেক বিষয়ে আমাদের আরও অগ্রসর হইতে হইবে। ভারতের যে রাজন্যবর্গ পরস্পরের বিরুদ্ধে সর্ব্বদাই অস্ত্র ধারণ করিতেন, তাঁহারা যে মিলিয়া মিশিয়া দেশের ভালমন্দ আলোচনা করিতে উদ্যত হইয়াছেন, ইহা একটী আশ্চর্য্য শুভ লক্ষণ। এই যুদ্ধের কারণে প্রজাতন্ত্র শাসনের প্রতি অনুরাগ সমগ্র দেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। ইহার ফলে প্রত্যেকের আত্মনির্ভরের ভাব অল্পবিস্তর জাগিয়া উঠিয়াছে। শিক্ষার প্রতি অনুরাগ সমধিক জাগ্রত হইয়াছে। স্ত্রীশিক্ষা এখন অনেকটা উন্নতিকামী সমাজের অন্যতর স্বাভাবিক অঙ্গ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। কাহারও প্রতি অত্যাচার করিতে নাই, অত্যাচার করিলেই তাহার প্রতিঘাতে সমানুপাত বিপ্লব উপস্থিত হয়, ইহাও আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি।

আমাদের কর্ত্তব্য, রাজন্যবর্গকে নানা উপায়ে সমবেতভাবে দেশের উন্নতি করিবার জন্য উৎসাহিত করা। আমাদের কর্ত্তব্য দেশের প্রত্যেক লোককে আত্মনির্ভরে দীক্ষিত করা—বিলাসিতা ত্যাগ করিয়া দেশের মোটা ভাত মোটা কাপড়ে অনুরক্ত থাকিতে শিখাইলেই আত্মনির্ভর খুবই সহজ হইয়া আসিবে। সকল প্রকার শিক্ষাই যাহাতে বহুল প্রচার হয় এবং শিক্ষার প্রভাবে সকলেই যাহাতে উন্নত হয় তাহার উপায় সকল অবলম্বন করিতে হইবে।

এইরূপ করিতে পারিব কখন? যখন আমরা নিজেরা প্রকৃত ব্রাহ্মণ্য অবলম্বন করিয়া, নিন্দা ও স্তুতিকে সমান জ্ঞান করিয়া পার্থিব সুখসম্ভোগকে পদাঘাত করিতে পারিব এবং হৃদয়ের সহিত বলিতে পারিব—ধিক বলং ক্ষাত্রবলং ব্রহ্মতেজোবলং বলং। তখনই আমাদের ভারতবাসী এবং ঋষিদের বংশধর হওয়া সার্থক হইবে।

অপেক্ষায়।

জীবনের লতা গিয়াছে শুকায়ে
পাতাগুলি গেছে ঝরে একে একে।
শুধু আছে ডাল শ্মশানের মাঝে
সাক্ষী দাঁড়াইয়া অষ্ট অঙ্গে বেঁকে॥
মরমের পরে বহেনাকো আর
মৃদুল হিল্লোলে বসন্তের বায়।
ফোটেনাকো আর কুসুম সুগন্ধ
গন্ধ মধু নাহি প্রাণেরে জুড়ায়॥
কোথায় বা আর বনের সে হাসি,
প্রভাতের সেই লুকোচুরি খেলা?
সন্ধ্যা সমীরণে নব ভাব আর
করে না আঘাত হৃদয়ের বেলা॥
মরণের শ্বাস লেগে আছে যেন
গায়ে গায়ে গায়ে—আনন্দকল্লোল
কোথারে লুকাল—অপেখিয়া আছি
করে পাব মা'র শীতল সে কোল॥

জ্ঞান ও চিন্তা।

(শ্রীমতী প্রতিভা দেবী)

ভাল চিন্তা হৃদয়কে অধিকার না করিলে ভাল হইবার দিকে অগ্রসর হওয়া যায় না। চিন্তার ভাল-মন্দ গতি আমাদের আচার ব্যবহারের গতি নিয়মিত করে। চিন্তা সংযত না হইলে আমাদের স্বভাব যথেচ্ছাচারী ও শিথিল হইয়া পড়ে। কিন্তু কাহার চালনায় এই চিন্তাকে আমরা সংযত করিতে পারি, কুপথ হইতে ফিরাইয়া লইতে পারি? সে সারথি কে? সে আর কেহ নয়—জ্ঞান। চিন্তাকে সুপথে চালনা করিবার জন্য আমাদের জ্ঞানের শরণাপন্ন হইতে হইবে। পূর্ণজ্ঞান পরমেশ্বরকে সকল চিন্তার কেন্দ্রস্থলে রাখিলে আমাদের সমস্ত চিন্তাই নিয়মিত হইয়া চলিতে থাকিবে। তাহাতে আমাদের কার্য্যের কোন বিশৃঙ্খলা ঘটিবে না। চিন্তা কেন্দ্রভ্রষ্ট হইলে আমাদের ঘোর অন্ধকারে পড়িয়া যাইবার ভয়। চিন্তার ভিত্তি জ্ঞানে স্থাপিত হইলে তাহাতে ধর্ম্মরূপ মহা অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়া মানবসমাজকে পরম সুখের করিয়া তুলে। জ্ঞানরূপ বীজে সুচিন্তা অঙ্কুরিত লইলে উহা ক্রমে বিশাল বৃক্ষে পরিণত হইয়া জগতে সুফল প্রদান করিবে। চিন্তা জ্ঞানের আশ্রয় না হইলে আমাদের জীবন যে কত ভয়সঙ্কুল হয় তাহা কে বলিবে? কত ঝড় ঝটিকা আসিয়া তখন আমাদিগকে বিধ্বস্ত করিবে, আমাদের চিত্ত কত না বিপদে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িবে!

জ্ঞানের দ্বারা চিন্তাকে সংযত করাই মনুষ্যের বিশেষত্ব। ইতর প্রাণী ও মনুষ্যের মধ্যে প্রভেদ এইখানে। ইতর প্রাণীরা মানুষের মত জ্ঞান দ্বারা চিন্তাকে আয়ত্ত করিতে পারে না। মানুষের মত ইতর প্রাণীর জ্ঞানের বিকাশ হয় না। তাই মানবের ন্যায় তাহাদের অন্তরে চিন্তা কার্য্য করিতে পারে না। চিন্তার শক্তি বড় কম নয়। ইহা আমাদের মনকে কত না ঘুরাইয়া লইয়া বেড়ায়। চিন্তার সাহায্যে আমরা কত কল্পনা-রাজ্যে বিচরণ করি; কত ভাঙ্গন, কত গড়ন, চিন্তা দ্বারা সাধিত হয়। কত যুক্তি, কত কল্পনা, কত ভাবান্তর, আনয়ন করিয়া চিন্তা আমাদিগকে বিক্ষিপ্ত করিয়া তুলে। চিন্তাকে শাসন করিতে হইলে জ্ঞানের হস্তে লাগাম দিতে

হয়। জ্ঞানের দ্বারা চিন্তা সংযত হইলে তখন উহা প্রশান্ত ভাব ধারণ করে। চিন্তার প্রশান্ত ভাব ধ্যান। চিন্তা ধ্যানে পরিণত হইলে তখন উহা দ্বারা আমরা আনন্দ-লোকে উপনীত হই। চিন্তার গতি সুপথে চালিত হইলে আমরা অমৃতের পথে সহজেই আসিতে পারি।

চিন্তাকে মন্দ পথ হইতে ফিরাইবার জন্য পূর্ণ-জ্ঞান ভগবানকে আমাদের সারথি করিতে হইবে। তাঁহার হস্তে সমস্ত চিন্তার ভার অর্পণ করিতে হইবে, তাহা হইলে আমরা নির্ভয়ে সংসারে বিচরণ করিতে সমর্থ হইব। চিন্তাকে ভগবানের অধীন করিলেই আমরা আরামে গম্যস্থানে যাইতে সক্ষম হইব, আমাদের সকল ভয় তিরোহিত হইয়া যাইবে। আমরা স্বেচ্ছায় চিন্তা সুপথে চালনা না করিলে দণ্ডের কশাঘাতে সুপথে ফিরিতেই হইবে। চিন্তা যেন আমাদিগকে গহন বনের কণ্টকিত পথে লইয়া না যায়। আমরা চিন্তার দ্বারা যেন স্বেচ্ছাচারিতার পথে না যাই। তাঁহার যে পথ তাহাই প্রকৃত স্বাধীনতার পথ, মুক্তির পথ। সেই পথে যাইতেই আরাম। তিনি রাশ ধরিয়া থাকিলে জ্ঞান, প্রেম, শান্তি, সৌভাগ্য, সকলই সহজায়ত্ত হয়। তাঁহার বিচ্ছেদে আমরা এক মুহূর্ত্তও তিষ্ঠিতে পারি না। তিনি রাশ ছাড়িয়া দিলে আমরা ভগ্ন, চূর্ণ হইয়া কোন্ অন্ধকারে যে নিপতিত হইব তাহা কে বলিতে পারে? সেই রাজরাজেশ্বরকে কর্ণধার করিয়া জীবন-তরী ভাসাইয়া দাও তাহা হইলে সংসার-স্রোতে অক্লেশে বাহিয়া যাইতে পারিবে। যদি সংসারে শক্তি চাও তো তাঁহার মহাশক্তির আশ্রয় গ্রহণ কর। সেই শক্তিই তোমাকে উদ্ধার করিবে, তাঁহারই বলই তোমাকে বলবান করিবে। নিজের চিন্তার জঞ্জালে আপনাকে জড়াইও না। তাঁহার চরণ ধরিয়া থাক। তাহা হইলেই শান্তি, মুক্তি, সকলই করতল-ন্যস্ত হইবে, তাহা না হইলে চতুর্দ্দিক শূন্যময় দেখিবে।

যথেচ্ছাচারিতা ও স্বাধীনতা এক কথা নয়। যথেচ্ছাচারিতা আমাদিগকে অন্ধতম নরকে লইয়া যায়, আর স্বাধীনতা মুক্ত গগনে বিচরণের জন্য আমাদিগকে উন্নত-লোকে লইয়া যায়। স্বাধীনতাতেই আমাদের মুক্তি। স্বাধীনতার চরম লক্ষ্য ভগবান। ভগবানের অধীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা।

সেই স্বাধীন মুক্তিরাজ্যের আনন্দময়কে প্রাপ্ত হওয়াতে আমাদের অন্তরে কত আনন্দধারা না প্রবাহিত হইতেছে। যিনি অন্তর্যামী তিনিই জানেন যে আমরা কত সুখী। তিনিই তাঁহার সঙ্গে আমাদের চিন্তা যুক্ত করিবার ক্ষমতা দিয়া আমাদিগকে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

অসৎচিন্তা দূর কর। সরলতা ও পবিত্রতা-পূর্ণ হৃদয়ে তাঁহার কাছে দাঁড়াও, তাহা হইলে ভগবানের সুদৃষ্টি তোমার উপর পড়িবে। তাঁহার কৃপা-বারি বর্ষিত হইলে তোমার পাপতাপ সকলি বিধৌত হইয়া যাইবে। পাপ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য অনুশোচনা কর। অনুতপ্ত হৃদয়ে তাঁহাকে আহ্বান কর তিনি তোমার অশ্রু মুছাইয়া দিবেন। ঈশ্বরে সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হইবে। সেই সত্যস্বরূপকে অবলম্বন করিলে নির্ভয়ে সকল দিকে চলাফেরা যায়। তিনি অনাদি ও অনন্ত, পূর্ণ পুরুষ। তাঁহার দয়া অসীম। তাঁহার অপার করুণা সকলের জন্য রহিয়াছে। সুখে দুঃখে বিপদে সম্পদে অম্লানবদনে সন্তোষের সহিত তাঁহার প্রতিদিনের দান গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। সকল ঋতু, সকল দিন, সকল মুহূর্ত্ত জীবের মঙ্গলস্বরূপ যাহা কিছু দিবেন তাহাই আমাদের শ্রেয়স্কর জানিয়া হাত পাতিয়া লইবে। আমাদের মত দুর্ব্বল প্রাণীকে তিনি কখনই বিস্মৃত হয়েন না। সর্ব্বদা ভাল চিন্তাকে মনে স্থান দিও। ভক্তিভাবকে মনে জাগাইয়া তোল। ঈশ্বরের পূজায় মনকে নিযুক্ত রাখ। তাহা হইলে ক্রমেই তোমার জ্ঞান উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। চিন্তাকে ধর্ম্মের দ্বারা, জ্ঞানের দ্বারা, নিয়মিত কর। তাহা হইলে তোমার বাক্য ও কার্য্য সকলি সুপথে চালিত হইবে। সংযম ও পূজা আরাধনার দ্বারা চিন্তাকে সত্যের পথে, জ্ঞানের পথে লইয়া যাও, দেখিবে মুক্তির অভয়পদ তোমার সম্মুখে। তখন স্বর্গ-রাজ্য তোমার হৃদয়ে অনুভূত হইবে। ভগবানের প্রীতির সুরে চিন্তার তন্ত্রী বাঁধিয়া জীবন-বীণা বাজাও, তাহা হইলে তোমার নিরানন্দ প্রাণ আনন্দময় হইয়া উঠিবে। *

---

* আনন্দ সভার বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে লিখিত ও বিবৃত।

নববর্ষে।

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এ)

রাগিণী টোড়ী ভৈরবী—একতালা।

নূতন করে নে' তোরে—
চির নূতনেরি মাঝে।
জাগে রবি প্রভাত হ'তে
নূতন আলোর অগাধ স্রোতে
নূতন গীতি গাহে বিহগ
ধরা নূতনতায় সাজে!
শিশির-সজল দুর্ব্বাদলে
দে'রে দে' তোর হৃদয় মেলে!
নূতন দিনের নূতন ফুলে
যেন রে তোর হৃদয় খুলে,
হাওয়ার দোলায় যেন দোলে,
প্রাণে কলগীতি বাজে!
এই যে চিরনবীনতায়
ভরে' নে তোর সকল হৃদয়।
চিরদিন এই স্থলে জলে
তারায় তারায় ফুলে ফলে
উৎসারিত যে প্রাণ, যে গান
জাগ্ রে (তুই) তারি মাঝে॥

দুর্নীতি ও তাহার প্রতীকার।

(শ্রীসত্যানন্দ দাস)

আমরা এখনও আলস-বালিশে মাথা দিয়া বেশ সুখে নিদ্রা যাইতেছি—আমাদিগকে ধিক। আমাদের চারিদিকে মহাসর্ব্বনাশকর প্রথাসমূহ আমাদিগকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতেছে, তাহা দেখিয়াও যে আমরা অন্ধের ন্যায় বিচরণ করিতেছি—আমাদিগকে শত ধিক। কোন্‌টাকে ছাড়িয়া কোন্‌টার কথা যে বলিব তাহা খুঁজিয়াই পাই না। এই যে পাপোদ্দেশ্যে বালিকা পোষণরূপ ভীষণ ব্যবসায় আমাদের চারিদিকে অব্যাহতভাবে চলিয়াছে—এ বিষয়ে তো বলিতে গেলে আমরা কোনই আন্দোলন করিতেছি না। কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতার পুলিস পরীক্ষা করিতেছিল যে ফৌজদারী দণ্ডবিধির সাহায্যে এই ব্যবসা বন্ধ করা যাইতে পারে কি না। এখন বলিতে গেলে সেই পরীক্ষার ফলে স্থির হইয়া গিয়াছে যে এই ব্যবসায় বন্ধ করা যায়। এবিষয়ে বিশেষভাবে আন্দোলন করিবার ইহাই তো অবসর। সংবাদপত্রে এবিষয়ে যে যৎসামান্য আন্দোলন হইয়াছিল তাহাতে আমরা তৃপ্ত হইতে পারি নাই। কেন যে এবিষয় লইয়া আরও তীব্র ও বিস্তৃত আন্দোলন হয় না, তাহার কারণ আমরা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারি না। এবিষয়ের আন্দোলনে দেশমধ্যে এখনও যে সে-রকম একটা সাড়া পড়িয়া যায় নাই, ইহাই আশ্চর্য্য। আশ্চর্য্য হই বা কেন? আমাদের বুদ্ধি অনেকটা মেষপালের ন্যায় হইয়া গিয়াছে। এমন বিপদের মধ্যেও বাস করিয়া আমরা নিজেরা চক্ষু বুজিয়াই আপনাদিগকে নিরাপদ মনে করি। এই ভীষণ ব্যবসায়ের ফলে ভীষণ পাপসমূহ ও তদনুসঙ্গী ভীষণতম রোগবীজসমূহ সমাজের শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া সমস্ত সমাজকে যে পুড়াইয়া ভস্ম করিয়া ফেলিতেছে, তবু আমাদের সুখের নিদ্রা ভাঙ্গিতেছে না—আমাদিগকে শত ধিক।

এই মহা অমঙ্গলের প্রতিবিধানে আমরা নীরব কেন? কেন আমরা এবিষয়ে উঠিয়া পড়িয়া লাগিতেছি না? বাহিরে বাহিরে দেখিয়া ইহার কারণের সন্ধান করিতে না পারিলেও একটু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখিলে একটী সন্দেহ মনের ভিতর জাগিয়া উঠে—বুঝি বা আমরা অন্তরে এই ব্যবসায়কে প্রশ্রয় দিবার ইচ্ছা পোষণ করি, বুঝি বা সেই অন্তঃসলিল ইচ্ছাই আমাদিগকে ইহার বিরুদ্ধে সবল প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইতে দিতেছে না। বর্ত্তমানে আমাদের সংযমের বড়ই অভাব হইয়াছে, তাই আমরা দুর্নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার পরিবর্ত্তে অনেক সময়ে নানাভাবে তাহার সমর্থনে অগ্রসর হই।

ইহার ফলে দুঃসাধ্য ভীষণ ভীষণ রোগের বীজ সকল এক ব্যক্তি হইতে শত ব্যক্তির শরীরে অনুপ্রবিষ্ট হইতে হইতে সমাজশরীরকে একেবারে রোগজর্জ্জরিত করিয়া তুলিতেছে। আমরা বলি ম্যালেরিয়াতে দেশ গেল, কলেরাতে দেশ গেল। ইহা কতকাংশে সত্য বটে। কিন্তু আমরা কেন এই ম্যালেরিয়া প্রভৃতির আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারি না, সে বিষয়ে একটীবারও ধীরভাবে ভাবিয়া দেখি কি না সন্দেহ। ম্যালেরিয়া প্রভৃতি বিষয়ে উপর উপর আমরা অনেক আলোচনা জল্পনা

করি বটে, কিন্তু আমরা মূল ধরিয়া আলোচনা করিতে সাহস করি না। মূল ধরিয়া আলোচনা করিলেই আমাদের আঁতে ঘা লাগিবে, আমাদিগকে সংযম অভ্যাসের সপক্ষে দাঁড়াইতে হইবে। তাই ম্যালেরিয়া হইতে আত্মরক্ষার আলোচনাকালে সংযম অভ্যাস প্রভৃতির কথাকে একটা বাজে কথা ও অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া আমরা অনেকেই উপহাসের দ্বারা উড়াইয়া দিতে চাহি। তাহাই কি ঠিক? ম্যালেরিয়া কলেরা আজও আছে এবং চিরকালই ছিল। কিন্তু ঐ সকল রোগের বিষকে দেহ হইতে এবং নিজেদের বাসস্থান হইতে তাড়াইবার জন্য যে উদ্যম, যে শক্তিব্যবহার আবশ্যক, পুরাকালে ভারতবাসীর সে উদ্যম সে শক্তিব্যবহার ছিল। আজ আমাদের বংশানুক্রমে সংযম হারাইবার ফলে আমরা সে উদ্যম ও শক্তিব্যবহারের ক্ষমতা বিনষ্ট করিয়াছি বলিয়াই ঐ সকল রোগের জ্বালায় আমরা সহজেই মৃত্যুমুখে নিপতিত হই। জাপানের কাউণ্ট ওকুমা তাঁহার একটী বক্তৃতায় অতিবড় এক সত্য ঘোষণা করিয়াছিলেন যে পচ ধরিবার ফলে কাঠ প্রভৃতি জীর্ণ হইয়া গেলে তবে তাহাতে শতবিধ কীট বাসা বাঁধিয়া তাহাকে সম্পূর্ণ নষ্ট করিয়া ফেলে। আমাদেরও শরীরমনকে ম্যালেরিয়া কলেরা অপেক্ষা ভীষণতর রোগবীজসকল বিষে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিয়াছে, তাই সেই ম্যালেরিয়া প্রভৃতিকে নির্ব্বাসিত করিবার উপযুক্ত উদ্যম ও শক্তি সকলই হারাইয়া বসিয়াছি। সেই ভীষণতর রোগের বিষে আমাদের সমাজশরীর একেবারে পচিয়া গিয়াছে, তাই কথায় কথায় নানা রোগ শরীরের মধ্যে বাসা বাঁধিয়া অল্পদিনের মধ্যেই তাহাকে ধরাশায়ী করিয়া ফেলে।

আমাদের সমাজে পচ ধরিবার অন্যতর প্রধান কারণ দুর্নীতি। দুর্নীতির ফলে যখন ছেলেদের ভক্তিশ্রদ্ধা প্রভৃতি সাধুভাব সকল শিথিল হইয়া যায়, তখন তাহাদের প্রকাশ্যভাবে দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিতেও কোন প্রকার কুণ্ঠা আসে না। গুপ্ত ও প্রকাশ্য উভয়বিধ দুর্নীতিই আমাদের সমাজদেহকে কুরিয়া কুরিয়া খাইতেছে। এই দুর্নীতি আমাদের সমাজশরীরের যক্ষ্মারোগ বলিলেও বলা যাইতে পারে। যক্ষ্মারোগে যেমন রোগী নিজের ক্ষয় বুঝিতে পারে না, দুর্নীতিও তেমনি সমাজকে বুঝিতে দেয় না যে তাহার শরীরে ঘুণ ধরিয়াছে। প্রকাশ্য ও গুপ্ত উভয়বিধ দুর্নীতি পরস্পরের সাহায্যে বিস্তৃত হইবার ফলে আমাদের সমাজ ক্রমশই অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িতেছে, ইহা আমরা প্রতিপদে প্রত্যক্ষ করিতেছি।

এই যে প্রতি বৎসর ভারতে ছোট ছোট বালক বালিকার বিবাহ দেওয়া হইতেছে, ইহাতে একেতো সেই বালকবালিকাদিগকে কিলাইয়া অকালপক্ব করিয়া তোলা হইতেছে। তাহার উপর, এই সকল বিবাহে প্রকাশ্যভাবে দুর্নীতির প্রশ্রয় দেওয়া একটা প্রথাতে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র দেখা যায় যে বিবাহোৎসবের একটী প্রধান অঙ্গ বাইনাচ। * যাঁহারা এ বিষয়ে কোন সংবাদ রাখেন, তাঁহারাই স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে বাইনাচ যতই জমাট বাঁধিতে থাকে, ততই তাহাতে গান ও ভাবের অশ্লীলতাও প্রগাঢ়তা লাভ করিতে থাকে। প্রকাশ্যভাবে এইরূপ দুর্নীতির সমর্থনের ফলে ভারতের অনেক অঞ্চলেই ধনীদিগের বারবনিতা পোষণ করা একটা সম্মানের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এমন কি, অনেকস্থলে মহিলাগণও শিক্ষার দোষে এই প্রথা সমর্থন করেন দেখা গিয়াছে। বর্ত্তমানে এই ভাব অনেকটা কমিয়া গেলেও সম্পূর্ণ যে চলিয়া গিয়াছে এমন কথা বলিতে পারি না। বঙ্গদেশও এই কুপ্রথার হস্ত সম্পূর্ণ এড়াইয়া যাইতে পারে নাই।

বঙ্গদেশ আবার ভারতের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা সবচেয়ে বেশী দুর্ব্বল কি না, তাই এই দুর্ব্বলতর দেশে বাইনাচ অপেক্ষা অশ্লীলতর কার্য্য বিবাহোৎসবের অঙ্গস্বরূপে একটা প্রথাতে দাঁড়াইয়াছে। সেই প্রথা হইতেছে খেমটানাচ। যে পরিবার প্রধানত অর্থ বিষয়ে একটু ধনী মানী বলিয়া খ্যাতিলাভ করিতে চাহেন, প্রায় সেই পরিবারেই প্রধানত ফুলশয্যার রাত্রে এই খেমটানাচের বিষবীজ ছড়ানো হইয়া থাকে। যাঁহারা এই নাচ কখনও দেখিয়াছেন, তাহার আনুষঙ্গিক গান শুনিয়াছেন এবং নর্ত্তকীদিগের হাবভাব দেখিয়াছেন, তাঁহারাই

* সামাজিক দুর্নীতির কথা ব্যক্ত করিতে গেলে দুই চারটা অভদ্র শব্দের ব্যবহার অপরিহার্য্য হইয়া উঠে, আশা করি তজ্জন্য পাঠকবর্গ ক্ষমা করিবেন।

এই নাচের অশ্লীলতার গভীরতা বিষয়ে নিঃসঙ্কোচে সাক্ষ্য দিবেন সন্দেহ নাই। আমাদের দেশে প্রায়ই ছোট ছোট বালকবালিকার বিবাহ হয় বলিয়া বিবাহ উপলক্ষে বরকন্যার সমবয়সীদেরই মধ্যে বিশেষ ভাবে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার ধুম পড়িয়া যায়। ফুলশয্যার রাত্রে আবার সমবয়সী মেয়েদেরই সমাগম অত্যন্ত বেশী হয়। বরকন্যা হইতে আরম্ভ করিয়া সেই সকল ছোট ছোট বালক বালিকারা নর্ত্তকীদের গান, নৃত্য ও হাবভাব একেবারে গিলিতে থাকে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এখন, দুর্নীতির বিষবীজ তাহাদের কোমল অন্তঃকরণে কি প্রকার স্থায়িত্ব লাভ করে, তাহা কি আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে? সেই সকল বালক বালিকাগণকে চিরজীবনের সর্ব্বনাশের পথে তাহাদের পিতামাতা আমরাই তো বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতেছি। তাহারা যখন দেখে যে তাহাদের গুরুজনেরা এই সকল দুর্নীতিময় কার্য্যকে প্রকাশ্যেই সমর্থন করেন, তখনই তাহাদের ইহা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে প্রকাশ্যে বা গোপনে সেই সকল কার্য্যের কায়মনোবাক্যে সমর্থন করা ভাল হউক বা না হউক, অন্তত অন্যায় হইতে পারে না।

আজকাল অবশ্য অনেক পরিবারের কর্ত্তৃপক্ষ বাইনাচ খেমটানাচ প্রভৃতির অপকারিতা উপলব্ধি করিয়া কোন উৎসবে তাহার ব্যবস্থা করিতে ইচ্ছা করেন না। কিন্তু তাঁহারা ইচ্ছা না করিলেই বা কি আসে যায়? বাড়ীর মেয়েরা যে তাহা চাহেন। কাজেই অনেক পরিবারের দুর্ব্বলচিত্ত কর্ত্তৃপক্ষ বাড়ীর মেয়েদের অনুরোধের চাপে মনের ইচ্ছা না থাকিলেও অনেক সময়ে কার্য্যে সেই সকল কুপ্রথা সমর্থন করিতে বাধ্য হয়েন। বাড়ীর মেয়েদের মতে সেগুলি বিবাহোৎসবের অপরিহার্য্য অঙ্গ। শিক্ষার অভাবে তাঁহারা একদিকে ঐ সকল কুপ্রথার অনিষ্টকারিতা উপলব্ধি করিতেই পারেন না, অপরদিকে ভাবেন যে ঐ সকল কুপ্রথা ছাঁটিয়া ফেলিলে বিবাহের অঙ্গহানি হইবে। ইহা আমার স্বকপোলকল্পিত নহে—ইহা আমার প্রত্যক্ষ।

এই সকল কুপ্রথা প্রধানত সমাজের এক অংশের—ধনীসম্প্রদায়ের—অবলম্বিত হইলেও দৃষ্টান্তের প্রভাবে তাহার কুফল দুর্নীতি ও তদনুষঙ্গী রোগসমূহ সমগ্র সমাজকে অকালে জরাজীর্ণ করিয়া তুলিতেছে। ইহার প্রভাব কি প্রকার বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে, একটী ঘটনাতেই তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইবে। শুনিয়াছি যে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে আমাদের দেশে বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের মধ্যে শতকরা ৭৫ জনের দেহে কোন-না কোন আকারে যক্ষ্মারোগের ভাব দেখা গিয়াছে। শতকরা ১০০ জনের দেহে কেন যে তাহা দেখা যায় নাই তাহাই আশ্চর্য্য। অধুনাতন চিকিৎসকগণ এবং বিদ্যালয়সংক্রান্ত কমিশনরগণ ইহার উপরিস্থ কারণসমূহ আবিষ্কার করিবেন এবং তৎপ্রতীকারক নানা উপায় অবলম্বন করিবেন বটে। তাহার ফলে রোগের বৃদ্ধি ও প্রসার উপকরণ অভাবে কতকটা নিবারিত হইতে পারে—কিন্তু তাহাতে রোগের বিনাশ হইবে না। স্কুলের ছেলেদের রোগের প্রধান কারণই হইল বাল্যকালের গুপ্ত দুর্নীতি। একেতো তাহাদের দেহ বংশানুক্রমে ভীষণতম রোগবীজের সংস্পর্শে অপটু হইয়া রহিয়াছে, কাজেই তাহা ম্যালেরিয়া ও কুইনাইনের নিত্য বাসস্থান হইয়া উঠিয়াছে। তাহার উপর, স্কুলের ছেলেদের ভিতরকার খবর যাঁহারা রাখেন, তাঁহারাই বলিতে পারিবেন যে গুপ্ত দুর্নীতির নিকট আত্মসমর্পণই তাহাদের দেহে যক্ষ্মাবীজের অস্তিত্বের অন্যতর কারণ না হইয়া যাইতে পারে না। এই দুর্নীতি যে সামাজিক কুপ্রথার ফলে ছেলেদের ভিতর সংক্রামিত হয় নাই তাহা কে বলিতে পারে।

এখন, আমরা যদি আমাদের দেশকে, আমাদের সমাজকে, পরিবারকে এবং ভবিষ্যৎ বংশকে এই মহা সর্ব্বনাশ হইতে রক্ষা করিতে ইচ্ছা করি, তবে, যেমন আর্থিক উন্নতিসাধনের জন্য একদিকে আয় বৃদ্ধি, অপরদিকে ব্যয়সংক্ষেপ করা কর্ত্তব্য, সেই প্রকার এ বিষয়েও আমাদের একদিকে ধর্ম্ম ও ব্রহ্মচর্য্যমূলক শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে, অপরদিকে সর্ব্বপ্রকার অনিষ্টকর ভাব আসিবার সম্ভাবনাও যথাসাধ্য প্রতিরুদ্ধ করিতে হইবে। একদিকে শরীর, মন ও আত্মার স্বাস্থ্যবিধায়ক নিয়মসমূহ পালন করিতে হইবে, অপরদিকে দুর্নীতিসমর্থক সকল বিষয় হইতে দূরে থাকিতে হইবে।

ঈশ্বরের নিয়ম এই যে আমরা আমাদের দেহমনের স্বাস্থ্যবিধানের একটুও চেষ্টা করিলেই সমস্ত প্রকৃতিই সে বিষয়ে আমাদের সহায়তা করিতে উদ্যত হয়।

বালকবালিকা-নির্ব্বিশেষে সন্তানগণকে ব্রহ্মচর্য্যমূলক শিক্ষা দিলে তবে তাহারা দুর্নীতির সহিত সংগ্রাম করিবার একটা বল পাইবে। ইহাই ভারতের মনুপ্রমুখ ঋষিদের আদিষ্ট শিক্ষাপথ। তৎপরিবর্ত্তে বর্ত্তমানে ভারতের দুরদৃষ্টবশত এক শ্রেণীর লোক ব্রহ্মচর্য্যের মূলোচ্ছেদক শিক্ষা প্রবর্ত্তিত করিতে চাহেন এবং নানা উপায়ে করিতে বসিয়াছেন। তাঁহারা কলাকৌশলের দোহাই দিয়া বাইনাচ প্রভৃতির সমর্থন করেন এবং তাঁহাদের লিখিত নানা প্রসঙ্গে মানবের নীচভাবের ও তজ্জনিত মন্দ কার্য্যের স্পষ্ট চিত্র দিয়া অধঃপতিত দেশকে আরও অধোগতির দিকে টানিয়া লইয়া চলেন। তাঁহাদের মতে এই সকল বিষয়ের এ প্রকার স্পষ্ট চিত্র realistic art বা প্রত্যক্ষব্যঞ্জক কলাকৌশল। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, সকল বিষয় হইতে সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তোলাই হইল কলাকৌশল। প্রত্যক্ষ মাত্রই ব্যক্ত করা যদি কলাকৌশল হয়, তবে চুরি ডাকাতি ব্যভিচার প্রভৃতি যাবতীয় কুক্রিয়ার কিছুমাত্র গোপন না রাখিয়া অত্যন্ত প্রত্যক্ষ চিত্র দেওয়াকেও কলাকৌশল বলিতে হয়। কি ভয়ানক কথা—ইহা তো কলাকৌশল নিশ্চয়ই নহে। আর যদি বা ইহা কলাকৌশল হয়, তবে সে কলাকৌশলকেও শত ধিক। কলাকৌশলের নামে শিক্ষার এই অপভ্রংশ ব্রহ্মচর্য্যমূলক শিক্ষার মূলোচ্ছেদ করিতে চাহে।

একদিকে যেমন ব্রহ্মচর্য্যমূলক শিক্ষার সাহায্যে সন্তানগণের হৃদয়ে সুনীতির পথে চলিবার উপকার দৃঢ় মুদ্রিত করিয়া দিতে হইবে, অপরদিকে সেইরূপ তাহাদিগকে দুর্নীতির সংস্রব হইতে দূরে রাখিতে হইবে। ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস বা ব্রহ্মচর্য্য ব্রতভঙ্গের সহায়ক কবিতা উপন্যাস প্রভৃতি নিজেরাও পড়িয়া সময় বৃথা নষ্ট করিব না এবং সন্তানগণকেও করিতে দিব না। আমরা নিজেরা যদি ঐ সকল পড়িয়া সময় নষ্ট করি, তবে সন্তানগণকে সে বিষয়ে নিষেধ করিবার অধিকার থাকিবে না।

সন্তানগণকে দুর্নীতির সংস্রব হইতে দূরে রাখিবার অন্যতর প্রধান উপায় হইতেছে বালিকাব্যবসায় উঠাইয়া দেওয়া। প্রজাদের মঙ্গলে গভর্ণমেণ্টের মঙ্গল। প্রজাদের শারীরিক প্রভৃতি সকল বিষয়ে মনুষ্যত্ব বজায় থাকিলে প্রয়োজনের সময়ে গভর্ণমেণ্ট সাহায্য পাইতে পারেন। তাই এই বালিকা ব্যবসায় উঠাইবার পক্ষে গভর্ণমেণ্টেরও বিশেষ চেষ্টা আবশ্যক। এই দুর্নীতিপোষক ব্যবসায় উঠাইবার পক্ষে আমাদেরও যে প্রাণপণ চেষ্টা আবশ্যক, সমুদয় দেহ মন দিয়া এ বিষয়ে যে আমাদেরও লাগা আবশ্যক, তাহা বোধ হয় কাহাকেও দুইবার করিয়া বলিয়া দিতে হইবে না। গবর্ণমেণ্ট ও আমরা, আমাদের সমবেত চেষ্টা থাকিলে উহা উঠাইয়া দিতেই বা কত সময় লাগে? ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইনের সাহায্যে বালিকাব্যবসায় অনায়াসে উঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। পুলিসকে এ বিষয়ে কার্য্যের দ্বারা, আমাদের সমবেত সপক্ষ মত জানাইয়া এবং অন্যান্য নানা উপায়ে সাহায্য করা উচিত। সমাজের একটী বিষকীট বিদূরিত করিবার এমন শুভ অবসর যেন আমরা অবহেলা পূর্ব্বক না হারাইয়া বসি।

কেবল বালিকাগণকে বেশ্যাদিগের হাত হইতে উদ্ধার করিলেও চলিবে না। তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া রাখা হইবে কোথায়? খৃষ্টানদিগের ভিতর ইহাদিগকে রক্ষা করিবার নানা উপায় অবলম্বিত হইতেছে। সম্প্রতি একটী খৃষ্টীয় মহিলার উদ্যোগে কটকে ইহাদিগের জন্য একটী আশ্রয়স্থান (Children's Shelter) খোলা হইয়াছে। আত্মবিক্রয়রূপ ভীষণ কষ্টকর জীবন যাপন করা অপেক্ষা যে কোন একটী ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নির্দ্দোষ জীবন যাপন শতগুণে মঙ্গলজনক। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস যে হিন্দুসমাজের ভিতরে এইরূপ বালাশ্রম খুলিয়া ঋষিপ্রদিষ্ট ব্রহ্মচর্য্যমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে এবং তৎসঙ্গে আশ্রিত বালিকাদিগের ভবিষ্যত জীবনযাত্রার উপযোগী শিক্ষা প্রদান করিলে সর্ব্বাপেক্ষা মঙ্গলপ্রসূ হইবে এবং বালিকাব্যবসায় অচিরে উঠিয়া যাইবে।

বর্ত্তমানে যে সময় আসিয়াছে, এখন আমাদিগের প্রত্যেককে সমাজের মঙ্গলের জন্য দেশের কল্যাণ

কামনায় যথাযুক্ত শক্তিনিয়োগ করিতে হইবে। নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। আমরা যে এই হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিতেছি—কাহাদের জন্য? আমাদের সন্তানগণের মঙ্গলের জন্য কি নহে? তাই যদি হয়, তবে ইহা কেমন কথা যে একদিকে আমরা তাহাদের মঙ্গলের জন্য আমাদের জীবন পর্য্যন্ত বলি দিতে প্রস্তুত, অথচ অপরদিকে তাহাদের চিরজীবনের সর্ব্বনাশের উপায় অপসারিত করিবার জন্য কোন উপায়ই অবলম্বন করিব না? আমরাও জননীর জঠরে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, মাতার মাতৃত্বই আমাদিগকে বিনাশ হইতে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে; ভগ্নীর, কন্যার স্নেহহস্ত কতবার আমাদিগকে অশান্তির মাঝে শান্তিদান করিয়াছে। মাতার, ভগ্নীর, কন্যার ছায়া যখন আমরা প্রত্যেক বালিকাতেই দেখিতে পাই, তখন সেই বালিকাগণকে সর্ব্বনাশের পথ হইতে রক্ষা করা, তাহাদিগের মাতৃত্বকে বিনষ্ট হইতে না দেওয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভবিষ্যৎ সন্তানসন্ততিকে রোগশোকের বিষবীজের সংস্পর্শ হইতে দূরে রাখিবার পথ প্রস্তুত করা—এ সকল কার্য্য যে আমাদের কতদূর প্রয়োজনীয়, তাহা একমুখে বলিয়া শেষ করা যায় না।

ভারতের জননী সর্ব্বপ্রকার দুর্নীতির অন্যতর প্রধান মূল এই বালিকাব্যবসায় উঠাইয়া দিবার বিষয়ে আমাদের শুভমতি ও ক্ষমতা প্রদান করুন।

ব্রহ্মসঙ্গীত।

রাগিণী ইমন—তাল আড়াঠেকা।

হে প্রাণের দেবতা,
তোমারি চরণে
প্রাণ যেতে চায়।
অনেক পেয়েছি দুখ,
ভেঙ্গেছে আঘাতে বুক,
লহ লহ তুলে
তোমারি কোলে॥

বঙ্গসাহিত্যের নবীন যুগ।

(শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী)

শ্রীরামপুরের খৃষ্টান মিশনারীগণ—ইংরাজ রাজত্ব আরম্ভ হইলে খৃষ্টান মিশনরিগণ বঙ্গদেশে খৃষ্টধর্ম্মের প্রচারার্থ বাঙ্গালা ভাষার আলোচনা আরম্ভ করেন ইহার ফলে বঙ্গ সাহিত্যের বিশেষ উপকার হয়। বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের তাঁহারাই সূত্রপাত করেন। তাঁহাদের সময়ে বঙ্গে মুদ্রাযন্ত্রের ব্যবহার আরম্ভ হয়।

রামমোহন রায় ও বঙ্গে নব যুগ—যে সকল মহাপুরুষ বঙ্গদেশকে বর্ত্তমান উন্নতির পথে পরিচালিত করিয়াছেন রাজা রামমোহন রায় তাঁহাদের সর্ব্বাগ্রণী। বঙ্গে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন এবং নানাবিধ উন্নতির পথ তাঁহার দ্বারাই উন্মুক্ত হইয়াছে। এই ব্রাহ্মসমাজ বঙ্গভাষাকে যে কি পরিমাণে উন্নত করিয়াছে তাহা বলা যায় না। রামমোহন রায় বাঙ্গালা দেশের নব যুগের সাহিত্যের আচার্য্য। তিনি গদ্য সাহিত্যের স্রষ্টা। অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হস্তে বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্য বিশেষ ভাবে পরিপুষ্ট হয় বটে কিন্তু রাজা রামমোহন রায়ই সর্ব্বাগ্রে গদ্যে উপনিষদ অনুবাদ করেন এবং বিরুদ্ধ পক্ষের সহিত তর্কবিতর্কের জন্য পদ্যেরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি সুবিখ্যাত সঙ্গীতরচয়িতা ছিলেন।

এই প্রকারে বঙ্গসাহিত্যের নবযুগের পত্তন হইলে অনেক প্রতিভাশালী পণ্ডিতগণ ধারাবাহিক ভাবে বঙ্গসাহিত্যের সেবা করিতে লাগিলেন। এই সকল সাহিত্যসেবীগণের মধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয় বঙ্গের বাণীমন্দিরের অন্যতর প্রধান পুরোহিত। বঙ্গীয় গদ্যসাহিত্যকে তিনি নব নব অলঙ্কারে সুসজ্জিত করিয়াছেন। তিনি, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি সাহিত্যিকগণের কল্যাণে বঙ্গসাহিত্য অচিরকালেই জনসাধারণের প্রিয় হইয়া দাঁড়াইল। অক্ষয়কুমার দত্তের সময়কে আমরা "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার" যুগ বলিতে পারি, কারণ দত্ত মহাশয়ের গ্রন্থাবলী ঐ পত্রিকাতেই সর্ব্ব প্রথমে মুদ্রিত হইয়াছিল। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-সম্পাদিত সংবাদ প্রভাকর ঐ সময়ে বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ পুষ্টিসাধন করিয়াছিল। গুপ্ত কবি নানাবিধ কাব্য রচনা দ্বারা

বঙ্গসাহিত্যকে বিশেষ অলঙ্কৃত করেন—সমালোচকগণের মতে গুপ্ত কবিই বাঙ্গালার শেষ খাঁটী বাঙ্গালী কবি।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র ও নব যুগের বাঙ্গালা কাব্য—প্রতিভা নিজের জন্য নূতন পথ প্রস্তুত করিয়া লয়। মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দ বাঙ্গালায় প্রথম প্রবর্ত্তন করেন এবং ইংরাজ কবির অনুকরণে বাঙ্গালায় কাব্য প্রণয়ন করেন। আধুনিক ইংরাজী শিক্ষিতগণ প্রাচীন কবিগণের লেখা বড় পছন্দ করেন না। তাঁহারা মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের পাঠক। পদ্যে যেমন মাইকেল নব যুগের প্রবর্ত্তন করেন, গদ্য সাহিত্যে সেইরূপ বঙ্কিমচন্দ্র নবযুগের প্রবর্ত্তক। বিদ্যাসাগরের সাধুভাষা এবং আলালী ভাষা এই দু'য়ের সংমিশ্রণে বঙ্কিমচন্দ্র যে ভাষায়র সৃষ্টি করেন তাহা অপূর্ব্ব। তাঁহার কল্পনার লীলাদণ্ড আবর্ত্তন করিয়া তিনি যে অপূর্ব্ব উপন্যাস বঙ্গভাষায় রচনা করেন পূর্ব্বে বাঙ্গালায় তাহা একেবারেই ছিল না। বস্তুত মাইকেল ও বঙ্কিমচন্দ্র এই দুই জন বাঙ্গালার ভাবরাজ্যের দুই বিভাগের সমসাময়িক দুই সম্রাট। দু'জনেই ইংরাজী সাহিত্যে সুপণ্ডিত এবং দুজনেরই গ্রন্থে ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাব বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়। হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র বিশেষভাবে মাইকেলেরই অনুকরণ করিয়াছেন বলিলেই হয়। তবে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার কাব্যে যে জাতীয়তার বীজমন্ত্র উচ্চারণ করেন—হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের কাব্যে তাহা বিশেষ পরিস্ফুট দেখা যায়।

বর্ত্তমান যুগে "গীতি কবিতার" পুনরভ্যুত্থান হওয়ায় মাইকেলের যুগ আংশিক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। "সারদামঙ্গল" কাব্যপ্রণেতা ৺বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয় বঙ্গসাহিত্যের গীতি কবিতার একটী নূতন সুর সংযোগ করেন। আজকাল রবি বাবুর দেখাদেখি অনেকে যে অস্পষ্ট ভাবের কবিতা (mystic poems) লেখা সুরু করিয়াছেন—সেই অস্পষ্ট ভাবের প্রথম আভাস পাওয়া যায় বিহারীলালের "সারদা মঙ্গল" কাব্যে। বর্ত্তমানে কাব্যে রবীন্দ্রনাথের যুগ চলিতেছে বলা যায়।

বাঙ্গালা নাটক। মুসলমানের যুগের সাহিত্যে নাটক ছিল না। ইংরাজ রাজত্বে আবার নাটকের পুনরভ্যুদয় ঘটিয়াছে। বাঙ্গালার আদি নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্ন। নাটকে মাইকেল, দীনবন্ধু মিত্র, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, অমৃতলাল বসু এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বিশেষ প্রসিদ্ধ। দীনবন্ধু বাবুর ন্যায় হাস্যরসের মধুর নাটক লিখিবার শক্তি অতি অল্প নাট্যকারেই দেখিতে পাওয়া যায়। গিরিশচন্দ্র ঘোষ একজন যথার্থ ভাবুক কবি। দ্বিজেন্দ্রলাল বাঙ্গালার আসরে নূতন সুরে গান গাহিয়াছেন।

সংবাদ পত্র ও মাসিক পত্র—এই দু'য়ের দ্বারা সাময়িক সাহিত্য আলোচিত হয়। তত্ত্ববোধিনী, বঙ্গ দর্শন, আর্য্যদর্শন, সাহিত্য, ভারতী, প্রবাসী ও ভারতবর্ষ প্রভৃতি বাঙ্গালায় অনেকগুলি শ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রিকার আবির্ভাব হইয়াছে। এক এক সময়ে এক একখানি বিশেষ উন্নত হইয়া বঙ্গসাহিত্যকে প্রভাবশালী করিয়াছে। সংবাদপত্র অনেকগুলি প্রচলিত হইয়াছে তন্মধ্যে সমাচারদর্পণ, বঙ্গবাসী, হিতবাদী, সঞ্জীবনী ও বসুমতী প্রভৃতি বাঙ্গালা সাহিত্যে সুযশ অর্জ্জন করিয়াছে। এই সকল সংবাদপত্র ও মাসিক পত্রের সম্পাদকগণ বঙ্গের চিন্তাশীল সুলেখক এবং বাণীর একনিষ্ঠ সাধক—যথাযোগ্য স্থানে তাঁহাদের বিষয় কিছু কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল।

আজকাল বঙ্গসাহিত্যের উন্নতির দিনে শুধু কাব্য, নাটক ও উপন্যাস লইয়াই বঙ্গসাহিত্য নয়। বঙ্গভাষাকে সর্ব্ববিদ্যার আধারভূতা করিবার নিমিত্ত যথেষ্ট চেষ্টা চলিতেছে। যাঁহারা বঙ্গভাষার এরূপ সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির নিমিত্ত বদ্ধপরিকর তাঁহারা আমাদের সকলের ধন্যবাদভাজন। "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ" এ বিষয়ে সর্ব্বাগ্রণী। এই সাহিত্যপরিষদের প্রধান প্রধান সভ্যগণের চেষ্টায় বৎসর বৎসর "সাহিত্য সম্মিলন" হইতেছে। এই সম্মিলনের ফলে একদিকে যেমন আমাদের সাহিত্য কোন্ বিষয়ে কি পরিমাণে উন্নত হইতেছে তাহা বুঝিতে পারা যায়, অন্য দিকে বঙ্গমাতার সুসন্তানগণ পরস্পর সম্মিলিত হইয়া ভ্রাতৃভাব বর্দ্ধন করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই সাহিত্যসম্মিলন চারিভাগে বিভক্ত—

এই চারিভাগে সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ও ইতিহাসের আলোচনা হইয়া থাকে। এইভাবে যদি সাহিত্যের আলোচনা কোনরূপ বাধা না পাইয়া চলিতে থাকে, তাহা হইলে অনতিদূর ভবিষ্যতে আমরা যে ইংলণ্ড, জর্ম্মনি প্রভৃতি দেশের সমুন্নত পাশ্চাত্য সাহিত্যের সহিত আমাদের বঙ্গসাহিত্যের তুলনা করিতে পারিব, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

৺হিতেন্দ্রনাথের প্রতি।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

বরষের পর বর্ষ গিয়াছে চলিয়া।
ধরণীর সুখদুখ গেছ এড়াইয়া॥
কত চেষ্টা করেছিনু রাখিবারে ধরি।
নিরাশের আশা গেলে সুনিষ্ফল করি॥
গেছ ভাল স্বরগের পেয়ে দিব্য বলে—
ফেলি অবিশ্রাম মোরা নিতি অশ্রুজলে॥
ছিলে যবে হেথা, কত করিতে উৎসব—
যত্ন কিসে ভাল থাকে ভাইবোন সব॥
কোথা সে আনন্দোৎসব আজিকার দিন।
বিষয় কুটিল লয়ে রয়েছি মলিন॥
এক দুই করি হেথা গণি গো বৎসর।
কালের যায় না সেথা গর্ব্বপদভর॥
কিবা মাস কিবা বর্ষ বুঝি তব কাছে।
কালের জটিল ভাগ ঘুচিয়া গিয়াছে॥
তোমা বিনা করি হেথা যত গীত গান।
সকলি নিরস্ত যেন—নাহি যেন প্রাণ॥
যে গান শুনিছ তুমি সংসারের পারে।
বন্ধু দেবগণ হতে অনাহত তারে॥
তেমন সঙ্গীত বল কোথা পাব হেথা—
অর্দ্ধ পথে থেমে যায় তুলি মর্ম্মব্যথা॥
যৌবন-মাখানো তব সরল সে মুখ,
ঢাকিতে পারে নি কভু শত কষ্ট দুখ॥
স্বচ্ছ অতি স্বচ্ছ তব নিষ্কলঙ্ক চিত্ত।
তুচ্ছ ছিল তব কাছে রাশি রাশি চিত্ত॥
প্রেমময় পরে তুমি অটল নির্ভর
রেখেছিলে চিরকাল—আনন্দনির্ঝর
বহিত তোমার প্রাণে—বারেকের তরে
নামেনি আঁধার তব জীবনের পরে॥
বিভুরে জানাই মোর প্রাণের এ কথা।
তুমি যেন নাহি পাও সেথা কোন ব্যথা॥
দীর্ঘশ্বাস অশ্রু যেন ফেলিতে না হয়।
মৃত্যু কষ্ট কাছে যেন ঘেঁসিতে না পারে॥
এতদিন সেবা তুমি করিয়াছ যাঁরে;
সার্থক জীবন তব—পাইয়াছ তাঁরে॥
কালের পরদা ছিন্ন করি দুই ভাগে,
অনিমেষ দেখিতেছ—তাঁরি আঁখি জাগে॥
তাঁহারি মহিমা গান করিয়াছ চলি।
সুনিস্তব্ধ শূন্যে তাঁর আহরিছ বলি॥

আদর্শ বা দাদাঠাকুর।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—নদীতীরস্থ প্রান্তর। কাল—শরৎ—প্রভাত।

(নৃত্য গীত করিতে করিতে বালকগণের প্রবেশ)

গৌড়সারঙ্গ—একতালা।

একি সাম্‌লে থাকা যায়?
ডাক পড়েছে, সকাল বেলা
——"আয়রে ছুটে আয়"।
কে রয়েছ ঘরের কোণে;
কে করেছ মুখ ভারী,
পুঁটলি ফেলে আয়রে চলে
তাড়াতাড়ি কাজ সারি'।
সকাল বেলায় পাগল হাওয়ায়
এমনি করেই কাজ ভাঙ্গায়।
হাওয়ার মতন আয়রে মেতে
আলোর মতন হেসে;
পাখীর মতন গান গেয়ে আয়
মেঘের মতন ভেসে;
সারা জগৎ দিচ্ছে সাড়া—
প্রাণে প্রাণে প্রেমে জাগায়।

১ম বালক। যাই বল, দাদাঠাকুর না এলে আমোদ হয় না।

২য় বালক। ঠিক বলেছ। দাদাঠাকুর যখন নাচেন, মনে হয় যেন খোলা মাঠের ঝোড়ো হাওয়া এসে তাঁর সাথে যোগ দেয়। যখন গান গান, বনের পাখী তাঁর সঙ্গে গেয়ে উঠে। আকাশ তাঁর গান কান পেতে শোনে, ফুলগুলি তাঁর হাসি দেখে হেসে ওঠে। বাতাসে যখন তাঁর সাদা চুলগুলি ওড়ে তখন তাঁকে কি সুন্দরই দেখায়।

১ম বালক। দাদাঠাকুর আমাদের যে কে, তা কেবল বুঝতে পারি, বলতে পারিনে। তিনি না হলে আমাদের কোনো কাজে মন বসে না।

৩য় বালক। আজ দাদাঠাকুর এলেন না কেন?

৪র্থ বালক। আমি ভাই আজ দাদাঠাকুরের উপর অভিমান করব। তাঁর সাথে মোর আড়ি।

১ম বালক। এমন কথা বলতে নেই। দাদাঠাকুরের উপর কি অভিমান ক'ত্তে আছে? তাঁকে যে মান্য ক'ত্তে হয়।

৪র্থ বালক। আমার ভাই তাঁর সাথে সবই চলে। আমি একদিন খুব রেগে তাঁর সাথে আড়ি করলুম; কিন্তু ভাই মজার কথা কি বলব, যাই তিনি এলেন, আর অমনি আগে আমিই হেসে ফেল্লুম।

২য় বালক। ঠিক বলেছ তাঁকে দেখলে আর অভিমান থাকে না। আমার তো ভাই তাঁকে দেখলেই নাচতে ইচ্ছা করে।

৪র্থ বালক। দাদাঠাকুর ভারী মজার মানুষ—পাগলের রাজা!

গৌড় সারঙ্গ—একতালা।

দাদাঠাকুর পাগলের রাজা।——
বড় মজার মানুষ, প্রাণের মানুষ,
মনের মানুষ গো—
নাচ্‌বো গাইবো তাঁরি সঙ্গে—
বাজারে বগল বাজা।
নাইকো কোনো বাঁধন ছাঁদন
নাইকো ঢাকা-ঢাপা
আমোদে তাঁর নতুন ধরণ
নাইকো যোখা মাপা।
বড় মজার মানুষ, প্রাণের মানুষ,
মনের মানুষ গো—
নাচ্‌ব গাইব তাঁরি সঙ্গে
বাজারে বগল বাজা।
আকাশ তাঁরে দিয়েছে প্রাণ
পাখী দেছে স্বর
ঝোড়ো হাওয়া দেছে নাচন
ঠাকুর দেছেন বর
বড় মজার মানুষ, প্রাণের মানুষ—
মনের মানুষ গো—
নাচ্‌ব গাইব তাঁরি সঙ্গে
বাজারে বগল বাজা।
কেবল গান আর কেবল হাসি
কেবল ভালবাসাবাসি
হাজার কসুর হ'লেও যে তার
কেবল দয়া—নাই সাজা।
বড় মজার মানুষ, প্রাণের মানুষ,
মনের মানুষ গো—
নাচ্‌ব গাইব তাঁরি সঙ্গে
বাজারে বগল বাজা।

দাদাঠাকুরের প্রবেশ।

দাদা। নাচ্‌ ব্যাটারা, খুব নাচ্‌, আরো নাচ্‌, যাহোক, যাই বলিস, আমোদ হ'লেই হ'ল। খুব নাচতে হবে; আরো নাচতে হবে। আজ নাচে গানে এই ভোরের আলো চমকে দিতে হবে; আজ নাচে গানে এই শরতের আকাশ লুট্‌ করে নেব।

(বালকগণ ছুটিয়া গিয়া দাদাঠাকুরকে ঘেরিল।)

গৌড় সারঙ্গ—একতালা।

দাদাঠাকুর, দাদাঠাকুর, ও দাদাঠাকুর
খোদার উপর খোদগিরিটে করেছ চতুর।
পাক্‌চে মতই চুল তোমার
পড়্‌চে মতই দাঁত
আমোদ ততই যাচ্ছে বেড়ে—
কি এক নতুন ধাত।
সকলেরি সমবয়সী—এমনি মধুর—
বাইরে বুড়ো হচ্চ যতই
ভিতরের যৌবন
উথ্‌লে উঠে পড়্‌চে ছেপে
ভাস্‌চে এ ভুবন;
যতই পেকে যাচ্ছ ততই রসে ভরপুর।
কালেরে যে দেছ ফাঁকি
কাল যে তোমার দাস
তোমার রাজ্যে ভরা ফাগুন
সদাই বারোমাস
অফুরন্ত সুধাকলস——বিলাচ্ছ প্রচুর।

দাদা। নাচ, আরো নাচ, খুব নাচ্। যা হোক যাই বলিস্, আমোদ হলেই হোল।

১ম বালক। নাচো ভাই নাচো; দাদাঠাকুর বলেছেন আমোদ কর্ত্তেই হবে।

দাদা। ওরে তা নয়; আমোদ কর্ত্তেই হবে ভাবিস্‌নে—তাতে আমোদ হয় না। নাচ গান কর্ত্তেই হবে ভাবিস্‌নে, ওতে নাচ গান আসে না। চেয়ে দ্যাখ্ ঐ আকাশের দিকে, ঐ খোলা মাঠের দিকে, চেয়ে দ্যাখ্ ঐ নদীর পানে। বাইরের এই আনন্দটুকু টেনে আন্ দেখি প্রাণে। তার পর দেখবি নাচতে গাইতে পারিস্ কিনা।

১ম বালক। দাদা ঠাকুর, তুমি ঈশ্বরের নাম কর, ঈশ্বরের নাম করে' করে' নাচব গাইব।

দাদা। কেন, তা না হলে' আর নাচতে গাইতে পার্‌বিনে?

১ম বালক। ওতে আমোদও হবে, পুণ্যিও হবে। ঈশ্বরের নাম কর্‌লে স্বর্গবাস হয়।

দাদা। দূর্ ব্যাটা! আ্যা মাটি করেছে। ঈশ্বর আর কে?—এই আনন্দই যে ঈশ্বর। পুণ্যি, স্বর্গ এসব উঁচু কথা তোদের কে শিখিয়ে দিলেরে? অত বড় কথায় কাজ কি? কেবল আমোদ কর্‌বি—কেবল আমোদ। ও সব উঁচু কথা পেলি কোথা?

১ম বালক। এসব আমরা পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে শুনেছি।

দাদা। কোন্ পণ্ডিত মশাই?

১ম বালক। ঐ যে টোলের পণ্ডিত বিদ্যানিধি ভটচাজ্ মশায়ের কাছে।

দাদা। এঃ—তোদের কাছে মিনি-পয়সায় অম্‌নি এসব বড় বড় কথা গুলো বলে ফেল্লে।

১ম বালক। আমাদের ঠেয়ে কি আর ব'লেছেন? উনি যখন টোলে ছাত্তরদের পড়ান্, তখন আমরা শুনে নিয়েছি।

দাদা। অ্যা—মাটি করেছে। পণ্ডিতের কথা শুনে ফেলেছিস্। ওরে তিনি যে বড় মানুষের পণ্ডিত। তোরা যে ছোট লোক। ওসব এখন থাক্। আমোদ কর্; খালি আমোদ কর্‌বি। ওসব বড় বড় পণ্ডিতি কথা এখন থাক্। আজকের পণ্ডিত এই শরতের আকাশ, আজ্‌কের পুঁথি এই শরতের পৃথিবী, আজকে পড়তে হবে এরই শাস্ত্র, গাইতে হবে এরই গান। এরই মধ্য দিয়ে আনন্দ আজ আকার ধরে দেখা দেবে—আর সেই আনন্দেই ঈশ্বরকে দেখতে পারি।

১ম বালক। তাই নাকি?

দাদা। তা নয়তো কি?

১ম বালক। তবে আর পণ্ডিতের মানা শুন্‌ব না। এস ভাই গাই আর নাচি।

পিলুবারোঁয়া—একতালা।

কে শোনে আজ মানারে, ভাই
কে করে আজ মানা?
সকল বাঁধন কাটে যখন
আমোদ তখন একটানা।
প্রাণের মাঝে জাগ্‌ল পাগল—
ভুলেছে কি গণ্ডগোল;
বাইরে ঘরে কি কলরোল
কে রাখে কার ঠিকানা?
এর নাই পরিমাণ, নাইরে হিসাব
নাইকো কোনো সীমানা
কেবল নাচানাচি মাতামাতি
বিভোল করে প্রাণখানা।

(ক্রুদ্ধভাবে বিদ্যানিধির প্রবেশ)

বিদ্যানিধি। আঃ ভারী জ্বালাতন করলে! ভারী জ্বালাতন করলে! (একটু গম্ভীরভাবে বসে) দার্শনিক তত্ত্বালোচনা কর্‌বার যো নেই; টোলে ছাত্রদের অধ্যয়নের ব্যাঘাত! এ ব্যাটারা তো ভারী জ্বালাতন করলে। ওহে দাদাঠাকুর তুমিও একেবারে খেপ্‌লে নাকি?

দাদা। প্রণাম।

বালকগণ। প্রণাম।

বিদ্যা। আরে যাও! হ্যাঁ দ্যাখ দাদাঠাকুর, দিন নেই রাত নেই এই সব ছোটলোকের ছেলেগুলোকে নিয়ে মাতামাতি করছ কেন বল দিকিন্?

দাদা। ওরা যে আমায় হাসায়, নাচায়, কাঁদায়, মাতায়—আমি কি কর্‌ব?

বিদ্যা। তুমি একটা বুড়ো-পাগল। বুড়ো হয়েছ, এখন গম্ভীর হওয়া উচিত।

দাদা। গম্ভীর হতে পার্‌ব না। ও আমার ধাতে সয় না।

বিদ্যা। অত আমোদ টামোদ বুড়োদের জন্যে নয়।

দাদা। বুড়ো হয়েছি? বুড়ো আবার কি! আমি তো বুড়ো হই নি। তবে এসেছি এখানে অনেক দিন হ'ল বটে। তাতেই তো এ জায়গাটার সঙ্গে আরো বেশী পরিচয় হয়েছে। চেয়ে দেখুন এই শরৎ-প্রভাতের দিকে, কেমন তরল আনন্দে সে মেতে উঠেছে; সে তো কতবার এল কতবার গেল, কিন্তু যত বার আস্‌ছে তত বারই নতুন। ওতো পুরাণো হয় নি; ওতো বুড়ো হয়নি। ও যে কেবলি যেন বেশী নতুন হচ্ছে। এই

প্রভাতের আলো যে আজ প্রাণে আনন্দের দোলা দিয়ে ঢেউ খেলিয়ে স্রোত বহিয়ে যাচ্ছে। না—য়েতে যে পারি না।

বিদ্যা। কি বল্‌ছো তোমার মাথা আর মুণ্ডু। প্রভাতের আলোর কথা এল কিসে? প্রভাতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কি?

দাদা। সম্পর্ক নেই? খুব সম্পর্ক—ভারী সম্পর্ক। এই বিশ্বের সাথে যে আমাদের নাড়ীর বাঁধন! বলেন কি? এই আলো ছায়া হাসি গান ফুল সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নেই? এই প্রভাতে কুসুম ফুটছে, পাখী গাচ্ছে, রৌদ্র হাস্‌ছে। আর আমরা কেন ফুলের মত ফুটে উঠ্‌ব না? রৌদ্রের মত হেসে উঠ্‌ব না? পাখীর মত গেয়ে উঠ্‌ব না? আমরাও যে এই আয়গারই মানুষ।

বিদ্যা। দ্যাখ, এ পৃথিবীটা কিছু নয়। দর্শন শাস্ত্র বলেছে, এসব মায়া মিথ্যা; কেবল সেই মায়াতীত যিনি, তিনিই সার; এসব ছেড়ে, আমোদ টামোদ ত্যাগ করে গম্ভীর হয়ে বসে' ব্রহ্ম চিন্তা কর।

দাদা। মায়া—মিথ্যা? তবে এ দর্শনশাস্ত্র আমার জন্যে নয়। এ যদি মায়া হয় তবে আপনিও মায়া—মিথ্যা, আপনার দর্শনও মিথ্যা, আমিও মিথ্যা, সকলি মিথ্যা। না—এ মায়া নয়, এ মিথ্যা নয়। ঐ যে ফুল হাস্‌ছে—এ তাঁরি হাসি; ঐ যে পাখী গাচ্ছে, এ যে তাঁরি কণ্ঠস্বর; এই শ্যাম-রম্যা পৃথিবীর অজস্র সৌন্দর্য্য—এ যে তাঁরি অঙ্গলাবণ্য। আমি এই সকলের মধ্যে তাঁরে পেতে চাই। এই সারা জগতে ছড়ানো আনন্দই আমার তিনি। আমার সত্য, মিথ্যা, ভালো, মন্দ, সুখ, দুঃখ, পাপ, পুণ্য সকল নিয়েই যে তিনি! তাঁকে ছেড়ে কোথায় যাবো? এ যদি মায়া হয় তো হো'ক মায়া, আমি এই মায়া নিয়েই থাক্‌ব। আমি এই প্রভাতের আলোতে প্রাণ হাসাব; এই শিশিরে প্রাণ ভেজাব; এই তরল আনন্দ পান কর্‌ব। গম্ভীর হয়ে একা বসে দুয়ার বন্ধ করে—এই আপন ঘরে প্রবাসী হয়ে—মালা জপা আমার মোটেই চলবে না। আমি সবাইকে নিয়ে হেসে খেলে বেড়াব।

বিদ্যা। নেচে মেতে বেড়াবে এই সব ছোটলোকের ছেলের পিলের সঙ্গে? কি আশ্চর্য্য! এরা সব কেউ নমঃশূদ্র, কেউ কৈবর্ত্ত, ওদের সঙ্গে মিশে এইরূপ মাতা-মাতি করছ! ছি ছি! ওদের স্পর্শ করলে যে অপবিত্র হ'তে হয়!

দাদা। ওরা ছোট বলেই তো ওদের সঙ্গে এত সহজে মিশতে পেরেছি। ওদের যে হিসাব নেই। আনন্দ যে ওদেরি ভিতরে বেশী সহজ হয়ে উঠছে। ওরা যখন মাঠে বাঁশী বাজায়, ধেনু চরায়, গুঞ্জা ফুলের মালা গেঁথে গলায় পরে, আনন্দ তখন আপনি এসে যে ওদের খোঁজ করে' নেয়।

বিদ্যা। দ্যাখ, তুমি লেখা পড়া শিখেছ, একটা জননায়ক হ'তে চলেছ।

দাদা। তাইতো কারেও ছাড়তে পারছিনে। আমি যে এই-ই শিখেছি কেবল সারা জীবন ভরে'। আমার সকল বিদ্যাই—এই সবার সাথে মিলে মিশে আমোদ করা।

বিদ্যা। এমন-ধারা করলে মানুষের কাছে হালকা হয়ে পড়বে। আর কেউ তোমাকে ভয় করবে না।

দাদা। ভয় করবে? সে কি! তার মানে কি? ভয় কেন? ভয়ের সঙ্গে আনন্দের যে বড় বিবাদ। ভয় করবে কেন? আমি এদের সঙ্গে নেচে গেয়ে বেড়াব—এর ফল যা হয় হবে।

বিদ্যা। তুমি ভুল বুঝেছ।

দাদা। এ যদি ভুল হয় তো আমি এই ভুল নিয়েই থাকব। এর চেয়ে কোনো সত্য আমি চাই নে।

ব্যস্তভাবে সেবাব্রতের প্রবেশ।

সেবা। গুরুদেব!

দাদা। চুপ্, বল্ দাদাঠাকুর। ভারী একটা কথা শিখেছেন "গুরুদেব"! ও সব উঁচু কথা রেখে দে—বল্ দাদাঠাকুর।

সেবা। আপনি যে গুরুর গুরু।

দাদা। আবার! মার খাবি। দাঁড়া আগে তোরে—(চপেটাঘাত করিলেন)।

(সেবাব্রত হাস্যমুখে দাদাঠাকুরের পদধূলি গ্রহণ করিলেন। দাদাঠাকুর তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন)

হ্যাঁ দ্যাখ, গুরু ভাবিস্ যা ভাবিস্—ভাববি, আমার কাছে বলিস্‌নে। আর গুরু টুরু ব'ল্লেই যেন কেমন আর একটা ভাব আসে, তাতে দাদাঠাকুরের মজা থাকে না। গুরু বল্লেই মনে হয়,—গম্ভীর মুখ, গেরুয়া পরা, লম্বা দাড়ী, ফোঁটা তিলক-কাটা, মাথায় টিকি, পায়ে খড়ম, একেবারে সার্ব্বভৌম ঠাকুর। আমি পাগলা মানুষ, অত শত হতে পারব না। আমি দাদাঠাকুর। আমার তাই ভাল।

সেবা। আচ্ছা এখন থেকে তাই ই-বল্‌ব। একটা খবর আছে।

দাদা। কি খবর?

সেবা। হরিচরণ মণ্ডলের ছেলের কলেরা হয়েছে।

দাদা। অ্যাঁ—তাই নাকি? ওরে চল্, আমরা সবাই মিলে সেখানে যাই।

সকলে। চলুন।

দাদা। ভট্‌চাজ্ মশাই, আপনিও চলুন।

বিদ্যা। কোথায়?

দাদা। হরিচরণের বাড়ী।

বিদ্যা। কেন?

দাদা। ছেলেটির শুশ্রূষা কর্ত্তে। আহা ওরা বড় গরীব।

বিদ্যা। তা আমি কি কর্‌ব?

দাদা। আপনিও শুশ্রূষা কর্‌বেন। আপনি সঙ্গে থাক্‌লে একটু বল হবে।

বিদ্যা। রাম, রাম, রাম, মহাভারত, মহাভারত! তুমি বল কি! ব্রাহ্মণ হয়ে' এখন চণ্ডালের সেবা করব? তুমি কি উন্মত্ত নাকি? ও জানিই তো; কলিতে ধর্ম্ম নাই,—ধর্ম্ম নাই। যত সব ম্লেচ্ছাচারী জুটে একেবারে ধর্ম্ম কর্ম্ম সব রসাতলে দিলে! পৃথিবী যাবে; বুঝেছি—পৃথিবী যাবে। চা'রপো পাপ পরিপূর্ণ হয়েছে। এইবার পৃথিবী যাবে।

দাদা। সেবা কি ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম নয়? সেবা কি ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্যের বাইরে? যে সেবা—রোগে জননী, দুঃখে সান্ত্বনা! সেবা—যা ত্রিদিবের মন্দাকিনী ধারার ন্যায়, দিব্য আলোকের ন্যায়, বিধাতার আশীর্ব্বাদের ন্যায়, মানবের বহুভাগ্যফলে ধরায় নেমে এসেছে, সে সেবার অধিকারী হয়ে মানুষ আপনাকে কৃতার্থ মনে কর্‌বে না? কৃতজ্ঞ অন্তরে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিবে না? দয়া সেবা যে নীচ পরিত্যক্ত ব্যক্তির জন্যই প্রায় হয়েছে। সেবার ধর্ম্ম যে জলের মত, সে নিম্নদিকেই ধাবিত হবে।

বিদ্যা। সেবা ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম নয়। সেবা শূদ্রের ধর্ম্ম—জান তো গুণানুসারে বর্ণ বিভাগ হয়েছে?

দাদা। হা অদৃষ্ট! তার অর্থ কি এই? সেবা মানবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি, যদি গুণ অনুসারে বর্ণ-বিভাগ হয়ে' থাকে; ব্রাহ্মণের যদি উচ্চ প্রবৃত্তি থাকে, তাঁর যদি উচ্চ অধিকার থাকে, তাহ'লে সেবা ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম না হয়ে আর কার ধর্ম্ম হবে?

বিদ্যা। চণ্ডাল সেবালাভের অধিকারী নয়। সেবা যদি ব্রাহ্মণের হয়, তো সে সেবা লাভের যোগ্য দেবতারা। ব্রাহ্মণ কেন নীচ জাতির সেবা কর্‌বে?

দাদা। সেবা লাভের, সেবা প্রাপ্তির অধিকারী কি কেবল উচ্চ জাতিমাত্র? পুণ্যতোয়া ভাগীরথী যদি কেবল হিমাচলের উচ্চ শৃঙ্গেই থাক্‌ত তবে কি তার অমৃত-ধারায় এই শ্যামা বসুন্ধরা শীতল হোত? সে যে নীচে নেমে এসে তবে বিশ্বকে প্লাবিত পুণ্যপূত করেছে। সে ভাল মন্দ, পবিত্রাপবিত্র স্থাননির্ব্বিশেষে ধুয়ে দিয়ে যাচ্ছে। সে তো কোনো বিচার করে না, কেবল অশ্রান্ত পুণ্য স্রোতে ধরিত্রীকে স্নেহসিক্ত করে দিয়ে যায়।

বিদ্যা। দাদাঠাকুর, তুমি পণ্ডিত, তুমি উচ্চ বংশোদ্ভব তা সত্য, কিন্তু তুমি ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা কি বোঝ? তুমি কায়স্থ। ব্রাহ্মণ অবশ্যই অন্যান্য জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; না হলে' তুমি ব্রাহ্মণ আমি কায়স্থ এ প্রভেদ কেন হোল?

দাদা। ব্রাহ্মণ! ক্ষমা করুন; তবে আজ কিছু বল্‌ব; আমি না বলে থাকতে পারছিনে। হাঁ, অবশ্যই ব্রাহ্মণ উচ্চ কেন, তার একটা কারণ আছে—একথা কারো সাধ্য নাই যে অস্বীকার করে। কিন্তু ব্রাহ্মণের উচ্চতার কারণ কি এই নয় যে তাঁর শিক্ষা, ধর্ম্ম, পরোপকারই তাঁকে শ্রেষ্ঠ করেছে?

ব্রাহ্মণ তাঁকেই বলে, যাঁর সমস্ত চিন্তা ভগবচ্চরণে, যাঁর সমস্ত সাধনা বিশ্বের কল্যাণের দিকে। সংসারে জাতি পূজ্য নয়, গুণই পূজ্য। ব্রাহ্মণ! একবার মনে করুন সেইদিন, সেই মানবের ইতিহাসের স্মরণীয় বরণীয় মহাপুণ্যময় দিন—যেদিন এই ব্রাহ্মণজাতি সকল স্বার্থ সকল বিলাসলালসা ছেড়ে কেবল স্বেচ্ছা-বৃত দারিদ্র্য মাত্র সম্বল করে তপোবনবাসী হয়ে বিশ্বের কল্যাণ কামনায় দেহপাত কর্ত্তেন। তখন তাঁর—এই ব্রাহ্মণের পদতলে গর্ব্বোদ্ধত রাজমুকুটশোভিত শির বিলুণ্ঠিত হয়ে আপনাকে কৃতার্থ মনে করত। হায় সেদিন আর ব্রাহ্মণের নেই। একদিন ছিল যখন ব্রাহ্মণত্ব কেবল বংশগত অধিকার ছিল না। একদিন ছিল সমাজের, যখন ব্রাহ্মণগণ গুণানুসারে ভিন্নজাতির অন্ন গ্রহণ কর্ত্তেন, তাঁদের সঙ্গে বন্ধুতা কর্ত্তেন, তাঁদের অস্ত্র শিক্ষা দিতেন, আবার শিষ্যভাবে শাস্ত্রাধ্যয়ন কর্ত্তেন। ব্রাহ্মণ! একবার এ অন্ধ অভিমান, স্বার্থমুগ্ধ বিচার পরিত্যাগ করে একবার সেই অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করে দেখুন।

বিদ্যা। দাদাঠাকুর, তুমি যেন কতকটা ঠিক বলচ মনে হচ্চে। আচ্ছা আমি ভেবে দেখব। তবে কি জান, এতকাল ধরে যা মেনে চলেছি তার উপর কেমন একটা মায়া জন্মে গেছে; হঠাৎ ছাড়তে পারা যায় না। —না—না তোমার কথা শুনতে পারি না। এতে ব্রাহ্মণের মর্য্যাদাহানি হবে।

দাদা। ব্রাহ্মণ! প্রণাম; তবে থাকুন আপনার ব্রাহ্মণত্ব নিয়ে। চণ্ডালের সেবা করবেন না? চণ্ডালকে স্পর্শ করলে অধর্ম্ম হবে? কি আশ্চর্য্য! চণ্ডাল কি মানুষ নয়? তারও কি মানুষের প্রাণ নয়? তারও কি মানুষের মত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নয়? সেই জগৎপ্রাণ কি তার প্রাণে নেই? ব্রাহ্মণ! সূর্য্য কি চণ্ডালের ঘরে কিরণ বিতরণ করেন না? বর্ষাধারা কি সর্ব্বস্থানকেই স্নেহসিক্ত করে না? ঈশ্বর! ঈশ্বর! আমি যেন জন্ম-জন্ম চণ্ডাল হয়ে জন্মগ্রহণ করি, তবু যেন হীন এরূপ স্বার্থদাস ব্রাহ্মণ না হই। চল ভাই চল, আমরা যাই, কর্ম্মময় জগৎ,

অনেক কাজ কর্ত্তে হবে। কার চোখের জল পড়বে, চল তার চোখের জল মুছিয়ে দিইগে। কে ক্ষুধায় অন্ন পাচ্ছে না, চল তাকে আহার্য্য দিইগে। কোন্ অভাগা অনুতাপের অনলে দগ্ধ হচ্চে চল তার বক্ষ শীতল করে দিইগে। ঐ যে অন্ধ, আতুর, অসহায়—আমাদের ঈশ্বর যে ওরাই। যদি ওদের মুখে এক গ্রাস অন্ন তুলে দিতে পারি, সেখানেই যে দেবতাকে নৈবেদ্য দেওয়া হল। ওদের সেবা কর্ত্তে পারলেই যে তাঁর সেবা হোল। চল ভাই সব, আমরা ধন্য, কৃতার্থ যে এমন সেবার অধিকার পেয়েছি।

সকলে। চলুন আমরা প্রস্তুত।

বেহাগ—একতালা।

সবার সাথে পড়লে বাঁধা
খুলবে তোমার এ বাঁধন।
আপনাকে ভাই বিলিয়ে দিলে
মিলবে তোমার সে আপন।
বড়ই বোঝা নিজের বোঝা
সে যে বোঝা যায় না বোঝা—
সবার বোঝাই নেয়া সোজা
বুঝলি নারে ওরে মন।
নেমে আয় সবার মাঝে
লেগে যা সবার কাজে;
চলে আয় সবার সাজে
সবার মাঝে নে আসন।

সকলে প্রস্থানোদ্যত—বিদ্যানিধি বাধা দিলেন।

বিদ্যা। দাঁড়াও দাদাঠাকুর, একটু দাঁড়াও। আমিও মানুষ, যতই বলি আমিও মানুষ, আমারও মানুষের প্রাণ।—দাদাঠাকুর, কে তুমি? কে তুমি? তুমি মানুষ নও,—কে তুমি? তোমার প্রতি বাক্যে আমার প্রাণে নবীন প্রেরণা, নব-জীবনের হিল্লোল মর্ম্মরিত হয়ে উঠ্চে। কে বলে আমি ব্রাহ্মণ, তুমি কায়স্থ। না না তুমিই ব্রাহ্মণ, আমিই শূদ্র। দাদাঠাকুর, আজ যদি তোমার চরণে এ মস্তক লুণ্ঠিত হয়, সেটা বেশি কিছুই করা হবে না। হায় অন্ধ সমাজ! দাদাঠাকুর, আবার বলি—কে তুমি? তোমার বাক্যে মেঘের গর্জ্জন, চক্ষে সূর্য্যের দীপ্তি, বক্ষে বজ্রের দৃঢ়তা, অঙ্গ সঞ্চালনে ঝটিকা—কে তুমি? এর পূর্ব্ব ক্ষণে তোমায় কি ভাবে দেখেছি—দেখেছি এক হাস্যোজ্জ্বল আনন্দময় মূর্ত্তি; এখন আবার একি দেখ্‌ছি—যেন প্রখর প্রদীপ্ত মহিমাময় মূর্ত্তি! দাদাঠাকুর নিয়ে চল, আমি অন্ধ, আমার হাত ধরে নিয়ে চল। হে মহাকর্ম্মী আমায় এ মহাকর্ম্মের অধিকারী কর। আমিও তোমার মত এ বিশ্বের কর্ম্মসাগরে ঝাঁপিয়ে পড়্‌ব। হে আনন্দময়, আমায় তুমি এমনি তোমার মত আনন্দে নাচাও মাতাও, কাঁদাও গলাও; আর আমার জাত্যভিমান নেই। আজ এ কি শুন্‌ছি,—কেউ তো এমন কথা কখনো শোনায় নি! আমার চক্ষে একটা নূতন জগৎ খুলে গেছে। এ আমায় কি শুনালে, কি দেখালে দাদাঠাকুর? মানুষ নও, দেবতা নও—কে তুমি? কে তুমি?

দাদা। আমি অধম, দীনাতিদীন, আপনার চরণের দাস দাদাঠাকুর। গাও সেবকগণ, তাঁর নাম কর; ধন্য তাঁর লীলা, আজ বড় মধুর মুহূর্ত্ত। আজ ব্রাহ্মণ! আপনাকে পেয়েছি। আপনি অগ্রবর্ত্তী হোন্, আমরা আপনার পিছনে যাবো। আমি পাগল, আমি অজ্ঞান, আমি অধম; ব্রাহ্মণ! আমায় আশীর্ব্বাদ করুন। আজ বড় আনন্দ। কে বলে ব্রাহ্মণসমাজ পতিত? বিশ্বসমাজ! আশ্বস্ত হও। অবোর সেই মহামুহূর্ত্ত আস্‌বে। কি আনন্দ আজ—আবার ব্রাহ্মণ অগ্রবর্ত্তী হয়ে শূদ্রের হাত ধরে, মানবসমাজের মহামিলনের মন্দিরাভিমুখে চলেছে! ওরে তোরা ডঙ্কা বাজা, নিশান উড়া, পুষ্প বৃষ্টি কর্। আবার সকল জাতি মিলে এক মহা মানবসঙ্ঘ সংগঠিত হবে। সব ভেদ বিবাদ দ্বিধা দ্বন্দ্ব দূর হবে। বিশ্ব অমৃতময় হবে। ওই শোন্ ধর্ম্মের বিষাণ বেজে উঠেছে। দেবতা জাগ্রত হয়েছেন। একি আলো! কি আনন্দ! কি অমৃতপ্লাবন। ব্রাহ্মণ! আমায় পদধূলি দিন্।

বিদ্যা। একি! একি! কর কি! কর কি! এস ভাই তোমার বক্ষে বক্ষ মিলিয়ে ধন্য হই। গাও ভাই, তোমরা একবার তাঁর নাম গান কর, আমিও তোমাদের সঙ্গে একবার গেয়ে ধন্য হই। তার পর চল, সবাই মিলে কর্ম্মসাগরে ঝাঁপিয়ে পড়িগে। দাদাঠাকুর, এস, ভাই, এস একবার আমায় আলিঙ্গন দাও।

উভয়ের আলিঙ্গনও সকলের নৃত্য গীত।

পিলু বাঁরোয়া—তাল একতালা।

আপনি ঠাকুর বাঁধা যে তাঁর জগতের কাজে
আমরা হেথায় রব বসে' তাও কি রে সাজে?
ঘরে বসে' জপলে মালা হয় না পূজা তাঁর।
ছোট বড় সবাই আসুক খুলে দাও দুয়ার।
সবার সনে আসবে সে জন—পাবে সকলের মাঝে।
প্রাণসাগরে পড় ঝাঁপায়ে পাবি শত প্রাণ
আসল চেয়ে অংশ বাড়ে যতই কর দান।
কেউ আসেনি আপন লয়ে' ঘুরতে আপনার মাঝে
কারেও যদি দাও তাড়ায়ে, তাড়ারে তাঁরে;
আস্‌তে দিলেই আনা হবে সেই দেবতারে;
হাস্‌লে ধরা হাসেন তিনি, ব্যথা দিলে তাঁরে বাজে।

সকলের প্রস্থান।

প্রথম দৃশ্য সমাপ্ত।

আদিব্রাহ্মসমাজের ত্রৈবার্ষিক কার্য্য বিবরণ।

(১৮৩৭-৩৯ শকের পৌষ পর্য্যন্ত)

১৮৩৪ শকের শেষভাগে দেখা গেল যে আদিব্রাহ্মসমাজের দেনা ন্যূনাধিক ১০০০৲ টাকা দাঁড়াইয়াছে এবং অগত্যা তাহার কার্য্যে নানাবিধ বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছে—উন্নতিসাধন তো দূরের কথা। সেই কারণে সভাপতি মহাশয়দিগের উপদেশ অনুসারে অধ্যক্ষসভা ঐ বৎসরে ৩ রা ফাল্গুনের অধিবেশনে আদিব্রাহ্মসমাজের কার্য্য শৃঙ্খলার মধ্যে আনয়ন করিয়া তাহার উন্নতিসাধনের জন্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সম্পাদকপদে নির্ব্বাচিত করিলেন। ইহা যথারীতি ট্রষ্টীগণের অনুমোদিত হইল।

১৮৩৫ শকের প্রথম অবধি ক্ষিতীন্দ্র বাবু তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সহিত সহযোগে সমাজের কার্য্য ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। সে সময়ে ক্ষিতীন্দ্র বাবু অন্য কার্য্যে বিশেষভাবে ব্যাপৃত থাকায় সমাজের কার্য্যে যথোপযুক্ত মনোযোগ প্রদান করিতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি এই বৎসরের আয়-ব্যয়ের একটী আনুমানিক হিসাব প্রস্তুত করিয়া সমাজের আর্থিক হিসাবে যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। এই হিসাব ঐ বৎসরের ২৫ শে শ্রাবণ অধ্যক্ষসভায় আলোচিত হইয়া অনুমোদিত হইয়াছিল। "আদি ব্রাহ্মসমাজের ১৩২০ সালের আনুমানিক আয়ব্যয়ের হিসাব নূতন আকারে প্রস্তুত করিয়া আলোচনার সুবিধা করিবার কারণে" সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রস্তাবে সর্ব্বসম্মতিক্রমে অধ্যক্ষসভা ক্ষিতীন্দ্র বাবুকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি এই আনুমানিক হিসাব অতি কষ্টে সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন। ক্ষিতীন্দ্র বাবুর প্রদর্শিত পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া প্রতি বৎসর আয়-ব্যয় প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে।

১৮৩৬ শকের অধিকাংশ সময় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সুদীর্ঘকাল প্রবাসে কাটাইতে মনস্থ করিয়া ঐ বৎসরের শেষভাগে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদন কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সহকারী শ্রীযুক্ত অজিতচন্দ্র চক্রবর্ত্তীও এই বৎসরের চৈত্রমাস পর্য্যন্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা চালাইয়াছিলেন এবং তিনিও সময়াভাব বশত পত্রিকার সম্পাদন ভার পরিত্যাগ করিলেন।

১৮৩৭ শকের প্রথম অবধি শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপর পত্রিকার সম্পাদনভার ন্যস্ত হইল।

এই বৎসরে বগুড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দাসগুপ্ত কয়েক মাসের জন্য কলিকাতায় অবস্থিতি করেন। তিনি বৃদ্ধ হইলেও আদিব্রাহ্মসমাজের মঙ্গলের জন্য তাঁহার উৎসাহ অদম্য ও অনুকরণীয়। তিনি ক্ষিতীন্দ্র বাবুকে একটী মণ্ডলী গঠনের জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন। ক্ষিতীন্দ্র বাবু প্রথমত মণ্ডলী গঠনের আবশ্যকতা বুঝাইয়া এবং কি প্রণালীতে আদিব্রাহ্মসমাজের অধীনে অসাম্প্রদায়িক একটী মণ্ডলী গঠিত হইতে পারে তাহা বিস্তৃতরূপে বুঝাইয়া দুইটী প্রবন্ধ যথাক্রমে এই বৎসরের মাঘ ও ফাল্গুন মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশ করেন। এই দুইটী প্রবন্ধে আদিব্রাহ্মসমাজের প্রাণের কথা ব্যক্ত হইয়াছে বলিলেও বলা যাইতে পারে। এই বৎসরের ১৫ই ফাল্গুনের অধ্যক্ষসভার অধিবেশনে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে উপরোক্ত প্রবন্ধদ্বয়ে ব্যক্ত মণ্ডলীসংগঠন প্রস্তাবনা বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়া সাধারণত গৃহীত হইয়াছিল। অধ্যক্ষসভা কর্ত্তৃক গৃহীত হইবার পূর্ব্বেই প্রবন্ধ দুইটী সভাপতি মহাশয়-গণের নিকট প্রেরিত ও তাঁহাদের কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছিল।

উক্ত মণ্ডলীপ্রস্তাবনার মর্ম্ম অনুসারে আদিব্রাহ্মসমাজের মণ্ডলীভুক্ত সভ্যগণের মধ্যে যাঁহারা অধ্যক্ষসভার সভ্য হইতে চাহেন, তাঁহাদের নাম জিজ্ঞাসা করিয়া নিম্নলিখিত পত্রখানি প্রচারিত হইয়াছিল :—

সবিনয় নমস্কার,—

ইহা অত্যন্ত আনন্দের কথা যে বর্ত্তমানে সমগ্র ভারত-বর্ষে ধর্ম্মবিষয়ক একটা বৃহৎ জাগরণের ভাব আসিয়াছে। ইহাও আপনার অবিদিত নাই যে আদিব্রাহ্মসমাজ হইতেই অনেক বৎসর পূর্ব্বে এই জাগরণের মূল প্রোথিত হইয়াছিল। আজ এই জাগরণের সময়ে আদিব্রাহ্মসমাজের নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলে চলিবে না। আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস যে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের উদারতম ট্রষ্টডীড এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ-দৃষ্ট উদারতম ব্রাহ্মধর্ম্ম-বীজ যাহার দুইটি মূল ভিত্তি, সেই আদিব্রাহ্মসমাজই এই দেশব্যাপী জাগ্রত ধর্ম্মভাবকে প্রকৃতপথে পরিচালিত করিতে পারিবে। আদিসমাজের কার্য্য করিবার এমন শুভ অবসর অবহেলায় হারাইলে চলিবে না। দেশে দেশে নগরে নগরে ইহার সত্য প্রচার করিয়া জনসাধারণকে ইহার পতাকার নিম্নে সমবেত করিতে হইবে। কিন্তু একথা আপনাকে বলিয়া দিতে হইবে না যে আদি-সমাজের কর্ম্মক্ষেত্র এ ভাবে বিস্তৃত করিতে গেলে একটী মণ্ডলী অত্যাবশ্যক। আপনি ব্রাহ্মসমাজের একজন হিতৈষী বন্ধু। আপনাকে উক্ত প্রস্তাবিত মণ্ডলীর সভ্য-

ভুক্ত করিয়া লইলাম। এই সঙ্গে আদিসমাজের মণ্ডলী সংগঠনের একটি প্রস্তাবনাও আপনার নিকট প্রেরিত হইল। তাহা হইতেই আপনি এ বিষয়ে আমাদিগের মূল বক্তব্য অবগত হইতে পারিবেন। পুনশ্চ, ষ্ট্যাম্পযুক্ত একখানি পোষ্টকার্ড পাঠান যাইতেছে, তাহাতে আপনি আগামী বৎসরের জন্য আদিব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার (কার্য্য নির্ব্বাহক সভা) সভ্য হইয়া উহার কল্যাণসাধনে ব্রতী হইতে ইচ্ছুক কিনা পত্রোত্তরে জানাইলে বাধিত হইব।

নিবেদক

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদক
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রীআশুতোষ চৌধুরী
সভাপতি।

প্রায় পঁয়ত্রিশখানি উত্তর পাওয়া গিয়াছিল, তন্মধ্যে তিন চার খানি ব্যতীত অন্য সকলগুলিই সম্মতিজ্ঞাপক ছিল। এই বৎসরের চৈত্র মাসে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ আদিসমাজের কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন:—সভাপতি—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাননীয় জষ্টিস সার আশুতোষ চৌধুরী। সম্পাদক—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি-এ, তত্ত্বনিধি। সহকারী সম্পাদক—শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় বি-এ, বি-এল। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি-এ, তত্ত্বনিধি। অধ্যক্ষ—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (স্বপদে বা ex-officio), মাননীয় জষ্টিস সার আশুতোষ চৌধুরী (স্বপদে), শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর (স্বপদে), শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় (স্বপদে), শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীসিদ্ধিনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকেদারনাথ দাসগুপ্ত, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীনরেন্দ্রনাথ ঘোষ, ডাক্তার শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল গুপ্ত, শ্রীবীরেশ্বর মজুমদার, শ্রীগোবিনলাল দাস, শ্রীআশুতোষ রায়, শ্রীপাঁচুগোপাল মল্লিক, শ্রীশিতিকণ্ঠ মল্লিক, শ্রীশরৎচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীশশধর সেন, শ্রীনীলকান্ত মুখোপাধ্যায়, শ্রীকালীপ্রসন্ন বিশ্বাস, শ্রীরাজকুমার সেন, শ্রীগৌরীনাথ চক্রবর্ত্তী কাব্যরত্ন শাস্ত্রী, মিঃ এস, পি, মিত্র। হিসাব পরীক্ষক—শ্রীসিদ্ধিনাথ চট্টোপাধ্যায়। ট্রষ্টী—শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীদ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ইহাদের অনেকেই কোন না কোন প্রকারে আদিব্রাহ্মসমাজকে সাহায্য করিয়া সমাজের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। যাঁহারা কোন প্রকার সাহায্য করিবার অবসর প্রাপ্ত হয়েন নাই, তাঁহাদিগের প্রতি আমাদের বক্তব্য এই যে, তাঁহাদের আদিব্রাহ্মসমাজকে সাহায্যপ্রদানের অবসর করিয়া লওয়া উচিত। তাঁহাদের যেন ইহা স্মরণ থাকে, তাঁহারা আজ ধর্ম্ম বিষয়ে এবং সামাজিক বিষয়ে স্বাধীনভাবে যে মতামত প্রকাশ করিয়া এবং কার্য্য করিয়া সমাজে নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছেন, ইহার মূল ব্রাহ্মধর্ম্ম এবং আদিব্রাহ্মসমাজ। তাঁহারা অন্য কোন উপায়েও যদি না পারেন, অন্তত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার গ্রাহক হইয়াও সাহায্য করিতে পারেন।

স্বদেশবাসীগণ প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে আদিসমাজ হইতে যে উপকার লাভ করিতেছেন, তজ্জন্য তাঁহাদের কোন না কোন প্রকারে আদিসমাজকে সাহায্য করা কর্ত্তব্য। অন্যান্য অনেক মাসিক পত্র প্রভৃতি থাকিলেও আদিব্রাহ্মসমাজের প্রত্যেক হিতৈষীর সর্ব্বাগ্রে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার গ্রাহক হওয়া কর্ত্তব্য। যদি তাহার প্রবন্ধ বা তৎসক্রান্ত কোন কিছু তাঁহাদের অমনোনীত হয়, তবে তাহার সংশোধন করা তো তাঁহাদের হস্তে—সে বিষয়ে জানাইলেই তো তাহার সংশোধনের চেষ্টা হইতে পারে।

আদিব্রাহ্মসমাজের ট্রষ্টডীড অনুসারে প্রতি সপ্তাহে একবার করিয়া (প্রতি বুধবার) উপাসনা কার্য্য নিয়মিত ভাবে নির্ব্বাহ করা হইয়াছে। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় শারীরিক অসুস্থতার কারণে দুএক দিন ব্যতীত প্রতি বুধবারই বেদী গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রতি বৎসর প্রায় সাত আট মাস ধরিয়া মাসে অন্তত একবার করিয়া চিন্তামণি বাবুর সহিত ক্ষিতীন্দ্র বাবুও বেদী গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাঁদের মধ্যে কেহ যে দিন বিশেষ ভাবে কোন বিষয়ের উপদেশ করিয়াছেন, তাহার পূর্ব্বে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রভৃতি দ্বারা জনসাধারণকে এবং পত্র দ্বারা মণ্ডলীভুক্ত সভ্যগণকে বিশেষভাবে আহ্বান করা হইয়াছে। চিন্তামণি বাবুর মত অক্লান্তকর্ম্মা ব্রাহ্মসমাজসেবক পাওয়া দুর্ঘট। তিনি পারিশ্রমিক বিনা আদিসমাজের উন্নতিকল্পে যেরূপ পরিশ্রম করেন, তাহাতে তিনি আদিসমাজের সমগ্র মণ্ডলীর কৃতজ্ঞতাভাজন নিঃসন্দেহ। বিশেষ বিশেষ দিনে প্রদত্ত উপদেশগুলি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়া থাকে।

অধ্যক্ষসভা যে কয়জন আদিসমাজের হিতৈষী ব্যক্তিকে আচার্য্য পদে বরিত করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেই যদি উৎসাহ পূর্ব্বক আচার্য্যের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন, তাহা হইলে সমাজের বিশেষ উপকার হইত।

আচার্য্যের কার্য্যের জন্য চিন্তামণি বাবু কোন বেতন গ্রহণ করেন না, তাঁহাকে পাথেয় স্বরূপে সামান্য কিছু দেওয়া হয় মাত্র। কিন্তু আমাদের বোধ হয় যে একটী পণ্ডিতলোকের ভরণপোষণের উপযুক্ত কিছু পারিশ্রমিক,

আন্দাজ মাসিক ৫০৲ টাকা দিয়া সমাজের আচার্য্যের কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য রাখিলে ভাল হয়।

সমাজের সঙ্গীতের কার্য্য সুপ্রসিদ্ধ গায়ক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন। শারীরিক অসুস্থতার কারণে কয়েক বার তিনি অনুপস্থিত থাকিবার কালে তাঁহার কোন ছাত্র অথবা সমাজের পূর্ব্বতন গায়ক শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর মিশ্রের দ্বারা কাজ চালাইয়া লওয়া হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র চন্দ্র নামক এক ব্যক্তি হারমোনিয়ম বাজাইয়া থাকেন। তাঁহাকে পাথেয় স্বরূপে পাঁচ টাকা মাত্র দেওয়া হয়। তিনি ইতিপূর্ব্বে বহুকাল যাবৎ আদিসমাজের প্রতি অনুরাগের কারণে উপাসনার দিনে হারমোনিয়ম বিনা পরিশ্রমিকে বাজাইতেন।

গত বৎসর উপাসকদিগের সুবিধার জন্য প্রায় দুইশত টাকা ব্যয় করিয়া ইলেক্‌ট্রিক আলোর সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে। উপাসনা গৃহের দুইদিকে দুই সারি আলো দেওয়া গিয়াছে। ইলেক্‌ট্রিক পাখারও বন্দোবস্ত করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু যুদ্ধের কারণে নানা বিষয়ে ব্যয়বৃদ্ধি হওয়ায় তাহা কার্য্যে পরিণত করা হয় নাই।

মিউনিসিপাল ট্যাক্স হিসাবে সমাজকে বৎসরে দুইশত টাকার অধিক দিতে হয়। এই ট্যাক্স না দিতে হইলে সমাজের অনেক উপকার হয়। আগামী বৎসর এই বিষয়ে বিশেষভাবে চেষ্টা করিবার ইচ্ছা আছে।

যুদ্ধের জন্য কিরূপ ব্যয়বাহুল্য হইয়া পড়িয়াছে একটী দৃষ্টান্তের দ্বারা তাহা সুস্পষ্ট উপলব্ধ হইবে। সমাজের একটী পায়খানা ভগ্নাবস্থায় ছিল, তাহা নূতন করিয়া গড়া বিশেষ আবশ্যক হইয়াছিল। যুদ্ধের ঠিক প্রারম্ভ-ভাগে এই প্রস্তাব উঠিয়াছিল। কিন্তু ইঞ্জিনিয়র প্রথমে আন্দাজ দেড়শত টাকা মাত্র ব্যয়ের এষ্টিমেট করিয়াছিলেন। দেখিতে দেখিতে যুদ্ধের কারণে উপকরণ সমূহের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায়, তিনি যুদ্ধ শীঘ্র থামিয়া যাইবে আশা করিয়া কিছুকাল অপেক্ষা করিতে বলিলেন। পরে যখন দেখা গেল যে যুদ্ধ শীঘ্র থামিবে না এবং জিনিসপত্রের দাম আরো বাড়িতে চলিল, তখন ইঞ্জিনিয়র অগত্যা কার্য্য আরম্ভ করিতে পরামর্শ দিলেন। তখন আবার নূতন করিয়া বাজার-দরের উপর এষ্টিমেট করিয়া দেখা গেল যে ১৫০৲ টাকার স্থলে প্রায় ৩৫০৲ সাড়ে তিন শত টাকা লাগিবে। এই ৩৫০৲ টাকা ব্যয় করিয়াই পাইখানাটী নূতন করিয়া গড়িতে হইয়াছে।

সমাজবাটীর পশ্চিম দিকে যে সকল গৃহ ছিল,তাহাদের কতকগুলি এক এটর্ণি ক্রয় করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন। সেই অবসর গ্রহণ করিয়া সমাজের পশ্চিম দিকের দেওয়ালে প্রায় ১০০৲ টাকা ব্যয়ে বালির কাজ করানো হইয়াছে।

আদিসমাজ পূর্ব্বাপর বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজ এবং কালনা ব্রাহ্মসমাজে খাজানা দিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তথাকার সমাজে উপাসনা কার্য্য হয় না। ইহার প্রধান কারণ প্রচারকের অভাব। প্রচারক প্রস্তুত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। একটি সুযোগ্য প্রচারকের ভরণপোষণ হিসাবে আন্দাজ ৫০৲ টাকা করিয়া প্রতিমাসে লাগিতে পারে। ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকদ্বয় শ্রীযুক্ত সিতিকণ্ঠ মল্লিক এবং শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়। চিন্তামণি বাবু উহার উপাসনা কার্য্য সুশৃঙ্খলার সহিত নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন। সিতিকণ্ঠ বাবু ব্রাহ্মসমাজের প্রথমাবস্থায় স্থাপিত ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্র। তাঁহার উৎসাহ অদম্য। তাঁহাকে সম্পাদকরূপে লাভ ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের সৌভাগ্য। বেহালা ব্রাহ্ম-সমাজের কার্য্যও সুন্দরভাবে চলিতেছে। শ্রীমহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় অধিকাংশ দিন উপাসনার কার্য্য করিয়া চলেন। চিন্তামণি বাবুর ভ্রাতা ও পুত্রগণ ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ অনুরাগী ও নানা প্রকারে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে সাহায্য করেন।

প্রচারক রাখিবার জন্য থিয়লজিকাল কলেজ ফণ্ড হইতে ৬২৫৲ টাকা পাইবার কথা আছে। এই টাকার কোম্পানির কাগজের সুদ বর্ত্তমান দরে ধরিয়া আন্দাজ ২৫৲ টাকা বৎসরে পাওয়া যাইতে পারে। সমাজের টাকা হইতে ঋণ শোধ করিয়া ১০০০৲ টাকার কাগজ এবং ১০০৲ টাকার যুদ্ধঋণের কাগজ করা হইয়াছে, তাহা হইতে ৪০৲ টাকা সুদ হিসাবে পাওয়া যাইবে। যুদ্ধ থামিয়া গেলে মূলধন আরও শীঘ্র শীঘ্র সঞ্চিত হইতে পারিবে আশা করা যায়। আদিসমাজের প্রত্যেক হিতৈষী যদি বার্ষিক ১৲ এক টাকা মাত্রও সাহায্য করেন, তাহা হইলেও মাসে ৫০৲ টাকা আসা অতি সহজসাধ্য। গত তিন বৎসরে পূর্ব্ববর্ত্তীকালের ৯৮৮৲ টাকা ঋণ পরিশোধ করা হইয়াছে।

অনেকের একটি ভ্রান্ত ধারণা আছে যে আদিব্রাহ্ম-সমাজ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পরিবারের সম্পত্তি। তাহার যাহা কিছু ব্যয় তাহা তাঁহারাই বহন করেন। ইহা ঠিক নহে। অবশ্য মহর্ষির জীবিত অবস্থায় উহার যে কোন অভাব হইত, তাহা তিনি মোচন করিতেন। কিন্তু তাঁহার পরলোকগমনের পর তিনি যে মাসিক দুইশত টাকা দানের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, তদতিরিক্ত আর কিছুই স্থায়ী সাহায্য হিসাবে তাঁহার ষ্টেট হইতে পাওয়া যায় না। এই দুই শত টাকা হইতে বলিতে গেলে কষ্টেসৃষ্টে সমাজের প্রয়োজনীয় ব্যয়সমূহ নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। যদি সমাজের কার্য্য বিস্তৃত করিতে হয়, সমাজের বিশুদ্ধ মত সকল দেশবিদেশে ভালরকম প্রচার করিতে হয়, তবে অর্থের বিশেষ প্রয়োজন।

মহর্ষিদেবের পরলোকগমনের পর সমাজের কার্য্য পরিদর্শনের জন্য দুইজন লোক রাখা হইয়াছিল, বর্ত্তমানে একজন কর্ম্মচারীর দ্বারা কার্য্য চলিয়া যাইতেছে, কেবল তাঁহার অনুপস্থিতিকালে অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। বর্ত্তমান কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় হিসাব-পত্র সুচারুরূপে রাখিতেছেন সত্য, কিন্তু সমাজের যাহাতে অর্থাগম হইতে পারে সে বিষয়ে নিশ্চেষ্ট বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। যদি তিনি সেদিকে সমাজের বিশেষ উপকার করিতে পারেন, তবে তাঁহার বেতন বৃদ্ধি করিলেও লোকসান হইবে না।

আদি সমাজের জীবনরক্ষার অন্যতর উপায় যন্ত্রালয়। রাজা রামমোহন রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র ৺ রমাপ্রসাদ রায় সমাজকে উপকরণসহ একটী এবং ৺ কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় আর একটি মুদ্রাযন্ত্র প্রদান করিয়া বড়ই দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন নিঃসন্দেহ। যন্ত্রালয়ের উন্নতি সাধনের বিশেষ ইচ্ছা ছিল, কিন্তু যুদ্ধের কারণে সে বিষয়ে বিশেষ কিছু করিতে পারা যায় নাই। তবু, গত তিন বৎসরের মধ্যে প্রায় সাড়ে পাঁচশত টাকার অক্ষরাদি উপকরণ কেনা হইয়াছে। পায়খানা প্রভৃতির জন্য অল্পস্বল্প যাহা দেনা আছে, তাহা পরিশোধ হইলেই আমরা যন্ত্রালয়ের উন্নতি সাধনের বিশেষ চেষ্টা করিব। "জব-ওয়ার্ক" হইতেই প্রেসের বেশী লাভ হয়। সেই কাজের জন্য ছোট বড় মেসিন প্রেস দুএকটী চাই। যন্ত্রালয়কে আত্মপুষ্ট করিতে গেলে প্রায় দশহাজার টাকা লাগিবে। আপাতত তিন হাজার টাকা হইলেই চলিতে পারে। তারপর, সংস্কৃত ও ইংরাজী অক্ষরের সম্পূর্ণ সেট রাখা আবশ্যক। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে ঈশ্বরের কৃপায় কোন না কোন ধনী ব্যক্তি এবিষয়ে আমাদের সাহায্যদানে অগ্রসর হইবেন।

বর্ত্তমান যুগে কোন একটী সমাজ স্থাপিত হইলেই তাহার মুখপত্র স্বরূপে একটী সাময়িক পত্রও স্থাপিত করা চাই। আবার, সাময়িক পত্র চালাইতে গেলেই নিজের একটী যন্ত্রালয় থাকা আবশ্যক, নচেৎ ব্যয়বাহুল্যবশত সেই সাময়িক পত্রের দীর্ঘজীবন লাভ অসম্ভব। সুখের বিষয় যে আদিসমাজের নিজের যন্ত্রালয় আছে, কাজেই তাহার মুখপত্রের জন্য বিশেষ ব্যয়বাহুল্য হয় না। আদিসমাজের মুখপত্র সেই সুপ্রসিদ্ধ মাসিকপত্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা আজ ৭৫ বৎসর চলিতেছে। প্রথম বারো বৎসর সুবিখ্যাত অক্ষয়কুমার দত্ত ইহার সম্পাদক ছিলেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাই বলিতে গেলে সুমার্জ্জিত বঙ্গভাষার সৃষ্টি করিয়া বঙ্গদেশে তাহা সুপ্রচলিত করিবার ব্যবস্থা করে। যে চারুপাঠ তিন ভাগ পড়িয়া সেই সময় অবধি আজ পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র বঙ্গসন্তান নিজের মাতৃভাষায় সুপণ্ডিত হইতে পারিয়াছেন, সেই চারুপাঠে লিখিত বিষয়গুলি সর্ব্বপ্রথম প্রবন্ধাকারে তত্ত্ববোধিনীরই অঙ্গ ভূষিত করিয়াছিল। পরে কয়েক বৎসর প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর ইহার সম্পাদন কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন সেই সময়েই মহাভারতের অনুবাদ ইহাতে প্রকাশিত হইতে থাকিয়া শাস্ত্রপ্রকাশের সূত্রপাত করিয়া দিয়াছিল। তিনি সম্পাদকত্ব পরিত্যাগ করিলে পর, শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের হস্তে ইহার সম্পাদন ভার ন্যস্ত হয়। সেই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ আচার্য্য কালীবর বেদান্তবাগীশ, চন্দ্রশেখর বসু, হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রভৃতি মনীষীগণ শাস্ত্রমাহাত্ম্যমূলক নানাবিধ প্রবন্ধ এবং সেকালের সুপ্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিৎ সীতানাথ বসু মহাশয়ের তড়িৎ বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধসকল পত্রিকাকে সর্ব্বজনমান্য করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার পরে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহার সম্পাদনভার গ্রহণ করিয়া ইহাকে দর্শনপ্রধান করিয়া তুলিয়াছিলেন। সেই সময়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের কথা ইহাতে এত অধিক পরিমাণে থাকিত যে, সেই সময় অবধি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা দর্শনপ্রধান বলিয়া খ্যাতি লাভ করিল। আজ পর্য্যন্ত পত্রিকার সেই খ্যাতি অবিচলিত রহিয়াছে। দ্বিজেন্দ্র বাবুর পত্রিকা সম্পাদন কালে পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন বহুকাল যাবৎ পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার পরে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কয়েক বৎসর ধরিয়া পত্রিকা সম্পাদন করিবার কালে নানাবিষয়ক প্রবন্ধের দ্বারা তাহার কলেবর পূর্ণ করিলেও পত্রিকার দর্শনপ্রধান খ্যাতি বিলুপ্ত হয় নাই। সেই দর্শনপ্রধান খ্যাতির ফলে আর্থিক হিসাবে পত্রিকার কিছু ক্ষতি হইয়াছে স্বীকার করিতে হইবে। পত্রিকার নাম শুনিলেই তাহা দর্শনপ্রধান বলিয়া অনেকে তাহার গ্রাহক হইতে অস্বীকার করেন।

রবীন্দ্র বাবুর আমেরিকায় সুদীর্ঘ প্রবাসের ইচ্ছা থাকায় তিনি পত্রিকার সম্পাদনকার্য্য পরিত্যাগ করায় ১৮৩৭ শক অবধি শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর পত্রিকার ভার গ্রহণ করিলেন। আহ্লাদের সহিত জানাইতেছি যে গত তিন বৎসরে গ্রাহক সংখ্যা ৬০এর উপর বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ক্রমশই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। সুখের বিষয় যে উহার মূল্যও (বকেয়া ও হাল) পূর্ব্বাপেক্ষা নিয়মিত রূপে আদায় হইতেছে। যাঁহারা মূল্য প্রদান পূর্ব্বক পত্রিকার জীবন রক্ষা করিতেছেন, এই অবসরে তাঁহাদিগের প্রতি আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

১৮৩৭ শক অবধিই পত্রিকার উন্নতি সাধনের জন্য আমরা বিশেষ ভাবেই চেষ্টা করিতেছি এবং আমাদের বিশ্বাস যে আমরা সে বিষয়ে অনেকটা কৃতকার্য্যও হই-

য়াছি। ইহাতে জ্যোতিষ প্রভৃতি অনেক প্রবন্ধ সচিত্র হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত, ব্রাহ্মসমাজের প্রথম অবধি যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের নেতৃত্ব অথবা আদি-ব্রাহ্মসমাজের বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের চিত্র দিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু যুদ্ধের কারণে সে ইচ্ছা সফল হইতে পারে নাই, কেবলমাত্র রামমোহন রায়ের বিভিন্ন অবস্থার চিত্র কয়েকখানি প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহাতে ব্রাহ্মসমাজের নিরপেক্ষ ইতিহাস ধারাবাহিক-রূপে প্রকাশ হইতেছে। ব্রাহ্মসমাজের সামাজিক অবস্থা ও তাহার উন্নতিসাধন সম্বন্ধেও নিরপেক্ষ আলোচনা হইয়া থাকে। ডাক্তার শ্রীযুক্ত বনওয়ারি লাল চৌধুরী বৈজ্ঞানিক একটী নূতন তত্ত্ব "মেণ্ডেলতত্ত্ব" সম্বন্ধে ধারাবাহিক প্রবন্ধ অতি সরল ভাষায় লিখিতেছিলেন। তাঁহার শরীর অসুস্থ থাকার কারণে কয়েক মাস এবিষয়ে কোন প্রবন্ধ দিতে পারেন নাই, পুনরায় দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ৺হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রসায়ন বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় অপ্রকাশিত প্রবন্ধ সকল নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইতেছে। শ্রীগিরীশ-চন্দ্র বেদান্ততীর্থ তত্ত্বসমূহের তত্ত্বসকল ক্রমশ প্রকাশ করি-তেছেন। শ্রীরামচন্দ্র শাস্ত্রী বৈয়াসিক ন্যায়মালা নামক একখানি সুপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মসূত্রমূলক বেদান্তগ্রন্থ সরল ভাষায় ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য্য সহ সানুবাদ প্রকাশ করিতেছেন। স্বরলিপি বিষয়ে জ্যোতিরিন্দ্র বাবু এবং শ্রীমোহিনী সেন গুপ্তা আমাদের বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত গীতারহস্য এবং রাণাডেপত্নী লিখিত সুপ্রসিদ্ধ রাণাডে মহোদয়ের জীবনচরিত শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদিত হইয়া ধারা-বাহিকরূপে প্রকাশিত হইতেছে।

অনেকগুলি সংবাদ পত্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্বন্ধীয় বিজ্ঞাপন সাদরে বিনা মূল্যে প্রকাশ করিতে সম্মতি জানাইয়াছেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহাদিগকে অন্তরের সহিত কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ প্রকাশ জানাইতেছি।

আদিব্রাহ্মসমাজের সংশ্লিষ্ট একটী বিক্রেয় পুস্তকালয় আছে। তাহা হইতে আদিসমাজ হইতে প্রকাশিত ধর্ম্ম প্রভৃতি বিষয় সংক্রান্ত পুস্তক সমূহ সাধারণত বিক্রয় হইয়া থাকে। এই পুস্তকালয়ের সহিত একটী গচ্ছিত পুস্তক বিক্রয়েরও বিভাগ ছিল। কিন্তু ১৮৩৭ শকের পূর্ব্বেই গচ্ছিত পুস্তকের বিভাগ একপ্রকার উঠিয়া গিয়াছিল বলিলেই চলে। সেই বিভাগকে পুনরুজ্জীবিত করা হইয়াছে। গচ্ছিত পুস্তক বিক্রয়ার্থে রাখা জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার অন্যতর উপায় এবং সেই কারণে প্রত্যেক সমাজেরই ইহা একপ্রকার অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ বলা যাইতে পারে।

এইবারে আমাদের অভাব ও অভিযোগ সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিয়া এই বিবরণের উপসংহার করিব।

আদিব্রাহ্মসমাজের কোন কোন হিতৈষী ব্যক্তির মত এই যে আদিব্রাহ্মসমাজকে শক্তিশালী করিতে ইচ্ছা করিলে যেখানে ছাত্রমণ্ডলীর অধিক পরিমাণে অবস্থিতি, এমন কোন কেন্দ্রে সরাইয়া লওয়া কর্ত্তব্য। কথাটীর মধ্যে যথেষ্ট সত্য আছে, কিন্তু ঐ রূপ কোন কেন্দ্রে নূতন একটী ভাল রকমের বাটী নির্ম্মাণ করিতে গেলে অন্যূন পঞ্চাশ হাজার টাকা আবশ্যক। অবশ্য সমাজের সভ্যগণ সমবেত ভাবে চেষ্টা করিলে যে তাহা অসম্ভব তাহা আমাদের মনে হয় না।

আদিসমাজের অভাব ও অভিযোগের শেষ পাওয়া যায় না। সমাজের তত্ত্বাবধানে একটী ভদ্রলোকের নিবাসস্থান করিতে পারিলে সকল দিকেই বিশেষ সুবিধা হয়। সমাজের অধীনে এমন একটী সাধারণ স্থান থাকা আবশ্যক, যেখানে দরিদ্র ব্রাহ্মগণ সহজে একেশ্বরবাদ-সম্মত অনুষ্ঠান সকল সম্পন্ন করিতে পারেন।

অনুষ্ঠানের কথা বলাতেই পুরোহিতের কথা মনে পড়ে। সমাজের অধীনে এমন একজন সুপণ্ডিত পুরোহিত থাকা আবশ্যক, যাঁহাকে প্রয়োজনমত দেশ বিদেশে পাঠানো যাইতে পারে। বর্ত্তমানে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পারিবারিক পুরোহিতকেই প্রয়োজনমত বিদেশে পাঠানো হইয়া থাকে।

আদিব্রাহ্মসমাজের বাটী সুবিধামত স্থানে না থাকিলেও আমরা প্রত্যেক ব্রাহ্মবন্ধুকে সাপ্তাহিক ও মাসিক উপা-সনার সময়ে উপস্থিত হইতে অনুরোধ করি। তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না যে ইহার ফলে সমাজের কি প্রকার বল আসে। নিয়মিত উপাসকদিগের সাহায্য লাভ করিলে অনেক সৎকার্য্যে হস্তক্ষেপ করা সহজ হয়।

প্রত্যেক সৎকার্য্যেই অর্থ আবশ্যক। দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি যে আদিব্রাহ্মসমাজের হিতৈষীদিগের অনেকেরই এদিকে দৃষ্টি নাই। আমরা আমাদের প্রত্যেক বন্ধুকে অনুরোধ করি যে তাঁহারা যেটুকু পারেন সেই-টুকুই অর্থ সাহায্য করুন। তাঁহাদের যেন মনে থাকে যে তৃণসংহতি দ্বারা মত্ত হস্তীকেও বাঁধিয়া রাখা যায়। প্রত্যেক সভ্য যদি অন্তত বৎসরে ৩৲ টাকা বা মাসে চারি আনা মাত্র দেন, তাহা হইলে সমাজের বিশেষ উপকার করা হয়, এবং সেই সঙ্গে সভ্যগণও বিনা মূল্যে প্রতিমাসে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা নিয়মিত পাইতে পারেন।

আদিসমাজের অধীনে একটী বালক এবং একটী বালিকা বিদ্যালয় থাকা বিশেষ আবশ্যক। বালক বালিকাদের ভিতর দিয়াই প্রচারকার্য্য শীঘ্র ও সুচারু-রূপে নিষ্পন্ন হয়।

গত তিন বৎসরের মধ্যে আদিব্রাহ্মসমাজের যন্ত্রালয়

হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মসংক্রান্ত দুই খানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে—একটী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রচারিত একেশ্বরবাদসম্মত অনুষ্ঠান পদ্ধতি। এই পদ্ধতি অনেকাংশে অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। ইহাকে সর্ব্বতোভাবে সম্পূর্ণ করিয়া তোলা উচিত। দ্বিতীয়টি হইতেছে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ওঁ "পিতা নোঽসি" গ্রন্থ। এই গ্রন্থে ঈশ্বরের পিতৃভাব সকল দিক হইতে দেখানো হইয়াছে। এই গ্রন্থ বয়স্ক বালক বালিকাদিগের হস্তে দিবার সম্পূর্ণ উপযোগী।

এই ত্রৈবার্ষিক বিবরণ সাধারণের হস্তে সমর্পণ করিলাম। এখন আদিসমাজের উন্নতিসাধন তাঁহাদের সমবেত যত্ন ও চেষ্টার উপর নির্ভর করিতেছে। আদিসমাজের প্রচার সম্বন্ধীয় মত অত্যন্ত অসাম্প্রদায়িক। সকলেই ইহার মণ্ডলী ভুক্ত হইতে পারেন। আমরা দেখিতেছি যে ভগবানও তাঁহার প্রসন্ন নয়নে ইহার প্রতি দৃষ্টি করিতেছেন এবং সেই কারণে ইহার কৃতকার্য্যতা বিষয়েও আমরা সম্পূর্ণ আশান্বিত আছি।

উপসংহারে আমরা আহ্লাদের সহিত জানাইতেছি যে কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চৌধুরী শতকরা ৬½ টাকা সুদের ৫০০৲ পাঁচশত টাকার একখানি কোম্পানির কাগজ মাঘোৎসবের সময়ে সমাজে দান করিয়াছেন।

বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত

গীতা-রহস্য।

আধিদৈবতবাদ ও ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ বিচার।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদিত।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সে যাক্; মানব-অন্তঃকরণের ব্যাপার কি প্রকারে চলে ইহা দেখিয়া, মন ও বুদ্ধির কাজ কি, ও 'বুদ্ধি' শব্দের অন্য অর্থ কি, তাহা বলিয়াছি। এক্ষণে মন ও ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধিকে এইরূপ পৃথক করিবার পর, সদসদ্‌বিবেকবুদ্ধি কোন্ পথে চলে তাহা দেখা যাক্। ভালমন্দনির্ব্বাচন করাই এই দেবতার কাজ হওয়ায় (কনিষ্ঠ) মনের মধ্যে তাহার সমাবেশ হইতে পারে না; এবং একমাত্র ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধিই বিচার করিয়া যে-কোন বিষয়ের নির্ণয় করে বলিয়া সদসদ্‌বিবেচনশক্তির আর পৃথক্ কোন স্থান থাকে না। যে কথার কিংবা যে বিষয়ের সারাসার বিচার করিয়া নির্ণয় করিতে হইবে, সেই বিষয় অনেক হইতে পারে। বাণিজ্য, যুদ্ধ, ফৌজদারী বা দেওয়ানী মোকদ্দমা, মহাজনী, কৃষিকার্য্য ইত্যাদি অনেক ব্যবসায়ে বিবিধ প্রসঙ্গে সারাসার বিচার করা আবশ্যক হয়। কিন্তু তাহার দরুণ উহাদের ভিতরকার ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধি বিভিন্ন হয় না। সারাসারবিবেক বলিয়া যে ক্রিয়া, তাহা সর্ব্বত্র একই প্রকার; এবং সেই জন্য সেই বিবেক কিংবা নির্ণয়কারী বুদ্ধি একই হওয়া চাই। কিন্তু মনের ন্যায় বুদ্ধিও, শারীরধর্ম্ম হওয়াপ্রযুক্ত পূর্ব্বকর্ম্মের দ্বারা, বংশানুক্রমিক সংস্কারবশতঃ বা শিক্ষাদি অন্য কারণে, এই বুদ্ধি ন্যূনাধিক পরিমাণে রাজসিক কিংবা তামসিক হইতে পারে; এবং সেই জন্যই একের বুদ্ধিতে যে বিষয় গ্রাহ্য তাহাই অন্যের বুদ্ধিতে অগ্রাহ্য বলিয়া মনে হয়, কিন্তু তাই বলিয়া বুদ্ধি-ইন্দ্রিয় প্রত্যেক সময়েই ভিন্ন হইয়া থাকে, এরূপ বলা যায় না। উদাহরণ স্বরূপ মনে কর চোখ। কাহারও চোখ ট্যারা, কাহারও বোজা, কাহারও কাণা; আবার কাহারও দৃষ্টি ঘোলাটে, কাহারও বা স্বচ্ছ হইয়া থাকে। তাই বলিয়া, চোখের ইন্দ্রিয় এক নহে—বহু, এইরূপ আমরা বলি না। বুদ্ধি সম্বন্ধেও এই নিয়ম প্রয়োগ করা যাইতে পারে। যে বুদ্ধির দ্বারা চাউল কিংবা গম বাছাই করা যায়, যে বুদ্ধির দ্বারা পাথর ও হীরার ভেদ জানা যায়, যে বুদ্ধির দ্বারা কালো, সাদা, মিষ্ট কটু বুঝা যায়, সেই বুদ্ধিই কাহাকে ভয় করিবে, কাহাকে ভয় করিবে না, কিংবা সৎ ও অসৎ, লাভ কিংবা ক্ষতি, ধর্ম্ম কিংবা অধর্ম্ম এবং কার্য্য কিংবা অকার্য্য এই সমস্ত বিষয়ের তারতম্য বিচার করিয়া শেষে নির্ণয় করিয়া থাকে। সাধারণব্যবহারে, মনোদেবতা বলিয়া উহার যতই গৌরব করা হউক না কেন তথাপি তত্ত্বজ্ঞান দৃষ্টিতে উহা একই ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধি। এই কথা মনে করিয়াই গীতার ১৮ অধ্যায়ে একই বুদ্ধির সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিন ভেদ করিয়া—

প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষং চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী॥

"অর্থাৎ—কোন্ কর্ম্ম করিবে, কোন্ কর্ম্ম করিবে না, কোন্ কর্ম্ম করা উচিত, কোন্ কর্ম্ম করা অনুচিত, কাহাকে ভয় করিবে, কাহাকে ভয় করিবে না, বন্ধন কিসে হয়, ও মোক্ষ কিসে হয়, ইহা যে-বুদ্ধির দ্বারা (যথার্থ) জানা বুঝা যায় তাহাই সাত্ত্বিকী বুদ্ধি" (গী, ১৮।৩০) এইরূপ বলিবার পর—

যয়া ধর্ম্মমধর্ম্মং চ কার্য্যং চাকার্য্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী ॥

অর্থাৎ—"ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, কিংবা কার্য্য ও অকার্য্য, ইহার মধ্যে যথার্থ নির্ণয় যে করে না, অর্থাৎ ভুল করে, সেই বুদ্ধিই রাজসিক" (১৮।৩১) এবং শেষে—

অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্ব্বার্থান্বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ॥

অর্থাৎ—"যে বুদ্ধি অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলে কিংবা সকল বিষয়ে বিপরীত অর্থাৎ উল্টা নির্ণয় করে সেই বুদ্ধি তামসী" এইরূপ ভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন (গী, ১৮।৩২)। এই বিচার হইতে স্পষ্ট দেখা যায়, কেবল ভালমন্দ-নির্ব্বাচনকারী অর্থাৎ সদসদ্‌বুদ্ধিরূপ স্বতন্ত্র পৃথক দেবতা গীতার অভিমত নহে। বুদ্ধি সর্ব্বদাই ভালনির্ব্বাচনকারী কখনই হইতে পারে না এরূপ ইহার অর্থ নহে। তবে বুদ্ধি একই হওয়া প্রযুক্ত, ভালোর নির্ব্বাচন করা এই যে স্বাত্ত্বিক ধর্ম্ম ইহা এক জনের বুদ্ধিতে পূর্ব্বসংস্কার, শিক্ষা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ কিংবা আহারাদির দ্বারা হইয়া থাকে; এবং এই পূর্ব্বসংস্কারাদিকারণের অভাবে এই বুদ্ধিই, কেবল কার্য্যাকার্য্যনির্ণয়ের কাজে নহে, অন্য বিষয়েও রাজসিক কিংবা তামসিক হইতে পারে, এইরূপ উপরের শ্লোকের ভাবার্থ। চোর ও সাধুদের অথবা বিভিন্নদেশীয় মনুষ্যদিগের বুদ্ধির মধ্যে পার্থক্য কেন হয়, এই সিদ্ধান্তের দ্বারা তাহার যেরূপ উপপত্তি হয়, সেরূপ সদসদ্‌বিবেচনশক্তি স্বতন্ত্রদেবতা বলিয়া মানিলে হয় না। আপনার বুদ্ধিকে সাত্ত্বিক করা ইহা প্রত্যেকেরই কাজ; এবং ইন্দ্রিয়নিগ্রহব্যতীত এ কাজ হইতে পারে না। যে পর্য্যন্ত ব্যবসায়াত্মকবুদ্ধি, মনুষ্যের প্রকৃত হিত কিসে হয় তাহার নির্ণয় বা পরীক্ষা না করিয়া কেবল ইন্দ্রিয়দের মর্জ্জি অনুসারে চলে, সে পর্য্যন্ত সেই বুদ্ধিকে শুদ্ধ বলা যাইতে পারে না। এইজন্য বুদ্ধিকে মন ও ইন্দ্রিয়ের অধীন হইতে না দিয়া, উল্টা, মন ও ইন্দ্রিয় যাহাতে বুদ্ধির অধীনে আসে এইরূপ আমাদের ব্যবস্থা করা উচিত। ভগবদ্‌গীতাতে অনেক স্থানে এই তত্ত্বই কথিত হইয়াছে (গী, ২।৬৭,৬৮; ৩।৭,৪১; ৬।২৪,২৬), এবং এই কারণেই কঠোপনিষদে শরীরের সহিত রথের উপমা দিয়া ঐ রথে যোজিত ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বকে বিষয়োপভোগমার্গে সুনিয়মে চালাইবার জন্য (ব্যবসায়াত্মক) বুদ্ধিরূপ সারথীকে মনোময় লাগাম ধৈর্য্য সহকারে খুব টানিয়া ধরিতে হইবে, এইরূপ রূপক করা হইয়াছে (কঠ, ৩।৩-৯); এবং মহাভারতেও দুই তিন স্থানে এই রূপকই কিছু ন্যূনাধিক পরিবর্ত্তন করিয়া গৃহীত হইয়াছে (সভা, বন, ২১০।২৫; স্ত্রী ৭।১৩; অশ্ব, ৫১।৫)। ইন্দ্রিয়নিগ্রহ বর্ণনা করিবার পক্ষে এই দৃষ্টান্ত এরূপ উপযোগী যে, গ্রীসদেশীয় প্রসিদ্ধ তত্ত্ববেত্তা প্লেটো আপন গ্রন্থে (ফীডুস ২৪৬) ইন্দ্রিয়নিগ্রহের বর্ণনা করিবার সময় এই দৃষ্টান্তই প্রয়োগ করিয়াছেন। ভগবদ্‌গীতাতে এই দৃষ্টান্তের প্রত্যক্ষ উল্লেখ নাই বটে; তথাপি উপরে নির্দ্দেশিত গীতার শ্লোকে, ইন্দ্রিয়নিগ্রহের বর্ণনা এই দৃষ্টান্তটি মনে রাখিয়াই করা হইয়াছে,—এই বিষয়ের পূর্ব্বাপর ধারা যাঁহারা অবগত আছেন, ইহা তাঁহাদের চোখে না পড়িয়া থাকিতে পারে না। সাধারণত অর্থাৎ শাস্ত্রীয় সূক্ষ্মভেদ করিবার আবশ্যকতা যখন হয় তখন ইহাকেই মনোনিগ্রহ বলা হইয়া থাকে। কিন্তু উপরিউক্ত অনুসারে মন ও বুদ্ধির যখন ভেদ করা হয় তখন নিগ্রহের কর্ত্তৃত্ব মনের হাতে না থাকিয়া ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধির হাতে চলিয়া যায়। এই ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধিকে শুদ্ধ হইতে হইলে, পাতঞ্জল যোগের সমাধির দ্বারা, ভক্তির দ্বারা, জ্ঞানের দ্বারা কিংবা ধ্যানের দ্বারা পরমেশ্বরের স্বরূপ অবগত হইয়া সমস্ত মনুষ্যের মধ্যে একই আত্মা আছে এই তত্ত্ব বুদ্ধির মধ্যে বদ্ধমূল হওয়া আবশ্যক। ইহাকেই আত্মনিষ্ঠ বুদ্ধি বলে। ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধি এইরূপ আত্মনিষ্ঠ হইলে এবং মনোনিগ্রহের দ্বারা মন ও ইন্দ্রিয় তাহার অধীনে কাজ করিতে শিখিলে, ইচ্ছা, বাসনা ইত্যাদি মনোধর্ম্ম (কিংবা বাসনাত্মক বুদ্ধি) স্বতই শুদ্ধ ও পবিত্র থাকিয়া শুদ্ধ সাত্ত্বিক কর্ম্মের দিকে ইন্দ্রিয়দিগের স্বভাবতই প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে ইহাই সমস্ত সদাচরণের মূল অর্থাৎ কর্ম্ম-যোগশাস্ত্রের রহস্য।

মন ও বুদ্ধি ইহাদের নিত্যক্রিয়া ছাড়া সদসদ্‌বিবেকশক্তি বলিয়া স্বতন্ত্র দেবতা আমাদের শাস্ত্রকারেরা কেন মানেন নাই তাহার কারণ উপরিউক্ত বিচার-আলোচনা হইতে পাঠকের উপলব্ধি

হইবে। মনকে কিংবা বুদ্ধিকেও গৌরবার্থে দেবতা বলিয়া মানিতে, তাঁহাদের মতে কোন বাধা নাই; কিন্তু যাহাকে মন কিংবা বুদ্ধি বলি, তাহা হইতে ভিন্ন ও স্বয়ম্ভূ এরূপ তৃতীয় সদসদ্‌বিবেকদেবতা তাত্ত্বিক বিচারান্তে নিষ্পন্ন হয় না, ইহাই তাঁহারা স্থির করিয়াছেন। 'সতাং হি সন্দেহপদেষু' এই বাক্যের মধ্যে 'সতাং' পদ বসাইবার উপযোগিতা এক্ষণে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। যাঁহাদের মন শুদ্ধ ও আত্মনিষ্ঠ তাঁহাদের পক্ষে অন্তঃকরণের সাক্ষ্য গ্রহণ করা কিছুই অসঙ্গত নহে। অধিক কি, তাঁহারা যতই কেন আপনার মনকে শুদ্ধ করুন না, কোন কর্ম্ম করিবার পূর্ব্বে মনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা আবশ্যক এরূপও বলা যাইতে পারে। কিন্তু উচ্ছৃঙ্খলচরিত্রের লোকেরা যে বলেন 'আমরাও এই রকম করেই চলি' এইরূপ বলিবার কোন অর্থ নাই। কারণ, দুজনের সদসদ্‌বিবেচনশক্তি এক নহে, সাধু লোকদিগের সাত্ত্বিক ও চোরদিগের তামসিক হইয়া থাকে। সার কথা—যাহাকে আধিদৈবতপক্ষের লোক সদসদ্‌বিবেকদেবতা বলেন তত্ত্বজ্ঞান দৃষ্টিতে তাহার বিচার করিলে উহাকে স্বতন্ত্র দেবতা বলিয়া মনে হয় না, ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধির স্বরূপদিগের মধ্যে উহা এক আত্মনিষ্ঠ অর্থাৎ স্বাত্ত্বিক স্বরূপ, এইরূপ আমাদের শাস্ত্রকারদিগের সিদ্ধান্ত এবং এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলে, আধিদৈবতপক্ষ স্বতই খোঁড়া হইয়া পড়ে।

আধিভৌতিক পক্ষ একদেশদর্শী ও অপূর্ণ এবং আধিদৈবতপক্ষের সহজ যুক্তিও এইরূপ খোঁড়া হইয়া গেলে, কর্ম্মযোগশাস্ত্রের উপপত্তি নির্দ্ধারণ করিবার অন্য কোন মার্গ আছে কি না, ইহা দেখা আবশ্যক হয়। এই মার্গ আধ্যাত্মিক। কারণ, বাহ্যকর্ম্মাপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ হইলেও সদসদ্‌বিবেকবুদ্ধি বলিয়া কোন স্বতন্ত্র ও স্বয়ম্ভূ দেবতা নাই এইরূপ স্থির হইলে পর, শুদ্ধ কর্ম্ম সম্পাদনের বুদ্ধিকে কিরূপে শুদ্ধ রাখিবে, শুদ্ধ বুদ্ধি কাহাকে বলে, কিংবা বুদ্ধিকে শুদ্ধ কেমন করিয়া করা যায়, কর্ম্মযোগশাস্ত্রেও এই প্রশ্নের বিচার আবশ্যক হইয়া থাকে; এবং এই বিচার শুধু বাহ্যজগতের বিচারকারী আধিভৌতিক শাস্ত্রকে ছাড়িয়া দিয়া অধ্যাত্মজ্ঞানে প্রবেশ না করিলে পূরা হয় না। আত্মা কিংবা পরমেশ্বরের প্রকৃত সর্ব্বব্যাপী স্বরূপের জ্ঞান যে বুদ্ধির হয় নাই সে বুদ্ধি শুদ্ধ নহে, এইরূপ এই বিষয়ে আমাদের শাস্ত্রকারদিগের চরম সিদ্ধান্ত; এই প্রকারের বুদ্ধিকে আত্মনিষ্ঠ বুদ্ধি কেন বলা হয় তাহা বলিবার জন্যই গীতাতে অধ্যাত্মশাস্ত্রের নিরূপণ করা হইয়াছে। কিন্তু এই পূর্ব্বাপর সম্বন্ধের প্রতি ঠিক্ লক্ষ্য না করায় গীতাসম্বন্ধীয় সাম্প্রদায়িক টীকাকারদিগের মধ্যে কেহ কেহ স্থির করিয়াছেন, বেদান্তই গীতার মুখ্য প্রতিপাদ্য-বিষয়। গীতার প্রতিপাদ্যবিষয়সম্বন্ধে উক্ত টীকাকারদিগের কৃত এই নির্ণয় ঠিক্ নহে, তাহা পরে সবিস্তার দেখান যাইবে। বুদ্ধি শুদ্ধ কিরূপে হয় ইহা দেখিবার জন্য আত্মারও বিচার করা কেন আবশ্যক হয়, এক্ষণে ইহাই দেখাইব। এই আত্মার বিচার দুই দিক্ দিয়া করা আবশ্যক হয়। (১) আপন পিণ্ডের, ক্ষেত্রের, কিংবা শরীরের এবং মনের ব্যাপারাদির পরীক্ষা করিয়া তাহা হইতে ক্ষেত্রজ্ঞরূপী আত্মা কিরূপে নিষ্পন্ন হয় তাহার বিচার করা—ইহা প্রথম প্রকার (গী, অ, ১৩)। ইহারই সংজ্ঞা—শারীরক কিংবা ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ-বিচার; এবং এই কারণেই বেদান্তসূত্রকে "শারীরক (শরীরের বিচারকারী) সূত্র" বলে। নিজের শরীর ও মনের এইরূপ বিচার হইলে পর (২) তাহা হইতে যে তত্ত্ব নিষ্পন্ন হয় তাহা, এবং আমাদের চতুর্দ্দিকে যে দৃশ্য জগৎ বা ব্রহ্মাণ্ড আছে তাহার পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা যে তত্ত্ব নিষ্পন্ন হয় তাহা, এই দুই মিলিয়া একই কিংবা ভিন্ন, ইহা দেখা আবশ্যক হয়। এই রীতি অনুসারে সম্পাদিত জগতের বিচার-আলোচনাকে "ক্ষরাক্ষরবিচার" কিংবা "ব্যক্তাব্যক্ত বিচার" বলে। ক্ষর কিংবা ব্যক্ত অর্থাৎ সৃষ্টির অন্তর্ভূত সমস্ত নশ্বর পদার্থ, এবং অক্ষর কিংবা অব্যক্ত অর্থাৎ সৃষ্টির অন্তর্গত নশ্বর পদার্থের যাহা মূলভূত নিত্য তত্ত্ব (গী, ৮।২১; ১৫।১৬)। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিচারের দ্বারা এবং ক্ষরাক্ষর বিচারের দ্বারা নিষ্পন্ন এই দুই তত্ত্বের পুনর্ব্বার বিচার করিয়া, এই দুই তত্ত্ব যাহা হইতে বাহির হয় এবং এই দুয়ের অতীত (পর) সমস্তের মূলীভূত যে তত্ত্ব নিষ্পন্ন হয় তাহাকে পরমাত্মা বা পুরুষোত্তম বলে (গী, ৮।২০)। ভগবদ্‌গীতাতে

এই সমস্তের বিচার আছে; পরিশেষে সকলের মূলীভূত যে পরমাত্মারূপ তত্ত্ব, তাহার জ্ঞানের দ্বারা বুদ্ধি কিরূপে শুদ্ধ হয় তাহা দেখাইয়া কর্ম্মযোগশাস্ত্রের উপপত্তি বলা হইয়াছে। তাই এই উপপত্তি আমাদের বুঝিতে হইলে আমাদেরও সেই মার্গ দিয়া যাইতে হইবে। তন্মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডজ্ঞান কিংবা ক্ষরাক্ষর বিচার, পরবর্ত্তী প্রকরণে বিবৃত হইবে। সদসদ্‌বিবেকদেবতার প্রকৃত স্বরূপনির্ণয় করিবার জন্য এই প্রকরণে যাহা সুরু করা হইয়াছে সেই পিণ্ডজ্ঞান কিংবা ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিচার অপূর্ণ থাকায় তাহা এক্ষণে পূরণ করিয়া লওয়া যাইবে।

পাঞ্চভৌতিক স্থূলদেহ, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধাত্মক পাঁচ বিষয়, সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক মন এবং ব্যবসায়াত্মকবুদ্ধি,—এই সম্বন্ধে বিচার শেষ হইল। কিন্তু ইহাতেও শরীরের বিচার পূরাপূরি হয় নাই। মন ও বুদ্ধি ইহারাই বিচার করিবার সাধন কিংবা ইন্দ্রিয়। জড় শরীরের মধ্যে ইহা ব্যতীত চেতনা অর্থাৎ চেষ্টাচাঞ্চল্য যদি না থাকিত তাহা হইলে মন ও বুদ্ধি থাকা ও না থাকা একই হইত। সুতরাং উপরি-উক্ত বিষয়গুলি ব্যতীত চেতনা বলিয়া শরীরের মধ্যে আর এক তত্ত্বের সমাবেশ করা চাই। কখন কখন চেতনাশব্দের অর্থ "চৈতন্য" হইয়া থাকে। কিন্তু চেতনাশব্দ উপস্থিত ক্ষেত্রে 'চৈতন্য'-অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই ইহা যেন মনে রাখা হয়। চেতনা অর্থাৎ জড়দেহের মধ্যে যে প্রাণ-চেষ্টা, বা জীবন-ব্যাপার দেখা যায় সেইরূপ অর্থই এখানে অভিপ্রেত। যে চিৎশক্তির দ্বারা জড়ের মধ্যেও চেষ্টা কিংবা ব্যাপার উৎপন্ন হয় তাহাই চৈতন্য; এবং এই শক্তিটি কি, এক্ষণে তাহার বিচার করিব। শরীরের মধ্যে পরিদৃশ্যমান জীবন-ব্যাপার কিংবা চেতনা ব্যতীত আত্মপর ভেদ যাহার দরুণ উৎপন্ন হয় তাহা এক পৃথক্ গুণ। কারণ, উপরি-কথিতানুসারে, বুদ্ধিরূপ ইন্দ্রিয় কেবল সারাসার বিচার করিয়া নির্ণয় করে বলিয়া, আত্মপর-ভেদের মূলস্বরূপ অহঙ্কারকে তাহা হইতে পৃথক করা আবশ্যক হয়। ইচ্ছা দ্বেষ, সুখদুঃখ প্রভৃতি দ্বন্দ্বগুলি মনেরই গুণ; কিন্তু নৈয়ায়িক, এই গুণ আত্মার বলিয়া মনে করায়, এই ভ্রম দূর করিবার জন্য বেদান্তশাস্ত্র মনেতেই উহার সমাবেশ করিয়া থাকে। সেইরূপ পঞ্চমহাভূত যে মূল তত্ত্ব হইতে নির্গত হইয়াছে সেই প্রকৃতিরূপ তত্ত্বের সমাবেশ মনেতেই হইয়া থাকে (গী, ১৩।৫,৬)। এই সমস্ত তত্ত্ব যে শক্তির দ্বারা স্থির থাকে সেই শক্তি আবার সর্ব্বাপেক্ষা পৃথক। তাহাকে 'ধৃতি' বলে (গী, ১৮।৩৩)। এই সমস্ত বিষয় একস্থানে জড়ো করিলে যে সমুচ্চয়রূপ পদার্থ হইয়া দাঁড়ায় তাহা শাস্ত্রে সবিকারশরীর কিংবা ক্ষেত্র এই নামে অভিহিত হইয়াছে; এবং ইহাকেই ব্যবহারে আমরা 'চলা-বলা', (সবিকার) মনুষ্যশরীর কিংবা পিণ্ড বলিয়া থাকি। ক্ষেত্র শব্দের এই ব্যাখ্যা আমি গীতা অবলম্বনেই করিয়াছি; কিন্তু ইচ্ছাদ্বেষাদিগুণ গণনা করিবার সময় এই ব্যাখ্যার অল্পস্বল্প ইতরবিশেষ করা হইয়া থাকে। উদাহরণ যথা—শান্তিপর্ব্বে জনক-সুলভ সংবাদে (শাং, ৩২০) শরীরের ব্যাখ্যা করিবার সময় পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়কে ছাড়িয়া দিয়া তাহার বদলে কাল, সদসদ্‌ভাব, বিধি, শুক্র ও বল এই ছয় গুণের সমাবেশ করা হইয়াছে। এই গণনাঅনুসারে পঞ্চমহাভূতেই পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়ের সমাবেশ করা আবশ্যক হয় এবং গীতার গণনানুসারে কালকে আকাশের ও বিধিশুক্রবলাদিকে মহাভূতের বা প্রকৃতির অন্তর্ভূত করা হইয়াছে, এইরূপ মনে করিতে হয়। যাহাই হউক, ক্ষেত্রশব্দের এক অর্থই সকলের অভিপ্রেত। মানসিক ও শারীরিক সমস্ত দ্রব্য ও গুণের প্রাণরূপ বিশিষ্টচেতনাযুক্ত যে 'সমুদায়' তাহার নাম ক্ষেত্র। শরীর এই শব্দ দেহ সম্বন্ধেও প্রযুক্ত হয় বলিয়া তাহা হইতে ভিন্ন ক্ষেত্রশব্দ, উপস্থিত স্থলে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ক্ষেত্রশব্দের মূল অর্থ এইরূপ; কিন্তু উপস্থিত প্রকরণে, 'সবিকার ও সজীব মনুষ্যদেহ' এই অর্থে তাহার লাক্ষণিক উপযোগ করা হইয়াছে। উপরে যাহাকে আমি বড় কারখানা বলিয়াছি তাহা ইহাই। বাহিরের মাল এই কারখানায় আনিবার ও কারখানা হইতে মাল বাহিরে পাঠাইবার দরজা—অনুক্রমে মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার; চেতনা তাহাদের কর্ম্মচারী; এবং এই কর্ম্মচারী যে ব্যবহার করে, কিংবা করায় তাহাকে এই ক্ষেত্রের ব্যাপার, বিকার কিংবা ধর্ম্ম বলে।

(ক্রমশঃ)

রাণাডের-স্মৃতি কথা।

সপ্তম—পরিচ্ছেদ। *

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর)

জানুয়ারী (১৮৮১) তারিখে আমরা বোম্বায়ে আসিলে পর, প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডোসাভাই-ফ্রাম্‌জি কডাকার নিকট হইতে আমার স্বামী চার্জ বুঝাইয়া লইলেন। এই বদ্‌লি শুধু তিন মাসের জন্য হইয়াছিল। আমরা শেত-ওলীতে এক বাঙ্গলা ভাড়া করিলাম এবং ভাণ্ডারকারের প্রতিবেশী হইলাম। এই সময়ে ভাণ্ডারকারের পরিবারের মেয়েদের সঙ্গে আমার চেনাপরিচয় হইল। তাঁহার বড়মেয়ে শান্তা-বাইর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব জমিয়া গেল; সেই সূত্রে আমাদের পরস্পরের মধ্যে যাওয়া আসা হওয়ায়, শান্তার মা, বোন ও ভায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় হইল। ঐ পরিবারের কর্ত্রীঠাকরুণ প্রেমার্দ্রহৃদয়, ধর্ম্মনিষ্ঠ ও নিরলস; তাই তাঁহার সংসারের সকল লোকই সুখী, নীতিমান্, উদ্যোগী ছিলেন। আনন্দে তাঁহার সময় কাটিত, এবং তিনি যে মনে করিতেন স্বর্গসুখ সংসারেই আছে সে কথা খুবই সত্য। যে কয়েকটি এইরূপ ভাগ্যবান পরিবারের সহিত আমাদের পরিচয় হইয়াছে, তন্মধ্যে ভাণ্ডারকারের নাম প্রথমেই ধর্ত্তব্য এইরূপ আমাদের ধারণা। শ্রীমতী অন্নপূর্ণা-বাই-ভাণ্ডারকার মেয়ে ও বৌর মধ্যে কোন পার্থক্য করিতেন না—তাহাদের সহিত সমান ব্যবহার করিতেন। হিন্দু পরিবারের মধ্যে এরূপ ব্যবহার কদাচিৎ দৃষ্টিগোচর হয়। কোন কোন গৃহে অল্পস্বল্প দেখা যায়, কিন্তু ভাণ্ডারকারের গৃহে এই ভেদ-ভাব কখনই দেখা যাইত না। সেজন্য, পরিবারের সকল লোকই বেশ মিলিয়া মিশিয়া আনন্দে থাকিত। এই ভাবটা যেমন যেমন আমার চোখে পড়িতে লাগিল, সেই পরিমাণে বাড়ীর কর্ত্রীঠাকুরাণীর উপর আমার ভক্তি পর-পর বাড়িতে লাগিল এবং ক্রমশ তাঁহাকে একেবারে আমার মায়ের মতো মনে হইতে লাগিল। সেই ভাবেই আমি তাঁহার সহিত ব্যবহার করিতাম এবং তিনিও আমাকে ভালবাসিয়া পুনঃ পুনঃ শিক্ষাপদ্ধতির কথা বলিতেন। শ্রীমতী শান্তা-বাই ও আমার মধ্যে বন্ধুত্ব আমরণ শুদ্ধ ও দৃঢ় ছিল। ২৪ বৎসর-ব্যাপী বন্ধুত্বের মধ্যে কখনও আমাদের পরস্পরের মধ্যে একবারও ভুল-বুঝাবুঝি হয় নাই; মুখের উপর কিংবা আড়ালে পরস্পরের নিন্দা করিবার কোন প্রসঙ্গ কখন উপস্থিত হয় নাই। শান্তা-বাই অতিশয় ধার্ম্মিক, সত্যনিষ্ঠ ও কর্ম্মিষ্ঠ ছিলেন। ১৮০৪ অব্দে অবোধ শিশুসন্তানদিগকে, বৃদ্ধ ও বৎসল পিতাকে, পুণ্য পতিকে, এবং আমাদের সবাইকে, মর্ম্মাহত করিয়া আমার মৈত্রিণী ইহলোক ছাড়িয়া অক্ষয় সুখভোগার্থ পরলোকে গমন করিলেন।

বোম্বাই প্রার্থনা সমাজের সম্মুখ ঘরে, পণ্ডিতা রমাবাই, আর্য্যমহিলাসমাজ নামে এক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রতি শনিবারে উহার অধিবেশন হইত। এই সভায়, ৮।১০ জন মহিলা ও ৫।৬ জন পুরুষ আসিতেন। কেহ না কেহ কোন বিষয়ের প্রবন্ধ কিংবা দুই এক পংক্তি লেখা এবং কখন কখন পুস্তক হইতে কোন উদ্ধৃত অংশ লিখিয়া আনিতেন। তথাপি ডাঃ আত্মারাম দাদা, ভাস্কর-রাও-ভাগবত প্রভৃতি যে সমস্ত বিজ্ঞ লোক সভায় উপস্থিত হইতেন তাঁহারা আমাদিগকে উৎসাহ দিবার জন্য বলিতেন, "বেশ লেখা হইয়াছে"। "এই সম্বন্ধে কিছু মুখে বলা হউক"—কেহ কেহ এইরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন; কিন্তু মুখে বলিতে কেহ সাহস না করিলে, "উনি"ই ২।৪টি সহজ বাক্য বলিয়া দেখাইতেন এবং বলিতেন এরূপ করিয়া বাক্য বলিবে। এইরূপে আমাদের বোম্বায়ের দিনগুলি বেশ কাটিয়া গেল এবং আমরা পুণায় আসিলাম। যাক্। বোম্বায়ের বৃত্তান্ত লিখিবার সময়, যে সকল কথা সহজভাবে মনে আসিয়াছিল, তাহাই প্রকাশ করিয়াছি।

পুণায়, ১৮৮১ অব্দে, প্রিন্সিপাল সদর-আমীনের জায়গায় উনি নিযুক্ত হইলেন। তদনুসারে আমরা সেখানে আসিলে পর, উনি সেখানকার "চার্জ" গ্রহণ করিলেন; এবং পুণায় কিছুদিন অবস্থিতি করিবার পর, তাঁহার মনে হইল, এই সময়ে নবীন শিক্ষার্থী মহিলাদের জন্য একটি সভা স্থাপন করিলে ভাল হয়; সেই সভায় নির্দ্দিষ্ট দিবসে মহিলারা একত্র সমবেত হইবেন; সেই সভায় আমাদের মধ্যে কোন অভিজ্ঞ পরিপক্ক ব্যক্তি সহজ সহজ বিষয় লইয়া সহজ ভাষায় তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিবেন। এইরূপ স্থির করিয়া, ১৮৮১র এপ্রিল মাস হইতে, "কাল্যাবরা"র অভ্যঙ্করার বাড়ীতে যে "ফিমেল ট্রেনিং কলেজ" ছিল তাহারই এক বৈঠকখানা-ঘরে প্রতি শনিবারে সন্ধ্যাকালে সভার অধিবেশন হইতে লাগিল। প্রথম প্রথম সভায় ৪।৫ ঘরের প্রায় ১০।১২ জন মহিলা ও ৫।৬ জন পুরুষ আসিত। তন্মধ্যে কৈ-কেবোপন্ত-নানা-ছত্রে নিয়মিতরূপে আসিতেন। ইনি সকলের আগে আসিয়া বসিয়া থাকিতেন। কখনই ভুলিতেন না। কাষ্ঠফলকের উপর ভূগোল, খগোল সম্বন্ধে বিভিন্ন আকৃতি খড়িতে কিরূপ আঁকিতে হয়, একদিন সেই সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হইত। অন্য সময়ে, গ্রহ তারা নক্ষত্র আকাশে কে কোথায় আছে,—কোন্ নক্ষত্র কত রাত্রি থাকে,

* এই পরিচ্ছেদ ভুলক্রমে যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হয় নাই।

আজ চন্দ্রের কোন্ তিথি, এবং কিরূপে তাহা জানিতে পারা যায় প্রভৃতি বিষয়, সহজ ভাষায় বুঝাইয়া বলা হইত এবং যে বিষয়সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হইত, সে বিষয় কে কতটা বুঝিয়াছে তাহা দেখিবার জন্য আমাদের প্রত্যেককেই এইরূপ বলা হইত ;—"আমি যাহা তোমাদিগকে বলিলাম, সে বিষয় তোমরা যতটা বুঝিয়াছ তাহা লিখিয়া আনো অথবা এখনই দাঁড়াইয়া মুখে বল।" কোন বিষয় বুঝিয়া থাকিলেও, তাহা তখন দাঁড়াইয়া বলা অপেক্ষা লিখিয়া আনা আমাদের ভাল মনে হইত। কারণ, আমাদের মধ্যে কাহারও দাঁড়াইয়া মুখে বলিতে সাহস হইত না। তাই, লিখিয়া আনিব বলিয়া স্বীকার করিয়া অন্য শনিবারে যতটা পারিতাম লিখিয়া আনিতাম। এইরূপ লিখিয়া আনা হইয়াছে দেখিয়া "নানা"র খুব আমোদ হইত, এবং যাহারা ঐ লেখা পাঠ করিত সেই সকল মেয়েদিগকে প্রশংসা করিয়া তিনি উৎসাহ দিতেন। কখন কখন আমাদিগকে যে বিষয় বুঝাইয়া বলা হইয়াছে তাহা বুঝিতে না পারায় আমরা যাহা তাহা একটা কিছু লিখিয়া আনিতাম। তখন তিনি হাসিয়া ঠাট্টা করিয়া, যাহাতে আমাদের ভুল আমরা বুঝিতে পারি সেইরূপ করিয়া বুঝাইয়া বলিতেন এবং সেই বিষয়ের পুনঃ প্রতিপাদন করিয়া আগ্রহের সহিত উপদেশ দিতেন, "আমার নিকট হইতে যে জ্ঞান লাভ করিয়াছ তদনুসারে এই বিষয়ের বৃত্তান্ত আবার লিখিয়া আনো" এইরূপ তিনি বলিতেন। কখন কখন ঐরূপ পুনর্ব্বার লিখিয়া আনিতে আমাদের বিরক্তি বোধ হইত। কিন্তু মা লিখিলেও, আমার স্বামীর রাগ হইত বলিয়া "নানা"র কথা-মত লিখিয়া আনিতাম। এইরূপ আশাপ্রদ বাক্য বলিয়া, কখন কখন মাষ্টারের মত রাগ করিয়া ১০।১২ ছত্র লেখা ও ২।৪ ছত্র মুখে বলার কাজ আমাদের দিয়া "নানা" করাইয়া লইতেন। তাছাড়া, আমাকে সংস্কৃত শিখাইবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল। সেই সম্বন্ধে তিনি ২।৪ দিন পরে, দুই একবার মৌখিক উপদেশও দিয়াছিলেন। আমার স্বামীরও মত হইল। তথাপি বাড়ীর মহিলারা (প্রাচীন ও নবীন) শিক্ষার বিরোধী হওয়ায়, আমি সংস্কৃত শিখিতে আরম্ভ করিয়াছি এইরূপ জানিবামাত্র, কে শিখাইতে আসেন তাহারও প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া,যাহাতে কোন সময় তাঁহার কাণে আসে এইরূপ অপমানসূচক বাক্য বলিতে লাগিলেন এবং "নানা"র স্বভাব মানী ও তেজীয়ান হওয়ায় উহা তাঁহার সহ্য হইল না; তখন, ঐরূপ কোন উপলক্ষ্য না আসিতে দেওয়াই ভাল এইরূপ "উনি" স্থির করিলেন। সাত আট মাস পরে আমাদের এই আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল। যাক্, আমরা সভায় যে দশ বারো জন জমা হইতাম তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ট্রেনিং-কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত মাষ্টারণী ছিলেন। সুতরাং তাঁহারা রীতিমত শিক্ষিত ও অধিক শিক্ষিত ছিলেন। তাঁহাদেরই শিক্ষাধীনে আমাসাহেব-ঝিড়ের কন্যা শিক্ষিত ও বিচক্ষণ হইয়াছিলেন। তাছাড়া তিনি পিত্রালয়বাসিনী হওয়ায়, অপেক্ষাকৃত স্বাধীনভাবে কাজ করা তাঁহার অভ্যাস ছিল। অবশিষ্ট মহিলারা পদ্ধতিপূর্ব্বক শিক্ষালাভ করিয়াছেন। তন্মধ্যে আমিই কেবল কম শিক্ষিতা এবং সহরের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে বড়ই অজ্ঞ ছিলাম। তথাপি "নানা"র স্নেহ আমার উপরেই বিশেষ ছিল। কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে হইলে, কিংবা কিছু বুঝাইয়া বলিতে হইলে, তিনি প্রথমে আমাকে বলিতেন; আমার কোন ভুলচুক হইলে, আমার স্বামীর সাক্ষাতে, "পাগলী" বলিয়া আমাকে রাগাইতেন; এবং এইরূপ ভুল আর কখন করিও না, এইরূপ বলিতেন। সভা জিনিষটা যে কি ও সভায় কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, এই সভাসূত্রেই তাহার জ্ঞানলাভ হইয়াছিল। কিন্তু এই সভার নামডাক আদৌ না থাকায় আমাদের বাড়ীর মহিলাদের নিকট হইতে আমার কষ্ট পাইতে হয় নাই। শুধু তাহা নহে, আমি প্রতি শনিবারেই বাহিরে যাইতাম, এবং আমি কোন সভায় যাইতেছি এ কথা পর্য্যন্ত তাঁহাদের মনে কখন আসে নাই। অন্য বৈত্রিণী যাঁরা আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন, তাঁহাদের সহিত আমিও কখন কখন সাক্ষাৎ করিতে যাইতাম, এইরূপ হয়ত তাঁহারা মনে করিয়া থাকিবেন। বাড়ীতেই আমার পাঠাভ্যাস চলিত। কিন্তু রাত্রে ও প্রভাতে যতটা হইতে পারে ততটাই হইত; কারণ, দিবসে পুস্তক হাতে লইয়া নীচে যাওয়া সুবিধা হইত না। পুস্তক পড়িতে বসিয়াছি, এই সংবাদমাত্র তাঁহাদের কাণে পৌঁছিয়াছে কি, অমনি তাঁরা নিন্দাচর্চ্চা সুরু করিয়া দেন। তারপর, ঠাট্টা টিট্‌কারী করিয়া হাসাহাসি করিয়া কত কথাই তাঁরা বলিতেন। এই সকল কথা আমি চুপ করিয়া শুনিয়া, সমস্তই সহ্য করিতাম। তজ্জন্য আমার বড়ই কষ্ট হইত। এই কথা আমার স্বামীর কানে কখন-না-কখন আসিতই আসিত।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

নব-বর্ষে।*

(শ্রীসুধীন্দ্রলাল রায়)

আজ বিগত বর্ষের ঐ ম্রিয়মান জ্যোতি অতীত সাগরের ধূসর বক্ষ চুম্বন করিতেছে; আজ অতীত বর্ষের

* শ্রীযুক্ত সার আশুতোষ চৌধুরীর বালিগঞ্জস্থ ভবনে নববর্ষোপলক্ষে প্রাতঃকালে পঠিত হইয়াছিল। আমরা তাহা আনন্দসহকারে প্রকাশ করিলাম।

বিদায়গান পত্র পল্লবে স্বনিয়া স্বনিয়া হর্ষের মাঝে বিষাদের ঢেউ তুলিয়া দিতেছে। কিন্তু এই আগামী বর্ষের স্বাগত সঙ্গীতে ঐ বিগত বর্ষের বিদায়সঙ্গীত ছাপিয়া যাইতেছে। নববর্ষের ঐ হেম-অরুণিমা ধরণীখানিকে এক আশ্চর্য্য মহিমামণ্ডিত করিয়া বিশ্ববিমোহন শোভায় বিশ্ববাসীকে মুগ্ধ করিতেছে।

আজ আমরা সকলে, এই নূতন বৎসরের শুভ প্রারম্ভে নূতন উৎসাহে, নূতন উৎসব-জাগরণে মিলিত শুভেচ্ছা লইয়া বিশ্বের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। যে মঙ্গলময় বিধাতার মঙ্গল নিয়মের অধীন হইয়া, আমরা বিভিন্ন পথে, বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়া আজ পুনর্ব্বার নব বর্ষের দ্বারে অতিথিভাবে দাঁড়াইতে সক্ষম হইয়াছি, সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকে আমরা ভক্তিভরে প্রণাম করি। যে সকল প্রাণের জিনিষ লইয়া আমাদের অতীত বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে, তাহাদিগকে নব বর্ষের নূতন উদ্দীপনায় আরও প্রাণের সঙ্গে মিশাইয়া লই; যে সকল স্নেহের ফুল, প্রীতির রত্ন, প্রেমের প্রতিমা, ভক্তির মূর্ত্তি আমাদিগকে শুভেচ্ছার বর্ম্মে ঘিরিয়া রাখিয়াছে তাহাদিগকে স্নেহ প্রীতি প্রেম ও ভক্তি দান করিয়া আমরা আমাদের জীবন সার্থক করি; আর যাঁহারা আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্যে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া হৃদয়মধ্যে তাঁহাদের পুণ্যস্মৃতি চিরসঞ্জীবিত করিয়া রাখি।

এই নূতন বর্ষের নূতন উদ্দীপনায় আমাদের প্রাণের কালিমারাশি বিধৌত হইয়া যাক; আবার আমরা আমাদের নিজ নিজ কার্য্যে নূতন উৎসাহে নূতন উদ্যমে ব্রতী হই। গত এক বৎসরে আমাদিগের মধ্যে কেহ বা জীবনপথে অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন কেহ বা পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িয়াছেন। যিনি অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন তিনি নব উদ্যমে আরও অগ্রসর হইয়া চলুন; আর যিনি নিজ অবহেলা বশতই হউক আর দৈব বশতই হউক পিছাইয়া পড়িয়াছেন, তিনি ভগবানের কর্ম্মময় সংসারে কর্ম্মযোগসাধনায় অগ্রসর হইতে শিক্ষা করুন। নিরুৎসাহ ও ভগ্নোদ্যম হইবার কোন কারণ নাই। সাধনায় সিদ্ধি আছেই আছে। আমাদের জীবনপথ—কাঁটাবন, জলা ও মরুর ভিতর দিয়া মানবত্বের পবিত্র তীর্থের দিকে চলিয়া গিয়াছে। আমরা যেন বাধা বিঘ্ন দেখিয়া উদ্যমহীন হইয়া না যাই। সংসারে বাধাবিঘ্ন, সুখ-দুঃখ স্বাভাবিক। এই সুখদুঃখ নিয়ত ও নিয়মিত চক্রবৎ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে ও হইতেছে। যদি অহর্নিশি আমাদিগকে দুঃখসাগরেই ডুবিয়া থাকিতে হইত তাহা হইলে জীবন শুধু বিড়ম্বনা হইত। অথবা যদি আমরা জীবন ধারণ অবধি জীবনবিয়োগ পর্য্যন্ত সুখের হিল্লোলেই ভাসমান হইয়া থাকিতাম তাহা হইলে আর আমাদের জীবনের মহত্ত্ব কখনই বর্দ্ধিত হইতে পাইত না। দুঃখ ও নিরাশার কশাঘাত না থাকিলে মানবজীবন এত সুখময় এত গৌরবময় হইয়া উঠিত না। অগ্নিদগ্ধ সুবর্ণের ন্যায় মানবজীবন দুঃখের পরীক্ষাগ্নিতে দগ্ধীভূত হইয়া খাঁটি হইয়া যায়। বিগত বৎসরের নিরাশাপূর্ণ অভিজ্ঞতা আমাদিগের আগামী বৎসরের ভবিষ্যৎ পথ পরিষ্কার করিয়া দিতেছে। অতীতের ত্রুটি পশ্চাতে থাকিয়া আমাদের জীবনপথের সম্মুখ পানে অগ্রসর হইতে সাহায্য প্রদান করিতেছে।

নববর্ষের উৎসবের হর্ষসঙ্গীতে প্রাণে পুলক সঞ্চারিত হউক। সেই পুলক সঞ্চারণে হৃদয়ে শক্তির বন্যা উথলিয়া উঠুক। সেই উচ্ছ্বসিত শক্তিতরঙ্গের ঘাতপ্রতিঘাতে আমাদিগের জীবনতরী কর্ত্তব্য লক্ষ্য করিয়া অনন্তের দিকে ছুটিয়া চলুক। সংসারের জটিল কৃষ্ণপথ ধর্ম্মালোকে সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠুক। মানুষ আমরা—শুধু আমোদ প্রমোদ, আহার নিদ্রা আমাদের জীবনের কার্য্য নয়। আমাদের স্কন্ধে গুরুতর কার্য্যভার ন্যস্ত আছে—যাহার জন্য আমরা ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি—"মানব" নামে অভিহিত হইয়াছি। সেই সকল মহৎ কার্য্য সাধন করিতে যেন আমরা অবহেলা না করি। এই সকল মহৎ কার্য্যসমূহের মধ্যে ধর্ম্মসাধনাই মহত্তম কার্য্য। এই ধর্ম্মেই একমাত্র আমাদের আত্মার ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়। জ্ঞান, প্রেম সেই খাদ্যের প্রধান উপাদান। আত্মার এই আধ্যাত্মিক খাদ্য যোগানো মানবজীবনের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। শরীরের খাদ্য যোগানো তত আবশ্যক নয় যত আবশ্যক এই আত্মার খাদ্য যোগানো। সুদূর অতীত যুগের মহাধর্ম্ম প্রচারক সন্ন্যাসীর মহাবাণীর প্রতিধ্বনি করিয়া আমরা বলিতেছি—"Better starve the body than the Soul."

আজ আমরা আমাদের নিজের নিজের সমাজের প্রদর্শিত পথে, নিজের নিজের জাতীয়ভাবে এই নবীন বর্ষে নব উৎসাহে মানবত্বের দুর্ল্লভ তীর্থের পথে আবার চলিতে আরম্ভ করি। আপাতত বিভিন্ন পথে যাত্রা করিলেও ভবিষ্যতে দেখি যে আমরা একই স্থানে একই তীর্থে উপনীত হইয়াছি। সে তীর্থ এক, বহু নয়—সকলকেই সেই একই তীর্থে উপস্থিত হইতে হইবে। তবে পথ ভিন্ন বলিয়া কেহ বা আগে কেহ বা পরে পৌঁছাইবেন। বিভিন্ন পথের পরিব্রাজক আমাদের নিষ্কামভাবে সেই তীর্থে যাইবার উপযুক্ত কর্ম্ম করিয়া যাইতে হইবে। বৃথা "মুক্তি মুক্তি" করিয়া কোন ফল নাই। মত্ত কামনায় কামনা নিভে না—বরং আরও বাড়িয়া

যায়। সাধনায় সিদ্ধি হয়; মুক্তি সাধনার স্বভাবজ ফল। আমাদের চাহিতে হইবে না; সাধনা পূর্ণ হইলে মুক্তি আপনিই হইবে।

সুখ ও দুঃখের মাঝে আশা ও নৈরাশ্যের মাঝে, উৎসাহ ও নিরুৎসাহের মাঝে আমাদের এই নবীন বর্ষ নবীন আলোকছটায় আমাদের জীবনটাকে সমুদ্ভাসিত করিতে আসিয়াছে। এস আজ আমরা এই নববর্ষের আগমনে স্বাগত সঙ্গীতে বিশ্ব ভরিয়া দিই। এই নববর্ষের স্বাগত সঙ্গীত নব নব রাগ রাগিণীর সুরে বাজিয়া উঠুক। তরুণ অরুণিমায় আজ ধরণীর পৃষ্ঠ মণ্ডিত করুক, আমরা সেই স্বর্গগত অমর কবি দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষায় বলি:—

আজ পুরাণ যা কিছু দাওগো ঘুচিয়ে,
মলিন যা কিছু ফেল গো মুছিয়ে,
শ্যামলে, কোমলে কনকে হীরকে
ভুবন ভরিয়ে দাও গো।
আজি বীণায় মুরজে স্বননে পরজে,
জাগিয়ে উঠুক গীতি গো
আজি হৃদয় মাঝারে অন্তর বাহিরে
ভরিয়া উঠুক প্রীতি গো।
আজি নূতন আলোকে নূতন পুলকে,
দাও গো ভাসায়ে ভূলোকে দ্যুলোকে,
নূতন হাসিতে বাসনা রাশিতে
জীবন মরণ ভরিয়ে দাও গো।

ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি।

মিশ্র আলাইয়া—ঝাঁপতাল।

(নববর্ষের প্রাতঃকালে আনন্দসভায় গীত)

নব বরষের আলো প্রবেশিল ঘরে।
উজলিল তব আলো বিশ্ব চরাচরে॥
তোমার মহিমা দেখি জগতের মাঝে।
গাহে সবে শুভ গীত শঙ্খ ধ্বনি বাজে॥
আনন্দ করহ সবে আজি মহোৎসব।
উষার শুভ্র আলোকে দেখা দিল নব॥
পূর্ণ তব জ্যোতিঃ কিবা চৌদিকেতে ভাসে।
রসভরা বসুন্ধরা পুলকিত হাসে॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী প্রতিভা দেবী।

২ ৩ ০ ১ ২ ৩
II { ধা ণা। ধা -পা পা। পা মা। গা -া মগা I গা রা। গমা -পা মা।
ন ব ব ০ র যে র আ ০ লো০ প্র বে শি ০ ০ ল

০ ১ ॥ ২ ৩ ০ ১
। গা -রা। সা -া -া I সা সা। মা -গা মা। পা পা। ধা -া না I
ঘ ০ রে ০ ০ উ জ লি ০ ল ত ব আ ০ লো

২ ৩ ০ ১
I র্সা র্রা। র্সর্রা -গা র্রা। র্সা -না। ধা -পা -া } II
বি শ্ব চ০ ০ রা চ ০ রে ০ ০

২ ৩ ০ ১ ২ ৩
II পা পা। র্সধা -র্সা র্সা। র্রা র্সা। র্সা -া র্সা I র্সা ধা। র্সা -া র্রা।
তো মা র০ ০ ম হি মা দে ০ খি জ গ তে ০ র

০ ১ ২ ৩ ০ ১
। র্সা র্সা। ধা -পা -া I { র্গা র্গা। র্গা -া র্মা। র্গা র্রা। র্সা না ধা I
মা ০ ঝে ০ ০ গা হে স ০ বে শু ভ গী ০ ত

২ ৩ ০ ১
I পা পা। ধনা -র্সর্রা র্সনা। ধা ণা। ধা -পা -া } II
শ ঙ্খ ধ্ব০ ০০ নি০ বা ০ জে ০ ০

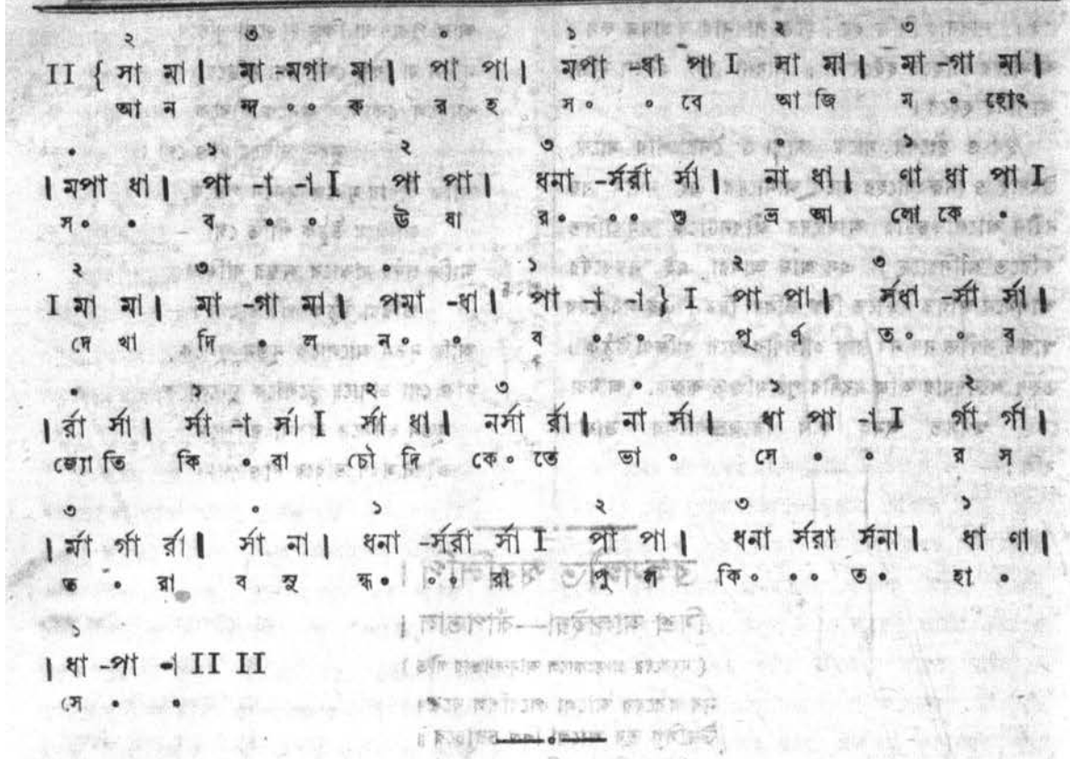

প্রতিদান।

(শ্রীহিরণ্ময়ী চৌধুরাণী)

দাও প্রভু, যত দুঃখ আছে মোরে দাও ;
যতেক যাতনা তব এ বিশ্ব সংসারে,
সবি মোরে দিয়ে তার বিনিময়ে নাও
দক্ষিণার মূল্যরূপে হে প্রভু আমারে।
তোমার সকল দান বহি নত শিরে,
দুঃখ ব্যথাভরা মোর ক্ষুদ্র দেহখান,
তোমারি চরণে সঁপি দিব ধীরে ধীরে
প্রতিদানে হে দয়াল! নাহি মোরে দান।

উন্নতি প্রসঙ্গ।

দুর্নীতি ও তাহার প্রতীকার—আমাদের দেশের হইল কি? আমরা কি শিক্ষিত হইয়াও প্রকৃত মানুষ হইব না? আমাদের যথার্থ হিত কোথায় তাহা বুঝিয়াও কি চলিতে শিখিব না? কিছুদিন পূর্ব্বে খুলনা বাসীতে দেখিলাম যে সেখানকার গভর্ণমেণ্টের কোন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর বিদায়োৎসব উপলক্ষে নাকি "খেমটা নাচের" বন্দোবস্ত হইয়াছিল। যাঁহারা শিক্ষিত, দেশের মধ্যে গণ্যমান্য, তাঁহারা কোথায় আদর্শস্থল হইয়া দেশের জনসাধারণকে মঙ্গলের পথে,—সত্যের পথে টানিয়া আনিবেন, না তাঁহারাই স্বয়ং সেই অতি ঘৃণ্য অমঙ্গলময় দুর্নীতির বীজ সাধারণের চিত্তক্ষেত্রে ছড়াইয়া দিতেছেন। কি লজ্জার কথা!

এবারকার তত্ত্ববোধিনীতে "দুর্নীতি ও তাহার প্রতীকার" যে প্রবন্ধটী বাহির হইয়াছে তাহাতে সমাজের দুর্নীতির প্রতি এইরূপ ঔদাসীন্যব্যাধির বিশেষ আলোচনা করা হইয়াছে। সমাজের এই ব্যাধিটি এতই প্রবল হইয়া উঠিতেছে যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই তাহার একটি জলন্ত দৃষ্টান্ত আমাদিগের প্রত্যক্ষ হইল।

ইহার বিপরীতে একটী ঘটনায় আমরা কিন্তু আশান্বিতও হইয়াছি, আমরা বুঝিয়াছি যে সমাজের এই ব্যাধি নিতান্ত দুশ্চিকিৎস্য নহে। সেদিন যখন অন্যতর পুলিস কোর্টের সুবিচারে একটী অসহায় রমণীকে ভুলাইয়া লইয়া যাইবার অপরাধে দুইটী দুষ্ট স্ত্রীলোকের সশ্রম কারাবাস দণ্ডাদেশ প্রচারিত হইল, তখন সেই শাস্তির আদেশ শুনিয়া আদালতে উপস্থিত জনসাধারণ যেরূপ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল—তাহাতে এ বিষয়ে দেশবাসীর মন যে বেশ একটু সজাগ হইয়া উঠিয়াছে তাহা স্পষ্টই অনুভূত হইয়াছিল।

মুসলমানের বঙ্গসাহিত্য চর্চ্চা—গত মাঘ মাসের আল এসলাম পত্রে শ্রীযুক্ত সিরাজী লিখিত বাঙ্গালা ভাষার পরিচর্য্যা প্রবন্ধ পাঠ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত

হইলাম। বহুকাল যাবৎ এদেশে একটা ধারণা ছিল যে মুসলমানের, হোক না কেন সে বাঙ্গালী, কেবল উর্দু, পারসী প্রভৃতি ভাষা নিজস্ব করা উচিত—বঙ্গভাষা কিছুতেই নহে। সুখের বিষয় যে এই ভ্রমান্ধ কুসংস্কার দূর হইতেছে। "বঙ্গীয় মুসলমান পুঁথিসাহিত্যের সংখ্যা প্রায় ৮৭০০।" শুনিলেও যে আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। লেখক যে বঙ্গভাষাকেই বঙ্গবাসী মুসলমানের মাতৃভাষা সিদ্ধান্ত করিয়া তাহারই চর্চ্চায় বঙ্গবাসী মুসলমানদিগকে উৎসাহিত করিয়াছেন, ইহা বর্ত্তমান সময়ের যেমন উপযোগী, তেমনি ইহা সমীচীন হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে যদি চিন্তাশীল লেখক উঠিয়া বুঝিয়া-সুঝিয়া রহিয়া বসিয়া উর্দু প্রভৃতি ভাষার শব্দসমূহ যথাযুক্তরূপে আপনাদের লেখায় প্রবেশ করাইতে পারেন, তবেই তো সেগুলি ক্রমেই বঙ্গভাষার নিজস্ব হইয়া দাঁড়াইবে। তখন আর বঙ্গীয় মুসলমান লেখকদিগকে বিদ্যাসাগরী ভাষার জন্য দুঃখবোধ করিতে হইবে না। যদি তাঁহারা উর্দু প্রভৃতি ভাষার শব্দ জোর জবরদস্তিতে তাঁহাদের লেখায় বড় বেশী ঢুকাইতে যান, তবে আমাদের বিশ্বাস যে তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। এই সূত্রে তাঁহাদিগকে অনুরোধ করি যে তাঁহাদের সাহিত্যসমিতি হইতে একটী উর্দু-বঙ্গ এবং বঙ্গ-উর্দু অভিধান প্রণয়ন করুন। এরূপ একটী অভিধান থাকিলে (বঙ্গাক্ষরে লিখিত) তাহার অনেক কথা বঙ্গভাষায় ঢুকাইবার বিশেষ সুবিধা হইবে।

সমাজ সেবা—আমাদের দেশের উন্নতির অন্যতর প্রধান লক্ষণ এই যে দেশে মানবসেবার একটা মহান্ ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে। মানবসেবার যে প্রবল তরঙ্গ আসিয়াছে, এই তরঙ্গ উঠাইবার মূল মহাত্মা বিবেকানন্দ স্বামী। স্বামী বিবেকানন্দ এই ভাব জাগাইয়া তুলিবার জন্য দেশের চিরনমস্য হইয়া থাকিবেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম সর্ব্বপ্রথম বলিতে গেলে স্পষ্টাক্ষরে ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধনকে তাঁহার উপাসনার অন্যতর অঙ্গ ঘোষণা করিয়া মানবসেবারও বীজ দেশে ভাল করিয়া প্রোথিত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ সেই বীজকে সযত্নে লালনপালন করিয়া আজ তাহাকে ফলবান বৃক্ষে পরিণত করিয়াছেন। সমাজসেবাসমিতির প্রদর্শনী খুলিবার উপলক্ষে সার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় একটী মহান্ সত্য ঘোষণা করিয়াছেন যে, জীবনের লক্ষ্য কেবল নিজেকেই উন্নতির চরম শিখরে তোলা নহে, কিন্তু অপর সকলকে সুখী করা।

গ্রন্থ পরিচয়।

The Bose Institute :—হিন্দুপেট্রিয়ট আফিস হইতে এই পুস্তিকা খানি প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র। ইহাতে সার জগদীশচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক তাঁহার বিজ্ঞানমন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবসে প্রদত্ত বক্তৃতা, অধ্যাপক প্যাট্রিক গেডিসের লেখনীপ্রসূত বিজ্ঞানমন্দিরসম্বন্ধীয় একটী প্রবন্ধ, আমেরিকার Scientific American নামক সুপ্রসিদ্ধ পত্র হইতে উদ্ধৃত সার জগদীশচন্দ্রের প্রাণের একতা বিষয়ক প্রবন্ধ এবং বিজ্ঞানমন্দির সম্বন্ধীয় অন্যান্য বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তিকাখানি ছবিতে ছবিতে ভরা। ইহার পক্ষে ১৲ এক টাকা মূল্য যৎসামান্য। বিজ্ঞান মন্দিরের ন্যায় বঙ্গের এত বড় গৌরবের জিনিস যে পুস্তিকাতে বর্ণিত আছে, তাহা বঙ্গের ঘরে ঘরে এক এক খণ্ড রাখা উচিত।

সংবাদ।

আনন্দ সভা—গত ১লা বৈশাখে আদিব্রাহ্মসমাজের অন্যতর সভাপতি সার আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের বাটীতে আনন্দ সভার বার্ষিক অধিবেশন সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। তাঁহার ও তাঁহার পত্নী শ্রীমতী প্রতিভা দেবীর আতিথেয়তায় অভ্যাগত সকলেই মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। এই অধিবেশন উপলক্ষে বৈদিক অর্চ্চনা মন্ত্র (ওঁ পিতা নোঽসি) এবং ব্রাহ্মধর্ম্মোক্ত স্তোত্র (ওঁ নমস্তে সতেতে জগৎ কারণায়) পাঠ করিয়া সভার কার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছিল। সঙ্গীত সঙ্ঘের ছাত্রীগণ স্বরসন্ধিসহ সেতার বাদ্যে সকলকেই আনন্দিত করিয়াছিলেন। ভবানী সাহিত্যসভার সভ্যগণ কর্ত্তৃক মধ্যে মধ্যে ছোটখাটো অভিনয় প্রদর্শিত হইয়াছিল। আমরা এইরূপ নির্দ্দোষ আমোদ অনুষ্ঠানের পক্ষপাতী—ইহাতে ছেলেদের মনের "খোঁচ" অনেকটা কাটিয়া যায়।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে গত বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত বঙ্গসাহিত্যের প্রাচীন যুগ প্রবন্ধ সাধারণের উপাদেয় লাগিয়াছে—ইহা গত সংখ্যায় শিক্ষাসমাচারে উদ্ধৃত হইয়াছে।

অনুষ্ঠান পদ্ধতি—আমরা গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ কোন উচ্চতন কর্ম্মচারীর নিকট হইতে আদিব্রাহ্মসমাজের অনুষ্ঠান পদ্ধতি সম্বন্ধে একটী অভিমত পাইয়াছি, তাহা এস্থলে সাদরে প্রকাশ করিলাম।

The book appears to me the very best of its kind, and I only wish that the cultured and educated Hindu families of Bengal followed these principles, which any Hindu can adopt without much difficulty.

শোক সংবাদ।

৺উমাশশী দেবী—আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত অবগত হইলাম যে আদিব্রাহ্মসমাজের সংশ্লিষ্ট ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুলপুরোহিত শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ শিরোমণির পত্নীবিয়োগ ঘটিয়াছে। বিগত ৫ই বৈশাখ ৪৮ বৎসর বয়সে বিষম কলেরারোগে তাঁহার দেহান্ত হয়। সুমিষ্ট ব্যবহারে তিনি প্রতিবেশী সকলেরই শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। প্রচলিত সংস্কার অনুসারে বহুসংখ্যক স্ত্রীলোক তাঁহার শিঁথির সিন্দুর সংগ্রহ করিবার জন্য মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে সমবেত হইয়াছিলেন। আমরা পরলোকগত আত্মার কল্যাণ কামনা করি। ঈশ্বর শোকসন্তপ্ত পরিবারকে শান্তি প্রদান করুন ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

৺স্বর্ণপ্রভা বসু—বিগত ১৭ই বৈশাখ মঙ্গলবার পরলোকগত শ্রদ্ধেয় আনন্দমোহন বসুর পত্নীর দেহান্ত হইয়াছে। তিনি সুশিক্ষিতা মহিলা ছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনেক শুভানুষ্ঠানের সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উপর তাঁহার অপরিমেয় শ্রদ্ধা ছিল। মহর্ষি তাঁহার পরলোক গমনের পূর্ব্বে যখন যোড়াসাঁকোতে তাঁহার আবাস-নিকেতনে থাকিতেন, আমরা প্রায়ই বসুজায়াকে তথায় দেখিতে পাইতাম। তিনি মহর্ষিকে বার্দ্ধক্যে সেবা করিতে বড়ই আনন্দ পাইতেন। মহর্ষিও তাঁহাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন, তাঁহার মত নিষ্ঠাবতী রমণীকে হারাইয়া আমরা সন্তপ্ত হইয়াছি। ঈশ্বর তাঁহার আত্মার সহায় হউন।

৺গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়—সুবিখ্যাত পুস্তক প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বিগত ১২ইবৈশাখ পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি অনেকগুলি দরিদ্র পুস্তক রচয়িতার উৎসাহদাতা ছিলেন। গুরুদাস বাবু না থাকিলে তাঁহাদের অনেক সুযোগ্য লেখকের রচিত পুস্তক আদৌ প্রকাশিত হইত কি না সন্দেহ। তিনি সাধুতায় সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন হইতে পারিয়াছিলেন। তিনি বঙ্গদেশে গ্রন্থপ্রকাশকের অগ্রণী ছিলেন, এবং এই ক্ষেত্রে বাঙ্গালীদের মধ্যে তিনিই প্রথম নূতন পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার আদর্শে আজকাল অনেকে সুলিখিত ও সুচিন্তিত পুস্তকের প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। আমরা গুরুদাস বাবুর মৃত্যুতে দুঃখিত হইয়াছি। তাঁহার সুযোগ্য পুত্রগণ পিতার পথ তুল্যভাবে অনুসরণ করিতে পারিবেন আমরা এইরূপ আশা করি।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

গত চৈত্র মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত "কেশবচন্দ্র—ব্রাহ্মসমাজে আগমনের পূর্ব্বে" প্রবন্ধে পুস্তক দেখিয়া গণিত প্রশ্নের উত্তর লিখিবার কারণে কেশবচন্দ্রকে পরীক্ষা হইতে উঠাইয়া দিবার কথা লিখিত হইয়াছে। ইহাতে ব্রহ্মানন্দের আত্মীয় স্বজনেরা মনে ব্যথা পাইয়াছেন জানিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। আমরা এবিষয় লেখকের কর্ণগোচর করাতে তিনি আমাদিগকে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রকাশ করিলাম :—

"আমার প্রবন্ধের কোন অংশে কেশবচন্দ্রের কোন কোন আত্মীয় হৃদয়ে ব্যথা পাইয়াছেন জানিয়া আমি নিজেও অত্যন্ত ব্যথিত হইলাম। কেশবচন্দ্রের আত্মীয় ছাড়িয়া অন্য কোন ব্যক্তিও এতটুকু আঘাত পাইবেন জানিলে আমি উহা প্রকাশ করিতাম কি না সন্দেহ। ব্যথা দেওয়া আমার উদ্দেশ্য ছিল না। আমার ইহাই দেখানো উদ্দেশ্য ছিল যে কি সামান্য ঘটনা হইতে ভগবানের কি প্রকার মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। ইহাই আমি প্রবন্ধে খুব স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছি। আলোচ্য বিষয়টী এতই প্রচারিত যে ইহা প্রকাশ করিলে যে কাহারও মনে আঘাত লাগিবে তাহা আমার কল্পনাতেও স্থান পায় নাই। এই বিষয়টী শ্রদ্ধেয় ৺প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের Life and Teachings of Keshab Chandra Sen গ্রন্থে প্রথম দেখি, ঐ কথাই শ্রদ্ধেয় ৺ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল মহাশয়ের কেশব চরিত গ্রন্থে (১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণেও) দেখি। তাহাই শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের History of the Brahmo Samajএও উল্লিখিত দেখি। কাজেই বিষয়টীর সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ উপস্থিত হয় নাই। বর্ত্তমানে দেখিতেছি এই ঘটনা সম্বন্ধে কেহ কেহ সন্দেহ প্রকাশ করেন। আমি উপরোক্ত তিনজন মনীষী ব্যক্তির প্রধানত পদানুসরণ করিয়াছি মাত্র। যাই হৌক, এই ঘটনা উল্লেখ করাতে যখন একজনেরও হৃদয়ে আঘাত লাগিয়াছে, তখন আমিই তাহাতে অধিকতর আঘাত পাইলাম, তাহা বলা বাহুল্য।"

আয় ব্যয়।

১৮৩৯ শকের বৈশাখ মাস হইতে
চৈত্র মাস পর্য্যন্ত।
আদিব্রাহ্মসমাজ।

আয়	৯৭৮২/১
পূর্ব্বকারস্থিত	৩৸৶/১১
সমষ্টি	৯৭৮৬/০
ব্যয়	৯৭৮০৶/৬
স্থিত	৫৸৶/৬

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ।

মাসিক দান	১৪০০৲
বণ্ডেড অয়ার হাউস	১০০৲
কাগজের সুদ	৫০৸৬
সাম্বৎসরিক দান	২৮৲
আনুষ্ঠানিক দান	১০৩৷৷৬
এককালীন দান	৬১৫৷৷০
দানাধারে প্রাপ্ত	৫৷৷৶০
মাঘোৎসবের দান	৬১৷৷৶০
থিওলজিক্যাল কলেজ ফণ্ড	৬২৫৲
সসপেন্স	১৭৶৭
গচ্ছিত আদায়	১০১১৶৯
হাওলাত আদায়	৬৬৷৷৶৬
হাওলাত জমা	২৭০০৸৶৩
সমষ্টি	৭৭৮৯৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

বকেয়া মূল্য	১২৬৲
হাল মূল্য	২০৪৸৶০
মাশুল	১৬৷৷৶০
নগদ বিক্রয়	৫৸৶০
সমষ্টি	৩৫৩৷৷০

পুস্তকালয়।

সমাজের পুস্তক	১৩১৸৬
গচ্ছিত পুস্তক	১৪৫৲
কমিশন	৷৷৶৯
মাশুল	১৩৶৬
সমষ্টি	২৯০৷৷৶৯

যন্ত্রালয়।

তত্ত্ববোধিনী মুদ্রণ	৪৮৫৲
সমাজের পুস্তক মুদ্রণ	৭৩৲
অপরের পুস্তক মুদ্রণ	৫৪৫৷৷৶৬
কাগজের মূল্য	২১৭৷৶৯
দপ্তরী	২৮৲
সমষ্টি	১৩৪৮৸৶৩
	৯৭৮২/১

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ।

পাথেয়	১৪২৶
কর্ম্মচারীর বেতন	৭৭২৲
সরঞ্জামী	৮৶৬
ডাকমাশুল	৯৸৶৩
পাখাকুলি	৭৷৷৯
Electric Light	৪১৷৷৶০
Tax	২০৭৸৶০
License	১২৲
খাজনা	১৶৩
সসপেন্স	৯৫৲
পূর্ত্তকার্য্য	১২৭৶০
পায়খানা	৩৫৬৲
কাগজ ক্রয়	৩৫১৶০
থিওলজিক্যাল কলেজ ফণ্ড	৬৩১৷৷৶৯
অন্যান্য	১৫৫৸৶৬
গচ্ছিত খরচ	৯১৭৸৶৬
হাওলাত	৩৬৸৬
হাওলাত শোধ	২২৪১৷৷৶৯
কাগজ গচ্ছিত	৫০০৲
সমষ্টি	৬৬১৫৸৶৯

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

কাগজ ক্রয়	৩১৬৸৬
পত্রিকা মুদ্রণ	৪৮৫৲
প্রবন্ধ	১৭১৶০
বাঁধান	৩০৲
ডাকমাশুল	৬৪৶৬
কর্ম্মচারীর বেতন	৭০৲
সমষ্টি	১১৩৭৸৶০

পুস্তকালয়।

দপ্তরী	১৸৶০
পুস্তক ক্রয়	৬৶০
আসবাব	৫২৷০
গচ্ছিত পুস্তকের মূল্য শোধ	৬০৷৷৶০
পুস্তক বিক্রয়ের কমিশন	১৭৶৬
বিজ্ঞাপন	৬৷৶০
ডাকমাশুল	১৩৸৶৯
অন্যান্য	১৶৬
মূল্য ফেরত	৸৶০
সমষ্টি	১৬০৷৶৯

যন্ত্রালয়।

কর্ম্মচারীর বেতন	৯৯৭৷৷৶০
জলপানী	৩৶০
প্রুফ কাগজ	১৩৷৶৩
ছাপার কাগজ	৪১৭৸৶৬
কালী	১৩৶০
দপ্তরী	৫০৷৷০
অক্ষর	১৫০৲
অতিরিক্ত পারিশ্রমিক	৬২৸৬
অন্যান্য সরঞ্জামী	১৫৬৸৯
সমষ্টি	১৮৬৫৷৷৶০
	৯৭৮০৶/৬

কৃতজ্ঞতা সহকারে নিম্নলিখিত দান প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি

উৎসবের দান।

শ্রীযুক্ত	সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০৲
,,	ভবনাথ রায়	১৲
,,	চুণীলাল মজুমদার	১৲
,,	হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	৵০
,,	চন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত	২৲
,,	পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়	১৲
,,	যদুনাথ মুখোপাধ্যায়	১৲
,,	চারুচন্দ্র মিত্র	১৲
,,	রাধাকিষণ ভট্টাচার্য্য	১৲
,,	দুলালচাঁদ মল্লিক	॥০
,,	বিষ্ণুচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৲
,,	ভগবতীচরণ মিত্র	১৲
,,	ক্ষণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	১৲
,,	বিনোদবিহারী দত্ত	১৲
,,	হরিশ্চন্দ্র মিত্র	১৲
,,	বীরেন্দ্র চন্দ্র শীল	॥০
,,	মুটবেহারী চট্টোপাধ্যায়	॥০
	G. Sarwar	॥০
,,	মনীন্দ্রনাথ রায়	।০
,,	রমেশচন্দ্র দত্ত	৪৲
,,	জিতেন্দ্রনাথ দাস	।০
,,	দক্ষিণারঞ্জন চন্দ্র	।০
,,	কল্যাণচন্দ্র বড়াল	॥০
,,	শ্রীশকুমার মুখোপাধ্যায়	।০
,,	তারিণীচরণ গুপ্ত	১৲
,,	লালচাঁদ সাহা	।০
,,	অম্বিকাচরণ মিত্র	১৲
,,	গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৲
,,	সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৲
,,	অবনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৲
,,	তুলসীদাস দত্ত	২৲
,,	বরদাচরণ চন্দ্র	।০
,,	শ্যামলাল সরকার	৪৲
,,	দ্বিজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	॥০

১৮৩৯ শকের শ্রাবণ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত	ভৈরবচন্দ্র দত্ত	১৮৩৭ ও ১৮৩৮ শক	৫৲
,,	সীতানাথ বক্সী	১৮৩৭। ৩৮ ও ৩৯ শক	৯৲
,,	সতীনাথ রায়	১৮৩৮ ও ১৮৩৯ শক	৬৲
,,	সুশীলকুমার গুপ্ত	১৮৩৮ শক	২৲
,,	ভগবতীচরণ মিত্র	১৮৩৮ ও ১৮৩৯ শক	৩৲
,,	সুধীন্দ্রনাথ নন্দী	১৮৩৮ ও ১৮৩৯ শক	৪৲
,,	শ্রীজানকীনাথ রায়	১৮৩৮ শক	১৲
,,	রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ	১৮৩৬। ৩৭ ও ১৮৩৮ শক	৩৲
,,	তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী	১৮৩৯ শক	৩৲
	S, D. Gupta Esqr.	,,	৩৲
শ্রীযুক্ত	চারুচন্দ্র বসু	,,	৩৲
,,	ভূজেন্দ্রনাথ মিত্র	,,	১॥০
ডাক্তার	জি, এল, গুপ্ত	,,	২৲
	পি, সি চৌধুরী স্কোয়ার	,,	৩৲
শ্রীযুক্ত	তেজেশচন্দ্র বসু	,,	৩৲
,,	মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী	,,	৩৲
	C. S. Ghosal Esqr.	,,	৩৲
মাননীয়	মহারাজা হৃষিকেশ লাহা বাহাদুর	,,	৩৲
শ্রীযুক্ত	প্রসাদদাস মল্লিক	,,	৩৲
,,	গোবিনলাল দাস	,,	৩৲
রায়	বাহাদুর রাজেন্দ্রকুমার বসু	,,	২৲
শ্রীযুক্ত	বিজয়মাধব মুখোপাধ্যায়	,,	১৲
,,	বিজয়চন্দ্র সিংহ	,,	৩৲
,,	পান্নালাল মিত্র	,,	৩৲
,,	লালবিহারী বসাক	,,	৩৲
,,	গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	,,	৩৲
,,	রসিকলাল রায়	,,	১॥০
,,	কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ	,,	৩৲
,,	রজতমোহন চট্টোপায়	,,	৩৲
,,	প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য	,,	২৲
,,	অক্ষয়কুমার সিংহ	,,	৩৲
,,	বনমালী চন্দ্র	,,	৩৲
,,	আশুতোষ চক্রবর্ত্তী	,,	৩৲
,,	রণেন্দ্রমোহন ঠাকুর	,,	৩৲
,,	সতীশচন্দ্র মল্লিক	,,	৩৲
,,	কালীপ্রসাদ বিদ্যাপঞ্চানন	,,	২৲
,,	অসিতবরণ মিত্র	,,	২৲
মিসেস	আর, এন, রায়	,,	২৲
শ্রীযুক্ত	উপেন্দ্রনাথ সেন	,,	৩৲
ডাক্তার	বি, এল, চৌধুরী	,,	৩৲
রাজা	শ্রীনাথ রায় বাহাদুর	,,	৩৲
শ্রীযুক্ত	বিষ্ণুচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮৩৯ শক	৩৲
,,	বটকৃষ্ণ ঘোষ	১৮৪০ শক	২৲
শ্রীমতী	মোহিনী সেন গুপ্তা	১৮৩৯ শক	২৲
শ্রীযুক্ত	ফকিরচন্দ্র নাথ	,,	২৲
,,	পূর্ণচন্দ্র দত্ত	১৮৪০ শক	১॥০
রায়	বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ সেন	১৮৩৮ ও ১৮৩৯ শক	৬৲
শ্রীযুক্ত	পান্নালাল দে	১৮৩৮ হইতে ১৮৪০ শক	৯৲
,,	মনোহর মুখোপাধ্যায়	১৮৩৮ ও ১৮৩৯ শক	৬৲
,,	সত্যরঞ্জন বসু	১৮৩৮ শক	২৸০
,,	দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস	১৮৩৬ হইতে ১৮৩৯ পর্য্যন্ত	৮৲
রায়	সাহেব নীলকান্ত মুখোপাধ্যায়	১৮৩৫—১৮৩৯	১৫৲০
শ্রীযুক্ত	রাধাকান্ত আঢ্য	১৮৩৪ হইতে ১৮৩৬ শক	৫৲
,,	হৃদয় চন্দ্র আচার্য্য	১৮৩৭ ও ১৮৩৮ শক	৪৲
,,	অন্নদাচরণ চট্টোপাধ্যায়	১৮৪০ শক	৩৲
,,	যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়	১৮৩৯ শক	৩৲
,,	গৌরহরি নন্দী	১৮৩৯ শক	১॥০
,,	প্রফুল্লকুমার বাগচী	১৮৩৯ শক	২৲
,,	পাঁচুগোপাল মল্লিক	১৮৪০ শক	৩৲
,,	শিশিরকুমার দত্ত	১৮৪০ শক	১॥০
,,	পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১৮৪০ শক	৩৲
মাননীয়	মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী	১৮৪০ শক	৩৲

১৮৩৯ শকের শ্রাবণ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত দান প্রাপ্তি।

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত	গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	১০৲
,,	বনমালী চন্দ্র ...	১৲
শ্রীমতী	হেমাঙ্গিনী বসু	১৲
,,	স্বর্ণকুমারী দেবী	১৲
শ্রীযুক্ত	পাঁচুগোপাল মল্লিক	৪৲

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২০৲
শ্রীমতী সরোজিনী দেবী	২০৲
শ্রীযুক্ত পান্নালাল দে	২৫৲
শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী	৫৲
,, প্রতিভা দেবী	২৫৲
,, মোহিনী সেন গুপ্তা	২৲

এককালীন দান।

শ্রীশরৎচন্দ্র চৌধুরী	৫০০৲

শ্রীযুক্ত হৃদীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীশঙ্কর নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণের উপনয়ন উপলক্ষে দান ১০০৲

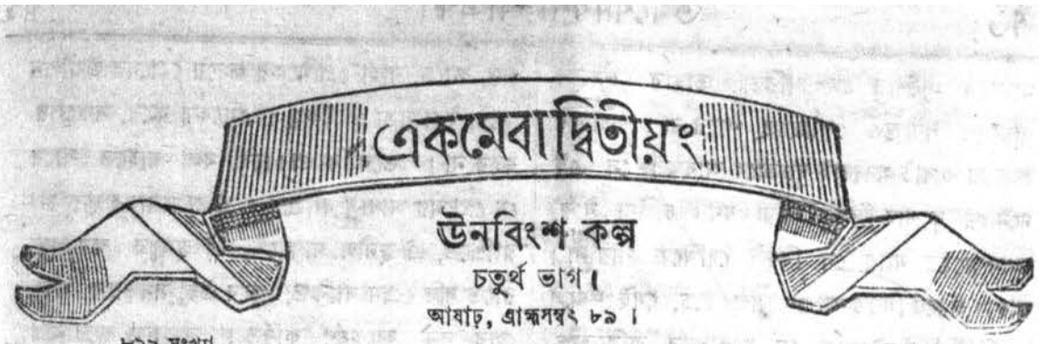

উনবিংশ কল্প
চতুর্থ ভাগ।
আষাঢ়, ব্রাহ্মসম্বৎ ৮৯।

৮৯ সংখ্যা

১৮৪০ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"আত্মা বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"

প্রার্থনা।

(শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত)

জগতের দ্বার হতে আমারে তোমার দ্বারে
ডেকে লও দয়াময়! বারেক করুণা করে।
পথে পথে, পথে পথে, তিতি' শুধু নেত্রাসারে—
ঘুরিতে পারি না আর সারাটী জনম ধরে॥

দাও দেব! কণ্ঠে মম বিহঙ্গের মধু তান,
পরাণে ফুলের হাসি, তটিনীর প্রেমোচ্ছ্বাস,
গাহিতে একান্তে শুধু তোমারি আরতি-গান,
আনন্দে আপনা-হারা নিশিদিন-বর্ষ-মাস॥

দাও নাথ! হৃদে মম মলয়ের পরশন,
পুলকে খেলিয়া যাক্ সুধাধারা চন্দ্রমার,
সুপ্তি যেন টুটে যায়, যেন আসে জাগরণ,
রাতুল চরণে তব অর্পিবারে অর্ঘ্যভার॥

হে প্রভু, হে দীনবন্ধু, বড় শ্রান্ত চিত আজ,
ক্ষণেক বিশ্রাম শুধু, দাও মোরে বিশ্বরাজ!

আনন্দ।

নানা জাতি ফুল ফুটিয়া নানা বর্ণে উদ্যানটীকে সুসজ্জিত করিয়াছে। সৌরভে দশদিক্ আমোদিত হইতেছে। আকাশে অসংখ্য নক্ষত্রমালা, পূর্ণ শশধর শোভা পাইতেছে। অদূরে বনরাজি, পর্ব্বতমালা, কল-নিনাদিনী তটিনী। নৈশ বায়ু রহিয়া রহিয়া বহিতেছে।

এই মনোহর দৃশ্য অবলোকন করিয়া তুমি প্রেমিক, তোমার হৃদয় আনন্দে বিভোর হইয়া সেই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যসুধা পান করিতেছে। তুমি আত্মহারা হইয়া সেই সুধাসিন্ধুতে ভাসমান হইয়াছ। আমি প্রেমিক নহি, কিন্তু প্রেমিকদের সহবাসে থাকিয়া কতকটা প্রেমের আভাস পাইয়াছি, তাই আমিও সেই সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়া চক্ষু ফিরাইতে পারি না। তাহার পানে তাকাইয়া থাকি এবং যদিও সেই সমুদ্রে ডুবিয়া যাইতে না পারি, কতকটা আনন্দ অনুভব করি। আমার হৃদয়রূপ শুষ্ক ভূমিতে যেন বারিবিন্দু বর্ষণ হইতে থাকে। আমার নিরবছিন্ন দগ্ধ-হৃদয় যেন যন্ত্রণা হইতে ক্ষণকালের জন্য মুক্তিলাভ করে। আমি মনে করি যদি ঐ সৌন্দর্য্যরাশি রাখিবার জন্য আমার হৃদয়ে প্রচুর স্থান থাকিত, তাহা হইলে আমি সেগুলিকে হৃদয়ে পোষণ করিয়া চিরজীবন সুখী হইতাম; কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে আমার হৃদয় নিতান্ত সংকীর্ণ, সে শান্তিবারির এক বিন্দুর অতিরিক্ত ধরিবার স্থান নাই, তাই আমি ঐ প্রেমিকের ন্যায় পরম-আনন্দে বঞ্চিত।

হতভাগ্যের উপরেও হতভাগ্য আছে। আমার ত দশা এই; আবার ঐ ভাগ্য-হীনের পানে একবার চাহিয়া দেখ, তাহার হৃদয়টী দুঃখে পরিপূর্ণ। এই

মনোহর দৃশ্যের চমৎকারিতা তাহার হৃদয়ের দ্বারদেশ পর্য্যন্তও পৌঁছিতে পারে না। তাহার হৃদয়ের কপাট সর্ব্বদাই দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ। সে এই মনোহর দৃশ্যের ভিতর দিয়া যখন চলিয়া যায়, তখন অন্ধের ন্যায় সে কিছুই দেখিতে পায় না। তাহার হৃদয়ে নিয়ত আগুন জ্বলিতেছে, সেই অনলে সে নিয়ত দগ্ধ হইতেছে, সে হাহাকার করিতেছে, জগতের কোন বস্তুই তাহার তৃপ্তিসাধন করিতে পারে না, পক্ষান্তরে সুন্দর সুমনোহর বস্তুগুলি তাহার হাহাকার বৃদ্ধি করিয়া দেয়।

হাহাকার কিসের? অভাবের। এ অভাব এমনি যে, জগতের কোন বস্তু দ্বারা তাহা পূর্ণ হয় না। যত পায় ততই এ অভাব বাড়ে বই আর কমে না। কোন একটী বস্তু লাভ করিলে এই অভাব পূর্ণ হইবে মনে করিয়া তাহা লাভ করিবার জন্য সে নিয়ত চিন্তায়, পরিশ্রমে, হাহুতাশে অতিবাহিত করে। কিন্তু সে বস্তুটীকে পাইয়াও সে সুখী হয় না, কারণ তখন সে দেখিতে পায়, উহার দ্বারা তাহার অভাব পূর্ণ হয় না। হৃদয়ের অশান্তি যেমন তেমনই থাকিয়া যায়। তখন আবার অপর একটী বস্তু লাভ করিয়া অভাব পূর্ণ করিবার আশায় যত্ন ও চেষ্টা আরম্ভ করে। উত্তরোত্তর লালসা বৃদ্ধিই হইতে থাকে, অভাব পূর্ণ হয় না, শান্তি আসে না। তাহার হৃদয় যাহা চায়, তাহা পায় না। কোন কালে সে সুখী হইতে পারে না। সুখ বস্তুতে নাই, ঐশ্বর্য্যে নাই, বিলাসিতায় নাই। সুখ কোথায় আছে? সুখ প্রেমে আছে। যাহার হৃদয়ে প্রেম আছে, সে নিত্য-সুখী, তাহার অভাব কিছুমাত্র নাই, তাহার হৃদয় সদাসর্ব্বদা পরিপূর্ণ। জগতের প্রত্যেক বস্তুই তাহার নিকট অনন্ত স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে রঞ্জিত। প্রেম শূন্য হৃদয় মরুভূমি সদৃশ। বারিধারা পতিত হইলেও শুষ্ক হইয়া যায়।

সুখ প্রেমে। প্রেমের স্থান হৃদয়, সুতরাং বাহ্য বস্তুর সহিত প্রেমের বা সুখের অতি সামান্য সম্বন্ধ। হৃদয়ে প্রেম না থাকিলে বাহ্য বস্তু কোন প্রকারে আমাদিগকে সুখী করিতে পারে না। বাহ্য বস্তুর সুখোৎপাদনের অধিকার থাকিলে উহা সমভাবে সকলকে সুখী করিত। বাহিরে অনেক বস্তু, আছে, যাহা প্রেমিকের হৃদয়ে প্রেমের উদ্দীপন করে, ইহা সত্য। কিন্তু প্রেমিকের করে, সকলের করে না। তবে কি প্রকারে বলা যাইতে পারে যে প্রেমের আবাস বাহিরে? ঐ সুমনোহর কুসুমরাশিতে, ঐ সুনীল আকাশে, ঐ সুমধুর স্বর-লহরীতে যদি প্রেম থাকিত, তবে উহা সমভাবে সকলের মন আকর্ষণ করিত। তাহা ত করে না। ঐ প্রেমিক যে আত্মহারা হইয়া পড়ে, আমি হই না কেন? ঐ হতভাগ্য কেন সঙ্গীতের স্বরমাধুর্য্য শ্রবণ করিয়া কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করে? প্রেম প্রেমিকের হৃদয়ে বাস করে। বাহিরের বস্তুগুলি যে এত সুন্দর, তাহা ঐ প্রেমিকের হৃদয়ের প্রেমরাশি বিনির্গত হইয়া উহাদিগকে রঞ্জিত করে বলিয়া। তাই উহারা আমার নিকট যত সুন্দর, প্রেমিকের নিকট তদপেক্ষা অনেক অধিক সুন্দর এবং অপ্রেমিকের নিকট সৌন্দর্য্যহীন।

জগতে এমন কতগুলি বস্তু আছে, তাহা সাধারণতঃ অনেকের হৃদয়ে প্রেমোদ্দীপন করে, তাই বলিয়া প্রেম যে ঐ সকল বস্তুতে বাস করে, ইহা বলা যায় না। অধিকাংশের হৃদয়ে ততটুকু প্রেম আছে যাহা দ্বারা ঐ সকল বস্তু প্রেমরঞ্জিত হয়। আবার ইহাও দেখা যায় যে ততটুকু প্রেমেরও অভাব কোন কোন হৃদয়ে কোন কোন সময়ে ঘটিয়া থাকে। চন্দ্রকিরণ বা মলয়হিল্লোল যে ব্যক্তি-মাত্রেরই প্রেমের সামগ্রী, ইহা বলা যায় না। এমনও লোক আছে যে, এসবে কিছুমাত্র সৌন্দর্য্য দেখিতে পায় না। আবার আজি যাহা প্রিয় হয়, অনেক সময়ে কাল তাহা প্রিয় হয় না। শোকসন্তপ্ত-হৃদয় চন্দ্রকিরণাদি কিছুই উপভোগ করিতে সমর্থ নহে, অথচ ঐ ব্যক্তিই শোক-সন্তপ্ত হইবার পূর্ব্বে ঐ সকল বস্তুতে প্রেমানুভব করিত। ফল কথা, হৃদয়ে প্রেম জাগ্রত না হইলে বাহিরের কোন বস্তুই প্রেম আনিতে পারে না। বাহিরের কোন বস্তুতে প্রেম নাই। প্রেমের উৎস অন্তরে; ঐ উৎস অন্তর হইতে প্রবাহিত হইয়া বহির্জ্জগতকে প্লাবিত করে। বাহিরের প্রত্যেক সুন্দর বস্তুটী অন্তরের প্রেমে বিনির্ম্মিত। যাহার অন্তরে যত অধিক প্রেম, বাহিরের প্রেমের বস্তুও তাহার নিকট তত অধিক। যিনি প্রেমময় তাঁহার নিকট বিশ্ব-

সংসারের যাবতীয় বস্তুই স্বর্গীয় প্রেমে রঞ্জিত। ঐ শিশুর পানে তাকাইয়া দেখ, অধিক দূরে যাইতে হইবে না। শিশু যাহা দেখিতেছে, যাহা পাইতেছে, তাহাতেই আনন্দ অনুভব করিতেছে। অন্তরের প্রেমের বস্তুও তাহার নিকট অনন্ত। তুমি আমি যাহা দেখি তাহাই মাত্র সে দেখে না, তাহা ছাড়া আরও অনেক অধিক দেখে। অনন্ত প্রেমের রাজ্য তাহার সম্মুখীন হয়, অনন্ত সৌন্দর্য্য-রাশিতে সে পরিবেষ্টিত হয়; সে সৌন্দর্য্য, সে প্রেম, সাধারণ দৃষ্টির অগোচর!

হৃদয়ভেদে যে প্রেমের ন্যূনাধিক্য দৃষ্ট হয় তাহার কারণ কি? প্রেমের উৎস কি কাহারও হৃদয়ে বড়, আর কাহারও হৃদয়ে ছোট? প্রেমের উৎস অনন্ত, তাহার ছোট বড় নাই সকল হৃদয়ে সমভাবে আছে। কাহারও হৃদয়ে এই উৎস চাপা পড়িয়া আছে, আর কাহারও হৃদয়ে উহা উন্মুক্ত হইয়া রহিয়াছে, তাই হৃদয়ভেদে প্রেমিকতার ন্যূনাধিক্য দৃষ্ট হয়। উৎস উন্মুক্ত হইলে প্রত্যেক হৃদয় অনন্তপ্রেমে প্রেমিক হইবে। আমাদের দেহটী পার্থিব হইলেও আমরা পার্থিব নহি। আমার "আমি" বলিতে যাহা আছে—তাহা সেই অনন্ত "আমি"র অবতার। আমার "আমি"ও অনন্ত। আমাতেও সেই অনন্তের অনন্তত্ব আছে। আমার দেহটী সান্ত হইলেও, আমি অনন্ত। আমার প্রেমও অনন্ত, আমার জ্ঞানও অনন্ত, আমার সত্তাও অনন্ত। আমি প্রেম, জ্ঞান ও সত্তা কোথায় পাইব? এসকল সেই অনন্ত হইতে আসিয়াছে। দৃষ্টিশক্তির দোষেই হউক, কি কোন আবরণবশতই হউক, সময় সময় বৃহৎ বস্তুকে যেমন ক্ষুদ্র দেখায়, আমার "আমি"কেও আমি সেইরূপ ক্ষুদ্র দেখি, অনন্ত দেখি না। আমার চক্ষুর দোষ, আমার চক্ষু অনন্ত দেখিতে জানে না—ততদূর প্রসারিত হয় না, একদেশমাত্র দেখিতে পায়।

আমার জ্ঞান ও সত্তা যেমন অনন্ত হইলেও আমার নিকট সান্ত, আমার প্রেমও যদিও অনন্ত, তাহার অনন্তত্ব আমার অনুভূতির বিষয় নহে। আমরা জীবনের পথে যতই অগ্রসর হইতে থাকি ততই আমাদের অনন্তত্ব সংকীর্ণতা লাভ করিয়া আমাদিগকে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র করিয়া ফেলে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমরা স্বার্থপর হইতে থাকি, অর্থাৎ "আমিত্বের" গণ্ডীটিকে ক্রমশঃ ছোট করিয়া ফেলি। প্রাকৃত অবস্থায় নিখিল ব্রহ্মাণ্ড লইয়া "আমি"; কৃত্রিম স্বার্থপর অবস্থায় আমার বাড়ীটী আমার পরিবারস্থ কয়েকটী লোক ও আমার কয়েকটী জিনিসপত্র লইয়া "আমি"। আমার প্রেম তখন ঐ কয়েকটী লোক ও জিনিসে মাত্র আবদ্ধ থাকে। ঐ ক্ষুদ্র গণ্ডী অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের আর কোনও বস্তুতে যায় না। যদি এই স্বার্থ-পরতার গণ্ডীকে কোন প্রকারে উঠাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, আমি যে চক্ষে আজ ঐ আমার বাড়ীটীকে, আমার পরিবারবর্গকে দেখিতেছি, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডকে সেই চক্ষে দেখিব, আমার প্রেম অনন্তত্ব লাভ করিবে। এইটী আমাদের স্বাভাবিক অবস্থা; আমরা এই স্বাভাবিক অবস্থা হারাইয়া ক্রমশঃ কৃত্রিমতা লাভ করি। জগতের যাহা কিছু সমস্তই আমার—আমার প্রেমের বস্তু, স্বার্থপরতা তাহা বুঝিতে দেয় না।

স্বার্থচিন্তা হইতে যাবতীয় বাসনার উৎপত্তি হয়। কাম ক্রোধাদি রিপুগণ এই স্বার্থচিন্তা হইতে সমুদ্ভূত হইয়া আমাদিগকে শান্তিময় রাজ্য হইতে দূরে লইয়া যায়। আমাদের অন্তরস্থ প্রেমজলধি এই বাসনারাশি দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া আমাদিগকে প্রেমানন্দ অনুভব করিতে দেয় না। আমরা ত প্রত্যেকে প্রেমের মূর্ত্তি, বিশ্বচরাচর ত প্রেমেরই রাজ্য, ভগবানের অনন্ত প্রেম এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ছড়ান রহিয়াছে, আমরা সকলে ভগবানের অনন্ত প্রেমে বিনির্ম্মিত, তথাপি আমাদের এত দুঃখ এত অভাব! আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক সুধা পরিত্যাগ করিয়া গরল ভক্ষণ করিতেছি, কাঞ্চনের বিনিময়ে কাচ গ্রহণ করিতেছি। হাসিতে ইচ্ছা করিলেই চিরজীবন হাসিয়া কাটাইতে পারি, আনন্দে নৃত্য করিয়া বেড়াইতে পারি; তাহা করি না,—হাসি আসিলে হাসিকে চাপি, নৃত্য আসিলে পা থামাইয়া দেই; যাহাতে আনন্দ আছে,—প্রকৃত সুখ আছে, সে পথে চলি না; কণ্টকাকীর্ণ পথে চলি, নিজের হাত পা নিজে কঠিন নিগড়ে আবদ্ধ করিয়া চিরজীবন বন্দী-

ভাবে অতিবাহিত করি। একদিনের জন্যও মনে শান্তি পাই না ; একদিনের জন্যও আত্মাকে স্বাধীন মনে করিতে পারি না, চিরকাল যেন পরাধীনভাবে অতিবাহিত করিতেছি; চিরজীবন দুশ্চিন্তায়, ভয়ে, আশঙ্কায়, সন্তর্পণে কাটাইতেছি। পদে পদে বিপদের বিভীষিকা দেখিতেছি, সকল সময়ে আপনাকে বিপন্ন মনে করিতেছি, এ সকল যন্ত্রণা কেন ভোগ করিতেছি ? এ যন্ত্রণার মূলে কি কিছু আছে, না শুধুই ভ্রম ? নশ্বর কখনও স্থায়ী হয় না, আপন কখনও পর হয় না, কামক্রোধাদি রিপু কখনও প্রকৃত সুখ দিতে পারে না ; এই সকল অসম্ভব যদি সম্ভব করিতে চাও, এবং তাহা না করিতে পারিলে যদি তোমার দুঃখ উপস্থিত হয়, তবে তুমি যে বিষম ভ্রমে পড়িয়াছ এবং সেই ভ্রমে পড়িয়াই যে এত কষ্ট পাইতেছ, তাহার আর সন্দেহ কি ? ইহা তোমার স্বপ্নদৃষ্ট ব্যাঘ্রসর্পাদির ভীতির ন্যায়—নিদ্রা না ভাঙ্গিলে এ ভীতি যায় না। মায়ানিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেলে এ সব কিছুই থাকিবে না। কে আপন, কে পর, কে আমার, কে তোমার, মান, অভিমান, আধিপত্য, যশ, এসকল একে একে অনন্ত শূন্যে বিলীন হইয়া যাইবে; তখন দেখিতে পাইবে যে তুমি আপনাকে আপনি বাঁধিয়া ছাঁদিয়া আপনি কষ্ট পাইতেছিলে। তুমি কোন কালে পরাধীন নও, তুমি চিরস্বাধীন ; এ জগতে তুমি হাসিতে আসিয়াছ, কাঁদিতে আস নাই। আনন্দের লহরী তোমার চারিদিকে বহিয়া যাইতেছে, আনন্দের উৎস তোমার হৃদয়মাঝে অহরহ প্রবাহিত হইতেছে, আনন্দের মধুর-মুরলী তোমার কর্ণকুহরে দিবানিশি ধ্বনিত হইতেছে—তুমি এই অনন্ত আনন্দজলধির একটী বুদ্‌বুদ্, আনন্দে ভাসিয়া যাইতেছ। এস মানব ! একবার এই বাসনারাশি বিসর্জ্জন দিয়া, আত্মপর ভুলিয়া গিয়া,—মান, অভিমান, কামক্রোধাদি রিপুগণকে পরাজয় করিয়া, শান্ত সমাহিতভাবে ঐ বিজন স্থানে বসিয়া আত্মনিষ্ঠ হইয়া থাকি, দেখিবে, তুমি অনন্ত সুখে সুখী ; তুমি অনন্ত সত্তা ! তুমি অনন্ত আনন্দ !

শাণ্ডিল্য-কথা।

আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ইতিহাস প্রণয়ন বিষয়ে বড়ই উদাসীন ছিলেন। ইতিহাসের উপকরণ স্বরূপে তাঁহারা আপনাপন মহৎ কার্য্য সকল রাখিয়া গিয়াছেন—সেই সকল কার্য্য আজ সহস্র সহস্র বৎসর পরেও আমাদের জীবনকে নবতর শক্তিমন্ত্রের সঞ্জীবনীশক্তিতে সঞ্জীবিত করিয়া তোলে। তাই বর্ত্তমান যুগে আমরা দিনক্ষণের হিসাবসহ এবং মহাপুরুষদিগের ও বড় বড় রাজ্যের দৈনন্দিন ঘটনার উল্লেখসহ যেরূপ বৃহৎ বৃহৎ গ্রন্থকে ইতিহাস নামে গৌরবান্বিত করি, সে ভাবের ইতিহাস সংগ্রহ করা অতীব দুঃসাধ্য—সংগৃহীত হইলেও তাহা নির্ভুল হওয়া একেবারেই অসম্ভব। অসম্ভব হইলেও পূর্ব্বপুরুষগণের ইতিহাসসংগ্রহে আমাদিগের যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে। যে দেশের অধিবাসীগণ পূর্ব্বপুরুষদিগের কীর্ত্তিকলাপ স্মরণে এবং তাঁহাদের নামকীর্ত্তনে গৌরব অনুভব না করে, সে দেশ নিশ্চয়ই সভ্যতার অতি নিম্নস্তরে অবস্থিত এবং সে দেশের অধিবাসীগণ অতীব কৃপাপাত্র।

বঙ্গদেশে আজ যে এত উন্নতি দেখা যাইতেছে, ইহার মূল যে সেই সুদূর অতীতকালে আগত পঞ্চব্রাহ্মণ ও তাঁহাদের সঙ্গে আগত পঞ্চকায়স্থ, ইহা সর্ব্ববাদসম্মত। তাঁহাদের বংশগৌরবে আমরা আপনাদিগকে গৌরবান্বিত বোধ করিব, ইহা কি কিছু আশ্চর্য্য ? কাহারও মতে কান্যকুব্জ হইতে ভট্টনারায়ণপ্রমুখ পঞ্চব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন এবং কাহারও মতে তাঁহাদের পিতা ক্ষিতীশপ্রমুখ পঞ্চব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, এবং অপর কাহারও কাহারও মতে দুই বিভিন্নসময়ে উক্ত দুইদল ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন—এক সময়ে ক্ষিতীশপ্রভৃতি এবং পরবর্ত্তী সময়ে ভট্টনারায়ণপ্রভৃতি। এ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছে এবং এখনও হইতেছে। এই সকল আলোচনার মধ্যে এইটুকু সার পাওয়া যায় যে ভট্টনারায়ণপ্রমুখ ব্রাহ্মণগণই সমধিক খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। আবার ভট্টনারায়ণপ্রমুখ ব্রাহ্মণপঞ্চকের মধ্যে ভট্টনারায়ণই মান্যতম ছিলেন দেখা যায়। সেই ভট্টনারায়ণ শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ছিলেন।

শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ব্রাহ্মণমাত্রেরই শাণ্ডিল্যঋষি হইতে উৎপত্তি ধরা হইয়া থাকে। গোত্রশব্দের মূল ব্যুৎপত্তিলব্ধ অর্থ কি ছিল বা না ছিল, তাহা এখানে আলোচনা করা আবশ্যক নহে। বর্ত্তমানে গোত্র শব্দের অর্থে মূলে যে বংশ হইতে তদনুসৃত বংশ সমূহের উৎপত্তি হইয়াছে, সেই বংশকেই ধরা হয়। যেমন, শাণ্ডিল্যগোত্রীয় যত বংশই হৌক, সকলই সেই মূল শাণ্ডিল্যবংশ হইতেই নামিয়া আসিয়াছে। এই শাণ্ডিল্যের পিতা কশ্যপ ঋষি। কশ্যপঋষি ব্রহ্মার মানসপুত্র অর্থাৎ কশ্যপঋষির পূর্ব্বপুরুষদিগের নামপর্য্যন্ত গোত্রপ্রবর্ত্তনের সময়ে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল।

শাণ্ডিল্য গোত্রকর্ত্তা বা বংশপ্রতিষ্ঠাতা ঋষি ছিলেন। তিনি এত বড় লোক হইয়াছিলেন যে তাঁহার নামে তাঁহার বংশ পরিচিত হইতে পারিয়াছিল। সর্ব্বপ্রথম আট জন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন—যমদগ্নি, গৌতম, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, অত্রি ও অগস্ত্য। এই আট ঋষি হইতে আট গোত্র উৎপন্ন হইয়া কালক্রমে ঊনপঞ্চাশ গোত্রে বিভক্ত হয়। শাণ্ডিল্য-গোত্র এই ঊনপঞ্চাশ গোত্রের অন্তর্গত একটী গোত্র।

এই ঊনপঞ্চাশ গোত্রগুলির প্রত্যেকটীর ভিন্ন ভিন্ন প্রবর উল্লিখিত হয়। ইহা সর্ব্ববিদিত যে পূর্ব্বকালে আর্য্যদিগের প্রত্যেক গার্হস্থ্য-অনুষ্ঠানেই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত। যজ্ঞকালে যজ্ঞকর্ত্তা স্বীয় পিতৃপুরুষদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও নামোল্লেখ করিতেন। কোন গোত্রের তিন, কোন গোত্রের চার, এইরূপ যে গোত্রের যত সংখ্যক পিতৃপুরুষের নাম উল্লেখ করা বিধি ছিল, যজ্ঞানুষ্ঠান উপলক্ষে সেই সেই গোত্রীয় যজ্ঞকর্ত্তার তত-সংখ্যক পিতৃপুরুষের নামোল্লেখ করিতে হইত। বিভিন্নগোত্রের বিভিন্নসংখ্যক পিতৃপুরুষদিগের নামোল্লেখ করিবার নিয়ম থাকাতে প্রতীয়মান হয় যে, এই ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ বা সম্পূর্ণরূপে প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে যে গোত্রে যে কয়েকজন মহাপুরুষ বা ঋষি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সেই গোত্রের সেই কয়জন ঋষিরই নামোল্লেখ করিবারই বিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। সম্ভবত সেই সর্ব্বপ্রথম নামোল্লেখযোগ্য ঋষিগণই প্রবর নামে অভিহিত হইতেন। 'প্রবর' শব্দের ব্যুৎপত্তিলব্ধ অর্থ (প্র+বর=প্রকৃষ্টরূপে শ্রেষ্ঠ) আমাদের এই অনুমানকে বিশেষভাবে সমর্থন করিতেছে। ক্রমে যতসংখ্যক ঋষিদিগের নামোল্লেখপূর্ব্বক যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত, সেই যজ্ঞকেও ততসংখ্যক ঋষিসম্বন্ধীয় প্রবর বলিয়া বলা হইত—যথা, দ্ব্যার্ষেয় প্রবর, ত্র্যার্ষেয় প্রবর ইত্যাদি।১ শাণ্ডিল্যগোত্রে অনুষ্ঠিত যজ্ঞাদি ত্র্যার্ষেয় প্রবর অর্থাৎ শাণ্ডিল্যগোত্রীয় কেহ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিলে তাঁহাক সেই যজ্ঞ উপলক্ষে স্বগোত্রের তিন ঋষির নাম উল্লেখ করিতে হয়—শাণ্ডিল্য, আসিত এবং দেবল।

শাণ্ডিল্যঋষি যে গোত্রকর্ত্তা হইয়াছিলেন, তাঁহার নামে যে একটী বংশ ধারাবাহিকরূপে অভিহিত হইবার অধিকার লাভ করিয়াছিল, তাহার যথেষ্ট কারণ আছে। তিনি অনেক গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। অধ্যাত্মবিষয়ক অনেক নূতন তত্ত্ব তিনি উত্তরবংশীয়দিগের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। লাট্যায়ন ও দ্রাহ্যায়ণ শ্রৌতসূত্রের মধ্যে আমরা তাঁহার অনেক উক্তি উদ্ধৃত দেখিতে পাই। লাট্যায়ন সূত্রের পঞ্চবিংশতম "ব্রাহ্মণের" (বেদবিভাগ-বিশেষের) এক প্রবক্তা বলিয়াই তাঁহাকে দেখি। শতপথ ব্রাহ্মণে তাঁহাকে আচার্য্য বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। অগ্নিরক্ষার জন্য বেদীনির্ম্মাণ-প্রণালীসম্বন্ধে শাণ্ডিল্য ঋষিই সর্ব্বপ্রধান প্রমাণ বলিয়া স্বীকৃত হইতেন।* তিনি আর একটী বিষয় আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, যাহার জন্য তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। জগতের নিয়ন্তা ও আমাদের অন্তরাত্মা,† উভয়েই যে সেই একই ব্রহ্ম, ইহা শাণ্ডিল্য ঋষিই সর্ব্বপ্রথম অন্তরে অনুভব করিয়া জগতে প্রকাশ করেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে এই সম্বন্ধে বিশেষভাবে উক্ত

১ "তস্য (অগ্নেরাহবনীয়স্য) প্রকর্ষেণ প্রার্থনানি তৈত্তেমস্য-দৃগ্‌ভিরেকদ্বিত্রিপঞ্চসংখ্যাকৈর্বিশিষ্টানি একার্ষেয়া দ্ব্যার্ষেয়াস্ত্র্যার্ষেয়াঃ পঞ্চার্ষেয়াঃ প্রবরা ইত্যুচ্যন্তে।" আশ্বলায়ন—Max Muller's Ancient Sans. Lit, P. 386.

* ইহা হইতে আমাদের অনুমান হয় (অবশ্য ইহা অনুমানমাত্র) যে, গৃহাদিনির্ম্মাণ প্রভৃতি বাস্তুবিদ্যা সম্বন্ধে শাণ্ডিল্য ঋষি একজন authority ছিলেন।

† ছান্দোগ্যে আছে "আত্মা"; কিন্তু সেই স্থানটি (৩য় প্রপাঠক ১৪ অ) পাঠ করিলেই বুঝা যায় যে আমাদের "আত্মার আত্মা"কে "আত্মা" বলিয়া বলা হইয়াছে।

হইয়াছে—"ইহা শাণ্ডিল্য কহিয়াছেন, ইহা শাণ্ডিল্য কহিয়াছেন।" শতপথ ব্রাহ্মণেও (১০ম-৬-৩) এই জ্ঞান শাণ্ডিল্যকথিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। "শাণ্ডিল্যসূত্র" নামক ভক্তিতত্ত্ববোধক একখানি গ্রন্থও তাঁহার কৃত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। কাহারও কাহারও মতে গ্রন্থখানি শাণ্ডিল্য ঋষির বিরচিত নহে, তদ্বংশীয় অন্য কোন লোকের লিখিত। কিন্তু এই উক্তির সপক্ষে বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

আসিত এবং দেবল, ইহাঁরা উভয়েই বেদমন্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। ঋগ্বেদের নবম মণ্ডলের পঞ্চম অবধি চতুর্বিংশতিতম সূক্ত পর্য্যন্ত কুড়িটী সূক্ত ইহাঁদের উভয়ের রচিত। দেবল ঋষি একটী সংহিতাও রচনা করিয়াছেন। সেই সংহিতা তাঁহারই নামানুসারে দেবলসংহিতা নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

শাণ্ডিল্য ঋষি ভারতের কোন্ স্থলে আসিয়া অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে স্থিরনির্ণয় করা অসম্ভব। তবে দেখা যায় যে হর্দোই জেলার অন্তঃপাতী ব্রহ্মাবর্ত্তের অন্তর্ভুক্ত একটী স্থান শাণ্ডিল্য নামে অভিহিত। "এই হর্দয় প্রদেশের চারিদিকে শাণ্ডিল্য নাম ধ্বনিত। এখানকার প্রধান তহশিল শাণ্ডিল্য। এখানকার সর্ব্বপ্রধান পরগণার নাম শাণ্ডিল্য। প্রধান রেলওয়ে ষ্টেশন শাণ্ডিল্য, এই জেলার সর্ব্বপ্রধান তড়াগের নাম শাণ্ড—ইহা শাণ্ডিল্যেরই সংক্ষিপ্ত আকার মাত্র। এই ব্রহ্মাবর্ত্তে এই হর্দয় প্রদেশে কেবল কান্যকুব্জীয়-ব্রাহ্মণদিগের বাস—অন্য কোনও ব্রাহ্মণ নাই। তাই মনে হয়, এই হর্দয় প্রদেশ, এই ব্রহ্মাবর্ত্ত কান্যকুব্জীয় ব্রাহ্মণদিগের আদিপুরুষ বৈদিক ঋষি শাণ্ডিল্যের স্থান ছিল। মহর্ষি শাণ্ডিল্যের নামে এই স্থান প্রসিদ্ধ হইয়া থাকিবে; তাই যুগযুগান্তর পরে এখনও এই স্থানের শাণ্ডিল্য নাম স্পষ্টাক্ষরে তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। কুরুক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী প্রদেশেই যে শাণ্ডিল্যের আশ্রম ছিল, তাহা মহাভারতে শল্যপর্ব্বোক্ত নিম্নলিখিত আখ্যান হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়। বলরাম কুরুক্ষেত্র দেখিয়া একটী আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সে আশ্রমটী কাহার, বলরাম সেই স্থানের ঋষিদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলিলেন—এই স্থানে মহাত্মা শাণ্ডিল্যের ধৃতব্রতা, সাধ্বী, সংযতা ও ব্রহ্মচারিণী কন্যা শ্রীমতী ছিলেন।"* ইহা আলোচনা করিয়া আমাদের অনুমান হয় যে শাণ্ডিল্যঋষি কোন না কোন সময়ে এই শাণ্ডিল্যনামক স্থানে অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন। এই কারণে শাণ্ডিল্যগোত্রীয় প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে এই শাণ্ডিল্যস্থান অন্যতর পরম তীর্থস্থান নিঃসন্দেহ।

প্রাণ গেল।

(বাউলের সুর)

প্রাণ গেল প্রাণ গেল—
(ওমা) প্রাণ গেল, প্রাণ গেল।
সুখের আগুণ চাইনাকো আর
দুখের জলই ভালো—
প্রাণ গেল প্রাণ গেল
(ওমা) প্রাণ গেল প্রাণ গেল।
সুখের দুখের দুলিয়ে দোলায়
কি যে ভেল্‌কী খেল—
(যবে) সুখের নেশায় ভুলি মা তোমায়,
মরণ পরশে আপনে হারাই,
(তখন) অসাড় জীবন করতে চেতন
প্রাণের দহন জ্বালো!
প্রাণ গেল প্রাণ গেল
(ওমা) প্রাণ গেল প্রাণ গেল।
সুখের দুখের দুলিয়ে দোলায়
কি যে ভেল্‌কী খেল—
(যবে) দুখের ভরায় একলা ধরায়
পাগল হয়ে ছুটিয়া বেড়াই,
(তখন) আপন কোলে লইয়ে তুলে
শান্তিধারা ঢালো।
প্রাণ গেল প্রাণ গেল
(ওমা) প্রাণ গেল প্রাণ গেল॥

১৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫।

* ১৩১৮ সালের শ্রাবণের সাহিত্যে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লিখিত "ব্রহ্মাবর্ত্ত ও শাণ্ডিল্য" প্রবন্ধ দেখ।

তন্ত্রের ইতিহাস।

(শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অত্রকথিত চতুঃষষ্টি তন্ত্রের নাম বামকেশ্বর তন্ত্রের প্রথম পটলে দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—দেবী মহাদেবের নিকটে প্রশ্ন করিয়াছেন, হে ভগবন্! আপনি আমার নিকট সমস্ত তন্ত্র (সাত কোটি মহামন্ত্র) এবং মাতৃদিগের উত্তম চতুঃষষ্টিতন্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন, অর্থাৎ শক্তি-তন্ত্রের মধ্যে প্রধান যে চতুঃষষ্টি তন্ত্র তাহা বলিয়াছেন। তাহাদের নাম মহামায়া তন্ত্র, শম্বরতন্ত্র (শম্বর দুই প্রকার বৃহৎ ও সাধারণ) যোগিনীজাল, তত্ত্বশম্বর, ভৈরবাষ্টক (অষ্ট ভৈরব বিষয়ক এক তন্ত্র) বহু রূপাষ্টক, অষ্টমাতৃকা-বিষয়ক আটখানা তন্ত্র বহুরূপ তন্ত্র নামে প্রসিদ্ধ। যামলাষ্টক ব্রহ্ম যামল, বিষ্ণু যামল, রুদ্র যামল, লক্ষ্মী যামল, উমা যামল, স্কন্দ মামল, গণেশ যামল ও জয়দ্রথ যামল। চন্দ্রজ্ঞান তন্ত্র, বাসুকি তন্ত্র, মহাসম্মোহন তন্ত্র, মহোচ্ছুষ্য তন্ত্র, বাতুল, বাতুলোত্তর, হৃদ্ভেদ, গুহ্য তন্ত্র, কামিক তন্ত্র, কলাবাদ, কলাসার, কুব্জিকামত, তন্ত্রোত্তর, বীণা তন্ত্র, ত্রোতল, ত্রোতলোত্তর, পঞ্চামৃত, রূপভেদ, ভূতোড্ডামর, কুলসার, কুলোড্ডীশ, কুলচূড়ামণি, সর্ব্বজ্ঞানোত্তর, মহাকালীমত, মহালক্ষ্মীমত, সিদ্ধ-যোগেশ্বরী মত, কুরূপিকা মত, দেবরূপিকামত, সর্ব্ববীরমত, বিমলামত, পূর্ব্বাম্নায়, পশ্চিমাম্নায়, দক্ষিণাম্নায়, উত্তরাম্নায়, নিরুত্তর, বৈশেষিক তন্ত্র, জ্ঞানার্ণব তন্ত্র, বীরাবলী তন্ত্র, অরুণেশ তন্ত্র, মোহিনীশ তন্ত্র ও বিশুদ্ধেশ্বর তন্ত্র"। *

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য আনন্দলহরী স্তবের উপাদান তন্ত্র হইতেই সংগৃহীত করিয়াছেন। বামকেশ্বর তন্ত্রই তাঁহার প্রধান অবলম্বনরূপে প্রতিভাত হয়। এক হাতে বামকেশ্বর তন্ত্র অপর হাতে আনন্দলহরী স্তোত্র রাখিয়া পাঠ করিলে উভয়ের একতানত্ব বুঝিতে আর বাকী থাকে না। অনেকেরই জানা আছে যে,—শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধমত নিরসন করিয়া পুনরায় ভারতে শ্রৌতস্মার্ত্তধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার চরিত্র পাঠে জানা যায় যে, তিনি শুধু বৌদ্ধ ধর্ম্ম নিবারণার্থ ধরাধামে অবতীর্ণ হন নাই, তাঁহার আবির্ভাবের বহুপূর্ব্ব হইতেই ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ধর্ম্মমত অত্যন্ত বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ধর্ম্মব্যপদেশে অনেক প্রকার অধর্ম্মের অভ্যুত্থান দেখা দিয়াছিল। শৈব বৈষ্ণব গাণপত্য প্রভৃতি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যেই শরীরে উপাস্য দেবতার আয়ুধ-চিহ্ন ধারণ প্রভৃতি বেদবিরুদ্ধ তামসিক আচরণ সমাদৃত হইয়াছিল। সেই সমস্ত বিরুদ্ধ মত নিরাসপূর্ব্বক শ্রৌত মত স্থাপনই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল। শক্তির উপাসকগণ উপাসনা ব্যপদেশে অবৈধরূপে মদ্য মাংস প্রভৃতি ভোজনে সমাসক্ত হইয়াছিল † সেই সমস্ত শাক্তদিগকে তিনি শাস্ত্রবলে এবং যুক্তির সাহায্যে পরাভূত করিয়া নিজমতে স্থাপিত করিয়াছিলেন। অশাস্ত্রীয় ব্যবহারনিরত সেই সমস্ত সম্প্রদায়ীকে তিনি স্পষ্টভাষায় ইহাও বলিয়াছিলেন যে, তন্ত্রাদি

---

* শ্রীদেব্যুবাচ—
ভগবন্ সর্ব্বমন্ত্রাশ্চ ভবতা মে প্রকাশিতাঃ।
চতুঃষষ্টিশ্চ তন্ত্রাণি মাতৃণামুত্তমানি চ॥
মহামায়া শম্বরঞ্চ যোগিনীজালশম্বরম্।
তত্ত্বশম্বরকঞ্চৈব ভৈরবাষ্টকমেব চ॥
বহুরূপাষ্টকঞ্চৈব যামলাষ্টক মেব চ।
চন্দ্রজ্ঞানং বাসুকিঞ্চ মহাসম্মোহনন্তথা।
মহোচ্ছুষ্যং মহাদেব! বাতুলং বাতুলোত্তরং॥
হৃদ্ভেদং তন্ত্রভেদঞ্চ গুহ্যতন্ত্রঞ্চ কামিকং।
কলাবাদং কলাসারং তথান্যং কুব্জিকামতং॥
তন্ত্রোত্তরঞ্চ বীণাখ্যং ত্রোতলং ত্রোতলোত্তরং।
পঞ্চামৃতং রূপভেদং ভূতোড্ডামরমেব চ॥
কুলসারং কুলোড্ডীশং কুলচূড়ামণিস্তথা।
সর্ব্বজ্ঞানোত্তরং দেব! মহাকালীমতস্তথা॥
মহালক্ষ্মীমতঞ্চৈব সিদ্ধযোগেশ্বরী মতং।
পূর্ব্বপশ্চিম দক্ষঞ্চ উত্তরঞ্চ নিরুত্তরং॥
তন্ত্রং বৈশেষিকং জ্ঞানং বীরাবলী তথাপরং।
অরুণেশং মোহিনীশং বিশুদ্ধেশ্বরমেব চ॥
এব মেতানি শাস্ত্রাণি তথান্যান্যপি কোটিশঃ।
ভবতোক্তানি মে দেব! সর্ব্বজ্ঞানময়ানি চ॥

† অথ শিষ্যবরৈর্যুতঃ সহস্রৈ রনুযাতঃ স সুধন্বনাচরাজ্ঞা।
ককুভো বিজিগীষু রেষ সর্ব্বাঃ প্রথমং সেতুমুদারধীঃ প্রতস্থে॥
অভবৎ কিল তস্য তত্রশাক্তৈ র্গিরিজার্চ্চা কপটান্নধুপ্রসক্তৈঃ
নিকটস্থ-বিতীর্ণভূরিমোদস্ফুটরিংখৎ পটুযুক্তিমান্ বিবাদঃ॥
সহিযুক্তিভরৈর্বিধায় শাক্তান্ প্রতিবাগ্ বাহরণেঽপি তান শক্তান্।
দ্বিজজাতি বহিষ্কৃতাননার্য্যান্ অকরোল্লোক-হিতায় কর্ম্মসেতুং॥
(শঙ্কর দিগ্বিজয়। ১৬ সর্গ। ১২।৩)

শাস্ত্রোক্ত বেদের অনুকূল আচার, অর্থাৎ যাহা বৈদিক মতেরই সহায়তা করে, তাদৃশ আচার গ্রহণীয়, কিন্তু বেদের বিরুদ্ধ আচার কিছুতেই গ্রাহ্য নহে *। তিনি উপদেশমাত্র দিয়াই নিরস্ত হন নাই; কিন্তু তদনুরূপ আচরণেরও সুব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। কাঞ্চী নগরীতে পরাবিদ্যার অর্থাৎ উৎকৃষ্ট শক্তি-দেবীর উপাসনার উপযোগী বিচিত্র মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া অসদাচার তান্ত্রিকদিগকে নিরস্ত করিয়া তথায় বেদসম্মত শক্তির উপাসনা প্রচারিত করিয়াছিলেন। †

এইস্থলে বলা আবশ্যক যে তাঁহার প্রচারিত পূজাপদ্ধতি তন্ত্রবিহিত এবং বেদসম্মত অর্থাৎ বেদাবিরুদ্ধ। তাঁহার সময়ে ভৈরবোপাসক কাপালিকদিগের ভীষণ তাণ্ডবে কর্ণাট প্রদেশ প্রকম্পিত হইতেছিল। ইহাদের দলে বহুলোক সঙ্ঘবদ্ধ ছিল। ইহাদের অস্ত্রশস্ত্রেরও অভাব ছিল না। শঙ্করানুচরদিগের সহিত ইহাদের প্রবল যুদ্ধ হইয়াছিল। ভগবৎ শঙ্করের হুঙ্কারে এবং সুধন্ব-রাজের বিশিখ-জালে কাপালিকের দল বিনাশিত হইলে দলনেতা ক্রকচ শঙ্করাবতারের প্রতি অভিচার করিয়া নিজেই অভিচারের ফলে বিনষ্ট হইয়াছিল। ইহাদের শাস্ত্র ভৈরবাগম নামে প্রসিদ্ধ।

কাপালিকদিগের এবং শাক্তদিগের বামাচার সাধারণের পরিচিত। কিন্তু শঙ্কর যুগে গাণপত্যদিগের মধ্যেও প্রবল বামাচারের বন্যা প্রবাহিত হইতেছিল। দিগ্বিজয়রত শঙ্করসমীপে "হেরম্ব সুত" নামক একজন গাণপত্য আসিয়া স্বসম্প্রদায়ের মত বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা হইতে জানা যায় যে,—গাণপত্যদিগের ছয়টি শাখা, এই ছয়টি শাখা যথাক্রমে মহাগণপতি, হরিদ্রাগণপতি, উচ্ছিষ্টগণপতি, নবনীতগণপতি, স্বর্ণগণপতি ও সন্তানগণপতিকে উপাসনা করিত। যিনি শঙ্কর সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তিনি উচ্ছিষ্ট গণপতির উপাসক। ‡ তিনি স্বকীয় উপাসনামার্গের যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, ব্যভিচার ইহাদের উপাসনার প্রধান অঙ্গ, পরস্পরের সংযোগ জন্য আনন্দোৎপত্তিই মুক্তি বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। এই মতে সমস্ত কর্ম্মই ইচ্ছাধীন। কোন প্রকার কঠোরতা নাই। সকলের একই আত্মা সুতরাং জাতিভেদ নাই, এবং এই পুরুষের এই স্ত্রী এমত নিয়মও নাই। পরমাত্ম-স্বরূপ গণপতি আনন্দময়, ব্রহ্মপ্রভৃতি দেবতা তাঁহারই অংশ। অংশ এবং অংশীর কোনও ভেদ নাই, বেদেও এইমত কথিত হইয়াছে। "ন কর্ম্মণা" ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা কর্ম্মের মোক্ষ-সাধনতা নিরস্ত হইয়াছে, এবং সহিষ্ণুত্ব-প্রভৃতি-গুণযুক্ত কর্ম্মত্যাগই মুক্তির কারণ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে; অতএব মুমুক্ষুদিগের পক্ষে এই মতই অনুকূল ও সেব্য। পাপ পুণ্য বিচার থাকিলেও দ্বন্দ্বতা অর্থাৎ দ্বৈতজ্ঞান থাকিয়া যায়; অতএব পাপপুণ্যবিচারও পরিহরণীয়। এই গাণপত্য মত শুনিয়া ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে,—যে মতে বেদনিন্দিত সুরাপান এবং পরদারসেবা বিহিত হইয়াছে, তাহা অবশ্যই সুখাকাঙ্ক্ষীদিগের পক্ষে দূর হইতে পরিত্যাজ্য। অতএব তোমরা ব্রাহ্মণদিগের বাক্যানুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইয়া গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজাপরায়ণ হও, মোক্ষমার্গের পথিকদিগের ইহাই কর্ত্তব্য। § এইরূপে তিনি বেদ-বিরুদ্ধ মতের পথিক প্রত্যেক সম্প্রদায়কেই পঞ্চদেবতার পূজা করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

এইস্থলে একটা কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, ভগবৎপাদ শঙ্কর পঞ্চদেবতার পূজার উপদেশ করিয়াছেন, সুতরাং কেবল উক্ত পঞ্চদেবতার পূজাই

---

* আগমাদ্যুক্ত আচারো গ্রাহ্যো বেদানুকূলতঃ।
বিরোধে তস্য ন গ্রাহ্য উক্তং চেদং স্ফুটং কিল॥
(টীকাকারধৃত)

† সুরধাম স তত্র কারয়িত্বা পরাবিদ্যাচরণানুসার-চিত্রং।
অপবার্য্যচ তান্ত্রিকান তানীদৃগ্ভগবত্যাঃ শ্রুতিসম্মতাং
সপর্য্যাং॥ ১৫।৫

‡ তস্তো গণকুমারাখ্যো নিরস্তেহন্যঃ সমাগতঃ।
আচার্য্য মাহ হেরম্ব সুত ত্বং পরমং গুরুং॥
মহাগণপতে স্বেকং হরিদ্রাগণপস্য চ।
উচ্ছিষ্টগণপস্যৈকং নবনীতগণেশিতুঃ॥
মত মেকং তথা স্বর্ণগণপস্যৈক মীরিতং।
সন্তানগণপস্যৈক মাগমে শৈব সংজ্ঞকে॥
উচ্ছিষ্টগণপস্যাহ মুপাসন-পরায়ণঃ।
উচ্ছিষ্টগণপঃ প্রোক্তো বামমার্গাব-লম্বনাৎ॥

§ পুনা আনন্দাশ্রমে মুদ্রিত শঙ্কর দিগ্বিজয়ে ১৬ সর্গ ৫৪৯ পৃষ্ঠে তত্রত্য বর্ণিত বিষয়ের মূল বচন দ্রষ্টব্য।

তাঁহার অভিমত, অন্যান্য দেবতাপূজার আবশ্যকতা তাঁহার অভিপ্রেত নহে, কাহারও মনে যেন এমত ধারণা না হয়। কারণ এই পঞ্চদেবতার অবান্তর ভেদরূপে অবস্থিত অসংখ্য দেবতার বিবরণ তন্ত্র প্রভৃতি বিবিধশাস্ত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়। ত্রিপুরা প্রভৃতি সমস্ত স্ত্রী দেবতাই শক্তির অন্তর্গত। ভগবৎপাদ 'বৃহদারণ্যক'ভাষ্যেও অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই স্থলে তেত্রিশ শত দেবতার যে নির্দ্দেশ দেখা যায়, তাহা মধ্যম পরিমাণাভিপ্রায়ে বুঝিতে হইবে, পরমার্থতঃ দেবতার সংখ্যা অনন্ত। তৎকৃত প্রপঞ্চসারেও বহুদেবতার উপাসনাপদ্ধতি নিবদ্ধ হইয়াছে।

ভগবৎপাদ বিবিধ দেবতার যে সমস্ত স্তোত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তান্ত্রিক অনেক গূঢ়রহস্য প্রকটিত হইয়াছে। তারাদেবীর স্তোত্রে তিনি ধ্যেয় রূপের যে বর্ণনা করিয়াছেন, তদ্দ্বারা স্থূল মূর্ত্তির স্বরূপ সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। তন্ত্রপ্রসিদ্ধ অধুনা দৃশ্যমান ধ্যানসংজ্ঞক পদ্যে দেবীর গাত্রে আভরণরূপে নিহিত সর্পাবলীর উল্লেখ নাই, ভগবৎপাদকৃতস্তোত্রে সর্পবিন্যাসের সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। তৎকৃত স্তোত্রকে অবলম্বন করিয়াই গৌড়ীয় শঙ্করাচার্য্য "তারারহস্যবৃত্তিকা" নামক গ্রন্থে গদ্যাকারে তারাদেবীর সর্পাদি-সমলঙ্কৃত রূপের বর্ণনা করিয়াছেন, * এবং স্বমতসমর্থনের জন্য স্তোত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। † ভগবৎপাদকৃত স্তোত্রের মূল শ্রুতি; সেই সকল মূলীভূত শ্রুতিও তারারহস্য-বৃত্তিকায় নিবদ্ধ হইয়াছে।

স্তোত্র পাঠ উপাসনার একটি প্রধান সহজ উপায়। সংস্কৃত সাহিত্যে স্তোত্রপদ্ধতির উন্মাদনী-শক্তি অনেকেই অবগত আছেন। উহার পদের মাধুর্য্য এবং ভাবের গাম্ভীর্য্যে নিতান্ত সংসারাসক্ত মানবের হৃদয়ও অন্ততঃ কিয়ৎক্ষণের জন্য ভাবে বিভোর হইয়া উঠে। এই সহজ পথের পথিক-দিগের উপকারেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়াই তিনি ভিন্ন ভিন্ন দেবতার লালিত্যপূর্ণপদাবলীঘটিত স্তোত্র-নিচয় রচনা করিয়া উপাসনার পথ পরিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন।

কেবল শঙ্করযুগের তান্ত্রিকবিবরণ লিখিতে গেলেই একখানা বৃহৎ পুস্তক হইতে পারে, তাহা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভবপর হয় না। মধ্যযুগে দাক্ষিণাত্যে শাস্ত্রচর্চ্চার প্রবল প্রবাহ চলিতেছিল, অপর দিকে জ্ঞানগৌরবে সর্ব্বতোভাবে জয়লক্ষ্মী কাশ্মীর দেশকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিকগণ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশকে স্বকীয় জন্মের দ্বারা গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন।

শঙ্কর দিগ্বিজয়ের বর্ণনা হইতে জানা যায়—বিষ্ণু শঙ্করাচার্য্যকে আদেশ করিয়াছিলেন যে, "আপনি ভাস্কর, অভিনব গুপ্ত, নীলকণ্ঠ, গুরু মণ্ডন মিশ্র প্রভৃতি প্রধান পণ্ডিতদিগকে জয় করিয়া পৃথিবীতে অদ্বৈত তত্ত্ব স্থাপিত করুন।" ‡ ইহাদের মধ্যে ভাস্কর ভেদাভেদবাদী, অভিনব গুপ্ত শাক্ত, নীলকণ্ঠ ভেদবাদী শৈব, গুরু প্রভাকর, মণ্ডন মিশ্র ভট্টমতানুযায়ী। পশ্চিম সমুদ্রের সমীপবর্ত্তী গোকর্ণ তীর্থ সন্নিধানে নীলকণ্ঠ বাস করিতেন। ইনি শিবপক্ষে বেদান্তসূত্রের ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। শঙ্করের সহিত বিচারে পরাভূত হইয়া ইনি স্বমত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ইহার প্রধান শিষ্যের নাম হরদত্ত। নীলকণ্ঠ পরাজিত হইলে শঙ্করাচার্য্য সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে স্বকীয় ভাষ্য প্রচার করিয়া দ্বারকা নগরীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান সময়ে কাশ্মীর গভর্ণমেণ্টের অধ্যবসায়ে তত্রত্য অনেক দুর্লভ তন্ত্র গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে ও হইতেছে। তত্রত্য রাজকীয় পুস্তকাগারে এবং

* অতিনীল-নাগবদ্ধজটাজূটাং ললাটে জবাকুসুম সঙ্কাশতক্ষকনাগকৃত-কুণ্ডলামিত্যাদি ॥

† অথবা শঙ্করাচার্য্যভগবৎপাদৈঃ স্তোত্রান্তরেণোক্তং জলৎপাবকেত্যাদিনা সর্ব্বার্থসিদ্ধ্যধ্যায়ে। তদ্ যথা—

"জলৎ পাবক জ্বাল-জালাতিভাস্বং
চিতামধ্যসংস্থাং সুপুষ্টাং সুবর্ণামিত্যাদি ॥"

এই স্তোত্রে ১২টি শ্লোক আছে।

গৌড়ীয় শঙ্করাচার্য্য কোন সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহার নির্ণায়ক বিশেষ কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাঁহার গ্রন্থের অংশবিশেষ এবং শঙ্করাচার্য্যের নাম কৃষ্ণানন্দের তন্ত্রসারে গৃহীত হইয়াছে, সুতরাং তিনি কৃষ্ণানন্দের পূর্ব্ববর্ত্তী। ১৫২৬ শাকে লিখিত এক খণ্ড তারারহস্যবৃত্তিকা বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতিকর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে।

‡ ভাস্করাভিনবগুপ্ত-পুরোগাম্নীলকণ্ঠগুরুমণ্ডল মিশ্রান্ পণ্ডিতানথ বিজিতাজগত্যাং খ্যাপয়াদ্বয়মতে পরতত্ত্বং। ৬।৫

দাক্ষিণাত্যের বিবিধ পুস্তকাগারে রক্ষিত অমুদ্রিত পুস্তকাবলীর বিবরণসূচী হইতে বেশ বুঝা যায় যে তন্ত্রের মূলগ্রন্থ অদ্যাপি ঐ উভয় দেশেই রক্ষিত হইতেছে। বাঙ্গালায় তাহাদের নাম গন্ধও পাওয়া যায় না। এই সমস্ত দুর্লভ গ্রন্থ সুধীবৃন্দের নয়নপথিক হইয়া, এক সময়ে তন্ত্রের ঐতিহাসিক তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে অভিব্যক্ত করিবে, সময়স্রোতের পরিবর্ত্তন দর্শনে এরূপ আশা অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। ভাস্করভট্ট উজ্জয়িনীতে বাস করিতেন। ভগবান্ শঙ্কর তথায় যাইয়া ভাস্কর মত খণ্ডন করিয়াছিলেন। অভিনবগুপ্ত কামরূপবাসী; ইনি শক্তি পক্ষে বেদান্তসূত্রের ভাষ্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইনিও শঙ্করের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। অনন্তর ভগবৎপাদ শঙ্কর গৌড়দেশবাসী মুরারি মিশ্র ধর্ম্মগুপ্ত মিশ্র ও উদয়নকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

তন্ত্র সম্বন্ধে দার্শনিকদিগের অভিমত।

ভারতীয় দার্শনিকদিগের সম্প্রদায়ভেদে প্রভূত মতদ্বৈধসত্ত্বেও তন্ত্রের প্রামাণ্য সম্বন্ধে কাহারও প্রায় অবজ্ঞা দেখা যায় না। কারণ মৌলিকতত্ত্বগত বিবাদবাহুল্য সত্ত্বেও সগুণোপাসনার আবশ্যকতা প্রায় সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং উপাসনার অনুষ্ঠানজ্ঞাপক তন্ত্রশাস্ত্রের প্রতি পদপদার্থবিৎ প্রমাণজ্ঞদিগের অবজ্ঞা-প্রদর্শন সম্ভবপর হয় না। গৌড়পাদ হইতে শঙ্করসম্প্রদায়ের তন্ত্রচর্চ্চার নিদর্শন স্বরূপ আমরা কতিপয় প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছি। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজস্বামীর পরমগুরু যামুনমুনির আগমপ্রামাণ্যনিরূপণের কথাও উল্লিখিত হইয়াছে। সংপ্রতি মধ্বসংপ্রদায়ী আনন্দতীর্থের কথা কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। ইনি পূর্ণপ্রজ্ঞ দর্শনে বেদাদিশাস্ত্রের সহিত সমস্বরে তন্ত্রের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন।* ইহাঁর কৃত তন্ত্রসার গ্রন্থ অদ্যাপি বিলুপ্ত হয় নাই। উক্ত গ্রন্থের ছলারি—নৃসিংহাচার্য্যকৃত টীকা আছে। এই টীকাসমেত আনন্দ তীর্থের তন্ত্রসার মাদ্রাজ ওরিয়েণ্টাল লাইব্রেরীতে অমুদ্রিত অবস্থায় রক্ষিত হইতেছে। ইহাতে নারায়ণের উপাসনা বিবৃত হইয়াছে। সুতরাং মধ্বসংপ্রদায়ও তন্ত্র-পরতন্ত্র, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। খণ্ডনখণ্ডখাদ্য রচয়িতা প্রতিভাবরি দার্শনিক মহাকবি শ্রীহর্ষ স্বকীয় নৈষধকাব্যকে চিন্তামণিমন্ত্রচিন্তনের ফল বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। উক্ত চিন্তামণি মন্ত্র শিবোপাসনায় বিনিযুক্ত; অর্দ্ধনারীশ্বর ইহার দেবতা। প্রপঞ্চসার প্রভৃতি তন্ত্রে উহার বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত শ্রীহর্ষ কবি কান্যকুব্জের রাজসভায় সম্মানিতপণ্ডিতপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সুতরাং ঐ সময়ে কান্যকুব্জে তান্ত্রিকোপাসনা প্রচলিত ছিল, ইহাও প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য। শ্রীহর্ষের উক্তি হইতে তাঁহার তন্ত্রভক্তির আরও পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি স্বকীয় কাব্যে একমাত্র তন্ত্রপরায়ণ কাশ্মীর পণ্ডিতদিগকেই চতুর্দ্দশ বিদ্যাবিৎ বিশেষণে সমলঙ্কৃত করিয়াছেন। তিনি "শিব-শক্তিসিদ্ধি" নামক নিবন্ধ লিখিয়াছিলেন। কান্যকুব্জ প্রসঙ্গে ইহাও বক্তব্য যে, তথাকার ইতিহাসে প্রসিদ্ধ রাজা হর্ষবর্দ্ধনের সভাপণ্ডিত বাণভট্টের কাদম্বরীতেও তান্ত্রিকানুষ্ঠানের পরিচয় পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থে অপত্যকামনায় যে শিবাবলিদানের উল্লেখ আছে, উহা তান্ত্রিক ক্রিয়ারূপেই প্রসিদ্ধ। অপিচ কাদম্বরীতে যে জ্যেষ্ঠাদেবীর সপর্য্যা বর্ণিত হইয়াছে, ইনি তন্ত্রপ্রসিদ্ধ ত্রিশক্তির অন্যতমা।

* চ শব্দেন সকল-বেদ-শাস্ত্রাগম-তন্ত্র যামল-পুরাণাদিষু বিষ্ণুপরত্বং পুরুষসূক্তস্য সূচয়তি। ১।২।২৬।সূ ভাং।

ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি।

ইমন—মধ্যমান।

হে প্রাণের দেবতা
তোমারি চরণে প্রাণ যেতে চায়।
অনেক পেয়েছি দুখ আঘাতে ভেঙেছে বুক;
লহ লহ তুলে তোমারি কোলে।

কথা ও সুর—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বরলিপি—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৮ ২´
না -া ধা পা ঋধা -পপা ঋা গা II ঋা -া -া -ররা -গঋা -পগা -পা -া।
হে • প্রা ণে র• • • দে ব তা • • • • • • • • • • • •

৩ ॥
।-া পা ঋপা -ধনা -ঋধা -পপা ঋা গা। পপা গা -া -রা -নরা -সসা -া -া।
• তো মা • • • • • • রি চ র• লে • • • • • • • •

১ ২´
।-া -া না -রা -গা -ঋগা -পা -া I ঋধা -পপা -গা -পরা -গা -া -রা -া।
• • প্রা • • • • • • ণ• • • • • • • • • • •

• •
।-া গা পঋা -ধা -া ঋধা -নর্সা -র্রর্রা। -র্সনা -ধনা -র্সর্সা -নধা -পঋা -গা গঋা -পধা।
• যে তে • • • চা • • • • • • • • • • • য়ে হে • •

১
।-ননা ণ-নর্সা না ধা ঋধা -পপা ঋা গা II
• • • • প্রা ণে র• • • দে ব"

১ ২´
II পাপা ঋধা -নর্সা -র্রধা -র্সা র্সার্সা। নর্রা -র্সর্সা -া র্সা র্সা -া -া -া।
অনে ক• • • • • • পেয়ে ছি• • • ছ থ • • •

৩ •
।র্সার্সা র্সনা -র্রা -া -া র্সা র্সা। নর্সা -র্রর্গা -গর্রা -র্সনা -নর্সা না ধা -া।
আঘা তে• • • • • ভে ঙে ছে• • • • • • • • বু ক •

১ ২´
।-ঋধা -পপা -া ঋা ধা না ণপপা -ঋগা I পপা গা -া -রা -া রা গা পঋা।
• • • • ল হ ল হ• • • তু• লে • • • তো মা রি•

৩ •
।-ধা -া -া ঋধা -নর্সা -ধা -র্সা নর্সা। -র্রর্গা -র্রর্সা -নর্রা -র্সনা -ধপা ঋগা গঋা -পধা।
• • • কো• • • • • লে• • • • • • • • • • • হে • •

১
।-ননা ণ-নর্সা না ধা ঋধা -পপা ঋা গা II II
• • • • প্রা ণে র• • • দে ব"

কেশবচন্দ্র—ব্রাহ্মসমাজের সহযোগী সম্পাদক।

ব্রাহ্মসমাজের তত্ত্বাবধারণে ব্রহ্মবিদ্যালয় পরিচালিত হইবার কালে কেশবচন্দ্র তাঁহার উৎসাহাগ্নি চতুর্দ্দিকে এতদূর বিকীর্ণ করিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহার সেই উৎসাহের সংস্পর্শে যাঁহারা আসিতে লাগিলেন, তাঁহাদেরও হৃদয়ে উৎসাহাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতে লাগিল। সেই অগ্নির স্পর্শ পাইয়া যাঁহার হৃদয়ে যে বিষয়ের ক্ষমতা নিদ্রিত ছিল, তাহাও জাগ্রত হইয়া উঠিতে লাগিল। সেই জাগরণের অন্যতর পরিচয় আমরা তদানীন্তন ব্রহ্মসঙ্গীতে দেখিতে পাই। ইতিপূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাকালে রাজা রামমোহন রায় এবং তাঁহার সহচরদিগের রচিত সঙ্গীত গীত হইত। সেই সকল সঙ্গীতের অনেকগুলিতে মায়াবাদের ভাব উল্লিখিত ছিল। দেবেন্দ্রনাথ যখন ব্রাহ্মসমাজ হইতে অদ্বৈতবাদের সংস্পর্শ মুছিয়া দিলেন, সেই সময় অবধি অদ্বৈতমতসংশ্লিষ্ট সঙ্গীত সকলও সমাজে গাওয়া বন্ধ হইয়া গেল। অবশ্য বাছিয়া বাছিয়া সেই সকল গানের মধ্যে কতকগুলি গান তখনও গাওয়া হইত, কিন্তু সেগুলি ক্রমে উপাসকমণ্ডলীর কর্ণে বড়ই নীরস ও কঠোর বলিয়া অনুভূত হইতে লাগিল। এই সময়ে দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদের ভাব অবলম্বন করিয়া ভক্তি ও জ্ঞানের সামঞ্জস্যমূলক কয়েকটী গান রচনা করেন। সেগুলি আদিব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রকাশিত সঙ্গীতপুস্তকের দ্বিতীয়ভাগে দৃষ্ট হয়। কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকালে চতুর্দ্দিকে ধর্ম্মবিষয়ক যে উৎসাহ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল, সেই উৎসাহের ফলে দেবেন্দ্রনাথের পুত্রগণও সঙ্গীত রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। উক্ত সঙ্গীতপুস্তকের তৃতীয় ও চতুর্থভাগে সন্নিবিষ্ট সঙ্গীতগুলি এই সময়ের রচনা। এগুলির অনেকগুলি দ্বিজেন্দ্রনাথের এবং অধিকাংশই সত্যেন্দ্রনাথের রচিত। এগুলিতে ধর্ম্মের জ্যোতিঃপূর্ণ সরল হৃদয়ের সরল কথা শোনা যায়, প্রাণের সরল উচ্ছ্বাস দৃষ্ট হয়। এই সকল সঙ্গীত শুনিলে প্রত্যেক মানুষ উপলব্ধি করিতে পারে যে, সে তাহার নিজেরই হৃদয়ের কথা সেই গানে শুনিতে পাইতেছে। ঈশ্বরের সহিত মানবের যে পিতাপুত্রের একটী অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে, ঈশ্বরের মঙ্গলস্বরূপে মানব যে সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারে, সেই মহাবাণী এই সকল সঙ্গীতের ছত্রে ছত্রে উপলব্ধ হয়।

কেশবচন্দ্র যখন দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে সিংহলে, তখনই তাঁহার আত্মীয়স্বজন স্থির করিয়াছিলেন যে তিনি ফিরিয়া আসিলেই তাঁহাকে কোন কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া দিবেন। উদ্দেশ্য এই যে, তাহা হইলে আর ব্রাহ্মসমাজ লইয়া তিনি ব্যস্ত থাকিবার অবসর পাইবেন না। সেই সময়ে কেশবের জ্যেষ্ঠতাত হরিমোহন সেন বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দেওয়ান ছিলেন। কেশবচন্দ্র সিংহলযাত্রা হইতে প্রত্যাগত হইতে না হইতেই ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসের প্রথমেই হরিমোহন তাঁহাকে সেই ব্যাঙ্কের এক কেরাণীপদে বসাইয়া দিলেন। ত্রিশ টাকা বেতনে প্রবেশ করিলেও অল্পদিনের মধ্যেই কেশবের বেতন পঞ্চাশ টাকা নির্দ্দিষ্ট হইল। শীঘ্রই তাঁহার একশত টাকা বেতন হইবারও আশা ছিল। কিন্তু বৎসর খানেক এই কর্ম্ম করিয়া ১৮৬১খৃষ্টাব্দের১লা জুলাই (১৭৮৩ শকের আষাঢ়) কেশব সহসা ব্যাঙ্কের পদ পরিত্যাগ করিয়া একদিকে যেমন আত্মীয়স্বজনের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন, অপরদিকে ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারে অনুরাগ প্রকাশের কারণে দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁহার পরিবারের ততোধিক প্রীতিভাজন হইলেন।

এই বৎসরের ১১ই পৌষ দিবসে ব্রাহ্মসমাজের পরবর্ত্তী বৎসরের বিত্তসংস্থান জন্য ব্রাহ্মদিগের এক সভা হয়। কানাইলাল পাইন তাহার সভাপতি ছিলেন। এই সভার বিবরণ ১লা মাঘের পত্রিকায় প্রকাশিত দেখি। এই বিবরণে দেখা যায় যে, "ব্রাহ্মসমাজের ট্রষ্টী" দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসাধারণকে জানাইয়া দিলেন যে "তত্ত্ববোধিনী সভা ব্রাহ্মসমাজে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা দান করিয়াছেন। এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের মুখ্য উপায়। * * * তত্ত্ববোধিনী সভা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সহিত দুইটী মুদ্রাযন্ত্র এবং তাহার উপকরণ ইংরাজী ও বাঙ্গালা অক্ষরাদি যাবতীয় সম্পত্তি ব্রাহ্মসমাজে দান করিয়াছেন।"

এই সভাতে "সর্ব্বসম্মতি ক্রমে নিম্নলিখিত মহাশয়েরা সমাজের কর্ম্মকর্ত্তা হইলেন:—

সভাপতি	অধ্যক্ষ—
শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ রায়	পত্রিকাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
	যন্ত্রাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত কাশীকৃষ্ণ দত্ত
সম্পাদক	ধনাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সেন
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদক
শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন	শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সহকারী সম্পাদক	পরিদর্শক
শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ	শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায়

উপরোক্ত কর্ম্মচারী নিয়োগ হইতেই দেখা যাইবে যে এখন অবধি ব্রাহ্মসমাজসম্বন্ধীয় সমুদয় ক্ষমতা দেবেন্দ্রনাথের স্বহস্তে আসিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত বিতর্কের পর ব্রাহ্মসমাজের সমস্ত কর্ত্তৃত্ব ও দায়িত্ব তিনি স্বীয় স্কন্ধেই গ্রহণ করিলেন দেখা যায়। সভাপতি হইলেন রমাপ্রসাদ রায়—ইনি নিজে একজন ট্রষ্টী, রাজা রামমোহন রায়ের পুত্র এবং দেবেন্দ্রনাথের পরম বন্ধু। এ অবস্থায় রমাপ্রসাদ রায় সভাপতি হইলেও দেবেন্দ্রনাথের সমাজকার্য্য পরিচালনায় কোনই ব্যাঘাত আসিবার সম্ভাবনা ছিল না। বিশেষত তিনি নিজের কার্য্যভারেই এত ব্যস্ত থাকিতেন যে ইহা জানা কথা ছিল যে, তিনি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে একটুও মন দিতে পারিবেন না। ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার পিতৃকীর্ত্তি বলিয়া তাহার রক্ষাসাধনে তাঁহার যেটুকু যত্ন ও আগ্রহ ছিল।

দেবেন্দ্রনাথ এবারে স্বয়ং ট্রষ্টী ও সম্পাদক হইলেন। কাজেই ব্রাহ্মসমাজসংক্রান্ত যাবতীয় ক্ষমতা তাঁহারই হস্তে কেন্দ্রীভূত হইল। তাঁহারই তত্ত্বাবধানে ও সহযোগে কেশবচন্দ্র সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন। দেবেন্দ্রনাথ সর্ব্বক্ষণ বিষয়ের খিটিমিটি লইয়া থাকিতে ভাল বাসিতেন না। বাহিরের সহিত সংগ্রাম উপস্থিত হইলে স্বয়ং সংগ্রামে দাঁড়াইবার পরিবর্ত্তে অপরাপর উপযুক্ত লোকের দ্বারা সংগ্রাম করাইতেন। তিনি নিজে জ্ঞানার্জনে এবং ধ্যানে অধিকাংশ সময় কাটাইতে ভাল বাসিতেন। তাই ব্রাহ্মসমাজের প্রতি বিশেষ অনুরাগী কেশবচন্দ্রকে সম্পাদকরূপে লাভ করিয়া নিজে ব্রাহ্মসমাজের নানা কার্য্যের ভার হইতে কথঞ্চিৎ রক্ষা পাইলেন। সহকারী সম্পাদক আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ বাল্যাবধি দেবেন্দ্রনাথেরই সাহায্যে মানুষ। ইনি সহকারী সম্পাদক হওয়াতে ব্রাহ্মসমাজসংক্রান্ত কোন কার্য্যই ইহাঁর অজ্ঞাতসারে হইবার উপায় ছিল না। দেবেন্দ্রনাথ বিদেশে গেলেও ইহাঁর দ্বারা সমাজসংক্রান্ত সমস্ত সংবাদ পাইবার উপায় রহিল।

তত্ত্ববোধিনী সভা উঠিয়া যাইবার পর ব্রাহ্মসমাজের দুইটী অঙ্গ দাঁড়াইয়াছিল—ব্রাহ্মসমাজ এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। উপরোক্ত কর্ম্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা হইতেই বুঝা যাইবে যে ব্রাহ্মসমাজের ন্যায় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাসম্বন্ধীয় সমস্ত ক্ষমতাও দেবেন্দ্রনাথের হস্তে রক্ষিত হইয়াছিল। তিনি নিজেই পত্রিকাধ্যক্ষ হইলেন; পত্রিকাতে কোন্ প্রবন্ধ প্রকাশের যোগ্য এবং কোন্ প্রবন্ধ অযোগ্য তাহা তাঁহার বিচারসাপেক্ষ হইল। পত্রিকা-সম্পাদক হইলেন তাঁহারই পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ—বলা বাহুল্য যে তিনি পত্রিকাধ্যক্ষ পিতৃদেবের অধীনে থাকিয়া তাঁহারই মতানুসারে পত্রিকা চালাইবার ক্ষমতা ও আদেশ পাইয়াছিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথের সিংহল ভ্রমণের দৈনন্দিন লিপির উক্তি হইতে দেখিয়া আসিয়াছি যে কেশবের উপর ব্রাহ্মসমাজের নানা গুরুতর কার্য্যের ভার দিবার ইচ্ছা দেবেন্দ্রনাথ ইতিপূর্ব্বেই হৃদয়ে পোষণ করিতেছিলেন। সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিবার প্রথম সোপান স্বরূপে সিংহল হইতে প্রত্যাগমনের পরেই দেবেন্দ্রনাথ কেশবস্থাপিত ব্রহ্মবিদ্যালয়কে ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয়ে আনয়ন করিলেন। অবশেষে মাস খানেক পরেই (১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে—১৭৮১ শকের ১১ পৌষে) কেশবচন্দ্রকে ব্রাহ্মসমাজের সহযোগী সম্পাদকপদে প্রাপ্ত হইয়া দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার প্রতি নিজ প্রীতির পরিচয় দিয়া সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিলেন।

সন্ধ্যায়।

শান্ত সন্ধ্যা নেমে এল ডুবে গেল রবি,
আঁধার ছাইল ধরা যেন এক ছবি।
পথপ্রান্তে বৃক্ষছায়া দীর্ঘ হয়ে উঠে,
সাদা সাদা ফুলগুলি একে একে ফুটে।
জীবজন্তু যত সব নিজ ঘরে গেল,
অবিশ্রাম কোলাহল ধীরে থেমে গেল।
নিবিড় গাছেতে দূরে গাহে সান্ধ্য তান,
শত পক্ষী শত সুরে রসে ভরা প্রাণ।

নীরবতা যেন তাহে জাগে গাঢ় হয়ে,
আমি বাঁচি সন্ধ্যা সাথে কত কথা ক'য়ে।
ধীরে ধীরে থেমে যায় পক্ষী-কলতান,
শান্তিসুধা মধু ঝরে জুড়াইয়া প্রাণ।
তারাগুলি একে একে ফুটে শূন্যভূমে,
ছন্দে প্রেমে গাহে গান এনে দেয় ঘুমে।
প্রাণের ভিতরে এক জাগে মহাগান,
দুঃখের আনন্দধারা—অনাহত তান।
যারা সবে শোকহত শুনে পাবে বল,
ঝঞ্ঝাবায় থেমে যাবে পাবে শান্তিজল।

রামায়ণী।

(দশরথ)

(কথক—শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ন)

রামায়ণী চরিত্রসমালোচনার প্রারম্ভেই দশরথ-চরিত্রের আলোচনা করিব।

রাজা দশরথ—বীর, প্রজারঞ্জক, রাজনীতিজ্ঞ, স্নেহ-প্রাণ, সত্য-প্রতিজ্ঞ, দেবদ্বিজে ভক্তিমান এবং ঈষৎ ইন্দ্রিয়পরায়ণ।

বীরত্ব।

দেবরাজ ইন্দ্র অসুরবিজয়ের জন্য দশরথের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। দশরথ সে যুদ্ধে বিজয় লাভ করেন। তাঁহার শরসঞ্চালনে শব্দবেধিত্ব শক্তি ছিল। অন্ধমুনির পুত্রকে শব্দবেধী বাণ দ্বারা হত্যা করিয়াছিলেন। ইহার দ্বারা দেখিতে পাই যে ব্যবহারের বিভিন্নতায় গুণও দোষের হইয়া পড়ে। আত্মরক্ষার্থ যে শব্দবেধী বাণ ধর্ম্ম-মূলক, ব্যসনে প্রযুক্ত তাহাই পতনের কারণ হইল।

প্রজারঞ্জন।

দশরথ প্রজারঞ্জক নৃপতি ছিলেন। তাঁহার রাজত্বসময়ে অযোধ্যানগরীর বর্ণনা দেখিয়াই তাহা বুঝিতে পারা যায়।

রাজনীতিজ্ঞতা।

অযোধ্যাকাণ্ডে শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক-ব্যাপারে তাঁহার রাজনীতিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। রামকে তিনি উৎকৃষ্ট রাজনীতির উপদেশ দিয়াছেন। রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক দশরথের একান্ত অভিপ্রেত ছিল; কিন্তু তিনি কৌশলে অপরের মুখে রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক ব্যাপারের প্রস্তাব করাইতেছেন। অভিষেকের কথা উল্লেখ করিয়াই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—

যদিদং মেঽনুরূপার্থং ময়া সাধু সুমন্ত্রিতম্
ভবন্তো মেঽনুমন্যন্তাং কথং বা করবাণ্যহম্
যদ্যপ্যেষা মম প্রীতির্হিতমন্যাদ্বিচিন্ত্যতাম্
অন্যা মধ্যস্থচিন্তা তু বিমর্দ্দাভ্যধিকোদয়া।

সকলে সম্মতি দান করিলেও আবার তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—

শ্রুত্বৈতদ্বচনং যন্মে রাঘবং পতিমিচ্ছথ
রাজানঃ সংশয়োঽয়ং মে তদিদং ব্রূত তত্ত্বতঃ
কথন্নু ময়ি ধর্ম্মেণ পৃথিবীমনুশাসতি
ভবন্তো দ্রষ্টুমিচ্ছন্তি যুবরাজং মহাবলম্।

রাজনৈতিক দুর্ব্বলতা।

কেবল অবিশ্বাসের দ্বারাই রাজ্য পালন করা যায় না। সম্রাট ঔরঙ্গজেব তাহার দৃষ্টান্ত। বিশ্বাসীকে বিশ্বাস করা এবং অবিশ্বাসীর প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখাই উৎকৃষ্ট রাজনীতিজ্ঞতা। রামের রাজ্যাভিষেক ব্যাপারে রাজা দশরথ কিন্তু অতি-মাত্রায় সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাহাতে একটু অনর্থ ঘটিল। দশরথ রামচন্দ্রকে কহিলেন—

বিপ্রোষিতশ্চ ভরতো যাবদেব পুরাহিতঃ
তাবদেবাভিষেকস্তে প্রাপ্তকালো মতো মম
কামং খলু সতাং বৃত্তে ভ্রাতা তে ভরতঃস্থিতঃ
জ্যেষ্ঠানুবর্ত্তী ধর্ম্মাত্মা সানুক্রোশোজিতেন্দ্রিয়ঃ
কিন্তু চিত্তং মনুষ্যাণামনিত্যমিতি মে মতম্
সত্যঞ্চ ধর্ম্মনিত্যানাং কৃতশোভি চ রাঘব।

রামচন্দ্রের নিকটে ভরতের মত ছন্দানুবর্ত্তী ধার্ম্মিক পুত্র সম্বন্ধে বিজ্ঞ দশরথের এরূপ উক্তি করা ভালো হয় নাই। ভরতের অসাক্ষাতে রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হওয়াই কৈকেয়ীর পক্ষে বিশেষ অসন্তোষের কারণ হইল। হয় তো বা ভরত উপস্থিত থাকিলে ব্যাপারটা অন্য রকম ঘটিত। এটা দশরথের রাজ-নৈতিক দুর্ব্বলতা ছাড়া আর কি বলিব?

দেবদ্বিজে ভক্তি, সত্যপ্রতিজ্ঞতা ও স্নেহপরায়ণতা।

দশরথ ব্রাহ্মণগণের পরামর্শ না লইয়া কোনো কার্য্য করিতেন না। রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ এবং অন্যান্য পৌরবর্গের প্রতি ব্যবহারই তাঁহার স্নেহপ্রাণতার পরিচয়। রাম-নির্ব্বাসন-ব্যাপার হইতেই তাঁহার

সত্যপ্রতিজ্ঞতার নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাণত্যাগ করিয়াও সত্যরক্ষা করিতেন।

দশরথ অন্যান্য পুত্রগণ অপেক্ষা শ্রীরামচন্দ্রকেই অধিক স্নেহ করিতেন। রামচন্দ্র সম্বন্ধে তিনি একটু পক্ষপাত-দোষ-দুষ্ট। এই পক্ষপাত-দোষ দ্বারাই দশরথের সত্যপালনের দার্ঢ্য এবং মহনীয়তা কবি ব্যক্ত করিয়াছেন।

ইন্দ্রিয়পরায়ণতা।

দশরথ একটু ইন্দ্রিয়পরায়ণ ছিলেন। ইন্দ্রিয়াসক্তি নানা প্রকারের আছে। শীকারে অত্যধিক আসক্তিই তাহার প্রথম নিদর্শন। শাস্ত্রে আছে মৃগয়া একটী ব্যসন। এই মৃগয়া করিতে যাইয়াই তিনি অন্ধমুনির পুত্রকে হত্যা করিয়াছিলেন। এবং তাহা হইতেই সর্ব্বপ্রথমে সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হয়।

বহুবিবাহ।

বহুবিবাহের দ্বারাই রামের রাজ্যাভিষেকের ব্যাঘাত ঘটিল। ব্যসনাসক্তি এবং বহুবিবাহ দ্বারা দশরথের প্রাণত্যাগ, রাম-নির্ব্বাসন প্রভৃতি যত অনর্থ সম্ভূত হইল। কিন্তু তৎকালে নানা কারণে রাজগণ এরূপ বহুবিবাহ করিতেন। এক কারণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন। অর্থাৎ বিবাহ-সম্বন্ধ দ্বারা এক রাজ্যের সহিত অপর রাজ্যের মৈত্রী-স্থাপন। অন্য কারণ স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব। কিন্তু দশরথ কৈকেয়ীকে রূপের জন্যই বিবাহ করিয়াছিলেন।

রাম নির্ব্বাসন।

এখন আমরা দশরথের জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর অধ্যায়—রাম-নির্ব্বাসন-সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। রামচন্দ্রের নির্ব্বাসন জন্য তিন ব্যক্তিই দায়ী—মন্থরা, কৈকেয়ী এবং দশরথ। এই তিন জনের ভিতরে দশরথেরই দায়িত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। মন্থরা নীচকুলোদ্ভবা দাসী, কৈকেয়ী রাণী, মন্থরার কথা শুনিলেন কেন? আবার, কৈকেয়ী স্ত্রীলোক মাত্র—দশরথ ইক্ষাকুবংশীয় রাজা, তিনিই বা কৈকেয়ীর কথা শুনিলেন কেন?

ইহার সহজ উত্তর, দশরথ পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন—সেই জন্য। কিন্তু দশরথের পক্ষে কোন্‌টা কর্ত্তব্য, প্রতিজ্ঞাচ্যুতি না রাম-নির্ব্বাসন? কর্ত্তব্য কাহাকে বলে প্রথমতঃ তাহাই বিচার্য্য। দেশকালপাত্রানুসারে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ভর করে। এ সময়ে দশরথের পক্ষে কি কর্ত্তব্য তাহাই দেখা যাউক।

শ্রীরামচন্দ্র ভরত অপেক্ষা অধিক গুণশালী; এবং জ্যেষ্ঠপুত্র বলিয়া ন্যায়তঃ সিংহাসন লাভের অধিকারী। প্রজাগণেরও ইচ্ছা শ্রীরামচন্দ্র রাজ্যভার গ্রহণ করেন। এই সকল যুক্তি অনুসারে রামচন্দ্রকেই রাজা করা দশরথের কর্ত্তব্য ছিল।

কিন্তু প্রতিজ্ঞাভ্রষ্ট হওয়া মহাপাপ। দশরথ এরূপ প্রতিজ্ঞাভ্রষ্ট হইলে নিতান্ত কুদৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয়। কারণ—

যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে।

কিন্তু ইহাতে বিশেষভাবে একাকী দশরথই নিন্দিত। অপর পক্ষে রামচন্দ্রকে রাজা করিলে বহু লোকের উপকার হইবে। একদিকে নীতিবাদ, অপরদিকে হিতবাদ, এস্থলে যে কোন্‌টা অবলম্বনীয় তাহা বিষম সমস্যার বিষয়।

লোকের প্রকৃত মহত্ত্ব কোথায়? ত্যাগে। দশরথ রামকে প্রাণাপেক্ষা অধিক ভালোবাসিতেন। সেই রামকে বনে পাঠাইয়া সত্যপালন করিতে হইবে। এস্থলে দশরথের সত্যের উপর প্রবলানুরাগ দেখা যাইতেছে এবং ত্যাগও যথেষ্ট। ইহা যদি দোষও হয়—তবে গুণাতিরেক দোষ। কাহারো মতে এরূপ সত্যপালন নির্ব্বুদ্ধিতা। আবার কাহারো মতে এরূপ সত্যপালন না করা মহাপাপ—ইহার কোন্‌টা সত্য?

এই স্থানে একটি দৃষ্টান্তের অবতারণা করা গেল।

এক বনের ভিতরে এক মহাপুরুষ তপস্যা করিতেছিলেন। এমন সময় দেখিলেন তাঁহার নিকট দিয়া এক বণিক টাকার থলি হাতে লইয়া প্রাণভয়ে পলাইতেছে। কিয়ৎকাল পরে একদল দস্যু আসিয়া সাধুকে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি এইদিকে কোনো বণিককে যাইতে দেখিয়াছেন? সে কোন্ দিকে গেল?" বণিক যে কোন্ স্থানে পলাইয়াছে তাহা সাধুর অবিদিত নহে। এ অবস্থায় সাধুর কি কর্ত্তব্য? যদি বলেন "অমুক স্থানে পলাইয়াছে" তাহা হইলে বণিকের প্রাণ যাইবে। যদি বলেন—"আমি বলিব না" তাহা হইলে সাধুর নিজের প্রাণ

যাইবে। আর যদি বলেন—"আমি জানি না" তবে মিথ্যা কথা বলা হইবে। এ অবস্থায় সাধুর কি কর্ত্তব্য তাহা বিচারের ভার পাঠকগণের উপরে দিয়া ক্ষান্ত রহিলাম।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে সত্যপালনের জন্য রাম নির্ব্বাসন যদি দশরথের সম্পূর্ণরূপেই উত্তম কার্য্য হয়, তবে নিরাপত্তিতে রামচন্দ্রের নির্ব্বাসনাজ্ঞা পালন করার তাৎপর্য্য অনেকটা কমিয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে রামায়ণ রচনাকালে রামচরিত্রকেই শোভনীয়রূপে ফুটাইয়া তোলার দিকেই কবির বিশেষ লক্ষ্য ছিল।

"দুর্দ্দিনে"।

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এ)

রাগিণী—ইমনভূপালি।

ঘোর ঝঞ্ঝাঘন তিমির রাতে
যবে ডাকিব কাতরে
যেন সাড়া পাই!
যবে দিশেহারা হয়ে অন্ধকারে
ডাকিব তোমারে
যেন সাড়া পাই!
বাসনা যেদিন শতেক ডোরে
বাঁধিয়া ফেলিতে চাহিবে মোরে
যবে ডাকিব সঘন 'নাথ' 'নাথ' ক'রে
যেন সাড়া পাই!
শুকায়ে যাবে যবে এ জীবন-ধারা
জীবন-নদী হবে মরুমাঝে হারা
ফুটিবে না ফুল উঠিবে না তান
জাগিবে না প্রাণ—
যেন সাড়া পাই।
তোমারে রাখিব জীবন মাঝারে
সতত হেরিব হৃদয়-রাজারে
ডাকিব কাতরে আলোকে আঁধারে
যেন সাড়া পাই॥

আদর্শ
বা
দাদা ঠাকুর।

প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—হরিচরণের বাটী। কাল-অপরাহ্ণ।

(হরিচরণের পুত্রকে ক্রোড়োপরি স্থাপন করিয়া দাদাঠাকুর উপবিষ্ট। চতুর্দ্দিকে বালকগণ রোগীকে বেষ্টন করিয়া বসিয়া শুশ্রূষা করিতেছে। কবিরাজ নাড়ী দেখিতেছেন। নিকটে হরিচরণ সাশ্রুনেত্রে কবিরাজের পানে চাহিয়া আছে।)

হরি। দাদাঠাকুর, আমার বাছা বাঁচবে তো?

দাদা। হরিচরণ, অস্থির হ'য়োনা। (জনৈক বালকের প্রতি) ওহে তুমি এর পায়ে একটু সেক দাও।

(বালকের কথাবৎ কার্য্যকরণ)

হরি। দাদাঠাকুর, আমার আর যে কেউ নেই!

দাদা। ভগবান আছেন। তাঁকে ডাকো। (অপর একজন বালকের প্রতি) ওহে, তুমি একে একটু বাতাস দাও।

(বালকের কথাবৎ কার্য্যকরণ)

হরি। দাদাঠাকুর, তুমি মুখ দিয়ে একবার বল, তা হ'লেই আমার ছেলে বেঁচে উঠবে। কবরেজ মশাই, আপনার পায়ে পড়ি তুমি কিছু মনে করোনা। আমার কিছু নেই; জমীদার সব লুটে নিয়েছে। আমার উপর ব্যাজার হ'য়োনা। (পদধারণ)

কবি। আরে কর কি, কর কি! হরিচরণ, আমরা কি কসাই? আমাদেরো প্রাণ আছে। পাঁচ যায়গা থেকে নিচ্চি। না হয় তোমার কাছ থেকে কিছু নাই বা পেলুম। দাদাঠাকুর দয়া করে' যে আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন, এ আমার পরম সৌভাগ্য। আমি কিছু চাইনে। আমি যথাসাধ্য চিকিৎসা করব।

দাদা। সে কি কবিরাজ মশাই, তা কেন? আপনার ন্যায্য প্রাপ্য আমিই দিব।

কবি। দাদাঠাকুর মাপ করুন। এই যে এখানে এসে আপনার শ্রীচরণ দর্শন করেছি, এই-ই আমার পরম লাভ।

দাদা। কবিরাজ মশাই, দেখুন তো একবার নাড়ীটে—রোগী যেন কেমন করছে।

রোগী। জ—অ—অ—(ক্ষীণস্বরে)

দাদা। এই যে বাবা, জল খাও। (জল দান)

কবি। অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। সময় হয়ে' আসচে।

হরি। বাবা, যাদু আমার, গোপাল আমার। এই দ্যাখ একবার চেয়ে দ্যাখ্, এই যে আমি তোমার সামনে

দাঁড়িয়ে। ঠাকুর, আমায় পথের কাঙাল ক'রো না, আমার অন্ধের নড়ী কেড়ে নিও না।

(জনৈক জমীদার-কর্ম্মচারীর সহিত চারিজন বরকন্দাজের প্রবেশ)

কর্ম্ম। এই যে হরে, বাঁধো এরে।

(বরকন্দাজগণ হরিচরণকে ধরিল)

১ম বরকন্দাজ। চল্ ব্যাটা চল্।

হরি। একি আমায় কোথায় নে' যাচ্ছ?

কর্ম্ম। কাছারীতে; তোর তলব হয়েছে।

হরি। এজ্ঞে, আমি—আমি সেই দিনই তো বলেছি। বেগার খাটতে পারবনা। আমি গরীব মানুষ।

কর্ম্ম। সেখানে গিয়ে কাঁদুনি গাইবি। এখন চল্।

হরি। আপনার পায়ে পড়ি আজ্‌কের দিনটে আমায় রেয়াৎ কর।

কর্ম্ম। আরে চল্ ব্যাটা। ও সব কান্নাকাটি শুন্‌বোনা। মনিবের কড়া হুকুম।

হরি। আপনার পায়ে পড়ি।

কর্ম্ম। এই বরকন্দাজ! ধরে' নিয়ে চল্।

বর। চল্ চল্ ব্যাটা (গলাধাক্কা)

দাদা। মশাই, মনিবেরও মনিব আছে। যিনি সকলের মনিব তাঁর দরবারে এর বিচার হবে। এখানেই বিচারের শেষ নয়; এটা মনে রাখ্‌বেন।

কর্ম্ম। মশাই, ও সব লম্বাচওড়া কথা শুন্‌তে গেলে আর আমাদের চলে না। আমরা যার খাই, তার কাজ করি।

দাদা। আজ ওকে ছেড়ে দিয়ে যান। কাল না হয় ওর বিচার হবে। আপনার মনিব এতে রাগ করবেন্ না। আমি ওর জামিন হলুম। দেখুন ওর ছেলে মৃত্যু-শয্যায়।

কর্ম্ম। আপনার এত রাক্ষুসে মায়া কেন? আপনাকে আমরা বেশ চিনি। সে দিন তো একটা হাঙ্গামা করতে গিয়েছিলেন।

দাদা। আচ্ছা ভেবে দেখুন আপনিই একবার, এ অবস্থায় কি ওকে নিয়ে যাওয়া উচিত হবে? ধর্ম্ম তো আছেন।

কর্ম্ম। তোমার ওসব ধর্ম্মের কচ্‌কচানি রেখে দাও।

জনৈক বালক। এই! মুখ সাম্‌লে কথা কও। দাদাঠাকুর, একবার হুকুম দিন তো, তার পর দেখি কার সাধ্য ধরে' নিয়ে যায়।

দাদা। স্থির হও; আমাদের কাজ এরূপ নয়। এখনো এর সময় হয়নি।

বর। (হরিচরণকে) চল্ ব্যাটা চল্। (ধাক্কা মারিল)।

হরি। (কাঁদিতে কাঁদিতে) আমার বাছাকে বুঝি আর ফিরে এসে দেখ্‌বোনা। দাদাঠাকুর, আমি যাই আপনি আমার বাবার কাছে থেকো। আমায় না দেখে ও আর বাঁচবে না। মশাই আমায় একবার ছেড়ে দিন। আমি বাছাকে একবার বুকে করি।

কর্ম্ম। বরকন্দাজ, নিয়ে চল।

বরকন্দাজ। চল্ ব্যাটা চল্।

হরি। ওঃ—গরীবের কেউ নেই।

দাদা। ঈশ্বর আছেন। যাও হরিচরণ, নির্ভয়ে যাও, দীননাথ তোমার সহায়, তিনি তোমায় রক্ষা করবেন। তোদের বুকে আঘাত করলে যে তা তাঁরি বুকে বাজে। যাও হরিচরণ, যার কেউ নেই তার তিনি আছেন।

কর্ম্ম। তোমারো একদিন যেতে হবে। ধনদাস রায়ের বিষ নজরে পড়েছো। চল্ ব্যাটা চল্।

(কর্ম্মচারী ও বরকন্দাজগণ হরিচরণকে লইয়া প্রস্থান করিল)

রোগী। বাবা ··· উঃ

কবি। রোগীর আর বিলম্ব নেই। সময় হয়ে' এসেছে।

দাদা। তাইতো, (ছেলেদের প্রতি) তোমরা প্রস্তুত হও।

(কিয়ৎকাল পরে রোগী প্রাণ ত্যাগ করিল। দাদাঠাকুর কিয়ৎকাল নির্নিমেষ লোচনে মৃত দেহের পানে চাহিয়া পরে কহিলেন)

এই তো সব শেষ। কি আশ্চর্য্য; এত ক্ষণস্থায়ী এত নশ্বর এই মানব-জীবন! এরি জন্যে মানুষ মানুষকে হিংসা করে। ক্ষুদ্র মানব, চেয়ে দেখ, তোমার অত্যাচার ও অনুগ্রহের সীমা কতটুকু মাত্র! তুমি কত ক্ষুদ্র! এস আমরা সবাই মিলে একে শ্মশানে নিয়ে যাই।

(সকলের গীত গাইতে গাইতে মৃতদেহ লইয়া প্রস্থান)

বাউলের সুর।

এমনি করেই দুদিন পরে ফুরিয়ে যাবে সব খেলা;
ঐ যে আঁধার আস্‌চে ধেয়ে গগনে আর নাই বেলা।
(ওকি ভীষণ কালো গো, ঐ যে আঁধার)
এখনো বাহির ছেড়ে——(ও তুই কোন্ প্রভাতে
বাহির হলি গো সন্ধ্যা হোল)
এখনো বাহির ছেড়ে আয়রে ঘরে থাকিস্‌নে আর
একেলা।
চেয়ে দ্যাখ্ সাথী যত যাচ্ছে চলে সবাই—
কেউ রবেনা চোখের জলে ভাসবি যখন ভাই
কিসের আপন, কেউ কারো নয়, মিল্‌ছে দুদিনের
মেলা।

আপন জনে গেলি ভুলে, মত্ত হয়ে খেলায়
ঘরে বসে' রে অভাগা ডেকে মরে যায়
ও তুই দেখবি না পথ আঁধার হলে তুই যে বড়
একেলা।
হবে তোর খেয়া বন্ধ, (আমায় দেখে ওরে অন্ধ)
পড়ে রবি পথের মাঝে হয়ে' সবার পায় ঠেলা।

দ্বিতীয় দৃশ্য সমাপ্ত।

বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত

গীতা-রহস্য।

আধিদৈবতবাদ ও ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ বিচার।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদিত।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ক্ষেত্র শব্দের অর্থ এইরূপ নির্দ্ধারিত হইলে পর, এই ক্ষেত্র কিংবা ক্ষেত কাহার, এই কারখানার মালিক আছে কি না, এই প্রশ্ন পরে সহজে নিষ্পন্ন হয়। আত্মা এই শব্দ কখন কখন মন, অন্তঃকরণ কিংবা আমি স্বয়ং—এই অর্থে ব্যবহৃত হইলেও তাহার মুখ্য অর্থ ক্ষেত্রজ্ঞ কিংবা শরীরের মালিক বা স্বামী। মনুষ্য যে যে ক্রিয়া করে,—তাহা মানসিক হোক্ বা শারীরিক হোক্—সে সমস্ত তাহার বুদ্ধি-আদি অন্তরিন্দ্রিয়, চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় কিংবা হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় করিয়া থাকে। এই সমস্ত সমূহের মধ্যে মন ও বুদ্ধি এই দুই ইন্দ্রিয়ই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু উহারা শ্রেষ্ঠ হইলেও অন্য ইন্দ্রিয়াদির ন্যায় এই সমস্ত, মূলে জড়দেহের কিংবা প্রকৃতির বিকার (পূর্ব্বপ্রকরণ দেখ)। তাই, মন ও বুদ্ধি এই দুই ইন্দ্রিয় সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও আমাদের আপন-আপন বিশিষ্ট ব্যাপারের বাহিরে উহারা অন্য কিছুই করিতে পারে না, ও করিতে সমর্থও নহে। মন চিন্তা করে এবং বুদ্ধি নিশ্চয় করে, ইহা সত্য; কিন্তু এই কাজ মন ও বুদ্ধি কাহার জন্য করে, অথবা বিভিন্ন সময়ে মন ও বুদ্ধির যে পৃথক্ পৃথক্ ব্যাপার ঘটিয়া থাকে, তাহাদের একত্বের জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং এই জ্ঞান হইবার নিমিত্ত যে একীকরণ আবশ্যক হয় সেই একীকরণ কে করে, কিংবা পরে সমস্ত ইন্দ্রিয়, স্ব স্ব ব্যাপারকে তদনুকূল করিবার সন্ধান কি করিয়া পায়, ইহার নির্ণয় উহাদের দ্বারা হয় না। মনুষ্যের জড়দেহই এই কাজ করে এ কথা বলা যাইতে পারে না। কারণ, শরীরের চেতনা অর্থাৎ নড়াচড়া-ব্যাপার নষ্ট হইলে, যে জড়দেহ অবশিষ্ট থাকে, সে এ কাজ করিতে পারে না; এবং জড়দেহের মাংস স্নায়ু ইত্যাদি ঘটন-অবয়বসমূহ অন্নেরই পরিণাম, সুতরাং নিত্য ক্ষয়গ্রস্ত ও নিত্য নূতন নির্ম্মিত হয়; সুতরাং কাল যে ব্যক্তি অমুক বিষয় দেখিয়াছিল, সেই আমি আজ অন্য বিষয় দেখিতেছি, এইরূপ যে একত্ববুদ্ধি তাহা নিত্য-পরিবর্ত্তনশীল জড়দেহের ধর্ম্ম, এইরূপ মানিতে পারা যায় না। ভাল; জড়দেহ ছাড়িয়া চেতনাকেই যদি মালিক বলা যায় তাহা হইলে গাঢ়নিদ্রাতে প্রাণাদি বায়ুর শ্বাসোচ্ছ্বাসাদি কিংবা রক্ত-চলাচল-আদি ব্যাপার অর্থাৎ চেতনা, বজায় থাকিলেও 'আমি' এই জ্ঞান হয় না (বৃ, ২, ১, ১৫, ১৮)। তাই, চেতনা কিংবা প্রাণাদি ব্যাপার কেবল জড়েরই এইরূপ বিশিষ্ট গুণ, সমস্ত ইন্দ্রিয়ব্যাপারদিগের একীকরণ করিবার মূল প্রভু-শক্তি নহে, এইরূপ সিদ্ধ হইতেছে (কঠ, ৫, ৫)। 'আমার ও পরের' এই ষষ্ঠান্তবিশেষণের দ্বারা গুণের বোধ হইয়া থাকে; কিন্তু 'অহং' অর্থাৎ 'আমি' কে, ইহার নির্ণয় উহাদের দ্বারা হয় না। এই 'আমি'কে যদি নিছক্ ভ্রম বল, তাহা হইলে বলিতে হয় প্রত্যেকের প্রতীতি কিংবা অনুভূতি সেরূপ নহে এবং এই অনুভূতিকে ছাড়িয়া কোন কল্পনা করা কেমন? না, যেমন শ্রীসমর্থ-রামদাস স্বামী বলিয়াছেন—

"প্রচীতীরীণ জেঁ বোলণে। তেঁ অবঘেচি কণ্টারবাণে।
তোঁড় পসরুণ চৈসেঁ সুণেঁ। রডোন গেলে॥"

অর্থাৎ—মুখব্যাদান করিয়া কুক্কুরের কান্না যেমন বিরক্তিকর; প্রতীতি বিনা যাহা কিছু বলা হয় সমস্তই বিরক্তিকর (দা, ৯, ৫, ১৫); এবং এত করিয়াও তবু ইন্দ্রিয়ব্যাপারের একীকরণের উপপত্তি কিছুই পাওয়া যায় না। কেহ কেহ এরূপ বলেন যে, আমি' বলিয়া কোন পৃথক পদার্থ নাই; মন, বুদ্ধি, চেতনা, জড়দেহ প্রভৃতি সকল তত্ত্বের সমাবেশ ক্ষেত্র এই শব্দের মধ্যে করা হইয়া থাকে; সেই সমস্তের সংঘাতকে বা সমুচ্চয়কে 'আমি' বলা যায়। কিন্তু কাঠের উপর কাঠ চাপাইলেই বাক্সো হয় না, কিংবা ঘড়ির সমস্ত চাকা একত্র যুক্ত করিলেই

তাহাতে গতিও উৎপন্ন হয় না; ইহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। তাই নিছক্ সঙ্ঘাতের দ্বারা কর্তৃত্ব আইসে এরূপ বলা চলে না; ক্ষেত্রের সমস্ত ব্যাপার নিরর্থক পাগলামি নহে, তাহাতে কিছু বিশিষ্ট অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্য থাকে ইহা বলা বাহুল্য। এই ক্ষেত্র-রূপ কারখানার বুদ্ধি-আদি সমস্ত কর্ম্মচারীকে এই উদ্দেশ্য কে বলিয়া দেয়? সংঘাত অর্থে শুধু যুড়িয়া দেওয়া। সমস্ত পদার্থ একত্র করিলেও তাহার একপ্রাণত্ব বিধান করিতে হইলে, তাহার মধ্য দিয়া একটা যোগসূত্র স্থাপন করা আবশ্যক। নচেৎ উহা পুনর্ব্বার কখন-না-কখন বিশ্লিষ্ট হইতে পারে। এই যোগসূত্রটি কি, এক্ষণে তাহাই আমাদের দেখিতে হইবে। সংঘাত গীতার স্বীকৃত নহে এরূপ নহে; তবে, তাহার গণনা ক্ষেত্রসম্বন্ধেই করা হইয়া থাকে (গী, ১৩, ৬)। ক্ষেত্রের মালিক কিংবা ক্ষেত্রজ্ঞ কে, উহার দ্বারা তাহার সিদ্ধান্ত হয় না। সমুচ্চয়ের মধ্যে কোন নূতন গুণ উৎপন্ন হয়, এইরূপ কেহ কেহ মনে করেন। কিন্তু এই মতও আদৌ সত্য নহে। কারণ পূর্ব্বে যাহার অস্তিত্ব কোন আকারে ছিল না তাহা এ জগতে নূতন উৎপন্ন হয় না, এইরূপ তত্ত্বজ্ঞানীরা পূর্ণবিচারান্তে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন (গী, ২, ১৬)। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত ক্ষণভরে একটু পাশে সরাইয়া রাখিলেও, সংঘাতে উৎপন্ন নবগুণকেই ক্ষেত্রের মালিক বলিয়া কেন স্বীকার করা যাইবে না, এইরূপ ইহার পরে আর এক প্রশ্ন স্বভাবত উদ্ভূত হয়। এই সম্বন্ধে কতকগুলি আধুনিক আধিভৌতিকশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলেন যে, দ্রব্য ও তাহার গুণ বিভিন্ন হইতে পারে না, গুণের কোন-না-কোন অধিষ্ঠান থাকা চাই। এইজন্য সমুচ্চয়োৎপন্ন গুণের বদলে আমরা সমুচ্চয়ই এই ক্ষেত্রের মালিক এইরূপ বুঝি। ঠিক কথা; কিন্তু পরে ব্যবহারে, তুমি অগ্নিশব্দের বদলে জ্বালানি কাঠ; বিদ্যুৎশব্দের বদলে মেঘ, কিংবা পৃথিবীর আকর্ষণের বদলে পৃথিবী,—এরূপ কেন তবে বল না? ক্ষেত্রের সমস্ত ব্যাপার এক ব্যবস্থা ও এক পদ্ধতি অনুসারে চালাইবার জন্য, মন ও বুদ্ধি হইতে ভিন্ন আর কোন শক্তি থাকা চাই, এই কথা যদি নির্ব্বিবাদ হয়, তবে সেই শক্তির অধিষ্ঠান অদ্যাপি আমাদের অগম্য কিংবা সেই শক্তি বা অধিষ্ঠানের পূর্ণস্বরূপ অদ্যাপি ঠিক বলিতে পারা যায় না বলিয়া আদৌ সেই শক্তিও নাই এরূপ বলায় কি কোন যুক্তি আছে? যেই কেন হোক না, সে যেমন নিজের কাঁধের উপর বসিতে পারে না, সেইরূপ সংঘাতের জ্ঞান সংঘাত আপনিই সম্পাদন করিয়া লয় এরূপ বলা যাইতে পারে না। অতএব, ইন্দ্রিয়াদি-সংঘাতের ব্যাপার যাহার উপভোগের জন্য কিংবা লাভের জন্য হইয়া থাকে, সে যে কোন প্রকার সংঘাত হইতে ভিন্ন, এইরূপ তর্কদৃষ্টিতেও দৃঢ় অনুমান হয়। সংঘাত হইতে ভিন্ন এই তত্ত্ব স্বয়ং সমস্ত তত্ত্বের জ্ঞাতা বলিয়া, জগতের অন্য পদার্থাদির ন্যায় সে নিজেই নিজের জ্ঞেয় অর্থাৎ গোচর হইতে পারে না এ কথা সত্য; কিন্তু তাই বলিয়া তাহার অস্তিত্ব-সম্বন্ধে কোন বাধা হয় না। কারণ সমস্ত পদার্থকে এই একই "জ্ঞেয়ের" কোঠাতেই পড়িতে হইবে এরূপ কোন কথা নাই। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়—এই দুই বর্গ; দ্বিতীয় বর্গের মধ্যে কোন বস্তু যদি না আসে তাহা হইলে প্রথম বর্গের মধ্যে তাহার সমাবেশ হয় এবং তাহার সত্তা জ্ঞেয়বস্তু—ইহাই সম্পূর্ণ সিদ্ধ হয়। অধিক কি, সংঘাতের অতীত আত্মা স্বয়ং জ্ঞাতা হওয়ায় সে তাহার জ্ঞানের বিষয় না হওয়া কিছুই আশ্চর্য্য নহে, এইরূপ বলা যাইতে পারে; এবং এই অভিপ্রায় অনুসারেই "ওরে! যে, সমস্ত বস্তু জানে তাহার জ্ঞাতা অন্য কোথা হইতে আসিবে?—বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ—এইরূপ বৃহদারণ্যক-উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন (বৃ, ২, ৪, ১৪)। তাই হস্তপদাদি ইন্দ্রিয়াদি হইতে উচ্চে উঠিতে উঠিতে প্রাণ, চেতনা, মন ও বুদ্ধি এই পরতন্ত্র ও একদেশদর্শী কর্ম্মচারীদিগেরও বাহিরে থাকিয়া সেই সমস্ত ব্যাপারের একীকরণকারী ও তাহারা কিরূপ ভাবে কাজ করিবে তাহার নির্দেশক কিংবা তাহাদের কর্ম্মের নিত্য সাক্ষীস্বরূপ—এইরূপ তাহাদের হইতে অধিক ব্যাপক সমর্থ-শক্তি এই চেতনাবিশিষ্ট সজীবদেহে অর্থাৎ ক্ষেত্রে বাস করিয়া থাকে, এইরূপ শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। সাংখ্য ও বেদান্ত এই দুই শাস্ত্রেই এই সিদ্ধান্ত মান্য হওয়ায়, অর্ব্বাচীনকালে জর্ম্মন তত্ত্বজ্ঞ ক্যাণ্ট বুদ্ধিব্যাপারের সূক্ষ্ম পরীক্ষা করিয়া

এই তত্ত্বই নিষ্পন্ন করিয়াছেন। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার কিংবা চেতনা এই সমস্ত দেহের অর্থাৎ ক্ষেত্রেরই গুণ কিংবা অবয়ব। যাহা ইহাদের প্রবর্ত্তক, ইহাদের হইতে ভিন্ন, স্বতন্ত্র ও ইহাদের অতীত—"যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ" (গী, ৩, ৪২) তাহাই সাংখ্য-শাস্ত্রে পুরুষ নামে অভিহিত হইয়াছে। বেদান্তেও ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ ক্ষেত্রের জ্ঞাতাই আত্মা এইরূপ বলে; এবং "আমি আছি" এই যে প্রত্যেকের সাক্ষাৎপ্রতীতি, তাহাই তাহার অস্তিত্বের উৎকৃষ্ট প্রমাণ (বেসু, শাং ভা, ৩।৩।৫৩।৫৪)। "আমি নাই" এরূপ কেহ মনে করে না; শুধু তাহা নহে, মুখে "আমি আছি" এইরূপ শব্দ উচ্চারণ করিবার সময়েও 'নাই' এই ক্রিয়াপদের কর্ত্তার অর্থাৎ 'আমি'র কিংবা আত্মার অস্তিত্ব সে পর্য্যায়ক্রমে স্বীকার করিয়াই থাকে। 'আমি' এই অহঙ্কারযুক্ত, সগুণরূপে দেহের মধ্যে অবস্থিত এইরূপ স্বয়ংপ্রকাশ আত্মার অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞের মূলগত শুদ্ধ ও গুণবিরহিত স্বরূপটি কি, তাহারই যথাশক্তি নির্ণয়ার্থ বেদান্তশাস্ত্র প্রবৃত্ত হইয়াছেন (গী, ১৩, ৪); তথাপি এই নির্ণয় কেবল দেহের অর্থাৎ ক্ষেত্রের বিচার করিয়াই স্থিরীকৃত হয় নাই। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞের বিচার ব্যতীত বাহ্য জগতেরও অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডেরও বিচার করিয়া কি নিষ্পন্ন হয় তাহা দেখিতে হইবে, এইরূপ পরে কথিত হইয়াছে। এই ব্রহ্মাণ্ড-বিচারের নামই "ক্ষরাক্ষর-বিচার"। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ-বিচারের দ্বারা (অর্থাৎ দেহের মধ্যে কিংবা পিণ্ডের মধ্যে) কোন্‌টি মূলতত্ত্ব (ক্ষেত্রজ্ঞ কিংবা আত্মা) ইহার নির্ণয় হয়; পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ড মিলিয়া দুই দিকেরই মূলতত্ত্ব এইরূপ প্রথমে পৃথক্ পৃথক্ নির্দ্ধারিত হইলে, তাহার পর আরও বেশী বিচার করিয়া এই দুই-ই একরূপ কিংবা একই—কিংবা "যাহা পিণ্ড তাহা ব্রহ্মাণ্ড"—এইরূপ বেদান্তশাস্ত্রে শেষ-সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে *। ইহাই চরাচর সৃষ্টির চরম সত্য। পাশ্চাত্য দেশেও এইরূপ বিচারালোচনা হওয়ায়, ক্যাণ্ট প্রভৃতি কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানীর সিদ্ধান্ত আমাদের বেদান্তশাস্ত্রের সিদ্ধান্তের সহিত অনেকাংশে মিল হয়, ইহার প্রতি লক্ষ্য করিলে, অর্থাৎ আধিভৌতিক শাস্ত্রের উন্নতি এখনকার মত পূর্ব্বে না হইলেও যাঁহারা অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা অতি প্রাচীনকালে বেদান্তের সিদ্ধান্ত বাহির করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অলৌকিক বুদ্ধিবৈভব দেখিয়া আশ্চর্য্য না হইয়া থাকা যায় না; শুধু আশ্চর্য্য হইলে হইবে না, সেই সম্বন্ধে আমাদের উচিত গর্ব্ব অনুভব করাও আবশ্যক। ইতি ষষ্ঠ-প্রকরণ সমাপ্ত।

কি ভয়!

(শ্রীমতী বিধুমুখী দেবী)

যা কিছু আঁকড়ায়ে আমি
ধরেছিনু বুকে
নিমেষের মাঝে দেখি
সব গেল চুকে!
স্বপ্ন সম লুকাইল
কোন্ দেশান্তরে—
হে পূর্ণ! সম্পূর্ণ যত
পূর্ণ তব চরণ পরে।
মৃত্যু নাহি জরা নাহি,
নাহি নাহি ক্ষয়
মৃত্যু যে বহে গো হেথা
অমৃতের পরিচয়।
দাও দুঃখ দাও শোক
দাও অশ্রুজল
তার সাথে দাও যদি
ভকতি সম্বল।
জ্বলুক অন্তর মাঝে
দারুণ বিরহশিখা
এ বিশ্ব হোক্ ছারখার
তুমি যদি থাক প্রাণে
ওহে বিশ্বাধার
ব্রহ্মাণ্ড পাইলে লয়
কি ভয় আমার!

---

* ক্ষরাক্ষর বিচার ও ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ বিচার—আমাদের শাস্ত্রের এই বর্গীকরণ, গ্রীণ সাহেবের জানা ছিল না। তথাপি আপন Prologomena to Ethics এই গ্রন্থের আরম্ভে তিনি অধ্যাত্মের যে বিচার করিয়াছেন তাহা Spiritual Principle in Nature এবং Spiritual Principle in Man এইরূপ দুই ভাগ করিয়া পরে তাহাদের ঐক্য দেখাইয়াছেন। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ-বিচারের মধ্যে Psychology প্রভৃতি মানসশাস্ত্রের ও ক্ষরাক্ষর-বিচারে Physics, Metaphysics প্রভৃতি শাস্ত্রের পরে আত্মসমাবেশ হইয়া থাকে; এবং এই সমস্তের বিচার করিয়া স্বরূপের বিচার করা আবশ্যক হয়,—এই বিষয় পাশ্চাত্যবিদ্বান্‌দিগেরও মান্য।

রাণাডের-স্মৃতি কথা।

দশম—পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয়বার জেলা-ভ্রমণ (১৮৮২-১৮৮৩)।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর)

১৮৮২ অব্দে দশহরার পর আমরা সাতারা জেলা ভ্রমণ করিতে গেলাম। এইবার আমাকেও "উনি" সঙ্গে লইয়াছিলেন। একথা আলাদা আর বলিতে হইবে না। এই সময়ে আমাদের সঙ্গে ছিল—৫।৭ জন সিপাই, ৫।৭ জন কেরাণী, সিরেস্তাদার, দুইজন পাচক, ফাই-ফর্ম্মাস কাজের জন্য এক ব্রাহ্মণ, আমার এক দাসী, চাকর, বেহারা, গাড়োয়ান—সর্ব্বশুদ্ধ ৩৫।৪০ জন লোক। তাছাড়া সাতটা গরুর গাড়ী, দুই তাঁবু ও এক ঘোড়ার গাড়ী—এই সমস্ত সরঞ্জাম সঙ্গে ছিল। এইরূপ প্রবাস-ভ্রমণ আমাদের দুজনেরই খুব ভাল লাগিত। তাহার কারণ, ভিন্ন ভিন্ন স্থান, ভিন্ন হাওয়া, ভিন্ন জল, ভিন্ন দৃশ্য,—ইহার দরুণ মন সর্ব্বদাই উল্লসিত ও সুপ্রসন্ন থাকিত। তাহাতে আবার, পুণা অপেক্ষা প্রবাসে ওঁর শরীর—বিশেষত চোখ খুব ভাল থাকিত, এইজন্য সর্ব্বোপরি মনে সুখ ও শান্তি পাওয়া যাইত। প্রবাসে থাকিলেও, নিত্যকর্ম্ম ও কার্য্যক্রমে কোন ফাঁক পড়িত না—এই সমস্ত কাজ সমানই চলিত। আগের দিন যে আড্ডা নির্দ্দিষ্ট হইত, প্রাতঃকালে ৮।৯টার মধ্যে সেখানে গিয়া উঠিতাম। ঘোড়ার গাড়ীতে আমরা দু-জন, এক সিপাই ও কোচম্যান; এবং সেই গাড়ীতে জিনিসপত্র অর্থাৎ গদী, তাকিয়া, দুই দপ্তর, দোয়াত, জলযোগের খোরা ও জলের কুঁজো—এই সমস্ত সর্ব্বদাই থাকিত। নির্দ্দিষ্ট আড্ডায় পৌঁছিলে পর, যেখানে খুব গাছের ছায়া, সেইখানে গদী, তাকিয়া দোয়াৎ, দপ্তর সাজাইয়া, জায়গা প্রস্তুত হইয়াছে, এই খবর দেওয়া সিপাইদের কাজ ছিল। ততক্ষণ "উনি" গাড়ী হইতে নামিয়া মুখপ্রক্ষালনাদি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া, আড্ডার স্থানটা আশপাশে খোলা ও শুষ্ক আছে কিনা, খাবার জল বহতা-স্রোতের ও স্বচ্ছ কিনা, এই সমস্ত উনি দেখিয়া তাহার পর এখানে আসিয়া কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইতেন। গরুর গাড়ীগুলো একটু আগেই আসিত, কিংবা আড্ডার স্থানে আসিয়া জমা হইত। আমি গাড়ী হইতে নামিয়া, গরুর গাড়ী হইতে ভাঁড়ার ও রান্নার মালমসলা বাহির করিয়া, যেখানে রাঁধিতে হইবে সেই জায়গা ঝিকে দিয়া ঝাড়াইয়া ও গোবর-ছড়া দিয়া পরিষ্কার করাইতাম; এবং তাহার পর, হাঁড়ী-কুঁড়ি ও রান্নার মসলা বাহির করিবার পর হাত খোলসা হইলে, মোহনভোগ ও তাহার আনুসঙ্গিক অন্য মুখরোচক খাবার প্রস্তুত করিয়া যেখানে উনি বসিতেন, সেইখানে লইয়া যাইতাম। তখনো পর্য্যন্ত আমাদের গৃহে, কি পুরুষ কি স্ত্রীলোক—কাহারই চা খাওয়ার অভ্যাস ছিল না; সেইজন্য, পথ চলতি সময়ে রান্নার বিলম্ব হইলে সেইদিন মোহনভোগ লুচি এইরূপ কিছু টাটকা জলখাবার তৈরী করিয়া দিতে হইত। তৈরী জিনিস ভাল হইলেও এবং ক্ষুধিত হইলেও, নিত্য-নিয়মানুসারে উনি চার পাঁচ গ্রাস মাত্র খাইতেন, তাহার অধিক খাইতেন না। কিন্তু নিজের আহারের পূর্ব্বে, আমাদের সঙ্গে আগত কেরাণীদিগকে কিছু দেওয়া হইয়াছে কিনা, খোঁজ লইতেন।

আমি "দেওয়া হয় নাই" বলিলে, তিনি বলিতেন "উহাদিগকে আগে দেও"। তাই উহাদের জন্য লাড়ু, চিঁড়েভাজা প্রভৃতি কিছু জলখাবার তৈরী রাখিতে হইত। "ওঁর" জলযোগ হইয়া গেলে, আবার কাজ আরম্ভ হইত। অনেকক্ষণ ধরিয়া ঘাড় নীচু করিয়া লিখিতে লিখিতে একবার দুচার মিনিটের জন্য উনি ঘাড় উঠাইতেন; তখন সম্মুখে পাহাড় কিংবা নদী কিংবা গাছ যাহা কিছু আশপাশে থাকিত, তাহার দিকে সহজ-ভাবে তাকাইয়া থাকিতেন; ক্ষণকালের জন্য তাঁহার মুখশ্রী গম্ভীর হইয়া উঠিত, এবং তৎক্ষণাৎ আনন্দে যেন উৎফুল্ল হইয়া, সেই আনন্দের ভরে কোন শ্লোক কিংবা অভঙ্গের কোন এক চরণ আপন মনে আওড়াইতে আওড়াইতে তন্ময় হইয়া পড়িতেন; এই বিশ্রামটুকুই তিনি যথেষ্ট মনে করিতেন। তারপর আবার কাজ আরম্ভ হইত। নির্দ্দিষ্ট আড্ডায় পৌঁছিয়া দুই ঘণ্টার পর, স্নান করিতে উঠিতেন, এইরূপ নিয়ম ছিল। স্নান ও আহার হইয়া গেলে, সেই আসনে বসিয়াই সমস্ত লোকদিগকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতেন। পূর্ব্বদিনে আমাকে যে কাজ করিবার জন্য বলিয়া রাখিতেন তাহা কিরূপ হইল ও কতটা হইল তাঁহার খোঁজ লইতেন। প্রতিদিন ডাকে নূতন পত্র কাহারও আসিলে তাহা দেখিয়া তাহাদের উত্তর কি দিতে হইবে তাহা বলিয়া আমি একটু বিশ্রাম করিতাম। উনি ততক্ষণ সমস্ত পত্রের উত্তর লিখিয়া রাখিতেন এবং আমি উঠিলে পর, আমাকে পড়িয়া শুনাইতেন; এইরূপ আমাকে বলিয়া, বিশ্রাম করিবার জন্য অর্দ্ধ ঘণ্টা, পৌনে ঘণ্টা, কখন কখন এক ঘণ্টা কাল নিদ্রা যাইতেন। আমি সেইখানেই তাঁহার মাথার কাছে বসিয়া পত্র লিখিতে বসিতাম। নিদ্রা হইতে উনি উঠিলে পর, ওঁকে লিখিত পত্র পড়িয়া শুনাইতাম, তারপর পত্রগুলি বন্ধ করিয়া ডাকে দিবার জন্য সিপায়ের হাতে দিতাম। তাহার পর আমি রঘুবংশের নূতন দুই শ্লোক বাহির করিয়া তাহা দুই তিনবার ওঁর নিকট পাঠ করিয়া বুঝিয়া লইতাম;—যাহাতে

তাহার পর দিন তৈয়ারী করিয়া রাখিবার সুবিধা হয়। এই সমস্ত হইলে পর, "উনি" একটু জল কুলকুচি করিয়া আফিসে যাইতেন। সেখানে ফল সুপারী লইয়া তাঁহাকে দিতাম, তারপর সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত তাঁর কোন কাজ আমায় করিতে হইত না। তাহার পর আমি মারাঠী সংবাদপত্র লইয়া সেই বিছানার উপরেই পড়িতাম, কিংবা গ্রামের কোন মহিলা আসিলে তাঁহার সহিত গল্প করিতে বসিতাম, কিংবা তাঁহাদের গ্রামে দ্রষ্টব্য যদি কিছু থাকিত তাহা দেখিবার জন্য তাঁহার সঙ্গে যাইতাম।

এদিকে দুই তিন ঘণ্টা পর্য্যন্ত ওঁর সরকারী কাজকর্ম্ম হইয়া গেলে পর, সন্ধ্যাকালে, তালুকের কর্ম্মচারী, প্রধান প্রধান মহাজন, মাষ্টার প্রভৃতি লোক দেখা করিতে আসিত। তখন কলম ফেলিয়া রাখিয়া উনি দফ্‌তর বাঁধিতে বলিতেন এবং অভ্যাগত লোকদিগের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেন। সকালে যথেষ্ট বেড়ানো না হইয়া থাকিলে সেই লোকদিগের সহিত তিনি বেড়াইতে যাইতেন। উনি খুব জোরে দ্রুত চলিতেন, তাঁর সহিত সমান চালে আর কেহ হয়তো চলিতে পারিত; কিন্তু তালুকের গ্রামে আসিয়া কাজের অধিকার পাইয়া যাহাদের রাজ-রাজড়ার চাল হইয়া পড়িয়াছিল, পথ চলিবার অভ্যাস চলিয়া গিয়াছিল, সেই রাও সাহেবরা ওঁর সঙ্গে সমান-চালে চলিতে নাস্তানাবুদ হইয়া পড়িতেন। আমাদের লোকেরা সকলেই সঙ্গে সঙ্গে চলিত, কিন্তু রাওসাহেবদের দল পিছাইয়া পড়িত। চলিতে চলিতে উনি কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, তাহার উত্তর দেওয়া উহাদের পক্ষে মুস্কিল হইত, এইজন্য তাহার পর হইতে সাবধান হইয়া, বেড়াইতে যাইবার সময়টা এড়াইয়া উহারা একেবারে রাত্রি ৭টার সময় সাক্ষাৎ করিতে আসিত। মুন্‌সেফ, মামলেদার উঠিয়া গেলে পর, বাকীলোক অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বসিয়া থাকিত। তাহাদের সহিত কথাবার্ত্তায়, নানাবিষয়ের সংবাদ ও খোঁজখবর পাইবেন—ইহাই "উহার" উদ্দেশ্য ছিল। সেই গ্রামে জমির খাজনা কত, কি পরিমাণ কর উহাদিগকে দিতে হয়, জমি কোন্ ফসলের পক্ষে ভাল, কয় আনা পরিমাণ ফসল হয়, অবসরকালে গ্রামের লোকে কি করিয়া সময় কাটায়, বড় রকমের ব্যবসা কি ও তাহা কেমন চলে, কোন্ দেবতা গ্রামের মুখ্য দেবতা, তাহার জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট আয় আছে কি না, সেখানে কোন্ পুরাণ পাঠ হয়, গ্রামের বিশেষ উৎসবটা কি, সন্ধ্যাকালে কেরাণী, বেপারী, চাষী, দেশমুখ, দেশপাণ্ডা—এই সমস্ত গ্রামের লোক একত্র মিলিয়া কোন ভজনপূজন করে কি না, সমস্ত দিন কাজকর্ম্ম করিয়া শ্রান্তক্লান্ত প্রাণের ইহাই একমাত্র শ্রেয়স্কর বিশ্রামের জিনিস, এইরূপ বিশ্রাম লওয়া আবশ্যক—এই সকল কথা এবং গ্রামের পাঠশালার কাজ কিরূপ চলিতেছে, সে বিষয়ে লোকেরা কতটা মনযোগ দেয়—এই সমস্ত বিষয়ের খোঁজখবর লইতেন।

এইরূপ সহজ কথাবার্ত্তা হইতে খোঁজখবর লইবার উহাঁর অভ্যাস ছিল। লোকেরা উঠিয়া গেলে পর, সন্ধ্যার সময় আহার করিতে বসিতেন; তারপর দুপুরের সময়, আমি যে সকল মারাঠা সংবাদপত্র পড়িয়া রাখিতাম তাহা হইতে কিছু কিছু মুখে মুখে বলিতে হইত। সেইরূপ আবার, আজ নূতন খবর কি, কোন্ মহিলা সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল, কি কথাবার্ত্তা হইল প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করিতেন; আমি বলিতাম,—"বলিবার মতো কথা এমন কিই বা হইয়াছে? এখানকার সেখানকার যা' তা' কথা হইয়াছিল।" আমার এই কথা শুনিয়া "উনি" বলিতেন:—"হুঁ, ঠিকই হইয়াছে; তুমি শিক্ষিতা, তোমার সহরে বাস, রোজ তুমি খবরের কাগজ পাঠ কর—এইরূপ তোমার ধরণধারণ! সে বেচারীরা গ্রাম্য লোক, তারা সহরের সভাসমিতির কথা কোথেকে জান্‌বে? তোমার এই ধরণধারণ ও বড়মানুষী দেখে তারা বোধ হয় অবাক্ হয়ে গিয়েছিল! তখন তারা আর কি বল্‌বে।" এইরূপ উনি দুই পক্ষেরই কথা কিছু কিছু বলিয়া আমাকে লজ্জা দিতেন, এই রকম বলবার দিকে তাঁর একটা ঝোঁক ছিল, আর কিছুতে না। এইরূপ আমোদ-আহ্লাদে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে পর শোবার আগে, একঘণ্টাকাল কেরাণীদের মধ্যে কেহ একজন আসিয়া ইংরেজি সংবাদ পত্র পড়িত। সেই সময় আমি ওঁর পায়ে বী মালিস করিতাম। কারণ চোখের পীড়া থাকায়, প্রতিদিন পায়ে বী মালিস না করিলে নিদ্রা হইত না। যে দিন পড়া হইত না, সেদিন আমরা দুজনে দাবা খেলিতাম। এই সময়ে চাকর পায়ে বী মালিস করিত। প্রায় ১০টার সময় আমরা শুইতে যাইতাম। ওঁর নিদ্রাটাই আসলে কম হইত বলিয়া ৩।৪। ঘণ্টা নিদ্রা হইলেই উনি যথেষ্ট মনে করিতেন। এই সম্বন্ধে আমার আবার ঠিক্ উল্টা ছিল। আমি বেশী ঘুমাইতাম বলিয়া ৩। ৩॥০টার সময় ওঁর ঘুম ভাঙ্গিলেই, আমাকে জাগাইতে চেষ্টা করিতেন। তখন উঠিতে বিরক্তি বোধ হইত বলিয়া মনে মনে আমার রাগ হইত এবং কখন কখন কষ্ট হওয়ায় আমার কান্না আসিত; কিন্তু ইহার কিছুই আমি বাহিরে প্রকাশ করিতাম না, বলিতামও না। তবু উনি জানিতে পারিতেন। কিন্তু যেন উনি জানিতে পারেন নাই এইরূপ দেখাইয়া, যতক্ষণ না আমি আমার নিত্য নিয়মিত কর্ম্ম আরম্ভ করিতাম—ততক্ষণ আমাকে জাগাইবার চেষ্টা করিতেন। আমি একবার উঠিয়া নিকটে গিয়া পাঠ্য-পুস্তক হাতে লইলেই অমুক স্থানটা পাঠ কর—এইরূপ আমাকে বলিতেন। এইরূপ আমি পাঠ আরম্ভ করিয়া

দিলে, তাহা হইতে শ্লোক, কেকা, অভঙ্গ উনি বলিতে সুরু করিতেন; কিংবা শুনিবার সময় অর্থের দিকে মনটা গেলে, তল্লীন হইয়া হাতে তুড়ী কিংবা তাল পর্য্যন্ত দিতে থাকিতেন। নামদেবের কোন প্রেমরসপূর্ণ অভঙ্গ ওঁর ভাল লাগিলে, তাহা আমাকে পুনঃপুনঃ আবৃত্তি করিতে বলিতেন এবং সেই অভঙ্গের চিন্তায় মন নিমগ্ন হওয়ায়, চোখ বুজিয়া গুলিতে আরম্ভ করিতেন, এরূপ অবস্থাও কখন কখন হইত। এই সময়ে সকালের শান্ত মৃদু আলোকে সেই ভক্তিপূর্ণ মুখ বড়ই প্রেমার্দ্র দেখাইত, তাহাতে আমার মনও ভাবে গদগদ হইত এবং ওঁর উপর ভালবাসা ও ভক্তি স্বতই বৃদ্ধি হইত। আমি একলা থাকিলে আমার মনে হইত, আমি ওঁকে কেবল পার্থিব সম্বন্ধের দৃষ্টিতে, কিংবা সংসারের দৃষ্টিতেই দেখি, কিন্তু ওঁর ভিতরে আধ্যাত্মিক শক্তি ও দৈবী বিভূতি বেশী আছে। কিন্তু এইভাব মনে অনেকক্ষণ স্থায়ী হইত না। এই বিষয়ে ওঁকে আমি কিছু জিজ্ঞাসা করিব, এবং আমার যাহা মনে হয় ওঁকে বলিব, এইরূপ মনে করিয়া আমি যখন ওঁর মুখের পানে তাকাইতাম এবং সেই সময়ে উনিও যখন আমার দিকে তাকাইতেন, তখন এইরূপ চোখাচোখী হওয়ায়, আমার সেই জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা বালির ইমারতের মতো সমস্ত ধ্বসিয়া যাইত। আমি কিছু বলিতে যাইতে ছিলাম, ইহা লক্ষ্য করিয়া উনি বলিতেন, "আমার বোধ হচ্ছে, আমার বিষয়ে কোন টীকাটিপ্পনী করবে বোলে তোমার মনে ঘুট্ ঘুট্ করচে—না? যদি তা হয়, বোলে ফেল না, অত ভাবচ কেন? আমরা সাদাসিধা মানুষ! কোন রকম করে' ভজন পূজন করি। তুমি ইংরেজী শিক্ষিতা মহিলা, এ তোমার তেমন রুচিকর হবে না।" এই কথা শুনিয়া আমি লজ্জায় উঠিয়া যাইতাম। এইরূপ নিত্য চলিত।

তালুকের প্রত্যেক গ্রামে আমরা দুই তিন দিন থাকিতাম। তখন মেয়েদের স্কুলের মাষ্টার, স্কুল দেখিবার জন্য আমাদিগকে আমন্ত্রণ করিতেন। তাঁহারা আমন্ত্রণ করিলে পর, "উনি" বলিতেন "বক্তৃতা দিবার কাজ মহিলাদের। তাঁহাদিগকে আমন্ত্রণ কর—তাহা হইলে তাঁহারা আসিবেন।" এই কথা শুনিয়া তাঁহারা আমাদের নিকট আসিতেন, এবং কখন্ স্কুল দেখিতে যাইতে হইবে তাহার সময় ঠিক্ করিতেন। রাত্রে আহারের সময় "উনি" জিজ্ঞাসা করিতেন, "আজ দেখা করিতে কে কে আসিয়াছিল?" আমি বলিতাম—"কেহই না। মামলেদার-গৃহিনী ও মুন্সেফ-গৃহিনী আসিয়াছিলেন।" সন্ধ্যার সময় বালিকা বিদ্যালয়ের মাষ্টার আসিয়া আমন্ত্রণ করিয়া গেলেন। এই কথা শুনিয়া উনি বলিতেন, "তাহলে, কখন যাবে স্থির করলে? একটা কিছু বক্তৃতা ঠিক্ তৈরী করে রাখতেই হবে। আমিও একটু আগে কাজে ব্যস্ত ছিলাম সেই সময়ে একটা কি শুন্‌ছিলাম বটে, কিন্তু তখন সে বিষয়ে ততটা লক্ষ্য করি নি। কোন কোন পথ-চল্‌তি রাস্তার লোক বল্‌ছিল যে, একজন খুব স্থূল (অর্থাৎ গভীর) বিদ্বান্ মহিলা আসিয়াছেন, কাল বালিকা বিদ্যালয়ে তাঁর বক্তৃতা হইবে; ইত্যাদি ইত্যাদি কথা তারা বল্‌ছিল বটে; কিন্তু আমরা নিজের কাজে ব্যস্ত; সে দিকে লক্ষ্য করি নি; এখন মনে হচ্চে যে কথাগুলা কাণে আস্‌ছিল, তা তোমার সম্বন্ধেই হচ্ছিল।" এ কথা যে প্রথম শুনিবে, সে সত্যই মনে করিবে, "উনি" গম্ভীরভাবে কথাগুলো বলিতেছেন। অবসর সময়ে, ঠাট্টা তামাসা করা তাঁর অভ্যাস ছিল। আমি বলিলাম "খুব স্থূল" এই কথাটাই আমার পক্ষে খাটে, বাকী সমস্ত কল্পনা।" তার পর দিন, আমি স্কুল দেখিয়া আসিবার পরেও, এই রকম ঠাট্টই চলিতে লাগিল। কোনও গ্রামে, কোনও বাধা কিংবা আলস্যের দরুন স্কুল দেখিতে না গেলে উনি রাগ করিতেন এবং এইরূপ বলিতেন যে,—"লোকেরা আগ্রহ করে নিমন্ত্রণ করতে আসে, সেখানে একবার গিয়ে দেখ্‌তে কি বাধা হয়? সে খানে গিয়ে কি বোঝা ঘাড়ে করতে হবে? ওদের নিমন্ত্রণে তুমি গেলে তাতে এদের কি মোক্ষলাভ হবে? সেখানে কিছু জ্ঞান লাভ হবে বোলেই তোমার যাওয়া, আমি বল্‌চি বোলেই কি যাবে? আমি শুধু একটু মজা করবার জন্য বলি ঠাট্টা কথার কাল্‌তো অর্থ নিও না।" এইরূপ সুখসম্ভোগে প্রবাস কি আরও ভাল লাগিবার কথা নহে?

এইরূপ আমাদের তো গৃহ অপেক্ষা প্রবাসে অধিক সুখ হইত। ভ্রমণ করিতে করিতে একবার "তাসগ্রামে" আমাদের আড্ডা হইল। তালুকের গ্রাম বলিয়া আমাদের সেখানে ২।৩ দিন থাকিতে হইল। এই সময়ে আমরা শ্রীগণপতির ধর্ম্মশালায় উঠিয়াছিলাম। সেখানে উঠিয়া আমাদের খাওয়া দাওয়া হইয়া গেলে দুপুরবেলায় ডে-এ ইনস্‌পেক্টর সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া আমাকে বলিলেন, আমাদের এই তালুকের স্কুলের পরীক্ষা এই মাত্রেমাত্র শেষ হয়েছে, আর এই সময়ে আপনাদের শুভাগমন হল। এরূপ সুযোগ বল্‌লামাত্র ঘটে না। বালক ও বালিকাদের স্কুলের পুরস্কার বিতরণের কাজটা আপনার এখানে থাক্‌তে থাক্‌তেই করা যাবে; আপনাদের দুজনের হাত দিয়ে দুই স্কুলের পুরস্কার দেওয়া যাবে" ইত্যাদি ডেপুটি অনুরোধ করিলে পর, 'উনি' তাঁকে বলিলেন—"আচ্ছা।" কেবল আমাকে রাত্রে বলিলেন যে, "আজ দুপুর বেলা স্কুলের ডেপুটী এসেছিলেন। পরশু দিন বালিকা স্কুলের পুরস্কার বিতরণ হবে।

ওরা পুরস্কার তোমার হাত দিয়ে দেবে মনে করচে। এই সময়ে একটা বক্তৃতা তৈরী করে নিয়ে যেতে হবে। আমি যে রকম অন্য সময়ে ঠাট্টা করে বলি, এ কথা সে রকম ঠাট্টা করে বলচি নে। তুমি ঠাট্টা মনে কোরো না। সেখানে কেবল মেয়েরাই থাকবে, পুরুষ কেহই আসবে না। কিন্তু অনেক মেয়ে আসবে। সেখানে গিয়ে তুমি লজ্জায় না পড়, এই জন্য তোমাকে আগে থাকতে বোলে রাখচি। মুখে যদি বলতে না পার, যা মনে হয় একটু লিখে নিয়ে যেয়ো।" এই কথা শুনিয়া আমি সত্য সত্যই ভীত হইয়া পড়িলাম; একটা দুর্বহ বোঝা যেন আমার মাথায় চাপানো হইয়াছে এইরূপ অনুভব করিয়া আমি বলিলাম, আমি আবার কি বলব? আমার কি বলা অভ্যাস আছে? এখনি আমার হাত পা কাঁপচে, তার পর পরশু দিন না জানি কি হবে। আমি একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছি, কি লিখব, কি বলব, আমার কিছুই মনে হচ্চে না। তুমি কিছু মুখে বলো, আমি লিখে নি।" এই কথা শুনিয়া উনি একটু জোর করিয়া বলিলেন;—"আমি কিছু বলচি নে, আমার নিজের কিছু কাজ আছে, আমি অন্যের কাজ হাতে নেব কি করে?" আমাকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়ে তার পর সেই লেখা সেখানে পড়বে? এ আমার ভাল লাগে না। ভাল হোক্ মন্দ হোক্ তোমার যা মনে আসে তাই লিখে ফেল। তার ভিতর দুই একটা কথা কমবেশী করা যেতে পারে এই মাত্র। আর তা যদি না হয় প্রসঙ্গোচিত দু চার কথা মুখে বলবে—সেই ভাল। তা বলতে তোমার কি বাধা? এখন যদি তুমি যাবড়িয়ে গিয়ে থাক, কাল ভোরে লিখে ফেলো। তুমি মেয়েমানুষ মেয়েমানুষদের মধ্যে টক্করা-টক্করি হবে! সেখানে কেবল মেয়েরাই বলবে; তুমি দুই চারটে কথা যা বলবে তা একটু গুছিয়ে বল্লেই হবে।" এই ধরণে "উনি" অনেক কথা বলিলেন। তার পর দিন ভাবনা চিন্তাতেই কাটিয়া গেল। কিন্তু কি লিখিব তাহা ঠিক্ করিতে পারিলাম না। তাসগাঁওকর তাই-সাহেবের বৈঠকখানায় পুরস্কার-অনুষ্ঠানের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। শ্রীমতী তাই-সাহেব এবং গ্রামের প্রায় ৮০ জন মহিলা উপস্থিত ছিলেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে আমি সেখানে গেলাম। মেয়েরা কিছু কবিতা আবৃত্তি ও শিক্ষয়িত্রী কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলে পর মেয়েদিগকে আমার দুই চারিটা উপদেশের কথা বলিবার সময় আসিল। আমি ত উঠিয়া দাঁড়াইলাম; কিন্তু আমার দম আটকাইবার মতো হইয়া হাত পা কাঁপিতে লাগিল; দুই তিন মিনিট এইরূপ অবস্থা হইয়াছিল, তবুও আমি বলিতে আরম্ভ করিলাম,—কে জানে কিরূপ হইল; ২০।২৫টা কথা আমি তাড়াতাড়ি ও অবাধে বলিয়া গেলাম সভা। সভায় দাঁড়াইয়া সভাকর্ত্রীর হিসাবে বক্তৃতা করিবার প্রসঙ্গ আমার এই প্রথম উপস্থিত হয়। এই অনুষ্ঠান এখানকার মহিলাদের খুব ভাল লাগিয়াছে মনে হইল, কারণ, তারপর, ঐ গ্রামে আমরা যে দুই দিন ছিলাম, সেই সময়ে অনেক মহিলা, "হলুদকুঙ্কুমে" তাঁদের বাড়ী আমরা যাই এইরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিল এবং দুই দিনই অনেক মহিলা আমাদের বাড়ী আসিয়া গল্পস্বল্প করিত। এক সময়ে কোন কারণে "ওঁর" অন্দরে আসিতে হইয়াছিল। কিন্তু অনেক মেয়ে সেখানে থাকায়, ওঁকে ফিরিয়া যাইতে হইল। আমাকে ঠাট্টা করিবার উনি এই এক উপলক্ষ্য পাইলেন এবং বলিলেন "এখন তোমার এই শিষ্যমণ্ডলী তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে দিবে কিনা আমার ভয় হচ্ছে। মেয়েদের কাণ্ড এই রকমই।" পুরস্কার অনুষ্ঠানের দিনে আমি গৃহে আসিলে, "আজ কেমন হল?" এইরূপ অনেকবার আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু আমি কিছুই বলিলাম না। শুধু এই কথা বলিলাম, মেয়েদের মধ্যে যাই হোক না, পুরুষদের সে-সব খোঁজ করবার দরকার কি? আমি লজ্জায় পড়ব, তুমি ভবিষ্যদ্ বাণী করেছিলে—সেই রকম কিছু হয়ে থাকবে। কিছু না বোলে দিয়ে, কিছু না শিখিয়ে দিয়ে একজন মূর্খ মানুষকে এত লোকের মধ্যে পাঠিয়ে দিলে এই রকমই ত হবার কথা। আর কি হবে?" এই কথা ওঁর ভাল মনে হইল না। মনে হইল যেন উনি কি একটা ভাবিতেছেন, কিন্তু তাহার পর, একটি কথাও বলিলেন না। কিন্তু ঘুমাইবার আগে আর না বলিয়া থাকিতে পারিলেন না—আমাকে পুনঃ পুনঃ খুঁটিয়া খুঁটিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন;—"তুমি যা বলছিলে, এখন সব খুলে বলো, সমস্ত কথা না শোনা পর্য্যন্ত মানুষের ভাবনা হয়। একটা কোন কাজ দায়িত্বের সঙ্গে তুমি কতটা করতে পার, এইটিই আমি দেখতে চাই। এতে ঠাট্টা চলে না।" এই কথা শুনিয়া আমার যাহা মনে ছিল সমস্তই বলিলাম। এই সময়ে তিনি উদাহরণ দেখাইলেন।—"আমাদের লোকেরা স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে যে আপত্তি আনে, তাতে এই কথাই তারা বিশেষ করিয়া বলে যে, মেয়েরা শিক্ষিতা হ'লে, উদ্ধত বেপরোয়া ও মর্য্যাদারহিত হইবে। এইজন্য, মেয়েদের,—শিক্ষিতা মেয়েদের এই আপত্তি তুলিবার কোন অবসর তোমার দেওয়া উচিত নয়। মানুষ উদ্ধত হইবে—ইহা নিশ্চয়ই শিক্ষার পরিণাম নহে। সুশিক্ষা ও সম্পদের পরিণাম মানুষকে বিনয়সম্পন্ন ও নম্রই করিয়া থাকে। এর উদাহরণ কলাগাছ; এ উদাহরণ সর্ব্বসাধারণের বুঝিবার মতো, একটা বড় কাঁধিই—কলা গাছের কল

সম্পদ; এই সম্পদ লাভ করিলেও কলাগাছ কিছুই মনে করে না, বরং তাকে আরও নম্র ও বিনয়ী হইতে দেখা যায়। এবং এইজন্যই কলাগাছের এত শোভা। ইহা হইতে আমাদের এইটুকু জ্ঞান লাভ হয় যে, বিদ্যা, ধনসম্পত্তি, অধিকার, এইরূপ কোন কিছু বৈভব লাভ করিলে, আমরা অধিক নম্র ও বিনয়ী হইয়া প্রীতি ও ভক্তিসহকারে আপন স্বামীর সহিত, গুরুজনদিগের সহিত ব্যবহার করিব, তাহাতে আমাদের কল্যাণ আছে ইত্যাদি ইত্যাদি।" এই সমস্ত কথা আমি বেশ মনোযোগ দিয়া শুনিলাম—তাহাতে 'উনি' খুশী হইলেন মনে হইল। কোন উত্তর করিলেন না। এ-যাত্রা ফিরিবার সময় প্রথমে "ওয়াই"-নগর, তাহার পর মহাবলেশ্বর হইয়া ফিরিয়া আসিলাম। মহাবলেশ্বরে ৮ দিন থাকিয়া দ্রষ্টব্য স্থানগুলি (ভিন্ন ভিন্ন points) দেখিয়া লইলাম এবং প্রতাপগড়ে গিয়া সেখানকার কেল্লা, যেখানে শিবাজী অবজুল খাঁকে হত্যা করিয়াছিলেন সেই স্থান ও দেবীর মন্দির দেখিলাম।

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন।*

(সংবাদ প্রভাকর হইতে উদ্ধৃত)

(৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত)

আমরা আশ্বিন মাসের প্রথম দিবসীয় প্রভাকর পত্রে মহাত্মা ৺রামপ্রসাদ সেন কবিরঞ্জন প্রণীত কয়েকটী গীত প্রকটন করিয়াছিলাম তৎপাঠে পাঠক মাত্রেই প্রেমানন্দে পরিপূর্ণ হইয়াছেন, যেহেতু ইহার তুল্য বঙ্গভাষা ভাষিত অমূল্য গীতরত্ন এ পর্য্যন্ত কোন কবি কর্ত্তৃক প্রচারিত হয় নাই। বঙ্গদেশের মধ্যে যত মহাশয় কবিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তন্মধ্যে রামপ্রসাদ সেনকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে, কারণ তিনি সকল রসের রসিক, প্রেমিক, ভাবুক ও ভক্ত এবং জ্ঞানী ছিলেন, ইনি কতকালের পুরাতন মনুষ্য ও কতকাল মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন তথাচ ইঁহার কৃত একটিও পদ অদ্যাপি পুরাতন হইল না, নিয়তই নূতন ভাবে পরিচিত হইতেছে; যখনি যাঁহা শুনা যায় তখনই তাহা নূতন বোধ হয়; গায়কেরা যখন গান করেন তখন শ্রোতৃবর্গেরি কর্ণে বর্ণে বর্ণে সুধা প্রবেশ করিতে থাকে। কোন সুগায়ক ব্যক্তি অপর কোন কবি রচিত গীত অতি সুস্বরে গান না করিলে শ্রুতিসুখকর হয় না তাহাতে বাদ্য ও অন্যান্য যন্ত্রের আবশ্যক করে, রামপ্রসাদী পদে ইহার কোন বিষয়েরই প্রয়োজন করে না, কাকের ন্যায় অতি নীরস কর্কশকণ্ঠ কোন মানুষ (যাহার তাল, মান, রাগ, সুর কিছুই বোধ নাই) তাহার কণ্ঠ হইতে রামপ্রসাদী পদ নির্গত হইলে বোধ হইবে যেন কোথা হইতে অকস্মাৎ অমৃত বৃষ্টি হইতেছে। এই গানে যন্ত্র না হইলে যন্ত্রণার বিষয় কি। যিনি মানুষ হইবেন শ্রবণ করিতে করিতে তাঁহার মন অমনি মুগ্ধ হইবেক, ভাবার্থ গ্রহণ করণের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি প্রেমাহ্লাদে পরিপূর্ণ হইতে থাকিবেন। পৃথিবীতে যত প্রিয় পদার্থ আছে তৎকালে তাঁহার চিত্ত এতদপেক্ষা পরম প্রিয় বলিয়া আর কাহাকেই গ্রাহ্য করিবে না। কোন কোন রামপ্রসাদী পদের কোন কোন চরণের কোন কোন শব্দ ও কোন কোন ভাব এরূপ রমণীয় ও এরূপ অত্যাশ্চর্য্য কৌশল পরিপূরিত যাহার স্বরূপার্থ প্রকাশ হইলে বহুশাস্ত্রের মর্ম্ম অনায়াসেই গ্রহণ করা যাইতে পারে এবং তদ্দ্বারা সিদ্ধান্তসূর্য্যের সন্দীপণে সমুদয় সংশয়ধ্বান্ত অন্ত হইলে হৃদয়ারবিন্দ আনন্দ-মকরন্দ-ভরে প্রফুল্ল হইয়া কি এক অভাবনীয় অদ্ভুত ব্যাপারে অভিভূত করিতে থাকে।

কবিতা বিষয়ে রামপ্রসাদ সেনের অলৌকিক শক্তি ও অসাধারণ ক্ষমতা ছিল, ইনি চক্ষে যখন যাহা দেখিতেন এবং ইঁহার অন্তঃকরণে যখন যাহা উদয় হইত তৎক্ষণাৎ তাহাই রচনা করিতেন, কস্মিনকালে দৎ-কলম লইয়া বসেন নাই। মুখ হইতে যে সমস্ত বাক্য নির্গত হইত তাহাই কবিতা হইত। তিনি পরমার্থ-পথের একজন প্রধান পথিক ছিলেন, অতি সামান্য সকল বিষয় লইয়া ঈশ্বর-

* কবিবর ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকরে' 'কবিরঞ্জন ৺রামপ্রসাদ সেন' প্রবন্ধ ১২৬০ সালের ১লা পৌষ শুক্রবারে প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১—১৪ পৃঃ। প্রভাকর সংখ্যা ৪৮০১। 'প্রভাকরের' এই সংখ্যা এখন লুপ্ত হইয়াছে। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাগারে একখানি মাত্র আছে। 'গয়াকাহিনী' ও নচিকেতা লেখক শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আজ ৮ বৎসর যাবৎ রামপ্রসাদ জীবনী লিখিতেছেন। তিনি বহু অনুসন্ধানে 'সংবাদ প্রভাকর' সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার সযত্ন রক্ষিত লুপ্ত প্রায় প্রবন্ধটী সম্পূর্ণ আকারে যথাযথ ভাবে এখানে উদ্ধৃত করিলাম। স্থল বিশেষেও গুপ্ত কবির বানান সংশোধন (?) করা তিনি সঙ্গত মনে করেন না। কারণ সেই সময়ে এই বানান ও ভাষা দেশবাসীর আদর্শ ছিল। তং বোঃ সং

প্রসঙ্গে তাহারই বর্ণনা করিতেন, এই মহাশয় সদানন্দ পুরুষ ছিলেন, ব্রহ্মচিন্তা ব্যতীত তাঁহার অন্তঃকরণে অন্নচিন্তা বা অন্য চিন্তা মাত্রই ছিল না, বিষয়বিশিষ্ট সাংসারিক সুখকে অত্যন্ত হেয়জ্ঞান করিতেন, পরিচ্ছদের পারিপাট্য ও আহারের উত্তমতাবিষয়ে দৃষ্টি ছিল না, অতি জঘন্য দ্রব্য আহার করিয়া ও অতি মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া সর্ব্বদাই সন্তুষ্ট থাকিতেন। অবস্থার উন্নতিকল্পে মনোযোগ না থাকাতে সৌভাগ্য সঞ্চয় করিতে পারেন নাই, তিনি যদ্রূপ অদ্বিতীয় কবি ছিলেন ও তাঁহার জীবিত সময়ে কবিতার যদ্রূপ সমাদর ছিল এবং তৎকালে এই দেশ যদ্রূপ ধনী লোকে মণ্ডিত ছিল, ইহাতে বিষয়-বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র বাসনাবিশিষ্ট হইলে অক্লেশে বিপুল বিত্ত সংগ্রহ পূর্ব্বক পুত্র-পৌত্রাদিকে সমূহ সুখে সুখী করিয়া যাইতে পারিতেন। তিনি যে এক উচ্চ বিষয়ের বিষয়ী ছিলেন তাহাতে সহজেই সমস্ত বিষয়কে তুচ্ছ বোধ হইত, কেননা সমুদয় অসার ভাবিয়া কেবল কালীনাম সার করিয়াছিলেন, সুতরাং যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে পরম প্রকৃতির উপাসনা করেন অতি কুৎসিৎ যৎসামান্য রূপাসোণার উপাসনা তাঁহার মনে কি প্রকারে ভাল লাগিতে পারে?

রামপ্রসাদের পদী রামপ্রসাদের পদ হইয়াছিল, তিনি পদের বলেই পদে ছিলেন, ইহাতে সামান্য-পদের প্রয়োজন কি? পদ পাইয়াই পদ পাইয়াছিলেন, সেন সদাত্মার যে পদ তাহাই বিপদ, অথচ বিপদ নহে, বিপদনাশক বিপদ। যিনি যথার্থ দ্বিপদ, তিনিই এই পদ ও বিপদের মর্ম্মগ্রাহী হইবেন, নচেৎ অপর কেহই তাহার যোগ্য হইতে পারিবেন না।

রামপ্রসাদ সেন প্রথমাবস্থায় কলিকাতাস্থ বা তন্নিকটস্থ কোন বিখ্যাত ধনির গৃহে ধন-রক্ষকের অধীনে এক মুহুরির কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন, কিন্তু বিষয়-বাসনা-বিহীনতা জন্য তৎকর্ম্মে তাঁহার মনের অভিনিবেশমাত্র ছিল না, একারণ তিনি তহবিলদারের প্রিয় হইতে পারেন নাই, সর্ব্বদাই উভয়ের মধ্যে বাক্ কলহ ও বিবাদ হইত, সেন-কবির চাকরি করা কিছু উদ্দেশ্য ও অভিপ্রেত ছিল না তিনি মানসিক সংকল্প পূর্ব্বক যে পরম প্রভুর দাসত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন শুদ্ধ তাঁহারি কার্য্য করিতেন, মানব-প্রভু বিরক্ত হইলে উপস্থিত পদে বিপদ হইবে সেদিকে দৃকপাতো করিতেন না, প্রতিদিবস নিয়মিতকালে কার্য্যের আসনে উপবিষ্ট হইয়া খাতার পাতা খুলিয়া আগা গোড়া শুদ্ধ "শ্রীদুর্গা" "শ্রীদুর্গা" এই নাম লিখিতেন, এই প্রকারে যখন খাতার সমুদয় পাতা কেবল "দুর্গা নামে" পরিপূর্ণ হইল, তখন সর্ব্বশেষে এই একটি গান লিখিয়া বসিলেন। যথা:—

(১)

আমায় দেওমা তবিল্‌দারী।
আমি নিমক্ হারাম্ নই শঙ্করী॥
পদ-রত্নভাণ্ডার সবাই লুটে,
ইহা আমি সইতে নারি,
ভাঁড়ার জিম্মা আছে যার,
সে যে ভোলা ত্রিপুরারি।
শিব আশুতোষ্ স্বভাব-দাতা,
তবু জিম্মা রাখো তাঁরি॥ (১)
অর্দ্ধ-অঙ্গ জায় গিরি,
তবু শিবের মাইনা ভারি,
আমি বিনা মাইনায় চাকর কেবল
চরণ ধুলার অধিকারী॥ (২)
যদি তোমার বাপের ধারা ধর,
তবে বটে আমি হারি।
যদি আমার বাপের ধারা ধর,
তবে তোমা পেতে পারি॥ (৩)
প্রসাদ বলে এমন পদের
বালাই লয়ে আমি মরি।
ও পদের মত, পদ পাইত,
সে পদ লয়ে বিপদ সারি॥ (৪)

খাতার শেষ পত্রে এই কবিতা লিখিত হইলে তহবিলদার সেই খাতা দৃষ্টি করত অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও ব্যগ্র হইয়া আপনার প্রভুর নিকট কহিলেন, "মহাশয়, একটা পাগল ও মাতালকে বিশ্বাস-পূর্ব্বক কর্ম্ম দিয়া কি সর্ব্বনাশ করিয়াছেন! দেখুন এমন সুন্দর পাকা খাতাখানা একেবারে নষ্ট করিয়াছে, ইহাতে অঙ্কপাত মাত্র নাই, কেবল পাগলামি করিয়াছে ইত্যাদি" উক্ত প্রভু তচ্ছ্রবণে খাতার আগা গোড়া সকল পাতা বিলক্ষণ রূপে বিলোকন ও

"আমায় দেওমা তবিলদারি" এই পদটী সমুদয় তিন চারিবার পাঠ করতঃ অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়া প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং খাজাঞ্চিকে কহিলেন, "তুমি পাগল ও মাতাল বলিয়া কাহার উপর অভিযোগ করিতেছ? এ ব্যক্তিতো কাঁচা কর্ম্ম করিয়া পাকা খাতা নষ্ট করে নাই, পাকা খাতায় পাকা কর্ম্মই করিয়াছে, তুমি কথার ইঙ্গিতে ও ভাবের ভঙ্গিতে এই সঙ্গীতের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পার নাই, আর তুমি বিষয়-মদে মত্ততা জন্য ইঁহাকে চিনিতে পার নাই, রামপ্রসাদ সেন সামান্য মনুষ্য নহেন, সাক্ষাৎ দেবী-পুত্র, অতি সাধু ব্যক্তি," পরে অতি প্রিয় বাক্যে সম্বোধন পূর্ব্বক কবিরঞ্জনকে কহিলেন, "রামপ্রসাদ! তুমি যে পদে পর্দাপণ করিয়াছ তাহাতে এপদে বদ্ধ রাখায় কেবল তোমারি বিপদ করা হইতেছে, তুমি যাবজ্জীবন এ সংসার কাননে বিচরণ করিবে আমি তাবৎকাল তোমাকে ৩০ ত্রিশ মুদ্রা মাসিকবৃত্তি প্রদান করিব (১) তোমার আর ক্ষণকাল এখানে থাকিবার আবশ্যক করে না, যাও তুমি এখনি আপনার গৃহে গিয়া স্বকার্য্য সাধন কর।"

রামপ্রসাদ সেন ৩০ ত্রিশ টাকা মাসিকবৃত্তির উপর নির্ভর করত বাটীতে আসিয়া সানন্দচিত্তে কাল যাপন করিতে লাগিলেন, কিন্তু পরিবার অধিক হওয়াতে ঐ স্বল্প বৃত্তি দ্বারা কোন প্রকারেই সুপ্রতুলরূপে সংসার নির্ব্বাহ হইত না, একারণ স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতি পরিজনেরা সর্ব্বদাই উপার্জ্জনের নিমিত্ত উত্তেজনা করিত, কিন্তু সে পক্ষে তিনি ভ্রূক্ষেপও করিতেন না, শুদ্ধ শক্তিভক্তি সার করিয়া সঙ্গীতানন্দার্ণবে নিমগ্ন হইতেন। ফলে তাঁহার পরিবারে কোন দ্রব্যেরি অপ্রতুল ছিল না, নানা স্থান হইতে নানা ব্যক্তি যাঁহারা সংকীর্ত্তনাদি নানা বিষয়ক গীত লইতে আসিত তাহারা কালীর ও কবির প্রণামিস্বরূপ অনেক অর্থ ও বহুপ্রকার দ্রব্যাদি অর্পণ করিত, তিনি নিজে অতিশয় দাতা, এবং দয়ালু ছিলেন, স্নেহপাত্র অনুগত এবং দীন দরিদ্র যাহাকে সম্মুখে দেখিতেন তাহাকেই তৎক্ষণাৎ তৎসমুদয় দান করিয়া বসিতেন, এদিকে আপনার ঘরে হাঁড়ি চড়ে না, আহার অভাবে পরিবারগণ হাহাকার করিতেছে, তিনি প্রকৃত মুক্তহস্ত পুরুষ ছিলেন, এ জন্যই তাঁহার দীনতার ক্ষীণতা হইত না, কন্যা পুত্র স্ত্রী কিংবা অপর কেহ নিতান্ত বিরক্ত করিলে জগদীশ্বর স্মরণপূর্ব্বক মনের ভাবে এক একবার এক একটা গান করিতেন। যথা :—(২)

"তুমি এ ভাল করেছ মা, আমারে বিষয় দিলে না,
এমন ঐহিক সম্পদ কিছু, আমারে দিলে না ॥
কিছু দিলে না, পেলে না, দিবে না, পাবে না,
তায় বা ক্ষতি কি মোর, হোক্ দিলে দিলে বাজি,
তাতেও আছি রাজি, এবার এ বাজি ভোর গো ॥(১)
এ মা দিতিস্, দিতাম্, নিতাম্, খেতাম্,
মজুরি করিয়া তোর, এবার মজুরি হোল না,
মজুরা চাব কি কি জোরে করিব জোর গো ॥২
আছ তুমি কোথা, আমি কোথা,
মিছামিছি করি শোর্।
শুধু শোর্ করা সারা, তোর্ যে কুধারা,
মোর যে বিপদ ঘোর্ গো ॥৩
এমা ঘোর মহানিশি, মন যোগে জাগে,
কি কাজ তার কঠোর।
আমার এ-কূল, ও-কূল, দু-কূল মজিল,
সুধা না পেলে চকোর গো ॥৪
এমা আমি টানি কোলে, মনে টানে পিছে,
দারুণ করম ডোর্।
রামপ্রসাদ কহিছে পোড়ে দুটানায়,
মরে মন ভুঁড়া চোর গো ॥৫

এই গীত যখন রচনা করেন, তখন তাঁহার মনের ভাব কি চমৎকার হইয়াছিল তাহা ভাবজ্ঞ জনেরা বিবেচনা করিবেন। ইহার গূঢ়ার্থ যিনি গ্রহণ করিবেন তিনিই সুখী হইবেন। কারণ কোন বিষয়ের অভাবকালে স্বভাবকে স্বভাবে রাখিয়া সেই অভাবের অভাব করা অথবা সেই অভাবকে অভাবে রাখিয়া স্বভাবে রাখা বড় সহজ ব্যাপার নহে, যে কেহ হউন, এই সহজ তখন তাঁহার পক্ষে অতি সহজ হইবে, যখন তিনি সহজে সহজকে জানিতে পারিবেন। যথা :—(৩)

(১) এই স্থলে দুই প্রকার প্রবাদ আছে, কেহ কেহ কহেন রামপ্রসাদ শিদিরপুরস্থ ৺দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষালের নিকট, কেহ কেহ কহেন কলিকাতায় নবরঙ্গ কুলপতি ৺দুর্গাচরণ মিত্রের নিকট মুহুরি-গিরি কর্ম্ম করিতেন।

আমি তাই অভিমান করি।
আমায় করেছ সংসারী ॥
অর্থ বিনা ব্যর্থ যে, এ সংসারে সবারি।
ওমা তুমিও কোন্দল করেছ বলে শিব ভিখারী ॥১
জ্ঞানধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ বটে, দান ধর্ম্মোপরি,
ওমা বিনা দানে মথুরা পারে যান্নি ব্রজেশ্বরী ॥২
নাতোয়ানী কাচ্ কাচো মা, অঙ্গে ভস্ম ভূষণ ধরি,
ওমা কোথায় লুকাবে তোমার কুবের ভাণ্ডারী ॥৩
প্রসাদে প্রসাদী দিতে মা এত কেন হোলে ভারি।
যদি রাখো পদে,থেকে পদে,পদে পদে বিপদ সারি ॥৪

তথা :—(৪)

তারা নামে সকলি ঘুচায়।
কেবল রহে মাত্র ঝুলি-কাঁথা, সেটাও নিত্য নয় ॥
যেমন স্বর্ণকারে স্বর্ণ হরে স্বর্ণ-খাদি উড়ায়।
ওমা তোর নামেতে তেমনি ধারা,
তেমনি ত দেখায় ॥১
যে জন গৃহস্থলে, দুর্গা বলে, পেয়ে নানা ভয়,
এমা তুমি ত অন্তরে জাগ, সময় বুঝতে হয় ॥২
যার পিতা মাতা ভস্ম মাখে, তরুতলে রয়,
ওমা তার তনয়ের ভিটেয় টেঁকা এ বড় সংশয় ॥৩
প্রসাদে ঘেরেছে, তারা প্রসাদ পাওয়া দায়।
ওরে ভাইবন্ধু থেকো না রামপ্রসাদের আশায় ॥৪

কোন আত্মীয় ব্যক্তি একদিবস কথায় কথায় রামপ্রসাদ সেনকে কহিয়া ছিলেন, "সেনজ এতদিন দুঃখে গেল, এইক্ষণে কিঞ্চিৎ সুখভোগ কর" এই কথার তিনি অপর কোন উত্তর না করিয়া তৎক্ষণাৎ একটি গান করিলেন, ঐ গীত তাহার প্রকৃত উত্তর হইল। যথা :—(৫)

মন কোরনা সুখের আশা।
যদি অভয় পদে লবে বাসা ॥
হোয়ে দেবের দেব সচ্চিদেচক,
তেঁইতো শিবের দৈন্য দশা ॥
সে যে দুঃখী দাসে দয়া বাসে,সুখের আশে বড় কসা।
হোয়ে ধর্ম্ম তনয়,তেজে আলয়,বনে গমন হেরে পাশা ॥
হরিষে বিষাদ আছে মন, করনা এ কথায় গোঁসা।
ওরে সুখেই দুঃখ দুঃখেই সুখ
ডাকের কথা আছে ভাষা ॥২
মন ভেবেছ কপট ভক্তি কোরে পূরাইবে আশা।
লবে কড়ার কড়া তস্য কড়া,এড়াবেনা রতি মাষা ॥৩
প্রসাদের মন হও যদি মন,কর্ম্মে কেন হওরে চাসা।
ওরে মনের মতন্ কর যতন্,রতন পাবে অতি খাসা ॥৪

এই প্রকারে কত চমৎকার চমৎকার বিষয় আছে যাহার বর্ণনা করিতে হইলে অত্যন্ত বাহুল্য হইয়া উঠে। একদিবস দিবাভাগে কবিরঞ্জন কুলক্রিয়া সমাধা করত কুমারহট্টের বলরাম তর্কভূষণনামক বিখ্যাত তার্কিক পণ্ডিতের টোলের সম্মুখ দিয়া গমন করিতেছিলেন, উক্ত অভিমানি পণ্ডিত তাঁহাকে দেখিয়া উচ্চৈস্বরে কহিয়াছিলেন "দেখ দেখ মাতাল ব্যাটা যাইতেছে", তৎকালে তৎস্থানে অনেক সম্ভ্রান্ত বিদ্বান্ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা উত্তেজিত হইয়া দশনাগ্রে রসনাবিস্তারপূর্ব্বক বলিলেন "ভট্টাচার্য্য মহাশয় কি করিলেন, রাম প্রসাদ সেন অতি সাধুব্যক্তি তাঁহাকে মাতাল বলিয়া উপহাস করিলেন?" এই কথা কহিতে না কহিতেই রামপ্রসাদসেন হাস্যবদনে "ও তার্কিক ভট্টাচার্য্য কি বলিতেছ?" এই বলিয়াই গান ধরিলেন। যথা :—(৬)

"রসনে কালী রটরে।
মৃতারূপা নিতান্ত ধরেছে জঠরে ॥
কালী যার হৃদে জাগে,
তর্ক তার কোথা লাগে,
কেবল বাদার্থ মাত্র, ঘট পটরে। ১
রসনারে কর বশ শ্যামানামামৃত রস,
গান কর, পান কর, পাত্র বটরে ॥ ২
সুধাময় কালীনাম, কেবল কৈবল্যধাম,
করে জপনা কালীর নাম, কি উৎকটরে। ৩
শ্রুতি রাখ স্ব স্ব গুণে, অন্য নাম নাহি শুনে,
প্রসাদ বলে দোহাই দিয়া, শিব কঠোরে ॥" ৪

তথা (৭)

"সুরা পান করিনেরে, সুধা খাই কুতূহলে,
আমার মন্ মাতালে মেতেছে আজ,
মদ মাতালে মাতাল বলে।"

আহা এই স্থলে রামপ্রসাদ সেন, কি বিচিত্র কবিত্ব পাণ্ডিত্য, ও পরমার্থ রসের রসিকতা প্রকাশ করিয়াছেন! বোধ করি জগদীশ্বর এবম্ভূত অদ্ভুত ক্ষমতা অপর কাহাকে প্রদান করেন নাই, প্রসাদ কেবল একাই তাঁহার যথার্থ প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দৈবশক্তি দেবী অনবরতই ইঁহার কণ্ঠে

জাগ্রতাবস্থায় বিহারপূর্ব্বক নৃত্য করিতেন, ক্ষণমাত্র নিদ্রিতা ছিলেন না, নচেৎ এবম্প্রকার অসাধারণ ব্যাপার ঘটনার সম্ভাবনা কি প্রকারে হইতে পারে।

(ক্রমশঃ)

দাক্ষিণাত্যে জলপ্রপাত।

(শ্রীকালীপ্রসন্ন বিশ্বাস)

মলয়-পর্ব্বতের নাম কে না অবগত আছে? ভারতীয় ঋষিগণ মুক্ত কণ্ঠে এই পর্ব্বতের প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। মহর্ষি অগস্ত্য এই মলয়পর্ব্বতের (উপত্যকার) উপর আশ্রম স্থাপন করিয়া সমগ্র দাক্ষিণাত্যে আর্য্যধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন। ইহা শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য, রামানুজাচার্য্য এবং মাধবাচার্য্যের লীলাক্ষেত্র ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। জনৈক মনীষী নিম্নলিখিত সূত্রত্রয় দ্বারা মলয়-পর্ব্বতের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন :—

নব-চন্দন-কান্তার-কন্দল-মন্দ-মারুতং।
অভঙ্গুর ভুজঙ্গস্ত্রী সংগীতরসসংকুলং॥
করিপোতকরাকৃষ্টস্ফুরদেলাতিবাসিতং।
বরাহদংষ্ট্রিকাধ্বস্ত মুস্তাসুরভি কন্দরং॥
পটীরদল পর্য্যেকপ্রসুপ্তব্যাধদম্পতিং।
মাধবীমল্লিকাজাতিমঞ্জরীরেণুরঞ্জিতং॥

মলয় পর্ব্বতোপরি অসংখ্য চন্দন বৃক্ষ থাকা প্রযুক্ত মন্দ মন্দ সুগন্ধি বায়ু সর্ব্বদা প্রবাহিত হয়। নাগস্ত্রীগণের মধুর সঙ্গীত সর্ব্বত্র ধ্বনিত হয়। হস্তিশাবকগণের শুণ্ড দ্বারা আকৃষ্ট এলা (ছোট এলাচি) এবং বন্যবরাহের দন্ত দ্বারা উৎপাটিত মুস্ত-মূল (থস-থস) হইতে সুগন্ধ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়। তথায় ব্যাধ-দম্পতী চন্দনপত্রের পর্য্যঙ্ক প্রস্তুত করিয়া তদুপরি শয়ন করে। মাধবী, মল্লিকা, জাতি প্রভৃতি পুষ্পের সৌরভে চারিদিক আমোদিত হয়।

মলয়পর্ব্বতে বাস্তবিক নাগপত্নীগণ সঙ্গীত করিত কিনা জানা যায় না, তবে কবিগণ ইহা মলয়পর্ব্বতের একটি বিশেষত্ব বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে পশ্চিমঘাটের নিকটে কোন কোন স্থানে এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, তথায় একপ্রকার নাগিনীনামক অতি বৃহদায়াতন (নারিকেল বৃক্ষের ন্যায়) সর্প ছিল। তাহার ফণা কয়েক হস্ত প্রশস্ত। এই সর্প বংশীধ্বনির ন্যায় এক প্রকার শব্দ করিত—যাহা অনেক দূর হইতেও মধুর সঙ্গীতের ন্যায় শ্রুত হইত। সম্ভবতঃ ইহাকেই কবিগণ নাগস্ত্রীর সঙ্গীত বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

এতদ্ভিন্ন মলয়পর্ব্বতের নানা স্থানে ঋষিগণ-মনোলোভা, কবিচিত্ত-উন্মাদিনী স্বাভাবিক শোভা বর্ত্তমান আছে। ইহাদিগের মধ্যে জল-প্রপাত অন্যতম। বোধ হয় এই সকল কারণেই মলয়াচল সকলের অতি আদরের স্থান ছিল।

মলয়পর্ব্বতের বর্ত্তমান নাম মহীসুর অধিত্যকা। এই মহীসুর অধিত্যকার উত্তর পশ্চিম-প্রান্তে ভীষণ বন-সংকুল পশ্চিমঘাট পর্ব্বত। যে কেহ এই স্থান একবার দেখিয়াছেন তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদা ইহা জাগরূক আছে।

মহীসুর অধিত্যকা এবং পশ্চিমঘাট পর্ব্বতে অনেকগুলি জলপ্রপাত আছে। তন্মধ্যে কাবেরী প্রপাত, গরসপা প্রপাত, গোকক প্রপাত এবং দুধসাগর প্রপাত বিশেষউল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত দুইটি প্রপাতের আলোকচিত্র প্রদত্ত হইল।

কাবেরী প্রপাত।

মহীসুর ষ্টেট রেলওয়ের বাঙ্গালোর এবং মহীসুরের মধ্যবর্ত্তী মাদার নামক ষ্টেসন হইতে প্রায় ৩০ মাইল দূরে শিবসমুদ্র নামক গ্রামের সন্নিকট কাবেরী নদী দুইভাগে বিভক্ত হইয়া ভীষণ গর্জ্জনে মলয়পর্ব্বত হইতে প্রায় চারিশত ফিট নিম্নে কর্ণাটের সমতলক্ষেত্রে নিপতিত হইয়া জগতের একটি অতুলনীয় শোভার সামগ্রী সৃষ্টি করিতেছে।

উক্ত প্রপাতের পশ্চিমশাখার নাম গগনচুক্কী এবং পূর্ব্বশাখার নাম ভড়চুক্কী। পশ্চিমশাখা অপেক্ষা পূর্ব্বশাখার প্রপাত অধিকতর সৌন্দর্য্যশালী। বর্ষাকালে ইহা প্রস্থে প্রায় এক চতুর্থ মাইল হয়। কিন্তু গ্রীষ্মকালে ইহার বিস্তার অল্প হইলেও, ইহা কয়েকটি স্বতন্ত্র প্রপাতে বিভক্ত হইয়া অতি আশ্চর্য্য শোভা ধারণ করে। য়ুরোপীয় পর্য্যটকগণ ইহাকে জগতের মধ্যে একটি

বৃহৎ ও সুদৃশ্য প্রপাত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

গগনচুক্কী প্রপাতের অনতিদূরে পীরসাহেব নামক একটি মুসলমান সাধুর সমাধি আছে। এই সমাধির নিকট হইতে অবতরণ করিয়া যাইলে দেখা যায় যে প্রপাতস্রোত দুইভাগে বিভক্ত হইয়া ঐ স্থানেকে এলিকুর নামক একটি দ্বীপে পরিণত করিয়াছে। এখানে দাঁড়াইলে প্রপাতের দৃশ্য এবং গগনবিদারী বজ্রনিস্বন দর্শকের মনে একাধারে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ, বিস্ময় ও ভীতির সঞ্চার করে। শিবসমুদ্রে কাবেরীর উপর একটি প্রস্তর নির্ম্মিত পুরাতন সেতু আছে। এই সেতু অতিক্রম করিয়া প্রায় দুই মাইল যাইলে তথা হইতে প্রপাতের দৃশ্য আরও অধিকতর সুন্দর দেখায়।

এই প্রপাতের সৌন্দর্য্য যেমন চমৎকার এবং অতুলনীয়, ইহা হইতে তড়িৎশক্তি উৎপাদন করিবার প্রণালী ও যন্ত্রাদিও তদনুরূপ বিস্ময়কর। মহীসুরের ভূতপূর্ব্ব দেওবান সার্ শেশদ্রী আয়ারের সময় ইহা স্থাপিত হয়। প্রসিদ্ধ ভারতপর্য্যটক সার সিডনী লো (Sir Sidney Low) সাহেব এ সম্বন্ধে তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছেন :—

There is nothing in India or in all Asia more remarkable in its own way, than this skilful and successful effort to utilise and transmit some of the wasted force of Nature, and it says much of the Mysore Administration under its late Diwan, the clever Brahmin statesman, Sir Seshadri Iyer, that it had the courage and fore-sight to carry out and finance this project. The Sivasamudram power station is worth coming a long way to see, by those who are interested in the future, as well as in the present and the past of India.

শিবসমুদ্র হইতে উৎপন্ন তড়িৎশক্তি দ্বারা তথা হইতে ৯০ মাইল দূরস্থিত কোলার সুবর্ণ-খনি সকল পরিচালিত হইতেছে, এবং তথাকার এবং বাঙ্গালোর এবং মহীসুরের তড়িৎ-আলোক সকল প্রজ্বলিত হইতেছে।

সম্প্রতি শিবসমুদ্রের বর্ত্তমান বাঁধটি উচ্চ করিয়া মহীসুররাজ্যে কৃষিকর্ম্মাদির জন্য জলসঞ্চারের একটি প্রকাণ্ড সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইবার পথে অগ্রসর হইতেছে। ইহাও ভবিষ্যতে মহীসুরের বর্ত্তমান দেওবানের একটি অক্ষয় কীর্ত্তি বলিয়া পরিগণিত হইবে সন্দেহ নাই।

গরসফা প্রপাত।

মহীসুর-প্রদেশে আরও একটি প্রসিদ্ধ জলপ্রপাত আছে। ইহার নাম গরসফা-প্রপাত। ইহা কাবেরী প্রপাত হইতে আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও গভীরতায় ভারতের শ্রেষ্ঠ প্রপাত বলিয়া পরিগণিত হয়। গরসফা মহীসুর-ষ্টেট্-রেলওয়ের সিমোগা নামক ষ্টেশন হইতে প্রায় ৬০ মাইল। সিমোগা হইতে ৪৫ মাইল দূরে সাগর নামক স্থান পর্য্যন্ত সরকারী ডাকগাড়ী পাওয়া যায়। তৎপরবর্ত্তী ১৫ মাইল স্বতন্ত্র ঘট্‌কা বা গো-শকটে যাইতে হয়।

গরসফায় ২৫০ ফিট প্রশস্ত সরস্বতী নদী চারিশাখায় বিভক্ত হইয়া গিরিশিখর হইতে ৮৩০ ফিট নিম্নে নিপতিত হইয়া এক অদ্ভুত ও অনির্ব্বচনীয় দৃশ্যের সৃষ্টি করিয়াছে।

প্রথম শাখা একাধারে অতি ভয়ঙ্কর গর্জ্জনের সহিত পর্ব্বতশিখর হইতে ৮৩০ ফিট নিম্নে পতিত হইতেছে! দ্বিতীয়-শাখা দুই-স্তরে এবং তৃতীয়-শাখা তিন-স্তরে বিভক্ত হইয়া মত্ত প্রমথগণের ন্যায় তাণ্ডব-নৃত্য করিতে করিতে যেন কৈলাস-শিখর হইতে ধরাতলে অবতীর্ণ হইতেছে। চতুর্থ-শাখা বহুধারে বিভক্ত হইয়া যেন স্বর্গীয় অমৃত ধারা সিঞ্চন করিতেছে।

আহা কি অপরূপ দৃশ্য! এ হেন অতুলনীয় দৃশ্য দেখিয়া কে না মুগ্ধ হইবে? য়ুরোপীয় এবং আমেরিকান পর্য্যটকগণ যে ইহাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জলপ্রপাতের মধ্যে গণ্য করিবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি? এইরূপ দৃশ্যে সাধক ভগবৎ-প্রেমে মত্ত হইয়া পড়ে, কবি-হৃদয়-তন্ত্রী ঝঙ্কার দিয়া উঠে, মূকেরও বাক্যনিঃসরণ হয়।

জনৈক য়ুরোপীয় প্রসিদ্ধ পর্য্যটক এই দৃশ্য-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া নিম্নলিখিত ভাষায় ইহার বর্ণনা করিয়াছেন :—

With the sunshine flooding it, and lighting its mighty sides of perpendicular rock,

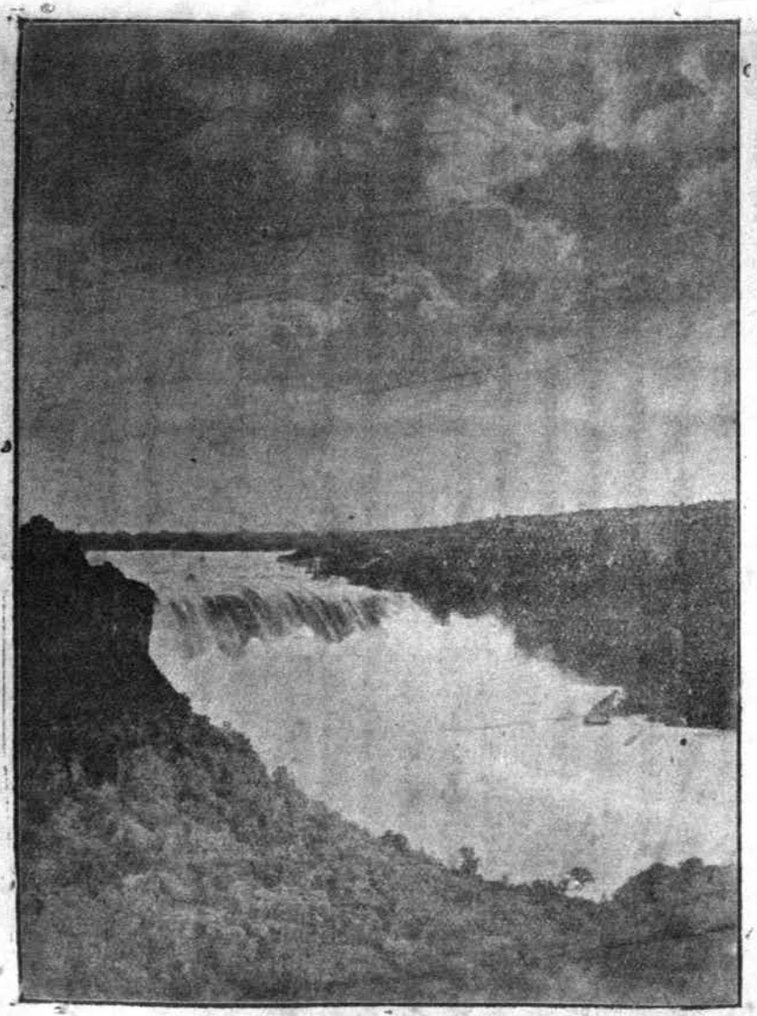

গোকক জলপ্রপাত।

কাঃ প্রঃ বিশ্বাস।

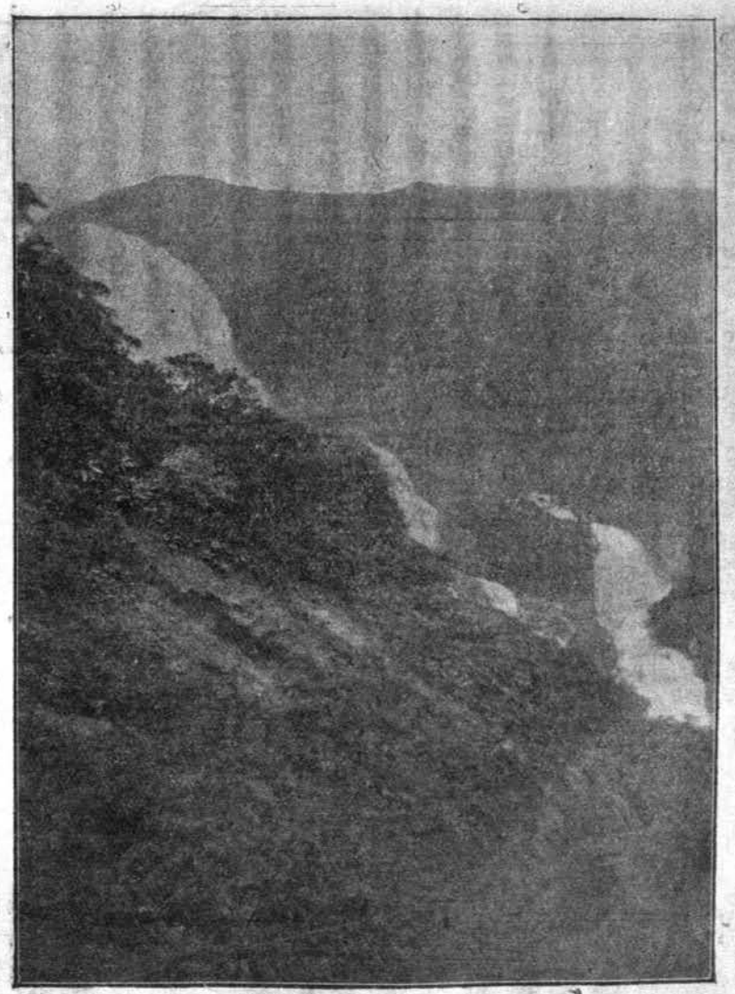

দুধ সাগর জলপ্রপাত।

and jungle-filled gorges and ravines, it is a most beautiful and imposing panorama. Far below is the boulder-strewn bed over which the river, emerging from the vapour-shrouded pools, rushes in a network of rapids, while across the ever-rising veil of mist from the tumult of waters below there is thrown a perfect rainbow spanning the end of the enchanted valley which sinks and ascends with the rising and setting sun. Lovely effects of lights and shadows are produced by the brilliant sunshine, which continually change with the passing hours, and greatly enhance the beauties of the multi-coloured rocks and foliage. Sitting in the increasing darkness and gazing into the obscurity of apparently bottomless depths, from which issue volumes of steam-like clouds, accompanied by an endless roll of thunder, one cannot but feel profoundly impressed by the scene, fit subject for the brush of a Dore and recalling his illustrations of Dante's Inferno.

গোকক প্রপাত।

বেলগাঁও হইতে গোকক-রোড চতুর্থ ষ্টেসন। এই ষ্টেসন হইতে প্রায় ৩½ মাইল দূরে একটি জল-প্রপাত আছে। ইহা কাবেরী এবং গরসপা প্রপাত হইতে ক্ষুদ্র। ইহাকে গোকক-প্রপাত কহে। এখানে ঘটপ্রভা নদী একাধারে প্রায় তিন শত ফিট নিম্নে পতিত হইতেছে। এই জল-প্রপাত হইতে শক্তি সংগ্রহ করিয়া গোকক্-মিল নামক একটি সুবৃহৎ সুতার কল পরিচালিত হইতেছে। কলটি প্রপাতের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত এবং ইহার সম্মুখে একটি সুড়ঙ্গ পথ আছে। এই পথ দিয়া ৩১২টি সোপান অতিক্রম করিয়া শক্তি-সঞ্চয়-গৃহে উপনীত হওয়া যায়। এখান হইতে আরও কিছু দূর অবতরণ করিলে নদীর তীরে উপস্থিত হওয়া যায়। এই স্থান হইতে প্রপাতের সম্পূর্ণ এবং অতি সুন্দর দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। প্রপাতের অপর পার্শ্বে একটি পাহাড় এবং তৎপশ্চাতে হুফেরী নামক গ্রাম এবং হুফেরী-রোড ষ্টেসন আছে। পূর্ব্বে এই ষ্টেসন হইতে গোকক মিলে যাইতে হইত। মিল হইতে নদীর অপর পারে যাতায়াত করিবার জন্য প্রায় এক-চতুর্থ মাইল লম্বা একটি তারের পুল (সেতু) আছে। ইহা প্রপাত হইতে কয়েক ফিট মাত্র পশ্চাতে অবস্থিত। এই পুলের উপর হইতেও প্রপাতের দৃশ্য সুন্দর দেখায়। আলোক-চিত্রে প্রপাতের উপরিভাগে যে কাল রেখা দেখা যাইতেছে, উহাই উপরি-উক্ত তারের পুল।

দুধ-সাগর প্রপাত।

আমরা অদ্য আর একটি জলপ্রপাতের উল্লেখ করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধ শেষ করিব। এই প্রপাতের নাম দুধ-সাগর। ইহা গোয়া যাইবার পথে ক্যাসলরক (Castle Rock) এবং কোলেম (Collem) ষ্টেসনের মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতমালা-বেষ্টিত ভীষণ অরণ্য মধ্যে অবস্থিত। বর্ষাকালে এই প্রপাতের শোভা ও দৃশ্য বিশেষভাবে উপলব্ধি করা যায়। ঐ সময় প্রপাতের জল রেলের গাড়ী অতিক্রম করিয়া নিম্নস্থিত উপত্যকায় পতিত হয়। এমন কি যাত্রিগণ হস্ত প্রসারণ করিয়া উহা স্পর্শ করিতে সক্ষম হয়। ট্রেনে যাইতে যাইতে নানাস্থান হইতে এই প্রপাত নানাভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। দূর হইতে এই প্রপাতটির প্রতি দৃষ্টি করিলে বোধ হয় যেন কেহ পর্ব্বত-শিখর হইতে দুগ্ধ ঢালিয়া দিতেছে। এইজন্য ইহা দুধ-সাগর নামে অভিহিত হয়।

চা-খড়ির আত্মকাহিনী।

(রায়বাহাদুর ডাক্তার শ্রীচুণীলাল বসু এফ্-সি-এস্)

আমি আমার এই ক্ষুদ্র জীবনের ইতিহাস তত্ত্বানুসন্ধিৎসু তত্ত্ববোধিনীর শ্রদ্ধেয় পাঠকপাঠিকাগণকে সংক্ষেপে শুনাইতে বাসনা করিয়াছি।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় সাধারণতঃ দর্শন, ধর্ম্ম ও সমাজনীতিমূলক প্রবন্ধ আলোচনার জন্য স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আমার ন্যায় অকিঞ্চিৎকর জড় পদার্থের উৎপত্তি ও সংস্থিতির সংক্ষিপ্ত বৈজ্ঞানিক বিবরণী মানবসমাজে প্রচার করিতে অবসর প্রদান করিয়া সম্পাদক মহাশয় আমাকে সাতিশয় অনুগৃহীত করিয়াছেন।

তোমরা মনে করিতে পার যে আমার মত ক্ষুদ্র তুচ্ছ পদার্থের আবার বলিবার কথা কি আছে? আমার যে কত মূল্য, তাহা তো কাহারও জানিবার বাকী নাই। বেণের দোকানে এক পয়সা ফেলিলে একতাল "চা-খড়ি" মিলে। আমার দ্বারা কি কাজ হয়, তাহা একজন পাঁচ বৎসর বয়সের স্কুলের ছেলে পর্য্যন্ত জানে। আমার আদর কত, তাহা আবালবৃদ্ধবনিতা কাহারো অবিদিত নাই। সকালবেলা লোকে আমার দ্বারা দাঁতের ময়লা পরিস্কার করিয়া কুলকুচার সহিত মুখ হইতে আমাকে থু-থু করিয়া ফেলিয়া দেয়! অতএব আমার মত নগণ্য পদার্থের জীবনের ইতিহাসই বা কি এবং তৎসম্বন্ধে বলিবারই বা কি কথা আছে?

ওগো, তোমরা যদি কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য ধারণ করিয়া আমার কথা শুন, তাহা হইলে জানিতে পারিবে যে আমার এই ক্ষুদ্র জীবনটী কত রহস্যপূর্ণ ঘটনাবলী দ্বারা বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে। যদিও আমি এতই দুর্ব্বল যে সামান্য আঘাতেই আমার দেহ শতধা বিদীর্ণ হইয়া যায় (brittle); যদিও বর্ষাস্নাত নির্ম্মল আকাশের ইন্দ্রধনুর ন্যায় আমার বর্ণবৈচিত্র্য নাই (colourless); যদিও তোমাদের শয়নগৃহের পার্শ্বস্থিত বিমলচন্দ্রিকাজাল-বেষ্টিত পুষ্পোদ্যানের সদ্যপ্রস্ফুটিত যুথিকা-সুন্দরীর ন্যায় সৌরভ-সৌন্দর্য্যে আমি তোমাদের নয়ন-মনের আনন্দবর্দ্ধন করিতে পারি না (odourless); যদিও আমি রসশূন্য এবং মধুর ন্যায় জলে দ্রব হইয়া তোমাদিগের রসনার তৃপ্তি সাধন করিতে অসমর্থ (tasteless, insoluble in water), তথাপি আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, আমার কথা বিশ্বাস কর, আমি চিরদিন এরূপ অকর্ম্মণ্য, অচল, অসার পদার্থ ছিলাম না।

চা-খড়ি বর্ণ, স্বাদ ও গন্ধবিহীন, ভস্মপ্রবণ, জলে অদ্রবণীয়।

সে বহুদিনের কথা, তাহার পর কত দিন, কত মাস, কত বৎসর, কত যে যুগ-যুগান্তর অতীত হইয়াছে, তাহা গণনার দ্বারা সংখ্যা করা যায় না। তখন পৃথিবীতে তোমাদের মত মানুষের আবির্ভাব হয় নাই। তখন কেবলমাত্র কতিপয় অতিকায় অদ্ভুতাকৃতি জলচর ও উভচর প্রাণী সসাগরা ধরণীর উপর একচ্ছত্র আধিপত্য করিত। বর্ত্তমান যুগ হইতে লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে সেই সময়ে আমার জন্ম হইয়াছিল। একটী ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র প্রাণীর দেহ হইতে আমার উদ্ভব। আমি তাহার বড়ই আদরের বস্তু ছিলাম; আমি কঠিন হইলেও সে আমাকে সর্ব্বদা বুকে-পিঠে করিয়া সমুদ্রতরঙ্গের লীলাভঙ্গের সহিত নানা রঙ্গে আপনার আড়ম্বরশূন্য জীবনযাত্রা পরমসুখে নির্ব্বাহ করিত। আমি তাহার পিঠে চড়িয়া কখন সমুদ্রবক্ষে, কখন গভীর নীলাম্বুরাশির মধ্যে আনন্দে বিচরণ করিতাম; দুর্গপ্রাচীরের ন্যায় আমার কঠিন আবরণে তাহার কোমল দেহ আচ্ছাদিত করিয়া প্রবল বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে তাহাকে সর্ব্বদা রক্ষা করিয়া তাহার ভালবাসার কথঞ্চিৎ প্রতিদান করিতে প্রয়াস পাইতাম। সেই একদিন, আর এই একদিন; সেই সুখস্বপ্নবিজড়িত অতীত জীবনের অস্পষ্ট স্মৃতি আজি সহসা মানসপটে উদিত হইয়া প্রাণের মধ্যে বড়ই ব্যাকুলতা উপস্থিত করিতেছে।

চা-খড়ির জন্ম।

এখন দেখিলে ত, আমি তোমাদের অপেক্ষা বয়সে কত প্রাচীন—এত প্রাচীন যে বৎসরের সংখ্যা দ্বারা তাহা নির্ণয় করা যায় না। বয়ঃকনিষ্ঠ হেতু তোমাদিগকে স্নেহসূত্রে "তোমরা, তোমাদের" বলিয়া সম্বোধন করিতেছি, তোমরা কেহ ইহার জন্য রাগ করিও না।

পাথুরে কয়লার উৎপত্তি-বিবরণ তোমাদের কিছু কিছু জানা আছে। তাহার জন্মের সহিত আমার জন্মের কিয়ৎ পরিমাণ সাদৃশ্য আছে, এইজন্য এস্থলে সে সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। পাথুরে কয়লা আমা অপেক্ষাও বয়সে অনেক প্রাচীন; আমার জন্মের বহু যুগ-যুগান্তর পূর্ব্বে জগতে তাহার আবির্ভাব হইয়াছিল। তোমাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে যেমন মাঝে মাঝে বিপ্লব উপস্থিত হয় এবং তাহার প্রভাবে কত পুরাতন সংস্কার, কত প্রাচীন প্রথা, কত জাতি, কত জনপদ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ এই ধনধান্যপূর্ণ বসুন্ধরার জীবনেতিহাসে কতবার যে কত ভীষণ বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, ভাঙ্গিয়া চুরিয়া তাহার মূর্ত্তি যে কতবার নূতন করিয়া গঠিত হইয়াছে তাহার সংখ্যা করা যায় না। পাথুরে কয়লার জীবনের ইতিবৃত্ত এইরূপ একটী ভয়ঙ্কর বিপ্লব-কাহিনীর সহিত জড়িত।

পাথুরে কয়লার জন্ম।

উদ্ভিজ্জগৎ হইতে পাথুরে কয়লার উদ্ভব। উদ্ভিদ মাত্রেরই মধ্যে যে অঙ্গারাংশ (carbon) থাকে, তাহাই জাগতিক বিপ্লবশক্তি সাহায্যে রূপান্তরিত হইয়া পাথুরে কয়লার আকার ধারণ করিয়া ভূগর্ভমধ্যে অবস্থিতি করিতেছে এবং মানবের বিবিধ কার্য্যে আত্মদান করিয়া কত প্রকারে তাহার সুখসমৃদ্ধির বৃদ্ধিসাধন করিতেছে।

(ক্রমশঃ)

শোকসংবাদ।

৺মাধুরীলতা দেবী—আমরা শুনিয়া মর্ম্মাহত হইলাম, সার রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ কন্যা ৺মাধুরীলতা দেবী আজ কয়েক মাস ধরিয়া জ্বর ও কাস রোগে ভুগিয়া গত ২রা জ্যৈষ্ঠ তারিখে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। মঙ্গলময় পরমেশ্বর তাঁহার আত্মার কল্যাণসাধন করুন এবং পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা প্রদান করুন।

৺ইরাবতী দেবী—গত ১২ই জ্যৈষ্ঠ দিবসে শ্রীমতী ইরাবতী দেবী পরিবারবর্গকে দুঃখে ভাসাইয়া ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি মহর্ষিদেবের জ্যেষ্ঠ কন্যা শ্রীমতী সৌদামিনী দেবীর জ্যেষ্ঠ কন্যা ছিলেন। বহুকাল যাবৎ তিনি হাঁপানি রোগে ভুগিতেছিলেন। পরমেশ্বর তাঁহার আত্মাকে স্বীয় সুশীতল ক্রোড়ে স্থান দিন এবং পরিবারবর্গকে দুর্ব্বিষহ শোক বহন করিবার শক্তি প্রদান করুন।

একমেবাদ্বিতীয়ং

ঊনবিংশ কল্প

চতুর্থ ভাগ।

শ্রাবণ, ব্রাহ্মসম্বৎ ৮৯।

৯০০ সংখ্যা

১৮৪০ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"আত্মা বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎকিঞ্চনাষীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং প্রতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্।
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"

গান।

রাগিণী হাম্বীর।

আমার পরাণ ধায়
ধায় তোমারি পানে।
গোপনে মরমব্যথা
লয়ে আছি একা হেথা
আকুল পরাণে।
তুমি আছ কোন্ দূরে
জ্যোতির্ম্ময় কোন্ পুরে
আমার কাতর ডাক
পশে না কি কাণে?
বিরহে প্রভু তোমার
আঁখি ঝরে শত ধার
বাধা নাহি মানে।
কবে আসি দিবে দেখা
মধুরূপে প্রাণ সখা—
চৌদিকে উঠিবে ভরি
তব জয় গানে॥

ধর্ম্ম ও যুদ্ধ।

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)

বর্ত্তমান যুদ্ধে যে বিষম শোণিতপাত চলিতেছে, কবে তাহার শান্তি হইবে তাহা নির্ণয় করা বড় কঠিন। কিন্তু এই আত্মীয়স্বজনের বিনাশে পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের প্রতি পরিবারের ভিতরে যে আর্ত্তনাদ সমুত্থিত হইতেছে, তাহার ফলে অনেকেই ভগবানের মঙ্গলস্বরূপে বিশ্বাস হারাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। প্রচলিত ধর্ম্ম তাহাদিগের বিক্ষত-হৃদয়ে সান্ত্বনা দান করিতে পারিতেছে না। অনেকগুলি সুবিখ্যাত সাময়িক সংবাদপত্রের স্তম্ভের ভিতর দিয়া এই আক্ষেপ বাহির হইতেছে, যে প্রচলিত ধর্ম্ম সত্য সত্যই সামর্থ্যহীন হইয়া পড়িয়াছে—উহা জনসাধারণের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে (Faliure of the church)। এইরূপ আন্দোলন ও আলোচনার তরঙ্গ ইংলণ্ডের চারিদিকে ছুটিয়া পড়িতেছে।

সম্পদের ভিতর দিয়া যাহাদের জীবন চলিয়া যায়, ঐহিক বিভবের ভিতরে যাহারা অবস্থান করে, সুবিস্তৃত বাণিজ্যের কলরব যাহাদের কর্ণকে অনবরত প্রতিধ্বনিত করে, অবাধে যাহারা সংসারের সুখ উপভোগ করে, সর্ব্ববিধ সৌন্দর্য্যপিপাসা ও গার্হস্থ্যের সুষমা যাহাদের দৃষ্টিকে নিরবছিন্ন সমাকৃষ্ট করিয়া রাখে, বিপ্লব ও বিপর্য্যয়ে যাহারা একেবারেই অনভ্যস্ত, তাহাদের মধ্যে যখন নিদারুণ বিপদপাত হয়, সমস্ত সৌষ্ঠব বিপর্য্যস্ত হইবার উপক্রম হয়, তখন তাহারা হৃদয়ের শান্তি যে একেবারে হারাইবে, ভগবানের মঙ্গলময় হস্তের প্রতি যে সন্দিহান হইবে, ধর্ম্মমন্দিরে যাজকের নিকট গিয়া উপদেশ বাক্যের ভিতরে যে সান্ত্বনার অভাব উপলব্ধি করিবে, ইহাতে আর বিচিত্র কি।

একেত পাশ্চাত্য জাতির ধর্ম্মের ভিতরে পরলোকের চিত্র, মানবাত্মার অনন্ত জীবনের ছবি সেরূপ পরিস্ফুট নহে; তাহার উপরে সমগ্র ইউরোপখণ্ড ধন-মান সম্পদ-বৈভবের নশ্বরতা আমাদের মত পদে পদে উপলব্ধি করিবার অবসর পায় নাই; তাহাতে এই কাল-সমরের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের উপযোগী প্রার্থনা ও উপদেশর ধারা, যাহা এখনও অপরিবর্ত্তিত আকারে বিঘোষিত হইতেছে, তাহা বর্ত্তমান সময়ে অসম্পূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হওয়াই স্বাভাবিক।

যে কোন দেশেই হউক ধর্ম্মভাব ও ধর্ম্মমত ঘাত-প্রতিঘাতের ও বিপ্লবের ভিতর দিয়াই বিকশিত হয়। মানুষ আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে যখন অভাব বোধ করে, প্রকৃত মীমাংসা খুঁজিয়া না পাইয়া যখন তাহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠে, অতৃপ্তি অশান্তির ভিতরে পড়িয়া তাহার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়, এবং যখন এই ভাব চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, তখনই সেই দেশে সেই সময়ে অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন ধর্ম্মবীরের আবির্ভাব হয়। তিনি আলোকরশ্মি সাধারণের সম্মুখে ধারণ করিয়া জনসাধারণের হৃদয়ের অন্ধকার দূর করিয়া দেন, সর্ব্ববিধ রহস্যের মর্ম্মভেদ করিয়া দেন, নূতন নূতন তত্ত্বের প্রচার আরম্ভ করিয়া দেন; লোকে তখন সেই নূতন শিক্ষা নূতন দীক্ষা লাভ করিয়া তাহাদের অবসন্ন হৃদয়কে আবার প্রসারিত করিবার অবকাশ প্রাপ্ত হয়।

ভারতের উপর দিয়া অনেক বিপ্লব বহিয়া গিয়াছে। রাজনৈতিক হিসাবে ইহা ভারতের দুর্ভাগ্যের কারণ হইলেও, অন্য দিকে ইহা ভারতের আধ্যাত্মিকতাকে ও বৈরাগ্যকে শতগুণে প্রবর্দ্ধিত করিয়া দিয়া গিয়াছে। পাশ্চাত্য জগত বাসনা-পরিপূরণে দৃঢ়ব্রত, কিন্তু এদেশের ধর্ম্ম বাসনা-নিবৃত্তিতে চরম সার্থকতা লাভের জন্য ব্যাকুল। সেখানকার আনন্দ ভোগে, এ দেশের তৃপ্তি ত্যাগে; সে দেশের লোক অস্থায়ীকে আঁকাড়াইয়া ধরিয়া রাখিতে চায়, এখানকার লোক সাংসারিক সুখের উপকরণগুলিকে মায়া বা স্বপ্ন বলিয়া উপহাস করে; সে দেশের সুখের প্রতিষ্ঠা ক্ষুদ্রের উপরে, এ দেশের আনন্দের প্রতিষ্ঠা ভূমার উপরে; সে দেশে ইহজীবনেরই মূল্য আছে, কিন্তু এ দেশের সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ সামগ্রী পুণ্যস্নাত পরজীবন। সহিষ্ণুতাই এ দেশের অঙ্গের ভূষণ, তদ্‌বিপরীতই প্রতীচ্যের ভাব। দৈন্যে আমরা অটল, দীনতার চাপ পাশ্চাত্য জগৎ বহিতে চায় না।

ইহজগতে আমরা সৌভাগ্যলাভের আশা রাখি না। বহুশতাব্দী ধরিয়া আমরা রাজনৈতিক নিরাশার মধ্যে অবস্থান করিতেছি। ইহজীবনে নিরাশ হইয়া পরজীবনে আশান্বিত হইবার ব্যাকুলতা আমাদের অন্তরে বহুযুগ ধরিয়া কার্য্য করিতেছে; এবং ইহাই আমাদের বিশ্বাসকে ও ধারণাকে অন্যভাবে গঠিত করিয়া তুলিতেছে। তাই শত-বিপ্লবও আমাদিগকে মোহাচ্ছন্ন করিতে পারে না, হৃদয়ের স্থৈর্য্য হরণ করিতে পারে না। মৃত্যুর ভিতর দিয়া বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়াই আমাদের শিক্ষা; এবং এই মৃত্যুর ভিতর দিয়া অমৃতকে দেখিবার জন্য আমাদের চিরন্তন সাধনা। পাশ্চাত্য ভূমি এ সাধনার অবসর লাভে চিরবঞ্চিত। এ নব-সাধনা তাহার অদৃষ্টে ঘটে নাই।

এই নিদারুণ যুদ্ধে নরযজ্ঞ ভগবানের মঙ্গলস্বরূপে প্রতীচ্যের বিশ্বাসকে শিথিল করিয়া দিতেছে। কিন্তু ভগবানের রুদ্র মূর্ত্তির ভিতরে তাঁহার দক্ষিণ মুখের পরিচয়লাভ তাহাদের পক্ষে এতদিন সুদূর-পরাহত থাকিলেও তাহাদের নব দীক্ষা লাভের সময় সমুপস্থিত। এই মৃত্যুর ভিতর দিয়া তাহারা নব সত্য নব আলোক লাভ করিবে, বিপ্লবের ভিতরে পড়িয়া তাহারা দিব্য দৃষ্টি লাভ করিবে। জগন্মাতার প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তির ভিতরে তাঁহার সেই অভয় হস্তের পরিচয় পাইয়া আশান্বিত হইবে।

ফলত ধর্ম্মজীবনের প্রকৃত পরীক্ষা মৃত্যুতে। ব্যক্তিগত জীবনে যেমন ইহা সত্য, সমষ্টিগত জীবনেও ইহা তেমনি সত্য। ধর্ম্মকে জীবনে ভাসা ভাসা করিয়া রাখিলে বিনাশে, বিপ্লবে, অবস্থাবিপর্য্যয়ে উহা হৃদয়ে শান্তির রশ্মি বিতরণ করিতে পারিবে না, বৈদ্যুতিক তেজে অবসন্ন হৃদয়কে বলীয়ান্ করিতে পারিবে না। বিপদের সঙ্গে বিনাশের সঙ্গে আমাদের চিরসখ্য, তাই বিপর্য্যয়ের দিনে ভগবানের নিকট হইতে আলোক পাই, সান্ত্বনা পাই, নবচেতনা পাইয়া জীবিত থাকি।

দূরের পদার্থনিচয় দেখিতে হইলে দূরবীক্ষণ যন্ত্রটি বাঁধিয়া লইতে হয়, অর্থাৎ তাহার focus স্থির করিয়া লইতে হয়, তেমনি ভগবানের মঙ্গলস্বরূপ সুনিপুণ-ভাবে বুঝিতে হইলে মনুষ্যজীবনের পরিণাম চিন্তায় আপনাকে বিভোর করিয়া লইতে হয়। প্রাচীন-ঋষিগণ ঠিক এইভাবে আপনাদের জীবনকে নিয়মিত করিতে পারিয়াছিলেন, তাই তাঁহারা নচিকেতা ও যমের কথোপকথন-মুখে পরলোকতত্ত্বের পরিস্ফুট ছবি বাহির করিতে পারিয়াছিলেন। কুরুপাণ্ডব-রণের সেই ভীষণ দুর্দিনে যখন মৃত্যু চারিদিকে অট্টহাস্য করিতে-ছিল, সংসারের নশ্বরতা মনুষ্যজীবনের অনিত্যতা হৃদয়ঙ্গম করিবার বিপুল অবসর আসিয়া পড়িয়া-ছিল, তখনই গীতার পরলোকতত্ত্ব আবার সুস্পষ্ট ভাষায় প্রকটিত হইবার সুবিধা ঘটিল, তাই কুল-ক্ষয়-ভয়-পীড়িত শোক-সংবিগ্ন-মানস অর্জ্জুনকে উদ্বোধিত করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন ক্ষুদ্র হৃদয়-দৌর্ব্বল্য পরিহার কর—

ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।
বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্লাতি
নরোপরাণি,
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি
দেহী ॥
নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥

"শরীর নষ্ট হইলে আত্মা বিনষ্ট হয় না। জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া লোকে যেমন নববস্ত্র পরিধান করে, তেমনি এই জীর্ণ শরীর পরিহার করিয়া লোকে নূতন দেহ লাভ করে। শস্ত্র এই আত্মাকে ছিন্ন করিতে পারে না, অগ্নি ইহাকে দগ্ধ করিতে পারে না, জল ইহাকে ক্লিন্ন করিতে পারে না, বায়ু ইহাকে বিশুষ্ক করিতে পারে না।" মানবাত্মা চিরজীবী। কয়েকদিনের জন্য আত্মীয়-গণের বিচ্ছেদ ঘটিতে পারে, কিন্তু পুনর্মিলন অবশ্যম্ভাবী।

মানুষ যে পর্য্যন্ত না এই শিক্ষা হৃদয়ে দৃঢ় ভাবে ধারণ করিবে, ততদিন তাহার শোকের সান্ত্বনা নাই। মৃত্যুর ও বিপ্লবের ভিতর দিয়া ভগবানের মঙ্গল উদ্দেশ্য যে ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনে কার্য্য করিতেছে, এ ধারণা সুস্পষ্ট না হইলে মানুষ পূর্ণ সান্ত্বনা লাভ করিতে পারে না। যে জাতির যে ধর্ম্মের ভিতরে এই পরলোকতত্ত্ব উদ্-ভাসিত, যে জাতির ভিতরে ভগবানের মঙ্গলস্বরূপে বিশ্বাস অচল অটল, তাহারাই রোগে বিপর্য্যয়ে বিরহে বিচ্ছেদে সান্ত্বনা লাভের আশা করিতে পারে।

মহাভারতের যুগে আমাদের দেশে যে ভয়াবহ অবস্থা আসিয়া পড়িয়াছিল, বর্ত্তমান সময়ে সমগ্র ইউরোপে তদপেক্ষা ঘোরতর দুর্দ্দিন উপস্থিত। মহাভারতের যুগেই গীতাশাস্ত্রের পরলোকতত্ত্ব বিবৃত হইবার অবসর আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। আমাদের বিশ্বাস ইউরোপের এই মহাসমরের ভিতর দিয়া পরলোকতত্ত্ব নবভাবে বিবৃত হইবার সম্ভাবনা আসিয়া পড়িয়াছে। এই পরলোকতত্ত্ব আয়ত্ত করিতে না পারিলে ভগবানের মঙ্গলস্বরূপের উপর অচল নিষ্ঠা জাগিয়া উঠিবে না এবং অন্তর সুদৃঢ় হইতে পারিবে না। ইউরোপীয় ধর্ম্মের ভিতরে এই পরলোকতত্ত্ব এতদিন তাদৃশ পরিস্ফুট হইতে পারে নাই। আমরা আশা করি যে এই মহাসমরের ভিতর দিয়া এই শিক্ষা সমগ্র ইউরোপে অবতীর্ণ হইবে এবং এই ঘোর রক্তপাতের ভিতর দিয়া প্রকৃত বৈরাগ্য পাশ্চাত্যভূমিকে স্পর্শ করিবে এবং তাহার জীবনকে নবভাবে গঠিত করিয়া তুলিবে, তাহাদের দেশের ধর্ম্মকে আরও সুগঠিত করিয়া তুলিবে, তাহাদের হৃদয় হইতে ঔদ্ধত্য ও স্বার্থপরতা বিদূরিত করিয়া দিবে; সর্ব্ববিধ অভিমান তিরোহিত হইয়া বৈরাগ্যের সুরে এবং দীনতার ছন্দে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে সখ্যবন্ধন দৃঢ় হইয়া উঠিবে এবং জগতে শান্তির ও মৈত্রীর রাজ্য সম্ভবপর হইয়া উঠিবে।*

* বিগত ২৮ এ এপ্রেল (Father Holmes) পাদ্রী হোমস্ কলিকাতা লাটের গির্জ্জাতে যে একটি উপদেশ দান করেন, তাহাতে অনেকগুলি মূল্যবান কথা ছিল। আমরা তাহার কয়েকটি কথা উপলক্ষ করিয়া এই প্রবন্ধ লিখিয়াছি। তিনি বাইবেল হইতে যে শ্লোক উদ্ধৃত করেন তাহার মর্ম্ম এই যে "আমরা চর্ম্মচক্ষুর দৃষ্টিতে নহে, কিন্তু বিশ্বাসের দৃষ্টিতে চলি"। (We walk by faith, not by sight)

ঝঞ্ঝারাতে।

(রাগিণী—মিশ্র পিলু।)

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এ)

আমার
কুটীর তুমি ভেঙ্গেই দিয়ো—
নূতন ক'রে জাগিয়ো
আমায় তোমার মাঝে জাগিয়ো !
অমনি ক'রে বজ্র হেনে
সুখের বাসা দিয়ো ভেঙ্গে
রুদ্র তুমি ভীষণ তুমি
চোখের জলে জাগিয়ো !

এই
সুখে ম'রে থাকার চেয়ে
মরণ আমায় যাক্ না নি'য়ে
মৃত্যু মাঝে নবজীবন
ধন্য হব পে'য়ে !
আঘাত সে যে পরশমণি
অতুল ধনে করে ধনী
সেই আঘাতে সুপ্ত জীবন-
কমল তুমি ফুটিয়ো ॥

বৈয়াসিক-ন্যায়মালা।

চতুর্থ অধিকরণ—বেদান্তসমূহের ব্রহ্মৈকপরত্ব।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(শ্রীরামচন্দ্রশাস্ত্রী সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ
ও
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি)

দ্বিতীয়ং বর্ণকমাহ—

অধিকরণ শ্লোক।—

প্রতিপত্তিং বিধিৎসন্তি ব্রহ্মণ্যবসিতা উত।
শাস্ত্রত্বাত্তে বিধাতারো মননাদেশ্চ কীর্ত্তনাৎ ॥২১
নাকর্ত্তৃতন্ত্রেঽস্তি বিধিঃ শাস্ত্রত্বং শংসনাদপি।
মননাদিঃ পুরা বোধাদ্ ব্রহ্মণ্যবসিতাস্ততঃ ॥ ২২ ॥

টীকা। একদেশী মন্যতে—ব্রহ্মপরত্বেঽপি বেদান্তা ন ব্রহ্মণ্যেব পর্য্যবস্যন্তি। কিং তর্হি পারোক্ষ্যেণ ব্রহ্মতত্ত্বং প্রতিপাদ্য পশ্চাদপরোক্ষপ্রতিপত্তিং বিদধতি। তথা চ সতি বেদান্তানাং শাসনাচ্ছাস্ত্রত্বমুপপদ্যতে। কিঞ্চ "শ্রোতব্য" ইতি শ্রবণং শব্দজ্ঞানাত্মকং বিধায় অথ "মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" ইত্যনুভবজ্ঞানাত্মকং মননাদিকং স্পষ্টমেব বিধীয়তে। তস্মাৎ—প্রতিপত্তের্বিধাতারো বেদান্তাঃ। ইতি প্রাপ্তে—

ব্রূমঃ—ন প্রতিপত্তের্বিধিঃ সম্ভবতি, কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা বা কর্ত্তুমশক্যত্বাদপুরুষতন্ত্রত্বাৎ। শাস্ত্রত্বং তু নানুষ্ঠেয়শাসনাদেব নিয়তং, সিদ্ধবস্তুশংসনেনাপি তদুপপত্তেঃ। শাব্দজ্ঞানে জাতে পশ্চাদনুভবাত্মকং মননাদিকং বিধীয়তে—ইতি বক্তুং ন যুক্তং। 'দশমস্ত্বমসি' ইতিবচ্ছব্দস্যৈবাপরোক্ষানুভবজনকত্বেন শাব্দবোধাৎ পুরৈবাসংভাবনাদিনিবৃত্তয়ে ব্যাপাররূপস্য কর্ত্তৃতন্ত্রস্য মননাদের্বিধানাৎ। তস্মাৎ "তত্ত্বমসি" ইত্যাদয়ো বেদান্তা ব্রহ্মণ্যবসিতাঃ।

শ্লোকানুবাদ। দ্বিতীয় বর্ণক বলা যাইতেছে—

(বেদান্ত সমূহ) জ্ঞান বিধান করিতে চাহে অথবা ব্রহ্মেতেই পর্য্যবসিত ? সেগুলি যখন শাস্ত্র এবং যখন (সেই বেদান্তে) মননাদিরও উল্লেখ আছে, তখন সেই (বেদান্তসমূহ) (জ্ঞান-) বিধায়ক। কর্ত্তৃতন্ত্র যাহা নহে, তাহাতে বিধি নাই। কথনেরও কারণে শাস্ত্রত্ব (হয়)। মননাদি জ্ঞানের পূর্ব্বে। সেই কারণে (বেদান্তসমূহ) ব্রহ্মেতেই পর্য্যবসিত।

টীকার অনুবাদ। কেহ বা বলেন—ব্রহ্মপর হইলেও বেদান্তসমূহ ব্রহ্মেতেই পর্য্যবসিত নহে। তবে কি ? পরোক্ষভাবে ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিপন্ন করিয়া পরে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিধান করিতেছে। তাহা হইলে বেদান্ত সমূহের শাসনের কারণে শাস্ত্রত্ব উপপন্ন হয়। আরও, "শ্রোতব্যঃ" এই পদের দ্বারা শব্দজ্ঞানাত্মক শ্রবণ বিধান করিয়া পরে "মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" এই পদের দ্বারা অনুভবজ্ঞানাত্মক মননাদি স্পষ্টই বিহিত হইতেছে। অতএব বেদান্তসমূহ জ্ঞানের বিধায়ক। ইহা প্রাপ্ত হইলে—

বলিতেছি—জ্ঞানের বিধান সম্ভবপর নহে, কারণ অপুরুষ-তন্ত্র বলিয়া (উহাকে) করা, না করা বা ভিন্ন প্রকারে করা সম্ভবপর নহে। শাস্ত্রত্ব কেবলই যে অনুষ্ঠেয় বিষয়ের শাসন হইতেই হয় তাহা নহে, প্রসিদ্ধবস্তুসম্বন্ধীয় কথন হইতেও শাস্ত্রত্ব উপপন্ন হয়। শাব্দ (বা শ্রবণাত্মক) জ্ঞান জন্মিলেই পরে অনুভবাত্মক মননাদি বিহিত হইয়াছে, ইহা বলা ঠিক নহে, যেহেতু "তুমি দশম হইতেছ" ইহার

ন্যায় শব্দেরই প্রত্যক্ষ অনুভব জন্মাইবার শক্তির ফলে শাব্দজ্ঞানের পূর্ব্বেই (ব্রহ্মবিষয়ক) অসম্ভাবনা প্রভৃতির নিবৃত্তির জন্য ক্রিয়ারূপ কর্ত্তৃতন্ত্র মননাদির বিধান করা হইয়াছে। অতএব "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি বেদান্ত (বাক্য) সকল ব্রহ্মেতেই পর্য্যবসিত।

তাৎপর্য্য। বেদান্তের ব্রহ্মৈকপরত্ব-অধিকরণে বুঝাইবার কথা যে, সমস্ত বেদান্ত বা উপনিষদ একমাত্র ব্রহ্মেতেই পর্য্যবসিত, ব্রহ্মকেই একমাত্র প্রকাশ করে—উপনিষদ কর্ম্ম বা অন্য কোন কিছু, এমন কি ব্রহ্মজ্ঞানেরও বিধায়ক শাস্ত্র নহে, অর্থাৎ উপনিষদ কোন বিষয়েই এরূপ কর, ওরূপ করিও না, এই ভাবের বিধি-নিষেধের শাস্ত্র নহে। বেদের কর্ম্মকাণ্ড বা পূর্ব্বভাগ স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছে যে এই কর্ম্ম এই ভাবে অনুষ্ঠেয় ইত্যাদি। বেদের কর্ম্মকাণ্ডই বিধিবিধানের শাস্ত্র—তাহাতেই লেখা আছে যে কোন্ কর্ম্ম অনুষ্ঠেয় এবং কোন্ কর্ম্ম কি প্রণালীতে করিতে হইবে। কিন্তু বেদের উত্তরভাগ বা উপনিষদসমূহ সেরূপ কোন প্রকার বিধিবিধানের শাস্ত্র নহে। বেদান্তের উদ্দেশ্যই হইল ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ চিনাইয়া দেওয়া—প্রত্যক্ষ প্রকাশ করা। সেই উদ্দেশ্যে যেটুকু জ্ঞানচর্চ্চার প্রয়োজন, সেইটুকু জ্ঞানেরই বিষয়ে বেদান্তে বলা হইয়াছে। কিন্তু তদ্ব্যতীত জ্ঞান বা কর্ম্ম বা অন্য কোন কিছুরই বিধেয়ত্ব বা অবিধেয়ত্ব সম্বন্ধে কোন কথা বেদান্তে অর্থাৎ উপনিষদে প্রতিপন্ন করা হয় নাই।

এই বিষয়টী বুঝাইবার উপলক্ষে বর্ত্তমান অধিকরণে প্রথম বর্ণকে বুঝানো হইয়াছে যে বেদান্ত, দেবতা অথবা ক্রিয়াকর্ম্মসংশ্লিষ্ট কর্ত্তা বা সাধনাদির প্রতিপাদক নহে,—একমাত্র ব্রহ্মেরই প্রতিপাদক। এবার দ্বিতীয় বর্ণকে বলা হইতেছে যে, উপনিষদ যে কেবল ক্রিয়াকর্ম্ম সংশ্লিষ্ট কর্ত্তা প্রভৃতির প্রতিপাদক নহে তাহা নহে,—উপনিষদ কোন প্রকার জ্ঞানেরও বিধায়ক নহে অর্থাৎ কোন্ জ্ঞান গ্রহণীয় বা কোন্ জ্ঞান অগ্রহণীয়, উপনিষদ এ প্রকার কোন বিধিনিষেধেরও শিক্ষা প্রদান করে না। উপনিষদের মূল উদ্দেশ্য হইল ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ প্রকাশ করা, এবং উপনিষদে জ্ঞানের বিষয় যেটুকু বলা হইয়াছে, তাহা সেই মূল উদ্দেশ্যেরই অনুষঙ্গে উক্তি মাত্র—ইহাই দ্বিতীয় বর্ণকে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।

পূর্ব্বপক্ষ বলিতে চাহেন যে উপনিষদ জ্ঞানেরই বিধান করে। পূর্ব্বপক্ষের মতে বেদান্ত ব্রহ্মপর হইলেও অর্থাৎ ব্রহ্মবিষয়ে আলোচনা করিলেও ব্রহ্মেতেই পর্য্যবসিত নহে অর্থাৎ একমাত্র যে ব্রহ্মকেই প্রত্যক্ষ প্রকাশ করিতেছে তাহা নহে। উহা প্রথমত পরোক্ষ ভাবে বা সামান্যত ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশ করিলেও পরে ব্রহ্মবিষয়ক প্রত্যক্ষ জ্ঞানেরই বিধান করে। পূর্ব্বপক্ষের এরূপ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, উপনিষদকে যখন শাস্ত্র নামে অভিহিত করা হয়, তখন তাহাতে বিধিনিষেধ বা শাসনরূপ শাস্ত্রের মূল কথা থাকা চাই—শাসনের ভাব না থাকিলে বেদান্তের শাস্ত্রত্বই থাকিতে পারে না। যদি বেদান্তে কেবল ব্রহ্মতত্ত্বমাত্রই প্রকাশ করা হয়, তবে তাহা লইয়া বিধিনিষেধের কোন কথাই আসিতে পারে না, কারণ ব্রহ্মতত্ত্ব সিদ্ধবস্তু—তাহার আর বিধিনিষেধ কি? সিদ্ধবস্তুকে একমাত্র প্রকাশ করা যাইতে পারে। বিধিনিষেধের কথা না থাকিলে কাজেই শাস্ত্রের শাস্ত্রত্বও থাকিতে পরে না। উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" অর্থাৎ আত্মা বা ব্রহ্মের দর্শন, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিবেক। পূর্ব্বপক্ষ ব্রহ্মকে দর্শন করিবার কথা ছাড়িয়া দিলেন, কারণ তাহাতে তাঁহার যুক্তির বল কিছু কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা। তিনি তাই বলিলেন যে, উপনিষদে এই যে বলা হইয়াছে যে "শ্রোতব্যঃ" অর্থাৎ ব্রহ্মের বিষয় শ্রবণ করা উচিত এবং এই প্রকারে শ্রবণরূপ কার্য্যের দ্বারা ব্রহ্মবিষয়ে শাব্দ জ্ঞান হইলে পরে তাঁহার বিষয়ে মনন বা সত্যপ্রকাশের অনুকূল আলোচনা করিতে হইবে এবং নিদিধ্যাসন বা অবিচ্ছিন্ন ধ্যানযুক্ত হইতে হইবে—এই করা উচিত, করিতে হইবে, এই প্রকার অর্থবাচী শব্দ প্রয়োগের দ্বারাই বুঝা যাইতেছে যে উপরোক্ত শ্রুতিবাক্যে শ্রবণ, মনন প্রভৃতি বিষয়ে বিধি প্রদত্ত হইয়াছে। অতএব পূর্ব্বপক্ষের মতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে বেদান্ত বা উপনিষদ জ্ঞানের বিধানকর্ত্তা শাস্ত্র।

সিদ্ধান্তপক্ষ পূর্ব্বপক্ষের বক্তব্যগুলির এক

একটী ধরিয়া উত্তর দিতেছেন। প্রথমত, পূর্ব্বপক্ষ যে বলিয়াছেন যে, বেদান্ত ব্রহ্মসম্বন্ধীয় প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের বিধান করিয়াছে, তাহার উত্তরে সিদ্ধান্ত-পক্ষ বলিলেন যে বেদান্তে প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিধান সম্ভব নহে। সিদ্ধান্তী বলেন যে, যে জ্ঞানের বিষয় তুমি আমি বিচার করিতেছি, সে জ্ঞান যখন পুরুষ-তন্ত্র নহে, পুরুষের অধীন নহে—পুরুষ যখন সেই জ্ঞানের সৃষ্টি করে নাই, তখন সেই জ্ঞান কাজেই নিত্যজ্ঞান হইল। নিত্য যাহা কিছু, তাহার কোন প্রকার পরিবর্ত্তন সম্ভব নহে। সুতরাং এই যে নিত্যজ্ঞান, ইহার সম্বন্ধেও কোন প্রকারে করা, না করা বা পরিবর্ত্তিতরূপে করা, এ সকল কথাই প্রযুক্ত হইতে পারে না। বিধানের অর্থই হইল—ইহা করিও, উহা করিও না, অথবা উহা এপ্রকারে না করিয়া ও-প্রকারে করিও। নিত্যজ্ঞানের সম্বন্ধে যখন কোনপ্রকারে করিবার কোন কথা আসে না, তখন তাহার সম্বন্ধে বেদান্ত বিধান করিতেছে, সে কথা বলাও অযৌক্তিক।

পূর্ব্বপক্ষের দ্বিতীয় কথা এই যে, বেদান্ত যদি জ্ঞানের বিধান করে, তবেই তাহার শাস্ত্রত্ব বজায় থাকে। তাঁহার মতে "শাস্ত্র"পদ "শাস"ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। শাস ধাতুর অর্থ শাসন। শাসনের সঙ্গে সঙ্গেই কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্যের বিধান আসিয়া পড়ে। অতএব পূর্ব্বপক্ষ বলেন যে বিধানের অভাব হইলে বেদান্তের শাস্ত্রত্বই থাকিতে পারে না, তাহার উত্তরে সিদ্ধান্তপক্ষ বলিতেছেন যে "শাসন" অর্থাৎ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বিধান না থাকিলেই যে বেদান্তকে শাস্ত্র বলিতে পারিব না এমন কোন কথা নাই। "শাস্ত্র" শব্দের ব্যুৎপত্তি যেমন শাস ধাতু হইতে হয়, সেইরূপ শংস ধাতু হইতেও হইতে পারে। শংস ধাতু অর্থ কথন বা বলা। সিদ্ধান্তপক্ষ বলেন যে তাঁহার মতে সিদ্ধবস্তু বা নিত্যবস্তু ব্রহ্মবিষয়ে কথন বা প্রকাশ করিয়া বলিবার কারণেই বেদান্তের শাস্ত্রত্ব।

পূর্ব্বপক্ষের তৃতীয় কথা এই যে, বেদান্তে "শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ" এই সকল উক্তির দ্বারা প্রথমে শ্রবণ করা উচিত, পরে মনন ও নিদিধ্যাসন করা কর্ত্তব্য, এই প্রকারে জ্ঞানের বিধান করা হইয়াছে। তদুত্তরে সিদ্ধান্তপক্ষ বলেন যে, শ্রবণরূপ শব্দজনিত জ্ঞানের পরে যে অনুভবাত্মক মনন ও নিদিধ্যাসনের বিধান করা হইয়াছে, পূর্ব্বপক্ষ একথা বলিতে পারে না। শ্রবণের ফল হইল শব্দের সাহায্যে প্রত্যক্ষজ্ঞানলাভ। দৃষ্টান্ত—দশজন লোক বসিয়া আছে, তন্মধ্যে একজন এক দুই করিয়া উপস্থিত লোকদিগকে গণিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু প্রতিবারেই আপনাকে ছাড়িয়া বাকী নয়জনকে গণিতে লাগিল। অবশেষে উপস্থিত লোকেরা তাঁহার ভ্রম দেখাইয়া বলিয়া উঠিল—"তুমিই যে দশম।" এই "তুমিই দশম" এই উক্তি দ্বারা তাহার নিজের দশমত্ববিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মিল। এই দৃষ্টান্তের বলে সিদ্ধান্ত-পক্ষ বুঝাইতে চাহেন যে শ্রবণের ফল বা অর্থ হইল শব্দের সাহায্যে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ। উপনিষদ্ যে ব্রহ্মকে "শ্রোতব্য" বলিয়াছেন, তাহার অর্থ এই যে বেদান্তের উক্তিসমূহের সাহায্যে ব্রহ্মবিষয়ক প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ করিতে হইবে। শ্রবণ করা উচিত বা কর্ত্তব্য, এরূপ বিধানার্থক ভাবে "তব্য" প্রত্যয় ব্যবহৃত হয় নাই। প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইলে বিধানের কথাই আসিতে পারে না। ভাষ্যকারের মতে এখানে "তব্য" প্রত্যয়ের ব্যবহারের দ্বারা বিধির ছায়ামাত্র প্রকাশ করা হইয়াছে। এখন কথা হইতেছে এই যে, বেদান্তে যে "শ্রোতব্য" শব্দের পরে "মন্তব্য" ও "নিদিধ্যাসিতব্য" এই দুইটী শব্দ আছে, বিধানের ভাব অস্বীকার করিলে এরূপ উক্তির তাৎপর্য্য কি? সিদ্ধান্তীর মতে ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মের অস্তিত্ব যে অসম্ভব এইরূপ মিথ্যা জ্ঞান নিরস্ত করিবার জন্যই মনন বা মনে মনে আলোচনা এবং নিদিধ্যাসন বা ধ্যানধারা অবলম্বন করিবে। এই মনন ও নিদিধ্যাসন হইল দুইটী কার্য্য, সুতরাং কর্ত্তৃতন্ত্র—কর্ত্তার অভাবে কার্য্য হইতে পারে না। এই দুইটী কার্য্যের বিধান করা হইয়াছে বটে, কিন্তু শ্রবণরূপ শব্দজনিত প্রত্যক্ষ জ্ঞানের পূর্ব্বেই উক্ত দুইটী কার্য্য শেষ হইয়া যাইবে, কারণ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের পরে আর আলোচনাদি কার্য্যের সম্ভাবনাই আসিতে পারে না। যখন উপনিষদ্‌বাক্যে বিধি-নিষেধের কোনই বিধান রহিল না, প্রত্যুত ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ প্রকাশক উপদেশমাত্র রহিয়াছে, তখন

কাজেই বলিতে হয় যে বেদান্তসমূহ ব্রহ্মেতেই পর্য্যবসিত।

বৌদ্ধমহিলা রাজনন্দিনী মালিনী।

(পণ্ডিত শ্রীহরিদেব শাস্ত্রী)

বৌদ্ধযুগে অতি-উচ্চ সম্ভ্রান্ত বংশের মহিলাগণ স্ব স্ব উচ্চ সুরম্য প্রাসাদমধ্যে অতুল ঐশ্বর্য্য ও মহাসুখসম্ভোগ পরিত্যাগ করিয়া নির্ব্বাণমুক্তিপথে অগ্রসর হইবার জন্য কঠোর বৈরাগ্য ব্রত অবলম্বন করিতেন এবং অধ্যয়ন অধ্যাপন ও পরহিতানুষ্ঠানাদি সৎকার্য্যে সর্ব্বদা রত থাকিয়া সামান্য মঠে বাস করিতেন। তাঁহারা দিগন্তব্যাপী যশঃসৌরভে মাতোয়ারা হইবার জন্য কোন কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন না। তাঁহারা দক্ষিণ হস্তদ্বারা যখন কাহাকেও কিছু দান করিতেন তখন তাঁহাদের বামহস্ত তাহা জানিতে পারিত না। তাঁহারা কামনাশূন্য হইয়া পরহিতব্রতে দীক্ষিত হইতেন। তাঁহাদের অসীম অধ্যবসায় জগতের লোককে জানাইবার জন্যই যেন শাস্ত্রকারগণ "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন", এই মহামন্ত্রটি রচনা করিয়াছিলেন, ইহাই অনুমিত হয়। "চণ্ডী"তে চণ্ড ও মুণ্ড নামক শুম্ভাসুরের দুইটি দূতের নিকটে হিমাচলশোভিনী দুর্গার মুখ হইতে যেরূপ প্রতিজ্ঞাবাক্য উক্ত হইয়াছিল, দেখা যায়, তাঁহাদের প্রতিজ্ঞাও তদ্রূপই দৃঢ় ছিল। তাঁহারা এ জগতে যে বস্তুকে সত্য বলিয়া বুঝিতেন, সূর্য্য পশ্চিম দিকে উদিত হইলেও তাঁহারা তাহা পরিত্যাগ করিতেন না। তাঁহাদের সৎ সাহসের নিকটে ভীমপরাক্রম বীরপুরুষগণকেও পরাজয় স্বীকার করিতে হইত। সংস্কৃত-অভিধানগ্রন্থ-প্রণেতৃগণ কেন যে, নারীমাত্রকে অবলা নামে অভিহিত করিয়াছেন, তাহার কারণ তাঁহারাই বুঝিতেন, আমরা বুঝিতে পারি না। যাঁহারা মানসবল, সাহসবল, ধর্ম্মবল, বুদ্ধিবল ও চরিত্রবলে বলীয়সী ছিলেন, তাঁহাদিগকে অবলা নামে অভিহিত করা কোন প্রকারেই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। ভারতমহিলা দেহবলেও যেরূপ বলীয়সী, তাহা রাণী দুর্গাবতী প্রভৃতির বীরত্বকাহিনীতে যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এক্ষণে যাঁহারা কোন কোন মহিলার বক্তৃতাশক্তি দেখিয়া বিস্মিত হন, তাঁহারা রাজনন্দিনী মালিনীর বৃত্তান্ত অবগত হইলে অধিকতর বিস্মিত হইবেন। আর, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, প্রাচীন ভারতের কুলমহিলারা কোন ধর্ম্মের কোন এক শাস্ত্রের অনুবাদ মাত্র পাঠ করিয়াই সেই শাস্ত্রের অনুবাদ-গ্রন্থ রচনা করিতেন না। তাঁহারা অগ্রে নিজের দেশের উন্নতি সাধন করিতেন। তৎপরে পরের দেশের উন্নতি সাধনে ইচ্ছুক হইতেন। তাঁহারা ভারতীয় জ্ঞানকাণ্ড-শাস্ত্র ও কর্ম্মকাণ্ড-শাস্ত্র বিষয়ে বক্তৃতা দিবার পূর্ব্বে সংস্কৃত ব্যাকরণ, অভিধান, গণ, সাহিত্য অলঙ্কার, দর্শনশাস্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্রাদি অতি উত্তমরূপে পাঠ করিতেন। সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়া মূলগ্রন্থ সকল যথাবিধি পাঠ করিতেন। পশ্চাৎ সংগ্রহ গ্রন্থগুলি পাঠ করিতেন। পরে ঐ সকল গ্রন্থের সরল ব্যাখ্যা প্রচার করিয়া জনসমাজের প্রকৃত কল্যাণসাধন করিতেন। তাঁহাদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা শুনিয়া জনসমাজ উপকৃত হইত। তাঁহারা যে ধর্ম্মবিষয়ে গ্রন্থ লিখিতেন বা বক্তৃতা করিতেন, সেই ধর্ম্মের শাস্ত্রীয় ভাষাটি অগ্রে আয়ত্ত করিতেন। পালি ও সংস্কৃত ভাষায় পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া পশ্চাৎ বৌদ্ধধর্ম্ম বিষয়ে বক্তৃতা করিতেন, গ্রন্থ লিখিতেন। তাঁহারা সৎকার্য্যের জন্য অর্থের প্রয়োজন উপস্থিত হইলে নিজেরাই অর্থ দান করিতেন। অন্যজাতীয় লোকের নিকটে অর্থ সাহায্য লাভেচ্ছা তাঁহাদের হৃদয়ে স্থান পাইত না। তাঁহারা এক একটি লক্ষপতি ক্রোড়পতির কন্যা ছিলেন।

আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধযুগে বারাণসী নগরীতে কৃকী নামক একজন হিন্দু স্বাধীন রাজা ছিলেন। মহারাজ কৃকী সনাতনবৈদিকধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। সর্ব্বদাই যজ্ঞাদি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন। তাঁহার প্রজারঞ্জনমহিমায় বারাণসীরাজ্য অতিশয় সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। মহারাজ কৃকীর মালিনী নাম্নী এক কন্যা ছিলেন। মহারাজ তাঁহাকে তৎকালোচিত শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। রাজনন্দিনী মালিনী হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী পিতার কন্যা হইলেও গোপনে গোপনে বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন এবং বৌদ্ধধর্ম্মে তাঁহার

প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল। তিনি বৌদ্ধসন্ন্যাসী দিগকে অতিশয় শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতেন। তিনি ক্রমে ক্রমে গোপনে বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া সেই শাস্ত্রে অসাধারণ বিদুষী হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু অনেকে এ বিষয় জানিতে পারে নাই। অনেকেই জানিত যে, তিনি হিন্দুরাজার হিন্দু মেয়ে। একদিন তিনি কতিপয় বৌদ্ধসন্ন্যাসীকে ভোজনার্থ নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা মধ্যাহ্নে রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বারে উপস্থিত হইলে দৌবারিক রাজনন্দিনীকে তাঁহাদের আগমন বার্ত্তা জ্ঞাপন করিল। তিনি তাঁহাদিগকে প্রাসাদ মধ্যে আনয়ন করিয়া উত্তমরূপে ভোজন করাইলেন এবং তাঁহাদের পুস্তকবন্ধনের জন্য ক্ষৌমবস্ত্রখণ্ড ও তাঁহাদের পরিধানের জন্য হরিদ্রাবর্ণ বস্ত্র প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিলেন। তাঁহারা রাজনন্দিনীর আদর অভ্যর্থনায় অতিশয় প্রীত হইয়া স্বস্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। ইহার কয়েক দিন পরে এই ঘটনা রাজা কৃকীর কর্ণগোচর হইল। রাজার উপদেশক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ রাজাকে বলিলেন, "মহারাজ, আপনি সনাতন বৈদিকধর্ম্মাবলম্বী, কিন্তু আপনার কন্যা স্বধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া অন্যধর্ম্মাবলম্বীদিগকে আপনার অনুমতি বিনা প্রাসাদ মধ্যে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইয়াছেন। ইহা অত্যন্ত অন্যায় ও গর্হিত কার্য্য হইয়াছে। যদি তাহাদিগকে ভোজন করানই উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে তাহাদের মঠে খাদ্যদ্রব্য প্রেরণ করিলেই চলিত। আপনার অনুমতি না লইয়া বিধর্ম্মীদিগকে প্রাসাদাভ্যন্তরে আনয়ন করিয়া ভোজন করান ভাল কার্য্য হয় নাই। পিতার অনুমতি ব্যতীত যে কন্যা ঈদৃশ কার্য্য করে, শাস্ত্রে তাহাকে অবাধ্যা কন্যা কহে। রাজনন্দিনী যখন অবিবাহিতা, তখন পিতার আদেশ লইয়া সমস্ত কার্য্য করাই তাঁহার পক্ষে উচিত। আর এক কথা এই যে, এইরূপ কার্য্য করায় তাঁহার বৌদ্ধধর্ম্মে আস্থা প্রকটিত হইয়াছে। তিনি বোধ হয় গোপনে বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন। আমাদের বোধ হয় ঐ বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা তাঁহাকে বৌদ্ধধর্ম্মে সেই দিন দীক্ষিত করিয়াছে। সেই দিন তাহাদিগকে অত খাতির করিবার কারণই এই"। রাজার একজন জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিত বলিলেন, "আমি ইহা চক্ষে না দেখিলেও গণনা করিয়া দেখিয়াছি যে, রাজনন্দিনী সেই দিন বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। এক্ষণে সম্রাট বৌদ্ধ। আর, বৌদ্ধসম্রাটের সাম্রাজ্যবর্দ্ধনের লালসা দিন দিন যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে আমাদের এই আশঙ্কা হইতেছে যে, আপনার এই কন্যা যদি বৌদ্ধদিগের সহিত মিলিত হয়, তাহা হইলে আপনার এই স্বাধীন বারাণসীরাজ্য হয় তো অচিরে বিধ্বস্ত হইতে পারে। অতএব ঈদৃশী অবাধ্য কন্যাকে বারাণসীরাজ্য হইতে অতি দূরদেশে নির্ব্বাসিত করাই শ্রেয়ঃ। নতুবা আপনার মহা-অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা"। রাজা কৃকী এই প্রকারে স্বীয় সভাসদ ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের মন্ত্রণা শুনিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি রাজ্যনাশভয়ে কন্যাকে নির্ব্বাসিত করাই শ্রেয়ঃকল্প বলিয়া স্থির করিলেন। তিনি কন্যাকে চির-নির্ব্বাসনের আদেশ প্রদান করিলেন। রাজনন্দিনী মালিনী এই আদেশ শুনিয়া মোটেই ভীত হইলেন না। বরং তিনি মহাহর্ষের সহিত ইহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু তিনি রাজাকে এইমাত্র বলিলেন যে, "পিতঃ আমি রাজকন্যা। রাজপ্রাসাদেই মহাসুখস্বচ্ছন্দে লালিত পালিত হইয়াছি। সুতরাং নির্ব্বাসনে প্রস্তুত হইবার জন্য আমি সাতদিন সময় প্রার্থনা করিতেছি। মহারাজ কৃকী এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। কারণ, তিনি মনে করিলেন, এই সাত দিনের মধ্যে এই কন্যার দ্বারা রাজ্যের অনিষ্ট ঘটিবার কোন সম্ভাবনা নাই। ইহার উপর কড়া নজর রাখিলেই চলিবে। কাহারও সহিত পত্রব্যবহার যাহাতে না হয়, যাহাতে কোন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী প্রাসাদ মধ্যে আসিতে না পারে, তদ্বিষয়ে ভাল বন্দোবস্ত করিলেই চলিতে পারে। এই মনে করিয়া তিনি ভৃত্যবর্গের প্রতি কঠোর আদেশ প্রদান করিলেন। কোন রূপ কিছু ঘটিলে তাহারা কঠোর দণ্ড পাইবে, ইহা বলিয়া দিলেন। এবং মালিনীর চিরনির্ব্বাসনোপযোগী দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহের জন্য মালিনীর অভিলাষ জানিতে চাহিলেন। মালিনী বলিলেন, "পিতঃ আমি আর কিছুই চাহি না। আমি কেবল এই সাত দিন বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে চাহি। সাত দিন

বক্তৃতা শেষ হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ আমাকে নির্ব্বাসিত করিবেন। একমুহূর্ত্তও থাকিব না। এই আমার শেষ প্রার্থনা।" রাজা মনে করিলেন যে, বক্তৃতা শুনিতে আপত্তি কি? যত ইচ্ছা তত বক্তৃতা করুক না কেন। উহার বক্তৃতা দ্বারা রাজ্যের অনিষ্ট ঘটিবার তো কোন সম্ভাবনা নাই। সুতরাং বক্তৃতা শুনিতে দোষ কি? এইরূপ মনে করিয়া রাজা মালিনীকে বক্তৃতা করিতে আদেশ দিলেন। এই ষোড়শবর্ষবয়স্কা রাজকুমারী এক সপ্তাহ কালের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্মবিষয়ে স্বীয় অদ্ভুত বক্তৃতাশক্তির প্রভাবে রাজা, রাজ্ঞী, ভ্রাতা, ভগিনী, অন্যান্য আত্মীয়বর্গ, মন্ত্রিগণ, সভাসদ্ ব্রাহ্মণপণ্ডিতমণ্ডলী ভট্টসেনা নামক রাজসৈন্য এবং বারাণসী নগরীর প্রায় দশ হাজার অধিবাসীদিগকে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করাইয়াছিলেন।

বৌদ্ধশাস্ত্রে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য দেখিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণও বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলেন। এতাবৎকাল পর্য্যন্ত তাঁহার বক্তৃতাশক্তি, বিচারশক্তি, সমালোচনাশক্তি, বিশ্লেষণশক্তি ও বুঝাইবার শক্তি ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় হৃদয় মধ্যেই লুক্কায়িত ছিল। তাঁহার এই লুক্কায়িত শক্তিরূপ অগ্নি এই ঘটনারূপ পবনহিল্লোলে সন্দীপিত হইয়া দেশব্যাপিনী উজ্জ্বল শিখা বিস্তার করিয়া পৌরজানপদবর্গের অজ্ঞান তিমির-রাশি অপসারিত করিয়াছিল। যে সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাঁহার বিরুদ্ধে ইতঃপূর্ব্বে ষড়্‌যন্ত্র করিয়াছিলেন, তাঁহারা পরে "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ", এই বৌদ্ধশাস্ত্রীয় মহাবাক্যোপদেশের সুযুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা শ্রবণে যজ্ঞে পশুহিংসার অনিষ্টকারিতা উপলব্ধি করিয়া গো-মেষাদি দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠানে বিরত হইলেন। তাঁহারা তাঁহার উপদেশানুসারে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। পণ্ডিতদিগকে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিতে দেখিয়া অন্যান্য অনেক লোক ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। এইরূপে তিনি এতগুলি লোককে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করাইয়া সপ্তাহ শেষে পিতাকে বলিলেন, "পিতঃ, এক সপ্তাহ শেষ হইয়াছে এইবার আমাকে নির্ব্বাসিত করুন। কারণ, আপনি মনে করিয়াছিলেন, আমি আপনার রাজ্যের শান্তিভঙ্গকারিণী। আমি আপনার প্রাসাদের আবর্জ্জনা স্বরূপ। কিন্তু পিতঃ, আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি যে, আমি কোন দোষই করি নাই। নির্ব্বাণপথের পথিক জ্ঞানী বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদিগকে প্রাসাদমধ্যে ভোজন করাইলে মহাপাপ হয় না। যাহাই হউক, পিতৃ-আজ্ঞা সর্ব্বথা পালনীয়। আপনি আমার নির্ব্বাসনের জন্য আজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন। সেই আজ্ঞা আমাকে পালন করিতে হইবে। অতএব আমাকে নির্ব্বাসিত করুন। আমি এইবার নির্ব্বাসিত হইব। অদ্য এক সপ্তাহ শেষ হইল। আর কেন? আমি চলিলাম। আমিও কোলাহলপূর্ণ দুঃখশোকময় অনিত্য তুচ্ছ সুখের আবরণে আচ্ছাদিত নগরীতে বাস করিতে চাহি না। নাগরিক জীবন নাগরিক লোকের হৃদয় ছল-কপটতা ও দ্বৈধভাবে পূর্ণ। সদাই কলুষিত। আমি ঈদৃশ স্থানে বাস করিতে চাহি না। এখানে ভিতরে একভাব, বাহিরে অন্য ভাব। এখানে বৌদ্ধধর্ম্মালোচনা একটা বিড়ম্বনা মাত্র। এখানে ইহা একটা লৌকিক আচার মাত্র। অতএব নগরীর কোলাহল হইতে দূরে অপসৃত হইয়া শান্তিপূর্ণ নির্জ্জন বনে আমি তপস্যা করিব। আমাকে নির্ব্বাসিত করুন, আমি আপনার বারাণসী-রাজ্যের স্বাধীনতাহরণে চেষ্টা করিব, এ কথা মনে করিবার আর কোন কারণই থাকিবে না। আপনি সুখস্বচ্ছন্দে পণ্ডিতমণ্ডলী লইয়া রাজ্য ভোগ করুন। আপনার রাজ্য বিধ্বস্ত করিবার ইচ্ছা আমার হৃদয়ে মোটেই উদিত হয় নাই। জ্ঞানী বৌদ্ধসন্ন্যাসীরা রাজনীতিক আন্দোলনে যোগদান করেন না। যোগদান করা উচিতও নয়। কারণ, ইহা গৃহীর ধর্ম্ম—ত্যাগীর ধর্ম্ম নয় ত্যাগীর কর্ম্ম নয়। যে সন্ন্যাসী রাজনীতিক আন্দোলনে যোগ দেয়, রাজনীতি চর্চ্চায় মহা আমোদ অনুভব করে, এবং রাজবিদ্রোহের পক্ষপাতী হয়, সে সন্ন্যাসীই হউক, বা গৃহীই হউক না কেন, সে মহাপাপী। তাদৃশ লোককে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করাই বুদ্ধিমান্ রাজার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। না করিলে রাজাকে বিপন্ন হইতে হয়। ইহা প্রাচীন ভারতীয় রাজনীতিরই কথা। আমাকে যদি রাজবিদ্রোহকারিণী বলিয়া মনে করেন, তাবে আমাকে বিদায় দিন। আমি পিতৃবাক্য পালনার্থ বনে গমন করিতেছি।" এই বলিয়া রাজনন্দিনী মালিনী রাজবাটী

হইতে প্রস্থানোদ্যতা হইলে মহারাজ কৃকী অশ্রুপূর্ণ-নয়নে গদগদকণ্ঠে বলিলেন, "মা, তুমি যাইও না। মা তুমি আমার কন্যা হইলেও আমার গুরুস্বরূপা। আমার গুরু হইবার জন্য আমার কন্যারূপে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছ। তুমি ঈশ্বরপ্রেরিত। তুমি এই সপ্তাহকালমধ্যে আমাদিগকে অমূল্য ধর্ম্মোপদেশ দিয়া আমাদের হৃদয়ে যে উজ্জ্বলতম জ্ঞানালোক প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিয়াছ, তাহার প্রভায় আমা-দের হৃদয়ের অজ্ঞানান্ধকার বিনষ্ট হইয়াছে। আমি, তোমার মাতা, তোমার ভ্রাতাভগিনীরা, রাজবাটীর অন্যান্য সমস্ত লোক, রাজসৈন্য, দশসহস্র নগরবাসী, এমন কি, বেদবেদাঙ্গ-পারদর্শী মহামান্য রাজসভাসদ্ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ পর্য্যন্ত আমরা সক-লেই তোমার নিকটে ঋণী হইয়াছি। তুমি কাশী হইতে অন্যত্র কুত্রাপি চলিয়া গেলে আমরা তোমার নিকটে এই ঋণ পরিশোধ করিব কি প্রকারে? তুমি আমাদের সকলের ধর্ম্মগুরু, নেত্রী, মাতৃস্বরূপা। তুমি তোমার পুত্রকন্যাগণকে ছাড়িয়া কিরূপে যাইবে? তুমি আমাদিগকে বিশুদ্ধ নিষ্কণ্টক ধর্ম্ম-পথ দেখাইয়া দিয়াছ। তুমি এ অবস্থায় আমা-দিগকে ত্যাগ করিলে আমরা স্রোতস্বতী নদীতে কর্ণধারবিহীন নৌকারোহিগণের ন্যায় বিষম সঙ্কটে পড়িব। আমি তোমার বৃদ্ধ পিতা হইলেও এক্ষণে তোমার শিশুপুত্রস্বরূপ। সবেমাত্র জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হইয়াছি। এক্ষণে আমরা তোমার পর্য্যবেক্ষণাধীন না থাকিলে এ আলোক নিভিয়া যাইতে পারে। তোমার আরো অনেক ব্যাখ্যাদি দ্বারা এই আলো-কটি ক্রমে ক্রমে যাহাতে বর্দ্ধিত হয়, উজ্জ্বলতম হয়, তদ্বিষয়ে তুমি সাহায্য না করিলে আমাদের গত্যন্তর নাই। আমি তোমাকে বলিতেছি, তুমি আমা-দিগকে ত্যাগ করিয়া যাইও না। পিতৃবাক্য পালন করা তোমার ন্যায় ধার্ম্মিক কন্যার অবশ্য পালনীয় কর্ম্ম। আমি যাইতে নিষেধ করিতেছি। মা, তুমি যাইতে পাবে না। তুমি আমার কথা রাখ। আমার সম্মান রক্ষা কর। তুমি যদি কোলাহল-পূর্ণ নগরীতে থাকিতে না চাও, তাহা হইলে কাশী নগরীর প্রান্তভাগে নির্জ্জন শান্তিপূর্ণ উপনগরে সারনাথ নামক স্থানে বৌদ্ধতীর্থক্ষেত্রে বাস করিয়া নরনারীগণের কল্যাণ সাধিত কর। বনে গেলে কি হবে মা? বাঘ ভাল্লুকেরা কি ধর্ম্ম কথা শুনে? বনে গিয়া তপস্যা করিলে কেবলমাত্র একলা তোমার নিজেরই ধর্ম্মজীবনের যোগজীবনের উন্নতি সাধিত হইবে। কিন্তু ঐখানে বাস করিলে তোমারও ভাল হইবে এবং লক্ষ লক্ষ নরনারীরও মঙ্গল হইবে। নিবিড় বনে বাস করিলে ত্রিতাপদগ্ধ নরনারীর কি উপকার হইবে? তাহাদের যাহাতে ত্রিতাপের শান্তি হয়, তোমার তাহাই কর্ত্তব্য। তোমার অমূল্য ধর্ম্মোপদেশে তাহাদের ত্রিতাপের শান্তি হইবে। নরনারীগণের উপকারার্থ ভগবান বুদ্ধদেব স্বয়ং নগর হইতে নগরান্তরে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে অক্লান্তভাবে অনবরত উপদেশ দিতে দিতে বিচরণ করিতেন। তিনি যদি সমস্ত জীবন নিবিড় অরণ্যানীমধ্যে অতিবাহিত করিতেন, তাহা হইলে এত অসংখ্য নরনারী কি পরিত্রাণ পাইত? কখনই না। তিনি ঐরূপ করিলে ভারতের এত উপকার হইত না। ভারতের সভ্যতার এত খ্যাতি বাড়িত না। এতদিনে ভারত দস্যুভূমিতে পরিণত হইত। ভারত শ্মশানে পরিবর্ত্তিত হইত, চিতাগ্নিতপ্ত শ্মশানে শৃগাল কুক্কুর সকল যেমন মৃতদেহমাংস ভক্ষণ করিয়া বীভৎস কাণ্ডের অভিনয় করে, তদ্রূপ পশুমাংসলোলুপ যাজ্ঞিকগণ হোমাগ্নিতপ্ত যজ্ঞক্ষেত্রে পশুকুলের ধ্বংস সাধন করিয়া পশুর রক্তনদীর স্রোতে ভারতবর্ষ এতদিনে প্লাবিত করিয়া দিত। ভারতে পশুকুলের প্রলয় সাধন হইত।"

ক্রমশঃ।

আদর্শ বা দাদা ঠাকুর।

প্রথম অঙ্ক।

তৃতীয় দৃশ্য।

কাল—প্রহরাধিক প্রভাত। স্থান—জমীদারের কাছারী।

(তাকিয়া ঠেসান দিয়া জমিদার ধনদাস রায় অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় আসীন। দক্ষিণ হস্তে একখানি পত্র পাঠ করিতেছিলেন। বাম-হস্তে আলবোলার নল টানিতেছিলেন। সম্মুখে জনৈক কর্ম্মচারী। কিয়দ্দূরে হরিচরণ ও রহিমদ্দী দণ্ডায়মান।)

ধন। এত বড় আস্পর্দ্ধা!—এই দু'ব্যাটাকে আমি ভিটেছাড়া করব,—জাহান্নামে দেব—তবে আমার নাম ধনদাস রায়। আমার নামে বাঘে গরুতে এক ঘাটে

জল খায়। আমার সঙ্গে বদ্‌মায়েসী! মার তো ব্যাটাকে পঞ্চাশ জুতো। দেখি কোন্ দাদাঠাকুর—কোন্ বাপ্ তোকে রক্ষা করে!

হরি। কর্ত্তা, আপনি গরীবের মা বাপ্। আপনার পায়ে পড়ি, আমায় ছেড়ে দিন। আমার ছেলে বাঁচবে না; কাল সন্ধ্যাবেলা আমায় ধরে নিয়ে এসেছে, আজও বাড়ী যাইনি। আমার বাছা বুঝি আর বাঁচবে না। কর্ত্তা আপনার পায়ে পড়ি, আমায় একবার ছেড়ে দিন, আমি সত্যি বলছি, একটু দেখেই আবার আসব। একবার ছেড়ে দিন। আপনার পায়ে পড়ি। (পদ ধারণোদ্যত)

বরকন্দাজ। দাঁড়া এখানে। (ধাক্কা মারিল)

ধন। কেন—এখন ডাক তোর দাদাঠাকুরকে।

হরি। একটু জল খাবো। কর্ত্তাবাবু, আমরা আপনার ছাওয়াল, মরে যাবো কর্ত্তাবাবু। তেষ্টায় ছাতি ফেটে গেল; একটু জল খাবো।

ধন। জন্মের মত খাওয়াচ্ছি। রোস। ব্যাটা জমীদারীতে এসেছেন কিনা! (রহিমদ্দীর প্রতি) এই রহিম, বল্ সাক্ষ্য দিবি কিনা?

রহিম। এজ্ঞে পাপ হবে। মিথ্যে সাক্ষী দিতে পারবো না।

ধন। এঃ ব্যাটা কি ধর্ম্মপুত্তর যুধিষ্ঠির রে। পাপ হবে! আমরা মিথ্যা সাক্ষী দিই কি করে?

রহিম। এজ্ঞে আপনাগোর বড় লোকের সয়; আমাগোর সয়না।

ধন। সাক্ষী দিবি না?

রহিম। খোদা কসম। মাপ করুন।

ধন। পারবি না?

রহিম। কিছুতেই না।

ধন। এ সব সেই দাদাঠাকুর ব্যাটা শিখিয়েছে। ব্যাটা ভারী পাজী, ভারী বজ্জাৎ।

রহিম। আহা কর্ত্তা মশাই, দাদাঠাকুরকে কিছু বলো না। দাদাঠাকুর গরীবের মা বাপ।

ধন। র'সো সব ব্যাটাকেই মজা দেখাচ্ছি। আগেই এই দাদাঠাকুর এই বজ্জাত ব্যাটাকে জাহান্নামে দেব।

রহিম। কর্ত্তাবাবু, দাদাঠাকুরকে কিছু বলো না। তার কুচ্ছো শুনে আমার চ'কের কোণে পাণি আস্‌চে। আহা এমন দাদাঠাকুর!

ধন। চোপ্ রও। এই দাদাঠাকুর ব্যাটার নাম শুনলেই আমার মাথা খারাপ হ'য়ে উঠে। দেশের জমীদার আমি, আর সব ব্যাটারা গুণ গাইবে দাদাঠাকুরের।

রহিম। তাঁর গুণ গাবো না তো কার গুণ গাবো?

ধন। তবেরে ব্যাটা পাজী! আমার মুখের ওপর এত বড় কথা! র'সো মজাটা দেখাচ্ছি। বল্ সাক্ষী দিবি কিনা?

রহিম। মাপ করুন।

ধন। টাকা পাবি।

রহিম। কর্ত্তা মশাই, আমরা গরীব মানুষ; গতর খাটিয়ে খাই। যে রকম করেই হোক্ দিন চলে যায়। যতদিন দুনিয়ায় আছি, দুনিয়ার মালিক যেন এই হালেই রাখে। এই দোয়া করি। আর বেশি কিছুই চাইনে। আপনি বড় লোক আছেন, থাকুন। আমি ধন-দৌলত চাইনে। টাকা ভালো না; বেশী টাকা হলে তার গরম বরদাস্ত করতে পারব না। যদি জানও যায় তবু মিথ্যে সাক্ষী দিতে পারবো না। আরো দাদাঠাকুরের বিপক্ষে! ইয়া আল্লা!

ধন। পারবিনে? তবে দ্যাখ্, জুতিয়ে চামড়া খসিয়ে ফেলব।

রহিম। আপনি মনিব, যা খুসী তাই কত্তে পারো। মিথ্যা সাক্ষী দিবই না।

ধন। এই কে আছো? এই ব্যাটাকে কয়েদ করে রাখবে, আর পঁচিশ জুতো লাগাবে।

রহিম। সেও বি আচ্ছা। তবু মিথ্যে সাক্ষী দিতে পারবো না। খোদার কাছে তো সাফ্ থাকবো।

ধন। আচ্ছা দেখি খোদা রক্ষা করে কিনা!

রহিম। আচ্ছা দেখো।

ধন। (হরিচরণের প্রতি) হরে, বল জঙ্গল সাফ্ করে দিবি কিনা? আর চাঁদার টাকা দিবি কিনা?

হরি। উঃ তেষ্টায় ছাতি ফেটে গেল!

ধন। আঃ যা জিজ্ঞেস করি তার উত্তর দে।

হরি। ছেলের ব্যামো ভালো হোক। দুই বাবা-ব্যাটায় এসে গতর খাটিয়ে আপনার কাজ করে দেব। আমি গরীব, ছা-পোষা মানুষ। চাঁদার টাকা এখন দেব কোত্থেকে?

ধন। আবার বজ্জাতী! রাখ্, তোর বদমায়েসী বার করে দিচ্ছি।

হরি। ঠাকুর জানেন, কোনো বজ্জাতী করি নাই। বাবু খামকা আমার ছেলেকে আমায় দেখতে দিলেন না। আমার তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, একটু জল খেতে দিলেন না। আপনার কি মানুষের প্রাণ? আবার দাদাঠাকুরকে মন্দ বলচেন? সে আর আপনি ঢের তফাৎ।

ধন। তবে রে পাজী, আমার মুখের উপর এত বড় কথা! এই বরকন্দাজ, মার্‌তো ব্যাটাকে জুতো, এখনি মার।

(বরকন্দাজ পাদুকা প্রহার করিতে অগ্রসর হইলে, দাদাঠাকুর প্রবেশ করিয়া ধীরভাবে কহিলেন)—

দাদা। খবর্দ্দার! (বন্দুক স্তব্ধ হইল) রায় মশাই; একি? এই বৃদ্ধ গরীব বেচারীর উপর অত্যাচার কেন? আমি বুক পেতে দিচ্চি, এ আঘাত আমার বুকে করুন।

ধন। হাঁসিয়ারি দাদাঠাকুর, তুমি কোনো কথা কয়োনা। জানো এ জমীদারের কাছারী? বড় শক্ত যায়গা, এখানে তোমার কোনো বুজরুকী খাট্‌বে না।

দাদা। সব যায়গাই সেই সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের। সবাই আমরা তাঁর দাস। তাঁর শাসন সবারি মান্‌তে হবে।

ধন। উঃ উনি দেখ্‌ছি ভারী বেড়াল-তপস্বী! তুমি বের হও এখান থেকে! তোমায় দেখ্‌লে আমার মাথা গরম হয়ে ওঠে। তোমার সঙ্গে যে কথা বলি, এই ঢের। ভারী আস্পর্দ্ধা! ভারী আস্পর্দ্ধা! ছোট লোক, যত সব ছোট লোকের সঙ্গে মিশে এখানে এসেছেন বুজরুকী কর্ত্তে। জানোনা বড় লোকের মেজাজ? টাকার জোরে যা' ইচ্ছে তাই কর্ত্তে পারি।

দাদা। রায় মশাই, ঐশ্বর্য্যের এত গর্ব্ব! আর সব ছোটো লোক, আর তুমি বড় লোক। কিন্তু জেনো—

গীত।

হবে নামতে ধূলার তলে।
পথে ঘাটে, রৌদ্রে মাঠে,
সবাই যেথায় চলে।
অহঙ্কারে উচ্চাসনে, বসে রসে আপন মনে,
ভাবছো বুঝি তোমার মত নাইকো ত্রিভুবনে,
(ওতে) নিজেরেই যে ছোটো করে তুলছ প্রতিক্ষণে!
(যিনি) রাজার রাজা, তিনিই বেড়ান
ছোটোবড় সবার দলে।
তাঁরেই শুধু মানী জানি, সবারে যে করবে মানী,
সে নহে মান, এ বেইমানী-ফেরা মানের খোঁজে,
সবার চেয়ে কাঙাল সে যে, সে কিগো তা বোঝে?
মানের গোড়ায় না দিলে ছাই
মান কি মেলে কথার ছলে?

ধন। আরে রাখো, তোমায় আর বক্তিমে কর্ত্তে হবে না। তোমার গুণের কথা আমার সব জানা আছে। তুমি এই ছোটলোক গুলোকে নিয়ে একটা দল পাকাচ্ছ। দেশের বড় লোক আমি। আর সব ব্যাটারা পেছনে হাঁটবে ওঁর। কি তামাসা! দাঁড়াও, তোমাকেও আচ্ছা রকম জব্দ করব। যাও এখান থেকে—ভালোয় ভালোয় বলছি।

দাদা। হরিচরণ আর রহিমদ্দিকে ছেড়ে দিন।

ধন। তোমার তো বড় সাহস! আমার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে এখনো জেদ্ কর্‌চ? যাও-বলছি।

দাদা। ওদের ছেড়ে দিন।

ধন। এঃ—তোমার কথায়?

দাদা। ধর্ম্মের আজ্ঞায়।

ধন। যাও এখান থেকে, ওদের কিছুতেই ছাড়বো না। কিছুতেই না।

দাদা। আমিও না নিয়ে যাবো না।

ধন। কি, আমার বাড়ীতে এসে আমার সাম্‌নে চোখ্ রাঙাবে?

দাদা। অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো মানব ধর্ম্ম।

ধন। কি, আমার অন্যায়? বেয়াকুব, বেল্লিক, পাজী।

দাদা। আমাকে আপনার যা-খুসী তাই বলুন, কিন্তু ওদের ছেড়ে দিন। ভেবে দেখুন, এ ঐশ্বর্য্য কি আপনার চিরদিন থাকবে? একি পরলোকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবেন? আজ এই অসহায় দরিদ্রের বুকে যে আঘাত কচ্ছেন, এ আঘাত যে তাঁরি বুকে লেগেছে! তিনি যে দীনের ভগবান! এ ক্রন্দন তাঁরি কাছে পৌচেছে! একদিন তার ন্যায়দণ্ডের তলে মাথা নত কর্‌তেই হবে। সেই বিশ্বতশ্চক্ষু সবি দেখ্‌তে পাচ্ছেন। তাঁর কাছে সব সমান। তিনি ধনী কি দীন দেখে বিচার করেন না। এখনো ধর্ম্ম আছে, এখনো চন্দ্রসূর্য্য উদিত হচ্ছে, সাবধান! সাবধান!

গীত।

সাবধান! সাবধান! সাবধান!
আসিছে নামিয়া, ন্যায়ের দণ্ড দীপ্ত রুদ্র মূর্ত্তিমান।
ঐ শোনো তাঁর গরজে কম্পু অম্বুধি যথা উছলে,
প্রলয়-ঝঞ্ঝা ইরম্মদে মৃত্যু-ভীষণ কল্লোলে,
হুঙ্কার শুনি গভীর মন্দ্র, কাঁপিছে তারকা সূর্য্যচন্দ্র,
বিদরে আকাশ, স্তব্ধ বাতাস,
শিহরি উঠিছে জগৎ-প্রাণ।
ভ্রূকুটী-কুটিল রক্ত-নেত্রে চিত্রভানু উজ্জ্বলে,
উঠিছে কিরীট গরিমা-দীপ্ত ভেদিয়া সূর্য্যমণ্ডলে।
অগণিত করে ঝলসে কৃপাণ, তপ্তরক্ত করিয়া পান,
বলদর্পিত চরণাঘাতে ত্রিভুবন ভীত কম্পমান,
ত্রিভুবন জুড়ি বিরাট দেহ
ভেবেছ কি আর পালাইবে কেহ?
এখনো চরণে শরণ লহ নতুবা নাহিরে পরিত্রাণ।

ধন। পাজী, যা ইচ্ছে তাই বলছ? এই দারোয়ান,

ব্যাটাকে ঘাড় ধরে' বের করে দাও। (দারোয়ানের প্রতি) ফিরে ব্যাটা দাঁড়িয়ে রৈলি যে? গে'র করে দে।

দারোয়ান। আজ্ঞে মাপ করুন।

ধন। কি আমার হুকুম অগ্রাহ্য! তুমি আজ হ'তে বরখাস্ত।

দারোয়ান। যে আজ্ঞে; প্রণাম। (প্রস্থান)

ধন। (বরকন্দাজের প্রতি) ওরে তুই মার্, মার্তো হরেকে পঞ্চাশ জুতো; আখ্ ব্যাটা (দাদাঠাকুরের প্রতি) পাজী দাঁড়িয়ে দেখ্।

দাদা। রায় মশাই এখনো বল্‌ছি, ক্ষান্ত হউন। দেখবেন যেন আপনার কোনো অপ্রিয় কার্য্য আমার কর্‌তে না হয়। নিশ্চয় জান্‌বেন, অন্যায় কর্‌তে দেবই না।

ধন। মার জুতো, মার্ দু' ব্যাটাকেই মার্।

(বরকন্দাজ অগ্রসর হইল)

দাদা। খবর্দ্দার! থামো। না, এর প্রতীকার কর্ত্তেই হোল। (দাদাঠাকুর সাঙ্কেতিক শব্দ করিলেন, সেবাব্রত প্রভৃতি যুবকগণ প্রবেশ করিল। দাদাঠাকুর, সেবাব্রতের দিকে চাহিয়া কহিলেন) এদের নিয়ে এস।

সেবাব্রত প্রভৃতি হরিচরণ ও রহিমদ্দিকে লইয়া দাদাঠকুরের সহিত চলিয়া গেলেন।

ধন। এই, এই, কে আছো ধর্ ধর্ ধর্। একি তোরা সব সংঙের মত দাঁড়িয়ে রৈলি? কেউ কিছু করতে পার্‌লি নে? আচ্ছা যাক্—এর প্রতিশোধ যদি না লই তো আমার নাম ধনদাস রায় নয়। (কর্ম্মচারীর প্রতি) এই শোনো—(কর্ম্মচারী শুনিতে পাইল না) ওকি কাপ্‌ছ যে! এই শোনো।

কর্ম্ম। এ—এ—এ— হুজুর।

ধন। এখনি ওর নামে এক মোকদ্দমা সাজাও। ওকে আমি পথের ভিখিরী করে ছাড়্‌ব।

কর্ম্ম। যে আজ্ঞে।

ধন। রো'সো পাজি। (প্রস্থান)

কর্ম্ম। সাবাস্! একটা মানুষ বটে এই দাদাঠাকুর।

সকলের প্রস্থান।

বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত

গীতা-রহস্য।

সপ্তম প্রকরণ।

কাপিলসাংখ্যশাস্ত্র কিংবা ক্ষরাক্ষরবিচার।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদিত।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শরীর ও শরীরের অধিস্বামী কিংবা অধিষ্ঠাতা—ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ—ইহাদের বিচারের সঙ্গে সঙ্গেই দৃশ্য জগৎ ও তাহার মূলতত্ত্ব—ক্ষর ও অক্ষর—ইহাদের বিচার করিয়া পরে আত্মার স্বরূপ নির্ণয় করা আবশ্যক হয়, ইহা পূর্ব্ব প্রকরণে কথিত হইয়াছে। যোগ-পদ্ধতিতে এই ক্ষরাক্ষর জগতের বিচার করিবার তিন শাস্ত্র আছে। প্রথম ন্যায়-শাস্ত্র ও দ্বিতীয় কপিলসাংখ্য; কিন্তু এই দুই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত অপূর্ণ এইরূপ স্থির করিয়া বেদান্তশাস্ত্র ব্রহ্মস্বরূপের নির্ণয় তৃতীয় প্রকারে করিয়াছেন। তাই বেদান্তের উপপত্তি দেখিবার পূর্ব্বে, ন্যায় ও সাংখ্যের কল্পনাটা কি, তাহা আমাদের দেখা আবশ্যক। বাদরায়ণশাস্ত্রের বেদান্তসূত্রে এই পদ্ধতিই স্বীকার করিয়া দ্বিতীয় অধ্যায়ে ন্যায় ও সাংখ্যের মতকে খণ্ডন করা হইয়াছে। এই সমগ্র প্রকরণ এখানে উদ্ধৃত করিতে না পারিলেও ভগবদ্‌গীতার রহস্য বুঝাইবার জন্য যতটা আবশ্যক তাহার বিবরণ এই প্রকরণে ও পূর্ব্ব প্রকরণে আমি দিয়াছি। নৈয়ায়িক সিদ্ধান্ত অপেক্ষা সাংখ্য-সিদ্ধান্তের অধিক গুরুত্ব আছে। কারণ, বাদরায়ণ আচার্য্যের (বেসু, ২, ১, ১২ ও ২, ২, ১৭) উক্তি অনুসারে কোন শিষ্ট ও প্রমুখ বেদান্তী কাণাদ-ন্যায়মত স্বীকার না করিলেও কপিলসাংখ্যশাস্ত্রের অনেক সিদ্ধান্ত মনু-আদি স্মৃতি-গ্রন্থাদিতে ও গীতা-তেও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাই উহাদের বিবরণ প্রথমে পাঠকের জানা আবশ্যক। তথাপি আরম্ভেই এই-টুকু বলা আবশ্যক যে, সাংখ্যশাস্ত্রের অনেক কল্পনা বেদান্তে পাওয়া গেলেও সাংখ্য ও বেদান্তের শেষ-সিদ্ধান্ত অত্যন্ত ভিন্ন, ইহা পাঠক যেন বিস্মৃত না হন। বেদান্ত ও সাংখ্যের এইরূপ যে সাধারণ কল্পনা তাহা প্রথমে কে আবিষ্কার করে—বেদান্ত না সাংখ্য—এইরূপ এক প্রশ্নও বাহির হইয়াছে। কিন্তু এই গ্রন্থে, এত গভীর বিচারের মধ্যে প্রবেশ করা যাইতে পারে না। উপনিষৎ (বেদান্ত) ও সাংখ্য ইহাদের অভিবৃদ্ধি দুই বৈমাত্র ভায়ের মত এক সঙ্গেই হওয়ায়, উপনিষদের যে সকল মত সাংখ্য মতের অনুরূপ তাহা উপনিষৎকারেরা স্বতন্ত্র অন্বেষণ করিয়া বাহির করিয়াছেন, কিংবা তন্মধ্যে কোন সাংখ্যশাস্ত্র হইতে লইয়া সেই মত-গুলিকে বেদান্তশাস্ত্রের অনুকূল স্বরূপ প্রদান করি-

য়াছেন, অথবা কাপিল-আচার্য্য আপন মত-অনুসারে প্রাচীন উপনিষদের সিদ্ধান্তগুলির সংস্কার করিয়া সাংখ্যশাস্ত্র রচনা করিয়াছেন—এইরূপ তিন পক্ষের মত এই ক্ষেত্রে সম্ভবপর। কিন্তু উপনিষৎ ও সাংখ্য উভয়ই প্রাচীন হইলেও তাহার মধ্যে উপনিষৎ অধিক প্রাচীন (শ্রৌত),—ইহার প্রতি লক্ষ্য করিলে, শেষের অনুমানটি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিশ্বাস্য বলিয়া মনে হয়। সে যাহাই হোক্, প্রথমে ন্যায় ও সাংখ্যের সিদ্ধান্তগুলির সহিত আমাদের পরিচয় হইলে, বেদ বেদান্তের বিশেষত গীতান্তর্গত বেদান্তের—তত্ত্বসকল শীঘ্রই আমাদের উপলব্ধি হইবে; এই জন্য, ক্ষরাক্ষর জগতের রচনা সম্বন্ধে এই দুই স্মার্ত্তশাস্ত্রের কি মত, প্রথমে তাহার বিচার করিব।

কোনো বিবক্ষিত কিংবা গৃহীত বিষয় হইতে তর্কের দ্বারা পরে কোন্ কোন্ সিদ্ধান্ত কেমন করিয়া বাহির করিতে হইবে, এবং এই সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে কোন্‌টি সত্য ও কোন্‌টি ভ্রান্ত, ইহাই ন্যায়শাস্ত্রের বিষয়—এইরূপ কেহ কেহ মনে করেন, কিন্তু তাহা ঠিক্ নহে। অনুমানাদি প্রমাণখণ্ড, ইহা ন্যায় শাস্ত্রের এক ভাগ। কিন্তু ইহা মুখ্য ভাগ নহে; প্রমাণ ব্যতীত জগতের অন্তর্ভূত অনেক বস্তুর, অর্থাৎ প্রমেয় পদার্থের, শ্রেণীবন্ধন বা বর্গীকরণ করিয়া, নিম্ন বর্গ হইতে উচ্চতর বর্গে আরোহণ করিতে করিতে, সৃষ্টির অন্তর্গত সমস্ত পদার্থের মূল ভূতবর্গ কিংবা পদার্থ কত, তাহার গুণধর্ম্ম কি, তাহা হইতে পরে অন্য পদার্থাদির উৎপত্তি কেমন করিয়া হইল এবং এই বিষয় কি প্রকারে সিদ্ধ হইতে পারে, ইত্যাদি সমস্ত প্রশ্ন ন্যায়শাস্ত্রে বিচার করা হইয়া থাকে। অধিক কি, এই জন্যই এই শাস্ত্র রচিত হইয়াছে, শুধু অনুমানখণ্ডের বিচার করিবার জন্য নহে, ইহা বলিলেও চলে। কণাদকৃত ন্যায়শাস্ত্রের আরম্ভভাগ ও পরবর্ত্তী রচনাও এইরূপ। কণাদের অনুযায়ীদিগকে কাণাদ বলা যায়। ইঁহাদের মত এই যে, পরমাণুই জগতের মূল কারণ। কণাদের পরমাণুর ব্যাখ্যা ও পাশ্চাত্য আধিভৌতিক শাস্ত্রকারদিগের পরমাণুর ব্যাখ্যা একই প্রকার। পদার্থ বিভাগ করিতে করিতে শেষে যখন আর বিভাগ হয় না তখন তাহাকে (পরম-অণু) পরমাণু বলে। এই পরমাণু যেমন-যেমন একত্র হয়, তেমনি-তেমনি তাহার মধ্যেই সংযোগের দ্বারা নূতন নূতন গুণ উৎপন্ন হইয়া ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ হইয়া দাঁড়ায়। মনের ও শরীরেরও পরমাণু আছে এবং তাহা একত্র হইলেই চৈতন্য হয়। পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু ইহাদের পরমাণু স্বভাবতই পৃথক্ পৃথক্ কিংবা ভিন্ন ভিন্ন। পৃথিবীর মূল পরমাণুতে চার প্রকার গুণ (রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ), জলের পরমাণুতে তিন গুণ, তেজের পরমাণুতে দুই গুণ, এবং বায়ুর পরমাণুতে একটি গুণ আছে। এইরূপ সমস্ত জগৎ প্রথম হইতেই সূক্ষ্ম ও নিত্য পরমাণুর দ্বারা পরিপূর্ণ। পরমাণু ব্যতীত জগতের অন্য কোন মূল কারণ নাই। সূক্ষ্ম ও নিত্য পরমাণুগণের পরস্পর সংযোগ যখন আরম্ভ হয়, তখন সৃষ্টির অন্তর্গত ব্যক্ত পদার্থ সকল রচিত হইতে থাকে। ব্যক্ত সৃষ্টির উৎপত্তি সম্বন্ধে নৈয়ায়িক-প্রতিপাদিত এই কল্পনার পারিভাষিক সংজ্ঞা—'আরম্ভ-বাদ', এবং কোনো নৈয়ায়িক ইহা ছাড়াইয়া কখন যান না। এক জনের সম্বন্ধে এইরূপ একটা গল্প আছে যে, মরণসময়ে ঈশ্বরের নাম লইবার সময় তাহার নিকট আত্মীয়েরা, "পীলবঃ! পীলবঃ! পীলবঃ!" পরমাণু! পরমাণু! পরমাণু! এই কথা তাহাকে বলিবার পর, তাহার মুখ দিয়াও ঐ কথা বাহির হইল! তথাপি অন্য কোন কোন নৈয়ায়িক পরমাণুর সংযোগ হইবার পক্ষে ঈশ্বর নিমিত্তকারণ এইরূপ মানিয়া, সৃষ্টির কারণপরম্পরার শৃঙ্খলটি পূরা করিয়া লন; এবং ইঁহাদিগকে "সেশ্বরনৈয়ায়িক" বলা হয়। বেদান্তসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদে, এই পরমাণুবাদের (২, ২, ১১-১৭) খণ্ডন এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গেই পরে ঈশ্বর কেবল নিমিত্ত কারণ এই মতেরও খণ্ডন করা হইয়াছে।

উপরি-উক্ত পরমাণুবাদ পাঠ করিয়া, রসায়নশাস্ত্রজ্ঞ ডাল্টন নামক পণ্ডিত-প্রতিপাদিত পরমাণুবাদ, ইংরেজি শিক্ষিত পাঠক স্মরণ না করিয়া থাকিতে পারেন না। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে ডাল্টনের পরমাণুবাদকে ডার্বিন নামক প্রসিদ্ধ সৃষ্টিশাস্ত্রজ্ঞের উৎক্রান্তিবাদ যেরূপ এক্ষণে পশ্চাতে ফেলিয়াছে, সেইরূপই প্রাচীনকালে হিন্দুস্থানেও সাংখ্যমত,

কণাদের মতকে পশ্চাতে নিঃক্ষেপ করিয়াছে। মূল পরমাণুতে গতি কিরূপে আসিল ইহা কাণাদেরা শুধু যে বলিতে পারে না তাহা নহে, বৃক্ষ পশু মনুষ্য এইরূপ সচেতন প্রাণীদিগের পর-পর উচ্চতর পদবী কি করিয়া হইল ও অচেতনে সচেতনত্ব কি করিয়া আসিল প্রভৃতি এইরূপ আরও অনেক বিষয় এই মতের দ্বারা ঠিক ব্যাখ্যা হয় না। পাশ্চাত্য দেশে ১৯ শতকে লামার্ক ও ডার্বিন এবং আমাদের দেশে কপিল এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। একই মূলপদার্থের গুণসমূহের বিকাশ হইয়া জগতের সমস্ত রচনা হইয়াছে, এই দুই মতের ইহাই তাৎপর্য্য; এবং সেইজন্য পূর্ব্বে হিন্দুস্থানে এবং এক্ষণে পাশ্চাত্যদেশে পরমাণুবাদ পশ্চাতে পড়িয়া গিয়াছে। সেইরূপ আবার, পরমাণু অবিভাজ্য নহে, একথাও এক্ষণে আধুনিক পদার্থশাস্ত্রজ্ঞেরা সিদ্ধ করিয়াছেন। আজকাল, যেরূপ সৃষ্টির অন্তর্গত অনেক পদার্থের পৃথক্করণ ও পরীক্ষণ করিয়া অনেক সৃষ্টিশাস্ত্রের প্রমাণ-অনুসারে পরমাণুবাদ কিংবা উৎক্রান্তিবাদ সিদ্ধ করা হইয়া থাকে, পূর্ব্বে সেরূপ অবস্থা ছিল না। সৃষ্টির অন্তর্গত পদার্থের উপর ভিন্ন ভিন্ন নূতন নূতন পরীক্ষা প্রয়োগ করিয়া দেখা, কিংবা তাহাদের অনেক প্রকারে পৃথক্করণ করিয়া তাহাদের মূলধর্ম্ম নির্দ্ধারণ করা, কিংবা সজীব জগতের পুরাতন নূতন অনেক প্রাণীদিগের শারীরিক অবয়ব সমূহের একত্র তুলনা করা, ইত্যাদি আধিভৌতিক শাস্ত্রের অর্ব্বাচীন যুক্তি কণাদের কিংবা কপিলের উপলব্ধ ছিল না। তাঁহাদের দৃষ্টির সম্মুখে সেই সময় যে সামগ্রী ছিল তাহা হইতেই তাঁহারা আপন সিদ্ধান্ত বাহির করিয়াছেন। তথাপি সৃষ্টির অভিবৃদ্ধি কিংবা সংগঠন কি করিয়া হইয়াছিল এই সম্বন্ধে সাংখ্য শাস্ত্রকারগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তের মধ্যে এবং অর্ব্বাচীন আধিভৌতিক শাস্ত্রের তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তের মধ্যে অধিক প্রভেদ নাই, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়। সৃষ্টিশাস্ত্রের জ্ঞান বৃদ্ধি হওয়াপ্রযুক্ত এই মতের আধিভৌতিক উপপত্তিতে এক্ষণে অধিক সঙ্গতি আছে এবং সেই জন্য আধিভৌতিক জ্ঞানের বৃদ্ধিতে মনুষ্যের ব্যবহারিক দৃষ্টিতে অনেক লাভ হইয়াছে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এক অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে পরে নানাবিধ ব্যক্ত সৃষ্টি কি করিয়া হইল এই সম্বন্ধে অর্ব্বাচীন আধিভৌতিক শাস্ত্রী, কপিল অপেক্ষা বেশী কিছুই বলিতে পারেন নাই,—ইহার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য কপিল সিদ্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গেই পরে যথাস্থানে আমি তুলনা করিবার অভিপ্রায়ে হেকেলের সিদ্ধান্তগুলির নির্দ্দেশ করিয়াছি। হেকেল এই সিদ্ধান্ত নূতন বাহির করেন নাই; ডার্বিন, স্পেনসর প্রভৃতি তৎপূর্ব্বের আধিভৌতিক গ্রন্থের প্রমাণ-অনুসারেই আপন আপন সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করিয়াছেন—এইরূপ তাঁহারা আপন গ্রন্থে স্পষ্ট লিখিয়াছেন। তথাপি এই সিদ্ধান্তগুলি একত্র জুড়িয়া তাহা হেকেলই প্রথমে সংক্ষেপে "বিশ্বের রহস্য" * এই নিজ গ্রন্থে সুবোধ রীতিতে বিবৃত করায়, সুবিধার জন্য হেকেলকেই আধিভৌতিক তত্ত্বজ্ঞদিগের প্রধান কল্পনা করিয়া তাঁহার মতেরই প্রাধান্য দিয়া এই প্রকরণে ও পরবর্ত্তী প্রকরণে উল্লেখ করিয়াছি। এই উল্লেখ-বাক্যগুলি যে একেবারেই বিচ্ছিন্ন, তাহা আর বলিতে হইবে না। কিন্তু এখানে ইহা অপেক্ষা এই সিদ্ধান্তের অধিক বিচার করা যাইতে পারে না। যাঁহারা এই সম্বন্ধে সবিস্তার জানিতে চাহেন তাঁহাদের স্পেনসর, ডার্বিন, হেকেল প্রভৃতির মূলগ্রন্থ অবলোকন করা আবশ্যক।

কাপিলসাংখ্যশাস্ত্রের বিচার করিবার পূর্ব্বে, 'সাংখ্য' এই শব্দের দুই ভিন্ন অর্থ আছে ইহা এখানে বলা আবশ্যক। প্রথম অর্থ কপিল-আচার্য্য প্রতিপাদিত সাংখ্যশাস্ত্র হওয়ায়, তাহাই এই প্রকরণে ও ভগবদগীতাতেও একবার (গী. ১৫, ১৬) প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু এই বিশিষ্ট অর্থ ব্যতীত সর্ব্বপ্রকারের তত্ত্বজ্ঞানেরও সাধারণত এই নামই দিবার রীতি থাকায়, উহার মধ্যে বেদান্তশাস্ত্রেরও সমাবেশ হয়। সাংখ্যনিষ্ঠা কিংবা সাংখ্যযোগ এই শব্দে, সাংখ্যশব্দের এই সাধারণ অর্থই বিবক্ষিত হইয়া থাকে; এবং পরে এই নিষ্ঠার অন্তর্গত জ্ঞানীপুরুষদিগকেও (গী. ২. ৩৯; ৩. ৩; ৫. ৪, ৫ ও ১৩, ১৪) 'সাংখ্য' এইরূপ ভগবদগীতাতেও যেখানে বলা হইয়াছে, সেই সেই স্থানে সাংখ্য অর্থাৎ

* The Riddle of the Universe by Earnest Hacckel এই গ্রন্থের R. P. A. Cheap reprint সংস্করণের আমি সর্ব্বত্র উপযোগ করিয়াছি।

কেবল কপিলসাংখ্যমার্গী এইরূপ অর্থ না হইয়া, আত্মানাত্মবিচারের দ্বারা সমস্ত কর্ম্মের সন্ন্যাস করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানেতেই যাহারা নিমগ্ন থাকে সেই বৈদান্তিককেও উহার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। 'সাংখ্য' এই শব্দ 'সংখ্যা' এই ধাতু হইতে বাহির হওয়া প্রযুক্ত তাহার প্রথম অর্থ 'গণনাকারী' এইরূপ হয়; এবং কপিলশাস্ত্রের মূলতত্ত্ব গণনায় পঞ্চবিংশতি হওয়াতেই তাহা 'গণনাকারী' এই অর্থে 'সাংখ্য' এই বিশিষ্ট নাম প্রাপ্ত হইয়াছে এবং তাহার পর 'সাংখ্য' অর্থাৎ সাধারণত সর্ব্বপ্রকারের তত্ত্বজ্ঞান এই ব্যাপক অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—এইরূপ শব্দশাস্ত্রজ্ঞদিগের মত। কপিলভিক্ষুকে 'সাংখ্য' বলিবার রীতি প্রথমে দাঁড়াইয়া গেলে, পরে বেদান্তী সন্ন্যাসীকেও ঐ নাম দেওয়া হইয়া থাকিবে এইরূপ মনে হয়। যাহাই হোক, সাংখ্য শব্দের এই অর্থভেদপ্রযুক্ত পাছে গোলযোগ হয় এইজন্য আমি এই প্রকরণের ইচ্ছা করিয়াই "কাপিলসাংখ্যশাস্ত্র" এই লম্বাটে নাম দিয়াছি। কণাদন্যায়শাস্ত্রের ন্যায় এই কাপিলসাংখ্যশাস্ত্রেরও সূত্র আছে। কিন্তু গৌড়পাদ কিম্বা শারীরকভাষ্যকার শ্রীশঙ্করাচার্য্য ইহাঁরা এই সকল সূত্র যেহেতু আপন গ্রন্থের প্রমাণ স্বরূপ বলিয়া গ্রহণ করেন নাই, অতএব ঐ সকল সূত্র প্রাচীন না হইতে পারে, এইরূপ অনেক বিদ্বান দিগের মত। ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকা তদপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া তাঁহারা মনে করেন। তাহার উপর শঙ্করাচার্য্যের গুরু গৌড়পাদের ভাষ্য থাকায়, খোদ্ শঙ্করভাষ্যেতেও এই কারিকা হইতেও অনেক কথা উদ্ধৃত হইয়াছে এবং খ্রীষ্টাব্দ ৫৭০ র পূর্ব্বে চিনীয় ভাষায় অনূদিত উক্ত গ্রন্থের ভাষান্তর অধুনা পাওয়া গিয়াছে। * 'ষষ্ঠিতন্ত্র' নামক ষাট প্রকরণের এক তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বিস্তৃত গ্রন্থের তাৎপর্য্য (কোন কোন প্রকরণ ছাড়িয়া দিয়া) ৭০ আর্য্যাশ্লোকে এই গ্রন্থে কথিত হইয়াছে, এইরূপ কৃষ্ণ কারিকার শেষভাগে বলিয়াছেন। ষষ্ঠিতন্ত্র গ্রন্থ এখন পাওয়া যায় না। তাই কারিকার আধারেই কাপিল সাংখ্যশাস্ত্রের মূল সিদ্ধান্তগুলি আমি এখানে আলোচনা করিয়াছি। মহাভারতের অনেক অধ্যায়ে সাংখ্যমতের অনেক সিদ্ধান্তের উল্লেখ আছে। কিন্তু তাহাতে প্রায়ই বৈদান্তিকমতের মিশাল থাকায় শুদ্ধ কাপিলসাংখ্যমতটি কি তাহা স্থির করিবার জন্য অন্য গ্রন্থ দেখা আবশ্যক হয়; এবং এই কার্য্যে সাংখ্যকারিকা অপেক্ষা অধিক প্রাচীন অন্য গ্রন্থ এক্ষণে পাওয়া যায় না। "সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ" (গী, ১০,২৬) সিদ্ধদিগের মধ্যে আমি কপিল মুনি—এইরূপ ভগবান গীতায় যে বলিয়াছেন তাহা হইতে কপিলের যোগ্যতা স্পষ্টই দেখা যায়। তথাপি কপিল ঋষি কোথায় ও কখন আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাহার ঠিকানা নাই। সনৎকুমার, সনক, সনন্দন, সনৎসুজাত, সন, সনাতন এবং কপিল—ব্রহ্মদেবের এই সাত মানসপুত্র; জন্মিবামাত্রই তাঁহাদের জ্ঞান হইয়াছিল এইরূপ শান্তিপাঠের একস্থানে বর্ণিত হইয়াছে (৩৪০. ৬৭); এবং আর এক স্থানে (সাং ২১৮) কপিলের শিষ্য আসুরি ও আসুরির শিষ্য পঞ্চশিখ (জনককে প্রদত্ত) সাংখ্যশাস্ত্রের উপদেশ দিয়াছিলেন। সেইরূপ আবার, শান্তিপর্ব্বে (৩০১, ১০৮, ১০৯) ভীষ্ম, এ কথাও বলিতেছেন যে, সাংখ্যেরা সৃষ্টির রচনা সম্বন্ধে যে জ্ঞান এক সময় প্রবর্ত্তিত করেন তাহাই "পুরাণে, ইতিহাসে, অর্থশাস্ত্র প্রভৃতি সর্ব্বস্থানে" দেখিতে পাওয়া যায়। অধিক কি, "জ্ঞানং চ লোকে যদি যদিহাস্তি কিঞ্চিৎ সাংখ্যাগতং তচ্চ মহন্মাত্মন্"—এই জগতের সমস্ত জ্ঞান সাংখ্যগণ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে—এরূপ বলিলেও চলে (সভা, শাং,৩০১,১০৯)। পাশ্চাত্য গ্রন্থকার অধুনা উৎক্রান্তিবাদের কিরূপ উপযোগ করিতেছেন, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিলে,—

* ঈশ্বরকৃষ্ণ সম্বন্ধে এক্ষণে বৌদ্ধগ্রন্থাদি হইতে অনেক বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। বৌদ্ধপণ্ডিত বসুবন্ধুর গুরু এই ঈশ্বরকৃষ্ণের সমকালীন প্রতিপক্ষ ছিলেন; এবং এই বসুবন্ধুর পরমার্থ কর্ত্তৃক (খৃষ্টাব্দ ৪৯৯-৫৬৯) চিনীয় ভাষায় লিখিত চরিত্র এক্ষণে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা হইতে ঈশ্বরকৃষ্ণের কাল প্রায় খৃষ্টাব্দ ৪৫০ হইবে, এইরূপ ডাক্তার টককসু স্থির করিয়াছেন। Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain & England. 1905 PP. 33-53. কিন্তু ডাক্তার ভিন্সেণ্ট স্মিথের মতে স্বয়ং বসুবন্ধুর কালও খৃষ্টাব্দ চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যে (প্রায় ২৮০-৩৬০) ধরা হইয়াছে। কারণ সেই গ্রন্থের ভাষান্তর খৃঃ ৪০৪এর মধ্যে চিনীয়ভাষায় হইয়াছে। বসুবন্ধুর কাল এইরূপ পিছাইয়া পড়ায় ঈশ্বরকৃষ্ণের কালও সেইরূপ প্রায় দুইশো বৎসর পশ্চাৎ অর্থাৎ খৃঃ ২৪০ ধরিতে হয়। Vincent Smith's Early History of India. 3d Ed. P. 328.

উৎক্রান্তিশাস্ত্রেরই অনুরূপ আমাদের প্রাচীন সাংখ্য-শাস্ত্রেরও ন্যূনাধিক অংশ সকলেই স্বীকার করিয়াছিলেন বলিয়া কিছুই আশ্চার্য্য মনে হয় না। গুরুত্বাকর্ষণ কিংবা জগৎরচনার উৎক্রান্তিতত্ত্ব * অথবা ব্রহ্মাদ্বৈক্য, এই রকমের উচ্চ কল্পনা শত শত বৎসরের পর কোন এক মহাত্মার মনে উদয় হইয়া থাকে। তাই, যে সময়ে যে-সাধারণ সিদ্ধান্ত কিংবা ব্যাপক তত্ত্ব প্রচলিত থাকে, তাহারই উপর ভিত্তিস্থাপন করিয়া নিজের তত্ত্ব-প্রতিপাদন করিবার রীতি সাধারণত সর্ব্বদেশের গ্রন্থেই দেখিতে পাওয়া যায়। (ক্রমশঃ)

বিবেকতত্ত্ব।

(শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যানিধি এম্, এ, বি এল্)

ইষ্টানিষ্টবাবোধিকা শক্তিহি বিবেকো নাম।

যে শক্তির প্রভাবে আমরা ইষ্টকে অনিষ্ট হইতে, হিতকে অহিত হইতে পৃথক্ করিয়া লইয়া সম্যক্ অবধারণ করিতে পারি, তাহারই নাম বিবেক। ইহা নীতি-জগতের আলোকস্বরূপ—ইহার প্রভাবেই আমাদিগের কর্ম্মের ইষ্টানিষ্টত্ব ও কার্য্যাকার্য্যত্ব বুদ্ধি উদ্দীপিত হয়; এবং ইহাই সতত আমাদের আচার ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রিত করে। এক্ষণে বুঝিতে হইবে ইষ্ট কি, আর অনিষ্টই বা কি? নীতির আদর্শ উপলব্ধি না হইলে নীতি-জীবনে আমাদিগের ইষ্টানিষ্টত্ব বুদ্ধি আসিতে পারে না, সুতরাং দেখা যাইতেছে নীতির আদর্শভেদে বিবেকের প্রকৃতিভেদ আসিয়া পড়ে, কারণ বিবেক আমাদিগের ইষ্টানিষ্টত্ববোধ লইয়া আসে এবং নীতির আদর্শ অনুসারেই আমাদের ইষ্টানিষ্টত্ব ও কার্য্যাকার্য্যত্ব নিরূপিত হয়। পথিক যেমন পথ চলিবার পূর্ব্বেই লক্ষ্যস্থল নির্ণয় করিয়া লয়, নীতিজগতেও মানব নীতির আদর্শ বুঝিয়া লইয়া নীতিপথে অগ্রসর হইবার প্রয়াসী হয়। বিবেকতত্ত্ব অবধারণ করিতে হইলে প্রথমে নীতিতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। ধর্ম্মের তত্ত্ব যেমন 'নিহিতং গুহায়াম্' নীতির তত্ত্ব তদ্রূপ না হইলেও অন্ততঃ বনেষু কীর্ণম্ একথা বলা যাইতে পারে। আবার শুধু বনে নয়, হিংস্রশ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যানীতে নীতির-তত্ত্ব বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে, কুড়াইয়া লইতে গেলে মহতী আশঙ্কা। আমরা দূর হইতে সেই গহন বনের বহির্দ্দেশে দণ্ডায়মান হইয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিব, যাঁহার আত্মরক্ষার সামগ্রীসম্ভার আছে তাঁহাকেই আমরা সোৎসাহে তত্ত্বসংগ্রহ করিতে উপদেশ দিব।

নীতিতত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গেই বিবেকতত্ত্ব পরিস্ফুট হইয়া আসে। আমরা নীতির যে আদর্শ লক্ষ্য করিব তদনুযায়ী মার্গ অবলম্বন করিতে হইবে এবং সেই মার্গোপদেষ্টাকেই আমরা বিবেক আখ্যা দিব। বিভিন্ন আদর্শাবলম্বীর নিকট বিবেকের তত্ত্ব বিভিন্ন-রূপে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। ধর্ম্মজগতের ন্যায় আমরা নীতিজগতেও "ইদমেব তত্ত্বম্" বলিতে যাইব না, কেবল কোন্ আদর্শ অবলম্বন করিলে কিরূপ শক্তিকে বিবেক বলিতে হয় তাহা দেখাইয়া দিব এবং কোন্ শক্তিকে বিবেক আখ্যা দিলে কি কি দোষ হয় তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

নীতির ব্যবসায়াত্মক আদর্শ গ্রহণ করিলে কর্ম্মের শুভাশুভত্ব ও কার্য্যাকার্য্যত্ব বিচারের জন্য বিশেষ কোনও সূক্ষ্মশক্তির প্রভাব স্বীকার করিতে হয় না, যেহেতু এই আদর্শানুযায়ী ইষ্টানিষ্টত্ব স্থূলজ্ঞান ও অনুমিতির অগম্য নহে—যৎকিঞ্চিৎ সাংসারিক অভিজ্ঞতা থাকিলেই ব্যবসায়াত্মক আদর্শ লক্ষ্য করিয়া আমাদিগের ক্রিয়াকলাপ পরিচালিত করিতে পারি। এস্থলে জানিতে হইবে এই ব্যবসায়াত্মক আদর্শ কাহাকে বলে? নিশ্চয়াত্মক সুদৃঢ় নিয়মকে আমরা ব্যবসায় বলিয়া থাকি। যদি আমরা বহির্জগতের সুদৃঢ় নিয়ম ও শাসনকে নীতির আদর্শ মনে করি অর্থাৎ যাহা কিছু এই নিয়মের ও শাসনের অধীন ও অনুকূল তাহাই আমাদের ইষ্ট আর যাহা উহার প্রতিকূল ও পরিপন্থী তাহাই অনিষ্ট এইরূপ মনে করি তাহা হইলে কেবল স্থূল জ্ঞান ও অনুমিতির সাহায্যেই আমরা কোন্‌টা ইষ্ট কোন্‌টা অনিষ্ট বুঝিয়া লইতে

* উৎক্রান্তিবাদ এই শব্দ Evolution Theory এই অর্থে আজকাল প্রচলিত হওয়া প্রযুক্ত আমি এখানে ব্যবহার করিয়াছি। কিন্তু 'উৎক্রান্তি' এই শব্দের অর্থ সংস্কৃত ভাষায় 'মরণ'। তাই উৎক্রান্তিতত্ত্ব-শব্দ অপেক্ষা গুণ-বিকাস, গুণোৎকর্ষ কিংবা গুণপরিণামএই সাংখ্য-দিগের শব্দ যোজনা আমার মতে অধিক প্রশস্ত।

পারি। পূর্ব্বে আমরা বিবেকের যে সংজ্ঞা বলিয়া আসিয়াছি তদনুযায়ী এই ইষ্টানিষ্টত্ববোধক স্থূলজ্ঞান ও অনুমিতিকেই বিবেক বলিয়া জানিতে হইবে। এক্ষণে নীতির ব্যবসায়াত্মক আদর্শ লক্ষ্য করিয়া স্থূলজ্ঞান ও অনুমিতিকে বিবেক নামে অভিহিত করা কি কি দোষে দুষ্ট, তাহা নিম্নে বিবৃত হইতেছে।

যদি বহির্জগতের সুদৃঢ় নিয়ম ও শাসনই আমাদের নীতিজীবনের পরিচালক হয় তাহা হইলে কূটস্বার্থপরতা নীতির স্থান অধিকার করিবে, সূক্ষ্মদর্শিতা ধর্ম্মের আসন গ্রহণ করিবে। যদি আমরা নিয়ম ও শাসনের আনুকূল্য ও প্রাতিকূল্যকে যথাক্রমে ইষ্ট ও অনিষ্ট মনে করি এবং তদনুসারে কার্য্যাকার্য্য অবধারণ করিয়া লই, তাহা হইলে এই সিদ্ধান্ত আসিয়া পড়ে যে আমরা শাসনের অনুকূলে কর্ম্ম করিলে পুরস্কৃত হইব এবং প্রতিকূলে কার্য্য করিলে দণ্ডিত হইব; এই পুরস্কারের আশায় ইষ্টকর্ম্ম কার্য্য এবং এই দণ্ডের ভয়ে অনিষ্ট কর্ম্ম অকার্য্য বলিয়া বিচার করি। এই নিয়ম ও শাসন—যাহাকে ব্যবসায়াত্মক আদর্শ বলিয়া আসিতেছি তাহা ঐশ্বরিকই হউক, সামাজিকই হউক, আর রাজকীয়ই হউক যখন আমরা দেখিতে পাই, ইহার প্রতিকূলে কার্য্য করিলে আমাদিগকে দণ্ডিত হইতে হইবে আর ইহার অধীন হইয়া চলিলে আমাদের দণ্ডের ভয় থাকিবে না, তখন দণ্ডের ভয় অথবা পুরস্কারের আশাই যে নীতিজীবনের নিয়ন্তা বলিয়া পরিগণিত হয় তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ থাকিতে পারে না সুতরাং পুরস্কারের আশারূপ স্বার্থই আমাদিগকে ইষ্ট কর্ম্ম করিতে উপদেশ দেয় এবং দণ্ডের ভীতিরূপ স্বার্থহানিই অনিষ্ট কর্ম্ম হইতে আমাদিগকে নিবৃত্ত করে। তাহা হইলে স্বার্থপরতাই আমাদের নীতি—এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। আবার ধর্ম্মের সহিত নীতির এরূপ সম্বন্ধ যে নীতি যখন স্বার্থমূলক হইয়া উঠিল, তখন সূক্ষ্মদর্শিতাই যে ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই যেহেতু ধর্ম্মজ্ঞানই আমাদিগকে নীতিপথে চালিত করে এবং সূক্ষ্মদর্শিতাই আমাদিগের কূটস্বার্থবিজড়িত কার্য্যাকার্য্যত্ব পর্য্যালোচনা করিবার ক্ষমতা দেয়। ইহাতে নীতির ব্যবসায়াত্মক আদর্শ অবলম্বনকরা যে সমীচীন নহে ইহাই প্রতিপন্ন হইল। আরও আমরা দেখিতে পাই যে নীতির সহিত মানবপ্রকৃতির গভীর সম্বন্ধ আছে, যেহেতু নীতিপথে চলিলে আমাদের মঙ্গল হয় এবং নীতিপথভ্রষ্ট হইলে আমাদের অমঙ্গল বুঝিতে পারি। নীতি আমাদের অন্তরের সামগ্রী, আমাদের অন্তঃকরণ স্বতই নীতিপথে প্রধাবিত হয়, নৈতিক জীবন আমাদের নিকট যুক্তিযুক্ত ও উপাদেয় বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু ব্যবসায় বা নিয়ম ও শাসনের সহিত অন্তঃপ্রকৃতির কোনও সম্বন্ধ নাই; ব্যবসায় লৌকিক ইচ্ছাই হউক আর ঈশ্বরেচ্ছাই হউক ইহা কেবল বহির্জগতের সুদৃঢ় নিয়মকলাপ যাহা যুক্তিযুক্তই হউক আর অযৌক্তিকই হউক আমরা পালন করিতে বাধ্য। পরন্তু এই নিয়মকলাপ যাহাকে আমরা ব্যবসায়াত্মক আদর্শ বলিতেছি আমাদের পক্ষে শুভ ও উপাদেয় হইতে পারে আবার অনিষ্ট ও অশুভও হইতে পারে সুতরাং এই আদর্শ নিয়মাবলীর উপর আর একটি আদর্শ স্বীকার করিতে হয় যদ্বারা এই নিয়ম ও শাসনের শুভাশুভত্ব পর্য্যালোচিত হইয়া থাকে। অতএব আমরা নীতির ব্যবসায়াত্মক আদর্শ গ্রহণ করিতে পারিনা এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঐ আদর্শের পথপ্রদর্শক স্থূলজ্ঞান ও অনুমিতিকে বিবেক বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন ইন্দ্রিয়সুখই নীতিজীবনের আদর্শ অর্থাৎ যাহা কিছু আমাদের ইন্দ্রিয়সুখের নিদান তাহাই ইষ্ট আর যাহা উহার পরিপন্থী তাহাই অনিষ্ট। এই মত অবলম্বন করিলেও বিবেক স্থূল পার্থিবজ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই নহে এই সিদ্ধান্তে আসিতে হয় কারণ আমরা আমাদের জীবনের পূর্ব্ব পূর্ব্ব ক্রিয়াকলাপ ও তাহার ফলসমূহ পর্য্যালোচনা করিয়াই কর্ম্মের ইষ্টানিষ্টত্ব ও কার্য্যাকার্য্যত্ব নির্ণয় করিতে পারি অর্থাৎ কোন্ কর্ম্ম করিলে আমাদের ইন্দ্রিয়সুখ উপলব্ধ হইবে আর কোন্ কর্ম্মেই বা আমাদের সুখের ব্যাঘাত হইবে তাহা আমরা অভিজ্ঞতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সহজেই অনুমান করিয়া লইতে পারি। কিন্তু এই অভিজ্ঞতা ও স্থূলজ্ঞানকে বিবেক বলিলে কি কি আপত্তি হইতে পারে তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ইন্দ্রিয়সুখই যাঁহারা নীতিজীবনের আদর্শ মনে করেন তাঁহাদের মধ্যে আবার কেহ কেহ ব্যক্তিগত সুখ

আর কেহ কেহ বা সার্ব্বজনীন সুখকে আদর্শ বলিয়া থাকেন, কেহ কেহ স্বকীয় অভিজ্ঞতাকে আর কেহ কেহ বা পুরুষপরম্পরাক্রান্ত জ্ঞানকে বিবেক আখ্যা দিয়া থাকেন। কিন্তু মূলতঃ ইঁহাদের সকলেরই একই আদর্শ একই পন্থা।

কেহ কেহ বলেন নীতিজীবনে বহির্জগতের কোনও আদর্শ অবলম্বন করিলে চলিবে না—কোনও বাহ্য আদর্শ অবলম্বন করিয়া আমাদের ইষ্টানিষ্টত্ব ও কার্য্যাকার্য্যত্ব নির্দ্ধারণ করিলে চলিবে না। কর্ম্মের ইষ্টানিষ্টত্বের প্রকৃত হেতু আমরা বহির্জগতে খুঁজিয়া পাই না, কারণ ইষ্টানিষ্টত্ব কর্ম্মের স্বতঃসিদ্ধ প্রকৃতি। এই ইষ্টানিষ্টত্ব যে শক্তির প্রভাবে অবগত হওয়া যায় তাহাকে আমাদের অন্তরের অন্তরতম উচ্ছ্বাস ব্যতীত আর কিছু বলা যায় না। এই উচ্ছ্বাস আমাদের প্রকৃতিগত এবং ইহারই নাম বিবেক। আবার যাঁহারা অন্তরের এই স্বাভাবিক উচ্ছ্বাসকে বিবেক বলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিতে চান, যেমন ইন্দ্রিয়-বৃত্তি দ্বারা পদার্থের স্বরূপ জ্ঞাত হওয়া যায়, তেমনই অন্তরের উচ্ছ্বাস দ্বারাই আমরা কর্ম্মের ইষ্টানিষ্টত্ব জানিতে পারি। যেমন প্রাকৃতিক পদার্থের সহিত আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়াতেই বিষয়জ্ঞানের সঞ্চার হয়, তেমনই আমাদের এমন একটি নৈতিক ইন্দ্রিয় আছে, যাহার সহিত আমাদের কর্ম্মের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়াতেই কর্ম্মের ইষ্টানিষ্টত্বস্বরূপ সূচিত হইয়া থাকে। বাহ্য-জগতের সহিত আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার ঘাতপ্রতিঘাতে আমাদের পদার্থজ্ঞানের সঞ্চার হয়, অর্থাৎ যে পদার্থ আমাদের যে ইন্দ্রিয়ের সহিত ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া দ্বারা যেরূপ অনুভূতির উদ্রেক করে, আমরা তদনুযায়ী সেই পদার্থের স্বরূপ জানিতে পারি। তেমনই কর্ম্মের সহিত আমাদের অন্তরের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাসের যে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া হইয়া থাকে, তাহার ঘাতপ্রতিঘাতে আমাদের যে অনুভূতির সঞ্চার হয়, তদনুযায়ী আমাদের কর্ম্মের ইষ্টানিষ্টত্ব বোধ হইয়া থাকে অর্থাৎ সেই অনুভূতিতে যদি প্রীতির ভাব পাই তবে আমরা তাহার মূলীভূত কর্ম্মটাকে ইষ্ট বলি আর অপ্রীতির ভাব আসিলে আমরা কর্ম্মটাকে অনিষ্ট বলিয়া জানি। তাহা হইলে পদার্থের স্বরূপনির্ণয়ের উপায় আর কর্ম্মের ইষ্টানিষ্টত্ব বিচারের উপায় একই প্রকারের হইয়া পড়িল। যে কর্ম্ম ইষ্ট তাহা আমাদের অন্তঃকরণে একটা প্রীতির উচ্ছ্বাস,—একটা সুন্দর ভাবের অনুভূতি উন্মেষিত করিয়া দিবে আর যাহা অনিষ্ট তাহা অসুন্দর অপ্রীতির ভাবের উদ্রেক করিবেই করিবে। বিবেকশক্তিকে এইরূপ একটা অনুভূতি মাত্র বলিলে কি কি দোষ আসিয়া পড়ে তাহা আলোচনা করিলেই অনুভূতিবাদের দুষ্টত্ব প্রতীত হইবে।

(ক্রমশঃ)

উন্নতি-প্রসঙ্গ।

অন্নাভাব :—সম্প্রতি মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট অন্নাভাব এবং সাধারণত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মহার্ঘতা নিয়মিত করিবার জন্য বিশেষ আদেশ প্রচার করিয়াছেন। এই হাহাকারের ভাব দেখিয়া আমাদের দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে। আমাদের সে সকল জমীদার কোথায় গেলেন যাঁহাদের গৃহে অন্নবস্ত্রসকল যথেষ্ট পরিমাণে সংগৃহীত থাকিত এবং দরিদ্র প্রজাদের কষ্টের অবস্থায় যথাপরিমাণে বিতরিত হইত। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে গবর্ণমেণ্ট জমীদারশ্রেণীর সংরক্ষণে মনোযোগ প্রদান করিলে দেশের মঙ্গল এবং প্রজার মঙ্গলে রাজার মঙ্গল। বিলাতে জমীদারশ্রেণী সংরক্ষিত আছেন বলিয়াই সেখানে ভাল কাজ, ভাল চিন্তা প্রভৃতি সাধু বিষয় সকল বর্দ্ধিত হয়, ইহা অনেক প্রবীণ পাশ্চাত্য পণ্ডিতের অভিমত। জমীদারশ্রেণীর দেশের মধ্যে বিপ্লব প্রভৃতির উপায়ে গোলযোগ আনা কিছুতেই মত হইতে পারেনা, কারণ তাহাতে তাঁহাদেরই ক্ষতি। ইহারই জন্য আমরা চিরস্থায়ী জমীদারী বন্দোবস্তের পক্ষপাতী। জমীর উপর প্রত্যেক জমীদারের টান যত বেশী থাকিবে ততই মঙ্গল। যদি সেরূপ টান না থাকে, তবে স্বভাবতই দেশের লোকের কেবল কিসে টাকা বেশী হয় সেইদিকেই ঝোঁক হইবে। তাহাতে গোলযোগ বা অ-গোলযোগের কথা হৃদয়ে স্থান পাইতে পারে না। এরূপ ভাবের পরিণাম ফল বিষময়—বিপ্লবের দিকে প্রবণতা। অবশ্য কিছুকালের জন্য অস্থায়ী বন্দোবস্ত গভর্ণমেণ্টের লাভজনক বোধ হইতে পারে, কিন্তু যখন দেশের পক্ষে তাহা মঙ্গলজনক নহে, তখন গভর্ণমেণ্টেরও পক্ষে তাহা মঙ্গলজনক হইতে পারে না। কয়েকটী ইংরাজ সংবাদপত্র যে কথায় কথায় ঘোষণা করেন যে

দেশে কোটী কোটী টাকার রৌপ্য সঞ্চিত আছে, সুতরাং দেশ ধনী—একথা আমরা বিশ্বাস করি না। দেশবাসী যদি ধনী হইত, তবে আজ তাহারা বস্ত্রাভাবে লজ্জানিবারণের অক্ষমতার কারণে আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইত না। Statisticsরূপ ভ্রমসাধক যন্ত্র ছাড়িয়া দিয়া প্রত্যক্ষ দৃষ্টির উপর নির্ভর করিলে আমরা শতবার বলিব যে এদেশবাসীর ন্যায় দরিদ্র পৃথিবীর কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। ঐ যে দেশের ধনসঞ্চয়ের কথা উক্ত হয়, আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে মুষ্টিমেয় কতকগুলি বণিকের হস্তেই সেই অর্থ প্রধানত সঞ্চিত আছে। আমরা সেই সকল বণিক সম্প্রদায়কেই, বিশেষত যে সকল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বণিক সর্ব্বাপেক্ষা ধনী, সেই সকল ধনীশ্রেষ্ঠ বণিকগণকে সাম্রাজ্যের এই সংসময়ে সাহায্য প্রদানে অগ্রসর হইতে অনুরোধ করি। যাঁহার দশ কোটী টাকা আয়, তাঁহার পক্ষে এক কোটি কেন, পাঁচ কোটি টাকা দিলেও বিশেষ কষ্টকর হইবে না, কিন্তু যাহার আয় মাসে ৩৲ টাকা মাত্র, তাহার পক্ষে দেড় টাকা দূরে থাক, চার আনা বা দুই আনা বা এক আনা দেওয়াও বিশেষ কষ্টকর।

হোলি উৎসব ও মদ্যপান :—আমরা কিছুদিন পূর্ব্বে সংবাদপত্রে দেখিয়াছিলাম যে বোম্বাই সহরে "সমাজসেবাসমিতির" উদ্যোগে হোলি উৎসবের সময় দুইদিন মদের দোকান সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা হইয়াছিল। এরূপ ঘটনার কথা শুনিলেও শরীর আনন্দে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। প্রত্যেক নগরে, প্রত্যেক পল্লীতে মদ্যের অপকারিতা বুঝাইবার জন্য কি উদ্যোগী যুবক পাওয়া যায় না?

বৌদ্ধমন্দিরে জুতা পায়ে প্রবেশ। সম্প্রতি ব্রহ্মদেশে ইউরোপীয়গণ জুতাপায়ে বৌদ্ধমন্দিরে প্রবেশ করিতে পারিবেন কি না, তদ্বিষয়ে বিশেষ আন্দোলন হইয়া গিয়াছে। সংবাদপত্র হইতে যতদূর দেখা যায়, তাহাতে বোধ হয় যেন, মন্দিরাধ্যক্ষগণ এ প্রথার বিরোধী। তবে, মন্দিরাধ্যক্ষগণের মধ্যে কেহই যে নানা কারণে এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে দাঁড়ান নাই, সে কথা আমরা বলিতে পারি না। যাই হোক, ব্রহ্মদেশের গবর্ণমেণ্ট একটী আদেশ ঘোষণা করিয়াছেন যে বৌদ্ধমন্দিরে ইউরোপীগণের জুতাপায়ে প্রবেশ করা বহু পুরাতন প্রথা—এ পর্য্যন্ত তাহাতে কেহ বাধা প্রদান করেন নাই, সুতরাং এখনও সে প্রথা রহিত হইতে পারিবে না। এই আদেশ মোটেই সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। ধরিয়া লইলাম যে এতদিন ব্রহ্মে বৌদ্ধগণ ভয়ে হউক বা অন্য যে কোন কারণে হউক, তাহাদের মন্দিরে ইউরোপীয়গণকে জুতাপায়ে প্রবেশ করিতে নিষেধে সাহস করে নাই, তাই বলিয়া সেই অন্যায় প্রথাকে যে বজায় রাখিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। গবর্ণমেণ্টের ভাবা উচিত যে নানা কারণে অন্যান্য সম্প্রদায়ের ন্যায় বৌদ্ধ সম্প্রদায়েরও অন্তরে জাগরণ আসিয়াছে, তাই তাহারা আজ এই কুপ্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সাহস করিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট যদি এই প্রথা রহিত করিতেন, তবে রাজাপ্রজার সম্বন্ধসূত্রে প্রেমের আর একটী গ্রন্থি পড়িয়া যাইত। তাহার বদলে ব্রহ্মগবর্ণমেণ্টের ঐ অযথা আদেশের ফলে আমাদের আশঙ্কা হয় যে বিষবৃক্ষের বীজ রোপিত হইল। সাম্রাজ্যের মঙ্গলের দিকে চাহিয়াই এই বিষয়ে দু'চারটী কথা আমাদিগকে খুলিয়া বলিতে হইল।

বঙ্গের নাবিক—আমরা সংবাদপত্রে দেখিয়া আনন্দিত হইলাম যে চট্টগ্রাম প্রভৃতির অধিবাসী বঙ্গসন্তানেরা নাবিকের কার্য্যে বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে। বম্বের লাট তাহাদিগকে পদকপ্রদান কালে তাহাদের কর্ম্মকুশলতা এবং সাহস ও বীরত্বের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন। আমরা তো জানি যে বঙ্গসন্তানেরা সাহসে ও বীরত্বে কোন জাতি অপেক্ষা হীন নহে। একটী প্রবাদ আছে যে চোরকে ভাল বলিতে বলিতে চোরও ভাল হইয়া যায় এবং ভাল লোককে চোর বলিতে বলিতে ভাল লোকও চোর হইয়া যায়। বাঙ্গালীরা জন্মগ্রহণ অবধি আপনাদিগকে কাপুরুষ দুর্ব্বল প্রভৃতি শুনিতে শুনিতে হীনতার দিকে অগ্রসর হইতেছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু বিধাতা সে অন্যায় সহ্য করিবেন কেন? তাই তিনি আজ বঙ্গসন্তানকে সকল বিষয়ে সাহস ধৈর্য্য প্রভৃতি সদ্‌গুণ সমূহের পরিচয় প্রদর্শনের অবসর দিয়াছেন।

উত্তরবঙ্গ জমীদার সভা—আমরা জমীদার সংরক্ষণের পক্ষপাতী, সেই কারণে আমরা এই প্রকার সভা স্থাপনেরও পক্ষপাতী। এই সভার উদ্দেশ্য থাকা উচিত যে জমীদার সম্প্রদায়কে রক্ষা করিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রজারক্ষারূপ ব্রতপালনে যাহাতে তাঁহারা শিক্ষিত দীক্ষিত হইয়া উঠেন তাহার উপায় অবলম্বন করা। আমরা শুনিতে পাই যে অনেক জমীদার স্থির করিয়া বসিয়া আছেন যে প্রজাশোষণ করিয়া টাকা সংগ্রহ করা এবং সেই টাকা নানাবিধ অসৎকার্য্যে ব্যয় করাই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু জমীদার সভা যদি প্রজাপালনে জমীদারদিগের স্বার্থ বুঝাইয়া দিতে পারেন এবং ঐ কার্য্যে জমীদারদের একটা আনন্দের ভাব ঢুকাইয়া দিতে পারেন, তবেই সভার অস্তিত্ব ও জীবন সার্থক।

———

আঁধারে।

(শ্রীমতী বিধুমুখী দেবী)

আপনার অন্ধকারে
আঁধারিয়া রাখে মোরে
একাকী ঘুরে মরি
কণ্টকিত বনে।
দুর্গম এ পথের মাঝে
কেহত আসেনা কাছে
কেহ না সুধায় কিছু মোরে।
নিতান্ত পাগলের মত
ভ্রমিতেছি ইতস্তত ;
আঁধার আসিছে ছেয়ে
হয়ে ঘনীভূত।
প্রেমময় বিধাতার বরে
নিঝরও ত ঝরে গো প্রস্তরে ;
এ দগ্ধ পরাণ পরে
সে ধারা নাই বা যদি ঝরে
তবে পুড়ে যাক ছাই হয়ে,
টুটে যাক্ বাঁধন যত,
চাব না কারো পানে
চির জীবনের মত।
ঘোর আঁধারে উৎস মাঝে
ফুটবে যবে আলো
কণ্টকিত আঁধার বনে
তাই হবে মোর ভাল।
আঁধারে কারো পাবনা দেখা
প্রকৃতি হবে জীবনসখা ;
হাসিয়া কাঁদিয়া কয়ে দুটি কথা
জুড়াব দারুণ মরমব্যথা
বিশ্বপিতা যিনি
শুনিবেন তিনি
আমার দুঃখের গান,
ডাকিবেন তিনি
চরণে মোরে
গানটী হলে অবসান।

লিঙ্গায়তধর্ম্মে পৌরোহিত্য।

(শ্রীকালীপ্রসন্ন বিশ্বাস)

বাসবা বংশগত পৌরিহিত্যপদের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁহার মতে মনুষ্য তাহার আধ্যাত্মিক উন্নতি অনুসারে শ্রেষ্টত্ব প্রাপ্ত হয়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে লিঙ্গায়ত গুরু এবং পুরোহিত-গণকে জঙ্গম বলে। এই জঙ্গমশব্দ জানা-অর্থে গম ধাতু হইতে উৎপন্ন। যিনি নিজকে অভ্রান্ত ব্রহ্মে সম্পূর্ণরূপে লীন বলিয়া জানেন তিনিই জঙ্গম। ইহা ব্রাহ্মণশব্দের প্রতিশব্দমাত্র। কেহ কেহ বলেন গম-অর্থে যাওয়া হইতে জঙ্গম শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে অর্থাৎ যিনি নানা দেশে গমন করিয়া লিঙ্গায়ত বা বীর শৈবধর্ম্ম প্রচার করেন তিনিই জঙ্গম নামে অভিহিত হন।

লিঙ্গায়ত সাধুগণ বলিয়াছেন যে যিনি আত্মাকে সম্যক্‌রূপে জানিতে পারিয়াছেন, অর্থাৎ যিনি কূটস্থ হইয়াছেন তিনিই শিবযোগী। সুতরাং যে কোন ব্যক্তি ঐ অবস্থা প্রাপ্ত হন তিনিই জঙ্গম হইবার উপযুক্ত। বাসবা বলিয়াছেন "হে জঙ্গমগণ তোমরা জঙ্গম দিগের জাতি স্বতন্ত্র করিয়াছ, অর্থাৎ যাহারা তোমাদের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহাদিগকে জঙ্গম বলিয়া স্বীকার কর, এবং অপরকে নীচ জাতি মধ্যে গণ্য কর ; এইজন্য তোমরা কেবল মাত্র ক্রিয়াশীল লিঙ্গপূজকরূপে পরিণত হইয়াছ, প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞ হইতে পার নাই। ইহাই তোমাদের পাপের শাস্তি"। (ভক্তিস্থল ভক্তিবচন ২৮৪)

"যে ব্যক্তি জঙ্গমদিগের মধ্যে জাতিভেদ স্বীকার করে সে নিশ্চয়ই বাহ্যিক পূজক মাত্র। ভক্তের প্রধান উদ্দেশ্য আন্তরিক উপাসনা, ধ্যান ও আত্মসংযম দ্বারা ভগবানে লীন হওয়া। যদি কোন ভক্ত অবিশ্বাস করে যে অপর একজন কেবল-মাত্র নীচ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া উদ্দেশ্য-পথে উপস্থিত হইতে সক্ষম নহে, তাহা হইলে ইহাই প্রতিপন্ন হইবে যে সে জাত্যভিমান বশতঃ উক্ত স্থানের উপযুক্ত হইতে পারে নাই। যদি জাতি একজনের পক্ষে পরমাত্মার সহিত মিলিত হওয়ার ব্যাঘাতস্বরূপ হয় তবে ইহা সকলের পক্ষেই ব্যতিক্রম উৎপাদন করিবে। সুতরাং এইরূপ সন্দেহ এবং কুসংস্কার লিঙ্গবিশ্বাসীর ধর্ম্মের মূল ছেদন করে মাত্র। "লিঙ্গতে কি কাঠিন্য সম্ভবে ? জঙ্গমে কি জাতিভেদ থাকিতে পারে ?"—ঐ ২৮৫।

"হে পরমেশ্বর আমাকে অপরের অপেক্ষা শ্রেষ্ট জাতি বলিয়া অভিমানজনিত কাজে লিপ্ত করিওনা। আমাকে দয়া কর। কাক্যার ভোজনাবশিষ্ট তণ্ডুল-

কণা মাত্র দিয়া আমাকে ধন্য কর"। (এই কক্কয়া কর্ম্মকারবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ভক্তি ও জ্ঞান প্রভাবে শিবযোগিত্ব প্রাপ্ত হইয়া জঙ্গম হইয়াছিলেন।)

"আমি যদি সিরিয়াকে বৈশ্য বলিয়া, মাচয়াকে রজক বলিয়া, কক্কয়াকে চর্ম্মকার বলিয়া, চন্নয়াকে মাড় বলিয়া ঘৃণা করি এবং আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিমান করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ভগবান আমার কপটতা দেখিয়া হাস্য করিবেন।" ঐ ৩৪৫। "অয্য" শব্দ সংস্কৃত আর্য্যশব্দের কন্নাড় ভাষান্তর মাত্র। এই শব্দ মান্যের স্বরূপ জঙ্গমদিগের ও সাধুদিগের প্রতি ব্যবহৃত হয়।

"আমি জঙ্গম বা সাধুদিগের মধ্যে জাতিভেদ করিব না। আমি তাহাদিগের মধ্যে উত্তম, মধ্যম বা অধম নির্ব্বাচন করিব না। জঙ্গম এবং সাধুদিগের মধ্যে কি উচ্চ মধ্যম অধম আছে?"—ঐ ৪০০।

উপরি উক্ত বচন দ্বারা বাসবা বংশাগত পৌরোহিত্যের নিন্দা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমরা এক্ষণে দেখিতে পাই যে, যে ব্রাহ্মণগণের বংশগত পৌরহিত্যের বিরুদ্ধে বীর শৈবগণ এক সময়ে খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন, অনেকস্থলে লিঙ্গায়ত জঙ্গমগণও আজ সেই দশাই প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহাদের বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, ধর্ম্ম, কর্ম্মের অভাব থাকিলেও কেবলমাত্র জঙ্গমবংশে জন্মগ্রহণ বশতঃ সাধারণ লিঙ্গায়তগণের উপর প্রভুত্ব করিতে লজ্জিত হন না, এবং অপর নীচবংশীয় জ্ঞানী ও বিশ্বাসী ভক্তগণকে জঙ্গমের আসনে বসাইতে অস্বীকার করেন। তবে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র জাতির মধ্যে যে পরিমাণে জাতীয় পার্থক্য বর্ত্তমান আছে, জঙ্গম ও সাধারণ লিঙ্গায়তদিগের মধ্যে ততদূর নাই। এখনও জাতিনির্ব্বিশেষে ভক্তগণ জঙ্গমদিগের ন্যায় মান্য পাইয়া থাকেন। লিঙ্গায়তগণ বিশ্বাস করেন যে প্রকৃত জঙ্গম এবং প্রকৃত ভক্ত উভয়েই মুক্তির অধিকারী। তবে জঙ্গম জ্ঞানযোগী এবং ভক্ত কর্ম্মযোগী।

চা-খড়ির আত্মকাহিনী।

(ডাক্তার শ্রীচুনীলাল বসু রায়বাহাদুর)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পাথুরে কয়লা এবং আমার জন্মের কথা বলিতে বলিতে আরো প্রাচীনতর যুগের অনেক কথা মনে পড়িতেছে, সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিয়া তোমাদের কৌতূহল নিবারণ করিব।

সৃষ্টির ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা।

তোমাদের বিখ্যাত গণিতবিদ্ পণ্ডিত লা-প্লাস্ (Laplace) বহু গবেষণা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে এক সময়ে সূর্য্য ছিল না, চন্দ্র ছিল না, নক্ষত্র গ্রহ উপগ্রহ প্রভৃতি নভোমণ্ডলস্থিত কোন জ্যোতিষ্কেরই পৃথক্ অস্তিত্ব ছিল না। তোমরা যাহাকে আকাশ বল, তাহা তখন ছিল না; বায়ু ছিল না, স্থল ছিল না, জল ছিল না। সূর্য্য-চন্দ্র-গ্রহ-উপগ্রহ-বেষ্টিত যে সৌরজগতের মধ্যে তোমরা বাস করিতেছ, সেইরূপ সংখ্যাতীত সৌরজগত এখন এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডের অঙ্গীভূত হইয়া রহিয়াছে। রাত্রিকালে যে অসংখ্য নক্ষত্ররাজির বিকাশে গগনমণ্ডল হীরকখচিত চন্দ্রাতপের ন্যায় প্রতীয়মান হয়, তাহাদিগের প্রত্যেকটি তোমাদের সূর্য্যের ন্যায় এক একটি সূর্য্য। প্রত্যেক নক্ষত্র নানা গ্রহ উপগ্রহ-পরিবেষ্টিত হইয়া পৃথক্ সৌরজগতের সৃষ্টি করিয়াছে এবং সূর্য্যরূপে উহার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিতি করিতেছে। সৃষ্টির আদি যুগে কিন্তু এই অসংখ্য সৌরজগতের একটিরও পৃথক্ অস্তিত্ব ছিল না। তখন অনন্ত মহাব্যোম প্রদেশ প্রচণ্ডতাপসম্পন্ন, মহাবেগে ইতস্ততঃ ধাবমান, ভাস্বর, কুজ্ঝটিকার ন্যায় এক বাষ্পময় পদার্থ দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল।

নীহারিকা-বাদ।

এই জ্যোতির্ম্ময় কুয়াসার ন্যায় পদার্থ ইংরাজীতে নেবুলা (Nebula) নামে পরিচিত। আমরা ইহাকে "নীহারিকা" বলিব। এখনো ব্যোমপথে এবং অনেক নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে দূরবীক্ষণ সাহায্যে নীহারিকার খণ্ডাংশ দৃষ্টিগোচর হয়। নীহারিকা দেখিতে নীলাকাশে ভাসমান মধ্যাহ্ন সূর্য্যকরোদ্দীপ্ত শুভ্র তরল মেঘখণ্ডের ন্যায়। মাঝে মাঝে আকাশমণ্ডলে যে ধূমকেতুর উদয় তোমরা দেখিতে পাও, উহাদিগের দেহ অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহের ন্যায় এখনো তরলত্ব বা

কঠিনত্ব প্রাপ্ত হয় নাই। ধূমকেতু আজিও নীহারিকার অবস্থায় অর্থাৎ ভাস্বর বাষ্পের আকারে বিদ্যমান রহিয়াছে। পদার্থ বাষ্পাকারে থাকিলে অত্যন্ত হাল্কা হয় এবং উহার একটী সামান্য কণামাত্র বিস্তৃত হইয়া বিপুল স্থান অধিকার করিয়া থাকে। ধূমকেতু বাষ্পাবস্থায় আছে বলিয়া পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে কোটী কোটী মাইল বিস্তৃত একটী ধূমকেতুর দেহের ওজন ১০।২০ সেরের অধিক হইবে না। লাপ্লাসের মতে এক সময়ে এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ডদেহ নীহারিকাময় ছিল। তোমাদের আর একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ইমানুয়েল্ কাণ্ট্ও এই মত সমর্থন করিয়া গিয়াছেন।

উল্কাবাদ।

আবার কোন কোন পণ্ডিতের মতে নীহারিকা বিশ্ব-সৃষ্টির মূল উপাদান নহে। তাঁহারা বলেন যে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অসংখ্য উল্কাপিণ্ড (Meteors) পুঞ্জীভূত হইয়া এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ড গঠিত হইয়াছে। সংখ্যাতীত উল্কাপিণ্ড আজিও ব্যোমপথে ভ্রমণ করিতেছে এবং দল বাঁধিয়া সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ধূমকেতুর ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাঁহাদিগের মতে নীহারিকার দেহ অসংখ্য বৃহৎ ও ক্ষুদ্র উল্কাপিণ্ডের সমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নহে। ব্যোমপথে প্রচণ্ড বেগে ভ্রাম্যমান উল্কাপিণ্ডের পরস্পর সংঘর্ষণে এত অধিক তাপ সমুৎপন্ন হয় যে তদ্দ্বারা উহারা প্রজ্বলিত হইয়া বাষ্পাকার ধারণ করে। তাপ বিকিরণ দ্বারা ক্রমশঃ শীতল হইয়া এবং মাধ্যাকর্ষণের বলে পরস্পর আকৃষ্ট হইয়া বহুসংখ্যক উল্কাপিণ্ড একত্রে মিলিত হইতেছে এবং তাহার ফলে গ্রহ নক্ষত্রাদির সৃষ্টি হইয়াছে এবং আজি পর্য্যন্ত সৃষ্টি-প্রকরণ এই একই ভাবে চলিয়া আসিতেছে। এইরূপ শত সহস্র উল্কাপিণ্ড তোমাদের আকাশের মধ্যে নিত্য প্রচণ্ড বেগে আগমন করিতেছে। রাত্রিকালে দূরবীক্ষণ সাহায্যে আকাশপথ পর্য্যবেক্ষণ করিলে ইহাদিগের অস্তিত্ব তোমাদের প্রত্যক্ষীভূত হইবে। ইহাদিগের দেহের সহিত বায়ুমণ্ডলের বিষম ঘর্ষণ উপস্থিত হইয়া এত অধিক তাপ ও আলোক উৎপন্ন হয় যে উহাদিগের দেহ অগ্নিময় দেখায়। অনেক সময়ে তাপ সংযোগে উহারা জ্বলিয়া যাইয়া একেবারে বাষ্পাকারে পরিণত হয় এবং বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে। দূরবীক্ষণের সাহায্য ব্যতীত তোমরা মাঝে মাঝে আকাশে যে নক্ষত্রপাত (Shooting star) দেখিতে পাও, তাহা পতনশীল জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড অথবা দুই বা ততোধিক উল্কাপিণ্ডের সংঘাত ব্যতীত আর কিছুই নহে। যেগুলি জ্বলিয়া বাষ্পাকারে পরিণত হয় না, মাধ্যাকর্ষণের বলে তাহারা পৃথিবীর উপরে পতিত হইলে উক্ত ঘটনা "উল্কাপাত" বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে উল্কাপুঞ্জ সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিবার সময় পৃথিবীর কক্ষপথে আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন বিস্তর উল্কাপিণ্ড পৃথিবীর উপর বৃষ্টিরূপে পতিত হয়। তোমরা এই ঘটনাকে "উল্কাবৃষ্টি" বলিয়া থাক। উল্কাপিণ্ডের দেহ বহু ক্ষুদ্র ও বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড দ্বারা গঠিত, লৌহ ইহার একটী বিশিষ্ট ও শ্রেষ্ঠ উপাদান। উল্কাপিণ্ডের দেহে লৌহ অনেক সময়ে বিশুদ্ধ অবস্থায় থাকে, ইংরাজীতে এরূপ লৌহকে "উল্কাপিণ্ডজাত লৌহ" (Meteoric iron) কহে। এই মতে উল্কাপিণ্ডই বিশ্বসৃষ্টির মূল উপাদান।

গ্রহ নক্ষত্রাদির উপাদানের অভিন্নতা।

সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু সকলেরই উপাদান এক। তোমাদের বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতেরা এই সকল জ্যোতিষ্ক হইতে যে আলোক নির্গত হয়, তাহা যন্ত্রবিশেষ (Spectroscope) দ্বারা বিশ্লেষণ করিয়া পৃথিবীর দেহ যে সকল মূল পদার্থ (Elements) দ্বারা গঠিত, তাহাদিগের অস্তিত্ব গ্রহ নক্ষত্রাদির দেহেও প্রমাণ করিয়াছেন। এই উপাদান-সমত্বের আবিষ্কার লাপ্লাসের নীহারিকাবাদের সমর্থন করিতেছে। আমি ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে তাঁহার মতে এই সকল গ্রহ নক্ষত্র এক সময়ে অনন্ত আকাশব্যাপী নীহারিকার ভাস্বর বিরাট বপুর অন্তর্ভূত ছিল। কালসহকারে উহারা পৃথক্ অস্তিত্ব ধারণ করিয়াছে বটে কিন্তু একই পদার্থ হইতে উৎপন্ন বলিয়া উহাদিগের মধ্যে উপাদানগত পার্থক্য লক্ষিত হয় না।

সূর্য্য, পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহাদির জন্ম।

অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহের ন্যায় তোমাদের পৃথিবীরও পৃথক্ অস্তিত্ব এককালে ছিল না। তখন বন, উপবন, সাগর, সরিৎ, পর্ব্বত, প্রান্তর, দ্বীপ, উপদ্বীপ, ইহাদের মধ্যে কোনটীই ধরা-বক্ষের

অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিত না। কেবল এক বিশ্বব্যাপী জ্যোতির্ম্ময় বাষ্পীয় পদার্থ তোমাদের সৌর-জগতের তাবৎ স্থান অধিকার করিয়া তাণ্ডব নৃত্য করিত। বিকিরণ হেতু উহার প্রচণ্ড তাপ ক্রমশঃ মন্দীভূত হইতে লাগিল এবং এইরূপে অপেক্ষাকৃত শীতল হইয়া প্রথমতঃ তরলাকার, পরে আরো জমাট বাঁধিয়া কঠিন হইতে আরম্ভ হইল। তোমরা জান যে জল উত্তাপ সংযোগে বাষ্পাকার ধারণ করে ঐ বাষ্প শীতল হইলে পুনরায় তরল জলের আকারে পরিণত হয় এবং অধিক শৈত্য সংযুক্ত হইলে তরল জল ক্রমশঃ জমাট বাঁধিয়া কঠিন বরফের আকার ধারণ করে। ঠিক এই একই নিয়মে তাপের অপসারণহেতু বাষ্পময় বিরাট বিশ্বদেহ জমাট বাঁধিয়া প্রথমতঃ তরল ও পরে কঠিন আকারে পরিণত হইয়াছে। পৃথিবী, শুক্র, মঙ্গল প্রভৃতি গ্রহের উপরিভাগ একেবারে কঠিন হইয়া গিয়াছে; পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ প্রচণ্ড উত্তাপ সংযোগে এখনো তরলাবস্থায় বিদ্যমান রহিয়াছে। আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সময় আমরা পৃথিবীর গর্ভস্থিত এই তরলাংশকে গলিত ধাতু ও প্রস্তরধারারূপে নিঃসৃত হইতে দেখিতে পাই। চন্দ্রের ভিতর ও বাহির, উভয় প্রদেশই একেবারে কঠিন হইয়া গিয়াছে। একসময়ে চন্দ্রের মধ্যেও বহু আগ্নেয় গিরি বিদ্যমান ছিল এবং সেইগুলি অনবরত তরল অগ্নিময় পদার্থ উদ্গিরণ করিত। একসময়ে চন্দ্র তোমাদের পৃথিবীর মত বায়ু ও জল পৃষ্ঠদেশে বহন করিত; এখন চন্দ্রে বায়ুও নাই, জলও নাই, থাকিলেও তাহারা অত্যধিক শৈত্যপ্রযুক্ত কঠিনাবয়ব ধারণ করিয়া আছে। চন্দ্র এখন নির্জীব ও নিষ্প্রভ হইয়া পরের আলো ধার করিয়া তোমাদের আলো যোগাইতেছে। চন্দ্রের প্রভাব এখন পৃথিবীর জোয়ার ভাঁটার উপর এবং তোমাদের কবিকুলের কল্পনারাজ্যে নিজ আধিপত্য বিস্তার করিয়া রহিয়াছে।

সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়ম এই যে তাপসংযোগে পদার্থ আয়তনে বড় হয় এবং শৈত্য সংযোগে সঙ্কুচিত হইয়া আকারে ছোট হইয়া যায়। বাষ্পময় বিশ্বদেহ যতই শীতল হইতে লাগিল, ততই উহা সঙ্কুচিত হইয়া ছোট হইতে আরম্ভ হইল এবং উহার গতিরও পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইল। প্রথম অবস্থায় বাষ্প-দেহের মধ্যে অসংখ্য প্রবাহ উৎপন্ন হইয়া অসংযত ভাবে চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত হইত। ক্রমশঃ দেহের যত সঙ্কোচ হইতে আরম্ভ হইল, উহার অসংযত বহুমুখী গতি একটীমাত্র আবর্ত্ত-গতিতে পরিণত হইল এবং বহু বিস্তৃত বাষ্পদেহ ক্রমে একটী অপেক্ষাকৃত ছোট বর্ত্তুলাকার পিণ্ডে পরিণত হইয়া নিজ অক্ষের উপর ব্যোমপথে প্রচণ্ড বেগে আবর্ত্তিত হইতে লাগিল। তখনও উহা তরল এবং বাষ্পাবস্থায় রহিয়াছে; এই মহাঘোর আবর্ত্তনের সময় উহার মধ্যাংশ স্ফীত হইয়া উঠিল এবং উভয় প্রান্ত কিঞ্চিৎ চাপিয়া গেল এবং মাঝে মাঝে উহার স্ফীত প্রদেশ হইতে কিয়দংশ বিচ্যুত হইয়া চক্রাকারে (Rings) উহাকে বেষ্টন করিয়া পৃথক্ ভাবে ঘূর্ণায়মান হইতে লাগিল। এই রূপে ক্রমে ক্রমে আমাদের সৌর-জগতে একটী করিয়া আটটী মূল চক্রের সৃষ্টি হইয়াছিল; উহারা কালে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া এবং চূর্ণ অংশগুলি মাধ্যাকর্ষণের বলে পুনর্ম্মিলিত হইয়া পৃথিবী, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, নেপ্‌চুন এবং ইউরেনাস্ নামক আটটী গ্রহের সৃষ্টি করিয়াছে। সৌরজগতব্যাপী সেই জ্বলন্ত বাষ্পময় পদার্থের মধ্যাংশ এখন সূর্য্যরূপে বিরাজ করিতেছে এবং বিচ্যুত অংশগুলি হইতে যে গ্রহগুলির সৃষ্টি হইয়াছে, তাহারা নিজ নিজ কক্ষপথে পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব মুখে সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া অবিরাম ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

উপগ্রহদিগের জন্ম।

এই একই প্রণালীতে অনন্তবিস্তৃত মহাব্যোম-প্রদেশে যে কত সৌরজগতের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। তোমাদের পৃথিবী সৌরজগতব্যাপী আবর্ত্তনশীল সেই নীহারিকা দেহের ক্ষুদ্রাংশ মাত্র। যখন পৃথিবীর দেহ কঠিন হয় নাই, তখন ঘোর আবর্ত্তনের ফলে উহার দেহ হইতেও একাংশ বিচ্যুত হইয়া চন্দ্রের উৎপত্তি হইয়াছে; এক সময়ে পৃথিবী ও চন্দ্র একাঙ্গীভূত ছিল। সুতরাং চন্দ্র পৃথিবীর একটী উপগ্রহ। চন্দ্র সম্বন্ধে দুই একটী কথা পরে বলিবার ইচ্ছা রহিল। চন্দ্রের ন্যায় বৃহস্পতি, শনি প্রভৃতি গ্রহগুলির এক বা ততোধিক উপগ্রহ আছে। এই সকল উপগ্রহ একই

নিয়মে গ্রহগণের দেহ হইতে বিচ্যুত হইয়া জন্মলাভ করিয়াছে। উপগ্রহদিগের সাধারণ ইংরাজী নাম সাটেলাইট্ (Satelites)। বৃহস্পতির চারিটী উপগ্রহ। কতকগুলি উপগ্রহ এখনো চক্রাকারে স্বীয় গ্রহকে পরিবেষ্টন করিয়া নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট কক্ষপথে ভ্রমণ করিতেছে। দূর-বীক্ষণ সাহায্যে, শনি গ্রহের উপগ্রহ চক্রাকারে শনিকে সুন্দর ভাবে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। (ক্রমশঃ)

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন।

(সংবাদ প্রভাকর হইতে উদ্ধৃত)

(৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের অনুবৃত্ত)

রামপ্রসাদ সেন চৈত্র মাসের সংক্রান্তির দিবস কতিপয় বন্ধু সমভিব্যাহারে চড়ক দেখিতে গিয়াছিলেন, যখন চড়কি দেপাক্, দেপাক্, বলিয়া চড়ক গাছে ঘূরিতেছে, তখন কেহ কেহ কহিলেন "সেন মহাশয় দেখ কেমন সুন্দর ঘূরিতেছে, প্রসাদ তাহাতে হাস্যপূর্ব্বক উত্তর করিলেন 'ভাই! একি এক সামান্য চড়ক দেখাইতেছ, আমি দিবানিশি যে চড়কে ঘূরিতেছি তাহার নিকট এ চড়ক কোথায় লাগে।' তাঁহারা কহিলেন 'সে কিরূপ চড়ক ভাই', তচ্ছ্রবণে তৎক্ষণাৎ সহস্র ব্যক্তির সাক্ষাতে মুক্তকণ্ঠে এই গান ধরিলেন। যথা ঃ—

"ওরে মন চড়কি, ভ্রমণ কর,
এ ঘোর সংসারে।
মহাযোগেন্দ্র কৌতুকে হাসে,
না চিন তাঁহারে।
যুগল স্বয়ম্ভূ শম্ভু মূরতীর উরে,
মনরে, ওরে কর পঞ্চ বিল্বদলে পূজিছি তাহারে। ১
ঘরেতে যুবতীর বাক্,
গাজনে বাজিছে ঢাক,
মনরে, ওরে বৃন্দাবলী, খেমটা ঢালি,
বাজায় নানা সুরে॥ ২
কাম দীর্ঘ ভারায় চোড়ে,
ভাংলে পাঁজর পাটে পড়ে।
মনরে ওরে যাতনা করেছ তুচ্ছ,
ধন্যরে তোমারে॥ ৩
দীর্ঘ আশা চড়ক গাছ,
বেছে নিলে বাছের বাছ।
মনরে ওরে মায়া ডোরে বঁড়শী গাথা,
স্নেহ বল যারে॥ ৪
প্রসাদ বলে বার বার,
অসারে জন্মিবে সার।
মনরে, ওরে শিঙ্গে ফুঁকে শিঙ্গে পাবি,
ডাকো কেলে মারে॥"৫

এই প্রেমভক্তি পরিপূরিত পীযূষময় সাধু সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া তৎকালে সকলেই সাধু সাধু সাধু শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক মোহিত হইলেন। আহা! এই স্থলেই তাঁহারদিগ্যেই সাধু সাধু সাধু বলিয়াই সাধুবাদ প্রদান করিব, যাঁহারা সাধু সাধক সেনের সুধাধার বদন বিনির্গত সঙ্গীত সুধাপান করত তৃপ্তচিত্ত হইয়াছিলেন, অপিচ কি পরিতাপ! আমরা ঐহিক সুখময় অদ্ভুত ভূতকালে ভূতরূপে উক্ত মহাভূতের অলৌকিক কার্য্য সকল সাক্ষাতে দর্শন করিতে পারি নাই, সেইকাল প্রকৃত সত্যকালের ন্যায় কাল ছিল; যদিও এইকাল সেইকালি বটে, তথাচ এ কালের সহিত সে কালের তুলনা কোন মতেই হইতে পারে না, কারণ একাল কিকাল এবং কোন কালে কোন কালের সঙ্গে এই কালের উপমা হইবে তাহারো নিশ্চয়তা করা দুঃসাধ্য হইতেছে। আমরা যে কালে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছি সে কাল আমাদিগের পক্ষে কাল স্বরূপ হইয়াছে, এই কাল রাঙ্গার পক্ষে পক্ষ হইয়া কালোর দেশের আলো নির্ব্বাণ করিয়াছে, সে স্বাধীনতা কোথা? সে সুখ কোথা? সে ধর্ম্ম কোথা? সে কর্ম্ম কোথা? সে বিদ্যা কোথা? সে চালনা কোথা? সে পাণ্ডিত্য কোথা? সে কবিত্ব কোথা? সে সমাদর কোথা? সে সম্মান কোথা? এবং সে অনুরাগ ও উৎসাহই বা কোথা? স্বাধীনতা সংহারের সঙ্গে সঙ্গেই কাল সমস্ত উদরস্থ করিয়াছেন। আমরা অধুনা রঘুকুলতিলক ভগবান রামচন্দ্রের কথা উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করিনা। দ্বারকাধিপতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং হস্তিনাধিপতি পাণ্ডুকুল প্রদীপ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের প্রসঙ্গ করিতে চাহিনা। নবরত্ন সভার অধীশ্বর মহারত্ন

বিক্রমাদিত্যের নাম উচ্চারণ করিবনা, কেবল নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সময়কেই স্মরণ করিতেছি। ঐ সময়ে যে, যে, ব্যাপার হইয়াছিল বর্ত্তমান কালে তাহার শতাংশের একাংশ থাকিলেও কত সুখের ব্যাপার হইত। উক্ত মহারাজ নানা শাস্ত্রালঙ্কৃত পণ্ডিত ও সজ্জনের হৃদয়পদ্ম প্রকাশকারী রবিস্বরূপ কবিগণকে সাতিশয় সমাদর করিতেন, গৌরবপূর্ব্বক গুণের পরীক্ষা করিয়া উৎসাহবর্দ্ধনার্থ সর্ব্বদাই পারিতোষিক ও বৃত্তি প্রদান করিতেন। তৎসমকালে এই বঙ্গদেশে যে সকল ধনাঢ্য ভূম্যধিকারি মহাশয়েরা সজীব ছিলেন তাঁহারাও তাঁহার দৃষ্টান্তানুসারে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন করিতেন, অর্থাৎ তাবতেই পণ্ডিত ও কবিদিগে যথাসাধ্য সম্ভবমত সাহায্য করত সম্যক প্রকারেই অনুরাগের পথ পরিষ্কৃত করিতেন। এই কালে সেই কালের চিহ্ন কিছুই নাই, এইক্ষণেও অনেক সুপণ্ডিত ও সুকবি হইতেছেন, কিন্তু কি আক্ষেপ! কেহই তাঁহার দিগ্যে আদর করেন না, উৎসাহ দেন না, গুণের পুরস্কার করা দূরে থাকুক্, একবার আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসাও করেন না। অধ্যাপক পণ্ডিতেরা কোনরূপ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিলে এবং কোন কবি কবিত্ব দর্শাইলে, যত্ন পূর্ব্বক তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করা চুলায় পড়ুক, বরং বিপরীত ভাবে হাস্য পরিহাস করিয়া সেই সকল প্রকৃষ্ট পদার্থকে রসাতলে নিক্ষেপ করেন। সম্প্রতি দেশ কালপাত্র সকলি সমান হইয়াছে, সুতরাং যথার্থরূপে গুণের সৌরভ ও গুণীর গৌরব প্রকাশ হইতে পারে না, জগদীশ্বর যাঁহার দিগ্যে ধনি করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অত্যল্প মহাশয় ব্যতীত প্রায় তাবতেরি ধনি বলিয়া কেবল এক ধ্বনি মাত্র রহিয়াছে, ধনির কার্য্য প্রায় কাহারও নাই, শুদ্ধ ধনীর কর্ম্মই দেখিতে পাই, শাস্ত্রালাপ একবারে লোপ হইয়া গেল, অধিকাংশ মহাশয় শুদ্ধ অলীকামোদে কালহরণ করিতেছেন। প্রাচীন বা আধুনিক সুকাব্য লইয়া আমোদ করা অভ্যাস নাই, যেহেতু তাহার বিন্দুমাত্র বুঝিতে পারেন না, মনে বড় উল্লাস হইলে এক-রাত্রি বন্ধু-বান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিয়া যাত্রা দিয়া বসিলেন, যাত্রা-ওয়ালা, কেলুয়া, ভুলুয়া, সং আনিয়া উপস্থিত করিল, তাহারা বহুবিধ অঙ্গভঙ্গি ও রঙ্গ ভঙ্গ করিয়া গীত ধরিল,—

'কেন নকিব ডাকছ আমারে।
আমি হাজির আছি হুজুরে॥
কাঁহে বোলাতোঁ হোঁ।
কেঁই কেঁই কেঁই এং এং এং॥'

বাবুরা এই প্রকার সং রং চং দেখিয়াও টং শুনিয়া আহ্লাদে আপনারাই জংবোহাদুর সাজিয়া বসেন, পরে মালিনী আসিয়া গান ধরিল।

* * *
* * *
* * *

এইরূপ গীতে আহ্লাদিত হইয়া পেলা দিবার কত ধূম পড়িয়া যায়।

অনেক ক্ষমতাবান পুরুষ অনেক সম্ভাবিত সৎকর্ম্মে বঞ্চিত হইয়া গঙ্গাযাত্রার সময়ে এক সখের যাত্রা করিলেন।

* * *

যেমন দেবতা তেমনি নৈবেদ্য, অধুনা যেমন সময় তেমনি রসিক ও তেমনি গীত হইয়াছে।

* * *
* * *
* * *

কি করা যায়? সকলি কালের ধর্ম্ম, সকলি কালের কর্ম্ম, এই কালের মর্ম্ম বুঝিয়া যিনি মর্ম্মগ্রাহী হইতে পারিলেন এই জগতে তিনিই ধন্য হইলেন। সংপ্রতি সর্ব্বত্রই শুদ্ধ ছলের বাজার ও খলের বাজার বসিয়াছে, কোনখানেই একখানা ফলের দোকান দেখিতে পাই না। যেখানে সেখানে কেবল দলের আঁটাআঁটী, বলের আঁটা-আঁটী কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া এবং হতাদর হইয়া পণ্ডিত ও গুণী লোকেরা আপনারাই অভিমানে মনে মনে ম্লান হইতেছেন। যে দেশের লোকেরা বস্ত্র পরিধান করে না সে-দেশে রজকের অন্ন কখনই হইতে পারে না,

গুণগ্রাহী না থাকিলে গুণের বিচার কে করে? যদি ভাগ্যধরেরা এ পক্ষে কিঞ্চিৎ অনুরাগী ও মনোযোগী হয়েন তবে এই পরাধীন অবস্থাতেও দেশের এত দূরবস্থা হয় না, অনায়াসেই সর্ব্বতোভাবে সুখ সৌভাগ্যের আধিক্য হইতে পারে, কর্ত্তারা তাহা না করিয়া মোসাহের নাম ধারী কতকগুলি চমৎকার চিত্ত অবতারদিগ্যে আদরপূর্ব্বক পূজা করিয়া থাকেন, সেই মা লক্ষ্মীর বরযাত্র মহাপাত্র মহাশয়দিগের মহিমার কথা বর্ণন করিতে হইলে লেখনীর মুখ আড়ষ্ট হইয়া যায়, তাঁহারা না পারেন ও না করেন এমন কর্ম্মই নাই। আহা! যখন আমরা কোন ধনির সভায় গমন করিয়া তাঁহার সভাসদ্ ও পারিষদ্ সকলকে বিদ্যা, বুদ্ধি, সভ্যতা, শীলতা, সৌজন্য প্রভৃতি সমুদয় গুণ সম্পন্ন দেখিতে পাই তখন আমাদিগের অন্তঃকরণ কত আহ্লাদে স্ফীত হইতে থাকে, আমরা কত সুখী হইয়া সৌভাগ্য স্বীকার করিতে থাকি। যদি প্রত্যেক স্থানেই এরূপ দেখিতে পাই তবে আর সুখের পরিসীমা থাকে না, এককালেই দুঃখের অবসান হইয়া যায়। কিন্তু আমাদিগের দুর্ভাগ্যক্রমে বঙ্গদেশে এরূপ সুখের স্থল অতি বিরল। দুই এক স্থানে এতদ্রূপ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান ব্যতীত প্রায় সর্ব্বত্রই কেবল সৎকার্য্যের সৎকার্য্যই দেখিতে পাই। যাহা হউক এই স্থলে এ বিষয়ে আর প্রস্তাব বাহুল্য করণের প্রয়োজন করেনা, যে এক সদ্বিষয়ে লেখনী ধারণ করিয়াছি, তাহারি আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইলাম, সকলে নয়নাস্তপাত করুন।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুরের যদিও সর্ব্ব শাস্ত্রজ্ঞ বুধগণ ও ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর প্রভৃতি কবি ও অন্যান্য বিষয়ের অনেক গুণিলোক নিয়তই অবস্থান করিতেন যদিও ইঁহারা নিজ নিজ গুণাংশে স্ব, স্ব, প্রধান ছিলেন, তথাচ তিনি কুমারহট্ট নিবাসী বৈদ্যকুলোদ্ভব এই রামপ্রসাদ সেনের প্রণীত পদ, কালীকীর্ত্তন কৃষ্ণকীর্ত্তন এবং বিদ্যাসুন্দরের কবিতা সকল লোক মুখে শ্রবণ করত অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইতেন, এবং ইঁহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া গন্য করিতেন। 'বলা ফেন চাটা' নামক একজন কীর্ত্তনওয়ালা রামপ্রসাদি কালীকীর্ত্তন গান করিত, ঐ ফেনচাটা একদিন কৃষ্ণনগরের রাজবাটীতে গিয়া কালীকীর্ত্তন গান করিয়া মধু বর্ষন করত সকলের চিত্ত হরণ করিল রাজা সেই গানে পুলকিত হইয়া কীর্ত্তনকারীকে কহিলেন 'বলরাম, এতদিন তোমার নাম ফেনচাটা ছিল, এইক্ষণে আমি তোমার নাম মধুচাটা রাখিলাম' এতদ্রূপ রাজপ্রসাদে প্রফুল্ল হইয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক বলরাম কহিল, 'মহারাজ' আমি কৃতার্থ হইলাম, ফলে আক্ষেপ এই যে আপনি রাজা হইয়া আমার ফেন ঘুচাইয়া দিলেন, 'চাটা টুকু ঘুচাইতে পারিলেন না।' রাজা গায়কের এই উক্তিতে প্রসন্ন হইয়া তখনি তাহাকে উপযুক্ত পারিতোষিক প্রদান করিলেন, পরন্তু নবদ্বীপাধিপতির মনে এইরূপ ইচ্ছা হইল যে, রামপ্রসাদ তাঁহার অধীন হইয়া নিরন্তর নিকটে থাকেন, কিন্তু সে মনোরথ পূর্ণ করিতে পারেন নাই কারণ রামপ্রসাদের মন অধীনতা ও বিষয় বাসনা হইতে এককালেই বিরত হইয়াছিল। ঐ সময়ে রামপ্রসাদ সেনের প্রতি ও তাঁহার কবিতার প্রতি মহারাজের এতদ্রূপ প্রীতি জন্মিল যে তিনি মধ্যে মধ্যে হালিশহরে স্বয়ং আসিয়া নিজ স্থাপিত কাছারি বাটীতে কিছু দিন বাস করত রামপ্রসাদ সেনকে আহ্বান করিয়া প্রচুরতর প্রযত্ন পুরঃসর তাঁহার কবিতা সকল শ্রবণ করিতেন, এবং তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কবিরঞ্জন অভিধান দান করিয়াছিলেন। কবিরঞ্জন রাজ কৃপায় কবিরঞ্জন উপাধি পাইয়া নিজ বিরচিত বিদ্যাসুন্দরের নাম 'কবিরঞ্জন' রাখিলেন। ইহাতেই স্পষ্টরূপে প্রমাণ হইতেছে মহারাজ রামপ্রসাদি বিদ্যাসুন্দর দৃষ্টি করিয়া ভারতচন্দ্রের প্রতি বিদ্যাসুন্দর রচনায় আদেশ করিয়াছিলেন, রাজাজ্ঞায় ভারতচন্দ্র যে বিদ্যাসুন্দর প্ররচনা করেন, তাহা সমুদয় রাজ পণ্ডিত কর্ত্তৃক সংশোধিত হইয়াছিল। এজন্য তাহা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর বলিয়া সর্ব্বত্র বিখ্যাত হইয়াছে, রামপ্রসাদ সেন দুঃখী ছিলেন এবং রচনা কল্পে কোন ব্যক্তির আনুকূল্য প্রাপ্ত হয়েন নাই, আপনার মনে যেমন উদয় হইয়াছিল তাহাই লিখিয়া গিয়াছেন, সুতরাং ভারতচন্দ্রি বিদ্যাসুন্দরের ন্যায় তাঁহার বিদ্যাসুন্দর সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর না হইতে পারে, ফলে তিনি কবিরঞ্জনের এক এক স্থলে এমন সুন্দর

বর্ণনা করিয়াছেন যাহা ভারতচন্দ্রি রচনার অপেক্ষা অনেক অংশেই উৎকৃষ্ট, বিশেষতঃ যে খানে পরমার্থ প্রসঙ্গ এবং কালী নামের গন্ধ পাইয়াছিলেন, সেই সেই স্থানে রচনার শেষ করিয়া তুলিয়াছিলেন। এই মহাশয় যে কালী কীর্ত্তন ও কৃষ্ণকীর্ত্তন রচনা করিয়াছেন, তাহা বিদ্যাসুন্দরের অপেক্ষা অনেক উত্তম, ফলে তাঁহার পদ সর্ব্বাপেক্ষাই উৎকৃষ্ট, তেমন উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই, পূর্ব্বে রামপ্রসাদি পদ সম্বল করত ব্যবসায় দ্বারা কত লোক কত সৌভাগ্য সঞ্চয় করিয়াছে এবং এইক্ষনে ও কত মনুষ্য এই উপলক্ষে ভিক্ষা করিয়া সমূহ সুখে দিনপাত করিতেছে—তাহার সংখ্যা করা দুষ্কর। বোধ করি রামপ্রসাদি পদ অদ্যাপি লক্ষ লোকের উপজীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, গায়কের অভাবে ইদানীং কালীকীর্ত্তন ও কৃষ্ণকীর্ত্তন লোপ হইবার উপক্রম হইয়াছে, তাহার রাগ সুরের উপদেশ করে এইক্ষণে এমন লোক কেহই নাই, যদি কোন গুণি ব্যক্তি আপনি রাগ সুর প্রস্তুত করিয়া গান করাইতে পারেন, তবে একটা উত্তম কীর্ত্তি স্থাপন করা হয়।

পূর্ব্ব অঞ্চলে রামপ্রসাদি কবিতা অনেক প্রচারিত আছে, সে সকল পদ্য এখানে প্রচার নাই। ঢাকা সেরাজগঞ্জ ও পাবনা প্রদেশের নাবিকেরা সর্ব্বদাই তাহা গান করিয়া থাকে, সে বিষয়ে তাহারদিগের এত ভক্তি যে, যখন অস্নাত থাকে তখন মুখাগ্রে উচ্চারণ করে না। কহে "বাসী কাপড়ে রামপ্রসাদের গান গাহিলে নরকে যাইতে হইবে।"

বাঙ্গালা ১১৬৫ সালে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় ১৪/০ বিঘা ভূমি রামপ্রসাদ সেনকে নিষ্কররূপে প্রদান করেন, তাঁহার সনন্দ পত্রে লিখিত আছে "গর আবাদি জঙ্গল ভূমি আবাদ করিয়া পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ভোগ দখল করিতে থাক।" পরন্তু তাহাতে রাজার মোহর ও নাম স্বাক্ষরিত আছে, এই ভূমি কুমারহট্টের অতি নিকটেই।

(ক্রমশঃ)

বিজ্ঞাপন।

শ্রাবণ মাসের পত্রিকা বাহির হইতে বিলম্ব হওয়ায় অনেকের নিকট হইতে অভিযোগ পত্র আসিয়াছে। সকল পত্রের উত্তর দেওয়া সম্ভব নহে বলিয়া পত্রিকার গ্রাহক ও অনুগ্রাহকবর্গের নিকট সানুনয় নিবেদন এই যে, যন্ত্রালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ হইতে কম্পোজিটর ও প্রেসম্যান পর্য্যন্ত সংক্রামক জ্বরে আক্রান্ত হওয়ায় এইরূপ বিলম্ব ঘটিয়াছে, আশা করি তজ্জন্য ত্রুটি ক্ষমা করিবেন। নিঃ—কার্য্যাধ্যক্ষ।

MADRAS HARBOUR.

মান্দ্রাজ বন্দর।

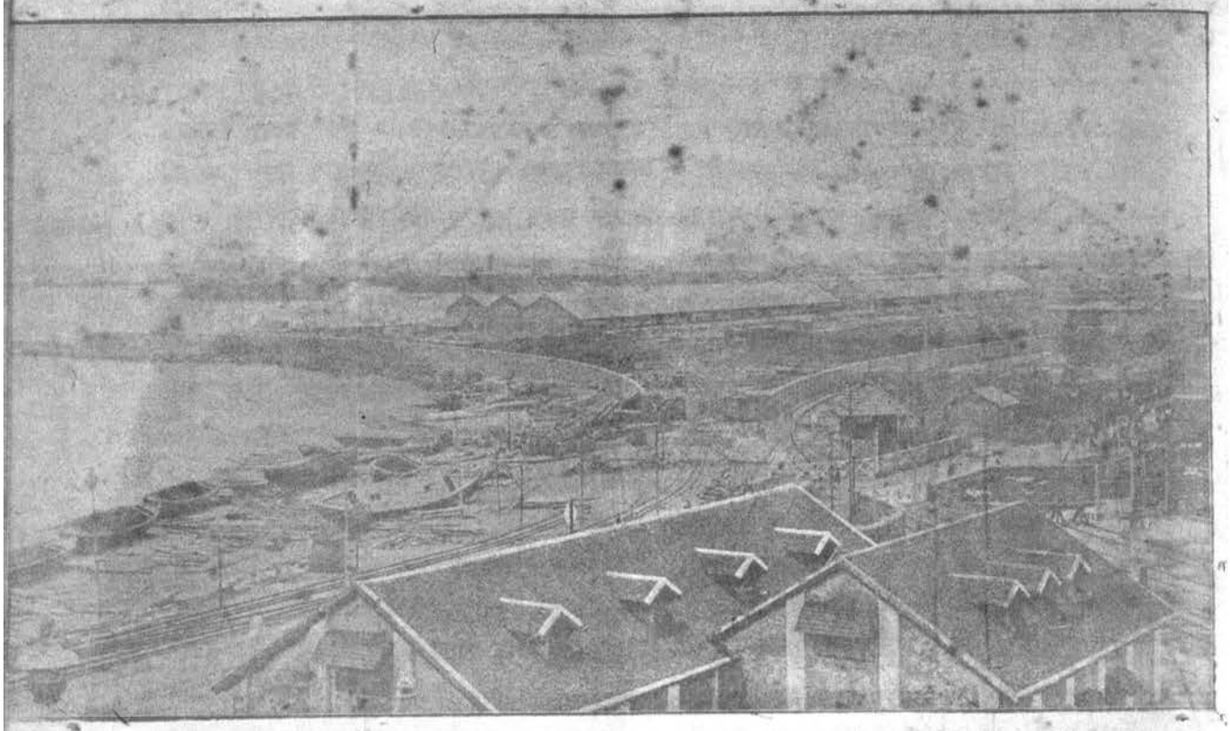

জার্ম্মান রণতরী এমডেন মান্দ্রাজ বন্দরকে চিরস্মরণীয় করিয়াছে।

পর্ত্তুগীজ বন্দর মারমো গোয়ায় পাঁচখানি জার্ম্মান এবং অষ্ট্রিয় বাণিজ্যপোত আটক পড়িয়াছে।

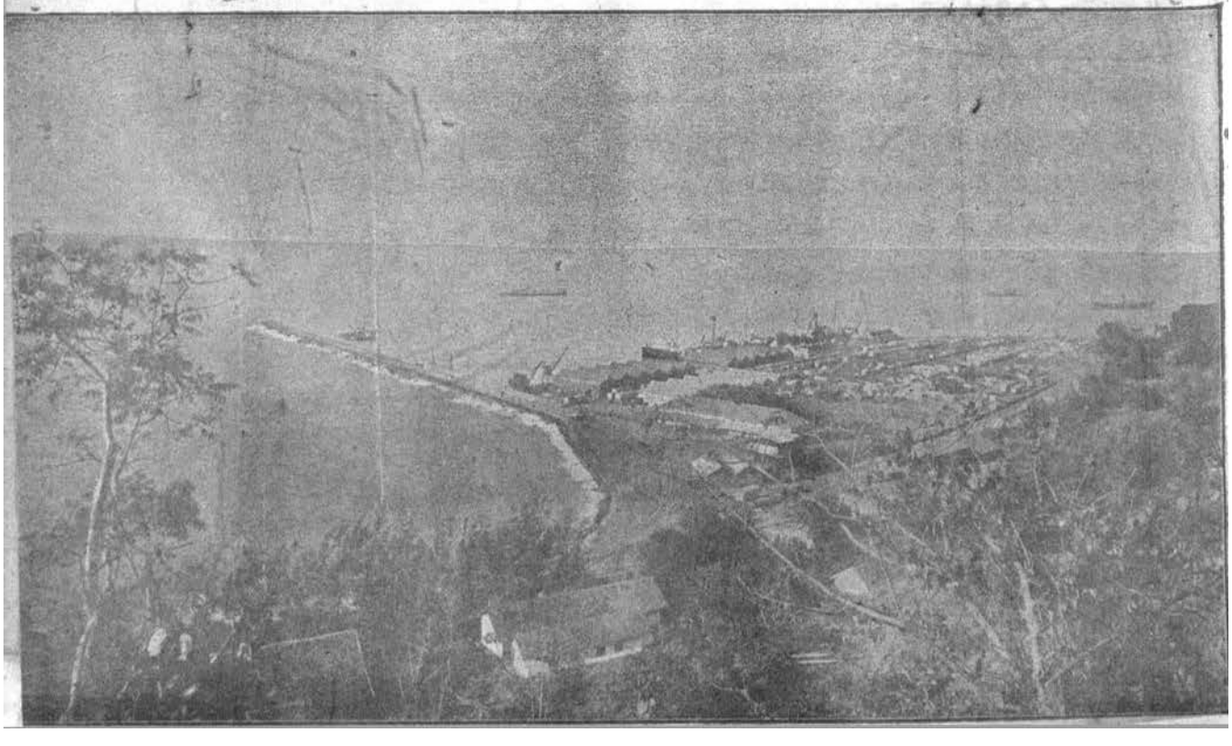

ঊনবিংশ কল্প
চতুর্থ ভাগ।
ভাদ্র, ব্রাহ্মসম্বৎ ৮৯।

১০১ সংখ্যা

১৮৪০ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিব স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"

উদ্বোধন।

আজ আমরা এই উপাসনামন্দিরে আসিয়াছি, সেই বিশ্বপিতা পরমমাতা পরমেশ্বরের নাম গান করিবার জন্য। এমন শুভ অবসর আমরা কেমন করিয়া ছাড়িয়া দিই? ঘরে অনেক সময় নানা অশান্তি নানা অভাব-অভিযোগ আসিয়া পড়ে, কিন্তু এই উপাসনামন্দিরে সেই সকল অশান্তি অভাব-অভিযোগের কোন কিছুই মনে আসিতে পারে না—সে সমস্তই তো পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছি। এই সমস্ত অন্তত একদিনের জন্য এক ঘণ্টারও জন্য পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়া আত্মার অন্তরে সেই আত্মার আত্মা পরমাত্মাকে দেখিবার চেষ্টা করিব বলিয়াই তো এই উপাসনামন্দিরে আসিয়াছি। ইহা যদি স্বীকার করিতে হয় যে আমাদের এই শরীরের মধ্যে 'আমি' বলিয়া একজন কর্ত্তা আছে, তাহা হইলেই ইহাও না স্বীকার করিয়া উপায় নাই যে এই ব্রহ্মচক্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে ওতপ্রোতরূপে এক বিধাতা পুরুষ আছেন। সেই বিধাতা পুরুষ আছেন বলিয়াই আমরাও আছি। সেই বিশ্ব-বিধাতাকে জানিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য, তাহাও কি আর কাহাকে বলিয়া দিতে হইবে? এই উপাসনা-মন্দিরে সেই চেষ্টার একটা সুন্দর অবসর পাই, ইহা কে অস্বীকার করিতে পারেন? এমন অনেকে আছেন যাঁহারা উপাসনামন্দিরে আসিয়া এই অবসর লাভের ভাব হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারেন না বলিয়া উপাসনামন্দিরে আসিবার প্রয়োজনই স্বীকার করেন না। উপাসনামন্দিরে আসিবার প্রয়োজন নাই একথা নিতান্ত বালকের উপযুক্ত কথা।

আরও এক কারণে উপাসনামন্দিরে আসা নিতান্ত আবশ্যক। মনুষের মনে ঈশ্বরকে ধরিবার জন্য, তাঁহাকে হৃদয়ে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য একটা স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা আছে। অনেক সময়েই আমরা সেই আকাঙ্ক্ষাকে নানা বিষয়ের ভাবনায়, নানাবিধ মলিন জঞ্জালে আচ্ছাদিত করিয়া রাখি। তখন সেই আকাঙ্ক্ষার কথা ভুলিয়া যাই, সেদিকে আর আমাদের দৃষ্টি পড়িতে চাহে না। তখন আর অন্তরে সেই আকাঙ্ক্ষার বিমল ধ্বনি আমাদের শ্রুতিগোচর হয় না। কিন্তু দেখা গিয়াছে যে একটা কথায়, একটা ইঙ্গিতে, একটা ঘটনায় অন্তরের বীণায় সেই আকাঙ্ক্ষার ধ্বনি সহসা কেমন আশ্চর্য্য ঝঙ্কার দিয়া উঠিয়াছে। কখন্ কোন্ মানবাত্মার অন্তরে কোন্ ইঙ্গিতে কোন্ কথায় যে ঝঙ্কার দিয়া উঠে, তাহা কে জানে? এক ফলবিক্রেত্রীর "বেলা চলে যায়" এই একটা কথায় বিষয়াসক্ত সুপ্রসিদ্ধ লালাবাবুর জীবনে কি যে আশ্চর্য্য ঝঙ্কার উঠিয়াছিল তাহা কাহার অবিদিত আছে? ক্রৌঞ্চবধের উদ্বেজনার ফলে দস্যু রত্নাকর যে কেমন করিয়া মুনি বাল্মীকিতে পরিণত হইয়াছিলেন, তাহা পুরাণাদিতে জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিত আছে। উপাসনামন্দিরে যে সকল গান হয়, যে সকল উপদেশ দেওয়া হয়, সেই সকল

গানের ভিতর উপদেশের ভিতর ঝঙ্কার আনয়নের উপযুক্ত ইঙ্গিত প্রচুর পরিমাণে লুক্কায়িত থাকে। সেই ইঙ্গিত ধরিবার জন্যও ব্রহ্মোপাসনায় সকলের যোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। প্রতীক্ষা করিতে হইবে, কখন্ কোন্ ইঙ্গিত আত্মাতে ঝঙ্কার আনয়ন করিয়া আমার দেহ মন ও আত্মার সর্ব্ব-অঙ্গকে তড়িৎ-শক্তিময় করিয়া তুলে।

বিবেকতত্ত্ব।

(শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যানিধি এম্, এ, বি এল্)

ইষ্টানিষ্টত্ববোধিকা শক্তির্হি বিবেকো নাম।

(পূর্ব্বানুবৃত্তির পর)

বিবেক যদি একটা অনুভূতি ব্যতীত আর কিছুই নয় তবে অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের মত আমাদের একটী নৈতিক ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয় যেহেতু ইন্দ্রিয় না থাকিলে কোনও অনুভূতি আসিতে পারে না। আবার যেমন কোনও কোনও ইন্দ্রিয়শক্তির অভাব হইলেও আমরা মনুষ্যপদবাচ্য হইয়া থাকি তদ্রূপ এই নৈতিক ইন্দ্রিয়শক্তির অভাবেও আমাদের মনুষ্যত্বের হানি হয় না অতএব নীতিজ্ঞান আমাদের মনুষ্যত্বের অত্যাবশ্যকীয় উপাদান নহে আমরা অনুভূতিবাদ স্বীকার করিলে এইরূপ উৎকট সিদ্ধান্তে উপনীত হই; আর নীতিজ্ঞান যে অন্তঃকরণের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস এই পূর্ব্বাভাসের সহিত এই সিদ্ধান্তের কোনও সামঞ্জস্য থাকে না। যাহা অন্তঃকরণের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস তাহার উন্মেষের জন্য কোনও বহিঃশক্তির প্রয়োজন হয় না, কিন্তু যদি একটী নৈতিক ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় তাহা হইলে ঐ উচ্ছ্বাস ঐ নৈতিক ইন্দ্রিয়ের শক্তির প্রভাবেই আমাদের অন্তঃকরণে উদ্বেলিত হয় এই অসামঞ্জস্য আসিয়া পড়ে। অধিকন্তু যদি নীতিজ্ঞানের জন্য বিশেষ কোনও ইন্দ্রিয় থাকিত তবে আমরা কর্ম্মের ইষ্টানিষ্টত্ব সম্বন্ধে দেশকালগত পার্থক্য দেখিতে পাইতাম না। যেরূপ ইন্দ্রিয়সকলই বস্তুজ্ঞানের উৎপত্তির মূল হওয়াতে আমাদের পদার্থের স্বরূপজ্ঞান সম্বন্ধে দেশকাল গত পার্থক্য দেখা যায় না, পদার্থের আকৃতি ও বর্ণ প্রভৃতি বিষয়জ্ঞানে যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন দেশে ও ভিন্ন ভিন্ন যুগে বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয় না, তদ্রূপ কর্ম্মের ইষ্টানিষ্টত্ব সম্বন্ধেও কোনও বৈষম্য পরিলক্ষিত হইত না। যাহা শুভ্র যাহা মণ্ডলাকৃতি তত্তদ্ বিষয়ে যেমন কোনও দেশে কোনও কালে মতভেদ নাই, সেইরূপ যাহা ইষ্ট তাহা বিশ্বের সর্ব্বত্রই এবং সকল সময়েই ইষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইত; কিন্তু বস্তুতঃ আমরা দেখিতে পাই যে এক যুগে যাহা ইষ্ট ছিল অন্যযুগে তাহা অনিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে, পূর্ব্বে যাহা অনিষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইত আজ তাহা ইষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। আবার নীতিজ্ঞান অন্তরের উচ্ছ্বাস হইলে নীতিবিষয়ে আমাদের ভ্রান্তিপ্রমাদ সংশোধনের কোনও উপায় থাকিত না এবং আমরা পাপাচরণ করিয়াও এই কর্ম্ম আমরা অন্তরের স্বাভাবিক উচ্ছাস দ্বারা প্রণোদিত হইয়া করিয়াছি সুতরাং ইহা নীতি-বিগর্হিত হইতে পারে না মনে করিয়া কখনই পাপের প্রায়শ্চিত্তে ব্রতী হইতে পারিতাম না; কিংবা পাপানুষ্ঠানের পর কখনই আমাদের পশ্চাত্তাপ হইত না; কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে আমাদের জীবনে কত সময়ে কত ভ্রান্তিপ্রমাদ ঘটিতেছে যাহা আমরা পরে যুক্তির বিচারে সংশোধিত করিয়া লই। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে যাহা অন্তরের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস তাহাই নীতির আদর্শ নহে, কেবল অনুভূতিই বিবেক নহে, বিবেক তাহার অনেক উচ্চে অবস্থিত। এজন্য কেহ কেহ বলিয়া থাকেন শুদ্ধ যুক্তি যাহা আমাদের দৈনন্দিন ভ্রান্তিপ্রমাদ সংশোধন করিয়া দেয় তাহাই বিবেক।

যাঁহারা কোনও নৈতিক ইন্দ্রিয়বিশেষের অনুভূতিকে বিবেক না বলিয়া কেবল শুদ্ধ যুক্তিকেই বিবেক বলেন তাঁহাদের মত এই যে আমাদের প্রকৃতিতেই কতকগুলি নীতিসূত্র আছে যাহা আমরা যুক্তিমূলক বুদ্ধির সাহায্যে অবগত হইতে পারি। এই নীতিসূত্রগুলি নিত্য, অক্ষয়, চিরন্তন, স্থিতিশীল, অত্যাবশ্যকীয় এবং স্বতঃসম্ভূত ও স্বতঃসিদ্ধ। শুদ্ধ যুক্তিমূলক বুদ্ধির বা বিবেকের সাহায্যে আমরা নীতিসূত্রগুলি জানিতে পারি সুতরাং আমাদের নীতিজ্ঞান বিষয়ে ভ্রান্তি হইতে পারে না।

বিবেক অভ্রান্তভাবে নীতিসূত্রগুলি আমাদিগকে দেখাইয়া দেয়। যেরূপ আমাদের চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়কে কিরূপে কি উপায়ে এবং কোন্ বিষয় দেখিতে বা শুনিতে হইবে তাহা শিখাইয়া দিতে হয় না, তদ্রূপ নীতিসূত্রগুলি কি এবং কি উপায়ে পাইতে হইবে, বিবেককে তাহা বুঝাইয়া দিতে হয় না। এই সূত্রগুলি মানবপ্রকৃতিতেই ওতপ্রোত-ভাবে লুক্কায়িত থাকে, বিবেক শুধু এই সূত্রগুলি—এই চিরন্তন তথ্যগুলি প্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখাইয়া দেয়। এই তথ্যগুলি আমাদের মানস-চক্ষের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইবার পর কোনও একটী কর্ম্ম ইষ্ট কি অনিষ্ট তাহা আমরা দেখিয়া লই এবং যদি কোনও নীতিসূত্রের সহিত ঐ কর্ম্মের সমন্বয় থাকে তবে ঐ কর্ম্ম আমাদের ইষ্ট আর যদি সমন্বয়ের অভাব ও অসামঞ্জস্য দেখিতে পাই, তবে উহা অনিষ্ট ও অকার্য্য বলি। এক্ষণে বুঝিতে হইবে—বিবেক যদি সকলকেই অভ্রান্ত-ভাবে নীতিসূত্রগুলি দেখাইয়া দেয়, তাহা হইলে নীতিজগতে এত মতভেদ,—কর্ম্মের ইষ্টানিষ্টত্ব সম্বন্ধে এত মতবৈষম্য হইবার কারণ কি? সকলেরই যদি বিবেক অভ্রান্তভাবে নীতির তথ্য বলিয়া দেয়, তবে যাহা সৎ যাহা ইষ্ট তাহা সকলের নিকটই একরূপ হইবে; কিন্তু আমরা দেখিতে পাই সক-লের ইষ্টানিষ্টত্বের বিচার একরূপ নহে। এরূপ হইবার কারণ এই যে যদিও বিবেক সকলকেই একইপ্রকার নীতিসূত্র বলিয়া দেয়, তথাপি ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির বিষয়বিশেষে সেই সূত্র প্রয়োগ করিবার কৌশল ভেদে বিচারের বৈষম্য হইয়া থাকে। নীতির সাধারণ সূত্রগুলি সকলের নিকটই একইরূপে উদ্ভাসিত হয় বটে কিন্তু উহাদের তাৎ-পর্য্যগ্রহণে সামর্থ্য ব্যক্তিভেদে বিভিন্নপ্রকার। সূত্রগুলি অন্তরের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস এবং বিবেক-গম্য হইলেও উহাদের তাৎপর্য্যবোধ কাহারও প্রকৃতি-সিদ্ধ নহে—সকলেই নিজ নিজ অভিজ্ঞতা অনুসারে বিষয় বিশেষে সাধারণ সূত্রের সমন্বয় করিবার চেষ্টা করে, সেই জন্যই ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নীতিজ্ঞানে এত বৈষম্য। আমাদের অন্তরের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস বলিয়া নীতিসূত্রগুলির শুভাশুভত্ব আমরা পর্য্যালোচনা করিতে পারি না—শুভই হউক আর অশুভই হউক সূত্রগুলি স্বীকার করিয়া লইতে হয়। এইটীই উচ্ছ্বসবাদের দোষ বলিতে হইবে—কারণ সূত্রগুলি স্বীকার্য্য বলিয়া গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে যুক্তিযুক্ত কি অযৌক্তিক তাহা বিচার না করিয়া আমরা তৃপ্ত হইতে পারি না, আবার এই বিচার করিতে হইলে আরও উচ্চস্তরে অবস্থিত একটী আদর্শ দেখিয়া লইতে হইবে যদ্দ্বারা ঐ সূত্রগুলি পরীক্ষা করা যায়। আমরা এই আদর্শটীকে আত্মার চরমোৎকর্ষ সাধন বা আত্ম-সম্প্রাপ্তি বলিব এবং যে নীতিসূত্র আত্মার এই চরমোৎকর্ষের পরিপোষক তাহাই যুক্তিমূলক আর যাহা ইহার পরিপন্থী তাহাই অযৌক্তিক বলিব। যে শক্তির প্রভাবে এই আত্মসম্প্রাপ্তির আদর্শ হৃদয়ঙ্গম করা যায় তাহাকেই বিবেক বলিতে হইবে। এক্ষণে বুঝিতে হইবে আত্মার চরমোৎকর্ষ সাধন বা আত্মসম্প্রাপ্তি—যে আদর্শের সাহায্যে আমাদের অন্তরে স্বতঃ উচ্ছ্বসিত নীতিসূত্রগুলির যৌক্তিকতা বা অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন হয় তাহার প্রকৃতি কি?

আমরা জানি যে জীব যদিও সংসারে জড়িত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে থাকে কিন্তু তাহার আত্মা সংসারের ঊর্দ্ধে অবস্থিত, আত্মার গতি সতত ঊর্দ্ধ-দিকে আত্মা ব্রহ্ম হইতে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। আবার ব্রহ্মেই লীন হইবার জন্য সতত উদ্যুক্ত। আবার আমরা বলিয়া থাকি যে ব্রহ্মই কেবল সৎ আর সকল বস্তুই অসৎ। তাহা হইলে ব্রহ্মই আমাদের ইষ্টতম, আমাদের ব্রহ্মকেই পাইতে হইবে। ব্রহ্মকে পাইতে হইলে আমাদের আত্মরূপে উদ্ভাসিত স্বপ্রকাশকে জানিতে হইবে, কারণ আত্মাতে ব্রহ্মকে যেরূপ বিকাশপ্রাপ্ত দেখিতে পাই, অন্য কিছুতেই আমরা তেমন পাই না। এই ব্রহ্মস্বরূপ আত্মাকে এই স্বপ্রকাশকে অবগত হওয়ার নামই আত্মসম্প্রাপ্তি। কেবল অনুভূতির দ্বারা চালিত হইয়া আমরা আত্মার উৎকর্ষ সাধন করিতে পারি না, কারণ অনুভূতি ইন্দ্রিয়ের সহিত বাহ্যবস্তুর ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার ফলমাত্র। আবার আমরা অনুভূতিকে ছাড়িতে পারি না, কারণ ইন্দ্রিয় না থাকিলে আমরা কোনও কর্ম্মই করিতে পারি না এবং ইন্দ্রিয় থাকিলেই অনুভূতি থাকি-

বেই থাকিবে। যখন আমরা অনুভূতি ছাড়িতে পারিব না, তখন আমাদের যুক্তির বেদীতে অনুভূতির সংস্কার করিয়া লওয়াই আত্মোৎকর্ষসাধনের একমাত্র উপায়। কেবল ইন্দ্রিয়ানুভূতির দ্বারা চালিত না হইয়া যদি আমরা আত্মযুক্তি দ্বারা পরিশোধিত অনভূতিকে ইষ্টানিষ্টত্ব বিচারের জন্য প্রযুক্ত করি তাহা হইলে আমরা বুঝিতে পারিব, ইন্দ্রিয়-সুখাবহ সকল অনুভূতিই আমাদের ইষ্টত্ব-নির্ণয়ের উপায় নহে কিংবা দুঃখময় অনুভূতি মাত্রই আমাদের অনিষ্টত্বের নিরূপক নহে। অতএব যে শক্তির প্রভাবে আমরা আমাদের ইন্দ্রিয় ও বাহ্যবস্তুর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াত্মক অনুভূতিকে যুক্তির বেদীতে সংশোধিত করিয়া লইয়া ইষ্টানিষ্টত্ব বিচারের উপায়ীভূত করিয়া লইতে পারি, তাহাকেই বিবেক আখ্যা দিতে হইবে—যাহার নির্দেশে অবস্থিত হইয়া আমরা আত্মার চরমোৎকর্ষ সাধন করিতে পারি, চিন্ময় আত্মস্বরূপ স্বপ্রকাশকে অন্তরে উপলব্ধ করিতে পারি, আত্মসম্প্রাপ্তির উচ্চতম স্তরে দণ্ডায়মান হইয়া মানব প্রকৃতির পূর্ণত্ব ও ব্রহ্মসাযুজ্যযোগ্যতা চিদাকাশে চিত্রিত করিয়া লইতে পারি।

বেলা যায়।

বেলা চলে যায় তোমা পানে চেয়ে
দিবানিশি একা বসি
আঁধার ঘরে
শূন্য হিয়ে।
কবে হবে পূর্ণ আশা
সার্থ হবে ভালবাসা
ভেসে যাবে উছল প্রেমে
হৃদয়-তীরে
জননি হে।
কত লোক তো যায় মা চলে
চায় নাকো কেউ বারেক ফিরে—
পথের ধারে কে কোথা পড়ে।
মরণ-ছোঁয়া কেবা ছেলে—
তারেও তুমি যাও না ভুলে;
তারেও তুমি লও মা তুলে
আদর করে
জননি হে॥

বৌদ্ধমহিলা রাজনন্দিনী মালিনী।

(পণ্ডিত শ্রীহরিদেব শাস্ত্রী)

(পূর্ব্ব প্রকাশের অনুবৃত্ত)

সারনাথ বা মৃগদাব কাশীনগরী হইতে বেশী দূরে অবস্থিত নহে। সংসারাসক্ত মূঢ় নরনারীগণের কোলাহলে উহা মুখরিত নহে। ঐ স্থানটী সদাই শান্তিপূর্ণ। তথায়, ত্যাগী বৌদ্ধ যোগিগণ বাস করিয়া তপস্যা করেন। তথায় বৌদ্ধ নারীকুলের কল্যাণ সাধনার্থ একটি বৃহৎ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম শিক্ষা দাও। এরূপ একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিতে এবং তাহার স্থায়িত্ব সম্পাদনে যাহা ব্যয় হইবে, তাহা বহন করিব। তুমি যখন নারীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তখন নারীকুলের কল্যাণ সাধন করাই, নারীকুলের হিতসাধনার্থ জীবন সমর্পণ করাই তোমার উচিত কার্য্য। অতএব তোমার জীবনের অনেক কর্ত্তব্য কর্ম্ম এখনও অবশিষ্ট আছে। সুতরাং তুমি বনে গেলে চলিবে না। বনে বাস করিলে লোকসমাজের কিছু উপকার সাধিত হইবে না। তুমি গোপনে বৌদ্ধধর্ম্ম শিক্ষা করিয়া যে এত শক্তি লাভ করিয়াছ, এত বৈরাগ্য লাভ করিতে পারিয়াছ, তাহা আমি পূর্ব্বে জানিতে পারি নাই। সেই জন্যই আমি রাজসভার পণ্ডিতগণের উপদেশের বশবর্ত্তী হইয়া তোমার নির্ব্বাসনের আদেশ প্রদান করিয়াছিলাম। মা, তজ্জন্য তুমি দুঃখিত হইও না। পিতার প্রতি ক্রুদ্ধ হইও না। তোমাকে এ বিষয়ে বেশী বলাই বাহুল্য মাত্র। তুমি আমাদিগকে সৎপথে পরিচালিত কর। শান্তিপূর্ণ নির্জ্জন সারনাথেই বাস কর। অন্যত্র কুত্রাপি যাইও না। মহারাজ কৃকীর এই আদেশ শুনিয়া সুশীলা বুদ্ধিমতী শিক্ষিতা পিতৃ-আজ্ঞানুবর্ত্তিনী মালিনী "তথাস্তু" বলিয়া পিতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলেন। মহারাজ কৃকী সারনাথে দশ হাজার বৌদ্ধ মহিলা ছাত্রীর বাসোপযোগী একটি বৃহৎ বিদ্যালয় নির্ম্মাণ করাইতে আরম্ভ করিলেন। যথাসময়ে উহা নির্ম্মিত হইল। তিনি সেই সমস্ত ছাত্রীর অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিয়া দিলেন। মালিনী পিতৃপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া সেই মঠে ছাত্রীদের অভিভাবিকা হইয়া

বাস করিতে লাগিলেন। তথায় বহু অধ্যাপিকা নিযুক্ত হইল। সুন্দররূপে বিদ্যালয়ের কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতে লাগিল। মালিনী অধ্যয়ন, অধ্যাপন, ধর্ম্মপ্রচার ও দানাদি সৎকার্য্যে সদা ব্যাপৃত থাকিয়া নারীকুলের কল্যাণ সাধন করিতে লাগিলেন। মহারাজ কৃকীও কন্যার এইরূপ সৎকার্য্যে যথেষ্ট আনুকূল্য করিতে লাগিলেন। জগতে নারীজীবনের উৎকর্ষ সাধিত হইতে লাগিল। কাশীর উপনগর সারনাথ নামক স্থানে বৌদ্ধদিগের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। নানাদিগ্‌দেশ হইতে সুশিক্ষাপ্রার্থিনী সদ্ধর্ম্মাবলম্বিনী বৌদ্ধমহিলারা উক্ত মঠে সমাগত হইয়া নির্ব্বাণমুক্তিশাস্ত্রাদি শিক্ষা করিতে লাগিলেন। কাশীর সারনাথ বৌদ্ধমহিলাবিদ্যালয়ের কেন্দ্রস্থানে পরিণত হইল। দিন দিন সারনাথের সমৃদ্ধি বাড়িতে লাগিল। কালের করাল কুক্ষিতে সেই সমৃদ্ধি এক্ষণে বিলীন হইয়া গেলেও আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বের নির্ম্মিত বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকার দর্পণতুল্য সুদৃশ্য প্রস্তরখণ্ডগুলি,—সেই প্রস্তরময় সিংহ ব্যাঘ্রাদি জন্তুগুলি অদ্যাপি নূতনবৎ প্রতীয়মান হইয়া থাকে। এবং প্রাচীন সুসভ্যতম দেশ ভারতবর্ষের স্থপতিবিদ্যার অমূল্য উজ্জ্বল নিদর্শন প্রদর্শন করিতেছে। যাঁহার রাজ্যে সূর্য্য অস্তমিত হন না, সেই বৃটিশসিংহ ভারতসম্রাটের ভূতপূর্ব্ব মহাপ্রতাপ বিদ্বান প্রতিনিধি লর্ড কর্জ্জন মহোদয়ের কৃপায় সারনাথের ঐ প্রাচীন অবশিষ্ট প্রোথিত গৌরব ভূমিমধ্য হইতে উত্থাপিত হইয়া এক্ষণে দর্শকগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছে। লর্ড কর্জ্জনের আদেশে বহু অর্থ ব্যয়ে ভূগর্ভপ্রোথিত ঐ অট্টালিকাদির অংশগুলি উত্তোলিত হইয়া প্রাসাদসম নবনির্ম্মিত গৃহে সুরক্ষিত হইতেছে এবং আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বের ভারতীয় স্থাপত্যকৌশল ও ভারতীয় সভ্যতা বিঘোষিত হইতেছে। ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের কৃপায় আজ আমরা আমাদের জিনিষ দেখিতে পাইয়া অসীম আনন্দ অনুভব করিতেছি। সেইজন্য ও নানা কারণে ভগবানের নিকটে সর্ব্বদাই প্রার্থনা করিতেছি যে, ভারতসম্রাটের ভারতসাম্রাজ্য চিরস্থায়ী হউক। আমাদের অতীত গৌরবের পুনরুদ্ধার হউক। অধঃপতিত এই দেশের বিলুপ্ত শ্রী পুনরুদীয়মান হউক। আমাদের কলাবিদ্যাদি যেন পুনরায় উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হয়। হে ভগবন্, তোমার নিকটে ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা। তুমি আশীর্ব্বাদ কর। তোমার আশীর্ব্বাদ অবশ্য সফল হইবে।

কর্ণাটের বৈষ্ণব কবি।

(শ্রীকালীপ্রসন্ন বিশ্বাস)

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক অদ্বৈত মত প্রচারের প্রায় তিন শত বৎসর পরে দাক্ষিণাত্যে বৈষ্ণব মতের এক প্রবল স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। এই স্রোতে অনেক জৈন এবং শৈব বৈষ্ণব মতের কূলে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিল। যে সকল ঔপনিষদ শ্লোকের উপর শঙ্করাচার্য্য তাঁহার অদ্বৈত মত স্থাপিত করিয়াছিলেন, বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রবর্ত্তকগণ সেই সকল শ্লোকের বিভিন্ন ভাষ্য দ্বারা অদ্বৈত মত খণ্ডন এবং বিশিষ্টাদ্বৈত ও দ্বৈতমত প্রসিদ্ধ করেন।

দাক্ষিণাত্যে শ্রীমৎ রামানুজ স্বামীই বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রথম প্রবর্ত্তক। তিনি খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে মান্দ্রাজের অন্তর্গত শ্রীরঙ্গম নামক স্থানে বিশিষ্টাদ্বৈত বৈষ্ণবমত প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। তৎপরে শৈবগণ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া কর্ণাট প্রদেশেই আসিয়া তত্রস্থ প্রসিদ্ধ জৈন রাজা বল্লালকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করেন এবং মেলকোটী নামক স্থানে তাঁহার মঠ স্থাপন করেন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় ভাষ্যাদি রচনা করেন। তাঁহার শিষ্যগণ তামিল ভাষাতেই পুস্তকাদি রচনা করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীরামানুচার্য্যের তিরোভাবের প্রায় এক শত বৎসর পরে (খৃঃ ত্রয়োদশ শতাব্দে) শ্রীমৎ আনন্দ তীর্থ বা মধ্বাচার্য্য কর্ণাটের উলজী নামক স্থানে তাঁহার দ্বৈত বৈষ্ণবমত প্রচার করেন। তিনি যদিও স্বয়ং সংস্কৃত ভাষায় ভাষ্যাদি লিখিয়াছেন, তথাপি তিনি তাঁহার শিষ্যগণকে কন্নাড়ভাষা ব্যবহার করিতে উৎসাহিত করিতেন।

বৈষ্ণব সাধুগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঙ্গীত রচনা করিয়া গ্রামে গ্রামে ঐ সঙ্গীতের সাহায্যে ধর্ম্ম প্রচার করিতেন। ইঁহারাই দাসকবি নামে উক্ত হয়েন। দাসকবিগণের মধ্যে পুরন্দর দাসই সর্ব্বপ্রাচীন

এবং শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হন। তৎপরে বেতর * জাতীয় প্রসিদ্ধ সাধক কনক দাসের নাম উল্লেখ যোগ্য। এতদ্ভিন্ন বরাহ ডিমাপ্পা দাস, বিট্টল দাস, বেম্কট দাস, বিজয় দাস, কৃষ্ণ দাস নামক আরও কয়েক জন দাসকবির পরিচয় পাওয়া যায়।

আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রধান দাসকবি পুরন্দর দাস এবং কনক দাসের কয়েকটি কবিতার অনুবাদ প্রদান করিব।

পুরন্দর দাস।

পুরন্দর দাস সম্বন্ধে নিম্ন লিখিত আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে। অহনাবাদ জেলায় পুরন্দরগড় নামক তালুকে পুরন্দর নামক একজন অতি কৃপণ স্মার্ত্ত (শৈব) ব্রাহ্মণ বাস করিত। সে কখন কাহাকেও একটি কপর্দক মাত্রও দান করিত না। একদিন একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাহার নিকট কিছু ভিক্ষা প্রার্থনা করে। পুরন্দর অদ্য নহে কল্য আসিও প্রাতে নহে সায়াহ্নে, অদ্য আমার অবকাশ নাই ইত্যাদি নানা মিথ্যা বলিয়া তাহাকে প্রতিদিন ফিরাইয়া দিত। ব্রাহ্মণও কিন্তু কথিত মত সময়ে পুনরায় দর্শন দিত। এইরূপে প্রায় এক বৎসর কাল অতিবাহিত হইলে পর একদিন পুরন্দর অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া এক মুষ্টি মূল্যহীন কৃত্রিম ধাতব পদার্থ লইয়া ভিক্ষুক ব্রাহ্মণকে দিল। ব্রাহ্মণ তাহা না লইয়া পশ্চাৎ দ্বার দিয়া পুরন্দরের অন্তঃপুরে গমন পূর্ব্বক পুরন্দরপত্নীর নিকট যাইয়া বলিল "আমার পুত্রের উপনয়ন উপলক্ষে কিছু ভিক্ষা দাও।" পুরন্দরপত্নী "আমার নিকট কিছুই নাই। গৃহস্বামীর নিকট যাও" এইরূপ উত্তর করিল। ব্রাহ্মণ পুনরায় কহিল "তোমার নাসিকায় যে নথ আছে তাহাই আমাকে প্রদান কর।" পুরন্দরপত্নী "আমার স্বামী কখন কাহাকেও এক কপর্দ্দক দান করেন না, আমি না হয় কিছু দান করি" এইরূপ মনে করিয়া ঐ নথটি খুলিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ সেই নথটি লইয়া গিয়া পুরন্দর সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিল "আমাকে এই নথটি বন্ধক রাখিয়া কিছু অর্থ দাও।" পুরন্দর সেই নথটি তাঁহার স্ত্রীর অলঙ্কার সন্দেহ করত নথটি পেটী মধ্যে স্থাপন করিয়া ব্রাহ্মণকে "এখন টাকা নাই সন্ধ্যাকালে আসিয়া লইয়া যাইও" বলিয়া ফিরাইয়া দিল। তৎপরে গৃহে গমন পূর্ব্বক স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নথ কোথায়?" তাহার পত্নী উত্তর করিল "খুলিয়া রাখিয়াছি।" ইহা শুনিয়া পুরন্দর অতিশয় রুষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ নথ উপস্থিত করিবার জন্য কঠিন আদেশ করিল। ইহাতে পুরন্দরপত্নী যার পর নাই ভীতা হইয়া বিষপানে জীবন বিসর্জ্জন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে যেমন সে বিষপাত্র মুখের নিকট আনিল অমনি তন্মধ্যে সেই নথটি দেখিতে পাইল। তৎক্ষণাৎ সে সেই নথ আনিয়া স্বামীহস্তে সমর্পণ করিল। পুরন্দর নথ লইয়া দোকানে গমন করিয়া দেখিল পেটী মধ্যে নথ নাই! ইহাতে সে যারপর নাই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পুনরায় গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া পত্নীকে এই নথ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিল। পুরন্দরপত্নী যথাযথ সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিল। এই ঘটনায় পুরন্দরের মনে পশ্চাৎতাপ আসিয়া ঘোর বৈরাগ্য উপস্থিত হইল। পরে সমস্ত সম্পত্তি দরিদ্রগণকে দান করিয়া স্ত্রীপুত্র সহ ভিক্ষা করিতে করিতে পাণ্ডারপুরে বিটবাদেবমন্দিরের নিকট আসিয়া অবস্থান করিল। তৎপরে তাহার অসাধারণ হরিভক্তি দেখিয়া বিজয়নগরের সম্রাট অচ্যুতরায় তাহাকে স্বীয় রাজধানীতে লইয়া আসে। এই স্থানেই খ্রীঃ ১৫৬৪ অব্দে পুরন্দরের মৃত্যু হয়।

পুরন্দর দাস ভক্তিমার্গের একজন শ্রেষ্ঠ কবি। তাহার কবিতা শুনিলে অতি পাষাণ হৃদয়ও ভগবৎপ্রেমে বিগলিত হয়। তাহার ভাষা যেমন প্রাঞ্জল ও মধুর, কবিত্বশক্তিও তদ্রূপ অতুলনীয়। অনুবাদের দ্বারা ইহার পরিচয় দেওয়া অসম্ভব। আমরা নিম্নে পুরন্দর দাসের কয়েকটি সঙ্গীত ভাষান্তর করিয়া দিলাম।

তোমরা কে মিছরী নেবে গো,
আমার মিছরী নেবে গো,
(আমার) এ মিছরী কভু হয়নিক,
বলদের পিঠে লাদা, গো,

* এই জাতি মাহার ভিন্ন অপর হিন্দু জাতি অপেক্ষা নিকৃষ্ট।

(আমার) এ মিছরী কভু পড়েনিক
বোয়ার মধ্যে বাঁধা গো,
(আমার) এ মিছরী কভু ধারেনিক
কয়ের ধার রাজার গো,
তবুও ত সে খেতে মধুর,
লাভের হেতু আমার গো।
লও গো মোর মিছরী সবে
এ যে, বড়ই মধুর গো,
যেই খেয়েছে সেই বলেছে
ইহার তুল্য নাইক গো,
(আমার) বিষ্ণু নামের খাঁটি মালের
কোথাও তুল্য নাইক গো।

এ যে, সময়ে হয় না নষ্ট
বয় না মন্দ গন্ধ গো,
(আমার) এ মিছরী দিব বিনামূল্যে
যতই তোমরা চাবে গো,
(আমার) এ মিছরী কভু খেতে নারে
মিছরী খেকো পিপড়ে গো,
(আমার) এ মিছরী যশে ঘোষে লোকে
সকল সহরময় গো।

লও গো মোর মিছরী সবে
এ যে বড়ই মধুর গো,
যেই খেয়েছে সেই বলেছে
ইহার তুল্য নাইক গো,
(আমার) বিষ্ণু নামের খাঁটি মালের
কোথাও তুল্য নাইক গো।

ওগো বাজারে বাজারে ঘুরি
বল কিবা প্রয়োজন গো,
(আমার) মিছরী নাহি বিকয় বেনে
এ যে, হাটে নাহি যায় গো,
(আমার) মিছরী খেতে এতই ভাল
যে রসনা রাখানে গো,
(আমার) মিছরী নিয়ে বারেক দেখ,
এ বিষ্ণু নামের কন্দ গো।

লও গো মোর মিছরী সবে
এ যে বড়ই মধুর গো,
যেই খেয়েছে সেই বলেছে
ইহার তুল্য নাইক গো,
(আমার) বিষ্ণু নামের খাঁটি মালের
কোথাও তুল্য নাইক গো॥ ১

শুন গো ভগিনী ওগো, শুন মোর বাণী,
খাঁচা ছেড়ে চলে গেছে (মোর) তোতা গুণমণি।
যতনে পুষিনু তায়, শুন গো ভগিনী হায়,
মার্জ্জারে ধরিল তারে, মম অবসাদ গণি।
(আমার) ভালবাসার তোতাপাখী, সতত সাজায়ে রাখি,
মুক্তার শৃঙ্খলে তারে, কোথায় গেল জানিনি।
(ওগো) সজ্জা রঙ্গা তোতা মোর, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছিল তোর,
ফাঁকি দিয়ে উড়ে যাবি, এমন কভু ভাবিনি।
যতনে পালিনু আমি, খাইয়ে তারে নবনী,
উড়ে গেল আচম্বিতে, হাত হতে গো ভগিনী।
প্রাণ খুলে রাম রাম, বল্‌তো সে যে অবিরাম,
তোতা মোর কোমল কায়, ডাকতে কভু ভুলেনি।
(আমার) তোতা ছিল ভিতর ঘরে, নবদ্বার বন্ধ করে,
উড়ে গেল পিঞ্জর ভেঙ্গে, আকাশ পানে এখনি।
খেলিত কমল করে, বস্‌তো মণিবন্ধ পরে,
পুরন্দরের অন্তরঙ্গ, কোথা গেল তোতামণি॥ ২॥

আয়রে ভাই সবে মিলে, মুক্তা নিবি আয়।
সচ্চিদানন্দ রূপ মুক্তা, এনেছি হেথায়॥
মুক্তা আমার জ্ঞানের সুতায় বাঁধা,
এ যে অমূল্য ধন, মূল্য দিয়ে ভক্তে কেনে সদা,
আয়রে সব ত্বরা করে, কে আছে কোথায়॥
মুক্তা আমার কভু, রয়না নাকে বাঁধা,
এ যে অমূল্য ধন, থাকেনাক অলঙ্কারে গাঁথা,
কৃষ্ণ নামের মুক্তা মোর, সহজে বিকায়॥
মুক্তা আমার কেহ ধরিতে না পারে,
এ যে অমূল্য ধন, মূল্য এর নাহিক সংসারে,
পুরন্দরের মহা রত্ন, প্রভু দেবরায়॥ ৩॥

জীবনের কিবা কাজ, যদি না ভজয় হরি।
রসনার কিবা কাজ, যদি না বলয় হরি॥
ব্রাহ্মণের কিবা কাজ যদি নাহি জানে বেদ।
ক্ষত্রিয়ের কিবা কাজ, যে না জানে ধনুর্ব্বেদ।

সন্ন্যাসের কিবা কাজ যেবা নাহি ছাড়ে রোষ।
ভোজনের কিবা কাজ, বিনা বচন সন্তোষ।
পূজনের কিবা কাজ, বিনা সত্য চিত্তশুদ্ধি।
জপতপে কিবা কাজ, যদি না করে নিত্যসিদ্ধি।
হরিপূজা কিবা কাজ, যদি নাহি একমন।
মন্দিরের কিবা কাজ, বিনা পূজারী উত্তম।
সন্তানের কিবা কাজ, বিনা পিতৃমাতৃস্তুতি।
পুত্রবধূ কিবা কাজ, বিনা শ্বশ্রূ-সেবা-বৃত্তি।
সোদরের কিবা কাজ, যার নাহি ন্যায়জ্ঞান।
নাথকের * কিবা কাজ বিনা ক্রোধ সমাধান।
সন্তানের কিবা কাজ, যেবা মরে বাল্যকালে।
গুরুর কিবা কাজ যদি, নাহি উপদেশ দিলে।
নয়নের কিবা কাজ, নাহি দেখে প্রাণ ভরি।
বিট্টল নলিনীনাভ, রঙ্গ পুরন্দরের হরি ॥ ৪ ॥

বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত

গীতা-রহস্য।

সপ্তম প্রকরণ।

কাপিলসাংখ্যশাস্ত্র কিংবা ক্ষরাক্ষরবিচার।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদিত।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সে যাক; কাপিল সাংখ্যশাস্ত্রের অভ্যাস আজকাল প্রায় লুপ্ত হওয়াপ্রযুক্ত এই প্রস্তাবনা করা আবশ্যক হইয়াছে। এক্ষণে কাপিল সাংখ্য-শাস্ত্রের মুখ্য সিদ্ধান্তগুলি কি তাহা দেখা যাক্। সাংখ্যশাস্ত্রের প্রথম সিদ্ধান্ত এইরূপ যে, এই জগতে নূতন কিছুই উৎপন্ন হয় না; কারণ, শূন্য অর্থাৎ যাহা পূর্ব্বে ছিলই না তাহা হইতে শূন্য ছাড়া অন্য কিছুই নিষ্পন্ন হইতে পারে না। তাই, উৎপন্ন বস্তুর মধ্যে অর্থাৎ কার্য্যের মধ্যে যে গুণ দৃষ্টিগোচর হয় তাহা, যাহা হইতে উক্ত বস্তু উৎপন্ন হইয়াছিল তাহার মধ্যে অর্থাৎ কারণের মধ্যে সূক্ষ্ম আকারে অবশ্যই ছিল, এইরূপ নিয়ত বুঝিতে হইবে (সাং, কা, ৯)। বৌদ্ধ ও কাণাদ ইহাঁদের মতে, এক পদার্থের নাশ হইয়া তাহা হইতে অন্য নূতন পদার্থ প্রস্তুত হয়; উদাহরণ যথা—বীজের নাশ হইয়া তাহা হইতে অঙ্কুর এবং অঙ্কুরের নাশ হইয়া তাহা হইতে বৃক্ষ ইত্যাদি। কিন্তু সাংখ্যশাস্ত্রী ও বেদান্তী ইঁহারা এ মত স্বীকার করেন না। তাঁহারা এই-রূপ প্রতিপাদন করেন যে, বৃক্ষের বীজ হইতে যে দ্রব্য হয় তাহা বিনষ্ট না হইয়া তাহাই ভূমি হইতে ও বায়ু হইতে অন্য দ্রব্য আকর্ষণ করিয়া লওয়া প্রযুক্ত অঙ্কুর এই নূতন রূপ কিংবা অবস্থা প্রাপ্ত হয় (বেসু, শাঙ্কা, ২, ১, ২৮ দেখ)। সেইরূপ কাঠ জ্বলিলে তাহারই ছাই কিংবা ধোঁয়া ইত্যাদি রূপান্তর হয়; কাঠের দ্রব্য একেবারেই বিনষ্ট হইয়া ধূম এই নূতন পদার্থ হয় না। "কথমসতঃ সজ্জায়তে"—যাহা নাই তাহা হইতে যাহা আছে তাহা কি করিয়া উৎপন্ন হইবে—এইরূপ ছান্দোগ্যোপনিষদে উক্ত হইয়াছে (ছাং, ৬, ২, ২)। জগতের মূল কারণের প্রতি কখন কখন 'অসৎ' এই শব্দ প্রযুক্ত হয় (ছাং ৩, ১৯, ১; তৈ. ২, ৭, ১); কিন্তু তাহার 'অভাব=নাই' এরূপ অর্থ না করিয়া নামরূপাত্মক ব্যক্ত স্বরূপের কিংবা অবস্থার অভাব ইহাই বিবক্ষিত হইয়া থাকে, এইরূপ বেদান্তসূত্রে স্থিরীকৃত হইয়াছে (বেসু, ২, ১, ১৬, ১৭)। দুগ্ধ হইতেই দধি হয়, জল হইতে হয় না; তিল হইতে তৈল বাহির হয়, বালুকা হইতে বাহির হয় না; ইত্যাদি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতেই এই সিদ্ধান্ত বাহির করিতে হয়। কারণের মধ্যে না থাকা গুণ কার্য্যের মধ্যে স্বতন্ত্র উৎপন্ন হয় এইরূপ যদি স্বীকার করা যায়, তবে জল হইতে দধি কেন হয় না, ইহার কারণ বলা যাইতে পারে না। সার কথা—যাহা মূলেতে নাই, তাহা হইতে—যাহা এক্ষণে অস্তিত্বে আছে, তাহার উৎপত্তি হইতে পারে না। তাই, যে কোন কার্য্য ধর না কেন, তাহার এখনকার দ্রব্যাংশ ও গুণ মূল কার-ণেই কোন না কোন আকারে থাকা চাই এইরূপ সাংখ্যেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্তেরই নাম 'সৎকার্য্যবাদ'। পদার্থসমূহের জড়দ্রব্য ও কর্ম্মশক্তি চিরস্থায়ী এবং কোন পদার্থের যতই রূপান্তর হোক্ না কেন, শেষে সৃষ্টির অন্তর্ভূত সমগ্র দ্রব্যাংশের ও কর্ম্মশক্তির মোট পরিমাণ নিয়ত সমানই থাকে, এইরূপ সিদ্ধান্ত অর্ব্বাচীন পদার্থবিজ্ঞানশাস্ত্রীরাও স্থির করিয়াছেন। উদাহরণ

* 'নাথ' সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী।

যথা—দীপ জ্বলিয়া তৈল বিনষ্ট হইয়াছে এইরূপ মনে হইলেও আসলে তৈলের পরমাণু একেবারে বিনষ্ট না হইয়া কাজল, ধোঁয়া কিংবা অন্য সূক্ষ্ম দ্রব্যের আকারে উহার অস্তিত্ব থাকে; এবং এই সূক্ষ্ম দ্রব্যসকল একত্র করিয়া ওজন করিলে তাহা এবং তৈল পুড়িবার সময় তাহার সহিত মিশ্রিত হয় যে বায়ু-স্থিত পদার্থ—এই দুয়ের ওজন সমান হইয়া থাকে ; এবং এই নিয়ম কর্ম্মশক্তি সম্বন্ধেও প্রযুক্ত হয়, ইহা এক্ষণে সিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু আধুনিক পদার্থবিদ্যাশাস্ত্রের ও সাংখ্যের সিদ্ধান্ত, এই দুই দেখিতে এক হইলেও সাংখ্যগণের সিদ্ধান্ত এক-পদার্থ হইতে অন্য পদার্থ উৎপন্ন হওয়া এই একটি বিষয়েরই—অর্থাৎ বিশেষ করিয়া কার্য্যকারণভাবে-রই—বর্ণনা হওয়ায়, অর্ব্বাচীন পদার্থবিজ্ঞান শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত ইহা হইতে অধিক ব্যাপক, ইহা বিস্মৃত হইলে চলিবে না। কার্য্যের কোন গুণই কারণ বহির্ভূত গুণ হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না শুধু নহে, কারণগুলি কার্য্যের স্বরূপ প্রাপ্ত হওয়ায়, সেই কার্য্যের দ্রব্যাংশ ও কর্ম্মশক্তির একটুও নাশ না হইয়া পদার্থের বিভিন্ন অবস্থায় দ্রব্যাংশ ও কর্ম্মশক্তির মোট পরিমাণ একই থাকে. বাড়েও না কমেও না, এইরূপ প্রত্যক্ষ পরীক্ষার দ্বারা, গণিত-পদ্ধতি অনুসারে এক্ষণে স্থিরীকৃত হইয়াছে এবং এই দুই সিদ্ধান্তের মধ্যে ইহাই গুরুতর বিশেষত্ব। এইরূপ দৃষ্টিতে দেখিলে ভগবদ্গীতায় "না সতো বিদ্যতে ভাবঃ"—যাহা মূলে নাই তাহা কখনই অস্তিত্বে আসিতে পারে না—ইত্যাদি যে সিদ্ধান্ত দ্বিতীয় অধ্যায়ের আরম্ভে প্রদত্ত হইয়াছে (গী. ২. ১৬), তাহা সৎকার্য্যবাদের মতো দেখিতে হইলেও, নিছক কার্য্যাকারণাত্মক সৎকার্য্যবাদ অপেক্ষা, অর্ব্বাচীন পদার্থবিজ্ঞানশাস্ত্রের সিদ্ধান্তের সহিত উহার অধিক সাম্য আছে এইরূপ দেখা যায়। উপরে প্রদত্ত ছান্দোগ্য-উপনিষদের বচনের ভাবার্থও তাহাই। সার কথা—সৎকার্য্যবাদের সিদ্ধান্ত বেদান্তীরা স্বীকার করেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত, সগুণ সৃষ্টির বাহিরে খাটে না। নির্গুণ হইতে উৎপন্ন সগুণ কিরূপ দেখায় ইহার উপপত্তি বিভিন্ন প্রকারে প্রয়োগ করা আবশ্যক এইরূপ অদ্বৈত বেদান্ত-শাস্ত্রের মত। এই বেদান্ত মতের বিচার পরে অধ্যাত্মপ্রকরণে বিস্তৃতভাবে করা যাইবে। আপা-তত. সাংখ্য মতবাদের দৌড় কোন পর্য্যন্ত তাহারই বিচার করা কর্ত্তব্য হওয়ায় সৎকার্য্যবাদের সিদ্ধান্ত স্বীকৃত হইয়াছে মানিয়া লইয়া ক্ষরাক্ষর শাস্ত্রে সাংখ্যেরা তাহার কিরূপ উপযোগ করিয়াছে ইহার বিচার করিব।

সাংখ্যমতানুসারে এই সৎকার্য্যবাদ সিদ্ধ হইলে পর, দৃশ্য জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে কোন পদার্থই ছিল না, উহা শূন্য হইতে উৎপন্ন হইয়া-ছিল—এই মতটি আপনা-আপনিই খণ্ডিত হইয়া যায়। কারণ, শূন্য অর্থে—নাই বুঝায়; এবং যাহা নাই তাহা হইতে যাহা আছে তাহা কখনই উৎপন্ন হইতে পারে না। সুতরাং জগৎ কোন-না-কোন পদার্থ হইতে অবশ্য উৎপন্ন হইয়া থাকিবে এবং এক্ষণে জগতের মধ্যে যে গুণ দেখিতে পাই সেই গুণও এই মূল-পদার্থ হইতে অবশ্য উৎপন্ন হইয়া থাকিবে, ইহা স্পষ্ট সিদ্ধ হইতেছে। এক্ষণে জগতের দিকে চাহিয়া দেখিলে, তাহার মধ্যে বৃক্ষ, পশু, প্রস্তর, সোনা, রূপা, হিরা, জলবায়ু প্রভৃতি অনেক পদার্থ আমাদের ইন্দ্রিয় গোচর হয়। এবং তাহাদের রূপ ও গুণও বিভিন্ন। এই বিভিন্নতা কিংবা নানাত্ব চিরস্থায়ী কিংবা মূলগত নহে, সমস্ত পদার্থের মূল-বস্তু একই ;—এইরূপ সাংখ্যদিগের সিদ্ধান্ত। অর্ব্বাচীন রসায়নশাস্ত্রজ্ঞানী বিভিন্ন দ্রব্যের পৃথক্করণ করিয়া প্রথমে ৬২ মূল তত্ত্ব বাহির করিয়াছিলেন ; কিন্তু এই ৬২ তত্ত্বও চির-স্থায়ী না হওয়ায়, মূলে একটি কোন পদার্থ আছে এবং সেই পদার্থ হইতেই সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা, পৃথ্বী প্রভৃতি সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে এইরূপ পাশ্চাত্য পদার্থশাস্ত্রবেত্তারাও এক্ষণে স্থির করায় এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে অধিক বিচার আলোচনা আবশ্যক নাই। জগতের অন্তর্ভূত সমস্ত পদার্থের এই যে মূলীভূত বস্তু তাহাকেই সাংখ্যশাস্ত্রে 'প্রকৃতি' বলে। প্রকৃতির অর্থ 'মূলের' এইরূপ হওয়ায়, এই প্রকৃতি হইতে পরে যে সকল পদার্থ হইয়াছে তাহাকে 'বিকৃতি' কিংবা মূলীভূত বস্তুর বিকার এইরূপ নাম দেওয়া হইয়াছে।

কিন্তু সমস্ত পদার্থের মধ্যে বস্তু যদি একই হয়, এবং এই বস্তুর মধ্যে গুণও যদি একই হয়, তবে

সৎকার্য্যবাদ-অনুসারে এই একই গুণ হইতে অনেক গুণ বাহির হইতে পারে না; এবং পাথর মাটি, জল, সোণা ইত্যাদি জগতের বিভিন্ন পদার্থ দেখিলে তাহাদের মধ্যে বিভিন্ন অনেক গুণ আছে, এইরূপ চোখে পড়ে। তাই পদার্থমাত্রের গুণ প্রথমে নিরীক্ষণ করিয়া,সাংখ্যেরা সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন বর্গ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। কারণ, যে কোন পদার্থ ধর না কেন, তাহার শুদ্ধ, নির্ম্মল কিংবা পূর্ণাবস্থা এবং তদ্বিরুদ্ধ নিকৃষ্টাবস্থা এইরূপ দুই ভেদ স্বভাবতই আছে এবং নিকৃষ্ট অবস্থা হইতে পূর্ণাবস্থার দিকে উন্নতি হইবারও তাহার প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, এইরূপ নজরে পড়ে। এই তিন অবস্থার মধ্যে শুদ্ধাবস্থাকে সাত্ত্বিক, নিকৃষ্টাবস্থাকে তামসিক ও প্রবর্ত্তক অবস্থাকে রাজসিক এইরূপ বিশেষণ দিয়া, সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণ সমস্ত পদার্থের মূলীভূত বস্তুর মধ্যে অর্থাৎ প্রকৃতির মধ্যে প্রারম্ভ হইতেই আছে এইরূপ সাংখ্যগণ বলিয়া থাকেন। অধিক-কি, এই তিন গুণই প্রকৃতি, এইরূপ বলিলেও চলে। এই তিন গুণের মধ্যে প্রত্যেকেরই বল আরম্ভে একইরূপ হওয়ায় প্রথমতঃ প্রকৃতি সাম্যাবস্থায় থাকেন। এই সাম্যাবস্থা জগতের আরম্ভে হইয়াছিল এবং জগতের লয় হইলে পুনর্ব্বার হইবে। সাম্যাবস্থাতে কোন নড়াচড়া নাই; সমস্ত স্তব্ধ থাকে। কিন্তু পরে এই তিন গুণ কম বেশী হইতে আরম্ভ করিলে, প্রবৃত্ত্যাত্মক রজো গুণের দরুণ, মূল প্রকৃতি হইতে বিভিন্ন পদার্থ উৎপন্ন হইয়া সৃষ্টির আরম্ভ হয়। সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণ প্রথমে সাম্যাবস্থায় থাকিয়া তাহার মধ্যে ন্যূনাধিক্য কিরূপ উৎপন্ন হয়, এইরূপ এই সময় এক সংশয় আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু সাংখ্যেরা তাহার উত্তরে এই বলেন যে, ইহা প্রকৃতিশরীরের মূল ধর্ম্ম (সাং, বা, ৬১)। প্রকৃতি জড় হইলেও, আমরা জন্মিলেই তিনি এই সমস্ত ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই তিন গুণের মধ্যে সত্ত্বের গুণ জ্ঞাতৃত্ব, তমের ধর্ম্ম অজ্ঞান এবং রজোগুণ প্রবর্ত্তক অর্থাৎ উহা ভালমন্দ কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে। এই তিন গুণই কখনই পৃথক্ হইয়া থাকিতে পারে না। সমস্ত পদার্থের মধ্যে সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণেরই মিশ্রণ আছে; এবং এই মিশ্রণ নিয়তই তিনের অন্যোন্যন্যূনাধিক্য অনুসারে হয় বলিয়া মূলবস্তু এক হইলেও গুণভেদে এক মূল বস্তুরই সোণা, লোহা, মাটি, আকাশ, মানবশরীর ইত্যাদি বিভিন্ন বিকার হইয়া থাকে। যাহাকে আমারা সাত্ত্বিক গুণের পদার্থ বলি, তাহার মধ্যে রজঃ ও তম এই দুই গুণ অপেক্ষা সত্ত্বের বল কিয়ৎ পরিমাণ অধিক থাকায়, তাহার মধ্যে যে রজঃ ও তম সর্ব্বদাই থাকে, তাহারা ক্ষীণ হইয়া পড়ে, তাই আমাদের চোখে পড়ে না এইমাত্র। বস্তুত দেখিতে গেলে, সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই তিন গুণই অন্য পদার্থের ন্যায় সাত্ত্বিক পদার্থের মধ্যেও আছে, এইরূপ বুঝিতে হইবে; নিছক্ সত্ত্বগুণী, নিছক্ রজোগুণী, কিংবা নিছক্ তমোগুণী এরূপ পদার্থই নাই। প্রত্যেক পদার্থে তিন গুণই সবেগে চলিয়া থাকে এবং এই চাঞ্চল্যের মধ্যে যেগুণ প্রবল হয় সেই অনুসারে প্রত্যেক পদার্থ সাত্ত্বিক রাজসিক বা তামসিক এইরূপ আমরা বলিয়া থাকি (সাং। কা। ১২; সভা। অশ্ব।—অনুগীতা—৩৬ ও শাং ৩০৫ দেখ)। উদাহরণ যথা—আমাদের শরীরের মধ্যে রজ ও তম এই দুয়ের উপর সত্ত্বের প্রাধান্য হইলে আমাদের জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সত্য কি, তাহা আমরা জানিতে পারি, এবং আমাদের চিত্তবৃত্তি শান্ত হয়। এই সময়ে শরীরের মধ্যে রজ ও তম একেবারেই থাকে না এরূপ নহে; তবে কিনা, তাহা দমিয়া থাকায় সজোরে চলে না (গী. ১৪, ১০)। সত্ত্বের বদলে রজোগুণ যদি প্রবল হয় তখন মনুষ্যের শরীরের মধ্যে লোভ জাগ্রত হইয়া তাহার আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হয় এবং সে অনেক কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়। সেইরূপ সত্ত্ব ও রজ এই দুয়ের উপর তমের প্রাধান্য হইলে, নিদ্রা, আলস্য, স্মৃতিভ্রংশ প্রভৃতি দোষ শরীরের মধ্যে উৎপন্ন হয়। তাৎপর্য্য, জাগতিক পদার্থের মধ্যে সোনা লোহা পারা ইত্যাদি যে নানাত্ব আছে তাহা প্রকৃতির সত্ত্ব রজ তম এই তিন গুণের পরস্পর চাঞ্চল্যের কিংবা ন্যূনাধিকপরিমাণের ফল। মূল প্রকৃতি এক হইলেও এই নানাত্ব কিরূপে উৎপন্ন হয় ইহার যে বিচার তাহাকে বিজ্ঞান বলে। এবং ইহার মধ্যেই সমস্ত আধিভৌতিকশাস্ত্রের সমাবেশ। উদাহরণ যথা—রসায়নশাস্ত্র, বিদ্যুৎশাস্ত্র, পদার্থবিজ্ঞানশাস্ত্র এই সমস্ত বিবিধ জ্ঞানই বিজ্ঞান।

সাম্যাবস্থায় এই মূলপ্রকৃতি অব্যক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অগোচর হওয়ায়, তদন্তর্ভূত সত্ত্ব রজ ও তম এই তিন গুণের পরস্পরবিক্ষোভ হইতে উৎপন্ন যে অনেক পদার্থ আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হয় অর্থাৎ যাহা আমরা দেখি, শুনি, আস্বাদন করি, আঘ্রাণ করি বা স্পর্শ করি, সাংখ্যশাস্ত্রে তাহার নাম—'ব্যক্ত'। ব্যক্ত অর্থাৎ স্পষ্ট ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থ; পরে তাহা আকৃতির দ্বারা কিংবা রূপের দ্বারা, গন্ধের দ্বারা কিংবা অন্য কোন গুণের দ্বারা ব্যক্ত হয়। ব্যক্তপদার্থ অনেক হওয়ায় তন্মধ্যে গাছ পাথর প্রভৃতি কতকগুলি স্থূল; আবার মন, বুদ্ধি, আকাশ প্রভৃতি কতকগুলি ইন্দ্রিয়গোচর অর্থাৎ ব্যক্ত হইলেও সূক্ষ্ম। সূক্ষ্মের অর্থ এস্থলে ক্ষুদ্র নহে; কারণ, আকাশ সূক্ষ্ম হইয়া সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। তাই, সূক্ষ্ম অর্থে স্থূলের বিপরীত, এইরূপ বুঝিতে হইবে। সূক্ষ্ম ও স্থূল এই দুই শব্দের দ্বারা কোন্ বস্তুর শরীরগঠন কিরূপ তাহাই বুঝায়; এবং ব্যক্ত ও অব্যক্ত এই দুই শব্দের দ্বারা, উক্ত বস্তুর প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে, ইহাই প্রদর্শিত হয়। তাই, দুই বিভিন্ন পদার্থ উভয়ই সূক্ষ্ম হইলেও তন্মধ্যে একটি ব্যক্ত এবং অন্যটি অব্যক্ত হইতে পারে। উদাহরণ যথা—বায়ু সূক্ষ্ম হইলেও, স্পর্শেন্দ্রিয় তাহা জানিতে পারে বলিয়া তাহাকে ব্যক্ত বলিয়া মনে করা হয়, এবং সমস্ত পদার্থের মূলবস্তু যে প্রকৃতি তাহা বায়ু অপেক্ষাও অত্যন্ত সূক্ষ্ম হওয়া প্রযুক্ত, কোন ইন্দ্রিয়ই তাহাকে জানিতে পারে না, অতএব প্রকৃতি অব্যক্ত। প্রকৃতি যদি কোন ইন্দ্রিয়েরই গোচর না হয় তবে, প্রকৃতি আছে কি না তাহার প্রমাণ কি, এই প্রশ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু অনেক ব্যক্ত পদার্থের অবলোকন হইতে সৎকার্য্যবাদ অনুসারে, সেই সমস্তের মূলরূপটি, ইন্দ্রিয় সমক্ষে প্রতিভাত না হইলেও সূক্ষ্মরূপে তাহার অস্তিত্ব অবশ্যই থাকিবে, অনুমানের দ্বারা ইহা সিদ্ধ হয়,—এইরূপ সাংখ্যদের এই প্রশ্নের উত্তর (সাং, কা. ৮); এবং বেদান্তীরা ব্রহ্মের অস্তিত্ব সিদ্ধ করিবার সময়, এই যুক্তিক্রমই স্বীকার করিয়াছেন (কঠ, ৬. ১২, ১৩ উহার শাঙ্করভাষ্য দেখ)। প্রকৃতি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও অব্যক্ত এইরূপ স্বীকার করিলে, নৈয়ায়িকদিগের পরমাণুবাদ আপনা আপনিই খণ্ডিত হইয়া যায়। কারণ, পরমাণু অব্যক্ত ও অসংখ্য হইলেও, এক এক পরমাণু স্বতন্ত্র ব্যক্তি কিংবা অবয়ব হওয়াপ্রযুক্ত দুই পরমাণুর মধ্যে কি পদার্থ আছে, এই প্রশ্ন আবার বাকী থাকিয়া যায়। এইজন্য সাংখ্যশাস্ত্রের এইরূপ সিদ্ধান্ত যে, প্রকৃতির মধ্যে পরমাণুরূপ অবয়বভেদ না থাকায়, উহা সর্ব্বদাই একসংলগ্ন কিংবা একই প্রকার অথবা মধ্যে একটুও খণ্ডিত না হইয়া অব্যক্ত রূপে (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অগোচর) ও নিরবয়বরূপে নিরন্তর সর্ব্বত্র পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। পরব্রহ্মের বর্ণনা করিবার সময় দাসবোধের মধ্যে (দা, ২০, ২, ৩) শ্রীসমর্থ রামদাস স্বামী এইরূপ বলেন যে,—

জিकडे पहावे तिकडे अपार।
कोनीकडे नाहि पार॥
एक जिनसी स्वतन्त्र। दुसरे नाहीं॥

অর্থাৎ—যে দিকে দেখিবে সেই দিকেই অসীম, কোন দিকেই সীমা নাই; একমাত্র বস্তু স্বতন্ত্র, অন্য কিছুই নাই। এইরূপ বর্ণনা সাংখ্যদিগের প্রকৃতি সম্বন্ধেও প্রযুক্ত হইতে পারে। ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি অব্যক্ত, স্বয়ম্ভূ, একবস্তু হওয়ায় চারিদিকে নিরন্তর নিবিড়ভাবে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। আকাশ, বায়ু এই ভেদ পরে হইয়াছে এবং তাহা সূক্ষ্ম হইলেও ব্যক্ত; এই সমস্তের মূলীভূত যে প্রকৃতি তাহা একমাত্র বস্তু ও সর্ব্বব্যাপী হওয়া প্রযুক্ত অব্যক্ত। তথাপি বেদান্তীদিগের পরব্রহ্মের মধ্যে ও সাংখ্যদিগের প্রকৃতির মধ্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান। কারণ, পরব্রহ্ম চৈতন্যরূপী নির্গুণ, আর প্রকৃতি জড়রূপী ও সত্ত্বরজস্তমোময়ী অর্থাৎ সগুণ। কিন্তু এই সম্বন্ধে অধিক বিচার পরে করা যাইবে। এক্ষণে, সাংখ্যদিগের মত কি, ইহাই আমাদের আলোচ্য। সূক্ষ্ম ও স্থূল, ব্যক্ত ও অব্যক্ত, ইহাদের এইরূপ অর্থ করিলে পর, সৃষ্টির মূলারম্ভে প্রত্যেক পদার্থ সূক্ষ্ম কি অব্যক্ত প্রকৃতির রূপে থাকিয়া, তাহার পর (স্থূল হোক্ বা সূক্ষ্মই হোক্) ব্যক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গোচর হইয়া থাকে, এবং প্রলয়কালে এই ব্যক্তরূপের নাশ হইলে অব্যক্ত প্রকৃতির মধ্যে মিশিয়া গিয়া পুনর্ব্বার অব্যক্ত হইয়া পড়ে, এইরূপ বলিতে হয়; গীতাতেও এই মতেরই অনুরূপ মত ব্যক্ত হইয়াছে (গী, ২, ২৮ ও ৮, ১৮ দেখ)

এই অব্যক্ত প্রকৃতিকে 'অক্ষর', এবং প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন সমস্ত পদার্থকে 'ক্ষর' এইরূপ সাংখ্যেরা দ্বিতীয় সংজ্ঞা দিয়াছেন। ক্ষর-অর্থাৎ একেবারে যাহা নষ্ট হয় এইরূপ অর্থে গৃহীত হইবে না, শুধু ব্যক্ত রূপের নাশ এই অর্থই এস্থলে বিবক্ষিত। প্রধান, গুণক্ষোভিনী, বহুধানক, প্রসবধর্ম্মিণী, এইরূপ প্রকৃতির অন্য নামও আছে। সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে মুখ্য মূল, অতএব প্রধান—ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা স্বতই ভাঙ্গিয়া যায় বলিয়া গুণক্ষোভিনী, গুণত্রয়রূপী পদার্থভেদের বীজ তাহাতে আছে বলিয়া বহুধানক, এবং ইহা হইতে সমস্ত পদার্থ প্রসূত হয় কিংবা উৎপন্ন হয় বলিয়া প্রসবধর্ম্মিণী, প্রকৃতির এই সকল নাম দেওয়া হইয়া থাকে। বেদান্তশাস্ত্রে প্রকৃতিই মায়া অর্থাৎ মায়িক অবভাস এইরূপ উক্ত হইয়াছে।

সৃষ্টির অন্তর্ভূত সমস্ত পদার্থের, 'ব্যক্ত' কিংবা 'অব্যক্ত' কিংবা 'ক্ষর' ও 'অক্ষর' এইরূপ দুই ভেদ হইলে পর, ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ বিচারে কথিত আত্মা, মন, বুদ্ধি, অহংকার ও ইন্দ্রিয়াদি ইহাদের কোন্‌টিকে কোন্ বিভাগে ফেলিতে হইবে ইহার পরে এই কথা আসিতেছে। ক্ষেত্র ও ইন্দ্রিয়াদি—ইহারা জড় হওয়া প্রযুক্ত, ব্যক্তের মধ্যে ইহাদের সমাবেশ হয়; কিন্তু মন, অহঙ্কার বুদ্ধি ও বিশেষত আত্মা ইহাদের কিরূপ ব্যবস্থা করা যাইবে? য়ুরোপ খণ্ডের আধুনিককালের প্রসিদ্ধ সৃষ্টিশাস্ত্রজ্ঞ হেকেল আপন গ্রন্থে এইরূপ প্রতিপাদন করেন যে, মন বুদ্ধি অহঙ্কার ও আত্মা এ সমস্ত শারীরধর্ম্ম। মনুষ্যের মস্তিষ্ক বিগড়াইয়া গেলে তাহার স্মরণশক্তি লোপ পায় এবং সে উন্মাদগ্রস্ত হয়—ইহা আমরা দেখিতে পাই। সেইরূপ মাথায় গুরুতর আঘাত লাগিয়া মস্তিষ্কের কোন অংশ অসাড় হইয়া গেলেও সেই অংশের মানসিক শক্তি বিলুপ্ত হয়, এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব মস্তিষ্কের সঙ্গে সঙ্গেই মনোধর্ম্ম ও আত্মাকে 'ব্যক্ত' এই বিভাগের মধ্যে ফেলা আবশ্যক। এইরূপ ব্যবস্থা করিবার পর, অব্যক্ত ও জড় প্রকৃতি ইহাদের সম্বন্ধে কি হইবে তাহা অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। কারণ, সমস্ত ব্যক্ত পদার্থ এই মূলের অব্যক্ত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। প্রকৃতি ব্যতীত জগতের কর্ত্তা বা উৎপাদক আর কেহই নাই। মূল প্রকৃতির শক্তি বাড়িতে বাড়িতেই তাহাতে চৈতন্য কিংবা আত্মা আসিয়াছে। সৎকার্য্যবাদের ন্যায় এই মূল প্রকৃতির নিয়ম স্থির করা হইয়াছে; এবং তদনুসারে সমস্ত জগৎ ও তার সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যও এই নিয়মানুসারে চলিতেছে। আত্মা বলিয়া পৃথক্ পদার্থ নাই শুধু নহে, উহা অবিনাশীও নহে, স্বতন্ত্রও নহে; তবে মোক্ষ কোথা হইতে আসিবে? আমার ইচ্ছানুসারে আমি অমুক কর্ম্ম করিব এইরূপ প্রত্যেকে যে মনে করে তাহা নিছক্ ভ্রম। প্রকৃতি তাহাকে যে দিকে টানিবে সেই দিকেই তাহাকে যাইতে হইবে। সার কথা—৺ শঙ্করমোরো রান্‌ডে কলহপুরী নাটকের আরম্ভের ধ্রুপদে যাহা বলিয়াছেন তদনুসারে—

বিশ্ব সর্ব হেঁ তুরুঙ্গ মোঠা প্রাণীমাত্র কৈদী।
পদার্থধর্ম্মাঞ্চিয়া শৃঙ্খলা তাঁতেঁ কোণি ন ভেদী॥

অর্থাৎ—এই সমস্ত বিশ্ব এক বৃহৎ কারাগার, প্রাণীমাত্রই কয়েদী তাহাতে পদার্থধর্ম্মের যে শৃঙ্খল রহিয়াছে তাহাতে কোন ভেদ নাই এইরূপ সমস্ত সজীব ও নির্জীব সৃষ্টির ব্যবহার চলিতেছে, ইহাই হেকেলের মত এবং একমাত্র জড় ও অব্যক্ত প্রকৃতিই সমস্ত সৃষ্টির মূল হওয়া প্রযুক্ত হেকেল আপন মতের নাম দিয়াছেন—'অদ্বৈত'! কিন্তু এই অদ্বৈত জড়মূলক অর্থাৎ একমাত্র জড়প্রকৃতির মধ্যেই সমস্ত বিষয়ের সমাবেশ হয় বলিয়া আমি উহাকে জড়াদ্বৈত কিংবা আধিভৌতিকশাস্ত্রাদ্বৈত বলি। (ক্রমশঃ)

দাক্ষিণাত্যে বাঙ্গালী উপনিবেশ।

(শ্রীকালীপ্রসন্ন বিশ্বাস)

বহুকাল পূর্ব্বে বাঙ্গালী সওদাগরগণ কাষ্ঠনির্ম্মিত সমুদ্রগামী পোত লইয়া বঙ্গোপসাগর এবং আরব সমুদ্রের তীরস্থ নানাস্থানে বাণিজ্য করিতে যাইত, এ সম্বন্ধে প্রমাণ আছে। একসময় দারুনির্ম্মিত অর্ণবপোত সুদূর ইংলণ্ডেও উপস্থিত হইয়াছিল। আজ কাল আমাদের দেশে কাষ্ঠতরীর সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে। অনেক দিনের

কথা নহে, আমাদের বাল্যকালে, আমরা শত শত ছোট বড় নৌকা ভাগিরথী, গঙ্গা, পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, রূপনারায়ণ, প্রভৃতি নদীবক্ষে যাতায়াত করিতে দেখিতাম। এক্ষণে তাহার শতকরা পাঁচখানিও বর্ত্তমান আছে কি না সন্দেহ। যে সরস্বতী নদীর বক্ষ দিয়া এক দিন বড় বড় কাষ্ঠনির্ম্মিত জাহাজ অবাধে যাতায়াত করিত, যে নদীবক্ষে তরী ভাসাইয়া শ্রীমন্ত সওদাগর সিংহলবিজয়ে গমন করিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশ স্থল আজ ধান্য-ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। যে ঘরঘরা নদীর নাম লিঙ্গপুরাণে উক্ত হইয়াছে, যাহার গর্ভ খোদিত করিয়া, অনেক দিনের কথা নহে, কাষ্ঠ-জাহাজের ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়াছিল, আজ সেই ঘরঘরার চিহ্ন মাত্রও নাই। কেবল একস্থানে অতি সামান্য অংশ মাত্র ঘুঁঘির খাল নামে বিদিত আছে। কিন্তু সেই এক দিন আর এই এক দিন। জগৎস্রষ্টা পরমেশ্বরের অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মের অধীন এই পরিবর্ত্তনশীল জগতের সমুদায় অনিত্য সৃষ্ট পদার্থই এইরূপ নিত্য পরিবর্ত্তিত হইয়া সেই নিত্য সত্যকে আমাদিগের হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরূক করিয়া দিতেছে।

যাহা হউক আমাদের বক্তব্য এই যে এইরূপ বাণিজ্যকারণ এক দেশের লোক অপর দেশে যাতায়াত করিয়া উপনিবেশ স্থাপনের হেতুস্বরূপ হয়। বাঙ্গালী জাতি দ্বারা যে এইরূপ বাণিজ্য-সংক্রান্ত দেশভ্রমণের জন্য কোন কোন স্থানে উপনিবেশ স্থাপিত-হয় নাই ইহা কে বলিতে পারে? আমার বোধ হয় যদি কোন Research Scholar এ বিষয়ে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন তাহা হইলে সময়ে অনেক তথ্য প্রকাশ হইতে পারে। মান্দ্রাজের চিংগলিপট জেলার সেণ্ট টমাস মাউণ্টের (St Thomas Mount) "বাঙ্গালী বাজার" এক সময় একটি বাঙ্গালী উপনিবেশ ছিল বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা একটি বিশিষ্ট বাঙ্গালী উপনিবেশের বিষয় পাঠকগণের গোচর করিব। এই উপনিবেশের লোক সংখ্যা প্রায় ১০ সহস্র, তন্মধ্যে প্রায় ৫০০০ পুরুষ এবং ৫০০০ স্ত্রীলোক। সুতরাং এতগুলি বাঙ্গালী সন্তান সন্ততির বিষয় বঙ্গবাসীদিগের অজ্ঞাত থাকা কর্ত্তব্য নহে। এই সম্প্রদায়ের নাম গৌড়-সারস্বত-সম্প্রদায়। ইঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণ।

ইঁহারা পূর্ব্বে গোয়া (Goa) অঞ্চলে বাস করিতেন। খৃঃ ষোড়শ শতাব্দীতে পর্ত্তুগীজ কর্ত্তৃক গোয়া অধিকৃত হইবার পরে তত্রস্থ অধিবাসীগণের বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণের প্রতি ভয়ানক অত্যাচার আরম্ভ হয়। অনেকে খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া এই অত্যাচারের হস্ত হইতে নিস্তার পায়, এবং অনেকে বা দেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনাদিগের ধর্ম্ম, জাতি, কূল, মান রক্ষা করিতে বাধ্য হয়। এই সময়ে প্রায় সমগ্র গৌড়-সারস্বত-সম্প্রদায় পলায়ন করিয়া, সমুদ্র তীরস্থ কারবার, (Karwar) আঙ্কোলা (Ankola), মাঙ্গালোর এবং হলিয়াল, (Haliyal), সূপা (Supa), সির্সি (Sirsi) প্রভৃতি স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে। এক্ষণে ঐ সকল স্থানেই এই সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ বাস করিতেছে। অতি অল্প সংখ্যক লোক পুনরায় গোয়ারাজ্যে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক তথায় বসবাস করিতেছে।

উত্তর কারবার জেলার (Gazeteer) গেজেটিয়রে ইহাদিগের সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে।

According to tradition the founders of the caste called Sharmas were brought with their family god and goddess by Parashuram the sixth incarnation of Vishnu, from Trihotra, the modern Trihut in Bengal to help him in performing ceremonies in honour of his amcestors.

এখানে পরশুরামকে বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। রামায়ণপাঠে আমরা অবগত হই যে পরশুরাম, অযোধ্যাধিপতি রাজা দশরথের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র তাঁহার বিবাহের পর মিথিলানিবাসী রাজা জনকের ভবন হইতে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন কালে পথিমধ্যে পরশুরামের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। অতএব পরশুরাম সম্ভবতঃ অযোধ্যা এবং মিথিলার মধ্যবর্ত্তী কোন স্থানে বাস করিতেন। রামচন্দ্রের বিবাহের পর পরশুরামের কোন অস্তিত্ব

ছিল কিনা সন্দেহ। অধিকন্তু এই সম্প্রদায়ের নাম গৌড়সারস্বত। শ্রীরামচন্দ্র এবং পরশুরামের সময় বঙ্গদেশের নাম গৌড় ছিল কিনা তাহার কোন প্রমাণ নাই। অতএব আমার বোধ হয় গেজেটিয়র লিখিত পরশুরাম বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার নহেন। তিনি তৎকালীন গোয়ারাজ্যের রাজা ছিলেন।

এই রাজা পরশুরাম বঙ্গদেশবাসী বাণিজ্যকারী বণিকগণের নিকট বঙ্গদেশের সারস্বত ব্রাহ্মণগণের বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের হিতার্থে তিনি যে মহাযজ্ঞের অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন তৎ সম্পাদনার্থ কয়েক জন শর্ম্মা বা দেবশর্ম্মা উপাধিযুক্ত ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন। ইঁহারাই বর্ত্তমান গৌড়সারস্বতদিগের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন।

গেজেটিয়রে লিখিত হইয়াছে যে উক্ত ব্রাহ্মণগণ ত্রিহোত্র—বর্ত্তমান ত্রিহুত জেলা হইতে আসিয়াছিলেন। আমার মতে ইহাও ঠিক নহে। গৌড় সারস্বত জাতীয় নরনারীর আকৃতি ত্রিহুত জেলার লোক অপেক্ষা বাঙ্গলাদেশের ব্রাহ্মণগণের আকৃতির সহিত অধিক সামঞ্জস্য দৃষ্ট হয়। অধিকন্তু গৌড় সারস্বত নরনারীর উচ্চারণের ত্রিহুতের নিকটবর্ত্তী উত্তরবঙ্গের ব্রাহ্মণদিগের উচ্চারণের সহিত অতি আশ্চর্য্য মিল দেখিতে পাওয়া যায়। আমি স্বয়ং এই সম্প্রদায়ের নরনারীর সহিত একস্থানে বাস করিয়া দেখিয়াছি যে এই উভয় সাম্প্রদায়িক লোকেদের উচ্চারণের এতদূর সামঞ্জস্য আছে যে যদি একটি ঘরে সারস্বত ব্রাহ্মণ এবং অপর ঘরে উত্তর বঙ্গের বাঙ্গালীকে রাখিয়া কথাবার্ত্তা করিতে দেওয়া হয় তাহা হইলে যাঁহারা এতদুভয়ের ভাষা পরিজ্ঞাত নহেন, তাঁহারা উক্ত ভাষা শ্রবণ করিয়া নিঃসন্দেহ উভয়কে এক সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া মনে করিবেন। এরূপ উচ্চারণ আর কোথাও শুনি নাই। আমার একজন বন্ধুকে এই সামঞ্জস্য দেখাইয়া দেওয়ায় তিনিও ইহা স্বীকার করিয়াছেন। অতএব আমার বিবেচনায় এই সম্প্রদায়ের আদি পুরুষগণ উত্তর বঙ্গদেশ হইতে আসিয়াছিলেন।

উক্ত গেজেটিয়রে লিখিত আছে—

The memory of the Sharmas survives in figures which are placed before the images of the god Mongesh and the goddess Shantadurga which the Sharmas are said to have brought from Trihut to Goa. These figures are much revered by visitors and by the priests of the temple who pay divine honours, offering them plantains, flowers, cocoanats and cooked rice. According to the Shenvis the caste god and goddess, Mongesh and Shantadurga, were brought from Bengal. But the Mongesh-mahatmya seems to show that they were local Goa deities whose worship was adopted by the three founders of the class. Again the Shenvis state that their names came from ninety six, the number of the families of the original Bengal settlers.

উপরি উক্ত দেবদেবী সম্বন্ধেও আমার কিছু সন্দেহ আছে। যে সময় সারস্বত সম্প্রদায়ের পূর্ব্বপুরুষগণ বঙ্গদেশ হইতে আসেন তখন সম্ভবতঃ বঙ্গদেশে তান্ত্রিক পূজার বিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল। অতএব উক্ত ব্রাহ্মণগণ বঙ্গদেশ হইতে কেবলমাত্র শান্তদুর্গা দেবীমূর্ত্তি লইয়া আসিয়া গোয়া প্রদেশে স্থাপন করিয়াছিলেন। মঙ্গেশদেব বোধ হয় গোয়ারই স্থানীয় দেবমূর্ত্তি। কারণ বঙ্গদেশে মঙ্গেশ দেব নামক কোন দেবতা দৃষ্টিগোচর হয় না। কেহ কেহ বলেন মঙ্গেশ লিঙ্গ বঙ্গেশ লিঙ্গের অপভ্রংশ মাত্র।

বাঙ্গালাদেশে আমাদের পুরুষদিগের নামের পূর্ব্বে সম্মানসূচক "বাবু" শব্দ অনেক দিন হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। গৌড়সারস্বতদিগের মধ্যেও এই "বাবু" শব্দের ন্যায় "বাব" শব্দ সম্মানার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সহ্যাদ্রিখণ্ডের মতে সারস্বতব্রাহ্মণগণের প্রধান কার্য্য দান, প্রতিগ্রহ, যাগ, যজ্ঞ, অধ্যয়ন এবং অধ্যাপন। এই গ্রন্থে ইহাদিগকে "দেবশর্ম্মাণঃ" বলা হইয়াছে।

আমার বোধ হয় সর্ব্বপ্রথমে ইঁহারা তান্ত্রিক ধর্ম্মাবলম্বী শক্তিপূজক ছিলেন। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের সময় ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই শৈব ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তৎপরে শ্রীমৎ মধ্বাচার্য্যের

আবির্ভাব কালে কেহ কেহ বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। সম্ভবতঃ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের সময়েই অথবা পরে মঙ্গেশলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হয়।

উল্লিখিত মঙ্গেশলিঙ্গ এবং শান্তদুর্গা ভিন্ন ইহারা বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণগণের ন্যায় ব্রহ্মরাক্ষস বা ব্রহ্মদৈত্য, গ্রাম্য দেবতা, পঞ্চমাতৃকা, অন্নপূর্ণা, গোপালকৃষ্ণ, রাম সীতা প্রভৃতির এবং সত্যপীরের পূজা করিয়া থাকেন। ইঁহারা দেবতাকে অন্ন-ভোগ প্রদান করেন।

সারস্বত সম্প্রদায়ের বালিকা এবং স্ত্রীগণ আমাদের দেশের ন্যায় গঙ্গা, যমুনা, ঊষা, শান্তা, কাশী, রুক্মিণী, সত্যভামা, দৌপদী, সুভদ্রা, পার্ব্বতী, জানকী, সীতা, রাধা, লক্ষ্মী, অন্নপূর্ণা, উমা প্রভৃতি নামে অভিহিত হন।

বাঙ্গালা দেশের ব্রাহ্মণগণের কোন সাম্প্রদায়িক গুরু নাই। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণগণের এক এক সম্প্রদায়ের এক একজন সাম্প্রদায়িক গুরু আছেন। একারণ যখন সারস্বতগণ গোয়া প্রদেশে আগমন করেন তখন স্থানীয় ব্রাহ্মণগণ তাহাদিগের সাম্প্রদায়িক গুরু না থাকায় তাঁহাদিগের প্রতি উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করেন। সেই সময়ে এই সম্প্রদায় সাম্প্রদায়িক গুরু করিতে বাধ্য হন। অদ্যাবধি তাঁহারা এই সাম্প্রদায়িক গুরুর অধীন।

এই সম্প্রদায়ের পূজক ব্রাহ্মণগণকে ভট্ট বা ভট্ট-আচার্য্য কহে।

গৌড় সারস্বত ব্রাহ্মণগণের প্রধান খাদ্য সিদ্ধ বা আতপ তণ্ডুলের অন্ন (অপর ব্রাহ্মণগণ সিদ্ধ তণ্ডুলের অন্ন বড় একটা ব্যবহার করেন না), তরকারী এবং মৎস্য। শক্তি-উপাসকগণ মাংস এবং মদ্যের দ্বারা শক্তিদেবীর উপাসনা করিয়া প্রসাদরূপে তাহা গ্রহণ করেন। ইহাতে তাঁহাদিগের জাতিগত বাধা নাই। আজকাল কোকনস্থাদি দক্ষিণদেশীয় ব্রাহ্মণদিগের অনুকরণে অনেকে মৎস্য মাংস ভক্ষণ হইতে বিরত হইতেছেন। বলাবাহুল্য দাক্ষিণাত্যের অপর ব্রাহ্মণগণ মৎস্য মাংস স্পর্শ করেন না।

অনেকেই অবগত আছেন যে দাক্ষিণাত্যে হুঁকায় তামাক খাইবার প্রথা নাই। কিন্তু গৌড় সারস্বতগণের মধ্যে এই প্রথা অদ্যাবধি কোন কোন স্থানে প্রচলিত আছে।

গৌড় সারস্বতগণ বাঙ্গালীদিগের ন্যায় তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন এবং উচ্চশিক্ষার পক্ষপাতী। তাহাদের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষাও অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে।

ইহাদিগের পুরুষগণ কাছা ও কোঁচা দিয়া বস্ত্র পরিধান করে। স্ত্রীলোকেরা মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ স্ত্রীগণের ন্যায় কাছা দিয়া ১৬।১৭ কিংবা ১৮ হাত লম্বা সাটি পরিধান করে এবং সধবাগণ মস্তক অনাবৃত রাখে। সিঁথিতে সিন্দুর দিবার পরিবর্ত্তে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণগণের অনুকরণে কপালে কুঙ্কুম এবং হস্তে সধবার চিহ্নস্বরূপ "লৌহের" পরিবর্ত্তে এতদ্দেশীয় প্রথা অনুসারে গলদেশে মঙ্গলসূত্র ধারণ করে।

পূর্ব্বে আমাদের দেশে যেমন বাঁশের চেটাই দ্বারা সূতিকাগৃহ (আঁতুড় ঘর) গঠিত হইত ইহাদের মধ্যে এখনও সেই প্রথা সংরক্ষিত হইয়াছে।

জন্ম, উপনয়ন, বিবাহ, পুনর্ব্বিবাহ, গর্ভাধান, ও মৃত্যুকালীন প্রথা সমুদায় সম্বন্ধে ইহারা এতদ্দেশীয় প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন। সুতরাং এই সকল বিষয়ের সবিস্তার বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিবার আবশ্যক দেখি না।

গৌড় সারস্বত ব্রাহ্মণগণ অত্রি, ভরদ্বাজ, কাশ্যপ শাণ্ডিল্য, বাশিষ্ঠ প্রভৃতি গোত্রে বিভক্ত।

এতদ্ভিন্ন আরও এক সম্প্রদায় সারস্বত ব্রাহ্মণ আছেন। ইহাঁরা কান্যকুব্জ (কনৌজ) হইতে আসিয়াছিলেন। ইঁহাদিগকে কেবলমাত্র "সারস্বত ব্রাহ্মণ" কহে। গোত্র অনুসারে ইঁহারা বাৎস্য, কৌশিক এবং কৌণ্ডিল্য এই তিন ভাগে বিভক্ত।

গৌড় সারস্বত সম্প্রদায়ের মধ্যে কতকগুলি চলিত কথা (proverb) এবং গল্প আমাদের বাঙ্গালা দেশের অনুরূপ। এ সম্বন্ধে বারান্তরে আলোচনা করা যাইবে। কেবলমাত্র একটি গল্প নীচে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"একটা ইঁদুর একদিন চুরি করে বেগুণ খেতে গেছিল। যেমন সে বেগুণ খাবে, অমনি তাহার লেজে একটি কাঁটা ফুটিল। ইঁদুর তখন নাপিতের বাড়ী যাইয়া বলিল "নাপিত ভায়া আমার লেজ হইতে কাঁটা বাহির করিয়া দাও।" নাপিত

যেমন কাঁটা বাহির করিতে গেল অমনি ইঁদুরের লেজটি কাটিয়া গেল। ইঁদুর বলিল "আমার লেজ কাটিয়া দিলে আমাকে ইহার বদলে নরুণ দাও।" নাপিত নরুণ দিল। নরুণ লইয়া যাইতে যাইতে ইঁদুর দেখিল একজন কুমর হাত দিয়া মাটি খুঁড়িতেছে। ইঁদুর বলিল "হাত দিয়া মাটি খুঁড়িতেছ কেন? এই আমার নরুণ নিয়ে মাটি খোঁড়।" যেমন কুমর নরুণ দিয়া মাটি খুঁড়বে অমনি সেটা ভেঙ্গে গেল। ইঁদুর বলিল "আমার নরুণ ভাঙ্গলে আমাকে হাঁড়ি দাও।" কুমার হাঁড়ি দিল। ইঁদুর দেখিল একজন মালী হাত দিয়া জল ছেঁচছে। ইঁদুর বলিল "আমার হাঁড়ি লইয়া জল দাও।" যেমন মালি হাঁড়ি করিয়া জল ছেঁচবে অমনি হাঁড়ী ভেঙ্গে গেল। ইঁদুর বলিল "আমার হাঁড়ী ভাঙ্গলে আমাকে টোপর দাও।" মালী টোপর দিল। ইঁদুর দেখিল একজন ধুচুনী মাথায় দিয়ে বিয়ে করতে যাচ্চে। সে বলিল "আমার টোপর নাও।" বর টোপর নিল। বিয়ের সময় টোপরটি ভেঙ্গে গেল। ফিরিবার সময় ইঁদুর টোপর চাইল। বর বলিল ভেঙ্গে গেছে। ইঁদুর বলিল "তবে তার বদলে কনে দাও।" বর কনে দিল। তখন ইঁদুর কনে দিয়া একটা ঢাক কিনিল। এবং এই ঢাক বাজাইতে বাজাইতে বলিতে লাগিল "লেজের বদলে নরুণ পেলুম ঢাক টিম্ টিম্ টিম্। নরুণের বদলে হাঁড়ী পেলুম ঢাক টিম্ টিম্ টিম্। হাঁড়ীর বদলে টোপর পেলুম ঢাক টিম্ টিম্ টিম্। টোপরের বদলে কনে পেলুম ঢাক টিম্ টিম্ টিম্। কনের বদলে ঢাক পেলুম ঢাক টিম্ টিম্ টিম্।"

আমি ভারতবর্ষের যুক্তপ্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, বোম্বাই, মান্দ্রাজ প্রভৃতি নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়াছি এবং কোন কোন স্থানে অনেকদিন বাসও করিয়াছি কিন্তু বঙ্গদেশ ভিন্ন পূর্ব্বে আর কোথায়ও এইরূপ গল্প শুনিতে পাই নাই। উপরি উক্ত গল্পটিতে 'ইঁদুরের' পরিবর্ত্তে 'শৃগাল' এবং 'লেজের' পরিবর্ত্তে 'নাক' বসাইলে উহা আমাদের দেশের "শৃগালের নাকে কাঁটা ফুটার" গল্পে সঠিক পরিণত হইবে। আমাদের দেশের গল্পটিই অধিকতর যুক্তিপূর্ণ। কারণ বেগুণ খাইতে গেলে নাকেই কাঁটা ফুটে এবং শৃগালেরাই বেগুণ খাইতে যায় ও চুরি করিয়া বেগুণ খায় এইরূপ প্রবাদ আছে।

গৌড়সারস্বত ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় সম্বন্ধে আমি উপরি উক্ত বিবরণ পাঠকগণের নিকট উপস্থিত করিলাম। এ সম্বন্ধে আমি আরও অধিক তথ্য সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতেছি। যথাসময়ে তাহা প্রকাশিত হইবে। এক্ষণে আমার বিনীত প্রার্থনা যে আমার বঙ্গদেশীয় বন্ধুগণ যেন এই প্রবন্ধ অবলম্বন করিয়া এতৎ সম্বন্ধে বঙ্গদেশ হইতে কিছু নূতন তথ্য সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করেন। তাহা হইলে এই সকল প্রবাসী বাঙ্গালীর বংশধরগণের সহিত আমরা এক সময়ে নিকটতর সম্বন্ধ স্থাপন করিতে সক্ষম হইব। বাঙ্গালীর রক্ত যাঁহার অঙ্গে বিন্দুমাত্রও বর্ত্তমান আছে তিনিই আমাদের আদরের ধন। গৌড় সারস্বতগণ অদ্যাবধি আপনাদিগকে বাঙ্গালীর বংশধর বলিয়া গৌরব করিয়া থাকেন, আমরাই কেবল তাঁহাদিগকে জানি না!

গান।

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি, এ।

(মিশ্র পিলু)

আমার কুটীর তুমি ভেঙ্গেই দিয়ো—
নূতন করে জাগিয়ো
তোমার মাঝে জাগিয়ো।
অমনি করে বজ্র হেনে
সুখের বাসা দিয়ো ভেঙ্গে
রুদ্র তুমি ভীষণ তুমি
প্রলয় মাঝে জানিয়ো!
এই সুখে মরে থাকার চেয়ে
মরণ আমার যাক্ না নিয়ে
মৃত্যু মাঝে নবজীবন
ধন্য হব পেয়ে।
আঘাত সে যে পরশমণি
অতুল ধনে করে ধনী—
সেই আঘাতে সুপ্ত-জীবন-
কমল তুমি ফুটিয়ো॥

বঙ্গের বর্ত্তমান শিক্ষাসমস্যা।

(শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী)

বর্ত্তমানে বাঙ্গালার শিক্ষাসমস্যা লইয়া বেশ একটু আন্দোলন পড়িয়া গিয়াছে। দেশের জনসাধারণ এবং কর্ত্তৃপক্ষগণ সকলের দৃষ্টিই এইদিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। প্রচলিত প্রথায় আর কেহই সন্তুষ্ট নহেন—সকলেরই ধারণা, যে ভাবে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় নহে—উহাকে পরিবর্ত্তিত করিয়া লইবার দিন আসিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিশন বসিয়াছে—তাহাতে আমাদের দেশের শিক্ষিত বরেণ্যগণের মধ্যে অনেকেই মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। এই অবসরে শিক্ষা সম্বন্ধে দু' একটী কথা বলা বোধ হয় অসঙ্গত ও অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

জীবনকে পূর্ণাঙ্গ করিয়া তোলা এবং সর্ব্বতোভাবে আত্মশক্তির বিকাশই শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য। সেই হিসাবে শিক্ষাকে আমরা দুই ভাগে বিভাগ করিয়া লইতে পারি। প্রকৃতি কোন বিষয়েই কৃপণ নহেন। মানুষের শিক্ষার জন্য প্রকৃতির ভাণ্ডার সুসজ্জিত রহিয়াছে। এই প্রকৃতি-রচিত শিক্ষা এক, আর এক শিক্ষা যাহা মানুষ মানুষের জন্য সৃষ্টি করিয়াছে। এই শেষোক্ত শিক্ষাই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা এবং বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয়। প্রকৃতির মধ্য দিয়া মানুষ যে উৎকৃষ্ট শিক্ষা পাইতে পারে এবং মনুষ্যসৃষ্ট প্রণালী হইতে সে শিক্ষা অবনত নয় তাহার উদাহরণ আমরা বড় বড় কবির কাব্যে পাইয়া থাকি। কিন্তু কাব্য এক এবং জীবন অন্য। যাহা কাব্যে সম্ভব তাহা হয়ত জীবনে ঘটে না—বিশেষ বিংশ শতাব্দীর যুগ প্রকৃতির যুগ নয়—আর্ট ইহাকে বিশেষ ভাবে আত্মসাৎ করিয়া তুলিয়াছে। অতি প্রাচীন যুগে মানুষ প্রকৃতির উপর সর্ব্ব বিষয়ে নির্ভরশীল ছিল—কিন্তু আর্টের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ প্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে আরম্ভ করিল, এবং বর্ত্তমান যুগে সে এতই বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে যে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির যে বিশিষ্ট যোগ এবং বিশেষ সম্বন্ধ আছে তাহা খুঁজিয়া পাওয়া ভার হইয়া উঠিয়াছে। প্রকৃতিকে অবহেলা করা মানুষের জীবনের সর্ব্বপ্রধান অপরাধ। এই অপরাধের শাস্তিও মানুষকে বহুল পরিমাণে ভোগ করিতে হয়। আর্টের ক্ষমতা যতই অধিক হউক না কেন, উহাকে চিরদিনই প্রকৃতির অনুগামী হইতে হইবে। প্রকৃতি হইতে পৃথক্ হইলে তাহার অপঘাতমৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। শিক্ষা সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা। যে শিক্ষায় প্রকৃতি অবহেলিত সে শিক্ষা কখনও তাহার চরম উদ্দেশ্য সাধনে সমর্থ হয় না। রবীন্দ্রনাথের সুপ্রসিদ্ধ "তোতাকাহিনী" নামক গল্পটী শুধু গল্প নয়—উহা এই "থিওরি"টিকে সম্পূর্ণ ভাবে সমর্থন করে। প্রকৃতিকে অবলম্বন না করিলে কোন শিক্ষাই দাঁড়াইতে পারে না। আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা গরিষ্ঠ দোষ—প্রকৃতিকে দেখিবার ও বুঝিবার প্রয়াস ইহাতে যথেষ্ট নাই। এই দোষের নিমিত্তই এ শিক্ষা আমাদের নিকট সহজ বলিয়া বোধ হয় নাই—সেই জন্যই বালক বালিকার নিকট ইহা "ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদের" মত অবতীর্ণ না হইয়া "ঘাড়ের বোঝা"র মত চাপিয়া বসে। এমন শিশু অল্পই দেখা যায় যাহাকে জোর করিয়া বিদ্যালয়ে পাঠাইতে না হয়—যে স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া পাঠশালায় গিয়াছে। এই শিক্ষা পুস্তকরাশির মধ্যে নিবদ্ধ—জীবনের সহিত, বিশাল বিশ্বপ্রকৃতির সহিত ইহার সম্বন্ধ অল্প। জীবনের সাধ ইহাতে মিটে না—জীবনের সজীবতা, নবীনতা ইহাতে নাই—প্রথার অভ্রভেদী প্রাচীরের মধ্যে আপনাকে আবদ্ধ রাখিয়া ইহা আত্মনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে। এ শিক্ষাকে আমাদের দূরে রাখিতে হইবে নচেৎ আমাদের মঙ্গল নাই।

বাঙ্গালায় ইংরাজী শিক্ষার জন্মদিবস হইতে প্রায় শত বৎসরের পরে আজ আমাদের নিকট "শিক্ষা" একটী সমস্যার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আজ বুঝিতে পারিতেছি, ইহারই উপর অন্যান্য সমস্ত সমস্যা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিয়া আছে। শিক্ষা-সমস্যার সমাধান না হইলে জীবনের অন্যান্য কোন সমস্যারই সমাধান হইবে না। আজ বাঙ্গালীর জীবন নূতন হইতে নূতনতর সমস্যার দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া উঠিতেছে। এগুলির মীমাংসা হওয়া আবশ্যক এবং মীমাংসা না হইলেও উপায়

নাই। যদি বাঁচিয়া থাকিতে হয় আমাদিগকে ইহার মীমাংসা করিতেই হইবে। শিক্ষা-সমস্যা হইল সেই সমস্যা যাহা এই সকল সমস্যারই ভিত্তি-স্থল। এই ইংরাজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই অন্যান্য সমস্ত সমস্যাগুলিই আমাদের চোখের উপর আসিয়া পড়িয়াছে।

আমাদের প্রথম সমস্যা হইল স্বাস্থ্য। ইহার অভাব শিক্ষিতের মধ্যে যেরূপ অধিক পরিমাণে দেখা যায় অশিক্ষিতের মধ্যে তেমন নয়। চিকিৎসা শাস্ত্রের যথেষ্ট উন্নতি হইতেছে—সেই সঙ্গে পীড়ার আধিক্যও বাড়িয়া চলিতেছে। শিক্ষিত যুবকের মধ্যে শতকরা বোধ হয় ৮০ জন অজীর্ণ, উদরাময়, ধাতুদৌর্ব্বল্য এবং নিদারুণ মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া থাকেন। ছাত্রগণের মধ্যে ক্ষয়-রোগের প্রভাবও নিতান্ত অল্প নহে। অধিকাংশ যুবক বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহির্গত হইবার পর সম্পূর্ণরূপে কর্ম্মের অযোগ্য হইয়া পড়েন। দ্বিতীয় সমস্যা—"অন্ন-সমস্যা"—এই সমস্যা থাকিলে কোনও শিক্ষা বড় বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারে না, কারণ কালিদাসের ন্যায় মহাপণ্ডিতও ইহাতে বুদ্ধি হারাইয়া ফেলেন; সুতরাং এ সমস্যাটীকে দূর করিতেই হইবে। এই অন্নসমস্যা এখন মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ঘরে ঘরে।

এতদিন পর্য্যন্ত আমাদের বাঙ্গালী জীবন জড় স্পন্দহীন হইয়া পড়িয়াছিল—বহুদিন পরের দাসত্ব করিয়া আমাদের জীবনের উপর একটী আবরণ আসিয়া পড়িয়াছিল। আজ পাশ্চাত্য জীবিত জাতির সঙ্গে একত্র দাঁড়াইয়া তুলনায় আমাদের জীবনের একটা অস্পষ্ট অভাব চোখের উপর ফুটিয়া উঠিয়াছে।

পর-পদানুলেহন, পর-পদানুসরণ এই ছিল আমাদের শিক্ষার বিষয়। আপন প্রকৃতিতে ইহা দণ্ডায়মান হয় নাই সুতরাং জীবনকেও কোনদিন চিনিতে পারি নাই। আজ বিংশ শতাব্দীর জীবন-যুদ্ধে জীবনের প্রয়োজনীয়তা আমরা অনুভব করিয়াছি এবং সর্ব্বান্তঃকরণে তাহার অন্বেষণও আরম্ভ হইয়াছে। পূর্ব্ব ও পশ্চিমের সম্মিলনে আমাদিগকে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে এই আত্মান্বেষণের বিশেষ প্রয়োজন আছে। তাই আজ এতদিন পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী আলোচনা করিয়া দেখিবার সঙ্কল্প হইয়াছে। জীবনযুদ্ধে পদে পদে লাঞ্ছিত ও ধিক্কৃত হইয়া প্রকৃত শিক্ষার জন্য আমাদের প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। যখন প্রথম ইংরাজী শিক্ষা উঠিয়াছিল তখনকার দিনে ইংরাজী শিক্ষাবলে ভাল ভাল চাকরী মিলিত, রাজসরকারে সম্মান পাওয়া যাইত, সেই লোভে অনেকে ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করিল। আশা—ইংরাজী শিখিলে চাকরী পাওয়া যাইবে। কিন্তু চাকরী আর কত পাওয়া যাইবে! স্বাস্থ্য হারাইয়া যে বিদ্যালাভ করিলাম সে আমাকে দাস হইতেই শিক্ষা দিল; অন্য কোন ভাবে যে আমি দাঁড়াইব তাহার উপায় রহিল না। জীবনের এই আঘাত বড় আঘাত—এই শিক্ষা যথার্থ শিক্ষা। জীবনের ঘাতপ্রতিঘাতে পাশ্চাত্য জাতির অবিরাম সংঘাতে এই শিক্ষাই আমাদের হৃদয়ে ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইয়া যাইতেছে যে এমনভাবে আমাদিগকে শিক্ষিত হইতে হইবে যাহাতে আমরা নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারি। যদি সামান্য উদরান্নের জন্যই আমাকে পরের উমেদারী করিতে হয় তাহা হইলে উচ্চশিক্ষা আমার কি করিবে—ইহা আমার নিকট গলগ্রহের মতই মনে হইবে। ফলতঃ শিক্ষার সহিত জীবনের ঘনিষ্ঠ সংযোগ থাকা উচিত। নতুবা শিক্ষা এবং জীবন দুইই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। এই জীবনের বীজ প্রকৃতির মধ্যে উপ্ত রহিয়াছে। সুতরাং জীবনকে প্রাপ্ত হইতে হইলে প্রকৃতিতে প্রত্যাবর্ত্তন প্রয়োজন। শিক্ষা সম্বন্ধে প্রাকৃতিক প্রণালী অবলম্বন যে আমাদের একমাত্র উপায় আমরা এখন ইহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব।

প্রচলিত প্রণালীতে শিশুর প্রথম হাতে-খড়ি হইলে তাহাকে "অ, আ", শিখান হইয়া থাকে। এই অ, আ, প্রভৃতি বর্ণ তাহারা কেন শিখে তাহা জানে না—ঐ অর্থহীন শব্দ তাহাদের নবোন্মেষিত জ্ঞানের দ্বারে নিগড়স্বরূপ আসিয়া পড়ে। সুর, শব্দ প্রভৃতি জানিবার ইচ্ছা যখন তাহাকে বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে টানিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে সেই সময়ে প্রকৃতি হইতে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিবার নিমিত্ত প্রথম জগদ্দল পাথর

তাহার বুকের উপর বসান হইল—অর্থহীন অ, আ। শিশু ঐ "অ, আ" করিয়াই গুরু মহাশয়ের বেতের ভয়, বাড়ীতে পিতার তাড়না এবং অধীত গ্রন্থের অভিনব প্রলাপের মধ্যে জীবনের স্বর্ণময় প্রভাত হারাইয়া বসিল। তাহার পর ক্রমান্বয়ে তাহাকে টানিয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে—অতি অল্প দিন পরেই আবার নূতন বর্ণমালা তাহাকে শিখিতে হইবে—তখনও পর্য্যন্ত অ, আ প্রভৃতির প্রয়োজন তাহার উপলব্ধি হয় নাই—অথচ A, B, C, Dর মহিমা না জানিলে নয়—এই ভাবে আমরা যে শিক্ষা পাইয়া আসিতেছি তাহা জীবনের নবীনতার দ্বারা সতেজ নয় এবং জীবনের রসের দ্বারাও অভিষিক্ত নয়। ইহার পর কালেজের পাঠ সমাপ্ত করিয়া একেবারে যখন জীবনের সম্মুখে আসিয়া পড়ি, তখন আপনাকে জীবন-যুদ্ধের সম্পূর্ণ অনুপযোগী এবং দুর্ব্বল মনে করিয়া হতাশ ভাবে চতুর্দ্দিকে চাহিতে চাহিতে জীবনটা কাটাইয়া দিই। জীবন ভোগ করা আর ঘটিয়া উঠে না; বর্ত্তমান শিক্ষিত বাঙ্গালী জীবনের ইহাই হইল সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ ট্রাজেডি।

আমাদের পাঠশালার প্রাথমিক শিক্ষা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শিক্ষা উভয় শিক্ষাতেই জীবনের সহিত আমাদের পরিচয় অল্পই হইয়া থাকে। শিশুকে ভূগোল শিখান হয়—হিমালয় পর্ব্বত ভারতবর্ষের উত্তরে। সে মানচিত্রে একটা মসী-রেখা দেখে এবং বারংবার উহা আবৃত্তি করে। এই হিমালয় যে ভারতের কি সম্পৎ তাহার আভাস সে প্রাপ্ত হয় না, তাহার কোন চিত্র দেখাইবার বন্দোবস্ত বিদ্যালয়ে নাই; ইহা ভারতীয় জীবনকে কি ভাবে গঠিত করিতেছে তাহার সামান্য মাত্র ছায়াপাতও বালকহৃদয়ে হয় বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই। তাহার নিকট হিমালয় একটা অর্থ-হীন শব্দ, যাহার ভার তাহার স্মৃতিকে প্রপীড়িত করিয়া তুলে।

ইতিহাসের অবস্থা আরও শোচনীয়। জীবনের সঙ্গে যেন তাহার কোনই সম্পর্ক নাই—কতকগুলি রাজা ও সংস্কারকেরনাম, যেগুলি শুধু নাম মাত্র, সেইগুলিকে স্তরে স্তরে স্মৃতির মধ্যে সাজাইয়া রাখিতে হইবে এবং প্রয়োজনমত বাহির করিতে হইবে। ইতিহাসের প্রতি কোন বালকের অনুরাগ নাই; তাহারা জানে ইহা শুধু মুখস্থ করিবার জন্য সৃষ্টি হইয়াছে। পুস্তকের মধ্যে বুদ্ধদেবের নাম থাকা ছাড়া আর তাঁহার কোনরূপ অস্তিত্ব ছিল ইহা অধিকাংশ বালক জানে না। বস্তুর সঙ্গে পরিচয় নাই—শিক্ষা চলিয়াছে। প্রথম শ্রেণীর অনেক ছাত্রও পুস্তকে অধীত বিদ্যা ব্যতিরেকে বাহিরের একটা কথাও জানে না। যখনই সে বাহিরে যায় তাহার শিক্ষক ও অভিভাবকের সতর্ক দৃষ্টি তাহাকে প্রকৃতি-শিক্ষা হইতে সাবধান করিয়া আসিতেছে। এই কলিকাতা সহরের অধিকাংশ ছাত্র কবির ভাষায় বলিতে গেলে—

"ভোজনে নিপুণ বটে অন্নরুটী ডাল
কিসে জন্মে জিজ্ঞাসিলে ঘটিবে জঞ্জাল।"

রাশীকৃত পুস্তকের ভারে প্রপীড়িত অল্পবয়স্ক বালকগণের সাধারণ জ্ঞানের অল্পতা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। অথবা বিস্মিত হইবার বিশেষ কারণ নাই, কেননা শিক্ষাব্যাপারে যে প্রণালী অনুসৃত হইতেছে, ফলও তদনুযায়ী হইবে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর সহিত প্রাণের সংযোগ নাই। ইহাই বর্ত্তমান যুগে বাঙ্গালার শিক্ষাসমস্যা। আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে এই প্রাণ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন।

প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইলে তবেই জীবনের উপযোগী শিক্ষা আমরা প্রাপ্ত হইব। স্বাস্থ্যই জীবনের সমস্ত সুখের মূল ভিত্তি। যে বিদ্যাশিক্ষার দ্বারা স্বাস্থ্য নষ্ট হয় সে শিক্ষা সর্ব্বথা পরিত্যজ্য। আমাদের ছাত্রবৃন্দের স্বাস্থ্যের প্রতি বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের আদৌ দৃষ্টি নাই। একটা প্রবেশিকাপরীক্ষার্থী ছাত্রকে বিদ্যালয়ে পাঁচ ঘণ্টা থাকার পর বাটীতে ৬।৭ ঘণ্টা পাঠাভ্যাস করিতে হয়—তাহা হইলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাহাকে ১২ ঘণ্টাকাল পুস্তকের মধ্যে নিবদ্ধ থাকিতে হয়—একটা ১৫।১৬ বৎসরের বালকের পক্ষে ইহা সহজ ব্যাপার নয়। তাহার উপর পরীক্ষার দুশ্চিন্তা—তৎপূর্ব্বে রাত্রি জাগরণ প্রভৃতি ব্যাপারে কলেজে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই ছাত্রগণের স্বাস্থ্যভঙ্গ আরম্ভ হয়। আজকাল অধিকাংশ কলেজে ছেলের চোখে চশমা দেখা যায়। অতীব

দুঃখের বিষয় যে পাঠার্থী বালক এত সামান্য বয়সেই ক্ষীণদৃষ্টি হইবে!

আমাদিগের প্রাথমিক শিক্ষা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার এই কলঙ্কটী সর্ব্বাগ্রে মোচন করিতে হইবে। প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্য্যন্ত পুস্তকের সংখ্যা কমাইয়া প্রকৃতিজ্ঞান, বস্তুজ্ঞান প্রভৃতির বিষয় নির্দ্দেশ করিলে শিক্ষাও প্রকৃত হয় এবং ছাত্রগণেরও স্বাস্থ্য নষ্ট হয় না। প্রথম সমস্যাটীর মীমাংসার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় সমস্যার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ইহা অন্নসমস্যা। মানুষকে আর সকল কার্য্য করিবার পূর্ব্বে তাহাকে জীবন ধারণ করিতে হইবে এই বিষয়ে আর অন্যমত দেখা যায় না, কিন্তু আমাদের শিক্ষিতগণ কি করিবেন? গভর্ণমেণ্ট আফিস ভর্ত্তি হইয়া গিয়াছে, মার্চ্চেণ্ট আফিসেও আর ন স্থানং তিলধারয়েৎ—ক্রমে জমিদারী বিভাগে ইংরাজী শিক্ষিত কর্ম্মচারীতে পূর্ণ হইয়া গেল—চাকরীর সোণার তরী বোঝাই হইয়া গিয়াছে,

"স্থান নাই স্থান নাই ছোট এ তরী
আমারই সোণার ধানে গিয়াছে ভরি"

এখন উপায় কি? ততঃ কিম্—ইংরাজী তর্জ্জমা, ইংরাজী ব্যাকরণ, ইংরাজী ভাষাই শিখিয়াছি—ইংরাজীতে একখানি পত্র লিখিতে পারি বা একটী হিসাব করিতে পারি—ইংরাজের দ্বারে বা ইংরাজের পদাঙ্ক যাহারা অনুসরণ করেন তাঁহাদের দাসত্ব ব্যতিরেকে আর কি উপায় আছে?

যদি দাসত্বের দ্বারা উদরের চিন্তা দূর হইত তাহা হইলে দুঃখ ছিল না, কিন্তু তাহা হইতেছে না! মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সাংসারিক অবস্থা বর্ণনীয় নয়। খরচ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে কিন্তু তেমন আয় নাই। কোনরূপে সংসারখরচ সঙ্কুলান হয়। ইহার উপর যদি গৃহে অবিবাহিতা কন্যা থাকেন তাহা হইলে আর নিস্তার নাই (আর কন্যা নাই এমন গৃহও বিরল)—সে গৃহস্থকে সর্ব্বস্বান্ত হইতেই হইবে। আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারীগণ বিবাহের সময় অনেক পণ পাইয়া থাকেন—এ কেমন উচ্চ শিক্ষা যাহা বিবাহের ন্যায় গুরুতর ব্যাপারেও কন্যার পিতার—অর্থের প্রতিই দৃষ্টি রাখে! এ উচ্চ শিক্ষার অর্থ নাই! বাঙ্গালার বরপণ উচ্চশিক্ষার কলঙ্ক! এই চাকুরীজীবী মধ্যবিত্ত গৃহস্থের জন্য এমন শিক্ষার প্রয়োজন যাহাতে তাঁহারা দেশে নানারূপ কার্য্য পাইতেও করিতে পারেন। অনেক বিষয় আছে যেগুলি বিশেষভাবে আলোচিত হইলে মধ্যবিত্তের এই অন্নাভাব নিবারিত হইতে পারে। অবশ্য ইহার নিমিত্ত প্রথম প্রথম আমাদিগকে কিয়ৎপরিমাণে স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে; কার্য্যারম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই অভাব মিটিবে না। বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষিকার্য্য, এই বস্ত্রসঙ্কটের দিনে কার্পাস প্রভৃতির চাস এবং সুতা ও বস্ত্রের কল প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি শিল্প, কৃষি এবং বাণিজ্যের দ্বার সর্ব্বসাধারণের নিমিত্ত উদ্ঘাটন করিতে হইবে। কিন্তু শুধু শিক্ষাতেই উহা পর্য্যবসিত হইলে চলিবে না। এ প্রস্তাব বোধ হয় নূতন নহে, বহুবার ইহা কথিত এবং লিখিত হইয়াছে, কিন্তু কার্য্যে পরিণত হয় নাই। দেশের ব্যবসায়ী এবং শিক্ষিত ধনীগণ এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করিলে উপায় নাই। আমাদের দেশে স্বদেশী যুগ হইতে অনেক বক্তৃতা হইয়াছে, দেশের নাম করিয়া National fund ও গঠিত হইয়াছিল কিন্তু আজ সে fund এর যে কি ফল হইতেছে তাহা কেহই বলিতে পারিবে না। শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি, বিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষার বন্দোবস্ত করিবার পূর্ব্বে যাহাতে ঐ সমস্ত বিদ্যালয় হইতে শিক্ষিত ছাত্রগণ এই দেশেই যথেষ্ট কার্য্য পাইতে পারেন তাহার বন্দোবস্ত করা উচিত। যাঁহার মূলধন নাই, স্বাধীনভাবে কোনও কার্য্য আরম্ভ করিতে যিনি পারিতেছেন না তাঁহারও যেন কার্য্যের অভাব না হয়। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিজ্ঞান শিক্ষার বন্দোবস্ত হইল—কিন্তু দেশের কোনও সুসার তদ্দ্বারা হইল না। B. Sc. ও M. Sc. উত্তীর্ণ উকিল আজকাল যথেষ্ট হইয়াছে। বিজ্ঞান দেশের কাজে লাগিল না। এইভাবে আমাদের শিল্প ও কৃষিশিক্ষাও ব্যর্থ হইবে, যদি আমরা পূর্ব্ব হইতে সর্ব্ব বিষয়ে দৃষ্টিপাত না করিয়া শুধু শুধু শিল্প, কৃষি ও বাণিজ্য শিক্ষার বন্দোবস্ত করি। যাঁহারা ব্যবসাদার, অন্যান্য বিষয়ে যাঁহাদের টাকা খাটিতেছে তাঁহারা যদি অগ্রণী হন—একটী নূতন speculation বলিয়া এই সমস্ত কার্য্য গ্রহণ করেন তবেই একদিন উহা সার্থক হইতে পারে। শিল্প ও

কৃষিশিক্ষা দেশের মধ্যে জাগাইয়া তুলিতেই হইবে। কিন্তু লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে শিক্ষা যেন দাসত্বের নাগপাশে বদ্ধ হইয়া আপনার মহদুদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করিয়া না বসে।

এই স্বাবলম্বন প্রবৃত্তি আমাদের সমস্ত শিক্ষার মূলে বিজড়িত করিয়া তুলিতে হইবে। স্বাবলম্বনেই "অন্ন-সমস্যার" মুক্তি। তার পর উচ্চশিক্ষা—উদরান্নের জন্য লালায়িত ব্যক্তির মস্তিষ্কে উচ্চ চিন্তা স্থান পাইতে পারে না। অভিনব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, সাহিত্যে অভিনব রসসৃষ্টি, কাব্যকলার সুন্দরতম নৈপুণ্য সাধন, গণিতের উচ্চাঙ্গের সমস্যা পূরণ, দর্শনশাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব মীমাংসা—রোগক্লিষ্ট অন্নচিন্তাক্ষুব্ধ দাসত্বভারাবনত মস্তিষ্কের দ্বারা কখনই সম্ভবপর নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্ত্তমানে আমরা যে শিক্ষা পাইয়া থাকি, সংসারের চিন্তায় তাহা আমাদের জীবনে কখনই বিকশিত হয় না। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন ও বিজ্ঞানের জ্ঞান আমাদের কলেজের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই লুপ্ত হইয়া যায়, জীবনে তাহার আর নিদর্শন থাকে না।

বর্ত্তমানে বাঙ্গালা ভাষার মধ্য দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সমস্ত শিক্ষা দিবার এবং বঙ্গসাহিত্যকে M, A পরীক্ষার অন্যতম বিষয়রূপে নির্দ্ধারিত করিবার একটী আন্দোলন শোনা যাইতেছে। যে জাতির মাতৃভাষা ঘৃণিত সে জাতির উদ্ধারের আশা নাই। বঙ্গভাষার প্রতি আন্তরিক আগ্রহ না হইলে বাঙ্গালীর উন্নতি হইবে না। বাঙ্গালীর জীবন ও শিক্ষা বাঙ্গালার জলবায়ুতে পরিপুষ্ট হইয়া বঙ্গভাষার মধ্য দিয়াই সম্যক্ বিকশিত হইবে। আজ যে শিক্ষা আমরা পাইয়াছি ইহা প্রকৃত শিক্ষা নয়—ইহা অনুকরণমাত্র। কিন্তু ইহা একেবারে ব্যর্থ নয়—বিদেশ হইতে প্রাণের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আনিয়া ইহা আমাদের চেতনাহীন প্রাণকে চৈতন্যের বিপুল বেদনায় ব্যথিত করিয়া তুলিয়াছে। বঙ্গের অন্নাভাব দূর করিয়া আজ বাঙ্গালীকে নানা বিদ্যার আভরণে ভূষিত করিবার দিন আসিয়াছে। পরের জীবনের সৌন্দর্য্য দেখিয়া ঘরে ফিরিয়া আর আমরা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিব না—কলা, শিল্প, কাব্য, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের অভিনব সৃষ্টি দ্বারা বঙ্গসাহিত্য-ভাণ্ডারকে পরিপূর্ণ করিবার সুদিন উপস্থিত। এখন কেবল পূজাবেদীতে বঙ্গবাণীর উদ্বোধনের জন্য সমবেত ভক্তমণ্ডলীকে মায়ের আগমনী সঙ্গীতে যোগদান করিতে হইবে।

আদর্শ
বা
দাদা ঠাকুর।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—রহিমদ্দীর বাটী। কাল—অপরাহ্ণ।

রহিমদ্দী উঠানে বসিয়া বেত কাটিতেছিল। তাহার সম্মুখে দুইখানি কাঠাসনে নিধিরাম ও কেনারাম উপবিষ্ট।

রহিমদ্দী। এ দেশে আর থাকা হোল না। এত অত্যাচার!

নিধি। দেশ ছেড়েই বা যাব কোথায়? আর বাপ-দাদার বাস্তভিটে—একি সহজে ছাড়া যায়?

রহিম। না হলে' তো এই অত্যাচার সইতে হবে। এই দ্যাখো, আমি মিথ্যা সাক্ষী দিইনি' বলে, আমায় কয়েদ করে রেখেছে, মেরেছে, বাড়ী লুট করে নিয়েছে। যদি দাদাঠাকুর গিয়ে না পড়তেন, তাহলে সেইদিনই অক্কা পেতে হোত। যদি দাদাঠাকুর মেহেরবাণী করে দুটো চাল না দিতেন, তাহলে এই কয়দিন উপোস করে থাকতে হোত।

নিধি। দেখি ঠাকুর কি করেন।

কেনা। ঠাকুর গরীবের জন্যে কিছু করেন না।

নিধি। ও কথা বলো না ভাই। ওহে, হরিচরণের কি হোল?

রহিম। আহা তা জানো না? বেচারার ছাওয়ালটি মারা গেল, মরবার সময়ে তাকে একটু দেখতেও পেল না। কাছারী থেকে মার খেয়ে এসে এই কথা শুনে বুড়ো আর বরদাস্ত করতে পারলে না। ভিরমী খেয়ে পড়ল। তারপর দুদিনের জ্বরে মারা গেল।

নিধি। মারা গেল! আহা তবে তার আর কেউ নেই। একেবারে বাড়ী শূন্য?

রহিম। আছে তার ছেলের বৌ। সে এখন দাদাঠাকুরের বাড়ীতে আছে। পোড়াকপালে মানুষগুলো তাতেও কাণাকাণি করে। দাদাঠাকুর দয়া করে আশ্রয় না দিলে বউটার কি দশাই হোত। দাদাঠাকুরের মত এমন মানুষ কি আর হয়!

কেনা। তুমি বল কি; দাদাঠাকুর কি মানুষ? সে যে দেবতা। তিনিও নাকি বড় বিপদে পড়েছেন।

নিধি। কি বিপদ?

রহিম। জমিদার তাঁর নামে মিথ্যা মোকদ্দমা করেছে। বোধ হয় তাঁর জেল হোতেও পারে।

নিধি। তাঁর আর আছে কে?

রহিম। আছে তাঁর গিন্নী আর একটী ভায়ের মেয়ে। কোনো সন্তান-টন্তান নেই।

নিধি। টাকাকড়ি আছে কেমন?

রহিম। খুব ভালো অবস্থা ছিল। কিন্তু জমিদার ব্যাটা তাঁর নামে জাল দলিল তৈরী করে, মিথ্যা মোকদ্দমায় ডিক্রী করে তাঁকে এখন ভিকিরী করেছে। এদিকে তো আবার দান করে ফতুর।

কেনা। আহা এমন মানুষেরো এমন দশা হয়!

রহিম। ঐ বুঝি দাদাঠাকুর আস্‌ছেন। এত যে দুঃখ কষ্ট তবু গান গেয়ে তেমনি আগের মতন আমোদ করে বেড়াচ্ছেন।

(গাহিতে গাহিতে দাদাঠাকুরের প্রবেশ)

গীত।

(ওমা) তুই মা আঁধার ঘরের আলো।
যেমন থাকি তেমন থাকি তোরেই বাসি ভালো।
আকাশ যখন ছেয়ে আসে কালো কাজল মেঘে,
ঝঞ্ঝা যখন আসে ধেয়ে রুদ্র ভীষণ বেগে,
কুঁড়ে যখন যায় গো পুড়ে বাজের আগুণ লেগে,
সেই ভয়ের রাতে ওজননী তুমিই কোলে তোলো।
(যখন) ঘিরে আসে দৈন্য লজ্জা দুঃখ খরতর,
সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে আপন যে হয় পর,
সেই শূন্য ঘরে ও জননী তুমিই প্রদীপ জ্বালো॥

(সকলে দাদাঠাকুরকে প্রণাম করিল)

রহিম। আসুন দাদাঠাকুর। কাঙালের বাড়ীতে মেহেরবাণী করে এসেছেন।

দাদা। ও কথা বলিস্‌নে। ও রকম করলে আমি চলে যাব। তোরা যে আমার আপনার জন। আমার সঙ্গে এতটা সামাজিকতা করতে হবে না। ঈশ্বর এই বুঝে তোদের সঙ্গে এখন একেবারে সমান করে দিয়েছেন —যা একটু তফাৎ ছিল, তা এখন আর নেই। দয়া করে আমায় ভিকিরী করেছেন। বেশ করেছেন! বেশ করেছেন!

গীত।

যখন আমার নাই গো কিছু
ভাব্‌বো তখন তুমি আছ;
যখন সকল আস্‌বে ফিরে
বুঝব তুমি ছেড়ে গেছ।
সব-হারাদের তুমিই সকল
শূন্য ঘরেই তোমার দখল
যারা তোমায় চায় গো কেবল
তুমি তাদের সকল নেছ।
ভিক্ষা করে মানুষ বাঁচে
যাব না মানুষের কাছে
তার আবার কি অভাব আছে
তুমি যারে ভিক্ষা দেছ?

রহিম। আবার আপনার সব হবে।

দাদা। কি হবে? কি ছিল? কি গ্যাছে? বলিস্ কিরে? ঠাকুর আমার ক্রমে তাঁর বেশী আপন করে নিচ্ছেন। টাকা থাক্‌লে পাছে তাঁকে ভুলে থাকি তাই টাকা কড়ি সব নিয়েছেন। আমি সব হারিয়ে আমার সব পাব। ওরে তাঁর বড় দয়া! যাক্ সে কথা। ধর এখন এই আট আনার পয়সা নে।

রহিম। না, না, আমার আছে। ও আমি নেব কি জন্যে?

দাদা। আরে ব্যাটা নে। ঘরে যে চাল নেই তা জানি।

রহিম। দাদাঠাকুর, তুমি যখন ভরা-গলায় "রহিম" বলে ডাকো তখনি দুঃখ কষ্ট সব ভুলে যাই। টাকায় কাজ কি?

দাদা। আরে ধর্ নে।

রহিম। দাদাঠাকুর, আজকাল যে তোমার কিছুই নেই তবু তুমি এখনো আমাদের দিচ্চ?

দাদা। আমার কিছু নেই তোকে কে বল্লে? ওরে ভগবানের রাজ্যে কি কিছুর অভাব আছে? ওরে তাঁর ভাণ্ডার যে অনন্ত আমি আর কতটুকু নেব?

গীত।

রাজার ছেলে কাঙাল হয়ে ঘুর্‌বি কোথায়
কাহায় দ্বারে?
কতটুকু পার্‌বি নিতে? কতই আছে
এ ভাণ্ডারে।
আছে কান্না আছে হাসি
আছে সুখ দুঃখ রাশি
এই প্রকৃতি হবে দাসী চিনিস্ যদি আপনারে।
রতনের সেরা রতন
পেয়ে বুঝি পেলিনে মন
পেলে সে অমূল্যধন ঘুচ্‌ত অভাব একেবারে।
থাকিস্‌নে আর আঁখি বুজে
মরিস্‌নে আর মিছা খুঁজে

বাইরে আলো থাকলে কি হয়,
মুদ্‌লে আঁখি অন্ধকারে।
দেওয়া হলেই হয় না পাওয়া
তাইতো পেয়েও রয় গো চাওয়া
দুয়ার দিয়ে রইলে ঘরে মলয় হাওয়া লাগে নারে॥

রহিম। তা হলে' আর অভাব কি? আমাকেও তিনিই দেবেন। না দাদাঠাকুর, আমি কিছুই নেবনা। তিনিই দেবেন।

দাদা। এও তো তিনিই দিচ্চেন। এ কি আমি দিচ্চি? আমি কে? আমি কি কিছু দিতে পারি? কার দ্রব্য কারে দেব?

রহিম। না দাদাঠাকুর, আমি কিছুই নেবনা। আহা কি মিষ্টি কথা শুন্‌লুম—"তাঁর রাজ্যে অভাব নেই, তিনিই দিবেন"—না দাদাঠাকুর আপনার পায়ে পড়ি আমি কিছুই নেব না।

দাদা। রহিম, রহিম, এমন প্রাণ তোর? তুই যে আমার চেয়ে অনেক বড়! আয় একবার তোকে বুকে করি। (আলিঙ্গন)

রহিম। দাদাঠাকুর, দাদাঠাকুর, আমার দাদাঠাকুর! কেনারাম, ভাই দ্যাখো দ্যাখো কেমন দাদাঠাকুর।

কেনা। ঠিক্ যা শুনেছিলাম তাই। এমন মানুষ তো আর দেখিনি। এ যে দেব্‌তা!

দাদা। কেরে তুই ব্যাটা? মার্ খাবি, মার্ খাবি। এঃ বক্তিমি কচ্চে (স্নেহে কিল মারিলেন) কেমন দেব্‌তা? আর দেবতা বল্‌বি?

নিধি। ওরে কেনারাম, পায়ে পড়, পায়ে পড়। তোর বরাত ভালো। দাদাঠাকুরের কিল্ খেয়েছিস্। পায়ে পড়।

(নিধিরাম, কেনারাম ও রহিমদ্দী দাদাঠাকুরের চরণে প্রণত হইল। দাদাঠাকুর তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া গাহিল)

গীত।

আমায় পাগল করে'দে।
খুলি খুলি কর্‌ব উজাড় সবাই লুটে নে।
কি বাতাসে উঠ্‌ছে যে ঢেউ লাগ্‌ছে বুকে এসে
হাল ছেড়েছি যাক্‌না নিয়ে যাবই চলে ভেসে;
একেবারে যাব মেতে হেসে গেয়ে কেঁদে।
জোয়ার যখন আসে জোরে স্রোত যখন ছুটে
ঝড়ের বাতাস মেতে উঠে আকাশ যখন লুটে
তখন তারে কোন্ বাঁধনে রাখ্‌তে পারে বেঁধে॥

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন।

(সংবাদ প্রভাকর হইতে উদ্ধৃত)

(৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের অনুবৃত্তি)

রাজা যখন কুমারহট্টে আসিতেন তখন রামপ্রসাদ সেন অজু গোঁসাইকে একত্র করিয়া উভয়ের সঙ্গীতযুদ্ধের কৌতুক দেখিতেন। রামপ্রসাদ কবীন্দ্র ছিলেন, অজু গোঁসাই আধ পাগলা ছিলেন, কিন্তু মুখে মুখে রহস্য-কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। রামপ্রসাদ সেন জ্ঞানভক্তি বিষয়ে পদ বিন্যাস করিতেন, ইনি তখনি রহস্যচ্ছলে তাহারি উত্তর করিতেন।

একদিবস রাজসমীপে রামপ্রসাদ গান করিলেন,

"এই সংসার ধোঁকার টাটী।
ও ভাই আনন্দ বাজারে লুটী॥
ওরে ক্ষিতি বহ্নি বায়ু জল,
শূন্যে এত পরিপাটী।
প্রথমে প্রকৃতি স্থূলা,
অহঙ্কারে লক্ষ কোটী।
যেমন শরার জলে সূর্য্যছায়া
অভাবেতে স্বভাব ঘিটি॥ ১
গর্ভে যখন যোগ তখন,
ভূমে পড়ে খেলেম মাটী।
ওরে, ধাত্রীতে কেটেছে নাড়ী,
দড়ির বেড়ি কিসে কাটী॥ ২
রমণী বচনে সুধা,
সুধা নয় সে বিষের বাটী।
আগে ইচ্ছাসুখে পান করে,
বিষের জ্বালায় ছট্‌ফটী॥ ৩
আনন্দে রামপ্রসাদ বলে,
আদি পুরুষের আদি মেয়েটী।
ওমা, যাহা ইচ্ছা তাহাই কর,
মা তুমি পাষাণের বেটী॥" ৪

অজু গোঁসাই শ্রুত মাত্রেই ইহার উত্তর করিলেন,

'এই সংসার রসের কুটি,
খাই দাই বাজক্লে বসে মজা লুটী॥

ওহে সেন নাই জ্ঞান, বুঝ তুমি মোটামোটী।
ওরে ভাই বন্ধু দারা সুত, পিড়ি পেতে দুধের বাটী॥'

কবিরঞ্জন গান করিলেন,—

"আয় মন বেড়াতে যাবি।
কালীকল্পতরু তলেরে মন,
চারি ফল কুড়ায়ে খাবি॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া,
তায় নিবৃত্তিরে সঙ্গে নিবি।
ওরে বিবেক নামে জ্যেষ্ঠ পুত্র,
তত্ত্বকথা তায় সুধাবি॥ ১
অহঙ্কার অবিদ্যা তোর পিতা মাতায় তাড়্য়ে দিবি॥
যদি মোহগর্ত্তে টেনে লয়,
ধৈর্য্য খোঁটা ধরে রবি। ২
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজা,
তুচ্ছ হাড়ে বেঁধে থুবি।
যদি না মানে নিষেধ তবে,
জ্ঞানখড়্গে বলি দিবি॥ ৩
প্রথম ভার্য্যের সন্তানেরে দূরে হোতে বুঝাইবি।
যদি না মানে প্রবোধ,
জ্ঞানসিন্ধুমাঝে, ডুবাইবি॥
প্রসাদ বলে এমন হোলে,
কালের কাছে জবাব দিবি।
তবে বাপু বাছা বাপের
ঠাকুর, মনের মত হবি॥" ৪

গোঁসাইজী ইহার উত্তর করিলেন,—

"বোলেছে রামপ্রসাদ কবি।
আয় মন বেড়াতে যাবি॥
তার কথায় কোথায়ও যেও নারে।
সাধকের মনের ভাব সেকি জানেরে॥"

রামপ্রসাদ কালীকীর্ত্তনে একাম্রকাননে ভগবতীর গো-চারণ প্রসঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন,—

গিরীশগৃহিণী গৌরী, গোপবধূ বেশ।
কষিতকাঞ্চনকান্তি প্রথম বয়েস॥
সুরভির পরিবার, সহস্রেক ধেনু।
পাতাল হইতে উঠে, শুনে মার বেণু॥
জগদম্বারে যব পূরে বেণু।
যব পূরে বেণু, ধায় বৎস ধেনু।
উড়ে পদরেণু, রেণু ঢাকে ভানু।
ভাবে ভোর তনু। ইত্যাদি—

গোস্বামী ইহার উত্তর দিলেন,—

"না জানে পরম তত্ত্ব, কাঁঠালের আমসত্ত্ব,
মেয়ে হোয়ে ধেনু কি চরায় রে।
তা যদি হইত, যশোদা যাইত,
গোপালে কি পাঠায় রে।"

রামপ্রসাদ সেন কহিলেন,—

"কর্ম্মের ঘাট্ তেলের কাট্ আর পাগলের ছাট্ মোলেও যায় না।"

অজু গোঁসাই তখনি উত্তর দিলেন,—

কর্ম্মডোর, স্বভাব চোর, আর মদের ঘোর মোলেও যায় না।

রামপ্রসাদ কহিলেন,—

শ্যামভাবসাগরে ডোবোরে মন,
কেন আর বেড়াও ভেসে॥

গোঁসাই উত্তর দিলেন,—

একে তোমার কোপো নাড়ী।
ডুব দিওনা বাড়া বাড়ী॥
হোলে পরে জ্বর জাড়ী।
যেতে হবে যমের বাড়ী॥

এই সমস্ত কবিতা পাঠে পাঠকগণ সেনজি ও গোঁসাইজির বিদ্যা ও গুণের তারতম্য বিবেচনা করিবেন।

মহারাজ রামপ্রসাদকে ভূমি দান করিয়া কিছু দিন পরে জিজ্ঞাসা করিলেন কেমন সেনজি সে ভূমি ভালরূপে আবাদ করিয়াছ কি না? প্রসাদ তাহার উত্তর ছলে এই গান ধরিলেন,—

যথা—

তারার জমি আমার দেহ,
ইথে কি আর আপদ্ আছে।
ও যে দেবের দেব,
সুকৃষাণ হোয়ে মহামন্ত্রে বীজ বুনেছে॥
ধৈর্য্য খোঁটা ধর্ম্ম বেড়া,
এ দেহের চৌদিক ঘেরেছে।
এখন কালা চোর কি করতে পারে,
মহাকাল রক্ষক রোয়েছে॥
দেখে শুনে ছটা বলদ্ ঘরে
হতে বার হোয়েছে॥ ১
কালীনাম অস্ত্রের তীক্ষ্ণ ধারে,
পাপতৃণ সব কেটেছে॥ ২

প্রেমভক্তি সুবৃষ্টি তায়,
অহর্নিশি বর্ষিতেছে।
কালীকল্পতরুবরে রে ভাই,
চতুর্ব্বর্গ ফল ধরেছে ॥ ৩

রামপ্রসাদ সেনের অবস্থাভেদের পদ্য সকল অতি চমৎকার, ইনি ক্রিয়াকাণ্ড কিছুই মান্য করিতেন না, ইঁহার সকল অবস্থার কবিতার দ্বারাই তাহার বিশিষ্ট রূপ প্রমাণ হইয়াছে। ইনি তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষ ছিলেন, ফলভোগবিরাগী হইয়া সুপবিত্র প্রীতিচিত্তে গীত ছলে পরমপূজ্য পরমেশ্বরের পূজা করিতেন। রামপ্রসাদি পদের অধিকাংশই জ্ঞান যুক্ত প্রেমভক্তি রসে পরিপূরিত। নিরাকারবাদিরা "ব্রহ্ম" শব্দ উল্লেখ পূর্ব্বক যাঁহার উপাসনা করেন ইনি কালীনাম উচ্চারণ করত তাঁহারি আরাধনা ও উপাসনা করিতেন, ইহাতে পুরুষ আর প্রকৃতি অথবা পরমেশ্বর বা পরমেশ্বরী, এই নামান্তর জন্য ভাব, রস, ভক্তি, প্রেম এবং জ্ঞানগত বৈলক্ষণ্য কিছুই হইতে পারে না, কারণ উভয় পক্ষেরি উদ্দেশ্য এক এবং যথার্থ পক্ষে উভয়েরি মর্ম্ম ও অভিপ্রায় এক হইতেছে।

রামপ্রসাদ সেনের শক্তিভক্তিবিষয়ক উক্তি সকল শুনিয়া সকলেই তাঁহাকে কালীর বরপুত্র বলিয়া বাচ্য করিতেন, এবং তৎকালে তাবতেই বলিতেন "অন্নপূর্ণা" প্রতিদিবসেই কাশী হইতে আসিয়া তাঁহার শিয়রে বসিয়া কথা কহিতেন, স্বপ্ন দিতেন, আর কন্যার বেশ ধরিয়া গান শুনিতেন, রন্ধন করিয়া দিতেন; এবিষয়ে অপর একটা অত্যাশ্চর্য্য অলৌকিক কথা রাষ্ট্র আছে। যথা—"এক দিবস রামপ্রসাদ সেন বাটীর বেড়াবন্ধনের জন্য দড়ি, বাঁশ, বাঁকারী প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া ঘরামীর অন্বেষণে গমন করিয়াছিলেন, ক্ষণকালের পরেই ঘরামী লইয়া প্রত্যাগমন পূর্ব্বক দেখিলেন, বাঁশ বাঁকারী দড়ি প্রভৃতি আপনারাই যথাস্থানে সংলগ্ন হইয়া বেড়া বন্ধ করিয়াছে। ইহাতে তৎক্ষণাৎ প্রতিবাসী ও গ্রামবাসীগণের মধ্যে কোলাহল শব্দ ঘোষণা হইয়া উঠিল যে "কাশীপুরেশ্বরী অন্নদা" স্বয়ং আসিয়া রামপ্রসাদ সেনের বেড়া বাঁধিয়া দিয়াছেন, এই প্রকার চমৎকার চমৎকার ব্যাপারঘটিত জনরব কত আছে, যাহার বর্ণনা করিতে হইলে একখানা পুস্তক ব্যতীত কোন মতেই নিষ্পন্ন হইতে পারে না। এই সকল ঘোষণা প্রসাদ স্বয়ং কখনই করেন নাই, কেননা তাহা হইলে তাঁহার অসীম রচনার কোন স্থানে না কোন স্থানে অবশ্যই ইহার কোন কথা উল্লেখ থাকিত।

ক্রমশঃ।

রাণাডের-স্মৃতিকথা।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদিত)

আমাদের বাড়ীতে আজ প্রায় ৪০ বৎসর হইতে, ৪৫ জন ছাত্রের সমস্ত খরচ চালাইতে হইত। অন্য অনেক দানধর্ম্ম অপেক্ষা, বিদ্যার্থীকে দান করা 'উনি' অন্তরের সহিত ভালবাসিতেন, তাই এই উদ্দেশে বেশী বেশী দান হইত। এই সকল ছাত্র যাহারা আমাদের বাড়ীতে থাকিত, উহাদের পাঠাভ্যাস শেষ হইলে,—শাকসব্জী তরকারী কেনা, ব্যাপারী কাপড়ওয়ালা মুদী প্রভৃতির দোকান হইতে আমার কথা মতো জিনিস আনা—এই সব কাজ উহারা করিত। উহাদের মধ্যে যাহারা বেশী চালাক ও অভিজ্ঞ তাহাদের দ্বারা হিসাব লেখা ও বিল চুকাইবার কাজ করাইয়া লওয়া হইত। এই অনুসারে 'উনি' মধ্যে মধ্যে জমাখরচ লিখিবার জন্য তাগিদ করিতেন। কোন জিনিস ধারে আনিবার নিয়ম ছিল না। শ-দুইশো টাকার মাল আনিবার পর, হিসাব পরীক্ষা না হওয়া পর্য্যন্ত, ১০।১৫ দিনের দেনা থাকিয়া গেলে, মাসকাবারে সেই দেনার টাকা চুকাইয়া দিয়া তাহার রসিদ লইতে হইবে, এইরূপ উনি তাগিদ করিতেন। এই অনুসারে সমস্ত ব্যবস্থা হইল কিনা, আমার ননদ দেখিতেন। সেই সময়কার ছাত্রদের মধ্যে "ভট্" এই ডাক নামে কোঙ্কন প্রদেশের এক ছেলে ছিল। লেখার কাজে তার বেশ দক্ষতা ছিল, 'মোডী' অক্ষর সে সুন্দর লিখিতে পারিত; সেইজন্য জমাখরচ লিখিবার ভার তার উপরেই দেওয়া হইয়াছিল। প্রত্যেক মাসের দশ তারিখের মধ্যে লোকজনের মাহিনা ও দোকানদারদিগের বিল চুকাইয়া দিতে হইত। ইদানীং কখন কখন চাকরদিগের বেতন দিবার সময়েই দোকানদারদের বিলের টাকাও তাহার হাত দিয়াই পাঠাইয়া দেওয়া হইত। তাহাতে, একই দিনে জমাখরচ লিখিবার সুবিধা হইত। কিন্তু কিছুদিন এইরূপ নিয়মে কাজ চলিলে পর, এই ছেলেটির মনে জুয়াচুরী করিবার মৎলব

আসিল। বিল চুকাইয়া দেওয়া ও জমাখরচ লেখা—এই দুই কাজই উহার হাতে থাকায় জুয়াচুরী ঢাকিবার বেশ সুযোগ পাইল। উক্ত 'ভট্' প্রায় দুই মাসের বিলের টাকা আমাদের নিকট হইতে লইয়া খাতায় খরচ লিখিয়াছে এবং বিল চুকাইয়া না দিয়া সে নিজে অসৎ কার্য্যে ঐ টাকা খরচ করিয়া ফেলিয়াছে। এই জুয়াচুরী ধরা পড়িবার একটা কারণ ঘটিল:—একদিন আমার ননদ, এক পোয়া 'কাজু'-বাদাম মুদীর দোকান হইতে আনাইয়াছিলেন। মুদী উহা লইয়া আসিলে পর, আমার ননদ তাহাকে সহজভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'এই কাজু ছাড়া আমাদের পূর্ব্বেকার দেনা আর কিছু নেইত? এটাই কেবল ধারে এসেছে?" এই কথা শুনিয়া মুদী আশ্চর্য্য হইয়া বলিল,—"কি? আপনি টাকা পাঠিয়েছিলেন কি? আমার তো গত দুই মাসের টাকা পাওনা আছে।" এই কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া ননদ তাহাকে বলিলেন:—"আমরা কখনই ধার রাখিনে,—একথা তুমি জেনেও দুইমাস কাহাকে না জিজ্ঞাসা করে' চুপ করে' বসে' রইলে কি-করে?' তুমি তোমার দোকানের লোকদের কাছে অনুসন্ধান কর।" মুদী বাহির হইয়া যাইবার পরেই ঐ ছেলেটি বাড়ী আসিল; তখন ননদ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি মুদীর টাকা কি চুকিয়ে দেওনি? সে একটুও ইতস্তত না করিয়া একেবারেই বলিল,—"আমি সকলেরই বিলই চুকিয়ে দিয়েছি।" তখন, ভয় পায় এমন কোন কথা তাকে না বলিয়া, ননদ তাকে শুধু বলিলেন—"যা, তোর পড়া অভ্যাস করগে যা," এবং দানা-ওয়ালা ও কাপড়-ওয়ালার দোকানে চুপি চুপি সিপাইকে পাঠাইয়া সন্ধান লইলেন,—দোকানদারেরা টাকা পাইয়াছে কিনা; উহারা টাকা পায় নাই শুনিয়া তিনি সিপাইকে বলিলেন—"তুই দেউড়ীতে বসে থাক্; কোন কাজের জন্য হরিকে দরজার বাহিরে যেতে দিস্‌নে।" সে দিনটা পরবের দিন; তাই, আহারান্তে দোকানদারদিগকে সম্মুখে ডাকাইয়া আনিয়া মুকাবেলা করিবেন এবং তাহার পর এই কথা "ওঁকে" জানাইবেন এইরূপ আমার ননদ মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন; কিন্তু হরির মনে সন্দেহ হওয়ায়—"বন্ধুর বাড়ী যেতে হবে, পুস্তক আনতে হবে" ইত্যাদি অছিলা করিয়া সে সদর দরজা দিয়া বাহিরে যাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু সিপাইরা তাহাকে যাইতে দিল না। তখন সে "মার্কেটের" প্রাচীরের উপর দিয়া খাসগীবালার বাগানে লাফাইয়া পড়িয়া পলায়ন করিল। একজন ছাত্র এই কথা ননদের কাছে গিয়া বলিল; কিন্তু তিনি কিছুই বলিলেন না দেখিয়া, সে এই খবরটা আমার কাছে আসিয়া বলিল। এই কথা শুনিবামাত্র চারি পাঁচশো টাকার হিসাবের গোল হইতেছে, দিন-দুপুরে একজন লোক প্রাচীরের উপর দিয়া লাফাইয়া পলাইল এবং এত লোকজন ও সিপাই থাকিতে কেহ তাহাকে ধরিতে গেল না এইজন্য আমার এত রাগ হইল যে, আজ পর্ব্বদিন, আহারের পূর্ব্বে এই খবরটা ওঁকে দিলে ওঁর কষ্ট হবে, ওঁর খাওয়া হবে না—এ কথা আমি একেবারেই বিস্মৃত হইলাম, এবং আমি একেবারেই ওঁর নিকট গিয়া এই কথা জানাইলাম। আমার এই অধৈর্য্যের দরুণ আর এক জনের কাছে আমার উচিত প্রায়শ্চিত্ত হইল। "উনি" আমার কথা শুনিলেন মাত্র, কোন উত্তর দিলেন না সত্য, কিন্তু বেশ বোধ হইল, উঁহার মনে একটু কষ্ট হইয়াছে। কারণ, লিখিবার কাজ চলিতেছিল, তাহা বন্ধ করিলেন এবং আহারের সময় হইয়াছে বলিয়া সিপাই দপ্তর বাঁধিবার জন্য উপরে আসিয়াছিল, তাহাকে উনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই দেউড়ীর সিপাই, চুরী করে' একটা ছেলে পালিয়ে যাচ্চে, সে কথা তোর খবরে এল না? যা, তার পিছনে পিছনে ছুটে যা, যেখানেই থাক সেখান থেকে তাকে ধরে নিয়ে আয়; কিন্তু তাকে মার-ধর করিসনে।" এই কথা বলিয়া,—কাছে একটা বই ছিল, সেইটা লইয়া পড়িতে লাগিলেন। আমি নীচে নামিয়া রান্না ঘরে গেলাম। সিপাই বকড় বকড় করিতে করিতে বাহির হইল:—"সে যাবে কোথায়? আমি এখনি তাকে ধরে আন্‌চি"—এই কথা বড়াই করিতে করিতে সিপাই দেউড়ীতে গেল। আমার খুড়-শাশুড়ী ও ননদ ঠাকরুণ ঘরে ছিলেন তাঁহারা এই কথা শুনিতে পাইলেন। তখন তাহারা সিপাইকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওরে, এরই মধ্যে উপরে এ খবর কে দিলে? সিপাই বলিল, "কে জানে কে দিলে; বৌ-ঠাকরুণ সেখানে ছিলেন, তিনিই হয়তো বলে থাকবেন, কে জানে। এই কথা শুনিবার পর আর কোথায় আছে!! ননদ বলিলেন, "দেখলে কাকী!! আজ পর্ব্বদিন, এই কথা খাবার আগে জানানো ভাল নয় বোলে আমি এতক্ষণ জানাই নি—না তো,—সে কি আমার কাকা মামা যে, ইচ্ছে করে তাকে পালাতে দিয়েছি? তাই কি, বৌ তাড়াতাড়ি উপরে গিয়ে এই খবরটা দিয়ে এল? আমাদের সঙ্গে কি কোন সম্পর্ক নেই!! আমরা কি কেউ নই!! সে কি মনে করে, একমাত্র হিতাকাঙ্ক্ষী সেই? "যে আসে শেষাশেষি, তার ঝাল আরো বেশী"—এ যে দেখি তাই!" এই কথা শুনিয়া খুড়শাশুড়ী রাগে লাফাইয়া উঠিয়া বলিতে লাগিলেন; ওগো, দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী এই রকমই 'লাগানে' হয়ে থাকে; এই রকম লাগালাগি করে, স্বামীকে খুসী

করবার চেষ্টা। আজ পর্য্যন্ত ওর এ দোষটা দেখি নি। আমি বরং ওর পক্ষ নিয়ে বলতুম, ও অন্য দ্বিতীয়পক্ষ স্ত্রীর মতন নয়; কিন্তু আমার শীঘ্রই সন্দেহটা ঘুচলো! দিনকে দিন এক একটা গুণ বেরুচ্চে, বেশ, বেশ! এতদিন, যতই কিছু বলি না কেন, ওর রাগ হ'ত না; শুধু এখন তা খুবই চলছে! আগে ও জবাব ক'রত না, কিন্তু মুখ গোমসা করে থাকৃত। কিন্তু এখন—বেশ বেশ—খুব ভাল, খুব ভাল! সভায় যেতে আরম্ভ করেছেন! ইংরেজি ত শিখছেই! দুচার জন বুড়ী বাড়ীতে আছে; তাদের তাড়িয়ে দেও না, তাহলেই সব ল্যাঠা চুকে যাবে। তারপর সাহেব মেম দুজনে বই হাতে ক'রে কেদারায় বোসো। আজকাল দেখি, সে দিনকে দিন মনে করচে, সেই ঘরের গিন্নী। চাকর বাকর তাঁরই তাঁবে আছে। লাভ লোকসান যা হয় যেন সব তারই। ওগো, অত ফেঁপে উঠো না। আমরা বেঁচে থাকতে ওসব হতে দেব না! ও রকম লাগালাগি করলে লোকজন টিকবে কি ক'রে? হরি চুরী করেছে সে লোকসান ত আমাদেরই হয়েছে! ওর বাবারা কি সেই লোকসানের টাকা পূরণ করে দেবে? এই রকম লাগালাগি করে দেখনা কি কাণ্ড করে তুলেছে।" এইরূপ খুব রাগিয়া উচ্চৈস্বরে বকিতে বকিতে ঠাকুর-ঘর হইতে মাঝ-ঘরে আসিতেছিলেন। তিনি শেষ কথাগুলা বলিতেছেন, আর "উনি" নীচে নামিতেছেন—এমন সময়পথের মাঝে দুজনের সাক্ষাৎ ঘটিল; দুই তিনটা কথা ওঁর কানে আসিয়াছিল। আগেই তাঁর মনে অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছিল। তারপর, এত কথা তিনি আমাকে অকারণ বলিতেছেন, নিজে স্বকর্ণে শুনিয়া 'ওঁর' আর সহ্য হইল না এবং একটু দাঁড়াইয়া থাকিয়া উনি তাঁকে বলিলেন—"সত্য কথা বল্‌তে হলে, এই কথা তোমাদেরই আগে আমাকে জানানো উচিত ছিল; এবং চোরের পক্ষ নিয়ে ঘরের লোকদের নির্য্যাতন করা কেন? ও আমার কাছে বল্‌বে না তো কাকে বলবে?" এই কথা শুনিয়া তিনি অত্যন্ত রাগিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন—"স্ত্রীর পক্ষ হয়েএতটা বলা কেন? আমি তার গায়ে লোহা পুড়িয়ে ছাঁকা দিয়েছি নাকি? স্ত্রী যদি তোমার এত আদরের হয়, এত সুকুমার হয়, তুমি ওকে কাছে নিয়ে বোসে থাকো। কিংবা ওকে সিংহাসনে বসিয়ে দেবী বলে পূজা কর। ইংরাজী পড়ে খুব চালাক হয়েছ তুমি মনে কর, কিন্তু তোমার একটুও বুদ্ধি নেই! আমাদের উপর তোমার যদি বিরক্তি হয়ে থাকে—তাই বলে স্ত্রীর পক্ষ নিয়ে আমাদের অপমান কোরো না; তার চেয়ে আমাদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে বলনা কেন?" এইরূপ উল্টা চাপ দিয়া কথা বলায়—ওঁর যে কখন রাগ হয় না উনিও রাগিয়া একেবারে বলিয়া উঠিলেন—"বেরিয়ে যেতে কে বারণ কচ্চে?" এই কথাগুলি মুখ দিয়া বাহির হইবামাত্র উনি বুঝিলেন, কথাটা বলা ভাল হয় নাই; চুক হইয়াছে, ওঁর গলার আওয়াজ তখনি মৃদু হইয়া আসিল এবং চুক্‌টা শোধরাইয়া লইবার জন্য খুব নম্রভাবে খুড়শাশুড়ীকে বলিতে লাগিলেন; নানারকমে উনি তাঁকে অনেক কথা এইরূপ বলিলেন:—"বাড়ীর মধ্যে তুমিই সকলের বড়; রাগ করে তুমি যাই বলনা কেন, তা আমাদের শোনা উচিত। কখন যদি আমার চুক হয়, আমার কান মলিবার অধিকার কেবল তোমারি আছে। তোমার যা ইচ্ছা হয় তাই বোলো, কিন্তু সত্য মিথ্যা একবার বিচার করে দেখো। এখন হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে যে কথা বেরিয়ে পড়েছে, তারজন্য তোমার কাছে আমি ক্ষমা চাচ্ছি"। এইরূপ স্পষ্ট করিয়া শেষে বলিবার পর, খুড়শাশুড়ীর রাগ একটু কমিয়া আসিল। বাড়ীর মেয়েদের সহিত সম্মান ও সম্ভ্রমের সহিত ব্যবহার করা—আমাদের বাড়ীর এই চাল পূর্ব্ব হইতেই আছে। বাড়ীর মেয়েদের মান্য করা উচিত, উত্তর দিয়া অমর্য্যাদা করিতে নাই, এইরূপ শ্বশুর মহাশয়ের ও আমার স্বামীর উপদেশ ছিল। আমাদের বাড়ীর মান্য সম্পর্কীয় মেয়েদের অপমানের কথা শোনা একেবারেই অভ্যাস ছিল না। তাই, আমার মান্য আত্মীয়াদের মনে কষ্ট হয় এরূপ কথা যাঁহার মুখে কখনই শোনা যাইত না, মেয়েদের প্রতি কটু বাক্য প্রয়োগ করা কখনই উচিত নহে এইরূপ যাহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তাঁহার মুখ হইতে স্ত্রীর পক্ষ লইয়া কথা বলিতে শুনিয়া খুড়শাশুড়ীর ভয়ানক অপমান মনে হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু উপরি কথিত অনুসারে ক্ষমা চাহিবার পর তাঁহার রাগ কমিয়া গেল; তাঁহার সরল অন্তঃকরণ, কিছুদিন পরেই তাঁহার রাগ একেবারেই চলিয়া গিয়াছিল বলিলেও হয়। কিন্তু ওঁর মনে এই কথাটা বরাবর লাগিয়া রহিল। যখনি এই কথা তাঁর স্মরণ হইত, তখনি তিনি মনে করিতেন—"সেই সময় এতটা ক্রোধের বশীভূত কিরূপে হইয়াছিলাম? এই সম্বন্ধে বারংবার তাঁহার পশ্চাত্তাপ হইত। খুড়শাশুড়ী ঠাকরণের মৃত্যুর পর চি-আবা ভাইকে ও আমার ননদকে পুণায় 'উনি' যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতেও খুব দুঃখের সহিত উপরি-উক্ত গলদের কথা বলিয়াছিলেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে আমার খুড়শাশুড়ী ঠাকরণের প্লেগে মৃত্যু হয়।

ইতি একাদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

দিদিমার—আশীর্ব্বাদ।

(শ্রীমতী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী)

অনাম অজানা তুমি, অজানা হতে আসিয়া
অন্তরের দুর্গ ভেদি, নিলে অন্তর কাড়িয়া।
আচম্বিতে কোথা হতে, তুমি যেন এসে উড়ে,
বসিলে প্রবল বলে, হৃদি সিংহাসন যুড়ে।
কিশল-কোমল তনু, প্রাণটুকু সুকুমার,
সহিতে পার না তুমি, কোন জোর কিম্বা ভার।
অতি ক্ষুদ্র, ক্ষীণ তুমি, অক্ষম ও নিরুপায়,
বাঁচিতে পারনা হেথা, বিনা সেবা মমতায়।
কিন্তু কি যে মহাশক্তি আছে তোমার ভিতর,
তব কান্না-ডাকে মোরা ছুটি আকুল অন্তর,
নিয়ে বুকভরা ক্ষীর, মুখভরা মিষ্ট বোল,
আদরমাখানো হাত, আদরবিছানো কোল।
তোমারে তুষিতে হই আত্ত পাগলের মত;
করি নানা অঙ্গভঙ্গী, চেঁচামেচি করি কত।

পুষিতে তুষিতে তোমা দিই ভাণ্ডার লুটিয়া,
তোমারে বাঁচাতে ব্যস্ত, নিজেরে যাই ভুলিয়া।
সম্রাটেরে তুষি পুষি, হয়ে ভয়েতে বিহ্বল,
দেখি তার অস্ত্র শস্ত্র, আর যত লোকবল।
তাহার হুকুমে করি প্রাণভয়ে প্রাণদান,
এড়াতে পারিলে তারে, আনন্দে করি প্রস্থান।
তোমার অবল বল, এমনি তাহা প্রবল,
তোমারে ছাড়িতে মোরা, কাঁদিয়া হই বিহ্বল।
স্বেচ্ছায় আঁকড়ি তোমা বুকেতে ধরি চাপিয়া,
রাখিতে চাহি তোমায়, শত যাতনা সহিয়া।
প্রবল সম্রাট্ হতে, সমধিক বল তব,
সম্রাট্ সম্রাজ্ঞী পায় তব কাছে পরাভব॥
অনাম অতিথি তুমি, এসেছ মোদের ঘরে,
একটী সুন্দর নাম পেয়েছি তোমার তরে।
আনন্দে করিব আজি তোমার নামকরণ
নামটী সার্থক করো, লভো সুদীর্ঘ জীবন!

চিত্রপরিচয়।

বর্ত্তমান সংখ্যায় ভারতের দুইটি প্রসিদ্ধ বন্দরের আলোকচিত্র প্রকাশিত হইল। প্রথমটি মান্দ্রাজ বন্দরের। দ্বিতীয়টি পর্ত্তুগীজ রাজ্যের মার্ম্মগোয়া বন্দরের।

মান্দ্রাজ বন্দর লোক কোলাহলপূর্ণ প্রধান নগরীর মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া জীবলোকের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। আর দ্বিতীয়টি পর্ব্বতবনরাজীবেষ্টিত লোকজন-বর্জ্জিত নিভৃত শান্তিময় স্থান অধিকার করিয়া মঙ্গলস্বরূপ শান্তিদাতার শান্তিময় ইচ্ছা পরিঘোষণা করিতেছে।

এই দুইটি ছবির মধ্যভাগে একটি ক্ষুদ্র তরণী লইয়া ধর্ম্ম ও কর্ম্মরূপ দুইজন নাবিক সকল কোলাহলের আকরভূমি ইহলোক হইতে যেন জীবগণকে শান্তিধামে লইবার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে।

ভাবুক পাঠকহৃদয়ে এই কবিত্বময় মহাভাবের উচ্ছ্বাস প্রবাহিত করিবার মানসে চিত্রগুলি প্রদত্ত হইল।

শ্রীক. প. ব.।

একখানি পত্র।

[রেলওয়ের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী এক আমাদের পরম হিতৈষী জনৈক বন্ধু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাদিগকে যে চিঠি লিখিয়াছেন, তাহা আনন্দসহকারে নিম্নে প্রকাশ করিলাম। আমাদের গ্রাহক ও অনুগ্রাহকবর্গ যদি এই বন্ধুর ন্যায় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করেন, তবে ইহার উন্নতির জন্য আমাদিগকে কিছুমাত্র চিন্তিত হইতে হয় না। তং বোং সং]

"তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার দ্বারা এক সময়ে বঙ্গদেশের অনেক উপকার সাধিত হইয়াছিল এ কথা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। বর্ত্তমান সময়ে ইহা বাংলাদেশের সর্ব্বপ্রাচীন মাসিকপত্রিকা।

"আনন্দের বিষয় যে তত্ত্ববোধিনীর উন্নতিকল্পে আজকাল বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু গ্রাহক অনুগ্রাহকগণের সাহায্য ব্যতীত ইহাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করা সম্ভবপর নহে।

"তত্ত্ববোধিনীর গ্রাহক অনুগ্রাহকগণের মধ্যে অনেকেই চেষ্টা করিলে অনায়াসে তাঁহাদিগের বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজনের মধ্য হইতে অন্ততঃ একজন করিয়া নূতন গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দিতে পারেন। এজন্য আমার প্রস্তাব এবং একান্ত অনুরোধ যেন তাঁহারা এ বিষয়ে একটু চেষ্টা করিয়া দেখেন।

"তত্ত্ববোধিনীতে আদিব্রাহ্মসমাজের উপাসনা প্রণালী এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইবার বন্দোবস্ত হইতেছে। ইহাতে নূতন গ্রাহক সংগ্রহের কতক সুবিধা হইবার সম্ভাবনা।

"আমি তত্ত্ববোধিনীর কয়েকজন গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইলাম। তন্মধ্যে কয়েকটি নাম এই পত্রের সহিত পাঠাইতেছি।"

২৭শে মে, ১৯১৮।

গার্হস্থ্য সংবাদ।

আমাদের পরমাত্মীয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্রের শুভ অন্নপ্রাশন ও নামকরণ রাঁচিতে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। নাম দেওয়া হইয়াছে শ্রীসুনৃতেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাহার পিতামহী তদুপলক্ষে একটী কবিতা রচনা করিয়া পত্রিকায় প্রকাশার্থ প্রেরণ করিয়াছেন, আমরা সাদরে তাহা প্রকাশ করিলাম। আমরা শ্রীমান্ সুনৃতেন্দ্রের দীর্ঘজীবন কামনা করি।

সংবাদ।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—আমরা দেখিয়া সুখী হইতেছি যে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রবন্ধগুলি জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছে। গত ১লা শ্রাবণ তারিখের তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকায় শ্রীসত্যানন্দ দাস লিখিত "দুর্নীতি ও তাহার প্রতীকার" প্রবন্ধ উদ্ধৃত হইয়াছে। গত ৪ঠা ভাদ্র তারিখের শিক্ষাসমাচার পত্রে ডাক্তার চুনীলাল বসু মহাশয়ের লিখিত "চাষাড়ের আত্মকাহিনী" উদ্ধৃত হইয়াছে।

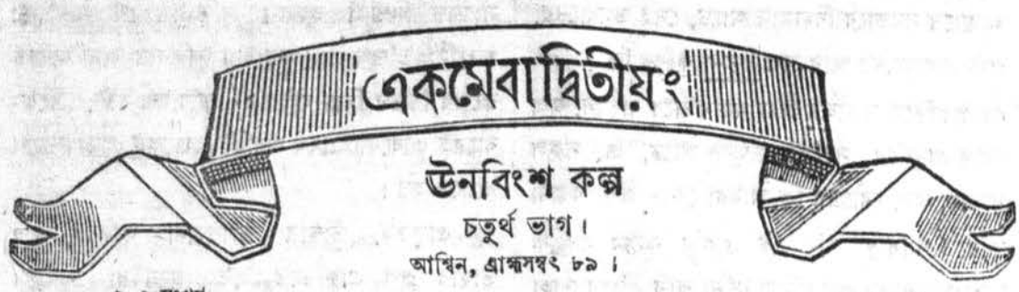

ঊনবিংশ কল্প
চতুর্থ ভাগ।
আশ্বিন, ব্রাহ্মসম্বৎ ৮৯।

৯০২ সংখ্যা

১৮৪০ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং প্রতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"

আমায় রাখো।

বেহাগ।

আমায় রাখো আমায় রাখো।
তুমি গো জননী দিবস রজনী
হৃদয়ে জাগো
হৃদয়ে জাগো।
তোমারে ছাড়িয়া আকুলিত হিয়া
ভ্রমি যে কোথা জানি নাকো
তবু যে মা শুনি তোমারি মধু বাণী—
করুণ স্নেহ সুরে তুমি ডাকো
তুমি ডাকো।
বিরহ তোমার সহেনাকো আর
প্রাণ চাহে সদা কাছে থাকো
কাছে থাকো।
আর কিবা চাহি বল, চাহি শুধু ক্ষমা কর
অপরাধ মম লাখো লাখো;
তোমারি শীতল কোলে লহগো আমায় তুলে
বারেক মা-গো—
আমার মা-গো।

উদ্বোধন।

আমি জানি না আপনাদিগকে কি প্রকারে উদ্বোধিত করিব। কেমন করিয়া, কোন্ কথা বলিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতি আপনাদের অনুরাগ, আপনাদের ভগবদ্ভক্তি জাগাইয়া তুলিব তাহা ভাবিয়াই পাইতেছি না। আমি নিজেই এ বিষয়ে এতই পশ্চাৎপদ ও হীন যে আপনাদিগকে এ বিষয়ে কোন কথা বলিতে সাহসেই কুলাইতেছে না। আর, আপনাদিগকে জাগাইয়া তুলিবই বা কি? আপনারা তো নিজেরা উদ্বুদ্ধ হইয়াই এখানে আসিয়াছেন—জাগরণ তো সঙ্গে করিয়াই আপনারা আনিয়াছেন। আপনাদের হৃদয়ে জাগরণ না আসিলে কি আপনারা দূর-দূরান্তর হইতে ব্রহ্মনাম শুনিবার জন্য এই উপাসনামন্দিরে উপস্থিত হইতেন? সমস্ত বাধাবিঘ্ন ও আলস্য পরিত্যাগ করিয়া আজ যে এই উপাসনামণ্ডপে আসিয়াছেন ইহাই তো আপনাদের জাগরণেরই পরিচয়।

অনেকে এখানে আসেন নাই। যাঁহারা এখানে আসেন নাই, তাঁহাদের অনেকে ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মপ্রীতিকে একটা ফাঁকা ফাঁকা বস্তু বলিয়া ধরেন। তাঁহাদের মতে একেবারেই ব্রহ্মের উপাসনা করিতে যাওয়া অসম্ভব—ধাপে ধাপে উঠিয়া তবে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে হয়। এই কারণে তাঁহারা "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা" অর্থাৎ সাধকদের মঙ্গল বা সুবিধার জন্য ব্রহ্মের রূপ কল্পিত হয়, এই বাক্যের বড়ই সমর্থন করেন। যে ভগবানের নাম, যে ব্রহ্মজ্ঞান আমাদের সকলেরই হৃদয়ে নিহিত আছে, সকলেরই

আত্মাতে সমভাবে বিদ্যমান আছে, সেই ভগবানের, সেই ব্রহ্মজ্ঞানের আর রূপ কল্পনা করিব কি? এই যে প্রকৃতিতে সকলের জন্য সমানভাবে বাতাস, জল রৌদ্র প্রভৃতির সদাব্রত উন্মুক্ত আছে, এই সকল বাতাস, জল, রৌদ্রের কি আমরা কোন রূপ কল্পনা করিতে পারি? যদি এই একটী কঠিন বস্তুকে বাতাস প্রভৃতির রূপ বলিয়া বর্ণনা করি, তবে তাহা কি অপ্রকৃত কল্পনা হইবে না? তেমনি অনন্তস্বরূপ ভগবানকে একটী কল্পিত রূপের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া বর্ণনা করিলে তাহা কি নিতান্তই অপ্রকৃত হইবে না?

তারপর, আমাদের সকলেরই হৃদয়ে যখন ব্রহ্মজ্ঞান অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিত আছে, তখন ব্রহ্মের রূপকল্পনার প্রয়োজন কি? আমারও পূর্ব্বে একটা সংস্কার দাঁড়াইয়াছিল যে সহজে ব্রহ্মের দ্বারে পৌঁছিবার জন্য বুঝি বা তাঁহার রূপকল্পনা আবশ্যক। কিন্তু সে সংস্কার নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে। অল্পদিন হইল আমি একবার পুরীতে গিয়াছিলাম। সেখানে একটী তিন বৎসরের বালক যখন সমুদ্রের প্রতি স্থিরদৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল যে, "এত জল কে ঠেলিতেছে", তখনই দেখিলাম যে সেই শিশুরও হৃদয়ে ব্রহ্মের একটী মহান্ ভাব নীরবে কার্য্য করিতেছে। আবার, একজন "নিলুয়া" (যাহারা সাঁতার শেখায় তাহাদিগকে নিলুয়া বলে) তাহার চার পাঁচ বৎসরের বালককে সমুদ্রে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল দেখিলাম। দেখিয়া আমার তো হৃৎকম্প উপস্থিত হইল যে—একি করিল! পরক্ষণে দেখি যে সেই বালকটী ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া আসিল। আমি বাঁচিলাম ভাবিয়া যে বালকটীর প্রাণরক্ষা হইল। তখন সেই নিলুয়াকে এ প্রকার করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে জানিলাম যে, সে তাহার পুত্রকে সাঁতার শিখাইবার জন্য এই কাজ করিয়াছিল। আমি অবাক হইয়া ইঙ্গিত করিলাম যে, অতটুকু শিশুকে প্রথমে পুকুরে, পরে নদীতে, সর্ব্বশেষে সমুদ্রে সাঁতার শিখাইতে হয়। তদুত্তরে সে স্পষ্ট বলিল যে নদীতে পুকুরে হাজার সাঁতার শিখাইলেও সমুদ্রের ভয় যাইবে না, তাই সে একেবারেই সমুদ্রে সাঁতার দিতে শিখাইতেছে। আমার চমক ভাঙ্গিল, পূর্ব্ব সংস্কার নির্ম্মূল হইল। বুঝিলাম যে আমাদের অন্তর্নিহিত ব্রহ্মজ্ঞান ফুটাইয়া তুলিবার জন্য কল্পিত রূপের ভিতর দিয়া যাইবার প্রয়োজন নাই, একেবারেই জীবনের প্রথম অবধিই ব্রহ্মকেই প্রত্যক্ষরূপে ধরিতে হয়।

প্রকৃতই, তাঁহার রূপকল্পনা করিব কি? তাঁহার রূপ প্রকৃতিতে তো ছড়াইয়া আছে। তাঁহার মুকুটে যে চন্দ্র সূর্য্য দিবানিশি জ্বলজ্বল করিতেছে, তাঁহার মুখের হাসি যে শত শত ফুল্ল কমলে, শত শত পুষ্পরাজিতে বিকসিত হইতেছে, তাঁহারই আশ্চর্য্য প্রভা এই যে সমস্ত প্রকৃতিতে বিছাইয়া আছে, যদি তাঁহার রূপ দেখিতে হয় তবে এই সকলেই তো দেখিব। তিনি নিজে নিজের রূপ যেমন দেখাইতেছেন, তাহাই তো দেখিব—আমাদের মনগড়া রূপের মধ্যে তাঁহাকে আনিব কি প্রকারে?

তাই আমরা বলিতে চাই যে আমরা যেন আসলে আলস্যের কারণে রূপকল্পনার দোহাই দিয়া ঈশ্বর হইতে দূরে না সরিয়া যাই। এই উপাসনামন্দিরে তাঁহার পূজার একটী আদর্শ রক্ষিত হইয়াছে, সেই আদর্শ অনুসরণ করিয়া আমরা যেন প্রত্যক্ষভাবে সেই ব্রহ্মোপাসনার সরল পথ অবলম্বন করি। সেই মহান্ পরমেশ্বরকে পাইবার জন্য যেন তাঁহারই প্রদর্শিত মুক্ত পথ অবলম্বন করি, শত সহস্র কল্পিত রূপের সঙ্কীর্ণ পথের ভিতর দিয়া তাঁহার নিকট যাইতে চাহিলে অনেক সময়েই প্রকৃত পথ হারাইয়া ফেলি। বাহিরে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে যেমন তাঁহাকে সহজে দেখিতে পাই তেমনি ভক্তজনদিগের অন্তরে ভক্তির ভিতরে, মানুষের স্নেহ প্রীতি দয়া প্রভৃতির মধ্যে তাঁহাকে আরও কত সহজে দেখা যায়। শৈশবাবধি শুনিয়া শুনিয়া রূপকল্পনার প্রতি একটা অযথা আস্থা দাঁড়াইয়া গিয়াছে, এখন পরীক্ষা দ্বারা তাহার ভিত্তি বড়ই দুর্ব্বল দেখা যাইতেছে। সেই সংস্কার ছাড়িয়া দিয়া এবার আমাদিগের প্রত্যক্ষভাবে সেই স্নেহময়ী মাতার নিকট ছুটিয়া যাইতে হইবে। আসুন সকলে, পিছাইয়া থাকিবার আর সময় নাই।*

* আদিব্রাহ্মসমাজ, ১৯ আষাঢ় ১৮২৫।

ভাদ্রোৎসবে ব্রাহ্মসম্মিলন।

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)

১১ই মাঘ ব্রাহ্মসমাজের স্থায়ী গৃহপ্রতিষ্ঠার দিন বলিয়া ঐ পবিত্র দিনটী ব্রাহ্মসাধারণের মাঘোৎসবের দিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ৬ই ভাদ্রে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় কর্ত্তৃক ব্রহ্মোপাসনার সূত্রপাত হয়। ঐ দিনটীর গৌরব স্মরণ করিয়া ব্রাহ্মসমাজে ভাদ্রোৎসব হইয়া থাকে। এ বৎসর আমাদের সুহৃৎ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দাস-গুপ্ত ৬ই ভাদ্রে ব্রাহ্মদিগের সম্মিলিত উপাসনা করিবার প্রস্তাব করিলেন। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর নববিধান সমাজের প্রচারক শ্রদ্ধাস্পদ ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী, উক্ত সমাজের সম্পাদক ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য মহাশয়গণের নিকট সেই প্রস্তাব উপস্থিত করিলে তাঁহারা সকলেই সেই প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য-নির্ব্বাহক সভাও এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। ব্রজগোপাল বাবু প্রভৃতির ইচ্ছাক্রমে ক্ষিতীন্দ্র বাবু ইহার বন্দোবস্তের ভার গ্রহণ করিলেন। রামমোহন লাইব্রেরি এই অনুষ্ঠানের উপযুক্ত স্থান বিবেচিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহার কর্ত্তৃপক্ষগণ আহ্বানপত্রে "অসাম্প্রদায়িকভাবে ব্রহ্মোপাসনা হইবে" এই কথা না থাকিলে লাইব্রেরির হলটি ব্যবহারের জন্য দিবার অক্ষমতা জানাইবার কারণে এবং আহ্বানকারীগণের মধ্যে কেহ কেহ "অসাম্প্রদায়িকভাবে" এই কথাটী আহ্বানপত্রে রাখিবার বিরুদ্ধে দৃঢ় অসম্মতি জানাইবার কারণে লাইব্রেরিহল পাওয়া গেল না। সিটি কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় নবনির্ম্মিত ঐ কলেজের সুবিস্তৃত সভাগৃহটী আমাদের ব্যবহারের জন্য অনুমতি দিয়া কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক, ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য এবং শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই তিন ব্যক্তির নামে আহ্বানপত্র বাহির করা হইয়াছিল। সম্মিলিত ব্রহ্মোপাসনার প্রস্তাব ও কার্য্যে পরিণতির মধ্যে অবসর এত অল্প ছিল যে বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও আহ্বানপত্র সকলের নিকট যথাসময়ে পৌঁছায় নাই। তাহার জন্য আমরা বিশেষ দুঃখিত ও ক্ষমাপ্রার্থী। উপাসনার সময় সন্ধ্যা ৬৷৷০টা নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও তাহার অনেক পূর্ব্বেই সুবিস্তৃত ঘরটী শ্রোতৃবর্গে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। স্থানাভাবে অনেককে বারান্দায় দাঁড়াইয়া থাকিতে হইয়াছিল। প্রায় দেড় হাজার লোক উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে প্রায় দেড় শত মহিলা ছিলেন।

সর্ব্বপ্রথম সমবেতভাবে ওঁ পিতানোঽসি প্রভৃতি অর্চ্চনা পাঠ করিয়া উপাসনা কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া যখন মিলিত কণ্ঠে এই অর্চ্চনায় যোগদান করিয়াছিলেন, তখন ভক্তি-ভাবের যে কি এক তরঙ্গ বহিয়া গিয়াছিল, তাহা যাঁহারা প্রত্যক্ষ করেন নাই, তাঁহাদিগকে বোঝানো অসম্ভব। তাহার পর ভাই ব্রজগোপাল বাবু, আচার্য্য শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ এবং ক্ষিতীন্দ্র বাবু বেদী গ্রহণ করিলেন। তৎপরে আদিব্রাহ্মসমাজের সুপ্রসিদ্ধ গায়ক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সুমধুর কণ্ঠে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রচিত "শুভ-দিন ক্ষণ শুভ এই মাসে" এই সুপ্রসিদ্ধ সময়োপযোগী গান করিলেন। তৎপরে ব্রজগোপাল বাবু স্বল্পাক্ষর ও সারদিগ্ধ কথায় সমাগত ব্রহ্মোপাসকগণকে উদ্বোধিত করিয়া তুলিলেন। পরে রাজা রামমোহন রায়ের সেই তড়িৎ-সঞ্চারক সুপ্রসিদ্ধ গান "ভাব সেই একে" গীত হইল। তদনন্তর তত্ত্বভূষণ মহাশয় "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" প্রভৃতি মন্ত্র অবলম্বনে আরাধনা করিয়া "অসতো মা সদ্গময়" প্রভৃতি মন্ত্রে তাহার উপসংহার করিলেন। তাঁহার আরাধনাকালীন উপদেশের সার মর্ম্ম আমরা স্থানান্তরে প্রকাশ করিলাম।

তৎপরে ক্ষিতীন্দ্র বাবুর রচিত "মিলেছি মা তোর আজি মধুর ডাকে" গানটী রামপ্রসাদ সুরে গীত হইল। গান হইয়া যাইবার পর ক্ষিতীন্দ্র বাবু যে মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহা স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল। অবশেষে অতীব করুণ ভাষায় ভাই ব্রজগোপাল একটী প্রার্থনা ও "ব্রহ্মকৃপাহি কেবলং" শান্তিবাচন করিলে পর রবীন্দ্রনাথের "একবার তোরা মা বলিয়ে ডাক" গান গাওয়া হইল। তৎপরে সভা ভঙ্গ হইল।

উপাসনা অন্তে সকলেই মধ্যে মধ্যে এইরূপ সম্মিলিত উপাসনার আবশ্যকতা ও সার্থকতা স্বীকার করেন।

আমরা ভাবি নাই যে সম্মিলিত ব্রহ্মোপাসনায় সকলে এত আগ্রহের সঙ্গে যোগ দিতে অগ্রসর হইবেন। ব্রাহ্মসমাজের সকল শাখার কর্ত্তৃপক্ষগণের প্রতি আমাদের এই অনুরোধ যে তাঁহারা যেন প্রতি ভাদ্রোৎসবে এই সম্মিলিত ব্রহ্মোপাসনাকে একটী স্থায়ী অঙ্গরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। মঙ্গলময় পরমেশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করি, তিনি সকল ব্রহ্মোপাসকেরই হৃদয়ে সত্যকার একটা মিলনের আকাঙ্ক্ষা ও সম্প্রীতি জাগ্রত করিয়া তুলুন।

আরাধনা।

(শ্রীসীতানাথ দত্ত তত্ত্বভূষণ)

হে স্বপ্রকাশ দেবতা, হে চৈতন্যস্বরূপ, প্রাণের প্রাণ, আত্মার আত্মা, নিজ আলোকে নিজে প্রকাশিত রয়েছ, আবার নিজগুণে আমাদের নিকট প্রকাশিত হয়েছ। তুমি শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, বাক্যের বাক্য। তুমি আমাদের চিন্তাস্রোতের, আমাদের স্তবস্তুতির, আধার আশ্রয় হয়ে রয়েছ। উপাসনার ধূপগন্ধ, স্তবস্তুতির সৌরভ, তোমার অতীব প্রিয়। তুমি আমাদের ভক্তি চাও, তাই তুমি তোমার এই পুত্র কন্যাদিগের চিত্তকে তোমার জীবন্ত স্পর্শে জাগ্রত করে তাহাদিগকে তোমার পূজায় প্রবৃত্ত করেছ। তুমি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির প্রেরয়িতা, তুমি আলোক, জীবনের প্রতি পদক্ষেপে তুমি চালক, তুমি শিক্ষক, তুমি গুরু, তুমি আচার্য্য, তুমি পথ, তুমি গম্য স্থান। নিজের দীনতায়, নিজের অনীশভাবে মুহ্যমান হয়ে যখন দেখি—অনন্তস্বরূপ তুমি আমার আধার আশ্রয় হয়ে রয়েছ, তখন আশ্বস্ত হই। তোমার অনন্ত ঐশ্বর্য্য, অনন্ত শক্তি আমার সহায়, তোমার অনন্ত জ্ঞান আমার চালক। আমরা যতই ভ্রমপ্রমাদে পতিত হই না কেন, তুমি সমুদয় সংশোধন করবে জানি। তোমার সহস্র বাহু আমাদের রক্ষক, আমাদের কোন ভয় নাই, ভাবনা নাই। তোমার অনন্ত সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যে আমাদের পৈত্রিক অধিকার। এই রূপে, হে অনন্ত, তোমার সহিত নিগূঢ় যোগ অনুভব করে সমুদায় শোকের অতীত হই। তোমার আনন্দ আমাদের প্রাণে সঞ্চারিত হয়ে আমাদের হৃদয়কে প্লাবিত করে। তুমি পূর্ণানন্দ হয়েও যেন আমাদিগকে তোমার আনন্দ না দিয়ে তৃপ্ত নও। আমাদিগকে নিয়েই তোমার পূর্ণানন্দ, আমাদিগকে নিয়ে তুমি সর্ব্বদা ব্যস্ত রয়েছ। এই যে জীবের সঙ্গে তোমার নিত্যলীলা, এতেই তোমার প্রেমের সাক্ষাৎ নিদর্শন পাচ্ছি। এই তোমার অনিমেষ প্রেমদৃষ্টি, এই তোমার মধুর প্রেমস্পর্শ। জীবকে না হ'লে তোমার চলে না, ইহা তোমার এই ব্যবহারে স্পষ্ট দেখ্‌ছি। তোমাকে পিতা বলে তৃপ্তি হয় না, কোনও পার্থিব পিতা প্রাণের এত কাছে এসে প্রেম দেয় না। তোমাকে মাতা বলেও তৃপ্তি হয় না, কোন পার্থিব মাতা আত্মার এত নিগূঢ় স্থানে এসে স্নেহ জানায় না। পৃথিবীর কোন সম্বন্ধই তোমার এই প্রেম সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ কর্ত্তে পারে না। মানব তোমার অতীব প্রিয়, মানবের জন্যই তোমার এই সৃষ্টি। তারই জন্য আকাশ, তারই জন্য বৃক্ষলতা, তারই জন্য ফলপুষ্প, তারই জন্য জল-বায়ু, তারই জন্য শিল্প-বাণিজ্য, বিজ্ঞান-দর্শন, তারই জন্য সমাজ ও ধর্ম্মবিধান। এই জীবন্ত ব্রাহ্মধর্ম্ম-বিধানে তুমি অদ্ভুত প্রেমলীলা কচ্ছ। তুমি আমাদের সমুদায় চেষ্টা, সমুদায় সংগ্রাম, সমুদায় বিবাদ বিরোধের ভিতর দিয়ে আমাদিগকে উন্নতির পথে পরিচালিত কচ্ছ। তুমি আমাদের চিরসম্বল, তুমিই আমাদের একমাত্র অদ্বিতীয় প্রভু, আমাদের হৃদয় মনের একমাত্র অধিকারী, আমাদের একমাত্র সাধন, একমাত্র সিদ্ধি। তোমার পূর্ণতা, তোমার সৌন্দর্য্য, তোমার মাধুর্য্য, আমাদের প্রতি জনের জীবনে প্রতিবিম্বিত না কল্লে তোমার তৃপ্তি নাই। তুমি আমাদের জন্য, আমরা তোমার জন্য। তোমার পবিত্র চিন্তা আমাদের চিন্তা হবে, তোমার পবিত্র দৃষ্টি আমাদের দৃষ্টি হবে, তোমার পবিত্র চেষ্টা আমাদের চেষ্টা হবে। আমরা সম্পূর্ণরূপে তোমার হব, আমরা প্রত্যেকে তোমার প্রতিমূর্ত্তি হব। আমরা তোমার পবিত্র চরণে আত্মসমর্পণ

করি, তুমি আমাদিগকে গ্রহণ কর। তোমার ইচ্ছা আমাদের প্রত্যেকের জীবনে পূর্ণ হউক্, পূর্ণ হউক্, পূর্ণ হউক্।

ব্রাহ্মসমাজের পুণ্যাহ। *

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ওঁ পিতা নোঽসি পিতা নো বোধি নমস্তেঽস্তু।

তুমি আমাদের পিতা, পিতার ন্যায় আমাদিগকে জ্ঞানশিক্ষা দাও, তোমাকে নমস্কার।

আজ প্রায় ২৫ বৎসর হইতে চলিল, বিশ্ববিদ্যালয় হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলাম। আমার আগ্রহ দেখিয়া পূজ্যপাদ পিতামহদেব আমার স্কন্ধে আদিব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকীয় গুরুভার ক্রমে ক্রমে ন্যস্ত করিয়াছিলেন। অনেক উন্নত আশাভরসা লইয়া ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছিলাম। কিন্তু বলিতে বড়ই দুঃখ হয়, সত্য কথা বলিতে কি, হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায় যে, ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়া হৃদয়ে বড়ই গুরুতর আঘাত পাইয়াছিলাম। প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে বড়ই আশা ছিল যে শত মতভেদের ভিতরেও ব্রাহ্মদিগের মধ্যে একতা দেখিতে পাইব এবং ব্রহ্মোপাসকদিগের সমবেত চেষ্টার ফলে ব্রহ্মোপাসনাকে কেবল ভারতবাসীর নহে, সমগ্র জগতবাসীর সকল কার্য্যেরই নিয়ামকরূপে অচিরকালেই সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিব। প্রবেশ করিয়া দেখি যে, ব্রাহ্মসমাজের কেবল তিন শাখার পরস্পরের মধ্যে নহে, প্রত্যেক শাখার উপশাখাসমূহেরও পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতির একান্তই অভাব; এতই অভাব দেখিয়াছিলাম যে, জগতে ব্রহ্মোপাসনা সুপ্রতিষ্ঠিত দেখা দূরে থাক্, ব্রাহ্মসমাজের জন্মভূমি এই কলিকাতা নগরেই আন্তরিক ব্রহ্মোপাসনা অচিরে বিলুপ্ত হইবে বলিয়া আশঙ্কা হইয়াছিল। এবিষয়ে মহর্ষিদেবের সহিত আলাপ আলোচনা উপস্থিত হইলেই তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিতেন যে, রাজা রামমোহন রায় কোথায় বিবাদ বিসম্বাদ দূর করিবার জন্য "বিগতবিবাদং" পরমেশ্বরের উপাসনা প্রবর্ত্তিত করিলেন, আর সেই বিগতবিবাদং পরমেশ্বরের উপাসকগণের মধ্যে বিবাদের অন্ত নাই।

ব্রাহ্মসমাজের, মধ্যে মনোমালিন্যের প্রাবল্য দেখিয়া কেবল আমি কেন, ব্রাহ্মসমাজের নেতাগণেরও অনেকে হৃদয়ে বড়ই আঘাত পাইতেন এবং ব্রাহ্মদিগের পরস্পরের মধ্যে মিলনের আশা একপ্রকার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। কিন্তু ভগবানের মঙ্গলস্বরূপে আমি প্রাণের সহিত বিশ্বাস রাখি বলিয়াই ব্রাহ্মদিগের মধ্যে মিলনের আশা আমি কখনই সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করি নাই। তাই আজ কয়েক দিন হইল, যখন আমার এক বন্ধু ৬ই ভাদ্র দিবসে ভাদ্রোৎসব উপলক্ষে ব্রাহ্মসমাজের তিন শাখার মধ্যে সম্মিলিত ব্রহ্মোপাসনা ব্যবস্থা করিবার প্রস্তাব করিলেন, আমি তৎক্ষণাৎ সেই প্রস্তাবে মঙ্গলময় পরমেশ্বরের মঙ্গল হস্ত দেখিতে পাইলাম। আমি সেই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া ব্রাহ্মসমাজের সকল শাখার বন্ধুবর্গের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদিগের নিকট এই মঙ্গল প্রস্তাব উপস্থিত করিলাম এবং আনন্দের সহিত আপনাদিগকে জানাইতেছি যে তাঁহারা সকলেই আহ্লাদের সহিত এই প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজে প্রথম প্রবেশের সময় সম্প্রীতির অভাব দেখিয়া যেরূপ নিরাশার কঠোর আঘাত পাইয়াছিলাম, আজ সকল সম্প্রদায়ের ব্রহ্মোপাসকদিগের সহিত মিলিতভাবে ব্রহ্মোপাসনায় যোগদান করিবার অবসর পাইয়া ততোধিক আনন্দ লাভ করিতেছি। ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে এই প্রার্থনা করি যে, তিনি সকল সম্প্রদায়ের ব্রহ্মোপাসকগণের মধ্যে সম্প্রীতিকে দৃঢ় ও স্থায়ী করিয়া তুলুন; এবং তিনি আমাদের হৃদয়কে এমনভাবে গড়িয়া তুলুন যে আমরা বিগতবিবাদং এর উপাসক হইয়া সত্যসত্যই বিগতবিবাদ হই।

যে দিনে আমরা আমাদের মাতার চরণে সম্মিলিতভাবে হৃদয়ের পূজা নিবেদন করিতে আসিয়াছি, যে দিনে আমরা এক পিতার সন্তান বলিয়া, গুরুভাই বলিয়া পরস্পরকে পরস্পরের বক্ষে টানিয়া লইতে প্রস্তুত হইয়া এখানে আসিয়াছি, সেই ৬ই ভাদ্র ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে একটী অতীব পবিত্র দিন। ৬ই ভাদ্রকে আমরা ব্রাহ্ম-

* ৬ই ভাদ্রের ভাদ্রোৎসব উপলক্ষে সিটিকলেজের হলে বিবৃত।

সমাজের পুণ্যাহ বলিয়া উল্লেখ করিতে পারি। প্রত্যেক গৃহস্থের পক্ষে গৃহপ্রতিষ্ঠা একটী আনন্দের দিন বটে, কিন্তু ভিত্তি সংস্থাপিত না হইলে গৃহপ্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা হইতে পারে না, তাই গৃহস্থের পক্ষে ভিত্তিস্থাপনের দিনও একটী আনন্দের দিন। সেইরূপ যে ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় লাভ করিয়া আমরা আপনাদিগকে এবং সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র দেশকে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির স্রোতে পরিচালিত করিতে সমর্থ হইয়াছি, যে ব্রাহ্মসমাজ আমাদিগকে বর্ত্তমান যুগে ভগবানের সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ যোগবন্ধনের পথ প্রথম প্রদর্শন করিয়াছে, সেই ব্রাহ্মসমাজ ১১ই মাঘে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে ১১ই মাঘও যেমন ব্রাহ্মসমাজের নিকট পবিত্র মহোৎসবের দিন, এই ৬ই ভাদ্রে ব্রাহ্মসমাজের প্রথম বীজ ভারতবর্ষে রোপিত হওয়ায় এই ৬ই ভাদ্রও ব্রাহ্মসমাজের একটী উৎসবের দিন।

এই দিনের পবিত্রভাব আমরা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছি কি না সন্দেহ। যাঁহারা এই দিনের বিশেষত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া ভাদ্রোৎসব অনুষ্ঠানের সূত্রপাত করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র। এই দিনে কি মহান ঘটনার বীজ এদেশে রোপিত হইয়াছিল, তাহা আলোচনা করিলে নির্ব্বাক হইতে হয়, ভগবানের চরণে মস্তক স্বতই অবনত হইয়া আসে। আজ ৯০ বৎসর হইতে চলিল, এই দিনে এই দুর্ব্বল ভারতের দুর্ব্বলতম অংশ বঙ্গদেশের এক অধিবাসী রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজের বীজ রোপিত করিয়া জগতের ভাবসাগরে এমন একটী তরঙ্গ চালাইয়া দিলেন, যে তরঙ্গ আজ সমুদয় জগতকে স্বীয় করায়ত্ত করিবার সূত্রপাত করিতেছে, ইহা আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি। একজন বাঙ্গালী দ্বারা সেই তরঙ্গ প্রথম পরিচালিত হইয়াছিল বলিয়া আমরা আজ মর্ম্মে মর্ম্মে গৌরব অনুভব করিতেছি। আজ দেখি যে, পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর ভাবতন্ত্রে স্বীয় সিংহাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন—কিন্তু এই ৬ই ভাদ্রে বঙ্গদেশে ব্রাহ্মসমাজের বীজ প্রোথিত না হইলে, জন্মাবধি ব্রাহ্মসমাজের শ্যামল ছায়ায় মুক্ত বাতাসে তিনি লালিত পালিত না হইলে আমরা তাঁহাকে এখনকার রবীন্দ্রনাথ-রূপে পাইতাম কি না সন্দেহ। সাধারণ লোকের বিশ্বাস এই যে ধর্ম্মের বিভিন্নতার মধ্যে মিলন আনয়ন দুঃসাধ্য। কিন্তু যে ভক্তিভাজন প্রতাপচন্দ্রের হৃদয় হইতে শত শত বিভিন্ন ধর্ম্মের মধ্যে মিলন সংস্থাপনের উপায়স্বরূপ ধর্ম্মমহাসঙ্ঘের কল্পনা নিঃসৃত হইয়াছিল, এই পবিত্র ৬ই ভাদ্রে ব্রাহ্মসমাজের বীজ বঙ্গদেশের সরস ভূমিতে উপ্ত হইবার ফলেই আমরা সেই ভাই প্রতাপচন্দ্রকে লাভ করিয়াছিলাম। যিনি যাহাই কেন বলুন না, আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, নব্যযুগে বঙ্গদেশের এবং ভারতের যে কোন বিষয়ে যত কিছু উন্নতি হইয়াছে, এবং হইতেছে, রাজা রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজই তাহার মূল। ব্রাহ্মসমাজ সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির মূল আত্মার স্বাধীনতা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা না করিলে ভারতবাসী স্বামী বিবেকানন্দকে লাভ করিত কি না সন্দেহ। ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন রায় আত্মার স্বাধীনতার জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া সমুদ্রযাত্রার নিষেধ-বন্ধন যদি অবলীলাক্রমে ভাঙ্গিয়া না ফেলিতেন, তবে ভারতবর্ষীয়ের উচ্চতর রাজপদে প্রবেশ লাভের প্রথম পথপ্রদর্শক সত্যেন্দ্রনাথকে অথবা রাজনীতিক্ষেত্রে ভারতবাসীর সম্মুখে উন্নত আশার প্রথম দীপ্ত দীপধারক সুরেন্দ্রনাথকে পাইতাম কি না জানি না; জড় ও জীবের সামঞ্জস্যপ্রকাশক জগদীশচন্দ্রকে অথবা রসায়নবিদ্যায় অন্যতর অগ্রণী প্রফুল্লচন্দ্রকে পাইতাম কি না জানি না। এইরূপে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে স্থিরভাবে আলোচনা করিলে বুঝিতে পারিব যে, নব্যযুগে ভারতের যে কোন ক্ষেত্রে যে কোন উন্নতি দেখিতে পাই, এবং ভারতের যে কোন সত্যসুন্দরমঙ্গল ভাব জগতের গাত্রে স্বীয় মঙ্গল চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিতেছে, সেই সকলেরই মূল পত্তনভূমি ব্রাহ্মসমাজ। সেই ব্রাহ্মসমাজের বীজরূপে সর্ব্বপ্রথম আবির্ভাব যে শুভদিনে, সেই শুভদিন কেবল ব্রাহ্মসমাজের কেন, কেবল ভারতবর্ষের কেন, সমগ্র জগতের ইতিহাসে একটী স্মরণীয় দিন—জগতের ইতিহাসে তাহা পুণ্যাহ নিঃসন্দেহ।

আমাদের দেশে কৃষকেরা বৎসরের মধ্যে প্রথম যে দিন নিজ নিজ ক্ষেত্রে হল চালনা করে, সেই দিনকেই সাধারণত পুণ্যাহ বলা হয়। * আমাদের

* 'পুণ্যাহে লাঙ্গলযোজনং'—পারস্কর গৃহ্যসূত্র।

শরীর রক্ষার জন্য যে দ্রব্য সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যক, সেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ধান্য প্রভৃতি দ্রব্যের সংগ্রহচেষ্টার প্রথম দিনকে যে পুণ্যাহ বলা হইবে, ইহা মোটেই অসঙ্গত নহে। ইহা যদি অসঙ্গত না হয়, তবে যে স্বাধীনভাব আত্মার একমাত্র জীবন, সেই আত্মার স্বাধীনতা সর্ব্বপ্রথম যে দিন জনসাধারণের নিকট বিতরণ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল, সেই পবিত্র দিনকে যে আমরা ব্রাহ্মসমাজের পুণ্যাহ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি, তাহাও কিছুমাত্র অসঙ্গত নহে, প্রত্যুত খুবই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।

আমাদের দেশে অন্যান্য শুভদিনের ন্যায় পুণ্যাহেরও কার্য্য আরম্ভ হয় ভগবানের পূজা দ্বারা। যিনি ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক, ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে, দুর্ব্বল-সবলনির্ব্বিশেষে, জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে যিনি সকলের পিতামাতা, ৬ই ভাদ্রের পুণ্য দিবসে তাঁহারই পবিত্র নাম যখন বঙ্গদেশে সর্ব্বপ্রথম প্রচারিত হইতে সূত্রপাত হইয়াছে, তখন সেই ব্রাহ্মসমাজের পুণ্যাহকেও আমাদের স্মৃতিপথে জাগরূক রাখিবার পক্ষে সেই ভগবানেরই চরণতলে আমাদের সম্মিলিতভাবে প্রতি বৎসর ভক্তিকুসুম নিবেদন করা অপেক্ষা অন্য কোন প্রকৃষ্টতর উপায় আছে কি না সন্দেহ। প্রাচ্যদিগের, বিশেষত ভারতবাসীর মনের স্বাভাবিক গতিই ধর্ম্মের দিকে। যে সম্প্রদায়েরই লোক হউন না কেন, ভারতবাসীর অন্তরে একটা ধর্ম্মভাব, ভগবানের প্রতি একটা আত্মনিবেদনের ভাব, প্রকাশ্যভাবে বা অন্তঃসলিলভাবে, সর্ব্বদাই সকল অবস্থাতেই কার্য্য করে দেখা যায়। তাই উচ্চনীচ-নির্ব্বিশেষে ভারতবাসীমাত্রই প্রত্যেক পর্ব্বাহে প্রত্যেক শুভদিনে সর্ব্বাগ্রে ভগবানের পূজা করিয়া তবে অন্যান্য শুভকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়।

ভগবানের প্রসাদে আমরা এই পবিত্র দেশে, সত্যধর্ম্মের আদিভূমি এই ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছি। এই ভারতবর্ষই আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছে এবং আবহমান কাল শিক্ষা দিয়া আসিতেছে যে, আমাদের সকল কর্ম্মকেই, আমাদের আহার বিহার, শয়ন জাগরণ প্রত্যেক কর্ম্মকেই ভগবৎ-কেন্দ্রক করিয়া তুলিতে হইবে। ভারতের অধিবাসী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি বলিয়াই আমরা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি যে আমাদের জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তকে প্রতি নিশ্বাসকে ভগবৎ-কেন্দ্রক করিয়া না তুলিলে নিস্তার নাই—রক্ষা নাই; প্রকৃত সুখশান্তি পাওয়া যাইতে পারে না। আমরা স্থির জানিয়াছি যে ঈশ্বরকে সত্যসত্য হৃদয়ের দেবতা বলিয়া গ্রহণ না করিলে পরিণামে বিনাশের পথে নামিতে হয়।

অনেক বিপ্লব, অনেক আঘাতের ফলে ভারতবাসী এই সত্য মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছে। পাশ্চাত্য জগত আজ পর্য্যন্ত এই সত্য অন্তরে সম্যক্ ধারণ করিতে পারিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। বর্ত্তমান প্রলয়ঙ্কর মহাসমরেরও ফলে পাশ্চাত্যদিগের অন্তরে ইহা সম্যক্ বিস্ফুরিত হইবে কি না সন্দেহ। ইহা কিছু আশ্চর্য্য নহে, প্রাপ্ত-যৌবন বালক সকল কাজ সকল ঘটনাই আত্মকেন্দ্রক করিয়া দেখে, এবং সেই কারণে প্রধানত নিজের দৈহিক বলবীর্য্যের উপর নির্ভর করিয়া আত্মকৃত কার্য্যের সমস্তই ভাল দেখে, জ্ঞানবৃদ্ধ বয়োবৃদ্ধ গুরুজনদিগেরও শ্রেষ্ঠত্ব ও সদ্‌গুণ সমূহের প্রতি তাহার দৃষ্টি অনেক সময়েই অন্ধ থাকে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সংসারের কঠোর কশাঘাত পাইতে পাইতে তাহার জ্ঞানচক্ষু প্রস্ফুটিত হইতে থাকিলে সে ক্রমশ আপনার অতিরিক্ত অন্যান্য ব্যক্তিগণের মহত্ত্ব উপলব্ধি করে এবং তখন সে আপনাকে তাঁহাদের প্রদর্শিত পথে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করে। জগতের ইতিহাসে পাশ্চাত্য জগতও বলিতে গেলে নবযৌবনে পদার্পণ করিয়াছে মাত্র। তাই পাশ্চাত্য জগত সকল কর্ম্ম সকল ভাবকে আত্মকেন্দ্রক করিয়া তুলিতে তুলিতে পরিণামে তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল বর্ত্তমান মহাসমরে অবতীর্ণ হইয়াছে। পাশ্চাত্য জগত প্রকৃতপক্ষে অন্তর হইতে ধর্ম্মকে ঈশ্বরকে বিদায় প্রদান করিয়াছে। বর্ত্তমান মহাসমরের কঠোর আঘাতে এখন পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য জগতের অন্তর হইতে বলদর্প ধনদর্প প্রভৃতি আত্মকেন্দ্রক করিবার মূলভাব সকল তিরোহিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তবে আশা আছে যে মঙ্গলময় পরমেশ্বরের মঙ্গল বিধান সেই অমঙ্গলপ্রসূ দর্প সকল চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া যথাসময়ে পাশ্চাত্য জগতকে স্বীয় মঙ্গলপথের পথিক করিয়া দিবেন।

আমাদের দেশে পুণ্যাহের সূত্রে দুইটী প্রধান কার্য্য সংসাধিত হয়—রাজা ও প্রজার পরস্পরের মধ্যে প্রত্যক্ষ পরিচয় সাধন, এবং প্রজাগণের পরস্পরের মধ্যে সম্মিলন ও সম্প্রীতিবর্দ্ধন। এই দিনে রাজা প্রজাকে চিনিয়া লয়েন—কোন্ প্রজা রাজভক্ত, কোন্ প্রজা বা রাজভক্ত নহে, রাজা সাক্ষাৎভাবে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হয়েন। আবার প্রজাও প্রত্যক্ষ ভাবে রাজার পরিচয় পায় যে রাজা প্রজার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী কি না, রাজা প্রজার সুখদুঃখের কথা শোনেন কি না। রাজাপ্রজার মধ্যে বিরোধ বিবাদ দূর করিবার এমন শুভ অবসর সহজে পাওয়া যায় না। ব্রাহ্মসমাজেরও এই ৬ই ভাদ্রের পুণ্যাহে আমাদের রাজাকে চিনিয়া লইতে হইবে। আমাদের হৃদয়ের দেবতা যিনি, তিনিই যে ব্রাহ্মসমাজেরও রাজা। সুতরাং তাঁহাকে চিনিয়া লইতে, তাঁহার মঙ্গলভাবের প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইতে আমাদের বেশী বিলম্ব ঘটিবে না। আমরা যাঁহাকে প্রতিদিন আমাদের হৃদয়ের পূজার্ঘ্য প্রদান করি, তিনি এক দরিদ্র বঙ্গবাসীর দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের বীজ রোপিত করাইয়াইতো তাঁহার অনন্ত মঙ্গলভাবের প্রত্যক্ষ পরিচয় দিয়াছেন।

পরমেশ্বরের নানাবিধ স্বরূপের বিষয়ে আমরা অনেক সময়ে আলোচনা করি, আত্মার অন্তরে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করি। আমরা অনেক সময়েই তাঁহার জ্ঞানস্বরূপ, সত্যস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ শুনিয়াও থাকি, আর উপদেশ দিবারও চেষ্টা করিয়া থাকি। কিন্তু আমাদের মধ্যে কয়জন তাঁহার বিগতবিবাদ স্বরূপের বিষয়ে আলোচনা করি বা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করি? আমরা কয়বার তাঁহার এই স্বরূপের বিষয়ে উপদেশ শুনিতে পাই অথবা উপদেশ দিবার চেষ্টা করি? এই স্বরূপ সম্বন্ধে আমরা যদি বিশেষ মনোযোগ দিতাম, তাহা হইলে ব্রহ্মোপাসকগণের মধ্যে কখনই বিবাদের সম্ভাবনা আসিতে পারিত না। উপনিষদে আছে—ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি, ব্রহ্মকে যিনি জানেন, তিনি ব্রহ্মই হয়েন। কথাটীর মধ্যে একটী গভীর সত্য নিহিত আছে। ব্রহ্মকে জানিয়া ব্রহ্মের ইচ্ছার সহিত যিনি আপনার ইচ্ছা, ভাব এবং নিজের অস্তিত্ব মিলাইয়া দিয়াছেন, তিনি ব্রহ্মের সহিত একযোগে যুক্ত হইয়া তাঁহার নানাবিষয়ক স্বরূপ বিষয়ে যে সিদ্ধিলাভ করেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেইরূপ আমরা যদি ব্রহ্মের বিগতবিবাদস্বরূপে তন্ময় হই, তবে আমরাও যে অচিরে বিগতবিবাদ হইব, সে বিষয়ে কি কোন সন্দেহ আছে? রাজা রামমোহন রায় ভগবানের এই স্বরূপটীর বিষয় অন্তরে বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার তিরোভাবের পর তিনি কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, এই বিষয় লইয়া হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদিগের মধ্যে তর্কবিতর্ক লাগিয়াছিল। ধর্ম্ম লইয়া বিবাদের উপর তাঁহার এতই বিদ্বেষ ছিল যে একদিকে তিনি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিকট তাহাদের নিজ নিজ শাস্ত্রগ্রন্থের প্রমাণ দিয়া ব্রহ্মোপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইতেন, অপরদিকে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের অন্যতর ভিত্তিই এই করিলেন যে সেখানে এমনভাবে উপাসনাকার্য্য নির্ব্বাহ হইবে, যাহাতে বিবাদের পরিবর্ত্তে লোকসকলের পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতি বর্দ্ধিত হয় ও স্থায়িত্ব লাভ করে। * আমরা যদি সত্যসত্য ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন রায়ের প্রতি যথার্থ সম্মান দিতে প্রস্তুত হই, যদি আমরা ভগবানকে যথার্থ বিগতবিবাদ বলিয়া স্বীকার করিয়া অন্তরে তাহা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করি, তবে নিশ্চয়ই আমাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাদের অস্তিত্বই থাকিতে পারিবে না। রাজা রামমোহন আমাদিগকে যেভাবে ব্রহ্মোপাসনা নির্ব্বাহ করিতে উপদেশ দিয়াছেন, যেভাবে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারের ব্যবস্থা করিয়াছেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে তাঁহার পদানুসরণে প্রবৃত্ত হইলে আমাদের মধ্য হইতে বিবাদ বিসম্বাদ নিশ্চয়ই চলিয়া যাইবে এবং তখনই আমাদের ব্রাহ্ম নাম গ্রহণ সার্থক হইবে।

এই শুভ পুণ্যাহের দিনে আমাদের রাজা, আমাদের হৃদয়ের দেবতার পরিচয় পাইয়া যেমন আমরা কৃতার্থ হইব, তেমনি আমাদের পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতির পথ উন্মুক্ত করিয়া তাঁহার বর্ষিত আনন্দধারায় অভিষিক্ত হইতে চাহি। আমরা

* * * Strengthening the bonds of union—Trustdeed of the Adi Samaj.

প্রত্যেকে মায়ের সন্তান; একবার ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিব যে প্রত্যেক মাতা, তাঁহার সন্তানগণ বিবাদবিসম্বাদ ভুলিয়া সম্প্রীতির সহিত পরস্পরের প্রতি ব্যবহার করিলে কতদূর সুখী ও আনন্দিত হয়েন। প্রত্যেক মাতা যাঁহার প্রতিনিধি, আমাদের মধ্যে সম্প্রীতি বর্দ্ধিত হইলে তিনিও কি আনন্দিত হইবেন না? বিবাদবিসম্বাদ আসিবারই বা কারণ কি? বিগতবিবাদং পরমেশ্বর যে আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে আত্মার স্বাধীনতা স্থাপিত করিয়া বিবাদের মূল ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। প্রকৃতিতে দেখি যে দুইটী অণু পরমাণুর ভিতর একান্ত সৌসাদৃশ্য নাই, অথচ তাহারা কেহ কাহাকে বিনাশ করিতে পারে না—প্রত্যেকেই আপনাপন কার্য্য অবিচলিত নিয়মে করিয়া চলিতেছে। প্রকৃতি হইতেই বিশ্বজননী আমাদিগকে এই কথা স্পষ্টভাবে শিক্ষা দিতেছেন যে আমরা কেহই কাহারও সহিত একেবারে সম্পূর্ণ মিল প্রত্যাশাই করিতে পারি না—পরস্পরের মধ্যে কিছু না কিছু পার্থক্য থাকিবেই। কিন্তু তাই বলিয়া কি আমরা বৃথা বিবাদবিসম্বাদে প্রবৃত্ত হইব? পিতার সহিত কি পুত্রেই সম্পূর্ণ একমত হয়? হয় না, হইতে পারে না বলিয়াই কি পিতার সহিত পুত্র বিবাদে প্রবৃত্ত হইবে? স্বামীর সহিত কি স্ত্রীই সম্পূর্ণ একমত হয়? হয় না, হইতে পারে না বলিয়াই কি স্বামীর সহিত স্ত্রী অথবা স্ত্রীর সহিত স্বামী চিরবিবাদে প্রবৃত্ত থাকিবে? ভগবানের সৃষ্টিতে যদি অণুপরমাণুর মধ্যে জীবজন্তুসমূহের মধ্যে প্রভেদ ও পার্থক্য না থাকিত, তবে তো তাঁহার সৃষ্টিই থাকিতে পারিত না। তাঁহার সৃষ্টিও থাকিবে, সেই সৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য ও বৈচিত্র্যও থাকিবে। আমাদের কর্ত্তব্য হইতেছে যে নিম্নশ্রেণীর জীবজন্তুর ন্যায় পার্থক্য ও বিভিন্নতার কারণে বিবাদকলহে আপনাদের বিনাশ সাধন না করি।

ঈশ্বর বিগতবিবাদং বলিয়াই আমাদের মধ্যে আত্মার স্বাধীনতা দিয়াছেন। সেই আত্মার স্বাধীনতা দিয়াছেন বলিয়াই আমাদের পরস্পরের মধ্যে মতভেদ নিশ্চয়ই থাকিবে। কিন্তু আমাদের সেই আত্মার স্বাধীনতা আছে বলিয়াই শত শত ভেদের ভিতরেও বিবাদ আনয়নের প্রয়োজন নাই। বিগতবিবাদং এর পূজাতে বিবাদ আনিব কেন? শ্রীক্ষেত্রে দেখি, সেখানে শত সহস্র যাত্রী বিশ্বাসের বলে সমস্ত জাত্যভিমান পরিত্যাগ করিতে পারে; আর আমরা মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্রহ্মোপাসক আমাদের কি এতটুকু বিশ্বাসের বল নাই যে আমরা বলিতে পারি যে, আমরা বিগতবিবাদং ব্রহ্মের উপাসক, আমাদের মধ্যে কিছুতেই বিবাদ বিসম্বাদ স্থান পাইতে পারে না? ছোটখাটো মান অভিমান আমাদের চক্ষে ধূলি দিয়া এতদিন পরস্পরকে চিনিতে দেয় নাই। সেই সকল মান অভিমান কি পায়ের তলে দলিয়া ফেলিতে পারিব না? এখন চারিদিকেই মিলনের বাতাস উঠিয়াছে, সকলেই সেই বাতাসে পাল তুলিয়া দিয়াছে, আমরাই কি কেবল আলস্যকে সম্বল করিয়া পাল নামাইয়া রাখিব? যে সকল বিষয়ে মতভেদ আসিতে পারে, অভিমানশূন্য হৃদয়ে সেগুলিকে আলোচনার জন্য পশ্চাতে রাখিয়া মায়ের মন্দিরে আসিবার সময় আমরা নির্ব্বিবাদ হইয়া আসিব। এই প্রকার নির্ব্বিবাদভাবে যখন সেই ব্রাহ্মসমাজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বিগতবিবাদং পরমেশ্বরের নাম ভারতের সর্ব্বত্র প্রচার করিতে পারিব, যখন ভারতের ত্রিশকোটি সন্তান এক হৃদয়ে মায়ের সন্তান বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দিবে, তখন সমগ্র জগতে কি যে অপূর্ব্ব বিরাট সাড়া পড়িবে, তাহা ভাবিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়। আমরা নির্ব্বিবাদ হইয়া তাঁহার নাম প্রচার করিতেছি না বলিয়াই লোকের চক্ষে আজ ব্রাহ্মসমাজ দুর্ব্বল বলিয়া প্রতীত হইতেছে। কিন্তু যে ব্রাহ্মসমাজ মানবাত্মার স্বাধীনতা ঘোষণা করিতে কুণ্ঠিত নহে, তাহার ন্যায় সবল আর কিছু আছে কি না সন্দেহ। আমাদের ভিতর হইতে হিংসা দ্বন্দ্ব চলিয়া যাক, নির্ম্মূল হইয়া যাক। হৃদয় খুলিয়া সেই পরমদেবতার চরণে আত্মনিবেদন করিয়া দাও, দেখিবে যে প্রাণটা কতদূর হালকা হইয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে কতটা সবল হইয়া উঠে।

হে পরমাত্মন্ তোমার বিগতবিবাদ স্বরূপ আমাদিগকে উপলব্ধি করিতে দাও। আমাদের হৃদয় হইতে হিংসাদ্বেষ বিবাদকলহ বজ্রের আঘাতে বিচূর্ণ করিয়া দাও। হে বিগতবিবাদ পরমেশ্বর, তোমারই শক্তিতে আমরা শক্তি লাভ করিয়াছি। তোমাকেই জীবনের মাঝি করিয়া শত

বিভিন্নতার মধ্যে, শত পার্থক্যের মধ্যেও যেন আমরা তোমার আদেশ সুখে বহন করি এবং তোমার ইচ্ছার সহিত আমাদের ইচ্ছা সম্মিলিত করিয়া আমরাও যেন বিগতবিবাদ হই। আজ এই শুভ দিনে এই মাতৃপূজা উপলক্ষে তোমাকে একই পিতামাতা জানিয়া আমরা পরস্পরকে যেন ভাল বাসিতে শিক্ষা করি। আজ হইতে যেন এই প্রতিজ্ঞা লইয়া গৃহে ফিরি যে আমরা পরস্পরের হৃদয়ে আঘাত দিবার পরিবর্ত্তে পরস্পরের মুখে হাসি আনিবার চেষ্টা করিব। হে হৃদয়ের দেবতা আমাদের মধ্যে সম্প্রীতি বর্দ্ধিত করিয়া আমাদিগকে ব্রহ্মোপাসক নামের উপযুক্ত কর। ওঁ।

"তুমি এস"।

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এ)

রাগিণী—মিশ্র-বিভাস।

আপ্‌নি যখন হৃদয়ে ফুল ফুট্‌বে না
তুমি এস !
শুষ্ক যখন জীবনে গীত উঠবে না
তুমি এস !
জীবন যখন হবে মরু
রইবে না আর একটি তরু
যখন অন্ধ কারা লাগবে ধরা
তুমি এস !
কান্না যখন বক্ষে আমার বন্যা ব'বে
তুমি এস !
বিফল যখন লাগবে জীবন, মাগবে মরণ
তুমি এস !
ওগো নিমেষে ফুল ফুটিয়ো তবে
সুধার উৎস ছুটিয়ো তবে—
আমার কান্নাজলে পান্নাদোলায়
তুমি এস !
তুমি আমার জীবনে কি
কইতে আমি পারি সে কি
সব গীতি যে বন্ধ সেথায়
সব উপমা মিথ্যে মেকি !
তুমি আমার জীবনে কি,
আমি বিনে জান্‌বে কে কি—
ওগো তোমার চরণতলে সব বিকা'নু
তুমি এস ॥

বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত

গীতা-রহস্য।

সপ্তম প্রকরণ।

কাপিলসাংখ্যশাস্ত্র কিংবা ক্ষরাক্ষরবিচার।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদিত।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কিন্তু সাংখ্যশাস্ত্রকারেরা এই জড়াদ্বৈত স্বীকার করেন না। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, ইহারা পঞ্চভূতাত্মক জড়প্রকৃতিরই ধর্ম্ম এই কথা তাঁহারা মানেন এবং সেই অনুসারে অব্যক্ত প্রকৃতি হইতেই পরে ক্রমে ক্রমে বুদ্ধি, অহঙ্কার প্রভৃতি উৎপন্ন হয় এইরূপ সাংখ্যশাস্ত্রে পরে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু জড় প্রকৃতি হইতে চৈতন্য উৎপন্ন হইতে পারে না শুধু নহে, যে কেহই হোক্ না কেন, সে যেমন আপন কাঁধের উপর বসিতে পারে না, সেইরূপ প্রকৃতির জ্ঞাতা ও দ্রষ্টা প্রকৃতি হইতে ভিন্ন না হইলে 'আমি অমুক জানিতেছি' এই ভাষাও প্রচলিত হইতে পারে না ; এবং সৃষ্টিব্যবহার দেখিলে আমি যাহা জানিতেছি, কিংবা দেখিতেছি তাহা আমা-হইতে ভিন্ন—এইরূপ সকলেরই অনুভূতি হয়। তাই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, দ্রষ্টা ও দৃষ্টবস্তু কিংবা প্রকৃতির দ্রষ্টা ও জড়প্রকৃতি এই দুই পদার্থ মূলতঃই ভিন্ন ভিন্ন এইরূপ সিদ্ধান্ত না করিলে চলে না, এইরূপ সাংখ্যেরা স্থির করিয়াছেন (সাং, কা, ১৭)। পূর্ব্বপ্রকরণে যাহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ কিংবা আত্মা বলা হইয়াছে তাহাই এই দ্রষ্টা, জ্ঞাতা বা উপভোক্তা হওয়ায় সাংখ্যশাস্ত্রে তাহাকেই 'পুরুষ' কিংবা 'জ্ঞ' (জ্ঞাতা) এইরূপ উক্ত হইয়াছে। এই জ্ঞাতা প্রকৃতি হইতে ভিন্ন হওয়া প্রযুক্ত স্বভাবতই তাহা সত্ত্ব, রজ ও তম প্রকৃতির এই তিন গুণের বাহিরে অর্থাৎ নির্গুণ, অবিকারী এবং জানা, দেখা ব্যতীত অন্য কোন কাজ করে না ; অতএব জগতে যাহা কিছু ভাঙ্গাগড়া চলিতেছে তৎসমস্ত একমাত্র প্রকৃতিরই কাজ, এইরূপ নিষ্পন্ন হয়। সারকথা—প্রকৃতি অচেতন, পুরুষ সচেতন ; প্রকৃতিই সমস্ত কর্ম্মচেষ্টা করিতেছে, পুরুষ উদাসীন ও অকর্ত্তা ; প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মক, পুরুষ সাক্ষী ;—এইরূপ এই

দুই ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব এই সৃষ্টির মধ্যে অনাদিসিদ্ধ, স্বতন্ত্র ও স্বয়ম্ভূ এইরূপ সাংখ্যশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত; এবং তাহার অনুলক্ষণও ভগবদ্গীতাতে "প্রকৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি"—অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষ ইহারা উভয়েই অনাদি (গী, ১৩।১৯) এইরূপ প্রথমে বলিয়া পরে "কার্য্যকারণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে" অর্থাৎ দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির ব্যাপার প্রকৃতিই করিয়া থাকে, এবং "পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে" অর্থাৎ পুরুষ সুখদুঃখের উপভোগ ঘটাইবার কারণ,—এইরূপ উহাদের বর্ণনা করা হইয়াছে; কিন্তু প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুই অনাদি এই মত গীতায় মান্য হইলেও সাংখ্যদের ন্যায় গীতা এই দুই তত্ত্বকে স্বতন্ত্র কিংবা স্বয়ম্ভু বলিয়া মানেন না—ইহা মনে রাখা আবশ্যক। কারণ, গীতাতে ভগবান্ প্রকৃতিকে আপন মায়া বলিয়াছেন (গী, ৭, ১৪; ১৪, ৩) এবং পুরুষ-সম্বন্ধেও—"মমৈবাংশো জীবলোকে" (গী, ১৫, ৭)—উহা আমারই অংশ, এইরূপ বলিয়াছেন। অতএব গীতা সাংখ্যশাস্ত্রকেও আগাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু আপাতত সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া শুধু সাংখ্যশাস্ত্র পরে কি বলিতেছেন তাহা দেখা যাক্।

সাংখ্যশাস্ত্র অনুসারে, অব্যক্ত (মূলপ্রকৃতি), ব্যক্ত (তাহার বিকার) ও পুরুষ—সৃষ্টির অন্তর্গত সমস্ত পদার্থের এই তিন বর্গ। কিন্তু ইহার মধ্যে ব্যক্ত পদার্থের স্বরূপ প্রলয়কালে নাশ হওয়া প্রযুক্ত, মূলে অব্যক্তপ্রকৃতি ও পুরুষ এই দুই তত্ত্বই বাকী রহিয়া যায়; এবং এই দুই মূলতত্ত্ব অনাদি ও স্বয়ম্ভূ এইরূপ সাংখ্যদিগের সিদ্ধান্ত হওয়ায় তাহাতে এই দুইটিকে দ্বৈতী (যাহা দুই মূলতত্ত্ব স্বীকারকরে) বলা হইয়া থাকে। প্রকৃতি ও পুরুষের বাহিরে ঈশ্বর, কাল, স্বভাব কিংবা অন্য কোন মূল তত্ত্বই তাঁহারা মানেন না।* কারণ, সগুণ ঈশ্বর, কাল কিংবা স্বভাব এই সমস্ত ব্যক্ত হওয়া প্রযুক্ত অব্যক্ত-প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন ব্যক্ত পদার্থের মধ্যেই তাহার সমাবেশ হইয়া থাকে; এবং ঈশ্বরকে নির্গুণ বলিয়া মানিলে, সৎকার্য্যবাদ-অনুসারে নির্গুণ মূলতত্ত্ব হইতে ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি কখনই উৎপন্ন হইতে পারে না। তাই, প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয় হইতে পৃথক্ সৃষ্টির তৃতীয় মূলতত্ত্ব যে নাই এইরূপ তাঁহারা স্থির-নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, এবং দুই মূলতত্ত্ব এইরূপ নির্দ্ধারণ করিলে পর, সেই উভয় হইতে সৃষ্টি কিরূপে উৎপন্ন হইল, তাঁহারা আপন-মতানুসারে তাহারও ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহারা এইরূপ বলেন যে, নির্গুণ পুরুষ স্বতঃ কিছু করিতে না পারিলেও, প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ হইলে যেরূপ গরু বাছুরের জন্য দুধ দেয় কিংবা লৌহ-চুম্বকের সন্নিধানে লৌহে আকর্ষণ শক্তি আইসে, সেইরূপ মূল অব্যক্ত প্রকৃতি স্বকীয় গুণসমূহের (সূক্ষ্ম ও স্থূল) ব্যক্ত বিস্তার পুরুষের সম্মুখে স্থাপন করে (সাং, কা, ৫৭)। পুরুষ সচেতন ও জ্ঞাতা হইলেও, কেবল নির্গুণ হওয়া প্রযুক্ত, তাহার নিকট স্বতঃ কর্ম্ম করিবার কোন সাধন নাই;

* ঈশ্বর কৃষ্ণ একজন পাক্কা নিরীশ্বরবাদী। ইহার সাংখ্যকারিকাতে মূলবিষয়ের উপর ৭০ আর্য্যা শ্লোক আছে এইরূপ তিনি শেষের উপসংহারাত্মক আর্য্যাতে বলিয়াছেন। কিন্তু কোলব্রুক্ ও উইলসন্ ইঁহাদের ভাষান্তরসহ বোম্বায়ে রা, রা, তুকারাম-তাতা যে সংস্করণ ছাপাইয়াছেন তাহাতে মূলবিষয়ের উপর কেবল মাত্র ৬৯ আর্য্যা আছে। তখন ৭০ আর্য্যা কোন্‌টি এইরূপ উইলসন্ সাহেবের সন্দেহ হইল। কিন্তু ঐ আর্য্যাটি না পাওয়ায় তাঁহার সন্দেহ সেইরূপই রহিয়া গিয়াছে। আমার মতে, এই আর্য্যা এখনকার ৬১ আর্য্যার পরে হইবে। কারণ ৬১ আর্য্যার উপর গৌড়পাদের যে ভাষ্য আছে তাহা এক আর্য্যার নহে, দুই আর্য্যার। এবং এই ভাষ্যের মূল শ্লোকের পদগুলি লইয়া আর্য্যা রচনা করিলে তাহা—

কারণ মীশ্বরমেকে ব্রুবন্তি কালং পরে স্বভাববিদঃ।
প্রজা কথং নির্গুণতো ব্যক্তঃ কালঃ স্বভাবশ্চ॥

এইরূপ দাঁড়ায়; এবং তাহা অগ্রপশ্চাদ্-গত সন্দর্ভেরও অনুযায়ী। এই আর্য্যা নিরীশ্বর মতের প্রতিপাদক হওয়ায়, কেহ-না-কেহ পরে উহা হইতে ছাঁটিয়া ফেলিয়াছে এইরূপ মনে হয়। কিন্তু মূল আর্য্যাতে মূঢ়-অনুসন্ধানকারী এই ভদ্র লোকটি সেই আর্য্যার ভাষ্যও ছাঁটিয়া ফেলিতে বিস্মৃত হওয়া প্রযুক্ত ঐ আর্য্যা আমরা খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলাম; তাই এই মূঢ়-অনুসন্ধানকারীকে আমাদের ধন্যবাদ করা আবশ্যক! প্রাচীনকালে কোন কোন লোক স্বভাব ও কালকে এবং বেদান্তী তাহাদিগকেও ছাড়াইয়া গিয়া ঈশ্বর জগতের মূল কারণ—ইহা মানিয়া থাকেন, এইরূপ শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম মন্ত্র হইতে দেখিতে পাওয়া যায়, এই মন্ত্র এইরূপ যথা—

স্বভাবমেকে কবয়ো বদন্তি কালং তথান্যে পরিমুহ্যমানাঃ।
দেবস্যৈষা মহিমা তু লোকে যেনেদং ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রম্॥

কিন্তু এই তিন মূল কারণই সাংখ্যেরা স্বীকার করেন না ইহা দেখাইবার জন্যই ঈশ্বর কৃষ্ণ উপরি-উক্ত আর্য্যা, ৬১ আর্য্যার পরে বসাইয়াছেন।

এবং প্রকৃতি কর্ম্মকর্ত্তা হইলেও জড় কিংবা অচেতন হওয়া প্রযুক্ত, কোন্ কাজ করিবে তাহা তাহার জানা নাই। তাই, খঞ্জ ও অন্ধের জুড়ী মেলায়, অন্ধের কাঁধের উপর খঞ্জ বসিয়া দুজনেই যেরূপ পথ চলিতে থাকে, সেইরূপ জড় প্রকৃতি ও সচেতন পুরুষ ইহাদের সংযোগ হইলে, সৃষ্টির কর্ম্ম সুরু হইয়া থাকে (সাং, কা, ২৩); এবং নাটকে যেরূপ প্রেক্ষকদিগের মনোরঞ্জনার্থ কোন নটী এখন এক বেশে, খানিক পরে আর এক বেশে নাচিতে থাকে, সেইরূপ পুরুষের লাভের জন্য (পুরুষার্থের জন্য) পুরুষ কোন রকম প্রতিদান না করিলেও, প্রকৃতি স্বত্বরজতমের ন্যূনাধিক্যের দ্বারা অনেক বেশ গ্রহণ করিয়া তাহার সম্মুখে সমান নাচিতে থাকে (সাং, কা, ৫৯)। প্রকৃতির এই নৃত্যে ভুলিয়া মোহবশতঃ কিংবা বৃথাভিমানবশতঃ (গী, ৩, ২৭) প্রকৃতির এই কর্ত্তৃত্ব পুরুষ নিরর্থক আপনার উপর টানিয়া লইয়া সুখদুঃখের জালে আপনাকে যে পর্য্যন্ত জড়াইয়া রাখে, সে পর্য্যন্ত তাহার মোক্ষ হইতে পারে না। কিন্তু যেদিন ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি পৃথক্ ও আমি পৃথক এই জ্ঞান পুরুষের হয় সেইদিন সে মুক্ত হয় (গী, ১৩, ২৯, ৩০; ১৪, ২০)। কারণ, বস্তুত দেখিতে গেলে পুরুষ মূলে কর্ত্তাও নহে, বদ্ধও নহে। পুরুষ স্বতন্ত্র হওয়ায় স্বভাবতই কৈবল্য-অবস্থাপন্ন অর্থাৎ অকর্ত্তা। যাহা কিছু হয় তাহা প্রকৃতিই করিয়া থাকে। অধিক কি, মন ও বুদ্ধি ইহারাও প্রকৃতিরই বিকার হওয়া প্রযুক্ত বুদ্ধির যে জ্ঞান হয় তাহাও প্রকৃতির কার্য্যেরই ফল। এই জ্ঞান তিন প্রকারের;—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক (গী, ১৮, ২০-২২)। তন্মধ্যে বুদ্ধির সাত্ত্বিক জ্ঞান হইলে, আমি পৃথক্ ও প্রকৃতি পৃথক্ ইহা পুরুষ জানিতে পারে। সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই গুণত্রয় প্রকৃতির, পুরুষের নহে। পুরুষ নির্গুণ হওয়ায় ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি তাহার দর্পণ স্বরূপ হইয়া থাকে (সভা, শাং, ২০৪৫)। এই দর্পণ যখন সাফ্ থাকে, অর্থাৎ প্রকৃতির বিকার যে বুদ্ধি সেই বুদ্ধি যখন সাত্ত্বিক হয়, তখন আমি পৃথক্ ও প্রকৃতি পৃথক্ এইরূপ আপনার প্রকৃত স্বরূপ, এই স্বচ্ছ দর্পণে, পুরুষের নজরে আসে ও প্রকৃতি লজ্জিতার ন্যায় হইয়া পুরুষের সম্মুখে আবার নৃত্য বন্ধ করিয়া দেয়। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে পর, পুরুষ সমস্ত পাশ হইতে মুক্ত হইয়া তাহার স্বাভাবিক কৈবল্যপদ প্রাপ্ত হয়। কৈবল্য অর্থাৎ কেবলত্ব, একাকীত্ব কিংবা প্রকৃতির সহিত সংযোগ না থাকা এইরূপ অর্থ হওয়ায়, পুরুষের এই নৈসর্গিক অবস্থাকেই সাংখ্যশাস্ত্রে মোক্ষ (বন্ধন-মোচন) বলে। কিন্তু এইরূপ অবস্থাতে পুরুষ প্রকৃতিকে ছাড়ে, না—প্রকৃতি পুরুষকে ছাড়ে এইরূপ এক সূক্ষ্ম প্রশ্ন সাংখ্যেরা উপস্থিত করিয়াছেন। বর অপেক্ষা কনে ঢ্যাঙা কিংবা কনে অপেক্ষা বর বেঁটে ইহা এইরূপ ধরণের প্রশ্ন হওয়ায় তাহা নিরর্থক, এইরূপ কেহ কেহ মনে করিতে পারেন। কারণ, দুই বস্তুর বিয়োগ হইলে পর, কে কাহাকে ছাড়িল ইহা দেখার কোন ফল নাই; উভয়ই পরস্পরকে ছাড়ে, এইরূপ আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু একটু সূক্ষ্ম বিচার করিয়া দেখিলে সাংখ্যদিগের এই প্রশ্ন তাঁহাদের দৃষ্টিতে অযোগ্য নহে, এইরূপ উপলব্ধি হইবে। সাংখ্যশাস্ত্রানুসারে পুরুষ নির্গুণ, অকর্ত্তা ও উদাসীন হওয়া প্রযুক্ত 'ছাড়া' কিংবা 'ধরা' এই দুই ক্রিয়ার কর্তৃত্ব, তত্ত্বদৃষ্টিতে পুরুষে বর্ত্তিতে পারে না (গী, ১৩।৩১।৩২)। তাই, কর্তৃত্ব এই যে প্রকৃতির ধর্ম্ম, সেই প্রকৃতিই পুরুষকে ছাড়িয়া যায়, অর্থাৎ প্রকৃতিও পুরুষ হইতে আপনার মোক্ষসাধন করিয়া লয়, এইরূপ সাংখ্যেরা স্থির করিয়াছেন (সাং কা, ৬২ ও গী, ১৩।৩৪)। সার কথা, পুরুষের মোক্ষ নামে পৃথক্ অবস্থা বাহির হইতে প্রাপ্ত অবস্থা নহে কিংবা পুরুষের মূলগত স্বাভাবিক অবস্থা হইতে ভিন্ন এইরূপ অন্য অবস্থাও নহে। ঘাসের উপরকার ছাল হইতে ভিতরকার শাঁসাল ডাঁটা যেরূপ পৃথক্ কিংবা জলস্থ মাছ যেরূপ জল হইতে পৃথক্ সেইরূপ প্রকৃতি ও পুরুষের সম্বন্ধ। প্রকৃতির গুণের দ্বারা মুগ্ধ হইয়া সাধারণ কোন ব্যক্তি এই ভিন্নতা বুঝিতে পারে না তাই সংসারচক্রে নিমগ্ন থাকে। কিন্তু এই ভিন্নতা যে জানিতে পারে সেই মুক্ত। তাহাকে 'জ্ঞানী' কিংবা 'বুদ্ধ' ও 'কৃতকৃত্য' বলে, এইরূপ মহাভারতে উক্ত হইয়াছে; (সভা, শাং ১৯৪।৫৮; ২৪৮।১১ ও ৩০৬-৩০৮ দেখ), "এতদ্‌বুদ্ধা বুদ্ধিমান স্যাৎ" (গী,

১৫।২০) ইহা গীতাবচনে 'বুদ্ধিমান্' শব্দেরও ঐ একই অর্থ। অধ্যাত্মশাস্ত্রদৃষ্টিতে মোক্ষের প্রকৃত স্বরূপও এই প্রকারেরই (বেসু, শাং ভা, ১১০৪ দেখ)। কিন্তু পুরুষ স্বভাবত কৈবল্য অবস্থায় আছে এইরূপ কারণ না দিয়া, আত্মা মূলে পরব্রহ্মরূপী হওয়া প্রযুক্ত, পুরুষ আপন মূলের রূপ অর্থাৎ পরব্রহ্মকে জানিতে পারাই মোক্ষ এইরূপ সাংখ্য হইতে বিশিষ্ট অদ্বৈত বেদান্তের উক্তি। সাংখ্য ও বেদান্ত ইহাদের মধ্যে এই ভেদ পরবর্ত্তী প্রকরণে স্পষ্ট করিয়া দেখান যাইবে।

পুরুষ (আত্মা) নির্গুণ, উদাসীন ও অকর্ত্তা—এই সাংখ্যদিগের মত যদিও অদ্বৈত বেদান্তের সম্পূর্ণ মান্য, তথাপি একই প্রকৃতির দ্রষ্টা স্বতন্ত্র পুরুষ মূলেতেও অসংখ্য,—পুরুষসম্বন্ধে সাংখ্যদিগের এই আর এক কল্পনা, বেদান্তীরা স্বীকার করেন না। (গী. ৮. ৪; ১৩. ২০-২২; সভা, শাং, ৩৫১; ও বেসু শাং ভা ২৪১; ও বেসু শাং ভা. ২. ১. ১ দেখ)। উপাধিভেদপ্রযুক্ত জীব পৃথক্‌রূপে প্রতিভাত হয়, বস্তুত সমস্তই ব্রহ্ম, এইরূপ বেদান্তীদিগের উক্তি। কিন্তু সাংখ্যদিগের এইরূপ মত যে, যেহেতু প্রত্যেক মনুষ্যের জন্ম মরণ ও সংসার ভিন্ন ভিন্ন, এবং যেহেতু কেহ সুখী, কেহ দুঃখী এইরূপ এই জগতে ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, অতএব প্রত্যেক আত্মা কিংবা পুরুষ মূলেও ভিন্ন ভিন্ন, এবং তাহাদের সংখ্যা অনন্ত (সাং. কা. ১৮)। প্রকৃতি ও পুরুষ সমস্ত সৃষ্টির এই দুই মূলতত্ত্বই প্রকৃত; কিন্তু তাহার মধ্যে, পুরুষ এই শব্দের দ্বারা অসংখ্য পুরুষের সমুদায় বুঝায় এইরূপ সাংখ্যদিগের অভিপ্রায়। এই সকল অসংখ্য পুরুষ ও ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি ইহাদের সংযোগ প্রযুক্ত সৃষ্টির সমস্ত ব্যবহার চলিতেছে। প্রত্যেক পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগ হইলে পর, প্রকৃতি আপন গুণের বিস্তার সেই সেই পুরুষের সম্মুখে স্থাপন করে, এবং পুরুষ তাহার উপভোগ করিয়া থাকে। এইরূপ হইতে হইতে, যে পুরুষের আশপাশের প্রকৃতির খেলা সাত্ত্বিকরূপী হয়, সেই পুরুষেরই (সব পুরুষের নহে) যথার্থ জ্ঞান হয় এবং তাহার প্রকৃতির খেলা বন্ধ হইয়া সে আপনার মূলের কৈবল্যস্বরূপে উপনীত হয়। কিন্তু তাহার মোক্ষলাভ হইলেও অবশিষ্ট পুরুষদিগের সংসার চলিতেই থাকে। পুরুষ এইরূপ কৈবল্যপদে উপনীত হইলে পর, সে প্রকৃতির জাল হইতে অবশ্যই একেবারেই মুক্ত হইবে—এইরূপ কেহ কেহ মনে করিতে পারেন। কিন্তু সাংখ্যমতানুসারে এইরূপ না হইয়া, দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি প্রকৃতির বিকার তাহাকে মরণ পর্য্যন্ত ছাড়ে না। এইরূপ হইবার কারণ সাংখ্য এইরূপ বলেন যে, যেরূপ কুমারের চাকা হইতে, কলসি তৈয়ার হইয়া গেলে কলসি বাহির করিয়া লইলেও তাহা কিয়ৎক্ষণ ঘুরিতে থাকে, সেইরূপ কৈবল্য-প্রাপ্ত মনুষ্যেরও শরীর কিছু দিন অবশিষ্ট থাকে" (সাং. কা. ৬৭)। তথাপি সেই শরীর হইতে কৈবল্যপ্রাপ্ত পুরুষের কোন প্রতিবন্ধক কিংবা সুখ দুঃখের বাধা হইতে পারে না। কারণ, জড়প্রকৃতির বিকার যে দেহ তাহাও জড় হওয়া প্রযুক্ত সুখই বা কি, দুঃখই বা কি তাহার নিকট দুই-ই সমান এবং পুরুষের সুখ দুঃখ হইবে যদি বলা হয় তবে প্রকৃতির ব্যবহার ও তাহার নিজের ব্যবহার পৃথক্ হওয়ায়, সমস্ত কর্ত্তৃত্ব প্রকৃতিরই—তাহার নিজের নহে এই তত্ত্ব পুরুষ জানিতে পারে এবং প্রকৃতির যতই খেলা হউক না কেন, পুরুষ উদাসীনই থাকে। প্রকৃতির ত্রিগুণ হইতে মুক্ত হইয়া যে পুরুষের এই জ্ঞান হয় নাই, তাহার জন্মমরণের পুনরাবৃত্তির একেবারে শেষ হয় না; পরে, সত্ত্বগুণের উৎকর্ষ প্রযুক্ত সে দেবযোনিতে জন্মগ্রহণ করে কিংবা রজোগুণের উৎকর্ষ হেতু মানব-যোনিতে, অথবা তমোগুণের প্রাবল্যে পশুর শ্রেণীতে উৎপন্ন হয় (সাং. কা. ৪৪, ৫৪)। প্রত্যেক পুরুষের চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রকৃতিতে অর্থাৎ তাহার বুদ্ধিতে সত্ত্বরজতমের যে উৎকর্ষাপকর্ষ হইয়াছে, সেই উৎকর্ষাপকর্ষপ্রযুক্ত সেই পুরুষ জন্মমরণচক্রের এই ফল প্রাপ্ত হয়। "ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থাঃ"—সাত্ত্বিক বৃত্তির পুরুষ স্বর্গে যায়—এবং তামসিক পুরুষ অধোগতি প্রাপ্ত হয়, এইরূপ গীতাতেও উক্ত হইয়াছে (গী. ১৪. ১৮) কিন্তু এই স্বর্গাদি ফল অনিত্য। জন্মমরণ হইতে যে আপনাকে মুক্ত করিতে চাহে কিংবা সাংখ্যদিগের পরিভাষায়, যে ত্রিগুণ হইতে আপনার ভিন্নতা বা কৈবল্য চিরস্থির রাখিতে চাহে,

তাহার ত্রিগুণাতীত হইয়া বিরক্ত (সন্ন্যস্ত) হওয়া ভিন্ন অন্য মার্গ নাই। এই বৈরাগ্য ও জ্ঞান কপিলাচার্য্য জন্ম হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু সকলেই এই অবস্থা জন্ম হইতেই পাইতে পারে না। তাই, তত্ত্ববিবেকরূপ সাধনের দ্বারা প্রকৃতিপুরুষের মধ্যে ভেদ উপলব্ধি করিয়া আপন বুদ্ধিকে পরিশুদ্ধ করিবার প্রযত্ন প্রত্যেকের করা আবশ্যক। এইরূপ প্রযত্নের দ্বারা বুদ্ধি সাত্ত্বিক হইলে. পরে সেই বুদ্ধিরই জ্ঞান, কৈবল্য ও ঐশ্বর্য্য এই গুণ সকল উৎপন্ন হইয়া, মনুষ্য কৈবল্য প্রাপ্ত হয়। ঐশ্বর্য্য অর্থাৎ, যাহা ইচ্ছা করিবে তাহাই প্রাপ্ত হইবার যোগসামর্থ্য, এইস্থানে এইরূপ অর্থ। সাংখ্য মতানুসারে, ধর্ম্মের গণনা সাত্ত্বিক গুণের মধ্যেই হইয়া থাকে; কিন্তু শুধু ধর্ম্মের দ্বারা কেবল স্বর্গপ্রাপ্তি হয় মাত্র; এবং জ্ঞান ও বৈরাগ্যের (সন্ন্যাস) দ্বারা মোক্ষ কিংবা কৈবল্য প্রাপ্ত হইয়া পুরুষের দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হয়, কপিলাচার্য্য শেষে এইরূপ ভেদ করিয়াছেন।

ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির মধ্যে প্রথমে সত্ত্বগুণের উৎকর্ষ হইয়া উপরে আরও উঠিতে উঠিতে পরিশেষে ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি পৃথক্ ও আমি পৃথক্ এই জ্ঞান যে পুরুষের হইয়াছে সে ত্রিগুণাতীত অর্থাৎ সত্ত্ব রজ ও তম এই তিন গুণেরই বাহিরে পৌঁছিয়াছে এইরূপ সাংখ্য বলেন। এই ত্রিগুণাতীত অবস্থায় সত্ত্ব, রজ ও তম ইহাদের মধ্যে কোন গুণই অবশিষ্ট থাকে না। তাই, সূক্ষ্মরূপে বিচার করিলে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিন অবস্থা হইতে এই অবস্থা ভিন্ন, এইরূপ স্বীকার করিতে হয় এবং এই অভিপ্রায়েই ভাগবতে, সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক, ভক্তির এই তিন ভেদ করিবার পর, এই তিন গুণেরই বাহিরে উপনীত পুরুষ, নির্হেতুক ও অভেদভাবে যে ভক্তি করিয়া থাকে তাহাকে নির্গুণ ভক্তি এইরূপ চতুর্থ নাম প্রদত্ত হইয়াছে (ভোগ, ৩, ২৯, ৭-১৪)। কিন্তু সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক এই তিন বর্গ অপেক্ষা বর্গীকরণের তত্ত্বসকলের ফাজিল বাড়াইয়া বসা যুক্তিসিদ্ধ নহে। তাই সত্ত্বগুণের অত্যন্ত উৎকর্ষের দ্বারা শেষে ত্রিগুণাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায় এইরূপ স্বীকার করিয়া সাংখ্যশাস্ত্রী সাত্ত্বিকবর্গের মধ্যেও তাহার গণনা করিয়া থাকেন; এবং গীতাতেও ঐ পদ্ধতিই স্বীকৃত হইয়াছে। উদাহরণ যথা—যা কিছু সমস্তই এক—এইরূপ যে অভেদাত্মক জ্ঞান তাহা সাত্ত্বিক, এইরূপ গীতাতে উক্ত হইয়াছে (গী, ১৮, ২০); এবং সত্ত্বগুণের বর্ণনা করিবার সময়েই পরে ত্রিগুণাতীত অবস্থার বর্ণনা গীতার ১৪ অধ্যায়ে, শেষে আসিয়াছে। কিন্তু ভগবদ্‌গীতার প্রকৃতি ও পুরুষ—ইহা দ্বৈত স্বীকৃত না হওয়ায় গীতাতে প্রকৃতি, পুরুষ, ত্রিগুণাতীত ইত্যাদি সাংখ্যদিগের পারিভাষিক শব্দের প্রয়োগ বরাবরই একটু ভিন্ন অর্থে হইয়া থাকে, কিংবা সাংখ্যের দ্বৈতের উপর অদ্বৈত পরব্রহ্মরূপ টোপর স্থায়ীভাবে বসাইয়া রাখা হয়, ইহা মনে রাখা আবশ্যক। উদাহরণ যথা—সাংখ্যদিগের প্রকৃতিপুরুষ ভেদও গীতার ১৩ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে (গীতা, ১৩, ১৯-৩৪)। কিন্তু তথায় প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুই শব্দ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের সহিত সমানার্থক। সেইরূপ, ১৪ অধ্যায়ের ত্রিগুণাতীত অবস্থায় বর্ণনাও (গী, ১৪, ২৫-২৭) ত্রিগুণাত্মক মায়া জাল হইতে মুক্ত হইয়া প্রকৃতি ও পুরুষ ইহাদেরও অতীত, পরমাত্মার জ্ঞাতা সিদ্ধ পুরুষগণের অবস্থা; প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুই পৃথক্ তত্ত্ব স্বীকার করিয়া পুরুষের কৈবল্য অর্থাৎ ত্রিগুণাতীত অবস্থা যাহারা মানে, সেই সাংখ্যদের অবস্থা ইহা নহে। এই ভেদ, পরে অধ্যাত্মপ্রকরণে আমি স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছি। কিন্তু গীতাতে অধ্যাত্মবাদও প্রতিপাদ্য হইলেও অধ্যাত্মতত্ত্বসকল বিবৃত করিবার সময় ভগবান, সাংখ্য পরিভাষা ও যুক্তিবাদের পরিভাষার উপযোগ স্থানে স্থানে করিয়াছেন বলিয়া, গীতায় কেবল সাংখ্য-মতই গ্রাহ্য, এইরূপ পাঠকের ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা আছে। তাই সাংখ্যশাস্ত্র ও গীতায় তৎসদৃশ সিদ্ধান্ত—ইহাদের মধ্যে এই ভেদ পুনর্ব্বার এখানে বলা হইয়াছে। প্রকৃতি ও পুরুষের বাহিরে, জগতের মূলভূত পরব্রহ্মরূপী একই তত্ত্ব হওয়ায় তাহা হইতে প্রকৃতি-পুরুষ-সমেত সমস্ত সৃষ্টিই উৎপন্ন হইয়াছে। এই উপনিষদের অদ্বৈত সিদ্ধান্তকে না ছাড়িয়া সাংখ্যদিগের অবশিষ্ট সিদ্ধান্ত আমাদের অগ্রাহ্য নহে, এইরূপ বেদান্ত-সূত্রভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন। (বেসু,

শাং, ভা, ২, ১, ৩); এবং গীতার উপপাদনেও এই নীতির প্রয়োগ হইতে পারে। ইতি সপ্তম প্রকরণ সমাপ্ত।

কি ভয়।

(শ্রীমতী বিধুমুখী দেবী)

যা কিছু আঁকড়ায়ে থাকি'
ধরে ছিল বুকে,
নিমেষের মাঝে দেখি
সব গেল চুকে।
স্বপ্ন সম লুকাইল
কোন দেশান্তরে,
হে পূর্ণ অপূর্ণ যত
পূর্ণ তব পদ-পরে।
মৃত্যু নাহি জরা নাহি
নাহি নাহি ক্ষয়,
মৃত্যু যে বহে গো হেথা
অমৃতের পরিচয়।
দাও দুঃখ দাও শোক
দাও অশ্রুজল,
তার সাথে দাও প্রভু
ভক্তি সুনির্ম্মল।
জ্বলুক অন্তর-মাঝে
দারুণ বিরহ-শিখা,
এ বিশ্ব হক্ ছারখার—
তুমি যদি থাক প্রাণে
ওহে বিশ্বাধার,
ব্রহ্মাণ্ড পাইলে লয়
কি ভয় আমার॥

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন।

(সংবাদ প্রভাকর হইতে উদ্ধৃত)

(৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের অনুবৃত্তি)

অপিচ এমত জনরব যে, কবিরঞ্জন এক লক্ষ কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু এ বিষয়ে অপর কোন প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই, কেবল তাঁহার প্রণীত একটি পদ সাক্ষীস্বরূপ হইয়া সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

যথা—

"জানিলাম বিষম বড়,
শ্যামা মায়েরি দরবার রে।
ফুকারে ফরেদি দাদি,
না হয় সঞ্চার রে॥
আরজবেগী যার শিবে,
সে দরবারের ভাস্য কিরে মাগো।
ওমা দেওয়ান্ দেওনা নিজে,
আস্থা কি কথার রে॥ ১
লাক্ উকিল করেছি খাড়া,
সাধ্য কি মা ইহার বাড়া (মাগো)
তোমায় তারা ডাকে আমি ডাকি,
কান নাই বুঝি মার রে॥ ২
গালাগালি দিয়ে বলি,
কান খেয়ে হয়েছে কালী (মাগো)
রামপ্রসাদ বলে প্রাণ কালী
করিলে আমার রে॥" ৩

রামপ্রসাদ লক্ষ কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, ইহা নিতান্ত অসম্ভব নহে, অনেকাংশে সম্ভাবনার যোগ্য বটে, কারণ বাল্যকাল হইতে মৃত্যুর দিবস পর্য্যন্ত পদবিন্যাসে বিরত হয়েন নাই, মনে যাহা উদয় হইয়াছে, তাহারি কবিতা করিয়াছেন। কবিরঞ্জন, কালীকীর্ত্তন ও কৃষ্ণকীর্ত্তন এই তিনখানি গ্রন্থ কেবল লিখিত হইয়াছিল, আর কিছুই লিপিবদ্ধ ছিল না। পূর্ব্বে দুই একটা করিয়া অভ্যাস করত সংগ্রহপূর্ব্বক যিনি যাহা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন তাঁহারি নিকটে তাহাই ছিল, এইক্ষণে তাহাও প্রায় লোপ হইয়া গিয়াছে, কারণ পূর্ব্বকালের লোকেরা ইষ্টমন্ত্রের ন্যায় গোপন করিয়া যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিতেন, প্রাণান্ত হইলেও কাহাকে দেখিতে দিতেন না, আহ্নিক পূজাকরণ কালে সেই পুঁথির উপর ফুলচন্দন প্রদান করিতেন, অধুনাও দুই এক মহাশয় ঐ প্রকার করিয়া থাকেন, আমরা সর্ব্বস্ব স্বীকার করিয়াও তাঁহারদিগের নিকট হইতে সে পদাবলি প্রাপ্ত হইতে পারি নাই, এইরূপ গোপনেই সর্ব্ব অন্তর্যাগবিষয়ে যাঁহার গাঢ় সংস্কার আছে, তিনিই এই গীতামৃতের যথার্থ রসাস্বাদন প্রাপ্ত হইবেন,

নচেৎ অন্যের সাধ্য নহে। এ বিষয় অত্যন্ত কঠিন, বিশেষ বিশেষ রামপ্রসাদি পদের নিগূঢ়াভিপ্রায় ও তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়া ভাব ব্যাখ্যা করেন ইদানীং ইহলোক হইতে তদ্রূপ মনুষ্য প্রায় তাবতেই অপসৃত হইয়াছেন, কেবল দুই এক মহাত্মা আছেন।

রামপ্রসাদের প্রাচীন অবস্থার এই গানটী অতি মনোহর।

যথা—

কাজ হারালেম কালের বশে।
মন মজিল রতিরঙ্গ রসে॥
যখন ধন উপার্জ্জন,
করেছিলাম দেশবিদেশে।
তখন ভাইবন্ধু দারাসুত,
সবাই ছিল আমার বশে॥ ১
এখন ধন উপার্জ্জন না হইল দশার শেষে,
সেই ভাইবন্ধু, দারাসুত,
নির্ধনে বলে সবাই রোষে॥ ২
যমদূত আসি শিয়রেতে বসি,
ধর্ব্বে যখন অগ্রকেশে।
তখন সাজায়ে মাচা কলসী কাচা,
বিদায় দেবে দণ্ডিবেশে॥ ৩
হরি হরি বলি, শ্মশানেতে ফেলি,
যে যার যাবে আপন বাসে।
রামপ্রসাদ মলো, কান্না গেল,
অন্ন খাবে অনায়াসে॥ ৪

বৈরাগ্য ও বিবেক যখন তাঁহার অন্তঃকরণকে বিশেষরূপে অধিকার করিয়াছিল, বোধ করি তৎকালীন মনের স্বরূপানুরাগেই ঐ গানটী কণ্ঠ হইতে নির্গত করিয়াছিলেন। এই পুরুষের অন্তঃকরণে কাপট্য মাত্র ছিল না, অন্তর বাহির একরূপ ছিল, মুখে যাহা বলিতেন কার্য্যে তাহাই করিতেন, তাঁহার উক্তি দ্বারা ও প্রবাদ দ্বারা ইহার প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, যে ব্যক্তি অকপটে সত্যপালন পূর্ব্বক ঈশ্বর সাধনায় কালক্ষয় করিয়াছেন, আহা! তিনি কি মহাপুরুষ ছিলেন।

শক্তিভক্তিসূচক উক্তি দ্বারা যুক্তিমতে সকলে রামপ্রসাদ সেনকে শাক্ত বলিতে পারেন, ফলে তিনি শাক্ত ছিলেন বটে, ভাক্ত ছিলেন না যথার্থই ভক্ত ছিলেন, কারণ উপাসনাকল্পে তাঁহার মনে দ্বেষ মাত্রই ছিল না। নিম্নস্থ পদটীই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হইতেছে।

যথা—

মা আমার অন্তরে আছ।
তোমায় কে বলে অন্তরে শ্যামা,
মা আমার অন্তরে আছ॥
তুমি পাষাণ মেয়ে বিষম মায়া,
কত কাচ্ কাচাও কাচ্॥
উপাসনা ভেদে তুমি,
প্রধানমূর্ত্তি ধর পাঁচ॥
যে পাঁচেরে এক কোরে ভাবে,
তার হাতে কোথা বাঁচ॥ ১
বুঝে ভার দেয় যে জন,
তার ভার নিতে হাঁচ।
যে কাঞ্চনের মূল্য জানে,
সে কি ভুলে পেয়ে কাঁচ॥ ২
প্রসাদ বলে আমার হৃদয়,
অমল কমল সাঁচ।
তুমি সেই সাঁচে নির্ম্মিতা হয়ে
মনোময়ী হোয়ে নাচ॥ ৩॥

রামপ্রসাদ সেনের চিত্তের একাগ্রতা, বিশ্বাসের স্থিরতা ও ভক্তি এবং প্রেমের প্রগাঢ়তা কি পর্য্যন্ত ছিল এই পদের দ্বারা তাহা প্রত্যক্ষ হইতেছে। অদ্য এই পর্য্যন্ত লিখিয়াই প্রস্তাব সাঙ্গ করিলাম।

রামপ্রসাদ সেনের জীবন-বৃত্তান্ত অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিলাম, তথাচ অদ্যতন পত্রের নিয়মিত স্থানে তাহা সম্পন্ন হইল না, এজন্য একখণ্ড অধিক প্রকাশ করিতে হইল, ইহাতে আমাদিগের অতিরেক ব্যয় অনেক হইয়াছে, কারণ অত্যন্ত ক্ষুদ্র অক্ষরে চারি ফার্ম্মা কাগজ প্রকাশ করিতে হইল, তত্রাচ এ বিষয়ে মনের আক্ষেপ কিছুমাত্র নিবারণ হয় নাই, যেহেতু বিস্তার করিয়া বাহুল্যরূপে লিখিতে পারিলাম না। অতি অল্পেই শেষ করিতে হইল, এ দেশের প্রাচীন যে যে মহাশয় বঙ্গভাষায় কবিতা রচনা করত বিখ্যাত হইয়াছিলেন, ক্রমে ক্রমে তাঁহারদিগের তাবতেরি জীবন চরিত লিপিবদ্ধ

করণের মানস করিয়াছি, কিন্তু ইহা সুসিদ্ধ করা সুকঠিন হইয়াছে, কারণ সমুদয় ব্যাপার সংগ্রহ করা বড় সহজ নহে। প্রাচীন লোক কেহই জীবিত নাই, এবং যাঁহারা এইক্ষণকার বৃদ্ধ তাঁহারা অনেকেই তদ্বিশেষ অবগত নহেন, যদিও কোন কোন মহাশয় কিছু কিছু জানিতে পারেন কিন্তু আক্ষেপ এই যে, তাঁহারদিগের সহিত আবার আমারদিগের এ পর্য্যন্তই সাক্ষাৎ নাই। যাহা হউক, "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন" এইরূপ করিয়া দেখিতে হইবেক। চেষ্টা ও যত্ন দ্বারা যতদূর পর্য্যন্ত করিয়া তুলিতে পারি তাহার ত্রুটী কখনই করিব না, ইহাতে শারীরিক শ্রমের তো কথাই নাই, যদি অর্থব্যয়ের আবশ্যক করে তাহাতেও সম্ভবমত বিত্তব্যয় অবশ্যই করিব। এই সঙ্কল্পিত কল্পে কৃতকার্য্য হইতে পারিলে একটা প্রধান কর্ম্মই করা হয়, অতএব সর্ব্বসাধারণকে বিনয়পূর্ব্বক নিবেদন করিতেছি, যদি কেহ এ বিষয়ে অস্মদাদিকে যথাযোগ্য সাহায্য করিতে সমর্থ হয়েন তবে যেন তাহাতে সম্ভাবিত কৃপা বিতরণে কৃপণতা না করেন। তাঁহারদিগের নিকট এতদ্রূপ আনুকূল্য প্রাপ্ত হইলে আমরা শ্রমসাফল্যজ্ঞানে যাবজ্জীবন মহোপকার স্বীকার পূর্ব্বক কৃতজ্ঞতাঋণে বদ্ধ রহিব, ইহাতে শুদ্ধ আমরাই উপকৃত হইব এমত নহে, দেশ শুদ্ধ সমস্ত লোকেই তাহার সমান অংশ প্রাপ্ত হইবেন, সুতরাং এই স্থলে অধিক লেখা বাহুল্য মাত্র। এই দেশহিতকর কর্ত্তব্য কার্য্য সাধনে সাধ্যসত্ত্বে কেহ যেন আলস্যপরবশ না হয়েন, ইহাতে আমাদিগের উপকার করিতে ইচ্ছা না হয় আপনারা স্বতন্ত্ররূপে করুন, তাহাতে হানি কি, যেরূপে হউক, কার্য্য সিদ্ধ হইলেই চরিতার্থ হইব।

এই স্থলে মহাকবি কবিরঞ্জন ৺ রামপ্রসাদ সেন মহাশয়ের কয়েকটী সঙ্গীত উদ্ধৃত করিলাম। *

যথা—

মনরে আমার এই মিনতি।
তুমি পড়া-পাখী হও, করি স্তুতি॥
অবুতবু গিরিসুতা, পড়লে, শুনলে দুদিভাতি।
ওরে জাননা কি ডাকের কথা,
না পড়লে ঠেঙ্গার গুতি॥ ১॥
কালী কালী, কালী পড় মন্,
কালী পদে, রাখ প্রীতি।
ওরে, পড় বাবা আত্মারাম,
আত্মজনের কর গতি॥ ২॥
উড়ে উড়ে, বেড়ে বেড়ে,
বেড়ায়ে কেন বেড়াও ক্ষিতি।
ওরে, গাছের ফলে, ক'দিন চলে,
কররে চার্ ফলে স্থিতি॥ ৩॥
রামপ্রসাদ বলে, ফলাগাছে,
ফল্ পাবি মন্ শোন্ যুকতি।
ওরে, বোসে মূলে, কালী বলে,
গাছ নাড়া দেও, নিতি নিতি॥ ৪॥

তথা—

আর কাজ্ কি আমার কাশী।
ওরে, কালী পদ, কোকনদ,
তীর্থ রাশি রাশি॥
ওরে, হৃৎকমলে, ধ্যানকালে,
আনন্দ সাগরে ভাসি।
কালীনামে পাপ কোথা,
মাথা নাই মাথা ব্যথা,
অনল দাহন যথা, করে তুলারাশি॥১॥
গয়ায় করে পিণ্ড দান,
পিতৃ-ঋণে পায় ত্রাণ,
যে করে কালীর ধ্যান,
তার গয়া শুনে হাসি॥ ২॥
কাশীতে মোলেই মুক্তি,
বটে সে শিবের উক্তি,
সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি তার দাসী॥ ৩॥
নির্ব্বাণে কি আছে ফল,
জলেতে মিশায় জল,
চিনি হওয়া ভাল নয়,
চিনি খেতে ভালবাসি॥ ৪॥
কৌতুকে প্রসাদ বলে,
করুণা নিধির বলে,
চতুর্ব্বর্গ করতলে, ভাব্‌লে এলোকেশী॥৫॥

মহাকবি মৃত রামপ্রসাদ সেন মহাশয় কিরূপ রসিক, কিরূপ প্রেমিক, কিরূপ ভাবুক, কিরূপ

* এই পদাবলীগুলি ১২৬০ সালের 'প্রভাকরের' ১লা আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

ভক্ত ও কিরূপ জ্ঞানী ছিলেন, এই সঙ্গীত দ্বারাই প্রেমভক্তিশালী মহাশয়েরা সহজে তাহার মর্ম্মজ্ঞ হইতে পারিবেন। যাঁহারা নিরাকারবাদী, তাঁহারাও এই গান শুনিয়া প্রেমার্দ্রচিত্ত হইবেন, যেহেতু ইহা জ্ঞানযুক্ত প্রেম-ভক্তিরসে পরিপূরিত।

নিরাকারবাদীরা "ব্রহ্ম" শব্দ উল্লেখপূর্ব্বক যাঁহার ভজন ও উপাসনা করেন, ইনি "কালী"নাম উচ্চারণপূর্ব্বক তাঁহারি আরাধনা ও উপাসনা করিয়াছেন। ইহাতে নামান্তর জন্য ভাব, রস, ভক্তি, প্রেম এবং জ্ঞানগত বৈলক্ষণ্য কিছুই হইতে পারে না। উভয় পক্ষের উদ্দেশ্যই এক; যথার্থ-ভাবে ব্রহ্মোপাসনা উভয়পক্ষেরি তুল্য হইতেছে, তাঁহারা যেমন তীর্থপর্য্যটনাদি ক্রিয়াকর্ম্ম গ্রাহ্য করেন না, ইনিও তদনুরূপ করিয়াছেন। অতএব মহাত্মা রামপ্রসাদ সেন কি প্রকার জ্ঞানী ছিলেন তাহার প্রমাণকরণার্থ এইস্থলে আর একটী পদ প্রকটন করিলাম, সকলে অভিনিবেশপূর্ব্বক তাহার ভাবার্থ গ্রহণ করুন।

যথা—

আর বাণিজ্যে কি বাসনা।
ওরে আমার মন বলনা॥
ঋণী আছেন ব্রহ্মময়ী,
সুখে সাধো সেই লহনা॥
ব্যজনে পবন বাস,
চালনেতে সুপ্রকাশ, মনরে।
ওরে শরীরস্থা ব্রহ্মময়ী,
নিদ্রিতা জন্মাও চেতনা॥ ১
কানে যদি ঢোকে জল,
বার করে যে জানে কল,
মনরে ওরে সে জলে মিশায়ে জল,
ঐহিকের এরূপ ভাবনা॥ ২
ঘরে আছে মহারত্ন,
ভ্রান্তিক্রমে কাঁচে যত্ন,
মনরে, ওরে শ্রীনাথ দত্ত,
কর তত্ত্ব, কলের কপাট্ খোলনা॥ ৩
অপূর্ব্ব জন্মিল নাতি,
বুড়া দাদা দিদিঘাতী, মনরে।
ওরে জনন-মরণাশৌচ
সন্ধ্যা পূজা বিড়ম্বনা। ৪
প্রসাদ বলে বারে বারে,
না চিনিলে আপনারে,
মনরে, ওরে, সিন্দুর বিধবার ভালে,
মরি কিবে বিবেচনা॥ ৫

এই কবিতার যথার্থ মর্ম্মগ্রহণ যিনি করিবেন তিনিই মহানন্দসাগরসলিলে নিমগ্ন হইবেন। এতদ্দ্বারা কবিরঞ্জনের তত্ত্বজ্ঞানবিষয়ক প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রচুররূপেই প্রকাশ পাইতেছে তিনি ফলভোগ-বিরাগী অর্থাৎ নিষ্কামী হইয়া প্রগাঢ় ভক্তিভরে সুপবিত্র প্রীতিচিত্তে পরম পূজনীয় প্রেমময় প্রিয় উপাস্যের উপাসনা করিয়াছেন। সেন সদাত্মা স্বীয় কবিতায় স্পষ্টই ব্যক্ত করিয়াছেন। যিনি জ্ঞানী তাঁহার সন্ধ্যাপূজার কিছুমাত্র প্রয়োজন করে না। 'অপূর্ব্ব জন্মিল নাতি, বুড়া দাদা দিদিঘাতী, জনন-মরণাশৌচ, সন্ধ্যাপূজা বিড়ম্বনা।' এই পীযূষপূরিত পদের নিগূঢ়ার্থ ও ভাব যাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইবেক, তিনি অত্যন্ত প্রীত হইবেন, রামপ্রসাদী পদ সকল রত্নাকরবৎ, যত্নপূর্ব্বক তাহার ভিতরে যত প্রবেশ করা যায় ততই অমূল্য রত্ন লাভ হইতে থাকে। পাঠকগণ অবধান করুন।

যথা—

মায়ারে পরম কৌতুক্, মায়াবদ্ধ জনে ধাবতি,
অবদ্ধে লুটে সুখ॥
আমি এই আমার্ এই, এভাব ভাবে মূর্খ সেই,
মনরে, ওরে, মিছামিছি সার ভেবে,
সাহসে বাঁধে বুক॥ ১॥
আমি কেবা আমার কেবা, আমা ভিন্ন আছে কেবা,
মনরে, ওরে, কে করে কাহার সেবা,
মিছা সুখ্ দুখ্॥ ২॥
দীপজ্বালে আঁধার ঘরে, দ্রব্য যদি পায়, করে,
মনরে, ওরে, তখনি নির্ব্বাণ করে,
না রাখে একটুক্॥ ৩॥
প্রাজ্ঞ অট্টালিকায় থাকো, আপনি আপন দেখো,
মনরে, রামপ্রসাদ্ বলে,
মশারি তুলিয়া দেখ মুখ॥ ৪॥

তথা—

মন কর কি তত্ত্ব তারে।
ওরে উন্মত্ত আঁধার ঘরে॥

সে যে ভাবের বিষয়,
ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধর্ত্তে পারে।
মন অগ্রে শশি-বশীভূত
কর তোমার শক্তি সারে॥
ওরে কোটার ভিতর চোর কুটারী,
ভোর হোলে সে লুকাবে রে॥ ১॥
ষড় দর্শনে দর্শন পেলেনা,
আগম নিগম তন্ত্র ধোরে।
সে যে ভক্তি রসের রসিক,
সদানন্দে বিরাজ করে পুরে॥ ২॥
সে ভাবলোভে পরম যোগী
যোগ করে যুগ যুগান্তরে।
হোলে ভাবের উদয় লয় সে যেমন
লোহাকে চুম্বুকে ধরে॥ ৩॥
রামপ্রসাদ বলে মাতৃভাবে,
আমি তত্ত্ব করি যারে।
সেটা চাতরে কি ভাঙ্‌বো হাঁড়ী
বুঝরে মন ঠারে ঠোরে॥ ৪॥

তথা—

এই সংসার ধোঁকার টাটি।
ও ভাই আনন্দ বাজারে লুটি॥
ওরে ক্ষিতি বহ্নি বায়ু জল,
শূন্যে এত পরিপাটি।
প্রথমে প্রকৃতি স্থূলা
অহঙ্কারে লক্ষ কোটি॥
যেমন শরার জলে সূর্য্য ছায়া
অভাবেতে স্বভাব যিটি॥ ১॥
গর্ভে যখন যোগ তখন,
ভূমে পড়ে খেলাম মাটি।
ওরে, ধাত্রীতে কেটেছে নাড়ী,
দড়ির বেড়ি কিসে কাটি॥ ২॥
রমনীবচনে সুধা,
সুধা নয় সে বিষের বাটী।
আগে ইচ্ছা মুখে পান কোরে,
বিষের জ্বালায় ছটফটি॥ ৩॥
আনন্দে রামপ্রসাদ বলে,
আদি পুরুষের আদি মেয়েটী।
ওমা যাহা ইচ্ছা তাহাই কর,
মা তুমি পাষাণের বেটী॥ ৪॥

তথা—

ত্যজ মন কুজন ভুজঙ্গম সঙ্গ।
কাল মত্ত মাতঙ্গেরে না কর আতঙ্গ॥
অনিত্য বিষয় ত্যজ, নিত্য নিত্যময় ভজ,
মকরন্দরসে মজ, ওরে মন ভৃঙ্গ॥ ১॥
স্বপ্নে রাজ্য লভে যেমন,
নিদ্রাভঙ্গে ভাব কেমন
বিষয় জানিবে তেমন,
হোলে নিদ্রাভঙ্গ॥ ২॥
অন্ধস্কন্ধে অন্ধ চড়ে,
উভয়েতে কূপে পড়ে
কর্ম্মিকে কি কর্ম্ম ছাড়ে,
তার কি প্রসঙ্গ॥ ৩॥
এই যে তোমার ঘরে,
ছয় চোরে চুরি করে
তুমি যাও পরের ঘরে,
এত বড় রঙ্গ॥ ৪॥
প্রসাদ বলে কাব্য এটা,
তোমাতে জন্মিল যেটা
অঙ্গহীন হোয়ে সেটা,
দগ্ধ করে অঙ্গ॥ ৫॥

* * * *
* * * *

মহাত্মাবর কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের জীবন-বিবরণ আমরা গত মাসের প্রথম দিবসীয় পত্রে (১লা পৌষ) যাহা লিখিয়াছিলাম তৎপাঠে অনেকেই আমাদিগের নিকট সন্তোষসূচক পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। সেনকবি মহাশয় অদ্বিতীয় মনুষ্য ছিলেন, বহুকাল গত হইয়াছেন এবং এদেশমধ্যে মহল্লোকদিগের জীবনবৃত্তান্ত লিখিবার নিয়ম না থাকাতে আমরা তাঁহার বিষয় অনেক জানিতে পারি নাই, এ কারণ আমরা দেশবিদেশীয় পাঠক মহাশয়দিগের সমীপে প্রার্থনা করিয়াছিলাম যে সেনকবি মহাশয়ের গীতাবলী যদ্যপি কাহার নিকট লিখিত থাকে এবং কেহ যদ্যপি তাঁহার জীবনের অন্য কোন ঘটনা জ্ঞাত থাকেন অনুগ্রহপ্রকাশপূর্ব্বক আমাদিগের যন্ত্রালয়ে প্রেরণ করিলে আমরা অতিশয় সন্তোষচিত্তে তাহা প্রকাশ করিব, আমাদিগের এই প্রার্থনানুসারে কোন আত্মীয় বন্ধু যে পত্র

প্রেরণ করিয়াছেন তাহা সাদরে নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম।

'মহাত্মা রামপ্রসাদ সেনের জীবনবৃত্তান্ত উল্লেখে আপনি যাহা যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া আপনার পৌষ-মাসিক প্রথম দিবসীয় অতিরিক্ত পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন, তৎপাঠে অস্মদ্‌গণেরা কি গাঢ় পুলক প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা লিখনে লেখনী অসমর্থা, কেননা প্রকাশ্য পত্রে ঐ কবির গুণাবলী এরূপ আন্দোলন ও আলোচনা না হইলে কালে তাঁহার প্রকৃত গুণ ও অসাধারণ ক্ষমতা লোপ হইবার সম্ভাবনা। ইদানীন্তন ঐ মহাপুরুষ কেবল কতিপয় প্রাচীন তত্ত্বজ্ঞ ও মর্ম্মগ্রাহী মনুষ্যের নিকট পরিচিত ছিলেন মাত্র, নব্য সম্প্রদায়মধ্যে তিনি অপরিচিত ছিলেন, যদিও ঐ দলাক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার দুই একটী গান জানিতেন, কিন্তু তাহার ভাব ও প্রকৃতার্থ বিষয়ে অনভিজ্ঞতা-প্রযুক্ত তাহার সমাদর করিতেন না, যাহা হউক আপনি যে পরিশ্রম ও অর্থব্যয় স্বীকার করিয়া যে মহতী বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ইহাতে আপনার সমীপে আমরা চিরবাধিত হইলাম এবং ইহাও একপ্রকার আপনার কীর্ত্তি, যেহেতুক আপনি সেনকবির গ্রন্থচয়ে পুনর্জীবন প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছেন। আবার কবিরঞ্জনের দৈবশক্তি ও পাণ্ডিত্য ও তত্ত্বরসের ব্যাপার যাহা বর্ণন করিয়াছেন তাহা উৎকট বর্ণনা হয় নাই, স্বরূপাখ্যান হইয়াছে, রামপ্রসাদ সেন অস্মদ্‌গ্রামস্থ ছিলেন, সুতরাং তাঁহার বিষয়ে আমরা অনেক জ্ঞাত আছি। অপিচ তাঁহার মাহাত্ম্য-বিষয়ক আপনার রচনাপ্রবন্ধ বিজ্ঞ ও বহুদর্শী ও অনুসন্ধানকারী এবং বহু মনুষ্যদের সম্মুখে পাঠ করিলে তাঁহারা অম্লান বদনে ব্যক্ত করিলেন শিব-শক্তি-প্রভাবে গীতাবলী প্রস্তুত করিয়াছিলেন, ইহাতে সন্দেহ বিরহ, শাস্ত্রাধ্যয়ন না করিয়া সর্ব্বশাস্ত্রের শাসন দর্শন ও মর্ম্ম প্রকাশ করা কি সামান্য ক্ষমতার কর্ম্ম? শ্রুত আছি যে কবিবরের মিষ্ট স্বর ছিল না তথাচ তিনি যখন গান করিতেন শ্রোতৃগণের শ্রবণে সেই স্বর মধুর স্বর বোধ হইত এবং যতক্ষণ গান করিতেন ততক্ষণ তাঁহারা চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় স্তব্ধ থাকিতেন। ঐশ্বরিক অনুকম্পা ব্যতীত এ বিষয়ে আর কি অনুমান করা যাইতে পারে? একদা নবদ্বীপাধিপতি মহামতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুর সেনকবি সমভিব্যাহারে নৌকারোহণে মুরশিদাবাদে গমন করিয়াছিলেন, তথায় যে কয়েক দিবস রাজা অবস্থিতি করিয়াছিলেন সে কয়েকদিন তাঁহার বাস নৌকাতেই ছিল এবং রামপ্রসাদ সর্ব্বদাই ঈশ্বরের মহিমা-সূচক গান করিতেন। এক দিবস সায়ংকালে নবাব সিরাজদ্দৌলা বায়ুসেবনার্থ তরি আরূঢ় হইয়া গমন করিতে করিতে রাজার নৌকার মধ্যে সেনের গানের ধ্বনি শ্রবণে, মুগ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে এ নৌকা কাহার ও এ গায়ক বা কে? পরে পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া সেনকে স্বযানে আহ্বান করিয়া গান করিতে অনুজ্ঞা দিলেন, কবিরঞ্জন নবাবের মনোরঞ্জনার্থে একটী খেয়াল ও একটী গজল গাহিলেন, কিন্তু নবাব তাহাতে বৈরক্তি প্রকাশপূর্ব্বক কহিলেন যে আমি তোমার খেয়ালাদি গীত শুনিতে ইচ্ছা করি না, কালী কালী শব্দে যে গীত আরম্ভ করিয়াছিলা, ঐ গীত আরব্ধ করহ। নবাবের আজ্ঞানুসারে রামপ্রসাদ স্বীয় রচিত ভক্তিপূরিত একটী শ্যামাবিষয়ক গান আরম্ভ করিলে পাষাণবৎ কঠোরহৃদয় যে সিরাজদ্দৌলা তিনিও নয়ন-নীর নিবারণে অক্ষম হইলেন, পরে গান ভঙ্গ হইলে নবাব তাঁহাকে সাধুবাদ দিয়া কহিলেন যে রামপ্রসাদ তুমি প্রকৃত ঈশ্বরানুগৃহীত ব্যক্তি তুমি আমার অধীনে থাক, আমি তোমাকে উচ্চপদস্থ করিব, কিন্তু রামপ্রসাদ বিষয়াকাঙ্ক্ষী নহেন এরূপ নবাব গোচর হইলে তেঁই তাঁহাকে আরো অধিক সাধুবাদ প্রদান করিলেন, এক্ষণে পাঠক মহাশয়েরা বিবেচনা করুন যে রামপ্রসাদ কিরূপ মনুষ্য ছিলেন, সিরাজদ্দৌলা কিরূপ দুর্দ্দান্ত ও পাষণ্ড ছিলেন তাহা কাহার অবিদিত এবং তিনিও যে কি প্রকার গুণগ্রাহী তাহাও বা কোন জনের অগোচর আছে, অতএব তাঁহাকে বঙ্গীয় ভাষা-গানে বিমোহিত করা ও তাঁহার রসনা হইতে যশোঘোষণা করান দৈববল ভিন্ন অন্য কি শক্তি দ্বারা হইতে পারে। সেনকবির বিষয়ে এবম্প্রকার কত শত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য প্রবাদ আছে তাহা সমুদায় প্রকাশ করিলে একখানি পুস্তক হয়, এতাবতা এস্থলে তাহা লেখা অনাবশ্যক। পরন্তু যদিও রামপ্রসাদ সেন প্রতি

গানেই কালী, দুর্গা, তারা, শিবে ইত্যাদি দেবীর নামোল্লেখ করিয়াছেন এবং ঐ ঐ নাম বদনে অহর্নিশি উচ্চারণ করিতেন, ফলত, তিনি এক-ঈশ্বরবাদী ছিলেন, পরব্রহ্মের কাল্পনিক মূর্ত্তি ও রূপাদি মনে মনে ঘৃণা করিতেন, তবে দেশ কাল পাত্র বিবেচনানুসারে বাহ্যে কালী কালী শব্দ করিতেন, তেঁই রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সময়ে ছিলেন এবং সুতরাং ভীত হইয়া প্রচলিত ধর্ম্মানুযায়ী প্রকাশ্য উপাসনাদি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, এতন্নিমিত্ত তিনি জগদীশ্বরের নিকট দোষী হইতে পারেন নাই, কারণ জগদন্তরাত্মা তাঁহার আন্তরিক ভাব জানিতেন, লোকে দুর্গাই বলুক বা ঈশ্বরই বলুক বা খোদাই বলুক অথবা গডই বলুক সকলিই তাঁহারই উদ্দেশে বলিয়া থাকে, ইহাতে প্রকৃত ধর্ম্মের হানি হয় না। যথা গোলাপ পুষ্পকে যে নামে উল্লেখ করা যাউক না কেন তাহার সৌরভের লাঘব হয় না। অপর সেনকবির কালী নামাদি উচ্চারণ যে মৌখিকমাত্র তাহা তাঁহার পশ্চাল্লিখিত গানে প্রামাণ্য হইতেছে।

মন কর কি তত্ত্ব তাঁরে।
ওরে উন্মত্ত আঁধার ঘরে॥
সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত অভাবে,
কি ধর্ত্তে পারে।
অগ্রে কর শশি-বশি, ভূতরে তোর—
শক্তি সারে॥
আছে কোঠার ভিতর চোর কুঠারী,
ভোর হ'লে সে লুকাবে রে।
ষড়দর্শন পেলে না আগম,
নিগম শাস্ত্র ধরে॥
সে যে ভক্তি রসের রসিক,
সদানন্দপুরে বিরাজ করে।
সে ভাব ল'তে পরম যোগী যোগ করে
যুগ যুগান্তরে।
হলে ভাবের উদয়, যেমন লোহাকে
চুম্বকে ধরে।
প্রসাদ বলে আমি মাতৃভাবে
তত্ত্ব করি যাঁরে॥
সেটা চাতরে কি ভাঙ্গবো হাঁড়ি
বুঝরে মন ঠারে ঠোরে॥

শ্রীযুক্ত মণিলাল পারেখের খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ।

[আজ কয়েক মাস যাবৎ বম্বে নববিধান সমাজের অন্যতর সভ্য শ্রীযুক্ত মণিলাল পারেখের খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ উপলক্ষে ব্রাহ্মসমাজের কাগজপত্রে কিছু আন্দোলন আলোচনা চলিতেছে। এরূপ ঘটনায় আমরা বিশেষ কিছু আশ্চর্য্য হই নাই। নববিধান সমাজের একটী সম্প্রদায় আছে, যাঁহাদের মত অত্যন্ত খৃষ্টকেন্দ্রক। ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃত ভূমি ব্রহ্মকেন্দ্রক। কেহ যদি খৃষ্টের সদ্‌গুণসমূহকে আদর্শ করিয়া স্বীয় জীবনকে পরিচালিত করেন, তাহাতে আমাদের বলিবার কিছু নাই। কিন্তু খৃষ্টকে অভ্রান্ত গুরুপদে বসাইয়া নিজের জীবনকে খৃষ্টকেন্দ্রক করিয়া তোলাকে আমরা নিশ্চয়ই অসঙ্গত মনে করি। এরূপ ভাবের পরিণামফল অবতারবাদ ও মূর্ত্তিপূজা। যে মূলমন্ত্র লইয়া ব্রাহ্মসমাজের জন্ম, ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কাহাকেও আত্মার সমুদয় স্থান অধিকার করিতে দিলে সেই মূলমন্ত্রই ব্যর্থ হইয়া যায়। শ্রীযুক্ত মণিলাল পারেখের খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ এই কথার স্বপক্ষে খুবই সাক্ষ্য দিতেছে। তং বোং সং]

শ্রীযুক্ত মণিলাল পারেখ নববিধান ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভূত ছিলেন। তিনি কয়েক মাস হইল খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। তিনি তাঁহার আত্মকাহিনী "The Epiphany" নামক খৃষ্টীয় সংবাদ পত্রে বাহির করিতেছেন। তিনি বলেন যে "কাটিবার প্রদেশে অবস্থানকালীন শ্রদ্ধেয় কেশব বাবুর জীবনী ও তাঁহার বক্তৃতা পাঠের ফলে নববিধান সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূত হইয়া তাহার একজন প্রচারক হইবার ইচ্ছা আমার অন্তরে বলবতী হইয়া উঠে। তৎপূর্ব্বে বেদান্তের ও বিবেকানন্দের প্রভাব আমার ভিতরে বিদ্যমান ছিল। কেশব বাবুর সমস্ত ভাব আমি গ্রহণ করিলাম। তিনি যিশুখৃষ্টকে তাঁহার ধর্ম্মের কেন্দ্র করিয়াছিলেন, তাহা আমার বেশ ভাল লাগিল। ১৯০৯ সালে বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় আসিলাম। পণ্ডিত গৌরগোবিন্দ বাবুর সহিত যুক্তিতর্ক করিয়া তাঁহাকে বুঝাইতে সক্ষম হইলাম যে ঈশাই নববিধানের প্রাণ। "Asia's message to Europe" বিষয়ক বক্তৃতায় কেশব বাবুও তাহাই বলিয়াছিলেন। তাহার পর শ্রদ্ধেয় প্রমথ লাল সেনের সহিত আমার কথা হয়। মোক্ষমূলার শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদারকে ১৯০০ সালে যে পত্র লিখেন, তাহাতে তিনি নববিধানান্তর্গত ব্রাহ্মগণকে Anglican church এর সহিত মিলিত হইবার

সম্বন্ধে প্রস্তাব করেন। ঐ পত্রের কথা উল্লেখ করিয়া প্রমথ বাবু বলেন যে আমি এবং আরও কয়েকজন নববিধানবিশ্বাসী যুবক আমরা ঐ প্রস্তাবের পক্ষপাতী ছিলাম। ঐ সময় হইতে পারেখ বলেন আমি নিজেকে কখন হিন্দু কখন খৃষ্টিয়ান্ বলিয়া পরিচয় দিতে আরম্ভ করি।

১৯১৪ খৃঃ অব্দে লক্ষ্ণৌ নগরে নববিধান সমাজের সংঘ হয়। প্রমথ বাবুর সহিত পরে কলিকাতা ও কুচবিহারে দেখা হইলে আমি তাঁহাকে Anglican Church এর সহিত মিলিত হইবার পূর্ব্ব প্রস্তাবের আবার অবতারণা করিতে বলি, এবং নববিধান সমাজকে ঈশাকেন্দ্র করিবার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে The world and the New dispensation পত্রে কয়েকটি প্রবন্ধ দেখি। ঠিক এই সময়ে নববিধান সমাজে কেশব বাবুকে কেন্দ্র করিবার কথা সর্ব্বপ্রথম উত্থাপিত হয়। ডাক্তার বিমলচন্দ্র ঘোষ যিনি এই বিষয়ের প্রথম প্রস্তাবক ছিলেন তিনি বলিলেন যদিও কেশব বাবুর কথানুসারে ঈশা নববিধানের কেন্দ্রস্থান অধিকার করিয়া আছেন, তাহা হইলেও কার্য্যতঃ কেশব বাবুই নববিধান সমাজের কেন্দ্রস্থানীয়। ইহা হইতে আমার মনে একটু খট্‌কা বাধে।

১৯১৫ খৃঃ অব্দে মাঘোৎসব ঘনাইয়া আসিল। আমি কলিকাতায় আসিয়া দেখি নববিধান সমাজের ভিতরে দুইটি স্বতন্ত্র দল দাঁড়াইয়াছে; একদল কেশব বাবুকে কেন্দ্র করিতে চান, অপর দল কাহাকেও কেন্দ্র করিতে প্রস্তুত নহেন। আমি বলিলাম কেশব বাবুকে কেন? তিনি নিজেইত ঈশাকে কেন্দ্র করিয়া গিয়াছেন। আমরা কেন তাহা অস্বীকার করি? কিন্তু আমার কথা ভাসিয়া গেল। আমি নিরুপায় হইয়া ক্রমে খৃষ্টিয়ানির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম, এবং উক্ত ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া পড়িলাম।"

উপরে যাহা লিখিত হইল তাহা হইতে বুঝা যায়, যে পারেখের ধর্ম্মভাব প্রথম হইতেই খৃষ্টধর্ম্মের অভিমুখীন ছিল। কেশব বাবুর উক্তি তাঁহার এই পথের সহায়ীভূত হইয়াছিল এইমাত্র। কেশব বাবুর অতিরিক্ত খৃষ্টপ্রীতির সম্বন্ধে এই পত্রে অনেকবার আলোচনা হইয়া গিয়াছে, আমরা সেই অপ্রীতিকর কথার পুনরালোচনা করিতে সঙ্কোচ বোধ করি। আমরা বিগত তিন বৎসর ধরিয়া নববিধান সমাজের কয়েকজনকে কেশব বাবুকে কেন্দ্র করিয়া তুলিবার আকুল চেষ্টার ভিতরে অবস্থিত দেখিতেছি। ঐ দলের অনেকেই আবার উহার বিরোধী। যাঁহারা আবার কেশব বাবুকে কেন্দ্র করিতে চান, তাঁহারা উহার অর্থ সকলে সমান ভাবে গ্রহণ করেন না। আমরা শুনিয়াছি ডাক্তার বিমলচন্দ্র ঘোষ যে ভাবে কেশবকেন্দ্রের অর্থ বুঝেন, শ্রদ্ধেয় ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী সে অর্থ গ্রহণ করিতে সঙ্কুচিত। আমাদের বোধ হয় দুই বৎসর পূর্ব্বে মাঘোৎসব উপলক্ষে মধ্যাহ্নের আলোচনায় কেশবকেন্দ্র লইয়া বক্তৃতার অবতারণা হইতে দেখিয়াছি।

নববিধান কেশব বাবুরই সৃষ্টি। এ কথা ইতিহাস চিরকালই সাক্ষ্য দিবে। নববিধান প্রচারে যদি কিছু গৌরব থাকে তাহা যখন একমাত্র কেশব চন্দ্রেরই প্রাপ্য, তখন "কেশবকেন্দ্র" ইত্যাকার বাক্যের সাহায্যে ধর্ম্মসমাজের ভিতরে dogmaর সৃষ্টি এবং মতবিভিন্নতার সঙ্গে সঙ্গে বিরোধের উৎপত্তির যত অল্প হয় ততই কল্যাণ ইহা বুঝিতে হইবে। একে নববিধান সমাজে বক্তৃতার ভিতরে, ধর্ম্মতত্ত্বের প্রস্তাবের মধ্যে কেশব বাবুর নাম নিতান্ত অতিরিক্ত পরিমাণে ব্যবহৃত হয়, তাহার উপরে "কেশবকেন্দ্র" প্রভৃতি কথার উদ্ভব অদূর ভবিষ্যতে মধ্যবর্ত্তিবাদ আনিয়া ফেলিবে অনেক চিন্তাশীল লোকের এইরূপ আশঙ্কা হয়। মহারাণী কুচবিহার লক্ষ্ণৌসংঘে উপস্থিত ছিলেন। নববিধান ব্রাহ্মসমাজের উপর তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ, তাঁহার পিতার পবিত্র স্মৃতির উপর তাঁহার অপরিসীম শ্রদ্ধা, নববিধান সমাজের উপরেও তাঁহার যথেষ্ট প্রভাব, সাধারণের অতিরিক্ত শ্রদ্ধা প্রকাশের ফলে যাহাতে ভাবীকালে কেশব বাবুর নাম মলিন না হয়,—নববিধ dogmaর সৃষ্টি না হয় তাহার দিকে আমরা তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

এইখানে আমাদের একটি কথা মনে পড়িয়া গেল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যখন মৃত্যুর অভিমুখীন, শরীর নিতান্ত দুর্ব্বল, তখন মৃত্যু-অন্তে তাঁহার চিতাভস্ম বোলপুর শান্তিনিকেতনে রাখিবার সংকল্প তাঁহার পুত্র ও পৌত্রগণের মধ্যে হইয়াছিল। এ কথা

যখন মহর্ষির কর্ণে পৌঁছিল তিনি তাঁহার সুযোগ্য পুত্র পৌত্রগণকে ডাকিয়া কঠোরভাবে এই আদেশ দেন যে "তোমরা ঐ সংকল্প একেবারে পরিহার কর, একেশ্বরের আরাধনার জন্য আমি বোলপুর আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছি। ঈশ্বরের প্রাপ্য পূজার কোন অংশ লোকে ভ্রমবশতঃ আমার স্মৃতি-মন্দিরে অর্পণ করিতে পারে, আমি তোমাদিগকে সে ব্যবস্থা করিতে দিব না। তোমরা ঐ সংকল্প হইতে একেবারে নিরস্ত হইবে বোলপুরে আমার চিতাভস্ম স্থাপন করিতে পারিবে না, ইহা আমার আমার আদেশ জানিবে"। মহর্ষিকে লোকে আজও ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিল না ইহাই আমাদের আক্ষেপ।

রাণাডের-স্মৃতিকথা।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

স্পেশাল জজের জায়গায় বদলী। আর একবার সরকারী কাজে যাত্রা। ১৯৯৩-৮৪।

পুণা ও সাতারা জেলায় প্রবাস।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদিত)

এই দুই জিলার সমস্ত তালুকে যেখানে যেখানে কন্সিলিয়েটর ও গ্রাম-মুন্সেফ আছে, সেইখানে আমরা (অর্থাৎ 'উনি') গিয়া এবং অর্দ্ধ দিবস থাকিয়া তাঁহাদের দপ্তর পরীক্ষা করিতাম এবং তাহার পর আবার যাত্রা আরম্ভ করিতাম। আমাদের পূর্ব্বেকার এই পদস্থ কর্ম্মচারীর, এইরূপ নিজে গিয়া দপ্তর পরীক্ষা করিতেন না। এই কাজ তাঁহাদের ইচ্ছাধীন ছিল। তাঁহারা দুই চারিদিন তালুকের গ্রামে মোকাম করিয়া, আশপাশের গ্রাম-মুন্সফ্ ও কন্সিলিয়েটরদিগকে ডাকাইয়া পাঠাইতেন এবং দপ্তর লইয়া আসিলে দপ্তর দেখিয়া দিতেন। আমাদের সময়ে ঐরূপ কাজ স্বেচ্ছাধীন না রাখিয়া উনি নিজে ছোটখাটো গ্রামে আসিয়া উঠিতেন। সেই জন্য আমাদের এবং আমাদের সহগামী সমস্ত লোকদিগের অসুবিধা হইতে লাগিল। দুই এক দিন আমরা গরুর কিংবা মহিষের দুধও পাইতাম না। তরকারীর ত নাম নাই। ৭।৮ খানা বয়েলের গাড়ী ও দুই ঘোড়ার মতো যথেষ্ট ঘাসদানাও পাওয়া যাইত না। সেইরূপ আবার, গ্রামে একটি মাত্র কূপ থাকায় আমাদের ৩০।৪০ জন মানুষ ও জানোয়ারের জন্য জল পাওয়া মুস্কিল হইত। পূর্ব্বকার কর্ম্মচারী এরূপ ছোটখাটো গ্রামে স্বয়ং না গিয়া তালুকের দপ্তর চাহিয়া পাঠাইতেন, এই কথা কারকুনকে (কেরাণী) বলিতে শুনিয়াছিলাম; তাই ওঁকে বলিলাম যে, তালুকের দপ্তর চাহিয়া আনিলেই যদি কাজ চলে, তবে এত কষ্ট করা কেন? তখন তিনি বলিলেন, "সরকার যে আমাকে এই কাজে মনোনীত করিয়াছেন, বেতন লইয়া শুধু আমোদ করিয়া বেড়াইবার জন্য নহে; তালুকের দপ্তর চাহিয়া আনিলে, সেখানকার চালাক চতুর লোকই সম্মুখে আসে এবং আবশ্যক মতো নক্সার রেখা টানিয়া কর্ম্মচারীর সম্মুখে নক্সা আনিয়া ধরে;—ইহাতে চাষাদের প্রকৃত অবস্থা জানা যায় না; তাহাদের প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়া লইয়া তাহাদের বাধাবিঘ্ন দূর করাই, সরকারের মুখ্য অভিপ্রায়; এ কথা কেহ কেহ বোঝে না, তাই অকারণ আলস্য করে। বাকী লোকে অর্থাৎ আমরা নিজে ছোটখাটো গ্রামে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইলে পর, গ্রামের গৃহস্থ ও বৃদ্ধ লোকদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়, এবং জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে তাহাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিয়া, সহজেই সমস্ত অবস্থা বুঝিতে পারা যায়। এই জন্যই আমরা ছোটখাটো গ্রামে বেড়াইতে যাই; নতুবা এতটা কষ্ট স্বীকার করিতে কে চায় বলো?" যাক্।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

নস্যের ডিবা হারাইল! ১৯৮৪।৮৫।

এই বৎসরেই ঘুরিতে ঘুরিতে আমরা সাতারা জিলায় আসিলাম। সেই দিন কোরে-গ্রামে আড্ডা করাই স্থির হইয়াছিল। বয়েল-গাড়ীগুলা রাত্রেই বাহির হইয়া গিয়াছিল। কেবল আমরা নিত্যানুসারে সকালে উঠিয়া ঘোড়ার গাড়ীতে চড়িয়া বাহির হইলাম। রাত্রিতে আড্ডায় আসিয়া পৌঁছিলে যদি সেখানে ভাল জল না থাকিত তবে, পথে কোন নদী বা ভাল মনের মতো জায়গা দেখিয়া সেই খানে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করা হইত। কোরে-গ্রামের এদিকে 'বসনা' নদীর ধারে আমরা সবাই প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিলাম। আজ বিলম্ব হওয়ায় নিকটস্থ ডিবা হইতে আমরা দুজনে কিছু খাবার লইয়া জলযোগ করিয়া বাকি খাবার জিনিস শিপাই ও কোচমানদের দিয়া "ঐখানে গিয়া খাও ডিবাটা মাজিয়া ঘসিয়া নিয়ে আয়"—এইরূপ আমি বলিলাম। ইতি মধ্যে 'উনি' বলিলেন—"আজ দেরী হইয়া যাওয়াও চলা হয় নাই, তাহা না হইলে আর একটু আগাইয়া যাইতে পারা যাইত। ঐ সকল লোক ফিরিয়া আসিলে, তুমি গাড়ী জুতিয়া শীঘ্র এসো।" এই কথা বলিয়া একটু সামনে আগাইয়া যাইবার পর আমি

একটু আমোদ করিবার জন্য সেখানে ঘোড়ার চাবুক ছিল সেই চাবুক হাতে লইয়া নিকটস্থ এক খাটো আম-গাছের তলায় গেলাম ও চাবুক দিয়া গাছে দুই তিন ঘা মারিলাম, তাহাতে ২০।২৫টা কাঁচা আম পড়িয়া গেল। কিন্তু তাহাতেও তৃপ্তি হইল না; আরও বেশী পাড়িবার জন্য, খুব জোরে ঘা মারায়, চাবুকের সরু শেষটুকু বালায় আটকিয়া, চাবুকের জোরে বালাটাও উপরে উড়িয়া গিয়াছে তখনি বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু উপর দিয়া কোথায় পড়িল তাহা দেখা গেল না। আমি ও সিপাহীরা গাছের নীচে আশে পাশে অনেক খোঁজ করিলাম; কিন্তু যারা খোঁজ করিতেছিল তাহাদের পায়ের নীচে পড়ায়, ভুল করিয়া তাহারা গুঁড়াইয়া ফেলিয়াছে কিংবা গাছের কোথাও আট্‌কাইয়া রহিয়াছে, কে জানে। অনেক খোঁজাখুঁজি করিয়াও পাওয়া গেল না সত্য! ইতি মধ্যে গাড়ী তৈয়ার হইয়া আসিল। গাড়ীতে চড়িয়া আমি অগ্রসর হইলাম। এখন 'ওঁকে' কি বলিব? বালা হারাইয়াছে শুনিলে উনি কি মনে করিবেন? আমি আম পাড়িবার লোভ করিয়াছিলাম—কাজটা ভাল হয় নাই, এইরূপ আমার অনুতাপ হইল, আর ভয় হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে এক রয়েল-গাড়ী আসিয়া পড়িল, তবু ওঁর সহিত সাক্ষাৎ হইল না; আমি ঘাবড়িয়া গেলাম, এবং আমার নির্ব্বুদ্ধিতার দরুণ এই গরমের সময় ওঁর অনেক দূর হাঁটিতে হইল এই জন্য আমার বড় খারাপ লাগিল। কিন্তু উপায় কি? দ্বিতীয় mile-এর রাস্তায় ওঁর সঙ্গে দেখা হইল ও গাড়ীতে বসা গেল। গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিলে, আজ আমার একটা বড় চুক্ হইয়াছে বলিয়া হাতের বালার বৃত্তান্ত সমস্ত বলিলাম। সমস্ত শুনিবার পর, অনেকক্ষণ পরে ও শান্তভাবে উনি বলিলেন যে, "লোকের আম তুমি না জিজ্ঞাসা করিয়া পাড়িয়াছিলে, কাজটা ভাল হয় নাই। এরূপ আর কখন করিবে না। তুমি একটু শাস্তি পাও, ও তোমার বরাবর মনে থাকে, এই জন্যই তোমার বালা হারিয়েছে। আমি ঐ বালার খোঁজ করিব না ও নূতন বালাও গড়াইয়া দিব না, তাহা হইলে তোমার মনে থাকিবে।" সচরাচর যে রকম ভাবে বলিয়া থাকেন এই কথা সেইরূপ ভাবেই বলিলেন। কিন্তু তাঁহার ভাবভঙ্গীতে মনে হইল, আমার এ কাজটা তাঁর ভাল লাগে নাই; তাই তাঁর সিধাভাবের কথাতেও আমার বিলক্ষণ শিক্ষা হইল। বেশী রাগ করিবার কোন হেতু নাই বলিয়া আমি সমস্ত দিন আমার নিত্যকর্ম্ম না ভুলিয়া বিষণ্ণচিত্তে করিতে লাগিলাম। রাত্রে খাইতে বসিলে পর, উনি নিত্যানুসারে ব্রাহ্মণকে শুধু ডাকিয়া নহে—হাঁক দিয়া ডাকিয়া বলিলেন, "এক কাজ কর, আজ সকালের ৭৫ টাকার আচার পাতে দেবার জন্য নিয়ে এসো।" সে বেচারা কি-আনিবে? 'কাচুমাচু' মুখ করিয়া ঠায় দাঁড়াইয়া রহিল। আচার করিবে কে? কাঁচা আমগুলা সকাল হইতে স্থানে স্থানে পড়িয়া ছিল। সকাল হইতে সেই আমগুলি দেখাই যেন আমার শাস্তি বলিয়া মনে হইতে লাগিল। কেহই কিছু বলিতেছে না, আমের আচার কেহই আনিতেছে না দেখিয়া, উনি আমাকে বলিলেও, "অন্য কোন কথা মনে আনো, বালা হারিয়েছে বলে' এতটা খিন্ন হবার দরকার নেই। তোমার মতো আমারও একটা দুর্ঘটনা হয়েছে। আজ দুপরে আমার নস্যের ডিবেটা কোথায় পড়ে গিয়ে হারিয়ে গেছে। আমার এক জিনিস হারিয়েছে, তোমারও এক জিনিস হারিয়েছে। তুমি বলবে ডিবেটা দস্তার ছিল, তার আবার দাম কি! মূল্যের বিচার এই সময়ে না করে' কাজে লাগার হিসাবে আমার জিনিসের মূল্য বেশী ছিল; কারণ ঐ ডিবে নইলে যে আমার চলে না—কাজ আট্‌কায়। জিনিস হারানোতে অসাবধানতা ও অমনোযোগিতা এই দোষ দেখা যায়। পুনর্ব্বার এরূপ না হয় সেই চেষ্টা করাই ভাল। কিন্তু উহা হারাইবার দরুন এতটা খিন্ন হবার দরকার কি? হেসে খেলে মনের সুখে থাক্‌বে, তা হলে অন্যেরও ভাল লাগবে।" যাক্। ইহার পর হারানো জিনিসের নামও আর আমি মুখে আনি নাই।

নারিকেল ফল ও পাখীর ডিম।

(শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল বার্-এট্ ল)

জড়জগৎ ও জীবজগতের মধ্যে যে "পর্দ্দা" বা ব্যবধান দৃষ্ট হয়, তাহা ক্রমে ক্রমে অপসৃত হইতেছে। জীবজগতে উদ্ভিদ ও প্রাণীবিভাগেরও মধ্যে যে ভেদ বা পার্থক্য দৃষ্টি গোচর হয়, তাহাও প্রকৃত পার্থক্য বলিয়া প্রতীত হয় না। নারিকেল ফল ও পাখীর ডিম উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। তৃণাদি নির্ম্মিত বাসার মধ্যে ডিম থাকে। নারিকেল-ছোবড়ার মধ্যে ডিম্বাকার খোল থাকে। ডিমের মধ্যে yolk বা "কুসুম" থাকে, খোলের মধ্যেও "সার" অর্থাৎ নারিকেল থাকে। yolk এর মধ্যে পাখীর "বীজ" অর্থাৎ জীবাঙ্কুর থাকে। নারিকেলের মধ্যেও nutty বা সারাংশের দ্বারা বেষ্টিত "বীজ" বা "বীজাঙ্কুর" থাকে। "কুসুম" দ্বারা "জীবাঙ্কুর" পরিপুষ্ট হয় এবং ক্রমে ক্রমে

বর্দ্ধিত হইয়া পক্ষীতে পরিণত হয়—তখন shell অর্থাৎ ডিমের খোল ভাঙ্গিয়া যায়। নারিকেলের মুখে যে knob বা "বীজাঙ্কুর" থাকে, তাহা নারিকেলের সারে পরিপুষ্ট হইয়া সেই মুখ বা সহজভেদ্য ছিদ্র দিয়া বহির্গত হয়।

নারিকেলের তিনটি আবরণ। একটী সবুজ ত্বক্। দ্বিতীয়টি ছোবড়া। তৃতীয়টী shell বা খোল। বৃক্ষচ্যুত নারিকেল ফলের এই তিনটী আবরণ ভেদ করিয়া নারিকেলের "জীবাঙ্কুর" জল গ্রহণ করিতে অক্ষম। তাই নারিকেলের মধ্যে জলের সঞ্চার বা সঞ্চয় পূর্ব্ব হইতেই আবশ্যক হয়। এই জলে নারিকেল চারা ক্রমশ পুষ্ট হইতে থাকে ও বাড়িতে থাকে, বেশী বাড়িলেই shell বা খোলটা আপনা-পনিই ভাঙ্গিয়া যায়। ডিম ভাঙ্গিয়া পক্ষীশাবক নির্গত হইয়াই আপনি খুঁটিয়া খায় (যথা মুর্গির বাচ্ছা) বা মা-বাপরা খাওয়ায়। এ খাদ্য ডিমের ভিতরের সার নহে, ডিমের বাহিরের যাহা উপযোগী খাদ্য, এ তাহাই। নারিকেলের চারাও খোল ভাঙ্গিবার পর পৃথিবী হইতে তদুপযোগী খাদ্য অর্থাৎ জলাদি আহরণ করে। খোল ভাঙ্গি-বার পূর্ব্বে খোলের মধ্যে যে জল-সার তাহাই ব্যবহার করে।

প্রকৃতিমাতা নারিকেলবীজ ও পক্ষীবীজকে একই কৌশলে লালন পালন করিয়া আসিতেছেন। পাখীরা দু'চারটে করিয়া ডিম পাড়ে; তাহার অর্থ—একটা আধটা খারাপ হইলেও ক্ষতি হইবে না। বংশ বৃদ্ধি বা রক্ষার জন্য একটী ফুটিলেই যথেষ্ট। নারিকেলেরও পূর্ব্বে তিনটী করিয়া "বীজাঙ্কুর" হইত—তাহার পরিচয় নারিকেলের তিনটী pits বা depressions অর্থাৎ মুখ। একটী মুখ সচ্ছিদ্র—যাহার মধ্যে ছুরি দিলে খোলের ভিতর হইতে জল নির্গত হয়। তাহারই নীচে দুইটি বন্ধ মুখ—এক কালে এই দুই মুখ বন্ধ ছিল না। প্রত্যেক মুখে একটী করিয়া knob বা বীজাঙ্কুর থাকিত। পূর্ব্বকালে নারি-কেল এইরূপ ত্রি-আবরণে আবৃত ছিল না। তিনটী ছিদ্রই ছিল, তিনটী knobই হইত। নারিকেলের সার ও মিষ্ট জলের জন্য নারিকেলের অনেক শত্রু জুটিল। তন্মধ্যে মনুষ্যের অতিবৃদ্ধপিতামহ বানরেরাই গুরুতর শত্রু। তাহারা নখ দাঁত দিয়া ছিদ্রগুলি খুলিয়া নারিকেলের জল পান করিত ও নারিকেল ভাঙ্গিয়া kernel বা সার খাইত। প্রকৃতিদেবী অনন্যোপায় হইয়া শত্রুদিগের চোখে ধুলা দিবার জন্য একটী মাত্র ছিদ্র রাখিলেন। যে দুইটী বন্ধ হইল সেই দুটিরই উপর প্রথমেই নজর পড়ে। বাঁদরেরা এই দুইটী বন্ধ মুখ নখদাঁত দিয়া খুলিয়া ছেদ করিতে অপারক হইয়া শেষে হাল ছাড়িয়া দিত। বীজ অর্থাৎ বংশ রক্ষা করিবার জন্য প্রকৃতি এই কৌশল অবলম্বন করিলেন।

আবার নারিকেল গাছ ক্রমে উঁচু হইতে লাগিল—উঁচু বৃক্ষ হইতে নারিকেল পড়িয়া খোল ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। প্রকৃতি তাই নারিকেলের খোলকে আরো দুইটী আবরণে ঢাকিয়া দিলেন। প্রথমটী ত্বক, আর দ্বিতীটী ছোপড়া, এই ছোপড়া থাকাতে ঝুনা অর্থাৎ বীজ-নারিকেল গাছ হইতে পড়িলেও সহজে ভাঙ্গিতে পারে না। পরে যখন নারিকেল-বীজকে এইরূপ তিন-ফেরা কেল্লার মধ্যে পোরা হইল, তখন সে বীজের ধ্বংসের ভয় আর রহিল না। তাই তিনটী knob বা বীজের যায়গায় একটীই যথেষ্ট হইল। অরক্ষিত অবস্থায় একাধিক বীজের প্রয়ো-জন ছিল কারণ বীজ নষ্ট হইবার ভয় ছিল। এখন আর সেই ভয় রহিল না। তিনটী ছিদ্রের স্থলে এখন একটী ছিদ্র অবশিষ্ট রহিল, দুইটীর কেবল চিহ্ন মাত্র রহিল। বাঁদরকে প্রতারণা করি-বার জন্যই বোধ হয় প্রকৃতি এই কৌশল আবিষ্কার করিয়াছেন।

কত যুগযুগান্তর ধরিয়া কৌশলের পর কৌশল পরীক্ষা বা অবলম্বন করিয়া শেষে প্রাকৃতিক নির্ব্বা-চনফলে নারিকেল তাহার বর্ত্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। ধনী লোকের এক পুত্র হইলে যেমন সে স্বচ্ছন্দে সঞ্চিত ধন ভোগ করিতে পারে, দশপুত্র হইলে সেরূপ করা অসম্ভব। নারিকেল ফলও bitter experience দ্বারা এই শিক্ষা পাইয়াছে যে, তাহার মধ্যে যে সঞ্চিত খাদ্য আছে তাহা একটী বীজের উপযোগী, তিনটী মাত্র বীজের পক্ষে যথেষ্ট নহে। তাই প্রকৃতিরূপী ধাত্রীএকটী বীজ-কেই 'দুগ্ধ' (coconut milk) পান করান।

জ্ঞানগর্ব্বিত মানব মনে করেন প্রকৃতি তাহারই জন্য ডাবের মধ্যে জল দিয়াছেন—খোলের মধ্যে

পৌষপিটে খাইবার জন্য নারিকেল দিয়াছেন। মানুষের জন্য প্রকৃতির এত মাথাব্যথা ধরেনি। প্রকৃতি নারিকেলের বংশরক্ষার জন্যই নারিকেল ফলে জল ও সার সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

চা-খড়ির আত্মকাহিনী।

(ডাক্তার শ্রীচুণীলাল বসু রায়বাহাদুর)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

চন্দ্রদেবের জন্মসম্বন্ধে দুই চারিটী কথা ইতি-

চন্দ্রের বর্ত্তমান অবস্থা।

পূর্ব্বে তোমাদিগকে বলিয়াছি। অন্যূন ৫ কোটী ৬০ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে চন্দ্র ও পৃথিবী উভয়েই একাঙ্গীভূত ছিলেন। চন্দ্রদেব পৃথিবীর দেহ হইতে বিচ্যুত হইয়া যাইবার পর একেবারে অধিক দূরে গমন করেন নাই। তোমরা ছেলেবেলায় ঠাকুরমার মুখে গল্প শুনিয়াছ যে এক বুড়ি ঝাঁট দিতে দিতে যেমন সোজা হইয়া দাঁড়াইবে, অমনি চাঁদ তাহার মাথায় ঠেকিয়া গেল। সে রাগান্বিত হইয়া চাঁদকে সম্মার্জ্জনী প্রহার করিতে উদ্যত হইলে চন্দ্রদেব প্রহারের ভয়ে আকাশের বহু উর্দ্ধদেশে পলায়ন করিলেন। সেই অবধি পৃথিবী ও চন্দ্রের মধ্যে এত অধিক ব্যবধান রহিয়া গিয়াছে। চন্দ্রদেব, উপকথার চাঁদের ন্যায়, পৃথিবীর অত নিকটে না থাকিলেও এখনকার অপেক্ষা পূর্ব্বে যে অনেক কাছে ছিলেন, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। চন্দ্র পৃথিবীর এত কাছে থাকিবার জন্য তখন জোয়ার ভাঁটার প্রভাব এখন অপেক্ষা অনেক প্রবল ছিল। তখন জোয়ারের সময় সমুদ্রের বক্ষ স্ফীত হইয়া অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গের ন্যায় উর্দ্ধদিকে উন্নত হইয়া উঠিত। এখন তোমাদের চান্দ্রমাস ২৭ দিনে হয়, তখন ১½ দিনে এক একটী চান্দ্রমাস হইত। তখন বৎসরের পরিমাণ এখনকার মত ৩৬৫ দিন ছিল না, এক হাজার দিনে এক বৎসর হইত। অধ্যাপক ডারউহনের মতে ৪ কোটী ৭০লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর আহ্নিক গতি এত শীঘ্র শীঘ্র সম্পাদিত হইত, যে তখন ২৪ ঘণ্টার পরিবর্ত্তে ৬½ ঘণ্টা পৃথিবীর দিবারাত্রির পরিমাণ ছিল। চন্দ্রদেব এখন পৃথিবী হইতে ১ লক্ষ ১৯ হাজার ক্রোশ দূরে অবস্থিতি করিতেছেন। কিন্তু এত দূরে থাকিলেও জননীর স্নেহমমতা একেবারে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। তাই তিনি দিবসে এখনো দুই বার জননীর সহিত মিলিত হইবার জন্য তাঁহাকে নিজের কাছে টানিয়া লইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। পুত্রবৎসলা জননীরও সেই সময়ে স্নেহের উচ্ছ্বাসের সহিত বক্ষস্থিত স্তন্যধারা উচ্ছলিত হইয়া উঠে এবং সন্তানকে তাহা পান করাইবার জন্য ব্যাকুলভাবে তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া থাকেন। মাতা-পুত্রের এই অপূর্ব্ব স্নেহের আদানপ্রদানকে কবিত্বহীন নীরস বিজ্ঞানের ভাষায় তোমরা জোয়ার ভাঁটা বলিয়া থাক।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এক সময়ে চন্দ্রের মধ্যে বহু আগ্নেয় গিরির অস্তিত্ব ছিল এবং তাহারা সদাসর্ব্বদা অগ্নিময় গলিত প্রস্তরাদি উদ্গিরণ করিত। সে সময় তোমাদের জন্ম হয় নাই, তাহা না হইলে দূরবীক্ষণ সাহায্যে তোমরা অনায়াসে চন্দ্রের মধ্যে এই ভীষণ অগ্নিকাণ্ড দেখিতে পাইতে। এখন এই অগ্ন্যুৎপাত চিরদিনের জন্য নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে। চন্দ্রের গতি এখন মন্দ হইয়াছে এবং আকর্ষণশক্তিও হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। তাই এখন জোয়ার-ভাঁটা পূর্ব্বের ন্যায় প্রবলভাবে ঘটিতে দেখা যায় না। এখন চন্দ্রদেব কেবল রাত্রিকালে স্নিগ্ধ বিমল অমৃতধারা সিঞ্চন করিয়া বিরহবিধুরা জননীর শোকাগ্নি নির্ব্বাণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

স্থল ও জলের আবির্ভাব।

বাষ্পময় পৃথিবীর বহির্ভাগ ক্রমশঃ শীতল হইয়া কঠিনত্ব প্রাপ্ত হইল; এই অংশই বর্ত্তমান ভূপঞ্জরের আদিস্তর বলিয়া পরিগণিত। শীতল হইয়া সঙ্কুচিত হইবার সময়ে ভূস্তরের কোন স্থান উচু হইয়া উঠিল, কোন স্থান বা বসিয়া গেল, আবার অনেক স্থান চিড় খাইয়া ফাটিয়া গেল। এইরূপে কত স্থানে কত শত গভীর খাতের সৃষ্টি হইল। তাপ ক্রমশঃ আরো যত কমিয়া যাইতে লাগিল, অসীম আকাশমণ্ডলে যে জলরাশি বাষ্পাকারে বিদ্যমান ছিল, তাপের অপসারণে তাহা ঘনীভূত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলবিন্দুর আকার ধারণ করিল এবং বৃষ্টিরূপে ধরাবক্ষে পতিত হইতে লাগিল। সে বৃষ্টির মাপ ছিল না, তাহার বিশ্রামও ছিল না। অবিরাম বর্ষণ হেতু

মহাগভীর খাতগুলি ক্রমে সাগর মহাসাগরে পরিণত হইল।

যে কোন বস্তুর দুই দিকে চাপ দিলে উহার মধ্যাংশ স্ফীত ও উন্নত হইয়া উঠে এবং উহার উপরিভাগ কুঞ্চিত হইয়া যায়। এই একই নিয়মে ভূপৃষ্ঠের যে সকল স্থান সঙ্কোচনজনিত প্রচণ্ড পেষণে ঊর্দ্ধদিকে স্ফীত বা মন্দিরের চূড়ার ন্যায় উন্নত হইয়া উঠিল, তাহারাই দেশ, মহাদেশ অথবা অভ্রভেদী পর্ব্বতমালারূপে এই অসীম জলরাশির উপরে জাগ্রত হইয়া বিরাজ করিতে লাগিল। এইরূপে সেই বিশ্বব্যাপী সঙ্কোচনজনিত উত্থান-পতনরূপ বিপ্লবের ফলে একদিকে যেমন প্রকাণ্ড জলভাগের, অপরদিকে তেমনি স্থলভাগের সৃষ্টি হইয়াছে। পৃথিবীর মধ্যে যে সর্ব্বোচ্চ গিরিরাজ তোমাদের জন্মভূমির শিরোমুকুটরূপে বিরাজ করিতেছে, তোমরা শুনিলে আশ্চর্য্য হইবে যে সেই মহিমান্বিত অভ্রভেদী তুষারমণ্ডিত বিশালদেহ হিমাদ্রিও এক সময়ে সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত ছিল। ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা হিমালয় পর্ব্বতের মধ্যে কত সমুদ্রচর প্রাণীর কঙ্কাল প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইয়ুরোপের শ্রেষ্ঠ শৈলরাজি আল্প্‌স্‌ও একসময়ে সমুদ্রগর্ভে লুক্কায়িত ছিল। তোমাদের এই সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা সোণার বাংলা দেশ সেদিন মাত্র সমুদ্রগর্ভ হইতে মাথা তুলিয়া মানুষের আবাস-ভূমিতে পরিণত হইয়াছে। আমার জন্মিবার কত লক্ষ লক্ষ বৎসর পরে সে সূর্য্যের মুখ প্রথমে দর্শন করিয়াছে। তোমাদের জননী তোমাদের নিকট প্রাচীনা হইলেও তিনি আমার চোখে সেদিনকার মেয়ে বইত নয়!

চন্দ্র পৃথিবী হইতে বিচ্যুত হইবার পর পৃথিবীর আকারের একটু পরিবর্ত্তন সংসাধিত হয়। উহার একভাগ অতি প্রশস্ত ও অপরাংশ অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ হইয়া যায় এবং এতদুভয়ের মধ্যে একটী গভীর খাতের সৃষ্টি হয়। কালে এই খাত বৃষ্টির জলে পরিপূর্ণ হইলে পৃথিবীতে প্রথম সমুদ্রের আবির্ভাব হয়। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে এই প্রথম সমুদ্রই বর্ত্তমান প্রশান্ত মহাসাগর। এইরূপে পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ এই মহাসাগর দ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িল। প্রশস্তাংশ বিভিন্ন মহাদেশরূপে এবং অপ্রশস্তাংশ জলের মধ্যে কতিপয় দ্বীপরূপে শোভা পাইতে লাগিল। প্রশস্ত-ভাগ হইতে ইউরোপ, আফ্রিকা, এসিয়ার প্রায় তাবদংশ, উত্তর আমেরিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকার বৃহদংশ গঠিত হইয়াছে। অপ্রশস্ত অংশের মধ্যে জলভাগই অধিক, স্থলের পরিমাণ খুব কম। আবার এই স্থলাংশ কতকগুলি দ্বীপের সমষ্টিমাত্র। অষ্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড, দক্ষিণ আমেরিকার কিয়দংশ এবং মালয় উপদ্বীপ এই অপ্রশস্ত স্থলভাগের অন্তর্গত ছিল।

উত্থানপতন বিপ্লব।

এক সময়ে পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ সর্ব্বত্রই জলরাশির মধ্যে নিমজ্জিত ছিল। এই অসীম অনন্ত-বিস্তৃত জলরাশিকে তোমাদের একজন বৈষ্ণব কবি মধুচ্ছন্দে "প্রলয়পয়োধি-জল" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তোমাদের প্রাচীন ঋষিরাও বলিয়া গিয়াছেন যে প্রলয়কালে পৃথিবী জলমগ্না ছিলেন। আধুনিক পণ্ডিতদিগের মধ্যে এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ পৃথিবীর সর্ব্বস্থানই যে এক সময়ে জল-মগ্ন ছিল, তাহা স্বীকার করেন না। বিভিন্ন স্থানে পৃথিবীর স্তরের গঠনের তারতম্য দেখিয়া তাঁহারা অনুমান করেন যে স্থল ও জল আদিকাল হইতেই একত্র এক সময়ে সৃষ্ট হইয়াছে। পৃথিবীর আদিম পর্ব্বতসমূহের গঠন দেখিয়া তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে এই সকল পর্ব্বত বহুপূর্ব্বে গঠিত স্থল-ভাগের ভগ্নকণা দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। যাহা হউক, ক্রমে ক্রমে উত্থানপতন-বিপ্লবের ফলে পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের আকারে হেথায় সেথায় জলের উপরিভাগে জাগিয়া উঠিতে লাগিল। তোমরা শুনিলে আশ্চর্য্য হইবে যে তখন আফ্রিকা মহাদেশ বর্ত্তমান মাদাগাস্কার্ দ্বীপ অপেক্ষা বৃহদাকার ছিল না। তোমাদের স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী জন্মভূমি ভারতবর্ষ বর্ত্তমান সিংহলদ্বীপ অপেক্ষা আয়তনে বড় ছিলেন না। এই সকল দেশের অধিকাংশ স্থলভাগই তখন জলে নিমজ্জিত ছিল।

আবার উত্থানপতন-বিপ্লবের ফলে যে সকল ভূভাগ উন্নত হইয়া পর্ব্বত ও মহাদেশে পরিণত হইয়াছিল অন্য কারণে তাহাদের অনেকেরই অস্তিত্ব ধরাপৃষ্ঠ হইতে এককালীন লোপ প্রাপ্ত হইল।

কালে এই সকল উচ্চ ভূভাগ বায়ু, বৃষ্টি ও রবিতাপের সম্মিলিত শক্তি দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বালুকণায় পরিণত হইতে লাগিল এবং পর্ব্বতবাহিনী স্রোতস্বতী দ্বারা প্রবাহিত হইয়া পুনরায় সাগরগর্ভে আশ্রয় লাভ করিল। আবহমান কালব্যাপী এই "পলি" সঞ্চয়ের ফলে অতল সমুদ্রগর্ভ পুনরায় উচ্চ হইয়া মনুষ্যের বাসোপযোগী হইয়াছে। এইরূপে কত পর্ব্বত, কত দেশ, কত মহাদেশ একবার গঠিত হইয়া প্রাকৃতিক ক্রিয়া দ্বারা পুনরায় ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া একেবারে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে, আবার কত অদৃশ্য অতলস্পর্শ সমুদ্রগর্ভস্থিত স্থানও উন্নত হইয়া কোথাও বা জলশূন্য ও জনশূন্য বালুকাময় মরুভূমি, কোথাও বা ঘনপাদপরাজিবেষ্টিত নিবিড় অরণ্যানী অথবা সমৃদ্ধিশালী বহুবিস্তৃত জনপদে পরিণত হইয়াছে। সৃষ্টির আদিকাল হইতে এই ভাঙ্গাগড়া কার্য্যের আরম্ভ হইয়াছে; পৃথিবীর জীবনেতিহাসে এইরূপ লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী বিপ্লব উপস্থিত হইয়া তাহাকে তাহার বর্ত্তমান আকার ও উপযোগিতা প্রদান করিয়াছে। সেই বিপ্লবের এখনো শান্তি হয় নাই, পৃথিবীর গঠন এখনো পূর্ণ পরিণতি লাভ করে নাই। প্রকৃতি দেবীর ভাঙ্গাগড়া কার্য্য এখনো অবিরাম ভাবে চলিতেছে। এখনো এই উত্থানপতন-বিপ্লবের ফলে অথবা ভূগর্ভস্থ দ্রবীভূত ধাতুপ্রস্তর-স্রোতের বিষম চাঞ্চল্যে, ভূমিকম্প উপস্থিত হইয়া কত জনপদ ধ্বংস বা জলমগ্ন হইয়া যাইতেছে, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত দ্বারা কত দ্বীপ, কত নগর শ্মশানে পরিণত হইতেছে, আবার পর্ব্বতগাত্রস্খলিত স্রোতোবাহী পলি-পাত দ্বারা কত জলমগ্ন স্থান উন্নত হইয়া পুনরায় মনুষ্যের বাসের যোগ্য হইয়া উঠিতেছে। তবে পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ কঠিন হইয়া গিয়াছে বলিয়া পূর্ব্বের ন্যায় এখন এই বিপ্লব সেরূপ প্রবলভাবে বা ঘন ঘন সংঘটিত হইতে দেখা যায় না; ইহা তোমাদের পরম সৌভাগ্যের কথা স্বীকার করিতে হইবে।

(ক্রমশঃ)

চা পানের অপকারিতা।

(শ্রীশশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়)

বর্ত্তমান কালে আমাদের দেশে চায়ের প্রচলন বিশেষরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। লোকে অনায়াসে ২টী পয়সা ব্যয় করিয়া চা খাইয়া থাকে। কলিকাতার প্রতি রাজপথে অসংখ্য চায়ের দোকান বসিয়াছে। এবং প্রতি দোকানেই বহু খরিদ্দারের সমাগম হইয়া থাকে। আমার কোন বন্ধু একদিন হ্যারিসন রোড, কলেজ ষ্ট্রীট, বহুবাজার ষ্ট্রীট ও সার্কুলার রোড এই চতুঃসীমাবদ্ধ স্থানের চাএর দোকান গণনা করিয়াছিলেন, গণনায় দোকান ১১০ খানি হইয়াছিল। ইহাতেও অনেক দোকান বাদ পড়িয়াছিল। এই সকল দোকানেই ঘরভাড়া সরঞ্জামী খরচ প্রভৃতি ব্যয় সঙ্কুলান হইয়া বেশ লাভ হইয়া থাকে, নতুবা দোকান উঠিয়া যাইত। এই সমস্ত টাকাই আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত লোক এবং সামান্য ব্যবসায়ী, মুটে, মজুর, ফেরিওয়ালা প্রভৃতি দিয়া থাকে। যাহাদের চা-বাগান আছে তাহারা এবং চাএর বড় বড় ব্যবসায়ীগণ প্রথমতঃ বিনা পয়সায় চাএর প্যাকেট বিতরণ করিতেন, তারপর ক্রমে যখন লোকের নেশা ধরিল, তখন বিতরিত চাএর মূল্য সুদসহ আদায় করিয়া লইলেন। শুধু কলিকাতায় নহে, আমাদের দেশের সকল প্রধান সহরেই এইরূপে চাএর বহুল প্রচলন হইয়াছে। আমি যখন বোম্বাই নগরে গিয়াছিলাম তখন সেখানে অসংখ্য ইরাণী দোকান দেখিয়াছিলাম। ঐ সব দোকানে চা বিক্রয় হইত। সে সময়ে কলিকাতায় চাএর দোকান বসে নাই। বর্ত্তমানে বোম্বাই সহরে চা-বিক্রয় আরও বাড়িয়া গিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কেহ কেহ বলেন যে চাএর একটু উপকারিতা আছে, তাহাতে শরীর ঝরঝরে রাখে এবং উৎসাহ জাগাইয়া তোলে। বাস্তবিক পক্ষে যদিও ঐ গুণ চাএর থাকে তাহা সাময়িক মাত্র এবং যেমন প্রত্যেক সাময়িক ও কৃত্রিম উপায়ে উৎপাদিত উত্তেজনার অবসানে দ্বিগুণ অবসাদ আসে, চায়ের প্রভাবটুকু অন্তর্হিত হইলেও শরীরে সেইরূপ অবসাদ আসিয়া থাকে। এ কারণ একবার চা ধরিলে তাহা ত্যাগ করা বড়ই কষ্টসাধ্য। সমস্ত নেশার জিনিষের সম্বন্ধেই এই কথা প্রযোজ্য।

ইহা সর্ব্ববাদসম্মত যে চায়ে dyspepsia আনয়ন করে। কিছু দিন নিয়মিত চা সেবন করিলে পাকযন্ত্রের পূর্ব্বের তেজ থাকে না, উক্ত যন্ত্রস্থ gastric juice পাতলা হয় এবং তাহার কার্য্যকরী শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। এ কারণ ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধ, অজীর্ণ প্রভৃতি নানাবিধ ব্যায়রাম সৃষ্টি হইয়া থাকে। চাএর এই কুফল একদিনে

অথবা হঠাৎ উপস্থিত হয় না এ কারণ লোকে মনে করে ঐ সব ব্যায়রাম অন্যান্য কারণে উদ্ভূত হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে চা পান যে ঐ সব রোগের এক প্রধান কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই।

চা সেবনে নিদ্রার ব্যাঘাত হইয়া থাকে এবং ক্রমে ক্রমে নিদ্রার পরিমাণ কমিয়া যায়, তাহাতে পরিণামে নানাবিধ দুঃসাধ্য ব্যাধি জন্মিয়া থাকে। যদিবা শীত-প্রধান দেশে চাএর কোন উপযোগিতা থাকে আমাদের দেশের মত গ্রীষ্মপ্রধান স্থানে চা বিষের মত ক্রিয়া করিয়া থাকে। বহু লোকে চা পান করিয়া তাহার অনিষ্টকর ফল ভোগ করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে চায়ে তাহাদের অপ্রবৃত্তি হয় নাই। এইটিই চা-পানের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর কুফল। পরের অনুকরণে উন্মত্ত হইয়া আমরা যাহা করি তাহার পরিণামফল বিবেচনা করি না। ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় কি হইতে পারে?

চা পানের আর একটি অনিষ্টকর ফল আর্থিক ক্ষতি। যে পরিবারে ৪ জন লোক চা পানে অভ্যস্ত, তাহাদের দুবেলা চা পানে অন্ততঃ চারি আনা ব্যয় হইয়া থাকে অর্থাৎ মাসে প্রায় ৮৲ টাকা ব্যয় হয়। একটি দরিদ্র অথবা মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষে মাসিক ৮৲ টাকা ব্যয় করা সহজ কথা নহে। ফলে তাহাদের অন্যান্য আবশ্যকীয় ব্যয় সঙ্কোচ করিতে হয়। এই ভাবে আমাদের দরিদ্র দেশের কত টাকা যে চাএর জন্য ব্যয় হইয়া থাকে তাহার পরিমাণ নির্ণয় করা সহজ সাধ্য নহে।

চা পানের এতগুলি কুফল। আমাদের জনসাধারণের অবগতির জন্য গৃহে গৃহে চা পানের কুফল সম্বন্ধীয় পুস্তক প্রচারিত হওয়া বিশেষ আবশ্যক। এবং আমাদের দেশের লোকের বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক হিতপথ গ্রহণ করিয়া চা পান একেবারে ত্যাগ করা উচিত।

চা পানের আরও একটি কুফল এই যে বাড়ীর পুত্রকন্যাগণ সকলেই চা পানে উৎসাহিত হইয়া থাকে। কোন কোন পিতা মাতা নিজ হাতে স্বীয় পুত্রকন্যাগণকে চা পান করিতে শিখাইয়া থাকেন। পরিণামে এজন্য তাহাদের সকলেরই নানাবিধ কষ্ট ভোগ করিতে হয়।

এই সব কারণে এই অশীতিপর বৃদ্ধের অনুরোধ দেশস্থ সকলেই এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করিবেন এবং বালক বালিকাগণের ভবিষ্যৎ জীবনপথে কণ্টক রোপণ করিবেন না।

চা পান ত্যাগ করা অত্যন্ত প্রয়োজন মনে করিয়া সকলেই চাএর বিরোধী হন এই আমার নিবেদন। *

* আমরা লেখকের প্রস্তাব খুবই অনুমোদন করি। তাহার উপর এইটুকু বলিতে চাই যে, যে দিন আমাদের দেশের লোকেরা চা-পান হইতে বিরত হইয়া তাহার খরচটা দেশের দারিদ্র্যমোচনে ব্যয় করিতে কৃতসংকল্প হইবেন, সেইদিন দেশের মানসিক বলের পরিচয় পাইব। তং বোং সং।

মহর্ষির জীবনের কয়েকটী কথা।

বাল্য জীবন।

(১) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বাল্যকালে প্রথমতঃ রাজা রামমোহন রায়ের ইংরাজী বিদ্যালয়ে তৎপরে হিন্দুস্কুলে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথকে রাজা অতিশয় ভাল বাসিতেন। মধ্যে মধ্যে রাজার সহিত তিনি বেড়াইতে বাহির হইতেন। মহর্ষি বলিয়াছেন—"রাজার মুখমণ্ডলের তেজস্বিতা ও মহত্ত্বব্যঞ্জক ভাব আমার হৃদয়কে আকর্ষণ করিত—ভাবিতাম ইনি একজন বড় লোক।" এই সময় মহর্ষির বয়স ১২।১৩ বৎসরের অধিক নহে।

(২) মহর্ষির পিতা সুবিখ্যাত দ্বারকানাথ ঠাকুরের সহিত রাজার বিশেষ বন্ধুতা ছিল। একবার দুর্গাপূজার সময় তাঁহাদের বাটীতে দুর্গা প্রতিমা দর্শনের জন্য দেবেন্দ্রনাথ রাজা রামমোহন রায়কে নিমন্ত্রণ করিতে গিয়াছিলেন। রাজা বলিলেন—"আবার আমাকেও কেন"। এই কথা শুনিয়া বালক দেবেন্দ্রনাথের মনে একটী গভীর প্রশ্নের উদয় হইল। প্রতিমা দর্শনের বিষয় বলাতে রাজা ঐরূপ কথা কেন বলিলেন, দেবেন্দ্রনাথ সেই চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং যখন বুঝিতে পারিলেন যে, রাজা ব্রহ্মোপাসক, প্রতিমা পূজাতে যোগ দেওয়া উচিত মনে করেন না, তখন হইতেই তাঁহার মন সর্ব্বপ্রথম নিরাকার ব্রহ্মোপাসনার দিকে আকৃষ্ট হইল। মনে মনে স্থির করিলেন আর প্রতিমার নিকট নমস্কার করিবেন না। তাঁহার সমবয়স্ক বন্ধুদিগকেও নমস্কার করিতে নিষেধ করিলেন।

(৩) রাজা রামমোহন রায় বিলাত যাওয়ার সময় দ্বারকানাথ ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন; রাজা দেবেন্দ্রনাথকে নিকটে ডাকিয়া আনিয়া বিদায় কালে সাদরে তাঁহার সহিত হস্তমর্দ্দন করেন এবং দ্বারকা নাথ ঠাকুরকে বলেন—'আপনার এই পুত্র আমার ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করিবে।" রাজার এই ভবিষ্যদ্বাণী বস্তুতঃই কয়েক বৎসরের মধ্যে সফল হইয়াছিল।

বর্ত্তমান জীবন।

(১) মহর্ষির বয়ক্রম এখন ৮৫ বৎসর। দুই বৎসর যাবৎ তাঁহার যোড়াসাঁকোস্থ বাটীতে বাস করিতেছেন। এই বাটীতে আসিয়া বলিয়াছেন, যেখানে জন্মগ্রহণ করিয়াছি সেখানেই দেহত্যাগ করিবার ইচ্ছা।

(২) মহর্ষি অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করেন। তৎপর কিছু বেলা হইলে গৃহের বাহিরে আসিয়া যোড় হস্তে চতুর্দ্দিক মুখ ফিরাইয়া বার বার নমস্কার করেন এবং কিছুকাল ঈশ্বর চিন্তাতে নিমগ্ন থাকেন। প্রতিদিন প্রাতে ৭॥ ঘটিকার সময় তাঁহার বাড়ীর পারিবারিক উপাসনার ঘণ্টা পড়ে। বাড়ীর নরনারী সকলে উপাসনাতে যোগদান করেন কি না এবং কে আচার্য্যের কার্য্য করেন ইত্যাদি সংবাদ প্রতিদিন লইয়া থাকেন। ৮ ঘটিকার সময় কিঞ্চিৎ দুগ্ধপান করেন। এখন দুগ্ধ ও বেদানার রসই তাঁহার প্রধান আহার।

(৩) প্রায় প্রতিদিনই প্রাতঃকাল ও অপরাহ্ণ সময়ে তাঁহার পুত্র, পৌত্র ও যাঁহারা তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য উপস্থিত হয়েন, তাঁহাদের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম ও

ব্রাহ্মসমাজ বিষয়ে আলাপ করিয়া থাকেন। উপনিষদ ও হাফেজ ইত্যাদি ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে শ্লোক বলিবার সময় তাঁহার যে প্রকার হৃদয়োচ্ছ্বাস এবং মুখশ্রী হয় তাহা বস্তুতঃই দেখিবার জিনিস।

(৪) এই বৃদ্ধবয়সে মহর্ষি ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা বিষয়ে কত চিন্তা করেন তাহা বর্ণনাতীত। অল্পকাল গত হইল একদিন মহর্ষি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে এইরূপ বলিয়াছেন—"যাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের মত পরিষ্কার থাকে, তদ্বিষয়ে তুমি সর্ব্বদা যত্ন করিবে। ইহাতে যেন কোন দূষণীয় মত স্থান পায় না।" প্রতি বুধবার আদি-ব্রাহ্মসমাজের সপ্তাহিক উপাসনাতে কোন্ কোন্ গান হইয়া থাকে এবং কি প্রকার গান হওয়া আবশ্যক এবং কে কি বিষয়ে উপদেশ দান করেন তাহারও তত্ত্ব লইয়া থাকেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে কিপ্রকার প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় এবং কি ভাবে উক্ত পত্রিকা পরিচালিত হওয়া উচিত তৎসম্বন্ধে পরামর্শ দান করেন। বাড়ীর ছেলে ও মেয়েদিগকে "ব্রাহ্মধর্ম্ম" গ্রন্থ শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রতি রবিবার নিয়ম করিয়াছেন। অন্তঃপুরস্থ স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহাতে ধর্ম্মভাব জাগ্রত থাকে তজ্জন্য প্রতিদিন অপরাহ্নে অন্তঃপুরমধ্যে ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা হইয়া থাকে। পারিবারিক, শারীরিক ও আধ্যাত্মিক কর্ত্তব্য সাধনে বৃদ্ধ মহর্ষির নিষ্ঠা ও দৃঢ়তা দর্শন করিলে অবাক হইতে হয়।

(৫) প্রতিবৎসর ৩রা জ্যৈষ্ঠ তারিখে মহর্ষির জন্মদিনে সন্তানসন্ততি জামাতা ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজন দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া যখন তিনি উপাসনা করেন, তখনকার সেই দৃশ্য কি মনোহর। তিনি ঐ দিবসে তাঁহার পুত্র, পৌত্র, দৌহিত্র প্রভৃতিকে ব্রাহ্মধর্ম্মে অটল বিশ্বাসী হইবার জন্য প্রত্যেকের হস্তে এক এক খানি আশীর্ব্বাদ পত্র প্রদান করেন। চক্ষুর তেজ ও শ্রবণশক্তি হ্রাস হওয়াতে তিনি অপরের সঙ্গে আলাপাদি করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন। মহর্ষি এখন অনেক সময় এইরূপ বলেন—পরমেশ্বর ক্রমে ক্রমে সংসার হইতে আমার আত্মাকে বিমুক্ত করিয়া সম্পূর্ণরূপে তাঁহার দিকে রাখিবার জন্য আমার বাহ্য ইন্দ্রিয় গুলিকে ক্ষীণ করিতেছেন। মহর্ষির শরীর এখন অতিশয় দুর্ব্বল কিন্তু কখনও দিবানিদ্রা যান না। যদি কেহ গৃহী যোগী দর্শন করিতে চাহেন, এই বেলা দর্শন করিয়া লউন।

সেবক, পৌষ ১৩০৭।

সমরক্ষেত্র হইতে পত্র।

রণাঙ্গন,
৪ জুন ১৯১৮।

পূজনীয়া মাতা ঠাকুরাণী—

আমার প্রণাম জানিবেন। আজ অনেক দিন পরে আপনার পত্র পাইয়া যে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম তাহা আর কি লিখিব। আমার আসবার কথায় আপনারা খুব আশান্বিত হয়েছিলেন, কি করব বলুন আপনাদের আশা এখন সফল করতে পারলুম না। পূজার সময় নিশ্চয়ই যাইব জানিবেন—আমার ছুটী অনেক দিন পাওনা হইয়াছে এখন আমি লই নাই, তার কারণ এখন রাস্তায় গরমে বড় কষ্ট পেতে হয়, আর প্রায় এক মাস ইজিপ্টে বালির উপর থাকতে হয় তাতে বড় কষ্ট হয়। আমার বন্ধুরা যাঁরা দ্বিতীয় দলে আছেন,তাঁরা তাঁদের কষ্টের কথা লিখেছেন। যাক্; আমি পূজার সময় দেশে যাবার ঠিক করেছি, কারণ অনেক দিন দেশের মহাপূজা দেখি নাই; যদি তার আগে বাড়ী যেতে বলেন—তাহলে আপনার কথামত কার্য্য করিব। আর এক কথা আপনাকে কে বলেছে যে বিবাহ করব বলে বাড়ী যাই নাই? প্রথম কথা—আমার বিবাহের বয়স হয় নাই, দ্বিতীয় কথা—আমি যে দেশ ছেড়ে এত দূরে এসেছি সেটা কি বিবাহের জন্য? মানুষের মনে এতটা নীচতা আসতে পারে? এসেছি এখানে দেশের কাজে—অন্য কথা কি মনে আসতে পারে? আর আমাদের দেশে কি কন্যার অভাব যে আমি এক বিদেশীয়া বিজাতীয়া কন্যাকে মস্তকে করিয়া দেশে যাইব? আমার দেশের চেয়ে বড় পৃথিবীতে কি আর কেউ আছে? এসব দেশ তার পায়ের কাছেও দাঁড়াতে পারে না—আমাদের বরাত মন্দ—তাহা না হইলে আমরা পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তিশালী জাতি হইতাম। আমাদের দেশ—তাতে কত সুখ—কত শান্তি কত তৃপ্তি, এমন দেশ ছেড়ে আমি বিদেশে থাকিব—বিজাতীয়াকে বিবাহ করিব? যে তাহা ভাবিয়াছে—সে জানে না, আমার কাছে দেশ কত পবিত্র, কত মহান্, কত সুন্দর। আর কি লিখিব আপনি আমায় বিশ্বাস করেন। ভাল আছি ইতি—

সেবক—সিদ্ধু।

মা আমার।

ভৈরবী।

আমরি মরি কিরূপ ধরি
এসেছ মা—মা আমার!
হৃদয় উজল করি
জ্যোতি অপরূপে ভরি,
বারেক দাঁড়াও
প্রণমি গো মা আমার।

তোমারি ভালে তপন জ্বলে
তোমারি হাসি ফুটে কমলে
তোমারি প্রভা জগতীতলে
প্রণমি গো মা আমার।

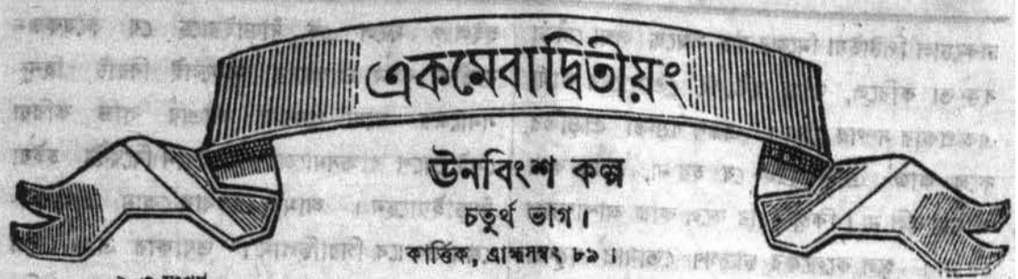

উনবিংশ কল্প
চতুর্থ ভাগ।
কার্ত্তিক, ব্রাহ্মসম্বৎ ৮৯।
২০৩ সংখ্যা
১৮৪০ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা।

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং প্রতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং॥
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমমিতমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"

ব্রাহ্মসমাজ ও প্রচারক।

ব্রাহ্মসমাজ যে প্রকৃতপক্ষে হিন্দুসমাজ, ইহা বলিতে গেলে সকল সম্প্রদায়েরই ব্রহ্মোপাসকের প্রাণে উপলব্ধ হইতেছে বলিয়া মনে হয়। এখন আর সহজে কোন ব্রাহ্ম স্বীকার করিতে চাহেন না যে তিনি হিন্দু নহেন। তুমি বলিবে যে তাহা রাজনৈতিক হিসাবে। আমরা বলিব তাহা নহে। মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতি অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরা হিন্দুস্থানবাসী বলিয়া কি আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেয়? তাহারা আপনাদিগকে ভারতবর্ষীয় বলিতে অসম্মত হইবে না, কিন্তু তাহারা কখনই আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে স্বীকার করিবে না। বেশ করিয়া ভাবিয়া দেখিলেই উপলব্ধি হইবে যে ব্রাহ্মসমাজ প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্মোপাসক হিন্দুগণেরই একটী সমাজ। এই ব্রহ্মোপাসক হিন্দুগণের ভিতর কেহ বা জাতিভেদ মানেন না, আর কেহ বা সমাজের হিতজনক মনে করিয়া জাতিভেদ স্বীকার করেন। ইহাতে কিছু আসে যায় না। ইহা সত্ত্বেও আমরা বলের সহিত বলিব যে ব্রাহ্মসমাজ প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মোপাসক হিন্দুদেরই সমাজ। মূর্ত্তি-উপাসক হিন্দুদিগেরই ভিতর কি এইরূপ নানা মতাবলম্বী লোক স্থান পায় নাই? যে ছুঁই-ছুঁই ভাব ভারতের সর্ব্বনাশ করিয়াছে ও করিতেছে, জাতিভেদের মূল সেই ছুঁই-ছুঁই ভাব হিন্দুগণ পুরীধামে কেমন সহজে পরিত্যাগ করে। ইহা বৌদ্ধ প্রভাবের ফলই হউক বা অন্য যে কোন প্রভাবের ফলই হউক, তাহা বিচার করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমরা দেখাইতে চাই যে, অনেকে যে বলেন যে জাতিভেদ হিন্দুধর্ম্মের অন্যতর ভিত্তি—সেটী একটী মস্ত ভুল। আসল কথা এই যে, সমাজের নেতা বা ধর্ম্মবক্তাগণের ব্যক্তিগত প্রভাবের উপর সমাজের ভাব অনেকটা নির্ভর করে। বুদ্ধই হউন বা চৈতন্যদেবই হউন, ইহাঁদের কাহারও না কাহারও প্রভাবে পুরীধামে জাতিভেদের প্রভাব, বিদূরিত হইতে পারিয়াছিল। সেইরূপ ব্রাহ্মসমাজের নেতাগণের উপদেশে ও চরিত্রে যদি জ্ঞানের প্রভাব ভক্তির প্রভাব, প্রেমের প্রভাব খুব বেশী মাত্রায় থাকে—এতটা থাকে যে তাঁহাদের কথা উপদেশ জনসাধারণের হৃদয়ে দিবানিশি ঝঙ্কার দিতে থাকিবে, তবেই না ব্রাহ্মসমাজের ভিতরেও জাতিভেদ স্থান পাইতে পারিবে না। কিন্তু জাতিভেদ প্রভৃতি সামাজিক বিষয়ে ব্রাহ্মগণ সকলেই একমত হইতে পারুন বা নাই পারুন, আমরা ব্রাহ্মসমাজকে ব্রহ্মোপাসক হিন্দুগণের সমাজের অতিরিক্ত অন্য কোন সমাজ বলিতে পারিব না।

এখন দেখিতে হইবে যে কি উপায়ে হিন্দুসমাজের অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের মত প্রবেশ করানো যাইতে পারে। তোমরা মনে কর যে কলিকাতা সহরে বা কয়েকটী বড় বড় সহরে

ঢাকঢোল পিটাইয়া নিজের মত সম্বন্ধে লম্বা-চৌড়া বক্তৃতা করিলে, তাহা হইলেই তোমাদের কার্য্য একপ্রকার সম্পন্ন হইল। এরূপ বক্তৃতা প্রভৃতির ফলে কাজ একেবারেই যে হয় না, এমন কথা আমরা বলি না। কিন্তু ইহার ফলে কাজ আশানুরূপ হয় না। স্কুল কলেজের ছাত্রগণ তোমার বক্তৃতা শুনিয়া মনে স্থির জানিল যে ব্রাহ্মসমাজের মত ঠিক। কিন্তু যেই তাহারা সেই পল্লীগ্রামের দলাদলির ভিতর মোড়লির ভিতর গিয়া পড়িল, তখন পর্ব্বত-সমান বাধা দেখিয়া বলিল—'কাজ কি বাপু, আমার ঠিক করিয়া—কোন্ ধর্ম্ম ঠিক আর কোন ধর্ম্ম বেঠিক; আমার চুপচাপ করিয়া গতানুগতিকের মত থাকাই ভাল'। কিন্তু তোমরা যদি তোমাদের কথায়, কাজে, চরিত্রে, তোমাদের জীবনের প্রত্যেক খুঁটিনাটিতে এমনভাবে চল যে তোমাদের প্রতি নিশ্বাস জনসাধারণেরও হৃদয়ে ঝঙ্কার তুলিতে পারিবে, তাহা হইলে কি আর প্রচারের ভাবনা ভাবিতে হয়? উপযুক্তমত ঢেউয়ের ফাঁপ তুলিতে পারিলে যেমন সমস্ত জলটাই ক্রমে ফাঁপিয়া উঠে, সেই রকম জনসাধারণের হৃদয়ে প্রেমের ভক্তির জ্ঞানের ফাঁপ উঠাও, সমস্ত লোক তোমার গোলাম হইয়া পড়িবে।

এই কথাটী এখানে বলার উদ্দেশ্য—ব্রাহ্ম-দিগকে তাঁহাদের প্রথম উদ্যমের ভুল দেখাইয়া দেওয়া। আমরা শুনিয়াছি যে বঙ্গের উত্তর ভাগে অবস্থিত কোন দেশে একজন ব্রাহ্ম প্রচারক গেলেন। তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া অনেকে ব্রাহ্ম হইলেন। কিন্তু প্রচারক মহাশয়ের ভয় হইল যে পাছে তাঁহারা আবার হিন্দু হইয়া যান। তাই তিনি স্থির করিলেন যে এমন একটী উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, যাহার ফলে সেই নূতন ব্রাহ্মদিগকে হিন্দুগণ আর ফিরিয়া না লইতে পারে, তাহা হই-লেই সেই ব্রাহ্মেরা "জাত-ব্রাহ্মে" পরিণত হইবে এবং ব্রাহ্মদের দলপুষ্টি হইবে। অনেক ভাবিয়া ভাবিয়া ঠিক করিলেন যে নূতন ব্রাহ্মদিগকে কুকুট সেবন করাইতে হইবে এবং হিন্দুরা যখন পাঁঠা খায়, তখন নূতন ব্রাহ্মদিগকে পাঁঠা খাওয়াইতে হইবে। তাঁহার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি তাহার ফল আসলে কি ভাল হইল? ফলে এই দাঁড়াইয়াছে যে কয়েকজন ব্যতীত নূতন ব্রাহ্মদের সকলেই বিরাট হিন্দু-সমাজের মধ্যে পুনরায় আশ্রয় লাভ করিয়া সেই দেশে ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্বপ্রধান বিদ্বেষ্টা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। আমরা একবার কোন ব্রাহ্মসমা-জের উৎসবে গিয়াছিলাম। তথাকার ব্রাহ্ম নেতা আমাদের জন্য এবং অবশ্য নিজেরও জন্য নানাবিধ অখাদ্য কুখাদ্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আমরা কিন্তু সে সকল খাইয়া জনসাধারণের হৃদয়ে বেসুরা তান জাগাইয়া তোলা অপেক্ষা ঋষিপ্রদিষ্ট আতপ তণ্ডুলের অন্ন এবং সুবাসপূর্ণ গব্যঘৃত প্রভৃতি সেবন করিয়া যেমন নিজেদেরও উপকার সাধন করিয়া-ছিলাম, জীবহিংসার পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিলাম, সেইরূপ স্থানীয় লোকদিগেরও শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। বর্ত্ত-মানে সেই স্থানীয় নেতাই সর্ব্বাপেক্ষা ব্রাহ্মবিদ্বেষ্টা হইয়াছেন। আরও একটী দৃষ্টান্ত দিব। একবার কোন ব্রাহ্মনেতা আমাদের সঙ্গে বিদেশে যাইতে-ছিলেন। তিনি জাতিভেদ মানেন না, ইহাই দেখাইবার জন্য "পাণিপাঁড়ে"কে পরিত্যাগ করিয়া এক ভিস্তিকে ডাকাইয়া তাহার মশকের জল পান করিয়া অধিকতর তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু সহযাত্রীদিগের হৃদয়ে কি অপূর্ব্ব ভাব উত্থিত হইয়া-ছিল তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে। এখন আর সে রকল ভুল করিলে চলিবে না। এখন ব্রাহ্ম-প্রচারকদিগের অপেক্ষা জনসাধারণের অনেকে নানাবিষয়ে অনেক উন্নত হইয়াছেন। এখন তাঁহা-দের মনে ঠিক করিয়া চলা উচিত যে তাঁহাদের উপদেশ কাজ চরিত্র প্রভৃতি জীবনের প্রত্যেক বিষয়ের অণুপরমাণু পর্য্যন্ত নানাভাবে সমালোচিত হইবে। এই কারণে যাঁহাকে তাঁহাকে ধরিয়া প্রচারক সাজাইয়া প্রচার কার্য্যে পাঠানো উচিত নহে। সুদীর্ঘ পরীক্ষার পর যাঁহারা সকল বিষয়ে উত্তীর্ণ হইবেন, যাঁহারা ছয় রিপুর সংযমসাধনে কৃত-কার্য্য হইয়াছেন দেখা যাইবে, তাঁহাদিগকেই প্রচা-রকপদে নিযুক্ত করা উচিত।

এইবারে দেখা যাউক যে কি উপায়ে প্রচারক-দিগের দ্বারা প্রচারকার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে। আমরা যতই আলোচনা করিয়াছি ও করিতেছি,

আমাদের অভিজ্ঞতা যতই বাড়িতেছে, ততই আমাদের হৃদয়ে বসিয়া যাইতেছে যে রাজা রামমোহন রায়ের প্রদর্শিত প্রচারপ্রণালীই সকল কালে সকল অবস্থায় সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী। সেই প্রণালীকে অবশ্য প্রত্যেক সময়ের ও প্রত্যেক অবস্থার জন্য এক আধটু পরিবর্ত্তিত করিয়া লইবার আমরা বিরোধী নহি। আমাদের কথা এই যে রামমোহন প্রদর্শিত প্রচারপ্রণালীর মূলতত্ত্ব অবলম্বনে আমাদেরও প্রচারব্রত গ্রহণ করিতে হইবে।

সেই প্রচারের সর্ব্বপ্রথম মূলমন্ত্র আমাদের পরস্পরের মধ্যে হিংসা দ্বেষ বিসম্বাদ পরিত্যাগ করা। বর্ত্তমানে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে তিনটী শাখা যে তিনদিকে বাড়িয়া চলিতেছে, তাহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। তিনটী শাখা তিন দিকে বাড়িয়া চলুক তাহাতে কাহারও আপত্তি নাই এবং হইতেও পারে না। কলিকাতা সহরে এবং কয়েকটী বড় বড় সহরে এই তিনটী শাখার পরস্পরের মধ্যে আংশিক বিরুদ্ধভাব প্রচারিত আছে। কিন্তু মফঃস্বলে সাধারণ লোকের ভিতর ইহার পরিচয় আছে কি না সন্দেহ। এখন যদি মফঃস্বলে তিন শাখার আমরা তিনটী প্রচারক গিয়া নানা উপায়ে, এমনকি, মিথ্যা কথা বলিয়া পরস্পরের বিনাশের উপায় ঠিক করিয়া দিই, তাহা হইলে আমরা ভাবি না যে আমাদের মূল—যাহার কথা বলিয়া এত বড় হইতে পারিয়াছি, সেই ব্রাহ্মসমাজেরই অস্তিত্ব একদিন অন্তর্হিত হইবে। ব্রাহ্মসমাজের এক শাখার কোন প্রচারক অপর এক শাখাকে পৌত্তলিক প্রভৃতি নানা আখ্যা দিয়া গালালালি করেন। ইহার ফলে অপমানিত শাখার বিশেষ কোন ক্ষতি হইবে বলিয়া মনে করি না; কিন্তু সেই প্রচারক মহাশয়ের নিজের এবং তিনি যে শাখার প্রচারক সেই শাখারই পরিণামে বিশেষ অনিষ্ট হওয়া সম্ভব। তিন শাখা যদি নিজের নিজের শাখার অবলম্বিত সামাজিক মত প্রচার করেন তাহাতে কাহারও আপত্তি করিবার কিছু নাই। কিন্তু কটুকথায় অপরের অবলম্বিত মতের সমালোচনা করিলে হিংসাদ্বেষ বাড়ে বই কমে না। ফলে যে শাখায় উপবেশন সেই শাখার মূলোচ্ছেদন হয়। তিন শাখারই একমত হইয়া সত্য সত্য একপ্রাণে ব্রহ্মজ্ঞান প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজের মূলতত্ত্ব প্রচার করা সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য।

তার পর উচিত হইতেছে যে আমাদের তিন শাখার প্রকৃত নেতাদের মধ্যে সম্মিলনের উপায় বৃদ্ধি। সময়ে অসময়ে সুবিধা পাইলেই তাঁহাদের পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া ব্রাহ্মসমাজের উন্নতিকল্পে আলাপ আলোচনা করা উচিত। জাতিভেদ প্রভৃতি যে সকল বিষয়ে তিনশাখার মতভেদ আছে, সে সকল বিষয়ও আলোচিত হইতে পারে; কিন্তু যেই সে আলোচনার মধ্যে এতটুকু বিবাদের সম্ভাবনা বা কটুরসের আবির্ভাব দেখা যাইবে অমনি সে বিষয় আলোচনা বন্ধ করিতে হইবে।

এই প্রকারে আমাদের আপনাদের মধ্যে প্রীতি বাড়িতে থাকিলে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি জনসাধারণেরও প্রীতি বাড়িবে। তার উপর আমাদেরও উচিত যাহাতে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি জনসাধারণের প্রীতি ও সদ্ভাব বর্দ্ধিত হয় তাহার উপায় সকল অবলম্বন করা। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ একবার সদ্য সদ্য যাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষা গৃহীত হয় তাহার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। পরিষদের নব্যদল বলিলেন—এখনি এক দরখাস্ত করা হউক যে বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষাকে গ্রহণ করিতেই হইবে, কারণ ইহা একটী স্বতঃসিদ্ধ সত্য। সেই সময়ে প্রবীণ সুবিজ্ঞ পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ভাগ্যবশত একদিকে বিশ্ববিদ্যালয়েরও ভাইসচ্যান্সেলর ছিলেন, অপরদিকে সাহিত্য পরিষদেরও সহকারী সভাপতি ছিলেন। তাঁহার ন্যায় সুদক্ষ নেতা পাওয়া দুর্ঘট। তিনি বঙ্গভাষাকে গ্রহণ করিবার জন্য দরখাস্ত উপলক্ষে বেশ একটী কথা বলেছিলেন, তাহা আজও আমাদের কানে বাজিতেছে। তিনি বলিলেন যে এ সকল বিষয়ে এরকম জোরজবরদস্তি করিলে বা ব্যস্ত হইলে চলিবে না; বঙ্গভাষা আমাদের মাতৃভাষা বলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহা গ্রহণ করার কর্ত্তব্যতাও যেমন সত্য, বিশ্ববিদ্যালয় যাহাতে তাহা গ্রহণ করে তাহার যথাযুক্ত উপায় অবলম্বন করিবার কর্ত্তব্যতাও তেমনি সত্য। আমরাও গুরুদাস বাবুর সেই কথারই প্রতিধ্বনি করিয়া ব্রাহ্মসাধারণকে এই কথা বুঝাইতে চাহি যে

আমাদের নিজেদের ব্রহ্মজ্ঞানের উপর দাঁড়াইয়া আপনাদিগকে প্রকৃত ধর্ম্মের পথে ব্রহ্মের পথে পরিচালিত করার কর্ত্তব্যতাও যেমন সত্য, জনসাধারণকেও সেই পথে আকৃষ্ট করিবার উপায় অবলম্বনেরও কর্ত্তব্যতা তেমনি সত্য। একথা বলিলে চলিবে না যে আমরা তো ঠিক আছি, অন্য কেহ আমাদের দলে আসুক বা না আসুক। আমরা ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে একথা ঠিক বলিয়া মনে করি না। প্রথমত, ঐতিহাসিক দিক দিয়া দেখিলে কখনই ইহা টিকিতে পারিবে না। গীতার সময়, তন্ত্রের সময়, চৈতন্যদেবের সময় কি হিন্দু সমাজ বিস্তৃতি লাভ করে নাই? এই বিস্তৃতি লাভের অর্থই তো এই যে, ঐ সকল সময়ে হিন্দুধর্ম্ম অন্যান্য নিম্নশ্রেণীর উপধর্ম্মসমূহকে গ্রাস করিতেছিল। ইতিহাসের দিক ছাড়িয়া দিয়া প্রকৃত ধর্ম্মের কেন্দ্রে দাঁড়াইয়া দেখিলেও বুঝিব যে ব্রাহ্মদের পক্ষে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রাণের সঙ্গে সজোরে প্রচার না করিলে অন্যায় হয়, অধর্ম্ম হয়। এ বেশ মজার কথা যে, তুমি যে ধর্ম্ম লাভ করিয়া হৃদয়ে শান্তি পাইলে, অপরের হৃদয়ে সেই শান্তি দিবার কোনই উপায় করিতে চাও না। ইহা স্থির যে, সমাজে থাকিতে গেলেই অপরের সুখে, অপরের স্বাস্থ্যে তোমার স্বাস্থ্য, তোমার সুখশান্তি এবং অপরের দুঃখে কষ্টে নিশ্চয়ই তোমার দুঃখ কষ্ট। তোমার গ্রামে যদি মহামারী লাগে, তবে সেই মহামারীর প্রতিবিধানের উপায় না করিলে তোমার নিজেরও অনিষ্টের আশঙ্কা অবশ্যম্ভাবী। সেইরূপ তোমার চতুর্দ্দিকে যে সকল অনিষ্টকর উপধর্ম্মসমূহ বিরাজমান, সে সকল ধর্ম্মকে তোমার সত্যধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা না করিলে তোমার সমাজকে নিশ্চয়ই সেই অনিষ্টকর উপধর্ম্মসমূহের সহিত একটা যোগ-সাজোস compromise করিয়া লইয়া বাস করিতে হইবে। মূর্ত্তিপূজা স্বার্থের দিক দিয়া যে কেমন করিয়া প্রচার হইতে পারে তাহার পরিচয় অনেক সময়েই আমরা পাই। আমরা দেখিয়াছি যে পূজারিদের হ্যাপায় পড়িয়া হয়তো এক ব্যক্তি বিশেষ কোন মূর্ত্তির পূজা করিয়া জুয়াখেলায় প্রবৃত্ত হইল এবং ঘটনাচক্রে কিছু লাভও করিল। তাহার বিশ্বাস দাঁড়াইয়া গেল যে, সেই দেবতার দয়াতে সে লাভ করিল। তাহার দেখাদেখি আরও একজন সেই দেবতার পূজা করিয়া জুয়া খেলিল বটে, কিন্তু কিছুই লাভ করিতে পারিল না। তাহাতে সে অবশ্য দেবতার উপর কোন দোষারোপ করিল না, আপনার অদৃষ্টেরই উপর দোষ দিতে লাগিল। সে মনে মনে আশা পোষণ করিল, হয়তো বারান্তরে দেবতা তাহার প্রতি সুপ্রসন্ন হইবেন। এই প্রকারে স্বার্থই ভারতে মূর্ত্তিপূজা প্রচারের অন্যতর কারণ হইয়াছে। কিন্তু সত্যধর্ম্ম ঠিক সে ভাবে প্রচার করিতে পারা যায় না। সত্যধর্ম্মের সত্যভাব বুঝাইয়া লোকসকলকে সত্যধর্ম্ম অবলম্বন করাইতে হইবে। কাজেই সত্যধর্ম্মের প্রচার চাই—শিক্ষিত অথচ ভক্তিমান "তৃণ হইতেও সুনীচ" প্রচারকের দ্বারা প্রচার করানো চাই।

প্রচার কি ভাবে করিতে হইবে? প্রচারের মূল নিয়মই হইল—"যেখানে যেমন সেখানে তেমন"। একটা কাটাছাঁটা নিয়ম হইতেই পারে না যে সকল স্থানে সকল অবস্থায় একই ভাবে প্রচার করিতে হইবে। এইখানে প্রকৃতির ভিতর দিয়া দেখা যাক। এই যে গাছপালা জীবজন্তু আছে—ইহাদের জীবনধারণের মূলমন্ত্র হইল ক্ষুধানিবৃত্তি। সেই ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য কোন গাছ বা খুব আলগা ভূমির ভিতর দিয়া রস টানে, কোন গাছ বা পাথুরে জায়গা ভেদ করিয়া রস না টানিলে বাঁচিতে পারে না; কোন প্রাণী বা সমস্ত দিনই ঘাসপাতা খাইয়া জীবনধারণ করে, কোন প্রাণী বা কেবলমাত্র মাংস খাইয়াই থাকে। ইহাদের কোনটির প্রকৃতি বদলাইতে গেলে তাহাদের বংশবৃদ্ধি করাইয়া পুরুষানুক্রমে চেষ্টা করিতে হইবে, মনে করিলাম আর হিমালয়জাত গাছকে বাঙ্গালার গাছ করিয়া লইলাম, তাহা হইতে পারে না। সেইরূপ যে সত্যধর্ম্ম মানবমাত্রেরই জীবন, সেই সত্যধর্ম্ম লোককে দিতে গেলে স্থান কাল ও অবস্থা বুঝিয়া উপায় ধরিতে হইবে। হিন্দুদের কাছে বাইবেল কোরাণ দেখাইলে অথবা খৃষ্টান মুসলমানদিগের কাছে বেদ উপনিষদের কথা বলিলে, অশিক্ষিত লোকের কাছে সেক্ষপীয়র কালিদাসের কথা, অথবা শিক্ষিত লোকের কাছে দিনরাত্রি গ্রাম্য কথা বলিলে চলিবে

কেন? এইরূপ অবস্থা বুঝিয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা করাকেই আমরা "দেশীয়ভাবে" প্রচার করা বলি। আমরা বিদ্বেষভাবে বলিতেছি না, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস আলোচনা করিলে বুঝিতে পারি যে এই "দেশীয়ভাবে" প্রচার করিবার অভাবেই ব্রাহ্মসমাজ এদেশে আশানুরূপ শক্তিশালী হইতে পারে নাই। যে মানবাত্মার স্বাধীনতা সকল মনুষ্যেরই সাধারণ সম্পত্তি, যে পরমাত্মা প্রত্যেক মনুষ্যেরই উপাস্য দেবতা, ব্রাহ্মসমাজ যখন সেই স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছেন, সেই দেবতারই উপাসনার কর্ত্তব্যতা প্রচার করিতেছেন, তখন ব্রাহ্মসমাজ প্রত্যেক মনুষ্যেরই হৃদয়ে ঝঙ্কার আনয়ন করিবে বলিয়া আশা করিতে পারিতাম। কেবল অযোগ্য প্রণালী অবলম্বনের ফলেই আমরা সেই ঝঙ্কার আনিতে পারিতেছি না বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। রাজা রামমোহন রায় যে প্রণালী আমাদিগকে দেখাইয়া গিয়াছেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয় স্থাপন, বিদ্যালয়ে বঙ্গভাষা দ্বারা ধর্ম্ম ও বিদ্যাশিক্ষা দিবার প্রণালী প্রবর্ত্তন, বেদ উপনিষৎ প্রভৃতি অবলম্বনে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার প্রভৃতি "দেশীয় ভাবে" সত্যধর্ম্ম প্রচারের যে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, সে প্রণালী আমরা সকলে সমবেতভাবে অবলম্বন করিলে, আমাদের বেশ মনে হয় যে আমরা অন্তত ভারতবর্ষকে ব্রাহ্মধর্ম্মের ভাবে আচ্ছাদিত করিতে পারিতাম। আমরা জানি যে এবিষয়ে মতভেদ আছে। কিন্তু পরীক্ষার ফলে আমরা যাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি তাহাই এখানে উল্লেখ করিলাম।

এইভাবে প্রচার কার্য্যের জন্য উপযুক্ত প্রচারক রাখিতে গেলে অর্থ আবশ্যক। আমরা যদি ব্রাহ্মসমাজকে সত্য সত্য প্রাণের সহিত ভাল বাসি, যদি সত্যই আমরা চাই যে সকলে ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করুক, তবে সোজা কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় ইহার জন্য টাকা চাই। আমরা কাহাকেও ভয়ানক কষ্ট করিয়া এই টাকা দিতে বলি না। আমরা এই একটী ইঙ্গিত করিতেছি যে যেমন সকল দোকানেই একটী বৃত্তি ধরিয়া লয়—এক টাকার জিনিস কিনিলে দু-এক পয়সা বৃত্তি দিতে হয়, এবং সেই বৃত্তি দ্বারা সময়ে রক্ষাকালী পূজা, বারইয়ারি পূজা প্রভৃতি কার্য্যের অনুষ্ঠান হয়, সেই রকম যদি প্রত্যেক ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মসমাজের হিতৈষী বন্ধু নিজের নিজের আয়ের অতি সামান্য কিন্তু নির্দ্দিষ্ট অংশও ব্রাহ্মসমাজের জন্য রাখিয়া দিয়া মাসান্তে কিম্বা বৎসরান্তে ব্রাহ্মসমাজে পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে যে আশাতীত মহান্ কার্য্য সাধিত হইতে পারে। ধরা যাক যে আমি মাসে ৩০৲ টাকা মাহিনা পাই; যদি স্থির করি যে প্রতি টাকায় আধ পয়সা মাত্র ব্রাহ্মসমাজে দিব, তাহা হইলে আমার অবশ্য আয়ের ১২৮ ভাগের একভাগ মাত্র দেওয়া হইল, আমার তাহাতে কিছুমাত্র কষ্ট হইল না, কিন্তু বৎসরে প্রায় ৩৲ টাকা ব্রাহ্মসমাজ পাইল। এইরূপ সকলে করিলে ব্রাহ্মসমাজের আয়ও যথেষ্ট হইতে পারে এবং ব্রাহ্মসমাজ যথাযোগ্য প্রচারকও নিযুক্ত করিতে পারে। এইরূপ প্রচারকের দ্বারা জনসমাজ যখন বিশেষ উপকৃত হইতেছে দেখিব, তখন আমাদেরও আনন্দের পরিসীমা থাকিবে না এবং ভগবানেরও নামে জয়ধ্বনি সুবিস্তৃত গগন ভেদ করিয়া দিবানিশি উত্থিত হইবে।

দেহ-রূপান্তর।

(শ্রীপ্রসন্নময়ী দেবী)

নাহি জাতি, নাহি বর্ণ, নাহি গোত্র গাঁই,
মৃত্যুর শীতল স্পর্শে শূন্য সব ঠাঁই;
সর্ব্বত্যাগী রত্নদেহ সমাধি-মগন
চাহিবে না কভু পুনঃ মেলিয়া নয়ন।
অনন্ত নিদ্রার কোলে অনন্ত শয়ানে
যোগাসনে যোগীবর সমাহিত ধ্যানে,
অশরীরী আত্মা থাকে দেহে প্রীতিযোগে
কত স্নেহ ভালবাসা সম্মিলন-ভোগে;
দেহের সৌন্দর্য্য শোভা করিতে বিকাশ,
জীবদেহে পরমাত্মা প্রেমে পরকাশ;
পার্থিব কায়ার মায়া করি পরিহার
আত্মা যায় দিব্যলোকে ছাড়ি দেহভার,
সুকুমার শিশুরূপে নব কলেবরে
আবার নবীন জন্ম লভিবার তরে;
জননীর স্তন্য-সুধা জন্মান্তের স্মৃতি
যখনি অন্তরে জাগে ছাড়ি যায় ক্ষিতি;—
সে-ত নহে মৃত্যু, সে যে দেহ-রূপান্তর,
বিচ্ছেদ মিলন বহি ভ্রমে চরাচর।

চিত্র-দর্শন।

(শ্রীযামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়)

লোকে প্রায়ই এ কথা বলিয়া থাকে যে প্রত্যেক মনুষ্যের অন্তত এটুকু জ্ঞান বা রসবোধ আছে, যাহার সাহায্যে সে সুন্দর বস্তুর সৌন্দর্য্যটুকু ধরিতে পারে। অথচ ছবি যে প্রণালীতে দেখা উচিত সে প্রণালীর সঙ্গে আমরা কোনই পরিচয় রাখিতে চাহি না। আমরা মনে করি যে ছবি দেখা খুবই সহজ—তাহার জন্য আবার বিশেষ শিক্ষার কি প্রয়োজন? গাছপালা, বাড়ীঘরদুয়ার মানুষজানোয়ার প্রভৃতি—এ সকল তো প্রতিদিনই দেখিতেছি—ছবিতে তো এই সকলেরই প্রতিমূর্ত্তি? এই ছবি দেখা তবে কঠিন কিসে? বাস্তবিকই ছবি আঁকা তেমন কঠিন নয়, কিন্তু ছবি দেখিতে শেখা ও তাহার ভালমন্দ বিচার করা বড়ই কঠিন।

একটা ছবি ঠিক্ রকমে দেখা মোটেই সহজ নয়। সকল ছবি একই দৃষ্টিতে দেখিলে চলিবে না। অনেকে হয়তো মনে করিতে পারেন যে ছবি দেখিবার ভিতর আবার এ-দৃষ্টি ও-দৃষ্টি কি—ছবি তো ছবিই? কিন্তু তা নয়। ছবি বলিতে গেলে প্রত্যেক চিত্রশিল্পীর আপনার আপনার বিশেষ ভাষা। তাই সকল ছবি একই দৃষ্টিতে দেখিলে চলে না।

ছবি দেখিবার দুইটী নিয়ম আছে। ছবি দেখিবার সময় সেই দুইটী নিয়ম বরাবর মনে রাখা দরকার। প্রথমত, আমরা নিজে যে চক্ষে প্রকৃতিকে দেখি, সেটা ভুলিতে হইবে। দ্বিতীয়ত, চিত্রকর নিজে যে ভাবে প্রকৃতিকে দেখিয়াছেন সেই ভাবটী বুঝিয়া আমাদের প্রাণের ভিতর তাহা মিশাইয়া লইতে হইবে।

চিত্রকর তাঁহার নিজের সমুদয় বিদ্যাবুদ্ধি কারিগুরি খাটাইয়া একটা ছবি আঁকিলেন, আঁকিয়া দেওয়ালে ঝুলাইয়া দিলেন। ছবিখানি বোবা নিস্পন্দ ভাবে ঝুলিয়া রহিল। দর্শকদের মধ্যে যাঁহার প্রাণে ছবির বিচিত্রভাব সায় পাইল, তিনি ছবির প্রশংসা করিলেন। যাঁহার প্রাণে ছবির ভাব সায় পাইল না, তিনি ছবির নিন্দা করিলেন। ছবিখানি কাহারও কোন কথার প্রতিবাদ করিল না বটে, কিন্তু তাহার ভিতর যে শিল্প জাজ্বল্যমান, সেটা বোবা নহে, সেটা কথা কহিতে জানে। তাহার ভিতরে একটা গূঢ় ভাষার অস্তিত্ব দেখা যায়। সেই ভাষা বুঝিবার জন্য বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন।

প্রকৃত শিল্প কোন প্রকার প্রশংসার ভিক্ষাপ্রার্থী নহে। প্রকৃত শিল্প কেবল এইটুকু চায় যে যাঁহারা তাহার সংশ্রবে আসিতে চাহেন, তাঁহারা তাহার ভাষার অর্থ বুঝিবার চেষ্টা করুন; কোন্ মূলসূত্র তাহার ভিতরে কার্য্য করিতেছে, সেইটুকু ধরিবার চেষ্টা করুন। দর্শকগণের ছবি সম্বন্ধে কেবল লেনদেনের ব্যবস্থা করিলে চলিবে না—চিত্রকরের সঙ্গে তাঁহাদের ছবির সৌন্দর্য্য উপলব্ধি-বিষয়ে অংশীদার হইতে হইবে। ছবির ভাষা বুঝিতে চাহিলে চিত্রকরের ভিতরে আপনাকে প্রবেশ করাইতে হইবে—তাঁহার সহিত পৃথক্ হইয়া থাকিলে চলিবে না। শিল্পীকে সাথের সাথী, অন্ধের যষ্টি করিয়া না লইলে চিত্রের গূঢ় তত্ত্বটীকে, চিত্রনিহিত সেই বোবার ভাষাটীকে কোন মতেই বুঝা যাইবে না। সেই কারণে একটী ছবিকে নিন্দা বা প্রশংসা করিতে গেলে, তাহার ভালমন্দ বিচার করিতে গেলে কি প্রকার পর্ব্বতসমান বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া যে ছবিটী জন্মলাভ করিয়াছে, সেগুলিও মনেতে একবার আলোচনা করা কর্ত্তব্য।

ছবির ভালমন্দ বিচার করিবার পূর্ব্বে ছবি আঁকিবার সাধারণ নিয়মগুলি আমাদের জানা আবশ্যক। সেই সকল সাধারণ নিয়ম বিভিন্ন বিষয়ের—অঙ্কন, বর্ণ, রীতি ইত্যাদি। একটী ছবি দেখিতে গেলে আমাদের সর্ব্বাগ্রে দেখা আবশ্যক যে চিত্রকর কোন্ প্রণালী অবলম্বন করিয়া অঙ্কন প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে নৈপুণ্য দেখাইতে পারিয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে চিত্রকরের দোষগুণ বিচার করা এত কঠিন যে একরাশ ছবির ভিতর হইতে ভাল ছবি বাছিয়া বাহির করিবার সময় শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পীকেও অনেক সময়ে থমকাইয়া যাইতে হয়। চিত্রপ্রদর্শনীতে প্রদর্শিত চিত্রসমূহের ভিতর হইতে ভাল ছবি বাহির করিতে বলিলেই এই বিষয়ে বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়।

আমরা এই বারে অঙ্কন প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষভাবে দুইচারিটি কথা বলিব।

ছবিতে drawing বা রেখাঙ্কন যত নির্ভুল হয় ততই ভাল, একথা বোধ হয় কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। ভাল ছবি বাছিয়া বাহির করিতে গেলে সর্ব্বপ্রথম আমাদের দেখা উচিত যে কোন্ ছবিটীর অঙ্কন বা drawingটা নির্ভুল হয়েছে, কোন্ ছবিতে সেই প্রকার নির্ভুল আঁকাটীর ভিতর দৃঢ় হস্তের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তুলির কাজে একটা স্বাধীনভাব ও আত্মনির্ভরের ভাব প্রকাশ পাইতেছে। অনেক সময়ে বে-ঠিক্ অঙ্কন মহা-চিত্রীদের কাজেও দেখা যায়। অঙ্কনের দোষ হইতে বুঝা যায় যে রেখা-অঙ্কনে সেই মহাচিত্রীদের ভাল হাত ছিল না। তবে তাঁহাদের চিত্রের শিল্প-চাতুর্য্য এত বেশী যে তাহা দ্বারা তাঁহাদের অঙ্কন-দোষ অনেক স্থলেই ঢাকিয়া যায়—কেহ না দেখা-ইয়া দিলে সেগুলি নজরেই পড়ে না।

ভ্যানডাইক (Vandyke)এর চিত্রিত একটী রমণীর চিত্রে (Potrait of a lady) চক্ষু দুইটী দেখিলেই মনে হয় যেন উহার অঙ্কনে দোষ আছে—drawing ঠিক নাই। কিন্তু Vandykeএর ন্যায় মহাচিত্রী যখন ঐ প্রকার আঁকিয়াছেন, তখন কাজেই আমাদিগকে চিত্রকরের পক্ষ হইয়া বলিতে হয় যে চিত্রিত আদর্শে চক্ষের স্বাভাবিক দোষ থাকাতেই তাহা ঐ ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে।

দেহের কোন গঠনে স্বাভাবিক দোষ থাকিলেও তাহা চিত্রে কি ভাবে দেখানো যাইতে পারে, ভ্যালাস্‌ক্যিস (Valaesquis) তাঁহার "বামন" (Dwarf boy) ছবিতে তাহা স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। এই ছবিতে চিত্রিত নাক, চোখ, গাল প্রভৃতির গড়ন ও হাবভাব দেখিলেই শিল্পীর উদ্দেশ্য স্পষ্টই বুঝা যায়।

বটিচেলির (Botticelli) চিত্রিত "বসন্ত" (Spring) ছবিটীর প্রশংসাও আছে, নিন্দাও আছে। মোটামুটি চিত্র হিসাবে দেখিতে গেলে ইহাতে অনেক দোষ-গুণ পাওয়া যায়। রেখাঙ্কন বা drawing হিসাবে ছবিটী যে বড় সুবিধাজনক তাহা আমার মনে হয় না। শুনিয়াছি যে মূল চিত্রে নাকি রংয়ের বা বর্ণ-ফলনের যথেষ্ট কারিগুরি আছে। রেখাঙ্কন অনেক স্থানে ভ্রমপূর্ণ। ছবিতে কেন্দ্রস্থ central মূর্ত্তিটীই প্রধান। ইহাতে রেখাঙ্কনে দোষ থাকায় ছবির সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়াছে।

আবার এমনও ছবি দেখা যায়, যাহার হয়তো এক অংশে চিত্রকর আশ্চর্য্য গুণপনা দেখাইয়াছেন, কিন্তু হয়তো সেই চিত্রের অপর অংশ অবহেলার পরিচয় দিতেছে। Rebortএর "পরিবার" (Family group) চিত্র দেখ। চিত্রকর ছোট ছেলেদের চিত্রে যে কিরূপ সিদ্ধহস্ত এই চিত্রেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। এই ছবিখানি একটী পারিবারিক চিত্র। ছোট ছেলে তিনটীই এমন সুন্দর আঁকা হইয়াছে যে ইহাদের কাছে মাঝের মূর্ত্তিটী নিকৃষ্ট বলিয়া মনে হয়। এটী চিত্রকরের আলস্য ও অব-হেলার পরিচয় মাত্র।

ছবিতে রেখাঙ্কনের গুণপনা থাকিলে অন্য অনেক দোষ নজরে পড়ে না। Sir Frederick Leighton, Burne, Jones প্রভৃতির ছবিতে রেখাঙ্কন এত সুন্দর যে তাহার গুণে উহাদের চিত্রাঙ্কনের দোষ অনেক সময়ে চাপা পড়িয়া যায়।

এইবারে আমি রং বা বর্ণফলন বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু বলিব। চিত্রের সৌন্দর্য্যের সহিত বর্ণের সম্বন্ধ বলিতে গেলে একটী বৃহৎগ্রন্থ রচনা করিতে হয়। তদ্ব্যতীত সেগুলি বর্ণচিত্রের দ্বারা না বুঝা-ইতে পারিলে বিষয়টী বড়ই নীরস লাগিবে।

ভাল ছবিমাত্রেই রংএর কারিকুরি থাকে। ছবিতে রেখাঙ্কন যেমন একটী প্রধান অঙ্গ, রং ব্যবহারেরও কারিকুরি তেমনি আর একটী প্রধান অঙ্গ। অনেক সময় শিল্পী কোন একটী বিশেষ রং ব্যবহারের ফলে চিত্রের মূর্ত্তি প্রকাশ করেন। অনেক শিল্পী রংএর কারিকুরি দেখাইবার উদ্দে-শ্যেই ছবি আঁকেন। প্রকৃতিতে যে ভাবে রংএর ব্যবহার দেখা যায়, ছবিতে তাহা অপেক্ষা বেশী বর্ণ ফলানো ঠিক নহে। আমার মতে চিত্রে কতক-গুলি জ্বলজ্বলে রং ফলানোর সঙ্গে কথাবার্ত্তায় শপথ করা ও অভদ্র শব্দের ব্যবহারের তুলনা দেওয়া যাইতে পারে। অবশ্য যেখানে হীরাজহরৎ দেখা-ইতে হইবে সেখানে উজ্জ্বল রং ব্যবহার না করিলে কোন কাজই হয় না, কিন্তু তাই বলিয়া জ্বলজ্বলে রংসমূহের অযথা ব্যবহারে কোন চিত্রকে লুপ্ত-সৌন্দর্য্য হইতে দেওয়া উচিত নহে। ভাল ছবিতে

যে সকল রং ব্যবহৃত হয়, সেইগুলির যথাসঙ্গত ব্যবহারে একটী বর্ণসামঞ্জস্য ফুটিয়া উঠে।

বর্ণফলনের সঙ্গে value (প্রকৃতিনৈকট্য), technique (শিল্প কৌশল) ও style (রীতি) বা individuality'র (ব্যক্তিগত ভাবের) ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। চিত্রাঙ্কনে value বা প্রকৃতিনৈকট্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। ইহার অর্থ এই যে প্রকৃতিতে আলো ও ছায়ার যে একটী স্বাভাবিক সুর বা চেহারা দেখা যায়, ছবিতেও কোন সুর বা চেহারা সেই স্বাভাবিক ভাবকে অতিক্রম করিয়া যাইবে না। আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, সকল ছায়া সমান গভীর হইবে না অথবা সকল আলো সমান উজ্জ্বল হইবে না। ছবিতে সকল রংএর একটা সামঞ্জস্য থাকা দরকার। অযথা বেশী উজ্জ্বল বা অযথা বেশী ছায়া থাকিলে ছবির সুর বা চেহারা (tone) নষ্ট হইয়া যায়। ছবিতে সকল রংএর মাত্রার সামঞ্জস্য থাকা চাই—না থাকিলে ছবির সুরের মাধুর্য্য নষ্ট হয়।

Style বা রীতি কাহাকে বলে? প্রত্যেক ফুলের যেমন নিজের নিজের একটী সুন্দর রূপ বা গন্ধ থাকে, সেইরূপ প্রত্যেক মহাচিত্রীর অঙ্কিত চিত্রে এমন একটী অনির্ব্বচনীয় গুণ থাকে, যেটী আমাদের মনকে বিশেষভাবে সেই চিত্রের প্রতি আকর্ষণ করে। এই গুণটীকেই style বলে। বাঙ্গালায় ইহাকে ছবির রীতি বা ধরণ বা বিশেষত্ব বলা যাইতে পারে। প্রত্যেক প্রসিদ্ধ চিত্রকরেরই এক একটী নিজস্ব রীতি বা ধরণ আছে। যেমন প্রত্যেক পাকা হাতের লেখায় একটী নিজস্ব ভাব থাকে, চিত্রসম্বন্ধেও সেইরূপ প্রত্যেক মহাচিত্রীর এক একটী নিজস্ব ভাব পরিস্ফুট হয়। আঁকিবার ধরণ দেখিয়া কোন্ চিত্র কাহার চিত্রিত তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারা যায়। প্রাচীন মহাচিত্রীগণ তাঁহাদের চিত্রিত ছবিতে স্বাক্ষর করিতেন না, কারণ তাঁহারা ভাবিতেন যে তাঁহাদের ছবিই তাঁহাদের নাম ঘোষণা করিবে।

উপরে যাহা বলিয়া আসিলাম তাহা হইতেই বুঝা যাইবে যে ছবি আঁকিবার রীতি বা ধরণ নানা প্রকার। আমি এখানে প্রধান কয়েকটী রীতি সম্বন্ধে কিছু বলিব।

এই রীতি আবিষ্কার করিবার জন্য তিনটী উপায় অবলম্বন করিতে হয়—(১) তুলির কাজ এবং রং ফলাইবার প্রণালী; (২) mannerism পৌনঃপুনিকতা বা মুদ্রাদোষ, এবং (৩) বর্ণ বিশেষের প্রতি পক্ষপাত।

সুনিপুণ শিল্পীমাত্রেই নিজের নিজের নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুসরণ করিয়াই চিত্রে বর্ণফলন করিয়া থাকেন। সেই প্রণালী ভাল বা মন্দ, সে বিষয়ে সমালোচনা করিতে যাওয়া আমাদের উচিত নয়। যে কোন প্রণালী অবলম্বনে হউক চিত্রকর তাহা দ্বারা স্বীয় মনোভাব স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিতে পারিলেই তদ্বিষয়ে আমাদের বলিবার কিছুই থাকে না। যে বিষয়টা আমি ব্যক্ত করিতে চাহি, সেটা স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিতে পারিলেই হইল—সেই ব্যক্ত করিবার জন্য আমি কোন্ প্রণালী অবলম্বন করিলাম, তাহাতে কি আসিয়া গেল? যে ছবিতে শিল্পীর এই প্রকার স্ব-রচিত প্রণালীর বিশেষত্ব পাওয়া না যায়, সে ছবি কিছুই নয় বলিলেও চলে। যে ফুলের সুগন্ধে তাহার নিজের বিশেষত্ব না থাকে, সে ফুল কোথায় আদর পাইবে? শিল্পীর বিশেষত্ববিহীন চিত্রে অন্যান্য নানা বিষয়ের কারিগরি থাকিলেও তাহাতে একটী প্রধান বস্তুর অভাব থাকিয়া যায়।

এখন চিত্রে মুদ্রাদোষ কি? যখন কোন চিত্রকর তাঁহার সকল চিত্রেই একটী ভাব পুনঃ পুনঃ ব্যক্ত করিতে চাহেন, তখনই সেই সকল চিত্রে শিল্পীর মুদ্রাদোষ বা পৌনঃপুনিকতা (mannerism) প্রকাশ পায় বলিয়া আমরা বলি।

এতক্ষণে আমরা চিত্রের রীতি কি এবং সেই রীতি আবিষ্কার করিতে গেলে কোন্ কোন্ বিষয় বিচার করিয়া দেখিতে হইবে তাহা বলিয়া আসিলাম। মহাচিত্রীগণের চিত্রসমূহে তাঁহাদের প্রত্যেকের নিজের নিজের এক একটী বিশেষ রীতি প্রকাশ পায় বলিয়া বর্ত্তমান কালে নব্য শিল্পীগণের মধ্যে একটা বিশেষ চেষ্টা দেখা যায় যে তাঁহাদের চিত্রগুলিতে কে কত রকম-বেরকমের রীতি প্রকাশ করিতে পারেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য কেবল—"একটা নতুন কিছু কর।" তাহার ফলে ছবির

সৌন্দর্য্য রহিল অথবা রহিল না, সেদিকে তাঁহাদের বড় একটা লক্ষ্য থাকে না। তাঁহারা হয়তো মনে করেন যে আজকালকার চিত্রপ্রদর্শনীতে একটা কোন রকমের নূতনত্ব দেখাইতে না পারিলে তাঁহাদের ছবিগুলি মোটেই আমল পাইবে না। এই অযথা নূতনপ্রিয়তা নব্যযুগের চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে অনেকস্থলেই অবগতির কারণ হইয়া উঠিয়াছে। ইহার অনিষ্টকর প্রভাব নব্যযুগের চিত্রকরগণের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। এই বিষম নূতনপ্রিয়তা চিরকাল দাঁড়াইতে পারে না। ইহা নূতনপ্রিয় একদল লোকেরই সন্তোষ উৎপাদন করিতে পারে। ইহার ফলে অজ্ঞ লোকেরা সন্তুষ্ট হইলেও চিত্রশিল্পের প্রকৃত তাৎপর্য্য—সৌন্দর্য্যবোধ ফুটাইয়া দেওয়া এবং মনোহরত্বের উপলব্ধিকে জাগাইয়া তোলা—সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া যায়।

সৌন্দর্য্য—চিত্রশিল্পের প্রধান লক্ষ্যই হইল সৌন্দর্য্য পরিস্ফুট করিয়া তোলা। কোন নবীন চিত্রালোচক ঠিকই বলিয়াছেন যে ছবির একটী অপরিহার্য্য মূল ভিত্তি এই যে প্রত্যেক ছবি যে বাণী বহন করিয়া আনিবে, সেই ছবি সেই বাণী মাত্র ছবির আকারে ব্যক্ত করিবে। এক কথায় বলিতে গেলে সৌন্দর্য্যই সেই অপরিহার্য্য মূল ভিত্তি।

প্রকৃত চিত্রশিল্পীর পক্ষে একটী সুন্দর বস্তু দেখাই যথেষ্ট। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা চিত্রে ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিবেন। সুন্দর বস্তু সর্ব্বত্রই আদরণীয়। "চিত্র সুন্দর হওয়া চাই। চক্ষের আনন্দ হওয়া চাই"। "চিত্রে সৌন্দর্য্য" কি প্রকারে বর্ণনা করিয়া বুঝাইব জানি না। চিত্র সৌন্দর্য্যের অলঙ্কারে ভূষিত না হইলে চিত্তাকর্ষণে অপারক হয়। মোটামুটি হিসাবে বলা যাইতে পারে যে আকৃতি, বর্ণফলন এবং ভাবপ্রকাশ নিখুঁৎ হইলেই চিত্রখানি সুন্দর হইল। নিখুঁৎ শরীরেই নিখুঁৎ আত্মার প্রকাশ হয়।

দুঃখের বিষয়, প্রকৃত শিল্পীর ভিতরে সৌন্দর্য্যবোধ বিশেষভাবে থাকিলেও অনেক সময়ে তিনি তাহা প্রকাশ করিতে অসমর্থ হন—তাঁহার ইচ্ছা থাকিলেও শক্তির অভাব হয়। ছবির মর্ম্মকে মূর্ত্তিমান করিয়া তুলিবার ইচ্ছাই প্রকৃত চিত্রশিল্পীকে সাধারণ মনুষ্য অপেক্ষা অনেক অধিক দূরদৃষ্টি এবং সকল বিষয়ে গভীর দৃষ্টির একটা শক্তি প্রদান করে। চিত্রসমালোচকের কর্ত্তব্য, আলোচ্য চিত্রের প্রাণটুকু অনুসন্ধান করিয়া বাহির করা এবং দেখা যে চিত্রকর যে ভাবটুকু ব্যক্ত করিতে চাহিয়াছেন, তাহার কতটুকু তিনি সত্য সত্য ব্যক্ত করিতে পারিয়াছেন।

যে ব্যক্তি চিত্রশিল্প সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, ইহার বাধা, ক্ষমতা, সীমা উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ চিত্র সত্যসত্য উপভোগ করিতে পারেন। সেই চিত্রের বিষয় যে দর্শক কিছুই জানেন না, তিনি হয়তো "কি সুন্দর" বলিয়া চলিয়া যাইবেন। কিন্তু যিনি তাহার বিষয় জানেন, তিনি সেই চিত্রপটের সম্মুখে মুগ্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকিবেন। ভাল জিনিসকে ভাল বলিতেই হইবে। কিন্তু ভাল জিনিস কেন যে ভাল, তাহার উত্তর সকলে দিতে পারে না।

রাণাডের-স্মৃতিকথা।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

অনুসূয়া বাইএর পুরাণপাঠ।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর)

প্রায় এই সময়েই অনুসূয়া বাই নামক সংস্কৃতজ্ঞ এক পুরাণব্যাখ্যাত্রী মহিলা পুণায় আসিয়াছিলেন। সঙ্গে তাঁর পতি ও বৃদ্ধ পিতা ছিলেন। এই পণ্ডিতা রমাবাইএর মতো শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ করিতেন এবং পুরাণকথকের ন্যায়, সমস্ত মন্দিরময় শুনা যাইতে পারে এইরূপ উচ্চকণ্ঠে সংহিতা পাঠ করিয়া অর্থ বলিতেন। আমাদের গৃহে এবং অন্য অনেক স্থানে তাঁহার পুরাণপাঠ হইয়াছিল এবং এক দিন, জোসিদিগের মন্দিরে অথবা মহিলাদিগের বিষ্ণুমন্দিরে তাঁহার পুরাণপাঠ হইবে স্থির হইল। সেই সময়, দেবালয়ে যাঁহারা নিত্য আসিতেন সেই মহিলারা এইরূপ চক্রান্ত করিলেন যে, এই সংস্কারক মহিলাদের আজ আমরা বসিতে জায়গা দিব না। সভামণ্ডপের কোন এক স্থানে উহাদের জন্য জায়গা রাখিয়া দিয়া আমরা মন্দির-গর্ভের সম্মুখে বসিব। কাজেই মণ্ডপের মধ্যে উহাদিগকে পুরুষের পাশাপাশি বসিতে হইবে। ওরা যখন কোন সভায় যায়, তখন

পুরুষের সঙ্গে কেদারার পাশাপাশি বসে; কিন্তু এখানে সেরূপ পৃথক্ জায়গা কি করে' হবে? আমার দুই এক জন মৈত্রিনীর নিকট উহাদের এই অভিসন্ধির কথা শুনিলাম। প্রাচীনা ও নবীনা সকল রকমের মহিলারই সহিত আমি মিলিয়া মিশিয়া থাকিবার চেষ্টা করিতাম, এই জন্য দুই পক্ষের মধ্যেই আমার মৈত্রিনী ও পরিচিত মহিলা অনেক ছিল। দেবালয়ের মহিলারা আমাদিগকে ভিন্ন স্থানে বসাইবার যে যুক্তি করিয়াছেন তাহা আমার ভাল লাগিল না; একটু অপমানও বোধ করিলাম। দুই এক ঘণ্টা আগে যদি এই কথা জানিতে পারিতাম তাহা হইলে এই সমস্ত মৎলব ধূলিসাৎ করিয়া দিতে পারিতাম; কিন্তু সেরূপ সময় পাওয়া গেল না। গোড়ায়, দেবালয়ে যাইতেই আমার দেরী হইয়া গিয়াছিল। সেইখানে গিয়া আমি তবে এই সমস্ত জানিতে পারিলাম। কিন্তু দেবালয় লোকে ভরিয়া যাওয়ায়, আর কোন উপায় ছিল না। তাই, পণ্ডিতা রমা-বাই ও আমাদের দলের অন্য মহিলারা যেখানে বসিয়াছিলেন, অনিচ্ছা সত্ত্বেও, সেইখানে তাঁহাদের মধ্যে গিয়া বসিলাম। কিন্তু মনের সন্তোষ ছিল না। তাঁহাদের ওখান থেকে উঠিয়া বাড়ী যাই এইরূপ মনে তোলাপাড়া করিতেছিলাম। সভামণ্ডপের একধারে সংস্কারক পুরুষদের বসিবার জন্য এবং অন্যধারে তাঁহাদের মেয়েদিগের বসিবার জন্য জায়গা করিয়া, তাঁহাদের মধ্যস্থলে অনুসূয়া বাই আপনার জায়গা করিয়াছিলেন। পুরাণপাঠ আরম্ভ হইয়া ১০।২০ মিনিট পরেই আমি রমাবাইর কানে কানে আস্তে আস্তে বলিলাম,—"আজ আমার ভাল লাগ্‌চে না, আমার মাথা ঘুরচে, আমি বাড়ী যাচ্চি।" এই কথা বলিয়া আমি বাড়ী আসিলাম। আমার মনে হইল, আমি যাহা করিয়াছি তাহা ভালই করিয়াছি, এতে আমার তেজস্বিতা দেখান হইয়াছে। এইরূপ মনে করিয়া মাঝঘরের সামনের বারণ্ডায় খুড়শ্বাশুড়ী বসিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট উপরি-উক্ত বৃত্তান্ত সমস্ত বলিলাম। আমি বলিলাম, দেবালয়ের মেয়েরা দেবালয়ের সমস্ত স্থান অধিকার করিয়া আমাদিগকে পুরুষদের মধ্যে বসাইবার মৎলব করিয়াছিল। তাই আমার রাগ হইল এবং আমি অধিকক্ষণ না বসিয়া বাড়ী চলিয়া আসিলাম। যেন আমি খুব ভাল কাজ করিয়াছি এবং সকলেরই তাহা পছন্দ হইবে, এই বিশ্বাসে, অহঙ্কারের সহিত এই বৃত্তান্তটা বলিতেছিলাম। খুড়শ্বাশুড়ীর আমার এই কাজটা পছন্দ হইল। তিনি সাবাস্ দিবার স্বরে বলিলেন —"দেখ, এই রকম জেদ্‌ই চাই; তাহা হইলে লোকতঃ ভাল দেখায়, আর লোকেরা নিন্দাও করে না। এখনকার নূতন শিক্ষিত ছেলেরা লৌকিক ব্যবহার বোঝে না। যা-ইচ্ছা তাই করতে বলে। তা করলে আমাদের চল্‌বে কি-করে'? বাড়ীর পুরুষেরা রাগ করলেও দুদিনেই সে রাগ চলে যাবে। তার জন্য ভাবনা কি? পুরুষদের রাগী স্বভাব। যত কিছু রাগ স্ত্রীর উপর ঝেড়ে তারা বিক্রমের কাজ মনে করে।" আমার স্বপক্ষে এইরূপ আরও অনেক কথা মমতার সহিত বলিয়া আমাকে উৎসাহিত করিলেন। এই কথা শুনিয়া আমার খুব আনন্দ হইল। কিন্তু এই আনন্দ দুই এক ঘণ্টাও টিঁকিল না; শুধু তাহা নহে, ধৃষ্টতা করিয়া এরূপ গলদ তারপর আর কখন করি নাই। সন্ধ্যাকালে 'উনি' বাড়ী আসিলে, আমি নিত্য-নিয়মানুসারে কাপড় লইয়া সম্মুখে দাঁড়াইলাম। তখন, আগেকার মতো তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার আজ কি হয়েছে?" আমি সহজভাবে বলিলাম "কিছুই না, কিছুই হয় নাই।" এই কথা বলিয়া চলিয়া যাইবার পর, আজ দেবালয় হইতে অছিলা করিয়া বাড়ী আসিবার কথা মনে পড়িল। আমার নিজের মনেই গোলযোগ চলিতেছে, এখন উনি যদি আবার ঐ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন ত আমি কি বলিব? একটা ভাল হইয়াছে—সেই সময় উনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন নাই এবং আমার সঙ্গে কথাও কহেন নাই। ছাড়া কাপড় লইবার জন্য আমি নিত্যানুসারে সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলাম; কিন্তু কাপড় আমার হাতে না দিয়া উনি আপনি খুঁটীর উপর রাখিলেন। ওঁর বুট-জুতা খুলিবার জন্য নত হইলাম উনি আমার হাত সরাইয়া দিয়া আপনিই বুট খুলিলেন, আমি আরো ১০।১৫ মিনিট ঠায় দাঁড়াইয়া রহিলাম, কিন্তু নিত্যানুসারে আমাকে কোন কথা বলিলেন না, কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না দেখিয়া আমার বুক ফাটিয়া গেল এবং এতক্ষণ আমি যে গর্ব্ব অনুভব করিতে ছিলাম সে সব কোথায় বিলীন হইল—আমার জিব শুকাইয়া গেল। কারণ ওঁর এইরূপ নিত্য অভ্যাস ছিল যে, নিদেন ১০।১৫ মিনিট আমার সহিত কথা না কহিয়া আর কোন কাজ করিতেন না; বাহির হইতে আসিবার সময় কোন ভদ্র লোক ওঁর সঙ্গে থাকিলে কিংবা জরুরি কোন কাজ থাকিলে, তবেই এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইত। কিন্তু সেরূপ ত কিছুই ঘটে নাই, তবে আজ এরূপ হইল কেন? রাত্রে যখন খাদ্যসামগ্রী পাতে দিবার জন্য লইয়া গেলাম, "খাব না" মুখের কথায় না বলিয়া তাহার বদলে হাতের ইশারা করিলেন। এটা আর কেহ লক্ষ্য করে নাই, কিন্তু আমি তৎক্ষণাৎ লক্ষ্য করিয়াছিলাম। আমার ভাল লাগিল না; মনে মনে ভাবিলাম আমার কাজটা যদি ওঁর ভাল না লাগিয়া থাকে তাহা হইলে সকলে জানিতে

পারে এইরূপ প্রকাশ্যভাবে রাগ করিলেই এক রকম ভাল হইত। কিন্তু এ যে "মুখ টিপে কীল মারা" হইল। রোজ যেমন যাই সেইমত উপরে গেলাম, এবং অন্য দিনের মতো আজও দক্ষিণা প্রাইজ-কমিটি হইতে আগত পুস্তকের যে অংশ পূর্ব্বদিনে পড়া হইয়াছিল, তাহার পর হইতে পড়িতে আরম্ভ করিলাম। ইহা পড়িবার সময় কোন অশুদ্ধ বাক্য কিংবা শব্দ পাইলে তার উপর চিহ্ন দেও—এইরূপ উনি বলিতেন; কিন্তু সেদিন কিছুই বলিলেন না। পড়িবার সময় আমি ইচ্ছা করিয়া দুই একটা ভুল করিলাম, তবু উনি তাহার প্রতি লক্ষ্য করিলেন না। পড়াটা শেষ হইয়া গেলে, উনি অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া কাপড় লইলেন। তখন আমি প্রদীপ দূরে রাখিয়া পুস্তকটা যথাস্থানে রাখিয়া দিলাম। চাকর ওঁর পায়ে ঘী মালিস করিবার জন্য আসিলে আমি বলিলাম "আজ তোর দরকার নেই, তুই যা;" এইরূপ বলিয়া আমিই ঘী মালিস করিতে লাগিলাম। আমার অভিপ্রায় এই ছিল যে,—"হয়েছে, আর না"—এইটুকু ওঁর মুখ থেকে বাহির হইলেই আমার পক্ষে যথেষ্ট হইবে। ঘী মালিস করিবার পর তখনি ওঁর নিদ্রা আসিল; প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টার পর, দ্বিতীয় পাশ-বালিসের দিকে ফিরিবার সময়, "হয়েছে আর না" এইরূপ বলিয়া অন্য দিন দ্বিতীয় পা-টা বাড়াইয়া দিতেন। কিন্তু আজ নিদ্রার সময়েও কিরূপে তাঁর স্মরণে ছিল কে জানে। কোন কথা কহিলেন না। কেবল, দ্বিতীয় বালিসের উপর উল্টাইয়া পড়িয়া যেন গাঢ় নিদ্রায় মগ্ন এইরূপ ভান করিলেন। এতক্ষণ আমি ঘী মালিস করিতে করিতে ঢুলিতে ছিলাম, ওঁর এই নিদ্রার ভান এবং কথা কহিবার সময় অতীত হইয়াছে লক্ষ্য করিবামাত্র আমারও তন্দ্রা কাটিয়া গেল এবং আমার মন বড় খারাপ হইল। আমি অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিলাম। নীরব কেন? এমন ত কখন হয় নাই—এই কথা জিজ্ঞাসা করিব এবং যদি কোন অপরাধ করিয়া থাকি, তবে একটিবার আমায় যেন ক্ষমা করেন, এইরূপ মন খুলিয়া তাঁহাকে বলিব বলিয়া স্থির করিলাম। কিন্তু শপথ করিয়া বলিতেছি আমার মুখ দিয়া একটি শব্দও বাহির হইল না। মন অত্যন্ত ম্রিয়মান হইলেও শিশুকাল হইতে অভিমানী স্বভাব হওয়ায় এরূপ কোন কথা মুখ দিয়া বাহির করিতে কেমন বাধ-বাধ ঠেকিল। এই কথা বলিব বলিয়া হাজার বার মনে মনে স্থির করিলেও, মুখ হইতে কথা বাহির হইল না। এইবার নিশ্চয়ই বলিব মনে করিতেছি এমন সময় তাঁহার জাগরণের অঙ্গচাঞ্চল্য দেখিতে পাইলাম; অমনি আমার জিজ্ঞাসা সেইখানেই রহিয়া গেল। এইরূপ করিতে করিতে সারারাত্রি কাটিয়া গেল। আমাদের দুজনেরই ঘুম হয় নাই। একটু আলো হইবামাত্রই, উনি বাহির হইয়া গেলেন; তখন আমি হতাশ হইয়া পড়িলাম, যাহা পূর্ব্বে আমার কখনই হয় নাই এইরূপ জবরদস্তি শাস্তি আমার অসহ্য হইল, আমি খুব কাঁদিতে লাগিলাম এবং চোখে ঠাণ্ডা জল দিয়া চোখ ভাল করিয়া মুছিয়া, দেরী হইয়া গিয়াছে মনে করিয়া চট্ করিয়া নীচে নামিয়া আসিলাম সত্য; কিন্তু নীচে গিয়া আদৌ মনে শান্তি পাইলাম না। সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল, তবু কেন ক্ষমা চাহিয়া মন খোলসা করিলাম না? মিথ্যা অভিমানভরে মনকে কষ্ট দিয়া কি ভাল করিলাম? এক্ষণে আহারের পূর্ব্বে এই সম্বন্ধে মনকে খোলসা করিয়া লইব, তখন আমার মন ভাল হইবে, এইরূপ বিচার করিয়া আমি রোজকার মতো গা ধুইয়া কৌমিশ্বির, ঘোল প্রভৃতি প্রস্তুত করিলাম। কিন্তু আমি এখন স্নান-শুচি আছি। আহারের পূর্ব্বে অস্নাত না থাকিলে কিরূপে ওঁর সহিত সাক্ষাৎ ঘটিবে? স্নান-শুচি হইলেই ত পরিবেষণ করিতে যাইতে হইবে। এখন কি অছিলা করিয়া স্নান বন্ধ করিব, তাহা ভাবিতে লাগিলাম। কারণ, যে অবধি আমি মধ্যাহ্ন-ভোজনে পরিবেষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছি, তখন হইতে ননদ খুড়শাশুড়ী প্রভৃতি সবাই আমার হাতে খাইতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের এই কড়াকড় নিয়ম ছিল যে, গা ধুইয়া আসিবার পর, দ্বিতীয় পংক্তি উঠিয়া যাওয়া পর্য্যন্ত—অর্থাৎ বড় মেয়েদের আহার শেষ হওয়া পর্য্যন্ত—মাঝঘর, রান্নাঘর ও ঠাকুরঘর ছাড়া আমি যেন আর কোথাও না যাই। জলের চৌবাচ্ছার দিকে পিছনের দরজায় ও উপরের তালায় গেলে আবার গা ধুইয়া শুচি হওয়া দরকার, তা নৈলে চলিবে না। এই নিয়মের দরুণ, অত্যন্ত ভাবনায় পড়িয়া গেলাম। এক্ষণে নীচে যাইয়া স্নান করিবার সময় হইয়াছে; এই সময় পেট ব্যথা করিতেছে এইরূপ অছিলা করিয়া একেবারে স্নান বন্ধ করিয়া দিব, এ ছাড়া অন্য উপায় নাই। মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া আমি তখনি উচ্চৈঃস্বরে বলিলাম;—"আমার ভাল বোধ হচ্চে না; আমি এখনি আসছি; যতক্ষণ না আমি আবার স্নান করে আসি, ততক্ষণ আর কেউ পরিবেষণ করুক,"—এইরূপ আমাদের বাড়ীর অন্য একজন আত্মীয়াকে আমি বলিলাম। এই কথা শুনিয়া আমার ননদ রাগিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন;—"হাঁ এখন অন্য সবাই পরিবেষণ করুক, তারপর ঠিক সময়ে বাইসাহেব শিলমোহর নিয়ে আস্তে আস্তে দেওয়ানী চালে আসবেন।" এই সময় অন্য মেয়েরা হাসিতে লাগিল। কিন্তু খুড়শাশুড়ী ঠাকুরণ বলিলেন,—"ওগো তোমরা এ-রকম কেন বল্‌চ? ওকি রোজ পরিবেশন করে না? ও সে রকম দেমাকী

নয়, ও কখন মিথ্যা ভান করবে না। আজ সকাল থেকেই ওর মুখ শুকনো শুকনো দেখাচ্চে।"

স্ত্রীলোকটি কথা কহিতেই ব্যাপৃত, আমার দিকে তাহার লক্ষ্য নাই—এই সুযোগে পবিত্র স্থান নীচের তলা হইতে আমি উপর তলায় গেলাম। 'ওঁর' উঠিবার সময় হওয়ায় তখন দপ্তর বাঁধা চলিতেছিল। আমি নিকটে গিয়া বলিলাম যে, "আমার একটা অপরাধ হয়েছে; আমি এমন কর্ম্ম আর কখন করব না। কাল সন্ধ্যা থেকে আমার মন খারাপ হয়ে গেছে, কিছুই ভাল লাগচে না।" তখন, কয়েক মিনিট পরে উনি আমাকে বলিলেন—"এই প্রথমবার তুমি নির্ব্বোধের মতো ব্যবহার করেছ, তাতে তোমার কষ্ট ত হবেই. আমারও হচ্চে। আমার আপনার লোক আমার মনের মতো কাজ না করলে, তা কার ভাল লাগে? আমার আপনার লোকের কোন্ জিনিস ভাল লাগে তা একবার জানতে পারলে তাই দৃঢ়রূপে ধরে থাকলে দুজনের মধ্যে কাহারই আর কষ্ট হয় না। এ রকম আর কখনও কোরো না।" ইত্যাদি বলিয়া উনি নীচে স্নান করিতে গেলেন। আমিও অন্য সিঁড়ি দিয়া নীচে গিয়া ওঁর জন্য চাকর যে জল তুলিয়া রাখিয়াছিল, চট্ করিয়া তাহাই একটু গায়ে ছিটাইয়া, পরিবেষণ করিতে আরম্ভ করিলাম এবং সেই বিভ্রাট মিটিয়া গেল। পরিবেষণ হইয়া গেলে, এবং পরের পংক্তিতে, বড় মেয়েদের সহিত এক সঙ্গে আমার খাওয়া হইল; তবু সমস্ত দিনটা আমার উদাস ভাবেই কাটিয়া গেল। আমার আচরণটা ওঁর ভাল লাগে নাই, অতএব এরূপ কাজ আর কখনই করিব না, এইরূপ মনে মনে নিশ্চয় করিলাম। সমস্ত শাস্তির মধ্যে কথা না কহিবার মতো জবর শাস্তি আর দ্বিতীয় নাই এরূপ আমার দৃঢ় ধারণা হওয়ায়, পুনর্ব্বার ঐরূপ প্রসঙ্গ শেষ পর্য্যন্ত উপস্থিত হইতে দিই নাই এবং ঐরূপ প্রসঙ্গ আর উপস্থিত হয়ও নাই।

ইহার কিছুদিন পরে হিরাবাগে এজুকেশন কমিসনের অধিবেশন হয়। সেই কমিশনের সম্মুখে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে আমাকে ও পণ্ডিতা রমা-বাইকে কিছু বলিতে অনুরোধ করা হয়। পণ্ডিতা রমাবাই স্বয়ং বিদুষী, তাঁহার বলিবার খুব অভ্যাস ও সভা-সাহস থাকায়, তাঁর অভিভাষণ বেশ উতরাইয়াছিল। কিন্তু আমি ভেব্‌ড়িয়া গেলাম; দশ পাঁচটা কথা কোন রকম করিয়া বলিয়া শেষ করিলাম। তবু কিন্তু এই হিরাবাগে প্রথমবার আমি যে অভিভাষণ করিয়াছিলাম, তাহা অপেক্ষা এবারকার অভিভাষণ ভাল হইয়াছিল,—এই কথা কখন কখন উনি বলিতেন; তাই জানিতে পারিলাম। এই দুই তিন সভায় সহরের প্রাচীন ও নবীন অনেক মহিলা সমবেত হইয়াছিল এবং মন খুলিয়া স্ফূর্ত্তির সহিত পরস্পরের সহিত ব্যবহার করিতেছে দেখিয়া উনি আমাকে বলিলেন "পরস্পরের সহিত বারংবার দেখা সাক্ষাতের উপলক্ষ্য ঘটিলে এই সকল মহিলাদের মধ্যে বেশ ভালবাসা ও মনের মিল হইবে; উহাদের সঙ্কীর্ণতার হ্রাস হইয়া লেখাপড়া শিখিবার দিকে স্বতই টান হইবে; তাই হলুদ কুঙ্কুমের মতো কিংবা পার্টির মতো সম্মিলনের কোন অনুষ্ঠান বৎসরে অন্ততঃ দুই চারিবার করা আবশ্যক; তাতে যে খরচ হইবে তা আমরাই দিব, লোকের কাছে না চাওয়াই ভাল।" এই কথা অনুসারে কয়েক মাস পরে, দুই চারি জন মৈত্রিনী মিলিয়া, সেই সময়কার গবর্ণরের স্ত্রী লেডি-রের অভ্যর্থনার্থ একটা পার্টি দিলেন। মহিলাদের পার্টি পুণায় এই প্রথম হইল। এই পার্টিতে হিন্দু মহিলাদের জন্য খাদ্য-সামগ্রী ভিন্ন ঘরে সজ্জিত হইয়াছিল। সেখানে অন্ন প্রভৃতি খাদ্য ছিল না; কেবল ফলফুলরী ও মিষ্টান্ন রাখা হইয়াছিল। তাই, এই বন্দোবস্ত হিন্দু মহিলাদের খুব ভাল লাগিয়াছিল। সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিয়া শিষ্টাচার অনুসারে কোন জিনিস অল্প খাওয়া অপেক্ষা ফল ও মিষ্টান্ন রুমালে বাঁধিয়া ছেলেদের জন্য লইয়া যাইবার দিকে তাহাদের বেশী মনের টান কিন্তু সে দিন ছেলে সঙ্গে আনা মানা ছিল। খাওয়া হইয়া গেলে, হিন্দুরীতি অনুসারে পান সুপারী, হলুদ কুঙ্কুম প্রভৃতি সমস্ত থাকায় আমাদের এই মহিলা-পার্টির ধরণধারণ বিদেশী বলিয়া মনে হয় নাই, বরং সকলের পছন্দই হইয়াছিল। পরে এইখানেই স্মলকজ-কোর্টের জজের জায়গায় ওঁর বদলী হইল। ইহার কিছুদিন পরে ভারতবর্ষের ফাইনান্স্ কমিটির মধ্যে ওঁর নিয়োগ হইল। এইজন্য উঁহাকে সিমলায় যাইতে হইল। ১৮৮৬ অব্দে চৈত্র মাসে সিমলায় যাত্রা করিবার জন্য আমরা পুণা হইতে বাহির হইলাম।

চা-খড়ির আত্মকাহিনী।

(ডাক্তার শ্রীচুণীলাল বসু রায়বাহাদুর)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পৃথিবীর প্রায় তৃতীয়-চতুর্থাংশ এখনো জলে মগ্ন হইয়া রহিয়াছে। এই অংশ সম্বন্ধে আমরা বলিতে পারি যে ইহার বাহিরে বাষ্প (বায়ুমণ্ডল), মধ্যে জল (সাগর মহাসাগরাদি) এবং ভিতরে স্থল (হ্রদ, নদী, সমুদ্রের তলদেশ)। পুনশ্চ পৃথিবীর উপরি ভাগ শীতল, অভ্যন্তর ভাগ অত্যুষ্ণ। বর্ত্তমান বায়ুমণ্ডল ও জলরাশি এক সময়ে পৃথিবীর

বাষ্পময় দেহের অন্তর্ভূত ছিল। পৃথিবীতে পূর্ব্বে যে পরিমাণ জল ছিল, তাহার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ইতিমধ্যে স্থলভাগ দ্বারা শোষিত হইয়া গিয়াছে। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে এমন এক সময় আসিবে যখন জলের বাকি অংশও সম্পূর্ণ শোষিত হইয়া যাইবে এবং এখনকার চন্দ্রের ন্যায় পৃথিবীও তখন জল এবং বায়ুশূন্য হইয়া উদ্ভিদ্ ও প্রাণী-দিগের বাসের অনুপযোগী হইবে। সে কিন্তু অনেক দূরের কথা; তার জন্য তোমাদের এখন হইতে কোনরূপ দুর্ভাবনা করিবার আবশ্যক নাই।

পৃথিবীর রণ-রঙ্গিনী মূর্ত্তি।

পৃথিবীর আদি-গঠন-কালের কথা চিন্তা করিলে মনোমধ্যে যুগপৎ বিস্ময় ও ভয়ের উদ্রেক হয়। মনে কর যেন এক দিগন্তবিস্তৃত লোহিতোত্তপ্ত প্রকাণ্ড কটাহের মধ্যে পুঞ্জীভূত তরল প্রস্তর ও ধাতুরাশি প্রচণ্ডতাপ-সংযোগে রক্তবর্ণ উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া বজ্র-নির্ঘোষরবে ফুটিয়া উঠিতেছে; তাহার শতধাবিভক্ত শিখার ঔজ্জ্বল্যে দিঙ্মণ্ডল প্রভাসিত হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহার ভীষণ চাঞ্চল্যে অবিরাম বিদ্যুৎস্ফুরণ ও অগ্ন্যুৎপাত সংঘটিত হইয়া গগনমণ্ডল বিদীর্ণ ও উদ্বেলিত হইতেছে। প্রাচীনযুগের সেই ভীষণ হইতে ভীষণতর পৃথিবীর মূর্ত্তি কল্পনা করিলে কে মনে করিতে পারে যে তিনিই আবার এমন শান্তিময়ী, এমন চিরকল্যাণময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া কোটি কোটি জীবকে মায়ের মত স্নেহে বক্ষে ধারণ করিয়া স্তন্য-দান করিয়া লালনপালন করিতেছেন, কে ভাবিতে পারে যে সেই জ্বালাময়ী সংহারমূর্ত্তিধারিণী পৃথিবী পুনরায় ধনধান্যপুষ্পেভরা, আনন্দদায়িনী, অনন্ত-সৌন্দর্য্যশালিনী তোমাদের এই বসুন্ধরায় পরিণত হইবেন!

ভূ-পুঞ্জের গঠন।

এ পর্য্যন্ত পৃথিবীর গঠন সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিলাম, তাহা তাঁহার নিতান্ত শৈশবাবস্থার কথা। প্রতিমা গড়িতে হইলে প্রথমতঃ যেমন একটী শক্ত বাঁশের "কাঠামো"র প্রয়োজন হয় এবং তাহার উপর খড়, মাটি, খড়ি ও রং স্তরে স্তরে সাজাইয়া যেমন অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যময়ী দেবীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করা হয়, সেইরূপ তোমাদের পৃথিবীর বাষ্পময় দেহ জমাট বাঁধিয়া কঠিন হইয়া তাঁহার "কাঠামো" নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাহার উপর লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী বৎসর ব্যাপিয়া মৃত্তিকা, ধাতু ও প্রস্তরময় স্তরাবলী উপর্য্যুপরি সজ্জিত হইয়া, মায়ের এখনকার এই বিশ্ববিমোহিনী মূর্ত্তি গঠিত হইয়াছে।

পৃথিবীর বহিরাবরণ অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠ অনেকানেক কঠিন স্তরের সমষ্টি মাত্র। স্তরগুলি পিঁয়াজের খোসার মত একের উপর অন্যটি অবস্থিত হইয়া ভূ-পৃষ্ঠ নির্ম্মাণ করিয়াছে। ভূ-পৃষ্ঠের যে অংশ উত্থানপতন-বিপ্লবের ফলে নিম্নগামী হইয়া স্বল্পগভীর বা গভীর খাতে পরিণত হইয়াছে, কালে তাহাই জলপূর্ণ হইয়া নদী, হ্রদ বা সমুদ্রের আকার ধারণ করিয়াছে।

ভূ-পৃষ্ঠ হইতে পৃথিবীর কেন্দ্রস্থানের ব্যবধান প্রায় ৪০০০ মাইল। তোমরা যদি ভূ-পৃষ্ঠ খনন করিয়া নিম্নদিকে গমন কর, তাহা হইলে কিছু দূর পর্য্যন্ত এখানকার অপেক্ষা অধিক শীত অনুভব করিবে, কিন্তু বেশী দূর যাইলে শীতের পরিবর্ত্তে ক্রমশঃ উত্তাপের আধিক্য অনুভূত হইবে। ১৩০০০ ফিট্ গভীর স্থানের উত্তাপ এত অধিক যে সেখানে জল লইয়া গেলে তাহা তৎক্ষণাৎ আপনাপনি ফুটিতে আরম্ভ করিবে। পৃথিবীর আরো গভীর প্রদেশ এত অধিক উষ্ণ যে তথায় মৃত্তিকা, প্রস্তর, গন্ধক, স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, তাম্র প্রভৃতি তাবৎ খনিজ কঠিন পদার্থ প্রচণ্ড উত্তাপসংযোগে দ্রবীভূত হইয়া তরলাকারে অবস্থিতি করিতেছে। আগ্নেয়-গিরির শিখরদেশস্থিত গহ্বর হইতে মধ্যে মধ্যে যে গলিত প্রস্তরধাতুময় পদার্থের স্রোত বাহির হইয়া কত সমৃদ্ধিশালী বহুবিস্তৃত জনপদের ধ্বংস সাধন করিয়া থাকে, তাহার দ্বারাই ভূগর্ভের মধ্যে কিরূপ প্রচণ্ড তাপ সঞ্চিত থাকিয়া প্রস্তরাদি কঠিন পদার্থকে তরলাকারে পরিণত করিয়াছে, তাহার যৎকিঞ্চিৎ আভাস তোমরা পাইয়া থাক।

কোন কোন ভূবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিত অনুমান করেন যে এই অত্যুষ্ণ তরল প্রস্তর-ধাতু-স্রাবের নিম্নে অর্থাৎ পৃথিবীর ঠিক কেন্দ্র-স্থানে পুনরায় কঠিন স্তরের সমাবেশ রহিয়াছে। তাঁহারা বলেন যে উপরের স্তরসমূহের বিষম চাপে পৃথিবীর কেন্দ্র-সন্নিহিত বহু বিস্তীর্ণ প্রদেশ অত্যুষ্ণতাসত্ত্বেও কঠিন হইয়া গিয়াছে। ইহাঁদিগের মতে পৃথিবীর

উপরিভাগ কঠিন এবং কেন্দ্রস্থলও কঠিন; এই উভয় প্রদেশের ব্যবধানস্থান ভূগর্ভনিহিত প্রচণ্ড তাপসংযোগে দ্রবীভূত ধাতু ও প্রস্তরের স্রোত দ্বারা পরিপূর্ণ রহিয়াছে। আবার অনেকে অনুমান করেন যে পূর্ব্বোক্ত বিষম চাপ সংযোগে পৃথিবীর তাবৎ দেহই কঠিনত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, তবে ভিতরের উত্তাপ উপরের অংশের উত্তাপ অপেক্ষা অনেক অধিক। যদি কোন কারণে ভিতরের চাপ অপসারিত হয়, তাহা হইলে সেই সময়ে সেই স্থানের কঠিন প্রস্তরাদি প্রচণ্ডতাপসংযোগে গলিয়া যায় এবং সেই দ্রবীভূত প্রস্তরধাতুরাশিকে অনেক সময়ে আগ্নেয়গিরির প্রস্রবণরূপে প্রকাশিত হইতে দেখা যায়।

ভূ-স্তরবেষ্টক "প্রস্তর"।

যে সকল বিভিন্ন উপাদান দ্বারা পৃথিবীর স্তর-সমূহ নির্ম্মিত হইয়াছে, তোমাদিগের ভূ-বিদ্যার ভাষায় তাহাদিগের সাধারণ নাম "প্রস্তর" (Rock)। বালি, কাঁকর, বেলে পাথর (Sandstone), চূণ-পাথর (Limestone), মৃত্তিকা, ধাতুময় পদার্থ, পাথুরে কয়লা, জলচরপ্রাণীর কঙ্কাল প্রভৃতি যে কোন পদার্থ দ্বারা পৃথিবীর স্তর গঠিত হইয়াছে, তাহাকেই আমরা এস্থলে "প্রস্তর" বলিয়া উল্লেখ করিব।

"প্রস্তরের" মূল উপাদান।

তোমাদের পণ্ডিতমণ্ডলী বহু চেষ্টা করিয়া এ পর্য্যন্ত ৮১টী মাত্র মূলপদার্থের (Elements) আবিষ্কার করিয়াছেন। ঐ সকল মূলপদার্থের পরস্পরের সংযোগে ভূ-স্তরের "প্রস্তর" গঠিত হইয়াছে। তবে প্রধানতঃ ১৬টী মূলপদার্থ লইয়াই পৃথিবীর দেহ-নির্ম্মাণ-কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে এবং এই মূল পদার্থগুলির সর্ব্বপ্রধান অক্সিজেন্ (Oxygen)। ইহা বাষ্পাকারে অমিশ্রিতাবস্থায় বায়ুমধ্যে অবস্থিতি করিয়া তোমাদের জীবন-ধারণ ও অগ্নি-প্রজ্জ্বালনের সাহায্য করিতেছে। ভূ-স্তরের প্রস্তরমধ্যেও অক্সিজেন্ অন্য মূল পদার্থের সহিত সংযুক্ত হইয়া বিভিন্ন যৌগিকের (Compounds) আকারে অবস্থিতি করিতেছে। অক্সিজেনের পরেই সিলিকন্ (Silicon)। সিলিকন্ অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া বালুকা-রূপে (Silica) পৃথিবীর দেহমধ্যে ওতঃপ্রোতভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। যাহাকে তোমরা সহজ ভাষায় "মাটী" বল, তাহা সিলিকন্, অক্সিজেন্, এবং এলুমিনিয়ম্ (Aluminium) নামক একটী ধাতুর মিলনে গঠিত হইয়াছে। মৃত্তিকা পৃথিবীর দেহের একটী প্রধান উপাদান। আমার দেহ অক্সিজেন্, অঙ্গার (Carbon) এবং ক্যাল্সিয়ম্ (Calcium) নামক অপর একটী ধাতুর সম্মিলনে উৎপন্ন হইয়াছে। চূণ-পাথরের (Limestone) গঠনও তাই, আমাদের উভয়ের মধ্যে উপাদানের পার্থক্য কিছুই নাই। আমরা উভয়েই এক সময়ে মহাসমুদ্রের গভীর তলদেশে অবস্থিতি করিতাম। উত্থানপতন-বিপ্লবের প্রভাবে আমরা উভয়েই অতি প্রাচীন কালে সমুদ্রতল হইতে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া তোমাদিগের বাসোপযোগী বহু জনপদের সৃষ্টি করিয়াছি; সুতরাং আমিও তোমাদের পৃথিবীর অঙ্গীভূত "প্রস্তর" বিশেষ। আমার অনেকানেক জ্ঞাতিবর্গ এখনো সমুদ্রগর্ভে অবস্থিতি করিতেছে; সময়ে হয়ত তাহারাও মাথা তুলিয়া, জল হইতে জাগিয়া উঠিয়া, তোমাদের কার্য্যে জীবনপাত করিবে।

"আগ্নেয় প্রস্তর" ও "পলি-প্রস্তর"।

পৃথিবীর স্তর-গঠক "প্রস্তর" সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। একশ্রেণীর প্রস্তরকে "আগ্নেয় প্রস্তর" (Igneous rock) কহে এবং অপর শ্রেণীর প্রস্তর "পলি-প্রস্তর" (Sedimentary rock) নামে পরিচিত। ইহাদিগের নামই ইহাদিগের উৎপত্তির ইতিহাস স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে। বাষ্পময় ভূ-পৃষ্ঠ ক্রমশঃ শীতল হইয়া জমাট বাঁধিয়া "আগ্নেয়-প্রস্তর"-সমূহ উৎপন্ন হইয়াছে। তোমাদের পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে কোন পদার্থ শীতল হইয়া সঙ্কুচিত হইলে আকারে ছোট হয় এবং কোঁকড়াইয়া যায়। ভূ-পৃষ্ঠ শীতল হইয়া কঠিন হইবার সময়ে বহুদূরব্যাপী প্রবল সঙ্কোচনের চাপ দ্বারা কুঞ্চিত হইয়া কোথাও উন্নত, কোথাও নিম্নগামী হইয়া পড়িল। এই উচ্চাংশসমূহ পর্ব্বতের আকার ধারণ করিয়া আজিও পৃথিবীর বক্ষে বিরাজ করিতেছে। এই উত্থানপতনের সময়ে পৃথিবীর দেহ ভীষণভাবে কম্পিত হইতে থাকে; ইহাকেই তোমরা ভূমিকম্প বলিয়া থাক। এই বিপ্লবের

ফলে কত অতল সমুদ্রতল উত্তুঙ্গ শৈলমালায় পরিণত হইয়াছে, আবার কত অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গ ভূপৃষ্ঠ হইতে অদৃশ্য হইয়া সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হইয়া রহিয়াছে। পর্ব্বতসমূহের মধ্যে "আগ্নেয়-প্রস্তর" বহুল পরিমাণে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই আগ্নেয় প্রস্তরই ভূস্তরের আদি ও প্রধান উপাদান।

পলি-প্রস্তরের উপাদান।

ভূ-স্তরনিহিত দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রস্তর "পলি-প্রস্তর" নামে অভিহিত। উত্থান-পতনবিপ্লবের ফলে যখন পর্ব্বতমালা ও উন্নত ভূমির সৃষ্টি হইল, তখন এই সকল উচ্চ স্থান বায়ু, বৃষ্টি ও রৌদ্রের সম্মিলিত ক্রিয়া দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া সূক্ষ্ম মৃত্তিকাকণায় পরিণত হইল এবং নদনদী সাহায্যে পুনরায় সমুদ্র-গর্ভে আশ্রয় লাভ করিতে আরম্ভ করিল। এই সূক্ষ্ম মৃত্তিকাকণার সমষ্টিকে তোমরা "পলি-মাটী" বলিয়া থাক। এই পলি-পতন দ্বারা সমুদ্রগর্ভে যুগযুগান্তর ব্যাপিয়া একটীর পর আর একটী করিয়া স্তর নির্ম্মিত হইয়া আসিতেছে।

জলে যে কোন কঠিন পদার্থ অধিক পরিমাণে দ্রব থাকিলে উহা সময়ে সময়ে পৃথক্ হইয়া দানা বাঁধিয়া নীচে থিতাইয়া পড়ে। সমুদ্রের জলে নানাবিধ লাবণিক দ্রব্য সর্ব্বদা দ্রবীভূত থাকে। উহাদের পরিমাণ বেশী হইলে উহারা মধ্যে মধ্যে পৃথক্ হইয়া সমুদ্রতলে থিতাইয়া পড়ে; এইরূপ থিতান পদার্থ দ্বারাও কালসহকারে এক একটী স্তর নির্ম্মিত হইয়া থাকে; ইহাকেও আমরা "পলি প্রস্তর" বলিব।

পুনশ্চ অনেকানেক সমুদ্রচর প্রাণীর দেহ-কঙ্কাল চূণ-পাথর বালুকা বা আমার (চা-খড়ি) দ্বারা নির্ম্মিত। এই সকল প্রাণী যখন দেহ ত্যাগ করে, তখন তাহাদের কঙ্কালরাশি নিম্নগ হইয়া সমুদ্রতলে আশ্রয় লাভ করে। এই রূপে বিস্তর জীবকঙ্কালের সমষ্টি দ্বারা একপ্রকার "পলি-প্রস্তর" গঠিত হইয়া ভূ-পৃষ্ঠের অঙ্গীভূত হইয়া রহিয়াছে। লাবণিক দ্রব্য, জীবকঙ্কাল বা পর্ব্বতশ্রেণীর উপাদানভেদে পলিমাটীর উপাদানও ভিন্ন হইয়া থাকে, সুতরাং বিভিন্ন প্রকারের পলিমাটী দ্বারা গঠিত সমুদ্রতলস্থিত এই সকল স্তরের উপাদানেরও পার্থক্য লক্ষিত হইয়া থাকে। কোন স্তরটী বা বেলে-পাথর দ্বারা গঠিত, কোনটী বা চূণ-পাথরের, কোনটীর উপাদান বা অন্য রকমের। যুগধর্ম্মে উত্থানপতন-বিপ্লবের ফলে সেই স্তরগুলি কোথাও বা সমুদ্রগর্ভ হইতে মাথা তুলিয়া উদ্ভিদ্ ও জীবের বাসোপযোগী ভূমিতে পরিণত হইয়াছে, কোথাও বা ক্ষয়ক্রিয়া দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া সমুদ্রক্রোড়ে পুনরায় আশ্রয় লাভ করিয়াছে।

ভূ-স্তর-বিন্যাস।

"আগ্নেয়প্রস্তরের" উপরেই এই "পলিপ্রস্তরের" অবস্থান। ভূপৃষ্ঠ হইতে নিম্নদিকে প্রায় ৫০ মাইল পর্য্যন্ত "পলিপ্রস্তরের" অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার নিম্নেই "আগ্নেয়-প্রস্তর"। পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশে গভীর গর্ত্ত খুঁড়িয়া নিম্নদিকে নামিয়া যাইতে পারিলে এই সকল স্তর-বিন্যাস অতি সুন্দররূপে দেখিতে পাওয়া যাইবে। কিন্তু খুব গভীর প্রদেশে যাওয়া অসম্ভব; কারণ তথায় উত্তাপের আধিক্য অত্যন্ত অধিক; তবে কি উপায়ে পৃথিবীর গভীরতম প্রদেশে অবস্থিত স্তরা-বলীর গঠন সম্বন্ধে প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণয় করা যাইতে পারে?

উত্থান-পতন-বিপ্লবের ফলে পৃথিবীর অনেক স্থানে এই সকল স্তর একেবারে উলট-পালট হইয়া গিয়াছে। যে স্তর নীচে ছিল, তাহা ঠেলিয়া উপরে উঠিয়া আসিয়াছে,আবার উপরের স্তরগুলি নিম্নগামী হইয়া ভূগর্ভের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছে। এইজন্য অনেকানেক উচ্চ পর্ব্বতের মধ্যে আদিম "আগ্নেয় প্রস্তরের" স্তরের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। তোমাদের ভূ-তত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ এই সকল উৎক্ষিপ্ত "আগ্নেয়-প্রস্তরের" পরীক্ষা করিয়া পৃথিবী গঠনের আদি ইতিহাস কতক পরিমাণে জানিতে পারিয়াছেন।

খনিজ পদার্থ উত্তোলন করিবার জন্য অনেক স্থলে গভীর খনি প্রস্তুত করা হইয়াছে। এই সকল খনির মধ্যে প্রবেশ করিলে ভূপৃষ্ঠের স্তর-বিন্যাস সুন্দরভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু ইহাদ্বারা বেশী দূরের খবর পাওয়া যায় না। অতি গভীর খনির গভীরতা পৃথিবীর গভীরতার তুলনায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর মাত্র। পর্ব্বতাঙ্গীভূত উৎক্ষিপ্ত "প্রস্তর" স্তরাবলীর পরীক্ষা দ্বারাই পৃথিবীর আদি-গঠন ও জীবনেতিহাস নিরূপিত হইয়া থাকে।

ভূ-স্তরাবলী পৃথিবীর জীবনেতিহাসের এক একটী পৃষ্ঠা।

এই এক একটী স্তর পৃথিবীর জীবনেতিহাসের একটী একটী পৃষ্ঠামাত্র। পৃথিবীর জীবন লক্ষ লক্ষ বৎসরব্যাপী এক একটী বিভিন্ন যুগে বিভক্ত; এই এক একটী স্তর সেই এক এক যুগের ঘটনাবলীর কথঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিতেছে। তোমাদের ভূ-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ এই সকল স্তর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া পৃথিবীর দীর্ঘজীবনের কত অচিন্তনীয় রহস্যময় ঘটনার দ্বার উদ্ঘাটন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কোন্ যুগে পৃথিবীতে উদ্ভিদ্ বা জীবের প্রথম বিকাশ হইয়াছিল, কোন্ যুগে কোন্ কোন্ জাতীয় উদ্ভিদ্ বা কোন্ কোন্ জাতীয় প্রাণী ধরাবক্ষে বিরাজ করিত, তাহাদের আকৃতি ও প্রকৃতিই বা কিরূপ ছিল, কোন্ জাতীয় উদ্ভিদ্ সমগ্র উদ্ভিদ্জাতির আদিপুরুষ এবং কোন্ জাতীয় প্রাণী এই অসংখ্য প্রাণীমণ্ডলীর আদি-জনয়িতা, ক্রমবিকাশের ফলে প্রাণী ও উদ্ভিদ্জগতে কিরূপ অত্যাশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে, এই সকল স্তরমধ্যে আবদ্ধ উদ্ভিদ্ ও প্রাণীগণের কঙ্কালরাশি তাঁহাদিগের জ্ঞাননেত্রের সম্মুখে গ্রন্থের পৃষ্ঠার ন্যায় উদ্ঘাটিত হইয়া নিজ নিজ পূর্ব্বজীবনের পরিচয় প্রদান করিতেছে। প্রকৃতিদেবীর এই বিশাল গ্রন্থ পাঠ করিয়া তাঁহারা বর্ত্তমান উদ্ভিদ্ ও প্রাণী জগতের কত গূঢ় রহস্যময় তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কত আশ্চর্য্য বৃক্ষলতা পৃথিবী হইতে এককালীন লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে, কত অতিকায় অদ্ভুতাকৃতি প্রচণ্ডবলশালী জীব এক সময়ে এই পৃথিবীতে বিচরণ করিত এবং সসাগরা ধরণীর উপর একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল, এই সকল ভূস্তরনিহিত কঙ্কালরাশি পরীক্ষা করিয়া তাহাদের প্রকৃতি, গতিবিধি ও আবির্ভাবের কাল কতক পরিমাণে নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তোমরা কোন্ যুগে পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছিলে, তোমাদের আদি পুরুষদিগের আকৃতি ও প্রকৃতি কিরূপ ছিল, তাহারা কিরূপে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিত, তাহাদের ব্যবহার্য্য গৃহসামগ্রী কিরূপ ছিল, তাহারা আত্মরক্ষা ও শত্রুনিপাতের জন্য কিরূপ অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করিত, তাহারা কিরূপে উন্নতির ক্রম-সোপানে উত্থিত হইয়া বর্ত্তমান কালের সুসভ্য বুদ্ধিজীবী মানুষে পরিণত হইয়াছে, সেই সমুদয় রহস্যময় তত্ত্বও ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ পৃথিবীর স্তরাবলী পরীক্ষা করিয়া সবিশেষ নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং এখনো তাঁহারা অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া উক্ত অনুসন্ধানকার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন। তাঁহাদেরই অনুসন্ধানের ফলে আমি আমার এই ক্ষুদ্র জীবনের ইতিহাস সম্বন্ধে যতটুকু জানিতে পারিয়াছি, তাহাই তোমাদিগকে জানাইতে বাসনা করিয়াছি।

বিজ্ঞান-শক্তির বাভিচার।

এখানে একটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। তোমাদিগের বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের ক্ষমতা অদ্ভুত। তাঁহারা অসাধারণ উদ্ভাবনী-শক্তির বলে নানাবিধ আশ্চর্য্য যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া একদিকে যেমন অচিন্তনীয় দূর-দূরান্তরে অবস্থিত জ্যোতিষ্কদিগের গতিবিধি, আকার, প্রকৃতি ও উপাদান নির্ণয় করিয়াছেন, তেমনি অন্যদিকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দৃষ্টিশক্তির বহির্ভূত উদ্ভিদ্ ও জীবজগতেরও অস্তিত্ব এবং জীবনের রহস্য আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এ জগতে জ্ঞানবলই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বল। তোমরা এই জ্ঞানবলের সাহায্যে জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছ। কে কবে ভাবিয়াছিল যে মানুষ জলচর প্রাণীর ন্যায় সমুদ্রের মধ্যে অনায়াসে বাস, বিচরণ, এমন কি শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে? পুরাণে বর্ণিত আছে যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যমুনার জলে প্রবেশ করিয়া কালীয় নাগের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে দমন করিয়াছিলেন, কিন্তু সে কালে তাহা শ্রীকৃষ্ণের পক্ষেই সম্ভব হইয়াছিল, আর কাহারো পক্ষে নহে। কিন্তু এখন দেখিতেছি যে মানুষ বার মাস জলের মধ্যে বাস করিতে পারে এবং সে জলের মধ্যে থাকিয়া শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছে এবং তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছে। কে কবে মনে করিয়াছিল যে মানুষ বিহঙ্গের ন্যায় ব্যোমপথে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিয়া ইন্দ্রজিতের ন্যায় মেঘের আড়ালে থাকিয়া শত্রু সৈন্য ধ্বংস করিতে সমর্থ হইবে? অতএব দেখা যাইতেছে যে তোমরা বিজ্ঞানবলে প্রাচীনতম যুগের কবিবর্ণিত ঘটনাসমূহ বাস্তব ঘটনাতে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াছ। তবে দুঃখের বিষয় এই যে তোমাদের এই অসাধারণ প্রতিভা ও বিজ্ঞান-

বুদ্ধি সদুদ্দেশ্যে ও ধর্ম্মের পথে পরিচালিত না হইয়া অনেক সময়ে অধর্ম্মের পথে, অন্যায় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিয়োজিত হইয়া থাকে ; এক কথায় তোমরা তোমাদিগের এই অদ্ভুত বিজ্ঞানবলের উপযুক্ত ব্যবহার কর না। তোমাদের বিজ্ঞানবল অনেক সময়ে মানুষের মঙ্গলের জন্য ব্যবহৃত না হইয়া জগতের দুঃখ, কষ্ট ও অশান্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য নিয়োজিত হয়। ইহা বিজ্ঞানবলের ব্যভিচার, ইহাই জাগতিক যাবতীয় অমঙ্গলের নিদান। তোমাদের জাতীয় কবি ভারতচন্দ্রের "বিদ্যা" অতিশয় বিদ্যাবতী ছিলেন, কবি তাঁহাকে "রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু বিদ্যার জননী এক স্থানে "বিদ্যার" বিদ্যার প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিয়াছেন যে "গুণ হয়ে দোষ হৈল বিদ্যার বিদ্যায়।" তোমাদেরও ঠিক তাহাই হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে জর্ম্মানজাতি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে সমধিক ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছে বলিয়া অহঙ্কার করিয়া থাকে, কিন্তু সেই জর্ম্মানগণই বর্ত্তমান ইউরোপীয় সমরে মনুষ্যকুল ও অতুলনীয় কলাশিল্পজাত পদার্থের ধ্বংসের জন্য বিজ্ঞানবলের যেরূপ অসদ্ব্যবহার করিতেছে, তাহাতে অনেক সময়ে সন্দেহ হয় যে বিজ্ঞানশিক্ষা দ্বারা জগতের সুখের সমষ্টি বাড়িয়াছে অথবা কমিয়া গিয়াছে? পূর্ব্বপুরুষগণের অতুলনীয় কীর্ত্তি এবং পরস্পরের ধ্বংসের জন্য যদি বিজ্ঞানশক্তির এইরূপ প্রয়োগ করা হয়, তাহা হইলে বিজ্ঞানশিক্ষা এবং বৈজ্ঞানিক যন্ত্রগুলি যত শীঘ্র এ জগত হইতে অন্তর্হিত হয়, ততই জগতের পক্ষে মঙ্গলজনক। কিন্তু আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এ সকল বিজ্ঞানশক্তির ব্যভিচারের দৃষ্টান্ত মাত্র, সদ্ব্যবহারের ফল নহে। আমি আশা করি যে এই ভীষণ নরমেধযজ্ঞের অবসান হইলে তোমাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইবে, তোমাদের মতিগতি আবার ফিরিবে। তখন তোমরা তোমাদের প্রতিভা এবং সমগ্র বিজ্ঞানশক্তি মানুষের ও সমস্ত জগতের কেবল মঙ্গল ও সুখশান্তি সাধনের জন্যই নিয়োগ করিবে। (ক্রমশঃ)

বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত

গীতা-রহস্য।

অষ্টম প্রকরণ।

বিশ্বের রচনা ও সংহার।

"গুণাগুণেষু জায়ন্তে তত্রৈব নিবিশন্তি চ"।*

মহাভারত, শান্তি, ৩. ৫. ২৩।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদিত)

কাপিলসাংখ্য-অনুসারে, প্রকৃতি ও পুরুষ, জগতের এই যে দুই স্বতন্ত্র মূলতত্ত্ব আছে তাহাদের স্বরূপ কি, এবং দুয়ের সংযোগরূপ নিমিত্ত-কারণ ঘটিলে পর, পুরুষের সম্মুখে প্রকৃতি আপন গুণত্রয়ের যে বাজার বসাইয়া থাকে, তাহা হইতে কিরূপে মুক্তিলাভ করা যাইবে, ইহার বিচার করা হইয়াছে। কিন্তু এই প্রকৃতির বাজারা লীলা, মরাঠী কবি যাহার ভাবব্যঞ্জক নাম দিয়াছেন "সংসারের খেলা" এবং জ্ঞানেশ্বর মহারাজও যাহাকে "প্রকৃতির টাকশাল" বলিয়াছেন, সেই প্রকৃতির সংসার কি অনুক্রম-অনুসারে পুরুষের সম্মুখে বিস্তৃত হইয়া থাকে ও তাহার লয় কিরূপে হয় ইহার ব্যাখ্যা এখনো বাকী রহিয়া গিয়াছে ; এই প্রকরণে সেই ব্যাখ্যা করিব। প্রকৃতির এই ব্যাপারকেই বিশ্বের "রচনা ও সংহার" বলে। সাংখ্যমতানুসারে এই সমস্ত জগৎ বা সৃষ্টি অসংখ্য পুরুষের লাভের জন্যই প্রকৃতি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। প্রকৃতি হইতে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড কিরূপে নির্ম্মাণ হয়, 'দাসবোধের' দুই তিন স্থানে শ্রীসমর্থ রামদাসস্বামীও তাহার সুরস বর্ণনা করিয়াছেন ; এবং সেই বর্ণনা হইতেই "বিশ্বের রচনা ও সংহার" এই নাম আমি গ্রহণ করিয়াছি। সেইরূপ, ভগবদ্গীতার সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে এই বিষয় মুখ্যভাবে প্রতিপাদ্য হইয়া পরে একাদশ অধ্যায়ের আরম্ভে—"ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া" (গী. ১১.২)—ভূতসকলের উৎপত্তি ও প্রলয় (যাহা আপনি) বিস্তারিতরূপে (বলিয়াছেন তাহা) আমি শুনিয়াছি, এক্ষণে আপনার বিশ্বরূপ দেখাইয়া আমাকে কৃতার্থ করুন—এই যে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহা হইতে স্পষ্ট দেখা যায় যে, বিশ্বের রচনা ও সংহার ক্ষর-অক্ষর- বিচা-

* "গুণ হইতেই গুণ উৎপন্ন হয় এবং গুণেতেই গুণ লয় পায়।"

রেরই এক মুখ্য ভাগ। সৃষ্টির অন্তর্গত অনেক (নানা) ব্যক্ত পদার্থের মধ্যে একই অব্যক্ত মূল দ্রব্য আছে ইহা যাহার দ্বারা বুঝা যায় তাহাই জ্ঞান (গী. ১৮. ২০); এবং যাহা দ্বারা একই মূলভূত অব্যক্ত দ্রব্য হইতে ভিন্ন ভিন্ন অনেক ব্যক্ত পদার্থসকল কিরূপে পৃথকভাবে নির্ম্মিত হইয়াছে (গী. ১৩. ৩০) বুঝা যায় তাহাই বিজ্ঞান; এবং ইহার মধ্যে কেবল ক্ষরাক্ষর বিচারের সমাবেশ হয় না, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞজ্ঞান ও অধ্যাত্ম বিষয়সকলেরও সমাবেশ হয়।

ভগবদ্গীতার মতে প্রকৃতি আপন সংসারের কার্য্য স্বতন্ত্ররূপে নির্ব্বাহ করেন না, পরন্তু তিনি পরমেশ্বরের ইচ্ছায় এই কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন (গী. ৯. ১০)। সাংখ্যশাস্ত্রের মতে পুরুষের সংযোগরূপ নিমিত্ত-কারণই প্রকৃতির সংসার-কার্য্য আরম্ভ করিবার পক্ষে যথেষ্ট। প্রকৃতি এই বিষয়ে আর কাহারও অপেক্ষা রাখেন না। সাংখ্যের বক্তব্য এই যে, পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগ হইলেই, প্রকৃতি-টাকশালের কাজ আরম্ভ হয় এবং বসন্ত-ঋতুতে যেরূপ পল্লব ফুটিয়া ক্রমে ক্রমে পাতা, ফুল ও ফল বাহির হয় (মভা. শাং. ২৩১. ৭৩; মনু ১. ৩০) সেইরূপ প্রকৃতির মূল সাম্যাবস্থা ভাঙ্গিয়া তাহার গুণসমূহের বিস্তার হইতে থাকে। ইহার বিপরীতে বেদসংহিতাতে, উপনিষদে ও স্মৃতি-গ্রন্থাদিতে প্রকৃতিকে মূল বলিয়া স্বীকার না করিয়া, পরব্রহ্মকে মূল বলিয়া স্বীকার করিয়া তাঁহা হইতে সৃষ্টির উৎপত্তি হইবার বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা করা হইয়াছে; যথা—"হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ" প্রথমে হিরণ্যগর্ভ (ঋ. ১০. ১২১.১); এবং এই হিরণ্যগর্ভ হইতে কিংবা সত্য হইতে সমস্ত সৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে (ঋ. ১০. ৭২; ১০. ১৯০); কিংবা প্রথমে জল উৎপন্ন হইয়া (ঋ. ১০. ৮২. ৬; তৈ. ব্রা.১. ১. ৩. ৭; ঐ. উ. ১. ১. ২) তাহা হইতে সৃষ্টি হইল; এই জলেতে এক অণ্ড উৎপন্ন হইবার পর তাহা হইতে ব্রহ্মা, এবং ব্রহ্মা হইতে কিংবা মূল অণ্ড হইতেই সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হইল (মনু. ১. ৮. ১৩; ছাং. ৩. ১৯); কিংবা সেই ব্রহ্মাই (পুরুষ) অর্দ্ধভাগে স্ত্রী হইয়াছিলেন (বৃ. ১.৪. ৩; মনু. ১. ৩২); কিংবা জল উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বেই পুরুষ হইয়াছিল (কঠ ৪. ৬); অথবা প্রথমে পরব্রহ্ম হইতে তেজ, জল ও পৃথ্বী (অন্ন) এই তিন তত্ত্ব উৎপন্ন হইবার পরে তাহাদের মিশ্রণে সমস্ত পদার্থ নির্ম্মিত হইয়াছিল (ছাং ৬. ২-৬)। উপরোক্ত বর্ণনা সমূহে অনেক ভিন্নতা থাকিলেও পরিশেষে বেদান্তে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে (বেসূ. ২.৩.১-১৫), আত্মরূপী মূল ব্রহ্ম হইতেই আকাশাদিক্রমে পঞ্চমহাভূত নিঃসৃত হইয়াছে (তৈ, উ.২.১), কঠ (৩.১১), মৈত্রায়ণী (৬.১০), শ্বেতাশ্বরে (৪.১০; ৬.১৬), প্রভৃতি উপনিষদেও, প্রকৃতি মহৎ ইত্যাদি তত্ত্বেরও স্পষ্ট উল্লেখ আছে। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, বেদান্তী প্রকৃতিকে স্বতন্ত্র বলিয়া স্বীকার না করিলেও, একবার যখন শুদ্ধ ব্রহ্মেতেই মায়াত্মক প্রকৃতিরূপ বিকার প্রকাশ পায়, তখন পরে সৃষ্টির উৎপত্তিক্রমসম্বন্ধে তাঁহার ও সাংখ্যবাদীর পরিণাম একবাক্যতা হইয়া গিয়াছে, এবং এই কারণেই মহাভারতে উক্ত হইয়াছে (শাং, ৩০১,১০৮,১০৯)। "ইতিহাস. পুরাণ অর্থশাস্ত্র প্রভৃতিতে যে কিছু জ্ঞান আছে সে সমস্ত সাংখ্য হইতেই আসিয়াছে"—কপিল হইতে এই জ্ঞান বেদান্তীরা কিংবা পৌরাণিকেরা গ্রহণ করিয়াছে এরূপ তাহার অর্থ নহে; কিন্তু সৃষ্টির উৎপত্তিক্রমের জ্ঞান সর্ব্বত্রই এক-প্রকার, এই অর্থই এখানে অভিপ্রেত। কেবল তাহাই নহে, 'জ্ঞান' এই ব্যাপক অর্থেই, এই স্থানে 'সাংখ্য' শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে, একথা বলিলেও চলে। কপিলাচার্য্য শাস্ত্রদৃষ্টিতে সৃষ্টির উৎপত্তিক্রম বিশেষ পদ্ধতি-সহকারে বিবৃত করিয়াছেন, এবং ভগবদ্গীতাতেও এই সাংখ্যক্রম মুখ্যরূপে স্বীকৃত হওয়ায়, এই প্রকরণে তাহারই বিচার করা হইয়াছে।

ইন্দ্রিয়ের অগোচর অর্থাৎ অব্যক্ত, সূক্ষ্ম একবস্তু-মাত্র এবং চারিদিকে অখণ্ডরূপে পরিপূর্ণ এক নিরবয়ব মূল দ্রব্য হইতে সমস্ত ব্যক্ত জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, সাংখ্যদিগের এই সিদ্ধান্ত পাশ্চাত্যদেশের অর্ব্বাচীন আধিভৌতিক শাস্ত্রজ্ঞদিগের শুধু গ্রাহ্য নহে, পরন্তু এই মূল দ্রব্যের অন্তর্ভূত শক্তির ক্রমশ বিকাশ হইয়া আসিতেছে এবং এই পূর্ব্বাপর ক্রম কিংবা ধারা ছাড়িয়া মাঝখানে উপরিপড়ার মতন

হঠাৎ কিছুই নির্ম্মাণ হয় নাই, ইহাও তাঁহারা এক্ষণে স্থির করিয়াছেন। এই মতকে উৎক্রান্তি-বাদ বা বিকাশ-সিদ্ধান্ত বলে। এই সিদ্ধান্ত পাশ্চাত্যরাষ্ট্রে বিগত শতাব্দীতে যখন প্রথম আবিষ্কৃত হইল, তখন সেখানে খুব গোলযোগ বাধিয়া গিয়াছিল। খৃষ্টধর্ম্মের পুস্তকসমূহে এইরূপ বর্ণনা আছে যে, ঈশ্বর পঞ্চ মহাভূত ও জঙ্গমশ্রেণীর প্রত্যেক জাতীয় প্রাণীকে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পৃথক্ পৃথক্ ও স্বতন্ত্রভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এই মতই উৎক্রান্তিবাদ বাহির হইবার পূর্ব্বে সমস্ত খৃষ্টানমণ্ডলী সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিত। তাই, যখন উৎক্রান্তিবাদ এই সিদ্ধান্তকে মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিল তখন চারিদিক হইতে উৎক্রান্তিবাদের উপর আক্রমণ আরম্ভ হইল এবং অদ্যাপি ঐ আক্রমণ অল্পবিস্তর চলিতেছে। তথাপি বৈজ্ঞানিক সত্যের বল অধিক হওয়ায়, সৃষ্টির উৎপত্তি সম্বন্ধে উৎক্রান্তি মতটাই সমস্ত বিদ্বানের নিকট এক্ষণে গ্রাহ্য হইতে চলিয়াছে। এই মতানুসারে সৌর জগতে প্রথমে একই বস্তুসার সূক্ষ্ম দ্রব্য ভরিয়াছিল; উহার গতি বা উষ্ণতার পরিমাণ ক্রমে ক্রমে কমিতে লাগিল; তখন উক্ত দ্রব্যের অধিকাধিক সঙ্কোচ হইয়া পৃথ্বীসমেত সমস্ত গ্রহ ক্রমে ক্রমে সৃষ্ট হইল এবং সূর্য্যই শেষ অবশিষ্ট অংশ রহিল। পৃথিবীও সূর্য্যের ন্যায় প্রথমে এক উষ্ণ গোলক ছিল; কিন্তু যেখানে যেখানে তাহার উষ্ণতা কম হইতে লাগিল সেইখানে সেইখানেই মূল দ্রব্য সমূহের কোন দ্রব্য পাতলা ছিল এবং কোন দ্রব্য ঘন হইয়া, পৃথিবীর উপর বায়ু ও জল এবং তাহার নীচে পৃথিবীর কঠিন জড় গোলার সৃষ্টি হইল; এবং পরে, এই সকল বস্তুর সংমিশ্রণে বা সংযোগে সমস্ত সজীব ও নির্জীব সৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে। এই প্রকারে ক্ষুদ্র কীট হইতে মনুষ্যও ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে ডার্বিনপ্রভৃতি পণ্ডিতেরা এইরূপ প্রতিপাদন করিয়াছেন। তথাপি আত্মা বলিয়া মূলে পৃথক্ কোন তত্ত্ব স্বীকার করা যাইবে কি, যাইবে না, এই সম্বন্ধে আধিভৌতিকবাদী ও অধ্যাত্মবাদীর মধ্যে এখনও অনেক মতভেদ আছে। হেকেল প্রভৃতি কোন কোন পণ্ডিত জড় হইতেই বাড়িতে বাড়িতে আত্মা ও চৈতন্য উৎপন্ন হইয়াছে এইরূপ স্বীকার করিয়া জড়াদ্বৈত প্রতিপাদন করেন; এবং ইহার বিপরীতে ক্যাণ্ট প্রভৃতি অধ্যাত্মজ্ঞানী বলেন যে, জগৎ সম্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান তাহা আমাদের আত্মার একীকরণ ব্যাপারের ফল হওয়ায় আত্মাকে এক স্বতন্ত্র তত্ত্ব বলিয়া মানিতে হয়। কারণ, বাহ্য জগতের জ্ঞাতা যে আত্মা সেই আত্মা স্বতঃ গোচরীভূত জগতের এক ভাগ কিংবা এই বাহ্য জগৎ হইতেই তাহা উৎপন্ন হইয়াছে, এই কথা বলা,—"আপন স্কন্ধের উপরে আপনি বসিতে পারি" —এই কথার ন্যায় তর্কদৃষ্টিতে অসম্ভব। এই কারণেই সাংখ্যশাস্ত্রে প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুই স্বতন্ত্র তত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। সারকথা এই যে, আধিভৌতিক জগৎ-জ্ঞান যতই বাড়ুক না কেন, জাগতিক মূলতত্ত্বের স্বরূপের বিচার সর্ব্বদাই বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসারেই করিতে হইবে, অদ্যাপি পাশ্চাত্য দেশের অনেক বড় বড় পণ্ডিত ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। কিন্তু এক জড় প্রকৃতি হইতে পরে সমস্ত ব্যক্ত পদার্থ কি ক্রম-অনুসারে নিঃসৃত হইয়াছে, ইহা বিচার করিয়া দেখিলে, পাশ্চাত্য উৎক্রান্তিমত ও ও সাংখ্যশাস্ত্রে বর্ণিত প্রকৃতির প্রপঞ্চতত্ত্ব, এই উভয়ের মধ্যে বিশেষ কোন ভেদ উপলব্ধ হইবে না। কারণ, অব্যক্ত, সূক্ষ্ম ও একবস্তুসার মূল প্রকৃতি হইতেই ক্রমে ক্রমে (সূক্ষ্ম ও স্থূল) বস্তুবহুল ব্যক্ত জগৎ নির্ম্মাণ হইয়াছে, এই মুখ্য সিদ্ধান্ত উভয়েরই সমান সম্মত। কিন্তু আধিভৌতিক শাস্ত্রের জ্ঞান এক্ষণে অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় সাংখ্যদিগের 'সত্ত্ব, রজ, তম' এই তিন গুণের বদলে অর্ব্বাচীন সৃষ্টিশাস্ত্রজ্ঞগণ গতি, উষ্ণতা ও আকর্ষণশক্তিকেই প্রধান গুণ বলিয়া ধরিয়াছেন। এ কথা সত্য যে, সত্ত্ব, রজ ও তম এই ত্রিগুণের ন্যূনাধিক্যের পরিমাণ অপেক্ষা উষ্ণতা কিংবা আকর্ষণশক্তির ন্যূনাধিক্যের ধারণা আধিভৌতিকশাস্ত্রদৃষ্টিতে অপেক্ষাকৃত শীঘ্র বোধগম্য হয়। তথাপি "গুণা গুণেষু বর্ত্তন্তে" (গী, ৩. ২৮) এইরূপ যে গুণত্রয়ের বিকাশ কিংবা গুণোৎকর্ষের তত্ত্ব তাহা উভয়দিকেই এক। ঘড়ির পাখা বন্ধ হইয়া গেলে তাহা যেরূপ আস্তে আস্তে খোলা যায়, সেইরূপ সত্ত্ব রজ ও তম ইহাদের সাম্যাবস্থা হইলে প্রকৃতির ঘড়ি আস্তে আস্তে খুলিয়া চলিতে

থাকিলে সমস্ত ব্যক্ত জগৎ সৃষ্টি হয়, ইহাই হইল সাংখ্যশাস্ত্রের কথা ; এই কথায় ও উৎক্রান্তিবাদে বস্তুত কোন ভেদ নাই। তথাপি খৃষ্টধর্ম্মের ন্যায় গুণোৎকর্ষতত্ত্বকে উপেক্ষা না করিয়া গীতাতে এবং অংশত উপনিষদাদি বৈদিক গ্রন্থেও অদ্বৈত বেদান্ত মতের অবিরোধেই স্বীকৃত হইয়াছে ; এই ভেদ তাত্ত্বিক ধর্ম্মদৃষ্টিতে মনে রাখিবার যোগ্য।

ভাল, প্রকৃতি-কলিকা-বিকাশের ক্রম সম্বন্ধে সাংখ্যকারের কি মত এখন দেখা যাক্। এই ক্রমকেই গুণোৎকর্ষ কিংবা গুণপরিণামবাদ বলে কোনও কাজ করিবার পূর্ব্বে মনুষ্য উক্ত কাজ করিবে বলিয়া আপন বুদ্ধির দ্বারা নিশ্চয় করিয়া থাকে, কিংবা তাহা করিবার বুদ্ধি বা সঙ্কল্প তাহার প্রথমে হওয়া চাই, ইহা আর কাহাকেও বলিতে হইবে না। অধিক কি, উপনিষদেও এইরূপ বর্ণনা আছে যে, মূল এক পরমাত্মারও আমি বহু হইব—এই বুদ্ধি বা সঙ্কল্প হইবার পর, জগৎ উৎপন্ন হইল (ছাং, ৬,২,৩ ; তৈ, ২,৬)। এই ন্যায় অনুসারে অব্যক্ত প্রকৃতিও আপনা হইতেই সাম্যাবস্থা ভাঙ্গিয়া পরে ব্যক্ত জগৎ নির্ম্মাণ করিবে বলিয়া নিশ্চয় করে। নিশ্চয় অর্থাৎ ব্যবসায় এবং তাহা করা বুদ্ধিরই লক্ষণ। তাই প্রকৃতিতে ব্যবসায়াত্মিক বুদ্ধিরূপ গুণ প্রথমে উৎপন্ন হয়, এইরূপ সাংখ্যেরা স্থির করিয়াছেন। সার কথা, এই যে মনুষ্যের যেরূপ কোন কার্য্য করিবার বুদ্ধি প্রথমে হয়, সেইরূপ প্রকৃতিরও স্বকীয় বিস্তার করিবার বুদ্ধি প্রথমে হওয়া চাই। কিন্তু মনুষ্যপ্রাণী সচেতন হওয়া প্রযুক্ত, অর্থাৎ সেই স্থলে প্রকৃতির বুদ্ধির সহিত সচেতন পুরুষের (আত্মার) সংযোগ প্রযুক্ত, মনুষ্যের ব্যবসায়াত্মিক বুদ্ধি মনুষ্য বুঝে, এবং প্রকৃতি স্বয়ং অচেতন অর্থাৎ জড় হওয়া প্রযুক্ত, তাহার নিজের বুদ্ধির কোন জ্ঞান থাকে না। এই দুয়ের মধ্যে বিলক্ষণ পার্থক্য আছে। এই পার্থক্য, পুরুষের সংযোগ দ্বারা প্রকৃতিতে উৎপন্ন চৈতন্যপ্রযুক্ত হইয়া থাকে ; তাহা শুধু জড় বা অচেতন প্রকৃতির গুণ নহে। মানবী ইচ্ছার অনুরূপ কিন্তু অস্বয়ংবেদ্য শক্তি জড়পদার্থেও আছে এইরূপ না মানিলে, গুরুত্বাকর্ষণ কিংবা রসায়নক্রিয়ার বা লৌহচুম্বকের আকর্ষণ ও বিকর্ষণ ইত্যাদি গুণসকল কেবল জড়জগতের স্বেচ্ছানির্ব্বাচনের কার্য্য এ যুক্তি খাটে না। এই কথা অর্ব্বাচীন আধিভৌতিক সৃষ্টিশাস্ত্রজ্ঞও এক্ষণে বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। * আধুনিক সৃষ্টিশাস্ত্রজ্ঞদিগের এই মতের প্রতি লক্ষ্য করিলে, প্রকৃতিতে প্রথম বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, সাংখ্যের এই সিদ্ধান্তে আশ্চর্য্য হইবার কোন কারণ থাকিবে না। প্রকৃতির মধ্যে প্রথম উৎপন্ন এই গুণকে ইচ্ছা হয় তো অচেতন বা অস্বয়ংবেদ্য বা আপনাকে আপনি জানিতে অক্ষম বল,—যাহাই বল না কেন, মনুষ্যের বুদ্ধি ও প্রকৃতির বুদ্ধি, এ উভয়ই মূলে যে একই বর্গের অন্তর্ভুক্ত তাহা সুস্পষ্ট ; এবং সেইজন্য উহাদের ব্যাখ্যাও, উভয়স্থলে একই প্রকার করা হইয়াছে। এই বুদ্ধিরই—'মহৎ, জ্ঞান, মতি, আসুরী, প্রজ্ঞা, খ্যাতি,' প্রভৃতি অন্য নামও আছে। অনুমান হয় যে, তন্মধ্যে মহৎ (পুংলিঙ্গী প্রথমার একবচন মহান্—বড়) এই নাম, প্রকৃতি এক্ষণে বড় হওয়ায় তাহার প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে কিংবা এই গুণের শ্রেষ্ঠতা প্রযুক্ত এই নাম দেওয়া হইয়াছে প্রকৃতির মধ্যে প্রথম উৎপন্ন মহান্ কিংবা বুদ্ধিগুণ,

* Without the assumption of an atomic soul the commonest and the most general phenomena of chemistry are inexplicable. Pleasure and pain, desire and aversion, attraction and repulsion must be common to all atoms of an aggregate ; for the movements of atoms which must take place in the formation and dissolution of a chemical compound can be explained only by attributing to them Sensation and Will":—Haeckel in the Perigenesis of the Plastidule cited in Martineau's Types of Ethical Theory, Vol II. P. 399, 3rd Ed. Haeckel himself explains this statement as follows:—I explicitly stated that I conceived the elementary psychic qualities of sensation and will which may be attributed to atoms, to be unconscious—just as unconscious as the elementary memory, which I in common with the distinguished psychologist Ewald Hering consider to be a common function of all organised matter, or more correctly the living substances."—The Riddle of the Universe, Chap. IX. P. 63 (R. P. A. Cheap Ed.)

সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিনের মিশ্রণেরই পরিণাম হওয়ায়, প্রকৃতির এই বুদ্ধি দেখিতে এক হইলেও পরে উহা অনেক প্রকারের হইতে পারে। কারণ, এই সত্ত্ব, রজ ও তম গুণ প্রথম দৃষ্টিতে তিন হইলেও বিচারদৃষ্টিতে প্রতীত হয় যে, উহাদের মিশ্রণে প্রত্যেকের পরিমাণ অনন্তরূপে ভিন্ন হওয়া প্রযুক্ত এই তিন হইতেই প্রত্যেক গুণের অনন্ত ভিন্ন পরিমাণে উৎপন্ন বুদ্ধির প্রকারও তিন গুণ অনন্ত হইতে পারে। অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন এই বুদ্ধিও প্রকৃতিরই ন্যায় সূক্ষ্ম। কিন্তু পূর্ব্বপ্রকরণে ব্যক্ত ও অব্যক্ত, সূক্ষ্ম ও স্থূল, ইহাদের যে অর্থ বলা হইয়াছে, তদনুসারে এই বুদ্ধি প্রকৃতির ন্যায় সূক্ষ্ম হইলেও প্রকৃতির ন্যায় অব্যক্ত নহে—তাহা মনুষ্যের জ্ঞানগম্য হইতে পারে। তাই, এক্ষণে সিদ্ধ হইল যে, 'ব্যক্ত' এই মনুষ্যগোচর বৃহৎ পদার্থবর্গের মধ্যে বুদ্ধির সমাবেশ হয়; এবং শুধু বুদ্ধি নহে, বুদ্ধির পরে, প্রকৃতির সমস্ত বিকারই সাংখ্যশাস্ত্রে ব্যক্ত বলিয়াই স্বীকৃত হয়। এক মূল প্রকৃতি ব্যতীত কোন তত্ত্বই অব্যক্ত নহে।

অব্যক্ত প্রকৃতির মধ্যে এই প্রকারে ব্যক্ত ব্যবসায়াত্মিক বুদ্ধি উৎপন্ন হইলেও প্রকৃতি এখনও এক বস্তুসারই রহিয়াছে। এই একবস্তুপরতা ভাঙ্গিয়া বহুবস্তুপরতা উৎপন্ন হওয়াকেই 'পৃথকত্ব' বলে। উদাহরণ যথা—পারা জমির উপর পড়িয়া ছোট ছোট গোলায় পরিণত হওয়া। বুদ্ধির পর, এই পৃথকত্ব বা বহুত্ব উৎপন্ন না হইলে একই প্রকৃতির অনেক পদার্থ হওয়া সম্ভব নহে। বুদ্ধির পরে উৎপন্ন পৃথকত্ব গুণকেই 'অহঙ্কার' বলে। কারণ, পৃথকত্ব 'আমি-তুমি' এই সকল শব্দের দ্বারাই প্রথমে ব্যক্ত করা হইয়া থাকে; এবং 'আমি-তুমি'র অর্থেই অহংকার,—অহং অহং (আমি আমি) করা। প্রকৃতির মধ্যে উৎপন্ন অহঙ্কার গুণকে ইচ্ছা হয় তো অ-স্বয়ংবেদ্য বা আপনাকে আপনি জানিতে অসমর্থ বল। কিন্তু মনুষ্যে প্রকটীভূত অহঙ্কার এবং যে অহঙ্কার প্রযুক্ত গাছ, পাথর, জল কিংবা ভিন্ন ভিন্ন মূল পরমাণু একবস্তুসার প্রকৃতি হইতে নির্ম্মিত হয়, ইহাদের জাতি একই। প্রভেদ এই যে, পাথরের চৈতন্য না থাকায় তাহার 'অহং'এর জ্ঞান হয় না এবং মুখ না থাকায় 'আমি পৃথক্ তুমি পৃথক্' এইরূপ স্বাভিমানসহকারে সে নিজের পার্থক্য অন্যকে বলিতে পারে না। অন্য হইতে পৃথকরূপে থাকিবার তত্ত্ব অর্থাৎ অভিমানের কিংবা অহঙ্কারের তত্ত্ব সকল স্থানেই এক। এই অহঙ্কারকেই তৈজস, অভিমান, ভূতাদি, ধাতুপ্রভৃতিও বলা যায়। অহঙ্কার বুদ্ধিরই এক উপভেদ হওয়া প্রযুক্ত বুদ্ধি না হইলে অহঙ্কার উৎপন্ন হইতে পারে না। তাই অহঙ্কার অন্য একটী গুণ অর্থাৎ বুদ্ধির পরবর্ত্তী এক গুণ ইহা সাংখ্যেরা স্থির করিয়াছেন। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে বুদ্ধির ন্যায় অহঙ্কারেরও অনন্ত প্রকার হইয়া থাকে ইহা বলা বাহুল্য। এই প্রকারে পরবর্ত্তী গুণসমূহের ও প্রত্যেকের তিন-গুণ অনন্তভেদ। অধিক কি, ব্যক্ত জগতে প্রত্যেক বস্তুর এইরূপ অনন্ত সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক ভেদ হইয়া থাকে; এবং এই সিদ্ধান্ত অনুসরণ করিয়াই গীতাতে গুণত্রয়-বিভাগ ও শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগ উক্ত হইয়াছে (গী, অ, ১৪ ও ১৭)।

ক্রমশঃ।

আদর্শ
বা
দাদা ঠাকুর।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—বাপীতীর। কাল—পূর্ণিমা রাত্রি।
লক্ষ্মী গাহিতেছিল।

গীত।

তুমি যদি বুকে, থাকো সুখে দুখে
সেই সুখে, দুখে সুখে রব' আমি
সুখের বেদনা উঠিবে শিহরি'
তোমারে চাহিয়া দিবস-যামী।

তোমারি মোহন স্নিগ্ধ দৃষ্টি
করিবে জীবনে অমিয় বৃষ্টি
নূতন রাজ্য করিতে সৃষ্টি
স্বরগ আসিবে মরতে নামি'।

প্রেম-সাগর সোহাগে মথিয়া
হৃদয়-পাত্র পূর্ণ করিয়া
নন্দন-সুধা রাখিব ধরিয়া
অধরে তোমারি দিবস-যামী।

দেহে প্রাণে মনে জীবনে মরণে
শয়নে স্বপনে কিবা জাগরণে
শ্রবণে মরণে নয়নে বচনে
হয়ে' রব' তব চির-অনুগামী।

নিবেদিতা আসিয়া পশ্চাৎ হইতে তাহার চক্ষু চাপিয়া ধরিল।

লক্ষ্মী। আঃ এমন সময়ে বাধা দিলে!

নিবে। কি লো, আজ যে খুব গান গাওয়া হ'চ্চে। বড় আনন্দ দেখা যাচ্ছে!

লক্ষ্মী। কেন, কাঁদব কোন্ দুঃখে?

নিবে। হাস্‌বেই বা কোন্ সুখে?

লক্ষ্মী। ঐ দেখ সবাই হাস্‌চে। ঐ চাঁদ কেমন হাস্‌চে; লতা কেমন দুল্‌চে; ঐ পুকুরের জল কেমন ঢল্ ঢল্ করছে; পদ্মের কলিগুলো শিউরে উঠ্‌চে। এমন সময়ে কেবল আমিই বা কোন্ দুঃখে কাঁদব?

নিবে। আ-মর্ বিধবা হয়েছিস্, স্বামীর জন্যে একটু কাঁদ্—তা তো নয়, মেয়েটার কেবল হাসি আর গান! এ কেমন অনাসৃষ্টি কথা!

লক্ষ্মী। বালাই, পতিহারা হব কেন? আজ যে এই জ্যোৎস্নারাতে আমি অভিসারে এসেছি। ঐ দেখ তিনি চাঁদে থেকে উঁকি দিচ্চেন; পুকুরের জলে ঢেউ হয়ে' খেলা করচেন; ফুল হয়ে হাস্‌চেন। তিনি বাতাস হয়ে আমায় স্পর্শ করচেন। আবার প্রাণে স্থির হয়ে' বসে আছেন। আমি যে আজ এই বিশ্বময় কেবল তাঁরেই দেখ্‌চি। এক "তিনি" আজ লক্ষ "তিনি" হয়েছেন।

নিবে। তোমার শিক্ষা সার্থক হয়েছে। আচ্ছা, বিধবা হয়েছ বলে কি তোমার প্রাণে কোনই দুঃখ নেই?

লক্ষ্মী। দুঃখ? দুঃখ কারে বল? স্বামী মরলে স্ত্রীর প্রাণে যা হয় তার কথা বল্‌ছ? না, আমার দুঃখ হয় নি। আমার প্রাণে যা হয়েছিল, তা যে কি, তা যে কেমন, তা বল্‌তে পারি না। তাকে দুঃখ বল্‌লে কিছুই বলা হোল না। দুঃখের চেয়ে সে অনেক বেশি। উঃ—! (চক্ষু মুছিল)

নিবে। একি তুমি কাঁদছ? এ কথা জিজ্ঞেস্ করে' তোমার প্রাণে ব্যথা দিয়েছি। থাক্ আর ও কথা তুলে কাজ নেই।

লক্ষ্মী। আর আমার দুঃখ নেই। দাদাঠাকুরের সান্ত্বনায় আমার প্রাণ জুড়িয়েছে। ঈশ্বরের যা ইচ্ছে তাই তিনি করেছেন। আমি তার জন্যে শোক করবার কে? আমি আমার স্বামীকে যতটুকু ভালো বাসি, তার চেয়ে ভগবান্ ভালো বাসেন অনেক বেশি। আরো দ্যাখো, জীবিত থাকলে হয়তো তাঁর সঙ্গে কত ঝগড়া হোত, বিচ্ছেদ হোত। কিন্তু এখন আর কলহ নেই,—বিচ্ছেদ নেই—কেবল মিলন কেবল সোহাগ। দুঃখের কথা বলছ? কি দুঃখ আমার? দাদাঠাকুরের আশ্রয়ে এসে আমার নূতন জীবন লাভ হয়েছে। এখন আমি যখন রোগীর সেবা করি, তখন ভাবি এরাই আমার সন্তান, যখন দেবসেবা করি তখন মনে হয়, আমি তাঁকেই সেবা করছি। বাপ্ ছিল না বাপ পেয়েছি, মা ছিল না মা পেয়েছি; বোন ছিল না বোন পেয়েছি। আর কি দুঃখ আমার?

নিবে। ধন্য তুমি, তোমার শিক্ষা সার্থক হয়েছে। লক্ষ্মী, তুমি একটা গান গাও। তোমার গান শুনতে আমার বড় ভালো লাগে।

লক্ষ্মী গাহিল—

গীত।

বুঝি এত প্রেম, নারিবে সহিতে
তাই অলখিতে গোপনে সহি;
আকুল আবেগ ধরিতে নারিবে
তাই তো নীরবে মরমে বহি।

শুধু আসি যাই, কাঁদি হাসি তাই
মরমের কথা মরমে লুকাই
জানি জানি আমি তোমারেই চাই
তবু তো' তোমার কাঙাল নহি।

মাধবী সমীর হাহাকার সনে
তুমি বয়ে' যাও আপনার মনে
শিহরি পরাণ উঠে যেই ক্ষণে
মধুর আবেশে বিভোর রহি।

নিবে। তোমার সুরে যেন ব্যথা মাখা। ওকি তোমার চোখে জল?

লক্ষ্মী। ও কেমন আমার চোখের দোষ।

নিবে। লক্ষ্মী দিদি, তোমার হিতোপদেশ এখনো সারা হয়নি? জ্যাঠামহাশয় বলেছেন আমাকে আর কিছুদিন পরেই বেদান্ত দর্শন পড়াবেন।

লক্ষ্মী। আমি ভাই নমঃশূদ্রের মেয়ে, অত পড়াশুনা করতে পারি না। আমার এই চরকা ঘুরানো আর রোগী সেবাই ভালো লাগে।

নিবে। আমি কেবল পড়তে আর মেয়েদের পড়াতে ভালো বাসি। আমি কেবল এই-ই করব।

লক্ষ্মী। এ আর ক'দিন চলবে? এই কুন্তী করা খুওর ভাঁজা, আর মেয়েদের পড়ানো ক'দিন চল্‌বে? বিয়ে হলে তো আর পারবে না। তখন ঘরকন্না করতে হবে।

নিবে। আমি বিয়ে করব না।

লক্ষ্মী। তা কি হয়!

নিবে। কেন হবে না? আমি ব্রহ্মচারিণী হব।

লক্ষ্মী। সে কি কথা? দাদাঠাকুর বলেন, বিয়ে করে সংসারধর্ম্ম করাই ভালো।

নিবে। তা ভালো। কিন্তু তিনি আরো বলেন যে, কতকগুলি পুরুষ আর কতকগুলি মেয়ে অবিবাহিত থাকা ভালো। তারা কেবল জগতের কাজ করবে। সবাই কেবল এক রকম জীবন যাপন করবে এ কেমন কথা?

লক্ষ্মী। কিন্তু মনে রেখো তুমি নারী, শেষ পর্য্যন্ত এ কথা রাখতে পারলে হয়।

নিবে। হোক্ নারী। কিন্তু ভাই নারীজাতির ভিতরেই গার্গী, সুলভা প্রভৃতি নারীগণ জন্মেছিলেন।

লক্ষ্মী। আবার সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তীও জন্মেছিলেন। গার্গী সুলভার চেয়ে তাঁরাও কম নন।

নিবে। হাঁ কম নয় বটে। তবে এ দু' রকমেরি প্রয়োজন আছে। সীতা সাবিত্রী সীতা সাবিত্রীরই মত। গার্গী সুলভা আবার গার্গী ও সুলভারই মত।

লক্ষ্মী। তোমার সঙ্গে তর্ক করা মুস্কিল। ও কি! ও কে?

গাইতে গাইতে পাগলিনীর প্রবেশ।

গীত।

কেন মোর এমন হোল শুকনো আঁখি পাষাণ মন!
কাঁদতে নারি পরাণ খুলে বুকের মাঝে কি বাঁধন।
(বুক ফেটে যায়—যেন পাথর-চাপা গো!)
বুক ফেটে যায় সইতে নারি, কান্না আসে নাই কাঁদন!
কালো মেঘ ছায়ার মতন জুড়ে হৃদয় খানি
নাই গরজন, নাই বরষণ, নাইরে দামিনী
চম্‌কি আপন অন্ধকারে মুদি যদি দু'নয়ন।
অধরের কোণে হাসি উঠে ভয়ে থেমে যায়
শ্বাসের তাপে আপনি পুড়ি জগৎ পোড়ে হায়!
সবাই যখন হাসে খেলে, মলিন হয়ে যায় বদন
নিরালা ঘরের মাঝে, বসি যখন একা
আশে-পাশে কারা যেন দেয় আসি দেখা
ভাব-ভাষাহীন শুষ্ক দৃষ্টি স্থির অনিমেষ-লোচন।

নিজের পানে চেয়ে আমি নিজেই শিউরে উঠি
নিজের নিকট থেকে যে চাই করতে নিজে পলায়ন।

নিবে। (পাগলিনীর প্রতি) তুমি কে গা?

পাগ। আমি—আমি—হাঃ হাঃ হাঃ (বিকট হাস্য)

নিবে। তুমি কোথায় থাকো?

পাগ। যেখানে যখন থাকি।

নিবে। এখন কোথা থেকে এলে?

পাগ। ঐ পুকুরের জলে ডুব দিয়েছিলুম।

নিবে। কেন?

পাগ। জ্বালায়। বড় জ্বালা গো—বড় জ্বালা, মরতে গেলাম, ডুবে মরতে গেলাম পারলুম না। ভয় হ'ল, মরতে ভয় হ'ল। ওঃ! সে কি ভয়! বড় ভয়! বড় ভয়! (কম্পন)

নিবে। কেন, ডুবে মরবে কেন?

পাগ। মরব না? মরব না? বড় জ্বালা গো বড় জ্বালা। সইতে পারি না।

নিবে। কিসের জ্বালা? তোমার কি কোনো ব্যারাম আছে?

পাগ। জানি না ত; বুঝি না। কিন্তু বড় জ্বালা। এ জ্বালা উপরের নয়—ভিতরের। উঃ পুড়ে গেল! পুড়ে গেল।

নিবে। তোমার কি জ্বালা বল মা। পারি তো জুড়িয়ে দেব।

পাগ। শুনবে? তবে বলব? হাঁ বলব, তোমার কাছে বলব। তোমার কথা বড় মিষ্টি। এমন মিষ্টি কথা তো আর কোথাও শুনিনি। বলব—তোমায় কাছে বলব।

নিবে। বল মা।

পাগ। আমায় তাড়িয়ে দেবে না? ঘেন্না করবে না?

নিবে। কেন মা, ঘৃণা করব কেন? জগতে কেউ ঘৃণার পাত্র নয়।

পাগ। আহা জুড়ালো! একটু জুড়ালো! তবে বলব? তা বললে এই জ্যোৎস্না নিবে যাবে, এখুনি আঁধার হবে, মেঘ করবে, বাজ পড়বে। উঃ কি ভীষণ! কি ভয়ানক! বলব? তবে বলব।

নিবে। বল না, কিছু ভয় নেই।

পাগ। তবে শোনো। এক যে ছিল কুলীন বামুনের মেয়ে, তার সোয়ামির ছিল আঠারোটা বিয়ে। অনেক বছর কেটে গেল সোয়ামীর সাথে দেখা নেই। মেয়ের বাড়ীর কাছে ছিল এক যাত্রার দলের ছেলে। সে জাতিতে নমঃশূদ্র। মেয়ে তার সঙ্গে চলে গেল কাশীতে। কিছুদিন পরে অভাগিনীর এক ছেলে

হোল। যাত্রার দলের ছেলেটা ছিল ভারী মাতাল, টাকা না পেলে মেয়েটাকে মারত, তার গয়না কেড়ে নিত। দু'দিন পরে সে মেয়েটাকে ছেড়ে গেল। তখন মেয়েটা অনুপায় হয়ে এক ভদ্দর লোকের কাছে ছেলেটাকে বিক্রী করলে। পেটের জ্বালা বড় জ্বালা। শেষে মেয়েটা পথের ভিখারী হো'ল। তার ব্যামো হোল। কব্‌রেজ ডাক্তারে চিকিৎসা করলে না। শেষটা পাগল হয়ে গেল। কয়েক দিন পাগলা গারদে থেকে সেখান থেকে পালিয়ে এল। শুনলে তো? রূপকথাটা শুনলে তো? এখন তার প্রাণে আগুণ জ্বলচে উঃ পুড়ে গেল! পুড়ে গেল।

নিবে। দয়াময়কে ডাকো। সব জ্বালা জুড়াবে।

পাগ। ডাকতে পারি নে। ভয় করে, লজ্জা করে, মা, লজ্জা করে। আমি কি তাঁকে ডাকতে পারি।

নিবে। কেন পারবে না? তিনি যে পতিতের বন্ধু, পতিতের প্রতিই তাঁর বেশী দয়া। তোমার চোখের জলে সব পাপ ধুয়ে গেছে। এখন এক মনে তাঁকে ডাকো।

পাগ। ধুয়ে গেছে! সত্যি?

নিবে। হাঁ।

পাগ। আহা, কে মা তুমি আমার বুক জুড়ালে? মা, তুই আমার মা হবি? আমি তোর কোলে থাকব।

নিবে। তুমি আমাদের বাড়ীতে থাকো।

পাগ। না না, তা যাবো না। কারো বাড়ীতে যাবো না। আমি পাগলী, আমি ডাইনী, তবে যাই, যাই মা এখন যাই। আর একদিন আসব, তোর কাছে এসে জুড়াব।

(দ্রুত প্রস্থান)

নিবে। হায় অভাগিনী! চল দিদি আমরাও বাড়ী যাই।

উভয়ের প্রস্থান।

ভারতমহিলা ও রাজা রামমোহন রায়।

(রামমোহন স্মৃতিসভায় বিবৃত)

(শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ)

আজ যে মহাপুরুষের শ্রাদ্ধবাসরে, আমরা আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করবার জন্যে সমবেত হয়েছি—সর্ব্ব প্রথমে তাঁর উদ্দেশে অন্তরের সভক্তি প্রণাম জানিয়ে আমি আমার কথাগুলি বল্‌ব। তাঁর সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা, চরিত্রবল, হৃদয়ের ঔদার্য্য, বিশ্বপ্রাণতা, মানব-মৈত্রী, কতদিকে কত কাজ করেছিল, সে সব বিষয়ে আমার চেয়ে জ্ঞানী ও গুণী অন্য সকলে জানাবেন; তাঁর সহৃদয়তা ও করুণায়, আমাদের বঙ্গনারীগণের জীবনে, যে নব যুগের সৃষ্টি হয়েছে, আমি শুধু সেই কথাটিই জানাব।

জীবনকে আঁকড়ে ধরে থাক্‌বার জন্যে প্রাণী মাত্রেরি, বিশেষ করে মানবমনের প্রাণপণ চেষ্টা আর ঐকান্তিক আগ্রহ দেখা যায়। মরতে আমরা সহজে চাইনে, জীবনে সুখ না থাক্‌লেও, বেঁচে থাক্‌বার সব সার্থকতা চলে গেলেও তবু দেখি মানুষ বেঁচে আছে, বেঁচে থাক্‌তে চায়। তাই মনে হয় জীবনের প্রতি এই অচলা নিষ্ঠা কখনই বৃথা নয়—সংস্কারের মত দৃঢ় এই বাসনার অন্তর্গূঢ় কারণের মর্ম্ম আমরা নিশ্চিত না জানলেও কারণ যে আছে সেটা নিঃসংশয়। যে বাঁচতে চায় তাকে বাঁচতে দাও—সে তার জীবন পরিণতির মুখে অগ্রসর করে নিয়ে যাক সে পথে বাধা হোয়োনা। তাই প্রাণ-হানি করবার মত মহাপাপ আর নেই—পরকে হত্যা করাত দূরের কথা—আত্মঘাতী হওয়াও এই কারণেই মহাপাপ বলে গণ্য। আবার এও দেখি, জীবন-নিষ্ঠ এই মানুষই জীবনকে তুচ্ছ করে, স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে বরণ করে অমর হবার আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল। বিশেষতঃ ধর্ম্মের অনুশাসন বলে মৃত্যু-বিধান যখন প্রচারিত হয়—তখন মানুষ মরতে আর মারতে দ্বিধামাত্র বোধ করে না। এক সময়ে স্বামীর সহিত সহমরণ এ দেশে বিধবা রমণীর পক্ষে জীবনের স্বর্গদ্বার বলেই প্রচারিত হয়েছিল। এই সাহস যিনি করতে পারতেন তাঁর কীর্ত্তি-গৌরবে পিতৃ-মাতৃ-শ্বশুর, তিনটি কুলই মহিমান্বিত হত, তিনি রমণীসমাজে প্রাতঃস্মরণীয়া হতেন, ফলে তাঁর ভাগ্যে পতি-সহবাসে অক্ষয় স্বর্গলাভ হত। যে মানুষ প্রাণ-ভয়ে ভীত; জীবনের সুখ-সম্ভোগ তুচ্ছ করে, মহত্তর কর্ত্তব্যকে বরণ করে নিতে অগ্রসর হয় না, আমরা তাকে করুণার চক্ষে দেখ্‌লেও প্রশংসা-ভাজন মনে করি না, তার জীবনের অনুসরণ করতে

আমাদের মন সরে না। আবার যে, মুহূর্ত্তে সব পরিহার করে, হাসিমুখে জ্বলন্ত চিতায় উঠে জীবন বিসর্জ্জন করতে পারে—তার এই আত্মত্যাগ আমাদের সমস্ত মনকে শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ে অভিভূত করে ; সেই মুগ্ধ অবস্থায় কাজটির মধ্যে ন্যায় অন্যায় ভাল মন্দ কোথায় কত খানি কিম্বা কতটুকু আছে কি নেই, সে সব বিচার-বিবেচনা করবার শক্তি, আমাদের থাকে না, এমন কি প্রবৃত্তিও চলে যায়। সহমরণের অনুশাসন, আর আমাদের পূর্ব্ব পিতামহীদিগের স্বেচ্ছায় অকুণ্ঠিত চিত্তে সে বিধানের অনুসরণের দৃষ্টান্ত এই ভাবেই সাধারণের মনকে মুগ্ধ করেছিল। ক্রমে অবস্থা এমনি হোল যে স্বেচ্ছায় স্বচ্ছন্দ চিত্তে সহমৃতা না হলে, তার প্রতি বল প্রয়োগ হোত।

এদেশে সহমরণ প্রথা প্রচলিত ছিল, কত যুগ যুগ ধরে এই নিষ্ঠুর নিয়মটি অব্যাহত ভাবে চলে এসেছিল—তার প্রমাণ আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র পুরাণ-ইতিহাস হতে জানা যায়। শাস্ত্রকারেরা এর পোষকতা করেছিলেন, জনসাধারণের সম্মতিলাভে সম্মানিত হওয়ায় ইহা ক্রমে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল।

মৃত্যুর নিকটেই আমরা সাচ্চা আর মেকি পরখ করে নিয়ে থাকি। যেখানে আন্তরিক প্রীতি আছে সেইখানেই মানুষ জীবনকে তুচ্ছ করে' মৃত্যুকে আনন্দে বরণ করে। স্বদেশপ্রেমিক স্বদেশের জন্যে প্রাণ উৎসর্গ করেন, সন্তানের শুভ-কামনায় মাতা মৃত্যুকে গণ্যই করেন না, ভগবদ্ভক্ত তাঁকে লাভ করবার জন্যে সকল কৃচ্ছ্র-সাধন বরণ করে', প্রাণপণ করেন। কথায় বলে মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন। আর যে প্রিয়-জন-বিচ্ছেদে নারীর জীবনের সমস্ত কল্যাণ ভ্রষ্ট, সমস্ত প্রয়োজন নিরর্থক হয়ে যায়—তাঁর জন্যে মরা বড় কথা নয়, বিশেষতঃ এ মরণে যখন ইহ-পরতঃ স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই মঙ্গলের সম্ভাবনা, তখন পত্নী যে স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণ করবেন তা'তে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। মহাভারতে দেখি ঋষি-শাপের পরিণাম-বশতঃ মহারাজ পাণ্ডু যখন অসময়ে মারা পড়লেন—তখন মাদ্রী সহমৃতা হলেন। তিনি মহারাজের প্রেয়সী মহিষী, লোকান্তরে তাঁর সহবাস স্বামীর পক্ষে অধিকতর সুখের হবে জেনে—কুন্তী সন্তানপালনের কর্ত্তব্যভার গ্রহণ করে বেঁচে রইলেন।

সহমরণ-প্রথা কেন যে প্রচলিত হয়েছিল, এর অর্থ-নৈতিক কিংবা সমাজনৈতিক কোন প্রকৃষ্ট কারণ কি সার্থকতা কালবিশেষে ছিল কিনা জানিনে ; কিন্তু এ যে নিষ্ঠুর প্রথা এ বিষয়ে কারো মনে সন্দেহ নাই, তখনও ছিল না। কেননা অঙ্গিরা হারীত প্রভৃতি ঋষিরা এ নিয়ম সুসংস্থাপিত করবার চেষ্টা করলেও, ভগবান মনু ব্রহ্মচর্য্য এবং নিষ্কাম ধর্ম্ম-সেবাকেই বিধবা নারীর শ্রেষ্ঠতর কর্ত্তব্য বলে' নির্দ্দেশ করেছেন। তাই রাজা রামমোহন রায় যখন এই নিষ্ঠুর নিয়ম উচ্ছেদ করবার জন্যে অস্ত্র ধারণ করলেন, তখন শাস্ত্রবিচার করে দেখিয়ে ত দিলেনই যে, একে ধর্ম্মের অনুশাসন-স্বরূপে মেনে নেওয়া চলে না—বরং এটি কাম্য কর্ম্ম বলে ভারতবর্ষের যে বিশেষ আদর্শ নিষ্কাম-ধর্ম্ম-পালন, তাকে হীন করা হচ্ছে। স্বর্গলাভের লোভে পুণ্য-অনুষ্ঠান করলেও, তার মূল আদর্শটি খাটো হয়ে যায়। এই জন্যে রাজা বললেন অনুমরণ-প্রথা শুধু নিষ্ঠুর নয়, এতে জীবনের আদর্শ ছোট হচ্ছে—মানবমনের দৃষ্টি অসীমে প্রসারিত না হয়ে, সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হচ্ছে। এতে জীবনের মূল্য হ্রাস হয়ে যাচ্ছে, মানব-আত্মার উন্নতির পথে অন্তরায় উপস্থিত করা হচ্ছে। জীবনের যে আদর্শ শ্রেষ্ঠতম, তাকে স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে সকলের মনের সম্মুখে জাজ্বল্যমান ও প্রাণবান করে রাখাই ধর্ম্মের অনুশাসন আর সাধনা।

কাজের চেয়ে, যে মনোভাবের প্রেরণায় মানুষ কাজটি করে, সেই মনোভাবের শক্তি অনেক অধিক। কাজ বাহিরের প্রকাশ, নানা বাধা-বিপত্তিতে তা' খণ্ডিত আর লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়া অসম্ভব নয়, চোখের উপর যা দেখি, মনের মধ্যে যা আছে তাকে হয়ত সম্পূর্ণ ব্যক্ত করতে পারে না। তবু মনোভাব যদি অব্যাহত থাকে—তবে মানুষের চেষ্টা কখনই ব্যর্থ হয় না—বারংবার খণ্ডিত হলেও একবার সে অখণ্ড মূর্ত্তিতে প্রকাশ পায়ই। রাজা রামমোহন ঐ যে প্রচার করলেন, জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ নিষ্কাম-ধর্ম্ম, আর স্ত্রী পুরুষ উভয়েই সে ধর্ম্মের সমান অধিকারী, বেঁচে থাক্‌বার অধিকার কারো চেয়ে কারো কম নয় ; বিধবা নারী মরণে পুণ্যতর লোকের অধিকারী হন, তার বেঁচে থাক্‌লে তিনি নিন্দনীয়, একথা একেবারে অস্বীকার করে শাস্ত্রপ্রমাণের সঙ্গে যখন দেখিয়ে দিলেন, জীবনের যেটি সবচেয়ে বড় জিনিস তা' পেতে হলে, উভয়কেই এক পথে চল্‌তে হয়—তখন নারীর জীবনের মূল্য কত বেড়ে গেল। দাঁড়াবার জায়গাটুকুও যার ছিল না, সে দেখলে পথ চল্‌বার অধিকারও তার আছে। এই সময় হতে আবার নূতন করে স্ত্রী-শিক্ষার সূত্রপাত, স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী লোকের আবির্ভাব হয়। এক সময়ে ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী, গার্গী ; বিদুষী খনা, লীলাবতী; বীরনারী দ্রৌপদী, সুভদ্রা, সংযুক্তা, জনা ; সাধ্বী জানকী, গান্ধারী, সাবিত্রী যে গৌরবে গৌরবান্বিত ছিলেন, একদিন তারাও সে মহনীয় স্থান অধিকার করতে পারবে এমন আশাও

মনে স্থান পেলে। আশাই জীবনকে রাখে, জীবনকে গতি দেয়, জীবনকে গড়ে তোলে; তাই আমরাও সম্মুখে চেয়ে আছি, ভারতের পূর্ব্ব-গৌরবের দিন যখন আবার ফিরে আসবে, তখন আমাদেরি মেয়েরা দেশের পুরুষের কাজের সহায় হবে, জীবনের পথে তা'দের অগ্রসর করে দুঃখ সাধনার দিনে তা'দিগকে উৎসাহিত করবে, তাদের জীবনের আদর্শকে কিছুতেই হীন হতে দেবে না, স্ত্রী স্বামীর, মাতা পুত্রের, ভগ্নী ভ্রাতার সাধনার পথে উত্তরসাধকের কাজ করতে পারবেন, সহায় হবেন, অন্তরায় কখনই হবেন না।

আজ আমাদের এই দেশে তর্পণের তিথি এসেছে, আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের স্মরণ করে, প্রতিদিন মন্ত্রোচ্চারণ করছি। শরতের আকাশে শারদ-শ্রী দেখা দিয়েছে—কোন্ সেই সুমেরুর সুদূর পথ হতে উত্তরের শিশির বাতাস বয়ে আসছে—এ যেন আমাদের পূর্ব্বগতদেরি-স্নিগ্ধ নিশ্বাস—ভরা নদীর গদগদ কণ্ঠে যেন শ্রাদ্ধের অপূর্ব্ব মন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছে:—ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ। মধুনক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধুদ্যৌরস্তু নঃ পিতা। মধুমান্নো বনস্পতিঃ, মধুমান্ অস্তু সূর্য্যঃ, মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ।

বায়ু মধু বহন করিতেছে, সমুদ্র মধু ক্ষরণ করিতেছে, ওষধি বনস্পতি সকল মধুমান্ হউক গো সকল সুমধুর দুগ্ধ দান করুক। রাত্রি মধু হউক, উষা মধু হউক, দ্যুলোক ও ভূলোক মধুময় হউক, সূর্য্য মধুমান হউক, মাতা ও পিতা মধুময় মঙ্গলভাবের অনুকরণ করুন।

আমরাও আজ স্বর্গীয় রাজা রামমোহনের উদ্দেশে বলছি—ওঁ যদ্ভয়াদ্বাতি বাতোঽয়ং, সূর্য্যস্তপতি যদ্ভয়াৎ। যস্মাদ্ভিয়ঃ প্রবর্ত্তন্তে, স দেব স্ত্বাং প্রসীদতু॥ হংসাঃ শুক্লীকৃতা যেন, শুকাশ্চ হরিতীকৃতাঃ। ময়ূরাশ্চিত্রিতা যেন স দেব স্ত্বাং প্রসীদতু॥

আর্য্যবিবাহের অভিব্যক্তি।

(আধুনিক)

(শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল, বার-এ্যাট-ল)

হিন্দুজাতি জীবন্মৃত হইলেও আজও জীবিত। প্রাচীন গ্রীস, রোম ও অ্যাথেন্স কোথায়? কোথায় ব্যাবিলন্, অ্যাসিরিয়া ও নিনেভা? কোথায় ঈজিপ্ট ও ইরান্? হায়! সে সব পুরাতন জাতির অস্তিত্ব-গৌরব আর নাই,—আর ভারত—সমসাময়িক ভারত,—এখনো পূর্ব্ববৎ বিদ্যমান রহিয়াছে। কোনো জীবন্ত জাতির অভিব্যক্তির সীমা নির্দ্দেশ করা যায় না,—তাই আর্য্যবিবাহের অভিব্যক্তিও এখনো অপ্রতিহত বেগে চলিতেছে, শেষে কোথায় দাঁড়াইবে, কি প্রকার রূপ ধারণ করিবে, কে বলিতে পারে? অতএব আর্য্যবিবাহের অভিব্যক্তির ইতিহাসকে দুই ভাগ বা অংশে বিভক্ত করা যাইতে পারে—একটী ভাগ প্রাচীন আর একটী ভাগ আধুনিক। "ব্রাহ্ম"বিবাহে আর্য্যবিবাহের ইতিহাসের প্রাচীনাংশের পরিসমাপ্তি।

রোমকেরা যাহাকে বলিত ancestral sacra (অর্থাৎ worship of the dei parentum) বৈদিক ঋষিরা তাহাকে "পিতৃযজ্ঞ" বলিতেন। অধুনা "পিতৃযজ্ঞ" রূপান্তরিত হইয়া "শ্রাদ্ধে" পরিণত হইয়াছে। শ্রাদ্ধের মৌলিক অর্থও, ancestor-worship—"শ্রদ্ধয়া দীয়তে যস্মাৎ শ্রাদ্ধং তেন নিগদ্যতে।" মৃত পিতৃদিগের উদ্দেশে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অনুষ্ঠেয় কর্ম্মই শ্রাদ্ধ, তাহাই আধুনিক "পিতৃযজ্ঞ।" Ancestor-worship বা "শ্রাদ্ধের" প্রভাবে পরোক্ষভাবে সর্ব্বপ্রকার দুষণীয় বিবাহ-প্রথা একরকম অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্ম-বিবাহই এক্ষণে সর্ব্ববর্ণের পক্ষে প্রশস্ত। কারণ, ব্রাহ্মোদ্বাহজাত সন্তানগণ ঊর্দ্ধ অধঃ একবিংশতি পুরুষকে পবিত্র করে অর্থাৎ "পুন্নামক * নরক" হইতে উদ্ধার করে। অন্যান্য বিবাহের সন্তান অপেক্ষা এই বিবাহের সন্তানেরা maximum number of ancestors and descendants বা অধিকতম সংখ্যক ঊর্দ্ধ-অধস্তন পুরুষকে উদ্ধার

---

* "পুন্নামনরকাৎ ত্রায়তে "পুত্র"ইত্যুচ্যতে"—"পুত্র"কে double "ত" দিয়ে "পুন্নামনরকে"র ত্রাণকর্ত্তা স্বরূপ দাড় করান হইয়াছে। double 'ত' না দিলে "ত্রায়তে" অর্থাৎ ত্রাণ কার্য্য কেমন করিয়া হইবে? Etymologically "পুত্র" শব্দের single 'ত' হওয়া চাই, যাস্কতে single 'ত'ই আছে) Double 'ত' টা "Pious forgery" বা "ধর্ম্ম-জাল" ছাড়া আর কিছুই নহে। "পুন্নামক নর-কের" কথাটা কোন রকমে আনা চাই, তাই "পুত্র"কে "পুত্র" করা হইয়াছে। আর একটা প্রমাণ—ঋগ্বেদে 'নরক' নাই—একুশটা নরক পৌরাণিক যুগে কল্পিত হইয়াছিল। দুষ্ট বালককে যেমন 'জুজুর' ভয় দেখাইয়া শান্ত করা হয়, ভয়াবহ নরক সকল কল্পিত করিয়া অশিক্ষিত কুসংস্কারাপন্ন সাধারণ হিন্দুদিগকে তেমনি ধর্ম্মপথে রাখিবার চেষ্টা হইয়াছিল। সেই একই কারণে "রাজদণ্ড" অর্থাৎ রাজনৈতিক দণ্ডও কতকটা "প্রায়শ্চিত্ত" দণ্ডে পরিণত হইয়াছিল। ঋগ্বেদের ঋষিরা optimists ছিলেন, তাঁহারা নরকের ধার ধারিতেন না। যমলোককেই স্বর্গ (Elysium) মনে করিতেন। ইন্দ্রাদি দেবতাদের সঙ্গে একটা চুক্তি বা রফা করিয়া লইতেন—তাঁহাদের সোমরস বা সুরা দিতেন ও নিজেরাও খেতেন, এবং তৎপরিবর্ত্তে দেবতারা তাঁহাদের শত্রুনাশ করিতে সহায়তা করিতেন, স্ত্রী গরু পুত্র দাস দাসী ধন ও শত বৎসর আয়ুও দান করিতেন।

করে। এ ছাড়া, আবার ব্রাহ্ম বিবাহে কন্যা দান করিলে কন্যাদাতার স্বর্গ লাভ হইবার সম্ভাবনা; এই বিবাহের এই মন্ত্রটাই তাহার প্রমাণ—"কন্যাং কনকসম্পন্নাং সর্ব্বাভরণভূষিতাং দাস্যামি বিষ্ণবে তুভ্যং ব্রহ্মলোকজিগীষয়া।" "ঔদ্বাহিকেঽপি সম্বন্ধে ব্রাহ্মী ভার্য্যা বরীয়সী"—অতএব ব্রাহ্মবিবাহ "দ্বিজাতি"দিগের, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণদিগেরই monopoly বা একচেটে ছিল। মনুর সময়ে এই বিবাহের একটা qualification বা কড়ার দাঁড় করান হইয়াছিল—"শ্রুতশীলবতে দানং কন্যায়াঃ" (মনু ৩।২৭); বেদজ্ঞ ব্যক্তিই এই বিবাহ প্রথা দ্বারা দারপরিগ্রহ করিতে পারিতেন। অতএব বেদপাঠে অনধিকার হেতু শূদ্রেরা ব্রাহ্মবিবাহ করিতে পারিত না, প্রকৃত পক্ষে তাহাদিগের jus connubium বা ধর্ম্মবিবাহ করিবার অধিকারও একরকম ছিল না। ধর্ম্মবিবাহের স্ত্রীই প্রকৃত পত্নীবাচ্যা।

মনূক্ত qualification "শ্রুত শীলবতে দানং কন্যায়া" যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় দৃষ্ট হয় না—শূদ্রদিগের এই "সুবর্ণ-সুযোগ"—অতএব উচ্চবর্ণের অনুকরণেচ্ছু সৎশূদ্রেরা ব্রাহ্মোদ্বাহ-প্রথা অবলম্বন করিতে লাগিল। আজকাল (তদ্‌বিপরীতে প্রমাণ না থাকিলে) সর্ব্ববর্ণের বিবাহ ব্রাহ্ম বিবাহ বলিয়া primafacie presumption রূপে পরিগৃহীত হইবে।

স্ত্রীধন কাহার প্রাপ্য কাহার অপ্রাপ্য, তন্নির্ণয়ার্থই আর্য্যব্যবহারশাস্ত্র বা হিন্দু-আইন মন্বমুমোদিত আট প্রকার বিবাহ স্বীকার করে, যেহেতু বিবাহভেদে স্ত্রীধনের স্বামিত্বভেদও হয়। এতদ্দ্বারা ইহা প্রমাণ হইতেছে না, যে এই শাস্ত্রোক্ত আট প্রকার বিবাহের অতিরিক্ত অন্য কোন বিবাহ-প্রথা স্বীকৃত হইবে না। মনু বলেন "আচারো পরমো ধর্ম্মঃ", অর্থাৎ "clear proof of custom overrides the written text of the law"; * দেশ কালজাতিবিশেষে আচারেরও তারতম্য হইয়া থাকে। এইরূপে হয় বলিয়াই মান্ধাতার আইনেরও উন্নতির আশা করা যাইতে পারে—custom harmonizes the dead law with the living practice.

ভারতযুদ্ধের পর অভিজাত রাজন্যবর্গ ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়াতে নানা বৈদেশিক জাতিরা পঙ্গপালের ন্যায় ভারতবর্ষে আসিতে লাগিল—শক, যবন, কিরাত, কম্বোজ, পারসীক, বাহ্লীক, হূন প্রভৃতি নানা জাতির উল্লেখ "মুদ্রারাক্ষসে" দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব এই সব বৈদেশিক জাতির ঘাত-প্রতিঘাতে আর্য্যদিগের ধর্ম্ম ও আচারেরও পরিবর্ত্তন ঘটিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে নানা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান হইল—মহাভারতে ভারতযুদ্ধের যোদ্ধাদিগের তালিকার ন্যায় "দশকুমারচরিতে" এইসব অভিনব ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সেইরূপ লম্বা-চৌড়া একটী তালিকা প্রদত্ত আছে। ক্রমে ক্রমে বৌদ্ধধর্ম্ম, ইসলামীধর্ম্ম ও খৃষ্টানীধর্ম্মের সংস্পর্শে আসিয়া ভারতবাসীদিগের মধ্যে কাহার কাহার মতিগতি-ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিল। ইহারা কতকটা আর্য্যাচার কতকটা বৌদ্ধ, মুসলমানী বা খৃষ্টানী আচার ও ধর্ম্ম অবলম্বন করিল—বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতিকালে তান্ত্রিক-সম্প্রদায় আবির্ভূত হইল—মুসলমানধর্ম্মের প্রভাবে শিখ-সম্প্রদায় ও খৃষ্টান ধর্ম্মের সংস্পর্শে ব্রাহ্মসমাজ, বিশেষত, নববিধান-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল।

বাহাত্তর সালের তিন আইনের পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে মাননীয় ষ্টিফেন সাহেব বঙ্গব্যবস্থাসভায় ব্রাহ্মসমাজ-সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন—

"It (the Brahmo Samaj) is interesting on many accounts; but, above all, because Brahmoism is at once the most European of Native religions, and the most living of all Native versions of European religion. The orginal founder of the Brahmo body was the well-known Ram Mohun Roy, who founded the sect about forty years ago. Since that time the Brahmos have divided themselves into two bodies, the Adi Brahmo samaj, or the Conservative Brahmos and the [Keshobites or the] Progressive Brahmos The Progressive Brahmos have broken far more decisively with Hinduism than the Conservatives.

অর্থাৎ 'একাধিক বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজ আমাদের চিত্তাকর্ষণ করে, বিশেষতঃ এক বিষয়ে তো করেই—ব্রাহ্মধর্ম্ম একাধারে দেশীয় ধর্ম্মসমূহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ইউরোপীয় ভাবাপন্ন এবং ধর্ম্মের সর্ব্বাপেক্ষা জীবন্ত দেশীয় ইউরোপীয় সংস্করণ। ব্রাহ্মসমাজের স্থাপনকর্ত্তা হচ্ছেন সুবিখ্যাত রামমোহন রায়। তিনি চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করেন কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর ব্রাহ্মেরা দুই দলে বিভক্ত হইলেন—আদিব্রাহ্মসমাজের রক্ষণশীল ব্রাহ্ম ও কৈশব বা উন্নতিশীল ব্রাহ্ম;"উন্নতিশীল" ব্রাহ্মগণ "রক্ষণশীল" ব্রাহ্মদিগের অপেক্ষা হিন্দুদিগের সহিত অনেক বেশী পৃথক হইয়া পড়িয়াছেন।

* এই কথা স্থিরতর থাকিলে সহমরণ প্রভৃতি অন্যায় প্রথা উঠাইতে পারা যাইত না। তং সং।

শিখ-সম্প্রদায় মুসলমানধর্ম্ম-প্রভাবে সংস্থাপিত—শিখেরা সর্ব্বজাতিকে তাহাদের দলভুক্ত করিতে পারে। স্বামী দয়ানন্দ প্রতিষ্ঠিত আর্য্যসমাজ খানিকটা শিখদিগের অনুকরণে খানিকটা বৈদিক সমাজের আদর্শে গঠিত। আর্য্যসমাজ ও শিখদের ন্যায় সর্ব্বজাতিকে আর্য্যধর্ম্মে দীক্ষা দিয়া গ্রহণ করে। আর্য্যসমাজ ভারতের একটী বিশেষ ক্ষমতাশালী সম্প্রদায়। আর্য্যসমাজের লোকসংগ্রহের অন্যতর প্রধান কারণ ইহার বেদমূলকত্ব। বৈদিক কালে ঋষিরা "ব্রাত্যস্তোম" দ্বারা নানা জাতিকে আর্য্যমণ্ডলীর ভিতর গ্রহণ করিতেন। আর্য্যসমাজীরা বেদের দোহাই দিয়া আর্য্য ঋষিদিগের পদানুসরণ করিতেছেন। আর্য্য শব্দও গৌরবসূচক। আর্য্যধর্ম্মের দোষগুণ বিচার করা নিষ্প্রয়োজন, কেননা সর্ব্বধর্ম্মই progressive অর্থাৎ সকল ধর্ম্মেরই অভিব্যক্তি অবশ্যম্ভাবী।

বলা বাহুল্য, এই সব দশ আনা পরধর্ম্মী ও ছয় আনা স্বধর্ম্মীদিগের প্রতি ষোল আনা খাঁটি হিন্দু আইন প্রযুক্ত হইতে পারে না। তথাপি যতদূর সাধ্য ব্রিটিশ ধর্ম্মাধিকরণ এই অসাধ্য সাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। একটা উদাহরণ দি। Kutchee Memon প্রভৃতি জাতিরা পূর্ব্বে হিন্দু ছিল, পরে মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিল, কিন্তু মুসলমান ধর্ম্মের সহিত মুসলমান আইন বা ব্যবহার শাস্ত্র গ্রহণ করিল না। হিন্দু আইন দ্বারা তাহাদের উত্তরাধিকারিতা ও সর্ব্বপ্রকার স্বত্বাস্বত্ব নির্ণীত হইতে লাগিল। Kutchee Memonদের বিবাহ মুসলমান ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা সম্পাদিত হয়। মনুক্ত আট প্রকার বিবাহের মধ্যে কোনটাতে ইহা আসিতে পারে না। অথচ হিন্দু আইন দ্বারা স্ত্রীধনাদি নির্ণীত হওয়া চাই। এরূপ অবস্থায়—কি কর্ত্তব্য? ব্রাহ্মাদি বিবাহ হইলে স্ত্রীধনের devolution বা উত্তরাধিকারিতা একরূপ, পৈশাচাদি বিবাহের devolution বা উত্তরাধিকারিতা অন্যরূপ—বিবাহভেদে স্ত্রীধনের অধিকারির ভেদ হইয়া থাকে। Kutchee Memonদের বিবাহ হিন্দু ধর্ম্ম-সম্মত না হইলেও, হিন্দু বিবাহে যাহা শাস্ত্রে দোষণীয় বলা হইয়াছে (যথা শুল্ক গ্রহণ পূর্ব্বক কন্যা বিক্রয় করা ইত্যাদি) সে সব দোষ হইতে শূন্য (অর্থাৎ free from all that is reprehensible) এবং ব্রাহ্ম বিবাহ হিন্দুদিগের মধ্যে যেমন শ্রেষ্ঠ, Kutchee Memonদিগের মুসলমান ধর্ম্মানুষ্ঠানে যে বিবাহ হয় তাহাও ব্রাহ্মবিবাহের ন্যায় শ্রেষ্ঠ। অতএব ব্রাহ্মবিবাহে স্ত্রীধনের যেরূপ devolution বা গতি হইবে, Kutchee Memonদেরও ব্রাহ্মসদৃশ বিবাহে স্ত্রীধনের devolution বা গতি সেইরূপ হওয়া কর্ত্তব্য, কারণ—

"it is the quality and not the form of marriage that decides the course of devoltion. ব্রিটিশ ধর্ম্মাধিকরণের এই সিদ্ধান্ত। পিছনে দশ আনা বিলাতী ফ্যাসানে, সম্মুখে ছয় আনা দেশী ফ্যাসানে চুল কাটার মত দশ আনা reformed বা heterodox ও ছয় আনা orthodox ভারতবাসীদিগের প্রতি ষোলআনা অর্থাৎ সম্পূর্ণ হিন্দু আইন প্রযুজ্য নহে—তাই ব্রিটিশ ধর্ম্মাধিকরণগণ পুরাতন সংস্কৃত পুঁথি বা শাস্ত্রের অনুস্বার বিসর্গ সমেত ব্যাখ্যা করিয়া তাহাদিগের স্বত্বাস্বত্ব নির্ণয় করিতে গিয়া সময়ে সময়ে হাস্যাস্পদমাত্র হয়েন। সম্পূর্ণ orthodox হিন্দু আইন শাস্ত্র প্রযুজ্য নয় বলিয়াই the English Rule of Justice, Equity and Good conscience প্রয়োগ করিবার ও তৎসঙ্গে হিন্দু শাস্ত্রের উদার ব্যাখ্যার ব্যবস্থা চালাইবারও কোন ব্যাঘাত নাই।

(ক্রমশঃ)

সংবাদ।

আদিব্রাহ্মসমাজ মেডিকেল মিসনের শাখারূপে বোম্বাই অঞ্চলে ধারবার নামক স্থানে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিশ্বাসের তত্ত্বাবধানে একটি মেডিকেল মিসন স্থাপিত হইয়াছে। এখানে দরিদ্রদিগকে বিনামূল্যে হোমিওপাথিক ঔষধ বিতরণ করা হয়। গত জুলাই মাসে যখন এখানে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা এপিডেমিক প্রথম আরম্ভ হয় তখন এই মিসন হইতে প্রায় ৬০ জন উক্ত রোগাক্রান্ত রোগী চিকিৎসিত হইয়া আরোগ্য লাভ করে। বর্ত্তমান দ্বিতীয় এপিডেমিকে বহু রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে। রোগী সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। এক্ষণে এই মিসনটি ক্রমেই জন সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে এবং যাহাতে ইহা চিরস্থায়ী হয় তাহার বন্দোবস্ত হইতেছে। এই মিসনের আর্থিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই মিসন দ্বারা যে ব্রাহ্মসমাজের প্রচার কার্য্যের বিশেষ সহায়তা হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৩০শে কার্ত্তিক শনিবার বেহালা ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চষষ্ঠিতম সাম্বৎসরিক উৎসবে অপরাহ্ণ ৩টার পরে ব্রাহ্মধর্ম্মের পারায়ণ ও সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার পরে ব্রহ্মোপাসনা হইবে। বন্ধুগণ যথাসময়ে উৎসবে যোগ দিয়া সুখী করিবেন।

বেহালা, ১৮৪০ শক, ১লা কার্ত্তিক। শ্রীনীলকান্ত মুখোপাধ্যায়। সম্পাদক।

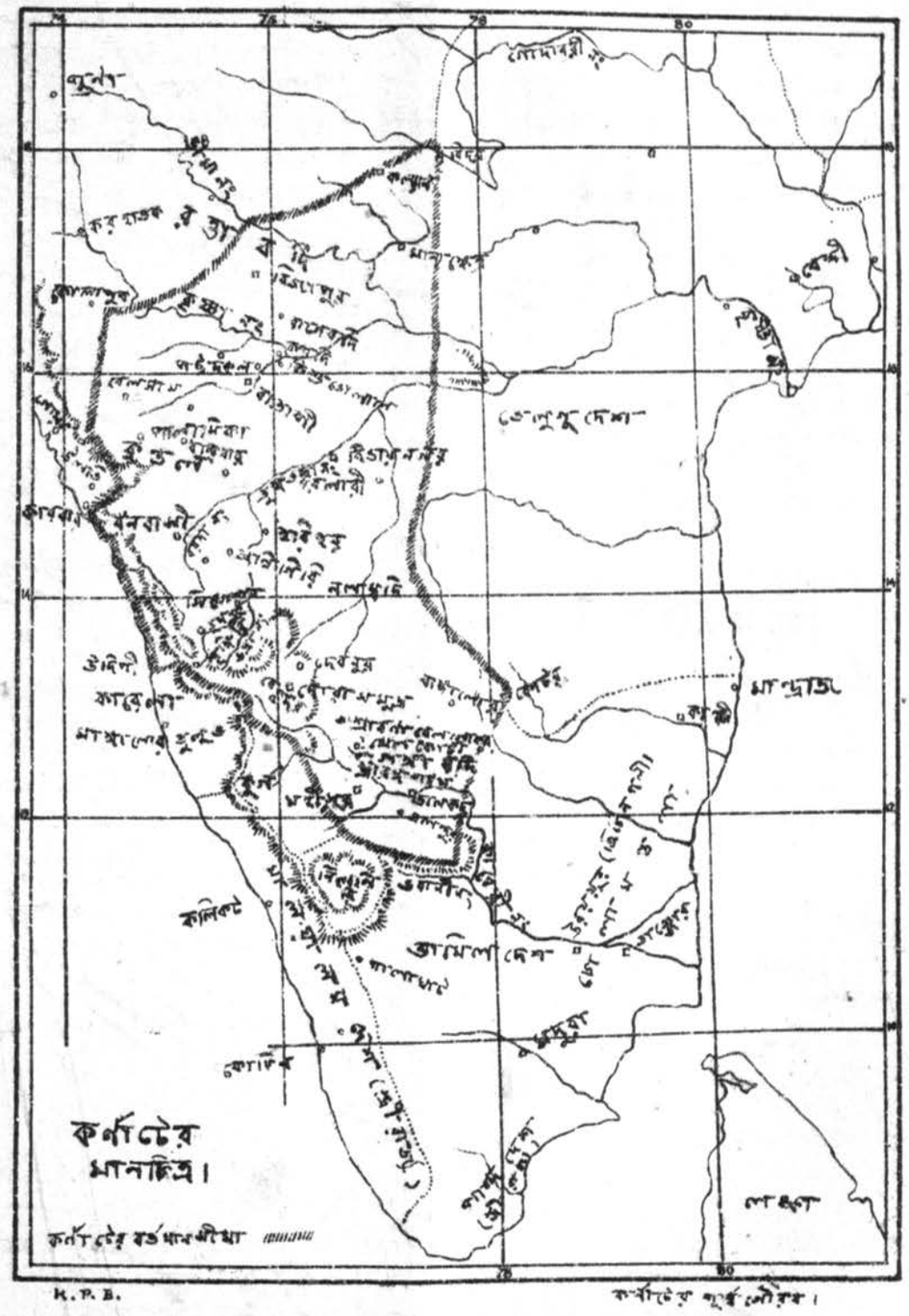
কর্ণাটের
মানচিত্র।
কর্ণাটের বর্তমান সীমা
K. P. B.
কর্ণাটের পূর্ব সীমা।

একমেবাদ্বিতীয়ং

ঊনবিংশ কল্প

চতুর্থ ভাগ।

অগ্রহায়ণ, ব্রাহ্মসম্বৎ ৮৯।

১০৪ সংখ্যা

১৮৪০ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
ঐহিকমামুষ্মিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"

সত্যধর্ম্ম ও উপধর্ম্ম।

বর্ত্তমান যুগে বাহিরে বাহিরে দেখিলে হতাশা আসিয়া হৃদয় অধিকার করিতে চাহে বটে যে জনসাধারণ বুঝি অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের উপযোগিতা উপলব্ধি করে না। মনে হয় বটে যে, প্রত্যেক মনুষ্যই যেন একটী-না-একটী সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের গণ্ডীর ভিতরে থাকিতে পারিলেই তৃপ্তি বোধ করে, শান্তি অনুভব করে। মনের ভিতরে তখন এই সংশয়ও আসে বটে যে, অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া লাভ কি? এই সংশয় অমূলক—আমাদের হতাশ হইবার কোনই কারণ দেখা যায় না। একটু তলাইয়া দেখিলেই আমরা বুঝিতে পারিব যে বর্ত্তমান যুগের অন্যতর প্রধান লক্ষণই হইল অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের অনুসন্ধান। তবু যে জনসাধারণ সাম্প্রদায়িকতার ভিতরে থাকিয়া তৃপ্তি লাভ করে, শান্তি অনুভব করে, তাহার কারণ অন্যায় বিভীষিকা ও আলস্য। সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে আপন সম্প্রদায়ের পাঁচজনে যেরূপ চলিবে সেইমত অনুষ্ঠানাদি করিলেই আর কোন ঝঞ্ঝাট থাকে না; পাঁচজনে জানিল যে তুমি তাহাদিগের ধর্ম্মমত স্বীকার কর এবং তুমিও আপনাকে প্রবোধ দিলে যে তুমি যথাযুক্ত ধর্ম্মচর্চ্চা কর; তোমার হৃদয়ে সত্য সত্য ধর্ম্মের অধিষ্ঠান হইল কি না, সে কথা না তোমার সম্প্রদায়ের লোকেরা, না তুমি নিজে, অনুসন্ধান করা আবশ্যক বোধ করিলে। সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের, ধর্ম্মের বহিরাবরণের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ না হইয়া যাইতে পারে না। কিন্তু অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে ভগবানের সহিত আমাদের প্রত্যক্ষ যোগ নিবদ্ধ করিতে হইবে, আত্মনির্ভর অবলম্বন করিতে হইবে, সাধনা করিতে হইবে। তুমি অপর পাঁচজনের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া নিখুঁতভাবে অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন কর বা না কর, তাহা অবান্তর কথা। অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্মাবলম্বী অন্যের নিকটে হৌক বা না হৌক, অন্তত নিজের কাছে হিসাব নিকাশ দিতে দায়ী যে, প্রকৃত ধর্ম্মের কতটুকু তিনি আত্মস্থ করিয়া লইতে পারিলেন; বাহ্যিক অনুষ্ঠানে মাত্র নহে, কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্মের সাধনায় তিনি কতদূর অগ্রসর হইলেন। এখানে গতানুগতিকতার স্থান নাই, আলস্যের অবসর নাই। এই যে ধর্ম্মসাধনার ফলে বিশ্রামের অভাব হইবে, এই বিভীষিকা এবং তদনুষঙ্গী আলস্যের প্রতি পক্ষপাতই প্রধানত জনসাধারণকে অসাম্প্রদায়িক সত্যধর্ম্ম অবলম্বনে পশ্চাৎপদ রাখে।

ধর্ম্মের বহিরাবরণ মানুষের প্রস্তুত, কিন্তু প্রকৃত সত্যধর্ম্ম ভগবৎপ্রেরিত। সুখসম্পদের উত্তাপের ভিতর দিয়া, বিপদ আপদের উর্ব্বর ভূমি ভেদ করিয়া, শোকসন্তাপের শান্তিধারা লাভ করিয়া এই অন্তর্নিহিত সত্যধর্ম্ম মানবহৃদয়ে অভি-

ব্যক্ত হইতে থাকে। এই অভিব্যক্তির আবেগ উপস্থিত হইলে প্রাণের পুরাতন স্তরগুলি একে একে খসিয়া গিয়া নবনব স্তরের জন্মদান করে। সেই আবেগের সম্মুখে কোন বাধাই দাঁড়াইতে পারে না। এইরূপ আবেগের বশেই স্মৃতির অতীত পুরাকাল হইতে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত সাধকমাত্রেই ঈশ্বরের সঙ্গে আত্মার প্রত্যক্ষ যোগ নিবদ্ধ করিয়াছেন এবং সেই প্রত্যক্ষ যোগমূলক অসাম্প্রদায়িক সত্যধর্ম্ম জনসাধারণের নিকট প্রচার করিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন। কেবল এই ভারতবর্ষের সাধকগণ নহে, জগতের বিভিন্ন দেশের সাধকগণও সাধনার ফলে অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের একই উন্নতক্ষেত্রে উপনীত হইয়াছেন দেখা যায়। পারস্যবাসী জনৈক সাধক (জালাল উদ্দিন) তাঁহার এক উক্তিতে আমাদেরই প্রাণের কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন—"যাঁহার মহিমা চতুর্দ্দিকে কীর্ত্তিত হয় তিনি যখন একমাত্র অদ্বিতীয়, তখন ধর্ম্মও প্রকৃত পক্ষে এক ও অভিন্ন।"

অসাম্প্রদায়িক সত্যধর্ম্মই মিলনের ভিত্তিভূমি। এই সত্যধর্ম্ম এক ও অভিন্ন বলিয়া, ইহার অভিব্যক্তির সঙ্গে মিলনেরও ভাব অভিব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে। এই সত্যধর্ম্ম ভগবানের স্বরূপ নবতর মূর্ত্তিতে মহত্তর মূর্ত্তিতে প্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে। মানব পুরাতন জীর্ণ সংস্কারসমূহ হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির পথে, সকল মিলনের মূল ভগবানের সহিত প্রত্যক্ষ যোগের পথে আপনাকে পরিচালিত করিতে উদ্যুক্ত হইয়াছে। তাই আমরা বলিতে চাহি যে বর্ত্তমান যুগ মিলনের যুগ। আমরা দেখিতেছি যে বর্ত্তমান যুগে সত্যধর্ম্মের অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে, মিলনের ভাব অগ্রসর হইবার সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের যাহা কিছু, সকলই ধীরে ধীরে পিছাইয়া চলিয়াছে। ইহা স্বীকার করিতে কোনই বাধা নাই যে প্রাচীন কালের সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মসমূহের অনেক প্রথা, অনেক আচার ব্যবহার, অনেক অনুষ্ঠান সমাজরক্ষার জন্য প্রকল্পিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহাও আমরা অস্বীকার করিতে পারি না যে সেগুলি যথাসময়ে সমাজরক্ষার উপযোগী হইলেও পরিণামে তাহাদের অনেকগুলি সমাজকে নানা প্রকারে বিভক্ত করিতে করিতে ধ্বংসের মুখে লইয়া চলিতেছিল। বর্ত্তমান যুগে আমরা যুগধর্ম্মের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে চাহি না—আমরা আর সে 'শতধাবিভক্তের' বিভাগ চাহি না। আমরা চাহি মিলন—একতা; আমরা চাহি, সকলেরই হৃদয়ে একই ভাব ঝঙ্কার দিয়া উঠুক। পুরাকালের ন্যায় মতভেদের কারণে আমরা ধর্ম্মের নামে অভিশাপ প্রদানে আর অগ্রসর হইব না; তদ্বিপরীতে আমাদের সহিত একমত বা ভিন্নমত, সকলেরই মঙ্গলের জন্য হৃদয়ের প্রার্থনা জাগাইয়া তুলিব। এই যে এত বড় যুদ্ধ চলিতেছে, লক্ষ লক্ষ নরহত্যা হইতেছে—আপাতত মনে হইতেছে বটে যে বিরোধ বিবাদ মূর্ত্তিমান হইয়া মৃত্যুর হস্ত ধারণ করিয়া জগতসংসারে বিচরণ করিতেছে। কিন্তু এই মহাবিবাদ, এই মহামৃত্যুর ভিতর দিয়াও যে এক মহামিলনের সৃষ্টি হইতেছে, তাহা চিন্তাশীল চক্ষুষ্মান ব্যক্তিমাত্রই উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন। মহাসমরের গগনভেদী অবিশ্রাম কামানগর্জ্জনও ভেদ করিয়া মহামিলনের আনন্দসঙ্গীত আমাদের কানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্য কথা যে, এই মহামৃত্যুর সমক্ষেই হৃদয়ের শান্তিপ্রদ অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের প্রকৃত রূপ স্পষ্টতররূপে উপলব্ধ হইতেছে।

এই মহামিলনের যুগে প্রকৃত সত্যধর্ম্ম আপনাকে সাম্প্রদায়িকতার সীমার মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারেই না। কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মই এখন আর এ কথা বলিতে সাহস করে না যে, সেই ধর্ম্মই পরিত্রাণের একমাত্র উপায়। এখন প্রত্যেক সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মই আপনাপন গণ্ডীর সীমা বিস্তৃত করিতে করিতে উদারতর ধর্ম্মের সহিত বিলীন হইতে চাহে। প্রত্যেক সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম নিজ নিজ গণ্ডীর উপরে উঠিয়া এখন বিশ্বমানবের জ্ঞানের উপর প্রেমের উপর আপনাকে দাঁড় করাইতে চাহে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাব বিশ্বাস মতামত প্রভৃতির স্থানে এখন এক বৃহত্তর মানবধর্ম্ম আপনার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে উদ্যত হইয়াছে। জগদ্ব্যাপী যে সকল মহাধর্ম্মের শিষ্যসংখ্যা অগণিত, সেই সকল মহাধর্ম্মও আজ আপনাদিগকে মানবের অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত ঐ বৃহত্তম সত্যধর্ম্মের একদেশ-

মাত্র বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছে। যে ধর্ম্ম জগতের ধর্ম্ম, যে ধর্ম্ম মানবজাতির ধর্ম্ম, মহা-ধর্ম্মের নেতাগণ আজ সেই ধর্ম্মকেই নিজেদের ধর্ম্ম বলিয়া পরিচিত করিতে চাহেন। কোন সুপ্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য পণ্ডিত (Schiller) বলিয়াছেন—"কোন্ ধর্ম্ম আমি স্বীকার করি ? তোমরা যে সকল ধর্ম্মের নাম করিবে, তাহাদের কোনটাই আমার ধর্ম্ম নহে। কেন নহে ? কারণ আমি ধর্ম্মেরই।" সকল ধর্ম্মের ভিতর যে সার ধর্ম্ম, তাহাই এখন সকলে রাখিতে চাহে, ধরিতে চাহে এবং সেই সার ধর্ম্মকেই বিজ্ঞা-নের ভিতর দিয়া, সমাজনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি মানবের সর্ব্ববিধ কর্ম্মক্ষেত্রের ভিতর দিয়া প্রচার করিতে চাহে। বর্ত্তমান যুগে ব্যবসায় বাণিজ্য বল, রাজনীতি বল, এমন কি বিরোধ বিবাদ সমস্তই নিজ নিজ দেশের, নিজ নিজ জাতির, নিজ নিজ অবস্থার সীমা অতিক্রম করিয়া আন্তর্জাতিক ভাব ধারণ করিবার অভিমুখে চলিয়াছে, কেবল ধর্ম্মই কি একমাত্র স্থান ও কালের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমা-বদ্ধ হইয়া থাকিবে ? তাহা কখনই হইতে পারে না। ব্রাহ্মধর্ম্মকে আমরা এই অসাম্প্রদায়িক সত্য-ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করি, কারণ ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলভিত্তি এই চিরসত্য যে "ব্রহ্মজ্ঞানরূপ স্বর্গীয় অগ্নি দেশ-কাল অবস্থা-নির্ব্বিশেষে সকলেরই অন্তরে নিহিত আছে।" এই মহাসত্য কোন প্রকার সীমাদ্বারা আবদ্ধ নহে—আবদ্ধ হইতেই পারে না। জগতের সকল ধর্ম্মই এই চিরসত্যের অভিমুখীন হইয়া চলিয়াছে।

কে বলে যে জনসাধারণের পক্ষে এই অসাম্প্র-দায়িক ধর্ম্ম ধারণ করা সহজ বা সম্ভব নহে ? সেই সত্যধর্ম্মকে উপলব্ধি করিবার জন্য যত্ন, চেষ্টা ও সাধনা আবশ্যক হইলেও এ কথা বলা ঠিক নহে যে সেই সত্যধর্ম্ম হৃদয়ে ধারণ করা অত্যন্ত কঠিন বা অসম্ভব। অসাম্প্রদায়িক সত্যধর্ম্মকে তো আর নূতন করিয়া গড়িতে হইতেছে না—উহা যে প্রত্যেক মানবেরই অন্তরে সহজরূপে নিহিত রহিয়াছে। আধ্যাত্মিক দিক দিয়া দেখিলে, মানবত্বের দিক দিয়া দেখিলে দেখিব যে সকল মানুষই বস্তুত এক। মানবত্ব প্রত্যেক মানবেরই অন্তরে অবিনশ্বর ধর্ম্ম-রূপে জাগ্রত থাকিয়া চতুর্দ্দিকে আশা-ভক্তির বিমল কিরণ বিকীর্ণ করিতে করিতে চরম লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। প্রকৃত মানবধর্ম্মের উৎসসকল মানবপ্রকৃতিরই অন্তরতম প্রদেশে অবস্থিত। সেই ধর্ম্মের সুস্নিগ্ধ স্রোত জীবনের প্রথম প্রভাতেই প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত মানবপ্রকৃতিকে সিক্ত রাখিয়াছে।

এই সত্য মানবধর্ম্মের উৎসসকল চিরনূতন। এই চিরনূতন উৎসসকল হইতে সেই সত্যধর্ম্ম প্রত্যেক মানবের জন্মাবধি প্রত্যেক মুহূর্ত্তের নিশ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে নব নব আকারে দেখা দেয়। আলোচনা করিয়া যখন মানবসৃষ্টির মূল খুঁজিয়া পাই না এবং তাহার অভিব্যক্তির শেষও দেখিতে পাই না এবং যখন দেখি যে কোন মানবই অসম্বন্ধ-ভাবে জন্মগ্রহণ করে না—জগতের বর্ত্তমান অতীত ও ভবিষ্যৎ প্রতিমানবের সঙ্গে সম্বন্ধ লইয়া জন্মগ্রহণ করে ; যখন দেখি যে কোন মানবই কেবল নিজের জন্য বাঁচিয়া থাকে না, প্রত্যুত তাহার মঙ্গলামঙ্গলের সঙ্গে জগতের প্রত্যেক অধিবাসীর এবং জগতের প্রত্যেক অধিবাসীর মঙ্গলামঙ্গলের সঙ্গে তাহার মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে, তখন মানবসৃষ্টির আদি হইতে মানবের অন্তর্নিহিত সেই সত্যধর্ম্মের সীমা নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বাক্য ও মন প্রতিনিবৃত্ত হয়। সেই সত্য মানবধর্ম্মের সীমা নির্দ্দেশ করা সম্ভব নহে, কারণ মানবের উপরে অনন্ত, মানবের নিম্নে অনন্ত ; মানবের বামে অনন্ত, মানবের দক্ষিণে অনন্ত। যে মানব এইরূপে নিজের অগ্রে পশ্চাতে সর্ব্বত্র অনন্তকে দর্শন করেন, তিনিই অমৃতসাগরে অব-গাহন করেন। মানব এখন বুঝিয়াছে যে, আত্মার অন্তরে স্থান ও কালের অতীত, বিভিন্ন অবস্থার অতীত যে সত্যধর্ম্ম উপলব্ধি করা যায়, তাহাই একমাত্র ধর্ম্ম ; ইহা ব্যতীত আর যাহা কিছু ধর্ম্মের নামে অভিহিত হয়, সেগুলি ধর্ম্ম নহে, উপধর্ম্ম মাত্র।

অনেকের মত এই যে, স্থান, কাল ও অবস্থার বিভিন্নপ্রকার সমাবেশ হইতেই ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়। এ কথা নিতান্তই ভুল। এ প্রকার সমা-বেশ হইতে সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের বা বিভিন্ন অনুষ্ঠান আচার ব্যবহার প্রভৃতি ধর্ম্মের বহিরাবরণসমূহের উৎপত্তি হইতে পারে, কিন্তু মানবসাধারণের অন্ত-র্নিহিত একটী সাধারণ ধর্ম্মের অস্তিত্ব আসিতে

পারিত না। স্থান প্রভৃতির বিভিন্ন সমাবেশের ফলেই যদি ধর্ম্মের উৎপত্তি হইত, তবে সকল ধর্ম্মের ভিতর একটা মহান একতা আসে কোথা হইতে? আসল কথা এই যে, সত্যধর্ম্ম স্থান প্রভৃতি সকল বিষয়ের সর্ব্বপ্রকার সমাবেশের অতীত, কারণ ইহা ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক পরমাত্মা হইতে মানবাত্মায় নামিয়া আসিয়াছে। তাই মানবাত্মাই এই সত্যধর্ম্মের উৎস। এই উৎস হইতে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির পরিপোষক ভাবসকল, পরমাত্মার সহিত অক্ষয় যোগসাধক ভাবসকল নিয়তই উৎসারিত হইতে থাকে।

এই সত্যধর্ম্ম যেমন সমগ্র মানবজাতির সাধারণ ধর্ম্ম, ইহা তেমনই প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব। প্রত্যেক মানবাত্মার অন্তরে অনন্তস্বরূপকে স্পর্শ করিবার যে একটা গভীর আকাঙ্ক্ষা আছে, তাহারই ভিতর দিয়া ধর্ম্ম প্রধানত বিকাসিত হইতে থাকে। ধর্ম্মের নামে যে সকল বিভিন্ন পন্থা উঠিয়াছে, সেগুলি পন্থামাত্র, সেগুলি আসলে সত্যধর্ম্ম নহে—সত্যধর্ম্ম একই। মানবের আধ্যাত্মিক শক্তিসমূহ উপলব্ধি করিবার চেষ্টা হইতে যে ধর্ম্মের পরিচয় পাই, সেই ধর্ম্মই প্রকৃত ধর্ম্ম। পন্থা সকল তর্কবিতর্কের আশ্রয়স্থান মাত্র—এক পন্থা অপর পন্থার সত্যভাব সকলও স্বীকার করিতে পরাঙ্মুখ হয়। কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্মের মূল লক্ষণই হইল প্রত্যেক মানবের স্বাধীনভাবে উন্নতির পথে অভিব্যক্ত হইবার অধিকার ও কর্ত্তব্য স্বীকার করা। অনুষ্ঠান, পুরাণকাহিণী প্রভৃতি যে সকল বিষয় ধর্ম্মকে সীমাবদ্ধ করিতে উদ্যুক্ত হয়, সেই সকল বিষয় হইতে পৃথক করিয়া আমরা যখন ভগবৎপ্রদত্ত ধর্ম্মকে আত্মার জীবন বলিয়া উপলব্ধি করি, তখনই আমরা সত্যই অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্মকে অবলম্বন করি।

একনিষ্ঠ সাধকগণ ধর্ম্মের যে সকল তত্ত্ব "দৃষ্টি" করিয়া প্রকাশ করেন, সে গুলিকে আমরা নিশ্চয়ই উপহাসের সহিত উড়াইয়া দিতে পারি না। সেই সকল তত্ত্বই তো তাঁহাদের পরমাত্মাকে আত্মস্থ করিবার চেষ্টা। সেই সকল তত্ত্বের ভিতর দিয়া আমরাও আমাদের আত্মনিহিত ধর্ম্মের বাণী শুনিতে পাই। কিন্তু একটী কথা আমরা অনেক সময়ে ভুলিয়া যাই যে, সেই সকল সাধক তাঁহাদের "দৃষ্ট" সত্য সকল নিজ নিজ অবস্থা, ভাষা প্রভৃতির সীমার ভিতর দিয়াই ব্যক্ত করিয়াছিলেন। পরে কালসহকারে যখন তাঁহাদের অবস্থা তাঁহাদের ভাষা আমাদের দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠে, যখন আমরা তাঁহাদের ভাষা প্রভৃতি ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারি না, তখন তাঁহাদের প্রচারিত সত্যসমূহের প্রকৃত তত্ত্ব পরিত্যাগ করিয়া সেই সকল সত্য যে ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন সেই ভাষাকে জপমন্ত্ররূপে এবং যে অবস্থার মধ্যে ব্যক্ত করিয়াছিলেন সেই অবস্থাকে অনুষ্ঠানরূপে উত্তরাধিকারসূত্রে আঁকড়াইয়া ধরি; অভ্যাসবশত সেই সকল ধর্ম্মের বহিরাবরণই আমাদের প্রিয়তম হইয়া উঠে। জনসাধারণ নানাবিধ কার্য্যে ব্যস্ত থাকে এবং ঐ সকল বহিরাবরণ যথাযথ অভ্যাস করিবার অবসর পায় না বলিয়া, সেই সকল বহিরাবরণ নিয়মিত অভ্যাস করিয়া নির্ভুলভাবে অনুষ্ঠানে ব্যক্ত করিবার জন্য এবং নিজ নিজ বিবেচনামত জনসাধারণকে সেগুলির অর্থ বুঝাইয়া দিবার জন্য মধ্যবর্ত্তী, অভ্রান্ত গুরু প্রভৃতির আবির্ভাব আবশ্যক হয়। কিন্তু অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে ভগবান ও মানবের মধ্যে মধ্যবর্ত্তী বা অভ্রান্ত গুরু বলিয়া কোন কিছু দাঁড়াইতে পারে না। ভগবানই একমাত্র আমাদের লক্ষ্য এবং তিনিই একমাত্র আমাদের মধ্যবর্ত্তী ও অভ্রান্ত গুরু। তাঁহাকে আত্মাতে উপলব্ধি করিলে, তাঁহার স্বরূপ অন্তরে দেখিলে এবং তাঁহার বাণী অন্তরে শুনিলে অপর কোন কিছুকেই মধ্যবর্ত্তী বলিয়া গ্রহণ করিবার প্রয়োজনই হইবে না। তখন আমরা তাঁহাকেই ডাকিয়া বলিব —নাথহে প্রেমপথে সব বাধা ভাঙ্গিয়া দাও। বিজ্ঞান দর্শন প্রভৃতি যে কোন বিষয়ের যে কোন সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে বা হইবে, সকলেরই ভিতরে আমরা ধর্ম্মের অক্ষুণ্ণ সম্বন্ধ দেখিতেছি। যে কোন বিষয়ের যে কোন সত্য আবিষ্কৃত হইবে, সে সমস্তই আমরা আমাদের আধ্যাত্মিক দৃষ্টির কেন্দ্র হইতে দেখিব। এই দৃষ্টি আমাদের আত্মাতে নিবদ্ধ। তাই আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি যে অসাম্প্রদায়িক সত্যধর্ম্ম একটা কাল্পনিক বস্তু নহে—ইহা সত্যবস্তু। ধর্ম্মবক্তা, শাস্ত্র প্রভৃতি কোন কিছু দ্বারাই ইহাকে সীমাবদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। চারিদিকে সত্যধর্ম্মবিষয়ক যে সকল ভাব জাগ্রত

দেখিতেছি, তাহাতে স্পষ্টই উপলব্ধি হইতেছে যে সমগ্র জগতে সত্যধর্ম্মের একটা মহাজাগরণ অদূরবর্ত্তী।

ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ইতিহাসের ভিতর দিয়াও এই অসাম্প্রদায়িক সত্যধর্ম্মের পরিচয় পাওয়া যায়। এখন ঐতিহাসিকগণ বুঝিয়াছেন যে, কোন একটী-মাত্র ধর্ম্ম আলোচনা করিলেই ধর্ম্মের ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া যাইবে না। ধর্ম্মের প্রকৃত ইতিহাস বাহির করিতে গেলে সকল খণ্ডধর্ম্মই আলোচনা করিতে হইবে। সমীক্ষিত-ধর্ম্ম বা comparative religion সমস্ত ক্ষেত্র দেখিয়া বিভিন্নাকৃতি খণ্ড-ধর্ম্মসমূহকে একই মূল সত্যধর্ম্মের বিভিন্ন ধারা বলিয়া গ্রহণ করে। পূর্ব্বে পূর্ব্বে ধর্ম্মবক্তাগণ নিজ নিজ ধর্ম্মের ইতিহাসের উপর দাঁড়াইয়া তাহারই সত্যতা প্রমাণে এবং অপর ধর্ম্মগুলিকে মিথ্যাপ্রমাণে নিযুক্ত থাকিতেন। এখন আমরা কোন ধর্ম্মকেই সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিতে পারি না। আমরা দেখিতেছি যে, সকল ধর্ম্মের ভিতর দিয়াই সকল ধর্ম্মের সারধর্ম্ম জগতে শান্তিধারা ঢালিবার জন্য ধীরে ধীরে আপ-নার মূর্ত্তি প্রকট করিতেছেন। আমরা যেমন কোন ধর্ম্মকেই সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিতে পারি না, তেমনি যতই কেন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ও ভক্তসংখ্যা-পরিপুষ্ট হউক না, পূর্ব্বতন কোন ধর্ম্মকেই আমরা অভ্রান্ত ও অসাম্প্রদায়িক বলিয়াও গ্রহণ করিতে পারি না। ধর্ম্মবিষয়ক ইতিহাস আলোচনা করিলেই আমরা বুঝিতে পারি যে ইতিহাসের অতিরিক্ত স্থানে প্রকৃত ধর্ম্মের উৎপত্তি। ইতিহাসের ভিতরে ধর্ম্মের উৎপত্তিস্থান অনুসন্ধান করিতে করিতে আমরা আত্মাতে আসিয়াই উপনীত হই। দেখি যে, জগতের জীবন্ত কর্ম্মক্ষেত্রে এবং মানবের জাগ্রত আত্মাতে জাগ্রত দেবতা ভগবানের লীলা প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। আমরা বুঝিতে পারি যে, ধর্ম্মের পরিবর্ত্তনশীল বহিরাবরণ লইয়া থাকিলে চলিবে না, সারবস্তু সত্যধর্ম্মকে আমাদের অবলম্বন করিতে হইবে। বিশ্বমানবের আত্মার অন্তরে সেই শুদ্ধমপাপবিদ্ধং পবিত্র পরমাত্মাকে উপলব্ধি করিতে হইবে। এই প্রকারে ইতিহাসের ভিতর দিয়াও আমরা জানিতেছি যে অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম আমাদের কল্পনামাত্র নহে, কিন্তু সারসত্য বস্তু।

এখন প্রশ্ন এই যে, যদি এই অসাম্প্রদায়িক সত্যধর্ম্ম প্রত্যেক মানবের নিজস্ব ও মানবজাতির সাধারণ ও সহজ ধর্ম্ম, তবে জনসাধারণ সেই সত্য-ধর্ম্মের অনুগামী হয় না কেন? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহার দুইটী প্রধান কারণ হইতেছে—সত্যধর্ম্ম অবল-ম্বন করিলে যে সাধনা করিতে হইবে, যে কঠোরতা অবলম্বন করিতে হইবে তাহার বিভীষিকা এবং জ্ঞানবিজ্ঞান অর্জ্জনে যে পরিশ্রম আবশ্যক হইবে তৎপ্রতি আলস্য। এই দুইটী ব্যতীত আরও একটী কারণ আছে—তাহা স্বার্থ। যাঁহারা অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম অন্তরে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারা একবার স্বার্থের কথা বিস্মৃত হইয়া এই সত্যধর্ম্মের পতাকার নিম্নে দণ্ডায়মান হইতে অগ্র-সর হউন, এবং দেখুন যে জনসাধারণ এই অসা-ম্প্রদায়িক ধর্ম্ম অকুতোভয়ে গ্রহণ করে কি না। যাঁহারা স্বাধীনতার মুক্ত বায়ুতে বিচরণ করিয়া সত্যলাভ করিয়াছেন, কিন্তু নানা কারণে সেই সত্য ঘোষণা করিতে পশ্চাৎপদ রহিয়াছেন, তাঁহারাও তখন ছুটিয়া আসিয়া সত্যধর্ম্মীগণের সহিত মিলিত হইবেন। ক্রমে ধীরে ধীরে খণ্ডধর্ম্মের সহিত আমাদের সম্বন্ধ হ্রাস হইবে এবং সেই অসাম্প্রদায়িক সত্যধর্ম্মই নানা আকারে প্রকারে আমাদের ক্রিয়া-কলাপের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইবে। তখন জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোকে খণ্ডধর্ম্মের অন্ধকার দাঁড়াইতে পারিবে না। খণ্ডধর্ম্ম সকল ক্রমে অখণ্ড সারধর্ম্মেই বিলয় প্রাপ্ত হইবে। খণ্ডধর্ম্ম সমূহকে সহসা বিধ্বস্ত করা সংহার করা আমাদের কার্য্য নহে—তাহাদের অন্তর হইতে জ্ঞানবিজ্ঞানের সাহায্যে অখণ্ড সারধর্ম্মকে বাহির করিয়া তাহার ভাস্বর জ্যোতি জগতের সম্মুখে ধারণ করাই আমা-দের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য। ধর্ম্মের বহিরাবরণ যে কি প্রকারে সত্যধর্ম্মকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহাই আমাদের প্রকাশ করিতে হইবে। এই প্রকারে জনসাধারণের হৃদয় হইতে নানাবিধ অন্ধ-কার দূর করিতে পারিলেই জনসাধারণ সত্যধর্ম্মের পথিক না হইয়া থাকিতে পারিবে না।

অতিপ্রাকৃতের প্রতি অযথা আকর্ষণও যে জন-সাধারণের সত্যধর্ম্ম গ্রহণের অন্তরায়, তাহাও অস্বীকার করা যায় না। অতিপ্রাকৃত বলিয়া

সত্য সত্য কিছুই নাই—প্রত্যেক ঘটনাই যে প্রকৃতির নিয়মের অন্তর্ভুক্ত। কেবল আমরা যে ঘটনাকে কোন নিয়মের দ্বারা বুঝাইতে পারি না, বা কি নিয়মে সেই ঘটনা ঘটিল বুঝিতে পারি না, তাহাকেই আমরা অতিপ্রাকৃত বলিয়া ধরিয়া লই। অতিপ্রাকৃতের প্রতি আকর্ষণ অন্যায় নহে—তাহাই সময়ে সময়ে সত্যধর্ম্মের সন্ধানে আমাদের দৃষ্টি ফিরাইয়া দেয়। কিন্তু অযথা আকর্ষণ আবার আমাদের মতকে পরাধীনতার বদ্ধ বাতাসে নিমগ্ন রাখিয়া সেই স্বাধীন পুরুষ পরমাত্মা হইতে অনেক দূরে লইয়া যায়। কোন সাধক কোন একটী বিষয়ে অতিপ্রাকৃত শক্তি প্রদর্শন করিতে পারিলেই আমরা এতই মোহমুগ্ধ হইয়া যাই যে সেই বিকৃত দৃষ্টির দোষে তাঁহার অন্যান্য তত্ত্ববিষয়ক ভ্রান্তিও দেখিতে পাই না—তাঁহার ভ্রমকে আমরা সত্য বলিয়া গ্রহণ করি। এই প্রকারে বিভিন্ন সাধকের অতিপ্রাকৃত শক্তির প্রতি অযথা আকর্ষণজনিত পরাধীনতাই মানবসমাজকে বিভাগের পথে অগ্রসর করে। স্বাধীনভাবে প্রকৃতির কার্য্যে নিয়মের সুশৃঙ্খলা দেখিবার চেষ্টা করিলেই তাহার ভিতর একই সত্যের একই ধর্ম্মের কার্য্য দেখিতে পাইব। জ্ঞানে বিজ্ঞানে উন্নত হইলে খণ্ডধর্ম্মসকল আর আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না। তখন ভগবৎপ্রবর্ত্তিত ব্রহ্মজ্ঞানমূলক সনাতন ধর্ম্মই আমাদিগকে মহামিলনের পথে লইয়া চলিবে। ঈশ্বরকে এইরূপে হৃদয়ে ধারণ করিলে কথায় কথায় আর তাঁহার রূপকল্পনার কথা হৃদয়ে স্থান পাইবে না।

বর্ত্তমানে আমাদের দেশ মিলন চাহিতেছে। অসাম্প্রদায়িক সত্য মানবধর্ম্মকে অবলম্বন করা ব্যতীত প্রকৃত মিলন হওয়া অসম্ভব। অসাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মধর্ম্মই একমাত্র ঋষিদিগের পদানুসরণ করিয়া ভগবানের সহিত মানবের প্রত্যক্ষ যোগের কথা ঘোষণা করিয়া মহামিলনের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্মঘোষিত চিরন্তন সত্য যে "ব্রহ্মজ্ঞানরূপ স্বর্গীয় অগ্নি সকলেরই অন্তরে নিহিত আছে", তাহাই অবলম্বন করিয়া আমাদের প্রত্যেককে ভগবানের সহিত প্রত্যক্ষ যোগ নিবদ্ধ করিতে হইবে। আলস্য পরিহারপূর্ব্বক সর্ব্বপ্রকার বিভীষিকা ও স্বার্থকে পদদলিত করিয়া এই পথে আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে। জ্ঞানে বিজ্ঞানে উন্নত হইবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অন্তর্নিহিত ধর্ম্মকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে হইবে। সত্যধর্ম্ম একই ভাবে বসিয়া থাকিবার ধর্ম্ম নহে—তাহা ঈশ্বরপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম বলিয়া তাঁহারই এই জগৎ-সংসারের অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে নানা আকারে প্রকারে অভিব্যক্ত হইতে থাকিবে।

সমগ্র ভারতের অধিবাসীগণ যখন এই অবিনশ্বর সত্যধর্ম্ম অবলম্বনের ফলে একহৃদয় হইয়া উঠিবে, তখন সামাজিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি কোন অবান্তর বিষয়ে একতার জন্য আমাদিগকে ভাবিতে হইবে না। তখন আমরা স্পষ্ট উপলব্ধি করিব যে আমরা আমাদের একই পরম পিতার গৃহে আছি এবং থাকিবার চির অধিকারী, সুতরাং তখন আমাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাদকলহের কোনই অবসর থাকিবে না।

কথালাপ।

[ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে স্বর্গীয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহোদয় বলিয়া গিয়াছিলেন, এবং তাঁহার তৃতীয় পুত্র স্বর্গীয় হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই "কথালাপ" লিখিয়া লইয়াছিলেন। স্বর্গীয় হেমেন্দ্রনাথ পাণ্ডুলিপিতে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন,—"২৫ অগষ্ট, শুক্রবার. ১৮৮২ খৃঃ, সন্ধ্যাকাল। 'প্রথম হইতে জীবনের ঘটনাবলী বলুন', এই বলিয়া আগ্রহ করাতে। মস্থরি পর্ব্বত—The Priory." সেই পাণ্ডুলিপি যথাযথ মুদ্রিত হইতেছে।]

"সিমলা পর্ব্বতে একদিন রাত্রে শুয়ে রয়েছি, হঠাৎ বুকের ভিতর ধড়াস ধড়াস করতে লাগল। সকাল বেলা বেড়াতে বের হলেম, মনে করলেম, বুঝি ইদিক উদিক দেখে শুনে বেড়ালে মন ঠাণ্ডা হবে; দৌড়ে দৌড়ে বাড়ী থেকে বের হলেম, কিছুই হয় না। পেয়ারী বাঁড়ুয্যে—আমার এক বন্ধুর বাড়ীতে গেলুম। এ কথা ও কথা, কই, সে ধড়ফড়ানি কিছুতেই যায় না। তার পরে ঘরে ফিরে যেয়ে কিশোরীকে বল্লুম, আচ্ছা, ঝাপান নিয়ে এস দিকি, বাড়ী যাব, আর দেখি যে বলতে বলতে ধড়ফড়ানি কমে যাচ্চে। তেমনি দেখছি, এখন হয়েছে; এখন বাড়ী যাবার মন হয়েছে, এতকাল

পর্য্যন্ত বিদেশে ঘুমিয়ে রয়েছি, এখন কেবল বাড়ী বাড়ী মনে হয়। যখন ঐ রকম কথা কই, তখনই মনটা ঠাণ্ডা হয়, আর কোনও কথাতে ঠাণ্ডা হয় না। আমি এখন একটা খুব কথা পেয়েছি—

কবিং পুরাণম্ অনুশাসিতারম্
অণোরণীয়াংসম্ অনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্ব্বস্য ধাতারম্ অচিন্ত্যরূপং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥
প্রয়াণকালে মনসাচলেন ভক্ত্যা
যুক্তঃ যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণ আবেশ্য সম্যক্
সত্যং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥

এই প্রয়াণকালে 'ভ্রুবোর্মধ্যে' সেই একটি বিন্দুতে প্রাণকে স্থির রাখচি, অন্য কথায় মন বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। যেমন মরবার প্রাক্কালে 'ওঁ সত্যনারায়ণ ব্রহ্ম' কানে শোনাতে শোনাতে গঙ্গায় নিয়ে যায়, তোমরা আমাকে তেমনি এখন আমার এই বিষয়ে সাহায্য করবে।

অক্ষয় বাবু প্রভৃতির কাছে আমার উদাস ভাবের সায় পাওয়া, তা পাইনি। Brown, Stewart প্রভৃতি ইংরাজি philosophy, তা পড়েছিলেম, কিন্তু সে যেন সব পৃথিবীতেই আবদ্ধ—মনকে নিয়ে নাড়াচাড়া করে, আত্মাকে আকাশে উড়িয়ে নিয়ে যায় না। মনকে শ্রেণীবদ্ধ কোরে পাঠশালার শিক্ষার মতন শিক্ষা দেয়। রাজনারাণ বাবু আমাকে একটা Fichte পাঠাইয়া দেন, রাজনারাণ বাবুর সে বই * * নিয়ে গেচে, সে বয়ে উপহার-লিপিতে লেখা ছিল,—"My friend, philosopher and guide"। সে বই ঝামাপুকুরের * * ঘোষ আর তার ভাই * * ঘোষ নিয়ে গিয়েছে। এক আলমারী philosophyর বই ছিল; তারা ব্রাহ্মধর্ম্ম পড়তে এসে ক্রমে ক্রমে সব নিয়ে গেল। মাঝে সেই * * ঘোষ কি বই টই ছাপিয়ে এখানে আমার কাছে ৯০০৲ টাকা চেয়ে পাঠিয়েছে। আমি মনে করলুম, ৯০০৲ টাকা চেয়েছে, আচ্ছা, ওকে ১০০৲ টাকা দিই। বোলে শাস্ত্রীকে টাকা দিতে বলে দিলুম। তার পর মনে পড়লো, ঝামাপুকুরের সেই * * ঘোষ। দুই প্রহর তিনটা রাত্রি পর্য্যন্ত ঐ Fichte নিয়ে পড়তুম, সে যেন আমাকে মর্ত্ত্যলোক হ'তে আর একটা রাজ্যে নিয়ে গেল; তার পর Kant যখন পেলুম, তখন আমি ব্যাকরণ বুঝলুম।

আমি অনেক দিন বিদেশে থাকলেম, এখন স্বদেশের জন্য আগ্রহ হয়েছে। সিমলায় অনেক দিন থেকে যেমন মন ধড়ফড় করেছিল, তেমনি মনে হচ্চে, অনেকদিন হ'ল—এখানে আছি। আমি এখন সব পুরাণ গল্প ভুলে গিয়েছি, ভেবে দেখলুম, ভাল মনে পড়ে না। কথায় কথায় মন থেকে আপনাআপনি যা বের হবে, তাই বলব। বর্ত্তমান ভাব জ্বলজ্বল করচে, তাই বলতে পারি।

২৭ আগষ্ট, রবিবার, বৈকাল ৫টা।

সিমলা বেড়াবার গল্প বলতে গেলে গোপাললাল বাবুর বরানগরের বাগান থেকে ধরতে হয়। গঙ্গার উপরে সে বাগান, তোমরা দেখেছ। ভিতরে মস্ত পুকুর ছিল, তার উপরে মেলা রাজহাঁস সাঁতার দিয়ে বেড়াত, আর সারস পাখী সব বাগানে বেড়িয়ে বেড়াত। সে পুকুরের জল বড় ভাল ছিল না, হাঁসে খারাপ করে দিয়েছিল; তবুও আমি তাতে সাঁতার দিয়ে বেড়াতুম। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে বুঝি সেই বাগানে যাই; সেখানে থেকে মনে মনে সংকল্প কোরেছি, এবার আশ্বিন মাসে পূজার সময় এলে হয়, খুব এক চোট বেরিয়ে পড়ব। ক্রমে সেই আশ্বিন মাস এল। কিশোরীকে দিয়ে কাশী পর্য্যন্ত boat ভাড়া করলেম, ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দ বোধ হয়। mutinyর এক বৎসর আগে আর কি। বোট টোট সব ঠিক করেচি, যাবার আগের দিনে বাড়ীতে বিদায় হবার জন্য এসেছি। সেই রাত্রে ৭।৮ টার সময় আমার শিষ্য প্রতাপ বাবু বিশ্বম্ভর বাবুকে নিয়ে উপস্থিত। কাল সকালে যাব, আজ রাত্রে তোরঙ্গ টোরঙ্গ নিয়ে ওঁরা সব এলেন। বিশ্বম্ভর বাবু, তিনি বীরভূমে এক জন প্রধান লোক; আমার আবার সেই সময় চোখের ব্যামো। আলো দেখবার যো নেই, ঘর অন্ধকার কোরে বোসে আছি, চোখে সবুজ ঠুলি দেওয়া, অথচ আলো দেখতে হবে। এই বিভ্রাট। সেই রাত্রে খাওয়া দাওয়া তোয়ের করা, বিছানাপত্রের হাঙ্গাম করা, যাবার আগের রাত্রে এমন উৎপাত।

পরদিন বোটে কোরে কাশী চল্লেম। সঙ্গে

এক জন উড়ে বামুন, আর কুবের গোড়োগোয়ালা, লেঠেল, সেই চাকর। বাঁশবেড়েতে গিয়ে মনে হল, কিশোরীকে নিয়ে গেলে হয়। কিশোরীকে জিজ্ঞাসা করলুম, তুমি যাবে? সে অমনি 'হাঁঃ' কোরে উঠলো। তা তাকে সঙ্গে কোরে নিলুম। কিশোরীকে যে গোড়াগুড়ি মনে করেছিলুম নিয়ে যাব, তা না, এখানে এসে মনে হয়ে গেল। আমাদের বোটওয়ালা এমনি যে, গঙ্গায় নেবে একদিন স্নান করচি, আর দেখি বোট চোলে গিয়েচে! আমাদের সাঁতার টাতার দিতে একটু গৌণ হয়েছে। আমাদের জমীদারীর বোট—কালাচাঁদ মাঝি—হাজার ধমকধামক কর, নড়েও না চড়েও না। এ কাশী অবধি চুক্তি ভাড়া কি না! ১০টা ১১টা রাত্রি অবধি টেনে যাচ্চে, খারাপ যায়গা টায়গা কিছুই মানে না! আমি খুব খুসী হলুম। তখন adventurous, spirit উদাসীনের মতন চলেছি! মাঝে আমার একটা দাঁড়ী মরে গেল। মোসলমানের কাণ্ড। তার ব্যামো হোতে তাকে বোটের সামনে খোলের ভিতর রাখত। আবার তাতে চট্ টট্ দিয়ে মুড়ে রেখেছে, বাতাস লাগতে দেবে না। আমি বল্লুম, অমন কোরে রাখলে ও যে মোরে যাবে? তা তারা শুনবে না। আর একদিন দেখলেম যে, তাকে লঙ্কামরীচ খাওয়াচ্ছে। তার পরে দেখি, সে সত্যি সত্যি মরেই গেল। আবার পুলিসে খবর দিলে। কেমন কোরে মরলো। তার পরে তাকে গোর দিলে। এই কোরে এক মাসে কাশী গিয়ে পৌঁছুলুম।

এর আগেও একবার কাশী দেখেছিলুম। সেবার ১৪ দিনে ডাকে গিয়েছিলুম। নৌকা যেই কাশীর পারে লাগিল, অমনি নেবেই ডাঙ্গায় চলে গিয়েছি। আর ওদের নৌকায় যাব না; বাড়ীও নেই, কিছুই নেই, হুহু কোরে দৌড়চ্ছি। কিশোরী সঙ্গে চলতে পারছে না। যে দিকে রাস্তা পেলেম, চল্লেম। এই কোরে সিক্রোলের উদিকে গিয়ে দেখলেম, একটা খালি বাগানের মতন পড়ে রয়েছে, তাতে মিস্ত্রীরা একটা বাড়ী তোয়ের করছে, এখনো দরজা টরজা বসানো হয়নি। কার বাড়ী, কি বৃত্তান্ত!—এখানেই থাকব—নিয়ে আয় জিনিস—সেই ঘরেই উঠলেম—কার ঘর ঠিক নেই! সেই উড়ে বামুন খিচুড়ী রাঁধলে। সে কেমন খিচুড়ী রাঁধতো, সব সাদা থাকত, সেই এক রাশ খেয়ে পেট ভরত। বসে আছি, একদিন গেল, দু'দিন গেল, কিছু নেই, খোলা ঘর মেরামত করছে। কেউ নেই; কে আসবে? আমিই যাই,—তাই কম্বল টম্বল দিয়ে পোড়ে থাকতুম। জিজ্ঞাসা পড়া নেই, কার বাড়ীতে আছি। যাদের বাড়ী, তারা শুনতে পেয়েছে যে, কে এসে বাড়ী দখল কোরে নিলে। তারা কেমন কোরে আমার নাম টের পেয়েছে। আপনি গুরুদাস মিত্র, রাজেন্দ্র মিত্রের ছেলে এসে বল্লে, "মশায়! এখানে এত কষ্ট নিচ্চেন, আমাকে বল্লেন না কেন? পরদা দিতেম তো এর কোরে।" "আমি কি জানি যে, এ আপনার বাড়ী?" দৈবাৎ যার বাড়ীতে ছিলেম, সে আমার পরিচিতের মধ্যে হয়ে গেল। সে সব পরদা টরদা দিয়ে ভাল কোরে দিলে। কিশোরীকে বল্লুম, যাও এখান থেকে, যাও এখান থেকে। আমাদের সব জানতে পেরেছে, তবে বিস্তর দিন থাকা হবে না। আমাদের জানলে টানলে বোলে আমরা চলে গেলুম। সব সুদ্ধ ১০ দিন ওখানে ছিলুম। এই গুরুদাস মিত্রের বাপ হচ্ছে রাজেন্দ্র মিত্র। তার সঙ্গে এর আগেরবার যখন কাশীতে যাই, তখন দেখা হয়েছিল। *

"স্বধর্ম্মের" পরিণতি।

(চট্টগ্রাম নববিধান ব্রহ্মমন্দিরে প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ)

(শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত)

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় আমরা দেখিতে পাই, শ্রীভগবান যুদ্ধবিমুখ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ"। অনেকে এই "স্বধর্ম্ম" শব্দটীর অনেক প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। আমি আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে "স্বধর্ম্ম" বলিতে যাহা বুঝিয়াছি, তাহাই আজ যথাসম্ভব সংক্ষেপে আপনাদের সমক্ষে নিবেদন করিব এবং এই "স্বধর্ম্মের" পরিণতি কোথায় তাহাও সাধ্যমত বুঝিতে চেষ্টা করিব।

ধর্ম্ম কি? অমর ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, শক্তির বিকাশই ধর্ম্ম। আমার মনে হয়,

* ১৩১৮ সালের শ্রাবণের সাহিত্য হইতে উদ্ধৃত।

আমাদের আপনাপন কর্ত্তব্য পালনই ধর্ম্ম। ইহাও একরূপ শক্তির বিকাশ বটে।

জীবনের কর্ত্তব্য দ্বিবিধ; ব্যক্তিগত ও সার্ব্বজনীন কর্ত্তব্য। ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য অবস্থাভেদে বিভিন্ন হইতে পারে। কিন্তু সার্ব্বজনীন কর্ত্তব্য সকল অবস্থাতেই একইপ্রকার।

ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য কি? সংসারী যিনি, আপন পরিবারের কল্যাণ সাধনই তাঁহার ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য। সেইরূপ দেশসেবকের পক্ষে দেশসেবা, ছাত্রের পক্ষে বিদ্যাভ্যাস, পিতামাতার পক্ষে সন্তান-বাৎসল্য ও তাহাদের হিতচেষ্টা এবং সন্তানের পক্ষে গুরুজনের প্রতি ভক্তি প্রভৃতিই ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য। এক কথায়, যে যেমন, তাহার পক্ষে তাহার উপযুক্ত কাজই ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য। এখানে অধিকারভেদ সুস্পষ্ট।

সার্ব্বজনীন কর্ত্তব্য কি? যাহাতে নিজের ও অপরের মঙ্গল হয়, তেমন কর্ম্মই সার্ব্বজনীন কর্ত্তব্য। ষড়রিপু দমন, সত্যভাষণ, স্বার্থত্যাগ, পরোপকার, দয়াদাক্ষিণ্য, স্নেহ, প্রেম, প্রীতি, ভক্তি সেবা, জ্ঞানার্জ্জন ইত্যাদি এ সমস্তই সার্ব্বজনীন কর্ত্তব্যের অন্তর্গত। সার্ব্বজনীন কর্ত্তব্য ছোটবড়-নির্ব্বিশেষে প্রতিপালিত হইতে পারে। এখানে ছোট কিংবা বড়র, ক্ষুদ্র কিংবা মহতের কোন পার্থক্য নাই।

আমার মনে হয়, এই সার্ব্বজনীন এবং বিশেষ ভাবে ব্যক্তিগত কর্ত্তব্যপালনই গীতার উদ্দিষ্ট "স্বধর্ম্ম"। ইহার প্রমাণ, "স্ব" শব্দটী এবং মহাবীর অর্জ্জুনের ব্যক্তিগত দুর্ব্বলতার সময় শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বোক্ত উপদেশ।

স্বীয় বাহুবলে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। ধর্ম্মযুদ্ধে সমাগত ক্ষত্র-চূড়ামণি বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন যখন সাময়িক মোহ-বশে এই জনপূজ্য ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম বিস্মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন, যখন তাঁহাকে "ক্ষুদ্রং হৃদয় দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ" বলিয়া অনুপ্রাণিত করা আবশ্যক হইয়াছিল, তখনই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে সাবধান করিয়া বলিয়াছিলেন, "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ"।

যে নিশ্চেষ্টতা বা বৈরাগ্যচর্চ্চা ক্ষত্রিয়বীর পার্থের পক্ষে উপযোগী ও পালনীয় নয়; পরন্তু যাহা তাঁহার ন্যায় শৌর্য্যবীর্য্যশালী আদর্শ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে গ্লানিজনক, মায়াচ্ছন্ন অর্জ্জুন সেই "পরধর্ম্ম" আশ্রয় করিতে আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে উপরোক্ত উপদেশে প্রবুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই "স্বধর্ম্ম" পালনের মূল ভিত্তির উপরেই সর্ব্বধর্ম্মসার গীতা প্রতিষ্ঠিত।

সহজ কথায়, যাহার যাহা কর্ত্তব্য, অটল ও অপরাজিত চিত্তে তাহা প্রতিপালন করাই তাহার পক্ষে সর্ব্বথা বিধিসঙ্গত। ইহাই মানবের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। এই কর্ত্তব্য রক্ষা করিতে যাইয়া যদি কাহারও মৃত্যুও ঘটে, তবে তাহাও তাহার পক্ষে মঙ্গলজনক—তাহাই তাহার বাঞ্ছনীয়। পক্ষান্তরে, নিজের কর্ত্তব্য পরিত্যাগ করিয়া অন্যের কর্ত্তব্য লইয়া অনধিকার চর্চ্চা করিতে যাওয়া সর্ব্বতোভাবে "ভয়াবহঃ"—দূষণীয় ও অবিধেয়।

"স্বধর্ম্ম" পালনে যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ আছে। কিন্তু তাহাতে যথোচিত আত্মতৃপ্তি নাই। কঠোর কর্ত্তব্যপরায়ণতা মানবজীবনকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে গড়িয়া তুলিতে পারে না। সেখানে সজীবতা আছে, সরসতা নাই; উর্ব্বরতা আছে, শ্যামলতা নাই।

ইহার কারণ কি? এই অতৃপ্তির হেতু কোথায়? আমার মনে হয়, শুধু মানবের কেন, সমস্ত বিশ্বেরই অন্তরে এমন একটী অব্যক্ত প্রবল ক্ষুধা লুকান আছে যে, কেবলমাত্র বহির্জগৎ লইয়া কেবলমাত্র বহির্জগতের কর্ত্তব্য পালন করিয়া তাহা নিঃশেষিত বা নিবৃত্ত হইতে পারে না।

নদী বহিয়া যায়—আপন সুধাধারায় দু'কূল প্লাবিয়া কত তৃষ্ণাতুর শুষ্ক কণ্ঠ স্নিগ্ধশীতল করিয়া কত রৌদ্রদগ্ধ ঊষরভূমি সরস ও শস্যশালী করিয়া নদী বহিয়া যায়। তাহার অবিরাম গতির যেমন ত্রুটি নাই, তেমনি তাহার প্রত্যেক ক্ষুদ্র কর্ত্তব্য বা "স্বধর্ম্ম" পালনেও বিন্দুমাত্র অবহেলা নাই; কিন্তু তাহাতে তাহার চিরচঞ্চল হৃদয়ের অব্যক্ত ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় কি? তাহার সকরুণ "কুলু" "কুলু" আর্ত্তনাদ মুহূর্ত্তের জন্য কখনও শান্তি লাভ করে কি?

বিশ্বের যে এই মর্ম্মগ্রাসী ক্ষুধা, বুঝিবা একদিন বিশ্বপ্রেমিক বিশ্বেশ্বর পরমযোগী মহাদেবের কোমল

অন্তরেও স্পর্শ করিয়াছিল। তাই তিনি সমগ্র ক্ষুধার্ত্ত বিশ্বের প্রতিনিধিরূপে করুণাময়ী বিশ্বজননীর উন্মুক্ত দ্বারে দাঁড়াইয়া গভীর আকুলকণ্ঠে বলিয়াছিলেন—"ভিক্ষাং প্রদেহি গিরিজে ক্ষুধিতায় মহ্যম্।"

দর্ব্বীপূর্ণ অমৃত চরু হস্তে লইয়া যখন আমাদিগকে দয়াময়ী বিশ্বমাতা আহ্বান করেন, যখন আমাদের অতৃপ্ত ক্ষুধা প্রকৃত নিবৃত্তি লাভ করে, জীবনের প্রত্যেক কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিয়া যখন আমাদের পরিশ্রান্ত প্রাণ পরম ও চরম কর্ত্তব্য প্রতিপালনের জন্য স্বতঃই উন্মুখ হইয়া উঠে, তখন আমরা অপূর্ব্ব আত্মপ্রসাদের সহিত অপূর্ব্ব আত্মতৃপ্তিও প্রাপ্ত হইয়া থাকি। সাগরসঙ্গমে যেমন কল্লোলিনীর সকল ব্যাকুলতা শেষ হইয়া যায়, তেমনিধারা আমাদের অন্তরের উদ্বেল উচ্ছ্বাসও মহাপ্রেমসিন্ধুমিলনে স্থির, ধীর ও প্রশান্ত হয়। তখন আমরা অন্তরের অন্তস্থলে শ্রীভগবানের ত্রিলোকবাঞ্ছিত আশ্বাসবাণী শুনিতে পাই—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ!"

ইহাই স্বধর্ম্মের পরিণতি।

কর্ণাটের পূর্ব্ব গৌরব।*

(শ্রীকালীপ্রসন্ন বিশ্বাস)

[এই প্রবন্ধের সহিত বর্ত্তমান কর্ণাটের মানচিত্র প্রদর্শিত হইল। খ্রীঃ সপ্তম শতাব্দীতে গুর্জ্জর হইতে উড়িষ্যা পর্য্যন্ত সমগ্র দাক্ষিণাত্য কর্ণাট-সম্রাট্ চালুক্য-বংশের রাজ্যভুক্ত ছিল। খ্রীঃ একাদশ শতাব্দীতে চালুক্য-রাজ বিক্রমাদিত্য বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। বিজয়নগর সাম্রাজ্য দাক্ষিণাত্যের নিম্নার্দ্ধ এবং ব্রাহ্মণী-রাজ্য উত্তরার্দ্ধ অধিকার করিয়াছিল।]

জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি করিতে হইলে কেবল যে নিজের জাতির পুরাণ-কাহিনী, ভাষার ক্রমবিকাশ, প্রচলিত ধর্ম্মকর্ম্মাদির উপর নির্ভর করিতে হইবে তাহা নহে। অপর দেশ অপর ভাষা হইতেও অনেক উপকরণ সংগ্রহ করা আবশ্যক। কিন্তু যদি ঐ সকল দেশ এবং ঐ সকল ভাষার সহিত নিজের দেশের এবং নিজের ভাষার কিছু গৌণ বা মুখ্য সম্বন্ধ থাকে তাহা হইলে আরও ভাল হয়। এইজন্য আমি কর্ণাট দেশের পূর্ব্ব কাহিনী লইয়া পাঠকগণের নিকট উপস্থিত হইতেছি।

আমরা মহাভারতের সময় হইতেই কর্ণাট বা কর্ণাটক প্রদেশের নাম শুনিয়া আসিতেছি, কিন্তু কর্ণাট দেশের পূর্ব্ব গৌরব সম্বন্ধে আমাদের অতি অল্পই জানা আছে। কি ইংরাজী, কি সংস্কৃত, কি মহারাষ্ট্রী, কি বাংলা, কোন ভাষাতেই অদ্যাবধি কর্ণাটের পূর্ব্ব গৌরব সম্বন্ধে প্রকৃত ইতিহাস লিখিত হয় নাই। এমন কি কন্নাড় ভাষায়ও এরূপ কোন পুস্তক নাই। সেইজন্য আমাদিগকে এই ইতিহাস লিখিবার জন্য বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিতে হইতেছে।

কর্ণাটের ইতিহাস লিখিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে সমগ্র দাক্ষিণাত্যের বিষয় কিছু বলা আবশ্যক। কথিত আছে যে খৃষ্ট জন্মগ্রহণ করিবার প্রায় তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মহামুনি অগস্ত্য সশিষ্য বিন্ধ্যগিরি অতিক্রম করিয়া সর্ব্বপ্রথমে দক্ষিণদেশে নেলমঙ্গলস্থ অর্কাবতী নামক নদীর তীরে আসিয়া বাস করেন। তৎপরে গৌতম, কণ্ব, বিভাণ্ডক, দত্তাত্রেয়, জমদগ্নি প্রভৃতি তাপসগণ শ্রীরঙ্গম, মালুর, শৃংগেরী, দ্রোণগিরি প্রভৃতি স্থানে আসিয়া আশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন।

মহাভারতীয় বিরাটরাজার রাজধানী কর্ণাট প্রদেশস্থ বর্ত্তমান ধারবাড় জেলার অন্তর্গত হোঙ্গল নামক স্থানে বর্ত্তমান ছিল। এই স্থানেই পাণ্ডবগণ অজ্ঞাত বাসে কালযাপন করিয়াছিলেন। বিরাটরাজশ্যালক কীচক পাণ্ডবসহধর্ম্মিণী দৌপদীর প্রেমাকাঙ্ক্ষী হইয়া ভীমহস্তে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। হোঙ্গল এবং উহার চতুঃপার্শ্বস্থ গ্রামসমূহে এখনও অনেক স্থান বিরাটরাজ এবং পাণ্ডবগণের কীর্ত্তিকলাপের স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে।

তৎপরে বেলারী জেলার অন্তর্গত হম্পী (ভূতপূর্ব্ব বিজয়নগর) নামক স্থানের অনতিদূরে ঋষ্যমুখ পর্ব্বতে সীতার অন্বেষণকারী শ্রীরামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণের সহিত সুগ্রীব, হনুমান ও জাম্বুবানের সাক্ষাৎ হয়। ঐ সময় তাঁহারা দশাননরথারূঢ়া সীতাদেবী কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত অলঙ্কারাদি নিদর্শনগুলি শ্রীরামচন্দ্রের সমীপে উপস্থিত করিয়া তাঁহাকে কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা প্রদান করেন। তৎপরে সপ্ততাল

* ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে লিখিত।

বিদ্ধ করতঃ শ্রীরামচন্দ্র সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা-বন্ধনে আবদ্ধ হন।

ইহার কিঞ্চিৎ দূরে বর্ত্তমান অনিগুণ্ডী নামক স্থানে কিষ্কিন্ধ্যাপতি বালীর রাজধানী ছিল। অদ্যাবধি সেই তুঙ্গভদ্রা নদী এই রাজধানীকে বেষ্টন করিয়া ভীষণ গর্জ্জনে প্রবাহিত হইতেছে। এই নদীর অপর পার্শ্বে শ্রীরামচন্দ্রের আদেশ অনুসারে বালীরাজার মৃতদেহের অগ্নিসৎকার করা হইয়াছিল। এখনও সেই চিতার স্থান পোড়া কাষ্ঠের ন্যায় প্রস্তর খণ্ডের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইতেছে।

বিজাপুরের অন্তর্গত বাদামী নামক স্থানই ভূতপূর্ব্ব বাতাপি বা বাতাবী নগর। এই স্থানে অগস্ত্যমুনি কর্ত্তৃক প্রসিদ্ধ বাতাবী নামক রাক্ষস নিধন প্রাপ্ত হয়। স্থানীয় লোকে এই ঘটনা স্মরণ করিয়া অগস্ত্যকে বারবার প্রণাম করিয়া থাকে।

এই সকল স্থান যুগযুগান্তর হইতে লোকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে সত্য, কিন্তু লিখিত প্রমাণাদির অভাবে অনেকে ঐ সকল ঘটনাগুলি অপ্রামাণ্য পৌরাণিক উপন্যাস বলিয়া বিশ্বাস করিতে চান না। সুতরাং আমরা ঐ সকল পুরাণকথার আর অধিক কিছু উল্লেখ না করিয়া তৎপরবর্ত্তী সময়ের ইতিহাসের বর্ণনা করিব।

ভারতবর্ষের লিখিত ইতিহাসে চন্দ্রগুপ্তের পূর্ব্বকালীন কোন রাজার সময় নির্দ্দিষ্ট নাই। সুতরাং আমাদিগকে চন্দ্রগুপ্তের সময় হইতেই আরম্ভ করিতে হইবে। চন্দ্রগুপ্ত খৃঃ পূঃ ৩২১ সালে রাজ্যলাভ করেন। বলা বাহুল্য তিনি আর্য্যাবর্ত্তের রাজা ছিলেন। তাঁহার রাজত্বের শেষভাগে তিনি তাঁহার গুরু ভদ্রবাহুর সহিত দাক্ষিণাত্যে আগমন করিয়া বেলুগল নামক স্থানে শেষ-জীবন অতিবাহিত করেন। এই বেলুগল বর্ত্তমান মহীসুর রাজ্যের অন্তর্গত।

চন্দ্রগুপ্তের পর রাজা অশোকের নাম উল্লেখ করা আবশ্যক। খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে তিনি দাক্ষিণাত্যে বনবাসী নামক স্থানে বৌদ্ধ প্রচারক প্রেরণ করেন। ইহার পর এই স্থানে অশোকবংশীয় রাজাগণ বহুদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন। তদ্বংশীয় শেষ রাজা তাঁহার ব্রাহ্মণ মন্ত্রী পুষ্যমিত্র কর্ত্তৃক নিধন প্রাপ্ত হন। তৎপরে পুষ্যমিত্র সুঙ্গা নামক রাজবংশ স্থাপন করেন। এই বংশীয় রাজাগণ খৃঃ পূঃ ১৮৪ হইতে ৭২ সাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। খৃঃ পূঃ ৭২ সাল হইতে ২৭ সাল পর্য্যন্ত কণ্ব-বংশীয় রাজগণের রাজত্ব-কাল বলিয়া পরিগণিত হয়। এই কণ্ব-বংশ খৃঃ পূঃ ২৭ সালে অন্ধ্রাধিপতি জনৈক নৃপতি কর্ত্তৃক উচ্ছিন্ন হয়। ইহার পর খৃঃ তৃতীয় শতাব্দীতে অন্ধ্রবংশও ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

খৃঃ ৩১৯ সালে আর্য্যাবর্ত্তে গুপ্তবংশ স্থাপিত হয়। গুপ্তরাজগণের মধ্যে সমুদ্রগুপ্তের নামই বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইঁহাকে কেহ কেহ ভারতীয় নেপলিয়ন বলিয়া থাকেন। ইনি সমস্ত ভারতবর্ষ স্বকরায়ত্ব করিয়া দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ করত একাদশটি রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন।

অতঃপর শিলাদিত্যবংশীয় রাজা হর্ষবর্দ্ধন ভিন্ন আর কোন উত্তরদেশীয় রাজা কর্ত্তৃক দাক্ষিণাত্য আক্রমণের কথা জানা যায় নাই। খৃঃ সপ্তম শতাব্দীতে রাজা হর্ষবর্দ্ধন দাক্ষিণাত্য জয় করিবার উদ্দেশ্যে আসিয়া চালুক্যবংশীয় খ্যাতনামা রাজা পুলকেশী কর্ত্তৃক এরূপ পরাভূত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হন যে তাঁহার পর আর্য্যাবর্ত্তের আর কোন হিন্দু রাজা দাক্ষিণাত্য আক্রমণের প্রয়াস পান নাই। রাজা হর্ষবর্দ্ধন খৃঃ ৬৪৮ সালে পরলোক গমন করেন।

আর্য্যাবর্ত্তের সহিত দাক্ষিণাত্যের সাময়িক সম্বন্ধ নির্ণয় করিবার জন্যই উপরি উক্ত ঘটনাগুলি বর্ণিত হইল। অতঃপর আমি দাক্ষিণাত্যের রাজন্যবর্গের কথা বলিব।

খৃঃ প্রথম শতাব্দীতে উত্তর-দাক্ষিণাত্যের অন্ধ্রকৃত রাজগণ তাঁহাদের রাজধানী পৈথান নগরে রাজত্ব করিতেন এবং পশ্চিম-দাক্ষিণাত্যে বনবাসী নগরে কদম্বা রাজগণের রাজধানী ছিল। এই কদম্বারাজবংশ রাজা অশোকের সমসাময়িক ছিল। Ptolemy তাঁহার ভূগোল গ্রন্থে বনবাসী নগরের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তিনি কর্ণাট দেশের বাদামী, ইণ্ডি, (Indi), কলফেরী, মুদ্গল, পট্টদকল প্রভৃতি আরও অনেক নগরের নাম করিয়া গিয়াছেন। Mr. Buchanan বলেন যে খৃঃ প্রথম শতাব্দীর পূর্ব্বে গ্রীস-দেশীয় সওদা-

গরগণ কর্ণাট দেশে বাণিজ্য করিতে আসিতেন। তৎকালে কর্ণাট, কুণ্ডল, লাট, নাট, আর্য্যক প্রভৃতি নামে বিখ্যাত ছিল।

খৃঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে ঝুমলনার নামক জনৈক কবি তাঁহার লিখিত অহনানুর গ্রন্থে মহীসুরের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কিছু দিন পূর্ব্বে ইজিপ্ট দেশের (Oxyrinkas) অক্সিরিঙ্কায় একখানি দ্বিতীয় শতাব্দীর গ্রীক নাটক পাওয়া গিয়াছে। এই গ্রন্থের নায়িকা একটি গ্রীস-দেশীয়া বালিকা। কোনক্রমে সে হৃত হইয়া ভারত উপকূলে আনীত হয় এবং তৎপরে তাহার সহোদর ভ্রাতা আসিয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যায়। এই ঘটনা উপলক্ষে উক্ত গ্রন্থে কতকগুলি ভারতীয় (কন্নাড়) শব্দের ব্যবহার হইয়াছে। বরাহমিহিরও তাঁহার গ্রন্থে কর্ণাট প্রদেশের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

কর্ণাটের নৃপতি-মণ্ডলের মধ্যে কদম্বা বংশই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। এই বংশ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ জানিতে পাওয়া যায়। সোরবের সন্নিকট-বর্ত্তী স্থান কুন্দুরু নামক নগরে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। কথিত আছে যে মুকুন্ন নামক জনৈক রাজা অহিচ্ছত্র হইতে ১২০০০ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া এই স্থানে "সংস্থান" স্থাপন করেন। এই নগরে ময়ূর-শর্ম্ম নামক একজন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তৎকালীন দক্ষিণ ভারতে মাদ্রাজের সন্নিকট কাঞ্চি (বর্ত্তমান কাঞ্জিভরম) নামক স্থান বিদ্যা চর্চ্চার জন্য বিখ্যাত ছিল। দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণগণ ইহাকে উত্তর-ভারতীয় কাশীর সমকক্ষ বলিয়া জ্ঞান করিতেন। ময়ূর-শর্ম্ম বেদ অধ্যয়ন করিবার মানসে উক্ত কাঞ্চি নগরে গমন করেন। কিন্তু তত্রস্থ পল্লব নামীয় ক্ষত্রিয় রাজা কর্ত্তৃক অবমানিত হওয়ায় তথা হইতে বিফলমনোরথ হইয়া প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হন। ইহাতে তিনি যার-পরনাই দুঃখিত এবং মর্ম্মাহত হন। তৎপরে ক্ষত্রিয়রাজার ব্রাহ্মণের উপর এতাদৃশ প্রতিপত্তি দেখিয়া ময়ূর-শর্ম্ম ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম (শাস্ত্র পাঠ ক্রিয়া কলাপাদি) পরিত্যাগ করিয়া ক্ষাত্রধর্ম্ম অর্থাৎ যুদ্ধ-বিদ্যা শিক্ষা করিতে কৃতসংকল্প হন। পরে শৃঙ্গোলা নামক স্থানে যুদ্ধনীতি বিশেষ রূপে শিক্ষা করিয়া কতিপয় ক্ষত্রিয় সৈন্য সংগ্রহপূর্ব্বক কাঞ্চি আক্রমণ করেন এবং পল্লবরাজাকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া কদম্বা রাজ্য স্থাপন করেন। এই কদম্বা-রাজগণ খৃঃ তৃতীয় শতাব্দী হইতে ষষ্ঠ শতাব্দী পর্য্যন্ত রাজ্য করিয়াছিলেন। এই সময়ের অতি অল্প-সংখ্যক শিলা অথবা তাম্র-লিপি দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং এই রাজবংশ সম্বন্ধে অধিক কিছু জানিবার উপায় নাই। তবে ইহা জানিতে পারা গিয়াছে যে এই বংশীয় রাজগণ আর্য্যাবর্ত্তের গুপ্ত রাজবংশের সহিত বিবাহাদি সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন।

কদম্বা বংশের সমসাময়িক দাক্ষিণাত্যে আরও একটি প্রসিদ্ধ রাজবংশের পরিচয় পাওয়া যায়। এই বংশের নাম গঙ্গাবংশ। ইঁহাদিগের সময় এ দেশে সাহিত্য এবং কলাবিদ্যা বিশেষ রূপে প্রসারিত হইয়াছিল। এই বংশীয় নৃপতিগণের মধ্যে কয়েক জন প্রসিদ্ধ কবি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

খৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দী অর্থাৎ চালুক্য বংশের রাজত্ব-কাল হইতে কর্ণাট দেশে প্রকৃত ইতিহাস পাওয়া যায়। এই সময় হইতে যে সকল প্রসিদ্ধ রাজ-বংশ কর্ণাট প্রদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহা দিগের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। চালুক্য খৃঃ ৫৫০ হইতে ৭৫৩ সাল পর্য্যন্ত।
২। রাষ্ট্রকূট " ৭৫৩ " ৯৭৩ "
৩। চালুক্য " ৯৭৩ " ১১৯০ "
৪। কুলাচার্য্য " ১১৫৬ " ১১৮৩ "
৫। ভৈষাল
৬। যাদব (দেবগিরি)

অতঃপর আমি বর্ত্তমান প্রবন্ধের জন্য কোন্ কোন্ স্থান হইতে তথ্য সংগ্রহ করিতেছি তাহার পরিচয় দিব। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে প্রাচীন-কালের লিখিত ইতিহাসাদি না থাকায় প্রকৃত বিবরণ সংগ্রহ করা অতি সুকঠিন। অনেক সময় কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই কার্য্য করিতে হয়। আমি Indian Antiquary, Eqigraphica Karnatika, Dr. fleet, Dr. Rice, প্রভৃতি পশ্চিমদেশীয় পণ্ডিতগণের পুস্তকাদি হইতে অনেক সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। এতদ্ভিন্ন নিম্নলিখিত বিষয় আলোচনার ফলে অনেক তথ্য সংগৃহীত হইতেছে।

১। দেশীয় লোক কথা এবং আচার ব্যবহার।
২। শিলা এবং তাম্রলিপি, প্রাচীন মুদ্রাদি।
৩। সাহিত্য এবং ধর্ম্ম-পুস্তকাদি।
৪। কারুকার্য্য এবং বিবিধ শিল্প দ্রব্যাদি।
৫। বিদেশীয় পর্য্যটকগণের ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

কর্ণাট প্রদেশ শিলালিপি, তাম্রলিপি পুরাতন মন্দির এবং গুহামন্দিরাদির জন্য প্রসিদ্ধ। ভারতের অন্য কোন প্রদেশে এত অসংখ্য স্থায়ী উপাদান আছে কিনা সন্দেহ। এই সকল উপাদান হইতে Dr. Fleet, মহীসুর রাজের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ Dr. Rice এবং তাঁহার সরকারী Mr. R. Narasimhacharya, Dr. Bhanderkar প্রভৃতি পণ্ডিতগণ অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। সম্প্রতি আমরা "ধারবার বিদ্যাবর্দ্ধক সঙ্ঘ" অর্থাৎ সাহিত্যপরিষৎ হইতেও নূতন নূতন খোদিত লিপি, তাম্রলিপি, তালপত্রে লিখিত পুস্তকাদি সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতেছি। গত ডিসেম্বর মাসের শেষ ভাগে অর্থাৎ বড় দিনের ছুটিতে আমি বাদামী, পরেশগড়, শিবমন্দির, মহাকূট প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়াছি। আমার বন্ধু মিঃ আলুর প্রভৃতি ঐ সকল স্থান হইয়া আরও কয়েকটি স্থানে গমন করিয়াছিলেন। (ক্রমশঃ)

রাবণবধের মূল তত্ত্ব।

(শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ন)

রাবণ নিহত হইয়াছে। দীর্ঘকালব্যাপী মহাসমরের অবসান হইয়াছে। হৈমলঙ্কা বীর-শূন্যা। অতিকায়, প্রহস্ত, প্রকম্পন, ইন্দ্রজিৎ ও কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি রণদুর্ম্মদ রাক্ষসগণ রামলক্ষ্মণের নিশিত শায়কাহত হইয়া বীর-শয্যায় শয়ন করিয়াছে।

বলদর্পিত দশানন অমরত্ব লাভের জন্য কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা তপস্যায় তুষ্ট হইয়া কহিলেন "বর গ্রহণ কর।" রাবণ অমরত্ব বর প্রার্থনা করিলেন। বিরিঞ্চি তাহা প্রদানে অস্বীকৃত হইলেন। হওয়ারই তো কথা। প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করিতে দেবতাদিগের সাধ্য কি? দেহ ধারণ করিলেই মরিতে হইবে—সে যত বড় বীরই হউক, আর যত বড় মহাপুরুষই হৌক না কেন।

"জাতস্য হি ধ্রুবোমৃত্যু ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যার্থে নানুশোচিতুমর্হসি।
দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীর স্তত্র ন মুহ্যতি॥
মৃত্যু র্জন্মবতাং বীর দেহেন সহ জায়তে।

অতঃপর রাবণ ভাবিলেন যে কৌশল করিয়া অমরত্ব বরটা আদায় করিয়া লইবেন। তিনি কহিলেন যে দেব, যক্ষ, রক্ষ, কিন্নর কাহারও হস্তে তাঁহার মৃত্যু হইবে না। কমলযোনি বুঝিয়া মনে মনে হাস্য করিলেন। দেহসুখ সর্ব্বস্ব মোহান্ধ রাবণ বুঝিল না যে সাধন-জগতে চতুরতা খাটে না। যে মূঢ় সাধন ভজন করিয়া বিনিময়ে ক্ষুদ্র বিষয়-সুখের প্রার্থনা করে তাহার এই দশাই হইয়া থাকে। সত্যযুগে হিরণ্যকশিপু এই প্রকার কৌশল করিয়া অমরত্ব বর আদায়ের চেষ্টা করিয়াছিলেন; ফল যাহা হইবার তাহা হইল। মধুকৈটভ দৈত্য দ্বয়ও চতুরতা করিয়া কহিয়াছিল "আবাং জহি ন যত্রোর্ব্বী সলিলেন পরিপ্লুতা"। অবশেষে তাহারাও নিহত হইল। দশানন বরগ্রহণ-কালে তুচ্ছ করিয়া মানবের কথা উল্লেখ করিলেন না। ভাবিলেন যদি দেব, যক্ষ, রক্ষ, কিন্নর প্রভৃতির অবধ্য হই, তবে মানুষ তো কোন্ ছার!

অবজ্ঞাতঃ পুরা তেন বরদানে হি মানবাঃ
এবং পিতামহাত্তস্মাদ্বরদানেন গর্ব্বিতঃ।

সুতরাং ঘৃণা করিয়া মানুষের কথা কহিলেন না। ব্রহ্মার বরপ্রভাবে রাবণ ত্রিজগৎ তুচ্ছ করিতে লাগিল। মহান্ অত্যাচারী হইয়া উঠিল। অতঃপর কালবশে সেই মানবের হস্তেই তাঁহার মৃত্যু হইল।

যেখানে ঘৃণা সেইখানেই মৃত্যু। যাহাকে তুচ্ছ করা যাইবে, তাহার কাছেই পরাজিত হইতে হইবে। সমদর্শী ভগবানের এ এক অপূর্ব্ব বিধান। জগতে কেহই ছোট নহে। "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ"। সুতরাং তৃণ লতা গুল্ম মনুষ্য পশু পক্ষী কেহ কাহাকে ঘৃণা করিতে পারে না। পূজায় সম্মানে জীবন আর ঘৃণায় মৃত্যু। যাহাকে ঘৃণা করিলে, তাহাকেই চিনিলে না, সুতরাং তৎসম্বন্ধে সে স্থলে তোমার আত্মার মৃত্যু হইল। ঘৃণায় সমবেদনার অভাব হয়। সমবেদনার অভাব এক বস্তুকে চিনিবার পক্ষে বিশেষ অন্তরায়-স্বরূপ। বহুত্ব হইতে একত্বে

যাইতে হইলে, সকল পদার্থকে চিনিতে হইবে। চিনিতে হইলেই সমবেদনা চাই, সমবেদনা অনুভব করিতে হইলেই সে স্থলে সম্মান চাই, সম্মান করিতে হইলেই আত্মানুরূপ বোধ করিতে হইবে। যিনি যে বস্তুকে ঘৃণা করেন, করুণাময় ভগবান তাহার কাছে ঠিক সেই বস্তুরূপে আসিয়া ঘৃণাকারীকে পরাজিত করেন। তাই ভগবান রামরূপে মনুষ্যদেহে অবতীর্ণ হইয়া রাবণকে নিধন করিয়াছিলেন। রামাবতার ও রাবণবধের এই এক মহা তত্ত্ব। জীব, তুমি মনে রাখিও, যখনি তোমার কাহারও প্রতি ঘৃণা আসিবে, মনে করিও সেই পদার্থই তোমার কাছে ভগবানের অবতার-স্বরূপ হইয়া আসিয়াছে। তাহা হইলে আর ঘৃণা থাকিবে না।

ব্রাহ্মণ, তুমি যে চণ্ডালকে ঘৃণা করিতেছ, ঐ চণ্ডাল হইয়া তোমায় জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে। প্রত্যেক পদার্থের মধ্যে তোমার আপনাকে উপলব্ধি করিতে হইবে। এ জগতে ঘৃণার স্থান নাই। উপনিষদ্ ঋষিয়াছেন "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং"; শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছেন, "ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব"। বেদে উক্ত আছে—

যঃ একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাৎ
বর্ণান্ অনেকান্ নিহিতার্থো দধাতি।

ঘৃণার মূলে অহঙ্কার। অহঙ্কার বড় প্রবল রিপু। সাধনা করিতে করিতে সকলের পরে অহঙ্কারের লোপ হয়। অহঙ্কার লুপ্ত হইলেই জীব ভগবানে বিলীন হইয়া কৈবল্য, মোক্ষ অথবা নির্ব্বাণ লাভ করে। এই অহঙ্কারের ধ্বংস করিতে হইলে কঠোর সাধনার প্রয়োজন। রাবণ ও কুম্ভকর্ণের জীবন একটা সাধনা। এই অহঙ্কারের ধ্বংস করিতে তাহাদের তিনযুগে তিন জন্ম গ্রহণ করিতে হইয়াছে।

পুরাণানুসারে রাবণ এবং কুম্ভকর্ণ বিষ্ণুর দ্বারে দ্বার-রক্ষক ছিলেন। ইহাদের নাম ছিল তখন জয় এবং বিজয়। একদা সনক, সনন্দ, সনৎকুমার, সনাতন প্রভৃতি ঋষিগণ হরিচরণ দর্শনাশায় বিষ্ণুলোকে উপস্থিত হন। ইহারা দেখিতে পঞ্চম বর্ষীয় বালকের মত। জয়-বিজয়-নামক দ্বাররক্ষকদ্বয় অহঙ্কারবশে ইঁহাদিগকে অবমানিত করিয়াছিলেন। তাই ঋষিগণ এতদুভয়ের সংশোধন-মানসে কৃপাপূর্ব্বক অভিশাপ প্রদান করেন। কৃপাই তো বটে। ঋষিগণ ভাবিলেন, ইহারা আর কতকাল দ্বারে দাঁড়াইয়া থাকিবে। পরিশুদ্ধ করিয়া শ্রীহরি-সাযুজ্য লাভের উপায় করিয়া দিলেন। ঋষিগণ কখনো ক্রুদ্ধ হন না। তাঁহারা নিষ্ঠুর নহেন। সর্ব্বজগতের কল্যাণ বিধানই তাঁহাদের কার্য্য। স্বাধিকারপ্রমত্ত জয়বিজয় তখন পরিতাপ করিতে লাগিলেন। বিষ্ণু কহিলেন তোমরা আমার শত্রুরূপে জন্মগ্রহণ করিবে, আমি স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া তোমাদের উদ্ধার করিব। অর্থাৎ অহঙ্কারই ভগবানের শত্রু। আমার আমিত্বকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করিয়া দিতে না পারিলে মুক্তিলাভ হইবে না। জীব তাহা নিজের চেষ্টায় পারে না। জীবের যতই সাধনাভিমান থাকুক না কেন, তাহা পারে না। বিষ্ণুর নিকটবর্ত্তী দ্বাররক্ষক জয় বিজয় পর্য্যন্ত পারেন নাই। ভগবান কৃপা করিয়া স্বয়ং জীবের অহঙ্কারকে দমন করিয়া তাহাকে মুক্ত করিয়া থাকেন। জীবের কর্ত্তব্য কেবল সাধনাভিমান ত্যাগ করা। সাধন করিতে করিতেই সাধনাভিমান বিদূরিত হইবে। সাধনের প্রয়োজনীয়তা এই জন্য যে, তাঁহাকে সাধন করিয়া পাওয়া যাইবে।

শ্রুতি কহিয়াছেন—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ
ন মেধয়া ন বহুধা শ্রুতেন
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ
তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূং স্বাম্।

এ তত্ত্ব ভাগবদ্ধর্ম্মে বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতীয় শ্রীকৃষ্ণের ননী চুরির ব্যাপার এ তত্ত্বের সর্ব্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। যখন যশোদা নিজের চেষ্টায় কিছুতেই গোপালকে বন্ধন করিতে পারিলেন না, তখন—

স্বমাতুঃ স্বিন্নগাত্রায়াঃ বিস্রস্তকবরস্রজঃ
দৃষ্ট্বা পরিশ্রমং কৃষ্ণঃ কৃপয়াসীৎ স্ব-বন্ধনে।

এই জয় বিজয় অভিশাপগ্রস্ত হইয়া, সত্যযুগে হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু, ত্রেতায় রাবণ এবং কুম্ভকর্ণ, অতঃপর দ্বাপরযুগে দন্তবক্র ও শিশুপালরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কলিযুগের এই কৃপালাভ, ভাগবদ্ধর্ম্ম এবং সহজ সাধনের বিরাট আয়োজন পূর্ব্ববর্ত্তী তিন যুগ ধরিয়া চলিয়াছে। তাই ভাগবদ্ধর্ম্মাবলম্বিগণ চারিযুগের ভিতরে কলি-

যুগকেই শ্রেষ্ঠ যুগ বলিয়া থাকেন। তিনযুগে ভগবান অবতীর্ণ হইয়া এই অহঙ্কারকে নিপীড়নপূর্ব্বক জীবের জন্য এই সর্ব্বমঙ্গলময় ভাগবদ্ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। ভাগবদ্ধর্ম্মে ঘৃণার স্থান নাই। তাঁহারা বলেন—"ইয়ং পৃথিবী সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু—" ভাগবদ্ধর্ম্মে অহঙ্কারের অবকাশ নাই। তাঁহারা বলেন—"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা"।

জীব, তুমি অহঙ্কার ও ঘৃণাবশে রাবণের মত এমন কঠোর জীবন-সাধনা ব্যর্থ করিও না। ভগবানের সঙ্গে কৌশল করিয়া কেনা বেচার সাধনা করিও না। হনুমানের মত তাঁহার নিত্যদাস হও। চৈতন্য-চরিতামৃতে উক্ত আছে "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস"। এই অমৃতময়ী বাণীই তোমার সাধনার মূলমন্ত্র হৌক্।

কন্নাড় সাহিত্য।

কর্ণাটের বৈষ্ণব কবি।

পুরন্দর দাস।

অহং জ্ঞান পরিহরি, ভেদাভেদ ত্যাগ করি,
জ্ঞানের সলিলে কর স্নান।
পিতা মাতা ভক্তি স্নান, বন্ধন মোচন স্নান,
হরিধ্যান গঙ্গা কর স্নান।
ভবিষ্যত চিন্তাস্নান, পরস্ত্রী অলোভ স্নান,
নিন্দা বিসর্জ্জন কর স্নান।
চৌর্য্য-বৃত্তিহীন স্নান, পর-তত্ত্ব-জ্ঞান স্নান,
আত্ম-জ্ঞান গঙ্গা কর স্নান।
পরহিতজ্ঞান স্নান, অন্যায়বর্জ্জন স্নান,
হরিনাম গঙ্গা কর স্নান।
সজ্জন প্রীতির স্নান, অপ্রীতি ত্যাগের স্নান,
অক্ষিদোষজ্ঞান কর স্নান।
বেদ অধ্যয়ন স্নান, সত্য মিথ্যা জ্ঞান স্নান,
সাধু-সঙ্গ গঙ্গা কর স্নান।
আছে যত জন স্নান, পুরন্দর ধ্যান স্নান,
পুণ্যময় গঙ্গা কর স্নান ॥ ৫ ॥

সত্য-দেবতায় ছেড়ে, মিথ্যা-দেবে পূজা করে,
তারে মূর্খ সর্ব্বলোকে কয়।
রমণী ত্যজিয়া যায়, পর হস্তে ধন দেয়,
আত্মীয়কে ঋণ দেয়, মূর্খ বলি জান তায়,
মহামূর্খ অপরে মজায়।
উদর পুরিতে হায়, সন্তান বিকায়ে যায়,
শ্বশুরের ঘরে রয়, মূর্খ নিজে গালি দেয়,
মহামূর্খে ভক্তি নাহি রয়।
মহিষ শাবক হীন, দোহে মূর্খ অতি দীন,
বিনা দ্রব্যে দেয় ঋণ, ব্যস্ত রহে রাত্র দিন,
মহামূর্খ জননী নিন্দয়।
নিত্য-পূজা নাহি করে, গুরুভক্তি নাহি ধরে,
হরি কথা শুনিবারে, মূর্খে না বাসনা সরে,
মহামূর্খ অলস সঙ্গে রয়।
উপকার লভি দীনে, অপকার প্রতিদানে,
পরনিন্দা শুনি কানে, মূর্খ নাশে নিজ জনে,
মহামূর্খ ভজে না দেবায় ॥ ৬ ॥

দাস কর হে আমায়, ওহে প্রভু দয়াময় হে,
তুমি বেঙ্কট রমণ, হৃদয়ের ধন, সহস্র নাম ধ্যেয় হে!
পাপ ইচ্ছা নিবারয়, পাপ চিন্তা নাশ কর হে,
পরাও আমারে নাথ, নিজ কৃপাগুণে, তব করুণা-কবচ হে।
করাও আমারে প্রভু, তব পদসেবা-রত হে,
সাজাও কবরী মোর, ভয়হারী তব অভয় কুসুমদামে হে।
কাঁদিয়ে মাগিছে দাস, দাও অটল ভকতি হে,
দিবস রজনী করি, গুণ গান তব, যায় সকলি বৃথায় হে।
কেন বা বিলম্ব কর, তব ধ্যানে মগ্ন কর হে,
বঙ্কিম নয়নে কেন, নিখিল রঞ্জন, হের আমার পানে হে!
পতিত পাবন দেব, তুমি পতিতের সখা হে,
শরণাগত আশ্রয়, অনাথ বৎসল, ওহে ভুলনা আমায় হে।
ধুয়ে দিয়ে পাপ তাপ, মোরে মুক্তি দিতে হবে হে,
কৃপাময় কৃপা কর, গুরুপুরন্দর, ডাকে বিট্‌টল তোমায় হে ॥ ৭ ॥

"ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান।"

দেবেন্দ্রনাথের হিমালয়ভ্রমণ তাঁহার নিজের এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসীর কি উপকার সাধন করিয়াছে, তাহা তাঁহার হিমালয়ভ্রমণ হইতে প্রত্যাগমনের পর বিবৃত ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান পাঠ করিলেই উপলব্ধ হইবে।

হিমালয়ভ্রমণের পূর্ব্বে ও পরে ব্রাহ্মসমাজে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম্ম-সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের উপর অনেক উপদেশ দিয়াছিলেন; কিন্তু "ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান" বলিলে সে সকল উপদেশ বুঝায় না। হিমালয়প্রবাস হইতে প্রত্যাগমনের পরেই কেশবের আগমনে উৎসাহিত হইয়া দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে যে সকল ব্যাখ্যান বিবৃত করিয়াছিলেন এবং যে ব্যাখ্যানগুলি "ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান" নামক পুস্তকাকারে নিবদ্ধ হইয়াছে, সেই গুলিই বিশেষভাবে "ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান" বলিয়া অভিহিত হয়। ধর্ম্মসাহিত্যে এই ব্যাখ্যানগুলি বাস্তবিকই অত্যুচ্চ আসনের অধিকারী—ধর্ম্মসাহিত্যে এগুলি অপূর্ব্ব সামগ্রী। প্রাণ হইতে সরলভাবে নিঃসৃত ও সরল ভক্তিরসে আপ্লুত ব্রহ্ম বিষয়ক ব্যাখ্যান জগতের ধর্ম্মসাহিত্যে অতীব বিরল।

দেবেন্দ্রনাথ আচার্য্যপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ১৭৮২ শকের ১১ শ্রাবণ হইতে ১৭৮৩ শকের ১০ মাঘের মধ্যে এই সকল ব্যাখ্যান বিবৃত করিয়াছিলেন। এই সময়ে কেশবের প্রতি দেবেন্দ্রনাথের অনুরাগ এত গাঢ়তা প্রাপ্ত হইয়াছিল যে আমরা দেবেন্দ্রনাথকে অনেকবার বলিতে শুনিয়াছি যে, বেদীতে বসিয়া সম্মুখে কেশবকে সমাসীন দেখিলে তবে তাঁহার হৃদয় খুলিয়া যাইত, যাহা কিছু তাঁহার বলিবার থাকিত, তাহা অতি সহজেই হৃদয় হইতে নিঃসৃত হইয়া আসিত। এই ব্যাখ্যানগুলি দেবেন্দ্রনাথের তৃতীয় পুত্র হেমেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। তখন রেখাক্ষর বর্ণমালার ন্যায় কোন প্রকার সাঙ্কেতিক লিপি উদ্ভাবিত হয় নাই, কিন্তু বক্তৃতা লিপিবদ্ধকরণে হেমেন্দ্রনাথ সিদ্ধহস্ত ছিলেন। হেমেন্দ্রনাথ মৃত্যুশয্যায় শয়ান হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দেবেন্দ্রনাথ যে কোন ব্যাখ্যান বা উপদেশ বিবৃত করিয়াছিলেন, তাহাই তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের উপদেশ প্রভৃতি এই প্রকার লিপিবদ্ধকরণে হেমেন্দ্রনাথের বিশেষ অনুরাগ থাকাতে আমরা দেবেন্দ্রনাথের মুখ-নিঃসৃত অনেক বাণী সঞ্চিত দেখিতে পাই। যাঁহার মুখ হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান নিঃসৃত হইয়াছে এবং যিনি সেগুলিকে লিপিবদ্ধ করিয়া আমাদের সকলের সহজলভ্য করিয়া দিয়াছেন, তাঁহাদের উভয়কেই আমরা ভক্তিভরে প্রণাম করি।

১৭৮৯ শকের কার্ত্তিক মাসে ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র দেবেন্দ্রনাথকে যে অভিনন্দন পত্র প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে এই ব্যাখ্যানের বিষয় উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন—"যখন আপনি কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্যরূপে পবিত্র বেদী হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মের মহান্ সত্য সকল বিবৃত করিতে লাগিলেন, তখনই আপনার হৃদিস্থিত মহোচ্চ ও সুগভীর ভাবনিচয় লোকের নিকট প্রকাশিত হইল; এবং বিশেষরূপে ঈশ্বরের দিকে উপাসকদিগের হৃদয়কে আকর্ষণ করিলেন। কতদিন আমরা সংসারের পাপতাপে উত্তপ্ত হইয়া সমাজে আপনার হৃদয়-বিনিঃসৃত জ্ঞানামৃত লাভে শীতল হইয়াছি; কতদিন আপনার উৎসাহকর উপদেশ দ্বারা আমাদের অসাড় মুমূর্ষু আত্মা পুনর্জ্জীবিত হইয়াছে এবং আপনার প্রদর্শিত আধ্যাত্মিক রাজ্যের গাম্ভীর্য্যে ও সৌন্দর্য্যে পুলকিত হইয়া সংসারের প্রতি বীতরাগ হইয়াছে। সেই সকল স্বর্গীয় অনুপম "ব্যাখ্যান" পরে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। আমরা তৎশ্রবণদ্বারা যে মহোপকার লাভ করিয়াছি, বোধ করি, অনেকে পাঠ করিয়া তাদৃশ ফল প্রাপ্ত হইবেন। পরন্তু ইহা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে এই অমূল্য পুস্তক ভবিষ্যতে দেশবিদেশে উপযুক্তরূপে সমাদৃত হইবে।"

"বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে" রাজনারায়ণ বসু মহোদয় বলেন—"বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা করিবার উৎকৃষ্ট প্রণালী ব্রাহ্মসমাজের সভ্যেরা প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন। ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতার মধ্যে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যাখ্যান অতি প্রসিদ্ধ। উহা তড়িতের ন্যায় অন্তরে প্রবেশ করিয়া আত্মাকে চমকিত করিয়া তুলে এবং মনশ্চক্ষুসমক্ষে অমৃতের সোপান প্রদর্শন করে।

দেবেন্দ্র বাবু ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক বলিয়া বিখ্যাত, কিন্তু বঙ্গভাষা তাঁহার নিকট উক্ত ব্যাখ্যান প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ প্রণয়ন নিমিত্ত এবং অন্যান্য কারণ জন্য কতই উপকৃত, তাহা বলা যায় না।"

"বর্ত্তমান সময়ে যিনি বিদ্যালয়ের পাঠ্য কোন পুস্তক প্রণয়ন করেন, তিনি যেমন বিদ্যাসাগরের লিখিত ভাষা অবলম্বন করেন; যিনি কোন প্রাকৃতিক তত্ত্ব বর্ণনা করেন, তিনি যেমন অক্ষয়কুমারের লিখনপ্রণালীর অনুসরণ করেন; তেমনি যিনি এক্ষণে ধর্ম্মবিচার, ধর্ম্মতত্ত্বব্যাখ্যা বা ঈশ্বরের প্রেম-মাহাত্ম্য বর্ণন করেন, তিনি কাশীবাসী হউন বা পদ্মাপারে অবস্থান করুন, তাঁহাকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বাক্যাবলী গ্রহণ করিতে হয়।" (সমীরণ, শ্রাবণ ১৩০২)

এই ব্যাখ্যানগুলি মুদ্রিত হইয়া কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ ব্যতীত অন্যান্য ব্রাহ্মসমাজে বিনামূল্যে বিতরিত হইত।

ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাদিবসে দেবেন্দ্রনাথ যেমন একদিকে ব্যাখ্যান সকল বিবৃত করিতে লাগিলেন, তেমনি এই বৎসর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে দ্বিতীয় প্রস্তাব আরম্ভ করিয়া বিশেষভাবে উপনিষদের ভাব সকল ব্যক্ত করিতে লাগিলেন।

এইরূপে দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের যত্নে ও উৎসাহে যখন ব্রাহ্মধর্ম্ম চারিদিকে প্রচারিত হইতে লাগিল, যখন অনেক পরিবারের লোকেরা ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্রত গ্রহণপূর্ব্বক পৌত্তলিক অনুষ্ঠান পরিত্যাগে উদ্যোগী হইতে লাগিলেন, তখন অবধি ব্রাহ্মসমাজের বিরোধীপক্ষেরও পুনরাবির্ভাব হইতে লাগিল। কেশবচন্দ্রও নীরব থাকিবার লোক ছিলেন না। আমরা যতদূর জানি, সেই সময়ে তাঁহারই পরামর্শমত ব্রহ্মোপাসকদিগকে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা হইতে লাগিল এবং সে বিষয়ে কতকটা সাফল্যও দেখা যাইতে লাগিল।

একদিকে কেশবের ব্রহ্মবিদ্যালয়, অপরদিকে দেবেন্দ্রনাথের ব্যাখ্যান, এই উভয়ের ফলে উপাসনাদিবসে ব্রাহ্মসমাজে এত শ্রোতৃসমাগম হইতে লাগিল যে সকলের স্থান সংকুলান হইত না। সেই কারণে ব্রাহ্মদিগের জন্য কতকগুলি আসন নির্দ্দিষ্ট রাখিতে হইত। এই সকল নির্দ্দিষ্ট আসনের জন্য ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মচারীগণের নিকটে পূর্ব্ব হইতে নিদর্শন-পত্র সংগ্রহ করিতে হইত। ইহার অবান্তর ফল হইল এই যে শ্রোতৃবর্গের মধ্যে ব্রাহ্মমণ্ডলীর কতগুলি, তাহার কতকটা আভাসও পাওয়া যাইত।

বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত

গীতা-রহস্য।

অষ্টম প্রকরণ।

বিশ্বের রচনা ও সংহার।

(পূর্ব্বের অনুবৃত্তি)

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদিত)

ব্যবসায়িক বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই দুই ব্যক্ত গুণ মূল সাম্যাবস্থ প্রকৃতিতে উৎপন্ন হইলে প্রকৃতির একত্ব ভাঙ্গিয়া গিয়া, তাহার অনেক পদার্থ নির্ম্মাণের সূত্রপাত হয়। তথাপি তাহার সূক্ষ্মত্ব অদ্যাপি বজায় আছে। অর্থাৎ নৈয়ায়িকদিগের সূক্ষ্ম পরমাণু এক্ষণে আরম্ভ হয়, এইরূপ বলিলেও চলে। কারণ অহঙ্কার উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে প্রকৃতি অখণ্ড ও নিরবয়ব ছিল। নিছক্ বুদ্ধি ও নিছক্ অহঙ্কার—বস্তুতঃ দেখিতে গেলে ইহারা কেবল গুণ। তাই প্রকৃতির দ্রব্য হইতে উহারা পৃথক্ থাকে, উপরি-উক্ত সিদ্ধান্তের এরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে না। আসল কথা এই যে, যখন মূল ও নিরবয়ব একই প্রকৃতিতে এই গুণগুলি উৎপন্ন হয়, তখন উহারই বিবিধ ও সাবয়ব-দ্রব্যাত্মক ব্যক্ত রূপ উৎপন্ন হয়। এই প্রকার যখন মূল প্রকৃতিতে অহঙ্কারের ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ নির্ম্মাণ করিবার শক্তি আসে তখন পরে উহার বুদ্ধি দুই শাখায় বিভক্ত হয়। এক শাখা, মনুষ্যপ্রভৃতি সেন্দ্রিয় প্রাণীগণের সৃষ্টি; এবং দ্বিতীয়,—নিরিন্দ্রিয় পদার্থের সৃষ্টি। এই স্থানে ইন্দ্রিয়শব্দে "ইন্দ্রিয়বান্ প্রাণীদিগের ইন্দ্রিয়ের শক্তি" এই অর্থই বুঝিতে হইবে। কারণ, সেন্দ্রিয় প্রাণীদিগের জড়দেহের সমাবেশ জড় অর্থাৎ নিরিন্দ্রিয় সৃষ্টিতে হইয়া থাকে, এবং এই প্রাণীদিগের আত্মা 'পুরুষ' নামক পৃথক্ বর্গের ভিতরেই পড়ে। তাই সাংখ্যশাস্ত্রে সেন্দ্রিয় জগতের বিচার করিবার সময় দেহ ও আত্মা ছাড়িয়া

কেবল ইন্দ্রিয়েরই বিচার করা হইয়াছে। জগতে সেন্দ্রিয় ও নিরিন্দ্রিয় পদার্থের অতিরিক্ত তৃতীয় পদার্থ থাকা সম্ভব না হওয়ায় অহঙ্কার হইতে দুয়ের অধিক শাখা বাহির হইতে পারে না ইহা বলিতে হইবে না। তন্মধ্যে নিরিন্দ্রিয় পদার্থ অপেক্ষা ইন্দ্রিয়শক্তি শ্রেষ্ঠ হওয়া প্রযুক্ত ইন্দ্রিয়-জগতের সাত্ত্বিক অর্থাৎ সত্ত্বগুণের উৎকর্ষের দ্বারা উৎপন্ন এবং নিরিন্দ্রিয় জগতের তামসিক অর্থাৎ তমোগুণের উৎকর্ষের দ্বারা উৎপন্ন এইরূপ নাম আছে। সারকথা এই যে, অহঙ্কার আপন শক্তির দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ উৎপন্ন করিতে আরম্ভ করিলে তাহাতেই এক সময় সত্ত্বগুণের উৎকর্ষ হইয়া একদিকে পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন মিলিয়া ইন্দ্রিয়-জগতের মূলভূত এগারো ইন্দ্রিয় এবং অন্যদিকে তমোগুণের উৎকর্ষ হইয়া তাহা হইতে নিরিন্দ্রিয় জগতের মূলভূত পাঁচ তন্মাত্র দ্রব্য উৎপন্ন হয়। কিন্তু প্রকৃতির সূক্ষ্মত্ব অদ্যাপি বজায় থাকা প্রযুক্ত অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন এই ১৬ তত্ত্বও সূক্ষ্ম হইয়াই থাকে। *

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—ইহাদের তন্মাত্র, অর্থাৎ মিশ্রণ না হইয়া প্রত্যেক গুণের পৃথক্ পৃথক্ অতিসূক্ষ্ম মূলস্বরূপ—নিরিন্দ্রিয় জগতের মূলতত্ত্ব এবং মন-সমেত এগারো ইন্দ্রিয় সেন্দ্রিয় জগতের বীজ। এই বিষয়ে সাংখ্যশাস্ত্রপ্রদত্ত উপপত্তি বিচার করিবার যোগ্য বিষয় যে, নিরিন্দ্রিয় সৃষ্টির মূলতত্ত্ব পাঁচই বা কেন এবং সেন্দ্রিয় সৃষ্টির মূলতত্ত্ব এগারোই বা কেন মানা আবশ্যক হয়। অর্ব্বাচীন সৃষ্টিশাস্ত্রজ্ঞানী জাগতিক পদার্থের ঘন, তরল ও বায়ুরূপী তিন প্রকার ভেদ করিয়াছেন। কিন্তু সাংখ্যশাস্ত্রে পদার্থসমূহের বর্গীকরণ ইহা হইতে ভিন্ন। সাংখ্য বলেন যে জাগতিক সমস্ত পদার্থের জ্ঞান মনুষ্যের পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা হইয়া থাকে; এবং এই জ্ঞানেন্দ্রিয়ের রচনায় এইরূপ কিছু বিশেষত্ব আছে যে, এক ইন্দ্রিয়ের একই গুণ জ্ঞান-গোচর হইয়া থাকে। চোখে আঘ্রাণ হয় না, কানেও দেখা যায় না; এবং ত্বকের মিষ্ট-তিক্ত জ্ঞান হয় না, জিহ্বার শব্দ জ্ঞান হয় না; নাক শাদা-কালো বুঝিতে পারে না। পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও তাহাদের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচ বিষয় এইরূপ যদি স্থির হইয়া থাকে, তবে জগতের সমস্ত গুণ ইহা অপেক্ষা অধিক স্বীকার করিতে পারা যায় না। কারণ, পাঁচ অপেক্ষা অধিক গুণ যদি কল্পনা করাও যায় তাহা হইলে তাহা জানিবার কোন উপায় আমাদের নাই। এই পাঁচ গুণের মধ্যে প্রত্যেকের অনেক ভেদ হইতে পারে। উদাহরণ যথা—শব্দ, এই গুণ একই হইলেও ছোট, বড়, কর্কশ, ভাঙ্গা, চেরা, মধুর কিংবা সঙ্গীতশাস্ত্রের বর্ণনা অনুসারে নিষাদ, গান্ধার, ষড়জ ইত্যাদি অথবা ব্যাকরণশাস্ত্র অনুসারে কণ্ঠ্য, তালব্য ওষ্ঠ্য প্রভৃতি এক শব্দেরই অনেক প্রকার ভেদ হইয়া থাকে। রস কিংবা রুচি ইহারা বস্তুত এক হইলেও তাহারও—মধুর, টক্, নোন্‌তা, ঝাল, তিতো কিংবা কষা ইত্যাদি অনেক ভেদ হইয়া থাকে; এবং রূপ একটি গুণ হইলেও, সাদা, কালো, সবুজ, নীল, হল্‌দে, তাঁবাটে এইপ্রকার রূপও অনেক প্রকারের হইয়া থাকে। সেইরূপ আবার মিষ্টতা এই এক বিশিষ্ট রুচির কথা যদি ধর, তাহাতেও আখের মিষ্টতা ভিন্ন, দুধের ভিন্ন, গুড়ের ভিন্ন, চিনির ভিন্ন, এইরূপ তাহারও আবার অনেক ভেদ আছে; এবং পৃথক্ পৃথক্ গুণের ভিন্ন ভিন্ন মিশ্রণ যদি ধর—এই গুণবৈচিত্র্য অনন্তপ্রকারে অনন্ত হইতে পারে। কিন্তু যাহাই হউক না কেন, পদার্থসকলের মূল গুণ পাঁচ অপেক্ষা কখনই অধিক হইতে পারে না। কারণ, ইন্দ্রিয় পাঁচই এবং প্রত্যেকের এক এক গুণই বোধগম্য হয়। এইজন্য, কেবলমাত্র শব্দগুণের কিংবা কেবলমাত্র স্পর্শগুণের এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ পদার্থ অর্থাৎ অন্য

* ইংরাজি ভাষায় এই অর্থই সংক্ষেপে বলিতে হইলে এইরূপ বলিতে হয়—

The Primeval matter (*Prakriti*) was at first *homogeneous*. It *resolved* (*Buddhi*) to unfold itself, and by the *Principle of differentiation* (*Ahankara*) became *heterogeneous*. It then branched off into *two* sections—one *organic* (*Sendriya*) and the other *inorganic* (*Nirindriya*). There are *eleven* elements of the organic and *five* of the inorganic creation. *Purusha* or the observer is different from all these and falls under none of the above categories.

গুণের মিশ্রণরহিত পদার্থ আমাদের নজরে না আসিলেও মূলে কেবলমাত্র শব্দ, কেবলমাত্র স্পর্শ কেবলমাত্র রূপ, কেবলমাত্র রস ও কেবলমাত্র গন্ধ অর্থাৎ শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র—এইরূপ মূল প্রকৃতির পাঁচ ভিন্ন ভিন্ন সূক্ষ্ম তন্মাত্রবিকার কিংবা দ্রব্য অবশ্যই আছে, এইরূপ সাংখ্যেরা স্থির করিয়াছেন। পঞ্চতন্মাত্র কিংবা তাহা হইতে উৎপন্ন পঞ্চ মহাভূত সম্বন্ধে উপনিষৎকারেরা কি বলেন তাহার বিচার পরে করিয়াছি।

নিরিন্দ্রিয় জগতের এইপ্রকার বিচার করিয়া উহাতে পাঁচটিমাত্র সূক্ষ্ম মূলতত্ত্ব আছে এইরূপ নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে। এবং যখন সেন্দ্রিয় জগৎ দেখি, তখন পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন—এই এগারোর অধিক ইন্দ্রিয় কাহারও নাই এইরূপ প্রতীতি হয়। স্থূল দেহে হস্তপদাদি ইন্দ্রিয় স্থূল প্রতীত হইলেও ইহাদের মধ্যে প্রত্যেকের মূলে কোনপ্রকার সূক্ষ্ম মূলতত্ত্ব না থাকিলে ইন্দ্রিয়সমূহের বিভিন্নতার যথোচিত কারণ বুঝা যায় না। পাশ্চাত্য আধিভৌতিক উৎক্রান্তিবাদে এই সম্বন্ধে খুবই আলোচনা হইয়াছে। এই মতে আদিম ক্ষুদ্রতম গোলাকার জন্তুর ত্বক্‌ই একমাত্র ইন্দ্রিয়; এবং এই ত্বক্ হইতে অন্য ইন্দ্রিয় ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হইয়াছে। উদাহরণ যথা—মূল-জন্তুর ত্বকের সহিত আলোকের সংযোগ হইলে পর চোখ হইল ইত্যাদি। আলোকাদির সংযোগে স্থূল ইন্দ্রিয়াদির প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে,—আধিভৌতিকবাদীদিগের এই তত্ত্ব সাংখ্যদিগেরও গ্রাহ্য। মহাভারতে (শাং. ২১৩, ১৬) সাংখ্যপ্রক্রিয়ানুসারে ইন্দ্রিয়াদির আবির্ভাবের এইপ্রকার বর্ণনা আছে ঃ—

শব্দরাগাৎ শ্রোত্রমস্য জায়তে ভাবিতাত্মনঃ।
রূপরাগাৎ তথা চক্ষুঃ ঘ্রাণং গন্ধজিঘৃক্ষয়া ॥

অর্থাৎ "প্রাণীর আত্মায় শব্দ শুনিবার ভাবনা হইলে পর কান, রূপ চিনিবার ইচ্ছায় চোখ, এবং গন্ধ আঘ্রাণ করিবার বুদ্ধি হইতে নাক উৎপন্ন হয়" কিন্তু সাংখ্যেরা এইরূপ বলেন যে, ত্বকের আবির্ভাব প্রথমে হইলেও, মূল-প্রকৃতিতেই যদি ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হইবার নৈসর্গিক শক্তি না থাকে তবে সজীব জগতের অন্তর্ভূত অত্যন্ত ক্ষুদ্র কীটের চর্ম্মের উপর সূর্য্যালোকের যতই আঘাত বা সংযোগ হউক না, তাহার চোখ—এবং চোখ শরীরের এক বিশিষ্ট অংশ—কোথা হইতে আসিবে? ডার্বিনের সিদ্ধান্ত এইমাত্র বলে যে, এক চক্ষুযুক্ত এবং দ্বিতীয় চক্ষুহীন—এই দুই প্রাণী সৃষ্ট হইলে পর, জড়-জগতের যুঝাযুঝি বা ঝটাপটিতে চক্ষুযুক্ত প্রাণী অধিককাল টিকিয়া থাকে এবং দ্বিতীয় বিনষ্ট হয়। কিন্তু নেত্রাদি ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয় প্রথমে উৎপন্ন কেন হয়, ইহার উপপত্তি, পাশ্চাত্য আধিভৌতিক সৃষ্টিশাস্ত্র বলেন নাই। সাংখ্যদিগের মত এই যে, এই সমস্ত ইন্দ্রিয় মূল এক ইন্দ্রিয় হইতেই পরে পরম্পরায় উৎপন্ন না হইয়া, অহঙ্কার প্রযুক্ত প্রকৃতির বহুত্ব আরম্ভ হইলে পর, প্রথমে সেই অহঙ্কার হইতে পাঁচ সূক্ষ্ম কর্ম্মেন্দ্রিয়, পাঁচ সূক্ষ্ম জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন মিলিয়া এগার ভিন্ন ভিন্ন শক্তি কিংবা গুণ, মূল প্রকৃতিতেই যুগপৎ স্বতন্ত্রভাবে সৃষ্ট হইয়া পরে তাহা হইতে স্থূল সেন্দ্রিয় জগৎ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই এগারটির মধ্যে মন, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের যোগে সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক কাজ অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়-গৃহীত সংস্কারসকলের যোগাযোগ করিয়া বুদ্ধির সম্মুখে নির্গমার্থ স্থাপন করে; এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়ের যোগে ব্যাকরণাত্মক কাজ অর্থাৎ বুদ্ধিকৃত নির্ণয় কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কাজে প্রয়োগ করে—এইপ্রকারে উহা উভয়বিধ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ভেদে ভিন্ন ভিন্ন দুই প্রকারের কাজ করিয়া থাকে, ইহা পূর্ব্বে ষষ্ঠ প্রকরণে কথিত হইয়াছে। উপনিষদেও ইন্দ্রিয়াদির প্রাণ এই নাম দেওয়া হয়; এবং সাংখ্যদিগের মতানুসারে উপনিষৎকারদিগেরও এই মত যে, এই প্রাণ পঞ্চ মহাভূতাত্মক না হইয়া পরমাত্মা হইতে পৃথক উৎপন্ন হইয়াছে (মুণ্ড, ২. ১. ৩)। এই প্রাণাদির অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির সংখ্যা উপনিষদে কোথাও সাত, কোথাও দশ, এগার, বার বা তের বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু উপনিষদের এই সমস্ত বাক্যের একবাক্যতা করিলে ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা এগারই সিদ্ধ হয়, বেদান্তসূত্রের ভিত্তিতে শ্রীশঙ্করাচার্য্য ইহাই স্থির করিয়াছেন (বেসূ, শাংভা, ২. ৪. ৫, ৬); এবং গীতাতে "ইন্দ্রিয়াণি দশৈকং চ" (গী, ১৩. ৫)—ইন্দ্রিয় দশ এবং এক অর্থাৎ এগার—এইরূপ স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে। অতএব

এই বিষয়ে সাংখ্য ও বেদান্ত এই দুই শাস্ত্রেই কোন মতভেদ নাই।

সাংখ্যদিগের সিদ্ধান্তের সারাংশ এই যে, সেন্দ্রিয় জগতের মূলভূত এগার ইন্দ্রিয়শক্তি বা গুণ সাত্ত্বিক অহংকার হইতে উৎপন্ন হয়; এবং নিরিন্দ্রিয় জগতের মূলভূত পাঁচ তন্মাত্র দ্রব্য তামস অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হয়; পরে পঞ্চতন্মাত্র দ্রব্য হইতে ক্রমান্বয়ে স্থূল পঞ্চমহাভূত (ইহার 'বিশেষ' এইরূপ নামও আছে) এবং স্থূল নিরিন্দ্রিয় পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে, এবং এই পদার্থসমূহের সহিত যথাসম্ভব এগার সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইলে সেন্দ্রিয় জগৎ সৃষ্ট হয়।

সাংখ্যমতে প্রকৃতি হইতে আবির্ভূত তত্ত্বসমূহের ক্রম—যাহার বর্ণনা এতক্ষণ করা হইয়াছে—নিম্নপ্রদত্ত বংশবৃক্ষ হইতে স্পষ্ট দৃষ্ট হইবে—

ব্রহ্মাণ্ডের বংশবৃক্ষ

÷পুরুষ (উভয়েই স্বয়ম্ভূ ও অনাদি) প্রকৃতি÷ (অব্যক্ত ও সূক্ষ্ম)
(নির্গুণ; পর্য্যায় শব্দ—জ্ঞ, দ্রষ্টা ইত্যাদি)। (সত্ত্ব রজ তম গুণী; পর্য্যায়শব্দ—প্রধান অব্যক্ত, মায়া, প্রসরধর্ম্মিণী ইত্যাদি)

মহান্ কিংবা বুদ্ধি (ব্যক্ত ও সূক্ষ্ম)
(পর্য্যায় শব্দ—আসুরী, মতি, জ্ঞান, খ্যাতি ইত্যাদি)

অহঙ্কার (ব্যক্ত ও সূক্ষ্ম)
(পর্য্যায়শব্দ—অভিমান, তৈজস, ইত্যাদি)

(সাত্ত্বিক জগৎ অর্থাৎ ব্যক্ত ও সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়) (তামস অর্থাৎ নিরিন্দ্রিয় জগৎ)

পাঁচ বুদ্ধি-ইন্দ্রিয় পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয় মন পঞ্চতন্মাত্র (সূক্ষ্ম)

বিশেষ বা পঞ্চ মহাভূত (স্থূল)

স্থূল পঞ্চ-মহাভূত ও পুরুষ ধরিয়া সর্ব্ব-সমেত ২৫ তত্ত্ব। ইহার মধ্যে মহান্ কিংবা বুদ্ধি হইতে পরবর্ত্তী ২৩ গুণ—মূল প্রকৃতির বিকার। কিন্তু তাহার মধ্যেও এই প্রভেদ যে, সূক্ষ্ম তন্মাত্র ও পাঁচ স্থূল মহাভূত, এ সকল দ্রব্যাত্মক বিকার; এবং বুদ্ধি, অহঙ্কার ও ইন্দ্রিয়, ইহারা কেবল শক্তি বা গুণ; এই ২৩ তত্ত্ব ব্যক্ত ও মূল প্রকৃতি অব্যক্ত। এই ২৩ তত্ত্বের মধ্যে সাংখ্য আকাশে দিক্ ও কালের সমাবেশ করিয়া থাকেন। প্রাণকে পৃথক্ স্বীকার না করিয়া, যখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার সুরু হয় তখনই উহাদিগকেই সাংখ্য প্রাণ বলেন (সাং, কা, ২৯)। কিন্তু বেদান্তী এ মত স্বীকার করেন না, তাঁহারা প্রাণকে স্বতন্ত্র তত্ত্ব বলিয়া বুঝেন (বেসূ, ২, ৪, ৯)। ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সাংখ্যেরা যেরূপ বলেন, প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই স্বয়ম্ভূ ও স্বতন্ত্র, বেদান্তীরা তাহা না বলিয়া, উভয়কে এক পরমেশ্বরেরই দুই বিভূতি বলিয়া মানিয়া থাকেন। সাংখ্য ও বেদান্ত ইহাদের মধ্যে এই ভেদ বাদে বাকী জগদুৎপত্তিক্রম উভয়েরই গ্রাহ্য। উদাহরণ যথা—মহাভারতের অনুগীতায় 'ব্রহ্মবৃক্ষ' কিংবা 'ব্রহ্মবন'—ইহাদের যে দুইবার বর্ণনা আছে (মভা, অশ্ব, ৩৫, ২০—২৩; ও ৪৭, ১২-১৫) তাহা সাংখ্যদিগের তত্ত্ব অবলম্বন করিয়াই করা হইয়াছে—

অব্যক্তবীজপ্রভবো বুদ্ধিস্কন্ধময়ো মহান্।
মহাহংকারবিটপ ইন্দ্রিয়ান্তরকোটরঃ॥
মহাভূতবিশাখশ্চ বিশেষপ্রতিশাখবান্।
সদাপর্ণঃ সদাপুষ্পঃ শুভাশুভফলোদয়ঃ॥
আজীব্যঃ সর্ব্বভূতানাং ব্রহ্মবৃক্ষঃ সনাতনঃ।
এনং ছিত্ত্বা চ ভিত্ত্বা চ তত্ত্বজ্ঞানাসিনা বুধঃ॥
হিত্ত্বা সঙ্গময়ান্ পাশান্ মৃত্যুজন্মজরোদয়ান্।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥

অর্থাৎ "অব্যক্ত (প্রকৃতি) যাহার বীজ, বুদ্ধি (মহান্) যাহার স্কন্ধ, অহঙ্কার যাহার মুখ্য পল্লব, মন ও দশ ইন্দ্রিয় যাহার ভিতরকার কোটর, সূক্ষ্ম মহাভূত (পঞ্চতমাত্র) যাহার বড় বড় শাখা এবং বিশেষ অর্থাৎ স্থূল মহাভূত যাহার ছোট ছোট ডাল-পালা, এইরূপ সদা-পুষ্পপত্রধারী ও শুভাশুভফলধারী, সমস্ত প্রাণীমাত্রের আধারভূত পুরাতন বৃহৎ ব্রহ্মবৃক্ষ। ইহাকে তত্ত্বজ্ঞানরূপ তরবারির দ্বারা ছেদন করিয়া, ও টুকরা টুকরা করিয়া, জ্ঞানী পুরুষ জন্ম, জরা ও মৃত্যুর সঙ্গময় পাশকে ছিন্ন করিবেন এবং মমত্ববুদ্ধি ও অহঙ্কার ত্যাগ করিবেন, তাহা হইলেই তিনি মুক্ত হইবেন, ইহাতে সংশয়মাত্র নাই।" সংক্ষেপে এই ব্রহ্মবৃক্ষই "সংসারের লীলা" কিংবা প্রকৃতির বা মায়ার 'প্রপঞ্চ'। ইহাকে 'বৃক্ষ' বলিবার রীতি বহু প্রাচীনকাল ঋগ্বেদের কাল হইতেই চলিয়া আসিয়াছে; ইহাকেই উপনিষদে 'সনাতন অশ্বত্থ বৃক্ষ'

বলা হইয়াছে (কঠ, ৬. ১)। কিন্তু বেদে এই বৃক্ষের মূল (পরব্রহ্ম) উপরে এবং শাখা (দৃশ্য জগতের বিস্তার) নীচে, এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। এই বৈদিক বর্ণনা এবং সাংখ্যদিগের তত্ত্ব, ইহাদিগকে একত্র জুড়িয়া গীতায় অশ্বত্থ বৃক্ষের বর্ণনা রচিত হইয়াছে, ইহা গীতার, ১৫. ১ ও ২ শ্লোকসম্বন্ধীয় আমার টীকাতে স্পষ্ট করিয়া দেখান হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

বিজয়-সঙ্গীত।

(শ্রীপঞ্চানন রায়)

ধন্য আজি হে ভারত রাজন্ বিজয়ী মহান্ বীর।
শান্ত উদার প্রকৃতি তোমার সতত সুশীল ধীর॥
ধর্ম্ম তোমার সদা সহচর সতত সকাশে রয়।
জগত্‌বাসীরে দেখাইলে তুমি "যথা ধর্ম্ম তথা জয়॥"
বাজাও বাদ্য উড়াও পতাকা বিজয়োল্লাসে মাতিয়া।
শুনাও চারণ জগত্‌বাসীরে বিজয়-সঙ্গীত গাহিয়া॥
সদর্পে দলিয়া জর্ম্মান্‌দলে প্রচারি ধর্ম্মের মহিমা।
দেখালে হে তুমি জগত্‌বাসীরে ন্যায়ের শুদ্ধ গরিমা॥
শান্তি তুমি স্থাপিলে জগতে মহান্ কষ্ট নিবারিয়া।
শান্ত আজি হে অশান্ত জগত্ তব দত্ত শান্তি পাইয়া॥
বাজাও বাদ্য উড়াও পতাকা বিজয়োল্লাসে মাতিয়া।
শুনাও চারণ জগত্‌বাসীরে বিজয়-সঙ্গীত গাহিয়া॥
দীর্ঘ চারিটী বরষ অতীত প্রলয় প্রচারি জগতে।
এসেছিল রাহু মহাযুদ্ধ-রূপে পৃথিবীবাসীরে গ্রাসিতে॥
তাড়ায়ে রাহুরে ভৈরব বিক্রমে প্রচারি ধর্ম্মের জয়।
শান্ত তোমার মহান্ বিক্রম জগতে প্রচার হয়॥
বাজাও বাদ্য উড়াও পতাকা বিজয়োল্লাসে মাতিয়া।
শুনাও চারণ জগত্‌বাসীরে বিজয়-সঙ্গীত গাহিয়া॥
রক্ষ ভগবন্ মোদের মহান্ শান্ত উদার রাজারে।
বাড়াও তাঁহার মহান্ বিজয় করুণা তোমার সঞ্চারে॥
শান্তি তুমি দাও জগ-বাসীগণে দুঃখ-ভয় সদা নাশিয়ে।
শান্ত রাজার মহতী শান্তি দাও জগজনে জানায়ে॥
বাজাও বাদ্য উড়াও পতাকা বিজয়োল্লাসে মাতিয়া।
শুনাও চারণ জগত্‌বাসীরে বিজয়-সঙ্গীত গাহিয়া॥

রাণাডের-স্মৃতিকথা।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

ফায়নান্স্ কমিটিতে নিয়োগ—১৮৮৬ অব্দ।

সিমলাযাত্রা।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর)

আমরা পুণা হইতে বাহির হইয়া, আহমদাবাদে, ওঁর মিত্র প্রোঃ-বাবাসাহেব কাথবটের গৃহে প্রথমে আড্ডা করিলাম। এই সময়ে, ওঁর প্রাণপ্রিয় মিত্র রাও বাহাদুর শঙ্কর পাণ্ডুরং পণ্ডিত, কোন বিষয়ে তাঁহার প্রতি সরকারের নারাজি-বশতঃ বেকার অবস্থায় ছিলেন। সিমলায় যাইবার জন্য আগ্রহের সহিত অনুরোধ করিয়া, তাঁহাকে ওঁর সঙ্গে লইয়াছিলেন। তাছাড়া এই সময়েই, ভাবনগরের এক ধনশালী ও উচ্চবংশীয় নাগর গৃহস্থ হরিপ্রসাদ সন্তকরাম দেশাই ওঁর ও পণ্ডিতের মিত্র হওয়ায় সিমলাদর্শনোদ্দেশে, নিজের ছেলেপুলে ও চাকর-বাকর সঙ্গে লইয়া ভাব-নগর হইতে অহমদাবাদে আসিয়াছিলেন এবং সেখান হইতে আমরা সকলে মিলিয়া যাত্রা করিলাম। আমরা সবশুদ্ধ প্রায় ৪০। ৫০ জন ছিলাম। আমাদের মধ্যে আমরা দু'জন, ননদ, বাবা ভাউজী; ঝী, ব্রাহ্মণ ও এক চাকর এই তিনজন ভৃত্য এবং ওঁর মিত্র—রাও বাহাদুর পণ্ডিত; বাকী—দেশাইদের মধ্যে ভাইসাহেবের পরিবার, দুই মেয়ে ও দুই চাকর, অনেকগুলি মেয়েমানুষ, ভাইসাহেব, ভাইসাহেবের চার ছেলে, বাড়ীর খাস্ কবিরাজ; আরও কতকগুলি নিকট আত্মীয় ও বাকী চাকর-বাকর। অহমদাবাদ হইতে বাহির হইয়া, দ্বিতীয় আড্ডা হইল জয়পুরে। আহারাদির পর, আমরা সবাই তত্রত্য প্রসিদ্ধ ম্যুজিয়ম দেখিতে গেলাম। সেখানে অনেক মিস্ত্রি কারিগর, সাদা মার্ব্বেল পাথরের কাজ—দেবতাদিগের খুব সুন্দর মূর্ত্তি, পক্ষী ও জীবজন্তুর চিত্র, চৌকোণ, অষ্টকোণ বাদামী ও গোল ছোট ছোট বাক্স, জরির কাজ, থালা বাসন এইরূপ অনেক তরোবেতরো শিল্পকাজ তৈয়ারী করিতে ছিল; তৈরী-হওয়া জিনিসগুলা তাকের উপর সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল। তন্মধ্যে, লক্ষ্মীনারায়ণের এক মূর্ত্তি, ছোট হাল্কা ও সুন্দর হওয়ায়, আমার ননদের ভারী পছন্দ হইল এবং তিনি উহা লইবার ইচ্ছা প্রকাশ করায়, ঐ মূর্ত্তি আনিয়া দেওয়া হইল। সেখান হইতে আমরা রাজপ্রাসাদ ও সরকারী বাগান দেখিতে গেলাম। যাইতে যাইতে সহরের যে যে অংশ নজরে পড়িল সেই সব দেখিয়া বাসায় আসিলাম এবং রাত্রির গাড়ীতে, অম্বালায় যাইবার জন্য যাত্রা

করিলাম অম্বালা পর্য্যন্ত রেল ছিল। সেইখানে পৌঁছিয়া, টঙ্গায় চড়িয়া কাল্কায় গেলাম। কাল্কায় 'উড়িয়া গার্ডেন' নামক এক দ্রষ্টব্য বড় বাগান আছে। উহা দেখিবার জন্য আমরা কালিকায় থামিলাম। এই সময় বেলা ১১।১২টা হইয়াছিল। উপন্যাসে কোন উদ্যানের যেরূপ বর্ণনা থাকে, সেইরূপ এই বাগানের দৃশ্য বড়ই মনোহর। প্রথমতঃ, আমাদের তিন দিনের প্রবাস হইতে সেই উদ্যানে, ঘোর গ্রীষ্মের সময় আসিয়া উপস্থিত হওয়ায়, ফল-পুষ্পে সুশোভিত বাগান, বৃক্ষের শীতল ছায়াতে এবং স্থানে স্থানে স্বচ্ছ জলে পরিপূর্ণ চৌবাচ্চার উপর দিয়া শীতল বায়ু প্রবাহিত হওয়ায় আমাদের নিকট উহা আরো রমণীয় হইয়াছিল। সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ চিত্তপ্রফুল্লকর সেই প্রদেশের বিভিন্ন রঙের, সুন্দর গঠন ও সুন্দর আকারের, মধুর কণ্ঠ বিহঙ্গ; কোথাও কোথাও ক্ষুদ্র চড়াইয়ের মতো পক্ষী খুব উচ্চ ও মিহি গলায় শিস্ দিতেছে; তাহাদের শিস্ ও মঞ্জুল কলধ্বনিতে আমাদের প্রবাসের সমস্ত শ্রম অপনীত হইয়া মন আনন্দে পূর্ণ হইল। এই বাগানে পিয়র নামক ফলের গাছই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল। এই সবুজ ফলগুলায় এক দিক্ লাল হওয়ায়, সিঁদুরে-আমের মতো দেখাইতেছিল। আম-গাছের মতো এই গাছে খুব পাতা; গাছগুলা বেশ ছত্রাকার ও খাটো। এই সময় ফলের মৌশম হওয়ায়, গাছগুলা ফলভারে নত হইয়া পড়িয়াছিল। মাটীতে দাঁড়াইয়া হাত বাড়াইয়া ফল পাড়া যাইতে পারিত। মনে হইত যেন ফলের চেয়ে পাতা কম। চৌবাচ্চার কাছে মেরাপ করিয়া তাহার উপরে বিচিত্র রংএর ও গন্ধের ফুলের লতা চড়ান হইয়াছে। মোটের উপর বাগানটি খুবই ভাল, এবং চিরকাল মনে থাকিবার মতো। উদ্যানটি দেখিয়া আবার আমরা যাত্রা আরম্ভ করিলাম। রাত্রি ৮টায় সিমলায় আসিয়া পৌঁছিলাম। সেখানে যে-বাঙ্গলা ভাড়া লওয়া হইয়াছিল, তাহাতে আমাদের হিন্দু পরিবারের অন্তর্গত ৩০।৪০ জন লোক বেশ থাকিতে পারে। এই বাঙ্গলা অর্কীর রাজার;—পুরাতন গোরস্থানের নিকটে। বাঙ্গলাটা দুই-মহল ও বড় হওয়ায়, দেশাই ও আমাদের পরিবার মণ্ডলীর বেশ সংকুলান হইয়াছিল। এই বাঙ্গালার একতালায় অর্কী রাজার গোমস্তা থাকিতেন। সিমলার হাওয়া খুবই উত্তম এবং জলও বেশ মিঠা। কিন্তু প্রচুর নহে—বস্তীর পরিমাণে বড়ই কম; তাই দেখা যাইত, সেখানকার পাহাড়ী লোক কাঠের টবে বসিয়া স্নান করিতেছে এবং সেই জলেই সদরা (লম্বা জামা) ও ইজার ধুইতেছে। সেখানকার স্ত্রীলোকদিগের পোষাক—তুলা ভরা ইজার, গাত্রে সদরা ও মাথার উপর তিন চার হাত লম্বা ওড়না। হাতে পায়ে গলায় ও মাথায় রূপা, পিতল ও মণির নানা প্রকার গহনা। উহারা অনেকগুলি বেণী বাঁধিয়া পিঠের উপর ঝুলাইয়া দেয়—বরফ পড়িতে আরম্ভ করিলে এই সব লোক আগ্নেয় পর্ব্বতের তলদেশে ও আশপাশে অবস্থিতি করে। পুরুষদের পোষাক—লঙ্গোটী, সদরা এবং মাথায় জড়াইবার চার পাঁচ হাত লম্বা কাপড়ের টুকরা এই মাত্র। ইহাদের মজবুত গঠন, রং গৌর ও সুকুমার। ইহাদের মধ্যে অনেকে, বেহারা কিংবা মজুরের কাজ করে। উহাদের ভিতর, চার পাঁচ কিংবা ততোধিক ভায়ের এক স্ত্রী গ্রহণ করিবার প্রথা আছে। অবস্থা অনুকূল হইলে, আরও এক স্ত্রী গ্রহণ করিলেও চলে। আমাদের আচার ও নীতিসংক্রান্ত বিধি-নিষেধ উহারা মানে না। আমরা যে সময়ে ছিলাম সেই সময় আমাদের বাঙ্গলার আসপাশে কুলীলোকের অনেক বসতি ছিল। সন্ধ্যাকালে উহাদের স্ত্রীলোকেরা আমাদের কম্পোণ্ডে বসিবার জন্য আসিত। তাহাদের সহিত সহজভাবে কর্ত্তাবার্ত্তা কহিয়া, এই কথা আমি জানিয়াছি। আমাদের দক্ষিণী লোকদিগের সম্বন্ধে সেখানকার লোকেরা শুধু নহে, য়ুরোপীয়ন লোকেরাও বেশী কিছু জানে না, এইরূপ দেখা যায়। সন্ধ্যাকালে আমাদের বাঙ্গলার আমরা সবাই বেড়াইতে বাহির হইলে পর, আমাদের দলের ১০।১৫ জন লোক চার পাঁচ জন চাকর এবং ৪।৫ খানা "জিনরিকে"র (হাত গাড়ী) ২০।২৫ জন কুলী থাকিত। এক এক জিনরিকের চার-জন করিয়া কুলী। এইরূপ সবশুদ্ধ অনেক লোক জমা হইত। সেই সময়কার সিমলার রাস্তা অতিশয় সংকীর্ণ, তেড়াবাঁকা ও উঁচু-নীচু ছিল। তাই, আমাদের সমস্ত লোক সবাই একসঙ্গে রাস্তার বাহির হইয়া পড়িলে রাস্তা লম্বালম্বি ভরিয়া যাইত, সেই জন্য নূতন কোন দর্শক এইরূপ মনে করিত যে, ইহারা কোন এক রাজার অনুচরবৃন্দ। এইরূপ অবস্থায় আমাদের সহিত কোন সাহেবের রাস্তায় সাক্ষাৎ হইলে, সাহেব আমাদের চাপরাশীকে (সেখানকারই লোক) জিজ্ঞাসা করিতেন, "ইয়ে কাঁহাকা রাজা হ্যায়?" তাহাতে চাপ্‌রাশী উত্তর দিত—"পুণার"। শুধু "পুণা" শব্দে কোন পরিচয় লাভ হইত না। একটু মুস্কিলে পড়িয়া চাপ্‌রাশী আবার বলিত—"পুণা সাতারার রাজা"। তখন সাহেব "হাঁ" বলিলে, সে মনে করিত সাহেব এইবার ঠিক্ বুঝিয়াছেন। আমরা সিমলায় চারমাস ছিলাম। কিন্তু সেখানে আমাদের একটুও বিরক্তি বোধ হইত না। সকাল ও দুপর বেলায় আমরা আপন আপন কাজে ব্যাপৃত থাকিতাম। সন্ধ্যাকালে ৫টা বাজিলে, স্ত্রী-পুরুষ সবাই মিলিয়া

কখনও 'জক্কোর' উপর (এই পাহাড়ের চূড়ায় বানরের যে স্থান আছে তাহা রামদাস স্বামীর স্থাপিত এইরূপ কথিত আছে এবং সেখান হইতে, বরফে ঢাকা হিমালয়ের শিখর-মালা দেখা যায়—মনে হয় যে, রূপার রস গড়াইয়া পড়িতেছে)। কখন 'কুসুমতি' পাহাড়ের উপর ও কখন এখানে সেখানে বেড়াইতে যাইতাম। সন্ধ্যায় ফিরিয়া আসিবার পর, ৯টা রাত্রি পর্য্যন্ত ওঁর-কাছে ইংরেজী পড়িয়া শুনাইবার ভার পণ্ডিতের উপর ছিল; এই কাজ তিনি বেশ প্রীতির সহিত করিতেন; কিন্তু বাহির হইতে আসিয়া কিয়ৎকাল পরেই—"মাথা ব্যথা করচে", "বড় খিদে পেয়েছে" এইরূপ বলিয়া, পড়া বন্ধ করিয়া, হাত মুঠা করিয়া ছোটো ছেলের মতো বসিতেন। ইহা দেখিয়া "ওঁর" হাসি পাইত। এবং বুঝাইবার মতো আদরের স্বরে উনি তাঁহাকে বলিতেন, "এরূপ করা কি ভাল? তৃতীয় স্তম্ভটা পর্য্যন্ত পড়। তার পর আমরা খেতে উঠ্‌ব। এখনো তোমার ছেলে-মানুসি গেল না। ছোট ছেলের মতো তোমার কতই বাহানা"। ইত্যাদি বলিবার পর, পণ্ডিত হাসিয়া নীরবে আবার পড়িতে আরম্ভ করিতেন। কিন্তু একটু পরেই প্রত্যেক বাক্যের উপর কিছু না কিছু টীকাটিপ্পনী ও ঠাট্টাতামাসা করিয়া নিজেও হাসিতেন এবং ওঁকেও হাসাইতেন। এইরূপ ভাবে ৯টা পর্য্যন্ত, ঠাট্টাতামাসা, ইংরেজী-পঠন হইবার পর, আহারে বসিতেন। খাইতে বসিলেই বা কি হইবে? প্রথমতঃ ত তাঁহার ক্ষুধা হইত না; সেই জন্য প্রত্যেক জিনিস হাতে লইয়া, কখন ভাল, কখন খারাপ বলিয়া হাসিয়া ও টীকা করিয়া, খাওয়া শেষ হওয়া পর্য্যন্ত, কোনরূপে সময় কাটাইয়া দিতেন। তাঁহার মনের অভিপ্রায় এই ছিল—আজ যে আমি আহার করিলাম না,—ইহা যেন "ওঁর" নজরে না পড়ে। কিন্তু তাঁহার এই চেষ্টা ব্যর্থ হইত। তিনি ভাত খাইতে বড় একটা ভাল বাসিতেন না। কিন্তু নিয়মমতো যে লুচি (পুরী) থাকিত তাহাও খাইতেন না, কেবল মুখভঙ্গী করিয়াই কাটাইয়া দিতেন। "উনি" সেই সময় কিছু বলিতেন না, কিন্তু ইহা ওঁর নজর এড়াইত না। সেই জন্য যে দিন তিনি খাইতেন না সেই দিন উনি তাঁহাকে বলিতেন—"থামো উঠো না, আজ যতটা তোমার খাওয়া উচিত তুমি তা খাওনি। লুচী নেও, কিংবা দুধ খাও—তার পর উঠো"। ঠিক্ সময়ে ধরা পড়িয়াছেন দেখিয়া তিনি হাসিয়া উঠিতেন এবং বলিতেন, "এতক্ষণ যে চেষ্টা করলুম, সব বৃথা হল"। একদিন এইরূপ তাঁহার খাওয়া হয় নাই; তাই "উনি" দুধ খাইবার জন্য তাঁকে খুব পীড়াপীড়ি করিলেন। তখন তিনি বলিলেন, "দিদিমণি পাশে ছিলেন বলে' আপনাকে সাম্‌লে নিয়ে চুপ্‌করে বসে ছিলুম, তাই এতক্ষণ কিছু বলিনি। কিন্তু একটা জিনিসও ভাল হয়নি; তবে আর খাব কি? তখন আমি বলিলাম;—"কোন্ কোন্ জিনিস খারাপ হয়েছে একবার বর্ণনা কর—তাতেই অনেকটা সময় কেটে যাবে। কোনো রকমে সময় কাটান চাই—এই না? তোমার খিদে ছিল না—এ আর বল্‌তে হবে না!!" এই কথায় পণ্ডিত বলিলেন, "তুমি আমাকে বল্‌তে বল্‌চ আমি বল্‌চি। এর দরুন যদি কেউ রাগ করে, আমাকে দোষ দিও না। বল্‌ব আর কি? কৌশিম্বিরটা টক্ হয়েছে, তরকারী সুস্বাদ হয় নি; ভাজী একটু ভাল হয়েছে কিন্তু তাও আবার বেশী তেলা, ও আমি খেতে পারিনে। "আমটী"তে পেঁয়াজ কম। লুচী বেশী কালো পড়েছে। মুরব্বা ঘন হয়েছে। আঁব বেশী পেকে গেছে। তবে আর খাব কি?!!" উনি বলিলেন,—"নুনটা লোন্‌তা নয়, লঙ্কায় ঝাল নেই—একথা বল্‌তে ভুলে গেলে কি করে'? হ্যাঁ, সব জিনিসই খারাপ হয়েছে আমি স্বীকার করচি; আচ্ছা তুমি শুধু দুধই খাও"। এইরূপ বলিবার পর, তিনি অগত্যা দুগ্ধ পান করিয়া উঠিলেন। আমাদের সিমলায় আসিবার পূর্ব্বে, পণ্ডিতের উপর সরকার হইতে অকারণ অত্যাচার হইয়াছিল। এই অত্যাচার কেমন?—না, সাপ মনে করে মাটিতে বাড়ী মারিবার মতো। পুর্ণায় যে দিন ফিমেল হাইস্কুলের উদ্ঘাটন-অনুষ্ঠান হইয়াছিল, সেই দিন শ্রীমন্ত সয়াজীরাও গায়কোয়াড় এই অনুষ্ঠান-সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং লীওয়ার্ণর প্রভৃতি সেই সময়কার উচ্চপদস্থ রাজপুরুষেরাও ছিলেন। শ্রীমন্ত গায়কোয়াড় অন্যত্র যাইতে হইবে বলিয়া ঐ সভার কার্য্য সমাপ্ত হইবার আধঘণ্টা পূর্ব্বে উঠিয়া গেলেন। শেষে যে গান হইবার কথা ছিল সেই গানের পূর্ব্বেই চলিয়া গেলেন—ইহাই লীওয়ার্ণর সাহেবের অসন্তোষের কারণ হইল। কিন্তু রাঃ-বাঃ পণ্ডিত এই হাইস্কুলের মুরুব্বিদের মধ্যে একজন ছিলেন। তিনিই নির্দ্দিষ্ট কার্য্যক্রম শেষ করিতে অধিক বিলম্ব হইবে বলিয়া আগেই গান কমাইয়া দিয়াছিলেন। এইজন্য লীওয়ার্ণন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং এই ব্যাপারের মূলে রাজদ্রোহের বীজ আছে এইরূপ তিনি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতে লাগিলেন এবং সর্ষপকে পর্ব্বত প্রমাণ করিয়া তুলিয়া, ৩।৪ দিনের মধ্যেই পণ্ডিতকে সস্‌পেণ্ড করিলেন। ইহা লীওয়ার্ণরের স্বভাবের অনুরূপই হইয়াছিল; কিন্তু রা-বা পণ্ডিতের এবং তাঁহার মিত্র যে উনি—ওঁরও এইজন্য অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছিল। তিনি স্বভাবতই অভিমানী ও গরম-মেজাজী ছিলেন; অকারণে মানহানি হওয়ায় তাঁর মনে বড়ই আঘাত

লাগিয়াছিল। সর্ব্বদাই ইহা চিন্তা করিতেন বলিয়া তাঁহার মাথা ব্যথা করিত; আহারের দিকে লক্ষ্য থাকিত না; তাঁকে বিষণ্ণ দেখাইত। তাঁহার এই অবস্থা উনি জানিতেন বলিয়া, পণ্ডিতের মন যাহাতে ব্যাপৃত থাকে, খুসী থাকে, তার বিবিধ উপায় অবলম্বন করিতেন। প্রতিদিন, যাহাতে তিনি আমোদ পান এইরূপ কথাবার্ত্তা উনি তাঁহার সহিত কহিতেন। দুপুরের সময় দুই তিন বার উনি তাঁর ঘরে গিয়া বসিতেন। ৫।১০ মিনিট তাঁহার সহিত কথা কহিয়া পুনর্ব্বার নিজের কাজে প্রবৃত্ত হইতেন। দুইচার ঘণ্টা ইনি যে তাঁকে একাকী চিন্তা করিতে দিতেন না, ইহাই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। বৈকালে তাঁহার ঘরে বসিয়াই জলযোগ করিতেন ও চা খাইতেন। ফায়নান্স কমিটির যে দিন বৈঠক হইত সেই দিন সেখানে গিয়া পণ্ডিতকে লিখিবার কাগজ দিয়া রাখিতেন এবং সন্ধ্যাকালে বাড়ী আসিলে পর, পণ্ডিতের হস্তাক্ষর সম্বন্ধে ও লাইনের সরলত্বসম্বন্ধে নিরর্থক কিছু-না-কিছু ঠাট্টা করিয়া তাহাকে হাসাইতেন এবং আমি যখন সেখানে যাইতাম, "তুমি আজ কি কি করিলে তার হিসাব দেও" ইত্যাদি উনি তাঁহাকে বলিতেন। পণ্ডিতের ধারণা ছিল,—আমাদের আমোদ দিবার জন্যই উনি ঐরূপ বলিতেন; তাই, তিনি উদাসীন নহেন,—আনন্দেই আছেন—এইরূপ দেখাইতেন; ঠাট্টা তামাসা করিতেন, হাসিতেন; মাথা ব্যথা করিলেও, তাঁহার ঘরে উনি গেলে, চট্ করিয়া উঠিয়া বসিয়া তাঁহার কিছুই হয় নাই, শুধু শুধু আল্‌সেমি করিয়া বসিয়া আছেন, এইরূপ দেখাইতেন। পাছে তাঁর সম্বন্ধে উনি কিছু খারাপ মনে করেন, কিংবা উদ্বিগ্ন হন,—এরূপ কোন প্রসঙ্গ যাতে না হয় তজ্জন্য তিনি চেষ্টা করিতেন। পণ্ডিতের মন যাহাতে অন্য কোন চিন্তায় ব্যাপৃত থাকে, এই মনে করিয়া উনি একদিন সন্ধ্যাকালে কথায়-কথায় সহজভাবে মাধবরাও কুণ্ঠের কথা পাড়িলেন এবং তাঁহার ধারণাশক্তি সম্বন্ধে ও ঐকান্তিক বিদ্যানিষ্ঠা সম্বন্ধে খুব বর্ণনা করিয়া বলিলেন যে, আমাদের সকলের মধ্যে কুণ্ঠের ধারণাশক্তি ও স্মরণশক্তি সব চেয়ে বেশী। এই কথাটা পণ্ডিতের তেমন ভাল লাগিল না, কিন্তু তবু তিনি কিছুই বলিলেন না। তখন উনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কুণ্ঠের গুণের প্রশংসা তোমার বুঝি ভাল লাগ্‌চে না? তখন পণ্ডিত একটু আবেশের সহিত বলিলেন, তাঁর এমনই কি গুণ আছে? ভাল লাগ্‌বার মতোই বা কি আছে? নূতন কিছু শিখ্‌ব মনে করলে আপনি কি শিখ্‌তে পারেন না? তখন "উনি" বলিলেন যে, "আমার এখন অনেক কাজ। আমার কথা ছেড়ে দেও। কিন্তু তুমি ফ্রেঞ্চ শিখছ কি? সত্যি এখনও যদি তোমার শেখ্‌বার ইচ্ছা থাকে, এখানে শেখাবার লোক আছে। তুমি যদি প্রস্তুত থাকো ত শেখো। তবে কি না, যিনি শেখাবেন তিনি হচ্চেন একজন মহিলা! তাঁর বাঙ্গলায় তোমাকে রোজ যেতে হবে। তিনি তোমার বাড়ী আস্‌বেন না। তিনি যেখানে থাকেন সেই পাহাড়টার নাম "কুসুমতী হিল্"। দেখ তুমি যদি শ্রম স্বীকার করতে পার ত এখনি লেগে যাও। তোমাকে আমি এই সুযোগটা দেখিয়ে দিলুম।" পণ্ডিত কিছুই বলিলেন না; কেবল একটু হাসিলেন। তার পর, খাবার সময় হইয়াছে বলিয়া আমরা সবাই খাইতে গেলাম। সকালে উঠিয়া চা-খাইবার সময় পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্যি ফ্রেঞ্চ শিখ্‌বার কিছু সুবিধা আছে?" তখন উনি বলিলেন যে, "বাঃ তুমি কি মনে করচ তোমাকে আমি ঠাট্টা করে বলেছিলুম? এই দেখ, তাঁর নাম ও ঠিকানার চিঠি আমার পকেটে আছে। কাল যদুনাথ বাবুর সঙ্গে কথা কইতে কইতে, এই কথা জান্‌লেম।" তার পর দিন হইতে পণ্ডিত সকাল ৭টা থেকে ১০টা পর্য্যন্ত সেই মহিলার বাড়ী সত্য সত্যই ফ্রেঞ্চ শিখিবার জন্য যাইতে লাগিলেন এবং "ওঁর" অনুমান অনুসারে এই নূতন আসক্তির দরুন পণ্ডিতের মনের বিষণ্ণতা অনেকটা কমিয়া গিয়াছে মনে হইল। তা ছাড়া সেই সময়কার ভাইস্‌রয় লর্ড ডফ্‌রিনের সহিত দুই চারিবার সাক্ষাতের সুযোগ হওয়ায় পণ্ডিতের মন অনেকটা ভাল মনে হইল। যাক্। সবশুদ্ধ সিমলায় চারি মাস আমাদের সবারই, বিশেষত "ওঁর" ও শঙ্কররাওর বেশ কাটিয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমরা ফিরিয়া আসিবার পর, সিমলা-প্রবাসের বর্ণনা লিখিতে আমাকে উনি বলিলেন; কিন্তু আমার লেখা আসে না, এবং যদি কিছু লিখি তার উপর লোকে টীকা-টিপ্পনী করিবে এই ভয়ে কিছুই লিখিলাম না। রাস্তায় একদিন পণ্ডিতকে দেখিতে পাইয়া উনি বলিলেন,—তুমি সিমলা প্রবাসের কথা লিখ্‌ছ, কিন্তু কুসুমতী পাহাড়ের মেম সম্বন্ধে কিছু লিখো না। এইটুকু শুধু সহজভাবে লিখো সিমলায় এক পণ্ডিতানী মেম্‌কে রাখা হয়েছিল। পণ্ডিত অমনি বলিয়া উঠিলেন, "শেখ্‌বার জন্য" বলো। এ রকম অনির্দ্দিষ্ট ভাবে কেন বল্‌চ? ওরকম করে আমার নামে অপবাদ এনো না; ওরকম বল্লে, আমাদের লোকেরা এ কথা সত্যিই মনে করবে।" সিমলায় ৪ মাস হইয়া গেলে, ফায়নান্স কমিটিকে মাদ্রাজে যাইতে হইবে বলিয়া, সেই সঙ্গে আমাদেরও যাইতে হইবে। তাই, আমরা আবার পুণায় যাত্রা করিলাম। প্রথমে সিমলায় যাইবার সময় ত্বরা থাকায়, পথের প্রসিদ্ধ তীর্থ ও সহরগুলি দেখিবার অবকাশ পাই

নাই; তাই ফিরিবার সময় প্রত্যেক তীর্থক্ষেত্র ও নগরে দুই এক দিন থাকিয়া তাহা দেখিয়া যাইব এই উদ্দেশে তিন সপ্তাহের ছুট লওয়া হইয়াছিল। সিমলা হইতে যাত্রা করিয়া হরিদ্বারে যাইবার জন্য, নীচে নামিবার সময় পথে কাল্কা ও অম্বালা এই দুই স্থানের মধ্যে খুবই রাত্রি হইল। সেই সময় রাস্তার উপরেই এক চালা-ঘর দেখা গেল; সেখানে টাঙ্গা দাঁড় করাইয়া নিকটে জলের অনুসন্ধানে দুই একজন গেল। সেই চালাঘরে গিয়া মোমবাতী জ্বালাইয়া আমরা এদিক ওদিক দেখিতেছি—সেখানে এক আবড়োখাবড়ো ঘরাঞ্চির মতো একটা বেঞ্চি ছিল। আমরা দুই জন ও পণ্ডিত সেইখানে গিয়া বসিলাম। যারা জল আনিতে গিয়াছিল তাহারা ফিরিয়া আসিলে তাহাদের অবকাশ হওয়ায় আমি জলযোগের পাত্র ও ঝুড়ি আনিবার জন্য চাকরদের আদেশ করিলাম এবং এখানকার সেখানকার নানা কথা বলিতে লাগিলাম। পণ্ডিত বলিলেন, আজ তুমি জলযোগের জন্য কি করিয়াছ! আমার বড় খিদে পেয়েছে। তা থেকে ঠাট্টা সুরু হইল; উনি বলিলেন—"এই নির্জীব পদার্থে তোমার ক্ষুধা শান্তি হবে না"। পণ্ডিত হাসিয়া বলিলেন, "এ কথা কতকটা সত্যি"; নির্জ্জীব সজীবের কথা কিছু মনে না করলেও এই বামুনে খাদ্যের চেয়ে সেই খাদ্যের স্বাদ ও রুচি বেশী তাতে আর কোন সন্দেহ নাই। যাহারা কোন কিছুর স্বাদ পায় নি আমার বিবেচনায় সেই সব লোক অতি দুর্ভাগ্য।" তাহাতে উনি চট্ করিয়া উত্তর দিলেন যে "তোমার এই সৌভাগ্য তোমারই থাক্। ঐ রকম সৌভাগ্য লাভে ইচ্ছা যেন আমাদের জন্ম জন্মান্তরেও না হয়"। এইরূপ অনেক ঠাট্টার পর পণ্ডিত বলিলেন—"এই কথা বলায় যদি এতই বিরক্ত হয়ে থাকেন তাহা হইলে আপনি যে বিলেত যাবেন বলে' মনে করচেন তার কি হবে?" 'উনি' বলিলেন—"সেখানে এমন একটি দল আছে যারা ও-পদার্থ ছোঁয়ও না। কিন্তু ও কথা কেন বল্‌চ? আমাদের দুধভাত ও দালভাতের সুবিধা করে নিয়ে তবে আমরা যাত্রা করব। যদি সময়-মতো দুধ পাওয়া না যায়, নিদেন ভাতের উপর ছোলার ডা'ল দিয়ে'নেব। আস্বাদ-বৈচিত্র্যের জন্য আমাদের অনেক জিনিসের দরকার নেই।" যখন এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছিল, জল লইয়া আমাদের লোকজন টাঙ্গার কাছে আসিল। এক্ষণে জলযোগ করিবার পূর্ব্বে জায়গাটা ঝাড়িতে হইবে বলিয়া পুনর্ব্বার বাতী জ্বালান হইল এবং ঝাড়িবার মতো কিছু আছে কিনা ভৃত্য এদিক্ ওদিক বাতী লইয়া দেখিতে লাগিল। পণ্ডিতের নজর সেই দিকে যাওয়ায় তিনি হোহো করিয়া হাসিয়া বলিলেন "ওঁহ! এ শুধু চালাঘর নয়—এটা কসায়ের দোকান"। উনি জিজ্ঞাসা করিলেন:—"এটা তোমার কেন মনে হল?" তিনি বলিলেন—"কেন মনে হল? এই দেখুন একটা আস্তো কাঠের কুঁদো।" এই কথা বলিয়াই হাসিতে লাগিলেন। এই কথা শুনিয়া "এখানে কোন জিনিস্ বার কোরো না" বলিয়া উনি একেবারে বাহিরে চলিয়া গেলেন। তার পর, রাস্তার ও-ধারে খোলা জায়গায় আমরা জলযোগ করিতে বসিলাম। শঙ্কররাও এই সুযোগ পাইয়া মধ্যে মধ্যে হাসিয়া ঠাট্টা করিয়া বলিতে লাগিলেন—"কসায়ের দোকান"—শুধু এই শব্দ মাত্র শুনেই বিদ্যুতের ধাক্কা লাগ্‌বার মতো একদম উঠে এদিকে এলেন যে—ব্যাপারটা কি?" ইত্যাদি অনেক বোল-চাল ও ঠাট্টা করিতে করিতে আমাদের জলযোগ হইল। তার পর আমরা ষ্টেশানে আসিলাম এবং গাড়ীতে যাত্রা করিয়া সকালে ৭।৮ টার সময় হরিদ্বারের ষ্টেশনে অর্থাৎ সহারানপুরে আসিয়া পৌঁছিলাম।

(ক্রমশঃ)

গ্রন্থপরিচয়।

পল্লীবাসীর প্রতি নিবেদন:—ডাক্তার—শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু প্রণীত—এই পুস্তিকাখানি প্রত্যেক পল্লীবাসীর পাঠ করা উচিত। পল্লীগ্রামে বাস করিতে হইলে কি উপায়ে নির্ম্মল বায়ু সেবন করা যায়, নির্ম্মল জল পান করা যায়, কিরূপ খাদ্যে দেহ পুষ্ট হয় ও কিরূপ ভাবে বিশ্রাম, ব্যায়াম করিলে ও কিরূপ পরিচ্ছদ ব্যবহারে স্বাস্থ্য ভাল থাকে তাহার সঙ্কেত ইহাতে করা হইয়াছে। পুস্তিকায় কতকগুলি সংক্রামক রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার সহজ উপায় নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই পুস্তিকার মূল্য যেমন "আগাগোড়া পড়িবার অঙ্গীকার" স্থির করা হইয়াছে সেইরূপ ইহার প্রচার পল্লীগ্রামে বেশী হইলে ভাল হয়। পল্লীগ্রামের প্রত্যেক মাইনর স্কুলের উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে বিতরণের জন্য কয়েক খণ্ড করিয়া প্রতিবৎসর প্রধান শিক্ষকের নিকট পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে পারিলে ভাল হয়। Some practical Hints to improve the Diatory of the Bengalis—by Chuni Lall Bose I. S. O., M. B., F. C. S. Rasayanacharya. ডাক্তার চুণিবাবু বাঙ্গালীর আহারসম্বন্ধে এই পুস্তিকাখানিতে যে সকল যুক্তিপূর্ণ উপদেশ দিয়াছেন সে গুলি তাঁহার অভিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতার ফল। এই ক্ষুদ্র

পুস্তিকাখানিতে অনেক খাদ্য দ্রব্যের আলোচনা করিয়াছেন এবং কি খাদ্যে কিরূপ পুষ্টিকর পদার্থ আছে তাহাও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে বুঝাইয়াছেন। ডাল, ঘৃত প্রভৃতি নানাবিধ খাদ্যদ্রব্যের গুণ ও রাসায়নিক তত্ত্ব এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাতে যথাসম্ভব বলা হইয়াছে। এই পুস্তিকাটী প্রত্যেক বঙ্গবাসীর পাঠ করা উচিত।

The milk supply of Calcutta its Hygienic commercial and Social Aspects —by Chuni Lall Bose I. S. O., M. B. R. C. S.—পুস্তিকাখানি প্রত্যেক গৃহস্থের বিশেষতঃ প্রত্যেক কলিকাতাবাসীর পাঠ করা উচিত। ইহাতে শৈশবাবধি মানব-জীবনে দুগ্ধের উপকারিতা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে বুঝান হইয়াছে। এই পবিত্র খাদ্য কলিকাতায় কি ভাবে সরবরাহ করা হয় ও কি ভাবে গোয়ালারা ব্যবসায়ের জন্য বিকৃত করে এবং কি উপায়ে গৃহস্থগণ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র সাহায্যে সহজে তাহা ধরিতে পারে তাহা বিশেষ রূপে বলা হইয়াছে। কি উপায়ে বিকৃত দুগ্ধ বিক্রয় না হয় এবং কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি ও গভর্ণমেণ্ট সাহায্য করিলে কি উপায়ে বাজারে পবিত্র দুগ্ধ পাওয়া যাইতে পারে তাহাও বর্ণিত হইয়াছে। উপরোক্ত দুইটী পুস্তিকা বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইলে সাধারণের অধিকতর উপকারে আসিত বলিয়া মনে হয়।

দান প্রাপ্তি।

বালীগঞ্জ ২১ নম্বর ষ্টেসন রোড্ নিবাসী—শ্রীযুক্ত নির্ম্মলকুমার রায় চৌধুরী তাঁহার মাতার আদ্য শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ২৲ টাকা এবং পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ২৲ টাকা আদি ব্রাহ্মসমাজে দান করিয়া আমাদের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

কলিকাতা ৪৯ কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট-নিবাসী—শ্রীমতী সুখদা নাগ তাঁহার স্বামী ডাক্তার আর, কে, নাগের আদ্য শ্রাদ্ধ উপলক্ষে সমাজে ৫৲ টাকা দান করিয়া আমাদের ধন্যবাদের পাত্রী হইয়াছেন। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তাঁহার স্বামীর আত্মার কল্যাণ বিধান করুন এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারকে শান্তি প্রদান করুন।

নিবেদন।

অগ্রহায়ণ মাসের পত্রিকা বাহির হইতে বিলম্ব হওয়ায় গ্রাহক অনুগ্রাহকবর্গের নিকট আমার সবিনয় নিবেদন এই যে, প্রেসম্যান ও কম্পোজিটরগণ সংক্রামক জ্বরে আক্রান্ত হওয়ায় যথা সময়ে পত্রিকা প্রকাশ করিতে পারি নাই। আশা করি তজ্জন্য ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।

নিঃ কার্য্যাধ্যক্ষ।

একমেবাদ্বিতীয়ং

ঊনবিংশ কল্প

চতুর্থ ভাগ।

পৌষ, ব্রাহ্মসম্বৎ ৮৯।

৯০৫ সংখ্যা

১৮৩০ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং প্রশান্তমদ্বিতীয়মেকমেবাদ্বিতীয়ং॥ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"

গান।

(শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত)

ওরে ও মন! আনন্দে থাক্,
আনন্দময়ের নিকেতনে,—
মায়ের কোলে ক্ষুদ্র শিশু
রহে যেমন ফুল্ল মনে।
মুক্ত এই বিশ্বভাণ্ডার
সবার তরে রাত্রিদিন,—
যার রে যাহা পাওনা আছে,
পাচ্ছে সে তা' বিরামহীন!
ওরে ও মন! প্রাপ্য যা' তোর
রয়েছে ঠিক রাজার দ্বারে,
পাবি তা' তুই চাবার আগে,—
বঞ্চিত কে করতে পারে?
কেন রে তবে ভাবিস্ বৃথা,
কাঁদিস্ কেন অকারণে,—
হেসে খেলে বেড়ারে তুই
গানের সুরে ত্রিভুবনে!

ঈশ্বরকে জানা আর না জানা।

(বালকদের জন্য)

অনেক হাজার বৎসর আগে এক ঋষি ছিলেন। তাঁর নাম ছিল তলবকার। নামটা হয়তো তোমাদের মনের মতো হয় নি। কিন্তু ঋষিদের যুগে এই রকম বেঢপ গোছের নাম অনেক দেওয়া হোত। এই তলবকার ঋষি ঈশ্বরকে জানা সম্বন্ধে বড় উচুদরের কথা বলে গেছেন—কথাটী দুটী লাইনে বলে গেছেন, কিন্তু সেই দুইটী লাইনেরই কি গভীর ভাব—সে ভাবটী ভাল করে আয়ত্ত করতে চাইলে সমস্ত জীবনেও পারা যায় কিনা সন্দেহ। ঋষির কথাটী ঋষিরই ভাষায় বলব, তারপর তার মানে বাঙ্গলা ভাষায় বলব, তাহলেই তোমাদের মনে কথাটী বেশ বসে যাবে। সেই কথাটী হচ্চে:—

নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ।
যোনস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ॥

এর মানে হচ্ছে—"আমি ঈশ্বরকে ভাল করে জেনেছি তা মনে করি নে। আমি ঈশ্বরকে যে না জানি এমনও নয়, আর জানি যে এমনও নয়। 'আমি ঈশ্বরকে যে না জানি এমনও নয়, আর জানি যে এমনও নয়' এই কথার ঠিক ভাব আমাদের মধ্যে যিনি জানেন, তিনিই তাঁকে জানেন।" কি সুন্দর কথা—কি গভীর ভাবের কথা বল দিকিন? এর ভাবটা কি বুঝতে পারলে? ভাবটা হচ্ছে এই যে, আমরা ঈশ্বরকে একেবারে পুরোরকম জানতে পারিনে—এমন কথা বলতে পারিনে যে ঈশ্বর সম্বন্ধে যা কিছু জানবার আছে, সমস্তই জেনেছি, তাঁর বিষয় জানবার বাকী কিছু নেই; কিন্তু তাই

বোলে যে তাঁর বিষয় একেবারে কিছুই জানতে পারিনে, তাও নয়।

ঈশ্বরের বিষয় ঠিকভাবে আলোচনা করলে এই রকমই মনে হয় বটে। কিন্তু যে রকম গভীর জ্ঞান হোলে এই ভাবটা মনে আসে, সকলের মনে সে জ্ঞান হয় না। তলবকার ঋষির মনে সেই গভীর জ্ঞান ফুটে উঠেছিল বোলেই তিনি ঐ কথাটা বলতে পেরেছিলেন। আর, সত্যি কথা বলতে কি, ঋষিদের সময়ে সকল ঋষিরই মনে যে এই গভীর জ্ঞানের কথা প্রকাশ পেয়েছিল, তাও নয়। তা যদি হোত তাহলে ঈশ্বরকে জানা নিয়ে ঋষিদের মধ্যে দুটো দল দেখতে পেতুম না। ঈশ্বরকে জানা যায় কিনা এই বিষয় নিয়ে এখনও যেমন দুটো দল আছে, তখনও সেই রকম দুটো দল ছিল দেখতে পাওয়া যায়। একদল বিশ্বাস করতেন যে ঈশ্বর আছেন, আত্মা আছে, পরকাল আছে এবং বিশ্বাস করতেন যে, ঈশ্বর, আত্মা প্রভৃতি জড় ইন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত বিষয় সম্বন্ধেও অনেক কথা জানা যায়। আর এক দলের মত এই ছিল যে, হাত চোখ নাক কান প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দিয়ে যখন ঈশ্বর, আত্মা প্রভৃতিকে জানা বা অনুভব করা যায় না, তখন সেই সমস্ত বিষয় যে আছে অথবা তাদের বিষয় যে কোন কিছু জানা যায়, সে কথা বিশ্বাস করা যেতে পারে না।

ঈশ্বর, আত্মা প্রভৃতি আছেন বলে যাঁরা বিশ্বাস করতেন, তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন উপনিষদ যাঁরা করেছেন সেই সব ঋষিরা, আর, মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকার ঋষিরা, যাঁরা উপনিষদের ঋষিদের মত মেনে চলতেন। যাঁরা ঈশ্বর, আত্মা প্রভৃতি আছেন বলে বিশ্বাস করতেন না, সেই দলের প্রধান নেতা ছিলেন চার্ব্বাক মুনি। এইজন্য চার্ব্বাক মুনির মতকে নাস্তিক মত (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যা অনুভব করা যায় না, এমন কিছুই ন অস্তি অর্থাৎ নাই) বলা হয়। আর, মনে হয় যে এক সময়ে দেবতাদের গুরু বৃহস্পতিও এই দলের আর একজন প্রধান লোক ছিলেন। চার্ব্বাক বৃহস্পতির শিষ্য বলে প্রসিদ্ধ—আমাদের দেশের শাস্ত্রে এই কথায় উল্লেখ আছে এবং কিম্বদন্তীতে এই কথা চলেও এসেছে। তার উপর দেখা যায় যে, চার্ব্বাক তাঁর নিজের মতের সপক্ষে জোর দেবার জন্য কয়েক জায়গায় বৃহস্পতির কথাও উঠিয়েছেন। এ সত্ত্বেও আমাদের মনের ভিতর একটা খটকা আসে যে, বৃহস্পতি দেবতাদের গুরু হয়ে সত্যিই কি নাস্তিক মত প্রচার করেছিলেন? দেবতারা যে আস্তিক বলে প্রসিদ্ধ; তাঁরা ঈশ্বর, আত্মা প্রভৃতি আছেন বোলে খুবই বিশ্বাস করতেন। তাঁরা যে একজন নাস্তিককে নিজেদের গুরু বোলে স্বীকার করবেন, তা তো সহজে মনে হয় না। আমার মনে হয় যে, হয়তো বৃহস্পতি অতিবুদ্ধির ফলে যৌবনের প্রথম বয়সে "অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী"র নেশায় নাস্তিক মতের পক্ষপাতী হয়েছিলেন এবং সেই মত খুব প্রচারও করেছিলেন। নাস্তিক মতগুলো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণ ও যুক্তির উপর বেশীর ভাগ দাঁড় করানো যায় বোলে সেগুলো সাধারণের কাছে খুব যুক্তিপূর্ণ কথা বোলে মনে হয়। এই রকম মনে হয় যে, বৃহস্পতির নাস্তিক মতগুলো এক সময়ে ভারতবর্ষের অনেক জায়গা ছেয়ে ফেলেছিল। চার্ব্বাক বোধ হয় বৃহস্পতির সেই সময়ের শিষ্য ছিলেন। পরে যখন বৃহস্পতি জ্ঞানের গভীর সাগরে ডুব দিলেন, তখন আর তিনি নাস্তিক থাকতে পারলেন না; বরঞ্চ নাস্তিকতার অসারতা বুঝতে পেরে ঘোর আস্তিক হয়ে দাঁড়ালেন। এই সময়ে বোধ হয় যে, দেবতারা বৃহস্পতির জড়বিজ্ঞানসম্বন্ধে এবং আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞানসম্বন্ধে গভীর পাণ্ডিত্য দেখে তাঁকে নিজেদের গুরু করে নিলেন।

বৃহস্পতি যখন দেবতাদের গুরু ছিলেন, তখন যে তিনি নাস্তিক ছিলেন না, তার আর একটী প্রমাণ এই যে, প্রবাদ আছে যে, দেবতাদের শত্রু অসুরদের ভোলাবার জন্যই বৃহস্পতি নাকি নাস্তিক মত প্রচার করেছিলেন। হয়তো বৃহস্পতি অসুরদের কাছে কোন কাজের প্রার্থী ছিলেন, কিন্তু অসুরেরা হয়তো তাঁকে সে কাজ দেয় নি; তাই খুব সম্ভব বৃহস্পতি অসুরদের প্রতাপে ভয় পেয়ে মুখে কিছু বলতে সাহস করেন নি, কিন্তু মনে মনে সেই রাগ পুষে রেখেছিলেন। বৃহস্পতি যে রকম বুদ্ধিমান ছিলেন, তাতে এ মনেই করতে পারিনে যে তিনি নাস্তিকতার অবশ্যম্ভাবী কুফল বুঝতে পারেন নি। তিনি জ্ঞানের পথে যখন খুব এগিয়ে গিয়েছিলেন, তখনই ঠিক বুঝেছিলেন যে

ঈশ্বর নেই, পরকাল নেই, এই রকম নাস্তিক মত ধরে চল্লে কিছুতেই ভাল হোতে পারে না, বরঞ্চ সর্ব্বনাশই হয়।

কেন যে নাস্তিকমতের ফলে ভাল না হোয়ে সর্ব্বনাশ হয়, তার অনেক কারণ আছে। তার মধ্যে এখানে একটা সহজ কারণ তোমাদের কাছে বোলে রাখব মনে করছি। ঈশ্বর নেই, আত্মা নেই, পরকাল নেই, এ রকম মতের উপর দাঁড়ালে প্রত্যেক মানুষই স্ব-স্ব-প্রধান হোয়ে উঠবে। ঈশ্বরের প্রতিনিধি বোলে আমরা বাপমাকে ভক্তি করি, তাঁদের শাসন মানি; কিন্তু যদি ঈশ্বরই না থাকেন, তবে তাঁরা কারই বা প্রতিনিধি, আর কেনই বা আমরা তাঁদের কথা মানব? সমাজেরই বা বাঁধন মানতে যাব কেন? এই রকমে কোন কিছুরই বাঁধন থাকে না, যার যা ইচ্ছে সে তাই করতে চাবে। কাজেই একটা বাঁধন থাকলে লোকের এবং সমাজের যে সংযম থাকে, সেটা থাকতে পারে না,তখন মানুষও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠে, সমাজও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠে—সমস্তই নষ্ট হবার দিকে ছুটে যায়।

এখন, বৃহস্পতি এই তত্ত্বটী ভাল কোরে বুঝতে পেরে অসুরদের কাছে ঐহিক সুখের লোভ দেখিয়ে নাস্তিক মত ভাল কোরে প্রচার করেছিলেন বোলে মনে হয়। এর ফলে অসুরদের পতনও যে হয়েছিল তাও আমাদের শাস্ত্রে লেখা আছে দেখি। এই সমস্ত আলোচনা কোরে দেখলে মনে হয় না যে বৃহস্পতি সত্যিসত্যি নাস্তিক ছিলেন। জর্ম্মানদের দৃষ্টান্ত দেখলে এ বিষয় আরও স্পষ্ট বুঝতে পারা যাবে। জর্ম্মনির সম্রাট থেকে আরম্ভ কোরে সকলেই চাইত যে, তাদের দেশের পণ্ডিতেরা এমন সব মত প্রচার করুন যে, জর্ম্মানমাত্রেই ন্যায়ত বা অন্যায়ত অন্যের দেশ জয় কোরে নিজের দেশের ধন-দৌলত বৃদ্ধি করাকে অন্যায় বোলে না মনে করে। এমন অনেক জর্ম্মান পণ্ডিত ছিলেন, যাঁদের ভিতরকার মত ছিল যে অন্যায় কোরে দেশ জয় করা অন্যায়; কিন্তু তাঁরাও জর্ম্মানসম্রাটের ভালবাসার টুকরো পাবার জন্য নিজেদের মতকে দুমড়ে-টুমড়ে যুদ্ধের সপক্ষে দাঁড় করাতে কুণ্ঠিত হন নি। তারই ফলে আজ চার বৎসর ধোরে এই এত বড় লড়াইটা বেধে জগতটাকে উচ্ছন্ন করবার যোগাড়ে ছিল। যাই হৌক, বৃহস্পতি অসুরদের ভোলাবার জন্য নাস্তিকতা প্রচার করেছিলেন, এই প্রবাদ থেকে বৃহস্পতিকে ঠিক নাস্তিক বোলে ধরা হোক আর না হোক, অন্তত এইটুকু বোঝানো হয়েছে যে নাস্তিকতা থেকে অধর্ম্মেরই প্রচার হয় এবং যারা নাস্তিকতা ও অধর্ম্মকে ধোরে থাকে, তাদের মহাবিনাশ হয়।

ভারতের খুব সৌভাগ্য যে এখানে নাস্তিক ভাবগুলো তেমন কিছু জোর করতে পারে নি। ঈশ্বরে বিশ্বাস, আত্মায় বিশ্বাস, পরকালে বিশ্বাস প্রভৃতি আস্তিক ভাবগুলো এ দেশে এমন জমাট বেঁধে আছে যে, নাস্তিক ভাবগুলো এখানে মাথা তুলতে পারে নি। চার্ব্বাক অবশ্য নাস্তিকতার একটা নতুন মত একবার খুব জোরের সঙ্গে চালাবার চেষ্টা করেছিলেন বোলে মনে হয়; তাঁর খুব একটা ক্ষমতা ছিল সন্দেহ নেই, আর সেই কারণে সেকালের ভারতবাসীরা তাঁকে "মুনি"র আসন দিয়ে তাঁকে সম্মান দেখিয়েছিলেন। কিন্তু এই ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষ থেকে চার্ব্বাকমুনির সেই সমস্ত নাস্তিকমত যে কোথায় উড়ে গেল তার ঠিক নেই—আজ তাঁর মতের সমর্থক একখানিও বই পাওয়া যায় না। কাজেই আমরাও বলতে পারিনে যে ঠিক কি রকম যুক্তিতর্কের উপর তাঁর মতটা পুরো রকমে দাঁড় করিয়েছিলেন। তবে দর্শন বিষয়ের অনেক সংস্কৃত গ্রন্থে তাঁর মতের বিষয়ে দুএকটা টুকরো কথা দেখতে পাওয়া যায়। যেমন, সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ নামে একটা সংস্কৃত বই আছে। সেই বইয়ে গ্রন্থকার, নিজের সমসময়ে যে সমস্ত দার্শনিক মত ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, সেইগুলি সংগ্রহ কোরে লিখে গেছেন। তিনি এইগুলো সংগ্রহ কোরে দেশের যে কি উপকার করেছেন, তা এক-মুখে বোলে শেষ করা যায় না। এই বইয়ে চার্ব্বাকেরও মত বিষয়ে অল্পস্বল্প কিছু লেখা আছে। কিন্তু সে এত অল্প যে, আমার মনেই হয় না যে, সেইটুকুতেই চার্বাকের দর্শন শেষ হয়েছিল। চার্বাকের মত বোলে বলা আছে যে, যেমন চুন আর হলুদ, এই দুটো জিনিসের রং আলাদা হলেও, দুটোকে মেশালে আর একটা নতুন রং হয়—চুনের রং সাদা,

হলুদের রং হলুদে, কিন্তু দুটোকে মেশালে লাল রং হয়—সেই রকম আমাদের শরীরে যে নানা রকমের অচেতন বা জড় বস্তু আছে, সেই সমস্ত জড় বস্তুর এক সঙ্গে মিশে থাকবার ফলে, লোকে যাকে চেতন আত্মা বলে, সেই চেতন আত্মা তৈরি হওয়া কিছু অসম্ভব নয়। কেবলমাত্র এই রকম দুএকটা দৃষ্টান্তের উপর যে চার্বাকের দর্শন দাঁড়িয়েছিল তা বিশ্বাসই করতে পারিনে—বিশেষত এই চার্বাকদর্শন যখন এক সময়ে ভারতের প্রাণকে বেশ একটু নাড়া দিয়েছিল বোলে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। আসল কথা এই যে, ভারতবাসীর প্রাণটা স্বভাবতই ধর্ম্মের দিকে হেলে আছে—চার্বাকদর্শন যতই যুক্তিপূর্ণ হোক না কেন, ভারতবাসীর প্রাণে সেই নাস্তিকতা-পক্ষপাতী মতগুলো কিছুতেই স্থায়ী হোতে পারল না।

সেকালের মতো একালেও নাস্তিক ও আস্তিক দুই দলের মধ্যে খুব তর্কবিতর্ক চলে দেখা যায়। এদেশে এই তর্কের খুব জোর দেখতে না পেলেও ইউরোপ অঞ্চলে এই তর্ক এখনও খুব জোরে চলছে দেখা যায়। একশো দেড়শো বৎসর আগে নাস্তিকদল যে রকম জোর কোরে ঈশ্বর, আত্মা, পরকাল প্রভৃতি বিষয় একেবারে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করতেন, এখন আর তাঁরা ঠিক সে ভাবে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেন না। এখনকার নাস্তিকদল বোলতে চান যে ঈশ্বর, আত্মা, পরকাল প্রভৃতি থাকলেও আমরা কেউ তা জানতে পারি নে, কেন না আমাদের বর্ত্তমান ইন্দ্রিয় নিয়ে ইন্দ্রিয়ের অতীত ঐ সমস্ত বিষয় জানা অসম্ভব। যে সময়ে ইউরোপে বিজ্ঞানের উন্নতির সূত্রপাত হয়েছিল, সেই সময়েই বিজ্ঞানের পণ্ডিতেরা প্রধানত অহঙ্কারে ফুলে উঠে ধরাকে সরা জ্ঞান করতে লাগলেন এবং আস্তিকদের মতগুলোকে একেবারে উপহাসের বিষয় বোলে ঠিক করলেন। কিন্তু ক্রমে যতই বিজ্ঞানের সাগরে পণ্ডিতেরা ডুবতে লাগলেন, ততই তাঁরা অসীমের একটা মহান বিরাট ভাব অনুভব করতে লাগলেন এবং ততই তাঁরা বুঝতে লাগলেন যে, অসীম ভূমাপুরুষের ভাবটা নেহাৎ উপহাস করবার জিনিস নয়,—তবে সেটা আমরা মনের ভিতর আনতে পারি নে, কারণ ইন্দ্রিয়ের অতীত সে সমস্ত বিষয় জানবার ক্ষমতাই আমাদের নেই। তাঁরা অবশ্য ভুলে গিয়েছিলেন যে, যখনই তাঁরা বলেন যে ইন্দ্রিয়ের অতীত সে সমস্ত বিষয় জানবার ক্ষমতাই তাঁদের নেই, তখনই একরকম তাঁদের মেনে নেওয়া হচ্ছে যে, ইন্দ্রিয়ের অতীত বিষয়ও জানবার ক্ষমতা তাঁদের আছে, তা নইলে তাঁরা ইন্দ্রিয়ের গোচর আর ইন্দ্রিয়ের অতীত এই দুই বিষয়ের তফাৎ বুঝতেও পারতেন না, আর সে তফাতের কথা প্রচারও করতে পারতেন না। আজকাল পুরো নাস্তিক বোলে কেউই নিজেকে বোলতে চায় না; কিন্তু নাস্তিকতার পক্ষপাতী পণ্ডিত ঐ কথাই বোলতে চান যে মানুষ ঈশ্বর প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের অতীত বিষয় জানতে পারে না।

এই মতকে সংক্ষেপে অজ্ঞেয়বাদ বলা যায়, অর্থাৎ যে "বাদ" বা মতে ঈশ্বর প্রভৃতি "জ্ঞেয় নয়" অর্থাৎ জানা যায় না। যাঁরা এই মত স্বীকার করেন বা প্রচার করেন, তাঁদের সাধারণত "অজ্ঞেয়বাদী" বলা যায়। ভারতবর্ষেও বর্ত্তমানে ইংরাজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এই মতের ঢেউ এসে লেগেছে। যাঁরা নিজেকে ইউরোপের বিজ্ঞানে দর্শনে পণ্ডিত বোলে জানাতে চান, তাঁদের অধিকাংশই সকল সময়ে মনেতে বিশ্বাস না করলেও অন্তত মুখে ঐ মতের কথাগুলো জাহির করতে চান। ভারতবর্ষে এই সব লোকের সংখ্যা খুব অল্প হোলেও তাঁরা ফেলনা লোক নন। তাঁদের অনেকে ধনে মানে বড়লোক, কাজেই তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেকে তাঁদের নকল কোরে অজ্ঞেয়বাদ প্রচার করতে এগোন। তবে এটা আমরা সাহস কোরে বোলতে পারি যে ভারতবর্ষে নাস্তিকভাবের মত কিছুতেই বেশীদূর শিকড় নামাতে পারবে না। কিন্তু এই ভেবে আমাদেরও চুপ কোরে থাকলে চলবে না—ঐ মতের দোষগুণ ভাল কোরে বিচার কোরে আমাদের নিজেদেরও জানতে হবে বুঝতে হবে যে তাঁদের মতের কোথায় ভুল, আর কোথায় ঠিক; এবং সেইমতো লোকেদেরও জানাতে হবে, বোঝাতে হবে।

আমরা বলি যে, ঈশ্বর আছেন, আত্মা আছে, পরকাল আছে। কেবল তাই নয়, আমরা বলি যে ঈশ্বর, আত্মা, পরকাল প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের

অতীত বিষয় হোলেও আমাদের ভিতরে এমন একটা শক্তি ও ক্ষমতা আছে, যার বলে আমরা ঐ সমস্ত বিষয় জানতেও পারি। "ঐ সব জানতে পারি" যে মত বলে, সেই মতকে "অধ্যাত্ম-ধর্ম্ম" বলা যায় অর্থাৎ আত্মার উপর এই ধর্ম্মমত দাঁড়িয়ে আছে এবং যাঁরা এই মত স্বীকার করেন ও প্রচার করেন, তাঁদের সাধারণত অধ্যাত্মবাদী বলা যায়। এই অধ্যাত্মবাদীদেরই একজন—তলবকার ঋষি—বলে গেছেন যে আমরা ঈশ্বরকে যে সম্পূর্ণ জানি তা নয়, আর একেবারে যে জানি নে তা-ও নয়। তাঁর সঙ্গে একহৃদয়ে আমরাও ঐ কথাই বলি যে ঈশ্বরকে সম্পূর্ণ রকমে আমরা জানতে পারিনে বটে, কিন্তু একেবারেও যে জানতে পারিনে তা-ও নয়। যদি তাঁকে একেবারেই জানতে না পারতুম, তবে যুগযুগান্তর ধোরে তাঁকে জানবার একটা প্রবল ইচ্ছে আসতেই পারত না। আজ এই পর্য্যন্ত। এ সম্বন্ধে তোমাদের কাছে আরও অনেক বিষয় বলবার আছে, সেগুলো ক্রমে ক্রমে বলবার চেষ্টা করব।

দাক্ষিণাত্যে বাঙ্গালী উপনিবেশ।

(শ্রীকালীপ্রসন্ন বিশ্বাস)

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা গৌড়-সারস্বত-ব্রাহ্মণদিগের ভাষাগত শব্দের সহিত বাংলা শব্দের সামঞ্জস্য দেখাইব। দক্ষিণদেশীয় সারস্বত সম্প্রদায়ের ভাষাতত্ত্ব আলোচনা করিলে দেখা যায় যে ইহাদিগের মধ্যে এক সম্প্রদায় খাঁটি বাংলা (মুখ্য গৌড়) দেশ হইতে আসিয়াছিল। ইহারা "মুখ্য গৌড় সারস্বত" নামে পরিচিত। অপর এক সম্প্রদায় কান্যকুব্জ দেশ হইতে আসিয়াছিল। কেহ কেহ বলেন যে পঞ্চগৌড়ের প্রত্যেক স্থান হইতেই এক এক সম্প্রদায় আসিয়াছিল। যাহারা কান্যকুব্জ হইতে আসিয়াছিল, তাহাদের ভাষায় তদ্দেশপ্রচলিত অনেক শব্দ পাওয়া যায়। এবং তাহাদিগের আকার-প্রকারও তদ্দেশীয় লোকের অনুরূপ। "মুখ্য গৌড় সারস্বত"দিগের ভাষাই বাংলা ভাষার অনুরূপ। ইহাই আমাদের বর্ত্তমান আলোচ্য বিষয়।

বলা বাহুল্য যে বাংলা ভাষার ন্যায় মুখ্য-গৌড় সারস্বতীয়-ভাষায় অনেক সংস্কৃত শব্দ প্রচলিত আছে। এতদ্ভিন্ন এতদ্দেশীয় দ্রাবিড় ভাষারও কতকগুলি শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যে সকল শব্দ মুখ্য গৌড় সারস্বত এবং বাংলা উভয় ভাষাতেই অবিকৃত ভাবে ব্যবহৃত হয় নিম্নে তাহার একটি তালিকা প্রদত্ত হইল। প্রধানতঃ চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনের শব্দ-সূচী অবলম্বন করিয়া আমরা এই তালিকাটি প্রস্তুত করিয়াছি। তালিকার প্রথমে অর্থাৎ বাম দিকে মুখ্য-গৌড়-সারস্বতীয় শব্দ এবং তৎপরে বাংলা শব্দ প্রদর্শিত হইয়াছে। উচ্চারণ সম্বন্ধে কিছু বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায়। যথা অন্তঃস্থ "ব"কার অনেক স্থলে "ও" এবং "ব" এর মধ্যবর্ত্তী স্বরে এবং "ল" কার কোন কোন স্থানে "ল" এবং রএর মধ্যবর্ত্তী স্বরে উচ্চারিত হইয়া থাকে। আবার অনেক স্থলে, অন্য ভাষায় অননুরূপ, বাংলা ভাষায় যেমন "অ"কার, "ও" কারের ন্যায়; অন্তস্থ "ব", বর্গীয় "ব"র ন্যায়; এবং "ষ্ঠ", "ষ্ট" এর ন্যায় উচ্চারিত হয়, ইহাদিগের ভাষায়ও তদ্রূপ দৃষ্ট হয়। যথা :—"সরূপ" উচ্চারণ "সোরূপ", "অপূর্ব্ব" উচ্চারণ "অপরুব", "বন" উচ্চারণ "বন" "কৃষ্ণ" উচ্চারণ "কৃষ্ট" ইত্যাদি। "ক্ষ" উভয় ভাষারই "ক্-থ" এইরূপ উচ্চারিত হয়। যথা "ক্ষণ" উচ্চারণ "ক্-থ ণ"।

অখণ্ড	অখণ্ড	অগুণ	অগুণ (দোষ)
অতি	অতি	অথবা	অথবা
অনুমতি	অনুমতি	অনেক	অনেক
অন্তর	অন্তর	অপমান	অপমান
অমূল্য	অমূল্য	অবশ্য	অবশ্য
অবিচার	অবিচার	অশেষ	অশেষ
আই, আয়ী	আই, মা	আকার	আকার
আকাশ	আকাশ	আগো, গো	আগো, ওগো (সম্বোধনে)
আজি, আজু, আজুনী	আজি	আদি	আদি
আঁধার	আঁধার	আরতি	আরতি
আরসী	আরসি	আস্বড়া	আস্বড়া(আমড়া)
উঠ	উঠ	উত্তম, বরা	উত্তম, বর
উলট	উলট	উদ্দেশ	উদ্দেশ
উপবাস, উপাস	উপবাস, উপোষ	একলা, একলাটি	একলা, একলাটি

এলায়চি	এলায়চি	কঠোর	কঠোর
কণ্ঠ	কণ্ঠ	কান	কান
কথা	কথা (কথকতা)	কপট	কপট
কপাল	কপাল	কমল	কমল
কর	কর (করা)	করপুর	কর্পূর
করুণা	করুণা	করসি	করসি
কলস	কলস	কাঁকর	কাঁকর
কাজল	কাজল	কাড়ি	কাড়ি (কাড়িয়া)
কাপড় / কাপাড় / বস্ত্র	কাপড়, বস্ত্র		
কিরণ	কিরণ	কুম্ভার	কুম্ভার, কুমার,
কুল	কুল	কোকিল	কোকিল
কোপ	কোপ	কোমল	কোমল
খাইলি	খাইলি	খাজা	খাজ (মিষ্টান্ন)
খাসা	খাসা	খিট খিট	খিট খিট
খিড়কি	খিড়কি	খেল	খেলা
গরজ	গরজ	গর্ম্	গর্ম্ (স্তব্ধতা),
গরু	গরু	গলা	গলা
গাই	গাই	গাঁব / গাঁম	গাঁ, গ্রাম,
গুণ	গুণ	গেল / গেলা	গেলা
গোঠ	গোঠ (গোষ্ঠ)	গোয়ালা	গোয়ালা
গোয়ালিনী	গোয়ালিনী	গোরাথা / রাথোবাল	রাথাল
গোবর	গোবর	ঘর	ঘর
চক্র	চক্র	অঞ্চল	অঞ্চল
চড়	চড় (উঠ)	চরিত্র	চরিত্র
চল্	চল	চিও	চিও
চিন্ত	চিন্ত	চূর	চূর
ছত্রি	ছত্র (ছাতা)	ছাতি	ছাতি (সাহস)
জগ, জগত	জগ, জগৎ	জঞ্জাল	জঞ্জাল
জটা	জটা	জন	জন
জননী	জননী	জন্ত্	জন্ত
জন্ম	জন্ম	জর	জর
জরদ	জরদ	জাউ	জাউ (যাও)
জাতি	জাতি	জাম্বল	জাম্ব, (জাম)
জাল	জাল	জীব / জীবন	জীব / জীবন
জুতা	জুতা	ঝগড়	ঝগড়
টাটকা	টাটকা	ঢাকণ	ঢাকণ
ঢেঁকুর	ঢেঁকুর	তণ্ডুল	তণ্ডুল
তক	তক (পর্য্যন্ত)		
তপ	তপ	ত্রাস	ত্রাস
তিথি	তিথি	তিল	তিল
তিলক	তিলক	তীর্থ	তীর্থ
তুহ্কি	তুহ্কি, তুমি	তু	তু, তুই
তেকারণ	তেকারণ (সেকারণ)		
তেজসি	তেজসি	তেল	তেল
তেলী	তেলী (তৈলকার)		

স্থল	স্থল	দধি / দহি	দাধ / দই
দন্ত, দাঁত, দশন	দন্ত / দাঁত / দশন	দরকার	দরকার
দরদ	দরদ	দস্তর	দস্তর
দহন	দহন	দান	দান
দাস	দাস	দাসী	দাসী
দিন	দিন	দিবস	দিবস
দীর্ঘ	দীর্ঘ	দুখ	দুখ
দুষ্ট	দুষ্ট	দুধ	দুধ
দেরে	দেরে (দাওরে).		
দেবা	দেব, (দেবতা)		
দৈব	দৈব	দোষ	দোষ
ধন	ধন	ধারা	ধারা
ধ্বনি	ধ্বনি	ধৈর্য্য	ধৈর্য্য
নবীন	নবীন	নদী / নয়	নদী
নাব / নৌকা	নাব / নায়, নৌকা,	নাভি	নাভি
নাক	নাক	না, নাহি	না, নাই
নিদ, নিদ্রা / ঝোপ	নিদ, নিদ্রা / ঝোপ	নিষ্ঠুর	নিষ্ঠুর
নিন্দা	নিন্দা	নির্দ্দয়	নির্দ্দয়
নিবারণ	নিবারণ	নিশ্চল	নিশ্চল
নিষেধ	নিষেধ	নীতি	নীতি
পতি	পতি(অধিপতি)	পাঅ,	পাঅ, পা
পাতাল	পাতাল	পাথর	পাথর
পাপ	পাপ	পামর	পামর
পিতরে	পিতরে	পুতা / পুত্	পুতা, পুত্র
পুতলী	পুতলী	পুণ্য	পুণ্য
পুরে	পুরে, পূর্ণ	পুরুষ	পুরুষ
পূজা	পূজা	প্রিয়	প্রিয়
পোটলী	পোটলী, পুটলী		
ফল	ফল	ফলা	ফুল
বচন	বচন	বদন	বদন
বধ	বধ	বন	বন
বদ্ধ	বদ্ধ	বর্ষ	বর্ষ
বসন্ত	বসন্ত	বইস্	বইস
বহু	বহু	বায়ু / হাওয়া	বায়ু, / হাওয়া
বাছা	বাছা (বৎস)	বাজ	বাজ
বাট	বাট	বাপা	বাপা, বাপ
বাঁধ	বাঁধ	বামন	বামন
বার	বার	বাঁশ	বাঁশ
বাস	বাস (গন্ধ)	বাসি	বাসি
বাহু / হাত / হস্ত	বাহু / হাত / হস্ত	বিকার	বিকার
বিছানা	বিছান	বিনাশ	বিনাশ
বিরহ	বিরহ	বিরোধ	বিরোধ
বিলাস	বিলাস	বিষ	বিষ

বীর	বীর	বুদ্ধি	বুদ্ধি
বুধবন্তী	বুধবন্তী, বুদ্ধিবন্তী,		
ভক্তি	ভক্তি	ভয়	ভয়
ভাউ	ভাউ	ভাস্ত	ভাস্ত (ভাঁড়)
ভারি	ভারি	ভিথারী	ভিথারী
ভিতরি	ভিতরি	ভীতি	ভীতি
ভুজ	ভুজ	ভুবন	ভুবন
ভূমি	ভূমি	ভ্রমর	ভ্রমর
মঙ্গল	মঙ্গল	মন	মন
মরণ	মরণ	মধু, মৌ, মধু,	মধু
মলিন	মলিন	মাকড়	মাকড় (মর্কট)
মাগ	মাগ (প্রার্থনা কর)		
মুখ	মুখ	মূল	মূল
মেঘ	মেঘ	যত্ন	যত্ন
যাত্রা	যাত্রা (রথযাত্রা শোভাযাত্রা)		
যে কারণ	যে কারণ	যোগ	যোগ
যোড়	যোড়	বড়	বড় (কাঁদা)
রাখ	রাখ	রাজ, রাজ্য	রাজ, রাজ্য
রে	রে, সম্বোধনে,	রাণী	রাণী
রাতি	রাতি	রান্ধনা	রান্ধনী (উনান)
রন্ধন	রন্ধন	রুচি	রুচি
রূপ	রূপ	রোষ	রোষ
রোষ	রোষ	লবঙ্গ	লবঙ্গ
লাঙ্গল	লাঙ্গল	লাজ	লাজ
লোভ	লোভ	লৌহ / লৌহখণ্ড	লৌহ
শরীর	শরীর	শীঘ্র	শীঘ্র
শুদ্ধ	শুদ্ধ	শোভা	শোভা
সকল	সকল	স্বর্গ	স্বর্গ
সজ্জন	সজ্জন	সত্য	সত্য
স্বপন	স্বপন, স্বপ্ন,	সভা	সভা
সমান	সমান	সম্মান	সম্মান
সমুখ	সমুখ (সমুখ)	সম্বন্ধ	সম্বন্ধ
সব / সর্ব্ব	সব, সর্ব্ব	সাঁকো	সাঁকো
স্বামী	স্বামী	সেবক	সেবক
সেবক	সেবক	হাস	হাস (হাস্য)
হিত	হিত	ক্ষেত্র	ক্ষেত্র

অতঃপর আর একটি তালিকা দিতেছি। ইহাতে যে সকল বাংলা শব্দ গৌড়-সারস্বতীয় ভাষায় অপভ্রংশ রূপে বর্ত্তমান আছে তাহা প্রদর্শিত হইল।

অম্মা	মা	অসি চি	অই সি (ঈদৃশী)
অসোলো	আছিল	আম্লনী	আলুনী
উদাক্	উদক	উপ্জল	উপজিল
উম্ম	চুম, (চুম্ব)	উম্ব	পুর (ভরপুর)
একলেচি	একলা	একবেলি	একবার, একবেলা,
কাইন	কেহ নাই	কাড্ডি	কাড়ি, কাঠি
কালী	কাহিনী	কাপ	কাট
কাছোটা	কাছা	কীড়	কীড়া (পোকা)
কেলে	কলা	কোন	কোন
খবরি	খবর	গয়ের	গহের, (গহ্বর)
ঘরণ / ঘরণী	ঘরণী, (গৃহিণী)	ঘাঘর	ঘাঘরা (ঘড়া)
চোরি	চুরি	কোলী	কাঁচোলী, কাঁচুলী,
ছে, আছে	আছে	ঠাঙ	ঠাঙ্গা
তড়	তট	তড়ে	তড়া (তড়াগ)
থাপড়	থাপড়, থাপ্পড়,	ধুর	ধুর, দূর
নন্তর	অনন্তর	নাতু	নাতি
নাত্তি	নাতিনী	নাব	নাম
পট	পেট	পাট	পীঠ
পিকলো	পাক্লো	পুরেৎ	পুরুত (পুরোহিত)
পোথী	পুথী	বইট	বেহেট
বহরি	উপরি	বর (উঃ ওর)	উপর
বড্ডি	বাড়ি, ছড়ি	বলৈ	বোলই
বাঘু, বাগ	বাঘ	বাড়া	বাড়ী
বেল	বেলা	ভ্যাট	ভেট (দেখা)
মকা	মোকে (আমাকে)	মচ্ছ	মৎস, মাছ
মত্তা	মরতা	মড়ে	মড়া
মাতে / মস্তক	মাথা / মস্তক	মাউলানী / মামী	মাউলী, মাতুলানী মামী
মাচো	মাচা	মাঝা	মাঝু(আমার)
মারগ	মহার্ঘ, মাগ্গি	মৌ	মৌনের ম,
য়ে	আয়	য়ো	য়োল
রচলে	রচিল	লগ্গি	লাগি (লাগালাগি)
সান্	ছানা (ছোট বাচ্ছা)	সিসি	ছিছি
হলক্	হল্লাক্	হেরদে	হেরদয়

রামায়ণের ভ্রাতৃধর্ম্ম।

(কথক—শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ন)

লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তি যতই বেশী হউক্ না কেন, তাহাকে আদর্শ ভ্রাতৃভক্ত বলিতে পারা যায় না। কোনো গুণের আদর্শত্ব কেবল তদ্‌গুণের অসম্ভব আতিশয্য লইয়াই নহে; নির্দ্দোষ অর্থাৎ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দররূপে তদ্‌গুণের বিকাশেই আদর্শত্ব। লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তি পিতার প্রতি সাময়িক ক্রোধের দ্বারা কলুষিত হইয়াছিল। গুরুজনের ইতরবিশেষ আছে, সুতরাং তাঁহাদের প্রতি ভক্তিরও স্তরের তারতম্য আছে। জ্যেষ্ঠ অপেক্ষা পিতা অবশ্যই অধিক পূজনীয়। ভ্রাতা এমন কি মাতা অপেক্ষাও পিতা পূজনীয় কোনো কোনো শাস্ত্রকারদিগের এইরূপ অভিমত। লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের পক্ষগ্রহণ করিয়া কৈকেয়ীকে এবং দশরথের উদ্দেশে যে কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা কোনো ক্রমেই সমীচীন নহে। ইহা যে কেবল ন্যায়পরতার জন্যই তাহা নহে, রামচন্দ্রের প্রতি লক্ষ্মণের অতিরিক্ত শ্রদ্ধা ও ভালবাসার

জন্যই। শ্রদ্ধা ও ভালবাসা বৃত্তি দুইটী ভালো বটে; কিন্তু তাহাদের বশে পক্ষপাতিত্ব কখনই যুক্তিযুক্ত নহে।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অপেক্ষা পিতা বড় আবার পিতা অপেক্ষা ধর্ম্ম বড়। ধর্ম্মের ভিত্তি ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। লক্ষ্মণ সকল ছাড়িয়া ন্যায়ের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন।

ইহাতে দুইটী সংশয় উপস্থিত হইতে পারে। হয় দশরথ অন্যায় করিয়াছিলেন, না হয় রামচন্দ্র অন্যায় করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণ যদি ন্যায়ের পক্ষাবলম্বন করিয়াই থাকেন, তবে দোষটী কাহার হইবে? অবশ্যই দশরথের। এবং সকল ছাড়িয়া ন্যায়ের পক্ষে দণ্ডায়মান হওয়াই কর্ত্তব্য। নতুবা অপরাধ হয়। তাহা হইলে রামচন্দ্র দশরথের বিরুদ্ধাচরণ না করিয়া অন্যায় করিয়াছেন বলিতে হইবে। তাঁহার বনে যাওয়াটা নিতান্তই বিচারবিমূঢ়তা হইয়া দাঁড়াইবে। এমন কি মাতা কৌশল্যা এবং কত ঋষিগণ পর্য্যন্ত তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে আদেশ করিলেন। কিন্তু রামচন্দ্র কাহারো কথা শুনিলেন না। তাহা বালী কূটতম নাস্তিক্যবাদ দ্বারাও রামচন্দ্রকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার কথায় কর্ণপাত করেন নাই। রামচন্দ্র যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ করিয়াছেন, লক্ষ্মণ তাহা মানিলেন না কেন? ইহাতে বুঝিতে পারি লক্ষ্মণ একটু ভাবপ্রবণচিত্ত। অন্যান্য বিষয়ে কবি লক্ষ্মণের মহত্ত্ব অনেক স্থলে দেখাইয়াছেন, কিন্তু তিনি আদর্শ ভ্রাতৃভক্ত নহেন।

অতঃপর ভরতের চরিত্র আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। কোনো কোনো সমালোচক ভরতকে রামচন্দ্র অপেক্ষা অনেক বড় করিয়া তুলিয়াছেন। ভরত ত্যাগী ও ভ্রাতৃভক্ত বটে কিন্তু রামচরিত্র অপেক্ষা তাঁহার চরিত্র কোনো ক্রমেই শ্রেষ্ঠ নহে। কারণ রামচরিত্রের ঘটনা-পরম্পরায় ঘাতপ্রতিঘাত অনেক বেশী। বহু বিচিত্রতার ভিতর দিয়া রামচরিত্র অভিব্যক্ত হইয়াছে। তবে কিনা লক্ষ্মণের অপেক্ষা ভরত-চরিত্র মহত্তর সন্দেহ নাই। কিন্তু কৈকেয়ীর প্রতি কটূক্তিগুলি ভরতের পক্ষে ঠিক কি না সন্দেহ। কবি ভরতের কৈকেয়ীর প্রতি কটূক্তি, লক্ষ্মণের দশরথের প্রতি দুর্ব্বাক্য এই সকল দ্বারাই রামচরিতের অনন্যসাধারণতা ব্যক্ত করিয়াছেন। এটী অদ্ভুত কৌশল। ইহা দ্বারা কবি দেখাইয়াছেন যে শ্রীরাম চন্দ্রের আকর্ষণী শক্তি এত বেশী, যে তাঁহার প্রতি বাণীতে লোক আত্মহারা হইয়া যায়। ভরতের ক্রোধ দ্বারা তিনি ভরতকেই বড় বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহেন নাই।

অতঃপর আমরা সুগ্রীব ও বিভীষণের চরিত্র সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। উভয় ব্যক্তিই অনার্য্য-জাতীয়; উভয় ব্যক্তিই বিনাপরাধে জ্যেষ্ঠভ্রাতা কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত। উভয়ই পরপক্ষ গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব ভ্রাতার নিধন সাধন করাইলেন। সুগ্রীবে আর বিভীষণে কোনো বিভিন্নতা নাই। উভয়েরই ভ্রাতৃ-বিদ্বেষ স্বার্থমূলক। উভয় ব্যক্তিই প্রকৃত পক্ষেই তাঁহাদের জ্যেষ্ঠভ্রাতা কর্ত্তৃক, উৎপীড়িত হইয়াছিলেন। বিভীষণের অপেক্ষা সুগ্রীবই তাঁহার ভ্রাতা কর্ত্তৃক প্রপীড়িত হইয়াছিলেন অনেক বেশী।

ভ্রাতৃবিদ্বেষে কিষ্কিন্ধ্যার অধঃপতন; ভ্রাতৃ-বিদ্বেষে লঙ্কার অধঃপতন। বিভীষণ রামচন্দ্রকে সাহায্য না করিলে, লঙ্কা জয় করিতে রামচন্দ্রের আরো অনেক বেগ পাইতে হইত। এই জন্যই জাতীয়সমাজের যৌথপরিবারকে শিক্ষাদানই যেন কবির অনেকটা উদ্দেশ্য। তাই দেখাইলেন এক-দিকে ভ্রাতৃস্নেহে অমৃতময় ফল উৎপাদন করিয়াছে, অপর দিকে ভ্রাতৃবিদ্বেষের বিষময় পরিণাম চিত্রিত করিয়া মানবজাতিকে শিক্ষা দান করিলেন।

কেহ বলিবেন বিভীষণের কোনো স্বার্থ ছিল না, তিনি ন্যায়ের লক্ষমাত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা নহে। শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বনে বাস করিতে বলিলেন তাহাতে যুধিষ্ঠির আপত্তি করিয়াছিলেন। কিন্তু বিভীষণ কোনও এরূপ আপত্তি করেন নাই।

বারাণসী কথা।

(অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়)

'এবার পূজোর ছুটীতে কোথায় যাচ্ছ?'

'কাশী।'

'আমি ভেবেছিলুম তুমি একটু বিশ্রামের জন্য পুরী কি ওয়াল্‌টেয়ার যাবে, না একেবারে বলে বস্‌লে কাশী

সেখানেত ভাই বুড়ো বয়সে মানুষ যায়। সেখানে তোমাদের 'প্রত্নতত্ত্বের' কিছু আছে কি?'

'ভাই ঠাট্টা করো না।' দেশের প্রাচীন অবস্থা, রীতিনীতি, পুরাতন মস্‌জিদ মন্দির, স্থাপত্য-শিল্প প্রভৃতি জানা কিছু অন্যায় নয়। এ সব জান্‌তে পারলে হৃদয়ে যে আনন্দ আসে তার তুলনা কোথায়?' একদিন ভাদ্রের সন্ধ্যাবেলা, হর্ম্মু নদীর পুলের নিকট দাঁড়াইয়া একজন কেরাণী বন্ধুর সহিত আমার পূর্ব্বোক্ত প্রকার কথাবার্ত্তা হইতেছিল। বন্ধু যাহাই বলুন, পূজার সপ্তাহে কাশী ও গয়া ঘুরিয়া আসিব স্থির করিলাম।

কাশীবাসী আমার জনৈক আত্মীয়কে পত্র লিখিয়া সব ঠিক করিয়া লইলাম। বিগত ১৭ই আশ্বিন বেলা ২ টার সময় আফিস গৃহ হইতে বাসায় চলিয়া আসি। পথে জনৈক নবাগত আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করিতে যাই। তখন চারিদিক অন্ধকার করিয়া মুষলধারে বৃষ্টি আসিল। আমি দৌড়িয়া বাসায় আসিয়া দেখি, আমার যাত্রার সবই আয়োজন ঠিক করিয়া রাখা হইয়াছে। ষ্টেশনে আসিয়া দেখি শত শত লোক—কেহবা বাংলা দেশে, কেহবা উড়িষ্যা, কেহবা বিহারে চলিয়াছে। টিকিটঘরে ভয়ানক ভিড়, অনেক চেষ্টা করিয়াও টিকিট খরিদ করিতে পারা গেল না। নিরুপায় হইয়া রেলের একটি কর্ম্মচারীকে একখানি টিকিটের জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলাম। তিনি প্রায় ২০ মিনিট চেষ্টার পর আমাকে মোগলসরাই পর্য্যন্ত একখানা টিকিট আনিয়া দিলেন। আমি হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম ইণ্টার ক্লাসের গাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দেখি গাড়ীতে অত্যন্ত ভিড়, সুতরাং উঠিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। আমি যে গাড়ীতে উঠিলাম, তাহাতে কয়েকটি বেহারী ও উড়িয়া কেরাণী ছিলেন। আমি ক্ষুদ্র একখানি বেঞ্চিতে অতি কষ্টে একটু স্থান অধিকার করিয়া বসিলাম। একটি বিহারী পুলিশের লোকও সেই গাড়ীতে যাইতেছিলেন। চারিটা বাজিয়া গেল, তখনও বহুলোক টিকিট খরিদ করিতেছিলেন। গাড়ী আর ছাড়ে না। ৪-১০ মিনিটের সময় পাঁচ মিনিটের ঘণ্টা ঢং ঢং বাজিয়া উঠিল। ৪-১৫ মিনিটের সময় দেখি গাড়ী খানি সত্যসত্যই রাঁচি ষ্টেশন ছাড়িয়া চলিল।

আমি জানালার ফাঁক দিয়া মুখ বাহির করিয়া গাড়ীর উভয় পার্শ্বের দৃশ্য দেখিতে দেখিতে চলিলাম। গ্রামের পর গ্রাম, নদীর পর নদী, মাঠের পর মাঠ, এমনি করিয়া ছোটনাগপুরের কঠোর প্রকৃতিকে পশ্চাতে ফেলিয়া আমাদের গাড়ীখানি সন্ধ্যার সময় ঝালদায় আসিয়া পা দিল। ঝালদা মানভূমের অন্তর্গত। এস্থান গালা-ব্যবসায়ের জন্য বিখ্যাত। এখানে ভাল বাঁশের লাঠি ও লোহার জিনিস প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এই লাঠি কিনিবার জন্য যাত্রীগণ ঝুঁকিয়া পড়িলেন। এখানে গাড়ীর এঞ্জিন জল লইয়া পুনরায় ছুটিয়া চলিল। গাড়ীতে দুইটি অপরিচিত বিহারীর ভাব-ভঙ্গী ও 'উৎকট' আলাপে আমার চক্ষু সেই দিকে পড়িল। তাঁহাদের মুখে কেবলি বাঙ্গালীদের সমালোচনা—বাঙ্গালী কেন বাংলা মুলুক ছাড়িয়া এখানে আসিয়াছে, এ দেশ ত তাহাদের নয়, এ দেশ কেবলি বেহারীদের জন্য। আমি ইহাঁদের তর্কবিতর্ক ও সমালোচনা শুনিতে লাগিলাম। উড়িয়া যাত্রী কয়টি কিন্তু এসব আলোচনার ভিতর ছিলেন না। তাঁহারা আমারই মত নীরবে দূরে বসিয়া বিহারীদের কাণ্ডটা দেখিতেছিলেন। উহাঁদের মধ্যে একজন বিলাতপ্রত্যাগত উড়িয়া ছিলেন। ইনি খুব শিষ্ট ও বিনয়ী। পরিধানে ধুতি চাদর, গায়ে একটি ফ্লানেলের জামা। ইহাঁর কোমল স্বভাবটি দেখিয়া মনে হইল ইনি হ্যাটকোটকে বিলাতী সভ্যতার শ্রেষ্ঠ সম্পৎ বলিয়া গ্রহণ করেন নাই; য়ুরোপের জ্ঞান-চর্চ্চাকেই ইনি সাদরে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হইল। উড়িষ্যা সমাজে বিলাতপ্রত্যাগতকে গ্রহণ করা হয় কিনা জিজ্ঞাসা করায় একজন যুবক বলিলেন,—'হাঁ, আমরা এ সব বিষয়ে বাংলাকেই অনুকরণ করি, বাংলাই আমাদের আদর্শ ছিল'। সামাজিক রীতিনীতিসম্বন্ধেও দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। উড়িষ্যাদের নিকট হইতে সরলতা-মাখান সদুত্তর পাইয়া মুগ্ধ হইলাম। এদিকে কিছুক্ষণ পর দেখি রাত্রি ৮টার সময় গাড়ী পুরুলিয়া আসিয়া পৌছিল।* পুরুলিয়ার কুষ্ঠাশ্রম পৃথিবীর মধ্যে যতগুলি কুষ্ঠাশ্রম আছে তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। রেভারেণ্ড আক্‌থ্যান ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ইহার প্রতিষ্ঠাকার্য্য আরম্ভ করেন ও তিনি দেশে চলিয়া গেলে রেভারেণ্ড হান্‌সে কার্য্য সম্পূর্ণ করেন। এখানে রোগী, কর্ম্মচারী প্রভৃতির ঘরবাড়ী লইয়া সর্ব্বসমেত ৬৫টী গৃহ আছে। এই আশ্রমটি প্রতিষ্ঠা করিতে লক্ষাধিক টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

এ ষ্টেশনে গাড়ী বদলাইতে হয়, আমরা সকলেই এখানে অবতরণ করিলাম। ষ্টেশনঘরের ভিতরের ফটক পার হইয়া অন্য প্লাটফরমে গিয়া গাড়ীতে চড়িলাম। দেখিতে দেখিতে অসংখ্য লোক আসিয়া গাড়ীর দরজায়

* Within a few miles of the station of Purulia and near to river Cossye are the ruins of an old Settlement called Palma, where there are some remains of Jain temples, and at the village of Chara there are two very old stone temples, the construction of which is ascribed to the Sarawaks.

ধাক্কা মারিতে লাগিল। একজন পুলিশের দারোগা এই গাড়ীতে ছিলেন। তিনি কাহাকেও গাড়ীতে প্রবেশ করিতে দিবেন না, তিনি ভিতরের দিক হইতে দরজা ঠেলিয়া দিলেন, একটি ভদ্রলোক পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গেলেন। এই সময় একটি প্রৌঢ় পুলিশের ইন্‌স্পেক্টর হ্যাটকোটধারী দারোগা বাবুটির সঙ্গে জুটিয়া 'আইয়ে আইয়ে' বলিয়া ভীষণ নাদে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। আমরা ত সকলে অবাক। বাঙ্গালী ও উড়িয়ার সহিত বিহারী পুলিশের একটা হাঙ্গামার সূচনা দেখিয়া গাড়ীর আরোহীবর্গ ছুটিয়া আসিলেন। বহু চেষ্টায় গোলযোগ থামিলে দেখি দুইটি বাঙ্গালী সেই গোলের ভিতর হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। এখানেই যুদ্ধপর্ব্বের শেষ হইল। ৯-৪০ মিনিটের সময় গাড়ীখানি মন্থর গতিতে পুরুলিয়া ছাড়িয়া কলিকাতা অভিমুখে চলিল। একঘণ্টা পরে আমরা আদ্রা আসিয়া পৌছিলাম। এখানে উত্তর-পশ্চিমের যাত্রীদিগকে নামিয়া আসিতে হয়। কলিকাতার গাড়ী চলিয়া গেল, আমরা তাড়াতাড়ি অন্য এক প্লাটফরমের গাড়ীতে গিয়া বসিলাম। প্রায় আধঘণ্টা পর গাড়ীখানি আমাদিগকে লইয়া অন্ধকারের মধ্যে আসানসোলের অভিমুখে দ্রুতগতিতে ছুটিয়া চলিল। একখানি তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে আমি ও আর একটি লোক আশ্রয় লইয়াছিলাম। বি, এন, আরের, এই লাইনে ইণ্টার গাড়ী রাখেন না। কাজেই ইণ্টার গাড়ীর টিকিট থাকিলেও আরোহীদিগকে বাধ্য হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে বসিতে হয়। অন্ধকার রাত্রি, পথের বড় কিছু দেখা গেল না, শুধু মাঝে মাঝে পাশের ষ্টেশনের মিটমিটি ল্যাম্পগুলি চলন্ত গাড়ীর জানালা দিয়া উঁকি দিতে লাগিল। মাঝে মাঝে ঝম্ ঝম্ শব্দে বুঝিলাম এই আমাদের গাড়ী পুলের উপর দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। কত গ্রাম, কত মাঠ, কত নদী অতিক্রম করিয়া গাড়ীখানি রাত্রি ১১টার সময় আসনসোল আসিয়া পৌঁছিল। এই ষ্টেশনটি ঈষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের বড় জংসন, এখান হইতে মেন লাইন পশ্চিমে এবং গ্রাণ্ড কর্ড গয়ার দিকে চলিয়া গিয়াছে। এই দুইটি লাইন অবশেষে মোগলসরাইতে গিয়া মিলিত হইয়াছে। গাড়ী হইতে নামিয়া ওভারব্রিজ পার হইয়া অন্য একটি প্লাটফরমে এদিক ওদিক ঘুরিতেছি, এমন সময় দেখি হুস্ হুস্ শব্দে একখানি গাড়ী আসিয়া তথায় দাঁড়াইল। একজন হিন্দুস্থানীকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল—'বাবুজি, ও-এক্সপ্রেস হ্যায়।' আমি পঞ্জাব মেল ধরিব, এক্সপ্রেসে আমার কোনই প্রয়োজন ছিল না। আমি স্বচ্ছন্দমনে বেড়াইতেছি, এমন সময় একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'মশায়, পঞ্জাব মেল কখন ষ্টেশনে আসিবে।' উত্তরে তিনি বলিলেন,—'এই যে পঞ্জাব মেল, এখনি গাড়ী ছাড়িবে। আপনি উঠিয়া পড়ুন'। আমি তাড়াতাড়ি একখানি ইণ্টার গাড়ীর নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলাম। দেখি "ন স্থানং তিলধারয়েৎ।' এখন কি করি? উঁকি মারিয়া দেখিলাম একটি হিন্দুস্থানী রমণী একটি ক্ষুদ্র শিশু কোলে করিয়া নীচে শুইয়া আছে। আমি পাঞ্জাব মেলে উঠিব,—এ ইঠা নয় ত, রীতিমত সংগ্রাম। একটি বাবু আমাকে কিছুতেই উঠিতে দিবেন না। তিনি মল্লবেশে 'রণং দেহি' গোছের ভাবে দাঁড়াইয়া আমাকে বলিলেন,—'মশায়, অন্য গাড়ী দেখুন, এখানে জায়গা হবে না।' আমার তখন তর্ক করিবার সময় ছিল না। আমি অতি বিনীতভাবে দুইএকটি কথা বলিলাম। উদ্ধত বাবুটির মেজাজ একটু নরম হইল, আমিও পলকের মধ্যে দরজাখানি একটু ফাঁক করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম। দাঁড়াইয়া আছি—জানালার ভিতর দিয়া দেখি পঞ্জাব মেল হু-হু করিয়া পথ কাটিয়া চলিয়াছে। গাড়ী আর থামে না, কোনই গোলযোগ নাই, একটু নড়া চড়া নাই। কিছুক্ষণ পর গাড়ী আসিয়া মধুপুর দাঁড়াইল। আবার পাঞ্জাব মেল ঝড়ের মত ছুটিয়া চলিল। তখনও আমার ঘুম আসে নাই, নীচেই কম্বল খানির উপর বসিয়া আছি। আমার সম্মুখে একটি বাঙ্গালী ভদ্রলোক দেখিয়া আমি একটু কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাঁহার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিতে অগ্রসর হইলাম। পরিচয়ে জানিলাম ভদ্রলোকটির পূর্ব্বনিবাস বরিশাল কলসকাটি। তাঁহার পিতৃদেব স্বদেশ ছাড়িয়া কাশীতে যাইয়া ঘরবাড়ী করিয়াছেন। ইহাঁর সদ্ব্যবহারে ও মিষ্টালাপে আমি অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিলাম। কাশী পর্য্যন্ত আমরা উভয়ে এক সঙ্গেই ছিলাম। ইনি আমাকে গোধুলিয়া গাড়ীর আড্ডা পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দেন।

গাড়ী চলিয়াছে, বহিঃপ্রকৃতির স্নিগ্ধ গম্ভীর মূর্ত্তিখানি দেখিবার জন্য আমি জানালার নিকট দাঁড়াইলাম। দেখি আমাদের গাড়ীখানা প্রকৃতির বিরাট শক্তিকে উপেক্ষা করিয়া উন্মত্তের মত ছুটিয়া চলিয়াছে। দেখিতে দেখিতে পথের দুইধারে কত বনউপবন, মাঠ ঘাট, গাছপালা দৃষ্টিপথে পড়িতেছে, আবার অন্তর্হিত হইয়া যাইতেছে। এই ভাবে পরিবর্ত্তনশীল চিত্রের ভিতর ট্রেনখানি কিউল ও মোকামায় অল্প সময়ের জন্য থামিয়া প্রত্যূষে আসিয়া পাটনা ষ্টেশনে দাঁড়াইল। ষ্টেশনের চতুর্দ্দিকে প্রকৃতির ভৈরবী মূর্ত্তি। বঙ্গপ্রকৃতির সেই সুজলা সুফলা, মলয়জশীতলা, শস্যশ্যামলা চিত্রখানি অনেকক্ষণ পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছি। এই কঠোর প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়াই আমাদের দুঃখদৈন্য-পূর্ণ জীবনের শেষ

দিকটা অতিবাহিত করিতে হইবে বলিয়া প্রাণের ভিতর কেমন একটা অবসাদ আসিল। পাটনার পর বাঁকিপুর, বাঁকিপুর ছাড়িয়া গাড়ী দানাপুরে দাঁড়াইল। এইবার আমি জানালার কাচ তুলিয়া বেঞ্চে বসিয়া চতুর্দ্দিকের দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। কোথায়ও গাছপালার মধ্যে গ্রাম, গ্রামে কূপ, স্ত্রীলোকেরা জল তুলিতেছে। দেখিতে দেখিতে গাড়ী আরায় পৌঁছিল। আরা ছাড়িলেই বিখ্যাত সোন-সেতু দেখিতে পাইলাম। ইহা দৈর্ঘ্যে ৪৭২৬ ফিট্, ইহা নির্ম্মাণ করিতে ৪৩,৩৩ ৩২৪৲ টাকা খরচ পড়িয়াছিল। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে এই সেতু প্রথম খোলা হয়। বেলা সাড়ে সাতটায় গাড়ী বক্সার পৌঁছিল। ইহা ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান। এখানে ইংরাজের সহিত বাংলার শেষ নবাবের যুদ্ধ হইয়াছিল, যুদ্ধে নবাব পরাজিত হন। বেলা ৯টার সময় পাঞ্জাব মেল আমাদিগকে আনিয়া মোগলসরাইতে ছাড়িয়া দিল। মোগলসরাই আউড্‌রোহিলখণ্ড রেলের সংযোগস্থল। এস্থান হইতে কাশী ১০ মাইল দূরে অবস্থিত। ষ্টেশনের ওভারব্রিজ পার হইয়া অপরদিকে গিয়া কাশীর গাড়ীতে আরোহণ করিলাম। আমার সঙ্গী ভদ্রলোকটী আমাকে কাশী ষ্টেশনের একখানা টিকিট আনিয়া দিলেন। ষ্টেশনে উৎকৃষ্ট কাঠের খেলানা, নানারকমের ফল দেখিতে পাইলাম। কিছুক্ষণ পরে বোম্বে ও দিল্লী এক্সপ্রেস ট্রেণ আসিয়া পৌঁছিল। তখন দেখি অগণিত লোকেরা আমাদিগের প্লাটফরমের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। অত্যন্ত ভিড় বলিয়া গাড়ী ছাড়িতে প্রায় একঘণ্টা বিলম্ব হইয়াছিল। পুণ্য নগরী দেখিবার জন্য হৃদয়-মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। কখন্ গাড়ী ছাড়িবে এই ভাবনায় অনেকেই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পরে গাড়ীখানি মন্থর গতিতে চলিল। স্ত্রীলোকের মুখোত্থিত হুলুধ্বনি ও 'জয় বিশ্বেশ্বরের জয়' ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইয়া উঠিল। সম্মুখে ধূলি উড়াইয়া মরুসম মাঠের মধ্য দিয়া গাড়ী ছুটিয়া চলিল। কিছুদূর অগ্রসর হইতেই সহসা দিবাকর-কিরণমালায় উজ্জ্বল অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি জাহ্নবীসলিলবিধৌত শিবমোক্ষপুরী বারাণসী আমাদের চক্ষের সম্মুখে বিকশিত হইল। সেই অপূর্ব্ব দৃশ্য কত সুন্দর, কত মনোরম। দূরে বেণীমাধবের ধ্বজা আকাশের দিকে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। উহার ভিতর দিয়া হিন্দুধর্ম্ম জগতকে সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের মূলমন্ত্র যেন শিক্ষা দিতেছে বলিয়া মনে হয়। বিশ্বেশ্বরের পুরীতে বেণীমাধবের মন্দিরের নিকট উচ্চশীর্ষ মিনারেট দেখিয়া আমাদের মনে হইল, 'কাশী পরমতীর্থ' এখানে আসিলে যেন বিভিন্নধর্ম্মাবলম্বীর কোনই প্রভেদ থাকিতে পারে না। (ক্রমশঃ)

পরশে তোমার।

রাগিণী—ভৈরবী।

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এ)

কুসুম হয়ে ফুটে ওঠে কাঁটা
আলো হয়ে ফুঠে ওঠে আঁধার!
প্রভু পরশে তোমার!

থেমে যায় ঝড়-ঝঞ্ঝা-রাতি
ফুটে ওঠে তারার পাঁতি
জেগে ওঠে শশীর ভাতি
প্রভু পরশে তোমার!

বন্ধুর পথ হয় সে কুসুম কীর্ণ
শ্যামল হয়ে ওঠে মরু জীর্ণ!
জেগে ওঠে নিঝর-ধারা
কল-বিহগ ডেকে সারা
পবন বহে পাগল-পারা
প্রভু পরশে তোমার!

তেম্‌নিতর একটি পরশে
চিত্ত আমার ডুবাও হরষে!
অন্ধকারে ফুটাও তারা
ছুটাও প্রাণে গানের ধারা
প্রেমসুধায় কর হারা
প্রভু পরশে তোমার॥

আদর্শ
বা
দাদা ঠাকুর।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—অরণ্য। কাল—রাত্রি।

রাস। ও বাবা, কি ঘুটঘুটে অন্ধকার! কোলের মানুষটী দেখ্‌বার যো নাই। জামাই, ভাগ্‌নে, শ্যালক আর পুষ্যিপুত্তুর যার সংসারে থাকে তার ভিটেয় ঘুঘু চর্‌বেই। ধনদাস রায়ের ঘাড়ে এই দুইজন চেপেছি—শালা আর

পুষ্যিপুত্তুর। একের ধাক্কা সাম্‌লানো দায়, তাতে আবার দুইজন। আর যায় কোথা? কুলভূষণটা বড় গোঁয়ার, ওকে দিয়েই কাজ হাসিল কর্ত্তে হবে। ব্যাটাকে অনেক চেষ্টা করে মদ ধরিয়েছি। আগে ওকে দিয়েই রায়মশাইকে পথ থেকে সরাতে হবে। তার পর কুলভূষণের দফা-রফা করব। একবার দেখাব যে শালাবাবুর বুদ্ধির দৌড় কত!

(কুলভূষণের প্রবেশ)

ও কেউ আস্‌চে নয়? হাঁ তাই তো, ঐ যে কুলভূষণই তো বুঝি।

কুল। কৈ, মামা!

রাস। এস বাবাজী। আমি ভাবনায় পড়েছিলুম।

কুল। এখানে আস্‌তে বলেছিলে কেন?

রাস। তোমার কাছে অনেক দিন থেকেই একটা কথা বল্‌ব বলে ভেবেছি। ফুর্‌স্থৎ পাইনি।

কুল। বল।

রাস। কথাটা বড়ই গোপনীয়। সাবধান—

কুল। মামা, তুমি আমাকে অবিশ্বাস কর?

রাস। না না, অবিশ্বান করিনা। তবে কিনা ছেলে মানুষ। দ্যাখো কুলভূষণ, তোমায় আমায় ছেলেবেলা থেকেই বড় ভাব; তার পর সম্পর্ক তো একটা আছেই।

কুল। তা বৈ কি। যাক্ কথাটা বলুন।

রাস। হাঁ বল্‌চি। যা বল্‌ব তাতে তোমারো ভালো, আমারো ভালো।

কুল। যাক্ কথাটা বলুন।

রাস। হাঁ বল্‌চি; বল্‌চি যে:তোমারো রাজ্যিপাট উঠ্‌লো, আমারো রাজ্যিপাট উঠ্‌লো।

কুল। কি রকম?

রাস। এখন আগে থেকেই এর একটা উপায় করা উচিত।

কুল। উপায় আর কি?

রাস। আমি একটা ভেবে রেখেছি।

কুল। কি?

রাস। বল্‌ব?

কুল। বল।

রাস। সাবধান, যদি প্রকাশ হয়ে পড়ে, তা হ'লে বিপদ হবে।

কুল। মামা, তুমি আমায় অবিশ্বাস কর?

রাস। না না, অবিশ্বাস করি না, তবে কিনা ছেলে মানুষ।

কুল। যাক্ কথাটা বল।

রাস। বিয়ে হবার আগেই রায়মশাইকে পথ থেকে সরাতে হবে। তা হ'লে সব সম্পত্তি তোমার আর আমার।

কুল। পথ থেকে সরাতে হবে কি রকম?

রাস। তবে শোনো। (কানে কানে কহিল)

কুল। আঁ্যা বল কি! সর্ব্বনেশে কথা! ও বাবা!

রাস। বুঝ্‌লে না? এই সোজা কথাটা বুঝ্‌লে না—সাধে কি বলি ছেলেমানুষ!

কুল। যাক্ কথাটা বলুন।

রাস। রায়মশাই আবার বিয়ে কর্‌বেন, শুনেছো?

কুল। দাদাঠাকুর মেয়ে দিতে স্বীকার করেন নি।

রাস। আরে তুমি একেবারেই ছেলেমানুষ। সে মেয়ে ছাড়া কি আর মেয়ে নাই।

কুল। তা আছে বৈকি?

রাস। তবে আর কি? বিয়ে একটা কর্‌বেই; বুঝ্‌লে বিয়ে একটা কর্‌বেই। এখন ধর, আমারো বোন্ মারা গেছে, তখন আর রায়মশাইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক কি? যদি এ পক্ষে ছেলে পিলে হয়, তোমাকে ত সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করবে। আর যে বিমাতা হবে, সে তোমাকে বিষের মত দেখবে। বুঝ্‌লে?

কুল। ঠিক্ বলেছো মামা। আমিও এ কথাটা অনেক দিন থেকেই ভাব্‌ছি। এঃ তোমার মনের সঙ্গে যে ঠিক্-ঠাক্ মিলে যাচ্ছে।

রাস। কেন, পিতৃহত্যা পাতকের ভয় কর নাকি?

কুল। আঃ, বাপ্ কোন্ ব্যাটা। পুষ্যিপুত্তুরের আবার বাপ্!

রাস। তবে আর কি?

কুল। যদি কেউ জান্‌তে পারে?

রাস। কেউ জান্‌বে না।

কুল। কি রকম করে?

রাস। খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দেবে।

কুল। আমার যে শুনেই গা কাঁপে।

রাস। কুছ্ পরোয়া নেই।

কুল। আচ্ছা দেখা যাক্।

(অন্তরালে পাগলিনীর বিকট হাস্য—হাঃ হাঃ হাঃ)

রাস। ও কে?

কুল। ও বাবা, ভূত বুঝি।

রাস। র'সো, দেখি।

(পাগলিনীর প্রবেশ)

কুল। ও বাবা, ও কে? এই—এই—কে তুমি?

রাস। কে তুমি?

পাগলিনী। আমায় চিন্‌বে না। আমি কেবল আমায় চিনি।

কুল। এ আঁধারে বসে এখানে কি কর্‌ছ?

পাগলিনী। তোমরাও যা করছ আমিও তাই করছি। বাইরে তো অন্ধকার নেই। অন্ধকার যে ভিতরে। ও বাবা বড় অন্ধকার! ভিতরের আঁধার বড় আঁধার! সেখানে

ঝড় হ'চ্চে, বাজ পড়্চে, ভূতপ্রেত দানবদৈত্যি কত ঘুরে বেড়াচ্চে। বড় ভয় করে! বড় ভয় করে!

রাস। বেটী বলে কি?

কুল। দেখ্ছো না পাগল।

পাগলিনী। পাগল হ'তে পারি কৈ? তা যে পারি নে। মনে পড়ে—নিজের কথা মনে পড়ে,আর পাগল হ'তে পারিনে। হবি, তোরাও আমার মত পাগল হবি। ও বাবা বড় আঁধার। বড় ভয় করে।

কুল। চল মামা, পাগলীর কাছে থেকে কি হবে?

রাস। চল।

(উভয়ের প্রস্থান)

পাগলিনী। কোথায় যাবি? ভিতরের আঁধার যে সাথে সাথে থাক্বে। হাঃ হাহাঃ শুনেছি, সব শুনেছি। বিষ দেবে, ও বাবা বিষ খাওয়াবে। এরা তো বিষ খেয়েই আছে। আমায় বিষ কেন দেয় না? আমি তো বিষ খেতে পার্লুম না! যাই যাই। বিষ দেবে। হাঃ হাঃ হাঃ!

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—দাদাঠাকুরের বাটী। কাল—অপরাহ্ন।

সত্যবতী। নাঃ আর ওঁর সঙ্গে পেরে উঠ্ছিনে। এই তো বেলা গেল, এখনো বাড়ী-মুখো হচ্চেন না। সারা দিন না-খেয়ে না-নেয়ে ঘুরে' ঘুরে বেড়াবেন। এই বয়সে এমন করে' খাট্লে আর শরীর ক'দিন টিঁক্বে? হয় তো ভাত খেতে বসেছেন, এমন সময়ে খবর এলো অমুকের কলেরা হয়েছে, অম্নি দে ছুট্!

(লক্ষ্মীমণির প্রবেশ)

এই যে লক্ষ্মী, কি মা, কোথায় গিয়েছিলে?

লক্ষ্মী। কেলে ডোমের বাড়ী গেছ্লুম। তার মেয়ের বড় জ্বর হয়েছে।

সত্য। তা বেশ করেছো বাছা। এখনো যে কিছু খেলে না!

লক্ষ্মী। বাবা এখনো ফেরেন নি বুঝি?

সত্য। না, আহা ক্ষিদেয় যে তোর মুখ শুকিয়ে গেছে।

লক্ষ্মী। আমরা গরীবের মেয়ে, ক্ষিদেয় আমাদের কষ্ট হয় না।

সত্য। তা বুঝেছি।

লক্ষ্মী। মাগো, একটা কথা—

সত্য। কি মা?

লক্ষ্মী। অনেক দিন বল্ব-বল্ব ভেবেছি, কিন্তু বলা হয়নি'। আজ বল্ব।

সত্য। বল।

লক্ষ্মী। আমি আর তোমাদের কাছে থাক্ব না।

সত্য কেন?

লক্ষ্মী। আমি পোড়াকপালী, আমার তিনকুলে কেউ নেই, বাবা দয়া করে' আশ্রয় দিয়েছেন, তোমার যত্নে—

সত্য। আঃ রাখ্ রাখ্ তোর বক্তিমি রাখ্, ও সব কথা বল্লে মার খাবি। এক রত্তি মেয়ে, টুলো ভট্চাজ্যের মত বক্তিমি কচ্ছে! নে, নে, তোর ছোট মুখে বড় কথা আমার আর শুন্তে ইচ্ছা হয় না, এখন কি বল্বি তাই বল্।

লক্ষ্মী। আমার জন্য লোকে কাণাকাণি করে; বাবাকে মন্দ বলে।

সত্য। ওমা, লোকে আবার কি বল্বে? তুই তো আমাদের হেঁসেলে যাস্নি।

লক্ষ্মী। লোকে যা বলে সে বড় মন্দ কথা। আমার জন্য এমন দেবতার মত মানুষ, তার নিন্দা হবে!

সত্য। আ গেল, ও নিন্দে অমন হয়েই থাকে। ও যারা বল্চে, তারা ত জানে যে মিছে কথা বল্চে। এ নিন্দা চিরদিন থাক্বে না। ও কি! আবার কাঁদতে আরম্ভ কর্লি! কোথাকার এক বোকা মেয়ে! দ্যাখ অমন কর্বি তো ভারী মার খাবি।

লক্ষ্মী। মাগো—(আবার কাঁদিয়া উঠিল)

সত্য। ওকি, আবার কান্না! তবে কাঁদ বসে'। থাক্ আজ আর আমি খাবোনা, নাইবোনা কিছু কর্ব্ব না। কেবল বসে' কাঁদব।

লক্ষ্মী। না আর কাঁদব না।

সত্য। ছিঃ মা অমন করে' কি কাঁদতে আছে? তোর কান্না কি সৈতে পারি? তুই কি আমাদের বোঝা? মাগো আয় আমার কাছে আয়। বলুক লোকে, তাদের যা ইচ্ছা! তোকে কি ফেলে দিতে পারি? আমি যে মা, তুই যে আমার মেয়ে, আয় আমার বুকে আয়!

(বক্ষে ধারণ, উভয়ে কাঁদিতে লাগিলেন)

(নিবেদিতার প্রবেশ)

নিবে। লক্ষ্মী দিদি, তুমি এখানে? আমি যে তোমায় খুঁজে খুঁজে হয়রাণ!

সত্য। মা নিবেদিতা, তুমি আর লক্ষ্মী এখনো তো কিছু খেলে না! কি দেব বাছা, ঘরে যে কিছুই নেই।

নিবে। আমি আজ কিছু খাবো না—

লক্ষ্মী। আমিও খাবোনা।

সত্য। বুঝেছি। এ "খাবোনা"র অর্থ ঘরে চাল নেই। আমার এ দুঃখে আর কোনো দুঃখ নেই, কেবল তোদের মুখ যখন শুক্নো দেখি তখনি প্রাণ কেঁদে উঠে। আমি যে মেয়ে মানুষ! তিনি সৈতে পারেন, তিনি দেবতা। আমি যে মূর্খ মেয়ে মানুষ!

নিবে। মা, তুমি এজন্য দুঃখ কর কেন?

সত্য। দুঃখ হয় বৈ কি। যখন বাড়ীর 'পড়ো' ছেলেরা খেতে না পেয়ে ফিরে গেল। যখন পাড়ার ছেলেরা মা মা বলে কাছে এসে খেতে চায়, তখন তাদের হাতে কিছু দিতে পারিনে। যখন অতিথি এসে ফিরে যায়, তখন আমার প্রাণ কেঁদে উঠে। হা ঠাকুর! আমার এমন সোণার সংসার।

লক্ষ্মী। আমরাই তোমাদের এই কষ্টের মূল।

নিবে। দিদি, অমন কথা বললে ভাব্‌বো তুই আমাদেরে পর ভাবিস।

লক্ষ্মী। আমায় ক্ষমা কর। আর বলব না।

(গাইতে গাইতে বালকগণের প্রবেশ)

গীত।

সারা রাত ঘুমিয়ে কেটে সকাল বেলায় উঠি—
হঠাৎ দেখি আজ আমাদের হয়ে গেছে ছুটি
মোদের, হয়ে গেছে ছুটি।
সারা জগৎ মোদের সনে খেলতে এসেছে
কোন্ সুদূরের সাগর পারের খবর এনেছে—
কোথায় বাঁশী বেজেছে
কোথায় সাড়া পড়েছে
ভোরের আলো তাই দেখে ভাই হেসে কুটি কুটি।
হল হেসে কুটি কুটি।
লুট করে আজ নেব আকাশ সবাই মুঠি মুঠি
হাসি গালের ঝড় বহায়ে নেব জগৎ লুটি
মোরা নেব জগৎ লুটি।

সত্য। ঐ যে ছেলেরা আসচে।

সকলে। মা, মা ওমা (ঘেরিয়া দাড়াইয়া)

সত্য। কি বাছা?

১ম বালক। খেতে দে মা।

২য় বালক। যা ইচ্ছে তাই দে। মাঠে গোরু চরাতে গিয়েছিলেম, বড় ক্ষিদে পেয়েছে।

সত্য। হা ঠাকুর! (চক্ষু মুছিলেন)

৩য় বালক। ওকি মা, তুই কাঁদ্‌ছিস?

সত্য। না—বাছা, ও কিছু নয়।

২য় বালক। তুই কাঁদিস্‌নে মা। তুই কাঁদলে আমরাও কাঁদব।

সত্য। না আর কাঁদব না। কি দেব বাছা? ঘরে যে কিছুই নেই।

৩য় বালক। এর জন্যে কাঁদিস্, থাক্, আমরা কিছু চাইনে, আমাদের ক্ষিদে পায়নি। মিছামিছি বলেছিলুম।

সত্য। তা বুঝেছি বাছা।

১ম বালক। আজ তোমাদের ঘরে কিছু নেই মা?

সত্য। না বাছা কিছুই নেই।

১ম বালক। আচ্ছা আমরা তোমার জন্যে ফল পেড়ে আনব। ভাই চল সবাই মিলে মায়ের জন্য ফল পেড়ে আনিগে।

সকলে। চল্ চল্। (বালকগণের প্রস্থান)

(দাদা ঠাকুরের প্রবেশ)

দাদা। সত্যবতী!

সত্য। একি একেবারে মুখ শুকিয়ে গেছে যে! কোথা ছিলে এতক্ষণ?

দাদা। রামধনের বাড়ীতে। তার স্ত্রীর বড় ব্যারাম, দু'জন লোক ঘরে মরে পড়ে ছিল। কেউ নেই যে তাদের সৎকার করে, উঃ দেশে কি ভয়ানক মহামারী! কি ভয়ানক দুর্ভিক্ষ! ওকি তোমাকে অমন দেখছি কেন? তুমি কেঁদেছ?

সত্য। (নীরব)

দাদা। কথা কইছ না যে! বুঝেছি; কেন কেঁদেছ?

সত্য। ছেলেরা এসে খেতে চেয়েছিল।

দাদা। ঘরে বুঝি কিছুই নেই? তাদের কিছুই দিতে পারনি। তোমরাও উপোস করে আছ!

সত্য। আমাদের কোনো কষ্ট হয়নি।

দাদা। কষ্ট হয়নি! বুঝি, সবি বুঝ্‌তে পারি। কি কর্‌ব? অত্যাচার! ধনদাস রায় আমাকে এমন কর্ব্বে আগে বুঝিনি। কিন্তু মনে রেখো, এ আমাদের পরীক্ষা। দুঃখ দিয়ে ঠাকুর আমাদের পরীক্ষা করছেন। আমরা বড় ভাগ্যবান্, যে তিনি এমন কঠোর পরীক্ষায় ফেলেছেন। যাকে তিনি বেশি ভালবাসেন, কঠোর পরীক্ষা তাঁরি জন্যে হয়। মহদ্দুঃখ কয়জনের ভাগ্যে ঘটে? পাছে ঐশ্বর্য্যের মাঝে থেকে আমরা তাঁকে ভুলে যাই, তাই তিনি এই ঐশ্বর্য্যের ব্যবধানটুকু সরিয়ে দিয়েছেন। ঠাকুরের অপার দয়া। আচ্ছা তোমার কি বড় দুঃখ হয়?

সত্য। কিসে? কি জন্য?

দাদা। কত কারণ আছে। দ্যাখো আমার ঘরে এসে, লোকে যাকে সংসারিক সুখ বলে তার কিছুই পাওনি। একখানা অলঙ্কার পরনি। আমি নিঃসন্তান; চিরকাল পরিশ্রম কর্‌তে হয়েছে। তার উপরে বর্ত্তমানে এই দারিদ্র্যের কষ্ট; এতে বিচলিত হ'চ্চ?

সত্য। তুমি বিচলিত হয়েছ!

দাদা। না—।

সত্য। কেন?

দাদা। আমি জানি, এ ভগবানের অনন্ত করুণা। সংসারে থাক্‌লে এ সব তো হবেই। এর থেকে জ্ঞানলাভ করেই তো মানুষের জীবন অনন্ত উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। এই জন্যই গৃহস্থাশ্রমই শ্রেষ্ঠ। এখানেই আমাদের

শিক্ষা, এখানেই আমাদের পরীক্ষা। দুঃখের কাছে মাথা নুয়ে পড়বে কেন? তার ভয়ে ভীত হব কেন? আমরা মানুষ। আমরা দুঃখকে নির্জ্জীব করে' দেব। এর আঘাতকে তুচ্ছ জ্ঞান কর্‌ব। দুঃখে কাঁদব না, তার পীড়নে জ্ঞানলাভ কর্‌ব। এ যে প্রেমময়ের প্রেমের দান। তাঁর দেওয়া সুখটুকু নিতে পেরেছি, দুঃখটুকু নিতে পারব না? তবে আর তাঁর সঙ্গে প্রেম হ'ল কৈ? এ যে বড় মধুর, প্রেম হলাহলকে অমৃত করে। এমন প্রেমের আমরা অধিকারী। আমাদের দুঃখ কর্‌বার অবকাশ কৈ? আর দ্যাখো, তোমাকে অনেক দিন বলেছি। সুখ দুঃখ সবি মায়া। দেহের ধর্ম্ম। আমরা দেহ নহি। আত্মা সুখ দুঃখের অতীত। এ আঘাত তো আমাদের লাগ্‌বে না। তবে কেন বিচলিত হব? আমার কিন্তু মোটেই দুঃখ হচ্ছে না। ভারী আনন্দে আছি, ভারী আনন্দে।

সত্য। আমারি বা কিসের দুঃখ? যতই ছোটো হই, তবু তোমারি তো সহধর্ম্মিণী। আমার মত ভাগ্যবতী কে? অলঙ্কারের কথা বল্‌ছো, তুমিই যে আমার শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার। তোমার প্রেমই যে আমার অতুল ঐশ্বর্য্য। আমি তো সন্তানহীনা নই। এই যে কত ছেলেরা মা বলে ডাকে, চাষী বালকেরা আমার কোলে ওঠে, দীন-দুঃখীরা আমার কাছে খেতে চায়—এরাই তো আমার সন্তান। আমি যে সকলের মা হ'য়ে কৃতার্থ হয়েছি। হয়তো নিজের ছেলে থাক্‌লে তা পার্‌তুম না। প্রাণটা ছোটো হয়ে' যেত। কি দুঃখ আমার? আমার মত ভাগ্যবতী কে?

দাদা। আনন্দ, আনন্দ। দারিদ্র্যে আমার চোখে জল আসেনি, আজ আমার আনন্দে চোখে জলধারা আস্‌চে। আজ আমার মত ভাগ্যবান, এমন সুখী সংসারে কে আছে? আজ আমি রাজ-রাজেশ্বর। ধনদাস, দেখে যাও, তুমি আমায় কিছুমাত্র দরিদ্র কর্‌তে পারনি। সত্যবতী,—

সত্য। প্রভো,—

দাদা। সত্যবতী তুমি আমার চেয়ে অনেক বড়।

(কিয়ৎকাল উভয়ে নীরব)

সত্য। একটা বড় দুঃখ হয়।

দাদা। কি দুঃখ?

সত্য। আমার মনে হয়—আমি তোমার চরণে শৃঙ্খল, মাথার বোঝা, একটা গলগ্রহ। যদি আমি না থাক্‌তাম!

দাদা। সে কি?

সত্য। আমার মনে হয়, আমি যেন তোমায় আমার স্বার্থপর ভালোবাসা দিয়ে কেবলি ঘিরে রাখ্‌তে চাই। তোমার মূল্যবান জীবনের ভার-স্বরূপ আমি। তুমি তো আমার একার নও; তুমি যে বিশ্বের সম্পত্তি। কত অজ্ঞান জ্ঞানপিপাসায় তোমার দিকে চেয়ে আছে। কত অন্নহীন তোমার কাছে দীনভাবে মুষ্টিভিক্ষা কর্‌ছে। কত পাপী কত অনুতাপী তোমার কাছে উপদেশ নিতে আস্‌চে। দেশ তোমার হৃদয় চায়, অসহায় তোমার বাহু চায়, কে আমি যে তোমায় কেবল সারাক্ষণ আগ্‌লে রাখ্‌তে চাইব? আমার জন্যে তোমার একটুকু তো ভাব্‌তে হয়—সে ভাবনাটুকু তুমি, আমি না থাক্‌লে, জগতের কাজে ব্যয় কর্‌তে পার্‌তে।

দাদা। তুমি কি জগৎ ছাড়া? আমার এ রাজ্য মধ্যে তোমারো একটা স্থান আছে, আর সে স্থানটুকু সাধারণ নয়।

সত্য। আমি সে স্থানটুকু অধিকার না কর্‌লে, আর একজন এসে সেখানে দাঁড়াতে পার্‌ত।

দাদা। যে স্থানে তুমি আছো, সে স্থানে কেবল তোমারি অধিকার। পাত্রভেদে স্থানভেদ হয়। তুমি আমার বাহুতে শক্তি, কর্ম্মে উৎসাহ, নয়নে দীপ্তি, হৃদয়ে আনন্দ। তুমি আমার সুখে সুখী, দুর্দ্দিনে বন্ধু, বিপদে মন্ত্রী, ঈশ্বরোপাসনায় সহধর্ম্মিণী। তোমায় ভালোবাসি বলে' বিশ্ব ভালোবাসি। আবার বিশ্ব ভালোবাসি বলে' তোমায় ভালোবাসি। এস সত্যবতী এই সন্ধ্যাবেলা একবার দুজনে মিলে ঠাকুরের চরণে প্রণত হই। আজ আমার বড় আনন্দ হ'চ্ছে।

(গাইতে গাইতে বালকগণের প্রবেশ)

এমন ভাবের পাগল রসের পাগল দেখিনিকো ভাই
পাগ্‌লা দাদার পাগলামীতে পাগল হয়ে' যাই,
ঢুলু ঢুলু' দু'টী আঁখি টলে' টলে' পড়ে
হাসে কাঁদে নাচে মাতে কি এক নেশার ঘোরে
এমন পাগল-ভোলা কেউ দেখিনি গো—
তারে বুঝ্‌তে পারি কইতে নারি,
নূতন যে সদাই!
মিলিয়েছে এই মোদের মাঝি কি এক রংয়ের মেলা
কখন করি মান অভিমান কখন বা খেলা
তাঁরে চিন্‌তে পেরেও চিন্‌তে নারি গো—
এই দেখি এক ভাবে আছে, আবার সে ভাব নাই।

দাদা। এই যে আমার ঠাকুর এসেছে! ঠাকুর—তুমি বালকের বেশে এসেছ?

১ম বালক। দাদাঠাকুর, আমরা মায়ের জন্য ফল এনেছি।

সত্য। ও ফল তোমরা খাও, তাতেই আমি সুখী হব।

১ম বালক। না মা, এ ফল তোমাকে খেতে হবে। না হলে' আমরা কাঁদ্‌ব। দাদাঠাকুর, তোমাকেও খেতে হবে।

দাদা। দে ব্যাটারা তোদের ফল আমি আনন্দে খাব।

২য় বালক। তবে আমরা এখন যাই; আমরা কাল আস্‌ব।

সত্য। এসো বাছা।

(বালকগণের প্রস্থান)

দাদা। সত্যবতী, ধনদাস রায় নিবেদিতাকে বিবাহ করতে চান, তাঁর সঙ্গে নিবেদিতার বিবাহ দিলে সে সমস্ত সম্পত্তি ফিরিয়ে দেবে, আর দারিদ্র্য থাক্‌বে না।

সত্য। তুমি কি বলেছ?

দাদা। তা তো বুঝ্‌তেই পারছ।

সত্য। আমিও তাই বলি।

দাদা। তুমি বড়ই দুর্ব্বল হয়ে' পড়েছো দেখ্‌তে পাচ্ছি। সমস্ত দিন অনাহারী!

সত্য। না আমার কোনো কষ্ট হচ্চে না।

দাদা। মেয়ে দু'টো বুঝি কিছুই খায়নি?

সত্য। কিছুই খায়নি।

দাদা। (দীর্ঘনিঃশ্বাসসহকারে) প্রেমময়, জগদীশ!

সত্য। লক্ষ্মী পাগ্‌লী বড় ক্ষেপেচে।

দাদা। কি রকম?

সত্য। পাগ্‌লী বলে তারি জন্যে আমাদের এমন অবস্থা হয়েছে। আর সে এখানে থাকে বলে লোকে তোমাকে নিন্দে করে, তাই সে আর আমাদের এখানে থাক্‌বে না।

দাদা। পাগ্‌লীকে তুমি বুঝিয়ে বলো'। যদি এর চেয়েও কঠোর পরীক্ষা আসে, তবু ভয় করব না। ও যে নিরাশ্রয়া, ওকে তাড়িয়ে দিলে যে সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের দেবতাকে তাড়িয়ে দিতে হবে। এতে যদি আমার প্রাণ যায়, তবু আমি আমার মাকে রাখ্‌ব। ও যে আমার দুঃখিনী মা, পরের কথায় কি ছেলে মাকে ফেলে দিতে পারে? লোকনিন্দা? লোকনিন্দা আমি তুচ্ছ করি। বিশ্বশুদ্ধ আমার নিন্দা করুক্‌, তবু আমার কর্ত্তব্য আমি কর্‌ব। ধর্ম্মের কাছে লোকনিন্দা অতি তুচ্ছ।

(রহিমদ্দীর প্রবেশ)

রহিমদ্দী। দাদাঠাকুর, সেলাম।

দাদা। কিরে রহিম, কি জন্য?

রহিম। দাদাঠাকুর, আমার একটা কথা আছে।

দাদা। কি কথারে রহিম?

রহিম। বল, কথাটা রাখ্‌বে তো?

দাদা। আরে বল্‌না।

রহিম। এই দুটো চাল-ডাল তোমার জন্যে এনেছি। আমার ইচ্ছে হয়েছে তোমায় একদিন খাওয়াব। তা আমাদের বাড়ীতে গিয়ে, আমাদের রান্না তো আর তুমি খাবে না—তাই এই চাল-ডাল এনেছি, তোমরা রেঁধে খাও। আমি মানৎ করেছিলাম, আমার ছেলের ব্যামো ভালো হলে তোমায় ভুজ্যি দেব। ছেলে তোমার দয়ায় ভালো হয়েছে এখন এই কাঙালের যা কিছু নিয়ে আমায় খুসী কর।

দাদা। রহিম, তুই এ করেছিস্‌ কি? তোর নিজেরি যে খেতে নেই। তুই যে নেহাৎ গরীব।

রহিম। খুব আছে। দাদাঠাকুর, আমরা তোমাদের দশজনের কাছ থেকে নিয়েই তো বাঁচি; আমাদের কিসের অভাব? তোমার এ সব নিতেই হবে। এ আমি মানৎ করেছি। তুমি এগুলো না নিলে আমার ছেলের আবার ব্যামো হবে।

দাদা। ইস্‌! ও ব্যাটারা দেখ্‌চি আমায় দেবতা করে' তুল্‌লে। কি সরল প্রাণ, সহজ বিশ্বাস এদের! দ্যাখ্‌ রহিম, ওরকম মানৎ টানৎ করিস্‌নি। অমন করলে আমি আর তোদের সঙ্গে কথাও কবনা। মানৎ করেছিস্‌ কেন?

রহিম। তুমি মুসলমানের পীর, হিন্দুর দেবতা। আমরা দরগায় সিন্নি মানৎ করি। সেই রকম তোমাকেও মান্য করি। মানৎ করে ফল পেয়েছি।

দাদা। তা হ'লে আমার নামে মানৎ না করে' তোর পীরের নামে মানৎ করিস্‌। তাতে আমাকেও দেওয়া হবে, পীরকেও দেওয়া হবে। আর আমি সেই পীরের প্রসাদ খাবো। ও সব নিয়ে যা।

রহিম। সে হবে না দাদাঠাকুর, তোমায় ও নিতেই হবে। আমি গরীব মানুষ বলে' বুঝি আমার ঠেঙে নিতে সরম করচ?

দাদা। ওঃ! আরে—এ ব্যাটা তো খুব কথা শিখেচে। দেখি একবার লাঠিখানা।

রহিম। তা মারো দাদাঠাকুর, তোমার মার বড় মিষ্টি। দাদাঠাকুর তোমার পায়ে পড়ি আমার এ ভুজ্যিখানা নেও। আমি সামান্য লোক। আমার প্রাণে দুঃখ দিও না। তোমার পায়ে পড়ি দাদাঠাকুর।

(পদতলে পতনোদ্যত)

দাদা। (রহিমকে উঠাইয়া) রহিম, রহিম, তুই যদি সামান্য লোক হবি তবে এ দুনিয়ায় বড় কে? সভ্যজগৎ চেয়ে দ্যাখো, যদি প্রাণ থাকে তবে এই রহিমদ্দীর শ্রেণীর লোক যারা, তাদেরি মধ্যে আছে। তবু সভ্যজগৎ এই হৃদয়বান দরিদ্রকে ঘৃণা করে! ভগবান্‌, তুমি দরিদ্রকে বাহিরের এই হীন সম্পত্তি হ'তে বঞ্চিত করে' হৃদয়ের অমূল্য সম্পত্তি দান করেছো। দীননাথ, দীনেরি উপরে তোমার বেশী দয়া। বাইরের রিক্ততায় তুমি এ মহত্ত্বের উজ্জ্বলতা ঢেকে দিয়েছো। রহিম, আমার চোখে জল

আস্‌চে। এতো তোর মানৎ নয়; আমি উপবাসী তুই তা জেনে একান্ত গরীব হয়েও তোর ক্ষুদ্র ভাণ্ডার খালি করে আমার জন্যে এই স্নেহের দান নিয়ে এসেছিস্। তুই আবার গরীব! তোর চেয়ে ধনী কে? আমার কি সাধ্য যে তোর এই স্নেহের দান উপেক্ষা করি? এ যে শ্রেষ্ঠ দান। রহিম, রহিম, আয় ভাই একবার গলাগলি করে' সুখের কান্না কাঁদি। আজ বড় আনন্দে কান্না পাচ্ছে। ঐ যে তোর চোখে জল দেখ্‌চি—কাঁদ্ রহিম, কাঁদ্। তোর কান্নায় বিশ্বের সকল গ্লানি, সকল নিষ্ঠুরতা, সকল পাপ ধুয়ে যাবে। যে পৃথিবীতে রহিমের মত এক ব্যক্তিও কাঁদতে জানে, সে জগতে আনন্দ, স্নেহ, দয়ার অভাব কি? আয় রহিম একবার আমায় আলিঙ্গন দে। আজ তুই ডাক্ তোর আল্লাকে, আমি ডাকি আমার হরিকে। আয়, রহিম আয় তোকে স্পর্শ করে' ধন্য হই, বাধিত হই, সার্থক হই (আলিঙ্গন)

রহিম। কর কি, কর কি দাদাঠাকুর, আমি যে আর কান্না রাখ্‌তে পাচ্ছিনা। আমায় অত বলোনা। অত ভালো বেসোনা, সৈতে পার্ব্ব না। আমায় অত প্রশংসা করোনা। আমি যে কেমন হ'য়ে গেছি। দাদাঠাকুর দাদাঠাকুর—

দাদা। রহিম, ভাই আমার। আনন্দ, আনন্দ। আজ তাঁর করুণা মূর্ত্তিমতী হয়ে' দেখা দিয়েছে।

(দারোগা, কয়েকজন কনেষ্টবল ও ধনদাস রায়ের প্রবেশ)

দাদা। একি আপনারা এখানে কেন? এ সময়ে—

দারোগা। আপনার নামে ওয়ারেণ্ট আছে।

দাদা। কিসের?

দারোগা। আপনি ধনদাস রায়ের বাড়ীতে অনধিকার প্রবেশ করে' হাঙ্গামা করেছেন। তাতে দুটো লোক জখম হয়েছে।

দাদা। সে কি?

দারোগা। তবে চলুন।

দাদা। চলুন। তবে যাই সত্যবতী। ওকি! তুমি কথা বল্‌ছ না যে? সত্যবতী, আমার বক্ষ দুর্ব্বল করে' দিও না। মনে রেখো, এও তাঁরি পরীক্ষা।

সত্যবতী। তুমি যে আজ সমস্ত দিন অনাহারী!

দাদা। তার জন্যে কিছু ভেবোনা। স্থির হও। প্রেমময় জগদীশ—

সত্যবতী। যাও, তুমি যদি হাস্‌তে হাস্‌তে এ আঘাত সইতে পারো, আমিও তোমারি স্ত্রী, আমিও তেমনি সইতে পারব।

(সেবাব্রতের প্রবেশ)

সেবাব্রত। দাদাঠাকুর কোথায় যাচ্ছেন?

দাদা। হাজতে—

সেবা। কি অপরাধে?

ধন। আরে অপরাধ না থাক্‌লে কি আর অম্‌নি শুধু শুধু সাজা হয়?

সেবা। চুপ্ কর, কুক্কুর।

দাদা। সেবাব্রত উত্তেজিত হয়োনা।

সেবা। উত্তেজিত হব না! এখনো উত্তেজিত হব না? অত্যাচার ধর্ম্মের বুকের উপর দিয়ে অবাধে তার রক্তাক্ত শকট চালিয়ে যাবে? অন্যায় আজ ন্যায়ের বক্ষের উপর পৈশাচিক নৃত্য কর্ব্বে? উত্তেজিত হব না? এখনো উত্তেজিত হব না? আশ্চর্য্য! এই অন্যায় দেখে এখনো পৃথিবী একটা বিরাট্ ভূমি-কম্পে কেঁপে উঠচে না! এখনো চন্দ্র সূর্য্য খসে' পড়্‌চে না? এখনো একটা প্রলয়-ঝঞ্ঝা পৃথিবীকে বিধ্বস্ত করে' দিচ্চে না! সব স্থির! সব স্থির! আশ্চর্য্য!

দাদা। সেবাব্রত স্থির হও। কাল তার কাজ আপনি করে।

সেবা। না তা করে না। তা করে না। না হলে' এখনো ধনদাসের মস্তকে বজ্রাঘাত হচ্চে না? এখনো স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে সে এই সব দেখ্‌চে? ঈশ্বর, ঈশ্বর, দেখো যেন আজ তোমার অস্তিত্বে সন্দেহ না হয়। যেন তোমার দয়া, তোমার শক্তিতে বিশ্বাস না হারাই! ঈশ্বর, ঈশ্বর, তুমি কি আছো না সয়তানের কাছে পরাস্ত হয়েছ?

দাদা। সেবাব্রত স্থির হও।

ধন। দারোগা বাবু, দাঁড়িয়ে দেখ্‌চেন কি? নিয়ে চলুন। না হলে' হয় তো এখনি একটা হাঙ্গামা কর্ব্বে। ব্যাটা ভারী গোঁয়ার।

সেবা। ধনদাস! না থাক্—কি বল্‌ব—হাঙ্গামা? জানো কি ধনদাস, ঐ যে দেখ্‌ছো পর্ব্বতের মত অটল সমুদ্রের মত স্থির, বৃদ্ধ কেশরী তোমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে—যার শিশুর মত সারল্য, ধরিত্রীর মত ক্ষমা, সূর্য্যের মত তেজ, সে যদি একবার চক্ষু রক্তবর্ণ করে, তুমি ভয়ে মাটীর ভিতরে সেঁধিয়ে যাবে। বৃদ্ধ মর্কট, তুমি কি মস্ত অন্যায় করছ, জানোনা। কি বল্‌ব যদি একবার আজ্ঞা পাই।

ধন। ওহে বেশ তো অভিনয় করে' যাচ্ছ। থামো থামো আর একটু কাল অপেক্ষা কর। আরো আছে; সব এখনো শেষ হয়নি। আরো দেখাব। আরো দেখ্‌বে। আমি ধনদাস রায় আমায় চেনোনা? কি হে দাদাঠাকুর, এখন তোমায় কে রক্ষা কর্ব্বে। এখনো বল্‌চি, বুঝে দেখ—

সেবা। সাবধান নরপিশাচ! তবে এই লও।

সেবাব্রত আক্রমণ করিলেন দাদাঠাকুর তাঁহার হস্ত ধারণ করিলেন।

দাদা। ক্ষান্ত হও।

সেবা। (ধনদাসের প্রতি) কুক্কুর, এর প্রতিফল পাবে। জানো আজ কাকে জেলে পাঠাচ্ছ? আজ যার জন্যে সকলের চোখের জল পড়্‌চে, সকলের প্রাণে হাহাকার উঠ্‌চে, সকলের বুকে আঘাত লেগেছে। জেনো, এ আঘাত, এ চোখের জল, এ হাহাকার শুধু যাবে না। এর পরিণাম অতি ভীষণ। যান্ দাদাঠাকুর—যাবার বেলায় একবার পদধূলি দিন। (প্রণত হইলেন)

দাদা। তবে যাই। তোমরা অধীর হবে না। চলুন দারোগা বাবু।

(সকলে প্রস্থান)

বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত

গীতা-রহস্য।

অষ্টম প্রকরণ।

বিশ্বের রচনা ও সংহার।

(পূর্ব্বের অনুবৃত্তি)

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদিত)

সাংখ্য ও বেদান্তী উপরি-প্রদত্ত পঁচিশ তত্ত্বের ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে বর্গীকরণ করা প্রযুক্ত, এই বর্গীকরণ সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ বিবরণ এখানে দেওয়া আবশ্যক। সাংখ্য বলেন যে, এই পঁচিশ তত্ত্বের মূল প্রকৃতি, প্রকৃতি-বিকৃতি, বিকৃতি এবং অ-প্রকৃতি-অ-বিকৃতি এই চারি বর্গ। (১) প্রকৃতিতত্ত্ব অন্য কাহা হইতে উৎপন্ন হয় নাই বলিয়া উহা মূলপ্রকৃতি এই নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। (২) এই মূলপ্রকৃতি ছাড়িয়া অন্য ভিত্তির উপর আসিলে "মহান্" তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। এই মহান্ তত্ত্ব প্রকৃতি হইতে নিঃসৃত বলিয়া উহা 'প্রকৃতির বিকৃতি কিংবা বিকার'; এবং ইহার পরে অহঙ্কার মহান্ তত্ত্ব হইতে নিঃসৃত বলিয়া 'মহান্' অহঙ্কারের প্রকৃতি বা মূল। এই প্রকারে মহান্ অথবা বুদ্ধি একপক্ষে অহঙ্কারের প্রকৃতি বা মূল; এবং অন্যপক্ষে মূল প্রকৃতির বিকৃতি কিংবা বিকার। তাই সাংখ্যেরা তাহাকে 'প্রকৃতি-বিকৃতি' এই বর্গের মধ্যে ফেলিয়াছে; এবং এই ন্যায়-অনুসারে অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র ইহাদের সমাবেশও 'প্রকৃতি-বিকৃতি' এই বর্গের মধ্যেই করিতে পারা যায়। যে তত্ত্ব বা গুণ স্বয়ং অন্য হইতে নিঃসৃত (বিকৃতি) হওয়ার পরে নিজেই অন্য তত্ত্বের মূলভূত (প্রকৃতি) হয়, তাহাকে 'প্রকৃতি-বিকৃতি' বলা যায়। এই বর্গের সাতটত্ত্ব মহান্, অহঙ্কার ও পঞ্চত-ন্মাত্র। (৩) কিন্তু পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন এবং স্থূল পঞ্চ মহাভূত এই ষোল তত্ত্ব হইতে পরে অন্য কোন তত্ত্বই নিঃসৃত হয় নাই। উল্টা, তাহাই অন্য তত্ত্ব হইতে নিঃসৃত হইয়াছে। তাই, এই ষোল তত্ত্বকে 'প্রকৃতি-বিকৃতি' না বলিয়া শুধু 'বিকৃতি' কিংবা 'বিকার' বলা হয়। (৪) পুরুষ প্রকৃতিও নহে এবং বিকৃতিও নহে; উহা স্বতন্ত্র ও উদাসীন দ্রষ্টা। ঈশ্বরকৃষ্ণ এইরূপ বর্গীকরণ করিয়া—আবার উহার এইরূপে স্পষ্টীকরণ করিয়াছেন:—

মূলপ্রকৃতিরবিকৃতিঃ মহদাদ্যাঃ প্রকৃতি-বিকৃতয়ঃ সপ্ত।
ষোড়শকস্তু বিকারো ন প্রকৃতি র্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ॥

অর্থাৎ—"এই মূলপ্রকৃতি অবিকৃতি অর্থাৎ কোনরূপ বিকার নহে। মহদাদি সাত তত্ত্ব (অর্থাৎ) মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র, প্রকৃতি-বিকৃতি; এবং মনসমেত এগার ইন্দ্রিয় ও স্থূল পঞ্চ মহাভূত মিলাইয়া ষোল তত্ত্বকে শুধু বিকৃতি কিংবা বিকার বলা হয়। পুরুষ প্রকৃতি নহে এবং বিকৃতিও নহে"। (সাং. কা. ৩), পরে এই পঞ্চবিংশ তত্ত্বের আবার অব্যক্ত, ব্যক্ত ও জ্ঞ এই তিন ভেদ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে এক মূল প্রকৃতিই অব্যক্ত, প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন তেইশ তত্ত্ব ব্যক্ত, এবং পুরুষ জ্ঞ। সাংখ্যদিগের বর্গীকরণের ইহাই ভেদ। পুরাণ, স্মৃতি, মহাভারত প্রভৃতি বৈদিক মার্গীয় গ্রন্থ-সমূহে প্রায় এই পঁচিশ তত্ত্বই কথিত হইয়া থাকে (মৈত্র্য. ৬. ১০; মনু ১. ১৪, ১৫ দেখ)। কিন্তু উপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে যে, এই সমস্ত তত্ত্ব পরব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; কিন্তু তাহাতে উহাদের বিশেষ বিচার বা বর্গীকরণও করা হয় নাই। উপনিষদের পরবর্ত্তী গ্রন্থাদিতে মাত্র উহাদের বর্গীকরণ করা হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু উপরি-উক্ত সাংখ্যদিগের বর্গীকরণ হইতে তাহা ভিন্ন। সমষ্ট ধরিয়া পঁচিশ তত্ত্ব; তন্মধ্যে ষোল তত্ত্ব সাংখ্য মতানুসারেই স্পষ্টই অন্য তত্ত্ব হইতে উৎপন্ন হওয়া প্রযুক্ত বিকার বলিয়া তাহাকে প্রকৃতি কিংবা মূলভূত পদার্থ-বর্গের মধ্যে ধরা হয় নাই। বাকী নয় তত্ত্ব অবশিষ্ট রহিল—১ পুরুষ, ২ প্রকৃতি, ৩—৯ মহৎ, অহঙ্কার, ও পাঁচ তন্মাত্র। ইহার মধ্যে, পুরুষ ও প্রকৃতিকে ছাড়িয়া দিয়া, সাংখ্য বাকী সাতকে প্রকৃতি-বিকৃতি বলেন। কিন্তু বেদান্তশাস্ত্রে প্রকৃতি স্বতন্ত্র স্বীকৃত হয় না, এক পরমেশ্বর হইতেই পুরুষ ও প্রকৃতি উৎপন্ন হয় এইরূপ তাঁহাদের সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে মূল-প্রকৃতি ও প্রকৃতি-বিকৃতি এই যে ভেদ সাংখ্য করেন তাহার অবকাশ থাকে না। কারণ, প্রকৃতিও পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন হওয়া প্রযুক্ত তাহাকে মূল বলা যাইতে পারে না, তাহা প্রকৃতি-বিকৃতির বর্গের মধ্যেই আইসে। তাই সৃষ্টি-উৎপত্তি বর্ণনা করিবার সময় বেদান্তী বলেন যে, এক পরমেশ্বর হইতে এক পক্ষে জীব ও অন্য-পক্ষে (মহদাদি সাত প্রকৃতি-

বিকৃতিসহ) অষ্টধা অর্থাৎ আট প্রকারের প্রকৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে (মভা. শাং. ৩০৬. ২৯ ও ৩১০. ১০ দেখ)। অর্থাৎ বেদান্তীদিগের মতে পঁচিশ তত্ত্বের মধ্যে ষোল তত্ত্ব ছাড়িয়া দিয়া বাকী নয় তত্ত্বের 'জীব' ও 'অষ্টধা প্রকৃতি' এই দুই প্রকার বর্গীকরণই হইয়া থাকে। বেদান্তীদিগের এই বর্গীকরণ ভগবদ্গীতাতে স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু ইহাতেও শেষে একটু পার্থক্য ঘটিয়াছে। সাংখ্য যাহাকে পুরুষ বলেন তাহাকেই গীতায় জীব বলা হয়; এবং জীবই ঈশ্বরের পরা প্রকৃতি অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ স্বরূপ এইরূপ উক্ত হইয়াছে; এবং সাংখ্য যাহাকে মূল প্রকৃতি বলেন তাহাকেই গীতাতে পরমেশ্বরের 'অপর' অর্থাৎ কনিষ্ঠ স্বরূপ বলা হইয়াছে (গী· ৭. ৪,৫)। এই প্রকার প্রথমে দুই বৃহৎ বর্গ করিবার পর, উহার মধ্যে দ্বিতীয় বর্গের অর্থাৎ কনিষ্ঠ স্বরূপের পরবর্ত্তী ভেদ কিংবা প্রকার যেখানে বলিতে হইবে সেখানে এই কনিষ্ঠ স্বরূপের অতিরিক্ত ও তাহা হইতে নিঃসৃত বাকী তত্ত্ব বিবৃত করা আবশ্যক। কারণ, এই কনিষ্ঠ স্বরূপ (অর্থাৎ সাংখ্যদিগের মূলপ্রকৃতি) স্বয়ং আপনারই এক প্রকার বা ভেদ হইতে পারে না। উদাহরণ যথা, বাপের কত ছেলে যখন বলিতে হয় তখন তাহার মধ্যে বাপকে গণনা করা যাইতে পারে না। তাই, পরমেশ্বরের কনিষ্ঠ স্বরূপের ভেদ কত হইয়াছে তাহা বলিবার সময় বেদান্তীরা অষ্টধা প্রকৃতির মধ্যে মূল প্রকৃতিকে ছাড়িয়া দেওয়ায় বাকী মহান্, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র এই সাতটী সেই মূলপ্রকৃতির ভেদ কিংবা প্রকার বলিতে হয়। কিন্তু এইরূপ করিলে পরমেশ্বরের কনিষ্ঠ স্বরূপ বা মূলপ্রকৃতি সাত প্রকার বলিতে হয়; এবং উপরে বলা হইয়াছে যে, বেদান্তী প্রকৃতিকে অষ্টধা অর্থাৎ আট প্রকারের বলিয়া স্বীকার করেন। বেদান্তী যে প্রকৃতিকে আট প্রকারের বলেন, গীতা কি তাহাকেই সাত প্রকারের বলেন—এই স্থানে এই বিরোধ দেখা যায়। এই বিরোধ না রাখিয়া 'অষ্টধা প্রকৃতি'র বর্ণনাকেই বজায় রাখা গীতার অভীষ্ট। তাই মহান্, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র এই সাতের মধ্যেই এই অষ্টম তত্ত্ব মনকে পুরিয়া দিয়া পরমেশ্বরের কনিষ্ঠ স্বরূপ অর্থাৎ মূলপ্রকৃতিকে অষ্টধা করিয়াই গীতায় বর্ণিত হইয়াছে (গী· ৭.৫)। তন্মধ্যে মনের ভিতরেই দশ ইন্দ্রিয়ের এবং পঞ্চতন্মাত্রের মধ্যে পঞ্চ মহাভূতের সমাবেশ করা হইয়াছে। এখন ইহা প্রতীত হইবে যে, গীতার বর্গীকরণ সাংখ্যদিগের ও বেদান্তীদিগের বর্গীকরণ হইতে ভিন্ন দেখিতে হইলেও সমস্ত তত্ত্বগুলির সংখ্যা তৎপ্রযুক্ত ন্যূনাধিক হয় না। স্বীকৃত হইয়াছে তত্ত্ব সর্ব্বত্র পঞ্চবিংশতিই। তথাপি বর্গীকরণের উক্ত ভিন্নতার কারণে পাছে ভ্রমে পড়িতে হয় বলিয়া এই তিন বর্গীকরণ কোষ্টকের আকারে একত্র করিয়া পরে দেওয়া হইয়াছে। গীতার ১৩ অধ্যায়ে (১৩.৫) বর্গীকরণের বিষয় বলিবার সময় সাংখ্যদিগের পঁচিশ তত্ত্ব যেমনটি তেমনিই পৃথক্ পৃথক্ বর্ণিত হইয়াছে; এবং তাহা ধরিয়া বর্গীকরণ ভিন্ন হইলেও দুই স্থানেই তত্ত্বসংখ্যা একই—ইহা স্পষ্ট দেখা যায়।

পঁচিশ মূলতত্ত্বের বর্গীকরণ।

সাংখ্যদিগের বর্গীকরণ। তত্ত্ব। বেদান্তীদিগের বর্গীকরণ।

অ-প্রকৃতি-অ-বিকৃতি ১ পুরুষ পরব্রহ্মের শ্রেষ্ঠস্বরূপ।

গীতার বর্গীকরণ।

পরা প্রকৃতি।

অপরা প্রকৃতি।

মূলপ্রকৃতি ১ প্রকৃতি

৭ প্রকৃতি বিকৃতি { ১ মহান্ ১ অহঙ্কার ৫ তন্মাত্র }

পরব্রহ্মের কনিষ্ঠস্বরূপ (আট প্রকারের) } অপরা প্রকৃতির আট প্রকার

১ মন

১৬ বিকার { ৫ বুদ্ধীন্দ্রিয় ৫ কর্ম্মেন্দ্রিয় ৫ মহাভূত } বিকার বলিয়া বেদান্তী এই ষোল তত্ত্বকে মূল-তত্ত্বের মধ্যে গণ্য করেন না

বিকার বলিয়া গীতাতে এই ১৫ তত্ত্বকে মূল তত্ত্বের মধ্যে গণ্য করা হয় নাই।

যাক্। এই পর্য্যন্ত বিচার করা হইয়াছে যে, মূল সাম্যাবস্থায় অবস্থিত একমাত্র নিরবয়ব অব্যক্ত জড় প্রকৃতিতে ব্যক্ত সৃষ্টি উৎপন্ন করিবার অস্বয়ংবেদ্য বুদ্ধি কিরূপে প্রকট হইল; আবার 'অহঙ্কারের দ্বারা' সেই প্রকৃতির মধ্যেই সাবয়ব বহুবস্তুত্ব কিরূপে আসিল; এবং পরে 'গুণ হইতে গুণ', এই গুণপরিণামবাদ অনুসারে একপক্ষে সাত্ত্বিক অর্থাৎ সেন্দ্রিয়সৃষ্টির মূলভূত সূক্ষ্ম এগার ইন্দ্রিয় এবং অপর পক্ষে নিরিন্দ্রিয় অর্থাৎ তামসিক সৃষ্টির মূলভূত পাঁচ সূক্ষ্ম তন্মাত্র কিরূপে নির্ম্মিত হইল। এখন ইহার পরবর্ত্তী সৃষ্টি অর্থাৎ স্থূল পঞ্চ মহাভূত বা তাহা হইতে উৎপন্ন অন্য জড়পদার্থ কি ক্রম-অনুসারে নির্ম্মিত হইল, তাহার ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। সূক্ষ্ম তন্মাত্র হইতেই স্থূল পঞ্চ মহাভূত অথবা 'বিশেষ', গুণপরিণামে উৎপন্ন হইয়াছে ইহাই সাংখ্যশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু বেদান্তশাস্ত্রসম্বন্ধীয় গ্রন্থাদিতে এ প্রশ্নের অধিক বিচার করা প্রযুক্ত প্রসঙ্গক্রমে তাহাও,—এই সূচনারই সঙ্গে ইহা বেদান্তশাস্ত্রের মতে, সাংখ্যদিগের নহে—

সংক্ষেপে বলা আবশ্যক মনে হয়। 'স্থূল পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ, ইহাদিগকে পঞ্চ মহাভূত বা বিশেষ বলে। ইহাদের উৎপত্তিক্রম তৈত্তিরীয় উপনিষদে এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে যে—"আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্ বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী। পৃথিব্যা ওষধয়ঃ। ইত্যাদি" (তৈ. উ. ২.১),—অর্থাৎ প্রথমে পরমাত্মা হইতে (সাংখ্যদের কথামত জড় মূল প্রকৃতি হইতে নহে) আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল এবং জল হইতে পরে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে এই ক্রমের কারণ কি তাহা কথিত হয় নাই। কিন্তু উত্তর-বেদান্ত গ্রন্থাদিতে পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তি-ক্রমের কারণ বিচার সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত গুণপরিণামের তত্ত্বের উপরেই করা হইয়াছে দেখা যায়। এই উত্তরবেদান্ত বলেন যে, "গুণা গুণেষু বর্ত্তন্তে" এই ন্যায় অনুসারে প্রথমে একই গুণের পদার্থ উৎপন্ন হইয়া তাহা হইতে দুই গুণের, তিন গুণের, পদার্থ—উৎপন্ন হইতে হইতে ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। পঞ্চমহাভূতের মধ্যে আকাশের মুখ্যতঃ শব্দ এই একগুণই থাকা প্রযুক্ত আকাশ প্রথমে উৎপন্ন হইল। তাহার পর বায়ু। কারণ, বায়ুর শব্দ ও স্পর্শ এই দুই গুণ আছে। রূপটা বা জলে শুধু শোনা যায় নহে, উহা স্পর্শেন্দ্রিয়েরও গোচর হয়। বায়ুর পর অগ্নি। কারণ, শব্দ ও স্পর্শ এই দুই ছাড়া অগ্নিতে রূপ, এই তৃতীয় গুণ আছে। এই তিন গুণের সঙ্গেই রুচি বা রস, ইহা জলের চতুর্থ গুণ হওয়া প্রযুক্ত, অগ্নির পরে জল হওয়া আবশ্যক; এবং শেষে পৃথিবীতে এই চারিগুণ অপেক্ষা গন্ধ এই গুণটি বিশেষ হওয়া প্রযুক্ত জল হইতে পরে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে এইরূপ সিদ্ধান্ত হয়। যাস্ক এই সিদ্ধান্তই দিয়াছেন (নিরুক্ত. ১৪. ৪)। স্থূল পঞ্চ মহাভূত এই ক্রম-অনুসারে উৎপন্ন হইলে পর "পৃথিব্যা ওষধয়ঃ। ওষধিভ্যোঽন্নম্। অন্নাৎ পুরুষঃ।" (তৈ. ২. ১) পৃথিবী হইতে বনস্পতি, বনস্পতি হইতে অন্ন, এবং অন্ন হইতে পুরুষ উৎপন্ন হইল,—এইরূপ তৈত্তিরীয়োপনিষদেও পরে বর্ণিত হইয়াছে। এই সৃষ্টি পঞ্চমহাভূতের মিশ্রণে উৎপন্ন হওয়ায় সেই মিশ্রণক্রিয়াকে বেদান্ত-গ্রন্থাদিতে 'পঞ্চীকরণ' এই নাম প্রদত্ত হইয়াছে। পঞ্চীকরণের অর্থে পাঁচ মহাভূতের মধ্যে প্রত্যেকের ন্যূনাধিক অংশ লইয়া সেই সমস্তের মিশ্রণে নূতন পদার্থ প্রস্তুত হওয়া। এই পঞ্চীকরণ কাজেই অনেক প্রকারের হইতে পারে। শ্রীসমর্থ রামদাস স্বামী "দাসবোধ" গ্রন্থে এই কথারই সমর্থন করিয়া বর্ণন করিয়াছেন—

কালেঁ পাঁচরে মেলবিতাঁ। পাববেঁ হোতেঁ তত্ত্বত।
কালেঁ পিবলেঁ মেলবিতাঁ। হিববেঁ হোয়॥

অর্থাৎ কাল-সাদা মিলিয়া পায়রা (নীল) হয়, কালো হলুদে মিশিয়া সবুজ রং হয়। দাস বোধের নবম দশকে (৯.৬.৪০) এইরূপ বলিয়া তের দশকে—

ত্যা ভূগোরাচে পোটী। অনন্ত বীজাঁচিয়া কোটী॥
পৃথ্বী মানা হোতাঁ ভেটী। অঙ্কুর নিবতী॥
পৃথ্বী বল্লী নানা রঙ্গ। পত্রেঁ পুষ্পাঁচে তরঙ্গ।
নানা স্বাদ তে মগ। ফলেঁ জালী॥

* * *

অণ্ডজ, জারজ, স্বেদজ উদ্ভীজ। পৃথ্বী পানী সকলাচে বীজ
ঐসে হে নবম চীজ। সৃষ্টি বচনেচেঁ॥
চারি খানী চারী বাণী। চৌর্‌য্যাশী লক্ষ * জীব যোনী
নির্ম্মাণ ঝালে লোক তিহীঁ। পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ড॥

অর্থাৎ—সেই ভূগোলের উদরে অনন্ত কোটি বীজ রহিয়াছে। মাটির সহিত মিলন হইয়া অঙ্কুরের উৎপত্তি হয়। পৃথিবীতে লতার নানা রঙ্গ, পত্র পুষ্পের তরঙ্গ। তারপর নানা আস্বাদের নানা ফল। অণ্ডজ, জারজ, স্বেদজ উদ্ভিদ—পৃথ্বী ও জল সকলের বীজ॥ এই সৃষ্টি রচনা আশ্চর্য্য। এই প্রকার চারি খণ্ড, চারি বাণী, চুরাশি লক্ষ জীবযোনি তিনলোক পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ড নির্ম্মিত হয়। (দা. ১৩. ৩. ১০-১৫)।

* চৌরাশী লক্ষ যোনির কল্পনা পৌরাণিক হওয়ায় ইহা আনুমানিক স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। তথাপি ইহা একেবারেই ভিত্তি-হীন নহে। পাশ্চাত্য আধিভৌতিকপন্থী উৎক্রান্তিবাদ-অনুসারে সৃষ্টির আরম্ভে উৎপন্ন এক ক্ষুদ্র গোল সজীব জন্তু হইতে মনুষ্য প্রাণী উৎপন্ন হইয়াছে, এইরূপ মানেন। এই কল্পনা অনুসারে সূক্ষ্ম গোল জন্তু হইতে স্থূল গোল জন্তুর উৎপত্তি, এই স্থূল জন্তু হইতে পুনরায় ক্ষুদ্র কীটের উৎপত্তি, ক্ষুদ্র কীট হইতে তাহার পরবর্ত্তী প্রাণীর উৎপত্তি; প্রত্যেক যোনি অর্থাৎ জাতির মধ্যে এইরূপ অনেক ধাপ চলিয়া গিয়াছে, স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। এই সম্বন্ধে এক ইংরেজ জীবশাস্ত্রজ্ঞ এইরূপ গণনা করিয়াছেন যে, জলের ক্ষুদ্র মৎস্যাদিগের গুণধর্ম্ম বাড়িতে বাড়িতে তাহাদের মনুষ্যের স্বরূপ প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে মধ্যবর্ত্তী বিভিন্ন জাতির মোট সংখ্যা ৫৩ লক্ষ ৭৮ হাজার ধাপ চলিয়া গিয়াছে; এবং কখনও বা এই সংখ্যার দশগুণও হইতে পারে। জলের ক্ষুদ্র জলচর হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত এই যোনি উৎপন্ন হয়। ইহার মধ্যেও ক্ষুদ্র জলচরের পূর্ব্ববর্ত্তী সজীব জন্তু ধরিলে আরো কত লক্ষ বংশ ধরিতে হয় তাহার কল্পনাও করা যায় না। ইহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে আমাদের পুরাণের চৌরাশী লক্ষ যোনির কল্পনা অপেক্ষা আধিভৌতিক শাস্ত্রের পৌরাণিক-বংশকল্পনা কত বাড়িয়া গিয়াছে। কালের কল্পনা সম্বন্ধেও এই ন্যায়ই প্রযুক্ত হইতে পারে। সজীব জগতের সূক্ষ্ম জন্তু এই পৃথিবীতে কখন উৎপন্ন হইল, স্থূল পরিমাণেও তাহা নিশ্চয় করিতে না পারায় সূক্ষ্ম জলচরের উৎপত্তিও কোটি বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছে এইরূপ ভূগর্ভগত-জীবশাস্ত্রজ্ঞেরা বলেন। এই সম্বন্ধে সংক্ষেপে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে The Last Link by Ernst Haeckel with notes &c by Dr Gadow (1898) এই পুস্তক দেখিবে। এই পুস্তকে ডাক্তার গাডো যে দুই তিন উপযুক্ত পরিশিষ্ট যোজিত করিয়াছেন তাহাতে উপরি-উক্ত অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। পুরাণের চৌরাশী লক্ষ যোনির হিসাব এই প্রকারে কর হইয়াছে—১ লক্ষ জলচর, ১০ লক্ষ পক্ষী, ১১ লক্ষ কৃমি, ২০ লক্ষ পশু, ৩০ লক্ষ স্থাবর ও চার লক্ষ মনুষ্য (দাস. ২০.৬ দেখ)।

কিন্তু পঞ্চীকরণের দ্বারা শুধু জড় পদার্থ কিংবা জড় দেহই উৎপন্ন হয়। এই জড় দেহের সচেতন প্রাণী হইতে হইলে প্রথমে সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের সহিত পরে আত্মার সহিত অর্থাৎ পুরুষের সহিত জড় দেহের সংযোগ হওয়া আবশ্যক ইহা বিস্মৃত হইলে চলিবে না।

উত্তরবেদান্ত-গ্রন্থাদিতে বর্ণিত এই পঞ্চীকরণ প্রাচীন উপনিষদের নহে ইহাও এখানে বলা আবশ্যক। পঞ্চ তন্মাত্র বা পাঁচ মহাভূত স্বীকার না করিয়া ছান্দোগ্যোপনিষদে 'তেজ, জল ও অন্ন (পৃথ্বী)' এই তিন সূক্ষ্ম মূলতত্ত্ব লইয়া তাহাদের এই মিশ্রণে অর্থাৎ 'ত্রিবিৎকরণের' পরে বিবিধ সৃষ্টি উৎপন্ন হইল এইরূপ বর্ণনা আছে। এবং "অজামেকাং লোহিতশুক্ল-কৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ" (শ্বেতা. ৪, ৫)-অর্থাৎ—লাল বা তেজরূপী, সাদা বা জলরূপী এবং কালো বা পৃথ্বীরূপী এই তিন রং-বিশিষ্ট তিন তত্ত্বের এক যে অজা অর্থাৎ ছাগ ইহা হইতে নামরূপাত্মক অনেক প্রজা (সৃষ্টি) উৎপন্ন হইয়াছে—এইরূপ শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে উক্ত হইয়াছে। ছান্দোগ্যোপ-নিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে শ্বেতকেতু ও তাহার পিতার সংবাদ (কথোপকথন) প্রদত্ত হইয়াছে। তাহাতে আরম্ভেই শ্বেতকেতুকে তাহার পিতা এইরূপ স্পষ্ট বলি-তেছেন যে, "বাবা! জগতের আরম্ভে 'একমেবাদ্বিতীয়ং সৎ' ব্যতীত অর্থাৎ যথাতথা সমস্ত একবস্তুময় ও নিত্য পরব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। যাহা অসৎ (অর্থাৎ 'নাই') তাহা হইতে সৎ কিরূপে উৎপন্ন হইবে? তাই আরম্ভে সৎ-ই সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া ছিল। তাহার পর, উহা, অনেক অর্থাৎ বহু বস্তু হইবে মনে করাতে তাহা হইতে ক্রমে সূক্ষ্ম তেজ (অগ্নি), জল, ও পৃথিবী উৎপন্ন হইল। তাহার পর এই তিন তত্ত্বের মধ্যেই জীবরূপে পরব্রহ্ম প্রবেশ করিলে, তাহাদের ত্রিবিৎকরণের দ্বারা জগতের অনেক নামরূপাত্মক বস্তু নির্ম্মিত হইল। স্থূল অগ্নি, সূর্য্য বা বিদ্যুৎ ইহাদের জ্যোতিতে যে তাম্র (লোহিত) রং আছে তাহা সূক্ষ্ম তেজোরূপী মূলতত্ত্বের পরিণাম, যে সাদা (শুক্ল) রং আছে তাহা সূক্ষ্ম জলতত্ত্বের এবং যে কালো (কৃষ্ণ) রং আছে তাহা সূক্ষ্ম পৃথ্বীতত্ত্বের পরিণাম। সেইরূপ আবার মনুষ্য যে অন্ন ভক্ষণ করে তাহাতেও সূক্ষ্ম তেজ, সূক্ষ্ম জল ও সূক্ষ্ম অন্ন (পৃথ্বী) এই তিন মূলতত্ত্বই ভরিয়া থাকে। দধি ঘুঁটিলে যেমন মাখন উপরে আইসে সেইরূপ উপরি-উক্ত তিন সূক্ষ্ম তত্ত্বের দ্বারা উৎপন্ন অন্ন উদরে গেলে, তন্মধ্যে তেজতত্ত্ব হইতে মনুষ্যের দেহে অস্থি, মজ্জা ও বাণীরূপে অনুক্রমে স্থূল, মধ্যম ও সূক্ষ্ম পরিণাম উৎপন্ন হয়; এবং সেইরূপ জল এই তত্ত্ব হইতে মূত্র, রক্ত ও প্রাণ; এবং অন্ন অর্থাৎ পৃথ্বী এই তত্ত্ব হইতে পুরীষ, মাংস ও মন এই তিন দ্রব্য নির্ম্মিত হইয়া থাকে (ছাং. ৬. ২-৬)। মূল মহাভূত পাঁচ না মানিয়া তিনই মানিয়া ত্রিবিৎকরণের দ্বারা সমস্ত দৃশ্য পদার্থের উৎ-পত্তির ব্যবস্থা করিবার ছান্দোগ্যোপনিষদের এই পদ্ধতিই বেদান্তসূত্রে (২. ৪. ২০) উক্ত হইয়াছে। বাদরায়ণাচার্য্য পঞ্চীকরণের নামও করেন নাই। তথাপি তৈত্তিরীয় (২. ১), প্রশ্ন (৪. ৮), বৃহদারণ্যক (৪. ৪. ৫) প্রভৃতি অন্য উপনিষদে এবং বিশেষত শ্বেতাশ্বতর (২. ১২), বেদান্তসূত্র (২. ৩. ১-১৪) ও পরিশেষে গীতা (৭. ৪; ১৩-৫) এই সকলেও তিনের বদলে পাঁচ মহাভূত উক্ত হইয়াছে। এবং গর্ভোপনিষদে মনুষ্যদেহ 'পঞ্চাত্মক' এইরূপ আরম্ভেই কথিত হই-য়াছে; মহাভারত ও পুরাণে পঞ্চীকরণ স্পষ্টই বর্ণিত হইয়াছে (মভা. শাং. ১৮৪-১৮৬)। ইহা হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ত্রিবিৎকরণ প্রাচীন হইলেও যখন মহাভূতের সংখ্যা তিনের বদলে পাঁচ স্বীকৃত হইতে লাগিল, তখন ত্রিবিৎকরণের নমুনাতেই পঞ্চীকরণের কল্পনার প্রাদুর্ভাব হইল এবং ত্রিবিৎকরণ পশ্চাতে পড়িয়া রহিল; এবং পরিশেষে পঞ্চীকরণের কল্পনা বেদান্তীদিগের গ্রাহ্য হইল। পরে এই পঞ্চীকরণ শব্দের অর্থে এই কথাও বলা হইয়াছে যে, মনুষ্যের শরীর কেবল পঞ্চমহাভূতে গঠিত নহে, কিন্তু এই পঞ্চ মহাভূতের মধ্যে প্রত্যেক পাঁচ প্রকার শরীরের মধ্যে বিভক্ত হইয়াছে। উদাহরণ যথা—ত্বক্, মাংস, অস্থি, মজ্জা ও স্নায়ু এই পাঁচটি বিভাগ অন্নময় পৃথ্বীতত্ত্বের ইত্যাদি ইত্যাদি (মভা. শাং, ১৮৪. ২০-২৫; ও মরাঠী দাসবোধে ১৭, ৮ দেখ)। এই কল্পনাও উপরিপ্রদত্ত ছান্দোগ্যোপনিষদের ত্রিবিৎকরণের বর্ণনা হইতে সূচিত দেখা যায়। কারণ, সেখানে শেষে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে 'তেজ, জল, ও পৃথ্বী এই তত্ত্বগুলির প্রত্যেকের তিন তিন প্রকার মনুষ্যের দেহে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

(ক্রমশঃ)

রাণাডের-স্মৃতিকথা।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

ফায়নান্স্ কমিটিতে নিয়োগ—১৮৮৬ অব্দ।

সিমলাযাত্রা।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর)

সেখান হইতে আমরা যাত্রা করিয়া প্রথমে হরিদ্বারে আসিলাম। সে সময়ে সিধা হরিদ্বার পর্য্যন্ত রেল গাড়ী হয় নাই। রেল ছাড়িয়া ১৩।১৪ ক্রোশ আমাদিগকে

টাঙ্গা করিয়া যাইতে হইল। হরিদ্বারে আমরা সিদ্ধিয়ার সরায়ে উঠিলাম। সেইদিন শ্রাবণী সোমবার ছিল। ঠিক-দুফর বেলা, খুবই গরম হইয়াছিল। আমাদের দেশের চৈত্র বৈশাখের মতো সেখানে আষাঢ় শ্রাবণ শুকনো গরমের দিন। এই সময় উত্তাপে হিমালয়ের বরফ গলিয়া গঙ্গায় আসিয়া পড়ায় বন্যার জলে গঙ্গা ভরিয়া উঠিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া চলিতেছিল এবং অতি মনোরম দেখিতে হইয়াছিল। তাছাড়া এই সময় আমরা সিমলার ঠাণ্ডা হাওয়া হইতে সদ্য নীচে নামিয়া আসায় হিমালয়ের পাদদেশস্থ উষ্ণতা আমরা বেশ অনুভব করিয়াছিলাম, এবং অহমদাবাদে আসিয়া পৌঁছিবার পূর্বেই, ঐ উষ্ণতার পরিণাম "ওঁর" শরীরের উপর প্রকটিত হইয়াছিল। সে কথা পরে বলিব। "খেজুরের সারী"তে সিদ্ধিয়ার সরায়ে উঠিয়া জিনিসপত্র গুছাইয়া রাখিবার পর, "আমি কি কিছু জলযোগের আয়োজন করিব?"—এই কথা ওঁকে জিজ্ঞাসা করিতে গেলাম। দুধ এখনো পাওয়া যায় নাই। আজ শ্রাবণী সোমবার আমাদের মধ্যে কতকগুলি লোক উপোস করিবেন—তাই রান্নাটা দেরীতে আরম্ভ করিলে সকলেরই সুবিধা হইবে, এই কথা আমি বলিতেছিলাম; কিন্তু শোনে কে? ওঁর দৃষ্টি তখন কোনদিকে ছিল? পুরুষদিগের বসিবার জায়গা লম্বালম্বি সোজা সারিতে ছিল। তাতে ৫।৭টা জানালা ও সেই জানালার মধ্যে তাকিয়ার মতো পাথরের কাঠোরা দেওয়া। জানালার নীচেই গঙ্গার প্রবাহ-পথ হওয়ায়, গঙ্গার জল ভরিয়া উঠিয়া সেই জল জানালায় উপবিষ্ট লোকদিগের হাতে সহজে লাগে। এইরূপ এক জানালায় উনি বসিয়া ও দুই হাত গঙ্গার প্রবাহে ছাড়িয়া দিয়া জলখেলা করিতেছিলেন। চেহারা গম্ভীর, গঙ্গার উৎপত্তি স্থানের দিকে দৃষ্টি দৃঢ়বদ্ধ। তাঁহার মন চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া গঙ্গাময় হইয়া গিয়াছিল। মধ্যে মধ্যে মুখে আনন্দ ও উল্লাস প্রকাশ পাইতেছিল। এই তল্লীন অবস্থা দেখিয়া আমি কয়েক মিনিট চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ওঁর মুখ দেখিতে লাগিলাম, কারণ ইহার মাঝে একটা বিক্ষেপ আনিতে আমার মন সরিল না। ইতিমধ্যে রাওবাহাদুর পণ্ডিত সামনে আসিয়া বলিলেন,—"আমাদের কিছু "খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা?" আমি বলিলাম—"হাঁ, আমি ঐ কথাই জিজ্ঞাসা করতে এসেছি, দুধ এখনো পাওয়া যাইনি, মোহনভোগ করে এনে দেব কি?" এইরূপ আমাদের কথাবার্তা চলিতেছে এমন সময় 'উনি' আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন "ব্যাপারটা কি? কি বলচ?" আমি পূর্বে যাহা বলিয়াছি তাহাই বলিলাম। তাহাতে উনি বলিলেন, "আমি এখন খাব না। তোমরা যখন খাবে তখন আমি খাব। কিন্তু এই ব্যক্তির যাতে সুবিধা হয় আগে তাই কর। "ওঁর ক্ষুধা সহ্য হয় না," এইরূপ শঙ্কর রাওর দিকে তাকাইয়া হাসিয়া বলিলেন। এই সুযোগ পাইয়া পণ্ডিত আমাকে বলিলেন "দিদি ওঁর খিদে হবে কি করে'!! তুমি সেদিকে কাজে ছিলে, কিন্তু এখানে আসা অবধি ওঁর মনোভাব একেবারে গঙ্গাময় হয়ে গেছে। আমার মনে হয় ওঁর এখন হরিদ্বারেই বাস করবার ইচ্ছা হয়েছে। শুধু নামের দরুণ এতটা মনের টান হয়েছে, তারপর প্রত্যক্ষ মহাদেবকে দেখলে না জানি কি কাণ্ডই করবেন!!" তখন উনি হাসিয়া বলিলেন:—"এখানে তুমি একটা মস্ত ভুল করেছ!! এ কথা তোমার উপরেই খাটে, কারণ আমার নাম মহাদেবের নাম নয়, আমার নাম তিন-অক্ষরী বিষ্ণুর নাম (মাধব)।" তবু শঙ্কর রাও আবার বলিলেন:—"কিন্তু দিদি এখানে উনি যদি থাকতে ইচ্ছা করেন তাহলে তোমার কি হবে?" সেই কুসুমতী পাহাড়ের কথার এটা পাল্টা জবাব, এই কথা তৎক্ষণাৎ আমার মনে হওয়ায় আমি বলুম, "আমার আর কি হবে? আমার ভাবনা কিসের? যেখানেই থাকা হোক না আমি ত ওঁর কাছেই থাকব। তবে আমার ভয় কিসের? আমরা এখানে থাকলে তোমারই কাজ আরও বেড়ে যাবে। রোজকার সংবাদপত্র বই প্রভৃতি পাঠানো, নিজের কোন কাজকর্মের চেষ্টা হলে তাহা জানানো, মত জিজ্ঞাসা করা,—এ সমস্ত কাজ তোমারই করতে হবে। পুণার বন্ধুমণ্ডলীর সঙ্গরূপ আফিম-মৌতাত ছাড়তে হবে এবং তাঁদের কথা-চালাচালিরূপ উদ্ধবের কাজ তোমাকেই করতে হবে।" তখন পণ্ডিত বলিলেন, "উদ্ধবই কি, আর রাধবই কি, পুণার লোক সকল-দেশের সেরা ঝগড়াটে! আর তাদের উপরই এত ভালবাসা? পুণা ওঁর প্রাণ বল্লেও হয়! পুণা ছেড়ে কোথাও ওঁর ভাল লাগে না। এখানে ধ্যানস্থ হয়ে বসে থাকলেও মনের টানটা পুণার দিকেই আছে।" এই সব কথাবার্তা চলিতেছিল, উনি চুপ করে সব শুনিতেছিলেন, তারপর বলিলেন; "সম্পূর্ণরূপে না হইলেও তুমি যা বলছ তা কতকটা তোমার উপদেই আরোপ করা যেতে পারে।" যাক্। এইরূপ কথা হইতেছিল এমন সময় ক্ষেত্রোপাধ্যায়, সিদ্ধিয়ার উকিল প্রভৃতি লোক দেখা করিতে আসিলেন। তাঁহাদের সহিত কথাবার্তা কহিয়া হাওয়ার সময় আমাদের আহার হইল। আহারান্তে আমরা সবাই কনখল তীর্থ দেবালয় ও গঙ্গোত্রী, বদ্রিকেদারা যাইবার দরজা প্রভৃতি দেখিয়া বাড়ী ফিরিলাম; এবং রাত্রির গাড়ীতে যাত্রা করিয়া সকালে লাহোরে আসিয়া পৌঁছিলাম।

সকালে লাহোর ষ্টেশনে আমাদের গাড়ী আসিয়া

পৌঁছিল। সেখানে লাহোরের মিত্রমণ্ডলী আমাদের লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছিলেন; তাঁরা যে স্থান আমাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন আমরা সেইখানে গিয়া উঠিলাম। লাহোরে একটা বক্তৃতা দিবার জন্য তাঁহারা আগ্রহ প্রকাশ করায় উনি রাজি হইলেন এবং সেইদিন সন্ধ্যাকালেই ওঁর বক্তৃতা হইল। আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য কতকগুলি পঞ্জাবী বন্ধুর স্ত্রীরা আসিয়াছিলেন। তাঁরা আমাকে সঙ্গে লইয়া সমস্ত সহর এবং সার্থজনিক বাগান ও কেল্লা দেখাইলেন এবং সন্ধ্যাকালে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিলেন। তারপর দিন, কতকগুলি মহিলার আগ্রহ বশতঃ আমি তাঁদের বাড়ী গেলাম। ওঁর মিত্রমণ্ডলীও ওঁর অভ্যর্থনার্থ "পানসুপারীর" নিমন্ত্রণ করিলেন। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিলে, লাহোরের প্রসিদ্ধ কাঠের কাজ, রূপার গিল্‌টি করা উত্তম নক্সাদার বাসন, রেসমি ও কলাবতুর ছুঁচের কাজ-করা হরেক রকমের কাপড়, ছেলেমেয়েদের খেলনা প্রভৃতি খরিদ করিয়া আবার রাত্রির গাড়ীতে যাত্রা করিলাম এবং তাহার পর দিন অমৃতসরে আসিয়া পৌঁছিলাম।

অমৃতসরের প্রখর গ্রীষ্ম অসহ্য মনে হইল। রেলগাড়ী ও রাস্তার কুলীদের মাথার উপর মোট থাকিলেও, তাহাদের এক হাতে পাখা থাকা চাই-চাই। এত-কড়া গ্রীষ্ম যে, কাজ করিবার সময়েও এক হাতে পাখা-করা চাই, নৈলে চলে না। যাঁহারা আমাদের অভ্যর্থনার জন্য ষ্টেশনে আসিয়াছিলেন, তাঁরাই পরে আমাদিগকে একটা বাসা-বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিলেন। আমাদের থাকিবার জন্য তাঁরা একটা বড় সরাই নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। সেখানে তাঁরা কৌচ, কেদারা, ফলকরা দুধ প্রভৃতি পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত রাখিয়াছিলেন। তাছাড়া তিন চার জন কুলী হাতে পাখা লইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। এই অঞ্চলে "ফিয়র" নামক ফল বিস্তর জন্মে। অম্লমিঠা স্বাদ—বড়ই মধুর। যাঁহারা পৌঁছিয়া দিতে আসিয়াছিলেন তাঁহারা ফিরিয়া গেলে পর, পণ্ডিত ও উনি একটু দুগ্ধ পান করিয়া ও কিছু ফল খাইয়া আপন আপন পুস্তক খুলিয়া কৌচের উপর আরামে গা ঢালিয়া দিলেন। কুলীরা পাখা করিতে ছিল। আমার জন্যেও পর্দ্দা ঘিরিয়া কামরার মতো একটু জায়গা করা হইয়াছিল এবং কোন এক মিত্র, নিজের বাড়ীর একজন মজুরণীকে পাখা করিবার জন্য পাঠাইয়া ছিলেন। কিন্তু আমি সেই মজুরণীকে বলিলাম, "এখন তুই বাড়ী যা, তোকে দরকার নেই। আমার দাসী আমার সঙ্গেই আছে।" এই কথা বলিয়া তার হাতে চারি আনা পয়সা দিলাম; পয়সা পাইয়া সে তখনি চলিয়া গেল, আমিও একটু আরাম করিলাম। কারণ সমস্ত জিনিসপত্রের ব্যবস্থা করিয়া, রান্নার সরঞ্জাম বাহির করিয়া লইয়া রান্না করাই আমাদের প্রধান কাজ। পুরুষদের খাওয়া না হইলে, কাজ ফেলিয়া গরম হইতেছে বলিয়া আরামে পাখার বাতাস খাইতে খাইতে পড়িয়া থাকা, হিন্দু-রমণী আমাদের রুচিবে কেন? আমি নীচে গিয়া রান্নার সমস্ত যোগাড় করিয়া দিলাম। বাসন-কোসন ঠিক্-ঠাক্ করিলাম এবং রান্না না হওয়া পর্য্যন্ত সেইখানেই বসিয়া রহিলাম। কিন্তু অত বেলায় আমার চার বার ঠাণ্ডা জলে গা ধুইতে হইল, তার পর ভাত বাড়িতে সমর্থ হইলাম। এমন ভয়ানক গ্রীষ্ম। আমরা যে সরাইয়ে উঠিয়াছিলাম, সেই সরাইটা খুবই বড় ছিল। সরাইয়ের দরজা হইতে ভিতরে আসিবার পর প্রায় ২৫।৩০ হাত দূরে একটা বড় বাঁধানো পুষ্করিণী ছিল। পুষ্করিণীর তিন ধারে বড় বড় ধাপ বাঁধানো, তাহার উপর ঘাটের বাঁধানো চাতাল। তাহাতে প্রবাসীদের নামিবার সুবিধা ছিল। প্রথম-দরজা হইতে ভিতরে সরায়ে আসিবার সময় দরজা বড় ফটকের মতো হওয়ায়, তাহার ভিতরে দুই পাশে দই-য়ে ভরা বড় বড় মাটীর ঘড়া, পানের খিলি, ফুল, পাখা, সরবৎ ও ফলফুলরি—এই সমস্তের দোকান দুইদিকে বসিয়াছিল। বাহির হইতে আসিয়া প্রত্যেক ব্যক্তি, নিদেন আধপয়সার দই কিনিয়া ভিতরে আসিবার পর, সরায়ের মধ্যস্থলে অবস্থিত বড় পুষ্করিণীতে গায়ে দই মাখিয়া স্নান করিয়া যাইবে। এই ব্যাপার সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত চলিতে থাকে। এই পুষ্করিণীর একটা কোণ ঘিরিয়া উঁচু পাকা দেয়াল গাঁথিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং ভিতরে যাইবার একটিমাত্র বাঁকা পথ রাখা হইয়াছিল, ঐ জায়গা কেবল স্ত্রীলোকদের স্নানের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। স্ত্রীলোকেরাও পুরুষদের মতো দই কিনিয়া ভিতরে আসে। এই লোকদের মধ্যে পর্দ্দার কড়া ব্যবস্থা থাকায়, মুখের উপর "বুর্‌খা" দিয়া উহারা স্নানের ঘরে গমন করে। আমি প্রথমে উহাদেরই স্নান-ঘরে স্নান করিয়াছিলাম। আমি আমার পরা-কাপড়-চোপড় সমেত স্নান করিবার জলে প্রবেশ করিলাম। আমার এই ব্যবহার সেখানে অবস্থিত মহিলাদের ভাল বোধ হইল না। কোন কোন রমণী হাসিতে লাগিল, কিন্তু আমি সেদিকে লক্ষ্য করিলাম না দেখিয়া দুই একজন পাকা মেয়ে আমাকে বলিল; "ওগো, কাপড় গায়ে রেখে স্নান করলে কি পরিষ্কার মনে হয়? আমরা কি পুরুষ মানুষ? স্ত্রীলোকের মধ্যে স্ত্রীলোকের লজ্জা কিসের? তোমাদের দেশের কি এই চাল্?" আমি বলিলাম—"হাঁ! তোমাদের মত স্নান করা আমাদের কখনই অভ্যাস নাই।" এই কথা বলিয়া আমি সেখান হইতে বাহির হইয়া গেলাম। এই স্নান ঘরে যারা স্নান করিত সেই সব রমণীর একই রীতি হওয়ায় তাহারা

কিছুই মনে করিত না। কিন্তু আমার এইরূপ স্থানে অভ্যাস না থাকায় আমার বড় লজ্জা করিত। আমাদের মধ্যাহ্নভোজন হইয়া গেলে, কতকগুলি শিখ-মৈত্রিনী আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। লোকে যে বলে অমৃতসরে এক সোনার মন্দির আছে, না জানি সে কি রকম তাই দেখিবার জন্য আমি এই মহিলাদের সহিত গেলাম। মন্দিরের কেবল ভিতর দিক্‌টা সোনার কারীর বেলবুট্ট ও নক্‌সা করা। মন্দিরে বিশেষ কিছু দেখিলাম না। পুরাণ শুনিবার জন্য স্ত্রীলোক ও পুরুষদিগের খুব ভীড় হইয়াছিল। মন্দিরে এবং মুখ্য স্থানে অন্য হিন্দু মন্দিরের ন্যায় দেবতা, শিবলিঙ্গ, কিংবা কোন রকম মূর্ত্তি বা আকার কিছুই ছিল না; মুখ্য স্থানে একটি ভব্য ধরণের চৌকী পাতিয়া তাহার উপর মূল্যবান কাপড়ে আচ্ছাদিত 'গ্রন্থ-সাহেবের' এক পুঁথি ছিল। "এই আমাদের দেবতা এবং এ-ই আমাদের ধর্ম্মগ্রন্থ"—আমার সঙ্গিনী মহিলারা আমাকে বলিলেন। তার পর ফিরিয়া আসিবার সময় কতকগুলি মহিলার বিশেষ অনুরোধে আমি তাঁহাদের বাড়ী গেলাম। তাঁদের চাল-চলন অনুসারে তাঁরা হুক্কা, সরবৎ পানসুপারী প্রভৃতি আতিথ্যের দ্রব্য আমার সম্মুখে আনিয়া ধরিলেন। আমরা দক্ষিণী রমণী আমাদের রোজ পান খাইবারও অভ্যাস নাই; তবে অন্য জিনিসটার সহিত আমাদের পরিচয় কি-করিয়া হইবে!! কারণ হুকার সহিত আমাদের পুরুষদেরও প্রায় পরিচয় নাই বলিলেও চলে। কাজে-কাজেই আমি এই আতিথ্যসৎকার অস্বীকার করিলাম। তাহার পর তাঁহাদিগের রীতি অনুসারে একটা মস্ত সম্মান—গৃহকর্ত্রী আমাকে পানের খিলি দিলেন এবং আমি তাহা গ্রহণ করিলাম। এবং তাঁহাদের চাল-চলন সম্বন্ধে কিছু কথা বলিয়া আমি বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। সেই রাত্রিতেই আমরা অমৃতসর হইতে যাত্রা করিয়া তাহার পর দিন দিল্লীতে আসিয়া পৌছিলাম।

দিল্লীতেও এইরকম একটা বড় সরায়ে উঠিলাম। সেই সরায়ের নীচের তালায় বাঙ্গালী তীর্থযাত্রীর এক বড় দল উঠিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যাই বেশী। তাহার মধ্যে, কতকগুলি বালিকা, কতকগুলি গর্ভিণী, কতকগুলি ছেলেপিলের মা, এবং কতকগুলি বৃদ্ধা—এইরূপ সকল রকমের রমণী ছিল। গায়ে চেলি নাই, কপালে কুঙ্কুম নাই, শুধু তাহা নহে, তাহার মধ্যে একজনেরও মাথায় চুল নাই। কাপড়ের আঁচল শুধু মাথার উপর থাকায় তাহাদিগকে আমাদের বিধবা রমণীদের মত দেখিতে হইয়াছিল। এই সমস্ত লক্ষণ হইতে আমার ইহাদিগকে বিধবা মনে করিয়া আমার মন বড় খারাপ হইল। এবং এই ভাবেই পুনঃপুনঃ তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছিলাম—কিন্তু দেখিলাম, তাহারা হাসিতেছে খেলিতেছে, ঠাট্টা মস্করা আমোদ করিতেছে। এই সব দেখিয়া আমার মনে হইল আমার হয়ত ভুল হইয়াছে। বোধ হয় ইহারা বিধবা নহে; কিন্তু সকলেই সধবা-চিহ্ন বিবর্জ্জিত একইরকম কি করিয়া হইল? এই সম্বন্ধে উহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া সন্দেহটা দূর করিব মনে করিলাম—কিন্তু ভাষার প্রতিবন্ধক আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি বাঙ্গালার এক শব্দও বুঝিতাম না এবং উহারাও ইংরেজী কিংবা মরাঠী জানিত না। তাছাড়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিবার সময়ও ছিল না। কারণ আমরা দিল্লীর প্রসিদ্ধ ইমারৎ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য স্থান ও মিনার আজি দেখিয়া দুই দিন পরেই আগ্রায় আসিলাম। সেখানকার মুখ্য ইমারৎ তাজমহল দেখিতে গেলাম। স্বচ্ছ ও কৃষ্ণবর্ণ বৃহৎ প্রবাহযুক্ত যমুনা-নদী পরিবেষ্টিত সেই সুন্দর মর্ম্মর-প্রস্তরের তাজমহল আমরা দেখিলাম। তাহার প্রত্যেক স্তম্ভের উপর যে বেলবুটী গাছ, ফুল ও পাখীর চিত্র খোদিত হইয়াছে, তাহা সকল রকম রঙের পাথর মিলাইয়া যথা প্রমাণ উত্তমরূপে বসান হইয়াছে। এইরূপ ইমারৎ নির্ম্মাণ করিবার জন্য যিনি অগণিত অর্থ ব্যয় করিয়াছেন তাঁহার সম্বন্ধে বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না। কিন্তু তাহা অপেক্ষাও, এই ইমারৎ নির্ম্মাণকারী শিল্পকারের কার্য্য আরও অধিক বিস্ময়জনক বলিয়া মনে হয়, সন্দেহ নাই। সেখানকার আরো কতকগুলি দ্রষ্টব্য স্থান দেখিয়া আমরা মথুরায় আসিলাম। তার পর দিন নৌকা করিয়া গোকুল ও বৃন্দাবন দেখিতে গেলাম। গোকুলে দ্রষ্টব্য জিনিস কিছুই নাই। কিন্তু বৃন্দাবনে কেবল অতীব সুন্দর-গঠিত বড় বড় দেবালয় আছে। দেবালয়ের হাতাও খুব বড়। সেদিন গোকুল অষ্টমীর উৎসবের দিন হওয়ায় তদ্দেশীয়, অর্থাৎ ব্রজবাসী, গুজরাটি ও বাঙ্গালী প্রায় শ-দেড়শো ব্রাহ্মণ আপন আপন শ্রীমদ্‌ভাগবতের পুঁথী সম্মুখে রাখিয়া পাঠ করিতেছিলেন। এই সপ্তাহের সমস্ত ব্যয়নির্ব্বাহ ও ব্রাহ্মণভোজনের ব্যবস্থা ধনী যাত্রীরাই করিয়াছিলেন; পাণ্ডারা এইজন্য যাত্রীদের নিকট হইতে কিছু কিছু টাকা আদায় করিয়া থাকে। বৃন্দাবন হইতে আবার আমরা মথুরায় ফিরিয়া আসিলাম, মথুরা বড় সহর, ইহার ইমারৎও বেশ মজবুত ও ভব্যধরণের। সহরের পাণ্ডারা বেশ ধনশালী। সেখানে প্রধানতঃ ব্রজভাষা কথিত হয়। ব্রজভাষা বড়ই মধুর মৃদু ও নম্র এইরূপ সেখানকার লোকেরা মনে করে। ভিন্ন ভিন্ন দেশে যে হিন্দী ভাষা ব্যবহৃত হয়, তন্মধ্যে ব্রজভাষাই

সর্ব্বাপেক্ষা উপরি-উক্ত গুণে বিভূষিত বলিয়া উহারা অভিমান করে। আমরা মথুরা হইতে যাত্রা করিয়া আজমীরে আসিলাম। এখান হইতে ৬।৭ মাইল দূরে পুষ্কর নামক পুরাণ প্রসিদ্ধ তীর্থ আছে। এখানে প্রচুর পদ্ম জন্মায় বলিয়া খুব পদ্ম পাওয়া যায়। এবং খাবার সময় কলা-পাতার মতো পদ্মের বড় বড় পাতা ব্যবহার করা হয়। পদ্মবীজকে শস্যদানায় পরিণত করা হয়। আজমীরে আসা অবধি 'ওঁর' শরীর ভাল মনে হইতেছিল না; তাই উনি আমাকে বলিলেন, "পুষ্কর যদি দেখিতে হয় তাহলে তুমিই যাও, আমার শরীরটা তেমন ভাল নেই, আমি আর যাব না," পুষ্করের এত নিকটে আসিয়াছি, পুষ্করটা দেখিয়া যাইব এইরূপ মনে করিয়া আমি জানকী-বাই ও উপাধ্যায়কে সঙ্গে লইলাম। টাঙ্গা হইতে নামিয়া দেখিলাম, সেখানে অনেক যাত্রী স্নানের জন্য আসিয়াছে। দিল্লীতে যে বাঙ্গালী মেয়েদিগকে দেখিয়াছিলাম তাহারাও আসিয়াছে। এই মেয়েদের সহিত শুধু মুখ-চেনাচিনি ছিল মাত্র, তবু তাহাদিগকে আমার কিছু জিজ্ঞাসা করিবার অভিপ্রায় থাকায়, আমি তাহাদের মধ্যে এক জন বৃদ্ধার সহিত এক সঙ্গে স্নানের জন্য জলে নামিলাম। স্নান করিতে করিতে, তাহাকে হিন্দি ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই সমস্ত স্ত্রীলোকদের মধ্যে কুমারী কত জন? বিবাহিতা কত জন এবং বিধবাই বা কত জন? তোমরা সবাই এক রকমের পরিচ্ছদ পরেছ—এর কারণ কি? চোলী কাঁচের চুড়ী, কুঙ্কুম প্রভৃতি সধবার চিহ্ন ধারণ করবার রীতি কি তোমাদের নাই? অবিবাহিত, বিবাহিত ও বিধবা এদের কি চিহ্ন দেখে চেনা যেতে পারে?—আমাকে অনুগ্রহ করে' বলুন—রাগ করবেন না। আমি পরদেশী লোক ব'লে সব জানবার জন্য জিজ্ঞাসা করচি।" এই বৃদ্ধা বেশ পরিপক্কবুদ্ধি ও সমজদার ছিলেন। তিনি সমস্ত শুনিয়া লইয়া, নিম্নলিখিত বিবরণ আমাকে বলিলেন। তিনি বলিলেন,—"দশবৎসরের ভিতর হইলে, যাহার হাতে লোহার বালা নাই, কিন্তু যে পাড়-ওয়ালা কাপড় পরে ও সিঁথিতে সিঁদুর দেয় না তাকে অবিবাহিতা বলেই বুঝতে হবে। যে পাড়-ওয়ালা শাড়ী পরে ও যাহার সিঁথিতে সিন্দুর আছে ও বাঁ হাতে লোহার বালা আছে তাহাকে বিবাহিত বলে বুঝবে। লোহার বালা বাঁ হাতে পরা এই আমাদের বিবাহ চিহ্ন। যে বিনা-পাড়ের সাদা কাপড় পরে ও যার সিঁথিতে সিন্দুর নেই ও যার হাতে বালাও নেই তাকেই বিধবা বলে বুঝবে। চোলী, কাঁচের চুড়ী, মঙ্গলসূত্র হার—এ সব পরা আমাদের রীতি নয়।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমাদের কাহারও মাথায় চুল নেই কেন?" তিনি বলিলেন—"তীর্থ করতে এসে যদি মাথা মোড়ান না যায় তাহলে দেশে ফিরি গেলে লোকে আমাদের অশুচি মনে করে"—এই সমস্ত বলিয়া, আমাদের চাল-চলন সম্বন্ধে উল্টে তিনি আমাকে প্রশ্ন করিলেন, "মাথায় কাপড় না দিয়ে নির্লজ্জভাবে পুরুষদের সামনে যাওয়া তোমাদের ভাল লাগে কি করে? মাথা খুলে রাখাই কি তোমাদের দেশের চাল? তোমাদের পর্দা নাই কি?"—প্রভৃতি কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে, আমার স্নান হইয়া গেল, আমি শুকনো কাপড় পড়িয়া ব্রহ্মদেবের মন্দিরে গেলাম। সমস্ত হিন্দুস্থানের মধ্যে, ব্রহ্মদেবের মন্দির এই ক্ষেত্রেই আছে এবং এই ক্ষেত্রেই ব্রহ্মদেবের পূজা হইয়া থাকে, শুনিলাম নাকি ব্রহ্মদেবের মন্দির আর কোথাও নাই। এখান হইতে আর একটু দূরে সাবিত্রীর মন্দির আছে। কিন্তু তাহা আমি দেখিতে গেলাম না। কারণ, পূর্ব্বদিন হইতেই আমাশা হইয়া "ওঁর" শরীর একটু খারাপ হইয়াছে। সেইজন্য আমার শীঘ্র ফিরিয়া যাইতে হইল। আজমীর হইতে আমরা সিদ্ধপুরে গেলাম। সেখানে সরস্বতী নদী আছে; সেখানে শ্রী কপিল মহামুনির দেবালয় আছে। এই স্থানেই কপিলমুনি আপন মাতা দেবহূতীকে ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করেন। ইহা একটি প্রসিদ্ধ স্থান—আমরা হিন্দুলোক এই স্থানকে বিশেষ পবিত্র বলিয়া মনে করি। এই তীর্থক্ষেত্রকে মাতৃগয়া বলে। এই তীর্থক্ষেত্র দেখিয়া আমরা আহমদাবাদে আসিলাম। এই স্থানে "ওঁর" শরীর আরও খারাপ হয়; একবার ভাও-নগর ও কাঠেবাড় দেখিয়া আসিবার জন্য, আমাদের ভাও-নগরের মিত্রেরা অনুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু শরীর খারাপ বলিয়া এই মৎলব রহিত করিয়া আমরা একেবারে পুণায় আসিলাম। সেইদিনই আমার পিতার মৃত্যু সংবাদ আসিয়া পৌঁছিল। এদিকে "ওঁর" অসুখ আরও বৃদ্ধি হওয়ায়, আমাদের ১৫ দিন দুঃখ, কষ্ট ও ভাবনায় কাটিল। তারপর, "ওঁর" অসুখ একটু কমিয়া আসিল। ১৫ দিনের পর ওঁর শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া, রেলগাড়ীতে যাইবার মতো অবস্থা হইলে, আমরা মান্দ্রাজের অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

(ইতি পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত)

মহর্ষির কথা।

(আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী এম-এ)

একবার যখন মহর্ষিদেব একাকী বোলপুর শান্তিনিকেতনে বাস করিতেছিলেন, তখন আমার পরলোকগত বন্ধু আনন্দ মোহন বসু ও আমি পরা-

মর্শ করিলাম যে মহর্ষিদেবকে সংবাদ না দিয়া শান্তিনিকেতনে গিয়া উপস্থিত হইব। তদনুসারে একদিন প্রাতঃকালের গাড়ীতে কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়া ১০টার পরে শান্তিনিকেতনে গিয়া উপস্থিত হইলাম। চাকরের হাতে আমাদের নাম উপরে প্রেরণ করিলে দেখিতে পাইলাম যে মহর্ষি সিঁড়ির উপরের বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং আমাদিগকে উপরে যাইবার জন্য আদেশ করিলেন। আমরা উপরে উঠিলে বলিলেন—"আমি খেতে যাচ্চি, এস তোমরাও আমার সঙ্গে খেতে বসো।" আমি বলিলাম—"খাবার ত একজনের মত হয়েছে, আপনি আহার করুন, আমরা একটু অপেক্ষা করি, পরে খাব।" শুনিয়া মহর্ষি হাসিয়া বলিলেন—"তোমরা কি মনে কর একজনের মতই খাবার প্রস্তুত হয়েছে? এস না, বসে দেখ না, কিছুরই অভাব হবে না।" আমরা গিয়া তাঁর সঙ্গে আহারে বসিলাম। তিন জনে বেশ আহার চলিল, কিছুরই অভাব হইল না। পরে ভৃত্যদের মুখে শুনিলাম যে, কে কখন আসে তাহা স্থির না থাকাতে প্রতিদিনই দুই একজনের মত অধিক রান্না হয়।

আহারান্তে মহর্ষি মুখ হাত ধুইতেছেন; ইতিমধ্যে আমরা দুজনে তাঁর বসিবার ঘরে গেলাম। গিয়াই দেখি যে ভূতত্ত্ব-বিদ্যা বিষয়ে একখানি নবপ্রকাশিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ তাঁহার টেবিলের উপরে রহিয়াছে। ঐ গ্রন্থখানির প্রশংসা আমরা সংবাদপত্রে পড়িয়াছিলাম। গ্রন্থখানি দেখিয়া আনন্দমোহন বাবু বলিলেন—এই বইখানার অনেক প্রশংসা কাগজে পড়েছি, মহর্ষি কি এখানা আনায়ে পড়ছেন?" আমি বলিলাম—"তাই ত মনে হয় কারণ বৈএর ভিতর হাড়ের কাগজ-কাটা রয়েছে, দেখলে মনে হয় কাটছেন ও পড়ছেন।" ইতিমধ্যে মহর্ষি আসিয়া উপস্থিত; সে বৈখানা আনন্দমোহন বাবুর হাতে দেখিয়া বলিলেন—"কি আনন্দমোহন, বৈখানা কি আগে দেখেছ?"

আনন্দমোহন।—না দেখিনি, তবে কাগজে অনেক প্রশংসা শুনেছি। এখানা কি আপনি পড়ছেন?

মহর্ষি। হাঁ, আমিও প্রশংসা শুনে আনিয়ে পড়ছি।

আনন্দমোহন। (বিস্ময়াবিষ্টভাবে) আপনি Geology পড়ছেন?

মহর্ষি। (হাসিয়া) সে কি আনন্দমোহন অমন করে জিজ্ঞাসা করছ যে! Geology কি অপাঠ্য? তোমরা কি জান না Geology আমার বহুদিনের পাঠ্য বিষয়; Geology বিষয়ে আমি একটা authority বল্‌লে হয়; বহু বৎসর পাহাড়ে পর্ব্বতে ঘুরেছি ও Geology অনুশীলন করেছি।

মহর্ষি যখন তাঁর পর্ব্বত ভ্রমণের ও Geology পাঠের কথা বলিতেছেন তখন আমি আনন্দমোহন বাবুর কানে কানে বলিলাম,—"আপনি কি মহর্ষির কন্যা স্বর্ণকুমারী দেবীর "পৃথিবী" নামক গ্রন্থের ভূমিকা পড়েন নাই? তাতে দেখবেন স্বর্ণকুমারী বলেছেন যে মহর্ষির ক্রোড়ে বসেই তিনি ভূতত্ত্ব-বিদ্যাকে ভালবাসতে শিখেছেন।"

ইত্যবসরে মহর্ষি হাসিয়া আনন্দমোহন বাবুকে বলিলেন, "কথাটা কি বুঝলে না? আমার যাবার সময় হচ্চে কি না, তাই মনের জাহাজে যত মাল বোঝাই নিতে পারি তার চেষ্টা করছি।"

মহর্ষির সেই হাসি ও সেই উক্তি কখনো আমি ভুলিব না। এই বার্দ্ধক্যে সেই মনের জাহাজ-বোঝাইয়ের কথা মনে হয় এবং আমাকে জ্ঞানালোচনাতে উৎসাহিত করে।

পরে রাত্রিকালের আহারের পর আমরা মহর্ষির বসিবার ঘরে গিয়া তাঁহার সহিত নানা আলাপে প্রবৃত্ত হইলাম। কথা কহিতে কহিতে রাত্রি যখন সাড়ে নয়টা বাজিল তখন মহর্ষি আমাদিগকে বলিলেন—"আমি এখন একলা থাকব, তোমরা গিয়ে শয়ন কর।" আমরা নামিয়া আসিলাম, এবং শয়নগৃহে শয্যাতে গিয়া নানা বিষয়ে কথা কহিতে লাগিলাম। রাত্রি প্রায় ১১টা বাজিল, আমরা শুনিতেছি যে উপরকার বারাণ্ডায় মহর্ষি বেড়াইতেছেন। শুনিতে শুনিতে আমরা ঘুমাইয়া পড়িলাম। রাত্রি তিনটার সময় আমার নিদ্রাভঙ্গ হইলে, চাহিয়া দেখি সেই পূর্ণিমার রাত্রে শান্তিনিকেতনের বাগান মনোহর শ্রী ধারণ করিয়াছে। বাগানে বেড়াইবার জন্য আমি আনন্দমোহন বাবুকে জাগাইয়া তুলিলাম। বলিলাম, "উঠুন উঠুন, চলুন একবার পূর্ণিমার রাত্রে বাগানে বেড়াই।"

আমরা দুজনে উঠিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া দেখিলাম, মহর্ষিদেব তখনও উপরের বারাণ্ডায় বেড়াইতেছেন। আমি আনন্দমোহন বাবুকে বলিলাম, "মহর্ষির ধ্যানপরায়ণতার বিষয়ে যে শুনিয়াছেন, ঐ তাঁহার দৃষ্টান্ত দেখুন। এই পূর্ণিমার রাত্রে আনন্দ-সাগরে মগ্ন আছেন।"

একবার মহর্ষিদেব দার্জ্জিলিঙ পাহাড়ে বাস করিতেছিলেন। তখন আমি মধ্যে মধ্যে তাঁহার নিকটে যাইতাম। একদিন আমি গিয়া বসিয়াছি, মহর্ষি জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি গতবারের 'ভারতী' পড়েছ?" আমি বলিলাম—"না, এখনও পড়িনি"। তখন মহর্ষি তাঁহার টেবিল হইতে একখানা "ভারতী" তুলিয়া লইয়া আমার হাতে দিয়া বলিলেন—"এই দেখ গত বারের ভারতী।" আমি পাতাগুলি উল্টাইয়া দেখি, মহর্ষি প্রবন্ধগুলির পাশে পাশে নিজের হাতে নিজের অভিপ্রায় লিখিয়াছেন। স্বর্ণকুমারীর লিখিত একটি প্রবন্ধের পার্শ্বে লিখিয়াছেন, "রুচিসঙ্গত নহে" ইত্যাদি। আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম যে নিজ পরিবারের ব্যক্তিদের প্রবন্ধ বিষয়েই এরূপ মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। আমাকে বিস্ময়াবিষ্ট দেখিয়া মহর্ষি বলিলেন—"আমার কাছে দুখানা 'ভারতী' আছে—একখানা আমার কাছে রাখি; আর একখানাতে আমার পরিবারের লোকদের সম্বন্ধে আমার মতামত প্রকাশ করে ফেরত পাঠাই; সেখানা তাদের কাছে পাঠান হয়।" আমি বলিলাম, "ওঃ, আমি এতদিনের পর বুঝতে পারলাম কেন আপনার সন্তানেরা সাহিত্য চর্চ্চাতে দেশের অগ্রণী,—আপনি তার মূলে। স্বর্ণকুমারীর প্রতিভার পশ্চাতে যে আপনি তা বুঝতে পারছি। "স্বর্ণ! তোমার হস্তে পুষ্পবৃষ্টি হউক" যে বলেছেন, এ কি সামান্য কথা।" শুনিয়া মহর্ষি হাসিয়া বলিলেন—"স্বর্ণের লেখা ত তুমি পড়েছ, তার লেখার শক্তি দেখে তোমার কি আশ্চর্য্য বোধ হয় না?"

আমি বলিলাম, "তাতে সন্দেহ কি? তাঁর প্রতিভা দেখে আমিও চমৎকৃত!" *

* ১৩২২ সালের মাঘ মাসের ভারতী হইতে উদ্ধৃত।

পুরাতন স্মৃতি।

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)

আমরা মহাত্মা শিবচন্দ্র দেবের জীবনীর এক খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি। তত্ত্ববোধিনী পাঠে তিনি ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট হন। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাবে তিনি মর্ত্ত্যলোকে আদর্শ জীবন রাখিয়া গিয়াছেন। কোন্নগরের যাহা কিছু উন্নতি, তিনি সকলেরই মূল। ব্রাহ্মসমাজ, বিদ্যালয়, রেলওয়ে ষ্টেসন, পোষ্ট অফিস প্রতিষ্ঠা তাঁহা হইতে সংঘটিত হয়। স্থানীয় অনেক গৃহবিবাদ তিনি স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। উচ্চ পদস্থ হইলেও তাঁহার মত বিনয়ী, সত্যনিষ্ঠ, সাহসী লোক বড় বিরল। তাঁহার সুন্দর ও সুপরিষ্কৃত আবাস নিকেতনে ব্রাহ্মসমাজের যে উৎসব হইত, তাহা চতুঃপার্শ্বস্থ শিক্ষিত মণ্ডলীতে ভরিয়া যাইত। আদর অভ্যর্থনায় সকলেই বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিতেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, শ্রদ্ধেয় দ্বিজেন্দ্র বাবু, বেচারাম বাবু প্রভৃতি উপাসনার কার্য্য করিতেন ইহা আমরা নিজে দেখিয়াছি। তৎপরে গঙ্গাতীরে তাঁহারই যত্ন চেষ্টায় ব্রাহ্মসমাজ গৃহ প্রতিষ্ঠিত হয়। শিবচন্দ্র বাবু মহর্ষির সহধর্ম্মী ও সহকর্ম্মী ছিলেন। সেই সময়ে ব্রাহ্মগণের মধ্যে যে ঐকান্তিকতা শিক্ষা স্বদেশসেবার পরিচয় পাইয়াছি, তাহার শতাংশও বর্ত্তমান সময়ে পরিলক্ষিত হয় না। কোন্নগরে যাইয়া পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ, শিবচন্দ্র বাবুর আগ্রহে সাপ্তাহিক উপাসনা করিয়া আসিতেন। দেবেন্দ্রনাথ নানা স্থানে অর্থ সামর্থ্য ও উৎসাহ দিয়া ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিতেন। পণ্ডিত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী দিন কতকের জন্য স্থায়ী ভাবে ঢাকায় থাকিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতেন। স্বর্গীয় ব্রজসুন্দর মিত্র অর্থ দিয়া ঐ ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ উন্নতি সাধন করেন। স্বর্গীয় ঈশানচন্দ্র বসু চিরদারিদ্র্য গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের জন্য প্রাণপাত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারই চেষ্টায় রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী সংগৃহীত ও প্রকাশিত হইতে পারিয়াছিল। পণ্ডিত দয়ালচন্দ্র শিরোমণি বর্দ্ধমানের মহারাজা মহাতাপ চাঁদের আমলে তাঁহার গৃহে নিয়মিত ভাবে আজীবন উপাসনা করিয়া আসিয়াছেন। পণ্ডিত কালিপ্রসন্ন

বিদ্যারত্ন ও বিহারিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কালনা ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করিতেন। গবর্ণমেণ্ট প্লীডার স্বর্গীয় দাননাথ গঙ্গোপাধ্যায় বহরমপুর ব্রাহ্মসমাজের নেতা ছিলেন। স্বর্গীয় গোকুলকৃষ্ণ সিংহ ও নন্দলাল মৈত্রেয় ও স্বর্গীয় উকীল অম্বিকাচরণ সরকার, হুগলী শ্রীরামপুর ও বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। হাইকোর্টের খ্যাতনামা উকীল স্বর্গীয় ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রামপুর বোয়ালিয়ায় অবস্থান কালীন সেখানকার ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা করিতেন। মহাত্মা রাজনারায়ণ বসু মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের প্রাণ ছিলেন। দ্বারবঙ্গ মহারাজার অন্যতম সদস্য পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ স্বর্গীয় চন্দ্রশেখর বসু তথাকার ব্রাহ্মসমাজের পরিচর্য্যা করিতেন। সদরআলা কাশীশ্বর মিত্র চুঁচুড়ায় অবস্থান কালীন তথাকার ব্রাহ্মসমাজে উপদেশ দিতেন। আজকালকার দিনে, কয়জন ভৈরব বাবুর প্রচারিত বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ, ৺ কাশীশ্বর মিত্রের চুঁচুড়া ব্রাহ্মসমাজে উপদেশ, রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা, ৺ কালিপ্রসন্ন বিদ্যারত্নের কালনা ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ, ৺ চন্দ্রশেখর বসুর বক্তৃতা, ও বেচারাম চট্টোপাধ্যায় রেহালা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতার সন্ধান রাখেন। মহর্ষির ব্যাখ্যান প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে রাজনারায়ণ বাবুর ও বেচারাম বাবুর বক্তৃতা অনেক ব্রাহ্মসমাজে পঠিত হইত। বেচারাম বাবু নানা স্থানে আট দশটি ব্রাহ্মসমাজ রক্ষা করিয়া বেড়াইতেন। ব্যবস্থা-দর্পন প্রণেতা শ্যামাচরণ সরকার ও সংস্কৃত কলেজের গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ব্রাহ্মসমাজের প্রতি বিশেষ আস্থাবান ছিলেন। পণ্ডিত ঈশ্বচন্দ্র বিদ্যাসাগর তত্ত্ববোধিনী সভার সম্পাদকরূপে উহাকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন। যাবতীয় শিক্ষিত মণ্ডলী ও কলিকাতার প্রধান প্রধান সকল লোক ব্রাহ্মসমাজ ও তত্ত্ববোধিনী সভাকে স্নেহের চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন। অধ্যাত্মতত্ত্ববিদ্ প্যারীচাঁদ মিত্র, পাথুরিয়াঘাটার দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্ঞানবৃদ্ধ আনন্দকৃষ্ণ বসু ও শিবচন্দ্র দেব ব্রাহ্মসমাজের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ৺ শম্ভুনাথ গড়গড়ি জীবনের শেষ রক্তটুকু ব্রাহ্মসমাজের জন্য পাত করিয়া গিয়াছেন। রামায়ণ অনুবাদক হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন আজীবন ব্রাহ্মসমাজের গৌরব অক্ষুন্ন রাখিয়া গিয়াছেন। শেষ ভাগে ৺ প্রিয়নাথ শাস্ত্রী ব্রাহ্মসমাজের জন্য অনেক করিয়াছেন। মহর্ষির আত্মজীবনীর পরিশিষ্ট ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে মূল্যবান সামগ্রী। আজ দীননাথ অধ্যেতা-সমগ্র উপনিষদ্ কণ্ঠস্থ করিয়া নানা স্থানে প্রচার করিয়া বেড়াইতেন। ভবানীপুরের শতবর্ষী শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সারাজীবন ধরিয়া আজও ব্রাহ্মসমাজকে ধরিয়া রহিয়াছেন।

বহু সংখ্যক পণ্ডিত মণ্ডলীর সহানুভূতি ধারণ করিয়া ৺ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের সময় হইতে ব্রাহ্মসমাজ চলিয়া আসিতেছিল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের সহানুভূতি না পাইলে যে ব্রাহ্মসমাজের প্রচার ত্বরিত গতিতে চলিবে না ইহা বুঝিয়া মহর্ষি মধ্যে মধ্যে মাঘোৎসব উপলক্ষে ও গার্হস্থ ক্রিয়া-কলাপে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায় করিতেন এবং তাঁহাদের প্রত্যেকের হস্তে এক একখানি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ দিতেন। বর্ত্তমানে প্রচার করিবার সে আদর্শ আমরা হারাইতে বসিয়াছি। হিন্দুসমাজ হইতে ব্রাহ্মসমাজ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে। আমরা সম্প্রদায়ের বেড়া দিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের আধ্যাত্মিক ভাব জাগাইয়া রাখিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছি। বর্ত্তমানে আমরা দেশের শাস্ত্র পাঠে বিমুখ হইয়া পড়িতেছি, আজকাল সংস্কৃত ভাষায় অধিকাংশই অনভিজ্ঞ। বাইবেলে আমরা যেরূপ সুপণ্ডিত, তাহার শতাংশ পাণ্ডিত্য সংস্কৃত ভাষায় থাকিলে ক্ষোভের কারণ থাকিত না। বক্তৃতার সময় সংস্কৃত শ্লোক অবলম্বন না করিয়া বাইবেল হইতে চরণ উদ্ধৃত করিয়া বক্তৃতা দিতেছি, সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুশ্রোতার হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারিতেছি না। ভারতের গৌরবময় অতীতের সহিত যোগরক্ষা করিবার জন্য মহর্ষি উপনিষদ ও মহানির্ব্বাণতন্ত্রের শ্লোক লইয়া উপাসনা পদ্ধতি রচনা করিয়াছিলেন। অবিবেচনা বশতঃ তাহার পরিহার অনেক স্থানে ঘটিয়াছে। আমরা বিনয় হারাইতে বসিয়াছি, ঔদ্ধত্য তাহার স্থান অধিকার করিতে বসিয়াছে। পূর্ব্ব আদর্শে ব্রাহ্মসমাজের অনেক লোক নিরামিষ আহার করিতেন বর্ত্তমানে সংযম যাহা ধর্ম্মের পত্তন ভূমি তাহা শিথিল হইয়া যাইতেছে। বলিদান প্রথার বিরুদ্ধে ব্রাহ্মসমাজ চীৎকার করিতেছেন, করাও যৌক্তিক ইহা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু

বর্ত্তমান সময়ে কি হিন্দুসমাজের কি ব্রাহ্মসমাজের অনেক লোকের মধ্যে প্রতিদিনের আহারের জন্য অবাধে বিবিধ প্রাণী হত্যা চলিতেছে। এমন কি উৎসব অবসানে উদ্যান-সম্মিলনের দিনে ছাগ ও ছাগী হত্যা করিয়া মাংসাহারে উদর প্রপূর্ত্তি হইতে দেখা গিয়াছে। প্রবৃত্তিমার্গ আজকালকারদিনে প্রমুক্ত, নিবৃত্তিমার্গে আজকাল বড় কেহ হাঁটিতে চাহে না। বিলাস ত্বরিত গতিতে চারিদিকে ছুটিয়া পড়িতেছে। বৈরাগ্যের পরিবর্ত্তে আমাদের জীবনকে ভোগের অনুকূল করিয়া তুলিতেছি। মহিলাগণের মধ্যেও বসন-চাক চিক্য উৎসবের দিনে বাড়িয়া উঠিতেছে। বৈরাগ্য সংযম, আজকাল উপেক্ষিত; বিপরীতভাবের ও উচ্ছৃঙ্খলতার আতিশয্য চারিদিকে পরিলক্ষিত হইতেছে। ব্রাহ্মসমাজের চিন্তাশীল লোকমাত্রেই ইহাতে শঙ্কিত ও ভীত হইয়া পড়িতেছেন।

"মানবাত্মার স্বাধীনতা" আজকাল কদর্থে লোকে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। চিন্তার স্বাধীনতা ব্রাহ্মসমাজ এদেশে আনয়ন করে নাই। "চিন্তার স্বাধীনতা" বা "স্বাধীন মত ঘোষণ" অতি প্রাচীন কাল হইতে এদেশে চলিয়া আসিতেছে। চিন্তার স্বাধীনতা না থাকিলে এদেশে বেদত্যাগী বুদ্ধদেবের আবির্ভাব হইত না; হিংসাবিরত জৈন ধর্ম্মের উৎপত্তি হইত না; দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের সূচনা হইত না; নিষ্কাম গীতার ধর্ম্ম মস্তকোত্তলন করিতে পারিত না; পুরাণ তন্ত্রের উদ্ভব হইত না; গৌরাঙ্গদেবের প্রেমের ধর্ম্ম জাগিয়া উঠিত না। এ সমস্তই মানবাত্মার স্বাধীনতার পরিচায়ক। যাঁহারা জ্ঞানী ও সুপণ্ডিত ও সূক্ষ্মদর্শী তাঁহারা স্বাধীন মত প্রচারের দাবী করিতে পারেন। কিন্তু যাঁহারা তাদৃশ সমুন্নত নহেন, জ্ঞানীর ও ধার্ম্মিকের অনুকরণ ভিন্ন তাহাদের উন্নতির সম্ভাবনা নাই। গৃহে বালক ও যুবাকে অবিভাবকের অধীন করিয়া রাখিতে না পারিলে তাহাদের কল্যাণ নাই। দায়ীত্ব-বুদ্ধি-সম্পন্ন বাটীর কর্ত্তার অধীন হইয়া না থাকিলে স্ত্রী পুত্র কন্যার ভবিষ্যৎ কণ্টকময় হইয়া উঠে, পারিবারিক শান্তি চলিয়া যায়। অপরিণত বুদ্ধির নিকটে মানবাত্মার স্বাধীনতার জয়ঢক্কা বাজাইলে তাহার ফল বিষময় হইয়া উঠে।

৮

সে যাহা হউক শিবচন্দ্র বাবু শেষ বয়সে ৩আইন মতে অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া গ্রামের লোকের বিদ্বেষ-ভাজন হইয়া উঠিলেন। মান সংভ্রম রক্ষার ভয়ে তিনি কলিকাতায় আসিয়া বাস করিলেন। এখানে আসিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা সময়ে ইহার কর্ণধার হইয়া উহার সভাপতিরূপে আপনার পরিণত বুদ্ধির সাহায্যে অনেক করিয়া গিয়াছেন। কোন্নগরে তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র উঠিয়া গেল। গ্রামের লোক তাঁহাকে হারাইয়া বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল। সেখানকার ব্রাহ্মসমাজ একেবারেই প্রাণহীন হইয়া যাইল, তাঁহার সুশোভন অট্টালিকা শ্রীহীন হইয়া পড়িল। সে কথা স্মরণ হইলে বিষাদগ্রস্ত হইতে হয়। হিন্দুসমাজের ভিতরে থাকিয়া তাহাকে উত্তোলিত করিয়া তুলিবার একটি দিক আছে এবং উহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবার আর একটি উল্টা দিক আছে; ইহার মধ্যে কোনটি গ্রহণীয় তাহা বিবেচ্য। অনেকে অনেক কথা বলিবেন, তাহা আমরা জানি। কিন্তু জিনিষটি সহজে মীমাংসিত হইবার নহে, ইহাই আমরা মিনতি সহকারে নিবেদন করিতে চাই। আমরা সেদিন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবনী পাঠ করিতেছিলাম। তিনি দাক্ষিণাত্যে জাতিভেদের প্রাথর্য্যের কথা উল্লেখ করিতে গিয়া একস্থানে বলিয়াছেন যে খৃষ্টীয়ান পাদ্রীরা তত্রত্য জাতিভেদের উপর বিশেষভাবে হস্তক্ষেপ না করিয়া কেবলমাত্র খৃষ্টধর্ম্মের প্রচার কল্পে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়া রাখিয়াছেন। আমরাও বলি ধর্ম্মপ্রচার সর্ব্বাগ্রে; অন্যান্য উন্নতি জ্ঞানের ও বিদ্যার প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে আপনা হইতেই অল্পে অল্পে সংসাধিত হইবে। সামাজিক ব্যাধি দূর করিতে আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে, কিন্তু ধীরে ধীরে।

শ্রীরামপুর মিসন।

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)

শ্রীরামপুর কলেজের শত বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে রেঃ কেরি সাহেবের বক্তৃতায় অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় বাহির হইয়াছে। এক ভাবে বলিতে গেলে শ্রীরামপুরের মিসনরিগণ বঙ্গ-ভাষার পুষ্টি সাধনে

এবং মুদ্রাযন্ত্র স্থাপনে বঙ্গ ভাষার বহুল প্রচারে ও শিক্ষাবিস্তারে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট আমরা যে অনেক বিষয়ে ঋণী এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র। কেরি ও মার্সমান সাহেবের নাম প্রতি শিক্ষিত বঙ্গসন্তান অবগত আছেন। বর্ত্তমান রেঃ কেরি সাহেব, উক্ত কেরি সাহেবের প্রপৌত্র। পুরাতন কেরি সাহেব এ দেশে আসিয়া প্রথম ৬ বৎসর কাল নীলকরের কার্য্য করিতে থাকেন এবং বঙ্গভাষায় বাইবেল অনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন। মার্শমান ও ওয়ার্ড সাহেব পরে আসিয়া পরস্পরে সহিত মিলিত হন। ইংরাজ বণিক সম্প্রদায় তাঁহাদিগকে আপনাদের অধিকারের মধ্যে স্থান দেয় নাই। তাহারা মিসন কার্য্যের ও শিক্ষা বিভাগে বিরোধী ছিল। অন্য পক্ষে বাধা দিকে থাকে। কেরি সাহেব উত্তরবঙ্গে মালদহে নীলের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরামপুরে আসিয়া ১৮০০ অব্দে পূর্ব্বোক্ত অপর দুই জনের সহিত মিলিয়া প্রচারব্রতে প্রবৃত্ত হন। আশাই তাঁহাদিগকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছিল। মালদহে অবস্থানকালে কেরি সাহেব সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। পরে তিনি ফোর্ট-উইলিয়ম কলেজের জনৈক প্রফেসর নিযুক্ত হন। তাহাতে তাঁহার অর্থাগম হইতে লাগিল এবং তিনি বঙ্গীয় ও মাদ্রাজের সিভিলিয়নগণের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হইলেন। তিনি তাঁহার অর্জ্জিত অর্থ ও প্রভাব মিসন কার্য্যে নিয়োগ করিতে লাগিলেন। কেরি সাহেব সপ্তাহের দুই দিন শ্রীরামপুরে অতিবাহিত করিতেন এবং ত্রিশ বৎসর ধরিয়া তিনি ফোর্ট-উইলিয়ম কলেজে বিবিধ ভাষার শিক্ষা দান করেন। মার্সমান শ্রীরামপুরে স্কুল স্থাপন করিয়া বহুকাল ধরিয়া শিক্ষাদান করিতে লাগিলেন। উহার এক অংশ গির্জ্জারূপে ব্যবহৃত হইত। চীন ভাষার উপরে মার্সমান সাহেবের বিশেষ অনুরাগ ছিল। ওয়ার্ড সাহেব বিশ বৎসর ধরিয়া বহু পরিশ্রম অন্তে সুবিখ্যাত শ্রীরামপুর প্রেশ, কাগজের কল ও তাহার গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তুলিলেন; এবং যেটুকু অবকাশ পাইতেন তাহার ভিতরে হিন্দুগণের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে একখানি প্রকাণ্ড গ্রন্থ রচনা করিয়া ফেলিলেন। বঙ্গভাষায় বাইবেলের অনুবাদ প্রকাশিত হইতে লাগিল, বিদ্যালয়ে ছাত্রগণও উহা পাঠ করিবার শক্তি অর্জ্জন করিতে লাগিল। তাঁহারা যখন এ দেশে আসেন, কলেজ প্রতিষ্ঠা তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল না, কিন্তু কয়েক জনকে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিতে না পারিলে এ দেশে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের অসুবিধা হইবে, ইহা বুঝিয়া ১৮১৮ অব্দে কলেজ প্রতিষ্ঠা কার্য্যে অগ্রসর হইলেন।

কেরি মার্সমান ও ওয়ার্ড সাহেব উত্তর-ভারতে প্রটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায়ের যেমন প্রথম প্রচারক ছিলেন, তেমনি দক্ষিণ ভারতে মাদ্রাজের সান্নিধ্যে ট্রাঙ্কুবার নামক স্থানে Ziegenbalg and Schwarytz সাহেব উঁহাদের এক শতাব্দী পূর্ব্বে আসিয়া প্রচার আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। শ্রীরামপুর ও ট্রাঙ্কুবার এই দুইটী স্থানেই (Danes) দানিস্‌দিগের অধিকারভুক্ত ছিল। দিনেমারেরা ট্রাঙ্কুবারে ১৬২০ অব্দে এবং শ্রীরামপুরে ১৭৫৫ অব্দে উপনিবেশ স্থাপন করেন। এবং ঐ ঐ স্থানে আসিয়া ব্যবসা বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করেন। ডেনমার্কের ৪র্থ ফ্রেডারিক ভারতে সর্ব্বপ্রথম প্রটেষ্টাণ্ট মিসনের প্রতিষ্ঠাতা; তাঁহারই উদ্যোগে ট্রাঙ্কুবারে এবং ৬ষ্ঠ ফ্রেডারিকের চেষ্টায় শ্রীরামপুরে মিসনরিগণ স্থান পান। শেষোক্ত রাজা শ্রীরামপুরে কালেজ প্রতিষ্ঠাকল্পে সনন্দ দান করেন। যদিও ১৭৪৫ অব্দে ডেনস্‌রা একই দলিল যোগে সাড়ে বার লক্ষ টাকা মূল্যে উক্ত দুইটি নগর ব্রিটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে বিক্রয় করিয়া ফেলেন, তাহা হইলেও উক্ত দলিলে এইরূপ সর্ত্ত থাকে যে শ্রীরামপুর কালেজের সমস্ত স্বত্ব ভবিষ্যতে অব্যাহত থাকিবে। ট্রাঙ্কুবারে আসিয়া মিসনরিগণ উদ্যমসহকারে প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়া মাদ্রাজ হইতে সিংহল পর্য্যন্ত বহুলোককে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন এবং কেরি সাহেবের আগমনের পূর্ব্বে তামিল ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। যদিও জর্ম্মাণ জাতি বর্ত্তমান যুদ্ধে আপনাদিগকে কলঙ্কিত করিয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু সর্ব্ব প্রথমে যাঁহারা মিসনরি হইয়া ভারতে আসিয়াছিলেন এবং পরে এদেশে পদার্পণ করেন, তাঁহাদের অধিকাংশই জর্ম্মাণ জাতিভুক্ত; এবং তাঁহারা স্বদেশ

হইতে অর্থ আনাইয়া প্রচারকার্য্যে নিয়োগ করেন। ভারতের সর্ব্ব প্রথম প্রটেষ্টাণ্ট মিসনরি Ziegenbalg এবং Plutochan, Halle university'র ছাত্র ছিলেন এবং তাঁহারা ১৭০৬ অব্দে ট্রাঙ্কুবারে আসিয়া পৌঁছান। তাঁহারা মিসন কার্য্যে দেহপাত করিয়া গিয়াছেন।

১৮০০ অব্দে প্রটেষ্টাণ্ট-ধর্ম্মে সর্ব্বপ্রথম বঙ্গে দীক্ষা আরম্ভ হয়। ইহার অল্প দিন পরেই বাঙ্গলা বাইবেল বাহির হয়। ক্রমে ক্রমে মিসন কার্য্য প্রসারলাভ করিতে থাকে। বহু লোক এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে আরম্ভ করে। ১৮১২ অব্দে শ্রীরামপুরের মিসনরিগণের কর্ত্তৃক বহুকষ্টে স্থাপিত মুদ্রাযন্ত্র ভস্মীভূত হইয়া যায়। কিন্তু তাহাতে মিসনরিগণের অদম্য উৎসাহ নির্ব্বাপিত হয় নাই। বাইবেলের নিউ-টেষ্টামেণ্টের অনুবাদ এদেশের বিভিন্ন ত্রিশটি ভাষায় প্রকাশিত হইয়া পড়ে। তাহার পরবর্ত্তী সময়ে খৃষ্টিয়ান পাদ্রীগণের অদম্য উৎসাহ ফলে অনেকগুলি বিদ্যালয় ও কলেজ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। তাহার জন্য সমগ্র বঙ্গদেশ মিসনরিগণের নিকট অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ।

উৎসব দিনে বঙ্গের গবর্ণর শ্রীরামপুরে গমন করিয়াছিলেন। তিনি ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির অযথা ব্যবহারের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে যদিও তাহারা ধর্ম্মপ্রচারে উদাসীন ছিল, কিন্তু পরবর্ত্তী ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারে যেরূপ সাহায্য করিয়াছেন, তাহা সত্যসত্যই প্রশংসনীয়।

৺হেমেন্দ্র নাথ সিংহ। *

অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে ১২৭৫ সালের ৫ই আশ্বিন তারিখে দুঃখ-সুখ-পূর্ণ এই সংসারে পরিবারস্থ তৎকালজীবিত জনগণের আনন্দ কোলাহলের মধ্যে যিনি জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন—অর্দ্ধ শতাব্দী পরে যখন তাঁহার জীবনের দুঃখ-ক্লেশভার পর্ব্বতাকার গ্রহণ করিয়াছিল, তখন করুণাময় পরমেশ্বর তাঁহার জীবনের সকল কর্ম্মক্লান্তি হইতে, বিগত ১৩২৪ সালের ১৫ই পৌষ তারিখে মুক্ত করিয়া দিলেন। তিনি যে অনন্ত-ধামে গিয়াছেন, সেখানে তাঁহার পূর্ব্বগত তাঁহার গুরুজী মহর্ষিদেবের সহিত ও তাঁহার পিতৃগণের সহিত মিলিত হইয়া আনন্দভোগ করিতেছেন। আজ এক বৎসর পূর্ণ হইল, তেমন মধুর ভাবে সকল কষ্ট ভুলাইয়া "বাবা" বলিয়া আমাদিগকে আর কেহ ডাকে নাই। এক বৎসর পূর্ব্বে এই দিনে—

We stood beside the dying bed
Of him we loved so well,
We gently shed our bitter tears
And bid Earth's last farewell.
Our loss is great, will not complain,
But trust in Heaven to meet again.

তাঁহার কথা স্মরণ হইলে আমরা অনেকগুলি বিশেষ শিক্ষা প্রাপ্ত হই, তাহার মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি—

১। প্রবল ধর্ম্মানুরাগ, ঈশ্বরে বিশ্বাস ও সত্যপ্রিয়তা।

(ক) প্রবল ধর্ম্মানুরাগ।

জীবনের সকল অবস্থায় সুখে দুঃখে, সম্পদে ও নিঃস্বতার ভিতরেই তিনি প্রাতে উঠিয়াই সর্ব্বাগ্রে উপাসনা ও ব্রহ্মনাম কীর্ত্তন সমাপন করিয়া তবে দিনের কার্য্য আরম্ভ করিতেন। এমন কি মৃত্যুর দিনও প্রাতঃকালে রুগ্নদেহে উপাসনাদি সমাপন করিয়াছিলেন। উপাসনা না করিয়া তিনি কখনও জলগ্রহণ করিতেন না। কোন দিন তাঁহাকে উপাসনা বাদ দিতে দেখি নাই। প্রতি সন্ধ্যায় পরিবারস্থ সকলকে লইয়া উপাসনা করিতেন। মহর্ষিদেবের নিকট দীক্ষিত হইবার পর ছয় বৎসর ক্রমান্বয়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম-সাধন করিয়াছিলেন। অধিকাংশ সময়ই নামজপ উপাসনা ও ধ্যানাদিতে মগ্ন রহিতেন। সময়ে সময়ে এমন গভীর ধ্যানে মগ্ন হইতেন, যে বাহিরের কোন প্রকার কোলাহল তাঁহাকে বিচলিত বা তাঁহার চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিতে পারিত না।

ধর্ম্মের উদারতাই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। এই হেতু তিনি সকল ধর্ম্মের সত্যই অতি আদরের সহিত গ্রহণ করিতেন. কিন্তু সাধন করিতেন ব্রাহ্মধর্ম্ম।

জীবনের শেষ কয় বৎসর যে কোন ধর্ম্মের "প্রেম" সম্বন্ধে কথা উঠিলেই চক্ষু দিয়া জল পড়িত।

সন্তানেরা নানা প্রকারে উৎপাত করিলেও বিশেষ কিছু বলিতেন না। কিন্তু কেহ ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য করিতে উদ্যত হইলে বিশেষ বিরক্ত হইতেন। এমন কি তিনি বিভিন্ন রাজার অধীনে থাকিয়া কর্ম্মকালে তাঁহার প্রভু

* বার্ষিক শ্রাদ্ধে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীপ্রেমনাথ সিংহ কর্ত্তৃক পঠিত।

বা উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী কেহ ধর্ম্মবিরুদ্ধ কর্ম্মাচরণে উদ্যত হইলে, তিনি অকুতোভয়ে তাহার প্রবল প্রতিবাদ করিতেন ও যতক্ষণ পর্য্যন্ত অন্যায়াচরণ পরিত্যক্ত না হইত, ততক্ষণ পর্য্যন্ত প্রতিবাদ করিতে ক্ষান্ত হইতেন না।

(খ) ঈশ্বরে বিশ্বাস ও প্রেম—

বাইবেলে যে একটি কথা আছে যে, যদি এক সর্ষপ পরিমাণ বিশ্বাসও থাকে, তাহা হইলে পর্ব্বতকে "চলিয়া যাও" বলিলে উহা চলিয়া যাইবে। ইহা তিনি বিশেষভাবে বিশ্বাস করিতেন।

শেষোক্ত কথাটি সংসারের ঘোর দুর্দ্দিনের সময়ও তিনি আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেন এবং বলিতেন—ঈশ্বরের করুণার উপর প্রাণ ভরিয়া বিশ্বাস কর, সুদিন আসিবেই। ঘোর বিপৎ-কালেও তিনি অচল অটল রহিতেন।

এই বিশ্বাসই কর্ম্ম-জীবনে কর্ত্তব্য সাধনে বা পৃথিবীতে প্রভুর আদেশ পালনে তাঁহাকে শক্তি দান করিত।

(১) মৌরভঞ্জে একটি পরগণা বন্যায় ভাসিয়া যায়। তাঁহার উপর ভার পড়িল Relief এর বন্দোবস্ত করিবার জন্য। বন্যার জল দুই দিনেও কমিল না, পার্ব্বত্যনদীর প্রবল স্রোত উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। নৌকাদি লইয়া মাঝিরা অপর তীরে যাইতে ভীত; সঙ্গে যে হস্তী ছিল তাহার মাহুত ঐ স্রোতমধ্যে হাতী নামাইতে রাজি হইল না। প্রজাগণের দুঃস্থ অবস্থা স্মরণ পূর্ব্বক তিনি আর অপেক্ষা করিতে পারিলেন না। তাঁহার একটি আর্দ্দালী ও কয়েকটি বন্যজাতীয় বন্ধুর সহিত হাত ধরাধরি করিয়া ঈশ্বরের নাম গ্রহণ পূর্ব্বক নদীস্রোতে ঝাঁপ দিলেন, প্রত্যেকের পৃষ্ঠে অর্থের এক একটা পুটুলি। প্রায় ৩ মাইল সন্তরণ করিয়া নদীর অপর তীরে উত্তীর্ণ হইয়া পরে দুঃস্থজনগণের relief এর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

(২) তিনি মৌরভঞ্জে থাকিয়া অধুনাখ্যাত Tata Iron Mine আবিষ্কার করেন। তখন তিনি মৌরভঞ্জের Forest Superintendent। সেই সময় তিনি সমস্ত জঙ্গলের অবস্থা নিজ চক্ষে নিরীক্ষণ করিবার জন্য গমন করেন। একস্থলে বন এত নিবিড় ছিল, যে দিনমানেও তাহা আলোক-রহিত; জঙ্গলীরাও দিনে তন্মধ্যে কেহ প্রবেশ করিত না। যখন এই জঙ্গলের মধ্যে যাইবার উদ্যোগ করিলেন, সেই শ্বাপদসঙ্কুল গহন বনে যাইতে মহারাজ পর্য্যন্ত সকলেই নিষেধ করিয়াছিলেন; তিনি কাহাকেও সঙ্গী না পাইয়া একাকী কিছু খাদ্য ও অস্ত্র সঙ্গে ঐ বনের মধ্যে সকল বিঘ্ননাশনকে স্মরণ পূর্ব্বক প্রবেশ করিয়াছিলেন; এবং ঐ পথহীন বনে হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া অন্ধকারে অনেকদূর চলিয়া যান। উহার মধ্যে তিনি দুইদিন ছিলেন। দ্বিতীয় দিনের পর তিনি সহসা সূর্য্যালোক দেখিতে পান, দেখেন যে একটি খোলা জায়গায় উপনীত হইয়াছেন। তথাকার অবস্থা পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারেন যে তথায় খনি আছে। পরে ফিরিয়া আসিয়া—বন কাটাইয়া রাস্তা প্রস্তুত করেন ও যে খনি আবিষ্কারের বন্দোবস্ত করেন, তাহাই Tata Iron mine। উক্ত স্থানে উপস্থিত হওয়ার পরে তাঁহার আহারীয় সামগ্রী নিঃশেষ হইয়া যায়। তিনি কোথায় আসিয়াছেন জানেন না। ফিরিতে সময় লাগিবে অন্ততঃ আরো দুই দিন। অরণ্যপথে দুগ্ধাভাবে ও জলাভাবে তাঁহার কণ্ঠতালু শুষ্ক হইয়া গেল ও তিনি বিশেষ দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। ভগবানের নিকট প্রার্থনার পর হঠাৎ দেখিলেন দূরে একটি মনুষ্য মূর্ত্তি কাংশপাত্র হস্তে লইয়া যাইতেছে। তিনি তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিলেন কোথায় উপনীত হইয়াছেন। তাহার হস্তে দুগ্ধ দেখিয়া ভগবানের প্রেরিত দান মনে করিয়া তিনি ঐ দুগ্ধ চতুর্গুণ মূল্য দিয়া গ্রহণ করেন।

(৩) কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমরা মধুপুরে গিয়াছিলাম। সেখানে এক দিন অর্থাদি নিঃশেষ হইয়া যাওয়ায় নির্ব্বান্ধব এবং অপরিচিত নূতন দেশে আমরা বিশেষ বিচলিত হই। তিনি অচল অটলভাবে আমাদিগকে আশ্বাস দিতে লাগিলেন। "পরদিনকার কথা আজ ভাব কেন; যিনি দিনের মালিক তিনি নিশ্চয়ই দিন চালাইয়া দিবেন। কোনরূপে রাত্রি কাটিল। পরদিন প্রাতঃকালে আটটার সময় সত্য সত্যই রেজেষ্টারী ডাকে অপ্রত্যাশিতভাবে টাকা আসিয়া পৌঁছিল।

এই প্রকার নানা ঘটনায় ও বিপদের মধ্যে তাঁহার স্থির জলন্ত বিশ্বাস আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

(গ) সত্যানুরাগ—

তিনি জীবনে কখনও মিথ্যাচরণ করেন নাই। নির্ভয়ে সকল সময়ে সত্য ব্যবহার করিয়াছেন। নিলগিরি রাজ্যে কার্য্যকালে তথাকার মহারাজা বিশেষ ভাবে প্রজাপীড়ন ও নানা প্রকার অকথ্য অত্যাচার সুরু করেন। বাবা কত প্রকারে তাঁহাকে বারণ করিতেন ও কু-কার্য্য হইতে বিরত করিবার চেষ্টা করিতে। ইহার জন্য মহারাজের সঙ্গীরা বাবার প্রাণহানির চেষ্টা করে। তথাপি তিনি ভয় পান নাই। গৃহে গৃহে প্রজার ক্রন্দন; বাবা প্রজাদেরও মধ্যে যথাসাধ্য দুঃখ লাঘবের চেষ্টা করিতেন এবং যেখানে ঘটনাচক্রে নিজে উপস্থিত হইতেন সেখানে প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া স্বীয় শারীরিক বলপ্রয়োগে প্রজার

গৃহমধ্যে দৌরাত্ম্য করিতে রাজাকে ক্ষান্ত করিতেন। শেষে যখন গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রজার নিবেদন পৌঁছিল, কমিশনার সাহেব Political Agent এর সহিত আসিয়া পৌঁছিলেন তখন উক্ত ইংরাজ কর্ম্মচারীদ্বয় এবং সকল প্রজাই একবাক্যে সাক্ষী স্থির করিল একমাত্র বাবাকে। সকলেই জানিত তিনি কখনই মিথ্যা বলিবেন না। বাবা উভয় সঙ্কটে পড়িলেন—একদিকে সত্য বলিলে চাকুরী যায় অপরদিকে চাকুরী রাখিতে হইলে মিথ্যা বলিতে হয়। মহারাজার ভীতি প্রদর্শন ও অর্থলোভ প্রদর্শন সত্ত্বেও তিনি মিথ্যা বলিতে পারিলেন না। সত্য কথাই বলিলেন। ফলে চাকুরী যায়। কিন্তু অপরদিকে ভগবান সত্য বলার পুরস্কারও তাঁহাকে দেন। তাঁহার এজাহারের ফলে রাজ্যে অত্যাচারস্রোত বন্ধ হওয়ায় প্রজাকুল বাবাকে ছাড়িতে চাহিল না। তিনি কর্ম্মত্যাগান্তে বালেশ্বর ষ্টেশনে Madras Mail এ উঠিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। দশহাজার প্রজা, বন্য লোক, ষ্টেশন ঘেরাও করিল। বলে "হেমবাবু তুই আমাকে ছেড়ে যেতে পাবি না ফিরে চল তোকে যেতে দোব না।" তাহা অসম্ভব বলিয়া বাবা যখন কিছুতেই রাজি হইলেন না, তখন দূরাগত ট্রেণ দেখিয়া তাহাদের মধ্যে বিস্তর লোক রেল লাইনের উপর শুইয়া পড়ে। বলে, "যদি যাস তবে আমাদের বুকের উপর দিয়া গাড়ী নিয়ে মেরে দিয়ে তবে যা।" তাদের বন্য সরলতার এই আকুল প্রার্থনায় তিনিও অভিভূত হইলেন। তিনিও কাঁদেন তারাও কাঁদে। ট্রেণ প্ল্যাটফরমে প্রবেশ করিতে পায় না। রেল কর্ম্মচারীরাও বিব্রত। পরে তাহাদের অনেককে আলিঙ্গন করিয়া অনেক বুঝান ও চোখের জলের পরে তাহারা পথ ছাড়িল, দুই ঘণ্টা দেরীতে ট্রেণ প্ল্যাটফরমে প্রবেশ করিল।

২। অর্থের প্রতি লোভহীনতা ও চরিত্রবল।

তিনি যখনই যে যে রাজ্যে কার্য্য করিয়াছেন তখনই কোন না কোন বিভাগীয় অথবা সমগ্র রাজ্যের প্রধান কর্ম্মচারী থাকার উৎকোচ লইবার বিশেষ সুযোগ রহিলেও তিনি কখনই বেতনের অতিরিক্ত ধনে লোভ করেন নাই বা উৎকোচ গ্রহণ করেন নাই। অসংখ্য দৃষ্টান্ত রহিয়াছে, দুই একটি মাত্র বলি। ময়ূরভঞ্জের মহারাজা প্রথম বিবাহ কালে বাবার উপর ভার পড়ে মহারাণীর জন্য ১০ লক্ষ টাকার অলঙ্কার ক্রয় করিতে, কলিকাতার * * দোকানে যান। তাহারা তাঁহাকে ২॥ লক্ষ টাকা ঘুষ দিতে চাহে, ও পাঁচ লক্ষ টাকার অলঙ্কারকে ১০ লক্ষ টাকার বলিয়া রিপোর্টে চালাইয়া দিতে অনুরোধ করে। তিনি বলেন যে, যে গহনা গুলিকে তোমরা ১০ লক্ষ টাকায় চালাইতে চলিতেছ, তাহাই মহারাজকে ৫ লক্ষ টাকায় দাও, আমাকে কিছু দিতে হইবে না। শুনিয়া সাহেবরাও স্তব্ধ ও পরে মহারাজাও ইহা শুনিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন।

দ্বারভাঙ্গা রাজ্যেও বর্ত্তমান মহারাজা বাবার আর্থিক অবস্থা কোন প্রকারে জানিতে পারিয়া তাঁহাকে ডাকাইয়া একদিন বলেন 'হেমবাবু' আমার রাজত্ব সীতার জন্মস্থান লক্ষ্মীর দেশ। এখানে যে মাহিনাতেই নির্ভর করে, টাকা করিয়া লইয়া যাইতে পারে না, সে বড়ই দুর্ভাগ্য।" বাবা বলিলেন, "ঈশ্বরের করুণায় ও আপনার আশীর্ব্বাদে এ দুর্ভাগ্য যেন স্থায়ী হয়।" মহারাজা সকলের coveted post যাহা ও যাহাতে প্রচুর উৎকোচ লইবার সুযোগ সেই সকল কার্য্যে বাবাকে নিযুক্ত করেন। বাবার আর্থিক কোন উপকারই হইল না, বাবার অধীনস্থ accountant প্রভৃতি উৎকোচগ্রাহীতার সমাপ পাওয়ায় পদচ্যুত হইল। তাহারা কেহ কেহ, বিশেষ acct বাবু লক্ষপতি হইয়া গেলেন অথচ সংসারের ব্যয়ভারের জন্য বাবা ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন।

এই প্রকারে চাকরীর সময় বেতনাতিরিক্ত কোন অর্থ না লওয়ায় চাকরীর সময়েও সংসারের বিপুল ব্যয় বহন হেতু অর্থসঞ্চয় না হওয়ায় ও অনেক সময় চাকরী না থাকায় তিনি বড়ই ঋণগ্রস্থ হইয়া পড়েন। তথাপি কোন কালে কোন অন্যায় উপায়ে অর্থার্জ্জনের লোভই তাঁহার ছল না। এ জন্য তিনি সন্তানদের ভবিষ্যত সম্বন্ধে কেহ দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে তিনি কেবলমাত্র বলিতেন "ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলং"। এইরূপে যিনি পুত্রাৎ প্রিয়তরঃ বিত্তাৎ প্রিয়তরঃ করিয়া ভগবানকেই আজীবন ধরিয়া ছিলেন এবং আজীবন ব্রাহ্মধর্ম্মই সাধন করিয়াছিলেন, তাঁহাকে ব্রাহ্ম ভিন্ন অপর কি বলা যাইতে পারে?

৩। বিদ্যানুরাগ ও জ্ঞানালোচনা—

দিবসের অধিকাংশভাগই তিনি পুস্তকাদি পাঠে ব্যয় করিতেন। অধ্যয়নই যেন দিবসের প্রধান কার্য্য ছিল, অবসর সময় মাত্র অন্যান্য কর্ম্ম করিতেন; জীবনের শেষ কয়েক বৎসর যখন আর কোন প্রকার চাকরীর চেষ্টা পর্য্যন্তই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন তখন তিনি প্রায় দিবারাত্র অধ্যয়নে নিময় রহিতেন। অধ্যয়নে এত অনুরাগ ছিল যে জীবনে যখন যেখানে যাইতেন, কয়েক শত বাছা বাছা পুস্তক সর্ব্বদা সকল স্থানেই লইয়া পরিভ্রমণ করিতেন।

জীবনের প্রথম গ্রন্থ রচনা—'প্রেম' পুস্তক খানি ও জীবনের শেষ রচনা ঐ 'প্রেম' পুস্তকেরই ইংরাজী অনুবাদ। এই কার্য্যের জন্য তিনি সকল কর্ম্ম ত্যাগপূর্ব্বক নিবিষ্টচিত্ত যোগীর ন্যায় অনুবাদ কার্য্যে দিবারাত্রি রত

ছিলেন, দেহ বিশেষ পীড়িত ছিল, তথাপি বাটীর সকলে বৈদ্যনাথে যাইলেও তিনি অনুবাদ কার্য্যের জন্য কলিকাতায় রহিলেন। এবং অনুবাদ কার্য্যও বিলাতে প্রকাশ করিবার আয়োজন সম্পূর্ণ করিবার নিমিত্ত দিবারাত্র শরীরের প্রতি দৃকপাত না করিয়া শ্রম করিতেন। এই সকল কার্য্যে তাঁহার শরীর একেবারেই ভাঙ্গিয়া যায় এবং সামান্য জ্বরেই দেহত্যাগ করেন। অনুবাদ শেষ হইয়াছিল কিন্তু প্রকাশ করিবার সকল ব্যবস্থা শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

হৃদয়ের ফুল চন্দনে তাঁহার হৃদয়দেবতার উদ্দেশে যে বন্দনা উপহার রচনা করিয়াছিলেন তাহা জনসমাজে অপ্রকাশিত রহিলেও প্রেমের কাহিনী জগতকে শুনাইবার ইচ্ছা অসম্পূর্ণ রহিলেও আমাদের বিশ্বাস—

জীবনে যত পূজা হ'ল না সারা
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।
যে ফুল না ফুটিতে ঝরেছে ধরণীতে
যে নদী মরুপথে হারাল ধারা,
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা॥

বৈয়াসিক-ন্যায়মালা।

পঞ্চম অধিকরণ—ঈক্ষতি অধিকরণ বা সচ্ছব্দবাচ্যতাধিকরণ।

(শ্রীরামচন্দ্রশাস্ত্রী সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ
ও
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি)

মূল। ঈক্ষতের্নাশব্দং ॥ ৫ ॥ গৌণশ্চেন্নাত্মশব্দাৎ ॥ ৬ ॥ তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাৎ ॥ ৭ ॥ হেয়ত্বাবচনাচ্চ ॥৮॥ স্বাপ্যয়াৎ ॥৯॥ গতিসামান্যাৎ ॥১০॥ শ্রুতত্বাচ্চ ॥ ১১ ॥

পঞ্চমাধিকরণমারচয়তি—

শ্লোক। তদৈক্ষতেতি বাক্যেন প্রধানং ব্রহ্ম বোচ্যতে।

জ্ঞানক্রিয়াশক্তিমত্ত্বাৎ প্রধানং সর্ব্বকারণং ॥২৩॥
ঈক্ষণাচ্চেতনং ব্রহ্ম ক্রিয়াজ্ঞানে তু মায়য়া।
আত্মশব্দাত্মতাদাত্ম্যে প্রধানস্য বিরোধিনী ॥২৪॥

টীকা। ছান্দোগ্যে ষষ্ঠাধ্যায়ে—"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং" ইতি প্রস্তুত্য "তদৈক্ষত বহু স্যাম্ প্রজায়েয় ইতি তত্তেজোঽসৃজত" ইতি শ্রূয়তে। তত্র সাংখ্যা মন্যন্তে সচ্ছব্দবাচ্যং সর্ব্বজগৎকারণং প্রধানং নতু ব্রহ্ম। প্রধানস্য সত্ত্বগুণযুক্ততয়া পরিণামিতয়া চ জ্ঞানশক্তিক্রিয়াশক্তিসম্ভবাৎ। নির্গুণস্য কূটস্থস্য ব্রহ্মণস্তদসম্ভবাৎ ইতি।

অত্রোচ্যতে ঈক্ষিতৃত্বশ্রবণাচ্চেতনং ব্রহ্ম সচ্ছব্দবাচ্যং। অচেতনস্য প্রধানস্য ঈক্ষিতৃত্বাযোগাৎ। জ্ঞানক্রিয়াশক্তী তু ব্রহ্মণি মায়য়া সম্ভবিষ্যতঃ। কিঞ্চ, "অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবানি" ইতি নামরূপব্যাকর্ত্রী জগৎকারণদেবতা স্বযাচকেনাত্মশব্দেন চেতনং জীবং ব্যপদিশতি। তথা "তত্ত্বমসি" ইতি চেতনস্য শ্বেতকেতো র্জগৎকারণতাদাত্ম্যং গুরুরুপদিশতি। তদুভয়মপ্যচেতনস্য প্রধানস্য জগৎকারণত্বে বিরুধ্যতে। তস্মাৎ চেতনং ব্রহ্ম সচ্ছব্দেনোচ্যতে ॥

মূলের অনুবাদ। ঈক্ষতি হেতু (জগৎকারণ) অশব্দ (অ-বেদোক্ত) নহে ॥ ৫ ॥ গৌণ যদি, নহে —"আত্ম" শব্দ হেতু ॥ ৬ ॥ তৎ-(আত্ম) নিষ্ঠ ব্যক্তির মোক্ষবিষয়ে উপদেশ হেতু ॥ ৭ ॥ হেয়ত্ব (পরিত্যজ্যত্ব) বিষয়ে উক্তি না থাকা হেতু ॥ ৮ ॥ আপনাতেই লয় হেতু ॥ ৯ ॥ (সর্ব্ববেদের) সামান্য (সাধারণ) গতি হেতু ॥ ১০ ॥ এবং শ্রুতিতে উক্তি হেতু ॥ ১১ ॥

পঞ্চম অধিকরণ সংরচিত হইতেছে—

শ্লোকের অনুবাদ। "তদৈক্ষত" এই বাক্যের দ্বারা প্রধান অথবা ব্রহ্ম উক্ত হইতেছেন? জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি থাকিবার কারণে প্রধান সকলের কারণ। ঈক্ষণ হেতু চেতন ব্রহ্ম, কিন্তু ক্রিয়া ও জ্ঞান মায়া দ্বারা। "আত্ম" শব্দ এবং আত্মার সহিত তাদাত্ম্য (সমধর্ম্মিত্ব) প্রধানের বিরোধী।

টীকার অনুবাদ। ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠাধ্যায়ে "হে সৌম্য, পূর্ব্বে একমাত্র অদ্বিতীয় এই সৎস্বরূপ ছিলেন" এই প্রকারে আরম্ভ করিয়া "তিনি দৃষ্টি বা আলোচনা করিলেন আমি প্রকৃষ্টরূপে জন্মিবার জন্য বহু হই, এই সূত্রে তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন" ইহা শ্রুত হয় (অর্থাৎ শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে)। এই সম্বন্ধে সাংখ্যগণ বলেন "সৎ" শব্দের বাচ্য সর্ব্বজগতের কারণ প্রধান, কিন্তু ব্রহ্ম নহে। প্রধানের সত্ত্বগুণযুক্ত ও পরিণামী হইবার কারণে জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির সম্ভাবনা হেতু। নির্গুণ কূটস্থ ব্রহ্মে তাহার অসম্ভাবনা হেতু।

এ বিষয়ে বলা যাইতেছে—ঈক্ষিতৃত্ব শ্রুত হই-

রার কারণে চেতন ব্রহ্ম সৎ শব্দের বাচ্য। অচেতন প্রধানের ঈক্ষিতৃত্বের যোগাভাব হেতু। জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি কিন্তু ব্রহ্মেতে মায়া দ্বারা সম্ভব হইতে পারে। আরও কি, "এই জীব (রূপ) আত্মা দ্বারা অনুপ্রবেশ করিয়া নাম ও রূপ প্রকাশ করি" এই (সূত্রের দ্বারা) নামরূপপ্রকাশক জগৎকারণ-দেবতা স্ব-বাচক আত্মশব্দের দ্বারা চেতন জীবকে নির্দ্দেশ করিতেছে। সেইরূপ "তত্ত্বমসি" (তিনি তুমি) এই বাক্যের দ্বারা চেতন শ্বেতকেতুর জগৎকারণের সহিত তাদাত্ম্য গুরু উপদেশ করিতেছেন। সেই উভয়ই অচেতন প্রধানের জগৎকারণ হইবার বিরোধী হইতেছে। অতএব চেতন ব্রহ্ম সৎ শব্দের দ্বারা উক্ত হইয়াছেন।

তাৎপর্য্য। এই অধিকরণকে "ঈক্ষতি" অধিকরণ বলা যায়, কারণ যে শ্রুতি অবলম্বন করিয়া এই অধিকরণ রচিত হইতেছে, সেই শ্রুতির প্রথমেই আছে "তৎ ঐক্ষত"। এই ঐক্ষত শব্দের মূল ঈক্ষ ধাতুর উত্তর "স্তিপ্" প্রত্যয়ে "ঈক্ষতি" পদ সিদ্ধ হয়। এই "ঈক্ষতি" শব্দে অবলম্বিত অধিকরণকে "ঈক্ষতি অধিকরণ" বলা হইয়াছে। এই অধিকরণকে "সচ্ছব্দবাচ্যতা" অধিকরণও বলা হয়, কারণ "তদৈক্ষত" মূলক শ্রুতির পূর্ব্বে "সৎ-এব" শব্দ মূলক আর একটী শ্রুতি অবলম্বন করিয়াও এই অধিকরণের বিচার চলিয়াছে।

বেদান্তসূত্রকার পূর্ব্ববর্ত্তী তিনটী সূত্রে প্রধানত দেখাইয়াছেন যে, ব্রহ্ম জগৎকারণ এবং সকল শাস্ত্রই সেই ব্রহ্মেতেই পর্য্যবসিত অর্থাৎ একমাত্র ব্রহ্মকেই জগৎকারণরূপে নির্দ্দেশ করিতেছে। দেখা যাইতেছে যে তাঁহার সময়ের পূর্ব্বাবধি সত্ত্ব, রজ ও তম গুণের সমষ্টিকে "প্রধান" নাম দিয়া তাহাকেই জগৎকারণরূপে নির্দ্দেশ করা সাংখ্যবাদীদিগের অনুমোদিত ছিল। বর্ত্তমান অধিকরণে বেদান্তসূত্রকার সেই মতকে অবৈদিক প্রমাণ করিয়া চেতন ব্রহ্মেরই জগৎকারণত্ব বেদসিদ্ধ বলিয়া প্রমাণ করিতে উদ্‌যুক্ত হইয়াছেন। যে সকল দর্শন বেদান্তসূত্রকারের পূর্ব্বে প্রকারান্তরে জগৎকারণকে অচেতন বলিয়া দাঁড় করাইবার চেষ্টায় ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে সাংখ্যমতই বহুলরূপে প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া বেদান্ত তাহারই মত খণ্ডনে উদ্যুক্ত বলিয়া অনুমান হয়। অবশ্য সাংখ্যেরা তাঁহাদের মতের স্বপক্ষে শ্রুতির দোহাই দিতে পশ্চাৎপদ হয়েন নাই। তাঁহারা বলেন যে, যখন শ্রুতির মতে ব্রহ্ম নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়, তখন তাঁহা দ্বারা কোন সৃষ্টিকার্য্য সম্ভব হয় না। অথচ প্রত্যক্ষ সৃষ্টিকার্য্যও যখন অস্বীকার করিবার উপায় নাই, এবং যখন সৃষ্টিতে জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির পরিচয় থাকাতে জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির সাহায্য বিনা সৃষ্টিকার্য্যের সম্ভাবনা স্বীকার করিতে পারা যায় না, তখন কাজেই সাংখ্যবাদী প্রধান বা প্রকৃতি নামক একটী কল্পিত পদার্থকে জগৎকারণ বলিয়া ধরিয়া লইলেন এবং সেই প্রধান বা প্রকৃতিতে জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি আরোপ করিতে বাধ্য হইলেন। বেদান্তী এখন দেখাইতে চাহেন যে, প্রকৃতির জগৎকারণত্ব অশব্দ অর্থাৎ শ্রুতিতে কোথাও প্রকৃতিকে জগৎকারণ বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই, বরঞ্চ তদ্বিপরীতে "তদৈক্ষত" (তিনি দৃষ্টি বা আলোচনা করিলেন) এই কথা থাকাতে ব্রহ্মেরই জগৎকারণত্ব শ্রুতির অনুমোদিত বলিয়া স্পষ্টই প্রকাশ পাইতেছে। এস্থলে মাত্র শ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া সাংখ্যমত নিরস্ত করিবার চেষ্টা হইয়াছে।

ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে এক শ্রুতিবাক্যে উক্ত হইয়াছে যে, পূর্ব্বে একমাত্র "সৎস্বরূপ" ছিলেন এবং এই বাক্যের পরবর্ত্তী বাক্যেই আছে "তিনি দৃষ্টি বা আলোচনা করিলেন।" প্রশ্ন উঠিল যে উপরোক্ত শ্রুতিমন্ত্রে উল্লিখিত "সৎ" শব্দে কাহাকে ধরিতে হইবে—চেতন ব্রহ্মকে অথবা অচেতন প্রকৃতিকে? বেদান্তী বলিলেন যে শ্রুতির মতে একমাত্র চেতন ব্রহ্মই জগৎকারণ, অচেতন প্রকৃতি কখনই জগৎকারণ নহে, অতএব "সৎ শব্দে চেতন ব্রহ্মকেই বুঝাইবে। বেদান্তী স্বমতের ভিত্তি স্বরূপে "তদৈক্ষত" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য অবলম্বন করিলেন। তিনি বলেন যে শ্রুতিতে যখন "তদৈক্ষত" অর্থাৎ "তিনি দৃষ্টি বা আলোচনা করিলেন", তখন অচেতন প্রকৃতিকে জগৎকারণ বলা শ্রুতির উদ্দেশ্য হইতেই পারে না, কারণ দৃষ্টি বা আলোচনা করা চেতনের ধর্ম্ম। সাংখ্যবাদী বেদান্তীকে এই

যুক্তির উত্তরে বলেন—"ভাল, আমি প্রধান বা প্রকৃতিকে অচেতন বলিয়া ধরিলাম, কিন্তু তাই বলিয়া তাহার জগৎকারণ হওয়া অসম্ভব বলিতে পার না। আমি প্রধানকে সত্ত্ব, রজ ও তমগুণের সমষ্টি বলিয়াছি। এখন আমার মতে এবং তোমারও মতে সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম হইল প্রকাশ, আবার জ্ঞানেরও ধর্ম্ম হইল প্রকাশ। কাজেই চেতন ব্রহ্মের জ্ঞানের সাহায্য বিনা যে সৃষ্টিতে জ্ঞানশক্তির কার্য্য সম্ভব নহে সে কথা বলিতে পার না—প্রধানে প্রকাশধর্ম্মী সত্ত্বগুণ থাকাতেই জ্ঞানশক্তিরও কার্য্য প্রত্যক্ষ হওয়া সম্ভব। সেইরূপ, আমার মতে এবং তোমারও মতে রজোগুণের ধর্ম্ম হইল ক্রিয়াশক্তি, আবার পরিণাম বা নিত্য নূতন ভাবে পরিণত বা পরিবর্ত্তিত হইবারও মূল হইল ক্রিয়াশক্তি; কাজেই চেতন ব্রহ্মের ক্রিয়াশক্তির প্রয়োগ না হইলেই যে সৃষ্টিকার্য্যে ক্রিয়াশক্তির পরিচয় পাওয়া যাইবে না, সে কথা বলিতে পার না—প্রধানে রজোগুণ থাকাতেই স্বীকার করিতে হয় যে "প্রধান" পরিণামী অর্থাৎ নিত্য পরিবর্ত্তনশীল এবং প্রধানে ক্রিয়াশক্তি আছে'।

বেদান্তী ইহার উত্তরে বলিলেন যে, সাংখ্য-দর্শনে পুরুষকে নিত্য ও চেতন, এবং তদ্ব্যতীত অন্য সকলকেই অচেতন বলা হইয়াছে—এই পর্য্যন্ত শ্রুতিসম্মত এবং বেদান্তসম্মত বলিয়া মানিতে প্রস্তুত আছেন; এই অংশে উভয় মতের কোনই বিরোধ দেখা যায় না। কিন্তু সাংখ্য যেখানে "অচেতন" প্রধানকে জগতের কারণ বলেন, সেই খানেই বেদান্তের সহিত এবং শ্রুতির সহিত বিরোধ। কারণ এই যে, শ্রুতি যে মন্ত্রে বলিতেছেন যে, পূর্ব্বে "সৎস্বরূপ" ছিলেন, তাহার পরবর্ত্তী মন্ত্রেই সেই সৎস্বরূপ "দৃষ্টি বা আলোচনা" করিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে দেখা যায়। বেদান্তীর প্রধান যুক্তি এই যে, যতই কেন সত্ত্বগুণ বা রজোগুণ থাক্ না, আলোচনা করা অচেতন কোন কিছুর পক্ষে সম্ভব নয়।

ইহার পর, বেদান্তী আরও বলেন যে, শ্রুতি-মতে সৎশব্দের দ্বারা মাত্র চেতন জগৎকারণ বুঝা-তেছে তাহাও নয়। কিন্তু চেতন আত্মাকেই জগৎ-কারণরূপে নির্দ্দেশ করা শ্রুতির উদ্দেশ্য বলিয়া স্পষ্টই বুঝা যায়, কারণ উহ্যরোক্ত মন্ত্রদ্বয়ের পরেই শ্বেতকেতুকে তাঁহার গুরু আরুণি উপদেশ দিবার কালে ঐ "সৎ" শব্দের বাচ্য জগৎকারণকেই "তিনি আত্মা, তিনি তুমি" বলিয়া স্পষ্টই নির্দ্দেশ করিয়াছেন দৃষ্ট হয়। আর একটী মন্ত্রে "এই জীব-রূপ আত্মা দ্বারা অনুপ্রবেশ করিয়া নাম ও রূপ আমি প্রকাশ করি" এইরূপ বলিয়া শ্রুতি আত্মা-কেই জগৎকর্ত্তারূপে বলিবার অভিপ্রায় খুবই স্পষ্ট-রূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। এই সকল প্রমাণ অব-লম্বনে বেদান্তী বলেন যে শ্রুতিমতে অচেতন প্রধান কিছুতেই জগৎকারণ হইতে পারে না—একমাত্র চেতন ব্রহ্ম বা আত্মাই জগৎকারণ।

কিন্তু এইখানে বেদান্তীর সম্মুখে একটী মহা-সমস্যা আসিয়া উপস্থিত হয়—ব্রহ্ম যখন শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ, অর্থাৎ নির্গুণ ও কূটস্থ, তখন তাঁহা কর্ত্তৃক সৃষ্টি কিরূপে সম্ভব হয়? কেবল চেতন যিনি, তিনি মাত্র আছেন এবং আপনাকে আপনি জানেন। চেতনের সঙ্গে জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির সংযোগ না হইলে পরিদৃশ্যমান সৃষ্টি সম্ভব হয় না, ইহা সাংখ্য ও বেদান্ত উভয় মতেরই সম্মত। এই সংযোগ হয় কিরূপে, অর্থাৎ চেতনে সৃষ্টিমূল জ্ঞান-শক্তি ও ক্রিয়াশক্তি আসে কোথা হইতে? বেদান্তী তাহার উত্তরে বলেন যে মায়া দ্বারা এই সংযোগ সম্ভব হয়। আকাশে কোন প্রকার বর্ণ না থাকি-লেও তাহাকে নীলবর্ণ বলিয়া একটা ভ্রম হয়—আকাশে নীলবর্ণের একটা মিথ্যা আরোপ হয়। এইরূপ আরোপ যে ভ্রমের কার্য্য, তাহাকেই মায়া বলা যাইতে পারে। এই মায়ার ফলে ব্রহ্মেতে সৃষ্টির মূল জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি সংযুক্ত হয়, অর্থাৎ ব্রহ্মের সৃষ্ট্যাত্মক একটা ভ্রম উপজাত হয়। কাজেই দাঁড়ায় এই যে, সৃষ্টি প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মের কল্পনা, ব্রহ্মকে ছাড়িয়া ইহার বাস্তব কোন সত্তা নাই।

তারপর, বেদান্তী বিপক্ষ পক্ষের একটী বিতর্ক নিজেই উপস্থিত করিলেন যে, 'ঐ যে ঈক্ষণ বা আলোচনার কথা বলা হইয়াছে, উহা গৌণভাবে বলা হইয়াছে; মনে কর যে, যদি আমি বলি যে, ফুল হাসিতেছে, তবে আমার উক্তির তো এমন তাৎপর্য্য নহে যে, সত্য সত্যই ফুল হাসিতেছে—

আমার বলার উদ্দেশ্য এই যে, ফুলগুলি যেভাবে রহিয়াছে, তাহাতে মনে হয় যেন ফুল হাসিতেছে ;—ইহাকেই বলা যায় যে গৌণভাবে ফুলের হাসির কথা বলা হইয়াছে। সেইরূপ উপরোক্ত "তদৈক্ষত" ইত্যাদি শ্রুতিতে চেতন ব্রহ্মের পরিবর্ত্তে অচেতন প্রধান-সম্বন্ধেই গৌণভাবে আলোচনার কথা বলা হইয়াছে, অর্থাৎ সৃষ্টির কারণরূপে প্রধান যেন আলোচনা করিয়াছিল, এইভাবেই উহা শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, যদি বলা যায় ? বেদান্তী নিজেই তদুত্তরে বলিতেছেন যে তাহা ঠিক নহে, কারণ তাহা হইলে শ্রুতিতে স্পষ্টরূপে আলোচনার কর্ত্তাকে চেতন আত্মারূপে নির্দ্দেশ করা থাকিত না।

আরও কয়েকটী স্বমতের সমর্থক যুক্তি উল্লেখ করিয়া বেদান্তী সাংখ্যবাদীকে সম্পূর্ণ নিরস্ত করিতে চাহেন। একটী যুক্তি এই যে, আত্মনিষ্ঠেরই মুক্তি হয় শ্রুতিতে এইরূপ উপদেশ আছে। সাংখ্যবাদী যদি ইহা ধরেন যে, প্রিয়তম ব্যক্তির প্রতি যেরূপ গৌণভাবে আত্মা শব্দের প্রয়োগ হয়, সেইভাবেই হয়তো প্রধানেরই প্রতি গৌণভাবে আত্মা শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে ? তাহারই খণ্ডনের জন্য বেদান্তী বলেন যে সে প্রকার গৌণভাবেও আত্মাশব্দের প্রয়োগ সম্ভব নয়। শ্রুতিতে আছে যে আত্মনিষ্ঠেরই মুক্তি হয়। এখন, সাংখ্যেরও মতে (বেদান্তেরই ন্যায়) অচেতন যাহাই হৌক না কেন, তাহাকে পাইলে মুক্তি হয় না। সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে শ্রুতির মতে চেতন আত্মাই জগৎকারণ।

বেদান্তী আর একটী বিতর্কের অবতারণা করিলেন। অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিকে কোন কঠিন বিষয় বুঝাইতে গেলে সহজবোধ্য বিষয়ের অবলম্বনে বুঝাইবার বিষয়ে অগ্রসর হইতে হয় ; কোন সূক্ষ্ম বিষয়কে বুঝাইতে গেলে স্থূল স্থূল বিষয়ের সাহায্যে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হয়। কিন্তু যতই কঠিনতর বা সূক্ষ্মতর বিষয়ে অগ্রসর হওয়া যায়, ততই সেই সেই বিষয়ের পশ্চাদ্বর্ত্তী বিষয়গুলিকে, বুঝাইবার প্রকৃত লক্ষ্য বিষয় নহে বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হয়। মনে কর, কাহাকেও অরুন্ধতী নক্ষত্র দেখানো আবশ্যক হইল। তখন হয়তো প্রথমে তাহাকে বলিলাম যে চন্দ্রকে দেখ। সে যখন বলিল যে চন্দ্রকে দেখিতেছে, তখন তাহাকে বলিলাম যে চন্দ্র অরুন্ধতী নক্ষত্র নহে, তাহার পার্শ্ববর্ত্তী ঐ উজ্জ্বল নক্ষত্রটি দেখ। সে যখন বলিল যে সেই নক্ষত্রকে দেখিতেছে, তখন তাহাকে বলিলাম যে ঐ নক্ষত্রও অরুন্ধতী নহে, কিন্তু উহার সমসূত্রে অবস্থিত ঐ সূক্ষ্মতর নক্ষত্রটী দেখ। এইরূপে তাহাকে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর নক্ষত্র দেখাইতে দেখাইতে এবং পূর্ব্বদৃষ্ট স্থূলতর নক্ষত্র যে অরুন্ধতী নক্ষত্র নহে তাহা প্রতিপদে বুঝাইতে বুঝাইতে ক্রমে তাহাকে অরুন্ধতী নক্ষত্র দেখাইলে, দেখাইবার সুবিধা হয়। এই প্রকার পূর্ব্ববর্ত্তী বিষয়সমূহকে একে একে ত্যাগ করাকেই "হেয়" করা বলা হয়। "হেয়" শব্দ ত্যাগার্থ "হা" ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এখন কথা এই যে, সাংখ্যবাদী যদি বলেন যে, শ্রুতিতে যেখানে আছে সৎ-কে পাইলেই মুক্তি হয়, সেখানে গৌণভাবে প্রধানকে উদ্দেশ করিয়াই "সৎ" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার উত্তরে বেদান্তী পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্ত অবলম্বনে বলেন যে তাহা হইতে পারে না, কারণ গৌণভাবে প্রধানকে মোক্ষের কারণ বলিয়া ধরা হইলে মুখ্যভাবে ব্রহ্মকে মোক্ষের কারণ বলা আবশ্যক হইত এবং সেই সময়ে ইহাও বলা আবশ্যক হইত যে "প্রধান" মোক্ষের প্রকৃত কারণ নহে। কিন্তু শ্রুতিতে কোথাও এই ভাবে সৎশব্দবাচ্য প্রধানকে হেয় বা পরিত্যাগ করিবার কোন কথা পাওয়া যায় না। কাজেই বলিতে হয় যে মোক্ষের একমাত্র কারণ চেতন ব্রহ্মই জগৎকারণ এবং তিনিই সৎশব্দের বাচ্য।

সৎশব্দের অর্থে যে শ্রুতিতে প্রধান বুঝায় না, তাহারই সমর্থনে বেদান্তী আর একটী প্রমাণ দিতেছেন এই যে, শ্রুতিতে আছে যে "সুষুপ্তি অবস্থায় এই পুরুষ "সৎ" এর সহিত মিলিত হয়েন।" এই কথা শ্বেতকেতুকে বলা হইয়াছে। এখানে "মিলিত" হওয়ার অর্থে "লীন" হওয়া বা লয় পাওয়া বা অভিন্নভাবে মিলিত হওয়া ধরিতে হইবে। এখন, যে শ্বেতকেতুকে ঐ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, সেই শ্বেতকেতু চেতন। এখন কথা এই যে, চেতন কাহার সঙ্গে অভিন্নভাবে মিলিত বা লীন হইতে পারে ? জল জলেই লীন হয়, মাটীতে লীন হয় না। সেইরূপ চেতন চেতনেই লীন হইতে

পারে, অচেতনের সঙ্গে হইতে পারে না। সহজ কথায় বলা যাইতে পারে যে, সমধর্ম্মী না হইলে পরস্পরে অভিন্নভাবে লীন হইতে পারে না। দুইটী বস্তু সমধর্ম্মী হইতে গেলেই এক হইতে অপরের উৎপন্ন বা অংশ হওয়া আবশ্যক, তাহা না হইলে উভয়ের ধর্ম্ম এক হইতে পারে না। এই কারণে শাস্ত্রীয় একটী যুক্তি এইরূপ উক্ত হয় যে, যাহা হইতে উৎপত্তি, তাহাতেই লয় বা অভিন্নভাবে মিলন সম্ভব। এই যুক্তি অবলম্বনে বেদান্তী বলিতেছেন যে, যখন চেতন শ্বেতকেতুরূপ আত্মার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে সুষুপ্তিকালে সেই আত্মা "সৎ" এর সহিত লীন হইয়া যান, তখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে সেই "সৎ" হইতেই শ্বেতকেতুরূপ চেতন আত্মার উৎপত্তি এবং কাজেই একমাত্র চেতন আত্মা ব্রহ্মই "সৎ" শব্দের বাচ্য।

সমস্ত শ্রুতির একবাক্যতা বেদান্তীদিগের মতে সৎ শব্দবাচ্য ব্রহ্মেরই জগৎ কারণ হইবার সপক্ষে অন্যতর প্রমাণ। সাংখ্য, বৈশেষিক প্রভৃতি বিভিন্ন তর্কশাস্ত্রে একমাত্র কোন বস্তুকে জগতের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয় নাই—সাংখ্য প্রধানকে জগৎ কারণ বলেন, বৈশেষিক পরমাণুকে বলেন ইত্যাদি। কিন্তু সমস্ত শ্রুতিই একমাত্র চেতন আত্মা বা ব্রহ্মকেই জগতের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আবার আলোচ্য অধিকরণের অবলম্বিত শ্রুতিতে দেখা যায় যে "সৎ"কেই সৃষ্টির কারণ বলা হইয়াছে। অতএব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে জগৎকারণ চেতন আত্মা ব্রহ্মই একমাত্র সৎশব্দের বাচ্য, ইহা শ্রুতিসমূহের অভিমত।

উপসংহারে বেদান্তী বলিতেছেন যে চেতন আত্মা ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব কেবল যে শ্রুতিসমূহে উল্লিখিত হইয়াছে তাহা নহে, কিন্তু এই মতই সর্ব্বজনবিশ্রুত।

Brahmo Dharma.

CREED.

1. In the beginning was the one God, none else, and naught but He, the Creator of all things.

2. He is the True, the Good, the Infinite. He is the Eternal Lord of the universe, the All-knowing, All-pervading, All-protecting, the Almighty. He is the Formless, Changeless, Self-contained and Perfect. He is the One and Absolute, there is none like unto Him.

3. In His worship lies our good, in this world and in the next.

4. To love Him and to do His will,—this is His true worship.

INITIATION.

I accept this creed as my own, and embrace the Brahmo faith.

1. Loving Him and doing His will, I shall worship the One, Absolute Parabrahma, the Creator, Preserver and Destroyer, who is the Giver of all good in this world and the next, who is All-knowing, All-pervading, Formless and Beneficent.

2. I shall not adore any created thing, thinking it to be Parabrahma.

3. Unless prevented by sickness or trouble, I shall daily, in loving reverence, hold communion of spirit with Parabrahma.

4. I shall endeavour to perform good deeds.

5. I shall endeavour to abstain from sinful deeds.

6. If I should ever, through delusion, be led into sin, I shall desist therefrom with sincere repentance.

7. I shall give something, out of my income, every year to the Brahmo Samaj, to promote the Brahmo faith.

O God, grant me strength to live in accordance with the sacred principles of this religion.

God, the One alone, the Absolute.

Ekamevâdvitîyam

The Service.

PRAYER.

Thou art our Father ; as a father, teach us true wisdom : we bend low in reverence before Thee ; save us from delusion and sin ; forsake us not, destroy us not.

O God our Father, forgive us our trespasses and send us that which is for our good.

Thou art the cause and source of all goodness and happiness. Thou art goodness itself, and more than good. We bow down to Thee.

SALUTATION.

We bow down in reverence, again and yet again, to the Deity who dwells in fire, in water, who is immanent in the universe, who is in plants as well as in the trees.

COMMUNION.

He who is our Creator, Protector and Giver of all happiness, the Life of all life and the Fount of all good, from Whose grace we derive our body and mind, our intellect and strength, our wisdom and piety, the constant Protector of our body and mind from manifold disasters, He is the True, All-wise and Infinite Parabrahma, revealing Himself in bliss and immortality. He is the Peace, the Righteousness, the One above all.

With mind intent and full of love, I now hold communion of soul with this supreme Spirit of good.

He is all-pervading, stainless, formless, without infirmity or blemish, pure and sinless, free from all fleshly taints. He is the all-seeing Ruler of the mind. Highest of all is He and Self-revealed. He bestows on His creatures all things at all times according to their needs. He has given us our life, our mind and all our senses. He has created the sky, air, light, water and the all-receiving earth.

Through fear of Him the fire burns, the sun gives out its rays, the clouds pour forth rain, the winds blow, and death wanders through the world.

MEDITATION.

Let me meditate on the benign wisdom and might of that Supreme Being, who reveals all worlds, who pervades all things, who is the highest good, the Creator of the universe, who sends us all our powers of thought.

HYMN.

Thou art the Real, the prime cause of the Universe.
We bow to Thee.
Thou art the All-wise, the one Refuge of all.
We bow to Thee.
We bow to Thee, the Absolute,
the Giver of salvation.
Thou art the Supreme, the Eternal,
All-present Brahma, we bow to Thee.
To thee alone is honour due,
Thou alone art the Protector of all,
Thou alone preservest the Universe,
The self-revealed.
Thou alone art Creator, Preserver, and Destroyer of all,
Most high, motionless and fixed of purpose,
Thou the dread of all dreads
The Terror of the terrifying,
Thou art the End of all creatures,
The Purifier of all which purify.
Thou alone art the Ruler of all high estates,
Holier than the holiest,
The Guardian of those who guard.
We commune with Thee, we pray to Thee,
Thou art the Witness of the universe,
We bow to Thee.
Let us seek refuge in the one, absolute God,
Who is shelter, self-poised,
Who is our raft on the sea of life.

PRAYER.

O divine Spirit, deliver us from all sins committed in ignorance of Thy purpose, keep our hearts free from all evil thoughts, make us diligent in righteous deeds which thou hast inspired, grant us with earnest reverence and love to think always of Thy boundless glory and unspeaktable goodess, so that at the last we may attain our fulfilment in the beatitude of Thine Eternal union.

Lead me from the unreal to the real,
Lead me from darkness into light,
Lead me from death to life Eternal.
O Thou self revealed, reveal Thyself to me.
O Terrible, ever protect me with thy look benign.

RECITATION.

Thus say the worshippers of Brahma :—

He from whom all creatures proceed, by whom their life is sustained, to whom they go forth, and into whom they enter at the end of time,—seek ye to know Him wholly; He is Brahma.

All creatures spring from Pa abrahma who is Joy Eternal.

After birth their life is preserved by Brahma who is Joy eternal.

At the end of time, they go forth and enter into Brahma, who is Joy Eternal.

He who has tasted the eternal joy of Parabrahma, before whom thoughts and words fail, he no longer knows fear.

That divine Spirit is of joy all compact and satisfies every longing of the heart. All creatures delight to attain to that Parabrahma who is eternal bliss.

Who would ever live and move and have their being, if this divine Spirit of joy did not fill the heavens? He it is who scatters delight through all worlds.

When the worshipper freely rests in this Parabrahma, who is invisible, formless, inexpressible and unbounded, he is released form fear.

He who has known the delights of that Parabrahma, before whom our thoughts and words fail, no longer knows any fear.

He is the highest goal of all creatures,
He is their greatest wealth,
He is their final abode,
He is their utmost joy,

All others enjoy only a particle of this in-effable bliss.

God the Eternal, Peace, Peace, Peace.

CONCLUDING PRAYER.

May God, the Transcendent, who knows the needs of all His creatures and supplies them by His manifold power, who pervades the universe from beginning to end, the shining Lord of all deities, inspire us with holy thoughts and aspirations.

শোক-সংবাদ।

সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে বঙ্গদেশের যে ক্ষতি হইল, তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নহে। বিনয়ে ঔদার্য্যে সরলতায় ব্রাহ্মোচিত অমায়িক ব্যবহারে তিনি সকলের আদর্শীভূত ছিলেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি সাধারণের হিতকর কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। কলিকাতার ভিতরে এমন কোন সভা সমিতি হইত না যেখানে গুরুদাস বাবুর পদধূলি না পড়িত। সাহিত্য পরিষদের তিনি একজন বিশেষ উৎসাহদাতা ছিলেন। বঙ্গভাষায় শিক্ষা বিস্তারে তিনি যাহা করিয়া গিয়াছেন তাহার জন্য জন-সাধারণ তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে।

ভাই উমানাথ গুপ্ত। নববিধান সমাজের অন্তর্গত বর্ষীয়ান শ্রীযুক্ত ভাই উমানাথ গুপ্ত ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। যাঁহারা এক সময়ে প্রবল উৎসাহের সহিত ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়াছিলেন, তাঁহারা, একে একে অন্তর্হিত হইতেছেন। সুলভ সমাচারের সহিত উমানাথ বাবুর নাম বিশেষ ভাবে বিজড়িত। মহর্ষির প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। পরমেশ্বর তাঁহার পরলোকগত আত্মায় শান্তি বিধান করুন।

শ্রীমৃণালিনী দেবী। শ্রদ্ধেয় রাজনারায়ণ বসুর দৌহিত্র শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ গত ২রা পৌষ তাঁহার পত্নী হারাইয়াছেন। অরবিন্দ বসুর অসামান্য প্রতিভা বিপদসঙ্কুল সংসারে সেরূপ ফুটিতে পারিল না, ইহাতে আমরা বিশেষ ক্ষুব্ধ। অরবিন্দ বাবু এখন কোথায় কি অবস্থায় জানি না, তাঁহার সাধ্বী স্ত্রী চলিয়া গেলেন ঈশ্বর তাঁহাকে তাঁহার মঙ্গলময় ক্রোড়ে স্থান দিন।

শ্রীযুক্ত অজিত কুমার চক্রবর্ত্তী। অজিত বাবু অপরিণত বয়সে আমাদিগকে ছাড়িয়া গেলেন। তাঁহার আরব্ধ রাজা রামমোহন রায়ের জীবনী অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল। মহর্ষির জীবনী রচনায় তিনি তাঁহার পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহা হইতে আমরা অনেক প্রত্যাশা করিয়াছিলাম। আমাদিগকে বঞ্চিত হইতে হইল। ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা সংসিদ্ধ হউক। আমরা আর কি বলিব?

ঊননবতিতম সাম্বৎসরিক

ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ই মাঘ শনিবার প্রাতঃকাল ৮ ঘটিকার সময় মহর্ষিদেবের ভবনে ব্রহ্মোপাসনা হইবে। অতএব ঐ দিবস যথাসময়ে উক্ত গৃহে সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

একমেবাদ্বিতীয়ং

ঊনবিংশ কল্প

চতুর্থ ভাগ।

ফাল্গুন ব্রাহ্মসম্বৎ ৮৯।

১০৬ সংখ্যা

১৮৪০ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"

ঊননবতিতম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব।

(সুরেশ চন্দ্র চৌধুরী)

বর্ত্তমান বৎসরের দুঃখ-দুর্দ্দিনের ভিতর, মহামারী দুর্ভিক্ষ প্রভৃতির ভিতর দিয়া ব্রহ্মোৎসবের সার্থকতা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ভগবানকে প্রাণের সহিত ডাকিতে হইবে, এই প্রকার একটা ব্যাকুল প্রার্থনার ভাব যেন সকলের প্রাণে জাগিয়া উঠিয়াছিল।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গনে প্রাতঃকালের এবং সায়ংকালের উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছিল। প্রাঙ্গনটী পুষ্পমাল্যে সুশোভিত হইয়া এবং দীপমালায় সুসজ্জিত হইয়া সকলের হৃদয়ে উৎসবের ভাব জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছিল।

প্রাতঃকালের উৎসবে প্রায় তিন শত ভক্তজন গভীর শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে উপস্থিত হইয়া আচার্য্যদিগের সঙ্গেই ভগবানের চরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছিলেন। আমাদের আশা এই অল্পসংখ্যক ভক্তমণ্ডলী দেখিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করে না। আমরা চাই যে বিস্তৃততর ভক্তমণ্ডলী প্রস্তুত হইয়া প্রাণ ভরিয়া প্রাতঃকালের বিহগগীতের সঙ্গে আপনাদের হৃদয়ের গীত মিলাইয়া দেন।

প্রাতঃকালে সকলে সমবেত হৃদয়ে সেই সুপ্রসিদ্ধ অর্চ্চনাগীত "দেহজ্ঞান দিব্যজ্ঞান দেহ প্রীতি শুদ্ধ প্রীতি—তুমি মঙ্গল আলয়; ধৈর্য্য দেহ বীর্য্য দেহ তিতিক্ষা সন্তোষ দেহ বিবেক বৈরাগ্য দেহ দেহ ওপদ আশ্রয়" গাহিবার পর ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে মধ্যে রাখিয়া শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় বেদীর আসন পরিগ্রহ করিলেন।

তৎপরে শ্রীমতী রমাদেবী এবং শ্রীমতী অরুণাদেবী সুমিষ্ট কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের একটী গান গাহিলেন। তৎপরে সুগায়ক ভ্রাতৃদ্বয় শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ গায়কগণ গম্ভীর ভৈরব রাগে একটী গান করিবার পর আমাদের প্রিয়বন্ধু ক্ষিতীন্দ্র বাবু তাঁহার ভগ্নী শ্রীমতী শোভনা দেবীর সহিত স্বরচিত গান গান্ধারী তোড়ী রাগিণীতে গাহিয়া সকলের হৃদয়কে ভগবানের উপাসনার জন্য প্রস্তুত করিয়া দিলেন।

তৎপরে সুধীন্দ্র বাবু তাঁহার স্বাভাবিক কবিহৃদয়োত্থিত প্রাণস্পর্শী ভাষায় ঈশ্বরোপাসনায় যোগ দিবার জন্য সমবেত ভক্তমণ্ডলীকে আহ্বান করিলেন।

ভক্তিভাজন সত্যেন্দ্রনাথ প্রাচীন হইলেও তাঁহার যে স্বাভাবিক উৎসাহ লইয়া উপাসনাকার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন, তাহা বর্ত্তমান সময়ের যুবকগণের অনুকরণযোগ্য।

উপাসনার পর চিন্তামণি বাবু প্রার্থনার প্রয়োজন সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন।

সায়ংকালের উৎসবে নির্দ্দিষ্ট সময়ের বহুপূর্ব্বেই সমস্ত প্রাঙ্গন লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সন্ধ্যা ৬টার সময় মঙ্গলশঙ্খ ও ঘণ্টাধ্বনি ধ্বনিত হইল।

তৎপরে শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী ও শ্রীমতী বাণী-দেবী স্বরসন্ধি সহকারে অর্গ্যাণ ও পিয়ানো যন্ত্রে বেদগান (তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং) বাজাইতে লাগিলেন এবং তাহার সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া গায়কগণ ও বালিকাগণ বেদগান গাহিয়া এক স্বর্গীয় ভাব সকলের হৃদয়ে আনয়ন করিয়াছিলেন। উপনিষদের সেই কথা—মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বেদেবা উপাসতে—মুহুর্মুহু আমাদের মনে জাগিয়া উঠিতেছিল।

বেদগানের পর আচার্য্যগণ বেদী গ্রহণ করিলেন এবং আরম্ভোচিত সঙ্গীত হইবার পর আদিব্রাহ্মসমাজের অন্যতর সভাপতি সুবিদ্বান্ ধর্ম্মনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় স্বাভাবিক সুগম্ভীর স্বরে সমবেত উপাসকগণের প্রতি তাঁহার অভিভাষণ পঠ করিলেন। সেই অভিভাষণে তিনি হিন্দুর ধর্ম্ম কি এবং হিন্দুধর্ম্মের বীজ যে প্রকৃত অসাম্প্রদায়িক এবং সেই ধর্ম্মবীজ ও আদিব্রাহ্মসমাজের প্রচারিত ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ যে একই তাহাই সুস্পষ্টরূপে বুঝাইয়া সকলকে অসাম্প্রদায়িক সত্যধর্ম্ম গ্রহণে আহ্বান করিলেন।

যথাসময়ে ভক্তিভাজন সত্যেন্দ্রনাথ শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ শিরোমণি এবং শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত উপাসনাকার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন। এই উপাসনা উপলক্ষে সত্যেন্দ্র বাবু, মহর্ষিদেব যে কি ভাবে ১১ই মাঘের উৎসবের প্রবর্ত্তনা করিলেন, তদ্বিষয়ে একটী সুদীর্ঘ সারগর্ভ উপদেশ দিলেন। সর্ব্বশেষে ক্ষিতীন্দ্র বাবু নির্জ্জন ও সজন উপাসনার উপকারিতাবিষয়ক একটী সুলিখিত উপদেশ পাঠ করেন। বর্ত্তমানে এক সম্প্রদায়ের মধ্যে উপাসনা, বিশেষত সজন উপাসনার উপযোগিতাবিষয়ে আলোচনা উপস্থিত হইয়াছে! ক্ষিতীন্দ্র বাবু তাঁহার উপদেশে এ বিষয়ে সন্দেহের নিরর্থকতা সুন্দররূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। উপদেশটী বড়ই সময়োপযোগী হইয়াছে। প্রাঙ্গনের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত তাঁহার উপদেশের প্রত্যেক শব্দটী সুস্পষ্ট শোনা গিয়াছিল।

সর্ব্বশেষে কবি রবীন্দ্রনাথের সুপ্রসিদ্ধ প্রার্থনাগীত "পাদপ্রান্তে রাখ সেবকে" স্বরসন্ধি সহকারে গীত হইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

সমাগত ভক্তমণ্ডলীকে শ্রীযুক্ত ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর বেহালা ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে পঠিত তাঁহার "ব্রাহ্মসমাজের লক্ষণ" বিষয়ক একটী উপদেশ মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করিয়াছিলেন। আশ্চর্য্য-এই যে, ইহারও মধ্যে সেই উপাসনার উপযোগিতাই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।

মাঘোৎসবের উদ্বোধন।

(শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

আজ প্রাতঃকালে সমস্ত কুজ্ঝটিকা অন্ধকার দূর করে' সূর্য্যকিরণ যেমন প্রকাশ পাচ্চে, তেম্নি আজকের এই শুভ উৎসব আরম্ভে আমাদের অন্তরের সমস্ত গ্লানি সংশয় সন্দেহ বিষাদ অবসাদ দূর করে' প্রত্যেকের হৃদয়ে আনন্দজ্যোতি বিভাসিত হোক্। আজকের এই উৎসব কোন ব্যক্তিগত জীবনের পার্থিব আশা আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থতার উৎসব নয়, কোন পারিবারিক বা সামাজিক ক্রিয়াকর্ম্ম অনুষ্ঠানের উৎসব নয়, কোন জাতিবিশেষের কৃত কর্ম্মগৌরবের উৎসব নয়, আজকের এ উৎসব সমস্ত মানবজাতির পরমোৎসব। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি রাজরাজেশ্বর যিনি, তাঁর অন্তঃপুরে সন্তানপরিচয়ে আমাদের সকলেরই যে সমান স্বাধীন অবাধ গতিবিধি, তাঁর সম্মুখে আমাদের প্রাণের সকল অভাব আকাঙ্ক্ষা নিবেদনের যে পূর্ণ অধিকার আছে, আজ এইদিনে এদেশে এ আনন্দবার্ত্তা পুনঃপ্রচারিত হয়েছে। আজকের এ উৎসবের অধিকারী উদ্যোক্তা আনন্দফলভাগী আমরা সকলেই। আজ নববেশে শুদ্ধচিত্তে আমরা সকলে এক হ'য়ে এ উৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছি—আজ যিনি এই উৎসবের দেবতা তাঁকে আমরা প্রাণের মধ্যে দেখে, নতমস্তকে ভক্তিভরে তাঁর চরণে প্রণাম করে' এস আমরা এ উৎসবের আবাহন করি।

আজ কিছুকাল থেকে আমরা দেখ্‌চি এ পৃথিবীর বুকের উপর কি ভীষণ ঝড়ই ব'য়ে যাচ্চে ;—দুর্ভিক্ষ মহামারী যুদ্ধবিগ্রহ রোগ শোক মৃত্যুর করাল ছায়ায় এ পৃথিবীর মুখ অন্ধকার। মানবপ্রাণে এরূপ নিদারুণ আঘাতের পর আঘাত জগতের ইতিহাসে আর দেখা যায় না। কত গ্রাম নগর জনপদ দেশ-দেশান্তর আজ শ্মশানে পরিণত, কত স্নেহময়ী জননীর কোল আজ শূন্য, কত শিশুপ্রাণ আজ অনাথ নিরাশ্রয়, কত প্রিয়পরিজনবেষ্টিত আনন্দমুখর সুখের ভবন আজ নীরব নিস্তব্ধ,—চারিদিকে অন্ধকার অন্ধকার। কিন্তু এই দুর্দ্দিনের অন্ধকারে সব্‌চেয়ে আমাদের এই কথাই বেশী করে' মনে হয় যে, যে আঘাত, প্রতিদিনের যে নিদারুণ বিচ্ছেদব্যথা এই দুর্ব্বল মানুষের শরীর মনকে নিমেষে চূর্ণ বিচূর্ণ করে' দিতে পারে তা' কেমন করে' আজ আমাদের পক্ষে সহনীয় হ'ল ? কেমন করে' এই প্রলয়-ঝঞ্ঝার মুখে আমরা এখনও নির্ভয়ে অবস্থান করচি ? কোন্ আশ্বাসে বিশ্বাসে এখনও আমাদের মুখে হাসি, প্রাণে আশা, কর্ম্মে উৎসাহ, জীবনে উৎসব র'য়েছে ? সংসারচক্র যেমন চল্‌ছিল তেম্‌নি চল্‌চে ? ব্রাহ্মধর্ম্ম—যে সত্যধর্ম্মের উৎসবে আমরা আজ এখানে সকলে সমবেত হয়েছি—তিনিই এর উত্তর দিচ্চেন—এ জগতে এক সর্ব্বশক্তিমান অদ্বিতীয় পরমেশ্বর আছেন, তিনিই একমাত্র এই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ; তিনি মঙ্গলময় ; আমরা সকলেই তাঁর সন্তান। তিনি মঙ্গলময় ;—আমরা মুখে যে যাই বলি না কেন, অন্তরে তাঁকেই আমরা মানি, তাঁর মঙ্গলবিধানে বিশ্বাস করি। আমরা জানি, এ জগৎসৃষ্টি কোন অন্ধশক্তির নিয়মাধীনে নেই ; আমরা জানি, আমাদের এ মানবজীবন শূন্যময় নয় ; আমরা জানি, জন্ম হ'তে আরম্ভ করে' আমাদের জীবনরক্ষার এত স্নেহ-আয়োজন কোন নিষ্ঠুর দানবের ক্রূর পরিহাস নয় ; আমরা জানি, শীতের পর বসন্ত আসে—আবার ফুল ফোটে, পাখী গান গায়, মধুর বাতাস বয়, পাতায় পাতায় রঙ ধরে—চারিদিকে আনন্দ জেগে ওঠে ; আমরা জানি, দুর্গন্ধ কদর্য্য পঙ্ক ভেদ করে' অপূর্ব্ব শোভাময় কমল ফুটে ওঠে ; এবং আমরা জানি, এই দুঃখময় পৃথিবীতে আমরা নিরাশ্রয় নই, ঈশ্বর আছেন—এ অন্ধকারপথে তাঁরই মঙ্গল কর আমাদের অমৃতের পথে নিয়ে যাচ্চে, আমাদের কোন ভয় নেই, ভয় নেই। এই জ্ঞানে ও বিশ্বাসে, যিনি বিশ্ববিধাতা তাঁরই জয়গান পূজা করতে আমরা সকলে এখানে সমবেত হ'য়েছি। আজ ব্যাকুলপ্রাণে তাঁকেই আমরা ডাক্‌চি, তিনি তাঁর অভয় মঙ্গল-মূর্ত্তিতে আমাদের নিকট প্রকাশিত হউন্।

আজ আমাদের উৎসব, আনন্দের দিন ; এ উৎসব পুষ্পসৌরভের মত ক্ষণকালের জন্য আমাদের জীবনে বৎসরান্তে এক দিন আসে ; তাই আবার বলি, আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে আজ আনন্দজ্যোতি বিভাসিত হোক্। এ উৎসবক্ষেত্রে ভগবান আমাদের পূজাগ্রহণের জন্য দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি আমাদের বল্‌চেন, 'আমি তোমাদের সঙ্গে এখানে রয়েচি, আমি তোমাদের পরিত্যাগ করিনি ; তোমরা আমাকে আর দূরে রেখো না ; তোমাদের দুঃখ তোমাদের প্রাণের,—তোমাদের প্রাণের সেই ঘরের মধ্যে আমাকে নিয়ে যাও, আমি তোমাদের সকল দুঃখ দূর করে দেব।'—এস আজ আমরা আমাদের প্রাণেশ্বর প্রিয়তম জীবনবল্লভকে আমাদের প্রাণের ঘরে আনি, হৃদয়ের শ্রদ্ধাভক্তিপ্রীতির কুসুমাঞ্জলি দিয়ে তাঁর পূজা করে' আমাদের জীবনকে নিরাময় ধন্য ও এ উৎসবকে সার্থক করি।

প্রার্থনার প্রয়োজন। *

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)

সম্বৎসরকাল পরে আমরা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের স্মৃতিমণ্ডিত তাঁহারই এই আবাস-নিকেতনে, মাঘোৎসব উপলক্ষে সকলে মিলিত হইয়াছি। ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ—যাহা মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের অমূল্য দান, এখনও আমরা তাহার প্রকৃত মর্য্যাদা উপলব্ধি করিতে পারি নাই। তিনি আমাদিগকে আধ্যাত্মিক চেতনা প্রদান করিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন, কিন্তু সে অরুণালোক লাভ করিয়া এখনও আমরা আমাদিগকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে পারি নাই। তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য, বিপুল স্বদেশপ্রেম, এখনও আমাদিগকে তাঁহার

* ১১ই মাঘ প্রাতঃকালের উপাসনায় বিবৃত।

পথের পথিক করিতে পারে নাই। দেবেন্দ্রনাথের বৈরাগ্য, তাঁহার আকুলতা, তাঁহার ত্যাগের ভাব এখনও আমরা হৃদয়ে বদ্ধমূল করিতে পারি নাই।

রাজা রামমোহন অদ্যকার শুভদিনে আদি-ব্রাহ্মসমাজ-গৃহের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ছিল, যে প্রতিদিন সেখানে এমনই ভাবে প্রার্থনা ও সঙ্গীত চলিবে, যাহাতে ভগবৎ-চিন্তার ভাব অন্তরে জাগ্রত হয়, নীতি ও ধর্ম্মের ভাব বিকশিত হয়, সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রত্যহ এই ভাবে উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব হইলে, সপ্তাহান্তে একদিন মিলনের আদেশ তিনি রাখিয়া গিয়াছেন। প্রায় নব্বুই বৎসর অতীত হইতে চলিল, ঠিক এই দিনে সম্পাদিত "ব্রহ্মসভার" প্রতিষ্ঠাপত্রে, রাজা তাঁহার বিরাট হৃদয়ের যে সুস্পষ্ট ছবি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে গিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়া যাই। সম্মিলিত ভাবে উপাসনা না করিলে যে জাতির কল্যাণ নাই, দেশব্যাপী জাগরণের সম্ভাবনা নাই, ইহা বুঝিয়া তিনি মিলিতভাবে উপাসনার পথ প্রমুক্ত করিয়া দিলেন।

নিরবচ্ছিন্ন প্রার্থনা উচ্চ অঙ্গের সাধনা কি না, তৎসম্বন্ধে মতদ্বৈধ থাকিলেও, প্রার্থনা ছাড়িয়া মানুষ এক দণ্ডের জন্যও তিষ্ঠিতে পারে না। প্রার্থনা মানবের চিরসঙ্গী। দুর্ব্বলতাই উহার নিয়ামক। মাতার ক্রোড়ে শায়িত ক্ষুদ্র শিশু ক্রন্দনের ভাষায় তাহার অভাব অভিযোগ পিতা মাতা বা ধাত্রীর নিকট জ্ঞাপন করে। শিশুর বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল, অর্দ্ধস্ফুট স্বরে ক্রমিকই তাহার প্রার্থনা; বিদ্যালয়ে গিয়াও তাহার প্রার্থনার অন্ত নাই। সে শিক্ষককে ব্যতিব্যস্ত করিয়া শিক্ষা-লাভ করিতে থাকে। সংসারে প্রবিষ্ট হইয়াও তাহার প্রার্থনা। অপরের মুখাপেক্ষী না হইলে তাহার চলে না। সে পণ্যশালায় গিয়া মূল্য দিয়া তাহার অভাবের বিবিধ সামগ্রী সংগ্রহ করে বটে; কিন্তু সেই ক্রয়ের ভিতরেও প্রার্থনার ভাব অন্তর্নিহিত। বার্দ্ধক্যে যখন দুর্ব্বলতা আসিয়া মানবকে অথর্ব্ব করে, তখন স্ত্রী-পুত্র কন্যার সেবাপ্রার্থনা ভিন্ন গত্যন্তর থাকে না। সংসারে মানুষ নানা সমস্যার মধ্যে অবস্থান করে, নিজের জ্ঞানের আলোকে সমস্ত সংশয় নিরাকরণ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব। তাই পরের নিকটে গিয়া সে পরামর্শ প্রার্থনা করে, বিপদে সাহায্য প্রার্থনা করে, শোকে সান্ত্বনা লাভের জন্য অপরের দ্বারে গমন করে। মানুষ যখন আবার তাহার সন্তাপ—তাহার সন্দেহ এখানে নিরাকৃত করিবার অবসর পায় না, কিছুতেই আপনার দুর্ব্বলতা মোচনের সন্ধান পায় না, হৃদয় যখন নিতান্ত ভারবহ হইয়া উঠে, তখন সে পৃথিবীর দিক হইতে নিরাশ হইয়া করজোড়ে ঊর্দ্ধমুখে চাহিতে অভ্যাস করে। এইখান হইতেই তাহার প্রকৃত প্রার্থনার সূচনা। সে এই অবস্থায় নিজ অন্তরে দৈববাণী শ্রবণ করে। কে যেন তাহার অন্তর্দ্দেশ প্রতিধ্বনিত করিয়া এই আশার বাণী শুনাইয়া দেয় যে "ব্যাকুল অন্তরে চাহরে তাঁহারে, যে জন চায় নাহি ফিরে, তিনি যে অকিঞ্চনগুরু"।

মাতার নিকট প্রার্থনা করিবার যৌক্তিকতা ক্ষুদ্র শিশুকে কেহ শিখাইয়া দেয় না। এ তাহার স্বাভাবিক ভাব। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিবার আগ্রহও আমাদের স্বভাবসিদ্ধ। আমরা আমাদের প্রকৃতিকে বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছি, তাই স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রার্থনা আমাদের অন্তঃস্থল ভেদ করিয়া উৎসারিত হইতে কালবিলম্ব ঘটে। যৌবনের চাপল্য অতিবাহিত না হইলে, বার্দ্ধক্যের দুর্ব্বলতায় আপনাকে অসহায় না বুঝিলে, দুঃখ-দুর্দ্দিনের ভিতর নিপতিত না হইলে, তাঁহাকে প্রাণভরে ডাকিবার সৌভাগ্য মানুষ লাভ করে না।

আমরা কখন্ প্রার্থনা করি? যখন দেখি নিজ-শক্তি পরাস্ত। আপনাকে নিতান্ত অকিঞ্চন মনে না হইলে প্রকৃত প্রার্থনা কণ্ঠ হইতে বিনির্গত হয় না। মানুষ কাহার নিকট প্রার্থনা করে? যেখানে দেখে তাহার সমস্ত কামনা পূর্ণ হইবে। একজন দরিদ্র আর একজন দরিদ্রের দ্বারে গিয়া প্রার্থনা করে না, কেন না সে জানে, সে তাহারই মত শক্তিহীন। কেন লোকে প্রার্থনা করে? পাইবার আশায়। তাই প্রকৃত প্রার্থনার মূলে চাই নিজের ভিতরে অভাব-বোধ, এবং চাই সেই অভাব-বোধের তাড়না। যাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তাঁহার সত্যসত্যই সেই অভাব দূরীকরণের সামর্থ্য আছে,

চাই সেই জ্বলন্ত বিশ্বাস। তিনি আমার সমস্ত অভাব বিদূরিত করিয়া দিবেন, চাই সেই অনির্ব্বাণ আশা। সেই দাতা যে আমার সম্মুখে, চাই সেই সুস্পষ্ট ধারণা; ভিখারী শূন্যে তাহার প্রার্থনা নিবেদন করে না। দ্বারের নিকট গিয়া চীৎকার করে, এই বোধ লইয়া, যে গৃহস্বামী গৃহদ্বার উন্মুক্ত করিয়া ভিক্ষাহস্তে বাহির হইয়া তাহার অভাব বিদূরিত করিয়া দিবেন।

আমরা যখন অন্তরের কালিমা ধৌত করিবার জন্য, পুণ্য সলিলে স্নাত হইবার জন্য, ক্ষতহৃদয়ে মৃতসঞ্জীবন ঔষধ লাভ করিবার জন্য, সংশয়-অন্ধকার হইতে মুক্তিলাভের জন্য, দুর্ব্বল হৃদয়ে বললাভের জন্য, জীবনে প্রথম প্রার্থনা আরম্ভ করি, তখন হয়তো তাঁহার দক্ষিণ মুখের আভাস সুস্পষ্ট-রূপ দেখিতে পাই না। কিন্তু প্রার্থীর মত আশা লইয়া, ব্যাকুলতা লইয়া, দৈন্যের বেদনা লইয়া, তাঁহার মঙ্গলস্বরূপে বিশ্বাস লইয়া করযোড়ে একাগ্রমনে তাঁহাকে ডাকিতে হইবে। অচিরে দেখিতে পাইব, তিনি তাঁহার স্বর্গদ্বার প্রমুক্ত করিয়া আমাদিগকে তাঁহার করুণহস্তে স্পর্শ করিতেছেন, সমস্ত জ্বালা জুড়াইয়া দিতেছেন, সকল সন্দেহ নিরাকৃত করিতেছেন, অন্তরের চিরসঞ্চিত কালিমা বিধৌত করিতেছেন, পুণ্যনীরে আমাদিগকে দীক্ষা দিতেছেন, নবজীবনে আমাদিগকে জাগ্রত করিতেছেন, আনন্দনীরে অভিষিক্ত করিতেছেন।

যাঁহারা প্রার্থনার আবশ্যকতা অস্বীকার করেন, তাঁহারা ঈশ্বরের হস্তে জীবন ন্যস্ত করিয়া দিন, পরীক্ষা করিয়া দেখুন, নবজীবন লাভ হয় কি না; শোক-দুঃখবহুল জরা-ব্যাধিসঙ্কুল পৃথিবীতে আশ্রয়-তরু প্রাপ্ত হওয়া যায় কি না। এখানে এমন অনেক সত্য রহস্যের আবরণে আবৃত হইয়া প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, যাহা যুক্তিপরম্পরায় সুপ্রতিষ্ঠিত করা সুকঠিন। তাই প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ সুস্পষ্ট-ভাষায় বলিয়া গিয়াছেন, "নৈষা মতিস্তর্কেনাপনেয়া"। আস্তিক্যবুদ্ধিই বল, আর ধ্যান ধারণা সাধনার কথাই বল, উহা ঠিক তর্কের বিষয়ীভূত নহে। নিজ জীবনে পরীক্ষা করিয়া দেখ, সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারিবে।

না চাহিলেও যখন ভগবান আমাদের অভাব পূর্ণ করিতেছেন, তথাপি প্রার্থনা করিবার আবশ্যকতা আছে? মাতা ত পুত্রকে অযাচিতভাবে বক্ষের রক্ত পর্য্যন্ত দান করিতেছেন, তাই বলিয়া পুত্র কি সঙ্গত বা অসঙ্গত সমস্ত প্রার্থনা মাতার নিকট নিবেদন করে না? এ যে তাহার স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস। ইহা যে তাহার দুর্ব্বলতার অভিব্যক্তি। সে শক্তিহীন বলিয়াই দাঁড়াইতে শিক্ষা করিবার জন্য মাতার অঙ্গুলির আশ্রয় ভিক্ষা করে। সে বাক্‌শক্তিহীন, তাই ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য, বস্তুর নাম জানিবার জন্য মাতাকে অস্ফুটস্বরে অবিরাম প্রার্থনায় ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে। কৌমারে বা যৌবনে, শিক্ষাগারে বা বিষয়ক্ষেত্রে প্রার্থনা আছে বলিয়াই অজ্ঞানতা অপসারিত হয়, জ্ঞানের দ্বার প্রমুক্ত হইবার অবসর ঘটে। আবার সাধকের প্রার্থনা আছে বলিয়াই, নবনব আধ্যাত্মিক সত্য তাঁহার হৃদয়ে অবতীর্ণ হয়, প্রেমানন্দে যোগানন্দে তাঁহার অন্তর পুলকিত হইয়া উঠে।

আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি এই আশায় যে, মোহ-অন্ধকার নির্ব্বাসিত হইবে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে এই বোধ জাগিয়া উঠিবে যে, সেই পরমমাতা আমাদের অতি নিকটে রহিয়াছেন এবং তাঁহার প্রেমাঞ্চলের আবরণে, আমাদিগকে জীবনে-মরণে আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন। তাই আমাদের প্রতিদিনের প্রার্থনা এই যে "পিতা নোঽসি" "তুমি যে আমাদের পরমপিতা" এ-বোধ আমাদের অন্তরে প্রেরণ কর। সংসার-তাপদগ্ধ, সংশয়বিমুগ্ধ মানব! উপাসনাব্রত জীবনে অবলম্বন কর, সেই অপ্রতিম দেবতাকে জানিবার ও বুঝিবার জন্য সচেষ্ট হও, নিশ্চয়ই ভয়শূন্য হইবে। সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিবে—পারিবে, "ব্রহ্মাভয়ং" সেই অভয়-স্বরূপ শান্তিদাতা বিধাতা তোমার সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছেন।

সমগ্র ইউরোপব্যাপী মহাসমরে ধরণীর গাত্র নরকণ্ঠ নিঃসৃত রক্তে কর্দ্দমাক্ত হইয়া গেল, বিয়োগবিধুর অসংখ্য নরনারীর কাতর ক্রন্দনে গগনাভোগ প্রতিধ্বনিত হইল, ইহাতে তাঁহার মঙ্গল-স্বরূপে সন্দিহান হইও না। এই আপাত-প্রতীয়মান

অমঙ্গলের ভিতর দিয়াই যে তাঁহার মঙ্গলরাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, বিবাদের ভিতর দিয়াই যে চিরশান্তি জাগিয়া উঠে, সংসারে মৃত্যু আছে বলিয়াই যে অমৃতের সন্ধান পাইবার জন্য সকলে আকুলভাবে তাঁহার অনুসন্ধান করে, কলহ আছে বলিয়াই শান্তির অর্থ আমাদের হৃদ্‌গত হয়। দুঃখ আছে বলিয়াই মানুষ আনন্দ লাভের প্রয়াসী। দৈন্য আছে বলিয়াই সৌভাগ্য লাভ করিবার জন্য মানুষের এই অদম পিপাসা। এই বিরুদ্ধ ভাব আছে বলিয়াই মানুষকে সংগ্রাম করিতে হয়, নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করা তাহার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। এই দ্বন্দ্ব আছে বলিয়াই সত্যের ধারা উৎসারিত হইতে পারিয়াছে, ধর্ম্মের ভাব আধ্যাত্মিকতার ভাব স্ফূর্ত্তিলাভ করিতে পারিয়াছে। আলোড়নের ভিতর দিয়া যুক্তিতর্কের ভিতর দিয়াই প্রকৃত মনুষ্যত্ব জাগিয়া উঠিতেছে। আমাদের গণনায় যাহা অমঙ্গল, তাহাই মঙ্গলের কূলে আমাদিগকে উপনীত করিতেছে। আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে জগতে নিরবছিন্ন অমঙ্গল নাই। মঙ্গল তাহার অন্তর্নিহিত। প্রাণঘাতী সর্পবিষও বিকারী-রোগীর একমাত্র মহৌষধ। যে জীবনে ঘাত-প্রতিঘাত তরঙ্গের মত ক্রীড়া করে না,—নিশ্চেষ্ট সে জীবন। কর্ম্মবিহীন উদ্যমবিহীন উদ্দেশ্য ও চিন্তাবিহীন যে জীবন, তাহা অধঃপতনের অভিমুখীন। পাশ্চাত্য ভূমিতে এই যে দারুণ বিপ্লব, অসংখ্য কামানের এই যে অশনিনির্ঘোষ, জগতে শান্তিপ্রতিষ্ঠা তাহার চরম পরিণাম নহে, কিন্তু সমগ্র খৃষ্টিয়ান জাতি "তোমার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হউক" এই বলিয়া বহুশতাব্দী ধরিয়া যে প্রার্থনা করিয়া আসিয়াছে, এই মহাবিপ্লব সেই অমূল্য প্রার্থনাকে সফলতার দিকে আনয়ন করিবে; ভগবানের মাতৃমূর্ত্তিকে প্রকট করিয়া দিবে, আধ্যাত্মিক চক্ষুকে আরও বিকশিত করিয়া তুলিবে। আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে আঘাত যত বলে কার্য্য করে, প্রতিঘাত তাহার শতগুণ বলে বিশ্বব্যাপী সুফল প্রসব করিবে।

প্রার্থনার ভাব সাধককে উপলব্ধির দিকে দিন দিন অগ্রসর করিয়া দেয়। সর্ব্বাবস্থায় এই যে ব্রহ্ম উপলব্ধি, ইহাই ধর্ম্মজীবনের শেষ পুরস্কার। আমরা নিরবছিন্ন প্রার্থনা লইয়া চিরদিন থাকিতে চাই না। আমরা তাঁহার অখণ্ড সত্তা উপলব্ধি করিতে চাই। তাঁহার বিরাট সত্তার ভিতরে আপনাদিগকে ডুবাইতে চাই, অন্তরে-বাহিরে সেই জাগ্রত দেবতা যে বিরাজমান, আমরা যে তাঁহার ভিতর নিমজ্জিত, আমরা সেই বোধ আনিতে চাই।

আমরা কি বলিয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা আরম্ভ করিব? তাঁহার নিকট বিষয়সুখ প্রার্থনা করিব কি না? সাংসারিক অভাব নিবেদন করিব কি না? অভাব দূরীকরণের জন্য ভিক্ষাই যদি প্রার্থনার অর্থ হয়, তবে তাঁহার নিকট সমস্ত অভাবই জানাইতে পারি। প্রার্থনার বিষয় বা তাহার ভাষা কে কাহাকে শিখাইয়া দিবে? উৎস হইতে বিনিঃসৃত জলোচ্ছ্বাসের ন্যায় প্রার্থনা আপনা হইতেই বাহির হইবে, এবং জ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনার বিষয় নব নব মূর্ত্তি ধারণ করিবে। ক্ষুদ্র শিশু কাচখণ্ডের চাকচিক্যে বিমোহিত হইয়া তাহা সংগ্রহ করিবার জন্য ক্রন্দন করে, কিন্তু যুবক রৌপ্য বা স্বর্ণখণ্ড লাভের জন্য ব্যাকুল। মানুষের প্রথম অবস্থার প্রার্থনা "ধনং দেহি, মানং দেহি, যশো দেহি" হইলেও তপঃক্লিষ্ট সাধক ব্যাকুলভাবে এই বলিয়া প্রার্থনা করেন যে, "অসত্য হইতে সত্যেতে, অন্ধকার হইতে আলোকে, মৃত্যু হইতে জীবনে লইয়া যাও, তোমার সৎস্বরূপ প্রকাশ কর", "ধন মান চাহি না তোমা হতে। দাও দাও এই অধিকার যাতে সহচর অনুচর হয়ে থাকি তোমারি"।

ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক বা সাম্বৎসরিক মহোৎসবের দৃশ্য অবলোকন করিয়া যদি আমরা মনে করি যে ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের তাবৎ, তাহা হইলে ইহা সুনিশ্চিত যে, আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃতি নিঃসংশয়রূপে বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। ব্যক্তিগত সাধনার উপরেই ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। একেশ্বরবাদের শীতল ছায়ায় বসিয়া আমরা যে নিরতিশয় আনন্দ লাভ করিতেছি, জ্ঞানের সঙ্গে ধর্ম্মের যে সামঞ্জস্য রক্ষা পাইয়াছে, সেই কথা পরস্পরের মধ্যে আলোচনা ও সাধারণের মধ্যে সেই বার্ত্তা ঘোষণা করিবার জন্য আমাদের এই আনন্দসম্মিলন।

ধর্ম্মকে জীবনে, ঈশ্বরকে অন্তরের মধ্যে নিভৃতে

রক্ষা করিতে হইবে। প্রতিদিনের পূজা তাঁহাকে নিবেদন করিতে হইবে। শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি কৃতজ্ঞতার ভাব নিত্য সাধনে জাগাইয়া তুলিতে হইবে। অন্তর্দৃষ্টিকে প্রখর করিয়া জননীস্নেহে ভ্রাতৃপ্রেমে আত্মীয় স্বজনের প্রেমার্দ্র ভাবের মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে হইবে। আবার উৎসবের ভিতরে সকলের প্রেমোজ্জ্বল ভাবের অন্তরালে তাঁহার দর্শন লাভ করিতে হইবে।

হে প্রতিদিনের পূজার দেবতা! আজ এই নৈমিত্তিক সাধনার দিনে, এই মহা মহোৎসবে তোমার প্রসাদ তুল্যরূপে উপভোগ করিবার জন্য আমরা এখানে মিলিত হইয়াছি। এই বিমল প্রভাতে, এই পুণ্য দিনে, তড়িৎপ্রকাশের ন্যায় উৎসাহবহ্নি আজ অন্তরে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। সত্যের বীজ আজ সকলের অন্তরে অঙ্কুরিত হউক। কঠোর পাষাণ হৃদয় আজ তোমার নামে বিগলিত হউক; সংশয়াত্মার অন্তরে আজ ক্রন্দন জাগিয়া উঠুক; মৃতের হৃদয়ে আজ নব চেতনার সঞ্চার হউক; শক্তিহীন আজ নবজীবন লাভ করুক, ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী বিবাদ কলহের উপরে চিরযবনিকা নিপতিত হউক, বিশ্ব জুড়িয়া ব্রহ্মনাম প্রতিধ্বনিত হউক! হে জগন্মাতা তুমি আজ আমাদের সম্মুখে; তোমার সৌন্দর্য্যে আমাদের মন-প্রাণ ভরিয়া উঠুক, আজ সকলের মস্তক তোমার চরণে অবনত হউক, তোমার শুভ আশীষ এই প্রভাতের আলোর মত সকলকে স্পর্শ করুক ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

হিন্দুর সাধনা।

(আদিব্রাহ্মসমাজের সভাপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের অভিভাষণ)

সভা চ মা সমিতিশ্চাবতাং প্রজাপতের্দুহিতরৌ সংবিদানে।
যেনা সংগচ্ছা উপ মা স শিক্ষাচ্চারু বদানি পিতরঃ সংগতেষু॥
বিদ্ম তে সভে নাম নরিষ্টা নাম বা অসি।
যে তে কে চ সভাসদস্তে মে সন্তু সবাচসঃ॥
এষামহং সমাসীনানাং বর্চো বিজ্ঞানমা দদে।
অস্যাঃ সর্ব্বস্যাঃ সংসদো মামিন্দ্র ভগিনং কৃণু॥
যদ্ বো মনঃ পরাগতং যদ্ বদ্ধমিহ বেহ বা।
তদ্ ব আ বর্ত্তয়ামসি ময়ি বো রমতাং মনঃ॥

অথর্ব্ববেদসংহিতা ৭। ১৩। ১-৪

ধর্ম্মসভায় ধর্ম্মোৎসবের দিনে যাহা আমাদিগের দূর হইতেও সুদূরে তাহা সন্নিকট হয়; যাহা প্রচ্ছন্ন তাহা বিকশিত হয়; যাহা সুষুপ্ত তাহা জাগ্রত হয়। আজকার দিনে সমাসীন সভাসদ্‌বর্গের হৃদয়ের আনন্দ সকলের হৃদয়কে অধিকার করে। অন্য সময়ে সাম্প্রদায়িক বা জাতীয় গৌরবের ভাব কিংবা অহঙ্কার যাহা অব্যক্ত থাকে আজ তাহা পরিস্ফুট হয়। সেই সাম্প্রদায়িক গৌরবের ভাব আমার মনকে অধিকার করিয়াছে বলিয়াই সাহসপূর্ব্বক আজ আপনাদিগের সম্মুখীন হইয়াছি। সেই সামাজিক গৌরবে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিতে কুণ্ঠা কিংবা সঙ্কোচ হয় না। সমবেত সকলের হৃদয় প্রসূত আনন্দ আমার হৃদয়কে আনন্দময় করিয়াছে বলিয়াই সানন্দে অদ্যকার অধিবেশনে আদিসমাজের সভাপতিরূপে আদিসমাজের যাহা উদ্দেশ্য ও নিবেদন, তাহা বলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আপনাদের শুভ ইচ্ছা পাই, এই প্রার্থনা। এইরূপ আনন্দ ভক্তিতে পরিণত হয়, পরম প্রেমরূপের সাধনার সাহায্য করে।

যে সাম্প্রদায়িক ভাবের কথা উল্লেখ করিলাম তাহাই আমাদের জাতীয় ভাবের ভিত্তি, তাহাই আমাদিগের জাতীয়তার স্রষ্টা। সেই সাম্প্রদায়িক ভাব হিন্দুর বলিয়া আমরা আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করি। বহু দিন পূর্ব্বে এই সমাজের একজন পূজ্য স্বনামধন্য আচার্য্যমহোদয় * হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার উপসংহারে তিনি এই কয়েকটী কথা বলেন:—

"আমি দেখিতেছি আমার সম্মুখে মহাবল পরাক্রান্ত হিন্দুজাতি নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া বীর-কুন্তল পুনরায় স্পন্দন করিতেছে এবং দেব-বিক্রমে উন্নতির পথে ধাবিত হইতে প্রবৃত্ত হইতেছে। আমি দেখিতেছি যে এই জাতি পুনরায় নব যৌবনান্বিত হইয়া পুনরায় জ্ঞান ধর্ম্ম সভ্যতাতে উজ্জ্বল হইয়া পৃথিবী সুশোভিত করিতেছে, হিন্দু-

* ৺ রাজনারায়ণ বসু মহোদয়।

জাতির কীর্ত্তি, হিন্দুজাতির গরিমা পৃথিবীময় পুনরায় বিস্তারিত করিতেছে"।

আমারও সেই আশা ও বিশ্বাস। তাঁহার উপসংহার আমার উদ্বোধনস্বরূপে গ্রহণ করিলাম। আমি বিশ্বাস করি, আমরা মরি নাই। হিন্দুধর্ম্ম, হিন্দুজাতি মরিবার নহে। যাহা সত্য, সত্য-প্রতিষ্ঠ, তাহার মরণ নাই। আশা হয় আমাদের ধর্ম্মকেন্দ্রক জাতীয় ভাব জাগিয়া উঠিলে সেই ভাব সমগ্র পৃথিবীকে অধিকার করিবে, পৃথিবীতে ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। সত্যমেব জয়তে নানৃতং।

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন,—"আমরা ভারতবাসী যে এই দুঃখ দারিদ্র্য, ঘরে বাহিরে উৎপাত সয়ে বেঁচে আছি, তার মানে আমাদের একটা জাতীয় ভাব আছে, সেটা জগতের জন্য এখনও আবশ্যক।" আমারও তাহাই মনে হয়। আমরা যে শক্তি আশ্রয় করিয়া বাঁচিয়া আছি তাহা ধর্ম্মশক্তি। সে শক্তির বিস্তার নিশ্চয় হইবে। মরাগাঙ্গে আবার জোয়ার বহিবে, আমার বিশ্বাস। আশা হয় পোড়া ক্ষেত আবার অঙ্কুরিত হইবে। সেই আশার উপর নির্ভর করিয়া আজ দু'চার কথা বলিতে উদ্যত হইয়াছি।

ইউরোপে যে সমরানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল, যাহা এখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই, যাহা এখনও ধোঁয়াইতেছে, যতদিন ধর্ম্মাধিকার ও রাষ্ট্রধর্ম্ম স্বতন্ত্র থাকিবে ততদিন সে আগুন নিভিবে না। ইউরোপীয় জগতে স্বাধিকার ও স্বকর্ত্তৃত্বের ভাব প্রবল। তাহা হইতেই সেখানে তুমুল বিরোধের উৎপত্তি হয়। এই যুদ্ধই তাহার পরিণাম। সেখানে যে আগুন জ্বলিয়াছিল তাহাতে সন্ধিপত্র কাগজের টুকরা মাত্র। League of Nationsই বল, Parliament of menই বল, আর Federation of the worldই বল—যে ভারেই তাহার উল্লেখ করনা কেন, সেই League, Federation, Parliament এর ধর্ম্ম ভিত্তি না হইলে নামেমাত্রই থাকিবে। সে নামে মুক্তি নাই। মোক্ষ ধর্ম্মভাবের উপর নির্ভর করে; ঐহিক প্রতিপত্তির উপর নহে। ঐহিক প্রতিপত্তির উৎপত্তি ও শেষ এইখানে। কর্ম্মী হও, কিন্তু কর্ম্মের শেষে "ব্রহ্মার্পণমস্তু" বলিয়া কর্ম্মের ফল পরব্রহ্মকে অর্পণ না করিলে মুক্তি নাই, শান্তি নাই।

কর্ম্মী কর্ম্মবল চায়। তুমি যতই সেই শক্তি উপার্জ্জন কর ততই তাহা অসংযত হইয়া পড়ে, তাহার উপসংহার কল্যাণময় হয় না; সে শক্তি-সাধনা আসুরিক।

নিটশ্চের (Nietzsche) অ্যান্টিক্রাইষ্ট গ্রন্থে (Anti-Christ) পড়িতে পাই—

"শুভ কিসে? ক্ষমতা প্রসারে। ক্ষমতা লাভের আকাঙ্ক্ষা যাহাতে প্রবল হয় তাহাতে। মানুষের শক্তি প্রতাপে। আনন্দ কিসে? ক্ষমতা প্রসারের অনুভূতিতে। বাধা বিঘ্নের অতিক্রমে। ক্ষমতা অর্জ্জনে অক্লান্তি ও অপরিতৃপ্তিতে। সর্ব্বস্ব বিনিময়ে শান্তিলাভে নহে, সংগ্রামে। কর্ম্মবলে, ধর্ম্মবলে নহে।" *

জার্ম্মানীতে তিনি এই শিক্ষা দেন। সে জাতি এই আসুরিক মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিল। এখন তাহার অবস্থা কি?

ম্যাটসিনি তাঁহার "মানবধর্ম্মে" (Duties of man) স্পষ্টভাবে ঐহিক প্রতিপত্তি সম্বন্ধে বলেন, 'যদি ইহাকেই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া মানিয়া লও, তবে বিরোধ লইয়া জীবন অতিবাহিত করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্য সাধনের ফলে প্রেম, প্রীতি, আনন্দ লাভ হয় না'। ঐহিক প্রতিপত্তি যাহাদিগের একমাত্র উদ্দেশ্য, তাহারা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পথ আবিষ্কারে ব্যস্ত। সে পথ ধরিয়া চলিতে কাহার বুকে পা পড়িতেছে তাহা ভাবিবার প্রয়োজন নাই; কি দলাইয়া যাইতেছে তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই। মুখে "ভাই, ভাই", কিন্তু কার্য্যে বৈরী—ইহাই স্বাধিকারবাদীদিগের শিক্ষার ফল। ম্যাটসিনি বলেন যে ধর্ম্মবন্ধন না থাকিলে বিরোধ, স্বতন্ত্রভাব, ঘটিবেই ঘটিবে। নির্ব্বিরোধ হইতে চাহিলে লক্ষ্য এক হওয়া,—একীভূত হওয়া চাই, সেই লক্ষ্য ধর্ম্ম। ব্যক্তিগত অধিকার আছে সত্য, কিন্তু সেই অধিকার রক্ষার চেষ্টাতে স্বভাবতই অন্য জন

* "What is good? All that increases the feeling of power, will to power, power itself in man. What is happiness? The feeling that power increases, that resistance is overcome. Not contendedness but more power; not peace at any price but warfare, not virtue but capacity."

বা অন্য জাতি প্রতিকূল হইয়া দাঁড়ায়—যতদিন তাহাকে ধর্ম্মভাবের উপর প্রতিষ্ঠা করিতে না পার। সমাজ কিংবা জাতি সংস্করণে ধর্ম্মভাবের প্রয়োজন; আমরা এক পিতার সন্তান—এই বোধ জীবনের মধ্যবিন্দু হওয়া চাই; এই ভাব জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে ব্যাপ্ত হওয়া আবশ্যক। তিনি ফরাসী দেশের Lamennaisএর উপদেশের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন 'অধিকারলিপ্সা ও কর্ত্তব্যপালন দুইটি স্বতন্ত্র জিনিষ'। প্রাপ্তির চেষ্টাতে ত্যাগের ভাব না থাকিলে জাতিগত বিরোধের অবসান হয় না। স্বাধিকার-চেষ্টায় বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করা যায় বটে, কিন্তু তাহাতে বৈষম্যের সামঞ্জস্য করিতে পারা যায় না, জাতীয় একতা গড়িয়া তুলিতে পার না। যে জাতি স্বাধিকার-প্রসারে আত্ম-নিবিষ্ট, সে জাতির জীবন শোণিত-সিক্ত। এই চেষ্টার নিবৃত্তি কিসে, শেষ কোথায়? যত দিন সেই জাতি অপেক্ষা দুর্ব্বল জাতি জগতে থাকিবে, ততদিন সেই অধিকারের প্রসার চলিতে থাকিবে। নির্জ্জীব জাতি দলিত হইবে। বলবানের কথা,—'আমার শক্তি আছে, আমি সেই শক্তির উপর নির্ভর করি। আমার পথে যে পড়িবে তাহাকে দমন করিব, যাহার সহিত বিরোধ তাহাকে উচ্ছেদ করিব; সংগ্রামই আমার জীবন। বাধা বিঘ্ন সহ্য করিব না। আমার শক্তির বিস্তার চাই'।

এই আসুরিক ভাব প্রবল হইলে পৃথিবী দানবরাজ্য হয়। যদি পৃথিবীর কোন স্থানে ধর্ম্মরাজ্য থাকে, তবে তাহার সহিত সেই ধর্ম্মরাজ্যের সংগ্রাম বাধে, তাহাতেই দেব-দানবের যুদ্ধ হয়। যে মহাসমর হইয়া গেল তাহার শেষ অঙ্কে এই ধর্ম্মভাব জাগ্রত হইয়াছিল বলিয়া আসুরিক বলের দমন হইয়াছে। এই যুদ্ধে আমেরিকার যোগদান সেই ধর্ম্মভাবের উত্তেজনায়। আমেরিকার নিজের সুবিধা কিংবা প্রতিপত্তিলাভের কিছুই ছিল না। Crusade এর সময় যেমন God wills it! God wills it! বলিয়া বিবিধ জাতি একত্রিত হইয়াছিল, ঈশ্বরের আদেশপালনরূপ কর্ত্তব্যজ্ঞানের উপর ঈশ্বরে বিশ্বাসের উপর তাহারা একত্রিত হইয়াছিল, আমেরিকাও সেই ধর্ম্মভাব লইয়া এই মহাযুদ্ধে যোগদান করে। ইহাই দেবদানবের যুদ্ধ। ব্রহ্মশক্তির অভাবে রিপু দমন হয় না। যে শক্তিসাধনায় মুক্তি লাভ হয়, তাহা ঐশী শক্তি—তাহা ঐহিক প্রতিপত্তি নহে। ঐশী শক্তিই প্রাণশক্তি। সেই শক্তির সাধনাতেই মানবের মোক্ষ লাভ হয়। যাহা কিছু কর্ম্ম তাহাই ব্রহ্মে অর্পণ করিলে শান্তি। অশান্ত বিক্ষিপ্ত হৃদয়, রিপু-উত্তেজিত জীবন, ধ্বংসের কারণ, প্রলয়ের কারণ। ধর্ম্মই কর্ত্তব্য। প্রাপ্তিতে ত্যাগের ভাব চাই। আমার যাহা, তাহা আমারই নহে, আমাদের সবাকার। আমি কয়দিনের? যাহা আমার, তাহার শেষ আমাতেই। যাহা সবাকার, তাহার শেষ নাই; সবটা শেষ হইবার নহে। সেই "আমিত্ব" পরিত্যাগ আবশ্যক। সব জগতের যাহা, তাহা অনন্তের; হৃদয়ের সেই সর্ব্বব্যাপক ভাব ধর্ম্মেই অর্জ্জনীয়। কর্ম্মবলের উপর প্রতিষ্ঠিত রাজ্যতন্ত্র আসুরিক শক্তির উপর নির্ভর করে। তাহা মরণশীল।

ম্যাটসিনি বলেন—"যদি মানব-মনের অধীশ্বররূপে একটি মহা-মন না থাকেন, তবে বলবত্তর ব্যক্তিরা আমাদের উপর অত্যাচার করিলে কে সেই অত্যাচার হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারে? মানুষের রচিত নহে, এমন কোন পবিত্র ও অলঙ্ঘ্য নিয়ম যদি না থাকে, তবে ন্যায় অন্যায় বিচার করিবার মাপদণ্ড কোথায় থাকে? অত্যাচারের বিরুদ্ধে, অনিয়মের বিরুদ্ধে কাহার বলে, কিসের বলে প্রতিবাদ করিব? আমাদের ব্যক্তিগত মতামতের দোহাই দিয়া জনসাধারণকে কি প্রকারে স্বার্থত্যাগ করিতে, আপনাকে বলি দিতে আহ্বান করিব? যত দিন পর্য্যন্ত আমরা আমাদের বুদ্ধি-প্রসূত মতামতের উপর দাঁড়াইয়া উপদেশ দিতে থাকিব, ততদিন কথায় মিল পাইতে পারি, কিন্তু কাজে পাইতে পারিব না।" *

* "If there be not a Supreme mind reigning over all human minds, who can save us from the tyranny of our fellowmen, whenever they find themselves stronger than we? If there be not a holy and inviolable law, not created by man, what rule have we to judge whether an act is just or unjust? In the name of whom, in the name of what shall we protest against

জর্ম্মান জাতি শক্তিকেই মানবজাতির প্রধান সাধনা বলিয়া তাহাদের দেশের শিক্ষাপ্রণালী নিয়ন্ত্রিত করেন। সংগ্রামেচ্ছা মানবপ্রকৃতিগত, অতএব সংগ্রামচেষ্টা, সংগ্রাম করিতে শিক্ষা মানবজীবনের একটি প্রধান উদ্দেশ্য, ইহা Baron von Freytag Loringhoven জর্ম্মানীর এক জন সর্ব্বপ্রধান সৈনিক লেখকের মত।

ট্রাইট্‌স্‌কে (Treitschke) বলেন—

"সুসভ্য বল, বর্ব্বর বল উভয়েরই পশুপ্রবৃত্তি আছে। বাইবেলের এক কথা সত্য—মানবচরিত্রের পাপভাব মানুষ যে সময় সৃষ্টি হয় সেই সময় হইতেই। সভ্যতা সে পাপ হইতে উদ্ধার করিতে অপারক—যতই কেন সভ্য হও না তাহা যাইবার নহে। পশুপ্রবৃত্তিকে দমন করিতে মানুষ কখনই পারিবে না"।*

কিন্তু তাঁহারও মতে মানবজাতির আধ্যাত্মিক পরিবর্ত্তন না হইলে শক্তিপূজাতে মানবের হিতসাধন হইবে না। আত্মার সংস্কার যদি আবশ্যক হয়, তাহা ধর্ম্মভাব ভিন্ন কিসে হইবে? জর্ম্মনসম্রাট যিশুখৃষ্টের পদ পাইয়াছেন ভাবিতেন। তিনি প্রকাশ্যভাবে তাঁহার প্রজাবর্গকে বলেন "আমি সমরেশ—আমি তোমাদের রণদেবতা। আমি যদি তোমাদিগকে আজ্ঞা করি, পিতা মাতাকে সংহার কর, তোমাদিগের তাহা তৎক্ষণাৎ প্রতিপালন করিতে হইবে। সে কার্য্য ভাল কি মন্দ তোমাদের বিচারাধীন নহে। তোমাদের শক্তিতে আমার রাজশক্তি, কিন্তু আমার উপরে আর কেহ নাই। আমার আজ্ঞাপালনই তোমাদের প্রধান ধর্ম্ম।"

জর্ম্মনির নেতাগণ জর্ম্মান সৈনিককে এই ভাবে শিক্ষা দেন যে তাহারা সততই মরিবার জন্য প্রস্তুত থাকে।—শিক্ষা দেন, "বল, আমরা কোথায় গিয়া প্রাণ দিব? আমরা বলিবামাত্র প্রাণ দিতে প্রস্তুত থাকিব।" তাঁহাদের মত এই যে, রাজা রাজ্যের জন্য। রাষ্ট্রনীতি ও ধর্ম্ম শাসনতন্ত্র (State and Church) বহু দিন হইতেই ইউরোপে স্বতন্ত্র হইয়া গিয়াছে। রাষ্ট্রনীতি ধর্ম্মনীতি হইতে স্বতন্ত্র রাখাই কর্ত্তব্য, রাজনীতি ধর্ম্মের শাসনের অধীন নহে এই তাঁহাদিগের কথা।

কিন্তু হিন্দুর সাধনাতে পরব্রহ্ম লক্ষ্য। ব্রহ্মই আমাদের নেতা ও নিয়ন্তা। পৃথিবীতে যখন ধর্ম্মভাব প্রবল হইয়াছে, তখনই মানবহৃদয়ে আনন্দ দেখা গিয়াছে। ম্যাটসিনি এই কথা ইতালীতে প্রচার করেন। তিনি বলেন—

সমস্ত বড় বিপ্লবের ভিতর যে ধ্বনি বাহির হইয়াছিল, তাহাই ক্রুজেডের ধ্বনি—"ঈশ্বর সহায় আছেন, ঈশ্বর সহায় আছেন।" এই ধ্বনিই নিষ্কর্ম্মাকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিতে পারে। স্মরণ রেখো যে ফ্লরেন্সের শিল্পীগণ মেডিচিদিগের অধীনে নিজেদের জনতন্ত্রীয় স্বাধীনতা বলি দিতে অস্বীকার করিয়া যিশুখৃষ্টকেই জনতন্ত্রের নেতা বলিয়া অভিষেক করেন।*

ইতালিতেই স্যাভনরোলা (Savanorola) ম্যাটসিনি (Mazzini) এবং গ্যারিবল্ডি (Garibaldi) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের শিক্ষা—জ্ঞানময় পিতা পরব্রহ্মের উপর বিশ্বাস রাখিয়া জ্ঞান অর্জ্জন কর, এবং তাঁহার নিয়ম, সত্যের নিয়ম জান। আর আমাদের পুরাতন ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন—

"সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম"

তাঁহাকে ভক্তি করা সম্বন্ধে তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন;—

---

oppression and irregularity? How shall we demand of men self-sacrifice, martyrdom in the name of our individual opinions? As long as we speak as individuals in the name of whatever theory our individual intellect suggests to us, we shall have what we have to-day adherence in words not in deeds".

* The polished man of the world and the savage have both the brute in them. Nothing is truer than the biblical doctrine of original sin, which is not to be uprooted by civilisation to whatever point you may bring it.

* The cry which rang out in all the great revolutions the cry of the crusade "God wills it"! God wills it!" alone can rouse the inert into action. Remember the Florentine artisans who refused to submit their democratic liberty to the domination of the Medicis by solemn vote, elected Christ as head of the republic.

"সা তস্মিন্ পরম প্রেমরূপা"

তাঁহাকে "প্রেমস্বরূপম্" বলিয়াছেন—তাঁহাকে লাভ করিলে,—

'সিদ্ধো ভবতি'
অমৃতো ভবতি
তৃপ্তো ভবতি' বলিয়াছেন।

ভন মল্কি (Von Moltke) একটী শান্তি সঙ্গতে (Peace Deputation) এই কথা বলেন :—

"যুদ্ধ পুণ্য কার্য্য, বিধাতার বিধান। এই পুণ্য বিধানে জগতের শাসন চলিতেছে। যুদ্ধ মানব-প্রকৃতির মহত্ত্ব ও উন্নতির উপায়। তাহাতেই মনুষ্যত্ব, নিঃস্বার্থপরতা, সাহস, বদান্যতা প্রভৃতি গুণের পরিচয় পাওয়া যায়; এক কথায়, অত্যন্ত নীচ, হেয় বৈষয়িক ভাব হইতে যুদ্ধ মানুষকে উদ্ধার করে।*

এই কপট আধ্যাত্মিক ভাবের কথা পড়িলে বিস্মিত হইতে হয়। জার্ম্মানিতে কি দাঁড়াইয়াছে তাহা দেখিলেই ইহা সত্য কি মিথ্যা বুঝা যায়। যে যাহাই বলুক, ইহা মিথ্যা, সম্পূর্ণ মিথ্যা। এই ধর্ম্ম-সভায় উপস্থিত সকলেই নিশ্চয় বলিবেন, ইহা মিথ্যা, সম্পূর্ণ মিথ্যা। পাপকে পুণ্য করিয়া তুলিতে কেহ কখনও পারিবে না। কর্ম্মকে ধর্ম্ম করিয়া তুলিলে অধঃপতন নিশ্চয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

অষ্ট্রিয়ার একজন বিখ্যাত অধ্যাপক বলেন, মানব সম্প্রদায়ের বিবেক নাই—"Human communities have no conscience"; তিনি বলেন—"উদ্দেশ্য সাধনে সব পন্থাই সাধু।" সেখানকার একজন নীতিবৈজ্ঞানিক বলেন, রাজনীতি-ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ অনিবার্য্য। জেনারল বার্ণহার্ডি বলেন, যুদ্ধ স্বভাবদত্ত জৈবিক প্রয়োজন (biological necessity); যুদ্ধ হইতে জীবন লাভ হয়। আজকালকার অষ্ট্রিয়া ও জর্ম্মনির এই ভাব। কিন্তু সেই জর্ম্মানিতেই ক্যাণ্ট (Kant) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার শিক্ষা এই যে, "মানুষ স্বাধীন; স্বাবলম্বন তাহার প্রকৃতি। যখন সে কোন স্বার্থের দ্বারা বাধ্য না হইয়া কর্ত্তব্যপরায়ণ হয়, তখনই সে ন্যায়ের পথে চলে।" তিনি বলেন যে "ঐশী প্রকৃতির পূর্ণ সাগর হইতে অভিব্যক্ত অন্তর্নিহিত এক পবিত্র উৎস হইতে মানুষ নিজের শক্তি লাভ করে। তাই মানুষ কর্ত্তা, নিজের ভিতরে নিজের ইচ্ছা পরিচালনের নিয়ম ধারণ করে।" * ক্যাণ্ট আরও বলেন "মানবহৃদয়ে ন্যায়জ্ঞানই ব্রহ্মোদ্ভূত। যাহা ন্যায় তাহাই পবিত্র। এই নীতিধর্ম্ম রাজারও প্রণম্য, তাঁহাকে তাহা হাঁটু পাতিয়া লইতে হয়।"† কিন্তু বার্ণহার্ডি বলেন—ঈশ্বরের প্রেম সর্ব্বোচ্চ সাধনা এবং প্রতিবাসীকে আত্মবৎ দেখ এই দুই কথা রাজ্যতন্ত্রে খাটে না। খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম-নীতি নিজের জন্য, তাহা কখনই শাসনতন্ত্রের জন্য হইতে পারে না। যিশুর শিক্ষা স্বাভাবিক নিয়মের বিরুদ্ধে।‡

"Never can the teaching of jesus be quoted in opposition to a universal law of nature." মল্কি (Moltke) হউন বার্ণহার্ডি হউন কিংবা কাইজার (Kaiser) হউন, কাহারও এ সব কথা আমাদের মনে স্থান পাইবে না। আমরা দাস জাতি; কিন্তু আমাদের হৃদয়ে ধর্ম্মভাব আছে,—আমাদের অন্তর্নিহিত বিপুল ধর্ম্মশক্তি আছে; আমাদের মনে তাঁহাদিগের

* "War is sacred and instituted by God; it is one of the holy bonds which rule the world; war maintains in man all the great and noble feelings, sense of honour, unselfishness, magnanimity, courage, in short, it prevents man from sinking into the most repulsive materialism."

* "He derives his power from an inward spring, a sacred source from the ultimate deeps of the Divine nature. Man is then a sovereign entity, bearing within himself the law of his own will."

† "Our sense of right, the Divine element in man, desires it. What-soever is right must be held sacred by man. To this law all statecraft must bow the knee."

‡ Love God above all-things and your neighbour as yourself cannot in any way apply to the relation of one state to another. For this would lead to a collision of duties. Christian morality is personal and social but it can, from its very essence, never become political."

এ কথা কখনও স্থান পাইবে না। আমাদের কথা সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম, শান্তং শিবমদ্বৈতং॥

"তদেব সাধ্যতাম্, তদেব সাধ্যতাং"

তাঁহাকেই সাধনা কর, তাঁহাকেই সাধনা কর। তিনি আমাদের পিতা, 'পিতানোঽসি' তিনি পিতার ন্যায় আমাদিগকে জ্ঞান দান করেন—

"পিতা নো বোধি"।

অনায়াসাৎ সৌলভ্যং ভক্তৌ (ভক্তিসূত্রম – ৪৮)

ভক্তদিগেরই তিনি সুলভ।

নাস্তি তেষু জাতিবিদ্যারূপকুলধনক্রিয়াদিভেদঃ (ভক্তিসূত্রম – ৭২)।

তাঁহাদিগের মধ্যে জাতি বিদ্যা রূপ কুল ধন ক্রিয়াদির ভেদ নাই।

তন্ময়াঃ (ভক্তিসূত্রম – ৭০)

তাঁহাতে সকলই সম্পূর্ণ;

যত স্তদীয়াঃ (ভক্তিসূত্রম ৭৩)।

সবই তাঁহার;

এই সহজ শিক্ষা হিন্দুধর্ম্মের। যিনি এই শিক্ষা অনুসরণ করেন,

স শ্রেষ্ঠং লভতে, স শ্রেষ্ঠং লভতে (ভক্তিসূত্রম – ৮৪)

তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠকে প্রাপ্ত হয়েন।

আদি সমাজের এই সাধনা ও শিক্ষা—হিন্দুধর্ম্মের এই বীজ-মন্ত্রজালই আদিসমাজের বীজমন্ত্র। আদিসমাজ হিন্দুর সমাজ; আদিসমাজের ধর্ম্ম হিন্দুর ধর্ম্ম। হিন্দুর সাধনাতে জাতি-বিদ্যা-রূপ-কুল-ধন-ক্রিয়াদির ভেদ নাই। সকল হিন্দুকেই, সমগ্র মানব জাতিকে এই শিক্ষা গ্রহণ করিতে বলিতে কুণ্ঠা হয় না—সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং বলিতে সাহস হয়, বলিতে গৌরবান্বিত মনে হয়। সাধকসমবায় ইহাতেই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। আমাদের জাতীয় সমীকরণ ইহাতেই সম্ভব। উপস্থিত ভূত-ভবিষ্যতের এই শেষ শিক্ষা—ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা।

ত্রিসত্যস্য ভক্তিরেব গরীয়সী ভক্তিরেব গরীয়সী—স্বত্বাধিকার অর্জ্জন কর কিন্তু ধর্ম্মার্জ্জনের অনুশীলন না করিলে, ব্রহ্মে তাহা সমর্পণ না করিলে বিরোধের সামঞ্জস্য সম্ভব নহে। দেশ কাল পাত্রের উপর এ শিক্ষা নির্ভর করে না। সব শিক্ষার শ্রেষ্ঠ শিক্ষা স্বাবলম্বন। এই শিক্ষা নিজের উপর নির্ভর করে; ইহার জন্য মধ্যবর্ত্তী কোন কিছুর প্রয়োজন নাই। ইহার মধ্যবিন্দু 'ত্বং অস্মাকং তবাস্মি'। এই ধর্ম্ম সনাতন—ইহা কোন ব্যক্তি-বিশেষের শিক্ষা নহে।

ম্যাটসিনি বলেন—ভগবান ক্রমান্বয়ে মানবের ভিতর দিয়াই প্রকাশ পান—God manifests himself successively in humanity.

হিন্দুধর্ম্মেও জগদ্ধিতের জন্য

সম্ভবামি যুগে যুগে

ভগবানোক্তি বলিয়া উল্লিখিত।

ম্যাটসিনি ইতালি সম্বন্ধে বলিয়াছেন—আমাদের জাতির ভিতরে ধর্ম্মভাব নিদ্রিত আছে—জাগ্রত হইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। রাশি রাশি রাজনৈতিক তত্ত্ব প্রচার অপেক্ষা যিনি সেই সুপ্ত ধর্ম্মভাবকে জাগ্রত করিতে পারিবেন, তিনিই জাতির অধিকতর উপকার সাধন করিবেন। *

আমারও আজ সেই কথা। এই কোটি কোটি হিন্দুর মধ্যে এরকম একটি লোকও জন্মে নাই, কিংবা জন্মিবে না, ইহা বিশ্বাস করি না। আজ এই ধর্ম্মসভা হইতে ধর্ম্মোৎসবের দিনে সেই ভাব জাগ্রত হয় এই আমার প্রার্থনা।

ওঁ ব্রহ্মার্পণমস্তু

উপাসনা।

(মাঘোৎসবে শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক বিবৃত)

ত্বয়ং ত্বাং স্মরামো ত্বয়ং ত্বাং ভজামো।
ত্বয়ং ত্বাং জগৎসাক্ষিরূপং নমামঃ॥

আমরা তোমাকে স্মরণ করি, আমরা তোমাকে ভজনা করি; তুমি জগতের সাক্ষী, আমরা তোমাকে নমস্কার করি।

যে বিশ্বপতির আশ্রয়ে এই বিশ্বচক্র উন্নতির পথে পরিচালিত হইয়া নিরন্তর তাঁহার শুভ অভিপ্রায়সকল সম্পাদন করিতেছে, নবযুগের প্রারম্ভে ব্রাহ্মসমাজ সেই জগন্মাতা বিশ্বপিতার অবাধ প্রত্যক্ষ উপাসনা এই শুভ ১১ই মাঘের দিনে নবতরভাবে

* The religious sentiment sleeps in our people waiting to be awakened. He who knows how to raise it, will do more for the nation than can be done by twenty political theories.

প্রচারিত করিয়াছেন বলিয়া এই ১১ই মাঘ আমাদের বড়ই প্রিয়। মানবাত্মার স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া ব্রাহ্মসমাজ যেমন নবযুগে ভারতের এবং সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র জগতের অন্তর হইতে একটী কঠিন শৃঙ্খল নামাইয়া দিয়াছেন, তেমনি বিশ্বপিতা পরমাত্মার সঙ্গে আমাদের প্রত্যেকের আত্মার যোগের কথা, তাঁহার সঙ্গে আমাদের প্রত্যেকের পিতাপুত্রের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধের কথা নবতরভাবে প্রচার করিয়া, জগতের অন্তরে তাহা মুদ্রিত করিয়া দিয়া, ভারতকে এবং সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র জগতকে আর একটী শৃঙ্খল হইতে মুক্তিদান করিয়াছেন। আমরা নবযুগে ব্রাহ্মসমাজ হইতেই আমাদের পিতামাতা পরমেশ্বরকে পিতামাতা বলিয়া জানিতে পারিয়াছি এবং বিনা বাধায়, তাঁহার সহিত যোগযুক্ত হইয়া তাঁহার উপাসনা করিবার অধিকার পাইয়াছি বলিয়াই ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার দিন এই শুভ ১১ই মাঘ আমাদের এত প্রিয়। ব্রাহ্মসমাজই নবযুগে বিশেষভাবে প্রচার করিলেন যে যন্ত্রের ন্যায় মন্ত্রতন্ত্র উচ্চারণ করিবার পরিবর্ত্তে, নির্জ্জনে এবং আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবে মিলিত হইয়া সজনে, সমুদয় হৃদয় দিয়া ভগবানের উপাসনা করিতে হইবে। ইহারই জন্য ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার দিন আমাদের মহোৎসবের দিন। আজ সম্বৎসর পরে এই মহোৎসবের দিনে সমাগত এই ভক্তজনগণের হৃদয়ের সহিত হৃদয় মিলাইয়া এবং আমার পূর্ব্ববর্ত্তী মহাপুরুষদিগের কণ্ঠের সহিত আমার এই ক্ষুদ্র কণ্ঠ মিলাইয়া ব্রহ্মনামের জয়গান করিয়া ধন্য হইবার আশায় এই উৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছি।

গীতা আমাদিগকে এই একটী মহাসত্য দিয়াছেন যে জগতে ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইলেই ভগবান রুদ্রমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া ধর্ম্মরাজ্য পুনরায় সংস্থাপন করেন এবং শান্তিজল বর্ষণ পূর্ব্বক জগতকে শীতল করেন। পাশ্চাত্য জগতের মহাসমর ইহার যাথার্থ্য অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপন্ন করিতেছে। মহাসমরের পূর্ব্বে পাশ্চাত্য জগত অন্তরের সহিত ঈশ্বরের উপাসনা করিবার পরিবর্ত্তে প্রেয়ের উপাসনাতেই আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। ক্রমে যখন প্রেয়ের প্রতি আসক্তি নিজের সীমা অতিক্রম করিয়া স্বীয় করাল বদনে সর্ব্বপ্রকার সাধুভাব গ্রাস করিতে উদ্যত হইল, ধর্ম্মবহির্ভূত কার্য্যসকল যখন জ্ঞানসাধনের প্রধান লক্ষ্য হইয়া পড়িল, তখনই বিধাতার মঙ্গল বিধানে পাশ্চাত্য জাতিসমূহ রণদুন্দুভি বাজাইয়া বলদৃপ্ত বৃষভের ন্যায় পরস্পরের সংহারকল্পে মহাসমরে অবতীর্ণ হইল। ভগবান তখন স্বীয় রুদ্রমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া সেই মহাসমরের প্রখর অগ্নিতে অধর্ম্মের জঞ্জাল ভস্মসাৎ করিয়া দিলেন এবং সুদূর আমেরিকা হইতেও যুক্তরাজ্যের ধর্ম্মাত্মা সভাপতিকে আহ্বান করিয়া আনিয়া ধর্ম্মরাজ্য পুনঃসংস্থাপনের সূচনা করিয়া দিলেন। ধর্ম্মের জয়ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সুমধুর শান্তিজল বর্ষিত হইয়া মহাসমরের দাবানল নির্ব্বাপিত হইবার উপক্রম হইল। এই মহাসমরের কঠিন আঘাতের ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে আজ পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে মঙ্গল বায়ু প্রবাহিত হইবার সূত্রপাত হইয়াছে। আজ সেখানে সত্যের মর্য্যাদা, ন্যায়ের মর্য্যাদা, ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য জনসাধারণের অনেকটা আগ্রহ জন্মিয়াছে বলিয়া মনে হয়; যথার্থ আন্তরিক ঈশ্বরোপাসনার প্রতি, সরল সবল সত্যধর্ম্মের প্রতি একটা আন্তরিক টান হইয়াছে দেখা যায়।

এই মহাসমরের আঘাত-তরঙ্গ আমাদেরও দেশে যে লাগিয়াছিল এবং এখন পর্য্যন্ত যে সেই আঘাতের যন্ত্রণা আমাদের কাতর শরীরে বহন করিতে হইতেছে, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। সৌভাগ্যের বিষয়, এই অল্পতর যন্ত্রণার ফলে ভগবৎরক্ষিত ধর্ম্মপ্রাণ এই ভারতের জনসাধারণের মনের গতি সত্যধর্ম্মের প্রতি, প্রকৃত ঈশ্বরোপাসনার দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। আমরা এখন বুঝিয়াছি যে আমাদের সকল কর্ম্মকে ধর্ম্মকেন্দ্রক করিয়া তুলিতে পারিলেই আমাদের মঙ্গল। দেশবাসী এখন বুঝিয়াছে যে, আমাদের সকল কার্য্যের ভিতরেই ভগবানের মঙ্গল হস্ত উপলব্ধি করিয়া হৃদয়ের ধর্ম্মভাবকে জাগ্রত করিলে, সবল করিলে, দেশের প্রকৃত মঙ্গল। ভগবানের নিকট যোড়করে এই প্রার্থনা করি, এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষকে তিনি এই ধর্ম্মভাবে, শ্রদ্ধাপূর্ণ জ্ঞানযোগে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত রাখুন, ধর্ম্মগ্লানির ফলে এদেশে যেন কুরুক্ষেত্রের অগ্ন্যুৎপাতের পুনরভিনয় না হয়;

শ্রদ্ধার অভাবে এদেশ যেন বিনাশের অভিমুখীন না হয়।

আমাদের নিজের, দেশের, জাতির, সমাজের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল কার্য্যেই ভগবানের মঙ্গল হস্ত জাগ্রত উপলব্ধি করাই তাঁহার প্রকৃত উপাসনা। মঙ্গলময় পরমেশ্বরের সঙ্গে জ্ঞানযোগে যুক্ত হইয়া, তাঁহার সহিত আমাদের অনুপম আনন্দের সম্বন্ধ, পিতাপুত্রের সম্বন্ধ, চির-বন্ধুর সম্বন্ধ জানিয়া তাঁহাকে সমুদয় হৃদয়ের সহিত, সমুদয় বলের সহিত ভালবাসা এবং ভালবাসিয়া তাঁহার প্রিয়-কার্য্যের অনুষ্ঠান করাই প্রকৃত পক্ষে তাঁহার উপাসনা। "তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব" তাঁহাতে প্রীতি এবং তাঁহার প্রিয়-কার্য্য সাধনই তাঁহার উপাসনা। প্রকৃত উপাসনার মূল প্রাণ হইল ভগবানকে মঙ্গলময় আশ্রয় জানিয়া তাঁহারই হস্তে সম্পূর্ণরূপে আত্ম-সমর্পণ। যাঁহার অন্তহীন স্বরূপের নিকট আমরা আপনাকে হারাইয়া ফেলি, যাঁহার ইঙ্গিতে মাত্র এই বিশ্বচক্রের প্রত্যেক অণুপরমাণু যথানিয়মে আপনাপন কার্য্য করিয়া চলিয়াছে, প্রকৃতিরাজ্যে এবং জগতের ইতিহাসে যাঁহার মঙ্গল ইচ্ছা নিয়তই অভিব্যক্ত হইতেছে, ভয় ও বিপদের মাঝে তাঁহাকে বর্ম্ম-দুর্গরূপে, প্রিয়তম সখারূপে প্রাণের ভিতর উপলব্ধি করিয়া তাঁহাতে একান্ত নির্ভর করাই হইল প্রকৃত উপাসনার প্রাণ। আমাদের দেশে এ কথা নূতন নহে। উপনিষদকার ঋষি খুব জোরের সঙ্গেই বলিয়া গিয়াছেন যে "সেই পরমাত্মা পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, অন্যান্য যাহা কিছু আছে সকল অপেক্ষা তিনি প্রিয়তম"—"তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতমং যদয়মাত্মা।" সমস্ত গীতাতেও এই আত্মসমর্পণের কথাই বিশদরূপে পরিব্যক্ত হইয়াছে।

ভগবানের উপাসনায় সত্যসত্য প্রবৃত্ত হইতে চাহিলে ধন দাও পুত্র দাও, এ ভাবের স্বার্থসাধক প্রার্থনা করিলে চলিবে না। এরূপ প্রার্থনা যে উপাসনার একেবারেই অঙ্গ নহে, সে কথা আমি বলিতে পারি না। তবে ইহা স্থির যে, এরূপ প্রার্থনা উপাসনার অতি নিম্ন স্থান অধিকার করে। কেবল মাত্র ঐহিক সুখের প্রার্থনা পূরণের উপর যে ভালবাসা নির্ভর করে, সে ভালবাসা কাঙ্গাল-দুঃখীর ভালবাসা। এ রকম কাঙ্গালের ভালবাসায় মহাশক্তি বিশ্বপতি ধরা দেন না। এই জন্যই ঋষি বলিয়াছেন যে বলহীন ব্যক্তি তাঁহাকে পাইতে পারে না—নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।

এই বিশ্ববিধাতা আমাদের প্রত্যেকের পিতা-মাতা। তাঁহাকে কেবল মুখের ভালবাসা দেখাইলে চলিবে না। শুষ্ক পত্রের মস্তকে বর্ষার সমস্ত বারিধারা পড়িলেও যেমন সে তাহার এক বিন্দুও গ্রহণ করিতে পারে না, সেইরূপ শুষ্ক হৃদয় শত মুখের ভালবাসা দেখাইলেও ভগবানের প্রেমকরুণা উপলব্ধি করিতে পারে না। তাঁহাকে আমাদের পিতামাতা জানিয়া ভালবাসিতে হইবে বলিয়াই ভালবাসিতে হইবে। তাঁহাকে সকল হৃদয় দিয়া ভালবাসিলেই আমাদের তাঁহাকে পাইবার পিপাসা নিশ্চয়ই মিটিবে; তাঁহার সঞ্জীবনীশক্তি আমাদিগকে নিশ্চয়ই মৃত্যু হইতে অমৃতে লইয়া যাইবে। দ্বৈত-বাদ ঠিক, অথবা অদ্বৈতবাদ ঠিক, তর্কনিপুণ ব্যক্তি-দিগের এই সকল বাক্যজঞ্জাল নদীর জলে ভাসাইয়া দিয়া, যিনি আমাদের পিতার পিতা, মাতার মাতা, সরল পথে তাঁহার চরণতলে গিয়া উপস্থিত হও এবং তাঁহার ইচ্ছার সঙ্গে নিজের ইচ্ছা মিলাইয়া দাও; তাঁহার সঙ্গে জ্ঞানযোগে প্রেমযোগে একযুক্ত হইয়া যাও। তখন আর বুঝাইয়া দিতে হইবে না যে পরমাত্মার উপাসনা কাহাকে বলে এবং তাহার ফল কি। ঋষিরা তাই স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, যে সাধক তাঁহাকে প্রাণের সঙ্গে প্রার্থনা করেন, তিনিই তাঁহাকে লাভ করেন। তাঁহাকে সমস্ত হৃদয়ের সহিত ভালবাসিয়া ডাকিলে তিনিও যে তাহার সাড়া দেবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই প্রকার সাড়া পাইয়াই তো যুগযুগান্তর ধরিয়া কত সাধক মুক্তির পথে অগ্রসর হইয়াছেন। ব্রাহ্ম-সমাজ এই উপাসনাতত্ত্বটী নবযুগে সকলের সম্মুখে পরিস্ফুট আকারে ধারণ করিয়াছেন। রাজা রাম-মোহন রায় তাঁহার "ব্রহ্মোপাসনা" পুস্তিকাতে বলিয়াছেন যে "মনুষ্যের ধর্ম্মের দুই মূল—একটী পরমেশ্বরে নিষ্ঠা এবং দ্বিতীয়টী পরস্পরের প্রতি সৌজন্য ও সাধু ব্যবহার"। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সাধু

ব্যবহারের মূল দৃষ্টি করিয়া "ব্রাহ্মধর্ম্মবীজের" অন্যতর বীজ ও সনাতন মূল সত্য ব্যক্ত করিলেন যে "পরব্রহ্মে প্রীতি এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা; এবং একমাত্র তাঁহার উপাসনা দ্বারাই ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়।"

ব্রহ্মপ্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন উপাসনার দুইটী অঙ্গ। তাহারা উভয়ে বলিতে গেলে ভগবৎপ্রীতিরূপ একই বস্তুর দুইটী পিঠ। আমার হৃদয়ের দেবতা যিনি, তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভালবাসিলে তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন না করিয়া কি থাকিতে পারি? ভাল কাজ তাঁহার প্রিয় বলিয়া করিতে থাকিলে ভাল কাজ করা সহজ ও সরস হয়। আবার তাঁহার প্রিয় কার্য্য করিতে থাকিলে তাঁহার প্রতি প্রীতিও উজ্জ্বলতর হইয়া উঠে। তাঁহার প্রিয়কার্য্য করিবার চেষ্টা না থাকিলে তাঁহার প্রতি প্রীতি নিশ্চয়ই মুখের কথামাত্রে দাঁড়ায়। একদিকে যেমন প্রীতি ব্যতীত প্রিয়কার্য্যসাধনে ক্রমেই অনিচ্ছা আসা সম্ভব, সেইরূপ অপরদিকে প্রিয়কার্য্যসাধন ত্যাগ করিলে প্রীতির উৎসসকল শুষ্ক ও নির্জ্জীব হইয়া পড়া সম্ভব।

আমরা অনেক সময়ে উপাসনাপদ্ধতিকে উপাসনার সহিত অভিন্ন দৃষ্টিতে দেখিয়া বড়ই ভুল করি। উপাসনা ও উপাসনাপদ্ধতি এক নহে বলা বাহুল্য। প্রকৃত উপাসনা এক—পরমাত্মার সঙ্গে আত্মার যোগযুক্ত হওয়া। উপাসনাপদ্ধতি স্থান, কাল ও অবস্থা অনুসারে বিভিন্ন। বিভিন্ন জাতিতে বিভিন্ন দেশে প্রয়োজন অনুসারে উপাসনামন্দিরের আকারের ন্যায় উপাসনাপদ্ধতিও বিভিন্নরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। বিভিন্ন পদ্ধতি বিভিন্ন সময়ে অনুপযোগী বিবেচিত হইলেও তাহার অন্তর্নিহিত প্রাণ ভগবানের উপাসনা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া ধরা যাইতে পারে না। তাই দেখা যায় যে, নিতান্ত বন্য জাতি হইতে সুসভ্য জাতি পর্য্যন্ত সকলেরই মধ্যে প্রকৃত উপাসনার ভাব অল্পবিস্তর আছেই।

সকল সাধকেরই মত এই যে, "পরব্রহ্মে আত্মা সমাধান করিতে গেলে একটা শব্দের অবলম্বন অতি প্রশস্ত উপায়। সে শব্দ প্রাচীন ও প্রচলিত, সহজ ও সুবোধ্য হইলে তাহা উপাসনার আশু উপকারী হয়।" যে দেশের যে ধারায় জনসাধারণ শৈশব অবধি লালিত পালিত, সেই ধারা অনুযায়ী শব্দগুলি নির্ব্বাচিত হইলেই ধর্ম্মপ্রচার সহজ হয়। আমাদের দেশে বহুযুগের সাধনালব্ধ ঋষিদৃষ্ট ওঙ্কার প্রভৃতির ন্যায় এবং গায়ত্রী প্রভৃতির ন্যায় উপাসনার সহায়ক শব্দ মন্ত্র প্রভৃতি প্রচলিত থাকিতে আমরা অন্য কোন দেশের কোন শাস্ত্র হইতে উপাসনাপদ্ধতি রচনা বিষয়ে ঋণ লইবার কোনই প্রয়োজন দেখি না। তাই, ইতিপূর্ব্বে যে উপাসনাপদ্ধতি অবলম্বনে বর্ত্তমান উৎসবক্ষেত্রের উপাসনাকার্য্য নির্ব্বাহিত হইল, সেই পদ্ধতি আমাদের দেশের শতসহস্র বর্ষের পরমার্থচিন্তার ফলে প্রাপ্ত, সহজ ও সুবোধ্য শব্দবিশিষ্ট এবং স্বল্পাক্ষর ও গভীর ভাবরাশির ইঙ্গিতে পরিপূর্ণ উপনিষদাদির প্রাচীন ও প্রচলিত মন্ত্র সকল অবলম্বনে সংরচিত হইয়াছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ-প্রবর্ত্তিত এই পদ্ধতি একটী আদর্শ পদ্ধতি মাত্র। অনেক আত্মসন্ধানের পর মানবের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ও অভাবের উপর ইহা গঠিত হইয়াছে। প্রকৃত সাধক যিনি, যিনি প্রকৃতই ব্রহ্মসাধনে সিদ্ধ হইতে চাহেন, উপাসনার গভীরতা যিনি প্রার্থনা করেন, তাঁহার পক্ষে এই পদ্ধতিটী বড়ই সহায় হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। সময়, স্থান ও অবস্থা অনুসারে কোন নূতন পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইলে অথবা কোন পদ্ধতির কোন অংশ পরিত্যাগ করিলে বিশেষ কোনই ক্ষতি হয় বলিয়া আমরা মনে করি না।

যে কোন পদ্ধতি অবলম্বিত হউক না, আমরা ব্রহ্মোপাসক বলিয়া একটুও গৌরব করিতে চাহিলে আমাদিগকে প্রতিদিন নিয়মিত ব্রহ্মোপাসনা করিতে হইবে, প্রতিদিন নিয়মিতরূপে পরমাত্মার সহিত আত্মাকে যোগযুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। আমরা নিজেকে ধর্ম্মপ্রাণ ভারতবাসী বলিয়া পরিচয় দিতে চাহিলে জাগরণ অবধি শয়ন পর্য্যন্ত আমাদের সকল কার্য্যই ব্রহ্মকেন্দ্রক করিয়া নিয়মিতরূপে পরমাত্মাতে আত্মার নীরব সমাধান করিতে হইবে।

নির্জ্জনেও যেমন পরমাত্মার সহিত আত্মার যোগসাধনরূপ উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে, সেইরূপ সময়ে সময়ে সকলের সহিত, পিতাপুত্রে স্বামীস্ত্রীতে ভাইভগ্নীতে এবং বন্ধুবান্ধবে মিলিত হইয়াও তাঁহার উপাসনা করিতে হইবে। নির্জ্জনে

আত্মাতে পরমাত্মাকে দেখা, তাঁহার মহিমা আলোচনা করা এবং তাঁহার চরণে আত্মনিবেদন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কার্য্য আর কি আছে? তেমনি পরিবারস্থ পাঁচজনের সহিত, বন্ধুবান্ধবের সহিত মিলিতভাবে উপাসনা, এক কথায়, সজন উপাসনার ন্যায় আনন্দদায়ক কার্য্য আর কি আছে? নির্জ্জন উপাসনার ন্যায় সজন উপাসনাও ব্রহ্মপ্রীতি-সাধনের পক্ষে মহান সহায়। নির্জ্জন উপাসনায় জগন্মাতার পবিত্র মূর্ত্তি দেখা যায়, সজন উপাসনায় বিশ্ববিধাতার সবল ও কর্ম্মোজ্জ্বল মূর্ত্তি উপলব্ধ হয়। বিশ্ববিধাতা জগন্মাতাকে ভালবাসিতে গেলে তাঁহার পবিত্র স্থির অকম্পিত মাতৃমূর্ত্তি যেমন উপলব্ধি করিতে হইবে, তাঁহার ঐশ্বর্য্য-ঢলঢল, ব্রহ্মচক্রের পরিচালক ও জনগণের অধিনায়ক পিতৃমূর্ত্তিটীও তেমনি উপলব্ধি করিতে হইবে। আমাদের এই উৎসবক্ষেত্রে আমাদের হৃদয়-দেবতা তাঁহার অরূপ রূপের যে অপরূপ জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার এ মূর্ত্তি নির্জ্জন উপাসনায় দেখা যায় কিনা সন্দেহ।

নির্জ্জন ও সজন, উভয়বিধ উপাসনাই পরস্পর পরস্পরের সহায়। যিনি নীরবে আত্মসমাধানের ফলে শ্রদ্ধাভাব উদ্রিক্ত করিয়াছেন, সজন উপাসনাতেও তাঁহার আত্মসমাধান সহজ হয়। আবার, সজন উপাসনা সাধনেচ্ছু ব্যক্তির মনোযোগ নিশ্চয়ই নির্জ্জন উপাসনার দিকেও ফিরাইয়া দিবে। সজন উপাসনাতে একটী বিশেষ লাভ এই হয় যে, সমাগত ভক্তজন পরস্পরের বলে ধর্ম্মপথে সাহসের সহিত অগ্রসর হইতে পারেন। সমাগত ভক্তগণ প্রকৃত শ্রদ্ধার সঙ্গে উপাসনায় মনোনিবেশ করিলে নক্ষত্র হইতে অপর নক্ষত্রে যেরূপ আলোক ছুটিয়া যায়, সেইরূপ এক হৃদয় হইতে অপর হৃদয়ে শ্রদ্ধা তড়িৎবেগে অনুপ্রবেশ করিতে থাকে। ধর্ম্মমন্দিরে আসিয়া যিনি সমস্বরে ভগবানের আরতিতে, স্তবগান প্রভৃতিতে শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে যোগ দিয়াছেন, তিনিই অনুপম আনন্দের এই তড়িৎপ্রভাব নিশ্চয়ই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

নির্জ্জন উপাসনা ও সজন উপাসনা যেমন পরস্পরের সহায়, তেমনি উভয়ই মানবের প্রকৃতিসিদ্ধ। পরিবারে সুখ-দুঃখের কোন বিশেষ ঘটনা ঘটিলে সন্তানেরা যেমন পিতামাতাকে সকল কথা নিবেদন করিয়া শান্তি ও সান্ত্বনা লাভ করে, সেইরূপ দেশের মধ্যে, জাতির মধ্যে বা সমাজের মধ্যে বিপদ ঘটিলে সকলের মিলিতভাবে জগন্মাতার চরণতলে দণ্ডায়মান হওয়া অথবা সম্পদ আসিলে তাঁহার সিংহাসন ঘিরিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাও প্রকৃতিসিদ্ধ। ইহাই হইল সজন উপাসনার মূলতত্ত্ব। সজন উপাসনা মানবের প্রকৃতিসিদ্ধ বলিয়াই ইহা কোন না কোন আকারে প্রত্যেক জাতির মধ্যেই অভিব্যক্ত দেখা যায়। বন্ধুবান্ধবের সহিত মিলিয়া উপাসনা প্রকৃতিসিদ্ধ বলিয়াই ইহা মানবের একটী স্বাভাবিক পবিত্র অধিকার এবং কর্ত্তব্য। মানবজাতিই যে সামাজিক জীব। রাজনীতিক্ষেত্রে, সামাজিক ক্রিয়াকর্ম্মে সে পাঁচজনের সহিত মিলিয়া মিশিয়া কার্য্য করিতে চাহে। উপাসনা বিষয়েও যে সে সহধর্ম্মী আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবের সহিত মিলিত হইবার ইচ্ছা করিবে, ইহা কিছু আশ্চর্য্য নহে।

পূর্ব্বতন ঋষিদিগের পদানুসরণ করিয়া নির্জ্জন ও সজন উভয়বিধ উপাসনার সামঞ্জস্য রক্ষা করাই ব্রাহ্মসমাজের অন্যতর প্রধান কার্য্য। ব্রাহ্মসমাজ যেমন প্রতিদিন নির্জ্জনে আত্মসমাধান করিবার উপদেশ দেন, তেমনি সপ্তাহান্তে, মাসান্তে ও বৎসরান্তে উপাসনা ও ব্রহ্মোৎসব প্রভৃতি প্রবর্ত্তিত করিয়া সজন উপাসনারও মাহাত্ম্য বিঘোষিত করিয়াছেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এক সময়ে হিমালয়ের প্রবাসে নীরব সাধনে মন দিয়াছিলেন, কিন্তু পরে তিনি সজন উপাসনারও মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়া এই মহানগরীতে ফিরিয়া আসিলেন এবং অগ্নিময় বাক্যে তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান বিবৃত করিলেন। নির্জ্জন উপাসনায় যে ব্রহ্মতত্ত্ব পাওয়া যায় সজন উপাসনাসূত্রে তাহা জনসমাজে বিতরণ না করিয়া কি থাকা যায়? কেবলমাত্র নির্জ্জন উপাসনা অবলম্বন করিলে, আজ ব্রাহ্মসমাজ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভূখণ্ডে যে অমূল্য ব্রহ্মবাণী সকল প্রচার করিয়াছেন, তাহা প্রচার হইত কি না জানি না।

অনেকের ভ্রান্ত ধারণা এই যে, হিন্দুশাস্ত্র সজন উপাসনার বিরোধী। আমরা কোন শাস্ত্রে এরূপ কোন কথা দেখি নাই। বরঞ্চ অনুমান হয় যে,

উপযুক্ত ক্ষেত্রে ঋষিরা মিলিতভাবে উপাসনার জন্যই অনুশাসন করিয়া বলিয়াছিলেন—সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মনাংসি জানতাং। এক সঙ্গে চল, একসঙ্গে বল এবং পরস্পরের মন অবগত হও। যে স্তোত্রের দ্বারা আমরা আজ এই উৎসবে আত্মাতে পরমাত্মার আসনপ্রতিষ্ঠা করিলাম, মহানির্ব্বাণতন্ত্র সেই স্তোত্র "ব্রহ্মনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবের" নিকট "শুনাইবার ও বুঝাইবার" বিধি প্রদান করিয়াছেন। গীতাতেও ভগবানের প্রতি আত্মসমাধান করিয়া পরস্পরকে তাঁহার বিষয় বুঝাইবার এবং তাঁহার মহিমা কীর্ত্তনের যে উপদেশ আছে (গীতা ১০।৯) তাহার ভিতর তো সজন উপাসনারই প্রাণ উপলব্ধি করা যায়। রাজা রামমোহন রায়ের সময়েও দেখি যে সজন উপাসনার বিরুদ্ধে কথা উঠিয়াছিল। তিনি তদুত্তরে বলিয়াছিলেন যে মৌনী হইয়া থাকা, নির্জ্জনে থাকা ব্রাহ্মের নিত্য ধর্ম্ম নহে; বেদে ও মন্বাদিশাস্ত্রে উপনিষদ্ প্রভৃতির পাঠ করিবার ও উপদেশ দিবার অনুশাসন আছে (কবিতাকরের সহিত বিচার)।

বৃথা তর্ক বিতর্ক পরিত্যাগ করিয়া আজ এই উৎসবের মাঝে সমাগত এই বন্ধুবান্ধবের মুখশ্রীতে আত্মার আত্মা পরমাত্মাকে উপলব্ধি করিয়া পূজ্যপাদ কবি রবীন্দ্রনাথের সহিত বলিব—

"সবার মাঝারে তোমারে স্বীকার করিব হে।
সবার মাঝারে তোমারে হৃদয়ে বরিব হে।
শুধু আপনার মনে নয়, আপন ঘরের কোণে নয়,
শুধু আপনার রচনার মাঝে নহে;
তোমার মহিমা যেথা উজ্জ্বল রহে,
সেই সবা মাঝে তোমারে স্বীকার করিব হে।
* * * *
কেবলি তোমার স্তবে নয়, শুধু সঙ্গীত রবে নয়,
শুধু নির্জ্জনে ধ্যানের আসনে নহে,
তব সংসার যেথা জাগ্রত রহে
কর্ম্মে, সেথায় তোমারে স্বীকার করিব হে।

বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত

গীতা-রহস্য।

অষ্টম প্রকরণ।

বিশ্বের রচনা ও সংহার।

(পূর্ব্বের অনুবৃত্তি)

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদিত)

মূল অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে কিংবা বেদান্তসিদ্ধান্ত অনুসারে পরব্রহ্ম হইতে অনেক নামরূপধারী জগতের অচেতন অর্থাৎ নির্জীব বা জড় পদার্থ কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে তাহার বিচার শেষ করা গিয়াছে। এক্ষণে বিচার করিব যে, জগতের সচেতন অর্থাৎ সজীব প্রাণীদিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে সাংখ্যশাস্ত্রে বিশেষ বক্তব্য কি আছে; তাহার পর দেখিতে হইবে যে, বেদান্তশাস্ত্রের সিদ্ধান্তের সহিত তাহার কতটা মিল আছে। সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়াদির সহিত মূল প্রকৃতি হইতে নিঃসৃত পৃথিব্যাদি স্থূল পঞ্চমহাভূতের সংযোগ হইলে সজীব প্রাণীর শরীর প্রস্তুত হয়। কিন্তু এই শরীর সেন্দ্রিয় হইলেও জড় ছাড়া আর কিছুই নয়। এই ইন্দ্রিয়দিগকে প্রেরণা করিবার তত্ত্ব জড় প্রকৃতি হইতে ভিন্ন এবং তাহাকে পুরুষ বলা হয়। সাংখ্যের এই সিদ্ধান্ত পূর্ব্বপ্রকরণে বর্ণন করিয়াছি যে, যদিও পুরুষ মূলে অকর্ত্তা, তথাপি প্রকৃতির সহিত তাহার সংযোগ হইলে পর সজীব সৃষ্টির আরম্ভ হয়; এবং "আমি পৃথক্ ও প্রকৃতি পৃথক্" এই জ্ঞান হইলে পর প্রকৃতির সহিত পুরুষের সংযোগ চলিয়া যায় এবং সে মুক্ত হয়; এরূপ না হইলে জন্মমরণের ফেরের মধ্যে তাহাকে পড়িতে হয়। কিন্তু পুরুষ পৃথক্ ও প্রকৃতি পৃথক্ এইজ্ঞান হইবার পূর্ব্বেই যাহার মরণ হয়, তাহার নব নব জন্ম কিরূপে হয়, তাহার বিচার করা হয় নাই, অতএব তৎসম্বন্ধে এইখানে বেশী বিচার করা আবশ্যক বলিয়া মনে হয়। জ্ঞান প্রাপ্ত না হইয়া যে মনুষ্য মরে, তাহার আত্মা প্রকৃতিচক্র হইতে একেবারে ছাড়ান পায় না, ইহা সুস্পষ্ট। কারণ ছাড়ান পাইলে, জ্ঞানের কিংবা পাপপুণ্যের কোনই মাতব্বরী থাকে না; চার্ব্বাকের ন্যায় ইহাও বলিতে হয় যে, মরিবার পর প্রত্যেক ব্যক্তিই প্রকৃতি হইতে ছাড়ান পায় বা মোক্ষ লাভ করে। ভাল; যদি বলা যায় যে, মরিবার পর শুধু আত্মা অর্থাৎ পুরুষ অবশিষ্ট থাকিয়া আপনা হইতেই নব নব জন্ম গ্রহণ করে, তাহা হইলে পুরুষ অকর্ত্তা ও উদাসীন এবং সমস্ত কর্তৃত্ব প্রকৃতির—এই মূলভূত সিদ্ধান্তের বাধা আসে। তাছাড়া যখন আমি মানিতেছি যে, আত্মা আপনা হইতেই নব নব জন্মগ্রহণ করে, তখন ইহা তাহার গুণ বা ধর্ম্ম হইয়া যাইতেছে; এবং তখন তো এরূপ অনবস্থা প্রাপ্ত হয় যে, জন্মমরণের ফের হইতে সে কখনই মুক্তি পাইবে না। অতএব সিদ্ধ হইতেছে যে, যদি জ্ঞান প্রাপ্ত না হইয়াই কোন মনুষ্য মরিয়া যায়, তথাপি পরে নব নব জন্ম প্রাপ্ত করাইবার জন্য উহার আত্মার সহিত প্রকৃতির সম্বন্ধ অবশ্যই থাকা চাই। মৃত্যুর পর স্থূল দেহের নাশ হওয়া প্রযুক্ত উক্ত সম্বন্ধ এক্ষণে স্থূল মহাভূতাত্মক প্রকৃতির সহিত থাকিতে পারে না, ইহা স্পষ্টই রহিয়াছে। কিন্তু একথা বলা যায় না যে, প্রকৃতি কেবল পঞ্চ মহাভূত হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। প্রকৃতি

হইতে সমস্ত তেইস তত্ত্ব উৎপন্ন হয়; এবং স্থূল পঞ্চমহাভূতও এই তেইশ তত্ত্বের শেষের পাঁচ। এই শেষের পাঁচ তত্ত্বকে (পঞ্চ মহাভূত) মোট তেইশ তত্ত্ব হইতে বাদ দিলে ১৮ তত্ত্ব অবশিষ্ট থাকে। অতএব, এক্ষণে কাজে কাজেই বলিতে হয় যে, জ্ঞানপ্রাপ্ত না হইয়া যে মরে সেই পুরুষ পঞ্চ মহাভূতাত্মক স্থূল শরীর হইতে অর্থাৎ শেষের পাঁচ তত্ত্ব হইতে মুক্ত হইলেও প্রকৃতির অন্য ১৮ তত্ত্বের সহিত তাহার সম্বন্ধ এই প্রকার মরণের দ্বারা কখনই ছিন্ন হয় না। মহান্ (বুদ্ধি), অহঙ্কার, মন, দশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চতন্মাত্র এই কয়েকটী আঠারো তত্ত্ব (গ্রন্থের ১৭৬ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত ব্রহ্মাণ্ডের বংশ বৃক্ষ দেখ)। এ সমস্তই সূক্ষ্ম তত্ত্ব। তাই, এই তত্ত্বগুলির সহিত পুরুষের সংযোগ বজায় রাখিয়া যে দেহ নির্ম্মিত হয় তাহাকে স্থূল শরীরের বিরুদ্ধ সূক্ষ্ম কিংবা লিঙ্গশরীর বলা হয় (সাং. কা. ৪০)। যখন কোন প্রাণী জ্ঞান না পাইয়া মরে, তখন মৃত্যুর সময় তাহার আত্মার সঙ্গেই প্রকৃতির উক্ত ১৮ তত্ত্বের নির্ম্মিত এই লিঙ্গশরীরও স্থূল দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়; এবং জ্ঞানপ্রাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত সেই পুরুষ নব নব জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকে। এই সম্বন্ধে কাহার কাহার এই সন্দেহ হয় যে, মনুষ্য মরিবার পর প্রাণের সঙ্গে সঙ্গেই জড়দেহ হইতে বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন ও দশ ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারও নষ্ট হওয়া প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া লিঙ্গশরীরের মধ্যে এই ১৩ তত্ত্বের সমাবেশ করিতে কোন বাধা নাই, কিন্তু লিঙ্গশরীরের মধ্যে এই ১৩ তত্ত্বের সহিত পাঁচ সূক্ষ্ম তন্মাত্রের সমাবেশ কেন স্বীকার করিব? ইহার উত্তরে সাংখ্যেরা বলেন যে, শুধু বুদ্ধি, শুধু অহঙ্কার, মন ও দশ ইন্দ্রিয় এই তের তত্ত্ব—প্রকৃতির শুধু গুণ; এবং ছায়ার যেরূপ কোন পদার্থের আশ্রয় আবশ্যক হয় কিংবা চিত্রের জন্য যেরূপ দেওয়াল কাগজ প্রভৃতির আশ্রয় দরকার হয়, সেইরূপ এই গুণাত্মক ১৩ তত্ত্বেরও একত্র থাকিবার জন্য কোন-না-কোন দ্রব্যের আশ্রয় চাই। এখন আত্মা (পুরুষ) স্বয়ং নির্গুণ ও অকর্ত্তা, সুতরাং তাহা কোন গুণেরই আশ্রয় হইতে পারে না। মনুষ্য জীবিত থাকিতে, তাহার দেহের স্থূল পঞ্চ মহাভূত এই ১৩ তত্ত্বের আশ্রয় হইয়া থাকে। কিন্তু মরণান্তর অর্থাৎ স্থূল দেহের নাশানন্তর স্থূল পঞ্চ মহাভূতের এই আশ্রয় বিনষ্ট হয়। তখন, এই গুণাত্মক ১৩ তত্ত্বের অন্য কোন দ্রব্যকে আশ্রয় পাওয়া চাই। যদি মূল প্রকৃতিকেই আশ্রয় বলি, তবে উহা অব্যক্ত ও অবিকৃত অবস্থার অর্থাৎ অনন্ত ও সর্ব্বব্যাপী হওয়া প্রযুক্ত উহা একটি ক্ষুদ্র লিঙ্গশরীরস্থ অহঙ্কার বুদ্ধি আদি গুণের আধার হইতে পারে না। তাই মূল প্রকৃতিরই দ্রব্যাত্মক বিকারের মধ্যে স্থূল পঞ্চমহাভূতের বদলে তাহাদের মূলভূত পাঁচ সূক্ষ্ম তন্মাত্র দ্রব্যের সমাবেশ, উক্ত তের গুণের সহিতই তাহাদের আশ্রয়ের দৃষ্টিতে লিঙ্গশরীরের মধ্যে সমাবেশ করিতে হয় (সাং. কা. ৪১)। কোন কোন সাংখ্যগ্রন্থকার লিঙ্গশরীর ও স্থূলশরীরের মধ্যে পঞ্চতন্মাত্রনির্ম্মিত তৃতীয় এক শরীর কল্পনা করিয়া প্রতিপাদন করেন যে, এই তৃতীয় শরীর লিঙ্গশরীরের আশ্রয়। কিন্তু সাংখ্যকারিকার ৪১ শ্লোকের প্রকৃত অর্থ সেরূপ নহে, টীকাকারেরা ভ্রান্তিবশত তৃতীয় শরীর কল্পনা করিয়াছে, এইরূপ আমার মনে হয়। আমার মতে এই শ্লোকের উদ্দেশ্য কেবল ইহাই বুঝানো যে, বুদ্ধি-আদি ১৩ তত্ত্বের সহিত লিঙ্গশরীরে পঞ্চতন্মাত্রেরও সমাবেশ কেন করা হইয়াছে।* একটু বিচার করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, সূক্ষ্ম আঠারো তত্ত্বের সাংখ্যোক্ত লিঙ্গশরীর ও উপনিষদে বর্ণিত লিঙ্গশরীর এই দুয়ের মধ্যে বেশী পার্থক্য নাই। বৃহদারণ্যকোপনিষদে উক্ত আছে যে, জোঁক (অলোকা) যেরূপ একগাছা ঘাসের এক ডগায় পৌঁছিলে অন্য একগাছা ঘাসের উপর (সামনের পা দিয়া) শরীরের সামনের ভাগ রাখিয়া, পূর্ব্ব ঘাসের উপর অবস্থিত দেহের পশ্চাদ্‌ভাগটা টানিয়া লয়, সেইরূপ আত্মা এক শরীর ছাড়িয়া অন্য শরীরে প্রবেশ করে (বৃ. ৪. ৪. ৩)। কিন্তু কেবল এই দৃষ্টান্ত হইতে, শুধু আত্মাই অন্য শরীরে যায়, এবং তাহাও এক শরীর ছাড়িবামাত্রই যায়, এই দুই অনুমান সিদ্ধ হয় না। কারণ, বৃহদারণ্যকোপনিষদেই পরে (বৃ. ৪. ৪. ৫) বর্ণিত হইয়াছে যে, আত্মার সঙ্গে সঙ্গেই পঞ্চ (সূক্ষ্ম) ভূত, মন, ইন্দ্রিয়সকল, প্রাণ ও ধর্ম্মাধর্ম্মও শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়; আর ইহাও উক্ত হইয়াছে যে, আপন আপন কর্ম্ম-অনুসারে আত্মা ভিন্ন ভিন্ন লোক প্রাপ্ত হয়, এবং সেই সেই লোকে কিছুকাল বাস করে। সেইরূপ, ছান্দোগ্যোপনিষদেও অপ (জল) মূলতত্ত্বের সঙ্গে জীবের যে গতি বর্ণিত হইয়াছে (ছাং. ৫. ৩. ৩; ৫. ৯. ১), এবং বেদান্তসূত্রে তাহার যে অর্থ নির্ণয় করা হইয়াছে (বেসূ. ৩. ১. ১-৭), তাহা হইতে স্পষ্ট দেখা যায় যে, লিঙ্গশরীরে

* আমাদেরই মতানুযায়ী ভট্টকুমারিলও এই শ্লোকের অর্থ করিয়াছেন, ইহা তাঁহার মীমাংসাশ্লোকবার্ত্তিক গ্রন্থের এক শ্লোক হইতে (আত্মবাদ, শ্লো. ৬২) দেখিতে পাওয়া যায়। সেই শ্লোকটি এই—

অন্তরাভবদেহো হি নেষ্যতে বিন্ধ্যবাসিনা।
তদস্তিত্বে প্রমাণং হি ন কিঞ্চিদবগম্যতে॥ ৬২॥

"অন্তরাভব অর্থাৎ লিঙ্গশরীর ও স্থূল শরীর এই দুয়ের মধ্যস্থিত দেহ কিংবা শরীর বিন্ধ্যবাসীর সম্মত নহে। এই প্রকারের মধ্যবর্ত্তী দেহ আছে বলিবার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।" ঈশ্বরকৃষ্ণ বিন্ধ্যপর্ব্বতের উপর থাকিতেন বলিয়া তাঁহাকে বিন্ধ্যবাসী বলা হইয়াছে। অন্তরাভব শরীরের 'গন্ধর্ব্ব' এই নামও আছে। অমরকোষ ৩. ৩. ১৩২ এবং তাহার উপর কৃষ্ণাজী গোবিন্দ ওক প্রকাশিত ক্ষীরস্বামীর টীকা ও মূল গ্রন্থের প্রস্তাবনা পৃ. ৮ দেখ।

জল, তেজ ও অন্ন এই তিন মূল তত্ত্বেরই সমাবেশ ছান্দোগ্যোপনিষদেরও অভিপ্রেত। সার-কথা, মহদাদি আঠারো সূক্ষ্ম তত্ত্বের নির্ম্মিত সাংখ্যোক্ত লিঙ্গশরীরেই প্রাণ ও ধর্ম্মাধর্ম্ম অর্থাৎ কর্ম্ম সামিল করিলেই বেদান্তীর লিঙ্গশরীর হয় দেখা যাইতেছে। কিন্তু সাংখ্যশাস্ত্র অনুসারে এগারো ইন্দ্রিয়বৃত্তির মধ্যেই প্রাণের এবং বুদ্ধীন্দ্রিয়ের ব্যাপারের মধ্যেই ধর্ম্মাধর্ম্মের সমাবেশ হওয়া প্রযুক্ত উক্ত ভেদ কেবল শাব্দিক,—লিঙ্গশরীরের গঠনসম্বন্ধে বেদান্ত ও সাংখ্যের মধ্যে বস্তুত কোন ভেদ নাই বলিলেও চলে। এইজন্য মৈত্র্যুপনিষদে (মৈ. ৬. ১০) "মহদাদিসূক্ষ্ম-পর্য্যন্তং" এই সাংখ্যোক্ত লিঙ্গশরীরের লক্ষণ "মহদাদ্যবিশেষান্তং" এইরূপ পর্য্যায়ের দ্বারা যেমনটি তেমনি ঠিক রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে।* ভগবদ্গীতাতে "মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি" (গী. ১৫. ৭) অর্থাৎ মন ও পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় লইয়াই সূক্ষ্ম শরীর হয়, এইরূপ বলিয়া পরে বলা হইয়াছে—"বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ" (১৫. ৮) অর্থাৎ বায়ু যেরূপ ফুল হইতে সুগন্ধ হরণ করে সেইরূপ জীব স্থূল শরীর ছাড়িবার সময় লিঙ্গশরীর সঙ্গে লইয়া যায়। তথাপি গীতার অধ্যাত্মজ্ঞান উপনিষদ হইতেই গৃহীত হওয়ায় বলা যায় যে, 'মনের সহিত ছয় ইন্দ্রিয়' এই শব্দগুলির মধ্যেই পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র, প্রাণ ও পাপপুণ্য ইহাদের সংগ্রহই ভগবানের অভিপ্রেত। মনুস্মৃতিতেও বর্ণিত হইয়াছে যে, মনুষ্য মরিবার পর এই জন্মের পাপপুণ্য-ফল ভোগ করিবার জন্য পঞ্চতন্মাত্রাত্মক সূক্ষ্ম শরীর প্রাপ্ত হয় (মনু. ১২. ১৬, ১৭)। "বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ" গীতার এই দৃষ্টান্ত হইতে এই শরীর যে সূক্ষ্ম, তাহাই সিদ্ধ হয়; কিন্তু তাহার আকার কত বড় তাহা বুঝা যায় না। মহাভারতের সাবিত্রী-উপাখ্যানে (মভা. বন. ২৯৭. ১৬) সত্যবানের (স্থূল)শরীর হইতে অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত এক পুরুষকে যম বাহির করিল,—"অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষং নিশ্চকর্ষ যমো বলাৎ" এই যে বর্ণনা আছে, তাহা হইতে এই দৃষ্টান্তেরই জন্য লিঙ্গশরীর অঙ্গুষ্ঠ-আকারবিশিষ্ট মানা হইয়াছে বলিয়া প্রতীত হয়।

লিঙ্গশরীর আমাদের চোখে না দেখা গেলেও তাহার অস্তিত্ব কোন্ অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ হয়, এবং সেই শরীরের অবয়ব-গঠন কিরূপ, তাহার বিচার করা হইল। কিন্তু, প্রকৃতি ও পাঁচ স্থূল মহাভূতের অতিরিক্ত আঠারো তত্ত্বের সমুচ্চয় হইতে লিঙ্গশরীর নির্ম্মিত হয়, এই কথা বলিলেই যথেষ্ট বলা হয় না বলিয়া মনে হয়। এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, লিঙ্গশরীর যেখানে যেখানে থাকিবে, সেখানে সেখানে এই আঠারো তত্ত্বের সমুচ্চয় নিজ নিজ গুণধর্ম্মানুসারে মাতাপিতার স্থূল দেহ হইতে এবং পরে স্থূল জগতের অন্ন হইতে হস্তপদাদি স্থূল অবয়ব বা স্থূল ইন্দ্রিয় উৎপন্ন করিবে অথবা তাহাদের পোষণ করিবে। কিন্তু এখন বলা আবশ্যক যে, আঠারো তত্ত্বের সমুচ্চয়ে উৎপন্ন লিঙ্গশরীর পশু, পক্ষী, মনুষ্য প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেহ কেন উৎপন্ন করে। সজীব জগতের সচেতন তত্ত্বকে সাংখ্যবাদী 'পুরুষ' বলেন; এবং সাংখ্যদিগের মতে এই পুরুষ অসংখ্য হইলেও প্রত্যেক পুরুষ স্বভাবতই উদাসীন ও অকর্ত্তা হওয়া প্রযুক্ত পশুপক্ষী-আদি প্রাণীদিগের ভিন্ন ভিন্ন দেহ উৎপন্ন করিবার কর্তৃত্ব পুরুষেতে আসিতে পারে না। বেদান্তশাস্ত্রে পাপপুণ্যাদি কর্ম্মের পরিণাম হইতে এই ভেদ উৎপন্ন হয়, উক্ত হইয়াছে। এই কর্ম্মবিপাকের বিচার পরে করা যাইবে। সাংখ্যশাস্ত্র অনুসারে কর্ম্মকে পুরুষ ও প্রকৃতি হইতে ভিন্ন তৃতীয় তত্ত্ব মানিতে পারা যায় না; এবং পুরুষ যখন উদাসীন, তখন বলিতেই হয় যে, কর্ম্ম প্রকৃতির সত্ত্বরজতমগুণেরই বিকার। লিঙ্গশরীরে যে আঠারো তত্ত্বের সমুচ্চয় আছে, তন্মধ্যে বুদ্ধিতত্ত্ব প্রধান। কারণ, বুদ্ধি হইতেই পরে অহঙ্কারাদি সতেরো তত্ত্ব উৎপন্ন হয়। অতএব বেদান্ত যাহাকে কর্ম্ম বলে, তাহাকেই সাংখ্যশাস্ত্রে সত্ত্ব রজ ও তম এই তিন গুণের ন্যূনাধিক পরিমাণে উৎপন্ন বুদ্ধির ব্যাপার, ধর্ম্ম বা বিকার বলা হয়। বুদ্ধির এই ধর্ম্মের সংজ্ঞা—'ভাব'। সত্ত্ব রজ ও তম এই গুণত্রয়ের তারতম্যে এই ভাব অনেক প্রকারের হইয়া থাকে। ফুলেতে যেরূপ গন্ধ ও কাপড়ে যেরূপ রং, সেইরূপ লিঙ্গশরীরে এই ভাব লাগিয়া থাকে (সাং কা-৪০)। এই ভাব অনুসারে কিংবা বেদান্তের পরিভাষায় কর্ম্মানুসারে লিঙ্গশরীর নব নব জন্ম গ্রহণ করে; এবং জন্মগ্রহণ করিবার সময় পিতামাতার শরীর হইতে যে দ্রব্য লিঙ্গশরীর আকর্ষণ করিয়া লয় সেই সকল দ্রব্যেতেও অন্য ভাব আসিয়া থাকে। 'দেবযোনি, মনুষ্যযোনি, পশু-

* দ্বাত্রিংশৎ উপনিষদের পুনা আনন্দাশ্রম-সংস্করণের মৈত্র্যুপনিষদের উক্ত মন্ত্রের পাঠ "মহদাদ্যং বিশেষান্তং" এইরূপ দেওয়া হইয়াছে এবং উহাই টীকাকারও স্বীকার করিয়াছেন। এই পাঠ গ্রহণ করিলে লিঙ্গশরীরের মধ্যে আরম্ভের মহৎ-তত্ত্বের সমাবেশ করিয়া বিশেষান্ত এই পদের দ্বারা সূচিত বিশেষ অর্থাৎ পঞ্চ মহাভূত ছাড়িয়া দিতে হয়। অথবা এই অর্থ করা আবশ্যক হয় যে, মহদাদ্যং ইহার মধ্যে 'মহৎ'কে ধরিতে হইবে এবং 'বিশেষান্তং' ইহার মধ্যে বিশেষকে ছাড়িতে হইবে—কিন্তু যেখানে আদ্যান্ত বলা হইয়াছে সেখানে দুই-ই ধরা কিংবা ছাড়া যুক্তিসিদ্ধ। তাই প্রোফেসর ডয়সন্ বলিয়াছেন যে, মহদাদ্যং এই পদের শেষের অনুস্বার ছাঁটিয়া ফেলিয়া "মহদাদ্যবিশেষান্তম্" (মহদাদি+অবিশেষান্তম্) এই পাঠ গ্রহণ করা উচিত। এইরূপ করিয়া অবিশেষ পদ ধরিলে, মহৎ ও অবিশেষ অর্থাৎ আদি ও অন্ত এই দুয়েতেই একই নিয়মের প্রয়োগ হইবে এবং লিঙ্গশরীরে উভয়েরই সমাবেশ করা যাইবে। এই পাঠের ইহাই বিশেষ গুণ। কিন্তু যে-কোন পাঠই গ্রহণ কর না কেন, অর্থের ভেদ হয় না, ইহা মনে রাখা আবশ্যক।

যোনি ও বৃক্ষযোনি' এই সকল ভেদ এই ভাবের সমুচ্চয়েরই পরিণাম (সাং.কা.৪৩—৫৫)। এই সমস্ত ভাবের মধ্যে সাত্ত্বিকগুণের উৎকর্ষ হইয়া যখন মনুষ্য জ্ঞান ও বৈরাগ্য প্রাপ্ত হয় এবং সেই প্রযুক্ত প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদ বুঝিতে আরম্ভ করে, তখন মনুষ্য আপনার মূলস্বরূপ কৈবল্যপদে উপনীত হয়; এবং তখন এই লিঙ্গশরীর হইতে মুক্তি হইয়া তাহার দুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তি হয়। কিন্তু এই প্রকৃতিপুরুষের ভেদজ্ঞান না হইয়া শুধু সাত্ত্বিকগুণেরই উৎকর্ষ হইলে লিঙ্গশরীর দেবযোনিতে অর্থাৎ স্বর্গে জন্ম গ্রহণ করে; রজোগুণের প্রাবল্য হইলে মনুষ্যযোনিতে অর্থাৎ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে এবং তমোগুণের আধিক্য হইলে তাহাকে তির্য্যক যোনিতে প্রবেশ করিতে হয় (গী. ১৪. ১৮)। "গুণা গুণেষু জায়ন্তে" এই তত্ত্ব ধরিয়াই সাংখ্যশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, মানবযোনিতে জন্ম হইলে পর রেতবিন্দু হইতে ক্রমে ক্রমে কলল, বুদ্‌বুদ, মাংস, পেশী ও ভিন্ন ভিন্ন স্থূল ইন্দ্রিয়সকল কিরূপে গঠিত হয় (সাং-কা-৪৩; মভা. শাং. ৩২০)। সাংখ্য ও গর্ভোপনিষদের বর্ণনা প্রায় একই প্রকার। উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে বুঝা যাইবে যে, সাংখ্যশাস্ত্রে 'ভাব' শব্দের যে পারিভাষিক অর্থ বলা হইয়াছে, তাহা বেদান্তশাস্ত্রে বিবক্ষিত না হইলেও ভগবদ্‌গীতাতে (গী. ১০. ৪, ৫; ৭. ১২), "বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ" ইত্যাদি গুণের (পরবর্ত্তী শ্লোকে) যে 'ভাব' নাম দেওয়া হইয়াছে, অনুমান হয়, তাহা সাংখ্যশাস্ত্রের পরিভাষা মনে করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

এই প্রকারে সাংখ্যশাস্ত্রানুসারে মূল অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে কিংবা বেদান্ত অনুসারে মূল সৎ-রূপী পরব্রহ্ম হইতে সৃষ্টির সমস্ত সজীব ও নির্জীব ব্যক্ত পদার্থ ক্রমে ক্রমে সৃষ্ট হইয়াছে; এবং যখন সৃষ্টির সংহারের সময় উপস্থিত হয়, তখন উপরে কথিত জগৎ-উৎপত্তির গুণপরিণামক্রমের বিপরীত ক্রমে সমস্ত ব্যক্ত পদার্থ অব্যক্ত প্রকৃতিতে কিংবা মূল ব্রহ্মেতে লয় প্রাপ্ত হয়। এইরূপ সিদ্ধান্ত সাংখ্য ও বেদান্ত উভয় শাস্ত্রেরই মান্য (বেসূ.২. ৩. ১৪; মভা. শা ২৩২)। উদাহরণ যথা, পঞ্চ মহাভূতের মধ্যে পৃথিবীর লয় জলেতে, জলের অগ্নিতে, অগ্নির বায়ুতে, বায়ুর আকাশে, আকাশের তন্মাত্রে, তন্মাত্রের অহংকারে, অহঙ্কারের বুদ্ধিতে, এবং বুদ্ধি বা মহানের প্রকৃতিতে লয় হয়, এবং বেদান্তানুসারে প্রকৃতি মূল ব্রহ্মেতে লয় প্রাপ্ত হয়। জগতের উৎপত্তি বা সৃষ্টি হইলে পর উহার লয় ও সংহার পর্য্যন্ত কতকাল অতীত হয়, ইহা সাংখ্যকারিকায় কোথাও কথিত হয় নাই। তথাপি মনে হয় যে, মনুসংহিতা (১. ৬৯-৭০), ভগবদ্‌গীতা (৮-১৭), এবং মহাভারতে (শাং. ২৩১) বর্ণিত কালগণনা সাংখ্যদিগেরও মান্য। আমাদের উত্তরায়ণই দেবতাদের দিন এবং আমাদের দক্ষিণায়নই দেবতাদের রাত্রি। কারণ, শুধু স্মৃতিগ্রন্থাদিতে নহে পরন্তু জ্যোতিষশাস্ত্রের সংহিতাদিতেও বর্ণনা আছে (সূর্য্যসিদ্ধান্ত ১. ১৩; ১২. ৩৫, ৬৭) যে, দেবতা মেরুপর্ব্বতের উপর অর্থাৎ উত্তর ধ্রুবস্থানে থাকেন। অর্থাৎ দুই অয়নের আমাদের এক বৎসরই দেবতাদের এক দিবারাত্রি এবং আমাদের ৩৬০ বৎসরই দেবতাদের ৩৬০ দিবারাত্রি বা এক বৎসর। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এইরূপ আমাদের চারি যুগ। এই চারিযুগের কালগণনা এইরূপ—সত্যযুগের চারি হাজার বৎসর, ত্রেতাযুগের তিন হাজার, দ্বাপরের দুই হাজার এবং কলির এক হাজার বৎসর। কিন্তু এক যুগ শেষ হইতেই অন্য যুগ একেবারে আরম্ভ না হইয়া মধ্যে দুয়ের গোলযোগ অর্থাৎ সন্ধিকালের কএক বৎসর চলিয়া যায়। এই প্রকারে সত্যযুগের আদিতে ও অন্তে প্রত্যেক দিকে চারিশত বর্ষের, ত্রেতাযুগের আদিতে ও অন্তে প্রত্যেক দিকে তিনশত বর্ষের, দ্বাপরের আদিতে ও অন্তে প্রত্যেক দিকে দুই শত বর্ষের, এবং কলিযুগের পূর্ব্ব পশ্চাৎ প্রত্যেক দিকে একশত বর্ষের সন্ধিকাল মিলিয়া মোট চারিযুগের আদ্যন্তের সন্ধিকাল দুই হাজার বৎসর হয়। এই দুই হাজার বৎসর এবং সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি ইহাদের পূর্ব্ববর্ণিত সংখ্যামতে চারি যুগের দশ হাজার বৎসর মিলিয়া মোট বারো হাজার বৎসর হয়। এই বারো হাজার বৎসর মনুষ্যদিগের না দেবতাদিগের? মনুষ্যের বলিয়া ধরিলে, কলিযুগের আরম্ভ হইতে এক্ষণে পাঁচ হাজার বৎসরের উপর হইয়া গিয়াছে; কাজেই বলিতে হয় যে, হাজার মানব-বৎসরের কলিযুগ শেষ হইয়াছে, পুনরায় তার পরে আগন্তব্য সত্যযুগও শেষ হইয়া এক্ষণে ত্রেতাযুগ আসিয়াছে! এই বিরোধকে ঠেকাইবার জন্য এই বারো হাজার বৎসর দেবতাদের,এইরূপ পুরাণে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। দেবতাদিগের বারো হাজার বৎসর,মনুষ্যদের ৩৬০×১২০০০=৪৩,২০,০০০, তেতাল্লিশ লক্ষ, বিশ হাজার বৎসর হয়। এখনকার পঞ্জিকায় যুগপরিমাণ এই পদ্ধতিতেই বর্ণিত হইয়া থাকে। (দেবতাদের) বারো হাজার বৎসর মিলিয়া মনুষ্যদের এক মহাযুগ বা দেবতাদের এক যুগ হয়। দেবতাদের একাত্তর যুগে এক মন্বন্তর বলা যায় এবং এইরূপ মন্বন্তর চৌদ্দটী। কিন্তু প্রথম মন্বন্তরের আরম্ভে ও শেষে এবং পরে প্রত্যেক মন্বন্তরের শেষে দুই দিকে সত্যযুগের ন্যায় একাদিক্রমে এইরূপ ১৫ সন্ধিকাল হইয়া থাকে। এই পনেরো সন্ধিকাল ও চৌদ্দ মন্বন্তর মিলিয়া দেবতাদের এক হাজার যুগ কিংবা

ব্রহ্মদেবের এক দিন হয় (সূর্য্যসিদ্ধান্ত ১.১৫-২০); এবং মনুস্মৃতিতে ও মহাভারতে লিখিত হইয়াছে যে, এইরূপ হাজার যুগ মিলিয়া ব্রহ্মদেবের এক রাত্রি হয় (মনু. ১. ৬৯-৭৩ ও ৭৯ ; মভা. শাং ২৩১.১৮-৩১ ; এবং যাস্কের নিরুক্ত ১৪.৯ দেখ)। এই গণনানুসারে ব্রহ্মদেবের একদিন মনুষ্যের চার অর্ব্বুদ বত্রিশ কোটি বৎসর হয়, এবং ইহারই নাম—কল্প। * ভগবদ্গীতাতে (গী. ৮-১৮ ও ৯. ৭ দেখ), স্মৃতিগ্রন্থে এবং মহাভারতেও কথিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মদেবের এই দিন কিংবা কল্প আরম্ভ হইলে পর—

অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥

"অব্যক্ত হইতে জগতের সমস্ত ব্যক্ত পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে ; এবং ব্রহ্মদেবের রাত্রি সুরু হইলে, সমস্ত ব্যক্ত পদার্থ আবার অব্যক্তের মধ্যে লয় প্রাপ্ত হয়"। ইহা ব্যতীত অন্যান্য প্রলয়ের কথা পুরাণ-সমূহে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু এই প্রলয়সমূহে সূর্য্যচন্দ্রাদি সমস্ত জগতের নাশ না হওয়ায়, ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি ও সংহারের বিচার করিবার সময় ইহাদিগকে জমার মধ্যে ধরা হয় না। কল্প—ব্রহ্মদেবের এক দিন কিংবা রাত্রি ; এবং এইরূপ ৩৬০ দিন ও ৩৬০ রাত্রিই তাঁহার এক বৎসর। তাই পুরাণাদিতে বর্ণনা আছে (বিষ্ণুপুরাণ ১.৩ দেখ) যে, ব্রহ্মদেবের আয়ু তাঁহার একশত বৎসর, তাহার অর্দ্ধেক চলিয়া গিয়াছে, দ্বিতীয় অর্দ্ধেক অর্থাৎ ৫১ বৎসরের প্রথম দিন কিংবা শ্বেতবারাহ নামক কল্প এখন সুরু হইয়াছে ; এবং এই কল্পের চৌদ্দ মন্বন্তরের মধ্যে ছয় মন্বন্তর গিয়া সপ্তম অর্থাৎ বৈবস্বত মন্বন্তরের ৭১ মহাযুগের মধ্যে ২৭ মহাযুগ পূর্ণ হইয়া ২৮তম মহাযুগের অন্তর্গত কলিযুগের প্রথম পাদ অর্থাৎ চতুর্থ ভাগ এখন চলিতেছে। ১৯৫৬ সম্বতে (১৮২১ শকে) এই কলিযুগের ঠিক ৫০০০ বৎসর অতীত হইয়াছিল। এই অনুসারে হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে, কলিযুগের প্রলয় হইতে ১৮২১ অব্দে (১৯৫৬ সম্বতে) মনুষ্যের চারি লক্ষ সাতাশ হাজার বৎসর বাকী ছিল ; আবার বর্ত্তমান মন্বন্তরের শেষে কিংবা এখনকার কল্পান্তে যে মহাপ্রলয় হইবে সে ত দূরেই রহিয়া গেল! মানবী চার অব্জ বত্রিশ কোটি বৎসরের ব্রহ্মদেবের যে দিন এখন চলিতেছে, সাত মন্বন্তরেও তাহার পূর্ণ মধ্যাহ্নও এখনো হইল না অর্থাৎ সাত মন্বন্তরও এখনও অতীত হয় নাই!

জগতের উৎপত্তি ও সংহারের এখন পর্য্যন্ত যে বিচার করা হইয়াছে তাহা বেদান্তের উপর,—এবং পরব্রহ্মকে ছাড়িয়া দিলে সাংখ্যশাস্ত্রের তত্ত্বজ্ঞানের উপর করা হইয়াছে, সেই কারণে জগৎ-উৎপত্তিক্রমের এই পরম্পরাই আমাদের শাস্ত্রকার সর্ব্বত্র প্রমাণ বলিয়া মনে করেন, এবং ভগবদ্গীতাতেও এই ক্রমই প্রদত্ত হইয়াছে। এই প্রকরণের আরম্ভেই কথিত হইয়াছে যে, সৃষ্টির উৎপত্তিক্রমের সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন বিচারও দেখা যায় ; যেমন শ্রুতি স্মৃতি পুরাণের কোন কোন স্থানে কথিত আছে যে, প্রথমে ব্রহ্মদেব বা হিরণ্যগর্ভ উৎপন্ন হয়েন কিংবা জল প্রথমে উৎপন্ন হয় এবং তাহাতে পরমেশ্বরের বীজ হইতে এক সুবর্ণময় অণ্ড উৎপন্ন হয়। কিন্তু এই সমস্ত বিচার গৌণ ও উপলক্ষণাত্মক বুঝিয়া তাহাদের উৎপত্তি বুঝাইবার প্রসঙ্গ যখন আসে তখন ইহাই বলা যায় যে, হিরণ্যগর্ভ কিংবা ব্রহ্মদেব অর্থে প্রকৃতিই বুঝায়। ভগবদ্গীতাতেও "মম যোনির্মহৎ ব্রহ্ম" (গী. ১৪. ৩) এইরূপ ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতিকেই ব্রহ্ম বলা হইয়াছে, এবং ভগবান ইহাও বলিয়াছেন যে, আমার বীজ হইতে এই প্রকৃতিতে ত্রিগুণের দ্বারা অনেক মূর্ত্তি উৎপন্ন হয়। অন্যত্র এইরূপ বর্ণন আছে যে, ব্রহ্মদেব হইতে আরম্ভে দক্ষাদি সাত মানসপুত্র বা সাত মনু উৎপন্ন হইয়া তাঁহারা পরে চরাচর জগৎ নির্ম্মাণ করিলেন (মভা, আ. ৬৫-৬৭ ; মভা. শাং. ২০৩ ; মনু. ১. ৩৪-৬৩) ; এবং ইহার উল্লেখ একবার গীতাতেও করা হইয়াছে (গী. ১০. ৬)। কিন্তু বেদান্তগ্রন্থ ইহাই প্রতিপাদন করে যে, এই সকল বিভিন্ন বর্ণনাতে ব্রহ্মদেবকেই প্রকৃতি ধরিলে উপরি-প্রদত্ত তাত্ত্বিক জগদুৎপত্তিক্রমের সহিত মিল হইয়া যায় ; এবং এ নিয়ম অন্যত্রও উপযোগী হইতে পারে। উদাহরণ যথা, শৈব ও পাশুপতদর্শনে শিবকে নিমিত্ত-কারণ জ্ঞান করিয়া তাহা হইতে কার্য্য-কারণাদি পাঁচ পদার্থ উৎপন্ন হয়, এইরূপ মত দেখা যায়, এবং নারায়ণীয় ভাগবত ধর্ম্মে বাসুদেবকে প্রধান মানিয়া বাসুদেব হইতে প্রথমে সংকর্ষণ (জীব), সংকর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্ন (মন) এবং প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধ (অহঙ্কার) উৎপন্ন হয় এইরূপ বর্ণনা আছে। কিন্তু বেদান্তশাস্ত্রানুসারে জীব প্রত্যেকবারেই নব নব উৎপন্ন হয় না, উহা নিত্য ও সনাতন পরমেশ্বরের, নিত্য—অতএব অনাদি—অংশ ; তাই বেদান্ত-সূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে (বেসূ. ২. ২. ৪২-৪৫) ভাগবতধর্ম্মোক্ত জীবের উৎপত্তিবিষয়ক উপরি-উক্ত মতের খণ্ডন করিয়া ঐ মত বেদবিরুদ্ধ অতএব ত্যাজ্য, এইরূপ কথিত হইয়াছে ; এবং গীতাতে বেদান্তসূত্রের এই সিদ্ধান্তেরই অনুবাদ করা হইয়াছে (গী. ১৩. ৪ ; ১৫. ৭)। সেইরূপ আবার, সাংখ্যবাদী প্রকৃতি ও পুরুষ

* জ্যোতিঃশাস্ত্রের ভিত্তিতে যুগাদির গণনার বিচার স্বর্গীয় শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত স্বীয় 'ভারতীয় জ্যোতিঃশাস্ত্র' নামক গ্রন্থে ঠিক-ঠিকানা করিয়াছেন তাহা দেখ পৃ, ১০৩-১০৫ ; ১১৩ ইত্যাদি।

এই উভয়কে স্বতন্ত্র তত্ত্ব মানিয়া থাকেন; কিন্তু এই দ্বৈত অস্বীকার করিয়া প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুই তত্ত্ব নিত্য ও নির্গুণ এক পরমাত্মারই বিভূতি, ইহাই বেদান্ত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ভগবদ্গীতাতেও এই সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য হইয়াছে (গী. ৯. ১০)। কিন্তু এই সম্বন্ধে সবিস্তার বিচার পরবর্ত্তী প্রকরণে করা যাইবে। এখানে ইহাই বক্তব্য যে, ভাগবত বা নারায়ণীয় ধর্ম্মে বর্ণিত বাসুদেবভক্তির ও প্রবৃত্তিপর ধর্ম্মের তত্ত্ব ভগবদ্গীতায় মান্য হইলেও গীতাতে ভাগবতধর্ম্মের এই কল্পনা স্বীকৃত হয় নাই যে, বাসুদেব হইতে সংকর্ষণ বা জীব উৎপন্ন হয় এবং তাহার পরে প্রদ্যুম্ন (মন) এবং প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধ (অহঙ্কার) প্রাদুর্ভূত হয়। সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, ইহাদের নামও গীতার কোথাও আসে নাই। পাঞ্চরাত্রে কথিত ভাগবতধর্ম্ম এবং গীতার ভাগবত ধর্ম্মের মধ্যে ইহাই গুরুতর ভেদ। এই বিষয়ের উল্লেখ এখানে জানিয়া বুঝিয়া করা হইয়াছে; কারণ "ভগবদ্গীতাতে ভাগবতধর্ম্ম বলা হইয়াছে" এইটুকু হইতে কেহ ইহা না বুঝেন যে জগতের উৎপত্তি-ক্রমসম্বন্ধে কিংবা জীব-পরমেশ্বর-স্বরূপ সম্বন্ধে ভাগবতাদি ভক্তি-সম্প্রায়ের মতও গীতায় মান্য। এক্ষণে সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুয়েরই বাহিরে ব্যক্তাব্যক্ত ও ক্ষরাক্ষর জগতের মূলের অন্য কোন তত্ত্ব আছে কি নাই তাহার বিচার করিব। ইহারই নাম অধ্যাত্ম কিংবা বেদান্ত। ইতি ৮ম প্রকরণ সমাপ্ত।

রাণাডের-স্মৃতি কথা।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

কলিকাতাযাত্রা।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনূদিত)

মাদ্রাজ-অঞ্চলে একমাস থাকিয়া দশহরার সময় আমরা মাদ্রাজ হইতে ফিরিয়া আসিলাম এবং ৮।১০ দিন পুণায় থাকিয়া তাহার পর কলিকাতাযাত্রা করিলাম। রাস্তায় ভুসাওয়ল, জবলপুর প্রভৃতি স্থানে আড্ডা করা গেল। জবলপুরে এক দিন বেশী থাকিয়া নর্ম্মদায় প্রসিদ্ধ ধবল পাহাড় দেখিতে গেলাম। টাঙ্গা হইতে নামিয়া, নৌকা করিয়া ধবল-পাহাড় ও তাহার চতুর্দ্দিকস্থ অতীব রমণীয় দৃশ্য দেখিলাম। ঐ দৃশ্য দেখিয়া ঈশ্বরের অনন্ত অপার সৃষ্টিসম্বন্ধে অন্তঃকরণ বিস্ময়ে চকিত ও স্তম্ভিত হইয়া গেল। সেখান হইতে যাত্রা করিয়া আমরা প্রয়াগে আসিলাম ও দারাগঞ্জে নামিলাম। তাহার পর দিন, দশাশ্বমেধে গিয়া কল্‌সি ভরিয়া গঙ্গাজল লইলাম; তাহার পর সেখান হইতে আমরা সবাই একটা নৌকায় উঠিলাম এবং ত্রিবেণীসঙ্গমের মাঝখানে বড় বড় কাঠের চৌকোনা তখ্‌তা ফেলিয়া রাখা হইয়াছে, তাহার উপর নামিলাম। মস্তকমুণ্ডন করিবেন না, এইরূপ "উনি" স্থির করিলেন। কাছাকাছি আর একটা চৌকা তখ্‌তার উপর এক রমণীর মস্তক মুণ্ডন অনুষ্ঠান হইতেছিল, তাহা দেখিয়া আমরা ফিরিলাম এবং তার পর দিন কাশীতে আসিলাম। তাহার পর, কলিকাতায় যাইবার ত্বরা থাকায়, কাশীতে আমাদের দুই দিনও থাকা হইল না। কাশীতে পৌঁছিয়া তাহার পর দিন সকালে উঠিয়া ভাগিরথীতে স্নান করিলাম এবং বিশ্বেশ্বর, মঙ্গলাগৌরী, অন্নপূর্ণা, কালভৈরব প্রভৃতি দর্শন করিয়া আমরা ফিরিয়া আসিলাম। দুপর বেলায় নানা রকমের বাসন ও কাপড় খরিদ করিয়া সন্ধ্যাকালে এক ভাড়াটে নৌকা করিয়া, বরুণা পর্য্যন্ত আশপাশের সমস্ত ঘাট ও দেবালয় দেখিয়া, রাত্রি ৯।১০ টার সময় বাড়ী আসিলাম। রাত্রে জ্যোৎস্না ও চারিদিকের দৃশ্য অতীব রমণীয় হওয়ায়, এবং বিশেষত কাশীক্ষেত্রসম্বন্ধে পবিত্র ধারণা ও পুণ্যবুদ্ধি অন্তরে অনুভূত হওয়ায় সেই সময়টা ও সেই দৃশ্য চিরস্মরণীয় হইয়া রহিল। তার পর দিন আমরা কলিকাতায় গেলাম, সেখানে ধর্ম্মতলায় একটা বাঙ্গলা ভাড়া করিয়া রহিলাম এই বাঙ্গলাটা খুব বড় ছিল সত্য; কিন্তু অত্যন্ত পুরাতন। বাঙ্গলার হাতার মধ্যে কুয়া, বাগান, গাছপালা প্রভৃতি কিছুই না থাকায়, একেবারে উজাড় ও পোড়ো দেখাইতেছিল। এই জন্য এই বাঙ্গলায় মনের সুখ ও আনন্দ হওয়া দূরে থাক্ বরং মন উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল; এবং সেই দিনটা বড়ই খারাপ গিয়াছিল। সন্ধ্যাকালে উনি বাড়ী আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আজ কি করিলে"? আমি একটু বিরক্তির ভাবে বলিলাম—"কিছুই করি নি, কি আর করব? প্রথমত নূতন জায়গা, কারও সঙ্গে চেনাপরিচয় নেই। যে বাঙ্গলা নেওয়া হয়েছে তাও যদি সুন্দর হত—তাও না। গাছ, ফুল, লতা এই সব দেখেও তবু মানুষের মন খুসী হয়; কিন্তু এখানে তা কিছুই নেই। বরং যে দিকে তাকানো যায় সেই দিকেই সব ভোঁভাঁ করচে ও উজাড়। বাড়ীতেও কিছু করতে মন যায় না। ভাল, বাঙ্গলার ভাড়াটা কি কম? তাও না; ভাড়া খুব বেশী। এ রকম বাঙ্গলা নিয়ে কি হবে? বরং এর চেয়ে একটা সুন্দর বাঙ্গালা নেওয়া যাক্। খর্চ্চা যতদূর হবার তাত হয়েছে—কিন্তু আমরা যেন এখানে মাগ্‌না আছি এই রকম মনে হচ্চে" ইত্যাদি শুনাইবার মতো অনেক কথা বলিলাম। বাড়ীটা পুরাতন, মাটীর নীচের তলায় দিনের বেলাতেও শেয়াল ডাকে। যারা বাহিরে যায় তাদের কোন কষ্ট

নেই। কিন্তু বাড়ীতে যারা থাকে, তাদের সময় যেন কাটে না; মন উদাস হইয়া যায়। এই সমস্ত কথা শুনিয়া 'উনি' শান্তভাবে উত্তর করিলেন—"বাগ-বাগিচা ও গাছপালাই কি শুধু মানুষের মনোরঞ্জন করে? বই পড়ে' যে ব্যক্তি সময় কাটাতে পারে তার এরকম খুঁৎখুঁৎ করা উচিত নয়। পুস্তকপাঠে মনে যেমন আনন্দ ও সন্তোষ হয় এমন আর কিছুতে হয় না। এক রকমের বই পড়ে বিরক্তি বোধ হলে, অন্য কোন বই পড়তে পার, কবিতা পড়তে পার, কিংবা পুঁথী পড়তে পার। বেশী অধ্যয়নে মন ক্লান্ত হলে, ঈশ্বরনির্ম্মিত উদ্যান কানন দেখ্‌বার জন্য যেতে পার; এই সব উপায় কি তোমার নাই? গাড়ী যুতে কোথাও বেড়িয়ে আস্‌তে পার; এই-সবে মনের বিশ্রাম হয়। মানুষের হাতে গড়া বাগান প্রভৃতিতে যদি মনের আনন্দ ও আমোদ হয় তা-হলে সৃষ্টি-সৌন্দর্য্যের আলোচনা করলে সামঞ্জস্য, গভীরতা ও দয়াব্যঞ্জকতার হিসাবে সেই সব সৃষ্টিসৌন্দর্য্য প্রাণীমাত্রেরই কতটা সুখের সাধন ও উপভোগের জিনিস হয়ে রয়েছে। একথা মনে করলে মন স্তম্ভিত ও অন্তঃকরণ আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। কিন্তু এখন তোমার মন পিতৃশোকে উদাস হয়ে আছে, তাই কিছুতেই তোমার আমোদ হয় না। এখন তোমার মনকে কিছু কাজ দেওয়া দরকার। কাল তুমি এই উজাড় জায়গার শোভা মনে আনবার চেষ্টা কর।" এই কথা শুনিয়া আমার হাসি পাইল। আমি বলিলাম, "শুধু মনে আনলেই জায়গার শোভা কি-করে দেখা হবে?" এই কথায় উনি বলিলেন "আমি কি বলচি আগে তা' শুনে নেও;—কাল সকালে চার জন মজুর লাগিয়ে, তোমার যে রকম বাগান করতে হবে, সেই রকম জায়গা দাগ কেটে চিহ্নিত করে দিয়ে, তাদের দিয়ে মাটি খুঁড়িয়ে নেবে ও বুনানির উপযুক্ত করে নিয়ে তাতে মেথী ও ধনিয়ার বীজ ফেল। তা ছাড়া, এই ঋতুর উপযোগী ফুলগাছের কিছু বীজ আনিয়ে নিয়ে পুঁতে দেও, তাহা হইলে আমোদ ও কাজ দু-ই হবে। এই বাগানে তুমি নিজে জল দেবে, তাহলে, তোমার ব্যায়ামও সহজে হবে। আমি বাড়ী এলে, তোমার সন্ধ্যা-কালের পড়াশুনা এই বাগানেই আমরা করব।" এইরূপ বলিয়া তারপর দিন, শয্যা হইতে উঠিবামাত্র উনি আমাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন। আমিও তাঁর কথা-অনুসারে মজুর ডাকাইয়া সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত কাজ করাইয়া লইলাম। সন্ধ্যাকালে উনি বাড়ী আসিলে, আমরা গাড়ী করিয়া বেড়াইতে গেলাম এবং আসিবার সময় ফুলগাছের কিছু বীজ লইয়া আসিলাম। তারপর, দুদিন পরে আমাদের এই নূতন বাগানে কেদারা আনিয়া সন্ধ্যা-কালের পাঠ পড়িতে বসিলাম। এমন সময়, বাঙ্গালা সংবাদপত্র বিলি করিবার একজন লোক আসিয়া উপস্থিত হইল এবং এই সংবাদপত্রের গ্রাহক হব কিনা, জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম, "না বাবা ও পত্র আমার দরকার নেই। আমি বাঙ্গালা জানি না। তবে অনর্থক এই পত্র কেন নেব?" ঐ লোকটা আমার কথার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া ওঁর দিকে তাকাইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল। তখন উনি বলিলেন, "আজ-কের কাগজটা রেখে যাও। কাল থেকে আর এনো না। আসচে সোমবারে কাগজ নিয়ে এসো। তারপর কাগজ নিতে আরম্ভ করব।" এই কথা শুনিয়া আমার একটু আশ্চর্য্য মনে হইল, কিন্তু আমি চুপ করিয়া রহিলাম। সেই লোকটা চলিয়া গেলে, উনি আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"যাদের নগরে দুই চার মাস থাকতে হবে, তাদের ভাষা আমরা বুঝি না, এই কথা বলতে আমার লজ্জা কচ্ছিল।" আমি বলিলাম, "যে ভাষা আমাদের নয়, তা বুঝি-না বলতে লজ্জা কিসের? এর পর, শিখতে ইচ্ছে করলেও, শেখা হবে কি করে'? শেখা-বেই বা কে"? "ওঁর" শুধু বাঙ্গালার অক্ষর পরিচয় ছিল মাত্র; কিন্তু ভাল পড়িতে পারিতেন না; এই কথা আমি জানিতাম বলিয়া আমি বলিলাম;—"ভালই ত, তুমি কাল থেকেই আমাকে শেখাও-না। আমি প্রস্তুত আছি" এই কথা শুনিয়া, সত্য হইলেও নিত্যানুসারে কোন কিছু ঠাট্টা করিতেন কিংবা উত্তর দিতেন; কিন্তু আজ সেই জায়গায় কোন কথা না বলিয়া, যেন কি-একটা ভাবিতেছেন, এইরূপ তাঁহার মুখের ভাবে মনে হইল। আমি মনে মনে লজ্জিত হইলাম; আমার ঐ রকম বলার দরুণ উনি রাগ করেন নাই ত?—এইরূপ আমার মনে হইল। কিন্তু এই সম্বন্ধে কোন কথাই হইল না। সেইদিন ঐ ভাবেই কাটিয়া গেল। তারপর দিন চা-পান করিবার পর, নিত্য নিয়মানুসারে বেড়াইতে গেলেন। কিন্তু বাড়ী আসিতে নিত্যাপেক্ষা বিলম্ব হওয়ায় আমি তাঁহার পথ চাহিয়া বসিয়াছিলাম,—এমন সময় উনি আসিলেন। সঙ্গে এক সিপাই ছিল। তাহার হাতে ছোট বড় এইরূপ ১০।১৫ খানা বই ছিল। সেই পুস্তকগুলি সে টেবিলের উপর রাখিল। আমি 'ওঁর' কাছেই দাঁড়াইয়া ছিলাম। তাহার মধ্য হইতে দুই একটা পুস্তক খুলিয়া দেখিলাম। সেগুলি বাঙ্গালা ও ইংরাজী পুস্তক। "এই সব পুস্তক কেন আনা হল?" এই কথা আমার মুখ হইতে বাহির হইবামাত্র আগেকার দিনের কথা স্মরণ হওয়ায়, আমি চুপ হইয়া গেলাম। ওঁর ঘামে-ভেজা কাপড় ছাড়াইয়া অন্য এক সদরা (পাঞ্জাবী কামিজ) পরিতে দিলাম, এবং ওঁর পান করিবার দুধ আনিতে যাইব সেই সময় উনি বলিলেন

"পুস্তকগুলি গুনতি করে নিয়ে এই লোককে চিঠি মতো দাম চুকিয়ে দেও ত।" "আচ্ছা"—বলিয়া আমি তখনি চিঠি মতো পুস্তক গুনতি করিয়া লইয়া দাম চুকাইয়া দিলাম। তারপর, দুধ আনিয়া দিলাম। দুগ্ধ পান করিয়া তাঁহার পর টেবিলের উপর হইতে একটা বই উঠাইয়া লইয়া উহার পাতা উল্টাইতে আরম্ভ করিলেন। আমি সেই বৈঠকখানা ঘরে দূরে এক কেদারায় বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিলাম, কিন্তু মধ্যে মধ্যে, কি চলিতেছে তাহা দেখিতেছিলাম। কারণ, এত পুস্তক যে উনি নিজে গিয়া খরিদ করিলেন, তাহার উদ্দেশ্য আমি বুঝিতে পারি নাই। ওঁর বাজারে যাওয়া, জিনিস খরিদ করা কখনও আমি দেখি নাই। জীবনের মধ্যে ওঁর এই প্রথম বাজার করা হইল। আদৌ পয়সা হাতে লইতেন না, নিজের কাছেও রাখিতেন না, ইহাই তাঁহার মুখ্য নিয়ম ছিল। ১১টা পর্য্যন্ত এই বইগুলির পাতা উল্টাইতে লাগিলেন। কোন কোন পুস্তক পাঠ করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু বহু পূর্ব্বে শিক্ষা করায় ভুলিয়া গিয়াছিলেন; সেই জন্য অক্ষর চিনিতে পারিতেছেন না, মনে হইল। ১১টার সময়, রান্না হইয়া গিয়াছে বলায় উনি স্নান করিতে উঠিয়া গেলেন। যাইতে যাইতে সিপাইকে বলিলেন,—"আমি আহার করিয়া ফিরিয়া যতক্ষণ না আসি তুই বাজারে গিয়া একটা শ্লেট ও পেন্সিল নিয়ে আয়; দেরী করিস্‌নে।" আহারান্তে আবার বৈঠকখানায় আসিলে পর, আনীত শ্লেট হাতে লইলেন এবং সেই সকল পুস্তকের মধ্য হইতে একখানি পুস্তক লইয়া শ্লেটের উপর মূল-অক্ষরগুলা লিখিতে আরম্ভ করিলেন। এ পর্য্যন্ত, নিত্যানুসারে মাঝে মাঝে কিছু না কিছু আমোদ করিয়া, ঠাট্টা করিয়া কথা বলিতেন, কিন্তু আজ সে সব কিছুই নহে। এই নূতন পাঠের উপর তাঁর সমস্ত লক্ষ্য নিবদ্ধ ছিল। সন্ধ্যাকালে গাড়ী করিয়া বেড়াইতে যাইবার পূর্ব্বে, যে পুস্তক পড়িতে আট্‌কাইয়া ছিল, তাহা খুব উচ্চৈঃস্বরে শীঘ্র শীঘ্র পড়িতে লাগিলেন এবং সেই পুস্তকখানা নীচে রাখিয়া পোষাক পরিলেন। আমরা গাড়ী করিয়া দুজনে বেড়াইতে গেলাম। এটা ওটা অনেক কথা বলিলাম, কিন্তু সকালের পুস্তক সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতে আমার সাহস হইল না, উনি কথা-প্রসঙ্গে সহজভাবে বলিলেন, "আজ বাঙ্গালা পড়তে সমস্ত সময় কেটে গেছে—আমার রোজকার কাজ কিছুই হয় নাই।" এই কথা শুনিয়া আমি কোন উত্তর করিলাম না; কিন্তু কাল আমার বলাতেই উনি যে এত কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন,—ইহা আমার নিজেরই খারাপ লাগিল। বাঙ্গালা শেখাটা কোন প্রকারে এড়াইবার জন্যই, আমি বলিয়াছিলাম; "তুমি যদি আমাকে শেখাও তবেই শিখব, আর কারও কাছে শিখব না।" কারণ, আমি যদি শুধু বলিতাম—"আচ্ছা", তাহলে উনি একজন বাঙ্গালী মাষ্টার আনিতেন। কিন্তু আমার তাহা ভাল লাগিত না। কারণ, একে ত ছোট বেলা হইতে স্কুল কি তাই জানিতাম না এবং "উনি ছাড়া অন্য কোন পুরুষের নিকট শিক্ষার কোন প্রসঙ্গই হয় নাই। এখন ওঁর সময় না থাকায় এবং অনেক দিন হইল বাঙ্গালা শিখিয়াছিলেন কিন্তু এখন ভুলিয়া যাওয়ায়, বাঙ্গালা শিখাইবার জন্য যদি কোন লোক রাখার দরকার হয়, তাহা এড়াইবার জন্যই আমি পূর্ব্বদিনে ঐ কথা বলিয়াছিলাম। কিন্তু আমার এই কথায়, রেষারিষি করিয়া তার পর দিন বাঙ্গালাটা আবার ঝালাইয়া লইবার জন্য সমস্তক্ষণ ক্ষেপণ করিলেন,—ইহার দরুন আমার অনুতাপ হইল; আমি যেন চোরের মতন হইয়া গেলাম। রাত্রে ওঁর সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে অস্পষ্টশব্দে ঐরূপ কিছু আমি বলিলাম এবং তাহাতে করিয়া আমার মনের ভার কতকটা কমিয়া গেল। তার পর দিন সকালে, বেড়াইতে যাইবার আগে, উনি শ্লেট লইয়া এবং শ্লেটের উপর বাঙ্গালা মূলাক্ষর লিখিয়া আমাকে দিলেন এবং দুই একবার পাঠ করিতে বলিয়া তাহার পর, "আমি বাড়ী আস্‌বার পূর্ব্বে এই অক্ষরগুল অভ্যাস করে রেখো" এই কথা আমাকে বলিলেন। ওঁর বাড়ী ফিরিবার পূর্ব্বেই আমি সমস্ত অক্ষর অভ্যাস করিয়া পুনর্ব্বার লিখিয়া রাখিলাম, এবং তার পর আমার নিজের কাজে চলিয়া গেলাম। উনি বাড়ী আসিয়া নিত্যানুসারে সমস্ত কাজ সারিয়া ক্ষৌরী হইতে বসিলেন। সেই সময় উনি এক বাঙ্গালা বই হাতে করিয়া উচ্চস্বরে পড়িতে সুরু করিলেন এবং যে শব্দ আট্‌কাইতেছিল তাহার অক্ষর ও উচ্চারণ ঐ নাপিতের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। আমি নিকটের এক কাম্‌রায় পড়িতেছিলাম। সেখানে বৈঠকখানায় আর একজন কে কথা কহিতেছে এইরূপ আমি শুনিতে পাইলাম। কেহ হয় ত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে এইরূপ মনে করিয়া, লোকটি না জানি কে দেখিবার জন্য উঠিলাম, দেখিলাম অন্য কেহ আসে নাই, বাঙ্গালা বই হাতে করিয়া "উনি" উচ্চস্বরে পাঠ করিতেছেন। এবং নিকটস্থ নাপিত শব্দের উচ্চারণ ও অর্থ বলিয়া দিতেছে। ইহা দেখিয়া আমি হাস্য সম্বরণ করিতে পারিতেছিলাম না। নাপিত চলিয়া গেলে পর তৎক্ষণাৎ আমি ওঁর সম্মুখে আসিয়া বলিলাম—"মাষ্টারটি ত দিব্যি মিলেছে। শ্রীদত্ত যেমন ১৪ জন গুরু করেছিলেন, সেই রকম, এখানকার গুরুদের একটা ফর্দ্দ যদি কেউ করতে বলে, তাহলে এই গুরুর নাম আমি প্রথমে দেব। পূর্ব্বে গুরুর কাছে শিক্ষা করতে হলে, গুরুর

সেবা করতে হত এইরূপ শোনা যায়; কিন্তু এই গুরু বেচারা উল্টা এইখানেই চাকরী করচে, তাই এর নামটা প্রথমে দেওয়া চাই।" এত বেশী বয়সে এই প্রকারে নিজে বাঙ্গালা শিখিয়া আমাকে শিখাইবেন মৎলব করিয়াছেন দেখিয়া আমার আশ্চর্য্য মনে হইল এবং আমি পূর্ব্বে যে কথা বলিয়াছিলাম তাহার দরুন উনি রেষারিষি করিয়া অনেক জবাবদিহির কাজের মধ্যেও, সময় করিয়া লইয়া আমাকে বাঙ্গালা শিখাইবার জন্য এত কষ্ট করিতেছেন। এই অনুসারে বাঙ্গালা পাঠের ক্রম স্থির হইলে, মাস-দেড়েকের মধ্যে আমি বেশ পাঠ করিতে সমর্থ হইলাম; কম্পৌণ্ডের মধ্যে তৈয়ারী করা বাগানে মেথী ও ধনিয়া খুব ঘনভাবে বাহির হইয়াছিল, ইংরেজী ফুলগাছেও ফুল ধরিয়াছিল। সেই স্থানে কেদারা আনিয়া আমরা যখন বসিতাম, তখন কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে যে বাঙ্গালা খবরের কাগজ চাইনা বলিয়াছিলাম তাহাই এখন লইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিদিন সেখানে পাঠ করিতাম; তা-ছাড়া ক্রম-পাঠের পুস্তকগুলিও অভ্যাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। কলিকাতা হইতে ফিরিবার সময়, বিষবৃক্ষ দুর্গেশনন্দিনী আনন্দমঠ প্রভৃতি আরও অন্যান্য উপন্যাস লইয়া আমরা প্রত্যাগত হইলাম।

আর্য্যবিবাহের অভিব্যক্তি।

(আধুনিক)

(শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বিএল্, বার এট্-ল)

আর্য্যসমাজের, ব্রাহ্মসমাজের, ও অন্যান্য অভিনব সম্প্রদায়ের বিবাহপদ্ধতি এই প্রবন্ধে সাধারণভাবে আলোচ্য।

ভারতবর্ষ caste-ridden বা "বর্ণ"-প্রধান দেশ। সচরাচর দেখা যায়, "caste"-বিহীন জাতিরা হিন্দুর caste অবলম্বন করিতে সচেষ্ট হয়। আবার নিম্ন casteএর ব্যক্তিরা উচ্চ casteএর দাবী করে, অর্থাৎ শূদ্রেরা বৈশ্য, বৈশ্যেরা ক্ষত্রিয় প্রভৃতির উত্তরোত্তর উচ্চতর শ্রেণীতে উঠিতে চায়। বঙ্গদেশে কোন কোন কায়স্থ উপবীত গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।* এইরূপে যাহারা উচ্চ casteএর দাবী করে, সেই উচ্চcaste এর লোকেরা তাহাদিগের সে দাবী গ্রাহ্য করিলে, অর্থাৎ তাহাদিগকে সেই casteএর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া স্বীকার ও গ্রহণ করিলে, তাহাদিগের সেই উচ্চ casteএর সভ্যস্বরূপে পরিগণিত হইবার পক্ষে আর কোন বাধা থাকে না। আর যদি তাহাদিগের সে দাবী অগ্রাহ্য হয়, তাহা হইলে তাহারা একটী নূতন caste সংগঠন করিতে বাধ্য হয়। আবার দেখা যায়, উচ্চ casteএর লোকেরা casteএর rules বা বিধান ভঙ্গ করিয়া একঘরে হয়, অর্থাৎ তাহাদের কি ধর্ম্মকর্ম্মে কি অন্য বিষয়ে নিজ নিজ সমাজে চলন রহিত হয়। যদি এই লোকেরা ক্ষমতাশালী না হয়, তবে কালে তাহারা সেই casteএর একটী নীচ শাখায় পরিণত হয়। কোন্ হিন্দুর কি caste, তাহা এই প্রণালীতে নির্ণীত হইয়া থাকে।

সৌরজগতের গ্রহাদিরা যেরূপ সৌরনীহারিকা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়া কেন্দ্রস্বরূপ সূর্য্যমণ্ডলের চতুঃপার্শ্বে স্বস্ব কক্ষে পরিভ্রমণ করিতেছে, ভারতবর্ষের বর্ণোপবর্ণসমূহও সেইরূপ বিভিন্ন কারণ বশতঃ নানা শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া অনোন্যস্বতন্ত্রতা প্রাপ্তিপূর্ব্বক মহাহিন্দুজাতির গণ্ডীর মধ্যে স্ব স্ব মার্গে চলিতেছে। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের Calcutta Law Journalএ "Indo-Aryan Penal Jurisprudence" শীর্ষক প্রবন্ধে আমি হিন্দুদিগের বর্ণ-উপবর্ণ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত একটা উপমা দিয়াছি :—

"Out of the four primary castes of Manu have sprung up, (and the process is still going on under our very eyes), by social degradation, mixture of castes, conversion of foreigners and aborigines (originally by the vratya-stoma), and multiplication of occupations—an infinity of secondary castes, or rather sub-castes, each caste grown or growing into a nation, and each sub-caste into a caste, with a tendency, under the operation of the same causes, towards further ramification into sub-caste, caste, and nation *ad infinitum*; yet *all* of them gathered up

* জনৈক কায়স্থ উকিল যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া তাঁহার মাতাকে প্রণাম করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার মা দুইপা পিছাইয়া গিয়া বলিলেন, "বাবা! তুমি ব্রাহ্মণ হইয়াছ, কিন্তু আমি এখনও শূদ্রাণী আছি, তোমার প্রণাম গ্রহণ করিতে পারিব না, পাপ হইবে।" "কি-মা, আমার প্রণাম গ্রহণ করিবেন না? এমন ব্রাহ্মণ না হওয়াই ভাল," এই বলিয়া তিনি পৈতা ফেলিয়া তাঁহার মাকে প্রণাম করিলেন।

under the mother-wings of Hinduism; like unto the Majestic Banyan, throwing out, on all sides, shoot after shoot, each striking root into the soil and growing into a separate tree with a similar tendency to multiply itself, but all united to the same parent-trunk by bonds of natural piety." অর্থাৎ—মনুকথিত প্রধান চারি বর্ণের ভিতর দিয়া আবার নানা বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে, এবং এখনও আমাদের চক্ষের সম্মুখে হইতেছে; উহার কোনটি বা প্রচলিত বর্ণ বা সমাজ হইতে বহিষ্কৃতি-নিবন্ধন, কোনটি বা বিভিন্ন-বর্ণের সংমিশ্রণে, কোনটি বা বিদেশীয় অথবা আদিম অধিবাসীগণের হিন্দুভাবের দীক্ষা গ্রহণে (প্রাচীন কালে ব্রাত্য-স্তোম অনুষ্ঠানের দ্বারা এইরূপ ঘটিত), কোনটি বা বিশেষ বিশেষ ব্যবসায় অবলম্বনে সৃষ্টি হইয়াছে। উহাদের প্রত্যেকটিই এক একটি বর্ণ বা জাতি দাঁড়াইয়া যাইতেছে এবং এইরূপ শাখা-বর্ণের ভিতরে ঐ একই কারণে আবার অগণিত প্রশাখার সৃষ্টি হইতেছে। এইরূপ নানা প্রকারে বিভক্ত হইলেও সেই সকল শাখা-প্রশাখা মাতৃরূপী হিন্দু-সমাজের ভিতরে স্থান লাভ করিয়াছে। প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ হইতে চারিদিকে অসংখ্য ঝুরি নামিয়া যেমন ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হয় এবং কালে এক একটী প্রকাণ্ড স্বতন্ত্র বৃক্ষে পরিণত হয়, আবার তাহা হইতে স্বতন্ত্র বৃক্ষ জন্মিতে থাকে, অথচ তাহারা সকলে মিলিয়া সেই মূল মাতৃবৃক্ষের সহিত অখণ্ডভাবে অবস্থান করে, হিন্দু সমাজের ধারাও ঠিক সেই ভাবের।

বিভিন্ন শাখা-বর্ণের উৎপত্তির কথা বলিতে গিয়া Risley রিজ্‌লী সাহেব তাঁহার People of India গ্রন্থের পরিশিষ্টভাগে বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমানে আমরা নানা বর্ণের উৎপত্তি যাহা দেখিতেছি, ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের ভিতর দিয়া বহুযুগ ধরিয়া পূর্ব্বকালেও এইভাবে অসংখ্য শাখা-বর্ণের উৎপত্তি ঘটিয়াছে। সার জেম্‌স্ ষ্টিফেন * ১৮৭২ অব্দের তিন আইনের (Act III of 1872) পাণ্ডুলিপি উপলক্ষে বলিয়াছিলেন যে,—"(প্রতিবন্ধক না পাইলে) নূতন সম্প্রদায় সমুত্থিত হইতে পারে, কিন্তু তাহাদের অস্তিত্ব পতন নির্ভর করে তাহাদের অন্তর্নিহিত জীবনীশক্তির উপরে। এতদবস্থায় তাহাদের অস্তিত্ব লোপ না হইলে তাহাদের বৈবাহিক ও অন্যান্য আচার, অন্যান্য সম্প্রদায়ের আচারাদির সহিত সমশ্রেণীতে পরিগণিত এবং তাহাদের বিবাহাদি, সাধারণ প্রচলিত হিন্দুবিবাহের সহিত তুল্যরূপে সিদ্ধ হইতে পারে। এই সমস্ত আচারে কেন আমরা হস্তক্ষেপ করিব? কোনটি প্রকৃত হিন্দুভাবের অনুমোদিত, কোনটিই বা তাহার বিপরীত, কেনই বা আমরা তাহার মীমাংসা করিতে বসিব? যাহা আপনাপনি ঘটিতেছে, কেনই বা আমরা তাহার প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করিব? এইরূপ প্রশ্নের প্রত্যুত্তর এক কথায় এই যে, আমাদের পক্ষে কোনরূপ হস্তক্ষেপ অবিবেচনার কার্য্য হইবে, গবর্ণমেণ্টের মূল নীতির বিরুদ্ধ হইবে, জনসাধারণের অপ্রীতিকর হইবে, অসমীচীন হইবে। হিন্দু জাতির ভিতরে কোন সম্প্রদায় নিতান্ত আধুনিক এবং সেই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তিত বিবাহপদ্ধতি দেশপ্রচলিত সাধারণ বিবাহপদ্ধতি হইতে বিভিন্ন,—ব্রিটিষ ধর্ম্মাধিকরণ কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত হিন্দু-আইনের দৃষ্টিতে এতাদৃশ বিবাহ অসিদ্ধ হইবার পক্ষে এই দুই কারণ মাত্র যথেষ্ট নহে"।

বিচারপতি সার শঙ্কর নায়র, মথুস্বামী মুদালিয়র বনাম মসিলামনি * সংক্রান্ত মোকদ্দমার রায়ে বলিয়াছেন যে, সার জেমস্ ষ্টিফেনের পূর্ব্বোক্ত মন্তব্যে বিবাহসংক্রান্ত হিন্দু-আইন সম্বন্ধে শাস্ত্রকারগণের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও মর্ম্ম ব্যক্ত হইয়াছে। শাস্ত্রের বিধি মুখ্যতঃ তাহাদেরই জন্য, যাহারা শাস্ত্রবিহিত ধর্ম্মমত, সামাজিক এবং নৈতিক বিধি মানিয়া লইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া যদি কোন সম্প্রদায় ধর্ম্ম ও ন্যায়-বুদ্ধিতে অন্য কোন প্রণালীতে সুসম্পন্ন বিবাহ সিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিয়া লয়, দেশপ্রচলিত প্রণালীর সহিত তাহার মিল নাই বলিয়া তাহা অসিদ্ধ বলিয়া উপেক্ষিত হইতে পারে না। নানা সম্প্রদায়ে ও নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইবার এবং নূতন ধর্ম্মভাব ও নূতন আচার-

* The Gazette of India (January 27th, Supp. 1872) p. 81.

* Indian Cases Vol. V. 1910 p. 43.

ব্যবহার গ্রহণ করিবার দিকে হিন্দুধর্ম্মের স্বাভাবিক গতি। তাহার উপর আইন আদালতের হস্তক্ষেপ করা সঙ্গত নহে। যদি কোন সম্প্রদায় সঙ্গতবোধে অন্যরূপ ধর্ম্মমত পোষণ ও ঘোষণ করে, আদালতের উচিত নহে, তাহাকে জোর করিয়া পরিত্যক্ত পুরাতন মত বা ভাবের মধ্যে বাঁধিয়া বা অবরুদ্ধ করিয়া রাখা।

"১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্মসমাজের উৎপত্তি। গত শতাব্দীতে আরও কয়েকটি সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে। আর্য্যসমাজ আজ কয়েক বৎসর মাত্র হইল উদিত হইয়াছে, তাই বলিয়া এই সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বিবাহপদ্ধতি চলিয়াছে, সেগুলি আদালতের অনুমোদিত অন্যান্য হিন্দু বিবাহ পদ্ধতি হইতে বিভিন্ন বলিয়াই যে অসিদ্ধ হইবে তাহা সঙ্গত নহে। বৃটিষ আইনমতে সংসিদ্ধ আচার বা valid customএর প্রয়োজনীয় উপকরণবিহীন আচার দ্বারা সম্পন্ন কোন বিবাহ যদি কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে সিদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হয়, এবং এইরূপ বিবাহের বিরুদ্ধে যদি আইনের কোন সুস্পষ্ট নিষেধ না থাকে, তাহা হইলে বুঝি না কেমন করিয়া উহা অসিদ্ধ হইতে পারে।

"আর্য্যসমাজ হিন্দু অহিন্দু যে কোন লোককে নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত করিয়া লইতে পারে, এবং তাহার সহিত অন্যের বিবাহ দিয়া দিতে পারে, কিন্তু আমি (বিচারপতি নায়ার) বলি, এরূপ ব্যাপার যদি তাহাদের প্রথাসঙ্গত হয়, তবে তাহা প্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্র-বিরুদ্ধ হইলেও তাহা সিদ্ধ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। এইরূপ বিবাহ কোন সম্প্রদায়সম্মত কি নয়, তাহা সেই সম্প্রদায়ই বিচার করিবে। প্রাচীন কালের কথাই বল, আর বর্ত্তমান প্রথার কথাই বল, যে জাতি বা caste এর মধ্যে বিবাহ, সেই জাতির লোকই, অর্থাৎ সেই casteএর পঞ্চায়েতরা তাহা সিদ্ধ কিনা মীমাংসা করিয়া থাকে; বাহিরের লোক তাহার বৈধতা অবৈধতা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করে না। বাহিরের লোকের ধারণার বিরোধীভাবে ঈদৃশ বিবাহ সম্পাদিত হইলে, যদিও সেই সম্প্রদায়ের ভিতরে ঐরূপ বিবাহ দোষ জনক হয় না, তথাপি সেই সম্প্রদায় বাহিরের লোকের শ্রদ্ধা হারাইয়া ফেলিতে পারে এই মাত্র বলা যাইতে পারে। যদি কোন সম্প্রদায় কোন বিবাহকে সিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করে এবং ঐ স্বামী-স্ত্রীকে তাহার দলস্থ বলিয়া গণ্য ও গ্রহণ করে, তবে অপর সম্প্রদায়ের পক্ষে ঐরূপ বিবাহের অসিদ্ধতা ঘোষণা করা সঙ্গত হইতে পারে না।

"কোন হিন্দুর বিবাহ নিজ সম্প্রদায়ের পদ্ধতি অনুসারে না হইলেও এবং তাহা সেই সম্প্রদায় কর্ত্তৃক স্বীকৃত না হইলেও ঐ বিবাহ যে একেবারে অসিদ্ধ হইবে এমন কোন কথা নাই। অবশ্য স্বসম্প্রদায়ের পদ্ধতিতে না হইলে বিবাহটা সাধারণ-প্রচলিত হিন্দু আইনের পদ্ধতিতে হওয়া চাই। মানুষ যদি তাহার জাতি বা সম্প্রদায় ছাড়িতে চায়, কেহ তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না। সে ইচ্ছা করিয়া তাহার নিজ সম্প্রদায়ের নিয়মপ্রণালী রক্ষা বা ভঙ্গ করিয়া থাকে। যাবৎ সে সম্প্রদায়ের মধ্যে থাকে তাবৎ স্বসম্প্রদায়ের মতে সম্পন্ন তাহার বিবাহ হিন্দুশাস্ত্রের অনুমোদিত বলিয়া গণ্য হইবে। স্বসম্প্রদায়ের বিরোধী মতেও সে বিবাহ করিতে পারে, এবং তাহা আইনানুসারে গ্রাহ্যও হইতে পারে। আইনে গ্রাহ্য হইলেও যদি এইরূপ বিবাহ তাহার জাতি বা সম্প্রদায় বৈধ বলিয়া গণ্য না করে, তাহা হইলে সে স্বসম্প্রদায়ের নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে বলিয়া তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে মাত্র।

"বৌদ্ধধর্ম্ম মুসলমানধর্ম্ম ও খৃষ্টধর্ম্মের সংঘর্ষে অনেক অভিনব সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে। এই সকল সম্প্রদায় প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের আংশিক মত বা ভাব, যাহা orthodox হিন্দুদিগের চক্ষে অপরিহার্য্য, পরিহার করিয়াছে এবং পরধর্ম্মের আংশিক ভাব বা মত গ্রহণ করিয়াছে।" ব্রাহ্মসমাজ ও আর্য্যসমাজ এই নব সম্প্রদায়-সমূহের মধ্যে অগ্রগণ্য। সার শঙ্কর নায়ার তাঁহার রায়ের উপসংহারে বলেন—

"These facts make it impossible to apply the rules of present orthodox Hinduism to such sects when any usage inconsistent with such rules is proved or to treat such usages, as deviations from the ordinary law, requiring for their validity the requisites of anti-quity and continuity necessary to uphold a

custom in English law." মথুস্বামী মুদালিয়ার মকদ্দমায় বিচারপতি শঙ্কর নায়ারের রায়ের এই সার মর্ম্ম।

অতএব ব্রাহ্মসমাজ, আর্য্যসমাজ ও অন্যান্য অভিনব সম্প্রদায়ের বিবাহ-পদ্ধতি অ-দূষণীয় ও সম্পূর্ণ সিদ্ধ। *Contra bones mores* অর্থাৎ সুনীতি-বিরুদ্ধ না হইলে কোন অভিনব বৈবাহিক usage বা প্রথা Anglo-Hindu law অর্থাৎ British Courts দ্বারা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ব্যাখ্যাত হিন্দু-আইনের চক্ষে অসিদ্ধ হইবে না। সুতরাং নজীরের বিপক্ষে খাঁটি মান্ধাতার আমলের হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রের চক্ষে কিংবা কাশী ও ভাটপাড়া প্রভৃতি স্থানের পণ্ডিতদিগের মতে এই সকল বিবাহ সিদ্ধ কি অসিদ্ধ, তদ্‌বিষয়ে আলোচনা করা academic তর্ক মাত্র অর্থাৎ নিষ্প্রয়োজন।

শোক-সংবাদ।

শ্রীমতী সুকেশী দেবী—শ্রীযুক্ত কৃতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পত্নী সুকেশী দেবী গত ১৮ই পৌষ বৃহস্পতিবার শান্তিনিকেতনে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৩০ বৎসর হইয়াছিল। এই অল্প বয়সেই তিনি তাঁহার আত্মীয় স্বজনকে শোকসাগরে ভাসাইয়া অনন্তধামে প্রস্থান করিয়াছেন। ঈশ্বর তাঁহাকে আপন শান্তিময় ক্রোড়ে গ্রহণ করুন।

শ্রীমতী করুণা দেবী—গত ২রা ফাল্গুন শুক্রবার বেলা ১১৷৷০ টার সময় শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কন্যা করুণা দেবী মাত্র ২৬ বৎসর বয়সে কলেরা রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন জগৎপিতা তাঁহাকে শীতল ক্রোড়ে আশ্রয় প্রদান করুন এবং শোকাহত পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা দিন।

শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল দাস—গত ২০শে মাঘ সোমবার গোবিন্দলাল দাস মহাশয় ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগে পরলোক গমন করিয়াছেন। ভগবান তাঁহাকে আপনার স্নেহময় ক্রোড়ে গ্রহণ করুন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের সহিত গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি।

রায় সাহেব শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দেব—রায়গড় নিবাসী রায়সাহেব প্রকাশচন্দ্র দেব মহাশয় গত ২২শে মাঘ বুধবার ইহলোক হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। আমরা তাঁহার পরলোক গত আত্মার মঙ্গল কামনা করি। পরিজনবর্গের শোকসন্তাপ ভগবান দূর করিয়া দিন।

প্রাপ্তি স্বীকার।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে উৎসব উপলক্ষে নিম্ন লিখিত দান প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি।

শ্রীচন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত	২৲
শ্রীবিনোদবিহারী দত্ত	১৲
শ্রীভগবতীচরণ মিত্র	১৲
শ্রীফনীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	১৲
শ্রীরাধাকিশোর ভট্টাচার্য্য	১৲
শ্রীজিতেন্দ্রজিত সেন গুপ্ত	১৲
শ্রীসতীশচন্দ্র পল্লে	১৲
শ্রীফকিরচন্দ্র নাথ	১৲
শ্রীবিষ্ণুচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৲
শ্রীচুণীলাল মজুমদার	১৲
শ্রীমুটবেহারী চট্টোপাধ্যায়	॥০
শ্রীপ্রভাকর দাস	॥০
শ্রীএন, কে, মুখার্জ্জি	১৲
শ্রীজ্যোতিন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	॥০
শ্রীনারায়ণচন্দ্র দত্ত	৫৲
শ্রীতুলসীদাস দত্ত	২৲
শ্রীহরিশ্চন্দ্র মিত্র	১৲
শ্রী ইউ, এল, কুমার	২৲
শ্রীডি, এন দাস	॥০
শ্রীকল্যাণচন্দ্র বড়াল	॥০
জনৈক ভদ্র লোক	।০
শ্রীমাণিকলাল দাস	।০
শ্রীশশীভূষণ ঘোষ	।০
জি, সারওয়ার এক্সোয়ার	১৲
শ্রীমহেন্দ্রনাথ তত্ত্বনিধি	৫৲

আনুষ্ঠানিক দান।

বালীগঞ্জ নিবাসী শ্রীযুক্ত অমলকুমার রায় চৌধুরী তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে সমাজে ১০৲ টাকা দান করিয়া আমাদের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। ঈশ্বর তাঁহার পরলোক গত মাতার আত্মার কল্যাণ বিধান করুন। শোকসন্তপ্ত পরিবারকে শান্তি প্রদান করুন।

ঊনবিংশ কল্প
চতুর্থ ভাগ।
চৈত্র ব্রাহ্মসম্বৎ ৮৯।

৯০৭ সংখ্যা

১৮৪০ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং প্রতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্। সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"

উদ্বোধন।

ভগবানের রাজ্যে এটী একটী সত্য যে জীবন যখন শুষ্ক হয়ে যায়, জীবন যখন একবিন্দু করুণা-বারির জন্য হাঁ হাঁ করে ছটফট করে বেড়ায়, যখন প্রাণ শুষ্কতার তাপে দগ্ধ হবার উপক্রম হয়, তখনই করুণাধারা সুশীতল ধারায় নেমে এসে জীবনকে শান্ত করে, সুস্থ করে। প্রকৃতিতে এই সত্যের কেমন জ্বলন্ত পরিচয় পাই। জীবজন্তু বৃক্ষলতা যখন গ্রীষ্মের তাপে দগ্ধ হবার পথে চলে, সহসা আকাশের কোন্ এক কোণে মেঘ উঠে বাতাস হয়ে জলের ধারা পড়ে' প্রাণীগণকে সজীব করে' তোলে। এই ভাবটা বড়ই স্বাভাবিক। শিশুর কণ্ঠ যখন শুষ্ক হয়ে যায়, শিশুর প্রাণ যখন পিপাসায় কাতর হয়ে ওঠে, কিন্তু সে সেটা ব্যক্ত করতে পারে না, তখনও মাতার প্রাণ কেঁদে ওঠে, মাতার স্তন্য অবিরলধারে শিশুর উদ্দেশ্যে ঝরতে থাকে। এ সমস্তই সত্য কথা। কিন্তু আমরা জ্ঞানের অধিকারী হয়েছি, তাই আমাদের জীবন শুষ্ক হোতে থাকলেই আমাদের জানা চাই বোঝা চাই যে জীবন শুষ্ক হচ্ছে। সেইটী জানলে, ভগবানকে করুণা-ধারার জন্য প্রাণ ভরে' ডাকলে তবে আমাদের প্রাণ শীতল হবে। আমাদের জীবন বোধ হয় যেন কতকটা শুষ্ক হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু শুষ্ক হতে দিলে চলবে না। তাই বুঝি এবার মাঘোৎসবে সকল উৎসবক্ষেত্র থেকে উপাসনার জন্য এক গভীর আহ্বান জেগে উঠেছিল। উপাসনার দরকার কি অ-দরকার, এও যে ব্রাহ্মমণ্ডলীকে বোঝাতে হয়, এই আশ্চর্য্য। উপাসনা কি? না, কাছে বসা। মায়ের কাছে বসব, মাকে সুখদুঃখের কথা জানাব, এর আবার দরকার অ-দরকার কি? সকল ধর্ম্মেই উপাসনা দেখা যায়। ব্রাহ্মধর্ম্ম সেই কথাটা খুব স্পষ্ট করে' বলে' স্পষ্টভাষায় মানুষকে উপাসনার জন্য আহ্বান করেন। আজকের এই পবিত্র সন্ধ্যাকালে মায়ের কাছে বসবার সেই মধুময় আহ্বান আমাদের কানে পৌঁচেছে। সংসারের সকল কথা ফেলে রেখে, একবার এসো, মায়ের কাছে বসে' মায়ের কথা শুনে হৃদয়কে পবিত্র করি, জীবনকে ধন্য করি।

ঈশ্বরকে জানার ফল।

ঈশ্বরকে জানা আর না জানা নিয়ে যে দুটো দল আছে, সে কথা তোমাদের বলে' এসেছি। এবারে তোমাদের বলব যে ঈশ্বরকে জানার ফল কি। ঈশ্বরকে জানা বলতে গেলেই স্বীকার করতে হয় যে ঈশ্বর আছেন, আত্মা আছে ইত্যাদি।

তোমাদের হয়তো মনে হবে যে ঈশ্বরকে জানার আবার ফল কি? তাঁকে জানলুম তো জানলুম, আর না জানলুম তো না-ই জানলুম; কিম্বা

বিশ্বাস করলুম বা না-ই করলুম যে তাঁকে জানা যায় বা না-ই যায়; তার আবার ফলাফল কি? যার যে মত ভাল লাগে, সে সেই মত নিয়ে থাকুক, তার ফলাফল নিয়ে আমাদের এত মাথাব্যথা কেন? না—ঈশ্বরকে জানা বা না জানা, এর ফলাফল দেখার দরকার আছে। মতামতের ভালমন্দের উপর সংসারের অনেক ভালমন্দ কাজ হয়ে যায়। দৃষ্টান্ত দিই। জর্ম্মনির সম্রাট থেকে অনেক বড় বড় লোক বিশ্বাস করতেন যে যুদ্ধ করা কেবল ভাল নয়, খাওয়া দাওয়ার মত যথাসময়ে যুদ্ধ না করে' থাকা যায় না—করতেই হয়। এই মতটা তাঁরা জর্ম্মনির যেখানে-সেখানে যখন-তখন প্রচার করতে লাগলেন, আর তার ফলে দাঁড়ালো এই যে, জর্ম্মনির ছেলেছোকরা থেকে আরম্ভ করে' মেয়ে বুড়ো পর্য্যন্ত সকলেরই মন ঐ মতে গড়ে' উঠল। যখন সমস্ত জর্ম্মনির লোকদের মন ঐ খারাপ মতের উপর গড়ে' উঠল, তখনই ঐ মস্ত যুদ্ধের আগুন জ্বলে' উঠে' কত ভাল ভাল লোক, ভাল ভাল গ্রাম পল্লী, কত সহর বন্দর, কত জ্ঞান ধর্ম্ম, সমস্তই একেবারে হাঁ-হাঁ করে খেয়ে দিলে। আবার দেখ, আমেরিকা ধর্ম্মের ঠিক পথটী বলে' দিয়ে যেমনি এগিয়ে এল, অমনি সমস্ত জগত, এমন কি জর্ম্মনির লোকেরাও, সেই পথটী ভাল বুঝে তার দিকে ঝুঁকে পড়ল। ফলে, সমস্ত জগতে শান্তি স্থাপনের সম্ভাবনা হোল। এত বড় যুদ্ধটা বলতে গেলে কেবল মতামতের উপর দাঁড়িয়ে হোল। এই মনে কর যে, একজনের মত, দেবতার কাছে ছাগল বলি না দিয়ে কুমড়া প্রভৃতি বলি দেওয়া উচিত। তার মনটা স্বভাবতই এমন নরম হবে যে, সে ছাগল বলি দেখলেই শিউরে উঠবে। আবার যার মত ছাগল বলি দেওয়াই উচিত, তার মনটা আস্তে আস্তে কি রকম নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে—ছাগলের ছটফটানি দেখে সে মজা ভেবে হাসতে থাকে। এই রকম নিষ্ঠুর ভাব মনে পুষতে পুষতে, ক্রমে সে মানুষের উপরে নিষ্ঠুর ব্যবহার করলেও তার মনে যে কিছু-মাত্র কষ্ট আসবে না, সেটা কিছু অসম্ভব কথা নয়। ডাক্তারেরা ডাক্তারী বিদ্যা শেখবার সময় অনেক কাটাকুটি করবার ফলে মানুষের শরীরটাকে আর শরীর বলে' মনে করেন না, শরীরটাকে তাঁদের কাটাকুটির পরীক্ষার একটা বিষয় বলে' মনে করেন, একথা অনেক ভাল ভাল ডাক্তারের মুখে শুনেছি। এইজন্য বলি যে মতামতের ভালমন্দ দেখার দরকার আছে। মতামতের ভালমন্দের উপর আমাদের জীবনের ভালমন্দ অনেকটা নির্ভর করে। আর একটা কথা এই যে, আমরা দেখতে পাই যে, যে মতের ফল ভাল, সে মতটা প্রায়ই সত্য হয়; আর যে মতের ফল খারাপ সে মতটা প্রায়ই মিথ্যা হয়। চুরি করার ফল খারাপ, কাজেই চুরি করবার পক্ষে যদি কেহ মত দেয়, সে মতটা মিথ্যা বলে' জানব। ধর্ম্মের পথে চল্লে ভাল হয়, তাই তার সপক্ষে মত সত্য বলে' জানব। ঈশ্বরকে জানতে গিয়ে যদি ভাল ফল হয় দেখি, তাহলে তাঁকে জানা দরকার এই মতটা বুঝে, প্রাণের ভিতর ধরে', জীবনকে উন্নতির পথে চালাবার চেষ্টা করব।

দেখা যাক যে ঈশ্বরকে জানার ফল কি? মনে কর, একজন লোক ঈশ্বর আছেন বলে' বিশ্বাস করেন, অর্থাৎ তিনি মনে ঠিক জানেন যে, এই বিশ্বজগতের একজন স্রষ্টা আছেন, আর তিনি জগতের স্রষ্টা বলে'ই আমাদের প্রথম অবধি শেষ পর্য্যন্ত সমস্তই জানছেন, আর আমাদের দরকার বুঝে সমস্তই দিচ্ছেন; কেবল তাই নয়, আমাদের সমস্তের ভিতর দিয়ে যাতে ভাল হয়, তারই ব্যবস্থা করছেন। এক কথায়, সেই লোকটী ঈশ্বরকে জ্ঞানস্বরূপ আর মঙ্গলস্বরূপ জেনে তাঁর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে' থাকেন। আচ্ছা বল দিকিন, এই লোকের মনে কি রকম একটা গাঢ় গম্ভীর শান্তির ভাব থাকবার কথা! সংসারের কাজে যদি আমরা পরস্পরের উপর বিশ্বাস ও নির্ভর করতে পারি, তাহলে কি রকম একটা নির্ভরভাব মনে আসে বল দিকিন? বাপ-মা পরস্পরের উপর, বাপ-ছেলে পরস্পরের উপর, ভাইবোন পরস্পরের উপর বিশ্বাস ও নির্ভর করে' কাজ করতে থাকলে সকল কাজের ভিতরেই কেমন একটা সাহস পাওয়া যায়; সকল কাজের ভিতরেই কেমন একটা ভাল ভাব যেন সমস্ত ক্ষণ জেগে থাকে বল দিকিন? এখন ভেবে দেখ, যে ঈশ্বর সেই বাপ-মাকে সেই ছেলে-মেয়েকে সেই ভাই-বোনকে সংসারে পাঠিয়েছেন, যিনি আমাদের প্রাণে সেই মঙ্গলভাব পাঠিয়েছেন, তাঁর উপর

যিনি সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভর করতে পারেন, তাঁর ভয় কোথায়? তাঁর নির্ভরের জায়গা খুবই গভীর।

তোমার মা মৃত্যুশয্যায় পড়ে' আছেন, কিম্বা তোমার প্রাণাধিক ভগ্নী রোগের যন্ত্রণায় ছটফট করছেন; সেই ভীষণ সময়ে তোমার কি কষ্ট! কিন্তু তুমি যদি ভগবানের হাতে সকলই নিবেদন করে' দাও, তাহলে কেমন শান্তি পাও বল দিকিন? তাঁরা ইহলোক থেকে চলে' যান কিম্বা ইহলোকেই বেঁচে থাকুন, তুমি জান যে, তাঁরা কোন অবস্থাতেই ঈশ্বরের ভালবাসা হারাবেন না—এতে তোমার কতটা উদ্বেগ, শ্রান্তি আর ভয় ভাবনা দূর হোল বল দিকিন?

ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেক পদে ভাল করছেন, এইটী যিনি প্রাণের সঙ্গে বিশ্বাস করবেন, তিনি কথায় কথায় অমঙ্গলের ভয়ে চমকে', উঠবেন না। তিনি জগতের প্রত্যেক ঘটনায় প্রত্যেক জায়গায় ঈশ্বরের মঙ্গলভাবের পরিচয় পান। এই মস্ত বড় আকাশের অসীমভাবের মধ্যে, প্রকৃতির ভিতর প্রতি মুহূর্ত্তে যে নতুন নতুন সৌন্দর্য্য ফুটে বেরোচ্ছে সেই সৌন্দর্য্যের মধ্যে, পৃথিবীর অসংখ্য জীবজন্তুর মধ্যে, তিনি সেই জগতের স্রষ্টা পাতা ও বিধাতা পরমেশ্বরের জ্ঞান, মঙ্গলভাব ও অফুরন্ত ঐশ্বর্য্যের পরিচয় পেয়ে খুবই সুখী হন। আকাশের প্রতি নক্ষত্রে, পৃথিবীর প্রতি ফুলে তিনি ঈশ্বরকে দেখতে পান। এই যে শীতের পর গরম, গরমের পর বর্ষা, এইরকম করে' এক ঋতুর পর আর এক ঋতু আসে, সেই ঋতুপরিবর্ত্তনের মধ্যে, ঝড়বৃষ্টির মধ্যে, বরফপড়ার মধ্যে তিনি ঈশ্বরেরই মঙ্গল নিয়ম কাজ করছে দেখেন। ঐ বড় বড় পর্ব্বতগুলোর মধ্যে, পর্ব্বতগুলোর উপত্যকার বনজঙ্গলের মধ্যে, আর ঐ সীমাহীন সমুদ্রের মধ্যে ভগবানেরই হাতের কারিগুরি দেখে তাঁর মন আনন্দে ভরে' যায়। তিনি আরও দেখেন যে তাঁর মতো কত অসংখ্য মানুষ ঈশ্বরের দয়া উপভোগ করে' তাঁর নামগান করেছে, আর এখনও কত অসংখ্য মানুষ করছে। ইতিহাস আলোচনা করে' তিনি বুঝতে পারেন যে ঈশ্বর কেমন করে' এই জগতকে পালন করছেন। তিনি বেশ বুঝতে পারেন যে, ঈশ্বর মানুষকে ছেড়ে যান নি, বরঞ্চ ভালর দিকেই নিয়ে যাচ্ছেন। এই রকমে তিনি যা কিছু দেখেন, সকলের ভিতরেই ঈশ্বরের হাত, তাঁর মঙ্গল ইচ্ছা দেখে তাঁর বিষয়ে সমস্ত সংশয় মন থেকে দূর করে' দেন।

ঈশ্বরে যাঁর শ্রদ্ধাভক্তি আছে, তিনি শুধু বাইরে বাইরে ঈশ্বরকে দেখে' চুপ করে' থাকেন না। তিনি আত্মার ভিতরে সুখ-দুঃখের মধ্যে, আশানিরাশার মধ্যে ঈশ্বরকে আরও স্পষ্ট দেখতে পান। এই পৃথিবীতে আমরা রোগে শোকে, পাপেতাপে কত না কষ্ট পাই। এই সমস্ত কষ্টের মধ্যেও তিনি ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা পিতৃভাব বুঝতে পেরে কষ্টকে কষ্ট বলে'ই মনে করেন না। তিনি দেখতে পান যে, সুখ দুঃখ, বিপদ সম্পদ, এ সমস্ত কিছুই আমাদের মেরে ফেলবার জন্য কোন অন্ধশক্তি পাঠায় নি। যখন তাঁর কাছে সম্পদ আসে, তখন তিনি সেই সম্পদ ভোগ করে'ই ক্ষান্ত হন না, তিনি সেটা ভগবানের দান বুঝতে পেরে তাঁকে ভক্তিভরে প্রণাম করে' কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। আবার বিপদের গাঢ় অন্ধকার যখন তাঁকে ঘিরে ফেলে, তখন তিনি তার মধ্যে এই জেনে নির্ভয় থাকেন যে, ভগবান তাঁকে এই বিপদের ভিতর দিয়ে তাঁর নিজের কাছে আরও বেশী করে' টেনে নেবার ব্যবস্থা করছেন। তাঁর উপর বিশ্বাস ও নির্ভর থাকলে আমাদের কর্ত্তব্যের অধিকার দৃঢ় হয়; তাঁর আদেশ মনে করে', আর ফল ভালই হবে মনে করে' কর্ত্তব্য পালন করবার একটা জোর আসে। দুঃখকষ্টের বিষম কষ্ট পেলে সময়ে সময়ে সংসারটাকে মরুভূমির মতো বড়ই শুষ্ক কঠোর বলে' মনে হয়; কিন্তু ভগবানকে ভালবাসতে শিখলে সেই দুঃখকষ্টের ভিতরেও তাঁর মঙ্গল ইচ্ছার পরিচয় পেয়ে তাঁর দেওয়া সংসারকে কেমন সরস কেমন কোমল মনে হয়। তাঁকে হৃদয়ে রাখলে ভাল কাজের দিকে মন আপনিই ছুটে যায়।

এইভাবে ঈশ্বরকে সর্ব্বদা মনের ভিতর রাখাতে ঈশ্বর-ভক্তের মনে অহঙ্কার এতটুকু স্থান পায় না—শান্ত বিনয় সমস্ত মনটাকে অধিকার করে। তাঁর সঙ্গে কথা কও, দেখবে, তিনি নিজের

কথা একটুও ওঠাবেন না; যাঁর দয়াতে তিনি ভাল কাজ করতে পেরেছেন, সেই ভগবানেরই কথা তাঁর মুখে সমস্তক্ষণ শুনতে পাবে। তিনি নিজের মনটাকে এই বিশ্বপতির মস্ত ভাবে পূর্ণ করে' রাখেন। এই রকম ভক্ত লোকেই প্রকৃতির গান শুনতে পেয়ে আশ্চর্য্য হয়ে যান, আর আনন্দে ডুবে যান। এই রকম ভক্তের প্রাণ থেকেই গান উঠেছিল—

আনন্দ ধারা প্রবাহে কিবা আজি
হৃদাকাশ মাঝে
শত চন্দ্রমা বিরাজে।
দেখরে হৃদে অনুপম ভাব সুন্দর মধুময়—
একদৃষ্টে আত্মার পানে
মাতা হয়ে' অবনত

আছেন প্রেমভাবে তাকায়ে; শূন্য পূর্ণ আজি।

ঈশ্বরের ভক্তদের গান শুনলেই বোঝা যায় যে, তাঁরা সকলের চেয়ে প্রিয়, এমন কি আপনার চেয়েও প্রিয় ভগবানকে কত কাছে করে' দেখেন। তাঁদের কাছে দুদণ্ড বসে' থাক', দেখবে যে তাঁদের আত্মার ভিতর থেকে কি এক আশ্চর্য্য জ্যোতি বেরিয়ে তোমার ভিতর প্রবেশ করছে। ভক্ত লোকের কাছে চুপি চুপি চলতেও যেন সাহসে কুলোয় না—ভয় হয় পাছে এতটুকুও শব্দে তাঁর ধ্যানের ব্যাঘাত হয়।

ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তিকে চলিত কথায় ধর্ম্ম নাম দেওয়া হয়। ধর্ম্ম শব্দের মানে হচ্ছে যা ধরে' রাখে। শ্রদ্ধাভক্তি জগতকে ধরে' রাখে, শ্রদ্ধাভক্তি জগতের লোককে উচ্ছৃঙ্খলতা থেকে খুব রক্ষা করে, পরস্পরকে বিনাশ করা থেকে রক্ষা করে, তাই ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তিকে চলিত ভাষায় এককথায় ধর্ম্ম বলা হয়। জগতের ইতিহাস ভাল করে' পড়লে দেখা যায় যে, জগতের অনেক উন্নতির প্রথম আরম্ভ হয়েছে ধর্ম্মের দ্বারা। তোমরা তো জান, এক সময়ে ইউরোপ অসভ্যতা আর অজ্ঞানের অন্ধকারে একেবারে ডুবেছিল। সেই সময়ে যিশুখৃষ্টের শিষ্যেরা সেই সমস্ত অসভ্য জাতির মধ্যে যে উচুদরের ধর্ম্মের কথা প্রচার করলেন, তারই প্রভাবে তো আজ ইউরোপের লোকেরা এই উন্নতি লাভ করেছে। যদি বল যে, তাহলে সেখানে এত লড়াই মারামারি কাটাকাটি হয় কেন? তার উত্তর এই যে, সেখানকার বেশী লোক স্বার্থে অন্ধ হয়ে ধর্ম্মের কথা মেনে চলতে চায় না। এক সময়ে আরব দেশের লোকেরা জড়পূজা করতে করতে নানা বিষয়ে আপনাদের খুবই অবনত করে' ফেলেছিল। সেই সময়ে মহম্মদের উন্নত ধর্ম্মের কথা তাদের জাগিয়ে তুলেছিল। মুসলমানদেরও যে কালে অবনতি হয়েছিল, তার একটী প্রধান কারণ এই যে, সময়ে মুসলমানেরা ঠিক ধর্ম্মপথ অর্থাৎ ঈশ্বরকে শ্রদ্ধাভক্তি করে' তাঁর আদেশমতে ভাল কাজ করার পথ থেকে সরে' গিয়েছিল। এই যে আকাশ সূর্য্যচন্দ্র গ্রহনক্ষত্রে ভরা, অসভ্য জাতিরা যখন এই আকাশের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে খোঁজবার বোঝবার চেষ্টা করলে যে, কে এই সমস্ত গ্রহনক্ষত্র সূর্য্যচন্দ্র সৃষ্টি করলেন, কে-ই বা এ সমস্ত ধরে' রেখেছেন, কারই বা নিয়মে এগুলো নিয়মিতভাবে দেখা দিচ্ছে আবার সরে' যাচ্ছে, সেই খোঁজার ভিতরে, সেই বোঝবার চেষ্টার ভিতরে কত বড় উন্নতির মূল লুকিয়েছিল, ভেবে দেখলে অবাক হতে হয় না কি? শরীরটাকে ঠিক রাখবার জন্য যে সমস্ত চেষ্টা করতে হয়, সেই সমস্ত চেষ্টার ভিতর দিয়ে মানুষের জ্ঞানের খুব চর্চ্চা হয়, মানুষের অনেক উন্নতি হয় বটে; কিন্তু আপনার ভিতরে ঈশ্বরকে দেখবার যে চেষ্টা করা হয়, সেই চেষ্টার ভিতর দিয়ে জ্ঞানের আরও অনেক বেশী চর্চ্চা হয়, অনেক বেশী উন্নতি হয়, আনন্দ হয়। ইতিহাসে এর অনেক দৃষ্টান্ত দেখা যায়। হাতে হাতে দেখি যে, ভারতের একজন খুব বড় ঋষি ছিলেন শাণ্ডিল্য। তিনিই সব প্রথম বুঝেছিলেন যে ঈশ্বর কেবল বাইরের ঈশ্বর নন, তিনি আমাদের আত্মারও আত্মা। কথাটা বড় শক্ত, কিন্তু এ ভাবে ছাড়া এ কথা বলবার কোন উপায় দেখিনে। এর ভাবটা এই যে, আমাদের আত্মার ভিতরে ঈশ্বরকে দেখতে চাইলে আত্মারও মূল কারণ বলে' তাঁকে জানা যায়। এই কথাটা আলোচনা করতে গিয়ে ভারতবর্ষে সেই ঋষিদের সময়ে যে কি রকম উন্নতি হয়েছিল ইতিহাস তার সাক্ষী। ঋষিরা আত্মাতে

ঈশ্বরকে দেখেছিলেন বলে'ই তাঁরা যে সমস্ত আশ্চর্য্য তত্ত্ব প্রকাশ করতে পেরেছিলেন, আর যে সমস্ত ভাল ভাল কাজ করেছিলেন, আজ পর্য্যন্ত সমস্ত জগতের লোক যতই সেগুলোর বিষয় জানতে পারে ততই অবাক হয়ে যায়। আত্মাতে পরমাত্মাকে দেখা, এরই উপর বেদ উপনিষদ, রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি ভারতের সমস্ত শাস্ত্র দাঁড়িয়ে আছে, যার জ্যোতিপ্রভায় আজ জগত মুগ্ধ।

ব্রহ্মসঙ্গীত।

গত মাঘোৎসবে যে কয়েকটী নূতন সঙ্গীত গীত হইয়াছিল, সেগুলি নিম্নে প্রকাশিত হইল।

* * *

ভোরের বেলায় কখন এসে
পরশ করে গেছ হেসে।
আমার ঘুমের দুয়ার ঠেলে
কে সেই খবর দিল মেলে,
জেগে দেখি আমার আঁখি
আঁখির জলে গেছে ভেসে॥
মনে হল আকাশ যেন
কইল কথা কানে কানে।
মনে হল সকল দেহ
পূর্ণ হল গানে গানে।
হৃদয় যেন শিশিরনত
ফুটল পূজার ফুলের মত,
জীবননদী কূল ছাপিয়ে
ছড়িয়ে গেল অসীমদেশে॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

গান্ধারী তোড়ী—তাল ঝাঁপতাল।

আজিকে মধুর সুবিমল প্রাতে
মরম বাঁশরী উঠিল বাজিয়া।
আজি নামে তব ওহে প্রিয়তম
শত নব গান উঠিছে ফুটিয়া॥
তোমারি মধুরে সকলি মধুর
তব পুণ্য গন্ধ পড়িছে ঝরিয়া।
সুমন্দ বাতাস তোমারি নিশ্বাস
দিতেছে আমারে পাগল করিয়া॥

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

* * *

আমার কণ্ঠ তাঁরে ডাকে,
তখন হৃদয় কোথায় থাকে?
যখন হৃদয় আসে ফিরে
আপন নীরব নীড়ে
আমার জীবন তখন কোন্ গহনে
বেড়ায় কিসের পাকে?
যখন মোহ আমায় ডাকে
তখন লজ্জা কোথায় থাকে?
যখন আনেন তমোহারী
আলোক-তরবারী
তখন পরাণ আমার কোন্ কোণে যে
লজ্জাতে মুখ ঢাকে?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

রাগিণী ভৈরবী—তাল ঝাঁপতাল।

আমরি মরি কি রূপ ধরি
এসেছ মা—মা আমার!
হৃদয় উজল করি,
জ্যোতি অপরূপে ভরি,
বারেক দাঁড়াও
প্রণমি গো মা আমার!
তোমারি ভালে তপন জ্বলে,
তোমারি হাসি ফুটে কমলে,
তোমারি প্রভা জগতীতলে
প্রণমি গো মা—
মা আমার!

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

মিশ্র আড়ানা—একতালা।

এস হে এস সুন্দর ওহে নবতপন।
এস তিমির-হরণ, অরুণ-বরণ,
পুণ্য কিরণ ঢালো ঢালো—
আলোকে কর আলো ভুবন।
আমি খুলি মন্দিরদুয়ার সখা,
আঁধারে রয়েছি দাঁড়ায়ে একা,
কখন উদিবে তরুণ রেখা—
ভরিয়া নয়ন মন।
আমি অধিক কিছু চাহি না আর,
তুমি ঢেলে দাও নিখিল মাঝে,
তোমার সকল জ্যোতিধার।

শুধু দিয়ে যাও রেখে যাও হে সখা—
আমার লাগি, কাতরে মাগি,
একটি বিন্দু তার—ওহে বিশ্ব বিমোহন।
(সেই) একটি বিন্দু একটি দীপ্ত কণিকা—
অতি উত্তম, অতি উজ্জ্বল, অতুল রত্ন মণিকা—
তাহা যতনে রাখিব ধ'রে আমারি বিজন ঘরে—
তোমারি তরে গো তোমারি তরে—
জ্বালিব আরতি দীপিকা।
আমি দিবস নিশীথে, অশ্রু হাসিতে
বচনে গীতিতে, আশীষে প্রীতিতে
তোমারে করিব বরণ হে, অনুদিন অনুক্ষণ।

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী]

বেহাগ—তেওরা।

ভুবন জোড়া আসন খানি।
হৃদয় মাঝে আমার হৃদয় মাঝে বিছাও আনি।
রাতের তারা দিনের রবি
আঁধার আলোর সকল ছবি
তোমার—আকাশভরা সকল বাণী।
ভুবনবীণার সকল সুরে,
আমার হৃদয়পরাণ দাওনা পুরে,
দুঃখ সুখের সকল হরষে
ফুলের পরশে ঝড়ের পরশে,
তোমার করুণ শুভ উদার পাণি
আমার হৃদয় মাঝে আমার হৃদয় মাঝে
দিক্‌না আনি॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

* * *

দাড়িয়ে আছ তুমি আমার
গানের ওপারে
আমার সুরগুলি পায় চরণ, আমি
পাইনে তোমারে॥
বাতাস বহে মরি মরি
আর বেঁধে রেখোনা তরী
এস এস পার হয়ে মোরে
হৃদয় মাঝারে॥
তোমার সাথে গানের খেলা
দূরের খেলা যে
বেদনাতে বাঁশী বাজায়
সকল বেলা যে
কবে নিয়ে আমার বাঁশী
বাজাবে গো আপনি আসি
আনন্দময় নীরব রাতে
নিবিড় আঁধারে॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

নির্ভরের সোপান।

(শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত)

"ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।" এ কথাটী ভাবিতে, বলিতে, শুনিতে কত মধুর! বুঝিবা এ বাক্যের প্রতি অক্ষরে কত ভক্তি, কত শান্তি, কত প্রীতি উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িতেছে!

"হে হৃষীকেশ! তুমি আমার হৃদয়ে বিরাজ করিতেছ, তুমি যখন আমাকে যাহাতে নিযুক্ত কর, আমি তাহাই করিয়া থাকি।" সত্যই তো তাই! কিন্তু আমরা এ সত্যতা উপলব্ধি করিতে কখন্ সমর্থ হই? কখন্ আমরা প্রাণ খুলিয়া হৃদয় ভরিয়া বলিতে পারি—"ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি"?

ভাগ্য সুপ্রসন্ন। চারিদিক হইতে অজস্র সুখ-সম্পদ, আনন্দ-গৌরব আসিয়া আমাদিগকে সংগ্রাম-সঙ্কুল সংসারে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতেছে, আমরা যখন যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেছি, তখনই তাহাতে আশাতীতরূপে কৃতকার্য্য হইতেছি, আমাদের স্পর্শে ভস্মরাশিও স্বর্ণরাশিতে পরিণত হইতেছে; সেই সৌভাগ্য-সূর্য্য-করোজ্জ্বল জীবনের গৌরব-মধ্যাহ্নে দাঁড়াইয়া উপরোক্ত মহাবাণী কি আমাদিগের অন্তরে জাগরিত হইয়া থাকে? আমরা যে তখন 'শয়নে-স্বপনে-জাগরণে' শুধু এই একটী কথাই শুনিতে পাই—'অহম্'! সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বক্ষও অহঙ্কারে অনেকটা স্ফীত হইয়া উঠে।

কালবশে আবার যখন আমাদের ভাগ্যচক্র বিপরীত দিকে পরিবর্ত্তিত হয়, পদে পদে পরাজয় ও ব্যর্থতা আমাদিগকে গ্রাস করিতে আসে, আমরা রোগ-শোক-দুঃখ-দারিদ্র্যের তীব্র আঘাতে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়ি, তখনও যে আমাদের উদ্‌ভ্রান্ত হৃদয়ে পূর্ব্বোক্ত মহাবাণী সম্যক

স্ফূর্ত্তি পায় না—আমরা যে তখন নিরাশা ও হতাশার নিবিড় অন্ধকারে ডুবিয়া শুধু নিষ্ফল আর্ত্তনাদকেই সম্বল করিয়া লইয়া থাকি। তবু এত নিষ্পেষণেও যে 'অহম্' এর আস্ফালন সম্পূর্ণরূপে থামে না।

দেখিলাম, সৌভাগ্য কিংবা দুর্ভাগ্য আমাদিগকে "হৃষীকেশের" কথা শুনাইতে আসিলেও আমরা সে কথা শুনিতে পাই না—আমরা 'অহম্' এর মোহে এমনই বধির ও অন্ধ হইয়া পড়িয়াছি! যদি আমাদের জপমন্ত্র কিছু থাকে তবে সে—'অহম্!' সমুদ্রে যেমন একটীর পর একটী তরঙ্গ উত্থিত হইয়া তাহাকে সর্ব্বদা উদ্বেগচঞ্চল করিয়া রাখে, তেমনিধারা আমাদের চিত্তসাগরেও প্রতিনিয়ত 'অহম্' এর ঢেউ জাগিয়া আমাদিগকে নানাভাবে নাচাইয়া মাতাইয়া, অবশেষে কাঁদাইয়া ডুবাইয়া যাইতেছে! আজীবন 'হৃষীকেশের' অপার করুণার মধ্যে নিমগ্ন থাকিয়াও তাই আমাদের বিরাম, বিশ্রাম, শান্তি, সান্ত্বনা নাই!

যদি আমরা বাস্তবিকই বলিতে পারিতাম, "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি", তবে আমাদের এ দুরবস্থা হইবে কেন? সুখ, দুঃখ, জয়, পরাজয় আমাদিগকে বিচলিত করা দূরে থাকুক, তাহা হইলে আমরা যে মন্দ কর্ম্মের ভিতরে, পাপের দণ্ডের ভিতরেও ভগবানের মঙ্গল হস্তের পরিচয় পাইয়া প্রকৃত আত্মপ্রসাদ অন্বেষণ করিয়া লইতে পারিতাম; অপহরণ করিয়া রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইলেও আমাদের মুক্তির পথ পরিষ্কার দেখিতে পাইয়া বলিতে পারিতাম, "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি"!

কিন্তু তাহা তো হয় না! যতক্ষণ 'অহম্'এর ঐন্দ্রজালিক স্পর্শ আছে, ততক্ষণ আমাদিগকে হাউই বাজির মত শূন্যে জ্বলিতে, দহিতে ও নিভিতে হইবে। সমস্ত সংসার বিপর্য্যয় হইয়া গেলেও আমাদের নিস্তার নাই—কেহ আমাদিগকে রক্ষাও করিতে পারিবে না!

তবে উপায় কি? জীবনের কোন্ অবস্থা আমাদিগকে প্রাগুক্ত মহাবাণী উচ্চারণের যথার্থ যোগ্যতা ও অধিকার দান করিবে? নির্ভরের সে সোপান কোথায়?

আমার মনে হয় দুঃখের পর দুঃখের, আঘাতের পর আঘাতের 'বজ্রবেদনায়' যখন আমাদের অন্তর বাহির পূর্ণ হইয়া উঠে, আমাদের সকল আশাসাধ জল্পনা কল্পনা অদৃষ্টের নিষ্ঠুর তাড়নায় চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়, বিশাল সংসারে কাহারও মুখের পানে চাহিবার ভরসামাত্র থাকে না, হাহাকার—শুধু হাহাকার, অন্ধকার—শুধু অন্ধকার আমাদিগের সকল দম্ভ-অভিমান, শক্তিসামর্থ্য ও পুরুষকারকে গ্রাস করিবার জন্য চারিদিক হইতে মহাকালের তাণ্ডবলীলার ন্যায় বিকট উৎসাহে ছুটিয়া আসে, মন্ত্রৌষধিবশীভূত দুরন্ত পন্নগের মত আমাদের দুর্দ্দান্ত 'অহম্' একান্ত বিমুগ্ধ, বিমূঢ় ও নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে, আমাদের সেই মথিত চূর্ণিত অন্তরের অন্তস্থল হইতে মর্ম্মভেদীস্বরে স্বতঃই স্ফুরিত হয়—"নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ," প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের জীবনের সেই অনন্যগতি মুহূর্ত্তেই আমরা উন্মুক্ত হৃদয়ে বলিতে পারি—"ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।"

যাঁহারা ভুক্তভোগী, তাঁহারা জানেন, আমাদের এই পরম নিরাশ্রয়ভাবই আমাদিগকে চরম আশ্রয়ের পথে লইয়া যায়—ঘোর অকল্যাণ এমনি ভাবেই আমাদের জন্য শাশ্বত কল্যাণের সৃষ্টি করে, মঙ্গলময় দেবতার রাজ্যে ইহাই তাঁহার মঙ্গলবিধান—ইহাই নির্ভরের একমাত্র সোপান।

উপসংহারে, সেই নামহীন দেবতার দুইটী নামরহস্য একটু বুঝিতে চেষ্টা করিব। আমরা তাঁহার ঈপ্সিত কার্য্যে নিযুক্ত হইবার সময় তাঁহাকে "হৃষীকেশ" বলিয়া সম্বোধন করি কেন? আবার নিরাশ্রয় অবস্থায় তাঁহাকে "জগদীশ" বলিয়া কেন আহ্বান করি?

তিনি "হৃষীকেশ" অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াধিপতি, এ কথা জানিলেই আমাদের ইন্দ্রিয়গণ আর কুকর্ম্মে রত হইতে পারে না; তিনি "জগদীশ", আমরা ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র হইলেও তিনি আমাদিগকে ভুলিয়া নাই—আমরা তাঁহার খাস্‌দরবারেরই প্রজা, এ কথা বুঝিতে পারিলেই আর আমাদিগকে সদয় আশ্রয়ের জন্য কাহারও প্রতি নির্ভর করিতে হয় না।

এ জন্য নির্ভরের এ সোপানে পৌঁছিতে হইলে আমাদিগকে প্রেয়ের পথ ছাড়িয়া শ্রেয়ের

পথ অবলম্বন করিতে হয়। আমরা শ্রেয়ের পথে দাঁড়াইয়াই মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি—"ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি" কিংবা "নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ"। নতুবা এ দুইটী মহাবাক্যের দিব্যপ্রভাব আমাদিগের নিষ্ফল জীবনে প্রসারিত বা কার্য্যকরী হয় না।

আঁধারে।

(নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এ)

একটি সহজ হাসি হেসে
গলিয়ে দাও সব দুখ, রে ভাই
গলিয়ে দাও সব দুখ!
তোমার সকল কাঁটা ফুটুক ফুলে
দুঃখ হউক্ সুখ, রে ভাই
দুঃখ হউক্ সুখ!
আছে আঁধার আছে কালো,
তাই নেবাবে কি প্রাণের আলো?
কালোর বুকে আলো নাচে
তায় হৃদয়-দেউটী জ্বালো, ও ভাই
হৃদয়-দেউটী জ্বালো!
আলোকেরই পুত্র মোরা,
জনম মোদের আলোকে;
স্থির যে আলো বুকের তলে—
জ্বালা'ব তায় কালোকে,
মোরা জ্বালা'ব তায় কালোকে॥

পল্লীবাস।*

(শ্রীমনোরমা দেবী)

আজকাল প্রায় সকলেই লিখিয়া থাকেন ম্যালেরিয়ানিবারণ ও পল্লীবাস ব্যতীত বাঙ্গালীর আর বাঁচিবার দ্বিতীয় উপায় নাই। কিন্তু এ পর্য্যন্ত বিশেষভাবে কিছু চেষ্টা হইয়াছে বলিয়া আমি শুনি নাই। দূরে থেকে উপায় নির্দ্দেশে ত কোন ফল হইবে না, এখন কর্ম্মক্ষেত্রে নামিবার জন্য কর্ম্মীর আবশ্যক হইয়াছে, আর সময় নাই। ম্যালেরিয়া দূর হইলে ও পল্লীবাস স্থাপিত হইলে আবার বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য ও সম্পদ সকলই ফিরিয়া আসিবে, এ কথা সকলেই বলিতেছেন; কিন্তু কেবল বলিলেই ত আপনা আপনি সমস্ত হইয়া যাইবে না। সে চেষ্টা কই? প্রাণের সে আগ্রহ কোথায়? একটা বিরাট জাতি এইরূপে দ্রুত ধ্বংসের মুখে চলিয়াছে ইহা দেখিয়া দেশনেতৃগণের হৃদয়ে সেইরূপ তীব্র বেদনা কই? এখন মধ্যবিত্ত অনেকেরই প্রাণে পল্লীবাসের বাসনা জাগিয়াছে, ইহাদের সাহস দিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইবে কে? ম্যালেরিয়া-শ্মশান পল্লীতে গিয়া দুচার ঘর গৃহস্থ প্রাণে বাঁচিবে, না তাহারা ম্যালেরিয়ায় চিঁচিঁ করিতে করিতে দেশের উন্নতি করিবে?

আমি নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, যে স্থানটায় খুব ঘন বসতি, ডোবা-জঙ্গল কম, সে স্থলে ম্যালেরিয়া নাই; এমনও দেখিয়াছি, একই গ্রামে যে পাড়ায় খুব ঘন-বসতি, সে পাড়ায় ম্যালেরিয়া নাই বলিলেই চলে; আর যে পাড়ায় বিরল বসতি, ঝোপ জঙ্গল বেশী, সেই পাড়াতেই যত ম্যালেরিয়া। এ জন্য প্রত্যেক গ্রামে বিস্তর গৃহস্থ চাই। বসতি বিরল হইলে জঙ্গল ত হইবেই; কারণ, দ্রুতবর্দ্ধনশীল আগাছা কে কত পরিষ্কার রাখিতে পারে? ঘন-সন্নিবিষ্ট বসতি থাকিলে সকলে নিজ নিজ গৃহসংলগ্ন ভূমি পরিষ্কার রাখিলেই সমস্ত গ্রাম পরিষ্কার থাকিবে।

যে ম্যালেরিয়ার জন্য এত কাণ্ড, যে ম্যালেরিয়ার জন্য লক্ষ টাকা খরচ করিয়াও কিছুই হইতেছে না, তাহা একরূপ বিনা চেষ্টাতেই দূর হইয়া যাইবে। কোন যোগ্যব্যক্তির অধীনে এ জন্য একটি পল্লীবাস-সমিতি গঠিত হওয়া আবশ্যক। প্রথমে একটি গ্রাম ধরিয়া সমিতি কার্য্য আরম্ভ করিবেন; তারপর ক্রমে ক্রমে কার্য্য বিস্তার করা যাইবে। এই পল্লীবাস-সমিতির যিনি সভ্য হইবেন তাঁহাকে পল্লীবাস অথবা পল্লীবাস-সমিতিতে সাহায্য করিতে হইবে। যাঁহারা পল্লীবাস করিতে ইচ্ছুক অথচ ম্যালেরিয়ার ভয়ে একা সাহস করেন না তাঁহারা এই সমিতির সভ্য হইবেন। এক সহস্র গৃহস্থ পূর্ণ হইলেই তাঁহাদের প্রদত্ত অর্থে একখানি পতিত গ্রাম অথবা সুবিধা মত গৃহ, জমি কিনিয়া সকলের অর্থের পরিমাণ অনুযায়ী সকলকে গৃহ ও জমি

* মহিলাদের মনেও যে এ বিষয়ে আলোচনা হইতেছে, ইহা সুখের বিষয়। আমাদের মত লেখিকার সহিত অভিন্ন না হইলেও আমরা প্রবন্ধটী সাদরে প্রকাশ করিলাম। তঃ বোঃ সং

বিভাগ করিয়া দেওয়া হইবে। সমিতির সভ্য হইবার পর সকলে নিজ নিজ অর্থ স্বীয় নামে যাহার যেখানে সুবিধা সেইখানে জমা রাখিবেন কেবল খাতাগুলি সমিতির অধ্যক্ষের নিকট রাখিতে হইবে। এমন স্থানে টাকা রাখিতে হইবে যেন ইচ্ছামাত্রই টাকা উঠাইয়া লওয়া চলে। সমিতির সভ্যগণই নিজ-গ্রামে একটি চিকিৎসালয় একটি বিদ্যালয় ও একটি বাজার পরিচালিত করিবেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে বাঙ্গালার সমস্ত পল্লীতেই বসতি স্থাপন করা যাইতে পারে। যে সমস্ত বড়লোকের পল্লীবাসের আবশ্যক নাই, তাঁহারা তাঁহাদের নিজ দরিদ্র আত্মীয় একঘর নিজব্যয়ে পল্লীবাস করাইয়া এই পল্লী-বাস-সমিতির সাহায্য করিতে পারিবেন। অথবা কোন বড়লোক যদি নিজব্যয়ে দুই ঘর গৃহস্থকে পল্লীবাস করান তাহা হইলে সেই গ্রামের নাম তাঁহার নিজ নামে অথবা তাঁহার নির্ব্বাচিত নামে রাখা হইবে। ইহা নাম রাখিবার এক সুযোগ।

আজকাল পল্লীবাসে অনেকেই ইচ্ছুক হইয়াছেন, কারণ মধ্যবিত্ত লোকের সহরবাসে দুরবস্থার অন্ত নাই। যদি ৫০ টাকা আয় হয় তবে বাড়ীভাড়া দিতেই ১৫ টাকা যায় তার পর মাটি হইতে নিমপাতা পর্য্যন্ত কিনিয়া লইতে হয়। ছেলে মেয়ের হাত ধরিয়া অসহায়ভাবে এবাড়ী সেবাড়ী করিয়া বেড়াইতে হয় তাহাতেও পয়সা খরচ মনের অশান্তি। দুগ্ধের উপকারিতার কথা সকলেই জানেন; তাহা সহরবাসী কয়জন খাইতে পান? বয়স্ক লোকের কথা ছাড়িয়া দিই; যাহাদের দুগ্ধই জীবন সেই শিশুরাই উদর পুরিয়া দুগ্ধ না পাইয়া দুর্ব্বল—রুগ্ন। সহরবাসী দরিদ্র ভদ্রলোকেরা যতদিন কাজ করিতে পারেন ততদিন একরূপ চলিয়া যায়, যদি দু-মাস অসুখে পড়িয়া কাজ করিতে না পারেন তবে ভিক্ষার ঝুলি সম্বল করিতে হয়। আর যাহাদের কিছু সঞ্চিত অর্থ আছে তাহাদের ইচ্ছা থাকিলেও সহরে বাড়ী করা অসম্ভব; কাজেই তাহাদের চিরদিন গৃহহীন হইয়াই থাকিতে হয়। বর্ত্তমানে সুখ নাই, প্রাণে ভবিষ্যৎ ভরসা নাই; কোন গতিকে নিরানন্দ দিন গুলি কাটাইয়া দেওয়াই যেন ইহাদের একমাত্র কাজ।

দরিদ্র লইয়াই জাতি। সেই জাতীয় শক্তি দরিদ্রেরা যদি এমন ভাবে অর্দ্ধাসনে ভগ্নস্বাস্থ্য, নিরন্তর ঋণভারে অবসন্ন হইয়া পড়ে তবে কেমন করিয়া জাতীয় উন্নতি হইতে পারে? ইহারা যদি পল্লীবাস করিতে পায়, ইচ্ছামত ফলতরকারি গাছ লাগাইয়া দুটি একটি গরু রাখিয়া সুখে সংসার করিয়া দু-পয়সা সঞ্চয়ও করিতে পারে। হাতে পয়সা না থাকিলে শুধু শাক পাতা তুলিয়া দু-কুনকে চাউল রাঁধিয়াও গৃহস্থের দুদিন চলিয়া যাইতে পারে। কথায় কথায় এমন পয়সা খরচ করিতে হয় না। উদর পূর্ণ থাকিলে, ভবিষ্যৎ ভরসায় প্রাণটা উৎফুল্ল থাকিলে, তখন যদি দেশের উন্নতির কথা বল তাহা শুনিতেও ভাল লাগে আর তাহা করিতেও প্রাণ চায়; নচেৎ যাহারা পুত্রকন্যা লইয়া নিজে মরিতে বসিয়াছে তাহারা দেশের ও দশের উন্নতি করিবে কেমন করিয়া?

আবার যদি পল্লীবাস স্থাপিত হয়, ম্যালেরিয়া নিবারিত হয় তবেই পুষ্টকায় বাঙ্গালী শিশু ও অকালবৃদ্ধ বাঙ্গালী যুবকের যৌবন-লাবণ্য ফিরিয়া আসিবে; নচেৎ বাঙ্গালী মরিবে। আজকাল দেখা যায়, প্রায় সব কাজেই সকলে ধনীদের মাথায় সকল দোষ চাপাইয়া নিশ্চিন্ত হন, যেন তাঁহাদের দোষেই আমরা দরিদ্র হইয়াছি; ধনীরা সমস্ত সম্পত্তি বিতরণ করিয়া ফকিরি গ্রহণ করিলেই যেন লোকে সুখী হয়। কিন্তু তাহাতেই কি এই সীমাহীন জগদ্ব্যাপী অপার দারিদ্র্য-দুঃখ প্রশমিত হইবে। ধনীদের ত অন্ত নাই—ধনীদের সাহায্য দ্বারা উপকৃত হয় নাই এমন সৎকার্য্যই নাই। সকলেরই নিজের উন্নতির চেষ্টা নিজের করা উচিত। কেহ যদি পতিতকে তুলিবার জন্য হাত বাড়াইয়া দেন, তবে পতিতের সাহায্যকারীর হস্তে কম জোর দিয়া নিজের হাতে পায়ে বেশী জোর দিয়া উঠা উচিত। যে পতিত ব্যক্তি সাহায্য-কারীকে দেখিয়া একেবারেই হাত-পা ছাড়িয়া দেয় তাহাকে তোলা বড়ই কঠিন ব্যাপার।

জাগর্য্যা।

(শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ন)

ঘুম যেন নাহি আসে এ নয়নে মোর।
আজি সারা নিশি জাগি'
র'ব বাঞ্ছিতের লাগি'

রহিব তাঁহার ধ্যানে নিয়ত বিভোর
ঘুম যেন নাহি আসে এ নয়নে মোর।
এমন চাঁদিনী রাতে
নীরব চরণ-পাতে
গোপনে একেলা আসে সে চতুর চোর
ঘুম যেন নাহি আসে এ নয়নে মোর।
কি জানি কি আছে ভালে
এসে ফিরে কোন্ কালে
যাবে চলে ফাঁকি দিয়ে—হবে নিশি ভোর!
ঘুম যেন নাহি আসে এ নয়নে মোর।
না আসে নিঠুর যদি
তা হ'লেও নিরবধি
র'ব চাহি পথপানে ব'বে আঁখি-লোর
ঘুম যেন নাহি আসে এ নয়নে মোর।
বিরহ বহিয়া বুকে
তাঁরি ধ্যানে র'ব সুখে
সেও ভালো, যাক্ দূরে এ ঘুমের ঘোর
ঘুম যেন নাহি আসে এ নয়নে মোর।

গীতাধ্যায় সঙ্গতি।

(গীতারহস্য—চতুর্দ্দশ প্রকরণ)

প্রবৃত্তিলক্ষণং ধর্ম্মং ঋষির্নারায়ণোঽব্রবীৎ। *
মহাভারত, শান্তি. ২১৭. ২

কর্ম্ম করিবার সময়েই অধ্যাত্ম বিচারের দ্বারা কিংবা ভক্তির দ্বারা সর্ব্বাত্মৈক্যরূপ সাম্যবুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে সম্পাদন করা এবং তাহা প্রাপ্ত হইলেও সন্ন্যাস গ্রহণের ইচ্ছা না করিয়া সংসারে শাস্ত্রতঃ প্রাপ্ত সমস্ত কর্ম্ম কেবল কর্ত্তব্য বলিয়া সর্ব্বদা করিতে থাকা, ইহাই এই জগতে মনুষ্যের পরম পুরুষার্থ কিংবা জীবন যাপনের উত্তম মার্গ, এইরূপ ভগবদ্গীতায়, ভগবান্ কর্ত্তৃক গীত উপনিষদে প্রতিপাদিত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত যে বিচার করা হইয়াছে তাহা হইতে ইহা উপলব্ধি হইবে। তথাপি যে ক্রম-অনুসারে আমি এই গ্রন্থে এই অর্থ বিবৃত করিয়াছি তাহা হইতে গীতাগ্রন্থের ক্রম ভিন্ন হওয়ায়, ভগবদ্গীতায় ইহার কিরূপ বিন্যাস করা হইয়াছে, এখানে তাহারও একটু আলোচনা করা আবশ্যক।

কোনও বিষয়ের নিরূপণ দুই পদ্ধতি অনুসারে করা যাইতে পারে; এক, শাস্ত্রীয়, আর-এক পৌরাণিক তন্মধ্যে সমস্ত লোকের সহজবোধ্য বিষয় হইতে, প্রতিপাদ্য বিষয়ের মূলতত্ত্ব কিরূপে নিষ্পন্ন হয় তর্কশাস্ত্রানুসারে সাধক-বাধক প্রমাণ যথাক্রমে উপস্থিত করিয়া তাহা দেখানো হইল শাস্ত্রীয় পদ্ধতি। ভূমিতিশাস্ত্র এই পদ্ধতির একটী উৎকৃষ্ট উদাহরণ; ন্যায়সূত্র কিংবা বেদান্তসূত্র—ইহাদের উপপাদনও এই বর্গের মধ্যে আসে তাই ভগবদ্গীতায় ব্রহ্মসূত্রের বা বেদান্তসূত্রের যেখানে উল্লেখ আছে সেখানে তাহার বিষয়টি হেতুযুক্ত ও নিশ্চয়াত্মক প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে এইরূপ বর্ণনাও দেখিতে পাওয়া যায়—"ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ" (গী ১৩. ৪)। কিন্তু ভগবদ্গীতার নিরূপণ সশাস্ত্র হইলেও উহা এই পদ্ধতি অর্থাৎ শাস্ত্রীয় পদ্ধতি অনুসারে করা হয় নাই। ভগবদ্গীতার বিষয় শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের কথোপকথনরূপে সহজ ও মনোরঞ্জক রীতিতে বর্ণিত হইয়াছে। সেইজন্য প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে "ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে" এইরূপ উল্লেখ করিয়া তাহার পর "শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে" এইরূপ গীতানিরূপণের স্বরূপপ্রদর্শক শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। এই নিরূপণ ও শাস্ত্রীয় নিরূপণের প্রভেদ স্পষ্টরূপে দেখাইবার জন্য আমি সংবাদাত্মক নিরূপণকেই পৌরাণিক নাম দিয়াছি। ৭০০ শ্লোকের এই সম্বাদাত্মক বা পৌরাণিক নিরূপণে "ধর্ম্ম" এই ব্যাপক শব্দের মধ্যে যে সকল বিষয়ের সমাবেশ হয়, তাহার সবিস্তর বিচার আলোচনা করা কখনই সম্ভব নহে। কিন্তু যত সংক্ষেপেই হউক না কেন, গীতায় অনেক বিষয় যাহা পাওয়া যায়, তাহাদেরই সংগ্রহ অবিরোধে কেমন করিয়া হইল ইহাই আশ্চর্য্য। ইহা দ্বারাই গীতাকারের অলৌকিক শক্তি ব্যক্ত হইয়াছে; এবং অনুগীতার আরম্ভে যে বলা হইয়াছে যে, গীতার উপদেশ "অত্যন্ত যোগযুক্ত চিত্তে" কথিত হইয়াছে তাহার সত্যতায় বিশ্বাস হয়। অর্জ্জুন যাহা পূর্ব্বেই অবগত ছিলেন তাহা পুনর্ব্বার সবিস্তর বলিবার কোন কারণ ছিল না। আমি যুদ্ধের নিষ্ঠুর কর্ম্ম করিব কি না, এবং করিলেও কিরূপে করিব ইহাই তাঁহার মুখ্য প্রশ্ন ছিল। শ্রীকৃষ্ণ নিজের উত্তরে, দু'একটি যুক্তিবাদ দেখাইতে থাকিলে, অর্জ্জুন সেই সম্বন্ধে কোন-না-কোন আপত্তি উত্থাপন করিতে ছিলেন। এই প্রকার প্রশ্নোত্তররূপ সংবাদে গীতার বিচার-আলোচনা স্বভাবতই কখন ভাঙ্গাচুরি কিংবা সংক্ষিপ্ত আর কখন বা পুনরুক্ত হইয়াছে। উদাহরণ যথা,—ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির বিস্তারের বর্ণনা স্বরূপভেদে দুইস্থানে (গী, অ. ৭ ও ১৪) করা হইয়াছে; আবার, স্থিতপ্রজ্ঞ, ভগবদ্ভক্ত, ত্রিগুণাতীত ও ব্রহ্মভূত—ইহাদের অবস্থার বর্ণনা এক হইলেও,

* "নারায়ণ ঋষি, ধর্ম্ম প্রবৃত্তিমূলক বলিয়াছেন।" নর ও নারায়ণ এই দুই ঋষিদের মধ্যেই এই নারায়ণ ঋষি ছিলেন; এবং এই দুয়েরই অনুক্রমে অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ অবতার ছিলেন, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সেইরূপ আবার, নারায়ণীয় ধর্ম্মই গীতার প্রতিপাদ্য—এই সম্বন্ধে মহাভারতের বচন পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে।

বিভিন্ন দৃষ্টিতে প্রত্যেক প্রসঙ্গে অনেকবার করা হইয়াছে। উল্টাপক্ষে, অর্থ ও কাম যদি ধর্ম্মকে না ছাড়ে তবেই তাহা গ্রাহ্য হয়, এই তত্ত্বের—"ধর্ম্মাবিরুদ্ধঃ কামোঽস্মি (৭.১১) এই একটি বচনেই গীতা ইঙ্গিত করিয়াছেন। ইহার পরিণাম এই হয় যে, গীতার মধ্যে সমস্ত বিষয় সমাবেশ করা হইলেও শ্রৌত ধর্ম্ম, স্মার্ত্তধর্ম্ম, ভাগবত ধর্ম্ম, সাংখ্য শাস্ত্র, পূর্ব্বমীমাংসা, বেদান্ত, কর্ম্মবিপাক, ইত্যাদি যে সকল প্রাচীন সিদ্ধান্ত সমূহের আধারের উপর গীতার পরম্পরার জ্ঞানের নিরূপণ করা হইয়াছে, সেই পরম্পরা যে ব্যক্তি অবগত নহে, গীতা পাঠ করিবার সময় তাহার মন ঘুলাইয়া যায়; এবং গীতার প্রতিপাদনের গতি কোন্ দিকে তাহা ঠিক্ উপলব্ধি করিতে না পারায় এই লোকদিগের এইরূপ ধারণা হইয়া থাকে যে, গীতা এক-প্রকার ভেল্কীবাজি, অথবা শাস্ত্রীয় পদ্ধতি প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে গীতা রচিত হইয়া থাকিবে, এবং সেইজন্য গীতার স্থানে স্থানে অপূর্ণতা ও বিরোধ দেখিতে পাওয়া যায়, কিংবা নিদানপক্ষে গীতোক্ত জ্ঞান আমাদের বুদ্ধির অগম্য। সংশয়নিবৃত্তির জন্য টীকা দেখিতে গেলে বিশেষ লাভ হয় না; কারণ, তাহা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মতে রচিত হওয়ায়, টীকাকারদিগের মতসম্বন্ধীয় পরস্পর-বিরোধের সমন্বয় করা দুর্ঘট হয় এবং পাঠকদের মন আরও বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে। কোন কোন সুপ্রবুদ্ধ পাঠকও এইরূপ ভ্রান্তিতে পতিত হইয়াছেন আমি জানি। এই বাধা যাহাতে না থাকে সেইজন্য আমার নিজের ধারণা অনুসারে গীতার প্রতিপাদ্য বিষয় সমূহের শাস্ত্রীয় পদ্ধতি অনুসারে বিন্যাস করিয়া এপর্য্যন্ত বিচার করিয়া আসিয়াছি। এখন এ স্থলে আর একটু ইহা বলিতে চাহি যে, এই বিষয়ই শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের কথোপকথনে, অর্জ্জুনের প্রশ্ন কিংবা সংশয়ের প্রসঙ্গক্রমে ন্যূনাধিক পরিমাণে কি প্রকারে আসিয়া পড়িয়াছে। তাহা বলিলে, এই বিচার-আলোচনা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে এবং পরবর্ত্তী প্রকরণে সমস্ত বিষয়ের উপসংহার করা সহজ হইবে।

আমাদের ভারতবর্ষ যখন জ্ঞান, বৈভব, যশ ও পূর্ণ-স্বরাজ্যের সুখ সম্ভোগ করিতেছে বলিয়া তাহার খ্যাতি দিগন্তবিস্তৃত হইয়াছিল, তখন এক সর্ব্বজ্ঞ, মহাপরাক্রমী যশস্বী ও পরমপূজ্য ক্ষত্রিয়, অন্য মহাধনুর্দ্ধর ক্ষত্রিয়কে ক্ষাত্রধর্ম্মানুযায়ী স্বকর্ত্তব্যে প্রবৃত্ত করিবার জন্য গীতা উপদেশ করিয়াছিলেন, ইহার প্রতি পাঠকের প্রথমে লক্ষ্য করা আবশ্যক। জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধ, এই দুজনও ক্ষত্রিয় ছিলেন। তথাপি ইহাঁরা উভয়েই বৈদিক ধর্ম্মের কেবল সন্ন্যাস-মার্গকেই স্বীকার করিয়া ক্ষত্রিয়াদি সমস্ত বর্ণের সম্মুখে যেরূপ সন্ন্যাসধর্ম্মের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ সেরূপ করেন নাই; কারণ, ভাগবত-ধর্ম্মের উপদেশ এই যে, শুধু ক্ষত্রিয় কেন, ব্রাহ্মণ-দিগকেও নিবৃত্তিমার্গের শান্তির সহিত, নিষ্কামবুদ্ধিতে আমরণ সমস্ত কর্ম্ম করিবার প্রযত্ন করিতে হইবে। যে কোন উপদেশই হউক না কেন, তাহার কোন-না-কোন কারণ অবশ্যই থাকে; এবং সেই উপদেশের সফলতা চাহিলে, শিষ্যের মনে উক্ত উপদেশের জ্ঞান অর্জ্জন করিবার ইচ্ছাও প্রথম হইতেই জাগ্রত করিয়া দেওয়া আবশ্যক। তাই, এই দুই বিষয় স্পষ্ট করিবার জন্য ব্যাসদেব গীতার প্রথম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের অর্জ্জুনকে এই উপদেশ দিবার কি কারণ হইয়াছিল, তাহা সবিস্তার বর্ণনা করিয়াছেন। কৌরব ও পাণ্ডবদিগের সৈন্য যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হইয়া কুরুক্ষেত্রে দণ্ডায়মান; এক্ষণে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার অল্পই বিলম্ব আছে; ইতিমধ্যে অর্জ্জুনের কথা অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার রথ উভয় সৈন্যের মাঝ-খানে লইয়া গিয়া দাঁড় করাইলেন এবং অর্জ্জুনকে বলিলেন, "যাঁহাদের সহিত তোমার যুদ্ধ করিতে হইবে সেই ভীষ্ম-দ্রোণাদিকে দেখ"। তখন অর্জ্জুন উভয় সৈন্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, আপন বাপ, কাকা, পিতামহ, মামা, ভাই, পুত্র, পৌত্র, বন্ধু, আত্মীয়, গুরু, গুরুভাই প্রভৃতি দুইদিকে ভরিয়া আছে, এবং এই যুদ্ধে সকলেই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে! যুদ্ধ কিছু একেবারেই উপস্থিত হয় নাই। যুদ্ধ করা পূর্ব্ব হইতেই স্থির হইয়া গিয়াছিল এবং উভয় পক্ষেরই সৈন্য সংগ্রহ অনেক দিন হইতেই চলিতেছিল। তথাপি পর-স্পরের মধ্যে এই যুদ্ধের ফলে কুলক্ষয়ের প্রত্যক্ষ স্বরূপ যখন সর্ব্বপ্রথম অর্জ্জুনের দৃষ্টিতে উপস্থিত হইল, তখন তাঁহার ন্যায় মহাযোদ্ধারও তাহা খারাপ লাগিল এবং তাঁহার মুখ হইতে এই কথা বাহির হইল "রাজ্য-লাভের জন্য এই ভয়ঙ্কর কুলক্ষয় আমরা করিতে বসি-য়াছি; ইহা অপেক্ষা ভিক্ষা করাও কি শ্রেয়স্কর নহে?" এবং পরে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন যে "শত্রুরা আমার প্রাণবধ করিলেও আমার কিছুই আসে যায় না, কিন্তু ত্রৈলোক্যের রাজ্যের জন্যও পিতৃহত্যা গুরুহত্যা ভ্রাতৃ-হত্যা বা কুলক্ষয়ের ন্যায় মহাপাপ করিতে আমি ইচ্ছা করি না।" অর্জ্জুনের সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল, হাতপা শিথিল হইয়া গেল, মুখ শুকাইয়া গেল, বিষণ্ণ বদনে হস্ত হইতে ধনুর্ব্বাণ নিঃক্ষেপ করিয়া বেচারা রথে চুপচাপ বসিয়া পড়িলেন—এই কথা প্রথম অধ্যায়ে আছে। এই অধ্যায়কে "অর্জ্জুনবিষাদ-যোগ" বলে। কারণ, সমস্ত গীতায় ব্রহ্মবিদ্যান্তর্গত (কর্ম্ম)-যোগশাস্ত্র নামক একই বিষয় প্রতিপাদ্য হইলেও, প্রত্যেক অধ্যায়ে যে বিষয় মুখ্যরূপে বিবৃত করা হইয়াছে তাহাকে এই কর্ম্ম-

যোগশাস্ত্রেরই এক অংশ মনে করিয়া প্রত্যেক অধ্যায়কে তাহার বিষয়ানুসারে অর্জ্জুনবিষাদযোগ, সাংখ্যযোগ এইরূপ বিভিন্ন নাম দেওয়া হইয়াছে। এবং এই সমস্ত 'যোগ' একত্র হইলে পর তাহাই "ব্রহ্মবিদ্যার অন্তর্গত কর্ম্মযোগশাস্ত্র" হইয়া দাঁড়ায়। প্রথম অধ্যায়ের অন্তর্গত কথার মহত্ত্ব কি, তাহা আমি এই গ্রন্থের আরম্ভে বলিয়াছি। কারণ, আমার সম্মুখে কি প্রশ্ন উপস্থিত তাহা ঠিক না জানিলে সেই প্রশ্নের উত্তরও সম্যক্‌রূপে মনে আসে না। সাংসারিক কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া ভগবদ্‌ভজনেই প্রবৃত্ত হওয়া কিংবা সন্ন্যাস গ্রহণ করা,—ইহাই যদি গীতার তাৎপর্য্য বলিতে হয়, তাহা হইলে অর্জ্জুন যুদ্ধের নিষ্ঠুর কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ভিক্ষা মাগিতে তখনই প্রস্তুত থাকায় তাঁহাকে এই উপদেশ দিবার কোন আবশ্যকতা ছিল না। প্রথম অধ্যায়ের শেষে "বাঃ! বড় উত্তম কথা বলিয়াছ; চল, আমরা দুজনেই এই কর্ম্মময় সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম কিংবা ভক্তিযোগ অবলম্বন করিয়া আমাদের আত্মার কল্যাণ সাধন করি!" এইরূপ অর্থের দুই একটা শ্লোক শ্রীকৃষ্ণের মুখে পুরিয়া দিয়া সেই খানেই গীতা সমাপ্ত করা উচিত ছিল। আবার এদিকে যুদ্ধ হইয়া গেলে ব্যাস তাহার বর্ণনায় তিন বৎসর কাল (মভা. আ. ৬২. ৫২) যদি আপন বাণীর দুর্ব্যবহার করিতেন তাহা হইলে তাহার দোষ বেচারী অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণকে স্পর্শ করিত না। তাহা হইলে কুরুক্ষেত্রে সমবেত শত শত মহারথী অর্জ্জুনকে ও শ্রীকৃষ্ণকে উপহাস করিতেন সত্য, কিন্তু যে আপনার আত্মার কল্যাণ সাধন করিবে সে এইরূপ উপহাসকে অল্পই ভয় করিবে! জগতের লোক যাহাই বলুক না; "যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ" (জা. ৪)—যখনই উপরতি হইবে, তখনই সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে, বিলম্ব করিবে না—এইরূপ উপনিষদেও উক্ত হইয়াছে। অর্জ্জুনের উপরতি জ্ঞানমূলক ছিল না মোহমূলক ছিল, এইরূপ বলিলেও উপরতিই তো হইয়াছিল; ইহাতেই অর্দ্ধেক কাজ হইল, এখন মোহকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া সেই উপরতিকেই সম্পূর্ণ জ্ঞানমূলক করা ভগবানের পক্ষে কিছুমাত্র অসাধ্য ছিল না। কোন কারণে সংসারের উপর বিতৃষ্ণা জন্মিলে সেই বিতৃষ্ণার দরুণ প্রথমে সংসার ত্যাগ করিয়া পরে পূর্ণ সিদ্ধি লাভ করিবার অনেক উদাহরণ ভক্তিমার্গে বা সন্ন্যাসমার্গেও আছে। অর্জ্জুনেরও এই প্রকার দশা হইত। সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য বস্ত্র গেরুয়া করিবার জন্য এক মুঠা গেরুয়া মাটি কিংবা ভক্তিপূর্ব্বক ভগবানের নাম সংকীর্ত্তন করিবার জন্য তাল মৃদঙ্গাদি সরঞ্জামও সমস্ত কুরুক্ষেত্রে না মিলিত এমন নহে।

কিন্তু সেরূপ কিছুই না করিয়া বরং দ্বিতীয় অধ্যায়ের আরম্ভেই শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—"অর্জ্জুন, তোমার এই দুর্বুদ্ধি কি করিয়া আসিল? এই ক্লৈব্য তোমার শোভা পায় না! ইহা তোমার কীর্ত্তিনাশ করিবে! অতএব এই দৌর্ব্বল্য ত্যাগ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও!" তথাপি অর্জ্জুন কাপুরুষের ন্যায় পুনর্ব্বার প্রথমেই কান্নার সুর ধরিয়া অত্যন্ত দীনভাবে বলিলেন—"আমি ভীষ্ম-দ্রোণাদি মহাত্মাদিগকে কি করিয়া বধ করিব? মরা ভাল কি মারা ভাল, এই সংশয়ে আমার মন বিভ্রান্ত হইতেছে; অতএব ইহাদের মধ্যে কোন্ ধর্ম্ম শ্রেয়স্কর তাহা আমাকে বলো; আমি তোমার শরণাপন্ন হইতেছি"। শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন, অর্জ্জুন মায়ার বশীভূত হইয়াছেন; এবং একটু হাসিয়া "অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং" ইত্যাদি জ্ঞানের কথা ভগবান তাঁহার নিকট বলিতে আরম্ভ করিলেন। অর্জ্জুন জ্ঞানী পুরুষের ন্যায় ভড়ং দেখাইতে গিয়াছিলেন এবং কর্ম্মসন্ন্যাসের কথাও পাড়িয়াছিলেন। তাই, জগতে 'কর্ম্মত্যাগ' ও 'কর্ম্মসাধন'—জ্ঞানীপুরুষদিগের এই যে দুই আচরণ-পন্থা অর্থাৎ নিষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায়,—তাহা হইতেই ভগবান নিজের উপদেশ সুরু করিলেন; এবং এই দুই নিষ্ঠার মধ্যে কোন একটী নিষ্ঠা গ্রহণ করিলেও তুমি ভুল করিতেছ ইহা অর্জ্জুনের প্রতি ভগবানের প্রথম উক্তি। তাহার পর, যে জ্ঞাননিষ্ঠা বা সাংখ্যনিষ্ঠার উপরে অর্জ্জুন কর্ম্মসন্ন্যাসের কথা বলিতেছিলেন সেই সাংখ্যনিষ্ঠার ভিত্তির উপরে শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে "এষা তেঽভিহিতা বুদ্ধিঃ" (গী. ২. ১১-৩৯) পর্য্যন্ত উপদেশ করিলেন; এবং আবার অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত, কর্ম্মযোগমার্গ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধই তোমার প্রকৃত কর্ত্তব্য এইরূপ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন। "এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে" এইরূপ শ্লোক "অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং"—এই শ্লোকের পূর্ব্বে যদি আসিত তাহা হইলে এই অর্থই অধিকতর ব্যক্ত হইত। কিন্তু সম্ভাষণের প্রসঙ্গক্রমে সাংখ্যমার্গের প্রতিপাদন হইলে পর উহা এইরূপে আসিয়াছে—"ইহা সাংখ্যমার্গ অনুসারে প্রতিপাদিত হইল; এক্ষণে যোগমার্গ অনুসারে প্রতিপাদন করিতেছি"। যাহাই হউক না, অর্থ একই। সাংখ্য (বা সন্ন্যাস) ও যোগ (বা কর্ম্মযোগ) ইহাদের মধ্যে যে প্রভেদ তাহা ১১ প্রকরণে প্রথমেই আমি স্পষ্টরূপে দেখাইয়াছি। অতএব তাহার পুনরুক্তি না করিয়া ইহাই বলিতেছি যে, চিত্তশুদ্ধির জন্য স্বধর্ম্মানুসারে বর্ণাশ্রমবিহিত কর্ম্ম করিয়া জ্ঞানলাভ হইলে পর মোক্ষের জন্য শেষে সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করাকেই 'সাংখ্য'মার্গ বলে; এবং কর্ম্ম কদাপি ত্যাগ না করিয়া শেষ পর্য্যন্ত উহা নিষ্কামবুদ্ধিতে করিতে থাকাকেই যোগ কিংবা কর্ম্মযোগ বলে।

ক্রমশঃ

লিঙ্গায়তধর্ম্মে নীতিপ্রসঙ্গ।

(শ্রীকালীপ্রসন্ন বিশ্বাস)

অতঃপর বাসবার নীতিশিক্ষা সম্বন্ধে কিছু বলিব। বসবা বলিয়াছেন—ধর্ম্ম কতকগুলি নিয়ম এবং ক্রিয়াকলাপের মধ্যে আবদ্ধ নহে। চরিত্রগঠন ধর্ম্মের একটি প্রধান অঙ্গ। কদাপি মদ্য মাংস ভক্ষণ করিবে না।

"তোমরা একমাত্র ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করিবে। নানা দেবতার দিকে ধাবিত হইও না। তোমরা শিবমন্ত্র শিক্ষা করিয়াছ, চরিত্র-নীতি শিক্ষা করিয়াছ, তথাপি যদি তোমরা সেই সত্য পথ হইতে ভ্রষ্ট হও, তাহা হইলে সেই কপটতার জন্য তোমাদিগকে নিশ্চয়ই নিরয়গামী হইতে হইবে।—ঐ৯২।

"কুম্ভাণ্ডকে লৌহ দ্বারা আবদ্ধ করিয়া রাখিলে কি উহা পচিয়া নষ্ট হইবে না? কুচরিত্র ব্যক্তি বাহ্যিক ধর্ম্ম কর্ম্মে আবৃত থাকিলে কিরূপ প্রকৃত ধর্ম্ম মার্গ অধিকার করিতে পারিবে?—ঐ ৯২।

"তুমি গোময় দ্বারা একটি গণেশ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাকে চম্পকপুষ্প দ্বারা পূজা করিলে যেমন গোময়ের স্বভাব পরিবর্ত্তন হয় না, মৃত্তিকা-নির্ম্মিত দেবমূর্ত্তিকে বারংবার ধৌত করিলে যেমন তাহার মৃণ্ময়ত্ব নষ্ট হয় না, সেইরূপ যে ব্যক্তি পার্থিব সৃষ্ট পদার্থের প্রতি সর্ব্বদা ধাবিত হয় তাহাকে শিবদীক্ষা বা ব্রহ্মজ্ঞান দিলে সে প্রকৃত ভক্ত হইতে পারে না। ঐ ৯৩।

"যে ব্যক্তির কর্ম্ম তাহার জ্ঞানের বিরুদ্ধাচরণ করে, যে ব্যক্তি নিজের দোষ সংশোধন না করিয়া পরের ছিদ্র অন্বেষণ করে, আমি সেরূপ ব্যক্তিকে চাহি না। ঐ ৯৫।

"যাহারা ক্রুর ও কপটহৃদয় কিন্তু মুখে সরলতার ভান করে, তাহাদিগের সহিত আমার সম্পর্ক নাই। তাহারা লিঙ্গায়ত ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার উপযুক্ত নহে। তাহারা কেবল পার্থিক সুখের অভিলাষী বলিয়া ঈশ্বর তাহাদিগকে পরিত্যাগ করেন, অর্থাৎ তাহারা ঈশ্বরের ধারণা করিতে অসমর্থ হয়। ঐ ৯৬।

"যদি কাহারও গৃহের দ্বারদেশ হইতে অভ্যন্তর পর্য্যন্ত আবর্জ্জনায় পূর্ণ থাকে তাহা হইলে কি সে সেই গৃহের মধ্যে বাস করিতে পারে? সেইরূপ ঈশ্বরও আবর্জ্জনা পূর্ণ (কুপ্রবৃত্তিগত) মনের মধ্যে থাকিতে চান না। ঐ ৯৭।

"যাহার ভিতর এবং বাহির পবিত্রতাপূর্ণ নহে ঈশ্বর তাহাকে কৃপা করেন না। বরং তাহার সেই পঙ্কিল মনের জন্য তাহাকে বারংবার জন্মমৃত্যুর মধ্যে পরিভ্রমণ করান। ঐ ১০২।

"প্রস্তরখণ্ডকে অধিকক্ষণ জলমধ্যে রাখিলে কি তাহার কাঠিন্য নষ্ট হয়? সেইরূপ অপবিত্র মনে ঈশ্বরের উপাসনা করিলে কি ফল? ঐ ৯৯।

"বল্মীক-স্তূপের উপর আঘাত করিলে কি তন্মধ্যস্থিত সর্প আহত হয়? সেইরূপ মন পবিত্র না করিয়া কঠিন ব্রত সংযমের দ্বারা কি ফল হইবে? ঈশ্বর সেই কপট ভক্তকে কিরূপে বিশ্বাস করিবেন? ঐ ১১৭।

"কেন তুমি লোককে বৃথা উপদেশ দিয়া বেড়াইতেছ। প্রথমে নিজের শারীরিক এবং মানসিক উন্নতি সাধন কর। যাহারা নিজের (আধ্যাত্মিক) উন্নতি না করিয়া অপরের জন্য দুঃখ করে সেই সকল কপটদিগকে আমাদের প্রভু ঈশ্বর কখনই ভালবাসেন না।" ঐ ১২৪।

"ভেক যেমন সর্পের মুখমধ্যে থাকিয়াও ক্ষণিক সুখের জন্য সম্মুখস্থ মক্ষিকার প্রাণনাশে প্রবৃত্ত হয়, সেইরূপ তুমিও তোমার অনিত্য মরণশীল দেহ মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া ক্ষণিক পার্থিব সুখের জন্য লালায়িত রহিয়াছ। চোর যেমন কারাগারে যাইবার সময় কিঞ্চিৎ দুগ্ধ পান করিতে ইচ্ছা করে তোমার অবস্থাও সেইরূপ। আমাদের ঈশ্বর এইরূপ আত্মপ্রবঞ্চকদিগকে চান না।" ঐ ১৩০।

"যে ব্যক্তি প্রকৃত ভক্ত নহে তাহার নিকট বাস করিও না, তাহার সহবাসে থাকিও না, তাহার সহিত একত্রে যাত্রা করিও না, এমন কি দূর হইতেও তাহার সহিত বাক্যালাপ করিও না। প্রকৃত ভক্তের গৃহে দাসত্ব করাও দশগুণে শ্রেয়ঃ। ঐ১৩৩।

"যে সকল লোক জিহ্বার সুখের জন্য মদ্য এবং মাংস ভক্ষণ করিয়া পরস্ত্রীর প্রতি লোভ করে তাহার জীবনে ফল কি?" ঐ ১০৬।

লর্ড বিশপের শ্রাদ্ধ বাসরে।

(শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ)

জীবিতকালে যে মানুষটিকে আমরা শ্রদ্ধা করেছি, মৃত্যুর পরেও তাঁকে প্রীতির সহিত স্মরণ করতে ভাল লাগে; তাঁর বিচ্ছেদের দুঃখ আমরা এই উপায়ে বিস্মৃত হই, আর স্মৃতির মধ্যে সঞ্জীবিত করে তাঁকে ইহজীবনের সঙ্গীস্বরূপে লাভ করি। যিনি চলে গিয়েছেন তাঁকে অমর করে রাখবার একমাত্র উপায়, তাঁকে বারম্বার স্মরণ করা। এই উদ্দেশ্যেই শ্রাদ্ধ-তর্পণাদির ব্যবস্থা প্রচলিত আছে।

আজ যে মহানুভব ব্যক্তির স্মৃতিসভায় আমরা প্রীতি ও ভক্তির অর্ঘ্য নিবেদন করতে সমবেত হয়েছি তিনি বিদেশীয়, ভিন্ন জাতীয়, আর স্বতন্ত্র ধর্ম্মাবলম্বী, তবু সহৃদয়তা ও সহানুভূতির গুণে তিনি বঙ্গবাসী কেন, ভারতবর্ষীয়মাত্রেরি একান্ত আত্মীয় হয়েছিলেন। লর্ড বিশপ ডাক্তার লেফ্রয় যে বৎসর প্রথম কলিকাতায় আসেন তার অল্প-দিনের মধ্যে তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য আমাদের ঘটেছিল। প্রথম দিনই তাঁর সৌম্যমূর্ত্তি, সৌজন্য, নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা, বিশেষ তাঁর ঐকান্তিক মাতৃভক্তি আমাদের হৃদয়কে মুগ্ধ করেছিল। ঘনিষ্ট পরিচয়ে পরে তাঁর ধর্ম্ম নিষ্ঠা, অগাধ পাণ্ডিত্য, খৃষ্টশিষ্যের উপযোগী পরদুঃখ-কাতরতা, সহিষ্ণুতা ও ক্ষমা গুণের কথা ভাল করে জানবার সুযোগ হয়েছিল বটে কিন্তু প্রথম পরিচয়ের দিনে তিনি আপন মায়ের সম্বন্ধে যে কথা গুলি বলেছিলেন এখনও সে কথাগুলি মনের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে আছে। মায়ের কথা বলবার সময় তিনি যেন শিশুর মত হয়ে যেতেন; তাঁর কথা বলতে হলেই বলতেন My mother was an angel মা আমার দেবী ছিলেন। পাছে মায়ের কোনরূপ কষ্ট কি অসুবিধা হয়, তাই তিনি চির-কৌমার ব্রতধারী ছিলেন। যে ছেলেরা মাতৃভক্ত হয়, দেখা যায় তারাই নারীজাতির প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান। এদেশে স্ত্রীশিক্ষা যাতে প্রসর লাভ করে, সে বিষয়ে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। এই উদ্দেশ্যে লক্ষ্ণৌ মেয়েদের ডাইওসিজান কালেজে তিনি তাঁর অনেক ঐশ্বর্য্য দান করে গিয়েছেন। এ কাজ তাঁর হৃদয়ের উদারতার পরিচায়ক—এই কালেজও ইংরাজ মেয়ে এমন কি শুধু খৃষ্টান মেয়েদের জন্যেই নয়, এখানে সকল ধর্ম্মের সমস্ত জাতির মেয়েই শিক্ষা লাভ করে থাকে। খৃষ্টান অপেক্ষা ভিন্ন জাতি ও অন্য ধর্ম্মের ছাত্রই অধিক। এখানকার এই স্কুল এবং কালেজের পারিতোষিক বিতরণের সভায় প্রতি বৎসরই তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করতেন। উপদেশ দিবার সময় মেয়েরা যাতে ভাল মা হতে পারেন, সেই শিক্ষাই তাদের বিশেষ শিক্ষা, এই কথাটি বলতে কখনো ভুলতেন না—নিজের কথা বলে বলতেন, "আমি যদি কোন সদ্‌গুণের অধিকারী হয়ে থাকি, সুশিক্ষা লাভ করে মানুষনামের যোগ্য হতে পেরে থাকি সে সবই আমার মায়ের অনুগ্রহে—তাঁরি শিক্ষা ও যত্নে"। জাতিকে উন্নত করতে হলে মায়েদের সুশিক্ষা হওয়া প্রথম আবশ্যক এই ছিল তাঁর দৃঢ় মত এবং বিশ্বাস; তাই এদেশের মেয়েদের সুশিক্ষার জন্য প্রভূত সম্পত্তি দান করে তিনি সেই মতের সম্মান রক্ষা করে গিয়েছেন। এই দানই তাঁর নারী জাতির প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন আর এই হতভাগ্য দেশের প্রতি একান্ত প্রীতির পরিচয়।

ইউরোপে যে ভীষণ যুদ্ধ হয়ে গেল, সেই প্রসঙ্গে একদিন তিনি বলেছিলেন, আমরা আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছি, খৃষ্টশিষ্য হয়েও আমরা দারিদ্র্যের মাহাত্ম্য বুঝতে শিখিনি; এ যুদ্ধের আবশ্যকতা ছিল, আর যদি আমরা এই যুদ্ধ হতে জীবনের যথার্থ মূল্য বুঝতে পারি, যদি শিখতে পারি, ধর্ম্ম প্রথম, ক্ষমতা তার অনেক নীচে তবেই এ যুদ্ধের সব দুঃখ সার্থক হবে। ১৯১৭ সালের খৃষ্টের জন্মদিনে উপাসনামন্দিরে তিনি জর্ম্মানদিগেরও জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। তিনি যথার্থ সাধু, ভক্ত এবং বিশ্বাসী। যুদ্ধের সংস্রবে বার্ষিক উপাসনার দিনে যেভাবে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহাতে ভারত-প্রবাসী ইংরাজ সন্তুষ্ট হয় নাই। কিন্তু সেজন্য তাঁহার কুণ্ঠা ছিল না, তিনি শত্রুর জন্যও ভগবৎ-কৃপা প্রার্থনা করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেন না। তিনি যথার্থ খৃষ্টভক্তের ন্যায়ই নির্ভীক হৃদয়ে বলিয়াছিলেন শত্রুকেও প্রীতি এবং মার্জ্জনা করিতে হইবে।

এদেশের ছোট বড় সকলেরি প্রতি তাঁহার

আন্তরিক প্রীতি ছিল। একবার একটি জৈন বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ সভায় তিনি উপস্থিত ছিলেন—কয়েক জন উৎসাহী যুবক পল্লীর চামার ছেলে মেয়েকে একত্র করিয়া সন্ধ্যাকালে শিক্ষা দিতেন, এবং নির্দ্দোষ আমোদে অভ্যস্ত করিয়া তাদের পানদোষ প্রভৃতি সংশোধন করিতেছিলেন। অল্পকালের মধ্যেই ছাত্র ছাত্রীরা বিশেষ উন্নতি করিয়াছিল। ইহাদের অধিকাংশই হিন্দুস্থানী; সভা শেষ হইবার পূর্ব্বে ডাক্তার লেফ্রয় যে সুন্দর সরল সহজ উর্দ্দুতে তাদের উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা যাহারা শুনিয়াছিল, নিশ্চয়ই আজ পর্য্যন্ত ভুলিতে পারে নাই। বিদেশীর মুখে এমন পরিষ্কার উর্দ্দু, এমন সহৃদয় কথা ক্বচিৎ শোনা যায়। তিনি দিল্লীতে বহুকাল ছিলেন। চামারদিগকে উন্নত, ধর্ম্মপরায়ণ ও সৎপথে আনয়ন করিবার জন্য তিনিও সেখানে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। যাহারা সমাজে সকলের উপেক্ষিত হেয়, তাহাদের জন্যই তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়াছিল, তাহাদিগের মঙ্গল বিধানে সচেষ্ট হইয়া বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছিলেন। স্বদেশের লোক যাহাদের দূরে রাখে, তাহাদের দুর্দ্দশার কথা একবার মনেও করে না; বিদেশীর প্রাণ যদি তাহাদের জন্যই ব্যথিত হয়, ব্যাকুল হয়, তবে সে প্রাণ যে মহৎ প্রাণ, সে হৃদয় যে ভগবদ্ভক্তের উদার হৃদয় ছিল সে বিষয় আর সন্দেহ কি? এক একটি মানুষ জন্মে যাঁহাদের জাতি বর্ণ গোত্র ধর্ম্ম দেশ থাকিলেও তাঁহারা তাহারি গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকেন না উদার হৃদয়ের সহানুভূতির বলে বিশ্বমানবের আত্মীয় পদবীতে উন্নীত হয়েন। ডাক্তার বিশপ লেফ্রয় ছিলেন সেই পর্য্যায়ের মানুষ—তিনি বিদেশী হইয়াও আজ স্বদেশীর অপেক্ষা আমাদের আত্মীয়। খৃষ্টান হইয়াও তিনি কোন সঙ্কীর্ণ ধর্ম্মমন্দিরের মধ্যে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দূরে বসিয়া নাই; দেশে কালে যুগে যুগে যে একমাত্র ধর্ম্মকে মানুষের মন চিরদিন শ্রদ্ধা করিয়া আসিয়াছে,—ক্ষমার ধর্ম্ম, দয়ার ধর্ম্ম, ন্যায়ের ধর্ম্ম—সেই চিরন্তন ধর্ম্মের অধিকারী মানব, মৈত্রী-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ পুরোহিত তিনি, তাই আজ তাঁর স্মৃতিসভায় আমাদের হৃদয়ের একান্ত শ্রদ্ধা ও প্রীতি উদ্দেশে নিবেদন করিয়া চরিতার্থতা বোধ করিতেছি।

যিনি জীবের চরম গতি ও পরম আশ্রয় তিনিই তাঁহার আত্মার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল বিধান করুন।

বাঙ্গালা ভাষার নিজস্ব।

(শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ)

বাঙ্গালা ভাষার মূল কি? কোথা হইতে উহার উৎপত্তি? এই প্রশ্নের সমাধানার্থ অনুসন্ধানের ফলে মনীষিবৃন্দের দুই প্রকার অভিমত দেখা যায়। কাহারও মতে বাঙ্গালাভাষা প্রাকৃতভাষা হইতে উৎপন্ন, কাহারও মতে সংস্কৃত ভাষাই ইহার জননী বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। কিন্তু এই উভয় মতেই ইহার স্বাতন্ত্র্যব্যঞ্জক নিজস্বের কোনও উল্লেখ দেখা যায় না। এই উভয় মতের মধ্যে একটিরও সমীচীনতা অনুভূত হয় না। কারণ ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সুসমৃদ্ধ বঙ্গদেশ সর্ব্ববিষয়ে অন্যান্য দেশ হইতে স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়াও কেবল ভাষাবিষয়ে সর্ব্বতোভাবে পরতন্ত্র, একথা কিছুতেই নির্ব্বিবাদে স্বীকার করা যায় না। অতএব উহার মূলে কি তথ্য নিহিত রহিয়াছে, তাহা বিচার বিতর্কের দ্বারা স্থির করা আবশ্যক। এই দেশ কখনও নির্ম্মনুষ্য ছিল না। দেশান্তর হইতে আগত অধিবাসী উপনিবেশ স্থাপন করিয়া ইহাকে জনাকীর্ণ করিয়াছে, এরূপ কোনও প্রমাণ আবিষ্কৃত হয় নাই। প্রত্যুত স্মরণাতীত কাল হইতেই এই দেশে জনতার অধিষ্ঠানের প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষ থাকিলেই তাহার একটি ভাষাও থাকে, সুতরাং আদিম অধিবাসীদিগের কোন না কোনরূপ ভাষা ছিল বলিয়াই মানিয়া লইতে হইবে। সেই ভাষার সহিত ইদানীন্তন ভাষার কতটুকু সম্বন্ধ আছে, ইহার নিজস্বই বা কতটুকু, প্রথমতঃ তাহাই বিচার্য্য।

প্রাচীন সংস্কৃতগ্রন্থে দুই প্রকার ভাষার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার একটি আর্য্য ভাষা, অপরটি ম্লেচ্ছ ভাষা নামে অভিহিত হইয়াছে। দেবভাষা, দৈবী বাক্, যজ্ঞীয় বাক্ শব্দ ইত্যাদি আর্য্য ভাষারই নামান্তর। পক্ষান্তরে, ম্লেচ্ছভাষা, অপশব্দ অযজ্ঞীয় শব্দ প্রভৃতি নামে কথিত হইয়াছে।

যে সময়ে সভ্যজগতে যাগযজ্ঞের বাহুল্য ছিল, ঐ সময়ে ভাষাগত এই দ্বিবিধ পার্থক্যেরই পরিচয়

পাওয়া যায়। যজ্ঞ সময়ে যাজ্ঞিকগণ অপশব্দ অর্থাৎ অসংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিবার ব্যবস্থা আছে। মহাভাষ্যকার এই বিষয়ে একটী ব্রাহ্মণ বাক্য প্রদর্শিত করিয়াছেন। যথা—

"যাজ্ঞিকাঃ পঠন্তি আহিতাগ্নিরপশব্দং প্রযুজ্য প্রায়শ্চিত্তীয়াং সারস্বতীমিষ্টিং নির্বপেৎ"। ইহার অর্থ—যদি আহিতাগ্নি দ্বিজাতি অপশব্দের প্রয়োগ করেন, তবে সারস্বত যাগরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবেন। যাজ্ঞিকগণ এইরূপ পাঠ করেন অর্থাৎ তাহাদের ইহাই আদেশ। এইরূপ স্থলে আচার্য্য গোভিলও ক্রমে তিনটি সূত্র পাঠ করিয়াছেন। যথা—(১) ভাষেত যজ্ঞসংসিদ্ধিং। (২) নাযজ্ঞীয়াং বাচং বদেৎ। (৩) যদি অযজ্ঞীয়াং বদেৎ বৈষ্ণবীমৃচং যজুর্বাজপেৎ। ইহাদের স্থূল অর্থ—যজ্ঞসময়ে ব্রহ্মরূপে পরিকল্পিত ব্রাহ্মণ যজ্ঞ সম্পাদনের উপযোগী উপদেশ সংস্কৃত বাক্যের দ্বারা করিবেন, যদি তিনি অযজ্ঞীয় বাক্য অর্থাৎ অসংস্কৃতবাক্য উচ্চারণ করেন, তবে বৈষ্ণবী ঋক্ অথবা যজুর্মন্ত্র জপ করিবেন। এই বিষয়ে পাণিনীয় ভাষাবৃত্তির টীকাকার স্থষ্টিধরাচার্য্যও একটি বৃহস্পতিবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহা এইরূপ—

"নাসংস্কৃতাং বদেদ্বাণীং কর্ম্মকুর্ব্বন্নযজ্ঞীয়াং
যজ্ঞেঽপশব্দভাষী তু প্রায়শ্চিত্তীয়তে নরঃ॥

অর্থ—যজ্ঞকর্ম্মের অনুষ্ঠান সময়ে যজ্ঞকর্ত্তা অসংস্কৃতবাক্য প্রয়োগ করিবেন না; যদি অপশব্দ প্রয়োগ করেন, তবে প্রায়শ্চিত্ত করিবেন।

ব্যাকরণের প্রয়োজন কথন প্রসঙ্গে মহাভাষ্যকার আর একটী বৈদিক বাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা এই—"তস্মাদ্ব্রাহ্মণেন ন ম্লেচ্ছিতবৈ নাপভাষিতবৈ ম্লেচ্ছো হ বা এষ যদপশব্দঃ ম্লেচ্ছা-মাভূমেত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণং" ব্রাহ্মণ ম্লেচ্ছন অর্থাৎ অপশব্দ ব্যবহার করিবে না; কারণ যিনি অপশব্দ ব্যবহার করেন তিনিই ম্লেচ্ছ; আমরা ম্লেচ্ছ হইব না, এই উদ্দেশ্যেই ব্যাকরণ পাঠ করা কর্ত্তব্য। মনুসংহিতাতেও ম্লেচ্ছভাষা এবং আর্য্যভাষা এই দুই প্রকার ভাষার পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং আর্য্যভাষা বা সংস্কৃত ভাষার অতিরিক্ত যাবদীয় ভাষাই ম্লেচ্ছভাষা বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। অতএব ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায় যে মানবসভ্যতার সঙ্গে সঙ্গেই শব্দ এবং অপশব্দ চলিয়া আসিতেছে। কোন কোন মনীষীর মতে বৈদিক ভাষাই আদিম মানবদিগের সমস্ত ব্যবহার-সম্পাদক ভাষা। আপাতত ইহার অনুকূলরূপে বৃহদারণ্যকোপনিষদের একটি শ্রুতি উল্লেখযোগ্য। যথা—সোঽকাময়ত দ্বিতীয়োমে আত্মা জায়তেতি স মনসা বাচং মিথুনং সমভবৎ॥ সেই প্রসিদ্ধ মৃত্যু অর্থাৎ ঈশ্বর কামনা করিয়াছিলেন, আমার দ্বিতীয় আত্মা অর্থাৎ শরীর হউক, যাহাতে আমি শরীরী হইতে পারি, এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি বেদ-বাক্যের সহিত অর্থাৎ বেদে যে সকল শব্দ রহিয়াছে, তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া মিথুন-ভাব (স্ত্রী-পুরুষ ভাব) ধারণ করিলেন অর্থাৎ বেদ-প্রসিদ্ধশব্দানুসারে বস্তুজাতের নাম কল্পনা করিয়া ক্রমে সৃষ্টিব্যাপার আরম্ভ করিলেন। স্ত্রীপুরুষ উভয়ের দ্বারা যেমন সন্তানের উৎপাদন হয়, তেমনই ঈশ্বর ও বাক্য এতদুভয়ের দ্বারা সৃষ্টিপ্রক্রিয়া নিষ্পন্ন হইল। ভগবান্ মনুর উক্তিও এই মতের সমর্থন করিতেছে।

"সর্ব্বেষান্তু স নামানি কর্ম্মাণি চ পৃথক্ পৃথক্
বেদশব্দেভ্য এবাদৌ পৃথক্ সংস্থাশ্চ নির্ম্মমে"

অর্থ—সেই মহেশ্বর সৃষ্টির আদি সময়ে সমস্ত প্রাণিবর্গের পৃথক্ পৃথক্ সংস্থান ও কর্ম্ম বেদশব্দ হইতেই সৃষ্টি করিয়াছিলেন। শারীরক মীমাংসাতেও এইমত সমর্থিত হইয়াছে। বৈদিক ভাষায় ব্যাকরণের তত বাঁধন নাই, "কর্ণৈঃ কর্ণেভিঃ দেবাঃ দেবাসঃ" ইত্যাদি অনেক যাদৃচ্ছিক প্রয়োগ বৈদিক ভাষায় দেখিতে পাওয়া যায়। যদিও পাণিনি প্রভৃতির ব্যাকরণে এই ভাষাকেও সাধু করিবার জন্য প্রযত্নের ত্রুটি হয় নাই, তথাপি এমন কোনও রীতি অবলম্বিত হয় নাই, যাহার ফলে লৌকিক প্রয়োগের মত বৈদিক প্রয়োগ অব্যভিচরিতভাবে সিদ্ধ হইতে পারে। বৈদিক প্রক্রিয়ার অনেক সূত্রেই দেখা যায় "ছন্দসি বহুলং" এই এক ঘেঁয়ে সুরের কথার দ্বারা বেদে প্রযুক্ত অশুদ্ধ প্রয়োগের সাধুত্ব কীর্ত্তন করা হইয়াছে মাত্র। মানবজাতির সভ্যতা-বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাকরণাদির উদ্ভাবন হইয়াছে, এবং তাহার ফলে ভাষার সংস্কার অর্থাৎ পরিমার্জ্জন হইয়াছে। এই আগন্তুক সংস্কারের

ফলেই ইহার সংস্কৃত ভাষা এই নাম হইয়াছে। কিন্তু ব্যাকরণের দ্বারা সংস্কার লাভ করিয়া ভাষা সংস্কৃত নামে পর্য্যবসিত হইয়াছে, এই সিদ্ধান্ত সহজে মানিয়া লইবার উপায় নাই। কারণ যদি বেদের ভাষাকে অসংস্কৃত বলা যায়, তবে "যজ্ঞসময়ে অসংস্কৃত কথা বলিবে না" এই নিষেধ বাক্যের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। বেদের মন্ত্র ছাড়িয়া দিলে যজ্ঞনির্ব্বাহের উপায়ান্তর নাই। বিশেষতঃ বেদের ভাষা সংস্কারবর্জ্জিত নহে; প্রত্যুত উদাত্তাদি স্বরভেদের নিয়ম বেদমন্ত্রেই প্রভূতরূপে পালনীয়। ব্যাকরণকেও বেদপরবর্ত্তী আগন্তুক বলিবার উপায় নাই, কারণ বেদবাক্যেই ব্যাকরণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মহাভাষ্যকার দেখাইয়াছেন,—"ব্রাহ্মণগণ ইহা নিষ্কারণ ধর্ম্ম অর্থাৎ ইহার কোনও কাম্য ফল নাই, ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য, এই মনে করিয়া ষড়ঙ্গের সহিত বেদাধ্যয়ন করিবেন, এবং বেদের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিবেন (১), এইরূপ শ্রুতিবাক্য আছে। ষড়ঙ্গের মধ্যে ব্যাকরণ প্রধান অঙ্গ। এই শ্রুতিমূলক মীমাংসাদর্শনে এবং মীমাংসা সম্প্রদায়ের বিবিধগ্রন্থে নানারূপ বিচার ও মীমাংসা দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং ব্যাকরণকে ভাষার সংস্কারক আগন্তুক বলিয়া স্থির করা যায় না। যদি এই মত স্থির হয়, তবে এই ভাষার নাম সংস্কৃত হইল কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে যে ব্যাকরণাদি পাঠের দ্বারা যাহার বুদ্ধি এবং বাগিন্দ্রিয় সংস্কৃত অর্থাৎ পরিমার্জ্জিত হইয়াছে, তাদৃশ মানবই এই ভাষার ব্যবহারে সমর্থ হয়, হয়ত এইরূপ উপায়গত সংস্কৃতত্ব উপেয় পদার্থে উপচরিত হইয়া ভাষাকে সংস্কৃত নাম প্রদান করিয়া থাকিবে। অথবা ব্রহ্মা পূর্ব্বতন সংস্কারানুসারে বেদভাষার উচ্চারণ করিয়াছেন, তন্নিবন্ধনই ভাষার "সংস্কৃত" নাম সিদ্ধ হইয়াছে। বৈদিক ভাষা হইতেই অপভ্রংশ বা প্রাকৃত ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে, অনেকেই এই মতের পক্ষপাতী।

সংস্কৃতরূপ প্রকৃতি অর্থাৎ মূল হইতে উৎপত্তি নিবন্ধন ভাষার "প্রাকৃত" এই সংজ্ঞা হইয়াছে। প্রসিদ্ধ জৈনাচার্য্য হেমচন্দ্র সূরিকৃত গ্রন্থেও এই নিরুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। তিনি সংস্কৃত প্রাকৃত বিবিধ ব্যাকরণের রচয়িতা এবং "কলিকাল সর্ব্বজ্ঞ" বিশেষণে বিশিষ্ট হইলেও তাঁহার এই নিরুক্তি যুক্তিসহ বলিয়া মনে না। কারণ এমন অনেক প্রাকৃত শব্দ আছে, যাহাদের সহিত সংস্কৃত শব্দের অতি দূরসম্পর্কও অনুভূত হয় না; বিশেষতঃ তিনিও বৃহৎ মাগধী ব্যাকরণে "ন দেশ্যস্য" এই সূত্রে বলিয়াছেন যে দেশ্য অর্থাৎ তত্তদ্দেশপ্রসিদ্ধ প্রাকৃত শব্দের অনুশাসন (সূত্র) হইতে পারে না। যদি সংস্কৃতই সমস্ত প্রাকৃতের মূল হয়, তবে "দেশ্য" নামক স্বতন্ত্র শব্দের অস্তিত্বই অসম্ভব। প্রসিদ্ধ অলঙ্কারাচার্য্য দণ্ডীর মতেও সাহিত্যে প্রচলিত শব্দগুলি সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ ও মিশ্র এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে (২), তৎপর প্রাকৃত ভাষার সংস্কৃতোৎপন্ন, সংস্কৃতসম ও দেশী এই তিনপ্রকার ভাগ করা হইয়াছে (৩)। সুতরাং সংস্কৃত গন্ধরহিত দেশী প্রাকৃতের স্বতন্ত্র সত্তা স্পষ্টতই বিঘোষিত হইয়াছে। তাঁহার মতে গোয়াল জেলে চাণ্ডাল প্রভৃতির ভাষা কাব্য শাস্ত্রে অপভ্রংশ নামে পরিভাষিত হইয়াছে। শাস্ত্রে অর্থাৎ বেদানুসারী গ্রন্থে সংস্কৃত ভিন্ন যাবতীয় ভাষাই অপভ্রংশ নামে কথিত হইয়াছে (৪)। অতএব সুধীগণ ইহা অনায়াসেই বুঝিতে পারেন যে সংস্কৃত গন্ধরহিত দেশপ্রচলিত শব্দের অস্তিত্ব বিষয়ে মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের সন্দেহ হইতেই পারে না। বর্ত্তমান সময়ে যেমন হিন্দীভাষায় বিভিন্ন দেশবাসীর মনোগত ভাবের আদান প্রদান হয়, পক্ষান্তরে এক প্রদেশের চলতি ভাষা অপরদেশের লোকে বুঝিতে পারে না, পূর্ব্বকালেও তেমনি ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসীর পরস্পর কথোপকথনে ব্যাকরণ-নিয়ন্ত্রিত প্রাকৃত ভাষা ব্যবহৃত হইত বলিয়া মনে হয়। ছাত্রদিগকে ভালরূপে বুঝাইবার জন্য দেশভাষারও ব্যবহার হইত, কারণ দেশভাষায় মনের ভাব যতটা প্রকাশ পায়, অন্য কোনও ভাষাতেই ততটা প্রকাশ হইতে পারে না। এমন কি শিবধর্ম্মের একটি বচনে দেশভাষা ছাত্র বুঝাইবার একটি উপায়রূপে বিবেচিত

(১) ব্রাহ্মণেন নিষ্কারণো ধর্ম্মঃ ষড়ঙ্গো বেদোঽধ্যেয়ো জ্ঞেয় ইতি।

(২) তদেতদাদ্যং নাম সংস্কৃতং প্রাকৃতং তথা।
অপভ্রংশশ্চ মিশ্রশ্চেত্যাহুরার্য্যাস্তুরিধম্।

(৩) তদ্ভবস্তৎসমো দেশীত্যনেকঃ প্রাকৃতঃ ক্রমঃ।

(৪) আভীরাদিগিরঃ কাব্যেষপভ্রংশ ইতি স্মৃতাঃ।
শাস্ত্রেষু সংস্কৃতাদন্যদপভ্রংশতয়েব তে॥

হইয়াছে। তাহার অর্থ এই—"যিনি সংস্কৃত প্রাকৃত এবং দেশভাষা ও অন্যান্য উপায়ের দ্বারা শিষ্যকে বুঝাইতে পারেন, তিনি গুরু নামে অভিহিত হন (১)। প্রকৃতির নিয়মানুসারে মুখ হইতে যদৃচ্ছাক্রমে উচ্চারিত বলিয়া এই ভাষা প্রাকৃত নামে পরিচিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। জলবায়ুর পার্থক্য অথবা অন্য কোনও অপরিজ্ঞাত নৈসর্গিক কারণেই যে দেশভেদে বাগ্‌বৈচিত্র্য সংঘটিত হয়, তাহা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে। সুতরাং দেশভাষা মাত্রই সাধারণতঃ প্রাকৃত নামে অভিহিত হইবার যোগ্য। অধুনা বাঙ্গালা ভাষাকেও ব্যাকরণের দ্বারা অনেকটা শোধিত করিয়া বিভিন্ন দেশবাসী বাঙ্গালীর বোধগম্য একটি ভাষারূপে পরিণত করা হইতেছে বটে, কিন্তু বাঙ্গালার প্রাদেশিক ভাষার সংস্কার হয় নাই, এবং হইতে পারেও না; সর্ব্বজনীন প্রাকৃতের সহিত দেশ্য প্রাকৃতের এইরূপ প্রভেদ বিবেচিত হইয়াছিল। এই হিসাবে বাঙ্গালা ভাষাও একপ্রকার প্রাকৃত বলিয়া গণ্য হইতে পারে। পরমার্থতঃ বাঙ্গালাভাষা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিশুদ্ধ প্রাকৃত হইতে অথবা সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন হয় নাই। কারণ ইহার অন্যনিরপেক্ষ প্রভূত "নিজস্বের" পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষতঃ প্রত্যেক ভাষারই উৎপত্তি সম্বন্ধে বিচার করিয়া দেখিলে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে দেশজ কোনও ভাষাই সর্ব্বতোভাবে সংস্কৃত প্রাকৃত অথবা অন্য কোনও ভাষা হইতে সমুৎপন্ন হয় নাই। কোনপ্রকারে ইহার আত্মলাভ হইলেই ভিন্ন ভিন্ন ভাষা হইতে শব্দ আসিয়া ইহার পূর্ণতা সম্পাদন করিয়া থাকে।

সংস্কৃত ভিন্ন অন্যান্য সকল ভাষারই ভিত্তি সচল, ইহার প্রমাণ অনেক স্থলেই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সচল ভাষা এক শতাব্দীর মধ্যেই যে কতদূর রূপান্তরিত হইয়া থাকে, আমাদের বঙ্গভাষাই তাহার প্রকৃত নিদর্শন। রামমোহন রায় প্রভৃতি মনীষিবৃন্দের লেখনীপ্রসূত বাঙ্গালা হইতে বর্ত্তমান বাঙ্গলার প্রভূত প্রভেদ ঘটিয়াছে। সেকালের "আপনকার" বর্ত্তমানে "আপনার"রূপে পরিণত হইয়া ককারের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছে।

(১) সংস্কৃতৈঃ প্রাকৃতৈর্বাপি যঃ শিষ্যমনুরূপতঃ।
দেশভাষাদ্যুপায়ৈশ্চ বোধয়েৎ স গুরুঃস্মৃতঃ॥ আহ্নিকতত্ত্ব।

সংস্কৃত, প্রাকৃত ও বাঙ্গালা, এই তিন ভাষার স্বভাবের প্রতি লক্ষ্য করিলে প্রতীয়মান হয় যে মধ্যবর্ত্তী কতকগুলি বর্ণের তিরোভাব, স্বরসন্ধি, পূর্ব্বাপর স্বরের একীভাব ও বর্ণের স্থান পরিবর্ত্তন, এই ত্রিবিধ ভাষারই যেন সাধারণ। প্রাকৃত ব্যাকরণের একটি সূত্র আছে "ক গ চ জ তদ পয বাং প্রয়োলোপঃ" ইহার অর্থ অনাদিস্থিত অসংযুক্ত এই কয়টি বর্ণের প্রায়ই লোপ হয়, অর্থাৎ অনেক স্থলেই ইহাদিগকে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। অপর একটি সূত্রানুসারে (৪।১ প্রাকৃত প্রকাশ) সন্ধির প্রসক্তিস্থলে একস্বরের স্থানে অপর স্বর হয়, এবং কোন কোন স্থলে পূর্ব্বস্বরের লোপ হইয়া যায়। ইহা প্রকৃত পক্ষে সংস্কৃত ব্যাকরণপ্রসিদ্ধ পররূপ বা একীভাব বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য। যেমন দেব × কুলং = দেউলং। পূর্ব্বপ্রদর্শিত সূত্রানুসারে বকারের তিরোধান, ৪।১ সূত্রানুসারে অকারের লোপ হওয়ায় "দেউল" এইরূপ সিদ্ধ হয়।

পাণিনি প্রভৃতির ব্যাকরণে "শকন্ধ্বাদি"গণে পঠিত কতকগুলি শব্দের ঘটক স্বরবর্ণের পররূপ হইবার বিধান আছে। যেমন শক × অন্ধু = শকন্ধু ইত্যাদি। সুতরাং পাণিনীয় পররূপ ব্যবস্থা ও প্রাকৃতের লোপবিধান, এতদুভয়ের ফলগত কোনও প্রভেদ উপলব্ধ হয় না। সায়নাচার্য্য অথর্ব্ব বেদভাষ্যে (৯৯ পৃ, ঝগ্বেদ ম পৃ) মহীশব্দের নিরুক্তিকথনে বলিয়াছেন যে,—"মহতী = মহী। মহতী শব্দে ছান্দসঃ অচ্ছন্দলোপঃ"। অর্থ—ছান্দসরীত্যনুসারে মহতী শব্দে অংভাগের লোপ হওয়ায় "মহী" এইরূপ সিদ্ধ হইয়াছে। এইস্থলে স্পষ্টতঃ প্রাকৃতের রীতি প্রতিভাত হইতেছে। ছান্দস "অৎ" ভাগের লোপ কল্পনা না করিয়া প্রাকৃত রীত্যনুসারে "তী" ভাগের তকার লোপ এবং ৪।১ সূত্রানুসারে অকারের লোপ করিলেই অনায়াসে "মহী" এইরূপ সিদ্ধ হইতে পারে। সংস্কৃত ভাষার উচ্চস্তরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বেশ দেখিতে পাওয়া যায়, প্রকৃতির এই অপ্রতিহত শক্তি সংস্কৃত শব্দজগতেও রাজত্ব করিয়া আসিতেছে। উদাহরণস্বরূপ এইস্থলে কিঞ্চিৎ উপন্যস্ত হইতেছে। অভিধানে "কর্ম্মকার" ও "কর্ম্মার" এই দুইটি শব্দ

একার্থে পঠিত হইয়াছে। টীকাকারগণ উভয় শব্দেরই সাধুতাজ্ঞাপক নিরুক্তিও দেখাইয়াছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়,—কর্ম্মকার শব্দের ককার প্রাকৃত রীতিতে অন্তর্হিত হওয়ায় "কর্ম্ম আর" এইরূপ হইল; অনন্তর সন্ধি হওয়ায় "কর্ম্মার" এইরূপ সিদ্ধ হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

রামচরিত্রে ঋষিপ্রভাব।

(কথক—শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ন)

শ্রীরামচরিত্রের উপর দুইজন ঋষির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বিশ্বামিত্র ঋষির দ্বারা তাঁহার কর্ম্ম-জীবন গঠিত হইয়াছিল।

যজ্ঞবিঘ্ন নিবারণার্থে বিশ্বামিত্র শ্রীরামচন্দ্রকে পঞ্চদশবর্ষ বয়সের সময় লইতে আসিয়াছিলেন। ইহার অর্থ কি? এই বিঘ্ন নিবারণ করিতে কি তিনি নিজে অশক্ত ছিলেন? অথবা রাজা দশরথকেও লইয়া যাইতে পারিতেন? বিশ্বামিত্র এ সকল উপায় উপেক্ষা করিয়া শ্রীরামচন্দ্রকেই এ কার্য্যে ব্রতী করিলেন। ইহার অর্থ এই যে, বিশ্বামিত্র তখন ব্রাহ্মণ হইয়াছেন, যুদ্ধাদি ক্ষাত্র ধর্ম্ম। তপস্বীর এই সকল ক্ষুদ্র ব্যাপারে অভিশাপাদি দ্বারা তপোক্ষয় করা উচিত নহে। কঠোর তপস্যার সময় রম্ভাকে অভিশাপ দিয়া তিনি পরে অনুতপ্ত হইয়াছিলেন। ক্ষত্রিয়ের কার্য্য ব্রাহ্মণেরা করিলে সামাজিক বিশৃঙ্খলা ঘটে। রামায়ণের যুগে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের উপর বিশেষ লক্ষ্য ছিল। তাই শ্রীরামচন্দ্রের শূদ্র তপস্বীকে নিহত করিতে হইয়াছিল।

আর এক কারণ এই যে, শ্রীরামচন্দ্র যে কি বস্তু, জগতে তাঁহার দ্বারা কি মহৎ কার্য্য সাধিত হইবে তাহা ঋষিপ্রবর বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ভবিষ্যতে শ্রীরামচন্দ্রকে যে কি কার্য্য করিতে হইবে যৌবনোদ্গম সময়েই ঋষিপ্রবর তাঁহাকে সেই কার্য্যের উপযোগী করিয়া তুলিতে লাগিলেন। রাজপুরীর বিলাসিতার ভিতরে থাকিয়া চরিত্র অন্যরূপে গঠিত না হয় সেই জন্যই ঋষিপ্রবর আসিয়া কৌশলে শ্রীরামচন্দ্রকে লইয়া গেলেন।

শ্রীরামচন্দ্র তখন পঞ্চদশবর্ষীয় বালক মাত্র। দশরথ সেই কাকপক্ষধর বালককে আশঙ্কা-প্রযুক্ত বিশ্বামিত্রের সহিত প্রেরণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন, কহিলেন;—

বালং মে তনয়ং ব্রহ্মন্নৈব দাস্যামি পুত্রকম্।
অথ কালোপমৌ যুদ্ধে সুতৌ সুন্দোপসুন্দয়োঃ॥
যজ্ঞবিঘ্নকরৌ তৌ তেনৈব দাস্যামি পুত্রকম্।
(বাল্মীকিরামায়ণম্ আদিকাণ্ডম্)

ইহা শুনিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্র কহিলেন—

ইতি নরপতিজল্পনাৎ দ্বিজেন্দ্রম্।
কুশিকসুতং সুমহান্ বিবেশ মন্যুঃ॥
সুহুত ইব মখেঽগ্নিরাজ্যসিক্তঃ।
সমভবদুজ্জ্বলিতো মহর্ষি বহ্নিঃ॥
(বাল্মীকিরামায়ণম্ আদিকাণ্ডম্)

কৌশিক-দ্বিজেন্দ্র বিশ্বামিত্র নৃপতির এই কথা শুনিয়া আজ্যসিক্ত যজ্ঞীয় বহ্নির ন্যায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলেন। তখন রাজাকে বলিলেন—

পূর্ব্বমর্থং প্রতিশ্রুত্য প্রতিজ্ঞাং হাতুমিচ্ছসি।
রাঘবানাময়ুক্তোঽয়ং কুলস্যাস্য বিপর্য্যয়ঃ॥
যদীদং তে ক্ষমং রাজন্ গমিষ্যামি যথাগতম্।
মিথ্যাপ্রতিজ্ঞঃ কাকুৎস্থ সুখী ভব সুহৃদ্বৃতঃ॥
(বাল্মীকিরামায়ণম্ আদিকাণ্ডম্)

রাজন্ পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়া এখন আপনি তাহা পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। ইহা রঘুকুলের নিতান্ত গর্হিত আচরণ; ইহাই যদি আপনি উপযুক্ত বোধ করেন, আমি তাহা হইলে নিজস্থানে প্রতিগমন করি, আপনিও বৃথা প্রতিজ্ঞ হইয়া বন্ধুগণের সহিত সুখে অবস্থান করুন।

তখন ভীত দশরথকে মহামুনি বশিষ্ঠদেব বুঝাইলেন। বশিষ্ঠের কথায় আশ্বস্ত হইয়া দশরথ শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে বিশ্বামিত্রের সহিত যাইতে অনুমতি দিলেন।

প্রকৃতই কি বিশ্বামিত্রের ক্রোধোদ্রেক হইয়াছিল? কখনই নহে। ইহা ঋষিজনোচিত কৃত্রিম কোপ মাত্র। মহাকার্য্য সম্পাদনকালে ঋষিগণ এ প্রকার অনেক উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। যেমন ন্যায়ের প্রতিমূর্ত্তি দুর্ব্বাসার ক্রোধের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। এ জাতীয় ক্রোধাদি ঋষিজীবনের বিরোধী নহে। আধুনিক ইংরেজীশিক্ষিত

ব্যক্তিগণ অনেক সময় এই কথাটুকু ভুলিয়া গিয়া ইহচরিত্র সম্বন্ধে বড়ই অবিচার করিয়া বসেন।

শ্রীরামচন্দ্রের বীরত্ব-গৌরব যাহা কিছু, সে সকলই বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক প্রদত্ত। প্রথমতঃ, তাঁহাকে বলা ও অতিবলা নাম্নী দুইটী বিদ্যা দান করিলেন। সেই বিদ্যা দুইটির গুণ এই—

ন শ্রমো ন জ্বরো বা তেন রূপস্য বিপর্য্যয়ঃ।
ন চ সুপ্তং প্রমত্তং বা ধর্ষয়ন্তি নৈঋতাঃ॥
ন বান্তোঃ সদৃশো বীর্য্যে পৃথিব্যামস্তি কশ্চন।
ত্রিষু লোকেষু বা রাম ন ভবেৎ সদৃশস্তব॥
বলাঞ্চাতিবলাঞ্চৈব সর্ব্বজ্ঞানস্য মাতরৌ।
ক্ষুৎপিপাসে ন তে রাম ভবিষ্যেতে নরোত্তম॥
বলামতি বলাঞ্চৈব পঠতঃ পথিবাদ্যব।
বিদ্যাদ্বয়মধীয়ানে যশশ্চাথ ভবেদ্ভুবি॥
কামংবহুগুণাঃ সর্ব্বে ত্বয্যেতে নাত্রসংশয়ঃ।
তপসা সম্ভৃতে চৈতে বহুরূপে ভবিষ্যতঃ॥

(বাল্মীকি রামায়ণম্—আদিকাণ্ডম্।)

তারপর ঋষিপ্রবর শ্রীরামচন্দ্রের তাড়কা রাক্ষসী বধের পর দেবরাজ ইন্দ্র কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া ভগবান্ কুশাশ্বের তপোবলসম্ভূত অস্ত্রসমূহ প্রয়োগ ও প্রতিসংহার কৌশল সহিত দান করিয়াছিলেন।

বিশ্বামিত্রের সহিত যে কয়দিন শ্রীরামচন্দ্রের ও লক্ষ্মণের আসিতে হইয়াছিল, ততদিন তাঁহাদেরও মুনিঋষির মত থাকিতে হইয়াছিল। কুশ-শয্যায় শয়ন, অতি প্রত্যূষে স্নানাদি করিয়া সন্ধ্যাবন্দন সমাপন করিতে হইত।

বিশ্বামিত্র এই দুই ভ্রাতাকে ভাগীরথীর উত্তর দক্ষিণদিকের দেশসমূহ ভ্রমণ করাইয়া জনক রাজার ভবনে লইয়া গিয়াছিলেন। এই দেশ ভ্রমণকালীন পথিমধ্যে ঋষিপ্রবর শ্রীরামচন্দ্রকে তাঁহার পিতৃপিতামহগণের অদ্ভুত কীর্ত্তিগাথা সকল শুনাইলেন। শ্রীরামচন্দ্র দেশভ্রমণে বহুদর্শী এবং ইতিহাসজ্ঞ হইলেন। এই দেশভ্রমণ করার ও ইতিহাসজ্ঞ হওয়ার যে কি উপকারিতা, দুঃখের বিষয় আমরা তাহা যেন দিন দিন ভুলিয়া যাইতেছি।

মহর্ষি বিশ্বামিত্রের মত সঙ্গী সমভিব্যাহারে যৌবনের প্রারম্ভে সংযতচিত্তে দেশভ্রমণ করিতে করিতে তত্তৎস্থানীয় প্রাচীন কীর্ত্তি শ্রবণ করা প্রকৃতই কতই আনন্দের বিষয়। প্রায় মহাত্মাগণের জীবনেই এইরূপ দেশভ্রমণাদি দ্বারা সুশিক্ষা লাভের দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—অর্জ্জুন, বলরাম প্রভৃতির বহুদেশ পর্য্যটনের কথা পুরাণে বর্ণিত আছে। সংযম, অধ্যবসায়, এবং ঐকান্তিকী তপস্যা ব্যতিরেকে মহজ্জীবন গঠিত হয় না। শ্রীকৃষ্ণকেও সন্দীপনী মুনির নিকটে অধ্যয়ন করিতে হইয়াছিল। চৈতন্যদেবও প্রথম জীবনে অধ্যবসায়ী ছাত্র ছিলেন। বুদ্ধদেবও প্রথমে বিশ্বামিত্র নামক একজন পণ্ডিতের নিকট বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। উক্ত প্রকারে বিশ্বামিত্রের দ্বারায় শ্রীরামচন্দ্রের প্রথম জীবন গঠিত হইয়াছিল।

বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত

গীতা-রহস্য।

নবম প্রকরণ।

অধ্যাত্ম।

পরস্মাত্তস্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি॥ *

গীতা. ৮. ২০

পূর্ব্ববর্ত্তী দুই প্রকরণের মর্ম্মার্থ এই যে, ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ-বিচারে যাহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলে তাহারই নাম সাংখ্যশাস্ত্রে পুরুষ; সমস্ত ক্ষরাক্ষর বা চরাচর জগতের সংহার ও সৃষ্টির বিচার করিবার সময়, সাংখ্যমতানুসারে শেষে প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুই-ই স্বতন্ত্র ও অনাদি মূলতত্ত্ব থাকিয়া যায়; এবং আপনার সমস্ত দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি করিয়া মোক্ষলাভ করিতে হইলে, প্রকৃতি হইতে আপন ভিন্নতা অর্থাৎ কৈবল্য উপলব্ধি করিয়া পুরুষের ত্রিগুণাতীত হওয়া চাই, প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ হইলে পর প্রকৃতি আপন প্রপঞ্চ পুরুষের সম্মুখে কেমন করিয়া বিস্তার করে এই বিষয়ের ক্রম আধুনিক সৃষ্টিশাস্ত্রবেত্তাগণ সাংখ্যশাস্ত্র হইতে কিঞ্চিৎ ভিন্ন করিয়া বলিয়াছেন; এবং আধিভৌতিক শাস্ত্র সমূহে যেমন যেমন উন্নতি হইবে, তেমনি তেমনি এই ক্রম বিষয়ে আরও সংশোধন হইতে থাকিবার সম্ভাবনা আছে। যাই হোক, এক অব্যক্ত প্রকৃতি হইতেই সমস্ত ব্যক্ত পদার্থ গুণোৎকর্ষ অনুসারে ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হইয়াছে, এই মূল সিদ্ধান্তে কোনই পার্থক্য হইতে পারে না। তথাপি, এই বিষয় অন্য শাস্ত্রের, আমাদের নহে, এইরূপ মনে করিয়া বেদান্ত-কেশরী সেই সম্বন্ধে

* "সেই (সাংখ্য) অব্যক্ত হইতেও শ্রেষ্ঠ ও সনাতন যে অন্য অব্যক্ত পদার্থ, যাহা সমস্ত প্রাণী বিনষ্ট হইলেও নাশ পায় না", তাহাই চরম গতি।

বিবাদ করিতে বসেন না। তিনি এই সমস্ত শাস্ত্রের অগ্রে চলিয়া পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডেরও মূলে কোন্ শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব আছে এবং মনুষ্য কেমন করিয়া সেই শ্রেষ্ঠতত্ত্বে মিলিত হইতে পারে অর্থাৎ কেমন করিয়া তদ্রূপ হইতে পারে তাহা বুঝাইবার জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহার এই রাজ্যের মধ্যে অন্য কোন শাস্ত্রের গর্জ্জন চলিতে দেন না। সিংহের সম্মুখে যেরূপ শৃগাল চুপ্ হইয়া যায় সেইরূপ বেদান্তের সম্মুখে অন্য শাস্ত্রসকলও নীরব হইয়া যায়। তাই একজন প্রাচীন সুভাষিতকার বেদান্তের যথার্থ বর্ণনা করিয়াছেন যে,—

তাবৎ গর্জ্জন্তি শাস্ত্রাণি জম্বুকা বিপিনে যথা।
ন গর্জ্জতি মহাশক্তিঃ যাবৎবেদান্ত-কেসরী॥

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞের বিচারান্তে নিষ্পন্ন 'দ্রষ্টা' অর্থাৎ পুরুষ বা আত্মা এবং ক্ষরাক্ষর জগতের বিচারান্তে নিষ্পন্ন সত্ত্ব-রজ-তমোগুণময়ী অব্যক্ত প্রকৃতি স্বতন্ত্র হওয়ায়, জগতের মূলতত্ত্বকে এইরূপ দ্বিধা বলিয়া মানিতেই হয়—এইরূপ সাংখ্য বলেন। কিন্তু বেদান্ত আরও অগ্রসর হইয়া এইরূপ বলেন যে, সাংখ্যের পুরুষ নির্গুণ হইলেও অসংখ্য হওয়া প্রযুক্ত ইহা মানা সংগত নহে যে, এই অসংখ্য পুরুষের লাভ কিসে হয় তাহা বুঝিয়া প্রত্যেক পুরুষের সহিত তদনুসারে ব্যবহার করিবার সামর্থ্য প্রকৃতির আছে। এরূপ মানা অপেক্ষা সাত্ত্বিক তত্ত্বজ্ঞানের দৃষ্টিতে ইহা স্বীকার করাই অধিক যুক্তি সংগত হইবে যে, ঐ একীকরণের জ্ঞানক্রিয়ার শেষ পর্য্যন্ত নির্ব্বিবাদ প্রয়োগ করা হোক এবং প্রকৃতি ও অসংখ্য পুরুষের একই পরমতত্ত্বে অবিভক্ত রূপে সমাবেশ করা হোক যাহা "অবিভক্তং বিভক্তেষু" এই অনুসারে নিম্ন হইতে উচ্চ পর্য্যন্ত শ্রেণী সমূহে দেখা যায় এবং যাহার সহায়তাতেই সৃষ্টির অনেক ব্যক্ত পদার্থ এক অব্যক্ত প্রকৃতিতে সমাবেশ করা হয় (গী. ১৮-২০-২২)। ভিন্নতার অবভাস হওয়া অহঙ্কারের পরিণাম; এবং পুরুষ যদি নির্গুণ হয়, তবে অসংখ্য পুরুষের পৃথক থাকিবার গুণ উহাতে থাকিতে পারে না। কিংবা বলিতে হয় যে, বস্তুত পুরুষ অসংখ্য নহে! প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন অহঙ্কার-গুণরূপী উপাধির কারণেই উহাতে অসংখ্যতা দেখা যায়। তা ছাড়া আর এক প্রশ্ন এই উঠে যে, স্বতন্ত্র প্রকৃতির সহিত স্বতন্ত্র পুরুষের যে সংযোগ হইয়াছে তাহা সত্য বা মিথ্যা? সত্য বলিয়া মানিলে সেই সংযোগ কখনই দূর হইতে পারে না, সুতরাং সাংখ্যমতানুসারে আত্মা কখনই মুক্তি লাভ করিতে পারে না। মিথ্যা বলিয়া যদি মানা যায়, তাহা হইলে, পুরুষের সংযোগ প্রযুক্ত প্রকৃতি, পুরুষের সম্মুখে নিজের বাজার সাজাইতে যে বসিয়া যান, সে কথা নির্ম্মূল হয়। গাভী যেরূপ বাছুরের জন্য দুধ দেয় সেইরূপ পুরুষের লাভের জন্যই প্রকৃতি কার্য্যতৎপর থাকেন, এই দৃষ্টান্তও খাটে না; কারণ, গরুর পেটেই বাছুর হয় বলিয়া বাছুরের উপর গরুরসন্তান বাৎসল্যের উদাহরণ যেরূপ দেখান যায়, প্রকৃতি ও পুরুষ সম্বন্ধে সেরূপ দেখান যায় না (বেসূ. শাং ভা. ২-২-৩)। প্রকৃতি ও পুরুষ সাংখ্য-শাস্ত্রানুসারে মূলেই অত্যন্ত ভিন্ন—একটি জড়, আর একটি সচেতন। জগতের আরম্ভ হইতেই এই দুই পদার্থ যদি অত্যন্ত ভিন্ন ও স্বতন্ত্র হইল, তবে আবার একের প্রবৃত্তি অন্যটির লাভের জন্য কেন হইবে? ইহাই উহাদের স্বভাব, ইহা কিছুমাত্র সন্তোষজনক উত্তর নহে। স্বভাব-কেই যদি মানিতে হয়, তাহা হইলে হেকলের জড়াদ্বৈত মন্দই বা কি? মূল প্রকৃতির গুণের বৃদ্ধি হইতে হইতে সেই প্রকৃতিতে আপনাকে দেখিবার ও আপনার সম্বন্ধে বিচার করিবার চৈতন্য-শক্তি উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ ইহা তাহার স্বভাবই, হেকলেরও ইহাই সিদ্ধান্ত, কি না? কিন্তু এইমত স্বীকার না করিয়া সাংখ্যশাস্ত্র এই ভেদ করিয়াছেন যে, 'দ্রষ্টা' পৃথক এবং 'দৃশ্যজগৎ' পৃথক। এখন এই প্রশ্ন উপস্থিত হয় যে, যে ন্যায়ানুসারে এই ভেদ দেখান হয় সেই ন্যায়ের উপযোগ করত আরও অগ্রে চলিব না কেন? বাহ্য জগৎ তন্নতন্ন পরীক্ষা করিলেও এবং চক্ষুর মায়ুর মধ্যে অমুক অমুক গুণধর্ম্ম আছে নির্দ্ধারণ করিলেও, এই সকল বিষয়ের জ্ঞাতা বা 'দ্রষ্টা' ভিন্ন রহিয়াই যায়। 'দ্রষ্টা' পুরুষ 'দৃশ্য জগৎ' হইতে ভিন্ন, ইহা বিচার করিবার কোন সাধন বা উপায় কি নাই; এবং ইহা জানিবার কোন মার্গ আছে কি নাই যে, এই দৃশ্য জগতের প্রকৃত স্বরূপ, আমাদের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা যেরূপ দেখি তাহাই ঠিক্ কিংবা তাহা হইতে ভিন্ন? সাংখ্যবাদী বলেন যে, এই প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া অসম্ভব বলিয়া প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুই তত্ত্ব মূলেই ভিন্ন ও স্বতন্ত্র এইরূপ ধরিয়া লইতেই হয়। নিছক আধিভৌতিক শাস্ত্রের পদ্ধতি অনুসারে বিচার করিলেও সাংখ্যের উক্ত মত অসঙ্গত বলিতে পারা যায় না। কারণ, জগতের অন্য পদার্থ যেরূপ আমাদের ইন্দ্রিয়ের গোচর হইলে আমরা তাহাদের গুণধর্ম্মের পরীক্ষা করিয়া থাকি, সেইরূপ এই 'দ্রষ্টা' পুরুষ যাহাকে বেদান্ত 'আত্মা' বলেন সেই দ্রষ্টার অর্থাৎ আপনারই ইন্দ্রিয়ের ভিন্ন-ভিন্নরূপে কখনও গোচর হইতে পারে না। এবং যে পদার্থ এইরূপ ইন্দ্রিয়ের গোচর হইতে পারে না অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াতীত, মানবী ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাহার পরীক্ষা কি প্রকারে সম্ভব? ভগবান ভগবদ্ গীতাতেও ঐ আত্মার এইপ্রকার বর্ণনা করিয়াছেন—

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥(গী-২.২৩)

অর্থাৎ আত্মা এরূপ পদার্থ নহে যে জগতের অন্য পদা-

র্থের ন্যায় আমরা তাহার উপর উষ্ণ জল প্রভৃতি তরল পদার্থ ঢালিয়া দিলে তাহা দ্রব হইবে, কিংবা প্রয়োগশালার তীক্ষ্ণ শস্ত্রের দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহার আন্তরিক স্বরূপ দেখিয়া লইব, অথবা অগ্নির উপর রাখিলে তাহা ধোঁয়া হইয়া যাইবে কিংবা বাতাসে তাহা শুকাইয়া যাইবে! সারকথা, জাগতিক পদার্থের পরীক্ষা করিবার, আধিভৌতিক শাস্ত্রবেত্তাদিগের যে কোন উপায় আছে সে সমস্ত এস্থলে নিষ্ফল হইয়া যায়। তখন সহজেই প্রশ্ন উঠে যে, আত্মার পরীক্ষা হইবে কি প্রকারে? প্রশ্নটা কঠিন বলিয়া মনে হয় সত্য; কিন্তু একটু বিচার করিয়া দেখিলে ইহার মধ্যে কিছুই কঠিন নাই। সাংখ্যবাদীগণ তবে 'পুরুষ' নির্গুণ ও স্বতন্ত্র কিরূপে স্থির করিলেন? আপন অন্তঃকরণের অনুভূতি হইতেই কি নহে? তবে এই রীতিই প্রকৃতি ও পুরুষের স্বরূপ নির্ণয়ে কেন প্রয়োগ করা যাইবে না? আধিভৌতিক শাস্ত্রের বিষয় ইন্দ্রিয়গোচর হইয়া থাকে; এবং অধ্যাত্মশাস্ত্রের বিষয় ইন্দ্রিয়াতীত অর্থাৎ নিছক স্বসম্বেদ্য অথবা আপনিই আপনাকে জানিবার যোগ্য। কেহ যদি এইরূপ বলেন যে, আত্মা যদি স্বসম্বেদ্য হয় তবে প্রত্যেক মনুষ্যের ঐ বিষয়ে যেরূপ জ্ঞান হইবে তাহাই হইতে দাও; তবে অধ্যাত্মশাস্ত্রের প্রয়োজন কি? হাঁ, প্রত্যেক মনুষ্যের মন কিংবা অন্তঃকরণ যদি সমান শুদ্ধ হয়, তবে এই প্রশ্ন যোগ্য প্রশ্ন হইবে। কিন্তু যখন সকল লোকের মনের শুদ্ধি ও শক্তি এক প্রকার নহে বলিয়া আমরা জানি; তখন যাঁহাদের মন অত্যন্ত শুদ্ধ, পবিত্র ও বিশাল, তাঁহাদেরই প্রতীতি এই বিষয়ে আমাদের প্রমাণ বলিয়া মানিতে হইবে। অনর্থক "আমার এইরূপ মনে হয়" কিংবা "তোমার এইরূপ মনে হয়" বলিয়া বাদবিতণ্ডা বাড়াইয়া কোন লাভ নাই। যুক্তিবাদ ছাড়িয়া দেও বেদান্তশাস্ত্র সে কথা একেবারেই বলেন না। বেদান্ত শাস্ত্র ইহাই বলেন যে, অধ্যাত্মশাস্ত্রের বিষয় স্বসম্বেদ্য অর্থাৎ নিছক আধিভৌতিক যুক্তির দ্বারা নির্ণীত হইবার নহে বলিয়া যে সকল যুক্তি অত্যন্ত শুদ্ধ, পবিত্র ও বিশাল মন-বিশিষ্ট মহাত্মাদিগের এই বিষয়ে অপরোক্ষ অর্থাৎ সাক্ষাৎ অনুভবের বিরুদ্ধে না যায় সেই সকল যুক্তিই গ্রাহ্য হইতে পারে। আধিভৌতিক শাস্ত্রে যেরূপ প্রত্যক্ষের বিরুদ্ধ এই অনুভব ত্যাজ্য বলিয়া মানা হয়, সেইরূপ বেদান্তশাস্ত্রে যুক্তি অপেক্ষা উক্ত স্বানুভূতির অর্থাৎ আত্মপ্রতীতির প্রামাণিকতা অধিক বলিয়া বিবেচিত হয়। যে যুক্তি এই অনুভূতির অনুকূল তাহাই বেদান্তীদিগের মান্য। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য আপন বেদান্তসূত্রের ভাষ্যে এই সিদ্ধান্তই দিয়াছেন। অধ্যাত্মশাস্ত্রের অনুশীলনকারীদিগের ইহা সর্ব্বদা মনে রাখা আবশ্যক—

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ সাধয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যত্তু তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥

"ইন্দ্রিয়াতীত হওয়া প্রযুক্ত যে পদার্থের চিন্তা করা অসাধ্য তাহার নির্ণয় কেবল তর্কের দ্বারা কিংবা অনুমানের দ্বারা করিবে না; সমস্ত জগতের মূল প্রকৃতিরও বাহিরে যে পদার্থ তাহা এইরূপ অচিন্তনীয়"। এই একটী পুরাতন শ্লোক মহাভারতের মধ্যে (মভা. ভীষ্ম. ৫. ১২) পাওয়া যায় এবং 'সাধয়েৎ' ইহার বদলে 'যোজয়েৎ' এইরূপ পাঠভেদে বেদান্তসূত্র সম্বন্ধীয় শ্রীশঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যেতেও গৃহীত হইয়াছে (বেসূ. শাং ভা. ২.১. ২৭)। মুণ্ডক ও কঠোপনিষদেও আত্মজ্ঞান শুধু তর্কের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, ইহা কথিত হইয়াছে (মুং. ৩.২. ৩; কঠ ২. ৮, ৯ ও ২২)। অধ্যাত্মশাস্ত্রে উপনিষদ্ গ্রন্থাদির বিশেষ মাহাত্ম্যের কারণও ইহাই। মনকে কি করিয়া একাগ্র করিবে, সে বিষয়ে প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে অনেক আলোচনা হইয়া পরিশেষে এই বিষয়ে (পাতঞ্জল) যোগশাস্ত্র নামক এক স্বতন্ত্র শাস্ত্রই রচিত হইয়াছে। যে সকল বড় বড় ঋষি এই শাস্ত্রে নিপুণ ছিলেন, এবং স্বভাবতই যাঁহাদের মন পবিত্র ও বিশাল ছিল, এইরূপ মহাত্মাগণ মনকে অন্তর্মুখ করিয়া আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে যে অনুভূতি পাইয়াছিলেন, কিংবা সেই সম্বন্ধে তাঁহাদের শুদ্ধ ও শান্ত বুদ্ধির যে স্ফুরণ হইয়াছিল তাহাই উপনিষদ্গ্রন্থে কথিত হইয়াছে। তাই, যে কোন অধ্যাত্মতত্ত্বের নির্ণয় করণে এই শ্রুতিগ্রন্থ সমূহে কথিত অনুভূতির শরণ গ্রহণ ভিন্ন আমাদের অন্য পন্থা নাই (কঠ. ৪. ১)। মনুষ্য কেবল স্বীয় তীক্ষ্ণবুদ্ধির দ্বারা এই আত্মপ্রতীতির পোষক ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের যুক্তি দেখাইতে পারে; কিন্তু তন্নিবন্ধন মূল-প্রতীতির প্রামাণ্য এতটুকুও ন্যূনাধিক হইতে পারে না। ভগবদ্গীতা স্মৃতি গ্রন্থের অন্তর্গত সত্য; কিন্তু এই বিষয়ে তাহার যোগ্যতা উপনিষদের সমানই স্বীকৃত হয় ইহা প্রথম প্রকরণের আরম্ভেই বলিয়াছি। এতএব গীতা ও উপনিষদে প্রকৃতির অতীত এই অচিন্ত্য পদার্থ সম্বন্ধে কি-কি সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে; এবং উহাদের কারণের অর্থাৎ শাস্ত্ররীতিতে উহাদের উপপত্তির বিচার এই প্রকরণের শেষ দিকে করা হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

রাণাডের-স্মৃতি কথা।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

"করমালা" তালুকে পীড়া।

২৬, ২৭, ২৮ ফেব্রুয়ারী ১৮৯১।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনূদিত)

১৮৮৮ অব্দে কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিলে, কৃষি-বিভাগের স্পেশ্যাল জজ্ ডাঃ পোলনের জায়গায় ওঁর স্থায়ী

নিয়োগ হইল। যখন উনি এসিষ্ট্যাণ্ট স্পেশ্যাল জজ্ ছিলেন তখন ওঁর পুণা ও সাতারা এই দুই জেলার আদালতের তত্বাবধান করিতে হইত। কিন্তু এখন পুণা সাতারা নগর ও শোলাপুর এই চার জেলায় ভ্রমণ করিতে হইত বলিয়া আট মাস ভ্রমণেই কাটিয়া যাইত। তদনুসারে আমরা ১৮৮৯ জানুয়ারী মাসে নগর জেলায় ভ্রমণ করিতে গেলাম। সমস্ত জেলা ভ্রমণ করিয়া শোলাপুর জেলায় আসিতে আমাদের দেড়মাস লাগিল। এই বৎসরে ২৬শে ফেব্রুয়ারীতে আদমসুমারী হয়। সেই দিন এদিককার কাজ সারিয়া এবং শোলাপুর জেলার অন্তর্গত "করমালা"-তালুকে আফিস ও সমস্ত লোকজন রাখিয়া আমরা দুই দিন পুণায় থাকিয়া আসিব এইরূপ মৎলব করিলাম এবং সেইজন্য নগর-জেলার কাজ তাড়াতাড়ি সারিয়া আমরা করমালায় আসিলাম। সেখানকার কাজ দুই দিনে সারিয়া আফিস সমেত সমস্ত লোককে শোলাপুরে রওনা করিয়া দিয়া আমরা আদমসুমারীর জন্য পুণায় যাইব এরূপ উনি আমাকে বলিলেন ও স্থির করিলেন।সেই অনুসারে তারপর দিন সমস্ত সময় একটুও বিশ্রাম না করিয়া রাত্রি পর্য্যন্ত কাজ করিলেন। সেইজন্য খাইতে উঠিতেও একটু দেরী হইয়া গেল। আহারান্তে সেইদিন পড়া শুনিলেন না। তারপর দিন সকালে নিত্যানুসারে উঠিয়া কোকো পান করিয়া ভ্রমণে :বাহির হইলেন। এই ক্ষেপে, চিরঞ্জীব সখুকে সঙ্গে লওয়া হইয়াছিল। সে মোটে ১০ মাসের হওয়ায় সকাল বেলাটা তার কাজেই আমাকে থাকিতে হইত। তথাপি যত শীঘ্র সম্ভব সেই সব কাজ সারিয়া ওঁর বাড়ী ফিরিবার পূর্ব্বে, :পাঠের জন্য: আমাকে প্রস্তুত থাকিতে হইত; কারণ :সকাল বেলায় উনি ৮টা, ৯টার সময় বাড়ী আসিলে পর, ইংরেজী পাঠের জন্য ঘণ্টা দেড়েক পাওয়া যাইত। কোনদিন আমার :নিজের কাজ সারিতে না পারিলে, সেই দিনটা বৃথায় যাইত, এবং তারপরদিন ছাড়া ওঁর কাছে পড়িবার আর সুযোগ হইত না; তাই, পারত-পক্ষে :আমি সময় নষ্ট হইতে দিতাম না—ঠিক সময়ে প্রস্তুত থাকিতাম। এই সময় আমি মেডোজ-টেলারের "তারা" নামক পুস্তক পড়িতে লইয়াছিলাম। সেইদিন ওঁর বাহির হইতে ফিরিয়া আসিতে ৯টা বাজিয়া গিয়াছিল। আমি পুস্তক, খাতা ও পেনসিল লইয়া অপেক্ষা করিতেছিলাম। উনি বাড়ী আসিলে পর আমি সহজভাবে বলিলাম। "আজ ভ্রমণের জন্য বেশী সময় দিয়াছিলে? এই তালুকের কাজ কি কম মনে হয়? এটা নূতন ছোলা-ফসলের সময় গ্রামের লোকদের এখন খুব গরজ; সেখানে মুনসেফদের নানাপ্রকার অনুরোধ উপরোধ করে; এই অনুরোধ উপরোধ অগ্রাহ্য করতে না পেরে নিরুপায় হ'য়ে ২টার সময় আদালৎ বন্ধ করে মুনসেফদের চলে যেতে হয়; সেইজন্য তদন্তের কাজটা সামান্য রকমই হয়ে থাকে" এই কথায় উনি বলিলেন "একেইত দেরী হয়ে গেছে, কথা কয়ে আর সময় নষ্ট কোরো না, পড়ে নেও। কিন্তু প্রথমে আমাকে একটু চিনি এনে দেও। তারপর আরম্ভ কর। তোমরা মেয়ে মানুষ, আমাদের পুরুষদের কাজের খোঁজখবরে তোমাদের দরকার কি?" আমি বলিলাম, "বটেই ত! আমাদের খোঁজ খবরে দরকার নেই? খোঁজখবর নেবার মত কাজই বা কি আছে? এই তালুকের আদালতে যতটা কাজ সবজজ্ করেন, ততটা কাজ আমরা মেয়েমানুষরাও করতে পারি।" এই কথায় উনি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আজ সবজজ্দের উপর তোমার গদা উঠিয়েছ কেন? কাজ কম করা কিংবা বেশী করা—সে লোকের স্বভাবের উপর নির্ভর করে; কিন্তু তাঁরা যে কাজ করেন তা গুরুতর কাজ নয়—এ তোমার কিসের থেকে মনে হল?" আমি বলিলাম, "কাজের গুরুত্ব কে অস্বীকার করচে? কিন্তু সেই কাজের গুরুত্ব কতটা তাঁরা অনুভব করেন আমাদের এই ভ্রমণের সময়েই তা আমরা প্রত্যক্ষ দেখতে পাই। সরকার বাহাদুর ওঁদের নির্দ্দিষ্ট বেতন না দিয়ে, যদি উত্তম মধ্যম অধম এইরূপ কাজ অনুসারে কমিশনের ব্যবস্থা করতেন তা হলে এর :চেয়ে অধিক যত্ন ও শ্রমের সহিত কাজ করা হত; তাছাড়া গরীব বাদীপক্ষের লোকদের অকারণে এখনকার মতো আপীল করবার জন্য খর্চা হত না। কিন্তু একি!! আমি কথা কইতে কইতে আদার কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছি!" এইরূপ বলিয়া আদা-চিনি মিশাইয়া দিয়া পড়িতে বসিলাম। এই সময়কার পড়িবার অংশে তারার বৈধব্য অবস্থা ও তাহার বাপ-মায়ের মনের বিহ্বলতার বর্ণনা পাঠ করিবার সময় আমার মন খারাপ হইল, আমার যেন বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। এবং এই মনের আবেগের দরুন পড়া বন্ধ করিতে হইল। তাহার পর, বিধবাদের শোচনীয় অবস্থার কথা আমি এইরূপ বলিতে লাগিলাম;—"আমাদের সমাজের কোন কোন রীতি অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও মারাত্মক; তার ফল দিন দিন লোকের উপর ফলচে এবং অত্যন্ত অহিত হচ্চে এ কথা যখন লোকে বুঝ্বে তখনই ভাল হবে। এখন না বুঝুক, আস্তে আস্তে ক্রমশঃ বুঝ্বে";—ইত্যাদি কথা যখন আমি গম্ভীরভাবে ও আগ্রহের সহিত বলিতেছিলাম, তখন উনি বলিলেন,—"আজ পথেই আমার শরীর খারাপ হয়েছিল ও পেট কামড়াচ্ছিল"। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কেন বল দেখি? আজ সকালে দাস্ত সাফ্ হয় নি কি? রাত্রে কি ভাল ঘুম হয় নি? কাল রাত্রে সেই যে ঘুমিয়েছিলুম তারপর একেবারে ভোরে উঠলুম। আমিই প্রথমে জেগেছিলুম। "সখুও" সারারাত্রে একবারও ওঠে নি।"

উনি বলিলেন—"সখু" ওঠেনি বলেই তোমাকে আমি জাগাই নি। গত দুই তিন রাত্রি তার চোখের দরুন তোমাকে জাগতে হয়েছিল, তাই কাল তোমার বোধ হয় খুব ঘুম পেয়েছিল। এতে ভয় পাবার কোন কারণ নেই। রাত্রে আমার বেশ ঘুম হয়েছিল। আশপাশের হাওয়া খারাপ হবার কোন আশঙ্কা নেই; তা ছাড়া, আমরা যে জল পান করি তা ফুটিয়ে ফিল্টর করে তবে পান করি। তখন এরূপ কোন সংশয়ের কারণ নেই। কিন্তু আজ আমার শরীর ঐ রকমই খারাপ হয়েছে সত্যি।" আমি বলিলাম, "তাহলে হয় ত ঠাণ্ডা লেগে থাকবে। চিনির উপর কয়েক ফোটা পুদিনা ও আমের রস দিচ্চি ও আদার রস জাল দিয়ে আন্‌চি তাতে অসুখটা কমে যাবে।" এইরূপ বলিয়া আমি উঠিলাম এবং অনেকক্ষণ পরে এই দুই জিনিস তৈয়ারী করিয়া লইয়া আসিলাম। তখন পর্দ্দা লাগান হইয়াছিল, পর্দ্দার ভিতর হইতে উনি ফিরিয়া আসিলে দেখিলাম যেন পূর্ব্বাপেক্ষা আরও দুর্ব্বল ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। আমার তৈরী সেই দুই ঔষধ খাওয়াইয়া দিলাম এবং রবারের থলিয়া গরম জলে ভরিয়া তাহা দিয়া পেটে শেক দিলাম, কিন্তু তাহাতে কিছুই ভাল বোধ হইল না। তখন আমি ডাক্তার ডাকিতে পাঠাইলাম। তিনি আসিয়া হিং, মউরী ও পেপরমেণ্টের আরক একত্র করিয়া পান করিতে দিলেন এবং শেক্‌টা বরাবর চলুক—এই বলিয়া স্পঞ্জোপারলিনের একটা বড় টুক্‌রা পেটে সেক্ দিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। "ভাত দিও না, চাল ভেজে' তার কথ কিংবা সাবুদানা জলে সিদ্ধ করে' তাতে একটু লবণ মিশিয়ে পান করতে দেও। দুধ দিও না।"—এইরূপ ঔষধ, শেক্ ও পথ্য চলিতে লাগিল। আমাদের বাড়ীর আমি ছাড়া আর কেহই ছিল না। তথাপি আমাদের আফিসের সমস্ত লোক কাছে দাঁড়াইয়া থাকিত। এই সব লোক অধীন বলেই যে কাজ করিত তাহা নহে। ওঁর উপর তাদের যে ভক্তি ও ভালবাসা ছিল তাহার দরুন এই সব লোক তৎপরতার সহিত কাজ করিত। ঔষধো পচারের প্রয়োগ সত্ত্বেও পীড়ার কিছুই হ্রাস হইল না। চার পাঁচ মিনিটের পর আবার পীড়াটা সুরু হইল। অপরাহ্ণ প্রায় তিন চারিটা বাজিয়া গেল, তখনও আমাদের আফিসের কর্ম্মচারীদের স্নান কিংবা আহার হয় নাই। 'সখু' খুব ছোট, এক বছরের ও হয় নাই। আমাদের শিরেস্তাদার বাহিরে বাহিরে খুক্তীকে দাইয়ের দুধ খাওয়াইয়া সাম্‌লাইতেছিল, আমার কাছে আসিতে দিত না। আমার ব্যাকুলতার দরুন সখুকে আমার মনে পড়েনি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনটে পর্য্যন্ত ডাক্তার বসিয়াছিলেন; তারপর তিনি আহার করিতে বাড়ী গেলেন; "এর মধ্যে আমি একবার সন্ধ্যাকালে দেখ্‌তে আস্‌ব, কিন্তু রাত্রি ৮টার পর আদনসুমারীর কাজে নিযুক্ত থাক্‌তে হবে বলে আমি আস্‌তে পার্ব্ব না" এইরূপ বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। কিন্তু আমার বড়ই ভাবনা হইল; আমি আমাদের শিরেস্তাদারকে বলিলাম "তুমি মাম্‌লেদারের কাছে গিয়া দেখা কর এবং ওঁর অসুখের এই সমস্ত বিবরণ জানিয়ে, "অনুগ্রহ করে আজকের রাত্রিটা ডাক্তারকে আমাদের এখানে রেখে দিন,—তার বদলে আফিসের দুই জন কেরাণীকে কাজের জন্য আপনার এখানে পাঠাচ্চি" এই কথা আমার নাম করে মাম্‌লেদারকে বোলো। এই কথা বলিয়া আমি ভিতরে পর্দ্দার মধ্যে আসিলাম; আসিয়া দেখি ওঁর শরীরের অবস্থা যেরূপ তাহাতে ভাবনা হইবার কথা; মুখের ভাব বদলিয়া গিয়াছে। গা দিয়া ঘাম ছুটিতেছে, হাতের পাঞ্জা ও নখ্ একেবারে কালো হইয়া গিয়াছে। এই সমস্ত লক্ষণ দেখিয়া আমার বুক একেবারে দমিয়া গেল; আমার খুবই ভাবনা ও ভয় হইল; আমার এই ভাবটা ওঁর চখে না পড়ে এইজন্য সমস্ত দিন জোর করিয়া ধৈর্য্য ধরিয়া রহিলাম; ইতি মধ্যে ডাক্তার আসিলেন। আমি অত্যন্ত ভয় পাইয়া বলিলাম; "আর আমার সাহস হচ্চে না। পুনায় ডাক্তার বিশ্রামজীকে তার করচি। তিনি কাল সকালে আস্‌বেন; তাঁর না আসা পর্য্যন্ত, তুমি এই অবস্থায় আমাকে ছেড়ে যেও না। আমি মাম্‌লেদারকে এই কথা বলে পাঠিয়েছি, যে কাজের জন্য তোমার বদলে দুইজন কেরাণী পাঠানো হয়েছে"। এইরূপ বলিয়া আমি পুণার ডাক্তার বিশ্রামজীকে ও আমার ননদকে তার করিলাম। করমালা হইতে রেলওয়ে ষ্টেশন ১৩ মাইল দূর; তাই ঘোড়ার গাড়ী করিয়া নানা- আগাশাকে পাঠাইলাম, এবং তাকে বলিলাম;—"তুমি তার করে' ষ্টেশানেই থাক্‌বে ও ভোর চারটের সময়, ডাঃ বিশ্রামজী ও আমার ননদকে শীঘ্র নিয়ে আস্‌বে।" (ক্রমশঃ)

শোক-সংবাদ।

শ্রীমতী মাধুরী দত্ত—আমরা শোকসন্তপ্ত চিত্তে প্রকাশ করিতেছি যে মদনমিত্রের লেন নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীনারায়ণ রায় মহাশয়ের দৌহিত্রী শ্রীমতী মাধুরী দত্ত গত ১৬ই ফাল্গুন তারিখে পরলোক গমন করিয়াছেন। ঈশ্বর তাঁহার আত্মাকে শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় দিন এবং শোকগ্রস্ত আত্মীয়গণকে শান্তি প্রদান করুন। ইহাঁর মাতা শ্রীমতী সরোজিনী দত্ত তদীয় কন্যার স্মৃতিকল্পে আদিব্রাহ্মসমাজে ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন।

প্রাপ্তি স্বীকার।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে, ১৪২ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট নিবাসী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় আদিব্রাহ্মসমাজে ১০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

১৮৪০ শকের ৪ঠা ফাল্গুন দিবসের অধ্যক্ষসভার কার্য্যবিবরণ।

গত ১লা ফাল্গুন বৃহস্পতিবার দিবসের আহ্বান অনুসারে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ৬ নম্বর দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলিস্থিত ভবনের দালানে ৪ঠা ফাল্গুন রবিবার অধ্যক্ষসভার অধিবেশন হইয়াছিল। মাননীয় শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত শিতিকণ্ঠ মল্লিক এবং শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় অসুস্থতার কারণে উপস্থিত হইতে পারেন নাই।

উপস্থিত সভ্য।

শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী।
" ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
" নরেন্দ্রনাথ ঘোষ।
রায়বাহাদুর সুরেশচন্দ্র সিংহ।
শ্রীযুক্ত কেদার নাথ দাসগুপ্ত।
" পাঁচু গোপাল মল্লিক।

১। আদিব্রাহ্মসমাজের পরম সুহৃৎ ৺শরৎ চন্দ্র চৌধুরীর পরলোকগমন বিজ্ঞাপিত হইল।

স্থির হইল—তাঁহার পরলোকগমনে আদিব্রাহ্মসমাজ একজন বিশেষ বন্ধু হারাইল। তাঁহার পরিবারবর্গকে সমাজের সমবেদনা জানানো হউক।

২। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত কেদার নাথ দাসগুপ্তের সমর্থনে শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী এবং শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র চৌধুরী সর্ব্বসম্মতিক্রমে আগামী বৎসরের জন্য অধ্যক্ষসভার সভ্যরূপে গৃহীত হইলেন।

৩। ১৩২৬ সালের আনুমানিক আয় ব্যয় আলোচিত হইল।

সম্পাদক মহাশয়ের নানা কার্য্যের ঝঞ্ঝাটে ১৩২৫ সনের বজেট উপস্থিত করিতে পারা যায় নাই। ১৩২৬ সনের বজেট এক খণ্ড করিয়া অধ্যক্ষদিগের নিকটপাঠানো হইয়াছে। স্থির হইল—

(ক) ১৩২৬ সালের আনুমানিক আয়ব্যয় গৃহীত হউক।

(খ) বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজের খাজানা দিয়া উহাকে আদিসমাজের অধীনে পূর্ব্বের ন্যায় রাখা হউক।

(গ) কালনা ব্রাহ্মসমাজের দলিল করিয়া দিয়া উহার যথারীতি খাজানা দিয়া উহাকে আদিসমাজের তত্ত্বাবধানে আনা হউক।

৪। আদিব্রাহ্মসমাজের (১৮৩৭-৩৯ ত্রৈবার্ষিক কার্য্যবিবরণ আলোচিত হইল।

এই বিবরণ ইতিপূর্ব্বেই অধ্যক্ষগণের নিকট পাঠানো হইয়াছিল এবং গত ফাল্গুন মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল।

স্থির হইল—এই বিবরণ গৃহীত হউক।

৫। ১৩২৬ সনের জন্য অধ্যক্ষসভা সংগঠন ও কর্ম্মচারী নিয়োগ আলোচিত হইল।

স্থির হইল—নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ আগামী বৎসরের জন্য আদিব্রাহ্মসমাজের কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য, যথালিখিত পদে নিযুক্ত হইলেন। পুনর্নিয়োগ না হওয়া পর্য্যন্ত ইহাঁরাই স্থায়ী থাকিবেন।

১৮৪১ শকের জন্য কর্ম্মচারী নিয়োগ।

সভাপতি

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
মাননীয় জষ্টিস শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী।

সম্পাদক

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি-এ, তত্ত্বনিধি।

সহকারী সম্পাদক

শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় বি-এল।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
" ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি-এ, তত্ত্বনিধি।

অধ্যক্ষ

(স্বপদে বা exofficio)

১। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
২। ,, আশুতোষ চৌধুরী
৩। ,, ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৪। ,, চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়।

(কলিকাতা ও প্রান্তবাসী)

৫। ,, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৬। ,, ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর
৭। ,, সিদ্ধিনাথ চট্টোপাধ্যায়
৮। ,, কেদারনাথ দাস-গুপ্ত
৯। ,, নরেন্দ্রনাথ ঘোষ
১০। ,, ডাক্তার জ্ঞানেন্দ্র লাল গুপ্ত
১১। ,, পাঁচুগোপাল মল্লিক
১২। শ্রীযুক্ত সিতিকণ্ঠ মল্লিক
১৩। ,, খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
১৪। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সিংহ বিদ্যার্ণব
১৫। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু
১৬। শ্রীযুক্ত শ্যামলাল সরকার
১৭। ,, যোগেন্দ্রনাথ শিরোমণি
১৮। ,, নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল
১৯। ,, হরিপদ ত্রিবেদী
২০। ডাক্তার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ চৌধুরী
২১। শ্রীযুক্ত তুলসী দাস দত্ত
২২। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
২৩। রায়সাহেব ,, রসিকলাল রায়
২৪। ডাক্তার ,, গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়
২৫। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়
২৬। শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ মল্লিক
২৭। ,, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
২৮। ,, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী
২৯। ,, সুরেশচন্দ্র চৌধুরী

(মফঃস্বলের সভ্য)

৩০। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিশ্বাস—ধারবার
৩১। ,, উপেন্দ্রনাথ সেন—গৌহাটি
৩২। ,, জ্ঞানাভিরাম বড়ুয়া—গৌহাটি
৩৩। ,, রাজগোপাল চারিয়র—বীরভূম
৩৪। ,, সত্যেন্দ্র মোহন চৌধুরী—সেরপুর

৩৫। ,, রাজেন্দ্রনাথ বসু—বৈদ্যনাথ দেওঘর
৩৬। ,, চণ্ডীচরণ রায়-চৌধুরী—রংপুর
৩৭। ,, যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—চট্টগ্রাম।

৬। ১৩২৫ সালের ৬ই ভাদ্র ব্রাহ্মসম্মিলন উপলক্ষে ব্যয় আলোচিত হইল।

এই উপলক্ষে মোট ৫৮।০ খরচ হইয়াছে। রামমোহন লাইব্রেরীর হল পাইবার কথা ছিল, কিন্তু তাহা না পাওয়াতে সিটিকলেজ হলে সম্মিলন হইয়াছিল। এই সম্মিলনকে স্থায়ী অনুষ্ঠান করিবার চেষ্টা হইতেছে।

স্থির হইল—গত ৬ই ভাদ্রের ব্রাহ্মসম্মিলন উপলক্ষে ৫৮।০ ব্যয় অনুমোদিত হউক।

৭। আদিব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান গৃহ বিক্রয়ের প্রস্তাব আলোচিত হইল।

মাননীয় জষ্টিস্ ও আদিসমাজের অন্যতর সভাপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী প্রস্তাব করেন যে আদিসমাজের বর্ত্তমান উপাসনাস্থল লোকসংগ্রহ প্রভৃতির পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক নহে, সেই কারণে ইহা বিক্রয় করিয়া অন্য কোন সুবিধামত স্থলে ইহাকে স্থানান্তরিত করা উচিত। দেখা গিয়াছিল যে ইহার মূল্য প্রায় এক লক্ষ টাকার কাছাকাছি উঠিতে পারে। সেই টাকা দ্বারা অন্যত্র ভূমিক্রয় ও বাটী নির্ম্মাণ হইতে পারে। অধ্যক্ষসভা এবিষয়ে অনুমোদন করিলে বলের সহিত একার্য্যে নামা যায়।

স্থির হইল—বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজ গৃহ বিক্রয় করিয়া উপযুক্ত স্থানে জমী ক্রয় করিয়া নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করা হউক। এ বিষয়ের ভার সভাপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের উপর দেওয়া হউক।

৮। ব্রাহ্মসমাজের একটী সম্মিলিত সমিতি স্থাপনের প্রস্তাব আলোচিত হইল।

ব্রাহ্মসমাজের শাখাবিভাগের কারণে ব্রাহ্মসমাজ যে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে ও পড়িতেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রস্তাবটী এই যে ব্রাহ্মসমাজের তিন শাখা হইতে তিন তিন জন করিয়া প্রতিনিধি লইয়া একটী সম্মিলিত সমিতি স্থাপন করা হউক; সেই সমিতিতে ব্রাহ্মসমাজের উন্নতিকল্পে সকল প্রকার উপযুক্ত বিষয় উপস্থিত করা যাইতে পারিবে। কিন্তু কোন বিষয়ে বিবাদ বিসম্বাদের সূত্রপাত হইলেই তাহার আলোচনা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। এই বীজমন্ত্রের উপর সমিতিস্থাপন অধ্যক্ষসভার অনুমোদিত হইলে অন্যান্য শাখার নিকটে প্রস্তাব উপস্থিত করা হইবে।

স্থির হইল—যে ভাবে সম্মিলিত সমিতি স্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে, সেই মর্ম্মে প্রস্তাব গৃহীত হউক।

৯। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চৌধুরীকে সাহায্য স্বরূপে গত আষাঢ় মাস হইতে প্রতি মাসে অনধিক ১০৲ টাকা সাহায্যদানের প্রস্তাব আলোচিত হইল।

ইনি বেদান্তবিষয়ক শেষ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। ইহাঁর চরিত্র নির্ম্মল। ইনি বেদান্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে সমাজের আচার্য্য ও প্রচারক কার্য্যের উপযোগী হইবেন বলিয়া মনে হয় আপাতত ইহাঁকে সমাজের যন্ত্রালয়ের ভার দিলে চলিতে পারে। ইহা ব্যতীত সম্ভব হইলে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ৭৫ বৎসরের বিষয়সূচী ইহাঁর দ্বারা করাইয়া লইবার ইচ্ছা আছে।

স্থির হইল—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চৌধুরীকে সমাজ হইতে আগামী বর্ষ হইতে আপাতত মাসিক ১০৲ টাকা সাহায্য করা হউক।

১০। কটকপ্রবাসী শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের ১৩২৪ সালের ২২ শে মাঘ তারিখের পত্র আলোচিত হইল।

তিনি বলেন যে কটকের "ভদ্রলোকগণের আদিব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে অধিকতর উৎসাহ, অতএব অতি শীঘ্রই আমাকে কটক আদিব্রাহ্মসমাজে শনিবারে উপাসনা করিতে অনুমতি প্রদান করুন এবং এখানকার সম্পাদক মহাশয়কে পত্র প্রদান করুন ইহাই আমার প্রার্থনা।"

স্থির হইল—শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ চট্টোপাধ্যায়ের প্রার্থনা অনুযায়ী কটক ব্রাহ্মসমাজে আদিব্রাহ্মসমাজের পক্ষে উপাসনা করিবার অধিকার দেওয়া হউক এবং এ বিষয়ে তথাকার সম্পাদক মহাশয়কে পত্র লেখা হউক।

১১। আদিব্রাহ্মসমাজ মেডিক্যাল মিশন সম্বন্ধে অন্যতর ট্রষ্টী শ্রীযুক্ত দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অভিমত আলোচিত হইল।

গত শ্রাবণ মাস অবধি আদিব্রাহ্মসমাজের তত্ত্বাবধানে একটী মেডিক্যাল মিশন খোলা হইয়াছে। ইহার সাহায্যে সমাগত রোগীগণকে বিনামূল্যে হোমিওপ্যাথিমতে চিকিৎসা করা হয় এবং ঔষধ প্রদান করা হয়। ট্রষ্টডীডের বলে ইহার উপর সমাজের অর্থ ব্যয় করা যাইতে পারে কি না তদ্বিষয়ে মতভেদ হওয়াতে অন্যতর ট্রষ্টী শ্রীযুক্ত দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর মেডিক্যাল মিশন খুলিবার পক্ষে মত দিয়া সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিয়াছেন—

"আমি তোমার প্রস্তাবে মত দিতেছি কিন্তু সমাজের টাকা ব্যয় না করিয়া আলাদা একটী fund খুলিলে ভাল হয়, তাতে আমরাও যথাসাধ্য দিব। Outdoor ভিন্ন বাড়ীতে কোন patient রাখার ব্যবস্থা না হয়।"

এই মিশনের সুব্যবস্থা করিবার জন্য একটী কমিটি করিলে ভাল হয়।

স্থির হইল—আদিব্রাহ্মসমাজ মেডিক্যাল মিশন আপাতত যে ভাবে চলিতেছে সেই ভাবে পরিচালিত হউক।

১২। বগুড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দাসগুপ্ত এবং ধারবারপ্রবাসী শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিশ্বাস মহাশয়দ্বয়ের প্রচারমণ্ডলী সংস্থাপন বিষয়ক প্রস্তাব আলোচিত হইল।

স্থির হইল—পত্রখানি অধ্যক্ষগণের নিকট প্রচারিত হউক।

১৩। ঢাকানিবাসী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষের ১৩২৪ সালের ১৭ই মাঘের পত্র আলোচিত হইল।

পত্রখানি নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"আমি একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্ম, ব্রাহ্ম সাহিত্য প্রচারে প্রয়াসী।

গত বৎসর এক "ব্রাহ্মধর্ম্ম" গ্রন্থ বহু সংখ্যক ক্রয় করিয়াছি। ইহাকে ব্রাহ্মদের বাইবেল বা গীতার মত মনে করি। ইহা প্রত্যেক ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তিরই দৈনিক পাঠ্য হওয়া উচিত।

কিন্তু ইহার বর্ত্তমান আকার তাহার অন্তরায়। "ব্রাহ্মধর্ম্ম" পুস্তকখানা ইংরেজি পকেট এডিসন 'বাইবেল' 'প্রেয়ার বুক' আর্য্যমিশন "গীতা" সার রবীন্দ্রনাথের 'শান্তিনিকেতনের উপদেশ অথবা "ব্রহ্মসঙ্গীত" পুস্তকের আকার হইলে সুবিধা হয়। ইহার আকার বৃহৎ হওয়া সুবিধাজনক নহে। পাতলা কাগজ ও ক্ষুদ্র অক্ষরে মুদ্রিত হইলে, মূল্যও সুলভ করা যাইতে পারে। মূল্য যাহাই হউক কাগজ পাতলা ও আকার ক্ষুদ্র হওয়া অতি আবশ্যক।

আশা করি নূতন সংস্করণ সময় আমার প্রস্তাবনা বিবেচিত হইবে।

আমি আগামী মাঘোৎসবের সময় ১০ খানা ক্রয় করিব।"

নূতন সংস্করণের ব্রাহ্মধর্ম্ম রয়াল ১৬ পেজী আকারে ছাপা হইতেছে—ইহা পকেটসংস্করণ বাইবেলের ন্যায় ব্যবহৃত হইবে আশা করা যায়।

স্থির হইল—পত্রলেখককে লেখা হউক যে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের পকেট সংস্করণ ছাপা হইতেছে।

১৪। হুগলি পাণ্ডুয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দাসগুপ্তের বার্ষিক ১৲ টাকায় পত্রিকা প্রাপ্তির জন্য ১৯১৮ সালের ৩রা মার্চের পত্র আলোচিত হইল।

ইনি বহুদিনের গ্রাহক। চক্ষে দেখিতে পান না বলিয়া পত্রিকা বন্ধ করেন। কিন্তু তিনি লিখিয়াছেন যে—"পড়িয়া শুনাইবার লোক আছে, আমি বার্ষিক ডাকমাশুল স্বরূপ ১৲ এক টাকা দিব।"

স্থির হইল—শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দাসগুপ্তকে বার্ষিক ১৲ টাকায় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা দেওয়া হউক।

১৫। মহর্ষিদেবের বিবৃত "জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি"র স্বত্ব আদিব্রাহ্মসমাজে দানের প্রস্তাব আলোচিত হইল।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহার স্বত্বাধিকারী। তিনি এই সর্ত্তে তাঁহার স্বত্ব সমাজে প্রদান করিতে প্রস্তুত আছেন যে "উক্ত গ্রন্থের এক সংস্করণ ফুরাইয়া গেলেই পরবর্ত্তী এক বৎসরের মধ্যে অন্তত ৫০০ শত কাপির একটী সংস্করণ সমাজের ব্যয়ে প্রকাশ করা হইবে, এবং প্রতি বৎসরের শেষে ইহার হিসাব তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশ করা হইবে। এই সর্ত্তের অন্যথা হইলে উহার স্বত্ব তাঁহারই নিজস্ব থাকিবে।"

স্থির হইল—জ্ঞান ও ধর্ম্মের এক খণ্ড সভাপতি মহাশয়ের নিকট প্রেরিত হউক এবং আগামী অধিবেশনে তাঁহার মতামত সহ প্রস্তাব পুনরায় উপস্থিত করা হউক।

১৬। ঢাকানিবাসী শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের নবকুমার উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের লাইব্রেরীর জন্য আদিব্রাহ্মসমাজের প্রকাশিত পুস্তক বিনামূল্যে প্রার্থনা করিয়া ১৩২৪ সালের ৪ঠা মাঘের পত্র আলোচিত হইল।

অবিনাশ বাবু তাঁহার শিক্ষাসমাচার পত্রে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বিজ্ঞাপন বিনামূল্যে প্রকাশ করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। আদিসমাজের যে সকল পুস্তক দেওয়া যাইতে পারে সেগুলির এক এক খণ্ড প্রদান করিলে উপযুক্তরূপেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়।

স্থির হইল—যে সকল পুস্তক বিনামূল্যে বা অল্পমূল্যে দেওয়া সম্ভব সেগুলি সেইরূপ মূল্যে দেওয়া হউক।

১৭। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রীর নিকট প্রাপ্যের ব্যবস্থা বিষয়ে তাঁহার ১৯১৮ সালের ৩রা এপ্রিলের পত্র আলোচিত হইল।

পত্রের অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"সবিনয় নিবেদন—

আমার মিলিন্দ প্রশ্ন ছাপা সম্বন্ধে আমার নিকট আপনাদের যে পাওনা আছে, তদ্বিষয়ে আমি এইরূপ প্রস্তাব করিতেছি—

এ পর্য্যন্ত যে অংশ ছাপা হইয়াছে বা হইবে, তাহার খরচ আমি কিছু দিব না।

এই ও ইহার পরবর্ত্তী অংশ সমস্তই আমি সমাজের হস্তে অর্পণ করিব, সমাজ ইহা প্রকাশ করিয়া বিক্রয় করিবেন

ছাপা প্রভৃতি ইহার প্রকাশ ও প্রচার বাবতে সমাজের যাহা ব্যয় হইবে, পুস্তক বিক্রয়ের আয়ে তাহা উঠিয়া গেলে, লাভের অংশ সমাজ ও আমার মধ্যে অর্দ্ধেক হইবে। আপনারা এই প্রস্তাব অনুমোদন করিলে অনুগৃহীত হইব।"

স্থির হইল—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রীর প্রস্তাব গৃহীত হউক।

১৮। মাদ্রাজের শ্রীযুক্ত পি, এল নারায়ণের পত্র।

তিনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বিনামূল্যে প্রার্থনা করিয়াছেন, এবং মহর্ষিদেবের ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্যাখ্যানের তেলেগু ভাষায় অনুবাদ প্রকাশের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছেন।

স্থির হইল—শ্রীযুক্ত পি, এল নারায়ণের প্রস্তাব গৃহীত হউক।

১৯। পতিসর ঠাকুর কাছারীর জেনারেল ম্যানেজার শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরীর পতিসর মহর্ষি ইনষ্টিটিউটের বেতনের বিল ছাপা সম্বন্ধে ১৩২৫ সালের ১৪ই আশ্বিন তারিখের পত্র আলোচিত হইল। তিনি উক্তপত্রে লিখিয়াছেন যে—

কোন্ অর্ডারে ছাপা হইয়াছে, তাহা মধু বাবু ১৩২০ সালের ২১ শে মাঘের পত্রে জানিতে চাহেন। উক্ত পত্রের উত্তরে ৩০ শে মাঘ ৮৯ নং পত্রে অর্ডারের বিষয় জানান হয়। ৩০ শে মাঘ মধু বাবু পেন্সন লইয়া এখান হইতে চলিয়া যাওয়ায় সে সময়ে জানকী বাবুর উপর কার্য্যভার থাকে। তিনি উক্ত ৮৯ নং পত্র পাইয়া যথা সময়ে রসিদ বহিগুলি না পাঠানে এক্ষণে আর তাহা কোন প্রয়োজনে লাগিবে না, সুতরাং উহার মূল্যও দেওয়া হইবে না বলিয়া দ্বিজেন বাবুকে লিখেন। তাহার পর আমি ও জানকী বাবু কয়েক বার কলিকাতা গেলে উক্ত টাকা না পাইলে তাঁহার দণ্ড হয় বলিয়া দ্বিজেন বাবু কাকুতি মিনতি করেন। অসঙ্গত রূপে

টাকা দেওয়া যাইতে পারে না বলিয়া তাঁহাকে প্রত্যেক বারই বলা হইয়াছে।

স্থির হইল—পতিসর মহর্ষি ইনষ্টিটিউটের বেতনের বিলছাপা বাবতে পাওনা ৩২৷০ ছাড়িয়া দেওয়া হউক।

২০। কার্য্যাধ্যক্ষের ভাদ্রোৎসব ও মাঘোৎসব উপলক্ষে সমস্ত কার্য্য সুশৃঙ্খলার সহিত নির্ব্বাহ করিবার জন্য ৫৲ টাকা পুরস্কার দিবার প্রস্তাব আলোচিত হইল।

স্থির হইল—কার্য্যাধ্যক্ষকে ৫৲ টাকা পুরস্কার দিবার প্রস্তাব গৃহীত হউক।

২১। কম্পোজিটার শ্রীগোপীনাথ ঘোষের মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে ৫৲ সাহায্য প্রদানের প্রস্তাব আলোচিত হইল।

স্থির হইল—কম্পোজিটর গোপীনাথ ঘোষকে ৫৲ টাকা সাহায্য দিবার প্রস্তাব গৃহীত হউক।

২২। বর্দ্ধমান রাজ-ষ্টেটের সুপারিটেনডেণ্ট শ্রীক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ১৬ই মাঘের পত্র আলোচিত হইল।

তিনি লিখিয়াছেন যে কালনা ব্রাহ্মসমাজের ব্যবস্থা অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় করিতেছিলেন। সম্প্রতি তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। সত্বর উক্ত সমাজবাটীর কবুলতি প্রদান করিয়া সমাজের ব্যবস্থা করিতে লিখিয়াছেন।

স্থির হইল—সমাজবাটীর কবুলতি সম্পাদন করিয়া সমাজের ব্যবস্থা করা হউক।

২৩। মালাবার ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক রায় সাহেব এ. গোপালম মহাশয়ের ৩০শে জানুয়ারীর পত্র আলোচিত হইল।

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য মালাবারী ভাষায় একখানি সাপ্তাহিক পত্রের প্রয়োজন, অর্থাভাবে পারিতেছেন না, তজ্জন্য ব্রাহ্মসমাজের নেতাগণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন।

স্থির হইল—বর্ত্তমান বৎসরে সাহায্যের প্রস্তাব গৃহীত হইতে পারে না।

২৪। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চৌধুরীকে আচার্য্যের কার্য্য করিতে দিবার প্রস্তাব আলোচিত হইল।

স্থির হইল—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চৌধুরীকে উপাচার্য্যপদে নিযুক্ত করা হউক।

২৫। শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদক পতিসর মহর্ষি ইনষ্টিটিউট, শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, মহাশয়গণের প্রেসের দেনা সম্বন্ধে আলোচনা হইল।

স্থির হইল—উঁহাদের দেনা হিসাব হইতে বাদ দিয়া উঁহাদের হিসাব পরিস্কার করিয়া লওয়া হউক।

২৬। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দাসগুপ্ত মহাশয়কে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য পাথেয় দিবার প্রস্তাব আলোচিত হইল।

স্থির হইল—ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য একটী পৃথক অর্থভাণ্ডার খোলা হউক এবং রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র সিংহ মহাশয়ের উপর এই বিষয়ের যথাযথ ব্যবস্থা করিবার বিশেষ ভার অর্পিত হউক।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সম্পাদক

শ্রীআশুতোষ চৌধুরী। সভাপতি

৬ই ফাল্গুন ১৩২৫।

কুড়ানো গান।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক হিন্দী অবলম্বনে)

(১)

প্রাণারাম ভজ না—মনরে দেখ না
সংসার কি কারখানা।
সাধুসঙ্গে সদাই রে রহ
ছাড়িয়া রঙ্গ ছলনা
বাপ মা বল স্ত্রী-পুত্র আর
হবে নাকো কেউ আপনা
ধনদৌলত রুপা সোনা
নাহি কিছু রবে তোর
ধরণী ছাড়িয়া যেতে হবে
ইহা স্মরণে রাখ না
শেষের দিনেতে একা হবে যেতে
এ কথা সবারি জানা
সে সময়ে ওরে ভগবৎ-নাম
হৃদয়ে ধরিতে ভুলো না।

(২)

মুখ রে কি আর দেখ দরপণে
দয়া ধরম তোর নাহি কিছু মনে
হরিনামের তরী করে তাঁরি দেওয়া ঘটে
সাধু যোগী কত হয়ে গেল পার
পাপী ডুবিল জলে।
তিলে তিলে মায়া চলিছে বাড়িয়া
জমা হয়ে বর্ত্তনে
ভাগ্য তব হায় টুটিবে যেদিন
কাকে খাবে যতনে
কাগজের তরী করে ছেড়েছ জলপরে
কত সাধু যোগী হয়ে গেল পার
পাপী ডুবিল জলে।

বর্ষ শেষ ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ৩০শে চৈত্র রবিবার বর্ষ শেষ। প্রত্যেক জীবনের একটি বৎসর নিঃসেষিত হইবে। জন্ম মৃত্যুর মধ্য দিয়া যিনি আমাদিগকে অনন্তের পথে অগ্রসর করিতেছেন—এই বর্ষশেষ দিনে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় আদিব্রাহ্মসমাজ গৃহে তাঁহার বিশেষ উপাসনা হইবে।